ব্রত উদ্‌যাপনের জন্য আবির্ভূত হইলেন ভগবান বুদ্ধ, 'শিবোঽহং' বাণী ঘোষণায় আবির্ভূত হইলেন শঙ্করাচার্যের ন্যায় মহামানব। যুগে যুগে এই আবির্ভাবের ফলে সাহিত্য ও ইতিহাস আজিও শাশ্বত ও সুবর্ণস্তরে মণ্ডিত হইয়া আছে। ইহাঁরই শেষ স্তর—শ্রীচৈতন্য দেবের নাম-সংকীর্তন। কলিতে ইহা ব্যতীত মুক্তির আর কোন সহজ পন্থা নির্দেশিত হয় নাই।

প্রাকৃত, পালি প্রভৃতি ভাষার আঘাত-প্রতিঘাত সহ্য করিয়াও চৈতন্য যুগে সংস্কৃত সাহিত্য নবরূপে রূপায়িত হইবার সুযোগ লাভ করিয়াছিল। একদিকে বাসুদেব, রঘুনাথ প্রমুখ দার্শনিকগণের দর্শনশাস্ত্র আলোচনা এবং অপর দিকে স্মার্ত রঘুনন্দনের স্মৃতিশাস্ত্র যুক্তি দিয়া হিন্দু-সমাজ-বন্ধনরূপ যুগান্তর সৃষ্টি করিতে ক্রমশঃ সমর্থ হইয়াছিল। সেই সময়েই শ্রীচৈতন্যদেবের মুক্তির পথ প্রদর্শক নবধর্মের বিজয় বৈজয়ন্তী দিকে দিকে উড্ডীন হইয়াছিল। আর সেই সঙ্গে সঙ্কটসঙ্কুল নৈরাশ্যের মধ্যে মুক্ত মন্ত্রে ধ্বনিত হইয়াছিল মহামন্ত্র "হরের্ণাম হরের্ণাম হরের্ণামৈব কেবলম্।" আচণ্ডাল সকলেই নাম সংকীর্তন রূপ অমৃতের সন্ধান পাইলেন, সকলেই মুক্তির এই সহজ পথটিকে কলির মহামন্ত্ররূপে গ্রহণ করিয়া নিজেকে ধন্য জ্ঞান করিলেন। এই নামই সকল জীবের যন্ত্রণায় সুশীতল নির্ঝর হইয়া দেখা দিল। দর্শনশাস্ত্র এক অভিনব রূপ পরিগ্রহ করিল এবং বৈষ্ণব সাহিত্য এই সময়ে এক গৌরবোজ্জ্বল অধ্যায়ে পরিণত হইল। কত কবি, শাস্ত্রকার, দার্শনিক ও নাট্যকার আবির্ভূত হইলেন। সাহিত্যের এই নবযুগের প্রবর্তক হইলেন শ্রীচৈতন্যদেব।

তাঁহার ধর্মমত প্রচারের জন্য তিনি কোন গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন বলিয়া জানা যায় না বটে, কিন্তু তিনি যে সকল শ্লোক ও পদাবলী উচ্চারণ করিতেন, তাহা যে তাঁহারই রচিত এ বিষয় কোন সন্দেহ নাই। যে ভাব-সম্পদ বৈষ্ণব সাহিত্যে স্থান লাভ করিয়াছে তাহার একটি "শিক্ষাষ্টক।" এই শিক্ষাষ্টকে একাধারে স্মৃতি, দর্শন ও কাব্য সবই আছে। এতদ্ব্যতীত ইহাতে আছে নাম-সংকীর্তনরূপ জীব-মুক্তির সহজ পথ-নির্দেশ। জগন্নাথের মন্দির ও সমুদ্র দর্শনে শ্রীচৈতন্যের যে ভাবের উদয় হইয়াছিল, তাহা ব্রহ্ম দর্শনের পরিচায়ক। এই নাম-সংকীর্তনের প্রভাব আসমুদ্র হিমাচল সকলের প্রাণে নব-জীবনের সঞ্চার করিয়াছিল। এই সময়ে একদিকে যেমন সংস্কৃত সাহিত্যের উন্নতি হইয়াছিল, অপর দিকে তেমনই বাংলা সাহিত্য ও বৈষ্ণব পদাবলী দ্বারা সাহিত্য চরম উৎকর্ষ লাভ করিয়াছিল।

বৈষ্ণব সাহিত্যের অবতারণায় [illegible] বা ষট্‌-বৈষ্ণবাচার্যের প্রসঙ্গ অপরিহার্য। বৈষ্ণব কবি ভক্তপ্রবর নরোত্তম দাস ষট্‌গোস্বামী সম্বন্ধে লিখিয়াছেন—

> শ্রীরূপ শ্রীসনাতন ভট্ট রঘুনাথ।
> শ্রীজীব [illegible] দাস রঘুনাথ॥
> এ ছয় গোসাঞীর কর চরণ বন্দন।
> যাঁহা হইতে বিঘ্ননাশ অভীষ্ট পূরণ॥

এই ষট্‌ অর্থাৎ ছয় গোস্বামীপাদ সংস্কৃত সাহিত্যে যে স্মৃতি রাখিয়া গিয়াছেন, শ্রীচৈতন্যদেবের উজ্জ্বল জ্যোতির সঙ্গে তাহাও শাশ্বত হইয়া আছে। শ্রীরূপ ও সনাতন দুই ভ্রাতা ষট্‌গোস্বামীপাদের দুইটি উজ্জ্বল রত্ন। এই দুই ভাই-ই গৌড়ের বাদশাহ হোসেন শাহের দরবারে উচ্চ রাজকার্যে নিযুক্ত ছিলেন। রূপ ছিলেন উজীর এবং সনাতন ছিলেন বাদশাহের সচিব। বাদশাহ রূপ সনাতনের কার্যে সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহাদিগকে যথাক্রমে দবিরখাস ও শাকর মল্লিক উপাধিতে ভূষিত করেন। জ্যেষ্ঠের আবির্ভাবকাল ১৪১০ শক এবং কনিষ্ঠের আবির্ভাব কাল ১৪১১ শক। প্রথমে শ্রীরূপের সংসারের প্রতি বৈরাগ্য উপস্থিত হয়, ক্রমে জ্যেষ্ঠ-ভ্রাতাও সংসারের প্রতি বীতশ্রদ্ধ হইয়া উঠেন। শ্রীরূপ মালদহ জেলার অন্তর্গত রামকেলী নামক স্থানে শ্রীচৈতন্য-দেবের সহিত মিলিত হন। পরে মহাপ্রভুর আদেশক্রমে দুই ভাই কর্তৃক বৃন্দাবন তীর্থের উদ্ধার সাধিত হইয়াছিল। শ্রীরূপ ও সনাতন পরম পণ্ডিত ছিলেন। তাঁহাদের রচিত গ্রন্থ তাঁহাদিগকে অমর করিয়া রাখিয়াছে। শ্রীরূপ গোস্বামী প্রণীত বা সঙ্কলিত কয়েকখানি গ্রন্থের নাম—ভক্তিরসামৃতসিন্ধু। এই গ্রন্থ ১৪৬৩ শকে প্রণীত হইয়াছিল। হংসদূত, উদ্ধবদূত, শ্রীরূপচিন্তামণি গ্রন্থে শ্রীকৃষ্ণ রাধিকার বিষয় বর্ণিত আছে। এতদ্ব্যতীত রাধাকৃষ্ণের লীলা মাহাত্ম্য সম্বন্ধে নন্দনাষ্টক, চাটুপুষ্পাঞ্জলী, তুলস্যষ্টক, বৃন্দাদেবাষ্টক, শ্রীমুকুন্দ মুক্তাবলী স্তব, স্তবমালা, পদ্যাবলী

প্রভৃতি পুস্তক রচিত হইয়াছিল। ললিতমাধব, বিদগ্ধমাধব প্রভৃতি নাটকেও শ্রীকৃষ্ণ রাধিকার লীলা মাহাত্ম্য বর্ণনা করা হইয়াছে। কৃষ্ণ জন্মতিথি বিধি, লঘুগণ দেশ দীপিকা, প্রেমেন্দ্রসাগর, প্রযুক্তাক্ষচন্দ্রিকা, দানকেলি কৌমুদী, ছন্দোঽষ্টাদশ প্রভৃতি গ্রন্থ তাঁহার রচিত।

সনাতন গোস্বামী রচিত গীতাবলী, রসময় কলিকা, বৈষ্ণব তোষিণী, ভাগবতামৃত, হরিভক্তিবিলাস ও শ্রীমদ্ভাগবতের দিক প্রদর্শনী টীকা প্রভৃতি গ্রন্থগুলি সমধিক প্রসিদ্ধ। ষট্ গোস্বামীপাদের তৃতীয় গোস্বামী শ্রীজীব গোস্বামী শ্রীরূপ ও সনাতন গোস্বামীর কনিষ্ঠ ভ্রাতা শ্রীবল্লভ গোস্বামীর পুত্র। ১৪৫৫ শকে ইঁহার আবির্ভাব, ইনি দীর্ঘ ৮৫ বৎসরকাল জীবিত ছিলেন কিন্তু মাত্র ২০ বৎসর গৃহবাসী ছিলেন। অবশিষ্ট জীবন সংসার ত্যাগী হইয়া শ্রীবৃন্দাবন ধামে অতিবাহিত করিয়াছিলেন। পিতৃব্যদ্বয় যে পথ অবলম্বন করিয়াছিলেন, অল্পবয়সে তিনিও সেই পথাবলম্বী হইলেন। রাজসুখ তাঁহাকে ত্যাগের পথ অবলম্বনে বাধা দিতে পারে নাই। তাঁহার বৈরাগ্য সম্বন্ধে বৈষ্ণব কবির কিয়দংশ নিম্নে উদ্ধৃত করা হইল।

নানা রত্নভূষা পরিধেয় সূক্ষ্মবাস।
অপূর্ব্ব শয়ন শয্যা ভোজন বিলাস॥
এ সব ছাড়িল কিছু নাহি ভয় চিতে।
রাজ্যাদি বিষয় বার্ত্তা না পারে শুনিতে॥
* * * *
অল্প বয়সেতে অতি গভীর অন্তর।
শ্রীমদ্ভাগবত জানে প্রাণের দোসর॥
সদা কৃষ্ণকথা সুখ সমুদ্রে সাঁতারে।
অন্যকথা কেহ ভয়ে কহিতে না পারে॥
শ্রীজীব বালককালে বালকের সনে।
শ্রীকৃষ্ণ সম্বন্ধে ভিন্ন খেলা নাহি জানে॥

ইত্যাদি,—

পিতৃব্যদ্বয়ের পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়া বৃন্দাবনে অবস্থান কালে তিনি বহু ভক্তিমূলক গ্রন্থাদি প্রণয়ন করেন এবং বহু ভক্তিশাস্ত্রের টীকা প্রকাশ করিয়া বৈষ্ণব ধর্মের মহাত্ম্য প্রচার করেন। তাঁহার গ্রন্থ সমূহের মধ্যে কৃপাম্বুধিস্তব, কৃষ্ণপদচিহ্ন, কৃষ্ণার্চ্চনদীপিকা, শ্রীকৃষ্ণ সন্দর্ভ, গোপাল বিরুদাবলী, শ্রীগোপাল চম্পু, ধাতুসংগ্রহ, ভাবার্থসূচকচম্পু, হরিনামামৃত ব্যাকরণ, সূত্রমালা, রসামৃতশেষ, শ্রীমাধব মহোৎসব, সংকল্প কল্পবৃক্ষ, ষট্-সন্দর্ভ, যোগসার স্তব বটীকা, রসামৃতটীকা, ব্রহ্মসংহিতা টীকা, উজ্জ্বল নীলমণি টীকা, গায়ত্রীভাষ্য, লঘুতোষিণী প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য।

ষট্ গোস্বামীর চতুর্থ রঘুনাথ ভট্ট বারাণসীর অধিবাসী ছিলেন। ইনি ১৪২৭ শকে জন্মগ্রহণ করেন। পিতৃবিয়োগের পর তিনি সংসার ত্যাগ করিয়া নীলাচলে মহাপ্রভুর সহিত মিলিত হন। ইঁহার রচিত গ্রন্থ লুপ্ত হইয়াছে। পঞ্চম গোস্বামীপাদ গোপাল ভট্ট ১৪২৫ শকে দাক্ষিণাত্যের অন্তর্গত ভট্টমারি গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। ইঁহার রচিত ভক্তিবিলাস নামক একখানি মাত্র গ্রন্থ পাওয়া যায়, এই গ্রন্থখানি হরিভক্তিবিলাস নামেও প্রচলিত এবং ইহার আট সহস্র শ্লোকে বৈষ্ণবদিগের কর্তব্য সম্বন্ধে বিশদভাবে নির্দেশ দেওয়া হইয়াছে। ষট্গোস্বামীপাদের ষষ্ঠ গোস্বামী রঘুনাথ ১৪২৮ শকে সপ্তগ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। ইঁহার রচিত বিলাপকুসুমাঞ্জলী স্তোত্র ও মনঃশিক্ষা কাব্য গ্রন্থে কৃষ্ণলীলা ও কৃষ্ণপ্রেম সম্বন্ধে বিষয় বস্তুর সমাবেশ দেখা যায়।

শ্রীচৈতন্যদেবের আবির্ভাবের সঙ্গে সঙ্গে ষট্ গোস্বামীপাদের পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়া আরও বহু মহাজন সংস্কৃত সাহিত্যের সেবায় ব্রতী হইয়াছিলেন। শ্রীচৈতন্যের লীলা-মাহাত্ম্যই তাঁহাদের অধিকাংশের লক্ষ্যবস্তু ছিল। সংস্কৃত সাহিত্যের পরিপুষ্টি সাধনে কবিকর্ণপুর, প্রদ্যুম্ন মিশ্র, প্রবোধানন্দ সরস্বতী এবং মুরারী গুপ্ত প্রভৃতি সমধিক প্রসিদ্ধ। কবি কর্ণপুর চৈতন্যচরিতামৃত কাব্য, চৈতন্য চন্দ্রোদয় নামক নাটক, আনন্দ বৃন্দাবন ও শ্রীগৌরগণোদ্দেশ-দীপিকা নামক কাব্য এবং অলঙ্কার কৌস্তুভ নামক অলঙ্কার গ্রন্থ রচনা করেন। মুরারী গুপ্ত একই চতুষ্পাঠীতে শ্রীচৈতন্যের সহপাঠী ছিলেন। তিনি ১৪৩৫ শকে শ্রীচৈতন্যের বাল্যলীলা প্রসঙ্গে চৈতন্যচরিত গ্রন্থ রচনা করেন। বাঙলা ভাষায় রচিত তাঁহার গৌরপদাবলী বিশেষ সমাদর লাভ করে। প্রদ্যুম্ন মিশ্র সংস্কৃত ভাষায় 'চৈতন্যোদয়াবলী' রচনা করেন। এই গ্রন্থের বিভিন্ন সর্গে শ্রীচৈতন্যের জীবন বৃত্তান্ত বর্ণিত আছে। প্রবোধানন্দ সরস্বতী রচিত চৈতন্যচন্দ্রামৃত নামক গ্রন্থে সংস্কৃত ভাষায় বৈষ্ণব ধর্মের বিষয় বর্ণনা করা হইয়াছে। সমকালে শ্রীচৈতন্য সম্বন্ধে বহু সংহিতা ও তন্ত্র নামেও পরিচিত হইয়া আছে। তাঁহার সম্বন্ধে লিখিত চৈতন্যভাগবত, চৈতন্যচরিতামৃত, চৈতন্যমঙ্গল গ্রন্থে যে সকল শ্লোক লিখিত আছে, সেই সমসাময়িক কালের রচিত বলিয়া অনুমিত হয়। মোট কথা, শ্রীচৈতন্যদেবের আবির্ভাবে সংস্কৃত সাহিত্যে ভক্তিশাস্ত্রের বহু অঙ্গ পরিপুষ্টি লাভ করায়, সাহিত্য নবরূপে রূপায়িত হইবার সুযোগ লাভ করিয়াছিল। তাই শ্রীচৈতন্যের অবদান সাহিত্য ক্ষেত্রে আজিও অম্লান ও অক্ষয় হইয়া আছে এবং ইহার উজ্জ্বল জ্যোতি কখনও ম্লান হইবার নহে।

অবক্ষয়

তপোবিজয় ঘোষ

শেষ পর্যন্ত ফিরে এল সুধাকান্ত।

এতক্ষণ বদ্ধঘরে বসে উসখুস করেছিলেন স্বর্ণময়ী। কিছুই যেন ভাল লাগছিল না তার। একটা অসহ্য অস্থিরতার ভারে জড়িয়ে জড়িয়ে আসছিল শিরা স্নায়ুগুলো। ঘরে ঘড়ি নেই। রাত কতটা ঠিক আন্দাজ করতে পারছিলেন না। বাইরের অপ্রশস্ত উঠোনটুকু কালো। ডুমুর গাছের খসখসে পাতাগুলো আর নজরে আসছে না। কোনকালে একটা গাছ যে টান টান হয়ে দাঁড়িয়েছিল ওই রান্নাঘরের দেয়াল ঘেঁষে এখন আর বোঝা যাচ্ছে না। স্বর্ণময়ী অন্ধকারের কালোতে চোখ মেলে বসেছিলেন চুপ করে। বসেছিলেন আর নিস্তব্ধ গলিপথে কোন এক পরিচিত পায়ের শব্দ শোনবার আশায় প্রহর গুণছিলেন।

সেই কখন চলে গেছে সুধাকান্ত—সন্ধ্যা-বাতি জ্বালার আগে। ছাই ছাই বিকেলের ধূসরতায়। মোড় থেকে একটা রিক্সা ডেকে এনেছিল আগে। বৌমাকে হাসপাতালে নিয়ে গেছে সেই রিকসায় করে। এখনও ফিরে আসার নামটি নেই।

ভয়ে বেদনায় বড় কুঁকড়ে যাচ্ছিলেন স্বর্ণময়ী। প্রতি বিলম্বিত মুহূর্ত যেন শ্বাসরোধকারী যন্ত্রণায় চেপে বসছিল তাঁর বুকে। কে জানে কি আছে পোড়া অদৃষ্টে! হাসপাতালকে ভারি ভয় স্বর্ণময়ীর। এখন থেকে নয়—সেই ছোটবেলা থেকেই। জীবনে কখনো ওসব জায়গার ছায়া মাড়াননি তিনি। আর শুধু তিনিই বা কেন, রায় বংশের কেউই না। ভুলেও কোন সময় নাম উঠে নি তাদের হাসপাতালের খাতায়। সুখের সংসার তখন স্বচ্ছলতায় জমজমাট। অভাব দারিদ্র্য মালিন্যের চিহ্নও ছিল না কোথাও। কিন্তু—

একটা চাপা দীর্ঘনিশ্বাস ফেললেন স্বর্ণময়ী। এ সব আজ অতীতের কথা। স্মৃতি-কথা। এ স্মৃতি রোমন্থনে সুখ নেই। নেশা নেই। আছে দাহ। অন্তহীন প্রবল দাহ। সমস্ত মনটাকে ক্ষতাক্ত করে দিয়ে যায়। নিরাশার বেদনায় বড় আর্ত আর করুণ করে তুলে। দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে স্বর্ণময়ী একটু সজাগ হয়ে উঠলেন। পাশের গলিপথে মৃদু ঠুন ঠুন শব্দ, একটা রিকসা চলে যাচ্ছে। বাইরের অদৃশ্য ডুমুর গাছটা সচকিত হয়ে উঠেছে সেই শব্দে। একটা নিশাচর পাখী ডানা ঝাপটিয়ে ঘোষণা করছে নিজের অস্তিত্ব। সুধাকান্ত ফিরে এল, এই সময়।

স্বর্ণময়ী উঠলেন। উঠে দরজা খুলে দিলেন। দিয়ে তাকালেন সুধাকান্তর মুখের দিকে : সুধা?

সুধাকান্ত ঘরে ঢুকতে ঢুকতে বলল : ভর্তি করে দিয়ে এলাম মা।

স্বর্ণময়ী তবু নড়লেন না, চড়লেন না। স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন একই জায়গায়। শুধু সুধাকান্তর মুখের উপর তার চোখের খোলাটে দৃষ্টিটা আবদ্ধ হয়ে রইল। অর্থাৎ আরো কিছু শুনতে চান তিনি। আরো কিছু জানতে চান।

সুধাকান্ত বুঝল। দরজাটা বন্ধ করতে করতে লজ্জিত ভঙ্গিতে বলল : আজ রাত্রে কিছু হবে না মা। ডাক্তার বলল।

—ও। স্বর্ণময়ী মৃদুস্বরে বললেন : একা ফেলে এলি ওখানে! বৌমার কোন অসুবিধা হবে না ত?

—অসুবিধা।

ঘরের কালি-লেপা হারিকেনের নিষ্প্রভ আলোটার মত একটু যেন হাসতে চাইল সুধাকান্ত। কিংবা হাসির ভঙ্গিতে বিকৃত হয়ে গেল তার ঠোঁট দুটো।

—না মা। খুব নাম-করা হাসপাতাল ওটা। রোগীদের খুব যত্ন নেয়।

স্বর্ণময়ী কিন্তু এই আশ্বাস বাক্যে বিন্দুমাত্র সান্ত্বনা পেলেন কিনা বোঝা গেল না। আস্তে আস্তে বললেন : ভগবান করুক, ভালয় ভালয় ফিরে আসুক বৌমা! তুই আয়—হাত মুখ ধুয়ে খেয়ে নে।

সে রাত্রে সুধাকান্তর আর কিছু করবার ছিল না। নিশ্চিন্ত আরামেই ঘুমোতে পারত সে। ক্লান্ত অবসন্ন দেহটাকে পরম প্রশান্তিতে ডুবিয়ে দিতে পারত নিটোল একটি স্বপ্নের মধ্যে। এ বাড়ির শূন্যতায় কোন এক নরম ঠোঁটের আধো-আধো কাকলির গুঞ্জন শুনতে শুনতে রোমাঞ্চিত হয়ে উঠতে পারত। কিন্তু পারল না। বাজন্ত নূপুরের মত সুলেখা হয়ে উঠতে পারল না সুধাকান্তর দেহ-মন। বিছানায় শুয়ে থাকলেও কিছুতেই ঘুম নামল না তার চোখে। ও ঘরে স্বর্ণময়ী এতক্ষণে ঘুমিয়ে পড়েছেন হয়ত। আর কোন সাড়াশব্দ পাওয়া যাচ্ছে না তার। কিন্তু সুধাকান্ত ঘুমায় কি করে?

এই সংসারে পুরুষ বলতে সে একা! স্বর্ণময়ীর ভরসা আর সুরমার একান্ত নির্ভয় আশ্রয়। তার অনেক কর্তব্য। অনেক দায়িত্ব। নিশ্চিন্ত আরামে সে ঘুমায় কি করে। হয়ত পারত—যদি এমন ছন্নছাড়া না হত ভাগ্যটা। যদি টিউশনি জুটোর সঙ্গে সঙ্গে একটা যেমন তেমন বাঁধা চাকরি থাকত তার। তাহলে হয়ত কেন, মাসের এই শেষ তারিখটিতে এসেও নিশ্চয়ই খানিকটা নিশ্চিন্ত থাকতে পারত সে। উপভোগ করতে পারত তন্দ্রা-ঘন আজকের রাতটাকে। অনেক শান্তিতে অনেক আনন্দে স্বপ্নের নিটোল জাল বুনে বুনে কাটিয়ে দিতে পারত। কিন্তু—

সুরমা হাসপাতালে। অথচ এই হাসপাতালকে স্বর্ণময়ীর মতই বেজায় ভয় করত সে। সুধাকান্তর মনে আছে দেশ ভাগ হওয়ার পর পৈতৃক ভিটে মাটি ছেড়ে যখন কোলকাতায় উঠে এল ওরা, সেই তখন একবার টাইফয়েড্ হয়েছিল সুরমার। জ্বর-বিকারের ঘোর দেখে ঘাবড়ে গিয়েছিল সুধাকান্ত। পাড়াপ্রতিবেশীর পরামর্শে ওকে হাসপাতালে পাঠানোই ঠিক করেছিল। সেই তখন সুরমার সে কি ছেলেমানুষী কান্নাকাটি! যাবে না সে। কিছুতেই যাবে না হাসপাতালে।

—মরতে হয় আমি এখানেই মরব। তোমার দুটি পায়ে পড়ি—আমাকে হাসপাতালে যেতে বলো না! সুধাকান্তর হাত ধরে ঝরঝর করে কেঁদে ফেলেছিল সুরমা। সাত বছরের অবুঝ একটা শিশুর মত।

স্বর্ণময়ীও ধুয়া ধরেছিলেন সেই সঙ্গে : বালাই ষাট্। ও হাসপাতালে যাবে কোন দুঃখে শুনি! রায় বংশের কেউ কোনদিন গিয়েছে নাকি হাসপাতালে। তোর যেমন বাঁকা বাঁকা কথা!

সে কথা সত্যি। সুধাকান্ত অস্বীকার করতে পারেনি মায়ের যুক্তি। জ্ঞানতঃ রায় বংশের কাউকে কোনদিন হাসপাতালে যেতে সেও দেখেনি। শেষের দিকে অবস্থাটা যদিও সামান্য পড়ে এসেছিল তাদের, কমে এসেছিল জমি-জমার আয়, তবু রায় বংশের এতখানি দুর্ভাগ্য তারা কল্পনাও করত না। কিন্তু আজকে—

অন্ধকার ঘরে সুধাকান্ত পাশ ফিরল। শিয়রের কাছের জানালাটা খোলা। নক্ষত্র ছাওয়া আকাশের এক ফালি দেখা যাচ্ছে স্পষ্ট। জমাট অন্ধকারটা সামান্য তরল হয়ে এসেছে। ঝির ঝির করে হিমেল বাতাস আসছে একটু। শরতের বাতাস। ভেজা-ভেজা সোঁদা-গন্ধী। না গরম, না শীত—কেমন যেন একটা চাপা গুমোট ভাব। সুধাকান্ত স্থির দৃষ্টিতে চেয়ে রইল বাইরের সঙ্কীর্ণ আকাশটুকুর দিকে। সামনেই কয়েকটা তারা জ্বলছে। সোহাগে আদরে জড়াজড়ি করে। কারা ওরা? সপ্তর্ষী? স্বাতী-অরুন্ধতী-বিশাখা? সুধাকান্ত একটা তারাও চেনে না। একটারও নাম জানে না। মা হলে কিন্তু ঠিক বলে দিতেন। সুরমাও পারত। ও যে মেয়ে। ওরা সব জানে। আকাশের খবর আর ঘরের খবর পাশাপাশি রাখবার মত স্পর্ধা কেবলমাত্র ওদেরই আছে। বিশাল বিস্তীর্ণ মন ওদের। সংসারের তাবৎ বস্তু ছায়া ফেলে সে মনে। ওদের কাছে গোপনীয় কিছু নেই।

আর নেই বলেই এবার হাসপাতালে যেতে মোটেই আপত্তি করে নি সুরমা। না কান্নাকাটি, না কোন রাগ অভিমান। নইলে সেবারের মত বেঁকে বসলেই হয়েছিল আর কি! সুধাকান্তরা তখন সবে উঠে এসেছে দেশ থেকে। কাঁচা পয়সাও ছিল কিছু হাতে। সুরমার চিকিৎসাটা তাই ঘরেই করাতে পেরেছিল সুধাকান্ত। আয়োজন ব্যবস্থা দেশ-বাড়ির মত হয়ত হয়নি। বত্রিশ

টাকা ভিজিটের কোন ডাক্তার আসে নি। রাত্রি-দিন ষ্টেথিস্কোপ হাতে বসে থাকে নি রোগীর শিয়রে। ওষুধে-পত্রে ফল-মূলে ভরে যায়নি ঘর। সুযোগ পায়নি ছোট-খাটো একটা ডিস্‌পেন্‌সারী হয়ে উঠার। কিন্তু না হ'ক সে সব কিছু। অর্থের প্রাচুর্যে স্পর্ধিত আভিজাত্য প্রকাশ না করুক আপন অস্তিত্বকে। তবু সুরমাকে তো হাস-পাতালে পাঠাতে হয়নি আর। ঘর ছেড়ে রায় বাড়ির কুললক্ষ্মীকে যেতে হয়নি বাইরে। এইটুকুই যা সান্ত্বনা ছিল সুধাকান্তর।

কিন্তু এবার তাও যে গেল। মান-সম্ভ্রম আভিজাত্য রিক্ত হয়ে তলিয়ে গেল নিঃশেষে। আর এমনটি যে হবে তাও তো জানা কথাই। যুগ পাল্টেছে মহাকালের চাকা ঘুরেছে। আভিজাত্যের স্পর্ধা কালের কুটিল ভ্রূকুটির কাছে মাথা নত করেছে। আর কি কিছু থাকবে অতীতের মমতার মত?

একটা দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলল সুধাকান্ত। একদিন দু-দিন নয় এই কোলকাতায় উঠে এসেছে যে আজ ছ-বছর। অথচ এই দীর্ঘ দিনেও কোন একটা ভদ্র চাকরি যোগাড় করে উঠতে পারে নি সে। কেন? না—মাত্র ম্যাট্রিক পাস সুধাকান্ত। বি-এ, এম-এ কত ঘুরছে ফ্যা ফ্যা করে, আর ম্যাট্রিক পাসের চাকরি! অফিসে ঢুকতে না ঢুকতেই বড়বাবু মারমুখী হয়ে উঠেন: আরো দু'চার বছর কলেজে ঢু মেরে আসুন মশাই—তারপর ক্লার্কের জন্য এ্যাপ্লিকেসান সাবমিট্ করবেন। অথচ দেশের বাড়িতে আত্মীয়-স্বজনেরা বলত, ম্যাট্রিক পাস করে সুধাকান্ত নাকি রায় বংশের মুখ উজ্জ্বল করেছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রি নাকি এই প্রথম ঢুকেছে রায় বংশের বাড়িতে! হীরের টুকরোর মত সুধাকান্তর ক্ষুরধার পাণ্ডিত্য নাকি উজ্জ্বল-তম করেছে বংশের আভিজাত্য। এমনি সব স্তুতি কথা। ইনিয়ে বিনিয়ে সুধাকান্তর প্রশংসা। ভাবলেও আজকাল হাসি পায় তার।

সুরমাকে হাসপাতালে নিয়ে যাবার সময় চোখ ফেটে প্রায় জল এসে পড়েছিল সুধাকান্তর। হৃত-গৌরব রায়-বাড়ির লক্ষ্মী এই প্রথম যাচ্ছে হাসপাতালে। যাচ্ছে বংশের আরেকটি দীপশিখাকে জন্ম দেবার জন্য। এই মধু-ঘ্রাণ মুহূর্তটির জন্য কতদিন ধরে প্রতীক্ষা করে আছে ওরা দুটিতে। কত তাবিজ কবচ মাদুলি। কত পূজো-আর্চা ধর্ণা দেওয়া। স্বর্ণময়ীর চোখের জলে ভিজে গেছে ঠাকুরের সিংহাসন। বংশ বিলুপ্তির আশঙ্কায় শিউরে উঠেছেন মনে মনে। বিয়ের পর দশ বছর পার হয়ে গেল। কিশোরী সুরমা পেল যৌবনের আরক্ত লাবণ্য। নারীত্বের সজাগ স্নেহমুখ স্পর্শে সন্দীপ্ত হ'ল তার চেতনা। কিন্তু কই, মাতৃত্ব এল কই! সুরমা পেল কই নারীত্বের পূর্ণতা! ভাবনা শুধু একার স্বর্ণময়ীরই কি! সুরমা—সুধাকান্তরও। সে এক বিচিত্র ভয় ভয় ভাবনা। ভাবনা-চিন্তার সূচীমুখ যন্ত্রণা। যন্ত্রণার ঘন-করুণ বিলাপের মত দুটি ভরন্ত প্রাণের সে কি আকুল প্রতীক্ষা।

তারপর এই দীর্ঘ প্রতীক্ষার অবসান করে আকাশের নীল থেকে সে স্বপ্ন আজ নেমে এসেছে। বাজন্ত নূপুরের মত সুরে-রঙে ভরে দিয়েছে যন্ত্রণার আকুলতা। কিন্তু কই, তাকে তো পরিপূর্ণ প্রশান্তির মাঝে গ্রহণ করতে পারছে না সুধাকান্ত। কোথায় যেন বাঁধছে। কিসের একটা অদৃশ্য কাঁটা যেন ক্ষতাক্ত করে দিতে চাইছে ভাবনার মধুরতাটুকুকে। বিত্তহীন বেকার রায় বংশের অকর্মণ্য বংশধরের চেতনায় কিসের যেন আগুন জ্বলছে দপদপিয়ে। অভাবের আগুন? নিঃশেষিত আভিজাত্যের শেষ আগ্নেয় প্রলাপ? কে জানে!

রাত্রির রঙটা কি ভয়ানক কালো। চেয়ে থাকতে থাকতে চোখ দুটো কেমন যেন জ্বালা করে উঠতে চাইল সুধাকান্তর। দ্যুতিময় তারাগুলোকে যেন ঝাপসা আর বিবর্ণ বলে মনে হতে লাগল। সুধাকান্ত চোখ দুটো বুজিয়ে ফেলল আস্তে আস্তে।

হাসপাতালের 'বেডে' শুইয়ে দেবার পর কত করুণ আর অসহায় দেখাচ্ছিল সুরমাকে। লেবার ওয়ার্ড পর্যন্ত নার্সের সঙ্গে গিয়েছিল সুধাকান্ত। তাকে বিদায় দেবার সময় ক্লান্ত চোখ দুটো কেমন ছল ছল করে উঠেছিল সুরমার। তবু কি আশ্চর্য শান্ত এবং মিষ্টি করে বলেছিল: শুনছ!

—হ্যাঁ।

—আমার জন্য তুমি কিছু ভেবো না লক্ষ্মীটি। অনেক রাত হোল; মা হয়ত ভাবছেন। তুমি বাড়ি যাও।

সুধাকান্ত তবু দাঁড়িয়ে ছিল।

—তোমার কিছু লাগবে রমা ?

—আমার ? না না। কাল তুমি খুব ভোর-ভোর এসো।

—আচ্ছা। কিন্তু তুমি রাত্রে খাবে কি।

সাদা এ্যাপ্রন পরা একটি কম বয়সী নার্স এগিয়ে এল।

—সে সব হাসপাতাল থেকেই ব্যবস্থা করা হবে। আপনি এবার বাইরে যান।

—ও, আচ্ছা সিস্টার—

—আপনি বরং, নার্স বলল : কিছু ফল টল এনে রেখে যেতে পারেন। বেদানা কিংবা ডাব—

—না। সুরমা আস্তে আস্তে বলল : পয়সা খরচ করে ওসব হাবি-জাবি কিছু এনো না তুমি।

সেই মুহূর্তে কোথায় যেন একটা ব্যথা টনটনিয়ে উঠল সুধাকান্তর বুকে। সুরমার এই অস্বীকৃতির মূলের সন্ধান পেয়ে কুঁকড়ে গেল তার বিত্তহীন মন। কালো হয়ে গেল মুখটা। স্বামীর এই ভাবান্তরটুকু নজর এড়ালো না সুরমার। সুধাকান্তর মুখটার দিকে চেয়ে কি বুঝল সে কে জানে, অনেকক্ষণ পরে মৃদুস্বরে বলল : তবে বরং গোটা দুই কমলা নিয়ে এসো কাল। বেশী এনো না যেন তাই বলে—

গাড়ি-ভাড়া মিটিয়ে সুধাকান্তর পকেটে তখন একটা পয়সাও অবশিষ্ট ছিল না আর। থাকলে তখুনি ছুটে গিয়ে গোটা পাঁচেক কমলা এনে দিত সে সুরমাকে। হাসপাতাল থেকে বেশ একটু ভারি ভারি মন নিয়েই বাইরে বেরিয়ে এল সুধাকান্ত। একটা টিউশনি সেরে এসেছিল সে সকালে। বিকেলের টিউশনিটায় আজকে হাজিরা না দেওয়াই উচিত ছিল তার। কিন্তু উপায় নেই। গোটা পাঁচেক টাকার জন্য একমাত্র সেখানেই গিয়ে দাঁড়াতে পারে সুধাকান্ত। ছেলের দাদা মনোজিতই সে বাড়ির একমাত্র উপার্জনক্ষম অভিভাবক। তার সঙ্গে গোটা পাঁচেক অগ্রিম টাকার কথা প্রায় ঠিক হয়ে ছিল সুধাকান্তর। কিন্তু দুর্ভাগ্য কখনো একা আসে না। আসে দল বেঁধে। সাপের মত ঠাণ্ডা ঠাণ্ডা পিচ্ছল হিংস্রতার জাল [ছড়িয়ে। প্রায় ঘণ্টা তিনেক বসে থেকেও তাই সুধাকান্ত কোন খোঁজ পেল না মনোজিতের। ছেলের মা বললে সেই বিকালেই বেরিয়ে গেছে। এতক্ষণ ফিরে আসা উচিত ছিল। কিন্তু কোথায় কি। অবশেষে বিরক্ত হয়েই উঠে পড়ল সুধাকান্ত। ঘরে স্বর্ণময়ী একা রয়েছেন সেই সন্ধ্যা থেকে। আর তার অপেক্ষা করা চলে না। এমনিতেই কত রাত হয়ে গেল।

* * *

ভোর-ভোর আসতে বলেছিল সুরমা। কিন্তু সুধাকান্ত যখন হাসপাতালে ঢুকল তখন আর ভোর নেই। নরম কৃষ্ণচূড়া ফুলের মত রোদে ঝলমল করছে গোটা আকাশটা। রৌদ্রবতী পৃথিবী চঞ্চল হয়ে উঠেছে আলোর উত্তাপ পেয়ে। সারারাত জেগে ভোর-রাতেই কখন ঘুমিয়ে পড়েছিল সুধাকান্ত। টের পায় নি। স্বর্ণময়ীর ডাকে ঘুম ভাঙল তার।

—খোকা, ও-খোকা, ওঠ—

সুধাকান্ত উঠেই চমকে গেল : ইস্ এত বেলা হয়ে গেছে মা।

স্বর্ণময়ী অপ্রস্তুত হয়ে বললেন : সারারাত আমিও ঘুমোতে পারি নি বাবা। ভোর বেলাতেই কেমন যেন—' তুই যা তাড়াতাড়ি।

কিন্তু এত তাড়াতাড়ি করেও কত দেরি হয়ে গেল। হাসপাতালের গেট পার হয়ে বারান্দায় উঠে এল সুধাকান্ত। অসময়ে রোগী দেখার জন্য পারমিশন নিল অফিস ঘর থেকে। তারপর সিঁড়ি ভেঙ্গে একেবারে দোতালায়। সারা শরীরটা কি এক অস্থির উত্তেজনায় যেন কাঁপছে তার। বড় ভয়-ভয় করছে। কেমন আছে সুরমা ? কি দেখবে সে গিয়ে ? যদি—যদি, আরে কালকের সেই নার্সটি না ?

লেবার ওয়ার্ডের কাছে এগিয়ে আসতেই কালকের সেই কমবয়েসী নার্সটির সঙ্গে দেখা হয়ে গেল। বোধ হয় এই মাত্র ডিউটি শেষ হয়েছে ওর। রাত্রি জাগরণের ক্লান্তিতে মুখখানা ম্লান। সুধাকান্ত ডাকল : সিসটার—নার্সটি দেখতে পেয়ে একগাল হেসে এগিয়ে এল :

ও আপনি ! যান মিষ্টি আনুন আগে, তবে সুখবরটা দেব।

সুধাকান্তর সমস্ত শরীর এবার সত্যি কেঁপে উঠল। স্নায়ুতে স্নায়ুতে কিসের একটা সুরেলা উত্তেজনার ঢেউ

খেয়ে গেল চকিতে। নার্স'টি বলল: ছেলে এবং মা দুজনেই বেশ সুস্থ আছে। যান দেখে আসুন গিয়ে—

নার্স'টি চলে গেল অফিসঘরের দিকে। কিন্তু সুধাকান্ত ওর জায়গা ছেড়ে চট্ করে আর যেন নড়তে পারল না। অসহ্য একটা আনন্দের চাপে সমস্ত অনুভূতিগুলো যেন ভোঁতা হয়ে গেছে তার। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে বারকয়েক নিশ্বাস টানল সে।

সুরমার ছেলে হয়েছে। রায় বংশের বহু আকাঙ্ক্ষিত একটি বংশধর জন্ম নিয়েছে ওই পাশের ঘরটায়। কত তাবিজ-কবচ-ধর্না দেওয়া! কত পূজো-আর্চা-যন্ত্রণা। আকাশের নীল থেকে নরম নিটোল একটি স্বপ্ন পাঁচ বছর পর নেমে এসে বাস্তবরূপ নিয়েছে এতদিনে।

সুধাকান্ত আবার পায়ে পায়ে এগুতো লাগল। আর একটু, মাত্র আর একটু গেলেই দরজা ঠেলে ঘরে ঢুকতে পারত সে, কিন্তু হঠাৎ আবার দাঁড়িয়ে পড়ল সুধাকান্ত। কি যেন একটা মনে পড়েছে। ভয়ানক কিছু একটা যেন জড়িয়ে গেছে তার পা দুটোতে। সুধাকান্তর সমস্ত দেহটা অকস্মাৎ জমে যেন পাথর হয়ে গেল। বাড়ি থেকে তাড়াতাড়ি করে বেরুনোর সময় একদম ভুলে গিয়েছিল সে। ভুলে গিয়েছিল পথ চলতে চলতে আর হাসপাতালে পৌঁছে গিয়ে—যে সুরমার জন্য কমলা দুটো তো আনা হয়নি। কাল দুটো—মাত্র দুটো কমলার কথাই বলেছিল সে মুখ ফুটে। অথচ—

বরফ ঠাণ্ডা হাতদুটো দিয়ে নিজের জামার সব কটা পকেট একবার খুঁজে দেখল সুধাকান্ত। নেই। এ পকেটে ও পকেটে কোথাও কিছু নেই। বাড়িতে নেই। মা'র কাছে নেই। কোথাও নেই।

একটার পর একটা সিঁড়ি ভেঙে আবার নীচে নামতে সুরু করল সুধাকান্ত। সেই মনোজিতের বাসায় এক্ষুণি একবার যেতে হবে তাকে। পাঁচটা টাকা দেবার কথা আছে তার। একটু পা চালিয়ে গেলে এই ভোরবেলাতে হয়ত বাড়িতেই পাওয়া যাবে তাকে। এই মুহূর্তে অন্তত: একটা কমলাও হাতে না নিয়ে কিছুতেই সুরমার সামনে গিয়ে দাঁড়াতে পারবে না সুধাকান্ত।

স্মৃতির প্রত্যয়

(স্বর্গত দ্বিজেন্দ্রলাল রায় স্মরণে)

নিশীথ মিত্র

সব কিছু কবে যেন ধুলোর মতন
মাটিতে হৃদয় ঢেলে মিশে গেল চুপে,
কবে যেন পাতা ঘাস সুরের স্বনন
কী ব'লে কী গেল হেঁটে বৈভবের স্তূপে।

তবু যেন কারো স্মৃতি কারো সে হৃদয়
রোজই ফোটে প্রার্থনায় দূরের শিবিরে,
সাঁঝের শিথিল ধূমে; কী যেন প্রত্যয়
বারবার মন ছুঁয়ে ভোলায় শ্রান্তিরে।

সে ভালোবাসার স্বাদ আজও তার ঠোঁটে
আজও তার স্মৃতি ঘিরে
দেখেছি স্বপন ;
সমস্ত কান্নার ভিড়ে সে-ই যেন ফোটে
ভোরের শিশিরে ভিজে—
অমোঘ লগন!

জীবনের অতলান্তে মণির আশায়
আজও তাই পাতি মন সে ভালোবাসায়।

উপন্যাসের আদি সূত্র

নগেন দত্ত
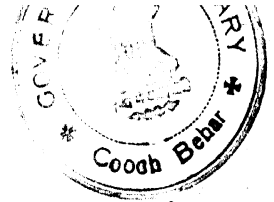
॥ ১ ॥

একটানা দীর্ঘস্থায়ী লিখিত সাহিত্যের ক্রমবিকাশ উপন্যাসের জন্ম খুব বেশীদিনের নয়। এর পূর্ব্বগামী সাহিত্যের মধ্যে কবিতাই প্রথম গল্পের ক্ষুধা মিটিয়েছে। সেকালের ছন্দোবদ্ধ কবিতায় চরিত্রের বিন্যাস, মানব-মনের ভাবের ক্রিয়া ও প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হত। কেননা কবিতাকে শুধু মাত্র ছন্দের মাঝে বিকাশ না করে সুরেও বিকাশ করার রীতি ছিল। এত করে চরিত্রগুলি শ্রোতার কাছে প্রত্যক্ষ-ভাবে তুলে ধরা সম্ভব হয়েছিল। একালের সাহিত্যের পাঠকমন লেখক বা কবি থেকে অনেক দূরে থাকেন অথবা অদৃশ্য থাকেন। সে কালের সাহিত্যজগতে এটা সম্ভব ছিল না। তাই শ্রোতার সক্রিয় সহানুভূতিই কবি-কাহিনীকারের প্রেরণার উৎস ছিল। সামন্তযুগের আদিতে দরবারী সাহিত্যের আমলে এই কবিকাহিনীকারেরা সাহিত্য রস সৃষ্টিতে একটা বড় অংশ গ্রহণ করতেন এবং শ্রোতা হিসেবে সেকালের অভিজাত ও মধ্যবিত্ত সম্প্রদায় উভয়েই রস উপভোগ করতেন। বস্তুত সাহিত্য ও সংস্কৃতির এই শ্রেণীরাই ছিল বড় সমর্থক। এদেরই প্রভাবের পক্ষপুটে শিল্প, সাহিত্যের উদ্যম-উদ্দীপনা প্রকাশ পেত, আর শুধু প্রকাশ পাওয়া কেন, কবি, সাহিত্যিক ও শিল্পীর যশ প্রতিপত্তিও ছিল এই শ্রেণীর দান। এককথায় সেকালের কবি, সাহিত্যিক, শিল্পীরা একালের মত স্বাধীন ছিল না।

"Under the influence of dynestic rulers stationed in great Cities, merchants and manufacturers were confounded with the old nobility, and in commonwealth like Florence the bourgeoie gave their tone to society. At the same time community thus formed was separated from the people by her humanistic culture Literature felt this social transformations. Its products were shaped to suit the taste of the middle classes and at the same time to amuse leisure of the aristocracy."(1)

এ তথ্য শুধু উয়োরোপীয় সাহিত্যের ইতিহাস খুঁজলেই পাওয়া যায় এমন নয়। আমাদের ভারতীয় সাহিত্য ও সংস্কৃতিতে এর ব্যতিক্রম বড় একটা খুঁজে পাওয়া যায় না। এদেশের রামায়ণ-গান, পাঁচালী, কথকতা, মহাভারত, জাতক থেকে সুরু গল্প গাথার যে প্রচলন হয়েছে তাকে ওদেশের Novelliere প্রথার সঙ্গে মোটামুটি তুলনা করা যেতে পারে। ঠিক পুরোপুরি তুলনা কোন দুই দেশের মধ্যেই সম্ভব নয়। আমাদের দেশে রামরসায়ন, বা মনসামঙ্গল যে পদ্ধতিতে অনুষ্ঠিত হত ওদেশেও Novelliers ঠিক অনেকটা সমান ধরণের ছিল। ওদেশের মধ্যযুগের সাহিত্যে যেমন চরিত্র-প্রধান কবিতার জন্ম হয়েছে এদেশেও তাই হয়েছে। অবশ্য এ-সব চরিত্র বীরত্বব্যঞ্জক, নীতিমূলক, ভক্তিমূলক ও ধর্ম্মাশ্রিত প্রেম-মূলক ছিল। আজকে যেমন বৃহত্তর সমাজের উপর নিছক সাহিত্যের কোন প্রভাব নেই, সেকালে তেমনটা ছিল না। যদিও ঐসব গান-গাথার ও প্রচারধর্ম্মী আলোচনার পরিধি ছিল স্বল্প, কিন্তু প্রভাব ছিল গভীর ও স্থায়ী। কাজেই সামাজিক মন বর্ত্তমান যুগের মত অতি দুরূহ জটীল গহনে ভ্রমণ করত না। বরং একটা বিশেষ ধারা অবলম্বন করে মানুষের বৈশিষ্ট্য বিচার সম্ভব হত। ভারতের মধ্য-যুগের ইতিহাসে দেখা যায় যে, সংস্কৃতির ধারক ও বাহক উচ্চবিত্ত, শিক্ষিতেরা ছিল। এদের সহানুভূতি প্রেরণার বলেই কবিতা, গাথা ও গান যে খানিকটা প্রভাবিত হবে তাতে আর বিস্ময়ের কি আছে। আজকে সমাজের অতি ব্যাপক চেতনায় সে যুগে অনেকটা অদ্ভুত বলে মনে হয় যে, পররাজ্য জয় ও পরস্ত্রী হরণ সাহিত্য রচনার বস্তু কি করে সম্ভব হতে পারে। কিন্তু সেকালে সেইটেই ছিল রস-বিন্যাসের আদি ক্ষেত্র, সমাজ চেতনা তখন ব্যক্তির বীরত্বের আশে-পাশে ঘুরছে। সে যাই হোক, মধ্যযুগীয় ভারতীয় সংস্কৃতি ও সাহিত্যরস উপভোগ করার মানসিক বৃত্তির পরিচয় নীচের কথা কটিতে বেশ পরিস্ফুট হয়ে উঠেছে।

"Educated men and women, of whom there were many, would sometimes relax themselves by reading light literature, short stories, novels, poetry, etc. Gulistan, Bostan and Diwans of various Persian poets were the favorites with those well-versed in Persian, while stories from the Ramayana and the Mahabharata were studied by others both as a recreation and religious instruction. It was usual to listen to stories of adventure."(2)

॥ ২ ॥

চরিত্র-প্রধান কবিতায় যেখানে করুণা, বিষাদ, হর্ষোচ্ছ্বাস, প্রীতি ইত্যাদি ভাবের অভিব্যক্তি হত সেই কবিতায়—সমাজ ব্যবস্থার বিচারে স্পষ্টতই

---

1. Renaissance in Italy—Vol. II by J. A Symond—p. 99.

2. Society and culture in Mughal Age, Dr. P. N. Chopra—P. 75.

স্থিতিশীল কোন অবসরভোগী জীবনযাত্রার মানসিক রুচির পরিচয় মিলত। সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম জটিল ঊর্ণনাভের মত মন তখন কাব্যে দেখা না দিলেই একটা অনাগত ভাব বিপ্লবের পদধ্বনি তখন থেকেই শোনা যাচ্ছিল। কালে কালে মানব মনের সূক্ষ্মবৃত্তিগুলি যখন ভাব-রাজ্যে আশ্রয় নিয়েছে তখন জীবনের রসানুভূতির রূপ অন্য ধারা নিয়েছে। বস্তুত এইধারা অখণ্ড এক চেতনার মত কাজ করেছে। মানুষ যেমন স্থানু তেমন সচল জীবও বটে। মনের-বিচিত্র ভাব সমষ্টির বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে যে, নিজ পরিচিত আবাসস্থল ত্যাগ করে অন্য অঞ্চলের আকর্ষণে যাত্রা করাটা মানুষের সুখকর উন্মাদনার পরিচয়। এই অন্তর্নিহিত গতিশীলতা জীবনকে বিভিন্ন ছন্দে গেথেছে। দুঃসাহসিক গতিপ্রবণ জীবনযাত্রার পেছনে মানসিক তেজস্বিতা প্রয়োজন—তা অর্জ্জিত অভিজ্ঞতা থেকেই সুলভে সঞ্চয় করা সম্ভব। অন্যথায় জীবনকে জড়পিণ্ডবৎ দেখতে হয়। কিন্তু যে সমাজ গ্রহণ ও বর্জ্জন করে জীবনকে গোড়েপিটে পূর্ণাঙ্গ জীবনের রূপ দিয়েছে—সে সমাজ সৃজনশীলতার তাগিদেই জীবনকে তড়িতের মত তাড়িয়ে নিয়ে চলেছে। তাই উপন্যাসে চলিষ্ণু চরিত্রসৃষ্টি দেখতে পাওয়া মানেই দুঃসাহসিক জীবনযাত্রার পূর্ণ পরিচয়। এদেশের রূপকথায়—রাজার পুত্র, মন্ত্রীরপুত্র, কোটালের পুত্রের অনির্দ্দিষ্ট জীবনযাত্রার প্রতি দুর্নিবার মোহ, আবার অভিজ্ঞতার স্রোত উজিয়ে প্রেমের পরশ পাথর খুঁজে বেড়ানো—সবই একটা চিরন্তন যাত্রার আংশিক বিকাশ মাত্র। সমাজের গভীর অতল ঘেঁটে যে ভাব খুঁজে পাওয়া গেল জীবনকে অর্থাৎ ব্যক্তির জীবনকে, সামগ্রিকভাবে চরিত্র হিসেবে গড়ে উঠতে তাই সহায়তা করল। শিল্পে যেমন অনুকরণ ক্রমবিকাশের একটা ধাপ হিসেবে স্বীকার করে নেওয়া, সাহিত্যে কেন তা হবে না? বস্তুতঃ সাহিত্য এই স্বীকৃতি পেয়েই আসছে। উপাখ্যানধর্ম্মী সাহিত্যে এই স্বীকৃতি আমাদের অগোচরে হয়েই আসছে। কিন্তু উপাখ্যান-ধর্ম্মী সাহিত্য বাস্তবানুগও নয়, তাছাড়া বাস্তব পরিবেষ্টিত জীবন চেতনার অভাবও তার মাঝে বিস্তর; ফলে সামাজিক মানুষের রসবোধকে উপাখ্যানের পথ ছেড়ে অন্য পথে মোড় ফিরতে হল। এ পথ রচিত হয়েই ছিল, মাত্র নয়া মূল্য দিয়ে তাকে মনের আসরে বসানো।

॥ ৩ ॥

"শৃঙ্খলিত ঘটনার যেমন একটানা সুর আছে তেমনি ঘটনাকে বিশেষ ভাবে সাজিয়ে একটি ভঙ্গীতে প্রকাশ করার মধ্যে আর্ট আছে। যা সাধারণভাবে একটি ঘটনা মাত্র, তা আর্টের জগতে নিছক ঘটনা নয়। সেই ঘটনা উদ্দেশ্যবিহীন নয় বলেই বিশেষ সুর, সঙ্গতি ও প্রতিচ্ছবি নিয়ে আমাদের চোখের সামনে ফুটে ওঠে। এর মাঝে ঘটনা তার আকস্মিক গতিকে জীবন-সত্যের মধ্য দিয়ে সুষ্ঠভাবে পরিণতি লাভ করে। জীবনসত্য ও ঘটনার অপরিহার্য্যতা বিশেষ মূর্ত্তি নিয়ে নাটকের মধ্যে আত্মপ্রকাশ করে। সেক্সপিয়রের নাটক এই অপরিহার্য্য পরিণতির আদর্শ দৃষ্টান্ত। জীবনের এই অপরিহার্য্য পরিণতি একদিন সাহিত্যে অন্যরূপে এলো। আকাশ যেমন দিগবলয়ের কাছে ছড়িয়ে পড়ে বিরাট আকার-ধারণ করে, অতি তীব্র ঘটনার গতি জীবনের সব বাঞ্ছিত ও অবাঞ্ছিত বস্তুকে গ্রহণ করে—ঠিক তেমনিভাবে ব্যাপকতা লাভ করে—এবং তখন সাহিত্যের রূপ হয় শতধা বিচ্ছিন্ন দ্বীপসঙ্কুলের মত। তার পাশেই থাকে সাগরের বিস্তৃত পরিধি। যখন সাহিত্যে এই পরিধি পরিপূর্ণ রূপে ফুটে ওঠে—তখনই হয় সত্যিকারের একটি উপন্যাসের জন্ম। এখানে উপন্যাসের সূত্র খুঁজতে গিয়ে নাটকের ভঙ্গী সম্বন্ধে আলোচনার কারণ অনেকেই মনে করেন, উপন্যাস সাহিত্যের মাঝে নাট্য-সাহিত্যের উদ্ভব।"

"The novel, on the other hand, as Carvantes, Richardson, and Fielding formed it for the modern nations, is an expansion and prose-digest of the drama. It implies the drama as a previous condition of its being, and flourishes among races gifted with the dramatic faculty."

॥ ৪ ॥

উপন্যাসের সূত্র আলোচনায় এসে পড়ে—উপন্যাস কারা রচনা করেছেন, উপন্যাস রচয়িতা, না পাঠক? কবিতার একটা বিশেষ ধর্ম্ম হল যে এ রচনায় ভাবপ্রধান হয়ে ওঠে—এবং সে ভাবটা মূলতঃ ব্যক্তির অভিজ্ঞতা বা মনোজগতের একটি সূক্ষ্ম চেতনার বিকাশ। কিন্তু উপন্যাস রচয়িতার এ জাতীয় ভাবজগতে প্রবেশ করবার অধিকার নেই। তার ভাব-জগৎ সামাজিক জীব-জগতের জগৎ—এখানে ইচ্ছায় হোক, বা অনিচ্ছায় হোক এরা ভীড় জমাবেই। কাজেই উপন্যাস সৃষ্টির প্রথম সূত্র সামাজিক জগতের কাছে আবদ্ধ হয়ে আছে। এই সূত্র সেখান থেকেই আবিষ্কার করতে হবে, সেই জন্যই সমালোচকরা বলেন,—"The novel proper begins when readers become interested in the life and fortunes of men of their own day, described with some measure of realistic details, and reasonable attention to the laws of probability." (৩) সুতরাং এখানে পাঠকের কথাটা এসে পড়েছে এবং এই পাঠকেরা হচ্ছেন সমাজের একটি বিশেষ অংশ—এদেরকে কষ্টিপাথর বলে মেনে নেওয়া যেতে পারে। কাজেই উপন্যাসের সৃষ্টির সঙ্গেসঙ্গেই পাঠকের অর্থাৎ বৃহত্তর সমাজ ও সামাজিক জীবের একটি মূল্যে নির্দ্ধারিত হয়ে আছে। পাশ্চাত্য সাহিত্যে প্রথম ঔপন্যাসিক বলে de Rogas'র নাম উল্লেখ পাওয়া যায়। এর পুঁথিখানির নাম হল 'Celestina'. এই উপন্যাসখানি আলোচনা করে সমালোচকরা বলেছেন এতে কথোপকথন, সংশ্লিষ্ট চরিত্র ও চরিত্রের খেলার পরিচয় পাওয়া যায়। পাশ্চাত্য সাহিত্যে এ মাত্র ষোড়শ শতাব্দীর কথা এবং এই

(৩) A History of western literature—J. M. Cohen p. 186.

সূত্রে পর্তুগীজরা উপন্যাসের আঙ্গিকের অনেক উন্নতিসাধন করেছেন বলেও সমালোচকরা বলে থাকেন। আমরা আজকের দিনে উপন্যাস বলতে যা বুঝি তার জন্ম হয়ত এইভাবে সম্ভব হয়েছে। কিন্তু ভারতীয় সাহিত্য এর বহুপূর্ব্বেই উপন্যাসের পরিচয় রেখে গেছে এবং তা মানবোচিত ব্যথা-বেদনায়, কূট-বুদ্ধিপ্রসূত চারিত্রিক ব্যঞ্জনায় ভরপুর। আমরা এখানে আলোচনার ক্ষেত্রে জাতকের গল্পের কথাই উল্লেখ করছি এবং এর জন্মকাল যে কতদিনের তা আজ আর কারুরই অবিদিত নেই। জাতকের গল্পের মধ্যে মানব জীবনের সবরকম অভিজ্ঞতার পরিচয় মেলে এবং সাধারণ মানুষের শুভ এবং অশুভ বুদ্ধির স্বভাবের এমন সব পরিচয় মেলে—যা অনেক ক্ষেত্রে বর্ত্তমান উপন্যাসের কূট চরিত্র-কেও হার মানায়, কাজেই বিশ্ব-সাহিত্যের ইতিহাসে পাশ্চাত্য জাতি-গুলির প্রথম উপন্যাস রচনার দাবী যুক্তিসম্মত হয়। জাতকের গল্পগুলি মানব চরিত্রের বিভিন্ন বৃত্তি নিয়ে যে সৃষ্টি হয়েছে এবং এর বহুল প্রচার তৎকালে মানব সমাজের রসের ক্ষুধা মিটিয়েছে ও জীবনগঠন করতে সহায়তা করেছে, এ বিষয় সন্দেহ নেই। এখানে জাতকের গল্পের সাহিত্যিক উৎকর্ষতার দিকে এবং অভিনবত্বের দিকে দৃষ্টি-আকর্ষণ করার প্রধান কারণ হল যে, বর্ত্তমান ইউরোপীয় সাহিত্য এমন একটা বিপর্য্যয়ের মধ্য দিয়ে চলছে যার বিষময় ফল বাঙ্গলা সাহিত্যেও প্রকট হয়ে উঠেছে। বিভ্রান্ত মনের বিপর্য্যস্ত চিন্তার যে সাহিত্য সৃষ্টি তা উপন্যাস আকারেই আমাদের সাহিত্যে আমদানী হয়েছে। উপন্যাসের সূত্র মানব-চরিত্র ও সমাজ—এ সর্ববাদীসম্মত, কিন্তু এই মানবের মানসিক স্থৈর্য্য আছে কিনা, চরিত্রের দৃঢ়তা আছে কিনা, সত্যি সত্যি যৌন দোষ দুষ্ট সমাজই প্রকৃত সমাজ কিনা, এবং এরাই সমষ্টিগতভাবে উপন্যাসের আদি বস্তু হিসেবে কাজ করতে পারে কিনা—একথা আজ স্পষ্ট করে বলার দিন এসেছে। বর্ত্তমান বাঙ্গলা সাহিত্যে উপন্যাসের প্রকৃত সূত্র অনুসন্ধান করা প্রয়োজন।

প্রিয়-বাক্য

শ্রীমাণিক ভট্টাচার্য্য

মাত্র দুটি কথা। কিন্তু এর শক্তি অসীম। এর মহিমা অপার! জগতের মানুষ পশু পাখী সবাই এদের জানে, চেনে, চায়। এই দুটি কথা যেন মন্ত্র। যে শোনে যে বলে উভয়েই এই মাত্র দুটি কথায় মুগ্ধ। ভক্তের কাছে এ দুটি কথা হরি নাম। আহতের কাছে প্রলেপ। রোগীর ঔষধ। তৃষ্ণার্ত্তের কাছে জল। ক্ষুধার্ত্তের কাছে খাদ্য। মুমূর্ষুর কাছে অমৃত।

সংস্কৃত সাহিত্যের প্রবচনের মত একটি সুন্দর শ্লোক আছে, সেটি এই—

প্রিয় বাক্য প্রদানেন সর্বে তুষ্যন্তি জন্তবঃ।
তস্মাৎ তদেব বক্তব্যং বচনে কা দরিদ্রতা॥

সত্যই তো। প্রিয় বাক্যে সবাই তুষ্ট হয়, সবাই সুখী হয়। সুখই সকলের কাম্য। তুষ্টি সবাই চায়। সেজন্য সকলের মুখেই প্রিয় বাক্য থাকা উচিত। সকলেরই মধুর বাক্য বলা প্রয়োজন। জগতে প্রিয় বাক্যের—মধুর বাক্যের তো অভাব নেই।

একটি সামান্য উদাহরণ ধরা যাক্। অর্দ্ধেক অন্ধকারে একজন লোক তোমাকে মারতে আসছে। তার পায়ের শব্দে তুমি বুঝলে কে একজন ছুটতে ছুটতে আসছে। কে আসছে তাও দেখতে পেলে না, তার উদ্দেশ্যও জানতে পারলে না, হঠাৎ সে একটা কিসের উপর জোরে হোঁচট খেল। সেটাও শব্দ শুনে তুমি বুঝলে। তৎক্ষণাৎ অতর্কিতে তোমার মুখ থেকে বেরিয়ে গেল—আহা কে পড়লে গা। এই 'আহা' শব্দে মুহূর্ত্তের মধ্যে এক অদ্ভুত কাণ্ড ঘটে গেল। আততায়ীর মনে একটা আশ্চর্য্য পরি-বর্ত্তন এনে দিল। সে এসেছিল তোমায় আঘাত করতে। কিন্তু তোমার মুখে 'আহা' শব্দ তাকে বিবশ করে দিল। সে স্থির হয়ে দাঁড়াল। কিছুক্ষণ মনে মনে কি ভাবল। তার বজ্রমুষ্টি শিথিল হয়ে এলো। তার ভ্রুকুটি-কুটিল মুখ বিস্ময়ে ঈষৎ বিস্ফারিত হয়ে উঠল। তারপর সে তার হাতের অস্ত্র সেখানেই ফেলে দিয়ে আনমনা হয়ে যেখান থেকে এসেছিল সেইখানেই ফিরে গেল। একটা অসম্ভব ঘটনা সম্ভব হয়ে গেল।

আবার এই প্রিয় বাক্যের অভাবে কত সংসারে কত অঘটন ঘটে যায় তার ইয়ত্তা নেই। লজ্জাবতী বধূ মুখরা

হয়ে যায়। মমতাময়ী কন্যা নিষ্ঠুরা হয়ে পড়ে। একপ্রাণ ভ্রাতা পৃথক হয়ে যায়। অনুরক্ত পুত্র বিরক্ত হয়ে ওঠে।

এই প্রিয় বাক্যের কালাকাল, স্থানাস্থান নেই। মানুষের চির-তৃষ্ণার্ত মনে এই প্রিয় বাক্য সর্ব সময়ে সুশীতল জলের মত কাজ করে। দেহ মন জুড়িয়ে দেয়। মজুর দারুণ রৌদ্রে মাটি তুলছে, কাঠ কাটছে, তুমি তাকে বললে—এখন একটু গাছের তলায় বসে বিশ্রাম কর, রোদটা একটু পড়ুক তখন আবার কাজ কোরো। সে এই কথাতেই কৃতার্থ হয়ে একটু জিরিয়ে নিল। পরে তোমার হয়ত বেশীই কাজ করে দিল। পাওনাদার কড়ার মত টাকা নিতে এসেছিল, তুমি মিষ্ট করে বললে—আজ টাকা নিশ্চয় দেব ভেবেছিলাম। একটা বিশেষ কারণে খরচ হয়ে গিয়েছে। আপনাকে মিছামিছি কষ্ট দিলাম। আপনি আসছে সপ্তাহে আসবেন আমি ঠিক করে রাখবই। আজ কিছু মনে করবেন না। পাওনাদার তার মুখের কর্কশ কথা চেপে রেখে সেদিনকার মত চলে গেল।

বাপ মেয়েদের পূজায় ভাল সাড়া কিনে দেব বলেছিলেন। কিন্তু কার্য্যকালে অর্থাৎ পূজা যখন আসন্ন তখন দেখা গেল হাতে একটা পয়সাও নেই। সে কথা কেউ জানে না। মেয়েরা এসে বললে—কই বাবা, কাপড় তো আনলে না এখনও। বাবা যদি বলেন—হাতে পয়সা নেই দেখতে পারছিস নে? কি করে আনবো? গায়ের মাংস কেটে? তখন মেয়েদের রাগ দুঃখ বেড়ে যাবে। দু'একটি কড়া কথা শুনিয়ে দিতে পারে। তার বদলে যদি বলা হয়—'কি করব মা, কিছুতে যে ব্যবস্থা করতে পারলাম না। কোনখানে ধারও পেলাম না। দোকানদারও ধার দিতে রাজী হল না। আগের ধার এখনও শোধ করতে পারিনি—তারই বা দোষ কি! একখানা করে সুতোর কাপড় দিয়ে তোদের মুখে যে হাসি দেখব একটু বৎসরকার দিনে—সে অদৃষ্ট করে আসিনি।' তখনই মেয়েদের মুখে আর কোন কঠিন কথা আসবে না। তার বদলে হয়ত বলবে—তাতে কি হয়েছে বাবা, এ বছর হল না, আসছে বছর হবে। তার চেয়ে বরং ভাল বই কিনে দাও এবার, আমরা সবাই মিলে পড়ব।

এই প্রিয় বাক্য অলঙ্কারের উপরকার কারুকার্য্য। কারুকার্য্য মূল্যবান অলঙ্কারের সৌন্দর্য্য আরও বাড়িয়ে দেয়। প্রিয় বাক্য আপ্যায়নকে মধুরতর করে নেয়। প্রার্থী নিরাশ হলেও প্রিয় বাক্য তার নৈরাশ্যের ভার লাঘব করে। যেমন নিরাভরণার কাছে কঙ্কণের একটা লাল সুতা তার সৌন্দর্য্য বৃদ্ধিতে সহায়তা করে, বিনা মূল্যে ২টি ১টি সাদা বা লাল ফুল যেমন অলঙ্কারের অভাব পূর্ণ করে, নিরাভরণার শুভ্র ললাটে একটি ক্ষুদ্র সিঁদুরের টিপ, মুক্তকেশের শীর্ষদেশে একটি শুভ্র ফুলের মত রিক্ততার ব্যথা এই প্রিয়বাক্য বহু পরিমাণে শান্ত করে দেয়।

এমন লোকও অনেক দেখা যায় যারা স্পষ্ট-বাক্য তিক্ত ভাষায় বলতে পেরে গৌরব অনুভব করে। তাদের বক্তব্য—'আমি কাউকে ডরাই নে, যা বলবার মুখের উপর বলে দিই। তাদের যদি আবার ঐরূপ তিক্ত বা স্পষ্ট বাক্য কেউ বলে তখন তারা বুঝতে পারে এ বাক্যের কত জ্বালা। ভুক্তভোগী না হলে এসব বিষয়ের অনুভূতি জাগে না।

মনে কর তুমি একজন অতি-বিখ্যাত লোক—সাহিত্যিক বা বৈজ্ঞানিক বা রাজনীতিবিদ্। কত বড় বড় সভা থেকে দেশ দেশান্তর থেকে তোমার আহ্বান আসে। একদিন একটি সামান্য স্থান থেকে বৃহৎ কার্য্যের উপলক্ষে কয়েকজন সামান্য লোক তোমাকে একটি বিশেষ প্রয়োজনীয় দিনে সভার পৌরোহিত্য করবার জন্য আহ্বান করতে এসেছে এবং বলেছে আমরা সামান্য বলে আমাদের সভায় যাবেন না? তুমি সে সময়ে বলতে পার, আমাকে দশ জায়গা থেকে ডাকতে এসেছিল—আমি বাধ্য হয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের সভায় যেতে রাজী হয়েছি। আজকের দিনে কি আমি যেখানে সেখানে যেতে পারি! অন্য কোন সাধারণ লোকের কাছে তোমাদের যাওয়া উচিত ছিল। এতে তোমাকে দোষ দেওয়া যায় না, কথাও ঠিক। তোমার কথা শুনে তারা ম্লানমুখে ফিরে যাবে। মনে একটু ব্যথাও পাবে। এর পরিবর্ত্তে তুমি যদি বল—'কেন যাব না নিশ্চয়ই যাব। এবারটা আমি যে নিমন্ত্রণ নিয়ে ফেলেছি। এর পর যে কোনদিন তোমরা বলবে আমি যাবই যাব। আজকে তোমরা কিছু মনে কোর না।' তোমার এই প্রিয় কথায় তাদের পথশ্রম, তাদের মনঃকষ্ট সব দূর হবে—অন্ততঃ অর্দ্ধেক কমে যাবে।

প্রার্থীকে প্রিয় বাক্যে বিমুখ করলেও বিমুখতার দুঃখ তার বুকে লঘু হয়ে বাজবে। একটা প্রস্তরখণ্ড যদি খুব

উঁচু থেকে একজনের বুকে ফেলা যায় তার আঘাত গুরুতরই হয়ে থাকে। সেই পাথরখানাই যদি বুকের অতি কাছে এনে ফেলা যায়, সে আঘাত তত কঠিন হয়ে বাজে না। যেখানে আঘাত করতেই হয় প্রিয় বাক্য সেই আঘাতকে সহনযোগ্য করে দেয়। এটাই কি কম লাভ।

কারো কারো ধারণা প্রিয়বাক্য মানে চাটুবাক্য, মিথ্যা বাক্য। তাই কি? প্রিয়বাক্য মানে মূর্খকে বিদ্বান বলা নয়, অসুন্দরকে সুন্দর বলা নয়, কয়লাকে খড়ি বা হীরে বলা নয়। কোন কাজের জন্য অনুরুদ্ধ হয়েও তোমার করার ইচ্ছা বা উপায় না থাকলে—'বয়ে গেছে করতে' না বলে, আমার এ কাজ করার সময় বা উপায় তো নেই এখন, কিছু মনে কোর না—এ কথা বললে কি মিথ্যা বলা হয়? না এতে কোন দোষ আছে?

অপ্রিয় বাক্য বা অপ্রিয় ব্যবহার পেয়েও প্রিয়বাক্য বলা বা প্রিয় ব্যবহার করাই যার স্বভাব, সে দেবতুল্য অর্থাৎ অসাধারণ মানুষ বা পুরুষোত্তম। প্রিয় বাক্যের উত্তরে যে প্রিয়বাক্য বা প্রিয় ব্যবহার করে সে সাধারণ মানুষ, প্রিয়বাক্য বা প্রিয় ব্যবহার পেয়েও যে অপ্রিয় বাক্য বা অপ্রিয় ব্যবহার করতে ছাড়ে না সে দানবতুল্য অর্থাৎ অমানুষ। তাই কলসীর কানার আঘাত পেয়েও যিনি প্রেম ও প্রীতিদান করে গিয়েছেন তিনি চিরস্মরণীয় হয়ে আছেন। তিনি মহাপুরুষ। সবাই মহাপুরুষ হয় না; কিন্তু মানুষ হবার চেষ্টা সবারই করা কর্ত্তব্য। মানুষের দুঃখ নিবারণ করা বা অন্ততঃ লঘু করা কর্ত্তব্য। মানুষের তাই প্রিয় বাক্যের এত মহিমা—এত সমাদর।

'তস্মাৎ তদেব বক্তব্যং।' তাই প্রিয় বাক্যই বলতে হয়।

বহত দখিন বায়

শ্রীনবনীহরণ মুখোপাধ্যায়
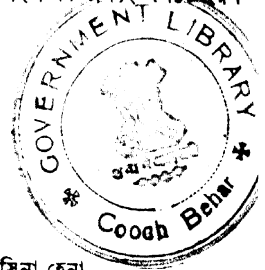
বহত দখিন বায়!
মধুর মধুর বহত বায়!
ঝরিল পর্ণদল,
শিশির শীর্ণ ক'ল;
(অব) জাগত সুপত পত
বিটপী শাখায়!
শাখ নব মঞ্জরিল,
ডাকিল কোয়েল কুল,
নূতন সুরত পাখী
মধুর গায়!
কে এল, কে এল, বল,
জাগে শ্যাম দূর্ব্বাদল,
ঝরা পাতা বায়ুপর
কঁহু ধায়!
ফুটিল কতনা ফুল,
এল এল অলিকুল,
প্রেরল হাসিনা হেনা
বাস মধু বায়!
উড়ল জলদ দল—
জলত সে ছল ছল,
ঝরত কভুবা ঝোর—
ঝর ঝর গায়!
দীপত তপন তলে
ধেনুগণ নাহি বুলে,
যাওয়ত শুনিয়ে বেণু
কদমের ছায়!
রাখাল তৃষিত ভেল
সেইক্ষণ খেল খেল,
তৃপত পিয়ত বারি
ঝরণা ধারায়!
বহত বহত বহত বায়!
বহত মধুর দখিন বায়!!

জগৎশেঠ বংশ

শ্রীকমলাপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়

জগৎশেঠ বংশের নাম বাংলার ইতিহাসের সঙ্গে জড়িয়ে আছে। নবাবী আমলের ইতিহাস পড়লে দেখা যাবে মুর্শিদাবাদের শেঠ বংশ বাংলার নবাব-নাজিমদের চেয়ে সম্মানে বা প্রতিপত্তিতে সেকালে কোনো অংশে কম ছিলেন না, বরং ধন-সম্পত্তির ব্যাপারে নবাব নাজিমের চেয়ে জগৎশেঠই তখনকার দিনে অধিকতর খ্যাতিমান্ ছিলেন। ভারতের মাটিতে সপ্তদশ শতকে যে সমস্ত বিদেশী ব্যবসায়ী এসেছিলেন, ইংরেজ, ফরাসী, ওলন্দাজ নির্বিভেদে তাদের সকলেই শেঠদের কাছে কারবারের জন্যে টাকা নিতো। জগৎশেঠ ফতেচাঁদ ছিলেন প্রথম জগৎশেঠ। ১৭২৪ খৃষ্টাব্দে সম্রাট মহম্মদ সাহ শেঠ ফতেচাঁদকে জগৎশেঠ উপাধি এবং তাঁর ছেলে আনন্দচাঁদকে শেঠ উপাধি দিয়ে এক ফার্মান দেন। জগৎশেঠ ফতেচাঁদ ছিলেন শেঠ মাণিকচাঁদের ভাগনে এবং পরে পোষ্যপুত্র।

মুর্শিদকুলী খাঁ যখন ঢাকা থেকে মুর্শিদাবাদে রাজধানী স্থানান্তরিত করেন, তখন পাটনার হীরানন্দ সাহুর বড় ছেলে মাণিকচাঁদও তাঁর সঙ্গে মুর্শিদাবাদে আসেন। মুর্শিদকুলী খাঁ কুলোরিয়ায় রাজপ্রাসাদ তৈরী করে নিজের নামে সহরের নাম রাখেন মুর্শিদাবাদ এবং মাণিকসাহুও কাছাকাছি মহিমাপুরে নিজের কারবার আরম্ভ করে দেন। সম্রাট ফররোখ সিয়ার কিছুকাল মুর্শিদাবাদে বাস করেছিলেন এবং সে-সময়ে সম্রাটের সঙ্গে মাণিকচাঁদের টাকা লেনদেন ছিল। পরবর্ত্তীকালে সম্রাট ফররোখ সিয়ার মাণিকচাঁদকে শেঠ উপাধি দিয়ে ১৭১৫ খৃষ্টাব্দে এক ফার্মান দেন এবং মুর্শিদকুলী খাঁ এই উপাধির ফার্মান পাওয়ার ব্যাপারে শেঠকে সাহায্য করেন। ফররোখ সিয়ারের রাজত্বের তৃতীয় বৎসরে শেঠ উপাধির ফার্মান মাণিকচাঁদকে দেওয়া হয় বলে মূল ফার্মানে উল্লেখ আছে। ব্রিটিশ ঐতিহাসিক ষ্টুয়ার্ট এ বিষয়ে ভুল লিখেছেন যে ফররোখসিয়ার শেঠ উপাধি দিয়েছিলেন মাণিকচাঁদের ভাগনেকে।* মূল ফার্মান দুখানিই আমি দেখেছি এবং তাতে লেখা আছে সম্রাট ফররোখসিয়ার তাঁর রাজত্বের তৃতীয় বৎসরে মাণিকচাঁদকে শেঠ উপাধি উপযুক্ত খেলাত সমেত দিচ্ছেন এবং তার অনেক পরে সম্রাট মহম্মদ সাহ তাঁর রাজত্বের চতুর্থ বৎসরে শেঠ ফতেচাঁদকে জগৎশেঠ এবং তাঁর ছেলে আনন্দচাঁদকে শেঠ উপাধি দিচ্ছেন একই ফার্মানে। জগৎশেঠ উপাধি দেওয়ার সময় দিল্লীর সম্রাট যে খেলাত দেন, তার পোষাক ইত্যাদি শেঠ পরিবারে আজ পর্য্যন্ত আছে। জগৎশেঠ ফতেচাঁদকে সম্রাট সুন্দর কারচোপী, কুর্ত্তা, শিরপেঁচ, কানের মুক্তোর এয়ারিং এবং একটি সুসজ্জিত হাতী দিয়েছিলেন। আনন্দচাঁদকে শেঠ উপাধির সঙ্গে এক খেলাতও দেওয়া হয়েছিল। ১৭২৪ খৃষ্টাব্দে সম্রাট মহম্মদ সাহ শেঠ ফতেচাঁদকে জগৎশেঠ উপাধি দিয়ে সম্মানিত করেন এবং তিনিই প্রথম জগৎশেঠ। শেঠ বংশের ইতিহাসে দেখা যায় যে জগৎশেঠ উপাধি প্রথম যিনি পেয়েছিলেন তাঁর নামও ফতেচাঁদ এবং যিনি এই উপাধি সরকারীভাবে শেষ ব্যবহার করে সম্প্রতি পরলোকগমন করলেন তাঁর নামও ফতেচাঁদ। প্রথম জগৎশেঠ ফতেচাঁদ ছিলেন শেঠ মানিকচাঁদের ভাগ্‌নে এবং পরে পোষ্যপুত্র। জগৎশেঠ ফতেচাঁদের জননীর নাম ধনবাই এবং শেঠ-বংশের স্থাপয়িতা হীরানন্দ সাহু-র এই মেয়ের বিয়ে হয়েছিল বারাণসীর শেঠ উদয়চাঁদের সঙ্গে।

জগৎশেঠ ফতেচাঁদ মুর্শিদকুলী খাঁ'র সমকালীন ছিলেন এবং ইতিহাসে আছে যে দিল্লী সহরে দুর্ভিক্ষ দেখা দিলে শেঠ ফতেচাঁদ অধিবাসীদের দুঃখ দুর্দ্দশা দূর করতে চেষ্টা করেন। সেই কারণে মোগল সম্রাট তাঁর উপর সন্তুষ্ট হয়ে তাঁকে জগৎশেঠ উপাধি দেন। সে সময়ে সম্রাট মহম্মদ সাহ যে অর্থসংকটে পড়েছিলেন, তার উল্লেখ ইতিহাসে আছে।* জগৎশেঠ ফতেচাঁদ হুণ্ডির প্রচলন বাড়িয়ে সেই অর্থসংকট থেকে মোগল সম্রাটকে রক্ষা করেন। শেঠবংশের কারবার জগৎশেঠ ফতেচাঁদের আমলে বহুগুণ বেড়ে যায় এবং সমস্ত বিদেশী কোম্পানী মোটাহারে বাট্টা ও সুদ দিয়ে শেঠদের কাছে তখন টাকা ধার নিত। জগৎশেঠ ফতেচাঁদের তিন ছেলের সকলেই বাবার জীবিত-কালেই মারা যায়। ফলে তাঁর ছেলেদের মধ্যে কেউ জগৎশেঠ উপাধি পায়নি। ফতেচাঁদ মারা যাওয়ার পর তাঁর বড়ছেলে শেঠ আনন্দ-চাঁদের ছেলে মহাতপচাঁদ জগৎশেঠ উপাধি লাভ করেন। মোগল-সম্রাট সাহ আলমের কাছ থেকে মহাতপচাঁদ জগৎশেঠ উপাধির ফার্মান পেয়েছিলেন। জগৎশেঠ মহাতপচাঁদ আর তাঁর খুড়তুতো ভাই মহারাজা স্বরূপচাঁদ পলাশীর যুদ্ধের সময় ইংরেজ কোম্পানীর প্রধান সহায় ছিলেন। মহাতপচাঁদের নাম সমকালীন ইতিহাসে মহাতব রায় নামেও উল্লিখিত হয়েছে। সে সময়ে শেঠদের গদীর মালিক ছিলেন তাঁরা দুভাই এবং ইষ্টইণ্ডিয়া কোম্পানীর সঙ্গে শেঠদের মোটাটাকার কারবার ছিল। জগৎশেঠ মহাতব রায় সম্বন্ধে পলাশীর যুদ্ধ ও পরবর্ত্তী ইতিহাসে বহু উল্লেখ আছে। উধুয়ানালার যুদ্ধে পরাজিত নবাব মীর কাশিম শেঠদের দুই ভাইকেই সঙ্গে করে মুঙ্গেরে নিয়ে যান এবং ১৭৬৫ সালে জগৎশেঠ মহাতপচাঁদ ও মহারাজা স্বরূপচাঁদকে গঙ্গায় ডুবিয়ে মারেন। তখনকার দিনে তাঁদের সম্পত্তির মূল্য কত ছিল

---

* History of Bengal Stewart. P. 393

* সয়ের মুতাক্ষরীণ—১ম ভাগ, ১৫৮ পাতা

বলা কঠিন। তাঁরা দুজনে প্রায় এককোটি পাউণ্ড রেখে যান বলে ইংরেজ ঐতিহাসিক লিখে গেছেন।

মহাতপচাঁদের পর শেঠদের গদীর মালিক হন তাঁর ছেলে শেঠ খুশলচাঁদ এবং মহারাজা স্বরূপচাঁদের ছেলে উদমস্তচাঁদ। ১৭৬৬ খৃষ্টাব্দে সম্রাট সাহ আলম খুশলচাঁদকে জগৎশেঠ এবং উদমস্তচাঁদকে মহারাজা উপাধি প্রদান করেন। মহাতপচাঁদের মেজছেলে শেঠ গোলাবচাঁদও সম্রাটের কাছ থেকে শেঠ ও জগত-ইন্দ্র উপাধির ফার্মান পেয়েছিলেন। শেঠ গোলাবচাঁদের সঙ্গে জগৎশেঠ খুশলচাঁদের বনিবনা না হওয়ায় গোলাবচাঁদ মহিমাপুর থেকে কাশীমবাজারে চলে আসেন এবং সেখানেই বসবাস করতে থাকেন। ছেলেবেলায় শেঠ গোলাবচাঁদকে নবাব মীরকাশিম মুঙ্গেরে ধরে নিয়ে গিয়েছিলেন এবং শেষ পর্য্যন্ত তিনি অযোধ্যার নবাবের হাতে পড়েন। পরে মীরজাফর অনেক উপঢৌকন দিয়ে গোলাবচাঁদ আর তার খুড়তুত ভাই মিহিরচাঁদকে অযোধ্যার নবাবের কাছ থেকে ছাড়িয়ে আনেন।

তৃতীয় জগৎশেঠ খুশলচাঁদের সময়ে শেঠদের ব্যবসাতে প্রায় আট কোটী টাকা খাটতো। ইষ্টইণ্ডিয়া কোম্পানীর তৎকালীন কর্ত্তারা শেঠ খুশলচাঁদের কাছে অনেক টাকা জোর করে আদায় করেছিলেন। যার জন্যে লর্ড ক্লাইভ যে তদন্ত করেন তাতে খুশলচাঁদকে সাক্ষ্য দিতে হয়। সাক্ষ্য দেওয়ার সময় ক্লাইভ শেঠ খুশলচাঁদকে সমস্ত কথা সত্যি কিনা প্রশ্ন করলে তিনি জোর গলায় বলেছিলেন যে তাঁর একটা মুখের কথার দাম এককোটি টাকা! মোটের উপর খুশলচাঁদের সঙ্গে ইংরেজ কোম্পানীর সম্বন্ধটা সুখের ছিল না! সেই কারণে শেঠ ইংরেজদের কাছে তাঁদের পৈত্রিক ৫০ লাখ টাকা তাগিদ বার বার দিতেন। কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত ইষ্টইণ্ডিয়া কোম্পানী তার মধ্যে মাত্র ২১ লাখ টাকা দেনার কথা স্বীকার করে জগতশেঠদের আর সমস্ত দাবী অস্বীকার করে। খুশলচাঁদ এবং উদমস্তচাঁদ একত্রে লর্ড ক্লাইভের কাছে তাঁদের পাওনা টাকা আদায় দেওয়ার লিখিত আবেদন করার পর ক্লাইভ অনেক বড় বড় কথার পর চিঠিতে লিখলেন, "You are still a very rich house……"। তবে ক্লাইভ জগৎশেঠ খুশলচাঁদকে কোম্পানীর সরফ বা তহবীলদার নিযুক্ত করেছিলেন।

শেঠ খুশলচাঁদের সময় থেকেই জগৎশেঠ বংশের আর্থিক অধঃপতন আরম্ভ হয়। জেনারেল কার্ণাক লিখেছেন যে জগতশেঠ খুশলচাঁদ তেমন উচ্চাকাঙ্ক্ষী নয়, রাজ্য পরিচালনার যেটুকু দায়িত্ব তাঁকে দেওয়া আছে, সেটাও তিনি ছেড়ে দিতে প্রস্তুত। খুশলচাঁদকে ইংরেজ কোম্পানী বছরে তিন লাখ টাকা দিতে চেয়েছিলেন, কিন্তু তিনি সে টাকা নিতে চাননি। জগৎশেঠ খুশলচাঁদ খুব আয়েসী লোক ছিলেন। তাঁর সংসারে তখন ৭০০ মেয়ে বাস করতো, আর চাকর চাকরাণীর সংখ্যা ছিল ১২০০। মাসে তাঁর একলাখ টাকা খরচ হ'তো এবং পৈত্রিক সম্পত্তি ভেঙে সে খরচ চালানো হ'তো। খুবই তিনি অমিতব্যয়ী ছিলেন। ধর্ম্মের কাজে টাকা খরচ করতে শেঠ খুশলচাঁদ কখনও পশ্চাৎপদ ছিলেন না। পরেশনাথ পাহাড়ের বিখ্যাত জৈন-মন্দিরগুলির জন্যে শেঠ খুশলচাঁদ কয়েক লক্ষ টাকা খরচ করেন। পরেশনাথ পাহাড়ের "মারালী" মন্দিরে স্থাপিত জৈন তীর্থঙ্করদের মূর্ত্তির নীচে শেঠ বংশের সৌগলচাঁদ বা সুখলচাঁদ ও হোসিয়ালচাঁদের নাম খোদাই করা আছে। সৌগলচাঁদ ছিলেন জগৎশেঠ খুশলচাঁদের ছোট ভাই। হোসিয়ালচাঁদের নাম জগৎশেঠ বংশের বংশ তালিকায় দেখা যায় না। অনেকের বিশ্বাস খোশিয়ালচাঁদ খোদাইকারীর ভুলে হোসিয়ালচাঁদ হয়ে গেছেন। শেঠ বংশ শ্বেতাম্বর জৈন হ'লেও তাঁরা দিগম্বর জৈন সম্প্রদায়ের মন্দিরেও দান করেছিলেন।

শেঠ খুশলচাঁদের সময় থেকে শেঠদের পৈত্রিক সঞ্চয় ভেঙে সংসার চালানো আরম্ভ হয়। ১৭৭০ খৃষ্টাব্দে ছিয়াত্তরের মন্বন্তরের ফলে শেঠদের বহু টাকা ক্ষতি স্বীকার করতে হয়। সেই বছর নিজামতের মন্ত্রী হিসাবে খুশলচাঁদকে যে টাকা দেওয়া হতো কোম্পানী সে টাকাও বন্ধ করে দেন। ১৭৭২ খৃষ্টাব্দে ওয়ারেন হেষ্টিংস সরকারী খাজনাখানা মুর্শিদাবাদ থেকে কলকাতায় উঠিয়ে নিয়ে যাওয়ায় জগৎশেঠ খুশলচাঁদের সরকারী সরফ বা তহবিলদারের কাজও যায়। ১৭৮৩ খৃষ্টাব্দে শেঠ খুশলচাঁদ মারা যান। তাঁর একমাত্র ছেলে তাঁর মৃত্যুর চারবছর আগে মারা যাওয়ায় শেঠ খুশলচাঁদ শেঠ হরখচাঁদকে পোষ্য নিয়েছিলেন।

শেঠ হরখচাঁদ ছিলেন জগৎশেঠ খুশলচাঁদের ভাই শেঠ সুমেরচাঁদের ছেলে। গভর্ণর জেনারেল ওয়ারেন হেষ্টিংস্-এর অনুরোধে নবাব নাজিম মোবারক-উদৌলা হরখচাঁদকে জগৎশেঠ উপাধি প্রদান করেন। হেষ্টিংসের লেখা সেই অনুরোধপত্রখানি নিজামত রেকর্ড থেকে পরে ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়ালের সংগ্রহশালায় পাঠানো হয়। অবশ্য হেষ্টিংসও জগৎশেঠ হরখচাঁদকে একটি খেলাত, মুক্তার হার, রত্নখচিত পাগড়ী এবং একখানি পাল্কী উপহার দিয়াছিলেন। নবাব নাজিম দিল্লীতে না জানিয়েই তাঁকে জগৎশেঠ উপাধি দেন। হরখচাঁদ প্রথমে বিশেষ অর্থকষ্টে পড়েন। কারণ শেঠদের গুপ্ত কোষাগার সম্পর্কে কোনো কথাই খুশলচাঁদ কাউকে বলে যেতে পারেননি। তবে শেঠ গোলাবচাঁদ জগত-ইন্দ্র কাশীমবাজারে মারা যাওয়ার পর জগৎশেঠ হরখচাঁদ তাঁর টাকার সমস্ত অস্থাবর সম্পত্তি ও টাকাকড়ি পাওয়ায় তাঁর আর্থিক অবস্থার উন্নতি হয়। সন্তান না হওয়ায় হরখচাঁদ বৈষ্ণব ধর্ম্ম গ্রহণ করেন এবং পরে তাঁর ইন্দ্রচাঁদ ও বিষ্ণুচাঁদ নামে দুটি ছেলে হয়। বৈষ্ণব সাধু রামানুজ দাস তাঁকে বৈষ্ণবমন্ত্রে দীক্ষিত করেন এবং শেঠ হরখচাঁদ তাঁর মহিমাপুরের বাসভবনে ১৮০১ সালে গোবিন্দজীর মন্দির নির্ম্মাণ করেন। বৈষ্ণব হলেও হরখচাঁদ জৈন মন্দিরও নির্ম্মাণ করেছিলেন এবং ওসোয়ালদের সামাজিক রীতিনীতি মেনে চলতেন। ১৮১৪ সালে শেঠ হরখচাঁদ মারা যান এবং তাঁর বড় ছেলে ইন্দ্রচাঁদ পঞ্চম জগৎশেঠ হন্। লর্ড কর্ণওয়ালিশের অনুমোদনে ইংরেজ কোম্পানী তাঁকে এই উপাধি প্রদান করেন। অনেকের মতে ইন্দ্রচাঁদ শেষ জগৎশেঠ। কারণ তাঁর উপাধি ব্রিটিশ গভর্ণমেন্ট স্বীকার করে নিয়েছিল। কিন্তু শেঠ বংশের প্রধানের জগৎশেঠ উপাধি পরবর্ত্তী কালেও যে ব্রিটিশ সরকার মেনে নিয়েছেন তার প্রমাণ

জগৎশেঠ বংশ তালিকা
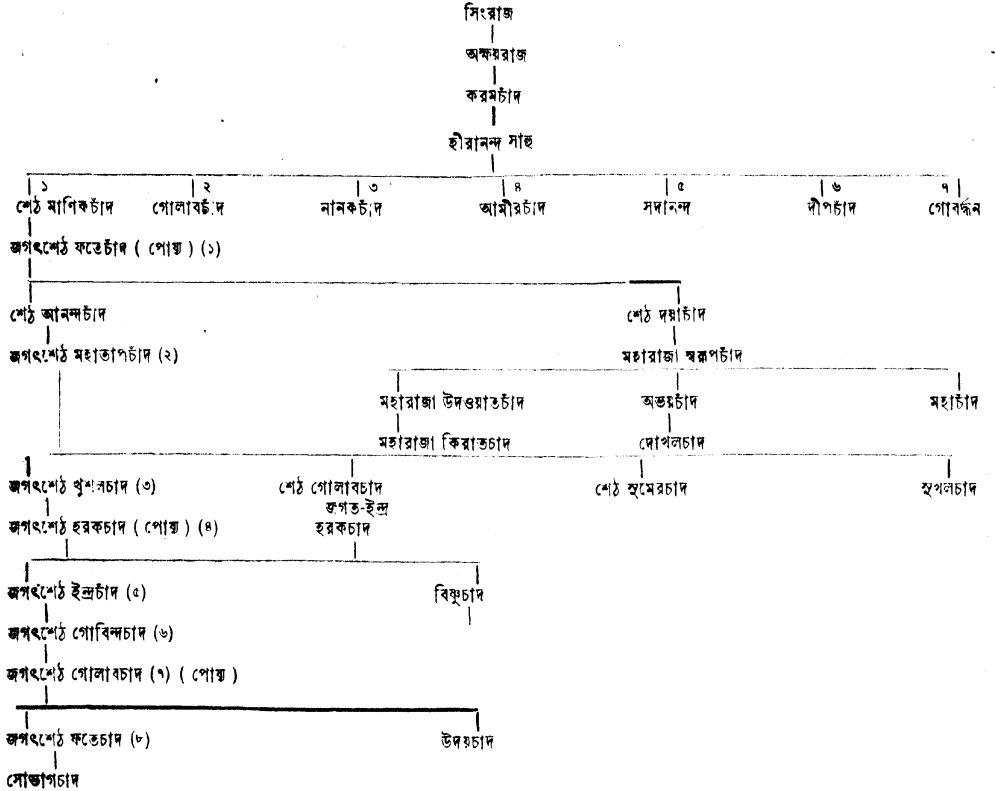
আছে। ১৮২৩ সালে জগৎশেঠ ইন্দ্রচাঁদ পরলোকগমন করেন এবং তাঁর ছেলে শেঠ গোবিন্দচাঁদ ষষ্ঠ জগৎশেঠ হন।

ইন্দ্রচাঁদের সময়ে শেঠ বংশে প্রথম মামলা আরম্ভ হয়। শেঠ বিষ্ণুচাঁদের সঙ্গে জগৎশেঠের সম্পত্তি ভাগের যে মামলা আরম্ভ হয়, কয়েক বছর চলার পর সে মামলার আপোষ নিষ্পত্তি হয়। তখনও শেঠ পরিবারের হীরা জহরত যা ছিল তা গোবিন্দচাঁদ বিক্রয় করেন। মাসিক পেনশন চাইলে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর ইংলণ্ডের ডিরেক্টর বোর্ড তাঁকে মাসিক ১২০০৲ টাকা পেনশন দেওয়ার হুকুম দেন।* তার দেখাদেখি শেঠ বিষ্ণুচাঁদের ছেলে কিষেণচাঁদ ও পেনশনের জন্যে আবেদন করেন। অনেক লেখালেখির পর জগৎশেঠের বৃত্তি থেকে মাসে ৩০০৲ টাকা কেটে, সেই টাকা কিষেণচাঁদকে দেওয়ার আদেশ হয়। (Despatch no 55 dt. 8th November, 1859)। সেই হুকুমের বিরুদ্ধে জগৎশেঠ গোবিন্দচাঁদ বিলাতে ষ্টেট সেক্রেটারীর কাছে আবেদন করলে পেনশনের পুরো টাকা আবার তাঁকেই দেওয়ার আদেশ হয়। জগৎশেঠ গোবিন্দচাঁদ মহিমাপুরে শেঠদের পুরাতন বাড়ীতে বাস করতেন এবং কেল্লা নিজামতে তাঁর সম্মান যথেষ্ট ছিল। বাংলার শেষ নবাব নাজিম ফেরেদুন জার বিয়ের সময় মুর্শিদাবাদের বিশিষ্ট ব্যক্তিদের খেলাত দেওয়া হয়। সব চেয়ে দামী খেলাত পেয়েছিলেন শেঠ গোবিন্দচাঁদ।

১৮৬৪ সালে জগৎশেঠ গোবিন্দচাঁদ পরলোকগমন করেন। তিনি অপুত্রক থাকায় নিজের জীবৎকালে গোপালচাঁদকে পোষ্যপুত্র নেন। জগৎশেঠ গোবিন্দচাঁদের মৃত্যুর পর শেঠদের পেনশন নিয়ে শেঠ কিষেণচাঁদ ও জগৎশেঠ গোপালচাঁদের মধ্যে অনেক গোলমাল চলে এবং শেষ পর্য্যন্ত ইংরেজ সরকার শেঠ কিষেণচাঁদকে মাসে ৫০০৲ এবং জগৎশেঠ গোপালচাঁদকে ৩০০৲ টাকা পেনশন বরাদ্দ করে দেন। কিন্তু জগৎশেঠ গোপালচাঁদ পেনশন নিতে অস্বীকার করেন এবং কিছুদিন পরেই মারা যান। শেঠ কিষেণচাঁদ ও গোপালচাঁদের মৃত্যুর পর সেই পেনশন দেওয়া হয়েছিল তার মা বিবি প্রাণকুমারীকে। জগৎশেঠানি প্রাণকুমারী ছিলেন শেঠ গোবিন্দচাঁদের বিধবা এবং তিনি পরে শেঠ গোলাবচাঁদকে

* (Despatch no 14 of 1843 dt. 30th May, 1843)

পোষ্য নেন। শেঠ গোলাবচাঁদের জগৎশেঠ উপাধি চিঠিপত্রে স্বীকার করলেও, তাঁকে ইংরেজ সরকার পেনশন দেননি। ১৮৯১ সালে বিবি প্রাণকুমারী মারা যান এবং তাঁর আগে বহু আবেদন নিবেদন করেও তিনি ছেলের জন্যে পেনশন আদায় করতে পারেননি।

জগৎশেঠ গোলাবচাঁদের পোষ্যপুত্র রদ নিয়ে এক বিরাট মামলা চলেছিল তাঁর নিজের ভাগ্নের সঙ্গে। এই মামলা প্রিভি কাউন্সিল পর্যন্ত চলে এবং তার ফলে শেঠ পরিবারের বহু জহরত বিক্রি হয়ে যায়। সাধারণতঃ শেঠেরা জিনিষপত্র বিক্রি করতেন না, বন্ধক রাখতেন। জগৎশেঠ গোলাবচাঁদ ব্রিটিশ সরকারের কাছে পেনশন প্রাপ্তির আশায় বহু আবেদন করেছিলেন। অবশেষে ১৮৯২ সালে ভারত সরকার তাঁকে মুর্শিদাবাদের কালেক্টর মারফত স্পষ্টভাবে জানিয়ে দেন যে জগৎশেঠের অনুরোধ রাখতে গভর্ণমেন্ট অক্ষম। ১৩০৪ সালের ভূমিকম্পের সময় পর্যন্ত জগৎশেঠ গোলাবচাঁদ শেঠদের জীর্ণ প্রাসাদেই বসবাস করতেন এবং সাংসারিক ব্যয় সঙ্কুলানের ব্যবস্থা জহরত বা মূল্যবান জিনিষপত্র বিক্রয় করেই চলতো। তারপর জগৎশেঠদের পুরাতন প্রাসাদ ভূমিকম্পে ভূমিসাৎ হয়ে যায় এবং তার সঙ্গে মূল্যবান দলিল ও কাগজপত্র, এমন কি শেঠ পরিবারের বহু ছবিও দালানের নীচে নষ্ট হয়। আবেদনের ফলে ভারত গভর্ণমেন্ট শেঠ গোলাবচাঁদকে বাড়ী তৈয়ারীর জন্যে ৫০০০৲ টাকা সাহায্য করেন এবং তিনি মহিমাপুরেই নতুন বাড়ী তৈয়ারী করে বসবাস করতে থাকেন।

১৯০২ সালে ভারতের বড়লাট লর্ড কার্জ্জন মুর্শিদাবাদে আসেন এবং জগৎশেঠ গোলাবচাঁদের বাড়ীতে গিয়েছিলেন। সেখানে শেঠদের যে প্রাচীন জৈন মন্দিরের ভগ্নাবশেষ ছিল লর্ড কার্জ্জন তা দেখেছিলেন এবং নানারকম জৈন বিগ্রহ দেখে বিস্মিত হয়েছিলেন। জগৎশেঠ গোলাবচাঁদ লর্ড কার্জ্জনকে শেঠদের পারিবারিক দলিলপত্র, বাদসাহী ফার্মান প্রভৃতি দেখিয়েছিলেন। ১৯১২ খৃষ্টাব্দে জগৎশেঠ গোলাবচাঁদ মারা যান্ এবং তাঁর বড় ছেলে ফতেচাঁদ জগৎশেঠ উপাধি পান। বাংলা সরকার তাঁর জগৎশেঠ উপাধি স্বীকার করেছিলেন।

জগৎশেঠ ফতেচাঁদ অষ্টম এবং শেষ জগৎশেঠ। তিনি শেঠ মাণিকচাঁদ স্থাপিত পুরাতন জৈন মন্দিরের কষ্টিপাথর ভাগীরথী গর্ভ থেকে উঠিয়ে নতুন জৈন মন্দির নির্ম্মাণ করেন। এখনও মহিমাপুরে সেই মন্দির বিদ্যমান। শেঠ ফতেচাঁদজী সৎ জৈন ছিলেন এবং সমস্ত জৈন তীর্থ ভ্রমণ করেন। শেষ বয়সে তিনি পারিবারিক অশান্তির জন্যে বহরমপুরে বসবাস আরম্ভ করেন এবং গত ১৯৫৮ সালে বহরমপুরেই হঠাৎ হৃদরোগে পরলোকগমন করেন। তাঁর পুত্র শেঠ সোভাগচাঁদ মহিমাপুরে বাস করেন বটে, কিন্তু জগৎশেঠ উপাধির শেষ শেঠ ফতেচাঁদের সঙ্গেই হয়ে গিয়েছে।

জেগে আছি

শ্রীভূতনাথ চট্টোপাধ্যায়

জেগে আছি—
তোমাদের কাছাকাছি—অতি কাছাকাছি!
সূর্য্যের স্বাদ তোমরা পেলে না
পেলে না আলোর ক্ষমা;
তাইতো আমার রাত্রি গভীরে
সূর্য্য পরিক্রমা!

জীবনে তোমরা হত-আশ্বাসে
কেঁদেছো অনেক জানি:
সে কাঁদার রূঢ় বাস্তব-দ্বারে
আমি করাঘাত হানি।
বিষণ্ণতায় ভরা—

ম্লান মুখ আমি হেরি তোমাদের:
ক্লান্ত তৃষিতা ধরা।
আমি চলি পথ নিশীথ রাত্রি তীরে—
উদয়ের চির আশ্বাসময়
লভিতে সূর্য্যটীরে।
তোমাদের এই জীবনের
ঘন তমিস্রা-রাশি সাথে—
পরিচয় মোর হয়ে আছে
সেই সূর্য্যোদয়ের প্রাতে।
তাই আমি জেগে আছি—
তোমাদের রূঢ় বাস্তবতার
অতিশয় কাছাকাছি!
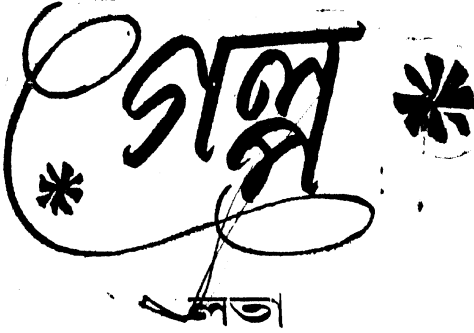
বাসুদেব বন্দ্যোপাধ্যায়

দিল্লী পৌছেই মোহিতকে বলেছিলাম—ভাই, বেড়াতে এসেছি বটে, কিন্তু তোমার কথা না শোনা পর্য্যন্ত বেড়িয়ে সুখ পাবো না।

মোহিত শুনে হেসেছিল, কিন্তু কিছু বলেনি। শুধু সেদিনই নয়, তারপর তিন দিন সে যে-কথা শোনার জন্যে আমি এত ব্যগ্র হয়েছিলাম তার ধার দিয়েও গেল না। এমনও ইঙ্গিত করেছিলাম যে লতা প্রতারণার উদ্দেশ্য নিয়েই ওকে বিয়ে করেছিল, কিন্তু সে-ইঙ্গিত ও গায়েই মাখলো না। তারপর, অপ্রত্যাশিত ভাবেই সে হঠাৎ আজ নিজের থেকেই বলতে সুরু করেছিল। একেবারে সুরু থেকে।

লতা আর যোগেশ ঢাকা সহরের পাশাপাশি বাড়ীর মেয়ে ও ছেলে। পাশাপাশি বাড়ীর ছেলে ও মেয়ের মধ্যে যে যে অবস্থায় বিয়ের প্রস্তাব অবশ্যম্ভাবী হয়ে ওঠে, অর্থাৎ ঘর, জাতি, বয়স, চেহারা, লেখা-পড়া, ইত্যাদি এ দু'জনের বেলায় তা যেন একটু অতিরিক্ত ভাবেই মিলে গিছলো। যোগেশ দু'টো বিষয়ে এম-এ, কিন্তু লতা আই-এ পাশ করার পর আর পড়েনি। তখনও, অর্থাৎ এই কাহিনীর সূত্রপাত পর্য্যন্ত ওদের বিয়ে যে ঘটে ওঠেনি, তার কারণ বোধ হয় এই যে, এদের দু'জনের বিয়ে অনিবার্য্য জেনেই দুই কর্ত্তৃপক্ষ এ ব্যাপারে তাড়াতাড়ি করার প্রয়োজন দেখেন নি।

এমনি সময়ে ওখানে বাধলো সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা। লোকেরা লাগলো পালাতে। বাড়ীতে সোমত্ত মেয়ে, কাজেই লতার বাবা ব্যস্ত হয়ে উঠলেন। যোগেশের বাবাকে জিজ্ঞাসা করতে তিনিও ছেলেকে নিয়ে ওদের সঙ্গেই চলে আসতে চাইলেন, কিন্তু বাধা দিল যোগেশ। আধুনিক ছেলে, পালিয়ে গিয়ে সাম্প্রদায়িক গোঁড়ামিকে প্রশ্রয় দিতে চায় না সে। কাজেই, শেষ পর্য্যন্ত শুধু লতারাই চলে আসে।

দেশ ছাড়ার আগে লতা নাকি যোগেশের দু'হাত ধরে বলেছিল, যোগেশ, তুমিও চলো আমাদের সঙ্গে। আমাকে একলা ঠেলে দিও না।

যোগেশ উত্তরে বলেছিল, আমি তোমাকে ঠেলে দিচ্ছি না, তুমিই বরং ভয় পেয়ে পালাচ্ছো।

লতা বলেছিল, তবে আমাকে কি করতে বলো?

এইখানেই থেকে যেতে বলি। যেখানে যাচ্ছো সেখানেও যদি এই অবস্থা ঘটে তখন কি করবে? কেবল পালিয়ে পালিয়ে বাঁচতে পারবে?

সমস্যাটা লতার কাছে কিন্তু অতো সহজ ছিল না। সরলভাবেই সে বলেছিল, আমার জন্যে বাবা আর মা'কে এই বিপদের মুখে আটকে রাখতে চাই না। কিন্তু তাঁরা যদি চলে যান, আমি একা কি ক'রে থাকবো?

যোগেশ ভেবে বলেছিল, বেশ, যাতে তোমাকে একা থাকতে না হয়, পারবে তার ব্যবস্থা করতে? বুড়ো বাবাকে যখন ধ'রে রাখতে পারছি, তোমাকেও সঙ্গে রাখতে আমার সাহসের অভাব হবে না। কিন্তু তোমাকে ভেবে দেখতে হবে। চক্ষু-লজ্জার সময় নয় এটা।

লতা একবার যোগেশের দিকে চেয়ে দেখেছিল, তারপর তার একটা হাত আকর্ষণ ক'রে বলেছিল, চলো।

কোথায়?

কালীবাড়ী। এইটে-ই আমি ভাবতে পারছি। ব্যবস্থা যা করার, ওইখানে দাঁড়িয়েই হবে। চক্ষু-লজ্জার সময় এটা যেমন নয়, লৌকিক আচারেরও সময় এটা নয়।

কতকটা বিমূঢ়ভাবেই যোগেশ বলেছিল, ভেবে দেখেছো, লতা?

লতা তৎক্ষণাৎ জবাব দিয়েছিল, ভাববারও সময় এটা নয়। চলো, দেরী করলে ক্ষতি হ'তে পারে।

এর পরে কালীবাড়ীতে গিয়ে কালী প্রতিমা সাক্ষী ক'রে ওরা পরস্পরকে অঙ্গীকার ক'রে নেয়।

এই পর্য্যন্ত ব'লে মোহিত ফিস্ ফিস্ ক'রে বললে, আমি কিন্তু এই ঘটনাকে গুরুত্ব দিইনি। সাময়িক উত্তেজনার বশে একটা খেয়ালী মনের কাজ ব'লেই ধরে নিয়েছিলাম। লতার বাপ-মা'ও বোধ হয় ওই রকমই ভেবেছিলেন।

আমি বললাম, তারপর? ওদের কথাই আগে বলো।

মোহিত ব'লে চললো।

লতা কিন্তু শেষ রক্ষা করতে পারে নি। সেদিন কালীবাড়ী থেকে ফিরে এসে যোগেশের সঙ্গে ঢাকাতেই থেকে যাবার সংকল্প ঘোষণা করেছিল বটে, খানিকটা বিদ্রোহও করেছিল, কিন্তু উকীল পিতার বুদ্ধির কাছে শেষ পর্য্যন্ত পরাস্ত হয়। মেয়েকে তিনি বললেন, যোগেশ ছেলেমানুষ, তোমাকে নিয়ে এ অবস্থায় এখানে বাস করার বিপদ তলিয়ে দেখতে পাচ্ছে না। দেখো, দু'দিন পরে ও'ও'ওর বাবাকে নিয়ে কলকাতা গিয়ে উঠবে। কিন্তু তুমি যদি সে সময়ে ওর সঙ্গে থাকো, ওদের বিপদই বাড়াবে। তা ছাড়া, তুমি মেয়ে-মানুষ, তোমার নিজের দিকটাও ত' দেখার আছে! তারপর একটু থেমে ব'লেছিলেন, আর, সত্যিই যদি কিছু না হয়, আমাদের ভয়টা যদি এতই অমূলক হয়, তখন ফিরে আসার পথটা ত' আর বন্ধ হয়ে যাচ্ছে না।

লতার নিজের মনেই বোধ হয় কোন দুর্ব্বলতা ছিল। তবু সে আর একবার যোগেশের সঙ্গে দেখা করার চেষ্টা করেছিল। কিন্তু পারেনি। লতার বাবা নিবারণবাবু মোটর ডাকিয়ে সামান্য দু'চারটে স্যুটকেশ নিয়ে স্ত্রী-কন্যাসহ একেবারে হাওয়াই আড্ডায় উপস্থিত হ'লেন এবং সেইখানেই রাত্রি কাটিয়ে ভোরের প্লেনে কলকাতায় রওনা হ'লেন। কলকাতা আসার ঠিক দু'দিন পরে খবর পেলেন, যোগেশ আর তার বাবা দু'জনেই গুণ্ডার ছুরীতে প্রাণ হারিয়েছে।

পরে শোনা গিছলো যোগেশ এক স্বেচ্ছাসেবক দল গড়তে গিয়ে স্থানীয় গুণ্ডাদের উত্তেজিত করে তোলে এবং তার ফলে শুধু ওদেরেই নয়, ও চত্বরের অবশিষ্ট সমস্ত হিন্দু পরিবারেরই বিপদের সীমা থাকে না।

এ নিয়ে নিবারণবাবু বা তাঁর স্ত্রী কেউই একটি কথাও লতার সঙ্গে বলেন নি। তাঁরা হয়ত ভেবেছিলেন লতা কান্নাকাটি করবে। দেবী-বিগ্রহের সামনে তাদের বিবাহের প্রতিক্রিয়া লতার মনে কি বিপ্লব ঘটাবে তা নিয়েও বোধ হয় তাঁদের উদ্বেগ ছিল। কিন্তু লতার দিক থেকে কোন সাড়া এলো না। যোগেশ নামক কোন যুবকের সঙ্গে যে তার পরিচয় ছিল, তার ব্যবহারে এমন কোন আভাসই প্রকাশ পেলো না। হঠাৎ সে বি-এ ক্লাশে ভর্ত্তি হ'লো এবং অখণ্ড মনোযোগে অধ্যয়ন সুরু করলো। বি-এ পাস করলো ভালভাবেই। এম-এ পড়ার সময় টের পেলো নিবারণবাবু তার বিয়ের উদ্যোগ করছেন। একটা স্যুটকেশ আর কিছু টাকা নিয়ে সে হঠাৎ উধাও হ'ল এবং একেবারে দিল্লীতে।

মোহিত বললে, ষ্টেশনেই আমার সঙ্গে আলাপ।

আমি প্রশ্ন করলাম, কি ভাবে আলাপ হ'লো?

মোহিত মৃদু হেসে বললে, সেও এক দৈব ঘটনা। আমি ষ্টেশনে গিছলাম বৌদিকে আনতে। তিনি এলাহাবাদ থেকে আসছিলেন। বৌদিকে পেলাম না, বাড়ী ফিরে তার পেয়েছিলাম তিনি পরের দিন আসছেন, দেখি একটি বাঙ্গালী মেয়ে কুলির মাথায় একটা স্যুটকেশ চাপিয়ে বিপন্নভাবে এদিক-ওদিক চাইছে। কুলিটা ত্বরান্বিত হয়ে উঠেছে। অবস্থা দেখে কাছে গিয়ে জিজ্ঞাসা করলাম – আপনি কি কাউকে খুঁজছেন?

মেয়েটি বললে, হাঁ, আমার এক বন্ধুকে। তার ষ্টেশনে আসবার কথা ছিল। বলতে পারেন রাউজ এভেনিউ কত দূর? আমি এই প্রথম দিল্লী আসছি।

বললাম, তা হ'লে রাত্রের ট্রেনে আপনার আসা উচিত হয়নি। রাউজ এভেনিউ মাইল চারেক দূরে। আপনি একা, প্রথম দিল্লী আসছেন, পৌছে দিলে কিছু মনে করবেন না নিশ্চয়।

মেয়েটি শুধু বললে, কৃতজ্ঞ থাকবো।

পথে যেটুকু দরকার, পরিচয় হ'লো। জানলাম, মেয়েটির নাম লতা। আসছে বন্ধুর কাছে, কলকাতা থেকে। বন্ধু দিল্লীর খাদ্য-দপ্তরে কাজ করে। প্রশ্ন করলাম, ঠিক ঠিকানায় খবর দিয়েছিলেন ত?

মেয়েটি বললে, অনেকদিন চিঠি-পত্র দেওয়া হয়নি,

তবে ঠিকানা ভুল হবার কথা নয়। ষ্টেশন থেকে টেলিগ্রাম পাঠিয়েছিলাম।

রাউজ এভেনিউ-এ পেঁাছে যা জানা গেল, মেয়েটি তা কল্পনা করেনি। তার বন্ধু বদলি হ'য়ে দিন পনেরো আগে কলকাতা চলে গেছে।

লতা বোধ হয় চোখে অন্ধকার দেখেছিল। নইলে তার গোপন কথা একজন অপরিচিতের কাছে কিছুতেই খুলে বলতো না। হতাশ কণ্ঠে সে বললো, বাপ-মাকে না বলে চলে এসেছি, হাতে হাতেই ফল পেলাম। রাত্তিরটা দিল্লীর ষ্টেশনে থাকা চলে ?

বললাম, যদি ভরসা দেন ত একটা কথা বলি। আমি আমার খুড়তুতো ভাই-এর সঙ্গে থাকি। তাঁর স্ত্রীকে আনতেই ষ্টেশনে গিছলাম, কিন্তু তিনি আসেন নি। অতএব বৌদি বাড়ী নেই। কিন্তু বুড়ী খুড়ীমা' আছেন। আর, আমার দাদারও বয়েস হয়েছে। যদি আপত্তি না থাকে ত' চলুন আমাদের বাড়ী। একেবারে অপরিচিত স্থানে রাত কাটানোর চেয়ে নিশ্চয়ই নিরাপদ হবে।

আমার কি পরিচয় দেবেন ?

আপনিই আপনার পরিচয় খুড়ীমা'র কাছে দেবেন। আমি সঙ্গে ক'রে নিয়ে যাবো মাত্র !

মেয়েটি বললে, চলুন।

মোহিত চুপ করতে বললাম, এই তোমাদের পরিচয়ের সূত্রপাত ? উপন্যাসের মত শুনতে বটে।

মোহিত ম্লান হেসে বললে, শুধু সূত্রপাত নয়, পরিণতিও। জানো ত ?

বললাম, এই জানি যে, তোমাদের বিয়ের পর এক বছরের মধ্যে লতা তোমাকে পরিত্যাগ ক'রে আর একজন যুবকের সঙ্গে চলে গেছে।

মোহিত বললে, ঠিকই জানো। কিন্তু বোধ হয় জানতে না যে সেই যুবক হচ্ছে যোগেশ চৌধুরী।

চমকে উঠলাম। বললাম, যোগেশ তা হ'লে মারা যায় নি ?

মোহিত বললে, না। আহত হ'য়ে মাস দু'য়েক হাসপাতালে ছিল। তারপর সেরে উঠে কয়েকজন মুসলমান যুবকের সঙ্গে মিলে কোন একটা গ্রামের মধ্যে চলে গিয়েছিলো। কমিউনিষ্ট ছিল, বোধ হয় ওদের পার্টির নির্দ্দেশেই কাজ করছিল। যাই হ'ক, ওখানকার অবস্থার কারণেই হ'ক, বা নিরর্থক ভেবেই হ'ক, যোগেশ লতাদের সঙ্গে কোন সংযোগ রাখে নি। কাজেই লতারা ভুল খবরটাই জানতো। অবশ্য যোগেশের বাবা সত্যিই মারা পড়েছিল।

এই পর্য্যন্ত বলে মোহিত অন্যমনস্কভাবে চুপ ক'রে রইল। বোধ হয় সে কিছু ভেবে নেবার চেষ্টা করছিল। আমার কাছে কিন্তু চিত্রটা অস্পষ্টই রয়ে গেল। মোহিত আমার বাল্যবন্ধু। কর্ম্ম-উপলক্ষে আমরা আজ পরস্পর থেকে হাজার মাইল দূরে অবস্থিত হলেও, আমাদের বন্ধুভাব নিঃশেষ হ'য়ে যায় নি। শুনেছিলাম, খুড়ী এবং দাদার সঙ্গে ঝগড়া করে মোহিত জনৈকা মেয়েকে বিয়ে ক'রে আলাদা হয়ে গেছে। লিখেছিলাম মোহিতকে। উত্তরে সে শুধু বলেছিল, আমি দিল্লী এলে পরে সাক্ষাতেই সে তার কৈফিয়ৎ জ্ঞাপন করবে। কিন্তু শুধু বন্ধুর সঙ্গে সাক্ষাতের জন্যে দিল্লী যাওয়া চলে না। যেতে পারি নি। এর মধ্যে মোহিতের দাদা একবার কলকাতা এলেন। তাঁর কাছেই শুনেছিলাম যে, যে মেয়ের মোহে পড়ে মোহিত আত্মীয়-স্বজন ছেড়ে নিজের সমাজের বাইরে ঘর বেঁধেছিল—সে মেয়ে ওকে ফাঁকি দিয়ে ঘর ছেড়ে পালিয়ে গেছে। বিয়ের পর একটি বৎসরও পার হয়নি।

মোহিতের অন্যমনস্কতা ভেঙে দিয়ে বললাম, যেমন বলছিলে, তেমনি ব'লে যাও মোহিত। নইলে আমি ঠিক বুঝতে পারছি না।

মোহিত বললে, হাঁ, বলছি। তারপর সে পূর্ব্বসূত্র ধরে ব'লে চললো :

ষ্টেসন থেকে বাড়ী পৌঁছে লতা মোহিতের খুড়ীকে সত্যি কথাই ব'লেছিল। ব'লেছিল, সে বাপ-মা'কে না ব'লেই কলকাতা থেকে চ'লে এসেছে। কিন্তু কি কারণে এমন কাজ করলো তা ভেঙে বলে নি।

মোহিতের খুড়ী সেকেলে মানুষ, বিব্রত ও কুণ্ঠিত হ'য়ে ব'লেছিলেন—কিন্তু মা, তাঁদের একটা খবর দেওয়া উচিত ত ?

লতা ব'লেছিল, কাল সকালেই খবর পাঠাবো। কাছে পোষ্ট-কার্ড আছে।

সকালে উঠেই পোষ্ট-কার্ড লিখেছিল। টেলিগ্রাম

পাঠানোর প্রসঙ্গে ব'লেছিল, আমার বাপ-মা আমাকে ভাল ক'রেই চেনেন। আমার অদর্শনে তাঁরা মোটেই উতলা হবেন না।

বিকালে দপ্তর থেকে ফিরে মোহিত দেখে, লতা তার স্যুট-কেশটা পাশে রেখে বাইরের ঘরে ব'সে আছে। ওর খুড়ীমা'ও আশে-পাশে কোথাও ছিলেন, মোহিতকে দেখে ব'লে উঠলেন, এই গ্যাখো কি কাণ্ড। পাগল মেয়ে আবার কোথায় চললো। তুই আসবি ব'লে জোর ক'রে বসিয়ে রেখেছি, নইলে এতক্ষণ চলেই যেতো। তুই বাপু ওকে সঙ্গে ক'রে এনেছিস, এখন বোঝ—ব'লে তিনি প্রচ্ছন্ন বিরক্তি নিয়েই ভেতরে চ'লে গেলেন।

মোহিত বললে, কোথায় যাবেন, লতা দেবী ?

লতা বললে, আমার আর এক বন্ধুর সন্ধান পেয়েছি। তার কাছেই যাচ্ছি। খুড়ীমা অকারণে ভাবিত হচ্ছেন।

মোহিত বলেছিল, বাপ-মার কাছে ফিরে যাবেন না ?

ফিরেই যদি যাবো, তবে তাঁদের ছেড়ে এলাম কেন ?

আপনাকে পৌছে দিতে পারি ?

লতা কুণ্ঠাহীন স্বরে বললে, বাধিত হবো। কিন্তু ট্যাক্সি নয়, বাসে যাবো। সতেরো নম্বর বাস ধরতে হবে।

মোহিত বুঝলো একদিনেই লতা দিল্লীর সম্বন্ধে কিছুটা হদিস সংগ্রহ ক'রে নিয়েছে। বাসে যেতে যেতে সে প্রশ্ন ক'রেছিল, এখানে কতদিন থাকবেন ?

লতার প্ল্যান যেন তৈরীই ছিল, বললে, একটা চাকরী পাবার ভরসা ইতিমধ্যেই পেয়েছি। আমরা পূর্ব্ব-বঙ্গের শরণার্থী, সেই হিসাবে আমি বিশেষ সুবিধে দাবী করতে পারবো ব'লে শুনেছি। আপাততঃ এই চাকরীর চেষ্টাই করবো।

মোহিত বললে, আশ্চর্য্য মেয়ে এই লতা। দেহ-মন দুইই যেন ইস্পাতে গড়া। এক মাসের মধ্যে সে একটা বড় দপ্তরে রিসেপ্‌শানিষ্ট-এর চাকরী জুটিয়ে নিল। তার পরে দপ্তরের ডিরেক্টারের সহায়তায় একটা সরকারী দু'ঘর ওলা ফ্ল্যাটও পেয়ে গেল।

প্রশ্ন করলাম, আর ওর বাপ-মা ?

মোহিত বললে, ওর বাপ-মা' অবস্থাটা মেনে নিয়েছিলেন। মেয়ের কাছে এসেওছিলেন একবার। ওর বাবা নতুন ক'রে জীবন-সংগ্রামে নেমেছেন, মেয়ের সাহায্যের প্রয়োজন ছিল তাঁর।

বললাম, অর্থাৎ লতা তার বাপকে টাকা দিয়ে সাহায্য করতো ?

মোহিত বললে, হ্যাঁ, প্রতিমাসে মাইনে পেলেই একটা অংশ বাপকে পাঠিয়ে দিতো। কিন্তু আর কোন চিঠিপত্র দিত না। বাপের ওপর কেমন একটা যেন বিরাগভাব ছিল।

প্রশ্ন করলাম, তুমি ওকে বিয়ে করতে গেলে কেন ? তোমাদের স্বজাত নয়, বংশ পরিচয়ও পরস্পরের জানা ছিল না, তবু কিসের জন্যে তুমি এ-কাজ ক'রেছিলে ?

মোহিত আস্তে আস্তে বললে, সে কথা তোমাকে বুঝিয়ে বলতে পারবো না। ওর চরিত্রের দৃঢ়তাই বোধ হয় অমন ক'রে আমাকে আকর্ষণ ক'রেছিল। প্রায়ই ছল-ছুতোয় ওর সঙ্গে দেখা করতে যেতাম, কিন্তু তোমার কাছে মিথ্যে বলবো না, ওর দিক থেকে কোন দুর্ব্বলতাই কোনদিন প্রকাশ পায়নি। আমার দিক থেকেই একদিন কথা হয়। শুনে কি বলেছিল জানো ? বলেছিল, আমি এই রকমই ভয় করছিলাম। আপনার সহায়তার জন্যে আপনাকে ধন্যবাদ, কিন্তু আপনার মনের আশা যদি এই হয়, তবে আপনি আর আসবেন না। তা ছাড়াও, আপনার এ বাসায় বার বার আসা শোভা পায় না।

একটু থেমে মোহিত আবার বললে, কিন্তু আমি ওর সঙ্গে দেখা করা বন্ধ করতে পারি নি। আমার মরীয়া ভাব দেখে বোধ হয় ভয় পেয়েই তখন ও আমায় যোগেশের কথা সর্ব্বপ্রথম বলে। বলেছিল, আপনি যাতে দুঃখ না পান, সেই জন্যে খুলেই বলছি মোহিতবাবু, আমার সঙ্গে আপনার বিয়ে হ'তে পারে না। আমার বাপ-মা' আমার বিয়ের সম্বন্ধ করাতেই আমি তাঁদের ছেড়ে এসেছি। অতএব, আপনার এ চেষ্টা কতখানি নিরর্থক বুঝতেই পারছেন। যার সঙ্গে আমার বিয়ে হ'তে পারতো, তার নাম যোগেশ চৌধুরী, ঢাকার ছেলে। দাঙ্গায় সে মারা গেছে।—বলে সে যোগেশদের সঙ্গে নিজেদের পারিবারিক সম্বন্ধের এবং কালীবাড়ীর ঘটনার কথা বলেছিল। মনে যাতে কোন সন্দেহ না থাকে সেই জন্যেই বোধ হয় অতো বুঝিয়ে বলেছিল।

আমি বললাম, লতা শেষ পর্য্যন্ত কিন্তু নিজের দৃঢ়তা বজায় রাখতে পারে নি।

মোহিত তা স্বীকার ক'রে বললে—না, তা পারে নি। কতকটা অবস্থার চাপেও বটে, আমাকে বিয়ে করতে মত দিয়েছিল। অভিভাবকহীন বয়স্কা কুমারী মেয়ের পক্ষে চাকরী করার যে বহু অসুবিধা আছে, অল্প দিনেই তা সে জেনেছিল। তাতে ততটা ভয় পায় নি। ভয় পেলো, যখন ওদের দপ্তরের ডিরেক্টারের দৃষ্টি ওর ওপর পড়লো। উনিই ওকে চাকরীতে মনোনীত করেছিলেন এবং সরকারী কোয়াটার্স'ও পাইয়ে দিয়েছিলেন। ও যে বাপ-মা' ছেড়ে একা দিল্লীতে আছে, একথা কেমন করে তাঁর কানে ওঠে। তিনি ওকে যথেষ্ট সাহস দিলেন, ভরসাও দিলেন, কিন্তু মেয়েমানুষের দৃষ্টি এই সবের অন্তরালে আরও কিছু দেখতে পেলো। এদিকে ওর বাবা সঞ্চিত সব টাকা নষ্ট করে ওর উপায়ের ওপর অনেকখানি নির্ভরশীল হ'য়ে কলকাতায় বসে আছেন। এ অবস্থায় চাকরী ছেড়ে দেওয়া ওর পক্ষে সম্ভব ছিল না। অন্যত্র চাকরার চেষ্টা করেছিল, কিন্তু ওর ডিরেকটর দিলেন বাধা। এমনি একটা অবস্থার মধ্যে পড়ে ও' আমায় বিয়ে করে, কিন্তু প্রতারণা করেছিল বলতে পারি না। মিথ্যে বলতে ওকে শুনি নি কোনদিন। ওর দিক থেকে যে এটা ভালবাসার বিবাহ নয়, সে কথা খুলেই বলেছিল।

প্রশ্ন করলাম—তোমার দিক থেকে? আর একজনের প্রতি ওর এত অনুরাগ জানা সত্বেও তুমি আত্মীয়-স্বজন ছেড়ে ওকে বিয়ে করতে গেলে কেন? শুনেছিলাম, তোমাদের বিয়ে রেজিষ্টারী করে হয়েছিল।

মোহিত বললে, হিন্দুর অসবর্ণ বিবাহে রেজিষ্টারী আইনের সাহায্য নেওয়া ছাড়া গতি নেই। বিয়েতে দাদা-বৌদি'রা রাগ করে আসেন নি, তবে লতার নিমন্ত্রণে তার আফিসের ডিরেকটর একবার এসে শুভেচ্ছা জানিয়ে গিছলেন।

বললাম, কিন্তু আমার প্রথম প্রশ্নের উত্তর দিলে না। লতার কথা বুঝলাম, কিন্তু তুমি কি জন্যে ওকে বিয়ে করার এত ব্যগ্র হয়েছিলে? বিশেষ, ওর মনোভাব জেনেও। আর একটা প্রশ্ন করছি, কিছু মনে করো না। বিয়ের পর তুমি সুখী হ'য়েছিলে?

মোহিত বললে, কেন ওকে বিয়ে করার জন্যে এত উতলা হয়েছিলাম, তার জবাব দিতে পারবো না। হয় ত আমি নিজেই জানি না। আর যোগেশের কথা আমার মনে স্থান পায় নি। ও মৃত জানতাম বলেই হয় ত। তবে বিয়ের পর সুখী হ'য়েছিলাম। বাস্তবিকই সুখী হয়েছিলাম।

আর লতা?

মোহিত মৃদু হেসে বললে, বিবাহিত জীবনে সুখ এক-তরফা হয় না। বিয়ের পর ওর ব্যবহার আমার দাদা-বৌদির বিরূপ মনোভাবকেও অনেকখানি বদলে দিয়েছিল। বন্ধু-বান্ধব যারা আসতো, তারাও ওর সৌজন্যে ও ব্যবহারে মুগ্ধ হ'য়ে যেতো। তারা নিঃসন্দেহ ছিল যে, আমি এক স্ত্রী-রত্ন বেছে নিয়েছি। হ্যাঁ, ভবেশ, আমি লতাকে পেয়ে পরম সুখী হয়েছিলাম। আমার ধারণা, আমরা দু'জনেই সুখী হ'য়েছিলাম।

তারপর?

তারপর এইখানেই লতা যোগেশকে দেখতে পায়।

আমরা কথা কইছিলাম কুতুব-মিনারের পাদদেশে চত্বরের উপর বসে। শীতের মধ্যাহ্ন, আরও অনেকে এদিকে সেদিকে বসে আছে। মিনারে চড়ার জন্যে অনেক নর-নারী লাইন বেঁধে দাঁড়িয়ে আছে। অনেক-গুলি ছেলে-মেয়ে মস্‌জিদ্ চত্বরের লৌহ স্তম্ভ ঘিরে দাঁড়িয়ে আছে। কেউ কেউ পিঠের দিকে হাত বাড়িয়ে স্তম্ভটাকে বেষ্টন করার চেষ্টা করছে, অন্যরা দেখছে বা উৎসাহ দিচ্ছে। কুতুব-মিনার যেমন পৃথিবীর অন্যতম বিস্ময়কর বস্তু, এই লৌহ-স্তম্ভও তেমনি। প্রায় দেড় হাজার বছর আগে খাঁটি লোহা যে কেমন করে স্তম্ভাকারে নির্ম্মিত হয়েছিল, তা আজও নাকি সমস্যাই রয়ে গেছে।

মাঠের একপাশ দিয়ে কুতুব-মিনারের যে ছায়াটা পড়েছিল, সেইদিকে চেয়ে মোহিত চুপ করে রইল। আমি বললাম, মনে হচ্ছে তুমি ইচ্ছে করেই এখানে এসে তোমার কথা বলছো।

মোহিত বললে, হ্যাঁ। ঘরের মধ্যে বসে শুনলে তুমি এ কাহিনীর মর্ম্ম বুঝতে না। দাদা বৌদি বোঝে নি। তারা লতাকে আর আমার বুদ্ধিকে দোষ দেয়। কিন্তু আশা করি তুমি বুঝবে।

হঠাৎ ব'লে ফেললাম, কিন্তু তোমার আবার বিয়ে করতে কোন বাধা নেই ত মোহিত?

মোহিত বিরক্তি-সূচক ভঙ্গী করে বললে, অতো খেলো প্রশ্ন করো না ভবেশ। লতার কথাই শোন—যা শুনতে চাইছো। এমনি এক শীতের দিনে আমরা ছুটী উপভোগ করতে এখানে এসেছিলাম। লতা মেহরৌলি বেড়াবার ওপর বেশী ঝোঁক দিয়েছিল। ওখানে ঘুরে ঘুরে ক্লান্ত হ'য়ে আমরা কুতুবে আসি। এসে এমনিভাবেই আমরা দু'জনে দুটো পাথরের ওপর বসে বিশ্রাম করছি, মধ্যে মধ্যে ইতিহাস-বর্ণিত প্রাচীন মেহরোলি সহর সম্বন্ধে দু' একটা টুকরো আলোচনাও করছি, এমন সময়ে হঠাৎ যেন লতা কি দেখে একটা অস্ফুট শব্দ করে উঠলো। ওর দৃষ্টি অনুসরণ ক'রে দেখলাম, যে ভীড়টা মিনারে ওঠার জন্যে দরজায় জমে আছে, সেই দিকে ও অনিমেষ নয়নে কাকে লক্ষ্য করছে। মেয়ে-পুরুষ অনেকেই সে ভীড়ে ছিল। ওর এই আকস্মিক ভাবান্তরের কারণ জিজ্ঞাসা করতে যাবো মাত্র, লতা হঠাৎ এক চমকে উঠে দাঁড়ালো এবং কোনদিকে ভ্রূক্ষেপ মাত্র না ক'রে মিনারের দিকে ছুটে গেল।

মোহিত এমন ভাবে বলছিল, যেন দৃশ্যটা চোখের ওপর আর একবার সে দেখছে। সে বলে চললো, আমি প্রথমটা অবাক্ হ'য়ে যাই। তারপর ভাবলাম হয় ত' কোন বন্ধুকে দেখে তাকে অনুসরণ করেছে। তাই অপেক্ষা করে রইলাম। কিন্তু অনেকক্ষণ কেটে গেলেও যখন সে ফিরলো না, তখন উৎকণ্ঠিত হলাম। জানো ত কুতুব-মিনার থেকে লাফিয়ে পড়ে অনেক মেয়ে আত্মহত্যা করেছে?

বললাম, কাগজে পড়েছি।

মোহিত বললে, ওই কথা মনে পড়াতেই আমার ভয় হল। চায়ের ফ্লাস্ক মাটিতেই পড়ে রইল, আমি ছুটলাম মিনারের দিকে। সিঁড়ি দিয়ে যে মেয়ে নামছিল অন্ধকারের মধ্যেই তাকে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখছি। শেষে মিনারের প্রথম তলাতেই লতার দেখা পেলাম। সঙ্গে যোগেশ।

বাধা দিয়ে বললাম, যোগেশকে ত তুমি চিনতে না, মোহিত?

মোহিত বললে, না চিনতাম না। আমি দেখলাম একজন রুক্ষ-মূর্ত্তি পাতলা চেহারা ফর্সা রঙের যুবকের সঙ্গে লতা যেন দিক-বিদিক জ্ঞানশূন্য হয়ে কি তর্ক করছে। আমি যখন গেলাম তখন লতাই কথা বলছিল। আমাকে দেখে বললে, এই যে, তুমি এসেছো ভালই হয়েছে। এই হচ্ছে যোগেশ। যোগেশ চৌধুরী। যোগেশ মারা যায়নি, আমরা এতদিন মিথ্যে খবর জানতাম।

মোহিত বললে, শুনেই যেন আমার পায়ের তলার মাটি সরে যেতে লাগলো। অতি কষ্টে আমি বলতে হয় বলেই যেন বললাম, তুমি ঠিক চিনেছো ত?

লতার যেন রূপান্তর ঘটে গেল। দারুণ অবজ্ঞায় তার নাসা কেঁপে উঠলো। বললে, তুমি জিজ্ঞেস করতে পারলে আমি যোগেশকে চিনেছি কিনা! যাক্ শোন, আমি আর ফিরবো না। যোগেশের সঙ্গেই চলে যাচ্ছি।

এত বিস্মিত বোধ হয় জীবনে কখনও হইনি। বললাম, সে কি? কোথায় যাবে?

লতা শুধু বললে, যেখানে যোগেশ যাবে। স্পষ্ট দেখলাম—লতা অল্প অল্প কাঁপছে।

যুবকটি এতক্ষণ চুপ করে ছিল, এইবার আমার দিকে চেয়ে বললে, আমাকে লতা ভুল চেনে নি, আমি সত্যিই যোগেশ চৌধুরী। আমার মৃত্যু সম্বন্ধে যে রটনা হয়েছিল, তার মূল মিথ্যে নয়। তবে কোন রকমে বেঁচে উঠেছি।

মোহিত বললে, ততক্ষণে আমার মনে আগুন জ্বলে উঠেছে। যোগেশের দিকে চেয়ে বললাম, কি চান আপনি? জানেন, এ মেয়ে আমার বিবাহিতা পত্নী?

যোগেশ বললে, কিছু চাইব ভেবে ত আসি নি। এই দেখাটাই অপ্রত্যাশিত। আর আপনাদের বিবাহের কথা আমি শুনেছি। লতাই একটু আগে বলছিল। কিন্তু আপনি বোধ হয় জানেন না—আমাদেরও একটা বিয়ে হয়েছিল। সেটা লতাদের কলকাতা আসার আগে কালীবাড়ীতে শুধু কালী প্রতিমা সাক্ষী করে। তারপর একটু হেসে বলে-ছিল, ওটা লতারই খেয়ালে বটেছিল, নইলে কোন লোক সাক্ষী থাকলে আমার কাছে তার দামই বেশী হতো।

মোহিত আমার হাতটা চেপে ধরে বললে, আমি কিন্তু ভাই আর সহ্য করতে পারি নি। যোগেশের গলায় জামাটা ডান হাতে চেপে ধরে বলেছিলাম, তুমি একটি ভণ্ড

স্কাউণ্ড্রেল। এতদিন লুকিয়ে লুকিয়ে থেকে যেই খবর পেয়েছো লতা জীবনে স্থায়ী হতে চলেছে, অমনি এসে হাজির হয়েছো ওর কাছে আর সঙ্গে সঙ্গে আমার সুখ-শান্তি নষ্ট করতে। এই মুহূর্ত্তে যদি তুমি চলে না যাও, এখান থেকে তোমাকে ঠেলে ফেলে দেবো। শুধু এখান থেকে নয়, দিল্লী থেকে চলে যাও, নইলে পুলিশে খবর দেবো। ব্ল্যাক-মেল করতে এসেছো ?

ওর আকস্মিক উত্তেজনা আপনিই হ্রাস পেলো, আমার হাত ছেড়ে দিয়ে নিস্পৃহকণ্ঠে তারপর বললে, বাধা দিল লতা। লতা আমার দিকে চেয়ে চোখে আগুন ছুটিয়ে বললে, নিজের সুখ-শান্তিটাই বড্ড বড় করে দেখছো। দাদা-বৌদির আওতায় মানুষ হয়েছো, তোমায় দোষ দিচ্ছি না। কিন্তু মনে রেখো আমি তোমার শিশু-পত্নী নই। আর যোগেশের সম্বন্ধে সব কথাই তোমাকে বলেছিলাম।

অতি কষ্টে উত্তর ক'রেছিলাম, স্বীকার করছি—বলেছিলে। সবই বলেছিলে। কিন্তু উত্তেজনার বশে যা ক'রেছিলে সেটা কি এতই বড়ো যে মেয়েমানুষ হ'য়ে তুমি আইন গত অবস্থাকে একেবারেই উপেক্ষা করতে চলেছো ? আমার কথা ধরছি না, কিন্তু ভেবে ত্যাখো সমাজ তোমাকে কি চোখে দেখবে। তোমার বাপ-মা'ই বা কি ভাববেন !

লতা চোখে-মুখে যেন ঘৃণা ছিটিয়ে বলেছিল, আইন আর অনুষ্ঠানটাই তোমার কাছে বড়। কিন্তু জেনে রাখো, যোগেশ মৃত জেনেই তোমার সঙ্গে আমার বিয়ে হয়েছিল। যোগেশ আমার সঙ্গে দেখা করতে আসে নি, আমি এখানে আছি জানতোও না ও। ও এসেছিল ওদের পার্টির কাজে। এই দেখা হঠাৎই হয়েছে। দেখা যখন হয়েছে, এর পর আমি এক মুহূর্ত্তের জন্যেও তোমার সঙ্গে বাস করতে পারবো না। স্থির জেনো, যোগেশকে সামনাসামনি দেখার পর আমার কাছে আমার বাপ-মা, চাক্‌রী, তুমি, সংসার—সব মিথ্যে হ'য়ে গেছে।

মোহিত বললে, লতার মুখে এক সঙ্গে এত কথা কোন দিন শুনি নি। ওর ইস্পাতে-গড়া দেহ মন দুই-ই যেন জ্বলে উঠেছিল। কিন্তু ওর যোগেশের হয়ে ওকালতী আমার দেহেও যেন জ্বালা ধরিয়ে দিল। লতাকে বলেছিলাম, তোমার কথা ত শুনলাম। কিন্তু তোমার এই যোগেশের কি কৈফিয়ৎ আছে এতদিন আত্মগোপন ক'রে থাকার ? বিশেষ যখন তোমার মনোভাব ওর অজানা থাকার কথা নয় ?

লতা তৎক্ষণাৎ বলেছিল, ওর কৈফিয়তে আমার দরকার নেই। তোমার ত নেই-ই। আমার মনোভাবই আমার পক্ষে যথেষ্ট।

মোহিত বলে চললো, আমার হাত থেকে ছাড়া পেয়ে যোগেশ এতক্ষণ এক পাশে চুপ করে দাঁড়িয়েছিল, কোন কথা বলে নি। এইবার সে লতাকে বাধা দিয়ে বললে, আমাদের আলাদা একটু কথা বলতে দাও না, লতা। বরং নীচে চলো, এখানে লোকজন সন্দেহ করছে। নীচে গিয়ে আমি মোহিতবাবুর সঙ্গে কথা কয়ে একটা বোঝা-পড়ার চেষ্টা করি।

মোহিত বললে, লতা একবার যোগেশের দিকে চাইল, একবার আমার দিকে চাইল, তারপর যোগেশকে লক্ষ্য ক'রে বললে, আমাকে ভুলোবার চেষ্টা করো না যোগেশ। আমার পক্ষে আর অন্য পথ নেই। এইখানে দাঁড়িয়েই তোমার মনের কথা খুলে বলো। যদি বোঝ আমাকে সঙ্গে নিয়ে যেতে পারবে না, তা খুলেই বলো। আমার পক্ষে বর্ত্তমান অবস্থা মেনে চলা অসম্ভব। সে রকম হ'লে এইখানেই আমার জীবনের ইতি হবে।

মোহিত থামতে বললাম, তারপর ?

পাংশু মুখে মোহিত বললে, আমি আর ওখানে দাঁড়িয়ে থাকতে পারি নি। ওদের ওই অবস্থাতেই রেখে নেমে এসেছিলাম, তারপর মনে একটা বোবা ব্যথা নিয়ে একেবারে বাড়ী এসে উঠেছিলাম।

লতা ফেরেনি ?

না।

একটু ভেবে প্রশ্ন করলাম, কোন খোঁজ করো নি ?

মোহিত উত্তর দিলে, খোঁজ করি নি, তবে কলকাতা থেকে খবর পেয়েছিলাম। লতা যোগেশের সঙ্গে পূর্ব্ব-পাকিস্থানে ফিরে গেছে।

ভারতবর্ষে খাদ্য সমস্যার সমাধানে সমবায়

শ্রীপ্রহ্লাদচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় এম্-এ, বি-এল

স্বাধীন ভারতের নাগরিকগণের অন্তঃকরণ যে কথাটি সদাসর্বদা ভারাক্রান্ত করছে সেই কথাটী খাদ্যসমস্যা! শুধু বাঁচার জন্য প্রধানতম আবশ্যক খাদ্য—তারপর আর সব।

আজ ভারতের রাষ্ট্রপ্রধানগণের মনে এই বিষয় তীব্রভাবে আঘাত করছে। এই খাদ্যসমস্যার সমাধান জন্য গত নাগপুর কংগ্রেসের অধিবেশনে কৃষির উন্নতিকল্পে সমবায় নীতি গৃহীত হয়েছে। যদিও এই সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে কোন কোন পক্ষ হতে আপত্তি উত্থিত হয়েছে কিন্তু তাহারা এই সমস্যা সমাধানের কোন বিকল্প প্রস্তাব দিতে সক্ষম হয় নাই।

ভারত স্বাধীন হবার পর সুদীর্ঘ দ্বাদশ বৎসর অতিক্রান্ত হয়েছে কিন্তু কৃষিপ্রধানদেশ ভারত, যেখানে লোকসংখ্যার শতকরা ৮৩ জন কৃষির উপর নির্ভরশীল, সেই ভারতে কৃষির এই শোচনীয় অবস্থা কেন? যে সময়ে ইটালী দেশের প্রতি একরে ধান্যের উৎপাদন ২৯০৩ পাউণ্ড, জাপানে একর প্রতি ২,২৭৯ পাউণ্ড, মিশরে ২,১৫০ পাউণ্ড সেই সময়ে স্বাধীন ভারতের উৎপাদন একর প্রতি ৭২৮ পাউণ্ড (পশ্চিমবঙ্গ সরকার প্রচারিত 'চাষ ও চাষী পত্রিকার ১৩৬৪ সাল আষাঢ় সংখ্যার পরিসংখ্যান)। এই লজ্জাজনক পরিসংখ্যানে ভারতের নরনারী স্বতঃই দুঃখে ও হতাশায় ম্রিয়মান।

ভারতের কৃষির এই শোচনীয় অবস্থার কারণ এই বিজ্ঞানের জয়যাত্রার যুগেও ভারতের কৃষক অশিক্ষিত, কুসংস্কারে আচ্ছন্ন, দরিদ্র ও অতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কৃষিক্ষেত্রে মান্ধাতার আমলের চাষ প্রণালীতে ব্যস্ত। অন্যান্য দেশের কৃষকগণ যে পরিমাণ শারীরিক শ্রমে যন্ত্র বিনিয়োগে ও সারের উপযুক্ত ব্যবহারে যে ধান্য উৎপাদন করেন ভারত তাহার বহুগুণ শ্রমে উৎপাদন করেন অন্যান্য দেশের এক তৃতীয়াংশের কম। স্বাধীন ভারতের এই গ্লানি বড়ই দুঃখদায়ক।

ভারতের প্রধানমন্ত্রী হইতে প্রদেশের মন্ত্রীগণ এবং প্রধান প্রধান রাজকর্মচারীগণের সকলেই বক্তৃতায় বলেন—বর্তমান কৃষি সংস্থার উন্নতি এবং বৈজ্ঞানিক প্রথায় চাষের প্রয়োগ ভিন্ন উৎপাদন বৃদ্ধির আশা দুরাশা। দ্বাদশবর্ষ অতীতে কংগ্রেস মহারথীগণের এই স্থির সিদ্ধান্ত—ভারতের কৃষির উন্নতির জন্য আবশ্যক সমবায় প্রথার এবং বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে চাষের ব্যবস্থা। নান্যপন্থা বিদ্যতে অয়নায়।

ভারতে সমবায় আন্দোলন অর্দ্ধশতাব্দী অতিক্রম করেছে। পরাধীন ভারতের সমবায় আন্দোলনের ব্যর্থতা ভুলিতে পারি, কিন্তু স্বাধীন ভারতের দ্বাদশবর্ষের জড়গতি আমাদের মনে দুঃখের কষাঘাত প্রদান করে—আমাদের চক্ষু অশ্রুভারাক্রান্ত হয়।

ভারতের প্রকৃত শ্রমজীবী কৃষকগণের শতকরা নব্বইজনের অধিক আজিও অশিক্ষিত—তাহাদিগকে সমবায় চাষের কথা—বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে চাষের উপকারিতার বিষয়ে বলিতে যাওয়া শুধু পণ্ডশ্রম নয়, তাহাদের পক্ষে বিরক্তিকর। এজন্য সমবায় পদ্ধতির বিফলতার জন্য ভারতের কৃষকগণকে দায়ী করা অশোভন। যেখানে অশিক্ষা সেখানে কুসংস্কার স্বাভাবিক—সন্দেহ মজ্জাগত।

বর্তমান সময়ে সমবায় প্রথার চাষের একান্ত প্রয়োজনীয়তা যখন কৃষিবিশেষজ্ঞগণ তাহাদের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা থেকে সমর্থন করেছেন তখন এই বিষয় লইয়া কালহরণ করা এবং নিষ্ক্রিয় অবস্থায় বসিয়া থাকা অপরাধ। স্বার্থপর প্রতিক্রিয়াশীল একদল লোক সকল দেশে সকল সময়ে থাকিবেই, সর্ববাদী সম্মত কোন গুরুত্বপূর্ণ কার্য কোন দেশে কোন সময় হয় নাই—দলবুদ্ধি কূটবুদ্ধি সকল সময়ে সকলদেশে শতকাংশ লোককে প্রভাবান্বিত করিবে এই কথাও ধ্রুব সত্য; তথাপি এই সকলক্ষেত্রে সেই বিষয়ে বিশেষজ্ঞ ব্যক্তিগণের বুদ্ধি বিবেচনায় যাহা সঙ্গত তাহাই কার্যকরী করা সঙ্গত।

ভারতের সকল প্রদেশে জমিদারীপ্রথা উচ্ছেদ হইতে বাধা হইল না—প্রত্যেক প্রদেশে লক্ষ লক্ষ মধ্যস্বত্বাধিকারী জনগণকে তাহাদের স্বার্থ হইতে উৎসাদিত করিতে কোন রাজ্যসরকারের কোন বাধা হয় নাই—এজন্য কোন বিপ্লব বা রক্তপাত হয় নাই। কিন্তু কৃষির উন্নতিকল্পে খাদ্য-সমস্যার সমাধান জন্য অন্ততঃ কোন কোন স্থানে পরীক্ষামূলকভাবে সমবায় চাষ প্রবর্তন হয় না কেন বুঝি না। যাহারা সহায়সম্পদহীন, অশিক্ষিত, স্বল্পবুদ্ধি, প্রতিক্রিয়াশীল ব্যক্তিগণের হস্তে ক্রীড়নক তাহাদিগকে তাহাদের মঙ্গল উদ্দেশ্যে যদি কোন কার্যে, তাহাদের স্বার্থের ক্ষতি না করিয়া, অন্ততঃ পরীক্ষামূলকভাবে কোন কোন স্থানে বাধ্য করা প্রয়োজন মনে হয় তাহা করা রাজ্যসরকারের পক্ষে একান্তভাবে করণীয়। রোগীর যদি রোগ সম্বন্ধে কোনরূপ চেতনা না থাকে তাহা স্বতঃই দুশ্চিকিৎস্য। তখন কর্তব্য পরমহংসদেবের ভাষায় বৈদ্যের মতো বুকে হাঁটু দিয়া ঔষধ সেবন করাইয়া তাহার জীবন রক্ষা; নতুবা, রোগীর সদিচ্ছার উপর থাকিয়া ঔষধ সেবনের উপদেশ দিতে দিতে তাহার মৃত্যু দর্শন হত্যার সমতুল্য অপরাধ।

খাদ্য বিষয়ে অসম্পূর্ণতার জন্য নিঃস্ব অন্নক্লিষ্ট ভারতবাসীর কোটী কোটী টাকা অপব্যয়িত হইতেছে—অথচ এই অপব্যয় প্রতীকার সম্ভব যদি ভারতের উৎপাদন অন্যান্য দেশের মতো বৃদ্ধি করা যায়। সুতরাং আমাদের দেশের অন্নকষ্ট নিবারণের উদ্দেশ্যে ভারতের কোটী কোটী অর্থের অপব্যয়ের প্রতিরোধ কল্পে, কৃষকবর্গের স্থায়ী আর্থিক উন্নতিকল্পে বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে যন্ত্র সাহায্যে চাষ প্রবর্তনের জন্য বর্তমান ভূমি-আইনের সংস্কার একান্ত করণীয়, অন্যথায় তাহা কর্তব্যহীনতা।

আমাদের এই পশ্চিমবঙ্গে চারি বৎসরের উপর সমস্ত প্রকার মধ্যস্বত্ব উৎসাদিত হইয়াছে। আজ পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যসরকার এই প্রদেশের একমেবাদ্বিতীয়ম্ জমিদার। পূর্বে জমিদারী আমলে চাষের যে ব্যবস্থা ছিল সেই ব্যবস্থা অব্যাহতই আছে—পূর্বের জমিদারগণ ও মধ্যস্বত্বাধিকারীগণ যেরূপ প্রজা জনসাধারণের নিকট হইতে খাজনাদি আদায় করিতেন বর্তমান রাজ্যসরকার তাহাই করিতেছেন। গত ১৯৫৫ সালে একটী ভূমি সংস্কার আইন (Land Reforms Act) বিধিবদ্ধ হইয়াছে—তাহার মধ্যে সমবায় চাষের কয়েকটী ধারা আছে তাহা শুধু আইন পুস্তকের শোভাবর্দ্ধন করিতেছে না। উহার বিনিয়োগে কোন জেলার কোন গ্রামে সমবায় প্রথার চাষের জন্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জমিগুলি একত্রীকরণ করা হইয়াছে এবং ঐ একত্রিত জমিতে বৈজ্ঞানিক প্রথায় চাষ আরম্ভ হইয়াছে কিনা আমরা এখন পর্য্যন্ত জানিতে পারি নাই।

পশ্চিমবঙ্গ ভূমি অর্জ্জন আইন বিধিবদ্ধ হইবার পর হইতে লেখক ভূমিসংস্কার সম্বন্ধে বহু প্রবন্ধ প্রকাশ করিয়াছেন এবং সর্বাত্মক ভূমি সংস্কার জন্য বঙ্গভাষায় ভবিষ্যৎ কৃষি সংস্থান নামক একটী মুদ্রিত পরিকল্পনা এবং ইংরাজী ভাষায় মুদ্রিত Practical suggestion towards solution of unemployment and Food Problem through Land Refrom ভারতের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী এবং মাননীয় প্রাদেশিক মুখ্যমন্ত্রীগণকে ও কৃষিমন্ত্রীগণকে পাঠাইয়াছিলেন এবং তাঁহারা অনুগ্রহ করিয়া তাহার প্রাপ্তি স্বীকার করিয়াছিলেন। পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যসরকার উক্ত বিষয় সম্বন্ধে আলোচনা জন্য উক্ত মুদ্রিত পরিকল্পনা চাহিয়াছিলেন তাহাদের ১৫।৩।৫৯ তাং ৭৬১ নং পত্রে। উক্ত অনুরোধ মতে আমি ২৫ কপি পাঠাইয়াছিলাম এবং ৩০।৩.৫৯ তাং ৯৩৬ নং পত্রে তাহার প্রাপ্তি স্বীকৃতি পাই।

ঐ পরিকল্পনার সর্বপ্রধান অংশ ছিল সমবায় প্রথায় চাষ। উক্ত সমবায় প্রথায় চাষ জন্য স্থানীয় কৃষি সমবায় সমিতি গঠন এবং তৎকর্তৃক আইনানুসারে জমি গ্রহণ এবং জমির মূল্য নগদে না দিয়া তৎমূল্যের সেয়ার প্রদান। উক্ত পরিকল্পনার ৫ম দফায় ছিল—

The tenants, whose lands will be acquired by the Society, will not get value of their lands in cash but the value payable to them will be converted into their shares of the Society. Shares of the Society are transferable among its members who have homestead lands within the village.

ঐ পরিকল্পনার ৮ম দফায় ছিল—workers should be appointed from amongest the members as far as possible.

উক্ত সমবায় চাষ কার্যকরী করিবার উদ্দেশ্যে ঐ পরিকল্পনায় ছিল—To introduce this scheme some sort of legal compulsion and active govt. co-operation will be necessary. A land Reforms Bill of the above effect should therefore be brought into existence for establishing sound economy in our country Etc. Etc.

গত ১৯৫৫ সালে পশ্চিমবঙ্গে যে ভূমিসংস্কার আইন বিধিবদ্ধ হইয়াছে তাহাতে জমি একত্রীকৃত করিয়া সমবায় চাষ সম্বন্ধে ৫ম অধ্যায়ে কয়েকটী ধারা আছে।

তন্মধ্যে ৩৯ ও ৪০ ধারায় আছে—জমি একত্রীকরণ ব্যবস্থা—রাজ্য সরকার (ক) রায়তগণের আবেদনানুসারে অথবা (খ) তাহার নিজের ইচ্ছায় জমি একত্রীকরণের প্রয়োজনবোধ করিলে যে কোন স্থানের জমি গ্রহণ করিতে পারিবেন এবং ঐ একত্রীকৃত জমি ঐ সকল রায়তের মধ্যে তাহাদের পূর্বজমির অনুপাতে পুনরায় বণ্টন করিতে পারিবেন—যদি সেই স্থানের অন্ততঃ দ্বি-তৃতীয়াংশ ব্যক্তি ঐ একত্রীকরণে সম্মতি দান করে।

ঐ দুই ধারায় ঐ 'যদি' রাজ্যসরকারের জমি একত্রীকরণের সদিচ্ছার সমাধি রচনা করিয়াছে। সুতরাং ঐ 'যদি'র সংশোধন একান্ত প্রয়োজনীয়।

তাহার পর ৪৩ ধারা হইতে ৪৮ ধারায় আছে—সমবায় সমিতি গঠনে সমবায় প্রথায় চাষের ব্যবস্থা—

সাত বা ততোধিক রায়ত যাহাদের জমি এখনও একলপ্তে আছে, তাহারা ঐ জমি অর্জনের ইচ্ছা করিলে (Any seven or more raiyat owning land in a compact block or intending to acquire such land may Etc.) সমবায় কৃষি সমিতি গঠন করিতে পারিবেন।

বঙ্গের শতকরা নিরানব্বইজন কৃষকের জমি একলপ্তে আছে কি না সন্দেহ। সাবেকী বিভাগে জমিগুলি ক্ষুদ্র হইতে ক্ষুদ্রতর হইতেছে এবং তাহাদের দূরে দূরে খণ্ডীকৃত হইতেছে। এমতাবস্থায় সমবায় কৃষি সমিতিগুলি গঠন অচলাবস্থায় আছে। এজন্য ভূমি সংস্কার আইনের উক্ত ধারা সমূহের সংশোধন আবশ্যক।

যে দেশের কৃষকগণ অশিক্ষিত, কুসংস্কারাচ্ছন্ন, অতিমাত্রায় সংরক্ষণশীল সেই দেশে কৃষকগণের সদিচ্ছার উপর নির্ভর করিয়া বা তাহাদিগকে সমবায় চাষের উপকারিতা জানাইয়া তাহাদের শুভবুদ্ধি উদ্রেক করিয়া সমবায় চাষের প্রবর্ত্তনের আশা অলীক ও দুরাশা।

মধ্যবিত্ত পরিবারবর্গের আয়ের কোন বিকল্প ব্যবস্থা না করিয়া সকলপ্রকার মধ্যস্বত্ব গ্রহণে পল্লীগ্রামের উন্নতি সম্পূর্ণ ব্যাহত হইয়াছে। আজ পল্লীগ্রাম প্রতিক্রিয়াশীল এবং মামলাবাজ লোকগণের লীলাক্ষেত্রে পরিণত। কোন শিক্ষিত শান্তিকামী ভদ্র পরিবার পল্লীগ্রামে সম্মানের সঙ্গে দিনপাত করিতে পারিবেন কিনা সন্দেহ। Back to villages পল্লীমুখী হও—এই শুভেচ্ছার যে ক্ষীণ আশা ছিল তাহাও যেন তিরোহিত হইতে চলিয়াছে। ইহার একমাত্র প্রতিকার—সমবায় প্রথায় চাষ।

আমাদের ভারতের মুখ্যমন্ত্রী কংগ্রেসকর্মীগণকে বলিতেছেন—তাঁহারা যেন সমবায় চাষ সম্বন্ধে তাহাদের "ক্ষমাপ্রার্থনার" মনোভাব

পরিত্যাগ করিয়া সমবায় চাষকে সফলীকৃত করেন। (২রা মে, ৫৯ ইন্দোর বক্তৃতা)

গত ২রা মে ১৯৫৯ ভারতের অর্থমন্ত্রী শ্রীমোরারজী দেশাই কলিকাতায় কংগ্রেসকর্মীগণকে পশ্চিমবঙ্গে সমবায় সমিতি গঠনে আত্মনিয়োগ করিতে আহ্বান করিয়াছেন। শুধু সদিচ্ছায় কোন কার্য সম্পন্ন হইবে না—'আপনি আচরি ধর্ম্ম পরকে শিখায়'—এই মনোভাব গ্রহণ করিতে হইবে—তজ্জন্য ভূমিসংস্কার আইনের সর্বাত্মক সংশোধন আবশ্যক। রাজ্যসরকার কর্ত্তৃক অন্ততঃ পরীক্ষামূলকভাবে প্রতি জিলায় প্রতি মহকুমায় রাজ্যসরকারের কর্ম্মচারীগণের সহযোগীতায় এক একটি আদর্শ সমবায় প্রতিষ্ঠান গঠন আবশ্যক—যাহার দৃষ্টান্তে কৃষক জনসাধারণ সমবায় চাষে উদ্যোগী হইবে। জনসাধারণ বহু বক্তৃতা শুনিয়াছে এখন কাজ দেখিতে চায়। আদর্শ কৃষি সমবায় আইনানুগতভাবে নিম্নলিখিত প্রণালীতে করা যাইতে পারে—

১। রাজ্যসরকার স্বয়ং ইচ্ছা করিলে বা মহকুমার সন্নিকটে কোন স্থানের সাতজন জমির মালিক আবেদন করিলে সেই স্থানের ঊর্দ্ধ সংখ্যায় ৫০০ একর জমি (বাস্তু, বাগান, কারখানা, মৎস্য চাষের কেন্দ্র পুষ্করিণী বাদে) স্থানীয় বাজার দরে গ্রহণ করিতে পারিবেন এবং ঐ সকল জমির মালিকগণের জন্য একটি সমবায় কৃষক সমিতি গঠন করিবেন। ঐ সকল জমির মালিকগণ তাহাদের জমির মূল্য নগদে পাইবেন না, ঐ মূল্য তাহাদের ঐ সমিতির অংশে (শেয়ারে) রূপান্তরিত হইবে। প্রতি শেয়ার মূল্য ৫৲ পাঁচ টাকা হইলে শেয়ারে রূপান্তর সহজসাধ্য হইবে। সমিতির মূলধন পাঁচলক্ষ হইতে দশলক্ষ হইতে পারে।

২। ঐ সকল সমিতির অর্দ্ধেক অংশ গভর্ণমেণ্ট গ্রহণ করিবেন। গভর্ণমেণ্ট তাহাদের শেয়ারের মূল্যবাবদ চাষের জন্য ট্রাকটর, উত্তম বীজ এবং সার দিবেন। কার্যারম্ভের জন্য নগদ টাকা আবশ্যক মত দিবেন। স্থানীয় মহকুমা ট্রেজারীর মাধ্যমে উক্ত টাকার এবং সমিতির সমস্ত আয় ব্যয়ে আদান প্রদান চলিবে।

৩। সমিতির কর্ম্মপরিচালনার জন্য যে সকল বেতনভোগী কর্ম্মী নিয়োগের প্রয়োজন হইবে তাহা ঐ সমিতির সভ্যগণ হইতে বা স্থানীয় বাসিন্দাগণ হইতে নিয়োগ করিতে হইবে। বিশেষ প্রয়োজন ভিন্ন স্থায়ীভাবে অন্য কোন কর্ম্মী নিয়োগ করা যাইবে না।

৪। যে স্থানে ঐ সমিতি গঠিত হইবে সেই স্থানে বা মহকুমার সন্নিকটে একটী work shop (যন্ত্রী মেরামতি কর্ম্মশালা), warehouse (শস্য সঞ্চয়ের গুদাম), কৃষি বিদ্যালয়, পোষ্টাফিস, পশুপক্ষী পালন কেন্দ্র (সম্ভব হইলে), ঢেঁকিশালা, তাঁতশালা, ঘানি, আদর্শ ফল ও সবজী বাগান করিতে হইবে। এই সমস্ত বিষয়ে স্থানীয় সভ্যগণের অগ্রাধিকার থাকিবে। ঐ স্থানে চিকিৎসালয় ও প্রসূতিকেন্দ্র স্থাপন করিতে হইবে।

৫। ভূমিসংস্কার বিভাগ, কৃষি বিভাগ, সমবায় বিভাগ প্রভৃতি জনহিতকর যতগুলি বিভাগ রাজ্যসরকার সৃষ্টি করিয়াছেন বা করিতেছেন তাহাদের স্থানীয় উচ্চতম কর্ম্মচারীগণ এই সমবায় সমিতির কার্যে সক্রিয় সহযোগীতা করিবেন। শুধু উপদেশ দানে তাহাদের কর্ত্তব্য শেষ হইবে না। দোষ ত্রুটী বা তাহাদের কর্ত্তব্যে অবহেলায় কোন ক্ষতি হইলে তজ্জন্য তাহাদের দায়ী থাকিতে হইবে। সেচ ব্যবস্থা, বন্যা প্রতিরোধ ব্যবস্থা সরকারের করণীয় থাকিবে।

৬। ফসল প্রস্তুত হইলে ফসলের ⅓ একতৃতীয়াংশ জমির মালিকগণ তাহাদের অংশানুযায়ী পাইবেন, একতৃতীয়াংশ রাজ্যসরকার তাহার অংশবাবদ গ্রহণ করিবেন। বাকী ⅓ অংশ (ব্যয় বাদে) সংরক্ষিত তহবিল ভাবে থাকিবে। কোন কারণে শস্য হানি হইলে জমির মালিকগণের প্রাপ্য অংশ (গত ৫ বৎসরের গড়) অগ্রিম দেয় থাকিবে। পরে ৫ বৎসর শোধনীয় হইবে।

৭। বিক্রয়যোগ্য শস্য ঐ সমিতির মাধ্যমে বিক্রয় করিতে হইবে।

এই ব্যবস্থায় কুফল

(ক) চাষীগণ অর্থাৎ জমির মালিকগণ তাহাদের মালিকানা স্বত্ব হইতে এই ব্যবস্থায় উচ্ছিন্ন হইবেন না—ইহাতে হীনমন্যতার অবকাশ নাই—বরং তাহাদের আশার অধিক একটী বৃহত্তর সংস্থার অংশীদার মালিক হিসাবে তাহাদের মনোবল বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইবে।

(খ) পল্লীঅঞ্চলে নানাবিধ কর্ম্ম ব্যবস্থার উদ্ভবে শিক্ষিত বা অল্পশিক্ষিত ব্যক্তিগণ যাহারা কর্ম্মপ্রচেষ্টায় সহরের দিকে প্রবাহিত হইতেছেন তাহারা পল্লীমুখী হইবেন।

(গ) জমির স্বত্বাদি ও বণ্টন লইয়া নানাবিধ জটিল দেওয়ানী ও ফৌজদারী মোকদ্দমার কারণ লোপ পাইবে। এই প্রতিক্রিয়াশীল ও মামলাবাজ (টাউট শ্রেণীর) লোকগণ গঠনমূলক কার্যে আত্মনিয়োগ করিতে বাধ্য হইবেন।

(ঘ) গভর্ণমেণ্টের খাজনাদি আদায়ের ক্ষেত্র কমিয়া যাইবে এবং আদায় ত্বরান্বিত হইবে। বর্ত্তমান তহশীলদারগণ গঠনমূলক কার্যে আপনাদের নিযুক্ত রাখিতে পারিবেন।

(ঙ) চাষীগণ যাহারা বৎসরের অধিকসময় কর্ম্ম অভাবে কষ্টে দিনাতিপাত করিতেন, যাহারা অর্থাভাবে, সার গরু ও লাঙ্গল অভাবে চাষ করিতে অক্ষম থাকিতেন, তাহারা স্বচ্ছল হইতে পারিবেন এবং তাহাদের নিজ নিজ চেষ্টায় কুটির-শিল্পে আত্মনিয়োগ করিতে পারিবেন।

(চ) মধ্যবর্ত্তী ব্যবসায়ীগণের বিলোপ সাধিত হইবে—অবশ্য শস্যমূল্য নিয়ন্ত্রণ এবং শস্য-সংগ্রহ রাজ্যসরকারের পক্ষে সহজসাধ্য হইবে।

(ছ) স্থানীয় শিক্ষিত ও অশিক্ষিত জনগণের একটি সংযোগস্থল হইবে—উহাদের মধ্যে ভাবের আদানপ্রদানে শিক্ষার দ্রুত উন্নতি হইবে।

(জ) স্থানীয় রাজকর্ম্মচারীগণ ও জনসাধারণ মধ্যে একটী প্রীতিকর সম্বন্ধ গড়িয়া উঠিবে এবং সকলে দায়িত্বশীল হইবেন।

(ঝ) পল্লীর সর্বাত্মক উন্নতিলাভে ভারত বিশ্বে শ্রেষ্ঠ আসনের অধিকারী হইবেন। বন্দে মাতরম্।

শ্যামসুন্দর সিংহল দ্বীপ

শ্রীনিখিলরঞ্জন রায়

সিন্দুর টিপ সিংহল দ্বীপ কাঞ্চনময় দেশ ?
চন্দন যার অঙ্গের বাস, তাম্বুল-বন কেশ !
উত্তাল তাল-কুঞ্জের বায়—মন্থর নিশ্বাস !
উজ্জ্বল যার অম্বর, আর উচ্ছল যার হাস !

প্রাবৃটের ঘনকৃষ্ণ মেঘমালায় দিগন্ত আচ্ছন্ন। কালো মেঘের ছায়ায় সমুদ্রের জলও কালো। ঝড়ের মত্ততায় সমুদ্র হয়ে উঠেছে উত্তাল অশান্ত। শুভ্র ফেনশীর্ষ ঢেউগুলি প্রবল গর্জনে প্রচণ্ড আক্রোশে অবিরাম আঘাত হানছে বেলাভূমির উপর। দূরে ঘনশ্যাম বনরেখা প্রলম্বিত উপচ্ছায়ার মতো কালো দিগন্তের কোল ঘেঁষে বিস্তৃত রয়েছে। প্রকৃতির আজ অশ্রুসজল বিষণ্ণ মূর্তি—বাত্যাবিক্ষুব্ধ সমুদ্র বক্ষ আজ তুমুল গর্জনশীল। এমনি একটা আলোহীন আনন্দহীন শ্রাবণ দিনের ধূমধূসর অপরাহ্ণে পেনিনসুলার এণ্ড ওরিয়েণ্টেলের বিরাট শ্বেতকায় বাষ্পপোত "হিমালয়" ধীরে ধীরে কলম্বো বন্দরে প্রবেশ করল। প্রাথমিক অভ্যর্থনায় মন দমে যাওয়ার কথা। কোথা সেই বহুশ্রুত রৌদ্রোজ্জ্বল বেলাভূমি, আর কোথা মলয়ানিল সঞ্চালিত নারিকেল-বীথি ! প্রবল বাতাস আর উত্তাল ঢেউয়ে স্ফীতোদর আরব ঢা-ও-গুলি জলের উপর ক্রমাগত আছাড় খেয়ে মরছে। বহু কষ্টে ছোট্ট ছোট্ট স্টিমলঞ্চগুলি জাহাজের গ্যাঙ্গওয়ের ধারে এসে লাগল, আর রেলিং বসানো গ্যাঙ্গ-ওয়ে অবলম্বন করে অতি সন্তর্পণে লঞ্চে এসে উঠলাম। তারপর তীরভূমি। কলম্বোর সৌন্দর্যখ্যাতি বহুদিন থেকেই শুনে এসেছি। কিন্তু আজ প্রকৃতি বিরূপ ! এখন শ্রাবণের ঘনঘটা গগনে গগনে। বর্ষাতি নিয়ে ছাতা নিয়ে—আর যার যা সম্বল তাই নিয়ে দলে দলে বেরিয়ে এল যাত্রিদল জাহাজটার অতিকায় উদর থেকে। মাঝি-মাল্লা-লস্কর-যাত্রী-আরোহী সব নিয়ে জাহাজটার জনসংখ্যা নাকি দেড়হাজার। একটা ছোটখাট দুনিয়া যেন ভেসে যেতে থাকে অকূল দরিয়ায়। একটা অদ্ভুত সমাজজীবন গড়ে উঠে জাহাজ-যাত্রীদের মধ্যে। যে কয়দিন জাহাজে থাকে—নিজ নিজ দেশ, সমাজ, গণ্ডী ও পরিবেশ হ'তে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন হয়ে—ততদিনে একটা সাময়িক সমাজ গড়ে তোলে মানুষ তার সহজাত বৃত্তির প্রেরণায় ? আর জাহাজের পরিবেশটিও সামাজিকতার পক্ষে অনুকূল : দুস্তর নীল বারিধি আর নিঃসীম নীলাকাশ—এই দ্বৈত বিরাট সমন্বয়ের এত সান্নিধ্যে মানুষের মন হয়ে উঠে উদার ও প্রসারিত। আধুনিক যাত্রীবাহী জাহাজগুলি মানুষের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য ও মনোরঞ্জনের কত বিচিত্র ব্যবস্থাই না করে থাকে ! খেলাধূলা, সন্তরণ, গান-বাজনা, অভিনয়, চলচ্চিত্র, লাইব্রেরী, ক্লাব—যার যা রুচি সময় কাটাবার হরেকরকম ব্যবস্থা ! চিত্তবিনোদক অনুষ্ঠানগুলির কোন না কোনটাতে যোগদান করা প্রায় বাধ্যতামূলক বল্লেও চলে। সংক্রামক নেশার মতো মানুষকে পেয়ে বসে। সবাই কিছু না কিছু নিয়ে মেতে আছে। তা আমি-ই বা বাদ যাই কেন ? জাহাজে কিছুদিন থাকলেই উদাসীন নির্লিপ্তির অবসান ঘটে।

জাহাজেই এঁদের সঙ্গে আলাপ পরিচয়…শ্রীধর্মবর্ধন, শ্রীবিজয়, শ্রীমতী বিক্রমাসিঙ্গে, ও শ্রীমতী সুদেক্ষা কুঁয়ে। ভারতীয় বাংলা নামের সঙ্গে বেশ মিল ! এঁদের আনুকূল্যেই সিংহলের অংশ বিশেষ দেখবার সুযোগ মিলল। কৃতজ্ঞতাজ্ঞাপক কথাটা প্রথমেই উল্লেখ করতে চাই। এঁদের নিতে এসেছেন জনকয়েক বন্ধুবান্ধবী। বেশ কিছুদিন বিদেশে কাটিয়ে এঁরা আজ দেশে ফিরছেন। তাই এদের এবং এঁদের যাঁরা আগুবাড়িয়ে নিতে এসেছেন সবার মুখে চোখেই আনন্দের আভাষ। দীর্ঘদিনের অবকাশে প্রিয়জন মিলনের আনন্দ ! একটা জিনিস নজরে পড়ল—শিক্ষিত সিংহলীরা বিশেষতঃ যারা ইংরাজীনবীস তারা প্রায় সকলেই পুরাদস্তুর সাহেবে রূপান্তরিত। নকল সাহেব ভারতবর্ষেও প্রচুর-সংখ্যক আজও আছে। কিন্তু বহু ইংরাজীশিক্ষিত ভারতীয়—আর তারাই সংখ্যাগরিষ্ঠ আছে, যারা আদৌ সাহেব হয়নি এবং হওয়ার প্রয়োজনও বোধ করে না। সিংহলীরা এ বিষয়ে আমাদের বিলিতী নকলনবীসদের বহুগুণে হারিয়ে দিয়েছে। বিলাতের অন্ধ নকলে ভারতে সব চাইতে অগ্রণী হচ্ছে বোম্বাইওয়ালারা। চলনে বলনে বেশভূষায় বোম্বাইয়ারা হচ্ছে উৎকট সাহেব-মেম। তার সব চাইতে বড় প্রমাণ হচ্ছে বোম্বাইয়া ফিল্ম—যা আজকের দিনে সারা ভারতের বাজার ছেয়ে ফেলেছে, আর মুঠি মুঠি টাকা লুটছে। এই বোম্বাইয়া ফিল্মে আর সবই আছে—নাই কেবল কোন কলা-শিল্পের লেশ মাত্র। শিক্ষিত সিংহলীরাও বিলিতিয়ানায় উদগ্র। পোশাক-আশাক, পানভোজন, আদবকায়দায় নিখুঁত সাহেবিয়ানার কী ব্যগ্র প্রয়াস ! কলম্বোর বাজারে কয়েকটা বড় ডিপার্টমেণ্টাল স্টোর্স আছে। সেখানে দেখা যাবে সিংহলীনিদের অসম্ভব ভীড়। চাহিদা বেশীরভাগই হচ্ছে টিনের কৌটায় অস্ট্রেলিয়া ও নিউজিল্যাণ্ডের আমদানী বিফ্, পর্ক, সসেজচিজ্, বাটার এবং ঐ শ্রেণীর আরও নানারকমের জিনিসের। গাঁয়ের পুরুষ ও স্ত্রীলোকেরা দেশীয় সারঙ্গা পরে, কিন্তু শহরে শিক্ষিত পুরুষেরা পরে কোট প্যাণ্ট, আর মেয়েরা অনেকে পরে মেমসাহেবী স্কার্ট ও গাউন। তবে বোম্বাইয়ে এ জিনিসটার হুড়োহুড়ি বেশী। বোম্বাইয়ের রূপসীরা স্কার্ট পরে নিজেদের মনোরম করে তুলতে চায়। বোম্বাইয়ের ক্রফোর্ড মার্কেট বিখ্যাত কেনাবেচার বাজার—সেখানে দেখেছি খাঁটি মেম-সাহেবরা শাড়ী খুঁজে বেড়াচ্ছেন, আর এ-দেশের নকলমেমেরা খুঁজছেন গাউন।

শ্রীমতি সুদেক্ষা কুঁয়ে সিংহল পার্লামেণ্টের সদস্যা এবং সজ্জ্যা ও

সামাজিক মর্যাদা-সম্পন্না মহিলা। তিনি আহ্বান জানালেন তাঁর বাড়িতে যাবার জন্য? জাহাজ ঘাটায় তাঁর সুদৃশ্য গাড়িখানা প্রস্তুত। বিনা বাক্যব্যয়ে তাঁর নিমন্ত্রণ গ্রহণ করলাম। শ্রীমতি কুঁয়েরকে বিদুষীও বলা চলে। পৃথিবীর অনেক দেশ দেখেছেন—পড়াশুনাও মোটামুটি মন্দ নয়। কথাবার্তায় আন্তরিকতার ছোঁয়াচ পাওয়া যায়। বাড়ি নিয়ে গেলেন। শ্রীমতি কুঁয়েরের স্বামী একজন পদস্থ সরকারী কর্মচারী। ঘর-দোর সবই ইউরোপীয় প্রথায় সজ্জিত। খাওয়া দাওয়া, চালচলন সবই নিখুঁত ইউরোপীয় কায়দাসম্মত। পারিবারিক কথাবার্তাও বেশির ভাগ ইংরাজীতেই চলে। কলম্বোর আরও কয়েকটি এ শ্রেণীর পরিবারের সঙ্গে আলাপ পরিচয় করিয়ে দিলেন—সবাই এ-বিষয়ে সমধর্মী। বুঝলাম যে সিংহলের ইংরাজী শিক্ষিত অভিজাত শ্রেণী ইউরোপীয় আদব-কায়দা বেশ নিষ্ঠার সঙ্গেই রপ্ত করে নিয়েছে। সে-সময়টা সিংহলে শ্রীসেনানায়কের শাসনকাল। কলম্বোতে প্রধান মন্ত্রীর সদর দপ্তর। প্রধান মন্ত্রীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করা খুব একটা দুঃসাধ্য কাজ নয়। সৌজন্য-সাক্ষাৎ প্রার্থীরা সপ্তাহের নির্দিষ্ট সময়ে ও নির্দিষ্ট দিনে প্রধান মন্ত্রীর দপ্তরের সংশ্লিষ্ট কর্মচারীর নিকট নিজ পরিচয় ও প্রয়োজনাদি দাখিল করলে স্বল্পসময়ের জন্য সাক্ষাৎলাভ হতে পারে। শ্রীসেনানায়কের অমায়িকতা সর্বজনখ্যাত। শ্রীমতি কুঁয়ের প্রস্তাব করলেন: চলুন, প্রধান মন্ত্রীর সহিত সাক্ষাৎ করবেন। প্রস্তাবটি লোভনীয়। এমন একটা সাক্ষাৎকার কলাও করে আত্ম-মহিমা প্রচারের পক্ষে খুবই অনুকূল। কিন্তু লোভ সম্বরণ করলাম। সবিনয়ে শ্রীমতি কুঁয়েরকে বললাম: প্রধান মন্ত্রীকে আমি কি বলব, কয়েকটি মামুলী কথা ছাড়া আমার কি বলবার আছে—মিছিমিছি তাঁর মূল্যবান সময় নষ্ট করি কেন? শ্রীমতি কুঁয়ের আমার বক্তব্যের যৌক্তিকতা অনুমোদন করলেন। প্রধান মন্ত্রীর সঙ্গে সাক্ষাতের প্রস্তাবের ঐ-খানেই ইতি হল।

সিংহল দ্বীপটি ছোট হ'লে হবে কি? প্রশাসনিক ব্যাপারে ঠাঁটের অভাব নেই। সরকারী ও আধাসরকারী প্রতিষ্ঠানগুলির ব্যয়াধিক্য অসম্ভব রকমের। সরকারী কর্মচারীর বেতন ভারতের তুলনায় অনেক বেশী। শিক্ষা বিভাগের খুব জুনিয়ার অফিসারও নিজে মোটর গাড়ি রাখেন। স্বাধীনতার পরবর্তী যুগে পশ্চিমবঙ্গের কোন এডুকেশন অফিসারের পক্ষে গাড়ি রাখা যে স্বপ্নেরও অতীত, সে-কথা হলপ করেই বলতে পারি। স্কুল-কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয় ব্যাঙ্ক, মিউনিসিপ্যালিটি ইত্যাদি প্রতিষ্ঠান মাত্রের কর্মচারিগণ খুব মোটা মোটা বেতন পেয়ে থাকেন। ফলে এ-শ্রেণীর সিংহলীদের জীবনযাত্রার মান বেশ উঁচু, কিন্তু নেহাৎ কৃত্রিম। উচ্চ বেতনের আকর্ষণে জনকয়েক বাঙালী ভদ্রলোকও কলম্বোর কয়েকটি প্রতিষ্ঠানে বহুদিন উচ্চপদে সমাসীন আছেন। বিদেশে যারাই যখন যায়—সবারই খানিকটা ভোল বদল হয়। সবাইতো আর মহাত্মা গান্ধী নন, যে বিলাতের প্রচণ্ড শীতেও সেই হাঁটু-অবধি ধুতি পরে মোজাহীন পায়ে এবং গায়ে কেবল একখানা পশমী চাদর জড়িয়ে চলাফেরা করবেন। কথাটা তা নয়। দেশ, কাল ও জলবায়ু অনুযায়ী পোষাক পরিচ্ছদ গ্রহণ করাই সমীচীন। কথা হচ্ছে যে বিদেশ-প্রবাসী বহু ব্যক্তিই পোষাক-আশাক ও চলনে বলনে এমন একটা ভাব দেখাতে চায় যে তারা যেন কতই হোমরা-চোমরা। সিংহলীদের অনেকের মধ্যে এই ভাবটা বড্ড বেশী প্রকট। সাহেবীয়ানা জাহির করার একটা নির্লজ্জ প্রয়াস। সিংহল দেশটা জগতের একটা ক্ষুদ্রতম দেশ, কিন্তু বাইরের ঠাঁট দেখে তা বোঝবার জো নেই। জনসংখ্যা ৭০ লক্ষ, আয়তন ২৫৭০০ বর্গ মাইল মাত্র। নানান দেশে সিংহলী রাষ্ট্রদূতাবাস জাঁকজমকে অন্য দশটা দেশের সঙ্গে সমান তালে টেক্কা দিয়ে চলেছে। বিদেশ থেকে বিশেষজ্ঞ আমদানীরও অন্ত নেই। অষ্ট্রেলিয়া ও নিউজিল্যাণ্ড থেকে এমন শতাধিক বিশেষজ্ঞ মোটা মোটা পারিশ্রমিকে নানা বিষয়ে সিংহলীদের বিশেষ বিশেষ জ্ঞান দান করছেন, আর দেশের উন্নয়ন প্রচেষ্টাকে ত্বরান্বিত ও সার্থক করায় সাহায্য করছেন। এই সব বিদেশী বিশেষজ্ঞেরা মহা-আরামে দেশময় বিচরণ করছেন। এমনটা যে আমাদের দেশেও না ঘটছে তা নয়। উন্নয়ন পরিকল্পনার কৃপায় বহু বিশেষজ্ঞ—বেশীর ভাগই আমেরিকান—আমাদিগকে বিশেষ বিশেষ বিষয়ে শিক্ষা দিয়ে যাচ্ছেন। তাদের বেতনের বহর দেখলে চক্ষু কপালে উঠতে চায়। এমনি একজন আমেরিকান বিশেষজ্ঞের কথা জানি। তিনি কাগজ কেটে ও জোড়া-তাড়া লাগিয়ে ফ্ল্যাশকার্ড ও ফ্লানেলোগ্রাফ ইত্যাদি তৈরী করতে সিদ্ধহস্ত Expert in audio-Visual education। সপরিবারে এদেশে থাকলেন বছর পাঁচেক—বেতনাদি নিতেন মাসিক হাজার চার-পাঁচ। টাকাটা যে তহবিল থেকেই আসুক না কেন—যে দেশের মাথাপিছু বার্ষিক আয় ২৮১৲ সে দেশে যে কোন ব্যক্তিরই একক আয় মাসিক ৪।৫ হাজার রীতিমত অন্যায়।

কলকাতার চৌরঙ্গী-পার্ক স্ট্রীটের ঝকমকে জৌলুস দেখে যেমন বাংলা-দেশের এঁদো পাড়াগাঁ সম্বন্ধে কোন ধারণাই হতে পারে না, কলম্বো শহর দেখেও তেমি প্রকৃত সিংহলের কোন পরিচয় পাওয়া দুষ্কর। কলম্বো ঝকঝকে শহর—সোজা, প্রশস্ত পিচঢালা রাস্তা—বড় বড় ডিপার্ট-মেণ্টাল স্টোর, সযত্ন রক্ষিত পাবলিক পার্ক, ইউরোপীয় কায়দায় পরি-চালিত হোটেল—এ-সব কলম্বোর বৈশিষ্ট্য। আর বৈশিষ্ট্য হচ্ছে—সুদীর্ঘ সমুদ্র-তীর। সমুদ্রের তীর ধরে চলে গেছে বহুদিকে সুন্দর সুদীর্ঘ রাজ-পথ, আর প্রায় সমান্তরাল রেলপথ। সিগিরিয়া, অনুরাধাপুর, ক্যাণ্ডি, পোলুন্নারুভা ইত্যাদি সিংহলের দর্শনীয় স্থানগুলি সবই কলম্বোর সহিত ভাল ভাল রাস্তা দ্বারা সংযুক্ত।

কলম্বো হারবার কৃত্রিম, মানুষের হাতের গড়া। দৃশ্যপট মনোরম। সমুদ্র-তীর অতিক্রম করেই দেখা যাবে সুদৃশ্য হর্ম্যাবলী! সুপ্রশস্ত মসৃণ পিচঢালা রাস্তা নানা দিকে প্রসারিত! এ অঞ্চলটি কলম্বোর সৌখীন অভিজাত অঞ্চল 'ফোর্ট' নামে খ্যাত। এ অঞ্চলে বিদেশী ও ইংরাজী-শিক্ষিত সিংহলীদের বাস! গৃহ-অলিন্দে আরাম কেদারায় আসীন কর্ম-হীন বিত্তর মেয়ে পুরুষকে দেখা যাবে। কোথাও বা গৃহ-উদ্যানে ছোট-খাট মজলিস বসেছে। শিক্ষিত শহুরে সিংহলীরা স্বভাবতঃ কর্মবিমুখ! শারীরিক শ্রমকে বড্ড হেয় জ্ঞান করে! শিক্ষকতা, ওকালতি, ডাক্তারি, হাকিমি বা নিদানপক্ষে একটা কেরাণীগিরি ছাড়া অন্য কোন

পেশা শিক্ষিত সিংহলীর মনঃপূত নয়। বাবুগিরির দিকে বেজায় ঝোঁক। বাঙালীবাবুর সঙ্গে কী অদ্ভুত মিল। কলম্বোর জনসংখ্যার একটা বিশেষ অংশ শ্বেতাঙ্গ—এঁরাই কিছুদিন পূর্বে ছিলেন দেশের শাসক ও সর্বেসর্বা।

আজ শাসনাধিকার এঁদের হাতে নাই বটে, কিন্তু ব্যবসা-বাণিজ্যে এরাই অগ্রগণ্য। সিংহলের ইংরাজ আমলের প্রভাব ভারতবর্ষে ইংরাজের প্রভাব অপেক্ষা ঢের বেশি গভীর ও প্রকট। এই শ্বেতাঙ্গ সম্প্রদায়ই বিদগ্ধ সিংহলী সমাজের নেতা-নিয়ন্ত্রক। শ্বেতাঙ্গদের আদব-কায়দা, চালচলন, ঢং, মুদ্রাদোষ শিক্ষিত সিংহলীর আদর্শ স্বরূপ। শ্বেতাঙ্গকুল অবশ্যই সিংহলকে নিজ দেশ বলে কখনো মনে করে না! উঁচু মানের জীবন যাত্রায় এরা অভ্যস্ত। ভাল খায়, ভাল পরে, ভাল বাড়িতে থাকে। ব্যবসায় লাভ করে লভ্যাংশ দেশে পাঠায়, আর নির্দিষ্টকালে দেশে ফিরে যায়! ছেলে-মেয়েদের শিক্ষা দেয় নিজ দেশে—সিংহলে নয়, যদিও সিংহলের বিশ্ববিদ্যালয় হতে শুরু করে যাবতীয় বিদ্যালয়ই হুবহু বিলাতীর অনুকরণ।

কলম্বোর জনসমষ্টির আর একটা বড় অংশ তামিল! এরা ভারতাগত! এদের পেশা বহুবিধ—মুখ্যতঃ দোকানদারি ও নানা মেহনতের কাজ! রিক্সাওয়ালা সবাই তামিল। ছোট-খাট দোকানদার তামিল। শ্রমিক মজুর সবই তামিল। কলম্বো শহরের মেথর-মুদ্দফরাস তামিল। একবার কলম্বো মিউনিসিপ্যালিটির মেথরেরা ধর্মঘট করেছিল। রাস্তার আবর্জনা, গৃহের জঞ্জাল সবই পুঞ্জীভূত হয়ে উঠতে লাগল—কিন্তু সিংহলে মেথর পাওয়া গেল না—সিংহলীরা সে-কাজ করবে না!

তারপর আছে মালয়ী মুসলমান আর কাবুলীওয়ালা। এরাও ক্ষণিকের অতিথি। ছোট-খাট কারবার, টাকার লেন-দেন, কুলি-মজুরের কাজ—এদের পেশা। এরাও বিদেশী সিংহলের স্থায়ী বাসিন্দা নয়; খাঁটি সিংহলীরা কলম্বোতে সংখ্যায় অল্প।

সিংহলীরা আসলে পল্লীপ্রিয়। কলম্বোতে আসে চাকুরী অথবা কার-কারবারের হদিসে। এ কলকাতা নয়! কলকাতা সারা বাংলা দেশের সমস্ত রস নিঃশেষে শোষণ করে নিজ দেহটাকে অস্বাভাবিক স্ফীত করেছে। বাকী দেশটা রয়ে গিয়েছে রিক্ত ও বঞ্চিত। কলকাতা হতে বেশি দূর যাবার প্রয়োজন নেই; হাওড়া ময়দানে ছোট্ট ট্রেনে চেপে ১৪.১৫ মাইল গেলেই দেখা যায় বাংলাদেশের অকৃত্রিম পাড়াগাঁয়ের রূপ। বেঁপ-ঝাঁড়-ডোবা, ভাঙা-চোরা কোঠা বাড়ি, বে-মেরামত রাস্তা আর পানাপুকুর এইতো পাড়াগাঁয়ের চিত্র। পাড়াগাঁয়ে না আছে আলো, না আছে আনন্দ। সবাই আমরা শহরমুখী যে।

সিংহলের দশা এতো মন্দ নয়। কলম্বো মোটামুটি ফিটফাট ছিমছাম শহর। কিন্তু পল্লী-অঞ্চল বাংলাদেশের পাড়াগাঁয়ের মতো এতো অবহেলিত, অবজ্ঞাত নয়। সমুদ্র উপকূল দিয়ে যতদূর যেদিকে যাও নিরবচ্ছিন্ন নারিকেল বীথি। নারিকেলের মাথায় মাথায় ঝড়ো হাওয়ার অবিরাম মাতামাতি। দেশের ভিতরে প্রবেশ কর—সেখানে ঘনসন্নিবিষ্ট রাবার বাগিচা। নিবিড় অরণ্যানী সিংহলের এক বিশেষ শোভা। অরণ্যানীর অধিবাসী হস্তীযুথ সিংহলের বিশেষ সম্পদ। সিংহলের গ্রামগুলির একটা স্নিগ্ধ মনোরম রূপ আছে। সিংহলীরা গ্রামগত প্রাণ। শহর তার কাছে স্বপ্নের বস্তু—আমোদের জায়গা, কিন্তু সেখানে সে ক্ষণিকের অতিথি। শহর থেকে গাঁয়ে পালিয়ে আসতে পারলেই যেন বাঁচে। সমুদ্র উপকূল ছেড়ে ভিতরে গ্রামাঞ্চলে যুগ যুগ ধরে প্রবাহিত হয়ে আসছে এক সহজ ও স্বল্পেতুষ্ট নিরুদ্বেগ জীবন ধারা। সিংহলী কৃষক বড়ই শ্রমভীরু। যেটুকু তার ন্যূনতম প্রয়োজন সেটুকু হ'লেই সে সন্তুষ্ট। অধিক মেহনত করতে সে নিতান্ত নারাজ। দেশের বহু বিস্তৃত অঞ্চল অনাবাদী অবস্থায় পড়ে রয়েছে। অথচ আবাদ করলে ফলত সোনা। দেশের উৎপন্ন খাদ্যশস্য যথেষ্ট নয়। প্রচুর অর্থ দিয়ে বিদেশ থেকে আমদানি করে ঘাটতি পূরণ করতে হয়। কিন্তু সেদিকে কারু ভ্রূক্ষেপ আছে বলে মনে হয় না। গ্রামের ঘরগুলি বেশীর ভাগই বাঁশ ও নারকেল পাতার উপাদানে রচিত। প্রায় প্রতি গৃহের সম্মুখেই বেশ খানিকটা জায়গা পরিষ্কার। কাজের অবসরে গৃহবাসী এখানে বসে অবসর বিনোদন করে। সিংহলীরা পান-সুপারি প্রিয়। পান খাওয়া প্রায় সার্বজনীন অভ্যাস। এমন কি যারা বিদেশীর অনুকরণে প্রায় সাহেব বনে গিয়েছে তারাও অনেকে গোপনে গোপনে এক আধটা পান পেলে তার সদ্ব্যবহার করতে ছাড়ে না। বিদেশী শাসনে বাংলাদেশে যেমন সিংহলেও তেমনি এসেছিল ম্যালেরিয়া। গ্রামাঞ্চলে ম্যালেরিয়ায় রুগ্ন, পিলেপেটা মানুষ দেখতে পাওয়া যায়। কিন্তু সাধারণ ভাবে সিংহলীদের স্বাস্থ্য ও দৈহিক গঠন ভাল। গায়ের রং তামাটে—তামিলরা কৃষ্ণবর্ণ। গাঁয়ের পুরুষেরা সাধারণতঃ হাঁটু অবধি ধুতি বা লুঙ্গি পরে। গায়ে একটা ফতুয়া চাপায় বা না চাপায়। স্ত্রীলোকেরা প্রায়ই একখানা দীর্ঘ বস্ত্রখণ্ডে সারা দেহ সুন্দর ভাবে আবৃত রাখে। আবার অনেক সময় উর্ধাঙ্গে পরে চোলী বা ব্লাউস এবং কটিদেশ হতে পায়ের গোড়ালি অবধি ঝুলিয়ে দেয় মেখলা। সিংহলিনীরা সুশ্রী, সুঠাম ও লাবণ্যবতী। মেয়েদের প্রধান কাজ গৃহকর্ম—ঘরদোর নিকানো—আহার্য প্রস্তুত করা ও সন্তান পালন।

গ্রাম্য সিংহলীরা হাঁচি-টিক্‌টিকি খুব মানে। চাষাবাদ, বৃক্ষরোপণ, গৃহ-নির্মাণ, নৌকা ভাসান, স্থানান্তরে গমন ইত্যাদি যে কোন কাজে হাত দেওয়ার পূর্বে রীতিমতো দিন ক্ষণ দেখে শুভ সময় বেছে নেয়। শুভ সময় ছাড়া কখনো কোন শুভ কাজ শুরু করা এদের রীতি নয়। চলতে চলতে পথে শোয়া কুকুর যদি তার কথায় পথ না ছেড়ে দেয় তবে তক্ষুণি বাড়ি ফিরে আসবে। কিছুতেই সেদিন আর কোন কাজ করবে না। টিকটিকির ডাক, পেঁচার ডাক ভারী অশুভ। কাজ ফাঁকি দিবার হাজার রকমের ফিকির। কুঁড়ের বাদশা সব!

কলম্বো সিংহলদ্বীপের দক্ষিণ পশ্চিমাঞ্চলে। দ্বীপের এই অঞ্চলটায় বৃষ্টিপাত অপেক্ষাকৃত বেশী। দ্বীপের মধ্যভাগে পাহাড় ও বন। কলম্বো হতে উত্তরে যেতে হবে সিংহলের অন্যান্য দ্রষ্টব্য স্থান দেখতে হলে। উল্লেখযোগ্য: সিগিরিয়া, পোলোন্নারুয়া, অনুরাধাপুর, ক্যাণ্ডি।

সিগিরিয়া ভারতের অজন্তা পর্বত গুহার মতোই এক বিস্ময়কর

শিল্প সৃষ্টি। বহুদূর ব্যাপ্ত অরণ্য ভেদ করে উঠেছে কুলিশ-কঠিন পাহাড়শ্রেণী। বনভূমির মাঝে মাঝে সু-উচ্চ পাহাড়। সেই পাহাড়-গাত্রে খোদাই করে বিগত দিনের নিপুণ শিল্পী সৃষ্টি করেছেন অপূর্ব গুহাগৃহ, আর প্রস্তর প্রাচীরগাত্রে এঁকেছেন কালজয়ী চিত্রকলা। আনুমানিক খৃষ্টীয় পঞ্চমশতকে রাজা ধাতুসেনের পুত্র কাশ্যপের কীর্তি সিগিরিয়ার পার্বত্য দুর্গ।

সিংহলের আর একটি লুপ্ত গৌরব অনুরাধাপুর। সিগিরিয়ার ও উত্তরে অনুরাধাপুর। এই দুইয়ের মাঝখানে রাজা কাশ্যপ তৈরী করেছিলেন এক বিরাট কৃত্রিম জলাধার। বহুদিনের উপেক্ষা ও অনাদরের মধ্য দিয়েও—সেই প্রাচীন দিনের বিস্মৃত গৌরবের চিহ্ন আজ বহন করেন অনুরাধাপুর, পোলোন্নারুভা ও ক্যাণ্ডি প্রভৃতি শহরগুলো। সিংহল দ্বীপের লুপ্তপ্রায় পুরাণো শহরগুলো পৃথিবীর প্রাচীনতম আশ্চর্যের শ্রেণীভুক্ত। কোথাও আছে বিশালকায় অখণ্ড শিলাময় বুদ্ধমূর্তি, কোথাও স্তূপ, কোথাও রাজপ্রাসাদের ধ্বংসাবশেষ, কোথাও মিনার, কোথাও ছক-কাটা রাজপথ, উদ্যান, দীঘি, হাট-বাজার সম্বলিত এক সুপরিকল্পিত শহরের ধ্বংশাবশেষ। তবে ভারতবর্ষের মতো প্রাচীন ইতিহাসের মূল উপাদানগুলি সিংহলে এখনও বহুলাংশে বিনষ্ট হয়নি, ফলে সিংহলের ধারাবাহিক ইতিহাস রচনা অপেক্ষাকৃত সহজ-সাধ্য। একদিন ক্যাণ্ডীয় নাচ দেখবার সুযোগ ঘটল। শ্রীমতী সুদেষ্ণা কুমারের সৌজন্যেই এটা সম্ভব হল। ঠিক এ ধরণের নাচ ভারতের কোথাও দেখিনি। এ পুরোপুরি সামরিক নাচ। কিন্তু তা বলে আমাদের রায়বেঁশের সঙ্গে এর কোন সাদৃশ্য নেই। এ নাচের বৈশিষ্ট্য হচ্ছে বলিষ্ঠতা। নাচিয়েরা পুরুষ—স্বাস্থ্যবান পেশীবহুল—দুর্দম নৃত্যের তালে তালে সুগঠিত, সুচিক্কণ পেশীগুলি স্ফীত হয়ে উঠে। আর মাদলবাদ্যের সমন্বয়ে হস্ত-পদের কী সাবলীল সঞ্চালন!

রবীন্দ্রনাথের কথায়—

> সিংহলে সেই দেখেছিলেম ক্যাণ্ডিদলের নাচ,
> শিকড়গুলির শিকল-ছেঁড়া যেন শালের গাছ।

ক্যাণ্ডিনাচের উৎপত্তিস্থান ঐতিহাসিক ক্যাণ্ডি-অঞ্চল। ক্যাণ্ডি প্রাচীন সিংহলের রাজধানী। ভগবান বুদ্ধের পূত-দন্তের রক্ষা-স্থান। প্রচলিত কিংবদন্তী এই যে ভগবান বুদ্ধ একাধিকবার সিংহলদ্বীপে শুভাগমন করেছিলেন। কিংবদন্তীর সঙ্গে ইতিহাসের সঙ্গতির একান্ত অভাব। অশোক-দুহিতা সংঘমিত্রা এবং পুত্র মহেন্দ্র (মতান্তরে ভ্রাতা) প্রথম সিংহলে বৌদ্ধধর্ম প্রচার করেছিলেন। সে'ত বুদ্ধ-মহাপরিনির্বাণের প্রায় ২০০।২৫০ বৎসরের পরবর্তী ঘটনা।

সিংহলীরা মনে করে দক্ষিণ ভারত অপেক্ষা উত্তর ভারতের সঙ্গেই তাদের সাদৃশ্য অধিকতর। কথাটা নেহাৎ মিথ্যা নয়। অন্ততঃ আকারে ও প্রকারে বাঙালী ও সিংহলীর মধ্যে মিল অনেকখানি। চেহারার মিল খুবই বেশী। মেজাজের দিক দিয়েও সাদৃশ্য বেশ আছে। মহাবংশো-ল্লিখিত দুর্জয় বাঙালী বীর বিজয়সিংহ হতেই সিংহলীদের উৎপত্তি—এ কথা অনেকেই বিশ্বাস করে। কিংবদন্তী অনুযায়ী বিজয়সিংহ এক বঙ্গ কেশরীর ঔরসে আর এক রূপবতী রাজকন্যার গর্ভজাত সন্তান। দুরন্তপনার অভিযোগে স্বদেশ হতে নির্বাসিত হয়ে—সঙ্গীদলসহ অকূল সমুদ্র পাড়ি দিয়ে সিংহলে উপনীত হন এবং বাহুবলে রাজ্যজয় করে নূতন রাজবংশের প্রতিষ্ঠা করেন।

> "একদা যাহার বিজয় সেনানী হেলায় লঙ্কা করিল জয়,
> একদা যাহার অর্ণবপোত ভ্রমিল ভারত-সাগরময়"

এই কিংবদন্তীকে আশ্রয় করে কবি-কল্পনা উৎসারিত হয়েছে। বিজয় সিংহলের আদিবাসী ভেড্ডা জাতির রাজকন্যা কুইরেণীকে বিবাহ করেন, এবং এই বিবাহের ফলে তিনটি কন্যা সন্তান লাভ করেন। বিজয় প্রথমেই প্রতিষ্ঠা লাভ করতে সক্ষম হননি। ভেড্ডারা তাকে প্রতি পদেই বাধা দিতে থাকে। কিন্তু বিজয় স্বল্পে সন্তুষ্ট থাকবার লোক ছিলেন না। তাঁর আকাঙ্ক্ষা ছিল অপরিমিত—সারা সিংহলের উপর আধিপত্য স্থাপনই ছিল তার লক্ষ্য। আর সেই উচ্চাকাঙ্ক্ষা চরিতার্থ করল জাতি-দ্রোহিণী কুইরেণী। কুইরেণীর পরামর্শে ও সাহায্যে বিজয় ভেড্ডা রাজধানী শ্রীবন্তীপুর আক্রমণ করে প্রত্যেকটি অধিবাসীকে হত্যা করলেন। এই-ভাবে সমগ্র ভেড্ডা রাজ্য তাঁর করতলগত হল। কুইরেণীর কিন্তু শেষ-রক্ষা হল না। নিজের বর্ধিত শক্তি সম্বন্ধে নিঃসন্দেহ বিজয় এইবার তিন কন্যাসহ কুইরেনীকে পরিত্যাগ করলেন। স্বামী পরিত্যক্তা, নিরুপায়া নিরাশ্রয়া কুইরেণী ফিরে গেল আবার ভেড্ডা সমাজে। কিন্তু ভেড্ডারা প্রতিশোধ নিল কুইরেণীর প্রাণহরণ করে। বিজয়ের মৃত্যু হয় অপুত্রক অবস্থায়। এই হল মোটামুটি বিজয়সিংহ সম্বন্ধে সিংহলে প্রচলিত কিংবদন্তী।

সিংহল দ্বীপের আর একটি দর্শনীয় স্থান—ডোণ্ড্রা। নারিকেলকুঞ্জ পরিবেষ্টিত সমুদ্র উপকূলের একটি ছোট্ট গ্রাম। দ্বীপের সর্ব-দক্ষিণে এর অবস্থান—এর পর কেবল ধূ ধূ নীল জলরাশি। ডোণ্ড্রাকে বলা হয় ল্যাণ্ডস্ এণ্ড—শেষ ভূখণ্ড। এর পর একেবারে দক্ষিণ মেরু মহাদেশ অবধি না গেলে আর পা ফেলবার মতো শক্ত জায়গা মিলবে না! সমুদ্র-গামী জাহাজের দিক-নিশানার জন্য এখানে আছে একটি বাতিঘর।

অল্প সময়ে সংক্ষিপ্ত পরিক্রমা শেষ করে আবার কলম্বো ফিরে এলাম! শ্রীমতী সুদেষ্ণাকে অশেষ ধন্যবাদ—তাঁর আনুকূল্যেই এতটা সম্ভব হল। সিংহলে তাঁর বহুল প্রভাব প্রতিপত্তি। তাঁর দেওয়া পরিচয়পত্র নিয়ে যার সঙ্গেই দেখা করতে গিয়েছি সেখানেই পেয়েছি সাদর অভ্যর্থনা ও সহৃদয় ব্যবহার। এই প্রসঙ্গে আরও দু'জন ভদ্রলোকের নামোল্লেখ না করলে প্রত্যবায়গ্রস্ত হব। এঁরা হচ্ছেন সিংহলের সোশ্যাল ওয়েলফেয়ার ডিপার্টমেন্টের উচ্চপদাসীন কর্মচারী মিঃ ধর্মবর্ধন এবং মিঃ সম্বুদ্ধ।

অল্প কয়েকটা দিনের জন্যই সিংহলে এসেছিলাম। কতটুকুই বা দেখলাম, আর কতটুকুই বা জানলাম! কিছু অনেক কিছুই যে দেখা হল না বা জানা হল না, তাই যেন সামান্য যা কিছু দেখলাম:তাকে আরও মনোরম করে তুলল। Yarrow visited এর চাইতে Yarrow unvisited সর্বদাই অধিকতর আকর্ষণীয়। কিন্তু সিংহলকে ভালবেসে

ফেলেছি, প্রায় প্রথম দর্শনেই অনুরাগ। এই সমুদ্রস্নাত দ্বীপ—এর নারিকেলকুঞ্জে ঝড়ো হাওয়ার অশ্রান্ত মাতামাতি—এর শ্যাম শৈলশ্রেণী, এর নয়নাভিরাম স্নিগ্ধ বনভূমি—রৌদ্রকরোজ্জ্বল আকাশ আর সর্বোপরি শান্তস্বভাব, স্বল্পে তুষ্ট ও পল্লীগতপ্রাণ সিংহলী কৃষক পরিবার—মনের উপর গম্ভীর রেখাপাত করে। ভাষার বিভিন্নতা বাদ দিলে সিংহলীর মধ্যে অতি সহজেই বাঙালী তাঁর স্বজনকে আবিষ্কার করে। কোন সুদূর অতীতে বিজয় সিংহ সিংহল দ্বীপে এক বাঙালী উপনিবেশ স্থাপন করেছিলেন—দীর্ঘ যুগের অবকাশেও উত্তর পুরুষের মধ্যে সেই পথিকৃৎ ঔপনিবেশিকের ছাপ অম্লান রয়ে গিয়েছে। তাই প্রশ্ন করি:

দেখতো চেয়ে আমারে তুমি চিনিতে পারো কিনা।

এদিকে শেষের দিন যে ঘনিয়ে এল। কলম্বোর উপকণ্ঠে এক সৌখীন হোটেল। তারি এক সুসজ্জিত কক্ষের বাতায়নে বসে সফেন সাগর ঊর্মির লীলা-চাঞ্চল্য লক্ষ্য করছি। বারবার মত্ত আবেগে সাগর তরঙ্গ বেলাভূমির উপর আঘাতের পর আঘাত করে ফিরে যাচ্ছে। উন্মত্ত আক্রোশে আবার ফিরে আসছে—আবার রজতশুভ্র উচ্ছ্বাসে কণায় কণায় ভেঙ্গে পড়ছে। সর্বংসহা বসুন্ধরা অসীম ধৈর্যে অনন্তের সবেগ আলিঙ্গন বুকপেতে নিচ্ছে। পুরুষ নিষ্ক্রিয় স্থাণুবৎ, আর প্রকৃতি লীলাচঞ্চলা। তীর ও তরঙ্গের এই নিত্যলীলা যেন সেই সৃষ্টি রহস্যেরই এক অপূর্ব অভিব্যক্তি। কাকপক্ষ মৌসুমী মেঘে গগনাঙ্গন আহত। নৈসর্গিক পরিমণ্ডল আসন্ন বর্ষণের আশঙ্কায় মৌন গম্ভীর।

মেঘলা থমথম সূর্য ইন্দু
ডুবল বাদলায় দুলল সিন্ধু—

আমার মনের আকাশও আজ ভারাক্রান্ত। ছেড়ে যাচ্ছি এই মনোহর মরকত শ্যাম দেশ! ছেড়ে যাচ্ছি সহৃদয় সিংহলী বন্ধুদের! আবার কোনদিন ফিরে আসা হবে কিনা? মানচিত্রে যে ছোট্ট দেশটি অনতিপ্রশস্ত লবণজলের ব্যবধানে ভারতবর্ষ হতে বিচ্ছিন্ন দেখে এসেছি এতোদিন, আজ তারি স্থান চিরতরে নির্দিষ্ট হয়ে গেল স্মৃতির মণিকোঠায়।

পরলোকে ডাঃ ডি-এল-দে

শ্রীঅক্ষয়জীবন বসু

কলিকাতা উইমেন্স কলেজের প্রতিষ্ঠাতা-অধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত ধীরেন্দ্রলাল দে এম, এ, (ইতিহাস ও দর্শন—কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়), পি-এইচ-ডি (লণ্ডন) গত ১৭ই মার্চ্চ সোমবার রাত্রি দশটা চারি মিনিটে ২২৯সি বিবেকানন্দ রোডে দেহত্যাগ করিয়াছেন। মৃত্যুকালে তাঁহার বয়স হইয়াছিল যাট্ বৎসরের কিছু বেশী। বহুদিন যাবত তিনি ব্লাডপ্রেসারে ভুগিতেছিলেন। ডাঃ দে মহাশয়ের অকাল-প্রয়াণে দেশের শিক্ষাক্ষেত্রে যে অভাব ও ক্ষতি হইল তাহা একদিক দিয়া অপূরণীয় বলিয়া মনে হয়। তাঁহার মত আদর্শ-নিষ্ঠ, দৃঢ়চেতা, কর্ম্মকুশল, মহানুভব নিঃস্বার্থ শিক্ষাব্রতী এ যুগে এ দেশে বিরল হইয়া আসিতেছে। তিনি প্রায় বিনা সম্বলে মুষ্টিমেয় কৃতবিদ্য সহকর্মীর সহায়তায় সুদৃঢ় আত্মপ্রত্যয়, অমানুষিক পরিশ্রম ও অপরাজেয় অধ্যবসায়ের বলে একটী প্রথমশ্রেণীর কলেজ প্রতিষ্ঠা করিয়া গিয়াছেন। তাঁহাকে পদে পদে বাধাবিঘ্ন অতিক্রম করিতে হইয়াছে, বিরূপ সমালোচনার সম্মুখীন হইতে হইয়াছে। অর্থাভাবে বিব্রত হইতে হইয়াছে। কিন্তু কোন কিছুতেই তিনি বিচলিত বা সংকল্পচ্যুত হ'ন নাই। দেশে একটি আদর্শ নারী শিক্ষা মন্দির গড়িয়া তুলিবেন এই স্বপ্নে এই আদর্শবাদী শিক্ষাবিদ বিভোর হইয়া থাকিতেন। আদর্শের প্রতি লক্ষ্য স্থির রাখিয়া দিনের পর দিন মাসের পর মাস বৎসরের পর বৎসর তিনি যে অক্লান্ত পরিশ্রম করিয়া গিয়াছেন তাহার তুলনা এ যুগে এ দেশে বড় মিলে না। তাঁহার বুকের রক্ত দিয়া তিনি তাঁহার এই মানসী-প্রতিমাকে গড়িয়া তুলিয়াছেন বলিলে অত্যুক্তি হয় না। ২০৪নং কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রিটে অবস্থিত উইমেন্স কলেজটি ডাঃ ডি, এল, দে মহাশয়ের জীবনব্যাপী নীরব-সাধনার ফল। ডাঃ দে ছিলেন অকৃতদার। ছাত্র-জীবনেই তিনি স্বামী ভোলানন্দ গিরির নিকট দীক্ষা গ্রহণ করিয়াছিলেন। গেরুয়া পরিধান না করিলেও তিনি আজীবন জিতেন্দ্রিয় ত্যাগী সন্ন্যাসীর ব্রত পালন করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার সম্বন্ধে সবচেয়ে বড় কথা এই যে তিনি ছিলেন খাঁটী মানুষ—তাঁহার মন, মুখও কাজের মধ্যে কোন অসামঞ্জস্য ছিল না। তাঁহার কঠোর সমালোচকও তাঁহার নৈতিক চরিত্রের বিশুদ্ধি এবং উদ্দেশ্যের সততা স্বীকার করিতে বাধ্য। তাঁহার শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ডাঃ দে চরিত্র-গঠন ও নিয়মানুবর্ত্তিতার উপর বিশেষ জোর দিতেন। তিনি কলেজে যে সব উৎসব-অনুষ্ঠান প্রবর্তন করিয়া গিয়াছেন সেগুলির মাধ্যমে যেমন অনাবিল আনন্দ পরিবেশনের আয়োজন আছে তেমনই তাহার প্রত্যেকটী উৎসবকে শিক্ষাপ্রদ করারও ব্যবস্থা রহিয়াছে। একটুখানি তলাইয়া দেখিলেই উৎসবগুলির গভীর তাৎপর্য্য উপলব্ধি করা যায় এবং প্রবর্ত্তকের দূর-দৃষ্টি, চিন্তার মৌলিকতা ও সংগঠন-শক্তির প্রমাণ পাওয়া যয়। ছাত্রীদের বিশ্ববিদ্যালয়ের ফল যে আশাতিরিক্ত ভাল হইত তাহার জন্য বিশেষভাবে দায়ী ছিল অধ্যক্ষ মহাশয়ের সুযোগ্য পরিচালনা এবং সতর্ক দৃষ্টি।

ডাঃ দের পারিবারিক জীবন ছিল না। তাঁহার বিশাল হৃদয়ের

স্নেহ-বাৎসল্য সহস্রধারায় তাঁহার ছাত্রীদের উপর বর্ষিত হইয়াছে। তিনি তাঁহাদের জন্য শাড়ী, জুতা, ছাতা, কলম এবং আরও প্রয়োজনীয় অনেক কিছু জিনিস সংগ্রহ করিয়া বিনামূল্যে ছাত্রীদিগকে বিতরণ করিয়াছেন। ছাত্রীরা যে বিনামূল্যে মাধ্যাহ্নিক জলখাবার কলেজ হইতে পায় তাহার ব্যবস্থাও তিনিই করিয়া গিয়াছেন। ছাত্রীরা যাহাতে বিনা ফিতে সুযোগ্য চিকিৎসকদের দ্বারা চিকিৎসিত হইতে পারে এবং তাহাদের আর্থিক অসামর্থ্য অনুপাতে বিনামূল্যে বা নামমাত্র মূল্যে ঔষধ পায় তাহার বন্দোবস্ত করিয়া গিয়াছেন। গরীব ছাত্রীরা কলেজ হইতে যে বিনামূল্যে পাঠ্য পুস্তক পায়—এ ব্যবস্থারও প্রবর্ত্তক স্বয়ং প্রতিষ্ঠাতা অধ্যক্ষ ডাঃ দে।

ডাঃ দে ছিলেন নির্ভীক দুর্দ্ধর্ষ যোদ্ধা। অন্যায় অবিচার দেখিলেই তিনি তাঁহার বিরুদ্ধে রুখিয়া দাঁড়াইতেন। প্রতিপক্ষ যত শক্তিশালী ও কৌশলীই হউক না কেন, ডাঃ দে কখনও তাহার কাছে নতি স্বীকার করে নাই। তিনি কোন বিষয়ে শৃঙ্খলা-ভঙ্গ বা শিথিলতা দেখিলেই ক্ষিপ্ত হইয়া উঠিতেন। তাঁহার বাহিরের দিকটা ছিল কঠোর কর্কশ, যদিও তাঁহার হৃদয় ছিল কোমল ও মধুর। অনেক ব্যাপারে অনেকে ভুল বুঝিয়াছেন। এজন্য এই মহাপ্রাণ শিক্ষাব্রতী বহুগুণের অধিকারী হওয়া সত্ত্বেও "অজাত-শত্রু"—পদবাচ্য হইতে পারেন নাই।

ডাঃ দে ছিলেন প্রচার-কুণ্ঠ নীরব-কর্ম্মী। তিনি নাম যশের কাঙ্গাল ছিলেন না। খ্যাতি প্রশংসা প্রতিপত্তি ও পদমর্য্যাদার আশা না করিয়া লোকচক্ষুর আড়ালে তিনি নীরবে তাঁহার কর্ত্তব্য কাজ করিয়া গিয়াছেন—তাঁহার জীবনে তিনি গীতোক্ত কর্ম্মযোগের দৃষ্টান্ত দেখাইয়া গিয়াছেন।

ডাঃ দে ছিলেন জাতীয়তার প্রকৃত উপাসক। আহার-পরিচ্ছদে, আচার-অনুষ্ঠানে, ভাব-ভাষায়, চাল-চলনে তিনি স্বাদেশিকতার ও স্বাজাত্যবোধের একনিষ্ঠ ভক্ত ছিলেন। বিলাত-ফেরত হইয়াও তিনি ধুতি পাঞ্জাবী ছাড়া আর কোন পরিচ্ছদ ব্যবহার করেন নাই। তাঁহার জীবনযাত্রা ছিল অতি অনাড়ম্বর ও সরল—বৈরাগী সন্ন্যাসীর মত। তাঁহার অর্থলিপ্সা ছিল না। কলেজ প্রতিষ্ঠা কল্পে তাহাকে যে দুঃখ-কষ্ট বরণ করিতে হইয়াছে তাহা শুনিলে বিস্মিত হইতে হয়। কোন

ডাঃ ডি, এস, দে
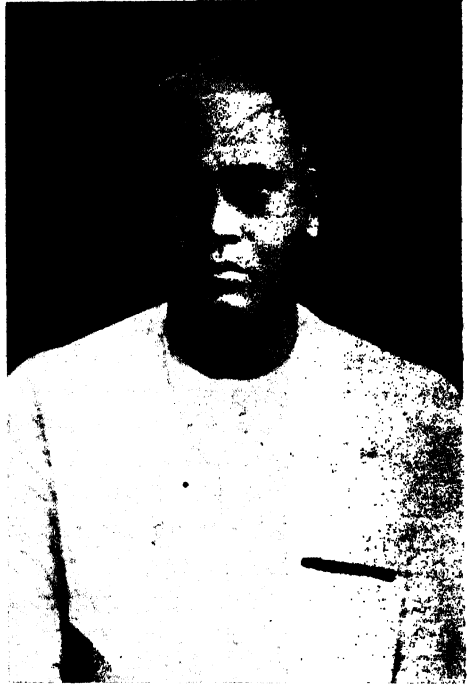
কোন দিন না খাইয়া এবং রাত্রে মেঝের উপর খবরের কাগজ বিছাইয়া শুইয়া কাটাইয়াছেন। তাঁহার কর্ম্মজীবনের ত্যাগোজ্জ্বল পুণ্যকাহিনী শুনিবার ও শুনাইবার মত।

স্রোতস্বতী

সনতকুমার মিত্র

অপরূপ কারুকাজ তোমার তরঙ্গে স্রোতস্বতী :
তোমার নৃত্যের ছন্দে যৌবনের নিদ্রাভঙ্গ হয়,
তোমারি তৃষ্ণায় আমি এমন অনন্ত গতিময় ;
এ গতি অক্ষুন্ন রেখো, তৃষ্ণা রেখো, ওগো মুক্তাবতী।
তোমার সমীপে এলে, সময় অমূল্য মনে হয়।

জীবনের কামনায় সুরময় তোমার সৌরভ,
তোমার অস্তিত্ব জানি আকাঙ্খিত, তবু মন বলে :
অন্ধ হ'য়ে লীন হোক এই সত্ত্বা তোমার অঞ্চলে
এ আমি চাইনা কভু, যদিও তোমার বৈভব
আমাকে প্রদীপ্ত করে বর্ণ-গন্ধ-শৃঙ্গারের ছলে।

(৩১)

আয়োজন

মন্দলে স্নান করতে গেছি। পথে একজন বাঙ্গালী ভদ্রলোককে দেখে আলাপ করে জানলাম—পশ্চিম বাংলার বিধানসভার স্পীকার। চমৎকার আলাপী ভদ্রলোক। দুর্ঘটনায় স্ত্রীর গায়ে আঘাত লেগেছে। পরিচয় করিয়ে দিতেই স্মরণে এলো বাল্যকাল। কাশীতে প্রকাণ্ড বাগান প্রকাণ্ড বাড়ী। সকাল বেলা ফুল তুলতে যেতাম সেই বাগানে। আমার চেয়ে বছর পাঁচের বড়ো মেয়েটীর সঙ্গে ঝগড়াও হয়েছে শিউলীর ভাগ নিয়ে।

সে সব কথা বলতে উনিও চিনতে পারলেন। কিন্তু তেমন নয়। ছায়া ছবি মিটে গেছে।

ভদ্রলোক বহুদর্শী অমায়িক। বল্লেন—"সুইজারল্যাণ্ডেও এমন দৃশ্যটী দেখিনি। পহালগামের সৌন্দর্য্য কোনও হিল্ ষ্টেশনে নেই।"

মন্দলে স্নান সেরে ফিরে এসে বাজারে ঘুরছি। বেণু দিব্যি এক বাঙ্গালী মহিলার সঙ্গে গল্প জুড়েছে।

"আচ্ছা তোমরা চলো। আমি এঁদের বাড়ী হয়ে ফিরছি।"

অসিত বল্লে, "বাপাবার মতলব আর কি! বেণুদির কেবল ধোঁৎ ধোঁজা, কোথায় রামধাই মারবেন!"

ফিরে এসে বেণু বল্লে—"পুডিং, বাড়ীর তৈরী মালপো, দুটো টোষ্ট, একটা......"

চটে অসিত বল্ল—"বি ব্রিফ—বাজে বক্ বক্ করবেন না। কি দেখে বলুন—এন্টেরো কুইনল্ না টাইকোসোডা?"

বেণু বল্লে—"টাইকো সোডাই দাও।"

অসিত বলে, "জায়গা হবে?"

বেণু বলে—এমনি না যায় পানের সঙ্গে খেয়ে নেবো বা এককাপ চা।

অসিত আরও চটে বল্লে—"চা আর পানের পয়সাটা বার করুন বেণুদি"

"চটছো কেন? খুশী হবে কোথায় যে বেচারি দিদি খেতে পেলো।"

"অমন খুশী আমার নেই। দাদা আমরা আজ ডবল আমলেট খাবো।"

"সেই ভালো। আমি পয়সা দেবো।" বল্লে বেণু।

"থ্রি চীয়ার্স বেণুদি......"

একসাথে ও রেষ্টুরান্টে উঠে পড়লো।

এর মধ্যে কোটেশ্বর আমাদের দেখেছে।

"কি পেলেন খবর? হবে অমরনাথ?"

"নিশ্চয় হবে। আমি খোঁজ করছিলাম! এক গুজরাতি পার্টি গিয়েছিল; তারা ফিরছে কিনা। আজ এই তাদের সঙ্গে দেখা করে এসেছি। চলুন আলাপ করিয়ে দিই।"

যুবক ভদ্র গুজরাতি। সঙ্গে স্ত্রী, বোন, ভাই। অনেক উপদেশ দিলেন। "এখন যাবেন। সরকার জানলে যেতে পাবেন না। আমরা লুকিয়ে পালিয়ে গেছিলাম। ভাল ঘোড়া নেবেন। গাইড্ অবশ্য নেবেন। সমস্ত বরফে ঢাকা, কোনও চিহ্ন নেই। বরফে পথ হারানোর আশঙ্কা খুব বেশী। ভীষণ হিমঝড় পাবেন। থাকা খাওয়ার কোনও ব্যবস্থা নেই। তাবু সঙ্গে নেবেন, আর খাবার ব্যবস্থা। ষ্টোভ থাকে ভালো—নৈলে কাঠকয়লা আর উনুন। একটি ঘাস পাতার চিহ্নও নেই। লাঠী নেবেন, ঘাসের জুতো, গগল্স আর সারা শরীর যেন ক্রীম দিয়ে ঢাকা থাকে, নৈলে নিদারুণ ফাটবে। ভয় পাবেন না, চলে যান।"

"ও কিছু নয় সাপ!" সেই কথা আর কি! ভয় পাবেন না! হিম ঝড়। পথ হারাতে পারেন।

হঠাৎ আবার বল্লেন—"দেখুন কুড়ুল নেবেন সঙ্গে। গাইডকে বলবেন—কুড়ুল নিয়ে আগে আগে যেতে।"

"কেন? কোন জন্তু জানোয়ার না কি?"

"না; পথ নেই তো। ঘোড়া চলার মতো পথও নেই। পাহাড়ের ঢালে ঘোড়া চলবে কি করে। বরফ কেটে একটু পথ করতেই হবে। আর পথ ঠুকে ঠুকে চলতে হবে। যদি নরম বরফ হয় ভেঙ্গে তলায় পড়ে যেতে পারে।

ভয় পাবো না। আমি ভয় পেলেই সব মাটী। ফিরে বল্লাম—"কি বেণু যাবি?"

"আমার বলো তো আমি যাবো না। কিন্তু তুমি? তুমি যাবে না?"

"কি মনে হয়?"

"যাবেই।"

"যাবোই।"

"তবে আমিও যাবো। তোমায় একা আমি ছাড়বো না।"

"কেন, আমায় বাঁচাবি তুই?"

"তা নয়, ঠাট্টা করো কেন? এ সব শোনার পর প্রাণের মায়া নিয়ে একা পড়ে থাকতে কোনও বোনই পারেনা। আমি যাবো।"

কোটেশ্বরজী বাজারে এসেই জিনিষপত্রের যোগাড় সুরু করলেন।

আমাদের অমরনাথ যাওয়ার কথা ঠিক হয়ে গেল।

আমি গেলাম ক্যাম্পে মিসেস্ শর্মাকে খবর দিতে। গিয়ে শুনি মিসেস্ শর্মা সকাল সাড়ে আটটায় হঠাৎ দিল্লী ফিরে গেছেন। শিক্ষা বিভাগ থেকে জরুরী তলব এসেছিল—তাই ওঁকে মাঝপথ থেকে হঠাৎ চলে যেতে হোলো। ওঁর ছেলে এসে খবরটা দিলো। "আপনারা অমরনাথ হয়ে এলে তারপর আমি যাবো। মা বলে গেছেন—আপনাকে জিজ্ঞাসা না করে যেন না যাই।"

মিসেস্ শর্মার উৎসাহেই অমরনাথের দিকে আমার মন টেনেছিল, এখন মিসেস্ শর্মাই নেই। মনটা খারাপ হয়ে গেল। আমাদের অমরনাথের দলে তখন বেণু, অসিত, জগজ্জীবন, গুপ্তা, বিহারীলাল, আর্টিষ্ট শর্মা—সাতজনার দল।

শকুন্তলা, রুক্মিণী, মনোরমা—সবাই ধরেছে "আমি যাবো।"

ভগবানদাসজী নোটীশ দিলেন—"মেয়েরা আর বালকরা কেউ যেতে পারবে না। কেবল শিক্ষকরা নিজেদের দায়িত্বে যেতে পারবে।"

লোহারা সিং দল গড়েছে আটজনার। লালসিং আর পাতিরাম আছে সেই দলে।

ভগবানদাসজী হাত পা ছোঁড়েন—"তুমি যাবে, পতিরাম, লালসিং আমার এ ক্যাম্প দেখতে তবে থাকবে কে? ক্যাম্প যে বেসামাল হয়ে পড়ছে।"

লালসিং বল্লে "ও যাক—আমরা থাকি। পরে আমরা যাবো।"

"যাতায়াতে কদিন লাগবে?"

"কদিন আর?" বল্লে কোটেশ্বর "তিনদিন, বড় জোর চারদিন ব্যস!"

আমি বলি, "ব্যস্ত হবেন না। চারদিনে আর পতিরাম এতো কি বিদিকিচ্ছি কাণ্ড করবে। এসে সামলে দিতে পারবো।"

পতিরাম বল্লে—"এই চারটে দিন তবু ক্যাম্পে একটা শৃঙ্খলা আনতে পারবো। রাত বিরেতে কেবল এদিক ওদিক ঘুরে ঘুরে কবিত্ব, যখন তখন খাওয়া আর কথার জাল বোনা—এতে কি আর শৃঙ্খলা থাকে?"

ভগবানদাসজী বল্লেন—"দেশ দেশ ঘুরে আসুন, বহিনজীও যাবেন নাকি? আপনাকে বারণ করবো কি করে। আপনার দাদা আপনাকে নিয়ে যাচ্ছেন, আমার বলবার কিছু নেই।"

প্লাজায় ফিরছি, একটী সুশ্রী সুঠাম চকচকে চেহারা। কোঁচা, পাঞ্জাবী আর পাম্পস্যু দেখেই বালিগঞ্জ মনে পড়ে। পরিচয়ে জানলাম—আমার পরম শ্রদ্ধেয় ঈশানচন্দ্র ঘোষ মহাশয়ের পৌত্র। বর্ত্তমানে ব্যারিষ্টার। এঁরই কাছে তথ্য পেলাম সেতার বাজের। ওঁর সঙ্গে ছিলেন ভারতের পরমগুণী সেতারী মুস্তাক আলি খাঁ, কাশীর আশেক আলি খানের পুত্র। আশেক আলি খাঁ সাহেবের বাড়ীতে বাল্যকালে গেছি মুস্তাকের সঙ্গে খেলা করতে। পুত্রের আড্ডা-প্রীতি দেখে দেখে বৃদ্ধগুণী আর্ত্তনাদ করে উঠতেন—ওর ভবিষ্যত ভেবে। কোনও মতে দশাশ্বমেধ অবধি পালিয়ে এসে আধ কাপ চা আর কয়েকটী বিড়ির দৌলতে লক্ষপতির মন নিয়ে গল্প করতাম, গান, বাজনা, ছবি, সাহিত্য, সাধু সন্ন্যাসী, সস্তা প্রেমের কথা। সে আড্ডার মানে ছিল না—সুর ছিল, রূপ ছিল না—রস ছিল। এতদিন পরে মুস্তাক আর আমায় চিনতে পারবে কিনা এ সঙ্কোচ আমার হৃদয়কে হঠাৎ আক্রমণ করলো।

কোহলাই তুষার স্রোত

বাল্যের বন্ধুত্বের মতো নিবিড় সরল সম্বন্ধ মানুষে মানুষে হয় না। তখনকার ভালবাসা হয়তো গভীর হয়না, হিংসাদ্বেষও তাই। পরে নদীর স্রোতে নুড়ির বাধার মতো চাপা পড়ে যায় হিংসা দ্বেষ; ওপরে পড়ে ভালবাসা আর বিশ্বাসের পলি। যৌবনের পরপারে সেদিনের সেই একাত্মবোধের স্মৃতি মনে যখন পড়ে তখন তা আকাশের চাঁদ। হাত বাড়াতে ইচ্ছা করে কিন্তু নাগাল পাওয়া যায় না।

মুস্তাক যখন সামনে দাঁড়ালো আমি সহজেই চিনলাম। সেই ডাগর ডাগর চোখ, কোঁকড়ানো চুল, জ্বলন্ত দৃষ্টি। কেবল অবয়বে

প্রৌঢ়ত্বের পলি পড়েছে, শরীরটা ভারী হয়েছে। কৈশোর তারুণ্যের কৃশতার জায়গায় প্রৌঢ়ত্বের ঢল নেমেছে।

আমায় ও চেনেনি। দলের সঙ্গে ভাব যার—ব্যক্তিকে সে মনে রাখেনা। কাজেই দলটাকে তুলে ধরলাম ওর মানস পটে। তাড়াতাড়ি সোনার সিগারেট কেস বার করে ৫৫৫ দিলে। আমি বল্লাম "ওতে চলবেনা মুস্তাক ; বিড়ি নেই, দশাশ্বমেধের বিড়ি ব্রজভাণ্ডারের পাশের দোকানের।"

"যা বলেছিস ভাই।" বলেই অন্য পকেট থেকে বিড়ি বার করে দিলো।

আজ রাতে বাজনা হবে সে ব্যবস্থা করে এলাম।

কিন্তু বাজনার দফা গয়া হোলো বিকেলে।

ফিরেছি ক্যাম্পের কয়েকটা কাজ সেরে। ঘোষমশায় আমাকে দেখেই চিৎকার। "আর মশায় আপনার ছেলেরা তো আমার জীবন বিপন্ন করে তুললো দেখছি। চলুন চলুন দেখবেন চলুন।"

হাত ধরে হিড় হিড় করে টেনে নিয়ে গেলেন ভিতরের ঘরে। ছেলে, মেয়ে, স্ত্রী সকলেই ঘরে।

এখানে বাড়ী সব কাঠের। "পথের দাবী যাঁরা পড়েছেন তাঁরা অপূর্বর ঘরের রান্নার ব্যবস্থা ভেসে যাবার কথা পড়েছেন। এখানে ব্যারিষ্টারসাহেব আর তাঁর পোষাক। অপূর্বর তেওয়াড়ীর পক্ষে রান্নাঘরের শুচিতা যা এখানে ব্যারিষ্টার সাহেবের পক্ষে তাঁর পোষাক-আসাকও তাই।

ওপর থেকে জল পড়ে তিন চারটা হ্যাট, কয়েকখান শাড়ী, বিছানার কিয়দংশ একেবারে নষ্ট।

অথচ যে দলে ধনেশ, হুকুমসিং এরা আছে—সে দলে এমন অসভ্যতা ঘটার কথা নয়। আমি মুস্তাককে বললাম,—"হতে পারে না এ কাণ্ড। কিছু একটা ব্যাপার আছে এর মধ্যে। আর তো ভাই, ওপারে চল্‌তো।" ওকে প্রায় জোর করে ধরে নিয়ে ওপরে আনলাম।

চোরের মত মুখ করে ওরা বসে আছে ক'জনে। জগজীবন, বেণু, অসিত এরা তখনও বাইরে। জিজ্ঞাসা করে খবর নিলাম। ওরা কখনও কাঠের বাড়ীতে বাস করেনি। কাঠের বাড়ীর মেঝের লাঙ্গল যে ছেঁদায় ছেঁদায় ভর্ত্তি সে খবর রাখেনা। ওরা সব গোছগাছ করে কখানা বাসন ধোবার জন্য এককোণে জড় করে জল ঢেলেছে। তারপর জল চুইয়ে পড়েছে নীচে। চিৎকার উঠেছে। সঙ্গে সঙ্গে অপরাধ বুঝতে পেরে ওরা তটস্থ হয়ে আছে।

ওদের চেহারা দেখে ওস্তাদ মুস্তাক তো হাসতে হাসতে নেমে যেতে যেতে বল্লে "কিসমৎ!" কিন্তু ব্যারিষ্টার সাহেবেরা কেমন যেন জুৎ হোলো বলে মনে করলেন না। দামী হ্যাটগুলো!! রাগের কথাই।

কিন্তু রাগ রইলনা বেশীক্ষণ। সন্ধ্যার দিকে ঘনঘটা করে এলো তুমুল ঝড় জল। গাছপালা মাটীর সঙ্গে নুইয়ে দিয়ে, লীদারের জলকে ফেণায় ফেণায় শাদা করে দিয়ে, মেঘের জটাজালকে বিরাট পাহাড়ের গায়ে আছাড় মেরে এ ঝড় এলো যেন সর্বনাশা ঝড়। কাঠের বাড়ীর ভেতরকার অজস্র ফাঁক দিয়ে, শার্সী খড়খড়ির ভেতর দিয়ে ভীষণ নিঃশ্বাস গর্জন করছে; ফোঁস ফোঁস করছে। কালো হয়ে সব অন্ধকার হয়ে গেল নিমিষে; আর সেই বাধাবন্ধহীন জমাট অন্ধকারের প্লেট মাঝে মাঝে দীর্ণ বিদীর্ণ হয়ে যাচ্ছে বিজলীর এপার-ওপার-চিড়িক-মারা প্রতাপে।

তখন আর বাধা রইলনা। মেঝে জলেতে ভেসে গেল। ছাদ দিয়ে জল, শার্সী বেয়ে জল, ছাদ দিয়ে জল, ব্যারিষ্টার মশায় সামলে সামলে বেসামাল হবার জো? মুস্তাক তো মরিয়া হয়ে গান জুড়ে দিলে। রাতে বাজনা বাজানোর মুডে কেউ ছিলনা, বাজনাও হয়নি।

আমি খবর পেলাম ক্যাম্পে দুটো তাঁবু পড়ে গেছে। ছেলেরা চাপা পড়েছিল কিন্তু সময়মতো সকলেই উদ্ধার পেয়েছে; প্রাণহানি কারুর ঘটেনি।

বাজার থেকে কিনলাম গগ্‌ল্‌স্‌, বাঁদুরে টুপী, লাঠি, দড়ির জুতো মোজা। ভাড়া করলাম লণ্ঠন, তাঁবু, বর্ষাতি জামা। খাবার জিনিস নিলাম মেওয়া, বিস্কুট, রুটী-মাখন, জেলী, চাল-ডাল, সামান্য মসলাপাতি, টিনের দুধ, চিনি, চা, কিছু সবজী। একটা প্যাকিং বাক্সে সব পুরে নিলাম। এক বোতল ব্র্যাণ্ডি নেওয়া হোলো। ঘুরে ঘুরে কিনতে বেশ লাগলো।

পথে বেণু লাঠি নিয়ে বাজার করছে! কে আবার একজন বেণুকে পাকড়েছে। বেণু ইঙ্গিতে আমায় দেখিয়ে দিয়েছে।

বর্ষীয়সী মহিলা। বেশ চোখা মুখের ভাব। উত্তর প্রদেশের বৈশ্য জাতির সঙ্গে যাদের জানাশুনা আছে তাদের কাছে এ পরিচিত মুখ।

"আপনারা অমরনাথ যাচ্ছেন?...এই বহিন্‌জীও যাচ্ছেন?...তবে শুনলাম যেতে মানা, পথ নেই?...তবু যাবেন?...শুনছো শুনছো, যারা যাবার তারা এমনি করেই যায়। আমাদের নিয়ে যাবেন?

"কে কাকে নিয়ে যায় বলুন। চলুন, দেখবেন ফিরে আসতে পারবেন। মৃত্যু খুব সহজ বলেই পদে পদে জীবন ওৎ পেতে আছে তাকে রক্ষা করার জন্য।"

ওর স্বামী রামকিশোর বংশল আমার দিকে সরে এসে জিজ্ঞাসা করলেন "কত খরচ পড়বে?"

"কতো আর? পঁচাত্তর টাকা মাথাপিছু। সে কিছু নয়। এতদূর এতো খরচ করে এসে পচাত্তর টাকা খরচ ও কিছু নয়।"

মাঝে কিছুক্ষণ কোটেশ্বরজী অদৃশ্য ছিলেন। এতক্ষণে এসে হঠাৎ বেণুকে আড়ালে নিয়ে গিয়ে কি যেন বোঝাচ্ছে হাত পা নেড়ে নেড়ে।

"বহুত আচ্ছা বাবুজীকেই জিজ্ঞাসা করবেন।"

"ব্যাপার কিরে?" জিজ্ঞাসা করি বেণুকে।

অসিত আর জগজীবনে হো হো করে হাসছে। বেণুও যোগ দিয়েছে। পাণ্ডা কোত্থেকে একজোড়া ব্রীচেস্ এনে দিয়েছে বেণুকে। আমরা সব যোধপুরী পাজামা বা ট্রাউজার পরে যাচ্ছি। বেণু আছে শাড়ী পরে। ঘোড়া চড়ে থাকতে হবে ঝাড়া তিন দিন। বিপজ্জনক পথ।

শাড়ী পরে যাওয়া সহজ নয়। তাই পাণ্ডা এনেছে ব্রীচেস্। বেণু তা পরবে না কিছুতেই।

বহুরাত্রি পর্য্যন্ত গোছগাছ চললো। বংশলরা শেষ অবধি যাবে। আর যাবে আমাদেরই আরও একটা দল। তারা এগারোজন। তাদের পুরোধা লোহারা সিং।

সমস্ত কাজকর্ম্ম সেরে প্যাকিং নিয়ে ব্যস্ত। এই ফাঁকে আমি নেমে গেছি।

ক্যাম্পে গিয়ে শুনি পতিরাম, লালসিং, স্বর্ণদন্ত এদের পার্টিটা যাচ্ছে না। আমি ফিরলে যাবে। নৈলে অফিস দেখবার কেউ নেই।

ক্যাম্প থেকে নেমে একা লীদারের ধার বেয়ে আসছি। ওপারের খাড়া পাহাড় জমাট অন্ধকার বুকে করে দাঁড়িয়ে। চাঁদের আলো পড়েছে চূড়ায়, জলের ওপর, সাঁকোটার ওপর। মনে হচ্ছে মিসেস্ শর্মার কথা।

এই অমরনাথ যাবার আগ্রহের মূলে তিনি। আমি কবে কি সংবাদ নিয়ে আসি এই প্রতীক্ষা ছিল তাঁর। আজ তিনি নেই আমাদের সঙ্গে। পিছনে কে ডাকলে "একটু দাঁড়ান।"

"এখন খাওয়াবার সময় তুমি ক্যাম্প ছেড়ে চলে এসেছ কেন কান্তা?"

"আপনি লক্ষ্য করেননি কাল থেকে তো আমি আর কাজ করছি না। আমার কনট্রাক্ট শেষ হচ্ছে আরও আটদিন পরে। কিন্তু আমি সেটা মাপ করিয়ে দিয়েছি।"

"কেন, কি হোলো?"

"নতুন কিছু নয়। যা এতদিন হয়ে এসেছে তাই। আমি যেন আর পারছিলাম না।"

"কেন?"

"এ কেনর উত্তর নেই। আপনার সঙ্গে কথা বলার পর থেকে বরাবর মনে হোতো আপনার সন্ধানী দৃষ্টি যেন আমার মর্ম পর্য্যন্ত গেঁথে ফেলছে।"

"বলো কি? কাপালিকের দৃষ্টি হার মানালো যে!"

"কাপালিক কাকে বলে জানিনা। সাধু সন্ন্যাসী হবে বা। আমি সে দৃষ্টি দেখিনি। কিন্তু নিজেকে নিয়ে এমন খেলা করা আমার ভাল লাগেনি কখনও। আপনার সঙ্গে কথা বলার পর ঠিকই করে ফেলেছিলাম এ কাজ ছাড়বো।...কিন্তু আপনি অমরনাথ চলে যাচ্ছেন।

চন্দনবাড়ির পথে লীদার

তার আগে আমার মনে হোলো আমি আপনাকে জানিয়ে দিই..."

হাসতে হাসতে বললাম..."কি জানিয়ে দেবে?—জানিয়ে দেবে তুমি দেহমনের বিলাস লিদারে ভাসিয়ে মাষ্টারের প্রেমে মাতোয়ারা মডার্ণ মীরাবাঈ হয়েছো?"

কুঁকড়ে গেল যেন কান্তা। "ঠাট্টা করেন আমার এই..."

"ঠাট্টা ও নয় বিদ্রূপও নয়। তবে এর মূল্য দিতে পারি এতো বকছল পুরস্কারের স্তূপ নেই আমার কাছে। আমি অমরনাথ যাবো আর তুমি চাকরী ছাড়বে এর মধ্যে যোগাযোগ কি?"

"দাদা, অমরনাথ বড় কঠিন পথ। আমার মনও এখন খুব চঞ্চল। যদি আমি হঠাৎ ফিরে যাই, যদি আর দেখা না হয়।......

"একটা কথা চেপে গেলে কান্তা।"

"না-না—সেটা চাপা থাক। মুখে আনবেন না ও কথা। আমি বারবার মনে করেছি, বারবার কষ্ট পেয়েছি। আপনার মায়ের আশীর্ব্বাদে আপনি ভালয় ভালয় ফিরে আসুন।"

"তবে কেন বললে যদি দেখা না হয়। ভয় পাচ্ছো কেন? স্নেহ-পাপশঙ্কী। মন্দ আশঙ্কা করা স্নেহের পরিচায়ক। হ্যাঁ যদি দেখা না হয়, সেই ভয়ে তুমি আমায় জানাতে এসেছো যে চাকরী ছেড়েছো এবং এ পথ ত্যাগ করবে।"

"কেন বিশ্বাস হয় না?"

"না, হয় না। ভাল হওয়াটা সহজে বিশ্বাস করি না। তা ছাড়া কোনটা ভালো, কোনটা মন্দ কতটুকু জানি। ভাল-মন্দের বিচার আসলে মূল্যের বিচার। এ মূল্য দেয় সমাজ, পরম্পরা, লোকভয়। বর্ত্তমানের সামাজিক মূল্য পরিবেশনের ধারাটা বদলাচ্ছে। সমাজে এই মূল্যের ওপর নির্ভর করে ফ্রী-থট্স্ মর্য্যাদা পাচ্ছে, ফ্রী-ওম্যানদের সংখ্যা বাড়ছে। আমি মনকে স্থাণু হতে দিইনি। তাই ক্রম বিবর্ত্তমান এই মূল্যের স্বরূপকে আমি স্বীকার করি। তাই ভালো মন্দর বিচার আমি করতে পারিনা। জানি একটা কথা—সেটাই মানি।"

উদ্গ্রীব হয়ে জিজ্ঞাসা করে কান্তা—"সেটা কি?"

"চিরকালের মানুষ চিরকালের মানুষকে যা দিল—"

"সেটা কি?"

"এককালে তার নাম ছিল ভালবাসা, প্রেম। আজ তার নাম ব্যবহার, behaviour। মানুষ মানুষের সঙ্গে যে ব্যবহার করে তারই তারতম্যে মানুষ সুখ/দুঃখ পায়। মানুষ চেয়েছে সুখ, চেয়েছে শান্তি। আমি দেখেছি সুখ-শান্তি পাবার একমাত্র উপায় সুখ শান্তি দেওয়া। তোমার ব্যবহারে আমি, আমার ব্যবহারে তুমি যদি সুখ পাও তবেই তা সত্য। ভালো বা মন্দ সমাজের দেওয়া তকথা। দশে তোমায় ভালো বা মন্দ বলে, তার মূল্য আমার কাছে খুবই কম কান্তা।"

"তোমার কাছে শুধুই মানুষের মূল্য?"

"শুধুই তাই। ভালো মানুষ দু'চক্ষের বিষ; মন্দ মানুষ বলার অধিকারী নই আমি। আমি বুঝি এ মানুষটার ব্যবহার প্রিয়, রুচিকর কিনা। সেটা যদি ঠিক থাকে বাকী সব সমাজের সার্টিফিকেট্।

"আমায় সে মূল্য তুমি দাও।"

"বলো "আপনি দেন?"—'তুমি দাও' বলবার মতো শান্ত সহজলোক নই আমি।"

লজ্জিত হয়ে কান্তা ধরা গলায় বলে—"হঠাৎ তুমি বলে ফেলেছি। আমায় আপনি মাপ করবেন।" বলেই পিছন ফিরে প্রায় একরকম ছুটে চলে গেল।

খানিকটা চেয়ে রইলাম চন্দ্রালোকে অপসৃয়মান নারী মূর্ত্তিটির পানে। তারপর আবার চলছি রাস্তার দিকে।

কান্তার অশান্তি চিত্তের ছবি খানিকটা চঞ্চলতা দিয়ে গেল। ওরও একদিন গৃহস্থের সংসার ছিল। বাপ-মা-ভাই-বোনের মাঝে একটা আরও হৃদয়, একটি আরও মুক্তাবিন্দু। পাঞ্জাবের হত্যাকাণ্ডে যে লক্ষ লক্ষ পরিবার ধ্বংস হোলো, কান্তা সেই সব পরিবারের অন্যতম উল্কা-পাত। মাত্র গ্রাসাচ্ছাদনের চেষ্টায় পথ হতে পথান্তরে ভ্রাম্যমান, সংশয় কুণ্ঠিত জীবন-যাপন করতে করতে ও এসে ঠেকেছে এক বদ্ধ গলির মোড়ে। এক, নয় ঠোকর খেতে হবে, যাত্রা পথকে শুরু করতে হবে, নয়তো ফিরতে হবে—এবাউট্ টার্ন। আমার সংস্পর্শে যদি ওর মন আজ ফিরতে চায় বোঝা কঠিন নয় ওর মনটী কোমল, গৃহস্থ বালার মন। ও চায় একটা বাঁধাধরা মামুলি সনাতন পথ থেকে কন্যা-পত্নী-জায়া-জননী সূত্রে গাঁথা মাল্য কণ্ঠে দুলিয়ে গরবিতা হয়ে বেড়ায়। পারলোনা ও; লোভ আছে অথচ সংযম নেই। ক্ষুধা আছে, সুযোগ নেই, খাদ্য নেই। তাই অখাদ্য, অরুচিকরকে গলাধঃকরণ করার তিরস্কার ওর দেহ মনকে ওতঃপ্রোত ভাবে বিচলিত করেছে।

ঝড় উঠেছে। কাল যে ঝড় উঠেছিল তার চেয়েও প্রচণ্ড, তার চেয়েও ভয়ানক। "ওমা, গিরিশৃঙ্গ উড়াইল বুঝি!"—সেই দারুণ মূর্ত্তি। দেখতে দেখতে তুমুল বর্ষণ; শিলা আর জলে দাঁড়ায় কার সাধ্য।

আধভেজা অবস্থায় হোটেলে ঢুকে দেখি ওরা খাদ্য সংগ্রহ করে বসে গেছে।

সমস্ত রাত্রি ঝড় জল থামেনি। ভোরের দিকে থামলো। রোদ উঠলো যেন নিকিয়ে নেওয়া আঙ্গিনায় আলপনার রেখা। গাঢ় নীল আকাশের গায়ে রূপালী মেঘের ভেলা। পর্বতের শিখর দেশে নতুন বরফের স্তূপ চমকাচ্ছে।

লোহারা সিং এসে উপস্থিত। "কি সংবাদ? যাচ্ছেন? ভীষণ দুর্যোগের রাত্রি গেল। পথঘাট জলে কাদায় ভর্ত্তি।

"যেতে না-ও পারি যদি কথা দেন এখানকার জল মানে অমরনাথের জল। বা এখানে শুক্নোর দিনে অমরনাথও শুকনো থাকবে। এ কথা দিতে পারেন?"

কে দেবে এ কথা। লোহারা সিং-এর দল যাবেনা বোঝা গেল। আমি মালপত্র নিয়ে নীচে নামার ব্যবস্থা করছি। পাণ্ডা কোটেশ্বর তৈরী; ঘোড়া নিয়ে গুজররা এসে গেছে।

খবর এসেছে ক্যাম্প থেকে ভগবান দাসজী ডাকছেন।

ক্যাম্পে গিয়ে দেখি ভগবান দাসজীর মুখ গম্ভীর। "আপনি কি যাবেন স্থির করলেন?"

"কেন? আপত্তি আছে কিছু?"

"দুর্যোগ, তাই বলছি।"

"আমি দুর্যোগ মাথায় করে বেরুবো। মনে হয় এ মা চণ্ডীর আশীর্ব্বাদ।"

"দেখুন তহ্শীলদার সাহেব স্বয়ং এসেছেন আপনাকে নিষেধ করতে।"

ভদ্রলোক আমায় কাতরভাবে অনুরোধ করলেন "যাবেন না।"

আমার ভীষণ দায়িত্ব। আপনাদের এই ক্যাম্প সম্বন্ধে বক্সী সাহেব বিশেষ সতর্ক। কাল এবং পরশু দুর্যোগ গেছে। কদিন আগে এক ইংরেজ দল জোর করে গিয়েছিল। বরক ধ্বসে নদীর জলে পড়ে গেছে। ঘোড়াটাকে পাওয়া যায়নি। ভদ্রলোক ঝুলেছিলেন একটা পাথর ধরে। দড়ি নামিয়ে চার পাঁচ ঘন্টায় চেষ্টায় তাকে উদ্ধার করা গেছে। এতোটুকু পথ নেই, পথের চিহ্ন নেই। এ সময়ে কোনও যাত্রী যায়না। যেতে দিইনা আমরা। পথে ঝড় জল আছে; বরফে পথ হারানো আছে; নদী নালা বরফে ঢাকা, বিরাট বিরাট গহ্বর সব বরফে ঢাকা। যে কোনও বিপদ যে কোনও সময়ে হতে পারে।"

"আরও কি ভীষণতর বর্ণনা আছে দিন, জেনে রাখা ভালো। যদি কোনও আইন থাকে না যাবার, আইন আমি অমান্য করবো না।"

"আইন নেই। এতো করে বলতামও না যদি আপনি এ দলের না হোতেন।"

"তা হলে কি করতেন?"

"আপনাকে দিয়ে লিখিয়ে নিতাম—আমার নিষেধ সত্ত্বেও স্বেচ্ছায় যাচ্ছেন। দায়িত্ব আমার নেই।"

"ব্যস্; এইতো। আমি লিখে দিচ্ছি।"

লিখে দিলাম।

পতিরাম খুশী হয়ে বল্লে—"টোপীবদল্ দোস্ত্ করেছি তোকে, ভাবছিলাম লোহার সিংয়ের মতো ভেগে যাবি কি-না। যা ঘুরে আয়। তোকে মিষ্টি খাওয়াবো।"

এসে দেখি ঘোড়ার জন্ম মালপত্র নিয়ে সকলে অপেক্ষা করছে। ঘোড়াওয়ালারা অদৃশ্য।

কোটেশ্বর ঘোড়া ঠিক করেছিল। সে বোকা হয়ে গেছে।

"ব্যাপার কি পাণ্ডাজী?"

"এখানকার ঘোড়াওয়ালাগুলো ভারী পাজী। বলে এতো বড় বড় চেহারা নিয়ে বরফের পথ চলতে পারবোনা।"

নিজের শারীরিক দৈর্ঘ্যপ্রস্থের এমন স্থূল অনুপযোগিতার সম্মুখীন হতে হয়নি কখনও। মুস্তাক আর ব্যারিষ্টর ঘোষেরা এসে দাঁড়িয়েছেন। আমাদের যে কোনও দুজনার প্রস্থ ব্যারিষ্টারদের একজনার চেয়ে ক্ষীণতর। তাই মুস্তাক হাসতে হাসতে বল্লো—"আমাদের পক্ষে এখন তাহলে অমরনাথ যাওয়া হতেই পারেনা।"

কোটেশ্বর নাছোড় বান্দা। কোত্থেকে ঘোড়া যোগাড় করলো সাতটা। একটা বেশী—সেটা খালি মালপত্র নিয়ে যাবে।

মালপত্র তাঁবু সবই বাঁধা ছাঁদা শেষ। বেণু ব্রীচেস্ পরে বিচিত্ররূপে এসে দাঁড়ালো। যতোবার অসিত বলে "বেণুদি ফোটো নেবো।" ততবার বেণু চেঁচামিচি করে ওঠে "খবরদার অসিত। আমি তোমার ক্যামেরা ভেঙ্গে দেবো কিন্তু।"

কিন্তু চেহারাটা হয়েছিল ফোটো নেবারই মতো। পায়ে মোজার ওপর জুতো, জুতোর দড়ির জুতো কষে বাঁধা। তার ওপর ব্রীচেস্। তার ওপর পুলওভার দুটো। মাথায় বাঁদুরে টুপীর ওপর বর্ষাতিটুপী, গায়ে একটা ওভারকোট তার ওপর বর্ষাতি। মুখময় পুরু করে ক্রীম, তার ওপর গগ্ল্স। হাতে দস্তানা। সেরূপ বেণুর আর দেখবোনা।

বলছি এতো করে, আমাদের অবস্থাও তাই! কেউ আর কারুকে বেশ বৈচিত্র্য নিয়ে কটাক্ষ করতে পারবোনা।

উঠেছি সব ঘোড়ার পিঠে। বেণু, অসিত, জগজীবন, বিহারীলাল, রামদাস গুপ্তা, আর্টিষ্ট ভর্মা আর আমি, সাতজন। আমাদের সঙ্গে কোটেশ্বরের ভাই খুনীশ্বর পায়ে হেঁটে যাবে। কোটেশ্বর ঘোড়ার পিঠে যাচ্ছে সেই বংশলদের সঙ্গে। বংশলরা দুইভাই, দুই বৌ, চারজন। ওদের দল আলাদা।

রওনা হবো, পোষ্টম্যান টেলিগ্রাম নিয়ে এলো।

বিহারীলালজীর বাড়ী থেকে টেলিগ্রাম। স্ত্রীর শরীর অত্যন্ত খারাপ। পত্রপাঠ যাবার নির্দেশ।

বাধার ওপর বাধা আসছে। তা ছাড়া আমার সঙ্গে বিহারীলালেরই বনতো ভাল। ওকে ছাড়তেই হবেনা, শুধু ও যাতে শ্রীনগর থেকে জাহাজে উড়ে যেতে পারে সেই ব্যবস্থা করে দিতে হবে।

জগজীবনের এক বন্ধু ছিল পহালগামে। সে যাচ্ছিল জাহাজে সেইদিন। তাকে বলে করে তার সীটটা বিহারীলালকে দিয়ে ওর যাবার ব্যবস্থা করে আমরা যখন রওনা হলাম তখন বেলা প্রায় দশটা।

(ক্রমশঃ)

যৌথ সমবায় কৃষি ও সেবামুলক সমবায় সমিতি

শ্রীলোকনাথ ঘোষাল এম-এ

কৃষি প্রধান দেশে কৃষির আমুল সংস্কার ব্যতিরেকে জাতীয় আয় ও জীবন-যাত্রার মান উন্নীত হইতে পারে না। জমির উপর জনাধিক্য, অপ্রচলিত যন্ত্রপাতি ও অচল কৃষি প্রণালী ভারতবর্ষের কৃষি ব্যবস্থায় আজও প্রকট হইয়া রহিয়াছে।

মূলধন, সার ও জল-সেচনের যথেষ্ট অভাব বিদ্যমান। আবার কৃষি ব্যবস্থার উন্নতি না হইলে খাদ্যাভাবও দূরীভূত হইবে না। জীবন-যাত্রার মান ও জাতীয় আয় শিল্পোন্নয়নের উপর নির্ভরশীল। বিদেশ হইতে খাদ্য আমদানী করিতে হইলে শিল্পোন্নয়ন ব্যাহত হইতে বাধ্য।

কৃষির উন্নয়ন সম্পূর্ণরূপে নির্ভরশীল ভূমি-ব্যবস্থার উপর। কৃষির উন্নয়ন করিতে হইলে ভূমি ব্যবস্থার আশু আমুল পরিবর্ত্তন করা চাই। ভূমি ও ভূমি ব্যবস্থা, ভারতবর্ষের শাসনতন্ত্রে রাজ্য সরকারের বিষয়ীভূত। বিভিন্ন রাজ্য সরকার মধ্য স্বত্ব লোপ, ভূমির স্বত্ব নিরাপত্তা, খাজনার হার জমির মালিকানার পরিমাণ নির্দ্ধারণ এবং ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জমির একত্রীকরণ সম্পর্কে আইন প্রনয়ণ ও কার্য্যকরী ব্যবস্থা অবলম্বনের জন্য চেষ্টিত হইয়াছেন। স্বাধীনতা প্রাপ্তির পর রাজ্য সরকারদের এই প্রশংসনীয় প্রচেষ্টা থাকিলেও ভূমি সমস্যার সমাধান আরও দ্রুতলয়ে কার্য্যকরী করিতে হইবে, একথা অনস্বীকার্য্য। দেশের কৃষি ব্যবস্থার এই পরি-প্রেক্ষিতে ও তৃতীয় পরিকল্পনা রচনার পূর্ব্বে ১৯৫৯ সালে জানুয়ারী মাসে নাগপুর কংগ্রেসে কৃষি ব্যবস্থা তথা সমবায়মূলক সেবা প্রতিষ্ঠান ও যৌথ সমবায় কৃষি বিষয়ে গুরুত্বপূর্ণ ও সুদূর-প্রসারী এক প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছে।

পরে, পার্লামেন্টে ও যৌথ সমবায় কৃষি ও সেবামূলক সমবায় প্রতিষ্ঠান চালু করার প্রস্তাবটি অনুমোদন লাভ করে।

রাজনৈতিক দলগুলির মধ্যে কংগ্রেসের বাহিরে বিভিন্ন দল কৃষি পদ্ধতি অবলম্বনের বিপক্ষে। কংগ্রেসের অভ্যন্তরে নাগপুর কংগ্রেসের প্রস্তাবিত যৌথ সমবায় কৃষি প্রণালী লইয়া সবিশেষ মতবিরোধ দেখা যায়। শ্রীযুক্ত সি রাজাগোপালাচারী, শ্রীকে, এম, মুন্সী ও অধ্যাপক রঙ্গ প্রভৃতি নাগপুর কংগ্রেসের প্রস্তাবিত কৃষি ব্যবস্থার বিরুদ্ধে মত প্রকাশ করিয়াছেন। পণ্ডিত নেহেরু ও কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটি নাগপুর কংগ্রেসের প্রস্তাবটিকে কার্য্যকারী করিতে দৃঢ়সঙ্কল্প।

নাগপুর কংগ্রেসের প্রস্তাবে কৃষি ব্যবস্থা সম্পর্কে বলা হইয়াছে যে,—

(১) গ্রাম পঞ্চায়েৎ ও সমবায় সমিতির মাধ্যমে গ্রাম্য সংগঠন গড়িয়া উঠা উচিত এবং তাহাদের কর্ত্তব্য যাহাতে সুচারুরূপে সম্পাদন করিতে পারে সেই মত তাহাদের ক্ষমতাও সুযোগসুবিধা দেওয়া উচিত। কয়েকটি সমবায় সমিতি মিলিয়া একটি ইউনিয়ন গঠন করিতে পারে। জমি থাকুক বা নাই থাকুক গ্রামের স্থায়ী বাসিন্দারা সমিতির সভ্য হইতে পারিবে; সেই সমিতিগুলির কাজ হইবে উন্নত ধরণের চাষ পদ্ধতি, পশু সংরক্ষণ, মৎস্য চাষ এবং কুটীর শিল্পের মাধ্যমে গ্রামের উন্নতি বিধান করা। ঋণ দান ও অন্যান্য সেবামূলক কাজ ছাড়াও তাহারা কৃষকদের উৎপন্ন দ্রব্যাদির সংরক্ষণ ও বিক্রয়ের দিকে লক্ষ্য রাখিবে। পঞ্চায়েত সমন্বয়ে সমিতিগুলির কর্ত্তব্য হইবে গ্রামের সমস্ত উন্নয়নমূলক কাজে প্রধান দায়িত্ব গ্রহণ করা এবং জমির উৎপাদন বৃদ্ধি করা।

(২) যৌথ সমবায় পদ্ধতিতে চাষ করাই ভবিষ্যৎ কৃষি ব্যবস্থা এবং সেই ব্যবস্থা অনুযায়ী সমস্ত জমিকে একত্রিত করিতে হইবে, কৃষকদের মালিকানা স্বত্ব বজায় থাকিবে এবং উহারা নিজ নিজ জমির পরিমাণ অনুযায়ী উৎপাদনের অংশ লাভ করিবেন। তদুপরি ভূমির অধিকারী ও ভূমি হীন যাঁহারা চাষের কাজ করিবেন, তাঁহারা তাহাদের কাজ অনুযায়ী উৎপাদনের অংশ লাভ করিবেন!'

উক্ত ব্যবস্থা চালু হওয়ার পূর্ব্বে প্রথমে দেশের সর্ব্বত্র সেবামূলক সমবায় সমিতি গড়িয়া উঠা উচিত এবং তাহা তিন বৎসরের মধ্যেই হইতে পারে।

নাগপুর কংগ্রেসের প্রস্তাবে যৌথ সমবায় পদ্ধতিতে চাষ করাই ভবিষ্যৎ কৃষি ব্যবস্থা হইলেও, সেবামূলক সমিতি দেশের সর্ব্বত্র গড়িয়া তোলা প্রথম ধাপেই গ্রহণ করিতে হইবে। সেবামূলক সমবায় সমিতি-গুলির সাফল্যের উপর যৌথ সমবায় পদ্ধতিতে চাষ প্রবর্ত্তন নির্ভর করিতেছে।

সেবামূলক সমবায় বলিতে কি বুঝা যায় তাহা নাগপুর কংগ্রেসে প্রস্তাবে স্পষ্ট প্রতিভাত হয় নাই। তবে প্রত্যক্ষভাবে চাষ করার সঙ্গে যে সমস্ত কাজ পারস্পরিকভাবে যুক্ত তাহাদের সমবায় নীতির প্রয়োগই সেবামূলক সমস্যা বলিয়া নিশ্চয়ই গণ্য হইবে। অনুসন্ধান করিলে দেখা যায় যে, দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী-পরিকল্পনার সময়ে এই ধরণের সমবায় সমিতির কার্য্যাবলীর সম্প্রসারিত হইয়াছে। নিম্নলিখিত সরকারী তথ্যাবলী সমবায় সমিতির প্রসার সমর্থন করে।

দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার প্রথম দুই বৎসরে ৪,৫২৯টি বৃহৎ আকারের সমবায় সমিতি ৬৪, ৭৪৬টি গ্রাম জুড়ে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। সমবায় ঋণ দান সমিতিগুলির ঋণদানের পরিমাণ ৫৩ কোটা টাকা ছিল ১৯৫৫-৫৬ সালে, ৭০ কোটা টাকা ছিল ১৯৫৬-৫৭ সালে এবং ১০০ কোটীতে বৃদ্ধি পায় ১৯৫৭-৫৮ সালে।

জাতীয় সমবায় উন্নয়ন ও শস্যাগার বোর্ড ১৯৫৬-৫৭ সালে ৬৭,৫৩ লক্ষ টাকা ৬১৬টি শস্যাগারের জন্য, ১৯৫৭-৫৮ সালে ১২৬,৩২ লক্ষ টাকা ১৩৩৭টি শস্যাগারের জন্য এবং ১৯৫৮-৫৯ সালে ১১৯,৬২ লক্ষ টাকা ১০৯১ টি শস্যাগার।

কৃষিজাত উৎপন্ন বিক্রয় সমবায় সমিতির কার্য্যাবলীও যথেষ্ট বৃদ্ধি পাইয়াছে। ১৯৫৬-৫৭ সালে ২৫১টি সমিতি ১৯৫৭টি সালে ৩৯৯টি প্রাথমিক এবং জেলা বিক্রয় সমিতি গঠিত হয়।

সমবায় বিক্রয় সমিতি বিশেষ অংশ গ্রহণ করিতেছে—সার, কৃষির যন্ত্রপাতি, উন্নত বীজ-সরবরাহ ও ব্যবস্থার কাজে। রপ্তানীর কাজেও সমবায় সমিতি উত্তর প্রদেশে ও মাদ্রাজে অগ্রসর হইতেছে।

কৃষিজাত উৎপন্ন শিল্পের ক্ষেত্রেও সমবায় পদ্ধতির পত্তন হইয়াছে। ৩১টি সমবায় চিনির কারখানার লাইসেন্স অনুমোদনই তাহার প্রমাণ। ধান কল ও তেল কলের কাজে সমবায় প্রচলন হইতেছে।

সেবামূলক সমিতি স্থাপনের প্রস্তাবে বিরোধিতা কম। যাঁহারা যৌথ সমবায় কৃষি ব্যবস্থা প্রচলনের বিপক্ষে তাঁহারাও সেবামূলক সমবায় সমিতি স্থাপনের বিরুদ্ধে কোন যুক্তি উত্থাপিত করেন নাই।

ভূমি সমস্যার সমাধানে এক সর্ববাদী সম্মত জাতীয় নীতি করিতে হইবে। বিশেষ করিয়া গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র ব্যবস্থায় সর্বস্তরের জনগণের উৎসাহ ও উদ্দীপনাই হইবে যে কোন নীতির সাফল্যের রাজপথ।

যৌথ সমবায় কৃষির বিরুদ্ধবাদীরা যে সব যুক্তি দর্শাইয়াছেন তাহাও একেবারে উপেক্ষা করা চলে না। অশিক্ষিত কৃষকদের সুসংগঠিত করিয়া যৌথ সমবায় কৃষির সাফল্য লাভ কিছুতেই খুব সহজ সম্ভাব্য নয়। রাশিয়ার যৌথ সমবায় কৃষি সাফল্য লাভ করে নাই। সুইডেন ও কানাডায় স্বেচ্ছামূলকভাবে যৌথ সমবায় কৃষি কিছু গঠিত হইয়াছে, সত্য; কিন্তু এই সমবায় গুলি কতদূর সাফল্য লাভ করিবে তাহা বলা দুষ্কর। অবশ্য চীনের 'Commune' চীনের ভূমি সমস্যা ও খাদ্য সমস্যার সমাধানে সমর্থ হইয়াছে। যৌথ সমবায় কৃষির সম্পর্কে চীনের সাফল্যে আশান্বিত হইলেও, একথা বিস্মৃত হইলে চলিবে না যে, চীনের রাষ্ট্রনৈতিক কাঠামো ও রাজনৈতিক প্রবাহ, ভারতবর্ষ হইতে সম্পূর্ণ বিভিন্ন।

ভারতবর্ষে গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রনৈতিক কাঠামোয়, বর্ত্তমানের আমলাতন্ত্র ও অশিক্ষিত কৃষকদের মধ্যে যৌথ সমবায় কৃষি কতদূর সাফল্য লাভ করিবে তাহা বিশেষ বিবেচ্য। তবে সেবা মূলক সমবায় সমিতি দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার সময়ে কিছু অগ্রগতি লাভ করিয়াছে বলিয়া এবং সকল রাজনৈতিক দল ও জনগণ সেবামূলক সমবায় সমিতির কার্য্যে আত্মনিয়োগ করিতে সম্মত হইতে পারে বলিয়া, সেবা মূলক সমবায় সমিতির প্রসার লাভে এক জাতীয় নীতি গ্রহণ করা চলিতে পারে।

ব্যাকুলতা

শ্রীদিলীপকুমার রায়

একবার তুই ডাক কেঁদে আজ, একবারটি ডাক তারে :
অধীর হ'য়ে আসবে সে—তুই অধীর হ'য়ে ডাক না রে!

নাম নিতে তার আসবে যবে জল ভ'রে তোর নয়নে,
ফুল কাননের, তারা নভের আনবে তাকেই স্মরণে,
একটি চিন্তা সার হবে—সে কবে দেবে দরশন,
একটিই ধ্যান ধরবি—কবে ধরা দেবে মনমোহন,
সেদিন তোকে দেবেই সে ঠাঁই—ঠাঁই তার তুই চা না রে!

একবার তুই ডাক কেঁদে আজ, একবারটি ডাক তারে :
করতে পরখ—ভালোবেসে একবার তায় দেখ না রে!

বাসিস যদি ভালো—যেন বাসতে পারিস সব ভুলে,
লাজ মান ভয় কুল—ভেসে সব যাক সে-প্রেমের অকূলে।
রোমে রোমে জপলে সে-নাম—ঝংকারে, তান মূর্ছনায়,
প্রতি শ্বাসে ঝরলে আগুন—"এলো সে আজও হায়,"
তাপ মিটাবে সে এসে—তুই জ্বালিয়ে আগুন দেখ না রে!

একবার তুই ডাক কেঁদে আজ, একবারটি ডাক তারে :
সে ভালোবাসবেই তোকে—তুই তাকে ভালোবাস্ না রে!

ব্যাকুল হ'য়ে ডাক : "দেখা আজ দিতেই হবে নাথ, প্রেমে,
এসো এসো বন্ধু! তোমার আসতে হবেই আজ নেমে।
তোমা বিনা নেই কেউ আমার,
ঠাঁই দিতে আজ হবেই পায়।
জন্মে জন্মে দাসী মীরা শ্রীচরণে শরণ চায়!"
মীরা! হরি দীনদয়াল, "হরি হরি" গা না রে
একবার তুই ডাক কেঁদে আজ একবারটি ডাক তারে।

হিন্দিভজনের অনুবাদ—ইন্দিরাদেবীর সমাধিশ্রুত—তারিখ : ৩. ৫. ৫৯.

আধুনিকা

(রচনা ঃ অন্তন শেখভ্)

অনুবাদক ঃ শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র চন্দ্র

(পূর্বপ্রকাশিতের পর)

(৫)

সেপ্টেম্বরের দু'তারিখ। কুয়াসায় ঘেরা গরম দিন। ভোরের দিকে পাতলা কুয়াসা ভল্‌গাকে ঘিরে বাতাসে উড়ে বেড়ায়। ন'টার পর গুড়িগুড়ি বৃষ্টি আরম্ভ হয়। পরিষ্কার দিনের কোনই আশা থাকে না। সকালে খাবার সময় রিয়াবভস্কী বলে "শিল্পের মধ্যে সব চেয়ে বিরক্তিকর হ'চ্ছে ছবি আঁকা। সে শিল্পী নয়, বোকারা ছাড়া অন্য কেউ তার প্রতিভার কথা বিশ্বাস করবে না। কাউকে বুঝতে না দিয়ে হঠাৎ সে ছুরিটা নিয়ে সব চেয়ে ভালো ছবিটা ফাঁসিয়ে দেয়। খাওয়া শেষ হলে ও জানলায় এসে বসে, বিমর্ষ মনে বাইরে নদীর দিকে চেয়ে থাকে। ভল্‌গা অস্পষ্ট হয়ে উঠেছে, সে চাকচিক্য আর নেই। প্রকৃতির সবখানেই বিষণ্ণ ছায়া, শরতের নিরানন্দের আগমনী। তীরে বিছানো কার্পেটের মত ঘন সবুজ ঘাস, হীরের মত চকচকে সূর্যরশ্মির বিকিরণ, স্বচ্ছ নীল আকাশ, প্রকৃতির সুন্দর দৃশ্য, সব কিছুই যেন ভল্‌গার ওপর থেকে সরিয়ে নেওয়া হয়েছে। বসন্তের আগে ও-সব আর ফিরে পাওয়া যাবে না। মাথার ওপর ঘুরে ঘুরে কাকগুলো বিকট চীৎকার জুড়ে দিয়েছে, রিয়াবভ্‌স্কী বসে বসে ওদের ডাকশোনে। কাকগুলো যেন চীৎকার করে উঠলো "সব কুছ ঝুটা হ্যায়, সব কুছ্ ঝুটা হ্যায়।" কাকের ডাক শুনে ও মনে মনে বলে চলে "আমি নিজেকে সম্পূর্ণ হারিয়ে ফেলেছি,আমার সমস্ত প্রতিভা আজ নিঃশেষিত। দেখছি এই পৃথিবীতে সব কিছুই গতানুগতিক, সব কিছুই আপেক্ষিক্, সব কিছুই অর্থহীন। ঐ মহিলাটির সঙ্গে মেলামেশা করা আদৌ সঙ্গত হয়নি।" এক কথায় বলতে গেলে ওর জীবনে এসেছে নৈরাশ্য আর অবসাদ।

"পার্টিশনের" অন্যদিকে বিছানার ওপর বসে অলগা ঘন চুলের মধ্যে আঙুল গুলো চালায়। কল্পনা করে, ও যেন নিজের ড্রয়িংরুমে, শোবার ঘরে এবং স্বামীর ঘরে বসে আছে। থিয়েটারের কথা, দর্জির কথা, কল্পনায় মনে করে। এখন কী করছে ওরা? ওরা কী অলগার কথা মনে রেখেছে? ডিমভ্! আমার ডিমভ্! বাড়ী ফিরে যাবার জন্যে চিঠির মধ্যে কি কাকুতি-মিনতি বেচারী ডিমভের! প্রত্যেক মাসে ও অলগাকে পঁচাত্তর রুবল পাঠায়। রিয়াবভ্‌স্কীর কাছ থেকে একশো রুবল ধার করেছে জানলে আরো একশো পাঠিয়ে দেয়। কত ভালো, কত দয়ালু ডিমভ্! ভ্রমণে এসেছে ক্লান্তি, জীবনে এসেছে অবসাদ। তাই এই চাষাভুষোদের সংস্পর্শ থেকে, নদীর এই স্যাঁতসেঁতে গন্ধের হাত থেকে অলগা পালিয়ে বাঁচতে চায়, ঝেড়ে ফেলতে চায় দেহের সমস্ত গ্লানি। চাষাদের সঙ্গে বাস করলে, গ্রামে গ্রামে ঘুরে বেড়ালে দেহের এই গ্লানি কোনদিনই দূর হবে না। রিয়াবভ্‌স্কী ওদের সঙ্গে আরো দিনকতক থাকবার কথা না দিলে, ওরা সকলে আজই এখান থেকে চলে যেতে পারতো। সেইটাই কী ভালো হতো না!

রিয়াবভ্‌স্কী বিরক্তির সুরে বলে "হায় ভগবান, কখন আবার সূর্য উঠবে? সূর্য না থাকলে আমি যে সূর্যালোকিত ভূভাগ-দৃশ্য আঁকতে পারি না।"

"পার্টিসানের" ও-পাশ থেকে বেরিয়ে এসে অলগা

বলে "তোমার তো একটা ছবি পড়ে আছে, শেষ করনি—আকাশে মেঘ করে আছে, বিদ্যুৎ চমকাচ্ছে, মনে নেই? ডানদিকে ঘন বন, বাঁদিকে গরুর পাল ও রাজহাঁসের ঝাঁক। ঐ ছবিটা তো এখন শেষ করতে পারো।"

"ভগবানের দোহাই, একটু চুপ করো! তুমি কী সত্যিই আমাকে এতো বোকা মনে করেছো যে, আমার কী করা উচিত তা আমি জানি না।"

"না! তুমি একবারেই বদলে গেছো।"

"ভালোই হয়েছে।"

অলগা ফুঁপিয়ে ওঠে, উনুনের কাছে গিয়ে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কাঁদে।

"আবার কাঁন্না হচ্ছে, কান্নাটাই যদি না শেষ হতো! চুপ করো বলছি, কাঁদবার হাজার রকম কারণ আমারও আছে, কিন্তু আমি কাঁদি না।"

ফোঁপাতে ফোঁপাতে অলগা বলে "কারণ আছে! সব চেয়ে বড়ো কারণ আমাকে তোমার আর ভালো লাগে না। আমাকে তুমি আর ভালোবাস না।" অলগার কান্না বেড়ে চলে।" "সত্যি বলতে কী আমাদের এই ভালোবাসার জন্যে তুমি লজ্জিত। পাছে সকলে জেনে ফেলে তাই তুমি ভয় পাও। তুমি হয়তো জানো নামে আমাদের মেলামেশা অনেকদিন আগে থেকেই সকলে লক্ষ্য করেছে, গোপন কিছুই নেই।

বুকের ওপর হাত দু'টো রেখে রিয়াব্‌ভস্কী অনুনয় করে বলে "অলগা একটা জিনিষ তোমার কাছ থেকে চাই, মাত্র একটা—তুমি আমাকে একা থাকতে দাও, তোমার কাছে এই আমার সব চাওয়া।"

"কিন্তু পণথ করো, বলো—আজও তুমি আমায় ভালোবাস।"

"কী যন্ত্রণা! তুমি কী চাও ভল্‌গায় ঝাঁপ দিয়ে এ জীবনটা শেষ করে দিই? আমাকে একা থাকতে দাও, তা না হলে যে আমি পাগল হয়ে যাব। দোহাই তোমার, আমাকে একটু একা থাকতে দাও।"

"মারো, আরো মারো, মেরে ফেল আমাকে।" কাঁদতে কাঁদতে "পার্টিসানের" পেছনে চলে যায় অলগা।

খড়ের গাদার ওপর বৃষ্টি পড়ার শব্দ শোনা যায়। মাথাটা দু'হাতে চেপে ধ'রে রিয়াবভ্‌স্কী ঘরের মধ্যে পায়চারি করে। হঠাৎ টুপীটা চাপিয়ে, বন্দুকটা কাঁধে ফেলে ও ঘর থেকে বেরিয়ে যায়।

ও বেরিয়ে গেলে অলগা বিছানায় শুয়ে অনেকক্ষণ ধরে কাঁদে। প্রথমে ভাবে বিষ খেয়ে মরলে কেমন হয়। ও ফিরে এসে দেখবে অলগা মারা গেছে। পরক্ষণেই বাড়ীর কথা মনে পড়ে, মনে পড়ে বৈঠকখানার কথা, স্বামীর পড়বার ঘরের কথা। কল্পনায় সে দেখে, স্বামীর পাশে সে বসে আছে, দেহে-মনে সে পবিত্র হয়ে উঠেছে। সভ্য সমাজের, শহরের কোলাহলের, নামকরা বন্ধুদের জন্যে ও দুঃখ বোধ করে। একজন মেয়েছেলে ঘরে ঢোকে। খাবার তৈরী করবার জন্যে উনুনে আস্তে আস্তে হাওয়া করে। ধিকিধিকি পোড়া কাঠের গন্ধ ভেসে আসে, ঘরের বাতাস ধোঁয়ায় নীল হয়ে ওঠে। এক এক করে ওরা ফিরতে আরম্ভ করে। কাদামাখা পায়ের জুতো, বৃষ্টির জলে ভেজা মুখ।

দেয়ালে টাঙানো ঘড়িটার টিক্ টিক্ শব্দ; মূর্তিটার পাশের কোণ থেকে মাছির ভন্‌ভন্ আওয়াজ ভেসে আসছে। বেঞ্চির তলায় মাছির গাদার মধ্যে তেলা পোকাগুলো ঘুরে বেড়াচ্ছে।

সূর্য অস্ত গেল, রিয়াবভ্‌স্কী ফিরে এলো। টুপীটা টেবিলের ওপর ছুড়ে দিয়ে ময়লা জুতো পরেই বেঞ্চির ওপর চোখ বুজে শুয়ে পড়ে।

"আমি ক্লান্ত, আমি শ্রান্ত, আমি অবসন্ন।" ভুরু কুঁচকে চোখের পাতা খোলবার চেষ্টা করে।

উৎকণ্ঠিতা অলগা ওর কাছে এগিয়ে যায়, ওকে দেখাতে চায় যে ওর ওপর সে রাগ করেনি। ওকে ঠাণ্ডা করবার চেষ্টা করে, চিরুণী দিয়ে ওর চুলের গোছা ঠিক করে দেয়।

রিয়াবভ্‌স্কীর মনে হয় চট্‌চটে কী যেন ওর গায়ে লাগছে। চোখ চেয়ে দেখে, বলে "এ আবার কী হচ্ছে? আমাকে কী একটুও শান্তিতে থাকতে দেবে না? তোমার পায়ে পড়ি, তুমি যাও।"

অলগাকে ঠেলে সরিয়ে দিয়ে ও সেখান থেকে চলে আসে। অলগা লক্ষ্য করে ওর চোখে-মুখে ঘৃণা ও রাগের ছাপ ফুটে রয়েছে। ঠিক ঐ সময় মেয়ে লোকটা থালায় করে খাবার নিয়ে আসে, ওর মোটা থাবার ওপর ঝোলের

দাগ লেগে। ঐ কুৎসিত মেয়ে লোকটা, ঐ খাবার, এই ঘর, এই জীবন যাত্রা, প্রথম প্রথম সুন্দর ও রমণীয় বলে মনে হয়েছিলো, কিন্তু আজ অলগার কাছে সবই বিরক্তিকর বলে মনে হয়।

নিজেকে অপমানিত মনে করে অলগা। সে আস্তে আস্তে বলে "কিছুটা সময় আমাদের তফাতে থাকা দরকার হয়ে পড়েছে। তা না হলে হয়তো রাগের বশে এখুনি ঝগড়া করে বসবো। এ-সব আর আমার ভালো লাগছে না। আজই আমি চলে যাব।"

"কেমন করে? উড়ে যাবে না কি?"

"আজ বৃহস্পতিবার, সাড়ে ন'টার সময় জাহাজ ভিড়বে।"

"তাই নাকি! বেশ, বেশ, তাই যাও।" তোয়ালে দিয়ে ঠোঁট মুছতে মুছতে ও নরম স্বরে বলে "এখানে তোমার ভালো না-লাগবারই কথা। আমি এতোটা স্বার্থপর নই যে, তোমাকে আটক রাখবার চেষ্টা করবো। আচ্ছা এসো, বিশ তারিখের পর আবার আমাদের দেখা হবে।"

অলগা জামা কাপড় গোছায়। মনে মনে ভাবে—সত্যিই কী সে ফিরে চলেছে? আবার কী সে ঘরে গিয়ে বসতে পারবে? আবার টেবিলে বসে খাবে সে?" বিরাট একটা ভার যেন ওর কাঁধ থেকে নেমে যায়, রিয়াবভ্স্কীর ওপর ওর আর কোন রাগ নেই।

অলগা আরম্ভ করে "রেবুসা, আমার রং ও তুলিগুলো রেখে যাচ্ছি। কিছু যদি পড়ে থাকে যাবার সময় সঙ্গে করে নিয়ে যেয়ো···। শোন, আমি না থাকাতে তুমি যেন কুঁড়েমি করে বসে থেকো না, মন দিয়ে কাজ কর। সত্যিই তুমি দয়ালু রেবুসা।"

রিয়াবভ্স্কী জানতো যে অলগা এখানে আসবেই। পাছে ডেকের ওপর সকলের সামনে বিদায়-সম্ভাষণ জানাতে হয়, তাই ঠিক ন'টার সময় সেখানে এসে অলগার কাছে বিদায় নেয়। ও দেখতে পায় অলগা সিঁড়ি দিয়ে বেয়ে জাহাজে উঠলো। জাহাজটা ওকে নিয়ে ধীরে ধীরে চোখের বাইরে চলে গেল।

আড়াইদিন পরে অলগা ফিরে আসে। মাথার টুপী ও বর্ষাতি না খুলেই হাঁপাতে হাঁপাতে সে বৈঠকখানায় ঢোকে, সেখান থেকে চলে আসে খাবার ঘরে। টেবিলের সামনে বসে ডিমভ্ ছুরিতে শান্ দিচ্ছে, গায়ে একটা সার্ট, ওয়েষ্টকোর্টের বোতামগুলো খোলা। সামনে ডিসের ওপর রয়েছে একটা গোটা মুরগী। ঘরে এসে ও মনে মনে ভাবে স্বামীর কাছে সব কথা চেপে যাবে। হাঁা, সব কথা চেপে যাবে সে স্বামীর কাছে। কিন্তু ডিমভের প্রাণ-খোলা হাসি দেখে ওর মনে হয়, গোপন করাটা মোটেই ভালো হবে না। এই সরল মানুষটাকে ঠকানো তার পক্ষে অসম্ভব। মনে মনে ঠিক করে—না, সব কথাই জানাবে সে। ডিমভ্ অলগাকে বুকে জড়িয়ে ধরে, অলগা কোন বাধা দেয় না। হাত দিয়ে মুখ ঢেকে অলগা ডিমভের সামনে হাঁটু মুড়ে বসে পড়ে।

"এ কী করছো?"

অলগা ঘাড় তোলে, মুখ লাল হয়ে উঠেছে ওর। লজ্জা ও ভয়ে অলগা কথা বলতে পারে না।

"না, না, কিছু হয়নি······আমি ঠিকই আছি···।

ডিমভ্ অলগাকে তুলে ধরে। টেবিলের কাছে এসে বলে "বসো, কিছু খেয়ে নাও। তোমার খিদে পেয়েছে বুঝতে পারছি।"

অলগা নিজেকে হাল্কা মনে করে, কিছুটা মাংস খায়। ডিমভ্ ওর দিকে চেয়ে খুসী মনে হাসে।

(৬)

শীতের মাঝামাঝি থেকে ডিমভের সন্দেহ হয় যে, বোধ হয় অলগা তাকে প্রতারণা করেছে। সে স্ত্রীর মুখের দিকে তাকাতে পারে না, যেন সে নিজেই দোষী। স্ত্রীকে দেখে সে আর আনন্দে হেসে ওঠে না। যতটা সম্ভব স্ত্রীর কাছে কম থাকা যায় তারই চেষ্টা করে ডিমভ। তাই বন্ধু কোরোস্টেলেভ্‌কে প্রায়ই খেতে আসতে বলে—কুৎসিত, বেঁটে, মাথাভর্তি খাঁড়া খাঁড়া চুল কোরোস্টেলেভের। অলগার সঙ্গে কথা কইবার সময় ও বিব্রত হয়ে ওঠে, জামার বোতামগুলো একবার খোলে, পরক্ষণেই আবার সেগুলো লাগিয়ে দেয়, ডান হাত দিয়ে বাঁদিকের গোঁফ পাকাতে থাকে। খাবার সময় দু'জনের মধ্যে কথাবার্তা হয়—"ডায়াফ্রাম্" যখন খুব ওপর দিকে উঠে যায়, তখন প্রায় দেখা যায় বুক ধড়ফড় করে অথবা পরে নানাপ্রকার রোগ

কথা দেয়। কিংবা ডিমভ্ বলে—আগের দিন সন্ধ্যে-বেলায় মরা চেরাই করবার সময় সে দেখতে পায় যে, রুগীটা "প্যানক্রিয়াস" ক্যানসারে মারা গেছে, যদিও মৃত্যুর কারণ ধরে নেওয়া হয়েছিলো রক্তহীনতা। মনে হয় তারা এই চিকিৎসা সংক্রান্ত আলাপ আলোচনা চালিয়ে যায়, যাতে না অলগা কোন কথা বলার সুযোগ পায়। কেন না, অলগা তো কেবল একরাশ মিথ্যে কথাই বলে যাবে। খাওয়ার শেষে কোরোস্‌টেলেভ্ পিয়ানো নিয়ে বসে আর ডিমভ্ ওকে বলে "আর দেরী করছো কেন? নাও এবার আরম্ভ করো।"

কোরোস্‌টেলেভ্ সোজা হয়ে ব'সে চড়া সুরে গান ধরে আর ডিমভ্ হাত দু'টোর ওপর মাথা রেখে গভীর চিন্তায় তলিয়ে যায়।

আজকাল অলগা প্রায়ই অমনোযোগী হ'য়ে পড়ে। সকালে ঘুম থেকে ওঠার পর ওর মেজাজটা ভালো থাকে না। ও ভাবতে থাকে—আমি আর রিয়াবভ্‌স্কীকে ভালোবাসি না, আমাদের মধ্যে সকল সম্পর্ক শেষ হয়ে গেছে, ঈশ্বরকে ধন্যবাদ। কিন্তু কফিটুকু খাবার পর ওর মনে হয় যেন রিয়াবভ্‌স্কী ওকে স্বামীর কাছ থেকে ছিনিয়ে নিয়েছে। আজ স্বামী ও রিয়াবভ্‌স্কী, দু'জনের একজনও ওর পাশে নেই। প্রদর্শনীতে পাঠাবার জন্য রিয়াবভ্‌স্কী যে ছবিগুলো আঁকাছিলো বন্ধুদের সেই ছবিগুলোর সম্বন্ধে আলোচনার কথা মনে পড়ে, মনে পড়ে তারা বলেছিলো "ওগুলো পোলেনভের ধরণে আঁকা।" অলগা মনে মনে ভাবে—যারাই ওর ষ্টুডিওতে এসেছে তারা সবাই এক-বাক্যে ওর ছবির প্রশংসা করেছে। কিন্তু সত্যি কথা বলতে গেলে এ ছবির সৃষ্টির মূলে রয়েছে তারই প্রভাব ও প্রেরণা। তার প্রভাবে রিয়াবভ্‌স্কীর উন্নতিও হয়েছে যথেষ্ট। যদি অলগার কাছ থেকে ও প্রেরণা না পেতো, তাহলে আজ কোথায় তলিয়ে যেতো ও। আরো মনে পড়ে শেষবার যখন ও অলগার সঙ্গে দেখা করতে আসে, ওর গায়ে ছিলো সাদা-ডোরা-কাটা ছাই রংয়ের একটা কোট, গলায় ছিলো একটা নতুন টাই" ও জিজ্ঞেস করেছিলো "বেশ মানিয়েছে, না?"

কোঁকড়ানো চুল, নীল চোখ আর ঐ বেশভূষায় অন্ততঃ অলগার ওকে সুন্দর বলেই মনে হয়েছিলো।

এই সব ভেবে এবং নানাপ্রকার চিন্তা করে রিয়াবভ্‌স্কীর সঙ্গে দেখা করবার জন্যে ও মনস্থির করে। তাই বেশভূষা শেষ করে বেশ খানিকটা উত্তেজিত হয়ে ষ্টুডিয়োর উদ্দেশে বেরিয়ে পড়ে। খুসী মনে বেশ সহজভাবেই রিয়াবভ্‌স্কী নিজের ছবি সম্বন্ধে আলোচনা করে, ছবিগুলো সত্যিই ভালো। মধ্যে মধ্যে হঠাৎ রিয়াবভ্‌স্কী ঠাট্টার ছলে বেয়াড়া প্রশ্ন করে বসে। ছবিগুলো দেখে অলগার হিংসে হয়, এ-সব ও সহ্য করতে পারে না। তবুও মুখ বুজে ছবি-গুলোর সামনে দাঁড়িয়ে বলে "হ্যাঁ, এ-রকম ছবি এর আগে তুমি কখনো আঁকনি। এ-সব দেখে আমি ভয় পাই।"

এরপর বলে অলগার অনুরোধ, উপরোধ, চলে কাতর প্রার্থনা—দয়া কর, ভালোবাস, আমায় পায়ে ঠেলো না। অলগা কাঁদে, জানতে চায় রিয়াবভস্কী ওকে ভালবাসে কী না। তাকে মনে করিয়ে দেয় যে, অলগা কাছে কাছে না থাকলে রিয়াবভস্কী বিপথে যেতে পারে, নষ্ট করতে পারে নিজেকে। ওর কথায় রিয়াবভস্কী অতিমাত্রায় বিচলিত হয়ে ওঠে আর অলগা নিজেকে যথেষ্ট খেলো মনে করে। পরে সে দর্জির কাছে যায় কিংবা থিয়েটারের টিকিটের জন্যে কোন বান্ধবীর সঙ্গে দেখা করে।

যেদিন রিয়াবভস্কীকে ষ্টুডিয়োর মধ্যে দেখতে না পায়, সেদিন অলগার বাড়ীতে আসবার জন্যে চিঠি লিখে আসে। চিঠিতে আরো লেখে যদি ও না আসে তাহলে অলগা বিষ খেয়ে মরবে। অলগা ওকে ভয় দেখাতে চায়। আশ্চর্য! রিয়াবভস্কী ওর বাড়ীতে আসে, ওর সঙ্গে দেখা করে, এমন কি এক সঙ্গে বসে খায়। ডিমভের সামনে কোন রকম লজ্জা না করেই ও অলগার সম্বন্ধে যা-তা বলে। দু'জনেই বেশ বুঝতে পারে যে, ওরা যে-যার নিজের পথেই চলেছে। বন্ধু ওরা নয়, ওরা পরস্পর শত্রু। ওদের খেয়ালই থাকে না যে, ওদের কথাবার্তা ওদের চাল চলন কতখানি দৃষ্টিকটু হয়ে উঠেছে আর পাঁচজনের কাছে। এমন কি কোরোস্‌টেলেভও সব বুঝতে পারে।

"কোথায় যাচ্ছো?" অলগা জিজ্ঞেস করে।

ভ্রূকুটি করে ও এমন একজনের নাম করে, যাকে ওরা দু'জনেই চেনে। ওর বলার উদ্দেশ্য আর কিছু নয়—একটু তামাসা করা, অলগাকে কিছুটা চটিয়ে তোলা।

অলগা শোবার ঘরে চলে এসে বিছানায় শুয়ে কাঁদে।

লজ্জা, অপমানে ও রাগে বালিশটা কামড়ায়। ডিমভ বন্ধুকে ড্রইং রুমে বসিয়ে রেখে শোবার ঘরে চলে আসে। হতবুদ্ধি, লাজুক ডিমভ্ অলগাকে সান্ত্বনা দিয়ে বলে "কেঁদো না, চুপ করো। কেঁদে লাভটা কী? এ-সব ব্যাপার চেপে যাওয়াই ভালো, অন্য কেউ যেন জানতে না পারে……। তুমি তো বোঝ, যা ঘটলো তা আর ফিরিয়ে নেওয়া যাবে না।"

রাগে রগের দু'পাশ কাঁপছে। অলগা নিজেকে সামলাতে পারে না। মনে মনে ভাবে এমন কিছুই হয়নি, সবই আবার স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে আসতে পারে। ও বিছানা ছেড়ে উঠে পড়ে, চোখে জল দেয়, মুখে পাউডার মেখে রিয়াবভ্স্কী এই মাত্র যার নাম করলো, সেই বান্ধবীর কাছে ছোটে। সেখানে ওকে দেখতে না পেয়ে, আর একজনের কাছে যায়, সেখানেও না পেয়ে ছোটে আর একজনের কাছে…। প্রথম প্রথম এতে অলগার লজ্জা হতো, ক্রমে ক্রমে সবই সহে যায়, এখন এ-সব অভ্যাসে দাঁড়িয়ে গেছে। কোন কোন দিন চেনাশোনা যত বান্ধবী আছে, ওর খোঁজে প্রত্যেকেরই বাড়ী টহল দিয়ে বেড়ায়। অলগার এই বাড়ী বাড়ী ঘুরে বেড়ানোর উদ্দেশ্য বুঝতে পারে বান্ধবীরা।

একদিন স্বামীকে দেখিয়ে রিয়াবভস্কীকে বলে "ঐ লোকটার উদারতা আমি সহ্য করতে পারি না।"

রিয়াবভস্কী ও অলগার মেলামেশার খবর যারা জানে তাদের সঙ্গে দেখা হলেই অলগা স্বামীর সম্বন্ধে ঐ কথাগুলো বলে নিজেকে সুখী মনে করে।

গত বছরের মতো এ বছরের দিনগুলো বাঁধাধরা নিয়মে কাটে। বুধবার সন্ধ্যায় বাড়ীতে আসর বসে। অভিনেতা আবৃত্তি করে, শিল্পী ছবি আঁকে, পিয়ানো বাদক পিয়ানো বাজায়, গাইয়ে গান করে। ঠিক সাড়ে এগারোটার সময় খাবার ঘরের দরজা খুলে ডিমভ বেরিয়ে আসে, হেসে বলে "খাবার তৈরী, আপনারা আসুন।"

স্ত্রী নামকরা লোকদের ডেকে ডেকে তোলে, তাদের তোয়াজ করে। পরে অন্য লোকজনদের কাছে যায়। রোজ রাত করে বাড়ী ফিরে দেখে স্বামী তখনও জেগে আছে, নিজের ঘরে বসে কাজ করছে। তিনটে বাজলে তবে শুতে যায়, পরের দিন আটটায় ঘুম থেকে ওঠে।

একদিন সন্ধ্যের সময় থিয়েটারে যাবার আগে অলগা যখন আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে চেহারাটা শেষ দেখে নিচ্ছে, সেই সময় ডিমভ শোবার ঘরে ঢোকে—গায়ে তার পোষাকী কোট, গলায় সাদা রংয়ের টাই। অলগার দিকে চেয়ে ডিমভ হাসে—ঠিক আগে যে-রকম হাসতো।

বিছানার ওপর বসে ঢিলে পা-জামাটা সোজা করতে করতে ডিমভ বলে "আমার প্রবন্ধটা পাঠিয়ে দিয়েছি।"

"উৎরোবে তো?"

"দেখাই যাক্ না!" স্বামীর দিকে পেছন ফিরে অলগা মাথার চুলগুলো ঠিক করে নিচ্ছেলো! ডিমভ গলাটা বাড়িয়ে আয়নার মধ্যে স্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ ক'রে আবার বলে "দেখাই যাক্ না! খুব সম্ভব প্যাথলজিতে আমাকে সম্মানসূচক উপাধি দেওয়া হবে।"

অলগা যদি ডিমভের এই সাফল্যের কিছুটা অংশীদার হতে পারতো, হয়তো ডিমভ তাকে ক্ষমা করতে পারতো, পারতো অতীত ও বর্তমানের সব ঘটনা মন থেকে মুছে ফেলতে। কিন্তু অলগা না উপাধি, না প্যাথলজি" কোনটাই বোঝে না। কিছুই বলে না অলগা, ওর মনে হয় থিয়েটারে যাবার দেরী হয়ে যাচ্ছে।

কিছুক্ষণ বসে থেকে ডিমভ হাসতে হাসতে ঘর থেকে বেরিয়ে যায়।

(৭)

মাথার যন্ত্রণায় ভুগছে ডিমভ। সকালে সে কিছুই খায়নি, হাসপাতালেও যায়নি। পড়ার ঘরে সারাদিন শুয়ে আছে। রোজ যেমন বেরোয় আজও অলগা বেরিয়ে যায়। ওর আঁকা ছবিটা রিয়াবভস্কীকে দেখাবে, জিজ্ঞেস করবে পরশু দিন সে ওর বাড়ী যায় নি কেন। ও বেশ বোঝে রিয়াবভস্কীর সঙ্গে ছল করে দেখা করবার জন্যে এঁকেছে ছবিটা, ছবিটা মোটেই ভালো হয়নি।

বেল না বাজিয়েই অলগা ভেতরে ঢোকে। হল ঘরের মধ্যে দাঁড়িয়ে পা থেকে জুতো খোলবার সময় ষ্টুডিয়োর মধ্যে মৃদু পায়ের শব্দ শুনতে পায়, আরো শুনতে পায় মেয়েলী-পোষাকের খস্ খস্ আওয়াজ। ভেতর দিকে তাকাতেই খয়ের রংয়ের স্কার্ট চোখে পড়ে। মুহূর্তের মধ্যে চমক লাগিয়ে কালো কাপড় মোড়া ক্যানভাসের পেছনে কে যেন চলে গেল। একটা মেয়ে যে ক্যানভাসের পেছনে

লুকিয়ে পড়লো, তাতে কোন সন্দেহ থাকে না। অলগাকেও যে কতবার ওরই পেছনে লুকোতে হয়েছে, তার ইয়ত্তা নেই। ওকে দেখে রিয়াবভস্কী আশ্চর্য হয়, হাত দু'টো ওর দিকে বাড়িয়ে শুকনো হাসি হেসে বলে ওঃ! কী যে খুশী হলাম তোমাকে দেখে। খবর কী?

অলগার চোখ জলে ভরে ওঠে, বেচারী অলগা নিজেকে অপমানিত মনে করে। মেয়েটা লুকিয়ে আছে, মরে গেলেও অলগা ওর সামনে কিছু বলতে পারবে না। ক্যানভাসের পেছনে দাঁড়িয়ে মেয়েটা নিশ্চয় হাসছে।

"আমার আঁকা ছবিটা দেখাতে এনেছি।" ভয়ে ভয়ে অলগা বলে।

"ছবি…?"

ছবিটা দেখতে দেখতে রিয়াবভস্কী অন্যমনস্ক হয়ে পড়ে, পরে পাশের ঘরে চলে যায়।

অলগাও ওর পেছনে পেছনে আসে।

ষ্টুডিয়োর ভেতর থেকে পায়ের ও স্কার্টের খস্ খস্ আওয়াজ শুনতে পাওয়া যায়। বেশ বোঝা যায় যে মেয়েটা চলে গেল। অলগা কেঁদে ফেলে, ইচ্ছে হয় রিয়াবভস্কীর মাথায় শক্ত একটা কিছু দিয়ে আঘাত করতে। তাড়াতাড়ি ছুটে চলে আসে ওখান থেকে, ছবির কথা ভুলে যায়, দু'চোখ জলে ভরে ওঠে, লজ্জায় ভেঙে পড়ে অলগা। নিজেকে বড়ো খেলো মনে হয়।

ছবিটার দিকে তাকিয়ে এবং মাথাটা একটু নেড়ে নিজেকে চাঙ্গা করে তুলে রিয়াবভস্কী বলে তোমাকে নিয়ে আর পারা গেল না। আজ একটা, কাল একটা, মাস-খানিকের মধ্যে আবার একখানা।…আচ্ছা, ছবি আঁকতে এখনো ভালো লাগে, বিতৃষ্ণা হয় না তোমার? তোমার মত অবস্থায় পড়লে আমি ছবি আঁকা ছেড়ে গান-বাজনা কিংবা অন্য কিছু একটা নিয়ে উঠে পড়ে লাগতাম। অবশ্য ছবিটা ভালোই হয়েছে। তুমি বেশ জান, তুমি বেশ বোঝ যে, তুমি শিল্পী নও, তুমি একজন গায়িকা। তুমি হয়তো বুঝতে পারছো না যে, আমি কত ক্লান্ত! আমাদের জন্যে চা আনতে বলি, বলবো কী?

ঘর থেকে বেরিয়ে যায় রিয়াবভস্কী, অলগা শোনে চাকরকে ও যেন কী বলছে। বিদায় নেওয়ার হাত থেকে এড়িয়ে যাবার জন্যে, তার চেয়েও আরো বেশী কান্নার হাত থেকে বাঁচবার জন্যে অলগা রিয়াবভস্কী আসবার আগেই ওখান থেকে হন্তদন্তে পালিয়ে আসে। কোন রকম জুতো দু'টো পায়ে গলিয়ে বেরিয়ে পড়ে, রাস্তায় এসে নিজেকে কিছুটা সুস্থ মনে হয়। ও ভাবে চিরকালের জন্যে ও রিয়াবভস্কীকে ছেড়ে চলে এলো। ওর ছবি, ষ্টুডিয়োর ভেতর যে অপমান ওকে সহ্য করতে হয়েছে আজ সব কিছুই ও দূরে ফেলে আসতে পেরেছে।

প্রথমে ও মেয়ে-দর্জির কাছে যায়। সেখান থেকে যায় "বারনাই"এর কাছে, "বারনাই" কিছুদিন আগে ফিরে এসেছে। "বারনাই"এর কাছ থেকে যায় বাজনার দোকানে। সব সময়ই সে ভাবতে থাকে রিয়াবভস্কীকে চিঠি লিখে জানাবে তাকে, বোঝাবে যে আজও অলগা ইজ্জৎ হারায়নি। চিঠিতে লিখবে যে, আসছে বসন্তকালে কিংবা গ্রীষ্মকালে সে ডিমভকে নিয়ে "ক্রিমিয়ায়" বেড়াতে যাবে। অতীতের সব কিছু ভুলে গিয়ে, নতুন ভাবে জীবন আরম্ভ করবে।

অনেক রাত করে অলগা বাড়ী ফেরে। নিজের ঘরে ঢুকে বেশভূষা না খুলেই চিঠি লেখবার জন্যে বৈঠকখানায় চলে আসে। রিয়াবভস্কী বলেছে অলগা সত্যিকারের শিল্পী নয়। অলগাও জানাবে সে-ও দক্ষ শিল্পী নয়। বছরের পর বছর সে একই ধরণের ছবি এঁকে এসেছে, দিনের পর দিন একই কথা বলে এসেছে। যতটুকু সে সুখ্যাতি পেয়েছে ততটুকুই তার সব। এর বেশী সুখ্যাতি সে কখনই পাবে না। ওর ইচ্ছে হয় লিখে জানাতে যে, ওর সাহচর্য রিয়াবভস্কীকে যথেষ্ট প্রভাবান্বিত করেছে; ওর কাছে সে ঋণী, আজ সে অলগার প্রতি বিমুখ, কেন না পাঁচজন তাকে বোকা বানিয়েছে—পাঁচজনের মধ্যে ঐ মেয়েটা একজন, যে আজ ছবির পেছনে লুকিয়েছিলো।

"মাম্স্।" দরজা না খুলেই পড়ার ঘর থেকে ডিমভ ডাকে।

"কেন, কী দরকার?"

দরজার কাছেই দাঁড়িয়ে থাকো, আমার কাছে এসো না, হ্যাঁ ঐখানেই। আজ দু'দিন হলো আমি "ডিপ্-থিরিয়া" রোগে ভুগছি।…এখন খুব খারাপ লাগছে। কোরোস্টেলেভের কাছে লোক পাঠাও।

বান্ধবীদের মত অলগাও স্বামীর পদবী ধরে ডাকে।

স্বামীর নাম "ওসিপ" অলগার ও নামটা পছন্দ হয় না। ঐ নামটা করলেই গগলের ওসিপের কথাই মনে পড়ে যায়।

কিন্তু আজ সে বলে "ওসিপ, এ কিছুতেই হতে পারে না।"

ঘরের ভেতর থেকে ডিমভ বলে "কোরোস্‌টেলেভের কাছে লোক পাঠাও, ওকে ডেকে আনুক। আমি ভালো বোধ করছি না।" অলগা বেশ বুঝতে পারে যে, ডিমভ পায়ে পায়ে এগিয়ে গিয়ে সোফার ওপর শুয়ে পড়লো।

"ওর কাছে লোক পাঠাও।" ধরা গলা ডিমভের।

অলগা ভয়ে নিরুৎসাহ হয়ে মনে মনে ভাবে "সত্যিই ডিপথিরিয়া নাকি? মহা বিপদ তো!"

অলগা ভেবে ঠিক করতে পারে না কেনই-বা সে শোবার ঘরে এলো, কেনই-বা সে বাতি জ্বালালে। কিছুই বুঝতে পারে না সে। মনে মনে ভাবে এখন তার কী করা উচিৎ। আয়নার মধ্যে নিজের চেহারাটার ওপর নজর পড়ে—ফ্যাকাসে হয়ে উঠেছে মুখ, চোখে-মুখে ভয়ের ছাপ। হাতওয়ালা বড় জামা, সামনে হলদে রংয়ের ঝালর, ডোরা কাটা স্কার্ট, সব কিছু মিলে একটা কিম্ভুত-কিমাকার জন্তু বিশেষ করে তুলেছে। স্বামীর জন্যে মায়া হয় অলগার। অলগার প্রতি ডিমভের কা গভীর ভালোবাসা, ওর ঐ নিসঙ্গ জীবন, বিশেষ করে ওর ঐ মিষ্টি হাসি—সব মনে পড়ে অলগার। দুঃখে কেঁদে ফেলে অলগা, শেষে কোরোস্‌টেলেভকে আসবার জন্যে অনুরোধ করে চিঠি লেখে। তখন রাত বারোটা।

(৮)

সাতটার কিছু পরেই অলগা শোবার ঘর থেকে বেরিয়ে আসে। গায়ে সাদাসিধে বেশভূষা অনিদ্রায় ক্লান্ত দেহ, অবিন্যস্ত চুলের গোছা, মুখে অপরাধীর ছাপ। মুখে এক-গাল দাড়ি একটা লোক অলগার পাশ দিয়ে হলঘরে চলে যায়। বোধ হয় কোন ডাক্তার হবে। ওষুধের গন্ধ নাকে ভেসে আসছে, পড়ার ঘরের দরজার কাছে দাঁড়িয়ে কোরোস্‌টেলেভ ডান হাত দিয়ে বাঁ দিকের গোঁফে চাড়া দিচ্ছে।

অলগাকে দেখে বলে "মাপ করবেন, আপনাকে ডিমভের কাছে যেতে দিতে পারি না। আপনারও ছোঁয়াচ লাগতে পারে, এখান থেকেই দেখুন। তা ছাড়া ওর কাছে গিয়ে লাভ নেই। ডিমভ এখন ভুল বকছে।

অলগা চুপি চুপি জিজ্ঞেস করে "সত্যি ওনার ডিপ্‌-থিরিয়া হয়েছে?"

কোরোস্‌টেলেভ বলে "আমার যদি ক্ষমতা থাকতো, তাহ'লে এই ভাবে যারা নিজেদের মরণকে ডেকে আনে, তাদের প্রত্যেককেই আমি জেলে পুরতাম। জানেন কী কেমন করে ও ঐ রোগ ডেকে এনেছে? একটা ছোট ছেলের গলা থেকে মুখ দিয়ে পুঁয টেনে বার করতে গিয়ে। ছেলেটা ডিপথিরিয়া রোগে ভুগছিলো। কী জন্যে সে এ-কাজ করলো? ডাহা বোকামি, ক্ষণিক মানসিক দুর্বলতা মাত্র!

"খুব কী ভয়ের কারণ আছে?"

"হ্যাঁ, ডাক্তাররা তো তাই বলেন।"

একজন বেঁটে লোক ঘরে ঢোকে—মাথায় কটা চুল, লম্বা নাক, কথায় তার ইহুদী ভাষার টান। ওর পেছনে ঢোকে একজন চ্যাঙা লোক—কদাকার চেহারা, সারা গা লোমে ভর্তি, মাথা ও কাঁধ সামনের দিকে নোয়ানো, সব শেষে ঢোকে একজন যুবক, লাল মুখ, বলিষ্ঠ চেহারা ও চোখে চশমা। ওদের সকলেই ডাক্তার, বন্ধুর অসুখে পালা করে দেখা শোনা করবার জন্যে এসেছে ওরা! পাহারা দেওয়া শেষ হলেও কোরোস্‌টেলেভ বাড়ী না গিয়ে ভূতের মতো ঘরগুলোর মধ্যে ঘুরে বেড়ায়। ঝি ডাক্তার-দের জন্যে চা তৈরী করে ও ওষুধের দোকানে অনবরত ছোটাছুটি করে। তাই অন্য ঘরগুলো বড়ো ফাঁকা ফাঁকা মনে হয়।

শোবার ঘরে বিছানার ওপর বসে অলগা আপন মনে ভাবে—স্বামীকে প্রতারণা করার শাস্তি আজ ভগবান ওকে দিলেন। মৌনী, দুর্বোধ্য, সংস্বভাব, রসিক ও শান্তপ্রকৃতি স্বামী তার কোচের ওপর শুয়ে নীরবে কষ্ট সহে যাচ্ছে, আর ও নিশ্চিন্ত মনে এ ঘরে বসে আছে। যদি ডিমভ্‌ অভি-যোগ করতো, এমন কি বেঘোরেও যদি প্রলাপ বকতো তাহলে ডাক্তাররা বুঝতে পারতেন যে, ডিপ্‌থিরিয়া একমাত্র কারণ নয় রোগের অন্য কারণও আছে। কোরোস্‌টেলেভ্‌ সব জানে, কোন কারণ না থাকলে ও বন্ধু-পত্নীর দিকে ওভাবে তাকাতো না। ডাক্তাররা ওকে জিজ্ঞেস করলেই

জানতে পারতেন। ওর চাহনি দেখলে স্পষ্ট বোঝা যায় যে, কোরোস্‌টেলেভ্‌ ভালো করেই জানে যে, বন্ধু-পত্নীই ওর বন্ধুর মৃত্যুর মূল কারণ, ডিপ্‌থিরিয়া উপলক্ষ মাত্র। ভল্‌গার ওপর চাঁদনী রাতের কথা ভুলে যায় অলগা, ভুলে যায় প্রেমের স্বীকৃতির কথা, ভুলে যায় চাষার কুঁড়ে ঘরে ছন্দোময় জীবন। যে পাপের পাঁকে সে আপাদ মস্তক ডুবেছে, সে পাঁক থেকে অলগা কোনদিনই নিজেকে মলিন মুক্ত করতে পারবে না। তুচ্ছ মোহ বশে এ-সবই তার খামখেয়ালী।

রিয়াবভ্‌স্কী ও অলগার মধ্যে যে গভীর প্রেম, সে প্রেমের কথা মনে পড়তেই অলগা আপন মনে বকে—কী মিথ্যুক আমি! এ-প্রেম যেন একটা মহা অভিশাপ।

চারটের সময় অলগা কোরোস্‌টেলেভ্‌কে সঙ্গে নিয়ে খেতে বসে। কোরোস্‌টেলেভ্‌ মদ ছাড়া আর কিছু খায় না, অলগাও কিছু খেতে পারে না। নীরবে ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করে, শপথ করে—ডিমভ্‌ ভালো হয়ে উঠলে সে স্বামীকে ভালোবাসবে, স্বামীর বাধ্য হবে। কিছুক্ষণের জন্যে দুঃখ-কষ্ট ভুলে গিয়ে অলগা কোরোস্‌টেলেভের দিকে তাকায়, আশ্চর্য হয় কোরোস্‌টেলেভের কথা ভেবে—এ-প্রকার তুচ্ছ, মুখোশ পরা,বদমেজাজী লোকের বেঁচে থাকাই এক বিড়ম্বনা। অলগার মনে হয় ভগবানের হাত থেকে অলগার পরিত্রাণ নেই। সত্যিই কী স্বামীর ছোঁয়াচ এড়িয়ে চলবার জন্যে ও একটিবারও তার পড়বার ঘরে ঢোকেনি! অলগার মনে হয় জীবন শুধুই দুঃখময়। জীবনের সব কিছুই আজ নষ্ট হয়ে গেছে, কিছুতেই তা আর ফিরে পাওয়া যাবে না।

খাওয়া শেষ হয়। সন্ধ্যে হয়ে আসে। ড্রয়িংরুমে এসে অলগা দেখে চকচকে সুতোয় কাজ করা সিল্কের বালিশের ওপর মাথা রেখে কোরোস্‌টেলেভ্‌ নাক ডাকিয়ে সোফার ওপর ঘুমোচ্ছে।

ডাক্তাররা বিছানার চার পাশে ঘুরে বেড়াচ্ছে। এ-সব ব্যাপার তারা কিছুই জানে না। ড্রয়িংরুমে অপরিচিত লোকটার নাক ডাকা, দেয়ালে টাঙানো ছবি, অদ্ভুত অদ্ভুত আসবাবপত্র, গৃহকর্ত্রীর অবিন্যস্ত চুলের গোছা, এলো-মেলো বেশভূষা, এ-সবে ওদের মন আকৃষ্ট হয় না। ডাক্তার-দের মধ্যে একজন হেসে ওঠে, ওর হাসিতে সকলেই অস্বস্তি বোধ করে।

ড্রয়িংরুমে ফিরে এসে অলগা দেখে, কোরোস্‌টেলেভ ঘুম থেকে উঠে বসে বসে চুরুট টানছে।

চাপাগলায় কোরোস্‌টেলেভ বলে—ডিপ্‌থিরিয়া রোগের বীজাণু নাকে সংক্রামিত হয়েছে। বেশ বোঝা যাচ্ছে যে রুগীর নিঃশ্বাস নিতে কষ্ট হচ্ছে। রুগীর অবস্থা খুব খারাপ।

"শ্রেক্‌কে ডেকে পাঠান নি কেন?" অলগা জিজ্ঞেস করে।

"তাঁকে ডেকে পাঠানো হয়েছে। তিনিই প্রথম লক্ষ্য করেন যে, ডিপথিরিয়া নাকে সংক্রামিত হয়েছে। তা-ছাড়া শ্রেক্‌কে? সত্যি কথা বলতে কী, শ্রেক্‌ ডাক্তারই নন, আমিও যেমন শ্রেক্‌ও তেমনি।"

উদ্বেগের মধ্যে দিয়ে ধীরে ধীরে সময় কাটে। জামা কাপড় পরে অলগা বিছানার ওপর তন্দ্রার ঘোরে শুয়ে আছে। সমস্ত ফ্ল্যাটটা—মেঝে থেকে সিলিং পর্যন্ত—যেন একটা লোহার চাঁই। যদি এই লোহার চাঁইটাকে কোন রকমে সরিয়ে দেওয়া যায়, তাহলে সব কিছুই আবার আনন্দে নেচে উঠবে। হঠাৎ অলগার চমক লাগে, মনে হয় ওটা লোহা নয়। ওটা ডিমভের রোগ ছাড়া আর কিছু নয়।

তন্দ্রার ঘোরে অলগা বকে চলে "নেচার-মোর্টি, পোর্ট, স্পোর্ট, কার-ওরট্‌…। শ্রেক্‌ কে? শ্রেক্‌, ট্রেক্‌,… ব্রেক্‌…ক্রেক। বন্ধুরা, তোমরা আজ কোথায়…কোথায় তোমরা? তোমরা কী জানো না যে আমরা বিপদে পড়েছি? হে ভগবান, আমাদের বাঁচাও, দয়া করো আমাদের…শ্রেক্‌, ট্রেক…।

আবার সেই লোহার চাঁই…। যদিও নীচের তলায় ঘড়িটা ঘণ্টায় ঘণ্টায় বেজে চলে, তবুও মনে হয় সময়ের যেন শেষ নেই। যখন-তখন বাইরের বেলটা ঘন ঘন বেজে ওঠে। ডাক্তাররা ডিমভ্‌কে দেখতে আসছে…। ট্রেটা হাতে ধরে ঝি ঘরের মধ্যে ঢোকে, ট্রের ওপর খালি গ্লাস একটা।

সে জিজ্ঞেস করে "মা, আপনার বিছানা পেতে দেবো কী?"

উত্তর না পেয়ে ঝি ঘর থেকে বেরিয়ে যায়। নীচের ঘড়িতে ঘণ্টা বাজার শব্দ হয়। অলগা স্বপ্ন দেখে যেন

অলগার ওপর বৃষ্টি হচ্ছে, যেন ঘরের মধ্যে অপরিচিত কেউ ঢুকলো। মুহূর্ত পরেই অলগা কোরোস্‌টেলেভ্‌কে চিনতে পারে। বিছানার ওপর উঠে বসে ও।

অলগা জিজ্ঞেস করে "ক'টা বাজে ?"

"প্রায় তিনটে।"

"উনি কেমন আছেন ?"

"কেমন আছেন ! উনি মরতে বসেছেন, সেই কথাটাই জানাতে এসেছি।"

কান্না চেপে যায় কোরাসটেলেভ্‌। বিছানার ওপর অলগার পাশে বসে জামার আস্তিন দিয়ে চোখের জল মোছে। প্রথমে অলগা কথাটা ধর্তব্যের মধ্যেই আনে না, কিন্তু পরমুহূর্তেই হতাশায় মুষড়ে পড়ে।

কোরোস্‌টেলেভ্‌ কাঁদতে কাঁদতে বলে ডিমভ মরছে, নিজেকে উৎসর্গ করে সে মরছে। বিজ্ঞান-শাস্ত্রের কী ক্ষতিটাই না হলো। আমাদের তুলনায় সে কত বড়ো, সে কত মহৎ! কত বড় গুণী সে, কতখানি আশাই না সে জাগিয়ে তুলেছিল আমাদের সকলের মধ্যে।"

হাতের মধ্যে হাত রেখে ও বলে চলে—"হায়, হায়, কত বড়ো বৈজ্ঞানিক সে হ'তে পারতো। ডিমভ, এ কী করলে তুমি ? হা ভগবান !" দু'হাতে মুখ ঢেকে হতাশায় ভেঙে পড়ে কোরোস্‌টেলেভ।

ওর কথা বলার ধরণ দেখে মনে হয় যেন ও কারোর ওপর চটে উঠেছে। "কি অদ্ভুত নৈতিক শক্তি! দয়ালু, স্নেহ-প্রবণ, এতটুকু মালিন্য নেই ডিমভের জীবনে। বিজ্ঞানের সাধক বিজ্ঞান সাধনায় আত্মাহুতি দিতে চলেছে। ব্যক্তিগত উপার্জনের জন্যে তাকে দিনরাত গাধার মতো খাটতে হ'তো—সারারাত ধরে করতে হ'তো অনুবাদ। কিন্তু কাদের জন্যে ? এই সব হতভাগা—অকৃতজ্ঞদের জন্যে। কেউ তাকে রেহাই দেয়নি। আজকের এই শিক্ষিত তরুণ হতে পারতো ভবিষ্যতের একজন অধ্যাপক।"

বৈঠকখানাতে কে যেন বলে ওঠে "হ্যাঁ, অসাধারণ লোক ছিলো ডিমভ।"

স্বামীর সঙ্গে জীবনযাত্রার ঘটনাগুলো একে একে ভাবে অলগা—ভাবে পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে, প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত। এখন ও বুঝতে পারছে যে, যাদের ও চেনে, যাদের ও জানে তাদের তুলনায় ওর স্বামী ছিলো অসাধারণ, সত্যিই ছিলো মহৎ। মৃত পিতার প্রতি ও সহকর্মীদের প্রতি তার ব্যবহারের কথা মনে পড়ে। সকলেই আশা করতো যে ওর স্বামী এক সময় যশস্বী হয়ে উঠবে। দেয়াল, সিলিং, আলো এবং মেঝেয় পাতা কার্পেট, সবাই ওর দিকে চেয়ে চোখ টেপাটেপি করছে, যেন তারা বলতে চায় "অলগা, তুমি সুবর্ণসুযোগ হারালে।"

কাঁদতে কাঁদতে অলগা শোবার ঘর থেকে বেরিয়ে যায়, প্রায় ছুটে চলে আসে বৈঠকখানায় সেই অদ্ভুত লোকটার কাছে। স্বামীকে দেখে ডুক্‌রে কেঁদে ওঠে, কোচের ওপর স্থির হয়ে পড়ে আছে ডিমভ, কোমর পর্যন্ত কম্বলে ঢাকা। মুখটা খুব বেশী লম্বা ও রোগা মনে হয়, মুখের এ' মেটে হলদে রং—এর আগে দেখেনি অলগা। কপাল, কালো ভ্রূ, মুখের ঐ স্মিত হাসি দেখে ডিমভকে চিনতে পারা যাচ্ছে। অলগা স্বামীর বুক, কপাল ও হাত দু'টো স্পর্শ করে। বুকটা তখনও গরম মনে হয়, কিন্তু কপাল ও হাত দু'টো বরফের মত ঠাণ্ডা। আধ-ভাবে চোখ খুলে তখনও চেয়ে আছে ডিমভ, চেয়ে আছে অলগার দিকে নয়, ঐ কম্বলটার দিকে।

অলগা জোরে জোরে ডাকে "ডিমভ্‌।"

অলগা স্বামীকে বোঝাতে চায়,ভুল—সব ভুল। এখনো সব শেষ হয়ে যায়নি, জীবন এখনও সুন্দর ও মধুময় হতে পারে। ডিমভ মহৎ, ডিমভ অসাধারণ, স্বামীর সামনে হাঁটু মুড়ে বসে অলগা জীবন ভোর স্বামীকে পুজো করবে, ভক্তি করবে, শ্রদ্ধা করবে।

স্বামীর কাঁধ দু'টো ধরে ঝাঁকুনি দিয়ে অলগা ডাকে "ডিমভ।"

অলগা বিশ্বাস করতে চায় না যে, ডিমভ আর জাগবে না।

"ডিমভ, ডিমভ, কথা কও। আমি অলগা কথা বলছি।"

বৈঠকখানায় কোরোস্‌টেলেভ ঝিকে বলছে- "জিজ্ঞেস করবার কী-ই বা আছে ? ঘুরতে ঘুরতে গির্জার দিকে যাও এবং খোঁজ করো ভিখিরিরা কোথায় থাকে। তারাই শবদেহ ধুয়ে মুছে সব কিছু ঠিক করে দেবে।"

বিভূতিভূষণের কথাশিল্প

অধ্যাপক শ্যামসুন্দর বন্দ্যোপাধ্যায়

(পূর্বপ্রকাশিতের পর)

প্রথম পর্ব : স্রষ্টা

'কিন্নরদল' গ্রন্থের 'তারানাথ তান্ত্রিকের দ্বিতীয় গল্প' অপ্রাকৃত পরিবেশে চমৎকার রোমান্টিক কাহিনী। কিন্তু এই গল্পে অপ্রাকৃতত্ব পাঠকের রসসন্ধানী মনে বড় হইয়া জাগিয়া থাকে না, রোমান্সের আবেদনই যেখানে প্রধান দিক। প্রকৃতপক্ষে গল্প যতক্ষণ চলিতে থাকে, কাহিনী সত্য কি মিথ্যা তাহার খেয়ালই থাকে না। এখানে মহাবিদ্যা দেবী মধুসুন্দরী মানবী-প্রেমিকার মত তারানাথের কাছে ধরা দেন, সাধারণ নারীর মতই তিনি গভীরভাবে ভালবাসেন, নিঃশেষে আত্মসমর্পণ করেন, আবার অন্য রমণীর দিকে দয়িতের দৃষ্টি পড়িলে ঈর্ষায় প্রতিহিংসা-পরায়ণ হইয়া উঠেন, মান-অভিমান করেন। মানুষী প্রেমের তীব্র তৃষায় আবেগাতুর দেবী-মূর্তিকে প্রচলিত দেবতার সংজ্ঞায় অনুভব করা এ গল্পে বিড়ম্বনা মাত্র। গল্প শেষ হইলে তারানাথের মুখনিঃসৃত কাহিনীর শ্রোতার, তথা আমাদের গল্পের বক্তার সম্বিৎ ফেরে, পাঠকেরও সম্বিৎ ফেরে সেইসঙ্গে। গল্পটির উপসংহারে কিন্তু মূল অলৌকিকত্ব সম্পর্কেই প্রশ্ন বর্তমান :— "তারানাথ গল্প শেষ করিয়া বাড়ীর ভিতর যাইবার জন্য উঠিল। আমিও বাহির হইয়া ধর্মতলার মোড়ে আসিলাম। এক অদ্ভুত অবাস্তব জগৎ হইতে বিংশ শতাব্দীর বাস্তব সভ্যতার জগতে আসিয়া যেন হাঁফ ছাড়িয়া বাঁচিলাম। যতক্ষণ তারানাথ গল্প বলিয়াছিল, ততক্ষণ ওর চোখ মুখের ভাব ও গলার স্বরে গল্পের সত্যতা সম্বন্ধে অবিশ্বাস জাগে নাই—কিন্তু ট্রামে উঠিয়াই মনে হইল—

'কি মনে হইল তাহা আর না-ই বা বলিলাম !'

একথা দ্বিধাহীনভাবেই বলা যায় যে, অলৌকিকত্ব বা অপ্রাকৃতত্বের যেটুকু বিভূতিভূষণের কথাসাহিত্যে স্থান পাইয়াছে, অভিধা অর্থে তাহার মূল্য খুবই সামান্য। পরিবেশ অথবা আবহ-সৃষ্টিতে তাহার বৈশিষ্ট্য অবশ্য আছে, কিন্তু কথাসাহিত্যের প্রাণ-ধর্ম মানুষের জীবনায়নই বিভূতিভূষণের গল্প-উপন্যাসের মুখ্য দিক বলিয়া মানুষকে পারিবেশিক রূপে ফুটানোই এই অলৌকিকত্ব সন্নিবেশের আসল কথা। বিভূতিভূষণের 'বেণীগির ফুলবাড়ী' গ্রন্থে 'বাঁশী' নামে একটি গল্প আছে। এই মন্ময় গল্পটি পড়িলেই বুঝা যাইবে হৃদয় প্রধান রচনার চমৎকারিত্ব সৃষ্টিতে অলৌকিক পরিবেশ কতখানি সাহায্য করিয়াছে। গল্পের নায়িকা বিধবা সুলেখার স্বামীর স্মৃতি তাঁহার সাধের বিবর্ণ পিতলের বাঁশিটি। সুলেখার বড় জা একদিন বিরক্ত হইয়া বাঁশিটি প্রাচীরের উপর দিয়া বাহিরে ফেলিয়া দিলেন। ক্রমে রাত হয়। গভীর রাত্রে বাঁশিটি যেন সুলেখাকে ডাকিতে থাকে। সুলেখা ঘরে থাকিতে পারে না।

তারপর "সুলেখার সমস্ত ইন্দ্রিয় আচ্ছন্ন হইয়া গেল। কিন্তু কি করিবে উপায় নাই। ওদিকে বাঁশি যেন কাঁদিয়া কাঁদিয়া বলিতেছে, আমায় তুলে নাও তুমি, তুলে নাও।

সুলেখা কি করিবে অনেকক্ষণ বসিয়া ভাবিল। তারপর ধীরে ধীরে চোরের মত পা টিপিয়া টিপিয়া বাহিরে আসিল। খিড়কির দরজা খুলিয়া প্রাচীরের নিকটে আসিয়া সেই বাঁশিটীর নিকট ধীরে ধীরে আগাইয়া গেল। কে এক ছায়া মূর্তি যেন বাঁশিটি হাতে করিয়া বসিয়া আছে। সুলেখা কেমন বিহ্বল হইয়া উঠিল। চীৎকার করিয়া উঠিতে চেষ্টা করিল, পারিল না।

তারপর কিসের এক উত্তেজনায় আগাইয়া গেল এবং সেই ছায়া মূর্তির হাত হইতে বাঁশিটি তুলিয়া বুকে চাপিয়া ধরিল। ছায়া মূর্তি খুশী হইয়া উঠিল যেন, কিন্তু কিছু বলিল না।"

বিভূতিভূষণের সম্পূর্ণ লোকোত্তর পটভূমিকায় লেখা 'দেবযান' উপন্যাসখানিরও এই দৃষ্টিকোণ হইতেই ব্যাখ্যা করিতে হইবে। স্বর্গ এই উপন্যাসের ঘটনাস্থল মাত্র, কিন্তু ইহার কাহিনী স্বর্গীয় নয়। স্বর্গের পট-ভূমিতে মর্ত্যের মানুষের জীবনলীলাই ইহাতে রূপায়িত হইয়াছে। মানবীয় হৃদয়বৃত্তি আশা-বাসনা, সাফল্য-ব্যর্থতার এই কাহিনীতে স্বর্গের গুরুত্ব নগণ্য। বিভূতিভূষণের ডায়েরীতে আছে এই গ্রন্থের নাম তিনি প্রথমে পরিকল্পনা করিয়াছিলেন 'দেবতার ব্যথা'।*৫৫ 'দেবযানে' মৃত্যুর পরও আত্মার পার্থিব ক্রিয়াশীলতায় লেখকের বিশ্বাস ফুটিয়াছে কি ফুটে নাই, সেটা বড় কথা নয়, বড় কথা হইল কথাসাহিত্যের উপজীব্য মানুষকে অভাবিত বিচিত্র পরিবেশে স্থাপন করিয়াও তিনি সাফল্যলাভ করিয়াছেন।*৫৬ 'দৃষ্টিপ্রদীপের জিতুও এক অলৌকিক শক্তির

---

*৫৫ বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়—স্মৃতির রেখা (১৩৬২), পৃঃ—২৪

*৫৬ ১৩৫১ সালের অগ্রহায়ণ সংখ্যা 'শনিবারের চিঠি'তে মনীষী হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় 'কবি বিভূতিভূষণ' শীর্ষক প্রবন্ধে 'দেবযান' সম্পর্কে বলিয়াছেন :—"কিন্তু দৃষ্টিপ্রদীপ ও দেবযান তাঁর সম্পূর্ণ নূতন ধরণের উপন্যাস। দেবযানে তিনি এক অভিনব উপায়ে প্রেমের জয় ঘোষণা করিয়াছেন। কবি ক্ষেমদাস ও বৈদান্তিকের হৃদ্যতাপূর্ণ ছদ্ম কলহ, করুণাময়ী ও প্রণয়দেবীর, গ্রহদেব বৈশ্রবণ ও পথিক দেবতার কথোপ-কথন লেখকের প্রেরণার পরিচয় দেয়। তাঁহার পুষ্প ও যতীন আমাকে মুগ্ধ করিয়াছে। লেখকের মাটির মর্ত্যের প্রতি দুর্বার আকর্ষণ, অফুরন্ত ভালবাসা। যতীনের ক্ষমাসুন্দর হৃদয় আর পুষ্পের অকপট প্রেমপূর্ণ সুনির্মল প্রাণ, যেন লেখকের সহানুভূতিভরা কোমল অন্তঃকরণের প্রতি-চ্ছবি। দাস রঘুনাথের আশ্রম যেন দেবতার স্বর্গকেও সৌন্দর্য এবং

উজ্জ্বল স্বাক্ষর আছে। গ্রাম্মের ছুটিতে কলিকাতার ক্লার্কওয়েল সাহেবের স্কুলের শিক্ষক ক্ষেত্রবাবু দেশে গিয়াছেন। প্রথম প্রথম গ্রামের বাড়ীতে ফিরিয়া দুধ আম কাঁটাল খেজুর খাইয়া গ্রামের লোকের আপ্যায়নে মুগ্ধ হইয়া ক্ষেত্রবাবু মনে মনে ভাবিলেন স্কুলে লাঞ্ছনার মধ্যে দিয়ে কাটানোর চেয়ে গ্রামে এই সম্মানিত সচ্ছল জীবন ঢের ভাল। কিন্তু কয়েকদিন যাইতে না যাইতেই ক্ষেত্রবাবুর মনে পরিবর্তন দেখা দিল। তাঁহার স্ত্রী নিভাননীর মনও খারাপ হইয়া গেল, দিন আর কাটে না। "ক্ষেত্রবাবুও নিজের মনের ভাব দেখিয়া নিজেই বিস্মিত হইলেন। যে ক্লার্কওয়েল সাহেবের স্কুলের নাম শুনিলে গায়ের মধ্যে জ্বালা ধরে, চাকুরীর সময় যাহাকে কারাগার বলিয়া বোধ হইত—সেই স্কুলের কথা এখন মনে হয়, তখন যেন সে প্রশান্ত মহাসাগরের নারিকেল দ্বীপপুঞ্জ ঘেরা পাগোপাগো দ্বীপ, চিরবসন্ত যেখানে বিরাজমান, পক্ষীকাকলীতে যাহার শ্যামতীরভূমি মুখর—ইংরাজি টকি ছবিতে যাহা দেখিয়াছেন কতবার। সেই সিঁড়ির ঘর, তেতালার ছাদে মাষ্টারদের সেই বিশ্রাম কক্ষ, হেডমাষ্টারের আপিসের ঘণ্টাধ্বনি, মথুরা চাকরের সারকুলার বই লইয়া ছুটাছুটি করিবার সেই সুপরিচিত দৃশ্য—এসব কল্পনার বিষয় হইয়া দাঁড়াইয়াছে। না, আর ভাল লাগে না, স্কুল খুলিলেই বাঁচা যায়।"*৬১

বিভূতিভূষণের কথাসাহিত্যে বৈচিত্র্যের অভাব অনবধানী পাঠকেরও চোখে পড়িবে। তাঁহার মত শক্তিমান শিল্পী নূতন নূতন বিষয়বস্তু লইয়া লিখিতে পারিলেন না, ইহাতে অনেকেই বিস্ময়বোধ করেন। 'পথের-পাঁচালী' তাঁহার প্রথম গ্রন্থ। কিন্তু পথের পাঁচালীকে তাঁহার উত্তরকালের কোন রচনাই অতিক্রম করিতে পারে নাই। তাছাড়া 'অনুবর্তনে'র ন্যায় দুএকটি রচনা বাদে বিভূতিভূষণের অধিকাংশ লেখায় 'পথের পাঁচালী'র প্রভাব পড়িয়াছে। ইংরাজীতে 'genius' এবং 'Talent' শব্দ দুটিতে অর্থের পার্থক্য আছে। 'genius' স্বতঃস্ফূর্ত পূর্ণপ্রতিভা, 'Talent'-এর প্রতিভা অনুশীলনে পূর্ণতা লাভ করে। এ হিসাবে বিভূতিভূষণ 'genius'। চরিত্রসৃষ্টির উপর জোর না দেওয়ায় নানাবিধ চরিত্রে বিচিত্র সংগঠনের যে সুযোগ উপন্যাসিকেরা পাইয়া থাকেন, বিভূতিভূষণ তাহা পান নাই। শান্ত-ভাবের সাধক হওয়ার জন্যও তাঁহার প্লটগুলির পরিধি জটিল জীবনের ভিত্তিতে গড়িয়া ওঠা কাহিনীর তুলনায় বাস্তবক্ষেত্রে সংকীর্ণ হইয়া গিয়াছে। প্রধানতঃ তিনি মানবতা এবং জীবনের সনাতন মূল্যবোধ কেন্দ্র করিয়াই লিখিয়াছেন এবং ফলে তাঁহার লেখায় বহুবৈচিত্র্য পরি-লক্ষিত হয় না। জটিল জীবনায়ন এড়াইবার এবং সরল সুন্দর জীবনের ছবি আঁকিবার দিকেই তাঁহার প্রবণতা, এই সীমারিত পরিসরে তবু অলৌকিক ঘটনার সমাবেশে কিছুটা বৈচিত্র্য আসিয়াছে।*৬২ অন্য কথাসাহিত্যের লৌকিক পটভূমিকায় এতবেশী অলৌকিকের সমাবেশ যখন ঘটিয়াছে, তখন স্বভাবতই মনে হয় অলৌকিকত্বে তাঁহার কিছুটা সংস্কারজাত প্রতীতি ছিল। পরম মূল্যে বিশ্বাসী, অস্তিবাদী ও আশা-বাদী শান্তভাবাশ্রয়ী লেখক হিসাবে বিভূতিভূষণের রচনায় একতারায় সুর বাজিবে বা তাহা মীড়প্রধান হইবে, সংঘাতসংকুল হইবে না, বৈচিত্র্যধর্মী হইবে না, ইহাই স্বাভাবিক। মার্কিণ ঔপন্যাসিক ফিটজেরাল্ডের (F. Scott Fitzerald) চোখে যেমন 'পৃথিবী ধাক্কা খাইয়া, ঘা খাইয়া, টুকরো টুকরো হইয়া গিয়াছে, ফুটো হইয়া গিয়াছে, তাতিয়া লাল হইয়াছে, যে কোন মুহূর্তেই ফাটিয়া চৌচির হইয়া যাইতে পারে', বিভূতিভূষণের পৃথিবীতে ঠিক তাহার বিপরীত প্রসন্ন প্রশান্তি। রবীন্দ্রনাথ যেমন 'পরুষ কলুষ ঝঞ্ঝার' মাঝে 'চিরদিবসের শান্ত শিবের বাণী' শুনিয়াছেন, *৬৩ তাঁহার ভাবশিষ্য বিভূতিভূষণও এই মহান আশাবাদের ধারক। দুনিয়ার যা কিছু কুশ্রীতা, বাস্তব হইলেও তাহা শাশ্বত নয়, একান্ত সাময়িক, সঞ্চারমান কুয়াশার অন্তরালস্থিত সূর্যের মতই সত্য চিরন্তন, এই রাবিন্দ্রিক আশাবাদে বিভূতিভূষণ প্রবুদ্ধ ছিলেন। পঙ্কিল আবর্ত হইতে বাংলা সাহিত্যের উদ্ধার সাধনা

---

*৬১ অবশ্য এরূপ স্বীকারোক্তি সত্বেও প্রকৃতিপ্রেম বিভূতিভূষণের সাহিত্যে উজ্জ্বলতম লক্ষণ সন্দেহ নাই। ধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় তাঁহার 'বক্তব্য' গ্রন্থে (১ম সংস্করণ, পৃঃ—১৭১) রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে বলিয়াছেন,—"রবীন্দ্রনাথ ছেঁড়া কাগজের ঝুড়ি নিয়ে কবিতা লিখেছেন জানি, কিন্তু ময়ূরাক্ষী নদীর ধারেই তিনি স্বাভাবিক।"—প্রকৃতি-প্রেমিক বিভূতিভূষণের বিপরীত রূপচিত্রণ কোথাও কোথাও মিলিলেও প্রকৃতির অন্তরঙ্গ সান্নিধ্যেই তাঁহাকে স্বরূপে পাওয়া যায়।

*৬২ সমরসেট মম বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের মত লেখকদের নূতন কথা বলিবার সুযোগের অভাব সম্পর্কে মনোজ্ঞভাবে বলিয়াছেন :—
"of course, the novelist has the right to deal with those great topics which are of concern to every human being, the existence of God, the immortality of the soul, the meaning and value of life, though he is prudent to remember that wise saying of Dr. Johnson that of these topics one can no longer say anything new about them that is true, or anything true about them that is now."

Someset Manghen—Ten Novels and Their Authors (1954), P. 14.

*৬৩ "দুঃখ পেয়েছি, দৈন্য ঘিরেছে, অশ্লীল দিনে রাতে
দেখেছি কুশ্রীতারে,
মানুষের প্রাণে বিষ মিশায়েছে মানুষ আপন হাতে
ঘটেছে তা বারে বারে।
তবু তো বধির করেনি শ্রবণ কভু,
বেসুর ছাপায়ে কে দিয়েছে সুর আনি।
পরুষ-কলুষ ঝঞ্ঝায় শুনি তবু
চিরদিবসের শান্ত শিবের বাণী।"
রবীন্দ্রনাথ—সেঁজুতি, পত্রোত্তর।

তারাশঙ্করের সহিত বিভূতিভূষণের লক্ষণীয় মিল দেখা যায়।*৬৪ কিন্তু তারাশঙ্করের জীবন-চাঞ্চল্য এবং কঠিন পৃথিবীর বাস্তব রূপ বিভূতিভূষণে অনুপস্থিত। বিভূতিভূষণের শান্ত ভাবাপ্রবিতার উল্লেখে নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় যথার্থ ই উপলব্ধি করিয়াছেন, তাঁহার বিখ্যাত 'কিন্নরদল' গল্পের গুণবতী মনোরমা যে বধূটি (শ্রীপতির বৌ) অসামাজিক প্রেম দিয়া বিবাহ করা সত্ত্বেও আপনার মধুর ব্যবহারে সমস্ত গ্রাম্য প্রতিকূলতা জয় করিয়া সকলকে একান্তভাবে আপন করিয়া লইল, শরৎচন্দ্রের হাতে পড়িলে অবলীলাক্রমে গৃহীতা হওয়া দূরে থাক—পল্লীসমাজের পাপচক্রে পড়িয়া হয়তো তিনদিন পরেই তাহাকে চোখের জলে ভাসিতে ভাসিতে গ্রাম ত্যাগ করিতে হইত।*৬৫

বিভূতিভূষণ কথাসাহিত্যের ক্ষেত্রে আবির্ভাব মাত্রই 'হাঙ্গার' রচয়িতা নুট হামসুনের মত সর্বজন-অভিনন্দিত হইয়াছেন। লেখকের এই সৌভাগ্য দুর্লভ। একথা সত্য যে, উত্তরজীবনের রচনায় তিনি প্রথম জীবনের 'পথের পাঁচালী'র মান অতিক্রম করিতে পারেন নাই। কিন্তু তবু একথাও ঠিক যে, যে প্রকৃতি-প্রেম ও মানবতাবোধ তাঁহার রচনার মূলভিত্তি এবং সত্যসুন্দরের যে স্বীকৃতি তাঁহার ভাবধর্ম, সমস্ত রচনাতেই তাহাদের অনবিস্তর ছাপ আছে। বিভূতিভূষণ শান্তরসের লোককান্ত লেখক, তিনি সিদ্ধরসেরও শিল্পী। তাঁহার দিনলিপিগুলি পড়িলেই বুঝা যায়, যেমন লেখার মধ্যে তেমনি ব্যক্তিগত জীবনে তিনি একই আদর্শ নিষ্ঠার সহিত সমুখে রাখিয়াছেন। শিল্পের সঙ্গে শিল্পীর এই গভীর একাত্মতা মহান শিল্পীর পক্ষেই সম্ভব। বাংলা সাহিত্যে তাঁহার দিনলিপি বা ডায়েরীগুলি অভিনব বস্তু লেখকের মানসলোকের সম্যক পরিচিতিতে এগুলি মূল্যবান উপকরণ। রবীন্দ্রনাথের 'ছিন্নপত্র' ছাড়া আর কোন সমশ্রেণীর বাংলা গ্রন্থ ইহাদের সহিত সার্থকভাবে তুলনীয় নয়। বিভূতিভূষণের এই দিনলিপিগুলির মধ্যে অনেক উপন্যাস গল্পের ভিত্তি আছে, ইহা হইতেই বুঝা যায় তিনি কতখানি জীবননিষ্ঠ শিল্পী ছিলেন এবং কতটা বাস্তব অভিজ্ঞতা হইতে কথা সাহিত্যের পটভূমি গ্রহণ করিতেন। তাঁহার অন্যতম শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি 'অনুবর্তন' পড়িলে কথাটার গুরুত্ব বুঝা যাইবে। তিনি নিজে স্কুল শিক্ষক ছিলেন, শিক্ষকদের জীবন লইয়াই এই উপন্যাসখানি রচিত। এ গ্রন্থে শিক্ষকেরা মানুষ হিসাবে চিত্রিত, 'মহান বৃত্তির মহৎ প্রতীক' হিসাবে নয়। তাই উপন্যাসের অন্যতম প্রধান চরিত্র যদু মাষ্টার স্কুলের পয়সা তো বটেই, স্কুলের ছেলেদের পয়সা পর্যন্ত চুরি করেন, কিন্তু অর্থনৈতিক দৈন্য নিরপেক্ষভাবে শিক্ষকতা বৃত্তিকে প্রাণ দিয়া ভালবাসিয়া দরিদ্র এই বৃদ্ধ শিক্ষকতার গৌরব-স্বপ্ন দেখিতে দেখিতেই শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন।

বিভূতিভূষণ একালের লেখক এবং কালের কষ্টিপাথরে এখনও তাঁহার রচনার বিচার হয় নাই বলিয়া তাঁহার পূর্ণ মূল্যায়ন খুবই কঠিন কাজ।*৬৬ যে সকল লেখকের রচনা দীর্ঘকাল সমালোচকের তির্যক দৃষ্টির সম্মুখীন হইয়া 'ক্লাসিক' মর্যাদা পাইয়াছে, মূলসূত্র সহজে পাওয়া যায় বলিয়া তাঁহাদের আলোচনা অপেক্ষাকৃত নিরাপদ। সমকালীন লেখক সম্পর্কে আলোচনা করিতে গেলে লেখকের মর্মলোক বিশেষভাবে অনুসন্ধান করা দরকার। এজন্য শুধু সেই লেখকের জীবনী বা রচনার উপর নির্ভর করিলে চলে না, সাহিত্যের ধারায় তাঁহার স্থান নির্ণয় এবং তাঁহার উপর তাঁহার আপন যুগের প্রভাব লক্ষ্য করিতে হইবে। প্রথম মহাযুদ্ধোত্তর বিচিত্র ভাবসংঘর্ষে বাঙালীর সমাজ-জীবনে কিরূপ আলোড়ন আসিয়াছিল এবং বিভূতিভূষণের বিশেষ মনোধর্মের উদ্ভবের মূলে সমাজের চাহিদা কতখানি ছিল, তাহাও আলোচ্য মূল্য বিচারের গুরুত্বপূর্ণ দিক। অতঃপর আমাদের দৃষ্টি এই দিকেই নিবদ্ধ হইবে। (ক্রমশঃ)

*৬৪ বাঙ্গালী চিত্ত যে এই জীবন-মন্থনের আতিশয্য ও বুদ্ধিবাদের নিষ্পেষণ হইতে মুক্তি পাইবার জন্য ও সহজ সমস্যাহীন আদর্শ-লোকে ফিরিবার জন্য অন্তরে উৎকণ্ঠিত হইয়া উঠিতেছিল, তাহার প্রকাশিত নিদর্শন মিলে তারাশঙ্কর ও বিভূতি বন্দ্যোপাধ্যায়ের উপন্যাসে। ইঁহাদের দুইজনের আবির্ভাব ঘটে বিংশশতকের দ্বিতীয় পাদে; বিভূতিভূষণের যুগান্তকারী উপন্যাস 'পথের পাঁচালী'র রচনাকাল ১৯২৯ সাল। ইঁহাদের আবির্ভাব অনেকটা আকস্মিক বলিয়াই মনে হয়। ১৯০০-১৯২৫ যুগের রচনায় ইঁহাদের কোন পূর্বাভাস আবিষ্কার দুরূহ। এই অতর্কিত আত্মপ্রকাশ এই সত্য প্রমাণ করে যে, জাতীয় যুগ-যুগ-সঞ্চিত জীবন-সাধনা ও ধ্যান কল্পনার দিব্য দীপ আধুনিকতার ক্ষুদ্র ফুৎকারে নির্বাপিত হইবার নহে, তাহার গভীর অন্তর-নিহিত অধ্যাত্ম আকৃতি প্রতিকূল প্রভাবের বাধা অতিক্রম করিয়া আপনাকে প্রকাশ করিবেই করিবে।...এই জাতীয় রচনার মধ্যে বাংলা উপন্যাস বাস্তব অনুস্মৃতির পথ ছাড়িয়া দেশের প্রাণসত্তার এক নিগূঢ় রহস্য-লোকে অনুপ্রবেশ করিয়াছে। পশ্চিমের ভাবধারাস্রোতে যে জাতি গা ভাসাইয়াছে, পাশ্চাত্য ভাব-সাধনায় সিদ্ধিলাভ যাহার একান্ত অভীষ্টরূপে গৃহীত হইয়াছে তাহার পক্ষে উহার শাশ্বত প্রাণকেন্দ্রে আকস্মিক প্রত্যাবর্তন শুধু যে মনস্তত্ত্বের দিক দিয়া কৌতূহলোদ্দীপক তাহা নহে, ভবিষ্যতে অনেক অপ্রত্যাশিত বিকাশের জন্যও আমাদের প্রতীক্ষাকে উদ্রিক্ত করিয়া রাখে।

—শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়—বাংলা উপন্যাস (১৯০১-২৫), দেশ, সাহিত্য সংখ্যা, ১৩৬৩।

*৬৫ নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়—বাংলা গল্প বিচিত্রা (১৩৬৪), পৃঃ—

*৬৬ "A writer of one age must come up for judgement by another, and take his chance with the changes in literary atmosphere. Shakespeare must be judges by Dryden, Donne by Johnson, Swinburne by Eliot. And it is good, indeed necessary, that it is so, for the criticism of each age is a kind of renewal for old authors."

Buddhadeva Bose—An Acre of Green Grass (1948) P. 8

ভগবানের ভাব ও বিভূতি

শ্রীকেশবচন্দ্র গুপ্ত

বহু ভাবে ব্যক্ত ভগবান। অজস্র তাঁর বিভূতি। অনন্ত বিভব।

"জেনে রাখ সমস্ত স্থাবর জঙ্গম, যা কিছু সৃষ্টি সমস্তই জন্মেছে প্রকৃতি হতে। কিন্তু বিশ্ব-জগতের আমিই উৎপত্তি এবং প্রলয়ের কারণ—বল্লেন শ্রীকৃষ্ণ। আরও বোঝালেন যে পরমেশ্বর হতে শ্রেষ্ঠ কিছু নাই। শ্রীকৃষ্ণ ভগবান স্বয়ং। সুতরাং জগৎ তাঁহাতে। মনিমালা বাঁধা থাকে সূত্রে। জীব উপলব্ধি করে মনির উজ্জ্বল দীপ্তি, এবং ঐশ্বর্য্য। কিন্তু প্রত্যেকটি রত্নগাঁথা মূল সূত্রে। সে সূত্র দেখে না দ্রষ্টা—মোহিত হয় সে রত্নের চাকচিক্যে। সেই সূত্র পরমেশ্বর। প্রকৃতি তাঁরই স্বভাবের বিকাশ। ঐশ্বর্য্যের বাহিরের রূপ দেখে বুদ্ধিমান জীব মানুষও চমৎকৃত হয়, আনন্দিত হয়, নমস্কার করে সে রূপকে।

সেই খণ্ডের বাহিরের রূপের ঝলকে বিমোহিত না হবার জন্য সতর্ক করলেন শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনের মত জ্ঞানী এবং একান্ত ভক্তকে। বোঝালেন চাকচিক্যে প্রীত হও। কিন্তু ভুলোনা সে খণ্ড সম্পদ অতি ক্ষুদ্র আমার অনন্ত সম্ভার। একবার না বহুবার এমনভাবে সতর্ক করলেন তিনি প্রিয় শিষ্যকে।

গীতার সপ্তম অধ্যায়—বিজ্ঞান যোগ। জীবনের চেতনার সঙ্গে মেশাতে হবে বিশেষ জ্ঞানকে। প্রকৃতির খেলায় অপরূপ তেজ-প্রধান বিকাশ প্রাণকে মুগ্ধ করে। সে বিকাশ ভগবানের অনন্ত অচিন্ত্য বিভূতির মাত্র এক একটি দ্যুতি। তাদের চিন্তায় অনন্তকে ধারণা করতে হবে, জ্ঞানকে বিস্তার করতে হবে। অনন্ত বিভূতি সম্পন্ন পরব্রহ্ম। টুকরাগুলি তাঁর বিভবের আভাস মাত্র।

তিনি উদাহরণ দিলেন। জলের রস মুগ্ধ করে প্রাণ মনকে—তরলতায়, শীতলতায়, চঞ্চলতায়। কী শান্তি পায় মানুষ পিপাসার উপশমে শীতল জলে। সে চিরদিন জলের দেবতাকে পূজা করেছে। শ্রীকৃষ্ণ বুঝালেন—সে দেবতা আমিই—আমার বিশ্বরূপের মাত্র এক অংশ বরুণ দেবতা। সেই খণ্ডের মাধ্যমে মনকে বিস্তার ক'রে উপনীত হও আমার অনন্তের সান্নিধ্যে।

রবির তেজ, শশীর প্রভা বাদ দিলে তো জীবন থাকে না। শশী সূর্য্যের পূজার অর্ঘ্য সজ্জিত হয় মানব-প্রাণে তাদের অপরূপ শোভার চেতনায়। মানুষ কেন? জীব জন্তু গাছপালা সবাই প্রাণ-শক্তি লাভ করে সূর্য্যের করে এ পৃথিবীতে। শান্তি পায় স্নিগ্ধ প্রভায় চন্দ্রিমার। সাবধান করে দিলেন তিনি শিষ্যকে। বল্লেন—সত্য সে সম্পদরাশি মনোমুগ্ধকর। কিন্তু ভুলে যেওনা—আমার অনন্ত রূপের সে এক টুকরা রূপ, অপার আনন্দের এক বিন্দু আনন্দ পাওয়া যায় শশি সূর্য্যের প্রভায়। সেই আনন্দকে বিজ্ঞান নিয়ে যাক অনন্তের উপলব্ধিতে।

সচ্চিদানন্দের মঙ্গলালোকে দীপ্ত পথের মিলবে সন্ধান।

বল্লেন—বেদের প্রণব উৎফুল্ল করে প্রাণকে, তার অন্তরে আমি আমি। আকাশের সারভূত শব্দও আমি। মানুষের পৌরুষও অনন্তের সূত্রে গাঁথা একটি রত্ন। তেমনি পৃথিবীর গন্ধ তন্মাত্র অগ্নির তেজ, সর্ব্ব-ভূতের জীবন। তপস্বী তপ ক'রে। সে এক শক্তি—তারও মূলে ভগবান। বুদ্ধিমানের বুদ্ধি, তেজস্বীর তেজ, কামরাগ-বিবর্জ্জিত বলবানের বল—সে ঐশবল। ধর্ম্মের অবিরোধী কামও ভগবান পরি-চালিত প্রকৃতির বিকাশ। সর্ব্বভূতের তিনিই তো বীজ।

সাত্ত্বিক, রাজসিক, তামসিক সব ভাবই তাঁরা হ'তে। কিন্তু তাতে মন আবদ্ধ করলে হয় না অগ্রগতি শেষ লক্ষ্য ভূমির যাত্রাপথে।

এই তো মায়া। যে সব সম্পদকে মানুষ ভাবে অভাবনীয়, তারা তো শাশ্বত নয়। তারা ছায়ামাত্র—যার প্রাণ-বস্তু অশাশ্বত। ক্ষিতি অপ, তেজ, মরুৎ, ব্যোম আছে চেতনার মূলে। কিন্তু তারা তো সদা পরিবর্ত্তনশীল। প্রতি মুহূর্ত্ত পূর্ব্ব মুহূর্ত্তের পরিণাম। এখনকার ভূমি গত কল্যের ভূমি নয়। এক নদীতে কেহ দুবার ডুব দেয় না—কারণ জলের গতি সদাই পরিবর্ত্তন করছে নদীকে। কিন্তু সে সৌন্দর্য্যের মূলে আছেন সর্ব্বসুন্দর। আনন্দ-দায়িনী জাহ্নবী স্রোত উঠেছে বিষ্ণুর পদ মূলে। সেই বিষ্ণুই চরম পরম। জাহ্নবী স্রোতস্বতী।

এ মায়াময় জগত উপভোগ্য আনন্দ-প্রদ। কিন্তু সে আনন্দ তো নিত্য উপাধি নয়। প্রেমে বিরহ আছে, জন্মের অন্তরে আছে মৃত্যু বলবানের বলের শত্রু আছে জরাব্যাধি। সুখ আনন্দ দেয় আর দহন করে।

এই জগতে দুঃখে এক আধা-সত্য বলেছিলেন ভগবান বুদ্ধ এই আধা সত্যের সাথে আছে তেমনি আধা সত্য—দুঃখ এড়াবার কৌশল। সুখ দুঃখ, সুন্দর অসুন্দর, সত্য ও ভ্রান্তি সব মিলে অখিলের রূপ তার আধা মায়া। মানুষ শান্তি চায়। অশান্তি ভয় পায়। আবার একদিন যখন জ্ঞানের আলো জ্বলে ওঠে সে অশান্তির অন্তরে আবদ্ধ শান্তি সুমহান।

মায়ার হাত হতে রক্ষা পাবার পথ দেখিয়ে ভগবান সখা অর্জ্জুনকে সংবাদ দিলেন নিজের অনন্ত রূপের। অথচ বল্লেন খণ্ড রূপও আমার কিন্তু তার অন্তরে আছে প্রকৃত পরম রূপ। বল্লেন শেষে চরম কথা—

মামেব যে প্রপদ্যন্তে মায়ামেতাং তরন্তি তে।

যে আমাকেই ভজনা করে সে এই মায়া অতিক্রম করতে পারে আমাকে মানে—পরমানন্দের কেন্দ্র পরব্রহ্ম।

আবার বলি—বিভূতি তাঁর। কিন্তু বিভিন্ন বিভূতি যেটুকু প্রকাশ করে তিনি তার অতীত। সুতরাং পূর্ণ তাঁকে জানলে বৈতরণীর পরপারে পৌঁছান যায়। অংশ পূজা সোপান মাত্র অবধার

শ্রীকৃষ্ণের এই বিবৃতিতে আর একটা মহত্ত্ববোধ অনিবার্য্য। অবতার আসেন প্রকৃত ধর্ম্ম সংস্থানের শুভ উদ্দেশ্যে। ভারতের কৃষ্টির প্রধান বৈচিত্র্য—যতটুকু সত্য থাকে যে কোনো অনুষ্ঠানে তাকে বেছে নিয়ে চরম সত্যের পথনির্দ্দেশ। জলের রস, শশীসূর্য্যের প্রভাব আদিকাল হ'তে পূজা করেছে মানব। নব শিশুর মতি-গতি লক্ষ্য করলে দেখা যায় এদের প্রভা কী ভাবে তাকে উৎফুল্ল করে, কী পরিমাণে তার শ্রদ্ধা করে উদ্বুদ্ধ। শ্রীকৃষ্ণ বল্লেন, না—এসব ভ্রান্তি এ সব পরিবর্জ্জনীয়। তিনি বোঝালেন—সে শ্রদ্ধা পূর্ণব্রহ্মের প্রকৃতস্বরূপে আত্মদানের এক রূপ—আনন্দলোকে আরোহণ করবার সোপান। তাই তিনি মেনে নিলেন বহু দেবতার পূজা নিজের পূজা রূপে—কিন্তু সতর্ক করে দিলেন জ্ঞানী ভক্তকে যে তারা তাঁর সম্পদের খণ্ড মাত্র। প্রণম্য তাঁর উপাধি কিন্তু ভজনার চেতনা পূর্ণকে, শাশ্বতকে অনন্ত সত্যকে ঘিরে যদি থাকে তা'হলেই মায়ার অবসান সম্ভবপর।

তাই তিনি বল্লেন—যে যে ভক্ত শ্রদ্ধাযুক্ত হ'য়ে যে যে দেবমূর্ত্তি অর্চ্চনা করতে ইচ্ছা করে সেই সেই ভক্তের সেই অচলা ভক্তি আমি দৃঢ় করি।*

কী আশার বাণী! কী প্রেরণা! বল্লেন, না—পুতুল পূজা ছাড়, বহু দেবতার বিশ্বাস ভ্রান্ত। বল্লেন না—অনন্ত নরকবাস তার ললাটে লিপে দিই যে শ্রীকৃষ্ণ ছেড়ে সূর্য্য পূজা করে, চান্দ্রায়ণ করে, বরুণ দেবতাকে অর্চ্চনা করে। বরং বল্লেন—সখা সবই আমি। এমন কি মায়াও গড়া আমার প্রকৃতিতে। জ্ঞান লাভ কর—বিশেষ জ্ঞান, বিজ্ঞান। ভক্তি লাভ কর, লও শরণ। তোমার যোগক্ষেম বহিব আমি। বল্লেন কর্ম্ম কর ফল অর্পণ কর আমাকে। আমার কর্ম্ম জেনে কাজ করলে মন্দ কাজ তো করতে পারবেনা।

অবশ্য বোঝালেন—খণ্ড জ্যোতন-শক্তির পূজার ফল অন্তবৎ বিনাশী। আমার ভজনায় মোক্ষ! আমি কি—তাহা বুঝিয়েছেন—অনন্ত অব্যক্ত শাশ্বত আনন্দ চেতনা। যেমন সর্ব্বত্র গমনশীল মহাবায়ু নিত্য আকাশে অবস্থিত তেমনি সকল জীব আমাতে অবস্থিত এই কথা অবধারণ কর।‡

সত্যই তো মানুষের জ্ঞানের ও প্রাণের স্তর আছে। সবার হৃদ্দেশে অধিষ্ঠিত পরব্রহ্ম। মায়ার যবনিকা প্রচ্ছন্ন করে রাখে অন্তরের দেবতাকে। মানুষ বোঝে তাঁর অস্তিত্ব—অথচ অলীক আলো নিয়ে যায় তাকে বিপথে। আপন আপন সাধা ও উন্নতির ক্রম অনুসারে মানুষ পূজা করে ভগবানকে। যবনিকা কারও মোটা, কারও পাতলা সাধনা অনুসারে—জ্ঞান বিজ্ঞানের আলোর মাত্রা অনুসারে।

গীতায় শ্রীকৃষ্ণ তাদের কতক পরিচয় দিয়েছেন। ভক্ত সর্ব্বদা তাঁর কীর্ত্তন করে দৃঢ়ব্রত প্রযত্ন সহকারে তাঁকে প্রণাম করে এবং সদাই ভক্তিতে নিত্যযুক্ত হ'য়ে ভগবানকে উপাসনা করে। ভাগবত তেমন ভক্তির শ্রেণী ভাগ করেছে। বিষ্ণুর শ্রবণ, কীর্ত্তন স্মরণ, পদসেবা, অর্চ্চনা, বন্দনা, দাস্য, সখ্য, আত্মনিবেদন।*

কেহ পূজা করে জ্ঞান যজ্ঞে। কোনো যোগী আপনাকে তাঁর সাথে অভিন্নবোধে ধ্যান করে। কেহ বৈদিক ক্রতু করে কেহ করে যজ্ঞ। ভগবান বল্লেন—সে সবই আমার পথ, আমার প্রকাশ। তিনি বল্লেন—আমি ক্রতু, আমি যজ্ঞ, আমি শ্রাদ্ধ, (পিতৃযজ্ঞের স্বধা) আমি ঔষধ, আমি মন্ত্র, আমি হোমের ঘৃত, আমিই অগ্নি, আমিই হোম।‡

উপাসনা ও উপাস্যের কথা বল্লেন—জগতের পিতা, মাতা, ধাতা, পিতামহ, জ্ঞেয়, প্রণব পবিত্র ঋক্ সাম ও যজুর্ব্বেদ—সমস্তই তিনি।

সেই উদারতার কথা আবার শুনি—সকল দেবতার পূজা তাঁর পূজা, সর্ব্বযজ্ঞের ভোক্তা তিনি। যে কোনো দেবতার উদ্দেশ্যে পত্র, পুষ্প, ফল বা বারি নিবেদন করা যায় ভক্তিপূর্ণ প্রাণে, গ্রহণ করেন তিনি।

এ উদার বিবৃতিতে ধর্ম্মদ্বেষিতা নাই। কিন্তু শেষ জ্ঞান উদ্বুদ্ধ করতে হবে—সবই তিনি, সমস্ত তাঁহাতে। খণ্ডে নিবদ্ধ করলে চেতনাকে পূর্ণজ্ঞান অসম্ভব।

তাঁর বিভূতির এইটিই প্রকৃত রূপ। বিভূতি মাত্র অংশের অশাশ্বত প্রকাশ—তার মাধ্যমে জানতে হবে অনন্ত শক্তিমানকে। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার দশম অধ্যায়ের নাম বিভূতি-যোগ। শ্রীকৃষ্ণ সে অধ্যায়ে স্পষ্ট বিবৃত করেছেন বিভূতির—তাঁর বিশেষ রূপের ঝলক। ঐতিহাসিকের চোখে যখন দেখি তখন বুঝি উপনিষদের সার বাণী—সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম—আপামর সাধারণ উপলব্ধি করতে পারেনি। ভগবানের এক এক বিশেষ দ্যুতির মূলে যে শক্তি আছে—সে শক্তিকে দেবশক্তি বোধে খণ্ড ভগবানের উপাসনা করত, পূজা করত মানুষ সেদিন, আজও যেমন করে। এ দোষের কথা নয়। জগদীশ্বরের প্রসাদ ও করুণা প্রার্থনা ভক্তির লক্ষণ। হে পরব্রহ্ম বৃষ্টির বর্ষণে আমার ভূমিকে সুফলা কর—এ কথা যখন মানুষ বলে তখন সে ভগবানের খণ্ড শক্তিরই শরণ চায়। সুতরাং—হে ইন্দ্র মেঘ হতে জল দাও—এ প্রার্থনার ভাব ও ভাষা মূলে এক পরব্রহ্মকে ইন্দ্র নামে অভিহিত করলে।

কিন্তু এ বিষয়ে ভয় আছে। এক দেবতাকে বহু নামে অভিহিত ক'রে লোকে ভাবতে পারে যে প্রত্যেক দেবতা ভিন্ন। এ বিচারের মূলে সত্য আছে। কারণ আমরা বহু পুরাণে এবং ইতিহাসে দেখি—ধর্ম্ম সম্প্রদায়ের মধ্যে বিবাদ। শিব বড় কী ব্রহ্মা বড়, লক্ষ্মী বড় কী সরস্বতী বড় এ সব তর্ক ক্রমশঃ সম্প্রদায়ের সৃষ্টি করেছে এবং হিন্দু ধর্ম্মের মূল তত্ত্ব একেশ্বরবাদকে ভুলিয়েছে। সৌর শাক্ত শৈব, বৈষ্ণব এক—এ কথা মানুষ ভোলে ইষ্টদেবতার প্রেমে।

---

* গীতা—৭।২১

‡ গীতা—৯।৬

* শ্রবণং কীর্ত্তনং বিষ্ণোঃ স্মরণং পাদসেবনম্
অর্চ্চনং বন্দনং দাস্যং সখ্যমাত্মনিবেদনম্।
ভাগবত—৭।৫।২৩

‡ গীতা—৯।১৬

শ্রীকৃষ্ণ যেসব দেব-বিভূতি বর্ণনা করেছেন, তার আলোচনা করলে বেশ বোঝা যায় যে কী কী ভাবে সেদিন মানুষ জগদীশ্বরের পূজা করত। শাক্ত, বৈষ্ণবের কলহ ছিল না কিন্তু আংশিক ভগবানের পূজা ছিল। তা না হলে শ্রীকৃষ্ণ তাদের বিবৃত করবেন কেন—বিভূতিযোগে? বিভূতির সাথে মন জোড়া—চরম শিখরের সোপান হয়, যদি জ্ঞান হয়। পূর্ণ বিভূতিকে ভিন্ন দেবতার উপাধি না ভেবে। সীমার মাঝে অসীমের ইঙ্গিত দেখলে সীমার স্বার্থকতা।

বিভূতি অরূপের রূপের লীলা। সুতরাং অশাশ্বত, খণ্ডরূপের অনুভূতিকে বিস্তার করা প্রকৃত উন্নতি। এর অধঃপতন হয় শৈব ও বৈষ্ণবের দেবতাকে ভিন্ন ভাবলে বা ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর, ইন্দ্র, বরুণ বৃহস্পতিকে ভিন্ন ভাবলে।

অবশ্য অর্জ্জুনের সে ভ্রান্তি ছিল না। তিনি অজ, অনাদি জানতেন ভগবানকে। তাই তিনি তাঁর বিভূতির কথা জানতে চেয়েছিলেন। শ্রীকৃষ্ণ কিন্তু সে অনুসন্ধানের মূলে ভগবানের পরিচয় দিলেন নিজের পরিচয়ে এবং বোঝালেন বিভূতি বিশেষ দেবতা ও ঋষির ভাবনার মাঝে মিশে তাঁদের সম্পন্ন করে বটে—কিন্তু সে সব বিভূতি তাঁর। সুতরাং দেবতা ও ঋষি প্রভৃতি তাঁরই আংশিক প্রকাশ—চমকপ্রদ পূজনীয় এবং আনন্দের স্বরূপ।

শ্রীকৃষ্ণ বিভূতি বর্ণনার পূর্ব্বে প্রথমেই সতর্ক করলেন ভক্তকে। বল্লেন এমন কি দেবতারা এবং মহর্ষিরাও আমার প্রভাব বিদিত নন। আমিই দেবতাদের এবং মহর্ষিদের সকল প্রকারের আদি কারণ।*

মানুষ মাত্রেই পাপ করে জগতে। অসত্য পথে বিচরণ সত্যের পূর্ণ সন্ধান না জানা, এই পাপ-ময় জগতে জন্ম জন্মান্তর ঘোরা। তাঁকে জানতে হবে, অজ, অনাদি এবং লোক মহেশ্বর। তবে হবে পাপের ক্ষয়। মাত্র সদগুণ সব মিলে বা এক একটি আয়ত্ত করলেও মায়ার মোহ হতে মুক্তি নাই। সদগুণ কল্যাণ কর—কারণ তারা মানব-প্রাণকে উন্নত করে। কিন্তু তাদের আয়ত্ত করবার পটভূমিতে থাকা চাই চেতনা—অজ, অনাদি, লোক মহেশ্বরের বুদ্ধি, জ্ঞান, অসংমোহ, ক্ষমা, সত্য, দম, শম, সুখ, দুঃখ উৎপত্তি ও অভাব, ভয় এবং অভয়, অহিংসা, সমতা, তুষ্টি, তপ, দান, যশ, অযশ—এসব ভাবের উৎপত্তি ঈশ্বরে। কারণ তাঁর সত্তার বাহিরে তো কিছু নাই।

তাই আবার সাবধান করলেন পরমগুরু। "আমিই সারাবিশ্বের উৎপত্তির কারণ। সমস্ত জ্ঞান বা বুদ্ধি প্রভৃতি উৎপন্ন হয় আমা হতে। এই ধারণা নিয়ে জ্ঞানীরা আমার ভাবে অভিনিবেশ হয়ে আমাকে ভজনা করে।" বোঝালেন ভজনা করেন আমাকে আমার আংশিক ভাবকে নয়।

তবে বুদ্ধির কথা কী বল্লেন? বুদ্ধি উৎপন্ন হয় শ্রীভগবান হতে। সে বুদ্ধি প্রকৃত ভগবদপ্রাপ্তির বুদ্ধি হয় কী রূপে তা বল্লেন। বুদ্ধি বহুরূপে বিকসিত হতে পারে মানুষের জীবন-লীলায়। কিন্তু প্রকৃত বুদ্ধি সেই জ্ঞান যার অনুশীলনে মুক্তি পাওয়া যায় মায়ার কবল হতে। বুদ্ধিকে জুড়ে দিতে হবে জীবনের সাথে। কিন্তু সে বুদ্ধিকে নিমন্ত্রণ করবে কে? —একান্ত ভক্তি। যদি পরম ভক্তি থাকে চিত্তে তা হলে বুদ্ধিযোগ সম্পন্ন হবে—যার ফলে পাওয়া যাবে তাঁকে। কেহ পরিত্যজ্য নয় কর্ম্ম, বুদ্ধি বা ভক্তি। কিন্তু তিনে না মিল্‌লে—যাত্রা হবে না মঙ্গল পথে সফল।

তাই শুনি শ্রীকৃষ্ণের শ্রীমুখে—মদ্‌গত-চিত্ত, মদ্‌গত-প্রাণ ব্যক্তিরা আমাকে বুঝে পরস্পর ভাব বিনিময় করে, সর্ব্বদা আমার কীর্ত্তন করে এবং পরম তৃপ্তি ও সুখ লাভ করে। এরূপভাবে নিত্যযুক্ত প্রীতিপূর্ব্বক ভজনশীল ব্যক্তিকে আমি বুদ্ধিযোগ দান করি। তেমন বুদ্ধির সহায়তায় তারা আমাকে লাভ করে।*

দুই উপায়ে ঈশ্বরের প্রকৃত জ্ঞান হতে পারে লাভ। ধন্য মানুষের সসীম বুদ্ধিকে পরিচালিত করা ঈশ্বরের তত্ত্ব জানবার পথে। কিন্তু তাতে ভ্রান্তির সম্ভাবনা একথা আমরা নিত্য উপলব্ধি করি। তাই ভগবান বোঝালেন যে সদা তাঁর কথা কও, বোঝ ভক্তিতে, পরম ভক্তিতে। চিত্ত মন তাঁর শ্রীচরণে অর্পণ কর, তা হ'লে ভ্রম হবে না। ধীরে ধীরে জ্ঞান-চক্ষু খুলবে। তিনি সবার হৃদ্দেশে বিরাজ করেন। আমাদের আসুর ভাব দেব ভাবকে ঢেকে রাখে। তমোগুণ সত্ত্বগুণকে অধিকার করে। ফলে বিভ্রম, ভুল-বোঝা, জ্ঞানের রূপ-ধরা অজ্ঞান অভিভূত করে চেতনা।

এবার ভক্তিতে অভিভূত হলেন অর্জ্জুন। তিনি জানেন তাঁর পরম রূপ। সে কথা ঋষিদের কথাতেও তিনি জেনেছেন। কিন্তু তিনি জানেন নানাভাবে, তিনি পূজিত হন। নানা বিভূতি তাঁর—যা চমকিত করে জগৎকে, যার অনুভূতিতে পূর্ণত্বের অনুভূতি লাভ করে বিশ্ব। তিনি নিশ্চয়ই জানেন বিভূতি তাঁর—তিনি বিভূতি নন। জানতে চাহিলেন বিভূতির কথা প্রিয় শিষ্য সখা। অর্জ্জুন জানেন—তিনি পরং ব্রহ্ম পরম ধাম পবিত্র পরম। কিন্তু তিনি যে পরমতত্ত্ব কথা বল্লেন সে কথা দেবতা বা দানব কেহ জানেনা। ব্রহ্ম ছাড়া কিছু নাই। তা হ'লে তাঁর প্রকাশ তো দানবের ও মাঝে। একমাত্র তিনিই পূর্ণভাবে তাঁকে জানতে পারেন। যেহেতু কম বেশী মায়ায় আচ্ছন্ন থাকে আত্মা যতদিন না ব্রহ্ম লাভ হয়। তিনি পুরুষোত্তম ভূতভাবন ভূতেশ দেবদেব জগৎপতি তাঁর বিভূতি পরিব্যাপ্ত বিশ্ব-সংসারে।

সমগ্র জ্ঞান হ'লে তো আর জানবার কিছু বাকী থাকে না। পরব্রহ্ম তিনি। কিন্তু বিভূতির মাধ্যমে জীব তাঁকে ভজনা করে। তাই অর্জ্জুন জিজ্ঞাসা করলেন—কী কী ভাবে তোমাকে চিন্তা করব। আর কোন্ কোন্ ভাবে তুমি চিন্তনীয় হও।

কি ভাবে তোমাকে চিন্তা করব?—

তিনি বল্লেন সে কথার উত্তরে—হে গুড়াকেশ আমি সর্ব্বভূতের

*গীতা—১০।২

*গীতা—১০।৯-১০

সর্বভূতে অবস্থিত আত্মা। অতএব আমিই ভূত সকলের সৃষ্টি, স্থিতি ও বিনাশের কারণ।*

এই সার তত্ত্ব বোঝালেন তিনি। বোধ হয় অর্জ্জুন কী ভাবে তাঁকে চিন্তা করবেন সে কথার উত্তর এই শ্লোক।

কিন্তু অর্জ্জুন জিজ্ঞাসা করেছেন কী কী ভাবে তোমাকে বিভিন্ন ভক্ত চিন্তা করে। তিনি তো ভাবগ্রাহী সর্বজ্ঞ। জীব নানাভাবে তাঁকে ভজনা করেন। তিনি তাতেই তুষ্ট হন। সেই সন্তোষের ফলে জীবের ধীরে ধীরে উন্নতির বিধান করেন তিনি। আর্য্য ধর্ম্ম তেত্রিশ কোটি দেবতার কথা বলেছে—তেত্রিশ কোটি তাঁরই তো বিভব বিভূতি, দ্যোতন জ্ঞান। তাই তিনি কয়েকটির বর্ণনা করলেন। কিন্তু পূর্ব্বেই সাবধান করে দিয়েছেন যে মানুষ সেই সব ভাবে আমাকে পূজা করে বটে, কিন্তু আমি সবার আদি, মধ্যম ও অন্ত।

সকল বিভূতি পর্য্যালোচনা করলে বোঝা যায় সে কালে কোন্ কোন্ দেবতার পূজা করত লোকে। আজিও সে অংশের পূজা বিদ্যমান। শুনি সে বর্ণনায় রবি, শশী, মরুত, শঙ্কর, কুবের, অগ্নি, সুমেরু প্রভৃতির কথা। লোকে বেদকে পূজা করে তার মাঝে সামবেদ। অশ্বত্থ বৃক্ষ, হিমালয় পর্ব্বত, জাহ্নবী প্রভৃতির কথা সে বর্ণনায় পাই।

বহু দেবতা, মুনি, ঋষি, প্রভৃতির উল্লেখ আছে বিভূতির মাঝে শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায়।

কিন্তু অবশেষে তিনি বলেন—অর্জ্জুন এত অধিক জেনে তোমার কী প্রয়োজন? আমি এই সমস্ত বিভব একাংশের দ্বারা ধারণ করে অবস্থান করছি।

একেশ্বরবাদ সম্যকরূপে অর্জ্জুনের মনে প্রতিষ্ঠিত করবার জন্য ভগবান কানে শোনালেন বিভূতি তত্ত্ব। তার পর দেখালেন—তাঁর দেহের একাংশে এই সমগ্র বিশ্ব। সকল ভূত বিশেষ সঙ্ঘ, ব্রহ্মা, কমলাসনস্থ ঈশ্বর ঋষিগণ, দিব্য প্রজাসমূহ। তারা একাংশে স্থিত বিশ্বরূপের।

এ জ্ঞান ধীরে ধীরে জাগাতে হবে প্রাণে জীবকে তার মঙ্গল-পথের যাত্রায়।

এই দেবতা এবং বিভূতির বিশেষ বর্ণনা পাই মার্কণ্ডেয় পুরাণের শ্রীশ্রীচণ্ডীতে—অথচ সম্যক দৃষ্টিতে তিনি—

সর্ব্বস্বরূপে সর্ব্বেশে সর্ব্বশক্তি সমন্বিতে। সে কথা অন্যত্র আলোচ্য।

তবে এ স্থলে দেবী-সূক্তের প্রথম দুটি শ্লোক অন্ততঃ না উল্লেখ করলে গীতার বিভূতি-যোগ এবং বিশ্বরূপের স্পষ্ট প্রতিধ্বনি শোনা যাবেনা।

> অহং রুদ্রেভির্বসুভিশ্চরাম্যহমাদিত্যৈরুত বিশ্বদেবৈঃ।
> অহং মিত্র বরুণোভা বিভর্ম্যহমিন্দ্রাগ্নী অহমশ্বিনোভা।
> অহং সোমমাহনসং বিভর্ম্যহং ত্বষ্টারমুত পূষণং ভগম।
> অহং দধামি দ্রবিণং হবিষ্মতে সুপ্রাব্যে যজমানায় সুন্বতে।

আমি রুদ্র বসু আদিত্য এবং বিশ্বদেবগণরূপে বিচরণ করি। মিত্র বরুণ ইন্দ্র অগ্নি এবং অশ্বিনীকুমারদ্বয়কে ধারণ করি।

আমি শত্রু হন্তা সোম, ত্বষ্টা, পূষা এবং ভগ-নামক দেবতাগণকে ধারণ করি। যারা দেবতাদের উদ্দেশ্যে হবির্যুক্ত সোমযোগাদি অনুষ্ঠান করে। সেই যজমানদের যজ্ঞফল আমিই ধারণ করি।

বলা বাহুল্য গীতার ভাব ও বিভূতির তথ্য এবং বিশ্বরূপ বর্ণনা এই শ্লোকের সঙ্গে মেলালে একথা স্পষ্ট হবে যে মূলে গীতার শিক্ষায় শক্তি এবং দেবী সূক্তের পার্থক্য নাই দার্শনিক দৃষ্টি ভঙ্গীতে।

রুদ্র—একাদশ রুদ্র—পঞ্চেন্দ্রিয় কর্ম্মের, পাঁচটি জ্ঞানের এবং মন। ত্বষ্টা—বিশ্বকর্ম্মা। সোম—সোম যজ্ঞ। পূষণ-সূর্য্য। ভগ-ষড়ৈশ্বর্য্য। বসু-ধন বা অষ্টবিধ ঐশ্বর্য্য। আদিত্য—প্রকাশমান বিশ্বশক্তি। মিত্র—সূর্য্য বরুণ—জলাধিপতি। ইন্দ্রাগ্নি—সুখ দুঃখের অনুভূতি।

উভয় দর্শন একদৃষ্টিতে দেখলে বিভিন্নতা লোপ পায়। বাকী শ্লোকগুলি আলোচনা করলে মনের দৃষ্টি আরও প্রসার পাবে।

* অহমাত্মা গুড়াকেশ সর্ব্বভূতাশয়স্থিত
অহমাদিশ্চ মধ্যং চ ভূতানামন্তমেব চ ।১০।২০

গ্রামের কথা

শ্রীবীরেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায়

আমাদের গ্রামের বটতলাতে, দুপুর বেলা,
গাছের ছায়ায় বসে ছোটরা সব, করে খেলা।
বুড়রা তামাক খায়, খেলে তাস, গল্প করে বসে,
বাউল বসে গায় গান, কেহ দেয় ঘুম ক'সে।

সামনে দিয়ে এঁকে বেঁকে, ছোট্ট নদী ছোটে,
টগর, চাঁপা, রাঙাজবা, চারিদিকে ফোটে।
আশে-পাশে কেয়াবনের মিঠে গন্ধ কত ভাসে,
বনের পাখি আনন্দে তাই সেথায় উড়ে আসে।

দেখতে পাবে ধানের গোলা, সবুজ ঝোপের পাশে,
ছোট্ট কাপড়, আদুড়গা, গ্রামের মানুষ হাসে।
ঝাঁকে ঝাঁকে পায়রা ওড়ে, নীল আকাশের কোলে,
ফলে ভরা গাছের শাখা, বাতাস লেগে দোলে।

আসামের বিহু ও সংস্কৃতি

শ্রীগিরীন্দ্রচন্দ্র চক্রবর্তী

যারা আসামের বাইরে আছেন বিশেষ করে তাদের জন্যই এ প্রবন্ধের অবতারণা করছি। 'মূকং করোতি বাচালম্' —শ্রদ্ধাই আমাকে বাচাল করেছে, কাজেই ভোজন-দ্রব্যে কিছু তিক্ততা থাকলেও তা অসহনীয় হবে না বলেই মনে করি।

আসামে যারা বাইরে থেকে আসেন তারা নাকি কিছুকাল পরে ভেড়া সাজেন এরূপ একটা কিংবদন্তী প্রচলিত আছে। এদেশে এমন একটা আকর্ষণ আছে যার জন্য তারা এ দেশ ছাড়তে চান না, ইহাই এ কথার তাৎপর্য্য। কথাটা যে একেবারেই মিথ্যে তা নয়, তার কারণ, আসাম প্রকৃতির দেশ। প্রকৃতির সৌন্দর্য্যে মনকে একবার বিকিয়ে দিলে মানুষ আর অন্য যে কোন পার্থিব সম্পদকে বড় মনে করে না। জীবন-যাত্রার সাবলীল গতি ও বন্ধনের একটা কারণ থাকতে পারে। একবার ভোগের দোলায় দোল খেলে জীবনের নিষ্ঠুর অনিশ্চয়তার দিকে কেহ দিক্‌পাত করতে চায় না।

এই প্রকৃতির সৌন্দর্য্য ও সম্পদ এ দেশবাসিগণকে গানে ও নৃত্যে মাতোয়ারা করেছে। গীত, নৃত্য দুটিই মানুষের স্বাভাবিক সম্পদ এবং দুই-ই অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত। অকৃত্রিম উৎসের ন্যায় মানুষের স্বাভাবিক প্রেরণা থেকে এ দুয়ের প্রবাহ হৃদয়-গুহা থেকে উচ্ছ্বসিত হয়ে ওঠে আর তার প্রকাশ পায় দেহে, যেমন করে এই বিশ্ব দেহে স্রষ্টার আনন্দের বিকাশ ফুলে, ফলে সহস্রধারায় বিকশিত হয়ে পড়েছে।

বিহু আসামবাসিগণের এক প্রকার জাতীয় উৎসব। নৃত্য ও গীত এ উৎসবের প্রধান অঙ্গ এবং সকল সমাজেই এর প্রচলন সমভাবে আছে। তার কারণ, এ কোন ধর্ম-মূলক উৎসব নয়। বিহু আনন্দোৎসব। প্রকৃতির সঙ্গে যাদের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ, যেমন কৃষক সম্প্রদায় ও কিশোর কিশোরীগণ, তারাই এ উৎসবে আত্মহারা হয়ে উঠে এবং নৃত্যগীতের মাধ্যমে উচ্ছ্বসিত সমুদ্র-তরঙ্গের মত তাদের প্রাণের আনন্দ-ধারা দেহকে ছাপিয়ে সমগ্র দেশের আকাশ-বাতাস প্লাবিত করে। বিভিন্ন স্থলে—এই উৎসবের রীতি-নীতির কিছু পার্থক্য থাকলেও মূলতঃ উহা অভিন্ন এবং শিক্ষিত সমাজ একে আন্তরিকভাবে সমর্থন করেন। যদিও দৈহিকভাবে এতে তেমন যোগ দিতে পারেন না।

পূর্বে আসামের নাম ছিল কামরূপ। তিনশ বছর বা তার কিছু পূর্ব থেকে 'আসাম' নামটি প্রচলিত হয়েছে। এই কামরূপ রাজ্যে 'অষ্ট্রিক' নামে এক শ্রেণীর লোক বাস করত। তারা চাষবাস করত। কৃষি তাদের প্রধান অবলম্বন ছিল বলে শস্য উৎপাদনের পর তারা আনন্দোৎসব করত এবং প্রকৃতিকে ভালবাসত বলে বসন্তকালেও উৎসব করত। এ দুটি উৎসবই পরবর্তীকালে 'বিহু' উৎসব নামে পরিচিত হলো এবং যা এক সময়ে বীজ ছিল তা বর্তমানে শাখা প্রশাখা নিয়ে বৃক্ষে পরিণত হয়ে মনীষীদেরও দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে।

'বিহু' কথাটি 'বিষুব' কথা থেকে এসেছে। আসামে 'হ' উচ্চারণটি খুব প্রচলিত এবং পূর্ববঙ্গেও সাধারণের মধ্যে এই উচ্চারণটি যথেষ্ট শোনা যায়। তা ছাড়া ট বর্গ এবং তবর্গ দুটিকেই তারা ট বর্গের মত উচ্চারণ করেন। তবর্গকে বলা হয় 'দন্ত্য টবর্গ'। চৈত্র-সংক্রান্তির নাম মহাবিষুব-সংক্রান্তি। এই 'বিষুব' কথা থেকেই ক্রমে আসামের প্রত্যেকটি সংক্রান্তি উৎসবেরই নাম 'বিহু' করা হয়েছে এরূপ অনুমান করা যায়। অবশ্য বারোটি সংক্রান্তিতেই উৎসব নেই। দুটি সংক্রান্তিতেই উৎসব হয়, আর একটিকে 'বিহু' নাম দেওয়া হয় বটে কিন্তু সঠিক উৎসব বলা চলে না। এটিকে বলা যায় 'বিশ্রামের উৎসব' বা আড়ম্বর শূন্য উৎসব (কার্তিক বিহু)। আসামের কোন কোন স্থলে বিহুকে 'দোমাহী' এবং সংক্রান্তি-উৎসব বলা হয়। 'দোমাহী' কথাটিকে বাংলায় বলা চলে 'দুমেসে।' সংক্রান্তিমাত্রই দুই মাসের সংযোগ, কাজেই এক মাস হতে আর এক মাসের সংস্রব আছে বলে এই নামটি যুক্তিসঙ্গত হয়েছে বলে মনে হয়! যেখানে বাঙ্গালী-

প্রভাব আছে সেখানে 'সংক্রান্তি' নামটিই প্রচলিত আছে। যে তিনটি 'বিহু' প্রচলিত আছে তার নাম (১) বহাগ বিহু (বৈশাখ বিষুব), (২) কাতি বিহু (কার্তিক বিষুব), (৩) ভোগালি বিহু (মাঘ বিষুব)।

বহাগ বিহুর অনুষ্ঠান চৈত্র সংক্রান্তি হতেই আরম্ভ হয়। প্রকৃতি যেমন বসন্তে ফুল ফল ভারে সজ্জিতা হন, মানুষের মনও তেমনি ভাবের স্পন্দনে স্পন্দিত হয়ে ওঠে। প্রকৃতির সঙ্গে যাদের অবিচ্ছেদ্য সম্বন্ধ তাদের দেহ-মন পুলকিত হয়ে উঠা নিতান্তই স্বাভাবিক। এ আনন্দে সঙ্কীর্ণতা নাই, ধর্মের প্রভাব বা আচার অনুষ্ঠানের গণ্ডী নাই, মন্ত্রোচ্চারণ নাই। এ নিতান্তই অনাবিল, শুদ্ধ, পবিত্র। শুধু চৈত্রের শেষ দিন নয়, ক্রমাগতঃ এক সপ্তাহ, দুই সপ্তাহ, এমন কি সমগ্র মাস ও উৎসব চলতে থাকে। উৎসবের প্রধান অঙ্গ নৃত্য গীত, দিনের চেয়েও রাত্রিতেই নাচ গান চলে বেশী। এই গানগুলিতে প্রেমিক, প্রেমিকার মিলনের ও বিচ্ছেদের সুস্পষ্ট ছবি পাওয়া যায়। এই গ্রাম্য সঙ্গীতগুলি আসামের সাহিত্যের ভিত্তি। আই-নাম, বিয়া-নাম, ধাই-নাম, বিহু গীত (বিবাহ সঙ্গীত; ধাত্রী গান) প্রভৃতি গানের উপরই অসমীয়া সাহিত্যের অমূল্য সম্পদ নিহিত আছে। গানের সুর ও তালে আধুনিক সভ্যতার কোন ছাপ নাই এবং গানের সুর সকলেরই কর্ণকুহর তৃপ্ত করবে এমনও মনে হয় না, তবু বলা চলে এ জনসাধারণের স্বতঃস্ফূর্ত আনন্দোচ্ছ্বাস।

বৈশাখমাসে দিনের বেলায় মেয়েদের মধ্যে কড়িখেলার এবং কিশোরদের মধ্যে ডিমের খেলার প্রচলন আছে। এই কড়ি ও ডিম হয়ত সৃষ্টির কোন প্রকাশচিহ্ন হবে, চারিদিক সৃষ্টির আনন্দে ভরপুর হোক্ এই হয়ত এর মূল তাৎপর্য্য। বাংলাদেশের পূর্ববঙ্গে হিন্দু পরিবারেও কোন কোন সংস্কারের সময় এই দুটি বস্তুর ব্যবহার দেখা যায়। চৈত্র সংক্রান্তিতে গরুর স্নান ও পূজার বিধান আছে।

কাতিক বিহুটি হয় আশ্বিনের সংক্রান্তিতে। এ বিহুতে কোন আনন্দের প্রকাশ নাই, বরং বিষাদের ছায়াই আছে। মাঠে মাঠে অবিশ্রাম খাটুনির পর শীতের প্রাক্কালে মনের সতেজ ভাব কমে আসে। তাই আশ্বিনের সংক্রান্তিতে লাঙ্গল ধুয়ে তুলে রেখে বাকী ছয়মাস লক্ষ্মীদেবীর করুণার উপর নির্ভর করে কৃষক-কুল বসে থাকে।

পৌষ সংক্রান্তিতে যে বিহু হয় এর নাম ভোগালি বিহু বা মাঘ বিহু। 'মেজি' তৈয়ার করা এই বিহুর একটা বৈশিষ্ট্য। পৌষমাস ধরে কিশোর কিশোরীরা মাঠে খড় সংগ্রহ ক'রে এক জায়গায় জমা করে, বা যারা একটু শিক্ষাদীক্ষা পেয়েছে তারা বাড়ীর কাছেই নিয়ে আসে। অনেক স্থানে কাঠ দিয়েও মঠের মত স্তম্ভ প্রস্তুত করে। কামরূপে একে বলে 'পুজি'। হয়ত উহা পূর্ববঙ্গের পুঞ্জীর নামান্তর। আসামে একটা বৈশিষ্ট্য এই, খড় ও বাঁশের খুটি, টানা প্রভৃতি দিয়ে খড়ের ঘর তৈরী ক'রে সারারাত্রি তাতে খাওয়া-দাওয়া করা হয় এবং ভোরবেলায় তাতে আগুন দিয়ে তার চারপাশে মহা উল্লাসের সঙ্গে বিবিধ ধ্বনি করা হয়। এরপর ক্রমাগত কয়েকদিন চলে খাওয়া-দাওয়া আর বন্ধু বান্ধবের অভ্যর্থনা। খাদ্যের প্রধান অঙ্গ পিঠা—যেমন বুকা পিঠা, ভকা পিঠা, খেলি পিঠা, ফেলি পিঠা, খলাচাপার পিঠা ইত্যাদি। হিন্দুদের ধর্মশাস্ত্রে মাঘমাসে প্রাতঃস্নান, হরিনাম কীর্তন, নিরামিষ ভোজন প্রভৃতির ব্যবস্থা আছে! অত্যধিক শীতে প্রাতঃস্নানের পর অগ্নি-সেবার কিছুটা প্রয়োজন হয়ত কখনো হয়েছিল। তারই ফলে ক্রমে এটা উৎসবে পরিণত হয়েছে। এর সঙ্গে দেশের সংস্কৃতিরও কিছুটা জড়িত আছে।

সংস্কৃতি বললে যে কোন এক কথায় তার অর্থ করা চলে না। কোন দেশের সংস্কৃতি বলতে, সেই দেশের ভাষার সাহিত্য, সভ্যতা, রীতিনীতি ও সামাজিক অনুষ্ঠানের মিলিত ফলাফলই বুঝায়। আসামের জলবায়ু এবং জীবনযাত্রার পদ্ধতিই আসামবাসীর মনকে পরিপুষ্ট করেছে এবং আধ্যাত্মিক রূপ দিয়েছে। প্রাচীন ইতিহাস আলোচনা করলে দেখা যায় এই দেশে সর্বপ্রথম অষ্ট্রিক ও দ্রাবিড় জাতি বাস করত। ব্রহ্মদেশ, শ্যাম, ইন্দোচীনের লোকেরা এই অষ্ট্রিক জাতির বংশধর। এই অষ্ট্রিকজাতি ছিল কৃষিজীবী। ভোট-চীন এবং পরে আর্য্যজাতির আগমনে ও সংমিশ্রণের ফলে এক নূতন সভ্যতার সৃষ্টি হয়। এই সভ্যতা দিয়েছে সরলতা, ভাবপ্রবণতা এবং কিছু পরিমাণে কর্ম-বিমুখতা।

কামরূপের উল্লেখ মহাভারতে আছে। খৃষ্টপূর্ব ৪৫০ শকে মহাভারতের যুগ বলা যায় এরূপ পণ্ডিতগণ অনুমান করেন। এই যুগেই কামাখ্যা মন্দির আসামে প্রতিষ্ঠিত হয়। প্রাগ্জ্যোতিষপুরের (গৌহাটি) স্থাপন কর্তা নরকাসুর, কুরুক্ষেত্রে যুদ্ধকারী ভগদত্ত, রাজা রুক্মিণী, ভীষ্মক তেজপুরে উষার পিতা বাণ প্রভৃতির স্থান ছিল এই আসামে। এমন কি ত্রেতাযুগে দশরথের পিতা রঘুর আগমনের কথারও ইতিহাসে উল্লেখ আছে। আসামের সংস্কৃতি প্রাচীন এবং গ্রামের জীবন অবলম্বন করেই তার সভ্যতা গড়ে উঠেছে।

মানবতার সাগর-সঙ্গমে, সুইডেনে আর সোবিয়েতে

শচীন সেনগুপ্ত

স্টকহোল্‌ম সুইডেনের রাজধানী। বড় বিচিত্র ইতিহাস এই সুইডেনের। ডেনমার্ক আর নরওয়ের সঙ্গে কতবার যে এর মিলন-বিচ্ছেদ হয়েছে, গণনায় তা শেষ করা যায় না। কিন্তু সেই ইতিহাসের ভিতর থেকে দুটি বৈশিষ্ট্য বেরিয়ে আসে। তা হচ্ছে এর কৃষকদের এবং চার্চের স্বাতন্ত্র্য প্রতিষ্ঠার প্রয়াস, আর এর রাজ-বংশগুলির পৌনঃপুনিক বংশ-লোপ। রাজারা যখনই নিজেদের ক্ষমতাবৃদ্ধির দিকে দৃষ্টি রেখে ইউরোপের নানা রাষ্ট্রের সঙ্গে গাঁটছড়া বাঁধতে চেয়েছেন জাতির স্বার্থের দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি না রেখে, তখনই এর কৃষকরা হয় বিদ্রোহ করেছে, নয় রাজন্যদেরকে বাধ্য করেছে জাতির স্বার্থ সম্বন্ধে অবহিত হতে।

সুইডেনের অনেক রাজা ও রাণী বাইরের দেশ সমূহ থেকে মনোনীত হয়ে আসতেন বলে তাঁরা প্রজাদের সঙ্গে আপোষ করেই রাজত্ব চালাতে চাইতেন। যিনিই তা করেন নি, তাঁকেই সিংহাসন হারাতে হয়েছে অথবা জীবন দিতে হয়েছে। এর ফলে সুইডেনে স্বাভাবিক ভাবে একটি কো-অপারেটিভ মনোবৃত্তি গড়ে উঠেছে। আর তাকেই কাজে ফলিয়ে তুলে সুইডেন আজ নিজেকে নানা রকমে উন্নত করতে সক্ষম হয়েছে।

ইউরোপীয় মহাযুদ্ধগুলিতে সে সর্ব্বদাই নিরপেক্ষ রয়েছে। নেপোলিয়ানিক যুদ্ধের সময় তাকে যুদ্ধের জালে জড়িয়ে ফেলবার জন্য যেমন নেপোলিয়ান জবরদস্তি করেছিলেন, তেমন জার আলেকজান্দারও নেপোলিয়ানের সঙ্গে বন্ধুত্বের সময় এবং সে বন্ধুত্ব শত্রুতায় রূপান্তরিত হবার সময়েও সুইডেনকে নিয়ে টানাটানি করেছিলেন। কিন্তু ওঁদের কেউ তাতে সফল হননি, যদিও নিরপেক্ষ থাকবার জন্য সেদিন সুইডেনকে কম ক্ষতিগ্রস্ত হতে হয়নি। ফ্রাঙ্কো-প্রুশিয় যুদ্ধের সময়েও সুইডেন নিরপেক্ষ থাকে। বর্ত্তমান শতাব্দীর দুটি বিশ্বযুদ্ধেও সুইডেন যুদ্ধে নির্লিপ্ত থাকে। যদিচ প্রথম বিশ্ব-যুদ্ধে সুইডেনের শ'তিনেক মালবাহী জাহাজ জার্ম্মানরা ডুবিয়ে দেয়। বিশ্বযুদ্ধে নির্লিপ্ত থেকে সুইডেন যেমন ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে, তেমন লাভও কম করেনি। রাশিয়া দুই বিশ্ব যুদ্ধেই ব্রিটেনের মিত্র ছিল। কাজেই রাশিয়াকে যে সাহায্য করা হোতো যুদ্ধের উপকরণ যুগিয়ে, তা সুইডেনের সহায়তায় প্রেরিত হোতো। প্রথম বিশ্ব-যুদ্ধের মাঝেই রাশিয়ায় বিপ্লব অনুষ্ঠিত হবার পর অবশ্য তা বন্ধ হয়ে যায়।

নির্লিপ্ত থেকে লাভের চেয়ে সুইডেনের ক্ষতি হয়েছে বেশি জার্ম্মান ব্লকেডের ফলে, নেপোলিয়ানিক যুদ্ধের সময় যেমন হয়েছিল কন্টিনেন্টাল সিস্টেমের ফলে। আমদানি-রপ্তানির বিঘ্ন ঘটায় তার নানা সামাজিক ও অর্থনৈতিক বিপর্য্যয় ঘটে; কয়লা, খাদ্যশস্য প্রভৃতি দুষ্প্রাপ্য হয়, কড়া রেশনিং চালু করতে হয়। তার মন্ত্রী সভারও পতন ঘটে। কিন্তু তা সত্ত্বেও সুইডেন অবিচলিত বিশ্বাস নিয়ে প্রথম বিশ্ব-যুদ্ধে নিরপেক্ষ থাকে প্রতিবেশী রাষ্ট্র সমূহের সর্ব্বস্ব নাশের প্রত্যক্ষ পরিচয় পেয়ে।

ইউরোপের নানা যুদ্ধে নির্লিপ্ত থাকলেও সুইডেন সব সময়ে যুদ্ধকে এড়িয়ে চলতে পারেনি। যুদ্ধ তাকেও করতে হয়েছে কখনো ডেনমার্কের সঙ্গে, নরওয়ের সঙ্গে, এবং রাশিয়ার সঙ্গেও। অপর দেশের রাজনীতির সঙ্গেও তাকে বারবার জড়িয়ে পড়তে হয়েছে; এবং অপর কতকগুলি দেশ সে জয়ও করেছে—যেমন পোলাণ্ড, ফিনল্যাণ্ড, আলাণ্ড দ্বীপ সমূহ। প্রকৃত প্রস্তাবে এই 'এগ্রেসন' সুইডেন করেনি; করেছে সুইডেন বিদেশ থেকে যে-সব রাজা অথবা রাণী মনোনয়ন করে এনেছে, তারা। তাই 'এগ্রেসন' অথবা সাম্রাজ্যবাদ সুইডেনের জাতীয় মনোবৃত্তি হয়নি। কিন্তু রাজতন্ত্রকে সে উচ্ছেদও করেনি। ইউরোপে যে স্বল্প কয়েকটি দেশে আজও রাজতন্ত্রের কাঠামো বজায় করে রাখা হয়েছে, সুইডেন তাদেরই একটি।

আজ যে রাজবংশ সুইডেনে রাজত্ব করছেন সে বংশ বিদেশ থেকে আগত। ১৮১০ খৃষ্টাব্দে এই বংশের আদিপুরুষ, নেপোলিয়ানের খ্যাত নামা মার্শাল, জাঁ বর্ণাদোতকে রাজা মনোনীত করে আনা হয়। এমন কাজ আগেও বার-বার করা হয়েছে। সব সময়েই তা করা হয়েছে ইউরোপীয় রাজনীতিক চাপ থেকে দেশকে মুক্ত রাখতে। নেপোলিয়ান তখন অসাধারণ চাপ দিচ্ছিলেন, যাতে করে সুইডেন ব্রিটেনের বিরুদ্ধে তাঁর নীতি সমর্থন করে। সুইডেন তাতে সম্মত না হয়ে তাঁর বিরাগভাজন হয়। সুইডেন মনে করল তাঁর মার্শাল বার্ণাদোতকে সিংহাসন দিলে নেপোলিয়ান খুশি হবেন। হয়েছিলেনও তাই। এই ভেবেও খুশি হয়েছিলেন যে, রাজা হয়েও বার্ণাদোত তাঁর মার্শালের মতোই কাজ করবেন। কিন্তু তাতে দুটি বাধা হোলো। প্রথম বাধা সুইডেনের নব-গঠিত সংবিধান—যা রাজার স্বেচ্ছাচার বন্ধ করল। আর দ্বিতীয় বাধা জার আলেকজান্দারের সঙ্গে নেপোলিয়ানের বিরোধ, এবং মস্কো অভিযান। সে ইতিহাস যাই হোক, সুইডেন শুধুই বেঁচে গেল না, তার সংস্কৃতি ধারা বজায় করে চলবার সুযোগও পেল।

আজ যিনি রাজা, তিনি রাজপ্রাসাদে বাস করেন না, রাজনীতিতে নিজের ব্যক্তিত্বকে বড় করতে চান না, সংবিধানকে মেনে চলেন। সুইডেন রাষ্ট্র আজ শ্রেষ্ঠ ডেমোক্রেটিক রাষ্ট্র। ওর নর-নারী সর্ব্ব বিষয়ে সম অধিকার সম্পন্ন। বিভিন্ন রাজনীতিক দলগুলির কোনটিই ক্রস মেজরিটির ফলে স্বাধিকার প্রমত্ত হয়ে ওঠবার সুযোগ পায় না বলে প্রত্যেককেই প্রত্যেকের সহযোগিতা ও সাহচর্য্য সন্ধান করতে হয়। রাজনীতিক ওই মনোভাব রয়েছে বলে অর্থনীতিক সংগঠনেও সমবায়-নীতি ক্রমশই প্রাধান্য লাভ করছে, ক্যাপিটালিজম্‌ জাতীয়-নীতি হয়ে উঠতে পারছে না। সুইডেন সোশ্যালিজম-এর দিকে এগিয়ে যাচ্ছে।

মাত্র আশী লক্ষ লোকের দেশ সুইডেন। কিন্তু সেই আশী লক্ষ

লোকের প্রয়োজনীয় খাদ্য সে উৎপাদন করতে পারে না, বিদেশ থেকে তা আমদানি করতে হয়। কয়লা সে-দেশে এক রকম নেই বললেই হয়। কিন্তু কয়লার যুগ শেষ হয়ে এসেছে। এটা ইলেকট্রিক পাওয়ারের যুগ। এই ইলেকট্রিসিটিকে সুইডেন সবার চেয়ে বেশি আয়ত্ত করেছে। প্রায় সব কিছুই করা হচ্ছে ইলেকট্রিক পাওয়ারের সাহায্যে। তারপর রয়েছে বন-সম্পদ, আর গো-ধন। দুটিই পল্লীর সম্পদ। তাই কৃষকদের জীবনের মান যেমন উন্নত, তেমন তাদের রাজনীতিক শক্তিও অনেক বেশি। তারা একেবারে নিঃস্ব, অজ্ঞ, এবং রাজনীতিক চেতনা-বিহীন নয় বলে উপরতলার মানুষরা তাদের কাঁধে পা রেখে আরো উপরে ওঠবার অবকাশ করে নিতে পারে না, প্রতি কাজেই ওদের কো-অপারেশন খুঁজতে হয়। পরস্পরের স্বার্থের খাতিরে রক্তক্ষয়ী বিরোধের ভিতর দিয়ে না এগিয়ে সুইডেন সোশ্যালিজম্-এর দিকে এগিয়ে চলেছে। মার্কস্-বাদীরা অবশ্য ওর নানা কনট্রাডিকশন দেখাতে পারেন, এবং দেখিয়েও থাকেন। সুইডিশ পার্লামেন্ট এবং মিউনিসিপাল কাউন্সিলে কমিউনিষ্ট সদস্যও আছেন কয়েকজন।

স্টকহোলম শহর আকাশ থেকে দেখতে দেখতে সুইডেনের ইতিহাসের জানা কথাগুলো স্মৃতিকে আলোড়িত করছিল। হঠাৎ এক সময়ে নেমে পড়লাম স্টকহোলম এয়ার পোর্টে। সুইডেন শান্তি কমিটির প্রতিনিধিরা বাস নিয়ে অপেক্ষা করছিলেন। তাঁরা অভ্যর্থনা করে এয়ার পোর্টের বিরাম কক্ষে বসালেন। পোর্টের করণীয় কাজগুলি শেষ করে আমরা বাসে আসীন হলাম। বাস গিয়ে থামল শহরের প্রান্ত ভাগে বোমোপ্লান অঞ্চলের হোটেল-রোমার নব-নির্মিত একটি অতি আধুনিক ভবনে। হোটেল-রোমা প্রকাণ্ড হোটেল। কিন্তু তাতে স্থান সঙ্কুলান হয় না বলে তার থেকে কিছু দূরে এই নতুন বাড়িটি তৈরি হয়েছে। নির্জন অঞ্চল, পথগুলো পরিচ্ছন্ন এবং প্রশস্ত, বাড়ীগুলো অধিকাংশই নতুন।

হোটেলের তিন-তলায় আমার আর গোপাল হালদারের জন্য ঘর ঠিক হোলো। চাবি নিয়ে লিফটে করে উপরে উঠে গেলাম। ঘরে ঢুকে দেখি একটিমাত্র বেড, আর খুব বড় একটা সোফা। ভাবলাম হয়ত ভুল হয়েছে; এক ঘরের চাবি নিতে আর এক ঘরের চাবি নিয়েছি। হোটেলের অফিসে রমেশচন্দ্র ছিলেন। তাঁকে ফোন করে বিছানা-সঙ্কটের কথা বললাম।

তিনি বল্লেন—ঘর সম্বন্ধে কোন ভুল হয়নি। সোফাটার ব্যাক্ পাল্টে নেওয়া যায় ল্যাচ্ খুলে। তাতেই আর একটা বিছানা রয়েছে।

ল্যাচ্ খুলে ব্যাকটা নামিয়ে নিলাম। দেখলাম ক্যান্ভাসের খোলসের ভিতরে তুষার-শুভ্র বিছানা, বালিশ, কম্বল, শীট্ সাজানো-গোছানো রয়েছে। বুঝলাম প্রয়োজন মত ঘরটি কখনো একজনকে, কখনো দম্পতীকে ব্যবহার করতে দেওয়া হয়। দিনের বেলায় সোফার ব্যাকটা আবার তুলে দিয়ে পুরোপুরি সোফা করেই ব্যবহার করা চলে।

জিনিষ-পত্তর গুছিয়ে নিয়ে স্নানাদি সেরে নিলাম। সন্ধ্যার ভোজ খেতে শহরে যেতে হবে। ঠিক হয়েছে বিভিন্ন দেশ থেকে যত প্রতিনিধি আসবেন, সবাই এক সঙ্গে লাঞ্চ আর সাপার খাবেন। সকলের থাকবার জায়গা এক হোটেলে হয় না। কিন্তু সকলের খাবার ব্যবস্থা এক হোটেলে করা সম্ভব। কলম্বো কনফারেন্স থেকে এই প্রথা চালু হয়েছে। তাতে দেখা গেছে বিভিন্ন জাতির মেলা-মেশা ওতে করে বেশ নিবিড় হয়ে ওঠে।

কলোম্বোতে যেভাবেও উইলিয়ামস্, সাইপ্রাসের একজন গ্রীক প্রতিনিধি, আমাদের সেক্রেটারী পরমেশ্বরম্, আর আমি চীফ্ জাষ্টিসের অফিসিয়াল ভবনে থাকতাম। চীফ্ জাষ্টিস্ সে বাড়ীতে থাকতেন না। কিন্তু তাঁর গৃহিণী রোজ সকালে এসে আমাদেরকে ব্রেকফাষ্ট খাইয়ে যেতেন। এবং টেবিলেই শুনিয়ে রাখতেন পরের দিন কি খাওয়াবেন। ব্রেকফাষ্ট খেয়ে আমরা কনফারেন্সে যেতাম যে হোটেলে, সেই হোটেলেই লাঞ্চ খেতাম, সাপার খেতাম, আর চীফ-জাষ্টিসের বাড়ী ফিরতাম রাত এগারোটায়-বারোটায়। সারাদিনই একরকম কাটাতাম বাট-সত্তরটি জাতির নানা-বয়সের, নানা ভাষা-ভাষি নর-নারীর সঙ্গে। বড় ভালো লেগেছিল তা। সেই একই ব্যবস্থা এখানেও করা হয়েছে জেনে মন খুশিতে ভরে গেল।

সকলেই তৈরী হয়ে নিজ-নিজ কামরা থেকে নিচে নেমে এলেন। রমেশচন্দ্র প্রত্যেকের হাতে একখানি করে কার্ড দিলেন। ওই কার্ড দেখিয়ে শহরের ইলেকট্রিক ট্রেণে, ট্রামে, আর সরকারী বাসে যেখানে-সেখানে যতবার খুশি যাওয়া আসা করা যেতে পারবে। রমেশচন্দ্র আগে আরো স্টকহোলমে গিয়েছেন। তিনি আমাদেরকে নিয়ে চল্লেন ব্রোমো-প্লান রেল-স্টেশনের দিকে। এটি ইলেকট্রিক রেল—শহরের মাঝখান দিয়ে যাতায়াত করে, কখনো উপর দিয়ে, কখনো সুড়ঙ্গের ভিতর দিয়ে। এই সিস্টেমটিকে ওরা বলে টানেল-বানা। প্রতি পাঁচ মিনিট পর পর ট্রেণ যাওয়া-আসা করে। ওই টানেল-বানায় যে কোচগুলি ব্যবহৃত হয়, সেই রকম কোচই আমদানি করা হয়েছে সুইডেন থেকে হাওড়া-বর্দ্ধমান ইলেকট্রিক রেলে ব্যবহার করবার জন্য। তফাৎ রয়েছে আসনের ব্যবস্থায়। ওদের আসনগুলিতে গদী আছে। জায়গা তুলনায় অনেক বেশি। আর তফাৎ রয়েছে ওদের গাড়ীর দরজাগুলো গাড়ী চলবার আগে আপনা থেকেই বন্ধ হয়ে যায় এবং স্টেশনে থামবার পর খুলে যায়, আর প্রতি স্টেশনে পৌঁছুবার আগেই সেই ষ্টেশনের নাম লাউড-স্পীকারের সাহায্যে জানিয়ে দেওয়া হয়। ওখানকার ট্রামের আর সরকারী বাসের দরজাগুলিও চলবার মুখে বন্ধ এবং থামবার পর আপনা থেকেই খুলে যায়।

ব্রোমাপ্লান ষ্টেশনটি সুড়ঙ্গের মাঝে নয়, উপরে। ওর খোলা প্লাটফর্মে গিয়ে পৌঁছুলাম হোটেল থেকে বেরিয়ে মিনিট তিন-চারের মধ্যেই। তার মিনিট দুই পরেই একখানা ট্রেণ পেলাম। সেই ট্রেণ আমাদেরকে নিয়ে যাবে আমাদের গন্তব্যস্থলে আট-দশটি ষ্টেশনের পরে। ওই ষ্টেশনগুলির কয়েকটি সুড়ঙ্গের মধ্যে, কয়েকটি খোলা জায়গায়। সুড়ঙ্গের ষ্টেশন-গুলিতে নামা-ওঠা করতে হয় এস্কিলেটরের সাহায্যে। সিঁড়ির ওপর শুধু দাঁড়াতে হবে, তারপর বিনা-আয়াসে ওঠা নামা সমাপ্ত হবে।

আমাদের গন্তব্য, যেড্‌বোরগার প্লাটফেন, শহরের বুকে বলেই সুড়ঙ্গের মাঝে। ষ্টেশন থেকে উঠেই হোটেলের লবী। আবার ডাইনিং হল-গুলো মাটির নীচে ঠিক ষ্টেশনটির ওপরে। হোটেলটির নাম হোটেল ম্যালমেন, ষ্টকহোলমের বৃহত্তম হোটেলগুলির অন্যতম। কংগ্রেসের অধিবেশনের সাত-দিন, আর তার আগে আর পরে তিন দিন, মোট দশদিন, সত্তরটি দেশের বারো-তেরো শ' প্রতিনিধি এই হোটেলেই লাঞ্চ আর সাপার খেতাম। খাবার টেবিলে, আর খাবার আগে আর পরে, লবীতে পুরোনো বন্ধুদের সঙ্গে পুনর্মিলন হতো, নতুন-নতুন বন্ধুত্বও জমে উঠত গোশ-গল্পের ভিতর দিয়ে।

আমরা প্রথম যে দিন ম্যালমেনে খেতে গেলাম, সেদিন সকল প্রতি-নিধি এসে পৌঁছান নি। আমাদেরই একদল রীগায় রয়ে গেছেন, অন্যান্য অনেকে রয়েছেন ইয়োরোপের নানা আকাশ পথে। তবুও বহু পুরাতন বিদেশী বন্ধুর সঙ্গে পুনর্মিলন ঘটে গেল। রাত বারোটা পর্য্যন্ত চল্ল হাসি আর গল্প, আর আসন্ন কংগ্রেস সম্বন্ধে আলোচনা আর গবেষণা। তারপর রাত কাটাবার জন্য ওই টানেল-বাণা বয়েই ব্রোমোম্মানে ফিরে গেলাম। ওই হোটেলে কেবল রাত কাটাবার আর ব্রেকফাষ্ট খাবার ব্যয় দৈনিক চল্লিশ টাকা।

সকালে উঠে স্নান প্রভৃতি সেরে নিয়ে ব্রেকফাষ্ট খাবার জন্য নীচে গিয়ে শুনলাম ওখানে ব্রেকফাষ্ট হবে বেলা দশটায়। তার আগে যদি আমরা ব্রেকফাষ্ট খেতে চাই, তাহলে আমাদেরকে একটু কষ্ট করে মূল ব্রোমা হোটেলে যেতে হবে। মিনিট পাঁচেকের পথ, রেল-লাইনের ও-ধারে।

যাব কি যাব না, তাই ভাবছি। গোপাল বল্লেন—চলুন দাদা, ও-কাজটা তাড়াতাড়ি সেরেই ফেলি। কাল থেকে কংগ্রেস শুরু হবে, নিঃশ্বাস ফেলবার অবসর থাকবে না। শহরটার যতটা পারা যায়, দেখে নেওয়া যাক্‌।

সকলেই পায়ে-পায়ে এগিয়ে চল্লাম হোটেল ব্রোমার মূল বাড়ীর দিকে। জুলাই মাস। সোনালী রোদ সবুজ গাছ-পালায় পড়ে ঝিক্‌ ঝিক্‌ করছে। তাদের পল্লবের উল্লাস প্রকাশ পাচ্ছে হিমেল হাওয়ায়। কিন্তু ফিনল্যাণ্ডের গ্রীষ্মকালীন হাওয়ার মতো তা হাড় কামড়ে ধরেনা। যে কোট আর ট্রাউজার এখানে পরে আছি, হেলসিঙ্কিতেও তাই পর-তাম; অতিরিক্ত থাকত ওভারকোট, তবু এমনই সময়ে হেলসিঙ্কিতে বেশিক্ষণ বাইরে থাকতে হাড়ে কাঁপুনি ধরত, এখানে বেশ আরামে আছি।

খাবার ঘরে ঢুকে দেখলাম চীনা ডেলিগেশন ব্রেকফাষ্টে বসে গেছেন। তাঁরা এই হোটেলেই স্থান পেয়েছেন। আমার পাঁচ-ছয়জন বন্ধুকে পেলাম ওই ডেলিগেশনে। কলোম্বর পর তাঁদের সঙ্গে এক বছর পরে দেখা। উভয় তরফের চোখ দিয়েই আনন্দের প্লাবন নামল।

সুইডিস্‌ ব্রেকফাষ্টে রুশী-ব্রেকফাষ্টের মতো ভূরি-ভোজনের আয়োজন থাকে না। টোষ্ট, মাখন, বিস্কুট, চীজ, কফি কি চা, মারমালেড, আর যত চাও দুধ। তাদের মাখন, চীজ, আর দুধ একেবারে অকৃত্রিম। ও-দিককার সব দেশেই তাই, ভেজাল কল্পনার অতীত।

ব্রেকফাষ্ট শেষ ক'রে বাইরে যখন বেরুলাম, তখন আর ঘরে ঢুকতে ইচ্ছে হোলনা। গোপাল আর আমি ঠিক করলাম ট্রেণে চেপে যত শহরটার যতটা দেখা যায়, ততটার ওপর দিয়ে চোখ বুলিয়ে নেওয়া যাক্‌। লাঞ্চের সময় পর্য্যন্ত ট্রেণে ট্রেণেই কাটিয়ে দিলাম। যতটুকু কাল সুরঙ্গের মাঝে থাকি, ততটুকুই অন্ধকারে কাটে, বাকি সবটা সময় শহরের সব দেখা যায়। হেলসিঙ্কি খুবই সুন্দর। কিন্তু হেলসিঙ্কির চেয়েও ষ্টকহোল্‌ম সুন্দর। হেলসিঙ্কিতে কর্ম্ম-চাঞ্চল্য কম, ষ্টকহোল্‌ম তাতে ভরপুর। অথচ কোলাহল নেই। ট্রেণ ভরতি লোক, কেউ কারু সঙ্গে কথা কইছে না, হয় বই পড়ছে, নয়ত ঠোঁটে ঠোঁট চেপে বসে রয়েছে। রুশীরা আর চীনরা আমাদের দেখে আপন জন মনে করে। কিন্তু এরা নির্বিকার। যেচে আমরা যদি কথা কই, তাহলে সংক্ষেপে জবাব দেয়, নতুবা আমাদের সঙ্গে কথাই বলেনা। নিজেদের সঙ্গেও না। লাঞ্চে গিয়ে দেখলাম আরো অনেক দেশের ডেলিগেশন এসে গেছেন। কিন্তু সেদিন লাঞ্চের পর আর আড্ডা জমানো সম্ভব হোলো না। কেনন সেইদিনই আমাদের অন্য হোটেলে স্থানান্তরিত হবে। রীগার দল সন্ধ্যাতেই এসে পড়বেন, এবং ভারতীয় ডেলিগেশনের আর যাঁরা ইয়োরোপ দিয়ে আসছেন, তাঁরাও পৌঁছে যাবেন। স্বয়ং রামেশ্বরী নেহেরু, ভারতীয় ডেলিগেশনের নেত্রী, আসবেন রাত্রে। ব্রোমায় অতিরিক্ত গৃহটিতে সকলের স্থান হবে না। ক্রিষ্টেনবুর্গ নামক একটি হোটেলে আমাদের সকলেরই থাকবার ব্যবস্থা করা হয়েছে। তাই লাঞ্চের পর তাড়াতাড়ি ব্রোমাতে ফিরে জিনিস-পত্তর গুছিয়ে ফেলতে হোলো। সুটকেশ ঘরের বাইরে রেখে দিয়ে হ্যাণ্ড-ব্যাগ কাঁধে ঝুলিয়ে আবার বেরিয়ে পড়লাম। কোথায় যাই?

গন্তব্য স্থির না করেই ট্রেণে চেপে বোসলাম। একটা ট্রাম টার্মিনাস চোখে পড়ল। নামলাম সেখানে। উঠে পড়লাম ট্রামে। নেমেছিলাম ঠিক যায়গাটিতেই, স্লাসেন নামক ষ্টেশনে। সেখান থেকে ট্রামে কিছু দূর এগিয়েই দেখতে পেলাম রাজপ্রাসাদ। (কুংলিগা স্টটট)। প্রাসাদটি তৈরি হয় ১৬৯০ থেকে ১৭২৪ খৃষ্টাব্দের মাঝে। শহরের মাঝখানে প্রতিষ্ঠিত হলেও স্থানটি ছোট একটি দ্বীপ। আগেই বলেছি ষ্টকহোলম শহরটি একটি হ্রদের বুকে কতকগুলি ছোট বড় দ্বীপ নিয়ে গঠিত। প্রাসাদটি দেখতে পেয়ে ট্রাম থেকে নেমে পড়লাম। ডাইনে হ্রদের বুকে হংস-শুভ্র একখানা জাহাজ দেখলাম। শুনলাম ওখানা ফিনল্যাণ্ডের তুরকু শহরে যাবে। আগের বার তুরকু পোর্টে ওই রকম একখানা জাহাজ দেখে প্রশ্ন করে জেনেছিলাম, সেখানা ষ্টকহোল্‌মে যাবে। আশ্চর্য্য মানুষের মন! জানা জিনিসের ওপর অকারণ মমতা দানা বেঁধে ওঠে। আজ যদি তুরকু যাই, কেউ আমাকে চিনবে না। কিন্তু তুরকুর সেই মধুর সন্ধ্যাটি আমার স্মৃতিতে এমনই বাস্তব হয়ে রয়েছে যে, মনে হচ্ছে হ্রদের বুকে ভাসমান ওই জাহাজখানায় চেপে বসলে বুঝি স্বজন-সমাজে যাওয়া যায়।

গোপাল জিজ্ঞাসা করলেন—অমন করে দেখবার মতো কি পেলেন ওই জাহাজে?

তাঁকে আমার মনের হাস্যকর চিন্তার কথা বললাম। জানতে চাইলাম—সত্যি, সত্যি, কেন এই মমতা, কেন এই মায়া?

গোপাল বল্লেন—মনোবিজ্ঞানের কথা।

আমি বললাম—রোমান্সের কথা। রোমান্টিক মানুষ ত। তুরকুর সেই সন্ধ্যাটি আমার মনে রোমান্সের রঙ ধরিয়ে দিয়েছিল। তাই তুরকুর প্রতি আমার এই মমত্ববোধ। আসলে তুরকুর মতো, কোলকাতাও আমার নিজস্ব শহর নয়। কিন্তু যেহেতু কোলকাতায় আত্ম-প্রকাশের সুযোগ হয়েছে, সেই হেতু কোলকাতার প্রতি আমার মমত্ববোধ অত্যন্ত বেশি। তুরকুর সন্ধ্যাটি যদি আমার মনকে কোন কারণে আহত করত, কোলকাতা শহরে যদি না কোথাও একটুকু স্বীকৃতি পেতাম, তাহলে মমত্ববোধ উপে যেত।

কথা বলতে বলতে এগিয়ে চলেছি। রাজপ্রাসাদের বাঁয়ে আরো ছোট একটি দ্বীপে দেখলাম পার্লামেন্ট ভবন, রিকস্‌ড্যাগস্‌হ্যুসেট। তারই পেছনে, যে দ্বীপে রাজপ্রাসাদ, সেই দ্বীপে রিড্‌ডাটা হ্যুসেট, অর্থাৎ হাউস অব লর্ডস্‌। বাড়ীগুলো শুধু বাহির থেকে দেখতে দেখতে এগিয়ে চলতে চলতে একটা বড় পার্কে গিয়ে পড়লাম। পার্কটাও ঠিক হ্রদের ওপর, ডাইনে গ্রাণ্ড হোটেল, ন্যাশনাল মিউজিয়াম, বাঁয়ে রয়াল অপেরা হাউস, রাজপ্রাসাদের মুখোমুখি, ব্যবধান একফালি হ্রদ।

পার্কে একটা খোলা রেস্তোরাঁয় চা কফি আর স্ন্যাকস্‌ বিক্রী হচ্ছে। ফোল্ডিং চেয়ারে বসে শ'খানেক নর-নারী পানাহার করছে দেখতে পেলাম। গোপাল চায়ের কাপ দেখলে তা ঠোঁটে তুলে নেবার লোভ দমন করতে পারেন না। তিনি বল্লেন—দাদা নিশ্চিতই শ্রান্ত হয়েছেন।

—তা একটু হয়েছি। তবে গরম দেশ নয় বলে তৃষ্ণার্ত হইনি।

—তৃষ্ণা নিবারণ করবার জন্য ত মানুষ চা পায় না, খায় মনকে চাঙ্গা করে নেবার জন্য।

—আমি ত জানি, যে-লোকে মানুষ চুমু খায়, চাও আসলে সেই লোকেই খায়। কবোষ্ণ অনুভূতি।

—তবে চলুন ওই রেস্তোরাঁয়, ভাগ্যে দুই-ই জুটতেও পারে।

—জুটেও যায় বইতেই পড়ি, জুটল না একবারও।

পায়ে পায়ে পার্কেই ঢুকলাম। দুজনা দু'কাপ চা আর দুখানা চেয়ার নিয়ে একটা ঝোপের কাছে বোসলাম। চারিদিকে চেয়ে চেয়ে দেখি, আর চায়ের বাটিতে চুমুক দি।

এক ভারতীয় ভদ্রলোক একখানা চেয়ার আর এক ডিস খাবার নিয়ে কাছে এসে বাংলায় বল্লেন—আসুন, এক সঙ্গেই খাওয়া যাক্‌। আমি ডাক্তার পি, কে, সেন।

—দন্ত স্পেশ্যালিষ্ট? জিজ্ঞাসা করলাম।

—লোকে তাই বলে। আসলে ওই রোগের চিকিৎসাই আমার পেশা। বসুন, এক কাপ চা নিয়ে আসি।

খাবারের ডিসটা চেয়ারের ওপর রেখে তিনি চা আনতে গেলেন, [illegible] এক হাতে একখানা হাল্কা টিপয় আর অপর হাতে কাপ-ডিস [illegible]।

—একি! খাবারে আপনারা হাতই দেননি যে! বলে তিনি খাবারের ডিসটা টিপয়ের ওপর রাখলেন।

গোপাল বল্লেন—আর এক কাপ চা নিয়ে আসি।

গোপাল কিছুটা এগিয়ে যেতেই ডাক্তার সেন জিজ্ঞাসা করলেন—উনি?

—সাহিত্যিক আর সাংবাদিক গোপাল হালদার। আমার নিজের নাম ধাম আর পেশাও বললাম।

—ভারি আশ্চর্য্য রকমে দেখা হয়ে গেল। আপনারা যখন এগিয়ে আসছিলেন, দেখেই ভাবলাম নির্ঘাৎ বাঙালী। তখনো ভাবিনি দুইজন প্রখ্যাত বাঙালীর দর্শন পাবার সৌভাগ্য হবে।

—খ্যাতির বহর যদি সৌভাগ্যের পরিচিতি হয়, তাহলে বক্তার দর্শন লাভ শ্রোতৃদেরই সৌভাগ্য বলতে হয়।

আমার কথার ওপরেই গোপাল বল্লেন—আমরা এখানে শান্তি 'কংগ্রেসে' এসেছি পিসফুল নেগোশিয়েশন মন্ত্র কণ্ঠে নিয়ে। কাজেই আমরা মেনে নি, আমরা তিনজন বাঙালী স্টকহোলম শহরের এই পার্কে বসে একসঙ্গে চা খাবার সুযোগ পেলাম বলে প্রত্যেকেই সমভাগ্যবান।

ডাক্তার সেন আর আমি গোপালের সিদ্ধান্ত মেনে নিলাম। ডক্টর সেন সেই দিনই সকালে এসেছেন বক্তা সম্বন্ধে একটি বক্তৃতা দিতে আহুত হয়ে। হোটেলে থাকবার ঠাঁই পাননি, একটি থাকবার ঘর কোন-মতে সংগ্রহ করেছেন এই অঞ্চলেই। তিনি থাকবেন সেখানেই, আর খাবেন কাছে-কিনারায় কোন রেস্তোরাঁয়। তিনি দুই দিন এখানে থাকবেন।

সন্ধ্যা নেমে এল। চারিদিকে বিজলীবাতী, ফ্লুয়োরেসেন্ট টিউব, লাইট-সাইন জ্বলে উঠল; হ্রদের বুকে অসংখ্য ছোট-বড় জাহাজ, ষ্টীমার, লঞ্চগুলি আলোয় আলোয় ঝলমল করে উঠল; পাহাড়ের ওপরকার বাড়ীগুলোর বাতায়নে বাতায়নে-দীপালীর সমারোহ দেখা দিল, হ্রদের নীলিমা, তার তীরের সুবিস্তৃত বনানীর শীষ-রেখা, আর উপরের নীল আকাশ আলো-ছায়ার মায়া-লোক সৃষ্টি করল। পার্কের খোলা-মঞ্চে অর্কেষ্ট্রা বেজে উঠল।

চেয়ে দেখলাম রাজপ্রাসাদের দিকে, চেয়ে দেখলাম পার্লামেন্ট হাউসের দিকে, ন্যাশনাল মিউজিয়ামের বাড়ীটার দিকে, রয়াল-অপেরা ভবনটির দিকে, গীর্জার চূড়াটার দিকে। কোন সমারোহই নেই। সবগুলোই যেন সাক্ষীগোপাল হয়ে চেয়ে রয়েছে মানব-জীবনের আর জড়বিজ্ঞানের মিলন-সঞ্জাত প্রবহমান জনতার আর স্থল-জল যান-বাহনের নিরুপম মিছিলের দিকে। তখন আর ওদেরকে বড় বা দর্শনীয় বলে মনে হোল না। মনে হোলো যে-মানুষরা এই রেস্তোরাঁয় বসে খাচ্ছে, যে মানুষরা পার্কের খোলা-মঞ্চে অর্কেষ্ট্রা বাজাচ্ছে, যে মানুষরা তাই শুনছে, যে মানুষরা ট্রামে-বাসে ষ্টীমারে-লঞ্চে ছুটে চলেছে, যে মানুষরা পাহাড়ের বনানীর হ্রদের সৌন্দর্য্যকে নিজেদের মনের মাধুরী মিশিয়ে অনুপম করে তুলেছে—সেই মানুষরাই বড়, সেই মানুষরাই দর্শনীয়।

উঠে দাঁড়িয়ে বল্লাম—ওই শুনুন, খোলা-মঞ্চে গান শুরু হয়েছে। চলুন একটু শোনা যাক্‌।

কাপ-ডিসগুলো রেস্তোরাঁয় জমা দিয়ে পায়ে পায়ে চলে গেলাম গানের খোলা আসরে। তখন একটা সোলো গান হচ্ছে। হাজারখানেক নর-নারী বসে দাঁড়িয়ে তাই শুনছে। আমরাও দাঁড়ালাম প্রশস্ত একটি পথের পাশে। পথের দুই দিকে ঘন-বিন্যস্ত গাছের সারি। এক দিকের গাছের ডাল অপর দিকের গাছের ডালের আলিঙ্গনে আবদ্ধ। বৃক্ষশাখার সেই খিলান থেকে ঝুলিয়ে দেওয়া হয়েছে ছেলেদের খেলনা-বেলুনের মতো রঙ-বেরঙের আলোর মালা। গান শেষ হতেই সেই বিটপী-বিথীকা বয়ে এগিয়ে চল্লাম। আমাদের ডাইনে রইল খোলা-মঞ্চের খোলা প্রেক্ষাগার, আর বাঁদিকে আলো-আঁধারের রহস্য-আবহে অবস্থিত নানা ধরণের ক্লাব সমূহের কাঠের কুটীর।

খানিকটা এগিয়েই দেখতে পেলাম টুরিষ্ট সেণ্টারের প্যাভিলিয়ন। এই টুরিষ্টরাই হচ্ছেন এই রাষ্ট্রের ধন-স্ফীতির সহায়ক। এঁরা কংগ্রেস-কনফারেন্স করতে আসেন না। এঁরা আসেন দেশ দেখতে, ফুর্ত্তি করতে, সোনা ছড়াতে। পৃথিবীর সকল দেশ থেকে আসেন এঁরা। শ্রেষ্ঠ ধনিকরা, তাঁদের দুলাল-দুলালীরা, দলে-দলে এমন করেই দেশে দেশে ঘুরে বেড়ান, প্রতিযোগিতা করে অর্থ ব্যয় করেন। এঁদের খাতির কত! স্থানীয় ধনিকদের এঁদের সঙ্গে মেলা-মেশা করবার আগ্রহ কত! আগ্রহের কারণ কেবল এঁদের পকেট রিক্ত করা নয়। অতিরিক্ত অনেক কারণও আছে। তা হচ্ছে ব্যবসায়ের সম্বন্ধ স্থাপন, ছেলে-মেয়ের জন্য পাত্র-পাত্রীর সন্ধান, আরো কত কী।

পার্ক থেকে বেরিয়ে বল্লাম—আর দেরি করা ঠিক হবে না, সাপার শুরু হয়ে যাবে।

ট্রামে উঠে বোসলাম। ডাক্তার সেনও সঙ্গ ছাড়লেন না। আমাদের পৌঁছে দিয়ে তিনি ফিরে আসবেন। ফ্রিড্‌হেমসপ্লানে ট্রাম ছেড়ে টানেল-বানায় চড়ে পাঁচ মিনিটে ম্যালমেন হোটেলে পৌঁছে গেলাম।

হোটেলের লবীগুলো জনারণ্য হয়ে উঠেছে। বহু প্রতিনিধি এসে গেছেন। অনেক জাতির অনেক পরিচিত নর-নারীর সঙ্গে এক বছর বাদে আবার দেখা হোলো। হাতের উষ্ণ পরশ, আদর্শের ভিতর দিয়ে একাত্ম হবার পরিচয়, ব্যক্তিগত কুশল প্রশ্ন, দেশের বিজয়া-সম্মেলনকে মনে করিয়ে দিল।

আজও আমরা তাড়াতাড়ি সাপার শেষ করে লবীর আড্ডাকে এড়িয়ে হোটেল থেকে বেরিয়ে পড়লাম। ক্রিষ্টেনবুর্গ হোটেলে সকল ভারতীয় প্রতিনিধিদের থাকবার ব্যবস্থা হয়েছে। আমাদের মাল-পত্র সেখানে পৌঁছে গেছে। পরমেশ্বরম, চিত্তবিশ্বাস, উমা শেহনবীস প্রভৃতি সেইখানে বসেই ঠিক করছেন কাকে কোন ঘর দেওয়া হবে। সর্ব্বসাকুল্যে ভারতীয় ডেলিগেশনের সংখ্যা দাঁড়িয়েছে মোট পচাত্তর জন। রামেশ্বরী নেহেরুকে আর ডাক্তার কিচ্‌লুকে টানা-পোড়েন থেকে অব্যাহত দেবার জন্য ম্যালমেন হোটেলেই রাখা ঠিক হয়েছে, সপুত্রক চমনলাল-দম্পতি আর মেজর জেনারেল শোখে নিজেদের থাকবার ব্যবস্থা নিজেরাই করে নিয়েছেন। এই ছয়জন ছাড়া মোট উনসাট জন ভারতীয় নর-নারীর থাকবার এবং ব্রেকফাষ্ট খাবার স্থান হয়েছে ক্রিষ্টেনবুর্গ হোটেল। বাড়ীটি একতলা, জিগ-জ্যাগ ধরণে নির্ম্মিত; কিন্তু জীবন যাপনের আধুনিক সব ব্যবস্থাই আছে। লবীতে টেলিভিশনও রয়েছে। থাকবার কামরা কোনটা চার জনের জন্য, কোনটা তিনজনের, দুজনের, এবং একজনের।

ম্যালমেন থেকে ক্রিষ্টেনবুর্গ হোটেলে পৌঁছিতেই পরমেশ্বরম আমার আর গোপালের হাতে দুটি চাবি দিয়ে বল্লেন—আপনাদের জিনিষ পত্তর আপনাদের ঘরে পৌঁছে দেওয়া হয়েছে। এখন বিশ্রাম করতে পারেন। দুজনাকেই সিঙ্গ্‌ল রুম দেওয়া হয়েছে।

ঘরে গিয়ে দেখলাম ছোট্ট ঘরটি, প্রয়োজনীয় সব কিছুই আছে, মায় একটা ওয়াশিং বেসেনি। সব সময়েই তাতে গরম আর ঠাণ্ডা জল পাওয়া যায়। সংলগ্ন বাথ-রুম নেই। সর্ব্বত্র তা পাওয়াও যায় না। কয়েকটা খুব ভালো স্নানাগার আছে। তাতে স্নান করতে হলে অতিরিক্ত প্রতিবার স্নানের জন্য দুই-টাকা করে দিতে হয়। কিন্তু সেখানে স্নান করবার সময় মনে হয় না টাকা-দুটোর অপব্যয় হোলো। আমি অবশ্য প্রায় প্রত্যহই বেসিনের জলেই স্নানের কাজটা সেরে নিতাম। ঘরটি আমার ভালোই লাগল। আট-দশদিনের মতো নিশ্চিন্ত রইলাম।

১৯৫৮ খৃষ্টাব্দের ১৩ই জুলাই। ষ্টকহোল্‌ম কংগ্রেস উদ্বোধন অধিবেশন হবে ২২ জুলাই পর্য্যন্ত। চুয়াত্তরটা দেশ থেকে বারো শত ডেলিগেট এসেছেন এই কংগ্রেসে যোগ দিতে। ন'টার মধ্যে ব্রেকফাষ্ট শেষ করে আমরা বেরিয়ে পড়লাম কংগ্রেসমণ্ডপের উদ্দেশ্যে। যেতে হবে ওই টানেল-বানার ইলেকট্রিক রেলে চড়ে। নামতে হবে ম্যালমেন হোটেলে যাবার জন্য যে ষ্টেশনে নামতে হয়, সেই মেডবোরগার প্লাটসেনের এক ষ্টেশন পরে, ফ্রিড্‌হেমসপ্লান ষ্টেশনে। সেখান থেকে মাইল খানেক যেতে হবে ট্রামে বা বাসে। একটি উচ্চ বিদ্যালয় আর তারই সংলগ্ন একটি ইনডোর ষ্টেডিয়াম কংগ্রেসের অধিবেশনের জন্য নেওয়া হয়েছে। ইস্কুলের ছোট ঘরগুলি নানা দেশের অফিসের জন্য ব্যবহার করা হতে লাগল, আর বড় হলগুলি বিভিন্ন কমিশনের বৈঠকের জন্য নির্দ্দিষ্ট রাখা হয়েছিল। ষ্টেডিয়ামটি মূল কংগ্রেসের অধিবেশন এবং সাংস্কৃতিক-কমিশনের জন্য নির্দ্দিষ্ট ছিল। সাংস্কৃত-কমিশনেই সব চেয়ে বেশি ডেলিগেট অংশ গ্রহণ করে থাকেন বরাবরই। তার কারণ ও-কমিশনে রাজনীতি আলোচনা হয় না।

ষ্টেডিয়ামে খুব বড় একটা মঞ্চ আছে। দুই দিকে কাঠের গ্যালারি আছে, লবী আছে, রেঁস্তোরা আছে, অনেকগুলো বাথ্‌ ও ল্যাভেটরি আছে। ষ্টেডিয়ামে নাচ হয় বলে মেঝটি মসৃণ, কাঠের তৈরি। মঞ্চে, মেঝেয়, এবং গ্যালারীতে হাজার তিনেক লোকের বসবার ব্যবস্থা করা যেতে পারে। মঞ্চে সাময়িক ভাবে একটি গ্যালারি করা হয়েছিল, সেখানে প্রেসিডিয়ামের বসবার ব্যবস্থা ছিল। প্রতিদেশের ডেলিগেটরা তাদের সংখ্যার অনুপাতে প্রেসিডিয়ামে নিজেদের প্রতিনিধি নির্ব্বাচন করেন। সকল দেশেরই প্রতিনিধি থাকে প্রেসিডিয়ামে।

ডেলিগেটদের বসবার আসন দেশের ভিত্তিতে ভাগ করা হয় না, ভাষার ভিত্তিতে ভাগ করা হয়। কংগ্রেসের বক্তৃতা এবং আলোচনা এই সব ভাষায় অনুবাদ করা হয়—ইংরেজী, ফরাসি, রুশী, স্পেনিশ

জার্মান, ইতালিয়ান আর চাইনিজ। লিখিত বক্তৃতাগুলি এই কয়েকটি ভাষায় অনুবাদ করে টেপ-রেকর্ড করা হয় এবং বক্তা যখন তাঁর ভাষণ পড়েন, তখন সাতটি ঘর থেকে সেই বক্তৃতাটির টেপ চালিয়ে দেওয়া হয়। শ্রোতাদের প্রত্যেককেই একটি করে যন্ত্র দেওয়া হয়, যা গলায় ঝুলিয়ে তার টিউব কানে লাগিয়ে বোসতে হয়। যন্ত্রগুলিতে একটি করে ডায়েল আছে। সেই ডায়েল ঘুরিয়ে শ্রোতাকে নিজের বোধগম্য "ভাষা বেছে নিতে হয়। অলিখিত আলোচনা ওই সাতটি ঘর থেকে মুখে মুখে অনুবাদ করে দেওয়া হয়।

এই ভাষাভিত্তিক বসবার ব্যবস্থায় ব্রিটেন, ভারতবর্ষ, আমেরিকা, পাকিস্তান, অষ্ট্রেলিয়া, জাপান, নিউজিল্যাণ্ড, বর্ম্মা, সিংহল প্রভৃতির প্রতিনিধিরা এক গোষ্ঠীভুক্ত হন। ক্যানাডার কিছু থাকেন এই গোষ্ঠীতে, কিছু যান ফরাসী ভাষা-ভাষি গোষ্ঠীতে।

আরবজাতিগুলি ফরাসী গোষ্ঠীভুক্ত থাকেন। আফ্রিকার অপরাপর জাতিগুলিও ফরাসী আর ইংরেজী গোষ্ঠীতে বিভক্ত থাকেন।

সোবিয়েৎ রিপাবলিকের এশিয়ান রাষ্ট্রগুলি রুশ গোষ্ঠীতে থাকেন। পূর্ব ইউরোপের কমিউনিষ্ট রাষ্ট্রগুলি কিছু থাকেন রুশ গোষ্ঠীতে, কিছু জার্মান গোষ্ঠীতে।

দক্ষিণ আমেরিকার দেশগুলি স্পেনীশ ও ফরাসী গোষ্ঠীতে বিভক্ত হয়ে যান। বেলজিয়াম, ডেনমার্ক, সুইডেন, নরওয়ে, আইসল্যাণ্ড প্রভৃতির প্রতিনিধিরা যে যাঁর ইচ্ছে মত ইংরেজী, ফরাসী, আর জার্মান গোষ্ঠীতে আসন গ্রহণ করেন। তুর্কী থাকেন ফরাসী গোষ্ঠীতে, গ্রীস ইংরেজী-ফরাসীতে।

দশটার সময় আমরা আসন গ্রহণ করলাম। কিন্তু এগারোটার আগে অধিবেশন শুরু হোল না। প্রতি কংগ্রেসেই এই বিলম্ব সেক্সার বিষয় হয়। লোকে ঠাট্টা করে বলে সভার উদ্যোক্তারা প্রধানতঃ ফরাসী বলেই এই রকম হয়। আসলে কিন্তু ইংরেজ আর জার্মানরা ছাড়া সকলেই আমাদেরই মতো কিছুটা শ্লথ। আন্তর্জাতিক সম্মেলনে আমরা কিন্তু ইংরেজের নীতিই অনুসরণ করি।

কংগ্রেস শুরু হোলো বিশ্বশান্তি সংসদের সভাপতি ফ্রেডারিক জোলিও কুরীর প্রেরিত ভাষণ দিয়ে। তিনি তখন অসুস্থ ছিলেন বলে কংগ্রেসে উপস্থিত হতে পারেননি। কলম্বো কংগ্রেসেও তিনি অনুপস্থিত ছিলেন ওই একই কারণে। ১৯৫৫ খৃষ্টাব্দে হেলসিঙ্কি কংগ্রেসে তাঁর দর্শন লাভের সৌভাগ্য আমার হয়েছিল। ১৯৫৮ খৃষ্টাব্দের ষ্টকহোলম কংগ্রেস শেষ হবার মাত্র কয়েকদিন পরেই তাঁর মৃত্যু হয়।

ফ্রেডারিক জোলিও-কুরীর প্রেরণাতেই প্রধানতঃ দশবছর আগে বিশ্বশান্তি সংসদ প্রতিষ্ঠিত হয়। প্রতিষ্ঠার সময় থেকে মৃত্যুর দিনটি পর্য্যন্ত তিনি সংসদের সভাপতির কাজ করছেন। নয় বছরকাল বিশ্বশান্তি সংসদের মতো একটি বিরাট প্রতিষ্ঠানের নেতৃত্ব করা সহজ কথা নয়। নিজে তিনি কমিউনিষ্ট ছিলেন। কিন্তু কোন সময়েই তিনি বিশ্বশান্তি সংসদকে কমিউনিষ্ট গোষ্ঠীর শক্তি-বৃদ্ধির কাজে নিয়োগ করতে চাননি। তা যদি চাইতেন, তাহলে বহু ভু-বিখ্যাত বৈজ্ঞানিক, দার্শনিক, সাহিত্যিক, রাজনৈতিক, শিল্পী, শ্রমিক, কৃষক, ধর্ম্মযাজক প্রভৃতিকে সংসদের প্রতি আকৃষ্ট করতে পারতেন না, পঁচাত্তরটি জাতিকেও না।

তিনি পৃথিবীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ বৈজ্ঞানিক ছিলেন বলেই বৈজ্ঞানিক অভিজ্ঞতা দিয়ে মানুষের রাজনীতি এবং জীবনোন্নয়নের কথা বিচার করতেন। সেই কারণেই যেমন তিনি কমিউনিজমের প্রতি আকৃষ্ট হয়েছিলেন, তেমন সেই কারণেই সংসদকে কমিউনিজমের প্লাটফর্ম্ম করতে দেননি। এতে কিন্তু কোন কনট্রাডিকশন নেই। এ হচ্ছে বিজ্ঞানী মনের বাস্তব দৃষ্টির পরিচয়। সংসদের নেতৃস্থানীয় যাঁরা, তাঁদের অধিকাংশই কিন্তু কমিউনিষ্ট নন।

একদিক দিয়ে বিচার করলে বিশ্বশান্তি সংসদ ইউনাইটেড্ নেশনস্ অর্গানাইজেশনের চেয়ে বেশি রিপ্রেজেন্টেটিভ। ইউনো রাষ্ট্রের প্রতিনিধিদের নিয়ে গঠিত, আর বিশ্বশান্তি সংসদ জনগণের প্রতিনিধি নিয়ে গঠিত। ডেমোক্রেটিক রাষ্ট্রে অপোজিশন থাকে, ছোট-ছোট অনেক দলও থাকে। কিন্তু রাষ্ট্রের মত বলে যা বিশ্ব-রাষ্ট্রসঙ্ঘে পেশ করা হয়, তা সংখ্যাগরিষ্ঠ ক্ষমতাপ্রাপ্ত দলেরই মত। মাইনরিটি দলগুলির মত সেখানে প্রকাশিত হয় না। কিন্তু বিশ্বশান্তি সংসদে তা হয়। তারপর রাষ্ট্রসঙ্ঘে চীনের ষাট কোটী অধিবাসীর কোন প্রতিনিধির স্থান নেই, অনেক কলোনীরও নেই। কিন্তু বিশ্বশান্তি সংসদে আছে।

বিশ্বশান্তি সংসদের সৈন্যবাহিনী নেই, রাষ্ট্রসঙ্ঘের তা গড়ে নেবার সুযোগ আছে। কিন্তু রাষ্ট্রসঙ্ঘের জনগণের সঙ্গে প্রত্যক্ষ সংযোগ নেই, বিশ্বশান্তি সংসদের আছে। রাষ্ট্রসঙ্ঘে রয়েছে কেবল পেশাদারী রাজনীতিকদের স্থান—আর বিশ্বশান্তি সংসদে বে-সরকারী সকলেরই স্থান রয়েছে। বিশ্বশান্তি সংসদ যুদ্ধ ঘোষণা করতে পারে না, কিন্তু জনগণের মনকে প্রভাবান্বিত করে যুদ্ধের ষড়যন্ত্রকে ব্যর্থ করে দিতে পারে।

ষ্টকহোলম কংগ্রেসের অধিবেশনের সময়েই লেবাননে আর জর্ডনে আমেরিকা আর ব্রিটেন সৈন্যাবতরণ করিয়ে সঙ্কটের সৃষ্টি করে। কংগ্রেসের প্রথম অধিবেশনেই রুশী লেখক এহরেণবুর্গ তাঁর ভাষণে তাই বলা প্রয়োজন মনে করেন :—

> সাম্রাজ্যবাদীরা ঠিক যে সময়টিতে জর্ডন আর লেবানন দখলে প্রবৃত্ত হয়েছে, ঠিক সেই সময়েই পঁচাত্তরটি দেশের জন-প্রতিনিধি আমরা এই ষ্টকহোলম শহরে বসে বিশ্বশান্তি সম্বন্ধে আলোচনা করছি। অনেকের কাছে এই ব্যাপারটি হাস্যকর মনে হবে। কিন্তু আমরা জানি অচিরেই তাদের মুখের হাসি মিলিয়ে যাবে, জর্ডন আর লেবানন থেকে সাম্রাজ্যবাদীরা তাদের সৈন্য সরিয়ে নিতে বাধ্য হবে।

এহরেণবুর্গের সেই ভবিষ্যবাণী সফল হতে সময় লাগেনি। তা আজ ইতিহাস হয়ে রয়েছে। বিশ্বশান্তি সংসদ রাষ্ট্রসঙ্ঘের চার্টার বিরোধী কোন কাজ করেনা, ইউনেস্কোর জনহিতকর কাজগুলিরও সে সমর্থন করে।

ওই প্রথম দিনের অধিবেশনেই ভারতীয় ডেলিগেশনের নেত্রী শ্রীমতী রামেশ্বরী নেহেরু ভারতের মনোভাব ব্যক্ত করেন। তিনি বলেন :—

ভারত ছেড়ে আসবার পথে ইরাকের সাম্প্রতিক ঘটনাবলী আমি শুনতে পাই, লেবাননে বিদেশী সৈন্যের অবতরণও আমি পথে-পথেই শুনতে পাই। শোনা অবধি আমার মন চঞ্চল হয়ে উঠেছে। মধ্য-প্রাচ্যে যে বলাৎকার শুরু হয়েছে, তা যে-কোন মুহূর্তে যুদ্ধের আগুন জ্বেলে তুলে সারা বিশ্বময় ধ্বংসের তাণ্ডব শুরু করতে পারে। আমাদের আর একটুকালও নীরব থাকা উচিত নয়। আসুন, এই কংগ্রেস থেকে এই মুহূর্তেই আমরা রাষ্ট্রসঙ্ঘের চার্টার ভঙ্গকারী-দেরকে এই ষ্টকহোলম থেকেই জানিয়ে দিই, মানব-স্বাধীনতা ক্ষুণ্ন করবার এই নিন্দনীয় কাজ বিশ্বের জনগণ সমর্থন করবে না। আমরা এই কংগ্রেসে সমবেত জনপ্রতিনিধিরা, ইরাকের লেবাননের স্বাধীনতা রক্ষার জন্য আমাদের সমস্ত শক্তি নিয়ে তাদেরই পাশে সমবেত হব।

শ্রীমতী রামেশ্বরী নেহেরুর ভাষণের পরই ব্রিটিশ ডেলিগেশনের পক্ষ থেকে শোনানো হলো তাঁরা ব্রিটেনের প্রধানমন্ত্রীকে তারবার্তায় সৈন্য অপসৃতির অনুরোধ জানাচ্ছেন এবং এ-কথাও তাঁরা জানিয়ে রাখছেন, এই অনুরোধ যদি তিনি অগ্রাহ্য করেন, তাহলে ডেলিগেশন দেশে ফিরে তাঁর গবর্ণমেণ্টের এই অন্যায় কাজের বিরুদ্ধে জনমতকে জাগ্রত করে তুলবেন।

কংগ্রেসের টেম্পো এক মুহূর্তে উঁচু পর্দ্দায় চড়ে গেল। দেশের পর দেশের প্রতিনিধি উঠে শোনাতে লাগলেন অনুরূপ তারবার্তা নিজ-নিজ দেশের প্রধানমন্ত্রীর উদ্দেশ্যে প্রেরিত হবে।

ভাষণ দিতে উঠ্লেন চীন-ডেলিগেশনের নায়ক, বিশ্বশান্তি সংসদের ভাইস প্রেসিডেণ্ট, কুয়ো-মো-জো। কুয়ো-মো-জোর বক্তৃতা চিরদিনই রসাল ও মধুর শুনে এসেছি। কিন্তু এবার তাও চড়া পর্দ্দায় বাঁধা। ভাবলাম ন্যায্য অধিকার থেকে দীর্ঘকাল বঞ্চিত থেকে চীনের বুঝিবা ধৈর্য্য-চ্যুতি ঘটেছে। কংগ্রেসের পরে কুইময় মাৎসু প্রভৃতির ওপর গোলা বর্ষণ শুরু হবার পর বুঝতে পারলাম আমার সেদিনকার অনুমান হয়ত একেবারে অলীক নয়। ব্যক্তিগত ব্যবহারে কুয়ো-মো-জো বড়ই মধুর প্রকৃতির মানুষ। কলোম্বোতে তিনি ভারতীয় ডেলিগেশনকে একদিন-লাঞ্চে আমন্ত্রিত করেছিলেন। সে ডেলিগেশনে আমাদের নায়করা, অর্থাৎ ডক্টর কিচ্লু, সুন্দরলাল প্রভৃতি ছিলেন। কুয়ো-মো-জো জানতেন আমি সঙ্গীত নাটক আকাদেমীর সদস্য। খাবার আসরে গোটা কয়েক গান হবার পর তিনি হঠাৎ উঠে দাঁড়িয়ে বল্লেন—আমি আশা করি শচীন সেনগুপ্ত একটি নাচ দেখিয়ে আমাদেরকে আনন্দ দেবেন।

আমি তক্ষুনি উঠে দাঁড়িয়ে বল্লাম—মিঃ কুয়ো-মো-জোকে যদি পার্টনার হিসেবে পাই, তাহলে সেই আনন্দে সারাদিন আমি নাচতে পারি। আসুন, বলে আমি হাত বাড়িয়ে দিলাম।

কুয়ো-মো-জো তখন করযোড়ে নাচ থেকে অব্যাহতি চাইলেন। আমি বল্লাম—এক সর্ত্তে।

কিচলু আর সুন্দরলাল আমার দিকে বিস্ময়ান্বিত দৃষ্টিতে চেয়ে রইলেন।

কুয়ো-মো-জো জানতে চাইলেন—সর্ত্তটা কি?

—কবিতার আবৃত্তি। আমি বল্লাম।

—বেশ! চেয়ারম্যান মাও সে-তুঙের একটি কবিতা আবৃত্তি করি সুললিত কণ্ঠে অতি সুন্দর একটি কবিতা তিনি আবৃত্তি করে শুনিয়ে ছিলেন। তাঁর ইণ্টারপ্রিটার ডক্টর তাও-সেটি ইংরাজীতে অনুবাদ করে শোনালেন। ১৯৫৩ খৃষ্টাব্দে আমি যখন চীনে সাংস্কৃতিক ডেলিগেশনের নায়ক হয়ে যাই, তখন ডক্টর তাও্ আমার অনেক বক্তৃতা অনুবাদ করে আমাকে সাহায্য করেছেন।

ষ্টকহোল্মে মধ্যপ্রাচ্যের ঘটনা যে উত্তাপের সৃষ্টি করেছিল, তাতে করে এমন ঘরোয়া বৈঠকের সম্ভাবনা নষ্ট হয়ে যায়।

প্রথম অধিবেশনে পাঁচটি বক্তৃতা হতেই লাঞ্চের সময় অতিক্রম হয়ে যায়। ম্যালমেন হোটেলে টেলিফোন করে দেওয়া হোলো আড়াইটায় ডেলিগেটরা লাঞ্চ খেতে যাবেন। আর ডেলিগেটদের জানিয়ে দেওয়া হোলো বিকেলে কোন অধিবেশন হবে না। পরের দিন থেকে সকালে বসবে কমিশনগুলির পৃথক পৃথক বৈঠক, আর বিকেলে কংগ্রেসের সাধারণ অধিবেশন।

আড়াইটা বাজতেই বারো শ ডেলিগেট আমরা ছুটলাম ম্যালমেন হোটেলের দিকে, ট্রামে, বাসে, হেঁটে, দৌড়ে। রোজই এমন করতে হোতো। কিন্তু টানেল-বানার ইলেকট্রিক ট্রেণ প্রতি পাঁচ মিনিট পর-পর পাওয়া যায় বলে কোন ডেলিগেটকে লাঞ্চ থেকে বঞ্চিত হতে হোতনা।

লাঞ্চ খাওয়া শেষ হতে সেদিন সাড়ে তিনটে বেজে গেল। বিকেলে কোন অধিবেশন নেই। লবীর এক কোণে একটা সোফায় বসে আগে একটু ঘুমিয়ে নিলাম। তারপর গোপাল আর আমি বেরিয়ে পড়লাম কিছুদূর গিয়ে দেখতে পেলাম কতগুলি বাস দাঁড়িয়ে আছে, শহরের উপকণ্ঠে যাবে। আমাদের কাছে যে কার্ড আছে তার জোরে যাওয়া যায় কিনা বাসের কাছে দাঁড়িয়ে তাই আলোচনা করছিলাম। একটি যুবক এগিয়ে এসে ইংরেজীতে জানতে চাইলেন—কোথায় যাবেন আপনারা?

আমরা বল্লাম—বাস যেখানে নিয়ে যাবে। শহরটা কিছুটা দেখিছি, শহরতলী কেমন একটু দেখে যেতে হবে।

যুবকটি বল্লেন—বেশত, চলুন। আমার বাড়ী একেবারে বাস টার্মিনাসে, এখান থেকে বারো মাইল দূরে।

আমরা জানতে চাইলাম—এই টুরিষ্ট কার্ডে যাওয়া যাবে কি?

তিনি বললেন—ও নিয়ে গবর্ণমেণ্ট ট্রান্সপোর্টে যাওয়া আসা করতে পারেন। এ লাইনে সে সার্ভিস্ নেই। কিন্তু তার জন্য ভাবছেন কেন? টিকিট আমাকেই কিনতে দিন।

—না, না, আমাদের কাছে সুইডিস ক্রোনা আছে।

তাড়াতাড়ি কনডাকটারের হাতে একখানা পাঁচ-ক্রোনার নোট গুঁজে দিলাম। যাওয়া-আসার দু'খানা টিকিটের দাম আড়াই ক্রোণা, দুটাকা দশ আনা। দামটা বেশ চড়া। তা ত হবেই বড় লোকের দেশ সুইডেন।

বাস ছাড়তেই যুবকটি আত্ম-পরিচয় দিলেন। তিনি একজন সা-

GOVERNMENT LIBRARY
Cooch Behar
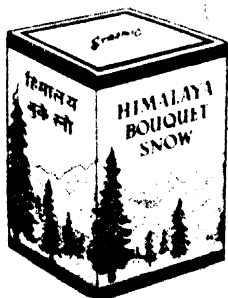
বাদিক। আপিস থেকে বাড়ী ফিরছেন। হঠাৎ চমকে উঠলাম। আপিস-ফেরতা বাস, অথচ আরামদায়ক আসনে আরামে বসে যাচ্ছি! সঙ্গে সঙ্গে মনে হোলো শহরের লোকসংখ্যাই যে কম, আর যান-বাহনের সংখ্যাও বেশি।

যেমন শহর সুন্দর, তেমন সুন্দর শহরতলী। ময়লা, আবর্জনা, আর দীনতার ছাপ কোথাও নেই। দু'পাশের বাড়ীগুলি ঠিক যেন সাজানো সেটিংস, ফুল-ফলের বাগানের মাঝে সাজিয়ে রাখা হয়েছে দর্শকদেরকে দেখবার জন্ত।

জিজ্ঞাসা করলাম—বাড়ীগুলো কাদের?

—আমাদের মতো অল্প আয়ের ওয়ার্কারদের। শহরে ত আমাদের থাকবার সামর্থ্য নেই। যুবকটি বল্লেন।

—কিছু যদি না মনে করেন, একটা কৌতূহল মেটাতে চাই।

—বলুন, কি জানতে চান।

—আপনার আয় কত?

—মাসিক হাজার দেড়েক ক্রোণা। যুবকটি বল্লেন।

—তাতে শহরে থাকা যায় না? জিজ্ঞাসা করলাম। সেটা আমাদের হিসেবে দেড় হাজার টাকারও বেশি।

যুবকটি বল্লেন—থাকা যে একেবারেই যায় না, তা নয়, তবে খুব কষ্ট করে থাকতে হয়, নুন আনতে পান্তা জোটে না। আমার স্ত্রীও চাকরি করেন। দুজনার আয়ে এই বাইরে বেশ আরামেই কাটাই। প্রতি-মাসে কিছু জমাতেও পারি। শহরে থাকলে তা পারতাম না।

কথা বলতে বলতে দুই-পাশের দ্রষ্টব্যগুলি তিনি দেখিয়ে তাদের পরিচয় দিয়ে যেতে লাগলেন। তারপর হঠাৎ বল্লেন—সুইডেন এসে তার সত্যিকারের পল্লী অঞ্চল না দেখলে সুইডেন দেখা হয় না। দেখবেন?

—কেমন করে?

—পরশু আমার এক বন্ধু যাচ্ছেন তাঁর বাড়ীতে, গ্রাটি পল্লী অঞ্চলে। আপনাদেরকে অতিথিরূপে পেলে খুব খুশি হবেন তিনি। যেতে চান ত আমি ব্যবস্থা করে দিতে পারি।

গোপাল আমার মুখের দিকে চেয়ে আমার মতামত জানতে চাইলেন।

আমি যুবকটিকে বল্লাম—আপনার ফোন নম্বরটা আমরা রেখে দি। কংগ্রেস কামাই করা উচিত হবে কিনা, তাই বুঝে নিয়ে আপনাকে কাল জানাবো আমরা যেতে পারব কিনা।

(ক্রমশঃ)

বিস্ময়

অনিলকুমার ভট্টাচার্য

যা দেখেছি তাতো তুমি নও,
যা ভেবেছি তাও তুমি নও!
অথচ তোমারে দেখি প্রত্যহের ভিড়ে
দিনগত পাপক্ষয়।
বস্তুতেই ঘিরে
জৈবিক চেতনাময়।
তুমি বুঝি আর কিছু নও!

ব্যথা পেয়ে কাঁদো তুমি
দুখের অতৃপ্ত ভূমি
এই বসুন্ধরা!
সুখ পেয়ে সুখী তুমি
রাঙা ঠোঁটে হাসি চুমি
সুধা মধুক্ষরা।
সংসারে সংসারী মন
আছো বুঝি অনুক্ষণ
দিন-রাত্রি একই প্রহর:
সমুদ্রে গর্জন নেই
মিশে আছো নদীতেই
যে-নদী তোলে না কোন ঝড়।

যা দেখেছি তাই শেষ নয়:
হঠাৎ তোমাতে দেখি আরেক প্রত্যয়!
সমুদ্র গর্জন করে
ঢেউগুলি ভাঙে গড়ে
চেতনায় আরেক বিস্ময়!
মনে হয় এ-জীবন নয়তো মাটির
তুমি—আমি নহি শুধু স্থির
রাত্রি-দিন সময়েতে লয়।

সমুদ্র গর্জন করে
আকাশ মেঘেতে ভরে
ভরে ওঠে মননের হৃদয়ের অনুভূতি প্রাণ।
দীপ্ত চোখে দেখি তোমা
অপরূপ মনোরমা
সাগর-পাখির ডানা মেলে নিই সমুদ্রের ঘ্রাণ
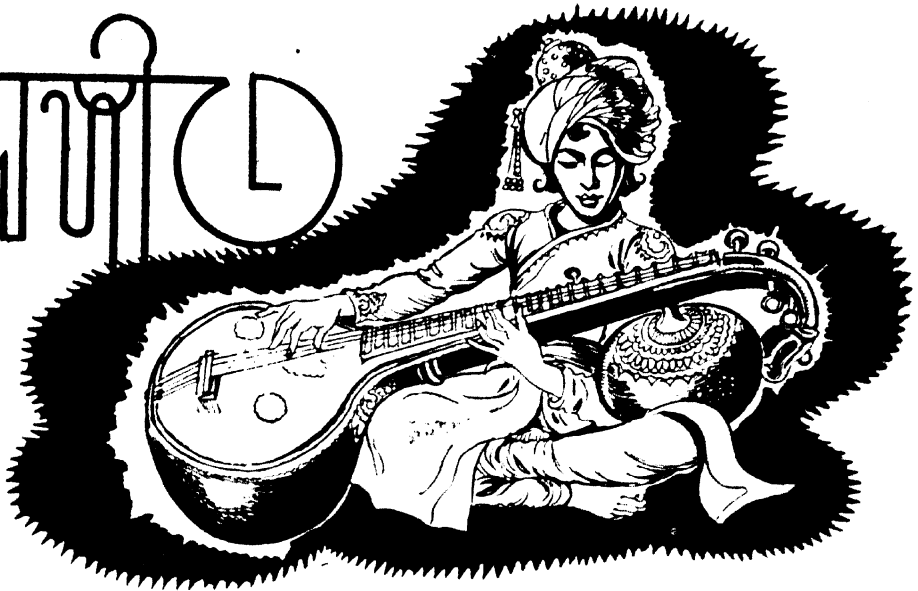
কথা-সঙ্গীত

তাল—দাদ্‌রা

(১)

তোমার পূজার কমলখানি
গাঁথি প্রেমের হারে।
পূজবো তোমায় ওগো প্রিয়,
রাখি হিয়ার দ্বারে॥

(২)

আনবে তুমি, প্রভাত বেলায়,
ফুলের বনে, বকুল তলায়,
তোমার অমল চরণখানি,
রাখি নদীর ধারে॥

(৩)

যে সুরে আজ বাজ্‌ছে বাঁশী
নীল গগনের কোণে।
মন-ভুলানো রবির কিরণ
লুটিয়ে পড়া বনে॥

(৪)

আজকে ওগো, আমার প্রিয়,
তোমার ও-সুর আমায় দিও।
সাধ্‌বো তোমার ও-সুরখানি,
বাঁধি হিয়ার তারে

কথা ও সুর ঃ ডাঃ মৃত্যুঞ্জয় ভট্টাচার্য্য   স্বরলিপি ঃ কল্যাণী দেবী

(১)

I স গ গ | ম প প I পধ প- ম | মগ ম ম
তো মা র পূ জা র ক ম ল্‌ খা নি ০

স গ গ | প মগ গম I র গ গ | - - -
গাঁ থি ০ প্রে মে র হা রে ০ ০ ০ ০

র র ম | প ধ ধ I মপধ ধ প | মগ ম ম
পূ জ্‌ বো তো মা য়্‌ ও ০ গো প্রি য় ০

স গ গ | প মগ গম I র গ গ | - - -
রা খি ০ হি য়া র দ্বা রে ০ ০ ০ ০

(২)

I র র ম | প ধ ধ I প ধ নর্স | ন র্স র্স I
আ স্ বে তু মি ০ প্র ভা ত বে লা য়্

ধ র্র র্র | ঋ র্র র্র I র্র্গ র্র র্স | ন র্স র্স
ফু লে র্ ব নে ০ ব কু ল্ ত লা য়

র্স র্স র্স | ন র্স র্স I র্সর্র র্স নো | ধ প -
তো মা র্ অ ম ল্ চ র ণ খা নি ০

স গ গ | প মগ গম I র গ গ | - - -
রা খি ০ ন দী র ধা রে ০ ০ ০ ০

(৩)

I স স স | ন্ স স I নস র র | ঋ র র I
যে ০ সু রে আ জ বা জ্ ছে বাঁ শী ০

স- র গ | ম প প I গ ম ম | - - -
নী ল্ গ গ নে র কো ণে ০ ০ ০ ০

র গ ম | প ধ ধনো I প ধপ ধনো | ধ প প
ম ন্ ভু লা নো ০ র বি র্ কি র ণ

প ধ প | ম গ ম I র গ গ | - - -
লু টি য়ে প ড়া ০ ব নে ০ ০ ০ ০

(৪) ২য় সুরে গেয়

I র র ম | প ধ ধ I প ধ নর্স | ন র্স র্স I
আ জ্ কে ও গো ০ আ মা র্ প্রি য় ০

ধ র্র র্র | ঋ র্র র্র I র্র্গ র্র র্স | ন র্স র্স
তো মা র ও সু র আ মা য় দি ও ০

র্স র্স র্স | ন র্স র্স I র্সর্র র্স নো | ধ প প
সা ধ বো তো মা র ও সু র খা নি ০

স গ গ | প মগ গম I র গ গ | - - -
বাঁ ধি ০ হি য়া র্ তা রে ০ ০ ০ ০

কোমল—রে=ঋ, কোমল নি=নো। উদারা—স্, মুদারা—স, তারা—র্স।

ভারতবর্ষ প্রিন্টিং ওয়ার্কস

ভরা নদী

ফটো : বিনয়ভূষণ দাস

রচনা ও সাহিত্য

উপানন্দ

তোমাদের মধ্যে অনেকেই মনের মধ্যে সাহিত্যিক হবার বাসনা পোষণ করে থাকো, তাই তোমাদের কাছে সাহিত্য সম্বন্ধে কিছু বলব।

বাইরের জগতের সঙ্গে মিলনের ভাব আছে বলেই সাহিত্য এত প্রিয়। রবীন্দ্রনাথ বলেছেন—'সহিত শব্দ হইতে সাহিত্য শব্দের উৎপত্তি। ধাতুগত অর্থ ধরিলে সাহিত্য শব্দের মধ্যে একটি মিলনের ভাব দেখিতে পাওয়া যায়। মানুষের প্রাণের কথার ধারক ও বাহক হচ্ছে সাহিত্য। এর উপযোগিতা আছে।

কবি কোল্‌রিজ বলেছেন—কাব্যের উদ্দেশ্য সত্য আবিষ্কার নয়—আনন্দ দানে। কবি কীট্‌স কাব্যে কোন উদ্দেশ্য বা মত প্রচারের চেষ্টা দেখলে তীব্র মন্তব্য প্রকাশ করতেন। যে লেখা মনে আনন্দ দেয়, সে লেখা বারে বারে পড়তে ইচ্ছে হয়। রস পাওয়া যায় বলেই তাই পড়বার আগ্রহ হয়। এই জন্যে ভাবের রস মূর্তিটী না গড়ে তুল্‌তে পারলে পাঠককে আনন্দ দেওয়া যায় না। অন্তরে উপলব্ধি না হোলে বা বুঝ্‌তে না পারলে আনন্দ পাওয়া যায় না। আনন্দ পাওয়া গেলে, তা প্রিয়, তা সুন্দর। ছেলেবেলা থেকেই মানুষের মন কল্পনাপ্রবণ, তার ভাবুক মনের পরিচয় ও অনেক সময় পাওয়া যায়। তাই সে মাকে প্রশ্ন করে—

'এলেম আমি কোথা থেকে
কোনখানে তুই কুড়িয়ে পেলি আমারে?'

ছেলেবেলায় ছেলে মেয়েদের কল্পনাপ্রবণ মন রূপকথার জগতে বাস করে, আর নানারকম আজগুবি কল্পনায় তাদের দিনগুলো চলে যায়। তারা নক্ষত্রদের সমবয়সী হয়, কানাই মাষ্টার সেজে বিড়াল ছানাকে পোড়ো মনে করে, মাকে নিয়ে পাল্‌কিতে চড়ে ভিন্ দেশেতে যায় তাঁর রক্ষক হয়ে, পথে চোর ডাকাত এলে বলে—'এই চেয়ে দেখ আমার তলোয়ার, টুকরো করে দেব তোদের বেঁধে।' এই সব ছেলে-মেয়ের মনের পথ ধরে যাঁরা শিশুর জীবন সত্তার মূলে দেখেছেন পরম রহস্য, তাঁরা সৃষ্টি করেছেন সেই সব রহস্য নিয়ে তাদের মনের মত করে গল্প, কবিতা, নাটক প্রভৃতি। তাঁরা শিশুর সঙ্গে শিশুর মত হয়ে এমন গল্প, কবিতা লিখেছেন, যা পড়ে ছেলে-মেয়েরা আনন্দে অভিভূত হয়েছে। শিশু সাহিত্যিকতার যথেষ্ট মূল্য রয়েছে, শিশুর ভাবুক মনের চিত্র যিনি ভাষায় রূপায়িত করতে পারেন, তাঁর সাহিত্য সমাদৃত হয়। শিশু সাহিত্যিকের যথেষ্ট কদর আছে। মেটারলিঙ্ক ব্লু বার্ড লিখে অমর হয়েছেন, পথের পাঁচালী লিখে বিভূতিভূষণ বিশ্বসাহিত্যে চিরস্মরণীয় ও চিরসমাদৃত, রবীন্দ্রনাথের স্থান শিশু সাহিত্যে উচ্চেই আছে—শিশুচিত্রঅঙ্কনে তাঁর বৈশিষ্ট্য বিস্ময়কর।

যাহোক বয়সের সঙ্গে সঙ্গে ছেলে-মেয়েদের কল্পনারাজ্যের পরিবর্তন হয়, জগৎ ও জীবন সম্বন্ধে তাদের মধ্যে জাগে নতুন দর্শন, সাহিত্যেরও ভিন্ন রূপ তাদের ভেতরে ধরা দেয়। ছেলে-মেয়েদের কল্পনা-জগতের কোন ভৌগোলিক সীমানা নেই, কিন্তু বড়দের কল্পনা-জগত সীমা থেকে অসীমের দিকে প্রসারিত হোলেও বিশেষ ভাব-ভাবনা ও ছন্দের মধ্য দিয়েই তার চিন্তার পরিধির ভেতর আবর্তিত হয়। বয়সের বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে চিন্তাধারাও স্তরে স্তরে পরিবর্তন লাভ করে।

প্রত্যেক লেখকেরই আছে তার সম্পদ। প্রত্যেক লেখার প্রকাশ ভঙ্গীতে থাকে স্বকীয়তা, ইংরাজীতে একে বলে 'অথেনটিসিটি।' এজিনিষটা না থাকলে সাহিত্য সাধনায় সমাদর পাওয়া যায় না, তা ছাড়া লেখার ভেতর রস বা ইমোশন না থাকলে, সে লেখা সাহিত্যের ক্ষেত্রে স্থান পায় না। রচনায় পরানুকরণপ্রিয়তা বর্জনীয়। জীবনকে বাদ দিয়ে আজও পর্যন্ত কোন শ্রেষ্ঠ সাহিত্য হোতে পারেনি। চিন্তা নিয়েই মানুষের মন সর্বদাই ব্যস্ত। মনের বিশ্রাম নেই, ঘুমিয়ে ও সে দেখে নানা স্বপ্ন। মনটাকে সাহিত্য সৃষ্টির মেজাজে আন্‌তে হোলে, বিশেষভাবে জগৎ ও জীবন, সমাজও সংসার সম্পর্কে বোধ থাকা চাই, হৃদয় দিয়ে এদের জানা চাই। মানুষের হৃদয়ের ভাষাই সাহিত্যকে রূপ দিয়ে থাকে। জেনে রেখো, সাহিত্য হচ্ছে মানুষের অন্তরের বিক্ষিপ্ত ও ক্ষণিক অনুভূতির

সংক্ষিপ্ত ও স্থায়ী ইতিহাস। আবেগ ও কল্পনার আতিশয্য অনেক সময় রচনার শিল্প-সৌন্দর্য্য নষ্ট করে, সুতরাং লিখতে বসে আবেগ ও কল্পনাকে সংযত করা উচিত। একই কথা একাধিকবার বলা অনুচিত। শব্দ শিল্প-কৌশলটী জেনে রাখা দরকার সাহিত্য রচনায় প্রয়োগ করবার জন্যে, আর ভাব-দৈন্য যাতে লেখার মধ্যে না থাকে, সেদিকেও দৃষ্টি রাখা দরকার। কথাগুলি যেন আবোল তাবোল না হয়ে যায়।

অতীতের সমগ্র চেহারা দেখ্‌তে হোলে, মনে রেখো বর্ত্তমান ও ভবিষ্যতের ভেতর দিয়ে অতীত নিরত আপনাকে গড়ে তুলছে—বর্ত্তমান ও ভবিষ্যতের সংঘাতে অতীতের রূপান্তর ঘটে। জগৎ যথার্থ কিনা এটা সাহিত্যের প্রশ্ন নয়—জগৎ কেমন মনে হয়, তাই হচ্ছে সাহিত্যের প্রশ্ন। মানুষকে ভালো করার দিকটায় যে দায়িত্ব আছে, সে দায়িত্ব সাহিত্যের নয়—মানুষের পরিচয় দেওয়াটাই হচ্ছে তার কাজ। সাহিত্যিকরা জীবন-পুরোহিত।

রবীন্দ্রনাথও বলেছেন সাহিত্যে মানুষকে প্রকাশ করে। সাহিত্য-সাধনা অনেকটা যোগ সাধনারই মত। সাহিত্য সাহিত্যিকের ব্যক্তিত্বের প্রকাশ হোলেও এটা মানুষেরই প্রকাশ। দস্যু রত্নাকরকে মহাকবি বাল্মীকিতে পরিণত করেছে সাহিত্য, এরই প্রভাবে লক্ষ্যহীন মূর্খ কালিদাস মহাকবির আসনে বসেছেন, আর ভবঘুরে গোল্ডস্মিথ হয়েছেন ভদ্র। আগামী দিনের বাস্তব কল্যাণ সত্তা নির্ভর করছে বর্ত্তমানের স্বাধীন চিন্তার কল্যাণ অভিব্যক্তির মধ্যে। যুগকে এড়িয়ে চলাটা সাহিত্যিকের ধর্ম্ম নয়।

সাহিত্য সৃষ্টির পক্ষে আজকের দিনে তোমাদের উচিত ভাবনার বিশুদ্ধতা বজায় রাখা। জীবনকে সুন্দরভাবে প্রতিফলিত করাই সাহিত্যিকতার মর্ম্ম কথা। শুধু ভঙ্গী দিয়ে এমন রচনা করোনা যা মন ভুলানোতেই পর্য্যবসিত হয়। কেননা সাময়িকভাবে বাহবা পেলেও পরে কেউ এ রচনার খোঁজও করবে না। রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, যেখানে লেখক নিজের ভাবনায় সমগ্র মানুষের ভাব অনুভব করেছে, নিজের লেখায় সমগ্র মানুষের বেদনা প্রকাশ করেছে সেখানেই তার লেখা সাহিত্যে জায়গা পেয়েছে।

যে ভাবটি মানুষের কাছে বেশী সত্য, সেইটেই দেয় তাকে বেশী আনন্দ—আর সেইভাবটাই হৃদয় দিয়ে উপলব্ধি করা হোলে তা লেখকের মর্ম্মগত সত্য বলে গ্রাহ্য হয়। সাহিত্য রচনা করতে হোলে ভালো ভালো সাহিত্যিকের গ্রন্থ পড়া দরকার; কিভাবে তাঁরা মনের ভাব প্রকাশ করেছেন, কি ভাবে তাঁদের কথাগুলি রসে ভরে উঠেছে, কিভাবে লেখার ভেতর দিয়ে সাহিত্য শিল্পশ্রী ফুটে উঠেছে, সেগুলি তোমরা লক্ষ্য করবে। যেমন ধর ছোট গল্প—জীবনের একটুকরো অংশই ছোট গল্পে রূপ নেয়—অনাবশ্যক কাহিনী, অনাবশ্যক চরিত্র সৃষ্টি এর মধ্যে চল্‌বে না—নানা আভাসে, ইঙ্গিতে, ব্যঞ্জনায় স্বল্পতর পরিসরের মধ্যে ছোট গল্পকে রূপ দিতে হবে। ছোট গল্প লিখ্‌তে হোলে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি ও মনন, গভীর অনুভূতি ও আন্তরিক পরিবেশ থাকা চাই, আর জগৎ ও জীবন সম্বন্ধেও অভিজ্ঞতা থাকা চাই। কবিতা লিখ্‌তে গেলে ছন্দ ও যতি, ভাব ও ভাষার সম্বন্ধে জ্ঞান থাকা চাই—আর কাণের হুঁস থাকা দরকার। যার কাণের ঠিক নেই, তার তালের ও ঠিক নেই। তার পক্ষে কবিতা লিখ্‌তে যাওয়া বাতুলতা মাত্র। তা ছাড়া মিত্রাক্ষর ছন্দে কবিতা লিখ্‌তে গেলে উৎকৃষ্ট মিল থাকা চাই, গদ্য কবিতা লিখতে গেলে যতিজ্ঞান থাকা দরকার। যে লেখায় রস থাকে না, সে লেখা সাহিত্যে স্থান পায় না। উপন্যাস রচনায় প্লট বা ঘটনা সমাবেশ যেমন থাক্‌বে, চরিত্র সৃষ্টিতেও তেমনি থাকবে দক্ষতা—যাতে প্রতিঘাতে কাহিনী মনোরম হয়ে ওঠে। পর্য্যবেক্ষণ শক্তি না থাক্‌লে উপন্যাস রচনায় সাফল্য লাভ হয় না। প্রবন্ধ রচনায় অনর্থক উচ্ছ্বাস বা আতিশয্য দোষ যেন না থাকে। প্রবন্ধের আরম্ভ ও শেষ চিত্তাকর্ষক হওয়া চাই, শেষটা শুধু চিত্তাকর্ষক কর্‌লেই চল্‌বে না, তা যেন বেশ সারবান হয়। লিখ্‌বার আগে ভেবে নেবে বিষয়টী সম্বন্ধে—নানা দিক দিয়ে ভাবলেই ভাব সংগ্রহ হবে—রচনার জন্যে উপকরণ সংগ্রহ হচ্ছে ভাব-সংগ্রহ। এইরূপে সংগ্রহ করে সেগুলিকে সাজাবে এই ভাব সন্নিবেশের মধ্য দিয়ে সম্প্রসারিত করে তুল্‌বে রচনাটি—যাতে চিন্তার স্বচ্ছ প্রবাহ লেখার মধ্যে ফুটে ওঠে, আর একটা অখণ্ড ঐক্য নিয়ে লেখা রস-সৌন্দর্য্যে মনোরম হয়ে ওঠে—রচনাটী সুসঙ্গত উপসংহারে এসে দাঁড়ায়। বঙ্কিমচন্দ্র বলেছেন—'বিষয় অনুসারে রচনার ভাষার উচ্চতা বা সামান্যতা নির্দ্ধারিত হওয়া উচিত—'চল্‌তি ভাষায় লিখ্‌তে হোলে সেই ভাষাতেই লিখবে—মার্জ্জিত ভাষার সঙ্গে এর সংমিশ্রণ হোলে 'গুরু চণ্ডালী' দোষ হয়, এ ভাষায় রচনা কর্‌লে প্রশংসা পাবে না। বঙ্কিমচন্দ্র বলেছেন—'রচনার প্রধান গুণ এবং প্রথম প্রয়োজন সরলতা এবং স্পষ্টতা—'এই সরলতা ও স্পষ্টতার সঙ্গে রস সৌন্দর্য্য প্রকাশ কর্‌তে পার্‌লেই রচনার সৃষ্টি সার্থকতা স্বীকৃত হবে সাহিত্য সমাজে।

রবীন্দ্রনাথের 'কাব্যে উপেক্ষিতা' আর বঙ্কিমচন্দ্রের 'কৃষ্ণ চরিত্র' দুটোই সমালোচনামূলক প্রবন্ধ, আর এই দুটোই অপূর্ব্ব সাহিত্য হয়েছে। তোমরা এইরকম উৎকৃষ্ট প্রবন্ধ পড়বে। বিশুদ্ধ সাহিত্যানুরাগ, বিচিত্র অভিজ্ঞতা ও উপলব্ধিকে আশ্রয় করে তোমরা সাহিত্য সৃষ্টির পথে অগ্রসর হও এইটাই আন্তরিকভাবে কামনা করে আমার বক্তব্যের উপসংহার করছি।

ছেলে সামলাও

শ্রীপ্রভাতকিরণ বসু (কাকাবাবু)

ছেলে যেই হামাগুড়ি দিতে শিখলো অমনি তার দাপাদাপি সুরু হল। যদি কাউকে শুয়ে থাকতে দেখে, মাথায় গিয়ে চটাপট মারবে চাঁটি। চুল ধরে জোরসে টানবে, বলবে ওতো, ওতো। ইলেকট্রিক ষ্টোভ গরম হ'য়ে রাঙা হ'য়ে উঠেছে, ধব্ ধব্ ধর স্বর করতে করতে তাতে গিয়ে থপ্ ক'রে হাত দিয়েছে, সঙ্গে সঙ্গে কচি হাতে ফোস্কা, তা থেকে দগ্‌দগে ঘা। ঘরে যা সে পাবে, বল, খেলনা, গেলাস, ঘটি বারান্দার রেলিঙের ফাঁক দিয়ে রাস্তায় ফেলে দেবে। নিত্য প্রলয়কাণ্ড ঘটায় ব'লে নাম রাখা হল প্রলয়।

প্রলয় বড়ো হল, স্কুলে গেল। সখ হল সাঁতার শিখবে পাড়াগাঁয়ে মামার বাড়ীতে গিয়ে পানাপুকুরে। ম্যালেরিয়ার ভয় দেখিয়ে তখন তো তাকে যেতে দেওয়া হল না। ছেলে বললে, তবে কলকাতায়ই শিখব আজাদহিন্দ বাগে। কারো কথা শুনল না, কারো কথা মানলো না, পাঁচ টাকা দিয়ে হঠাৎ একদিন ভর্তি হয়ে এলো। রোজ বিকেলে যায়, জলে ঝাঁপাই ছোড়ে। ওর বন্ধু নির্মল, তারই ঝোঁক বেশী। সেই ওকে নাচিয়েছে। সাঁতার কেটে এসে সন্ধ্যেবেলা ঘুম পায়, পড়ায় মন বসে না। বাপ মা কতো বারণ করে— সাঁতার কেটে আর কাজ নেই, খানিকটা তো শেখা হয়েছে, ঐ থাক্, কোনদিন অসুখে পড়বি! ছেলে তবু যায়।

একদিন মুখ চুণ করে ফিরে এসে বললে—মা, আর সাঁতার কাটতে যাব না।

কেন রে কি হল? হঠাৎ এমন সুবুদ্ধি? মার প্রশ্ন। নির্মল ডুবে গেছে আজ।

ডুবে গেছে? বেঁচে আছে তো?

না ম'রে গেছে।

আহা রে!

তারপর তার ঘুড়ি ওড়ানোর সখ জাগলো। ঝাঁ ঝাঁ করছে রোদ্দুর, দুপুরবেলা ছুটে যাবে শিবাজীদের বাড়ীতে। তাদের মস্ত ছাদে ঘুড়ি ওড়ানোর সুবিধা। বৈশেখ গেল, জষ্ঠি গেল, আষাঢ় শ্রাবণের বর্ষার দিন, ঘুড়ি ওড়ানো চলেইছে। ভাদ্রের চড়া রোদ এলো, বিশ্বকর্মা পুজোর তোড় জোড়ে মাঞ্জা দেওয়া মুখপোড়া, চাঁদিয়াল, পেটকাটা, সতরঞ্চি, চিত্রবিচিত্র—ঘুড়ির পাহাড় জমে উঠ্‌লো, জল-খাবারের পয়সা বাঁচিয়ে বাঁচিয়ে। মার কথা কানে যায় না। অসুখ করবে, কোন্ দিন কি দুর্ঘটনা ঘটবে—কে শোনে কার কথা?

সেদিন সন্ধ্যার মুখে শিবাজী চারতলার ছাদের আলসে থেকে তিনতলার ছাদে পড়লো চিৎপাত হ'য়ে। ডাক্তার এসে মাথায় আইওডিন লাগিয়ে চুপচাপ শুয়ে থাকতে বললে, বিশেষ কিছু লাগেনি। শিবাজীর বাবা এসে খুব বকলে, বললে—আর ঘুড়ি ওড়াতে যাবি তো ঠ্যাং ভেঙে দোব। ছেলে চুপ করে থাকে। রাত্রে শিবাজীর গা বরফের মতন ঠাণ্ডা, তার মা চম্‌কে উঠে চীৎকার করে।

প্রলয় ঘুড়ি লাটাই ফেলে দিয়ে মার কাছে এসে কাঁদে, শিবাজী চ'লে গেল। আর আমি ঘুড়ি ওড়াব না।

বারো বছরের ছেলে লুকিয়ে সাইকেল চড়তে শেখে। মা শুনে রাগ করে। বলে কলকাতার রাস্তায় বড় বিপদ। ও কক্ষি করিসনি।

ছেলে বলে, একদিন সাইকেল ভাড়া ক'রে ব্যারাকপুর যাব।

মা শুনে কত রাগ করে।

ছেলে রবীন্দ্রনাথের কথায় বলে,

> সাতকোটি সন্তানেরে হে মুগ্ধ জননী,
> রেখেছ বাঙালী ক'রে, মানুষ করোনি।

শোনবার ছেলে নয়। রবীন্দ্রনাথ কি ভেবে ওকথা লিখে-ছেন, তাও বোঝবার ছেলে নয় প্রলয়।

একদিন ভোরবেলা মাস্‌তুতো ভাই প্রদীপের সঙ্গে ও বেরোলো চুপি চুপি। প্রদীপের নিজের সাইকেল, তিনশো টাকায় নতুন কেনা, প্রলয়ের ভাড়া-করা পুরোন সাইকেল, তার ব্রেকও ভালো নয়।

প্রদীপও বেরিয়েছে বাপ মাকে না জানিয়ে। প্রলয়ও তাই।

ব্যারাকপুর ট্রাঙ্ক রোডে হঠাৎ একটা শব্দ হয়, প্রলয় ফিরে দেখে প্রদীপের সাইকেল ছিট্‌কে রাস্তার পাশে চ'লে

গেছে, আর প্রদীপের পিঠের ওপর দিয়ে লরীর একটা চাকা চ'লে গেল চোখের নিমেষে। ধুলোর ঝড় উড়িয়ে তীরবেগে তো লরী পালালো।

লোকজন ডাকাডাকি। বাড়ীতে খবর দেওয়া। শহরের প্রান্তে এক হাঁসপাতাল। ডাক্তারেরা নির্লিপ্ত, এরকম কাণ্ড তো রোজ ২।৪টে দেখছে। বললে, ক্যাবিনের দশদিনের ষাট টাকা আগে জমা দাও। ওষুধ ইন্‌জেকশন তুলো সব নিয়ে এসো বাইরে থেকে। এক্সরে-খরচ ৩১৫৲, ব্যাণ্ডেজ ১৫০৲!

এর নাম হাঁসপাতাল? এর জন্তেই লোকে কত টাকা দেয়, যাতে গরীবের ভালো চিকিৎসা হয়!

প্রলয় বলে—ভিখিরীদের কিরকম চিকিৎসা হয়?

ভিখিরীদের মতন।

হাউস সার্জ্জেনের চমৎকার উত্তর।

দশদিনে ওরা হাঁসপাতাল থেকে বার ক'রে দিলে। তখনো প্রদীপের বুকে ব্যথা। ছোক্‌রা ডাক্তার বুড়ো ডাক্তার বকে—ও কিছু নয়। নাইতে খেতে সেরে যাবে।

বাড়ী ফিরে এলো প্রদীপ। আবার অসহ্য ব্যথা, অসহ্য কষ্ট। এবার শহরের মাঝখানের হাঁসপাতাল। ছোক্‌রা ডাক্তার বুড়ো ডাক্তার বলে, কিছুই নয়। এ রকম রোগী আমরা ভর্ত্তিই করি না।

তারপর গঙ্গার ধারের হাঁসপাতাল। সেখানেও এক কথা। কিছুই নয়।

তারপর হাড়ের যে স্পেশালিষ্ট—সেই ডাক্তারের কাছে, ৩০০৲ খরচ ক'রে এক্সরে ক'রে জানা গেল পাঁজরার হাড় ভেঙে গেছে, নার্সিং হোমে থাকতে হবে। হাজার টাকা লাগ্‌বে।

তাহলে এতগুলো হাঁসপাতালের এতগুলো ডাক্তার কী দেখলে? এত টাকা খরচ ক'রে এত ছুটোছুটি ক'রে এত বড় বিরাট শহরে সত্যিকারের চিকিৎসা নেই! এত ভাঁওতা, এত অজ্ঞতা, এত হৃদয়হীনতা!

প্রলয় মার কাছে ফিরে এলো। চুপ ক'রে ব'সে রইলো।

কেন মা রাতদিন টিক্‌টিক্ করে, কেন সাবধান ক'রে, হয়তো এইবার বুঝলো।

ছোট ছেলের বিপদ চারিদিকে।

সাবধানের মার নেই, এইজন্তে গুরুজনরা এত সাবধান করেন রাতদিন।

রবীন্দ্রনাথ বলেছেন—মারেরও সাবধান নেই। নইলে কালীমন্দিরের মধ্যে ঢুকে যে ছেলেটি মাটিতে মাথা ঠেকিয়ে প্রণাম করছিলো বাগবাজারের রাস্তায়, সেখানে একটা বাস্ ফুটপাথে উঠে, মন্দিরের দরজা ভেঙে ঢুকে তাকে কি ক'রে চাপা দিলে? ড্রাইভারের জেল হল, কিন্তু বিধবার সন্তান তো ফির্‌ল না!

যাই হোক্, প্রলয় আর দুষ্টুমি করে না। লোকে দেখলে মনে করবে, ওর নাম বুঝি শান্তশীল।

প্রলয়ের দাদা একটা কবিতা লিখে দিলে ওকে মুখস্ত করবার জন্তে। সেটা ও বাঁধিয়ে রাখলো। কবিতাটা এই—

ঘুড়ি ওড়ানোর সাঁতার কাটার
সাইকেল চালানোর—
বাড়াবাড়ি মোটে ভালো নয়, এটা
যেন মনে থাকে তোর!
বেশী ডাক্তার বোঝে না কিছুই—
হৃদয়হীনের দল।
দুর্ঘটনাকে আনিস্‌নি ডেকে,
পথে সাবধানে চল্।
বাসে ট্রামে ঝোলা পৌরুষ নয়,
নেই বাহাদুরী নামে।
কবির বাঙালী বীর দেখা গেল—
নেতাজীর সংগ্রামে।

পথিকের গান

শ্রীশৈলেনকুমার দত্ত

নতুন যুগের পথিক মোরাই নতুন পথেই চলি—
ভয় ভাবনার লজ্জা নিরাশ সদাই দুপায় দলি।
বাধার প্রাচীর দু'খান করে আঁধার নিশায় প্রদীপ ধরে
আমরা চলি নতুন পথিক আজ ফোটা ফুল কলি।

হাতছানি দেয় পিছন থেকে শান্ত লাজুক ভাই
সদাই ডাকে ঘরের কোণে ফেরার কথাই পাই।

তবুও মোরা না শুনে সেই এগিয়ে চলি এই পথেতেই
পাষাণ বাধা বক্ষে সাহস—নিষ্ঠা পরাণটাই।

জাতিভেদের প্রাচীর ভাঙি—হস্তে বাঁধি রাখী—
গোপন মনের ক্ষেত্রার নেশা দু-হাত দিয়েই ঢাকি।
পথের কাঁটা দলিয়ে পায়ে পাল তুলে দেই আশার নায়ে
নতুন যুগের ডাক পেয়েছি—ভুল করে আর থাকি।

শান্ত জলেও তুফান ওঠে আকাশ ঘনায় মেঘে—
তবুও যে হায় আমরা এগোই নিত্য নতুন বেগে।
প্রলয় ঝড়েও সবুজ নিশান বাজায় সুরে আপন বিষাণ
আঁধার রাতের আমরা পথিক সদাই যে রই জেগে।

দুই বন্ধু

[মালয় দেশের রূপকথা]

শ্রীসুলতা কর এম-এ

গভীর এক বনে প্রকাণ্ড এক বটগাছ থেকে মস্তবড় একটি বটের পাতা টুপ করে নীচে খসে পড়ল। পাতাটি পড়ে আছে ত আছেই। ভারী একলা লাগছে তার। কোথাও আর একটাও পাতা পড়ে নেই, কার সঙ্গেই বা কথা বলে। চারদিকে সে চেয়ে দেখছে আর ভাবছে—একটা যদি কোন সঙ্গী পাই ত বেশ হয়। এমন সময় দেখে ঠিক তার কাছেই বেশ বড় আর শক্ত একটা মাটীর ঢেলা, মাটীতে পড়ে গড়াগড়ি দিচ্ছে।

বটের পাতা জিজ্ঞেস করল—"কে ভাই তুমি? একলাটি শুয়ে আছ কেন?"

মাটীর ঢেলা বলল—"আমি হলাম মাটীর ঢেলা। অনেক দূর দেশে আমার বাড়ী। একটা গাধার পিঠে চড়ে আমি আর আমার কত্তা, বাবা, ভাই, বোন সবাই মিলে বেড়াতে যাচ্ছিলাম। হঠাৎ আমি গাধার পিঠ থেকে পড়ে গেলাম এই বনের ভিতর। এখানে একলাটি পড়ে আছি কি খারাপ যে লাগছে। কেউ সঙ্গী, সাথী নেই। হ্যাঁ ভাই বটগাছের পাতা, তুমি আমার বন্ধু হবে?"

বটের পাতা বলল—"আমারও তোমারই মত অবস্থা। বটগাছ থেকে খসে এই জঙ্গলে পড়লাম! আর সব পাতারা গাছের ডালেই রইল। একলাটি সময় আর কাটে না। তুমি যদি আমার বন্ধু হও, তাহলে খুব আনন্দ হবে।"

মাটীর ঢেলা বলল—"তাহলে আজ থেকে দুজনে দুজনের বন্ধু হলাম।"

বটের পাতা বলল—"কিন্তু তার আগে এস প্রতিজ্ঞা করি—যে যতই বিপদ হোক না কেন, আমরা কেউ কাউকে ছেড়ে যাব না। চিরকাল বন্ধু থাকব।"

মাটীর ঢেলা তখন সেই প্রতিজ্ঞা করল।

এরপর থেকে বটের পাতা আর মাটীর ঢেলার সময় খুব ভাল কাটতে লাগল। তাদের আর একটুও একলা বলে মনে হয়না। সারাক্ষণ দুজনে গল্প করে।

অনেকদিন কেটে যাবার পর বটের পাতা আর মাটীর ঢেলা অন্য দেশে বেড়াতে চলল। বন ছেড়ে খানিকটা দূর যেই এসেছে অমনি আকাশ ঘোর কালো মেঘে ঢেকে গেল। কড়্‌কড়্‌ শব্দে বাজ পড়তে লাগল।

ঝম্‌ঝম্‌ শব্দে বৃষ্টি নামল। ভয়ে আঁতকে উঠে মাটীর ঢেলা বলল—"বন্ধু বটের পাতা, এবার আমি প্রাণে মারা গেলাম। বৃষ্টির জলের তোড় আমাকে গলিয়ে মাটীর সঙ্গে মিশিয়ে দেবে।"

বটের পাতা বলল—"কিচ্ছু ভয় নেই। আমি তোমার বন্ধু। দেখ, কেমন করে তোমায় বাঁচাই।" এই বলে বটের পাতা উড়ে এসে মাটীর ঢেলার উপর চড়ে বসল। তারপর নিজের প্রকাণ্ড শরীর দিয়ে মাটীর ঢেলাকে বেশ করে জড়িয়ে ধরল।

ওদিকে তখন খুব জোরে বৃষ্টি পড়ছে। কিন্তু পুরু বটপাতা জড়ান মাটীর ঢেলার গায়ে এক ফোঁটাও জল লাগছে না। কতক্ষণ বাদে বৃষ্টি ধরে গেল। রোদ উঠল। তখন বটের পাতা মাটীর ঢেলাকে ছেড়ে দিল।

মাটীর ঢেলা বলল—"বন্ধু, যা উপকার আজ করলে। তুমিই ভাই আমার প্রাণটা বাঁচালে।"

বটের পাতা বলল—"ও কথা বলছ কেন? আমরা দুজনে বন্ধু সে ত জানই। আমাদের বন্ধুত্ব যদি ঠিক থাকে ত ঝড় বৃষ্টি আমাদের কোন ক্ষতি করতে পারবে না।"

দুই বন্ধুতে আবার পথে বেরোল। বেশ খানিকটা

রাস্তা চলে এসেছে এমন সময় হঠাৎ এক ভীষণ ঝড় উঠল। ঝড়ের তর্জ্জন-গর্জ্জন দেখে ভয়ে বটের পাতা থর থর করে কাঁপতে কাঁপতে মাটীর ঢেলাকে বলল—"বন্ধু, এবার আমি প্রাণে মারা গেলাম। এই ঝড়ের মুখে পড়ে আমার মত ছোট্ট পাতা আর কতক্ষণ যুদ্ধ করবে।" মাটীর ঢেলা বলল—"কিচ্ছু ভয় নেই। দেখ আমি কি করি।"

এই বলে মাটীর ঢেলা গড়িয়ে গড়িয়ে এসে বটের পাতার উপর চেপে বসল। ঝড়ের যতই দাপট বাড়তে লাগল ততই সে তার বন্ধু বটের পাতাকে প্রাণপণে চেপে ধরতে লাগল। ঝড় কিছুতেই পাতাটিকে ওড়াতে পারল না। তারপর যখন ঝড় থেমে গেল তখন দেখা গেল পাতাটির গায়ে একটুও আঁচড় লাগেনি।

এখন ঝড়ের দেবতা আর বৃষ্টির দেবতা এঁরা দুজনেই যেমন রাগী আর তেমনি দাম্ভিক ছিলেন। এঁরা ভাবতেন যে আমরা হলাম পৃথিবীর রাজা। যাকে ইচ্ছা হয় মারব, যাকে ইচ্ছে হয় রাখব।

ছোট একটা বটের পাতা আর এতটুকু একটা মাটীর ঢেলার কাছে এ রকম প্রচণ্ড ঝড় বৃষ্টি হেরে গেল দেখে তাঁরা খুব রেগে উঠলেন। ঝড়ের দেবতা বৃষ্টির দেবতাকে বললেন—"এদের এই বন্ধুত্বের জন্যেই আমরা হেরে গেলাম। এস এদের বন্ধুত্ব ভাঙবার চেষ্টা করি।" বৃষ্টির দেবতা বললেন—"ঠিক বলেছ। চল প্রথমে বটের পাতার কাছে যাই।"

দুই দেবতা বটের পাতার কাছে গিয়ে বললেন—"ওগো বটের পাতা, তুমি ওই কাদার ঢেলাটার সঙ্গে বন্ধুত্ব করো না। ওর প্রাণ বাঁচাবার চেষ্টা করোনা। ও সব সময় তোমাকে মেরে ফেলবার ফন্দী আঁটছে।"

দেবতাদের কথা শুনে বটের পাতা রেগে উঠে বলল—"কে আপনারা? বন্ধুর নামে নিন্দা করে আমাদের মধ্যে বন্ধুত্ব ভাঙাবার চেষ্টা করছেন। চলে যান বলছি এখান থেকে।"

ঝড়ের দেবতা আর বৃষ্টির দেবতা দেখলেন বটের পাতা তাঁদের দুষ্ট ফন্দী ঠিক ধরে ফেলেছে। কাজেই তাঁরা ছুটে পালিয়ে গেলেন।

এবার দুই দেবতা খুব সুন্দর দুই দেবদূতের রূপ ধরে ধরে মাটীর ঢেলার কাছে গিয়ে বললেন—"ওগো মাটীর ঢেলা, আমরা স্বর্গের দেবদূত। তোমাকে বর দিতে এসেছি।"

মাটীর ঢেলা সুন্দর দেবদূতদের দেখে অবাক হয়ে চেয়ে রইল। তারপর মাটীতে গড়াগড়ি দিয়ে প্রণাম করে বলল—"হে স্বর্গের দেবদূতেরা, আপনাদের সন্তুষ্ট করবার জন্য কি করতে হবে বলুন।" মিষ্টি হেসে দুই দেবতা বললেন—"দেখ মাটীর ঢেলা, ওই যে বটের পাতা তোমার পাশে রয়েছে, আমরা ওকে মেরে ফেলব। তুমি ভাই আমাদের এ কাজে বাধা দিও না। যদি বাধা না দাও তাহলে তোমাকে স্বর্গে নিয়ে যাব। স্বর্গে পৌঁছেই তুমি সোনার ঢেলা হয়ে যাবে আর মাটীর ঢেলা থাকবে না। আর তখন দেবতারা তোমায় কত আদর করবেন। কেমন রাজী ত?

মাটীর ঢেলা খুব লোভী ছিল। সে ভাবল কি হবে বটের পাতার সঙ্গে বন্ধুত্ব বজায় রেখে। দেবদূতদের কথা শুনলে মাটীর ঢেলার বদলে সোনার ঢেলা হব, স্বর্গে গিয়ে দেবতাদের আদর পাব। তাড়াতাড়ি সে বলে উঠল—"দেবদূতেরা, আমি আপনাদের কথায় রাজী হলাম।" মাটীর ঢেলার কথা শেষ হতে না হতেই আকাশ কালো মেঘে ঢেকে গেল।

দেবদূতেরা সেই মেঘের ভিতর মিলিয়ে গেলেন। তারপর প্রচণ্ড তেজে ছুটে এল ঝড়। সোঁ সোঁ শব্দে সেই ঝড় বটের পাতাকে উড়িয়ে নিয়ে চলল।

বটের পাতা চীৎকার করে উঠল—"বন্ধু, মাটীর ঢেলা—প্রাণ বাঁচাও ভাই প্রাণ বাঁচাও।" কিন্তু মাটীর ঢেলা বটের পাতার এত ডাকেতে সাড়াও দিল না, গড়িয়ে এসে বটের পাতার উপর চেপে বসল না। বেচারী বটের পাতা ঝড়ের বেগে উড়ে সমুদ্রের জলে গিয়ে পড়ল। তারপর কোথায় যে ভেসে গেল কে জানে।

ঝড় থেমে গেল। তখন এল ভীষণ জোরে বৃষ্টি। বৃষ্টির জলের মুখে পড়ে মাটীর ঢেলা গলে মাটীর সঙ্গে মিশিয়ে যেতে লাগল। আর সেই সঙ্গে চীৎকার করতে লাগল—"ওগো দেবদূতেরা, আমাকে বাঁচাও।" মাটীর ঢেলার চীৎকার শুনে ঝড়ের দেবতা আর বৃষ্টির দেবতা আকাশ থেকে বললেন—"ওরে বিশ্বাসঘাতক, বন্ধুত্ব ভাঙলে এমনি শাস্তিই পেতে হয়। আমরা হলাম ঝড়ের

আর বৃষ্টির দেবতা। তোদের বন্ধুত্বের জোরে আমাদের সব ক্ষমতা নষ্ট হয়ে গেছল। এখন বন্ধুত্ব ভাঙলি বলে নিজেও মরলি আর বন্ধুকেও মারলি।" এই বলে দুই দেবতা চলে গেলেন। মাটীর ঢেলাও গলে মাটীতে মিশিয়ে গেল।

ভীষণ ব্যাপার !

শ্রীরবিদাস সাহারায়

ভীষণ ব্যাপার বলি তোমাদের কাছে,
কাল রাতে এ বাড়ীতে কি যে ঘটিয়াছে।
তখন অনেক রাত—পাড়াটি নিঝুম,
দোর এঁটে শুয়ে আছি চোখভরা ঘুম।
খুকুমণি দিয়ে ওঠে সহসা চিৎকার,
লাফ দিয়ে উঠে ভাবি—হল কি ব্যাপার!

দেখি খুকু বিছানায় উঠে বসে আছে,
তাড়াতাড়ি ছুটে সবে যাই তার কাছে।
ফোঁপিয়ে ফোঁপিয়ে কেঁদে খুকু শুধু বলে—
"সব কিছু নিয়ে মোর চোর গেল চলে।
বাক্সেতে রেখেছিনু যে সব পুতুল
চোর তাই নিয়ে গেছে, করেনি তো ভুল।
পুতুলের ধুতি-শাড়ী জামা যত ছিল,
চুপি চুপি চোর এসে সব নিয়ে নিল।"

বলে আর খুকুমণি কাঁদে অবিরত,
এদিক ওদিক মোরা খুঁজে দেখি কত।
পুতুল ওসব কিছু আছে ঠিক ঠাঁই;
—চোর কোথা দিয়ে এল? খুকুকে শুধাই।

খুকু বলে—"এখুনি তো ঘুমের মাঝেই
দেখেছি এসব আমি ভুল কিছু নেই।"

কর্ম্মফল

শ্রীমতী ফুল্লরা রায়

গৌতমী নামে এক তাপসীর একমাত্র পুত্রকে সাপে কামড়িয়েছে, বিষের প্রভাবে তখনই পুত্রটির মৃত্যু হ'ল। গৌতমী পুত্রটিকে বক্ষে ধরে বসে আছেন। এক ব্যাধ প্রত্যেকদিন তাঁকে প্রণাম ক'রে বনে মৃগয়ায় প্রবেশ করত।

তাঁকে ঐ অবস্থায় দেখে ব্যাধ প্রশ্ন করল—'আপনার ছেলের কি হয়েছে?'

গৌতমী বললেন—'বৎস, আমার পুত্রটি এইমাত্র সর্প-দংশনে মারা গেছে, এর সৎকার করতে হবে, তাই ভাবছি।'

সর্প দংশনের কথা শুনে তখনই ব্যাধ গর্ত খুঁড়ে সেই সাপটিকেই ধরে নিয়ে এসে বল্ল—'বলুন মা, কি ক'রে একে হত্যা করব, টুকরো টুকরো ক'রে কাটব, না আগুনে পুড়িয়ে মারব?'

গৌতমী বললেন—'ছি, ছি বৎস, একে মারলে কি আমার পুত্র বেঁচে উঠবে! একে মেরে তুমি কেন পাপ করবে, ওকে ছেড়ে দাও।"

ব্যাধ বল্ল—'সে কি! ও আপনার একমাত্র ছেলেকে বিনা কারণে কেটেছে, আর ওকে ছেড়ে দেবো? তাছাড়া, ও মুক্তি পেলেই আমাকে হয়তো কামড়াবে!'

গৌতমী বললেন—'আমার ছেলের মৃত্যুর জন্ম ও তো দায়ী নয়, তার মৃত্যু হয়েছে নিয়তির বিধানে। আর তোমার এখন যদি মৃত্যু না থাকে—ও কখনই তোমাকে দংশন করবে না।'

ব্যাধ দ্বিধাগ্রস্ত হয়ে ভাবতে লাগল। সর্পটি তখন বলল—'উনি ঠিকই বলেছেন, আমার নিজের কোন দোষই নেই, মৃত্যুই আমাকে পাঠিয়েছেন।'

ব্যাধ বলল—'অন্যের কথাতে তুমি এই নিরীহ বালকের অনিষ্ট ক'রে গুরুতর অপরাধ করেছ।'

সর্প টি বলল—'মৃত্যুকে ডেকে আগে জেনে নিন, আমাকে কেন মৃত্যু দংশন করতে বাধ্য করেছেন।'

মৃত্যু স্বয়ং এসে সাপটিকে ভৎ'সনা ক'রে বললেন—তুমি মিছিমিছি আমায় দোষারোপ করছ; এই বালকের প্রাণনাশের জন্য দায়ী তুমি বা আমি কেউই নই, এজন্য দায়ী স্বয়ং কাল, আমরা সবাই তাঁর আদেশ পালন করতে বাধ্য।'

কাল তাঁদের বিরোধের সংবাদ শুনে এই সময়ে নিজেই উপস্থিত হলেন। ব্যাধ তাঁকে বালকের মৃত্যুর জন্য দায়ী করলে তিনি বললেন—'বালকের প্রাণনাশের জন্য সাপ কিংবা মৃত্যু কেউই দায়ী নয়। তার জন্য বালক নিজেই অপরাধী, তার পূর্বজন্মের কর্মফলের জন্যই সে অকালে মারা পড়ে। গৌতমী ও তাঁর নিজের কর্মদোষেই এই শোক পেয়েছেন।'

এই কথা শুনে গৌতমী ব্যাধকে বললেন—'সব কথা শুনলে তো বাবা। এবার সাপটিকে ছেড়ে দাও। আমার নিজের প্রাক্তন অপরাধেই আমি শোক পেয়েছি, অতএব কাউকে দোষ দেবার উপায় নেই। সবই কর্মফল।'

রবিবারের গল্প

রমেন্দ্রকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায়

শনিবারের শেষে খোকা-খুকুর বুক ভ'রে উঠে আনন্দের জোয়ারে। রাত পোহালেই আসবে আলো ঝলমল আনন্দ-মাখানো ছুটির দিন রবিবার—আর সারাটা দিন কাটবে শুধু খাওয়া, খেলা আর হৈ-হুল্লোড়ে। বাবা-মা বা দাদা-দিদিরা কেউ স্কুলের জন্য তাড়া লাগাবেন না। কেবল খাও দাও আর আনন্দ ক'রে বেড়াও। তাই তো শনি-বারের শেষে—হাফ স্কুলের ছুটির পর থেকেই মনটা নেচে ওঠে একটা উচ্ছল আনন্দে। কেমন, তাই না?

কিন্তু বল দেখি রবিবার স্কুল কলেজ, অফিস কাছারী, দোকান-পাট সব বন্ধ থাকে কেন? তুমি উত্তর দেবে—'ছুটি থাকে বলে।' কেন ছুটি থাকে জান না ত? আচ্ছা শোন।

সে বহু বহুদিন আগেকার কথা। আজ থেকে কোটি কোটি বছর আগে। পৃথিবীর সৃষ্টি হয়েছে সবে। পৃথিবীর মাটিতে প্রাণের সাড়া জাগেনি তখনও। মানুষ ত দূরের কথা—পশু পাখী, কীট পতঙ্গ, এমন কি গাছপালারও সৃষ্টি হয়নি তখন। গোটা পৃথিবীটাই তখন জলে জলময়—এক বিন্দু ডাঙ্গার চিহ্ন নেই কোথাও। এমনি সময়ে হঠাৎ একদিন বিধাতাপুরুষের খেয়াল হোল পৃথিবীতে প্রাণীর সৃষ্টি করতে হবে। দেবতাদের খেয়াল ত! যা' ভাবা তাই কাজ। বিধাতাপুরুষ নানারকমের জীবজন্তু, গাছপালা তৈরী করতে শুরু করলেন। একে একে পাঁচ দিন কেটে গেল। ছ'দিনের দিন তিনি সৃষ্টি কোরলেন মানুষ। কিন্তু আর পারলেন না। ছ-দিনের অবিশ্রান্ত পরিশ্রমে অত্যন্ত ক্লান্ত হয়ে পড়েছিলেন তিনি। তাই এবার বিশ্রামের প্রয়োজন। সাত দিনের দিন সৃষ্টিকর্ত্তা বিধাতা বিশ্রাম গ্রহণ কোরলেন—আর এই দিনটাই হচ্ছে রবিবার।

তারপর বহু যুগ কেটে গেছে। পৃথিবীতে বহু পরিবর্ত্তন হয়ে গেছে। কিন্তু কৃতজ্ঞ মানুষ আজো ভোলেনি সেই দিনটিকে। তাই আজো তারা বিশ্রামের মধ্যে ঈশ্বরোপাসনার মধ্যে কৃতজ্ঞ-চিত্তে স্মরণ ক'রে ঐ দিনটিকে "সাব্‌বাথ ডে" বা ছুটির দিন ব'লে। এটা অবশ্য খ্রীষ্টপুরাণ বা বাইবেলের গল্প। ধর্মপ্রাণ খ্রীষ্টানরা দৃঢ়চিত্তে বিশ্বাস করেন এই কাহিনীটিকে।

আমাদের দেশ ভারতবর্ষ বহুদিন ধ'রে ইংরেজদের অধীন হ'য়েছিল। আর এই ইংরেজরাই হচ্ছে খ্রীষ্ট-ধর্মাবলম্বী। কাজেই তারা এই দিনটিকে ভারতবাসিদের মধ্যে ছুটির দিন হিসেবে ঘোষণা ও প্রচার করেছিল। আর তখন থেকেই আমাদের দেশে রবিবার ছুটির দিন হিসেবে পালিত হচ্ছে। এর আগে কিন্তু আমাদের দেশে রবিবার দিন ছুটি থাকত না। তখন হিন্দুদের ছুটি থাকত বৃহস্পতি-বারে, আর মুসলমানরা শুক্রবারকে পালন করত "জুম্মাবার" বা উপাসনার দিন হিসাবে।

এ ভাবে বাঁচা একটা বিড়ম্বনা। তিলে তিলে দুঃসহ হয়ে উঠেছে জীবন। প্রতিটি দিন—মুহূর্ত মনের উপর গভীর ক্ষতের সৃষ্টি করে চলেছে। কুরে কুরে নিঃশেষ করে দিচ্ছে সেই অসহ্য জ্বালা সমস্ত প্রাণ-শক্তি কে। ক্ষত-বিক্ষত রক্তাক্ত হয়ে উঠেছে মন নিদারুণ এই রক্তক্ষয়ী অন্তর্দ্বন্দ্বে। একলা থাকা যায় না—মনে হয় কে যেন দমবন্ধ করে দিতে আসছে। পুঞ্জীভূত আঁধারের মত দৃষ্টি-রোধ করে আসে আতঙ্কের কালো ছায়া। জনতার মাঝে মনে হয় হাজারো দৃষ্টি জ্বালা ধরিয়েছে দেহে মনে। সকালের গিনিগলা রোদ, পাখীর ডাক—সবুজ গালচে পাতা মাটির সব আকর্ষণ আজ হারিয়ে ফেলেছি—মনে হয় এই পৃথিবীতে আমি এসেছি অভিশাপের মত—মূর্তিমান অভিশাপ!

কলমটা থামলো।

গুড়ি গুড়ি বৃষ্টি পড়া রাত, কে যেন কাঁদছে। ওই কান্নায় আমার সুর মিশেছে। কেউ নেই। খাঁ খাঁ করছে বাড়ীটা। নির্মল ফেরেনি। একা আমি। নিঃসঙ্গ। দমকা বাতাস আছড়ে পড়ে খোলা জানলায়—নিষ্ফল প্রতিরোধে কাঁপছে গাছটা। এই আমার জীবনের শেষ-রাত্রি—কান্নাভরা শেষ রাত্রি।

পাপ। পাপ আমি করিনি। পাপ পুণ্যের বিচার আমি আগামী কালের হাতে দিয়ে গেলাম—রায় যেদিন বেরুবে সেদিন আমি থাকবো না। শুনবোও না। প্রতিবাদ! প্রতিবাদও আমি করিনি, করতে পারিনি। ভীরু-পরাজিত হয়েছি। হার মেনে সরে গেছি কোন নালিশ না করেই।

আরও পাঁচজন মেয়ের মত ম্যাট্রীক পাস করে কলেজে পড়বার চেষ্টা করেছিলাম। অন্ততঃ বি-এ পাস করবো—তারপর একটা চাকরী যা হয় জুটবে। কিন্তু তা সম্ভব হয়নি। বাবা অনেক আগেই মারা গেছেন—পিছনে রেখে গেছেন শুধু বোঝাই। ছোট ভাই, বোন আর বিধবা মা। কলেজে পড়বার মত সম্বল নেই। মা চুপ করে থাকে।

নির্মল বলে—টাইপ আর শর্টহ্যাণ্ড শিখলে চাকরীর সুবিধে হবে। তাই শেখ। কথাটা শুনে চুপ করে থাকি! কলেজের পরিবেশ—একটা বিচিত্র জীবনের স্বপ্নভরা ছবি আমার মনে ভেসে উঠতো—ভেবেছিলাম কোনদিন তা সফল হবে। কিন্তু তা স্বপ্নেই রয়ে গেল।

—কথাটা ভালো লাগলো না?

নির্মল সেলফ্রেমের চশমার ফাঁক দিয়ে চেয়ে রয়েছে আমার দিকে। ব্যর্থতার বেদনা ওর দৃষ্টি এড়ায় নি।

সাধারণ একটা চাকরী করে—মাষ্টারি। মায়ের দিক থেকে লতায় পাতায় কি যেন একটা সম্পর্ক আছে—সেটা অবশ্য হিসাবের মধ্যে আসে না, সেও ধরে না সেটা। ওর আসা-যাওয়া, সংসারের নানা ঝামেলায় বুক পেতে দাঁড়ানোর জন্য সে যেন বহুগুণ আপন হয়ে উঠেছে, মাও প্রশংসা করে—ভালো ছেলে নির্মল। আজকালের মত নয়।

নির্মল যেন আশ্বাস দিচ্ছে আমাকে—কলেজে পড়াতো আর পালায় নি, একটা চাকরী হলেও ত পড়তে পারো।

—হ্যাঁ, বিয়ে ফুরিয়ে বাজনা, কিস্তি ফুরিয়ে থাজনা। পড়ারও একটা বয়স আছে—বুঝলে?

জবাবটা শুনে কথা কইল না নির্মল, শুধু গম্ভীর ভাবে মাথা নাড়ে অসহায়ের মত। তার সামর্থ্য থাকলে পড়াতো সে, কিন্তু সংসারের মুখ চেয়ে আমিই সেই দান নিতে পারিনি।

অগত্যা একটা সস্তা-মাইনের স্কুলে টাইপ আর ষ্টেনো-গ্রাফী শিখতে ঢুকলাম। অন্ন সংস্থানের আশায়।

পোষাক চাল-চলনে আধুনিকা হবার ইচ্ছেটা বাধ্য হয়েই চেপে রেখেছিলাম। অভাব আর অনটনের জন্যই। আটপৌরে শাড়ী আর মোটা ব্লাউজ—চটি, এই ছিল আমার সম্বল। মা-ই পাড়ার অন্যান্য মেয়েদের সামনে শোনাত—ওই শাড়ী পরে কেউ বাইরে যায়, রঙীণ কিছু পর। চুলগুলো একটু গুছিয়ে বাঁধ; মেয়ে যেন ছর ছর করে চলেছে।

শাড়ী মোটে দুখানা, বহুবার জলকাচা আর সোডায় সেদ্ধ করার ফলে আসল রং তার জলে গেছে—খোলটা বিবর্ণ, তাতে ইস্ত্রির দাগ। চটিটা গোড়ালির দিকে ঘস-টানি খেয়ে মাটি সই হয়ে উঠেছে! এই পোষাককে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে আর যাই করা যাক না কেন—চটকদার করা যায় না। বাধ্য হয়েই পাড়ার অন্য অভিভাবিকাদের কাছে সরল সিম্পল মেয়ে হয়েই রইলাম। অবশ্য আড়ালে ওরা এই নগ্ন দারিদ্র্যটাকে নিয়ে বিদ্রূপের তীব্র চাবুক কসাতে ছাড়ে না। তার ছিটেফোঁটা আমার গায়ে দূর থেকেও এসে বিঁধেছে।

এই পড়ার আড়ালে মায়ের দৈনন্দিন তাগিদটা মোলায়েম থেকে একটু কড়া সুরে ক্রমশঃ বাজতে থাকে।

—হারে, চাকরী বাকরীর চেষ্টা দেখছিস?

পুঞ্জীভূত হতাশভরা সে সুর।

শীতের সময়। ছোট ভাইবোনদের শীতের কোন পোষাক-আশাক নেই। মা বাড়ীতেই থাকে, কোন রকমে কাপড় জড়িয়ে। ওকেই বাইরে যাতায়াত করতে হয়। মা বলে—একটা গরম জামা কেন?

জবাব দিই—কিনতে অনেক পড়বে, তার চেয়ে টুইশানির টাকা পাই, উল কিনবো কিছু।

অর্থাৎ অন্য দিক থেকে এড়িয়ে যাবার মতলব। উল কিনে সোয়েটার বুনে গায়ে দিতে দিতে শীতও পার হয়ে যাবে। নির্মল আড়ালে বলে—একটা সোয়েটার না হয় নিয়ে আসি।

—অনেক টাকা হয়েছে না?

জবাব শুনে চুপ করে যায় সে! মাষ্টারীর সামান্য রোজকার—অন্যত্র চাকরীর চেষ্টা দেখছে আমারই মত। একজন অন্ধের অপর অন্ধকে পথ দেখাবার চেষ্টায় হাসি আসে। ব্যর্থ করুণ কান্নার মত হাসি।

প্রথম চাকরীর উমেদারি করার স্মৃতি আজও ভুলিনি। মেয়েদের প্রার্থী হয়ে পুরুষের দরবারে আসতে হয় কনে সেজে। কয়েক জোড়া বুভুক্ষ দৃষ্টির সামনে দাঁড়াতে হয়,

নীরবে সইতে হয় ওদের দৃষ্টি। হাড় মাংস ভেদ করে ফুটে ওঠে অসহায় দীনতা। কিন্তু এই উমেদারির সাজ স্বতন্ত্র।

বিয়ের কামনা একটু শান্ত গৃহকোণ, স্বামী-সংসার। বেঁচে থাকবার স্বপ্নে তারই আশায় তারা এগিয়ে যায়। কিন্তু এই অগ্নি-পরীক্ষার পর তেমনি কোন নির্ভর গৃহ-কোণের সন্ধান নেই। শুধু বেঁচে থাকার জন্য পৃথিবীর শক্ত মাটিতে টিকে থাকবার জন্য যুদ্ধ। শুধু ভাত আর আশ্রয়। অন্য কিছু নেই। পিছনে চেয়ে আছে ভেসে-যাওয়া সমগ্র একটি সংসার—মা ভাই বোনেরা। কনে সাজা উমেদারীর চেয়ে আরও নগ্ন—আরও কদর্য্য—আরও নিষ্ঠুর নির্মম।

বিখ্যাত ষ্টিভেডার ফার্ম, ছোট-বড় ষ্টীমার—লঞ্চও আছে নিজেদের। দেশ-বিদেশের জাহাজীর সঙ্গে অর্ডার সাপ্লাই-এর কারবার। অফিস কোয়াটারে মস্ত বিলেতী কায়দায় সাজান অপিস। অন্যতম ডিরেকক্টার ইন্টারভিউ নিচ্ছেন। ঝকঝকে টাইপ রাইটার, নোতুন কার্বন, ক্রীম-লেড পেপারে নোট বই থেকে সর্টহ্যাণ্ডএ লেখা টাইপ করতে হচ্ছে। মিঃ সেন ইতিমধ্যে বিলাতটা কয়েকবার ঘুরে এসেছেন। যৌবন এবং প্রৌঢ়ত্বের মাঝখানে থমকে দাঁড়িয়েছে বয়সটা। শক্ত বলিষ্ঠ দীর্ঘ চেহারা, পোষাকে চাল-চলনে নিখুঁত আভিজাত্য ফুটে উঠেছে। পাইপটা দাঁতে চিবিয়ে নিয়ে ইংরাজী বলছেন—এর আগে আপনি আর কোথাও কাজ করেন নি ?

হাত কাঁপছে আমার। কাঁপছে বুকও। কোন রকমে জবাব দিই—না স্যার।

কাগজখানা মেসিনে চাপিয়ে—কি বোর্ডে আঙ্গুল বুলোতে থাকি। নিজের তলা-ক্ষয়ে-যাওয়া স্লিপারটার দিকে চেয়ে এমনি পরিবেশে লজ্জা পাই। লজ্জা ঢাকবার জন্যই যেন আরও জোরে আঙ্গুলগুলো চলছে। চলছে বেগে—মা ভাই-বোনের অসহায় মুখগুলো ভেসে ওঠে চোখের উপর। তাদের বাঁচা-মরা নির্ভর করছে আমার উপর—ওই আঙ্গুলগুলোর সঞ্চরণের উপর।

মিঃ সেন এগিয়ে আসেন—চোখে-মুখে তাঁর খুশীর আভাস। পাইপটা বের করে তামাক পুরতে পুরতে বলেন—ভেরি নাইস্! বেশ সুইপ্ট আপনার হাত।

চলে গেলেন নিজের চেম্বারে; ভারি দরজাটা বেয়ারা হুজুরের পিছনে বন্ধ করে দেয়; আমি বাইরেই পড়ে রইলাম। এর পরের জবাবটা আমার জানা। ফিরে যেতে হবে শুধু হাতে। অসহায় পঙ্গু আমি যেন দাঁড়িয়ে আছি ওই জবাবটা শোনবার জন্য। সামনেই গ্রেইজ কাঁচ-ঘেরা ঘরের বাইরে বেল বাজছে। দপ্ দপ্ করে জলছে নিভছে আলো—বেয়ারা উঠে গেল শশব্যস্ত হয়ে। বিচিত্র এই জগতে—কর্মচারীর ভিড়ে আমি একা; এত অসহায় নিজেকে কোন দিনই বোধ করিনি।

—আপনাকে ভিতরে ডাকছেন সাহেব।

বেয়ারার ডাকে চমক ভাঙ্গল—পায়ে পায়ে এগিয়ে গেলাম।

মায়ের মুখে বহুদিন পর আবার ফুটে উঠেছে হাসির আভা। সন্ধ্যার অন্ধকারে কেরাসিনের আলোয় চারি-দিকে ঘিরে বসেছে ওরা আমায়; সহজ সাবলীল হয়ে উঠেছে জীবন।

—দুশো টাকা! মা যেন কথাটা ঠিক বিশ্বাস করতে পারে না।

বলে উঠি—হ্যাঁ—বছরে দশ টাকা করে বাড়বে। ভাল কাজ দেখাতে পারলে দু'মাসের বোনস্।

মিনু এতদিন দূরে দূরেই থাকতো, একটু কাছ ঘেঁসে বসেছে সে আজ। চুপি চুপি বলে—একটা শাড়ী এ মাসে কিনে দিতে হবে দিদি। ফ্রক পরে স্কুলে যাই—দিদিমণি বকে। ওরা সব্বাই কি যেন হাসাহাসি করে।

মাথা নামাল সে। এতদিন মিনু ও কথা বলেনি। সমস্ত অপমান নিজেই সয়েছিল—অসহায়ের মত। আজ দিদিকে বলতে পেরে যেন প্রতিকারের পথ দেখে।

—বেশ, পছন্দ করে কিনে নিবি খান দুয়েক শাড়ী। খুশী ফুটে ওঠে ওর চোখে। আমার পরিশ্রমে ওদের মান-সম্মান রক্ষা হোক।

…মিঃ সেনের পার্শোনাল এ্যাসিষ্ট্যান্ট। মাইনের তুলনায় পদ মর্য্যাদা যেন একটু বেশী। একটা স্বতন্ত্র ছোট্ট ঘর, নোতুন টেবিল—ছোট্ট র‍্যাক—একটা হোয়াটনট, জলের কুঁজো—নোতুন বড় সাইজের মেশিন—একটা

টেবিল ল্যাম্প ইত্যাদি—এই দিয়েই ঘরখানাকে সাজিয়ে নিলাম।

…মস্ত দায়িত্ব মিঃ সেনের, দেশ বিদেশের জাহাজী এজেন্টদের চিঠি লেখা—ইংল্যাণ্ড—আমেরিকা থেকে সুরু করে ব্রেজিল—পেরু-নরওয়ে সুইডেন—কোথাও বাদ নেই। সাহেব-সুবোদের সঙ্গে হোটেলে দেখা করা—কনসাল্‌দের সঙ্গে চলাফেরা করতে হয়। কোম্পানীর অন্যতম স্তম্ভ তিনিই, ওদিকের কাজ সারতে সন্ধ্যা হয়ে যায়। অপিস ফাঁকা—ঝাড়ুদাররা ঝাড়ু দিতে থাকে, দারোয়ানরাও ছোট ধুতি পরে চুলায় আগুন দিয়ে ভাজি—রুটি সেকবার আয়োজন করে, একজন খৈনী বানায়—গোল হয়ে বসে সকলে তারই ভাগ নেয়।

—চলুন, একটু কাজ আছে। সেরে নিয়ে আপনাকে পৌছে দেবার ব্যবস্থা করবো।

মিঃ সেনকে ঢুকতে দেখে উঠে দাঁড়ালাম।

—কোথায় যেতে হবে? শুকনো গলায় প্রশ্ন করি।

মালিকের হুকুম। না গিয়ে উপায় নেই। বাইরে একত্রে বড় একটা বেরুই নি।

মিঃ সেন বলে চলেছেন—গ্রেট ইষ্টার্ণ হোটেলে একটু যাবো।

হোটেলের নাম শুনে চমকে উঠি। অনেক কথাই শুনেছি—পড়েছি বইএ। আজ নিজেকে তেমনি একটা চক্রে পড়তে হবে অনুমান করে শিউরে উঠি। মুখ-চোখ যেন বিবর্ণ হয়ে উঠেছে। মিঃ সেন এতক্ষণ আমার দিকে চেয়ে ছিলেন, একটু হাসি চেপে বলে ওঠেন—নোট নিতে হবে কিনা, সেইখানেই কাগজ-পত্র সই-সাবুদ হবে। টাইপ-রাইটার মেসিনটাও তুলে দিতে বলেছি গাড়ীতে।

ফোলিও ব্যাগটা তুলে বের হয়ে এলেন আমার সঙ্গে।

…এ জগতে কোনদিন আসিনি। মার্বেল পাথরের সিঁড়ি—দু-পাশে ওক কাঠের বাদামী পালিশ করা র‍্যালিষ্টার, দোতলার করিডোর দিয়ে চলেছি। এত বিলাস-ব্যসনের আয়োজন একটি বাড়ীর ভিতর জমা আছে অর্থশালীর জন্য তা জানতাম না। দু-পাশে ঝকঝকে পিতলের টবে পাম—ঝাউএর গাছ, বলরুম—ভারি ভেল্‌ভেটের পর্দা টাঙানো ব্যাকেট হতে ঝুলছে সাবেকী ঝাড় থেকে দামী বাল্‌বগুলো। সারি সারি সাজান চেয়ার—জবা টেবিল, ওদিকে কিউরিও শপ, বেনারসী—মির্জাপুরী শাড়ী থেকে বাঁকুড়ার পোড়ামাটির টেরাইকোট্টা অবধি সাজান—সেলুন—বার—টেলিফোন এক্সচেঞ্জ কোন উপকরণই বাদ নেই।

ভিতরে গিয়ে লিফ্‌টে চারতলায় উঠে গেলাম যেন জন-মানবহীন স্বপ্নপুরী। কোথায় মানুষ-জন নেই—বাসিন্দারা সব যাদুকাঠির ছোঁয়ায় নিদ্রজগতে ডুবে গেছে! জুতোর শব্দ তুলে বেয়ারা দু'একজন ঘুরে বেড়ায়, এগিয়ে চলাম মিঃ সেনের পিছু পিছু, রুম নয়—একটা পুরো 'সুইট' বলা যেতে পারে। এক লালমুখো বিদেশী ষ্টাইলেই বসতে বলে ভিতরে চলে গেল সাহেবকে খবর দিতে।

টাকা! টাকা বাতাসে ছড়ানো, যে ধরতে পারে টাকা তারই। আধ ঘণ্টার মধ্যেই কয়েক লক্ষ টাকার কাজ পেয়ে গেলেন মিঃ সেন। খুব খুশী হয়ে পেগে চুমুক দিচ্ছে। আমার অবস্থা কাহিল, খাস পেরুভিয়ান সাহেব—দুর্বোধ্য ইংরাজী উচ্চারণ। ভায়েল কনসোনেণ্ট সব একাকার ওর উচ্চারণে।

—পারডন।

ওর কথাগুলোকে ঠিক ছকে আনতে পারছি না!

—বেগ ইওর পারডন স্যার।

…হঠাৎ ধা ধা করে দমকা হাসির ধমকে যেন ফেটে পড়ে সাহেব। একটু সামলে নিয়ে আবার বলতে সুরু করে চুক্তির সইগুলো। আমি চেষ্টা করে নোট নিতে থাকি।

গাড়ীতে উঠে মিঃ সেনই কথা বলেন—আপনি না এলে এত শীঘ্র ওকে বধ করা যেত না। ভয়ানক খেয়ালী জাত।

কথা কইনা, ক্লান্তিতে শরীর যেন ভেঙ্গে আসছে।

—একটু চা খেলে হ'ত না? চলুন।

ওঁর আমন্ত্রণে আমি বাধা দিই—রাত্রি হয়ে গেছে! ক'টা বাজে?

—ঘড়ি নেই?

আরও কি বলতে যাচ্ছিলেন আমার নিটোল শূন্য হাতের দিকে চেয়ে চুপ করে যান। ঘড়ি নেই—মাত্র দসা একগাছি কঙ্কন। রাজ্যিজোড়া অভাব যার—তার হাতে

ড় উঠবে কোথেকে—এটা বোধ হয় তাঁর মত অর্থবান ।াকের মনে জাগেনি এতদিন।

হঠাৎ যেন সেই কথাটা আজ ধরা পড়ে।

নির্মল বসে আছে। মিনু মিন্টু ঘুমিয়ে পড়েছে। ও দরজার দিকে কান পেতে ছিল, পায়ের শব্দে এগিয়ে াসে। আপন মনেই বিড় বিড় করছে মা বিরক্তিভরা রে, রাত কত হয়েছে।

নির্মলও উঠে আসে—এত দেরী করলি। বলে যেতে । তো? মা যেন কৈফিয়ৎ চাইছে।

—হঠাৎ কাজে আটকে পড়লাম। জবাব দিই।

মা যেন সন্ধানী দৃষ্টিতে আমার দিকে চেয়ে আছে। তের ব্যাগটা টেবিলে রেখে বিছানায় এলিয়ে পড়ি। র্মল কথা কয় না—যেন নিরীক্ষণ করছে আমাকে। ওর ঃ দেখার নেশা কোন দিনই যেন ফুরোবে না। বলে ঠ—আধ ঘণ্টায় চার লাখ টাকা রোজকার করেছি নো?

—তাই নাকি? নির্মল সস্তা সিগারেট টানতে থাকে ারে। মা বাইরে গেছে কি কাজে। চুল খোলা বাতাসে লামেলো উড়ছে—হঠাৎ নির্মলের ছোঁয়া পেয়ে চমকে ঠি। উষ্ণ বিবশকরা ছোঁয়া—আবছা আলো কাঁপছে, গাথায় ডেকে উঠলো একটা পাখী। চুলগুলো সরিয়ে চ্ছে নির্মল মুখের উপর থেকে।

একটি মুহূর্ত! স্থির দৃষ্টিতে চেয়ে আছে সে আমার কে। একটি অসতর্ক মুহূর্তে আমাকে স্পর্শ করে সারা হে মনে সে তুফান এনেছে। নিবিড় করে বিলিয়ে য়ে তৃপ্তি পেতে চাই।

—রাত হয়েছে, আজ যাই।

—এসো।

চলে গেল নির্মল, চোখ বুজে আসে ক্লান্তিতে। এই ামি কে আজও চিনি না—এ যেন আমার কাছেও অধরা ·নির্মলের কামনা দিয়ে সে গড়া; তাই নির্মলকে দেখলেই চে ওঠে। ঝড়ের পর স্তব্ধ ক্লান্তির মত একটা অনুভূতি রে ধরেছে আমাকে।

মায়ের কথায় উঠে বসলাম, বেশ কঠিন সুরেই মা াজ্ঞাসা করে—নির্মল কি বলে গেল?

একটু চমকে উঠলাম। মায়ের চোখে কি কিছু পড়েছে! মা গজ গজ করতে থাকে—নিগুয়ো পুরুষের কুলো-পান্না কণা, তেজ দেখিয়ে মাষ্টারীতে জবাব দিয়ে এসেছে। চাকরা-বাকরী নেই—কে জানে হয়তো কস্ করে ধায় চেয়ে বসবে এইবার। দিবিনা কিন্তু।

নির্মল সম্বন্ধে মায়ের মুখে এই ধরণের কথা প্রথম শুনলাম। এতদিন পরিবারের অন্যতম শুভাকাঙ্ক্ষী ছিল —আজ মা ওকে এড়াতে চায়। ওর আসা যাওয়াটাও পছন্দ করে না। ও যে চরিত্রহীন—বেহায়া সে কথাটাও প্রকারান্তরে শুনিয়ে দেয় আমাকে। ওর ছেঁড়া জামা—মলিন চাহনি দেখেও কিছু বুঝিনি। এটা মানি—শত অভাবে পড়লেও ওরা কারোও কাছে হাত পাতে না—অন্যায় কাজ করে না।

মা বলে চলেছে—মেসের পাওনা দিতে পারেনি, তাই নাকি বের করে দিয়েছে তারা, কোথায় এক ছাত্র বাড়ীর চিলে ছাদের ঘরে পড়ে আছে। হোটেলে খায়।

মায়ের কথাগুলো চুপ করে শুনি। মনের সমস্ত খুশী যেন উপে যায়।

মনটা বিষিয়ে ওঠে মায়ের কথায়, মা ভুলেছে—আমি ভুলিনি। তার কাছে ঋণ আমার অপরিসীম। ম্যাট্রিকে ফিস্ দেওয়া—পড়ানো—বই কেনা—প্রায়ই সব খরচ সে দিয়েছে গোপনে। যেদিন অভাব—হতাশা আর মায়ের কথায় মন ভেঙে পড়তো—জীবনের উপর বিতৃষ্ণা আসতো —সেদিন সেই দাঁড়িয়েছে আমার পাশে। সেই দিত বাঁচবার প্রেরণা, টাইপ—ষ্টেনো স্কুলে সেই চুপে চুপে ভর্তি করে দেয়—মাকে বলেছে ফ্রিতে পড়ছে। মাসমাইনে অন্যান্য খরচ দিয়েছে সে তার সামান্য মাইনে থেকে। মা একথা জেনেও না জানার ভান করেছে। সে শুধু উপকারীই নয়—মনের নিকটতম সান্নিধ্যে সে এসেছে। তার পরে আজ আর কাউকে মনে পড়ে না।

...ভালবাসা—প্রেম এ সব সংজ্ঞা আমার তখনও জানবার মত সময় হয়নি—তবে তার চেয়েও আপনজন কেউ নেই এ কথা বড় হয়ে ওঠে। একটু আগের মুহূর্তগুলো তখনও মনে সুর তোলে—ভুলিনি তার চাহনি।

—চল খেয়ে নিবি বাছা।

অন্যমনস্ক ভাবে উঠলাম। মা তখনও কি বকে

চলেছে। নির্মল যে একটি শিমূল ফুল তা আজই জানল মা—সেই খবরটাই ইনিয়ে-বিনিয়ে বলে চলে।

চিন্তিত মনে অপিসে ঢুকি। বেয়ারা এসে হাজির—সাব সেলাম দিয়া। নির্মলের চিন্তা মন থেকে ঝেড়ে ফেলবার চেষ্টা করে সাহেবের ঘরে ঢুকলাম। মিঃ সেন তুলে দেন একটা দামী রিষ্টওয়াচ। কুক কেলভী কোম্পানীর দোকান থেকে সদ্য কেনা।

—পছন্দ হয়েছে?

ঘড়িটার দিকে অবাক হয়ে চেয়ে থাকি—অনেক দাম এর।

মিঃ সেন সহজভাবে জবাব দেন—কাল যা বাড়তি রোজকার হল কোম্পানীর তার থেকে আপনারও একটা বোনাস পাওয়া উচিত। পরে ফেলুন—ঘড়ি আজকের দিনে 'এসেন্‌সিয়াল'।

মাথা নীচু করে বের হয়ে এলাম। দরজার কাছে এসে হঠাৎ পিছনে চাইতে দেখি মিঃ সেন আমার দিকে চেয়ে আছেন বিচিত্র এক চাহনিতে। ঠিক অর্থ তার বুঝি না—তবু কেন জানিনা বুক কেঁপে ওঠে। টিক টিক করছে ঘড়িটা—শুদ্ধ অন্তহীন সময়ের বুকে নিজের অস্তিত্ব ঘোষণা করছে। আমার ক্ষণিকের এই বুক কাঁপা মুহূর্তটুকু ওর সন্ধানী দৃষ্টি এড়ায় নি।

…ছুটির পর বারবারই যেন নির্মলকে মনে পড়ে। কে জানে কোথায় আছে সে। কার্জন পার্কের একফালি সীমানা পার হয়ে ট্রাম ধরবার জন্য এগিয়ে আসছি হঠাৎ নির্মলকে দেখে এগিয়ে গেলাম—আপন খেয়ালেই চলেছে সে। বগলে একগাদা বই, চোখে পুরু হাই-পাওয়ার চশমা, ময়লা সাবান-কাচা কাপড়—পরণে গেরুয়া রং-এর সার্ট, ময়লায় আসল বর্ণ তার বদলে গেছে, পায়ে ফিতেছেঁড়া একটা কাবুলী চপ্পল; দৈন্যটুকু ওর বুদ্ধিদীপ্তির সঙ্গে মিশে একটা স্বাতন্ত্র্য এনেছে।

—তুমি!

নির্মল আমার ডাক শুনে অবাক হয়ে গেছে। ওকে নিয়ে অপেক্ষাকৃত একটা নির্জন রেঁস্তোরায় গিয়ে বসলাম। রাস্তায়—পার্কে ছেলে-মেয়ে একত্রে দেখলে এখনও হাজার কৌতূহলী দৃষ্টি যেন তীরের মত গায়ে বেঁধে।

—নাও, কেক—চপ দুখানা এগিয়ে দিলাম। বে[illegible] সাগ্রহে খেতে থাকে সে—নোতুন চাকরী হয়ে অবধি তোমার কাছে খাওয়া বাকী ছিল। আজ জুটে গেল।

—চাকরীটা হারালে ত?

আমার কথায় যেন চমকে ওঠে সে, একটু সামলে নিয়ে বলে—না হারিয়ে পথ ছিল না। ভালোই হয়েছে—

—চাকরী করবে? বেশ যেন একটু বিশ্বাসের সুরে কথা বলি।

হাসে সে—তোমার 'বসের' অফিসে? উহুঁ! সেন গুষ্টীকে ভাল করেই চিনি—ওখানে কেরাণীগিরি আমার পোষাবে না।

—তা হলে?

—চাকরী অন্য কোথাও জুটে যাবে দু-একদিনের মধ্যেই।

কথা বললাম না। ওর দাড়ি-গোঁফ ঢাকা মুখের দিকে চেয়ে থাকি নিবিড় বেদনাভরা চাহনিতে। হঠাৎ চোখোচোখি হতেই আমার হাতটা ধরে বলে ওঠে সে—রাগ করেছো?

—না, না!…কথা বাড়ালাম না। ওর যদি সত্যই কোন আদর্শ থাকে—তাতে আমি রাগ করবার কে?…ব্যাগ থেকে টাকা বের করে বলে উঠি—কিছু টাকা সঙ্গে রাখো।

একবার চোখ তুলে চাইল, কি ভেবে বলে ওঠে—দিচ্ছ? দাও।

…কৃতজ্ঞতা-ভরা চোখে ওর দিকে চেয়ে থাকি। ওকে দেখে এ আনন্দ কেন হয় জানি না।

মা কদিন থেকেই কেমন যেন বাড়াবাড়ি সুরু করেছে। চোখে ঠেকার মত ব্যাপার?—গরমজলে হাত মুখ ধুয়ে নে বাছা-যা ঠাণ্ডা।

—হোক না ঠাণ্ডা, গরম জলের দরকার নেই। জবাব দিই।

খাওয়া-দাওয়ার উপকরণও একটু মাত্রা ছাড়িয়ে যাচ্ছে। বাধা দিলে বলে—শরীর বজায় রাখতে হবে মা, একার খাটুনিতে এতবড় সংসার চালানো। অর্থাৎ এতবড় সংসারের চাকা টানতে বলদকে যেন জাবনার মাত্রা একটু বাড়িয়ে দেওয়া হচ্ছে।

ক্রমশঃ আসল কথাটা পাড়ে মা—মিনুর বিয়ের ঠিক ফেলেছি। ছেলেটি ভালো চাকরী করে, বাড়ী ছে আগড়পাড়ায়, আসছে মাসের প্রথমেই বিয়ে— গোল বেধেছে টাকার জন্যেই—শ' পাঁচেক টাকা !

রুটি ছিঁড়ে ডালে মাথাতে গিয়ে থামলাম। মায়ের অন্যদিকে। বলে চলেছে—আফিসে ধার দেয় না? তো শুনেছি। স্যাখ না?

…ডালের দানাগুলো সেদ্ধ হয়নি—টিপে নোয়ানো যায় সহরতলীর গাছে গাছে জমাট অন্ধকার; এঁদো নবাড়ীর গাছ গাছালির কালো স্তূপের গায়ে মিটমিট ছে জোনাকী জ্বালা অন্ধকার।

—শুনছিস আমার কথা? মা বেশ জোর গলায় কথাটা ছ—না শোনার কোন সম্ভাবনা নেই। আপাততঃ বার জন্যই বলে উঠি—হুঁ।

মা আউড়ে চলেছে—মেয়েকে ধিঙী করে রাখতে ভয় গ। মেয়ে শ্বশুরবাড়ী যাক—

বাপমায়ের গলা দিয়ে জল নামবে ভালোই।

কথাগুলো শুনিমাত্র—আমি যেন মেয়ে নামক পর্দার ত্তায় পড়ি না। হয়তো তা-ই। সংসারের ভারবাহী মাত্র। আমার বেলায় ওই সংজ্ঞা অচল।

টাকা পেয়েছিলাম। পাঁচশো টাকা। পাঁচখানা করে নোট—চোখের জলে ভিজে উঠেছিল ঠাঁই ঠাঁই। রাও নজরে পড়েনি। মায়েরও নজরে পড়েনি।

টাকা চাইবামাত্র মিঃ সেন ফাইল থেকে মুখ তুলে লেন—পাঁচশো টাকা?

আঁচলে আঙুলটা জড়িয়ে যায় অকারণেই, বলবার চেষ্টা র—বোনের বিয়ে—

তাই ভালো। ভাবলাম নিজেরই বুঝি। অবশ্য রও একটা প্রয়োজন আছে। জাষ্ট এ লাইসেন্স।

চমকে উঠি! তাঁর দিকে চাইলাম—যেন প্রতিবাদই বো। কিন্তু পাঁচশো টাকার স্বপ্ন আমাকে নিস্তেজ র দিয়েছে। মিঃ সেন একবার আমার মুখ চোখে নী দৃষ্টি ফেলে বলেন—চেকবই বাড়ীতে পড়ে আছে। র সময় সঙ্গে গেলে ওটা নিয়ে আসতে পারেন। কাল ক পাঁচদিন আবার কলকাতায় থাকবো না। ফিরে ৭ যদি পান?

টাকা!…মায়ের দরকার—বলে উঠি—না না আজই গিয়ে আনবো।

মিঃ সেন মনে মনে উৎফুল্ল হন—বেশ তো! টাকার ইমিডিয়েট দরকার—গিয়েই আনবেন।

পার্ক ষ্ট্রীট অঞ্চল সাহেবী পাড়ার ভিতরে বড় বড় কয়েকটী কাঠবাদাম অশত্থগাছের প্রহরাবেরা একটি মস্ত বাড়ীর তেতলার নির্জন ফ্ল্যাটে থাকেন মিঃ সেন। জনহীন সন্ধ্যার আঁধার-ঢাকা রাস্তা থেকে ঢুকেই একটা টেনিস-লন—তক-তকে সবুজ গালচে পাতা একফালি জমীর চারিপাশে সাজান টবে চন্দ্রমল্লিকা-গিনিগোল্ড-ক্রিসানথিমাম—ইত্যাদি। গ্যারেজে গাড়ীখানা রেখে আমায় নিয়ে উঠলেন তিন তলায়।

হালকা সৌরভে ঘরটা ভরপুর—দামী আসবাব। মেজেতে পুরু-গালচে পাতা। জানলায় ভেলভেটের পর্দা সারা ঘর-খানাকে যেন স্বতন্ত্র করে রেখেছে। মস্ত সোফায় বসতে গিয়ে যেন হারিয়ে ফেলি নিজেকে। চমকে উঠলাম—এমন পরিস্থিতির মুখে কখনও এর আগে পড়িনি। হাতটা ধরে ফেলেছেন তিনি। চোখেমুখে ওর কি একটা উত্তেজনা, সেদিন আপিসে ওরই ক্ষণিক প্রকাশ দেখে শিউরে উঠে-ছিলাম। গালে ছোঁয়া লাগে ওর উষ্ণশ্বাস—হাত ছাড়াবার চেষ্টা করতেই বলে ওঠেন মিঃ সেন—Don't be silly.

কাঠ হয়ে গেছি। আলোটা নিভে আসে অতর্কিতে।

সব চেষ্টা আমার ব্যর্থ হয়ে গেল। বাতাসে ঝাউ বট গাছের চাপা কান্নার সঙ্গে মিশে গেল আমার পরাজিত জীবনের করুণ কান্নার সুর; আতঙ্কের মত জেগে রয়েছে আবছা আঁধারে ওর শ্বাপদ লালসাভরা দুটো চোখ। আঁধারে নীল আভায় জ্বলছে ধক্ ধক্ করে।

যেন স্বপ্ন দেখছি। ঝড় বয়ে গেছে সারা দেহ মনে; ভেঙ্গে চুরে দিয়েছে ফুলভরা শাখাপ্রশাখা। ওর দেওয়া দলাপাকান নোটগুলো টেবিলে উড়ছে—নিজেই সে-গুলোকে ব্যাগে পুরে দিলেন তিনি।—ড্রাইভার পৌঁছে দিয়ে আসুক।

কথা বলবার সামর্থ্য আর নেই। দুঃসহ চাপা কান্না বুক ঠেলে গুমরে ওঠে। সারা গায়ে জড়িয়ে রয়েছে কালো-কালোমেঘের মত জমাট ঘৃণা।

—এই নাও।

মায়ের হাতে তুলে দিলাম নিজেকে বিক্রী-করা ওই পাঁচশো টাকা। মা তার জন্যই সাগ্রহে বসেছিল, আমার ঝড়ো চেহারার দিকে চাইবার অবসর তার নেই। উঠে পড়ে—

—তুই হাত মুখ ধুয়ে নে। বসন্ত পোদ্দারকে টাকাটা দিয়ে আসি বাছা। গয়নাগুলো তাড়াতাড়ি শেষ করে দিক। মধ্যে আর কটা দিন।

মা বের হয়ে গেল। মিনু ঘুমিয়ে পড়েছে।

নিঃস্ব শূন্য মন। জমাট কান্না হতাশ গ্লানিতে উপচে পড়ে বুকফাটা কান্নায়। তারাগুলো ঢেকে গেছে আবছা মেঘে—স্তব্ধ হয়ে গেছে ঝড়ের সঙ্কেত-আনা গুমোট বাতাস। দগ্ধ কান্নায় ভেঙ্গে পড়ি। সারা শরীরে জড়ানো জমাট ঘৃণা—ঝরে পড়ে চোখের জলে।

হঠাৎ কার ছায়ায় চমকে উঠলাম। ম্লান আলোয় চেয়ে দেখি নির্মল দাঁড়িয়ে। বাইরে সোঁ সোঁ ঝড়ের সঙ্গে বৃষ্টি নেমেছে। আঁধার ফুঁড়ে হাকছে বিদ্যুতের আভায় বনের তাণ্ডব, পৃথিবীর সব জ্বালা ও ধুয়ে দিক—তারই বিরুদ্ধে প্রতিবাদ ওর হুঙ্কার···তারই মাঝে নির্মল এসেছে। আমার নির্মল। আজ মনে হয় ওকেই সব চেয়ে বেশী দরকার। সর্বাঙ্গে ওর বৃষ্টির জল ঝরছে; মুখে হাসির আভা। চশমাটা মুছতে মুছতে বলে—ভালো একটা কলেজে প্রফেসারি পেয়েছি। আগে তাই তোমাকেই জানাতে এলাম। ইস্-যা বৃষ্টি! একি! আমাকে কাঁদতে দেখে চমকে উঠেছে; এগিয়ে আসে আরও কাছে।

প্রকম্প স্নেহ মন এমনি একটা নির্ভর খুঁজছিল। নিজেকে ওর সঙ্গে মিশিয়ে দেবার চেষ্টা করি, এ যেন অন্য কোন আমি, নির্মলের ছায়া সঙ্গিনী।

—এখান থেকে নিয়ে যাবে আমাকে?

নিবিড়ভাবে ওকে ধরে হু হু চোখের জল নামে। নির্মলও অবাক হয়ে গেছে আমার কাণ্ড দেখে! বুকের জ্বালা চোখের জলে শান্ত হয়।

—বেশত!···

—যত শীঘ্র পারো নিয়ে চলো। এখানে থাকলে মরে যাবো আমি।

···গালে মুখে ওর ছোঁয়া লাগে—হিম ছোঁয়া।··· বাঁচবার স্বপ্ন দেখি আবার।

বাইরে মায়ের পায়ের শব্দ শোনা যায়। মা ফিরে খুশী মনে।

—যাক, কাজ এগিয়ে রইল।

হঠাৎ নির্মলকে দেখে মা চুপ করে যায়—যেন বাতাস-ভরা বেলুন চুপসে গেছে। মুছে যায় ওর মুখের হাসি।

—এত কি গল্পো করিস জানিনা বাবা। কথার যেন শেষ নেই।

একটা কড়া কথা বলতে গিয়ে থেমে গেলাম। চুপকরে বের হয়ে গেল নির্মল ঘর থেকে। যাবার আগে ওর দৃষ্টি দিয়ে ভরিয়ে গেল আমাকে তৃপ্তির ধারায়।

···জীবনের এই পরম পাওয়াটুকু আমি হারাতে চাই নি। শুধু কেরাণী নই—আমিও নারী। তাই নির্মলের ডাকে সাড়া দিয়েছি। ছোট একটু বাসা—বাসাটা ভালো কিনা জানিনা—তবে সেইখানে ভালোবেসেছি দুজন দুজনকে। মাধবী লতার ছাউনি দেওয়ালে—সন্ধ্যায় মুখে ফুল দু'একটা জেগে ওঠে, বাতাসে তার ব্যাকুল সৌরভ।

নির্মল আর আমি ঘর বেঁধেছি। বুকের সব জ্বালা—অপমান ভুলতে চাই ওর মধ্যে। সেই ছায়া-সঙ্গিনী আর যেন আমার কাছে আর অধরা নেই। তাকে চিনেছি।

নির্মল এক গাদা পরীক্ষার খাতার মধ্যে ডুবে কি রত্নের সন্ধান করছে—হঠাৎ অতর্কিতে আমার ঠেলাতে চমকে ওঠে—এ্যাই।

···খুশীভরা মুহূর্তগুলোই যেন আমাকে স্মরণ করিয়ে দেয় অন্য কথা। মা এ বিয়েতে মত দেয়নি, ফেটে পড়ে রাগে ক্ষোভে—লেখাপড়া শেখলাম, শেষকালে এমনি করে চলে যাবি তা কি জানতাম। এখন ডানা গজালেই তো—মেয়ে কি আপন হয়।

—মাসে মাসে তোমার খরচ দোব। মাকে সান্ত্বনা দেবার চেষ্টা করি।

মা জবাব দেয় না।

···নির্মল হাসছে। এগিয়ে আসছে আমাকে জড়িয়ে ধরতে।···হাসিতে ওর হাসি ডুবিয়ে দিয়ে লুকোচুরি খেলতে পারিনি। মাঝে মাঝে এই উপচে পড়া আনন্দটুকু ম্লান হয়ে যায়। একটা বিভীষিকার মত কালো ছায়া ছেয়ে ফেলে সব কিছু।

একটি সন্ধ্যার সেই লুণ্ঠনকারীর শ্বাপদ-লালসাভরা চোখ

জেগে ওঠে।···আমাকে মাকড়সার জালে যেন ঘিরে ধরেছে।

···নির্মল নিবিড় নিষ্পেষণে টেনে নেয় আমাকে—কি এত ভাবো বলত ?

—কিছু না !···

এ সেই ছায়াসঙ্গিনী নয়, আমার পরাজিত অপমানিত সত্তা। বিয়ের কথা শুনে মিঃ সেন কি ভেবে খুশী হন। পাইপটা দাঁতে চেপে মাথা নাড়তে থাকেন—স্যাটস বেটার। কিছু টাকা দিতে আসেন, আমিই নিতে চাইনি। হাসেন তিনি।

—তোমাকে Present দেবার অধিকার আমার নিশ্চয়ই আছে। টাকা কিছু নাও—এ সময় দরকারে লাগবে। ডোণ্ট টেক ইট আদার ওয়াইজ মাই ডিয়ার।

···ওকে সহ্য করতে পারি না আর। সব মুখোস ওর খুলে পড়েছে। টাকাটা নিতে হয়েছে। কিন্তু পার্টির প্রস্তাবে এড়িয়ে যাই—শিউরে উঠি। আমাকে নির্মলকে কোন হোটেলে নেমতন্ন করবে।

—না, না ! আমি আর্তনাদ করে উঠি।

হাসতে থাকেন তিনি, বিজ্ঞের মত বলেন—খুব চালাক মেয়ে তুমি। অলরাইট—ইট ইজ সেফ !

···গালে এর চেয়ে চড় মারলেও রাগ হ'ত না। চুপ করে বেয় হয়ে এলাম। মনস্থির করে ফেলেছি। দরকার হয় কোন স্কুলেই সামান্য মিস্ট্রেস হয়ে চাকরা নেব—তবু এখানে আর নয়। নির্মলকে কথাটা অন্য ভাবে বলতে সেও মত দেয়।

—বেশ তো, পড়াশোনা সুরু করো। ততদিন আমি চালিয়ে নোব। কিইবা খরচ আমাদের।

মুক্তির স্বাদ পেয়েছি। মিঃ সেন রেজিগ্‌নেশন চিঠিখানা দেখে যেন চমকে ওঠেন। মুখে-চোখে ফুটে ওঠে একটা কাঠিন্য, পায়চারী করতে থাকেন। হঠাৎ বলে ওঠেন—তা হয় না। কোম্পানীর অনেক গোপন খবর তুমি জানো। তা ছাড়া—হঠাৎ কাছে এসে বেশ কঠিন স্বরেই বলে ওঠেন—এসব কথা তোমার স্বামী জানলে তোমার সংসার খুব সুখের হবে না।

অস্ফুটে আর্তনাদ করে উঠি—চোখের সামনে জাগে নির্মলের শান্ত মধুর মুখখানা, ছোট্ট একটু আশ্রয়—সন্ধ্যার শুব্ধ সৌরভ-মধুর বাতাসের স্বপ্ন। তাকে হারাতে চাই না।

মিঃ সেন তির্য্যক দৃষ্টিতে চেয়ে আছেন—নরম হাতখানা ওর হাতে; জলছে সর্বাঙ্গ। কঠিন হাতে যেন দলে পিষে দিতে চায় ওই দানব আমার হাতটাকে।

একটা জানোয়ার যেন থাবা উচিয়ে আসে—পিঙ্গল জলন্ত দু-চোখে আগুনের আভা। দূর থেকে স্বপ্নের মত শোনা যায় কথাগুলো—এর আগেও এমনি ঘটনার মুখোমুখী হয়েছিলাম বোম্বেতে। সেই গার্লফ্রেণ্ডের ভাবী স্বামীকে জোর করেই সরিয়ে দিতে হয়েছিল—অবশ্য হাজার আট-দশ খরচ হয়েছিল পুলিশের ফ্যাসাদ সামলাতে।···আবার কি তাই করতে হবে ?

···সারা শরীরের রক্তপ্রবাহ হিম হয়ে আসে। কাঁপছি আমি। হঠাৎ সমস্ত শক্তি এক করে ওর হাত থেকে নিজেকে মুক্ত করে নিতে চাই।···

—উঃ !

···একটু অস্পষ্ট আর্তনাদ ভেসে ওঠে মুখ থেকে, আমার হাত থেকে রক্ত চুইয়ে পড়ছে। ধস্তাধস্তিতে হাতের শাঁখাটা ভেঙ্গে বসে গেছে একটুকরো—অন্য টুকরো ক'টা মেজেতে ছিটিয়ে পড়েছে।

···হাতটা সরিয়ে নিয়ে বের হয়ে এলাম—ওঘর থেকে চাপা হাসির শব্দ শোনা যায়।···কাঁপছি উত্তেজনায়—চোখে জলও এসে গেছে। দরজা থেকে দেখি পদত্যাগ-পত্রখানা মিঃ সেন ছিঁড়ে ফেলছেন।

নাগপাশের কঠিন বাঁধনে পাকে পাকে জড়িয়ে পড়েছি। এর থেকে কি মুক্তি আমি পাবো না ?

একটি সন্ধ্যাই নয়—কয়েকটি সন্ধ্যা-ই আমার জীবনে অভিশাপ এনেছে—ওই দানবের কীর্তি-কাহিনী চীৎকার করে শোনাতে ইচ্ছে করে—কিন্তু একজনের মুখ চেয়ে পারিনি। নির্মল আমাকে হয়তো ক্ষমা করবে না।

···হু হু করে কান্না আসে। বাইরে শোনা যায় কর্মচারীদের পায়ের শব্দ—টাইপ মেসিনের দ্রুত আওয়াজ ! আমি যেন এ জগতের স্বাভাবিক জীবনযাত্রা থেকে নির্বাসিত।

···বাড়ীতে পা দিয়েই অবাক হয়ে যাই। একগাদা

ফুল এনেছে নির্মল। রজনীগন্ধা—গোলাপ—পদ্ম, আরও কত কি!

—এত দেরী যে? এগিয়ে এসে কাছে টেনে নেয়।

ওর দৃষ্টি থেকে ক্ষত হাতটা সরিয়ে নিই; শাঁখা ভাঙা ক্ষত হাতটা যেন আজকের অপমানের প্রকট চিহ্ন। শরীর বইছে না। অসহ্য অস্বস্তি দেহ-মন ভরে তুলেছে। ওর আনন্দের আভায় নিজেকে রাঙিয়ে তোলবার চেষ্টা করি মাত্র।

—বাঃ চমৎকার ফুল এনেছো। কি ব্যাপার?

—তোমার জন্মতিথি কাল না? ছুটি নিয়ে এসেছো তো? কাল যেতে দোবনা কোথাও, বুঝলে।

…বুকের কাছে টেনে নেয় আমাকে।

…হঠাৎ যেন ঝড় বয়ে আসে। একটি সন্ধ্যার নিষ্ঠুর দৃশ্য মনে জাগে—কার শ্বাপদ লালসাভরা দুটো চোখ গ্রাস করছে আমাকে; সমস্ত জীবন ব্যর্থ করে দিয়েছে।…

—কি হল?

…বাথরুমের দিকে এগিয়ে যাই। সারা গা পাক দিচ্ছে অসহ্য ঘৃণায়। দুর্বিসহ গ্লানি যেন নাক-মুখ ঠেলে বের হয়ে আসতে চায়। বাথরুমের দেওয়াল ধরে সামলাবার চেষ্টা করি। শব্দ শুনে ছুটে আসে নির্মল—বলিষ্ঠ হাতে আমাকে ধরে মাথায় মুখে জল দিতে থাকে।

—ডাক্তারকে খবর দিই?

লজ্জায় ঘৃণায় শিউরে উঠি—আর্তনাদ হয়ে ওঠে কণ্ঠস্বর—না-না!

…এই দুঃস্বপ্নই বার বার দেখেছিলাম। এমনি করে ব্যর্থ হয়ে যাবে আমার জীবন নিদারুণ জীবনযোড়া অভিনয়ে। নির্মল জানবে না—আমার পরিচয়, ঘৃণ্য নরকের কীটকে স্বীকৃতি দেবে—প্রশ্রয় দেবে ওই নিষ্ঠুর মানবের পাশবিকতাকে। আর আমিও অভিনয় করে যাবো। এ কথা ভাবতে গেলেও ঘৃণায় মন ভরে ওঠে।

ডাক্তার এসে কি বলবে? আমি টের পেয়েছি সেই রক্তবীজের অস্তিত্ব আমার শিরা উপশিরায়, দেহের অণু-পরমাণুতে।

—তোমার জন্ম দিনেই সেও এসেছে।

—হ্যাঁ!

…নির্মল খুশীতে—নিজের পূর্ণতার সংবাদে আজ উল্লসিত, জড়িয়ে ধরে আমাকে।

—আর অপিস যেতে হবে না, ছুটি নাও, দরকার হয় ছেড়েই দাও ও চাকরী…নির্মলের দিকে ফ্যাকাসে বিবর্ণ দৃষ্টিতে চাইবার চেষ্টা করি। মনের ভিতরটা সে যেন দেখতে না পায়—এ জীবনে এত বড় পাওয়া আমি হারাতে চাই না।

…কিন্তু অসহ্য হয়ে উঠেছে এই বিড়ম্বনাহীন অপমান। নির্মলকে এই পাপের বোঝা বইবার বেদনা আমি দিতে পারি না—আমিই প্রায়শ্চিত্ত করে যাবো আমার পাপের—দোষের—দুর্বলতার।

সেতারের খরজের তার সপ্তমে উঠে তীব্র কম্পনে থান্ থান্ হয়ে ছিঁড়ে পড়ে—অন্তহীন শুব্ধতায়। আমার মনের সব সহ্যসীমা আজ চরমে উঠেছে—অসহ্য হয়ে উঠেছে প্রতিটি মুহূর্ত—নির্মলের ওই স্পর্শ—আশার আনন্দ আমার কাছে। ক্ষত-বিক্ষত মন ক্রমশঃ চেতনাহীন হয়ে আসছে রক্তক্ষয়ী সংগ্রামে। এর শেষ হোক।

…ভেঙে যাক এ খেলাঘর। নির্মল দুঃখ পাবে, কিন্তু পুঞ্জীভূত ঘৃণা আর জীবনযোড়া অবিশ্বাসের বোঝা বওয়ার চেয়ে ক্ষণিকের নিবিড় দুঃখও সহনীয়। জন্মতিথি আর মৃত্যুতিথি এক হয়ে যাক। উৎসবের ফুল—বিদায়ের দুঃখে রাঙা হোক—ঝরে যাক।

…আমার পথ বেছে নিলাম।

হ্যাঁ। সব কথাই বললাম। নামটা বলিনি—হয়তো কেউ কেউ শুনতে চাইবে। হাজারো নামের ভিড়ে হারিয়ে যাওয়া একটি সাধারণ মেয়ে—অতি সাধারণ তার নাম। কল্পনা।

দিনের পর দিন প্রতিদিন...
রেক্সোনা সাবান
আপনার ত্বককে আরও সুন্দর করে
যতবারই আপনি রেক্সোনা সাবান দিয়ে মুখ ধোবেন—আপনার ত্বক আরও মসৃণ, আরও মোলায়েম দেখাবে। তার কারণ, রেক্সোনায় আছে ক্যাডিল—অর্থাৎ কয়েকটি তেলের এক বিশেষ সংমিশ্রণ যা আপনার লাবণ্যকে সুন্দর করে এবং আপনার ত্বককে সুস্থ রাখে। রেক্সোনার সরের মত ফেণা মাখুন দেখবেন আপনার ত্বক প্রতিদিন আরও সুন্দর হয়ে উঠছে।
আপনার সৌন্দর্য্যের জন্যে··· রেক্সোনা
Rexona
BLENDED WITH CADYL
রেক্সোনা প্রো, লিঃ, অষ্ট্রেলিয়ার পক্ষে হিন্দুস্থান লিভার লিঃ, কর্তৃক ভারতে প্রস্তুত
RP. 158-X52 BG

বেদান্ত-দর্শন

শ্রীতারকচন্দ্র রায়

বেদান্ত-বিরুদ্ধ মত খণ্ডন

পূর্ব্ব মীমাংসা মতে বেদের সর্ব্বত্র কর্ম্মের কথাই আছে। সুতরাং ব্রহ্মই বেদের প্রতিপাদ্য, ইহা বলা যায় না। কিন্তু উপনিষৎ বাক্যগুলি বিচার করিলে দেখা যায়, ব্রহ্ম প্রতিপাদন করাই তাহাদের উদ্দেশ্য। ইহা বলা যায় না যে যজ্ঞকর্ত্তার স্বরূপ কি, তাহাই এই সকল উপনিষৎ বাক্যে বর্ণিত হইয়াছে এবং এই সকল বাক্য যজ্ঞেরই অঙ্গ। যদি বলি-যজ্ঞ দ্বারা স্বর্গ লাভ হয়, কিন্তু ব্রহ্মকে জানিয়া লাভ কি? ইহার উত্তর ব্রহ্মকে জানিলে দুঃখ হইতে ঐকান্তিক মুক্তি এবং অনন্তকাল অসীম আনন্দ লাভ হয়। যজ্ঞ বিধি অপেক্ষা ব্রহ্মজ্ঞান লাভের প্রয়োজন অধিক।

মীমাংসা বলেন—বেদে ব্রহ্মের উপাসনার কথা আছে। সত্য, কিন্তু উপাসনারূপ কর্ম্মের অঙ্গস্বরূপেই ব্রহ্মের স্বরূপ বলা হইয়াছে। যথোক্তরূপে ব্রহ্মের উপাসনারূপ কর্ম্ম করিলে মোক্ষ লাভ হইবে, ইহা বলাই বেদের উদ্দেশ্য। কিন্তু শঙ্কর বলেন, কর্ম্মের ফল অনিত্য। উপাসনা কর্ম্ম দ্বারা যদি মোক্ষলাভ হইত, তাহা হইলে মোক্ষ অনিত্য হইত। মোক্ষ কর্ম্মের ফল নহে, জ্ঞানের ফল "তমেব বিদিত্বা অতিমৃত্যুম্ এতি"। আত্মা নিত্য শুদ্ধ। কর্ম্ম দ্বারা তাহার শুদ্ধি হয় না।

যদি বলেন, জ্ঞান মনের ক্রিয়া বিশেষ। তাহা যদি হয় তাহা হইলে মোক্ষ জ্ঞানরূপ কর্ম্ম দ্বারা লভ্য। কিন্তু শঙ্করের মতে জ্ঞান বস্তু-তন্ত্র। তিনি বলেন, যাহা ইচ্ছা হইলে করা যায়, ইচ্ছা না হইলে না করা যায়, তাহাই ক্রিয়া। কিন্তু জ্ঞান যখন বস্তুতন্ত্র, তখন তাহা কাহারও ইচ্ছার উপর নির্ভর করে না। ব্রহ্মকে ব্রহ্মরূপে জানাই ব্রহ্মজ্ঞান। তাহা ক্রিয়া নহে।

সাংখ্য মত খণ্ডন

"সদেব সৌম্য, ইদম্ অগ্রে আসীৎ। একমেবাদ্বিতীয়ং তদ্ ঐক্ষত বহু স্যাম্ প্রজায়েয়।" ছান্দোগ্য উপনিষদের (৬।২।১-৩) এই বাক্যে যে সত্তের কথা আছে, তিনি সাংখ্যের "প্রধান" নহেন। কেননা সাংখ্যের প্রধান অচেতন। এখানে যে সত্তের কথা আছে—তিনি "ঐক্ষত" অর্থাৎ আলোচনা করিয়াছিলেন। অচেতন বস্তু আলোচনা করিতে পারে না। (১।১।৫) গৌণ অর্থেও এখানে "ঐক্ষত" শব্দ ব্যবহৃত হয় নাই। কেননা পরে আত্মা শব্দের প্রয়োগ আছে। "অহং ইমাঃ তিস্রঃ দেবতা অনেন জীবেন আত্মনা অনুপ্রবিশ্য নামরূপে ব্যাকরবাণি" (ছা- ৬।৩।২)। আমি এই তেজ অপ ও অন্ন এই তিন দেবতার মধ্যে জীবাত্মা রূপে প্রবেশ করিয়া নাম ও রূপ ব্যক্ত করি। আবার "তন্নিষ্ঠস্য মোক্ষোপদেশাৎ" (১।১।৭)। সেই সতে নিষ্ঠ যিনি, তাহার মোক্ষ হইবে একথাও আছে। অচেতন প্রকৃতিনিষ্ঠ যিনি, তাহার মোক্ষ হইতে পারে না। স্থুল জগৎ ত্যাগ করিয়া প্রথম সূক্ষ্ম প্রধানের ধারণা করিয়া পরে সূক্ষ্মতর ব্রহ্মের ধারণা করিতে হয়। এইজন্য এখানে 'সৎ' পদ দ্বারা প্রধানের কথা বলা হইয়াছে। ইহাও কেহ কেহ বলেন। কিন্তু ইহা ঠিক নহে। "হেয়ত্বাবচনাৎ" (১।১।৮) কেননা এই 'সৎ' যে হেয়, তাহাকে ত্যাগ করিয়া ব্রহ্মকে গ্রহণ করিতে হইবে এ কথা নাই।

সুষুপ্তি কালে জীব 'স্ব'কে প্রাপ্ত হয়, একথা উপনিষদে আছে (স্বাপ্যয়াৎ ১।১।৯। অপ্যয়=প্রাপ্তি)। এই স্বশব্দ বাচ্য সৎ অচেতন প্রকৃতি হইতে পারে না।

সকল বেদান্ত বাক্যের "গতি" (তাৎপর্য্য) এক। (গতি সামান্যাৎ। ১।১।১০) তাহা ব্রহ্মজ্ঞান। সুতরাং এখানে বেদান্ত বাক্যের তাৎপর্য্য প্রধান বা প্রকৃতি হইতে পারে না। ব্রহ্ম যে জগতের কারণ, তাহা শ্রুতিতে স্পষ্টভাবে আছে। "স কারণং করণাধিপাধিপঃ" (শ্বেত)

উপনিষদে ব্রহ্মকে বহুস্থলে আনন্দময় বলা হইয়াছে। (১।১।১২)। (আনন্দময়ঃ অভ্যাসাৎ) তাহাকে আনন্দের হেতুও (তদ্ধেতুব্যপদেশাৎ চ-১।১।১৪) বলা হইয়াছে। আনন্দময় শব্দের অর্থ—যাহাতে প্রচুর আনন্দ আছে। ইতর

ব আনন্দময় হইতে পারে না। (১।১।১৬)। আনন্দময় আত্মা যে জীব হইতে ভিন্ন, তাহাও বলা হইয়াছে। (ভেদব্যপদেশাৎ চ ১।১।১৭)। এই আনন্দময় আত্মা "কামরত বহু স্যাম প্রজায়েয়" অর্থাৎ আমি বহু হইব, জন্মগ্রহণ করিব, এই কামনা করিলেন। (১।১।১৮) অচেতন প্রকৃতি কামনা করিতে পারে না।

সাংখ্যদর্শনের প্রকৃতি শ্বেতাশ্বতর উপনিষদে যে অব্যক্তের কথা আছে, তাহা নহে। (মহতঃ পথমব্যক্তং)। যেখানে অব্যক্ত শব্দের অর্থ শরীর। যে সকল সূক্ষ্ম ভূত হইতে শরীরের উৎপত্তি তাহারাই 'অব্যক্ত' শব্দের বাচ্য। এই অব্যক্ত ব্রহ্মের অধীন। এই অব্যক্তকে জানিতে হইবে একথাও উপনিষদে নাই।

শ্বেতাশ্বতর উপনিষদে 'অজামেকাং লোহিত শুক্লকৃষ্ণারং' যাহাকে বলা হইয়াছে', তাহা যে সাংখ্যের প্রকৃতিকে লক্ষ্য করিতেছে, তাহা বলা যায় না। তাহা বেদান্তের প্রকৃতি। ঈশ্বরের শক্তিই এই অজা প্রকৃতি।

বৃহদারণ্যকোপনিষদে আছে যাহার মধ্যে "পঞ্চ পঞ্চ জনা আকাশশ্চ প্রতিষ্ঠিতঃ" তাহাকে আত্মা, ব্রহ্ম ও অমৃত মনে করি"। এই "পঞ্চ পঞ্চরূপাঃ" "সাংখ্যের পঞ্চ বিংশতি তত্ত্ব নহে। কেননা সাংখ্যের পঞ্চ বিংশতি তত্ত্ব নানাবিধ বস্তু। তাহাদিগকে পাঁচটি পাঁচটি করিয়া একত্র উল্লিখিত করিবার কারণ নাই। বিশেষত: আকাশও আত্মা ধরিয়া উপনিষদের তত্ত্বসংখ্যা ২৭টি, ২৫টি নহে। (১।২।১১)

সাংখ্যশাস্ত্র স্মৃতিশাস্ত্র, তাহাকে অগ্রাহ্য করা যায় না। এ কথা বলা চলে না। কেননা মহাভারত মনুসংহিতা প্রভৃতি স্মৃতির সাহিত সাংখ্যদর্শনের মিল নাই। ঐ সকল স্মৃতিতে ঈশ্বরকেই জগৎকারণ বলা হইয়াছে। যে স্মৃতি বেদের অনুযায়ী, তাহাই গ্রাহ্য, বেদ-বিরোধী স্মৃতি গ্রাহ্য নহে। স্মৃত্যেনবকাশ প্রসঙ্গ ইতিচেৎ, ন অন্যস্মৃত্যনবকাশদোষ প্রসঙ্গাৎ। ২।১।১)

সাংখ্যদর্শনে যে সকল তত্ত্বের উল্লেখ আছে, তাহাদের কতকগুলির উল্লেখ বেদে নাই। তাহাদের অনুভবও হয় না। (ইতরেষাং চ অনুপলব্ধেঃ—২।১।২)

অচেতন প্রকৃতি কর্তৃক জগৎ রচনা সম্ভবপর নহে। সাংখ্যমতে পুরুষের প্রয়োজন সাধনের উদ্দেশ্যে অচেতন প্রকৃতি জগৎরূপে পরিণত হইয়াছেন। কিন্তু কোনও বস্তু রচনা করিতে হইলে প্রথমে সেই উদ্দেশ্যে প্রবৃত্তি হওয়া চাই। অচেতন বস্তুর প্রবৃত্তি হইতে পারে না। সুতরাং অনুমান (সাংখ্য প্রকৃতি) জগতের কারণ হইতে পারে না। (রচনানুপপত্তেশ্চন অনুমানম্। ২।২।১। প্রবৃত্তেশ্চ ২।২।২)

গো-বৎসের তৃপ্তির জন্য ধেনুর স্তন হইতে আপনা হইতেই দুগ্ধ ক্ষরিত হয়। জীবের মঙ্গলের জন্য বৃষ্টি হয়। এ সকল স্থলে অচেতন বস্তু চেতন বস্তুর প্রয়োজনসাধনার্থ আপনা হইতেই প্রবৃত্ত হয়—ইহা বলা যায় না। বৎসের প্রতি ধেনুর স্নেহই তাহার দুগ্ধক্ষরনের কারণ। বৃষ্টির জল ঈশ্বরাধিষ্ঠিত হইয়া জীবের মঙ্গলের জন্য পতিত হয়। এখানে অচেতনের প্রবৃত্তির কথা নাই। (পয়োম্বুবৎ চেৎ তত্রাপি। ২।২।৩)

চেতনের অধিষ্ঠান ব্যতীত যদি প্রকৃতি জগৎ রচনা করিতে সমর্থ হয়, তাহা হইলে জগৎ রচনা সর্ব্বদাই চলিবে, কখনও প্রলয় হইবে না। (ব্যতিরেকানবস্থিতেশ্চ অনপেক্ষত্বাৎ। ২।২।৪)

গাভীর উদরস্থ তৃণ অন্যবস্তুর অপেক্ষা না করিয়া যেমন নিজ হইতেই দুগ্ধে পরিণত হয়, সেইরূপ প্রকৃতি কাহারও অপেক্ষা না করিয়া জগতে পরিণত হয়, ইহা বলা যায় না। কেননা তৃণ দুগ্ধে পরিণত হইবার জন্যে যদি অন্য কিছুর অপেক্ষা না রাখিত, তাহা হইলে সর্ব্বদাই দুগ্ধে পরিণত হইত। (অন্যত্র অভাবাৎ চ, ন তৃণাদিবৎ। ২।২।৫)

প্রকৃতি অন্য বস্তুর অপেক্ষা না করিয়া জগতে পরিণত হইতে পারে ইহা স্বীকার করিলেও, পুরুষের প্রয়োজনের অভাবে এই যুক্তি সিদ্ধ হয় না। সাংখ্যমতে পুরুষ নির্বিকার। তাহার কিসের প্রয়োজন? সে কিরূপে ভোগ করিবে? যদি বল তাহার প্রয়োজন মোক্ষ, তাহা হইলে বক্তব্য যে মোক্ষ তো তাহার নিত্যসিদ্ধ, মোক্ষতো হইয়াই আছে। (অভ্যুপামেহপি অর্থাভাবাৎ। ২।২।৬)

পঙ্গু ও অন্ধ এবং চুম্বক প্রস্তরের দৃষ্টান্ত এখানে খাটে না। পঙ্গু দেখিতে পায়, চলিতে পারে না। অন্ধ চলিতে পারে, দেখিতে পায় না। অন্ধের স্কন্ধে আরোহণ করিয়া পঙ্গু তাহাকে চালিত করিতে পারে। সাংখ্যের পুরুষের জ্ঞান আছে, কিন্তু ক্রিয়া-ক্ষমতা নাই। প্রকৃতি ক্রিয়া করিতে পারে, কিন্তু তাহার জ্ঞান নাই। পুরুষের দ্বারা অধিষ্ঠিত প্রকৃতি ক্রিয়া করিতে পারে। কিন্তু পঙ্গু

চলিতে না পারিলেও পথ নির্দেশ করিতে পারে। কিন্তু সাংখ্যের পুরুষ কিছুই পারে না। সে প্রকৃতিকে পরিচালিত করিবে কিরূপে? চুম্বক-প্রস্তর যেমন নিকটস্থ লৌহকে চালিত করে, সেইরূপ পুরুষ প্রকৃতিকে চালিত করে, ইহাও বলা যায় না। কেননা তাহা হইলে প্রকৃতি সর্ব্বদাই ক্রিয়াশীল থাকিত, প্রলয় কখনও হইত না। (পুরুষাশ্মবৎ, ইতি চেৎ, তথাপি। ২।২।৭)

সাংখ্যমতে সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ প্রকৃতিরূপ অঙ্গীর অঙ্গ নহে, সত্ত্ব-রজঃ ও তমঃর সাম্যাবস্থাই প্রকৃতি। সুতরাং ঐ তিন গুণের সাম্যবস্থার, বিচিত্র হইয়া কিরূপে সৃষ্টি হইতে পারে, তাহা বোধগম্য হয় না। যদি উক্ত তিনগুণ প্রকৃতির অঙ্গ হইত, তাহা হইলে অঙ্গীর প্রভাবে গুণ বিশেষের কাহারও প্রাবল্য কাহারও দৌর্বল্য হইতে পারিত। কিন্তু তাহারা কোনও অঙ্গীর অঙ্গ নহে। (অঙ্গিত্বানুপপত্তেশ্চ। ২।২।৮)

যদি বল, প্রলয় অবস্থায় গুণত্রয়ের সাম্য থাকিলেও তাহাদের বৈষম্যের উপযোগিতা আছে এবং সেইজন্য তাহারা কমবেশী হইয়া জগৎ রচনা করিতে পারে, তাহা হইলে প্রশ্ন ওঠে বৈষম্যের উপযোগিতা থাকিলেও বৈষম্যের উদ্ভবের কারণ চাই। প্রকৃতির যখন চৈতন্য শক্তি নাই, তখন কি কারণে এক গুণের প্রাবল্য, অন্য গুণের দুর্ব্বলতা ঘটিবে? (অন্যথা নুমিতৌ চ উৎ-শক্তি বিয়োগাৎ। ২।২।৯)

সাংখ্যমত সামঞ্জস্য বিহীন। ইহার মধ্যে বিরোধ আছে। (বিপ্রতিষেধাৎ চ অসমঞ্জসম। ২।২।১০)। কেহ বলেন ইন্দ্রিয় সাতটি, কেহ বলেন ১১টি। কেহ বলেন মহৎ হইতে পঞ্চ তন্মাত্র উৎপন্ন হয়। কেহ বলেন অহংকার হইতে। কোথাও উক্ত হইয়াছে অন্তঃকরণ তিনটি, কোথাও উক্ত হইয়াছে একটি। পুরুষকে নির্বিকার আবার ভোক্তাও বলা হইয়াছে। আবার পুরুষকে নিগুর্ণ বলিয়া, প্রকৃতির গুণ পুরুষে আরোপিত হয় এবং পুরুষ আপনাকে সুখী বা দুঃখী মনে করে, ইহাও বলা হইয়াছে। (বিপ্রতিষেধাৎ চ অসমঞ্জসম্। ২।২।১০)

যোগ খণ্ডন

যোগ স্মৃতিশাস্ত্র হইলেও মনুসংহিতা, মহাভারত প্রভৃতি শাস্ত্রের সহিত জগতের উৎপত্তি সম্বন্ধে ইহার মিল নাই। বেদের সহিতও এই বিষয়ে ইহার বিরোধ আছে। সুতরাং সাংখ্যদর্শনের ন্যায় যোগ দর্শনও এই বিষয়ে গ্রহণীয় নহে। (এতেন যোগঃ প্রত্যুক্তঃ ২।১।৩)

যোগমতে ঈশ্বর প্রকৃতি ও পুরুষ হইতে ভিন্ন ঈশ্বরের সহিত তাহাদের কোনও সম্বন্ধ থাকিতে পারে না। (সম্বন্ধানুপপত্তেশ্চ। ২।২।৩৮)

যোগমতে প্রকৃতি, পুরুষ ও ঈশ্বর সকলেই অনন্ত। ঈশ্বর যদি অনন্ত হন তাহা হইলে তিনি আপনাকে প্রকৃতিকে ও পুরুষকে সম্পূর্ণভাবে জানেন কি? যদি জানেন, তাহা হইলে প্রকৃতি পুরুষ অনন্ত হইতে পারেন না, কেননা তাহারা ঈশ্বরের জ্ঞানদ্বারা পরিচ্ছন্ন হন। যদি ঈশ্বর ইহাদিগকে সম্পূর্ণভাবে না জানেন তিনি সর্ব্বজ্ঞ হইতে পারেন না। কিন্তু যোগ মতে তিনি সর্ব্বজ্ঞ। (অন্তবত্ত্বং অসর্ব্বজ্ঞতা বা ২।২।৪১)

বৈশেষিক মত খণ্ডন

বৈশেষিক মতে দুইটি পরমাণু মিলিত হইয়া একটি দ্ব্যণুক হয়। তিনটি দ্ব্যণুক মিলিত হইয়া একটি ত্র্যণুক হয়। চারিটি ত্র্যণুকে চতুরণু হয়। পরমাণুর পরিমানকে পরিমণ্ডল বলে, দ্ব্যণুকের পরিমানের নাম হ্রস্ব। পরমাণু ও দ্ব্যণুক এবং ত্র্যণুক হইতে চতুরণুর উৎপত্তি হইলেও পরমাণুর গুণ পরিমণ্ডল এবং দ্ব্যণুকের গুণ হ্রস্ব চতুরণুতে থাকে না। 'মহৎ' ও 'দীর্ঘ' নামে অপর গুণ চতুরণুতে উৎপন্ন হয়। এইভাবে যদি চেতন ব্রহ্ম হইতে অচেতন জগতের উৎপত্তি হয়, তাহা হইলে বৈশেষিক তাহাতে দোষ দিতে পারেন না। (মহৎ-দীর্ঘবৎ বা হ্রস্ব-পরিমণ্ডলাভ্যাম্। ২।২।১১)

বৈশেষিক মতে সৃষ্টিকালে পরমাণুগণ সক্রিয় হয়। কেন হয়? জীবের কর্ম্ম বা অদৃষ্টবশতঃ? তাহা হইলে জীবের কর্ম্ম কাহাকে আশ্রয় করিয়া থাকে? যদি জীবকে আশ্রয় করিয়া থাকে তাহা হইলে পরমাণুর গতি উৎপন্ন হইবে কি প্রকারে? যদি পরমাণুর আশ্রয়ে থাকে, তাহা হইলে সেই অদৃষ্ট হইতে উদ্ভূত গতির তো কখনই বিরাম হইবে না। দুই বিকল্পের কোনটি অনুসারেই সৃষ্টি ও প্রলয় উভয়ের ব্যাখা হয় না। (উভয়থা অপি ন কর্ম্ম, অতঃ তদভাবঃ। ২।২।১২)

দুইটি পরমাণুর সংযোগে গঠিত দ্ব্যণুকের সহিত পরমাণু-দ্বয়ের সম্বন্ধ বৈশেষিক মতে সমবায় সম্বন্ধ। এই সম্বন্ধ কিরূপে দ্ব্যণুতে অবস্থান করে? ইহার জন্য অন্য একটি সমবায় সম্বন্ধের কল্পনার প্রয়োজন। আবার এই দ্বিতীয় সমবায়ের জন্য অন্য একটি সমবায় সম্বন্ধের কল্পনার প্রয়োজন। এইরূপে অনবস্থায় উদ্‌ভব হয়। (সমবায়াভ্যুগমাৎ চ সাম্যাৎ অনবস্থিতেঃ। ২।২।১৩)

পরমাণুর স্বভাব কিরূপ? উহার স্বভাব কি প্রবৃত্তি, না নিবৃত্তি, অথবা প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তি উভয়ই অথবা দুইটির কোনওটিই নহে। প্রবৃত্তি পরমাণুদিগের স্বভাব হইলে, তাহারা সর্ব্বদাই ক্রিয়াশীল থাকিবে, প্রলয় কখনও হইবে না। নিবৃত্তি স্বভাব হইলে পরমাণুগণ সর্ব্বকার্য নিষ্ক্রিয় থাকিবে কখনই সৃষ্ট হইবে না। দুইটি পরস্পর বিরোধী গুণ এক বস্তুতে থাকিতে পারে না। সুতরাং প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তি উভয়ই পরমাণুদিগের স্বভাব হইতে পারে না। প্রবৃত্তি অথবা নিবৃত্তি কোনটিই পরমাণুর স্বভাব যদি না হয়, অদৃষ্টহেতু কখনও প্রবৃত্তি কখনও নিবৃত্তি হয়, তাহা হইলে যে দোষ হয়, তাহা পূর্ব্বে উল্লিখিত হইয়াছে। সুতরাং পরমাণু বাদ অসিদ্ধ। (নিত্যমেবচ ভাবাৎ-২.২ ১৪)

বৈশেষিক মতে পরমাণুগণ নিত্য, কিন্তু তাহাদের রূপ-রসাদি গুণ আছে। কিন্তু দেখা যায় যে সকল বস্তুর রূপ-রসাদি গুণ আছে, তাহারা অনিত্য। সুতরাং পরমাণু গণ নিত্য গৃহীত হইতে পারে না। (রূপাদিমত্বাৎ চ বিপর্য্যয় দর্শনাৎ। ২.২।১৫)

বৈশেষিক মতে চারিপ্রকার পরমাণু—ক্ষিতি, অপ, তেজ ও মরুৎ। ইহাদের গুণসম্বন্ধে যদি বলা যায় ক্ষিতির চারি গুণ রূপ, রস, গন্ধ ও স্পর্শ, অপের তিনগুণ—রূপ, রস, ও স্পর্শ, তেজের দুইগুণ—স্পর্শ ও রূপ এবং মরুতের এক গুণ স্পর্শ, তাহা হইলে পরমাণুদিগের সূক্ষ্মত্ব ও স্থূলত্বের ইতর বিশেষ আছে, ইহা স্বীকার করিতে হয়। কিন্তু বৈশেষিক মতে সকল পরমাণুটি সূক্ষ্মতম। যদি বলা যায় মৃত্তিকার কেবল গন্ধগুণ, অপের কেবল রস, তেজের কেবল রূপ এবং বায়ুর কেবল স্পর্শগুণ আছে, তাহা হইলে তাহা প্রত্যক্ষের বিরোধী হয়। কেননা ক্ষিতির স্পর্শ, রূপ ও রস গন্ধ প্রত্যক্ষ। (উভয়থা চ দোষাৎ। ২।২।১৬)

বৈশেষিক দর্শনের কোনও মতই বেদজ্ঞ ঋষিগণ গ্রহণ করেন নাই। এইজন্য এই মত একেবারেই গ্রাহ্য নহে। (অপরিগ্রহাৎ চ অত্যন্তম্ অনপেক্ষা। ২।২।১৭)

বৌদ্ধ মত খণ্ডন

বুদ্ধের মহাপরিনির্বাণের পরে তাঁহার শিষ্যদিগের মধ্যে তাঁহার মত সম্বন্ধে মতভেদের উদ্‌ভব হয়। এই মতভেদের ফলে ত্রিশটির অধিক দর্শনের উদ্‌ভব হয়। বুদ্ধ-তাত্ত্বিক গবেষণা (melaphysical speculation) নিষেধ করিয়াছিলেন। কিন্তু এই সকল বৌদ্ধদর্শনে গভীর দার্শনিকতত্ত্ব সকল আলোচিত হইয়াছিল। বুদ্ধ যে কর্ম্মনীতি প্রচার করিয়াছিলেন, তাহার সমর্থনের জন্য সময়ে সময়ে তাঁহাকে জগতের স্বরূপের আলোচনাও করিতে হইয়াছিল। তাহার এই আলোচনাকে এক দার্শনিক প্রস্থান বলিয়া গণ্য করা যাইতে পারে। আমাদের চিন্তা এই জগতে এবং আমাদের জীনের উন্নতিতেই সীমাবদ্ধ করিতে তিনি উপদেশ দিয়াছিলেন। এইজন্য বুদ্ধের দর্শনকে প্রত্যক্ষ-বাদ (Positivism) বলা যাইতে পারে। তিনি ইহাও বলিয়াছিলেন যে আমাদের অভিজ্ঞতায় যেসকল সমুৎপাদের (Phenomena) সংস্পর্শে আসি, তাহাদের সম্বন্ধেই কেবল আমরা নিশ্চিন্ত হইতে পারি। সুতরাং তাহার দর্শনকে সমুৎপাদ বাদও (Phenomenalism) বলা যায়। অভিজ্ঞতাই (Experience) এই দর্শনের গবেষণার ভিত্তি বলিয়া ইহাকে অভিজ্ঞতাবাদও বলা যায়। বুদ্ধ যে অভিজ্ঞাতার অতীত, দশটি তাত্ত্বিক বিষয়ের আলোচনা নিষিদ্ধ করিয়াছিলেন, তাহা হইতে কেহ কেহ তাঁহাকে সম্পূর্ণ অভিজ্ঞতা বাদী (Empiricist) বলিয়া গ্রহণ করিয়াছিলেন, এবং অভিজ্ঞতার অতীত বিষয়ের জ্ঞান লাভ আমাদের পক্ষে অসম্ভব ইহাই বুদ্ধের মত বলিয়া ধরিয়া লইয়াছিলেন।

মহাযানিগণ বুদ্ধের এই মনোবৃত্তিকে ইন্দ্রিয়াতীত বিষয়ের অস্তিত্ব অস্বীকার, অথবা তাহার জ্ঞানলাভের অসম্ভবতাসূচক বলিয়া গ্রহণ করেন নাই। ইন্দ্রেয়াতীত বিষয়ের ও তাহার অভিজ্ঞতায় বর্ণনা করা যে সম্ভব, তাহাদের মতে বুদ্ধ তাহা অস্বীকার করেন নাই। ইহার সমর্থনে ইন্দ্রিয়ের অনধিগম্য বিষয়ের জ্ঞান নির্বাণে লাভ করা যায়। বুদ্ধের এই উক্তির তাহারা উল্লেখ করিতেন। বুদ্ধ অনেকবার বলিয়াছিলেন যে তিনি বহুদূরে স্থিত অনেক

অনুভব লাভ করিয়াছিলেন, যাহা যুক্তি দ্বারা লভ্য নহে এবং জ্ঞানী ব্যক্তিরাই কেবল যাহা বুঝিতে পারেন। ইহার ফলে এক প্রকার গুহ্যবাদের (mystic'sm) ও উদ্ভব হইয়াছিল।

বৌদ্ধদার্শনিক প্রস্থানগুলির মধ্যে চারিটি প্রধান: (১) মাধ্যমিক দর্শন বা শূন্যবাদ (২) বিজ্ঞানবাদ বা যোগাচার (৩) বাহ্যানুমানবাদ বা সৌত্রান্তিকবাদ (৪) বাহ্য প্রত্যক্ষবাদ বা বৈভাষিকবাদ। মাধ্যমিক বা শূন্যবাদ অনুসারে মানসিক অথবা অমানসিক, কোনও বস্তুরই প্রকৃত অস্তিত্ব নাই, সকলই শূন্য। যোগাচারে (বিজ্ঞানবাদ মতে) মনোবাহ্য জগতের অস্তিত্ব নাই, মানসিক বস্তুরই কেবল অস্তিত্ব আছে। সৌত্রান্তিকবাদে মানসিক এবং মনোবাহ্য উভয়বিধ বস্তুরই অস্তিত্ব আছে। কিন্তু বাহ্য-বস্তুর প্রত্যক্ষ জ্ঞান লাভ হয় না, তাহা অনুমানগম্য। এই মতকে সর্ব্বাস্তিবাদও বলে। বৈভাষিক মতে মানসিক ও মনোবাহ্য উভয়বিধ বস্তুই প্রত্যক্ষ অনুভবগম্য। প্রত্যেক বস্তুই সদাপরিবর্ত্তনশীল, তাহার অস্তিত্ব ক্ষণিক, ইহাও একটি বৌদ্ধমত।

ব্রহ্মসূত্রে এই সকল মতের যে সমালোচনা আছে, তাহা এই: (১) সর্ব্বাস্তিবাদে বাহ্য ও আন্তর উভয়বিধ পদার্থই স্বীকৃত। ক্ষিতি, অপ, তেজ ও মরুৎ পরমাণুগণ সম্মিলিত হইয়া জগৎ রচনা করে। ইন্দ্রিয়ের সহিত বিষয়ের মিলন হইতে রূপ, রস, গন্ধ ও স্পর্শের জ্ঞান হয়। এই জ্ঞানকে রূপস্কন্ধ বলে। ইহাই বাহ্য জগৎ। অন্তর্জ্জগৎ চারি স্কন্ধে বিভক্ত—বিজ্ঞান স্কন্ধ (অহং অহং রূপ বিজ্ঞান প্রবাহ) বেদনা স্কন্ধ (সুখ দুঃখাদির অনুভূতি), সংজ্ঞাস্কন্ধ (গো, অশ্ব প্রভৃতি নামের প্রত্যয়) এবং সংস্কার স্কন্ধ (রাগ দ্বেষ প্রভৃতি ভাব)। অণুদিগের সমুদায় (মিলন) এবং স্কন্ধদিগের সমুদায় হেতু জগতের ব্যাপার সকল নিষ্পন্ন হয়। কিন্তু এই দুই প্রকার সমুদায় হইতে পারে না! কেননা পরমাণুগণ যেমন অচেতন, স্কন্ধগুলিও তেমনি। কোনও চেতন বস্তু দ্বারা চালিত না হইলে সুসংবদ্ধ মিলন কিরূপে সংঘটিত হইবে? আর উৎপন্ন হইবার পরক্ষণেই যদি স্কন্ধগণের ধ্বংস হয়, তাহা হইলে মিলিত হইবার অবসর থাকে না। এই মতে স্কন্ধগণ ক্ষণিক। (সমুদায়ে উভয় হেতু অপি তদপ্রাপ্তিঃ। ২।২।১৮)

বৌদ্ধমতে অবিদ্যা, সংস্কার, নাম, রূপ, স্পর্শ, বেদনা, তৃষ্ণা, জরা, মরণ, শোক প্রভৃতির একটি হইতে আর একটির উৎপত্তি হয় এবং এইভাবে লোকে যাত্রা নির্ব্বাহিত হয়। কিন্তু একটি হইতে আর একটির উৎপত্তি স্বীকার করিলেও, ইহাদের পরস্পরের মিলনের কোনও হেতু নাই, সুতরাং লোকযাত্রা নির্ব্বাহিত হইতে পারে না। (ইতরেতর প্রত্যয়ত্বাৎ ইতি চেৎ ন, উৎপত্তিমাত্রনিমিত্ত ত্বাৎ। ২।২।১৯)

বৌদ্ধমতে পরবর্ত্তী ক্ষণ উৎপন্ন হইবামাত্র পূর্ব্ববর্ত্তী ক্ষণ বিনষ্ট হয়। অথচ পূর্ব্বক্ষণকে পরক্ষণের হেতু বলা হয়। পূর্ব্বক্ষণ উৎপন্ন হইবামাত্র যদি বিনষ্ট হয়, তাহা হইলে পরক্ষণকে উৎপন্ন করিবার অবসর কোথায়? (উত্তরোৎপাদে চপূর্ব্বনিরোধাৎ। ২।২।২০)

পরক্ষণ যখন উৎপন্ন হয়, তখন পূর্ব্বক্ষণ যদি "অসৎ" হয়, অর্থাৎ তাহার অস্তিত্ব যদি তখন না থাকে, তাহা হইলে পূর্ব্বক্ষণকে পরক্ষণের হেতু বলা যায় না (প্রতিজ্ঞার উপরোধ হয়)। আবার—তখন যদি পূর্ব্বক্ষণের অস্তিত্ব থাকে, তাহা হইলে যৌগপদ্য (Simultaneuty) হয়। তাহাতেও প্রতিজ্ঞার উপরোধ হয় কেননা তাহা হইলে পূর্ব্বক্ষণ পরক্ষণের পূর্ব্বক্ষণ হয় না। (অথবা পূর্ব্বক্ষণের ক্ষণিকত্ব থাকে না।) (অসতি প্রতিজ্ঞাপরোধো যৌগপদ্যম্ অন্যথা। ২।২।২১)

বৌদ্ধমতে যাবতীয় বস্তুই ক্ষণিক, কেবল প্রতিসংখ্যা-নিরোধ, অপ্রতিসংখ্যা নিরোধ ও আকাশ এই তিন বস্তু এরূপ নহে। সহেতুক বিনাশের নাম প্রতি-সংখ্যা নিরোধ। সহেতুক অনুপলব্ধ বিনাশের নাম অপ্রতি-সংখ্যা নিরোধ। বৌদ্ধমতে এই তিনবস্তু উৎপত্তি ও বিনাশহীন। ইহাদিগকে অবস্তু বা অভাব মাত্রও বলা হয়। কিন্তু এরূপ যাহার অস্তিত্ব আছে। কোনও বস্তুরই ধ্বংস হইতে পারে না। সুতরাং বৌদ্ধ কল্পনা ভ্রান্তিপূর্ণ। (প্রতিসংখ্যা নিরোধ—অপ্রতিসংখ্যানিরোধ প্রাপ্তিঃ অবিচ্ছেদাৎ। ২।২।২২)

বৌদ্ধমতে অবিদ্যার নিরোধ হইতে নির্ব্বাণ হয়। কিন্তু এই নিরোধ কি আপনা হইতে হয়, বা ইহার হেতু আছে? আপনা হইতে যদি হয়, তবে নানাবিধ উপদেশ দেওয়া হইয়াছে কেন? আবার—জ্ঞান হইতে অবিদ্যা নিরোধ

হয় বলিতে পারেন না, তোমাদের মতে অজ্ঞানের নিরোধ অহেতুক। (উভয়থাচোষাৎ ২।২।২৩)

আকাশ অবস্তু বা অভাব মাত্র নয়। অন্যবস্তুর সহিত আকাশের কিছু ভেদ নাই। "আত্মনঃ আকাশঃ সম্ভূতঃ" —ইহা বেদে আছে। আকাশের গুণ শব্দ ও তাহা প্রত্যক্ষ হয়।

তোমরা বল—আবরণের 'অভাবই' আকাশ। কিন্তু কোনও পক্ষী যখন পাখা মেলিয়া নিম্নে নামিয়া আসে, তখন তাহার পাখাই তো আবরণ। তখন আবরণের অভাব নাই। তবে কি বলিব তখন আকাশও নাই? তাহা হইলে তো অন্য পাখী উড়িয়া উপরে যাইতে পারিবে না। বুদ্ধ বলিয়াছিলেন, বায়ু আকাশকে আশ্রয় করিয়া থাকে। (আকাশে চ অন্য ২।২।২৪)

বৌদ্ধমতে সকল বস্তুই ক্ষণস্থায়ী (ক্ষণিকবাদ)। তাহা যদি হয়, তাহা হইলে যিনি উপলব্ধি করেন (উপলব্ধা) তিনিও ক্ষণিক। কিন্তু উপলব্ধা ক্ষণস্থায়ী হইলে 'অনুস্মৃতি'র (আমি পূর্ব্বে ইহা দেখিয়াছিলাম) সম্ভব হইতে পারিত না। (অনুস্মৃতেশ্চ। ২।২।২৫)

বৌদ্ধমতে কারণের ধ্বংস হইবার পরে কার্য্যের উৎপত্তি হয়। বীজের ধ্বংস না হইলে অঙ্কুরের উৎপত্তি হয় না। দুগ্ধ নষ্ট হইলে পরে দধি হয়। কিন্তু অসৎ হইতে কোনও বস্তুর উৎপত্তি হইতে দেখা যায় না। বীজ ধ্বংস হইবার পরে এবং দধি ধ্বংস হইবার পরে যাহা থাকে (শূন্য) উভয়ের মধ্যে কোনও পার্থক্য নাই। সুতরাং বীজ ধ্বংস হইবার পরে দধি উৎপন্ন হইবার বাধা নাই। যখন বীজ ধ্বংসের পরে অঙ্কুর ভিন্ন অন্য কিছু উৎপন্ন হয় না, তখন বুঝিতে হইবে যে অঙ্কুরোৎপত্তির পূর্ব্বে বীজের ধ্বংস হয় না। অসৎ অর্থাৎ যাহার অস্তিত্ব নাই, তাহার জ্ঞান হইতে পারে না, সুতরাং কোন বস্তু দেখিয়া যখন তাহার জ্ঞান উৎপন্ন হয়, তখন তাহার অস্তিত্ব শেষ হইয়া গিয়াছে, এই মত সত্য হইতে পারে না। (নাসতোঽদৃষ্টত্বাৎ। ২।২।২৬)

যদি অভাব হইতে ভাবের উৎপত্তি হইতে পারিত, তাহা হইলে উদাসীন থাকিয়াও লোকের ইচ্ছা পূর্ণ হইতে পারিত। বিনা সূত্রে তন্তুবায় বস্ত্র উৎপন্ন করিতে পারিত, কৃষককে কষ্ট করিয়া ভূমি কর্ষণ করিতে হইত না। (উদাসীনানামপি এবং সিদ্ধিঃ। ২।২।২৭)

বিজ্ঞানবাদ খণ্ডনের জন্য ব্রহ্মসূত্রে আছে :—

যাহা উপলব্ধ হয়, তাহার অভাব হইতে পারে না। বাহ্য বস্তু উপলব্ধ হয়। সুতরাং তাহার অস্তিত্ব নাই, কেবল বিজ্ঞান মাত্র আছে, তাহাই বাহ্যবস্তুরূপে উপলব্ধ হয়, ইহা হইতে পারে না। (ন অভাব উপলব্ধেঃ। ২।২।২৮)

স্বপ্ন জ্ঞান ও জাগ্রৎ জ্ঞানের ধর্ম্ম বিভিন্ন। স্বপ্নে যে সকল বস্তু দর্শন করা যায়, তাহাদের অস্তিত্ব নাই দেখিয়া জাগ্রৎ অবস্থায় যাহা উপলব্ধি করা যায়, তাহারও অস্তিত্ব নাই, ইহা মনে করা সংগত নহে। স্বপ্নকালে যাহা দেখা যায়, জাগ্রৎ অবস্থায় তাহাদের অস্তিত্ব থাকে না বলিয়া মনে করা যায়, তাহাদের অস্তিত্ব নাই। কিন্তু জাগ্রৎ অবস্থায় যাহা দেখা যায় তাহারা যে বাস্তবিক নাই এবোধ কখনই হয় না। (বৈধর্ম্যাৎ চ ন স্বপ্নাদিবৎ। ২।২।২৯)

বাহ্য বস্তুর অস্তিত্ব না থাকিলে বাসনার উৎপত্তি হইতে পারে না। তোমাদের মতে তো বাহ্য বস্তুর উপলব্ধি হয় না। তবে বাসনার উৎপত্তি হইবে কিরূপে? সুতরাং তোমরা যে বল বিচিত্র বাসনা হইতে বিচিত্র জ্ঞানের উৎপত্তি হয়, ইহা সত্য নহে। (ন ভাবঃ অনুপলব্ধেঃ। ২।২।৩০)

তোমাদের মতে "আলয়-বিজ্ঞান" বাসনার আশ্রয়। কিন্তু আলয়-বিজ্ঞানও তোমাদের মতে ক্ষণস্থায়ী, যাহা উৎপত্তির পরক্ষণে বিলীন হয়। যাহা ক্ষণকাল ও অবস্থান করে না তাহা বাসনার আশ্রয় হইবে কিরূপে? (ক্ষণিকত্বাৎ চ ২।২।৩১)

শূন্যবাদ সর্ব্বপ্রকারেই অনুপপন্ন। বাহ্যবস্তুও নাই। বিজ্ঞানও নাই। ইহা একবারেই যুক্তিহীন ও অগ্রাহ্য। বুদ্ধদেব যুক্তিহীন মত প্রচার দ্বারা জনসাধারণকে মোহগ্রস্ত করিয়াছিলেন। (সর্বথা অনুপপত্তেশ্চ। ২।২।৩২)

জৈনমত-খণ্ডন

জৈন মতে প্রত্যেক বস্তুর অসংখ্য ধর্ম্ম (অনন্তধর্ম্মকং বস্তু)। তাহার সম্বন্ধে কিছুই অনপেক্ষভাবে বলা যায় না। যাহাই বলা যায় তাহা আপেক্ষিকভাবে সত্য, ঐকান্তিক সত্য নহে। সেইজন্য প্রত্যেক বর্ণনার পূর্ব্বে "স্যাৎ" শব্দ ব্যবহার করা উচিত। জৈন দর্শনে সাতপ্রকার

নয়ের (Judgement) বর্ণনা আছে। (১) স্যাৎ অস্তি, (২) স্যাৎ নাস্তি, (৩) স্যাৎ অস্তিচ নাস্তিচ (৪) স্যাৎ অবক্তব্যং (৫) স্যাৎ অস্তিচ অবক্তব্যংচ (৬) স্যাৎ নাস্তিচ অবক্তব্যংচ, (৭) স্যাৎ অস্তিচ নাস্তিচ, অবক্তব্যংচ। এই সাত নয়ের কোনও একটি ব্যবহার করিয়া দ্রব্যের বর্ণনা করিতে হয়। এই মতের সমালোচনায় ব্রহ্মসূত্রে আছে 'ন একস্মিন অসম্ভবাৎ। ২।২।৩৩) এক পদার্থে এক সময়ে পরস্পর বিরোধী বর্ম্ম থাকিতে পারে না।

জৈন মতে আত্মার পরিমাণ দেহের সমান। কিন্তু কৈশোর যৌবন ও বার্দ্ধক্যে দেহের পরিমাণ বিভিন্ন। সুতরাং আত্মার পরিমাণও ভিন্ন ভিন্ন সময় ভিন্ন হয়। এইমত অশ্রদ্ধেয় (এবং চ আত্মা অকার্ৎস্নম্। ২।২।৩৪) আত্মা পর্য্যায় ক্রমে ক্ষুদ্র ও বৃহৎ হয় বলিলেও বিরোধের পরিহার হয় না। তাহা স্বীকার করিলে আত্মাকেও বিকারশীল বলিয়া স্বীকার করিতে হয় (ন চ পর্য্যায়াৎঅপি অবিরোধঃ বিকারাদিভ্যঃ। ২।২।৩৫)

অন্ত্য অবস্থায় অর্থাৎ মোক্ষলাভের পরে আত্মা যে ভাবে অবস্থান করে, সে সময় আত্মা ও তাহার পরিমাণ এই উভয়ের নিত্যত্ব হেতু মোক্ষের পূর্ব্বেও আত্মার পরিমাণের কোনও পার্থক্য হইতে পারে না। দেহ অনুসারে আত্মার হ্রাস বৃদ্ধি হইতে পারে না। (অন্ত্যাবস্থিতেঃ চ উভয় নিত্যত্বাৎ অবিশেষঃ। ২।২।৩৬)

ভাগবত মত খণ্ডন

ভাগবত মতে ঈশ্বর হইতে জগতের উৎপত্তি হয়। ঈশ্বরের চারিরূপ—বাসুদেব, সংকর্ষণঃ, প্রদ্যুম্ন ও অনিরুদ্ধ। বাসুদেব পরমাত্মা। সংকর্ষণ জীব। প্রদ্যুম্ন মন এবং অনিরুদ্ধ অহংকার। সংকর্ষণ, প্রদ্যুম্ন ও অনিরুদ্ধ বাসুদেব হইতে উৎপন্ন হইয়াছেন। কিন্তু জীব নিত্য তাহার উৎপত্তি হইতে পারে না। (উৎপত্তি-অসম্ভবাৎ। ২।২।৪২)।

এই মতে সংকর্ষণ (জীব) হইতে প্রদ্যুম্নের (মনের) উৎপত্তি হয়। কিন্তু জীব কর্ত্তা, মন তাহার করণ। কর্ত্তা হইতে করণের উৎপত্তি হইতে পারে না। (ন চ কর্ত্তুঃ করণম্। ২।২।৭৩)

ভাগবত মতাবলম্বী বলিতে পারেন সংকর্ষণ, প্রদ্যুম্ন ও অনিরুদ্ধ ইহারা সকলেই জ্ঞান-ঐশ্বর্য্য-শক্তি-বল-বীর্য্য-তেজ দ্বারা ঈশ্বর ধর্ম্মান্বিত। প্রকৃতপক্ষে ইহারা ঈশ্বরই। কিন্তু তাহা হইলে বাসুদেব হইতে ইহাদের উৎপত্তি সিদ্ধ হয় কিরূপে? আর ইহারা যদি ঈশ্বরই হন, তাহা হইলে চারিটি ঈশ্বরের কল্পনা করিতে হয়। কিন্তু ঈশ্বর বা বাসুদেব বা পরমাত্মা তো ইহাদের মতেও এক। (বিজ্ঞানাদি ভাবে বা তৎ-অপ্রতিষেধঃ। ২।২।৪৪)

এই মতে গুণ ও গুণীকে অভিন্ন বলা হইয়াছে বাসুদেব, প্রদ্যুম্ন প্রভৃতি নিজেই গুণ ও গুণী উভয়ই। বল, বীর্য্য ও তেজ এ সকল গুণ। ইহাদিগকে বাসুদেবের সহিত অভিন্ন বলা হইয়াছে। বিশেষতঃ ইহাতে বেদের নিন্দা আছে। "চতুর্ষুবেদেষু পরং শ্রেয়ঃ অলব্ধা শাণ্ডিল্য ইদং শাস্ত্রম্ অধিগতবান্" শাণ্ডিল্য চারিবেদে পরম শ্রেয়ঃ না পাইয়া এই শাস্ত্র লাভ করিয়াছিলেন।

রামানুজের মতে উপরোক্ত সূত্রগুলিতে ভাগবত মতের নিন্দা নাই, সমর্থন আছে। ২।২।৪২ ও ২।২।৪৩ সূত্র পূর্ব্বপক্ষ ভাগবত-মতের প্রতিপক্ষের উক্তি। মীমাংসা আছে ২।২।৪৪ সূত্রে। এই সূত্রের বিজ্ঞানাদি শব্দের অর্থ ব্রহ্ম। বিজ্ঞান (জ্ঞানময়) ও আদি (জগতের কারণ)। সংকর্ষণ; প্রদ্যুম্ন ও অনিরুদ্ধ শব্দ দ্বারা বাস্তবিক জীব, মন ও অহংকারকে লক্ষ্য করা হয় নাই। জীব মন ও অহংকারের অধিষ্ঠাতা ঈশ্বরকেই সংকর্ষণ প্রদ্যুম্ন ও অনিরুদ্ধ বলা হইয়াছে। শ্রুতিতে আছে "অজায়মানো বহুধা বিজায়তে" জন্মহীন হইলেও তিনি বহুরূপে জন্মগ্রহণ করেন। জীবের যে উৎপত্তি নাই, তাহাও পঞ্চরাত্রে উক্ত হইয়াছে। সুতরাং বাসুদেব হইবে সংকষণের উৎপত্তির অর্থ ইহা নয় যে জীব পরমাত্মা হইতে উৎপন্ন। বেদের নিন্দাও ইহাতে নাই। বেদের অর্থ দুরূহ। এইজন্ত ভগবান্ পঞ্চরাত্র শাস্ত্র প্রকাশ করিয়াছিলেন।

(পূর্বপ্রকাশিতের পর)

প্রতিপক্ষের পরাজয়ে যে-আনন্দ হওয়ার কথা, অভয়ের সে আনন্দ হল না। লোচন ঘোষের জবাব তার মনঃপুত হয়নি। পুরনো, সেকেলে, যান্ত্রিক একঘেয়ে কথা বলেছে ঘোষ। খারাপই লেগেছে তাতে অভয়ের। কিন্তু কবিওয়ালার মেজাজ যে তার নয়, বোঝা গেল। সে উল্লাস তার নেই।

বরং লোকের ছিল। ঘোষ নাকি 'শক্ত হাতে' পড়েছে, তাই নতুন কথার নতুন জবাব শোনবার জন্য, সকলেই খুশি।

অভয়কে উঠতে হল। ঘোষের পরাজয়ে তার আনন্দ নেই, নিজের কথার জবাব নিজে দেবার একটি চাপা ভাব তার মনে। কারণ, অভয় কথাকার। নিজের রচিত কথা শোনবার খুশি সে চাপবে কেমন ক'রে।

অভয় উঠল। সাড়া দিল ঢোলক কাঁসী। অভয় কানে হাত দিয়ে, চড়া গলায় সুর তুলল।

আ-আ-হা! ও ভাই বসে আছেন যাঁরা।
অভয়েরো কথার বিচার করিবেন তাঁরা॥

সে কথা বলতে হবে না। এখন ধরদিকিনি বাপু। মুগুর আছে, দরকার হ'লে পড়বে। তোমাকে তা' বলতে হবে না।

অভয় নিজের কথার জবাব নিজে গাইল,

লোকে বলে, সোনা দামী, হীরে দামী
আর দামী জহরৎ
এতে সংসার মেনেছে বশ
সর্বজনার মত।
তবে একবার চেয়ে দেখ নিজের দিকে
কান পেতে কালের কথা শোন হে বুকে।

ঢোলকের তালি, অভয় সাপের মত নাচতে লাগল দুলে দুলে। হাসতে লাগল মিটি মিটি। তারপর আঙুল তুলে তুলে গাইল, তবে তো ভাই—

থাকলে ট্যাঁকে কড়ি কিনতে পার দুনিয়াখানি
আর কী দিয়ে ভাই কিনতে পার মানুষ একখানি?
মানুষের মত মানুষের চেয়ে দামী কিছু নাই
'সবার উপরে মানুষ সত্য, তার উপরে নাই।'
তাই, একবার চেয়ে দেখ নিজের দিকে...।

ফুর্তির কাদ বিদায়ের কথা এসব নয়। তাই চেঁচামেচি হুল্লোড় লাগল না। কিন্তু ভিতরে ভিতরে একটি তারিফের সাড়া জাগল।

অভয় থামল না, গেয়ে চলল।
আবার দেখ মজার সংসার, হায় হরি হরি।
সবার চেয়ে মানুষ সস্তা, দাম নাই কানাকড়ি।
সে মরে বাঁচে হাজে পচে, পথে গড়াগড়ি।
হে ভগবান নরনারাণ তোমারে গড় করি।
একবার চেয়ে দেখ নিজের দিকে...।

এবার বেশ কলরব করেই হরিধ্বনি উঠল। ভবানী চৌধুরী নিজে এগিয়ে এসে, পকেট থেকে দুটি টাকা নিয়ে বাড়িয়ে দিতে যাচ্ছিলেন। তার আগেই শরত দাস এসে টাকা গুঁজে দিল অভয়ের হাতে। নইলে মহাজনের মান থাকে না। দুজনের কাছেই অভয় আভূমি প্রণত হ'য়ে টাকা গ্রহণ করল। চৌধুরীমশাই ক্ষুণ্ণ হননি তাতে। ফোগলা দাঁতে হাসলেন।

এ যেন অকূল সাগরে ভাসন্ত নেয়েদের তীরের অন্ধি-সন্ধি খুঁজে পাওয়ার উল্লাস। একবার সে উল্লাস উঠলে, পালে শেষবারের বাতাস লাগলে, তার জয়ধ্বনি সহজে থামতে চায় না। অভয়ের আসরের সেই অবস্থা হল। সে যা বলে, তারই দাম। যা গায়, তাতেই জয়ধ্বনি।

অভয়ের নেশা লেগেছে। তার মনে হল, সে আর নিজের মধ্যে নেই। দেহে তার অনুভূতি নেই। সে যেন নিজে গাইছে না। আর কেউ গাইছে তার ভিতরে বসে। আর কেউ নাচছে তার অঙ্গে অঙ্গে। ভঙ্গিতে বঙ্কিম ও আনত আর কেউ। সে দেখল, তার চারপাশে কথার ভাণ্ডার। ছড়ানো, ছিটনো, এলোমেলো। অনেক পাতা, অনেক লতা, অনেক বনফুল। মালাকরের মত সে তুলে নিচ্ছে, গাঁথছে ছন্দে ছন্দে।

ভগবান সহজ পাত্তর নন

খোলা আছে ত্রিনয়ন॥

"তাঁর খেলাটাকে বিধান মনে ক'রে সুখে আছে অনেকে। নরনারায়ণকে তিনি ভাগাড়ের মরা গরু করেছেন। লোভীকে করেছেন উল্লাসমত্ত শকুন। শকুনের ভাঁড়ামি দেখছেন, সে আবার কেমন দরিদ্রনারায়ণের 'ছিচরণে' পুজো দেয়। কিন্তু বিবেক বুদ্ধি হরণ করেননি সংসার থেকে। 'মিনি মাগনা' ছড়ানো আছে হেথাহোথা। যে নিতে পার নাও। না নিতে পার, সুখ লুটতে থাক।

"যুগ যুগান্ত ধরে ভগবান দেখিয়ে আসছেন এই অমিলের খেলা। মানুষের এই ক্ষমতার দম্ভ। সুখের দাপাদাপি!

"কিন্তু জেনে রাখ, বিধান আসছে। দরিদ্রনারায়ণ তার বেশ বদল করছে। এবার আর ক্ষমা নাই। এবার আর ভিক্ষাপাত্র নয়। এবার গদা সুদর্শন চক্র। খেলা সাজ হবে এবার, 'শিয়রে বিধান।"

এ সবই অভয় গান গেয়ে গেয়ে বলল। কেউ তাকে বলে দেয় নি, কথা ছড়িয়ে পড়েছিল। হাত দিয়ে তোলে নি। মন তার বাহু মেলে তুলে নিয়েছে। ছন্দে গেঁথেছে। সুরে দিয়ে সুন্দর করেছে। যার শেষ ভাল, তার সব ভাল। যার গলা ভাল, তার গান সব সময় ভাল। এই সম্পদটি আছে অভয়ের পুরোপুরি।

তারপর চারদিকে আঙুল দেখিয়ে গাইল,

ও ভাই একবার চেয়ে দেখ নিজের দিকে

হে নর—নারা—য়ণ!

মার খেয়েছ অনেক এবার ওঠ হে হেঁকে।

আসরের মন বদল হ'য়ে গেছে। চরিত্র বদলে গেছে তার। কথায় বলে, মন গুণে ধন, দেয় কোন্‌জন। যন্ত্র নয়, মন বদলায়। রূপ তার এক নয়, অনেক। যে রসের লোভে জুটেছিল রসিকেরা, সে-কথা তারা ভুলে গেছে। তারা নরনারায়ণ হ'য়ে কলকণ্ঠে জয়ধ্বনি দিয়ে উঠল। দরিদ্র-নারায়ণের ফুটো পয়সা ঝঙ্কৃত হ'য়ে উঠল অভয়ের পায়ের কাছে।

অভয় বারে বারে নমস্কার করল।

নমস্কার করতে পারল না হরি মিস্তিরিকে। সে এসে জড়িয়ে ধরল দু'হাতে। পকেটে যা ছিল, সব উজাড় ক'রে দিলে। চেনাশোনা মিস্তিরি যত ছিল, তাদের দাবী বেশী। তারা কাছে এসে হাতে গুঁজে দিল পয়সা।

কেবল অনাথ অভয়ের কাছে আসতে ভুলে গেল। খুশীতে তার দু'চোখ উদ্দীপ্ত। বিস্ময়ে সে অবশ। মানুষের মধ্যে মানুষ লুকিয়ে থাকে। লুকিয়ে থাকা মানুষটি অন্য মানুষ। সে সহজে বেরোয় না। অকারণ দেখা দেয় না। এ অভয় পুরোপুরি চেনা নয় অনাথের। এর ছিটেফোঁটা চেনা ছিল। তাই অনেক আশা ছিল।

কিন্তু সে যে এমনি ক'রে মানুষকে মাতাবে, কোন-দিন ভাবতে পারেনি। আর এ মাতানো, সাধারণ মাতানো নয়। গোটা আসরের মন বদলে দেওয়া। মানুষ নিয়ে অনাথের কারবার। ক্ষণভঙ্গুর নিস্তেজ শীতল মানুষদের নিয়ে অনাথকে চিরদিন হিমসিম খেতে হয়। সহজে যাদের মনের সংশয়ের জগদ্দল পাথর সরানো যায় না, সেই সব মানুষদের আসরকে দেখল অনাথ। তারা এসেছিল এক মন নিয়ে। পেল আর এক মন। দিন-যাপনের গ্লানির ওপরে একটু ফুর্তির প্রলেপ নয়। যে-রস সবাই চেটেপুটে খেয়ে, হাসতে হাসতে, খিস্তি করতে করতে ফিরে যাবে। এ অন্য জিনিষ।

অভয় যাদু করেছে তাদের। এখনো করছে। থামতে চাইলে, আর তাকে কে থামতে দিচ্ছে। চালিয়ে যাও ভাই। চালিয়ে যাও। বাতাস উঠে গেছে। পালে

লেগে গেছে। জানা গেছে তীরের সন্ধান। আর তো তোমায় এখন ছাড়া যাবে না।

ভবানীবাবু রয়েছেন, তাই মান্যগণ্য আরো দু'চারজন এসেছেন। শরত দাশের জায়গায় অসঙ্কুলান। মানীদের আপ্যায়ন করতে হচ্ছে তাকে।

ভবানীবাবু বাড়ি ফিরতে পারলেন না। নাকে দলাখানেক নস্য গুঁজে, প্রায় সুরেলা গলায় বললেন, শরত, ছেলেটি কি রাজনীতি করে?

শরত অবাক হয়ে বলল, রাজনীতি?

কড়ি গোণা মহাজন। বুঝতে পারেনি। ভবানীবাবু বললেন, রাজনীতি হে রাজনীতি। দলটল করে নাকি তোমাদের শৈলীর জামাই? যাকে বলে আন্দোলন।

বুঝতে পেরেছে শরত দাস। আজকালকার দিনে ও কথাটা বুঝতে খুব বেশী সময় লাগে না কারুর। বলল, আজ্ঞে তা তো জানি নে। তবে, ওই অনাথদের কলে কাজ করে। ওদের সঙ্গে মেশামিশি আছে দেখেছি।

—হুঁ। ভাল কথা। খুব ভাল কথা। নতুন ক'রে আবার কবিগান শুনবে হয় তো লোকে। তবে—

ভবানীবাবুর রেখাবহুল চামড়ায় আরো কয়েকটি নতুন রেখাপাত হল। এই শহরের, এই দেশেরই সমাজ ও রাজনীতি ভবানীবাবুর নখদর্পণে। সারাটা জীবন তো এই করেছেন। রাজনীতি, জেল, গোলা, গুলি। আজো ছাড়া পান নি। এই শহরে, এখনো মঞ্চে উঠে দাঁড়িয়ে হাত তুললে, হাততালি পড়ে সকলের। বললেন, দল ভাল, কিন্তু রাহুর গ্রাস ভাল নয়। দল যদি ছেলেটাকে ভালবাসে, গ্রাস না করে, তবে কিছু গাইতে পারবে। দেবে কিছু, মনে হচ্ছে।

শরতদাস বুঝল না। বলল, আঁজ্ঞে!

অভয় তখন ছন্দে বেঁধে গাইছে।

"ভাই পণ্ডিতে কি মিছে কথা বলেন? না স্বার্থপরে মিছে কথা বলে? পণ্ডিতে বলেন, মানুষ এক জাত। আর একদল বলে, মানুষের নানান জাত। কোন্‌টা মানব আমরা?

খাঁটি মানুষের কোন জাতাজাত নাই
জগতের মানুষকুল একে পরের ভাই।

"তবে সুখ-দুঃখের এই ভাগাভাগিটা কেন? এই অঘটন যে ঘটিয়েছে, নিয়মের নিক্তি তার ঠিক নেই। সবাই একবার চিন্তা ক'রে অঘটনটা দেখ, নইলে নিস্তার নাই। কাল যদি না বদলাবে, তবে মহাভারতের কাল কেন আর নাই? কালকে কালে খায়। কালের এই নিয়ম। আজ যারা কালকে নিজের মনে করছে, জেনে রাখ, তারো কাল আসছে।

"কাণ পেতে কালের কথা শোন আপন বুকে।"

তারপরে সে গাইল, "যে মায়ের জাতি, সেই আমার ঘরের বউ, বোন। তার কাছে আমরা প্রেম যাচি। কিন্তু তাকে বাইরে ফেলে রেখে, তার প্রেম কিনতে যাই আমি পয়সা দিয়ে। তবে কোটিপতিই প্রেমের রাজা! আমি তুমি কিছু নয়। যার টাকা, তারই প্রেম।"

স্বাভাবিক ভাবেই বারোবাসরের পাড়ার মেয়েদের মধ্যে কিছু অস্বস্তির লক্ষণ দেখা দিয়েছে। তারা মুখ তাকাতাকি করছে একে অপরের। আ ম'লো! ছোঁড়া আর গান খুঁজে পেল না। আবার এদিক নিয়ে পড়ল কেন?

অভয় তখন গাইছে, "প্রেম পায়নি বলে বাইরে গেছে তারা। তাই আমরা প্রেম যাচতে গেছি পয়সা দিয়ে। বুকে হাত দিয়ে বল ভাই সবে, টাকা দিয়ে কে প্রেম পেয়েছ? কেউ পাওনি। ঘৃণা পেয়েছ। টাকা দিয়ে কেনা ছাড়া যে-অবোধ কিছু জানে না, সে কিলুক। যাদের প্রাণ আছে, তারা ঘরের জিনিষ ঘরে তুলে নাও। প্রেম দিয়ে প্রেম কেনা যায়। আমরা যেন সেই কেনা-বেচার হাটের সন্ধান পাই।"

দেহোপজীবিনী মেয়েদের মধ্যে যেটা অস্বাভাবিক, সেইটাই দেখা দিল। তাদের চোখে কুণ্ঠা, মুখে লজ্জা, আসরে বিষণ্ণতা।

ভাবের ভাবীরা জয়ধ্বনি দিল। আর কে যেন শিস্ দিয়ে উঠল।

সুরীনের কাছে শৈলবালা ছিল। শৈলবালার কেন যেন বুকটা বড় অস্থির অস্থির করছে।

সুরীন বলল, একটু ঠাণ্ডা হও শৈলদি, অমন ক'র না।

—পারছিনে ভাই। পারছি নে। এ আমার নতুন রোগ দেখা দিয়েছে। আমার বুকের মধ্যে দম আটকে আসে। হাত পা' অবশ হ'য়ে যায়।

সুরীনের আসর ছেড়ে যাবার ইচ্ছে নেই। হাত বাড়িয়ে, শৈলর পিঠে হাত বোলাতে লাগল। বলল, একটু ঠাণ্ডা হ'য়ে বস। না হয় শোও।

নিমির বুকে বুঝি তার অদৃশ্য স্ত্রীত্ব অমৃতের ফোয়ারাই তুলেছিল। মেয়েরা যে অধিকাংশই তার দিকে তাকাচ্ছিল বারে বারে। এ নায়ক যে তার। তারই ঘরের পুরুষ, দেহের পুরুষ। আর বিচিত্র বিদ্বেষের মধ্যেও, অভয় যে তার মনেরও পুরুষ।

কিন্তু ভয়েই বুঝি তিক্ততা বাড়ে। তার অমৃতের ফোয়ারার নীচু তলার গভীরে কেন বিষের আবর্ত। সেখানে কেন কূট বিষের যন্ত্রণা।

সে যে অভয়ের গান শুনে হাসতে পারে নি। হাততালি দিতে পারেনি। কেন তত্ত্বকথা? কেন ভালবাসাবাসি, মান অভিমান, রাগ অনুরাগের গান নয়, যার মধ্যে নিমি দেখতে পাবে নিজেকে। ফুলের মত ফুটবে সরোবরের বুকে। কেন এত গম্ভীর গম্ভীর দুঃখ যন্ত্রণার ইতিহাস। কেন তুমি নিমির নাগালের বাইরে। তোমার দেহের নাগালটুকু ছাড়া, কেন আমি নিঃসঙ্গ।

কেন আমি দেখি, কুলটা সুবালা তোমাকে দেবতার মত দর্শন করছে। দয়িতের কাছে যেন লুটিয়ে পড়তে চাইছে।

নিমি যত দেখছে সুবালাকে, ততই তার চোখ আরক্ত হচ্ছে। সন্দেহ আর ঈর্ষা এমনি করেই বুঝি প্রেম হারায়। মন্দিরের ঠাট বাড়ায়, ঠাকুর থাকে না। সে দেখল, সুবালাকে ডেকেও গিরিবালা সাড়া পাচ্ছে না। সে কবিয়ালকে দেখছে।

সত্যি দেখছে। সুবালার যেন বিশ্বাস হচ্ছে না। ওই উদীপ্ত আত্মভোলা গায়ক তার দরজায় দীনের মত বসেছিল একদিন। হাত তুলে মারতে গিয়েছিল মাতালকে।

গিরিবালা এবার চিমটি কাটল জোরে—এই মুখপুড়ি।

সুবালা এবার ব্যথায় আর্তনাদ ক'রে ফিরে তাকাল। বলল, কী? বলছিস্ কী?

গিরিবালা আবার একটা চিমটি কেটে বলল, অই জাখ, তোর সেই ওপারের নাগর এসেছে। তোর দিকেই হাঁ ক'রে তাকিয়ে ছিল। ও তো জানে না, তুই ইস্পিৰে ভগমান পেয়ে গেছিস, তাই তোর লাভ নেই। আমার চোখে চোখ পড়তেই তোকে ইশারায় ডেকে দিতে বলল। ওদিকে আবার ভদ্দরলোক নাগর তো, লোকজনের সামনে আসতে পারবে না।

—থাকুক গে' যে খুশি।

ব'লে ফিরতে গিয়েও সুবালার দু'চোখে হঠাৎ আলোর ঝিলিক দিয়ে উঠল। চকিতে আবার ফিরে উৎসুক গলায় ব'লে উঠল, কই, কোথায় লো সেই মিনসে?

—ওই তো, উ-ই দেখা যায়।

বাজারের বাইরে যাবার গলির মোড়ের ভিড়ের দিকে আঙুল দেখিয়ে দিল। সুবালা ফিরে তাকাতেই চোখাচোখি হল তার সঙ্গে।

বয়স বেশী নয়। কোন্ এক ডাক্তারের ছেলে নাকি গঙ্গার ওপারের! বিয়েও নাকি করেছে মাস ছয়েক। নিজেও ডাক্তারি পড়েছে। এর মধ্যেই বারোবাসরে যাওয়া আসা ধরেছে। সুবালার দিকেই নজরটা বেশী। সপ্তাহে দু' তিন দিন প্রায় বাঁধা হ'য়ে দাঁড়িয়েছে।

চোখের ইশারা ক'রে সুবালা লোকটিকে বাজারের পিছন দিকে ইঙ্গিত করল। তারপর সে নিজেও উঠে, বাজারের পিছন দিকে চলে গেল।

কেবল গিরিবালা মুখ বাঁকিয়ে বলল, ছুঁড়ির ঢং বোঝা যায় না। যাব না তো আবার গেলি কেন তবে?

পিছন দিকে একটু অন্ধকার ও নিরালার অবকাশ রয়েছে। সুবালার আগেই, সেই লোকটিই উপস্থিত সেখানে। সুবালা আসতেই সে হাত টেনে ধরল। সুবালা বাধা দিল না। প্রায় গায়ের ওপর এসে পড়ল তার।

লোকটি বিরক্তিভরা গলায় বলল, কি সব ছাইপাঁশ শুনছ বসে বসে। চল, ঘরে চল।

সুবালা বলল, যাব। আগে পাঁচটা টাকা দাও দিকিনি।

—যাঃ বাবা। এখনি টাকা কিসের?

হতাশার সুর লোকটার গলায়।

সুবালা হাতের ঝাঁকুনি দিয়ে বলল, দাও না তাড়াতাড়ি, আমার দরকার।

লোকটা অসবুর। অন্ধকারে চোখ জলছে ধ্বকধ্বক
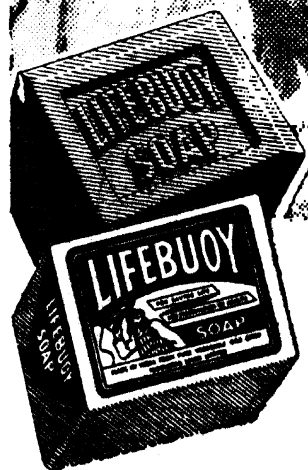
LIFEBUOY SOAP
LIFEBUOY
SOAP
লাইফবয় সাবান দিয়ে স্নান
করলে পাবেন সেই
পরিস্কার ও ঝরঝরে আমেজ।

ক'রে। নিঃশ্বাসে আগুনের তাঁপ। সুবালাকে বুকের মধ্যে জাপটে ধরে বলল, পাঁচ টাকাটা যেন আজ বেশী দাবী হচ্ছে?

সুবালা মনে মনে ছটফট করছিল। তবু বাধা দিল না। বাধা দিল না লোকটার বিছের মত সারা গায়ে বেয়ে বেড়ানো হাতটাকে। বলল, দাও এখন, তোমাকে পুষিয়ে দেব পরে।

—আর আজ?

আজ একটু পরেই যাচ্ছি। তুমি এখেনে থাকতে পার। নইলে, বাড়ি যাও। ঘণ্টাবুড়িকে গিয়ে বল, আমি আমার ঘরের দরজা খুলে দিতে বলেছি। সেখানে গিয়ে বস।

লোকটা পকেট থেকে টাকা নিয়ে দিল সুবালার হাতে। আর সঙ্গে সঙ্গেই ছিনে জোঁকের মত ঠোঁট নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ল।

সুবালা গাল মুছে, ছাড়িয়ে নিল নিজেকে। লোকটা চাপা অস্পষ্ট গলায় ছুঁড়ে দিল—দেখ, রাত কাবার ক'র না যেন। বাড়ি ফিরতে হবে।

সুবালা ততক্ষণ আলোর সীমানায়, আসরে। কিন্তু চোখের ভাব তার বদলে গেছে। মুখের সেই মুগ্ধ মগ্নতা যেন শুষে নিয়েছে কেউ। দু'খণ্ড অঙ্গার যেন কেউ বসিয়ে দিয়েছে চোখে।

আসরে ঢুকতে গিয়ে তার নজরে পড়ল বাজারেরই একটি চেনা ফড়েকে। সুবালা তাকে ধরল। বলল, এই যে, শোন।

— কী বলছ?

সুবালা তার হাত ধরে টাকা ক'টা দিয়ে বলল, ওই গাইয়েকে টাকা ক'টা দিয়ে এস না ভাই।

ফড়ে লোকটি তীক্ষ্ণ চোখে একবার তাকাল সুবালার দিকে। বলল, তুমি নিজে যাবে না?

—না! গাইয়েটার মাথায় আবার একটু ছিট আছে। না নেয় যদি? কিছু ব'ল না যেন।

ফড়ে আর কোনো কথা না ব'লে, এগিয়ে গিয়ে টাকা পাঁচটি তুলে দিল অভয়ের হাতে। অভয় হাত পেতে নিয়ে নমস্কার করল।

সুবালার মনে হল, একবার যেন অভয় তাকাল এদিকে। যেন তার চোখে চোরা চাউনি আর মিটি মিটি হাসি দেখা গেল।

কিন্তু আসলে কিছুই দেখছিল না সে। সে দাঁত দিয়ে ঠোঁট কামড়ে ধরেছিল। কী যেন ঠেলে আসছিল বুক থেকে। তার চোখের দৃষ্টি হারিয়ে যেতে চাইছিল অকারণ।

পর মুহূর্তেই যেন চকিতে নিজেকে কঠিন ক'রে, ফিরে গেল সে। অন্ধকারের দিকে অগ্রসর হ'য়ে চাবুকের শিস দেওয়া সুরে ডাকল লোকটাকে, এস!

ঘটনাটা দেখল দু'জন। একজনের চোখের আগুন সুবালার চেয়ে কিছু কম নয়। মুখ তার তেমনিও কঠিন। আর একজন বিরক্ত অথচ বিব্রতভাবে হাসল। মনে মনে বলল, কিন্তু ছুঁড়িটাকে আমি কোন দোষ দিতে পারি নে।

একজন নিমি। আর একজন রাজুবালা।

ক্রমশঃ

আমি ত সত্যেরে চিনি

বীরেন্দ্র মল্লিক

মোর কাছে সত্য নহে চিরপুরাতন।
নহে সে শাশ্বত সনাতন।
আমি ত সত্যেরে চিনি
পলকে পলকে;
নানান বিভিন্ন রূপে
ঝলকে ঝলকে

আলো ফেলে মনের কোঠায়।
ক্ষণে ক্ষণে তাহার প্রভায়
সবিস্ময়ে চিনেছি তাহারে
বারে বারে;
বারবার লভেছি জনম
দিনের আলোয় আর রাত্রির আঁধারে।

মেয়েদের কথা

ভাগবতোক্ত নারীধর্ম

চিত্রাঙ্গদা দেবী

ভাগবতের সপ্তমস্কন্ধে একাদশ অধ্যায়ে মনুষ্য ধর্ম, বর্ণধর্ম ও স্ত্রীধর্ম বর্ণিত হয়েছে। স্ত্রীধর্ম সম্বন্ধে ভাগবতকার যা বলেছেন তার বঙ্গানুবাদ (পঞ্চানন তর্করত্নকৃত) নিয়ে উদ্ধৃত করছি।

"পতিশুশ্রূষা, পতির অনুকূলতা, পতিবন্ধুর অনুবৃত্তি, সর্বদা পতির নিয়ম-ধারণ, এই কয়টি পতিব্রতাদিগের লক্ষণ ও ধর্ম। সাধ্বী স্ত্রী—সম্মার্জন, উপলেপন, গৃহভূষণ, গৃহের সৌগন্ধ্য সম্পাদন ও প্রত্যহ গৃহোপকরণ সামগ্রী পরিষ্কার করা—এই সমস্ত কার্য দ্বারা এবং স্বয়ং ভূষিত হইয়া, নানাবিধ ভোগ্যবস্তু প্রদান, বিনয়, দম, সুপ্রিয়বাক্য ও প্রেম-বিকাশ দ্বারা সর্বদা পতিসেবা করিবেন। রমণী যথালাভে সন্তুষ্টা, অলোলুপা, দক্ষা, ধর্মজ্ঞা, সুপ্রিয়বাদিনী, সাবধানা, শুচি এবং স্নিগ্ধা হইয়া অপতিত পতির ভজনা করিবে।"

আধুনিকাগণ একথা শুনে নিশ্চয়ই তেলেবেগুনে জলে উঠবেন। বলবেন, প্রাচীন সমাজের পুরুষেরা এভাবেই নারীকে ধর্মের আফিম খাইয়ে দাসী বানিয়ে রাখতে চেয়েছিল চিরকালের মত। অপাতদৃষ্টিতে তাই মনে হবে। কিন্তু পুরুষের জন্যেও শাস্ত্রকার অনুরূপ ব্যবস্থা করেছেন। তার জন্যেও রয়েছে শম, দম, তিতীক্ষার বিধান। পঞ্চযজ্ঞে তার দৈনন্দিন কর্তব্য সাধন। মোট কথা কেউই নিছক নিজের ভোগের জন্য জীবনধারণ করবে একথা আমাদের প্রাচীন ঋষিরা সহ্য করতে পারতেন না। তাই নারীকে উপদেশ দিয়েছেন, পতিসেবা করতে; পুরুষকে বলেছেন, পরিবারের সমাজের এমনকি পশু-পক্ষীরও সেবা করতে। অতএব নারী শুধু পুরুষের সেবা করবে, আর পুরুষ বসে বসে সে-সেবা ভোগ করবে সে ব্যবস্থা শাস্ত্রকার কখনও দেননি।

ভাগবতের উপদেশ অনুসারে শুধু পতিসেবাই নারীর ধর্ম একথা মনে করলে ভুল করা হবে। পতিত-পতির সেবায় নারী কখনও মোক্ষদায়ক ফল লাভ করতে পারবে না। যে পতি অপতিত অর্থাৎ নিজ ধর্ম যিনি পালন করেন একমাত্র তাঁর সেবাতেই, তাঁর প্রতি প্রেমের দ্বারাই নারী পরম ফল লাভ করতে পারেন। অন্যথা নহে। যে ব্যভিচারী, বেশ্যাগামী, তার শুশ্রূষা করতে বলেননি শাস্ত্রকার। যে পতি ধর্মপালনে বিরত, অসৎ পথে অর্থ বিকার্জন যার নিত্য কর্ম—তার প্রতি প্রেম ও একনিষ্ঠা দ্বারা নারী কখনও পরম পদলাভ করতে পারবে না।

সতীত্ব বলতে সকলে পতির প্রতি একনিষ্ঠ প্রেমকেই বুঝে থাকেন। কিন্তু শুধু মাত্র সতীত্বই নারীর একমাত্র ধর্ম নয়। পতি যেখানে ব্যভিচারী সেখানে তার পতি-একনিষ্ঠাকে সতীত্ব বলা যেতে পারে বটে, কিন্তু প্রকৃত নারীর ধর্ম তা নয়। ব্যভিচারী স্বামীকে যদি নারী সৎ-পথে না আনতে পারেন তবে তার সতীত্ব মিথ্যা। ভেজাল ঔষধের ব্যবসাকারী, প্রবঞ্চক, ধূর্ত, সমাজের অকল্যাণ-কারী পতিকে যদি সুপথে চালিত করতে না পারেন তবে নারীর একনিষ্ঠা, প্রেম, সতীত্ব নিরর্থক। দুষ্ট পুরুষের সঙ্গে পড়ে অবলা নারীর দুর্গতি! কতখানি সাধ্যে আছে তার? সাধ্য কিছু নেই তা কখনও কেউ বলতে পারবেন না। বরং দেখা যায় এ চরিত্রের পুরুষদের নারী বরং উত্তেজনা জোগায়, যাতে সে তার ভোগের ইন্ধন যোগাতে পারে। পুরুষের ভ্রষ্টাচার, কদাচার প্রভৃতির জন্যে নারী অনেকখানি দায়ী। ভোগলিপ্সু নারীর ভোগের সামগ্রী জোগাতে গিয়ে অনেক স্বামী সৎপথে লক্ষ অর্থ দিয়ে শুধু চালিয়ে উঠতে পারেনা। অমুকের স্বামী বাড়ী করল, গাড়ী করল, অমুকবালা শুধু ঘোড়ার লেজ পিঠে ফেলে, ঠোঁটে রং মেখে স্বামীর কিংবা স্বামী-বন্ধুদের সঙ্গে সিনেমা দেখে বেড়ায়, নাটক নভেল নিয়ে

কোচে কিংবা ডানলপবেডে শুয়ে কাটায়। মাসে মাসে নূতন অলঙ্কার গড়ায়! এরকম নানা ধরণের ভোগের লিপ্সা তাদের মনকে পীড়িত করে, তারা স্বামীদের উদ্‌ভ্রান্ত করে তোলে নিজেদের ভোগলিপ্সা পূরণের উদগ্র কামনায়। পতিত পতিদের অসদুপায়-অর্জিত অর্থে তারা নিজেদের ভোগবিলাসে রত থাকে। তাদের পতিপ্রেমও একনিষ্ঠা সতীত্ব সংজ্ঞা পেতে পারে, কিন্তু নারীর প্রকৃত ধর্ম নয়।

নারীর ধর্ম অপতিত পতির সেবা। তার পতি যেমন স্বধর্ম পালনকারী হবেন, তাঁকেও হতে হবে সত্যবাদিনী, যথালাভে সন্তুষ্টা, অলোলুপা, শুচি, স্নিগ্ধা। একটি সংসারকে সুখের করতে হলে নারীর যে-সকল কর্তব্য তার সকলের নির্দেশ রয়েছে ভাগবতে। সাধ্বী স্ত্রী গৃহ সম্মার্জন, উপলেপন, গৃহভূষণ, গৃহের সৌগন্ধ্য সম্পাদন, প্রত্যহ গৃহসামগ্রী পরিষ্কার, করে গৃহকে মধুর করে তুলবেন। তারপর নিজেকে ভূষিত করে, স্বামীকে ভোগ্যবস্তু প্রদান করে প্রেম-প্রকাশ করে, সে সংসারকে সুখের করবেন। সমাজকে মধুময় করবেন। তবেই সম্পন্ন তাঁর নারী-ধর্ম পালন।

আধুনিক যুগে যে-সব মনো-বৈজ্ঞানিক ও ধর্মযাজক পাশ্চাত্য জগতে পারিবারিক শান্তি প্রতিষ্ঠার সাধনা করে যাচ্ছেন, তাঁদের উপদেশও ভাগবতোক্ত উপদেশ থেকে ভিন্ন নয়। দেশকাল পাত্র ভেদে মানুষের কাজের মধ্যে, অনেক পার্থক্য এসে যায়। কিন্তু ভাগবতের উপদেশের মর্মকথা যা' আধুনিক কালের উপদেষ্টারা ও সে কথারই পুনরাবৃত্তি করছেন। এ তাদের করতে হচ্ছে কারণ, গৃহস্থাশ্রমের শান্তিলাভের এই হচ্ছে চরম ও পরম মন্ত্র।

মুষ্টিযোগ

শ্রীমতী ইরা ভট্টাচার্য্য

ঘরের মেয়েদের কিছু কিছু মুষ্টিযোগ বা টোটকা ঔষধ জেনে রাখা দরকার। অনেক সময় এগুলি বিশেষ কাজে লাগে। এখানে কয়েকটি মুষ্টিযোগ দিলাম—ঠিক ভাবে ব্যবহার করতে পারলে সুফল পাওয়া যাবে।

চক্ষের ছানি রোগ

শ্বেত অপরাজিতার পাতার রস দুই পায়ের বুড়ো আঙুলের নখের উপর যতটুকু ধরে, প্রতিদিন একবার করে দিয়ে অনেকক্ষণ রেখে দিলে ছানি ভালো হয়।

সর্ব্ববিধ জ্বর রোগ

নিসিন্দার মূল হাতে বাঁধলে সকল রকমের জ্বর নিশ্চয়ই আরোগ্য হয়ে থাকে।

পালাজ্বর রোগ

তেলাকুচার পাতা থেঁতো করে পুটলি বেঁধে পালার দিন শুঁকোলে ভালো হয়।

ফোঁড়া ফাটানোর ঔষধ

আপাঙ্গের পাতা নুন দিয়ে বেটে ফোঁড়ার মুখে প্রলেপ দিলে ফোঁড়া ফেটে যাবে। কাল নিসিন্দার পাতা ও আদা বেটে ফোঁড়ার উপর প্রলেপ দিলে ফোঁড়া ফেটে যাবে।

পাঁচড়ার ঔষধ

ভাল গন্ধকের মিহি গুঁড়া এক ছটাক, সরিষার তেল এক ছটাক উত্তমরূপে মিশিয়ে একটি বালির কাগজ বা প্যাকিং পেপারে উত্তমরূপে মাখিয়ে রৌদ্রে শুকিয়ে নিতে হবে। তারপর ঐ কাগজকে গোল করে পাকিয়ে আগুন ধরিয়ে দিলে পুড়ে গিয়ে যে ছাই হবে, সেই ছাই দিয়ে এক পোয়া আন্দাজ খাঁটি সরিষার তেলের সঙ্গে মিশিয়ে ক্ষতগুলিতে মালিশ করলে নিশ্চয়ই দু'তিন দিনের মধ্যে খোস-পাঁচড়া আরোগ্য হবে। ডাক্তার আর বলেন, ল্যাভেণ্ডার অয়েল তুলি দিয়ে যে সব স্থানে খোস পাঁচড়া অতিশয় চুলকায় সেই সব স্থানে লাগিয়ে দিলে এক সপ্তাহ মধ্যে খোস ভালো হয়। চালমুগরার তেল যেদিন লাগানো যায় সেদিন থেকে খোস-পাঁচড়া কমতে থাকে।

অর্শের রক্তপড়া বন্ধের উপায়

গরম জলে ফটকিরির গুঁড়া মিশিয়ে সেই জলে জলশৌচ করলে রক্ত নিবারিত হয়।

বিষফোঁড়ার যন্ত্রণা নিবারণ

বিষফোঁড়া হয়ে জ্বালা-যন্ত্রণা হোলে তার চতুর্দ্দিকে কেরোসিন তৈল মালিস করলে অতি অল্প সময়ের মধ্যে জ্বালা যন্ত্রণা দূর হয়।

হাঁপানির ঔষধ

আমগাছের পরগাছা আধ তোলা উক্ত পাতা আর আধ তোলা বেনার মূল গঙ্গাজলে বেটে তিন দিন খেলে হাঁপানি সেরে যায়।

অম্লরোগ ও শূল

একটা ভালো ঝুনো নারকেলের ছোব্ড়া ও গুঁড়া ফেলে দিয়ে মুখের দিকে টাকার পরিমাণ মালা সমেত কেটে একটা ছিদ্র করতে হবে, আর কাটা টুক্‌রোটা রেখে দিতে হবে। ঐ নারকেলের জলটা কোন পরিষ্কার পাথর বাটি বা কাচের পাত্রে রেখে দিতে হবে। নারকেলের আকৃতি

বিবেচনায় ছেড় থেকে দু ছটাক ঝিটকুনের গুঁড়ো ঐ নারকেলের ভেতর পুরে উপরোক্ত পাথর বাটিতে যে নারকেলের জল রাখা হয়েছে তা ঐ নুনের গুঁড়ো মধ্যে যতটুকু নারিকেলের ভেতর ধরে ঢেলে দিয়ে বাকীটা ফেলে দিতে পারেন, তারপর কাটা মুখটি ঐ নারকেলের মুখে চাপা দিন আর পাট দিয়ে জড়িয়ে শক্ত করে বেঁধে ফেলুন, তারপর গোবর আর এঁটেল মাটি এক সঙ্গে মিশিয়ে সমস্ত নারকেলের গায়ে বেশ মোটা একটা প্রলেপ দিন, তারপর রোদে একটু শুকিয়ে ঘুঁটের পোড়ের আগুনের হাপরে সম্পূর্ণভাবে আগুন দিয়ে ঢেকে দিন। অনুমানে যখন ঐ নারিকেলের শাঁসের ভেতর শুষে গিয়েছে বুঝবেন, তখন তাকে আগুন থেকে বের করে এনে কুরুনীতে নারিকেলটা কুরে নেবেন, তারপর শিলে ভালো করে বেটে কুলের আঁটির মত বড়ি তৈরী করে ফেলুন, বড়ি শুকিয়ে গেলে বোতলের ভেতর লেবেল দিয়ে রেখে দিন। রোজ সকালে বিকেলে ঠাণ্ডা বা গরম জলের সঙ্গে নিয়ে বা গুলে খেলেই কষ্টসাধ্য শূল ও অম্ল রোগ আর সাধারণ অম্ল রোগ সেরে যাবে।

—

বর্ষার রান্না

বর্ষা এসেছে। মুখ রোচক ভাজা-বড়া হবে প্রত্যেক বাড়ীতে। যাঁদের বাড়ীতে হবে না, তাঁরা কিনে খাবেন তেলেভাজার দোকান থেকে। আসবে অম্বল, চুয়াঠেকুর, পেট গড়বড় বাড়ীতে বাড়ীতে। ওষুধের দোকানে বেড়ে যাবে চাহিদা—সালফাগুয়ানিডাইন আর এণ্টারো-কুইনলের। অসুখ-বিসুখ সেরে যাবে হয়ত বর্ষা চলে যাওয়ার আগেই, কিন্তু এই অসুখ যে জীবনীশক্তি কমিয়ে দিয়ে যাবে তার খবর কয়জন রাখেন ?

এ সময়টায় নিয়ম করে চলতে পারলে কতকটা অসুখ-বিসুখ এড়ানো যেতে পারে তা ভেবে দেখবেন। বর্ষায় যেমন অসুখ বাড়বে—তেমন বাজারে প্রচুর পাওয়া যাবে গাঁদাল পাতা ও থানকুনি পাতা। এই দুই জাতীয় পাতা কত উপকারী তা আমরা অনেকেই ভেবে দেখি না। ঝোলে দুটি গাঁদাল পাতা ফেলে দিন। তা কতখানি উপকারী হবে তা আমরা জেনেও যেন জানি না। কিন্তু যাদের আমের দোষ রয়েছে, আর রয়েছে কোষ্ঠকাঠিন্য তাদের পক্ষে সব চেয়ে ভাল থানকুনির সুক্ত। কাঁচা পেপে কাঁচাকলা দিয়ে থানকুনির সুক্ত খেতে নিশ্চয়ই খারাপ নয়। অধিকন্তু এমন উপকারী খাদ্য খুব কম আছে। যাঁরা আমিষ আহার করেন তাঁরা এই সুক্তে জিয়ল সিঙ্গি, লেঠা, মাগুর, ছোট-পনাও দিতে পারেন। তাতে এর পুষ্টিকারিতা বৃদ্ধি পাবে। শুকনো লংকার পরিবর্তে কালো মরিচ ব্যবহার করলে আরো ভালো হবে।

মনে রাখবেন এ সময়ে ভাজা-বড়ার লোভ সামলে ঝোল-সুক্ত খেলে ওষুধের খরচ কমবে। শরীরটাও ভাল থাকবে।

—জয়ন্তী—তপতী
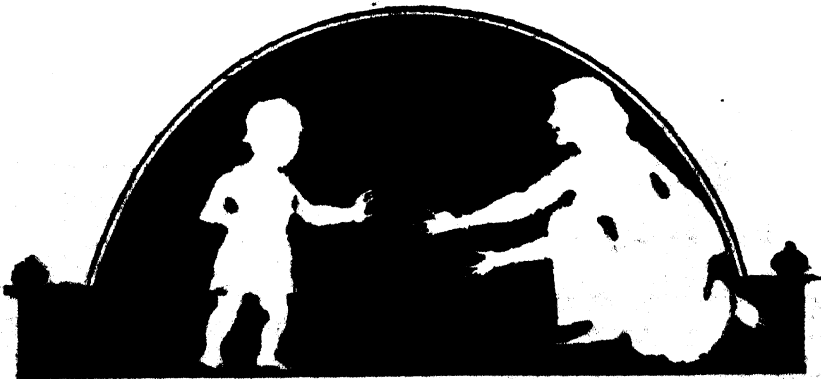
আমাদের রানীমা

আমাদের বাড়ীর কাছেই ছোট একটা বাড়ী আছে। সে বাড়ীতে থাকেন রানীমা। আমরা যখনই ছাদে উঠি দেখি রানীমা বাড়ীর উঠোনে বসে হয় চরকা কাটছেন নয় সোয়েটার বুনছেন।

একদিন ছাদে রোদ্দুরে চুল শুকোতে উঠে আমি দেখি রানীমা চরকার সামনে চুপ করে বসে আছেন। আমি ভাবলাম ওঁর সঙ্গে গিয়ে একটু গপ্পসপ্প করা যাক। আমি যেতে আমাকে বসার একটা আসন দিয়ে রানীমা বললেন "দ্যাখ, আমি না হয় মুখ্যসুখ্য মানুষ তাই বলে আমি কি এতই বোকা যে আজে বাজে কিছু বুঝিয়ে দিলেই বুঝব? রাশিয়া নাকি আকাশে একটা নতুন নক্ষত্র ছেড়েছে আর তার মধ্যে নাকি একটা কুকুর পোরা! হ্যাঁ: যত সব—"।

আমি যখন রানীমাকে স্পুটনিক আর লাইকা সম্বন্ধে সব কিছু বুঝিয়ে বললাম রানীমা একেবারে হতবাক বললেন "আমায় আর একটু খুলে বলতো, আমার মাথায় অত চট্ করে কিছু ঢোকে না।"

রানীমা কিন্তু সেটা বললেন নেহাৎই বিনয় করে। বুদ্ধিশুদ্ধি ওঁর বেশ ভালই আছে। ছেলে মেয়েরা যখন চেঁচিয়ে ওদের পড়া মুখস্ত করে উনি তখন ওদের নানারকম প্রশ্ন করে নানা বিষয়ে জেনেছেন। অন্যান্য মহিলাদের মত বাঁধাধরা গতে চলতে উনি মোটেই রাজী নন। সেদিন আমি যাচ্ছিলাম কেনাকাটা করতে। রানীমা আমায় বললেন "আমায় একটু কাপড় কাচা সাবান এনে দিবি ভাই?"

S. 261A-X52 BO

আমি অভ্যাস বশে ফিরে এলাম সানলাইট সাবান কিনে। রানীমা সানলাইট সাবান দেখে অনেকক্ষণ প্রাণ খুলে হাসলেন তারপর বললেন—"এত দাম দিয়ে সাবান কিনে আনলি; কিন্তু আমাদের বাড়ীতে সিল্কের জামাকাপড় তো কেউ পরেনা!"

"কিন্তু রানীমা, আমার বাড়ীতে সব জামা-কাপড়ই কাচা হয় সানলাইট সাবান দিয়ে।" রানীমা কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে বললেন—"বোনটি তুই বোধ হয় আমাদের বাড়ীর অবস্থা জানিসনা। আমরা এত দামী সাবান দিয়ে জামাকাপড় কাচব কি করে?"

আমাকে তাড়াতাড়ি ফিরতে হোল বলে ওঁকে সব কথা বুঝিয়ে বলতে পারলাম না। আমি রানীমাকে প্রতিশ্রুতি দিলাম যে আবার ফিরে আসব কিন্তু কাজে এমন আটকে গেলাম যে আমার আর রানীমার কাছে যাওয়াই হোলনা।

বিকেলে আমার বাড়ীর দরজায় কড়া নড়ে উঠল। দরজা খুলে দেখি রানীমা। বললেন—"ভগবান তোকে আশীর্বাদ করুন। সানলাইট সত্যিই আশ্চর্য্য সাবান। একবার দেখে যা!"

রানীমার উঠোনে গিয়ে দেখি সারি সারি পরিষ্কার, সাদা, উজ্জ্বল কাপড় টাঙানো—যেন একটা বিয়ের মিছিল চলেছে। রানীমা আমার কানে কানে বললেন—"আমি এত কাপড়জামা ধুয়েছি কিন্তু এখনও কিছুটা সাবান বাকী আছে…এ সাবানটা দামী নয়, মোটেই নয়—বরং সস্তাই।"

রানীমা বসে পড়লেন, তারপর বললেন "আমাকে একটা কথা বল তো। আমি শুনেছিলাম সানলাইট দিয়ে কাচার সময় জামাকাপড় আছড়াতে হয়না। সেই জন্যে আমি শুধু সানলাইটের ফেণায় ঘষেই জামাকাপড় কেচেছি…তাতেই জামাকাপড় এত পরিষ্কার আর উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে…হাঁ কি যেন বলছিলাম, আচ্ছা বলতো সানলাইট সাবানে এত ভাল হোল কি করে?" আমি রানীমাকে বোঝালাম—"রানীমা, সানলাইট সাবানটি একেবারে খাঁটি; তাই এতে ফেণা হয় প্রচুর। আর এ ফেণা কাপড়ের সুতোর ভেতর থেকে লুকোনো ময়লাও টেনে বের করে।"
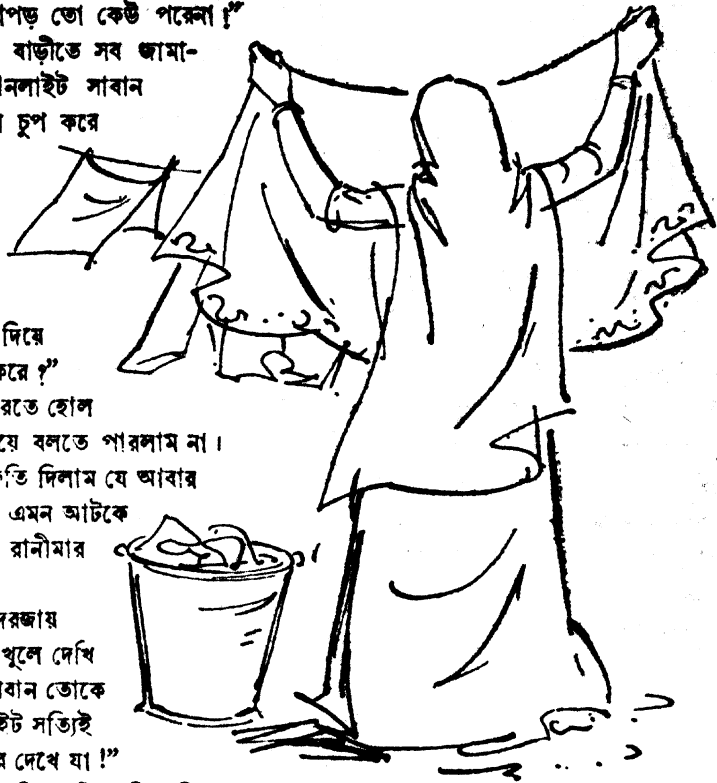
"ও! এখন বুঝেছি সানলাইট দিয়ে কাচলে জামা-কাপড় কি করে এত তাড়াতাড়ি এত পরিষ্কার আর উজ্জ্বল হয় ওঠে। আর সানলাইটে কাচা জামা-কাপড়ের গন্ধটাও আমার পরিষ্কার পরিষ্কার লাগে।" কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে রানীমা বললেন—"এবার কি বলবি বল। আমার হাতে অনেক সময় আছে।"

SUNLIGHT

বর্ষারম্ভ—

১৩৬৬ সালের আষাঢ়ে 'ভারতবর্ষ' ৪৭ বর্ষে পদার্পণ করিল। যাঁহার কৃপায় গত ৪৬ বৎসর ধরিয়া এই সাময়িক-পত্র সকল আপদ বিপদ অতিক্রম করিয়া জয়যাত্রার পথে অগ্রসর হইয়াছে, আজিকার দিনে সর্বপ্রথমে তাঁহার উদ্দেশ্যে প্রণাম জানাইয়া প্রার্থনা করি, তাঁহার কৃপা যেন ভবিষ্যতে আমাদের সুপথে পরিচালিত করে। এই দীর্ঘ দিনের জীবনে যাঁহাদের স্নেহ, প্রীতি ও কৃপা লাভ করিয়া 'ভারতবর্ষ' সাফল্য লাভ করিয়াছে, আজ কৃতজ্ঞতার সহিত তাঁহাদের সকলের সাহায্য, সহযোগিতা প্রভৃতির কথা স্মরণ করি। স্বর্গতদের উদ্দেশ্যে প্রণাম ও জীবিত-বান্ধবগণের উদ্দেশ্যে শ্রদ্ধা জানাই ও সকলের সহায়তা কামনা করি। পুনরায় প্রার্থনা করিব—সকলের আশীর্বাদ ও শুভেচ্ছা আমাদের এই কর্মোদ্যমে শুভবুদ্ধি ও শক্তি দান করুক—'ভারতবর্ষ' সমৃদ্ধতর জীবন লাভ করুক।

দুর্ভিক্ষের পদধ্বনি—

মে ও জুন মাসে পশ্চিম বাংলায় খাদ্যের অবস্থা চরম হইয়াছে। চাউলের দাম বাড়িয়া ২০।২১ টাকা হইতে ৩১।৩২ টাকা হইয়াছে। সরকারী চাউল-সংগ্রহ নীতির ফলে বাজারে চাউল পাওয়া যায় না—প্রত্যেক গৃহস্থ কালো বাজার হইতে চাউল কিনিতে বাধ্য হয়। গত কয় মাস যাবৎ আংশিক রেশন প্রথা চালু হইয়াছিল—তাহাতে মাথা পিছু সপ্তাহে মাত্র দেড় সের চাউল পাওয়া যাইত—শীতকালে লোক এক বেলা রুটী খাইত—গম বা আটা যাহা রেশনে পাওয়া যায়, তাহাতে এক বেলা রুটী খাওয়া চলে। দারুণ গ্রীষ্মে বাংলার লোক এক বেলাও রুটী খাইতে পারে না—২ বেলা ভাত হইলেই ভাল হয়। কাজেই অধিক চাল সংগ্রহের জন্য বাঙ্গালী সর্বদা ব্যস্ত। মার্চ এপ্রিল মাসে ৪৮, ৫২ ও ৫৪ নয়া পয়সা সের দরে রেশনের দোকানে যে চাল পাওয়া যাইত, তাহা অখাদ্য ছিল না। ক্রমে চাউলের দর বাড়ায় ৪৮ নয়া পয়সা দরে রেশনে অখাদ্য চাল দেওয়া আরম্ভ হইল। তাহা মানুষের পক্ষে গ্রহণযোগ্য ছিল না। মানুষ সর্বদা চাউলের জন্য ছুটাছুটি আরম্ভ করায় ও সরকারী গোয়েন্দা বিভাগ বাজার হইতে চাউল আটক করায় কোথাও আর ৩১।৩২ টাকার কম দরে এক মণ চাউল সংগ্রহ করা যায় না। মফঃস্বলের বা গ্রামাঞ্চলের অবস্থা আরও খারাপ। সহর, সহরতলী বা শিল্পাঞ্চলের লোক পয়সা সংগ্রহ করিয়া চাল কিনিতে পারে—গ্রামের দরিদ্র মানুষের পয়সাও নাই—গ্রামে চাল সংগ্রহ করা আরও কঠিন—কারণ ২৪ পরগণা, মেদিনীপুর, হুগলী, বর্দ্ধমান প্রভৃতি জেলায় কোন চাষীকে ধান মজুত রাখিতে দেওয়া হয় নাই—সরকারী সংগ্রহকারীর দল সব ধান পূর্বেই সংগ্রহ করিয়া লইয়াছে। ফলে গ্রামের দরিদ্র জনসাধারণ চাল না পাইয়া দলে দলে সহরে আসিতে আরম্ভ করিয়াছে। গত ২ মাসে কলিকাতা সহর ত বটেই, সহরতলীরও প্রতি পল্লীতে দরিদ্র ভিখারীর সংখ্যা বহু গুণ বাড়িয়া গিয়াছে—সকাল হইতে দ্বারে দ্বারে তাহারা হা অন্ন, হয় অন্ন করিয়া ঘুরিয়া বেড়াইতেছে—পথের ধারে, মাঠে ঘাটে দিনযাপন ও রাত্রি-বাস করিতে বাধ্য হইয়াছে। হুগলী, বর্দ্ধমান, কৃষ্ণনগর, বহরমপুর প্রভৃতি সহরের অবস্থাও ঐরূপ। গ্রামের শত শত দরিদ্র লোক ঐ সকল সহরে জমা হইয়া ভিক্ষা লাভের আশায় দ্বারে দ্বারে ঘুরিতেছে। ১৩৫০ সালের দুর্ভিক্ষের দৃশ্য এখনও আমরা ভুলিতে পারি নাই—সে দৃশ্যের কথা যখনই মনে হয়, তখনই চক্ষু শুধু অশ্রুসজল হইয়া উঠে না—হৃদয় ভারাক্রান্ত ও বিষণ্ণ হইয়া হইয়া যায়। এবারের অবস্থা দেখিয়া সে জন্য সর্বত্র ভীতির সঞ্চার দেখা দিয়াছে। জানুয়ারী, ফেব্রুয়ারী মাসে কেন্দ্রীয় সরকার বা পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সরকারের পক্ষ হইতে বার বার ঘোষণা করা হইয়াছিল যে—খাদ্যের কোন অভাব হইবে না—সরকারী গুদামে প্রচুর খাদ্য জমা করা আছে—প্রাদেশিক সরকারও কেন্দ্রীয় সরকার একযোগে—যাহা প্রয়োজনীয়—সকল খাদ্যই জোগাইবে। গম প্রচুর পরিমাণে দেওয়া হইলেও, এত

শীঘ্র কেন যে চালের অভাব হইল, তাহার কারণ বুঝা যায় না। কলিকাতা সহরে কয়েকটি মজুতদারের গুদাম হইতে পুলিস চাউল সংগ্রহ করিয়া জনগণকে কম মূল্যে বিক্রয় করিয়াছে বটে, কিন্তু আমাদের বিশ্বাস, এখনও বহু মজুতদারের গুদামে চাল লুকাইয়া রাখা হইয়াছে। নচেৎ কালোবাজারে ৩১।৩২ টাকা মণের চাল কোথা হইতে আসিতেছে। ৩২ টাকা বা তদপেক্ষা অধিক দাম দিলে এখনও কালো বাজারে যে কোন সময়ে ২।৪ মণ চাল পাওয়া যায়—সে চাল খারাপ ত নহেই—সাধারণ ৫৪ নয়া পয়সা সেরের চাল অপেক্ষা প্রায়ই ভাল। সরকারী অব্যবস্থার জন্ত বা বিচার বিবেচনার অভাবে যে পশ্চিমবঙ্গে আজ এই দারুণ খাদ্যাভাব উপস্থিত হইয়াছে, এ বিষয়ে প্রায় সকলেই এক মত। গত ১৩ই জুন হইতে ৪।৫ দিন ধরিয়া কেন্দ্রীয় সরকারের খাদ্য সচিবের সহিত পশ্চিমবঙ্গের মন্ত্রীদের কলিকাতায় যে আলোচনা বৈঠক চলিয়াছে, তাহাতেও কোন সুফল ফলে নাই। পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী ডাক্তার বিধানচন্দ্র রায়ের সহিত কেন্দ্রীয় প্রধান মন্ত্রী শ্রীজহরলাল নেহরুর এ বিষয়ে টেলিফোনে যে কথাবার্তা হইয়াছে, তাহার ফলে কেন্দ্রীয় সরকার নাকি পশ্চিম বাংলাকে প্রয়োজনীয় চাউল সরবরাহ করিতে সম্মত হইয়াছেন। ইহাই সর্বশেষ সংবাদ—তবে ফল কতটা ফলিবে বুঝা কঠিন। আমাদের বার বার বলা হইয়াছে যে সমগ্র ভারতের শস্য উৎপাদনের হিসাব হইতে দেখা যায়, ভারতে প্রচুর খাদ্য উৎপন্ন হইয়াছে। কিন্তু আজ অন্ধ্র, বিহার ও পশ্চিমবঙ্গ—তিনটি রাজ্যের অবস্থাই সঙ্গীন—তিনটি রাজ্য হইতেই কেন্দ্রের নিকট চাউল ভিক্ষা করা হইয়াছে। পশ্চিম বাংলায় বহু চেষ্টা করিয়াও সরকার দুর্নীতি দমন ব্যাপারে নিজেদের অসামর্থ্য প্রমাণ করিয়াছেন। পশ্চিমবঙ্গে দুর্নীতি দমন বিভাগে চোরা কারবারীদের কাজ বন্ধ করিতে পারেন নাই। শুধু চালের ব্যাপারে নহে, সকল ক্ষেত্রে দুর্নীতিপরায়ণ ব্যক্তিরা এখনও কাজ করিতেছে। গৃহ নির্মাণ ও কারখানায় ব্যবহার প্রভৃতির জন্ত লোহার বাজারে ও দুর্নীতি প্রবল হইয়াছিল—সম্প্রতি বাজারে প্রচুর লোহা আসায় লোহা পাওয়া কতকটা সোজা হইয়াছে। চালের দাম বাড়ার সময়ে আবার চিনি, ডাল, সরিষার তৈল, মশলা প্রভৃতির দামও বাড়িয়া গিয়াছে। কেন বাড়িয়াছে, তাহার কোন কারণ নাই। সরকারী কর্তৃপক্ষের কঠোরতার অভাব সকল ব্যবসা বাণিজ্যকে পঙ্গু করিয়া দিতেছে—ফলে ধনিকরা অধিক সুবিধা লাভ করে ও দরিদ্রগণ নানা অসুবিধায় পড়িয়া শেষ পর্যন্ত মারা পড়ে। চালের ব্যাপারেও ঠিক অনুরূপ অবস্থা হইয়াছে। ধনী মজুতদারগণ যেন তেন প্রকারেণ—মজুত মাল ঠিক রাখিয়া কালো বাজারের সুবিধা পাইতেছে—ছোট ছোট ব্যবসায়ীরা পুলিসের হাতে ধরা পড়িয়া ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে। আমরা ধনী দরিদ্র, সবল দুর্বল নির্বিশেষে সকলের সম্বন্ধে সমান ব্যবস্থা হইতে দেখিলে সুখী হইতাম।

১৩৫০ সালের দুর্ভিক্ষে বাংলাদেশে কম বেশী ৫০ লক্ষ দরিদ্র মানুষ মৃত্যুবরণ করিয়াছে—১৩৬৬ সালের এই অন্নাভাবে কত লোককে জীবন দিতে হইবে কে জানে? আমরা এখনও বর্তমান স্বাধীন ভারতের কংগ্রেসী শাসকদের মুখ চাহিয়া নিরাশার মধ্যেও আশায় বুক বাঁধিয়া দিন গণিতেছি।

সমবায় প্রথায় খাদ্য উৎপাদন—

নিখিল ভারত কংগ্রেসের গত নাগপুর অধিবেশনে দেশবাসী সকলকে সমবায় প্রথা গ্রহণ করিয়া অধিক খাদ্য উৎপাদন করিতে আহ্বান করা হইয়াছে, এ কথা আজ কাহারও অবিদিত নাই। স্বাধীনতা লাভের পর প্রায় ১২ বৎসর অতীত হইলেও আজ পর্যন্ত ভারতবর্ষ খাদ্য সরবরাহ ব্যাপারে স্বয়ং-সম্পূর্ণ হইতে পারে নাই—ইহা এক দিকে যেমন সাধারণ দেশবাসীর পক্ষে দুঃখের কথা, অন্য দিকে শাসক গোষ্ঠীর পক্ষেও লজ্জার বিষয়। সে জন্ত প্রতি বৎসর বিদেশ হইতে বহু কোটি টাকার গম ও অন্যান্য খাদ্য সামগ্রী আমদানী করিতে হইতেছে। তাহার ফলে অর্থাভাবে আমরা অধিকতর প্রয়োজনীয় যন্ত্রাদি বিদেশ হইতে উপযুক্ত পরিমাণে আমদানী করিতে পারি না। দেশের শিল্পসম্পদ বাড়াইতে হইলে ও দেশের বেকার সমস্যা দূর করিতে হইলে বহুল পরিমাণে যন্ত্রাদি আমদানী করিয়া দেশে অসংখ্য নূতন কারখানা স্থাপন করিতে হইবে। ভারতবর্ষে জমীর অভাব নাই—উপযুক্ত সার ও জলের ব্যবস্থা করিলে দেশের প্রয়োজনীয় খাদ্য উৎপন্ন করিয়াও বিদেশে রপ্তানীর জন্ত বহু খাদ্য ও অন্য শিল্প-প্রয়োজনীয় কাঁচা মাল এ দেশে উৎপন্ন করা যায়। এ বিষয়ে কিছু কিছু চেষ্টা আরম্ভ হইলেও প্রয়োজনের তুলনায় তাহার পরিমাণ খুবই কম। সে জন্ত প্রধানমন্ত্রী শ্রীজহরলাল নেহরু গত কয়েক মাস ধরিয়া সর্বত্র সকলকে খাদ্য উৎপাদন বিষয়ে সমবায় নীতি গ্রহণ করিয়া কাজ করিতে উপদেশ দিয়া বেড়াইতেছেন। একদল লোক ইহার কোন বিকল্প ব্যবস্থা নির্দেশ না করিয়াই সমবায় প্রথার অসুবিধার কথা বলিতেছেন। গত কয় বৎসরে বিভিন্ন রাজ্যের ভূমি-সংস্কার ব্যবস্থার জন্ত সরকার নানাবিধ উপায় অবলম্বন করিয়াছেন। ইংরাজ রাজত্বে ভূমি ব্যবস্থা পরিবর্তনের ফলে চাষের জমী খণ্ড খণ্ড হইয়া গিয়াছে ও তাহার ফলে বৃহদাকার চাষ ব্যবস্থা অসম্ভব

হইয়াছে সে জন্ত নূতন ব্যবস্থায় জমীগুলিকে একত্র করিবার জন্ত সমবায় সমিতি গঠন একান্ত প্রয়োজন। বর্ত্তমান যুগে আর হাতের লাঙ্গল ও গরু দিয়া চাষ করিয়া অধিক লাভ করা যায় না—সে জন্ত কলের লাঙ্গল ব্যবহার করিতে হইলেও খণ্ড খণ্ড জমীগুলিকে একত্র করা দরকার। সেচের জলের ব্যবস্থা করিতে হইলে বা সরকারী সেচ ব্যবস্থার সুযোগ গ্রহণের জন্তও বড় বড় জমী প্রয়োজন। এ সকল ত পুরাতন চাষ-জমীর কথা। নূতন নূতন পাহাড় জঙ্গল পরিষ্কার করিয়া বা জলা-জমী উদ্ধার করিয়া চাষ করিতে হইলে তাহা কম অর্থে বা একক চেষ্টায় কখনই সম্ভব হইবে না। উড়িষ্যা, মধ্যপ্রদেশ ও অন্ধ্র প্রদেশের যে স্থানে নূতন দণ্ডকারণ্য উপনিবেশ গঠন করা হইতেছে, সে স্থানের মত চাষের উপযোগী জমা বহু রাজ্যে বহু পরিমাণে পড়িয়া আছে। সে সকল জমীকে উদ্ধার করিয়া তথায় চাষ-বাস করিতে হইলে সমবায় সমিতি গঠন করিয়া সে কার্য্যে অগ্রসর হইতে হইবে—সমবায় সমিতি গঠিত হইলে সরকারও সহজে ঋণ দান করিয়া মূলধন সরবরাহ করিতে পারিবেন। পশ্চিমবঙ্গেও এখন পর্য্যন্ত এমন বহু জমী আছে, সেখানে সার ও জলের ব্যবস্থা করিলে বৎসরে ২।৩ বার ফসল তোলা যায় বা উৎপন্ন শস্তের পরিমাণ ২।৩ গুণ করা যায়। সে কাজেও সমবায় সমিতির সাহায্য বিশেষ ফলপ্রদ হইবে সন্দেহ নাই। মোটের উপর শ্রীনেহরু দেশবাসী সকলকে আবার কৃষিমুখী হইতে আহ্বান জানাইয়াছেন। ইংরাজি শিক্ষা ও সভ্যতা আমাদের কৃষি বিমুখ করিয়াছে, সে জন্ত নিজেদের প্রয়োজনীয় খাদ্য নিজেদের দেশে উৎপন্ন করার জন্তও আমরা চেষ্টা করি না। অথচ সামান্ত মাত্র চেষ্টা করিলেই ভারতে শুধু ধান, গম কেন, মাছ দুধও অতি সহজে বহু পরিমাণে উৎপন্ন করা যায়। দেশের শিক্ষিত ও ধনী তরুণের দলকে সে জন্ত সমবায় সমিতি গঠন করিয়া এ কার্য্যে অগ্রসর হইতে বলা হইয়াছে। কৃষি-খামার তৈয়ারীর সঙ্গে সঙ্গেই তাঁহারা ছোট ছোট কলকারখানা প্রতিষ্ঠা করিয়া উদ্বৃত্ত সম্পদ ব্যবহারের ব্যবস্থা করিবেন। দেশবাসী সকলেরই আজ এই প্রথম ও প্রধান প্রয়োজন মিটাইবার জন্ত সর্বপ্রকার চেষ্টা আরম্ভ করা দরকার।

ধীরেন্দ্র নারায়ণ মুখোপাধ্যায়

(পূর্বপ্রকাশিতের পর)

শিপ্রা ইচ্ছা করেই খবরের কাগজখানা ফেলে রেখে গিয়েছিল জয়ন্তর বিছানায়। কাগজ জয়ন্ত প্রতিদিনই পড়ে। প্রাত্যহিক কর্মতালিকায় আহার-নিদ্রার মতই অপরিহার্য দৈনন্দিন অভ্যাস ওর। সংবাদপত্রের পাতা-গুলো নিবিষ্ট মনে উল্টে যায় প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত। তবুও পুরানো কাগজখানা টেনে নিয়ে জয়ন্ত বসলো ইজি-চেয়ারটায় ঠেস দিয়ে।

সকাল থেকেই মনটা ছিল এলোমেলো হয়ে কেমন একটা অসহ তিক্ততায় ভরে উঠেছিল ওর অন্তরের সুকুমার অনুভূতিগুলো। মনটা বারবার বিদ্রোহ করে উঠেছে। মনে হয়েছে নির্মম হাতে ভেঙে চুরমার করে দেয় মানুষের এই আবাসভূমি। জীবনের দাঁড়ে ব'সে বুলি কপচানো কাকাতুয়ার ভিড়। অঙ্গে অঙ্গে স্পন্দন আছে। হাওয়ায় কাঁপে ওদের হালকা ডানার ফিনফিনে পালকগুলো। তিরতির করে কাঁপে থাকে-থাকে সাজানো পুচ্ছ। কিন্তু বুকের ভিতর যেন হৃৎপিণ্ডের কোন সাড়া নাই। অবয়ব আছে। মানুষের ছাঁচে ঢালাই-করা রক্তমাংসের পিণ্ড। অবিকল মানুষেরই দেহ। কিন্তু জীবনবোধ যেন ভোঁতা হয়ে গিয়েছে শান বাঁধানো পথে রাত্রিদিন হোঁচট খেয়ে।... অসংলগ্ন চিন্তাগুলো মগজের ভিতর কেমন জট পাকিয়ে যায়।...জয়ন্ত উঠে বসে ঘাড়টা উঁচু ক'রে।

সামনে টেবিলের ওপর পড়ে আছে টেলিগ্রামখানা। রীণা টেলিগ্রাম করেছে সুবিমলের কাছে। নৈনিতাল থেকে অনুরোধ জানিয়েছে অন্তত হাজার টাকা টেলিগ্রাম মণি অর্ডারে পাঠাবার জন্যে। ঋণ! ওরা ফিরে এসে শোধ দেবে।...আশ্চর্য!

সুবিমল এ পৃথিবীতে আছে কিনা, সে খবরও আর রাখে না রীণা। রাখবার দরকারও আর নাই তার। সে প্রয়োজন ফুরিয়েছে অনেক আগে। শুধু ফুরোয়নি টাকার প্রয়োজন। তাই এতদিন পরেও আবার চেয়েছে টাকা সুবিমলের কাছে, যার জীবনের মূলে রীণাই জেলে দিয়েছিল তুষের আগুন। সেই আগুনেই তো ধিকিধিকি পুড়ে ছাই হয়ে গেল সুবিমল। দুর্ভাগ্য নিয়ে এসেছিল খোকা—ওই নিরপরাধ শিশু, যে বেঁচে রইল সারাজীবন মাতৃনামের কলঙ্ক সইতে।...একবার যে নারী হাত বদলাতে সুরু করে, ঘর বাঁধতে সে আর পারে না কোনদিন। রক্তে তার কালো বাঘের জিব লকলক্ করে। নতুন মানুষ পুরানো হতে দেরী লাগে না।

সুবিমল দিয়ে গেল গুরুভার দায়িত্ব। সে দায়িত্ব জয়ন্ত কোনদিন পারবে না অস্বীকার করতে।...খোকা! ওই খোকার মুখপানে চেয়ে জয়ন্তকে বইতে হবে সারাজীবন সেই দায়িত্বের গুরুভার।...খোকা বড় হয়ে বিলেতে গিয়ে পড়বে। সেখানকার কোন কন্‌ভেণ্টে থেকে মানুষ হবে সে। এদেশে আর ফিরবে না কোন দিন। কিন্তু এখন! এখনো তার বড় হতে অনেক দেরী।

এমনি করে আর কতদিন থাকবে জয়ন্ত জোয়ারদার-ভিলায় আশ্রিত তাঁবেদার হয়ে? কর্তব্য ওর শেষ হয়েছে। তবুও বন্ধন কাটেনি। যে ভার নিয়ে একদিন জীবনের মায়া তুচ্ছ ক'রে জয়ন্ত এসেছিল সুবিমলের পাশে, সে ভার থেকে সুবিমল মুক্তি দিয়ে গিয়েছে। কিন্তু নিবিড় ক'রে বেঁধেছে নতুন দায়িত্বের বেড়া জালে। সে দায়িত্ব জয়ন্ত পালন করবে। সময় হলে আবার সে এসে দাঁড়াবে কর্তব্য পালন করবার জন্যে। কিন্তু এখন আর নয়। আর সে একটী দিনও থাকবে না উদরান্নের জন্যে ধনীর

পতাকী হয়ে।···যাবে। আজই যাবে সে স্বাচ্ছন্দ্যের এই আবাস ছেড়ে। জীবন যুদ্ধের পদাতিক সৈন্য সে। এ বিলাস তার সইবে না।

টেবিলের টানা থেকে কাগজ আর কলমটা বের করে জয়ন্ত তখুনি লিখে ফেললে ইস্তফা-পত্র।

দুর্দিনে যে উপকার সে পেয়েছে তার জন্যে অসংখ্য ধন্যবাদ জানালে জোয়ারদার সাহেবকে।···আর সে পারে না। পারে না এই বন্ধন সইতে। ভাবতে মাথাটা কেমন ঝিমঝিম করে। উন্মুক্ত উদ্যান-বীথিকার পর্যাপ্ত বাতাসেও আজ তার শ্বাসপ্রশ্বাস যেন রুদ্ধ হয়ে আসে।

সর্বেশ্বর!

নতুন চাকরটিকে ডাক দিয়ে, জয়ন্ত বারান্দায় গিয়ে দাঁড়ালো পুরানো খবরের কাগজখানা হাতে নিয়ে।··· কর্মখালির বিজ্ঞাপন! ন্যাশনাল প্লাষ্টিক ইন্‌ডাস্ট্রির জন্যে চেয়েছে একজন কেমিস্ট। নতুন ফ্যাক্‌ট্রির সম্পূর্ণ ভার নিতে হবে। মাসিক বেতন চারশো টাকা। ফ্রি কোয়ার্টার ফ্যাক্‌ট্রি সংলগ্ন।

বাইরে প্রদীপ্ত হয়ে উঠেছে হেমন্তের সূর্য। প্রহরের সীমা অতিক্রম ক'রে হাত বাড়িয়েছে আকাশের দিকে। গাছের মাথায় মাথায় ঝলমল করে জীবনের স্রোত।···ওই তো পৃথিবী! চারিদিকে মানুষের মিছিল!

বাবু।

সর্বেশ্বর এসে দাঁড়ালো আদেশের প্রতীক্ষায়।

একটু ইতস্তত করে জয়ন্ত বললে: আজ আর খাবো না কিছু ও-বেলায়। হয়তো না ফিরতেও পারি।

আজ্ঞে।

সর্বেশ্বর চলে যাচ্ছিল। মুহূর্তে কি ভেবে নিয়ে, পকেট থেকে চিঠিখানা বের করে সর্বেশ্বরের হাতে দিয়ে জয়ন্ত বললে: এই চিঠিখানা বিকেলে পৌছে দিয়ে আসবে জোয়ারদার সাহেবের হাতে।

জয়ন্ত আবার ঘরে গিয়ে বসলো ডেক চেয়ারখানায় ঠেস দিয়ে।···চাকরি। যে কোন চাকরি নিতে আজ তার আপত্তি নাই। তবু তো বাঁচবে এই শ্মশান জাগানো থেকে।···শিপ্রা বলেছিল, এমনি করে শ্মশান আগলে আর কতদিন থাকবেন।

ক্ষণকাল বিমূঢ়ের মত দাঁড়িয়ে থেকে সর্বেশ্বর ধীরে ধীরে নীচে নেমে গেল। জয়ন্তকে এমন অস্থির হতে সে দেখেনি কোনদিন।

সুরেখা ফিরেছে কাশ্মীর থেকে। ফিরেছে তার প্রমোদ সফর শেষ ক'রে নতুন আনন্দে উচ্ছসিত হয়ে। ক্লিটনের আনকোরা গাড়ীর স্পীড বেড়েছে। কিন্তু চোপরার জাওয়ারের হুইলে ধরেছে জং। তেলচিটে জমেছে খাণ্ডেল-ওয়ালের মনে।

ওরা ফিরে আসার পর থেকে খাণ্ডেলওয়ালের মনো-যোগ বেড়েছে কারবারে। যখনই বাড়ী ফিরে আসে, সঙ্গে থাকে হয় ফাটকার কোন দালাল, না হয় উন্মনা হয়ে হিসেবের খাতাগুলো টেনে নিয়ে বসে কি খুঁজতে। দরজাটা ভেজিয়ে দেয় ভিতর থেকে।

তার মানে?

দরজাটা ঠেলে সুরেখা ঘরে ঢোকে ঘাড়ের আঁচলটা মাটিতে লুটিয়ে। খাতাগুলোকে আড়াল ক'রে দাঁড়ায় ওর টেবিলের সামনে।

খাতা বন্ধ ক'রে খাণ্ডেলওয়াল একটা ঢোক গিলে বলে: মানে, পাওনাদারের তাগাদা।···মৌ আমার ফুরিয়েছে রেখা। আমি আর···

কি বলতে গিয়ে হঠাৎ থেমে যায়। ইতস্তত করে।

ওর মুখের কথা কেড়ে নিয়ে সুরেখা বলে: আর পারছো না আমার ভার বইতে। এই তো?

না-না: খাণ্ডেলওয়াল বিব্রত হয়ে পড়ে।

স্বভাবসিদ্ধ ছিলছিলে হাসির একটা ঝলক খাণ্ডেল-ওয়ালের চোখে-মুখে ছড়িয়ে দিয়ে সুরেখা বলে: কার-বারের নয়, মনের মৌ তোমার ফুরিয়েছে।···সেটা ফুরিয়েছে অনেক আগেই। খেলার মাঠে যে-দিন চোপরার সঙ্গে হলো পরিচয় সেদিনই তোমার মৌচাকে লেগেছিল বন-তুলসীর ছোঁয়া। নয় কি?

সুরেখা তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে চায় খাণ্ডেলওয়ালের মুখপানে। খাণ্ডেলওয়ালের ঠোঁট দুখানা মুহূর্তে কেমন বিবর্ণ হয়ে ওঠে। চোখ দুটো নামিয়ে নেয় সুরেখার দৃষ্টি থেকে। হঠাৎ কোন উত্তর যোগায় না মুখে।

সুরেখা থামে না। হাসির রেশ টেনে গিলে চিবিয়ে

দিয়ে বলে : জানি···জানি সে মন তোমার আর নেই, মন নিয়ে এগিয়ে এসেছিলে তিন বছর আগে। তাভা-রা মনের যেটুকু বাকী ছিল, সেটুকু শেষ করেছে ক্লিটন রোজ দিন যাতায়াত করে।···কাশ্মীর গিয়েছিলাম ক্লিটনের সঙ্গে। সইতে পারো নি।

সে কথা তো বলিনি কোন দিন : খাণ্ডেলওয়ালের কণ্ঠস্বর কাঁপে। নিজেকে সামলে নিয়ে সিধে হয়ে বসবার চেষ্টা করে।

বলবার সাহস তোমার ছিল না কোনদিন। আজও নেই।

কথাগুলো সুরেখা নির্বিকার ভাবে বলে। খাণ্ডেল-ওয়াল শিউরে ওঠে। ওর চোখের সামনে সুরেখা যেন কালিডোস্কোপের ছবির মত তুলে ধরে ওর ভীরু মনটাকে।

খাণ্ডেলওয়াল! ডার্লি!

খাণ্ডেলওয়ালের মাথাটা আরও নুয়ে পড়ে।

সুরেখা ঘনিয়ে দাঁড়ায়। চেয়ারের ব্যাকে এক হাত রেখে, আর এক হাত টেবিলে দিয়ে নিবিড় হয়ে দাঁড়ায় খাণ্ডেলওয়ালের পাশে। ওর ঘন নিশ্বাস লাগে খাণ্ডেল-ওয়ালের কপালে।···কপালের শিরাগুলো স্পষ্ট দেখা যায়। স্ফীত হয়ে উঠেছে আকস্মিক রক্ত প্রবাহে।

আমায় তুমি অবিশ্বাস করো?

অবিশ্বাস!

হাঁ, অবিশ্বাস। শুধু আজ নয়, আগেও অনেকবার দেখেছি তোমায়। অবিশ্বাস যদি সত্যি হয়ে থাকে তোমার, গোপন ক'রো না। অতবড় অপমান আমি সইতে পারবো না। তার চেয়ে সাপের বিষ এনে গোপনে মিশিয়ে দিও আমার সরবতের গেলাসে।···তোমার কাছে লাঞ্ছিত হওয়ার চেয়ে তোমার হাতে মরণ আমার অনেক ভালো।

টপটপ করে সুরেখার চোখের জল ঝরে পড়ে খাণ্ডেল-ওয়ালার কাঁধে।

খাণ্ডেলওয়াল চমকে ওঠে। মুহূর্তে ওর সারা দেহে বয়ে যায় একটা অতর্কিত বিদ্যুৎ প্রবাহ : রেখা!

সুরেখা কোন উত্তর দেয় না।

খাণ্ডেলওয়াল কেমন অস্থির হয়ে ওঠে। সুরেখার হাতখানা দুহাতের মুঠোয় চেপে ধরে বলে : রেখা! আমায় ভুল বুঝোনা তুমি।

কান্নার স্পন্দনে সুরেখার সারা দেহ কেঁপে কেঁপে ওঠে। ক্ষুব্ধ অভিমানের সুরে ভিজে গলায় বলে : ভুল আমি বুঝিনি। ভুল বুঝেছ তুমি।···চলে যদি সত্যি কোন দিন যেতে হয়, চোরের মত খিড়কি দরজা দিয়ে পালাবে না সুরেখা। মুক্তি নিয়ে যাবে সে তোমার চোখের সামনে দিয়ে।

জানি।···জানি রেখা।

জানো! জানো তুমি?···ধীরে ধীরে সুরেখার মাথাটা আরও নুয়ে পড়ে। খাণ্ডেলওয়ালের ঘাড়ে মাথা রেখে বিড় বিড় ক'রে বলে : খাণ্ডেলওয়াল! বলো, বলো যত কথা তোমার মনে জমে আছে, সব বলো তুমি। গোপন করো না, লক্ষ্মীটি!

ক্রমশঃ

অশ্রুতর্পণ

শ্রীঅপূর্ব্বকৃষ্ণ ভট্টাচার্য্য

তুমি তো চলিয়া গেলে ধরিত্রীর শেষ করি ঋণ,
সর্ব্ব আবরণ হোতে মুক্ত করি আপনারে, কবি!
দুঃখ সুখ সমাচ্ছন্ন সংসারের এই রাত্রি দিন
প্রদীপের তব দৃষ্টিজ্বলিবে না আর। স্মৃতিছবি
র'বে কিগো জীবনের জন্মান্তরে মর্ম্মর শুধু,—
তোমারে শুধাই? ঝরা বকুলের পথে পড়ে মনে
তব ফুল-ফোটাবার গান, বাসরঘরের বধূ,
কাঁদে নিরালায় আজি, বিয়োগ-ব্যথায় সঙ্গোপনে।

মহিলার শুভ্র জ্যোতি আজো দেশের অঙ্গনে ঝরে,
তোমার দীপালী জ্বলে বাণী-পীঠে অনির্ব্বাণ হয়ে;
মন্দিরা খঞ্জনী তব আজো বাজে দেশে দেশান্তরে
পূজা তুমি করে গেছ ভারতীরে পঞ্চপাত্র লয়ে।

সন্ধ্যায় কবরী চ্যুত পত্রসম ঝরে গেল আয়ু
অনন্ত কালের পথে। কতদিন কতবর্ষ যাবে
তোমার বিরহ সনে, করাঘাত করে যাবে বায়ু
সজল বর্ষণ রাতে তোমারি লাগিয়া—মহাভাবে
তুমি কি তখন কবি, আত্মভোলা হয়ে কবিতাতে
গাঁথিবে ছন্দের মালা ঊর্দ্ধলোকে—দূরে-বহুদূরে!

তোমার সম্মুখে চির শান্তি পারাবার, তারি সাথে
তুমি কি গাহিবে গান ভূমানন্দে নব নব সুরে?

এ বঙ্গের মৃত্তিকার ভাব শুভ্র করেছিলে পান,
শ্রীখণ্ডের ধূলিকণা অঙ্গে মাখি তীর্থ ধূলি সম।
ধূলোট উৎসব করি গেছ চলে—তব মহাপ্রাণ
স্নিগ্ধ যেন নির্ঝরের মত, হে কবি অগ্রজ মম!
কেন মোরে বেসেছিলে ভালো, ব্যথা পাই অন্তরাবে
ধ্বনিবে কি কণ্ঠ তব সভাকক্ষে নানা আলাপনে?
বাণীর অর্চ্চনা ক্ষণে কোনদিন পাবো কি তোমারে?
উৎসব রসের পাত্র বারে বারে দানে ও গ্রহণে।
আমার গোধূলি বেলা পড়ে আসে—সন্ধ্যা নামে ধীরে
কে জানে কখন তরী পারের ঘাটেতে দিবে দেখা?
তব সম নিরুদ্দেশে যাবো যবে রেখে ধরণীরে
তুমি যেন ভুলোনাকো জানাইতে মোরে তব লেখা?

সীমার তপস্যা হোতে অসীমের লভিয়া বিভূতি
লোকে লোকে বন্ধু-মিলনের গীতি সৌজন্যে শ্রদ্ধার
জাগিবে কি কবি! সাথে লয়ে অন্তরের শুভস্তুতি
ব্রহ্ম বিহারের তরে অপূর্ণের পরিপূর্ণতার।

[পরলোকগত কবি বসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়ের শোক সভায় পঠিত]

গ্রহ জগৎ

চতুর্থ বা বন্ধুভাব

উপাধ্যায়

লগ্ন থেকে বামাবর্ত্তে গণনায় চতুর্থ গৃহটীকে বন্ধুভাব বলা হয়, এই গৃহটী বিভিন্নভাবে আখ্যাত হয় যেমন পাতাল, হিবুক ইত্যাদি। এখান থেকে বিদ্যা, মন, পিতৃধন প্রাপ্তি, সঞ্চিত ধনাগার প্রাপ্তি, ক্ষেত্রলাভ, ভূমিলাভ, গৃহ, সুখসম্পত্তি, যানবাহন, জননী, শ্বশুর, খুল্লতাতপুত্র বা কন্যা, রাজ্ঞী, ঔষধ, নৈতিক চরিত্র প্রভৃতি বিষয়ে বিচার করা হয়। বন্ধুভাবে যার বিচার করতে হবে বলে উল্লিখিত হয়েছে, তার সম্পর্কে বন্ধু বা চতুর্থভাবকে লগ্ন মনে করে জাতকের কোষ্ঠী থেকে গ্রহ-সংস্থান দেখে নিয়ে তারপর শুভাশুভ ও স্বজনবর্গের বিচার করতে হয়। চতুর্থে পাপগ্রহ থাকলে মাতার অনিষ্ট হয়, চতুর্থস্থানে পাপগ্রহের দৃষ্টি থাকলেও ঐরকম ফল হয়ে থাকে। উক্তরূপ পাপগ্রহের দশায় মায়ের পীড়া আর অবস্থা বিশেষে তাঁর মৃত্যুও ঘটে। এই গ্রহে চন্দ্র, বুধ, বৃহস্পতি ও শুক্র থাকলে জাতক বহুরকমে সুখভোগ করে। এখানে যদি বলবান রবি ও মঙ্গল থাকে, তাহোলে এদের দশা ও অন্তর্দশায় মায়ের পিত্তরোগ বা ব্রণাদি পীড়া হয়, শনি রাহু থাকলে মাতার বায়ু পীড়া বা অন্য কোন পীড়া হয়। চন্দ্র, বুধ, বৃহস্পতি ও শুক্র বলবান হয়ে চতুর্থে থাকলে জাতকের বিদ্যা হবেই, কিন্তু লগ্নাধিপতি দুর্ব্বল হোলে বিদ্যাকারক গ্রহগুলি চতুর্থে অবস্থান করা সত্ত্বেও উৎকৃষ্ট ছাত্র হোতে পারবে না, তবে পরীক্ষার ভাল ফল হবে। বিদ্যা সম্পর্কে বিচারে চতুর্থ বা বন্ধুভাব, এর অধিপতি আর বিদ্যাকারক বৃহস্পতির অবস্থান লক্ষ্য করা দরকার। চতুর্থে পাপগ্রহ থাকলে বিদ্যা ভালো হয় না। চতুর্থে বৃহস্পতি উচ্চ আইন শিক্ষায় শিক্ষিত করে। চতুর্থভাব ও ভাবাধিপতি শুভগ্রহ এবং বুধ বলী হয়ে বন্ধুভাবে থাকলে বা দৃষ্টি দিলে জাতক বিদ্বান ও বুদ্ধিমান হয়। শনি বা রাহুযুক্ত চন্দ্র চতুর্থে থাকলে মাতা রুগ্না ও ব্যাধিগ্রস্তা হয়। লগ্নে বৃহস্পতি, ধনস্থানে শনি আর তৃতীয়ে রাহু থাকলে মাতার বিনাশ হয়। চতুর্থস্থানে বহু পাপগ্রহ থাকলে, সুখাধিপতি পাপগ্রহ হোলে আর শত্রু গ্রহগত হোলে অথবা পাপগ্রহযুক্ত বিশেষত শনিযুক্ত হোলে জাতক বহু পাপকার্য্যে রত হয়। চতুর্থাধিপতি পাপগ্রহ হয়ে নীচস্থ, পাপগ্রহ মধ্যস্থ, পাপগ্রহ দৃষ্ট কিম্বা পাপ বা শত্রু গৃহস্থ হোলে ভূমিনাশ হয়ে থাকে। লগ্ন থেকে চতুর্থস্থান যদি চররাশি হয় এবং চতুর্থাধিপতি কিম্বা গৃহকারক গ্রহ যদি চররাশিতে থাকে তাহোলে বহুস্থানে গৃহ হয়। চতুর্থাধিপতি দশমে, দশমাধিপতি চতুর্থে আর মঙ্গল বলবান হোলে বহু ভূমিলাভ হয়। চতুর্থে শুক্র অথবা অন্য শুভগ্রহ থাকলে অথবা চতুর্থভবন শুভগ্রহ যুক্ত ও শুভগ্রহ মধ্যবর্ত্তী হোলে এবং লগ্নপতি অপেক্ষা বৃহস্পতি অধিকতর বলবান হোলে জাতক সুখী ও সর্ব্বজন শ্রেষ্ঠ হয়।

তুলা, মকর, কুম্ভ ব্যতীত অন্য রাশিতে যার বন্ধুগৃহ, সেখানে শনি অবস্থান করলে জাতক নিয়ত ভগ্নগৃহে বাস করে, বিকলাঙ্গ, স্থানভ্রষ্ট ও দুঃখ পীড়িত হয়, সে কোনদিন মানসিক সুখ পায় না। যার রাশিচক্রে চতুর্থস্থানে পাপগ্রহ আছে আর চতুর্থাধিপতি পাপগ্রহের দ্বারা দৃষ্ট হয়েছে অথবা চতুর্থস্থান পাপগ্রহের মধ্যবর্ত্তী হয়েছে, সে ব্যক্তির হৃদয় প্রশস্ত নয়—তার হৃদয়ের কপটতা প্রকাশ পায়।

শনি যেমন সপ্তমস্থানে নিষ্ফল, বুধও তেমনই চতুর্থস্থানে নিষ্ফল। সুতরাং চতুর্থে বুধ থাকলে জাতকের পিতৃসম্পত্তির অধিকাংশই পিতার অনবধানতা দোষে নষ্ট হবে যায়, কোন কোন স্থলে পিতা সম্পূর্ণরূপে সম্পত্তি শূন্য ছিলেন, এরূপও প্রমাণ পাওয়া গেছে! চতুর্থাধিপতি ও শুক্র কেন্দ্রগত হোলে আর বুধ বলবান হোলে জাতক বিদ্বান ও পণ্ডিত হয়। চতুর্থাধিপতি পাপযুক্ত বা পাপদৃষ্ট হয়ে দুঃস্থানে থাকলে জাতক কখনই সরল অন্তঃকরণ বিশিষ্ট হয় না। চতুর্থাধিপতি চতুর্থ ভাবগত হোলে জাতক ভূসম্পত্তিবিশিষ্ট, মানী, খ্যাতনামা, ধার্ম্মিক ও সুখী হয়! শনি চতুর্থস্থ হয়ে পাপদৃষ্ট হোলে অগ্নিদাহাদি ভয়, অস্ত্র কর্ত্তৃক আঘাত প্রাপ্তি প্রভৃতি ঘটে থাকে। বৃহস্পতি অথবা রাহু চতুর্থে বিশেষ বলবান হোলে বিদ্যাক্ষেত্রে ডিগ্রী লাভে বাধা উৎপাদন করে না। ডিগ্রী লাভের পক্ষে চতুর্থে মঙ্গল বাধা প্রদান করে এবং পিতৃপক্ষ থেকে সাহায্যের বাধা ঘটে। চতুর্থস্থানে বৃহস্পতি বিশেষ সুখদাতা হয় এবং এই স্থানে ঐ থাকলে গার্হস্থ্য জীবনে স্বাচ্ছন্দ্য লাভ ও আত্মীয়বর্গের মধ্যে প্রধান হওয়া যায়। চতুর্থপতি ও দশমপতি একত্র কেন্দ্রে থাকলে আর শনি ত্রিকোণস্থ হোলে জাতকের সুন্দর সুবিশাল সৌধ ও বহুদূরব্যাপী বিস্তৃত গৃহপ্রাঙ্গণ হয়। চতুর্থভাব বা ভাবাধিপতি ক্রুরগ্রহ, পাপগ্রহ অথবা দুঃস্থানাধিপতির সঙ্গে একত্র থাকলে বা দৃষ্ট হোলে জাতকের বিমাতা হয়। সপ্তমাধিপতি ও জায়াকারক গ্রহ চতুর্থস্থানে অবস্থান করলে আর চতুর্থাধিপতি

ঃমস্থ হয়ে পরস্পরের মিত্র হোলে স্ত্রীধন প্রাপ্তি হয়। ভাগ্যাধিপতি বান হয়ে শুক্রের সঙ্গে চতুর্থস্থানে একত্র থাকলে জাতক আমরণ ভোগ করে। লগ্নাধিপতির ক্ষেত্রে তার শত্রুগ্রহ থাক্‌লে, তার ন্তর্দ্দশায় গৃহভূমির নাশ হয়। চতুর্থাধিপতি তুঙ্গস্থ হয়ে কর্ম্মাধি-তির সহিত একত্র থাক্‌লে বিয়াল্লিশ বছরে বাহন লাভ হয়। কাদশাধিপতি চতুর্থে আর চতুর্থাধিপতি একাদশে থাকলে দ্বাদশবর্ষে হন প্রাপ্তি ঘটে। চতুর্থপতি, চন্দ্র, বৃহস্পতি, শুক্রের যোগাযোগে নবাহন হয়। এরা চতুর্থস্থানে থাক্‌লে অথবা এদের মধ্যে দুয়েকটি গ্নে, চতুর্থে, দ্বিতীয়ে বা কেন্দ্র কোণে থাক্‌লে যানবাহন প্রাপ্তি ঘটে। তুর্থপতির শত্রুর দশান্তর্দ্দশায় বন্ধুনাশ হয়। চতুর্থপতি অষ্টমে বা দশে থাক্‌লে জাতক রতিক্রিয়ায় অসমর্থ ও পুরুষত্বহীন হয় আর ীব, জারজ ও দুঃখী হয়। চতুর্থে রবি, শনি ও মঙ্গল থাক্‌লে স্ত্রীর আগুনে পুড়ে মৃত্যু ঘটে। পরাজিত ও দুর্ব্বল গ্রহ চতুর্থস্থানে থাক্‌লে আর ষষ্ঠস্থান জলরাশি হোলে জলে ডুবে মৃত্যু হয়। প্রখ্যাত ব্যারিষ্টার ডব্লু, সি ব্যানার্জ্জির জন্মকুণ্ডলীতে চতুর্থস্থান চররাশি হওয়ায় ও চতুর্থাধি-পতি শনি চররাশিগত হয়ে মঙ্গলের সঙ্গে পূর্ণদৃষ্টি সম্বন্ধ করায় তাঁর বহুস্থানে গৃহভূমি সম্পত্তি লাভ হয়েছিল। চতুর্থস্থানে শনি ও চন্দ্র সহাবস্থান করলে মাতার অকালে মৃত্যু হয়। চতুর্থাধিপতি অষ্টমাধিপতির সঙ্গে একত্র থাক্‌লে জাতক ফৌজদারী অপরাধের জন্য কারাদণ্ড ভোগ করতে পারে। চতুর্থস্থানে গ্রহরা শুভগ্রহের দৃষ্টিসম্পন্ন হলে বা চতুর্থা-ধিপতি বলবান হোলে মাতৃকুলের বহু সম্পত্তি দেয়, শনি ওমঙ্গল চতুর্থ স্থানে বলবান হয়ে থাক্‌লে অনেক বিষয় সম্পত্তি হয়। লগ্নাধিপতির প্রতি চতুর্থাধিপতির দৃষ্টি লগ্ন স্থানে পড়্‌লে প্রতিভা ও নানা সদ্‌গুণের প্রভাবে জাতক তার বিষয় সম্পত্তির উন্নতি করে সুখস্বাচ্ছন্দ্যে জীবনযাপন করতে পারে। অধিকাংশ গ্রহ যদি লগ্ন থেকে চতুর্থ স্থান পর্য্যন্ত অবস্থান করে তাহোলে চল্লিশ বছরের ওপর বয়স পর্য্যন্ত বিশেষ রূপে উপার্জ্জন হয়। গ্রহগণ দ্বিতীয়ে, চতুর্থে ষষ্ঠে, অষ্টমে, দশমে ও দ্বাদশে একটার পর একটা করে অবস্থান করলে সমুদ্রযোগ হয়। এই যোগে জাতক অতুল ঐশ্বর্য্য ও রত্নাদির মালিক ও রাজতুল্য হয়। চতুর্থাধিপতি তুঙ্গী হয়ে লগ্নগত হোলে আর দশমাধিপতি বলবান হয়ে কেন্দ্রগত হোলে জাতক যেখানে, যাবে, সেখানেই বিশেষ সম্মান লাভ করবে। চতুর্থ পতি ও পঞ্চম পতি চতুর্থে সহাবস্থান সম্বন্ধ করলে জাতক বিদ্বান হয়। রবি ও বুধ লগ্ন থেকে চতুর্থ স্থানে একত্র থাক্‌লে জাতকের মধ্যে রাজকীয় মর্য্যাদা বা আভি-জাত্যবোধ থাকে এবং সে ধনী ও সদ্‌গুণসম্পন্ন হয়। তৃতীয় স্থানে শুভ গ্রহ থাক্‌লে আর চতুর্থাধিপতি বলবান হোলে গৃহলাভ হয়,কিন্তু চতুর্থাধি-পতি অষ্টম স্থানে থেকে পাপ গ্রহের দ্বারা দৃষ্ট হোলে গৃহ হানি হয়। চতুর্থ স্থান ও বৃহস্পতির অবস্থা উত্তম হোলে আর বলী গ্রহযোগ হোলে জাতকের পার্থিব সুখ হয়ে থাকে। লগ্ন, চন্দ্র, বিশেষতঃ রবির চতুর্থ ও দশম থেকে মান সম্ভ্রম ও প্রতিপত্তি সম্বন্ধে বিচার করতে হয়। চতুর্থ স্থানে অবস্থিত গ্রহ, চতুর্থ স্থানদর্শী গ্রহ এবং চতুর্থভাবের কারকগ্রহ চন্দ্র বলবান হোলে জাতকের জীবন অত্যন্ত সুখকর হয়। শুক্র থেকে চতুর্থ স্থানের শুভাশুভত্বের ওপর যান-বাহনাদি সুখ সম্পূর্ণরূপে নির্ভর করে। ক্রুর গ্রহ অর্থাৎ শনি বা মঙ্গল চতুর্থাধিপতি হয়ে নিধনস্থ হোলে জাতক রুগ্ন, দরিদ্র, অসৎকর্ম্মী ও মৃত্যুপ্রিয় হয়। চতুর্থাধিপতি ষষ্ঠ স্থানে থাক্‌লে জাতক বহু মাতা বিশিষ্ট, পিতার অর্থনাশক, চৌর পিতার শত্রু ও পিতৃ-দোষ করা হয়। শুভ গ্রহ হোলে তার পুত্র সঞ্চয়ী হয়। যদি চতুর্থাধি-পতি ক্রুর গ্রহ হয়, তাহোলে শ্বশুরকে পুত্র বধূ পালন করে না, শুভগ্রহ হোলে বিপরীত হয় অর্থাৎ পালন করে। ধনু রাশিতে কেতু চতুর্থস্থ হোলে সুখ হয়। চতুর্থ স্থানে রবি তুঙ্গস্থ হোলে জাতকের উচ্চপদ-প্রাপ্তির বা কর্ম্মক্ষেত্রে সাফল্য-গৌরবলাভের সম্ভাবনা লক্ষ্য করা যায়। চতুর্থভাবে মঙ্গল বাল্যেই জাতকের মাতৃ হানি ঘটায়। চতুর্থস্থানে রাহু থাক্‌লে জাতক নীচ জাতির গৃহে বাস করে। চতুর্থ স্থান ফুসফুস ও হৃদ্‌পিণ্ড। বিংশোত্তরী মতে চতুর্থপতি দশমে ও দশমপতি চতুর্থে থাকে তাহোলে তাদের পরস্পরের দশান্তর্দ্দশা শুভ হয়। যার চতুর্থে তুঙ্গীগ্রহ স্বক্ষেত্র বা মূল ত্রিকোণস্থ গ্রহ বা স্বাভাবিক শুভ গ্রহ বলবান হয়ে থাকে, তার দশায় যান-বাহন, গৃহ ভূমি, সুখস্বাচ্ছন্দ্য ও অর্থাদিলাভ হয়। চতুর্থ-পতি পুত্রস্থানে বা ভাগ্যে থাক্‌লে জাতকের পিতা ধনী, আর পুত্র দীর্ঘজীবী হয়। গ্রহগণ বলশালী হোলে তাদের অশুভত্বের হ্রাস হয় এবং শুভত্বের বৃদ্ধি হয়। বলহীন গ্রহরা দুঃখ দেয় আর তারা অশুভত্বই প্রকাশ করে। বন্ধু স্থান উত্তম হোলে রাজানুগ্রহলাভ হয়। শুভগ্রহ দুঃস্থানের অধিপতি হয়ে চতুর্থস্থানে থাক্‌লে কিছু না কিছু শুভফল দেবে, কিন্তু পাপগ্রহ মানসিক অশান্তি, আশাভঙ্গ, মনস্তাপ, বিদ্যায় ক্ষতি, মাতৃকষ্ট, গৃহকষ্ট প্রভৃতি দেবে।

***

আষাঢ় মাসের ব্যক্তিগত রাশির ফলাফল

মেষ

তিনটী নক্ষত্রাশ্রিত জাত ব্যক্তিদের মধ্যে ভরণী জাতগণের পক্ষে সর্ব্বাপেক্ষা শুভ। ভরণীর পর কৃত্তিকা, তারপর অশ্বিনী নক্ষত্র জাত-গণের শুভ ফলপ্রাপ্তি যোগ আছে। স্বাস্থ্যের অবস্থা কিছু পরিমাণে খারাপ হবে। উদরে গোলমাল, পাকাশয়ের পীড়া ও আমাশয়ের সম্ভাবনা। দু'চার জন ব্যক্তির জ্বরও হোতে পারে। ভ্রমণকালে দুর্ঘটনার আশঙ্কা আছে কিন্তু গুরুতর পীড়া কিম্বা মারাত্মক দুর্ঘটনার সম্ভাবনা নাই। স্বজন বন্ধুবিয়োগের জন্য শোকপ্রাপ্তি। মাসের বেশীর ভাগ সময়েই পারিবারিক শান্তি ও শৃঙ্খলা সংরক্ষিত থাকবে। মাসের প্রথমার্দ্ধে কিছু আর্থিক অস্বচ্ছলতা ঘট্‌লেও মোটের উপর আয়ভাব ভালোই যাবে। আর্থিক উন্নতির পক্ষে সুযোগ আসবে। অস্বচ্ছলতার

জন্তে ঘটনাচক্রে অর্থব্যয় হোতে পারে, প্রতারিত হবারও সম্ভাবনা আছে। নব পরিকল্পনা বর্জ্জনীয়। বিষয় সম্পত্তিভোগী, বাড়ীওয়ালা প্রভৃতির পক্ষে মাসটী কিছু পরিমাণে শুভ,—কৃষকের পক্ষেও মাসটী উত্তম। চাকুরী জীবীদের পক্ষে নানাপ্রকার অসুবিধা ভোগ করতে হবে। বৃত্তিজীবী ও ব্যবসায়ীর পক্ষে এ মাসটী অশুভ নয়। মেয়েদের পক্ষে মাসটি উত্তম—প্রণয় বা প্রণয়ের পূর্ব্বরাগ, বনভোজন, আমোদ-প্রমোদ, নানা সামাজিক কার্য্য, গার্হস্থ্য সংক্রান্ত ব্যাপার প্রভৃতি সম্পর্কে সাফল্য, বিভার্থীগণের বিভাভাব ও পরীক্ষার ফল মোটের উপর ভালো।

বৃষ

রোহিনী নক্ষত্রাশ্রিত ব্যক্তিদের পক্ষেই কষ্ট, কৃত্তিকা ও মৃগশিরা-নক্ষত্রাশ্রিতগণের পক্ষে অপেক্ষাকৃত শুভ। সাধারণ স্বাস্থ্য ভালোই যাবে। যাদের রক্ত চাপবৃদ্ধি, হৃৎশূল, হাঁপানি, চক্ষুপীড়া !প্রভৃতি ব্যাধি আছে, তাদের পক্ষে কিছুটা ভালো হবে। পারিবারিক জীবন শান্তিপূর্ণ থাকবে। বহির্ক্ষেত্র আদৌ ভালো নয়। স্বজন বিরোধ, লোকের সঙ্গে মতভেদ ও মনোমালিন্ত, উদ্বেগ প্রভৃতি সম্ভাবনা। আর্থিক অবস্থা আশানুরূপ ভালো বলা যায় না। আশা ভঙ্গ যোগ আছে। কোনরূপ নূতন পরিকল্পনা বা কার্য্যে হস্তক্ষেপ করাও এমাসে চলবে না, তার ফল খারাপ হবে, টাকাকড়ির লেন দেনও বর্জ্জনীয়। বিষয় সম্পত্তিভোগী ও বাড়ীওয়ালারা এ মাসে নানাপ্রকার অসুবিধা ভোগ করবে, প্রজা, ভাড়াটিয়া প্রভৃতির সঙ্গে মনোমালিন্ত হবার যোগ আছে, নিয়মিতভাবে টাকা আদায় সুসাধ্য হবে না। চাকরির ক্ষেত্র শুভ তবে কোনপ্রকার অপ্রত্যাশিত শুভসংযোগ, পদোন্নতি ইত্যাদি দেখা যায় না। ব্যবসায়ী ও বৃত্তিভোগীদের পক্ষে এ মাসটী শুভ, যদিও তাদের ক্ষেত্রে ওঠাপড়া ভাবটা গোটা মাসই থাকবে। মেয়েদের পক্ষে প্রথমার্দ্ধটী ভালো বলা যায় না, প্রণয়ে নৈরাশ্য, অবৈধ প্রণয়ে বিপত্তি, গার্হস্থ্য সম্পর্কে নানা-প্রকার বাধা প্রাপ্তি, পুরুষের কাছ থেকে মানসিক আঘাত ইত্যাদি রয়েছে কিন্তু শেষার্দ্ধে সর্ব্বপ্রকারে শুভ হবে। বিভার্থীদের পক্ষে বিভাভাব ও পরীক্ষার ফল আশানুরূপ বলা যায়।

মিথুন

মৃগশিরা ও পুনর্ব্বসু জাতগণের পক্ষে আর্দ্রানক্ষত্রাশ্রিত ব্যক্তিদের চেয়ে অপেক্ষাকৃত শুভ বলা যায়। স্বাস্থ্য খারাপ যাবে। জ্বর, উদর-পীড়া, রক্তচাপ বৃদ্ধি, শ্বাসপ্রশ্বাসের কষ্ট, হাঁপানি ইত্যাদি সূচিত হয়। মানসিক অস্বচ্ছন্দতা, ঈর্ষ্যাপ্রবণতা, উদ্বেগ, চিত্তের বিক্ষোভ, অপবাদ প্রভৃতির ভয়। এ ছাড়া, পারিবারিক অশান্তি, কলহ বিবাদ গৃহের ভিতরে বাহিরে বন্ধুবান্ধব আত্মীয় স্বজনের সঙ্গে চলবে—যাতে মাসটী দুর্ব্বিষহ হয়ে উঠবে সকলরকমে। আর্থিকক্ষেত্র সুবিধাজনক নয়, কখন লাভ, কখন ক্ষতি, এইভাবে চলবে। কোনপ্রকার পরিকল্পনা বা নূতন কার্য্যে হস্তক্ষেপ বর্জ্জনীয়। বিষয় সম্পত্তিভোগী ও বাড়ীওয়ালারা কষ্ট-ভোগ করবে। ভূমিজাত দ্রব্যাদি ও বাড়ী ভাড়া সম্পর্কে ক্ষতির আশঙ্কা আছে। বিশ্বস্ত ব্যক্তি বলে যার সম্বন্ধে ধারণা আছে তারও সহযোগ পাওয়া যাবে না। মন অন্ধকারাচ্ছন্ন হয়ে যাবে। চাকুরীজীবীরা কি অসুবিধার মধ্যে দিনযাপন করবে, উপরওয়ালার সঙ্গে ব্যবহারে সত হওয়া দরকার। ব্যবসায়ী ও বৃত্তিভোগীদের পক্ষে মাসটী মধ্যম। বিভার্থী দের পক্ষে বিভাভাব ও পরীক্ষার ফল নৈরাশ্যজনক। পুরুষের সঙ্গে মেলা মেশায় মেয়েরা মানসিক অসুস্থতা ভোগ করবে, কোনপ্রকারে অপ্রীতিকর ঘটনার সম্মুখীন হওয়ার আশঙ্কা আছে, এজন্ত সতর্ক হওয়া দরকার। অপবাদ ও নির্য্যাতন ভোগ ঘটতে পারে, পারিবারিক ও সামাজিক ক্ষেত্রেও মর্য্যাদাহানির আশঙ্কা আছে।

কর্কট

অশ্লেষানক্ষত্রজাতগণের পক্ষে বিশেষ শুভ, পুনর্ব্বসুর পক্ষে অপেক্ষাকৃত শুভ, পুষ্যাজাতগণের পক্ষে নিকৃষ্ট ফল। পিত্তপ্রকোপ, তাপ ও রক্তদোষ, শ্লেষা প্রকোপ প্রভৃতি আশঙ্কা করা যায়, তা ছাড়া স্বাস্থ্য মোটামুটি ভালোই যাবে। পারিবারিক শান্তি ও শৃঙ্খলা থাকবে কিন্তু সামাজিক ক্ষেত্রে বন্ধু-বান্ধব ও স্বজনবর্গরা কষ্ট দেবে, তার জন্তে কিছু কিছু অসুবিধার সম্ভাবনা। সাধারণতঃ ভাগ্যভাব ভালোই হবে, লাভ ও আর্থিকযোগ, আয় বৃদ্ধি, বড়লোকের সঙ্গে বন্ধুত্বজনিত সুযোগ, দায়িত্বপূর্ণ কাজে হস্তক্ষেপ ও তাতে সাফল্য দেখা যায়। বাড়ীওয়ালাদের পক্ষে মাসটী শুভ নয়। কর্ম্মক্ষেত্র শুভ। চাকুরীজীবীরা উপরওয়ালার সুনজরে পড়বে, সম্মান ও বিভাগীয় পদোন্নতি, চাকুরির জন্তে প্রার্থী হয়ে সাক্ষাতে সাফল্য, প্রতিযোগিতায় সিদ্ধি ইত্যাদিযোগ আছে। ব্যবসায়ী ও বৃত্তিভোগীদের পক্ষে মাসটী অত্যন্ত শুভ, প্রচুর উপার্জ্জন ও লাভ, সৌভাগ্যবৃদ্ধি ও উত্তম সুযোগ প্রাপ্তি, বিভার্থী ও পরীক্ষার্থীদের পক্ষে মাসটী শুভ। মেয়েরা নানাপ্রকার সুযোগ পাবে এবং বেশভূষা, অর্থ, প্রণয়ে সাফল্য, পূর্ব্বরাগে প্রীতি, গার্হস্থ্যক্ষেত্রে সুখ ও শান্তি লাভ করবে, তা ছাড়া পুরুষেরা আনু-গত্য প্রকাশ করবে।

সিংহ

পূর্ব্বফল্গুনী ও উত্তরফল্গুনী জাত ব্যক্তিরা মঘানক্ষত্রাশ্রিতদের চেয়ে বেশী ভালো ফল পাবে। স্বাস্থ্য মন্দ যাবে না, তবে চক্ষুপীড়া ও পিত্ত প্রকোপ হোতে পারে। ভ্রমণে দুর্ঘটনার ভয় আছে। পারিবারিক ক্ষেত্র মোটামুটি। বাহিরে আত্মীয় স্বজনদের জন্তে উদ্বেগ ও অশান্তি-ভোগ, আর্থিক অবস্থা খুব ভালো যাবে, কিন্তু সঞ্চয়ের আশা কম। নূতন কোন পরিকল্পনা ও প্রচেষ্টায় সতর্কতা অবলম্বন আবশ্যক। স্পেকুলেশন বর্জ্জনীয়। বিষয় সম্পত্তিভোগী ও বাড়ীওয়ালাদের পক্ষে মাসটী মধ্যম। সম্পত্তির কিছু ক্ষতি হোতে পারে। চাকুরি জীবীদের পক্ষে মাসটি শুভ, কর্ম্মোন্নতিযোগ আছে, উপরওয়ালার প্রীতিভাজন হবার সম্ভাবনা, প্রতিযোগীরা ও সাফল্য লাভ করবে।

কন্যা

শ্রবণানক্ষত্রজাত ব্যক্তিদের পক্ষে অশুভত্ব বেশী, উত্তরফল্গুনী ও চিত্রানক্ষত্রাশ্রিতগণের পক্ষে অশুভত্ব কম। ক্লান্তিকরভ্রমণ, বন্ধু ও স্বজন ব্যক্তির মৃত্যুজনিত শোক, অসাফল্য ও অপমান, গোচরগত

নানা অশুভত্ব প্রকাশ পাবে এই মাসের প্রথমার্দ্ধে, শেষার্দ্ধে, অর্থলাভ, বন্ধুত্ব, খ্যাতি ও সৌভাগ্য সূচনা। প্রথমার্দ্ধে শারীরিক অবস্থা ভালো যাবে না, ক্লান্তি ও সাধারণ দৌর্ব্বল্য প্রকাশ পাবে, মানসিক অশান্তিই বিশেষ পরিলক্ষিত হয় গুরুজনবর্গ, আত্মীয়স্বজন প্রভৃতির জন্তে, তাছাড়া দুঃসংবাদপ্রাপ্তির সম্ভাবনা আছে। আর্থিক স্বচ্ছলতা দেখা যায়। অর্থসংক্রান্ত ব্যাপারে শত্রুতার ভয়। নূতন বিষয় সম্পত্তি যোগও দেখা যায়। ভূম্যধিকারী, বাড়ীওয়ালা ও কৃষিজীবীর পক্ষে মাসটী ভালো বলা যায় না। চাকুরিজীবীরা নানা সুযোগসুবিধা ও উন্নতির পথ পাবে। ব্যবসায়ী ও বৃত্তিজীবীদের পক্ষে মাসটী মধ্যম। স্ত্রীলোকের পক্ষে মাসটী ভালো নয়। দুঃখজনক পরিবেশের মধ্যে দিনগুলি অতিবাহিত হবে, মাসের প্রথমার্দ্ধে বিলাসিতার দ্রব্যাদি, অলঙ্কার প্রভৃতি ক্রয় করতে যাওয়া উচিত নয়। মাসের শেষে ক্রয় করা যেতে পারে। বিদ্যার্থী ও পরীক্ষার্থীদের পক্ষে মাসটী শুভ।

তুলা

চিত্রা নক্ষত্রাশ্রিত ব্যক্তিগণের পক্ষে উত্তম, স্বাতী ও বিশাখা নক্ষত্রাশ্রিতগণের পক্ষে মাসটী তদনুপাতে শুভত্বের হ্রাস দেখা যায়। স্বাস্থ্য ভালোই যাবে। মাসের প্রথমদিকে রক্তের চাপবৃদ্ধি, ক্লান্তিকর ভ্রমণ প্রভৃতির জন্ত স্বাস্থ্যের হানি, শেষদিকে শুভ। শিশুদের সম্বন্ধে নজর দেওয়া দরকার, কেন না কোনরূপ মহামারী বা সংক্রামক রোগে তারা আক্রান্ত হোতে পারে। পারিবারিক শান্তি ও শ্রীবৃদ্ধি ঘটবে, সামাজিক ক্ষেত্র শুভ হবে। আর্থিক অবস্থা উত্তম হবে। স্পেকুলেশন বর্জ্জনীয়। বাড়ীওয়ালা ও বিষয় সম্পত্তি ভোগীদের পক্ষে মাসটী ভালো বলা যায় না—কলহ-বিবাদ, মামলা মোকর্দ্দমা প্রভৃতি নানা অশান্তির কারণ ঘটবে। রাজনৈতিক আবহাওয়ার পরিবর্ত্তন হেতু এই সম্প্রদায়ের দুঃখ কষ্ট ও ক্ষতির সম্ভাবনা। চাকুরির ক্ষেত্র অত্যন্ত শুভ। ব্যবসায়ী ও বৃত্তিজীবীদের কর্ম্মব্যস্ততা লক্ষ্য করা যায়, এতদ্ সত্ত্বেও এদের সময়টী মোটামুটি মন্দ যাবে না। মেয়েদের পক্ষে বহু শুভ ঘটনার সম্মুখীন হবার যোগ আছে,—বৈধ ও অবৈধ উভয় প্রকারের প্রণয়ে সাফল্য, অবিবাহিতার বিবাহ যোগ বা বিবাহের কথাবার্ত্তা, আমোদ-প্রমোদ, বনভোজন, ভ্রমণ প্রভৃতি সুযোগ ঘটবে। সামাজিক ও পার্হস্থ্য ক্ষেত্রে সমাদর লাভ। পুরুষের কাছ থেকে আনন্দপূর্ণ সাহচর্য্য ও অর্থলাভ। বিদ্যার্থী ও পরীক্ষার্থীদের পক্ষে শুভ।

বৃশ্চিক

বিশাখানক্ষত্রাশ্রিত ব্যক্তিগণের পক্ষে উত্তম, অনুরাধাজাতগণের পক্ষে কিছুটা ভালো, কিন্তু মূলানক্ষত্রাশ্রিতগণ সবচেয়ে বেশী কষ্ট পাবে। উদর সংক্রান্ত গোলযোগ, গুহ্যপ্রদেশে পীড়া, মূত্রদোষ, অতিরিক্ত তাপজনিত দৈহিক কষ্ট এবং রক্তের চাপ প্রভৃতি সম্ভাবনা আছে। শিশুদের মারামারি ও পীড়া, দুর্ঘটনার ভয়। পারিবারিক কলহহেতু এ মাসে পারিবারিক জীবন বিষাক্ত হবে, বাহিরেও বন্ধুবান্ধব ও স্বজনের সঙ্গে মনোমালিন্তজনিত অপ্রীতিকর পরিস্থিতি আর এজন্তে দুঃখভোগ হবে। আর্থিক অস্বচ্ছলতা, ঋণ ও ব্যয়াধিক্যজনিত অর্থকৃচ্ছ্রতার সম্ভাবনা, স্পেকুলেশন করলে সাংঘাতিক ক্ষতি ঘটবে। বাড়ীওয়ালা ও ভূম্যধিকারীর পক্ষে দুঃসময়, চাকুরিজীবীদেরও লাঞ্ছনাভোগ—মাসটী এদের পক্ষে নানাপ্রকার গোলযোগপূর্ণ। স্ত্রীলোকদের পক্ষে মধ্যম সময়, অবৈধ প্রণয়ে অগ্রসর হোলে বিশেষ বিপত্তির কারণ আছে। পুরুষের সঙ্গে মেলামেশার সতর্কতা অবলম্বন আবশ্যক। পারিবারিক ক্ষেত্রে লাঞ্ছনাভোগ আর সামাজিক ক্ষেত্রে অপ্রীতিকর অভিজ্ঞতা—এ মাসে খুব হিসেব করে চল্‌লে কোনপ্রকার অঘটন ঘটবেনা। বিদ্যার্থী ও পরীক্ষার্থীদের পক্ষে আশাপ্রদ কিছু দেখা যায় না।

ধনু

পূর্ব্বাষাঢ়াজাতগণের পক্ষে এ মাসে নিকৃষ্ট ফল, উৎকৃষ্ট ফলপ্রাপ্তি ঘটবে মূলা ও উত্তরাষাঢ়াজাতগণের পক্ষে। শারীরিক অবস্থা বিশেষ খারাপ হবে। দুর্ঘটনার জন্ত সতর্কতা আবশ্যক। মাসের প্রথমার্দ্ধে পারিবারিক অশান্তি ও কলহ চল্‌বে, তবে কোনপ্রকার অশুভ পরিণতির আশঙ্কা নেই। মাসের শেষের দিকে আর্থিক অবস্থা উত্তম হবে, গোড়ার দিকে ব্যয়াধিক্য ও ক্ষতি নিজের দোষে ঘটবে। কোনপ্রকার স্পেকুলেশন চল্‌বে না—কেন না বাজারদর এমন অবস্থায় এসে দাঁড়াবে যার জন্তে যথেষ্ট ক্ষতি ভোগ করতে হবে। বিষয় সম্পত্তি ভোগী ও বাড়ীওয়ালার পক্ষে মাসটী অশুভ নয়। চাকুরীজীবীদের পক্ষে শুভ। ব্যবসায়ী ও বৃত্তিজীবীরা ক্ষতিগ্রস্ত হবে। মেয়েদের পক্ষে সতর্ক হয়ে চল্‌তে হবে, নানাপ্রকার বিশৃঙ্খলতার সম্ভাবনা আছে—অপবাদ, লাঞ্ছনা ও মনস্তাপের ভয় আছে। বিদ্যার্থী ও পরীক্ষার্থীদের পক্ষে মধ্যম।

মকর

শ্রবণানক্ষত্রাশ্রিত ব্যক্তির পক্ষে নিকৃষ্ট ফল, কিন্তু উত্তরাষাঢ়া নক্ষত্রাশ্রিতগণের পক্ষে তদনুপাতে অপেক্ষাকৃত ভালো। প্রথমদিকে স্বাস্থ্য খারাপ হোলেও শেষের দিক ভালোই যাবে। শিশুদের স্বাস্থ্যভঙ্গ যোগ ও পীড়াদি কষ্ট, ভয়ের কোন কারণ নেই। অজীর্ণ, উদরের গোলমাল, চক্ষুপীড়া প্রভৃতি যোগ আছে। সামান্য দুর্ঘটনা, আঘাত বা কেটে যাওয়া ইত্যাদির আশঙ্কা আছে। পারিবারিক ও সামাজিক ক্ষেত্রে কলহবিবাদ। অর্থাগমের পথ অশুভ নয়। অর্থোপার্জ্জনের চেষ্টা ব্যর্থ হবে না, আয়ের যোগ আছে, এমন কি স্পেকুলেশনেও অর্থপ্রাপ্তি। বাড়ীওয়ালা ও ভূম্যধিকারীরা নানাপ্রকার অসুবিধা ও বিশৃঙ্খলতায় কষ্টভোগ করবে। গৃহাদির সংস্কার। চাকুরিজীবীদের পক্ষে মধ্যম সময়। ব্যবসায়ী ও বৃত্তিজীবীদের কর্ম্মতৎপরতা বৃদ্ধি হবে, মাসটী এদের মন্দ যাবে না। প্রণয়, বিবাহ ও পূর্ব্বরাগ সম্পর্কে এমাসে মেয়েদের বিশেষ সতর্কতা আবশ্যক। পরীক্ষার্থী ও বিদ্যার্থীদের পক্ষে আশাপ্রদ।

কুম্ভ

শতভিষাজাতগণের পক্ষে মাসটী নিকৃষ্ট। ধনিষ্ঠা ও পূর্ব্বভাদ্রপদ-নক্ষত্রাশ্রিতগণ অপেক্ষাকৃত শুভ ফল পাবে। স্বাস্থ্যই ভালো যাবে, কোন পীড়া না হোলেও শারীরিক দুর্ব্বলতা ঘটবে। শিশুদের স্বাস্থ্য সম্পর্কে দৃষ্টি নেওয়া দরকার। পারিবারিক শান্তির ব্যাঘাত ঘটবে না, সামান্য কলহাদি সূচিত হয়। আর্থিক সংক্রান্ত ব্যাপারে এ মাসটী শুভ যাবে। লাভ, আয়বৃদ্ধি, কর্ম্মোদ্যমে সাফল্য, কিছু ক্ষতি ঘটবে বিশেষ সতর্কতা সত্ত্বেও। মামলামোকর্দ্দমার জন্য কিঞ্চিৎ ব্যয়াধিক্য, স্পেকুলেশনের পক্ষে শুভ নয়। বাড়ীওয়ালা ও বিষয়সম্পত্তিভোগীর পক্ষে এ মাসটী শুভ। চাকুরির ক্ষেত্র শুভ নয়, নানারকম বাধা বিপত্তি ও উপরওয়ালার বিরাগভাজন হবার যোগ আছে। ব্যবসায়ী ও বৃত্তিজীবীদের পক্ষে মাসটী মোটামুটি ভালো যাবে। এ মাসটী মেয়েদের পক্ষে শুভপ্রদ নয়, এজন্যে কোনরকম কার্য্যে হস্তক্ষেপ না করাই ভালো। পরীক্ষার্থী ও বিদ্যার্থীদের পক্ষে শুভ।

মীন

উত্তরভাদ্রপদনক্ষত্রাশ্রিত ব্যক্তিদের পক্ষে এ মাসটী নিকৃষ্ট ফলপ্রদ হবে। পূর্ব্বভাদ্রপদ ও রেবতীনক্ষত্রাশ্রিতগণ অপেক্ষাকৃত শুভফল পাবে। স্বাস্থ্য ভালোই যাবে কিন্তু কিছু রক্তপাতের সম্ভাবনা আছে। শিশুদের সংক্রামক ব্যাধির সম্ভাবনা। পারিবারিক বিষয়ে সতর্কতা আবশ্যক, স্বজনবিরোধের আশঙ্কা করা যায়, এজন্যে মানসিক চাঞ্চল্য। আর্থিক অবস্থা মোটামুটি, কিছু কিছু লাভ ও সাফল্য আশা করা যায়। মাসের শেষার্দ্ধে অপরিমিত ব্যয়, নগদ টাকার টান ধরবে—টাকার লেনদেন ব্যাপার না করাই ভালো। বিষয়সম্পত্তি ভোগীও বাড়ীওয়ালাদের পক্ষে মিশ্রফল। এরা নানা অসুবিধা ভোগ করবে। চাকুরির স্থান অপেক্ষাকৃত ভালো,—উপরওয়ালার প্রীতিভাজন হবার সম্ভাবনা, প্রতিযোগিতায় অসাফল্য। এ মাসটী মেয়েদের পক্ষে মোটেই শুভ নয়, সামাজিক প্রতিষ্ঠা হবে না, সাংসারিক অস্বচ্ছন্দতা ও শত্রু বৃদ্ধি। শিক্ষার্থী ও বিদ্যার্থীদের পক্ষে শুভ।

***

ব্যক্তিগত লগ্ন ফলাফল

মেষলগ্ন—

দেহভাব দুর্ব্বল, শারীরিক পীড়াদির সম্ভাবনা, শত্রুবৃদ্ধি, শ্লেষ্মাপ্রকোপ অর্থাগম, অসন্তোষ, লাভ, আংশিক ব্যয়বৃদ্ধি। স্ত্রীলোকের সহিত অসদ্ভাব ও কলহ।

বৃষলগ্ন—

অর্থক্ষতি হোলেও অর্থাগমের যোগ আছে, আনন্দবৃদ্ধি, সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য ও উত্তম সঙ্গলাভ, নারীপ্রীতি, সৌভাগ্যলাভ, ভয়, অপবাদ।

মিথুনলগ্ন—

চক্ষুপীড়া, বিদ্যার্জ্জন, সম্মান লাভ, চিঠিপত্রাদি লেখার মধ্য দিয়ে অপ্রীতিকর ঘটনার সমাবেশ, জনপ্রিয়তা, অর্থাগম, কর্ম্মে ঝঞ্ঝাট ও উদ্বেগ।

কর্কটলগ্ন—

সন্তানের পীড়া, বিক্ষিপ্তচিত্ত, কর্ম্মক্ষেত্রে অশান্তি এ মনোমালিন্য, দুর্ঘটনার ভয়, কলহ বিবাদ ও আর্থিক ক্ষতি, নানা অশান্তির কারণ ঘটবে।

সিংহলগ্ন—

ধনাগম, মানসিক অস্বচ্ছন্দতা, ভ্রমণ, বিদ্যাভাব শুভ, সম্পদ লাভ, সন্তানাদির কষ্ট, শোক বা দুঃখপ্রাপ্তি।

কন্যালগ্ন—

শ্লেষ্মা প্রকোপ, আশাভঙ্গ, হৃদ্‌যন্ত্রের বৈকল্য, সঞ্চিত অর্থনষ্ট, কর্ম্মে বাধা, স্ত্রীর পীড়া ও পারিবারিক কলহ।

তুলা লগ্ন—

অপবাদ, পরিবর্ত্তন বিশেষতঃ কর্ম্মক্ষেত্রে, মানহানি, লাভ ও অর্থাগম, ধনবৃদ্ধি, সৌভাগ্যোদয়, পিতামাতার সহিত বিচ্ছেদ বা মনোমালিন্য বিদ্যার কিঞ্চিৎ বাধা, স্ত্রীর রক্তঘটিত পীড়াদি কষ্ট।

বৃশ্চিকলগ্ন—

অর্থভাব শুভ, আয়বৃদ্ধি, মনস্তাপ, দুর্ঘটনার আশঙ্কা, পিতার জীবন সংশয় পীড়া, কর্ম্মে বিপত্তি, মাতার সহিত মনোমালিন্য।

ধনু লগ্ন—

অর্থ-ব্যয়, আয় বৃদ্ধি, ব্যবসায়ে উন্নতি, পারিবারিক অশান্তি, দুশ্চিন্তা, ভ্রমণ, শারীরিক অসুস্থতা ও দুর্ব্বলতা, মধ্যভাগে যশ ও প্রতিষ্ঠা, কর্ম্মে সাফল্য। ঋণ সম্ভাবনা।

মকরলগ্ন—

স্ত্রীর সহিত মনোমালিন্য ; অবৈধ প্রণয়াভিলাষ, স্ত্রীর দুর্ঘটনা বা পীড়া, শত্রুহানি, সাফল্য, কর্ম্মোন্নতি, পারিবারিক অস্বচ্ছন্দতা ও বৈষয়িক গোলযোগ। শারীরিক অসুস্থতা ও ব্যয়।

কুম্ভলগ্ন—

অর্থক্ষতি, আশাভঙ্গ, মনস্তাপ, শত্রুবৃদ্ধি, সন্তানের উন্নতি, ক্ষতি, গৃহস্থালী বিষয়ে নানাপ্রকার অসুবিধা ভোগ, মধ্যে আয়বৃদ্ধি।

মীন লগ্ন—

ভয় ও পীড়া, ক্ষতি, অসম্মান, কিঞ্চিৎ সৌভাগ্যলাভ, সন্তানাদির বিশেষ পীড়া, স্ত্রীলোকের জন্যে নানাপ্রকার দুর্ভোগ।

প্যাট ও পীঠ

শ্রী'শ'—

॥ পটভূমিকার পরিবর্ত্তন ॥

অধুনা কয়েকজন প্রগতিশীল ভারতীয় চিত্র-নির্ম্মাতা ভারতের বাহিরে অন্যান্য দেশের পটভূমিকায় চিত্র-গ্রহণের আগ্রহ প্রকাশ করছেন এবং কয়েকটি ক্ষেত্রে কাজও আরম্ভ করেছেন। এখন অবশ্য এঁদের সংখ্যা অত্যন্ত সীমাবদ্ধ হলেও বিদেশের পটভূমিকায় গৃহীত এই সব চিত্রগুলি যদি ভবিষ্যতে বিশেষ সাফল্য লাভ করতে পারে তাহলে অন্যান্য চিত্র-নির্ম্মাতারাও উৎসাহিত হয়ে এই পথে পা বাড়াবেন এবং এর ফলে ভারতীয় চিত্রের পরিধিও বিস্তার লাভ করে দেশীয় চিত্রের, বিশেষ করে হিন্দী চিত্রের, একঘেঁয়েমী ও ছ্যাবলামীর হাত থেকে দর্শকদের মুক্তি দেবে।

শুধু নিজ দেশেই চিত্রগ্রহণ না করে বাহির বিশ্বের বিভিন্ন পটভূমিকায় চিত্র-গ্রহণ করায় যে চলচ্চিত্রের প্রসারতাই শুধু ঘটে তাই নয়—নিজদেশের সীমাবদ্ধ গণ্ডীর বাইরে ছড়িয়ে পড়বার সুযোগ পেয়ে চলচ্চিত্রের মধ্যে খানিকটা বিশ্বজনীন ভাবধারারও প্রকাশ সম্ভব হয়ে চলচ্চিত্রকে—সে যে কোনও দেশেরই হোক—বিশ্বমানবের মনের গ্রহণযোগ্য করে তোলে। তাছাড়া নানা দেশের দৃশ্যাবলী পর্দ্দায় প্রতিফলিত হয়ে দর্শকদের চক্ষুকেই শুধু তৃপ্ত করে না, তাঁদের মনের খোরাকও যোগায়। বিভিন্ন দেশের আচার, ব্যবহার, সভ্যতা, সংস্কৃতি প্রভৃতিও গল্পের মধ্য দিয়ে প্রস্ফুটিত হয়ে জ্ঞান পিপাসু দর্শকদের মনকে পরিতৃপ্ত করে প্রভূত আনন্দ দানও করে।

আশা করি ভারতের শ্রেষ্ঠ চিত্র-নির্ম্মাণকারী এই বাংলার চিত্র নির্ম্মাতারাও এ বিষয়ে অবহিত হবেন এবং বাহির বিশ্বের বিভিন্ন দেশের পটভূমিকায় বাংলা চিত্র-নির্ম্মাণের কাজে অগ্রসর হয়ে, বাঙ্গালী মনের প্রগতিশীলতার পরিচয় প্রদান করতে পশ্চাৎপদ হবেন না।

***

খবরাখবর ঃ

গত ২২শে জুন সন্ধ্যায় বাংলার প্রখ্যাত অভিনেতা তুলসী লাহিড়ী ৭২ বৎসর বয়সে পরলোক গমন করেছেন। তরুণ বয়সেই তুলসীবাবু অভিনয়ের প্রতি আকৃষ্ট হন এবং আইন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে রংপুরে ওকালতী আরম্ভ করলেও, অভিনয় কলার আকর্ষণ এড়াতে না পারায় তিনি রঙ্গমঞ্চে যোগদান করেন। পেশাদারী রঙ্গমঞ্চে তিনি সর্ব্বপ্রথম অভিনয় করেন ষ্টার থিয়েটারে অভিনীত "চিরকুমার সভা"-য়। এর পর তিনি নানা নাটকে এবং বহু চিত্রে অবতীর্ণ হয়ে তাঁর অভিনয় প্রতিভায় দর্শক সমাজকে

'আর্ট এণ্ড কালচার পিক্‌চার্স'-এর "অগ্নিসম্ভবা" চিত্রের দু'টি বিশিষ্ট ভূমিকায় ছবি বিশ্বাস ও মঞ্জুলা বন্দ্যোপাধ্যায়।

মুগ্ধ করেন। নাট্যকার ও চলচ্চিত্রের গল্প লেখকরূপে এবং সঙ্গীত পরিচালকরূপেও তিনি সুনাম অর্জ্জন করেন। তাঁর লেখা "যমুনা পুলিনে", "মণিকাঞ্চন", "সাবিত্রী", "মায়াজাল" ও "রিক্তা" চিত্রে রূপায়িত হয়েছে, আর তাঁর লেখা নাটক "দুঃখীর ইমান," "এই যুগ", "বাংলার মাটি", "লক্ষ্মীপ্রিয়ার সংসার", "ভিত্তি", পথিক", "ছেঁড়া তার" প্রভৃতি রঙ্গমঞ্চে বোধহয় আজকের দিনে সম্ভব নয়। আমরা তাঁর পরলোক-গত আত্মার শান্তি কামনা করি।

***

প্রযোজক-পরিচালক বিমল রায়ের নতুন চিত্র "সুজাতা" শীঘ্রই মুক্তিলাভ করবে। নূতন ও সুনীল দত্ত এতে

চিত্রলোক পরিবেশিত "আম্রপালী" চিত্রে সুপ্রিয়া চৌধুরীকে একটি মধুর ভঙ্গিমায় দেখা যাচ্ছে।

সাফল্যের সঙ্গে অভিনীত হয়েছে। তপন সিংহ পরিচালিত "ক্ষণিকের অতিথি" চিত্রটিতেই তিনি শেষ অভিনয় করেন।

তুলসীবাবু তাঁর লেখা ও অভিনয়ের মাধ্যমে তাঁর বহুমুখী প্রতিভার যে স্বাক্ষর রেখে গেলেন তা কোন দিনই মুছে যাবে না বাংলার রঙ্গজগৎ থেকে এবং তাঁর স্থান পূরণও

অভিনয় করেছেন, আর সঙ্গীতাংশে আছেন শচীনদেব বর্ম্মণ।

***

সচ্চিদানন্দ সেনমজুমদার রচিত ও পরিচালিত 'যাত্রী'র চিত্রগ্রহণ সমাপ্ত হয়েছে। আবহ সংগীতে রয়েছেন অনাদ-

সুরশিল্পী সুধীন দাশগুপ্ত। 'যাত্রী' অবিলম্বে প্রদর্শিত হবার অপেক্ষায় রয়েছে।

***

শম্ভু মিত্র ও অমিত মৈত্রের গল্প অবলম্বনে ডি, লুক্স পিক্চার্সের "শুভ বিবাহ" চিত্রটি নির্মিত হয়েছে। শম্ভু মিত্র তৃপ্তি মিত্র ছাড়াও সুপ্রিয়া চৌধুরী, ছবি বিশ্বাস, পাহাড়ী স্যান্যাল প্রভৃতি চিত্রটিতে অভিনয় করেছেন।

***

প্রবোধকুমার সান্যালের গল্প "পুষ্প ধনু"কে চিত্রে রূপায়িত করেছেন পরিচালক সুনীল মজুমদার। অরুন্ধতী মুখোপাধ্যায়, অমর মল্লিক, ভানু বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতি অভিনয় করেছেন চিত্রটিতে।

***

"The Singing Mountain"-এ হলিউড, ব্রিটিশ ও ভারতীয় তারকাদের একত্র সমাবেশ ঘটবে বলে জানা গেছে। বিশেষ করে প্রখ্যাতা হলিউড তারকা Pier Angeli-র এই চিত্রে অভিনয়ের জন্য ভারতে আগমনের সম্ভাবনা আছে। এই চিত্রের একটি বৈশিষ্ট্য হচ্ছে ভারতীয় সঙ্গীত ভারতীয় ও বিদেশী তারকাদের দ্বারা গীত হবে। চিত্রটির বহির্দৃশ্য দার্জিলিং, কালিম্পং ও খাণ্ডালায় গৃহীত হবে এবং অন্তর্দৃশ্যগুলি বোম্বাই-এর মেহ্‌বুব ষ্টুডিওতে তোলা হবে। বৈজয়ন্তীমালা, অশোককুমার ও আই, এস, জোহার প্রভৃতির এই চিত্রে অভিনয় করবার সম্ভাবনা আছে।

* * * *

ভারতীয় নৃত্য ও চিত্র জগতের উজ্জ্বলতম তারকা কুমারী

রঙমহলের চলতি নাটক "এক মুঠো আকাশ"এর একটি দৃশ্যে হরিধন, তরুণ কুমার, জহর রায় প্রভৃতিকে দেখা যাচ্ছে।

বৈজয়ন্তীমালা Theatre Des Nations কর্তৃক আয়োজিত আন্তর্জাতিক নৃত্য উৎসবে ভারতের প্রতিনিধিরূপে যোগদান করেছেন। তাঁর সঙ্গে ১৮ জন অর্কেষ্ট্রা শিল্পী নিয়ে গঠিত একটি দলও ভ্রমণ করছেন। এই দলের ভ্রমণের আয়োজন ভারত সরকার করেছেন। বৈজয়ন্তীমালা ও তাঁর দল প্যারিসের Sarah Bernhardt রঙ্গালয়ে ও টেলিভিসনে অবতীর্ণ হবেন এবং স্পেনের মাদ্রিদ শহরে ও জার্মানীর হামবুর্গে ও মস্কোতেও নৃত্য প্রদর্শন করবেন।

* * * *

দেশে-বিদেশে :

বেঙ্গল মোশান্ পিক্চার্স এসোসিয়েসন্ লণ্ডনে একটি বাংলা চলচ্চিত্র উৎসবের আয়োজন করছেন বলে জানা গেছে। উৎসবটি আগামী সেপ্টেম্বর মাসে ভারতীয় হাই-কমিশন্-এর উদ্যোগে অনুষ্ঠিত হবে।

* * * *

ভারত-লণ্ডন ফিল্ম প্রযোজক বিশু সেনের আগামী চিত্র

ভারত-মালয় যুগ্ম প্রচেষ্টায় "সিঙ্গাপুর" নামে একটি চিত্র নির্ম্মিত হচ্ছে। চিত্রটির বহির্দৃশ্যগুলি সব মালয়ে বিশেষ করে সিঙ্গাপুরেই গৃহীত হবে, আর অন্তঃদৃশ্যগুলি সব বোম্বাই-এর ষ্টুডিওতে নেওয়া হবে। চিত্রটির প্রধান ভূমিকাগুলিতে অভিনয় করছেন শাম্মি কাপুর, পদ্মিনী ও মালয়ের ভূতপূর্ব্ব 'বিউটি কুইন্' মারিয়া মেনাডো।

* * * *

সত্যজিৎ রায়ের "অপুর সংসার" চিত্রটির কয়েকটি অংশ কিছুদিন আগে লণ্ডনের বি, বি, সি-র টেলিভিসনে দেখান হয়েছে। আজকালকার ভারতের চলচ্চিত্র—এই পর্য্যায়ের একটি আলোচনায় এই দৃশ্যগুলি দেখান হয়। এই পর্য্যায়ে 'মাদার ইণ্ডিয়া', 'পথের পাঁচালী', 'অপরাজিতা', 'পিয়াসা' ও 'দো বিঘা জমিন্'—এই চিত্রগুলির অংশও দেখান হয়।

* * * *

বি, পি, ফিল্মস্-এর "মাহুত বন্ধুরে" বাংলা চিত্রটিকে ভিয়েনায় ইয়ুথ্ ফেস্টিভ্যালে পাঠাবার জন্য নির্ব্বাচিত করা হয়েছে। চিত্রটির প্রযোজক-পরিচালক ডাঃ ভূপেন হাজারিকাও একজন প্রতিনিধিরূপে ঐ উৎসবে যোগদান করবেন।

* * * *

মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের Illionis কলেজের একটি ভারতীয় ছাত্র ও ঐ কলেজের নাট্য পরিচালকের উদ্যমে নিউইয়র্কে কালিদাসের "শকুন্তলা" নাটকটি মার্কিণ ছাত্রছাত্রীদের দ্বারা সেপ্টেম্বর মাসের শেষে অভিনীত হবে।

* * * *

বিদেশী খবর ঃ

ব্রিটিশ চিত্র তারকা Dirk Bogarde ব্রিটেনের বিখ্যাত চলচ্চিত্র পত্রিকা "Picturegoer" কর্ত্তৃক পরিচালিত চিত্রতারকাদের জনপ্রিয়তা নির্ব্বাচনে সর্ব্বাধিক সংখ্যক ভোট পেয়ে প্রথম স্থান অধিকার করেছেন। "The Wind Cannot Read" ও "A Tale of Two Cities" এই দুইটি চিত্রে অপূর্ব্ব অভিনয়ের জন্যেই তিনি অধিক সংখ্যক ভোট লাভ করেন। অভিনেত্রীদের মধ্যে জাপানী অভিনেত্রী Yoko Tani যিনি 'The Wind Cannot Read'-এ নায়িকার ভূমিকা অভিনয় করেন, চতুর্থ স্থান অধিকার করেছেন এবং প্রথম স্থান পেয়েছেন Virginia Mc Kenna "Carve Her Name With Pride" চিত্রে অভিনয় করে।

* * * *

Metro-Goldwyn-Mayer-এর বহু বিজ্ঞাপিত বিরাট ব্যয়বহুল চিত্র "Ben Hur" আগামী নভেম্বর মাসে নিউইয়র্কে মুক্তি পাবে। ১৫,০০০,০০০ ডলার ব্যয়ে নির্ম্মিত এই বিশাল চিত্রটি তিন বৎসর ধরে চলবে বলে অভিজ্ঞ মহল মনে করেন। M-G-M এই চিত্রটি দ্বিতীয় বার নির্ম্মাণ করলেন। এর আগে ১৯২২ সালে ৪,০০০,০০০ ডলার ব্যয়ে নির্ব্বাক যুগে এই চিত্রটি নির্ম্মিত হয়েছিল এবং প্রভূত সাফল্য লাভও করেছিল। পাঁচ বছর আগে M-G-M এটি দ্বিতীয় বার নির্ম্মাণ করবার অভিপ্রায় করেন।

* * * *

আগষ্ট মাসে মস্কোতে যে আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসব হবে তাতে বিশ্বের কয়েকটি শ্রেষ্ঠ চলচ্চিত্র সংস্থা যোগদান করবার আগ্রহ জানিয়েছেন। এদের মধ্যে—ব্রিটিশ, মার্কিণ, জার্ম্মান, জাপান, ভেনিস, ফিনিস, চেকোস্লোভাকিয়া, হাঙ্গেরী, প্রভৃতি আছেন। প্রখ্যাত মার্কিণ, ব্রিটিশ ও ইতালীয় চিত্র তারকারাও যোগদানের ইচ্ছা জানিয়েছেন।

* * * *

১৯৩০ সালে সর্ব্বপ্রথম প্রদর্শিত ও Pulitzer Prize প্রাপ্ত Mare Connelly-র নাটক "Green Pastures" এইবারকার Venice Theatre Festival-এ দেখান হবে। একটি মার্কিণ নিগ্রো কোম্পানী নাটকটি অনুষ্ঠিত করবেন।

পরিচালক ও লেখক

রবীন সরকার

ছবি পরিচালক ও গল্প লেখকের মধ্যে কিরকম সম্বন্ধ সেটা বোধহয় অনেকেই ঠিক জানেন না। বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই এই দু'জনের সম্বন্ধটা খুব সুমধুর হয়না। আর তাঁদের মধ্যে মনকষাকষিও চলে থাকে।

এখন যদি কোন পরিচালককে জিজ্ঞাসা করা হয় তিনি গল্প লেখকের সঙ্গে আলোচনা করে ছবি পরিচালনা করতে রাজি আছেন কি না? তখন দেখতে পাবেন যে অনেক পরিচালকই রাজি হবেন না। কেননা তাঁদের ধারণা—লেখক পরিচালনার কি জানে?

লেখক তাঁর গল্প বিক্রি করেই ক্ষান্ত। অতশত আর ভাবেন না যে তাঁর গল্প কিভাবে পরিচালক পরিচালনা করে দেখাবেন পর্দ্দায়। যখন ছবি তোলা হয়ে প্রেক্ষাগৃহে দেখানো হল তখন লেখক তাঁর নাম ছাড়া গল্পের আর কিছুই হয়তো দেখতে পেলেন না। ভাবলেন তাইতো গল্পের এ দুর্দ্দশা হল কেন? কিন্তু বলবার কিছুই নেই। কেন না প্রযোজক গল্প টাকা দিয়ে কিনে নিয়েছেন। লেখক আর কি বলতে পারেন?

কিন্তু হলিউডে—যদিও আমাদের দেশের অবস্থা মাঝে মাঝে হয়—তবে যাঁরা ভাল পরিচালক তাঁরা লেখকের সঙ্গে বসে আলাপ আলোচনা করে গল্পের দানা পাকাতে থাকেন। তাঁরা জানেন যে ভাল গল্প ছাড়া ভাল ছবি হতে পারে না। গল্প থেকে যে স্ক্রিপ্ট্ বা ছায়াছবির নাটক পুস্তক তৈরী হয় —পরিচালক তাই পর্দ্দায় দেখিয়ে থাকেন। খুব কম লেখকই জানেন যে কি ভাবে পর্দ্দার জন্য স্ক্রিপ্ট্ তৈরী করতে হয় যা ফটোর মধ্যে দিয়ে প্রকাশ যোগ্য হবে। সেইজন্য তাঁরা ভাবতে পারেন না কি ভাবে এ্যাক্শান্ বা কাজ দেখাতে হবে ক্যামেরার সামনে বা গল্পের ভাব ফুটিয়ে তুলতে হবে ছবির মধ্যে। তাই গল্পের ভিতর যদি কিছু সমস্যা এসে হাজির হয়—তখন পরিচালককে সমাধান করতে হয় ছবি তোলার আগে। পরিচালক জানে যে কিভাবে লিখলে ছবিতে ভাব ঠিক প্রকাশ পাবে— যা লেখক কখনও কল্পনা করতেও পারবেন না। তবুও পরিচালক লেখকের সঙ্গে থেকে বুঝে নিতে চেষ্টা করেন যে গল্পের ভিতর কি ভাবে প্রাণ সৃজন সম্ভবপর হবে।

অনেক সময় পরিচালক গল্প জোগাড় করে আনেন টাকা দিয়ে। তারপর তিনি লেখককে দিয়ে প্রথম থেকে শেষ পর্য্যন্ত লেখাতে থাকেন যাতে গল্প সুন্দরভাবে পর্দ্দার গায়ে দেখানো সম্ভব হতে পারে। পরিচালক সব সময় লেখকের সহযোগিতা নিয়ে কাজে এগোতে থাকেন। তাঁর ধারণা যে লেখক সঙ্গে থাকলে বুঝতে পারা সম্ভব হবে যে অভিনয়ের ভাবার্থ প্রকাশমান হচ্ছে কিনা।

যদি ছবি তুলতে হয় ভাল করে তবে লেখকের সহযোগিতা নিতে হবে পরিচালককে। এটা জানা চাই যে ভাল স্ক্রিপ্ট ছাড়া ভাল ছবি উঠতেই পারে না। তাই পরিচালক চান ভাল স্ক্রিপ্ট্ ছবি তোলবার জন্য; কিন্তু অনেক ক্ষেত্রে লেখক চান পরিচালক যেন তাঁর গল্প হুবহু পর্দ্দার গায়ে রূপায়িত করে দেখান। পরিচালক ছবি পরিচালনা করেন নূতন নূতন ফটোগ্রাফীর দৃষ্টিকোণ নিয়ে যাতে ছবির ভাব, ভাষা ঠিকমত ফুটে উঠে, আবেগময় ও মনোমুগ্ধকর হয়। মান বা মাপ ঠিক রাখেন যাতে ছন্দ ঠিক থাকে। সব সময় মন প্রাণ দিয়ে ভাবতে থাকেন যে লেখকের মনের কথা, মনের ভাব ঠিক মত ব্যক্ত হচ্ছে কিনা।

প্রয়োজন মনে করলে লেখকের কথা কেটে দিতে পারেন—চরিত্র বদলে দেবার ক্ষমতা রাখেন—প্লট্ বা ঘটনা পরিবর্ত্তন করতে পারেন— হাসির খোরাক দেবার জন্য মাঝে কোন নূতন চরিত্র আমদানীও করতে পারেন—নাটকীয় করে তোলবার জন্য নূতন কিছু পরিবর্ত্তন ও পরিবর্দ্ধন করতে পারেন অর্থাৎ যা ইচ্ছা তাই করতে পারেন—কেবল গল্পের ভাব-ধারাটুকু ফুটিয়ে দর্শকদের আনন্দ দেবার জন্য। এর জন্য প্রয়োজন হয় পারদর্শিতা বা নিপুণতা আর অন্তর্দৃষ্টি। এই দুইয়ের সংযোজনায় পরিচালক ও লেখক ছায়াছবির কাজে সুনাম অর্জ্জন করতে সক্ষম হন।

বাড়ী তৈরী করতে হলে মিস্ত্রিরা একা কিছুই করতে পারবে না যতক্ষণ না ইঞ্জিনীয়ারের কাছ থেকে কোন নক্সা পায়—ঠিক সেই রকম লেখকের গল্প না হলে পরিচালক কিছুই নয়।

তবে এর মধ্যে একটু পার্থক্য আছে বৈকি।

দেখা গেছে যে লেখক ও পরিচালকদের মধ্যে মন কষাকষি আছে বেশ। লেখক বলেন যে লেখকের গল্প অনুযায়ী ছবি তৈরী করতে হবে; কিন্তু পরিচালক বলেন যে লেখককে সেই ভাবে গল্প লিখতে হবে যে ভাবে পরিচালক নির্দ্দেশ দেবেন। কেননা—পরিচালকরা লেখকদের বিদ্যার দৌড় জানেন। আবার লেখকরা পরিচালকদের মস্তিষ্কের উর্বরতা যে কতখানি তা জানেন। পরিচালকরা জানেন যে লেখকরা যখন লিখতে বসেন তখন এত ধ্যানস্থ হয়ে পড়েন যে বিনিয়ে বিনিয়ে পাতার পর পাতা ধরে প্রেমের বান ডাকাতে থাকেন যা ছায়াছবিতে মোটেই প্রয়োজন হয় না; আর লেখকদের ধারণা যে পরিচালকরা লেখার কিছুই জানেন না, অথচ দেখাতে চান যে তিনি একজন দস্তুর মতন লেখক।

যদিও দুজনের ধারণা দুজনের কাছে ঠিকই আছে বলতে হবে—তবে এই ধরণের লোকদের দিয়ে ছবির কাজ কখনও ভাল হয় না। যেখানে কোন সদ্ভাব নেই সেখানে গল্প ভাল ভাবে দেখানো সম্ভব নয়। মনে রাখতে হবে উভয়ের সদ্ভাবের উপরই ছবির কাজ নির্ভর করে। তাই পরিচালক ও লেখকের মধ্যে সদ্ভাব থাকা একান্ত দরকার।
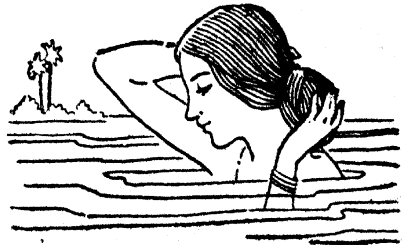
শিল্পীর কথা

'পথ ছাড় ওগো শ্যাম'

কুমারেশ ভট্টাচার্য

প্রায় বিশবছর পূর্বের কথা। কর্মকোলাহলমুখর কলকাতা মহানগরীর নিভৃত অঞ্চল প্রান্তের মত, আম-কাঁটাল-নারিকেল গাছে ঘেরা সহরতলী ঢাকুরিয়া—পল্লী ও শহরের এক অপূর্ব মিলনক্ষেত্র—আলো-আঁধারের যেন এক বিচিত্র সমাবেশ। এখানকার বনেদী বংশ মুখোপাধ্যায় পরিবারের তিন-চার বছরের ছোট্ট একটি মেয়ে প্রায়ই বাড়ীর সংলগ্ন ফুলবাগানে খেলা করত আর মায়ের কাছে শোনা 'কই কৃষ্ণ, কোথা কৃষ্ণ' গানটি গাইত আপন মনে—অন্তরের সবটুকু দরদ মিশিয়ে। কী সুমিষ্ট তার কণ্ঠস্বর, কী অপূর্ব তার সুরলালিত্য। তার গান শুনে শুধু বাড়ীর সবাই নয়, পাড়া-প্রতিবেশীরাও হতেন মুগ্ধ। প্রায় রোজই আসত তাঁদের কাছ থেকে সেই ক্ষুদ্র বালিকার সাদর আহ্বান—গান শোনাবার। আজকালকার মত তখন ঘরে ঘরে রেডিয়োর এত প্রচলন হয়নি। পাড়ার কোন বাড়ী থেকে ভেসে আসা গ্রামোফোনের কোন গানের সুর যদি একবার এই ছোট্ট মেয়েটির কানে যেত, তাহলে তৎক্ষণাৎ সে ছুটত গান শুনতে। শৈশব থেকে সংগীতের প্রতি এই যে তার সহজাত অধিকার ও অনুরাগ, কোন গান তন্ময় হয়ে শুনবার ও গাইবার এই যে প্রবল আকর্ষণ ও আগ্রহ, এর পেছনে রয়েছে তার পূর্বজন্মার্জিত কঠোর সাধনা ও সুকৃতি। কিন্তু সেদিন কি তার আত্মীয়-স্বজন ও প্রতিবেশীদের মধ্যে কেউ কল্পনা করতে পেরেছিলেন যে তাঁদের এই ছোট্ট মেয়েটিই একদিন সমগ্র ভারতের মধ্যে হয়ে উঠবে একজন শ্রেষ্ঠা সংগীত-শিল্পী? তাঁরা কি সেদিন স্বপ্নেও ভেবেছিলেন যে ভবিষ্যতে একদিন ভারতের এক-প্রান্ত থেকে অন্যপ্রান্ত পর্যন্ত এই বালিকাটির অপূর্ব সুর-ঝংকার লক্ষ লক্ষ শ্রোতার 'কানের ভিতর দিয়া মরমে পশিয়া' তাদের মনপ্রাণ আকুল করে তুলবে? কিন্তু জন্মান্তরের সাধনা, মাতৃদেবীর আশীর্বাদ ও তাঁর কাছ থেকে যেন উত্তরাধিকারসূত্রে প্রাপ্ত অপূর্ব সুললিত কণ্ঠস্বর এবং সংগীতের প্রতি অনুরাগ ও ঐকান্তিক চেষ্টার আ[illegible] তা সম্পূর্ণ সম্ভব হয়েছে। সেদিনকার সেই ছো[illegible] বালিকাটি আর কেউই নয়, ইনি হচ্ছেন ভারতের সর্বজন-প্রিয় সংগীতশিল্পী, বাংলা ও বাঙালীর গৌরব, সুরে[illegible] নিষ্ঠাবতী পূজারিনী গীতশ্রী কুমারী সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায়।

তিন ভাই ও তিন বোনের মধ্যে ইনি হচ্ছেন সর্ব[illegible] কনিষ্ঠা। পাঁচ-ছ' বছর বয়সে যথারীতি স্কুলে ভর্তি হ[illegible] নিয়মিত পড়াশুনা করতে থাকেন তিনি এবং ভাল ছা[illegible] হিসেবে পরিচয় দেন কৃতিত্বের। কিন্তু পাঠ্যপুস্তকের চে[illegible] সংগীতের আকর্ষণই তাঁর কাছে প্রবল হয়ে ওঠে দি[illegible] দিন। সুরের ধ্যানে নিমগ্ন হয়ে যেতেন তিনি। তা[illegible] লেখাপড়ার সংগে সংগে তিনি সংগীতচর্চা আরম্ভ করেন [illegible] অঞ্চলের অধিবাসী কয়েকজন সংগীতজ্ঞের কাছে।

১৯৪৩ সালে ফেব্রুয়ারী মাসে কলকাতা বেতার কে[illegible] থেকে সন্ধ্যা বারো বৎসর বয়সে—'যদি বা সুরাল গা[illegible] তাঁর সর্বপ্রথম এই আধুনিক গানটি সুললিতকণ্ঠে পরিবেশ[illegible] করেন। ঐ বৎসরেই ইউনিভার্সিটি হলে অনুষ্ঠিত নিখি[illegible] বংগ সংগীত প্রতিযোগিতায় তিনি যোগদান করেন নিতা[illegible] আকস্মিকভাবে। সাফল্যের সন্দেহে কিশোরী শিল্পীর ম[illegible] তখন দোদুল্যমান। কারণ, নামকরা বহুশিল্পী যোগদা[illegible] করেছিলেন উক্ত প্রতিযোগিতায়। তাঁদের তুলনায় সন্ধ[illegible] শুধু বয়সেই ছোট ছিলেন না, সংগীত শিক্ষাকালও তাঁ[illegible] ছিল সামান্য। কিন্তু প্রতিভা যা কিছু স্পর্শ করে তা[illegible] বুঝি সোনা হয়ে যায়। উক্ত প্রতিযোগিতায় একটিমা[illegible] ভজন গান গেয়ে তিনি প্রথমস্থান অধিকার করেন ভজনে।

এর কয়েকমাস পরেই প্রবীণ সংগীত-সাধক ও অভি[illegible] সংগীত-শিক্ষক শ্রীযামিনীনাথ গাঙ্গুলী মশাইয়ের কা[illegible] বিপুল উৎসাহে শুরু হয় সন্ধ্যার উচ্চাংগ সংগীত শিক্ষা—খেয়াল ও ঠুংরী। বহু ছাত্র-ছাত্রীর মধ্যে যামিনীব[illegible] সেদিন লক্ষ্য করলেন তাঁর নবাগতা কিশোরী ছাত্রী[illegible] অসাধারণ সংগীত প্রতিভা, তাঁর উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ। বিপু[illegible] উৎসাহে ও বিশেষ যত্নে তিনি সংগীত শিক্ষা দিতে আর[illegible] করলেন এই কিশোরী ছাত্রীকে।

১৯৪৪ সালে শিল্পী গিরীন চক্রবর্তীর সুরসংযোজন[illegible] 'তোমার আকাশে ঝিলমিল করে চাঁদের আলো, আম[illegible]

আকাশে রিমঝিম করে আঁধার কালো' এই আধুনিক গানটি সর্বপ্রথম রেকর্ড করেন সন্ধ্যা—কলম্বিয়ায়।

১৯৪৬ সালে এপ্রিল মাসে বিখ্যাত সংগীতজ্ঞ শ্রীরাইচাঁদ বড়ালের বিশেষ উদ্যোগে ও উৎসাহে ন্যাশনাল মিউজিক এসোসিয়েশন কর্তৃক অনুষ্ঠিত হয় একটি বিরাট সংগীত প্রতিযোগিতা। বহু শিল্পী যোগদান করেন। কিন্তু সবাইকে মুগ্ধ ও বিস্মিত ক'রে খেয়াল, ঠুংরী, গজল, ভজন, বাউল, ভাটিয়ালি প্রভৃতি সংগীতের সমস্ত বিভাগেই সন্ধ্যা প্রথম স্থান অধিকার করে লাভ করেন সর্বশ্রেষ্ঠা বিজয়িনীর বিপুল গৌরব ও বহু পুরস্কার। সেদিন রাইচাঁদবাবু কতকটা অবাক হয়েই যেন বলেছিলেন, একটি মেয়ে এতগুলো পুরস্কার পাবে! ঐ বৎসরেই বিশেষ সম্মানের সংগে সংগীত সম্মিলনী থেকে সন্ধ্যা লাভ করেন 'গীতশ্রী' উপাধি।

এর কিছুদিন পর শিল্পীর জীবনে এল একটি বিরাট সুযোগ। রাইচাঁদবাবুর বিশেষ ইচ্ছা ও আগ্রহে নিউ থিয়েটার্সের 'অঞ্জনগড়' (হিন্দী ও বাংলা) কথাচিত্রে তিনি প্লেব্যাক করেন কয়েকটি গানের। তারপর ১৯৪৭ সালে 'সমাপিকা' বাণীচিত্রে 'কে জাগে সূর্য ওঠার স্বপ্ন নিয়ে', 'মানুষের মনে ভোর হল আজ' প্রভৃতি গানের প্লে ব্যাক করে তাঁর নাম ও যশ ছড়িয়ে পড়ে চতুর্দিকে। সে সময় থেকে আজ পর্যন্ত 'অগ্নিপরীক্ষা', 'সবার উপরে', 'সাগরিকা', 'সূর্যতোরণ' প্রভৃতি অসংখ্য বাণীচিত্রে অগণিত গানের প্লেব্যাক করে সন্ধ্যা জনসাধারণের অন্তরে একটি বিশেষ শ্রদ্ধা ও সম্মানের আসন লাভ করেছেন। বম্বে ও মাদ্রাজের অনেকগুলো হিন্দী ছবিতেও তাঁর গান লাভ করেছে যথেষ্ট সমাদর। সংগীত জগতে সন্ধ্যা আজ জনপ্রিয়তার উচ্চশিখরে অধিষ্ঠিতা।

প্রখ্যাত সংগীতজ্ঞ এ, কানন ও চিন্ময় লাহিড়ীর কাছেও কিছুদিন সংগীত শিক্ষা করেন তিনি। সংগীত-সাধক শ্রীসুরেশ চক্রবর্তী মশাইও বেশ কিছুদিন সন্ধ্যাকে তালিম দেন উচ্চাংগ সংগীতে বিশেষ যত্ন ও স্নেহের সংগে। তারপর ১৯৫১ সাল থেকে আজ পর্যন্ত ভারত বিখ্যাত শ্রেষ্ঠ ওস্তাদ বড়ে গোলাম আলি খাঁ সাহেবের কাছে শিল্পী শিক্ষা করছেন খেয়াল ও ঠুংরীর অতি সূক্ষ্ম কলাকৌশল। খাঁ সাহেবও তাঁর এই ছাত্রীটির অসামান্য প্রতিভায় মুগ্ধ হয়ে বিশেষ আগ্রহ ও যত্নের সংগে শিক্ষা দিয়ে আসছেন। অগাধ সমুদ্রের মত এই সংগীত শাস্ত্র। এর যেন শেষ নেই—নেই সীমা পরিসীমা।

শুধু কলকাতায় অনুষ্ঠিত বিভিন্ন সংগীত সম্মেলনে নয়, বাঙলার বাইরে ভারতের বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন সময়ে অনুষ্ঠিত বহু সংগীত সম্মেলনে যোগদান করে সন্ধ্যা লাভ করেছেন বিপুল সম্মান ও গৌরব, বৃদ্ধি করেছেন বাঙলা ও বাঙালীর মর্যাদা, প্রমাণ করেছেন সংগীত জগতে বাঙালী মেয়ের অগ্রগতি।

১৯৫৫ সালে নাগপুরে বিশেষ এক সংগীত অনুষ্ঠানে যোগদান করেন সন্ধ্যা, লাভ করেন উচ্ছ্বসিত প্রশংসা ও পুরস্কার।

কুমারী সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায়

১৯৫৭ সালে বম্বে রাজ্য সরকারের উদ্যোগে 'রংভবনে' অনুষ্ঠিত সংগীত সম্মেলনে অংশগ্রহণ করেন তিনি। ১৯৫৬, ৫৭,৫৯ সালে পাঞ্জাবের অমৃতসরে হোলি উৎসবে অনুষ্ঠিত সংগীত সম্মেলনে যোগদান করেন সন্ধ্যা। বর্তমান বর্ষের অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন ভারতের কেবল মাত্র শ্রেষ্ঠ ওস্তাদ ওঁকার নাথ ঠাকুর, ভীমসেন যোশী, রোশনারা বেগম প্রভৃতি গুণিজন। বাঙলা থেকে আমন্ত্রিত হয়েছিলেন একমাত্র সন্ধ্যা। উপস্থিত প্রায় পঞ্চাশ হাজার শ্রোতা মন্ত্রমুগ্ধ হয়ে শুনেছিলেন তাঁর সুললিত কণ্ঠের অপূর্ব উচ্চাংগ সংগীত।

ভারতের বিভিন্ন স্থানে অনুষ্ঠিত সংগীত সম্মেলনের মধ্যে এলাহাবাদ সংগীত সম্মেলনের আছে বিশেষ বৈশিষ্ট্য। ১৯৫৭ ও ৫৮ সালে সন্ধ্যা এখানকার সম্মেলনে যোগদান করে পরিচয় দেন তাঁর অসামান্য সংগীত-প্রতিভার, লাভ করেন সর্বজনের অভিনন্দন ও সম্মান।

১৯৫৮ সালে এপ্রিল মাসে বম্বে ফিল্মফেয়ারের উদ্যোগে 'রিগ্যাল' সিনেমা হলে অনুষ্ঠিত হয় বিরাট সংগীত সম্মেলন। উক্ত অনুষ্ঠানে শ্রোতা হিসাবে উপস্থিত ছিলেন বম্বে চিত্র-জগতের প্রযোজক, পরিচালক, অভিনেতা, অভিনেত্রী ও উক্ত শহরের শ্রেষ্ঠ নাগরিকবৃন্দ। উক্ত অনুষ্ঠানে সন্ধ্যা পরিবেশন করেন অপূর্ব সংগীত তাঁর অনবদ্যকণ্ঠে। বম্বের প্রধান মন্ত্রী ও প্রত্যেক শ্রোতাটি তাঁকে জানিয়েছিলেন আন্তরিক অভিনন্দন ও শুভেচ্ছা।

১৯৫৮ সালেই ডিসেম্বর মাসে পুণায় অনুষ্ঠিত হয় বিরাট সংগীত সম্মেলন। উক্ত সম্মেলনে নিমন্ত্রিত হয়েছিলেন ভারতের শ্রেষ্ঠ ওস্তাদবৃন্দ। শিল্পীদের মধ্যে বড়ে গোলাম আলি, আমীর খাঁ, হীরাবাঈ, গাংগুবাঈ, বিলায়েৎ হোসেন প্রভৃতি উপস্থিত ছিলেন। বাঙলা থেকে শুধু যোগদান করেছিলেন সন্ধ্যা। তাঁর গানে অভিভূত হয়ে ভারতের একজন শ্রেষ্ঠা শিল্পী গাংগুবাই হাংগেলকার তাঁকে স্বহস্তে মাল্যভূষিত করেন।

ঐ বৎসরেই অল্ ইণ্ডিয়া রেডিয়ো কর্তৃপক্ষ কর্তৃক দিল্লীতে অনুষ্ঠিত সংগীত সম্মেলনে অংশ গ্রহণ করেন সন্ধ্যা। এখানেও উপস্থিত ছিলেন ভারতের প্রায় সমস্ত শ্রেষ্ঠ ওস্তাদ। তিনি এখানে পরিবেশন করেন খেয়াল ও ঠুংরী। তাঁর অভিনব গায়কী, রাগের বিস্তার, গানে নিজস্ব বৈশিষ্ট্য ও অপূর্ব তানে অভিভূত হন শ্রোতৃবৃন্দ।

বর্তমান বর্ষে গত ৩রা এপ্রিল বেনারস শহরে যে বিরাট ও বিশেষ সংগীত সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয় তাহাতেও সাদর আমন্ত্রণ লাভ করেন সন্ধ্যা। তিনি খেয়াল ও ঠুংরী গান করেন। তাঁর অপূর্ব রাগের বিস্তারে ও সুরের স্পর্শে প্রত্যেক শ্রোতা অভিভূত হয়ে শিল্পীকে জানান তাঁদের স্বতঃস্ফূর্ত অভিনন্দন।

এ ভিন্ন গোয়ালিয়র, অমরাবতী প্রভৃতি বিভিন্ন স্থানে অনুষ্ঠিত-সম্মেলনে বহুবার যোগদান করেছেন তিনি। শি[ল্পী] বলেন, কলকাতায় বিভিন্ন সময়ে অনুষ্ঠিত বহু সংগী[ত] সম্মেলনের মধ্যে ডোভার লেনে ১৯৫৭ সালে অনুষ্ঠি[ত] সম্মেলনে তিনি বিশেষ আনন্দ পেয়েছেন। আজ সম[গ্র] ভারতে সন্ধ্যা শুধু সুপরিচিতা নন, সর্বজনপ্রিয় শিল্পী বটে।

বম্বে, দিল্লী, লক্ষ্ণৌ, জম্মু, জলন্ধর, জয়পুর, হায়দ্রাব[াদ] প্রভৃতি ভারতের প্রায় সমস্ত বেতারকেন্দ্রের কর্তৃপক্ষ বিশেষ আগ্রহে উক্ত কেন্দ্রগুলো থেকে সন্ধ্যা পরিবেশ[ন] করেছেন তাঁর উচ্চাংগ সংগীত। খেয়াল গানে তাঁর অভিন[ব] গায়কী ও রাগের অপূর্ব বিস্তার উৎকর্ণ হয়ে শুনেছে হাজার হাজার শ্রোতা। তাঁর গানের অসংখ্য রেকর্ড শু[ধু] ভারতে নয় ইংল্যাণ্ড, আমেরিকা প্রভৃতি দেশেও সমাদৃ[ত] হয়েছে।

সন্ধ্যা এমন একজন সংগীত শিল্পী যিনি উচ্চাংগ [ও] আধুনিক এই উভয়বিধ সংগীতেই দেখিয়েছেন অসাধার[ণ] পারদর্শিতা। এই জন্যেই সর্ব শ্রেণীর শ্রোতার মনকে তি[নি] জয় করেছেন, সংগীত জগতে লাভ করেছেন বিরাট প্রতিষ্ঠা। এত অল্প বয়সে সংগীত জগতে এতখানি প্রতিষ্ঠার মূলে রয়েছে তাঁর জন্মান্তরের সাধনা ও ভগবানের আশীর্বাদ। এত বিরাট সম্মান ও বিপুল যশের অধিকারিণী হয়েও এ[ই] সর্বজনপ্রিয় শিল্পীর কিন্তু নেই এতটুকু অহমিকা। শিশু[র] মত সারল্য ও মাধুর্যে তিনি ভরপুর। তাঁর নম্রতায় অমায়িকতায় সত্যিই মুগ্ধ হতে হয়, শ্রদ্ধায় ভরে ওঠে সার[া] মন। এত প্রতিষ্ঠা লাভ করেও সংগীত সাধনা কিন্তু তাঁ[র] চলেছে অব্যাহত গতিতে। কেননা, এ সাধনার বুঝি শেষ নেই।

অল্পদিন পূর্বে কলম্বিয়া রেকর্ডে প্রকাশিত 'পথ ছাড়[ো] ওগো শ্যাম' ও 'তুমি তো জান না' শিল্পীর এই দুখানা উচ্চাংগ সংগীত বিশেষ জনপ্রিয় হয়েছে।

ভগবানের কাছে আমরা আন্তরিকভাবে প্রার্থনা করি, সন্ধ্যার শারীরিক সুস্থতা, সুদীর্ঘ ও শান্তিময় জীবন। কামনা করি, সংগীত-সাধনার পথে তিনি আরও অগ্রসর হয়ে দেশবাসীকে সংগীতের মধুর রসে আপ্লুত করুন।

বিধবা

শ্রীরেণুকা ভট্টাচার্য্য

আমি বাংলাদেশের বিধবা—ওকি ?

তোমাদের মুখ অমন হ'য়ে গেল কেন ? ভূত দেখলে নাকি ? অতো ভয় পাচ্ছ কেন ? তোমাদের কারোর মা, কারোর ঠাকুর মা, কারোর বোন বা কারোর মেয়েও তো বিধবা, তাদের জন্য তোমাদের সত্যিকারের দরদ কি একটুও নেই ? কেবল গলগ্রহ মনে না করে তাদের অন্তরের ভাষা কখন বুঝবার চেষ্টা করেছ কি ?

একটু যদি ধৈর্য্য ধরে আমার কথা শুনতে পার তবে দেখবে—আমার কাছেও তোমাদের জানবার ও শিখবার অনেক আছে। যাই হোক ! ভূমিকা রেখে এখন আমার কথা শুরু করি,—আমার নাম মায়া এবং আমার স্বামীর নাম ছিল প্রেমনাথ। আমি বাপমায়ের প্রথম সন্তান। আঁতুড় ঘরেই আমাকে দেখে ঠাকুর-মা বলেছিলেন,—হ'ক মেয়ে, ওকে দেখে আমার বড় মায়া হচ্ছে, বৌমা আমি ওর নাম রাখলুম 'মায়া'।

তারপর বড় হওয়ার সাথে সাথে কত রকম শুনেছি,—"বেশ মায়া-মাখা চোখ দুটি", "মেয়েটিকে দেখলেই মায়া হয়," "মেয়েটির বড় মায়ার শরীর", শাশুড়ী দেখতে এসে বলেছিলেন "বেশ নাম মায়া", স্বামী বলতেন মানুষকে মায়ার বাঁধনে বাঁধবার শক্তি তোমার আছে, এমনি ধারা কত কথা। কিন্তু যেদিন আমার স্বামী মারা গেলেন অর্থাৎ আমার নাম বিধবাদের তালিকাভুক্ত হ'ল সেদিন হতে কেবল শুনে আসছি "অলক্ষী", "পোড়া কপালী" "অপয়া" রাক্ষুসী না হ'লে পাঁচ বছরের মধ্যেই বাছাকে আমার খেয়ে বসলো।

ভাবি হাঁসব না কাঁদব ? আমি স্বামী খেয়েছি আর উনি ? অতো বড় ছেলে যে কোল ছাড়া হয়ে গেল সেটাই কি খুব পয়মন্তের চিহ্ন ? তাই বলি কাউকে বিচার করবার আগে তাকে ভালবাস—তার ব্যথা বুঝবার চেষ্টা কর।

পাশের বাড়ীর বিমলা যখন বলে,—আহা বেচারীর কি কপাল ? তখন অপমানে আমার সর্ব্ব শরীর রীরী করে ওঠে। ওর চেয়ে পোড়া কপাল কখনই আমার নয়। ওর চরিত্রহীন মাতাল স্বামী ওকে ধরে মারেন। পেট ভরে খেতে দেন না, ওর দুঃখ অপমানের শেষ কোথায় ? কিন্তু আমি যে আমার স্বামীর চোখের মণি ছিলাম, আজ ভগবান তাঁকে তুলে নিয়েছেন—কিন্তু আমার স্মৃতিতে কোন অপমানের জ্বালা রাখেননি। আমার স্বামী আমাকে ভালবাসতেন, আমার প্রতি কর্ত্তব্য করতেন, তাঁর নিন্দা কখন আমায় শুনতে হয়নি। তাঁর রূপ ছিল অর্থ ছিল—তবু আমি হলুম 'অপয়া'। মানুষের বিচারের উপর ঘেন্না ধরে গেল।—খুব পয়মন্ত মেয়ে না হলে আমার মত স্বামী-ভাগ্য কজনের হয় গা ?

আমার মনে কত আনন্দ তা তোমরা কেমন করে বুঝবে ? তোমাদের শত অত্যাচারের পরেও আমার হৃদয় স্বামীর চিন্তায় ভরপুর থাকে। স্বামী জীবিত অবস্থায় ঘর দুয়ার যে ভাবে মানিয়ে গুছিয়ে রাখা পছন্দ করতেন, আমি শতবাধা সত্বেও সব কিছু তেমনি ভাবেই রাখি। খোকনকে আমার ভবিষ্যৎ প্রেমনাথ তৈরী করবার চেষ্টা করি।

তোমরা আমায় দেখে যত দুঃখ পাও, তার চেয়ে ঢের বেশী দুঃখ আমি পাই তোমাদের চিন্তার ধারা দেখে। সধবা অবস্থায় যারা আমাকে প্রেমনাথের স্ত্রী মনে করে সমীহ করে চোলত, তারাও যখন আজ দু'পা দিয়ে মাড়িয়ে যাওয়ার চেষ্টা করে, তখন বিশেষ করে অনুভব করি, আমার জীবনে আমার স্বামীর স্থান কোথায় ছিল। যখন মনে পড়ে স্বামী বেঁচে থাকলে এদের কি অবস্থা করে ছাড়তেন, তখন তাঁর উদ্দেশ্যে মাথা নত না করে পারি না। আমার প্রেমের ভবিষ্যৎ ছবি আর ফুটবে না, কিন্তু অতীতের

যে স্মৃতি বুকে জড়িয়ে আছে তা চিরদিন স্থির ও ধ্রুব হয়েই থাকবে।

তোমরা আমায় জব্দ করবার জন্য যেন উঠে পড়ে লেগেছ, আমার চুল কেটে দিয়েছ, খোকার সামনে থান পরিয়েছ, তেষ্টা পেলেও একাদশীর দিন জল খেতে দাও না, সকালে উঠে আমার মুখ দেখনা, শুভ কাজে সামনে যেতে বা ছুঁতে দেওনা,—এমন কি লেখাপড়া জানাটাও আজকাল দোষের মধ্যে গণ্য হয়েছে। চুপ করে থাকলে বল অহঙ্কারী, আর উত্তর দিতে গেলে সবাই মিলে এক সঙ্গে ফেটে পড়ো। কেন? কেন তোমরা আমার প্রতি এত কঠিন, এতো বিরূপ? যদি বুক চিরে দেখাতে পারতাম তবে দেখতে—সব শুভ কাজেই আমি শুভ কামনা করি এবং সকলকেই আমি মায়ার চোখে দেখি।

তোমাদের অত্যাচারে আমি নিজেকে নিজে ভয় করতে শিখেছি, তাই ননদের বিয়ের দিন আমি একটা বন্ধ ঘরে স্যারাদিন কাটিয়েছি, তার অমঙ্গলের আশঙ্কায়।

বাংলাদেশ ছাড়া আর কোন দেশ বিধবাদের প্রতি এতো কঠিন, এতো নির্ম্মম হয় না, তাই বোধ হয় বাংলাদেশের মেয়েদের এতো বৈধব্য-ভীতি।

রকম রকম বয়সের রকম রকম বিধবাদের সাথে কথা বলে আমার এই অভিজ্ঞতা হয়েছে,—যাঁরা স্বামীর কাছ হতে প্রকৃত স্নেহ প্রেমের আস্বাদন পেয়েছেন, তাঁদের যে বয়সে এবং যে অবস্থাতেই বৈধব্য ঘটুক না কেন তাঁদের ব্যথার রূপ একেবারে এক। এ ব্যথা সকলের পক্ষে কল্পনা করাও শক্ত, কিন্তু নিষ্ঠুর বাংলাদেশ এই ব্যথার বোঝার উপর নিশ্চিন্তে চাপিয়ে দেয় অপমানের ভার। যাদের স্বামীর প্রতি সত্যিকারের দরদ থাকে তাঁদের আর বাঁধন দিয়ে বাঁধবার দরকার কি?

যাঁরা বিধবা তাঁরাই 'পোড়াকপালী' বা 'অলক্ষ্মী' মনে করাটা নিশ্চয়ই ভুল। বহু বিধবাকে দেখা গেছে প্রাণপাত পরিশ্রম করে ভাঙ্গা সংসারকে জোড়া দিতে। বহু বিধবা নানাভাবে দেশের ও দশের জন্য জীবন উৎসর্গ করেছেন এবং এও জানি যে—বহু বিধবার মৃত্যুর পর অসহায় পরিজনরা আরো অসহায় বোধ করেছেন। বিধবা বলে এঁরাও কি যাবেন অলক্ষ্মীর তালিকায়?

বিধবা হ'ক বা সধবা হ'ক, সেই মেয়েরা হচ্ছে অলক্ষ্মী বা পোড়া কপালী!—যারা মানুষকে ভালবাসতে পারেনি, যাদের কটু ও তিক্ত ব্যবহারে মানুষ বিরক্ত, যারা অসতী, যাদের চরিত্রদোষে সমাজ ক্ষতিগ্রস্ত অথবা যারা পরের অমঙ্গল সাধনে তৎপর।

কি বোলছ? আমি যদি এতো বুঝি, আমার ভিতরে যদি এতো তৃপ্তির ভাব, তবে আমি করুণ মুখে ঘুরে বেড়াই কেন?

মুখ আমার করুণ হওয়ার কথা নয়, ব্যথায় করুণ হওয়ার কথা আমার অন্তরের বিরহ বেদনায়। তারই কিছু ছাপ মুখে এসে পড়ে, কিন্তু মনে রেখ আমার বাহিরকে প্রকৃত করুণ করে তুলেছ তোমরা—তোমাদের অত্যাচারের আতিশয্য।

জ্যোতির্ময়

শান্তশীল দাশ

প্রাত্যহিক জীবনের ক্লান্তিকর অপমৃত্যু হ'তে
হে ঈশ্বর মুক্তি দাও। যেথা নিত্য বৈচিত্র্যের স্রোতে
উচ্ছল মুহূর্তগুলি, যেথা প্রাণ উন্মুক্ত উদার,
সেখানে জীবন নয় বেদনার্ত্ত, পাষাণের ভার
করেনি'ক জীবনেরে অবসন্ন অশ্রান্ত অধীর,
প্রাণের প্রাচুর্য্যে দীপ্ত যেথা দিন কাটে সুনিবিড়
হৃদয়ের প্রসন্ন উত্তাপে; যেথা বিচিত্রবরণী
এ পৃথিবী প্রতিদিন বর্ণে গন্ধে রসে সঞ্জীবনী
শক্তি দিয়ে দূর ক'রে দেয় যত অপমৃত্যু ভয়;
গ'ড়ে তোলে এ জীবন সহজ, সুন্দর, গতিময়—
হে ঈশ্বর, নিয়ে চল সেথা সেই প্রাণের মেলায়।
দুঃসহ এ জীবনের দিনগুলি মিথ্যা বঞ্চনায়
ভরে ওঠে পলে পলে, নিয়ে যায় মৃত্যুর দুয়ারে;
হে ঈশ্বর, মুক্তি দাও, অমৃত সন্ধান দাও তারে।

শ্রীক্ষেত্রনাথ রায়

ইংলণ্ড-ভারতবর্ষ প্রথম টেষ্ট ঃ

ইংলণ্ড ঃ ৪২২ (পিটার মে ১০৬, বারিংটন ৫৬, হর্টন ৫৮, ইভান্স ৭৩। গুপ্তে ১০২ রানে ৪, সুরেন্দ্রনাথ ৫৯ রানে ২ এবং নদকার্নি ৪৮ রানে ২)

ভারতবর্ষ ঃ ২০৬ (পি রায় ৫৪। টু্ম্যান ৪৫ রানে ৪, ষ্টেথাম ৪৫ রানে ২, মস ৩৩ রানে ২) ও ১৫৭ (পি রায় ৪৯, মঞ্জরেকার ৪৪। ষ্টেথাম ৩১ রানে ৫, টু্ম্যান ৪৪ রানে ২, গ্রীনহাউ ৪২ রানে ২)

নটিংহামের ট্রেন্ট ব্রিজে অনুষ্ঠিত ভারতবর্ষ বনাম ইংলণ্ডের প্রথম টেষ্ট ক্রিকেট খেলায় ইংলণ্ড এক ইনিংস এবং ৫৯ রানে ভারতবর্ষকে পরাজিত করে।

৪ঠা জুন খেলা সুরু হয়। ইংলণ্ড প্রথম ব্যাট করে। নির্দ্ধারিত সময়ে ইংলণ্ডের ৩৫৮ রান ওঠে ৬ উইকেটে। খেলার প্রথম দিকে ভারতবর্ষ বেশ খানিকটা সাফল্য লাভ করে। মাত্র ৬০ রানে ৩টে উইকেট পড়ে যায়। কিন্তু প্রথম মহড়ার এই সাফল্যটা ধোপে টিকল না। ২টো উইকেট পড়ে যখন মাত্র ইংলণ্ডের ২৯ রান উঠেছে তখন অধিনায়ক পিটার মে খেলতে নামলেন। দেশাইয়ের বল মেরে মে তাঁর ২৯ রানের মাথায় সুরেন্দ্রনাথের হাত থেকে ফস্কে গিয়ে সে যাত্রা রক্ষা পেলেন; এই ক্যাচটা ধরা পড়লেও ইংলণ্ডের অবস্থা কোনমতেই শোচনীয় হ'ত না এমন কথা ইংলণ্ডের অতি বড় সমর্থকও জোর গলায় বলতে পারেন না। এইদিন ছুটো সহজ ক্যাচ হাত থেকে ফস্কে ছিল। ইংলণ্ডের ১৮৫ রানে বারিংটন আউট হ'ন। মে এবং কেন বারিংটনের জুটিতে ১২৫ রান ওঠে। এরপর মে জুটি হন হর্টনের সঙ্গে। মে নিজস্ব ১০৬ রান করে আউট হ'ন দলের ২২১ রানে। এই নিয়ে মে ১৩টা টেষ্ট সেঞ্চুরী করলেন। এরপর হর্টনের সঙ্গে ইভান্স জুটি বেঁধে ঝড়ের বেগে রান তুলতে থাকেন। ইভান্স পুরো ৭৫ মিনিট খেলে নিজস্ব ৭৩ রান ক'রে আউট হ'ন এবং ৬ষ্ঠ উইকেটে হর্টন এবং ইভান্সের জুটিতে ইংলণ্ডের ১০৬ রান ওঠে। বহুদিন এরকম দ্রুতগতিতে টেষ্ট খেলায় রান উঠতে দেখা যায়নি। ২য়দিনে ইংলণ্ড একঘণ্টার খেলায় আরও ৬৪ রান ক'রে আউট হয়। ১ম ইনিংসে রান দাঁড়ায় ৪২২।

ভারতবর্ষের খারাপ ফিল্ডিংয়ের দরুণ ইংলণ্ডের শেষ দিকের খেলোয়াড়রাও বেশ রান তুলেছেন। ভারতবর্ষ যখন ১ম ইনিংসের খেলা সুরু করে তখন আকাশ মেঘাচ্ছন্ন—আলোও কম। ৪ ওভার খেলার পর প্রবল বেগে বৃষ্টি নামে। খেলোয়াড়দের অনেকক্ষণ প্যাভিলিয়নে অপেক্ষা করতে হয়েছিল। নির্দ্ধারিত সময়ে দেখা গেল ভারতবর্ষের ১১৬ রান উঠেছে—উইকেট পড়েছে ৩টে। ভারতবর্ষের বাঘা বাঘা ব্যাটসম্যান রায়, কনট্রাক্টর এবং উমরীগড় আউট হয়ে গেছেন। তখনও ইংলণ্ডের থেকে ভারতবর্ষ ৩০৬ রানে পিছুতে পড়ে আছে।

৩য়দিনে ভারতবর্ষের ১ম ইনিংস ২০৬ রানে শেষ হয় এবং ফলে তারা ফলো-অন্ করতে বাধ্য হয়। বোরদে ১ম ইনিংসে ১৫ রান ক'রে আহত অবস্থায় অবসর নেন। ২য় ইনিংসেও পঙ্কজ রায় দৃঢ়তার সঙ্গে খেললেন। তাঁর ৪৯ রানই দলের সর্ব্বোচ্চ রান হ'ল। নির্দ্ধারিত সময়ে ভারতবর্ষের ৩টে উইকেট পড়ে রান দাঁড়ায় ৯৬।

৪র্থদিনে ইংলণ্ডকে তিনঘণ্টার কিছু বেশী সময় খাটান দিতে হয়। ভারতবর্ষের ২য় ইনিংস ১৫৭ রানে শেষ হ'লে ইংলণ্ড এক ইনিংস ও ৫৯ রানে জয়ী হয়। ৫ দিনের টেষ্ট খেলা ৪র্থ দিনের তিনঘণ্টার খেলাতেই শেষ হয়ে যায়। বোরদে আহত থাকায় ২য় ইনিংসে আর খেলতে নামেননি। ভারতবর্ষ ক্রিকেট খেলার তিনটি বিভাগে—ব্যাটিং, বোলিং এবং ফিল্ডিংয়ে চরম ব্যর্থতার পরিচয়

দিয়েছে। তবুও ইংলণ্ড শক্তিশালী খেলোয়াড় নিয়ে দল তৈরী করেনি। তরুণ খেলোয়াড়দের দলভুক্ত করার নীতি অবলম্বন করায় তিনজন আনকরা খেলোয়াড় দলভুক্ত হয়েছিলেন। মার্টিন হর্টন, গ্রীনহাউ এবং টেলার—এই তিনজন এই প্রথম ইংলণ্ডের হয়ে টেষ্ট খেললেন। ধুরন্ধর খেলোয়াড় যেমন লেকার, লক, বেলী, গ্রেভনী, রিচার্ডসন, লোডার এবং ডেক্সটার—এঁদের দলভুক্ত করার কথা খেলোয়াড় নির্ব্বাচক মণ্ডলী বিবেচনা করেননি। ট্রেন্টব্রিজের উইকেট প্রচুর রান করার স্বপক্ষে থাকা সত্ত্বেও ভারতবর্ষের ব্যাটিং বিপর্য্যয় খুবই হতাশার কথা।

খেলার ২য়দিনে লাঞ্চের কিছুপর পঙ্কজ রায় যখন নিজস্ব ২৪ রানের কোঠায় পৌছান তখন টেষ্ট ক্রিকেট খেলায় তাঁর ২০০০ রান পূর্ণ হয়। আলোচ্য টেষ্ট খেলার রান ধরে তাঁর রান দাঁড়িয়েছে ২০৭৯; এই রান তুলতে তিনি খেলেছেন ৩৩টা টেষ্ট ম্যাচের ৬০টা ইনিংস। এর মধ্যে তিনি ৪ বার নট আউট থাকেন। টেষ্ট খেলায় তাঁর নিজস্ব সর্ব্বোচ্চ রান হ'ল ১৭৩, ১৯৫৬ সালে নিউজিল্যাণ্ডের বিপক্ষে। এ পর্য্যন্ত মাত্র এই চারজন ভারতীয় খেলোয়াড় টেষ্ট ক্রিকেট খেলায় ২০০০ রান পূর্ণ করেছেন—বিজয় হাজারে, ভিনু মানকড়, পলি উমরীগড় এবং পঙ্কজ রায়।

ইংলণ্ড সফরে ভারতীয় ক্রিকেট দল ঃ

ইংলণ্ড সফরে ভারতীয় ক্রিকেট দল ২৩শে এপ্রিল থেকে ১৬ই জুনের মধ্যে ১৫টি খেলায় যোগদান করেছে। এই খেলার মধ্যে ভারতীয় জিমখানার খেলাও ধরা হয়েছে। যদিও ইংলণ্ড সফরের সরকারী তালিকায় এই খেলাটি অন্তর্ভুক্ত নয়। এই ১৫টি খেলার মধ্যে ভারতীয় দল জয়ী হয়েছে মাত্র ৪টি খেলায়, ৬টি খেলা ড্র গেছে এবং একটি খেলা বৃষ্টির দরুণ পরিত্যক্ত হয়েছে। ভারতীয় দল হেরেছে ৪টি খেলায় (১ম টেষ্ট নিয়ে)। এ পর্য্যন্ত ভারতীয় দল মাত্র একটি কাউন্টি ক্রিকেট দলকে (নর্থ হামটনসায়ার) হারিয়েছে।

মাইনর কাউন্টি দলের কাছে ভারতীয় ক্রিকেট দলের পরাজয় সব থেকে মনে লাগার কথা। তিনদিনের খেলায় এইভাবে রান ওঠে। ১মদিনে ভারতীয় দলের ১ম ইনিংসে ২৮৭ রান; মাইনর কাউন্টি দলের ৬৬ (৩ উইকেটে)। ২য়দিনে মাইনর কাউন্টি দলের ১ম ইনিংস ২২৮ রানে শেষ হয়। ভারতীয় দল ৫৯ রানে অগ্রগামী থেকে ২য় ইনিংসের খেলায় ১৮০ রান করে ৫ উইকেটে। অর্থাৎ ভারতীয় দল ২৩৯ রানে এগিয়ে থাকে, হাতে জলজ্যান্ত ৫টা উইকেট। ৩য়দিনে অর্থাৎ শেষদিনে ভারতীয় দলের ২য় ইনিংসের ৭ উইকেটে ২৭৪ উঠলে পর অধিনায়ক পঙ্কজ রায় দলের ইনিংস ডিক্লেয়ার্ড করেন—লাঞ্চের প্রায় একঘণ্টা আগে। হাতে তখন খেলার সময় ৫ ঘণ্টার কম। এই সময়ের মধ্যে মাইনর কাউন্টি দলের পক্ষে ৩৩৪ রান ক'রে জয়লাভ করা একপ্রকার অসম্ভব ব্যাপার বলেই অধিনায়ক রায় ইনিংস ডিক্লেয়ার্ড করেছিলেন জয়লাভের আশায়। এটা দুরাশা বা কোন ঝুঁকি ছিল না। কিন্তু দেখা গেল খেলা শেষ হওয়ার নির্দ্ধারিত সময়ের একঘণ্টা আগে মাইনর কাউন্টি দল ৪ উইকেটে ৩৩৪ রান তুলে ৬ উইকেটে জিতে গেল। ভারতীয় দলের এই "চ্যালেঞ্জে" কাউন্টি দল না ঘাবড়ে সুরু থেকে পিটিয়ে খেলে ভারতীয় দলের বোলিংকে ভোঁতা করে দেয়। অবশ্য কাউন্টি দলের এই জয়লাভের প্রধান কারণ ছিল ভারতীয় দলের অতি নিকৃষ্ট ফিল্ডিং। মাইনর কাউন্টি দলের ওপনিং ব্যাটসম্যান পি শার্পে ২০২ রান করেন। অথচ এই শার্পেকে ৫০ রানেরও কম রানে ভারতীয় দল আউট করতে পারতেন। কৃপাল সিংয়ের দু'ওভার বলে শার্পে ৪বার সহজ ক্যাচ তুলে অব্যাহতি পেয়ে যান। শার্পে তাঁর খেলার শেষদিকেও তিন চারটি সহজ ক্যাচ তুলে ভারতীয় দলের দুর্ব্বলতা লোকচক্ষে ধরিয়ে দিয়েছিলেন। ১৯২৮ সালে মাইনর কাউন্টি দল সেই যে ইংলণ্ড সফরকারী ওয়েষ্ট ইণ্ডিজ ক্রিকেট দলকে হারিয়েছিল তারপর ইংলণ্ড সফরকারী বিদেশী ক্রিকেট দলের কাছে এই আবার তাদের জয়লাভ হ'ল।

ফুটবল লীগ :

প্রথম বিভাগের ক্যালকাটা ফুটবল লীগ প্রতিযোগীতায় উপস্থিত মোহনবাগান দল শীর্ষস্থান অধিকার ক'রে রয়েছে। ১৩টা খেলায় তাদের ২৪ পয়েন্ট হয়েছে; এখনও কোন খেলায় হারেনি। দুটো খেলা ড্র করেছে—বালীপ্রতিভা এবং হাওড়া ইউনিয়নের সঙ্গে। মাত্র ১টা গোল খেয়েছে হাওড়া ইউনিয়নের কাছে। ইষ্টবেঙ্গল ২য় স্থানে আছে—১২টা খেলায় তাদের ২০ পয়েন্ট উঠেছে। ইষ্টবেঙ্গল ১—৩ খেলায় রাজস্থানের কাছে হেরেছে। তারা দুটো খেলা ড্র করেছে—জর্জ্জটেলিগ্রাফ এবং খিদিরপুরের সঙ্গে। গতবছরের লীগ চ্যাম্পিয়ান ইস্টার্ণ রেলওয়ে ১১টা খেলায় ১৬ পয়েন্ট পেয়েছে। রেলদল হেরেছে ২টো খেলায়—মোহনবাগান এবং ইষ্টবেঙ্গল দলের কাছে। মহমেডান স্পোর্টিং ১০টা খেলায় ১৬ পয়েন্ট করেছে হেরেছে দুটো খেলায়—মোহনবাগান এবং ইষ্টবেঙ্গল দলের কাছে।

	খেলা	জয়	ড্র	হার	পক্ষে	বিপক্ষে	পয়েন্ট
মোহনবাগান	১২	১১	২	০	১৯	১	২৪
ইষ্টবেঙ্গল	১২	৯	২	১	২৪	৭	২০
ইষ্টার্ণ রেলওয়ে	১১	৭	২	২	১৩	৩	১৬
মহঃ স্পোর্টিং	১০	৮	০	২	২৪	৪	১৬

মণিবেগম : শ্রীশক্তিপদ রাজগুরু

বাঙালী পাঠক ঐতিহাসিক কাহিনী পড়িতে ভালবাসে না এমন কথা তাহার অতিবড় শত্রুও বলিবেনা। বঙ্কিমচন্দ্র আধুনিক বাংলা সাহিত্যের ভিত গাড়িয়াছিলেন দুর্গেশনন্দিনী দিয়া। সেদিনের বাঙালী দুর্গেশনন্দিনীকে মাথায় তুলিয়া নৃত্য করিয়াছিল এবং আজও তেমন ঐতিহাসিক কাহিনী পাইলে বাঙালী পাঠক নৃত্য করিতে প্রস্তুত আছে।

কিন্তু আধুনিক বাঙালী লেখক ঐতিহাসিক কাহিনী লিখিতে ভালবাসেন না। কেন ভালবাসেন না এ প্রশ্নের উত্তর খুঁজিব না, হয়তো কেবলমাত্র শ্রমবিমুখতাই ইহার কারণ নয়, হয়তো তাঁহাদের দৃষ্টি সম্মুখ দিকে বলিয়াই পিছু ফিরিয়া তাকাইবার অবকাশ তাঁহাদের নাই। কিন্তু প্রত্যেক বর্ধিষ্ণু সাহিত্যেই ঐতিহাসিক আখ্যায়িকার প্রয়োজন আছে; আমরা সবেমাত্র স্বাধীনতা লাভ করিয়াছি, আমাদের বিশেষ প্রয়োজন আছে। আমাদের অতীতের সহিত আমাদের বর্তমানের সংযোগ ঘটাইতে হইবে। বঙ্কিমচন্দ্র বলিয়াছেন—যে জাতির ইতিহাস নাই তাহার ভবিষ্যৎ নাই এবং যেখানে ইতিহাস অবলম্বনে লোক-সাহিত্য রচিত হয়না সেখানে ইতিহাস থাকিয়াও নাই।

নবীন লেখক শ্রীশক্তিপদ রাজগুরু ঐতিহাসিক উপন্যাস লিখিয়াছেন—মণিবেগম। উপন্যাসের কালের পটভূমিকা দুইশত বছর পূর্বেকার। মুসলমান রাজশক্তি ভাঙিয়া পড়িতেছে, ইংরেজ রাজশক্তি গড়িয়া উঠিতেছে। এই ভাঙা-গড়ার সন্ধিস্থলে মণিবেগম নাম্নী এক সুন্দরী নর্তকীকে কেন্দ্র করিয়া এই কাহিনী। নর্তকী কেন্দ্রে থাকিলেও তাহার চারিপাশে একটা জাতির জীবন-মৃত্যুর ওঠাপড়া চলিতেছে। Clive, Warren Hestings, নন্দকুমার, মীরজাফর, মীরণ—অসংখ্য অতি-পরিচিত নামের সহিত পদে পদে মাথা ঠোকাঠুকি হইয়া যায়।

বাংলা সাহিত্যের সৈকতভূমির একপাশ দিয়া ঐতিহাসিক কাহিনীর যে শীর্ণ ধারা প্রবাহিত হইতেছে, শ্রীশক্তিপদ রাজগুরুর এই বইখানি তাহাকে পুষ্ট করিবে। বইখানির অঙ্গশোভা অনবদ্য।

[প্রকাশক—গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স। ২০৩।১।১, কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট, কলিকাতা-৬। মূল্য—৫'৭৫]

শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়

অবতার শ্রীরামকৃষ্ণ—(নাটক) : অমল সরকার

বর্তমান কালে শ্রীরামকৃষ্ণ-সারদামণি ও রাসমণির জীবন চরিত অবলম্বনে অনেক সাহিত্য রচিত হয়েছে। রচিত হয়েছে কয়টি ছায়া চিত্রও। রামকৃষ্ণ প্রচারিত ধর্মের প্রতি মানুষের আগ্রহ বেড়েছে—স্পষ্ট বুঝতে পারা যাচ্ছে। সম্প্রতি প্রকাশিত অবতার শ্রীরামকৃষ্ণ নাটকটিও সমাদর লাভ করবে আশা করা যায়। যদিও এ নাটকে ঘটনার সংঘর্ষ তেমন জটিল হয়নি, তবুও কতগুলি নাটকীয় গুণ থাকায় এর রূপায়ণ দর্শক মনে ভাব সঞ্চারে সহায়তা করবে সন্দেহ নেই।

[প্রকাশক—শ্রীশ্যামলকুমার ভট্টাচার্য, ৬০।৩।১, শ্যামপুকুর ষ্ট্রীট, কলিকাতা-৪। মূল্য—এক টাকা পঞ্চাশ নয়া পয়সা।]

তাল সুর শিক্ষা (প্রথম সোপান) : শ্রীনারায়ণচন্দ্র দত্ত

গান বাজনা শিক্ষার প্রতি সমাজের মানুষেরা আজকাল অধিকতর আগ্রহান্বিত। তাল ও সুর শিক্ষা বিষয়ক গ্রন্থটি প্রকাশ করে লেখক অনেক শিক্ষার্থীর ও শিক্ষার্থিনীর কৃতজ্ঞতাভাজন হয়েছেন।

[প্রকাশক—লেখক। ১।১ বি প্রাণনাথ চৌধুরী লেন। কাশীপুর, কলিকাতা-২। মূল্য—দুই টাকা মাত্র।]

স্বর্ণকমল ভট্টাচার্য

সারদা গীতিকা—(প্রথম খণ্ড) : স্বামী অসিতানন্দ

বইখানিতে স্বামীজি লিখিত ১০৫টি গান—শ্রীশ্রীমা সারদামণির উদ্দেশ্যে লিখিত প্রার্থনা। লেখক শ্রীশ্রীমায়ের মন্ত্র-শিষ্য ও সেবক—মায়ের শতবর্ষ জয়ন্তী উপলক্ষে গানগুলি গ্রন্থাকারে প্রকাশ করা হইয়াছে। মানুষের শাশ্বত বাসনা ও কামনা এইগুলির মধ্য দিয়া প্রকাশিত বলিয়া যে কোন পাঠকের পড়িতে ভাল লাগিবে। সাধনালব্ধ অনুভূতির কথা ইহার মধ্যে প্রকাশিত হইয়াছে। ভাষা ও ছন্দ মধুর ও সরল।

[প্রাপ্তিস্থান—যোগেশ্বরী রামকৃষ্ণ মঠ, ভট্টনগর, লিলুয়া, হাওড়া। মূল্য—এক টাকা।]

স্বপ্ন-সাধনা—(কবিতা সংগ্রহ) : শ্রীসন্তোষ সেনগুপ্ত

বাংলা দেশে কবির সংখ্যা নাই—কাজেই প্রতিদিনই প্রায় একখানি

করিয়া নূতন কবিতা পুস্তক প্রকাশিত হইতে দেখি। বর্তমান পুস্তকখানির ভূমিকা লিখিয়া দিয়াছেন—কবিশেখর শ্রীকালিদাস রায়। তাঁহার মতে "স্বপ্ন-সাধনার মধ্যে ভাবানুকূল ভাষা ছন্দের মাধ্যমে ব্যবহৃত হইয়াছে—উহা অনুরূপ শ্রেণীর ভাবুকের মনে দোলা দিবে বলিয়া আশা করা যায়।" কবির পক্ষে ইহা কম প্রশংসার কথা নহে। আমরাও কবিতাগুলি পাঠ করিয়া আনন্দলাভ করিয়াছি—ইহার অধিক আর কিছু বলার নাই।

[প্রাপ্তিস্থান—গ্রন্থ বলাকা—১৫ ভূপেন্দ্র বসু এভেনিউ, কলিকাতা-৪ মূল্য—আড়াই টাকা।]

মেঘদূত : শ্রীধীরেন্দ্রনাথ ভৌমিক লিখিত পদ্যানুবাদ।

তরুণ খ্যাতিমান অধ্যাপক শ্রীঅরুণকুমার মুখোপাধ্যায় বইখানির ভূমিকা লিখিয়াছেন—"মূলের সঙ্গে মিলিয়ে পাঠ করলে কালিদাসের অনুরাগী পাঠক তৃপ্ত হবেন।" গ্রন্থের শেষে মূল সংস্কৃত শ্লোকগুলি ও দেওয়া হইয়াছে। বাংলা দেশে বহু কবি মেঘদূতের বাংলা কবিতায় অনুবাদ করেছেন—ধীরেন্দ্রনাথের কবিতা অতি সহজ ও সরল ভাষায় লিখিত—কিন্তু তথাপি ছন্দের অতি—তারল্যে মূলের গাম্ভীর্য্য ও সৌন্দর্য্য নষ্ট হয় নি—মূলের পাঠ কোথাও বিকৃত অর্থ গ্রহণ করে নি। পাঠক উহা পাঠ করিয়া আনন্দ লাভ করিবেন। যুগ যুগ ধরিয়া মেঘদূত পাঠককে তৃপ্তি দান করিতেছে, করিয়াছে ও করিবে।

[প্রাপ্তিস্থান—ঘোষ ব্রাদার্স এণ্ড কোং—৩ রমানাথ মজুমদার ষ্ট্রীট, কলিকাতা—৯ মূল্য—২ টাকা ২৫ নয়া পয়সা।]

শ্রীফণীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়

নতুন রেকর্ড

হিজ্ মাস্টার্স ভয়েস্ ও কলম্বিয়া প্রকাশিত নতুন রেকর্ডের পরিচয়

"এইচ্-এম্-ভি"

N82820—শ্যামল মিত্রের গাওয়া দু'খানি আধুনিক গান "মন মেতেছে" "সূর্যমুখী সূর্য খোঁজে।"

N82821—"গীতালি গীতাঞ্জলি" ও "একটি ফুলের মত" আধুনিক গান দুটি মিষ্টি সুরে পরিবেশন করেছেন—কুমারী বাণী ঘোষাল

N82822—দুখানি আধুনিক গান "কালো মেঘে ডম্বরু" ও "ওগো শকুন্তলা" গেয়েছেন খ্যাতিমান শিল্পী সুধীর সেন।

N82823—কুমারী পূরবী দত্তের সুরেলা কণ্ঠের সুন্দর দুখানি আধুনিক গান "আজ মনের মালঞ্চে" ও "হারিয়ে গেল জীবন।"

N82824—তালাৎ মামুদের গাওয়া মধুর দু'খানি গান—"তুমি সুন্দর যদি নাহি হও" ও "যেথা রামধনু ওঠে।"

N82825—নবাগতা মঞ্জুলা সেনগুপ্তের মধুর কণ্ঠের আধুনিক গান—"সূর্য্যমুখী সোনামুখী" এবং "খেলা যদি সারা হলো।"

N76083, N76084 এবং N76085—রেকর্ডগুলিতে "দেড়শো খোকার কাণ্ড" বাণী চিত্রের গানগুলি পরিবেশিত হয়েছে।

কলম্বিয়া

GE24943—শ্রীমতী গীতা দত্তের (রায়) কণ্ঠে আধুনিক গান "জানিতে চেয়েছ তুমি" ও "মাটির ভুবনে যদি।"

GE24944—"তুমি মধুর অঙ্গে" এবং "ওগো আমার নবীন সাথী" গান দুখানি অতুলপ্রসাদী সুরেলা কণ্ঠে পরিবেশন করেছেন শ্রীমতী নীলিমা বন্দ্যোপাধ্যায়।

GE24945—গীতশ্রী সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায়ের গাওয়া দু'খানি মধুর আধুনিক গান—"ঘুম নামে পথের ছায়া" ও "হাতে কোন কাজ নাই।"

GE30420 এবং GE30421—রেকর্ড দুটিতে "জল জঙ্গল" বাণীচিত্রের গানগুলি পরিবেশন করেছেন হেমন্ত মুখোপাধ্যায় ও গীতশ্রী সন্ধ্যা মুখোঃ।

সম্পাদক—শ্রীফণীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় ও শ্রীশৈলেনকুমার চট্টোপাধ্যায়

২০৩।১।১, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট্, কলিকাতা, ভারতবর্ষ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস হইতে শ্রীকুমারেশ ভট্টাচার্য কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

ভারতবর্ষের সূচী

সপ্তচত্বারিংশ বর্ষ—প্রথম খণ্ড—দ্বিতীয় সংখ্যা

শ্রাবণ—১৩৬৬

লেখ-সূচী

চিত্র-সূচী

লেখ-সূচী

চিত্র-সূচী

লেখ-সূচী

লেখ-সূচী

লেখ-সূচী

মৃতসঞ্জীবনী সুরা

ত্রিকালজ্ঞ ঋষি কল্পিত জীবনীয় রসায়ন। ইহা মৃতকল্পকে জীবন, ব্যাধিতকে স্বাস্থ্য, দুর্ব্বলকে বলদান করে এবং ব্যর্থতাক্লিষ্ট বেদনাভরা মনমরা হতাশ জীবনে আশা, উৎসাহ, উদ্যম ও আনন্দের ধারা উৎসারিত করে। ইহা সেবনে পাচকাগ্নি ও জীর্ণ শক্তি বাড়ে, যকৃৎ স্বাভাবিক সক্রিয়তা লাভ করে, অম্ল ও অরুচি দূর হয়, দেহে স্বাস্থ্য ও শক্তি সঞ্চারিত হয়। দীর্ঘকাল কঠিন রোগ ভোগান্তে এবং স্ত্রীলোকের প্রসবের পর রক্তাল্পতায় ও দৌর্ব্বল্যে ইহা মন্ত্রবৎ ক্রিয়া করে। কঠিন রোগে ক্ষীণনাড়ী মুমূর্ষুর হৃদপিণ্ডের ক্রিয়া নিস্পন্দ হওয়ার উপক্রমে ইহা নূতন জীবনীশক্তি ও স্বাভাবিক নাড়ীর গতি আনিয়া দেয়।

পাইণ্ট—৪৲ টাকা, কোয়ার্ট—৭৷৷০ টাকা

অধ্যক্ষ মথুরবাবুর

শক্তি ঔষধালয় ঢাকা লিঃ।

হেড অফিস: ৫২/১, বিডন স্ট্রীট, কলিকাতা। ব্রাঞ্চ—ভারত ও পাকিস্থানে সর্ব্বত্র।

মালিকগণ—অধ্যক্ষ মথুরামোহন, লালমোহন ও শ্রীফণীন্দ্রমোহন মুখার্জ্জী চক্রবর্ত্তী

ভারতবর্ষ প্রিন্টিং ওয়ার্কস

শ্রাবণ—১৩৬৬

প্রথম খণ্ড | সপ্তচত্বারিংশ বর্ষ | দ্বিতীয় সংখ্যা

বেদের তাত্ত্বিক ব্যাখ্যার আদিসূত্র

শ্রীঅরবিন্দ *

...র তাৎপর্য সম্বন্ধে কোন নূতন মতবাদ উপস্থাপিত ...ত হলে তার ভিত্তি—যে মূলসূত্র থেকে আলোচনা ...ন্ত হবে, তাকে বেদের শব্দার্থের মধ্যেই পরিষ্কার ...য়া চাই ; তাহলেই তা শুদ্ধ ও সুনিশ্চিত হবে। ...রাং, যদি বলতে হয় যে, বেদের বেশীর ভাগই অজ্ঞাত ...শয় একটা প্রতীক বা সাঙ্কেতিক চিত্রের সমাবেশ এবং সে সঙ্কেতের তাৎপর্য উদ্ধার করতে হয়, তাহলে দেখাতে ...যে, বেদের আক্ষরিক অর্থেই সে বিষয়ে উল্লেখ আছে ...সে সমস্যা সমাধানের সুস্পষ্ট দিশা আছে। নতুবা ...তগুলির অর্থ নিঃসংশয় হবে না, সর্বদাই আশঙ্কা থাকবে ...ঋষিদের নির্বাচিত প্রতীকের প্রকৃত তাৎপর্য আবিষ্কার না ক'রে, নিজের কল্পনা বা রুচি অনুসারে একটা মন-গড়া বিধান হয়ত খাড়া করা হয়েছে ; আর তাহ'লে অনুমিত সিদ্ধান্ত যতই নিপুণ বা সর্বাঙ্গসুন্দর হোক না কেন, আকাশ-কুসুমই হবে, তার চাকচিক্য যতই থাক না কেন, বাস্তবতা বা স্থায়িত্ব থাকবে না।

সুতরাং, প্রথম আমাদের নির্ধারণ করতে হবে যে, প্রতীক-সংকেতের কথা ছেড়ে দিয়ে, বেদের ভাষার স্ফুট অর্থে এমন কোন তাত্ত্বিক চিন্তার সারাংশের সাক্ষাৎ পাওয়া যায় কিনা—যাতে বোঝা যায় যে অধুনা-আরোপিত বর্বরোচিত প্রাথমিক ভাবের চেয়ে উচ্চতর তাৎপর্য বেদের আছে। তারপর, যতদূর সম্ভব সূক্তসমূহের আভ্যন্তরীণ

---

* অনুবাদক—শ্রীনলিনীকান্ত সেন

প্রমাণ থেকেই বার করতে হবে প্রত্যেক প্রতীক ও সঙ্কেতের অর্থ, প্রত্যেক দেবতার যথাযথ মনস্তাত্ত্বিক গুণ ও কর্ম। বেদে ব্যবহৃত প্রত্যেকটি পারিভাষিক সংজ্ঞার সর্বত্র স্বাভাবিকভাবে প্রযোজ্য দৃঢ়নিশ্চিত একটা অব্যভিচারী অর্থ সুষ্ঠু ভাষাতত্ত্বের উপর প্রতিষ্ঠিত করতে হবে। কারণ, আগেই বলেছি, বেদমন্ত্রের ভাষা, নির্দিষ্টার্থ ও অপরিবর্তনীয়, তার প্রতিপাদ্য কোন বিধিসম্মত বিশ্বাস বা অনুষ্ঠানই হ'ক, অথবা চিরাগত সংস্কার ও অবিতথ অভিজ্ঞতাই হ'ক, তার শব্দযোজন রীতি অতি যত্নে রক্ষিত হয়ে এসেছে, পরম সম্ভ্রমে অক্ষরে অক্ষরে মেনে নেওয়া হয়েছে। বেদের ঋষিদের ভাষায় যদি 'স্বৈরতা থাকত বা রূপকে বৈচিত্র্য-ব্যতিক্রম পাওয়া যেত, তাঁদের ধারণা যদি তরল অব্যবস্থিত বা অনিশ্চিত হত, তাহলে হয়ত তাঁদের নির্বাচিত সংজ্ঞাগুলিতে যে অর্থ দেওয়া হয়েছে বা তাঁদের সব ধারণার মধ্যে যে অন্যান্য সম্বন্ধ কল্পিত হয়েছে, তাতে সুবিধামত কিঞ্চিৎ স্বৈরাচার বা অসংলগ্নতা সমর্থিত বা মার্জনীয় হতে পারত। কিন্তু সূক্তগুলিই অতি স্পষ্টত ঠিক বিপরীত সাক্ষ্য দিচ্ছে। সুতরাং, মূলে যেমন গভীর শ্রদ্ধা ও সতর্ক সত্যনিষ্ঠা আছে, ব্যাখ্যাকারদের কাছ থেকেও তা প্রত্যাশা করবার অধিকার আমাদের আছে। স্পষ্টই বোঝা যায় যে, বৈদিক ধর্মের বিভিন্ন সব সংস্কারও সমাদৃত সব সংজ্ঞার মধ্যে একটা অব্যভিচারী নিত্য সম্বন্ধ আছে; ব্যাখ্যাতে যদি অসংলগ্নতা বা অনিশ্চয়তা আসে তাহলে প্রমাণ হবে না যে বেদের বাচ্যার্থ ভুল পথে নিয়ে গেছে, বরং প্রমাণ হবে যে, ব্যাখ্যাকার প্রকৃত সম্বন্ধ আবিষ্কার করতে পারেন নি।

এই প্রথম কর্তব্য সযত্নে নিষ্ঠাসহকারে সাধিত হবার পর, যদি বেদের সূক্তগুলি অনুবাদ ক'রে দেখান যায় যে আমাদের নির্ধারিত শব্দার্থ সর্বত্র, সব প্রসঙ্গেই সহজ ও স্বাভাবিকভাবে প্রযুক্ত হচ্ছে, যা অস্পষ্ট ছিল তা পরিষ্কার হচ্ছে এবং যেখানে অসঙ্গতি ছিল সেখানে বুদ্ধিগ্রাহ্য পরিষ্কার সঙ্গতি স্থাপিত হয়েছে, আর যদি তাতে সূক্তের সবটার একটা প্রাঞ্জল সুসংলগ্ন অর্থ হয় এবং শ্লোকগুলির পরপর সুসম্বদ্ধ চিন্তাধারার যুক্তিযুক্ত অনুক্রম লক্ষিত হয় এবং ফলে সব মিলিয়ে প্রাচীন একটা গভীর পূর্বাপর সঙ্গত সুগ্রথিত শাস্ত্র বা ধর্ম বিশ্বাসের সমষ্টি পাওয়া যায়, তাহলেই এই অনুমান অপরাপর মতের সামনে মাথা তুলে দাঁড়াতে পারবে, বিরোধী সব মতকে তর্কযুদ্ধে আহ্বান করতে পারবে এবং অনুকূল সব মতের পূর্ণতা বিধান করতে পারবে। তারপর, যদি দেখা যায় যে, এ ব্যাখ্যা অনুযায়ী সংস্কার ও ধর্মবিশ্বাসের সমষ্টি ভারতের পরবর্তী চিন্তা ধারার প্রাক্‌রূপ, যে বেদই বেদান্ত-পুরাণের স্বাভাবিক জন্মদাতা, তাহলে আমাদের অনুমান ঠিক হবার সম্ভাবনা কমবে তা নাই, বরং তার প্রামাণ্যতা সমর্থিত হবে।

তবে এত বড় ব্যাপক ও পুঙ্খানুপুঙ্খ প্রয়াসের অভিপ্রায় আমার এখন নাই। আমার বর্তমান উদ্দেশ্য, কয়েকটি নাতিদীর্ঘ অধ্যায়ে, আমার আবিষ্কৃত সূত্র যারা অনুসরণ করতে চায় তাদের সংক্ষেপে সে পথ দেখিয়ে দেওয়া, তার প্রধান প্রধান সন্ধিস্থলের দিশা দেওয়া এবং যে সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছি ও তাতে বেদের যে সব নিদর্শন থেকে সাহায্য পেয়েছি, তা বলে দেওয়া—আমি নিজে কি ক'রে এ পথের নির্দেশ থেকে সাহায্য পেয়েছি, তা বলে দেওয়া। আমি নিজে কি ক'রে এ পথের নির্দেশ পেলাম, মনে হয় সব প্রথম সেই কথাই বলা উচিত; তাহলে আমি যে পথ নিয়েছি পাঠকের পক্ষে তা আরও সহজবোধ্য হবে এবং আমার ব্যক্তিগত রুচি ও পূর্বসংস্কার এই কঠিন সমস্যা আলোচনায় বিচারবুদ্ধির সঠিক প্রয়োগ কতটা প্রভাবিত বা সীমাবদ্ধ করেছে, ইচ্ছা হলে, তা পরখ ক'রে নেওয়া সম্ভব হবে।

বেদ পড়বার আগে, বেশীর ভাগ শিক্ষিত ভারতীয়ের মত, কোন পরীক্ষা না ক'রেই পাশ্চাত্য পণ্ডিতদের দেওয়া বেদের ধর্মবিষয়ক, জাতিগত ও ঐতিহাসিক তাৎপর্য নির্বিচারে মেনে নিয়েছিলাম। ফলে, আধুনিক সভ্যতার আলোক প্রাপ্ত হিন্দুদের সাধারণ ধারণা মেনে নিতাম, মনে করতাম যে উপনিষদই ভারতীয় ধর্ম ও তত্ত্ব-চিন্তার প্রাচীনতম উৎস, প্রকৃত 'বেদ' প্রথম জ্ঞানের গ্রন্থ। ঋগ্বেদের সাম্প্রতিক অনুবাদই আমার জানা ছিল এবং এই গভীর ধর্মগ্রন্থ আমার কাছে ছিল জাতীয় ইতিহাসের পক্ষে একটি সংকলন মাত্র, কিন্তু তাত্ত্বিক চিন্তার ইতিহাসে বা জীবন্ত আধ্যাত্মিক ক্ষেত্রে মূল্য বা গুরুত্ব অল্পই দিয়েছি।

বৈদিক ভাবধারার সঙ্গে আমার প্রথম পরিচয় হয় পরোক্ষভাবে, যোগের পথে আত্ম-অনুশীলনের একটা ধারা

অনুসরণ প্রসঙ্গে। আমার অজ্ঞাতসারে স্বতঃই আমার সাধনা বৈদিক পিতৃপুরুষদের অনুসৃত, অধুনা অব্যবহৃত, সেই অতি-প্রাচীন পথের দিকে যাচ্ছিল। সে সময় আমার মনে কয়েকটি মনস্তাত্ত্বিক অভিজ্ঞতা নির্দিষ্ট আকার নিতে আরম্ভ করেছিল এবং তার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট হয়ে সুশৃঙ্খলভাবে আমার মনে কয়েকটি সাঙ্কেতিক নামের উদয় হচ্ছিল। তার মধ্যে ছিল তিনটি স্ত্রীশক্তি, ইলা-সরস্বতী-সরমা, সংবোধিময় মনের চারিটি বৃত্তির মধ্যে যথাক্রমে—স্বপ্রকাশ, অনুপ্রেরণা ও বোধি এই তিনটির প্রতীক। তবে দুটিকে বৈদিক দেবতার নাম বলে আমার জানা ছিল না, জানা ছিল প্রচলিত হিন্দুধর্মের বা প্রাচীন পৌরাণিক কাহিনীর সঙ্গে তাদের সম্বন্ধ—সরস্বতীকে বিদ্যার দেবতা ও ইলাকে চন্দ্রবংশের জননীরূপে। তবে সরমার নাম জানা ছিল—বেদের দেবশুনী, আমার স্মৃতিতে গ্রীক হেলেনের সঙ্গে সংযুক্ত এবং পার্থিব উষার প্রতিরূপ যিনি অন্তর্হিত আলোক-ধেনুর যূথের সন্ধানে অন্ধকারের শক্তিরাজির গুহাতে প্রবেশ করেন। কিন্তু এর সঙ্গে, আমার মনে সরমার যে-মূর্তি উদিত হয়েছিল তার কোন সম্পর্ক খুঁজে পাই নি। কিন্তু পার্থিব আলোক যে আন্তর আলোকের প্রতিরূপ, এই সঙ্কেত সূত্র পাবার পর সহজেই বুঝেছিলাম যে দেবশুনী হয়তঃ সম্বোধির বিদ্যুল্লেখা, অবচেতনের গহনে অবতরণ ক'রে, সেখানে অবরুদ্ধ সব জ্ঞানের উজ্জ্বল রশ্মিগুলিকে বিমোচন ও বিকীরণের জন্য প্রস্তুত করছে। কিন্তু তখন এ সূত্রের অভাব ছিল ব'লে এক্ষেত্রে আমাকে প্রতীকের একত্ব বিহীন, কেবলমাত্র নামের একত্ব অনুমান ক'রে নিতে হয়েছিল।

দক্ষিণ ভারতে অবস্থানের ফলেই আমার আন্তরিক মনোযোগ বেদের দিকে প্রথম ফিরল। দক্ষিণদেশীয় দ্রাবিড় ও উত্তরদেশীয় আর্যদের মধ্যে জাতিগত প্রভেদের অস্তিত্ব আমি মেনে নিয়েছিলাম। কিন্তু এখানে দুটি জিনিষ লক্ষ্য করতে বাধ্য হলাম যাতে আমার সেই ধার-করা সংস্কারে প্রচণ্ড আঘাত লাগল। আমার কাছে, এই প্রভেদের মূলে ছিল, আর্য-দ্রাবিড় শরীর সংগঠনে তথাকথিত পার্থক্য এবং আরও সুনির্দিষ্ট পার্থক্য উত্তরের সংস্কৃত-জাত ভাষা ও দক্ষিণের সংস্কৃত সম্বন্ধ রহিত ভাষাতে। অবশ্য, জানা ছিল, পরে আরও সব মত গড়ে উঠেছে যাকে সমগ্র ভারত উপদ্বীপের অধিবাসীদের এক সমগোষ্ঠী, দ্রাবিড় অথবা ইন্দো-আফগান জাতির অন্তর্ভুক্ত বলা হয়। তবে এ যাবৎ এই সব জল্পনা কল্পনার উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করিনি। কিন্তু দক্ষিণ দেশে অল্পকাল বাস করবার মধ্যেই, লক্ষ্য না ক'রে উপায় ছিল না যে, উত্তরদেশীয় বা 'আর্য' জাতির আদর্শরূপ বারবার তামিল জাতির মধ্যে দেখা দিচ্ছে। যেদিকে চক্ষু ফিরাই, শুধু ব্রাহ্মণ নয়, সব শ্রেণীর সব জাতের লোকের মধ্যেই, আমার পূর্বপরিচিত বন্ধুদের মুখ, চেহারা ও গড়নের বিস্ময়কর সাদৃশ্য। পরিষ্কার মনে পড়তে লাগল—মারাঠা, গুজরাট, হিন্দুস্তানের ত বটেই, এমন কি আমার নিজের প্রদেশ, বাংলারও, তবে সে সাদৃশ্য তত ব্যাপক নয়। মনে হল, উত্তরের সবদেশের লোক নিয়ে একটা বিরাট বাহিনী দক্ষিণে নেমে এসে আগের বাসিন্দা হয়ত যারা ছিল—তাদের যেন বন্যার জলে একেবারে ডুবিয়ে দিয়েছে। দক্ষিণের আকৃতির একটা সাধারণ ধারণা জেগে রইল বটে, তবে ব্যক্তি বিশেষের আকৃতির গঠন বিচার ক'রে তা নির্দিষ্ট করা অসম্ভব ছিল। আর, শেষ পর্যন্ত অনুভব না ক'রে পারলাম না যে, যত সংমিশ্রণই থাকুক না কেন, সব প্রভেদের পশ্চাতে সমগ্র ভারতবর্ষে রয়েছে যেমন আকৃতিগত তেমনি সংস্কৃতিগত(১) একত্ব। উপরন্তু, জাতিতত্ত্বের(২) আলোচনাও এই সিদ্ধান্তের দিকেই ক্রমশঃ বেশী ঝুঁকছে।

তাহলে ভাষাতত্ত্ববিদেরা আর্য ও দ্রাবিড় জাতির মধ্যে যে তীব্র প্রভেদ সৃষ্টি করেছে, তার কি? সে সবই অন্তর্হিত হয়। আর্য আক্রমণ আদৌ যদি

১। 'জাতিগত একত্ব বলতে চাই না, কারণ সাধারণতঃ যা মনে করা হয়, জাতি জিনিষটা তার চেয়ে অনেক জটিল এবং তা নির্ণয় করা অনেক বেশী দুঃসাধ্য। এই আলোচনা সম্পর্কে সাধারণ লোকের মনে এ বিষয়ে যত সব তীব্র প্রভেদের ধারণা আছে সে সব সম্পূর্ণ অপ্রাসঙ্গিক।

২। অবশ্য, যদি জাতিতত্ত্বের আলোচনার কোন প্রামাণ্যতা থাকে। জাতিতত্ত্বের একমাত্র দৃঢ় ভিত্তি ছিল এই থিয়োরি বা প্রকল্প যে পুরুষানুক্রমে মানুষের মাথার খুলির কোন পরিবর্তন হয় না, কিন্তু তাতেও এখন সংশয় এসেছে! আর এই ভিত্তি যদি ধ্বসে যায়, তাহলে ত এ শাস্ত্রের আর অস্তিত্বই থাকবে না।

মেনে নিতে হয় তাহলে বলতে হয় যে, আর্য বাহিনীর একটা বিরাট বন্যা এসে সমস্ত ভারত প্লাবিত করে সমগ্র জাতির দৈহিক আকৃতি, যতটা অদলবদল ক'রেই হক মূলতঃ নিরূপিত ক'রেছিল, আর না হয়, অপেক্ষাকৃত কম সভ্যজাতির ছোট ছোট দল এসে আদিম-বাসিন্দাদের সঙ্গে মিশে গিয়েছিল। আর তা যদি হয়, তাহলে ধ'রে নিতে হয় যে, এতবড় উপদ্বীপে প্রবেশ ক'রে, তার সুসভ্য অধিবাসী—যারা বড় বড় সহর তৈরী করেছিল ও দেশ-দেশান্তরে বাণিজ্য প্রসার করেছিল এবং আধ্যাত্মিক ও মানসিক সংস্কৃতিতে যারা হীন ছিল না—তাদের উপর নিজেদের ভাষা, ধর্ম, সংস্কার ও রীতিনীতি চাপাতে তারা সক্ষম হয়েছিল। অভাবনীয় ব্যাপার, তবে হয়ত তার কথঞ্চিৎ সম্ভাবনা থাকতে পারে, যদি বিজেতার ভাষা অতিমাত্রায় সুব্যবস্থিত ও সুগঠিত হয়, যদি মনের সৃজন-ক্ষমতা অতিমাত্রায় প্রবল হয় এবং ধর্মভাব ও ধর্মানুষ্ঠানের অনুপ্রেরণা অনেক বেশী বীর্যবান হয়।

আর ভাষার প্রভেদ ত চিরকালই ছিল এবং দুইটি ভিন্ন জাতির অনুমিত সমাগমের স্বপক্ষে এই যুক্তি দেখান হত। কিন্তু এখানেও আমার পূর্বসংস্কার বিচলিত ও বিধ্বস্ত হল। কারণ, তামিল ভাষার শব্দ সব পরীক্ষা করে দেখলাম যে, আপাতদৃষ্টিতে সংস্কৃত থেকে আকৃতি ও প্রকৃতিতে এত পার্থক্য সত্ত্বেও, বিশুদ্ধ তামিল ব'লে নেওয়া সব শব্দ ও শব্দগোষ্ঠি থেকেই অনেক নির্দেশ পেলাম যাতে সংস্কৃত ও তার দূর জ্ঞাতিভগিনী, লাতিনের মধ্যে, এমন কি সংস্কৃত ও গ্রীকভাষার মধ্যে, নূতন নূতন সম্বন্ধ স্থাপন করতে সক্ষম হলাম। তামিল শব্দ থেকে শুধু যে নূতন সম্বন্ধের ইঙ্গিত পাওয়া গেল তা নয়, কোন কোন ক্ষেত্রে একই পরিবারের শব্দ-শৃঙ্খলের হারান গ্রন্থি পাওয়া গেল তামিল শব্দে। আর এই তামিল ভাষার মাধ্যমেই পেলাম যাকে আমি এখন মনে করি আর্যভাষাসমূহের প্রথম গঠনবিধি ও মূল উদ্ভব, বলতে গেলে, যেন ভ্রূণতত্ত্ব, তার প্রথম অনুভব। সুনির্দিষ্ট সিদ্ধান্তে উপনীত হতে হলে যতটা দরকার ততদূর আমার অনুশীলন চালিয়ে নিতে পারিনি; কিন্তু আমার নিশ্চিত বিশ্বাস যে, সংস্কৃতের সঙ্গে দ্রাবিড় ভাষাগুলির সম্বন্ধ যা মনে করা হয় তার চেয়ে অনেক বেশী ঘনিষ্ঠ ও ব্যাপক; আর হতেও পারে হয়ত যে, একই অধুনা-বিলুপ্ত মূল ভাষা থেকে ভিন্নমুখী স্রোতে উদ্ভূত হয়েছে এই দুই ভাষাগোষ্ঠি। তা যদি হয়, তবে ত দ্রাবিড় ভারতের উপর আর্য-আক্রমণের স্বপক্ষে একমাত্র প্রমাণ বাকী রইল—বেদের সূক্তগুলি থেকে যে সাক্ষ্য পাওয়া যায়।

সুতরাং, বেদের মূল সংহিতা হাতে নিলাম এই দুই কৌতূহল নিয়ে। গভীর বা সবিস্তার অধ্যয়নের কোন অভিপ্রায় তখন আমার ছিল না। বেশী সময় লাগল না বুঝতে যে, বেদে আর্য-দস্যুর জাতিগত প্রভেদ অথবা দস্যু ও আদিম ভারতবাসীর অভিন্নতার প্রমাণ যা মনে করেছিলাম তার চেয়ে অনেক বেশী অসার। কিন্তু আমার কাছে তার চেয়ে অনেক বেশী গুরুত্বপূর্ণ হল, সেই প্রাচীন গাথার মধ্যে পেলাম যে বহুকাল-অনাদৃত গভীর তাত্ত্বিক চিন্তা ও অভিজ্ঞতার বেশ বৃহদাকার সঞ্চয়। এই উপাদানের মূল্য আবার আমার কাছে অনেক বেড়ে গেল—যখন দেখলাম যে, আমার নিজের যেসব তাত্ত্বিক অভিজ্ঞতার অর্থ পাশ্চাত্য মনোবিজ্ঞান থেকে বা বেদান্ত ও যোগ আমার যতদূর জানা ছিল তাথেকে পাইনি, তার পরিষ্কার ও যথাযথ তাৎপর্য বেদমন্ত্রের আলোকে উদ্ভাসিত হয়ে উঠল এবং দ্বিতীয়তঃ, উপনিষদের যেসব দুর্বোধ্য অংশের ও ভাবের ঠিক অর্থ ইতিপূর্বে করতে পারেনি, তা প্রাঞ্জল হয়ে গেল এবং সঙ্গে সঙ্গে পুরাণের অনেক অংশ অভিনব তাৎপর্যে মহিমান্বিত হয়ে উঠল।

সৌভাগ্যবশতঃ তখন সায়নভাষ্য আমার জানা ছিল না, তাতে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হতে আমার সুবিধা হয়েছিল। কারণ তাতে বেদের অনেক সাধারণ বহু-ব্যবহৃত শব্দ সহজ মনস্তাত্ত্বিক অর্থে নিতে পেরেছিলাম:—যেমন, 'ধী' অর্থে চিন্তা বা বোধশক্তি, 'মনস্' অর্থে মন, 'মতি' অর্থে মনন, মনের ভাব বা অবস্থা, যথাযথ সূক্ষ্ম প্রভেদ ধরতে পেরেছিলাম—যেমন 'কবি' সত্যদ্রষ্টা, 'মনীষী' চিন্তাশীল, 'বিপ্র' বা 'বিপশ্চিৎ' উদ্ভাসিত-মনা। তাছাড়া, 'দক্ষ' 'শ্রবস্' (সায়নের মতে যথাক্রমে বল এবং ধন বা অন্ন বা যশ) প্রভৃতি শব্দের তাত্ত্বিক অর্থ অনুমান করতে পেরেছিলাম, পরে ব্যাপকতর অধ্যয়নে যা সমর্থিত হল। এই সব শব্দ সহজ স্বাভাবিক অর্থে গ্রহণ করবার অধিকারের উপরই বেদের তাত্ত্বিক ব্যাখ্যা প্রতিষ্ঠিত।

'ধী', 'ঋতম্' প্রভৃতি শব্দে স্থলভেদে সায়ন বহু বিভিন্ন অর্থ আরোপ করেছেন। 'ঋতম্' শব্দের অর্থ, তাঁর কাছে, বেশীর ভাগ স্থলেই যজ্ঞ, কোথাও সত্য কোথাও বা জল; কিন্তু তাত্ত্বিক ব্যাখ্যাতে তার অব্যভিচারী অর্থ হল সত্য—আর এই শব্দই তাত্ত্বিক বা আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যাতে প্রায় মূলশব্দ, যার উপর সব নির্ভর করে। 'ধী' অর্থে, সায়নে কোথাও চিন্তা, কোথায়ও বা প্রার্থনা, ক্রিয়া, অন্ন, ইত্যাদি—তাত্ত্বিক ব্যাখ্যাতে সর্বত্র চিন্তা বুদ্ধি। বেদের অপর সব নির্দিষ্ট সংজ্ঞার বেলাতেও এই এক কথা। আবার, সায়ন প্রায়শই সমশ্রেণীর বিভিন্ন সব শব্দের সূক্ষ্ম অর্থপ্রভেদ মুছে দিয়ে সব শব্দই অনির্দিষ্টতম সামান্য অর্থে নিয়েছেন; তাঁর কাছে মানসিক ক্রিয়াদ্যোতক সব শব্দেরই অর্থ হল বুদ্ধি; শক্তির বিভিন্ন ভাব বোঝায় বেদের বহুশব্দ, কিন্তু সে সবই সায়নের কাছে দৈহিক বলের অতি-ব্যাপক সাধারণ সংজ্ঞাতে পর্যবসিত হয়েছে। অথচ আমার কাছে, সাধারণ অর্থের খুবই কাছাকাছি হলেও, সমার্থক বিভিন্ন শব্দের প্রত্যেকটির বাচ্যার্থে ও ভাব-সাহচর্যে সূক্ষ্ম তারতম্য নির্ণয় ক'রে সর্বত্র রক্ষা করা অত্যন্ত প্রয়োজনীয় মনে হয়েছে। সত্যই বুঝি না, কেন ধরে নেওয়া হয় যে, বেদের ঋষিরা, অন্যান্য শ্রেষ্ঠ কবিদের মত, পদ্য রচনার উৎকৃষ্টতম শিল্পীদের মত, প্রতিশব্দের যথাযথ অনুসঙ্গ অনুভব না ক'রে কিংবা শব্দগুচ্ছের মধ্যে তার প্রকৃত মূল্য ও শুদ্ধ অর্থ না দিয়ে, বিনাবিচারে শৃঙ্খলা-হীনভাবে শব্দ প্রয়োগ করেছেন।

এ পদ্ধতি অনুসরণ করে দেখলাম যে, শুধু বিশ্লিষ্ট শ্লোক নয়, সমগ্র সূক্ত ও অনুচ্ছেদের আশ্চর্যরূপ বেশী সংখ্যা বেরিয়ে এল, যাতে শব্দ ও শব্দগুচ্ছের স্বাভাবিক সহজ সরল অর্থ থেকে বিন্দুমাত্র বিচ্যুত না হয়ে, সমগ্র বেদের প্রকৃতি সম্পূর্ণ পরিবর্তিত হয়ে গেল। কারণ, তাতে বোঝা গেল যে এই শ্রুতির বেশীরভাগ সূক্তের মধ্যেই রয়েছে তাত্ত্বিক চিন্তা ও আধ্যাত্মিক অভিজ্ঞতার সমৃদ্ধতম স্বর্ণ খনি, তার কোথাও চোখে পড়ে সোনার সরু ছুরি, কোথাও চওড়া ডোরা বা পরত। আবার, এই যে সব শব্দের সহজ অর্থে সাক্ষাৎভাবে মূলের তাত্ত্বিক তাৎপর্য পাওয়া যায়, তা ছাড়াও বহু শব্দ আছে যে সবের অর্থ, বেদের সাধারণ অভিপ্রায় সম্বন্ধে আমাদের ধারণা অনুযায়ী, স্থূলবাহ্য বা আন্তর তাত্ত্বিক দুদিকেই নেওয়া চলে। যেমন, 'রায়ে', 'রয়ি', 'রাধস্', 'রত্ন' প্রভৃতি শব্দে বাহ্য শ্রীবৃদ্ধি ও ঐশ্বর্য—অথবা আন্তর সুখ ও বিভবের প্রাচুর্য অর্থে, জ্ঞেয় বা জ্ঞাতা পক্ষে, ভৌতিক ও চেতসিক উভয় লোক সম্বন্ধে প্রয়োগ করা যেতে পারে। আবার 'ধন', 'রাজ', 'পোষ' অর্থে বাস্তব সম্পদ প্রাচুর্য এবং ব্যক্তিগত জীবনে তার বৃদ্ধিও হতে পারে। উপনিষদে ঋগ্বেদ থেকে একটা উদ্ধৃতিতে 'রায়ে' শব্দ আধ্যাত্মিক সুখ অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে, মূলে এ শব্দের সে অর্থ থাকতে পারবে না কেন? 'বাজ' শব্দ সেখানে পাওয়া যায় তবে অনেক স্থলে অপর প্রত্যেকটি শব্দের অর্থ তাত্ত্বিক এবং সেখানে পার্থিব সম্পদের উল্লেখ সমগ্র চিন্তার ঐক্যতানের মধ্যে উৎকট একটা বেসুরের ধাক্কার মত লাগে। সুতরাং সাধারণ বুদ্ধিই চায় যে এসব শব্দের তাত্ত্বিক অর্থ মেনে নিতে হবে।

বিনা ব্যতিক্রমে সর্বত্র তাত্ত্বিক অর্থ নিলে, শুধু এক একটা শ্লোক বা অনুচ্ছেদ নয়, সমগ্র সব সূক্ত তৎক্ষণাৎ সুস্পষ্ট তাত্ত্বিকভাবে সমৃদ্ধ হয়ে ওঠে। আর, বিনা ব্যতিক্রমে অনেক সময় এই রূপান্তর সম্পূর্ণ হয়, কোন শব্দ বা শব্দগুচ্ছ বাদ যায় না, যদি বৈদিক যজ্ঞের সাঙ্কেতিক প্রকৃতি মেনে নেওয়া হয়। গীতাতে দেখি 'যজ্ঞ' শব্দ সাংকেতিক অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে, কোন দেবতা বা পরমদেবের উদ্দেশ্যে উৎসর্গীকৃত বাহ্য বা অন্তর, সর্ববিধ কর্ম বোঝাতে। এ তাৎপর্য কি পরবর্তী মনীষার সৃষ্টি, না মূল বেদে যজ্ঞের ধারণাতে তা অন্তর্নিহিত ছিল? বেদে দেখলাম অনেক সূক্তই আছে যাতে যজ্ঞ ও বলির ধারণা প্রকাশ্যতই সাঙ্কেতিক, আর কতগুলি আছে যেখানে আচ্ছাদন বেশ স্বচ্ছ। তাহলে প্রশ্ন উঠল, প্রাচীন কুসংস্কারজাত অনুষ্ঠানের মধ্যে পরের যুগের রচনাতে সাঙ্কেতিক রীতির প্রথম বিকাশ হচ্ছে, না অধিকাংশ সূক্তের আনুষ্ঠানিক চিত্রে কমবেশী আচ্ছাদিত অর্থ কচিৎ কখনও স্পষ্টাক্ষরে বলা হয়েছে। বেদে যদি প্রতিপদে তাত্ত্বিক অনুচ্ছেদগুলির বারবার দেখা পাওয়া না যেত, তাহলে প্রথম অনুমানই গ্রহণ করতে হত। কিন্তু, অনেক সূক্তেই, শ্লোক থেকে শ্লোকান্তরে আনুপূর্বিক সুসঙ্গতি সম্পূর্ণ, প্রাঞ্জলভাবে রক্ষা ক'রে, স্বাভাবিকভাবে তাত্ত্বিক তাৎপর্য পাওয়া গেল, এক-

মাত্র অস্পষ্ট রইল শুধু যেসব স্থলে যজ্ঞ বা আহুতির উল্লেখ আছে, কিংবা, কখনও কখনও, যেখানে মানব বা দৈব পুরোহিতের কথা আছে। সে সবও সাঙ্কেতিক অর্থে নিয়ে দেখলাম যে, সর্বত্র চিন্তার ধারা আরও সুষ্ঠুও সম্পূর্ণ, আরও জ্যোতির্ময় ও সঙ্গতিপূর্ণ হয় এবং সমগ্র সুক্তের তাৎপর্য সগৌরবে সুসিদ্ধ হল। সুতরাং, নিশ্চিত হলাম যে, সমালোচনার সব নিয়ম অনুসারেই, বৈদিক যজ্ঞের সাঙ্কেতিক অর্থ গ্রহণ ক'রে বেদের তাৎপর্য সম্বন্ধে আমরা অনুমান প্রয়োগে অগ্রসর হতে পারি।

অথচ তাত্ত্বিক ব্যাখ্যার প্রকৃত সঙ্কট এখানেই এসে পড়ল। এ পর্যন্ত শব্দ ও বাক্যের বাচ্যার্থ নিয়ে, ব্যাখ্যার সম্পূর্ণ সহজ সরল উপায়ে অগ্রসর হওয়া সম্ভব হয়েছিল। এখন যে উপাদান এল, তার বাচ্যার্থ, একহিসাবে, লঙ্ঘন করতে হল। তাতে সত্য মন্দ সব সমালোচকই অবিরাম দ্বিধাগ্রস্ত হয়। সতর্কতার পরাকাষ্ঠা সত্ত্বেও, প্রকৃত ব্যাখ্যার সূত্র ঠিক ধরতে পারা গেল কিনা সে বিষয়ে কখনই নিশ্চিত হওয়া যায় না।

আপাততঃ মন্ত্র ও দেবতার কথা ছেড়ে দিয়ে, বৈদিক যজ্ঞের আর তিনটি অবয়ব আছে : যজমান, আহুতি ও যজ্ঞফল। 'যজ্ঞ' অর্থে দেবোদ্দেশে উৎসর্গাকৃত কর্ম হলে, 'যজমান' অর্থে নিতে হবে, যে যজন করে, কর্মের কর্তা ; যজ্ঞ হল আন্তর ও বাহ্যকর্ম, যজমান জীব, কর্তার ব্যক্তিত্ব। তা ছাড়া আছে যাজক, 'হোতা, 'ঋত্বিক', 'পুরোহিত', 'ব্রহ্মা', অধ্বর্যু', ইত্যাদি যাঁরা যজ্ঞানুষ্ঠান করান। সঙ্কেতে তাঁদের ভূমিকা কি? সাঙ্কেতিক তাৎপর্য নিতে হলে, যজ্ঞের প্রত্যেকটি অঙ্গেরই ত তাত্ত্বিক মূল্য দিতে হবে। দেখলাম দেবতাদের বারবার নিবেদনের পুরোহিত বলে উল্লেখ করা হচ্ছে, আর অনেক অনুচ্ছেদে প্রকাশ্যভাবেই বলা হয়েছে যে এক অমানবীয় শক্তি বা দৈবীই যজ্ঞের অধ্যক্ষ। আরও দেখলাম, বেদে সর্বত্র আমাদের সব মনোবৃত্তিকেই ব্যক্তিত্ব দেওয়া হয়েছে। এই নিয়মটির বিপরীত সূত্র নিয়ে শুধু ধরে নিতে হল যে, পুরোহিতের ব্যক্তিত্ব হল অমানবীয় কোন শক্তির অথবা আমাদের ব্যক্তিত্বের কোন উপাদানের বাহ্য অর্থে, প্রতিনিধি, আন্তর ক্রিয়াপক্ষে প্রতীক। বাকী রইল, বিভিন্ন যাজকের কর্মের তাত্ত্বিক অর্থ নির্ধারণ করা। এখানেও বেদেই দিশা পাওয়া গেল, তার ভাষার ইঙ্গিত ও নির্বন্ধ থেকে; যেমন, 'পুরোহিত' শব্দকে ভাগ ক'রে দুই শব্দে, অগ্রে স্থাপিত প্রতিনিধি অর্থে, বারবার "তপোদেব" অগ্নির উল্লেখ, যে অগ্নি মানবের মধ্যে দিব্য ইচ্ছাশক্তি বা সামর্থ্যের প্রতীক, যিনি দেবোদ্দেশে কর্ম উৎসর্গী-করণের ভার গ্রহণ করেন।

আহুতির অর্থ বোঝা আর একটু কঠিন। সোমরসের অর্থ তবু আন্দাজ করা যায় এ শব্দ প্রয়োগের প্রসঙ্গ থেকে, সোমরসের ব্যবহার ও ফল থেকে এবং তার সার্থক শব্দের ব্যুৎপত্তিগত নির্দেশ থেকে। কিন্তু ঘৃত? আন্তর যজ্ঞে ঘৃতের কি অর্থ হতে পারে? অথচ বেদে এ শব্দের ব্যবহার দেখে অবিরাম মনে হয় যেন তার সাঙ্কেতিক অর্থই চাই, যেমন, ঘৃত ক্ষরিত হচ্ছে স্বর্গ থেকে, বা ইন্দ্রের অশ্ব থেকে বা মন থেকে, এ সবের কি অর্থ করা যায়? অর্থহীন প্রলাপ বই আর কিছুই হয় না, যদি না এখানে 'ঘৃত' শব্দ প্রতীকরূপে এমন শিথিল ভাবে ব্যবহৃত হয়ে থাকে যে তার বাহ্য অর্থ ঋষির মন থেকে সম্পূর্ণ বা আংশিকভাবে সরে গেছে। অবশ্য, সুবিধামত স্থলভেদে ভিন্ন ভিন্ন অর্থে নেওয়া যেতে পারত, যেমন, 'ঘৃত' অর্থে কোথাও ঘি, কোথাও জল এবং 'মনস্' অর্থে অন্ন বা পিষ্টক বা অন্তঃ-করণ। কিন্তু দেখলাম, যে, 'ঘৃত' শব্দ সর্বদা মন বা চিন্তার প্রসঙ্গে, যে স্বর্গ মনের প্রতীক এবং 'ইন্দ্র' প্রদীপ্ত মনও তার অশ্বদ্বয় প্রদীপ্ত মনের দুগ্ধশক্তি, যে 'ধিষণা'(৩) বা বুদ্ধিকেও পূত ঘৃতরূপে দেবোদ্দেশে নিবেদন করা হয়েছে। তদুপরি, 'ঘৃত' শব্দের ব্যুৎপত্তিগত অর্থের মধ্যে উত্তপ্ত সমৃদ্ধ ঔজ্জ্বল্যও ধরা যায়। এই সব সমবেত নির্দেশ থেকে ঘৃতের একটা বিশেষ তাৎপর্য স্থির করা যুক্তিযুক্ত মনে করলাম। দেখলাম যজ্ঞের অন্যান্য অঙ্গ সম্বন্ধেও এই একই নিয়ম, একই পদ্ধতি প্রয়োগ করা গেল।

যজ্ঞফল, আপাতদৃষ্টিতে, একেবারেই ঐহিক : গো, অশ্ব, সম্পত্তি, লোকজন, দেহের বল, যুদ্ধজয়। এখানে সঙ্কট জটিলতর। কিন্তু আগেই দেখেছিলাম, বেদে গো জন্তুটি বেশ প্রহেলিকাময়, কোন পার্থিব গোযূথ থেকে তা আসে নি: 'গো' শব্দের অর্থ আলোকও হয় এবং অনেক অনুচ্ছেদে সামনে গরুর ছবি ধরা হলেও, নিঃসংশয়ে

৩। ঋগ্বেদ, ৩।২।১

গো শব্দ আলোক অর্থে প্রযুক্ত হয়েছে। সূর্যের গাভীবৃন্দ – হোমারে হেলিয়স্-এর গোযূথ ও উষার গরুর পাল, এ-সব ক্ষেত্রে এ অর্থ সুস্পষ্ট। তাত্ত্বিক অর্থে, পার্থিব আলোক সহজেই জ্ঞানের আলো, বিশেষ দিব্যজ্ঞানের জ্যোতির প্রতীক হতেই পারে। এত একটা সম্ভাবনা মাত্র, তার পরীক্ষার ও প্রমাণের উপায়? দেখলাম, অনেক স্থলে প্রসঙ্গ সবই তাত্ত্বিক, কেবল 'গো' শব্দই নিয়ে এল তার মধ্যে রূঢ় বাস্তবতার হাওয়া। ইন্দ্রকে 'সুরূপকৃত্নু,' সিদ্ধ-রূপের কর্তা বলে সোমপানে আহ্বান করা হল, পানের উল্লাসে মত্ত হয়ে তিনি হলেন 'গো-দাতা, তখনই আমরা পাই তাঁর অন্তরতম সিদ্ধ মনোভাব ও চরম জ্ঞান এবং সেই 'বিপশ্চিত', জ্ঞানদীপ্ত, ইন্দ্রকে প্রশ্ন ক'রে, তাঁর কাছ থেকে পায় শ্রেয়ঃ।(৪) বেশ বোঝা যায়, এখানে 'গো' শব্দে রক্ত-মাংসের গরু বা পৃথিবীর আলো নিলে কোন অর্থ হয় না। অন্ততঃ এই একটা দৃষ্টান্তে 'গো' শব্দের তাত্ত্বিক অর্থ আমার কাছে নিঃসংশয় হল। তারপর যেখানে 'গো' শব্দ আছে, প্রত্যেক ক্ষেত্রেই দেখলাম, তাত্ত্বিক অর্থেই সব-চেয়ে ভাল তাৎপর্যের প্রাঞ্জলতা ও বিষয়-বস্তুর সামঞ্জস্য পাওয়া যায়।

গো এবং অশ্ব আবার সর্বত্র এক সঙ্গে ব্যবহৃত হয়েছে। উষাকে বলা হয়েছে 'গোমতী', 'অশ্ববতী', যজমানকে উষা গো এবং অশ্ব দান করেন। পার্থিব উষা 'গোমতী', তিনি আলোক রশ্মি সাথে আনেন, আর এই হল মানব মনে দিব্য বা আধ্যাত্মিক আলোকের প্রথম উন্মেষের প্রতীক। সুতরাং 'অশ্ববতী' শব্দেও পার্থিব অশ্বের কথা বলা হয়নি, তারও তাত্ত্বিক তাৎপর্য আছে। বেদে অশ্বের উল্লেখ বিচার করে মনে হল, 'গো' এবং 'অশ্ব', এই যুগ্ম-প্রতীকের তাৎপর্য হল আলোক ও তেজ, চেতনা ও শক্তি, এই নিত্য সহচর ধারণা দুটি, বেদ ও বেদান্তের ভাষায়, অস্তিত্বের সব ক্রিয়া এই হল যুগ্ম বিভাব বা দুই দিক।

কাজেই, স্পষ্ট বোঝা গেল যে, গোধন ও অশ্বধন, বৈদিক যজ্ঞের এই দুই প্রধান ফলই সাঙ্কেতিক; তাৎপর্য, মানসিক আলোকের ঐশ্বর্য ও জৈববীর্যের প্রাচুর্য। অতএব, এই দুই প্রধান ফলের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট, বৈদিক কর্মের অপর সব ফলেরও অবশ্যই তাত্ত্বিক তাৎপর্য থাকা সম্ভব। সে তাৎপর্য আবিষ্কার করতে হবে।

বেদের প্রতীক-বিন্যার সর্বথা গুরুত্বপূর্ণ আর দু-টা অঙ্গ হল—লোকসমূহের বিন্যাস এবং দেবতাদের গুণ। লোক-বিন্যাসের সঙ্কেতসূত্র পেলাম বেদে ব্যাহৃতি, 'ভূর্ভুবঃস্বঃ', এই মন্ত্রের তিনটি সাঙ্কেতিক বীজ-ধ্বনি থেকে, এবং চতুর্থ ব্যাহৃতি, 'মহস্'-এর সঙ্গে তাত্ত্বিক সংজ্ঞা 'ঋতম্'-এর সংযোগ থেকে। পৃথিবী অন্তরীক্ষ ও দ্যৌ, বিশ্বের এই তিন বিভাগের কথা ত ঋষিরা বলেছেনই; তা ছাড়াও, 'বৃহৎদ্যৌ' বা বৃহত্তর স্বর্গ আছে, তাকে বলা হয়েছে 'বৃহৎ' ভূমা বা বিশাল লোক, কখনও বা 'মহো অর্ণঃ', মহা সমুদ্র। এই 'বৃহৎ'কেই আবার 'ঋতং বৃহৎ' বলে, অথবা সত্যং ঋতং বৃহৎ এই ত্রিবৃৎ সংজ্ঞায় বর্ণনা করা হয়েছে। আর, এই তিন লোক যেমন ভূর্ভুবঃস্বঃ এই তিন ব্যাহৃতির বাচ্য, তেমনি মনে হয়,ভূমা ও সত্যের এই চতুর্থ লোকও উপনিষদের চতুর্থ ব্যাহৃতি, 'মহস্'-এর বাচ্য। পুরাণের ব্যাখ্যানে এই চারিটির সঙ্গে 'জন-তপঃ-সত্যং', এই তিনটি পরম লোক যোগ দিয়ে, হিন্দু ব্রহ্মাণ্ড তত্ত্বের সাত সংখ্যা পূর্ণ করা হয়েছে। বেদেও তিনটি পরমলোকের উল্লেখ আছে তবে তার নাম করা হয়নি। কিন্তু বেদান্তে এবং পুরাণে সপ্তলোকের অনুযায়ী হল, সৎ-চিৎ-আনন্দ-বিজ্ঞান-মন-প্রাণ-অন্ন এই সাতটি চেতনার তত্ত্ব বা সত্তার রূপ। এখন, মধ্যতত্ত্ব, বিজ্ঞান, 'মহস্' তত্ত্বের অনুযায়ী ভূমার লোকই হল সব বস্তুর সত্য, বেদের 'ঋতম্', বৃহত্তর তত্ত্বের সঙ্গে অভিন্ন; আবার পুরাণে যেমন আরোহক্রমে 'মহস্'-এর পরে এল 'জন' বা নিত্য আনন্দের লোক, বেদেও তেমনি 'ঋতম্' বা সত্য ঊর্ধ্ব দিকে যায় 'ময়স্' বা আনন্দে। সুতরাং এক রকম নিশ্চিত হওয়া যায় যে, এই দুই পর্যায় অভিন্ন, উভয়ের মূলেই রয়েছে একই ধারণা যে, দ্রষ্টা চেতনার সপ্ততত্ত্ব রূপায়িত হচ্ছে সাতটি দৃশ্য লোকে। এই যুক্তি অনুসরণ ক'রে, বেদের লোকের সঙ্গে তদনুরূপ চেতনার তাত্ত্বিক স্তরের অভিন্নতা নির্ধারণ করতে সক্ষম হলাম এবং বেদের লোক সংস্থানের রহস্য আমার কাছে সম্পূর্ণ স্পষ্ট হয়ে গেল।

এতটা প্রতিষ্ঠিত হবার পর বাকীটা সহজেই এসে গেল আপনা থেকেই। আগেই বুঝেছিলাম, বৈদিক ঋষিদের

(৪) ঋগ্বেদ, ১।৪।১,৩,৪

শিক্ষায় মধ্যমান হল, মিথ্যার স্থলে সত্যকে এবং খণ্ডিত সীমাবদ্ধ সত্তার স্থলে আনন্ত্য ও সমগ্রতাকে স্থাপিত ক'রে মানব আত্মাকে মৃত্যুর অবস্থা থেকে অমৃত লোকে নিয়ে যাওয়া। মৃত্যু হল জড়ে বিজড়িত প্রাণ মনের সত্য অবস্থা, আর অমরত্ব হল অনন্ত সত্তা-চেতনা-আনন্দের অবস্থা। স্বর্গ-মর্ত্ত, দেহ-মন, মনের অস্তিত্বের এই দুই 'রোদসী' বা নভোমণ্ডল অতিক্রম ক'রে সে অধিরোহন করে অনন্ত সত্যের ধাম, 'মহস'-এ, এবং ক্রমে সেখান থেকে নিত্য আনন্দে। এই হল আমাদের পূর্বপুরুষ, প্রাচীন ঋষিদের আবিষ্কৃত পরমগতি, 'দেবযান'-এর মহাপথ।

দেবতাদের, দেখলাম, বর্ণনা করা হয়েছে জ্যোতির সন্তান এবং 'অদিতি' বা আনন্ত্যের পুত্র বলে; এবং বিনাব্যতিক্রমে সর্বত্র বলা হয়েছে যে, তাঁরা মানুষকে দেন অভ্যুদয় ও আলোক, দুহাতে ঢেলে দেন জলধির পূর্ণতা ও ভূলোকের প্রাচুর্য, তার অন্তরের সত্যকে পুষ্ট করেন, দিব্য-লোক সব নির্মাণ করেন, বাধাবিপত্তির সব অভিভব থেকে রক্ষা ক'রে তাকে নিয়ে যান তার মহৎ লক্ষ্য, কুৎস্ন সুখ ও পূর্ণ আনন্দে। প্রত্যেক দেবতার বিশিষ্ট বিশিষ্ট গুণকর্ম বোঝা গেল তাঁদের কাজ দেখে গুণবাচক আখ্যা ও সংশ্লিষ্ট কাহিনীর তাত্ত্বিক তাৎপর্য থেকে, উপনিষদ-পুরাণের নির্দেশ থেকে এবং ক্বচিৎ, গ্রীক্ কাহিনীর প্রতি ফলিত আলোকে। অপর পক্ষে, তাদের বিরোধী অসুরেরা বিভাজন ও সীমা-বন্ধনের শক্তি,—তাদের কাজ, আচ্ছাদন, বিদারণ, ভক্ষণ, অবরোধন, দৈতস্থাপন, বাধা-সৃষ্টি। নাম থেকেই বোঝা যায়,সত্তার স্বচ্ছন্দ একত্বের সমগ্রতা স্থাপনের বিরুদ্ধে কাজ করে এসব শক্তি। বৃত্র, পনি, অত্রি, রাক্ষস, সম্বর, বল, নমুচি—এবং দ্রাবিড় জাতির রাজা বা দেবতা নয়,—যদিও আজকাল ঐতিহাসিক বোধের অতি-প্রবল-তার বশে, পণ্ডিতেরা তাই বলতে চায়। এ বিরোধী শক্তি হল আরও পূর্বযুগের বিশ্বাসের প্রতীক, আমাদের প্রাক্তন পূর্বপুরুষদের ধর্ম ও নীতি বিষয়ক সংস্কারের বেশী অনুকূল। প্রতিপাদ্য হল উচ্চতর শ্রেয়ের ও নিম্নতর বাসনার সব শক্তির মধ্যে সংঘাত। ঋগ্বেদের এই ধারণা, ভাল মন্দের দ্বন্দ্ব অপেক্ষাকৃত কম মনস্তাত্ত্বিক সূক্ষ্ম দৃষ্টি ও বেশী সাক্ষাৎ নৈতিক বিধানের সঙ্গে বলা হয়েছে অন্য ভাষায়, জোরোয়াস্ট্রীয়ানদের ধর্মগ্রন্থে; তারা আমাদের প্রাচীন প্রতিবেশী জাতি, হয়ত: উভয়েরই উদ্ভব হয়েছিল একই মূল আর্য সংস্কৃতির শাসন থেকে।

সবশেষে দেখলাম, বেদের বিধিবদ্ধ সাংকেতিক রীতি প্রযুক্ত হয়েছে দেবতাদের সম্বন্ধে সব কাহিনীতে ও ঋষিদের সঙ্গে দেবতাদের আদান-প্রদানের কথাতে। খুবই সম্ভব, এ সবের বেশীর ভাগ—হয়ত: সবই মূলত: জ্যোতিষিক বা নৈসর্গিক,তাহলেও সে সবের মৌলিক অর্থের উপর তাত্ত্বিক সংকেত সংযোগ করা হয়েছে। বেদের সংকেত সূত্র এক-বার আবিষ্কৃত হলে এসব কাহিনীর আধ্যাত্মিক অভিপ্রায় সুস্পষ্ট ও অবশ্যগ্রাহ্য হয়। বেদের সব উপাদানই পরস্পর অচ্ছেদ্য বন্ধনে গ্রথিত; আর এরকম রচনার স্বভাবই হল যে, ব্যাখ্যার যে কোন পদ্ধতিই গ্রহণ করা হয়, বাধ্য হয়ে যুক্তির শেষ সীমা অবধি তাকে চালিয়ে যেতেই হবে। দৃঢ় হস্তে অতি নিপুণভাবে তারসব উপকরণ জমাট বাঁধা হয়েছে, আলোচনাতে কিছুমাত্র অসঙ্গতির অবসর দিলেই তার তাৎপর্য ও চিন্তাক্রমের সমগ্র সৌধই বিচূর্ণিত হয়ে যাবে।

এইভাবে,প্রাচীন শ্রুতির মধ্য থেকে যে বেদ আত্মপ্রকাশ ক'রে আমার মনে আবির্ভূত হল, সে সুপ্রাচীন ও সুমহৎ ধর্মশাস্ত্র আত্মসংযমের গভীর সাধনায় সমৃদ্ধ; তাতে চিন্তার শৃঙ্খলাহীনতা বা বিষয়ের আদিমত্ব ও অপক্কতা মোটেই নাই, অসমধর্মী বা বিজাতীয় বর্বর সব উপকরণের আকস্মিক সংগ্রহ নয়। পরন্তু এক, সমরূপ ও সম্পূর্ণতার তাৎপর্য, সজ্ঞান তার অভিপ্রায়; অবশ্য, আর একটা বাহ্য অর্থের কোথাও স্থূল কোথাও স্বচ্ছ অবগুণ্ঠনে আচ্ছাদিত, কিন্তু কোথাও মুহূর্তের তরেও সে মহৎ আধ্যাত্মিক উদ্দেশ্য ও প্রেরণা তার দৃষ্টি-বহির্ভূত হয়নি।
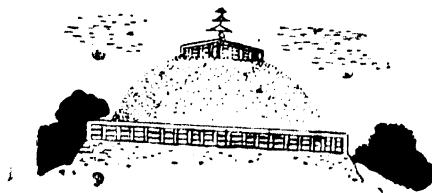
প্রাণগঙ্গা

অমলেন্দু মিত্র

রামরতনবাবু জরুরী একটা লেখাপড়ার কাজে ব্যস্ত ছিলেন। সহসা তাঁর আদুরে নাতি নিমাই ঝড়ের মত এসে ঢুকল। খানিকক্ষণ কাগজপত্র নিয়ে টানাটানি করলে, বই খুললে, বন্ধ করলে, ডাকলে : ঠাকুর্দা!

রামবাবু অন্যমনস্কভাবে বললেন : এখন যাও দাদু!

যাও বললে কখনো গিয়েছে নিমাই যে যাবে! ঠাকুর্দার কাছ ঘেঁষে গলায় হাত রেখে ফের ডাকলে : ঠাকুর্দা!

হাতখানা ছাড়িয়ে দিলেন রামবাবু। আবার বললেন : এখন যাও! বিরক্ত কোর না!

নিমাই রেগে গেল। বললে : করবই তো বিরক্ত— আবার করব।

রামবাবু জবাব দিলেন না। আপন মনে বই-এর পাতা উল্টাতে লাগলেন। কোন জবাব না পেয়ে আদুরে নাতির মনে অভিমান থমথম করে। চারিদিকে তাকায় অসহায়ভাবে—কোন্ কাজটা করলে ঠাকুর্দা কাগজপত্র ফেলে রেখে বাক্স থেকে লজেন্স বের করে ডাকবেন, দাদু ভাই! এসো কান মলে দিই!

নিমাই এগিয়ে আসবে। রামরতনবাবু হাতের মুঠোয় লজেন্স নিয়ে নিমাই-এর নাকটা মলতে মলতে বলবেন : এই দেখো দাদু, লজেন্স বেরিয়ে এল, নাক থেকে!

নিমাই লজেন্সটা হাতিয়ে নিয়ে কানটা এগিয়ে দেবে : ঠাকুর্দা! কান থেকে বেরুবে না?

: বেরুবে বৈকি দাদু!

কান দুটো মলবার ভাণ করেই হাতের মুঠো খুলবেন রামরতনবাবু। দেখা যাবে দুটো দুয়ানি, নয় খেজুর বেরিয়ে এসেছে। নিমাই-এর ভারী স্ফূর্তি! রামরতনবাবু বলবেন : একলা একলা খেয়ো না দাদু, অ.মাকে ভাগ দাও।

নিমাই কোন কথা কানে না তুলে নাচতে নাচতে চলে যাবে। ওগুলো শেষ না হওয়া তক্ ঠাকুর্দার সঙ্গে কোন সম্পর্ক নয়। সন্ধ্যেবেলা পা টিপতে বসলেই চারটে পয়সা। ও কি পা টিপতে পারে! তবু কচি কচি হাতে, আঃ···আঃ···ঠাকুর্দা, খুব আরাম লাগছে না··· আঃ···আঃ—

দাও ঠাকুর্দা পয়সা দাও!

সারারাত যে আনিটা দিয়ে ঠাকুর্দা গা চুলকাবেন, সেটা সকালবেলার জন্য বরাদ্দ করা আছে। ঠাকুর্দা খেতে বসলে চশমার খাপটা সরিয়ে রাখবে নিমাই। রামরতনবাবু খেয়ে উঠে বলবেন : আমার একটা বিনা মাইনের গোলাম আছে—সে খাপটা পৌঁছে দিয়ে আসবে!

রামরতনবাবুর কাছে শেখা বুলি আউড়ে ওঠে নিমাই : "চুঁচোর গোলাম চামচিকে—"

: তার মাইনে চৌদ্দ সিকে!···হি···হি···হি···!

ওর দুঃসাহস দেখে সবাই হাসে। রামবাবুও হাসেন।

ঐ চশমার খাপ নিয়ে তারপর আধ ঘণ্টা ঝুলোঝুলি চলবে—শেষকালে দুটো চমৎকার গল্প শোনাবার প্রতিশ্রুতি আদায় করে তবে ছাড়বে নিমাই!

বাড়ীতে আদর কাড়াবার সবে-ধন-নীলমণি নিমাই। ঠাকুর্দা, ঠাকুরমা, কাকারা, বাবা-মা, সবাই তাকে নিয়ে কাড়াকাড়ি করে। কিন্তু সবচেয়ে বেশী তার ভাব ঠাকুর্দার সঙ্গে। ঠাকুর্দার চোখের আড়াল হলে চলে না এক মুহূর্ত। রামরতনবাবুও তাকে নিয়েই আছেন—নিমাই, নিমাই—আর নিমাই। নিমাই ছাড়া এতবড় বাড়ীর লোকজন কাউকেই তাঁর দরকার নেই। নিমাই ছাড়া খাওয়া হয় না তাঁর। নিমাই ছাড়া বেড়ানো হয় না আর কারো সঙ্গে।

সুতরাং হঠাৎ রামরতনবাবু নিমাইকে অগ্রাহ্য করলে নিমাই শুনবে কেন? রামবাবুর দাপটে বাড়ী শুদ্ধ লোক

ভয়ে কাঁপে, ছেলেরা পর্যন্ত মুখ তুলে কথা বলতে সাহস পায় না; কিন্তু ভয় নেই কেবল নিমাই-এর। একবিন্দু ভয় করে না সে ঠাকুর্দাকে।

ঠাকুর্দার মনোযোগ আকর্ষণ করতে না পেরে নিমাই ফন্দী ঠাওরাতে লাগল। হঠাৎ চোখে পড়ে গেল ঘরের কোণে ঝুলঝাড়া লাঠিটা। সরু বাঁশের লম্বা আগায় পাটের তুলি। মাকড়সার ঝুলে কিম্ভূতকিমাকার হয়ে আছে। কত মরা পোকামাকড় আটকে আছে ওটার উপর। এটা হাতে নিয়ে এগিয়ে আসে। মাথার দিকটা আস্তে আস্তে পিছন থেকে ঘাড়ের পাশে এনে দাঁড় করায়: ও ঠাকুর্দা! দেখ, দেখ···

রামরতনবাবুর খেয়াল হয়। চমকে ওঠেন তিনি। ঘাড়ের পাশে নোংরা ধুলো-ভর্তি বস্তুটাকে দেখে চীৎকার করেন: আরে ছিঃ ছিঃ—সরা ওটাকে!

নিমাই সরিয়ে নেয়। হাসে: হি···হি···হি! কেমন মজা দাদু! কেমন মজা! কথা কইবে না নাকি!

রামরতনবাবু আবার দলিলপত্রে মন দিয়েছেন। ভয়ানক ব্যস্ত তিনি আজ। নিমাই দেখলে কোন ফলই হল না। কিন্তু সে দমবার পাত্র নয়। অকুতোভয়ে ঝুলঝাড়া লাঠিটাকে এবার সামনে এগিয়ে আনে। একেবারে রামবাবুর নাকের সামনে। কাগজপত্রগুলি বুঝি চাপাই পড়ে গেল। রামবাবু ধৈর্য হারান। চীৎকার করে ওঠেন: মেরে পিঠের ছাল তুলে নেবো। সরা ওটাকে!

: না সরাবো না!

: কি! কি বললে? সরাবি না!

: সরাবো না···সরাবো না···কি করবে কর না!

নিমাই ঝুলঝাড়াটাকে ঝাঁকাতে লাগল। ধুলোর ভয়ে রামবাবু নাকে কোঁচার খুঁট চাপা দিলেন। কাগজপত্রগুলিতে নোংরা ঝুল ঝরে ঝরে ঢেকে গেল যেন। রামবাবু উঠে দাঁড়ালেন। দারুণ ক্রোধে মুখখানা রাঙা হয়ে উঠেছে তাঁর। নিমাইকে নিয়ে কি যে করবেন ঠিক করতে পারলেন না। ইচ্ছা হল তুলে একটা আছাড় দেন। কিন্তু কিছুই করতে হাত উঠল না। শুধু খেঁকিয়ে ওঠেন: যাঃ···যাঃ—তোর সঙ্গে আড়ি—এ জীবনে কথা বলব না—হারামজাদা বজ্জাত কোথাকার!

তারপর চটি পায়ে দিয়ে ফটাস্ ফটাস্ করে বের হয়ে গিয়ে বাইরের রোয়াকে বসলেন গম্ভীর হয়ে!

নিমাই চুপি চুপি ঝুলঝাড়াটাকে কোণে দাঁড় করিয়ে রেখে পা টিপে টিপে বাইরে বারান্দায় বেরিয়ে আসে। ঠাকুর্দার বিমর্ষ মুখখানা দেখে কেমন যেন নিজেকে অসহায় মনে হয়। এমন মূর্তি তো কখনো দেখেনি। কি করতে কি হয়ে গেল। ভেবেছিল সেই ঠাকুর্দাকে ফিরে পাবে কিন্তু এ কি হোল! ঠাকুর্দা কেমন যেন হয়ে গেলেন আজ। নিমাই-এর ভয় ভয় করতে লাগল। কাঁপা কাঁপা গলায় ডাকলে: ঠাকুর্দা!···ও ঠাকুর্দা!

রামরতনবাবুর কোন বৈলক্ষণ্য দেখা গেল না। আগের মতই নিঝুম হয়ে বসে রইলেন। নিমাই ঘাবড়ে গেল। মুখখানা শুকিয়ে যায় তার। ঠাকুর্দা বিরূপ হলে—থাকবে কার কাছে সে। কে ছবি এঁকে দেবে! গল্প বলবে কে? লজেন্স, বিস্কুট, আখরোট, কিসমিস, জলছবি, পটকা নিয়ে কার সঙ্গে কাড়াকাড়ি করবে!

নিমাই শুকনা মুখে গিয়ে ঠাকুমার কাছে দাঁড়ায়। ঠাকুমা ভাঁড়ার বের করছিলেন। একটা মোয়া তুলে দেন নিমাই-এর হাতে। নিমাই নেয় না ওটা। বলে: কি হবে ঠাকুমা?

: কিসের দাদু?

: ঠাকুর্দা যে আড়ি দিয়েছেন আমার সঙ্গে।

: তাই নাকি! তাহলে তো ভারী ভাবনার কথা দাদু!

: হ্যাঁ ঠাকুমা, তুমি দেখবে চলো—দাদু কেমন মুখ হাঁড়ি করে বসে আছেন! কি হবে ঠাকুমা? তুমি ঠাকুর্দাকে একটু বলে দাও না—আর কখনো অমন করব না। এসো না ঠাকুমা—

আঁচল ধরে টানতে থাকে ঠাকুরমায়ের। ঠাকুরমা হাসতে হাসতে নিমাই-এর সঙ্গে বৈটকখানায় আসেন। রামরতনবাবু তখনও মুখখানা ভীষণ করে বসে আছেন।

: হ্যাঁগা তুমি নাকি নিমাই-এর সঙ্গে আড়ি দিয়েছো?

: দিয়েছিই তো! বলে দাও ও মুখপোড়া হনুমানটাকে, যেন আমার সামনে না আসে কখনো!

: কেন কি করেছে বেচারা, তাই শুনি?

: আর শুনতে হবে না—বা গুণধর নাতি তোমার। যাও চলে যাও এখান থেকে।

ঠাকুরমা ভারী ঠাণ্ডা মেজাজের। বেশী তর্কাতর্কি না করে নিমাই-এর হাত ধরে ফিরে আসেন: তাই তো দাদু! বড় রেগে গেছেন দেখছি! তুমি কিছু ভেবো না দাদু—রাগ পড়ে যাবে এক্ষুণি!

নিমাই তবু প্রবোধ পায় না। ঠাকুরমাকে দিয়ে হবে না। মায়ের কোলে গিয়ে আশ্রয় নেয়: মা! ঠাকুর্দা, আমার সঙ্গে আড়ি দিয়েছে যে! কি হবে?

নলিনী সেলাই নিয়ে ব্যস্ত ছিলেন। বলেন: কেন রে?

: কেন আবার! এমনি! আমি কি করে জানব—উনি অমনি রেগে যাবেন! এতবার ডাকলাম সাড়াই দিলেন না। বুঝলে মা, ঝুলঝাড়াটা নিয়ে যেমনি ভয় দেখাতে গেছি অমনি কী রাগ ঠাকুর্দার। তুমি যদি সামনে থাকতে মা, একেবারে কেঁদে ফেলতে!

: তুই নোংরা ঝুলঝাড়াটা নিয়ে ভয় দেখাতে গেলি কেন? ওঁর মন আজ ভাল নেই।

: কেন মা?

: সে তোকে শুনতে নেই।

নিমাই ভাবলে কি যেন, তারপর ভয়বিহ্বলকণ্ঠে বললে: হ্যাঁ মা! ঠাকুর্দা আমার সঙ্গে আর কখনও কথা কইবেন না?

: নিশ্চয়ই বলবেন বাবা! তোর সঙ্গে কথা না বলে পারেন?

: না, মা—তুমি দেখে নিও দাদু কখনও কথা বলবেন না—ভীষণ রেগে গেছেন যে! তুমি একবার বলে দাও মা!

: আচ্ছা বলব, রাগটা পড়ুক আগে!

: মা? ঠাকুর্দা যদি কথা না বলেন, তাহলে কে আমাকে গল্প বলবে?

নলিনী চেয়ে দেখলেন; নিমাই-এর চোখে জল টলমল করছে। দুরন্ত ছেলে এবার জব্দ হয়েছে ভেবে খানিকটা কৌতুক বোধ করেন যেন। বলেন: গল্প না-ই বা শুনলি।

: বা—গল্প না-বা শুনলি! তুমি তো বেশ বলে দিলে! আচ্ছা, শুনব না গল্প আমি। আমি নাইবো না, খাবো না। শোব না, বেড়াতে যাবো না—কিচ্ছু করব না! দেখে নিয়ো···এক ছুটে নিমাই বাইরে পালিয়ে যায়। নলিনী ছেলের অভিমানী মনটিকে ভাল করেই চেনেন। সহাস্য মুখে ওর গমন পথের পানে চেয়ে রইলেন।

কিন্তু ঘটনাটা যত হালকা ভাবা গিয়েছিল, ততটা হালকা মোটেই নয়। সেই কাণ্ডটার পর রামবাবু অস্বাভাবিকরকম গম্ভীর হয়ে গেছেন। নিতান্ত দরকার না হলে কথা বলেন না কারও সঙ্গে। ঠাকুমা কয়েকবার ওকালতি করেছেন নিমাই-এর পক্ষে। কিন্তু কড়া ধমক খেয়ে ফিরে এসেছেন। নলিনীর সাহসে কুলায়নি ছেলের হয়ে শ্বশুরের রাগ ভাঙাতে যাবার। নিমাই-এর বাবা কাকারাও ঘাটাতে সাহস পাননি। গোটা বাড়ীটা কেমন যেন অস্বাভাবিক রকম স্তব্ধ হয়ে গেছে। সবাই আস্তে আস্তে কথা কয়—ধীরে সুস্থে কাজ করে। থালা, বাটি, ঘটি, নামানোর শব্দ হয় না। রামবাবু খেতে বসবার সময়, গোটা অন্দর মহলটা নতুন করে প্রাণ ফিরে পেত যেন। নিমাই-এর সঙ্গে মিলে ছোট ছেলে সাজতেন রামবাবু। তাঁর দুরন্তপনা সবাই উপভোগ করত। রামরতনবাবু বেশী করে চেয়ে চেয়ে খেতেন সব কিছু। হাসি ঠাট্টার ফাঁকে কোন সময় মাত্রাতিরিক্ত খেয়ে ফেলতেন, তা তিনি নিজেই বুঝতে পারতেন না। কিন্তু এখন সব উল্টে গেছে। কারও মুখে টু শব্দটি পর্যন্ত শোনা যায় না। প্রচণ্ড গাম্ভীর্য নিয়ে রামরতনবাবু খেতে আসেন। মুখে কথাটি নেই। চেয়ে নেন না দ্বিতীয়বার কোন জিনিষ। জলখাবার সময় হৈ হল্লা করেন না—পাতে ফেলে রাখেন না কিছু। খাবার পর যথাস্থানে চশমার খাপ ঠিক মত খুঁজে পাওয়া যায়। রামরতনবাবু এই অস্বাভাবিক চেহারা দেখে বাড়ীর সবাই চুপ করে থাকে। দ্বিতীয়বার কোন জিনিষ নেবেন কিনা জিজ্ঞাসা করতে সাহস হয় না কারও। নিমাই সে সময়টা ভাঁড়ারের কোণে লুকিয়ে থাকে। সব সময়ই মনে হয়, ঠাকুর্দা বুঝিবা এই ডেকে উঠলেন: "কে দাদু, কোথায় গেলে ভাই?" কান দু'টি উৎকর্ণ হয়ে থাকে। কিন্তু সে ডাক শোনা যায় না। চুপি চুপি এক ফাঁকে উঁকি দিয়ে দেখে রামরতনবাবুকে। ওঁর মুখ দেখেই বুঝতে পারে নিমাই, ঠাকুর্দার রাগ পড়েনি। মুখখানা তেমনি ভীষণ হয়ে আছে। নিমাই বিহ্বল হয়ে পড়ে। রামবাবু উঠে

গেলে নলিনীর কাছে গিয়ে দাঁড়ায় কাঁদো কাঁদো মুখ করেঃ কি হবে মা! ঠাকুর্দা আজও কথা বললেন না!"

: কি করে বলবেন! তুই ক্ষমা চেয়েছিস্? যা পায়ে ধরে ক্ষমা চা!

নিমাই-এরও খাওয়া শোওয়ায় সুখ ঘুচে গেল। ফুট্‌ফুটে গোলগাল মুখখানিতে কত যেন চিন্তা ভাবনার ছাপ পড়ে গেছে। ওর আর সাড়া পাওয়া যায় না। বাড়ীর সকলে ব্যস্ত হয়ে উঠলেন, কিন্তু প্রতিবিধানের কোন উপায় খুঁজে পাওয়া গেল না।

হাতের গোলমালটা মিটে যাবার পরই রামরতনবাবু টের পেয়েছিলেন, একটা হঠকারিতা করে ফেলেছেন। ঘটনাটা আবার বাড়ী শুদ্ধ সবাই জেনে ফেলেছে। শুধু নিমাই আর তাঁর মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকলে যা হোক উপায়ে একটা মিটমাট করে ফেলতেন; কিন্তু এখন আর হয় না। একরোখা লোক রামবাবু। মাথায় জেদ চড়ে গেলে সহজে আর নামে না। অন্তরে যত দুর্বলতাই থাক, সেকথা প্রকাশ করবেন না কোনমতেই। তাঁর ঐ লোহার মত কঠিন আচরণ দেখে বাড়া শুদ্ধ সবাই ভয়ে কাঁপে। মুখ নীচু করে খেতে বসেন তিনি! তাকান না পর্যন্ত কারও পানে। স্ত্রী হয়ত জিজ্ঞাসা করছেনঃ হ্যাঁগো, কেমন হয়েছে, আরও একটু দিই!

রামবাবু জবাব দিচ্ছেন না। গম্ভীর মুখে খেয়ে চলেছেন। মনটা পড়ে আছে পিছন পানে। কখন এসে নিমাই গলা জড়িয়ে পিঠে বসবে। নাঃ নিমাই আসে না। ওর সাড়া পর্যন্ত পাওয়া যায় না। হয়ত কাছে পিঠে কোথাও দাঁড়িয়ে আছে। খাওয়ার শেষে ভাল জিনিবটুকু, অনেকখানি ফেলে রাখা অভ্যাস রামরতনবাবুর। সেই অভ্যাসবশে ফেলে রাখতে যান; কিন্তু সামলান পরমুহূর্তে। গলা দিয়ে খাবার যেন নামে না—আট্‌কে যায়। তবু কষ্টে স্বষ্টে মুখে পুরে ঢক ঢক করে জলের গেলাসটা শেষ করে উঠে পড়েন। সবাই চেয়ে দেখে কর্তা থালা পরিষ্কার করে খেয়ে উঠে যাচ্ছেন। রামরতনবাবু জানেন—চশমার খাপটা ঠিক জায়গাতেই আছে। কেউ সরায়নি ওটা। তবু আড়চোখে চেয়ে নিতে ভোলেন না। হাত ধুয়ে খাপটা কুড়িয়ে নিতে নিতে বড় একটা নিঃশ্বাস চেপে ফেলেন। বৈঠকখানা ঘরে গিয়ে কাজকর্মে মন লাগে না। কেমন উদাস উদাস ঠেকে। বিকালে বেড়াতে যান একটু—তাও বন্ধ করে দিয়েছেন আজকাল। সন্ধ্যার পরই আলো নিভিয়ে বিছানায় শুয়ে পড়েন। অথচ ঘুম আসে না আহারের পরও বহু রাত্রি পর্যন্ত। কত গল্পই না মনে পড়ে—সবাই ঘুমুলে আলো জেলে সেগুলো ডায়েরীতে লিখে রাখেন। দাদুর সঙ্গে ভাব হলে রাতের পর রাত ধরে শুনিয়ে দেবেন। সন্ধ্যে থেকে বিছানায় কান পেতে উৎকর্ণ হয়ে শুয়ে থাকেন রামরতনবাবু। যদি নিমাই-এর গলা শোনা যায়। কিন্তু রামরতনবাবুর কানে নিমাই-এর টুঁ শব্দটিও পৌছায় না। এত বড় লোকভর্তি বাড়ীটা যেন শ্মশান মনে হয় তাঁর।

নিমাই-এর সঙ্গে হৈ-হুল্লোড় হাসি-তামাসা করাটাই ছিল স্বাভাবিক ব্যাপার। এখন ঐটার চিন্তা পর্যন্ত অস্বাভাবিক ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছে। রামরতনবাবু নিমাই-এর কাছে যেন একটা বিভীষিকা। যদি কখনো মুখোমুখি পড়ে যায় নিমাই, ভয়ে কাঠ হয়ে দাঁড়িয়ে পড়ে। রামরতনবাবু অন্যমনস্কের মত পার হয়ে যান। নিমাই আড়চোখে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখে ঠাকুর্দার অপস্রিয়মান চেহারাটি। ঠাকুর্দা আজ কত দূরে!

আজকাল রামরতনবাবু ভাল কোন জিনিষ বাজার থেকে কিনে আনেন না সখ করে। সব সখ তাঁর মিটে গেছে। আঙ্গুর, বেদানা, আখরোট, কিসমিস, বাড়ী শুদ্ধ লোক যার ভাগ পেত, তা আজ পাবার উপায় নেই। ঠাকুমা বলেন, উনি কিনে এনে বাক্সের মধ্যে ভরে রাখেন। বের করেন না—নিজেও খাননা।

মায়ের শিক্ষায় নিমাই বার কয়েক চেষ্টা করলে, ঠাকুর্দার সঙ্গে আবার ভাব করবার। কাছে গিয়ে দাঁড়িয়েছে বৈঠকখানায়, শোবার ঘরের দরজার আড়ালে, খাবার সময় পিছনে; কিন্তু মুখ ফুটে সে কথা বলতে ভরসা পায়নি। তার দৃঢ় বিশ্বাস, দাদু কিছুতেই আর ভাব করবেন না। ধরে হয়ত ছুঁড়ে দেবেন উঠোনে। তেমনি শুকনো মুখ করে ফিরে এসে মায়ের কোলে মুখ লুকিয়েছে। বলেঃ মা তুমি শালগ্রামকে একটু বলে দাও না—ঠাকুর্দা যেন তাড়াতাড়ি ভাব করেন আমার সঙ্গে।

গ্রীষ্মের সন্ধ্যেবেলা। রামরতনবাবু কোথায় বেরিয়েছিলেন যেন। সমস্ত দুপুরের রোদটা মাথার উপর দিয়ে গেছে। ফিরে এসে একেবারে নেতিয়ে পড়েছেন। সবাই

সেবা হেপাজতে লেগেছিল। নিমাই-ও এসে বসেছিল চুপ করে এক পাশে। কোন কথাটি বলেনি। রামরতন-বাবু, তাকে দেখেছেন ; কিন্তু ধরে উঠোনে ছুঁড়ে দেননি, এইটুকু যা ভরসা। রামবাবু খানিকটা ঠাণ্ডা হতেই সবাই উঠে গেলেন। নলিনী যাবার সময় নিমাইকে ইসারা করে যান। যেন সে উঠে না পালায়। সুযোগ সুবিধা মত ক্ষমা চেয়ে নেয়। সবাই চলে গেছে ঠাকুরমা ছাড়া। আম-পোড়ার সরবৎ করে এনেছেন তিনি। আগে এই সরবৎ নিয়ে কত কাড়াকাড়িই না করত ঠাকুর্দার সঙ্গে। মনটা কেমন যেন করতে লাগল নিমাই-এর। ভাবলে উঠে পালায় সেখান থেকে। কিন্তু পারলে না। কাঠ হয়ে বসে রইল। বারান্দার সামনে আকাশে কতকগুলো তারা উঠেছে। নিমাই ওদের কতগুলোকে চেনে। ক্লাসের একটা ছেলেও জানে না। ওদের তো ঠাকুর্দা নেই। সপ্তর্ষিমণ্ডলটা ধ্রুব-তারাকে ঘিরে কেমন ঈশান কোণ থেকে বায়ু কোণে চলে যাচ্ছে। ঠাকুর্দা সব শিখিয়ে দিয়েছেন। আরও কত তারা চিনিয়ে দেবেন ; ঠাকুর্দা বলেছিলেন। কিন্তু তিনি আজ তারাদের চেয়েও বেশী অচেনা হয়ে গিয়েছেন।

রামরতনবাবু উঠে বসেছেন তার দিকে পিছন ফিরে। মাত্র দু'হাত তফাৎ। সরবতের খানিকটা খেয়ে গেলাসটা ঠাকুরমার পাশে এগিয়ে দিয়ে ঠাকুর্দা বলেন, ওকে দাও।

মানে নিমাইকে দিতে বলছেন ঠাকুর্দা। কেন ঠাকুর্দা কি নিজ হাতে দিতে পারতেন না। নিমাই-এর মনে হল, ঠাকুর্দা ভারী নিষ্ঠুর। অভিমানে চোখ দুটো জলে ভরে আসে। কিন্তু পাছে ঠাকুর্দা দেখতে পান, সেই ভয়ে মুছতে পর্যন্ত সাহস পায় না। সরবতের গেলাসটা তেমনি পড়ে রইল সামনে। নিমাই ছলছল মন নিয়ে বসে থাকে। রামরতনবাবু আবার শুয়ে পড়েছেন। নিমাই আছে, কি নেই সেদিকে তাঁর কোন গ্রাহ্যই নেই। ঠাকুমা বাসন-পত্তর রেখে আবার ফিরে এসে দেখলেন। নিমাই সরবতের গ্লাসটা ছোঁয়নি পর্যন্ত। বললেন : দাদুভাই, সরবতটুকু খেয়ে নাও।

প্রচণ্ড রাগ নিয়ে ফেটে পড়ল নিমাই : না…না…না …খাবো না…আমাকে কি হ্যাংলা ভিখিরি পেয়েছো যে খাবো!

ঠাকুমা মুচকে হাসেন। রামরতনবাবু একটু নড়ে-চড়ে শুলেন। নিমাই-এর বাপ কাজ সেরে বাড়ী ফেরেন এ সময় : কি-রে নিমাই, সন্ধ্যে হয়ে গেছে। এখনও পড়তে বসিস্‌নি কেন ?

ঠাকুমা বললেন : পড়বে কি ! ও ঠাকুর্দার কাছে ক্ষমা চাইবার জন্যে বসে আছে।

রামরতনবাবু ধড়ফড়িয়ে উঠে বসে তাকালেন নিমাই-য়ের পানে। নিমাই এবার উর্ধ্বশ্বাসে ছুটে পালায় বাড়ীর ভিতর। কিন্তু নলিনী টানতে টানতে নিয়ে আসেন ওকে। নিমাই কাঁদতে কাঁদতে ঝুলোঝুলি করছে পালাবার জন্যে ; ঠাকুর্দা কিছুতেই ক্ষমা করবে না—তুমি জান না মা! ঠাকুর্দা ভারী নিষ্ঠুর। কতবার তো মনে মনে বলেছি আমি! হেই মা, তোমার পায়ে পড়ি, ছেড়ে দাও—ঠাকুর্দা কিছুতেই ক্ষমা করবে না।

রামরতনবাবু দু'হাত বাড়িয়ে ডাকলেন : দাদু, দাদু ! এসো ভাই !

নিমাই কান্না বন্ধ করে দুটো চোখ বড় বড় করে দেখলে —যেন বিশ্বাস করতে পারছে না চোখ কানকে। ঠাকুর্দা সত্যিই যে, কোলে নেবার জন্যে দু'হাত বাড়িয়েছেন। তারপর ছুটে এসে পড়ল রামরতনবাবুর কোলে মুখ গুঁজে : ঠাকুর্দা, আর আমি কখনো করব না !

রামরতনবাবু তাকে বুকের মধ্যে নিবিড় করে ধরে বললেন : বৌমা ! আমার বাক্সে কি আছে নিয়ে এসো তো দেখি ! শালার অনেকদিন নাক-কান মলা হয়নি…

চারুচন্দ্র রায়

শ্রীবিমলেন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়

ফরাসী চন্দননগরের বিশিষ্ট নাগরিক চারুচন্দ্র রায় নানা কারণের সমবায়ে ইতিহাসে উজ্জ্বল স্থান অধিকার করিয়াছেন। তিনি পণ্ডিত, সুলেখক, সুবক্তা, সুরসিক, সুশাসক ও স্বাধীনচেতা ব্যক্তি ছিলেন। চন্দননগরের যুবকদের মধ্যে বিপ্লব চিন্তার উদ্বোধক ছিলেন তিনি।

চারুবাবুর প্রথম লেখা 'বাঁশীর ডাক' প্রবন্ধটি স্বর্গীয় সখারাম গণেশ দেউস্করের সহ-সম্পাদিত হিতবাদীতে প্রকাশিত হয়। এই লেখার পর হইতে নানা বিষয়ে তাঁহার রচনা প্রকাশিত হইতে থাকে। সখারাম গণেশ দেউস্কর মহাশয়ের মাধ্যমে তিনি সাহিত্য-সম্পাদক ৺সুরেশচন্দ্র সমাজপতির সহিত পরিচিত হন। সাহিত্য পত্রিকায় তাঁহার প্রথম ছোট গল্প 'কালনিদ্রা' প্রকাশিত হয়।

সখারামবাবুর পরামর্শে চারুবাবু বাংলাদেশে ফরাসীদের কীর্ত্তি লইয়া গবেষণা আরম্ভ করেন ও মূল দলিল অনুসন্ধান করিয়া কয়েকটি মূল্যবান প্রবন্ধ রচনা করেন।

প্রাচীন ভারতের সাহিত্যে এমন বহু নগর, জনপদ, নদনদীর উল্লেখ পাওয়া যায়—যে সবের বর্তমান অবস্থান জানিবার মত কোন নির্ভরযোগ্য পুস্তক ছিল না। চারুবাবু বহু অনুসন্ধান করিয়া এ সব সংগ্রহ করিয়াছিলেন এবং পাণ্ডুলিপিটি পরীক্ষার জন্য সাহিত্য পরিষদে পাঠাইয়াছিলেন, কিন্তু তাহা আর ফিরিয়া পান নাই। সাহিত্য পরিষদ ও উহার কোন সদ্ব্যবহার করেন নাই।

বাংলা ভাষায় প্রকাশিত সমস্ত গ্রন্থের card index তিনি বহু পরিশ্রম ও অর্থব্যয় করিয়া প্রস্তুত করেন, অর্থাভাবে তাহা এখনও অপ্রকাশিত আছে। তাঁহার শ্রেষ্ঠ সাহিত্য-সৃষ্টি 'কমলাকান্তের পত্র', ভুয়োদর্শন, সাহিত্য জ্ঞান, সূক্ষ্মবোধ প্রভৃতি গুণে বাংলা ভাষার একটি অমূল্য রত্ন। কমলাকান্তের প্রথম পত্রটি প্রকাশিত হয় ৺ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায়ের সন্ধ্যার এক পূজা সংখ্যায়। কমলাকান্তের দ্বিতীয় পত্র 'বিজয়া' প্রকাশিত হইয়াছিল শ্রীযুক্ত বসন্তকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত 'নিবন্ধ' পত্রিকায়। পরে অনেকগুলি প্রকাশিত হয় উপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'আত্মশক্তিতে'। দু'একটি প্রবাসী ও বঙ্গশ্রীতে।

চারুবাবুর লেখা দুখানা ছোটগল্পের বই 'কাল নিদ্রা' ও 'ষট্পদ'।' এই গল্পগুলির মধ্যে আন্তরিকতার সুর ফুটিয়া উঠিয়াছে। কতকগুলি প্রবন্ধ একত্র করিয়া 'ন্যাকামি' নাম দিয়া পুস্তকাকারে বাহির করিবেন বলিয়া স্থির করেন। সাধারণ জীবনের কার্য্যে ও চিন্তায় যে ন্যাকামি তিনি দেখিয়াছেন তাহাই এই শ্রেণীর প্রবন্ধের বিষয়বস্তু।

চারুবাবু প্রায় বলিতেন—যখন যা পড়েছি ও ভেবেছি তার সঙ্গে আমার দেশের ও সমাজের কি সম্পর্ক তাই আমার কাছে প্রধান হয়ে উঠেছে। তাই সমালোচনা, রসরচনা, প্রবন্ধ ও গল্পের মধ্যে সুর ফুটিয়ে জীবনকে সাহিত্যের সঙ্গে বেঁধে দিয়েছি।

চারুবাবুর শেষ লেখা শরৎচন্দ্র সম্বন্ধে অসম্পূর্ণ সমালোচনা গ্রন্থ। তিনি বলিয়াছিলেন তাঁহার এই গ্রন্থ পাঁচ ছয়শত পৃষ্ঠার কাছা-কাছি যাইবে। এজন্য তাঁহাকে তথ্য সংগ্রহ ও নানা বিষয়ে পড়াশুনা করিতে হয়। মৃত্যুর পূর্বে তিনি বলিয়াছিলেন—'চার বছর পরিশ্রম করে আমি এই গ্রন্থ শেষ করে এনেছি, কেবল বিভিন্ন পরিচ্ছেদগুলোকে গুছিয়ে একটা যোগসূত্র করে দিতে হবে।' ইহারই এক অংশ তাঁহার মৃত্যুর পর 'শেষ প্রশ্ন' নামে প্রকাশিত হয়। ইহা ছাড়াও তিনি ছেলেদের ইংরাজী শিক্ষার জন্য Red Reader নামে একখানি চমৎকার বই লিখিয়াছিলেন। ইবসেন, গোর্কি, বার্ণাড শ, গলসওয়ার্দি, রবীন্দ্রনাথ ও শরৎচন্দ্রকে আদর্শ বলিয়া মনে করিতেন। ইংরাজীতে তাঁহার জ্ঞান ছিল গভীর। কলেজে ইংরেজ অধ্যাপকের কাছে তিনি ইংরাজী পড়িয়াছিলেন। তাঁহার খবরের কাগজে লেখা বা ব্যক্তিবিশেষকে লেখা চিঠি অসংখ্য আছে। রবীন্দ্রনাথ, গান্ধীজি, জহরলাল ও সুভাষচন্দ্রকে লিখিত পত্রগুলি সত্যই সুন্দর।

লক্ষ্ণৌএ পড়িবার সময় দুইজন সহপাঠীর সাহায্যে 'বেঙ্গলী ইয়ং মেন্স এসোসিয়েশন' ও 'বিদ্যাসাগর পুস্তকালয়' প্রতিষ্ঠা করেন। এক্ষণে ঐ দুইটি প্রতিষ্ঠান নিজ গৃহে স্ফীত কলেবরে বিরাজ করিতেছে।

লক্ষ্ণৌএ অধ্যয়নকাল চারুবাবু চন্দননগরের জন্য বিশেষ আকর্ষণ অনুভব করিতেন। একবার পিতা ছুটীর সময় চন্দননগর আগমন নিষেধ করায় তিনি চন্দননগর দর্শনের জন্য প্রাণ বিসর্জ্জন দিতে চাহিয়াছিলেন।

উর্দ্দীবাজারে অবস্থান কালে চন্দননগর পুস্তকাগারের হীন অবস্থায় চারুবাবু শতাধিক টাকা সংগ্রহ করিয়া ঋণ পরিশোধ করেন। তিনি পুস্তকাগারে সেই সময় স্বতন্ত্র চাঁদার বিনিময়ে সারকুলেটিং লাইব্রেরীর প্রথাক্রমে সভ্যদের বাড়িতে ম্যাগাজিন দিবার ব্যবস্থা করেন। তিনি তখন ছিলেন পুস্তকাগারের সহকারী সম্পাদক। পরে পুস্তকাগারটি হরিহর শেঠ মহাশয়ের প্রতিষ্ঠিত নৃত্যগোপাল স্মৃতি মন্দিরে স্থায়ী স্থান নির্দ্দিষ্ট হয়।

বুদ্ধ ও বৌদ্ধদের কীর্ত্তির উপর তাঁহার অতীব অনুরাগ ছিল। ভারতীয় ভাস্কর্য্যের উপর অনুরাগের ফলেই তিনি রমাপ্রসাদ চন্দ, রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, বেণীমাধব বড়ুয়ার বিশিষ্ট বন্ধু ছিলেন। তাঁহারই নিমন্ত্রণে রাখালবাবু চন্দননগরে আসিয়া মহেঞ্জোদাড়োর সভ্যতা সম্বন্ধে অপূর্ব্ব বক্তৃতা করিয়া যান।

বুদ্ধদেবকে আদর্শ পুরুষ এবং বৌদ্ধযুগকে ভারতের আদর্শ যুগ

বলিয়া তাঁহার দৃঢ় ধারণা ছিল। সেই যুগের পরিচায়ক কোন চিহ্ন পাইলেই তিনি উৎফুল্ল হইয়া উঠিতেন এবং মাঝে মাঝে বিভিন্ন সংগ্রহাগারে যাইয়া স্মৃতিচিহ্নগুলি দেখিয়া আসিতেন। তাঁহারই উৎসাহে চন্দননগরে আর্টস্কুল সৃষ্টি হয়।

চারুবাবু ছিলেন আদর্শ শিক্ষক। ১৮৯৫ খৃষ্টাব্দে সেন্টমেরী ইনিষ্টিটিউসনে বা বর্তমানে 'চন্দননগর কলেজে' প্রথম অধ্যাপক হিসাবে কার্য্য শুরু করেন। ইংরাজী সাহিত্যের শিক্ষক হিসাবে কলেজে তাঁহার যথেষ্ট সুখ্যাতি ছিল। তিনি কেবল পড়াইবার জন্য পড়াইতেন না। প্রত্যেকটি ছাত্র যাহাতে এক একজন পণ্ডিত (Scholar) হইতে পারে সেইদিকে তাঁহার লক্ষ্য ছিল। কিন্তু সর্ব্বাপেক্ষা মনোজ্ঞ বস্তু ছিল তাঁহার নিজস্ব একটা দৃষ্টিভঙ্গি। ছাত্রদের জীবন গড়া ছিল তাঁহার শিক্ষার একটা অঙ্গ।

বিপ্লবী কানাইলাল ও উপেন্দ্রনাথ ছিলেন তাঁহার ছাত্র। ১৯০৮ খৃষ্টাব্দে আলিপুর বোমা মামলায় তিনি জড়াইয়া পড়েন। উপেন্দ্রনাথ তাঁহার 'নির্ব্বাসিতের আত্মকথা' পুস্তকে লিখিয়াছেন,—আমাদের বাগানে একখানা নোটবুকে একটা নাম লেখা ছিল চারুচন্দ্র রায়-চৌধুরী। খুলনার ইন্দুভূষণকে আমরা চারু বলিয়া ডাকিতাম। পুলিশ তাহা না জানিয়া চারুচন্দ্র রায়চৌধুরীকে খুঁজিয়া বেড়াইতে লাগিল। শেষে স্থির করিল যে চন্দননগরে ডুপ্লে কলেজের অধ্যাপক শ্রীযুক্ত চারুচন্দ্র রায়ই ঐ চারুচন্দ্র রায়চৌধুরী। চারুবাবুর বোধহয় অপরাধ যে কানাইলাল দত্ত ও আমি উভয়েই তাঁহার ছাত্র ও আমাদের বাড়ী চন্দননগর। যাঁহার ছাত্রেরা এমন রাজদ্রোহী তিনি রায়ই হোন, আর রায়চৌধুরীই হোন তাহাতে কি আসিয়া যায়? তাঁহাকেও ধরিতেই হইবে! এই মোকদ্দমা হইতে মুক্তিলাভ করিয়া চারুবাবু দেখিলেন ফরাসী ডিরেক্টর হাসপুঁদাস পণ্ডিচারিতে শিক্ষাসচিব ও গভর্ণর বাহাদুরকে লিখিয়া কলেজ ক্লাসগুলি উঠাইয়া দিয়াছেন। ১৯৩১ সালে নূতন গৃহে নূতন সম্ভাবনা লইয়া চারুবাবু কলেজ প্রতিষ্ঠা করিলেন।

চারুবাবু জাতিভেদ মানিতেন না। মানুষ মাত্রই নারায়ণ। বংশগত জাতিভেদ মানুষের সৃষ্টি। ইহাই ছিল তাঁহার মনের কথা। তিনি অল্পবয়স হইতেই পিতার ভিন্নজাতীয় বন্ধুদের গৃহে যাইয়া অন্নগ্রহণ করিতেন। এমন কি হিন্দুমুসলমানের বৈবাহিক মিলন পর্য্যন্ত সমাজের কল্যাণকর বলিয়া মনে করিতেন। ধর্ম্মসম্প্রদায়গত বাধাকে তিনি কখনও শ্রদ্ধার চক্ষে দেখেন নাই। মনুষ্যত্ব দিয়াই তিনি মানুষকে বিচার করিবার পক্ষপাতী ছিলেন। বিধবা বিবাহের তিনি পক্ষপাতী ছিলেন। অসবর্ণ বিবাহে তাঁহার সমর্থন ছিল।

নাট্যসাহিত্যে ও অভিনয় বিষয়ে চারুবাবুর গভীর অনুরাগ ছিল। তিনি নিজেও ভাল অভিনয় করিতে পারিতেন। সেক্সপিয়র ও গিরিশ ঘোষ এই দুই নাট্যকারকে তিনি বিশেষ শ্রদ্ধা করিতেন।

চারুবাবুর আদর্শ ছিল সৈনিক বিভাগে বাঙ্গালী যুবকদিগকে পাঠাইয়া বাঙ্গালীর মধ্যে সৈনিকবুদ্ধি অনুপ্রবিষ্ট করিয়া দেওয়া। বাঙ্গালী যে কাহারও অপেক্ষা যুদ্ধবিদ্যায় ও সাহসিকতায় কম নহে—সেই আত্মবোধ জাগাইয়া তোলা। যুদ্ধযাত্রায় কৃতসংকল্প হইয়া সিদ্ধেশ্বর মল্লিক ও নরেন্দ্র সরকার তাঁহার নিকট মনোভাব ব্যক্ত করিলে চারুবাবু আনন্দের সঙ্গে তাহাতে মত দেন এবং সিদ্ধেশ্বর মল্লিকের যোগদানে আইনগত যে বাধা ছিল তাহা দূর করিয়া দেন। অসামরিক জাতি বলিয়া বাঙ্গালীর যে অখ্যাতি ছিল তাহা যে সত্য-প্রতিষ্ঠিত নহে তাহা প্রমাণ করিবার সুযোগ পাইবামাত্র তিনি চন্দননগরের যুবকদিগকে লইয়া স্বেচ্ছাসৈনিক বাহিনী গঠন করেন ও তাহাদিগকে চন্দননগরের নরনারী সকলের আশীর্ব্বাদ-পূত করিয়া অগ্রদূতস্বরূপে এক শোভাযাত্রা করিয়া যুদ্ধক্ষেত্রে পাঠান।

শ্রীঅরবিন্দ চারুবাবুকে খুব শ্রদ্ধা করিতেন। তিনি ১৯০৩।৪ খৃষ্টাব্দে দুইবার তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে চন্দননগরে আসেন। পরে আশ্রয়প্রার্থী হইয়া অরবিন্দ চন্দননগরে আসিলে চারুবাবু তাঁহাকে স্বগৃহে আশ্রয় দেন নাই বলিয়া তাঁহার এক অখ্যাতি আছে। সকল দিক বিবেচনা করিলে বোঝা যাইবে যে সে সময় তাঁহার পক্ষে অরবিন্দকে আশ্রয় দেওয়া একেবারেই অসম্ভব ছিল। তাঁহার ভগ্নগৃহে একতো স্থানাভাব ছিল। দ্বিতীয় সে গৃহ এমনভাবে অবস্থিত যে তাহাতে কোন ব্যক্তিকে লুকাইয়া রাখা অসম্ভব ছিল। তার উপর তাঁহার আর্থিক অবস্থা তখন এমন শোচনীয় ছিল যে তাঁহার পরিজনবর্গের শাকান্ন জোটানো তাঁহার পক্ষে অতিকষ্টকর ছিল।

১৯১০ সালে চারুবাবুর নেতৃত্বে চন্দননগরে একটি সারস্বত উৎসব হয়। তৎকালীন যুবকেরা এই উৎসবের ভিতর দিয়া আত্মপরিচয় ও দেশ-পরিচয় লাভ করিবার সুযোগ পাইয়াছিলেন। সরস্বতী পূজা উপলক্ষে সারস্বত উৎসব হইত। চিত্রশিল্পী রবিবর্ম্মার সরস্বতী চিত্রটির অনুকরণে সরস্বতীর মৃণ্ময়ী প্রতিমা নির্ম্মিত হইত। পূজা মণ্ডপের চারিদিকে বঙ্গ-ভারতীর শ্রেষ্ঠ সাধকদিগের মৃন্ময় আবক্ষ মূর্ত্তি রক্ষিত হইত।

চন্দননগরের রাজনৈতিক জীবনের সঙ্গে তাঁহার ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ বরাবরই ছিল। শেষ জীবনে তিনি 'কঁসেই জেনারেল' হইয়া পণ্ডিচারীর ব্যবস্থাপক সভার সভ্য হইয়াছিলেন। ফরাসী ভারতে দুই শ্রেণীর নাগরিক ছিল। একশ্রেণী ছিল ফরাসী ও স্বসমাজ ত্যাগী (রেনোসাঁ) দিগকে লইয়া গঠিত, আর বাকী সকলকে লইয়া গঠিত ছিল দ্বিতীয় দল। প্রতি দলে প্রতিনিধি ছিল শতকরা পঞ্চাশ অর্থাৎ মুষ্টিমেয় প্রথম দল অসংখ্য দেশী লোকের সমান অধিকার ভোগ করিত। এই বৈসাদৃশ্য চন্দননগরবাসীরা বরাবরই অন্যায় বলিয়া বিবেচনা করিয়াছে এবং প্রতিবাদ করিতে থাকে। চারুবাবু সভ্য থাকার কালে প্রতিবাদ-তীব্রতা এমন বৃদ্ধি পায় যে ফরাসী সরকার চন্দননগরবাসীদের সঙ্গে একটা আপোষ মীমাংসা করিতে বাধ্য হন—যার ফলে চন্দননগরের অধিবাসীদের প্রত্যেকের জাতিবর্ণনির্বিশেষে সমান ভোটাধিকার জন্মে।

মেয়র হিসাবে তিনি দল নিরপেক্ষ ছিলেন। সকল দলের লোককে তিনি সমমর্য্যাদা দিতেন। সামান্য কুলি মজুরকে পর্য্যন্ত তিনি কাছে বসাইয়া অভিযোগ শুনিতেন এবং তাহারা লিখিতে না পারিলে তাঁহার সেক্রেটারীকে দিয়া অভিযোগ লেখাইয়া লইবার ব্যবস্থা করিতেন। তিনি

মৌখিক অভিযোগের পক্ষপাতী ছিলেন না। লিখিত অভিযোগের উপর তিনি অর্ডার দিতেন, সেই অর্ডার অনুযায়ী যাহাতে সত্বর কাজ হয় তাহা লক্ষ্য রাখিতেন। কর্মচারীদের রিপোর্ট অভিযোক্তার মনোমত না হইলে তিনি নিজে গিয়া তদন্ত করিতেন।

সারা শহরটাকে একটা ইউনিটরূপে ধারণা করিবার জন্য এবং সেই অনুসারে কাজ করিবার জন্য কমিশনারদিগকে উদ্বুদ্ধ করিয়াছিলেন। মাঝে মাঝে সকলকে লইয়া শহরের অবস্থা দেখিবার জন্য বাহির হইতেন। শহরের যেখানে সংস্কার বেশী আবশ্যক বলিয়া বিবেচনা করিতেন পল্লী নির্বিশেষে সেইখানেই সংস্কারের ব্যবস্থা করিতেন। সমস্ত শহরটিকে তিনি নখদর্পণে রাখিয়াছিলেন। তাঁহার সময় দুটি ঘটনা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য—প্রথম কলেজ পুনঃস্থাপন, দ্বিতীয়, চট্টগ্রামের বিপ্লবীদের উপর ব্রিটিশদের যে অত্যাচার হইয়াছিল তাহা উপলক্ষ করিয়া অনুরূপ অত্যাচারের পথ রুদ্ধ করিবার জন্য ফরাসী সরকারকে বাধ্য করা। ক্ষুব্ধ চন্দননগরবাসীদিগকে শান্ত করিবার জন্য গভর্ণমেণ্টকে পণ্ডিচারী হইতে চন্দননগরে আসিতে হইয়াছিল এবং তাঁহাকে এইরূপ প্রতিশ্রুতি দিতে হইয়াছিল যে অতঃপর গভর্ণর বৎসরে অন্ততঃ একবার চন্দননগরে আসিয়া শহরবাসীর অভাব অভিযোগ শুনিয়া উপযুক্ত ব্যবস্থা করিতে থাকিবেন। বিপ্লবী মাখন ঘোষালের হত্যার পর ক্রুদ্ধ শহরবাসীরা যাহাতে উচ্ছৃঙ্খল হইয়া না ওঠে তাহার জন্য তিনি নিজে তাহাদের নেতৃত্ব লইয়া শোভাযাত্রা করিয়াছিলেন। বন্দী বিপ্লবীরা যাহাতে ইংরাজের হাতে আত্মসমর্পণ না করিয়া ফরাসী বিচার মানিয়া লইতে স্বীকৃত হয় সেইজন্য তিনি শহরের প্রধান ম্যাজিষ্ট্রেট হিসাবে চেষ্টা করিয়াছিলেন। ফরাসী বিধান অনুসারে তৎকালে মেয়র প্রধান ম্যাজিষ্ট্রেট বলিয়া গণ্য হইয়াছিলেন। বন্দীরা ইংরাজের বিচারাধীন হইবার জন্য মত প্রকাশ করায় ফরাসী সরকার তাহাদিগকে ইংরাজের হাতে সমর্পণ করিতে বাধ্য হয়।

চারুবাবু যাহা সংগত বলিয়া বিবেচনা করিতেন সকলের মতামত উপেক্ষা করিয়া তাহা কার্যে পরিণত করিতে চেষ্টা পাইতেন। তাঁর এই মনোভাবের জন্য তিনি তাঁর সত্যকার শুভার্থীদের অনেকেরই মনোভঙ্গের কারণ হইয়াছিলেন। তথাপি স্বীকার্য্য যে, যে কয়জন ব্যক্তির জন্য চন্দননগরের বিশিষ্টতা চারুবাবু তাহাদের অন্যতম ছিলেন। তাঁহার ব্যক্তিত্বই তাঁকে মহনীয় করিয়া তুলিয়াছিল।

চারুবাবু ছিলেন লোকোত্তর পুরুষ। বাহির হইতে তাঁহাকে গম্ভীর বলিয়া মনে হইত। কিন্তু তাঁহার অন্তর ছিল কোমল।

অরুণচন্দ্র দত্ত লিখিয়াছেন—৪০ বছর পূর্ব্বের কথা। তখন আমার বয়স খুব ছোট। আমার দাদা ৺কানাইলাল দত্তের কাছে একখানি কাগজ আসত। ৺ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায়ের "স্বরাজ"—একখানি সাপ্তাহিক পত্রিকা। তার প্রতি সংখ্যায় একটি ছবি অঙ্কিত থাকত—ছত্রপতি মহারাজা শিবাজির। একদিন আমাদের বৈঠকখানায় একজন এলেন—যাঁকে দেখতে অবিকল সেই ছবিখানির মত। তেমনি উন্নত, প্রদীপ্ত ললাট, গরুড় নাসিকা। সমুজ্জল চক্ষু—মুখ মণ্ডলের কাট-ছাঁট যেন ঠিক একই, অবিকল ছত্রপতি যেন নবদেহ পরিগ্রহ করে আবার সশরীরে উপস্থিত। জিজ্ঞাসা করে জানলাম—ইনিই চারুচন্দ্র রায়—সর্ব্বপরিচিত শ্রদ্ধেয় মাষ্টার মশাই।

গতি বেগে

শ্রীনীহাররঞ্জন সিংহ

চঞ্চল রেখো গতিপথ চির অব্যাহত!
সমুখে যে আসে পশ্চাতে যাবে স্বপ্ন মত।
দূরে দূরে আরো দূরে দূরে চাও,
যেথানে নিলীমা নিলীমে উধাও,
অদেখা অসীম সসীমে ফুটাবে দীপ্তি যত।
ছুটেচলা-বেগ সমুখে রাখিও অব্যাহত।

কোথাও মরীচি বালু প্রান্তর মরুস্থানে,
কোথাও সুজলা শস্য শ্যামলা দৃশ্য আনে,
নদী বুকে কভু স্রোত বয়ে যায়,
কভু হিমগিরি ঝর্ণা নামায়,
কভু বা জলধি গর্জিয়া উঠে তোমার গানে;
তুমি যাবে চির এদের ভেদিয়া দূরের পানে।

পথ-অনন্ত হবে না তো শেষ, জানি তা জানি;
তোমার চলার গতি হবে শেষ, সে কথা জানি।
দূরকে কখনো যায় না তো পাওয়া,
অপাওয়ার মাঝে শুধু চেয়ে যাওয়া,
তবু এই চাওয়া, এই ছুটে যাওয়া—জীবন ব্রত!
এ ব্রত-যজ্ঞ সাগ্নিক হোক, অব্যাহত?
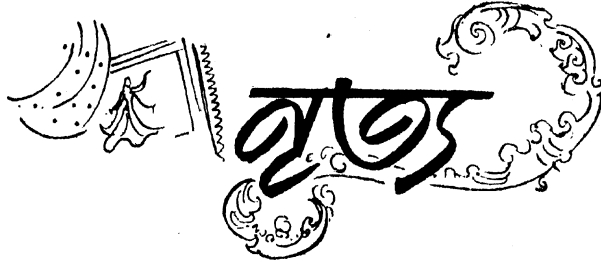
ভারতীয় নৃত্যে পাশ্চাত্য নর্তকী

স্বর্ণকমল ভট্টাচার্য

নৃত্যের দেশ ভারত। পথে, ঘাটে, ভিড়ে ভারতের সাধারণ মানুষের আচরণে, তাদের চলা-বলা, দাঁড়ানোর মধ্যে রয়েছে এমন ছন্দ, এমন রূপ, এমন মাধুর্য যে শিল্পী তার মধ্যে থেকে বেছে নিয়ে যে কোন দৃশ্যকে নৃত্যের মধ্যে রূপ দিতে পারেন, রচনা করতে পারেন একটা ব্যালে। এ কথা বলেছেন উদয়শংকর। শুধু ভারতীয় জীবনের দৃশ্যাবলীই নয়, ভারতের অতীত ইতিহাসে ও ভাবধারায় রয়েছে যে হাজার হাজার বছর ধরে সঞ্চিত ঐশ্বর্য, রয়েছে নৃত্যের স্পন্দন, তার দিকে যে শিল্পী চিত্ত-নিবেশ করবেন, তিনিই পাবেন পুলক নর্তনের উৎস-সন্ধান —যে নর্তনের মধ্য দিয়ে প্রাচীন ভারতের পুরুষ-নারী, হৃদয়ের অনুভূতিকে প্রকাশ করেছে, আনন্দে শিহরিত হয়েছে, আধ্যাত্মিক অনুপ্রেরণাকে রূপ দিয়েছে, দর্শন ও ভাবধারাকে মূর্ত করে তুলেছে। ভারতীয় নৃত্যের এই দার্শনিক ভাবধারা, এই 'মিষ্টিক্' অনুভূতি সমগ্র প্রাচ্যকেই শুধু অনুপ্রাণীত করে নি—পাশ্চাত্য জগতেও
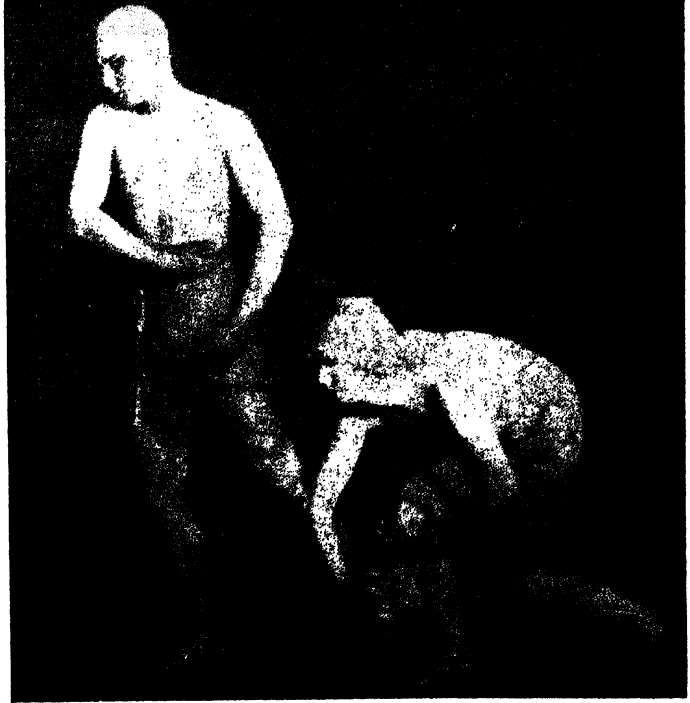
বীজবপন নৃত্যে রুথ্ ডেনিস্ ও টেড্ সন্।

এনেছে আলোড়ন, দিয়েছে প্রেরণা ওদেশের, ঐ নূতন জগতের নর্ত্তক-নর্ত্তকীদের মনেও।

বিংশ শতাব্দীর প্রথম দশকে অ্যামেরিকার তরুণ নর্তকী রুথ্ ডেনিস্ ভারতের দর্শন ও নৃত্য-মহিমায় আকৃষ্ট হন, উদ্বুদ্ধ হন। ভারতীয় নৃত্যের ছন্দে রচনা করেন রাই-উন্মাদিনী নৃত্য। তাঁর 'রাধা' নৃত্য অ্যামেরিকাবাসীদের মধ্যে সৃষ্টি করল আলোড়ন, আর ইউরোপীয়দের মধ্যে বিস্ময়। দেবী রাধারূপে তিনি পূজা পেলেন। তার পরে তিনি হিন্দু নাট্যের অনুসরণে আরও নৃত্য রচনা করেন। সে সকলও পাশ্চাত্য জগতে বিশেষ সমাদর লাভ করে।

রাশিয়ার উর্ব্বশী আনা পাব্‌লোভা

প্রাচীন যুগের প্রস্তর মূর্তিতে ও চিত্রে ভারতীয় নৃত্যের রূপ দেখে অনুপ্রেরণা পান বিশ্ব-বিখ্যাত রাশিয়ান নর্তকী আনা পাব্‌লোভা। পৃথিবী ভ্রমণ করতে করতে তিনি অজন্তা-ইলোরায় এসে উপস্থিত হন। বিস্মিত হন প্রাচীন ভারতের ঐশ্বর্য দেখে, মাধুরিমা দেখে, নৃত্যের যে মাধুরিমা ফুটে উঠেছিল অতীত ভারতের গুহানিহিত শিল্পে। এ শিল্পে তাঁর প্রাণে জাগাল নৃত্যের আবেগ, অন্তরে দোলা লাগাল এক অজ্ঞানিত পূর্ব ছন্দ। অধীর হয়ে উঠলেন তিনি এই ছন্দ-তালে নাচার দুর্দম্য আগ্রহে। কিন্তু এ কার্যে তাঁকে সাহায্য করবে কে? লণ্ডনে তাঁর সংগে দেখা হল শিল্পী উদয়শংকরের। তাঁকেই তিনি নৃত্যসঙ্গী করে নিলেন তাঁর অনবদ্য রাধাকৃষ্ণ নৃত্যে। উদয়শংরকে দলে নিয়ে তিনি ১৯২৩ সালে বিশ্বজয়ে বার হ'ন। সমগ্র পাশ্চাত্য জগত স্তম্ভিত হয় সেই নৃত্য দেখে। ভারতীয় নৃত্যে পাব্‌লোভার আগ্রহই সমগ্র পাশ্চাত্য জগতের ঔৎসুক্য জাগিয়ে তুলল। তার বিশেষ কারণ, পাভলোভা ছিলেন ব্যালে নৃত্যে বিশ্বের শ্রেষ্ঠ নর্তকী।

পাব্‌লোভার হিন্দু-নৃত্য ইউরোপ ও অ্যামেরিকার দর্শকদের দিল প্রকৃত ভারতীয় নৃত্যের আস্বাদন। মুগ্ধ হ'লেন সকলে, অনুপ্রাণিত হ'লেন কয়েকজন। সেই কয়েক জনের মধ্যে অ্যামেরিকার তরুণ নর্তকী লা মেরীর নাম বিশেষ করে উল্লেখযোগ্য। তিনি এমনি গভীরভাবে অনুপ্রাণিত হলেন যে ভারতীয় নৃত্য শিক্ষা করার জন্য ভারতে চলে এলেন। সাত বছর নৃত্য শিক্ষা করলেন। লক্ষ্ণৌএতে রামদত্ত মিশ্রের কাছে শিখলেন কথক নৃত্যের রহস্য, আর মাদ্রাজে শ্রীমতী গৌরীর কাছে ভরত নাট্যমের

মুদ্রা-কলা-কৌশল। ভারতে প্রায় সকল নৃত্যেই তিনি দক্ষতালাভ করলেন।

লা-মেরী আজিকার জগতের একজন শ্রেষ্ঠ নর্তকী। তিনি পৃথিবীর সব দেশে, ভারতবর্ষ, জাভা, বর্মা, শ্যাম, আরব, মরক্কো, চীন, জাপান, হাওয়াই, স্পেন, মেক্সিকো, পেরু, পানামা, চাইল, আর্জেন্টিনা, ভেনিজুয়েলা, কলম্বিয়া, প্রভৃতি প্রত্যেক জায়গায় নৃত্য শিক্ষা করেছেন, দক্ষতা লাভ করেছেন। তাঁর সে দক্ষতা দেখে ডঃ ফেলিক্স ক্লিভ্ অবাক হয়ে বলেছিলেন, পৃথিবীর কোথাও আর এমনটি নেই, পৃথিবীর সকল রকম নৃত্যের সম্বন্ধে এমন অসমান্য জ্ঞান সম্পন্ন নর্তকীর কথা কোন ইতিহাসে লেখা নেই। শুধু প্রত্যেক নৃত্যের জ্ঞানেই নয়, প্রত্যেক নৃত্যের শিল্পীজনোচিত পরিবেশনেও এমন পারদর্শিতা কেউ দেখাতে পারেন নি। এমন বিচিত্র প্রতিভাশালিনী নর্তকী অতীতে কখনও জন্মায় নি, এখনও কেউ নেই, একথা বললে অত্যুক্তি করা হবে না।

কিন্তু তবু বলতে হবে ভারতীয় ও স্পেনীয় নৃত্যেই লা-মেরীর দক্ষতা বেশী প্রস্ফুটিত হয়েছে। এই দুই শ্রেণীর নৃত্যের প্রতিই লা-মেরীর সবচেয়ে বেশী অনুরাগ। তাঁর রচিত "The Gesture Language of Hindu Dance," ১৯৪২ সালে ও "Spanish Dancing" ১৯৪৮ সালে প্রকাশিত হয়। এই দুই দেশের নৃত্যের প্রতি গভীর আগ্রহ দেখে অ্যামেরিকার বিখ্যাত নৃত্য-সমালোচক ওয়ালটর টেরী এক গভীর সত্যের সন্ধান পেয়েছেন। তিনি মনে করেন, এই দুই দেশের নৃত্যের প্রতি লা-মেরীর গভীর অনুরাগ একটা আকস্মিক ঘটনা নয়। এ-কথা কেউ অস্বীকার করতে পারবেন না, এই দুই দেশের মত বিচিত্র রকমের নৃত্য কোন দেশই সৃষ্টি করেনি। কোন দেশের নৃত্যই এই দুই দেশের নৃত্যের মত জটিল নয়, নাট্যরসে সমৃদ্ধ নয়। এই দুই দেশের নৃত্যের মধ্য গভীর সম্পর্ক রয়েছে। ভারতীয় যাযাবরেরা কোন সুদূর অতীতে বিস্তীর্ণ ভূভাগ পার হয়ে ভারতীয় নৃত্যের ছন্দ, তাল, ও অভিনয়-ভঙ্গিমা স্পেনে নিয়ে পৌঁছিয়েছিল এ সম্বন্ধে কোন সন্দেহের অবকাশ নেই।

একটি ভারতীয় নৃত্যে নর্তকীশ্রেষ্ঠা লা-মেরী

তবু সকলের চেয়ে ভারতীয় নৃত্যের প্রতিই লা-মেরী

বিশেষ ভাবে অনুরক্ত। ভারতীয় নৃত্য শিক্ষাদানের উদ্দেশ্যে তিনি ১৯৪০ সালে নিউইয়র্কে "লা-মেরী স্কুল অব নাট্য" প্রতিষ্ঠা করেন। সেখানে শত শত অ্যামেরিকান তরুণী ভারতীয় নৃত্যে দীক্ষা নিয়েছে। পাশ্চাত্য জগতকে প্রাচ্য-নৃত্য শিক্ষা দেওয়ার কঠিন দায়িত্ব নিজ স্কন্ধে তুলে নিলেন লা-মেরী।

দুর্গা' নৃত্যে লা-মেরী

লা-মেরী নিজে অনেকগুলি ভারতীয় নৃত্যের রচনা করেছেন। তার মধ্যে 'হংসরাণী', গীত-গোবিন্দ অবলম্বনে "কৃষ্ণগোপাল," রামায়ণের কাহিনী অবলম্বনে 'হরধনুভঙ্গ', তারপর 'মহাদেবী', 'পার্বতী,' 'অম্বিকা' 'দুর্গা' প্রভৃতি নৃত্য বিশেষ উল্লেখযোগ্য। তাঁর রচিত 'দুর্গামূর্তি' অপূর্ব কিন্তু তিনি যে কালীর রূপ দিয়েছেন তার সঙ্গে আমাদের পরিচয় নেই। কালীর মধ্যে শুধু ভীষণতার সৃষ্টি করতেই তিনি চেষ্টা করেছেন। বাঙলা দেশের কালী-নৃত্যের সঙ্গে পরিচয় থাকলে তিনি এ নৃত্যেও সাফল্য লাভ করতে পারতেন। বাঙলা দেশের কালী নৃত্যে বিচ্ছুরিত হয় বিশ্বের অন্তর্নিহিত মহাশক্তি। কালীর হস্তের খড়্গে প্রকাশ পায় জীবন যুদ্ধ, অশুভ বিনাশের সংগ্রাম। কালী নৃত্য জীবন যুদ্ধ-জয়ের আনন্দ-নৃত্য। এই নৃত্যে বিকশিত হয় মহাশক্তির রূপ। লা-মেরীর কালী নৃত্যে বাঙলা দেশের কালী নৃত্যের সে মহিমা ও গৌরব ফুটে উঠেনি। তবু তাঁর চেষ্টা নিঃসংশয়ে প্রশংসনায়। তাঁর ভরতনাট্যম্, মণিপুরী, মারোয়ারী নৃত্য বড় চমৎকার।

লা-মেরীর অপূর্ব সৃষ্টি ভারতীয় নৃত্য-কলার সাহায্যে পাশ্চাত্য প্রার্থনা সঙ্গীতের রূপদান। তিনি অনেক প্রার্থনা সঙ্গীতকে ভারতীয় অভিনয় বিধি অনুসারে নৃত্যের মধ্যে প্রকাশ করছেন। এ সকল নৃত্য অ্যামেরিকায় "ইণ্ডো-অ্যামেরিকান জেস্চার সঙ্গ" নামে প্রসিদ্ধি লাভ করেছে।

প্রার্থনা সভায় এ নৃত্যের অনুষ্ঠান করা উচিত বলে মত প্রকাশ করেছেন অনেক সমালোচক।

লা-মেরীর এ নৃত্য-রচনায় সাফল্য দ্বারা আরও একটি গভীর সত্য উদ্‌ঘাটিত হয়েছে। ভারতীয় নৃত্যের কলা-কৌশলের বিশ্বজনীনতাই তাঁর সাফল্য দ্বারা প্রমাণিত

হয়েছে। শুধু তাই নয়, অতীতে ভারত যে এককালে জগতের মানুষকে নৃত্য-কলা শিক্ষা দিয়েছিল, তাও সহজ-বোধ্য হয়ে আসছে। আজ যে লা-মেরী পাশ্চাত্যের যে কোন ভাব ধারাকে ভারতের নৃত্য-কলার সাহায্যে ফুটাতে

'কালী' নৃত্যে লা-মেরী

পারছেন তার মূলগত কারণ হ'ল প্রাচীন ভারত সমগ্র পৃথিবীর নৃত্যের শিক্ষক, অতীত ভারতের নৃত্য-কলাই আজ রূপান্তরিত হয়ে ভিন্ন ভিন্ন দেশে ভিন্ন ভিন্ন রূপ নিয়েছে।

কিন্তু বিভিন্নতা এত বিচিত্রতার মধ্যেও একটা গভীর সামঞ্জস্য রয়েছে—অন্তরের যোগ রয়েছে, সে যোগ হোল অতীত ভারতের নৃত্য-কলার সঙ্গে যোগ—তার নাড়ীর যোগ। ভারতীয় নৃত্য-কলার মধ্য যে তার বিশ্বজনীন প্রয়োগ সম্ভাবনা—লা-মেরী প্রমাণ করে দিয়েছেন তার মূলীভূত কারণ হল সকল দেশের প্রাচীন কালের নৃত্যের সঙ্গে ভারতীয় নৃত্য-কলার মাতৃ সম্পর্ক। • এ

সত্য আরও স্পষ্টভাবে প্রমাণিত হবে, লা-মেরীর মত নৃত্য সাধিকাগণ যখন ভারতীয় নৃত্যের সর্বতোমুখী প্রয়োগ সম্ভাবনা নিয়ে আরও গভীর সাধনা করবেন, আরও বৃহৎ সিদ্ধির পথে এগিয়ে যাবেন। লা-মেরীর আজিকার নৃত্য-সাধনায় ভারতীয় নৃত্যের জয়যাত্রা মাত্র সূচিত হল।

ভরত নাট্যম্ নৃত্যে লা-মেরী

মণিপুরী নৃত্যে লা-মেরী

বঙ্গে জাতীয় জাগরণ ও হেনরী ডিরোজিও

শ্রীদীপঙ্কর নন্দী

ঊনবিংশ শতাব্দী বাঙলা তথা ভারতবর্ষের জাতীয় জীবন-ইতিহাসে এক কীর্তিকলাপমণ্ডিত স্মরণীয় যুগ। এই যুগের প্রারম্ভে বাঙালী প্রথম ইংরেজের সংস্পর্শে এসে ইংরেজী ভাষা শিক্ষা করে, ইংরেজী কাব্যদর্শন সাহিত্য বিজ্ঞানের সহিত পরিচিত হয়। ফলে বাঙালীর সামাজিক ও রাজনৈতিক জীবনে আসে আমূল পরিবর্তনের স্রোত। শতাব্দীর সঞ্চিত মালিন্য ধুয়ে মুছে যায়। নতুন আদর্শ, নতুন আকাঙ্ক্ষা, নতুন চিন্তাধারায় বাঙালী উদ্বুদ্ধ হয়ে উঠে! বাঙালীর নবীন প্রতিভা দিকে দিকে নিয়োজিত হয়ে চরম উৎকর্ষ লাভ করে। বাঙালীর মানসিক প্রতিভার জাগরণ হয়।

যিনি এই জাগরণের হোতা—পুরোহিত, তিনি হেনরী ডিরোজিও। একজন পর্তুগীজ ফিরিঙ্গী। ১৮২৬ সালে মে মাসে হিন্দু কলেজের চতুর্থ শ্রেণীর ইংরেজী ও ইতিহাসের অধ্যাপক নিযুক্ত হন তিনি। তখন তাঁর বয়স মাত্র আঠার। এই অল্প বয়সেই তিনি তদানিন্তন কলকাতার কবি, সাহিত্যিক ও সাংবাদিকরূপে যথেষ্ট খ্যাতি অর্জন করেন। তাঁর "ফকির অব জঙ্গিরা" কাব্যের খ্যাতি শুধু কলকাতা নয়—সুদূর ইংলণ্ডে পর্য্যন্ত বিস্তৃতি লাভ করে। তিনি ডক্টর গ্রাণ্ট সম্পাদিত "ইণ্ডিয়ান গেজেটের" সহ-সম্পাদকতা করেও সাংবাদিকরূপে সুনাম অর্জন করেন।

হেনরী ডিরোজিও জন্মে (১৮ই এপ্রিল ১৮০৯) ছিলেন কলকাতায় মৌলালী অঞ্চলে। "হোমের" মিথ্যা মোহ তাঁর ছিল না; ভারতবর্ষকেই তিনি নিজের জন্মভূমি বলে মনে করতেন। ভারতবর্ষের অতীত গৌরব, তার সমৃদ্ধি ও সভ্যতা এবং পরাধীন ভারতের গ্লানি তাঁর মনে যুগপৎ হর্ষ-বেদনার তরঙ্গ তুলেছে :

> স্বদেশ আমার! কিবা জ্যোতির মণ্ডলী—
> ভূষিত ললাট তব; অস্তে গেছে চলি
> সে-দিন তোমার হায়! সে দিন যবে
> দেবতা সমান পূজ্য ছিলে এই ভবে
> কোথায় সে বন্দ্যপদ! মহিমা কোথায়
> গগন বিহারী পক্ষী ভূমিতে লোটায়!
> বন্দিগণ বিরচিত গীত উপহার
> দুঃখের কাহিনী কিবা আছে আর?
> দেখি দেখি কালার্ণবে হইয়া মগন
> অন্বেষিয়া পাই যদি বিলুপ্ত রতন!
> কিছু যদি পাই তার ভগ্ন অবশেষ
> আর কিছু পরে যার না রহিবে লেশ
> এ শ্রমের এই মাত্র পুরস্কার গণি
> তব শুভ ধ্যায় লোকে, অভাগা জননি!

অধ্যাপক হিসাবে ডিরোজিও অসাধারণ সাফল্য লাভ করেন। কলেজের অন্যান্য অধ্যাপকগণ অপেক্ষা তাঁর কর্তব্য জ্ঞান ছিল প্রখর। তিনি শিক্ষা দান বৃত্তি হিসাবে গ্রহণ করেননি। জীবনের ব্রত হিসাবে গ্রহণ করেছিলেন। কাব্য দর্শন সাহিত্য বিজ্ঞান, গণিত প্রভৃতি শাস্ত্রে তাঁর ছিল অগাধ পাণ্ডিত্য। তা ছাড়া শিক্ষাদানের এমন একটি পদ্ধতি অনুসরণ করতেন তিনি যা ছাত্রদের সর্ব্বদাই জ্ঞানানুশীলনে অনুপ্রাণিত করত। তিনি তাঁর জ্ঞান পাণ্ডিত্য, চিন্তাধারাসমূহ ছাত্রদের পরিবেশন করতেন। তিনি মনে করতেন, কতকগুলি নির্দিষ্ট পুস্তক পাঠ করলেই শিক্ষা সম্পূর্ণ হয় না। শিক্ষা তখনই সম্পূর্ণ হয়, যখন শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে হৃদয়বৃত্তির বিকাশ ঘটে। তাই তিনি ছাত্রদের মনস্তত্ত্ব বিষয়ে শিক্ষা দিতেন। তিনি ছিলেন যুক্তিবাদী সংস্কারমুক্ত পুরুষ। প্রত্যেকটি জিনিষকে তিনি যুক্তি ও তর্কের সাহায্যে বিচার করতেন, তবে গ্রহণ করতেন এবং ছাত্রদের গ্রহণ করতে শিক্ষা দিতেন। সার সত্যের অনুসন্ধানে অনুপ্রাণিত করতেন। তাঁর সাহচর্য্য—তাঁর শিক্ষার গুণে ছাত্রদের মানসিক প্রতিভার বিকাশ হয় ফুলের মত।

ডিরোজিওর অন্যতম প্রিয় ছাত্র সুবিখ্যাত প্যারীচাঁদ মিত্র লিখেছেন, Derozio appears to have strong impression on his pupils as they regularly visited him in his house and spent hours in conversation with him He continued to teach at home what he had tought at school. He used to impress upon his pupils the sacred duty of thinking for themselves—to be in no way influenced by any of the ideals mentioned by Bacon to live and die for truth—

অচিরেই ডিরোজিওর অপূর্ব্ব শিক্ষা পদ্ধতির খ্যাতি ছড়িয়ে পড়ল সারা স্কুলময়। উচ্চ শ্রেণীর ছাত্ররাও তাঁর ক্লাসে এসে বসত—তাঁর উপদেশ নির্দ্দেশ শুনত। ডিরোজিও তাঁর সমবয়স্ক ছাত্রদের সঙ্গে বন্ধুর মত ব্যবহার করতেন। স্নেহ-ভালবাসায় তিনি তাঁদের হৃদয় জয় করে নিয়েছিলেন। ছাত্ররাও তাঁর গভীর পাণ্ডিত্য ও সহৃদয়তায় মুগ্ধ হয়ে তাঁকে ভালবাসত। সব সময় তাঁর কাছে থাকতে চাইত। স্কুলে টিফিনের পর ও ছুটির পর তারা তাঁর কাছে ছুটে আসত। ছুটে আসত তাঁর সান্নিধ্য লাভের আশায়, তাঁর অমৃত উপদেশ শোনার জন্য। স্কুলে সারাদিন তাঁর কাছে থেকে তাঁর উপদেশ নির্দ্দেশ শুনেও ছাত্রদের আশা মিটত না; তারা তাঁর ইণ্টালীর বাড়ীতে আসত। কেউ আসত বহু-বাজার থেকে, কেউ আসত মাণিকতলা থেকে, আবার কেউ কেউ আসত সুদূর বাগবাজার থেকে পায়ে হেঁটে। রাত্রির অন্ধকার তারা গ্রাহ্য করত

না, তুচ্ছজ্ঞান করত ঝড়-বৃষ্টিকে। এমনি দুর্লঙ্ঘ্য ছিল ডিরোজিওর আকর্ষণ। ডিরোজিওকে গভীর ভাবে ভালবাসত বলেই তারা তাঁর উপদেশ আদেশ বেদ বাক্যের মত বিশ্বাস করত, অক্ষরে অক্ষরে পালন করত, কার্য্যে পরিণত করত প্রাণপাত পরিশ্রম করে। ছাত্রদের উপর এমনি অসাধারণ প্রভাব ছিল ডিরোজিওর।

কলেজের পাঠ্যসূচী ছাড়াও ডিরোজিও ধর্ম্মনীতি, সমাজ, দেশপ্রেম প্রভৃতি বিষয়ে ছাত্রদের উপদেশ দিতেন। ফলে কলেজের পাঠ্যসূচীর পাঠ বেশীদূর অগ্রসর হত না। এই কারণে কলেজ কর্ত্তৃপক্ষ ডিরোজিওর উপর বিরক্ত হন! তাই তিনি ছাত্রদের তাঁর বাড়ীতে আহ্বান করতেন। সেখানে তিনি তাদের নানা বিষয়ে উপদেশ দিতেন। অবশেষে ছাত্রদের সুবিধার জন্য তিনি একটি সভা প্রতিষ্ঠা করেন, যার নাম একাডেমিক এসোসিয়েসন। একাডেমিক এসোসিয়েসনের অধিবেশন বসত মাণিক-তলায়—শ্রীকৃষ্ণ সিংহের বাগান বাড়ীতে। সভায় সহরের বিদেশী গণ্য-মান্য লোকের সমাগম হ'ত। ডিরোজিও ছাত্রদের সঙ্গে সব বিষয়ই খোলাখুলি আলোচনা করতেন। এই সব আলোচনার ফলে ছাত্রদের মনে স্বাধীন চিন্তার স্পৃহা জাগে—চিন্তা শক্তির বিকাশ ঘটে। তারা সরাসরি তদানিন্তন কুসংস্কারাচ্ছন্ন হিন্দু ধর্ম্ম ও যুক্তিহীন সামাজিক রীতি-নীতির সমালোচনা করতে থাকে। হিন্দু ধর্ম্ম ও সমাজকে ঘৃণা করতে থাকে। তারা প্রকাশ্যে ঘোষণা করে: If there is anything that we hate from the core of our heart that is Hinduism. ধর্ম্মীয় বিধি নিষেধকে অমান্য করতে থাকে। হিন্দুর ধর্ম্মীয় অনুশাসন ও সামাজিক রীতি-নীতি সব ধূলিসাৎ করে দেয়। ফলে সামাজিক জীবনে বিপ্লবের সূচনা করে। রাজ নারায়ণ বসু তাঁর "সেকাল ও একাল" গ্রন্থে লিখেছেন "তখনকার সময়গুণে ডিরোজিওর যুবক শিষ্যদিগের এমন সংস্কার হইয়াছিল যে মদ খাওয়া ও খানা খাওয়া সুসংস্কৃত ও জ্ঞানালোক সম্পন্ন মনের কার্য্য। তাঁহারা মনে করিতেন, এক গ্লাস মদ খাওয়া কুসংস্কারের উপর জয় করা। কেহ উদ্ধত বেগে দোকানদারের নিকটে গিয়া বলিতেন—গোরু খেতে পারিস, গোরু খেতে পারিস। এইরূপে প্রচলিত রীতি-নীতির মস্তকে পদাঘাত করিয়া তাহারা মহা আস্ফালন করিয়া বেড়াইতেন।"

হিন্দু সমাজে যুবক সম্প্রদায়ের যখন এমনি অবস্থা তখন সমাজপতি-দের টনক নড়ল। তাঁদের ভয় হলো হিন্দুর জাতি ধর্ম্ম সব রসাতলে গেল। এর জন্য তাঁরা ডিরোজিওকে দোষী সাব্যস্ত করল; কারণ ডিরোজিওর ছাত্ররাই সমাজ জীবনে এই আলোড়নের সৃষ্টি করেছে। ডিরোজিওকে হিন্দু কলেজ থেকে না তাড়ালে হিন্দুর হিন্দুত্ব আর থাকবে না। সুতরাং ডিরোজিওকে কলেজ থেকে বিতাড়িত করার ব্যবস্থা হলো। হিন্দু কলেজের ডিরেক্টর রাধাকান্ত দেব, রামকমল সেন, প্রমুখ গোঁড়া হিন্দু সমাজপতিরা এক সভায় ডিরোজিওর বিরুদ্ধে তিনটি অভিযোগ আনলো। প্রথম, ডিরোজিও ভগবানের অস্তিত্বে বিশ্বাস করেন না; দ্বিতীয়, মাতা পিতাকে মান্যকরা নৈতিক কর্ত্তব্য বলে মনে করেন না; তৃতীয়, ভ্রাতা-ভগ্নীর বিবাহ সমর্থন করেন।

কলেজের পরিদর্শক এইচ, এইচ, উইলসন সাহেব, মহাত্মা ডেভিড ডিরোজিওর কবিখ্যাতি, সাংবাদিক সাফল্য ও অপূর্ব্ব শিক্ষা-পদ্ধতিতে মুগ্ধ হয়ে ছিলেন। ডিরোজিওকে তাঁরা বিশেষ প্রীতির চক্ষে দেখতেন। তাই যখন ডিরোজিও বিতাড়নের সংবাদ তাঁদের কানে গিয়ে পৌঁছল, তখন তারা ডিরোজিওকে সংবাদ দিলেন এবং অভিযোগগুলি খণ্ডন করে চিঠি দিতে বলেন। ডিরোজিও তাই করেন। উপরন্তু কলেজ কর্তৃপক্ষ তাঁকে পদচ্যুত করার আগেই তিনি পদত্যাগ করেন। পদত্যাগ পত্রে তিনি তাঁর বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগগুলি অস্বীকার করেন এবং যুক্তির দ্বারা প্রমাণ করেন, যে তিনি কখনও নাস্তিকতা প্রচার করেন নি বা ছাত্রদের শিক্ষা দেন নি। তবে ঈশ্বরের অস্তিত্বের সপক্ষে ও বিপক্ষে যুক্তিগুলি ছাত্রদের সমানে তুলে ধরেছেন এবং বিচার করতে উৎসাহিত করেছেন। মাতা পিতার প্রতি অবাধ্যতা শিক্ষা দেওয়া দূরের কথা, কেউ যদি তা করে তিনি তাকে শাস্তি দিতেন। আর তৃতীয় অভি-যোগ সম্পর্কে তিনি সারাসরি লেখেন, "I never tought such absurdity". আমি কখনও এমন অসঙ্গত শিক্ষা দিই নি।

ডিরোজিওর বিরুদ্ধে যে সব অভিযোগ আনা হয়, তার কোন প্রমাণ ছিল না। তিনি তার ছাত্রদের এমন শিক্ষা কোনদিনই দেন নি; দেওয়া সম্ভবও নয়। তিনি তাঁর ছাত্রদের কত ভালবাসতেন, কত স্নেহ যত্ন করতেন; ছাত্ররা যে তাঁর কত প্রিয় ও আদরের ছিল; তিনি তাদের কাছে কত আশা করতেন তা তাঁর রচিত To the student of Hindu College নামে সনেটটি পাঠ করলেই বুঝতে পারা যায়।

Expanding like the petates of young flowers
I watch the gentle opening of your minds
And sweet lossening of the spell the birds.
Your intellectual energies and powers that stretch.
Like young birds in soft summer hour
Their wings to try thing strength. How the winds
Of circumstances and freshening April showers
Of early knowledge and unnumbered kinds
Of new perceptions shed their influence
And how you worship truths omnipotence
What joyance rains upon me, when I see
Fame in the mirror of futurity
Weaving the chaplets you are yet to gain
And then I full I have not dioid in vain.

ডিরোজিওর আশা সফল হয়েছিল। তাঁর ছাত্ররা উত্তর জীবনে এক এক জন এক এক বিষয়ে দিক পাল হয়ে উঠেন। তাঁর ছাত্রদের মধ্যে কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, রামগোপাল ঘোষ, প্যারীচাঁদ মিত্র, মাধবচন্দ্র মল্লিক, রামতনু লাহিড়ী, মহেশচন্দ্র ঘোষ, শিবচন্দ্র দেব, রাধানাথ

শিকদার, গোবিন্দচন্দ্র বসাক, অমৃতলাল মিত্রের নাম উল্লেখযোগ্য। ডিরোজিওর ছাত্ররাই "ইয়ং বেঙ্গল" নামে খ্যাত। তাঁরাই বাঙ্‌লা তথা ভারতবর্ষের নব জাগরণের অগ্রদূত।

ডিরোজিও তাঁর ছাত্রদের মধ্যে যে শিক্ষার বীজ বপন করেছিলেন, তার মূল ছিল অন্তরে—বাইরে নয়। তাই তাঁর কলেজ পরিত্যাগের (১৮৩১ এপ্রিল) পর বা তাঁর মৃত্যুর পর (ডিসেম্বর ১৮৩১) তিনি যে সামাজিক বিপ্লবের সূচনা করেছিলেন তার অবসান হয়নি। তাঁর ছাত্ররা এই সামাজিক বিপ্লব দীর্ঘ দিন চালিয়ে গিয়েছিল। ফলে সামাজিক জীবনে অনন্যসাধারণ উন্নয়ন ঘটে। ডিরোজিওর ছাত্ররা নানাস্থানে বিদ্যালয় স্থাপন করে—সংস্কৃতিমূলক সভাসমিতির প্রতিষ্ঠা করে জনগণের শিক্ষা ও জ্ঞানের পরিধি প্রসারে সহায়তা করেন। তাঁরা প্রত্যেকেই মাতৃভক্তি, সেবা ও সাহিত্যচর্চ্চা করে ভাষা ও সাহিত্যের উন্নতির পথ প্রশস্ত করে গিয়েছেন। সংবাদপত্রের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করে—পরবর্ত্তী জীবনে অনেকেই সংবাদপত্র সম্পাদনা করেন। "জ্ঞানান্বেষণ" ও "বেঙ্গল স্পেক্টেটর" প্রভৃতি সংবাদপত্র পরিচালনা করে দেশের বাস্তব রূপ দেশবাসীর চক্ষের সামনে তুলে ধরেন। তাঁরা বুঝেছিলেন স্ত্রী শিক্ষা ব্যতীত জাতির উন্নতি হতে পারে না; এজন্য তারা নারী বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠায় মহাত্মা বেথুনের সহিত সহযোগিতা করে, নারী শিক্ষামূলক "মাসিক পত্রিকা" প্রকাশ করে নারী শিক্ষা বিস্তার করে গিয়েছেন। তাঁরা অনেকেই দেশসেবার বাহন রাজনীতির চর্চ্চা করেছেন। ডিরোজিওর শিক্ষার সব চেয়ে বড় গুণ ছিল আন্তরিকতা, সত্যনিষ্ঠা ও স্পষ্টবাদিতা—যা জাতিকে উন্নতির শিখরে আরোহণে প্রভূত সহায়তা করেছে।

এভারেষ্টই যে সর্ব্বোচ্চ গিরিশৃঙ্গ এই তথ্য প্রচার করে যিনি জগৎ বিখ্যাত হয়েছেন, সেই গণিতবিদ্‌ রাধানাথ শিকদার ছিলেন ডিরোজিওর অন্যতম শিষ্য। রাধানাথ শিকদার তাঁর আত্ম-জীবনীতে গুরুর যে প্রশস্তি গেয়েছেন, তা এই :—

"ডিরোজিও দয়ালু ও স্নেহশীল শিক্ষক ছিলেন। বিদ্যাবত্তার অভিমান না করিলেও তিনি সুবিদ্বান ছিলেন। তিনি প্রথমতঃ জ্ঞানলাভের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে আমাদিগকে উপদেশ দিতেন। এ শিক্ষা অমূল্য। তাঁর শিক্ষা-গুণে সাহিত্যিক-যশের আকাঙ্ক্ষা আমার মনে এমন ভাবে নিবদ্ধ হইয়াছে যে আজিও তাহা আমার সকল কর্ম্ম নিয়ন্ত্রিত ও অনুপ্রাণিত করিতেছে। তাঁহারই অধ্যক্ষতায় আমি দর্শন শাস্ত্র অধ্যয়ন করিতে আরম্ভ করি। তাঁহার নিকট হইতে এরূপ কতকগুলি উদার ও নীতিমূলক ধারণা লাভ করিয়াছি, যাহা চিরকাল আমার কার্য্যকে প্রভাবিত করিবে। বড়ই দুঃখের বিষয় ভারতবর্ষের উন্নতির নানা জল্পনার মধ্যে যৌবনে পদার্পণ করিতেই মৃত্যু তাঁহাকে অপসারিত করিয়াছে। ইহা নিশ্চিত বলিতে পারি যে সত্যানুসন্ধিৎসা ও পাপের প্রতি ঘৃণা—যাহা সমাজের শিক্ষিত-দের মধ্যে এখন এত অধিক দেখা যায় এবং যাহা ভারতবর্ষের হিতকর না হইয়া যায় না—সকলের মূলে ছিলেন এক মাত্র তিনিই।

বাঙ্‌লা তথা ভারতবর্ষের জাতীয় জাগরণের ইতিহাসে ডিরোজিওর নাম সোনার অক্ষরে লেখা থাকবে। তাঁর কবি-খ্যাতি ও সাংবাদিক-সাফল্যের কাহিনী আজ আমরা ভুলে গিয়েছি, কিন্তু আদর্শ শিক্ষক, সমাজ-সংস্কারক নেতা—জাতীয় জাগরণের হোতা—পুরোহিত রূপে হেনরী ডিরোজিও অবিস্মরণীয়।

প্রসাদ

শ্রীকেশবচন্দ্র গুপ্ত

ঈশ্বরের দর্শন পাওয়া যায় কী উপায়ে? কোথায় দেখে কোন্‌ চক্ষু সে সচ্চিদানন্দকে?

দর্শন উপলব্ধি। দর্শন লাভ হয় নিশ্চয়ই তাই অন্তরতম শুদ্ধ আত্ম-চেতনায়। উপলব্ধি হয় হৃদ্দেশে যেথা তাঁর সিংহাসন—সদা প্রচ্ছন্ন অজ্ঞান মোহে। অবশ্য প্রতিষ্ঠিত প্রত্যেকের হৃদয়ে সে রাজ রাজেশ্বরের সিংহাসন। গল্পের রাজকন্যার শয়নকক্ষের মতো দশা চেতনার সে অট্টালিকার। সেথা বিরাজ করে সুষুপ্তির ঘোর। সোনার কাঠি লাগলে ভাঙ্গে ঘুম জীব-চেতনার।

কী সে সোনার কাঠি? সে কথা নানা অবতার, পয়গম্বর, মেশায়াহ, ঋষি, মুনি, মহামানব বলেছেন—নানা ছাঁদে, নানা ভাবে। শ্রীমদ্ভাগবদ্-গীতায় সে ঘুম-ঘোর অবসানের উপায় বিবৃত করেছেন স্বয়ং ভগবান, শ্রীকৃষ্ণের রূপধারণ ক'রে।

কোন্‌ চক্ষু দেখবার সৌভাগ্য লাভ করতে পারে তাঁর—যিনি ঈশ্বরের পরম মহেশ্বর, দেবতাদের পরম দেবতা, পতির পতি, হিরণ্যগর্ভের ও পরম যিনি এবং যিনি ভুবনেশ্বর, বিশ্ব পূজ্য।

তমীশ্বরাণাং পরমং মহেশ্বরং তং দেবতানাং পরমঞ্চ দৈবতম্‌
পতিং পতীনাং পরমং পরস্তাৎ বিদাম দেবং ভুবনেশমীড্যম্‌।

সে চেতনা স্পষ্ট হতে পারেনা এ দেহের চক্ষুতে। নয়নের দৃষ্টি অতীব সসীম। অসীমরূপ দেখেছিলেন অর্জ্জুন। কিন্তু দেখাবার পূর্ব্বে শ্রীকৃষ্ণ বল্লেন—

ন তু মাং শক্যসে দ্রষ্টুমনেনৈব স্বচক্ষুষা
দিব্যং দদামি তে চক্ষু পশ্য মে যোগমৈশ্বরম্‌।

তুমি আপনার এ দেহের চক্ষুতে আমাকে দেখতে সমর্থ হবে না। তাই

তোমাকে আমি দিব্য চক্ষু দান করছি। যে ঐশ্বর্য্য আমাতে যুক্ত তা তুমি দেখ।

সুতরাং দিব্য চক্ষুলাভ না করলে আত্মচেতনায়, সে অব্যক্ত, সর্ব্বব্যাপী রূপ দর্শন হয় না। দিব্য, চক্ষু লাভ হয় কর্ম্মে, জ্ঞানে এবং পূর্ণ শরণে। কোন্ কর্ম্ম তাঁকে লাভ করবার শুভ অনুষ্ঠান ধীরে ধীরে জাগিয়ে তুলতে হবে সে জ্ঞানকে। জ্ঞানযোগে শুদ্ধ চেতনা উদ্বুদ্ধ হয়। ভক্তি—পরাভক্তি এককেন্দ্র করে চেতনাকে—বাসুদেব।সর্ব্বমিতি—এই কল্যাণকর এক বুদ্ধিতে। তখন দর্শন সম্ভব অসীম অনন্ত তেজপুঞ্জ জ্যোতির্ম্ময়। পরাভক্তিই তখন লাভ করতে পারে—দিব্য-চক্ষু তাঁর প্রসাদে।

তাই বিশ্বরূপ দেখিয়ে সখাকে তিনি বল্লেন—তুমি যে রূপ দেখলে মাত্র বেদ অধ্যয়নে, তপস্যায়, দানে বা শাস্ত্র বিহিত যজ্ঞানুষ্ঠানে এমন রূপের দর্শনলাভ হয় না।

নাহং বেদৈর্ন তপসা ন দানেন ন চেজ্যয়া
শক্যং এবং বিধং দ্রষ্টুং দৃষ্টবানসি মাং যথা।১১।৫৩

তবে কোন কল্যাণময় সৌভাগ্য দেখালো অর্জ্জুনকে বিশ্বরূপ?

অন্তরতম তত্ত্ব বিবৃত হ'ল একটি শব্দে—প্রসন্নেন। ভগবানের কৃপার প্রসাদে।

সে প্রসন্নতা অর্জ্জুন অর্জ্জন করলেন কোন্‌ উপায়ে? ভগবান এ ক্ষেত্রেও কতকগুলি রহস্যের সমাধান করলেন। দেবতারাও সে ঐশ্বর্য্যময় মূর্ত্তি দর্শনের জন্য সদা আকাঙ্ক্ষিত।

আবার বোঝালেন—দেবশক্তি খণ্ড শক্তি। এক দ্যোতন শক্তির সম্পূর্ণ জ্ঞান লাভ হলেও অখণ্ড দেবতানাং দৈবতের উপলব্ধি হয় না। দেব-শক্তির মাধ্যমে ধীরে ধীরে সাধক অর্জ্জন করতে পারে পূর্ণজ্ঞান। অনাদি অব্যক্ত তেজোময় রূপের দর্শন হয় লাভ—পূর্ণ প্রসন্নতায় পরব্রহ্মের। তিনি সবার হৃদ্দেশে বিরাজিত। মোহ যবনিকা ওঠে তাঁর প্রসাদে।

সাধক শুভ যাত্রা পথের পথিক হয় শুভ কর্ম্মে—বেদাধ্যয়ন, দান, যজ্ঞ, পূজা পাঠে। মাত্র যাগ যজ্ঞে তপস্যায়—দর্শন মেলে না। সে বিধি নিশ্চয় প্রাণে শ্রদ্ধা উদ্বোধন করে। একান্ত ভক্তি হলে প্রাণে তবে প্রসাদলাভ হয়। সেই প্রসন্নতার কারণ বিবৃত করলেন ভগবান। শ্রীকণ্ঠে স্পষ্ট ধ্বনিত হল—

হে পরন্তপ অনন্যা ভক্তির দ্বারাই আমার এরূপ স্বরূপ তত্ত্ব জানতে পারা যায়, দেখতে পাওয়া যায় এবং তার মধ্যে প্রবেশ করবার সামর্থ অর্জ্জন করতে পারা যায়।

ভক্ত্যা ত্বনন্যয়া শক্যো হ্যহমেবংবিধোঽর্জ্জুন।
জ্ঞাতুং দ্রষ্টুং চ তত্ত্বেন প্রবেষ্টুং চ পরন্তপ।১১।৫৪

এ শিক্ষা উপলব্ধি করলে প্রসন্নতার প্রকৃত স্বরূপ এবং কারণ হৃদয়ঙ্গম হয়।

অনন্যাভক্তি—অপৃথকভূত ভজনা। ভগবান হতে পৃথক যখন ভাবা যায় না আপনাকে বা বিশ্বকে তখন—আত্ম-চেতনার ক্ষুদ্র দীন সীমা বিস্তার লাভ করে। অনন্ত প্রসার বিশ্বব্যাপী মাত্র এক-চেতনায় যখন পরিণত করে ভক্তি বিশ্বব্যাপী প্রাণশক্তিকে তখন জীব লাভ করে অনন্যা-ভক্তি। এই ভক্তিতেই আত্মহারা হতেন মহাপ্রভু—অনন্ত জ্ঞানে মজতেন শ্রীরামকৃষ্ণ। মহাভাব—জগত তোমাতে, জগত তুমি—পার্থক্য হ'ক নিমজ্জিত তোমার অনন্ত মহাসাগরে। সবই তিনি—অন্য কিছু আবার কী। মহাকালের মহাঅঙ্কে ডুবে যায়—কাল ও পার্থক্য অনন্যাভক্তিতে। এ চেতনায় বিশ্বরূপ ব্যতীত কোন্ রূপ দ্রষ্টব্য? এ চর্ম্ম চক্ষু পারে না। দিব্য চক্ষুই মাত্র দেখতে পায়—অনন্যাভক্তি যখন ফুটিয়ে তোলে দিব্য চক্ষু। বিশ্ব-বেদা, বিশ্বশ্রবা সর্ব্ব দেবতা তো সে পরম দেবতার অংশের আভাস মাত্র।

এক-ভক্তিই আনতে পারে প্রসাদ, প্রসন্নতা, চির-আনন্দ। জ্ঞাতব্য কিছু অবশিষ্ট থাকে না সর্ব্বময়কে জানলে। তখন প্রসাদ জেগে ওঠে প্রাণে—প্রসন্নতার অমোঘ কল্যাণকর চেতনা মুছে দেয় সীমার রেখা—যা' জগতে জগতে জীবে জীবে জড়ে চেতনে, ভিন্নতার বোধে সৃষ্টি করে পার্থক্যের গণ্ডী। সে প্রসন্নতার ফল—বিশ্বরূপ উপলব্ধি—দিব্য-চক্ষে দর্শন।

ব্রহ্মাণ্ড ভ্রমিতে কোন ভাগ্যবান জীব
গুরু কৃষ্ণ প্রসাদে পায় ভক্তিলতা বীজ।
মালি হঞাকরে সেই বীজ আরোপণ
শ্রবণ কীর্ত্তন জলে করয়ে সেচন।

সেই বীজই বর্দ্ধিত করতে পারে সে চেতনা-লতাকে শ্রীকৃষ্ণ-চরণ কল্প-বৃক্ষে আরোহণ করতে। কিন্তু সে বৃক্ষে উপশাখা জন্মিলে চলবে না। সে উপশাখা—

ভুক্তি, মুক্তি, বাঞ্ছা যত অসংখ্য তার লেখা।
নিষিদ্ধাচার কুটিনাটি জীব-হিংসন
লাভ পূজা প্রতিষ্ঠাদি যত উপশাখাগণ।

সব ছাঁটতে হবে, কাটতে হবে, ফেলতে হবে—মাত্র চিত্তে বর্ত্তমান থাকবে এক ভাব—কৃৎস্ন জগত কৃষ্ণময়।

এ সাধনার মূলমন্ত্র দিলেন শেষে জগৎগুরু শ্রীকৃষ্ণ—

মৎকর্ম্মকৃন্মৎপরমো মদ্ভক্তঃ সঙ্গবর্জ্জিতঃ
নির্বৈরঃ সর্ব্বভূতেষু যঃ স মামেতি পাণ্ডব।

যখন বাসুদেব সর্ব্বমিতি—এ উপলব্ধিকে বদ্ধমূল করবে অনন্যাভক্তিবোধ হবে কর্ম্ম তাঁরই। তিনিই পরম। সে চেতনাই চরম।

সুতরাং যদিও এ চক্ষু, তাঁকে দেখতে পায় না, এ রসনা তাঁকে বর্ণনা করতে পারে না, তবুও চিত্ত তাঁর আনন্দের স্রোত উপলব্ধি ক'রে নির্ভয়ে ভেসে যেতে পারে—ভক্তি-ভাগিরথীর প্রবাহে।

শ্রীমদ্ভাগবতেও শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন—

ন রোধয়তি মাং যোগো ন সাংখ্যং ধর্ম্ম এব চ
ন স্বাধ্যায়স্তপোস্ত্যাগো নেষ্টাপূর্ত্তং ন দক্ষিণা।
মামেকমেব শরণমাত্মানং সর্ব্বদেহিনাম্।
সহি সর্ব্বাত্মভাবেন ময়া স্যা হ্যকুতোভয়ঃ।

উদ্ধব ভক্ত। তাঁকে ভগবান বলেছেন—

যোগ, সাংখ্য, ধর্ম্মানুষ্ঠান, বৈদিক যজ্ঞ, তপস্যা, ত্যাগ, দান, যাগাদি

কোনো কর্ম্ম পারে না আমাকে বাঁধতে। সকল দেহধারী জীব যদি একান্ত আমার শরণ লয় সর্ব্বভাবে সে হতে পারে অকুতোভয়।

উপনিষদেরই কথা যা রবীন্দ্রনাথ পুনঃ পুনঃ বুঝিয়েছেন—আনন্দং ব্রহ্মণো বিদ্বান ন বিভেতি কদাচন।

শ্রীকৃষ্ণের নির্দ্দেশ

তমেব শরণং গচ্ছ সর্ব্ব-ভাবেন ভারত।
তৎপ্রসাদাৎ পরাং শান্তিং স্থানং প্রাপ্স্যসি শাশ্বতম।

আত্মার তাঁর প্রসাদে উপলব্ধি হয় এ মত—উপনিষৎ বিভিন্ন স্থানে শিক্ষা দিয়েছে। কঠোপনিষৎ বলেছে—

নায়মাত্মা প্রবচনেন লভ্যো ন মেধয়া ন বহুনা শ্রুতেন
যমেবৈষ বৃণুতে তেন লভ্য তস্যৈষ আত্মা বিবৃণুতে তনুস্বাম।

কেবল শাস্ত্র ব্যাখ্যা বা ধারণা শক্তি বা শাস্ত্র শ্রবণ দ্বারা এই পরমাত্মাকে লাভ করা যায় না। ঈশ্বর আত্ম-জ্ঞানপিপাসু সাধকের ভক্তিতে প্রীত হয়ে তাকে বরণ করেন। সেই সাধকই তাঁকে লাভ করতে পারে।

তুমি নাহি দিলে দেখা কেহ কী দেখিতে পায়—কিন্তু সে প্রসাদ লাভ হয়না একান্ত ব্যাকুলতা ব্যতিরেকে। ব্যাকুলতার তাৎপর্য্য বুঝিয়েছেন পুনঃ পুনঃ শ্রীরামকৃষ্ণ।

শ্বেতাশ্বতরোপনিষদে শুনি—

অণোরণীয়ান মহতোর্মহীয়ান আত্মাগুহায়াং নিহিতোহস্য জন্তোঃ
তমক্রতুং পশ্যতি বীতশোকো ধাতুঃ প্রসাদাম্মহিমানমীশম।

অণু হতে সূক্ষ্মতর মহৎ হতেও মহত্তর পরমাত্মা—এই জীবগণের অন্তরে নিহিত। অজ্ঞানাতীত (সাধক) ঈশ্বরের প্রসাদে কামনা শূন্য হয়ে সেই ঈশ্বরের দর্শন লাভ করে এবং বিদিত হয় তাঁর মহিমা।

সুতরাং শরণে প্রসাদ অর্জ্জন না করলে কেমন ক'রে পাওয়া যেতে পারে তাঁর দর্শন ?

নানা বাধা আসে জীবনে আত্মজ্ঞানের পথে, প্রসারের পথে, সুতরাং প্রসাদ লাভের পথে। নিশ্চেষ্টের উপায় কোথা আত্মোৎসর্গের ? উদ্যোগ আবশ্যক। পুরুষকার এক-লক্ষ্য হ'লে জীবকে জাগাতে পারে আত্ম-প্রসারের চেতনায়। যোগ-বাশিষ্ট রামায়ণে রঘুনন্দনকে বলেছিলেন মহর্ষি—

ন কিঞ্চন মহাবুদ্ধে অস্তীহ জগত ত্রয়ে।
যদুদ্বেগিনা নাম পৌরষেণ ন লভ্যতে।
সর্ব্বমেবেহ হি সদা সংসারে রঘুনন্দন
সম্যক প্রযুক্তাৎ সর্ব্বেন পৌরুষাৎ সমাপ্যতে।

মহাবুদ্ধিমান রঘুনাথ ত্রি-জগতে এমন কিছু নাই যা উদ্বেগপ্রসূ পুরুষকারে সম্পন্ন না হয়। সম্যকভাবে পুরুষকারকে নিযুক্ত করলে সকল ফলই লাভ হ'তে পারে সংসারে।

ব্যাকুল পুরুষকারকে বিশ্বরূপ দেখবার পথে নিয়োজিত করলে, ভক্তি হবে অনন্যা। তখন প্রসন্ন পরব্রহ্ম আপনিই দেখা দেবেন শরণাগতকে।

রামপ্রসাদ হৃদি-রত্নাকরের অগাধ জলে ডুব দিতে বলেছিলেন।

জ্ঞান-সমুদ্রের মাঝে রে মন শক্তিরূপা মুক্তা ফলে,
তুমি ভক্তি ক'রে কুড়ায়ে পাবে শিব-যুক্তিমত চাহিলে।

রাজা রামকৃষ্ণ সাধকও একান্ত শরণের কথা বলেছেন—

ভবে সেই সে পরমানন্দ যে-জন পরমানন্দময়ীরে জানে।
সে না যায় তীর্থ পর্য্যটনে
কালী কথা বিনে না শুনে
সন্ধ্যা পূজা কিছু না মানে, যা করেন কালী সেই সে জানে।

প্রসাদ-লাভে বিশ্ব-রূপের উপলব্ধি। প্রসাদ একান্ত ব্যাকুল চেষ্টায় এবং শরণে লাভ করা সম্ভব। প্রসাদে সর্ব্বদুঃখের ক্ষয়। ভগবানে চিত্ত অর্পণই কৌশল। মচ্চিত্তঃ সর্ব্বদুর্গাণি মৎপ্রসাত্তরিষ্যতি।

বোধিপীঠ

শ্রীভবানীপ্রসাদ দাশগুপ্ত

জীব জগতে মানুষ পেয়েছে শ্রেষ্ঠ আসন—কায়িক শক্তির সাহায্যে নয়—ধীশক্তির প্রভাবে। মস্তিষ্কই হচ্ছে মানুষের সকল শক্তির উৎস। কিন্তু প্রকৃতির নিষ্ঠুর পরিহাসে প্রায় প্রতিবৎসরেই পৃথিবীতে কিছু সংখ্যক এমন মানব-শিশু জন্মগ্রহণ করে, যাদের মস্তিষ্কের স্নায়ুতন্তুর কোনরকম দোষের ফলে ধীশক্তির পূর্ণ বিকাশ কখনও ঘটতে পারে না। এই সব শিশুরা হয়ে থাকে জড়বুদ্ধি সম্পন্ন—আজন্ম নির্ব্বোধ। মস্তিষ্কের স্নায়ু ও কোষগুলির দোষ যদি খুব বেশী থাকে, তাহলে মানুষ জীবন্ত জড়পদার্থে পরিণত হয়; শুধু তাই নয়, এর ফলে অনেক ক্ষেত্রে তার শারীরিক গঠনেরও বিকৃতি দেখা যায়—মস্তিষ্ক আর দেহের সম্বন্ধ এতই নিবিড়। দেখা গেছে এই সব জীবন্মৃত হতভাগ্যদের সাধারণতঃ পূর্ণ আরোগ্যের কোন সম্ভাবনাই নাই। তবে খুব বেশী-দিন তাদের বিড়ম্বিত জীবনের বোঝা ব'য়ে বেড়াতে হয় না—কারণ সাধারণতঃ তারা হয়ে থাকে অল্পায়ু। এইটুকু অনুকম্পা আছে (জানি না অনুকম্পা বলা ঠিক হবে কিনা।) তাদের উপর প্রকৃতি দেবীর।

ধীশক্তিহীনতার পরিমাণ স্থির করে মনোবিজ্ঞানীরা এই সব বিকল মনা মানবদের তিনটী শ্রেণীতে বিভক্ত করে থাকেন—(১) জড়ধী (Idiot)—এদের বুদ্ধিবৃত্তি কিছুই নাই বল্লেই হয়, ভাল-মন্দের বিচার বুদ্ধি তো নেইই—এমন কি স্বাস্থ্যতত্ত্বের প্রাথমিক নিয়ম-

গুলি পালন করা এদের পক্ষে সম্ভব হয় না; (২) অপরিণতধী—(Imbecile) এদের অবস্থা প্রথম শ্রেণীর চেয়ে কিছুটা উন্নত; (৩) দুর্ব্বলধী (Moron feebleminded)—এদের অবস্থা আরও উন্নত এবং অনেকটা আশাপ্রদ এবং কোন কোন বিষয়ে স্বাভাবিকদের সমতুল্য।

অনেক সময়ে ভিক্ষুক আর ভবঘুরেদের সঙ্গে এই ধরণের হতভাগ্য ছেলেমেয়েদের দেখে মনটা মোচড় দিয়ে ওঠে না—এমন লোক কেউ আছেন কিনা জানিনা। এদের ভারগ্রহণের উপযোগী সংস্থা বিদেশে অনেক আছে শোনা যায়—এদেশেও যদি তেমন কোন সংস্থা গড়ে উঠতো—তাহলে কত ভালো হোত এই চিন্তা কিছুতেই মন থেকে দুর করা যায় না—যখন রাস্তায় এদের দেখতে পাওয়া যায়। বড় আনন্দ হোল তাই সেদিন যখন খবর পেলাম যে ভারতেও এই ধরণের প্রতিষ্ঠান আছে—শুধু তাই নয়—আছে আমাদের এই ক'লকাতাতেই। এই প্রতিষ্ঠান পরিদর্শনের প্রস্তাব তাই সানন্দে গ্রহণ করে আমরা কয়েকজন চব্বিশপরগণা জেলা সাংবাদিক সমিতির পক্ষ থেকে সমিতির সভাপতি "ভারতবর্ষ" সম্পাদক শ্রীফণীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে রওনা হলাম। গত ২৮শে ফেব্রুয়ারী সহরের উত্তর পূর্ব্ব অংশে যেখানে ২০ নং হরিনাথ দে ষ্ট্রীটে অবস্থিত রয়েছে মানুষের ভাগ্যবিড়ম্বিত অশেষ কল্যাণে নিযুক্ত অপূর্ব্ব প্রতিষ্ঠান—"বোধি পীঠ"।

গত পঞ্চাশের মন্বন্তরের সময়ে বহু জড়বুদ্ধি অনাথশিশু ঘটনাচক্রে কলকাতায় এসে পড়েছিল। এদের ভার গ্রহণ করবার জন্যে বাঁশতলায় একটী সংস্থা ১৯৪৪ সালে স্থাপিত হয়েছিল। আন্তর্জাতিক খ্যাতি-সম্পন্ন প্রখ্যাত মনোবিজ্ঞানী ডাঃ গিরীন্দ্রশেখর বসু ছিলেন এর কর্ণধার। এই ধরণের প্রতিষ্ঠান ভারতে এই প্রথম স্থাপিত হয়। কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের আশীর্ব্বাণী বর্ষিত হয় মানবতার এই নব প্রচেষ্টার উপর এবং তিনি এই সংস্থাটির নামকরণ করেছিলেন "বোধনা"। ১৯৪৬ সালের নরমেধযজ্ঞের কালে এই প্রতিষ্ঠানের অধিবাসীদের সংখ্যা বেশ বেড়ে গিয়েছিল। নানা কারণে এই সংস্থাটি এখন আর বর্ত্তমান নাই।

এরপর স্থাপনা হোল যে প্রতিষ্ঠানের—সেই হচ্ছে আমাদের আলোচ্য "বোধিপীঠ"। কলকাতার অনতিদূরে দমদমের বিরাটিতে ১৯৫১ সালের জুন মাসে মাত্র ৪টী অনাথ জড়বুদ্ধিসম্পন্ন শিশুকে নিয়ে এই প্রতিষ্ঠানের পত্তন হয়। এই প্রতিষ্ঠানের নামকরণ করে-ছিলেন মনোবিজ্ঞানী গিরীন্দ্রশেখর বসু। গত ১৯৫৬ সালের মাঝা-মাঝি সময়ে বর্ত্তমান বাড়ীটিতে মাসিক ৪২৫ টাকায় ভাড়া নিয়ে বোধি-পীঠ স্থানান্তরিত হোল হরিনাথ দে ষ্ট্রীটে। ক্যালকাটা এসোসিয়েসন ফর মেণ্টাল হেল্থ্ নামক সংস্থার তত্ত্বাবধানে জড়বুদ্ধিসম্পন্ন মানুষদের এখানে বিশেষ যত্ন নেওয়া হয়ে থাকে। শিক্ষা ও অভ্যাসের ফলে যাতে এদের ভালমন্দের আপাত বিচার-জ্ঞান ও সৌন্দর্য্যবোধের উন্মেষ হয়, সেদিকে বিশেষ লক্ষ্য রাখা হয়। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের এক্স-পেরিমেণ্টাল সাইকোলজির অধ্যাপক ডাঃ দ্বিজেন্দ্রলাল গঙ্গোপাধ্যায়, তাঁরই বিভাগের কয়েকজন গবেষক এবং কয়েকজন সমাজসেবীদের উপর এদের শিক্ষা ভার ন্যস্ত আছে। এঁরা এইসব হতভাগ্যদের মায়ের স্থান অধিকার করে আছেন। ডাঃ গঙ্গোপাধ্যায় বর্ত্তমানে এই প্রতিষ্ঠানের সম্পাদক ও অন্যতম কর্ণধার। মনোবিজ্ঞানী গিরীন্দ্র-শেখরের নামে বোধিপীঠের একটি হলঘরের নামকরণ করা হয়েছে। কুমারী রেখা ঘোষ এম-এ, বি-টি, এই প্রতিষ্ঠানের সুপারিনটেণ্ডেণ্ট এবং পীযুষ ঘোষ হচ্ছেন ডেপুটী সুপারিনটেণ্ডেণ্ট। বর্ত্তমানে ৫ থেকে ৪০ বৎসর বয়সের ৪৪টি ছেলে ও ২৩জন মেয়ে মোট ৬৭জন শিক্ষার্থী বোধিপীঠে নানা বিষয়ে শিক্ষালাভ করছে। শিক্ষার্থীদের নিরাপত্তা, স্বাস্থ্যরক্ষা ও সুচিকিৎসার বন্দোবস্তও করা হয়েছে। ছেলেদের ও মেয়েদের শিক্ষা ও বাসের ব্যবস্থা পৃথক পৃথক। গানবাজনা, ব্রতচারী-নাচ, শিল্প কাজ (যেমন কাপড় বোনা, পুতুল তৈরী করা ইত্যাদি) প্রভৃতি বহু বিষয়ে এরা বেশ দক্ষতা লাভ করেছে। প্রসঙ্গতঃ শিল্প শিক্ষায় প্রতিষ্ঠানের দক্ষতার স্বীকৃতি রূপে প্রতিষ্ঠান সম্পাদক ডাঃ গঙ্গোপাধ্যায় সম্প্রতি ন্যাশন্যাল কাউন্সিল অব হ্যাণ্ডিক্র্যাফ্‌ট-এর সদস্য নির্ব্বাচিত হয়েছেন। সাধারণতঃ সরকার ও কর্পোরেশানের দানেই এই প্রতিষ্ঠানের ব্যয় নির্ব্বাহ হচ্ছে। এখানে যে কয়জন অনাথ বালক-বালিকা আছে তাদের মধ্যে মন্বন্তরের সময়কার ৩৯ জন, বাস্তুহারা ১১জন ও সেণ্ট্রাল সোশ্যাল ওয়েলফেয়ার বোর্ডের ৫জনের জন্যে মাথা পিছু ৩২৲ টাকা করে সরকারী সাহায্য পাওয়া যায়। সেণ্ট্রাল সোশ্যাল ওয়েলফেয়ার বোর্ড ৮টী ফ্রী বোর্ডের ব্যবস্থা করে দিয়েছেন। শিল্প শিক্ষার জন্য কেন্দ্রীয় সরকার বাৎসরিক ৭০০৲ টাকা সাহায্য দান করছেন—এই ব্যবস্থা দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার শেষ পর্য্যন্ত চলবে। কলকাতা কর্পোরেশনের কাছ থেকে এককালীন ১০০০৲ টাকা পর্য্যন্ত সাহায্য পাওয়া যায়। গবেষণা কার্য্য পরিচালনার জন্য কেন্দ্রীয় সরকারের শিক্ষা মন্ত্রণালয় থেকেও সাহায্য পাওয়া যায়। বেসরকারী শিক্ষার্থীদের তত্ত্বাবধানের ফী মাসিক ৭৫৲ টাকা। কিন্তু যে গুরু দায়িত্ব ভার বোধিপীঠের উপর ন্যস্ত আছে, তার তুলনায় আর্থিক সাহায্য যা পাওয়া যায়, তাকে পর্য্যাপ্ত বলা যায় না। এমন একটি জনকল্যাণকারী প্রতিষ্ঠানের প্রতি দেশের প্রত্যেক নাগরি-কের কর্ত্তব্য আছে বলে আমরা মনে করি। আমরা আশা করি দেশের সকল ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠান দলমত নির্ব্বিশেষে—বোধিপীঠের প্রতি সেই কর্ত্তব্য পালন করবেন—সর্ব্বপ্রকার সাহায্য দান করে। সেদিন বোধি-পীঠে গিয়ে যা দেখলাম ও যা জানলাম, তাতে বিস্ময়ে হতবাক্ না হয়ে উপায় ছিল না। বোধিপীঠের পরিচালক-মণ্ডলী যে ব্রতের সাধনায় নিযুক্ত আছেন—তাকে শুধু জনহিত ব্রত বল্লেই যথেষ্ট হবে না—এহোল অসম্ভবকে সম্ভব করার ব্রত। তাঁদের ব্রত সাধনার সাফল্যই সেই ব্রতের যৌক্তিকতা বুঝিয়ে দেয়, মৃতের প্রাণ সঞ্চারে রত যাঁরা, তাঁদের মতই বোধিপীঠের কর্তৃপক্ষ আমাদের শ্রদ্ধা ও বিস্ময় উৎপাদন করেছেন। আমাদের ২৪ পরগণা জিলা সাংবাদিক সমিতির সভাপতি শ্রীফণীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় বোধিপীঠ পরিদর্শনের পর আমাদের প্রত্যাবর্তনের পূর্ব্বে উক্ত সংস্থার পরিচালক ও শিক্ষক মণ্ডলীর কাছে এই ভাবই ব্যক্ত করেছিলেন তাঁর নাতিদীর্ঘ সময়োপযোগী ভাষণে। প্রাণভরা আশা ও আনন্দ নিয়েই সেদিন প্রত্যাবর্ত্তন করেছিলাম আমরা।
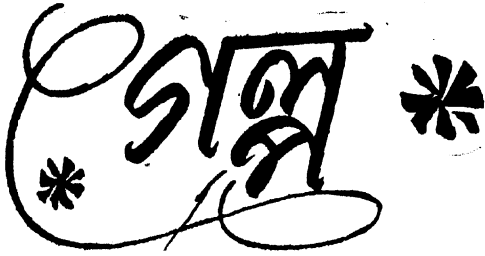
ফ্যাসাদ

সতীন্দ্রনাথ লাহা

কাশী মল্লিকের বাড়ীতে যাত্রা শুনতে গিয়ে একবার বড্ড ফ্যাসাদে পড়েছিলাম।

শুনেছিলাম, আমাদের গোপালদা নাকি বড্ড ভাল "ফিমেল পার্ট" করতে পারেন, আর তাঁকে নাকি মানাতও খুব ভাল। অনেকের কাছেই শুনেছিলাম, এ ব্যাপারে গোপালদা'র তুলনা নেই। অনেক মেয়েকে নাকি কান ধরে "ফিমেল পার্ট" করা শেখাতে পারেন।

আমার বরাবরই মনে হ'ত, তা' কি করে সম্ভব। লোকে হয়ত বাড়িয়ে বলে খানিকটা পিঠ চাপড়ে দেয় থিয়েটার করিয়ে নেবার জন্তে।

গোপালদা' ত ছোট-খাট ছেলে মানুষ নন? যে রং চং মাখিয়ে মেয়েছেলে সাজিয়ে দেওয়া যাবে। অনেকে স্ত্রী ভূমিকায় ওঁর অভিনয়ের প্রশংসা করত বটে, কিন্তু আমি ঠিক মনে মনে মেনে নিতে পারতাম না।

তর্ক করে লাভ কি? গোপালদা'দের যাত্রা থিয়েটার হ'লেই দেখতে পাব। তখনই চক্ষু-কর্ণের বিবাদ ঘুচবে। প্রায়ই ত এখানে ওখানে ওদের যাত্রা-থিয়েটার হয়।

মাস কয়েক পরেই কা'র কাছে যেন খবর পেলাম, গোপালদা'দের যাত্রা হচ্ছে কাশী মল্লিকের বাড়ীতে। সময় মত একখানা নিমন্ত্রণ পত্র ঠিক যোগাড় ক'রে ফেল্‌লাম। যথাসময়ে হাজির হলাম যাত্রা শুনতে।

"শ্রীবৎসচিন্তামণি"—যাত্রা হচ্ছে। সারা উঠান ভরা লোক গিজ গিজ করছে। কন্‌সার্ট হয়ে গেল। জুড়িরা গান ধরেছে। আসর বেশ সরগরম্। বেশ জমজমাটি ভাব।

চিন্তামণির আবির্ভাব হ'ল। দেখলাম গোপালদা'কে বেশ মানিয়েছে। যতটা লম্বা তাকে লাগত, এখন ত তা' লাগছে না। হাঁটা চলার ধরণ ধারণও বেশ। গলার আওয়াজও বেশ সুরেলা সুরেলা। আমার ধারণাই ভুল। সত্যি গোপালদা'র কেরামতি আছে। খেল দেখাতে ভালই জানেন। লোকে ভাল বলবে নাই বা কেন?

চড়বড় করে হাততালি পড়ছে চারিদিক থেকে। বাহবা, সাবাস বলে কেউ কেউ চেঁচিয়ে উঠছেন। আমিত অবাক হয়ে গোপালদা'র চলন-বলনের কেরামতি দেখছি এক মনে।

হঠাৎ একটা এগার বারো বছরের ছেলে কোথা থেকে এসে আমার কোলের উপর ঝুপ করে বসে পড়ল। আমার মুখের দিকে একবার চেয়েও দেখলে না। ভাবটা যেন তার অপেক্ষায় আমি কোল পেতে বসেছিলাম।

এ আবার কি ব্যাপার! কে এই ছেলেটা? মুখে কোন উদ্বেগের ছাপ নেই। আহ্লাদে আহ্লাদে দেখতে।

মুখের দিকে ভাল করে চেয়ে দেখলাম। না, কোন-দিন ত একে কোথাও দেখিনি। অস্বস্তি বোধ হতে লাগল।

নিশ্চিন্ত হয়ে যাত্রা শুনছি এক মনে, এ আবার কে জ্বালাতে এল?

ছেলেটাকে বললাম, নেমে বোসো না…কে ভাই তুমি? কোথায় থাক?

ঘাড় নাড়িয়ে জানালে সে নেমে বসবে না। অচেনা গলার স্বরে সে আশ্চর্য্য বোধও করল না। মনে হল, ছোঁড়াটা জ্বালাবে দেখছি।

বেশ স্পষ্ট করে বল্‌লাম, তুমি কে? তোমার নাম কি?

ঘ্যানঘেনে গলায় ছেলেটা বলে উঠল—আহা চেনে না যেন!

হেলে-দুলে কোলের উপর বেশ গুছিয়ে বসে রইল।

পাশের লোকেরাও চিন্তামণিকে দেখা ছেড়ে এই আমাদের যাত্রা দেখতে শুরু করে দিয়েছে।

এক ভদ্রলোক বললেন—কে এই ছেলেটি—আপনি কি চেনেন না একে ?

বললাম—সত্যি বলছি মশাই, কে এই ছেলে আমি কিছুই জানিনে। কার ছেলে, কোথায় থাকে, কিছুই আমি বুঝতে পারছি না।···হয়ত ভুল করেছে। কিন্তু আমার নিজের মনে হল, এ বয়েসের ছেলের এ রকম ভুল ত বড় একটা হয় না।

আমিও অবাক্, তারাও অবাক।

ইতিমধ্যে আরো পাশাপাশি অনেকের চোখ পড়েছে আমাদের দিকে। একবার দেখছে ছেলেটাকে, আর একবার দেখছে আমাকে।

ছেলেটাও কোল থেকে উঠবে না, আমিও বিদায় করে তবে ছাড়ব।

চারিপাশে খানিকটা গুঞ্জন সুরু হয়ে গেল। মুখে তর্জনী ঠেকিয়ে কেউ কেউ ইসারা করলেন, গোলমালটা একটু সামলে নিলেই ভাল হয় দাদা!

এক ভদ্রলোক বিরক্ত হয়ে বলেই উঠলেন—আহা! থাকনা মশাই, কি আর এমন ভারি ও! তারপর ছেলেটির দিকে মুখ ফিরিয়ে বললেন—

তোমার নাম কি খোকা? কোথায় থাক? চুপটি করে বসে থাক, গোলমাল কোরো না, লক্ষ্মী ছেলে!··· ইনি তোমার কে হন?

আবার সেই খ্যানখেনে গলায় ছেলেটা বলে উঠল—একে জিজ্ঞেস কর না। আমার দিকে মুখ ফিরিয়ে আবার বল্লে—আহা! চেনেনা যেন!

হলেই বা ছোট ছেলে, পাগলামি আর কতক্ষণ সহ্য হয়। মাথায় কি রকম একটা রাগ এসে গেল। সকলের সহানুভূতি ওর দিকে, আমার দিকে কেউ নেই। বললাম, কে রে ছোঁড়া, কোন পাড়াতে থাকিস?

মনে হল—দি ধাক্কা মেরে উঠিয়ে।

গোপালদা'র অমন কিমেল পার্ট, তা'ও আমাকে মন দিয়ে শুনতে দিচ্ছে না।

ছেলেটির কোন দিকে ভ্রূক্ষেপ নেই। বেশী কথাও কয় না। সেও মন দিয়ে যাত্রা শুনছে। তিনটি শব্দেই ওর বুলি বাঁধা: আহা, চেনেনা যেন!

হাঙ্গাম বাধিয়ে লাভ কি! বসে আছে বসে থাক। পরের কোলে বসবে তাও জেদ করে, কিছু আর বললাম না। আবার কি কান্নাকাটি করে ঝঞ্ঝাট বাঁধাবে? তার চেয়ে যেমন আছে তেমনি থাক্। আপনা থেকেই উঠে যাবে'খন।

কয়েক মিনিট পর হ'লও তাই। আমাকে নিশ্চিন্ত করে আপদ আপনা থেকেই বিদায় হ'ল।

কোল থেকে তড়াক করে লাফিয়ে এক ছুটে কোথায় পালিয়ে গেল। আর দেখতে পেলাম না। ফাঁড়া কাটল।

ভীড়ের মাঝে হারিয়ে গেল। পাশাপাশি লোক গুলা ঠিক যেন আমাকে বিশ্বাস করছিল না। বার বার সন্দেহের সুরে জিজ্ঞাসা করছিল—কে ছেলেটি? আপনাকে চেনে নিশ্চয়, নইলে আর অমন করে ঝুপ্ করে এসে বসে পড়ে। কৈ আমার কোলে ত এসে বসল না।······

কোথায় থাকে? নাম কি? কার ছেলে? ইত্যাদি।

বিপদ দেখছি, গিয়েও যায় না।

সে উঠে গেছে কখন, কিন্তু এদের মন থেকে এখন উঠতে পারেনি। ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখছেন, হদিস্ পান কি না।

স্পষ্ট করেই জবাব দিলাম—ওর সম্বন্ধে আমি কিছুই জানিনা। এর আগে কোনদিনই ওকে আমি দেখিনি। কোথায় থাকে তাও আমি জানিনে।

···তা' আপনাদের অত মাথা ব্যথা কেন? যাত্রা শুনুন না। ল্যাঠা ত চুকে গেছে।

খানিকটা চুপ চাপ হল। সকলে মন দিয়ে যাত্রা শুনতেই লাগল। আস্তে আস্তে সব রকম জ্বালাতন থেকে মুক্তি পেলাম।

মাঝে মাঝে আমার কিন্তু মনে হচ্ছিল, কে এই ছেলেটা? ভারি অদ্ভুত ব্যাপার ত! কোন দিন কাছে পিঠে কোথাও ওকে দেখিনি। কেনই বা এল আমার কাছে। ও যেন সত্যিই আমাকে চেনে।

···হঠাৎ গেলই বা কোথা?

সে দিন কিন্তু আর সে ঝামেলা বাড়াতে আসেনি।

যাত্রা দেখে নিশ্চিন্ত মনে রাত বারোটায় বাড়ী ফিরলাম।

* * * *

আসল ব্যাপারটা ঘটল আরো কয়েকদিন পর।

জয়মিত্র ষ্ট্রীট ধরে যাচ্ছি এক বন্ধুর বাড়ীতে। হঠাৎ দেখি ছুটতে ছুটতে সেই ছেলেটা আমার দিকে এগিয়ে আসছে, আর ঐ খ্যানখেনে গলায় চেঁচিয়ে বলছে—

ও মামা! ও মামা! চলনা আমাদের বাড়ীতে মা তোমাকে ডাকছে। ও মামা! ও মামা?……খপ্ করে আমার পাঞ্জাবীর আস্তিন ধরে টানাটানি শুরু করে দিলে। হা হা করে হাসতে লাগল মুখের দিকে চেয়ে। ভাবটা যেন—ধরে ফেলেছি আর পালাবে কোথায়?

ভাবলাম, পাগলা নাকি। না,…আমার কোন দূর আত্মীয়ার ছেলে। তবে সেই কি পর্দার আড়াল থেকে কলকাটি নাড়ছে। কাশী মল্লিকের বাড়ীতে সেই-ই বোধ হয় ওকে আমার কাছে ঐ রকমভাবে লেলিয়ে দিয়েছিল। কৈ না, সে রকম কাউকে ত মনে পড়ছে না। ছেলেটার মাথা খারাপ বলেও মনে হচ্ছে না।

একটা বাড়ীর দিকে আঙুল দেখিয়ে ছেলেটা বললে —ঐ ত ঐ বাড়ীটায়। চলনা মামা…আমি কোন কথা না বলে, ওর রকম সকম বুঝতে চেষ্টা করছি; আর ও আমাকে টানাটানি করছে আর পুরোনো সুরে সেই একই কথা—আহা চেনেনা যেন!

রাস্তার মাঝে আবার বিভ্রাট বাধাবে না কি! ওর বাড়ীর দিকে চাইতেই দেখি এক ভদ্রলোক আমাকে নমস্কার করতে করতে মুচ্‌কে মুচ্‌কে হাসছেন।

চেনাচেনা বলে প্রথমটা যেন মনে হল। ওদের বাড়ীর দিকে এগিয়ে গেলাম। কৈ না, চেনা ত নয়। তবে পথে ঘাটে প্রায়ই ওঁকে দেখেছি। সামান্য মুখ চিনি, তাই বলে কি আর চেনা বলা যেতে পারে? পরিচিত বলাও যায় না।

উনি যখন নমস্কার করলেন, তখন প্রথম কথা আমাকেই বলতে হয়।

বললাম, আপনি এখানে?

উত্তরে তিনি বললেন, এইখানেই ত আমরা থাকি। আপনি এদিক দিয়ে কোথায় যাচ্ছিলেন?

এদিকে ছেলেটা আমার হাত ধরে টানাটানি করছে আর বলছে—চল না, মা তোমাকে ডাকছে, চল না!

অবাক কাণ্ড!

মনে মনে বললাম, তোমার মা আমাকে ডাকতে যাবেন কেন? ও কথা বলে কোন অচেনা ভদ্রলোককে ডাকতে নেই।

ভদ্রলোকটি আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন, আমার পুত্রটি আপনাকে পাকড়াও করলে কোথা থেকে? আপনাকে ধরে টানাটানিই বা করছে কেন? চিনলই বা কি করে আপনাকে?

ভাবলাম, ওটা আমারও প্রশ্ন। আর এইটে জানতেই ত এগিয়ে আসা। কাশী মল্লিকের বাড়ীতে যাত্রা দেখার দিনের সব ঘটনা সবিস্তারে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে তাঁকে বললাম এবং আজকে রাস্তা থেকে ওই যে আমাকে এদিকে টেনে আনছিল, তা'ও বললাম। আরো বললাম, ওর মা যে কেন আমাকে ডাকছেন তা'ও ত বুঝতে পারছি না।

ভদ্রলোক হাসতে হাসতে বললেন—কিছু মনে করবেন না মশাই, ওর মামাকেও ঠিক আপনার মত দেখতে কিনা, তাই হয়ত ভুল করেছে। বড্ড মামার নেওটা। আজকাল তিনি কালে-ভদ্রে আসেন কিনা। আগে আগে আমিই কতবার ভুল করেছি আপনাকে দেখে। আপনাদের দুজনের আশ্চর্য্য চেহারার মিল।

ভাবটা: ওর পুত্রের পক্ষে ভুল করাটাই স্বাভাবিক। ছেলের ভুল সংশোধন না করে, কতকটা ওর হয়ে সাফাই গাইতে লাগলেন।

আমি বলেছিলাম, তাই বলে পথে-ঘাটে আমাকে দেখলেই জ্বালাবে নাকি? আবার বিস্তারিত ভাবে বললাম—কাশীমল্লিকের বাড়ীতে এই ধেড়ে ছেলের কীর্ত্তি।

ঠোঁটের কোণে খানিকটা রসঘন হাসি টেনে তিনি বললেন—তা' আর কি হয়েছে বলুন? আমার এই ছোট্ট ছেলেটা যদি আপনাকে মামা বলেই ডাকে, তা'তে আপনিই বা অত চোটছেন কেন? হলেনই বা ওর মামা, ক্ষতি কি!

কথাটা শেষ করে আবার তিনি হাহা করে হাসতে লাগলেন। এমন ভাবে বলার ধরণে তিনি বোঝাতে চেষ্টা করলেন যেন, এ লাগতাই যুক্তির আর কোন জবাব নেই,

এবং এই ছেলেটির স্নেহের ডাকে বিরক্তি বোধ করাটা মূর্খতা ছাড়া আর কিছুই নয়।

ছেলেটাও অনবরত টানাটানি করছে—মামা মামা বলে, আর উনিও সাধ মিটিয়ে লোকচার দিয়ে চলেছেন।

আমাকে ঘিরে বাপ-বেটাতে জমিয়েছে ভাল। ইনি হাসছেন, উনি হাসির খোরাক যোগাচ্ছেন। ছেলেটাকে কোথায় ধমক দিয়ে সরিয়ে দেবেন তা নয়। আদুরে ছেলেকে আস্‌কারা দেওয়া হচ্ছে: কী বলে যে ছেলেটা আমাকে টানাটানি করছে, সেদিকে ভদ্রলোকের হুঁস নেই। তাঁর স্ত্রী যে কেন ডাকছেন, তারও ত একটা খোঁজ নেবেন। অন্তত এ কথাও ত বলতে পারেন: পালা এখান থেকে, ওঁকে বিরক্ত করিস নে।

'মামা' বলেছে বলে আমি ত আর ছেলেটাকে মেরে তাড়াতে পারি নে। আদুরে ছেলে যাই করুক না কেন, ওর তা'তে কোন আপত্তি নেই। আমার অস্বস্তি বোধ হচ্ছে, ওর হাসি পাচ্ছে, উনি রগড় দেখছেন।

এই আস্‌কারা দেওয়া হাসি আর ছেলেটার বেয়াদপি ক্রমশ আমার বিরক্তিকর ও রুচিহীন মনে হ'তে লাগল।

আমাকে না হয় শুধু টানাটানিই করছিল, আর কাউকে যে টেনে নিয়ে যায় নি তারই বা ঠিক কি আছে? যেমনি হাবাতে বাপ, তার তেমনি আহ্লাদে ছেলে!

বলে কিনা—চলনা মামাবাবু, মা তোমাকে ডাকছেন।

হাজার লোকের সাম্‌নে বলে বসবে—আহা চেনেনা যেন! ওদের রকম সকম শুরু থেকেই আমার ভাল লাগছিল না। আমিও আর থাকতে পারিনি, বেশ মিষ্টি মিষ্টি করেই বলেছিলাম।—হেঁ তা'তে আর কি হয়েছে। ছোট ছেলেরা অমন একটু আহ্লাদে আদুরেই হয়। এর সঙ্গে ওর; ওর সঙ্গে তার, এ রকম গোলমাল একটু আধটু করেই ফেলে। না শিখিয়ে দিলে কা'কে কি বলে ডাকতে হয় তা' জানবেই বা কি করে বলুন! নেহাৎ ত আর ছেলেমানুষটি নেই। এখনও দেখছি আপনি বলে কথা বলতেও শেখেনি।

ভালভাবে এত কথা বোঝাবার পরও দেখি, ভদ্রলোক ভাঙেন ত মচকান না। এখন তিনি সেই বাঁধা বুলি আওড়ে যাচ্ছেন: কি আর এমন দোষ করেছে বলুন?, কি আর এমন বয়েস ওর? ইত্যাদি ছেলের গুণের ফিরিস্তি দিয়ে চলেছেন।

আমি এখন পালাতে পারলেই বাঁচি। এক পাগলে রক্ষা নেই এখন দু'পাগলের পাল্লায়। ওঁর কথা শেষ না হলে ত আর পালাতে পারিনে? ওঁর লেক্‌চার শেষ হবে আমিও পিট্টান দোব।

হঠাৎ খেয়াল হ'ল ছেলেটাত এখানে নেই। গেছে ভালই হয়েছে। ওর বাবা নিশ্চয় আড়ালে ওকে ধোম্‌কে দেবে; আর বোধহয় 'মামা' 'মামা'…'মা ডাকছে বলে' টানাটানি করতে আসবে না!

যা'ক যা' হল তা' হল। এখন নিজের কাজে যাই। আমি রুক্ষ ঝামেলা থেকে নিস্তার পাবার জন্যে পালাবার চেষ্টা করছি। কিন্তু মওকা পাচ্ছি কই? পালাতে দিলে ত! ছেলেকে নির্দ্দোষ প্রমাণ না ক'রে কিছুতেই তিনি ছাড়বেন না।

বুঝলাম পাগলের সঙ্গে তর্ক করে লাভ নেই, মানে মানে সরে পড়াই ভাল।

যাবার জন্যে পা বাড়িয়েছি, হঠাৎ দেখি, ছেলেটা আবার সামনে এসে হাজির।

এবার আর হাসতে হাসতে নয়। কাঁদতে কাঁদতে।

ব্যাপার কি? আবার কাঁদে কেন? আমি ত ওকে কিছুই বিশেষ বলিনি। ওর বাবাও ত ওকে মারেন নি বা বকেন নি। তবে কাঁদছে কেন?

ভদ্রলোক ছেলেটিকে জিজ্ঞেস করলেন, কাঁদছিস কেন? কি হয়েছে? কে মারলে?

মা বোকেছে, কান মুলে দিয়েছে।

কেন? কি করেছিলি তুই?

ওকে মামা বলে ডেকেছিলাম বলে আর বাড়ীতে টেনে আনছিলাম বলে। ফোঁপানির ফাঁকে ফাঁকে কথাগুলা বেরুল।

ভদ্রলোক গম্ভীরভাবে উচ্চারণ করলেন—অ

ছেলেটিকে সান্ত্বনা দিয়ে আমি বললাম—মা যখন তোমার আমাকে মামা ব'লে ডাকতে বারণ করেছেন, তখন আমাকে আর মামা বলে ডেকোনা…কেমন?… লক্ষ্মীছেলে কেঁদো না।

চোখ মুছে ছেলেটি কিছুক্ষণ আমার মুখের দিকে ফ্যাল-ফ্যাল করে চেয়ে রইল, তারপর আদুরে স্বুরে বল্লে—তবে কি বলে ডাকব।

কেন? কাকু, জেঠু, মেসো, পিসে যা ইচ্ছে তাই বলেই না হয় ডেকো। মায়ের কথা শুনতে হয়, বুঝলে?

দেখলাম, চারটি সম্পর্কের মধ্যে শেষটিই তার পছন্দ হল। ছেলেটি বললে—আচ্ছা, এবার থেকে তা হলে পিসে বলেই ডাকব।…এ্যাঁ ডাক্‌ব ত?

পিসে নয়, পিসেমশাই বলে ডেকো।

ভদ্রলোক ছেলেটিকে বাড়ীর মধ্যে হিড়হিড় করে টেনে নিয়ে গেলেন।

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

(৩২)

পহালগাম-চন্দনবাড়ী-পিস্সুঘাটি-শেষনাগ

পহালগামে লীদার নদী যেখান থেকে ঢুকছে সেইখানটায় একটা ছোটো কাঠের সাঁকো। এমনি তক্তা পাতা। এটা পেরিয়ে গেলেই পহালগাম ছেড়ে আসা গেল। বাঁ ধার দিয়ে পথ, নদীর গতি-পথের দক্ষিণে পড়বে পথ। ও পারে পাহাড়। সামনে বড় বড় পাহাড় পথকে অবরোধ করছে দিগন্ত-রেখায়। নদীর আশে পাশে ক্ষেত। ক্ষেত-ভরা শাক-সব্জী—কিছু কিছু ধান আর ভুট্টা আছে। আমাদের পথ ছায়ায় ঢাকা। ঘোড়ায় চলার সঙ্কোচ ক্রমশঃ দূর হয়ে আসছে।

সবার আগে বেণুর ঘুড়ীটা। শান্ত, ধীর ঘুড়ী; তাই ওকে এগিয়ে দেওয়া। তারপরে চলছে আর্টিষ্ট ভর্মা। জগজীবন, গুপ্তা, অসিত, শেষ আমি চলছি। মুনীশ্বর পাণ্ডা সাথে সাথে হেঁটে হেঁটে চলেছে। কোটেশ্বর আসছে পিছন পিছন সেই বংশলদের নিয়ে।

পাঁচটি প্রাণী চলেছে কেবল আমার উস্কানীতে। ওদের মনে যে কি ধরণের উত্তেজনা আমায় জানা নেই; আমি কেবল অনুমান করতে পারি ভর্মা যাচ্ছে তার স্কেচ্ বুক ভরে আনার নেশায়; জগজীবন চলেছে ভয়ে ভয়ে; আমরা সবাই যাবো, ও যদি যেতে রাজী না হয় লোকে নিন্দা করবে; গুপ্তাজী যাচ্ছে আমি যাচ্ছি সেই মজায়; অসিত যাচ্ছে নতুন একটা উত্তেজনার জৌলষে; বেণু যাচ্ছে আমার রক্ষা করতে বা আমার মৃত্যুসংবাদ বহন করে আনার জন্ম; মুনীশ্বর যাচ্ছে তার উপজীবিকার জন্ম। কিন্তু আমি? আমি কেন যাচ্ছি?

পাহালগামে প্লাজার মতো হোটেলের আরাম ছেড়ে কেন এই দুর্জ্জয়কে আহ্বান? ভ্রমণ-বিলাসী নই, মুমুক্ষু নই, পুণ্যলোভে চিত্ত নয় লালায়িত। কোন ধর্ম, অর্থ, কাম আমায় উত্তেজিত করেনি; যশো-লাভের আকিঞ্চন নেই আমার। তবে কেন? দেহ শ্রমকাতর, আরামপ্রিয়; মন বিলাসী, রসলোভী; আলস্য আর জড়তা পূর্ণভাবে আশ্রয় করে আছে পুস্তক-সঞ্চারী মনটাকে। ভগবানকে মানদণ্ড রক্ষা করার দায়িত্ব দিয়ে নিজে বিলাস, আলস্য, শ্রমবিমুখতার বিপুল বন্যায় গা ভাসিয়ে দিয়েছি। মুহুর্মুহুঃ এতো বাধা, এতো বিপত্তি সত্ত্বেও চলেছি ভারততীর্থের মধ্যে ভীষণতম তীর্থকে আয়ত্ত করার আশায়।
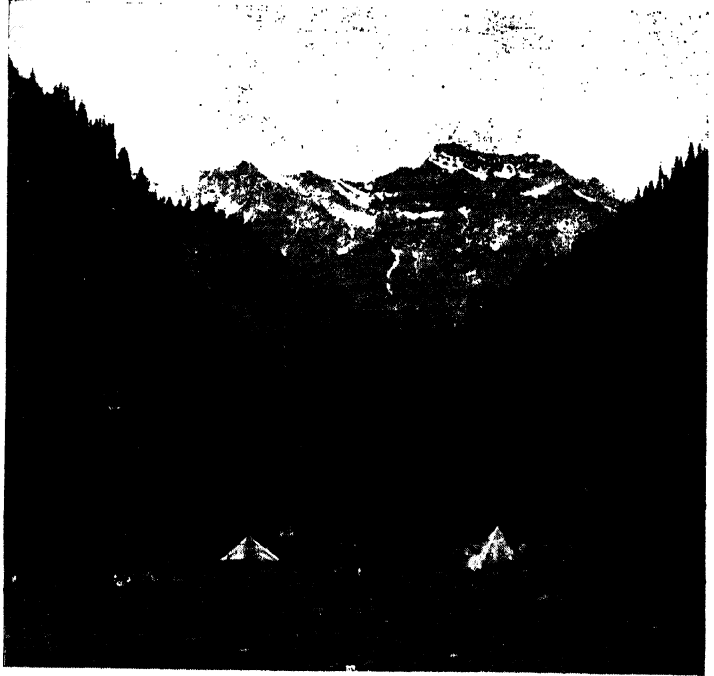
চন্দনবাড়ী

এই যে বাধা বিপত্তি এর সুর নানা স্থানে প্রকৃতিভেদে ভিন্ন ভিন্ন।

প্রারভ্যতে ন খলু বিঘ্নভয়েন নীচৈঃ।
প্রারভ্য বিঘ্নবিহতাঃ বিরমন্তি মধ্যাঃ॥

বিঘ্নৈঃ পুনঃ পুনরপি প্রতিহন্যমানাঃ।
প্রারভ্য চোত্তমজনাঃ ন পরিত্যজন্তি॥

উত্তম-জনের সংস্কার পড়ার অন্য দাবী রাখিনা; তবে লক্ষ্য করেছি আমার উত্তেজনা চাবুক নইলে ছোটে না, আগ্রহ বাধা নৈলে বাড়েনা; প্রতিজ্ঞা প্রসারিত হয়ে ওঠে আতঙ্ক আর ভয়ের ভ্রূকুটিতে। যেদিন বেরিয়েছি কাশ্মীর যাত্রার দলে সেদিন একবার অমরনাথের কথা মনে আসেনি সেকথা নয়; মনে এসেছিল; তবে মনেই; ঐ ঝলক চলকে পড়া চিন্তা। দরিদ্রের মনোরথ তা; উত্থায় হৃদিলীয়ন্তে। কিন্তু আজ মনে পড়ে মিসেস্ শর্মার প্রথম সেই প্রস্তাব শঙ্করাচার্য্য পাহাড় থেকে নামার পথে। তারপর টুরিষ্ট এজেন্সিগুলোতে যত খবরাখবর নিতে গেছি তত বাধা পেয়ে পেয়ে উত্তেজনা, উৎসাহ, প্রতিজ্ঞা বদলে বদলে একটা রোখ পেয়ে বসল। আজ তাই ঘোড়ার পিঠে করে আমাদের এই যাত্রা।

চটী মাত্র। পহালগামে যাঁরা দু'চার দিনের জন্য বেড়াতে যান্ তাঁরা একদিনে চন্দনবাড়ী গিয়ে পিকনিক করে ফিরে আসে। চন্দনবাড়ীতে একটা বরফের পুল আছে; সেটা দেখতে অনেকে যায়।

বরফের পুল কথাটা বোঝাতে হবে। পুল বা সেতু বলি তাকে যা নদীর এপার ওপার বেঁধে দিয়ে যাতায়াতের পথ সুগম করে দেয়। এখানে আছে লীদার বা নীল গঙ্গা। তার জলটা চন্দনবাড়ী চটী থেকে একটু উত্তরে একটা খঁড়ির মধ্য দিয়ে বয়ে গেছে। এই খাঁড়িটা খুব ঠাণ্ডা। পুব-পশ্চিমে খুব উঁচু পাহাড় আছে বলে প্রায় দিন ভোরই ছায়া থাকে। ফলে এখানে জলের ওপরে যে বরফ জমেছে সেটা গরমে গলতে গলতে আবার শীতকাল এসে পড়ে। সেই বরফের স্তুপের তলা দিয়ে নীল গঙ্গা ভীমগর্জনে 'হু-হু-হুঙ্কারি' বেরুচ্ছে ফেণায় ফেণায় শাদা হয়ে। এই বরফের ঢাকা জায়গাটা স্নো ব্রীজ। এই স্নো-ব্রীজে হেঁটে বেড়াবার জন্য অনেক লোক পাহালগাম থেকে আসে।

শেষনাগের গলিত হিমানী

আমাদের দলের অনেক ছেলে ঐদিন চন্দনবাড়ী গিয়েছিল। একটা বড় দল গিয়েছে কোহ্লাই। কোহ্লাই একটা তুষার স্রোতের মুখ। সেখান থেকে বেরিয়েছে অপর একটা ছোটো নদী, পহালগামে এসে লীদারের সঙ্গে মিশেছে। গওয়াশ্ব্রারী পাহাড়ের পাশ দিয়ে বয়ে আসছে। প্রকৃত তুষার-স্রোতটা আছে ১৫,০০০ ফুটের মাথায়। লোক জন যায় এক আধ দিন কাটিয়ে আসে। সঙ্গে তাঁবু খাবার নিয়ে যেতে হয়; যেতে আসতে তিনদিন লাগে। কিন্তু পথ সদাসর্বদা সুগম। অমরনাথের নামে যেমন সবার হৃৎকম্প আসে, কোহলাই পরিক্রমায় তেমন কিছু ভয়ঙ্কর নেই।

পহালগাম থেকে ঘোড়ায়। দুই ঠ্যাংয়ের মধ্যে চেপে রাখা একটা জীবন্ত প্রাণী—যার শক্তি আমার চেয়ে অন্ততঃ দশগুণ। ঘোড়ার পিঠে কোথাও যাবার সর্বাপেক্ষা বড় উত্তেজনা এই জীবন্ত বোধটা। ঘোড়ার নিঃশ্বাস প্রশ্বাস, মেজাজ আর গতি সব জড়িয়ে ঘোড়ায় চড়া একটা বড় আমোদ। ঘোড়া খুবই মেজাজী জানোয়ার। চালকের সাহস, ক্ষিপ্রতা আর চালনার গুণ ঘোড়া যেমন বোঝে তেমন আর কেউ নয়। এ-দেশী ঘোড়ারা সাধারণ রেসের ঘোড়ার সাইজের প্রায় অর্দ্ধেক। এরা খুব ছোটেনা, ধীরে ধীরে চলে; কিন্তু শুধুই যে ওজন বইতে পারে তা নয়, ওজন নিয়ে পাহাড়ের চড়াই ওঠার তাৎপর্য্য অদ্ভুত। অল্প আহারে, সময়ে সময়ে অনাহারেও এরা একভাবে দিনের পর দিন হেঁটে যেতে পারে; তাই গুজরদের অতি প্রিয় পশু এই ঘোড়ারা।

পহালগাম থেকে দলটা গিয়ে থামবে চন্দনবাড়ী। চন্দনবাড়ী একটা

আসল ব্যাপারটা আতঙ্ক। কিন্তু লক্ষ্য করে দেখেছি কোহলাই যাওয়াটা যেমন প্রগতিবাদিতার লক্ষণ, অমরনাথ যাওয়াটা তেমনি কাঠমোল্লানার ছোপধরা। কোহ্লাইয়ে কোনও 'নাথ' বা 'স্বামী'র বালাই নেই। তাই সতীপনা ক্ষুণ্ণ অক্ষুণ্ণ রাখার কথা ওঠে না তত্র গমনে। যত্র তত্র নির্বিবাদে নিছক ফুর্ত্তি করার প্রগ্রেসিভ্ লক্ষণটুকু সাহেবরা বারংবার স্তবে ও আনাগোনায় কায়েমী করে রেখে গেছেন। তেমনটা হয়নি অমরনাথের বেলায়। এইখানে পদমে কেমন একঘেয়ে তীর্থযাত্রার একটা পক্ষপাতিত্ব দেখাতে হয়। এই ধরণের দেবতানুগামী চিত্ত প্রগ্রেসিভনেসের দারুণ অরুচিকর। কায়েমী অমরনাথের 'নাথত্ব' তাই একদল ভক্তজে শাসিত করেন। সাহেবরা

জানতো পিকনিক করার পক্ষে অমরনাথের পথটা দারুণ বদমেজাজী। তাই শতহস্তেন ওকে পরিত্যাগ করে চলেছে। অবশ্য ডানপিটে সায়েবরা অগম্য রাখেনি কোনও নাথ বা স্বামীকে ; সে কথা স্বতন্ত্র।

কোহ্‌লাইয়ের দলকে পাইনি এ পথে। পাওয়ার কথা নয়। কিন্তু চন্দনবাড়ী যাবার পথে দলে দলে ছাত্র দেখেছি ঘোড়ায় করে ছুটেছে। যতই চন্দনবাড়ীর দিকে এগুই, তত ওদের দল কম কম বলে বোধ হয়।

পথের মাঝে অকস্মাৎ দেখি ঘোড়ার লোকগুলো সব অদৃশ্য। কেউ কোথাও নেই। ঘটনাটা ঘটলো পহালগাম থেকে দুমাইলের মধ্যে। একটিমাত্র ঘোড়াওলা সঙ্গে। তাকে জিজ্ঞাসা করতে জানলাম বাকী সব গেছে গ্রামে। পাশেই ওদের গ্রাম বাটকুট। বাটকুট গাঁয়ে থাকে কেবল মুসলমান, যারা বংশপরাম্পরায় এই অমরনাথের পথ সংস্কার করার গুরুভার বহন করে আসছে ; যারা দাবী করে প্রথম অমরনাথকে মানবসমাজে প্রকট করার—যারা ঘোড়ায় করে তীর্থযাত্রীদের নিয়ে যায়, এবং হিন্দু তীর্থযাত্রীর সঙ্গে একজোটে অমরনাথকে পূজা দেয়। এরা অমরনাথের প্রণামীর এক তৃতীয়াংশ পায়। এক অংশ পায় মহাদেব গীরের সন্ন্যাসীরা ; তারা অমরনাথের বিশিষ্ট উপাসক মণ্ডলী। তৃতীয় অংশ পায় মার্তণ্ডের পাণ্ডারা।

এইগ্রামে এরা আছে অনাদি অনন্তকালের সঙ্গে এক হয়ে, কবে থেকে কেউ জানে না। জাতিতে ওরা কবে মুসলমান হয়েছে তাও ওরা জানে না। তবে মনে প্রাণে ওরা হিন্দু। হিন্দুযাত্রীদের সেবা করেই আশেপাশের গ্রামের সাতহাজারটী প্রাণী জীবনযাত্রা নির্বাহ করছে। এই যখন এদের উপজীবিকা, তখন ভাবতে বেগ পেতে হয়না—কি চরম দারিদ্র্যের সঙ্গে সংগ্রাম করে এদের জীবন রক্ষা করতে হয়। শুনতে পাই ভুটানের, নেপালের তরায়ে এমনি সব গ্রাম আছে, পাহাড়ী কুলীদের, শেরপাদের, কলকাতায় এককালে ছিল মূর্তিকারদের কুমারটুলিতে। সামান্য জমিজমা প্রত্যেকেরই আছে, চাষবাস করে ; ছেলেরা গরু ভেড়া চরায়, পুরুষরা ঘোড়া নিয়ে যাত্রী আর মাল আনা-নেওয়ার ব্যাপারে থাকে।

মুনীশ্বর এই সুযোগে সাবধান বাণী উচ্চারণ করলো—"এ ব্যাটারা মহাপাজী। কেবল ঘোড়া ছেড়ে ছেড়ে আপোষে গল্প করতে করতে চলবে। ওদের পথ দেখেশুনে চলা উচিৎ ; তা নয় সবটা ঘোড়ার তবিয়ত আর তালিমের ওপর ছেড়ে দিয়ে দিব্যি গায়ে ফুঁ দিয়ে চলে। আপনি একটু বলুন না। মনে হয় কিছু ফল ফলবে।"

মনে মনে ভাবলাম বিশ্বশুদ্ধ সকলকে অপ্রিয় কথা বলার দায় আমারই কি? সেই দায় থেকে অব্যাহতি দিলো শ্রীমান জগজীবনের আতঙ্ক। চিৎকার করে বল্লে ও—"কী ঘোড়া ছেড়ে ছেড়ে চলে যাবে? চালাকি পায়া নাকি? দেখায় দেঙ্গা মজা। সাথমে সাথমে চলে পা।"

এ কদিনে আমাদের হিন্দী বলাকে জগজীবন ভেঙ্গাতে সুরু করেছে।

শেষনাগ—লীদার, নীলগঙ্গা বেরুচ্ছে

কিন্তু ও সত্যিই সারাপথ ঘোড়াওলাদের ক্রমাগতঃ খবরদারি করতে করতে গেছে। ওদের এই বদঅভ্যাস ছুবার আমাদের বিপদে ফেলেছিল সে কথা পরে হবে।

আপাততঃ চন্দনবাড়ী পৌছান পর্য্যন্ত আর শ্রীমানদের সাক্ষাৎ পেলাম না। মাইল আষ্টেক পথ আমরা ঘোড়ায় চলে চন্দনবাড়ী পৌছলাম বেলা তখন প্রায় দেড়টা। একটা তাঁবুর তলায় একটা পাঞ্জাবী ধাবা (শিখেদের তত্ত্বাবধানে পরিচালিত মাংস রুটীর দোকান) আমরা খাবারের অর্ডার দিয়ে সামনে-পাতা বেঞ্চে রোদে পা মেলে বসলাম। ঘোড়াগুলো চরে চরে আপন মনে পাহাড়ী ঘাস খেতে লাগলো।

কে জানে তখন চারদিনের মত ঘাস খাওয়া ওদের এই শেষ।

চন্দনবাড়ীতে থাচ্ছি একসময়ে চেয়ে দেখি হুকুমচাঁদ আর ধনেশ এসে হাজির। হুকুমচাঁদ যাবেই।

"নিয়ে চলুন আমায়, আপনাদের অনেক কাজে লাগাবো।" কাতর মিনতি তার। "আমি তব যাবো সাথে।"

অবশেষে বললাম "চল্। যদি ঘোড়া জোগাড় করতে পারিস।"

"ঘোড়া না পাওয়া যায় মুনীশ্বরের মতো হেঁটে যাবো।"

তা হোলোনা। ভারী মন নিয়ে হুকুম আর ধনেশ চলে গেল পুল অবধি আমাদের পৌঁছে দিয়ে। সামনে চেয়ে দেখি লীদারের জলের দুধার ধরে পাহাড়ের সার নেমে গেছে। দূরে হরমুকের একটা চমৎকার শৃঙ্গ সমস্ত পুব আকাশটাকে মহিমামণ্ডিত করে রেখেছে। সবুজের বাহার খুলেছে যেন একটা বাতায়ন পথে। অনেকক্ষণ চেয়ে আছি। ভর্মা ছবি আঁকছিলো। ডেকে বললাম এই দৃশ্যটা নিতে। দেখে ওর চমক লাগলো। "এতো চমৎকার? ওর কলম দ্রুত চলতে থাকে স্কেচ্ বুকের ওপর।

গাছপালা ক্রমশঃ গভীর হচ্ছে। পথ হচ্ছে সঙ্কীর্ণতর। খাড়াই উঠছে। ভীষণ খাড়াই—পিস্সুঘাটী। এই ঘাটীর সমান খাড়াই এবং বিশ্রী ঘাটী নাকি বড় একটা নেই। খাইবার, বোলাম প্রভৃতি প্রসিদ্ধ গিরিপথ দুস্তর হয়ে আছে মানুষের অত্যাচারেই বেশী নৈলে পথ হিসেবে এরা দুর্লজ্ঘ্য নয়। কিন্তু একেবারে সোজা দু'হাজার ফুট ওঠার এই খাড়াই এর ভীষণতার কথা লেখা যায়না। শোনা যায় এই পর্য্যন্ত এসে পণ্ডিত নেহরু ফিরে গিয়েছিলেন তাঁর ঘোড়ার পা ফস্কেছিল তাই। এ পথে ঘোড়ার পিঠে চড়ে যাওয়া নিষিদ্ধ। বড় বড় পাথরের ঢিবি। ঢিবির পর ঢিবি। উঠে গেছে আরও উঠে গেছে। ছড়িয়ে আছে ছোটো বড় নানা আকারের নুড়ির টুকরো। একটা থেকে একটু পা হড়কালেই আর কথা নেই একেবারে অবধারিত মৃত্যু। খাড়াইটাকে একটু আধটু বাদ দিয়ে প্রায় নব্বই ডিগ্রীর খাড়াই বলা চলে। সকলেই ঘোড়া ছেড়ে উঠছে। দম নিচ্ছে, হাঁফাচ্ছে, কিন্তু উঠছে।

কখন একটা ডালের খোঁচা লেগেছে। জগজীবনের মাথা থেকে টুপীটা পড়ে গেছে, বর্ষাতির সঙ্গে উনের টুপী ঢাকা দেওয়া রবার-ক্লথেরসেই টুপী। যেই পড়া সেই উধাও। কেউ চেষ্টা করেও তাকে আর উদ্ধার করতে পারলো না।

"আর কত উঁচু রে? কত উঠতে হবে?" জিজ্ঞাসা করে গুপ্তা।

বেণু বলে,—"দাঁড়িয়ে জিরুবো এটুকু জায়গা নেই। বুক বেয়ে বেয়ে উঠে যেতে হবেই।"

"ঐ ওপরে যে ভোজগাছটা দেখা যাচ্ছে—পাচ্ছেন দেখতে?" বল্লে মুনীশ্বর।

কোটেশ্বরের দল এতক্ষণে নীচে দেখা দিল। ছোটো ছোটো ক্ষুদে পুতুলের সার।

শেষনাগের বুকে তুষার স্রোত

অনেক চেষ্টার পর ওপর দিকে চেয়ে দেখলাম একটা গাছ। ঐটাই পুরাতন সেই ভোজ গাছ, পিস্সুঘাটীর অংশীদার, পাহারাদার। পর্য্যটক মাত্রে এই ভোজ গাছের উল্লেখ করেছে।

ভোজগাছটাই গাছ-জগতের শেষ গাছ এই পথে। এর পরে কেবল মাটী ঢাকা ঘাস। বেলা তখন চারটে হবে আমরা পিস্সুঘাটী ফেলে উঠে এলাম আরও দু'হাজার ফুট। এটা এখন দশ হাজার ফুট।

কাশ্মীরের 'বাটী'-র তলা থেকে আর এই ভোজগাছ পর্য্যন্ত যে শ্যামল জগৎ ডেরা বেঁধেছে তাদের মধ্যে 'পাড়া' গড়া বুদ্ধি জবর। ক্লানিশনেশ, কমুনালিটী, আর প্রভিন্সিয়ালিজম্ এদেরও কম নয়। গাছ হলে কি

হবে, শুধু প্রাণ আছে তাই নয়, বুদ্ধিও আছে। সমতলে ধান হচ্ছে চিনারের তলায়, চিনারের ছায়ায় ঢাকা গ্রামের চাষীদের চেষ্টায়। তারপর ওঠো,—থাকে থাকে সিঁড়িতে সিঁড়িতে ধান। গাছের রং গাঢ় খয়েরি, বা নীলাভ। তারপর সাত হাজার ফুটের মাথায় আর চিনার নেই। এলেন আখরোট সমাজ। সঙ্গে কেলু, খোরানী এঁরা। ওদিকে ধান আর নেই; এসেছেন ভুট্টা, জোয়ার। নদীর বাঁধারে ঘন বন। এক ধারে চাষ আবাদ, গাঁ, পথ। সে বনে পাইন, ফার্, স্প্রুস এক আধটা। ব্যস। আরও উঁচু দেশে এলে। এখানে প্রচণ্ড বিক্ষোভ জল তরঙ্গের দেশ। পায়ে পায়ে ভাম গর্জনে জল পড়ছে। এ সমাজে ম্যাপল আর শুদে আখরোট। জোয়ারও আর নেই। জনার হচ্ছে কায়ক্লেশে। আর তিব্বতী-যব। আরও উঁচু যাও, এবার ভোজগাছ; আর কিছু নয়। তারপর? হিমপ্রবাহ, তুষার, মাঝে মাঝে ঘাস। ভেড়া-ছাগল চরার দেশ। তারপর তাও নয়—শুধু হিমানী। শাদায় শাদায় সব একাকার। শেষ ভোজগাছটাও শেষ হয়ে গেল।

খানিকটা সমতল। একদল গুজর আগুন জ্বেলে রাতের আস্তানা গেড়েছে। মনে হচ্ছে ওরা যদি চা খেতে ডাকে। উৎসাহ তখনও পুরোমাত্রায় আছে, কিন্তু চা পেলে বেশ হতো।

চলেছি সপ্ত মহারথী আমরা, ছ জনায় ঘোড়ায়, মুনীশ্বর পায়েহেঁটে। আকাশে ঘনঘটা। আশে পাশে পাহাড়গুলো একেবারে নিষ্পাদপ, ঘাসে ঢাকা, আর অদ্ভুত উঁচু। মাঝে মাঝে এক একটারগা বেয়ে জল পড়ছে। খুব উঁচুতে পাহাড়ের গায়ে ভেড়ার পাল চরছে। অনেকক্ষণ লক্ষ্য করলে গুঁড়ো গুঁড়ো চলাচল করছে বোঝা যায়।

তুষারাবৃত পথহীন চড়াই—অমরনাথের পথে

পথ নেই। প্রায়ই বরফ ঢাকা পথ পার হতে হচ্ছে। পাহাড়ের গা কুরে কুরে ইঞ্চি দশেকের পথ। ঘোড়ার পা সন্তর্পণে পড়ছে, পার হচ্ছে পাহাড়ের ধার। গড়ালে তিন হাজার ফুটের তলায়।

এবার একটা সমতল। অনেকটা ঘাসে ঢাকা। দূরে টিনের ভাঙ্গা শেড্। কয়েকটা ঘোড়া চরছে। ধোঁয়া উঠছে। বৃষ্টি এসে গেলো। ঘোড়া ছেড়ে দিয়ে ঐ টিনের শেড্‌টার পানে দৌড়ালাম।

একটা ছোটো ছত্তলদারী—তাঁবু চোখে পড়লো। আমার ঘোড়াওলা বল্লে "বাবু যে ঘোড়াওলা তোমায় ধোকা দিয়েছিল সে বোধকরি ঐ দলে। যাওনা, গিয়ে ধমক লাগাও না।"

আমি এগিয়ে গেলাম চায়ের তল্লাসে।

ছত্তলদারীর মুখটা বৃষ্টির জন্য ঢাকা।

আমার শব্দ শুনেই যে মুখখানা উঁকি মারলো দেখে আমি বিস্মিত। একেবারে অপ্রত্যাশিত স্থানে একেবারে অপ্রত্যাশিত চমৎকার।

শান্ত নির্মল নীল দৃষ্টিতে খানিক চেয়ে ভ্রূযুগল নামিয়ে নিলো, বললো না কিছু। ছত্তলদারীর ঢাকা আবার পড়ে গেল।

ভাবছি ঢাকা খোলে কিনা, আবার খুলবে কি-না। ওরা ঘোড়া থেকে নেমে এদিক ওদিক ঘুরছে। ভর্মা স্কেচ্ নিচ্ছে সামনের তিন হাজার ফুটের বেশী উঁচু চড়াই সমেত উত্তুঙ্গ গিরি শ্রেণীর। বলয়ের মতো সমস্ত উত্তর দিকটা ঘিরে আছে একটা অতিকায় প্রাচীরে। সমগ্র উপত্যকাটায় কোথাও একটু লাস্য বা হাস্য নেই। একটা স্পর্দ্ধিত আক্রোশ, একটা নিরস্ত তর্জন। ঘনায়মান মেঘালোকের বিবর্ণ অন্ধকার রাত্রির ক্ষুধার মতো গ্রাস করছে দেখার বস্তুর মনোহারিত্বকে। আমি স্তব্ধ প্রতীক্ষায় দাঁড়িয়ে আছি।

নিমেষ কয়েকের প্রতীক্ষা সমাপ্ত হতে না হতে এবার বেরিয়ে এলেন পঞ্চাশোত্তরা দীর্ঘশ্রী ক্ষমতাপন্ন অবয়বের কান্তি নিয়ে একটা মহিলা, পরণে দীর্ঘ গাউন, চুলগুলো খাটী 'অবর্ণ', চোখের তারা ঘন নীল।

মেম সাহেব ইংরাজীতে বল্লেন "দাঁড়িয়ে কেন ভাই? ভেতরে এসো।"

ছত্তলদারীর ঢাকা তুলে উঁকি মেরে দেখি—ওরা পাঁচটী প্রাণী অতি-কষ্টে ওর মধ্যে ছড়িয়ে-জড়িয়ে কম্বল ঢাকা দিয়ে বসে। বিছানার স্তূপের ওপর ট্রেতে চা সব শেষ হচ্ছে।

আমি বল্লাম,—এখন নয়। চায়ের সময় ভদ্রলোকের ঘরে মাছি ছাড়া অনিমন্ত্রিত কেউ চাপে না।

বৃদ্ধ ভদ্রলোক, শক্ত সমর্থ চেহারা; চোখে সোনার ফ্রেমে বাঁধানো চশমা। সামনে টাক, পিছনটায় লম্বাটে শাদা চুল। ছাইরঙের গলা-ঢাকা পুলওভার পরে কোমর অবধি রাগ্ ঢেকে বসে আছেন। অমায়িক কণ্ঠে বললেন,—"কিন্তু চায়ের জন্যই ডাকছি। আসুন, আসুন।"

ডান হাত ঊর্দ্ধে তুলে বললাম, "মাপ করবেন সুন্দরীদের কারুকে এতক্ষণ নমস্কার জানিয়ে সাধারণ সৌজন্যটুকুও প্রকাশ করিনি। একমাত্র চা-ই আমায় এতটা অ-সামাজিক বর্বর করে তুলতে পারে।"

ওঁরা হেসে উঠলেন। তৃতীয়া সেই লালিত্যভরা মুখখানা ছাড়া কিশোর-বর্ণন এক যুবক বসে সেই কিশোরীর পাশে। বৃদ্ধ বললেন,—"চা ভাল বাসো ছোকরা! বাইরে দাঁড়িয়ে কেন, এসো চা খাও।"

"না খাব না। ভালবাসা সত্ত্বেও খাব না। আমার মাথা একটা দেখছেন বটে কিন্তু আসলে আমার ছটা মাথা। হৃদয় অবশ্য একটাই। তবু এক হৃদয়ের শূন্যতা মেটাতে ছয় মাথায় চা না খেলে…"

কথাটা শেষ হতে পায় না। বৃদ্ধ বলেন—"বহুৎ আচ্ছা ছোক্রা। ছজনাই এসো। এতবড় পার্টি, যাচ্ছো কোথায়? বায়ুযান না শেষনাগ?"

"আরও দূরে, অমরনাথ। কিন্তু এ পথে আচেল চায়ের রাশন থাকার কথা নয়। আপনাদের ভাঁড়ারে মঙ্গোলদের মতো পড়ে সব শেষ করে দিতে চাই না।"

বৃদ্ধা এবার জোর গলায় বল্লেন,—সে খোঁজ তোমার কেন বাপু? আমরা তীর্থ করতে বেরুইনি। সখ করার ভাঁড়ার আমাদের। সইস্, বেয়ারা, রসদ, রাঁধুনি সব আছে। ডাকো দলের সবাইকে।

আমি ওদের কাছে গিয়ে দেখি দুজনায় একটা বর্ষাতি ধরে আছে। তার তলায় বসে ভর্মা দিব্যি স্কেচ্ করছে। গিয়ে বললাম "চা খাবে? কেক্, বিস্কুট সহ?"

জগজীবন বলে—"কাটা ঘায়ে নুনের ছিটে কেন?"

আমি বল্লাম—"সত্যি।"

গুপ্তাজী বল্লেন—"সিগারেটের মধ্যে গাঁজার পাতা ছিল নাকি?"

আমি বলি—"পারি খাওয়াতে। প্রতি কোর্সের জন্য কি দেবেন?"

অসিত বলে—"চলুন চলুন। প্রাণটাই দেব যদি চা পাই।"

চললাম ওদের নিয়ে।

সারা গায়ে বর্ষাতি চাপানো। বাঁদুরে টুপীর ওপর বর্ষাতি টুপীতে ঢাকা। সবার চেহারাই খোলতাই আর বলার কথা নয়। ওই অবস্থায় ষড়ৈশ্বদ আমরা এসে 'ভিক্ষাং দেহি' বলে দাঁড়ালাম।

কিন্তু পরমাশ্চর্য্য মনে হয়নি ওদের চা দেওয়া। পরমাশ্চর্য্য বোধ হচ্ছিল ওই ছত্তলদারীর মধ্যে কি করে আমরা সকলে একত্রে বসলাম। সেই পাতা বিছানায় ঝুপঝাপ বসে পড়লাম। কিন্তু বিপদ করলে বেণু। ওযে মেয়ে—এ ওর অপরূপ রূপ সজ্জা ভেদ করে মালুম হয় না। পুল-ওভারের ওপর ওভারকোট, তার ওপর বর্ষাতি পরার পর ললনা লাবণ্যের পরিচয় একমাত্র কেশরাজিতে ঝুলতে থাকে। বেণুর দেড় ফুটী চুলের গাদা আত্মগোপন করেছে বাঁদুরে টুপী আর বর্ষাতির ভেতরে। তার ভেতর দিয়ে কেবল দেখা যাচ্ছে ওর ঘন ভ্রূ, আর ভোমরার মতো চক্‌চকে কালো চোখ দুটো। সে চোখ যে কতো ধূর্ত্ত, আর কি অদ্ভুত শয়তানীতে ভরা এই—"মাইনাস্—ফেমিনীন্"—চেহারায় স্পষ্ট। ওর পরণের সেই ব্রীচেস্ ওকে করে রেখেছে বাঁশের সঙ্গে বাঁধা কলাইয়ের মতো। হাঁটু মুড়তে পারে না, বসতেও পারে না। আমি ধরে কোনও মতে ওকে বসালাম। পা ছড়িয়ে ও বসলো।

এবার একে একে প্রত্যেকের পরিচয় করলাম—"অসিত, শিক্ষক, বায়লজীর বাতিকগ্রস্ত; জগজীবন শিক্ষক, কেন যে কমার্স পড়ায় জানি না, ওর মাথার চুলের হিসেব নিকেশেই ও দেউলে; প্রাণের বাজারে এখনও প্রবেশই করেনি, ভালবাসার এক্সচেঞ্জে দালালি করে করে খিট্‌খিটে হয়ে গেছে। গুপ্তাজী সত্যিকার ওস্তাদ; গাম্ভীর্য্য দেখলেই মালুম হয়; ইতিহাস পড়ান বটে কিন্তু জানেন ভালো গান, যা উনি গান না। ইনি আমাদের ভর্মাজী, পরিচয় পাবেন এই স্কেচ্ বুকে। আর এই ছেলেটীকে দেখুন উনি আদৌ ছেলে নন, মেয়ে নন, নাম বেণু, স্কুলের প্রধান শিক্ষয়িত্রীর কোনও ধরণধারণ চেহারায় নেই, আমার বোন্ এবং উপস্থিত পথের বিপদ। আমি নিজেও শিক্ষক তবে পড়াতে হয় কম, তম্বিরই বেশী। এবার আপনাদের পরিচয়?"

"আমরা টুরিষ্ট" আরম্ভ করলেন সেই কৈশোরিক যুবক। "বাড়ী আমেরিকায়।"

"আমেরিকায়? আশ্চর্য্য!"

"আশ্চর্য্য কি?" জিজ্ঞাসা করেন বৃদ্ধা।

"খুবই"

"কি বলুন না!" বলেন বৃদ্ধা।

"উচ্চারণ। তবে ইংরাজী উচ্চারণ ভাল জানি বলে তিলমাত্র সন্দেহ পোষণ করিনা। কিন্তু খুব মন দিয়ে ভালো উচ্চারণ শুনে থাকি। আপনি যখন ডাকলেন তখন আপনার সুদৃঢ় ও ব্যক্তিত্বপূর্ণ ইংরাজী উচ্চারণই আমায় আকৃষ্ট করেছিল। ভেবেছিলাম—"

সজাগ হয়ে বল্লেন বৃদ্ধ "বলুন কি ভেবেছিলেন। বেশ কৌতুক বোধ হচ্ছে তো। কোথাকার লোক ভেবেছিলেন?"

"তা আমেরিকার তো নয়ই। গ্রেটব্রিটেনের মধ্যেকার খাঁটি মাল ভেবেছিলাম।"

"কি ভাবলেন অক্সফোর্ড, চেশায়ার না ওয়েসেক্স?"

সলজ্জভাবে নিবেদন করলাম—"অত তো ভাবিনি। আমেরিকা

ইংরেজীর ছিরিছাঁদ ধরতে পারিনা। কিন্তু আপনাদের কথায় তো দিব্যি শ্রী আছে।"

যুবক বলে, "আমেরিকান তো শিখতেও পারে।"

"পারে বৈকি। আমরা যেমন শিখি। সে কথা তো হচ্ছেনা। হচ্ছে একটা প্রভাবের। আপনারা আমেরিকান কথাটা হঠাৎ আমায় চমকে দিলো এই উচ্চারণের ভঙ্গীতেই। আমি ওয়েসেক্স, লিঙ্কনশায়ার, অক্সফোর্ডের তারতম্য জানিনা। তবে আমার মনে হোলো আপনারা হাইল্যাণ্ড অন্ততঃ স্কটল্যাণ্ডের লোক।"

একটা শব্দ করে উঠলো বুড়ী। "কি করে জানলে?"

হাসতে হাসতে বলি—"ওই স্পষ্ট জোর দিয়ে থেমে থেমে বলা আর জোর করে 'আর্' আর 'টী' গুলোকে উচ্চারণ করা—। আচ্ছা আপনারা কি মিশনের সঙ্গে যোগাযোগ রাখেন?"

ভদ্রলোক জিজ্ঞাসা করেন, "কেন বলুন তো?"

"হঠাৎ কথাটা মনে হচ্ছে। আমেরিকান্, স্কচ্, ভারতবর্ষ, অমায়িকতা সব জড়িয়ে কোথায় যেন স্কটিশচার্চ বা সেণ্টএণ্ড্রুসে'র গন্ধ পাই। পরিচয় দিন না।"

চা এসে গেছিল। বুড়ী বললে "আমরা স্কটিশ এবং গত ত্রিশ বৎসর একনাগাড়ে ভারতবর্ষে চার্চের কাজ করছি। হানাদারদের হাতে সম্প্রতি লাঞ্ছিত হয় যে চার্চগুলি তাদের অন্যতম চার্চে ছিলাম। উপস্থিত পহালগামে চার্চে আছি, যেও একদিন। এঁরা সবে বিবাহিত। আমেরিকা থেকে আসছেন, অরেগণের লোক। মধুযামিনী পালন করতে চলেছেন পায়ে হেঁটে অমরনাথ। সঙ্গে কিছু আনেননি। এখানে আমাদের দেখে রুখেছেন। আমরা আর যেতে দিচ্ছিনা। এঁর নাম জর্জ ডীগ্, ইনি মিসেস ডীগ্।"

মিসেস্ ডীগের দিকে অনেকবার চেয়ে দেখেছি। যেন মোম ঢেলে তৈরী মুখ। উনি কথা বললেন—"কিন্তু আপনারা অমরনাথ যাচ্ছেন?"

"হ্যাঁ"

"তবে আমরাও যাবো।" বলেন মিঃ ডীগ্‌কে।

মিঃ ডিগ্ বলে "পারবে যেতে?"

"পারবো।" আমার দিকে চেয়ে সমর্থন চান।

"পারবো না?"

আমি বলি—"না পারবার কি? আমাদের দেশের অশীতিপর বৃদ্ধারা অমরনাথ যাত্রা করে থাকেন।"

আমি ভুলবনা পাদ্রী দম্পতীর বদান্যতা, বিশেষ করে মহিলাটার সেই মাতৃসুলভ স্নেহ ও অকুণ্ঠ আতিথেয়তা। বেশ কতকগুলো কেক আর বিস্কুট খেয়ে দুতিন কাপ চা খেয়ে আমরা যখন বেরুলাম তখন একেবারে চাঙ্গা। বৃষ্টি থেমেছে, রোদ বেরিয়েছে, ঘোড়াগুলো ফিটুফাট্ তৈরী। আমাদের মালবাহী ঘোড়া দুটোও এসে পৌঁছে গেছে।

নমস্কার করে আবার ঘোড়ার পিঠে চড়েছি। সামনের গগনস্পর্শী গিরিশৃঙ্গগুলি দেখছি, যেন এই সমতল থেকে খাড়া উঠে গেছে। ঘোড়ার উপর থেকে ঘাড় উঁচু করে দেখছি। হঠাৎ মনে হোলো খুব উঁচুতে যেন কি নড়ছে। মানুষ না ছাগল-ভেড়া? ঠিক ঠাওর হচ্ছে না। বড্ড ছোটো। মুনীশ্বরকে জিজ্ঞাসা করলাম—"ওপরে অত উঁচুতে কি সব ঘুরছে? মানুষ?"

"হ্যাঁ মানুষই। গুজর।"

"অত উঁচুতে? উঠলো কি করে? এমন খাড়াই চড়ে কি করে?"

মুনীশ্বর কৌতুকমিশ্রিত হাস্যরসে সিক্ত করে বল্লে—"কেন আমাদেরও তো ওই পথ। আমরা তো এখন ওখানেই উঠব।"

বুক ঢিপ ঢিপ করে। বিশ্বাস করতে পারিনা যে আমরা উঠতে পারব। এটা কুটা-ঘাটী। অর্থাৎ যে ঘাটী গিরিকূটেরই সংস্করণ; খাড়া শিখর। পেরিয়ে এলাম পিস্সুঘাটী। ঘাটী মানে খাড়া চড়াই, গিরিপথের চড়ক-সংস্করণ। এখানে নাম পিস্সু, জুই, মচ্ছর ইত্যাদি কীটের নামের সঙ্গে জড়িত। পিস্সু উকুন-জাতীয় পাহাড়ী পোকা, তেমনি উকুন, মশা, ছারপোকা ইত্যাদি পোকামাকড়ের নামে এইসব অতিকায় গিরিপথগুলির নাম। আমি ভাবছি মানুষে সুস্থ মস্তিষ্কে এই বাঁশ-চড়াই চড়ে কি করে। ঘোড়া থেকে নেমেই চলেছি খানিক। কিন্তু হাঁটুর ব্যথাটা এগুতে দিচ্ছে না। অবশেষে মরিয়া হয়ে ঘোড়াতেই চেপে বসলাম। জীনের ওপর থেকে প্রায় পড়ে যাচ্ছিলাম; ঘোড়ার পিঠের ওপর প্রায় ঝুঁকে পড়ে আছি, কিন্তু চলেছি। এই ঘাটী পার হয়ে আসতে ঝাড়া চল্লিশ মিনিটকাল সময় নিল! অথচ দূরত্বে আমরা এক ফার্লংও এগুলাম না।

চড়াই উঠে আর ঘাসও দেখিনি। পথে পথে ইতস্ততঃ কাঁচের মত কঠিন বরফের পর্দা জমে আছে। ঘোড়ার খুরের সংঘাতে তা থেকে একটা কঠিন শব্দ বেরুচ্ছে, আর সেই পর্দা মড় মড় করে ভেঙ্গে যাচ্ছে। মহাদেবের জটা কি, তা থেকে নির্ঝরিণী কেন উৎসারিত এখানে এসে যেন প্রত্যক্ষ করলাম। রুক্ষ, তাম্রাভ, রুদ্রাক্ষের মতো বন্ধুর গিরিগাত্র ভেদ করে মাঝে মাঝেই কোণগুলি বেরিয়ে আছে শৃঙ্গাকারে। একটা দুটো নয়, শত শত। তার মধ্যে কোথায় জটাবন্ধনের উত্তুঙ্গ ইঙ্গিত। আর সেই শৃঙ্গচূড় হতে বারিপ্রপাত ক্ষীণ রেখায় ঝরে পড়েছে লাবণ্য সৃষ্টি করে। যেন এককলা চাঁদের মায়া গলে গলে পড়ছে জটাজাল ভেদ করে। পাহাড় আড়াল করেছে আলো, পথটা অন্ধকার হয়ে এলো। জমীটা জলসিক্ত। মাঝে মাঝে বরফ। কোথাও কোনও গাছপালা নেই। এগিয়ে চলেছি। আবার একটা বড় পাহাড়ের বেড়। পাহাড়টার প্রায় মাঝখানটা দিয়ে চিরে বার করা কুটখানেকের পথ। একেবারে নিরাবরণ নিরাভরণ পাহাড়। তলা দিয়ে নীল গঙ্গা বইছে দেখা গেল এতক্ষণে। আমরা চলেছি নীলগঙ্গার উৎসমুখে, সেই শেষনাগে। লীদার নামটা লম্বোদরীর অপভ্রংশ। পুরাণে একে লম্বোদরীও বলা হয়েছে। কিন্তু নীলমত পুরাণে কথিত নীলনাগের প্রিয় নদী নীলগঙ্গা নামটাই আমার ভাল লাগলো জলের রং চাক্ষুষ করে।

অসিতের ঘোড়া এগিয়ে গেছে। একটা জায়গায় গিয়ে আনন্দে ও চিৎকার করে উঠলো—"অদ্ভুত, অদ্ভুত !"

এ ধরণের উচ্ছ্বাস অসিতের স্বভাবসিদ্ধ নয়। বুঝতে কষ্ট পেতে হয়না যে অপরূপ সুন্দর কিছু একটার সাক্ষাৎ পেয়েছে ও।

সারি সারি ঘোড়া নিয়ে পাহাড়টার বেড়ের মাথায় সকলে দাঁড়ালাম।

প্রায় হাজার ফুট নীচে দুই মাইল বৃত্ত দিয়ে পড়ে আছে গভীর নীল জলে ভরা একটি হ্রদ, যেন কে সবুজ তুঁতের গুলে রেখেছে। সে বর্ণের প্রকৃত বর্ণনা দিই এতো রং-সাজী জানিনে। গুণী ব্যক্তি দিতে পারতেন।

যে দেখা দেখার জন্য এতো অয়োজন তাকে পাবার পর হর্ষ জাগা উচিৎ, জাগা উচিৎ বিস্ময়। কিন্তু শোনা গেছে কখনও কখনও এমন বিস্ময়ের সম্মুখীন হতে হয় যে প্রত্যাশাকে বিমূঢ় করে দিয়ে স্বয়ং সর্ব্বস্ব। সেখানে যেন সকল প্রত্যাশা স্তব্দ, সকল বিস্ময় অপগত, সমস্ত চৈতন্য, উন্মেষ, উৎসাহ, থেমে থাকে। আমরা যেন তেমনি থেমে গেলাম। মাত্র একটা জলের চাদর বেছানো দুই বর্গ মাইল ব্যাপ্ত হয়ে। তার চারপাশ দিয়ে গোল হয়ে উঠে গেছে পাহাড়। পূব ধারের পাহাড়ের বৃত্তটা শুধুই বরফ ঢাকা। মাত্র হ্রদ, মাত্র নিঃসঙ্গ, নিস্তরঙ্গ, নিঃশব্দ একটা চিত্র। কিন্তু বিচিত্র সেই চিত্র, বিস্মিত করা সেই স্মিত। মাত্র একটা পরিবেশন, একটা রোমাঞ্চকর অনুভূতি ; যার মহিমার অনুধাবন আস্বাদনের অপেক্ষা রাখেনা। ইন্দ্রিয় নিরেপক্ষ এই অনুভূতি একেবারে পৌঁছায় পরমসত্বায়, লোকোত্তরতায়, অনির্বচনীয়ের বেদীতলে। পূর্ব্বের পাহাড় থেকে গলে গলে পড়ছে তুষারস্রাব ;—রূপার মতো শাদা সেই গলিত হিমানী এসে পড়েছে শেষনাগের নীলবুকে। ভেসে বেড়াচ্ছে নীল জলে সরের মতো। মাঝে মাঝে বরফের শৈলখণ্ড ভাসছে পানসীর মতো। নীলের বুকে শাদার সেই খোলতাই চমকে দিচ্ছে মন, চোখ, বিস্ময়বোধকে। পশ্চিমের সূর্য্যের আলো এসে পড়েছে পূর্ব্বের পাহাড়ের তুষারের গায়ে। সেই দ্যুতির প্রতিচ্ছবি পড়েছে নীলের বুকে। চারিধারে বিরাজমান অপূর্ব মহামৌন ; যেন শব্দ করলে কার একান্ত-সমাধি ব্যাহত হবে।

দাঁড়িয়ে আছি ছজনায়। ঘোড়া নিয়ে ওরা চলে গেছে। আমরা আর চোখ ফেরাতে পারি না। কেউ কারুকে বলতে অবধি পারিনা কত সুন্দর এই চিত্র। এ যেন আকণ্ঠ পান পরমলোকের সুধানির্ঝর, সহস্রার হতে ক্ষরা ব্রহ্মাস্বাদনের পরমক্ষণ। এখানে কেউ কারুর নই, এখানে যেন সেই পরমএকাকীত্ব সেই সোহহং বোধের একান্ত আত্মীয়তা।

চন্দ্র নেই, সূর্য্য নেই, অন্তরীক্ষ নেই, বায়ু নেই,
তুমি নেই, আমি নেই, কেউ নেই,কেউ নেই—
শুধু সেই পরমানন্দ, সেই অরূপ রূপের
অবিশ্রাম নৃত্য।—

শেষনাগ হ্রদ। এই হ্রদ থেকে বেরুচ্ছে লীদার নদী বা নীলগঙ্গা। তার মুখটার ফোটো নেওয়া গেল। চারিধার থেকে যতগুলি পারলাম ফোটো নিলাম। কিন্তু মনে যে চিত্র নিলাম তার আর তুলনা মেলেনা। সে চিত্র অনির্বাণ জ্যোতিঃ সম্পাতে চিররমণীয়।

শেষনাগে হ্রদের ঠিক ওপরে জরাজীর্ণ একটা ছোট্ট কাঠের কুঠরি আছে। আরও একটা আছে বটে ; তবে সেটা ভগ্নস্তূপ। মেলার সময়ে নাকি মেরামত হয়। হ্রদ থেকে খানিক দূরে কয়েকখানা ঘর এবং একখানা ভালো বাংলো ঘর আছে। আমি একরাত্রি প্রমোদের আশায় হ্রদের ধারটা ছাড়তে রাজী হলাম না। বরফ গলে গলে চারিধার থেকে অজস্র প্রস্রবণ নেমেছে। মেলার সময়ে এদের অস্তিত্বও থাকবেনা। ঘোড়াওয়ালারা ঘোড়া নিয়ে চলে গেল দূরের ঘরগুলোয় রাত্রিবাস করার জন্য। আমাদের "লাদ্দুঘোড়া" অর্থাৎ মালবাহী ঘোড়াটা এসে পড়েছিলো। তার মালপত্র বার করা গেল।

এ রাতটা আমাদের শেষনাগে কাটবে। ক্রমশঃ

নেই অধরা

সন্তোষকুমার অধিকারী

এখনই ছিলো ছায়ায় ঘন হাতের কাছে
পথের ধূলো ছেঁড়া বাতাস যেমন আছে,
গাছের পাতা, পাখার ডাক, অপরাজিতা
ফুলের নীল পাপড়ি, ছিলো স্মৃতিস্মিতা ;
সে তবু শুধু স্বপ্ন মেঘ-দিগন্তেই,
এখনই ছিলো বুকের কাব্যে, এখন নেই।

কত যে ভীরু আশায় জ্ব'লে কেঁপেছে বুক,
কত যে রাত প্রহর ধ'রে কি উৎসুক ?
দিনের শেষ, রাতের শেষ···সময় যায়
আঁকড়ে ধরা মুঠোর থেকে মুঠ হারায়।

এই ত' ছিলো ছোঁওয়ায় ভীরু গন্ধভরা,
চোখের চাওয়া তেমনি কাঁপে—নেই অধরা।
দুপুর রোদে বিজন মন···ভিখিরী মন,
নেই সে নেই···আকাশ মাটি কি নির্জন !

বাতাস ঢেউ পলকে থাকে, হারিয়ে যায়,
দীপের শেষ শিখায় জ্বালা মন পোড়ায়॥

শ্রীঅরবিন্দের একটি "নাটক"

শ্রীসুধাংশুমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়

নাট্যকার শ্রীঅরবিন্দের কথাই আজ বলবো। তাঁকে আমরা মহাযোগী, স্বদেশহিতব্রত বিপ্লবী, মহাপণ্ডিত ও দার্শনিক বলেই চিনি ও জানি, যিনি আত্মার বন্ধনহীন গান গেয়ে গেছেন। কিন্তু অদ্ভুত মনীষা, অগাধ পাণ্ডিত্য ও গভীরতম অন্তর্দৃষ্টির পিছনে যে এক অনাবিল সৃজনশীল কবিসত্তা বসে আছেন, তার কথা আমরা অনেকে জানি না বা বুঝি না।

তাঁর নাটকের কথা বলতে গেলে চলে যেতে হবে সেই যুগে যখন অরবিন্দ 'মার্তিলার গান' লিখছেন, 'চন্দ্রালোকে' স্বপ্ন দেখছেন, 'উর্বশী' 'প্রেম ও মৃত্যু'র কল্পনায় উর্দ্ধে উঠেছেন। সঙ্গে সঙ্গে চলেছে বেদবেদান্তের ভাষ্য, উপনিষদের ব্যাখ্যা, ভর্তৃহরির নীতিশতকের, কালিদাসের, চণ্ডীদাসের, রামায়ণ মহাভারতের অনুবাদ। বাংলা সংস্কৃত গ্রীক লাতিন ফ্রেঞ্চের অপূর্ব রসায়নে বিদগ্ধ কবিমানস অবিরাম সৃষ্টি করে চলেছে—এ সৃষ্টি, সাধনারই অঙ্গ—বিচিত্রকে প্রকাশ করছে একমুখী হয়ে, অনন্য হয়ে, তন্মনা হয়ে, তদ্‌যাজী হয়ে—এও যজ্ঞ। এই কবিক্রতু হোতাই আবার কংগ্রেস রাজনীতিকে বিশ্লেষণে দগ্ধ করেছে, বঙ্কিম মানসকে পুনরুজ্জীবিত করে নতুন করে দেখিয়েছে—গভীরতম চিন্তায় আলোড়িত হয়েছে।

শ্রীঅরবিন্দের তিনটি স্বয়ংসম্পূর্ণ নাটক—পরিত্রাতা পার্সিউস্ (Perseus the Deliverer), বাসবদত্তা (Vasavadutta) ও রদোগুণে (Rodogune)। এই তিনটি নাটকের দুইটি গ্রীক ও এলিজাবেথান ছাঁচে ঢালা এবং তৃতীয়টি অর্থাৎ 'বাসবদত্তায়' ভাস, কালিদাস ও সংস্কৃত নাটকের প্রভাব থাকলেও মূলতঃ এলিজাবেথান। চতুর্থটি বিক্রমোবর্শী—কালিদাসের নাটকের ইংরাজী অনুবাদ। পঞ্চম "Idion" অসম্পূর্ণ। একজন বিশিষ্ট সমালোচকের মতে "All three plays are steeped in poetry and romance, the plotting is competent, the characters are colourfully varied".

'পরিত্রাতা পার্সিউস্' নাটকের আখ্যানভাগ এই যে, রাজা এক্রিসাস্ দৈববাণীতে জেনেছিলেন যে তাঁর কন্যার পুত্রই তাঁকে ধ্বংস করবে—অনেকটা কংসকাহিনীর মত। সেইজন্য মেয়েকে তিনি আবদ্ধ করে রাখলেন নির্জন দুর্গে, কিন্তু স্বর্গের অধিপতি জিউস্ অবতরণ করলেন সেই কারাগারে এবং সেই মিলনের ফলে জন্ম নিলেন পার্সিউস্। রাজা কন্যা ও দৌহিত্রকে অকুল সমুদ্রে কাণ্ডারীহীন পালহীন তরণীতে ভাসিয়ে দিলেন। সে যাত্রাও তারা বেঁচে গেলো এবং আশ্রয় পেলে সেরিপস্ দ্বীপের অধিপতির কাছে। পার্সিউস্ যখনই বড় হলো তখন তার পালক-পিতা তার মাতাকে বিবাহ করতে উৎসুক হলেন এবং পার্সিউস্‌কে পাঠালেন গর্ডন মেডুসাকে বধ করতে। গর্ডন মেডুসার দৃষ্টি মানুষকে পাথরে পরিণত করতে পারতো এই ছিল প্রাচীন গ্রীকদের ধারণা। পার্সিউস্ কিন্তু শুধু বীর ছিলেন না, তিনি ছিলেন বিদ্যা ও শ্রী-র দেবতা প্যালাস এথেনীর ভক্ত—দেবী তাকে খড়্গ উপহার দিয়েছিলেন, অদৃশ্য হয়ে যাবার শিরস্ত্রাণ, আকাশ পথে গমনাগমনের ক্ষমতা এক্ এবং দুর্ভেদ্য বর্ম। দেবীর বরে পার্সিউস হয়েছিলেন অপরাজেয় বীর। সেই পার্সিউস্‌ই সমুদ্র-দেবতা পসিডন্ ও তাঁর ভক্তদের বিরোধিতা করে সিরিয়া রাজ্যকে মুক্তি দিলেন পীড়ন ও অত্যাচারের হাত থেকে ও সিরিয়া রাজকন্যা এণ্ড্রোমেডাকে বিবাহ করলেন; তারই কাহিনী কবি শ্রীঅরবিন্দ বর্ণনা করেছেন এই নাটকে।

গল্পের ছায়া পুরাতন গ্রীসের কাহিনী—যাকে heroic myth বলা যেতে পারে, কিন্তু কবি শ্রীঅরবিন্দের হাতে ইহা রূপান্তরিত হয়ে শুধু এলিজাবেথান যুগের রোমান্টিক নাটকেই পরিণত হয়নি—এর মধ্যে দেখেছি আমরা উর্দ্ধশক্তির কাছে অর্থাৎ জ্ঞানের, শ্রীর, হ্রীর, বিদ্যার কাছে নিম্নশক্তির অর্থাৎ লোভ, ভয়, পীড়ন অত্যাচার অনাচারের পরাজয়ের রূপকচ্ছলে একটি প্রতীক এবং "First prom-

ptings of the deeper and higher psychic and spiritual being which it is his (man's) ultimate destiny to become," অর্থাৎ মানুষের জীবনে সব শেষের পরিণতি যে উর্দ্ধতর গভীরতর আধ্যাত্মিক চৈত্য জীবন তারই সূচনা। অর্থাৎ নাট্যকার ও কবি শ্রীঅরবিন্দ যোগী ও শ্রীঅরবিন্দতে পরিণত হচ্চেন তারই পূর্বাভাস। নাটকের প্রথমেই প্রস্তাবনা বা Prologueএ দেখি—তরঙ্গোৎক্ষিপ্ত মহাসাগর, উর্মিমুখর, ব্যগ্র, চঞ্চল, ভীষণ উগ্র মহাঝটিকার আবর্ত—সৌন্দর্যের ও জ্ঞানের দেবী প্যালাস এথেনী এসে দাঁড়ালেন আকাশে—বিদ্যুৎ-মেখলা, তড়িতচঞ্চলা, আলুলায়িত কুন্তলা—

দেবী বললেন—হে সমুদ্রের দেবতা পসিডন্, তোমার অশান্ত জলরাশিকে শুব্ধ করো, তুমি জাগো, জাগৃহি, তোমার প্রবালখচিত নিম্নের দেশ হতে মুখ তুলে দেখো—শোনো আমার আদেশ—

সমুদ্রের বহু নিম্নে নিদ্রিত পসিডন্ জেগে বললে—

আমার অকালে নিদ্রা ভঙ্গ করলে কে—

জলধির কলনাদে উত্তর এলো—

—A whitness and a strength is in the skies—উর্দ্ধে আবির্ভাব হয়েছে এক শুভ্রা শক্তির—

তুমি কে—জিজ্ঞাসা করে পসিডন—

আমি—

Me, the Omnipotent
Made from his being to lead and discipline
The immortal spirit of man, till it attain
To order and magnificent mastery
Of all his outward world.

আমি পরম শক্তিমানের সৃষ্টি—মানবের অমর আত্মাকে ঠিক লক্ষ্যে নিয়ে যাই—যেন সে এই দৃশ্যমান সমস্ত বহিঃজগতের অধীশ্বর হতে পারে।

পসিডন্ জবাব দেয়—না, না, আমিই সেই রুদ্র, আমিই সে ভীষণ, আমার দণ্ডে সমুদ্র আলোড়িত হয়, বায়ু গর্জন করে, পর্জন্য বৃষ্টি দেয়, প্লাবিত করি আমি ভূমণ্ডলকে, ধরণী আমার কাছে নত, মানব-মানবী ভীত হয়ে আমার কৃপা প্রার্থনা করে, মন্দির গড়ে, আমার বলি জোগাড় করে।

দেবী উত্তর দেন—না, মানুষকে আমি নতুন করে গড়ে তুলবো, তাকে অভী করবো, জ্ঞানের দীপ্তিতে সে সুন্দর হবে, নিম্নের আবেগমুখর শক্তিকে তুচ্ছ করতে শিখবে।

For through the shocks of difficulty and death
Man shall attain his God head.

মৃত্যু ও বিপদের আঘাতের মধ্য দিয়েই মানুষ হবে দেবতা। পসিডন্ বলে—একী তুমি বলছো—সে হতে পারেনা। প্রকৃতির অন্ধ আবেগকে বন্দী করে আমি হয়েছি জয়ী, আমি তার অধিপতি—আমি পারবো না আমার শক্তিকে অবরুদ্ধ করতে—ফিরে যাও স্বর্গের দেবতা তোমার নিজের রাজ্যে, আমিও চলে যাই অতলের গভীরে—কি হবে যুদ্ধ করে'—

দেবী বললেন—আমি আহ্বান করছি তোমায় দ্বৈরথে—আমার সেনাপতি হবে পার্সিউস্—তুমিও তোমার ঝড়-জল ঝঞ্চা দৈত্যদানবদের পাঠাও—

অপেক্ষা করে থাকবো যুদ্ধ জয়ের জন্য—

এই পটভূমিকাতেই নাটকটির আরম্ভ—প্রথম অঙ্কেই দেখি সমুদ্রতীরে পসিডন মন্দিরের পরিচারক, সিরিয়াস্ বলছে—সেই দেবতার মূর্তিকে—

I have rubbed him and scrubbed him and bathed him and swathed him for these eighteen years, yet he never sent me one profitable piece of wreckage out of his sea yet—

আঠারো বছর ধরে এই মূর্তিকে ঘসেছি, মেজেছি, স্নান করিয়েছি, ধূলো ঝেড়েছি, কিন্তু কী পেলাম—দূরে দেখা গেলো—একটি জাহাজ ডুবছে—ঝড়ে জলে বাত্যাবিক্ষুব্ধ হয়ে—নিয়ম ছিল যারা বাঁচবে তারা সব জলদেবতার ভোজ্য হবে—আর জিনিষপত্র ভাগ হবে লুটের মাল। যাঁরা এর বিরোধিতা করবে তারা দেশের শত্রু, দেবতার শত্রু, রাজার শত্রু। দুর্ভাগ্যহত লোকদের উদ্ধার করেছিলেন পার্সিউস। কিন্তু পুরোহিত পলিয়াডন্ মনে করলেন রাজা ও রাণীই ও তাদের পুত্রকন্যাই এই বিরোধিতা করছেন।

সমুদ্রতীরে আকাশের ঘন গর্জনের মধ্যে তিমিরনিবিড় অন্ধকারের মধ্যে দাঁড়িয়ে অন্ধ দেবতা ও তার ক্রুর পুরো-

হিতের যে ছবিটি তৃতীয় অঙ্কের তৃতীয় দৃশ্যে উদ্‌ঘাটিত হয়েছে তার মধ্যে এমন একটা অতি-নাটকীয় ভাব এসেছে যা অপূর্ব—

রুদ্র ক্ষিপ্ত জলদেবতা হঠাৎ আবির্ভূত হয়ে বলছেন তাঁর ভক্তকে

My Victims, Polyadon, give me my victims
দাও দাও আহুতি দাও, ময় ভূখা হুঁ—রক্ত চাই—
এ যেন রবীন্দ্রনাথের বিসর্জনের

মহাকালী কালস্বরূপিনী, রয়েছেন
দাঁড়াইয়া তৃষাতীক্ষ্ণ লোলজিহ্বা মেলি,
বিশ্বের চৌদিক বেয়ে চির রক্তধারা
ফেটে পড়িতেছে নিষ্পেষিত দ্রাক্ষা হতে
রসের মতন অনন্ত খর্পরে তার

রঘুপতির মতই পলিয়াডন্ নির্মম দেবতার উপাসক—কিন্তু রবীন্দ্রনাথ রঘুপতিকে উদ্ধার করেছিলেন—জননী অমৃতময়ীকে দেখিয়ে। চতুর্থ অঙ্কে দেখি সিরিয়ার সাধারণ লোকেরা উত্তেজিত হয়ে উঠেছে—দেবতার গ্রাস মানুষ উদ্ধার করে কোন সাহসে—এ যে অমঙ্গলের কথা—রাজা যদি এর সহায়ক হন তবে রাজদ্রোহী হতে হবে। পুরোহিততন্ত্র যুগে যুগে যে কথা ঘোষণা করেছে তারই প্রতিধ্বনি পেলাম শ্রীঅরবিন্দের নাটকে। শেষ পর্য্যন্ত রাজকন্যা সুন্দরী আন্দ্রোমেডাই সমুদ্র-দেবতার 'বলি' স্থিরীকৃত হলো এবং সেখান থেকেই তাকে উদ্ধার করলেন পার্সিউস্। তিনি পরিত্রাণ করলেন সৌন্দর্যকে, জ্ঞানকে, মায়ামমতাকে, অন্ধ আবেগের হাত থেকে—তাই তিনি পরিত্রাতা।

তাই নাটকের শেষে যখন জিউস ও এথেনার নামে মন্দির উৎসর্গিত হলো তখন কবি শ্রীঅরবিন্দ বললেন—

But the blind nether forces still have power
And the ascent is slow and long is time
All alters in a world that is the same—
Man most must change who is a soul of time
His Gods too change and live in larger light.

মানুষ বদলাবে, মানুষের দেবতা বৃহত্তর আলোকের পরিপ্রেক্ষিতে বদলাবে।

কারণ All alters in a world that is the same. এই স্থিতিমান জগতে একদিক থেকে দেখলে সব কিছুই বদলায়—আর একদিক থেকে দেখলে কিছুই বদলায় না। হেগেলিয়ান দ্বন্দ্বের মধ্যে Being, Becoming এর ছন্দ ঘুরছে। প্যালাস এথেনী জ্ঞানের দেবী, পসিডন সমুদ্রের অশান্ত দেবতা—সে জীবনকে ঝটিকাময় তরঙ্গমুখর, বেদনাক্ষুব্ধই করে তোলে, জ্ঞানের আলোকে শুভ্র-জ্যোতির্ময় করেনা। কবি এই বিরোধের মধ্যেই নাট্যের সুরটি ধরেছেন—নাটকটি Poetic drama। ভাষার মধ্যে বেগ ও আবেগ আছে, কিন্তু drastic economy of words নেই—যা শ্রীঅরবিন্দ-লেখা বোঝবার মাঝে মাঝে বাধা হয়েই দাঁড়ায়। হয়তো অতি-আধুনিক ক্রিটিক মন চেষ্টারটনের ভাষায় এই নাটকে দেখবেন "a play not on pathos but bathos",

কিন্তু এখানে

"Time is more than Einstenian in its relativity, the creative imagination is its sole disposes and arranges ; fantasy reigns soveriegn, the names of ancient countries and peoples are brought in only as fringes of a decorative back ground, anachronisms romp in whenever they can get an easy admittance, ideas and associations from all climes and epochs mingle, myth, romance and realism make up a single whole. For here the stage is the human mind of all times.

এখানে কালের নির্দেশ আইনষ্টাইনীয় সীমাকে ছাপিয়ে। সৃষ্টি শক্তিমতী ভাবরাজ্যই তার একমাত্র নির্দেশক, তার একমাত্র প্রযোজক—বিচিত্র কল্পনার রূপকথার সাম্রাজ্য সামনে। এখানে পৃথিবীর পুরোণো জাতিগুলিকে, দেশগুলিকে মানুষগুলিকে আনা হয়েছে বটে, কিন্তু সেগুলি হচ্ছে চাকচিক্যময় পরিপ্রেক্ষিতের জন্য। ঘটনাপঞ্জীর মধ্যে সংঘাত আছে, বিরুদ্ধতা আছে, আবার অসংলগ্নতাও ঢুকেছে। প্রাচীন কাহিনী, প্রেমের কথা এবং বস্তুবাদ মিলে একটি রসক্ষেত্র সৃষ্টি হয়েছে। কারণ এখানে চিরকালের মানুষের মনই হচ্ছে নাট্যের পট-

ভূমিকা। তিনযুগ পরেও কবি সেই একই কথা বললেন—১৯৪৪ সালের Evolution কবিতায়—

Earth was a cradle for the arriving God
And man but a half dark luminous sign
Of the transition of the Veiled Divine.

এই পৃথিবী হচ্ছে আগন্তুক দেবতার লীলাভূমি, নব জাতকের দোতুল আশ্রয়, যে মানুষ একদিকে অপূর্ব ভাস্বর, আর একদিকে অন্ধ তমসাবৃত, যে মানুষ দিব্যেরই গুপ্ত প্রতীক। মানুষের তাই আশার অন্ত নেই। সেই অনন্ত আশা ও প্রত্যাশার কবি ও নাট্যকার শ্রীঅরবিন্দ।

দ্বিপদী

কবিশেখর শ্রীকালিদাস রায়

(১)
কূপে ব্যাঙ বেশ থাকে, নদীতে কুমীর
বিশাল সাগর চাই বিরাট তিমির।

(২)
পুরুষ যা কিছু গড়ে যুক্তি তর্ক দিয়া
রমণীর অশ্রুজল ফেলে তা মুছিয়া।

(৩)
সিন্ধু তার মর্মবাণী পূরি শঙ্খ মাঝে
পাঠায়েছে ঘরে ঘরে, সন্ধ্যাপ্রাতে বাজে।

(৪)
টাকার কাঁড়িতে বসি কেন বিষমুখ ?
হবেই ত, মা-লক্ষ্মীর বাহন উলূক।

(৫)
কাঁটা হেরি ক্ষান্ত কেন কৈ-মাছ ভোজনে,
ঝুঁকি বিনা সুখী কেবা হয়েছে ভুবনে ?

(৬)
আইনের বেড়াজালে হ'লে পরে বন্দী
পরাধীনতার সাথে হয়ে যায় সন্ধি।

(৭)
শুভ্রশুচি ফুটে ফুল শুচি র'য়ে লয় সে বিদায়।
ধূলা লাগিবার আগে ঝ'রে পড়ে বিধাতায় পায়।

(৮)
শিল্পীরা কখনো কি কাটনা কাটে ?
নারায়ণ-শিলা কভু বাটনা বাটে ?

(৯)
যাচাই যদি করতেই চাও কোন লেখার দাম
কে লিখেছে কোরো না তার নাম।

(১০)
ভুলাইনে আমার গাঁয়ের সুপরিচয় দিতে পারি,
গয়লা চাষীর ভাঙা কুঁড়ে, কেবল শুঁড়ির কোঠা বাড়ী।

(১১)
দানা চুরি করে যারা তাহাদেরি কাজ
দলাই-মলাইএ তোলা প্রচণ্ড আওয়াজ।

(১২)
নেইক আমার হায়রে কসুর পারের কড়ি দিতে,
তবু কেন পাথার-নদী হয়রে সাঁতারিতে ?

(১৩)
শোভার তরে রাঙায় নারী রাঙানো যায় যা যা,
কানকোতে রঙ মেখে চিতল দেখায় কেমন তাজা।

(১৪)
কবিরা পরাত কাব্যে রমণীরে অশোকের সাজ,
এখন অশোকারিষ্ট বানাইছে যত কবিরাজ।

(১৫)
বিস্তারণ্য বাড়ছে, তাতে ধরে না ফুল-ফল,
ভ'রে আছে বাক্যজালের পল্লবই কেবল।

(১৬)
মৌমাছি না পেলে ফুল করে না গুঞ্জন
ঘেয়ো মাছি অবিশ্রান্ত করে ভন ভন।

(১৭)
দেখিতেছি প্রুফে 'রাইফেল'রূপে 'বাইবেল' পরিণত।
কম্পোজিটার কাঁচা বটে তবু রসময় রীতিমত।

হিন্দু মেয়েদের বিষয়ে উত্তরাধিকার—ভাল কি?

শ্রীযমদত্ত

নয়া হিন্দু-সংহিতার অন্যতম বিশিষ্ট বিধান হইতেছে যে ধন-স্বামী বাপ মারা যাইবার পর তাঁহার ত্যক্ত যাবদীয় স্থাবর ও অস্থাবর সম্পত্তি ছেলেতে ও মেয়েতে উভয়েই সমান সমান অংশে পাইবে। মুসলমানদের মধ্যে মেয়েতে পায় ছেলের অর্দ্ধেক—আর আমাদের পাইবে সমান সমান। যেমন ক্রিশ্চিয়ানদের মধ্যে ব্যবস্থা আছে। হিন্দু ব্যবহার-ব্যবস্থার যুগে যুগে অল্প বিস্তর পরিবর্ত্তন হইয়াছে, ঋষিরাও করিয়াছেন; নিবন্ধকারেরাও ব্যাখ্যার ছলে করিয়াছেন। কিন্তু গত ২০০০ বৎসরের মধ্যে এইরূপ বৈপ্লবিক পরিবর্ত্তন কেহই করেন নাই, বা করা উচিৎ বলিয়া কোনও মত প্রকাশ করেন নাই। বৈপ্লবিক পরিবর্ত্তনের ফলে আমাদের একান্নবর্ত্তী পরিবার প্রথার মূলে কুঠারাঘাত করা হইয়াছে।

পণ্ডিত জহরলাল নেহরু ও তাঁহার সাঙ্গপাঙ্গরা এইরূপ বিধানের গোঁড়া পক্ষপাতি; অপর পক্ষে রাষ্ট্রপতি ডাঃ রাজেন্দ্রপ্রসাদ ব্যক্তিগত-ভাবে ইহাতে আপত্তি করিলেও নিয়ম-তান্ত্রিক রাষ্ট্রপতি হিসাবে এই বিধান চালু হইবার পক্ষে সম্মতি দিয়াছেন। দেশ স্বাধীন হইবার পর হইতে আমাদের শাসকবর্গের, বিশেষ করিয়া কংগ্রেসীদের 'একটা নতুন কিছু করো, 'একটা নতুন কিছু করো'র বাতিকে পাইয়া বসিয়াছে। তাহার ফলে তাঁহারা দেশের, সমাজের ও ব্যক্তির কল্যাণ হইবে, মঙ্গল হইবে, ভাল হইবে ভাবিয়া এমন অনেক কিছু করেন যে আখেরে তাহার ফল দেশের পক্ষে, সমাজের পক্ষে, ব্যক্তির পক্ষে আদৌ কল্যাণকর, মঙ্গলপ্রদ বা ভাল হয় না। ছেলেতে ও মেয়েতে সমান সমান অংশে বিষয় পাওয়ার ফলও শুভকর নহে।

কেন ভাল নহে, কেন শুভকর নহে, তাহা সংক্ষেপে বুঝাইবার চেষ্টা করিব। আমাদের দেশে শতকরা ৭০ জনের উপর লোক কৃষির উপর নির্ভরশীল। এজন্য কৃষি-জীবীদের উপর এই নব-বিধানের কি ফল তাহা আলোচনা করিব।

বাংলায়, বিশেষ করিয়া পশ্চিমবঙ্গে, চাষের জমী-টুকরো টুকরো হইয়া গিয়াছে। একজনের যদি ৫ বিঘা চাষের জমী থাকে, তাহা সবটা একত্তর বা এক খণ্ড নহে—৫।৬ জায়গায় ছড়াইয়া আছে। এ মাঠে এক জমী, ও মাঠে আর এক খণ্ড—এইরকম নানা জায়গায় ছড়ান। ফলে চাষীর ইচ্ছা ও সামর্থ্য থাকিলেও সে উপযুক্তভাবে, ভালভাবে চাষ-আবাদ করিতে পারে না। আর তাহার যদি সামর্থ্য না থাকে, ত কথাই নাই।

চাষের জমী কিরূপ টুকরো ও ছড়াইয়া আছে তাহার কিছুটা পরিচয় দিবার চেষ্টা করিব। পশ্চিমবঙ্গের ৪টী বড় বড় জেলার সার্ভে ও সেটেলমেণ্ট রিপোর্ট পাঠে জানিতে পারি যে প্রতিবর্গ মাইলে জমীর দাগের তথা চাষের জমীর সংখ্যা কত। নিম্নে তাহার হিসাব দেওয়া হইল। যথা:—

জেলা	প্রতিবর্গ মাইলে দাগের সংখ্যা
হুগলী—	২,৬৯৮
হাওড়া—	২,২৪৮
২৪ পরগণা—	১,৪৪৯
মেদিনীপুর—	১,৫৩৯

গড়ে চাষের জমীর পরিমাণ ১ বিঘারও কম। জমী টুকরো হওয়ার দুইটী কুফল:—(১) আইলের জন্য বেশী জমী যায়; (২) চাষের অসুবিধা। চাষের জমীর চারি পাশে 'আইল' দিতে হয়—নিজ নিজ সীমা সরহদ্দ বজায় রাখিবার জন্য, জমীতে জল ধরিয়া রাখিবার জন্য, মাঠে যাতায়াতের সুবিধার জন্য; গরু, লাঙ্গল লইয়া যাইবার জন্য ও ধান হইলে ধান ও খড় কাটিয়া আনিবার জন্য। সাধারণতঃ কর্ষণযোগ্য জমীর শতকরা ১০ ভাগ এইরূপে 'আইলের' জন্য নষ্ট হয়। এইটি আমাদের কথা নহে, জরিপ বিভাগের স্বীকৃতি।

চাষের জমীর খণ্ড যত ছোট হইবে, আইলের জন্য জমীর পরিমাণ তত বেশী হইবে। জমীর খণ্ড যদি গড়ে ১০ কাঠা করিয়া হয়, তাহা হইলে আইলের জন্য শতকরা ১৫ ভাগ নষ্ট হইবে। আর জমীর খণ্ড যত বড় হইবে, আইলের জন্য জমীর পরিমাণ ততই কমিবে। জমীর খণ্ড যদি ১ বিঘা হইতে বাড়িয়া ৩ বিঘা হয়, তাহা হইলে আইলের জন্য যে জমী নষ্ট হয়, তাহার পরিমাণ শতকরা ১০ হইতে কমিয়া ৫এ দাঁড়াইবে। এইরূপ জমীর খণ্ড যদি ৬ বিঘা হয়, তাহা হইলে আইলের জন্য জমীর পরিমাণ কমিয়া শতকরা ৩.৬এ দাঁড়াইবে।

চাষের জমীর পরিমাণ বাড়াইবার জন্য এবং চাষের অন্যবিধ সুবিধার জন্য আমাদের সরকার এই ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র খণ্ডে খণ্ডে বিভক্ত চাষের জমীর টুক্রোগুলিকে একত্র বা এক-গঠন (consolidation of holdings) করিবার চেষ্টা করিতেছেন। জমী এক-গঠন হইলে শুধুই যে আইলের জন্য ছাড়া জমীর পরিমাণ কমিয়া যাইবে তাহা নহে, চাষের অন্যান্য বহুবিধ সুবিধা হইবে। হাল ও গরুকে মাঠের একপ্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত ঘুরাইতে যে সময় ও বোনার জমী নষ্ট হয়, বা এক মাঠ হইতে অপর মাঠে হাল গরু লইয়া যাইতে যে সময় ও গতর নষ্ট হয় তাহা কমিয়া যাইবে, সেচের সুবিধা হইবে ইত্যাদি ইত্যাদি।

বাংলায় গড়ে মাথা পিছু কতটা জমী চাষীর আছে তাহা ১৯৪০ সালে প্রকাশিত ল্যাণ্ড রেভিনিউ কমিশনের রিপোর্টের ২য় খণ্ড ২৩৭ পৃষ্ঠায় লিখিত একটী উক্তি হইতে জানিতে পারা যায়। উক্তিটী এইরূপ—

"Only 0·85 acres is available per head of agricultural population."

অর্থাৎ মাথা পিছু কৃষি-জীবীদের মাত্র ২ বিঘা ১১ কাঠা জমী আছে।

ইহা কুড়ি বছর আগেকার অবস্থা—এক্ষণে লোক-বৃদ্ধিও উদ্বাস্তু আগমন হেতু অবস্থা আরও সঙ্গীন। আর বহু পরিমাণ কৃষি-যোগ্য জমী সরকারী বহু পরিকল্পনার জন্য গৃহীত হইয়াছে। ফলে বাকী কৃষি-জমীর উপর চাপ আরও বৃদ্ধি-প্রাপ্ত হইয়াছে।

পঞ্জাবে ১৫ বিঘার কম জমীতে চাষে একজনের চলে না বলিয়া স্থিরীকৃত হইয়াছে। বাংলায় যে ইহার কমে একটী চাষী পরিবারের চলিবে এইরূপ মনে করিবার কোনও হেতু নাই। বিশেষ করিয়া যখন পশ্চিম বাংলার বহু জমী পঞ্জাবের জমীর তুলনায় তাদৃশ উর্ব্বর নহে এবং দো-ফসলা জমীর পরিমাণ খুব কম। কত কম তাহা ল্যাণ্ড রেভিনিউ কমিশনের সংগৃহীত তথ্য হইতে জানা যায়। যথা—

জেলা	শতকরা কত জমীতে ১ বারের অধিক ফসল হয়
বাঁকুড়া—	৩'৩
বীরভূম—	৩'৫
বর্দ্ধমান—	৫'৪
মেদিনীপুর—	২'৪
হাওড়া—	১৬'৩
হুগলী—	১২'৭
২৪ পরগণা—	৬'৫
মুর্শিদাবাদ—	৩২'৮
নদীয়া—	৩৭'৮
দিনাজপুর—	৯'৮
জলপাইগুড়ি—	৫'৮
দার্জ্জিলিঙ—	১৪'৪
পশ্চিমবঙ্গ—	১১·

এইটি আমাদের হিসাব। বাংলায় চাষী-পরিবারদের কিরূপ পরিমাণ জমী আছে সে বিষয়ে একটি তদন্ত হইয়াছিল। তাহাতে দেখা যায়—

শতকরা কৃষি-পরিবারের জমী আছে—

শতকরা	জমী
৪৬'০	৬ বিঘার কম
১১'২	৬-৯ বিঘা
৯'৪	৯-১২ „
৮'০	১২-১৫ „
১৭'০	১৬-৩১ „
৮'৪	৩১ বিঘার

১৫ বিঘার উপর জমী আছে শতকরা ২৫'৪টী পরিবারের। ইহা সমগ্র বাংলার বিশ বৎসরের আগেকার হিসাবে। পশ্চিমবঙ্গের চাষের জমীর মালেকের মোট সংখ্যা হইতেছে ১৫,৭৩,০০০। ১৫ বিঘার কম জমীর মালেকের সংখ্যা ১১,১৩,০০০, অর্থাৎ শতকরা ৭১ জন, ৩ বিঘার কম জমীর মালেকের সংখ্যা ২॥ লক্ষ। শ্রীযুক্ত অশোক মিত্র প্রণীত Land Management in West Bengal দেখুন।

চাষীদের যে জমী আছে সবটা একলপ্ত নহে—বিভিন্ন মাঠে খণ্ডে খণ্ডে বিক্ষিপ্ত! চাষের জমী চাষীর সবটা রায়তি সত্ত্বের নহে—কতকটা রায়তি সত্ত্বের, কতকটা কোর্ফা সত্ত্বের। চাষের জমী কতটা টুক্‌রো টুক্‌রো হইয়াছে তাহার একটা মোটামুটি আভাষ পাওয়া যাইবে নিম্নের হিসাব হইতে; কৃষি-পরিবারদের রায়তি ও কোর্ফা সত্ত্বের জমা কয়টী ও শতকরা কয়টী পরিবারের তাহা আছে—

কৃষি-পরিবারের শতকরা	বিভিন্ন জমার সংখ্যা
৩৭'১	১
১৮'৭	২
১১'৮	৩
৮'১	৪
৫'৮	৫
১৫'২	৫ এর উপর

গড়ে আবার এক একটী জমার জমী ২।৩ দাগে বিভক্ত।

বাংলায় গড়ে একজনের ২।০ হইতে ২॥টী করিয়া ছেলে ও সমসংখ্যক মেয়ে প্রাপ্তবয়স্ক হয়। এক পুরুষে পূর্ব্বে বিষয় ভাগ হইত ২।০—২॥ গুণ; আর এখন ছেলে ও মেয়ে উভয়ে বিষয় পাওয়ার ফলে ভাগ হইবে ৪॥-৫ গুণ। কয়েক পুরুষ কি ভাবে বিষয় বিভক্ত হইবে নিম্নে তাহার হিসাব দিলাম। (এই আলোচনায় স্ত্রীর প্রাপ্য অংশ ধরিলাম না—ধরিলে অংশ আরও কম হইবে)।

বিষয় ভাগ হইবে—

পুরুষ	কেবল ছেলে পাইলে	ছেলে ও মেয়েতে
১	২।০—২॥ জনে পাইবে	৪॥-৫ জনে পাইবে
২	৫'১—৬'৩ „	২০'২—২৫ „
৩	১১'৪—১৫'৬ „	৯১'১—১২৬ „
৪	২৫'৬—৩৯'১ „	৪১০'১—৬১৫ „

এই দ্রুত বিষয়-বিভাগ সমাজের পক্ষে আদৌ কল্যাণকর নহে। প্রথমতঃ সঞ্চয়ের মাত্রা কমিয়া যায় এবং সঞ্চয়ের প্রবৃত্তি ও লোপ পায়। দ্বিতীয়তঃ খাইতে পরিতে এতটা বেশী অংশ ব্যয় হইয়া যায় যে সম্পত্তির উন্নতি করিবার সামর্থ্য ও স্পৃহা উভয়ই অতি দ্রুত কমিয়া যায় ও শীঘ্র লোপ পায়। তৃতীয়তঃ প্রত্যেক বংশের ক্রিয়া-কলাপ, আচার- ব্যবহারের একটা বিশিষ্ট ধারা থাকে—এই ধারা বজায় রাখা অনেকটা অর্থ সাপেক্ষ। দ্রুত বিষয়-বিভাগ হইলে এই সব বংশের ক্রিয়া-কলাপ, আচার-ব্যবহার অতি শীঘ্র লুপ্ত হইবে। এতদ ব্যতীত সরিকি বিবাদ বিসম্বাদ খুবই বাড়িবে। পূর্ব্বের তুলনায় সরিকদের সংখ্যা বাড়িবে—

পুরুষ	বাড়িবে
১	২ গুণ
২	৪ „
৩	৮ „
৪	১৬ „

সকলেই এক বংশের হইলে ও এক জায়গায় বসবাস করিলেও

সরিকি বিবাদ কিরূপ হয় তাহা আমাদের দেশের বড় বড় জমীদার বংশের ইতিহাস পর্য্যালোচনা করিতে জানিতে পারি। আর এখন এমন সরিক হইবে যাহাদের আমি জীবনে কখনও চোখে দেখি নাই। এক সঙ্গে থাকার কথাও ওঠেই নাই।

সম্পত্তির আয় সাধারণতঃ বাড়িলেও, চাষের জমীর আয় হয় বাড়ে না, না হয় ঐরূপ দ্রুত হারে বাড়ে না—কারণ বিঘা প্রতি উৎপাদন বা ফলন ত আর বাড়ে না। আর উৎপাদনের একটা মোটা অংশ চাষীর খাইতেই চলিয়া যায়। সরিক বাড়িলে প্রত্যেক সরিকের খাওয়ার জন্য খরচও বাড়িয়া যাইবে। একটা উদাহরণ দিয়া বুঝাইতে চেষ্টা করিব।

আমাদের দেশে সাধারণতঃ লোকে স্বল্পজীবী হয়—যদিও উপস্থিত মৃত্যুহার কমাতে কিছুটা পরমায়ু বাড়িয়াছে। তথাপি যদি ২৫ বৎসরে একপুরুষ ধরি—যাহা সাধারণতঃ ঐতিহাসিকগণ ধরিয়া থাকেন—তাহা হইলে আমার মৃত্যুর ৬০ বৎসর পরে আমার ত্যক্ত ১০০ বিঘা চাষের জমী ৯১ হইতে ১২৫ ভাগ হইবে। প্রত্যেকের ভাগে কম বেশ ১ বিঘা করিয়া পড়িবে। পুর্ব্বেকার ব্যবস্থা বহাল থাকিলে প্রত্যেকের ভাগে ৬—৯ বিঘা করিয়া পড়িত ; কোনক্রমে চাষ আবাদ করিয়া পেট্‌টা চলিত। আর এখন এই এত অল্প জমীতে কাহারও পেট চলিবে না, ভাগে বর্গা দিলে সামান্য ধান পাইবেন। যদি দূরদেশে থাকেন ত জমী পড়িয়া থাকিবে বা অন্য লোকে লুটেপুটে খাইবে। বাধ্য হইয়া 'আধা-কড়িতে' বেচিতে হইবে।

আমাদের দেশে খাদ্য—শস্যের অপ্রাচুর্য্য হেতু "খাদ্য ফলাও" আন্দোলন সরকার কর্ত্তৃক পরিচালিত হইতেছে। একেই ত আমাদের দেশের চাষীরা খানিকটা অজ্ঞতাবশতঃ, খানিকটা টাকার টানাটানি হেতু, আবার খানিকটা জমার পরিমাণ অল্প ও টুক্‌রো টুক্‌রো হওয়ায় জমীতে ভাল সার দিতে পারে না, ভাল বীজ কিনিতে পারে না, ভাল পদ্ধতিতে চাষ করিতে পারে না। তাহার উপর তাহারা যদি বাধ্য হইয়া ভাগ-চাষীতে পরিণত হয় তাহা হইলে চাষের উন্নতি করিবার স্পৃহা ও সামর্থ্য কমিয়া যাইবে বা উপিয়া যাইবে। কথায় বলে 'ভাগের মা গঙ্গা পায় না'—এখন ভাগের মাঠে কে সার দিবে, কে সেচের জল দিবে?

আমি মারা গেলাম, আমার ২ ছেলে ও ২ মেয়ে চাষের জমী পাইল। মেয়েরা থাকে শ্বশুর বাড়িতে—ভিন্ন গ্রামে ; তাহারা ত লাঙ্গল ঠেলিবে না। ছেলেরা জমীতে চাষ করিয়া যে শস্য উৎপন্ন করিল, তাহার অর্দ্ধেক বোনেদের জমীতে ভাগ-চাষী হিসাবে উৎপাদন করিল। বোনেদের এই অর্দ্ধেকের কিছুটা অংশ—তাহা অর্দ্ধেকই হউক বা একের-তৃতীয়াংশই হউক বোনেদের হাতে তুলিয়া দিতে হইবে। জমীতে ভাল সার দিলে সারের খরচা লইয়া তকরার, আলের জল সেচের জন্য ব্যবহার করিলে কেন দিলে ইত্যাদি প্রশ্ন উঠিবে। হয়ত সেচের জলের দরখাস্তে বোনেরা সই দিবে না। চিহ্নিত বণ্টন করিয়া লইলে আরও কিছু ভাল জমী আইলের জন্য নষ্ট হইবে। আর বোনেদের ত জমীটা অন্য-লোককে ভাগ-বিলি করিতেই হইবে।

সাধারণতঃ আমাদের মেয়েদের ভিন্ন গাঁয়ে বিবাহ হয়। কতদূর এই ভিন্ন গাঁ ইহার একটা হদিস সেন্সাল রিপোর্টের migration table আলোচনা করিলে পাওয়া যায়। মোটামুটি ৪।৫ মাইল দূরে বিবাহ হয়—চলতি কথায় মেয়ের বাড়ী একবেলা দূর। স্ত্রীর জমী যদি স্বামীর দেশ হইতে স্বামীর জমী হইতে ৪।৫ মাইল দূরে হয়, তাহা হইলে তাহার স্বামী কি করিয়া স্ত্রীর জমী চাষ করিবে? ফলে বহু জমী ভাল ভাবে কর্ষিত হইবে না। ফলে খাদ্য শস্য কম উৎপন্ন হইবে।

নব হিন্দু-সংহিতার এই বিধান অধিক খাদ্য-শস্য ফলাও আন্দোলনের সুফল ফলাইবার পক্ষে একটী বিশিষ্ট অন্তরায়। জমী এক-গঠন (consolidation of holdings) করার পক্ষে অনেক বাধা আছে, তাহার উপর এই বিধান একটি মারাত্মক বাধা। একদিকে জমী এক-গঠন করিবার চেষ্টা চলিতেছে, অপর দিকে জমী দ্রুত টুক্‌রো টুকরো হইয়া যাইতেছে। ধরুন সরকার কোন ক্রমে সব জমী এক-গাঠন করিয়াছিলেন এবৎসর। এক পুরুষ বাদে আবার এক-গঠন করা সব জমীই অন্ততঃ পক্ষে ৪।৫ ভাগে বিভক্ত হইবে। সরকারকে আবার এক-গঠন করিতে হইবে।

আজ এই পর্য্যন্ত। পরে সুবিধা হইলে আরও আলোচনা করিব।

সমবায়-চিন্তার নতুন দিক

শ্রীকালীপদ ভট্টাচার্য্য

সমবায় সম্পর্কে নতুন করে ভাববার সময় এসেছে—অতীতের সীমাবদ্ধ কার্য্যনীতির বাঁধাধরা নিয়মমাফিক রুটিনগত কাজের দিন অতীত হয়ে গেছে। এখন নতুন পরিবেশে সমবায় আন্দোলনকে জাতীয় জীবনের সর্ব্বস্তরে কার্য্যকর করার প্রচেষ্টা তাই দিকে দিকে সুরু করার সময় এসেছে।

ঋণ-সমবায়-সমিতি বর্ত্তমান সমবায় আন্দোলনের মূল ভিত্তি নয়—ইংরাজ শাসনকালের সেই গতানুগতিক ঋণ-সমবায়-আন্দোলন এখন রুর‍্যাল ক্রেডিট সার্ভে কমিটির' প্রদর্শিত পথে সংগঠিত ও সম্প্রসারিত হয়েছে, তাই দেখতে পাই ঋণ বা লগ্নি কারবার সমবায়ে একটি বিভাগ মাত্র। সমবায়ের বহু উদ্দেশ্য সাধনের প্রয়োজনে সমবায় প্রণালীকে জাতীয় অর্থনীতির সর্ব্ববিভাগে প্রয়োজনের যথাযথ ব্যবস্থা হয়েছে। সন্দেহ নেই যে, সমবায়কে পুরোপুরিভাবে কার্য্যক্ষেত্রে রূপায়িত করতে পারলে কেবল দেশের কৃষক সম্প্রদায়ের নয়—কুটীরশিল্পী, মধ্যবিত্ত, শ্রমিক মোটের ওপর সর্ব্বশ্রেণীর জনসাধারণের জীবনমান সমুন্নত হয়ে উঠবে।

স্বাধীনতা-পরবর্ত্তী যুগে প্রকৃতপক্ষে দেশে প্রকৃত সমবায়ের পথে

পদক্ষেপ আরম্ভ হয়েছে—দেশের লোকের সুন্দরতর জীবন রচনার দৃষ্টি নিয়ে এই আন্দোলনকে পুনর্গঠিত করার ব্যাপক ব্যবস্থা হয়েছে। সমবায় আন্দোলন সুপ্রতিষ্ঠিত হওয়ার উপর নির্ভর করছে কেবল কৃষক ও কুটীর শিল্পী এবং জনসাধারণের জীবনযাত্রার উন্নতি নয়, সামগ্রিকভাবে ভারতের সমৃদ্ধিপূর্ণ ভবিষ্যৎ। কারণ, আমাদের দেশ কতকগুলি সহরে সীমাবদ্ধ কেবল নয়—দেশের প্রকৃতি মূর্ত্তি গ্রামে গ্রামে ছড়িয়ে আছে। দেশের গ্রাম্যজীবনের উন্নতি যতক্ষণ সফল না হচ্ছে ততক্ষণ দেশের উন্নতির প্রকৃত সার্থকতা কি করে আশা করা যেতে পারে।

সমবায় আন্দোলনের অর্থনৈতিক দিক যেমন আছে—তেমনি আছে এই আন্দোলনের একটা নৈতিক আবেদন। মানুষের স্বেচ্ছামূলক সহযোগিতার পথে তাই কেবল অর্থনৈতিক স্বার্থের সমন্বয় নয়—নৈতিক ও মানসিক চেতনার উপরও সমবায়ের প্রভাব অসামান্য, সমবায়ী মানুষ তাই ব্যক্তি-কেন্দ্রিক নয়, সমাজকেন্দ্রিক জীবনের পথে সার্ব্বজনীন স্বার্থে নিজেদের বিকশিত করে তুলতে প্রয়াসিত। রাজনৈতিক আদর্শের থেকে তাই সমবায়ের নৈতিক আবেদন সার্ব্বভৌম—'সবার উপরে মানুষ সত্য' সমবেত ভাবনায় এই মহাবাণীর স্বার্থকতা তাই কেবল সমবায়ী জীবনেই দেখতে পাই।

ভারতবর্ষে সমাজতান্ত্রিক ধাঁচে সমবায়-সাধারণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার পথে সমবায় কেবল একটি বিশেষ পথ বা মত নয়—সমবায় হচ্ছে সার্ব্বজনীন মিলিত শক্তির সমাহার। পারস্পরিক স্বার্থের সমন্বয়ের পথে সমবায়ী সমাজতন্ত্র আপনা থেকেই বিকশিত হচ্ছে—রাজনীতি এখানে বড় নয়, মৌলকথা হচ্ছে মানবতাবাদী। তাই ভারতের অর্থনীতির বুনিয়াদ শোষণমূলক ধনতন্ত্রের পরিপোষক নয়—জনসমাগত প্রদায়ক-শক্তির উদ্বোধনে ভারতের নবনির্ম্মাণ সুরু হয়ে গেছে। ভারতের এই অর্থনীতির মধ্যে শত শত বৎসরের অবহেলিত গ্রামজীবন প্রথমেই স্বীকৃতি লাভ করেছে এবং গ্রামজীবনকে নবচেতনার আলোকে প্রতিভাত করার সর্ব্ববিধ ব্যবস্থা করা হচ্ছে। এই বিষয়ে 'রুর‍্যাল ক্রেডিট সার্ভে কমিটির' রিপোর্ট জনকল্যাণভিত্তিক সমবায় অর্থনীতির নতুন প্রয়োগের পথ আবিষ্কার করেছে—রাষ্ট্রীয় অংশীদারীত্বে তথা রাষ্ট্রীয় সহযোগিতায় সমবায় অর্থনীতির নব প্রবর্ত্তনে তাই দেশের দিকে দিকে উৎসাহপূর্ণ কর্ম্মশক্তির উদ্বোধন হয়েছে। সমবায় সম্পর্কে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়ার উল্লেখযোগ্য কর্ম্মনীতি ভারতের সমবায় আন্দোলনকে নতুন মহিমা ও গুরুত্ব দান করেছে! এই জন্যই রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়া এবং কেন্দ্রীয় সরকার সমবায় আন্দোলনকে কেবল পৃষ্ঠপোষকতা দান করে বসে নেই—সমবায়ের সামগ্রিক উন্নয়নে সক্রিয় সহযোগিতায় শক্তিদান করেছেন!

এত সত্ত্বেও সমস্যার গুরুত্বহীন হয়নি। এত তাড়াতাড়ি হওয়া সম্ভবও নয়। সমস্যাসমূহের দিকে দৃষ্টি দিলে প্রথমেই চোখে পড়ে দেশের 'আন-ইকনমিক কো-অপারেটিভ' ইউনিটের উপর। এখন দেশের সামনে যেমন বহুতর সমস্যা—তেমনি সমবায়ের মধ্যেও বহু সমস্যা আছে। অস্বীকার করা চলে না যে, অর্দ্ধশতাব্দীর উপর যে সমবায় আন্দোলন দেশে চলেছে—স্থান কাল পাত্রে পড়ে সে আন্দোলনের নবপর্য্যায় এখন প্রয়োজন। কিন্তু রাতারাতি নবপর্য্যায় বা যুগান্তর সৃষ্টি সম্ভব নয়—নতুন কিছু করার জন্য প্রস্তুতি ও সংগঠন চাই। দেশের কৃষি, কৃষি ঋণ, কৃষি জমী বিক্রয়, কৃষিপণ্যসংগ্রহ ও বণ্টন, প্রভৃতির জন্য যেমন শক্তিশালী প্রতিষ্ঠানের প্রয়োজন, ঠিক তেমনি বহু প্রতিষ্ঠানের প্রয়োজন আছে কুটিরশিল্প এবং সমাজজীবনের অন্যান্য ক্ষেত্রে। এই সঙ্গে চাই সমবায়ের নানা সংগঠন। কিন্তু প্রতিষ্ঠান বা সংগঠন বৃদ্ধি না করে—যাতে 'মিকস্‌ড টাইপ কো-অপারেটিভ' গঠন করে আদর্শ ও উদ্দেশ্যের রূপায়ন চলে সেজন্য সুসংকল্পিত পরিকল্পনা প্রয়োজন। দুঃখের বিষয় এখন দেশে 'সার্ভিস-কাম-মার্কেটিং কো-অপারেটিভ' গঠনের পরিকল্পনা গৃহীত হয়েছে। আশা করা যায় যে, রুর‍্যাল ক্রেডিট সার্ভে কমিটির পরিকল্পনার ভিত্তির সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে এই নতুন প্রতিষ্ঠানগুলির রূপায়ন চলবে। প্রাথমিক, মাধ্যমিক ও শীর্ষস্তরে চাই 'ফেডারেটেড ইকনমি'—এই ফেডারেটেড হচ্ছে সমবায়ের বৈশিষ্ট্য। প্রাথমিক ও মধ্যস্তরে ইকনমিক সহজে ইউনিট না গড়ে উঠলে আন্দোলনের গতানুগতিকতাই চলবে—আন্দোলন প্রাণবন্ত হবে না, সমবায় অধিক হবে না। সমবায়-আন্দোলনের নব-পর্য্যায়ে জনসহযোগিতাকে যৌথকর্ম্মশক্তিবদ্ধ করে তুলতে প্রয়োজন সমবায়-আইনের ও বিবিধ বজ্রআঁটুনির বিলোপ-সাধন। পরস্পরের নির্ভরতাকে আইন করে বাঁধা চলে না—পারস্পরিক নৈতিক মানসিকতাই তা সাধন করতে পারে। সমবায় আন্দোলনের ব্যর্থতার ইতিহাসের মূলে আছে আইনের সীমাবদ্ধ পরিসরে একটা বিরাট গণ-আন্দোলনকে বেঁধে রাখার প্রয়াস। সমবায়ের নতুন সংবিধান চাই—দেশের ও দশের মিলিত কর্ম্মশক্তি এখানে পথ দেখাবে। বন্ধু, দার্শনিক ও উপদেষ্টার ভূমিকায় সমবায় সমিতির পঞ্চায়েৎ থাকুক—রেজিষ্টারের ক্ষমতা সীমাবদ্ধ থাকুক কেবল সংগঠন ও পরিদর্শনের কর্ম্মক্ষেত্রে। হিসাব পরীক্ষার ও তদারকির ভার রেজিষ্টারের একতেয়ার থেকে বাইরে এনে স্বতন্ত্র সংগঠনের উপর ছেড়ে দেওয়ার প্রয়োজন আজ সব থেকে অধিক। অতিস্ফীত ক্ষমতায় রেজিষ্টারের বিভাগ কেন্দ্রীভূত হওয়ার দরুণ আন্দোলনে সমিতির সংখ্যা বৃদ্ধি পায়—কাজের মত কাজে সমিতিগুলিকে কর্ম্মমুখর করে তোলার প্রয়াস অনুপস্থিত। সমবায় একটা আন্দোলন—সমবায় সরকারী দপ্তর বিশেষের কাজ কারবার নয়—এই সত্য অনুধাবন করার সময় এসেছে। আন্দোলন তখনই আন্দোলনে পরিণতি লাভ করে—গণজীবন যখন আন্দোলনে যুক্ত হয়ে উঠে। আজ দেশে সমবায় সমিতি আছে, রেজিষ্টার ও তাঁর বিভাগ এবং আমলাগণ আছেন, কিন্তু সমবায়-গণআন্দোলন নেই বলেই সমবায় আন্দোলন প্রাণশক্তিপূর্ণ হয়ে উঠতে পাচ্ছে না। তাই নবপর্য্যায়ের প্রথমেই চাই যাঁদের আন্দোলন তাঁদের স্বাধীনতা দান করা—তাঁরা যেন নিজেদের আন্দোলনের কর্ত্তব্য পালন ও দায়িত্ব গ্রহণ নিজেরাই করতে পারেন। সমবায় আইন হওয়া প্রয়োজন সহজ ও সরল, সাধারণ মানুষের বোধগম্য এবং ব্যবহারোপযোগী। যে

আইন সামাজিক জীবনে মানুষকে কেবল সীমাবদ্ধ করে রাখে—কর্ম্মের এবং নৈতিক দায়িত্ব পালনের পথে বাধা স্বরূপ, সে আইন বোঝা বিশেষ। আজ চাই তাই যৌথ দায়িত্ব কর্ত্তব্য পালনের শুভ বুদ্ধি—এবং এইজন্যই চাই এমন একটি সমবায় আইন, যে আইন হবে নৈতিক দায়িত্ব পালনের নব বিধান।

আইনের নামে অকেজো বিধান যেমন প্রাণহীন—অনিয়ন্ত্রণের নামে আবার স্বেচ্ছাচারের পরিণামও তেমনি ভীতিজনক। সমবায় আন্দোলনের প্রত্যেক সদস্য যৌথদায়িত্ব পালন করতে বদ্ধপরিকর হয়। দেখা যায় যে সমবায় সমিতির পঞ্চায়েৎ নামেই থাকে—মাত্র দু'একজন সক্রিয়ভাবে কাজ করেন, ফলে সমবায় সমিতির উদ্দেশ্য ও আদর্শ ব্যর্থ হয়ে পড়ে। দল পাকানো সুরু হয়—এবং আইনের বিধানে তখনই সদস্যদের পিষে মারায় ব্যবস্থা হয় যখন সমিতিতে দলাদলি আরম্ভ হয়। দেখা যায় যে, দশ বৎসর যে সকল সদস্য সমিতির খবরাখবর পর্য্যন্ত রাখেন না, দলাদলি যখন সুরু হয় তখন আসরে অবতীর্ণ হয়ে দোষ ত্রুটি ধরতে তৎপর হয়ে উঠেন। এইজন্য সমবায় সংবিধান এমনভাবে প্রণীত হওয়া উচিত যাতে নৈতিক কর্ম্মবুদ্ধি সকলের মনে অনুপ্রেরণা সঞ্চার করে। দোষত্রুটি ধরার জন্য জোট না বেঁধে কাজের জন্য যেন সর্ব্বদা জোট বাঁধা হয়। সমবায় আন্দোলনের নৈতিক সত্য দেশে প্রচারণার প্রয়োজন ক্রমেই অধিক অনুভূত হচ্ছে—সমবায়ের মধ্যে মানুষের কর্ম্মপ্রবণতা সার্থক ও সফল করে তুলতে হলে চাই সমবায় শিক্ষা। সমবায় আদর্শ প্রচারণার প্রথম কথা তাই বলা যেতে পারে এই সমবায়শিক্ষার পরিবেশ। শ্রেণীহীন সমাজ-গড়ার এটাই সোজা পথ—এই পথেই আছে জনসাধারণের সামাজিক মান-উন্নয়নে এগিয়ে চলার শক্তি ও সামর্থ্য।

সামগ্রিক ভাবে সমবায়ের আদর্শ মানুষ তখনই ক্রমে করতে পারে—মানুষ যখন মানুষের প্রতি আত্মীয়সুলভ, প্রতিবেশীসুলভ এবং সহযোগীসুলভ মনোভাবে অনুপ্রাণিত হয়ে উঠবে। অর্থনৈতিক স্বার্থের সমাহারে সমবায়ের আংশিক রূপ প্রতিভাত—মানবতাবাদী সমবায়-অনুভাবনা মানুষকে বিরোধ ও সংঘাতের উচ্চে মিলাচ্ছে—যেখানে মানুষ সমাজের জন্য—পরিবার ও ব্যক্তি সমাজের একটি অংশ, এই বৃহত্তর সমাজ স্বার্থের মধ্যেই সকল স্বার্থের সম্মিলনে এবং মত ও পথের দ্বান্দ্বিক সংঘাত সমন্বয়িত হয়েছে—সমবায়ের মধ্যেই তাই:সকল বিরোধের অবসান এবং সত্যের সার্ব্বভৌম আলোকের শাশ্বত দ্যুতি বিচ্ছুরণ।

দূর

ডাঃ শচীন সেনগুপ্ত

দূরে
বহু দূরে
এক খণ্ড মেঘ ঐ
যায় ভেসে
নীল আকাশে।

জানো কি বলে সে ?
বলে, ভেসে ভেসে
যাই আমি দূর দূরান্তরে—
দূরে খোঁজের লাগি।

রহি জাগি
দিবা-নিশি
পাছে হারাইয়া ফেলি তায়।

আমার কাছেতে যারা রহে
নিত্য দহে
নিজের স্বার্থের তরে।
তাই আমি যাই দূরে
দূরের সন্ধান পেতে।

দূর মোরে ডাকে ঐ
হাতছানি দিয়ে।
খেলা করে মোর সনে
দেখোনি কি কভু ?

এক ফালি রোদের কিরণ
দেখোনি কি মোর সনে
কত খেলা করে ?
কেন জানো ?
খেলা দিয়ে বলে দেয়
দূরের সন্ধান।

আরো বলে—বলিদান
দাও যদি ছোট স্বার্থ সব
দূরের বেদীতে—
আচম্বিতে
দূর আসি টেনে নেবে আপনার বুকে !

বাঈজী

(চেখভের গল্পের অনুবাদ)

অনুবাদক—হাসুবানু

পাশা। সুন্দরী যুবতী। কোকিল-কণ্ঠি। একদিন সে তার প্রেমিক নিকোলাই পেট্রোভিচ্ কলপোকভের সঙ্গে সহরতলীর গ্রীষ্মাবাসে বাইরের ঘরে বসে আছে। গুমট গরম। একটু আগে পেট্রোভিচ্ কলপোকভ্ দুপুরবেলার খাওয়া-দাওয়া সেরেই সস্তা দামের এক বোতল মদ শেষ করেছে। মন তার বিস্রস্ত। শরীরটা ম্যাজ ম্যাজ করছে। পাশা ও কলপোকভ উভয়েই বিরক্ত হয়ে উঠেছে। এই গরমটা গেলেই ওরা বেড়াতে বেরোবে।

সেই সময় হঠাৎ দরজায় কড়া নড়ার শব্দ শোনা যায়। কলপোকভ্ কোট খোলা অবস্থাতেই লাফ দিয়ে উঠে স্যাণ্ডেলটা পায়ে দিতে দিতে পাশার দিকে জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে তাকায়।

নিশ্চয়ই পিওন, অথবা তাদের গায়িকা দলের কোন মেয়ে এসেছে—পাশা বলে।

পাশার কোন বান্ধবী বা পিওনের চোখে পড়লে কলপোকভ কিছু মনে করতো না। তবু 'সাবধানের মার নেই' মনে করে পাশের ঘরে চলে যায়। আর পাশা ছুটে গিয়ে দরজা খুলে দেয়। দরজা খুলেই এক অপরিচিত অল্পবয়সী সুন্দরী রমণীকে দেখে বিস্মিত হয়। আপাদমস্তক নিরীক্ষণ করে পাশা নিঃসন্দেহ হয় যে আগন্তুক একজন স্ত্রীলোকই।

আগন্তুক রমণীর মুখ ম্লান এবং দ্রুত অনেকগুলো সিঁড়ি বেয়ে উঠে এলে যেমন হয় সেই রকম জোরে জোরে শ্বাস নিচ্ছে।

কি হয়েছে আপনার?—পাশা প্রশ্ন করে।

স্ত্রীলোকটি সঙ্গে সঙ্গে উত্তর দেয় না। সামনে এক পা এগিয়ে এসে ঘরের চারদিকে একবার চোখ বুলায়। তারপর বসে পড়ে। মনে হয় সে যেন খুব ক্লান্ত কিংবা অসুস্থ। অনেকক্ষণ থেকে বৃথাই কথা বলবার জন্যে তার ম্লান ঠোঁট দুটো কাঁপছে।

আমার স্বামী এখানে আছেন?—অশ্রুসিক্ত রক্তিম আঁখিপল্লব উত্তোলন করে মহিলা পাশাকে শেষে জিজ্ঞেস করে।

স্বামী?—পাশা চমকে উঠে ফিস্ ফিস্ করে বলে। হাত-পা তার ভয়ে হিম হয়ে আসে। কার স্বামী?—কাঁপতে কাঁপতে পুনরায় বলে।

আমার স্বামী—নিকোলাই পেট্রোভিচ কলপোকভ্।

উ—ন—না, আমি—আমি তো কারো স্বামীকে চিনিটিনি না—বাঈজী বলে।

এক মিনিট উভয়েই নীরব। আগন্তুক মহিলা কয়েক বার তার শুষ্ক ওষ্ঠে রুমাল বুলায় এবং ভেতরের কাঁপুনীকে রোধ করবার জন্য শ্বাস বন্ধ করে। আর পাশা একটা থামের মত নিশ্চল অবস্থায় দাঁড়িয়ে ভয়ে ও বিস্ময়ে তার দিকে তাকিয়ে থাকে।

তাহলে তুমি বলছো সে এখানে নেই?—বিশ্রী হাসি হেসে দৃঢ়স্বরে আগন্তুক মহিলা পাশাকে জিজ্ঞেস করে।

আমি—আমি বুঝতে পারছি না আপনি কার কথা বলছেন— পাশা টেনে টেনে বলে।

তুমি রাক্ষুসী, নীচ, পাপী—আগন্তুক মহিলা ঘৃণা ও অবজ্ঞার সঙ্গে পাশার দিকে তাকিয়ে বিড় বিড় করে বলে। হ্যাঁ, হ্যাঁ তুমি, তুমি সর্বনাশী। তোমাকে ওসব কথা বলতে পারছি বলে মন আজ আমার খুব খুসী।

পাশা তখন অনুভব করলো, এই অপরিচ্ছন্ন মহিলার রাগান্বিত চক্ষু ও সাদা সরু সরু আঙুল ভয়ঙ্কর একটা ধারণা জন্মিয়ে দিয়েছে। তার ফোলা-ফোলা রক্তিম গাল দুটো, নাকের উপর বসন্তের দাগ, কপাল বেয়ে ঝরে-পড়া অগোছালো চুলে পাশা খুব লজ্জা বোধ করলো। তার মনে হলো সে যদি রোগা হতো এবং তার মুখে পাউডার, কপালে সোনার টিপ না থাকতো তবে বলতে পারতো সে 'সম্ভ্রান্ত মহিলা' নয় এবং সে এই অপরিচিত রহস্যময়ী নারীর মুখের সামনে দাঁড়াতে ভীত বা লজ্জিতবোধ করতো না।

আমার স্বামী কোথায়? যদিও সে এখানে থাক্ আর নাই থাক্, তবুও তোমাকে আজ আমার এ কথা বলা প্রয়োজন যে টাকা চুরির দায়ে লোকে তাঁকে গ্রেপ্তার করবে। এইটাই তোমার কাজ! এইটাই তুমি শেষ পর্য্যন্ত করলে!

আগন্তুক মহিলা এবার উঠে গভীর উত্তেজনায় ঘরের মধ্যে ইতস্ততঃ পায়চারি করতে আরম্ভ করে। পাশা অত্যন্ত ভীত হয়ে তার দিকে চেয়ে থাকে। কিছুই সে বুঝতে পারে না।

তাঁকে খুঁজে বের করে গ্রেপ্তার করবে। বলে আগন্তুক মহিলা দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলে। সেই নিঃশ্বাসের সঙ্গে তার রোষ ও বিরক্তি প্রকাশ পায়। আমি জানি কে তার এই সর্ব্বনাশ করেছে! নীচ, মানুষ-খেকো! ঘৃণ্য, অর্থলুব্ধা কোথাকার! বলে—আগন্তুক মহিলার ঠোঁট ঘন ঘন নড়তে থাকে। ঘৃণায় নাসিকা কুঞ্চন করে। আমি অসহায়, এই কুলাঙ্গার মাগী শুনতে পাচ্ছো—আমি অসহায়! আমার চেয়ে তোমার শক্তি বেশী। হ্যাঁ—একজনই কেবল আমাকে ও আমার শিশুদের বাঁচাতে পারেন। ভগবান সবই দেখেন! তিনিই এর বিহিত করবেন। তিনি আমার বিনিদ্র রাত্রির মন্ত্রণা ও প্রত্যেক বিন্দু অশ্রুর জন্য তোমাকে শাস্তি দেবেনই দেবেন। সময় একবার আসবেই—তখন আমার কথা তোমার মনে পড়বে।

আবার নীরবতা। আগন্তুক মহিলা আগের মত পায়চারি করতে করতে হাত ঝাঁকায়। পাশার মুখ ফ্যাকাশে হয়ে যায়। সে কিছুই বুঝতে পারে না। ভয়ঙ্কর একটা কিছু হবে বলে তার ধারণা। সে হতবুদ্ধি হয়ে মহিলার দিকে চেয়ে থাকে।

আমি তো এ বিষয়ে কিছু জানি না—হঠাৎ বলে ফেলেই ঝর্ ঝর্ করে কেঁদে ফেলে।

তুমি মিথ্যা কথা বলছো! আমি সব কিছু জানি। আমি অনেকদিন আগে থেকেই তোমাকে চিনি। এ কথাও ঠিক, সে গত কিছুদিন থেকে তোমার সঙ্গে প্রতিদিন কাটায়—চিৎকার করে আগন্তুক মহিলা বলে। রাগে তার চোখ জ্বলছে।

হ্যাঁ। তাই কি? কী করবেন আপনি? আমার কাছে অনেক লোকই আসে। আমি আসবার জন্যে পায়ে ধরি না। যার ইচ্ছা হয় সে আসে।

আমি বলছি শোন—তারা বুঝতে পেরেছে অফিসের তহবিল তসরূপ করেছে। কেবল মাত্র তোমার—তোমার মত—একটা রাক্ষুসীর জন্য—তোমার জন্যই ও অপকর্ম সে করেছে। শোন—দৃঢ়স্বরে বলে হঠাৎ থামে এবং পাশার দিকে তাকিয়ে আবার আরম্ভ করে—তোমাদের সত্যিকারের কোন নীতির বালাই নেই। তোমরা কেবল লোকের সর্ব্বনাশ করবার জন্যে আছো। সেইটাই তোমাদের উদ্দেশ্য। লোকে ভাবতেও পারে না তোমরা কত নীচে নেমে গেছ। মনুষ্যত্বের ছিটে-ফোঁটাও তোমাদের মধ্যে নেই। তার স্ত্রী আছে, ছেলে-পুলে আছে—সে যদি আজ সাজা পেয়ে জেলে যায়, আমরা অনাহারে থাকবো। বাচ্চাগুলো এবং আমি না খেয়ে মরব—সেটা জানো! এখনও তাঁকে বাঁচাবার, আমাদের এই দীন-হীনতা ও অপমান থেকে রেহাই পাবার উপায় আছে। আমি যদি ন'শ' রুবল নিয়ে অফিসে জমা দিতে পারি, তবে তারা তাঁকে মুক্তি দেবে। কেবল মাত্র ন'শ' রুবল!

কি বললেন, ন'শ' রুবল? আমি—আমি তো কিছুই জানি না—আমি নিইনি—পাশা নরম সুরে বলে।

আমি ন'শ' রুবল চাইছি না। তোমার টাকা পয়সা নেই আর আমি চাইও না। আমি অন্য জিনিষের কথা বলছি। তোমাদের মত মেয়েদের পুরুষরা সচরাচর অনেক দামী জিনিষ দিয়ে থাকে। আমার স্বামী তোমাকে যা দিয়েছে আমাকে সেইগুলো ফেরৎ দাও!

সে তো আমাকে কখনও কোন জিনিষ-উপহার দেয় নি। পাশা আঘাত পেয়ে হাউ হাউ করে কেঁদে ফেলে।

টাকা কোথায়? সে তাঁর নিজের সব কিছু নষ্ট

করেছে, আমার যা কিছু ছিল তা উড়িয়েছে—এ সমস্ত টাকার কি হলো? শোন ভাই, আমি অনেক রূঢ় কথা বলেছি—আমাকে ক্ষমা করো। গালাগাল করার জন্ত তুমি নিশ্চয়ই আমাকে ঘৃণা করবে জানি, কিন্তু তোমার মধ্যে যদি সহানুভূতি থাকে তোমাকে আমার জায়গায় রেখে একবার ভেবে দেখো! তাই তোমার কাছে আমার মিনতি—তুমি জিনিষগুলো ফিরিয়ে দাও।

পাশা এবার অবজ্ঞার সঙ্গে কাঁধ দুলিয়ে বলে—হুস্। আমি খুসী মনেই দিতাম, ভগবান সাক্ষী তিনিই আমার ভরসা। আপনার স্বামী কখনও কোন জিনিষ আমাকে উপহার দেন নি। আপনি আমার কথা বিশ্বাস করুন। পাশা এবার হন্তদন্ত হয়ে বলে—হ্যাঁ হ্যাঁ, মনে পড়েছে, আপনি ঠিকই বলেছেন। আপনার স্বামী আমাকে দুটো জিনিস দিয়েছিলেন বটে। হ্যাঁ, আপনি যদি তা নেন তবে আমি তা নিশ্চয়ই ফিরিয়ে দেবো।

পাশা ড্রেসিং টেবিলের একটা ড্রয়ার খুলে একটা সোনার ব্রেসলেট ও মুক্তা-বসানো একটা আংটি বের করে—এই যে নিন্, বলে আগন্তুক মহিলার হাতে তুলে দেয়।

আগন্তুক মহিলার চোখ মুখ উত্তেজনায় কাঁপতে থাকে। রেগে উঠে বলে—তুমি আমাকে এ কি দিচ্ছো? আমি তো তোমার দান চাইনি। কিন্তু যে জিনিষ তোমার নয়—সুযোগ বুঝে আমার স্বামীকে নিংড়ে নিয়েছো—সেই দুর্ব্বল অসুখী লোক—বিস্যুদবারদিন তোমাকে বন্দরে যে সব দামী দামী অলঙ্কার পরে আমার স্বামীর সঙ্গে বেড়াতে দেখেছিলাম—সুতরাং আমার কাছে নির্ব্বোধ মেষ-শাবক সাজবার মানে হয় না! আমি শেষবারের মত জিজ্ঞেস করছি—তুমি জিনিষগুলো দেবে কিনা!

পাশা এবার একটু রেগে বলে—অদ্ভুত তো! আমি তো বললাম। আমি তো বারবারই বলছি, হার আর ছোট্ট আংটিটি ছাড়া নিকোলাই পেট্রোভিচের কাছ থেকে আমি অন্ত কোন জিনিষ নেই নি। মিষ্টি কেক ছাড়া সে কিছুই আমার জন্তে আনে না।

মিষ্টি কেক্!—আগন্তুক মহিলা একটু ম্লান হাসে। বলে—বাড়ীতে ছেলেমেয়েগুলোর কিছু খাবার নেই—আর তোমার এখানে মিষ্টি কেক্! যাক্, তাহলে তুমি কি সত্যিই জিনিষগুলো দেবে না?

কোন উত্তর না পেয়ে মহিলা বসে পড়ে। শূন্সে তাকিয়ে চিন্তা করতে থাকে:

এখন কি হবে? যদি আমি ন'শ' রুবল না পাই তবে তাঁকে বাঁচাতে পারবো না। সেই সঙ্গে ছেলেপুলে নিয়ে আমিও মরবো। তাহলে এই ঘৃণ্য মেয়েটাকে আমি হত্যা করব, না তার পায়ে ধরে ভিক্ষা চাইবো?

মহিলা এবার রুমালখানা মুখে চেপে ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠে। বলে—আমি তোমার কাছে ভিক্ষা চাইছি। তুমি আমার স্বামীর সর্ব্বনাশ করেছো, তাঁকে পথে বসিয়েছে', তুমিই তাঁকে বাঁচাও। মানলাম—তাঁর প্রতি তোমার কোন মায়া মমতা নেই—কিন্তু অবোধ শিশুরা, অবলা বাচ্চাগুলো—তারা কি অপরাধ করেছে?

পাশা কথাগুলো শোনে—আর তার চোখে ভেসে উঠে রাস্তার উপর দাঁড়িয়ে ক্ষুধার জ্বালায় চিৎকার করছে কতকগুলো দুগ্ধপোষ্য শিশু। এবার পাশার দীর্ঘনিঃশ্বাস পড়ে।

পাশা বলে—তাহলে আমি কি করতে পারি বলুন? আপনি বলছেন আমি ঘৃণ্য নারী, আমি নিকোলাই পেট্রোভিচের সর্ব্বনাশ করেছি। কিন্তু বিশ্বাস করুন, আমি ভগবানের নামে দিব্যি করে বলছি আমি তার কাছে থেকে এমন কিছু পাইনি—আমাদের গায়িকা দলে একটি মাত্র মেয়েরই বড় বড় ধনী প্রিয়লোক আছে। তাছাড়া বাদবাকী আমরা দিনের রোজগারে দিন খাই। নিকোলাই পেট্রোভিচ শিক্ষিত মার্জ্জিত রুচির লোক। তাঁকে আমরা আদর না করে পারি? ভদ্রলোকদের অভ্যর্থনা করতে আমরা বাধ্য।

আমি জিনিষগুলো আবার চাইছি। সেগুলো আমাকে ফিরিয়ে দাও! সেগুলোর আমার বিশেষ প্রয়োজন। দাও আমাকে। আমি তোমার কাছে নতি স্বীকার করছি। তুমি যদি চাও—আমি তোমার পায়ে ধরতেও রাজী আছি।

পাশা ভয়ে কেঁপে উঠে। নিষেধ করার ভঙ্গিতে হাত নাড়ায়। সে বুঝতে পারে এই যে, সুন্দরী রমণী পাংশুটে হয়ে গেছে। মঞ্চে অভিনয় করার মত সুনিপুণভাবে গর্ব্ব ও আভিজাত্য দেখিয়ে নিজেকে বড় বলে জাহির করে সে তখন পায়েও ধরতে পারে। নিজের দণ্ড বজায় রেখে সে গায়িকা মেয়েদের ছোট করে দিতে চায়।

পাশা চোখ মুছে ব্যস্ত হয়ে বলে—ঠিক আছে, আমি জিনিষগুলো দিচ্ছি। অবশ্যই। কেবলমাত্র—এগুলো নিকোলাই পেট্রোভিচের নয়। আমি অন্যলোকের কাছ থেকে পেয়েছি। এখন আপনি যা মনে করেন—

পাশা দেরাজের উপরকার ড্রয়ার খুলে ব্রুচ্, প্রবাল-খোচিত একটা নেকলেস, কয়েকটা আংটি ও ব্রেসলেট বের করে আগন্তুক মহিলাকে সবগুলো দিয়ে দেয়। —আপনার স্বামীর কাছ থেকে ওর একটাও আমি নেই নি। যদি চান ওর সবগুলোই নিয়ে যান। ওগুলো দিয়ে আপনার দারিদ্র্যের অবসান হোক্। পায়ে ধরবার নাম করাতে বাঈজী একটু ক্ষুব্ধ হয়েছিলো। আবার বলে—আপনি যদি ভদ্র নারী হন, তার প্রকৃত স্ত্রী হন, তাহলে তাঁকে আপনি নিজের কাছে রাখবেন। আমি সেইটাই চাই। আমি তাঁকে কখনও আমার কাছে আসতে বলি না। সে নিজের ইচ্ছায়ই আসে।

অশ্রুসিক্ত নয়নে আগন্তুক মহিলা:জিনিষগুলো খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখে বলে—ও ক'টা হলেই তো হবে না। ওর দাম পাঁচ শ' রুবলও হবে না।

পাশা এবার খটাং করে দেরাজ খুলে একটা সোনার সিগারেট কেস, একটা ঘড়ি ও কয়েকটা বোতাম বের করে দেয়। হাত দিয়ে দেখিয়ে বলে—আমার আর কিছুই নেই—আপনি খুঁজে দেখতে পারেন।

আগন্তুক মহিলা দীর্ঘনিঃশ্বাস মোচন করে। কম্পিত হস্তে জিনিষগুলো রুমালে বেঁধে ঘর থেকে বেরিয়ে যায়। কৃতজ্ঞতাস্বরূপ একটা কথাও বলে না, মাথাটাও কৃতজ্ঞতায় নত হয় না।

পাশের ঘরের দরজা খুলে কলপোকভ্ এঘরে আসে। তার মুখ বিবর্ণ, থতমত খেয়ে যায় সে। তেতো কোন জিনিষ খেলে মানুষ যেমন মাথা ঝাঁঝায় সেই রকম মাথা ঝাঁকাতে থাকে, আর তার চোখ জলে চিক্ চিক্ করে।

পাশা বেগে এগিয়ে যেয়ে ফোঁস করে বলে—কখনও কোন জিনিষ তোমার কাছে চেয়েছি? তুমি আমাকে কী উপহার দিয়েছো?

উপহার—না না, সেটা কিছু নয়—কলপোকভ্ মাথা নেড়ে বলে—হে ভগবান, সে তোমার কাছে কাঁদলো, মিনতি করলো—

এবার পাশা চিৎকার করে বলে—আমি তোমার কাছে জানতে চাই, তুমি আমাকে কী দিয়েছো?

হে ভগবান, সে এত গর্ব্বিতা, অত্যন্ত নির্ম্মল চরিত্রের—তোমার পায়ে ধরে—একটা জাত গোত্রহীন মেয়ের কাছে—আমি শেষ পর্য্যন্ত এই ঘটালাম! আমিই তাকে এখানে নিয়ে এলাম!

কলপোকভ্ দুহাত দিয়ে নিজের মাথা চেপে ধরে আফশোষ করতে থাকে উত্তেজিত হয়ে—না, না, আমি নিজেকে ক্ষমা করব না, কিছুতেই করব না, আমার কাছ থেকে সরে যা ঘৃণ্য, অপদার্থ, নীচ্ কোথাকার! বিতৃষ্ণায় কলপোকভ্ কম্পিত হস্তে পাশাকে একটা খোঁচা মেরে নিজে সরে দাঁড়ায়। আবার বলে—সে পায়ে ধরতে যায়, সে তোর পায়ে ধরতে যায়। হায় ভগবান!

কলপোকভ্ কথাগুলো শেষ করে তাড়াতাড়ি জামা কাপড় পরে পাশাকে একপাশে ধাক্কা মেরে দরজা দিয়ে বেরিয়ে যায়।

পাশা পড়ে যেয়ে চিৎকার করে কেঁদে উঠে। ঝোঁকের মাথায় আগন্তুক মহিলাকে জিনিষগুলো দিয়ে দেবার জন্য তখন মনে মনে অত্যন্ত অনুতপ্ত হয় এবং একথা তাকে ভীষণভাবে আঘাতও দেয়। তার মনে পড়ে, তিন বছর আগে এক ব্যবসায়ী বিনা কারণে তাকে মেরেছিলো এবং সে বারের মত চিৎকার করে সে আর কোনদিন কাঁদে নাই।

সৌন্দর্য্যের কবি বিহারীলাল

সঞ্জীবকুমার বসু

সাহিত্য যুগে যুগে নদীর ধারার মত বাঁক নিয়ে চলে। বাংলা সাহিত্যে বিহারীলাল চক্রবর্ত্তী এইরূপ একটি ধারার বাঁক অতিক্রম করে নতুন পথে নতুন চিন্তায় বাংলা সাহিত্যকে নিয়ে যেতে পেরেছেন বলে তিনি আমাদের কাছে অমর হয়ে আছেন। মহাকাব্যের বিচিত্র ঘটনায় যখন বাংলা সাহিত্য মেতে উঠেছিল, সেই সময় বিহারীলাল নির্জ্জনে বসে তাঁর মানব-হৃদয়ের অন্তর্লোকের কথা সহজ ও সরল ভাষায় ছড়িয়ে দিলেন সাহিত্যাঙ্গনে। বাংলা সাহিত্যের একটা আদি ও অকৃত্রিম সুর আছে, তার প্রাণ-ধর্ম্মের একটা বিশিষ্ট দিক আছে, আধুনিককালে সেটাই প্রথম বিহারীলাল তাঁর 'সারদামঙ্গল' প্রভৃতি কাব্যের মধ্য দিয়ে নুতন ছন্দে নুতন সুরে প্রকাশ করলেন তাঁর নিজস্ব চিন্তায়, নিজস্ব ভাষায়। তিনি যখন বাংলার চিরন্তন প্রাণ ধর্ম্মের গানে সুর দিলেন, ভোরের আবছা আলোতে তিনি যখন তান ধরলেন, তখন কেউ তাতে সাড়া দেয় নাই। প্রকৃত পক্ষে তাঁর রচনা বাংলা সাহিত্যে মোড় ঘুরিয়ে দিয়েছিল। বিহারীলালের প্রেরণায় রবীন্দ্রনাথের সাধনার দ্বার খুলে গিয়েছিল একথা সত্য।

১২৪২ সালে ৮ই জ্যৈষ্ঠ বিহারীলাল জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম দীননাথ চক্রবর্ত্তী। পাঠশালার পড়াশুনা শেষ করে বিহারীলাল সংস্কৃত কলেজে পড়াশুনা করেন। এখানে তিনি কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য্যের সহচার্য্য পেয়েছিলেন এবং তাঁর চেষ্টায় তিনি ইংরাজী সাহিত্যে প্রবেশ করেন। এই ইংরাজী সাহিত্যের সহিত পরিচয় তাঁর কবিপ্রতিভার সম্মুখে এক নুতন জগৎ উন্মুক্ত করল। কালে তিনি বায়রন, সেকসপীয়র, ওয়ার্ডসওয়ার্থ, শেলি, কীটস, টেনিসন প্রভৃতি ব্যক্তিদের কাব্য পড়ে ফেললেন। কিন্তু বিহারীলাল এইসময় ইংরেজ কবিদের অনুকরণ করেন নাই। বিহারীলালের রচনার প্রশংসা আমরা সবচেয়ে বেশি রবীন্দ্ররচনার মধ্যে দেখতে পাই। বাংলাভাষায় নুতন ছন্দ নুতন ভাব প্রকাশ করে বিহারীলাল বাংলা সাহিত্যের ভাণ্ডারে যে অবদান রেখে গেছেন, সেই সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ হৃদয়াবেগে তাঁর 'আধুনিক সাহিত্যে' লিখেছেন।

"বিহারীলালের কণ্ঠ সাধারণের নিকট তেমন সুপরিচিত ছিল না। তাঁহার শ্রোতৃমণ্ডলীর সংখ্যা অল্প ছিল এবং তাঁহার সুমধুর সঙ্গীত নির্জ্জনে নিভৃতে ধ্বনিত হইতে থাকিত, খ্যাতির প্রার্থনায় পাঠক এবং সমালোচক সমাজের দ্বারবর্ত্তী হইত না। কিন্তু যাহারা দৈবক্রমে এই বিজনবাসী ভাব-নিমগ্ন কবির সঙ্গীত কাকলীতে আকৃষ্ট হইয়া তাঁহার কাছে আসিয়াছিল তাহাদের নিকটে তাঁহার আদরের অভাব ছিল না। তাহারা তাঁহাকে বঙ্গের শ্রেষ্ঠ কবি বলিয়া জানিত।...সে প্রত্যুষে অধিক জাগে নাই এবং সাহিত্য কুঞ্জে বিচিত্র কলগীত কুজিত হইয়া উঠে নাই। সেই উষালোকে কেবল একটি ভোরের পাখি সুমিষ্ট সুন্দর সুরে গান ধরিয়াছিল। সে সুর তাহার নিজের। ঠিক ইতিহাসের কথা বলিতে পারি না—কিন্তু আমি সেই প্রথম বাংলা কবিতায় কবির নিজের সুর শুনিলাম। রাত্রির অন্ধকার যখনই দূর হইতে থাকে তখন যেমন জগতের মূর্ত্তি রেখায় রেখায় ফুটিয়া উঠে, সেইরূপ...প্রতিভার প্রত্যুষকিরণে মূর্ত্তির বিকাশ হইতে লাগিল। পাঠকের কল্পনার নিকটে একটি ভাবের দৃশ্য উদ্‌ঘাটিত হইয়া গেল।"

"সর্ব্বদাই হু হু করে মন,
বিশ্ব যেন মরুর মতন ;
চারি দিকে ঝালা ফালা,
উঃ কি জ্বলন্ত জ্বালা।
অগ্নিকুণ্ডে পতঙ্গ পতন।"

আধুনিক বঙ্গ সাহিত্যে এই প্রথম বোধ হয় কবির নিজের কথা। 'জীবন স্মৃতিতে রবীন্দ্রনাথ বিহারীলালের যে পরিচয় দিয়েছেন তাও স্মরণীয়। তিনি লিখেছেন :—

"তাঁহার দেহও যেমন বিপুল তাঁহার হৃদয়ও তেমন প্রশস্ত। তাঁহার মনের চারিদিক ঘেরিয়া কবিত্বের একটি রশ্মিমণ্ডল তাঁহার সঙ্গে সঙ্গেই ফিরিত। তাঁহার যেন কবিতাময় একটি সূক্ষ্ম শরীর ছিল তাহাই তাঁহার যথার্থ স্বরূপ! তাঁহার মধ্যে পরিপূর্ণ একটি কবির আনন্দ ছিল।"

বিহারীলাল ছিলেন সুন্দরের পূজারী, সৌন্দর্য্য ধ্যানে তিনি প্রায় সময় নিমগ্ন থাকতেন। কখনও তিনি আত্মভাবে বিভোর হয়ে আপন মনে গান গেয়ে যেতেন। গানের চেয়ে তাঁর ধ্যানে বেশী সময় ব্যয় হত। প্রকৃতির বিশালত্বের মধ্যে তিনি নিজের চিন্তাকে ছড়িয়ে দিতেন। তাঁর কবিতা বুঝতে হলে সৌন্দর্য্যকে আগে বুঝতে হবে। রবীন্দ্রনাথ বিহারীলালকে বাংলা কাব্যের 'ভোরের পাখি' বলেছেন। প্রভাতে সূর্য্য-দেব মুঠি মুঠি সোনা ছড়িয়ে পৃথিবীকে যখন আলোকিত করে দেয়, ঠিক সেই সময় প্রকৃতির এই আহ্বানে ভোরের পাখি সর্ব্বপ্রথম তার কলকণ্ঠে আনন্দসংবাদ বহন করে মানুষের কাছে পৌছে দেয়। তার ভাব-ভাবনা মানুষের কাছে রহস্যময়। বিহারীলালের কাব্যেও কবির অন্তরের কথা পাঠকের মনে রহস্যের সৃষ্টি করে, ছন্দে ভাষায় ও ভাবে এই আনন্দ তিনি বাংলা সাহিত্যে দিয়ে গেছেন। তিনি তাঁর সর্ব্বশ্রেষ্ঠ গ্রন্থ 'সারদামঙ্গল' কাব্যে বলেছেন :—

হৃদয় প্রতিমা লয়ে
থাকি থাকি সুখী হয়ে
অধিক সুখের আশা নিরাশা শ্মশান ;
ভক্তি ভাবে সদা স্মরি

মনে মনে পূজা করি,
জীবন-কুসুমাঞ্জলি পদে করি দান,
বাসনা বিচিত্র ব্যোমে
খেলা করি রবি সোমে
পরিয়ে নক্ষত্র তারা হীরকের হার,
প্রগাঢ় তিমির রাশি
ভুবন ভরেছে আসি
অন্তরে জ্বলিছে আলো নয়নে আঁধার।
বিচিত্র এ মত্ত দশা
ভাব ভরে মাজা ঘসা
হৃদয়ে উদার জ্যোতি কি বিচিত্র জ্বলে।
কি বিচিত্র সুর তান
ভরপুর করে প্রাণ,
কে তুমি গাহিছ গান আকাশ মণ্ডলে।

রবীন্দ্রনাথ 'সারদামঙ্গল' সম্বন্ধে বলেছেন :—"প্রকৃত পক্ষে সারদা মঙ্গল একটি সমগ্র কাব্য নহে, তাহাকে কতকগুলি খণ্ড কবিতার সমষ্টি রূপে দেখিলে তাহার অর্থবোধ হইতে কষ্টকর বোধ হয় না। অথচ কবি নিজে গোটা কার্য্যটিকে অখণ্ডরূপে কল্পনা করেছেন। সারদা তাঁর কাছে কখনো জননী, কখনো প্রেয়সী, কখনো কন্যা। তিনি সৌন্দর্য্য রূপে জগতের অভ্যন্তরে বিরাজ করিতেছেন।" বাংলা কবিতায় গীত স্বভাবের মুক্তি বিষয়ে রবীন্দ্রনাথ তাঁর বিহারীলাল প্রবন্ধে লিখেছেন :—"বিহারীলাল তখনকার ইংরেজি ভাষায় নব্যশিক্ষিত কবিদিগের ন্যায় যুদ্ধ-বর্ণনা সংকুল মহাকাব্য, উদ্দীপনাপূর্ণ দেশানুরাগমূলক কবিতা লিখলেন না এবং পুরাতন কবিদিগের ন্যায় পৌরাণিক উপ্যাখানের দিকেও গেলেন না—তিনি নিভৃতে বসিয়া নিজের ছন্দে নিজের মনের কথা বলিলেন। তাঁহার সেই স্বগত-উক্তিতে বিশ্বহিত, দেশহিত অথবা সভা-মনোরঞ্জনের কোন উদ্দেশ্য দেখা গেল না। এই জন্য তাঁহার সুর অন্তরঙ্গ রূপে হৃদয়ে প্রবেশ করিয়া সহজেই পাঠকের বিশ্বাস আকর্ষণ করিয়া আনিল।"

রবীন্দ্রনাথের এই উক্তির মধ্যে আমরা দেখতে পাই বিহারীলালের কবিতা বাংলা কবিতার যৌবন পেরিয়ে ক্রম বিকাশের পথে এগিয়ে চলেছে। উনিশ শতকের দীর্ঘদিন ধরে রঙ্গলাল থেকে মধুসুদন, হেমচন্দ্র, নবীনচন্দ্র পর্য্যন্ত প্রায় সকল কবি "যুদ্ধ-বর্ণনা মহাকাব্যে" বা উদ্দীপনাপূর্ণ দেশানুরাগমূলক সাহিত্য সৃষ্টি করেছিলেন, কিন্তু বিহারীলালের সময় হতে নূতন কাব্য সৃষ্টির প্রেরণা নিয়ে বাংলা কবিতা তার পূর্ব্ব চিন্তা ও ভাব ত্যাগ করে নূতনের দিকে বাঁক নিল। বাংলাসাহিত্যের ইতিকথা' পাঠে আমরা জানতে পারি যে, হেমচন্দ্র বা নবীনচন্দ্রের গীত-কবিতায়, ঈশানচন্দ্রের কাব্য কবিতায় স্থানে স্থানে কবির নিভৃত ব্যক্তিত্বের পরিচয় চকিতে উদ্ভাসিত হয়েছে। কিন্তু সমকালীন জীবন-প্রচ্ছদের সমস্তাক্ষতা, আর তার অভিঘাতে ব্যক্তি-চিত্তের বেদনা বা অনুশোচনা-বোধের তীব্রতা এই কবি-কুলের নিভৃত-গোপন 'নিজের কথার' উৎসমুখকে রুদ্ধ করে রেখেছিল। এ দিক থেকে বয়ঃসন্ধি যুগের মন্ত্রণার মূলে রয়েছে নিভৃত কবি-আত্মার অবরুদ্ধতা-জনিত পীড়া বোধ। শিল্পী-ব্যক্তিত্ব এই পীড়া-মুক্ত আত্মস্থতার পথ খুঁজে পেয়েছে বিহারীলালের কবিতায়, রেনেশাঁ যুগের পরস্পর-বিরোধী ভাব-ভাবনার অন্ধ-অলোড়ন থেকে কবিসত্তার এই মুক্তি। তাই বাংলা কাব্যের যৌবন-মুক্তিও অভাসিত হয়েছে। বিহারীলালের ক্ষেত্রে এই মুক্তি অর্থে জাতীয়তা। ঘনিষ্ঠ বস্তু-নির্ভর (Objective) জীবন-প্রয়োজন বোধের হাত থেকে কবির স্পর্শকাতরতা মর্মলোকে তাঁর মন্ময় (Subjective) মানসের স্বভাব-মুক্তিকেই বুঝি। জনাকীর্ণ জীবন-লোকে সংগ্রামরত বাংলার কাব্যভাবনার জগতে প্রথম মর্মর ভাব-লোকের সংবাদ মৃদু কণ্ঠে তিনি বহন করে এনেছিলেন, এই অর্থেই রবীন্দ্রনাথ বিহারীলালকে বাংলা কাব্যের "ভোরের পাখী" বলেছেন।

বিহারীলাল বাল্যকাল হতে কবিতা লিখতে শুরু করেন। তাঁর রচনা প্রথম প্রকাশ হয় 'পূর্ণিমা' পত্রিকায়, তিনি কয়েকখানি মাসিক পত্রিকা প্রকাশ ও সম্পাদনা করেন ১২৫৮ সালে ১৭ই ফেব্রুয়ারী তিনি 'পূর্ণিমা' প্রকাশ করেন এবং 'রত্নসার' পুস্তক রচয়িতা কামাখ্যাচরণ ঘোষ এই পত্রিকার পৃষ্ঠ-পোষকতা করতেন। পূর্ণিমার প্রথম সংখ্যায় বিহারীলাল যে রচনা লেখেন তা দেখে তাঁর গদ্য রচনা সম্বন্ধে ধারণা করা যাবে, তিনি লেখেন :—

"অয়ি সুষমায় পূর্ণিমে! অদ্য তোমার প্রসাদে পরমানন্দ লাভ করিলাম। অদ্য বলিয়া কেন, আমার চিত্ত অনেকবার মহা মহা দুঃখে এরূপ দুঃখিত ও নানাবিধ কুচিন্তা দ্বারা এরূপ বিক্ষিপ্ত হইয়াছে যে কদাচ সুখের মুখাবলোকনের সম্ভাবনা ছিল না, কিন্তু নির্জনে আসিয়া একবার তোমার প্রফুল্ল বদন দর্শন করিতে পারিলেই সকল উদ্বেগ দুর হইয়া যাইত ও সকল দুঃখ ভুলিয়া যাইতাম! এবং এইরূপ সন্তোষ সলিলে নিমগ্ন হইয়া মহা মহা সুখানুভব করিতাম। এই নিমিত্ত আমি চিরকালই তোমার রূপের পক্ষপাতী ও বশম্বদ; কিন্তু এত দিন প্রীতি প্রকাশের অবসর পাই নাই। অদ্য আনন্দ চিত্তে এই পত্রিকাখানির তোমার নামে নাম রাখিয়া তোমাকে উপহার স্বরূপ প্রদান করিলাম। এ তোমার প্রতি অধিবেশন তিথিতে বর্হিগত হইবে।"

'পূর্ণিমা' পত্রিকা কিছুদিন পরে বন্ধ হয়ে যায় এবং বিহারীলাল তাঁর বন্ধু যোগেন্দ্রনাথ ঘোষের সহযোগিতায় 'সাহিত্য সংক্রান্তি নামে একখানি মাসিক পত্রিকা প্রকাশ করেন। এই পত্রিকায় বিহারীলাল অনেকগুলি কবিতা লেখেন যেমন—'নভোমণ্ডল' 'বীর্য্যবতী', 'হিন্দুনারী', 'প্রেম-প্রবাহিনী', কাব্য-পল্লীগ্রাম, প্রথম ইত্যাদি। কিছুদিন পরে 'সাহিত্য-সংক্রান্তি' বন্ধ হয়ে গেল, তারপর তিনি 'অবোধ বন্ধু' নামে আর একখানি পত্রিকা প্রকাশ করেন। এই পত্রিকায় বিহারীলাল 'নিসর্গসন্দর্শন,' 'বঙ্গসুন্দরী', 'সুরবালা', প্রভৃতি রচনা প্রকাশ করেন। তাঁর সেই সময় হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'ইন্দ্রের সুধাপান' এবং কৃষ্ণ ভট্টাচার্য্যের 'পৌলভর্জ্জীনী', "নেপোলিয়ন বোনাপার্টের জীবন

প্রভৃতি 'অবোধ বন্ধু' পত্রিকায় প্রকাশ হয়। পত্রিকাটির সুখ্যাতি করে রবীন্দ্রনাথ 'সাধনায় লিখেছেন :—

"বাংলা ভাষায় বোধ করি এই প্রথম মাসিকপত্র বাহির হইয়াছিল যাহার রচনার মধ্যে একটা স্বাদ বৈচিত্র্য পাওয়া যাইত। বর্ত্তমান বঙ্গ সাহিত্যের প্রাণ সঞ্চারের ইতিহাস যাঁহারা পর্য্যালোচনা করিবেন তাঁহারা 'অবোধ বন্ধুকে' উপেক্ষা করিতে পারিবেন না, বঙ্গদর্শনকে যদি আধুনিক বঙ্গ সাহিত্যের প্রভাত সূর্য্য বলা যায়, তবে ক্ষুদ্রায়তন 'অবোধ বন্ধুকে' প্রত্যুষের শুকতারা বলা যাইতে পারে।

'অবোধ বন্ধু' পত্রিকায় প্রকাশিত বিহারীলালের কবিতা পড়ে রবীন্দ্রনাথ যে প্রেরণা লাভ করেন সেই সম্পর্কে তিনি 'জীবন-স্মৃতিতে লেখেন :—

"এই কাগজেই বিহারীলাল চক্রবর্ত্তীর কবিতা প্রথম পড়িয়াছিলাম। তাঁহার সেই সব কবিতা সরল বাঁশীর সুরে আমার মনের মধ্যে মাঠের এবং বনের গান বাজাইয়া তুলিল।..."

সংস্কৃত কাব্যের সহিত বিহারীলালের বিশেষ পরিচয় ছিল। তিনি কালিদাস ও বাল্মীকির কাব্য নিয়ে গবেষণা করেছেন এবং প্রাচীন বাংলা সাহিত্যে ও ইংরাজী সাহিত্যের উপর তাঁর ছিল প্রচুর দখল। সেইজন্য তাঁর কবিতায় বিলাসের চেয়ে ব্যক্তিত্বের প্রকাশ বেশি। তাঁর কাব্য জীবনের গভীরতর আনন্দ-উপলব্ধির উৎস-স্থান হতে নানাভাবে নানা ভাষায় আবেগের সঙ্গে প্রকাশ হয়েছে এবং সেই ভাবাবেগের জন্য হয়ত তখনকার অন্যান্য লেখকদের নজরে বিহারীলালের লেখা তাঁদের আসরে আসন করে নিতে পারি নি। কারণ নূতন কাব্যচিন্তা বিহারীলালের পূর্ব্ব কবিদের চিন্তার বাইরের সামগ্রী ছিল। যারা বিহারীলালের কাব্যের রস সংগ্রহ করতে পেরেছিলেন তাঁদের মধ্যে হলেন, কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য্য, দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর, জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর ও তাঁর সহধর্ম্মিণী, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, অক্ষয়কুমার বড়াল প্রভৃতি রস-সুন্দরীও কবি বিহারীলালের রচনার মর্ম্ম অনুধাবন করতে পেরে তাঁর রচনার অনুরাগী ছিলেন।

প্রাচীন-পন্থীরা বিহারীলালের কাব্যের প্রতি কিরূপ কটাক্ষ প্রকাশ করতেন তাহা একটি উদাহরণ হতে বোঝা যাবে। 'বঙ্গসুন্দরী' কাব্যে তিনি সে ছন্দ ব্যবহার করেছিলেন তা সমালোচনা করে এক প্রাচীন পন্থী লেখেন :—

"যাত্রার সুর লইয়া কাব্য রচনা করাতে কীর্ত্তিলাভের সম্ভাবনা নাই বলিয়া আমরা চক্রবর্ত্তী মহাশয়কে সাবধান করিতেছি। তিনি যেন গ্রন্থান্তর রচনা কালে এই গায়ক ভাব পরিত্যাগ করিয়া সুকবি খ্যাতি লাভ করিতে যত্নবান হয়েন।"

পুরাতন ব্যবস্থা বা পুরাতন চিন্তা বদলে যখন নতুন ব্যবস্থা বা নতুন চিন্তার উদ্ভব হয় তখন সেই ব্যবস্থা বা চিন্তার সৃষ্টিকর্ত্তাদের এই রকম বহু সমালোচনার মুখোমুখী হতে হয়—এ উদাহরণ বিরল নয়। কাজেই বিহারীলালকে এই ধরণের সমালোচনা একটা স্বাভাবিক ঘটনা বলে ধরে নেওয়া যেতে পারে। কিন্তু কোন সমালোচনায় কর্ণপাত না করে বিহারীলাল তার সৃষ্টি অব্যাহত রেখেছেন। "বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস পাঠে আমরা জানতে পারি যে, 'সারদামঙ্গল' কাব্যে তিনি অন্তরবাসিনী কাব্য লক্ষ্মীকে অন্তরে বাইরে বিচিত্র কল্পনায় যে ভাবে ও যে রূপে উপলব্ধি করেছিলেন, কবি তাই 'সারদামঙ্গল' আঁকবার চেষ্টা করেছেন। এখানে কবি-কল্পনা যেমন বঙ্গোচ্ছ্বল ও পরিবর্ত্তনশীল কাব্যকল্পনাও তেমনি অবাস্তব ও উল্লায়ু। সন্ধ্যাসূর্য্যের অস্তরাগে যেমন মেঘের পটে মুহূর্ত্তে মুহূর্ত্তে রঙ ফেরাতে থাকে 'সারদামঙ্গলে' রোমান্টিক কবি-কল্পনা তেমনি ক্ষণে ক্ষণে রূপ পালটে চলেছে। সারদামঙ্গল পাঁচ সর্গে গাঁথা। প্রথম সর্গে কবি চিত্তে কাব্যলক্ষ্মীর প্রথম আবির্ভাব বিশ্বের জীবধাত্রী উষা-গায়ত্রীরূপে। দ্বিতীয় আবির্ভাব বাল্মীকির কবি মানসে করুণাময়ী-রূপে। সহচর বিরহে ক্রৌঞ্চীর শোক অরণ্য প্রতিধ্বনিত করে করুণা-হৃদয় মুনিকে বিহ্বল করল। কারুণ্যের ক্ষণসংযোগে কবি-মানসে কাব্য-সরস্বতী জেগে উঠল। "যোগীর ধ্যানের ধন ললাটিকা মেয়ে" কবির অন্তর হতে বের হয়ে নিখিলের আনন্দ-লক্ষ্মী উমারূপে প্রতিষ্ঠিত হলেন কালিদাসের কাব্যশ্রীমণ্ডিত হয়ে। কবি হৃদয়ে কিন্তু কাব্যলক্ষ্মী দেখা দিতে লাগলেন দুইরূপে—আনন্দময়ী বিষাদিনী রূপে। কবি জীবনের নিগূঢ় বিরহ ব্যথায় আনন্দলক্ষ্মী রূপ ক্ষণে ক্ষণে ঢাকা পড়ে যায়, তখন মৃত্যু হয় বাঞ্ছনীয়। তবুও সান্ত্বনা জাগে—

হেরিবে কাননে আসি
অভাগার ভস্মরাশি
অথবা হাড়ের মালা বাতাসে ছড়ায় ;
করুণা জাগিবে মনে—
ধারা ববে দু-নয়নে
নীরব দাঁড়াইয়া রবে, প্রতিমার প্রায়।

দ্বিতীয় সর্গে হারানো আনন্দ-লক্ষ্মীর উদ্দেশে কবি চিত্তের অভিসার। কবি চিত্ত যেন সতীহারা শিব। দীর্ঘ বিরহের হতাশা,—

কেমনে বা তোমা বিনে
দীর্ঘ দীর্ঘ রাত্রে দিনে
সুদীর্ঘ জীবন-জ্বালা স'ব অকাতরে
কার আর মুখ চেয়ে
অবিশ্রাম যাব বেয়ে
ভাসায়ে তনুর তরী আকুল সাগরে !

আবার কবিতাটির শেষে কবি চিত্তের সুগভীর প্রেমের প্রকাশ,

ধিক রে অধম ধিক
ভালোবাসা 'প্লেটোনিক'
ছদ্মবেশী রসিক মধুর "মিয়ু মিয়ু"
প্রেমের দরজা জান
আকাশে ঢালিয়া প্রাণ
সজোরে পাপিয়া হাঁকে "পীহু, পীহু, পীহু"
দুর্ব্বহ প্রেমের ভার
যদি না বহিতে পার
ঢেলে দাও আকাশ বাতাস ধরাতলে !

(মিটায়ে মনের সাধ
ঢালিয়া দিয়াছে চাঁদ)
ঢেলে দাও মানবের তপ্ত অশ্রুজলে।

বিহারীলালের শেষ কাব্য "সাধের আসন"। এই কাব্যগ্রন্থটিও সারদামঙ্গলের মত রস ও ভাবাবেগে পরিপূর্ণ। জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুরের পত্নী এই কাব্যের একজন অনুরক্ত পাঠিকা ছিলেন। ইনি কবিকে একটি পশমের আসন উপহার দেন তাতে এই কয় লাইন তোলা ছিল।

হে যোগেন্দ্র ! যোগাসনে
ঢুলু ঢুলু ঢুনয়নে
বিভোর বিহ্বল মনে কাঁহারে ধেয়াও ?

ব্যক্তি হিসাবে বিহারীলাল খুব উদার ও মহৎ লোক ছিলেন. তাঁর চরিত্র ও নির্মল স্বভাব সম্বন্ধে কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য্য বলেছেন :—

"বিহারীর স্বভাবচরিত্র অতি নির্ম্মল ছিল। নিতান্ত শৈশবে কিম্বা প্রথম উঠতি বয়সে যৎসামান্য কিঞ্চিৎ চরিত্রস্খলন হইয়াছিল কিনা বলিতে পারি না, কিন্তু আমি যত দিন দেখিয়াছি, এইরূপ সচ্চরিত্র, সদাশয়, নির্মলস্বভাব ব্যক্তিআমি দেখি নাই। তজ্জন্য আমি যে তাঁহাকে কত দূর শ্রদ্ধা ও ভক্তি করিতাম, তাহা বাকপথাতীত। আমার নিজের চেয়ে এ বিষয়ে তাঁহাকে যে কত দূর শ্রেষ্ঠ বিবেচনা করিতাম তাহা বলিয়া কি জানাইব।"

বিহারীলালের প্রায় সব রচনাগুলি কোন না কোন পত্রিকায় প্রকাশ হয়েছিল এবং পরে সেইগুলিকে একত্রিত করে পুস্তকাকারে প্রকাশ করা হয়। নিম্নলিখিত গ্রন্থগুলিও তিনি প্রকাশ করেন :—

(১) 'স্বপ্ন দর্শন', (২) সঙ্গীত-শতক (৩) বঙ্গসুন্দরী (৪) নিসর্গ-সন্দর্শন (৫) বন্ধুবিয়োগ (৬) প্রেম প্রবাহিনী (৭) এ ছাড়াও কবির কতকগুলি রচনা নিয়ে একটি গ্রন্থাবলী প্রকাশিত হয়। তার মধ্যে 'মায়াদেবী', 'শরৎকাল', 'ধূমকেতু', 'দৈববাণী,' 'বাউল বিংশতি', 'সাধের আসন', 'কবিতাও সঙ্গীত', ইত্যাদি রচনাগুলি তাঁর গ্রন্থাবলীতে স্থান পেয়েছে। আকাশের চন্দ্র, সূর্য্য ও তারকার শোভাই কেবল তাকে মুগ্ধ করে নি, অন্ধকারের নয়নানন্দময়ী রূপও তাতে আনন্দের সঞ্চার করেছে, বিহারীলালের কাব্য সেই সৌন্দর্য্য ও আনন্দের বহির্প্রকাশ।

"বাংলা সাহিত্য" গ্রন্থ পাঠে আমরা জানতে [illegible] বিহারীলালের সারদা মঙ্গলের সঙ্গে কেহ কেহ শেলির Hymn [illegible]tellectual Beautyর সংস্রব আছে। ইহা একেবারে ভিত্তিহীন বলা যায় না। যদিও বিহারীলাল শেলীর কাব্য পড়েছেন তবুও তাঁর রচনার প্রতিভা-গৌরব ক্ষুণ্ণ হয় নি। বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের আধারভূতা মহাশক্তিকে নিখিল সৌন্দর্য্যের মূর্ত্তিরূপে কল্পনা এই দেশে মোটেই নূতন নহে। 'শরৎকাল' নামক কবিতায় বিহারীলাল বিদেশী কাব্যের অনুকরণ করাকে তীব্রভাবে প্রতিবাদ জানিয়েছিলেন ; কাজেই এই থেকে প্রমাণ হয় তিনি শেলির অনুকরণ বা অনুসরণ করতেন না।

বিহারীলাল তাঁর 'নিসর্গসন্দর্শন' কাব্যে শুধু প্রকৃতি নহে মানুষের কথাও বর্ণনা করেছেন। ওয়ার্ডসওয়ার্থ ও তার কাব্যে প্রকৃতি এবং মানুষকেই একমাত্র বিষয়বস্তু করেছিলেন। উভয়ের মধ্যে সামান্য কিছু সাদৃশ্য থাকলেও বিহারীলালের সহিত ওয়ার্ডসওয়ার্থের বৈসাদৃশ্যই বেশী, প্রসিদ্ধ ইংরাজ কবির মতো বিহারীলালের কাব্যেরও এক প্রধান অংশ নিসর্গের বা বিশ্বপ্রকৃতির সহিত সংশ্লিষ্ট, এবং তিনিও বিশ্বাস করেন যে, এই বিশ্বপ্রকৃতির অন্তরে বাহিরে ব্যাপ্ত রয়েছে এক অদৃশ্য মহাশক্তি ; কিন্তু সাদৃশ্য এই পর্য্যন্ত।

বাংলা সাহিত্যের অন্যতম দিকপাল বিহারীলাল চক্রবর্ত্তী জীবন ভোর সাহিত্য সাধনায় কাটিয়ে গেছেন। আজ যে বাংলা সাহিত্য বিশ্বের অন্যতম শ্রেষ্ঠ ভাষা রূপে গণ্য হয়েছে তার জন্য বিহারীলালের নিকট আমরা ঋণী। তাই আজ তাঁর শুভ জন্ম দিনে আমরা তাঁকে স্মরণ করি ও প্রণতি জানাই।

থামবে কী এই ধ্বংস রব

প্রফুল্লরঞ্জন সেনগুপ্ত

অনেক স্বপ্ন সৌধ গড়ে কী ভেঙেছে সব ?
জীবন রথের চক্রখানি যে আজকে শ্লথ।
এখানে অন্ধ কঠিন পাষাণ—বন্ধ পথ !
মেঘে মেঘে দেখি নিবিড় আঁধার স্তব্ধ গান,
ব্যথার সায়রে আঁখিতে যে আজ অশ্রু বান !

দিক্-হারা বুঝি জাহাজের গতি হারালো থেই,
নাবিক কোথায় ? কোথায় নাবিক, কেউ কী নেই ?
আকাশে আভাস ঝড়ের হাওয়ার ছন্দহীন,
শঙ্কা নিবিড় কেঁপে কেঁপে ওঠে হৃদয় বীণ !
দিগ্-দিগন্তে মৃত্যু-মাদল গভীর মেঘে,
সাগরের জল দুলে দুলে ওঠে হাওয়ার বেগে।
অরণ্য সাধ রক্ত তৃষার প্রবল টানে,
ভরেছে কী আজ মানুষের প্রাণ তিক্ত গানে !
ঘূর্ণী হাওয়ায় ভরা ডুবি হ'য়ে যাবে কী সব,—
থামবে কী এই হিংস্র দিনের ধ্বংস রব ?

(পূর্বপ্রকাশিতের পর)

আসর ভাঙল অভয়ের জয়জয়কার দিয়ে। কিন্তু বাড়ি পালাবার উপায় নেই। শরতদাস বাজারের পক্ষ থেকে রাজভোগ খাওয়ালে লোচন ঘোষ আর অভয়কে। ভবানী-বাবু শেষ পর্যন্ত অপেক্ষা করছিলেন। নিজে অভয়ের কাঁধে হাত দিয়ে বাড়ি যাবার নিমন্ত্রণ ক'রে গেলেন। বললেন, ভাল হয়েছে, গান তোমার কালোপযোগী হয়েছে। এক-দিন এস আমার ওখানে, আলাপ করব।

শরতদাসের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে বাজারের বাইরে এসেই থমকে দাঁড়াল অভয়। অনাথ তার সেই ভাঙা দাঁতে হাসছে মিটি মিটি। দৃষ্টি অভয়ের দিকেই। কিংকর্তব্যবিমূঢ় অভয় কি করবে, কিছু স্থির করতে পারল না।

অনাথ হাত বাড়িয়ে ডাকলে, আয়।

অনাথের ওই হাসিটুকু অনেক দিন ধরে চেনা। হাসির সঙ্গে ওই ডাকের পরে পৃথিবীর কোনো বাধা আর ঠেকিয়ে রাখতে পারে না। কাছে যেতে যেতে বলল সে, তুমি আজকের গান শুনেছ ?

অনাথ দেখতে রোগা, কিন্তু গায়ে শক্তি ধরে। সমস্ত শক্তি দিয়ে সে দু'হাতে জড়িয়ে ধরল অভয়কে। প্রায় চাপা গলায় যেন ফিসফিসিয়ে বলল, সাবাস! সাবাস খুড়ো। তুই আজ আমার সব গুমোর ভেঙে দিইচিস।

অতবড় মানুষটা অভয়, তারও যেন দম বন্ধ হ'য়ে এল অনাথের আলিঙ্গনে। বলল, তোমার ভাল লেগেছে খুড়ো ?

অনাথের গলা যেন কেঁপে উঠল প্রায়। বলল, ওরে, আমি কোন্ ছার। ভবানীদা তোকে সার্টিপিকেট দিয়েছে, তুই কি যে সে লোক।

অভয় অনুভব করল, তার বুকের মধ্যে প্রবল আলোড়ন। অনাথ আবার বলল, আর মিটিংএ দাঁড়িয়ে তুই বলিস্, গান আমি গাইতে পারিনে!

সে কথায় জবাব না দিয়ে অভয় বলল—চল খুড়ো, গঙ্গার ধারে গিয়ে বসি খানিক।

অনাথ বলল, তা কি ক'রে হবে ? তোমার শাউড়ি, সুরীনদা, ওরা বোধহয় সব গলির মোড়ে দাঁড়িয়ে আছে তোমার জন্যে।

অভয় বলল, থাক্ খুড়ো। চল, একটু বসিগে ঘাটে। এখন ঘরে ফিরতে মন চাইছে না।

অন্ধকারে গঙ্গা চকচক্ করছে, ছলছলাচ্ছে। ওপারের আলোর অস্থির প্রতিবিম্বগুলি যেন স্থির থেকেও হারাচ্ছে নিমেষে। অদূরেই খেয়াঘাটে নৌকাগুলি বাঁধা! মাঝিরা ঘুমোচ্ছে! নদীর বুক শূন্য, নৌকা নেই। কাছে ও দূরে জেটিগুলি ছকে-আঁটা কালো অঙ্কের অবয়ব নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। কোথাও কোথাও অস্পষ্ট গাধাবোটগুলি নোঙর করে রয়েছে সিন্ধবাদের সেই অতিকায় তিমি মাছের মত।

আকাশের তারারা যেন নেমে এসেছে। মধ্যরাত্রি অতিক্রান্ত এইটুকু সময়, ধরাশায়িনী গঙ্গা কথা বলছে আকাশের সঙ্গে। এইটুকুনি সময়। মানুষেরা জেগে উঠলে আবার সে নিত্যপ্রবাহের কাজের যাওয়া-আসায় বইবে।

খেয়াঘাটের অদূরেই, ঘাসের ওপর বসল এসে দুজনে। অনাথের মনে বিস্ময়। আজ তার নতুন লাগছে অভয়কে। কী চায় অভয়, কেন এমন করছে। অনাথের হাত ছাড়ে-নি তখন থেকে। গঙ্গার ধারে এসে বসেও, অনাথের হাতটি ধরে রইল সে।

ব'সে, একটু পরে বলল অভয়, খুড়ো, জ্বর উঠতে লাগল, এ আর থামবে না। আমি টের পেয়েছি।

অনাথ সন্ত্রস্ত গলায় বলল, জ্বর ?

অনাথ অভয়ের গায়ে হাত দিল। সেই হাতটি ধরে অভয় হাসল। নিঃশব্দে হেসে তাকাল গঙ্গার দিকে। বলল, গায়ে নয় খুড়ো, প্রাণে। এ বড় বিষম জ্বর। এ আমাকে অনেকবার ধরব ধরব করেছে, পারে নাই। এই-বার ধরেছে, আর আমার ছাড়ান নাইকো।

অনাথের চোখের আঁধার কাটে না। বলল, একটু বুঝিয়ে বল ভাই খুড়ো।

সম্বোধনের বৈচিত্র্য আছে বটে অনাথের। আসলে খেয়াল নেই, ভাই খুড়ো বলেছে সে। আর অনাথের মত মানুষও আজ অভয়ের কাছে অজ্ঞান হ'য়ে গেছে। সে বুঝতে পারছে না সব কথা।

অভয় বলল, খুড়ো, এসব যে জ্বরের মতনই। সেই তোমার গান আছে না।

ও রাই, কী নাম জপে কী হল তোর
এ যে অবিরাম জ্বর।

আজকের আসরে আমার তেমনি জ্বর ধরিয়ে দিলে খুড়ো, এ আর সারবে না !

নদীর অন্ধকার স্রোতে যেমন সহসা চিক্‌চিক্‌ ক'রে ওঠে, তেমনি চিকচিকিয়ে উঠল অনাথের চোখ। সে বলল, সে তো খুব ভাল কথা রে খুড়ো। জ্বর ? তাই বল্‌, আমি বুঝতে পারি নি। হ্যাঁ, এতো জ্বর-ই। এতো ভাল, খুব ভাল। যত খুশি জ্বর চাপুক। এ জ্বর যত চাপে ততই ভাল।

কিন্তু খুড়ো, সামলাতে পারব তো ?

এ যেন দুই পাগলের মিলন। জীবন নিয়ে ছিনিমিনি নয়, কিন্তু নিজের রক্ত উজাড় ক'রে দিয়ে, সেই আরাধ্য মহাজীবনের পূজা, এই তো অনাথের জীবন সত্য। সে দু'হাত বাড়িয়ে অভয়ের কাঁধ ধরে বলল, কিসের সামলানো। সামলাবি কিসের কি ? মরবি। এই জ্বরেই মরবি, সেই তো সত্যি মরা।

অভয়ও দু'হাতে অনাথের দুটি হাঁটু জড়িয়ে ধরে বলে উঠল, এ্যাই, এ্যাই খুড়ো তোমার কথা। এ কথাটা বলে দেবার লোক নাই সংসারে। এই জন্যে তোমাকে গুরু মেনেছি। আবেগে অনাথ সম্পর্ক ভুলে যায়। বলল, এই শালা তোর বাজে কথা।

—না, বাজে কথা নয়।

—হ্যাঁ, বাজে কথা।

—বাজে নয় খুড়ো, গুরু দক্ষিণা নিতে হবে তোমাকে।

—গুরু দক্ষিণা ?

—হ্যাঁ।

দু' পকেটে হাত দিয়ে, খুচরো পয়সা, আস্ত টাকা সব বার করে তুলে দিল অভয় অনাথের কোলে।

অনাথ এবার চেঁচিয়ে উঠল, এই খুড়ো, কি করছিস্‌ ?

অভয় বলল, ঠিক করছি খুড়ো—ন্যায্য কাজ করছি। আমি তোমাকে দিলুম খুড়ো, তুমি ইউনিয়নে জমা করে দেবে। তুমি শিখিয়েছ, ইউনিয়নটা আমাদের মন্দিরের মতন। তুমি ভিক্ষে কর, আমিও ভিক্ষে করেছি! এ-গুলো তুমি নিয়ে যাও।

কয়েক মুহূর্ত কথা বেরুল না অনাথের মুখ দিয়ে। পয়সার দিকে ফিরে তাকাল না সে। জড়িয়ে ধরল না অভয়কে। যেন আকাশের দিকে মুখ ক'রে, চুপি চুপি বলল, আমি জানি, আমি জানি খুড়ো, তোকে কেউ ঠেকাতে পারবে না।

কিসে ঠেকাতে পারবে না, কোথায় পারবে না, সে কথা কিছু বললে না অনাথ। তারপরেই পরিষ্কার গলায় বলল, কিন্তু কত আছে; গুণেছিস্‌ ?

অভয় বলল, ঢুলীকে দিয়ে-থুয়েও আছে গোটা ছাব্বিশ সাতাশ। শরৎদাস গুণে দিয়েছে।

অনাথ গম্ভীর স্বরে বলল, বেশ, তবে আমার কথা মানো।

ব'লে বেছে বেছে নোট গুণে তুলল অনাথ। একটি পাঁচ টাকার নোট বুক পকেটে গুঁজে দিয়ে বললে, এ টাকা দিয়ে শাউড়ির একটি থান্‌ কিনে দিবি। আর এই ধর আরো আটটি টাকা, নীচের পকেটে দিলাম। এ টাকা দিয়ে বউমাকে একখানা রঙীণ শাড়ী কিনে দিবি। দিতে হয়, নইলে অধর্ম হবে। কারখানায় যে-টাকা পাস্‌, সেটা হল মজুরি, এটা হল সম্মানী। দু'য়েতে অনেক ফারাক। এ টাকা দিয়ে তাদের না দিলে অন্যায় হবে।

মাথা নত করল অভয়, যা হুকুম কর খুড়ো।

ব'লে একটি নিঃশ্বাস ফেলে, দূর গঙ্গার দিকে তাকাল অভয়। বলল, খুড়ো, একটা কথা।

—বল।

—জীবন ছোট না বড় ?

অনাথ বিস্ময়ের ঘোর নিয়ে অনেকক্ষণ চুপ ক'রে রইল। তারপর গম্ভীর হ'য়ে উঠল তার মুখখানি।

বলল, অমন ক'রে আমাকে কিছু জিজ্ঞেস করিস নে। আমি কি সব জানি ?

—তবু বল।

—নিজের কথা বলতে পারি।

—বল।

অনাথ গলার স্বর নামিয়ে বলল, খুড়ো, বড় বিপদে ফেলেছিস। তুই আমার চে' বয়সে অনেক ছোট, তবু সত্যি কথা বলব তোকে। জানিস তো, তোর একটা খুড়ি ছিল। সন্তান ছিল। জেল থেকে ফিরে এসে তাদের আর পেলাম না। শোক করিনে আর, কিন্তু তা' কি যাবার ? বুকটার মধ্যে যখন বড় বেশী কন্‌কনিয়ে ওঠে, তখন খালি বলি, জীবনটা ছোট। কত ছোট, তাতেও মাপ হল না। হল তখন, যখন একদিন আর একটা গণ্ডগোল ক'রে ফেললাম। ছেচল্লিশ সালে পুলিশের গুলিতে মরেছিল দীনু। আমাদের বন্ধু, দোস্ত। দীনুর বিধবা, নাম লক্ষ্মী। তখন ছিল কড়ের াঁড়ি,ছেলেপুলে হয়নি। মনের মধ্যে আমার শোক,তবু লক্ষ্মীর কাছে কেমন ক'রে যেন ধরা পড়ে গেছি। ঘুরে ফিরে পার পেলাম না, ধরা পড়তে হল।

অনাথের এই অকপট স্বীকারোক্তি অভয় অবাক হ'য়ে শুনল। অনাথ একজন নাম-করা লোক। তার নামে লোকে সহজে দুটি কথা বলতে পারে না।

অনাথ থেমে বলল, লক্ষ্মী ডাকলে যেতে পারি নে। কাছে গেলে দু'দণ্ড থাকতে পারি নে। কেন ? লোকে না বুঝুক, আমি তো বুঝি। কিন্তু লক্ষ্মী বোঝে না। রাত ক'রে পালিয়ে আসে, দিন-মানেও তার ব্যাভারের কিছু চাপাচাপি নেই। যা মুখে আসে, তাই ব'লে গাল দিয়ে যায়, কাঁদে। বলে, 'তোমাদের দেশের ভাল হোক্, আমি গলায় দড়ি দেব। যিদিনে কাঁদতে এয়েছিলুম তোমার কাছে, সিদিনে দূর ক'রে দাও নি কেন ? আমি ডাকি সাড়া দাও না। এলে দূর দূর কর।

অনাথ হাসল। অনাথের দুটি ভাঙা দাঁতের ফাঁকে যে হাসি দেখলে অভয়ের বুকের মধ্যে বড় টাটিয়ে ওঠে।

অনাথ হেসে বলল, সে থাকগে। যে কথা বলছিলাম। তা' এও তোমার ধরাই পড়েছি বলতে হবে। যখন মনে হয়, তখন বলি, জীবন কী ছোট। কাজ করি, ইউনিয়ন করি, দল করি, দশজনকে নিয়ে আছি, সব সময় মনে হয়, বড় ছোট জীবন। নাগাল পাইনে যা চাই। বড় ছোট এ জীবন।

বলে অনাথ চুপ করল। অভয়ও কথা বলল না। তাকিয়ে রইল দূরের অস্পষ্ট বাঁকের অন্ধকারে।

একটু পরে অনাথ বলল, কি খুড়ো, চুপ ক'রে রইলে যে ?

অভয় হেসে বলল, মিল হল না খুড়ো তোমার সঙ্গে। তুমি যে ভুল বললে ?

—ভুল ?

—নয় ? ওই যে বললে, 'যা চাই, তার নাগাল পাইনাকো।' ওইটে না জীবন ? যদি শুধু আপনাকে জীবন ভাবি, তবে জীবন ছোট। কিন্তু খুড়ো, যার নাগাল পাও না, সেইটেই না জীবন ? জীবনের কি কূল আছে ? তার কি সীমা আছে ? আমি তার কূল-কিনারা পাইনা। সে অকূল পাথার। আজ আমার পেত্যয় হল কি, না জীবন অনেক বড়। আমি দুটো কলি বেঁধেছি। সেইটে তোমায় শোনাব ব'লে ও-কথা জিজ্ঞেস করেছি।

অনাথ বলল, শোনা।

অভয় গুণ্ গুণ্ ক'রে গাইল ভৈরবী সুরে,

ওহে জীবন, আমি তোমারে বেড় পাই না।
কেঁদে কেঁদে মরি আমি
ক্ষেপে বেড়াই দিন যামি
এ কেমন রূপের অকূলপাথার মাপতে পারি না॥

অনাথ গান শুনে, একটু যেন চিন্তিত সুরে বলল, আচ্ছা ?

অভয় বলল, তাই না খুড়ো ? জীবনকে কি মাপা যায়। খুড়িকে দিয়ে পর্ব শেষ করতে পারলে না, মনের মধ্যে লক্ষ্মীঠাকরুণ এসে আসর জমিয়ে বসেছেন। খুড়ো, আরো কত কি বাকী আছে, কতটুকুনি জানি বল ? ছোট বলনা খুড়ো, জীবন বড়। তবে—

ব'লেই আবার গেয়ে উঠল,

কেউ কাঁদে ছোট ব'লে
কেউ কাঁদে বড় ব'লে

তবু পাখার মতন ঠোঁটে ক'রে নিতে যে হায় পারি না।

অনাথ বলল, এতক্ষণে পোষ্কার হ'ল।

অভয় চঞ্চল আজ। এক কথায় বেশীক্ষণ থাকতে পারছেনা। বলল, ঘুড়ো, আমি তানাকে একবারটি দেখব।

—কাকে ?

—তানাকে। একবারটি দেখতে মন করছে যে ?

নামটি নিতেও যেন কত সংকোচ অনাথের। বলল—লক্ষ্মীকে ?

অভয় বলল, যদি মনের মানুষ পাই, তার নাম কিছু নাই।

চালাক চতুর অনাথ অন্ধকারে বোকার মত হাসতে লাগল। তারপরে বুঝল, অভয়কে আজ সহজে নিবৃত্ত করা যাবে না। বলল, সে হবে খনি। এখন চলতো উঠি, আর নয়। রাত আর কতটুকুনি আছে ? কাজে যেতে হবে খানিক পরেই। চল চল।

হাত ধ'রে টেনে তুলল সে অভয়কে। দুজনের দু'দিকে রাস্তা। অনাথের দক্ষিণে, উত্তরে অভয়ের। অনাথ বলল, এত রাতে আর কোথাও যাস্‌নে খুড়ো, বাড়ি যা। ভোরে মিলে আসবি তো ?

অভয় বলল, মিলে না গেলে চলবে কেমন ক'রে ? খুড়ো, তোমাকে এগিয়ে দেব ?

অনাথ হেসে বলল, আঁজ্ঞে না, পাগলা কোথাকার। তুই যা দিকিনি এবারে ?

অভয় গঙ্গারধার দিয়ে এগিয়ে চলল। মালীপাড়ার সরু গলিতে ঢুকতেই, কুকুর চীৎকার ক'রে উঠল। তারপরে চেনা মানুষের গন্ধ পেয়ে থেমে গেল আপনি আপনি। এদিকটায় গৃহস্থদের আবাস। এখন অবশ্য সব আবাসই ঘুমন্ত, নিঃশব্দ।

অভয় দেখল, সদরের ঝাপ খোলা। আস্তে আস্তে ঢুকে বন্ধ ক'রে দিল ঝাপ। কিন্তু ঘরের পিছনে, পুকুরঘাটের দিকে আলোর আভাস দেখে একটু অবাক হল। নিমির ঘরের দরজা বন্ধ বলেই মনে হল। নবাগুড়ির ঘরটা খোলা প'ড়ে রয়েছে। পা'য়ে পায়ে সে পুকুর ঘাটের দিকে গেল।

যা সন্দেহ করেছি তাই। শৈলবালা পুকুরে কোমর ডুবিয়ে বসে আছে। কয়েক মাস ধরেই এরকম দেখা যাচ্ছে।

যৌবনে শৈলবালা যে কাল রোগ আয়ত্ত করেছে, রক্তের তেজে সে রোগ এতদিন ওষুধি লতার গন্ধে অবশ সাপের মত জীবন্তে মরেছিল। রক্তের তেজ যত কমেছে, ততই সে বিষধর কুণ্ডলমুক্ত হচ্ছে। এখন প্রতিদিন তার বিষের ছোবল বাড়ছে। শৈলবালার দেহের গর্তে ক্রমেই সে আরো বেশী গর্জাচ্ছে, ফুঁসছে, দংশনে দংশনে প্রাণ শেষ করছে। ব্যাধির প্রকোপে চোখের দৃষ্টি কমছিল অনেকদিন থেকেই। ছানি নয়, একটি চোখের মণি ক্রমেই শাদা হ'য়ে যাচ্ছিল। ফুলছিল সে অনেকদিন থেকেই। যেন নতুন স্বাস্থ্যের মত, একটা রক্তাভ দীপ্তি ফুটে উঠছিল তার সর্বাঙ্গে। কয়েক মাস ধরে শৈলবালা দেহে জ্বালা অনুভব করছিল। সকালবেলা ঘুম থেকে উঠে পুকুরে নামলে, প্রথম প্রথম সে উঠতো একটু দেরী করত। বলত, জলে ডুবে থাকলে ভাল লাগে। দাউ দাউ ক'রে যে আগুন জলছে, এইটুকু যেন ঠাণ্ডা থাকে।

ইদানীং আরো বেশী সময় সে জলে থাকছিল। সকালবেলা নেমে, নিমির মুখতাড়া গেয়ে বেলা দশটা বেজে যেত উঠতে। কঁকানি গোঙানি তো আছেই চলতে ফিরতে। নিয়মিত চিকিৎসা কথনো করে না সে। ডাক্তার বলেছে, ওই ক'রে অসুখটাকে পাকাপাকি ভাবে বাঁধালে।

কিন্তু রাত থাকতে পুকুরে গিয়ে কোনদিন ডোবে নি শৈলবালা।

হ্যারিকেনটা পুকুরের ওপরে। জলের ধারে আলো তেমন পৌছয় নি দেখল, শৈলবালা গালে হাত দিয়ে জলে বসে আছে। গা'য়ে তার কাপড় নেই। গায়ের কাপড় ঘাটের তালের ডোঙার ওপর প'ড়ে রয়েছে। শৈল কঁকাচ্ছে।

অভয় ডাকল, মা।

শৈলবালা তাড়াতাড়ি কাপড়টা টেনে নিয়ে জবাব দিল, কে জামাই ?

অভয় দু'পা এগিয়ে বলল, রাত ক'রে জলে নেমেছ মা। এর ওপরে সর্দিজ্বর ধরলে—

শৈলবালা কাপড়খানি বুকে মাথায় ভুর ক'রে ফেলে, হাঁপিয়ে হাঁপিয়ে ফুঁপিয়ে উঠল, কি করব বাবা। থাকতে পারলুম না। জলে যাচ্ছে, জলে যাচ্ছে। হে ভগবান, হে দেবতা, আমাকে নাও গো, এবার আমাকে নাও।

নিশুতি রাতের এই অন্ধকার পুকুরের স্থির জলে শৈলর চাপা কান্না যেন প্রেতিনীর মত অদৃশ্যে ভাসতে লাগল।

অভয় বলল, আমি যাব, তুলে নে' আসব তোমাকে?

শৈলবালা তেমনি স্বরে বলল, না বাবা না, মেয়েটা জেগে বসে আছে, তুমি ঘরে যাও। আমি এখেনেই বসে থাকব। থাকব, এখেনেই থাকব, আমি আর উঠব না।

বলতে বলতে শৈলর যন্ত্রণাকাতর শব্দ যেন কান্নায় ভেঙে পড়ল। আবার বলল, তোমার গান শুনতে শুনতে মনটা কেমন করতে লাগল। আমার বুকটার মধ্যে বসে যেন কে নখ দিয়ে টিপুনি দিচ্ছিল। বড় অবশ অবশ লাগছিল শরীলটা। সুরীনদাদা আমাকে চলে আসতে বলছিল—আমি তোমার সঙ্গে আসব ব'লে বসেছিলুম বাবা।

অভয়ের মনটা ব্যথায় অনুশোচনায় কেঁপে উঠল। আরো দু'পা এগিয়ে এসে বলল, আমাকে ডাকলে না কেন মা?

—ছি! তা কি ডাকতে পারি? তোমাকে নে সব্বাই টানাটানি করছে। দেখে আমার চোখ জুড়িয়ে গেল। আর তো মরতে আমার অসাধ নেই। তবে? কেন সে নিচ্ছে না। আমার বাবা অভয়, তুমি একবারটি বল, আমায় নিক, আমায় নিক এবার।

অভয়ের প্রকাণ্ড বুকটা যেন প্রচণ্ড ঝটকায় কেঁপে উঠলো। গলার কাছে ঠেলে এল কী একটা। সে শুধু অস্ফুটে ডাকল, মা।

শৈলবালা যেন সহসা পরিষ্কার গলায় বলল, মরব না বাবা, এখন মরব না। সব কিছুর তো শোধ আছে। তুমি যাও, ঘরে যাও। জানিনে, মেয়েটা এখনো খেয়েছে কি না। আমার জন্ম কিছু ভেব না।

অভয় আরো কয়েক মুহূর্ত্ত চুপ ক'রে দাঁড়িয়ে থেকে, ফিরে এল ঘরে। দরজা খোলাই, ভেজানো রয়েছে। না' হলে ঘরের মানুষও হয় তো জেগেই আছে। জেগে আছে কিনা, দেখা গেল না। ঘর অন্ধকার।

এটাই কি জীবনের নিয়ম? কিছুক্ষণ আগেও যেখানে অভয়ের মন জুড়ে প্রবল আলোড়ন, উচ্ছ্বাস ছিল; যা দেখছিল সবই ভাল লাগছিল; যা করছিল, সবই যেন মনের মত মনে হচ্ছিল। সেটা যেন ফানুসের মত চুপসে যেতে লাগল।

সে কথা বলবার আগেই নিমির গলার স্বর শোনা গেল, তক্তপোষের নীচে হ্যারিকেন কমিয়ে রেখেছি। বার ক'রে উস্‌কে নাও।

অভয় জিজ্ঞেস করল, ভাত খেয়েছ?

কোন জবাব নেই। আজকাল আগের মত দাপিয়ে হুলুস্থুল করে না নিমি। আগের মত অত গলা শানিয়ে তোলে না। অনেক শান্ত হয়েছে। তবে আসল মুর্তিকে সম্পূর্ণ আড়াল ক'রে রাখতে পারে না।

কিন্তু আজ নিমির বুকে আগুন অনেকক্ষণ ধ'রে ধোঁয়াচ্ছে। অনেক সংশয় সন্দেহের বাতাস অনেক সময় ধ'রে ওস্‌কাচ্ছে।

নিমির জবাব না পেয়ে অভয় সেই আগুনের কিছুটা আঁচ পেল। বাতিটা নিয়ে উস্‌কে দিল সে। কিন্তু নিমি উঠল না, তেমনি প'ড়ে রইল আলুথালু বেশে। কেবল বলল, ভাত ঢাকা দেয়া আছে, খেয়ে নাও। আমার আর উঠতে ইচ্ছে করছে না।

তা' না হয় না-ই উঠতে ইচ্ছে করল। ভাত বেড়ে খাওয়াটাও কিছু নতুন নয়। কিন্তু, আজ কি আর কিছু বলবে না নিমি? গানের আসরে তো সে গিয়েছিল, অভয় দেখেছে। সারা শহরের লোক বলেছে, ঘরে নিমি কিছুই বলবে না?

অন্যদিন হ'লে অভয় স্বাভাবিক নীরবতার সঙ্গেই হয় তো জামা খুলে খেতে বসে যেত।

কিন্তু মনের এমনি নিয়ম, কোনো কোনোদিন সে কষে-বাঁধা তারের মত টান টান হয়ে থাকে। আজ অভয়ের মনের তার তেমনি বাঁধা! আজ অল্প ঘা'য়ে সে হেসে উঠতে পারে, মাতাল হ'য়ে যেতে পারে। আবার রুদ্র হ'য়ে, আগুন জ্বালাতে পারে।

অভয় জামা না খুলেই উস্‌কে দেওয়া হ্যারিকেনের

দপ্‌দপে শিসটার দিকে অর্থহীন জলন্ত দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল।

অস্পষ্ট অন্ধকারে, বালিশে মুখ চেপে লুকিয়ে নিমি দেখছিল। বলল, শান্ত কিন্তু কেমন একটা জ্বালা ধরানো সুরে বলল, কোথায় ছিলে এতক্ষণ?

অভয় হঠাৎ ঘাড় ফিরিয়ে তাকাল নিমির দিকে। বলল, কথা-ই যদি বলবি তো বিছানা ছেড়ে উঠ্‌।

—নাঃ।

আলস্যভরে জবাব দিল নিমি।—কোথায় ছিলে বললে না?

—যেখানে মন চাইছিল, সেখানেই ছিলুম।

নিমি খিলখিল ক'রে হেসে উঠল। বলল, একটা মাগী তো দেখলুম, বাজারের ফড়ের হাত দে পাঁচটা ট্যাকা পাঠিয়ে দিলে। সে-ই কি মন কিনলে নাকি?

অভয়ের হাত পা শক্ত হয়ে উঠল। কিন্তু নিমি আশ্চর্য দ্রুত গতিতে উঠে একেবারে অভয়ের গায়ের ওপর এসে পড়ল। গলা জড়িয়ে ধরে, বুক পকেটে হাত ঢুকিয়ে বলল, দেখি, কত ট্যাকা পেয়েছ?

উঠল মোটে একটি পাঁচটাকার নোট। নিমির ভ্রূ কুঁচকে উঠল, ওমা, আর ট্যাকা কোথায়?

অভয় বলল, অনাথ খুড়োকে দে দিইচি, ইউনিয়নের চাঁদা ব'লে।

নিমির চোখে এবার বুকের আগুন গিয়ে উঠল। বলল, শুধু সুবালার পাঁচট্যাকার নোটখানি পান ধরে দিতে পারনি?

অভয় সহসা সরে দাঁড়াল। একবার তাকাল নিমির দিকে। যেমন সাপ ছোবল মারার আগে ঘাড় কাৎ ক'রে তাকায়। তারপরেই সে বাইরে বেরিয়ে গেল। টান মেরে ঝাপ খুলে ফেলল। এক মুহূর্তের জন্য যেন থমকে গেল সে। আবার এগিয়ে গেল অন্ধকার গলির মধ্যে। সুবালার দরজায় এসে দাঁড়াল সে।

ক্রমশঃ

বাংলা সাহিত্যরুচি

অমল হালদার

১৭৫৭ সালে পলাশীর যুদ্ধের সঙ্গে সঙ্গে মধ্যযুগ শেষ হয়ে গেল। সরু হলো আধুনিক যুগের। চর্যাপদ থেকে জয়দেব বিদ্যাপতি, চণ্ডীদাস কৃত্তিবাস, কাশীরাম, মুকুন্দরাম, আলওয়াল ও রামেশ্বর ভট্টাচার্য পর্য্যন্ত বাংলা-সাহিত্যের যে দীর্ঘ মধ্যযুগীয় ঐতিহ্য তার অবসান ঘটলো। এবার ইংরেজ বিজয়ের সঙ্গে সঙ্গে সমাজ, রাজনীতি, রুচিবোধ, সামাজিক কৌলীন্য, আচার-ব্যবহার, শিক্ষা-দীক্ষা সব কিছুই ভিন্ন পথ ধরলো। কাজেই, যেহেতু সাহিত্য সমাজের দর্পণ সেইজন্যই সাহিত্যেও এক নবযুগের ছবি ফুটে উঠতে লাগলো। অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষার্ধে এই প্রাচ্য-পাশ্চাত্য ভাবধারার সম্মিলনের প্রথম যুগে এক সাহিত্য ও সামাজিক রুচি-বিকার দেখা দেয়। এর অজস্র উদাহরণ তখনকার সাহিত্যে ছড়িয়ে আছে। উদাহরণস্বরূপ, ভারতচন্দ্র ও কবিগানের কবিওয়ালাদের নাম করা যেতে পারে। 'বিদ্যাসুন্দর' ভারতচন্দ্রের বিখ্যাত গ্রন্থ এবং এটি সে যুগের রুচিবিকারেরও চরম উদাহরণ। বিদ্যা ও সুন্দরের প্রেমকাহিনী অবলম্বনে এটি রচিত হলেও সে যুগের সামাজিক অশ্লীলতা এতে প্রকাশ পেয়েছে। সুন্দরের মিলনে বিদ্যার গর্ভসঞ্চারের কথা যখন রাণীর কাছে গোপন করতে চাইছে তখন ভারতচন্দ্র রাণীর ক্রোধ বর্ণনা করেছেন :—

তেমনি আমারে স্বপন বিহারে
পুরুষ সহিত ভেট
মিথ্যা পতিসঙ্গ মিথ্যা পতিরঙ্গ
সত্য বুঝি হবে পেট।
বাক্যের কৌশলে রাণী ক্রোধে জ্বলে
রাজারে কহিতে যায়।
ভারত ভাষায় সকল হাসায়
ছাঁয়ে ভাঁড়াইল মায়। (বিদ্যার অনুনয়, বিদ্যাসুন্দর)

পরবর্তী যুগে বঙ্কিমচন্দ্র এই রুচিবিকারকে কঠোরভাবে আক্রমণ করেছেন। তিনি বলেছেন, "ভারতচন্দ্রের কাব্যে এমন একটি অশ্লীলতা আছে যাহার জন্য তাঁহার কাব্য এই যুগে—পুনঃপ্রকাশের অযোগ্য হইয়া পড়িয়াছে, যখন পাঠ কবর্গের সকলেই যৌন আতিশয্যের ভক্ত নয়।"—(বাংলা সাহিত্য ১৮৭১)

এর পর আসে কবিওয়ালাদের যুগ। বাঙালীর রুচিবোধের যতখানি স্থূলতা ও বিকার সাহিত্যে প্রকাশ পাওয়া সম্ভব তার চরম উদাহরণ হলো এই কবিওয়ালাদেব যুগ। রবীন্দ্রনাথ এই সম্বন্ধে বলেছেন :—"ইংরেজের নূতন সৃষ্ট রাজধানীতে পুরাতন রাজসভা ছিল না, পুরাতন আদর্শ ছিল না। তখন কবির আশ্রয়দাতা হইল সর্বসাধারণ নামক এক অপরিণত স্থূলায়তন ব্যক্তি এবং সেই হঠাৎ-রাজার সভার উপযুক্ত গান হইল কবির দলের গান।" এদের মধ্যে রামবসু, হরুঠাকুর, অজুর্গোসাই, গোঁজলা গুঁই,

রাম্, নিত্যানন্দ বৈরাগী, ভবানী বেনে, ভোলাময়রা, এণ্টনী-ফিরিংগী ও যজ্ঞেশ্বরী ইত্যাদি কয়েকজন ছাড়া আর যে সমস্ত কবিওয়ালাদের দেখা সে সময় মিলেছিলো তাঁদের কাব্য প্রকাশের মধ্যে তৎকালীন রুচি-বিকৃতিরই সাক্ষ্য পাওয়া যায়। অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ ভাগে যখন এই সব কবিগান রচিত হয় তখন-ছিলো ভারতচন্দ্রের ঈশ্বরগুপ্তের সংক্রান্তি কাল। শহর কলকাতার তখন বিস্তৃতি ঘটেছে। ইংরেজ বেনিয়া ও তাদের মুৎসুদ্দিদের তখন প্রবল দাপট। বাংলার সাহিত্য সরস্বতী রাজদরবার ছেড়ে এই নূতন শ্রেণীর মনোরঞ্জনে ব্যস্ত। বলাই বাহুল্য এ রকম যুগে রুচিবিকৃতি ঘটতে বাধ্য। বাংলা দেশের রুচিবোধ তখন খুব উন্নত ছিলো না এ কথা অনায়াসেই বলা চলে। সেইজন্তেই তখন খিস্তি ও খেউড়ের যুগ। "এত সাহিত্যিক আবর্জনা ঐ যুগের মত আর কখনও বাংলা সাহিত্যে স্তূপীকৃত হইয়া উঠে নাই। সুখের বিষয় সে বিপুল পরিমাণ আবর্জনা জনশ্রুতি হইতে মুছিয়া গিয়াছে।" বঙ্কিমচন্দ্রের তীক্ষ্ণ খড়্গ এ যুগের ওপর ঝলকে উঠেছে। এ যুগের একটি উদাহরণ দেওয়া যাক গোপাল উড়ের গান :—

"কলঙ্কেতে ভয় করো না বিধুমুখী।
কমলেরি বনে গেলে কাঁটা ফোঁটে পায়,
তা বলে কি ফাঁকে ফাঁকে পা বাড়ানো যায়
ডুবেছি না ডুবতে আছি,
পাতাল কত দূর দেখি।"

এ যুগকে পাশ কাটিয়ে আমরা শতাব্দীর প্রথমার্ধে ঢুকলাম। পাশ্চাত্য প্রভাব এ যুগে আরও কিছু বেড়েছে। সামাজিক সাংস্কৃতিক ও শিক্ষাগত সংস্কারের জন্য আন্দোলন জেগেছে। উইলেয়ম কেরী, রাজা রামমোহন রায়, দাশরথি রায়, ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, ঈশ্বর গুপ্ত, মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার ইত্যাদির যুগ। এ যুগে বাঙালীর সাহিত্য-রুচি কিছু পরিমাণ উন্নত হলেও মোটামুটিভাবে তাকে প্রথম শ্রেণীর বলা চলে না। এই যুগেরই প্রকৃষ্ট উদাহরণ হলো ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'নববাবুবিলাস,' নববিবিবিলাস, 'কলিকাতা কমলালয়'।

ইংরেজী চালচাল শিক্ষা-দীক্ষা তখন সবে আমদানী হতে সরু করেছে। ইয়ং বেঙ্গলের প্রথম যুগের কথা। ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর দৌলতে ভুঁইফোড় যে সব 'বাবু' ধনী সম্প্রদায় কলিকাতা মহানগরীর বুকে দেখা দিতে সুরু করেছে হঠাৎ বড় মানুষ বাবুদের এইসব ছেলে-পিলে নব্যবাবুরা আচার-ব্যবহারে ও চারিত্রিক উচ্ছৃঙ্খলতায় আপন পিতৃপুরুষদেরও ছাড়িয়ে গেলো। বিদ্যের দৌড় এদের গোটাকতক ইংরেজী অক্ষর লিখতে শেখা—আর শ'দুই বুলি কপচানো। সায়েব লোকের কাছে বাবুরা 'বেরিগুড', দট নানসেন্স,' 'গোটে হেল' ইত্যাদি কতগুলি বিদেশী বচন শিখলো ও নানা জাতীয় বিলাসিনীদের নিয়ে এসে মজা লুটতে লাগলো। ১৮২৩ সালে রচিত 'নববাবুবিলাসে ও ১৮৩০ সালে রচিত 'নববিবি বিলাসে' তৎকালীন কলকাতার এই রুচি বিকার লক্ষ্য করেই ভবানীচরণ সাধারণকে সতর্ক করে বলেছেন :......

"ধর্ম রক্ষা করে সবে হইও না অসতী।
অসতী হইলে পাবে অশেষ দুর্গতি॥"

তখনকার কুরুচির আর একটি উদাহরণ এঁরই রচিত 'দূতীবিলাস' :

"সমরের শরের সহ সমান নয়ন।
ক্ষণ মাত্র নিরীক্ষণে জ্বলিতেছে মন॥
কুচ বটে কিন্তু কনকের কান্তি তায়।
এই হেতু কনক কলসী বলা যায়॥"—(দূতীবিলাস)

ঈশ্বর গুপ্তে নূতন যুগের প্রথম আভাস দেখা দিলেও তাঁর রচনায় অশ্লীলতা ও দুর্নীতির পূর্ব চিত্র দেখতে পাওয়া যায়। তাঁর রচনা সম্বন্ধে বঙ্কিমচন্দ্র বলেছেন :—তাঁহার রচনাবলী অতিমাত্রায় অলঙ্কৃত ও সৌকুমার্যহীন। চূড়ান্ত অশ্লীলতায়ও কবির অধিকাংশ রচনায় কলংকিত। নবযুগের আবির্ভাবকে প্রত্যক্ষ করেই ঈশ্বর গুপ্তের চাঞ্চল্য জেগেছিল। তারই ফলে তাঁর রচনায় দেখতে পাই :—

হায় দুনিয়া ওলট পালট,
আর কিসে ভাই রক্ষা হবে?
* * * *
আগে মেয়েগুলো, ছিল ভালো
ব্রতধর্ম কর্তো সবে।
একা 'বেথুন' এসে, শেষ করেছে
আর কি তাদের তেমন পাবে।
যত ছুঁড়ীগুলো তুড়ী মেরে
কেতাব হাতে নিচ্ছে সবে।
তখন 'এ, বি, শিখে বিবি সেজে
বিলাত-এ বোল কবেই কবে॥"

এরপর উনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধের কথা। এ যুগেই সর্বপ্রথম মাইকেল ও বঙ্কিমচন্দ্র সামাজিক ও সাহিত্যিক রুচির প্রথম উন্নত বোধ সৃষ্টি করলেন। রামনারায়ণ তর্করত্ন, প্যারি চাঁদ মিত্র, কালী প্রসন্ন সিংহ বা দীনবন্ধু মিত্রের মধ্যেও এ যুগের রুচি বিকারের যথেষ্ট প্রকাশ থাকলেও তা গত যুগের মত দৃষ্টিকটু ও স্থূল ছিল না। এমন কি মাইকেলের "একেই কি বলে সভ্যতা? ও 'বুড়ো শালিকের ঘাড়ে রোঁ'-তেও রুচিবিকারের চিহ্ন আছে। এই যুগকে মাইকেল লক্ষ্য করেই বলেছেন :—'বেহায়ারা আবার বলে কি যে, আমরা সাহেবের মত সভ্য হয়েছি!' হা আমার পোড়া কপাল, মদ-মাংস খেয়ে ঢলাঢলি কল্লেই কি সভ্য হয়? একেই কি বলে সভ্যতা?" মাইকেলের 'মেঘনাদ বধ' ইত্যাদি কাব্য ও বঙ্কিমচন্দ্রের'কপালকুণ্ডলা' এবং দীনবন্ধু মিত্রের মধ্যে নীলদর্পণ,' 'নবীন তপস্বিনী' বা সধবার একাদশীতে'—রুচিবিকার স্থূল হয়ে দেখা দিয়েছে। পুরানো যুগের স্থূলতা এ যুগে যাই যাই করেও যেন যাচ্ছে না।

নীল দর্পণের :—

আমিন!—কই শালা ফৌজদারী করলে নে? (কান মলন)

রাই! হাঁপাইতে হাঁপাইতে মলাম, মাগো! মাগো!

উড। ব্লাডি নিগার মারো বাঞ্চোৎকো।" কিংবা সধবার একাদশীতে :—

নিম। গোক্‌লো ব্যাটা ভারি মাগ-কপালে, কিন্তু ছুঁড়ী ভাতার কপালে নয় বাবা—এ রত্ন আমার হাতে পড়লে, রাইট প্লেস হতো। (মদ্যপান) চেনধারিণীর নাম কি জানিস?"

এ ধরণের পংক্তি বিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে রবীন্দ্রনাথ শরৎচন্দ্র বা প্রমথ চৌধুরীর মধ্যে পাওয়া যাবে না। এই ত্রয়ী ব্যক্তিত্বের রচনার ফলে যুগের রুচিবোধ পুরানো যুগের দৃষ্টিভঙ্গীতে গত রুচিকে স্থূল ও বিকারগ্রস্ত বলে মনে হবে। গত অর্ধ শতাব্দী ব্যাপী সাহিত্য সাধনার ফলে এমন অসাধ্য সাধন সম্ভব হয়েছে। স্থানীয় সাহিত্য রবীন্দ্রনাথের স্পর্শ পেয়ে... বিশ্বসাহিত্যে উন্নীত হয়েছে।

ফটো : অতীনকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

সংগ্রহ

ভারতবর্ষ প্রিন্টিং ওয়ার্কস্

রাসু, নিত্যানন্দ বৈরাগী, ভবানী বেনে, ভোলাময়রা, এন্টনী-ফিরিংগী ও যজ্ঞেশ্বরী ইত্যাদি কয়েকজন ছাড়া আর যে সমস্ত কবিওয়ালাদের দেখা সে সময় মিলেছিলো তাঁদের কাব্য প্রকাশের মধ্যে তৎকালীন রুচি-বিকৃতিরই সাক্ষ্য পাওয়া যায়। অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ ভাগে যখন এই সব কবিগান রচিত হয় তখন-ছিলো ভারতচন্দ্রের ঈশ্বরগুপ্তের সংক্রান্তি কাল। শহর কলকাতার তখন বিস্তৃতি ঘটেছে। ইংরেজ বেনিয়া ও তাদের মুৎসুদ্দিদের তখন প্রবল দাপট। বাংলার সাহিত্য সরস্বতী রাজদরবার ছেড়ে এই নূতন শ্রেণীর মনোরঞ্জনে ব্যস্ত। বলাই বাহুল্য এ রকম যুগে রুচিবিকৃতি ঘটতে বাধ্য। বাংলা দেশের রুচিবোধ তখন খুব উন্নত ছিলো না এ কথা অনায়াসেই বলা চলে। সেইজন্যেই তখন খিস্তি ও খেউড়ের যুগ। "এত সাহিত্যিক আবর্জনা ঐ যুগের মত আর কখনও বাংলা সাহিত্যে স্তূপীকৃত হইয়া উঠে নাই। সুখের বিষয় সে বিপুল পরিমাণ আবর্জনা জনশ্রুতি হইতে মুছিয়া গিয়াছে।"—বঙ্কিমচন্দ্রের তীক্ষ্ণ খড়্গ এ যুগের ওপর ঝলকে উঠেছে। এ যুগের একটি উদাহরণ দেওয়া যাক গোপাল উড়ের গান :—

"কলঙ্কেতে ভয় করো না বিধুমুখী।
কমলেরি বনে গেলে কাঁটা ফোঁটে পায়,
তা বলে কি ফাঁকে ফাঁকে পা বাড়ানো যায়
ডুবেছি না ডুবতে আছি,
পাতাল কত দূর দেখি।"

এ যুগকে পাশ কাটিয়ে আমরা শতাব্দীর প্রথমার্ধে ঢুকলাম। পাশ্চাত্য প্রভাব এ যুগে আরও কিছু বেড়েছে। সামাজিক সাংস্কৃতিক ও শিক্ষাগত সংস্কারের জন্য আন্দোলন জেগেছে! উইলেয়ম কেরী, রাজা রামমোহন রায়, দাশরথি রায়, ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, ঈশ্বর গুপ্ত, মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার ইত্যাদির যুগ। এ যুগে বাঙালীর সাহিত্য-রুচি কিছু পরিমাণ উন্নত হলেও মোটামুটিভাবে তাকে প্রথম শ্রেণীর বলা চলে না। এই যুগেরই প্রকৃষ্ট উদাহরণ হলো ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'নববাবুবিলাস,' নববিবিবিলাস, 'কলিকাতা কমলালয়'।

ইংরেজী চালচাল শিক্ষা-দীক্ষা তখন সবে আমদানী হতে সরু করেছে। ইয়ং বেঙ্গলের প্রথম যুগের কথা। ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর দৌলতে ভুঁইফোড় যে সব 'বাবু' ধনী সম্প্রদায় কলিকাতা মহানগরীর বুকে দেখা দিতে সুরু করেছে হঠাৎ বড় মানুষ বাবুদের এইসব ছেলে-পিলে নব্যবাবুরা আচার-ব্যবহারে ও চারিত্রিক উচ্ছৃঙ্খলতায় আপন পিতৃপুরুষদেরও ছাড়িয়ে গেলো। বিদ্যের দৌড় এদের গোটাকতক ইংরেজী অক্ষর লিখতে শেখা—আর শ'দুই বুলি কপচানো। সায়েব লোকের কাছে বাবুরা 'বেরিগুড', দট নানসেন্স,' 'গোটে হেল' ইত্যাদি কতগুলি বিদেশী বচন শিখলো ও নানা জাতীয় বিলাসিনীদের নিয়ে এসে মজা লুটতে লাগলো। ১৮২৩ সালে রচিত 'নববাবুবিলাসে ও ১৮৩০ সালে রচিত 'নববিবি বিলাসে' তৎকালীন কলকাতার এই রুচি বিকার লক্ষ্য করেই ভবানীচরণ সাধারণকে সতর্ক করে বলেছেন :......

"ধর্ম রক্ষা করে সবে হইও না অসতী।
অসতী হইলে পাবে অশেষ দুর্গতি ॥"

তখনকার কুরুচির আর একটি উদাহরণ এঁরই রচিত 'দূতীবিলাস' :

"সমরের শরের সহ সমান নয়ন।
ক্ষণ মাত্র নিরীক্ষণে জ্বলিতেছে মন ॥
কুচ বটে কিন্তু কনকের কান্তি তায়।
এই হেতু কনক কলসী বলা যায় ॥"—(দূতীবিলাস)

ঈশ্বর গুপ্তে নূতন যুগের প্রথম আভাস দেখা দিলেও তাঁর রচনায় অশ্লীলতা ও দুর্নীতির পূর্ব চিত্র দেখতে পাওয়া যায়। তাঁর রচনা সম্বন্ধে বঙ্কিমচন্দ্র বলেছেন :—তাঁহার রচনাবলী অতিমাত্রায় অলঙ্কৃত ও সৌকুমার্যহীন। চূড়ান্ত অশ্লীলতায়ও কবির অধিকাংশ রচনায় কলংকিত। নবযুগের আবির্ভাবকে প্রত্যক্ষ করেই ঈশ্বর গুপ্তের চাঞ্চল্য জেগেছিল। তারই ফলে তাঁর রচনায় দেখতে পাই :—

হায় দুনিয়া ওলট পালট,
আর কিসে ভাই রক্ষা হবে ?

*　　*　　*　　*

আগে মেয়েগুলো, ছিল ভালো
ব্রতধর্ম কর্তো সবে।
একা 'বেথুন' এসে, শেষ করেছে
আর কি তাদের তেমন পাবে।
যত ছুঁড়ীগুলো তুড়ী মেরে
কেতাব হাতে নিচ্ছে সবে।
তখন 'এ, বি, শিখে বিবি সেজে
বিলাত-এ বোল কবেই কবে ॥"

এরপর উনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধের কথা। এ যুগেই সর্বপ্রথম মাইকেল ও বঙ্কিমচন্দ্র সামাজিক ও সাহিত্যিক রুচির প্রথম উন্নত বোধ সৃষ্টি করলেন। রামনারায়ণ তর্করত্ন, প্যারি চাঁদ মিত্র, কালী প্রসন্ন সিংহ বা দীনবন্ধু মিত্রের মধ্যেও এ যুগের রুচি বিকারের যথেষ্ট প্রকাশ থাকলেও তা গত যুগের মত দৃষ্টিকটু ও স্থূল ছিল না। এমন কি মাইকেলের "একেই কি বলে সভ্যতা? ও 'বুড়ো শালিকের ঘাড়ে রো'-তেও রুচিবিকারের চিহ্ন আছে। এই যুগকে মাইকেল লক্ষ্য করেই বলেছেন :—'বেহায়ারা আবার বলে কি যে, আমরা সাহেবের মত সভ্য হয়েছি!' হা আমার পোড়া কপাল, মদ-মাংস খেয়ে ঢলাঢলি কল্লেই কি সভ্য হয়? একেই কি বলে সভ্যতা?" মাইকেলের 'মেঘনাদ বধ' ইত্যাদি কাব্য ও বঙ্কিমচন্দ্রের 'কপালকুণ্ডলা' এবং দীনবন্ধু মিত্রের মধ্যে নীলদর্পণ,' 'নবীন তপস্বিনী' বা সধবার একাদশীতে'—রুচিবিকার স্থূল হয়ে দেখা দিয়েছে। পুরানো যুগের স্থূলতা এ যুগে যাই যাই করেও যেন যাচ্ছে না।

নীল দর্পণের :—

আমিন!—কই শালা ফৌজদারী করলে নে? (কান মলন)

রাই! হাঁপাইতে হাঁপাইতে মলাম, মাগো! মাগো!

উড। ব্লাডি নিগার মারো বাঞ্চোৎকো।" কিংবা সধবার একাদশীতে :—

নিম। গোকুলো ব্যাটা ভারি মাগ-কপালে, কিন্তু ছুঁড়ী ভাতার কপালে নয় বাবা—এ রত্ন আমার হাতে পড়লে, রাইট প্লেস হতো। (মদ্যপান) চেনধারিণীর নাম কি জানিস?"

এ ধরণের পংক্তি বিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে রবীন্দ্রনাথ শরৎচন্দ্র বা প্রমথ চৌধুরীর মধ্যে পাওয়া যাবে না। এই ত্রয়ী ব্যক্তিত্বের রচনার ফলে যুগের রুচিবোধ পুরানো যুগের দৃষ্টিভঙ্গীতে গত রুচিকে স্থূল ও বিকারগ্রস্ত বলে মনে হবে। গত অর্ধ শতাব্দী ব্যাপী সাহিত্য সাধনার ফলে এমন অসাধ্য সাধন সম্ভব হয়েছে। স্থানীয় সাহিত্য রবীন্দ্রনাথের স্পর্শ পেয়ে... বিশ্বসাহিত্যে উন্নীত হয়েছে।

সংগ্রহ

ফটো : অতীনকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

ভারতবর্ষ প্রিন্টিং ওয়ার্কস্

ভারতবর্ষ প্রিন্টিং ওয়ার্কস্

নিভৃতে

ফটো : চুণীলাল দে

অভিজ্ঞের উপদেশ

উপাধ্যায়

জেনে রেখো—যে মানুষ ধৈর্য্য রক্ষা কর্তে পারে, সে মানুষ যা ইচ্ছা করে, তা-ই পেতে পারে। যেখানে ধৈর্য্যচ্যুতি ঘটে, সেখানে সকল আশাই ফুরিয়ে যায়। তোমরা কোন কাজ কর্তে বসে অধৈর্য্য হোলে, সে কাজে সফল হোতে পার্বে না। আগে দৃষ্টি দিয়ে চল্তে অভ্যস্ত হওয়া উচিত, নতুবা পশ্চাতে পড়ে থাক্তে হবে। নিছক আত্মসুখ ও স্বচ্ছন্দতায় উন্মত্ত হোলে, কোনদিন সুখী হোতে পারা যায় না। চরিত্রের প্রধান অন্তরায় স্বার্থপরতা। অনেকে বলেন যে, এক-আধজনের ভালো করে এমন কি বড় কাজ হোতে পারে। এ সম্পর্কে জনৈক অভিজ্ঞ ব্যক্তি বলেছেন যে, প্রত্যেক দিন যদি একজনেরও উপকার করতে পারা যায় তা হোলে দশ বৎসরে তিন হাজার ছয় শত পঞ্চাশ জনের উপকার করা হবে। আজকের দিনে একজনের উপকার করাও অনেকের কাছে শক্ত কথা হয়ে দাঁড়িয়েছে। তোমরা প্রত্যহ এক-জনের উপকার কর্বার যদি চেষ্টা করো,তা হোলে সমাজ-সংসার উন্নত হয়ে উঠ্বে, আর তোমরাও মানুষের কাছে শ্রদ্ধার আসন পাবে। তোমাদের দ্বারা বহু লোক উপকৃত হয়ে তোমাদের আশীর্ব্বাদ কর্বে, তাতে তোমাদের মঙ্গলই হবে।

আগে করণীয় কার্য্যের প্রত্যহ তালিকা তৈরী করে, সেই তালিকা মত কাজ কর্বার চেষ্টা কর্বে, তাহোলে দেখতে পাবে সমস্ত কার্য্যই সুচারুরূপে সম্পন্ন হবে, আর এই প্রাত্যহিক অভ্যাসের ফলে তোমরা অল্প সময়ের মধ্যেই বড় হোতে পার্বে। কর্ম্মে বিশৃঙ্খলা উন্নতির পরিপন্থী। যার কার্য্যে মৌলিকত্ব আছে, তার পক্ষে প্রতিষ্ঠা লাভ সহজ, জীবনে সে প্রচুর অর্থলাভও কর্তে পারে। স্যার টমাস লিপটন বলেছেন যে, ছেলেমেয়েদের মাথায় ঢুকিয়ে দিতে হবে কাজের তুল্য আর মজা নেই। তোমরা বোধহয় জানো, স্যার লিপটন নিজের অধ্যবসায়ের বলে উৎকৃষ্ট কর্ম্মী হয়ে পৃথিবীর অন্যতম শ্রেষ্ঠধনী হয়েছিলেন। কোন দুঃখ ধার করে টেনে এনো না, অলস জীবন যাপন করে। যে সব ছেলেমেয়ে পড়াশুনার অবহেলা করেই নিজের দুঃখ টেনে এনে ভবিষ্যৎ অন্ধকারাচ্ছন্ন … তোমাদের সর্ব্বদাই সতর্ক হওয়া উচিত। যে লোক নিজের অবস্থাকে অপেক্ষাকৃত উন্নত করবার জন্যে প্রকৃতই উৎকণ্ঠিত নয়, তার শোচনীয় পরিণতি ঘটে। সে চিরকালই পিছিয়ে পড়ে। তোমাদের ছাত্রজীবনেও চেষ্টা করতে হবে কিভাবে লেখাপড়ায় উন্নত হোয়ে উন্নততর হয়ে প্রশংসার সঙ্গে পরীক্ষোত্তীর্ণ হোতে পারো, কোনরকমে পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে গড্ডলিকা-প্রবাহে চল্লে, উন্নত জীবন গড়ে তুল্তে পার্বে না, ভবিষ্যতের পথে বহু কষ্ট পেতে হবে।

সময় আর জোয়ারের স্রোত কারো খাতির রাখে না। সময়ের কাজ সময়ে না কর্লে সময় চলে যাবে, জোয়ারের স্রোতও সেইরূপ। জোয়ারে তরণী ভাসাবার ইচ্ছা থাক্লে জোয়ারের অপেক্ষায় প্রস্তুত থাক্তে হবে, নতুবা জোয়ার উপেক্ষা করে চলে যাবে, তরণী আর ভাসিয়ে দেওয়া যাবে না। তোমরা যদি বাল্যজীবনে লেখাপড়ায় অবহেলা করো, দীর্ঘসূত্রী হয়ে ওঠো, আর শেষে পরীক্ষার কয়েকদিন আগে, মনপ্রাণ দিয়ে পড়াশুনা করে অভিভাবকদের চোখে ধূলো দেবার চেষ্টা করো, তাহোলে দেখবে একদিন তোমাদেরই চোখে জল ঝর্বে, অনুশোচনা আসবে, আর আত্মগ্লানিতে মন ভরে উঠবে। কিন্তু সময় আর থাকবে না পড়াশুনা করে মানুষের মত মানুষ হবার। বাল্যকালে যেদিনটা তোমরা অকারণে নষ্ট কর্বে, সেইদিনটার জন্যে পরবর্ত্তী জীবনে অনুতাপের সঙ্গে অনেক কথাই ভাবতে হবে—বল্তে হবে তখন—'কেন সময় নষ্ট করে নিজের সর্ব্বনাশ নিজে করেছি—' একা থাকায় অবকাশই অলসতা। এ অলসতা বর্জ্জন কর্বার জন্যে পাঁচজনের সঙ্গে মিলেমিশে কাজ কর্বে আর তাতে পাবে আনন্দ। তারাই সুখী যারা জগতকে কিছু দিয়ে যেতে পারে, কিছু উৎপাদন কর্তে পারে। যারা অপব্যয় করে, নষ্ট করে, আর

কোন কিছু উৎপাদন করে না বা সমাজ-সংসারকে কিছু দেয় না, তারা সমাজের বিরক্তিকারী ব্যক্তি—তারা সমাজ-বিধ্বংসী। যখন আমাদের গুণগুলি আলস্তে মর্চ্চে ধরে যায় তথনই প্রকাশ পায় অবসাদ বা ক্লান্তি। [illegible] ছেলেবেলা থেকেই স্যার আইজাক নিউটনের মত জগতকে কিছু [illegible] করবে, তাতে তোমাদের সদ্‌গুণগুলি অত্যুজ্জ্বল হয়ে উঠবে, [illegible]র সেগুলি মর্চ্চে পড়ে থাকবে না। ভালো ভালো বই যা [illegible] জীবনের যাত্রা পথে, জেনে রেখো, পরম পাথেয়। উত্তম [illegible] বিষয়বস্তুটী শুনেই ক্ষান্ত হয় না, সে সম্পর্কে সে আরও [illegible]

[illegible] চিত্রাঙ্কন আর সঙ্গীত যেমন পৃথিবীর অন্যান্য জাতির [illegible] আরবদের কাছে ভাষাই পরমপ্রিয়। উট বা তরো- [illegible] প্রতিশব্দ আরবেরা জানে, আ[illegible] তারা মনের ভাব [illegible] অভ্যস্ত, তাতে পায় খুব আনন্দ। ছেলেবেলা [illegible] সুন্দরভাবে শব্দ প্রয়োগ করে কথাবার্ত্তা বল্‌তে [illegible]র কথাবার্ত্তাও বেশ মিষ্ট হয়। মনোভাব ব্যক্ত [illegible] ভুল কথা বল্‌লে বেদুঈন মহিলারা তাঁদের ছেলেমেয়েদের [illegible]রে থাকেন। তোমরা কথাবার্ত্তায় আরবদের আদর্শ গ্রহণ [illegible]বে,—এক একটি শব্দের কতরকম প্রতিশব্দ আছে, তা অভিধান থেকে সংগ্রহ করে, আয়ত্ত করবে—আর ঠিক মত প্রয়োগ করবে, তোমাদের কথা-বার্ত্তায় যেন ব্যাকরণের ভুল না হয়, লেখার সময়েও এ বিষয়ে খেয়াল রাখবে। উৎকৃষ্ট কথাবার্ত্তা বা শব্দ প্রয়োগের দ্বারা মানুষের অন্তর জয় করা যায়। কর্কশভাষীরা সর্ব্বত্রই অনাদৃত হয়ে থাকে। প্রতারণাই অধঃপতনের মূল। কখন কাউকে প্রতারিত করলে, জেনে রেখো তোমরাও প্রতারিত হবে।

চার্চ্চিল বলেন সাহসই হচ্ছে মানুষের সর্ব্বোত্তম গুণ—কেননা এই গুণই পার্থিব সকল গুণের প্রতিভূস্বরূপ ও উন্নতিপ্রদ। সিড্‌নিস্মিথ এই কথারই প্রতিধ্বনি করে বলেছেন পৃথিবীতে বহু পরিমাণে প্রতিভা নষ্ট হয়ে যায় সামান্য একটু সাহসের অভাবে। প্রত্যেকটী দিন অজ্ঞাত অখ্যাত ব্যক্তিদের সমাধি রচনা করে—কেননা তাদের প্রথম প্রচেষ্টাতেই ভীরুতা এসে বাধা দিয়ে যায় তাদের কাজে। ছেলেবেলা থেকে তোমরা সাহসী হোলে আর ভীরুতা বর্জ্জন করলে নিজেদের প্রতিভার সম্যক স্ফুরণ হবে, এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। অজ্ঞাত-অখ্যাত ব্যক্তির মত তোমরা যেন বিড়ম্বনা ভোগ করো না।

একদা বার্ণার্ড বারুচের কাছে ভিয়েনার রুজভেল্ট তাঁর একটি সমস্যা সমাধানের প্রসঙ্গ উপস্থিত করে বলেছিলেন—'আমার মন বলছে এটা করি, কিন্তু আমার অন্তর বলছে এটা করো না—' বারুচ তাঁকে উপদেশ দিলেন—'এরকম সন্দেহ হোলে অন্তরকে অনুসরণ করবে, মন যা বলে, তা শুনবে না—' তোমরাও অন্তরকে অনুসরণ করবে কেননা মন অনেক সময়ে বিশ্বাসঘাতকতা করে। মনকে বশীভূত করবে, মনের বশীভূত হোলে বহু বিপদের সম্মুখীন হোতে হবে, এ বিষয়ে এখন থেকে সতর্ক হবার চেষ্টা করবে। কেননা মন স্বভাবতঃ চঞ্চল। এই মনকে আয়ত্তা-ধীনে আনতে বহু অভ্যাস,—বহুকালের অভ্যাস আবশ্যক। যে স্বভাবে কাম, লোভ, ঈর্ষ্যা, স্বার্থপরতা ও কলহপ্রিয়তা প্রবল, তাতে স্থিরতা ও শান্তি অসম্ভব। তোমরা বাহিরে বজ্রের মত হবে, কিন্তু ভেতরটা যেন ফুলের চেয়েও কোমল ও নির্ম্মল হয়। ক্ষণভঙ্গুর জীবন কেবল কর্ম্মের দ্বারাই অমরত্বলাভ করে। নিশ্চিত বিষয়কে শুধু আশার প্রলোভনে পরিত্যাগ করতে নেই, তা হোলে ঠকতে হবে।

যদি তোমরা সাধনায় সিদ্ধিলাভ করতে ইচ্ছুক হও, তা হোলে সুযোগের অপেক্ষা করে মোটেই বসে থাকবে না, সুযোগ করে নেবে—আর এই রকমেই সুযোগ ও সিদ্ধি করায়ত্ত হয়।

আশা করি তোমরা এই সব উপদেশ গ্রহণ করে নিজেদের সুন্দর ভাবী জীবন গড়ে তুলবে—তোমাদের উন্নত চরিত্র ও মহান্ আদর্শ ব্যতীত জাতির ভবিষ্যৎ কোনদিন উজ্জ্বল হবে না। জাতীয়তার গর্ব্ব ও মূল্য তোমাদের ওপর নির্ভর করছে; বুদ্ধি, চেষ্টা, পরিশ্রম, অধ্যবসায় ও সহিষ্ণুতার বলে তোমরা মাতৃভূমিকে গৌরবান্বিত করে তুলবে, এই আশাতেই এত কথা তোমাদের কাছে বলা গেল।

শ্রাবণের ধারা

শঙ্কর গঙ্গোপাধ্যায়

ঝরঝর ঝরে জল অবিরাম ছন্দে
মনের ময়ূর তাই নাচিছে আনন্দে!

থৈ থৈ পথঘাট, নদী করে টলমল
শ্যামলিমা বনানী নেয়ে উঠে ঝলমল।

পথে ভেজে খোকাখুকু নাহি মানে বন্ধন
দেখে তারা হেসে খুন আকাশের ক্রন্দন!

কদমের তল আজ ভরে গেছে রেণুতে
মল্লার সুর বাজে রাখালের বেণুতে।

চমকায় বিজলী ঘনঘোর নীলিমায়
মেঘ মাদলের ডাক গুরুগুরু শোনা যায়।

নেচে ওঠে মন-প্রাণ চঞ্চল লগনে
মন তাই উড়ে যায় শ্রাবণের গগনে।

সৌমিত্রের অভিযান

শ্রীপরেশকুমার দত্ত

না, সেদিনও ব্যর্থ হল সৌমিত্র! ব্যর্থ হল সেই রহস্যময় প্রকাণ্ড সিন্দুকটার ডালা খুলতে।

থমথমে নিশুতি রাত। প্রাসাদের কোথাও কেউ জেগে ছিলনা। দুয়ারের পর দুয়ার খুলে সন্তর্পণে এগিয়ে গিয়েছিল রাজকুমার সৌমিত্র। হাতে জ্বলন্ত প্রদীপ। শেষে থমকে দাঁড়াল এক সুড়ঙ্গের মধ্যে। এগিয়ে চলল নিঃশব্দে। সুড়ঙ্গের সর্বশেষ প্রান্তে সেটি একটি পাষাণ কক্ষ। একদিকে কালো পাথরের দেয়ালের সঙ্গে গাঁথা রয়েছে বিশাল লৌহময় সিন্দুক। প্রদীপ নামিয়ে সৌমিত্র হাতল ঘুরিয়ে উন্মুক্ত করবার চেষ্টা করলে সিন্দুকের বিরাট ভারী ডালাটা! কিন্তু বহুক্ষণ ধরে বার বার চেষ্টা করেও বিফল হল। রক্তিম হয়ে উঠল তার কাঁচা সোনার-বর্ণ মুখ। দর্দর্ ধারায় ঘাম ঝরতে লাগল সর্বাঙ্গে। কিন্তু সামান্য মাত্রও কাঁপল না প্রকাণ্ড ডালাটা।

রাজকুমার অবনত মুখে আবার তুলে নিলে প্রদীপ। বেরিয়ে এলো সুড়ঙ্গের বাইরে। প্রাসাদের অলিন্দে বসল একটা সুউচ্চ বিশাল শিলা স্তম্ভের গায়ে হেলান দিয়ে।

জ্যোৎস্না নেমেছে পাহাড়ে প্রান্তরে। সৌমিত্রের মনে পড়ল তার মা চন্দ্রাবতীর কথা। মাত্র দু'বছর আগে তাঁর কাছে প্রথম শুনেছিল এক আশ্চর্য কথা। শুনেছিল ইন্দ্রনগরের বিশ্ববিখ্যাত রাজা পৃথ্বীমিত্র তারই পিতা।

রাজকুমার একদিন তার মাকে জিজ্ঞাসা করেছিল, তার পিতা কেন দূরে থাকেন। শুনে ম্লান হেসে ছিলেন চন্দ্রাবতী। তিনি জানতেন রাজার মনের ইচ্ছা—সাধারণের সঙ্গে মানুষ হয়ে তাদের দুঃখ কষ্ট যেন বুঝতে শেখে সৌমিত্র। চোখের জল মুছে সৌমিত্রের মাথায় হাত বুলিয়ে দিয়ে হেসে বলেছিলেন, তিনি যে রাজা বাবা, কত কাজ তাঁর। প্রজাদের পালন করতে হয় তাঁকে। তারাও যে তাঁর সন্তানের মতো।

মায়ের হাতটা কোলে তুলে নিয়ে সৌমিত্র বলেছিল তবে আমি কেন রাজধানীতে তাঁর কাছে যাই না, মা?

চন্দ্রাবতী বলেছিলেন, যাবে বৈকি বাবা। বড় হলে, তোমার শরীরের যথেষ্ট শক্তি হলে নিশ্চয় যাবে সেখানে। সে সময় এখনো হয়নি। সৌমিত্র আগ্রহের সঙ্গে বলেছিল, আচ্ছা মা, কতদিনে আমি তেমন শক্তিমান হব? উত্তরে চন্দ্রাবতী তাকে সুড়ঙ্গের ঐ সিন্দুকের কাছে নিয়ে গিয়ে বলেছিলেন, যখন তুমি এই সিন্দুকটা খুলতে পারবে, তখন বুঝবে রাজধানীতে তোমার পিতার কাছে যাবার উপযুক্ত হয়েছ তুমি। দেখ দেখি এটা তুমি খুলতে পার কিনা।

সৌমিত্র জানত দেহে তার অসীম শক্তি। সিন্দুকের মস্ত হাতলটা প্রবল শক্তিতে ঘোরাতে চেষ্টা করলে সে। হাত কেটে রক্ত ঝরতে লাগল, তবু সিন্দুকের হাতলটা সামান্য মাত্রও ঘোরাতে পারলো না। সৌমিত্রের মনে হল একটা দৈত্য এলেও বোধহয় সেটা খুলতে পারবে না। চন্দ্রাবতী বিষণ্ণ হাসি মুখে দাঁড়িয়ে দেখলেন সৌমিত্রের প্রাণান্তকর প্রচেষ্টা। তার ব্যর্থতায় যেন তাঁর নিজের বুকটাও ভেঙে গেল। তিনি বললেন, রাজার কাছে যাবার আগে আরো বেশী শক্তি তোমায় অর্জন করতে হবে সৌমিত্র। এই আশ্চর্য সিন্দুকটা খুলে যখন তুমি আমাকে দেখাতে পারবে এর মধ্যে কি আছে, তখন বুঝব ইন্দ্রনগরে তোমার বাবার কাছে যাবার উপযুক্ত হয়েছ তুমি।

সেদিনের সেই ঘটনার পর সৌমিত্র একা প্রায়ই সেই গোপন সুড়ঙ্গের মধ্যে প্রবেশ করে বিশাল সিন্দুকটা খোলবার চেষ্টা করেছে। বছরের পর বছর চলে গেছে সিন্দুক খোলবার চেষ্টায়, বারবার রক্তিম হয়ে উঠেছে তার সর্বাঙ্গ। কিন্তু সিন্দুকের হাতলটা এতটুকুও ঘোরাতে পারেনি। ইতিমধ্যে সুড়ঙ্গের গা বেয়ে জল চুইয়ে ক্রমশঃ মরচে পড়ে গেল সমস্ত সিন্দুকটি। বিবর্ণ হয়ে গেল তার রঙ। ফাটল ধরল সুড়ঙ্গের পাথরের প্রাচীরে।

কিন্তু একদিকে সিন্দুকটি খোলা যেমন দুঃসাধ্য হয়ে উঠল, অপরদিকে দিন দিন আরও বীর্যবান যুবকে পরিণত হল সৌমিত্র। তার মনে বিশ্বাস বেড়ে উঠতে লাগল, শীঘ্রই একদিন প্রকাণ্ড সিন্দুকের ডালাটা সে খুলতে পারবে।

তাই অনেকবারের মতো সে রাত্রে ব্যর্থ হয়ে ও থামতে পারলে না সৌমিত্র। একপক্ষকাল পরে আবার প্রাসাদের সকলে ঘুমিয়ে পড়তেই নিঃশব্দে নেমে গেল সেই সুড়ঙ্গে। আবার সমস্ত শক্তি, সমস্ত তেজ, সমস্ত প্রতিজ্ঞা একত্র করে খোলবার চেষ্টা করলে সেই রহস্যময় সিন্দুক। প্রদীপের ম্লান আলোয় স্ফীত হয়ে উঠল তার দেহের সমস্ত পেশী।

হঠাৎ রাজপুত্রের হৃৎপিণ্ড কাঁপিয়ে কি একটা অস্বাভাবিক আওয়াজ হল। সেই শব্দ প্রতিধ্বনিত হল পাতালের সেই গোপন কক্ষে। আশায় আনন্দে উদ্বেল হয়ে উঠল সৌমিত্রের বুক। প্রদীপ তুলে নিয়ে তখনই ছুটে গেল মায়ের কাছে। চন্দ্রাবতী কৌতূহলী হয়ে ঘুম-চোখে ছেলের সঙ্গে নেমে গেলেন সুড়ঙ্গে।

কিন্তু সে রাত্রে সক্ষম না হলেও, সত্যিই সিন্দুক খুলতে আর বেশী দেরী ছিল না। ঠিক আর একপক্ষকাল পরে শেষ রাত্রে মায়ের সঙ্গে সুড়ঙ্গে গিয়ে সিন্দুক খোলবার চেষ্টা করলে সৌমিত্র। মনে তার দুর্জয় প্রতিজ্ঞা। রাজার ছেলে সে—রাজার কাছে গিয়ে দাঁড়াতে হবে তাকে; সুতরাং যত কঠিনই হোকনা কেন সিন্দুক তাকে খুলতেই হবে। নইলে ব্যর্থ জীবন শেষ হয়ে যাওয়াই ভালো। মায়ের ব্যগ্র ব্যাকুল দৃষ্টির সম্মুখে সেই প্রকাণ্ড সিন্দুকটা খোলবার প্রাণান্তকর প্রচেষ্টা করলে সৌমিত্র। স্বেদ বিন্দুতে সিক্ত হয়ে উঠল তার সর্বাঙ্গ। সমস্ত দেহের রক্ত ছুটে এলো সুগৌর মুখমণ্ডলে, আর শেষ পর্যন্ত একটা প্রচণ্ড শব্দে খুলে গেল সিন্দুকের ডালাটা। চন্দ্রাবতীর অশ্রুসিক্ত চোখে হাসি ফুটে উঠল। প্রবল আগ্রহে আর দুরন্ত উত্তেজনায় সৌমিত্র ঝুঁকে পড়ল উন্মুক্ত সিন্দুকের মধ্যে। চন্দ্রাবতী এগিয়ে গিয়ে সিন্দুক থেকে তুলে নিলেন স্বর্ণখচিত একবাঁকা তরবারি, আর হীরার লকেট ঝোলানো এক মহামূল্যের মুক্তার মালা।

সেই মুক্তার মালাটা চন্দ্রাবতী পরিয়ে দিলেন সৌমিত্রের কণ্ঠে। প্রদীপের ক্ষাণ আলোকে ও তার লকেটের হীরা ধাঁধিয়ে দিলে দুজনার চোখ। তারপর চন্দ্রাবতী ছেলের হাতে দিলেন সেই বাঁকা তরবারি।

সৌমিত্রের সঙ্গে প্রাসাদের অলিন্দে এসে দাঁড়ালেন চন্দ্রাবতী। রাজপুত্রের মাথায় হাত রেখে বললেন, শোনো সৌমিত্র, এই তরবারি আর কণ্ঠহার তোমার পিতার! রাজা হয়ে এখান থেকে চলে যাবার আগে তিনি বলে গিয়েছিলেন, ওই সিন্দুক খোলবার আগে তুমি যেন তাঁর সঙ্গে দেখা না কর। এখন সে কাজে সক্ষম হয়েছ তুমি। মনে রেখ অসীম ক্ষমতা এই তরবারির। এর দ্বারা তুমি যে কোনো শত্রুকে জয় করতে পারবে। এবার সত্যিই তুমি তোমার পিতার কাছে যাবার উপযুক্ত হয়েছ। উষার স্বর্ণরশ্মি অভিষিক্ত করল রাজপুত্রকে, আর প্রভাত পাখীরা কলকণ্ঠে তারই বন্দনা করলে।

উৎসাহে আনন্দে উত্তেজনায় চঞ্চল হয়ে উঠল সৌমিত্র। বললে, আর এক মুহূর্তও আমি দেরী করতে পারছি না মা। আজই আমি ইন্দ্রনগরে যাত্রা করব। পদ্মাবতী বাধা দিলেন না।

এগিয়ে এলো বিদায় মুহূর্ত। মাতামহ বিশ্বাচার্যের কাছে বিভিন্ন বিষয়ে উপদেশ গ্রহণ করে উষালগ্নে কণ্ঠে সেই মুক্তার হার দুলিয়ে, আর কটিবন্ধে সেই স্বর্ণখচিত তরবারি-ঝুলিয়ে ভূমিতে নত হয়ে মাতা ও মাতামহকে প্রণাম করলে সৌমিত্র। তাঁরা দুজনে তাকে চোখের জলে আশীর্বাদ করে বিদায় দিলেন।

বিশ্বাচার্য সৌমিত্রকে উপদেশ দিয়েছিলেন, সে যেন অরণ্যের বিপদসঙ্কুল পথে না গিয়ে নদীপথে ঘুরে যায়। কিন্তু রাজার ছেলে সে—ভয় কাকে বলে জানে না। যেখানে ভয়, যেখানে বিপদ, সেখানেই তো সত্যিকারের আনন্দ।

গভীর অরণ্যের দুর্গম পথ। ক্রমে অরণ্য আরও নিবিড়, আরও ভয়ঙ্কর হয়ে উঠল। সেই অরণ্যের উপান্তের জনশূন্য জনপদে এক ভয়াল সর্পরাজকে সে দ্বিখণ্ডিত করল সেই অমিতশক্তি তরবারির দ্বারা। সেই সাপের ভয়ে যারা গ্রাম-ছেড়ে পালিয়ে ছিল তারা আবার ফিরে এসে অভিনন্দন জানাল রাজকুমারকে।

সেখানেই শেষ নয়। পথে এক ভয়ঙ্কর দৈত্যকেও বধ করলে সৌমিত্র। আর রাজপ্রাসাদে পৌঁছবার আগেই তার বীরত্বের কথা ছড়িয়ে পড়ল দেশের দিকে দিকে—লোকের কানে কানে। আর সে-ই যে রাজা পুষ্পামিত্রের পুত্র—একথা জেনে তাদের আনন্দের আর সীমা রইল না। সৌমিত্র আরও দ্রুত এগিয়ে চললে ইন্দ্রনগরের দিকে। পিতার দর্শন লাভ করবে এই আশায় আনন্দে

অধীর হয়ে উঠল। কল্পনা করলে কি আনন্দের সঙ্গেই না তার পিতা তাকে বুকে টেনে নেবেন!

হতভাগ্য সৌমিত্র! জীবনের জটিল পথের কোনো অভিজ্ঞতাই ছিল না তার। জানত না তার জন্যে তখন কি নিদারুণ বিপদই অপেক্ষা করছে, যার তুলনায় তার পথের বিপদ কিছুই নয়।

(আগামীবারে সমাপ্য)

তোমরা কি জানো ?

সিদ্ধার্থ গংগোপাধ্যায়

গ্রামের চেয়ে শহরে বরফ বেশী তাড়াতাড়ি গলে কেন—

সূর্যের রশ্মি থেকে যে উত্তাপ জন্মায়, প্রত্যেক বস্তু তা পৃথকভাবে গ্রহণ করে। পরিষ্কার বরফ সেই উত্তাপ পুরোপুরি গ্রহণ করে না, ফিরিয়ে দেবার চেষ্টা করে, কিন্তু ধুলো-ময়লা-লাগা বরফ সেটাকে আরো তাড়াতাড়ি নিজের শরীরের মধ্যে নিয়ে নেয়। এটা নিশ্চয়ই বুঝতে পারছ যে গ্রামের চাইতে শহরেই বরফ শীগগির ময়লা হয়, আর সেই জন্যই শহরে সেটা তাড়াতাড়ি গলে যায়।

বিজ্ঞান বলে এর কারণ হচ্ছে, যে-জিনিস যতো কালো হবে, নিজের শরীরে বাইরের উত্তাপ টেনে নেবার শক্তি তার হবে ততো বেশী। তোমরা একটা সহজ পরীক্ষা দিয়ে এটা প্রমাণ করতে পারো। দুটো সমান মাপের বরফের টুকরো নাও। তার মধ্যে একটাকে কালো কাপড় দিয়ে জড়িয়ে রাখ, আর একটাকে জড়িয়ে রাখ সাদা কাপড় দিয়ে। কিছুক্ষণের মধ্যেই দেখতে পাবে কালো কাপড়ের নীচের বরফের টুকরোটা সাদা কাপড়ের নীচে-রাখা বরফের টুকরোটার চেয়ে বেশী গলেছে। কালো কাপড় সূর্যের রশ্মিজাত তাপ নিজের শরীরে বেশী করে টেনে নিয়েছে, আর সংগে সংগে তার নীচে-রাখা বরফের টুকরোটাকে বেশী গরম করেছে, সাদা কাপড়টা যা পারেনি। তাই কালো কাপড় দিয়ে জড়ানো বরফের টুকরো বেশী গলে গেছে। তবে মনে রেখো, এ পরীক্ষাটা বেশী রোদের দিনে ছাড়া হবে না।

জীবজন্তুরা কি জামা কাপড় বদলায়—

অধিকাংশ জন্তুরই গায়ের লোম শীতকালে আরো ঘন আর মোটা হয়ে ওঠে শীতের হাত থেকে রক্ষা পাবার জন্যে। কখনও কখনও লোমের রং-ও বদলায়, যাতে ঠাণ্ডা থেকে তারা নিজেদের আরো সহজে লুকিয়ে রাখতে পারে।

খরগোসের গায়ে শীতকালে ছাই রঙের পুরু লোম গজায়, আর পাহাড়ী খরগোসের গায়ে গজায় বরফের সংগে মানানসই তুলোর মতো সাদা আর নরম লোম। হিমালয় অঞ্চলে শেয়ালেরাও গায়ে একপ্রস্থ সাদা লোমের জামা চড়িয়ে নেয়, শত্রুর হাত থেকে রক্ষা পাবার জন্যে, সহজেই শিকার ধরবার জন্যে। তাদের গায়ের সাদা লোম বরফের সঙ্গে এমন মিলিয়ে থাকে যে শত্রুদের চোখে তারা সহজে ধরা পড়ে না, আর এতে শিকার ধরবারও খুব সুবিধে হয়।

কোন শব্দ কি চিরকাল একভাবে বেজে যেতে পারে—

কোন শব্দ চিরদিন একভাবে শব্দ হয়ে বেজে যেতে পারে না। যে-সমস্ত ঢেউগুলো ঐ শব্দদের বয়ে নিয়ে বেড়াচ্ছে, তারা এক সময় দুর্বল থেকে দুর্বলতর হয়ে পড়ে, আমাদের কান আর তখন সেগুলোকে ধরে রাখতে পারে না। বৈজ্ঞানিকেরা এমন কোন যন্ত্র বার করতে পারেন নি, যার দ্বারা আমরা চিরকালের জন্যে কোন শব্দকে ধরে রাখতে পারি (অর্থাৎ চিরদিন ধরে সেটা বাজতে থাকবে, কখনো থামবে না)।

শব্দ থেমে গেলে কিন্তু শব্দের ঢেউয়েরা তাদের শক্তি একেবারে হারিয়ে ফেলে না। আমাদের যদি শব্দ মাপবার কোন সূক্ষ্ম যন্ত্র থাকত, তাহ'লে দেখতে পেতাম যে আসল শব্দটা বন্ধ হয়ে যাবার অনেক পর পর্যন্তও শব্দের ঢেউয়েরা বাতাসের অণু-পরমাণুর সংগে ভেসে বেড়াচ্ছে। যদিও শব্দটা কিছুক্ষণের শব্দ হয়ে বন্ধ হয়ে গেছে, তবুও সেই শব্দের ঢেউয়ের শক্তি একরকম চিরদিন ধরেই বেঁচে থাকবে।

জীবজন্তুরা কতদিন বাঁচে—

মানুষ কতদিন বাঁচে, তা আমরা সঠিক বলতে পারি তার কারণ হচ্ছে মানুষ যেদিন জন্মায়, সেদিন জন্মের খাতায় (birth register) তার জন্মাবার সন-তারিখ লেখা হয়, আর তার মৃত্যুর তারিখ লিখে রাখা হয় মৃত্যুর খাতায় তার মৃত্যুর দিন। কিন্তু জীবজন্তু কতদিন বাঁচে, তা আমরা সঠিক বলতে পারি না; তাদের বেলায় জন্ম-মৃত্যুর তারিখ লিখে রাখার কোন বাঁধা-ধরা নিয়ম নেই, আর তা সম্ভবও নয়। তবে যাঁরা জীবজন্তু পোষেন, আর তাদের জন্ম-মৃত্যুর তারিখ খাতায় টুকে রাখেন, তাদের কাছ থেকে তাদের বয়স সম্বন্ধে কিছুটা জানা যায়।

পশুদের মধ্যে যে সবচেয়ে বেশীদিন বাঁচে, তাকে যদি পুরস্কার দেওয়া হয়, তাহ'লে সে-পুরস্কার পাবে কচ্ছপ। কচ্ছপ সাধারণতঃ তিনশো থেকে চারশো বছর বাঁচে। কুমীরেরাও বাঁচে প্রায় তিনশো বছর।

হাতীর বড় হতে অনেক দেরী লাগে, আর সে মরেও অন্য অনেক পশুদের চেয়ে দেরীতে। ভালভাবে থাকলে সে বাঁচতে পারে একশো বছর। ঈগলও বাঁচে একশো বছর. কিন্তু কেউ কেউ তাদের আয়ু দুশোর কোটায় ফেলেছেন। তিমি মাছের জীবনকাল সম্বন্ধে সঠিক কোন খবর পাওয়া যায় না, তবে আগেকার দিনে লোকে বিশ্বাস করত: তিমি মাছ পাঁচশো বছর বাঁচে; কিন্তু এখন অনেকে বলেন একশো বছরের বেশী তাদের আয়ু নয়।

কুকুর সাধারণত বাঁচে পনের বছর। কুকুরের জীবনের এক বছর আমাদের জীবনের সাত বছরের সমান। সুতরাং একটা পনের বছরের কুকুর একজন একশো পাঁচ বছরের মানুষের সমান বুড়ো।

জন্তুরা গড়পড়তা কত বছর বাঁচে

খরগোস	৫	গরু	২৫	হাতী	১০০
ভেড়া	১২	শুয়োর	২৫	তিমি	১০০
বিড়াল	১৩	ঘোড়া	৩০	কুমীর	৩০০
কুকুর	১৫	উট	৪০	কচ্ছপ	৩৫০
ছাগল	১৪	সিংহ	৪০		

পাখীরা গড়পড়তা কত বছর বাঁচে

মুরগী	১৪	হাঁস	৫০
পায়রা	২০	তোতাপাখি	৬০
ক্যানারি	২৪	কাক	১০০
সারস	২৪	রাজহাঁস	১০০
ময়ূর	২৪	ঈগল	১০০

* এ-সমস্ত হিসাব "বুক অফ নলেজ" থেকে নেওয়া হয়েছে।

খেঁকশিয়ালীর বিয়ে

পরিতোষ মুখোপাধ্যায়

ইলশেগুঁড়ি বিষ্টি পড়ে
টাকডুমাড়ুম ডুম,
ফিকফিকিয়ে হাসছে খুকু
ভাঙলো দিনের ঘুম।
ঘুম ভেঙেছে খেঁকশিয়ালীর,
গাছের পাতায় চিক;
শেয়াল মেয়ের আজকে বিয়ে
আনন্দে ছায় দিক।

ইলশেগুঁড়ি বিষ্টি পড়ে
রোদ উঠেছে ঢের,
তালশাঁসের ভোজটা দেখো
যাচাই হবে ফের।
খেঁকশিয়ালীর আজকে বিয়ে
টাকডুমাড়ুম ডুম,
বাঁশের বনে এলো কি আজ
খুশির মরশুম॥

সত্যিকারের বন্ধু

আভারাণী দেবী

জায়গাটির নাম মহুয়াবন। ছোটনাগপুরের মধ্যে ছোট্ট সাঁওতালি গ্রাম। বেশিরভাগই কুঁড়ে ঘর, কিন্তু ওরই মধ্যে লালটালি ছাওয়া বেশ বড় একটি বাংলো আছে। ঐ বাংলোর নাম রেখেছে সাঁওতালরা "বাবুবাংলা"। ঐ "বাবুবাংলা"য় এসেছে রঞ্জন। মস্তবড় লোকের ছেলে। কলকাতায় তাদের দুইতিনখানা বাড়ী, তিনচারটে গাড়ী, এতসব জিনিষের মধ্যে একটি মাত্র ছেলে রঞ্জন। সে লেখাপড়া করে খুব মন দিয়ে কিন্তু বড় রোগা। খালি তার অসুখ করে। এবার খুব অসুখ করেছিল তাই ডাক্তার বলেছেন চেঞ্জে নিয়ে আসতে। তাই ও এখানে এসেছে। ঐ বাবুবাংলাটা ওদেরই। বেশীরভাগ সময়ে বন্ধ থাকে।

ওর ভারী ভাল লাগছে এখানে এসে। সামনে ক—ত বড় খোলা সবুজ মাঠ। কেমন ছোট ছোট পাহাড় থেকে ছোট ছোট ঝরণা নেমে এসেছে পাহাড়ের গা বেয়ে ঝির ঝির কোরে। চারিদিকে শালের বন। কি সুন্দর মিষ্টি একটা গন্ধ সব সময়ে বাতাসে ছড়িয়ে আছে যেন সর্বদা। বোধহয় মহুয়ার গন্ধ। অনেক মহুয়া গাছ আছে এখানে।

কিন্তু ওর মনে বড় কষ্ট। ওর বাবার ভয়ে ও ইচ্ছে মত খেলতে পারে না। নিজের খুসী মত একলা একলা বেড়াতে পারে না ঐ সব সুন্দর জায়গায়। সব সময়ে ওর সঙ্গে থাকে রামদীন দারওয়ান। একটু দূরে যেতে দেয়না, ছুটে বেড়াতে দেয়না। সন্ধ্যে হতে না হতেই বলে, "খোঁখাবাবু ঘর চলো, নেহিতো ফিন জোথাম হো যাইবে।" আবার ফিরতে হয় ওর সঙ্গে। সঙ্গী নেই সাথী নেই। দুদিনেই হাঁপিয়ে ওঠে ও। ঐসব ছোটলোক সাঁওতালদের ছেলেদের সঙ্গে খেলা করা ওর বাবার বারণ। তবু কলকাতায় স্কুলে গিয়েও কিছু সঙ্গী পেতো ও।

ওদের বাড়ীর পাশেই সাঁওতাল সর্দারের ঘর। ও জানলা দিয়ে একমনে সেদিকে তাকিয়ে থাকে। ওরই

বয়সী একটি ছেলে। খুব কালো কিন্তু কী সুন্দর স্বাস্থ্য, কত আরও ঐ রকম ছেলের সঙ্গে দল বেঁধে মনের আনন্দে খেলছে। কাদা মাখছে, ধূলো মাখছে, কিন্তু কেউ ওদের বকছেনা। আবার তীর ধনুক নিয়ে একটা গাছে সবাই মিলে নিশানা কোরে তীর ছুঁড়ছে। আনন্দেই আছে ওরা। এবার ওর বাবা মোষ দুয়ে এনে সেই কাঁচা ফেনা-ওঠা গরম গরম দুধ গেলাস ভর্ত্তি কোরে ছেলেকে খাইয়ে দিলে। কি দুষ্টু ছেলে! দুধ খেতে খেতেও লাফাচ্ছে। ওর বাবা ওর একটা হাত শক্ত কোরে ধরে দুধ খাইয়ে দিচ্ছে। সেও তো কাপে কোরে দুধ খায়, তবে সে কেন এত রোগা? একটা কষ্টের নিঃশ্বাস পড়ে তার। ওর মা কখন যে ওর পেছনে এসে দাঁড়িয়েছিলেন, ও তা জানে না, যা বলেন, "তুই ওদের মত কোরে খেলবি রাজু?" রাজুর চোখে জল এসে যায়, সে তাড়াতাড়ি মায়ের বুকে মুখ লুকোয়। মা ওর কষ্ট বুঝতে পারেন। ওর মাথায় আস্তে হাত বুলোন।

কয়েকদিন পরে ওর বাবা কিছু দিনের জন্যে কলকাতা গেলেন। এই সুযোগে ঐ সর্দ্দারের ছেলে মংলুর সঙ্গে ওর ভারী ভাব হয়ে গ্যাল। সেও ওর সঙ্গে ভাব করার জন্য খুবই ব্যস্ত ছিল, কিন্তু সাহস কোরে বাংলোর মধ্যে ঢুকতে পারতো না। ভয় পেতো ওর বাবাকে। এবার মনের আনন্দে ওদের খেলা চললো। প্রথম প্রথম বাড়ীর মধ্যে, তারপর বাড়ীর বাইরেও। কদিনের মধ্যেই রঞ্জনের শরীরও বেশ সেরে উঠলো। ওর মা ওকে বারণ করেন না ওদের সঙ্গে খেলতে, বরং তিনি ভালইবাসেন মংলুদের। তীর ধনুক ছোঁড়ে ওরা ঐ পাহাড়ে উঠে। তারপর ঝরণার ধারে বোসে মংলুর বাঁশি শোনে। রঞ্জন ওর কাছে বাঁশি শিখবে বলেছে—তাই মংলু সেদিন বাঁশি তৈরী করছিল তার রাজা-বাবুর জন্যে। সে রঞ্জনকে ঐ বলেই ডাকে। লোহার শিক গরম করতে হবে বাঁশির ফুটো বানাতে তাই ভেতরে গিয়ে রঞ্জনের মার রান্নাঘরের সামনে সে দাঁড়িয়েছে। অমনি এসে পড়লেন রঞ্জনের বাবা। একেবারে খবর না দিয়েই এসেছেন তিনি। বাইরে যারা দাঁড়িয়েছিল তারা তো তাঁকে দূর থেকে দেখেই পালিয়ে গ্যাছে, রঞ্জন ছুটে এসে মংলুকে বলতে না বলতেই তিনি ভেতরে এসে ওকে দেখে ফেললেন, আর খুব রেগে মারতে গেলেন ওকে। রঞ্জন ওর হাত ধরে তাড়াতাড়ি খিড়কির দরজা দিয়ে বার কোরে দিলো। পরে সে বাবার কাছে মার খেলো—ঐ ছোট-লোকদের ছেলের সঙ্গে খেলার জন্যে। ওর মাও বকুনি খেলেন ওকে বারণ না করার জন্যে।

রাজু আবার বন্দী হল। কান্না পায় ওর। মনে মনে ভাবে সে যদি বড়লোকের ছেলে না হয়ে মংলুর ভাই হোতো। ওঃ তবে কি মজাই না হোতো। সারাদিন ও মংলুর সঙ্গে বনে বনে পাহাড়ে পাহাড়ে ঘুরে বেড়াতো মজা কোরে। খিদে পেলে বনের ফল খেতো, আর তেষ্টা পেলে খেতো ঝরণার জল। কি মজাই না হোত তাহলে!

তিন-চার দিন হয়ে গ্যাল—মংলু তার রাজাবাবুর সঙ্গে খেলতে পায়নি। ভারী মন খারাপ তার। এমন কি বাঁশিটাও তাকে দিতে পারেনি। এবার সে মনে মনে একটা ফন্দি আঁটে।

সেদিন রাত্রে বাঁশির আওয়াজে হঠাৎ ঘুম ভেঙ্গে যায় রাজুর। ও যে মংলুর বাঁশির সুর বেজেই চলেছে তুতুর-তুয়া তুতুরতুয়া শব্দে। আস্তে আস্তে বিছানা থেকে উঠে জানলায় এসে দাঁড়ায় ও।

ওদিকে গাছে বোসে বাঁশি বাজাতে বাজাতে মংলু দেখে একসার লোক লাঠি-সোঁটা হাতে নিঃশব্দে গুঁড়ি মেরে মেরে এগিয়ে চলেছে রাজুর বাড়ীর দিকে। জানালায় রাজুকে দেখে ছুট্টে গিয়ে বাঁশিটা রাজুর হাতে দিয়ে বলে, শিগ্‌গির তোমার বাবাকে ডেকে দাও তোমাদের বাড়ী ডাকাত পড়েছে। শুনেই তো ভয়ে রাজু ঠক্ ঠক্ কোরে কাঁপতে থাকে। ওদিকে মংলু ছুটে গিয়ে তার বাবাকে রাজুদের বাড়ীর বিপদের কথা জানায়। সমস্ত সাঁওতাল পল্লী নিঃশব্দে সর্দ্দারের নির্দ্দেশে জেগে উঠে রাজুদের বাড়ী ঘেরাও কোরে ফেলে।

প্রবল চিৎকার চেঁচামেচিতে ঘুম ভাঙ্গে রাজুর বাবার। যমদূতের মত মশাল হাতে ডাকাতদের দেখে ভয়ে তাঁর প্রাণ উড়ে যায়। তবু কোন রকমে চিৎকার করেন, "বন্দুক! হামারা বন্দুক লাও!" আর লাও। কে আনবে বন্দুক? রামদীন ভয়ে রান্নাঘরে ঢুকে খিল দিয়েছে। অন্য চাকররা ভয়ে চিৎকার করছে। রাজুর মা ছেলেকে বুকে জড়িয়ে কাঁপছেন, রাজুর বাবারও সেই অবস্থা। শুনতে পাচ্ছেন বাইরে কারা যেন দৌড়ে এলো—তারপরই ধুপ ধুপ খট্‌খট্

শব্দ মনে হচ্ছে এক সঙ্গে অনেকগুলো লাঠি চলছে। এমন সময়ে আঁ-আঁ কোরে একটা বিকট আওয়াজ—আবার বাবারে মারে শব্দ, ভেবে অবাক হল রাজুর বাবা কারা লড়াই করছে কার সঙ্গে? ডাকাতরা কি নিজেদের মধ্যেই লড়াই করছে? এমন সময় মংলুর গলা পায় রাজু, "বাবা এদিকে এসো কেনে, এই শালা আমারে ধরেছে বটে।" রাজু বলে—বাবা এ যে মংলু তার বাবাকে ডেকে এনেছে। অবাক হলেন তিনি। তাঁর শহুরে মন অবাক হয় এই ব্যাপারে। ঐ মংলু তার ছেলের বন্ধু, তাই তার বাবা তাঁর বাড়ীর ডাকাত তাড়াতে এসেছে। এমন সময় দুড়দার কোরে কারা যেন পালিয়ে গ্যাল। দুরে মশালের আলো মিলিয়ে গ্যাল ওঁরা দেখলেন দরজার ফাঁক দিয়ে। এবার সব চুপ—শুধু একটা গোঙানির শব্দ আসছে। আস্তে আস্তে সাহস ফিরে আসে রাজুর বাবার। এমন সময়ে দরজায় দুম দুম ধাক্কা। আবার কেঁপে ওঠেন ওঁরা—তবে শোনেন কেউ বলছে "বেরো কেনে বন্দুকবাবু? ডাকাত ভাগিয়ে গেছে। এবার বন্দুক দাগ কেনে" আর হা হা কোরে হাসছে। দরজা খুলে দেখেন একরাশ সাঁওতাল। সামনেই রক্ত মেখে দাঁড়িয়ে আছে তাদের সর্দ্দার, পাশে মংলু। ওরাও অক্ষত নয়। দালানের একদিকে রক্তে ভেসে যাচ্ছে। সেখানে একটা লোক উপুড় হয়ে পড়ে গোঙাচ্ছে। তখনো কাঁধের ক্ষত দিয়ে রক্ত গড়াচ্ছে সর্দ্দারের। রাজুর বাবা বলেন, তোমরা আমার অনেক উপকার করেছ সর্দ্দার, আমার একমাত্র ছেলের প্রাণ বাঁচিয়েছ। তোমাদের এই রক্তের ঋণ আমি কি দিয়ে শোধ করব বল? বল কি বকশিষ দেব তোমাদের?

আবার হা হা কোরে হেসে সর্দ্দার বলে, "বকশিষ দিবি? তবে দিগে কেনে ঐ তোর টাকার চাকর নেমক-হারামকে। আমরা বকশিষ মাঙতে আসি নাই বটে। আমার ছেইলেটা তোর ছেইলার বন্ধু বটে, তুই বকশিষের বদলি ওদের মিলতে দে কেনে। বাবু মোরা ছোটলোক বটে, কিন্তু ছোট কাম করেনা বটেক। মোরা বন্ধুর জন্যে মিতার জন্যে পরাণ দিবেক বটে।" অতবড় কঠিন মানুষ রাজুর বাবা, তাঁরও এই সরল প্রাণ সর্দ্দারের কথা শুনে চোখে জল আসে। বুঝতে পারেন ওরা এই বনে থাকে—তাই ওদের মন বনের মতই সবুজ, পরিষ্কার উদার আকাশের নীচে থাকে—তাই ওদের মন আকাশের মতই বিরাট। সেখানে কোন স্বার্থপরতা নীচতা নেই। গরীব হতে পারে কিন্তু ছোটলোক নয়। তিনি বলেন, "হ্যাঁ সর্দ্দার—তোমার কথাই ঠিক। কই তোমার ছেলে? ওই রাজুর সত্যি-কারের বন্ধু।" তারপর রাজুকে ডেকে মংলুর সঙ্গে তার হাত মিলিয়ে দেন। নিজেও সর্দ্দারের হাত ধরে বলেন, "আজ থেকে আমরাও বন্ধু।" ঐ টাঙ্গি খাওয়া ডাকাতটাকে কাঁধে কোরে সর্দ্দার হাসতে হাসতে বলে, "এই দেখ কেনে এটা ডাকাত, আমি একে মেরেছি, কিন্তুক ঘরে গিয়ে এটার সেবা করব, না মরা পর্য্যন্ত।" খুব খুসী হয়েছে সে রাজুর বাবার কথায়। পরদিন থেকে দুটো বাঁশি এক সঙ্গে তুতুরতুয়া তুতুরতুয়া কোরে বাজতে থাকে।

এই জন্য কখনই কাউকে ঘেন্না করতে নেই। কখন কার দ্বারা কি উপকার পাওয়া যাবে কিছুই বলা যায় না।

নবযুগ যাত্রী

বৈভব

সূর্য্য ওঠে ঐ আকাশে,
তূর্য বাজে ঐ বাতাসে!
সুপ্তির হ'ল অবসান!
বাজে ঐ ভৈরব জাগরণ গান!
আর নয়—নয় ঘুম
ঐ শোন রণ ধুম—
উন্মাদ উল্লাস!

মরণ-সাগর লাগি
জীবন নদীর এই কল উচ্ছ্বাস!
শান্তির ছবি ছায়া
রচে মনে মধু মায়া
হায়, বাস্তব ঝঞ্ঝায় সকলি উড়ায়
মৃত্যুর ছায়া ভাসে
আকাশে বাতাসে!
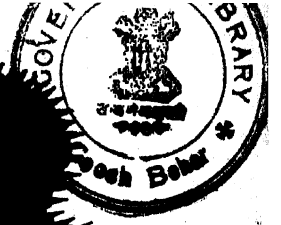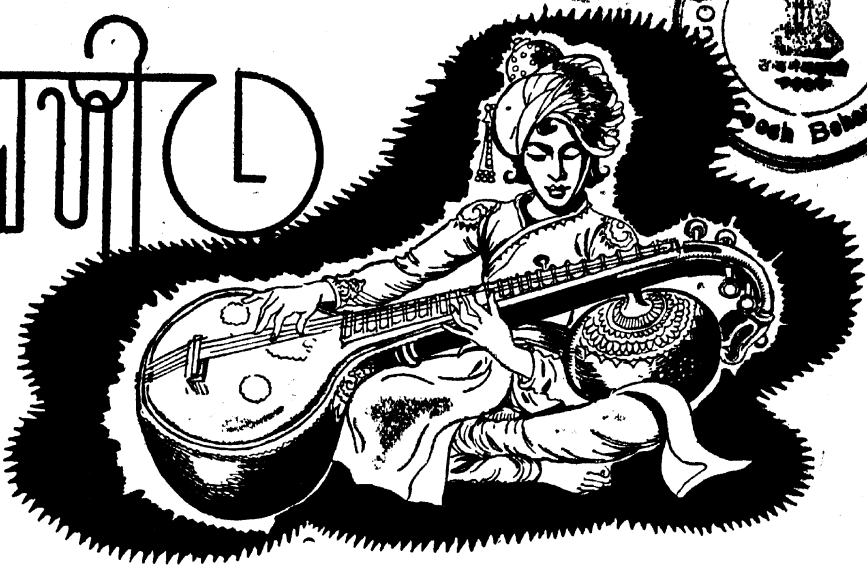
গান

মিশ্র আশাবরী

(ত্রিতাল—মধ্যলয়)

বাঁশী কেন বাজে না গো শ্যাম।
যমুনার জলে নাহি শুনি রাধানাম।
তমালের কুঞ্জে
পিয়াসী ভ্রমর নাহি গুঞ্জে,
গোঠে নাহি শত সখা—নাহি বলরাম।

কেলিকদম্ব-মূলে নাই কেহ নাই,
গাগরী ভরণে আর নাহি চলে রাই।
নৃত্যের ছন্দে,
গোপিনী তোমায় নাহি বন্দে,
শূন্য বৃন্দাবন আনন্দধাম।

কথা ঃ শ্রীরণজিৎ ভট্টাচার্য

সুর ও স্বরলিপি ঃ শ্রীঅমরচন্দ্র সরকার

II { ণ রমজ্ঞা রা সা | রা মা পা দা | পা । । । | (মপমা জ্ঞমজ্ঞা রজ্ঞরা সরাসা) }
• বাঁশী• কে ন বা জে না গো শ্যা ০ ০ ০ ০০০ ০০০ ০০০ ০ ০ ম্
০ ৩ + ২

পা র্জ্ঞা র্রা জ্ঞা | র্সা র্রা না র্সা | । জ্ঞা মা মা | পদা ণর্সা রর্জ্ঞা র্রর্সা |
য মু না র জ লে না হি • শুনি রা ধা না• •• • ০ • •
০ ৩ + ২

ণদা পমা জ্ঞরা সা ၊ | রা মা পা দা | পা ၊ ၊ ၊ | ၊ ၊ ၊ ၊ II
০০ ০০ ০০ ম ০ বা জে না গো শ্যা ০ ০ ০ ০ ০ ০ ম্
০ ৩ +

অন্তরা

II মা পা দাণা ণা | র্সা র্সা র্সা র্সা | দা ၊ ণা র্সা | ၊ ၊ ၊ ၊ |
ত মা লে র কু ন্ জে ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০

র্সা র্সা র্রা র্রা | জ্ঞা র্মার্পা র্রা র্সা | পা ণা পণা র্সর্রা | ণর্সা দা ၊ পা |
পি য়া সী ভ্র ম র না হি গু ০ ০০ ০০ ০ন জে ০ ০

၊ ၊ ၊ ၊ | পা জ্ঞা রা জ্ঞা | র্সা র্রা ণা র্সা | ၊ মা মা পা পা |
০ ০ ০ ০ গো ঠে না হি শ ত স খা ০ না হি ব ল

পদা ণসা র্রজ্ঞা র্রসা | ণদা পমা জ্ঞরা সা | II
রা০ ০০ ০০ ০০ ০০ ০০ ০০ ম্ বাজে নাগো শ্যাম

সঞ্চারী

II জ্ঞা ၊ জ্ঞা জ্ঞা | রা মজ্ঞা রা সা | গা রা গা পা | মা ၊ ၊ ၊ |
কে ০ লি ক দ ম্ব০ মূ লে না ই কে হ না ০ ০ ই

গা মা পা পা | র্সাণধা পধা মা গা | ধ্৷ ণ্৷ সা জ্ঞা | রা ၊ ၊ ၊ | II
গা গ রী ভ র০ গে০ আ র না হি চ লে রা ০ ০ ই

আভোগ

II মা পা দা ণা | র্সা র্সা র্সা র্সা | দা ၊ ၊ ၊ | র্সা ၊ ၊ ၊ |
নৃ ০ ত্যে র ছ ০ ন দে ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০

র্সা র্সা র্রা র্রা | জ্ঞা র্মা র্রা র্সা | পা ণা পণা র্সর্রা | ণর্সা দা পা ၊ |
গো পি নী তো মা য় না হি ব ০ ০০ নৃ০ দে০ ০ ০ ০

পা জ্ঞা র্রা জ্ঞা | র্সা র্রা ণা র্সা | মা মা পা পা | পদা ণর্সা রজ্ঞা র্রসা |
শূ ০ ন্য বৃ ন্দা ০ ব ন আ ০ ন ন্দ ধা০ ০০ ০০ ০০

ণদা পমা জ্ঞরা সা | II
০০ ০০ ০০ ম

(পূর্বানুবৃত্তি)

—ছাব্বিশ—

বনশ্রী যখন নিচে নেমে এল, সত্যজিৎ তখন দেওয়ালের হরিণের শিংটার দিকে তাকিয়ে ছিল অন্যমনস্ক দৃষ্টিতে। কোথায় একটা মিল আছে মুখার্জি ভিলার সঙ্গে। একটা জীর্ণতা আছে যাকে ঠিক চোখে দেখা যায় না, একটা মৃত্যুর গন্ধ আছে যাকে ঘ্রাণের মধ্যে পাওয়া যায় না—স্নায়ুর ভিতর অনুভব করা যায়; কেবল কিছুক্ষণ চুপচাপ এই ঘরটার মধ্যে বসে থাকলে রাশি রাশি অবসাদ এসে শরীরকে অবশ করে—চণ্ডুর বিষাক্ত নেশার মতো সমস্ত চেতনা নিষ্ক্রিয়তার গভীর থেকে গভীরে তলিয়ে যেতে চায়।

এই ঘরে এসে এম্‌নি ভাবে নিজের মধ্যে ডুবে থাকেন জে-কে রায়—সত্যজিৎ ভাবছিল। শিবশঙ্করের আর এক দিক। হিতেন দেশে আর ফিরল না। রীতেন দি গ্রেটার—

এমন সময় বনশ্রী এল।

—পথ ভুলে নাকি?—বনশ্রীর জিজ্ঞাসা।

সত্যজিৎ হাসল: তোমাদের এখানে আসব বলেই বেরিয়েছি এ-কথাটা বলতে পারলে তুমি খুশি হতে। কিন্তু মিথ্যে বলব না। ঘুরতে ঘুরতে এসে পড়েছি। তোমার যদি হাতে কাজ থাকে বিরক্ত করব না।

উল্‌টো দিকের সোফাটায় বসে পড়ল বনশ্রী। হাসল একটুখানি।

—হাসলে যে?

—আগেকার দিনগুলো মনে পড়ছিল। য়ুনিভার্সিটির সেণ্ট্রাল লাইব্রেরিতে দরকারি বই নিয়ে বসেছি নোট করতে, তুমি এসে তাড়া দিয়ে উঠিয়ে নিয়ে গেছ সিনেমায়। হেভী ল্যামারের ছবি দেখতে তুমি ভালোবাসতে, আর ওই রাঙা মাকাল মেয়েটাকে দেখলে আমার গা জ্বালা করত। সেদিন আমার কাজে কী ক্ষতি হবে না হবে তা তুমি ভাবোনি। একবার থামল বনশ্রী: কিন্তু তোমাকে কেবল দোষ দেব কেন? হয়তো তোমার বাড়ীতে গিয়ে আমিও এই কথাই বলতাম। সামনের গেটে অযত্নে জংলা হয়ে ওঠা হেনার ঝাড়টার দিকে চোখ মেলে বনশ্রী শেষ করল: আমরা বোধ হয় বুড়ো হয়ে যাচ্ছি।

—শরীরের দিক থেকে বুড়ো হতে হয়তো কিছু দেরী আছে শ্রী। অনেক, অনেকদিন পরে নামটা যেন হঠাৎ মনে এল সত্যজিতের: আসলে আমরা ক্লান্ত হয়ে গেছি। তাই কারো ওপরে আর জোর খাটাতে চাই না, কেউ খাটালেও ভালো লাগে না!

—ক্লান্ত?

—হাঁ, ক্লান্ত। আমরা—আমাদের দলের এই মানুষেরা—সবাই ক্লান্ত হয়ে উঠেছি। আমার কী মনে হয়, জানো? জীবনে কোথাও একটা অন্ধ আবেগ চাই—একটা বিশ্বাস চাই। সেই বিশ্বাস যদি অনেকটাই প্রিমিটিভ হয়, তাতেও ক্ষতি নেই। কিন্তু যা হোক তোমাকে আঁকড়ে ধরতেই হবে। হয় অ্যানার্কিস্টের মতো সব কিছু ভাঙবার আনন্দে মেতে ওঠো, নইলে যে কোনো একটা প্রত্যয়কে চেপে ধরো বজ্রমুঠিতে। আমাদের মতো যাদের বিশ্বাস করবার শক্তি গেছে হারিয়ে—অথচ অবিশ্বাস করবার মতো জোরটাও কোথাও নেই—আমরাই কোথাও

দাঁড়াবার জায়গা পাচ্ছি না! এ-যুগে ট্র্যাজেডীর ভূমিকায় তাই আমাদের নেমে পড়তে হয়েছে।

বনশ্রী কথা বলল না। বড় বড় চোখ মেলে চেয়ে রইল কেবল।

—ত্থাখো, রোমাণ্টিক্ হতে গেলে আমাদের হাসি পায় —অথচ রিয়্যালিটিকেই কি মানতে পারি সবটা? মার্কস্-বাদকে অনেকেই মানি—অথচ নিজের সমস্ত সত্য দিয়ে তাকে কি যাচাই করে নিতে পারি? বিশুদ্ধ বুদ্ধির দোহাই দিই—কিন্তু একটা আঘাত, একটা দুঃখকেই কি সেই বুদ্ধির তরীতে চেপে পার হয়ে যেতে পারি? মনের জটিলতায় জটিল কবিতা লিখি—ভাঙাচুরো ইম্প্রেশ্যনগুলো কর্মের অরণ্যে হারিয়ে যায়, আমাদের উপন্যাসের শেষ কথা এসে মুখ থুবড়ে পড়ে নৈরাজ্যের ধূসরতায়। জানো শ্রী! মনের ভেতর নিঃশব্দে বহুকাল ধরে একটা দাহন-ক্রিয়া চলছে আমাদের। পুড়ে আমরা পাক হয়ে গেছি। এলিয়টের মতো আমি বলব না—shape without form, আমাদের আকার-প্রকার সবই আছে—কিন্তু তা যেন ইলেক্ট্রীকের আগুনে জ্বলে যাওয়া, এখন কেবল কালের একটা ঝোড়ো নিঃশ্বাস লাগলেই আমরা দিকে দিকে উড়ে যাব।

অদৃশ্য জীর্ণতা, অলক্ষ্য মৃত্যুর-ছোঁয়া-লাগা এই ঘরটায়, ধুলো-জমা হরিণের শিঙে আর ছবির কাঁচে, স্প্রীং নষ্ট হয়ে যাওয়া পুরোণো সোফায় আর বনশ্রীর বিহ্বল চোখের তারায় যেন সত্যজিতের কথাগুলো কাঁপতে লাগল; যেন শব্দের পর শব্দ সাজিয়ে সে একটা তরল অভ্রের পর্দা বানিয়ে দিয়েছে—চারদিকে দুলে দুলে উঠছে তার ছায়া।

নিজের কথার ঝোঁক থেমে গেলে সত্যজিৎ অপ্রতিভ হয়ে রুমাল বের করল পকেট থেকে, মুছে ফেলল কপালটা। বনশ্রী নড়ে-চড়ে সোজা হয়ে বসল।

—তুমি পেসিমিস্ট্ হয়ে যাচ্ছ?

—একে কি পেসিমিজ্‌ম্ বলে? আমি ইতিহাসের সত্যটাই বলছি শুধু।

—তার মানে, আমাদের আর কিছু ভবিষ্যৎ নেই?

—আছে, যদি কোনো একটা সত্যকে আঁকড়ে ধরতে পারি। একেবারে প্রিমিটিভ মন নিয়ে।

—বুদ্ধির দরজা বন্ধ করে দিতে হবে?

—কিছুদিন রাখলে ভালোই হয়।

বনশ্রী হাসল: তুমি সভ্যতার কাঁটাটাকে কোন্ দিকে ঘোরাতে চাইছ সত্যজিৎ? সামনে না পেছনের দিকে?

সত্যজিৎ দাঁত দিয়ে নিচের ঠোঁটটাকে কামড়ে ধরল। চুপ করে রইল কয়েক সেকেণ্ড। তারপর বের করে আনল সিগারের কেসটা। একটা সিগার বের করতে করতে বললে, সে অর্থে বলছি না। ইতিহাসের বে-নিয়মে আমরা এই বুদ্ধির নৈরাজ্যে এসে পৌঁচেছি তার হাত থেকে মুক্তি পাবার কথাটাই ভাবছিলাম। সে মুক্তির পথও আমাদের অজানা নয়। কিন্তু এমন সংশয় আর এমন ক্লান্তির মধ্যে এসে আমরা পৌঁছে গেছি, যে কোনো জিনিসকেই ধরে রাখবার মতো জোর খুঁজে পাই না। কেবল তিল তিল করে জ্বলে যাচ্ছি নিজেদের ভেতর।

—তুমি তো চিরদিন নতুন মানুষ আর নতুন পৃথিবীর কথা বলেছ সত্যজিৎ! আজ এমন করে হাল ছেড়ে দিয়েছ কেন?

—নতুন মানুষ আসছে শ্রী, নতুন ইতিহাসও আসবে। তারা আমাদের জন্যে অপেক্ষা করবে না—যারা পথ জুড়ে দাঁড়িয়ে আছি—অথচ এগোতেও পারছি না পিছোতেও পারছিনা—আমাদের ঠেলে সরিয়ে তারা এগিয়ে যাবে।

বনশ্রী আবার মৃদু রেখায় হাসল।

—তা হলে তোমার আর দুঃখ কিসের? ইতিহাসের চাকা তো থামবে না।

—না, থামবে না। শুধু নিজেদের নিরুপায় যন্ত্রণার কথাই ভাবছি। ভাবছি, এই বুদ্ধির চোরাগলি আর ক্লান্তির হাত থেকে নিজেদের যদি কিছুক্ষণের জন্যেও মুক্ত করে আনতে পারতাম—যদি একটা প্রিমিটিভ বিশ্বাসের জোর নিয়ে বলতে পারতাম: আমরাও নতুন দিগন্তের দিকে চলেছি, আমরাও আর থামব না!

কিছুক্ষণ চুপচাপ। যেন মনের ভেতর জমাট হয়ে থাকা অনেকখানি ভার এক সঙ্গে নামিয়ে দিয়ে শ্রান্তিতে আচ্ছন্ন হয়ে রইল সত্যজিৎ—আলোচনার জের টানতে বনশ্রীও আর উৎসাহ পেলোনা। সত্যজিৎ থিয়োরী নিয়ে যা খুশি আলোচনা করুক, কিন্তু বনশ্রীও জানে—সে ক্লান্ত। এমন কি, মিনতির মৃত্যুর খবরটা একটু আগে তাকে যতখানি পীড়ন করছিল, এখন আর তা ততখানি আঘাত করছে না।

এই হয়—এম্‌নিই চলে আসছে। বায়ুগুলো এমন অবস্থায় এসে পৌচেছে যেখানে কোনো তীব্র স্পন্দন আর জেগে ওঠে না—না দুঃখের, না আনন্দের, না বাসনার।

: আমরা ছাইয়ের পুতুল, কেবল কালের নিঃশ্বাসে উড়ে যাওয়ার জন্যে প্রতীক্ষা করছি।

সত্যজিৎ এর মধ্যে চুরুটটা ধরিয়ে নিয়েছিল। কিছুক্ষণ নিঃশব্দে ধোঁয়া ছড়িয়ে বললে—জানো, রীতেন আর প্রীতি বিয়ে করতে যাচ্ছে।

বনশ্রী চমকে উঠল।

—সন্দেহ হয়েছিল। কিন্তু এত তাড়াতাড়ি?

—হাঁ, ওরা আর দেরি করতে চায় না।

—কিন্তু প্রীতি শেষ পর্যন্ত রীতেনকে—আশ্চর্য!

সত্যজিৎ হাসল: শেক্‌সপীয়ার মনে আছে আশা করি। "I would my father look'd but with my eyes"—

—ঠাট্টা নয়। রীতেন তো এই। ওরা দাঁড়াবে কোথায়?

—রীতেন প্রতিজ্ঞা করেছে ভালো ছেলে হবে। খুব সিরিয়াস্‌লি চাকরি-বাকরি জুটিয়ে নেবে এবং সেই প্রতিজ্ঞার প্রথম সর্ত হিসেবে হি ইজ গোয়িং টু স্যাক্রিফাইস্‌ হিজ জুয়েল্‌ অফ রিয়ার্ডস্‌।

হাসতে গিয়েও হাসতে পারল না বনশ্রী। বিষণ্ণ হয়ে উঠল মুখ।

—প্রীতি ভুল করছে, ভয়ানক ভুল করছে।

—ওটা অভিভাবকের চোখ নিয়ে দেখা শ্রী। ওদের মনটাকে ওতে চেনা যাবে না।

—তোমার বাবা?

—দ্যাট্‌স্‌ এ লিট্‌ল প্রব্লেম। হয়তো শকটা ফেটাল হয়ে দেখা দিতে পারে।

বনশ্রী বিবর্ণ হয়ে গেল।

—তোমার বাধা দেওয়া উচিত।

সত্যজিৎ স্নিগ্ধভাবে হাসল: এ-ও ইতিহাসের স্রোত বনশ্রী—একে ঠেকানো যায় না!—চুরুটের খানিকটা ছাই ঝেড়ে বললে, তুমিও আর দেরী করছ কেন? গেট্‌ সেট্‌ল্‌ড।

বনশ্রী উঠে দাঁড়ালো: তোমার জন্যে চা আনাই।

—চা একটু পরে হলেও চলবে। কিন্তু কথাটা এড়িয়ে যেয়োনা। বিয়ে করো এবার।

—পাত্র?

—হুকুম করো। হাজির আছি।

বনশ্রী আবার বসে পড়ল অকৃত্রিম বিস্ময়ে।

—সেকি! পূরবী কোথায় গেল?

—আমাকে সইতে পারল না। চাকরি নিয়ে চলে গেছে কলকাতার বাইরে।

—আই অ্যাম্‌ সরি—রিয়্যালি সরি।

মনের কাঁটাটাকে ভোলবার চেষ্টায় সত্যজিৎ আরো সহজভাবে হাসতে চাইল। বললে, কিন্তু রবীন্দ্রনাথ আমাকে সান্ত্বনা দিয়েছেন। বলেছেন, তুমিও এসো, তুমিও এসো, তুমিও এসো—এবং তুমি। তাই তোমার কাছে আমার দাবি নিয়ে এলাম।

বনশ্রীর চোখের পাতা ভারি হয়ে এল, কাঁপতে লাগল ঠোঁটের কোণা।

—কিন্তু আমাকে নিয়ে কী করবে তুমি? তুমি ক্লান্ত, আমিও ক্লান্ত। দু'জনের ক্লান্তির ভারে দু'দিন পরেই আমরা এ ওর কাছে অসহ্য হয়ে উঠব। তা ছাড়া আমার একজন নীরব প্রার্থী আছে। মনের ভার তাকে তুলে দিলেও সে হাসি মুখে তা বইতে পারবে। তার দাবিটাও—

বনশ্রীর চোখ দিয়ে জল গড়িয়ে গেল। আশ্চর্য, এখনো এত সেন্টিমেণ্টাল। জীবনে এত পোড় খেয়েও আজো সে শক্ত হতে পারল না!

কিন্তু সত্যজিতের দৃষ্টি জ্বলে উঠল এবার। মনের কাঁটায় ফুটে উঠল রক্ত।

—কে সে? আমি কি তাকে চিনি?

জলভরা চোখ নিয়ে বনশ্রী তাকালো। তার সমস্ত চেহারাটাই কেমন ঝাপসা হয়ে গেছে।

—চেনো তুমি। হীরেন।

—হীরেন!—একবার প্রতিধ্বনি করল সত্যজিৎ—কয়েক মুহূর্ত শক্ত হয়ে রইল চেয়ারের সঙ্গে। তারপর সশব্দ উজ্জ্বল হাসিতে ঘরটাকে ভরিয়ে তুলে বললে, অভিনন্দন জানাচ্ছি।

ক্রমশঃ

মানবতার সাগর-সঙ্গমে, সুইডেনে আর সোবিয়েতে

শচীন সেনগুপ্ত

সুইডেনের সাংবাদিক পল্লী-অঞ্চল দেখাবার যে প্রস্তাব করেছিলেন, তার সুযোগ আমরা নিতে পারিনি। কেননা আমরা সত্যি সত্যিই কিছু দেশ-ভ্রমণে বেড়াইনি, কংগ্রেসে আলোচনা করতেই ষ্টকহোলমে গিয়েছিলাম। কংগ্রেসের সাধারণ অধিবেশনের চেয়ে কমিশনগুলিই পারস্পরিক আলোচনার দ্বারা সিদ্ধান্তে পৌঁছুবার সহায়ক। শহরতলী দেখে মালমেন হোটেলে ফিরে এসে দেখলাম—লবীতে এখানে-সেখানে বিভিন্ন দল কমিশনের আলোচ্য বিষয়গুলি কি কি হওয়া উচিত, তাই নিয়ে আলোচনা করছেন। আমাদের সম্পাদক পরমেশ্বরম্ জানালেন—তাড়াতাড়ি সান্ধ্য-ভোজ, সাপার, শেষ করে আমরা যেন ক্রিষ্টেলবুর্গে ফিরে গিয়ে ভারতীয় দৃষ্টি-কোণ থেকে কমিশনের আলোচনাগুলি ঠিক করে ফেলি।

রাত দশটার পর ক্রিষ্টেলবুর্গ হোটেলের লাউঞ্জে, লবীতে, অপেক্ষাকৃত বড়-বড় ঘরগুলিতে, ভারতীয় ডেলিগেশনের নানা কমিশনের আলোচনা-বৈঠক শুরু হোলো। রাত একটার সময় আমাদের কালচুরাল কমিশন মোটামুটি আলোচ্য বিষয়গুলি স্থির করে একটি কমিটি গঠন করে দিয়ে ভারতীয় বক্তব্য লিখিতভাবে উপস্থিত করবার দায়িত্ব সেই কমিটির উপর অর্পণ করলেন। এই কমিটির সদস্যদের মাঝে ছিলেন ডক্টর মুলুকরাজ আনন্দ, ইংরেজী উপন্যাস রচয়িতা ডক্টর ভবানী ভট্টাচার্য্য, তাঁর স্ত্রী লেখিকা সলিলা ভট্টাচার্য্য, গোপাল হালদার, গুজরাতের এস-পি-দেশাই, শ্রীমতী শান্তিলতা বেন শুক্লা, শ্রীমতী পার্ব্বতী অম্মল, শ্রীমতী জয়আম্মা অনন্তাচারী। মস্কৌতেই অধ্যাপিকা রাণী রায়চৌধুরীকে কমিশনের সম্পাদক এবং আমাকে পরিচালনার দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল।

এই কমিটি আমাকে একটি খসড়া করবার ভার দিলেন। নিজের ঘরে বসে সারারাত ধরে আমি একটি খসড়া তৈরি করে রাখলাম। পরের দিন ব্রেকফাষ্টে যাবার আগে আমার ঘরেই কমিটির বৈঠক বসল। সকলের মতানুযায়ী খসড়াটির স্থান বিশেষ পরিবর্ত্তিত, পরিবর্দ্ধিত এবং পরিমার্জ্জিত করা হোলো।

আমাদের কমিশন যে-পদ্ধতিতে কাজ করল, ভারতীয় ডেলিগেশনের সকল কমিশনই ওই একই পদ্ধতি অবলম্বন করে এক-একটি খসড়া তৈরি করলেন। তারপর সমগ্র ডেলিগেশনের একটি বৈঠকে প্রতি কমিশনের ভারপ্রাপ্ত ব্যক্তি তাঁর কমিশনের সিদ্ধান্ত ডেলিগেশনের সকল সদস্যের কাছে উপস্থিত করলেন। এক কমিশনের সদস্যের পক্ষে অন্য কমিশনের সিদ্ধান্তের সমর্থনে বা প্রতিবাদে কোন বাধা নেই। এই মিলিত বৈঠকের সভানেত্রীত্ব করেন শ্রীমতী রামেশ্বরী নেহরু, ডেলিগেশনের শ্রদ্ধেয়া অধিনেত্রী।

'সর্ব্বশেষে সর্ব্বভারতীয় খ্যাতিসম্পন্ন যাঁরা এসে ভারতীয় ডেলিগেশনে যোগ দেন, তাঁদের মধ্যে ছিলেন নিখিল ভারত ট্রেড্ ইউনিয়ান কংগ্রেসের সভাপতি, বোম্বাইয়ের মেয়র, এস-এস-মিরাজকর, বিখ্যাত ব্লিৎজ কাগজের সম্পাদক আর-কে করান্জিয়া। পণ্ডিত চতুর নারায়ণ মাল্‌ভিয়া ভিয়েনা থেকে আগেই এসেছিলেন, তিনি এক সময়ে ভুপাল ষ্টেটের চীফ্ মিনিষ্টার ছিলেন, এখন বিশ্বশান্তি সংসদের সেক্রেটারিয়েটে ভারতীয় প্রতিনিধি হিসেবে ভিয়েনাতে কাজ করেন।

দশটার সময় কমিশনের বৈঠক শুরু হবার আগে ঘোষণা করা হয়, কোন্ কমিশন কোথায় বসবে। কালচুরাল কমিশনটি সব চেয়ে বড় বলেই কংগ্রেসের হলেই তার অধিবেশনের স্থান নির্দ্দিষ্ট হয়েছে। অন্যান্য কমিশনের সদস্যরা হল ত্যাগ করে স্কুলবাড়ীর নির্দ্দিষ্ট ঘরগুলিতে চলে গেলেন। কালচুরাল কমিশন তখন কতগুলি সাব-কমিশনে বিভক্ত হোলো। সাব-কমিশনগুলি এই :—

(ক) নাটক ও সাহিত্য।

(খ) শিক্ষা।

(গ) ফিল্ম, রেডিও, টেলিভিশন।

(ঘ) চিত্র ও স্থাপত্য।

(ঙ) সাংবাদিকতা।

বলা বাহুল্য আমি নাটক ও সাহিত্য সাব-কমিশনে যোগদান করলাম। গোপাল আর রাণী গেলেন শিক্ষা সাব-কমিশনে। সাব-কমিশনে মিলিত হবার পর শুনলাম একজন চেকোশ্লোভাকিয়ান্ অভিনেতা দাবী করছেন—তিনিই প্রেসিডেণ্ট নিযুক্ত হয়েছেন। অপর অনেকে প্রশ্ন তুলেছেন, প্রেসিডেণ্ট এই সাব-কমিশনই নিয়োগ করবেন। সাব-কমিশন এখনো তা করেন নি। চেয়ে দেখলাম শ'দেড়েক নর-নারী এই সাব-কমিশনে যোগদান করেছেন। জানতে চাইলাম—ইংরেজী ভাষা বোঝেন এমন ক'জনা আছেন। কুড়ি-পঁচিশজন হাত তুল্লেন। ইণ্টারপ্রিটারের কাজ করতে পারেন, এমন কজনা আছেন? একটি বর্ষীয়সী রুশ মহিলা এগিয়ে এসে বল্লেন তিনি ইংরেজী, জার্ম্মান এবং ফরাসী ভাষায় কথাবার্ত্তা বলতে পারেন, তাঁর মাতৃ ভাষায় ত পারেনই। তিনি একাই সকলের বক্তৃতা ওই সব ভাষায় তর্জ্জমা করতে প্রস্তুত।

আমি তাঁকে আমার পাশে বসিয়ে বল্লাম—বক্তৃতা আমরা এখানে কেউ করব না, পরস্পরের সঙ্গে পরিচিত হব, নাটক ও সাহিত্য সম্বন্ধে নিজ-নিজ দেশের বিবরণ ও অভিজ্ঞতা বলব। আমাদের আত্মপ্রকাশের পথে যে-সব বিঘ্ন আছে, তাই আমাদের পক্ষ থেকে কংগ্রেসের কাছে পেশ করব। এর অতিরিক্ত কিছু করবার জন্য এই সাব-কমিশন গঠিত হয়নি। সকলেই যখন আমার উক্তি সমর্থন করলেন, তখন আমি বল্লাম —এই বৈঠকে প্রেসিডেণ্টের বিশেষ কোন কাজ নেই। তবুও বৈঠকের
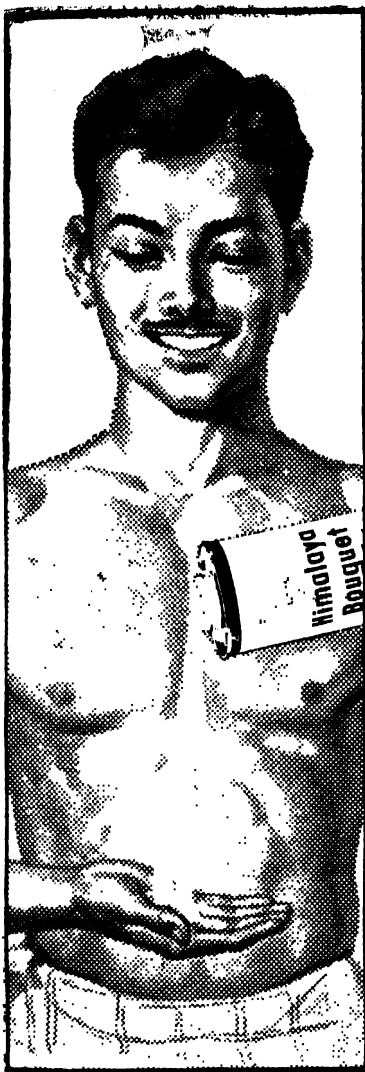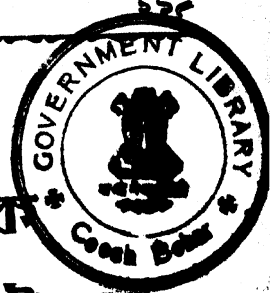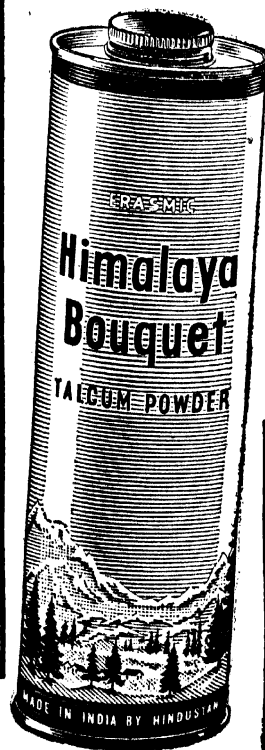
Himalaya
Bouquet

ERASMIC
Himalaya
Bouquet
TALCUM POWDER
MADE IN INDIA BY HINDUSTAN

কাজ যাতে শৃঙ্খলার সঙ্গে চলতে পারে, তাই দেখবার জন্য একজন সভাপতি আবশ্যক। আমাদের শ্রদ্ধেয় বন্ধু চেকোশ্লোভাকিয়ার প্রখ্যাত অভিনেতা এই গুরু দায়িত্ব বহন করতে এগিয়ে এসেছেন বলে আমি প্রস্তাব করি তিনিই আমাদের সভাপতির কাজ করুন। তিনি সমর্থিত হলেন। আর কেউ প্রতিবাদ করলেন না। আমি আবার বল্লাম—কিন্তু সভার একজন সেক্রেটারী একান্ত আবশ্যক। আমাদের আলোচনা এবং সিদ্ধান্তগুলি তাঁকে লিপিবদ্ধ করতে হবে। ক্যানাডার একজন শিক্ষিকা এই সভায় উপস্থিত আছেন, যিনি ও-কাজে সুদক্ষা। আমি প্রস্তাব করি তিনিই এই সভার সেক্রেটারী হোন্। তাই হোলো।

তিনি বল্লেন—আমি কি পারব?

রুশী মহিলাটি আর আমি এক সঙ্গেই বল্লাম—আমরা সাহায্য করব।

আমি পুনশ্চ বল্লাম—আলোচনায় প্রবৃত্ত হবার আগে আমাদের পরিচয় হওয়া প্রয়োজন। হয়ত আর কখনো আমরা সকলে একত্র মিলিত হবার সুযোগ পাব না। কিন্তু আজকার এই পরিচয়টুকু অনেকে অনেকদিন ধরে মনে করে রাখব। আমি তাই প্রেসিডেণ্টকে অনুরোধ করছি, তিনি এখন সদস্যদেরকে সংক্ষেপে আত্ম-পরিচয় দিতে আহ্বান করুন।

প্রেসিডেণ্ট তাই করলেন। খুব কুণ্ঠা নিয়েই একের পর আর একটি সদস্য স্বল্প কথায় আত্ম-পরিচিত দিতে লাগলেন। রুশী মহিলাটি একাই সব তর্জ্জমা করে শোনাতে লাগলেন। অদ্ভুত তাঁর শক্তি।

সকলেই কিছু আত্ম-পরিচয় দিতে উঠে দাঁড়ালেন না। তবুও পরিচয়-পর্ব্ব শেষ হতেই এক ঘণ্টার ওপর সময় লাগল। দেখা গেল কমিউনিষ্ট রাষ্ট্রগুলি থেকেই এই সাব-কমিশনে বেশি লোক যোগ দিয়েছেন।

প্রেসিডেণ্ট বল্লেন—পরিচয়ের পালা শেষ হয়ে গেল। এখন আলোচনা আরম্ভ হোক্। কে শুরু করবেন?

আমি উঠে দাঁড়িয়ে বল্লাম—যদি অনুমতি করেন ত আমিই শুরু করতে পারি।

প্রেসিডেণ্টের মতামত জানবার আগেই সদস্যরা করতালি বাজিয়ে সমর্থন জানালেন। ভারতের কথা জানবার আগ্রহ সকলের। আমি আমাদের কমিশনের লিখিত সিদ্ধান্ত পড়ে শোনালাম এবং প্রয়োজন মতো তার ব্যাখ্যাও করলাম।

আমার বলা হয়ে গেলে নানা দেশের প্রতিনিধি একে একে তাঁদের বক্তব্য বলতে লাগলেন। আমরা যেমন লিখিত সিদ্ধান্ত তৈরি করে নিয়েছিলাম, আর কেউ তা করেন নি।

কয়েক বছর থেকেই আমি লক্ষ্য করছি—কালচুরাল কমিশনগুলি রাজনীতিক কমিশনের মতো জোরদার হয়ে ওঠে না। তার কারণ আমি বুঝতে পারি। বিশ্বশান্তির সঙ্গে রাজনীতির, অর্থনীতির, আণবিক অস্ত্রের যে প্রত্যক্ষ সংযোগ আছে, সংস্কৃতির সঙ্গে তা নেই বলে অনেকে মনে করেন। অনেকের কথা আমি বিশেষ করে ভাবি না। কিন্তু এ-কথা ভাবি যে, কংগ্রেসে যে বিশ্ব-পরিচিত সাহিত্যিকদের দেখতে পাই, তাঁরা প্রায় সকলেই রাজনীতিক কমিশনে থাকেন,—যেমন তিকোনভ, এহরেণবুর্গ, কুয়োমো-জো। এঁদের কখনো আমি সাংস্কৃতিক কমিশনে দেখিনি। কেন তা দেখি না?

হেলসিঙ্কি কংগ্রেসের সাংস্কৃতিক কমিশনের বৈঠকে আমি বলেছিলাম সাহিত্যিকরা চিরকালই আত্ম-প্রকাশের পথে নানা-রকমের বাধা পেয়ে এসেছেন, আজও পাচ্ছেন। এই বাধা অপসৃতির সহায়তা শান্তি-কংগ্রেস কতটা করতে পারে, তাই হওয়া উচিত এই সাংস্কৃতিক কমিশনের আলোচ্য। সেখানেও দেখেছিলাম, এখানেও দেখলাম, এই বাধা অপসৃতির কথা পাস-পোর্টের কড়াকড়ি, পুস্তক বিনিময়ের অসুবিধা, কালচুরাল একস্‌চেঞ্জ বিষয়ক বিধি-নিষেধের মাঝেই সীমাবদ্ধ থাকে, লেখকের পরিপূর্ণ স্বাধীনতা আছে কি নেই, থাকলে কতটুকু আছে, না থাকলে কতখানি নেই, কেন নেই, সে-সব প্রশ্ন আলোচনার বিষয় হয়না। না হবার কারণ এই যে, পরিপূর্ণ স্বাধীনতা অল্প দেশেই আছে। স্বাধীনতা থাকা আদৌ উচিত কিনা, সে সম্বন্ধেও প্রশ্ন উঠেছে। সকল দেশে ক্রমশই সাহিত্য-শিল্প রাষ্ট্রের সাংস্কৃতিক দপ্তরের অভিভাবকত্বে চলে যাচ্ছে, সংস্কৃতিকে সিষ্টেমের সঙ্গে জড়িয়ে নেওয়া হচ্ছে। কাজেই সিষ্টেমের প্রতিনিধিরা যখন একসঙ্গে সমবেত হন, তখন বাইরের বাধা-গুলিকেই আলোচনার বিষয় করে তোলেন, মূল কথাটি এড়িয়ে যান।

এহরেণবুর্গ, তিকোনভ, কুয়ো মো-জো যদি এ-সব কমিশনে উপস্থিত থাকতেন,তাহলে তাঁরা অবশ্যই বলতেন—সাহিত্যিক ও শিল্পীদের স্বাধীনতা অবশ্যই থাকা উচিত। কিন্তু দেখতে হবে সেই স্বাধীনতার সুযোগ নিয়ে সাহিত্যিকরা এবং শিল্পীরা যাতে না সমাজের এবং রাষ্ট্রের ক্ষতি করেন। সব সমাজ বা সব রাষ্ট্র এক ধরণের নয়, সকলের উন্নতির বা অবনতির মানদণ্ডও এক নয়। কোনটা শ্রেয়ঃ, তার বিচার করতে বসলে আবার সিষ্টেমের ভালো-মন্দের কথা এসে পড়ে। কংগ্রেস তা করতে চান না। তাই এই সীমা-রেখা টানতে হয় বাধ্য হয়ে।

প্রশ্ন উঠতে পারে—তবে সাংস্কৃতিক কমিশনের সার্থকতা কোথায়? সার্থকতা আছে বৈ কি। বার বার সাংস্কৃতিক কর্ম্মীদের মেলা-মেশার ফলে, আলাপ-আলোচনার ফলে, মন ক্রমশ পরিষ্কার হতে পারে—এ জেনারেশনের না হলেও, পরের জেনারেশনের। ব্যক্তিগতভাবে আমি মনে করি শ্রদ্ধা ও প্রীতি মনে আলো জ্বেলে তোলে। তুলছেও দেখতে পাচ্ছি।

লাঞ্চের সময় হতেই কমিশনের প্রথম বৈঠক শেষ হোলো। বিকেলে কংগ্রেসের সাধারণ অধিবেশন। পরের দিন সকালে আবার কমিশনের বৈঠক। বিকেলে সাধারণ অধিবেশন হবার পর গোপাল হালদারকে বল্লাম—হ্রদের বুকে একটুখানি বেড়িয়ে এলে কেমন হয়?

—খুব ভালো হয়, দাদা।

—তবে আর দেরি নয়।

দুজনা ছুটে গিয়ে ট্রামে চেপে বোসলাম। ট্রাম আমাদের নিয়ে গেল আগেকার দেখা সেই পার্কে। সেইখানেই মোটর লাঞ্চ যাত্রীদের ডাকছিল। তিন ক্রোণার এক একখানা টিকিট। দুঘণ্টা ঘুরিয়ে নিয়ে

বেড়াবে হ্রদের বুকে। তাতে করে শহরের আধখানা দেখা যাবে। মন্দ কি! বোটে একজন গাইড ছিল। সে মাইক্রোফোনে দু'দিকের দর্শনীয় সব কিছুর বিবরণ বলে যেতে লাগল ইংরেজীতে। বেশ রসিক লোক। লঞ্চ ভরতি বিদেশী-বিদেশিনী। কাউকেএকটিবার, জিজ্ঞাসা করতে হোল না—ওটা কি, ওটা কি? দৃষ্টি পড়বার মতো যা-কিছু সবই সে বলে যেতে লাগল। ওর জন্য তাকে পরীক্ষায় পাশ দিতে হয়েছে। প্রথম স্থান অধিকার করেছিল কিনা তা অবশ্য জানি না।

গোপাল বল্লেন—মর্ত্ত্যে আছি ত, দাদা?

—আমারও মনে ওই প্রশ্ন উঠেছে। সব কিছু এরা এতো পরিচ্ছন্ন রাখে কি করে?

—প্রকৃতি সহায়তা করে।

—আর রুচিও প্রশংসনীয়।

—আর টাকাও প্রচুর।

—আর দেশটাও ছোট।

—আর লোক সংখ্যাও মোটে আশী লক্ষ।

গাইড বল্ল—বাঁয়ে ওই যে ছোট্ট সুন্দর একটী বাড়ী দেখ্ছেন, ওটিতে বিশ্বের অদ্বিতীয়া এক ফিল্ম-ষ্টারের বালিকা বয়সের দিনগুলি কেটেছে। —গার্বো! গার্বো! নর-নারীর সমবেত কণ্ঠের ধ্বনি। মনে হোলো, তাঁরা যেন দেখতে পাচ্ছেন গ্রেটা গার্বো দোতলার বারান্দায় দাঁড়িয়ে হাত নেড়ে তাদেরকে অভিনন্দন জানাচ্ছেন। বাড়ীটি জনমানব-বিহীন। গাইডটি কিন্তু বল্লে না—বাড়ীটি সত্যিই গার্বোর, না আর কারু।

সে বল্ল—'বনানী কেমন করে বাগান হয়, আর বাগানকে কেমন করে প্রমোদ-কানন করা যায়, ডান দিকে দৃষ্টি ফিরিয়ে তাই দেখে নিন। লজ্জায় হাত দিয়ে আপনারা যদি বা চোখ ঢাকেন, ওঁরা কিন্তু ঢাকবেন না। চেয়ে দেখলাম—হ্রদের তীরে নুয়ে-পড়া পল্লব-ঘন বৃক্ষ শাখার নীচে-নীচে অজস্র তরুণ-তরুণী, প্রৌঢ়-প্রৌঢ়া এবং দুচার জন বৃদ্ধ বৃদ্ধাও পাশা-পাশি বসে বা শুয়ে বা বাহু লগ্ন হয়ে চল্‌তে চল্‌তে হয়ত জীবন কী সুন্দর তাই বলা-বলি করছেন।

গাইড বল্লেন—আর ওদিকে দেখবেন না, ঝাঁপিয়ে পড়তে ইচ্ছে হতে পারে। দু'একবার তেমন দুর্ভোগও আমাদের ভুগতে হয়েছে। বাঁয়ে দৃষ্টি ফেরান। ভাববেন না ওটি কোন রাজপ্রাসাদ। ওটি একটি ফ্যাক্টরী। বাগানে যে নর-নারীরা বসে পানাহার করছেন, তাঁদের সিফট্ এখন শেষ হয়েছে। ওঁরা এখান থেকেই সোজা চলে যাবেন মিড্ নাইট ড্রিমস্ অভিনয় দেখতে। আমাদের শ্রমিকরা গ্রীষ্মের সন্ধ্যাতেই স্বপ্ন দেখেন।

—আমরা কবে দেখব? গোপাল আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন।

—আমরা ত অবিরাম স্বপ্নই দেখছি, নিজেদের ত ভুলেও দেখতে চাইনে।

দুই ঘণ্টা হ্রদের বুকে বেড়িয়ে বেশ আনন্দ নিয়েই মালমেনে ফিরে গেলাম সাপার খেতে। সেখানেও আনন্দের মেলা মিলেছে। লবীতে দলে দলে বিশ্ব রাজনীতির আলোচনাও করছে, আবার কেউবা তন্ময় হয়ে পিয়ানো বাজাচ্ছে, আর তাকে ঘিরে দাঁড়িয়ে কত লোকে নিবিষ্ট চিত্তে তাই শুনছে। কোথাও বা একদল কোন গায়ক বা গায়িকাকে নিয়ে গানের জলসা বসিয়েছে। কোথাও নিছক খোস-গল্প চলছে। ভিড়ে গেলাম শেষের একটি দলে। একেবারে কোলকাতার আড্ডা করে তুল্লাম। বিষয় থেকে বিষয়ান্তর—নাটক, লোক-সঙ্গীত, রাজনীতি, আণবিক যুদ্ধের ভয়াবহ রূপ, এমন কি যোগ-সাধনার কথাও বাদ পড়ল না। আড্ডা যে কোন্ জাতি পছন্দ করে না, কয়েকবার বাইরে গিয়ে তা বিশেষ করে ঠিক করতে পারিনি। ইংরেজ আর জার্মানিদের সম্বন্ধে ও-কথা এক-কালে খুবই শুনতাম। কিন্তু দেখলাম, তাও সত্য নয়।

হেলসিঙ্কিতে কংগ্রেস-হ'লেই একদিন মণিকা ফেলটন বল্লেন—আজ কয়েকজন ব্রিটিশ ডেলিগেট নিয়ে তোমাদের ওখানে যাব সন্ধ্যার পর।

—খুবই খুশি হব। কিন্তু অতিথি সেবা করতে পারব না। একটা পেগ যুগিয়েও তোমাদের শ্রান্তি দূর করতে পারব না। আমাদের ওখানে দোকান-পাট নেই। যে ক্যাফিটেরিয়াতে আমরা খাই, তা সন্ধ্যার পরই বন্ধ হয়ে যায়।

—আমরা সাপার শেষ করেই যাব। তোমাদের বিপদে ফেলবো না।

তাই গিয়েছিলেন তাঁরা; শহর থেকে সাত-মাইল দূরে। আমাদের থাকতে যে বাড়ীটি দেওয়া হয়েছিল, সেটি শ্রমিকের কাজ করতে করতে যাঁরা লেখা-পড়া করেন, তাঁদেরই হষ্টেল। একটি হ্রদের ওপর তা অবস্থিত। বাড়ী একটিই নয়, চারটি। প্রত্যেকটিই চারতলা। স্বামী-স্ত্রীর থাকবারও ব্যবস্থা আছে। আরাম দেবার আধুনিক কোন ব্যবস্থারই অভাব নেই। ইংরেজ অতিথিরা রাত একটা পর্যান্ত সেখানে আমাদের সঙ্গে আড্ডা দিলেন। গান-বাজনাও হোলো, সাহিত্য রাজনীতি নিয়ে আলোচনাও হোলো। আড্ডায় মুলকরাজ ছিলেন, রাধারাণী দেবী ছিলেন, নরেন্দ্র দেব ছিলেন, ভূপেন হাজারিকা ছিলেন, সস্ত্রীক রমেশচন্দ্র ছিলেন, আরো অনেকে ছিলেন। ঘুম-কাতুরে বিবেকানন্দ ঘরে ঘুমিয়ে ছিলেন।

ওই আড্ডায় আমি বল্লাম—তোমাদের অনেকের ধারণা ইংরেজের ওপর আমাদের রাগ আছে। রাগ আমাদের কারুর ওপরেই নেই। ইংরেজের প্রতি অনুরাগই আছে। তার কারণ তোমাদের ভাষার সাহায্যে আজও আমরা পৃথিবীর সকল পরিচয় সংগ্রহ করি, তোমাদের সাহিত্য পড়ি, এবং ইচ্ছে করলে তোমরা যে আরো বেশ কিছুদিন আমাদের পরবশ রেখে আমাদের দুঃখ বাড়াতে পারতে, তা আমরা জানি, এবং নিশ্চয় করে মানি—তোমরা ও-ব্যাপারে, জাতি হিসেবে, অনেক উঁচুতে উঠেছিলে।

মণিকা ফেলটন বল্লেন—ইংলণ্ডে থেকে তোমাদের স্বপক্ষে অনেক ইংরেজ সংগ্রামও করেছিলেন।

—আমি তার সাক্ষী, মুলকরাজ বল্লেন। 'আমি তখন ইংলণ্ডেই ছিলাম। আর এই মণিকা ফেলটনদের দলে ভিড়ে তখন আমিও কাজ করেছিলাম।'

আলাপ আলোচনা রাত একটা পর্যন্ত চলেছিল। কিন্তু কোন সিদ্ধান্তে পৌঁছুবার জন্য নয়, শুধু মনের কথা বলে আর শুনে আনন্দ পাবার জন্য। মণিকা কোলকাতায় এসেছিলেন। এখন মাদ্রাজে থাকেন।

ওই হেলসিঙ্কিতেই এক সন্ধ্যায় ইষ্ট-জার্মেনীর ডেলিগেটরা ভারতীয় ডেলিগেশনকে একটি ভোজ দেন। ভোজের শেষে একজন প্রবীণ অধ্যাপক আর একজন পূর্ব্বতন সেনানায়ক আদর করে আমাকে তাঁদের মাঝে বসালেন। হেলসিঙ্কিতে ঘটনাচক্রে আমি খুব পাব্‌লিসিটি পেয়েছিলাম। উদ্বোধনী সভায় রামেশ্বরী নেহরুর বাণী পড়ে শোনাবার ভার পড়েছিল আমার ওপর। তাই থেকে শ্রোতৃরা ধরে নিয়েছিলেন—আমি একজন কেউ-কেটা লোক। বাইরে যে মর্য্যাদা পাই, তাতে লজ্জিত, কুণ্ঠিত, হয়ে পড়ি। কিন্তু কখনো এ-ভুল করি না যে, তা ব্যক্তিগতভাবে আমাকে দেওয়া হচ্ছে। সব সময়েই মনে রাখি, ও মর্য্যাদা আসলে ভারতবর্ষকে দেওয়া হয়।

অধ্যাপকটি বল্লেন—ভারতবর্ষ সম্বন্ধে কিছু বল।

—তুমি বুঝি ধরে নিয়েছ আমি একজন প্রগল্‌ভ লোক?

—সে কি!

—তুমি একজন জার্মান অধ্যাপক। তোমার কাছে আমি ভারতবর্ষ সম্বন্ধে কিছু বলবার ধৃষ্টতা প্রকাশ কোরব কেমন করে? তোমাদের পণ্ডিতরা ভারতবর্ষের যে পরিচয় দিয়েছেন, তার ইংরেজি তর্জ্জমা পড়েই, অন্তত আমি, ভারতবর্ষ সম্বন্ধে যা-কিছু জেনেছি। সংস্কৃত পড়ে তা জানিনি।

অধ্যাপকটি বল্লেন—সে ভারতবর্ষের কথা নয়, আজকার ভারতবর্ষের কথা।

—আজকার কোন্ কথা জানতে চাও?

—বিশ্ব যুদ্ধে ইংরেজের মতো শক্তিমান জাতিকে কি করে তোমরা ভারতবর্ষ থেকে বহিষ্কৃত করলে?

কিছুকাল তাঁর মুখের দিকে চেয়ে চুপ করে বসে রইলাম। তারপর বল্লাম—প্রশ্নটা তোমরাই প্রথম করলে না। কংগ্রেস হলে এই কদিনে নানা জাতির নর-নারীই আমাদের ওই প্রশ্ন করেছেন। তাঁরা বিভিন্ন ভারতীয়ের কাছ থেকে অবশ্য বিভিন্ন জবাব পেয়েছেন। ওর একটা অফিসিয়াল বিবরণও আছে। আমি আমার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার কথাই বলতে পারি। ১৯০৫ খ্রীষ্টাব্দ থেকে আমি জাতীয় আন্দোলনের নানা তরঙ্গে ওঠা-নামা করিছি।

—তোমার নিজের কথাই বল—সেনানায়কটি বল্লেন।

—আমি মনে করি ইংরেজকে আমরা তাড়াইনি। তারা নিজেরাই সরে এসেছে। তবে এ-কথা সত্যি যে, আমরা তাদের সব দিক দিয়ে অতিষ্ঠ করে তুলেছিলাম। অচল করে দিয়েছিলাম তাদের গবর্ণমেণ্টকে। তখনকার ভাইসরয় লর্ড ওয়েভেল তা স্বীকারও করেছিলেন, তাঁর একটি লেখায়। আমার তা বেশ মনে আছে। তিনি বলেছিলেন, একটা কণ্টিনেণ্টের মতো বৃহৎ একটি রাষ্ট্রে যদি রেল আর তারের সংযোগ অব্যাহত না রাখা যায়, যদি থানাগুলো একে একে পুড়ে যায়, জেলের ভয় যদি কারুরই না থাকে, এখানে-সেখানে যদি স্বাধীন রাষ্ট্র এনক্লেভ গঠিত হয়; আর সমগ্র সামরিক শক্তি যদি নিযুক্ত রাখতে হয় ভারতের পূব-সীমান্ত রক্ষা করবার জন্য, দেশে খাদ্য যদি দুষ্প্রাপ্য হয়, তাহলে শাসনযন্ত্র কেমন করে চালু রাখা যায়? লর্ড ওয়েভেল যে অবস্থার বর্ণনা করেছিলেন, তা ছিল বাস্তব প্রতিফলন। ভারতবর্ষ ওই অবস্থা সৃষ্টি করেছিল।

—তোমাদের সমগ্র সংগ্রামটাই কি নন্-ভায়োলেণ্ট ছিল?

—না। কোনকালেই তা ছিল না। মহাত্মার নেতৃত্বের প্রথমদিকে ভায়োলেন্সের প্রকাশ হয়েছিল, যার জন্য আন্দোলন তিনি স্থগিতও রেখেছিলেন। তাঁর আন্দোলনের সঙ্গে সঙ্গে সমান্তরালভাবে সর্ব্বত্রই ভায়োলেন্সও প্রকাশ পেয়েছে। মাঝে-মাঝে ইংরেজ যেমন ভায়োলেন্সকে দমন করেছে, তেমন নন-ভায়োলেণ্ট সংগ্রামকেও দমন করতে সক্ষম হয়েছে। কিন্তু মহাত্মার নন-ভায়োলেণ্ট নন-কো-অপারেশনের আধ্যাত্মিকতা যেমন নন-ভায়োলেণ্ট যোদ্ধাদের শক্তি যুগিয়েছে, তেমনই শক্তি যুগিয়েছে ভায়োলেণ্ট অভিযাত্রীদের। এর মূলে রয়েছে গীতার প্রভাব। আর তোমরা ত জান—দুটো মহাযুদ্ধের সময়েই ভারতীয় বিপ্লবীরা জার্মেনীর সাহায্য চেয়েছিলেন, কিছুটা পেয়েও ছিলেন।

প্রাক্তন-সেনানায়ক বল্লেন—হ্যাঁ, মিঃ বোসের কথা আমরা শুনিছি।

—ওই সুভাষচন্দ্র বোস প্রথম কাজ শুরু করেন কংগ্রেসেরই পতাকাতলে। তখন তিনি নন-ভায়লেণ্টই ছিলেন। আবার যখন তিনি আজাদ হিন্দ ফৌজ গঠন করেন, তখনও তিনি নন-ভায়োলেণ্ট ছিলেন বলে আমার বিশ্বাস।

—সে কি! অধ্যাপক বল্লেন।

—আমরা সশস্ত্র সংগ্রাম মাত্রকেই ভায়োলেন্স বলি না। দেশরক্ষার জন্য অথবা মানবতা প্রতিষ্ঠার জন্য যুদ্ধ যখন অনিবার্য্য হয়, তখন যুদ্ধকে আমরা ধর্ম্মযুদ্ধ বলি, ভায়োলেণ্ট যুদ্ধ বা হিংসাত্মক যুদ্ধ বলি না। সাম্রাজ্য বিস্তারের জন্য, পরের অধিকার হরণের জন্য, লোভের জন্য, হিংসার জন্য, যে-যুদ্ধ অনুষ্ঠিত হয়, তাকেই আমরা পাশবিক বা ভায়োলেণ্ট যুদ্ধ মনে করি।

—মহাত্মা গান্ধী কি কখনো সশস্ত্র সংগ্রামকে সমর্থন করতেন? অধ্যাপক জানতে চাইলেন।

—ও সম্বন্ধে তার সংশয়ের শেষ ছিল না। তার মনের দ্বন্দ্বের কথা তিনি অনেকবার প্রকাশও করেছেন। কিন্তু ভায়োলেন্সকে শ্রেয়ঃ বলে তিনি কখনো মনে করেননি।

—তারপর, বল, তারপর? প্রাক্তন সেনানায়ক জানতে চাইলেন।

—দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের শুরুতেই মহাত্মা ব্রিটিশ জাতিকে ভারতবর্ষ 'কুইট' করতে পরামর্শ দিলেন। ইংরেজ তখন সে পরামর্শ গ্রহণ করলে হয়ত ভারতবর্ষ জাপানের পদানত হতো। ইংরেজ কংগ্রেসের নায়কদের কারারুদ্ধ করল, কংগ্রেসকে ভেঙে দিল, প্রায় সমগ্র কংগ্রেসটাকেই জেলে পুরে ফেল্ল। কংগ্রেসের যাঁরা কারাবরণ

আপনারও চিত্রতারকাদের মতই উজ্জ্বল লাবণ্য হতে পারে

অনুভা গুপ্তা বলেন! "বিশুদ্ধ ও মোলায়েম লাক্স টয়লেট সাবান ব্যবহার করার দরুণই আমার লাবণ্য সুন্দর থাকে। লাক্স টয়লেট সাবানের মোলায়েম সরের মত ফেণা আমার ত্বককে উজ্জ্বল রাখে।"

আপনার সৌন্দর্য্য চর্চ্চার জন্যে সর্বদাই লাক্স টয়লেট সাবান ব্যবহার করুন। লাক্সের কোমল সুগন্ধ আপনাকে স্নিগ্ধ ও সতেজ রাখবে।

বিশুদ্ধ, শুভ্র

লাক্স

টয়লেট

সাবান

চিত্র-তারকাদের সৌন্দর্য্য সাবান

হিন্দুস্থান লিভার লিঃ, কর্তৃক ভারতে প্রস্তুত

LTS. 8-X52 BG

করলেন না, তাঁরা আত্মগোপন করে মুক্তি আন্দোলন চালিয়ে যেতে লাগলেন। তাঁরা এবং সকল রকম রাজনীতিক কর্মিরা, শহরের পল্লীর শিক্ষিত-অশিক্ষিতরা, যিনি যেমন করে পারলেন, ইংরেজের ভারতে অবস্থিতি অসম্ভব করে দিতে চাইলেন। ভায়োলেণ্ট নন-ভায়োলেণ্ট কোন পন্থাই তাঁরা বাদ দিলেন না। সকলে মিলে যে পরিস্থিতি তাঁরা সৃষ্টি করেছিলেন, লর্ড ওয়েভেল তারই বর্ণনা করে জানতে চেয়েছিলেন, ওই পরিস্থিতিতে শাসন-যন্ত্র চালু রাখা যায় কি করে?

—তোমরাও গেরিলা-ওয়ারে প্রবৃত্ত হয়েছিলে, বল। সেনানায়ক বল্লেন।

—ওর ট্রাডিশন আমাদের দেশে ছিল। কিন্তু ইংরেজের শাসন অসম্ভব করে দেবার জন্য যা করা হয়েছিল, তা ভারতে পূর্ব্বে কখনো হয়নি। ওটা কিন্তু সম্ভব হয়েছে মহাত্মা গান্ধীর জন্য, তাঁর নন-ভায়োলেণ্ট নীতির জন্যই কেবল নয়। তিনি ইনফিরিয়ারিটি কম-প্লেক্স্ থেকে জাতিকে মুক্ত করেছিলেন, জাতীয় মর্য্যাদাবোধ জাগ্রত করে দিয়েছিলেন, ভয়কে সংগ্রামী জনসাধারণের মন থেকে সরিয়ে দিয়েছিলেন। তাঁর আগে রবীন্দ্রনাথও সাহিত্যের ভিতর দিয়ে ও-কাজ করবার চেষ্টা করেছিলেন তাঁর সারা জীবন ধরে। তাই মহাত্মা রবীন্দ্রনাথকে গুরু বলে স্বীকার করেছিলেন। রবীন্দ্রনাথ লিখে গণ-সংযোগ করতে পারেননি। মহাত্মা কাজ করে তা পেরেছিলেন। তাই তাঁকে সঙ্গত কারণেই নতুন ভারতের জনক বলা হয়।

—তোমায় বক্তব্য বুঝতে পারছি, অধ্যাপক বল্লেন।

—কিন্তু আমার কথা শেষ হয়নি। শেষ কথা ইংরেজের শেষ-ভরসা নাশের কথা। সেটি করেছিলেন সুভাষচন্দ্র ভারতীয় বিপ্লবীদের অসমাপ্ত সাধনাকে সার্থক রূপ দিয়ে। পূর্ব্ব-এশিয়ায় ইংরেজ একান্ত নির্লজ্জের মতো ভারতীয় সৈনিকদের জাপানী আক্রমণের মুখে ফেলে রেখে চলে এসেছিল। সেই সৈনিকদের দেশাত্মবোধে উদ্বুদ্ধ করে প্রধানত তাদের নিয়েই সুভাষচন্দ্র আজাদহিন্দ ফৌজ গঠন করে জাপানের সাহায্য নিয়েও ভারত অভিযান করেন। সে অভিযান ভারতের সীমানায় প্রবেশ করবার পর পরাজিত ও পরাভূত হয়। কিন্তু পরাজয় কোন জাতিকে এমন করে জয়যুক্ত করেছে বলে আমার জানা নেই। ইংরেজ ভারত জয় করেছিল, ভারতকে পরবশ রেখেছিল, প্রধানত, ভারতীয় সৈনিকের সাহায্যে। ভারতীয় বিপ্লবীরা বছরের পর বছর চেষ্টা করেছিলেন এই সৈন্যবাহিনীকে দেশাত্মবোধে উদ্বুদ্ধ করতে। তাঁদের অনেকে ও-কাজে প্রাণ দিয়েছেন, কিন্তু সফল হননি ইংরেজের সতর্ক দৃষ্টির ফলে। কিন্তু পূর্ব্ব-এশিয়ায় যে-কাজ ইংরেজ করল, তাতে করে কেবল পরিত্যক্ত সৈনিকরাই নয়, ভারতে অবস্থিত দেশীয় সৈনিকরাও ইংরেজের চরিত্র সম্বন্ধে সন্দিগ্ধ হয়ে উঠল। তারাও ভাবতে শুরু করল—তেমন বিপদে পড়লে ইংরেজ সেনানায়করা তাদেরও বিপদের মুখে এগিয়ে দিয়ে পালিয়ে যাবে। ইংরেজ শাসকরাও ভারতীয় সৈনিকদের ওপর ভরসা রাখতে পারলেন না। অথচ দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর ইংরেজের এমন লোকবল ও ধনবল রইল না যে, ব্রিটেন থেকে সৈন্য নিয়ে ওই বিরাট দেশের সর্ব্বশ্রেণীর স্বাধীনতার প্রয়াসকে দমন করে। মহাত্মা যুদ্ধের শুরুতেই যখন ইংরেজকে ভারত-বর্ষ 'কুইট' করতে বলেছিলেন, তখন ইংরেজ তা হেসেই উড়িয়ে দিয়েছিল। কিন্তু যুদ্ধের শেষের দিকে নিজেদের অসহায়তা বুঝতে পেরে তারা নিজেরাই স্থির করল যে, তারা ভারত ছেড়ে চলে আসবে। অবশ্য মূঢ়ের মতো তারা আরো কিছুদিন ভারতকে পরবশ রাখবার চেষ্টা করতে পারত। কিন্তু সে মূঢ়তা করতে তাদের দেশের লোকেরাই বাধা দিয়েছে। আমি তাই মনে করি, ভারতের বন্ধনমুক্তির গৌরব যেমন ভারতীয়রা করতে পারে, তেমন প্রগ্রেসিভ ইংরেজও করতে পারে।

ওঁরা বল্লেন—বিষয়টা অনেক পরিষ্কার করে বুঝলাম। ধন্যবাদ।

আমি বল্লাম—কিন্তু মনে রেখো, এ আমার ব্যক্তিগত মত।

আমাদের সেদিনকার আলোচনা শেষ হোলো। আলোচ্য বিষয় যত গুরুতরই হোক, আমি ওকে আড্ডাই বলব। কেননা ওঁরা চেয়েছিলেন কৌতূহলের নিবৃত্তি। তার অতিরিক্ত কিছু নয়। ওঁরা যে ওই আলোচনা মনে রাখবেন এবং ও থেকে শিক্ষা নেবেন, এমন অসম্ভব আশা আমি পোষণ করিনি। জাতীয়তার দম্ভ ওদের অনেক বেশি, গোঁড়ামী, এবং একদেশদর্শিতাও অল্প নয়।

অনেক রকমের, অনেক ধরণের, আড্ডার কথা মনে পড়ে। কিন্তু সবগুলির বিবরণ লেখা সম্ভব নয়, উচিতও নয়। কাজেই কংগ্রেসের কথায় ফিরে আসা যাক। এই রেণবুর্গের বক্তৃতার কথা আগেই বলেছি। ব্রিটেনের বৈজ্ঞানিক বার্ণাল বড় চমৎকার ভাষণ দেন। আর ভালো বলেন—ক্যানাডার রেভারেণ্ড ক্যাণ্ডি। ওঁরা দুজনেই বিশ্বশান্তি সংসদের ভাইস-চেয়ারম্যান।

এবার মধ্যপ্রাচ্যের বক্তারাই আসর গরম রাখেন। তার কারণ মধ্যপ্রাচ্যই তখন বারুদের স্তূপ হয়ে উঠেছে, প্রতি মুহূর্ত্তেই আতঙ্কের সৃষ্টি করেছে তৃতীয় বিশ্ব যুদ্ধ বুঝি ওই অঞ্চল থেকেই শুরু হয়ে যায়। আফ্রিকার জাতিগুলিও কম সম্বর্দ্ধনা পান না। সমস্ত ডেলিগেট সমস্বরে ওঁদের দাবী সমর্থন করেন, সহায়তায় স্বীকৃত হন।

কংগ্রেস-হলে, একমাত্র বিরতির স্বল্প সময়টুকু ছাড়া, পরস্পরের আলোচনার অবসর থাকে না, বক্তৃতার পর বক্তৃতাই শুনতে হয়। একটা-দুটো নৈশ-অধিবেশনেও সারারাত বক্তৃতার পর বক্তৃতা শুনতে হয়। ওতে মন ক্লান্ত হয় না, অবসন্ন হয় না। কেননা নানা-জাতির সমসাময়িক মনোভাবের হদিস ও-থেকে পাওয়া যায়, নানা-জাতির জীবন-নাট্যের রসাস্বাদনেরও সুযোগ ঘটে।

হাঙ্গেরীর প্রতিনিধি ইমরে নজের প্রাণদণ্ডের কথা তুল্লেন। তিনি বল্লেন যে-কারণে তাঁর গবর্ণমেণ্ট ইমরে নজের প্রাণদণ্ড দিয়েছেন, পৃথিবীর যে-কোন গবর্ণমেণ্ট, অনুরূপ অপরাধের জন্য, অনুরূপ অপরাধীকে, অনুরূপ দণ্ড দিয়ে থাকেন। রাজনীতিক কারণে প্রাণদণ্ড দেওয়া হয়না, এমন কোন দেশ আছে? হাইট্রিজনকে কোন সভ্য দেশের গবর্ণমেণ্ট

মার্জনা করেন? তাঁর গবর্ণমেণ্ট বিচার করেই দণ্ড দিয়েছিলেন। অপর কোন দেশের গবর্ণমেণ্টকে ও-বিষয়ে কোন কর্তৃত্ব করবার অধিকার তাঁর গবর্ণমেণ্ট দেন নি।

ও-নিয়ে কংগ্রেস কোন আলোচনা করেন না। প্রাণদণ্ড তুলে দেবার প্রস্তাব প্রতি কংগ্রেসেই কেউ না কেউ উত্থাপন করেন। কিন্তু কোন কংগ্রেসেই তা সমর্থন পায় না। তার কারণ, প্রায় সকল দেশেই প্রাণদণ্ড চালু রয়েছে। ইম্‌রে নজের প্রাণদণ্ডের বিরুদ্ধে যাঁরা বলেন, তাঁদের আপত্তি প্রাণদণ্ড নিয়ে নয়, আপত্তি বিচারের রীতি নিয়ে। যে রীতি অবলম্বন করে বিচার করা হয়েছিল, সেই রীতিকে তাঁরা বিচারের রীতি মনে করেন না। তাই ওই বিচারে যে প্রাণদণ্ড দেওয়া হয়, তাকে তাঁরা দণ্ড না বলে হত্যা বলেন। প্রতিপক্ষ রোজেনবার্গ-দম্পতি প্রভৃতির দৃষ্টান্ত তুলে বলেন—তাও হত্যা। এ সম্বন্ধে মীমাংসার সময় এখনো আসেনি। বিচার সর্বত্রই শাসন-কর্তৃপক্ষের হস্তক্ষেপ থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত নয়—বিশেষ করে রাজনীতিক এবং রাষ্ট্রীয় অর্থনীতিক ব্যাপারের সঙ্গে জড়িত অপরাধসমূহের বিচার।

ইস্রায়েল নিয়ে প্রতিবারই রাজনীতিক কমিশনে কিছু-না-কিছু উত্তাপের সঞ্চার হয়, আবার আপোষও হয়। এবারও তাই হয়েছিল। ইস্রায়েলীরা কমিশনে আপোষে রাজী হয়। কিন্তু খাবার টেবিলে রোজই তারা নানা প্রশ্ন তোলে। ইস্রায়েলের সমস্যা সহজ নয়। সেখানে যে কেবল দুই জাতি তাই নয়, দুই জাতির এবং এক জাতিরও দুই দল আছে। ইহুদী হিসেবে ইহুদী দুই-দলই যা দাবী করে, তা প্যালেষ্টাইনের আরব-স্বার্থের বিরোধী। প্যালেষ্টাইনের আরব অধিবাসীদের ইস্রায়েলের উপর জন্মগত অধিকার আছে। ইহুদী-প্রধান ইস্রায়েল গবর্ণমেণ্ট তা স্বীকার করছেন না। ভারতে পাকিস্তান থেকে আগত অসংখ্য উদ্বাস্তু যেমন শোচনীয় জীবন যাপন করছে, তেমন ইস্রায়েল থেকে বিতাড়িত বহু আরব উদ্বাস্তুও শোচনীয় জীবন যাপন করছে। আরবদের বিরুদ্ধে পশ্চিমী শক্তিরা যে ব্যবস্থা অবলম্বন করছে, ইস্রায়েলের একদল ইহুদী তার সমর্থন করছে, ইস্রায়েলকে আরব-অভ্যুদয়ের বিরুদ্ধে নিয়োগ করতে চাইছে। ইহুদীদের একদল তার সমর্থন করছে, একদল বিরুদ্ধাচরণ করছে। কিন্তু খুবই অল্পসংখ্যক ইহুদী প্যালেষ্টাইন-আরবদের স্বাধিকার মেনে নিতে রাজী। ইস্রায়েলের প্রতিনিধি মিসেস এসথার উইলেনেস্কা কংগ্রেসে এ-বিষয়ে একটি সুন্দর ভাষণ দেন। কিন্তু খাবার টেবিলে ইস্রায়েল গবর্ণমেণ্টের সমর্থকরা আমাদের অতিষ্ঠ করে তোলেন যে ইহুদী গবর্ণমেণ্টের ওপর ঘোরতর অবিচার চলছে। এখানে ওখানে এমন নানা বিরুদ্ধ-স্রোতের আবর্ত সৃষ্টি হয়েছে যে, প্রকৃত অবস্থা বোঝা দুরূহ। ইস্রায়েল একটি বিস্ফোরণ-কেন্দ্র হয়ে রয়েছে। যদি সংগঠন-কার্য্যে এবং কো-অপারেটিভ প্রয়াসে ইস্রায়েল সুইডেনের মতোই অগ্রণী, কমিউনিষ্ট সিষ্টেম ব্যতিরেকে। ইস্রায়েলের ইহুদিদের বিশ্বাস—ভারতবর্ষ তাদের বুঝতে পারবে, বুঝতে পারবে যে আরবি-ইস্রাইলীদের দাবী যুক্তিসঙ্গত নয়। কেন নয়, আমি কিন্তু, তা বুঝিনি—যেমন বুঝিনি পশ্চিমী শক্তি-জোটের সঙ্গে ইস্রায়েলের সম্বন্ধ কতটা নিবিড়। প্যালেষ্টিনিয়ান আরবদের দাবী, তাদের জন্মগত অধিকার কেন উপেক্ষিত হবে?

কলোম্বো কংগ্রেসে দক্ষিণ আফ্রিকার জনৈকা শ্বেতাঙ্গিনী শিক্ষিকা একটি অনুপম ভাষণে বুঝিয়ে দিয়েছিলেন—সারা আফ্রিকার কলোনিয়ালিষ্টরা কী জঘন্য ভাবে মানুষের আর মানবতার লাঞ্ছনা করছে, অবমাননা করছে। সমগ্র কংগ্রেস উঠে দাঁড়িয়ে দীর্ঘকালীন করতালি দিয়ে তাঁকে অভিনন্দিত করেছিলেন। এবার তাঁকে কংগ্রেসে দেখতে পেলাম না। লবীর আড্ডায় দক্ষিণ আফ্রিকার একটি প্রতিনিধিকে কাছে পেয়ে তাঁর কথা জিজ্ঞাসা করলাম।

তিনি বল্লেন—তাঁকে এবার পাসপোর্ট দেওয়া হয়নি।

—হেতু? জিজ্ঞাসা করলাম।

জবাব পেলাম—কলোম্বোর বক্তৃতা!

আর এক লবীর আড্ডাতে কথায় কথায় একজন পশ্চিম-জার্মানীর কমিউনিষ্ট মহিলা কানের কাছে মুখ এনে বল্লেন—স্বদেশে জীবন আমাদের দুর্বহ হয়ে উঠেছে, মুখ ফুটে কথা বলবারও উপায় নেই।

ভিন্ন এক আড্ডায় অভিযোগ শুনলাম, পূর্ব-জার্মানীতে ছেলেদের মন বিষিয়ে দেওয়া হচ্ছে স্কুল-পাঠ্য বইতে ইডিওলজি ঢুকিয়ে। শুনতেও হয়, অন্যমনস্ক হয়ে যাবারও ভাণ করতে হয়। কে কি মতলব নিয়ে কোন্ কথা বলছেন, কে জানে? জগতে যা-কিছু চিক্-চিক্ করে, সবই ত সোনা নয়।

ক্রমশঃ

দিনান্ত

সাধনা মুখোপাধ্যায়

বিষণ্ণ সন্ধ্যায় নিয়ে করুণ এ দিনান্তের দেনা,
যে কোন ইচ্ছার স্বপ্নে হৃদয়ের অতৃপ্তি মেটেনা।
আকাশ কুসুম বুড়ো দূর আর ম্লান মনে হয়,
জীবনের জানালায় পৃথিবীর সুর গান লয়,
—যেটুকুর ছাপ পড়ে সেটুকুও যেন হৃত স্বাদ,
প্রত্যহের ছকা মাঠে ফসলের সীমিত আবাদ

হৃদয়ে গুমোট হয় ঘাম জমে মনো-গহ্বরে,
আশার হাওয়ার পালে বৃষ্টিরা তবু কই ঝরে।
শূন্য প্রেম দিকে ঘূণী লঘু সুখ ঘিরে,
সুরের বৃন্ত থেকে সময় স্বপ্ন নেয় ছিঁড়ে।
কি এক রিক্ততা এসে তিক্ত মন করে দিশাহারা,
দিগন্তে গৈরিক রঙ হৃদয়ে বিরাগী একতারা।

ভুতোদা: আহাহা কি রান্না! কি স্বাদ! কিরে বিমলা বল বল।

বিমল: সত্যিই অপূর্ব রান্না! আমাকে আর একটু মাছের ঝোল দিনতো।

বিনয়: আমাকেও। আর একটু চচ্চড়ী। সত্যিই ডালনা, মাছ, তরকারী, মাংস সবই অপূর্ব।

ভুতোদা: ভাগ্যিস সেদিন মেনি-দির সঙ্গে দেখা হয়ে গেল! তানাহলে এই পোড়া সহরে কি এমন রান্না খাওয়া যায়।

মেনিদি ৪ মাস আগে তোমার মধুপুরের বাড়ীতে খেয়েছি সে রান্নার স্বাদ এখনও মুখে লেগে আছে।

মেনিদি: কি যে বল ভুতো। এত বিরাট সহর-এত লোকজন; এখানে ভাল রান্নার আর অভাব কি?

বিমল: আপনাকে যে এত ভাল ভাল হাতের রান্না খাওয়ালাম!

ভুতোদা: ছ্যা:! এ সহরের লোকজনের তাড়াহুড়ো করেই জীবন কেটে যায়। রান্নাবান্না খাওয়া দাওয়া করবে কখন?

বিনয়। তার মানে?

ভুতোদা: সবসময় পথে ঘাটে প্রান হাতে করে চলা। মেনিদি, সেদিন তোমার বাড়ী আসার জন্য প্রান হাতে করে তো এক বাসে উঠে পড়লাম। গাদাগাদি ভীড়। চৌরঙ্গীর কাছে, আমার পেছনের ভদ্রলোক পিঠে খোঁচা খেয়ে হাত ঘড়ীর দিকে তাকিয়ে বললেন" আপনি আমার পায়ের ওপর উঠে দাঁড়িয়েছেন ৯ টা ৪৫ মি: এখন সোয়া দশটা দয়া করে যদি নামেন তাহলে আমি অফিস যেতে পারি।

বিমল: হ্যা: হ্যা: হ্যা:

ভুতোদা: হাসছিস কি! এরকমভাবে বাঁচলে কখনও ফাইন আর্ট্ বাঁচে? রান্না খাওয়া এগুলো ফাইন আর্ট। অনেক সময় লাগে, অনেক যত্ন লাগে। মেনিদি, যদি এই পোড়া শহরে বেশিদিন থাকেন, তাহলে এরকম রান্না করতে পারতেন?

বিনয়: কেন না? তাড়াহুড়ো তো আমরা করছি। রান্না তো করে মেয়েরা, তাদের আর তাড়াহুড়ো কোথায়?

ভুতোদা: ইকনমিক্স পড়েছিস? ডিমাণ্ড আর সাপ্লাইয়ের ব্যাপারটা জানিস। যারা খাবে তারা যদি ভাল খাবার না খায় তাহলে তারা রান্না করে তাদের ভাল খাবার করার উৎসাহ থাকে?

DL/P. 3A-X52 BG

আর সারাদিন বাসে ট্রামে আফিসে দৌড়ঝাঁপ করে আর ভাল খাবার সম্বন্ধে ভাবার উৎসাহ কোথায় ?

বিমল: আপনি বলতে চান যে এখানে ভাল রান্না হতে পারেনা ?

ভুতোদা: হয় তো হতে পারে কিন্তু আমাদের মধুপুরের মত নয়। ওখানে দৌড়ঝাঁপ নেই লোকে মনের আনন্দে খায়, মেয়েরা সব সময়ই নতুন নতুন খাবারের কথা ভাবে। এই মেনিদির রান্নাই দ্যখনা।

মেনিদি: কেন বারে বারে আমার রান্নার কথা বলছো ভুতো। রান্না সম্বন্ধে আমরা কি সহরের কাছ থেকে কম শিখেছি ?

বিমল: দেখুনতো মেনিদি। নতুন জিনিষতো সহরেই আগে আসে তারপর যায় মফস্বল গ্রামে। ইলেকট্রিক গ্যাস' এ্যালুমিনিয়াম সবইতো সহরে প্রথম এসেছিল।

বিনয়: আপনি রান্নাবান্নার কথা বলছেন তো "ডালডার" কথাই ধরুননা। "ডালডা" এখন সহরে গ্রামে লক্ষ, লক্ষ পরিবারে ব্যবহার হচ্ছে কিন্তু "ডালডা" প্রথম এসেছিল কোলকাতা সহরেরই বাজারে।

ভুতোদা: তুমিও কি "ডালডা" ব্যবহার কর নাকি মেনিদি:

মেনিদি: নিশ্চয়ই। আজকের সব রান্নাই তো "ডালডা"য় হয়েছে।

ভুতোদা এ্যাঁ: ! ডাল, চচ্চড়ি, শুক্‌তো, মাছ, মাংস, সবই "ডালডা"য় ? আমিতো জানতাম "ডালডা"য় শুধু ভাজা-ভুজিই হয়।

বিমল: কেন ভুতোদা আপনাকে তো আমরা আগেই বলেছি যে "ডালডা" সব রান্নার পক্ষেই ভাল এবং পুষ্টিকর। সেইজন্য এখন লক্ষ লক্ষ বাড়ীতে "ডালডা" ব্যবহার হচ্ছে।

ভুতোদা: ও: সেইজন্যে ! মেনিদি, আমি তাই ভাবছিলাম যে তোমার মধুপুরের বাড়ীর রান্নাটা এত বেশী ভাল হয়েছিল কেন। এতক্ষণে বুঝলাম

মেনিদি: আমার মধুপুরের বাড়ীতেও সব রান্নাই "ডালডায়" হয়। তুমি যেদিন খেয়েছিলে সেদিনও সব রান্নাই "ডালডায়" হয়েছিল।

বিমল: কি ভুতোদা, আর সহরের নিন্দে করবেন।

DL/P. 3B-X52 BG

হিন্দুস্থান লিভার লিমিটেড বোম্বাই
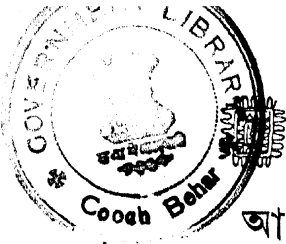
মেয়েদের কথা

আধুনিক নারী জীবন ও তার সমস্যা

(প্রতিবাদ)

শ্রীমতী অম্বুজবালা দেবী লিখিত "আধুনিক নারী জীবন ও তার সমস্যা" শীর্ষক প্রবন্ধটী পাঠ করিয়া তাঁহার সহিত সকল বিষয়ে এক মত হইতে পারিলাম না। এই সম্বন্ধে আমার কিছু বলিবার আছে। তিনি আধুনিক নারী-জীবনের কেবল খারাপ দিকটাই দেখাইয়াছেন,—আজ সামাজিক জীবনে নারী সমান অধিকার পাওয়ায় কুপথ-গামিনীই হইয়াছে! বর্ত্তমান যুগে নারীদের কর্ত্তব্য ও দায়িত্ব পূর্ব্ব হইতে অধিকতর বৃদ্ধি পাইয়াছে এবং অনেক জটিল সমস্যার সম্মুখীন হইতে হইয়াছে। পূর্ব্বে তাঁহাদের স্থান ছিল অন্তঃপুরে, সেখানে সকলের প্রতি যথাযথ কর্ত্তব্য পালন করিলেই তাহার কাজ শেষ, কিন্তু এখন ত কেবল অন্তঃপুরেই তাঁহার কর্ত্তব্য সীমাবদ্ধ নয়। বাহিরের বৃহৎ কর্ম্মক্ষেত্রেও নারীকে পুরুষের পাশে দাঁড়াইতে হইবে, এমতাবস্থায় নারী যদি সর্ব্ব প্রকার কার্য্যে উপযুক্তা বা শিক্ষিতা না হয়, তাহা হইলে পৃথিবীর এই দ্রুত পরিবর্ত্তনের যুগে নারী সমান তালে অগ্রসর হইতে পারিবে কি? রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক ইত্যাদি নানা প্রকার পরিবর্ত্তনের ফলে আজ বাঙ্গালীসমাজ বিপর্য্যস্ত। এই দুর্দ্দিনেও নারী সমাজের কিছুই করিবার নাই? পৃথিবীর কোন্ সভ্যদেশের নারী-সমাজ আজ সব কিছু হইতেই বিচ্ছিন্ন হইয়া গৃহ কোণে আবদ্ধ? নানা কারণে বাঙ্গালী জাতি আজ সর্ব্বস্ব হারা, ঘরে ঘরে অভাব অনটন। পূর্ব্বের সেই গোলা-ভরা ধান, পুকুর-ভরা মাছ আর নাই। জীবনের নিশ্চিন্ত আরামটুকু আজ কোথায়? আজ তাঁহারা উদয়াস্ত পরিশ্রম করিয়া দৈনন্দিন জীবনের ব্যয় সঙ্কুলান করিয়া উঠিতে পারিতেছেন না। অথচ তাঁহাদেরই সহধর্ম্মিণী বা ভগ্নী বা কন্যা হইয়া কেবল সুন্দর পুতুলের মত বসিয়া নীরব দর্শক হইয়া থাকিবে? সেই স্থলে নারীদের যদি স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া চাকুরী করিয়া তাহাদের এই প্রাণান্ত পরিশ্রমে সাহায্য করিতে আগাইয়া আসিতে দেখা যায় তাহা হইলে তাহাদের সহানুভূতিশীলা, সহৃদয়া না বলিয়া তাহাদের "স্বার্থ গৃধ্নু", "আত্মকেন্দ্রিক" ইত্যাদি বলিয়া অপবাদ দেওয়া যায় কি?

পুরুষ হইতে মেয়েদের চাকুরী করার অনেক অসুবিধা। পুরুষের সারাদিনের খাটুনীর পর গৃহে ফিরিলেই তার নিরবচ্ছিন্ন অবসর। কিন্তু মেয়েরা কর্ম্মক্লান্ত দেহে গৃহে ফিরিয়াই আবার চতুর্দ্দিকে সহস্র প্রকার অসমাপ্ত কাজে ব্যস্ত হইয়া পড়ে। ছুটীর দিনেও পুরুষের মত ছুটীর আনন্দ উপভোগ করার সময় থাকে না। সেদিনও হাজার রকমের সব "উপরি কাজ" জমা থাকে। কাজেই কোন নারীই অত্যন্ত প্রয়োজন না হইলে কেবল সখের খাতিরে "ফুটানিকা ডিবা" হাতে লইয়া গট্ গট্ করিয়া চাকুরী করিতে যান না। নারী যতই বাহিরের কাজে নিযুক্ত থাকুক না কেন, যতই পুরুষালি কাজে ব্যস্ত থাকুক না কেন, অন্তরে তার সেই চিরন্তনী কল্যাণী নারীই বিরাজ করছে। বিশেষতঃ যে নারী একবার জননীতে পরিণত হয়েছে তার মধ্যে নারীত্বের পরিপূর্ণ বিকাশ দেখা যায়। নিজ প্রিয় পরিজনের বর্ত্তমান ও ভবিষ্যত চিন্তায় অস্থির হইয়াই নারী বাহির ও ভিতরে অক্লান্ত পরিশ্রম করিয়া যাইতেছে। একমাত্র তাহাদের ঐকান্তিক মঙ্গল কামনায় তাহার এই নিরলস অধ্যবসায়। কাজেই শ্রীমতী লেখিকা মহাশয়া যে লিখিয়াছেন—"স্ত্রী হয়ত তাঁর অফিসের কোন বন্ধুর সঙ্গে ছুটীর পর বেড়িয়ে বা সিনেমা দেখে, কাফেতে-নৈশ-ভোজন ও স্বাস্থ্য পান করে ঘরে ফিরলেন,......নৈশ বিহারিণী এসে ছেলেমেয়েদের প্রহার ও স্বামীর সঙ্গে কলহ করে আধুনিকাত্ব প্রকাশ করলেন—," এই উক্তি শুধু অদ্ভুত ও হাস্যকরই নয়—ঘোরতর আপত্তিকর ও অপমানজনকও বটে।

তারপর ধরা যাক্ যে মেয়েরা ঘরে থাকেন—তাঁদের কথা। তিনি লিখিয়াছেন, "তাঁরা সারাদিনই সংসার

ধর্ম্ম ফেলে রেখে এখানে সেখানে ঘুরে বেড়ান, সিনেমায় যান, ট্রামে বাসে ভিড় ঠেলে নিজ আসনে ব'সে আত্মপ্রসাদ লাভ করেন"—একথা একবারেই অবান্তর। নারীর কাছে সবচেয়ে প্রিয় তার ছোট সংসারটী। কত মমতাই তার সংসারের প্রতি জিনিষটির উপর। সকল কাজ করে সাজিয়ে গুছিয়ে কতই না তৃপ্তি পায়। সুতরাং সারাদিন কর্ম্মব্যস্ততার পর সন্ধ্যায় পার্কে বা সিনেমায় কিছুটা সময় যদি আনন্দে কাটায়, কিংবা দুপুর বেলা পার্শ্ববর্ত্তিনী কোন বান্ধবীর সঙ্গে অবসর কাটায় তা কি নিন্দনীয়? তারপর অন্য একজায়গায় তিনি লিখিয়াছেন—"আজ সমাজের শাসন উদার হওয়ায় মেয়েরা নিজের ইচ্ছামত পথ ধরে চলবার সুযোগ পেয়েছে। 'ভ্রষ্টা' শব্দ অভিধান থেকে উঠে যাচ্ছে। আজ আর কেউ পতিতা নয়। তবে অধঃপতিতা হতে পারে।" তিনি কি বলতে চান যে সমাজের শাসন উদার হওয়ায় আজ প্রতিটী নারীই কুপথগামিনী দুশ্চরিত্রা? তিনি নিজে একজন নারী হইয়া কি ভাবে এই সকল অশোভন নিন্দাবাচক শব্দগুলি নারীদের প্রতি প্রয়োগ করিলেন ভাবিয়া লজ্জিত ও বিস্মিত হইতেছি। তিনি কি আবার মেয়েদের অসূর্য্যম্পশ্যা হইতে বলেন? আবার পূর্ব্বের 'সতীদাহ প্রথা' 'বাল্য-বিবাহ' ইত্যাদি কুপ্রথাগুলিই সমর্থন করেন?

প্রধান কথা হইতেছে, আমাদের দেখিতে হইবে যে আধুনিকতায় আজকের নারীসমাজ যেন উচ্ছৃঙ্খলাকে সমর্থন না করেন। নিজের রূপ বেশভূষা সমস্তই আধুনিকের নামে বিকৃত করিয়া না ফেলেন। নিজ দেশের জাতীয় বৈশিষ্ট্য ও আদর্শ হইতে বিচ্যুত না হন। যদিই বা কোন কোন নারীকে নিন্দনীয় আচরণ করিতে দেখা যায় তবে সেই কয়জনকে লইয়াই কি সমস্ত নারীদের বিচার করিতে হইবে? না তাহাই উচিত?

আজ প্রতিটী নারীর মনে জাগরুক হোক—দৃঢ় মনোবল, আত্মনির্ভরশীলতা, কঠোর নৈতিক চারিত্রিক মর্য্যাদা। আজ প্রতিটী নারীই স্নেহে প্রেমে দয়ায় তিতীক্ষায় ত্যাগে 'আদর্শ ভারতের নারী' হইয়া গড়িয়া উঠুক এই প্রার্থনা।

—জনৈকা পাঠিকা
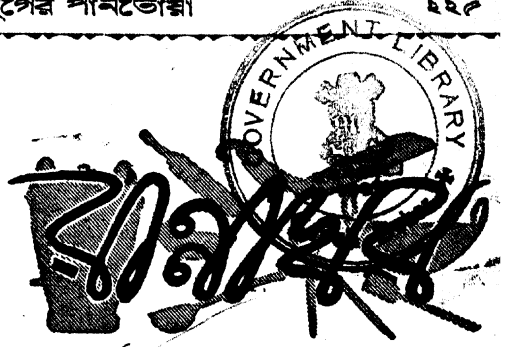
মুগ সাপলি ও মুগের পানতোয়া

উপকরণ:—মুগের ডাল তিন পোয়া, গুড় আধ সের; মাঝারি সাইজের নারিকেল ১টী; তেল, ঘি, লঙ্কা, গোলমরিচ চায়ের চামচের এক চামচ; ছোট এলাচ ৬টী, কিছু চালগুঁড়ি বা সবেদা।

প্রথমে নারকেলটা ভেঙ্গে কুরে নিয়ে, এক [illegible]ড় দিয়ে চাঁই তৈরি করে রাখুন। ছোট এলাচগুলি [illegible] নারকেল-চাঁইয়ে মাখিয়ে দিন। তারপর মুগের ডালগু[illegible] ভাল করে ভেজে নিয়ে তাতে লঙ্কাগুলি দিয়ে এমন ভাবে জল দেবেন যাতে সিদ্ধ হয় অথচ জলও থাকবে না, আবার খুব গলেও যাবে না। ঐ ভাবে সিদ্ধ হয়ে গেলে নামিয়ে অল্প গরম থাকতে থাকতে বাকি গুড়, চালগুঁড়ি বা সবেদা এবং গোলমরিচ গুঁড়ো দিয়ে চট্‌কিয়ে নিন। তবে কিন্তু ডালগুলি খুব চট্‌কানো চলবে না, কতক কতক আস্ত থাকলে খেতে আরো ভাল হয়। এইবার অল্প ঘি নিয়ে আঙ্গুলের চাপ দিয়ে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে ঠোঙার মত করে তার ভেতর পরিমাণ মত নারকেল-চাঁইয়ের পুর (যা—আগে তৈরি করে রেখেচেন) দিয়ে দু'-পাশ থেকে মুড়ে দিয়ে পানতোয়ার মত করে তৈরি করে থালায় সাজিয়ে রাখুন। এইভাবে প্রথম সবগুলি তৈরি করে নেবেন। তারপর কড়াই করে ঘি বা তেল দিয়ে ভেজে নিন। তা হলেই "মুগ সাপলি" তৈরি হল। এই বর্ষার সময় ইহা খেতে খুবই চমৎকার লাগে। আবার এতে নারকেল চাঁইয়ের পরিবর্তে ক্ষীরের পুর দিয়ে চিনির পাতলা করে রস তৈরি করে নিয়ে তাতে একটু গরম থাকতে থাকতে ভিজিয়ে দিলেই "মুগের পানতোয়া" তৈরি হয়। মুগের পানতোয়া তৈরি করার জন্য সিদ্ধ করা ডালগুলি বেশ মিহি করে চটকিয়ে নিতে হয়, আর উপকরণের মধ্য থেকে লঙ্কাগুলি বাদ দিতে হয়। "মুগের পানতোয়া"ও অতি উপাদেয় জিনিস। বাড়ীতে নিজেরা তৈরি করে খেয়ে এবং পরিজনকে খাইয়ে খুবই আনন্দ পাবেন।

—শ্রীমতী রাণী চক্রবর্তী
(চন্দননগর)

অতুল দত্ত

আন্তর্জাতিক রাজনীতিক্ষেত্রে উত্তেজনা আপাততঃ কতকটা হ্রাস পাইয়াছে। পূর্ব্ব ও পশ্চিমের পররাষ্ট্র সচিবরা জেনেভায় মিলিত হওয়ায় এবং ইহার পর শীর্ষ সম্মেলন বসিবার সম্ভাবনা থাকায় দুই পক্ষে আপোষ-মীমাংসার একটা চাপা আশা অনেকেই পোষণ করিতেছেন।

জেনেভা সম্মেলন—

গত ফেব্রুয়ারী মাসের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী গত ১১ই মে হইতে জেনেভায় চতুঃশক্তির (বৃটেন, আমেরিকা, ফ্রান্স ও মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র) পররাষ্ট্র-সচিবরা মিলিত হইয়াছিলেন। এই সম্মেলনে তাঁহাদের আলোচ্য বিষয় ছিল তিনটি—বার্লিন্ প্রসঙ্গ, জার্ম্মানীর সহিত সন্ধি-চুক্তির প্রশ্ন এবং ইউরোপীয় নিরাপত্তার প্রশ্ন। সোভিয়েট ইউনিয়নের প্রস্তাব—পশ্চিম বার্লিনকে স্বাধীন নগরীতে পরিণত করিতে হইবে; পশ্চিম ও পূর্ব্ব জার্ম্মানীর স্বতন্ত্র সত্তা স্বীকার করিয়া জার্ম্মানীর সহিত সন্ধি-চুক্তি সম্পাদন করিতে হইবে; মধ্য ইউরোপকে অর্থাৎ জার্ম্মানীর দুই অংশ, পোল্যাণ্ড চেকোশ্লোভাকিয়াকে পরমাণবিক অস্ত্র হইতে মুক্ত করিতে হইবে এবং সেই সঙ্গে সাধারণ অস্ত্র হ্রাস করিবার কাজও চলিতে থাকিবে। এই প্রস্তাবের উত্তরে পাশ্চাত্য শক্তিবর্গ তিনটি প্রসঙ্গ একত্র করিয়া একটি মিলিত প্রস্তাব (Package deal) উত্থাপন করেন। এই প্রস্তাব তিনটি পর্য্যায়ে বিভক্ত। প্রথম পর্য্যায়ে বার্লিন সম্পর্কে অস্থায়ী ব্যবস্থা এই যে, জার্ম্মান সমস্যার সমাধান সাপেক্ষে বার্লিন্ ঐক্যবদ্ধ নগরীতে পরিণত হইবে। দ্বিতীয় পর্য্যায়ে জার্ম্মানীর জন্য নির্ব্বাচনী আইন রচনার উদ্দেশ্যে একটি কমিশন নিযুক্ত হইবে; এই সময়ে সোভিয়েট ইউনিয়নের ও মার্কিণ যুক্ত-রাষ্ট্রের সৈন্য-সংখ্যা পঁচিশ লক্ষ করা হইবে এবং আকস্মিক আক্রমণের সম্ভাবনা নিবারণের জন্য তদারকী ব্যবস্থা থাকিবে। তৃতীয় পর্য্যায়ে—আড়াই বৎসরের মধ্যে নির্ব্বাচনী আইন অনুমোদনের জন্য গণভোট গৃহীত হইবে। তাহার পর সর্ব্ব-জার্ম্মান পরিষদ গঠিত হইয়া সেই পরিষদে শাসনতন্ত্র রচিত হইবে। তদনুসারে সর্ব্ব-জার্ম্মান গভর্ণমেণ্ট গঠিত হইলে সন্ধি-চুক্তি সম্পাদিত হইবে। এই সময়ের জন্য ইউরোপের নির্দ্দিষ্ট অঞ্চলে দুই পক্ষের সর্ব্বাধিক সৈন্য-সংখ্যা নির্দ্ধারিত করিয়া দেওয়া হয়। জার্ম্মানীর সহিত সন্ধি-চুক্তি সম্পাদিত হইবার পর সেখান হইতে সমস্ত বৈদেশিক সৈন্য অপসারিত হইবে। তাহার পর সোভিয়েট ইউনিয়নের ও মার্কিণ যুক্ত-রাষ্ট্রের সৈন্য-সংখ্যা প্রথমে ২১ লক্ষে এবং পরে ১৭ লক্ষে নামান হইবে। পশ্চিমী শক্তিবর্গের প্রস্তাবটি স্পষ্টতঃই অত্যন্ত জটিল। তাঁহারা বার্লিনের ভাগ্যকে জার্ম্মানীর সহিত যুক্ত করিয়াছেন এবং জার্ম্মানী সম্পর্কে তাঁহারা পুরাতন নীতি অনুসারে নির্ব্বাচনের কথাই বলেন। তবে দুইটি অঞ্চলে স্বতন্ত্র নির্ব্বাচনের ব্যবস্থা হইতে পারে বলিয়া তাহাদের প্রস্তাবে একটা ইঙ্গিত ছিল। সঙ্গে সঙ্গে তাহাদের জিদ—অভিন্ন সর্ব্ব-জার্ম্মান গভর্ণমেণ্ট গঠিত হইবে এবং সেই গভর্ণমেণ্টের সহিত সন্ধি-চুক্তি না হওয়া পর্য্যন্ত বৈদেশিক সৈন্য জার্ম্মানীতে থাকিবে। মধ্য-ইউরোপের পারমাণবিক অস্ত্রসজ্জা ও সাধারণ অস্ত্রসজ্জা সংক্রান্ত সকল প্রশ্নই জার্ম্মানী সংক্রান্ত প্রশ্নের সহিত সংশ্লিষ্ট। অথচ, জার্ম্মানী সম্পর্কে যে প্রস্তাব করা হয়, তিনটি ধাপ অতিক্রম করিতে তাহার অন্ততঃ পাঁচ বৎসর (তাহার বেশীও হইতে পারে) প্রয়োজন। সোভিয়েট ইউনিয়ন স্বভাবতঃ এই প্রস্তাব সম্বন্ধে আলোচনা করিতে আপত্তি করে এবং প্রসঙ্গগুলি স্বতন্ত্র-ভাবে আলোচনার দাবী জানায়। শেষ পর্য্যন্ত এই জটিল প্রস্তাব হইতে বার্লিন্ প্রসঙ্গ আলাদা করিয়া সেই সম্পর্কে পররাষ্ট্র-সচিব সম্মেলনে আলোচনা চলে। কিন্তু ছয় সপ্তাহব্যাপী আলোচনা মীমাংসার দিকে অগ্রসর হয় না। সোভিয়েট ইউনিয়ন পশ্চিম বার্লিনে পাশ্চাত্য শক্তি-বর্গের দখলকারী অধিকারের অবসান চায়; পক্ষান্তরে পাশ্চাত্য শক্তিবর্গ এই অধিকার ত্যাগ করিতে কিছুতেই সম্মত নন—তাঁহারা কিছু সৈন্য হ্রাস করিবার আগ্রহ প্রকাশ করেন মাত্র। বার্লিন্ নগরী দ্বিধা বিভক্ত জার্ম্মানীর পূর্ব্বাংশে অবস্থিত, এই নগরীর পশ্চিমাংশে পাশ্চাত্য তিনটি শক্তির দখলকারী অধিকার প্রতিষ্ঠিত। অর্থাৎ, কমুনিষ্ট-শাসিত পূর্ব্ব-জার্ম্মানীর অভ্যন্তরে পশ্চিম বার্লিন্ পাশ্চাত্য শক্তিবর্গের পর্য্যবেক্ষণ-ঘাঁটী-রূপে কাজ করিতেছে। এইজন্য বর্ত্তমান ঠাণ্ডা লড়াইয়ের যুগে অর্থাৎ সর্ব্বাত্মক সমর প্রস্তুতির সময়ে পশ্চিম বার্লিনে দখলকারী অধিকার যেমন পাশ্চাত্য শক্তিবর্গের নিকট গুরুত্বপূর্ণ, তেমনি সোভিয়েট ইউনিয়নের পক্ষে বিরুদ্ধ শক্তির এই অগ্রবর্ত্তী পর্য্যবেক্ষণ-ঘাঁটীর উচ্ছেদও একান্ত আবশ্যক। দুই পক্ষের এই বিপরীত স্বার্থের সহিত সামঞ্জস্য রাখিয়া সোভিয়েট ইউনিয়নের পক্ষ হইতে প্রস্তাব করা হইয়াছিল—পশ্চিম বার্লিনে পাশ্চাত্য শক্তিবর্গের দখলকারী অধিকারের অবসান ঘটাইয়া আপাততঃ ইহাকে স্বাধীন নগরীতে পরিণত করা হউক, জার্ম্মানীর সহিত সন্ধি-চুক্তি সম্পাদিত হইবার পর খণ্ডিত জার্ম্মানী যখন ঐক্যবদ্ধ হইবে, তখন সমগ্র রাজ্যের রাজধানীরূপে ঐক্যবদ্ধ বার্লিন্ তাহার ঐতিহাসিক মর্য্যাদায় প্রতিষ্ঠিত হইতে পারিবে। পশ্চিম বার্লিনের সমাজ-ব্যবস্থার নিরাপত্তার জন্য পশ্চিমী শক্তিবর্গকে সন্তোষজনক ব্যবস্থা করিতে দিতে সোভিয়েট ইউনিয়ন সম্মতি জানাইয়াছিল। বার্লিন সম্পর্কে সোভিয়েট ইউ-নিয়নের উত্থাপিত এই প্রস্তাবে যে পরিস্থিতির উদ্ভব ঘটে, সে সম্পর্কে আলোচনা করাই জেনেভা সম্মেলনের উদ্দেশ্য। অথচ, পাশ্চাত্য শক্তিবর্গ আলোচনা বৈঠকে মিলিত হইতে সম্মত হইলেও সোভিয়েট প্রস্তাবকে

LIFEBUOY
SOAP
LIFEBUOY
SOAP
LIFEBUOY
SOAP
লাইফবয় সাবান দিয়ে স্নান
করলে পাবেন সেই
পরিস্কার ও ঝরঝরে আমেজ।

আলোচনার ভিত্তিরূপে গ্রহণ করিতে একেবারেই প্রস্তুত নন। বিপরীত মনোভাব লইয়া জেনেভায় ছয় সপ্তাহ আলোচনা চলিবার পর জুন মাসের তৃতীয় সপ্তাহে সাময়িকভাবে আলোচনা স্থগিত রাখা হয়; ১৩ই জুলাই হইতে পুনরায় জেনেভায় চতুঃশক্তির পররাষ্ট্র সচিবদের আলোচনা আরম্ভ হইয়াছে।

সিঙ্গাপুরের স্বাধীনতা—

গত ১লা জুন হইতে সিঙ্গাপুর কমনওয়েলথের মধ্যে সীমাবদ্ধ স্বাধীনতা লাভ করিয়াছে। ১৯৫৭ সালে সিঙ্গাপুরের তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী মিঃ লিম্ ইউ হক্ লণ্ডনে যাইয়া সিঙ্গাপুরের স্বায়ত্ত শাসনাধিকার সম্বন্ধে এক চুক্তি করিয়া আসেন। সেই চুক্তি অনুসারে রচিত শাসনতন্ত্রের বিধান অনুযায়ী গত মে মাসের শেষভাগে সিঙ্গাপুরে সাধারণ নির্ব্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। লী কুয়ান্ ইউর নেতৃত্বাধীন চরম বামপন্থী দলটি এই নির্ব্বাচনে বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করিয়াছে। লী কুয়ান্ ইউর দলটি লিম্ ইউ হকের মূল পিপ্‌ল্‌স্ য়্যাক্‌শান্ পার্টির বামপন্থী শাখা। লিম্ ইউ হক্ তাঁহার দলের দক্ষিণপন্থীদিগকে লইয়া সোস্যালিষ্টদের সহিত একত্রে সংযুক্ত সোস্যালিষ্ট ফ্রন্ট গঠন করিয়াছিলেন। এই ফ্রন্ট সাধারণ নির্ব্বাচনে শোচনীয়ভাবে পরাজিত হইয়াছে। গত ১৯৫৭ সালের চুক্তি অনুসারে সিঙ্গাপুর কমনওয়েলথের অভ্যন্তরে স্বায়ত্ত শাসনাধিকার পাইয়াছে; কিন্তু পায় নাই প্রতিরক্ষা ব্যবস্থায় কর্তৃত্ব, পায় নাই স্বাধীন পররাষ্ট্রনীতি অনুসরণের অধিকার। আর যে আভ্যন্তরীণ নিরাপত্তা সংক্রান্ত প্রশ্নে মতদ্বৈধের জন্য ১৯৫৬ সালে সিঙ্গাপুরের তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী মিঃ মার্শালের সহিত বৃটিশ উপনিবেশ দপ্তরের আলোচনা ভাঙ্গিয়া গিয়াছিল, সেই সম্পর্কেও একটা গোঁজামিল দিয়া মিঃ লিম্ ইউ হক্ পরের বৎসর বৃটিশ কর্তৃপক্ষের সহিত মীমাংসা করিয়া আসেন। তাঁহার সহিত বৃটিশ উপনিবেশ দপ্তরের মীমাংসার সর্ত্তগুলি নিম্নলিখিতরূপ—দেশরক্ষা, পররাষ্ট্রীয় সম্পর্ক, বহির্ব্বাণিজ্য এবং অন্য দেশের সহিত সাংস্কৃতিক সম্পর্ক সংক্রান্ত বিষয়গুলি বৃটিশের কর্তৃত্বাধীন থাকিবে। সিঙ্গাপুরের নৌঘাঁটীতে ও বিমান ঘাঁটীতে পূর্ণ কর্তৃত্ব থাকিবে বৃটেনেরই। অন্যান্য ক্ষেত্রে নির্ব্বাচিত প্রতিনিধি মণ্ডলী স্বায়ত্ত শাসনাধিকার লাভ করিবেন। আভ্যন্তরীণ নিরাপত্তা সম্পর্কে এই ব্যবস্থা হয় যে, তিন জন সিঙ্গাপুরী মন্ত্রী, তিন জন বৃটিশ কর্মচারী এবং মালয়ের একজন মন্ত্রী লইয়া আভ্যন্তরীণ নিরাপত্তা পরিষদ গঠিত হইবে। এই পরিষদের উপর আভ্যন্তরীণ নিরাপত্তা রক্ষার দায়িত্ব থাকিবে। ইংলণ্ডের রাণীর প্রতিভূরূপে একজন মালয়ী সিঙ্গাপুরের রাষ্ট্রপ্রধান হইবেন। তাঁহার উপাধি হইবে "য়াং ডিপার্টুয়ান্ নাগারা"। শাসনতন্ত্র প্রবর্ত্তিত হইবার পর প্রথম ছয় মাস বৃটিশ হাই কমিশনার ও য়াং ডিপার্টুয়ান্ নাগারার পদ সংযুক্ত থাকিবে। প্রয়োজন অনুভূত হইলে শাসনতন্ত্র বাতিল হইতে পারিবে এবং বৃটিশ হাই কমিশনার তখন শাসনক্ষমতা হাতে লইতে পারিবেন। এই নির্দ্দিষ্ট কাঠামোর মধ্যে সিঙ্গাপুরের শাসনতন্ত্র রচিত হইয়াছিল। এই শাসনতন্ত্র অনুযায়ী অনুষ্ঠিত নির্ব্বাচনে বিজয়ী মিঃ লিউ কুয়ান্ ইউর বামপন্থী পিপ্‌ল্‌স্ য়্যাক্‌শান দল সিঙ্গাপুরের অপেক্ষাকৃত দরিদ্র শ্রেণীর এবং তরুণদের মনে উদ্দীপনা সঞ্চারে সমর্থ হইয়াছে। এই দল নিজেকে সোস্যালিষ্ট বলিয়া পরিচয় দেয়। ইহাদের পক্ষ হইতে দরিদ্র শ্রেণীকে ধনীর শোষণ হইতে রক্ষা করিবার প্রতিশ্রুতি দেওয়া হইয়াছে। দেশী ও বৈদেশিক কায়েমি স্বার্থের প্রভুত্ব হইতে এবং সামাজিক ও রাজনৈতিক দুর্নীতি হইতে সিঙ্গাপুরকে রক্ষা করিবার অঙ্গীকার শোনান হইয়াছে। এই প্রতিশ্রুতি ও অঙ্গীকার সিঙ্গাপুরের অধিকাংশ অধিবাসীর—বিশেষতঃ এই দ্বীপের আশী জন চীনা অধিবাসীর মনে গভীর রেখাপাত করিয়াছে। সিঙ্গাপুর বস্তুতঃ একটি নগর-রাষ্ট্র; ইহার চতুঃপার্শ্বে প্রয়োজনীয় কৃষিক্ষেত্র নাই। এই দ্বৈপায়ন নগরকে মালয়ের সহিত সংযুক্ত করা স্বভাবতঃ বামপন্থী পিপ্‌ল্‌স্ য়্যাক্‌শান্ দলের লক্ষ্য। অবশ্য, মালয়ের বর্ত্তমান দক্ষিণপন্থী গভর্ণমেণ্ট পূর্ব্বাহ্নেই প্রকাশ করিয়াছেন যে, এই দলের দ্বারা শাসিত সিঙ্গাপুরকে তাঁহারা কিছুতেই মালয়ে ভিড়িতে দিবেন না। সিঙ্গাপুরের অর্থনীতিতে স্থৈর্য্য আনয়ন পিপ্‌ল্‌স্ য়্যাক্‌শান্ দলের অন্যতম বিঘোষিত নীতি।

ইন্দোনেশিয়ার রাজনীতি—

ইন্দোনেশিয়ার প্রতিক্রিয়াপন্থী রাজনীতিকদের চক্রান্তে সুমাত্রায় যে সশস্ত্র বিদ্রোহ ঘটিয়াছিল, তাহা দমিত হইলেও প্রতিক্রিয়াপন্থীদের অশুভ চক্রান্তের অবসান হয় না। সরকারের প্রগতিশীল নীতিগুলি ব্যর্থ করিবার জন্য চেষ্টা চলিতে থাকে। তাহাদের এই জাতীয়তা-বিরোধী তৎপরতা বন্ধ করিবার উদ্দেশ্যে ডাঃ সোয়েকার্ণো গত এপ্রিল মাসে ১৯৫০ সালের শাসনতন্ত্র স্থগিত রাখিয়া তাহার পরিবর্ত্তে ১৯৪৫ সালের বৈপ্লবিক শাসনতন্ত্র প্রবর্ত্তনের প্রস্তাব করিয়াছিলেন। কিন্তু প্রধানতঃ সাম্প্রদায়িকতাপন্থী প্রতিক্রিয়াশীল দলগুলির বিরোধিতার জন্যই এই প্রস্তাব কার্য্যে পরিণত হইতে পারে নাই; গত মে মাসে গণপরিষদে প্রয়োজনীয় দুই-তৃতীয়াংশ ভোট এই প্রস্তাবের পক্ষে লাভ করা যায় নাই। ১৯৪৫ সালের শাসনতন্ত্র প্রবর্ত্তনের প্রস্তাব সম্বন্ধে আলোচনার সময় সাম্প্রদায়িকতাবাদী মাসজুমি, নাহাদাতুল প্রভৃতি দলগুলি আল্লাহ'র প্রতি বিশ্বাস ও ইসলামীয় আচরণবিধি সংবিধানের মুখবন্ধে উল্লেখ করিতে চান। অর্থাৎ তাহারা জাতীয়তাবাদী দলের প্রগতিশীল নীতির বিরোধিতা করিবার জন্য ধর্ম্মীয় সংস্কারের দোহাই দিয়া দেশের জনসাধারণকে প্রভাবিত করিতে চেষ্টা করিয়াছেন এবং কম্যুনিষ্ট-বিরোধী সাজিয়া বৈদেশিক সাহায্যের আশা পোষণ করিয়াছেন। উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, ইন্দোনেশিয়ার সুমাত্রায় ও সেলিবিসে পাল্টা গভর্ণমেণ্ট প্রতিষ্ঠা করিয়া প্রতিক্রিয়াপন্থীরা বৈদেশিক সাহায্যে টিকিয়া থাকিবে বলিয়া আশা করিয়াছিল। ইন্দোনেশিয়ার এক অংশকে কম্যুনিষ্ট-বিরোধী ঘাঁটীরূপে ব্যবহার করিতে দিবার আশ্বাস দিয়া তাহারা বৈদেশিক সাহায্য খুঁজিয়াছিল এবং সে সাহায্য পাইয়াছিলও।

তিব্বত ও চীন-ভারত সম্পর্ক—

গত মার্চ্চ মাসের শেষভাগে দালাই লামা ও তাঁহার সঙ্গিগণ ভারতে আশ্রয় লইবার পর বার চৌদ্দ হাজার তিব্বতী আশ্রয়প্রার্থীও

ভারতে আসিয়া আশ্রয় লইয়াছে। তিব্বতের প্রতি চীনের আচরণ অত্যন্ত অন্যায় হইয়াছে এবং তাহার প্রতিবিধানের জন্য ভারতের উদ্যোগী হওয়া উচিত—এই ধরণের উগ্র প্রচার একশ্রেণীর ভারতীয়রা করিতেছেন। বোম্বাইতে এক অশান্ত জনতা মাও সে-তুংএর প্রতিকৃতির অবমাননা করে। ভারত সরকারও—বিশেষতঃ শ্রীনেহরু স্বয়ং তিব্বত সম্পর্কে চীনের সরকারী বক্তব্যের প্রতি সন্দেহ প্রকাশ করিয়াছেন; তিব্বতের সাম্প্রতিক অভ্যুত্থানকে চীনা কর্তৃপক্ষ প্রতিক্রিয়াশীল সুবিধাভোগীদের চক্রান্তের ফল বলিয়া অভিহিত করিয়াছিলেন। কিন্তু শ্রীনেহরু ইহাকে জাতীয় অভ্যুত্থান আখ্যা দেন। এই সব কারণে ভারত ও চীনের মধ্যে একটু মন কষাকষি হইয়াছে। এই সম্পর্কে শ্রীনেহরু এক বিবৃতিতে বলেন যে, চীন-ভারতের মধ্যে "নীরবতার প্রাচীর" উঠিয়াছে। অবশ্য, তিব্বত প্রসঙ্গ উপলক্ষ করিয়া চীনের সহিত ভারতের বিরোধ ঘনাইয়া আসে, ইহা শ্রীনেহরুর কাম্য নহে। তিনি এই ধরণের আশা প্রকাশ করিয়াছিলেন যে, শেষ পর্য্যন্ত তিব্বত সম্পর্কে একটা শান্তিপূর্ণ মীমাংসা হইয়া যাইবে। জাতিসঙ্ঘে চীনের আসনের জন্য ভারত যে দাবী জানাইয়া আসিতেছে, তাহা পরিত্যক্ত হইবে না বলিয়াও তিনি জানাইয়াছেন। ইতিমধ্যে দালাইলামার এক বিবৃতি ভারত গভর্ণমেণ্টকে অত্যন্ত অসুবিধায় ফেলিয়াছে এবং তিব্বত সম্পর্কে (অর্থাৎ দালাই লামা ও তাঁহার সঙ্গীদের সম্পর্কে) চীনের সহিত শান্তিপূর্ণ মীমাংসার সম্ভাবনা দূর হইয়াছে। গত ২০শে জুন মুসৌরীতে (দালাইলামার বর্ত্তমান অবস্থান ক্ষেত্র) এক সাংবাদিক সম্মেলনে দালাই লামা বলেন, "মন্ত্রিগণ সহ আমি যেখানেই থাকি, সেখানেই তিব্বতের গভর্ণমেণ্ট।" অর্থাৎ তিনি নিজেকে ও তাঁহার সঙ্গীদিগকে তিব্বতের প্রবাসী গভর্ণমেণ্ট বলিয়া প্রতিপন্ন করিতে চাহেন। এই সাংবাদিক সম্মেলনের বিবৃতিতে তিব্বতে চীনা সামরিক কর্তৃপক্ষের জঘন্য অত্যাচারের ফিরিস্তি দেওয়া হইয়াছে; গত আট বৎসর ধরিয়া এই অত্যাচার নাকি সমানভাবে চলিতেছে এবং দালাইলামা দলবলসহ তিব্বত ত্যাগ করিবার পর এই অত্যাচারের মাত্রা নাকি আরও বাড়িয়াছে। দালাই লামা বলেন যে, ১৯৫০ সালের পূর্ব্বে তিব্বত বস্তুতঃ স্বাধীন ছিল; ঐ সময় চীনা গভর্ণমেণ্ট তিব্বতে সৈন্য পাঠাইয়া প্রকৃতপক্ষে স্বাধীন রাষ্ট্রের বিরুদ্ধেই আক্রমণ চালাইয়াছিলেন। অর্থাৎ এই বিবৃতিতে তিব্বতের উপর চীনের সার্ব্বভৌমত্ব অস্বীকার করা হইয়াছে যে সার্ব্বভৌমত্ব ভারত গভর্ণমেণ্ট কর্তৃক স্বীকৃত। দালাইলামা ১৯৫১ সালের চীন-তিব্বত চুক্তি বাতিল করিতে চাহিয়াছেন এবং বলিয়াছেন যে, ঐ চুক্তি "বেয়নেটের মুখে" সম্পাদিত হইয়াছিল। ঐ চুক্তিতে নাকি জাল মোহর অঙ্কিত হয়। দালাইলামার এই বিবৃতি সম্পর্কে ভারত গভর্ণমেণ্ট বলিয়াছেন যে, তাঁহারা দালাইলামা ও তাঁহার দলবলকে প্রবাসী গভর্ণমেণ্ট মনে করেন না এবং তাঁহাদের রাজনৈতিক ক্রিয়াকলাপও পছন্দ করেন না। বস্তুতঃ মুসৌরী বিবৃতিতে তিব্বত সম্পর্কে চীনের সহিত আপোষ-সম্ভাবনার একেবারে গোড়া ঘেঁষিয়া কোপ দেওয়া হইয়াছে। চীনের সহিত যে ভারতের প্রীতির সম্পর্ক এবং তিব্বতের উপর চীনের সার্ব্বভৌমত্ব যে ভারত মানিয়া লইয়াছে, তাহার মধ্যস্থ করিবার ক্ষমতা এই বিবৃতিতে একেবারেই নষ্ট করা হইয়াছে। কারণ তিব্বতের উপর চীনের সার্ব্বভৌমত্বের ভিত্তিতে ঐ অঞ্চলের স্বায়ত্ত শাসনাধিকার সম্পর্কেই শুধু আপোষ-আলোচনা সম্ভব, এবং ভারত সে আলোচনায় উদ্যোগী হইতে পারে। আপোষের আর দ্বিতীয় পন্থা নাই।

পরলোকে মিঃ ডালেস—

গত মে মাসে প্রাক্তন মার্কিণ পররাষ্ট্রসচিব মিঃ জন ফষ্টার ডালেসের পরলোক গমন একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা। গত ফেব্রুয়ারী মাসে জানা যায় যে, তিনি ক্যানসার রোগে আক্রান্ত হইয়াছেন। এই ব্যাধির আক্রমণেই তাহার জীবনাবসান ঘটে। মিঃ ডালেস দীর্ঘ ছয় বৎসর মার্কিণ পররাষ্ট্রনীতি পরিচালনা করেন। গণতান্ত্রিক রাজ্যের পররাষ্ট্রনীতি এক ব্যক্তির দ্বারা নির্দ্ধারিত হয় না সত্য। তবে, পররাষ্ট্র দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রিরূপে মার্কিণ পররাষ্ট্রনীতির দায়িত্ব প্রধানতঃ তাঁহারই। এই নীতির অবশ্য বহু বিরুদ্ধ সমালোচনা হইয়াছে। তবে, মিঃ ডালেসের দক্ষতায় ও আত্মবিশ্বাসে কাহারও সন্দেহ নাই। মিঃ ডালেসের স্থলাভিষিক্ত হইয়াছেন তাঁহারই সহকারী মিঃ কৃশ্চিয়ান হার্টার।

১৩।৭।৫৯
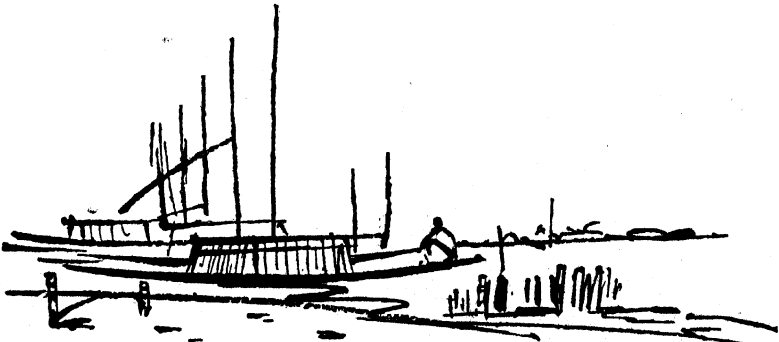
হীরেন্দ্র নারায়ন মুখোপাধ্যায়

(পূর্বপ্রকাশিতের পর)

আবার বিনিদ্র রাত্রি মুখর হয়ে ওঠে। সুরেখা গল্প করে। থাণ্ডেলওয়াল শোনে। সুদীর্ঘ পথের কথা। বিদেশী সহযাত্রীর সঙ্গে পাশাপাশি বসে মোটরে হাজার মাইল পথ অতিক্রমণের বিচিত্র অনুভূতির কথা সুরেখা অনর্গল বলে যায়। বলতে বলতে সারা দেহ-মন মাঝে মাঝে উদ্বেলিত হয়ে ওঠে উচ্ছ্বসিত আনন্দের মাদকতায়। থাণ্ডেলওয়াল অনুভব করে। নীরবে শুনে যায়। কোন উত্তর দেয় না।

কথা বলতে বলতে সুরেখা হঠাৎ ভীরু খরগোসের মত বাতাসে কান পেতে যাচাই করে নেয় থাণ্ডেলওয়ালের মনের গতিটা। একটু থেমে অভিমানক্ষুব্ধ সুরে বলে: শুনছো না বুঝি ?

শুনছি।

কোন কথা বলছো না যে ?

কি বলবো ?

ক্লিটনকে তোমার কেমন লাগে ?

ভালো।

হাতী।

কেন ?

ঢোঁড়া সাপ। ছোবলমারা তো দূরের কথা, মাথা তুলতেও জানে না।···ইংরেজী কার্টিসি !···মেয়েদের ওরা ভয় করে।···পুরুষ হবে দস্যুর মত। তবেই তো···

তার মানে ?

তুমি একটি গণেশ। এটাও বোঝ না !

সত্যি বোঝে না থাণ্ডেলওয়াল। বোঝে না সুরেখা কি বলতে চায়। বোঝে না ওর কথার ইঙ্গিত।

সুরেখা ফিনফিন ক'রে হেসে বলে: পথ চলতে গিয়ে যেখানে পা সামলে নেবার দরকার হয় না, সে পথ আমার ভালো লাগে না। তার চেয়ে ব্রোমাইড খেয়ে ঘুমানো ভালো। হাত-পা আপনা-আপনি শিথিল হয়ে আসে। অবসাদের জন্যে হাপিত্যেশ করতে হয় না।

থাণ্ডেলওয়াল নির্বাক্ হয়ে কি ভাবে। ওর মনের তলায় লুকানো ফণী-মনসার কাঁটাগুলো আবার খচ খচ করে ওঠে।

ঘুমোও: সুরেখা আস্তে আস্তে হাত বুলিয়ে কপালে। চুলগুলো নিয়ে লঘু আঙুলে খেলা করে।

ঘুম টিক আসে না থাণ্ডেলওয়ালের চোখে। সর্বাঙ্গ বয়ে নামে একটা অবসাদ। শিরা উপশিরায় সুরেখা অদ্ভুত মায়া-জাল ছড়িয়ে দেয়। মোহিনী-মায়ায় আবার ধীরে ধীরে পোষমানা গিনি পিগের মত থাণ্ডেলওয়াল আত্ম-সমর্পণ করে সুরেখার অঙ্কে।

থাণ্ডি, ডার্লিং !···সুরেখা ফিসফিস করে কানের কাছে ঠোঁট দুখানা নড়িয়ে।

তন্দ্রাচ্ছন্ন থাণ্ডেলওয়াল অজানা মুহূর্তে নিজেকে হারিয়ে ফেলে সুরেখার সর্পিল দুটি বাহুর নীচে: রেখা ! রে-খা ! ডার্লিং !

*

আবার সকাল আসে পুরানো দিনের সবটুকু ঝংকার প্রতিধ্বনিত করে।

ক্লিটন ইস্তফা দিয়েছে চাকরিতে। দু-মাসের নোটিসে চরমপত্র দিয়েছে চোপরাকে। চোপরার চেয়ে বেশী বিস্মিত হয়েছে থাণ্ডেলওয়াল।

থাণ্ডেলওয়াল ভাবতে পারে না হঠাৎ ক্লিটন চাকরি ছেড়ে দিচ্ছে কেন ! দেশে ফিরে যাবে চাকরি ছেড়ে দিয়ে ! ···ইচ্ছা থাকলেও থাণ্ডেলওয়াল পারে নি সুরেখাকে কোন কথা জিজ্ঞেস করতে।

গুঞ্জন ওঠে চেরিক্লাবের সান্ধ্য বৈঠকে। সায়ন্তনীর ভ্রমর-ভ্রমরীর ডানায় লাগে চৈতালি বাতাসের ঝাপটা। চঞ্চলতার স্পন্দন ওদের চোখে-মুখে।

সুরেখার কানের কাছে মুখ নিয়ে শিপ্রা চাপা গলায় জিজ্ঞেস করে: কি শুনছি রেখাদি?

কি?

ক্লিটন নাকি রিজাইন দিয়েছে চাকরিতে?

হবে।

হবে!...জানো না তুমি?

না।

শিপ্রা ইতস্তত করে। বিস্ময়ের ইল্লি কেটে আপম মনে বিড়বিড় করে বলে: তুমি জানো না। এও কি বিশ্বাস ভি
চীনেরত হবে রেখাদি?

পরি মনে মনে বললেও মুখ ফুটে শিপ্রা বলতে পারে না সব কথা।

সুরেখা চোখ দুটো বড় ক'রে শিপ্রার মুখের দিকে তাকিয়ে থাকে। শিপ্রাকে সে চেনে। ওর মনের তলা পর্যন্ত দৃষ্টিটা চোখা ক'রে হেসে বলে: চোপরার কার-বারের কথা তো আমার চেয়ে তুমিই ভালো জানো, শিপারিন্।...শুধু জানো তাই নয়, তার চেয়েও বেশী কিছু।

জেলাসি?

জহন্নাম।

কথাটা যেন সুরেখা শান দিয়ে ছেড়ে দেয় শিপ্রার কানে।

শিপ্রা চমকে ওঠে সুরেখার চোখের দিকে চেয়ে। মুহূর্তে চোখ দুটো ওর শিকারী নেকড়ে বাঘের মত জ্বলে উঠেছে।

পর মুহূর্তে সুরেখার দৃষ্টি স্নিগ্ধ হয়ে আসে। শিপ্রার হাতে মৃদু একটা চাপ দিয়ে হেসে বলে: মেয়েদের সাবধানে পা বাড়াতে হয়। ভুলে যাস্ নে শিপ্রা, রেখা ভুল করে না।...পুরনো রুমালে মুখ মুছতে ভালো। ধোপে ধোপে সুতোগুলো নরম হয়ে আসে।

শিপ্রা হাসে। মুচকি হেসে, সুরেখার মুখ পানে এক নজর চোরা দৃষ্টি চেয়ে বলে: তুমিও তা হলে ফাইডেলিটি মেনে নিয়েছ রেখাদি?...সাধ্বি...আগে বলতে, সুর-গমের বাঁধা পর্দায় সারাজীবন একঘেয়ে গানগাওয়া অসম্ভব। সে কথা তুমি ভাবতে পারো না।

এখনও বলি। অমন ক'রে সুর ভাঁজার চেয়ে গলির মোড়ে পকৌড়ি ভাজার দোকান খুলে বসাও ভালো। রকমারি খদ্দেরের ভিড় জমে। মনটা ঝিমিয়ে পড়বার অবসর পায় না।

তাই। সত্যি তাই রেখাদি।...পনের বছর না পেরোতেই ঠানদিরা সুরু করে নীতিকথা শোনাতে। কিন্তু আসলে মেয়েদের মন নোঙর ফেলে চল্লিশের পর। স্রোতের নৌকা তখন ধারে ভিড়াতে হয়। বেলা শেষের আস্তানা খোঁজে মন।

নাইস! এ রিয়ালিস্টিক আউটলুক অব লাইফ! জীবনবোধ তোমার সত্যি খুব বেড়েছে শিপ্রা। শুধু ভাবতে শিখেছ তাই নয়, বুঝতেও শিখেছ।

ঠাট্টা ক'রো না রেখাদি। তুমি নিজেই বলেছ—

বলেছি তো। এখনো বলবো...ভালোবাসা, যা নিয়ে এত মাতামাতি—এত উচ্ছ্বাস, তার মূলেও ওই একই তথ্য। মানুষ ভালোবাসে নিজের স্বার্থে। ভালো লাগে, আনন্দ পায়, তাই সে ভালোবাসে। অন্যকে আনন্দ দেবার জন্যে পৃথিবীতে কেউ কখনো ভালোবেসেছে কিনা জানি না। বাসেনি, বাসতে পারে না। মেয়েরা ঘর বাঁধতে চায় যখন নিশ্চিন্ত একটা আশ্রয় দরকার হয়। প্রাচুর্য্য যতদিন থাকে, উপযাচকের অভাব হয় না।

কিন্তু তুমি তো সে নীতি মানোনি, রেখাদি!

সুরেখা খিল খিল করে হেসে ওঠে: মানিনি!...কে বললে মানিনি, শিপ্রা?...আত্মরক্ষা আর আত্ম-সমর্পণ কি এক কথা? থাণ্ডেলওয়াল ইজ অ্যান ইডিয়ট। নিতান্ত নিরেট!...বুঝলি?

শিপ্রা চমকে উঠলো।...বোঝেনি, সত্যি সে বোঝেনি আগে। এ কথা সে ভাবেও নি কোনদিন। সুরেখাকে সে চেনে। নিজেকে যতখানি চেনে তার চেয়ে একচুলও কম চেনে না রেখাকে। তবু সে ভাবতে পারেনি যে, ওদের ঘরকন্না কোকিলের বাসা। দাম্পত্য জীবন আছে, কিন্তু ঘর বাঁধবার নেশা নাই।

শিপারিন্!

বলো।

কি ভাবছিস ?

কিছু না।

ভয় পাচ্ছিস বলতে ?

তাই।

সুরেখা হাসে। হাসি চুরি করে বলে : ফাইডেলিটি, অর্থাৎ স্বমেব গতিং, হবে চল্লিশের পর। দেহ আর মনে যখন মরচে ধরে আসবে, শান-পালিশ দিয়ে বাঁচিয়ে চলতে হবে শেষের ক'টা দিন মমতার জাল বুনে।

শিপ্রা ভেঙে পড়ে চাপা হাসির ঝড়ে : নাইস ! নাইস রেখাদি।

হঠাৎ বাধা পড়লো ওদের মনের গতিতে। মিসেস চৌধুরী এসে উপস্থিত হলো বিভোরের সন্ধানে। সঙ্গে বিভোরের দুটি ছাত্র। দীর্ঘ বলিষ্ঠ চেহারা। তারুণ্য উপচে উঠেছে দেহের কানায় কানায়। তবুও মুখের পানে চেয়ে বাৎসল্যের ছোঁয়াচ লাগে মনের কোণে।

অস্বাভাবিক চঞ্চলতা মিসেস চৌধুরীর মুখে চোখে। যেন ঢেউ উঠেছে ওর লবণ সমুদ্রে !

এই যে, মিসেস খাণ্ডেলওয়াল ! এবার নতুন অভিযান হবে কোথায় ? হিন্দুকুশ, না গান্ধারে ?

মস্কোতে : মুখ টিপে সুরেখা হাসে। ইস্পাতের ছুরির মত শান-দেওয়া হাসির ফলা লিকলিক করে ওঠে ঠোঁটের কিনারায়।

মুহূর্তে মিসেস চৌধুরীর চোখেমুখে এক ঝলক রক্ত হানা দিয়ে যায়। আচম্বিতে লীনার মুখখানা চোখের সামনে ভেসে ওঠে।...লীনা গিয়েছে মস্কো, সঞ্জয়ের সঙ্গে। যায়নি সে ঠিক, ও নিজেই কৌশলে সরিয়েছে তাকে বিভোরকে ছিনিয়ে নেবে ব'লে। মাতৃত্বের নরম অনুভূতিটা একটুখানি টোল খেয়ে যায়। কিন্তু সামলে নিতে দেরী লাগে না।...হোক তারা মা ও মেয়ে। তবুও প্রকৃতির যে নিয়মে লীনা এসেছিল ওর পেটে, ঠিক সেই নিয়মেই দুজনে পাশাপাশি এসে দাঁড়িয়েছিল বিভোরের পান্থশালার পরিপূর্ণ নারীত্ব নিয়ে। তখন আর মেয়ে ছিল মা লীনা। বিভোরের পথে হয়েছিল অন্তরায়।...তবুও যেন ভাবতে মনটা কেমন থমথম করে।

কি ভাবছেন ?...শিপ্রা প্রশ্ন করে মিসেস চৌধুরীর মুখপানে চেয়ে।

কিছু না।

সামলে নিতে মিসেস চৌধুরীর দেরী লাগে না। একটু থেমে বলে : কিছু না, বললে মিথ্যে কথা বলা হয়। ভাবছি, পুরোদস্তুর ক্যাপিটালিস্ট—ঐশ্বর্যই যাদের একমাত্র বিলাস, তাদের জন্যে তো মস্কো নয়। মেহনতি মানুষের রাজ্য সেখানে।

জানি। সুরেখা খাণ্ডেলওয়াল যাবে না সেখানে ঘর বাঁধতে। যদি যেতে হয়, সে যাবে চন্দ্রলোকের পথ খুঁজতে। স্টেশনে যারা যায়, তাঁরা যাত্রী, পাত্রী নয়। আমিও যাবো স্পুটনিকের যাত্রী হয়ে মস্কো স্টেশনে।

আর ক্লিটন ?

যাবে সঙ্গে।

ব্রেভো !

মিসেস চৌধুরীর সারাটা দেহ দুলে ওঠে বিজয়ের উল্লাসে।...মিসেস চৌধুরী ! এখন আর মিসেস চৌধুরী ব'লে ডাকা ও পছন্দ করে না। কল্পনা রহমানও নয়। শুধু কল্পনা চৌধুরী নামটাই ও শুনতে চায় লোকের মুখে।

সঙ্গের তরুণ দুটি বিস্মিত দৃষ্টিতে ওর মুখপানে চায়।

যেমন ঝড়ের মত এসেছিল, ঠিক তেমনি করে বেরিয়ে গেল ঘূর্ণী বাতাসের মত তরুণ দুটিকে কুড়িয়ে নিয়ে। ওরা দুজনে চললো ওর পাশে পাশে পা ফেলে।

বয়েস হয়েছে। কিন্তু কোথাও এতটুকু রেখা পড়েনি কল্পনা চৌধুরীর মুখে। পায়ে আজও যৌবনের সেই চঞ্চলতা। সর্বাঙ্গে বক্ষ প্রাচুর্য তেমনি টলমল করে।

ফেরিওয়ালা পালিয়েছে ওদের বস্তি ছেড়ে। পদ্ম বাধা দেয়নি। লোকটা যেমন দিন আনতো দিন খেতো, তেমনি আনে এখনো। রোজগার কমেনি! হাতের পয়সাও ফুরোয়নি ওর। কিন্তু পদ্মর কাছে মিন্‌সে নিজেই ফুরিয়ে গেল কয়েকমাস যেতে না-যেতেই।

ঘাটের মড়া। সারাদিন পথে পথে হেঁটে বেড়ায় ফেরি ক'রে। দুদিন বাদে হাঁপানি ধরবে মিন্‌সের।

পদ্ম মাঝে মাঝে গজগজ করতো।

লোকটা নিষ্কৃতি পেয়েছে। পদ্মও বেঁচেছে হাঁফ ছেড়ে।

নিবারণ দুপয়সা আনে আজকাল। বেশ ফুলফুল হয়ে উঠেছে আবার।...অতসীর কপাল ভালো।

কি লো অতসী, রাঁধবি না আজ ?

না।

শ্রান্তিভরে অতসী বসে পড়ে খুঁটিতে ঠেস দিয়ে।

ঘুরে ফিরে পদ্ম আসে অতসীর ঘরে। এখন আর অতসীর ওপর কোন ঝাল নাই ওর মনে।...অতসী টের পায়নি। কিন্তু তলে তলে পদ্ম সুড়ঙ্গ কেটে ঢুকেছে নিবারণের মনে।

অতসীর চুলগুলো জড়িয়ে দিতে দিতে পদ্ম বলে : ঘর-খানা বদলাবদলি করবি অতসী ?

চমকে অতসী একবার চায় পদ্মর মুখপানে। তারপর কি ভেবে বলে : করবো।

ক্রমশঃ

রঙ্গ-জগতের যুগস্রষ্টা শিল্পী—শিশিরকুমার

নরেন্দ্র দেব

বারাণসী ঘোষ স্ট্রীট-এ ঢুকতে ডাইনে কর্নওয়ালিস স্ট্রীটের মোড়ে যে প্রেসিডেন্সী ফার্মাসী রয়েছে তার মালিক শ্রীবামাপদ বসু আমাদের একজন পুরাতন বন্ধু। তাঁর এই ডিস্‌পেন্সারীতে সন্ধ্যের পর রোজ আমাদের একটি ছোট্ট আড্ডা বসতো। বামাপদ ছিলেন ইউনিভার্সিটি ইনস্টিটিউটের একজন উৎসাহী সদস্য। তাঁর আড্ডায় যারা আসতেন তাঁদের অধিকাংশই বামাপদর সহপাঠী বন্ধু এবং ইউনিভার্সিটি ইন্‌স্টিটিউটের কর্মী পরিষদ বা পরিচালক মণ্ডলীর প্রবীণ সদস্য, অর্থাৎ সিনীয়র মেম্বার।

আমি তখনও ইউনিভার্সিটি ইন্‌স্টিটিউটের সদস্য হইনি। কিন্তু বামাপদর আড্ডার একজন অনুরাগী ভক্ত ছিলুম এবং ইন্‌স্টিটিউটের অভিনয়গুলির নিয়মিত দর্শক ছিলুম। এখনকার মতো ইন্‌স্টিটিউটে সেকালে ঘন ঘন অভিনয় হত না। বছরে একটা কি বড় জোর দু'টো। বেশির ভাগ ইংরিজী নাটকেরই অভিনয় হ'ত। শিশির-কুমার ভাদুড়ী, নরেশচন্দ্র মিত্র, কান্তি মুখোপাধ্যায়, রাঘবেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতি ছিলেন এই সব অভিনয়ের শুধু পাণ্ডা নয় মেরুদণ্ড স্বরূপ।

শিশির ভাদুড়ীর সঙ্গে আমার প্রথম পরিচয় হয় বামাপদ বসুর এই প্রেসিডেন্সী ফার্মাসীর আড্ডায়। সকলেই তখন মহাবিদ্যালয়ের পাঠ সমাপ্ত করে স্নাতকোত্তীর্ণ হয়ে যে যার রুচি ও পছন্দ মতো কর্মক্ষেত্রে প্রবেশ করেছেন জীবিকার্জনের চেষ্টায়। শিশিরকুমার তখনও অধ্যাপনার কাজ শুরু করেছেন কিনা মনে নেই। তবে, উপার্জনের নানা পথ তিনি সন্ধান ও পরীক্ষা করেছিলেন এই সময়। তাই ইন্‌স্টিটিউটেও নিয়মিত যেতে পারতেন না। বামাপদর আড্ডাতেও মাঝে মাঝে অকস্মাৎ ধূমকেতুর মতো উদয় হতেন।
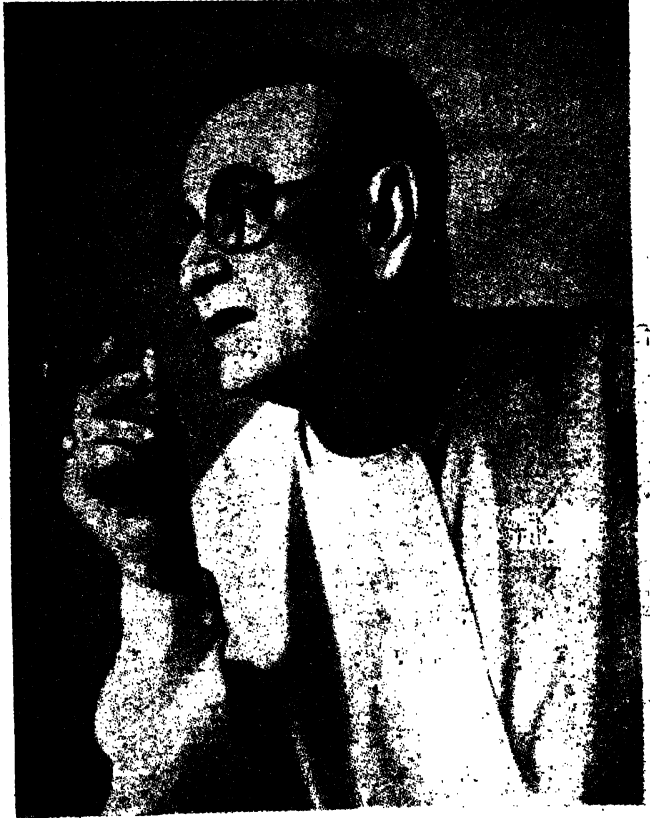
শিশিরকুমার ভাদুড়ী

এই আড্ডায় যখন শিশিরের সঙ্গে পরিচয় হয় তখন আমরা উভয়েই তরুণ যুবক। চুরুট ধরেছেন তিনি তখন থেকেই। আমি কিন্তু তখনও ধূমপান করতে শিখিনি। ধূম-বিলাসে আমার হাতেখড়ি হ'য়েছিল ২৮ বছর বয়সে। সে যাই

হোক, শিশির একরকম জোর করেই আমাকে ইউনিভার্সিটি ইন্স্টিটিউটের সদস্য, অবশ্য 'প্রবীণ সদস্য' করে নিলেন। এ প্রায় চল্লিশ-পঁয়তাল্লিশ বছর আগেকার কথা। শিশিরের অনেক গুণের মধ্যে মস্ত একটা গুণ ছিল—যখন যেটা করবেন মনস্থ করেন তখন সেটা তিনি করবেনই।

আমাদের এই আড্ডাটিকে একটি 'ইন্টেলেক্চুয়াল ক্লাব' বলা যেতে পারে। কারণ, যদিও সেখানে জুতো সেলাই থেকে চণ্ডীপাঠ সব রকম আলাপই চলতো, কিন্তু বেশির ভাগ আলোচনা হ'ত কাব্য ও সাহিত্য, নাটক নট-নটী ও অভিনয় কলার বিচার নিয়ে। তখন এই শহরে চার চারটে রঙ্গালয় পুরাদমে চলছে। বঙ্গরঙ্গমঞ্চের স্রষ্টা বড় বড় সব প্রতিভাবান অভিনেতা ও অভিনেত্রীরা তখন আমাদের নাট্যশালাগুলি উজ্জ্বল করে রয়েছেন। যাঁদের অভিনয় দেখবার আমার সৌভাগ্য হয়েছিল তাঁদের কয়েকজনের নাম আজও মনে আছে। স্বর্গীয় গিরিশচন্দ্র ঘোষ, অমৃতলাল বসু, অর্দ্ধেন্দুশেখর মুস্তাফি, অমৃতলাল মিত্র, মহেন্দ্রনাথ বসু, অমরেন্দ্রনাথ দত্ত, তারকনাথ পালিত, ক্ষেত্রমোহন মিত্র, প্রিয়নাথ বসু, হাঁদুবাবু, কাশীনাথ চট্টোপাধ্যায়, নৃপেন্দ্রনাথ বসু, চুনীলাল দেব, থাকোবাবু, রাণুবাবু। এঁদের সঙ্গে স্ত্রী চরিত্রে অবতীর্ণ হতেন বিনোদিনী, তারাসুন্দরী, তিনকড়ি, নরীসুন্দরী, নগেন্দ্রবালা, চুণীবালা, কুসুমকুমারী, নীরদাসুন্দরী, চারুশীলা, পুতুল, প্রভা, পটল (ঊষা) ইত্যাদি। শেষোক্ত পাঁচজন সে সময়ে সখীর ব্যাচের মেয়ে ছিলেন। অবশ্য মওড়ার প্রধানা নর্তকী বলে গণ্য হতেন। অভিনেত্রীর আসন পাননি। পরে শিশিরকুমার এঁদের অভিনয় বিদ্যা শিখিয়ে রঙ্গমঞ্চের সেরা অভিনেত্রী করে তুলেছিলেন।

কি জানি কেন,থিয়েটার দেখার প্রচণ্ড সখ ছিল আমার বাল্যকাল থেকেই! সে সময় অভিনেতা-অভিনেত্রীর ছবি দিয়ে রঙীণ কালিতে ছাপা হ্যাণ্ডবিল বিতরণ করতে শুরু করেন ক্লাসিক থিয়েটারই প্রথম। রঙ্গালয় নামে একখানি কাগজও ছিল। এর মালিক ছিলেন ✓অমরেন্দ্রনাথ দত্ত। ইনি তদানীন্তন নাট্য-জগতে অনেক কিছু স্মরণীয় নূতন কীর্তি করেছিলেন। রঙ্গ-মঞ্চের উপর অশ্বপৃষ্ঠে গোবিন্দলালরূপে অবতীর্ণ হয়ে অমরেন্দ্রনাথ দর্শকদের বিস্মিত করে দিয়েছিলেন। প্রাচীন রঙ্গালয়ের গতানুগতিক ধারাকে অমরেন্দ্রনাথই প্রথম ভাঙবার চেষ্টা করেছিলেন। এর জন্য তাঁর কাছে আমরা কৃতজ্ঞ। কি ঐতিহাসিক, কি সামাজিক নাটকে নাট্যোল্লিখিত চরিত্রগুলির কালোচিত সাজ-পোষাক ও দৃশ্যপটের দিকেও অমরেন্দ্রনাথই প্রথম লক্ষ্য রেখেছিলেন। তাঁর আগে আমরা গিরিশচন্দ্রের মত মনীষী নট ও নাট্যকারকেও 'পলাশীর যুদ্ধ' নাট্যাভিনয়ে ক্লাইভের ভূমিকায় যাত্রাদলের শলম চুমকি বসানো ভেলভেটের পোষাক পরে নামতে দেখেছি। সেকালের দর্শকেরা এসেছিলেন যাত্রার আসর থেকে উঠে একেবারে রঙ্গালয়ের প্রেক্ষাগারে। তাঁরা অত দৃশ্যপট ও সাজ-সজ্জার দিকে লক্ষ্য রাখতেন না। তাঁরা দেখতেন অভিনয় কেমন হচ্ছে? বীররস বীরোচিত ভাবে পরিবেশন হল কিনা? করুণ রসের অভিনয়ে চোখে জল আনতে পারলে কিনা? ভক্তি-রসের অভিনয়ে ভাগবতী ভাব ফুটিয়ে তুলতে পারলে কিনা?—ইত্যাদি। সেকালের অভিনয়ে কি গদ্য-নাটকে, কি ছন্দোবদ্ধ নাটকে অভিনেতা ও অভিনেত্রীদের কণ্ঠে একটা সুরের লীলা ছিল। সে দিন ধাপে ধাপে কণ্ঠস্বর উচ্চ পর্দা থেকে ক্রমে উচ্চতর গ্রামে তুলে নিয়ে যেতে পারাটা একটা বিশেষ শক্তি বা গুণ বলেই গণ্য হ'ত।

প্রায় অর্ধশতাব্দীকাল ধরে বাংলা রঙ্গমঞ্চের আদিপর্ব থেকে শিশিরকুমার ভাদুড়ীর সাধারণ রঙ্গমঞ্চে অবতরণের পূর্বকাল পর্যন্ত অভিনয়ের এই ধারাই এ দেশে প্রচলিত ছিল। আমরা এই রকমটাই দেখতে অভ্যস্ত হয়ে পড়েছিলুম। সৌখীন নাট্যাভিনয়েও এই ধারাই অনুসৃত হ'ত। শুধু তাই নয়, সৌখীন নাট্য-সম্প্রদায়ের অভিনয় দেখতে গিয়ে দর্শকেরা বিচার করতেন—কার 'যোগেশ' কতটা গিরিশচন্দ্রের মতো হ'ল? কার 'বিল্বমঙ্গল' কতটা অমরেন্দ্রনাথ দত্তের মতো হ'ল? কার 'প্রবীর' কতটা দানীবাবুর মতো হল? কার 'রঙা' কতটা মুস্তাফী সাহেবের মতো হল? কার 'চন্দ্রশেখর' কতটা অমৃত মিত্রের মতো হ'ল? কার 'লরেন্স ফস্টর' কতটা অমৃতলাল মিত্রের মতো হল; কার 'আবদালা' নৃপেন বসুকেও হারিয়ে দেয়! এই রকমটাই ছিল সেকালের অভিনয় সমালোচনার নিরীথ। আমরাও সেদিন সৌখীন নাট্য-সম্প্রদায়ের গুণাগুণ বিচার করতুম এই রকম তুলনারই সাহায্যে।

শিশিরকুমার কোনও নাটকের কোনো ভূমিকা অভিনয়ে

প্রশংসা অর্জন করবার অনেক আগেই 'আবৃত্তি' করে প্রচুর যশস্বী হয়েছিলেন। তাঁর আবৃত্তি শোনবার জন্য লোক ভেঙে পড়তো। তাঁর আবৃত্তির একটা প্রধান আকর্ষণ ছিল তাঁর অপূর্ব কণ্ঠস্বর, তার দিব্যকান্ত-বলিষ্ঠ মূর্তি, তাঁর আবৃত্তির সঙ্গে সঙ্গে অঙ্গসঞ্চালন ও মুখভঙ্গীর দ্বারা বিচিত্র ভাবব্যঞ্জনার শক্তিসমৃদ্ধ প্রকাশ! যদিও 'আবৃত্তি'-শাস্ত্র মতে আবৃত্তির সময় অঙ্গ সঞ্চালন বা মুখভঙ্গী একেবারে নিষিদ্ধ। কেবল মাত্র কণ্ঠস্বরের ব্যঞ্জনার দ্বারা আবৃত্তির বিষয়টিকে পরিস্ফুট করে তোলার অধিকার মাত্র আবৃত্তিকারকে দেওয়া হয়েছে। কিন্তু, শিশিরকুমারকে কোনও নিয়মের শৃঙ্খলই কোনও দিন সংযত রাখতে পারে নি। গতানুগতিককে ডিঙিয়ে এগিয়ে চলাই ছিল যেন তাঁর জন্মগত প্রকৃতি। এই বলিষ্ঠ সাহসের গুণেই তিনি ভবিষ্যৎ জীবনে নাট্যকলায় নবযুগ সৃষ্টি করতে পেরেছিলেন।

আবৃত্তির শাস্ত্রীয় আইন সম্পূর্ণ লঙ্ঘন করে তিনি তাকে রূপ দিয়েছিলেন নাট্যাভিনয়ের ভাব-ব্যঞ্জনার অনুরূপ। এই খানেই খুঁজে পাওয়া গিয়েছিল শক্তিশালী নটের প্রতিভার বীজ। শিশিরকুমারের অভিনয়-প্রতিভার বিরাট শক্তি সংহত ছিল এই দক্ষ আবৃত্তির অসামান্য নৈপুণ্যের মধ্যে। তারপর সেই নৈপুণ্য সকলকে বিস্মিত করে দিলে তাঁর ইন্‌স্টিটিউট আর ওল্ড ক্লাবের অদ্ভুত অভিনয় দক্ষতায়। 'রঘুবীর' 'পাণ্ডবের অজ্ঞাতবাস' আর 'চন্দ্রগুপ্ত' নাটকে 'রঘুবীর' 'ভীম' ও 'চাণক্যের' ভূমিকায় অভিনয় দেখে আমরা বিস্মিত ও স্তম্ভিত হয়ে এসেছি। তখনই আমাদের মনে এ ধারণা বদ্ধমূল হয়ে গিয়েছিল যে শিশির অসাধারণ অভিনয় প্রতিভার অধিকারী। ও যদি কখনো সাধারণ রঙ্গমঞ্চে যোগ দেয় তবে আমাদের রঙ্গমঞ্চও অসাধারণ হয়ে উঠবে।

ইতিমধ্যে শিশির বিদ্যাসাগর কলেজে ইংরাজীর অধ্যাপকের কাজে নিযুক্ত হয়ে গেছে। তার অধ্যাপনার যশোসৌরভ শহরময় ছড়িয়ে পড়েছে। সবার মুখে শুনি—শেলী, বাইরণ, কীটস্‌, ওয়ার্ডসওয়ার্থ, ব্রাউনিং, সুইন্‌বার্ণের কবিতা এমন করে এঁর আগে আর কাউকে পড়াতে শুনিনি। সেক্সপীয়রের নাটক পড়াতেন তিনি এমনভাবে যে ম্যাক্‌বেথ, ওথেলো, কিংলীয়ার যেন ছাত্রদের চোখের সামনে জীবন্ত হ'য়ে উঠতো! বিশদ ব্যাখ্যা করে বোঝাতে হতনা তাঁকে।

শিশির যে কোনও দিন সাধারণ রঙ্গালয়ে অবতীর্ণ হয়ে নটজীবনকে তার ভবিষ্যতের পেশারূপে অবলম্বন করবে একথা আমরা কথনো ভাবতেই পারিনি। তার কারণ, আমাদের সমাজে নটের মর্যাদা তখনও প্রতিষ্ঠিত

নরেন্দ্র দেব : শিশিরকুমার ভাদুড়ী : প্রেমাঙ্কুর আতর্থী

হয়নি। শিক্ষিত ভদ্র সন্তানরা যে শিশিরের আগে রঙ্গালয়ে যোগ দেন নি তা নয়। যাঁরা বলেন—শিশিরকুমারের দৃষ্টান্তেই এটা সম্ভব হয়েছিল তাঁরা ভুলে যান যে বঙ্গ-রঙ্গালয়ের জনক গিরিশচন্দ্র ঘোষ ছিলেন বাগবাজারের অভিজাত ঘোষ পরিবারের শিক্ষিত ছেলে, অমৃতলাল বসু ছিলেন কম্বুলেটোলার অভিজাত বোস বংশের বিদ্বান সন্তান, অমরেন্দ্রনাথ দত্ত ছিলেন চোরবাগানের প্রসিদ্ধ দত্ত পরিবারের যে শাখা হাতীবাগানে বসবাস শুরু করেছিলেন সেই অভিজাত দত্ত বংশের শিক্ষিত ছেলে! স্বর্গীয় পণ্ডিত হীরেন্দ্রনাথ দত্তের সহোদর ছিলেন তিনি। স্বর্গীয় মনোমোহন গোস্বামী এম-এ শ্রীরামপুরের গোস্বামী বংশের সন্তান। এঁরা সকলেই সুশিক্ষিত ছিলেন। এঁরা যখন সেকালের কঠোর

সামাজিক বাধা ও আত্মীয় বন্ধু মহলের মধ্যে নিজেদের মান-মর্যাদা নটনাথের সেবার জন্ত অনায়াসে অগ্রাহ্য করে সে-দিনের অমানী সাধারণ রঙ্গমঞ্চে অবতীর্ণ হ'তে সাহস করে এগিয়ে এসেছিলেন, তখন শিশিরের মতো দুঃসাহসী বেপরোয়া মানুষ যদি তাঁর প্রকৃতিলব্ধ অসামান্ত অভিনয়-প্রতিভাকে বিরূপ সমাজের যূপকাষ্ঠে বলি দিতেন, তবে, সেটাকে আমরা একটা শোচনীয় জাতীয় দুর্ভাগ্য বলেই অভিহিত করতুম।

ইং ১৯০৭ সাল। বামাপদ বসুর প্রেসিডেন্সী ফার্মাসী ও বোস কোম্পানীর ডিসপেন্সারীর সামনে বিপরীত ফুট-পাথে এই সময় 'কলিকাতা ঈভনিং ক্লাব' নাম দিয়ে একটি সৌখীন নাট্যামোদীদের অবসর বিনোদক প্রতিষ্ঠান স্থাপিত হয়। প্রসিদ্ধ পুস্তক-প্রকাশক ৺গুরুদাস চট্টোপাধ্যায়ের জ্যেষ্ঠ পুত্র ৺হরিদাস চট্টোপাধ্যায় এই ক্লাবের প্রধান পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। তাঁরই অনুরোধে দ্বিজেন্দ্রলাল রায় হয়েছিলেন সভাপতি এবং পণ্ডিত ৺ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ হয়ে-ছিলেন সহসভাপতি। হরিদাসবাবুর ও শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যা-য়ের বিশেষ বন্ধু ৺প্রমথনাথ ভট্টাচার্য হয়েছিলেন প্রধান সম্পাদক। ৺তুলসী গুপ্ত হয়েছিলেন সহ-সম্পাদক, আর আমার উপর ভার পড়েছিল তস্য সহকারীর কাজ করবার।

এই ঈভনিং ক্লাবের সূত্রে শিশিরকুমার ভাদুড়ীর সঙ্গে হরিদাসবাবুর পরিচয় হয় এবং সে পরিচয় ঘনিষ্ঠ হয়ে ওঠে শিশিরকুমার তাঁদের পাড়ায় এসে বসবাস করবার পর থেকে। রাঢ়ী ও বরেন্দ্র ব্রাহ্মণের মধ্যে কুটুম্বিতা তখনও প্রচলিত হয়নি। কিন্তু শিশির একটা সম্পর্ক ধরে হরিদাস-বাবুকে 'মামা' বলে ডাকতেন। প্রতি রবিবার প্রায়ই শিশির আসতো। দুপুর থেকে বিকেল পর্যন্ত হরিদাসবাবুর বাড়ীতে আমাদের রবিবাসরীয় আড্ডা বসতো। এই আড্ডায় থিয়েটার ও সিনেমার উন্নতির জন্ত আমাদের যেন উৎসাহ ও উৎকণ্ঠার অন্ত থাকতো না। কত পরিকল্পনাই না করা হ'তো দিনের পর দিন। শিশিরের উপর আমাদের খুব একটা ভরসা ছিল যে ওকে পেলে নাট্যজগৎ জয় করা আমাদের পক্ষে একটুও কঠিন হবে না।

ঈভনিং ক্লাব এই সময়ে 'চন্দ্রগুপ্ত' নাটক অভিনয়ের জন্ত প্রস্তুত হচ্ছিলেন। ওদিকে কলিকাতা ইউনিভার্সিটি ইন্সটিটিউটও 'চন্দ্রগুপ্ত' নাটক অভিনয়ের জন্ত প্রস্তুত হচ্ছিলো। দুই দলের মধ্যে একটা যেন প্রতিযোগিতার ভাব এসে পড়েছে লক্ষ্য করে হরিদাসবাবু একদিন শিশিরকে বললেন—তুমি এসে প্রমথর চাণক্য কেমন হ'চ্ছে একটু দেখে যেও। শিশির এলেন, দেখলেন। বললেন, খুব ভাল হচ্ছে। নিন্দা করবার মতো কোনও খুঁত পেলুম না খুঁজে। এরপর প্রমথবাবু গেলেন একদিন ইন্স্টিটিউটে শিশিরের 'চাণক্যে'র মহলা দেখতে। ফিরে এসে বললেন, আমি পারবো না চাণক্যের পার্ট করতে। শিশির যা করছে দেখে এলুম, তার পাশে আমি দাঁড়াতে পারবো না। বিশেষ তার সঙ্গে নরেশ মিত্রের কাত্যায়নের ভূমিকায় যেন মণিকাঞ্চন সংযোগ ঘটেছে!

যাই হোক, শেষ পর্যন্ত অভিনয় হল। দর্শকেরা এ কথা স্বীকার করলেন যে শিশিরবাবুর 'চাণক্যে'র তুলনায় প্রমথ-বাবুর 'চাণক্য' কোথাও বিশেষ ম্লান হয়ে পড়েনি।

সুখের বিষয়, শিশিরের জীবনে শেষ পর্যন্ত নট-লক্ষ্মীরই জয় ঘোষিত হ'ল। শিশিরকুমার দেখা দিলেন একদা শুভ সন্ধ্যায় শহরের নব-নির্মিত এক সাধারণ রঙ্গালয়ের পাদপীঠে হিন্দুস্থানের জিজিয়াখ্যাত বাদশাহ আলমগীরের ঐতিহাসিক জটিল চরিত্রের ভূমিকা অভিনয়ে।

আমরা যা আশা করিছিলুম—তা বর্ণে বর্ণে সত্য হয়ে উঠলো। দেশ জুড়ে একটা আশ্চর্য সাড়া পড়ে গেল। বাংলার নাট্য-জগতের ইতিহাসে এক নূতন যুগের প্রতিষ্ঠা হল সেদিন। নাট্য-রসবেত্তা শিক্ষিত সজ্জনগণের কণ্ঠে ধন্য ধন্য রব উঠলো। দলে দলে লোক এসে তাঁর অভিনয় দেখবার জন্ত ভীড় করে দাঁড়ালো সেই নব-নির্মিত পার্শী মালিকের 'বেঙ্গলী-থিয়েটারে'র প্রেক্ষাগারের দ্বারে, বেঙ্গলী থিয়েট্রী-ক্যাল কোম্পানীর কল্যাণে চললো বেশ কিছুদিন মহাসমা-রোহে শিশির সম্প্রদায়ের অপূর্ব অভিনয়। কিন্তু স্বাধীনচেতা শিশিরকুমার তাঁর পার্শী মনিব ম্যাডান সাহেবদের সঙ্গে বনিয়ে চলতে পারলেন না। নিজের আদর্শকে তিনি ওদের রুচি মেনে খর্ব করতে চাইলেন না। নিজের হাতেগড়া এই বড় সাধের রঙ্গমঞ্চকে অনায়াসে পরিত্যাগ করে সদলে বেরিয়ে এলেন। পঞ্চনদের বন্দী বীরের মতই কঠিন ছিল তাঁর পণ।

নামলেন এসে দ্বিজেন্দ্রলালের 'সীতা' নাটক নিয়ে কলিকাতা শিল্প প্রদর্শনীর অস্থায়ী রঙ্গমঞ্চে। সেখানেও

হৈ হৈ পড়ে গেল! প্রদর্শনী ফেলে লোকে ছুটতে শুরু করলো শিশির ভাদুড়ীর অভিনয় দেখতে। এই অসামান্য প্রতিভাশালী নট-শিল্পীর চারিদিকে তখন সমবেত হয়েছিলেন গুণগ্রাহী বন্ধুগণ। এসেছেন কবি, নাট্যকার, সাহিত্যিক, শিল্পী—সবাই দু'হাত বাড়িয়ে দিতে চায় তাদের সাহায্য ও সহযোগিতা—এই দেশগৌরব নটরাজকে তার নিজস্ব রঙ্গ-বেদীতে প্রতিষ্ঠিত করতে। ৺অটলবিহারী সেনকে ধরে আলফ্রেড রঙ্গমঞ্চ ভাড়া নেওয়া হল। দ্বিজেন্দ্রলালের 'সীতা' নাটক নিয়েই তিনি এবার সাধারণ রঙ্গমঞ্চে অবতীর্ণ হবেন স্থির হল।

কিন্তু ইতিমধ্যে ষ্টার রঙ্গমঞ্চে 'আর্ট থিয়েটার' নাম দিয়ে একটি লিমিটেড কোম্পানী শিশিরকুমারের আদর্শে প্রবর্তিত নবযুগোপযোগী একটি রঙ্গপীঠ প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন। শিশিরের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় পাছে তাদের পরাজয় বরণ করতে হয় এই আশংকায় তাঁরা দ্বিজেন্দ্রলালের একমাত্র পুত্র দিলীপকুমার রায়কে ধরে 'সীতা' নাটকের অভিনয়-স্বত্ব তৎপর হয়ে আগেই কিনে নিলেন। শিশির তখন বিপন্ন হয়ে পড়লেন। নিরুপায় হয়ে বন্ধুদের পরামর্শে তিনি আলফ্রেড্ রঙ্গমঞ্চে 'দোললীলা' নামে একখানি গীতিনাট্য নিয়েই অবতীর্ণ হলেন। কিন্তু 'সীতা' নাটক অভিনয়ের সংকল্প তিনি কিছুতেই পরিত্যাগ করলেন না। অদ্ভুত জেদী মানুষ ছিলেন। যোগেশ চৌধুরীকে দিয়ে তিনি নূতন 'সীতা' নাটক লিখিয়ে নিয়ে বিডন ষ্ট্রীটে চলে এলেন। বন্ধ হয়ে যাওয়া মনোমোহন থিয়েটারটি লীজ নিলেন। 'সীতা'র অভিনয় শুরু হল।

আবার চারিদিকে সাড়া পড়ে গেল! দিনের পর দিন মনোমোহন থিয়েটারের প্রেক্ষাগারে দর্শকের ভীড় বেড়েই চললো। কিন্তু, ভাগ্যদেবী বোধহয় অপ্রসন্ন ছিলেন। মনোমোহন থিয়েটার কলিকাতা ইমপ্রুভমেণ্ট ট্রাস্টের নূতন রাস্তা 'সেণ্ট্রাল এ্যাভেন্যু'র মধ্যে পড়ে গেল। শিশির তখন আবার ম্যাডানের রুদ্ধ দ্বার বেঙ্গলী থিয়েটারের ষ্টেজ লীজ নিয়ে তাঁর নিজস্ব রঙ্গালয় 'নাট্যমন্দির' খুললেন। রবীন্দ্রনাথ স্বয়ং এলেন তাঁকে সাহায্য করবার জন্য, শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ও এই অদ্বিতীয় শিল্পীর সাহায্যে অগ্রসর হয়ে এলেন। মণিলাল গঙ্গোপাধ্যায়, সৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়, হেমেন্দ্রকুমার রায়, প্রেমাঙ্কুর আতর্থী, সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, চারু রায়, স্থপতি শ্রীশ চট্টোপাধ্যায় প্রভৃতি 'ভারতী' গ্রুপের ও ইন্‌স্টিটিউটের এবং অন্যান্য সকল বন্ধু এসে দাঁড়ালেন শিশিরের পাশে। ধনী বন্ধুরা তাঁর, যেমন নির্মলচন্দ্র চন্দ্র, নাটোরের মহারাজার জামাতা যতীন্দ্রনাথ লাহিড়ী, সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, কান্তি মুখোপাধ্যায় প্রভৃতি বহু মহাজন, বহু এটর্নী, উকিল, ইঞ্জিনিয়ার, ব্যারিষ্টার, তাঁদের অর্থকোষ উন্মুক্ত করে ধরলেন শিশির প্রতিভার সম্যক বিকাশে সাহায্য করবার আন্তরিক আগ্রহ নিয়ে।

গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্সের অন্যতম সত্বাধিকারী ও ভূতপূর্ব আর্ট থিয়েটারের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা-পরিচালক নাট্যানুরাগী স্বর্গীয় হরিদাস চট্টোপাধ্যায় মহাশয় শিশিরকুমারকে আজীবন নানাভাবে সাহায্য করে এসেছেন। বিনা দক্ষিণায় শ্রেষ্ঠ লেখকগণের নাটক অভিনয়ের স্বত্ব সংগ্রহ করে দিয়ে, নানা গ্রন্থের নাট্যরূপ অবলম্বনের সুযোগ ও সুবিধা দিয়ে এবং বহুরাত্রি বহু নাটক অভিনয়ের জন্য তাঁর প্রাপ্য রয়ালটি ছেড়ে দিয়ে তিনি শিশিরকে সাহায্য করেছিলেন। শিশিরকুমারকে তাঁর সকল বন্ধুরাই আন্তরিক ভালবাসতেন। তাঁর সকল দোষ, সকল অকৃতজ্ঞতা ভুলে, সকল ত্রুটি প্রসন্ন মনে ক্ষমা করে আজীবন তাঁর গুণেরই সমাদর করেছেন।

কিছুদিন বেশ জোর চালাবার পর নাট্যমন্দির কিন্তু শেষ পর্যন্ত বাঁচিয়ে রাখা তাঁর পক্ষে সম্ভব হলনা। লীজ ফুরিয়েছিল। ম্যাডান কোম্পানী ওটাকে সিনেমা হাউস করবেন বলে শিশিরকুমারকে তুলে দিলেন। তাঁর কাছে ওদের পাওনা ভাড়া বাকী পড়েছিল অনেক।

সহপাঠী বন্ধু নেপেন্দ্র বসুর প্রচেষ্টায় শিশিরকুমার সিনেমা জগতেও প্রবেশ করেছিলেন। নির্বাক যুগ থেকে সবাকযুগ পর্যন্ত অনেকগুলি ছবিতে নেমেছিলেন ও পরিচালনাও করেছিলেন। চলচ্চিত্রে কিন্তু তিনি বিশেষ সাফল্য অর্জন করতে পারেননি। তার কারণ স্টেজ-টেকনিক ও সিনেমা-টেকনিকের পার্থক্য তিনি স্বীকার করেন নি।

শিশিরকুমারের আর একটি উল্লেখযোগ্য কীর্তি যে তিনিই সর্বপ্রথম এদেশ থেকে তাঁর নাট্যসম্প্রদায় নিয়ে আমেরিকার ব্রডওয়ে রঙ্গমঞ্চে অভিনয় করতে গিয়েছিলেন।

বাংলার নাট্যশালার পক্ষে এ এক ঐতিহাসিক ঘটনা। শিশিরের পর একাধিক ভারতীয় নৃত্য গীত ও বাদ্যযন্ত্রের শিল্পীরা এবং ঐন্দ্রজালিক বিদ্যায় শ্রেষ্ঠ বাঙালী যাদুকর পি-সি-সরকারও বিশ্বজয় করে এসেছেন, কিন্তু কোনও নাট্যসম্প্রদায়ই আর, এ দুঃসাহস দেখাবার স্পর্ধা করেননি।

শিশিরকুমারের নাট্য প্রতিভার যশ সৌরভ এইভাবে ভারতের বাইরেও প্রচার হয়েছিল। দেশ বিদেশের বহু গুণীরা ভারতে এলে শিশিরকুমারের অভিনয় দেখে মুগ্ধ হয়ে অজস্র প্রশংসা শুনিয়ে যেতেন।

এ ছাড়া শিশিরকুমারের আরও একটি উল্লেখযোগ্য কীর্তি হ'ল, তিনিই ভারতবর্ষে প্রথম সাধারণ রঙ্গালয়ে দেশের শিশুদের মনোরঞ্জনের জন্য বিশেষ ম্যাটিনী অভিনয়ের আয়োজন—শিশুদের উপযোগী রূপকথার ভিত্তিতে রচিত নাটক 'ফুলের আয়না' প্রবন্ধ লেখককে দিয়ে লিখিয়ে নিয়ে তিনি অভিনয় করেছিলেন। কিন্তু, এখনকার যুগের মতো সেদিনের অভিভাবকেরা নাট্যশালায় শিশুদের যাওয়াটা অনুচিত বিবেচনা করায় কয়েক সপ্তাহ অভিনয়ের পরেই শিশিরকে এ প্রচেষ্টা ত্যাগ করতে হয়।

ইদানিং 'যাত্রা'-আসরের ন্যায় ওপন-এয়ার থিয়েটারের পক্ষপাতী হয়ে উঠেছিলেন শিশিরকুমার। জাতীয় নাট্যশালা প্রতিষ্ঠার জন্যও তাঁর একটা প্রবল আগ্রহ দেখা দিয়েছিল, কিন্তু তাঁর এ স্বপ্ন তিনি সফল করে উঠতে পারেননি। সুযোগ পেয়েও তিনি তা গ্রহণ করেননি। যেমন গ্রহণ করেননি তিনি রাষ্ট্রের দেওয়া সম্মান 'পদ্মভূষণ'। এতে তাঁর মনের দৃঢ়তা ও চরিত্রের বিশেষত্বই প্রকাশ পেয়েছে খুব উজ্জ্বল হয়ে। আপন প্রতিভার আভিজাত্যকে তিনি কোন প্রলোভনেই অবমানিত করতে চাননি।

এরপর শিশিরকুমার কিছুদিন ষ্টার রঙ্গমঞ্চে আর্ট থিয়েটার লিমিটেড-এর সঙ্গে একটা বন্দোবস্ত করে ওঁদের দলের সঙ্গেই মিলিতভাবে অভিনয় করেন। কিন্তু, এ চুক্তি বেশিদিন স্থায়ী হয়নি। শিশিরকুমার ষ্টার থিয়েটার ছেড়ে চলে এলেন।

তারপর ষ্টার থিয়েটার শূন্য করে দিয়ে আর্ট থিয়েটার লিঃ উঠে গেল। আর্ট থিয়েটারের সুযোগ্য কর্মসচিব শ্রীপ্রবোধ গুহ মহাশয় 'রঙ্‌মহল' থিয়েটারের পিছনের জমী লীজ নিয়ে সেখানে 'নাট্যনিকেতন' নাম দিয়ে এক বিরাট রঙ্গালয় প্রতিষ্ঠা করেন। কিন্তু শেষ রক্ষা করতে পারেননি। শিশিরকুমার প্রবোধ গুহের অনুরোধে এখানেও কিছুদিন অভিনয় করেন। নানা দুর্বিপাকে 'নাট্যনিকেতনের' দ্বারও বন্ধ হয়ে গেল। তখন শিশিরকুমার সেই রঙ্গালয়টি ভাড়া নিয়ে 'শ্রীরঙ্গম' নামে নূতন নাট্যশালা খুলেছিলেন। কিন্তু, ব্যবসাবুদ্ধির অভাবে এটিকেও রাখতে পারলেন না। দীর্ঘকাল পরে এখান থেকেও তাঁকে বিদায় নিতে হল। 'শ্রীরঙ্গমের' ধ্বংসাবশেষের উপর নবনাট্যশালা বিশ্বরূপা আজ সগৌরবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

'শ্রীরঙ্গম' হারাবার পর থেকেই শিশিরকুমার বেকার হয়ে পড়লেন। তাঁর শরীর ও মন একেবারে ভেঙে পড়লো! দু'একটি নাট্যশালা তাঁর নামের দাম আছে জেনে তাঁদের সম্প্রদায়ে যোগ দেবার জন্য শিশিরকুমারকে আহ্বান জানিয়েছিলেন। কিন্তু আত্মাভিমানী শিশিরকুমার কোথাও দাসত্ব স্বীকার করেননি। সরকার থেকে অনুরুদ্ধ হয়েও তিনি 'পশ্চিমবঙ্গ সঙ্গীত-নাট্য-নৃত্য আকাদামিতে' রাজকর্মচারী হয়ে কাজ করতে রাজী হ'ননি। নিজের বহুবিধ শিল্পী-সুলভ চ্যুতি বিচ্যুতি সত্ত্বেও শিশিরকুমারের মতো এতবড় বন্ধু-ভাগ্য ইতিপূর্বে এদেশের আর কোনও শিল্পী পেয়েছিলেন কিনা জানিনা। শিশিরকুমারের দুরদৃষ্টবশতঃ শেষ পর্যন্ত তাঁকে স্বীয় কর্ম বৈগুণ্যেই নিরাশ্রয় হয়ে পড়তে হয়েছিল। 'শ্রীরঙ্গম' যখন আর নিজের পায়ে দাঁড়াতে পারছে না, এগিয়ে এসেছিলেন তাঁর দুই ছাত্র—শ্রীরাম চৌধুরী ও অনিল রায়। অর্থে ও সামর্থ্যে তাঁরা শিশিরকুমারকে প্রভূত সাহায্য করে তাঁকে জলের উপর ভাসিয়ে রেখেছিলেন। নইলে অনেক আগেই হয়ত তাঁকে ডুবে যেতে হত। কিন্তু, এই রাম চৌধুরীও শেষ পর্যন্ত তাঁকে ছেড়ে চলে এসে দক্ষিণ কলিকাতায় অবিলম্বে এক 'কালিকা' নামে নূতন থিয়েটার স্থাপন করেছিলেন। অবশ্য এ কাজে নেমে তিনিও বেশি দিন চালাতে পারেননি। 'কালিকা থিয়েটার' আর কালিকা সিনেমায় রূপান্তরিত হয়েছে।

শিশিরকুমার পেশাদার অভিনেতারূপে নিজের প্রতিষ্ঠিত রঙ্গালয়ে অবতীর্ণ হ'য়ে প্রচুর অর্থোপার্জন করেছিলেন; বাংলাদেশের জনসাধারণ তাঁর অভিনয়ের একান্ত

অনুরাগী ভক্ত হয়ে উঠেছিল। দলে দলে তাঁরা গিয়ে দিনের পর দিন শিশিরকুমারের রঙ্গালয়ের প্রেক্ষাগার পূর্ণ করে দিতেন। কিন্তু, শিশিরকুমার আপন উচ্ছৃঙ্খলতার দোষেই তাদের বিমুখ করে তুলেছিলেন। শিশিরকুমারই প্রথম থিয়েটারে টিকিটের দাম দুটাকা-চারটাকা থেকে বাড়িয়ে পাঁচটাকা-দশটাকা করেছিলেন। শিশিরের থিয়েটারই প্রথম আট আনার গ্যালারী তুলে দেওয়া হয়েছিল। পিছনের সীটও তাঁর থিয়েটারে একটাকার কম পাওয়া যেত না। কিন্তু তবু লোক আসতো। টিকিটের জন্য কাড়াকাড়ি পড়ে যেত। কিন্তু শিশিরের অভিনয় অনিয়মিত হয়ে পড়ায় তারাও মুখ ফেরালে একদিন। তাই শিশিরকুমারকেও প্রতিভাশালী কবি মাইকেল মধুসূদনের মতোই কপর্দকশূন্য হ'য়ে বহুকষ্ট ও অভাবের মধ্যে দিন কাটিয়ে শেষ জীবনে অকারণ অভিমান ও মনক্ষোভ নিয়ে চোখ বুজতে হল। আক্ষেপের কথা সন্দেহ নেই। কিন্তু এ অবস্থার জন্য কাউকে দোষী করা চলবেনা। না সরকারকে, না তাঁর দেশবাসী জনসাধারণকে। কারুর ওপর অভিমান করা, ক্ষোভপোষণ করা চলে না তাঁর। তিনি স্বখাদ সলিলেই তলিয়ে গিয়েছিলেন। একথা আর কেউ না জানুক তাঁর অন্তরঙ্গ বন্ধুদের অবিদিত নেই।

তবে তিনি দেশকে যা দিয়ে গিয়েছেন দেশবাসী তা সকৃতজ্ঞ চিত্তে চিরদিন শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ রাখবে। রঙ্গজগতের জনক গিরিশচন্দ্রের, মতই আশা করি, শিশিরকুমারকে—বাংলা রঙ্গমঞ্চের এই অমিত শক্তিশালী নবযুগ-প্রবর্তককে বাঙালী কোনও দিন ভুলবে না। তিনি শুধু রঙ্গালয়ের মঞ্চ-ব্যবস্থা, নাটকের প্রযোজনা ও অভিনয়ের ধারাই বদলে দিয়ে যাননি, সবচেয়ে তিনি বড় কাজ করে গেছেন, সাহস করে এবং আর্থিক ক্ষতি স্বীকার করেও নবযুগের রুচি অনুযায়ী নূতন আদর্শে রচিত নাটক অভিনয়ের ব্যবস্থা করে। তাছাড়া একাধিক নট নটিকে তিনি নিজের অক্লান্ত চেষ্টায় আশ্চর্য শিক্ষার গুণে প্রথম শ্রেণীর নট-নটীতে রূপান্তরিত করে দিয়ে গেছেন। তাঁর ঋণ মনেহয় অপরিশোধনীয়। বাংলাদেশ ও বাঙালী জাতির সংস্কৃতির ইতিহাসে শিশিরকুমারের নাম স্বর্ণাক্ষরে লেখা থাকবে।

ছুটির রাতে

শ্রীআশুতোষ সান্যাল

ফুরালো ছুটির রাত্রি হাসি গল্প গানে,
আলস-আবেশে মাতি'।
আর দণ্ড দুই—
তারপর পোহাইবে এ মায়া যামিনী
ছিন্ন করি' ক্ষণিকের স্বপন-জড়িমা
রবিরশ্মি শরাঘাতে! প্রগল্‌ভ বিহগ
নারিকেল তরুশিরে তুলি' কলরব
জাগাইবে সুপ্তিলীন তরুণী উষারে
দিগন্ত শয়ন হ'তে! বাহুবল্লী ডোরে
কেন বৃথা চাহো মোরে রাখিতে বাঁধিয়া
ভুলাইয়া হাস্যে লাস্যে! কঠোর সংসার,
ভেবেছ কি সুকোমল অঞ্চল তোমার?
স্নেহ-মায়া প্রেম শূন্য সে যে মহামরু
ছায়াতরুহীন। সেথা নিঃসঙ্গ হৃদয়
নিয়ে তার দুঃখ-সুখ কামনা কল্পনা
মধ্যাহ্নে বিটপীচূড়ে কপোতের মত
কাঁদে রুদ্ধ অভিমানে। কে কাহার পানে
দেখিবে চাহিয়া!—যত যাযাবর পাখী
এক সাথে চলে উড়ে প্রসারিয়া পাখা
যে যাহার মত! হেথা প্রেমগুঞ্জরণ—
আর সেথা শোণিতাক্ত জীবন সংগ্রাম,
নিরন্তর অশ্রু-ধৌত ব্যাকুল প্রয়াস
রাখিবারে এ প্রাণের কম্প্রশিখাটিরে
জ্বালাইয়া ধীকি ধীকি পঞ্জরের কোণে
কোনো মতে! কূলহীন কর্ম-পারাবার
কল্লোলিছে অবিরল সম্মুখে আমার
উথলি' আকুলি' সদা। তারি ঊর্মি মাঝে
ঝাঁপায়ে পড়িতে হবে ক্ষণপরে আর!
কোথা তুমি—কোথা আমি—কত ব্যবধান!
চক্রবাক-চক্রবাকী বসি' দুই তীরে
তটিনীর! তুমি র'বে সতৃষ্ণ নয়নে
শঙ্কাদুরুদুরু বুকে অবিশ্রাম চাহি'
আমার পথের পানে।—আমি অতঃপর
দাসত্বের গুরুভার পরিয়া শৃঙ্খল
শুধিব নয়ন জলে ক্লান্তক্লিষ্ট দেহে
অর্থহীন এ বাস্তব জীবনের ঋণ!

বন মহোৎসব—

প্রতি বৎসর জুলাই মাসে সরকারী ও বেসরকারী চেষ্টায় বন মহোৎসব করিয়া আমরা বৃক্ষ রোপণ করিয়া থাকি। গত ১০ বৎসর যাবৎ এই ব্যবস্থা চলিলেও আমরা ইহার কোন সুফল দেখিতে পাই না। দেশে ফলের উৎপাদন যে বাড়িয়াছে, বাজারে ফল কিনিতে যাইয়া তাহা বুঝা যায় না। বহু নূতন পথ নির্মিত হইতেছে, সে সকল পথের ধারে গাছ পুতিয়া পথিককে ছায়া দানের কোন ব্যবস্থা হইয়াছে বলিয়া দেখিতে পাই না। বহু বন-জঙ্গল কাটিয়া সাফ করা হইয়াছে। তাহার পরিবর্তে বন জঙ্গল সৃষ্টির যে চেষ্টা দেখা যায়, তাহা হাস্যকর বলিয়া মনে হয়। কেন এমন হইতেছে? সাধারণ মানুষ এখনও বৃক্ষ রোপণের প্রয়োজন অনুভব করে নাই বা তাহাদের সে বিষয়ে অবহিত করার কোন চেষ্টা করা হয় নাই। বৎসরে এক বার করিয়া বৃক্ষ রোপণের যে অভিনয় করা হয়, তাহার মধ্যে কোনরূপ আন্তরিকতা আছে বলিয়া মনে হয় না। সরকারী বিবরণে দেখা যায় যে বন মহোৎসব উপলক্ষে লক্ষ লক্ষ চারা গাছ বিতরণ করা হইয়াছে, কিন্তু তাহার শতকরা কয়টি বাঁচে, তাহা জানা যায় না। নূতন ও পুরাতন পথ-গুলির ধারে ফলের গাছ রোপণ করা হইলে উভয় দিক দিয়া লোক উপকৃত হয়—ফলের সময় ফল পায় ও পথিক রৌদ্রের সময় ছায়া পায়। এ সকল কথা কি সরকারী কর্তৃপক্ষের কানে পৌছিবে?

শিশিরকুমার ভাদুড়ী—

বর্তমান নাট্যজগতের সর্বশ্রেষ্ঠ ব্যক্তি, সর্বজনপ্রিয় নট শিশিরকুমার ভাদুড়ী গত ২৯শে জুন সোমবার রাত্রি দেড়টার সময় তাঁহার বরাহনগরস্থ গৃহে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করিয়াছেন। তিনি দীর্ঘকাল ধরিয়া ভুগিতেছিলেন। তাঁহারই ইচ্ছানুসারে কাশীপুর শ্মশান ঘাটে ঠাকুর শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের চিতার পার্শ্বে পরদিন ৩০শে জুন বেলা ১১টায় তাঁহার নরদেহ ভস্মীভূত করা হয়। তাঁহার একমাত্র পুত্র শ্রীঅশোককুমার ভাদুড়ী শেষকৃত্য সম্পাদন করেন। ঐ দিন সকালে তাঁহার গৃহে, শবযাত্রায় পথে ও শ্মশানে কলিকাতার বহু সাহিত্যিক, সাংবাদিক, নট-নটী প্রভৃতি উপস্থিত হইয়াছিলেন। তাঁহার পৈতৃক বাসভূমি ছিল হাওড়া সাঁত্রাগাছিতে—তিনি ১৮৮৯ সালের ২রা অক্টোবর মেদিনীপুরে জন্মগ্রহণ করেন। ইংরাজি সাহিত্যে এম-এ পাস করিয়া তিনি মেট্রোপলিটান কলেজে (বর্তমান বিদ্যাসাগর কলেজ) অধ্যাপক নিযুক্ত হন। ছাত্রাবস্থাতেই তিনি কলিকাতা ইউনিভার্সিটি ইনিষ্টিটিউটে অভিনয় করিয়া খ্যাতি অর্জন করেন। ১৯২০ সাল পর্য্যন্ত অধ্যাপনার সহিত তিনি সৌখীন অভিনয় করতেন। পরে পেশাদার অভিনেতারূপে ম্যাডান থিয়েটারে যোগদান করেন। তথায় আলমগীর অভিনয়ে তাঁহার খ্যাতি ছড়াইয়া পড়ে। এক বৎসর পরে সে কাজ ছাড়িয়া চলচ্চিত্র নির্মাণে ব্রতী হন ও প্রথমে শরৎচন্দ্রের 'আঁধারে আলো' 'চন্দ্রনাথ' প্রভৃতি ছবি প্রস্তুত করেন। ১৯২৩ সালে তিনি নিজের দল গড়িয়া বড়দিনে ইডেন গার্ডেনের প্রদর্শনীতে 'সীতা' নাটক অভিনয় করেন। পরে আলফ্রেড থিয়েটার ভাড়া করিয়া 'বসন্ত-লীলা' অভিনয় করেন। ঐ স্থানেই ক্রমে আলমগীর, দিগ্বিজয়ী প্রভৃতি নাটক মঞ্চস্থ হয়। মনোমোহন থিয়েটারে সীতা, পাষাণী, জনা প্রভৃতি নাটকাভিনয়ের পর তিনি নাট্য-মন্দির প্রতিষ্ঠা করেন। তথায় বিসর্জন, পাণ্ডবের অজ্ঞাত-বাস, নরনারায়ণ, প্রফুল্ল, ষোড়শী, শেষরক্ষা, প্রতাপাদিত্য বিল্বমঙ্গল, দিগ্বিজয়ী, সধবার একাদশী, রমা, চন্দ্রগুপ্ত, পাণ্ড গৌরব, শঙ্খধ্বনি, তপতী প্রভৃতি বহু নাটক অভিনীত হয় পরে তিনি আর্ট থিয়েটারে যোগদান করেন ও ১৯৩০ সালে সদলে আমেরিকা যাইয়া তথায় বহু নাটক অভিনয় করেন পরে তিনি রঙমহল, নাট্যনিকেতন, ষ্টার প্রভৃতি বহু রঙ্গমঞ্চে অভিনয় করিয়াছেন। শ্রীরঙ্গম্ মঞ্চে তিনি দীর্ঘকা একটানা অভিনয়ের পর বিশ্রাম গ্রহণ করেন এবং মা মাঝে অভিনয় করিতেন। গত ৮ই ও ১০ই

মহাজাতি সদনে আলমগীর ও রীতিমত নাটকে যোগদান তাঁহার শেষ অভিনয়। তিনি স্বদেশপ্রেমিক, স্বাধীনচেতা ও দৃঢ় মনের মানুষ ছিলেন। সম্প্রতি তাঁহাকে পদ্মবিভূষণ উপাধি দেওয়া হইলে তিনি তাহা প্রত্যাখ্যান করেন। শেষ জীবনে অর্থকষ্ট পাইয়াও তিনি কাহারও নিকট নতি স্বীকার করেন নাই। আজ তাঁহার মৃত্যুতে দেশ কি হারাইয়াছে, তাহা ভবিষ্যৎ যুগের মানুষ বিচার করিবে।

সীমান্ত সমস্যা—

পশ্চিমবঙ্গ, বিহার ও আসামের সহিত পূর্বপাকিস্তানের সীমান্ত সমস্যার এখনও কোন সমাধান হয় নাই। একদল দুর্বৃত্ত প্রায়ই পূর্ব পাকিস্তান হইতে ভারতীয় রাজ্যে প্রবেশ করিয়া নানা প্রকার চুরি ডাকাতি, খুন-জখম ও অন্যান্য উৎপাত করিয়া থাকে। সে সকল কথা পাকিস্তান কর্তৃপক্ষকে জানানো হইলে তাঁহারা প্রতীকারের আশ্বাস দেন বটে, কিন্তু কার্য্যত কিছুই করা হয় না। তাহার ফলে প্রায় পূর্ব-পাকিস্তানবাসী দুর্বৃত্তের দল ভারত রাজ্যে প্রবেশ করিয়া ফসল চুরি করে, গরু ছাগল লইয়া পলায়ন করে, ধনীর গৃহ আক্রমণ করিয়া লুণ্ঠন করে, রাত্রিতে চুরি ডাকাতি করে—এমন কি মধ্যে মধ্যে ভারত রাজ্যে অবস্থিত গ্রামকে গ্রাম দখল করিয়া বসে এবং সৈন্যদল লইয়া তাড়া না করিলে পালায় না। এ ঘটনা পশ্চিমবঙ্গে নিত্যকার ব্যাপার। বেরুবাড়ী ও টুকের গ্রাম সমস্যার কথা আমরা ইতিপূর্বে কয়েকবার আলোচনা করিয়াছি—কিন্তু সে সমস্যার কোন মীমাংসা হয় নাই। ২৪ পরগণা, নদীয়া ও মুর্শিদাবাদ সীমান্তে ফসল চুরি, গাছের আম-কাঁঠাল চুরি, গোলা হইতে ধান লুণ্ঠন, ধনীর অর্থাদি অপহরণ, জোর করিয়া জমী দখল প্রভৃতির সংবাদ নিত্য সংবাদপত্রে প্রকাশিত হইয়া থাকে। ভারতরাজ্যের পুলিশ আক্রমণও করে না—রক্ষার ব্যবস্থাও করে বলিয়া মনে হয় না। মন্ত্রী বা পুলিসের কর্তা মধ্যে মধ্যে যাইয়া কোন কোন ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেন, দুর্বৃত্তেরা আবার নূতন স্থানে হাঙ্গামার সৃষ্টি করে। জলপাইগুড়ী, কুচবিহার, মালদহ, পশ্চিম দিনাজপুর প্রভৃতি অঞ্চলেও প্রায় প্রত্যহ ঐরূপ কোন না কোন ঘটনা ঘটিতে দেখা যায়। আজ পর্য্যন্ত এই সকল অনাচার বন্ধের কোন ব্যবস্থাই হইল না। ফলে সীমান্ত অঞ্চল হইতে বহু লোক ভয়ে পলাইয়া আসিতেছে। সীমান্তের কাছাকাছি জমীসমূহে কৃষকরা চাষ-আবাদ করিতে সাহস করে না—কারণ সকলেরই ভয়—শস্য থাকিলে পাকিস্তানীরা তাহা চুরি করিয়া লইয়া যাইবে। পশ্চিমবঙ্গে সীমান্ত অঞ্চলের অধিবাসীদিগকে কতদিন এইরূপ ভয় লইয়া বাস করিতে হইবে জানি না।' সত্বর ইহার স্থায়ী প্রতীকারে সরকারী কর্তৃপক্ষের অবহিত হওয়া প্রয়োজন। পাহারার ব্যবস্থা তত ভাল নহে—পাকিস্তানীরা সে সংবাদ জানে বলিয়া অনাচার করিতে আসিতে সাহসী হয়। অনাচারীদের শাস্তির ব্যবস্থা না হইলে অনাচার কখনই বন্ধ হইবে না।

মহাত্মা গান্ধীর ভাষণ—

অল্-ইণ্ডিয়া রেডিও কর্তৃপক্ষ মহাত্মা গান্ধীর যে সকল ভাষণের রেকর্ড সংগ্রহ করিয়াছেন, তাহার সবগুলি একসঙ্গে শোনানো হইলে মোট ৫১ ঘণ্টা সময় লাগিবে। ১৯৪৭ সালের জুন হইতে ১৯৪৮ সালের ৩০শে জানুয়ারী পর্য্যন্ত প্রদত্ত মহাত্মাজীর সকল প্রার্থনান্তিক ভাষণ ইহাতে আছে। ১৯৪৭ সালের মার্চ মাসে দিল্লীতে এসিয়া সম্মিলনের প্রদত্ত একমাত্র ইংরাজি ভাষণ ইহার মধ্যে স্থান পাইয়াছে। ৬খানি উভয়দিকের রেকর্ডে কতকগুলি নির্বাচিত ভাষণ দিয়া প্রস্তুত হইয়াছে—তন্মধ্যে ৩খানি বাজারে বিক্রয়ের জন্য দেওয়া হইয়াছে। রেডিও কর্তৃপক্ষ শ্রীমতী সরোজিনী নাইডু, সর্দার পেটেল, শ্রীনিবাস শাস্ত্রী, সি-এফ-এণ্ডরুজ, নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসু প্রভৃতি নেতাদের ভাষণগুলিও সংগ্রহ করিয়াছেন ও সত্বর সে গুলি সাধারণের জন্য বিক্রয়ের ব্যবস্থা করিবেন। বিজ্ঞান ভবিষ্যতেও সকলের বাণী শুনাইবার ব্যবস্থা করিতেছে।

চাউলের দর কমিল না—

পশ্চিমবঙ্গের খাদ্য সরবরাহ নীতি সামান্য পরিবর্ত্তিত হইলেও তাহা দ্বারা জনগণ আদৌ লাভবান হয় নাই। এখনও (২৪শে আষাঢ়) মফঃস্বলে চাউলের মন কোন কোন স্থানে ৩০ টাকার কম নহে। লোক আশা করিয়াছিল, পশ্চিমবঙ্গ সরকারের খাদ্যমন্ত্রী এমন ব্যবস্থা করিবেন, যাহার ফলে সাধারণ মানুষ অন্তত ৪৮ নয়া পয়সা সের দরে মোটা চাল কিনিতে পারিবে। রেশনের মারফতও ঠিক মত চাল পাওয়া যায়না—বেশী দামের (৫৪ নয়া পয়সা সের

দরের) চাল ত দুর্লভ, কমদামের চাল অধিকাংশ সময়ে অখাদ্য। সরকারী বণ্টন ব্যবস্থা আদৌ সন্তোষজনক নহে। হয় ত সরকারী গুদামে চাল মজুত আছে, কিন্তু সরকারী কর্মচারীদের অব্যবস্থার ফলে তাহা দ্বারা সাধারণ মানুষ আদৌ উপকৃত হয় না। খাদ্যমন্ত্রী বার বার যে ভাবে তাঁহার অক্ষমতা প্রমাণ করিয়াছেন, তাহার পর ঐ বিভাগের ভার অপর কোন মন্ত্রীর উপর দিলেই ভাল হইত। কেন জানি না, তাহা করা হয় নাই। চালের দাম না কমিলে সাধারণ মানুষ স্বাধীনতা উপলব্ধি করিতে পারে না—এ কথা প্রত্যেক চিন্তাশীল ব্যক্তি স্বীকার করিয়া থাকেন—অথচ ১২ বৎসর ধরিয়া কংগ্রেসী শাসকরা খাদ্য মূল্য নিয়ন্ত্রণের উপায় স্থির করিতে পারিলেন না। ইহার পর কি বলিয়া সাধারণ মানুষকে প্রবোধ দেওয়া সম্ভব। আমরা সরকারকে খাদ্যনীতি পরিবর্তন করিতে অনুরোধ জানাই।

পশ্চিমবঙ্গের রাজনীতি—

নানা কারণে কেরল রাজ্যে কম্যুনিষ্ট দল মন্ত্রিসভা গঠন করিয়া তাহা দ্বারা দেশের শাসন কার্য্য সুষ্ঠুভাবে চালিত করিতে পারেন নাই—সেজন্য তথায় গণ-আন্দোলন আরম্ভ হইয়াছে। সে আন্দোলনের পিছনে সঙ্গত কারণ বর্তমান। সেজন্য কেরল কংগ্রেস কর্তৃপক্ষ কম্যুনিষ্ট মন্ত্রিসভার বিরুদ্ধে অভিযোগ পত্র প্রস্তুত করিয়া তাহা রাষ্ট্রপতির নিকট দাখিল করিয়াছেন। তাহা দেখিয়া পশ্চিমবঙ্গের কম্যুনিষ্ট দলও পশ্চিমবঙ্গ মন্ত্রিসভার বিরুদ্ধে অভিযোগ পত্র প্রস্তুত করিতে লাগিয়া গিয়াছেন। কেরলে কম্যুনিষ্ট মন্ত্রিসভা যে ভাবে আইন ও শৃঙ্খলা পদদলিত করিয়া স্বেচ্ছাচারমূলক কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন পশ্চিমবঙ্গে সেরূপ কোন ঘটনা ঘটে নাই। অবশ্য বর্তমান যুগে ত্রুটিশূন্য রামরাজত্ব প্রতিষ্ঠা করা পশ্চিমবঙ্গের কংগ্রেসী মন্ত্রিসভার পক্ষেও সম্ভব হয় নাই—জনগণের বহু অভাব অভিযোগের প্রতীকার ব্যবস্থাও হইয়া উঠে নাই। এ অবস্থায় পশ্চিমবঙ্গে যদি গণ-আন্দোলন আরম্ভ করা হয়, তাহার ফলে দেশের লাভ অপেক্ষা ক্ষতিই অধিক হইবে। এ রাজ্যে কম্যুনিষ্ট দল যেখানেই গণ-আন্দোলনের চেষ্টা করিয়াছেন, সেখানেই তাহা বিফল হইয়াছে, অর্থাৎ জনগণের অকল্যাণ সাধন করিয়াছে। কাজেই দেশের সাধারণ অধিবাসীরা যেন সকল বিষয় চিন্তা করিয়া কম্যুনিষ্ট প্রবর্তিত গণ-আন্দোলন সম্বন্ধে কর্তব্য স্থির করেন।

শ্রীসত্যকিঙ্কর সাহানা—

বাংলার প্রবীণতম সাহিত্যিক, বাঁকুড়া জেলার গৌরব, শ্রীসত্যকিঙ্কর সাহানা সম্প্রতি ৮৬ বৎসর বয়সে পদার্পণ করায় তাঁহাকে কলিকাতায় সম্বর্দ্ধনা করা হইয়াছে। তাঁহার লিখিত বহু গ্রন্থের মধ্যে 'মহাভারতের অনুশীলন তত্ত্ব' ও
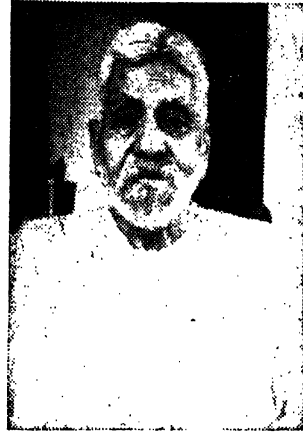
শ্রীসত্যকিঙ্কর সাহানা

'চণ্ডীদাস প্রসঙ্গ' বিশেষ উল্লেখযোগ্য। তাঁহাকে উপযুক্ত সম্মান দানের জন্য বাংলা দেশের কৃতী ব্যক্তিরা কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়কে এক অনুরোধ পত্র প্রেরণ করিয়াছেন। আমরা এই বর্ষীয়ান সাহিত্যিকের দীর্ঘজীবন কামনা করি।

পূর্ণ মন্ত্রীপদে শ্রীতরুণকান্তি ঘোষ—

১৯৫২ সালে পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভার সদস্য নির্বাচিত হইয়া অমৃতবাজার পত্রিকার সম্পাদক শ্রীতুষারকান্তি ঘোষের পুত্র শ্রীতরুণকান্তি ঘোষ পশ্চিমবঙ্গ সরকারের উপমন্ত্রী নিযুক্ত হইয়াছিলেন। ১৯৫৭ সালের সাধারণ নির্বাচনের সাফল্যের পর তিনি রাষ্ট্রমন্ত্রী নিযুক্ত হন। গত ৮ই জুলাই পশ্চিমবঙ্গ সরকার 'কৃষি ও খাদ্য উৎপাদন' নামে একটি নূতন বিভাগ খুলিয়া শ্রীতরুণকান্তি ঘোষকে তাহার ভারপ্রাপ্ত পূর্ণমন্ত্রী পদে নিযুক্ত করিয়াছেন। এত দিন পূর্ণমন্ত্রী পদে পশ্চিমবঙ্গে ১৩জন ছিলেন—তরুণকান্তি

মন্ত্রীপদ লাভ করায় মন্ত্রীর সংখ্যা ১৪জন হইল। তরুণ-কান্তি মহাত্মা শিশিরকুমার ঘোষের পৌত্র ও বৈষ্ণব মনোভাবাপন্ন। তিনি সর্বত্র বৈষ্ণব সম্মিলনে যোগদান করিয়া থাকেন। খাদ্য উৎপাদন ও কৃষি বিভাগ তাঁহার দ্বারা সুপরিচালিত হইয়া দেশের খাদ্যাভাব দুর করিবে—ইহাই সকলের বিশ্বাস।

জ্যোতিষচন্দ্র ঘটক—

খ্যাতনামা জ্যোতির্বিদ পণ্ডিত কলিকাতা ভবানীপুর নিবাসী জ্যোতিষচন্দ্র ঘটক গত ২০শে মে ৬৮ বৎসর বয়সে পরলোক গমন করিয়াছেন। তাঁহার অগ্রজ সতীশচন্দ্র রসরচনার জন্য সাহিত্য ক্ষেত্রে সুপরিচিত ছিলেন।

জ্যোতিষচন্দ্র ঘটক

জ্যোতিষচন্দ্র দীর্ঘকাল কলিকাতার বহু কলেজে অধ্যাপনার কাজ করিয়া খ্যাতি অর্জন করিয়াছিলেন। তিনি তিনটি বিষয়ে এম-এ ছিলেন এবং কলিকাতার পণ্ডিত সমাজ তাঁহাকে তাঁহার অগাধ জ্ঞানের জন্য শ্রদ্ধা-সম্মান করিত।

নানা স্থানে অতিবৃষ্টি—

মানুষ প্রকৃতিকে শৃঙ্খলিত করিয়া তাহা দ্বারা জন-কল্যাণের ব্যবস্থা করিয়া থাকে—প্রকৃতিও তাহার প্রতিশোধ লইতে কার্পণ্য করে না। পৃথিবীর সর্বত্র নূতন নূতন পরিকল্পনা প্রস্তুত করিয়া প্রাকৃতিক শক্তিকে নিয়ন্ত্রিত করিয়া তাহা দ্বারা মানব-সমাজের উপকার সাধনের ব্যবস্থা হইতেছে, সেজন্য পৃথিবীর সর্বত্র প্রাকৃতিক দুর্যোগও বাড়িয়া যাইতেছে। সম্প্রতি ভারতবর্ষে ও পাকিস্তানে অতিবৃষ্টির ফলে বহু মানুষ বিপন্ন ও ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে। করাচী ও লাহোরে অতিবৃষ্টিতে সে অঞ্চল বিশেষ বিপন্ন—এদিকে কাশ্মীরে ও আসামের বন্যায় মানুষের দুঃখ দুর্দ্দশার শেষ নাই। বন্যার্তদের সাহায্য দানের জন্য নানা ব্যবস্থা ও চেষ্টা হইতেছে বটে, কিন্তু হঠাৎ অতিবৃষ্টির ফলে যে দারুণ দুর্দ্দশা উপস্থিত হইয়াছে, সে জন্য লক্ষ লক্ষ মানুষকে অবর্ণনীয় দুঃখ সহ্য করিতে হইতেছে। চিরদিনই মানুষের সহিত প্রকৃতির এই সংগ্রাম লাগিয়া আছে ও থাকিবে, ইহার প্রতীকারের উপায় কোথায়?

শ্রীঅমিয়লাল দত্ত—

মেদিনীপুরের এক সাধারণ মধ্যবিত্ত পরিবারের সন্তান শ্রীঅমিয়লাল দত্ত এম-এ, বি-এল পাস করিয়া প্রথম জীবনে বীমার কার্য্যে যোগদান করেন। সম্প্রতি তিনি পূর্বাঞ্চল বীমা প্রদেশের জোনাল ম্যানেজার হইয়াছেন—তাঁহার
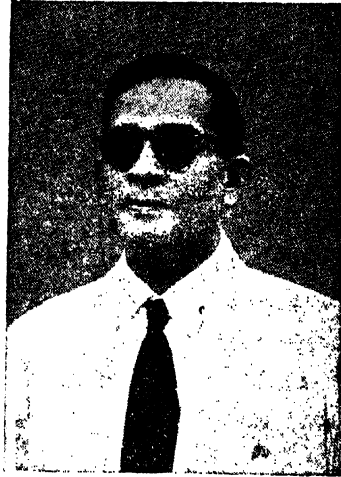
শ্রীঅমিয়লাল দত্ত

কার্য্যালয় কলিকাতায়। জীবন বীমা কর্পোরেশান তিনি বাঙ্গালী হিসাবে সর্বোচ্চ পদ লাভ করায় বাঙ্গালী মাত্রই উল্লসিত হইবেন। তিনি দিল্লীতে উত্তরাঞ্চল বীমা প্রদেশের জেনারেল ম্যানেজার থাকার সময় দিল্লীর বাঙ্গালী সমাজকে নানা ভাবে সমৃদ্ধ করার চেষ্টা করিয়াছিলেন।
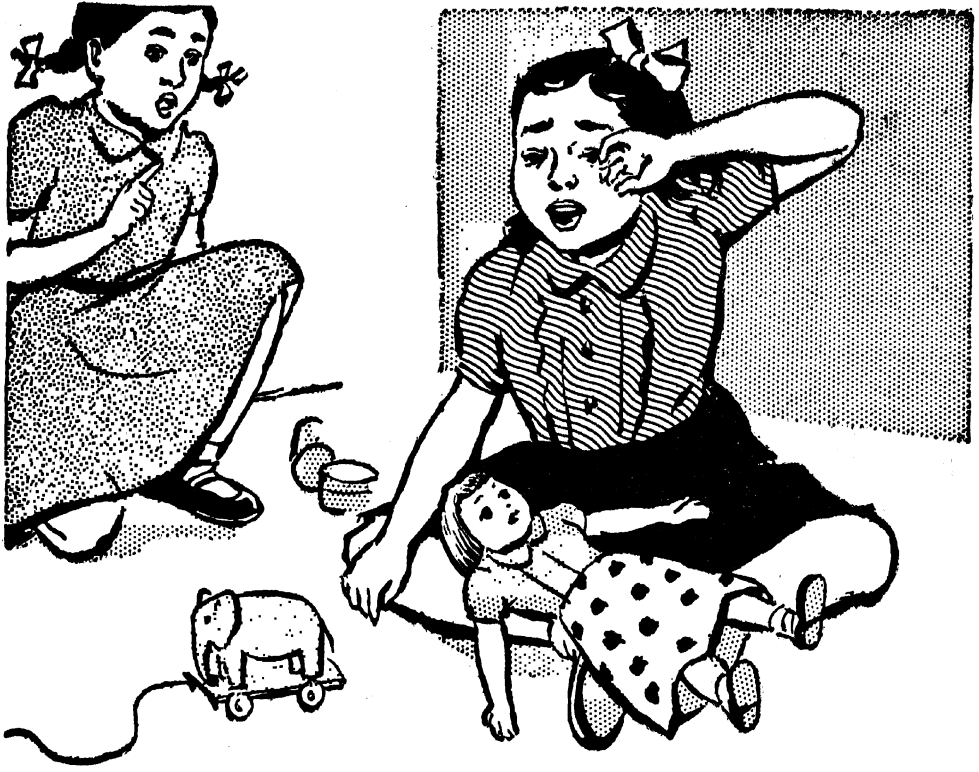
ছোট্ট মুন্নি কেন কেঁদেছিল

X52 BG

মুন্নি ফোঁপাতে আরম্ভ করল তারপর আকাশফাটা চিৎকার করে কেঁদে উঠল। মুন্নির বন্ধু ছোট্ট নিমু ওকে শান্ত করার আপ্রান চেষ্টা করছিল, ওকে নিজের আধ আধ ভাষায় বোঝাচ্ছিল—"কাঁদিসনা মুন্নি—বাবা আপিস থেকে বাড়ী ফিরলেই আমি বলব—" কিন্তু মুন্নির ভ্রুক্ষেপ নেই, মুন্নির নতুন ডল পুতুলটির দুধে আলতায় মেশানো গালে ময়লার দাগ লেগেছে, পুতুলের নতুন ফ্রকের ওপর পড়েছে ময়লা আঙ্গুলের ছাপ—আমি আমার জানলায় দাঁড়িয়ে এই মজার দৃশ্যটি দেখছিলাম। আমি যখন দেখলাম যে মুন্নি কোন কথাই শুনছেনা তখন আমি নিজে এলাম। আমাকে দেখেই মুন্নির কান্নার জোর বেড়ে গেল—ঠিক যেমন 'এন্কোর, এন্কোর' শুনে ওস্তাদদের গিটকিরির বহর বেড়ে যায়। আমাদের প্রতিবেশির মেয়ে নিমু—আহা বেচারা—ভয়ে জবুথবু হয়ে একটা কোনায় দাঁড়িয়ে আছে। আমি ঠিক কি করব বুঝতে পারছিলামনা। এমন সময় দৌড়ে এলো নিমুর মা সুশীলা। এসেই মুন্নিকে কোলে তুলে নিয়ে বলল—"আমার লক্ষী মেয়েকে কে মেরেছে?"

কান্না জড়ানো গলায় মুন্নি বলল—"মাসী, মাসী, নিমু আমার পুতুলের ফ্রক ময়লা করে দিয়েছে।"

"আচ্ছা, আমরা নিন্নুকে শাস্তি দেব আর তোমাকে একটা নতুন ফ্রক এনে দেব।"

"আমার জন্যে নয় মাসী, আমার পুতুলের জন্যে।"

সুশীলা মুন্নিকে, নিন্নুকে আর পুতুলটি নিয়ে তার বাড়ী চলে গেল আমিও বাড়ীর কাজকর্ম্ম সুরু করে দিলাম। বিকেল প্রায় ৪ টার সময় মুন্নি তার পুতুলটা নিয়ে নাচতে নাচতে ফিরে এলো। আমি উঠোন থেকে চিৎকার করে সুশীলাকে বললাম আমার সঙ্গে চা খেতে।

যখন সুশীলা এলো আমি ওকে বললাম "ডলের জন্যে তোমার নতুন ফ্রক কেনার কি দরকার ছিল?"

"না বোন, এটা নতুন নয়। সেই একই ফ্রক এটা। আমি শুধু কেচে ইস্ত্রী করে দিয়েছি।" "কেচে দিয়েছ? কিন্তু এটি এত পরিষ্কার ও উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে।"

সুশীলা একচুমুক চা খেয়ে বলল—"তার কারন আমি ওটা কেচেছি সানলাইট দিয়ে। আমার অন্যান্য জামাকাপড় কাচার ছিল তাই ভাবলাম মুন্নির ডলের ফ্রকটাও এই সঙ্গে কেচে দিই।"

আমি ব্যাপারটা আর একটু তলিয়ে দেখা মনস্থ করলাম। "তুমি তখন কতগুলি জামাকাপড় কেচেছিলে? আমাকে কি তুমি বোকা ঠাউরেছ? আমি একবারও তোমার বাড়ী থেকে জামাকাপড় আছড়ানোর কোন আওয়াজ পাইনি।"

সুশীলা বলল, "আচ্ছা, চা খেয়ে আমার সঙ্গে চল, আমি তোমায় এক মজা দেখাবো।"

সুশীলা বেশ ধীরেসুস্থে চা খেল, আর আমার দিকে তাকিয়ে মুচকি মুচকি হাসছিল। আমার মনের অবস্থা কিন্তু অন্যরকম। আমি একচুমুকে চা শেষ করে ফেললাম।

আমি ওর বাড়ী গিয়ে দেখলাম একগাদা ইস্ত্রীকরা জামাকাপড় রাখা রয়েছে। আমার একবার গুনে দেখার ইচ্ছে হোল কিন্তু সেগুলি এত পরিষ্কার যে আমার ভয় হোল শুধু ছোঁয়াতেই সেগুলি ময়লা হয়ে যাবে। সুশীলা আমাকে বলল যে ও সব জামাকাপড়ই সানলাইটে কেচেছে। ওই গাদার মধ্যে ছিল—বিছানার চাদর, তোয়ালে, পর্দা, পায়জামা, সার্ট, ধুতী, ফ্রক আরও নানাধরনের জামাকাপড়। আমি মনে মনে ভাবলাম বাবা: এতগুলো জামাকাপড় কাচতে কত সময় আর কতখানি সাবান না জানি লেগেছে। সুশীলা আমায় বুঝিয়ে দিল—"এতগুলি জামাকাপড় কাচতে খরচ অতি সামান্যই হয়েছে—পরিশ্রমও হয়েছে অত্যন্ত কম। একটি সানলাইট সাবানে ছোটবড় মিলিয়ে ৪০-৫০টা জামা কাপড় স্বচ্ছন্দে কাচা যায়।"

আমি তক্ষুনি সানলাইটে জামাকাপড় কেচে পরীক্ষা করে দেখা স্থির করলাম। সত্যিই, সুশীলা যা বলেছিল তার প্রতিটি কথা অক্ষরে অক্ষরে মিলে গেল। একটু ঘষলেই সানলাইটে প্রচুর ফেণা হয়—আর সে ফেণা জামাকাপড়ের সুতোর ফাঁক থেকে ময়লা বের করে দেয়। জামাকাপড় বিনা আছাড়েই হয়ে ওঠে পরিষ্কার ও উজ্জ্বল।

আর একটি কথা, সানলাইটের গন্ধও ভাল—সানলাইটে কাচা জামাকাপড়ের গন্ধটাও কেমন পরিষ্কার পরিষ্কার লাগে। এর ফেণা হাতকে মসৃণ ও কোমল রাখে। এর থেকে বেশি আর কিছু কি চাওয়ার থাকতে পারে?

SUNLIGHT SOAP

S. 2533-X52 BG

হিন্দুস্থান লিভার লিমিটেড, [illegible] প্রস্তুত
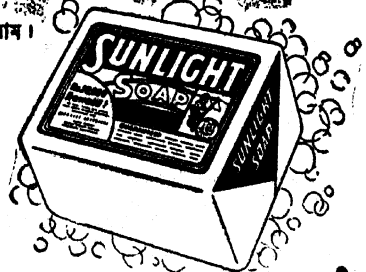
গ্রহ জগৎ

চতুর্থস্থান বা সুখভাব

(ভৃগুসংহিতা অবলম্বনে)

উপাধ্যায়

মেষলগ্ন জাতকের পক্ষে চতুর্থস্থান বা সুখভাব কর্কটরাশি।

এখানে রবির অবস্থিতি হোলে জাতকের সহজেই বিদ্যালাভ হয় এবং বিদ্যার্জ্জন সম্যক্‌ভাবে হওয়ায় চিত্তের প্রসন্নতা দেখা যায়, মাতৃ-স্বভাবপ্রাপ্তি ও সন্তানসুখ হয়। কথাবার্ত্তায় তার মাধুর্য্য থাকে। বিদ্যাক্ষেত্রে থেকে স্বোপার্জ্জিত ধনে ভূসম্পত্তি, পিতার সহিত আশানুরূপ সম্প্রীতি থাকে না। রাষ্ট্রশাসন ও সমাজ সম্পর্কে বিদ্বেষভাবাপন্ন হয় এবং গৃহে জ্ঞান বিজ্ঞান চর্চ্চার ব্যবস্থা করে। এখানে চন্দ্রের অবস্থিতি হোলে মাতৃসুখ ও সম্পত্তি লাভ হয়, বিলাসব্যসনের দিকে তার ঝোঁক থাকে। মঙ্গল এখানে অবস্থান করলে বেঁটে চেহারা হয়, মাতৃস্থানে ঈষৎ ক্ষতি ঘটে। গৃহসম্পত্তি বিষয়ে বিশেষ সুখ হয় না, স্ত্রী ভাগ্য ভালো হয় না, আর দৈনন্দিন জীবিকা উপার্জ্জনের জন্য কঠোর পরিশ্রম করতে হয়। বুধ থাক্‌লে পেশা থেকে লাভ হয়, রাজ সম্মান ও সামাজিক প্রতিষ্ঠা, ভ্রাতৃভগ্নী সুখ প্রভৃতি ঘটে। চতুর্থে বৃহস্পতি সৌভাগ্যসূচক, নানা লাভ হয়, ভূসম্পত্তি ও সম্মান প্রাপ্তি, পিতার সম্পর্কে ঔদাস্য, প্রভূত ঐশ্বর্য্য হেতু জীবনে কোন সমৃদ্ধি বা উন্নতির চেষ্টা করে না। জাতক ভাগ্যবান হয়। শুক্র থাক্‌লে যানবাহন, সুখ সম্পত্তি, সম্মান সৌন্দর্য্য ও উত্তম স্ত্রী লাভ হয়। পার্থিব ঐশ্বর্য্য ভোগ ঘটে—পারিবারিক আনন্দ ও উত্তম পেশালাভ হয়। শনি থাক্‌লে পিতৃবিষয়ে সুখী হয়, স্থানীয় ব্যবসায় শ্রীবৃদ্ধি, সম্মান ও আভিজাত্য মর্য্যাদাবৃদ্ধি, বাধা বিপত্তি অতিক্রম করবার শক্তি অর্জ্জন ইত্যাদি ঘটে। রাহু থাক্‌লে চতুর্থস্থান বা সুখ ভাবের ক্ষতি হয়, সুখ শান্তির ব্যাঘাত আসে, মাতৃ দুর্ব্বলতা, গৃহ ও সম্পত্তি বিষয়ে অসুখী, আশার অপূর্ণতা ও চিত্ত চাঞ্চল্য ঘটে। কেতু থাক্‌লে মায়ের সঙ্গে বিচ্ছিন্নতা, গৃহ সম্পত্তির ক্ষতি, নানা প্রকার দুঃখ ভোগ হয়।

বৃষলগ্ন জাতকের চতুর্থস্থান বা সুখভাব সিংহরাশি।

এখানে রবি থাক্‌লে অনেক ভূমিসম্পত্তি হয়, মায়ের প্রভাব প্রতি-পত্তি ঘটে, মর্য্যাদা বৃদ্ধি হয়, বেশী পরিশ্রমে অনিচ্ছা হয়। চন্দ্র থাক্‌লে ভ্রাতা ভগ্নীর সুখ, গৃহ ও ভূসম্পত্তি, পারিবারিক শান্তি, রাষ্ট্রশাসন ও সামাজিক সংক্রান্ত কাজে দৃষ্টি, মাতৃভূমির সম্মানের দিকে তার লক্ষ্য থাকে। মঙ্গল অবস্থান করলে মাতৃহানি বা মাতার সহিত বিচ্ছেদ, দৈনন্দিন জীবিকা উপার্জ্জনে সাফল্য লাভ হয়। স্বাধীন বৃত্তি অবলম্বন করলে তা থেকে কিছু ক্ষতি হয়। বুধ থাক্‌লে উত্তমভাবে বিদ্যালাভ, সন্তান সুখ, গৃহ সম্পত্তি, বাগ্মিতা ইত্যাদি সূচিত হয়। জাতক চতুর ও পরিশ্রমী হয়। বৃহস্পতি থাক্‌লে দীর্ঘ জীবন, খ্যাতি প্রতিপত্তি, বৈদেশিক সংস্রবে উন্নতি ও পিতার সহিত অসদ্ভাব হয়। শুক্র থাক্‌লে মাতৃ স্নেহ লাভ, রাজ সম্মান, সামাজিক প্রতিষ্ঠা, ব্যবসায়ে উন্নতির জন্যে কঠোর পরিশ্রম, শত্রু পীড়া ভোগ, গৃহ ভূমি সংক্রান্ত বিষয়ে আশানুরূপ প্রাপ্তির অভাব ইত্যাদি দেখা যায়। চতুর্থস্থান সিংহে শনি থাক্‌লে নিজের উন্নতি হয় বটে, কিন্তু পিতামাতার সহিত সদ্ভাবের অভাব দেখা যায় আর শত্রুনাশ ঘটে, পদমর্য্যাদা, সম্মান এবং রাষ্ট্র ও সমাজের ক্ষেত্রে প্রভাব বিস্তার ইত্যাদি হয়। এখানে রাহুর অবস্থিতি মাতার পক্ষে শুভ নয়, মাতৃহানি, গৃহ ও সম্পত্তির ক্ষতি, সুখ শান্তির অভাব, জীবনে নানা প্রকার দুঃখ কষ্ট, সহৃদয় আত্মীয়ের সান্নিধ্যের অভাব, চিত্তচাঞ্চল্য প্রভৃতি ঘটতে পারে। কেতুর অবস্থান মাতৃ ক্ষেত্রকে অশুভ করে, প্রবাস গমন, গৃহ সম্পত্তির ক্ষতি বা অভাব আর পারিবারিক অশান্তি হোতে পারে।

মিথুনলগ্নের চতুর্থস্থান বা সুখভাব হচ্ছে কন্যারাশি।

এখানে রবি থাক্‌লে ভ্রাতাভগ্নীর সুখ, গৃহ সম্পত্তি লাভ, পরিশ্রমের দ্বারা উন্নতি, পিতৃ-মাতৃ ক্ষেত্রে স্বাচ্ছন্দ্য, সমাজে ও রাষ্ট্রে উল্লেখযোগ্য স্থান অধিকার, ব্যবসায় ক্ষেত্রে সুযোগ সুবিধা, শান্তি সমৃদ্ধি প্রভৃতি হয়। চন্দ্র থাক্‌লে অর্থসঞ্চয়, বহু ভূসম্পত্তি, মাতৃস্নেহ ধনৈশ্বর্য্য হেতু স্বচ্ছন্দতা, সম্মান ও লোক সমাজে প্রতিষ্ঠা, সৌভাগ্য লাভ প্রভৃতি হয়। এখানে মঙ্গলের অবস্থান হেতু মায়ের পক্ষে শুভাশুভ ঘটনা ঘটে। গৃহ ও ও ভূসম্পত্তিলাভ, স্ত্রী বিষয়ে অসুখী, শত্রুবৃদ্ধি, যৌন সম্ভোগ তৃপ্তির অভাব, মানসিক কষ্ট, নানা কার্য্যে বাধা প্রভৃতি দেখা যায়। এখানে বুধের অবস্থিতি অত্যন্ত শুভ দায়ক। সুন্দর চেহারা, মাতৃ পক্ষিলাভ,

পিতৃক্ষেত্রের দুর্বলতা, উত্তম গৃহ সম্পত্তি লাভ, আধ্যাত্মিক শক্তি লাভ খেলাধূলা প্রিয়তা ও অত্যন্ত অনবধনতা, সম্মান লাভ প্রভৃতি সম্ভব। এখানে বৃহস্পতি ব্যবসায়ে ও বৃত্তি বা পেশা বিষয়ে, মাতৃক্ষেত্রে সম্মান, উন্নত ধরণের দৈনন্দিন জীবন যাত্রা ও জীবিকা নির্ব্বাহ, গৃহ ভূম্যাদির প্রাচুর্য্য, অযথা ব্যয়ের জন্য অসন্তোষ, স্ত্রী ও পরিবারবর্গের সহিত মধুর সম্বন্ধজনিত অত্যন্ত সুখলাভ প্রভৃতি হয়ে থাকে। এখানে শুক্র মাতৃস্থানকে দুর্ব্বল করে; প্রবাস, রাষ্ট্র ও সমাজে প্রতিপত্তি ও তজ্জনিত উন্নতি পারিবারিক অশান্তি ও মানসিক পীড়া প্রভৃতি যোগ দেখা যায়। শনির অবস্থানে মাতৃক্ষেত্র দুর্ব্বল হলেও ভাগ্যোন্নতি ঘটে, দৈনন্দিন জীবনযাত্রা উত্তম হয় ও গৃহবৃদ্ধি দেখা যায়, রাহুর অবস্থিতি মাতৃসুখ-হানি কর, সুখ সমৃদ্ধির জন্য মানসিক শক্তি ও উৎসাহ প্রয়োগ প্রভৃতি সম্ভব। কেতু ও এখানে মাতৃস্থান দুর্ব্বল করে, উত্তম গৃহ হয় কিন্তু জমিজমা সংক্রান্ত ব্যাপারে নানা প্রকার ঝঞ্ঝাট আসে। ধৈর্য্য ও সহিষ্ণুতা দেখা যায়। নানা প্রকার বাধাবিপত্তির ভেতর দিয়ে সাংসারিক উন্নতিও শ্রীবৃদ্ধি ঘটে।

কর্কটলগ্নের চতুর্থস্থান বা সুখ ভাব তুলারাশি।

রবির অবস্থান জাতকের নগদ টাকা হাতে বেশী রাখেনা, আর্থিক অস্বচ্ছলতা আনে, ব্যবসায়ে প্রতিপত্তি ও সম্মান লাভ হয়, ভুমিসম্পত্তি সংক্রান্ত ব্যাপারে নানা ঝঞ্ঝাট, চঞ্চলতার সঙ্গে অর্থোপার্জ্জন ও রাষ্ট্রে বা সমাজে সম্মান প্রভৃতি যোগ দেখা যায়। চন্দ্র এখানে অবস্থান করলে জাতক জন্মস্থানে সুখে বাস করে। তার সুন্দর চেহারা হয়। তার জমি-জমার সুখ হয়। সে সম্মান লাভ করে মস্তবড় ব্যবসায়ী হয়, বিদেশ যাত্রায় বাধা ঘটে, সমাজ ও রাষ্ট্র থেকে খ্যাতি মর্য্যাদা প্রভৃতি লাভ হয়। মনন শক্তির বলে পার্থিব সম্পদ পায়, আর পারিবারিক অবস্থা উত্তম হয়। এই স্থানে মঙ্গল থাকলে বুদ্ধি বলে ব্যবসায়ে বহু পরিকল্পনায় লাভ, পার্থিব ও পারিবারিক বিষয়ে সাফল্য, দৈনন্দিন জীবনযাত্রা পথে নানা সুযোগ সুবিধা, যৌন তৃপ্তি প্রভৃতি ঘটে। বুধ এখানে জাতককে কর্ম্ম-দক্ষ করে, পিতামাতার স্থান দুর্ব্বল করে, জমি জমা বিষয়ে অসুখী হয়, নানাদিকে বাধা বিঘ্ন, ভ্রাতা ভগ্নী থেকে অশান্তি ইত্যাদি সূচিত হয়। এখানে বৃহস্পতির অবস্থান সৌভাগ্যদায়ক, দৈব প্রভাবে ভূসম্পত্তি, সমাজে সম্মানলাভ ও শত্রুবৃদ্ধি হয়, দৈনন্দিন জীবন যাত্রায় উদ্বেগ ও নিরুৎসাহ সময়ে সময়ে ঘটে, ভাগ্যোন্নতির জন্যে বিশেষ নজর দেয় ও কৌশল অবলম্বন করে। শুক্র থাকলে গৃহ, সম্পত্তি সুখ, সহজে আয়, চাতুর্য্যবলে অর্থোপার্জ্জন ও তজ্জনিত আনন্দ, মায়ের বিশেষ স্নেহলাভ, পিতৃক্ষেত্র থেকে লাভ, বাহন ভোগ, সম্মান ইত্যাদি হয়। শনি এখানে থাকলে অত্যন্ত সুখসমৃদ্ধি, আয় বৃদ্ধি, স্ত্রী সুখ, যৌন-তৃপ্তি, সুকৌশলে দুঃখ কষ্ট আয়ত্তাধীনে আনা প্রভৃতি সম্ভব হয়। রাহু সুখস্বাচ্ছন্দ্যের বাধা প্রদান করে, মাতৃক্ষেত্র দুর্ব্বল হয়, গৃহসম্পত্তি হানি ঘটে, পারিবারিক কষ্ট হয়। অশান্তি উদ্বেগ লেগেই থাকে।

সিংহলগ্নের চতুর্থ স্থান বা সুখভাব বৃশ্চিক।

এখানে রবির অবস্থিতি মাতৃ স্থানকে সুদৃঢ় শক্তিসম্পন্ন করে, গৃহ ও ভূসম্পত্তি উত্তম হয়, নিজের স্থানে সুখেই জীবনযাপন ঘটে, ব্যবসায়ে ও পিতৃক্ষেত্রে অবহেলা, বিদেশ ভ্রমণে অসুবিধা, প্রকৃতিতে ঔদ্ধত্য আর শান্তির অভাব পরিলক্ষিত হয়। এখানে চন্দ্র মাতৃ বিষয়ে অসুখী করে, মনের শান্তি ও সুখ স্বাচ্ছন্দ্য হয় না, গৃহে বহু অশান্তির জন্য বিক্ষিপ্ত-চিত্ত, গৃহ সম্পত্তির যথেষ্ট ক্ষতি ও কোন ব্যক্তির পিতৃতুল্য উপকার-প্রাপ্তি প্রভৃতি সম্ভব। মঙ্গলের এখানে অবস্থিতি ভূ-সম্পত্তিকারক, মাতৃ-প্রতাপ বৃদ্ধি, উত্তম সৌভাগ্য, সুখশান্তি, ঈশ্বরে বিশ্বাস ও আমোদপ্রমোদের দিকে দৃষ্টি হয় কিন্তু পিতা ও ব্যবসায় বিষয়ে কিছু অশান্তি ভোগ সূচিত হয়। এখানে বুধের অবস্থিতি ধনৈশ্বর্য্যভোগ ও আয়বৃদ্ধি, ভূসম্পত্তি ও উত্তম গৃহ, গৃহে বসেই অনায়াসে সর্ব্বপ্রকার পার্থিব সম্পদভোগ সূচিত হয়, রাষ্ট্রে ও সমাজে সম্মানলাভ, পিতৃক্ষেত্র থেকে ও লাভ হয়। জাতক চতুর কর্ম্মী হয়ে থাকে। জীবনের উন্নতির পক্ষে নানাপ্রকার অনুকূল আবহাওয়া এই স্থানে সৃষ্টি করে বৃহস্পতি। মায়ের পক্ষে অশুভ হয়, সন্তান কষ্ট ও দীর্ঘ জীবন দেখা যায়। নানাপ্রকার সুযোগ সুবিধার মধ্যে দিনগুলি আনন্দে অতিবাহিত হয়। এখানে শুক্র থাকলে জাতক সহজেই মস্ত বড় ব্যবসায়ী হয়, তার খুব সম্মান ও প্রতিপত্তি হয়—মাতা-পিতা, ভ্রাতা-ভগ্নী ও আত্মীয় স্বজনের সাহচর্য্য ও সুখলাভ করে, রাষ্ট্র ও সমাজ শক্তিতে সুদৃঢ় হয়, গৃহ সম্পত্তি ও সুখভোগ ঘটে থাকে, সুসজ্জিত ও অলঙ্কৃত সৌধে বাস, নিয়মিত কর্ম্মী হওয়ার যোগ দেখা যায়। এখানে শনির অবস্থান ভালো নয়। মাতৃক্ষেত্র দুর্ব্বল হয়, নানারকম বাধা বিপত্তি ঘটায়, দৈহিক ও মানসিক স্বচ্ছন্দতার ব্যাঘাত ঘটে, প্রাত্যহিক জীবন যাত্রা ও জীবিকা নির্ব্বাহপক্ষে ও অনেক অসুবিধা আসে—জাতককে সংসার চালাবার জন্যে নানা কৌশল, সময়ে সময়ে অপকৌশল ও অবলম্বন করতে হয়। রাহু ও এখানে পার্থিব বিষয়ে দুঃখদাতা। মাতৃবিয়োগ বা মাতার সহিত বিচ্ছেদ, বহু বিপদ, চিত্তচাঞ্চল্য, সংসার যাত্রানির্ব্বাহে দুঃখ কষ্টভোগ, আশাভঙ্গ, মনস্তাপ ও শত্রুবৃদ্ধি দেখা দেয়। কেতুও এখানে মায়ের পক্ষে অশুভ, জন্মভূমি থেকে নির্ব্বাসন বা প্রবাস, অশান্তি-প্রদ আবহাওয়ার মধ্যে জীবনযাত্রা, অসাধারণ সহিষ্ণুতার সঙ্গে বাধা বিপত্তির সম্মুখীন হওয়া, গৃহ ও ভূমিহারা হয়ে কষ্টভোগ প্রভৃতি ঘটতে পারে।

কন্যালগ্নের চতুর্থ স্থান বা সুখভাব ধনু রাশি।

এই ধনুতে রবি থাকলে জাতক আমোদ-প্রমোদের জন্যে যে অর্থব্যয় করে সে অর্থ সহজেই আসে কিন্তু চিত্তের উদ্বেগ বা অশান্তি যায়না। মাতৃ-হানি বা বিচ্ছেদ ঘটে, ব্যবসায়ে ক্ষতি, পিতৃক্ষেত্রের দুর্ব্বলতা, সম্মানহানি রাষ্ট্র ও সমাজে খ্যাতি অর্জ্জনের অভাব ইত্যাদি দেখা যায়। এখানে চন্দ্র স্বচ্ছন্দে প্রভূত আয়ের ব্যবস্থা করে, জমিজমা ও গৃহ হয়, পিতামাতার সুখ সমৃদ্ধি লাভ ঘটে, যানবাহন প্রাপ্তি, প্রভূত সম্মান, মহৎকার্য্য, মাতৃ সুখ, বুদ্ধি প্রাখর্য্য দেখা যায়। মঙ্গলের অবস্থান দীর্ঘজীবন দাতা, মাতৃ-ক্ষেত্রের দুর্ব্বলতা, স্ত্রীর পক্ষে কিঞ্চিৎ অশুভ, পিতার সহিত অসদ্ভাব এবং বহু কার্য্যে অসাবধানতা ও অমনোযোগ, আয়ের স্বল্পতা ইত্যাদি পরি-লক্ষিত হয়। এখানে বুধ জাতককে সুখী করে, সুন্দর অট্টালিকায় তার

বাস হয়, পিতামাতার সুখ লাভ করে, সম্মান, প্রতিপত্তি, শারীরিক সৌন্দর্য্য, স্মৃতি ও মেধা লাভ হয়। রাষ্ট্র ও সমাজে প্রতিষ্ঠা অর্জ্জন হয়। জাতক আমুদে হয়। এখানে বৃহস্পতি স্ত্রী ও মাতার পক্ষে শুভপ্রদ। জাতকের সম্পত্তি, বৃত্তি থেকে সুখ, দীর্ঘায়ু, সুখৈশ্বর্য্যে জীবন অতিবাহিত করা ও পারিবারিক শান্তিলাভ প্রভৃতি সূচিত হয়। এখানে শুক্র থাকলে ধন সঞ্চয় ঘটে, গৃহ, গ্রাম, অর্থ সংক্রান্ত ব্যবসায়ে ধনাগম, পারিবারিক মর্য্যাদা বৃদ্ধি ও সম্মান দেখা যায়। সমাজ সেবার দিকে জাতক আকৃষ্ট হয়। শনির অবস্থিতিহেতু জাতকের উত্তম গৃহ হয়, গৃহে থেকেই সে কর্ম্ম-ক্ষেত্রের নানা জটিল সমস্যা সমাধান করে, তার শৌর্য্য-বীর্য্য ও সম্মানলাভ হয়, মাতৃক্ষেত্রে কোন স্ত্রীলোকের কাছ থেকে মাতৃস্থানীয়ার ন্যায় সাহায্য পায়। রাহুও কেতুর অবস্থান এখানে বহু গোলযোগের সৃষ্টি করে। দৈহিক মানসিক কষ্ট, গৃহ ভূমি ও অর্থ সম্পর্কে নানাকষ্ট ভোগ হয়।

তুলালগ্নের চতুর্থস্থান বা সুখভাব মকর রাশি।

রবির অবস্থিতি এখানে সুখের বিঘ্নকারক, আশানুরূপ অর্থাগম হয় না, পিতামাতার সাহায্য নিতে হয়, আশাভঙ্গ ও মনস্তাপ। চন্দ্র থাকলে নিজের সুন্দর গৃহ হয়, সম্মান ও মর্য্যাদা ঘটে, বড় ব্যবসায়ে সাফল্য, সামাজিক প্রতিষ্ঠা, কিন্তু কর্ম্মক্ষেত্রে মধ্যে মধ্যে অস্বচ্ছন্দতা। এখানে মঙ্গল অত্যন্ত সুখপ্রদ, দৈনন্দিন জীবিকা অর্জ্জনের পথে প্রচুর অর্থ, বহু-ভূসম্পত্তি, স্ত্রীর সুখ, বিবাহের পর আর্থিক সমৃদ্ধি, পরিবারে স্ত্রীর দোর্দ্দণ্ড প্রতাপ, মাতৃ সুখ, লোকবল জনিত সুখ, যৌন সম্ভোগের আতিশয্য প্রভৃতি দেখা যায়। এখানে বুধের অবস্থিতি সৌভাগ্য ও সুখৈশ্বর্য্যপ্রদ, বিলম্বে মাতৃ সুখ, ধর্ম্মানুষ্ঠান ও সম্ভ্রম প্রদান করে। এখানে বৃহস্পতির অবস্থান মায়ের পক্ষে অমঙ্গলদাতা। সুখৈশ্বর্য্যভোগ তেমন হয় না, কঠোর পরিশ্রমের দ্বারা সৌভাগ্য অর্জ্জন, গৃহে অশান্তি লেগেই থাকে, তা ছাড়া নানা অসুবিধা ও দুশ্চিন্তা। এখানে শুক্রের অবস্থিতি সৌভাগ্যবর্দ্ধক, দীর্ঘজীবনদাতা, পদমর্য্যাদাদায়ক ও সাংসারিক শ্রীবৃদ্ধি কারক। শনির অবস্থান অত্যন্ত সুখবর্দ্ধক, উচ্চাশঙ্কা, বুদ্ধির প্রাখর্য্য, মাতৃশক্তি, ভূসম্পত্তি ও অর্থের প্রাচুর্য্য ইত্যাদি সূচিত হয়। এখানে রাহু সুখ সমৃদ্ধিতে বাধা আনে, গৃহ ও মায়ের পক্ষে অশুভ, সময়ে সময়ে দারুণ ক্ষতি প্রভৃতি লক্ষ্য করা যায়। কেতুর অবস্থিতি অশুভব্যঞ্জক, মাতৃক্ষেত্রে ভূসম্পত্তিহানি ও বাহিরে বসতি হয়। জাতক অমনোযোগী হয়।

***

শ্রাবণ মাসের ব্যক্তিগত রাশির ফলাফল

মেষ

ভরণীনক্ষত্রজাত মেষরাশিগত ব্যক্তির পক্ষে অশুভ অংশন্যূন এবং শুভফলাধিক্য। কৃত্তিকাজাতগণের পক্ষে শুভাশুভ ফল মধ্যম। অশ্বিনী জাতগণের পক্ষে অশুভের আধিক্য। স্বাস্থ্য মোটামুটি ভালোই যাবে, তবে হজমের গোলমাল, জ্বর, রক্তপাত প্রভৃতি সম্ভব। ভ্রমণে বিপত্তি ও পারিবারিক মতভেদ জন্য অশান্তির সম্ভাবনা। প্রথমদিকে শান্তি ও শৃঙ্খলা পারিবারিক ক্ষেত্রে দেখা যাবে। আর্থিক ব্যাপারে এমাসটী ভালো যাবে না, প্রতারণার ক্ষতি, তাছাড়া চুরির ভয় আছে, পাওনা-দারের তাগাদা, স্পেকুলেশন চলতে পারে—কিন্তু কিছু লাভ কম হবে। ভূম্যাধিকারী ও বাড়ীওয়ালার পক্ষে মাসটী ভালো যাবেনা, কলহ বিবাদও মামলা-মোকর্দ্দমার আশঙ্কা। কৃষকের পক্ষে ও চাষবাসে নানা বাধা বিপত্তি ঘটবে। এজন্য ধৈর্য্য অবলম্বন বাঞ্ছনীয়। চাকুরির ক্ষেত্রে শুভ, পদোন্নতি, প্রতিযোগিতায় সাফল্য ও শত্রুনাশ, এবং উপরওয়ালার শুভদৃষ্টি আশা করা যায়। ব্যবসায়ী ও বৃত্তিজীবীগণের পক্ষে মাসটী মধ্যম—গতানুগাতকভাবে আয় হবে। মেয়েদের পক্ষে দ্রুত পরিবর্ত্তন হবে, ভালো থেকে মন্দ অবস্থায়, আবার মন্দ থেকে ভালো অবস্থায়। সামাজিক ও পারিবারিক ক্ষেত্রে নানাপ্রকার আমোদপ্রমোদজনিত সুখানুভব, আকস্মিকভাবে অবৈধ প্রণয়ের জন্য ব্যাকুলতা ও সুযোগ-লাভ, স্বামীর প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা, অপবাদ ও বিচ্ছেদ সম্ভাবনা—রোমান্টিক আবহাওয়া অতিমাত্রায় চলবে এবং তাতে মগ্ন হয়ে থাকবার সম্ভাবনা অত্যধিক। দাম্পত্য কলহ ও অশান্তি যোগ। কুমারী ও বিধবাগণের পক্ষে বিশেষ সতর্ক হওয়া উচিত। বিদ্যার্থীগণের পক্ষে বাধা, পরীক্ষায় অসাফল্য, বা আশানুরূপ উন্নতি হবে না।

বৃষ

কৃত্তিকা ও মৃগশিরাজাতগণের পক্ষে রোহিণীজাতগণের চেয়ে শুভাধিক্য। সাধারণভাবে সাফল্য, সুখসমৃদ্ধিলাভ, সন্তানগণের কাছ থেকে সদ্ব্যবহার প্রাপ্তি, নূতন বিষয়ে অধ্যয়ন, গৃহে মাঙ্গলিক অনুষ্ঠান, শীকার ও ভ্রমণ যোগ আছে। অশুভের দিকে মামলা-মোকর্দ্দমা ঘটবে, সন্তানদের জন্য দুশ্চিন্তা, ভৃত্য বিভ্রাট, বন্ধুদের প্রতারণা ও ব্যয় এই ফলগুলি দেখা যাবে। শারীরিক স্বাস্থ্য ভালোই বলা যায়, কেবল হজমশক্তির হ্রাসজনিত উদরে গোলমাল ঘটতে পারে। ঘরে বাহিরে ঝগড়া বিবাদ বচসা চলবে আত্মীয় স্বজন ও বন্ধুবান্ধবরা নানা প্রকারে উদ্বিগ্ন, অসুখী ও ক্ষতিগ্রস্ত করতে পারে। যেখানে দৃঢ়তার আবশ্যক সেখানে কোনপ্রকার রফা করে কোনকিছু মিটিয়ে নেওয়া চলবে না। মিটমাট বর্জ্জনীয়। আর্থিক অবস্থা সন্তোষজনক বলা যায় না। নগদ টাকার ঘাটতি পড়বে। স্পেকুলেশনে লাভ হবে। ভূম্যাধিকারী ও বাড়ীওয়ালাদের মাসটী মধ্যম যাবে, রাষ্ট্রসরকারের জন্যে কিছু কিছু অসুবিধাও গোলযোগের সম্ভাবনা আছে। চাকুরীজীবীদের পক্ষে মাসটী ভালোই যাবে, পদোন্নতির সম্ভাবনা আছে, উপরওয়ালার সুনজর পড়বে, ব্যবসায়ী ও বৃত্তিজীবীদের কাজ বেড়ে যাবে, আয়ও হোতে থাকবে। ভাবপ্রবণ ও রোমান্টিক ধরণের মেয়েরা সামাজিক ক্ষেত্রে বেশ আনন্দ পাবেন—অবৈধ প্রণয়ে সাফল্য ঘটবে। পারিবারিক ক্ষেত্রেও সুখ স্বাচ্ছন্দ্য ও বস্ত্রালঙ্কার লাভ। বহু মহিলার মধ্যে বিবাহ প্রেমজনিত প্রেরণায় পুরুষের সহিত বন্ধুত্ব সূত্রে আবদ্ধ হওয়ার সুযোগ ঘটবে।

ঘরে বাইরে মর্য্যাদা বৃদ্ধি হবে, অবিবাহিতাগণের পক্ষে বিবাহের সুযোগ আসবে। যে সব মহিলার সাহিত্য, শিল্প ও সঙ্গীতের দিকে ঝোঁক, তাঁদের মধ্যে রোমান্টিক পরিবেশ বৃদ্ধি হবে। বিদ্যার্থীগণের পক্ষে কিছু শুভফল দেখা যায়, পরীক্ষায় মধ্যম ফল।

মিথুন

মৃগশিরাজাতগণের পক্ষে অশুভত্ব অংশ ন্যূন। আর্দ্রা ও পুনর্ব্বসু নক্ষত্রাশ্রিতগণের পক্ষে অশুভত্ব বেশী দেখা যাবে। এমাসে খ্যাতি প্রতিপত্তির হ্রাস, শারীরিক গোলযোগ, কর্ম্মে বাধা বিপত্তি, উদ্বেগ, বন্ধুবান্ধবের সঙ্গে কলহ, ক্লান্তিকর ভ্রমণ, অভাবনীয় পরিবর্ত্তন ও ব্যয়-বৃদ্ধি এইগুলি অশুভ ফল। সাফল্য লাভের কিছু আশা, ভোগবিলাস দ্রব্য লাভ ও উপভোগ, ব্যাধি থেকে মুক্তি, ও দুশ্চিন্তার অপনোদন—এইগুলি শুভফল। শরীর সম্বন্ধে সতর্ক দৃষ্টি প্রয়োজন, অতিরিক্ত রক্তের চাপবৃদ্ধি, উদরের গোলমাল ও শ্বাসকাস কষ্ট ঘটতে পারে। স্বজন-বিরোধ ও পারিবারিক কলহ, এমন কি অপবাদের ভয় আছে। অর্থ সম্পর্কে এমাসটী মিশ্রফলদাতা। আকস্মিকভাবে বিশেষ আয়বৃদ্ধি হোলেও চাহিদা বৃদ্ধির জন্যে অর্থ অনেকটা বেরিয়ে যাবে, ফলে সঞ্চয়ের আশা কম। প্রতারণার ক্ষতিযোগ আছে। স্পেকুলেশন বর্জ্জনীয়। ভূম্যধিকারী ও বাড়ীওয়ালার পক্ষে মাসটি খারাপের দিকে বলা যায়, এজন্যে সতর্কতা আবশ্যক। চাকুরিজীবীদের পক্ষে শুভ হবে, উন্নতির সুযোগ আসবে। ব্যবসায়ী ও বৃত্তিজীবীরাও এ মাসে ভালো ফল পাবে—লাভের যোগ আছে। মেয়েদের পক্ষে এ মাসটা একেবারে নিস্তেজ। যাঁরা গৃহিণী, চিত্রতারকা, সামাজিক ও মিশুক, তাঁরা তাঁদের বৈশিষ্ট্য প্রকাশ করবার কোন সুযোগ পাবেন না। প্রণয়ের ক্ষেত্রে নৈরাশ্যজনক পরিস্থিতি ও অবৈধ প্রণয়ে অসাফল্য ও বিশ্বাস-ঘাতকতার সম্ভাবনা। বিদ্যার্থীগণের পক্ষে মাসটী ভালো বলা যায়না, পরীক্ষার ফল আশাপ্রদ নয়।

কর্কট

অশ্লেষাজাতগণের পক্ষেই শুভাধিক্য, পুনর্ব্বসুর পক্ষে মিশ্র এবং পুষ্যার পক্ষে নিকৃষ্ট। শত্রু জয়, শুভ মাঙ্গলিক অনুষ্ঠান, অগ্রজদের অনুগ্রহ, বিলাস ব্যসন উপভোগ, সৌভাগ্য বৃদ্ধি, নানারূপ মঙ্গলকর পরিবর্ত্তন, সুখ স্বাচ্ছন্দ্য প্রভৃতি শুভফলগুলির সম্ভাবনা আছে। স্বজন ও বন্ধুবান্ধবদের দ্বারা ক্ষতি, ভ্রমণে ক্ষতি, দুষ্টলোকের প্ররোচনায় গর্হিত কার্য্য করার জন্যে ক্ষতি, কার্য্যকলাপ গ্রহণের পথে বাধা, বন্ধু-বান্ধবদের সঙ্গে মনান্তর ও উদ্বিগ্নতা প্রভৃতি অশুভ ফলগুলি ঘটতে পারে। মাসের প্রারম্ভে জ্বরভাব, রক্তের চাপবৃদ্ধি ইত্যাদি সুচিত হয়। পারিবারিক ব্যাপার শুভ বলা যায়। পরিবারে নবজাত শিশুর আবির্ভাব সম্ভাবনা। আত্মীয় স্বজন ও বন্ধুবান্ধবের সমাগম। আর্থিক স্বচ্ছন্দতা। স্পেকুলেশনে লাভ। ভূম্যধিকারী ও বাড়ীওয়ালার পক্ষে মধ্যম সময়। চাকুরিজীবীদের পক্ষে মাসটী মন্দ নয়। প্রতিযোগিতায় সাফল্য লাভের সম্ভাবনা। কর্ম্মক্ষেত্রে কোন আশানুরূপ পরিবর্ত্তনের যোগ আছে। ব্যবসায়ী ও বৃত্তিজীবীদের পক্ষে মাসটি অশুভ নয়। এ মাসটি মেয়েদের পক্ষে শুভ। পারিবারিক শান্তি ও সুখস্বাচ্ছন্দ্য, অলঙ্কার ও বিলাস ব্যসন দ্রব্য ক্রয়, ধনীর সান্নিধ্য লাভ,—প্রণয়, পূর্ব্ব-রাগ, অবৈধ প্রণয় সম্পর্কে মাসটী উত্তম—সাফল্য লাভের যোগ আছে। বিদ্যার্থীগণের পক্ষে মাসটী শুভ, পরীক্ষার্থীগণ সাফল্য লাভ করবে।

সিংহ

পূর্ব্বফল্গুনীনক্ষত্রাশ্রিত ব্যক্তিগণের পক্ষে মাসটি উত্তম, তৎপরবর্ত্তী উত্তরফল্গুনীজাতগণের ফলাফল মধ্যম, সর্ব্বাপেক্ষা কষ্টভোগ করবে মঘানক্ষত্রজাতগণ। কর্ম্মে সাফল্য, সাধারণভাবে সৌভাগ্য বৃদ্ধি, লাভ, পারিবারিক সুখ স্বাচ্ছন্দ্য, বিলাসব্যসন দ্রব্য উপভোগ ইত্যাদি মাসের প্রথমার্দ্ধে সম্ভব, শেষার্দ্ধে মানসিক অস্বচ্ছন্দতা, উদ্বেগ, অপরিমিত ব্যয়, সন্তানদের জন্যে নানারূপ কষ্টভোগ, দুষ্ট সংসর্গ ও তজ্জনিত অপবাদ, স্বজন বিয়োগ প্রভৃতি সম্ভব। পিত্ত প্রকোপ ব্যতীত মোটামুটি শরীর ভালো যাবে, ভ্রমণের দিকে অগ্রসর না হওয়াই ভালো, ছোটখাটো দুর্ঘটনার সম্ভাবনা আছে। মাসের শেষার্দ্ধে পারিবারিক কলহ ও অন্তরঙ্গ আত্মীয়ের সঙ্গে মনান্তর, স্বজনবিয়োগজনিত শোক প্রাপ্তি। মাসের শেষের দিকে মনমেজাজ ও শরীর ভালো বলা যাবে না। আর্থিক-অস্বচ্ছন্দতা এবং আয়ের পথগুলির দুর্ব্বল অবস্থা আশঙ্কা করা যায়। বন্ধুবান্ধবদের জন্যে জামিন হওয়া বা তাদের টাকা ধার দেওয়ার পরিণাম অশুভ হবে। স্পেকুলেশন বর্জ্জনীয়। বাড়ীওয়ালা ও ভূম্যধিকারীগণের অবস্থা মোটামুটি মন্দ নয়। মামলা-মোকর্দ্দমা বর্জ্জনীয়। চাকুরির ক্ষেত্র সুবিধাজনক নয়, নানাপ্রকার কষ্টভোগ হবে। ব্যবসায়ী বৃত্তিজীবীর পক্ষে মাসটী অশুভ নয়। স্ত্রীলোকের পক্ষে মাসের প্রথমার্দ্ধ শুভ, শেষার্দ্ধ শুভ বলা যায় না—অপবাদ যোগ আছে, তাছাড়া প্রণয়ে বিপত্তি থাকায় পুরুষের সান্নিধ্যে না আসাই ভালো। বিদ্যার্থীগণের পক্ষে মাসটি মধ্যম, পরীক্ষার্থীগণের পক্ষে উত্তম বলা যায় না।

কন্যা

হস্তানক্ষত্রাশ্রিত ব্যক্তির পক্ষে নিকৃষ্ট ফল, কিন্তু উত্তরফল্গুনী ও চিত্রানক্ষত্রাশ্রিতগণের পক্ষে অপেক্ষাকৃত শুভ। এমাসে শুভাশুভ মিশ্র ফল পাওয়া যাবে। সাধারণতঃ ধীরে ধীরে সাফল্য, মনোভিলাষপূর্ণ হবে, বিলাসব্যসন দ্রব্যাদি লাভ, উত্তম বন্ধুত্ব ও সাহচর্য্য, সৌভাগ্য বৃদ্ধি, মাঙ্গলিক অনুষ্ঠান প্রভৃতি শুভফল আশা করা যায়, স্বাস্থ্য মোটা-মুটি মন্দ যাবে না। পিত্ত-প্রকোপ ও চক্ষুপীড়ার সম্ভাবনা। পারি-বারিক ক্ষেত্র শুভ, কোনপ্রকার কলহ বিবাদ নেই, হলেও তা সামান্যই হোতে পারে। স্বজন বিরোধ, একজন্যে উদ্বিগ্নতা ও ক্ষোভ। আর্থিক অবস্থা উত্তম হবে, বিভিন্ন উপায়ে লাভ, এ মাসে দীর্ঘ মেয়াদী চুক্তিতে অর্থ বিনিয়োগ করলে, ভবিষ্যতে তা থেকে বিশেষ অর্থাগম হবে। তৈল, জলীয় পদার্থ প্রভৃতি ব্যবসায়ের দিকে অগ্রসর হোলে সুন্দর প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠবে। ভূম্যধিকারী ও বাড়ীওয়ালাদের পক্ষে মাসটী উত্তম নয়। সম্পত্তিহানি যোগ আছে, মামলা মোকর্দ্দমার বিশেষ সম্ভাবনা। চাকুরী-জীবীদের পক্ষে মাসটী শুভ, কর্ম্মে সাফল্য, কর্ম্মোন্নতি, নূতনপদপ্রাপ্তি, সম্মান ও উপরওয়ালার সুনজর আশা করা যায়। ব্যবসায়ী ও বৃত্তি-

জীবীগণের পক্ষে মাসটী উত্তম বলা যায় না, আশানুরূপ আয়ের ব্যাঘাত ঘট্‌বে। মেয়েদের পক্ষে মাসটী একেবারে বেয়াড়া ও নিস্তেজ—প্রণয়ীদের ঔদাস্য, অবৈধ প্রণয়ে ব্যাঘাত, বিবাহে বিশৃঙ্খলতা, পার্টিতে নৈরাশ্যজনক পরিস্থিতি বা সমাদরের অভাব, পারিবারিকক্ষেত্রে উদ্বেগ, অশান্তি আশাভঙ্গ ও মনস্তাপ—দাম্পত্য কলহ। এক্ষেত্রে কোনরকম দিন অতিবাহিত করাই ভালো, কোন প্রকার কার্য্যে হস্তক্ষেপ করা আশঙ্কাজনক বা বিঘ্নপ্রদ। বিদ্যার্থীগণের পক্ষে মাসটী মধ্যম, পরীক্ষার্থীগণের পক্ষে ও মধ্যম।

তুলা

স্বাতীনক্ষত্রাশ্রিতগণের পক্ষে নিকৃষ্ট ফল, চিত্রা ও বিশাখা নক্ষত্রাশ্রিতগণের পক্ষে বহুলাংশে ভালো। মনোভিলাষ পূর্ণ হবে, লাভযোগ আছে, বিলাস ব্যসন দ্রব্যাদিভোগ, সম্বন্ধলাভ, মাঙ্গলিক অনুষ্ঠান, আমোদ-প্রমোদ, খ্যাতি প্রতিপত্তি, সৌভাগ্যসূচনা, বান্ধবীলাভ। গুরুজনও বয়োজ্যেষ্ঠদের সঙ্গে ব্যবহারে সতর্ক হওয়া উচিত। দৈহিক অবস্থা সন্তোষজনক। পারিবারিকক্ষেত্র উত্তম হবে, শান্তি ও শৃঙ্খলা অক্ষুণ্ণ থাক্‌বে। পরিবারবর্গের মধ্যে কারো বিবাহ সূচিত হয় ;—গৃহে মাঙ্গলিক অনুষ্ঠান। আর্থিকক্ষেত্রে শুভ, মাসের প্রথমার্দ্ধে অর্থ সংক্রান্ত ব্যাপারে শত্রু বৃদ্ধি যোগ আছে। বহু দিক থেকে অর্থাগমের সুযোগ আছে। ভূম্যধিকারী ও বাড়ীওয়ালাদের পক্ষে মাসটি আশাপ্রদ নয়। চাকুরিরক্ষেত্র শুভ। মেয়েদের পক্ষে মাসটী আনন্দজনক। সর্ব্বপ্রকার ব্যাপারে সাফল্য। পারিবারিক ও সামাজিক ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠা অর্জ্জন। সর্ব্বপ্রকার প্রণয়ঘটিত ব্যাপারে সাফল্য ও আনন্দজনক পরিস্থিতি—পূর্ব্বানুরাগে কৃতকার্য্যলাভ, বিবাহ এবং প্রণয়ীর আনুগত্যলাভ. উপঢৌকন প্রাপ্তিযোগ আছে। পরীক্ষার্থী ও বিদ্যার্থীগণের সাফল্যলাভ।

বৃশ্চিক

জ্যেষ্ঠানক্ষত্রজাতকগণের পক্ষে মাসটি অপেক্ষাকৃত শুভ। অনুরাধা ও বিশাখানক্ষত্রাশ্রিতগণের পক্ষে মিশ্রফললাভ। স্বজনবিয়োগ, কুটুম্ববিরোধ অকারণ অপ্রিয়ভাজন হওয়া, শত্রুবৃদ্ধি, ক্লান্তিকর ভ্রমণ, কর্ম্মে অসাফল্য, উদ্বিগ্নতা ও আশাভঙ্গ এইগুলি অশুভ ফল ফলবে। সমগ্র মাসটী চল্‌বে শারীরিক দুর্ব্বলতা, রক্তের চাপবৃদ্ধি, করোনারি থ্রম্বসিস প্রভৃতি বিষয়ে সতর্কতা আবশ্যক। স্ত্রীপুত্রগণেরও শারীরিক অসুস্থতা। মানসিক পীড়া ঘট্‌বে পারিবারিক ও ব্যক্তিগত সংক্রান্ত ব্যাপারে। আর্থিক অবস্থার দুর্ব্বলতা বিশেষভাবে দেখা যাবে। কোনপ্রকার লাভের আশা নেই বরং ব্যয় বৃদ্ধি হবে। টাকা লেন দেন বা স্পেকুলেশন একেবারেই বর্জ্জনীয়। বাড়ীওয়ালা ও ভূম্যধিকারীদের পক্ষে দুঃসময়, মামলায় পরাজয়, সম্পত্তিনাশ, বে-আইনী কাজের জন্য দণ্ডবিধি আইনের আওতায় আসা প্রভৃতি ভয় আছে। চাকুরি-জীবী, ব্যবসায়ী ও বৃত্তিজীবীদের পক্ষে মাসটী নানাকারণে অশুভ। মেয়েদের পক্ষে খুব হুঁসিয়ার হয়ে চলা দরকার—কোনপ্রকার অসতর্ক মুহূর্ত্তে ভ্রমাত্মক কাজ করলেই তার পরিণতি শোচনীয় হয়ে উঠ্‌বে, আর লাঞ্ছনাভোগ করতে হবে। কোনপ্রকার গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্তে আসা এ মাসে কোন মেয়ের পক্ষে শুভ হবে না। পরীক্ষার্থী ও বিদ্যার্থীগণের পক্ষে মাসটী ভালো নয়।

ধনু

পূর্ব্বাষাঢ়ানক্ষত্রাশ্রিতগণের পক্ষে বহুলাংশে ভালো। উত্তরাষাঢ়া-নক্ষত্রাশ্রিতগণ মধ্যম ফল পাবে। মূলানক্ষত্রাশ্রিতগণের পক্ষে অধম ফললাভ। কারো পক্ষে মাসটী একেবারে সম্পূর্ণ ভালো বা মন্দ হবে না। ক্লান্তিকর ভ্রমণ, শারীরিক ও মানসিক অসুস্থতা, ক্ষতি, দুর্ঘটনায় আঘাত-প্রাপ্তি, ব্যয়াধিক্য, আত্মীয় বা কুটুম্ব বিয়োগ প্রভৃতি অশুভ ফলের আশঙ্কা আছে। কিছু সুখ স্বাচ্ছন্দ্য, শুভ ঘটনা, সুনাম, মোটামুটি সৌভাগ্য সুখ, বিলাস-ব্যসন দ্রব্য সুখ, সাফল্য প্রভৃতি শুভ ফলও ঘটবে। উদর ঘটিত পীড়া. গুহ্য প্রদেশে পীড়া, প্রস্রাবের গোলযোগ, জ্বর, উচ্চ রক্ত চাপের বৃদ্ধি, অতিরিক্ত গরমের জন্য অসুখ—পারিবারিক শান্তি ও শৃঙ্খলা অক্ষুণ্ণ থাক্‌বে। আর্থিক সংক্রান্ত ব্যাপারে শুভ, ধনের সমাগম বিশেষভাবে হবে, কিন্তু ব্যয়াধিক্যহেতু সঞ্চয়ের সংখ্যা হ্রাস পাবে। স্পেকুলেশন বর্জ্জনীয়। বাড়ীওয়ালা ও ভূম্যধিকারিগণের পক্ষে মাসটী আশাপ্রদ নয়, নানারকম ঝঞ্ঝাট হবে। চাকুরির ক্ষেত্রে কোন প্রকার শুভ আশা করা যায় না, উপরওয়ালার সঙ্গে মনান্তর ঘট্‌বে। ব্যবসায়ী ও বৃত্তিজীবীগণের পক্ষে মাসটী-মধ্যম। বহির্ক্ষেত্রে এ মাসে মেয়েরা নানাপ্রকারে অসুবিধা ভোগ করবে, পুরুষের দ্বারা প্রতারিত হবে। এ মাসে কোনপ্রকার পার্টিতে, পিক্‌নিকে বা কোন অনুষ্ঠানে যোগদান না করাই ভালো, কেননা পরিণতি খারাপ হবে, তাছাড়া প্রণয় সংক্রান্ত ব্যাপারে আদৌ অগ্রসর হওয়া উচিত নয়। পারিবারিকক্ষেত্রে সহিষ্ণুতা অবলম্বন প্রয়োজনীয়। বিদ্যার্থী ও পরীক্ষার্থীদের পক্ষে মাসটী বিশেষ ভালো বলা যায় না, নানাপ্রকার বাধা ঘট্‌বে।

মকর

উত্তরাষাঢ়া ও ধনিষ্ঠা নক্ষত্রাশ্রিতগণের পক্ষে অপেক্ষাকৃত শুভ। শ্রবণানক্ষত্রাশ্রিতগণের পক্ষে ফল নিকৃষ্ট। সাধারণ সাফল্য, শত্রুজয়, লাভ, সুখ ও মানসিক শান্তি, শুভ ঘটনা, বিলাসব্যসন, বন্ধু-বান্ধবের সমাগম প্রভৃতি যোগ আছে। বিবাদ, মামলা মোকর্দ্দমা, মতদ্বৈধজনিত অপ্রীতিকর পরিস্থিতি, ক্ষতি, কর্ম্মে বাধা ও দুর্ঘটনা প্রভৃতি অশুভ ফলের আশঙ্কা করা যায়। অজীর্ণ, উদর পীড়া, জ্বর, চক্ষু পীড়া ইত্যাদি সম্ভাবনা আছে। স্ত্রীর সহিত মনোমালিন্য, বন্ধুবিরোধ প্রভৃতি ঘট্‌বে। আর্থিক স্বচ্ছন্দতা যোগ আছে। স্পেকুলেশনে লাভ হোতে পারে। বাড়ীওয়ালা ও ভূম্যধিকারিগণের পক্ষে মাসটী শুভ। চাকুরিজীবীগণের পদোন্নতি প্রভৃতি যোগ আছে। কর্ম্মভাব শুভ। ব্যবসায়ী ও বৃত্তিজীবীগণের পক্ষে মাসটী মোটামুটি ভালো। স্ত্রীলোকদের পক্ষে মাসটী উত্তম—নূতন বন্ধুত্ব, সামাজিক প্রতিষ্ঠা, পারিবারিক শান্তি ও প্রণয়ে সাফল্য। পরীক্ষার্থী ও বিদ্যার্থীগণের পক্ষে মধ্যম সময়।

কুম্ভ

ধনিষ্ঠা ও পূর্ব্বভাদ্রপদ নক্ষত্রাশ্রিত ব্যক্তিগণের পক্ষে অপেক্ষাকৃত শুভ। শতভিষানক্ষত্রাশ্রিতগণের পক্ষে নিকৃষ্ট ফল। শত্রুদের দ্বারা

পীড়িত হবার যোগ আছে। দুঃখ, স্বাস্থ্য হানি, দুর্ঘটনা প্রভৃতির সম্ভাবনা, তা ছাড়া স্ত্রীলোকের কাছ থেকে লাঞ্ছনা বা অপমানিত হ'তে পারে। লাভ ও ক্ষতি দুইই যোগ আছে। স্বল্প পীড়া বা স্বাস্থ্যহানি হোতে পারে। স্ত্রী পুত্রের শরীর ভালো যাবে না। অজীর্ণ, উদরঘটিত পীড়া, চক্ষুপীড়া সম্ভব। পারিবারিকক্ষেত্রে মন্দ নয়। স্ত্রীর সহিত মাঝে মাঝে মতদ্বৈধ ও কলহ। মাসের বেশীর ভাগ সময়েই পারিবারিক শান্তি বজায় থাকবে। আর্থিক স্বচ্ছন্দতা ঘটবে। সময়ে সময়ে ব্যয় বাহুল্য দেখা দেবে। স্পেকুলেশনে ক্ষতি। বাড়ীওয়ালা ও ভূম্যধিকারীগণের পক্ষে মাসটী মিশ্রফলদাতা। কর্ম্মক্ষেত্রে প্রসারতা লাভ। এ মাসে উপর-ওয়ালার বিরাগভাজন হবার সম্ভাবনা। সুতরাং চাকুরিজীবীদের পক্ষে মাসটী ভালো বলা যায় না। নানা কাজেই মেয়েরা বাধাগ্রস্ত হবে—পারিবারিক ও সামাজিকক্ষেত্রে প্রভাব প্রতিপত্তির হ্রাস। প্রণয়ীর বিশ্বাস-ঘাতকতা ও প্রতারণা। পরীক্ষার্থী ও বিদ্যার্থীগণের পক্ষে মাসটী ভালো বলা যায় না।

মীন

রেবতী নক্ষত্রজাতগণের পক্ষে মাসটী উত্তম। পূর্ব্বভাদ্রপদ ও উত্তর-ভাদ্রপদ জাতগণের পক্ষে মধ্যম। দুঃখ, বাধা, কলহ, বন্ধুবিরোধ, শত্রু-পীড়া, উদ্দেশ্যহীন কর্ম্ম, মামলা মোকর্দ্দমা ও অপমান এই অশুভ ফলগুলি দেখা যায়। সৌভাগ্য, সাফল্য, মাঙ্গলিক অনুষ্ঠান, বিলাসব্যসন দ্রব্য ক্রয় প্রভৃতি শুভযোগ আছে। মোটের উপর মাসটী শুভাশুভ মিশ্রফল দাতা। রক্তস্রাব ও রক্ত ঘটিত পীড়ার সম্ভাবনা। শেষার্দ্ধে মানসিক অস্বচ্ছন্দতা ঘটবে। ঘরে বাইরে কলহ বিবাদ ও তজ্জনিত অশান্তি, সামাজিকক্ষেত্রেও বহু অসুবিধা ভোগ হবে। আর্থিক অবস্থা মন্দ যাবে না। প্রথমার্দ্ধে উদ্বেগ, দুশ্চিন্তা ও আর্থিক চাপ দেখা দেবে। অনাদায়ী টাকা হস্তগত হবে। স্পেকুলেশন বর্জ্জনীয়। বাড়ীওয়ালা ও ভূম্যধি-কারীগণ নানা অসুবিধার মধ্যে পড়বে, ফলে দুশ্চিন্তা দেখা দেবে। মাসের প্রথমার্দ্ধে চাকুরীজীবীদের পক্ষে সময়টী আদৌ ভালো যাবে না, নানা-প্রকার গণ্ডগোলের মধ্যে পড়তে হবে। ব্যবসায়ী ও বৃত্তিজীবীদের পক্ষে মাসটী মন্দ নয়। মেয়েদের পক্ষে মাসটী মোটামুটি ভালো যাবে। পরীক্ষার্থী ও বিদ্যার্থীগণের পক্ষে মাসটী শুভ।

***

ব্যক্তিগত লগ্ন ফলাফল

মেষলগ্ন—

নব প্রচেষ্টায় সাফল্য, শারীরিক অবহেলার দরুণ সামান্য পীড়াদি, চিঠিপত্রে যোগাযোগে কলহের সূত্রপাত, ভৃত্যাদির জন্যে কষ্টভোগ, ব্যয়াধিক্য, পাওনাদারের তাগাদার জন্য উদ্বেগ। বুকে ব্যথা, শরীরে ক্লান্তিবোধ, সন্তানের বিশেষ পীড়া—পুত্র-কন্যাদের সহিত মনোমালিন্য। বিদ্যাভাব মধ্যম। কর্ম্মস্থানে বিশৃঙ্খলতা। বন্ধন ভয়।

বৃষলগ্ন—

অবিবাহিতগণের বিবাহ সম্ভাবনা। জনপ্রিয়তা। সন্তানের পীড়া। অর্থ ও বিক্রমলাভ। বিদ্যায় আংশিক ক্ষতি। কর্ম্মস্থান শুভ। ব্যবসায়ে লাভ। আয় বৃদ্ধি। সম্মান।

মিথুনলগ্ন—

শারীরিক অবস্থা ভালো বলা যায় না, মধ্যে মধ্যে অসুস্থতা। পারি-বারিক অশান্তি। বন্ধুত্ব ও লাভ। প্রণয়ে অসাফল্য। শত্রুবৃদ্ধি। কর্ম্মে বিপত্তি। বিদ্যার্জ্জনে বাধা। অপমান।

কর্কট লগ্ন—

অর্থ লাভ। স্থান পরিবর্ত্তন। মানসিক উদ্বেগ। সৌভাগ্য বৃদ্ধি। বিদ্যাভাব মধ্যম। সন্তানলাভ ও আনন্দ। কর্ম্মক্ষেত্রে নানাপ্রকার বাধা। ভ্রাতৃকলহ, মধ্যে দুঃখ অপমান।

সিংহলগ্ন—

নানা ঝঞ্ঝাট ও অসাফল্য, দাঁতের বা গলনালীর পীড়া, অসুস্থতা, যৌন আকর্ষণজনিত চিত্তের উদ্বেগ ও চাঞ্চল্য। হঠকারিতা, দাম্ভিকতা, ভাগ্য-হানি, কর্ম্মভাব শুভ, ব্যয় বৃদ্ধি, সন্তানাদির পীড়া। বিদ্যাভাব শুভ, কিছু দুঃখ ভোগ।

কন্যালগ্ন—

চৌর্য্য ভয়, ভ্রমণ, বায়ু প্রকোপ, অর্থাগম, কর্ম্মে বাধা, বাধা বিপত্তি ও ঝঞ্ঝাট, স্ত্রীর পীড়া, বিদ্যাভাব শুভ, লাভ।

তুলা লগ্ন—

কর্ম্মে অপবাদ বা অবনতি। পারিবারিক অশান্তি, অসংযতভোগ। হ্রাস বৃদ্ধি সম্পন্ন আয়। ব্যয়াধিক্য, আশাভঙ্গ ও মনস্তাপ। শেষার্দ্ধে লাভ।

বৃশ্চিকলগ্ন—

ধনাগম। পদমর্য্যাদা বৃদ্ধি। সামাজিক প্রতিষ্ঠা। বিদ্যাভাব শুভ। শ্লেষ্মা প্রকোপ, স্ত্রীলোকের সহিত কলহ। ভ্রমণ।

ধনু লগ্ন—

লাভজনক অর্থলগ্নীতে সাফল্য। উত্তম পদমর্য্যাদা, আয়বৃদ্ধি। ধনাগম, মধ্যে মধ্যে চিত্তে নৈরাশ্যভাব। মিথ্যা অপবাদ, বিদ্যার্জ্জনে আংশিক ব্যাঘাত ঘটলেও শুভ। স্ত্রীর সহিত সাময়িক বিচ্ছেদ বা কলহ, পিতার বিশেষ অসুখ। মাতার স্বাস্থ্যহানি।

মকরলগ্ন—

দেহ পীড়া। শ্লেষ্মা প্রকোপ। উদ্বেগ ও দুশ্চিন্তা, স্ত্রী লাভ। প্রতারণা, ক্রয় বিক্রয়ে লাভ, শুভাশুভ সময়, রাজরোষে পতিত হওয়ার সম্ভাবনা।

কুম্ভলগ্ন—

দেহভাব শুভ, ধনভাব মধ্যম,—সঞ্চয়ে বাধা, মামলা মোকর্দ্দমা, গুহ্য প্রদেশে পীড়া, অঙ্গে ক্ষত। কর্ম্মোন্নতি, আয় বৃদ্ধি, অব্যবস্থিত চিত্ত। উদ্বেগ ও অশান্তি, বিদ্যাভাব শুভ।

মীন লগ্ন—

দেহভাব মধ্যম। অজীর্ণ, চর্ম্মরোগ, নেত্ররোগ। সন্তানের পীড়া। শত্রু পীড়া, মধ্যে পীড়াদি কষ্ট, ধনপ্রাপ্তি বিশেষভাবে হবে। মান ও প্রতি-পত্তি। বিদ্যায় আংশিক বাধা।

শ্রীক্ষেত্রনাথ রায়
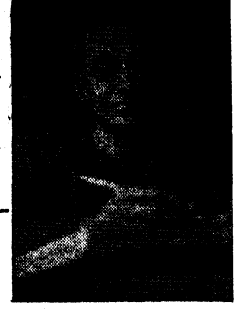
সুধাংশুশেখর চট্টোপাধ্যায়

ভারতবর্ষ বনাম ইংলণ্ড ঃ

ভারতবর্ষ : ১৬৮ (কনট্রাক্টর ৮১, ঘোড়পাড়ে ৪১। গ্রীণহাউ ৩৫ রানে ৫) ও ১৬৫ (মঞ্জরেকার ৬১, কৃপাল সিং ৪১। ষ্টেথাম ৪৫ রানে ৩)

ইংলণ্ড : ২২৬ (ব্যারিংটন ৮০, ষ্টেথাম ৩৮। দেশাই ৮৯ রানে ৫ এবং সুরেন্দ্রনাথ ৪৬ রানে ৩ উইকেট) ও ১০৮ (২ উইকেটে। ৩৩, কাউড্রে নটআউট ৬৩)

লর্ডস মাঠে অনুষ্ঠিত ভারতবর্ষ বনাম ইংলণ্ডের ২য় টেষ্ট খেলায় ইংলণ্ড ৮ উইকেটে ভারতবর্ষকে পরাজিত করে। পাঁচদিনের খেলা তিনদিনের কম সময়ে শেষ হয়। ভারতীয় ক্রিকেট দলের অধিনায়ক ডি কে গাই-কোয়াড অসুস্থ থাকায় সহ-অধিনায়ক পঙ্কজ রায় ভারতীয় দল পরিচালনা করেন। ঘোড়পাড়ে, কৃপাল সিং এবং জয়সিমা ভারতীয় দলে স্থান পান বোরদে, নাদকারনি এবং গাইকোয়াড়ের যায়গায়।

১৮ই জুন খেলা আরম্ভ হয়। টসে জয়ী হয়ে ভারত-বর্ষ প্রথম ব্যাট করে এবং প্রথম দিনেই ভারতীয়দলের ১ম ইনিংস ১৬৮ রানে শেষ হয়। ইংলণ্ডের সূচনাও ভাল হয়নি। মাত্র ২৬ রানে ২টো উইকেট পড়ে যায়। ৩য় উইকেট পড়ে ৩৫ রানের মাথায়। নির্দ্ধারিত সময়ে ইংলণ্ডের ৫০ রান ওঠে—উইকেট পড়ে ৩টে। দেশাই ২টো এবং সুরেন্দ্রনাথ ১টা উইকেট পান।

খেলার ২য়দিনে ইংলণ্ডের ১ম ইনিংস ২২৬ রানে শেষ হলে তারা ৫৮ রানে এগিয়ে যায়। সকলেই ভেবে ছিলেন আরও কম রানে ইংলণ্ডের ইনিংস শেষ হবে। কিন্তু ইংলণ্ডের শেষের তিনজন খেলোয়াড় অপ্রত্যাশিত ভাবে ১২৬ রান তুলে দেয়। ভারতীয়দলের ফিল্ডিংয়ে প্রভূত উন্নতি দেখা দেয়।

ভারতীয় দল ২য় ইনিংসের খেলা আরম্ভ করে এবং খেলার শেষ সময়ে দেখা গেল ভারতবর্ষের ৪টা উইকেট পড়ে ১০৮ রান উঠেছে। ফলে তারা ৫০ রানে এগিয়ে যায়, হাতে জমা থাকে ৬টা উইকেট।

খেলার ৩য় দিনে ভারতবর্ষের ২য় ইনিংস ১৬৫ রানে শেষ হয়। মঞ্জরেকার এবং কৃপাল সিংয়ের ৫ম উই-কেটের জুটিতে ৮৯ রান ওঠে। আহত অবস্থাতে কন-ট্রাক্টর ব্যাট করতে নেমে ১১ রান ক'রে শেষ পর্যন্ত নট-আউট থাকেন। জয়লাভের প্রয়োজনীয় ১০৮ রান তুলতে ইংলণ্ডের ২টো উইকেট পড়ে। ফলে ইংলণ্ড ৮ উইকেটে জয়লাভ করে।

ইংলণ্ডের ফাষ্ট-বোলার ষ্টেথাম এই টেষ্টে ম্যাচে মোট তিনটে উইকেট পান। ফলে টেষ্ট খেলায় তাঁর ১৫২টা উইকেট পাওয়া হয়। তাঁকে নিয়ে এ পর্য্যন্ত ইংলণ্ডের পাঁচজন খেলোয়াড় টেষ্ট ক্রিকেট খেলার ইতি-হাসে ১৫০ উইকেট লাভের গৌরব লাভ করেছেন।

লণ্ডন লন্ টেনিস চ্যাম্পিয়ানসীপ ঃ

লণ্ডন লন্ টেনিস চ্যাম্পিয়ানসীপের ফাইনালে ১নং ভারতীয় খেলোয়াড় রামনাথন কৃষ্ণান অষ্ট্রেলিয়ার নীল ফ্রেসারকে ৬-৩, ৬-০ গেমে পরাজিত করে বিশেষ কৃতিত্ব প্রদর্শন করেন। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখযোগ্য, কৃষ্ণান এই প্রতিযোগিতার সেমি-ফাইনালে এ বছরের উইম্বলডন বিজয়ী এ্যালেক্স অলমেডোকে ৮—৬, ৬—১ গেমে পরা-

জিত ক'রে ফাইনালে ওঠেন। সুতরাং তাঁর চ্যাম্পিয়ান-শীপ লাভ 'বেড়ালের ভাগ্যে শিকে ছেঁড়ার' সমান হয়নি।

বিশ্ব মুষ্টি যুদ্ধ ঃ

ইউরোপীয়ন চ্যাম্পিয়ান আই জনসন (সুইডেন) বিশ্ব মুষ্টি যোদ্ধা ফ্লয়েড প্যাটারসনকে পরাজিত ক'রে হেভীওয়েট বিভাগে বিশ্বমুষ্টি যোদ্ধার খেতাব লাভ করেছেন। ২য় রাউণ্ডের ২ মিনিট ৩ সেকেণ্ডর সময়ে রেফারী খেলাটি বন্ধ করে দেন। খেলাটি বন্ধ করার পূর্ব্বে জনসন তাঁর ডান-হাতের বজ্র মুষ্টি চালিয়ে প্যাটারসনের মুখে এক ডজন খানেক ঘুঁসি মারেন। প্যাটারসনের মুখ ও নাক দিয়ে অঝর ধারায় রক্ত পড়তে থাকে। ৩০,০০০ হাজার দর্শক প্যাটারসনের এই অসহায় বীভৎস অবস্থা দেখে ভয়ে সিঁটিয়ে চীৎকার করতে থাকে; প্যাটারসনের স্ত্রী সঙ্গে সঙ্গে সংজ্ঞা হারিয়ে ফেলেন। জনসনের ভগ্নী আনন্দ ভুলে গিয়ে কেঁদে ফেলেন; কিন্তু জনসনের ভাবী স্ত্রীর মনে এ ঘটনা কোন রেখপাত করেনি; তিনি চুপচাপ ছিলেন—মুখমণ্ডল বরং তাঁর উজ্জ্বল ছিল। হেভীওয়েট বিভাগে জনসনের বিশ্বখেতাব লাভ—সারাদেশে একটা রীতিমত তোলপাড় কাণ্ড হয়ে গেল। শেষ ইউরোপীয়ান মুষ্টিযোদ্ধা হিসাবে ইটালীর প্রিমো কারনেরা ১৯৩৩ সালে হেভীওয়েট বিভাগে বিশ্বখেতাব পেয়েছিলেন। তাঁর বিদায়ের পর এই প্রথম ইউরোপীয়ান হিসাবে জনসন বিশ্বখেতাব পেলেন।

উইম্বলডন চ্যাম্পিয়ানসীপ ঃ

১৯৫৯ সালের উইম্বলডন চ্যাম্পিয়ানসীপস প্রতি-যোগিতায় পুরুষদের সিঙ্গলসে পেরুভিয়ান খেলোয়াড় এ্যালেক্স অলমেডো আমেরিকার পক্ষে জয়লাভ করেন। মহিলাদের সিঙ্গলসে ব্রেজিলের মেরীয়া ইসথার বুইনো, পুরুষদের ডবলসে রয় এমারসন এবং নীল ফ্রেসার (অষ্ট্রেলিয়া), মহিলাদের ডবলসে মিস ডারলিন হার্ড এবং জিনী আর্থ (আমেরিকা) এবং মিক্সড ডবলসে মিস ডারলিন হার্ড (আমেরিকা) এবং ল্যাভের (অষ্ট্রেলিয়া) জয় লাভ করেন।

সিঙ্গলস খেতাব বিজয়ী আর ল্যাভের তিনটির ফাই-নালে উঠেছিলেন—পুরুষদের সিঙ্গলস, পুরুষদের ডবলস এবং মিক্সড ডবলসে। প্রথম দুটিতে তিনি পরাজিত হ'ন।

আমেরিকার ডাবলিন হার্ড তিনটির ফাইনালে উঠে মহিলাদের ডাবলস এবং মিক্সড ডবলসে জয়লাভ করেন। প্রতিযোগিতায় সব থেকে উল্লেখযোগ্য ঘটনা মহিলাদের সিঙ্গলস ফাইনালে আমেরিকার পরাজয়। গত ২১ বছর ধরে আমেরিকা এই মহিলাদের সিঙ্গলসে খেতাব লাভ করে এসেছিল।

ভারতীয় খেলোয়াড়দের মধ্যে রামনাথন কৃষ্ণানের খেলাই যা উল্লেখযোগ্য হয়েছিল। পুরুষদের ডবলসে কৃষ্ণান এবং লুইস আয়ালা (চিলি) ৪র্থ রাউণ্ড পর্য্যন্ত খেলেছিলেন। মিক্সড ডবলসে কৃষ্ণান এবং তাঁর জুটি ই বুডিং ৩য় রাউণ্ডে হেরে যান। পুরুষদের সিঙ্গলসের ৩য় রাউণ্ডে কৃষ্ণান পরাজিত হন এ বছরের সিঙ্গলস খেতাব বিজয়ী অলমেডোর কাছে।

ভারতবর্ষ ঃ ১৬১ (রোডস ৫০ রানে ৪, ট্রুম্যান ৩০ রানে ৩ উইকেট) ও ১৪৯ (মর্টিমোর ৩৬ রানে ৩, ক্লোজ ৩৫ রানে ৪ এবং ট্রুম্যান ২৯ রানে ২ উইকেট)।

ইংলণ্ড ঃ ৪৮৩ (৮ উইকেট ডিক্লেয়ার্ড। পুলার ৭৫, পার্কহাউস ৭৮, কাউড্রে ১৬০ ব্যারিংটন ৮০। গুপ্তে ১১১ রানে ৪ উইকেট)

লিডস মাঠে অনুষ্ঠিত ভারতবর্ষ বনাম ইংলণ্ডের ৩য় টেষ্ট খেলায় ইংলণ্ড এক ইনিংস এবং ১৭৩ রানে ভারত-বর্ষকে পরাজিত ক'রে আলোচ্য টেষ্ট সিরিজে 'রাবার' লাভ করেছে। পাঁচটি টেষ্ট খেলার মধ্যে পর পর তিনটি টেষ্ট খেলায় ইংলণ্ড জয়লাভ ক'রে 'রাবার' পাওয়ায় বাকি টেষ্ট খেলা দুটির ফলাফল সম্পর্কে দর্শক সাধারণের আগ্রহ অনেক কমে গেছে।

২য় টেষ্ট খেলায় ইংলণ্ডের পক্ষে যাঁরা খেলেছিলেন তাঁদের মধ্যে থেকে ৬জনকে বসিয়ে দিয়ে নতুন ক'রে দলগঠন করা হয়। অপরদিকে ভারতীয় দলে ৫ জন খেলোয়াড় বদলী হয়। এই পরিবর্ত্তনের ফলে ইংলণ্ড দল পূর্ব্বের তুলনায় দুর্ব্বল হয়ে পড়ে। এ নিয়ে খেলোয়াড়-নির্ব্বাচক মণ্ডলীকে যথেষ্ট বিরুদ্ধ সমালোচনায় সম্মুখীন হতে হয়েছিল। খেলোয়াড়-নির্ব্বাচক মণ্ডলীর এই রকম দল গঠনের উদ্দেশ্য এই ছিল যে, ভবিষ্যতের জন্যে ইংলণ্ডকে শক্তিশালী করা—নতুনদের টেষ্ট খেলার সুযোগ দিয়ে। দুর্ব্বল দল নিয়েও তারা ভারতবর্ষকে হারিয়েছে।

ইংলণ্ড দু'দিক থেকে লাভবান হয়েছে— 'রাবার' হাতে এসেছে সেই সঙ্গে টেষ্ট খেলোয়াড়ের সন্ধান মিলেছে।

আহত থাকার দরুণ মঞ্জরেকার এবং কনট্রাক্টর দলভুক্ত হননি। এ দু'জনকে না পাওয়াতে ভারতীয় দলও দুর্ব্বল হয়ে পড়ে।

২রা জুলাই খেলা আরম্ভ হয়। ভারতবর্ষ টসে দিতে প্রথম ব্যাট করে। কিন্তু টসে জয়লাভের যে সুযোগ তা ভারতবর্ষ সদ্ব্যবহার করতে পারেনি; ১৬১ রানে ভারতবর্ষের প্রথম ইনিংশ শেষ হয়। কোন উইকেট না হারিয়ে ইংলণ্ড ৬১ রান করে।

২য় দিনের খেলায় ইংলণ্ডের ৪টে উইকেট পড়ে ৪০৮ রান ওঠে। কাউড্রে ১৪৮ রান ক'রে নট আউট থাকেন।

৩য় দিনে ইংলণ্ড ৮ উইকেটে ৪৮৩ রান ক'রে ইনিংস ডিক্লেয়ার্ড করে। ৩য় দিন ইংলণ্ড ৭৫ মিনিটের খেলায় ৭০ রান তুলে ভারতবর্ষকে দান ছেড়ে দেয়। চা-পানের সময় ভারতবর্ষের রান ছিল ১৩৪, ৬টা উইকেট পড়ে। চা-পানের বিরতির পর ভারতবর্ষের ৩টে উইকেট পড়ে যায় মাত্র ৬ রানে। শেষ উইকেটের জুটিতে ৯ রান ওঠে।

ইংলণ্ড সফরে ভারতীয় ক্রিকেট দল

ইংলণ্ড সফরে ভারতীয় ক্রিকেট দল ২৩শে এপ্রিল থেকে ১৭ই জুলাইয়ের মধ্যে ২২টি খেলায় যোগদান করেছে। এই খেলার মধ্যে ভারতীয় জিমখানা দলের বিরুদ্ধে ভারতীয় দলের ড্র খেলাও ধরা হয়েছে। এই ২২টি খেলার মধ্যে ভারতীয় দল জয়ী হয়েছে মাত্র ৪টি খেলায়, ১১টি খেলা ড্র গেছে এবং ১টি খেলা বৃষ্টির দরুণ পরিত্যক্ত হয়েছে। ভারতীয় দল হেরেছে ৬টি খেলায় (৩টি টেষ্ট খেলা সমেত)।

পূর্ব্ব আফ্রিকায় ভারতীয় হকি দল ঃ

পূর্ব্ব আফ্রিকা সফরে ভারতীয় হকি দল এখনও পর্য্যন্ত (১৬ই জুলাই) অপরাজেয় আছে। ভারতবর্ষ ১৬টি খেলায় যোগদান ক'রে সবগুলিতেই জয়ী হয়েছে। এই ১৬টী খেলায় ভারতবর্ষ মোট ১১০টি গোল দিয়ে মাত্র ৫টি গোল খেয়েছে। নদার্ণ প্রভিন্স দলকে ভারতবর্ষ ১৫—০ গোলে হারিয়ে আলোচ্য সফরে সর্ব্বাপেক্ষা বেশী গোলের ব্যবধানে জয়ী হয়েছে।

কেনায়ার বিপক্ষে ১ম টেষ্ট খেলায় ভারতবর্ষ ১—০ গোলে জয়ী হয়। ঐ দলেরই বিপক্ষে ২য় টেষ্ট খেলায় ভারতবর্ষ ২—০ গোলে জয়লাভ করে। ভারতীয় দলের পক্ষে এরমন এ পর্য্যন্ত সফরে ৩৫টি গোল ক'রে সর্ব্বাধিক গোল করার কৃতিত্ব লাভ করেছেন।

অসীম সোমের অকাল মৃত্যু ঃ

ইষ্টার্ণ রেলদলের ইন-সাইড রাইট খেলোয়াড় অসীম সোম মাত্র ২১ বছর বয়সে পরলোকগমন করেছেন। ইলেকট্রিক ট্রেন থেকে পতনের ফলে তিনি মাথায় গুরুতর আঘাত পান। তাঁর এই অকালমৃত্যুতে ক'লকাতার অগণিত ক্রীড়ানুরাগী শোকে মুহ্যমান হয়ে পড়েন। খেলার মাঠে এরূপ শোকাচ্ছন্ন পরিবেশ আর কখনও চোখে পড়েনি।

গতবছরের সন্তোষ ট্রফি বিজয়ী বাংলাদলের তিনি সভ্য ছিলেন; ১৯৫৫ সালের আন্তঃবিশ্ববিদ্যালয় ফুটবল প্রতিযোগিতায় বিজয়ী কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পক্ষেও তিনি যোগদান করেছিলেন। তাঁর পিতা বাবা সোমের মতই বাংলাদেশের একজন নামকরা খেলোয়াড় হওয়ার পক্ষে তাঁর যথেষ্ট সম্ভাবনা ছিল।

প্রথম বিভাগের ফুটবল লীগ ঃ

১৮ই জুলাইয়ের খেলার পর প্রথম বিভাগের ফুটবল লীগ তালিকায় উপরের দিকের প্রথম চারটি দলের পয়েণ্ট :

	খেলা	জয়	ড্র	হার	পক্ষে	বিপক্ষে	পয়েণ্ট
মোহনবাগান	২৩	১৯	৩	১	৪২	৩	৪[illegible]
ইষ্টবেঙ্গল	২৩	১৬	৪	৩	৪১	১৫	৩[illegible]
ইস্টার্ণ রেলওয়ে	১৯	১৩	৪	২	৩১	১২	৩[illegible]
মহঃ স্পোর্টিং	২০	১৪	১	৫	৪১	১৫	২[illegible]

সেই চিরকাল : দেবেশ দাশ

জল পড়ে, পাতা নড়ে, কবির মনে ছবি গড়ে ওঠে, তিনি লিখে যান নিজের আবেগে—বহিরঙ্গের সঙ্গে অন্তরঙ্গ মিলে যায় অমর প্রাণের লাস্যে, স্থান-কাল-পাত্রের সীমানা হয় সংকীর্ণ। শ্রদ্ধেয় দেবেশ দাশের লেখা পড়লে এই অতি-পুরাতন কথাগুলিই বারে বারে মনে পড়ে। তাঁর মিত্র বা অমিত্ররা প্রকাশ্যে বা গোপনে রসিয়ে জরিয়ে ক্ষর বা অক্ষর যাই বলুন না কেন, ইউরোপা রাজোয়ারা রাজসী রক্তরাগ প্রভৃতি বইগুলি বাংলা-সাহিত্যের আসরেই বাসর গড়ে তোলেনি, তাদের বিষয়বস্তুর নির্বাচনে ও লেখার প্রসাদগুণে অনুবাদের মাধ্যমেও স্থান পেয়েছে তামিল, তেলেগু, মালয়লাম, হিন্দী, গুজরাতী প্রভৃতি শুধু ভারতীয় ভাষায় নয়, সমুদ্র উল্লঙ্ঘন করে চলে গেছে সাগর পারে। রোম থেকে রমনা জার্মানীতে পেয়েছে বিচিত্র সম্মান, ইউরোপা খ্যাতি পেয়েছে ইউরোপে। এর একটি বিশেষ কারণ যে, গল্পের পটভূমিকাগুলি এমন এক জগতের—যাকে পৃথিবীর অন্য দেশের লোকেরও চিনে নিতে দেরী হয় না। সাধারণ বাংলা গল্পে বা উপন্যাসে এই ধরণের বহু অভিজ্ঞতালব্ধ পটভূমিকা পাওয়া যায় না।

অধুনা প্রকাশিত "সেই চিরকাল" এই ধরণেরই আর একটি গল্পের বই। নেতাজীর আজাদ হিন্দ ফৌজ বর্মা-মনিপুর সীমান্ত যুদ্ধে হেরে পালাচ্চে—তারই মধ্যে ফুটে উঠলো "That Eternal"। প্রৌঢ় ব্যারিষ্টার রাকসিট বম্বে থেকে বাংলায় ফিরে এসে হারিয়ে যাওয়া বয়ঃসন্ধির একটি হঠাৎ আলোড়নে ফিরে পেলেন মিস্‌চিকের সেন্টে বাসি ফুলের বাস। লণ্ডনে মিঃ পিটহারের সম্পর্কে পাঠকের বৌদি কোথায় লুকিয়ে গেলো, সুপারফরট্রেস বোমারু বিমানটা কোন নীল স্বর্গে নিয়ে যায়, ফলিবার জোয়ারে হরিণচকিত নয়নার কটাক্ষের পেছনে কত করুণ মিনতির অশ্রুজল লুকানো আছে, সিমলার ম্যালে রাত্রির গভীরে কোন অপরাকে পাওয়া যায়, বড়োদিনের রাতে কোন প্রিয়া স্মরণ করে তার হারিয়ে যাওয়া প্রিয়কে, এ সব কথা এতো গভীরভাবে মেলায়েম করে আর কেউ লিখেছেন বলে জানা নেই। আবার সোহোর রেষ্টুরাণ্টে বসে প্রেমের বাতি দু'দিক থেকে কি রকমে জ্বলে তার দৃশ্যও তিনি দেখিয়েছেন যেমন শুনিয়েছেন কালিদাসীর নামের উপমায় কাশ-বল্লীর কাহিনী। লোকে বলবে দেবেশবাবু চেষ্টা করেও অতি-আধুনিক সাহিত্যিক হতে পারেন নি। তাঁর রোমাণ্টিক মর্বীড মন সেই পুরোনো ইতিকথাকে নিয়েই লণ্ডন্ নামে সেই বিলেতী জিনিষটাকে উদোর পিণ্ডী বুদোর ঘাড়ে চাপিয়ে দিয়েছে। কিন্তু তিনি শুধু সোনার হরিণের সন্ধানই পাননি, সোনার হৃদয়েরও খোঁজ দিয়েছেন মাটির রক্ত মাংসের মাঝখানে লন্ডচারিনীদের দেখেছেন, এই তো রসের ইতিহাসের মূল কথা।

নতুন পরিবেশে নতুন পটভূমিকায় নতুনভাবে লেখা গল্পগুলির বৈশিষ্ট্য এইখানে। তার সঙ্গে মিশেছে মননশীলতা ও গভীরভাবে হৃদয় রহস্যে ডুব দেবার রীতি। এগুলি শুধু চমক লাগায় না, ভাবিয়েও তোলে। রাম না হতেই রামায়ণ লেখেন যাঁরা, কাজ কি আমাদের তাদের কথায়—রত্নাকর রায় না হয় তাদের আশ্বাস দিন, আমরা বাল্মীকিকেই খুঁজি। সেই চিরন্তন খোঁজায় যতটুকু পাওয়া যায় ততটুকুই লাভ।

[প্রকাশক—মিত্র ও ঘোষ। ১০, শ্যামাচরণ দে ষ্ট্রীট, কলিকাতা—১২। মূল্য—৩.৫০ নঃ]

শ্রীসুধাংশুমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়

ত্রিপুরার ইতিকথা : কৃষ্ণপদ দত্ত

সরকারী চেষ্টায় কয়েকটি জেলার ছোট ছোট ইতিহাস লিখিত ও প্রকাশিত হইয়াছে—সেগুলিতে বহু তথ্য পাওয়া গেলেও তাহাদের পূর্ণাঙ্গ বলা যায় না। লেখক ত্রিপুরা রাজ্য সম্বন্ধে এই ছোট পুস্তকে প্রায় সকল প্রয়োজনীয় তথ্য দিয়া অনুসন্ধিৎসু পাঠকদের উপকার করিয়াছেন। ইহাতে জনপরিচিতি, বাস্তু ও জীবিকা, কৃষি বাণিজ্য শিল্প, আয়ব্যয়ের খতিয়ান, সাংস্কৃতিক জীবন, পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা প্রভৃতি সকল প্রাচীন ও বর্তমান সংবাদ দেওয়া হইয়াছে। প্রতি জেলার বা মহকুমার এইরূপ তথ্যবহুল ইতিহাস রচনা আজ একান্ত প্রয়োজন হইয়াছে। আমরা লেখককে অভিনন্দিত করি।

[প্রকাশক—ওরিয়েণ্ট বুক কোম্পানী, ৯ শ্যামাচরণ দে ষ্ট্রীট, কলিকাতা—১২। মূল্য—২৲ টাকা]

যুগে যুগে যার আসা : সত্যানন্দ

ভূমিকায় কবি শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক লিখিয়াছেন—"পরমহংস শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের সাধন পথের জ্বালাময়ী উৎকণ্ঠা, অবোধমস্ত বচন ও আচরণ, বিরহের অসহ্য যন্ত্রণা, মিলনের শাশ্বত পরমানন্দের যে চিত্র লেখক ফুটাইয়াছেন, তাহাতে তাঁহার অপরোক্ষ নিবিড় অনুভূতির ছাপ বর্তমান। ঠাকুর রামকৃষ্ণ যুগদেবতা—বর্তমান কালে তাঁহার জীবন-কথা লইয়া বহু ভক্ত ও সাহিত্যিক বহু গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন। সত্যানন্দ আজন্ম সাধক—তাঁহার সাধনালব্ধ জ্ঞান ও অনুভূতির কথা এই গ্রন্থে প্রকাশ করিয়াছেন। কলিহত যুগে ইহার প্রচারের প্রয়োজনের কথা বলিবার নহে।

[প্রকাশক—শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ সেবায়তন। ২নং প্রাণকৃষ্ণ সাহা লেন, কলিকাতা—৩৬। মূল্য ৫.৫০ নঃ পঃ]

শ্রীফণীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়

অনামী ঃ দিলীপকুমার রায়

প্রায় পঁচিশ বছর আগে "অনামী" যখন প্রথম প্রকাশিত হয়, মনে আছে বইখানা তখন বাংলা সাহিত্যে একটা নতুনের সাড়া জাগিয়েছিল। পঁচিশ বছরে বাংলা সাহিত্যের মেজাজের অনেকখানি বদল হয়েছে। দেখছি, অনামীও নবকলেবর হয়েছে এই দ্বিতীয় সংস্করণে। কিন্তু তার মেজাজ বদলায়নি। যুগের হাওয়া-বদল হওয়া সত্ত্বেও দিলীপকুমার যে কবিকৃতিতে স্বধর্মচ্যুত হননি, এটি আমাদের আশ্বস্ত করেছে। কিন্তু স্বধর্মকে আঁকড়ে এক জায়গায় তিনি দাঁড়িয়েও থাকেননি। তিনি 'অচেনা' পথের পথিক বাউল, অশেষ খুশির খেয়ালী'—অথচ বাউলের মতই আপন ধর্মে অটল। তাঁর প্রতিভার বৈশিষ্ট্য। তার পরিচয় নতুন অনামীর অনেক জায়গাতেই আছে।

অনামী সঙ্কলন গ্রন্থ। সঙ্কলনের দুটি বিভাগ—একটি কাব্য সঙ্কলন, আরেকটি পত্রসঙ্কলন। পত্র সঙ্কলনটি নানাকারণেই চিত্তাকর্ষক সন্দেহ নাই। তবুও তাকে আমরা এ-আলোচনা থেকে বাদ দেব, কেননা তাতে, দিলীপ-কুমারের মধুকর-নৈপুণ্যের পরিচয় থাকলেও সৃষ্টি-প্রতিভার প্রকাশ নাই। কাব্য সঙ্কলনেরও দুটি অংশে—মণিমঞ্জুষা আর সুধাঞ্জলিতে—তিনি অনুবাদক। সেখানে বৃত্তিতে মধুকর হলেও তিনি কবি, অতএব স্রষ্টা।

অনুবাদক কবির কথাই আগে বলি। মণিমঞ্জুষায় স্থান পেয়েছে প্রাচীন ও আধুনিক স্বদেশী ও বিদেশী বহু কবির কাব্যনিবন্ধের অনুবাদ। কয়েকটি গদ্য সুভাষিতের ও কবিতায় অনুবাদ আছে। অনুবাদের কাজ সহজ নয়—বিশেষত কবিতার কবিতায় অনুবাদ। তাকে অনুবাদ না বলে 'অনুসৃষ্টি' বলাই ভাল। প্রজাপতির সৃষ্টির মতই সার্থক কবিকৃতি উৎসারিত হয় এক অন্তর্গূঢ় তপঃশক্তির পরিস্পন্দ হতে। অনুবাদক যদি আত্মসমাহিতির দ্বারা কবির সেই অপালোকে অনুপ্রবিষ্ট হতে না পারেন, বৈখরীর মূলে যে পশ্যন্তীর দ্যুতি রয়েছে তাতে অবগাহন করতে না পারেন, তা'হলে কবিতার ভাষান্তরই হতে পারে, কিন্তু যথার্থ অনুবাদ বা অনুসৃষ্টি হয় না। কালিদাসের একটি উপমা ব্যবহার করে বলা যেতে পারে, সত্যকার অনুবাদ হচ্ছে দীপ হতে দীপ জ্বালানোর মত। ভাষার নেপথ্যে থেকে কবিতার মাঝে প্রাণ সঞ্চার করে ভাব, ধ্বনি আর ছন্দ। তার মধ্যে আবার ভাবই মুখ্য বা প্রযোজক। ভাবের তপঃশক্তি অন্তরিক্ষ-লোকে ধ্বনি ও ছন্দের নীহারিকায় কবিতার যে জ্যোতির্বাষ্পময় মূর্তি রচনা করে, তাকেই শেষে ভাষার কাঠামোয় বন্দী করা হয়। সুতরাং কবিকৃতির প্রায় বারো আনাই নেপথ্যলোকের ব্যাপার। অনুবাদককেও তাই মূর্তকে বিমূর্ত করে তারপর আবার নতুন করে মূর্তি গড়তে হয়। এই নতুন মূর্তিতে ভাব অক্ষুণ্ণই থাকে, কিন্তু ভাবের সঙ্গে সামঞ্জস্য বজায় রাখতে গিয়ে ধ্বনি ও ছন্দকে হতে হয় সাবলীল অথচ ব্যঞ্জনাবহ। এই হলেই মূলের রস অনুবাদেও সঞ্চারিত হয়ে তাকে জীবন্ত করে তোলে।

এই বিচারে দিলীপকুমারের অধিকাংশ অনুবাদই রসোত্তীর্ণ হয়েছে। বিশেষ করে দৃষ্টি আকর্ষণ করে সংস্কৃত হতে আর শ্রীঅরবিন্দের 'সাবিত্রী' হতে অনুবাদগুলি। গীতার বিশ্বরূপের সাতটি মাত্র শ্লোকের অনুবাদ পড়ে দুঃখ হয়, তিনি বাকী শ্লোকগুলির অনুবাদ হতে আমাদের বঞ্চিত করলেন কেন। সাবিত্রী হতে অনুবাদগুলিতেই বোধ হয় তাঁর অনু-বাদের উৎকর্ষ চরমে উঠেছে। দেখে খুশী লাগল, এ ক্ষেত্রে তিনি চোদ্দ-মাত্রার অমিত্রাক্ষর ব্যবহার না করে আঠারো মাত্রার অমিত্রাক্ষর ব্যবহার করেছেন। এ-সম্পর্কে তিনি যে-যুক্তি দিয়েছেন, তা অখণ্ডনীয়। মধুসূদন চোদ্দ মাত্রার অমিত্রাক্ষর চালু করে গিয়েছেন মৌলিক রচনায়, সে-স্বাধীনতা তাঁর ছিল। কিন্তু সাবিত্রীর অনুবাদকের তো সে-স্বাধীনতা নাই। ঐ আঠারো-মাত্রার অমিত্রাক্ষর ব্যবহার না করলে সাবিত্রীর মূল-ছন্দের সমুদ্রোচিত নির্ঘোষ আর আন্দোলনটুকু যে কিছুতেই ফুটিয়ে তোলা যেতনা।

'সুধাঞ্জলির' অনুবাদ সুন্দর হলেও তা কিন্তু মূলের সমকক্ষ হয়নি। অবশ্য অনুবাদক তার একটা কৈফিয়ত দিয়েছেন, 'অনুবাদগুলি করবার সময়ে আমার একটি লক্ষ্য ছিল এই যে, যে-সুরে মূল হিন্দী গানটি গাইব, ঠিক সেই সুরেই অনুবাদটি গাওয়া যেন সম্ভব হয়।' কিন্তু ইন্দিরা দেবীর ভজনগুলি গীতি-কবিতা হিসাবেও আশ্চর্য সার্থক—ঠিক যেন বৈষ্ণব পদাবলীর মত। ওর ভাষা শুধু মুখের ভাষা নয়, যেন বুকের ভাষা—সুর না দিলেও ওতে সুর উছলে পড়ে। শুনেছি গম্ভীরায় মহাপ্রভুর করুণ আর্তি আর প্রলাপ হতেই নাকি চৈতন্যোত্তর বৈষ্ণব পদাবলী তার প্রেরণা পেয়েছে। ইন্দিরা দেবীর ভজনগুলিতেও গম্ভীরার এই বেদন স্পন্দন। তার উপর প্রাচীন রাজস্থানী ঠেট্ বুলির মিষ্টত্বটুকু ঈষৎ অপরিচয়ের একটা ব্যবধান রচনা করে করে মরমীয়া অনুভূতির যে-রহস্যলোক সৃষ্টি করেছে, তার তুলনা নাই। এই রহস্য সৃষ্টির উদ্দেশ্যেই বোধ হয় বাংলার মহা-জনেরা পদাবলী রচনায় ব্রজবুলির আশ্রয় নিয়েছিলেন। দিলীপকুমারের অনুবাদ সুরের দিক দিয়ে মূলের সঙ্গে সাম্য রক্ষিত হলেও কাব্যিক রহস্য-ময়তার দিক দিয়ে সাম্য যে রক্ষিত হয়নি, একথা হয়তো তিনিও স্বীকার করবেন। এটা অবশ্য অনুবাদকের অগৌরবের কোনও কারণ নয়, কেননা লোকোক্তিতেও আছে, 'সর্বতো জয়মন্বিচ্ছেৎ, পুত্রাৎ শিষ্যাৎ পরাজয়ম্।' মনে হয় সুরসাম্যের সঙ্গে রহস্যসাম্যের মণিকাঞ্চন যোগ ঘটিয়ে ইন্দিরা দেবীর ভজনগুলির অনুবাদ এখনও সমস্যাই থেকে গেল।

কাব্য সঙ্কলনের তৃতীয় ভাগে 'কবিতাকুঞ্জ'—কবি দিলীপকুমারের স্বনির্বাচিত কবিতার সঙ্কলন। সাহিত্যের বিভিন্ন ক্ষেত্রে তাঁর দান অনুপেক্ষণীয়, কিন্তু এইখানেই তাঁর স্বরূপের পরিচয় নিবিড় হয়ে উঠেছে।

ভূমিকায় তিনি নিজেই বলেছেন, তাঁর কবিতা 'ভাগ্যবতী কবিতা।' আর বিষয় বস্তুর এ-বৈশিষ্ট্যের জন্য তাঁকে নাকি এমন অনুযোগও শুনতে হয়েছে যে তাঁর ভক্তসত্তা তাঁর সাহিত্যিক সত্তাকে আচ্ছন্ন করতে চাইছে। কথাটা অদ্ভুত ঠেকে, যদিও রবীন্দ্রোত্তর যুগে এ-ধরণের কথা আমরা হামেশাই শুনতে পাই। আধ্যাত্মিকতার সঙ্গে কাব্যের বিচ্ছেদ গত দুই

রণকে প্রায় সম্পূর্ণ হয়ে এসেছে, রাষ্ট্র secular হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে কাব্য সাহিত্যও পুরাদস্তুর secular হতে চলেছে। কিন্তু বেদনার সঙ্গে ভাবি, যে-সাহিত্য মানবচিত্তের সর্বতোভদ্র মুক্তির জগন্নাথক্ষেত্র, সেখানে এই রেষারেষি এই জাত বিচার কেন? জীবনের দাবি, বাস্তবতার দাবি —সবই বুঝি। কিন্তু আধ্যাত্মিকতা কি ছাড়া, সে কি অবান্তর? যা অধরা তাকে ধরবার জন্যই কি ক্ষুরধার দুর্গম পথে মানুষের অভিযান চলে আসেনি অনন্তকাল ধরে? আর সে অধরার আভাস কি শুধু এই প্রাকৃত জীবনের 'পরাণ পোড়ানিতেই, দিব্যজীবনের অভীপ্সায় নয়? দিলীপ-কুমার 'এই-টুকু ?-তে তাই প্রশ্ন করছেন:

"মনের কথা মনের মতন করে কইবে"—শুধুই কান্নাহাসির ফাঁকে?
বিপুল বাঁশী যখন উচ্ছল স্বরে ডাকে নিতুই পথের প্রতি বাঁকে?
কবির পরে শুধুই কাজের দাবি? ছায়াপথও চায় না কি হায় তারে?
দূর নীলিমার তারামণির মালা চাইবে না সে জন্ম অধিকারে?

* * * *

বাঁধনসীমা দুঃসহ যার কাছে, রূপবিদায়ে অরূপে যার রতি;
ধ্রুবধনে বুক ভরে না যার অশ্রুবেরি পায় যে করে নতি,

* * * *

মনস্-পারের সেই ধ্যানী কি শুধুই "কইবে কথা মনের মতন করে?"

এই লোকোত্তরের অভীপ্সাই দিলীপকুমারের কবি প্রাণের মূল সুর। তাঁর রাধা-হিয়া চিরশ্যামলেরি অভি সারী' সে,

'প্রত্যয়-স্ফুলিঙ্গ স্পর্শে প্রেমের স্পন্দনে
শুনেছে তাঁহার বাঁশি রক্তের দোলায়।'

তাই সে চায়

'সেই প্রেমাঞ্জন
বরে যার তমিস্রায়ো গর্ভে এ নয়ন
দেখে সত্য মানে সত্য সত্যতরে জ্বালে পূজারতি
প্রাণ ধনায়।'

হয় তো কখনও সংশয় জাগে:

'শুনেছি অকূল বাঁশি?' বার বার পুছে পান্থ, সত্যিই কি শুনেছি তাহারে'
ওই প্রাণলীলাহীন মেঘচুম্বী মৌলি পরে কভু কেহ বাঁচিতে কি পারে?
তথাপি তারেই চাহে যুক্তিমানা না মানিয়া অশ্রুবেই বরিবে বিদ্রোহী,
তুঙ্গ শৃঙ্গ ডাকে…ডাকে…অধিত্যকা পিছে রাখি চলে সমুধ্বের
তৃষ্ণা বহি।

আর এই সমূধ্ব' তাঁর জীবনদেবতা, তাঁর 'হৃদি বল্লভ…অরূপ বরণ মরণ-হরণ স্বপন সাথী' শ্রীকৃষ্ণ। কিন্তু তাঁর শ্রীকৃষ্ণ শুধু রাধার মন চোরাই নন, তিনি পার্থসারথিও। দুষ্কৃতনাশন কুরুক্ষেত্রের পরেই যে আনন্দ-বৃন্দাবনের প্রতিষ্ঠা, এ-কথা কবি জানেন, মানেন। তাই তাঁর দেবতাকে আহ্বান করে তিনি বলেন:

'নাথ! রৌদ্র নিনাদে এসে পীড়িত ভবে,
করো ধ্বংস দৈত্যচমূ হুঙ্কারবে;
ত্যজি বংশী চক্র ধরো অট্টরবে,
হও শ্যামল অগ্নিরাঙা ত্রিলোক ব্যাপি।

* * * *

শংখ তব পরে বাজায়ে চরাচরে করিয়ো বল্লভ, নন্দিত।
ফিরাইয়ো দক্ষিণ আনন সুন্দর।—রুদ্র যবে হবে তর্পিত।
বিদ্যুতের দাহে-স্তব্ধ হলে গ্লানি মেদুর।—এসো নিস্কন্দিয়া
পরমানন্দের বৃন্দাবন প্রেমমুরলীমন্দ্রীর ছন্দিয়া।'

শক্তি-সাধনা আর ভক্তি-আরাধনা দুই-ই তো বাঙালীর জীবনবেদ। কিন্তু এ-দুটি ধারা যেন পাশাপাশি বইছে বাংলার অধ্যাত্ম সাধনায়। শ্রীকৃষ্ণে এসে তারা স্বচ্ছন্দে মিলে যেতে পারে। বৃন্দাবন তাঁর কৈশোর স্বপ্ন, আর কুরুক্ষেত্র তাঁর তারুণ্য দৃপ্তি। আমরা বাস্তবকে উপেক্ষা করে স্বপ্নকে বড় করেছি। অথচ শ্রীকৃষ্ণতত্ত্বের আধখানা মাত্র নিয়েছি আধখানা নিইনি। বঙ্কিম এ-ভুলের সংশোধন করতে গিয়ে বৃন্দাবনকে বাদ দিয়েছিলেন! নবীন সেন কুরুক্ষেত্র আর বৃন্দাবন দুটিকেই নিলেন বটে, শেষ পর্যন্ত জাতীয় ঐতিহ্যই তাঁর মাঝে জয়ী হন। ভাববিহ্বলতার স্রোতে তিনি ভেসে গেলেন। কিন্তু দিলীপকুমার পরম-ভাগবত হলেও গীতার শ্রীকৃষ্ণকে ভোলেননি. তাঁর দেবতার বাঁশির সুর পাঞ্চজন্যের নির্ঘোষকে আচ্ছন্ন করেনি।

দিলীপকুমার আধ্যাত্মিক, কিন্তু তাঁর আধ্যাত্মিকতা জীবনবিমুখ মোটেই নয়। 'লীলাবাদীতে তাঁর জীবনদর্শনের সুন্দর পরিচয় তিনি দিয়েছেন। মহাশক্তিকে সম্বোধন করে তিনি বলছেন:

'আমি চাই বিশ্বলীলা—পূর্ণাঙ্গ সুন্দর,
যুগে-যুগে স্তরে স্তরে বিকাশ, প্রগতি,

* * *

আমারে দাও এ বর, অনন্ত রূপিণী,
যত রূপে লীলা তুমি করো মর্ত্যভূমে
মানিতে সবারে যেন পারি এ জীবনে।
বরিয়া তোমারে ধ্যানে দেহাতীত লোকে
সর্বব্যাপী আবির্ভাবে সমাধি-চেতনা
ফিরি যেন দেহলোকে দেহভোগ তরে
অগণ্য ইন্দ্রিয়পাত্রে জ্বালায়ে প্রদীপ,
করিতে আরতি তব মূর্ত প্রতিমার।

* * *

ভোগ নহে মরীচিকা, রূপ নহে চিতা,
সীমা নহে কারাগার, বৈচিত্র্য ছলনা।

* * *

নহ মা অরূপা শুধু, নহ রূপময়ী,
নহ প্রাণোচ্ছলা শুধু, নহ নিস্পন্দনী,
নহ শুধু প্রেমরাজ্ঞী জ্ঞান ধ্যানময়ী
বৈষ্ণবের কৃষ্ণ শুধু, শৈবের ধূর্জটী,
সংসারীর লক্ষ্মী শুধু, শাক্তের করালী…

কবিতাকুঞ্জে ভাব ও ছন্দের অজস্র বৈচিত্র্য আছে, সেগুলি বিশ্লেষণ করে দেখানো সম্ভব নয়। শুধু দুটি গুচ্ছের প্রতি দুটি আকর্ষণ করব, যাতে দিলীপকুমারের একটি চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য প্রকাশ পেয়েছে। সাম্প্রদায়িকতা আধ্যাত্মিকতার এক মহা অভিশাপ। কিন্তু এ-দীনতা দিলীপকুমারের চিত্তকে মোটেই স্পর্শ করেনি। গুরু শ্রীঅরবিন্দের প্রতি তাঁর অবিচল নিষ্ঠা তাঁকে অপরের অধ্যাত্মমহিমার প্রতি অন্ধ করেনি, শ্রীরামকৃষ্ণের প্রতি তাঁর শ্রদ্ধার পরিচয় রয়েছে 'শ্রীরামকৃষ্ণ কথিকায়'। এগুলির গ্রন্থনৈপুণ্য অপূর্ব, তাঁর মধুকরবৃত্তির চমৎকার নিদর্শন। বাংলার কাব্যসাহিত্যে এ ঢঙের কবিতা খুব বেশী আছে বলে মনে হয়না। কিন্তু আশ্চর্য করে দেয় শ্রীরমণ মহর্ষির উদ্দেশে রচিত তাঁর ছয়টি কবিতা। সেই 'আকাশ-চুম্বিত শান্ত সিন্ধুসম অগাধ অপারে'র মহিমস্তব দেশে বিদেশে রচিত মহর্ষির প্রশস্তির কোথাও এমন করে মন্ত্রিত হয়ে উঠতে দেখিনি। গভীর উপলব্ধিকে অপরের মাঝে সঞ্চারিত করবার সামর্থ্য যদি কবিকৃতির বৈশিষ্ট্য হয়, তাহলে বলব, এই কয়টি কবিতাতে দিলীপকুমার তাঁর সার্থকতার চরম শিখরে পৌঁচেছেন। বেদমন্ত্রের উদাত্ততা দিয়ে এ যেন মহর্ষির বাণীমূর্তির শিল্পায়ন।

দিলীপকুমারের কবিধর্ম সম্বন্ধে পত্রাবলীতে নলিনীকান্ত গুপ্ত মশায় একটি সুন্দর কথা বলেছেন: আপনার কবিতার চলনে বলনে পাই একটা চমৎকার জার্মানির আমেজ। বাংলা কাব্যে ও জিনিসটি খুবই বিরল। আমাদের কাব্য ছন্দের বিশেষত খেলতি।...কিন্তু কেবল গড়ন হিসাবে নয়, বস্তুর দিক দিয়েও দেখি একটা জার্মানিই গড়ে উঠেছে ভাবের ও তত্ত্বের যুগপৎ অধিষ্ঠানে।' এই জার্মানির প্রেরণায় তাঁর ভাষায় ও ভাবে যে একটা শালপ্রাংশু ঋজু বলিষ্ঠতা এসেছে, তা বাংলার কাব্যরীতিতে নিঃসন্দেহে অভিনন্দন-যোগ্য। মনে হয়না কি, এটি উত্তরাধিকার সূত্রে তিনি তাঁর পিতার কাছ থেকে পেয়েছেন এবং পিতৃরিক্থকে নিজস্ব প্রতিভায় আরও সংবর্ধিত করেছেন?

কাব্য সঙ্কলনের চতুর্থ বিভাগে 'গীতিগুঞ্জন'—দিলীপকুমারের গানের সঙ্কলন। গানকে কাব্য হিসাবে আলোচনা করতে গেলে তাকে সম্পূর্ণ করে দেখানো যায় না। তবুও আমাদের প্রাচীন এবং আধুনিক অনেক গীতিকাব্যের গান কাব্য হিসাবেও রসোত্তীর্ণ। দিলীপকুমার তাঁদেরই সগোত্র। অধিকন্তু তাঁর গানের কাঠামোতে লিরিকধর্মের সঙ্গে এপিক ও ব্যালাডধর্মের যে সংমিশ্রণ দেখতে পাওয়া যায়, বাংলার গীতি সাহিত্যে এটি তাঁর বিশিষ্ট দান বলে মনে হয়।

আলোচনা দীর্ঘ হয়ে যাচ্ছে, সুতরাং এইখানেই ইতি করি। অনামীর পঁচিশ বছর পূর্ণ হল, বাংলার সাহিত্য-জগতে সে একজন সাবালক। প্রার্থনা করি সে শতায়ু হ'ক।

[প্রকাশক—গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স, ২০৩।১।১, কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট, কলিকাতা—৬। মূল্য—৬.৫০ নঃ পঃ]

—অনির্বাণ

গ্রন্থালয় ও লোক শিক্ষা: শ্রীবিজয়নাথ মুখোপাধ্যায়

আমাদের দেশে প্রতি বৎসর নূতন শত শত গ্রন্থাগার স্থাপিত হইতেছে বটে, কিন্তু গ্রন্থাগার-বিজ্ঞান সম্বন্ধে বেশী গ্রন্থ দেখা যায় না। লেখক এই পুস্তকে সে অভাব কতকটা দূর করিলেন। তাঁহার গ্রন্থে বয়স্ক শিক্ষা, বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা, জীবিকা সমস্যার সমাধান, অবসর বিনোদন, নাগরিক গঠন প্রভৃতি বিষয়ে গ্রন্থাগারের প্রয়োজনের কথা বিস্তৃতভাবে আলোচিত হইয়াছে। মহিলা-গ্রন্থাগার, শিশু-গ্রন্থাগার ভ্রাম্যমান গ্রন্থাগার প্রভৃতির কথাও আছে। পশ্চিমবঙ্গে গ্রন্থাগার আন্দোলন ও গ্রন্থাগার বিষয়ক সরকারী পরিকল্পনাও প্রদত্ত হইয়াছে। নূতন ও পুরাতন কর্মীদের বিজ্ঞান সম্মত উপায়ে গ্রন্থাগার পরিচালনা কার্য্যে এই পুস্তক বিশেষ কাজে লাগিবে।

[প্রকাশক—স্মৃতিরত্ন ভবন, ২নং রামগোপাল স্মৃতিরত্ন লেন, হাওড়া। মূল্য—২.৫০ নঃ পঃ]

বানভট্ট

সম্পাদক—শ্রীফণীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় ও শ্রীশৈলেনকুমার চট্টোপাধ্যায়

২০৩।১।১, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা, ভারতবর্ষ প্রিন্টিং ওয়ার্কস হইতে শ্রীকুমারেশ ভট্টাচার্য কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

ভারতবর্ষের সূচী

সপ্তচত্বারিংশ বর্ষ—প্রথম খণ্ড—তৃতীয় সংখ্যা

ভাদ্র—১৩৬৬

লেখ-সূচী

চিত্র-সূচী

লেখ-সূচী

চিত্র-সূচী

শ্রীরামপুরের
এস.চক্রবর্ত্তীর
স্পেশাল গোল্ডেন
XX
নস্য
লক্ষ্মী এজেন্সী
৪৩/১, স্ট্র্যাণ্ড রোড • কলিকাতা-৭

ঢোল এণ্ড কোম্পানীর
দাদ ও কাউরের
মলম
নিম মলম
খোস, পাঁচড়া চুলকনীর জন্য
কিউটাটোন
পোড়া বেদনা ও
চর্ম্মরোগে ব্যবহার্য্য
বরানগর
কলিকাতা

লেখ-সূচী

লেখ-সূচী

লেখ-সূচী

ভ্রম-সংশোধন—গত শ্রাবণ, ১৩৬৬ সংখ্যা "ভারতবর্ষ"-এর চতুর্থ কভার পৃষ্ঠায় মুদ্রিত ইংরাজি মাসের নাম "August, 1959" স্থলে "July, 1959" হইবে।

শিল্পী : অসিতরঞ্জন বোস

পল্লীর প্রান্তে

ভারতবর্ষ প্রিন্টিং ওয়ার্কস্

ভাদ্র—১৩৬৬

প্রথম খণ্ড | সপ্তচত্বারিংশ বর্ষ | তৃতীয় সংখ্যা

দণ্ডী ও দশকুমার

অধ্যাপক দুর্গামোহন ভট্টাচার্য

দণ্ডীর এক গুণমুগ্ধ ভক্ত বাল্মীকি আর ব্যাসের পরেই দণ্ডীকে কবিসভায় আসন দিয়েছেন। তিনি বলেছেন—

জাতে জগতি বাল্মীকৌ কবিরিত্যভিধাভবৎ।
কবী ইতি ততো ব্যাসে কবয়স্ত্বয়ি দণ্ডিনি॥

যেদিন পৃথিবীতে বাল্মীকির উদয় হয়েছিল, সেদিন তাঁর উদ্দেশ্যে প্রথম 'কবি' নামের সৃষ্টি হ'ল। তার পর ব্যাসের আবির্ভাবে কবির সংখ্যা বেড়ে গেল; শব্দটি দ্বিবচনে প্রযুক্ত হ'তে লাগল। দণ্ডীর সাহিত্যক্ষেত্রে প্রবেশের পর থেকে বহুবচনে 'কবয়:' পদের প্রয়োগ চলেছে।

ভাবুক ব্যক্তির এই উক্তিতে স্তুতির আতিশয্য প্রকাশ পেয়েছে, সেকথা সকলেই জানেন। কিন্তু সংস্কৃত সাহিত্যে দণ্ডী যে এক অসাধারণ স্থান অধিকার করে আছেন, সে বিষয়ে মতভেদ নেই।

বেশির ভাগ সংস্কৃত কবিদের মত দণ্ডীও তাঁর গ্রন্থে আপন বৃত্তান্ত কিছুই লিখে যাননি। তাঁর জন্মকাল বা কর্মস্থান সম্পর্কে আজও কোন নিঃসংশয় নির্ধারণ সম্ভবপর হয়নি। দণ্ডীর কাল নিয়ে পণ্ডিতদের মধ্যে বিষম মতভেদ দেখা যায়। নানারূপ যুক্তি-প্রমাণ থেকে অনেকে অনুমান করেন যে, দণ্ডী হয়ত খ্রীষ্টীয় সপ্তম শতকের শেষের দিকে আবির্ভূত হয়েছিলেন। দণ্ডীর গ্রন্থে সুহ্ম, কলিঙ্গ, অঙ্গ, শ্রাবস্তী, বিদর্ভ, কাশী প্রভৃতি বহু দেশের কথা আছে। কিন্তু কবি যেভাবে বারংবার দক্ষিণ ভারতের নগর জনপদ ও কাবেরী নদীর নাম করেছেন এবং কাঞ্চীপুরের পল্লবরাজগণের উল্লেখ করেছেন, তাতে মনে হয় যে, তিনি ছিলেন দাক্ষিণাত্য প্রদেশেরই অধিবাসী।

দণ্ডীর নামে দুখানি গ্রন্থ চলিত আছে—কাব্যাদর্শ

আর দশকুমারচরিত। প্রথমখানি সাহিত্যসমীক্ষা বা অলঙ্কারের বই, দ্বিতীয়খানি গদ্যে রচিত কাহিনী বা গদ্যকাব্য। দুই গ্রন্থ একই দণ্ডীর রচিত কিনা সে বিষয়ে কেউ কেউ সংশয় প্রকাশ করেন, কারণ উভয় গ্রন্থে রুচির মিল নেই। কাব্যাদর্শের লেখক সাহিত্যে নৈতিক বিচ্যুতি সহ্য করেন না; শব্দে এবং অর্থে সর্বত্রই শুচিতা প্রত্যাশা করেন, গ্রাম্যতা পরিহারের উপদেশ দেন। অথচ দশকুমারচরিত ভাবে ও ভাষায় সর্বত্র সুনীতিনির্দেশ মেনে চলেনি। এ অসামঞ্জস্যের সমাধানে স্বীকার করতে হয় যে, দশকুমারচরিত কবির প্রথম গ্রন্থ, আর কাব্যাদর্শ পরিণত বয়সের রচনা।

দণ্ডী তিনখানা গ্রন্থ লিখেছিলেন বলে জানা যায়। খ্রীষ্টীয় নবম শতকে সাহিত্যসমালোচক রাজশেখর লিখে গেছেন—

ত্রয়োঽগ্নয়স্ত্রয়ো দেবাস্ত্রয়ো বেদাস্ত্রয়ো গুণাঃ।
ত্রয়ো দণ্ডিপ্রবন্ধাশ্চ ত্রিষু লোকেষু বিশ্রুতাঃ॥

তিন অগ্নি (গার্হপত্য, আহবনীয়, দক্ষিণ), তিন দেবতা (অগ্নি, বায়ু, সূর্য), তিন বেদ (ঋক্‌, সাম, যজুঃ), তিন গুণ (সত্ত্ব, রজঃ, তমঃ) এবং দণ্ডীর তিন গ্রন্থ ত্রিভুবনে বিখ্যাত।

কিন্তু দশকুমার আর কাব্যাদর্শ ছাড়া দণ্ডীর অপর কোন গ্রন্থ আমাদের হাতে এসে পৌঁছয়নি। কাব্যাদর্শের একটি শ্লোক 'লিম্পতীব তমোঽঙ্গানি' মৃচ্ছকটিক নাটকে পাওয়া যায়। এ থেকে কেউ কেউ ভেবেছিলেন যে, এই নাটকই দণ্ডীর তৃতীয় গ্রন্থ। কিন্তু শ্লোকটি ভাসের চারুদত্ত নাটকেও আছে। তা ছাড়া মৃচ্ছকটিক কাব্যাদর্শ অপেক্ষা প্রাচীন রচনা বলে মনে হয়। সুতরাং 'লিম্পতীব' শ্লোকের প্রমাণ বড় দুর্বল। দণ্ডী স্বয়ং তাঁর কাব্যাদর্শে 'ছন্দোবিচিতি' ও 'কলাপরিচ্ছেদে'র নাম করেছেন। এ দুখা'নি দণ্ডীর রচিত স্বতন্ত্র গ্রন্থ হ'তে পারে, আবার পৃথক কোন গ্রন্থ না হ'য়ে কাব্যাদর্শের বিলুপ্ত পরিচ্ছেদ মাত্রও হ'তে পারে। কাজেই এরূপ নাম থেকে কোন সিদ্ধান্ত করা সঙ্গত নয়। ভোজের শৃঙ্গারপ্রকাশে দণ্ডীর নামের সঙ্গে 'দ্বিসন্ধানে'র নাম উল্লিখিত দেখা যায়। 'দ্বিসন্ধান' ছিল এমন একখানি কাব্য—যাতে দণ্ডী একই বাক্য দুরকম অর্থে প্রয়োগ ক'রে এক সঙ্গে রামায়ণ-মহাভারতের ঘটনা বর্ণন করেছিলেন। এই শ্লেষ-কাব্যই হয়ত ছিল দণ্ডীর তৃতীয় গ্রন্থ। কিন্তু সবই অনুমান মাত্র।

দণ্ডীর অপর গ্রন্থের নাম যা-ই হোক, কবি তাঁর কবিত্বমহিমায় অপূর্ব প্রতিষ্ঠা লাভ করেছিলেন, তাঁর বাক্য অমৃতসম্পদে সিক্ত ব'লে বিবেচিত হ'ত, তিনি আচার্যগৌরবে পূজিত হ'তেন—

আচার্যদণ্ডিনো বাচামাচান্তামৃতসম্পদাম্‌।

সংস্কৃত কথাসাহিত্য বা গদ্যকাব্যগ্রন্থের প্রাচুর্যে সমৃদ্ধ নয়। আলঙ্কারিকেরা গদ্যকাব্যকে দুই শ্রেণীতে ভাগ করেন—আখ্যায়িকা আর কথা। কবির অভিজ্ঞতালব্ধ আখ্যানের নাম আখ্যায়িকা, আর কল্পনাবহুল কাহিনীর নাম কথা।—

আখ্যায়িকোপলব্ধার্থা প্রবন্ধকল্পনা কথা।

কিন্তু দণ্ডী এ ভেদ মানেননি। তাঁর মতে কথা আর আখ্যায়িকায় নামে মাত্র ভেদ, জাতিতে নয়—

তৎ কথাখ্যায়িকেত্যেকা জাতিঃ সংজ্ঞাদ্বয়াঙ্কিতা।

দশকুমারচরিত আখ্যায়িকা ব'লে খ্যাত। এতে আছে দশজন কুমারের কাহিনী। মুখ্য কুমার রাজবাহন, তাঁর পত্নী অবন্তিসুন্দরী এবং ন জন সুহৃৎ—সোমদত্ত, পুষ্পোদ্ভব, অপহারবর্মা, উপহারবর্মা, অর্থপাল, প্রমতি, মিত্রগুপ্ত, মন্ত্রগুপ্ত ও বিশ্রুত—এঁদের চরিতকথাই আখ্যায়িকার অবলম্বন।

পূর্বপীঠিকা, মূলগ্রন্থ এবং উত্তরপীঠিকা বা শেষ—এই তিন অংশে দশকুমারচরিত বিভক্ত। দশকুমারের বিভিন্ন পরিচ্ছেদের নাম উচ্ছ্বাস। গ্রন্থের নাম অনুসারে এই কাব্যে দশজন কুমারের বৃত্তান্ত থাকার কথা। কিন্তু মূল গ্রন্থের আটটি উচ্ছ্বাসে আটজন কুমারের চরিত মাত্র পাওয়া যায়, শেষ চরিতটি অসম্পূর্ণ রয়ে গেছে। পূর্বপীঠিকার পাঁচটি উচ্ছ্বাসে সমগ্র কাহিনীর গোড়াপত্তন ছাড়া দুজন কুমারের কাহিনী যোগ করা হয়েছে। উত্তরপীঠিকায় অসমাপ্ত বিশ্রুতচরিতের শেষ অংশ পূরণ করা হয়েছে। বিভিন্ন অংশের রচনায় ও ঘটনায় অল্পবিস্তর অমিল দেখা যায়। এতেই মনে হয় যে, গ্রন্থের তিন অংশ একই

ব্যক্তির রচনা নাও হতে পারে। উত্তরপীঠিকাটি চক্রপাণিদীক্ষিত নামে একজন মহারাষ্ট্র কবি রচনা করেছেন, এমন প্রসিদ্ধিও আছে।

কয়েক বছর আগে অবন্তিসুন্দরী নামে একখানা গদ্যকাব্য পাওয়া গেছে। গ্রন্থকারের নাম দণ্ডী। গ্রন্থের বিষয়বস্তুর সঙ্গে দশকুমারের সম্পূর্ণ মিল আছে। কোন কোন পণ্ডিত মনে করেন—অবন্তিসুন্দরী মূল দশকুমারচরিতেরই অংশ।

দশকুমার চরিতের আখ্যায়িকাটি এই—

মগধরাজ রাজহংস মালবরাজের কাছে পরাজিত হ'য়ে সপরিবারে বিন্ধ্য পর্বতে আশ্রয় গ্রহণ করেন। সেখানে কুমার রাজবাহনের জন্ম হ'ল। রাজকুমার ন জন মন্ত্রিপুত্রের সঙ্গে লালিতপালিত হ'লেন এবং শিক্ষার শেষে সকলে একসঙ্গে ভাগ্যলক্ষ্মীর সন্ধানে বিদেশ যাত্রা করলেন। ঘটনাক্রমে বন্ধুরা পথে বিচ্ছিন্ন হ'য়ে প্রত্যেকে ভিন্ন ভিন্ন দেশে ছড়িয়ে পড়লেন এবং বহুকাল পরে আবার মিলিত হ'য়ে নিজ নিজ অভিজ্ঞতার কাহিনী বর্ণনা করলেন। এঁদের কাহিনীগুলি সবই প্রায় আরব্যোপন্যাসের মত অদ্ভুত।

দ্যূত, চৌর্য, ছল, ইন্দ্রজাল, গুপ্তপ্রণয়, নারীহরণ, বিশ্বাসভঙ্গ, নরহত্যা—সমস্তই দশকুমারের কাহিনীতে পাওয়া যায়। কুমারেরা কেউ রাজ্য লাভের জন্য, কেউ রমণী লাভের জন্য, কেউ বা নিপীড়িত ও হৃতসর্বস্ব ব্যক্তির উপকারের জন্য নীতিগর্হিত কাজ করেছেন। দশকুমারের আখ্যায়িকায় বহুস্থলে দুর্নীতির প্রভাব এবং শ্লীলতার অভাব সুস্পষ্ট। কিন্তু বাস্তব ঘটনার এমন জীবন্ত আলেখ্য সংস্কৃত সাহিত্যে বিরল। হয়ত দণ্ডীর দুর্নীতিবর্ণন অভিপ্রায়মূলক। তিনি শোধনের আশায়ই সমাজের নিন্দনীয় দিকের ছবিটি পাঠকের সামনে তুলে ধরেছেন এমনও অসম্ভব নয়। লোভী ব্রাহ্মণ, ভণ্ড ক্ষপণক এবং ধূর্ত শ্রমণ সকলেই দশকুমারচরিতের মধ্যে স্থান পেয়েছে। এরূপ চরিত্রচিত্রণের এক উদ্দেশ্য হতে পারে এদের দোষ দেখিয়ে সমাজকে জাগিয়ে তোলা।

কাব্যরচনায় দণ্ডী প্রসাদনির্মল বৈদর্ভী রীতির আশ্রয় নিয়েছেন, কিন্তু প্রয়োজনমত সমাসবহুল গৌড়ী রীতির প্রয়োগেও দ্বিধা বোধ করেননি। দশকুমারচরিতে পদে পদে সহজাত কবিপ্রতিভার স্ফূর্তি লক্ষিত হয়, কিন্তু আয়াসসাধ্য কৃত্রিম রচনায়ও দণ্ডী কবি কম কৃতিত্ব দেখাননি। সপ্তম কাহিনীর বক্তা মন্ত্রগুপ্তের অধরে নাকি দন্তক্ষত ছিল, উচ্চারণে ক্লেশের আশঙ্কায় তিনি ওষ্ঠ্য বর্ণ বাদ দিয়ে আত্মকাহিনী বললেন এবং তাঁর সুদীর্ঘ বর্ণনার মধ্যে বরাবর উ-বর্ণ এবং প-বর্গের প্রয়োগ এড়িয়ে চললেন।

ললিতবল্লভারভসদত্তদন্তক্ষতব্যসনবিহ্বলাধরমণির্নিরৌষ্ঠ্য-
বর্ণমাত্মচরিতমাচচক্ষে।

সত্যই মন্ত্রগুপ্ত চরিতে একবারও উ-বর্ণ বা প-বর্গের প্রয়োগ নেই। তা সত্ত্বেও বর্ণনার কোন স্থানে কোনরূপ প্রকাশদৈন্য দেখা দেয়নি। ভাষা যেন দণ্ডীর সম্পূর্ণ বশ্যতা মেনে নিয়েছে।

দণ্ডীর বর্ণনদক্ষতা অসাধারণ। সূর্যোদয় ও সূর্যাস্ত বর্ণনায়, সন্ধ্যা ও বসন্ত বর্ণনায় এবং মিলন ও বিরহ বর্ণনায় তাঁর কবিত্বশক্তির চরম বিকাশ দেখা যায়। দণ্ডীর গদ্যরচনা সরল অথচ গূঢ়ার্থ, অনাবিল অথচ বিচিত্র। দশকুমারের ভাষা দৃঢ়বন্ধতা রক্ষা ক'রেও সাবলীল গতিতে চলেছে। এতেই কবির কৃতিত্ব।

* আকাশ বাণীর কলিকাতা কেন্দ্র হইতে প্রচারিত।

স্বপ্নভঙ্গ

কৃষ্ণকলি
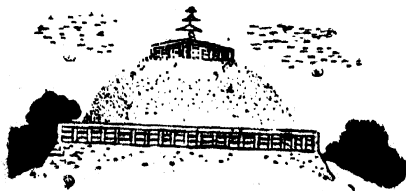
গোলাপী জরির বুটিদার মাদ্রাজী শাড়ীখানা খুলে ধরতেই, মনের গুমট ক্রোধটা প্রায় ফেটে বেরিয়ে এল রেণুর। বৌদি রেখার হাত থেকে কাপড়খানা নিয়ে টান মেরে দূরে ছুঁড়ে ফেলে দিল।—

তোমরা ভেবেছ কি ?

রেখা ঠোঁটের উপর আঙ্গুল দিয়ে চুপ করার সঙ্কেত জানাল। কারণ পাশের ঘরে পাত্রপক্ষ বসে আছে মেয়ে দেখার আশায়।

বৌদির সাবধানতার ধার দিয়েও গেল না রেণু। চাপা ক্রুদ্ধ কণ্ঠে বললো—শুনুক। কে কি শুনলো তো ভারি বয়ে গেল। দেখে শুনে যেয়ে সেই তো এক কথাই বলবে, সে কি তোমরা জান না ? সত্যি বলছি বৌদি। রোজ রোজ এ ভাবে সেজে গুজে লোকের কাছে নিজেকে মেলে ধরতে পারি না আমি।

গলার ঝাঁজটা ভিজে গেল চোখের জলে। রেখা ঠাট্টা করলো—আরে মলো, এতে চোখে জল আসার কি হোল শুনি ? পুরুষের সামনে মেয়েদের দাড়ান মানেই তো ফ্যাশান শো। সারা পৃথিবী জুড়ে এই শো-এর হিড়িক চলেছে। দুফোঁটা চোখের জল ফেলে একে ঠেকাতে পার না তুমি ! 'ফ্যাশান শো' আর 'লহ লহ তুলে লহ' পোজ নেয়নি, এমন মেয়ে বাংলা দেশে আজও জন্মায়নি রেণু। নাও, তোমার দাদা আবার তাড়া দিচ্ছে ওদিকে।

রেখা দূরে ফেলে দেওয়া শাড়ীখানা তুলে এনে রেণুকে পরতে সাহায্য করলো। বৌদিটা মারাত্মক ফাজিল। সব অবস্থায়, সব রকমে হাসাতে পারে। রেণুও হেসে ফেললো, তোমার আর কি বল, রংটা কটা ছিল, নিশ্চিন্তে বৈতরণী পার হয়ে গেছ। আমার মত অবস্থা হলে বুঝতে, জিনিসটা ঠাট্টার নয়, অপমানের।

—অপমান মনে করবো কেন ? তোমার মত তো আমি বোকা ছিলাম না। বরং যা করতেই হবে, তাকে একেবারে মনে প্রাণে আবেগ দিয়ে গ্রহণ করেছিলাম এবং দেখেছিলে যে 'লহ লহ তুলে লহ' পোজখানা এমন কৌশলে দিয়েছিলাম যে তোমরা এক টানেই ট্যারা। তারপর, খেল খতম পয়সা হজম, ড্যাং ড্যাং করে তোমাদের বাড়ী চলে এলাম।

বড়দা বাঁটুল ঘরে এসে ঢুকলো—তোমাদের এখনও হোল না। ওদিকে ওঁরা যে তাড়া দিচ্ছেন।

সাজান শেষ হয়ে গিয়েছিল। রেখা রেণুর মুখে শেষ-বারের মত একটু পাউডারের পাফটা বুলিয়ে দিল। মা দুর্গা নাম স্মরণ করলেন। রেণু বাঁটুলের পিছু পিছু ওঘরে গেল।

এ ঘরে পালঙ্কের উপর জুত করে বসে আছেন পাত্রপক্ষ। রেণু একবার আড় চোখে ওদের দিকে তাকিয়ে দৃষ্টি অবনত করলো। সেই একই দৃশ্যের একই পুনরাবৃত্তি।

বাঁটুল বললো—পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম কর।

এ ভাবে যার তার পায়ের ধুলো মাথায় নিয়ে নিজেকে অযথা ছোট করতে বাধে রেণুর। কিন্তু উপায় নেই। মনের সমস্ত বিতৃষ্ণা চাপা দিয়ে লোক দুটোর পায়ের ধুলো মাথায় দিল এবং পালঙ্কের সামনে রাখা একখানা চেয়ারে অত্যন্ত বিনীত ভাবে মুখ নিচু করে নিজেকে দর্শনার্থী করে বসলো রেণু।

—মুখটা একটু তোল তো মা !

রেণু চোখের দৃষ্টি মাটিতে রেখেই মুখ উঁচু করলো। ভদ্রলোক বললেন, বাঃ, বেশ। রান্না-বান্না জান ? উচ্ছের শুকতো কি করে করতে হয় বল তো !

রেণুর ইচ্ছে হোল স্পষ্ট বলে, উচ্ছের শুকতো রাঁধতে তোমাদের পিণ্ডি চটকানর মশলা লাগে।

কিন্তু রেণুর কিছু বলার আগেই বাঁটুল বললো—কাজ কর্ম, রান্না-বান্নার কথা আর বলতে হবে না। নিজের বোন বলে বলছি না মশাই, ওর বিয়ের পর আমাদের বোধহয় অর্ধেক দিন খাওয়াই হবে না। বলতে গেলে সংসারটা ঐ তো মাথায় করে রেখেছে।

দাদার বিনীত নিচু স্বরে কথা বলার কায়দায় ক্ষোভে জল এল রেণুর চোখে। এই গুণ নিয়েই যদি মেয়েমানুষের দিন চলে যায়, তবে কিসের দরকার রোজ রোজ পাঁচজনের কাছে পণ্য করে তোলবার? জীবনের দীর্ঘ পঁচিশটা বছর যদি বিয়ে না করে কেটে থাকে, তবে বাকিগুলো কিছু বসে থাকবে না।

কিন্তু মনের মধ্যে যতখানি রাগই থাক, রেণু লক্ষ্য করলো, এরা খুব একটা বিব্রতকর প্রশ্ন করেনি। দু-চারটে প্রাথমিক এ কথা সে কথার পর, একজন বললো—যাও মা, তোমায় আর বসে থাকতে হবে না কষ্ট করে।

রেণু কম্পিত পায়ে উঠে দাঁড়াল। বেশী কিছু জিজ্ঞাসাবাদ না করে মৌখিক ভদ্রতার পরিচয় দিল লোক-গুলো, মনে হচ্ছে অভদ্রতায় এরা আর এককাঠি উঁচুতে। অপমানের সব কথাগুলো আড়ালে যেয়ে বিনিয়ে বিনিয়ে চিঠিতে লিখে জানাবে।

দরজা দিয়ে বেরুতে বেরুতে রেণুর কানে গেল একজন বলছেন—না, মেয়ে কিছু অপছন্দের নয়। আমরা এমনই খুঁজছিলাম।

এ ঘরে আসতেই রেখা ধরলো—কি বললো?

—যা সবাই বলে।

—তারপর?

—তারপর দুদিন অপেক্ষা কর। ভাল করে জল খাবারের শ্রাদ্ধ করে, বাড়ী যেয়ে মেয়ের রূপ গুণের ঘাটতির কথা লিখে জানাবে চিঠিতে।

উদ্বিগ্ন মুখে মা বসেছিলেন অদূরে। মেয়ের বিক্ষুব্ধ মুখের দিকে চেয়ে বললেন, চুপ কর বাপু, সবাই কি সমান?

সমান নয় তো কি? সবাই সমান, সব এক ছাঁচে ঢালা। ফর্সা গায়ের রং নিয়ে মানুষ কি ধুয়ে খায়? কি হয় ফর্সা হলে আর না হলে? জীবন পথে চলতে মানুষের গুণই আসল। গুণেরই প্রয়োজন। কিন্তু বুঝছে কে সেই কথা। যা না হলে চলে না, সেই গুণটা সব সময়ই গৌণ, রূপই আসল—সেই সঙ্গে বাপের রূপো।

এই রূপ আর রূপো কোনটারই জোর নেই রেণুর। পাঁচ বোন তিন ভাই। বাবা বেঁচে থাকতেই চার বোনের বিয়ে দিয়ে গেছেন। অফিসের বড়বাবু ছিলেন রেণুর বাবা। ছেলেদের লেখাপড়া শেখান আর চার মেয়ের উপযুক্ত পাত্রে বিয়ে দিয়ে নিজে যখন এ পৃথিবী থেকে বিদায় নিলেন, তখন রেণুর জন্য কোন অবশিষ্টই রেখে যেতে পারেন নি।

জন্ম থেকেই রেণুর অদৃষ্ট মন্দ। বাবা যদি দশ হাজার টাকা রেখে যেতে পারতেন, অথবা রেণুর যদি অনেক রূপ থাকতো, তবে হয়তো আজ এমন অবস্থায় পড়তে হোত না। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ দুটোর কোনটাই না থাকায়, প্রায় প্রতি মাসেই সেই একদল লোকের আগমন, নিজেকে বিক্রি করার জন্য তাদের কাছে কুণ্ঠিত ভাবে মেলে ধরা, এবং এর পরের ফল—তাদের চিঠিতে জানতে পারা—মেয়ের গায়ের রংটা যদি একটু ফর্সা হোত? অথবা, গহনা আসবাব পত্র ছাড়া নগদ আড়াই হাজার টাকা পেলে, এ বিয়েতে আমরা অগ্রসর হতে পারি—ইত্যাদি।

রাত্রে ঘুম নামে না রেণুর চোখে, নানারূপ অহেতুক জল্পনায়। বার বার এপাশ ওপাশ করার জন্য মায়ের সন্দেহ জাগে, রেণু, ঘুমাস নি?

—গরমে ঘুম আসছে না মা।

মেয়ের অস্বাভাবিক শান্ত কথায় মা কি বোঝেন, তিনিই জানেন, অন্ধকারেই মেয়ের গায়ের উপর সস্নেহে একখানা হাত রাখেন। বুঝলি রেণু, চোরবাগানের এরা লোক হিসেবে সত্যি ভাল রে। বাঁটুল তো বলছিল, ভাব ভঙ্গি দেখে মনে হয় এদের পছন্দ হয়েছে। এদের পছন্দ হলেই নাকি ছেলের পছন্দ। আর তা ছাড়া চায়ওনি তেমন বেশী কিছু। ভদ্রলোক নয় তো কি। দেখা যাক ভগবান কি করেন।

—যা করবেন তা জানাই আছে। রেণু অন্ধকারেই বললো—আজ একটা কথা তোমায় বলে রাখি মা, এই শেষ লোকের সামনে বেরলাম আমি। আর নয়। এতে আমার বিয়ে সাতজন্মে হোক ছাই না হোক। দরকার নেই!

মনের অবরুদ্ধ বেদনাকে চাপতে রেণু মাথার বালিশে মুখ লুকাল। রাত্রির অন্ধকারে চোখের জলটা দেখা যায় না।

এমন করেই দিন কাটলো কয়েকটা। রোজই মনে হয় সংবাদবাহী চিঠি একখানা আসবেই আজ। কিন্তু মহা আশ্চর্য, চিঠি নয়, সেদিনের সেই লোক দুটো এসেছে স্বতস্ফূর্ত হয়ে! রেণু অবাক হোল, আশ্চর্য হোল! এমন তো হবার কথা নয়। এমন তো হয় না।

রেখা রান্নাঘরের চৌকাঠের উপর চেপে বসলো। বুঝলে রেণু, তোমার হিল্লে হয়ে গেল।

তরকারীর ছ্যাক ছ্যাক আওয়াজের মধ্যেই রেণু কান রেখেছে অন্যত্র। বৌদির কথায় হাসলো—যাও, যাও, গাছে কাঁঠাল আর গোঁফে তেল।

—আজ্ঞে না স্যার, কাঁঠাল আর গাছে নেই। একেবারে হাতে, ছাড়িয়ে খেতে যা দেরী।

অসম্ভব অবিশ্বাস্য ঘটনা। যে ঘরে বসে বাঁটুল লোকগুলোর সঙ্গে কথা বলছিল, বারকয়েক কাজের ছুতো করে তার কাছে ঘুরে এল রেণু। কথাবার্তার ধারা শুনে বোধ হচ্ছে পাত্র-পক্ষরা পাকা কথাই দিতে এসেছে। রান্নাঘরে বসে তরকারী কোটা, বাটনা বাঁটা, জলন্ত উনুনের একঘেয়ে পরিবেশ রেণুকে আজ বাইরের দিকে টানলো। বিচিত্র সম্ভার নিয়ে নূতন দিন কি আসছে রেণুর জীবনে? একঘেয়ে জীবনের ছেদ কি পড়তে যাচ্ছে তাহলে?

নূতন কুটুম্বের দল চলে যেতেই বাঁটুল হর্ষোৎফুল্ল হয়ে মায়ের কাছে এল,—আর কি, শাঁখে ফুঁ দাও মা।

মা খুঁ্যৎ খুঁ্যৎ করলেন—ছেলে পাশ করেনি বাপু।

—আরে রেখে দাও তোমার পাশ। বাঁটুল ধমক দিল—পাশের আজকাল কোন দাম আছে! রাস্তায় হাজার গণ্ডা বি-এ, এম-এ, পাশ ফ্যা ফ্যা করে ঘুরে বেড়াচ্ছে একটা একশো দেড়শো টাকার চাকরীর জন্যে। সে হিসেবে এ পাত্র তো সোনায় সোহাগা। নিজের বাড়ী, নিজের ব্যবসা, আর কি চাও।

—ব্যবসা তো বাপু তিন ভায়ের সেই চায়ের দোকান।

—চায়ের দোকান কি? বাঁটুল ভুল শুধ্রালো।—রেষ্টুরেণ্ট। কলকাতার বুকে একটা চালু রেষ্টুরেণ্ট থাকার মানে কি বোঝ? মাস গেলে খরচ খরচা বাদ দিয়েও হাজার দু'হাজার টাকা লাভ। তোমার একটা পাশ-করা কেরাণী পাত্র তার পায়ের কাছে দাঁড়াতে পারবে?

—তা তো বটেই, কিন্তু।—

মায়ের কিন্তু ভাব যায় না। দেখে শুনে বাঁটুল বললো—আর কিন্তু কিন্তু করো না মা। পনেরভরি সোনা, ছেলের ঘড়ি আংটি বোতাম, নগদ দেড়হাজার টাকা—এই দিতেই প্রাণ বেরিয়ে যাবে বলে ছেলের দাদার হাত ধরতে—ভদ্রলোক তাতেই রাজী হয়ে গেলেন।

রেখা পাশেই দাঁড়িয়েছিল। জানতে চাইলো—দেনা-পাওনার হাঙ্গামাও তাহলে মিটে গেছে বল?

—নিশ্চয়ই। শুধু দেনা পাওনা কি, এরা তো শ্রাবণ মাসের মধ্যেই বিয়েটা শেষ করে ফেলতে চায়।

শ্রাবণের শেষ হতে আর মাত্র একসপ্তাহ দেরী আছে। রেখা চোখ কপালে তুললো—এত তাড়াতাড়ি?

—তাড়াতাড়ি হবে না তো কি? মাঝের তিন মাস বিয়ে বন্ধ। অঘ্রাণ মাসে ছেলের জন্ম মাস। তেমন করতে গেলে সেই মাঘ। মানে ছ মাসের ধাক্কা।

সব কিছু ঝেড়ে ফেলে মা বললেন—না বাপু, দরকার নেই তুমি এখানেই ঠিক কর, এই মাসেই। আর কিছু না হোক—ভাংচি দিতে তো শত্তুরের অভাব নেই।

মেয়েকে পাত্রস্থ করতে রেণুর মাও উঠে পড়ে লেগেছেন। মেয়ে সুরূপা নয়, তার উপর ক্রমাগত বয়স বেড়ে চলেছে। মেয়েকে যদিও তিনি লোকের কাছে উনিশ বলে চালাচ্ছেন, তবুও গর্ভধারিণী হয়ে বয়সটা ভুলে যাবার কথা নয়। রেণু পঁচিশ বছরে পড়েছে এবার। বুঝতে পারেন, মেয়েটা বাপ ভায়ের সংসারে হাঁড়ি ঠেলার চাইতেও, নিজের ঘর পাবার ইচ্ছে বেশী করে পোষণ করে। রূঢ়ভাষী বদমেজাজী রুক্ষ প্রকৃতির মেয়ে নয় রেণু, চিরদিন এমন ছিল না।

আড়াল হতে সবকিছু শোনে রেণু, দেখেও। আর মাত্র কটা দিন। স্বপ্ন দেখছে না তো রেণু? ওর মাথার ঠিক আছে তো? কত ভাবনা, কত চিন্তা, কত গোপন মনের একান্ত বাসনা, সফল হতে চলেছে। এমনই আকস্মিক ভাবে।

রেখা এসে গাল টিপে দিল—ইস, মুখে যে হাসি আর ধরছে না।

রেখার হাত ধরে পাশে বসাল। এই বৌদি, একটা সত্যি কথা বলতে হবে। ফাজলামো করলে গাঁট্টা মারবো কিন্তু? লোকটাকে দেখতে কেমন রে।

রেখা খিল খিল করে হেসে ফেললো।—বাপরে বাপ, কেমন দেখতে তা কি আমি দেখেছি। তবে বিয়ের পর রোমান্স যতদিন রেখে চলতে পারবে, সব বরই ততদিন প্রাণকান্ত। তারপর অবিশ্যি সব লেজ-খসা চতুষ্পদ, গড়াই হতে গড়পড়তা মাস চারেকের বেশী দেরী লাগে না।

পরিহাসমুখর বৌদিকে আজ যত সুন্দর লাগলো, এমন আর কোনদিন লাগেনি রেণুর। ওর গলাটা দুহাতে জড়িয়ে ধরলো রেণু। গালের উপর গালটা চাপল—তুমি একটি আস্ত যমের অরুচী।

মাত্র একটি সপ্তাহ, কিছুই নয়। তবু মনে হয়, এও যেন অনেক দেরী। একটি মুহূর্ত একটি ঘণ্টার সামিল বলে মনে হচ্ছে।

নমোঃ নমোঃ করে কিছু সারতে ইচ্ছে নেই। হাজার হোক এই শেষ কাজ। গৃহিণীর হাতে যা ছিল সব খুলে ধরেছেন। যা রেণুর ইচ্ছে নিক। মেয়েটা কালো আর কুরূপা বলে লোকালয়ে বেরতো না। মেধা নেই বলে লেখাপড়া শিখলো না, পঁচিশটা বছর রান্নাঘরে জীবন কাটালো। আর নয়, এবার স্বামী সন্তান নিয়ে সুখে ঘর সংসার করুক।

জামা কাপড় গহনা প্রসাধন সামগ্রী সব কিছু কিনতে কাটতে, বাঁটুল, রেখা আর রেণুকে সঙ্গে নিয়ে বেরয়। ঘরের সংকীর্ণ পরিবেশ ছেড়ে এমন সুস্থ সুন্দর ভাবে নিজেকে জনারণ্যে মিশিয়ে দিতে পারায় রেণু রোমাঞ্চিত হয়ে উঠলো। কত ছেলে, কত মেয়ে, কত পুরুষ। পৃথিবীটা এমন সুন্দর ছিল নাকি? কৈ, আগে তো কখনও দেখেনি রেণু। মনটা অহেতুক ছেলে মানুষিতে লাফালাফি করতে চায়, ছুটোছুটি করতে চায়। নিজেকে সকল কিছুর মাঝে হারিয়ে ফেলতে চায়। এক অনাস্বাদিত অনুভূতি রেণুকে ঘিরে ধরেছে।

দূরে দূরে থাকে দিদিরা। বিয়ের দুদিন আগে থাকতে আসতে সুরু করেছে তাঁদের ছেলে মেয়ে স্বামী নিয়ে।

মেজ জামাইবাবু রেণুর আরক্ত মুখের দিকে চেয়ে ঠাট্টা করলেন—আরে বাসরে, রেণুকারাণী যে খুশীর সমুদ্রে ডিগবাজী খেয়ে বেড়াচ্ছেন। জানতে পারি কি, রতনকুমারকে লাভ করে আমাদের ভুলে যাবেন কি না?

—যাবই তো। রেণু জামাইবাবুকে দূর থেকে চড় দেখাল।

ছোড়দি বললো—রেণু কি রংএর শাড়ী নিবি বল। নিজের খেয়ালে আনতে পারি নি বাবা, কি জানি, তুমি আবার রঙিণ শাড়ী পর না।

—আহা, কথার ছিরি কি! রেণু কৃত্রিম মুখ ঝামটা দিল—তখন পরতে চাইতাম না বলে কি চিরদিনই পরবো না?

—আলবাৎ! রেণু ব্রহ্মচর্যটা টেম্পোরারী করেছিল বৈ তো নয়। রেখা গম্ভীরভাবে টিপ্পনী কাটলো।

রেণুর রাগ নেই। যে যা বলছে তাই ভাল, তাই অপূর্ব। এই সুন্দর পরিস্থিতির মাঝে আরো একজন এসে যোগ দিচ্ছে, যে শুধুই রেণুর, অপরের নয়। আর মাত্র দুদিন বাকি।

দুদিন, দীর্ঘ বিলম্বিত আটচল্লিশটি ঘণ্টা শেষ হলো এক সময়। আলোয় মালায় বর্ণে গন্ধে সামিয়ানা আর লোকজনের, আত্মীয়কুটুম্বের ভীড়ে এক বিচিত্র আকাংখিত দিন আঠাশে শ্রাবণ।

প্রভাত কি এত মনোমুগ্ধকর হয়, বাতাস কি এত মিষ্টি?

গভীর প্রত্যাশায় সারাদিন কাটাল রেণু, সন্ধ্যাও। বিয়ের লগ্নটা পড়েছে সেই রাত বারটায়। সন্ধ্যার সময় নাকি লগ্ন নেই।

এলো সেই রাত বারটার প্রত্যাশিত লগ্ন। অতিথি অভ্যাগতের অধিকাংশই চলে গিয়েছে। বাড়ীটা ঝিম ধরে এসেছে। এরই মাঝে সময় এগিয়ে এলো। কম্পিত থরো থরো রেণু চোখ মেলে চাইলো সেই শুভদৃষ্টির সময়।

শ্যামবর্ণ, দীর্ঘ স্বাস্থ্যকর চেহারা, মাথায় ঘন চুল, কপালে চন্দনের সারির নিচে দুটো কালো চোখ। ভাল লাগলো, আবেগে উত্তেজনায় চোখ নামালো রেণু।

বাঙালীর চিরাচরিত বাসরঘর। বন্ধু নেই রেণুর। না থাক, দিদি বৌদির দলের হুল্লোড় শেষ হয়েছে শেষ

হতে চায় না। সারা অন্তরটা জুড়ে পাশে বসা লোকটার সঙ্গে আলাপ করতে চাইছে। কিন্তু উপায় নেই, শান্ত ও গম্ভীর হয়ে একভাবে বসে থাকতে থাকতে রেণু নির্বুদ্ধি দিদি বৌদিকে গালাগাল দিল মনে মনে।

অবশেষে প্রায় শেষ রাতের দিকে বাসর জাগানীর দল বিদায় নিতেই ঘোমটার মাত্রা কমালো রেণু। মনে মনে ভাবলে—বর যদি আগে কথা না বলে তবে ও নিজেই বলবে। আগে কথা বললে কি ভাববে লোকটা? লজ্জা নেই? ভাবুক! তুচ্ছ ভাবাভাবির কথা চিন্তা করে বসে থাকবে না রেণু। সুতরাং মানসিক উত্তেজনায় রেণু পাশের দিকে দৃষ্টি ফিরাল। লোকটা ওর দিকেই চেয়ে আছে বটে। রেণু একটু চেয়ে মুখ নামাতেই নতুন বর রতন জানতে চাইলো—ঘুম পেয়েছে বুঝি?

লজ্জাশীলা না হলেও, স্বামীর প্রথম সংক্ষিপ্ত এই কথাটুকুতে একটা গভীর লজ্জারুণ ভাব ছেয়ে গেল রেণুর সারা দেহে। ও মুখ না তুলে আস্তে বললো—না।

সামান্য এই 'না' শব্দর পর ও পক্ষ থেকে আর কোন জবাব না পেয়ে রেণু নিজেই এবার জানতে চাইলো—তোমার ঘুম পায়নি?

—সে আর বলতে, আমার আর সময় কৈ—রতন হেসে হেসে সোৎসাহে বলে উঠলো—বাজার হাট, দেখা শোনা, সব কিছু তো আমাকেই করতে হয়।

ঘুম পাবার কথায় এমন অসম্ভব আশ্চর্যজনক জবাব পাবার আশা করেনি রেণু। ও শুধু অবাকই হোল না, স্তম্ভিত হয়ে চেয়ে রইলো। বোকা বোকা নিরীহ চাহনীর মধ্য দিয়ে লোকটাও কেমন ফ্যাল ফ্যাল করে তাকিয়ে আছে।

রেণুর মাথার ঘোমটা খসে পড়লো। ও অবাক হয়ে চেয়ে রইলো এতদিনের আকাংখিত মানুষটার দিকে। এ কেমন ওলোট পালোট কথা বলার কায়দা? শুধু কি তাই? সদ্য পরিচিত কোন মেয়ের সঙ্গে কথা বলতে গেলে যে আবেগ, কণ্ঠস্বরের যে গাঢ়তা, যে রোমাঞ্চকর উন্মাদনা প্রকাশ পাবার কথা, তার উপস্থিতি কোথায়?

বর রতন খানিকক্ষণ ঐ ভাবে চেয়ে থেকে, একসময় অতি সঙ্কুচিতভাবে বাসর সাজান একটা ভেলভেটের তাকিয়া মাথায় দিয়ে আড়ষ্ট হয়ে শুয়ে পড়লো।

সারারাত একটা বিশ্রী চিন্তায় ঘুম এলো না রেণুর চোখে। সকাল হতে বিয়ের বাদ-বাকি অনুষ্ঠান ও শ্বশুরবাড়ী যাবার তাড়ার মধ্যে রাত্রের ব্যাপারটা কিছু কিছু ভুলে গেল রেণু।

জীবনের দীর্ঘ পঁচিশটা বছর যেখানে কাটাতে হয়েছে, সেখান ছেড়ে যাবার নামে সমস্ত মনটা বেদনায় ভারাক্রান্ত হয়ে উঠলো রেণুর। ওর চোখে জল এল। এই বাড়ীর ওপর, বদ্ধ ঘর আর সংকীর্ণ পরিবেশের উপর—অযথাই সে অনেক রাগ করেছে। পাঁচজনের ঘর সংসার আর স্বামী সন্তান দেখে তার কালো কুৎসিত মনের তলে কিছু না-পাওয়ার বেদনা হিংসার জ্বালা রূপ নিয়েছে। রেণু হাসতে ভুলেছিল, ভদ্রতা সৌজন্য সব কিছু ভুলেছিল, সেইটুকু না পাওয়ার জন্য।

শ্বশুর বাড়ীর গলির সামনে মোটর দাঁড়াতে তন্ময়তা ভাঙলো রেণুর। এতদিনের ছেড়ে আসা জায়গার জন্য মনটা সত্যিই ভারি বেদনার্ত হয়েছিল, মুহূর্তে সে ভাব কাটতে ওর দেরী হোল না। মনটা আবার আবেগে রোমাঞ্চে ভরে উঠলো। রেণু দেখলো—সরু গলি-পথ দিয়ে ছেলে-বুড়ো মেয়ে-পুরুষের একটা দল বেরিয়ে আসছে। একজন গাড়ীর তলায় জল ঢাললো। একজন দরজা খুলে ধরলো, একটি বয়স্ক মহিলা মধুর পাত্র হাতে নিয়ে এগিয়ে এলেন। রেণু বুঝলো সেই শাশুড়ী। আধ ময়লা লাল ক'টা পাড়ের শাড়ী পরণে। মধুর পাত্র হতে আঙ্গুলে করে একটু মধু নিয়ে বললেন—হাঁ কর তো মা। বড় করে। কথা শেষ করার আগেই শাশুড়ী তাঁর মধুসিক্ত আঙ্গুলটি রেণুর মুখ গহ্বরের পরিবর্তে নাসা গহ্বরে প্রবিষ্ট করে দিলেন।

—ও মা, করছো কি, করছো কি—বর রতন শশব্যস্ত হয়ে মায়ের কম্পিত হাতটি ধরে যথাস্থানে এবার সেটি ঠেকিয়ে দিল।

রেণুর কপালটা একবার কুঁচকেই সোজা হয়ে গেল।

সরু গলি পথটুকু অতিক্রম করে বাড়ীর সদর। সদরের কড়ায় বিরাট দুটো তালা ঝুলছে। তালার বিরাটত্ব দেখে রেণু বিস্মিত হোল। বাড়ীর ভিতর ঢুকতে ঢুকতেই আড়-চোখে যতটা সম্ভব দেখার চেষ্টা করলো রেণু। পুরাতন আমলের ভাঙ্গা-চোরা বাড়ী। জায়গায় জায়গায় বালি

খসে পড়েছে। সংস্কার হয়নি। রং কলির আস্তরণ এর গায়ে যে কতকাল পড়েনি, অনুমান করা ভার।

শ্যাওলা পড়া উঠোনটায় নোংরা জঞ্জাল হ'তে এঁটো কলাপাতা ভাঁড় খুরি জড় হয়েছে আঁস্তাকুড়ের মত। সেই সব কিছু মাড়িয়ে ডিঙ্গিয়ে নড়বড়ে সিঁড়ি ভেঙ্গে দোতলায় উঠে এল রেণু গাঁটছড়া বাঁধা রতনের পিছু পিছু।

দোতলার ঘরে বধূ বরণের পালা। সতরঞ্জির উপর চাদর বিছিয়ে স্ত্রী আচারের সাজ-সরঞ্জাম নিয়ে বসেছে ননদের দল এবং আরো অনেকে। হাসি ঠাট্টা আর রসিকতায় জায়গাটা যখন ভরে উঠেছে, এরই মাঝে কখন ভগ্নদূতের মত প্রবেশ করেছে একটা লোক। দৃষ্টি নিচুর দিকে থাকার জন্য প্রথমে নজর পড়েনি, কণ্ঠস্বরের অস্বাভাবিকতায় মুখ তুললো রেণু।

—হ্যাঁ রে, খেঁদি, রতনার এই বউ!

হাফপ্যাণ্ট পরা, এক মুখ খোঁচা খোঁচা দাড়ি। রক্তবর্ণ চোখ, একটি মানুষ। রেণুকে ওভাবে মুখ তুলতে দেখে হঠাৎ লোকটা সবাইকে ঠেলে ডিঙ্গিয়ে সামনে এসে বসলো। শঙ্কিত রেণুর মুখের দিকে আগুন চোখে তাকিয়ে লোকটা প্রশ্ন করলো—হ্যাঁ মা, এ কার বউ?

গাড়ীতে যিনি মধু দিয়েছিলেন, তিনি জানালেন—রতনের বউ বাবা, কাল বিয়ে করতে গেল, মনে নেই?

—রতনের বউ হোল, আর আমার বউ হবে না? লোকটা অকস্মাৎ হাউ হাউ করে ভারি গলায় কেঁদে ফেললো।

মানুষটা নিঃসন্দেহে পাগল। রেণু সভয়ে মনে মনে প্রমাদ গণলো। ঘরের মধ্যে অট্টহাসির রোল উঠেছে। তারই মধ্যে কতগুলি চ্যাংড়ার দল সান্ত্বনা দিল—কেঁদ না গো পাগলা-মামা। তার চাইতে তোমার সেই গানটা নতুন মামীকে শুনিয়ে দাও তো।

পাগল এক হাতে চোখের জল মুছতে মুছতে অন্য হাত খানা কায়দা করে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে গান ধরলো—

সখী হে, তুমি বদন তোল,
চুমু খেতে সাধ গিয়েছে, চন্দ্রমুখী ঘোমটা খোল।

গানের কথা, কণ্ঠের সুর এবং সমস্ত আত্মীয়-স্বজনের অট্টহাসির মধ্যে রেণুকেও হাসতে হোল, কিন্তু সে একেবারেই কাষ্ঠহাসি। হঠাৎ একটা দুর্নিবার ভয় ও ভাবনা ওর ভিতরটা একটা প্রবল ক্রন্দনোচ্ছ্বাসে ভরিয়ে তুললো। এ সে কোথায় এসে পড়লো! বিয়ে আর বরের নামে মনের মধ্যে যে বিচিত্র অনুভূতি এতদিন ধরে লালন করে এসেছে সে, তার কি এই আসল স্বরূপ?

রেণু লক্ষ্য করলো—এ বাড়ীর প্রায় প্রতিটি লোকজনই এক একটি বিচিত্র টাইপের। তবু রেণু নিজের মনকে নানা ভাবে সুদৃঢ় করার চেষ্টা করলো। সকলের কপালেই কিছু সব ভাল জোটে না। রেণুর অদৃষ্ট মন্দ জন্ম থেকেই। তার জন্য অন্যকে গঞ্জনা দেওয়া বৃথা। ঈশ্বরের আশীর্ব্বাদে উপস্থিত যা সে পেয়েছে, তাই নিয়েই সন্তুষ্ট থাকবে। এদের পাঁচজনকে নিয়েই মানিয়ে মিশিয়ে চলতে চেষ্টা করবে। তার রূপ নেই যখন, তখন এর চেয়ে বেশী পাবার প্রত্যাশা করা বৃথা। আর কেউ না থাক, কিছু না থাক, স্নেহে প্রেমে ভালবাসায় আসল লোকটা তো খাঁটি হবে!

কিন্তু খাঁটি কি মাটি এখনও বোঝা যাচ্ছে না। রতনের দেখা পাওয়া ভার। সেই বাসর ঘরে দুটো কথার পর আর কোন কথা হয় নি। এক আধবার দেখা পাওয়া যাচ্ছে বটে। কিন্তু ব্যবহারে কোথাও প্রাণোচ্ছলতা নেই। মানুষটা যেমনই ভীরু তেমনই কুণ্ঠিত। বিয়ে করে বউ আনা যেন একটা দায়িত্ব ছিল। সেটা সম্পন্ন করে ও খালাস হয়েছে।

যাই হোক, দেখা মিললো রতনের, সেই ফুলশয্যার রাতে। লোকজন খুব একটা বেশী না হলেও বউ-ভাতের ভীড় বড় মন্দও হয়নি। সে ঝামেলা কাটতে রাত হোল বেশ। তারপর এল ননদ আর বৌদির দল। আজ তারাই করিৎকর্ম্মা। ঠাট্টা ইয়ার্কি আর সস্তা রসিকতার স্রোত তাদের শেষ হয়েও শেষ হতে চায় না যেন। ভিতর ভিতর রেণু অতিষ্ঠ হয়ে উঠলো। ভদ্রতা জ্ঞানটা এদের যদি এতটুকুও থাকতো।

লোকজনের ভীড় এক সময় কমলো। সবাই আস্তে আস্তে ঘর ছেড়ে যে যার চলে গেল। রেণু এইটুকুর জন্যই অপেক্ষা করছিল। খালি ঘরে ভাল করে নতুন মানুষটাকে দেখার সুযোগ পেল ও। না, চেহারাটা ভালই রতনের। বুকের চওড়া ছাতি, মাথা ভর্ত্তি কালো কোঁকড়া চুল, ওর মনে আবেগের সঞ্চার করলো। তবে একটা বড় দোষ,

লোকটা কথা প্রায় বলছেই না। ভাব-ভঙ্গি যেমনই নীরব তেমনই শান্ত। উত্তেজনা ও উদ্দীপনা বলে কোন বস্তু ওর মধ্যে আছে কিনা সন্দেহ জাগে। কিন্তু তা হোক, সব কিছু মিলিয়ে মিশিয়ে শান্ত গো-বেচারী মানুষটাকে ভালও লাগছে রেণুর।

রতন সিল্কের পাঞ্জাবীটা খুলে রেখে কাছে এসে বসলো কুণ্ঠিত ভাবে। এক সময় জানতে চাইলো—আমাদের বাড়ী তোমার কেমন লাগছে?

—ভালই। কথার তালে রেণু মাথা হেলাল।

বউএর মুখের দিকে চেয়ে রতন বললো—আর খারাপ লাগলেই বা কি হবে, বিয়ে তো হয়ে গেছে।

—সে কি, খারাপ লাগারই বা কি আছে। রেণু তৎপর হয়ে জবাব দিল। এই মুহূর্তে রেণুর মনে হোল বেশী চালাক আর চট্‌পটে হওয়ার চাইতে এমন নিরীহ আর বোকা হওয়া ঢের ভাল এবং বেশী সুবিধের। পুরুষকে হাতের মুঠোর মধ্যে ধরে না রাখতে পারলে মেয়ে মানুষের সুখ কোথায়। সুতরাং ভাবের আতিশয্যে রেণু হাসি-হাসি মুখে জানতে চাইল—আচ্ছা, কালকে, হাফপ্যাণ্ট পরা যে লোকটা—

রতন মাথা ঝুঁকিয়ে জানতে চাইলো—কি বলছো?

রেণুর মনে সন্দেহ জাগলো, কানে কম শোনে নাকি লোকটা। কিন্তু মনের সন্দেহ মুখে প্রকাশ না করেও পূর্ব্বের কথাগুলি আবার পুনরাবৃত্তি করলো—বলছিলাম কাল যে পাগলা লোকটা গান গাইছিল, ও তোমার কে হয়?

—ও বুঝেছি, বাবার কথা আর বলো কেন, ভাবলেও দুঃখ হয়। মাথাটার ঠিক নেই তো, সারাদিন যে কোথায় ঘোরেন, এই মানুষ এখানে রয়েছেন। এই নেই।

—উনি তোমার বাবা? রেণু কনে-সুলভ চাপা স্বরে এবার আর কথা বললো না। কারণ মেয়ে দেখা থেকে সুরু করে বিয়ে অবধি রতনের বাবার উপস্থিতি দেখা যায় নি। তিনি নাকি বাতের ব্যথায় দীর্ঘকাল শয্যাগত। হঠাৎ সেই বাত-ব্যাধিগ্রস্ত শয্যাশায়ী পিতা হাফপ্যাণ্ট পরে অশ্লীল গান গাইবে পুত্রবধূকে শুনিয়ে। এটুকু ভেবেও মহা আশ্চর্য হয়ে গেল রেণু।

রতন ভয়ে ভয়ে জানতে চাইলো—কার কথা বললে?

—কাল যে গান গাইলো সে তোমার বাবা?

—না, না, ও তো মেজদা আমার। কথাটা বলতেও রতন বেদনার্ত হোল। কি মাথাওলা ছেলে ছিল। কি গানের গলা। যে দেখতো সেই বলতো, ছেলেকে তোমার গান শেখাও হরিহর। আর কিছু না, শুধু সিনেমা থিয়েটারে গান গেয়েই ও ছেলে তোমার ধামা ধামা টাকা রোজগার করবে। তা দেখ, সেই মানুষের কি অবস্থা আজ। কথায় বলে না, ভগবানের মার দুনিয়ার বার।

রতন ছড়া কেটে ভাষণ থামাল। রেণুর ভ্রূটা অকারণেই কুঞ্চিত হয়ে উঠলো। পুরুষ মানুষের এ কি রকমের মেয়েলি কথা বলার ঢং! রেণু সমস্ত লজ্জা সংকোচ বিসর্জন দিয়ে উঁচু গলায় জানতে চাইলো—তুমি কি পাশ-টাস মোটেই করনি? মানে লেখাপড়া—

—লেখাপড়া? রতন দুঃখিতভাবে জিভ আর তালুর সঙ্গে একটা শব্দ তুললো! লেখাপড়া আর হবে কি করে বল? বাবার মাথার ঠিক নেই। মেজদাকে তো দেখছোই। এদিকে দোকান-পাট। দাদা একলা সামলাতে পারে না, তাই সেই সব কিছু দেখা শোনা করতেই আমার আর পড়াশুনা হোল না।

—তোমাদের কিসের দোকান?

—কেন, ঐ গলির মোড়ের জগত্তারিণী রেষ্টুরেন্ট দেখনি আসার সময়? ঐ দোকানটাই তো আমাদের। মায়ের নামে দোকান আর কি! তা দাদা আর কি করে, শুধু তো ক্যাশ আগলে বসে থাকে। যা কিছু সব আমাকেই করতে হয়। একদিন অসুখ করলে দোকান লাটে উঠবে। এই বিয়ে করেছি বলে দু'দিন সকাল সকাল বাড়ী আসতে পারছি, নয় তো সেই রাত বারোটা একটা।

রতন যত কথা বললো, তার কিছু কানে গেল কিছু গেল না। রেণু অবাক বিস্ময়ে চেয়ে রইলো তার সন্থ-বিবাহিত স্বামীর দিকে।

নিজের মনে কল্পনা দিয়ে গড়ে-তোলা তাসের ঘর ঝুরঝুর করে পড়ে গেল ফুলশয্যার রাত্রেই। রেণুর রোমান্স-মুখর মনটা মুহূর্তে ভোঁতা হয়ে গেল। সন্থ বিবাহের রঙিণ স্বপ্নে মনটা সমস্ত দিক দিয়েই উত্তেজিত ও উন্মুখ থাকার জন্য অস্বাভাবিক যা কিছু ঘটেছে। তাও কেমন

একটা আশ্চর্য ভাবালুতায় ভাল লেগেছে। কিন্তু সেটুকু মুছে যেতে দেরি হোল না, তীক্ষ্ণ যাচাই করা দৃষ্টিতে রেণু রতনকে দেখতে লাগলো।

রতন পুরুষ বটে, কিন্তু পুরুষত্বের ছাপ নেই কোথাও। মেয়েলি ভাবভঙ্গি ও সেই সঙ্গে বিনিয়ে বিনিয়ে সুর ভেজে হাত পা নেড়ে কথা বলার কায়দা, দৃষ্টির বোবা ভাষা প্রভৃতি সব কিছু মিলিয়ে একটি প্রচণ্ড অপদার্থতায় পরিণত করেছে লোকটাকে।

রতন বউএর কাছ থেকে কোন জবাব না পেয়ে ভয়ে ভয়ে জিজ্ঞাসা করলো। ঘুম পাচ্ছে বুঝি?

—হুঁ! সংক্ষিপ্তভাবে জবাব দিয়ে রেণু ঘরের চারিদিকে দৃষ্টি ফিরাল। বুঝতে পারছে রেণু, সে ঠকেছে, ভীষণ রকমে ঠকেছে। এ বাড়ীর মানুষগুলো কোন দিক দিয়েই খাপ খাওয়াবার যোগ্য নয়। কোনদিকেও নয়।

রেণু লক্ষ্য করলো এ বাড়ীর লোকগুলো অদ্ভুত স্বভাবের সঙ্গে আশ্চর্য নোংরাও। যে ঘরখানা তাকে দেওয়া হয়েছে সেটা শাশুড়ীর নিজের ঘর এবং তাঁর ঘর বলেই আসবাব হতে তৈজসপত্র সব কিছুই স্থান লাভ করেছে। বহু পুরাকালের রংচটা কালো বিবর্ণ খাটের উপর চিপি চাপা বিছানা। এতক্ষণ মনে হয়নি, কিন্তু এখন যেন মনে হলো বিছানা দিয়ে একটা ভ্যাপসা মত দুর্গন্ধও বেরুচ্ছে। তেলচিটে বিবর্ণ মলিন বালিশ ও চাদর। তারই উপর ওর ফুলশয্যার তত্ত্বে পাঠান ফুলগুলি ছড়ান ছিটান রয়েছে। অল্প পাওয়ারের একটা আলো টিম টিম করে জ্বলছে। ঘরের দেওয়ালে এখানে ওখানে বালি খসে পড়ে ভিতরের ইট দেখা যাচ্ছে, ঠিক যেন কুৎসিত ভঙ্গিতে দাঁত বার করে হাসছে ওগুলো। একটা বিভীষিকাপূর্ণ আবহাওয়া রেণুর মনকে অশান্ত করে তুললো।

সোহাগ ও প্রীতিলেশহীন পত্নীর কঠিন মুখের দিকে তাকিয়ে এবং তার অতি সংক্ষিপ্ত ভাষ্য শুনে রতন আর অধিক কথা বলার ইচ্ছা প্রকাশ করতে সাহসী হোলনা। শুধু মিনমিনে গলায় বললো,—আলোটা নিবিয়ে দেব?

রেণু ঘাড় নেড়ে সম্মতি জানিয়ে দেয়ালের দিকে মুখ করে শুয়ে পড়লো।

রতন আলোটা নিবিয়ে পাশে এসে শুলো। খুব আস্তে করে রেণুর গায়ে একটা হাত রাখলো। এই মুহূর্তে সকল মন্দ লাগা একটা আশ্চর্য ভাললাগায় রূপান্তরিত হয়ে গেল রেণুর কাছে। ও ফিরে শুলো। আচ্ছা, তুমি একটু লেখাপড়া শিখলে না কেন?

রেণুর নরম সুরের অভিব্যক্তিটুকুতে আবেগে উচ্ছ্বাসে গভীর করে জড়িয়ে ধরলো রতন ওকে। আবেগ দিয়ে ফিস ফিস করে বললো রতন—জান, মনে মনে কি ভেবেছি?

—কি! রেণু জানতে চাইলো।

—মনে করেছি অনেক রাত্তিরে তো দোকান থেকে ফিরি। এবার দোকান থেকে আসার সময় যে সব চপ কাটলেট বাঁচবে, তার থেকে কিছু কিছু পকেটে করে এনে তোমায় আমায় দরজা বন্ধ করে খাব। মাটা যা কিপ্‌টে, রান্নাবান্না তো আর তেল ঘি দিয়ে ভাল করে করে না। ও সব তোমার মুখে রুচবে না।

রেণু রতনের হাতখানা সজোরে ঠেলে সরিয়ে দিল। বললো—তুমি কি মোটেই কানে শুনতে পাও না?

কণ্ঠের পরিবর্তনটুকু কানে লেগেছে রতনের। সংকোচে কাচুমাচু হয়ে বললো—কি বলছো, একটু জোরে বল। আবার কানে একটু ইয়ে—মানে—

ফুলশয্যার রাতে নবলব্ধ বরের সঙ্গে কথা বলতে কণ্ঠস্বরকে সপ্তগ্রামের কোন গ্রামে তুলতে হবে জানে না রেণু। আর জানা থাকলেও, উচ্চগ্রামে কণ্ঠ তুলে প্রেমালাপ চালাবার মত ইচ্ছা বা প্রবৃত্তি কোনটাই ওর নেই। সুতরাং রেণু নীরব রইলো।

স্ত্রীর নীরবতায় কি বুঝলো রতন, সেই জানে। দুঃখিত ভাবে জানাল, ছোটবেলায় কানে একটা পায়রার পালক দিয়ে খুঁচিয়ে দিয়েছিলাম, তারপর থেকেই এই রকম হয়ে গেছে। মাঝে মাঝে মনে করি যে যাই একজন ডাক্তারের কাছে, দেখিয়ে আসি। যদি কোন অষুধ-বিষুধ দিলে সারে—তা আবার ভাবি, কি হবে মিথ্যে পয়সা খরচ করে। চলেই তো যাচ্ছে—

মনের অবরুদ্ধ বাষ্প চোখের জলের আকারে ঝরতে শুরু করেছে। দাঁতের সঙ্গে দাঁত টিপে থাকায় বুকের ভিতরের গুমরানো যন্ত্রণা ফেটে বাইরে বেরিয়ে আসতে

চায়। রেণু শাড়ীর আঁচলটা দলা পাকিয়ে মুখের মধ্যে পুরে দিল।

একি হোল তার? এই কি সে চেয়েছিল? এত সাধ্য সাধনার স্বপ্নের জিনিষের কি এই স্বরূপ। এই জিনিষের উপর নির্ভর করে তাকে সারা জীবন হাসিমুখে ঘর করতে হবে।

এই মুহূর্তে রেণুর সব কিছু নিরর্থক নিষ্প্রয়োজন মনে হলো। দরকার নেই ওর জীবনে বেঁচে থেকে। ও মরবে, নিশ্চয়ই মরবে। কি হবে এই অর্থহীন হাস্যকর জীবনে। ফুলশয্যার রাতে কত কল্পনার গাঁথা প্রেমপ্রীতির কল কল প্রলাপ গুঞ্জন নয়, পাঁচজনের কানে ভেড়ার মত উচ্চ গলায় প্রয়োজনীয় দুটো কথার কথা মাত্র, তাও পাঁচবার করে একটা কথার পুনরাবৃত্তি করতে হবে? থাক, রেণু আর বাঁচতে চায় না।

ও পাশে রতনের নাসা গর্জন শোনা যাচ্ছে।

রেণু শাড়ীর আঁচলের একটা অংশ গলায় ফাঁস দিয়ে মরার প্রয়াস করলো। নতুন কাপড়ের কড় কড়ে ভাবের জন্য, গলায় আঁচলটা জড়িয়ে একটু চাপ দিতেই ওর ভীষণ লাগলো। রেণু তবুও ফাঁসটা টানলো। সঙ্গে সঙ্গে হাঁস-ফাঁস করে উঠেছে ভিতরটা। রেণু দ্রুতগতিতে জড়ান আঁচলটুকু খুলে ফেললো।

মরা হোল না। নতুন জগতে প্রবেশ করে, সেই দিন হ'তে শেষ দিনের জন্যে নতুন করে কান্না সুরু করলো রেণু।

বোদরা পাইকহাটির পুরাণ কথা

ডাঃ প্রফুল্লকুমার সরকার এম্-এ, পি-এইচ ডি

২৪পরগণা সদর সাবডিভিশনে ভাঙর থানার মধ্যে বোদরা পাইকহাটি গ্রাম। এই গ্রামের নিকটে বিহারে বলিয়া একখানি গ্রাম আছে। বোদরার রায়চৌধুরীর বংশের পূর্বপুরুষ কমলনারায়ণ রায়চৌধুরী রাজা প্রতাপাদিত্যের সমর-সচিব ছিলেন। সেখানকার বিস্তীর্ণগড়ের মধ্যে উনিশ খানি নূতন ও পুরাতন অট্টালিকা আছে। ইহাদের মধ্যে মাঝের খানির একাংশে দেওয়ালের সহিত সংলগ্ন প্রায় বারটী বুদ্ধ ও বোধিসত্ত্ব মূর্ত্তি আছে, মূর্ত্তিগুলি পালবংশের সময়ের ক্লোরাইট পাথরে তৈয়ারী। এখন তাঁহারা শিব ও বিষ্ণুরূপে পূজা পাইয়া থাকেন। বাগানবাড়ীর পুষ্করিণীর ঘাটের উপর মন্দিরে দুই কিম্বা আড়াই ফুট লম্বা চতুর্ভুজ নারায়ণ মূর্ত্তি পূজিত হইতেছেন। পুকুর ঘাটের মন্দির অনেকটা দাক্ষিণাত্যের প্রথা স্মরণ করাইয়া দেয়। নারায়ণ ও সূর্য্য পূজক সেন রাজারা কর্ণাট হইতে আসেন। পূর্বদিকের বাগানে পতিত সূর্য্যমূর্ত্তি পুরাপুরী মানুষের মাপের —বর্ম্মপরিহিত,তৎসহ শিকারীর বুটজুতা পরা, হাতে তুরীয় ও সপ্তাশ্ববাহন পুষ্পকারূঢ়। গঙ্গাদেবীও সেন রাজ্যকালে বিশেষ সমাদরে পূজা পাইতেন। কটিদেশে চন্দ্রমালাবদ্ধা মকরোপরি দণ্ডায়মানা কালপাথরের প্রমাণ সেনরাজ পূজিত গঙ্গাদেবীর মহিমান্বিত প্রতিমা এখনও বরেন্দ্র মিউজিয়মে একখানি মাত্র ঘরে সকল মূর্ত্তির সহিত কোণ ঠাসা হইয়া থাকিতে পারেন। এইরূপ দুষ্প্রাপ্য মূর্ত্তি বা গোপালদেবের শিলালিপির ন্যায় লিপি সেখানে আরও থাকার সম্ভাবনা; অর্দ্ধনারীশ্বর মূর্ত্তি ও সেখানে দেখিয়াছিলাম। দেশ ভাগের সময় কি ব্যবস্থা হইয়াছিল এবং তাহার পরের অবস্থাও সম্পূর্ণ অবগত নহি। অর্দ্ধনারীশ্বর সম্বন্ধে কালিদাসের রঘুবংশে পাওয়া যায় "জগতঃ পিতরৌ বন্দে পার্বতী পরমেশ্বরৌ"। বরেন্দ্র মিউজিয়মে সংগৃহীত গুপ্তপাল ও সেন যুগের সংগৃহীত মূর্ত্তি, তাম্র ও শিলালিপিগুলি ভারতীয় চিত্রশালায় যদি নাই দেওয়া হয় বা হইয়া থাকে তো কোন আন্তর্জাতিক চিত্রশালায় দিলে ভাল হইত। কারণ প্রতিমা-রক্ষণ ইসলাম ধর্ম্মীয় রাষ্ট্রে বরাবর অনুমত হইবে কিনা বলা কঠিন। সম্রাট বিজয় সেনের গৌরবময় নৌবহরের বিজয়োৎসব বা কোন প্রাচীন যুগে বাণিজ্য ব্যপদেশে উপনিবেশ স্থাপনার্থ সমুদ্রযাত্রা উপলক্ষ করিয়া সেন রাজধানী নবদ্বীপে বিশেষ জাঁকজমকের সহিত গঙ্গাপূজা প্রবর্ত্তিত হয় বলিয়া আমাদের ধারণা। শুনা যায় বোদরার রায়চৌধুরী বংশ, পালবংশ ও সেন বংশের সময়ে দক্ষিণবঙ্গের শাসনকর্ত্তা ছিলেন। কুমারপালদেবের মন্ত্রী বৈদ্যদেব দক্ষিণবঙ্গে নৌযুদ্ধে বিজয় লাভ করেন। পাল রাজগণের সময়কার প্রতিষ্ঠিত বিগ্রহদর্শনে রায় চৌধুরীরা সে সময়ে বৌদ্ধ-ধর্ম্মাবলম্বী ছিলেন বলিয়া মনে হয়। সেন বংশের সময়ে তাঁহারা সূর্য্য ও নারায়ণ বিগ্রহ পূজা করিতেন। প্রতাপাদিত্যের সমকালীন শিব ও কালীমূর্ত্তি অপেক্ষাকৃত আধুনিক মন্দিরে প্রতিষ্ঠিত আছেন। এই মন্দির পাঁচশত বৎসরের ভিতরে তৈয়ারী বলিয়া রথাকৃতি চূড়াবিশিষ্ট। কিন্তু বুদ্ধ মন্দির চূড়াহীন দরদালান। চণ্ডীমণ্ডপে এখন দুর্গোৎসব হইয়া থাকে। পুরাকালের দামামা, তরবারী ও কামান বন্দুক অনেক ছিল। দামামা ব্যতীত আর কিছুই এখন নাই। গড়ের পুলের মুখে সিং-দরজায় এখনও নহবৎখানা আছে, তবে নহবৎ আর বাজে না এখন।

তাই কবি গাহিয়াছেন :—

সেখানে পুল পরে ধ্বনিত কতনা অশ্বখুরে
আর উড়ে নাকো ধুলা ধূম্র আকাশ জুড়ে।
ভগ্ন সে সৌধ দেউল কহে কত প্রতাপ
কমলকথা!
নারিকেল পাতার সন্ সন্ রবে হৃদয়
কাটান ব্যথা!

বিভূতিভূষণের কথাশিল্প

অধ্যাপক শ্যামসুন্দর বন্দ্যোপাধ্যায়

দ্বিতীয় পর্ব : পরিমণ্ডল

সাহিত্যের সহিত জীবনের অঙ্গাঙ্গী সম্পর্ক বর্তমান। মনীষী ম্যাথ্‌-আরনল্ড সাহিত্যকে 'জীবনের সমালোচনা' বলিয়াছেন। কথা সাহিত্যের ক্ষেত্রে এই সংজ্ঞা বিশেষভাবে প্রযোজ্য। সাহিত্যকে জীবন হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া দেখা চলে না। এই জীবন আবার শুধু মাত্র ব্যক্তি-জীবন নয়, ব্যক্তি-জীবন হইলেও তাহা সমাজ-জীবনেরই অংশ এবং সমাজের সহিত একান্তভাবে সংশ্লিষ্ট। এই প্রসঙ্গে স্মর্তব্য যে, সমাজ সমকালীন অর্থনৈতিক চিন্তার দ্বারাও অল্পবিস্তর আবর্তিত হয়। অবশ্য মনীষী ট্রটস্কি যেমন সাহিত্যকে সমাজের অর্থনৈতিক চিন্তার প্রতিরূপ বলিয়াছেন, ঠিক এইভাবে সম্পূর্ণ মার্কসীয় দৃষ্টিভঙ্গী যথার্থ নয়। সাহিত্য সৃষ্টিতে হৃদয়াদি উপাদানেরও নিজস্ব মূল্য আছে, যদিও অর্থনীতির প্রভাব অস্বীকার করা যায় না। যাহা হউক, মোটের উপর বলা যায় যে, কোন বিশেষ দেশের প্রতিনিধিমূলক সাহিত্যকৃতিতে সেই দেশের সমাজ-জীবনের অল্পবিস্তর ছাপ থাকিবেই।*১ সাহিত্যে স্রষ্টার মানসরূপের প্রতিফলন ঘটে বলিয়া এই ছাপ ইতিমূলক বা নেতিমূলক উভয় প্রকারেই হয়। প্রবহমান ভাবতরঙ্গ লেখক-মনে অনুকূল সাড়া জাগাইলে তাহার ছবি অপেক্ষাকৃত সহানুভূতি বা আবেগের সহিত ফুটিয়া উঠে, পক্ষান্তরে লেখক যদি মনে করেন যে, এই ভাবতরঙ্গ সর্বাংশে স্বীকার যোগ্য নয়, তাহা হইলে পরিচিতি সত্ত্বেও তাঁহার লেখায় ইহার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ ধ্বনিত হয়। বলা বাহুল্য, এই প্রতিবাদ স্থূল ও সূক্ষ্ম দুই প্রকারই হইতে পারে। তবে কথাসাহিত্যে মনন-বিলসিত সূক্ষ্ম প্রতিবাদের গৌরব নিঃসন্দেহে অধিক। স্থূল প্রতিবাদে স্পষ্টতর রূঢ়তায় কথাসাহিত্যের কমনীয় ঐশ্বর্য্য ম্লান হইয়া কেমন যেন একটা প্রাবন্ধিক রূপ আসিয়া পড়ে। 'কল্লোলীয়' বলিতে যে সকল সাহিত্যিকের কথা বিশেষ করিয়া আমাদের মনে আসে, তাঁহাদের বিপরীতে সমকালীন মণিলাল বন্দ্যোপাধ্যায় ও প্রফুল্লকুমার সরকারের সহিত বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়, সরোজকুমার রায় চৌধুরী ও তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়কে লক্ষ্য করিলেই এই মন্তব্যের যথার্থতা উপলব্ধি করা যাইবে। কথাটা অবশ্য লেখকের অন্তর-চেতনার বহিঃপ্রকাশের হিসাবেই বলা হইতেছে, সাহিত্য সৃষ্টির ক্ষমতার নিরিখে নয়।

কিন্তু সাহিত্য সমাজ-নির্ভর হইলেও সমাজের বহিরঙ্গ রূপ সাহিত্যকে দিলে সাহিত্য বিচারে বিভ্রাট ঘটিবারই সম্ভাবনা। এই সমাজ-কেন্দ্রিকতা-বোধের ফলে প্রকৃত ঘটনার বা বাস্তব চরিত্রের উপর কথাসাহিত্যকে দাঁড় করাইবার একটা প্রবণতা অনিবার্য এবং 'বাস্তবাশ্রয়িতাই কথাসাহিত্যের শেষ আশ্রয় নহে। বরং এই সমাজ-কেন্দ্রিকতার উপর খুব বেশি জোর মূলধর্ম,—এইরূপ নীতির উপর জোর পড়া স্বাভাবিক। প্রকৃতপক্ষে কোন কোন প্রাজ্ঞ সমালোচক আধুনিক কথাসাহিত্যের সাফল্যের কারণ হিসাবে ক্রমবর্ধমান বাস্তবাশ্রিতার দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করিয়া থাকেন। প্রখ্যাত কবি-সমালোচক মোহিতলাল মজুমদার সঙ্গতভাবেই এই দৃষ্টিভঙ্গির বলিষ্ঠ প্রতিবাদ করিয়াছেন। 'উপন্যাসে মানুষের জীবনই প্রধান লক্ষ্য হইবে'—একথা স্বীকার করিয়া লইয়া তিনি লেখকের রস-দৃষ্টিকেই উপন্যাসের সার্থকতার ভিত্তি বলিয়াছেন।*২ বাস্তব বিচারের তুলাদণ্ডে নয়, আমাদের আলোচ্য বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের মত মহান কথাসাহিত্যিককে উপলব্ধি করিতে হইলে এই রসদৃষ্টি বা ভাবদৃষ্টির মহিমাই অবধান করিতে হইবে। ক্রমবর্ধমান বাস্তবপ্রিয়তাই যদি উপন্যাসের তথা কথাসাহিত্যের সার্থকতার কারণ হইত, তাহা হইলে প্রথম উল্লেখযোগ্য বাংলা উপন্যাস প্যারীচাঁদ মিত্রের আলালের ঘরের দুলালকে আজ কার্যত ইতিহাসের পৃষ্ঠায় আত্মরক্ষা করিতে হইত না। উপন্যাসটি সুস্পষ্টভাবে বাস্তবধর্মী। ইহাদের বহুপরে ইংরেজি সাহিত্যে 'দি ওয়েভস্' বা 'ইউলিসিস' লেখা হইয়াছে, বাংলায় লেখা হইয়াছে 'শেষের কবিতা'; কিন্তু বাস্তবাশ্রয়িতা উপন্যাসের মূলধর্ম হইলে ভার্জিনিয়া উল্ফ, জেমস্ জয়েস বা রবীন্দ্রনাথের পক্ষে এত পরে বাস্তবতা-নিরপেক্ষ এইরূপ উপন্যাস রচনা কি সম্ভব হইত? স্বয়ং রবীন্দ্রনাথের দিক হইতেই যদি দেখা যায়, তাহা হইলে চোখের বালি রচনার বহু পরে রচিত 'শেষের কবিতা' তো রবীন্দ্রনাথের শোচনীয় অধঃপতনের স্মারক! কিন্তু রসিক জনতো এমন কথা বলেন না! টেকচাঁদ, হুতোম, প্রভাতকুমার, শরৎচন্দ্রের

---

*১ 'সাহিত্য সমাজের আভ্যন্তরীণ প্রচেষ্টার ফল, মুক্তা যেমন শুক্তির। তাই সাহিত্যের বাহিরে দাঁড়ানোর অর্থ সমাজের ভিতরে আসিয়া দাঁড়ানো।—শ্রীনীরেন্দ্রনাথ রায়—সাহিত্য-বীক্ষা (১৯৫৫), পৃঃ—৪

*২ উপন্যাস যদিও মানুষের জীবনালেখ্য হয় তবে তাহা বহির্জগৎ ও মনোজগতের সামঞ্জস্যমূলক বা পরস্পর পরিপূরক একটি চিত্রলিপিই নয়—সেই দুই-ই যেমন বাস্তব, তেমনই তাহারা মানুষের জীবন কাহিনীর একটা অংশ মাত্র; এই দুই জগতের উপরে আর একটা বৃহত্তর জগতের ছায়া সর্বদা ব্যাপ্ত হইয়া আছে—তাহারই যাদুশক্তির প্রভাবে বাস্তব ও অবাস্তব দুইই সমান মূল্যবান হইয়া উঠে। কবিচিত্তে সেই জগতের ছায়া পড়ে—এবং তাহাতে সেই শক্তির যে ক্রিয়া ঘটে তাহারই নাম কল্পনা। এই কল্পনাই কবির সৃষ্টিশক্তি, এবং কল্পনার প্রকৃতিভেদে জীবনের আলেখ্য নানা রসরূপ ধারণ করে।

—মোহিতলাল মজুমদার—সাহিত্য বিচার (২য় সংস্করণ)

পরে বিভূতিভূষণ বাংলা সাহিত্যক্ষেত্রে আসিয়াছেন, কিন্তু তাই বলিয়া এই পূর্বসূরীদের রচনারীতির ছকে ফেলিয়া তাঁহার বিচার নিরর্থক। তিনি আপন বৈশিষ্ট্যে সমুজ্জ্বল। এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য যে বিশিষ্ট সমালোচক অধ্যাপক শ্রীশ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় উপন্যাসে কবি-কল্পনার সহিত তথ্যবোধের চমৎকার সমন্বয় যে অসম্ভব নহে তাহা সহজভাবেই স্বীকার করিয়া লইয়াছেন। *৩ এই আলোচনা সূত্রেই তিনি বলিয়াছেন—"আসল কথা উপন্যাসের কোন প্রামাণ্য সুনির্দিষ্ট রূপ নাই। আমাদের প্রাচীন আলঙ্কারিকেরা এবং গ্রীস ও রোমের এ্যারিষ্টটল ও হোরেস যেরূপে কাব্যের বিভিন্ন বিভাগের প্রকৃতি ও উদ্দেশ্য বিশ্লেষণপূর্বক তাহার বাহিরে আকার বাঁধিয়া দিয়াছিলেন, সন্তোজাত উপন্যাস সম্বন্ধে সেরূপ বিধিনিষেধ কখনও আরোপিত হয় নাই। ইহা সম্পূর্ণ স্বাধীনভাবে, অনেকটা যদৃচ্ছাক্রমে বিভিন্ন লোকের হাতে বিচ্ছিন্নভাবে গড়িয়া উঠিয়াছে। মৌলিক উদ্দেশ্যের প্রতি ঠিক থাকিয়া, ইহা পুরাণ বর্ণিত তিলোত্তমার ন্যায় কাব্যসাহিত্যের বিভিন্ন বিভাগ হইতে তিল তিল সৌন্দর্য্য আহরণ করিয়া নিজ অঙ্গ-সৌষ্ঠব সম্পাদন করিয়াছে…"।*৪

কথাসাহিত্যের লেখক সর্বজ্ঞ অর্থাৎ গ্রন্থরচনার সময় ঘটনা ও চরিত্রের অতীত, বর্ত্তমান ও ভবিষ্যতের সকল সম্ভাব্যতাই তাঁহার মনোদর্পণে ভাসিয়া থাকে। বাংলা কথাসাহিত্যের প্রথম যুগে অন্যতম সার্থক স্রষ্টা তারকনাথ গঙ্গোপাধ্যায় (১৮৪৩-১৮৯১) তাঁহার স্বর্ণলতা উপন্যাসের প্রারম্ভে অপেক্ষাকৃত হাল্কাভাবে লেখকের এই শক্তি বা সুবিধার কথা উল্লেখ করিয়া গ্রন্থমধ্যে আপনার অবাধচারিতার পথ করিয়া লইয়াছেন।*৫ রামায়ণ-রচয়িতা মহর্ষি বাল্মীকি যোগপ্রভাবে ভবিষ্যতে যাহা ঘটিবে তাহা করতলস্থ আমলকী ফলের ন্যায় নিরীক্ষণ করিয়া তবেই রামচরিত লিখিয়াছিলেন।*৬ বলা বাহুল্য, লেখকের সর্বজ্ঞতার এই শক্তি যেমন উল্লেখযোগ্য, তেমনি উল্লেখযোগ্য এই যে, সমস্ত কিছু জানেন বলিয়া তাঁহার সার্থক সৃষ্টিরও একটা দায়িত্ব আছে। এইজন্যই সংসারে বাস্তব অভিজ্ঞতা যেমনভাবে পাওয়া যায়, ঠিক সেইভাবে লেখক সাহিত্যে তাহা উপস্থাপিত করিতে পারেন না। আলোকচিত্রের সহিত চিত্রশিল্পের যে পার্থক্য, সেই পার্থক্য বাস্তব ঘটনার সহিত সাহিত্যের।*৭ সাহিত্যিক যখন আপন রচনা পাঠককে উপহার দেন তখন বস্তুভিত্তিকতা সত্ত্বেও তাহাতে তাঁহার মনের রস বা মাধুরী মিশিয়া যায়। এই অর্থে তথ্য তখন কবি-সত্যে রূপান্তরিত হয়। সাহিত্যের সামগ্রী প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ বলিয়াছেন' 'ভাবকে নিজের করিয়া সকলের করা ইহাই সাহিত্য, ইহাই ললিতকলা'। এছাড়া সৃষ্ট চরিত্রগুলি লেখকের মানস-সন্তান বলিয়া তাহাদের প্রকৃতি বা পরিণতি যাহাই হউক, লেখকের তাহাদের প্রতি দরদের অভাব থাকে না এবং প্রধানত এইজন্যই কথাসাহিত্যিক সাধারণত সংবেদনশীল এবং মানবতাধর্মী হইয়া থাকেন। সাহিত্যের লক্ষ্য আনন্দ, প্রেম, সৌন্দর্যসৃষ্টি এবং মূল্যবোধ সঞ্চার। বাস্তব প্রয়োজন রচনায় কুশ্রীতা কলঙ্ক স্থান পাইলেও শুধু ক্লেদরতিই সাহিত্যের উদ্দেশ্য হইতে পারে না। প্রকৃতপক্ষে সাহিত্যের পথ মুক্তির পথ, কল্যাণের পথ। বঙ্কিমচন্দ্র সহস্র অসুবিধা সত্ত্বেও এই সাহিত্যের স্রষ্টা, রবীন্দ্রনাথ, শরৎচন্দ্র, তারাশঙ্কর—বাংলা কথাসাহিত্যের দিকপালগণ এই সাহিত্যধর্মের ধারক। বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ও এই পথেরই পথিক।

কথাসাহিত্যিকের সব কিছু বলিবার সুযোগ থাকিলেও বিশ্বজগতে যত ঘটনা ঘটিতেছে বা মানুষের যত চরিত্রবৈচিত্র্য সম্ভব হইতেছে, সমস্ত কিছু তিনি তাঁহার লেখায় সন্নিবিষ্ট করিতে পারেন না। প্লটের বন্ধন, উপস্থাপনে সংহতি, রচনার কলেবর এবং গতি-পরিণতির দিকে দৃষ্টি তাঁহাকে রাখিতেই হয়। আসলে তাঁহার মানসলোক যে সব বিষয়বস্তুকে প্রশ্রয় দেয়, অর্থাৎ বিশেষ বিশেষ যে সকল বিষয়ে তাঁহার অনুরাগ বা আগ্রহ আছে, মূলত তাহাই স্থানলাভ করে তাঁহার সৃষ্টিতে। ডাঃ শশিভূষণ দাশগুপ্ত এই প্রসঙ্গে বলিয়াছেন,—"মোটামুটিভাবে দেখা যায়, বহির্বিশ্ব আমাদের ইন্দ্রিয়দ্বারে অন্তর্জগতে প্রবেশ লাভ করিয়া নিরন্তর একটা রূপান্তর লাভ করিতেছে। নিত্যকালের বহির্বিশ্বটির তুলনায় আমাদের অন্তর্লোকটি অনেক ছোট, মনকে স্বভাবতই তাই বাছাই করিতে হয়।"*৮ এই দিক দিয়া দেখিলে সহজেই বুঝা যাইবে বিভূতিভূষণের মানসসঙ্গতি ও প্রতিবেশ যেরূপ, তাহাতে তাঁহার পক্ষে কল্লোলপন্থীদের সংখ্যাবৃদ্ধি অসম্ভব ছিল। বিজ্ঞানের ছাত্র মাণিক বন্দ্যোপাধ্যায় বিভূতিভূষণের পরে বাংলা সাহিত্যে অবতীর্ণ হন, কিন্তু যথাস্থানে আলোচনা করিয়া দেখান হইবে যে একই কারণে তিনি আবার "গোত্রে ও ধর্মে কল্লোলীয়। 'সাহিত্যে নবত্ব' প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ 'কল্লোলপন্থীরূপে পরিচিত তৎকালীন তরুণ কয়েকজন বাঙালী সাহিত্যিকের রচনার যে দুটি লক্ষণের প্রতি অঙ্গুলি নির্দেশ করেন, তাহা হইল দারিদ্র্যের আস্ফালন ও লালসার অসংযম। বিভূতিভূষণ প্রায় ইহাদের সমসাময়িক হইয়াও এই বিশেষ দুই লক্ষণে তাঁহাদের পৃথকগোত্রীয় ছিলেন। আগেই বলা হইয়াছে বিচিত্র মানসগঠনের জন্যই ইহা সম্ভব হইয়াছিল। সর্বব্যাপী বিশৃঙ্খলার প্রতিক্রিয়া তাঁহার মধ্যেও দেখা যায়, তবে এ প্রতিক্রিয়া অস্থির পারিপার্শ্বিকের স্রোতে গা ভাসাইয়া দেওয়া চঞ্চল মনের প্রকাশ নয়, বিক্ষুব্ধ আবর্তিত সমাজজীবনের উপর স্থিতপ্রজ্ঞ মানসসূর্যের রশ্মিপাত। টলষ্টয় আরভ্যে

*৩ ডাঃ শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়—বাংলা সাহিত্য পরিক্রমা (১৩৬৪), পৃঃ—১৭৬

*৪ ডাঃ শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়—বাংলা সাহিত্য পরিক্রমা (১৩৬৪), পৃঃ—১৭৯

*৫ তারকনাথ গঙ্গোপাধ্যায়—স্বর্ণলতা, দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ (মনোহারীর দোকান)।

*৬ বাল্মীকি রামায়ণ, বালকাণ্ড, তৃতীয় সর্গ।

*৭ প্রখ্যাত সমালোচক শশাঙ্ক মোহন সেন মহাশয় বলিয়াছেন :—"শ্রেষ্ঠ শিল্পমাত্রেই পৌত্তলিক। উহাকে ইংরেজী কথায় বলা যায়, "The Artist Knows only the presentation of the Concrete."

—শশাঙ্ক মোহন সেন—বাণীমন্দির (১৯২৮), পৃঃ—১৩৯

*৮ ডাঃ শশিভূষণ দাশগুপ্ত—শিল্পরীতি (১ম সংস্করণ), পৃঃ—৩৪

বিক্ষুব্ধ রাশিয়ার বিশৃঙ্খলার মধ্যেই মানুষ হইয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহার রচনায় এই চাঞ্চল্যের স্বীকৃতি থাকিলেও তদ্বারা তিনি প্রবাহিত হন নাই। আমাদের দেশে পরাধীনতার অভিশাপক্লিষ্ট পরিবেশে বিকশিত বঙ্কিমচন্দ্র ও রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধেও এই কথা বলা চলে। দান্তের সমকালীন ইটালী বা গ্যেটের সমকালীন জার্মানীর অবস্থাও ছিল শোচনীয়। এইসব মহামনীষী যেভাবে চারিদিকের নিরন্ধ্র হতাশা ও অন্ধকার হইতে উত্তরিত হইয়াছেন এবং সত্যসুন্দরের আলোকে আপন অন্তর উদ্ভাসিত করিয়া নিখিল বিশ্বে আলোক বিতরণ করিয়াছেন, বিভূতিভূষণও সেই পথেরই যাত্রী। বিভূতিভূষণের প্রতিভা যে সীমাবদ্ধ ছিল একথা আগেই বলা হইয়াছে, সে দিক হইতে পূর্বোল্লিখিত সাহিত্য-রথীদের সহিত তাঁহার তুলনা করা সঙ্গত নয়, কিন্তু বাংলা সাহিত্যের সৌভাগ্যক্রমে বিভূতিভূষণের প্রথম জীবন এমন এক পরিবেশে কাটিয়াছিল যাহার প্রভাব তাঁহার উপর অক্ষয় হইয়াছে এবং যাহা পরবর্তী কালে ঝঞ্ঝা-সংকুল জীবন সংগ্রামের মধ্যে অন্তরের স্নিগ্ধ-প্রদীপটি নিভিয়া যাইতে দেয় নাই।

কাঁচা সিমেন্টের উপর দাগের মত প্রথম জীবনে কাঁচা মনের দাগ উত্তর জীবনে সহজে মুছিবার নয়। প্রকৃতির সৌন্দর্যলোকের মধ্যে বিভূতিভূষণের মানসিক প্রস্তুতি হইয়াছিল, তাঁহার প্রথম জীবন কাটিয়াছিল প্রাণ-চঞ্চলা ইছামতীর তীরে গাছের ছায়ায়-ঢাকা শান্ত পল্লীগ্রামে। সে গ্রামে আর্থিক দারিদ্র্য ছিল, কিন্তু রাক্ষসের মত জীবনের সমস্ত আনন্দ শুষিয়া লইবার ক্ষমতা সে দারিদ্র্যের ছিল না।

লীলাময়ী প্রকৃতির প্রভাব ছাড়া বিভূতিভূষণের উপর সবিশেষ প্রভাব পড়িয়াছিল তাঁহার পিতা মহানন্দ বন্দ্যোপাধ্যায়ের। মহানন্দ কথকতা করিয়া জীবিকার্জন করিতেন। কথকতা করিতে গেলে পুরাণাদি শাস্ত্র-গ্রন্থ প্রচুর পড়িতে হয়। ধর্মপ্রাণ মহানন্দের শাস্ত্রগ্রন্থ সংগ্রহেরও অভ্যাস ছিল। তাছাড়া দরিদ্র হইলেও তিনি পল্লীগ্রামের সাধারণ নিরক্ষর বা অল্পশিক্ষিত লোকদের তুলনায় অনেক রুচিমান ও সংস্কৃতিবান ছিলেন। তিনি সাপ্তাহিক 'বঙ্গবাসী পত্রিকা'র গ্রাহক ছিলেন।*৯ এই পত্রিকা শিশু বিভূতিভূষণের মন কতখানি দূরচারী করিয়াছিল তাহা তাঁহার মানসপুত্র 'অপু'র কাহিনীতেও ফুটিয়া উঠিয়াছে। কথক পিতার সহিত নানাস্থানে ভ্রমণের এবং তাঁহার পুরাণালোচনার ও সংগৃহীত গ্রন্থাদির প্রভাব স্বভাবতই বিভূতিভূষণের উপর পড়িয়াছিল। আধুনিক জীবনের বা কলিকাতার নাগরিক জীবনের অন্তরঙ্গ পরিচয় বিভূতিভূষণ কলেজে পড়িবার পূর্বে বিশেষ পান নাই। কাজেই প্রথম জীবনের পরিবেশের প্রভাবে বিভূতিভূষণের মন গড়িয়া উঠিয়াছিল ধার্মিক ও প্রকৃতি-প্রেমিক হইয়া। স্বাভাবিক অতীতচারিত্ব তাঁহাকে অলৌকিকত্বে নিঃসন্দেহে কিছুটা আস্থাবান করিয়া তুলিয়াছিল। সরল গ্রাম্যজীবনের সহিত ঘনিষ্ঠতার এবং ধার্মিক পরিবেশে মানুষ হইবার জন্য তিনি সহজ সরল নির্মল জীবনের অনুরাগী হইয়া উঠিয়াছিলেন। আবার "সাপ্তাহিক বঙ্গবাসী"র পাঠকের কাছে বহু বিচিত্র সমস্যাপীড়িত আপন যুগ একেবারে অপরিচিত ছিল না। মহর্ষি পিতার সুবিপুল প্রভাবের মধ্যে রবীন্দ্রনাথের প্রথম জীবন গড়িয়া উঠিলেও জোড়াসাঁকো সিংহীবাগানের বস্তির বাস্তব-কঠোর অভিজ্ঞতার মূল্য যেমন সেখানে অনস্বীকার্য, পল্লীপ্রকৃতি ও ধার্মিক পরিবেষ্টনের মধ্যে মানুষ হইলেও প্রথমে বঙ্গবাসীর মত সংবাদপত্র এবং পরে বনগ্রামের স্কুল জীবন বিভূতিভূষণকে যুগজীবনের বাস্তবতায় নিঃসন্দেহে কিছুটা নামাইয়া আনিয়াছিল। তারপর কলিকাতার কলেজ জীবনের দিন।

এইভাবে যে বিভূতিভূষণ গড়িয়া উঠিয়াছিলেন তাঁহার রচনায় প্রকৃতি জীবন্ত চরিত্র, কিন্তু লেখক হিসাবে তিনি পুরাতন পন্থী নন, বরং মূল্য বোধের দিন হইতে তিনি আধুনিক পন্থী। তাঁহার রচনায় এ যুগের জীবন-সমস্যার অথবা সমকালীন সমাজ-চেতনার প্রতি কোন বিরূপতা ছিল না। তাঁহার মনোধর্মের মর্যাদা রক্ষায় বিভূতিভূষণ অধিকতর যত্নবান ছিলেন সত্য*১০, কিন্তু আপন মূলসুরের ব্যত্যয় না ঘটাইয়া তিনি এ যুগের নানা সমস্যাকে নিজ রচনায় স্থান দিয়াছেন। অবশ্য সমস্যা প্রকৃত সমস্যা কি না সে সম্বন্ধে তাঁহার মত শুদ্ধসত্ত্ব লেখকের কিছুটা বিচারবোধ স্বাভাবিক। যাহা মেকী, জুয়াড়ীসুলভ উত্তেজনা সৃষ্টিই যাহার লক্ষ্য, অথবা হতাশ মনের প্রতিক্রিয়াজাত আক্রোশের যাহা প্রতিফলক,—বিভূতিভূষণের সাহিত্যে সে সবের স্থান নাই। তাঁহার শক্তি সীমাবদ্ধ ছিল, রচনারীতিতে অলঙ্কার শাস্ত্রের নির্দেশানুযায়ী ত্রুটি ছিল বিস্তর, কিন্তু সত্য ও সুন্দরের নিত্যস্পর্শে তাঁহার সৃষ্টি সদাই স্নিগ্ধরসোজ্জ্বল। নিজের ক্ষমতা কিরূপ পরিমিত তাহা বিভূতিভূষণ জানিতেন এবং জানিতেন বলিয়াই যে চিত্রাঙ্কন তাঁহার ক্ষমতার বাহিরে অথচ যাহা অন্য শক্তিমান সাহিত্যিকের লেখনীতে সম্ভব, বিভূতিভূষণ সে সম্পর্কে অকৃত্রিম অনুরাগ প্রকাশ করিতেন। সমকালীন সাহিত্যিকদের অধিকাংশের সহিত তাঁহার লক্ষণীয় পার্থক্য ছিল, কিন্তু এই সকল সাহিত্যিকের প্রতি তাঁহার প্রীতি-প্রসন্নতার অভাব ছিল না। তিনি বলিয়াছেন:—"চিন্তার গোঁড়ামি আমি বড় অপছন্দ করি, স্থিতিস্থাপক মন না হ'লে সত্যদর্শী হওয়া বড় শক্ত।*১১ তাঁহার মাতৃভূমি শ্যামল বাংলাদেশকে তিনি প্রাণ দিয়া ভালবাসিতেন। মধ্য-প্রদেশের বা বিহার-উড়িষ্যার পার্বত্য বনাঞ্চল তাঁহাকে মুগ্ধ করিয়াছে, অরণ্যানীর সে ভাব-গাম্ভীর্য বাংলার পল্লীপ্রকৃতির

---

*৯ আমাদের বাড়ীর পেছনে বাঁশ বাগানটার পথে কাল বিকেলে ঘুম ভেঙে উঠে যাচ্ছি, তখন মনে কি এক অদ্ভুত অনুভূতি হোল। যেন কি সব শেষ হয়ে গেছে, কি যাচ্ছে, এই ধরণের একটা উদাস মনোভাব। ...বঙ্গবাসীর কথা, বাবার কথা, চীন ভ্রমণের কথা, কত কি মনে আনে।

—বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়—উৎকর্ণ (১ম সংস্করণ, পৃঃ—২১৩)

*১০ "এই বিশ্বের সকল সৃষ্ট পদার্থের সঙ্গে একত্ব অনুভব করা ও চারিধারে আত্মাকে প্রসারিত করে দেওয়াই জীবনের বড় আনন্দ।"

—বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়—তৃণাঙ্কুর, ২য় সংস্করণ, পৃঃ—৪

*১১ বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়—স্মৃতির রেখা, ১ম সংস্করণ পৃঃ—৭৮

নাই, একথা তিনি অসঙ্কোচে স্বীকার করিয়াছেন। কিন্তু তবু পদে পদে তিনি বাংলার শ্যামস্নিগ্ধ প্রকৃতির জন্যই আকুল হইয়া উঠিয়াছেন, ইহাকে স্মরণ করিয়াছেন বারে বারে, ইহার উদ্দেশে নিবেদন করিয়াছেন অকৃত্রিম অনুরক্তি। পাটনায় সাহিত্যিক তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় একবার তাঁহাকে বলিয়াছিলেন যে পাটনা তাঁহার ভাল লাগিতেছে না, বিভূতিভূষণ সেই সূত্র ধরিয়া উচ্ছ্বসিতভাবে লিখিয়াছেন :—"তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় আজকাল পাটনাতেই রয়েচে, আমার সঙ্গে দেখা করতে এসে বল্লে, এ জায়গা ভাল লাগচে না, বাংলা দেশে ফিরতে চায়। তারাশঙ্কর একজন সত্যিকার ক্ষমতাবান লেখক, বাংলার মাটি থেকে ও প্রাণরস সঞ্চয় করেচে, ওর কি ভাল লাগে এই সব জায়গা ?"*১২

প্রকৃতপক্ষে মানস-সঙ্গতি অনুযায়ী বিভূতিভূষণ প্রকৃতি-রূপের এবং মানবতামূলক সহজ জীবনের ছবি ফুটাইবার মধ্যেই তাঁহার রচনা একরূপ সীমাবদ্ধ রাখিয়াছিলেন। তাঁহার শান্তভাবাশ্রয়ী মানসলোকের বিচিত্র সংগঠন ঠিকমত বুঝিতে হইলে সমগ্রভাবে ভারতীয় সাহিত্যের সাধারণ ভাবদৃষ্টির নিরিখেই বুঝিতে হইবে এবং এজন্য পাঠককে চলিয়া যাইতে হইবে বিভূতিভূষণের নিজের যুগ ছাড়াইয়া পিছনের দিকে। ভারতীয় সাহিত্যে শান্তভাবের প্রাধান্য সম্পর্কে ইতিপূর্বে আলোচনা করা হইয়াছে, এখানে তাহার পুনরাবৃত্তির প্রয়োজন নাই। মোটের উপর, সত্য, সৌন্দর্য, পবিত্রতা, আশাবাদ ও কল্যাণ-ধর্মিতার ভাবদৃষ্টি অনুরঞ্জিত হওয়ার জন্য বিভূতিভূষণের সহিত সমকালীন কল্লোলপন্থী সাহিত্যিকদের চেয়ে মহাকবি কালিদাস বা কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের মিল অনেক বেশি। নিজে প্রতিভাবান লেখক হইয়া আপন যুগের শক্তিমান লেখকমণ্ডলী হইতে এরূপ বিচ্ছিন্নতা সচরাচর আশা করা যায় না, কিন্তু বিভূতিভূষণ জগৎ ও জীবনকে যে চোখে দেখিয়াছিলেন, তাহাতে এ পার্থক্য অনিবার্য ছিল। কল্লোলপন্থীদের তারুণ্যের উত্তেজনা ছিল, বুদ্ধি-প্রাধান্যের দম্ভ ছিল, প্রচলিত মূল্যবোধের বিরুদ্ধে বিদ্রোহীভাব ছিল। এছাড়া তাঁহাদের পাশ্চাত্য শিক্ষার অহমিকা ছিল এবং পশ্চিমী সাহিত্য পঠন পাঠনে অভিভূত হইবার জন্যই বোধ হয় তাঁহাদের মধ্যে অনুচিকীর্ষা দেখা দিয়াছিল। বাংলা সাহিত্যে প্রথম বাস্তবতা গণতান্ত্রিকতা তাঁহারাই আনিতেছেন, এরূপ একটা মনোভাবও তাঁহাদের মধ্যে পরিলক্ষিত হয়। প্রধানতঃ কল্লোল—প্রগতি—কালিকলম পত্রিকা কেন্দ্র করিয়া তাঁহারা দলবদ্ধ হইয়াছিলেন। বিভূতিভূষণ ইঁহাদের বিপরীত পথে চলিয়াছেন বলা চলে। ভাল করিয়া লক্ষ্য করিলে মনে হয়, প্রথম মহাযুদ্ধোত্তর কালে দেশব্যাপী যে হতাশা, বিশৃঙ্খলা এবং প্রচলিত মূল্যবোধের সম্পর্কে সন্দেহ প্রসার লাভ করিয়াছিল, কল্লোলপন্থীদের অভ্যুদয় তাহারই ফল-স্বরূপ। অন্যদিকে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যধর্মী ভাববাদী সাহিত্যরীতির উজ্জ্বল ধারক বিভূতিভূষণ, তিনি যেন 'কল্লোলীয়'দের সক্রিয়তার প্রতিক্রিয়ায় আবির্ভূত হইয়া বাংলা কথাসাহিত্যের প্রবাহে ভারসাম্য রক্ষা করিয়াছেন। এখানে একথা বলা বোধ হয় অপ্রাসঙ্গিক হইবে না যে তারাশঙ্কর প্রথম 'কল্লোল' পত্রিকাতেই আত্মপ্রকাশ করেন, কিন্তু কল্লোলপন্থীদের সহিত মানস-সমান্তরালতা অনুভব না করার জন্যই তিনি অল্পকালের মধ্যে নিজেকে সরাইয়া আনেন।*১৩ বিভূতিভূষণ যেমন অচিন্ত্যকুমার বুদ্ধদেব বসু, মণীশ ঘটকের বিপরীতে বাংলা সাহিত্যপ্রবাহে ভারসাম্য রক্ষাকারী, অন্যদিকে তেমনই শক্তিমান তারাশঙ্করের স্থান সমকালীন শক্তিমান কথাসাহিত্যিক মাণিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিপরীতে।*১৪

*১২ বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়—উৎকর্ণ, ১ম সংস্করণ, পৃঃ—১১৩

*১৩ রুচিমান বিদগ্ধ সাহিত্যরসিক মোহিতলাল মজুমদার কল্লোলপন্থীদের উদ্দামতায় কিরূপ ক্লান্তিবোধ করিয়াছিলেন, তাহা অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্তের 'কল্লোল যুগ' (১৩৫৭) হইতেই (পৃঃ—১৩৮) উপলব্ধি করা যাইবে :—শুনেছি, সুরেশকে (চক্রবর্ত্তী) লিখে পাঠালেন (মোহিতলাল মজুমদার), কল্লোলদলের যে সব লেখক তোমার কাগজে লেখে তাদের সংস্রব যদি ত্যাগ না করো তবে আমি আর "উত্তরা"য় লিখব না।

*১৪ মাণিক বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পর্কে অধ্যাপক জগদীশ ভট্টাচার্য (মাণিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের শ্রেষ্ঠ গল্পের ভূমিকা) বলিয়াছেন যে, তিনি "গোত্রে ও ধর্মে কল্লোলীয়, স্বপ্নে ও সাধনায় কল্লোলেরই পরিণাম। অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত 'কল্লোলযুগ' গ্রন্থে (১ম সংস্করণ, পৃঃ—৩২৪) মাণিক বন্দ্যোপাধ্যায়কে কল্লোলেরই পরিণাম' রূপে অভিহিত করিয়াছেন।

(ক্রমশঃ)

ময়লা কাগজ

শ্রীশশিগোপাল দাস

দীনহীন দরিদ্রের ক্ষুধার্ত্ত জীবন,
সারাদিন খুঁজে ফিরি পাগলের প্রায়,
কাগজের মাঝে কিছু জৈবিক স্পন্দন !
তবু কেন এই মনে বিষাক্ত বিস্ময় ?

কি ছিলাম অতীতের তন্দ্রালস তীরে
কি হয়েছি বর্ত্তমানে ভবিষ্যতে কি ?
চক্রাক্ত রচনা শুধু জীবনেরে ঘিরে !
দৃঢ় কণ্ঠে তবু বলি—'ভাগ্য দেয় ফাঁকি' ?

অস্পৃশ্য বস্তুর মত এই যে জীবন !
ময়লা কাগজ যা'র জীবিকা উপায়,
একান্ত সম্বল সুধু অতীত স্মরণ,
অস্বীকারে উপহাসে তারে মোছা যায় ?

কত আশা, কত কিছু রাঙ্গা অভিলাষ,
জন্ম হবে মুখে নিয়ে রূপোর চামচ ?
আসন্ন প্রভাতে র'বে রঙ্গীণ বিভাস,
সব মিথ্যে ! সত্য শুধু "ময়লা কাগজ" !

দ্বিজেন্দ্রলালের হাসির গান

শ্রীজয়দেব রায়

দ্বিজেন্দ্রলাল রায়কে বাংলা হাসির গানের জন্মদাতা বলা যায়। তাঁহার পূর্বেও আমাদের হাসির গান ছিল না যে তাহা নয়, একদিন বাংলার কবিওয়ালা যাত্রা-পাঁচালী প্রভৃতির আসরে ভাঁড়ামি এবং রসিকতার নামে গ্রাম্যতা এবং অশ্লীলতার রীতিমত বান ডাকিয়াছিল। ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত প্রথম কৌতুকরসকে ভদ্রলোকের হাতে দেওয়ার মতো ব্যবস্থা করেন। দ্বিজেন্দ্রলাল তাঁহার গানে বিলাতী আদর্শের সূক্ষ্ম রঙ্গব্যঙ্গের আমদানী করিলেন। তখনই প্রথম সবার সঙ্গে বসিয়া নিঃসঙ্কোচ মনে হাসির গান শুনিবার সৌভাগ্য বাঙ্গালী অর্জন করিল।

সে আমলের একজন বিশিষ্ট সমালোচক পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় বলিয়াছেন :—

"যখন দ্বিজেন্দ্রলাল বিলাত হইতে (১৮৮৬) এদেশে ফিরিয়া আসেন তখন বাঙ্গালীর ভাব স্থবিরতা ঘটিয়াছিল। এই সময়ে দ্বিজেন্দ্রলাল বিলাতের Humour বা ব্যঙ্গ এদেশে আমদানী করিয়া দেশী রসের মাদকতা মিশাইয়া বিলাতী ঢঙের সুরে হাসির গান প্রচার করিলেন। সে গান বাংলা ভাষায় যেমন অপূর্ব, সে গানের সুর ও গীতি-পদ্ধতিও তেমনি বাঙ্গালীর পক্ষে নতুন।"

দ্বিজেন্দ্রলালের হাসির গানগুলি গাহিবার বিশিষ্ট রীতি ও কৌশল আছে। সেই গীতি রীতিটি কবি নিজে গাহিয়া প্রচার করিয়া বিশেষ প্রতিষ্ঠা অর্জন করিয়াছিলেন। তিনি বলিতেছেন—

"বিলাত হইতে আসিয়া আমি ইংরেজি গান খুব গাহিতাম। ইংরেজি গান প্রায় কোন বাঙ্গালী শ্রোতারই ভাল লাগিত না। তখন ইংরেজি গান ছাড়িয়া দিয়া......কতকগুলি হাসির গান রচনা করি। এই হাসির গানগুলি অবিলম্বে অনেকের প্রিয় হয় এবং কার্যোপলক্ষে কোন নগরে যাইলেই আমায় স্বয়ং গাহিয়া শুনাইতে হইত।"

—এই গানে গাহিবার কৌশলে নাটকীয়তার সৃষ্টি করা হয়।

বিলাতী ও দেশী গানের পার্থক্য নির্দেশ করিয়া কবি বলিয়াছেন—
"একটি যেন রাজপথে নির্ভয়, স্বাধীন-গতি স্বাবলম্বিনী—বিংশতিবর্ষীয়া কুমারী ইংরাজ মহিলা, অপরটি যেন গৃহ প্রাঙ্গণে সলজ্জা সশঙ্কগতি গৃহ-প্রবেশোদ্যতা ষোড়শী সুন্দরী বঙ্গবধূ। একটি যেন প্রভাত আকাশে উড্ডীন স্বরসুধাবর্ষী পাপিয়া, অপরটি যেন নিভৃত নিকুঞ্জে কলকণ্ঠ কোকিল।"

দ্বিজেন্দ্রলালের হাস্যরস মার্জিত হইলেও তাহাতে সঙ্কোচ নাই, হাসি প্রাণখোলা। সুরের অঙ্গে অঙ্গে হাসির প্লাবন ঢালিয়া গান মনঃপ্রাণকে ভাসাইয়া লইয়া যায়.মুখ টিপিয়া অথবা ঠোঁট বাঁকাইয়া মৃদু হাসি হাসিলেই চলিবে না, গান গাহিতে গিয়া হাসিয়া অস্থির হইতে হইবে। এই Dramatic ভঙ্গীই দ্বিজেন্দ্রলালের গানের বৈশিষ্ট্য—

> বলিত হাসব না, হাসি রাখতে চাইত চেপে
> কিন্তু এ ব্যাপার দেখে, থেকে থেকে, যেতে হয় প্রায় ক্ষেপে।
> সাহেব-তাড়াহত, থতমত অঞ্চলস্থ স্ত্রীর,
> ভূত ভয়গ্রস্ত পগারস্থ মস্ত মস্ত বীর,
> যবে সব কলম ধরে, গলার জোরে দেশোদ্ধারে ধায়,
> তখন আমার হাসির চোটে, বাঁচাই যোটে,
> হয়ে ওঠে দায়॥

রবীন্দ্রনাথ তাঁহার হাসির গানে ব্রাহ্মসমাজসুলভ এত বেশী সতর্কতা গ্রহণ করিতেন যে, তাঁহার সুর হইয়াছে সম্পূর্ণ কৃত্রিমতাপূর্ণ। তাঁহার হাস্যরস বুঝিতে হইলে যে পরিশ্রম করিতে হয় তাহাতে হাসিবার খরচ পোষায় না! তাহা ছাড়া, তিনি সুরের মধ্যে এ অভিনয়-প্রবণতার পক্ষপাতী ছিলেন না। তাঁহার মতে ইহাতে কলা-লক্ষ্মীকে অপমান করা হয়।

পাশ্চাত্য সঙ্গীতে কিন্তু এই শ্রেণীর নাটকীয় ভঙ্গী খুবই সাধারণ বিষয়। দ্বিজেন্দ্রলালের কেবল হাসির গানেই নয়, অধিকাংশ গানেই ইহা আপনা হইতে চলিয়া আসিয়াছে। তিনি কতকগুলি ইংলিস, স্কচ, ও আইরিশ গানের সুর হুবহু নকল করেন, সেগুলিতেও এই ভঙ্গী দেখিতে পাওয়া যায়—যেমন, Auld Lang Syne গানের নকল 'পুরাণ প্রেমকো নহি যাও ভৈঁয়া হো।

দ্বিজেন্দ্রলালের হাসির গানের তিনটি বিভাগ করা যাইতে পারে—প্রথমত, যে গানে ব্যঙ্গ বিদ্রূপের কাঁটা নাই, যেখানে প্রাণের রসাবেশ স্বতঃ-উচ্ছ্বসিত হাসিতে ছড়াইয়া পড়ে, শ্রোতারা যেখানে কাহারো ব্যক্তিত্বের উপর আঘাত অনুভব না করিয়াই আনন্দে যোগ দিতে পারে। যেমন—

> এস এস বঁধু এস। আধ ফরাসে বোস,
> কিনিয়া রেখেছি কলসী দড়ি (তোমার জন্যে হে)
> তুমি হাতী নও, ঘোড়া নও,
> যে সোয়ার হয়ে পিঠে চড়ি,
> তুমিও চিড়ে নও বঁধু, তুমি চিড়ে নও,
> যে খাই দধি গুড় মেখে (বঁধু হে!)

অসঙ্গতিকে লক্ষ্য করিয়া যে হাস্য তাহাই কবির গানের দ্বিতীয় বিভাগ। সমাজে, রাষ্ট্রে, ধর্মে, জীবনে, আমরা বহুভাবে লাঞ্ছিত হইতেছি, কোথাও তীব্রকণ্ঠে প্রতিবাদ করিবার সাহস নাই, আক্ষেপ মনের মধ্যে জমা হইয়া উঠিতেছে, নিজেদের অসহায়তা ও মনে মনে গুমরিয়া উঠিতেছে।

এই শ্রেণীর গানে চাপা আক্ষেপ-অভিযোগ ফুটিয়া উঠিয়াছে—

খাও দাও নৃত্য কর মনের সুখে।
কে কবে যাবিরে ভাই শিঙ্গে ফুঁকে ॥
এক রকম যাচ্ছে যদি যাক্‌না কেটে,
পরে যা হবার হবে কাজ কি ঘেঁটে ?
গায়ে ফুঁ দিয়ে বেড়াও, কোমর এঁটে হাস্যমুখে ॥

এই রকম গান—

জন্মিতে কে চাইত যদি আগে সেটা জান্‌ত।
ভোরে উঠেই ঘুমটি নষ্ট, তারপরেতে যে সব কষ্ট,
বর্ণিতে অক্ষম আমি সে সব বৃত্তান্ত ॥

তৃতীয় ধারায় হাসির গানে রীতিমত যুদ্ধ চলিয়াছে, আক্রমণ—প্রতি-আক্রমণের অন্ত নাই। সমাজের রাষ্ট্রের কোন একটি অন্যায় অসঙ্গতিকে লক্ষ্য করিয়া 'হাসির বাণে শ্লেষ কথা হানা' হইয়াছে। কোন একটি বিশেষ শ্রেণীর প্রতিনিধিকে লক্ষ্য করিয়া সমস্ত শ্রেণীকেই তীব্রভাবে আক্রমণ করা হইয়াছে। বিলাতফেরতা, ইরাণ দেশের কাজী, নতুন কিছু করো, নন্দলাল বদলে গেল মতটা—প্রভৃতি এই শ্রেণীর গান। গানের মধ্যে বাস্তব বৈচিত্র্য আনিবার চেষ্টা করিয়াছেন দ্বিজেন্দ্রলাল—

যদি জানতে চাও আমরা কে ? আমরা Reformed Hindus,
আমাদের চেনে নাকো যে, Surely he is an awful
goose !

নকল সাহেবিয়ানা, কপট দেশপ্রেম, ধর্মের সুবিধাবাদীর ভণ্ডামি প্রভৃতি দ্বিজেন্দ্রলালের হাতে প্রচণ্ড আঘাত পাইয়াছিল। তরজার সুরে—

নন্দলাল ত একদা একটা করিল ভীষণ পণ—
স্বদেশের তরে যা করেই হোক, রাখিবেই সে জীবন।
সকলে বলিল 'আহা হা কর কি, কর কি নন্দলাল ?
নন্দ বলিল—বসিয়া বসিয়া রহিব কি চিরকাল ?
আমি না করিলে, কে করিবে আর উদ্ধার এই দেশ ?
তখন সকলে বলিল—বাহবা বাহবা বাহবা বেশ ॥

এই শ্রেণীর গানে কবি তাঁহার সমসাময়িক সমাজকে আক্রমণ করিয়াছেন। যে সমস্ত বিলেতফেরত বাঙ্গালী সাহেব সাজিয়া তাঁহার দেশবাসীকে 'নেটিভ' বলিয়া বিদ্রূপ করেন, যে সকল জনসেবক নিজের আত্মীয়-স্বজনকে দুঃখ-দুর্দশায় ফেলিয়া সমাজ কল্যাণে মাতেন, তাঁহাদের বিদ্রূপ ব্যঙ্গের শরে শরে জর্জরিত করিয়াছেন।

দ্বিজেন্দ্রলালের এই ধরণের হাসির গানের একদা বাংলার রসিক-সমাজে বিশেষ আদর হইয়াছিল। তারপর যুগ ধর্মের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে ঐ সকল সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় অনাচারের প্রতিকার ও বহু সমস্যার সমাধান হইয়াছে, সে সকল গানের আদরও কমিয়া গিয়াছে। রজনীকান্ত সেন দ্বিজেন্দ্রলালের আদর্শে তাঁহার পর কিছু ঐ শ্রেণীর হাসির গান রচনা করিয়াছেন। রবীন্দ্রনাথ এই ধরণের আঘাত প্রত্যাঘাত হইতে সন্তর্পণে দূরে দূরে থাকিতে চাহিয়াছিলেন। এ ধরণের গানের মধ্যে একটা সমাজ-চেতনার ভাব আছে। ইহার দ্বারা আক্রান্ত সমাজ বা ব্যক্তি ভবিষ্যতে নিজেদের সম্বন্ধে সতর্ক হইতে পারে। তখন আর আক্রমণের মূল্য থাকে না।

দ্বিজেন্দ্রলাল মনে করিতেন তাঁহার ব্যঙ্গ বিদ্রূপের দ্বারা কতকটা সমাজ-সংস্কার হইবে—

ব্যঙ্গ করি আমি ? ব্যঙ্গ করি শুধু ?
নিন্দা করি শুধু সকলের ?
কভু না ! আসলে ভক্তি করি আমি,
ঘৃণা করি শুদ্ধ নকলে।
যেথা আবর্জনা, ধরি সম্মার্জনী, তাই বলে
আমি অন্ধ না।
যেখানে দেবতা, ভক্তি পুষ্প দিয়ে স্তুতিছন্দে
করি বন্দনা ॥

বিদ্রূপের দ্বারা তিনি চাহিয়াছিলেন ত্রুটির সংশোধন করিতে। এজন্য যে আঘাত তিনি হানিতেন তাহা উপরে কঠিন মনে হইলেও ভিতরে দরদের রসে সিক্ত।

তাঁহার হাসির গানের উদ্দেশ্য রসের সঞ্চার নয়, স্বদেশের দুঃখ দুর্দশায় রোদনপ্রসূত তাঁহার এই গানগুলি। এই গুলির মধ্যে কবির গভীর দেশ-প্রীতি ও নিগূঢ় সহানুভূতি বিজড়িত আছে। রাজকীয় উচ্চতর শাসন-কর্মেরত কবির পক্ষে স্বদেশী আন্দোলনে সক্রিয় অংশ গ্রহণ করা সম্ভব হয় নাই, পৃথিবীর অন্যান্য জাতির তুলনায় আমাদের হীনতা সম্পর্কে আক্ষেপোক্তি করিতে তাঁহার সঙ্কোচ হইত। সকলের সঙ্গে একত্রে বসিয়া দেশের দুঃখে ক্রন্দন করিতে তাঁহার প্রবৃত্তি হয় নাই—তাই এই বিদ্রূপের হাসির মধ্য দিয়া তিনি রোদনের করুণ কলরোল তুলিয়াছিলেন।

তুচ্ছ জিনিসকে অকারণ প্রাধান্য দেওয়া অসঙ্গতির জন্য আর এক শ্রেণীর হাস্যরসের বস্তু। এক পেয়ালা চা আমাদের প্রতিদিন সকালে চাই, এজন্য যে রাজ্যসম্পদও ত্যাগ করিতে চায়, সে হয় আমাদের পরিহাসের পাত্র। নবাব সিরাজউদ্দৌলা নাকি জুতার জন্য শত্রুহস্তে ধরা পড়েন—এ দুঃসংবাদেও আমরা মনে মনে হাসি, তাহার কারণ ঐ তুচ্ছ জিনিসের এই রকম অকারণ প্রাধান্য ! তাঁহার গানে আছে—

বিভব সম্পদ ধন নাহি চাই, যশ মান চাহি না
শুধু বিধি যেন প্রাতে উঠে পাই ভাল এক পেয়ালা চা ॥

দ্বিজেন্দ্রলাল তাঁহার হাসিকে সব সময়ে সতর্ক পাহারায় রাখিতেন, একটু অসতর্ক হইলেই হয়তো অশ্লীলতা না হোক গ্রাম্যতার স্তরে নামিয়া যাইতে পারে। এই ইচ্ছাকৃত সতর্কতাও (careful careless) হাসির যোগান দিয়াছে—

যখন কেউ প্রবীণ ভণ্ড, মহাষণ্ড পরেন হরির মালা
তখন ভাই নাহি ক্ষেপে, হাসি চেপে রাখতে পারে
কোন্—!

'শালা' কথাটা উহ্য রাখার কৌশল !

হাসির পশ্চাতে যে উদ্দেশ্য আছে, তাহাই সাহিত্যেও রসের যোগান দেয়। রবীন্দ্রনাথ বলিয়াছেন—"কেবল হাস্যরসের দ্বারা কেহ যথার্থ অমরতা লাভ করে না। রূপালীর পাতের মধ্যে শুভ্রতা ও উজ্জ্বলতা আছে বটে, কিন্তু তাহার লঘুত্ব ও অগভীরতাবশত তাহার মূল্যও অল্প এবং তাহার স্থায়িত্বও সামান্য। সেই উজ্জ্বলতার সঙ্গে রৌপ্যপিণ্ডের কাঠিন্য ও ভার থাকিলে তাহার মূল্য বৃদ্ধি করে, হাস্যরসের সঙ্গে চিন্তা এবং ভাবের ভার থাকিলে তবে তাহার স্থায়ী আদর হয়। দ্বিজেন্দ্রলালের হাসির গানের মধ্যে কবির হৃদয় রহিয়াছে, তাহার মধ্য হইতে জ্বালা ও দীপ্তি ফুটিয়া উঠিতেছে।"

কবিতার কথা—সোনার তরী ও নিরুদ্দেশ যাত্রা

প্রশান্তকুমার রায়

(আলোচনা)

রবীন্দ্রনাথের সোনার তরী কাব্য গ্রন্থের প্রারম্ভিক কবিতা 'সোনার-তরী', সর্বশেষ কবিতা নিরুদ্দেশ-যাত্রা। এই দুই কবিতার একখানি সোনার-তরীর উল্লেখ আছে এবং দুই কবিতার মধ্যে স্বয়ং কবি ছাড়া অপর একজনের অস্তিত্ব আছে। তাহাকে প্রথম কবিতায় 'নেয়ে' ও অপর কবিতায় 'সুন্দরী' বলিয়া পরিচিত করানো হইয়াছে। উভয়ের মধ্যে একজন নর, অন্যজন নারী এই মাত্র প্রভেদ, তা ছাড়া আচরণের দিক হইতে উভয়ে একই কর্ম্মে লিপ্ত—নৌকা বাওয়া। উহারা ঘাটে নৌকা ভিড়ায় বটে কিন্তু তারপর কোথায় যে চলিয়া যায়, কি তাদের পরম উদ্দেশ্য, কোথায় তাদের গন্তব্যস্থল, এ সবের কিছুই জানা যাইতেছে না। অন্ততঃ কাব্যের কবি-পুরুষ তাহার সন্ধান জানিতে পারিতেছেন না। এ যেন শিখাটি অদৃশ্য কিন্তু আলোর তেজপুঞ্জের অস্তিত্ব বর্তমান!

যাহাকে দেখিতে পাওয়া যাইতেছে—অতি বাস্তবের মত সম্মুখে একান্ত প্রত্যক্ষ গোচর হইতেছে, বাক বিনিময় হইতেছে, এমন কি তার সুনিবিড় সঙ্গলাভ পর্যন্ত সম্ভব হইয়া উঠিয়াছে অথচ শেষ পর্যন্ত কোন্ অপার রহস্যের জালে কবি আত্মাকে বন্দী করিয়া লীলাচঞ্চল ভাবে রহস্য অবগুণ্ঠন টানিয়া দিয়া অদৃশ্য পথে পাড়ি জমাইতেছে। কবির আকাঙ্ক্ষা বাড়িতেছে কিন্তু সেই আকাঙ্ক্ষার নিবৃত্তি হইতেছে না—যেন দিবাবিভা ধাঁধাঁ রচনা করিয়া সুদূরে কোন মায়ালোকে মিলাইয়া যাইতেছে! ঐ রহস্য গুণ্ঠন উন্মোচন করিবার স্বাভাবিক আকাঙ্ক্ষা কবিকে দূর হইতে বহু দূরে ক্রমশঃ টানিয়ে নিতেছে। সেই রহস্যময় ব্যক্তি—যে কখনো পুরুষ, কখনো সুন্দরী নারী—কবিকে নিরন্তর আকর্ষণ করিয়া কবির আকাঙ্ক্ষাকে তীব্রতর করিয়া তুলিল। 'সোনার-তরী' কাব্যের এই অ-ধরা ব্যক্তির স্বরূপ সন্ধানেরই অপর নাম মানবাত্মার রোমান্টিক সৌন্দর্য পিপাসা। এই পিপাসার অবসান নাই। ইহা সীমা পরিবৃত নয়, ব্যবহারে ইহার ক্ষয় নাই, এ তৃষ্ণা কেবলি তৃষিতের তৃষ্ণা বাড়ায়। পৃথিবীর যেখানে যত রূপ, রস, সৌন্দর্য জলে স্থলে অন্তরীক্ষে বিপুল বিস্তারে ছড়াইয়া আছে এবং যাহা আস্বাদন করিবার জন্য মানুষের সমস্ত ইন্দ্রিয় অধীর হইয়া ওঠে, তাহা আপাতদৃষ্টিতে খণ্ড বিক্ষিপ্ত বলিয়া মনে হইতে পারে কিন্তু ঐ সৌন্দর্যের আধার ভিন্ন হইলেও মূলতঃ উহার উৎস এক। সেই মহা উৎসের সন্ধানে কোনদিনই পৌঁছান সম্ভব হইবেনা। সৌন্দর্য-পিপাসু মানুষ যতবার জিজ্ঞাসা করিবে, এ পিপাসার শেষ কোথায়, সে কোন শেষ উত্তর পাইবে না, কেবল জিজ্ঞাসাই অহরহ প্রতিধ্বনিত হইবে এবং কান পাতিয়া থাকিলে শোনা যাইবে ঐ প্রতিধ্বনির মধ্যে খানিকটা হতাশার কারুণ্যের, বিষাদের রেশ স্পন্দিত হইতেছে।

'সোনার তরী' কাব্যগ্রন্থের সেই সমস্ত কবিতাগুলি—যাহাতে ঐ সৌন্দর্যের আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ পাইতেছে তাহাতে ঐ সুর ঐ ধ্বনির অনুরণন শোনা যাইবে। সৌন্দর্যের যে বিপুল বন্যা, যে দুরন্ত প্রবেগ অনন্ত চরাচর আবরিত করিয়া রাখিয়াছে তাহার উৎস খুঁজিতে গিয়া কবিমন উধাও হইবার বাসনায় অধীর। কিন্তু কোথাও একটা সুনির্দিষ্ট সুসঙ্গত অর্থ খুঁজিয়া পাইতেছেন না, না অন্তরে না বাহির ভুবনে। রবীন্দ্রনাথ নিজেই বলিয়াছেন—আমি শীত গ্রীষ্ম বর্ষা মানিনি, কতবার সমস্ত বৎসর ধরে পদ্মার আতিথ্য নিয়েছি—বৈশাখের খর রৌদ্রতাপ, শ্রাবণের মুষলধারা বর্ষণে। পরপারে ছিল ছায়াঘন পল্লীর শ্যামশ্রী, এ পারে ছিল বালুচরের পাণ্ডুবর্ণ জনহীনতা, মাঝখানে পদ্মার চলমান স্রোতের পটে বুলিয়ে চলেছে দ্যুলোকের শিল্পী প্রহরে প্রহরে নানা-বর্ণের ছায়ার তুলি।

সৌন্দর্যের আলিঙ্গন কোথাও স্থির হইয়া নাই। উহার মধ্যে প্রবহমানতা রহিয়াছে, তৃষ্ণা বাড়ায়, পরিতৃপ্তির শেষ সীমান্ত রচনা করেনা। যে জ্যোতির তরঙ্গ অহরহ বিশ্বভুবনে প্লাবন বহাইয়া দিতেছে সেই জ্যোতির জ্যোতিকে—আদি জ্যোতিকে—খুঁজিয়া না পাইলে তার স্বরূপ বুঝিতে না পাইলে খোঁজার শেষ হইবে না। কবি-হৃদয় পৃথিবীর বস্তুপিণ্ডকে দুই হাত বাড়াইয়া প্রাণমন দিয়া আঁকড়িয়া ধরিতেছে; কখনো বস্তুকে ভালবাসিয়া ক্ষণিকের জন্য তিনি মুগ্ধমতি হইতেছেন। সে পরিচয় সোনার তরী কাব্যগ্রন্থের বহু কবিতায় ইতস্ততঃ ছড়ানো আছে কিন্তু মুহূর্ত্তেই সে সব খণ্ড বিক্ষিপ্ত রূপে কবির নিকট প্রতিভাত হইতেছে। সেখানে ভালবাসা আছে, আসক্তি আছে, তথাপি দারুণ অতৃপ্তির বেদনা অন্তরে গুমরিয়া মরিতেছে—বাসনার-সোনা অ-ধরাই রহিয়া গেল! অন্যত্র কবির আত্মজিজ্ঞাসা গভীর হইয়া উঠিয়াছে: আমি সত্যি সত্যি বুঝতে পারিনে আমার মনে সুখ দুঃখ বিরহ মিলনে পূর্ণ ভালবাসা প্রবল, না সৌন্দর্যের নিরুদ্দেশ আকাঙ্ক্ষা প্রবল।

এই অন্তর্দ্বন্দ্বই সোনার-তরী কাব্যের কবিতাগুলিতে প্রধানতঃ দুই-ভাগে বিভক্ত করিয়া দিয়াছে। ব্যবহারিক জীবনের প্রত্যক্ষগম্য প্রাত্যহিক ঘটনাপুঞ্জ যাহা কবির হৃদয়কে অধিকার করিয়াছে, তাহার মধ্যে কবি-কথিত ঐ সুখদুঃখ বিরহমিলনের কথা আছে এবং তাহার উপরেও এক উজ্জ্বল সৌন্দর্যের প্রলেপন আছে; কিন্তু তাহা খণ্ড-স্বরূপে ভাল-বাসার সীমায় বলয়িত। কচিৎ সীমার পরপারে দৃষ্টি প্রসারিত করিতে গিয়া মোহের বাধায় জড়াইয়া পড়িয়াছেন। মোহমুক্ত সুন্দরের আবাস স্থল খুঁজিয়া পান নাই। কিন্তু আলোচ্য কবিতা দুটিতে তাহার

ব্যতিক্রম ঘটিয়াছে। 'সোনার-তরী' ও 'নিরুদ্দেশ যাত্রা কবিতার মধ্যে বস্তুর ভার অকিঞ্চিৎকর হইয়া উঠিয়াছে। বস্তুকে স্বীকার করিয়াও তাহা অতিক্রম করিবার মন্ত্র জপিতেছেন কবি—কল্পনার ডানায় ভর করিয়া তাঁহার অনুভূতি দ্যুলোক ভূলোকে অখণ্ড অনন্ত সৌন্দর্যের উৎস সন্ধানে বাহির হইয়া পড়িয়াছে। ঐ অখণ্ড সৌন্দর্যবোধ সীমাকে লঙ্ঘন করাইয়া অসীমের পথে কবিপুরুষকে অ-শেষ যাত্রা করাইয়াছে। তাই বলিয়া কবি উদ্দেশ্যহীন ভাবে উদ্‌ভ্রান্ত যাত্রা করেন নাই। বরং উদ্দেশ্য স্থির আছে বলিয়াই তাঁহার যাত্রা দুর্বার হইয়া উঠিয়াছে স্পর্শ-কাতর কবি হৃদয়ে সৌন্দর্যের আবেগমুখর রাগিনী বেদনাপ্লুত অভিনব অপূর্ব রসের সৃষ্টি করিতেছে এবং ঐ বেদনাসিক্ত অতৃপ্তিই জীবনের অমোঘ সত্য বলিয়া প্রতীতির পর্য্যায়ে উঠিয়াছে। কবির এই প্রত্যয় বুদ্ধি নির্ভর নয়, হৃদয় পরিচালিত উপলব্ধির ফলশ্রুতি মাত্র। ডাঃ নীহাররঞ্জনের ভাষায়ঃ মানুষের চিত্ত রহস্য তাহার ভাব ও অনুভূতি যে নিসর্গানুভূতির সঙ্গে, নিসর্গ রহস্যের সঙ্গে কতখানি একাত্ম, রবীন্দ্রনাথের কবি-চিত্ত এই উপলব্ধিই আমাদের মনে জাগাইতেছে।' রূপকে আশ্রয় করিয়াই কবি মানস, অপরূপের অনির্বচনীয়ের যত কিছু আভাস ও ব্যঞ্জনা, ইঙ্গিত ও আকুতি। অপরূপ নিসর্গ-সম্ভোগ আবেগে উত্তাপে রমণীয় হইয়া ব্যক্ত হইতেছে। সৌন্দর্য পিপাসিত কবি-মানসের স্বরূপ।অনির্দেশ্য। অনন্ত অখণ্ড সৌন্দর্যের রোমান্টিক ব্যাকুলতায় আপনাকে বিকশিত করিয়া কার্য্যে নিরত তুলিয়া ধরিতেছে, একথা বলিতে আর দ্বিধা নাই। এই সৌন্দর্যের স্বরূপ খুঁজিতে গিয়া আইডিয়াল ও রিয়ালের দ্বন্দ্বে কবিমানস কখনও কখনও দিগ্‌ভ্রান্ত হইয়াছে বটে, কিন্তু 'নিরুদ্দেশ যাত্রা'র শেষ পর্যায়ে কবি মন অনেকটা দ্বন্দ্ব রহিত হইয়া উঠিয়াছে। তখন এ প্রত্যয় জন্মিয়াছে, বাহিরের ঐ নিয়ত দৃশ্যমান অনন্ত সৌন্দর্যরাশি এবং নিবিড় সৌন্দর্যানুভূতি একই আকর্ষণের দুইটি দিক, একদিক অপরদিককে প্রবল আকর্ষণ করিয়া দুইয়ে এক অখণ্ড সত্তায় মিশিবার ব্যাকুলতা প্রকাশ করিতেছে। সোনার তরী কাব্য সৃষ্টির কালে ঐ ব্যাকুলতার তাৎপর্য কবি খুঁজিয়া পান নাই। না পাইবারই কথা। রহস্যের অপার কৌতুক তাঁহার জিজ্ঞাসাকে বার বার শুদ্ধ করিয়া দিয়াছে—

যখনি শুধাই ওগো বিদেশিনী
তুমি হাস শুধু মধুর হাসিনী—
বুঝিতে না পারি কী জানি কী আছে
তোমার মনে

* * * * *

কী আছে হেথায়—চলেছি কিসের অন্বেষণে

আরো স্পষ্ট স্বীকার আছেঃ

সংশয়ময় ঘন নীল নীর, কোন দিকে চেয়ে
নাহি হেরি তীর
অসীম রোদন জগৎ প্লাবিয়া দুলিছে যেন।

* * * *

তারি মাঝে বসি এ নীরব হাসি হাসিছ কেন ?
আমি তো বুঝিনা কী লাগি তোমার বিলাস হেন॥

এই অভিনব 'বিলাসের' অর্থ—জিজ্ঞাসাই কবিপ্রাণকে চঞ্চল করিয়া তুলিয়াছিল। বাহিরে যাহা বিলাস বলিয়া ভ্রম হইতেছে তাহা যে বিলাস মাত্র নয়, সন্ধানী দৃষ্টিতে প্রথমে সে সত্য উপলব্ধির সীমায় ধরা পড়ে নাই। ক্রমে বাহিরের দৃষ্টি ঘুচিল, আত্ম মুখী কবি-মন বুঝিল পথ পরিবর্তন করিতে হইবে।

সোনার-তরী কবিতাটিতে প্রভাত বেলাকার পরিবেশের কথা বলা হইয়াছে—গ্রামখানি মেঘে ঢাকা প্রভাত বেলা ; অন্যদিকে 'নিরুদ্দেশ যাত্রায়'—আবার রজনী আসিবে এখনি মেলিয়া পাখা—বিবৃত হইয়াছে। জীবনের প্রভাত বেলা হইতে আবেগ মুখর কবি-প্রাণ সৌন্দর্যের সন্ধানে ছুটিয়া চলিয়াছে এবং বেলা যত বাড়িতেছে রহস্য ক্রমেই গাঢ়তর হইয়া উঠিতেছে, যেহেতু পরিণাম সম্পর্কে ধারণা অপরিচিত থাকিয়া যাইতেছে। তাহার ফলে দ্বিধা দ্বন্দ্ব ও সংশয়ে দোলাচল-চিত্ত-কবি সোনার তরী পর্বের পালা সাঙ্গ করিলেন। ঐ অভিব্যক্তিটি—সংশয়ময় ঘন নীল নীর কোন দিকে চেয়ে নাহি হেরি তীর—প্রায় সব কবিতার পশ্চাতেই জীবন্ত রহিয়াছে। জানা অজানার, আলো আঁধারের প্রেক্ষাপটে এই পর্বের কবিতাগুলি রচিত হইতেছিল। সূর্যোদয় ও বর্ণসমারোহে কবিতা দুইটি বিভাসিত—দুয়ের রঙ রূপ আলাদা, চেহারা বৈচিত্র্যপূর্ণ, কিন্তু সে তাই সুরের রকমফের, একই কবি চিত্তের আকাঙ্ক্ষার রূপ বৈভব—একথা মনে রাখিতে হইবে। কবির চিত্ত দ্বন্দ্ব কবিতার মধ্য দিয়া পাঠকের মানস দ্বন্দ্বের কারণ হইয়া উঠিয়াছে। পরবর্তী কাব্যগ্রন্থ 'চিত্রায়' কবি অধিকাংশে নির্দ্বন্দ্ব হইয়া উঠিয়াছেন এবং সেই সঙ্গে চিত্রার পাঠকও।

প্রেসক্রিপসান

শ্রীগোপী ভট্টাচার্য

(নাটিকা)
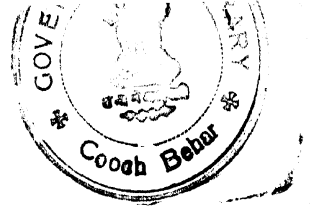
পাত্র-পাত্রী

পরেশ	...	প্রৌঢ়, সঙ্গীতরসিক, গৃহকর্তা
বঙ্কুবিহারী	...	ঐ বাল্যবন্ধু
সুজন জ্যোতি পীযূষ খোকন রবীন	...	পরেশবাবুর ছেলেরা
ডাঃ চৌধুরী	...	খ্যাতিমান চিকিৎসক
এসিষ্টান্ট	...	ঐ সহকারী
বিহারীমল	...	জনৈক রোগী
অপর্ণা	...	পরেশের স্ত্রী
লিলি	...	ঐ মেয়ে
সুরীতি	...	ঐ ছাত্রী
বনানী জলি	...	জ্যোতির বান্ধবী

পরেশবাবুর বৈঠকখানা—হারমোনিয়ামের সহিত তবলা বাঁধা শেষ হইল। তাহার পর কিছুক্ষণ অর্গাণ বাজিল

পরেশ। আজ কিন্তু তোমাকে বেশীক্ষণ শেখাতে পারব না সুরীতি। জানো তো, আমার মেজছেলে জ্যোতি কাল ফিরেছে বিলেত থেকে। তার পরিচিত বন্ধু-বান্ধবদের মধ্যে আজ অনেকেরই এখানে আসবার কথা। তাই এ বৈঠকখানা আজ আর বেশীক্ষণ আমাদের দখল করে রাখা চলবে না।

সুরীতি। গান শেখা আজ নয় বন্ধই থাক না মাষ্টার-মশাই? জ্যোতিদা দু'বছর পরে ফিরলেন বিলেত থেকে। আজ বরং তাঁর মুখ থেকে ওদেশের গল্প শুনে যাই। কখন ওঁরা সব আসবেন মাষ্টারমশাই?

পরেশ। এই সন্ধ্যের মধ্যেই সব এসে পড়বেন হয়ত। এখন পাঁচটা। এখনো ঘন্টাখানেক আমাদের গান গাওয়া চলতে পারে। নাও, কবীরের "রিনি রিনি বিনি চাদরিয়া" ভজনখানা গাও। দেখি ঠিকমত তুলতে পেরেছ কিনা।

অর্গানের সহিত অন্যান্য তারের যন্ত্রও বাজিল

সুরীতি। (গাহিল) "রিনি রিনি বিনি চাদরিয়া"

পরেশ। না না, এখনো ঠিকমত ওঠেনি দেখছি। আমি গাই, তুমি শুনে তারপর গাও। "রিনি রিনি বিনি চাদরিয়া" (অর্গাণের সুরটি বাজানর সঙ্গে সঙ্গে লিলির চীৎকার)

নেপথ্যে লিলির গলা শোনা গেল

লিলি। (চীৎকার করিয়া) মা-মা শীগ্‌গির এসে দেখে যাও। গরুতে বাগানের সব গাছ খেয়ে দিলে। মা-মা—

অর্গান থামিল

নেপথ্যে অপর্ণার গলা শোনা গেল

অপর্ণা। ওরে তাড়া-তাড়া, গরুটাকে তাড়া। এত কষ্ট করে কপির চারাগুলোকে বড় করলাম। সব খেয়ে গেল। বলি, বাড়ীতে এত লোক, সব যেন কেমন ধারা। ওরে লিলি, তাড়া মা। গরুটাকে তাড়া বাগান থেকে।

লিলি ও অপর্ণা। যাঃ-যাঃ-হেই-হেট্-হেট্—

অপর্ণা। ইস্ অমন কপির চারাগুলো। হতচ্ছাড়া গরুটা সব খেয়ে দিলে। নাঃ, এই শেষ। বাগানের আর দরকার নেই আমার। বাগানে কপি হলে যেন একা আমারি হবে।

বাগানের দরজা জোরে বন্ধ হইল

সামনে বসে রয়েছে তবু দেখবে না। চোখের ওপর দিয়ে গরুটা বাগানের কপি গাছগুলোকে সাবাড় করে দিয়ে গেল—গান শেখাচ্ছে বলে কি বাগানের দিকে নজর রাখা যেতো না? আমার কি অত সময় আছে! রান্নার এখনো আদ্দেক বাকী। যাই আবার রান্নাঘরে। ওরে লিলি—লিলি—

ক্রমশঃ দূরে চলিয়া গেল

সুরীতি। আজ গান থাক মাষ্টারমশাই। জেঠিমা খুব রেগে গেছেন, শুনলেন তো? সত্যি, কষ্ট করে পোঁতা কপির চারাগুলো খেয়ে গেল গরুতে, কষ্ট হবে না?

পরেশ। কিছুমাত্র ঘাবড়াবার কারণ নেই সুরীতি। তোমার জেঠিমার রাগ হোল একতরফা। মানে একস্‌পার্টি ডিক্রি। সুতরাং আমরা নিশ্চিন্ত মনে গেয়ে যেতে পারি।

সুরীতি। এবার থেকে আমি এসেই দেখে নেব বাগানের দরজা খোলা না বন্ধ। বাগানের সামনে বসে যখন গান শিখি, তখন আমারই উচিত নজর রাখা।

পরেশ। উচিত অনুচিতের কথা বলে আর লাভ কি।

অর্গান বাজিল

কিছুপরে লোকজন আসিতে আরম্ভ হইল। পরেশবাবু গান শেখানো বন্ধ করিলেন। পাঁচমিশালী কোলাহল। মেয়ে পুরুষের মিলিত কণ্ঠ। পরেশবাবুর উচ্চকণ্ঠ শোনা গেল

বনানী, জলি, সুজন, লিলির প্রবেশ

পরেশ। ওরে জ্যোতিকে ডেকে দে। তার জন্যে তার বন্ধু-বান্ধবরা এসে বসে রয়েছে অথচ জ্যোতির এখনো দেখা নেই। ও লিলি—তোর মেজদাকে ডেকে দে তাড়াতাড়ি।

জ্যোতির প্রবেশ

জ্যোতি। এই যে বাবা আমি এসে গেছি। Halloo! How Sweet evening! তোমরা সবাই এসে গেছ দেখছি। আমার কি সৌভাগ্য।

কোলাহল বাড়িল

সুরীতি। আপনি বরং গল্প বলুন জ্যোতিদা। ওদেশের মেয়েরা কেমন? আর বলুন, ওদেশের রাস্তা নাকি শুনেছি আমাদের দেশের মত মাটির নয়, তাই বুঝি?

জ্যোতি। One by one Please! এক সঙ্গে এত প্রশ্ন করলে আমি Atlantic এর মধ্যে পড়ে যাব। তাছাড়া তুমি এখেনে regular আস সুরীতি। পরে একদিন ধীরে-সুস্থে তোমার সব কথার জবাব দোব। আজ এদের সঙ্গে আলাপ করি। তারপর প্রদীপ! কেমন আছিস্। এই যে বনানীও এসে গেছ। very good, আরে ওটা কে? রতন না? Splendid! কি মোটাই না হয়েছিস এই দু'বছরে। চেনাই যায় না। Halloo! ঈক্ষ যে! বাঃ! জলিও এসে গেছ দেখছি। verygood. তোমাদের সকলকেই আমি আমার Heartiest welcome জানাচ্ছি…শোন, আমার বিলেত থেকে ফিরে আসার উপলক্ষে আমার ভাই বোনেরা একটা ছোটখাটো function এর আয়োজন করেছে। তোমাদের আপত্তি না থাকলে, I mean with all your Kind Permission সুরু করা যেতে পারে।

সকলে। Oh yes, Certainly.

অনুচ্চকণ্ঠে বনানী ও জলির আলোচনা

বনানী। জ্যোতিদা ঠিক আগের মতই আছে নারে জলি?

জলি। শুধু একটু Smart, আগের চেয়ে একটু বেশী forward লাগছে জ্যোতিদাকে। আমি ভেবেছিলাম, আমাকে হয়ত চিনতেই পারবে না।

বনানী। What's a wrong idea, জ্যোতিদা তেমন ছেলেই নয়। শুনেছি বিলেত ঘুরে এসে অনেকে বাংলা ভাষাই ভুলে যায়। কিন্তু দেখ জলি, জ্যোতিদাকে দেখলে কে বলবে, দু'বছর England এ কাটিয়ে এলো—

জলি। তুই ঠিক বলেছিস বনানী। আমি তোর সঙ্গে এ বিষয়ে এক মত।

জ্যোতি। Ladies and gentlemen! আজকের এই মনোরম সান্ধ্য আসরে সকলকেই আমি আমার আন্তরিক ধন্যবাদ জানিয়ে অনুষ্ঠান সুরু করছি। আজকের First item রবীন্দ্র সংগীত—by lily, আমার বোন School final candidate.

লিলি—

রবীন্দ্র সঙ্গীত গাহিল। গান শেষে সকলের হাততালি

সুজন। এবার একটু Test পালটানো যাক্। মানে আমি বলছি, এবার জ্যোতি আমাদের কিছু শোনাক।

সকলে। ঠিক বলেছেন—উত্তম প্রস্তাব।

জ্যোতি। যিনি order করলেন তাঁকে নিশ্চয়ই তোমরা চেন। আমার দাদা সুজন। কিন্তু দাদা, তুমি তো announce করে দিলে, এখন আমি যে কি শোনাই ভেবে পাচ্ছি না।

সুজন। কেন? তুই একটা English Tune শোনা—

সকলে। তাই হোক, তাই হোক—

জ্যোতি। বেশ।

ইংরাজী গান গাহিল ও গান শেষে সকলের হাততালি

জ্যোতি। The third item is ধন্যবাদ জ্ঞাপন। সমবেতভাবে ধন্যবাদ জানাচ্ছি আমরা—

সুজন, জ্যোতি, লিলি। (সমবেত ভাবে)—আমাদের আন্তরিক শুভেচ্ছা ও ধন্যবাদ গ্রহণ করুন।

লিলি। And the fourth and final item of this meetting is—ই-এ-টি-আই-এন-জি—

সকলের হাসি, হাততালি ও কোলাহলের মধ্যে নেপথ্যে পেয়ালা ডিসের শব্দ

সকলের প্রস্থান

অপর্ণা ও পরেশবাবুর প্রবেশ

অপর্ণা। নাচ-গান নিয়ে থাকলেই শুধু চলবে? আর কিছু করবার নেই?

পরেশ। কেন, আমি কি নাচ-গান নিয়েই আছি শুধু।

অপর্ণা। তাইতো দেখছি।

পরেশ। ও—আর অফিস? ডেলী প্যাসেঞ্জারী? নৈহাটী—কোলকাতা? এটা কে করছে শুনি?

অপর্ণা। ওতে আর বাহাদুরী কিসের! ওতো সবাই করছে। নিজের চোখ থাকলে আর আমাকে জিজ্ঞেস করতে না।

পরেশ। কেন? আমার চোখ তো ভালোই আছে।

চশমা নিয়েছি বটে, কিন্তু চল্লিশের পরে সে তো সবাই নেয় —আর তুমি বলছ কিনা আমার চোখ নেই! মানে, তুমি তোমার নিজের চোখ দিয়ে দেখেই বলছ তো?

অপর্ণা। তা নয় ত কি পরের চোখ দিয়ে দেখছি নাকি?

পরেশ। ঘোরতর সন্দেহ!

অপর্ণা। সন্দেহ? কাকে? আমাকে?

পরেশ। না না, তোমাকে কেন, তোমার চোখকে। তোমার Eye sightকে।

অপর্ণা। কেন, চোখে তো আমি ভালোই দেখছি। পরিষ্কার—এতটুকু ঝাপ্‌সা নয়।

পরেশ। সে তো আমিও জানি সব পরিষ্কার দেখছ। কিন্তু আমাকে? I mean আমার চোখকে? তাকাও —তাকাও আমার চোখের দিকে? কি দেখছ? ঝাপসা না পরিষ্কার?

অপর্ণা। ঝাপসা দেখতে যাবো কেন, পরিষ্কারই দেখছি।

পরেশ। কি দেখছ পরিষ্কার?

অপর্ণা। কি আবার, তোমার চোখ।

পরেশ। তবে···

অপর্ণা। যাও, তোমার সব তাতে তামাসা। ওই তামাসা নিয়েই থাকো, তাহলেই সব কিছু হয়ে যাবে।

পরেশ। মনে হচ্ছে তুমি খুব seriously কথাগুলো বলছ। কিন্তু আমি ঠিক বুঝে উঠতে পাচ্ছি না, মানে হঠাৎ এতদিন বাদে নাচ, গান আর আমার চোখ দুটোকে তুমি দু'চক্ষে দেখতে পাচ্ছো না কেন।

অপর্ণা। ছেলে-মেয়েদের বিয়ে দিতে হবে না?

পরেশ। ও—তাই বল। তা দিলেই হোল! ছুটি তো পাওনাই রয়েছে। বল তো দু'মাসের জন্যে একটা দরখাস্ত···

অপর্ণা। থাক, ঢের হয়েছে। মোল্লার দৌড় ওই মস্‌জিদ পর্য্যন্ত। তোমাকে বেশী করে বললে তুমি শুধু ওইটুকুই পারো—লম্বা ছুটি নিতে। ছুটি তো এর আগেও কতবার নিয়েছ। করতে পেরেছ কিছু?

পরেশ। অবশ্য সত্যি কথা বলতে কি, চেষ্টার মত চেষ্টা আমি করিনি। কতকটা জ্যোতির জন্যেও অপেক্ষা করছিলাম বলতে পারো। যাহোক, এখন সে ফিরে এসেছে। মাসখানেকের মধ্যে সাত-আটশো টাকা মাইনের চাকরীও পাবে। তারপর যে ছুটিটা নেব, দেখো একেবারে sure Goal. মানে এক seasonএ সব কটার···

অপর্ণা। বেশ, দেখাই যাক, কতদূর কি কর।

উভয়ের প্রস্থান

অন্ধকার

আলো জ্বলিল। সুজন অসুস্থ শরীরে প্রবেশ করিল ও লম্বা বেঞ্চে শুইয়া পড়িল। লিলির প্রবেশ

লিলি। কি রে বড়দা, অফিস থেকে ফিরে এসেই শুয়ে পড়লি যে?

সুজন। শরীরটা আজ খুব খারাপ দাঁড়ালেই চারদিক ঘুরপাক খাচ্ছে।

লিলি। (হাসিল) রোগ না ছাই! যত সব ম্যানিয়া!

ইংরাজী গানের সুর ভাঁজিতে ভাঁজিতে জ্যোতির প্রবেশ

জ্যোতি। কি ব্যাপার লিলি? বড়দা শুয়ে যে? Anything wrong?

লিলি। বড়দাকে জানিস না?

জ্যোতি। Yes. Yes। ডাক্তারে বলে রোগ নেই, বড়দার কিন্তু পেসেন্ট হবার সাধ। Young ageএতেই যদি এত রোগের সাধ, what will be in old age?

লিলি। সত্যি মেজদা, বড়দা যেন কি! এক এক সময় এমন করে যেন ভয় পেয়ে যেতে হয়!

সুজন। বেশ বেশ আমারি যত রোগের বাতিক। আমার ব্যাপারে তোদের মাথা গলাতে কে বলছে শুনি? যা এখান থেকে। আমাকে একলা থাকতে দে। "কি যাতনা বিষে বুঝিবে সে কিসে, কভু আশিবিষে দংশেনি যারে।"—

পীযূষ, খোকন ও রবীনের প্রবেশ

হঠাৎ রেডিওতে খুব জোরে রীলে শোনা গেল।

আঃ আবার রেডিও খুললে কে?

পীযূষ। আজ যে রীলে আছে—England vs. Australia.

খোকন। সেজদা, অষ্ট্রেলিয়া আজ সিওর ডিক্লেয়ার করবে না রে?

রবীন। করুক না, দেখিবি ইংল্যাণ্ড সেকেণ্ড ইনিংসে কি রকম পিটিয়ে রাণ তোলে।

সুজন। পীযূ, খোকন, রবীন, তোরা কি আমাকে বাড়ীতে থাকতে দিবি না? মা—মা—

অপর্ণার প্রবেশ

অপর্ণা। কি হয়েছে কি? এত চেঁচামেচি কিসের? হ্যাঁরে পীযূ, খোকন, রবীন, তোদের না সামনে পরীক্ষা? সন্ধ্যে থেকে রেডিও খুলে বসেছিস? যা পড়গে যা। লিলি রেডিও বন্ধ করে দে তো।

রেডিও বন্ধ হইল

পীযূ। বড়দার জ্বালায় একটু যে রীলে শুনবো তারও উপায় নেই।

অপর্ণা। না, রীলে শুনতে হবে না। এখন পড়গে যাও—হ্যাঁরে লিলি, উনি কোথায় রে?

লিলি। বাবা তো ওপরে। সুরীতিদিকে গান শেখাচ্ছেন।

অপর্ণা। গান আর গান। এদিকে যে কুরুক্ষেত্র হয়ে যাচ্ছে সেদিকে খেয়াল নেই—

জ্যোতি। (সুর করিয়া)

I sigh for Albion's distant shore,

It's valley's green, its mountain's high…

অপর্ণা। জ্যোতি, রাত-দিন ইংরিজী গান গাইলেই হবে? চল, তোদের খাবার তৈরী হয়ে গেছে, খেয়ে নিবি চ—

জ্যোতি। আমার কিন্তু তোমাদের ওই ঝাল ঝাল বেশী মস্‌লা দেওয়া রান্না একটুও ভালো লাগে না।

অপর্ণা। তোর খাবার আলাদা করেছি। সব সেদ্ধ।

জ্যোতি। চল লিলি, খেয়ে এসে English Tuneটা তোকে তুলে দোব।

সকলের প্রস্থান। সুজন রহিল

সুজন। (হতাশভাবে) বুঝবে না—বুঝবে না—এরা কেউ বুঝবে না। I wish to be alone—আমি একলা থাকতে চাই। Please please আমাকে একলা থাকতে দাও—একান্ত একলা…

অন্ধকার

আলো জ্বলিল। লিলি পড়া করিতেছে

লিলি। (পড়ছে) There was a harpsichord in one room, the other rooms were quite bare. I played a few tunes on the instrument. Then oppressed with past memories. I rushed out to give vent to my feelings.

বঙ্কুবিহারীর প্রবেশ

বঙ্কুবিহারী। পরেশ—পরেশ আছো নাকি?

লিলি। (পড়া বন্ধ করিয়া) বাবা ভেতরে আছেন। আপনি বসুন। আমি ডেকে দিচ্ছি—

দূরে শোনা গেল।

"বাবা—বাবা—"

লিলির প্রস্থান

চটি জুতার শব্দ। পরেশবাবুর প্রবেশ

পরেশ। আরে বঙ্কু যে! তারপর হঠাৎ এতদিন বাদে? তুমি তো শুনেছি বেনারস না লক্ষ্ণৌ কোথায় থাকো যেন?

বঙ্কু। বেনারসেও ছিলাম, লাখনোতেও ছিলাম। তবে সম্প্রতি বাড়ী করেছি মুংগেরে। সেখানেই ডোমিসাইল্‌ড। সত্যি, কতকাল পরে আমাদের দেখা হোল বলত পরেশ?

পরেশ। হাঁ্যা, সে কি আজকের কথা। আমরা তখন দক্ষিণেশ্বরে রেল কোয়ার্টারে থাকতাম। তখন বালী ব্রীজ Construction হচ্ছে। বাবা বেঁচে। তা প্রায় তিরিশ বছর হোল। মনে আছে তাস খেলার নেশাটা?

বঙ্কু। মনে আবার নেই। যতদিন বাঁচব ততদিন মনে থাকবে। শুধু কি তাস খেলা? মাছ ধরাটা?

পরেশ। মনে হয় এই তো সেদিন! অথচ তিরিশটা বছর কোথা দিয়ে কেটে গেল (দীর্ঘ নিঃশ্বাস) যাক্, এখন বল তোমার চল্‌ছে কেমন।

বঙ্কু। ওই কোন রকমে জোড়াতালি দিয়ে চালিয়ে যাচ্ছি এখনো। বুঝতেই তো পাচ্ছো মার্কেটের অবস্থা। ভালো আর বলি কি করে। শুধু দিনগত পাপক্ষয়।

পরেশ। এখনো সেই কণ্ট্রাক্টরী নিয়েই আছ তো?

বঙ্কু। তা ছাড়া আর উপায় কি! আজকাল যে keen competition তাতে করে এ বিজনেসে stick করে থাকাই মুস্‌কিল। তবে কি জানো, এতদিন এ লাইনে রয়েছি—বিস্তর টাকা-পয়সা নানাদিকে ছড়িয়ে রয়েছে, তাই ইচ্ছে থাকলেও ছেড়ে আসবার উপায় নেই। তোমার আর কি বল, মোটা মাইনের চাকরী নিয়ে নিশ্চিন্তে আছো—

পরেশ। তা এক রকম বলতে পারো।

বঙ্কু। তার ওপর ছেলে-মেয়েদের লেখায় পড়ায় সব দিকেই মানুষের মত মানুষ করে তুলছ—একি কম সৌভাগ্যের কথা।

পরেশ। সে সব তোমাদের পাঁচজনের শুভেচ্ছায় হচ্ছে ভাই। আমি কে? নিমিত্ত মাত্র। তা তুমি কি direct মুংগের থেকে আস্‌ছো নাকি?

বঙ্কু। না কাঁচড়াপাড়ায় বোনের বাড়ীতে উঠেছি। অনেকদিন ওদের দেখিনি। তা ছাড়া মেয়েরাও বড় হয়েছে। তাদের বিয়ের চেষ্টাও হবে আর আত্মীয় স্বজনের সাথে দেখা সাক্ষাৎও হবে, এই মনে করেই এসেছি।

পরেশ। তোমার মেয়ে কটি?

বঙ্কু। তিনটি। বড় এবার এম-এ দেবে। মেজো বি-এ। ছোট স্কুল-ফাইনাল।

পরেশ। বাঃ! আর ছেলে?

বঙ্কু। সে তো জানোই। Nil.

পরেশ। তা ভালো। শতপুত্র সমা কন্যা।

বঙ্কু। তা-তো বুঝলাম ভাই। কিন্তু এখন যে কন্যাদায়ে ঠেকেছি।

পরেশ। কেন? তোমার মেয়েরা তো সব দেখতে শুনতে ভালোই।

বঙ্কু। তাহলেও হোচ্ছে কই! সমাজ, জ্ঞাতি ছেড়ে বিদেশে পড়ে থাকি। কে আর যোগাযোগ করছে বল? শোন পরেশ, তোমার কাছে এসেছি যে কারণে সেটা বলেই ফেলি। শুনলাম তোমার দু'ছেলেরই বিয়ে

দেবে তুমি। তা যদি অন্ততঃ আমার একটি মেয়েকেও তুমি নাও, তাহলে আমি at least one third কন্যাদায় থেকে মুক্ত হোতে পারি।

পরেশ। বিয়ে দোব ঠিকই। ছেলের, মেয়ের সকলেরই দিতে হবে। তা বেশ! তুমি আমার বাল্য-বন্ধু। তুমি নিজে যখন প্রস্তাব নিয়ে এসেছ তখন তোমার দাবী সকলের আগে। কিন্তু মুংগের যাওয়া আমার পক্ষে···

বন্ধু। আরে না না, অতদূরে তোমাকে কষ্ট করে যেতে হবে না। আমি সপরিবারেই এসেছি। মানে কড়াপাড়ায় গেলেই মেয়ে দেখাতে পারবো।

পরেশ। বেশ। বাড়ীতে একটু পরামর্শ করে নি। তারপর তোমাকে জানাবো—কি বল?

বন্ধু। যাই হোক ভাই, মোট কথা একটু মনে রেখো আমাকে। তা হলেই হবে। আজ বরং আমি উঠি। তুমি গেলে তারপর একদিন অনেক সময় হাতে নিয়ে আসা যাবে।

পরেশ। সে কি! এতদিন পরে এলে, সামান্য একটু চা অন্ততঃ···

বন্ধু। না না, আজ থাক। পরে আর একদিন হবে—

উভয়ের প্রস্থান—অন্ধকার

আলো জ্বলিল। অপর্ণা ও পরেশবাবু

অপর্ণা। মেয়ে তো দেখে এলে। তোমার বন্ধুকে কথাও দিয়ে এলে। এদিকে সুজন যে বেঁকে বসেছে। সে বলে তার শরীর খারাপ। এখন বিয়েই করবে না।

পরেশ। মহা মুস্‌কিলেই পড়া গেল দেখছি। বাড়ীর বড় ছেলে। কতখানি নার্ভ ওর ষ্ট্রং হওয়া উচিত। তা নয়। রোগ আর রোগ।

অপর্ণা। ওর রোগ না হয়েও যদি ও রুগী হয় তাহলে আমি তো মহারুগী। রোজ রাতে আমার একটু একটু জ্বর হয়। কিন্তু তাই বলে আমি কি বিছানায় শুয়ে আছি?

পরেশ। জ্বর হয়! রোজ রাতে!

অপর্ণা। হোক। তোমাকে আর এ নিয়ে মাথা ঘামাতে হবে না। আমার জ্বর আমি বুঝবো।

পরেশ। না না One stitch in time saves nine. এখুনি step নেওয়া দরকার। আমি বরং ডাঃ গুপ্তকে আজই একটা কল্ দিয়ে আসি।

অপর্ণা। ছেলেদের আর দোষ কি! নিজেই যখন এত ব্যস্তবাগীশ। বলছি না—আমার জন্যে মাথা ঘামাতে হবে না।

পরেশ। মাথা যে আপনিই ঘেমে যাচ্ছে। মানে তোমার জ্বর···

অপর্ণা। তাতে কি!

পরেশ। Treatment করাতে হবে না?

অপর্ণা। মিক্‌শ্চার, ইঞ্জেক্‌সান্ ওতে কিছু হবে না। আমার জ্বর ছাড়বে সেদিন, যেদিন সুজন, জ্যোতি আর লিলির বিয়ে আমি দিতে পারবো।

পরেশ। ও—তাই বল। আসলে তোমার মনের জ্বর।

অপর্ণা। সে তুমি যাই বলগে যাও। আমার কিন্তু আর দেরী সইছে না। এমনিতেই সব বিয়ে দেবার বয়স পার হোতে চল্‌লো।

পরেশ। কোথায় আছ তুমি। এটা হোল বিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি। এখন আর বিয়ের বয়স বলে কিছু নেই। যখন হোক দিলেই হোল।

অপর্ণা। তাই বলে কি চুপ করে বসে থাকতে হবে নাকি?

পরেশ। আরে, তা কে বলছে। এই দেখো না আমিই কি চুপ করে বসে আছি? দু'মাস ছুটির মধ্যে সবে তো একমাস কেটেছে। এখনো পুরো একমাস ছুটি হাতে আছে। এর মধ্যে সব কিছু করবই। যাকে বলে determined.

অপর্ণা। লিলিকে যে দেখে গেল তারাও তো একটা 'হ্যাঁ' কি 'না' খবর পাঠালে না। নয় আরো দু'এক জায়গায় চেষ্টা কর। কিন্তু সুজনের জন্যে আমি যেন মহাভাবনায় পড়েছি। বাড়ীর বড় ছেলে, যদি রোগ রোগ করে বিয়ে না করে, তাহলে আমিও বলে রাখছি—কোন ছেলে মেয়ের বিয়ে আমি দোব না। রোগের নাম গন্ধ নেই—শুধু রোগ—রোগ—

সুজনের প্রবেশ

সুজন। বেশ তো, আমাকে বাদ দিয়ে জ্যোতির বিয়ে দাও না। আমি মত দিয়ে দিচ্ছি।

পরেশ। দেখ সুজন, be serious. তুমি বোধ হয় জানো না, আমি বন্ধুকে এক রকম final দিয়ে এসেছি। আর সত্যিই, মেয়েটি সর্বসুলক্ষণান্বিতা। জ্যোতির সম্বন্ধও ঠিক হয়ে গেছে। লিলির সম্বন্ধে কোথা থেকে একটা final খবর এলে ভাবছি আসছে ফাগুনেই আমি তিনটে function কয়েক দিনের intervalএ সেরে ফেলবো।

অপর্ণা। তাছাড়া, এতবড় সংসারের যাবতীয় কাজ আমি আর পেরে উঠ ছি না।

সুজন। তোমরা বুঝতে পারছ না। আমি helpless. আমি যে কি শরীর নিয়ে রোজ office করছি সে আমি তোমাদের বোঝাতে পারবো না। রাস্তা দিয়ে হাঁটবার সময় শুধু মনে হয় এই বুঝি মাথা ঘুরে পড়ে গেলাম।

পরেশ। চিকিৎসারও কিছু বাদ দেওয়া হয়নি। এ্যালোপ্যাথী, হোমিওপ্যাথী, সাইকোপ্যাথী, কোব্‌রেজী

সবই তো হয়েছে। মায় রেডিওলজিষ্ট, কার্ডিওলজিষ্ট, এ্যাষ্ট্রোলজিষ্ট যেখানে যা নাম করা আছে সকলের treatment-ইতো করানো হয়েছে। তাতেও যদি তোমার রোগ না সেরে থাকে তাহলে বলতে হবে রোগই নয়। বাকি আছে—ইউনানী হেকিমী। তা বলতো কালই একজন হেকিমকে নয় ডেকে আনি!

সুজন। সবই মানলুম। কিন্তু আমার Palpitation of the heart! upward motion of the wind? মাথা ঘোরা? weakness? এসব কি মিথ্যে? মোটকথা, বিয়ে এখন আমি করব না। তোমরা জ্যোতির বিয়ে দাও, লিলির বিয়ে দাও। আমাকে disturb কোর না।

অপর্ণা। বেশ! তোমার যা খুসী কর। আমিও আর এতবড় সংসারের চাকা নিত্যি ঘোরাতে পারবো না।

জোরে কড়া নড়ার শব্দ

দেখতো, লিলি, কে ডাকছে বাইরে—

লিলি। (দূর থেকে)—মা, পোষ্টম্যান্। রেজেষ্টি চিঠি বাবার নামে। সই করে নিতে হবে।

পরেশ। কোই—এদিকে নিয়ে আয় তো মা।

লিলি প্রবেশ করিল ও চিঠি দিল। খাম খুলিয়া চিঠি পড়িলেন

শোন শোন, সেই যে প্রফেসার ছেলেটি লিলিকে দেখে গিস্‌লো। তার মা লিখছেন—লিলিকে খুব পছন্দ হয়েছে। ফাগুন মাসেই তিনি ছেলের বিয়ে দিতে চান।

অপর্ণা। যাক্, নিশ্চিন্ত হলাম। কালো মেয়ে বলে লিলির জন্যে আমার দুর্ভাবনার অন্ত ছিল না: এখন ভগবান সবই তো করছেন, যদি সুজনের একটু সুমতি দিতেন তাহলে আমার এ সংসার স্বর্গের চেয়েও বড় হোত।

অন্ধকার

আলো জ্বলিল

জ্যোতি আর লিলি রবীন্দ্র সঙ্গীত গাহিতেছে "জীবনের পরম লগন কোর না হেলা।" দু'লাইন গাহিবার পরেই বঙ্কুবিহারীর গলা শোনা গেল

বঙ্কু। পরেশ—পরেশ আছ—

বঙ্কুবিহারীর প্রবেশ। গান বন্ধ হইল

জ্যোতি। কে? ও—আপনি। আসুন আসুন। বাবা আছেন। লিলি, বাবাকে ডেকে দে।

লিলির প্রস্থান

বঙ্কু। তুমিই জ্যোতি?

জ্যোতি। আজ্ঞে হ্যাঁ।

বঙ্কু। তারপর, আজ ছুটিতে এসেছ?

জ্যোতি। হ্যাঁ। আমাকে মিল কোয়ার্টারেই থাকতে হয়। শনিবারে আসি আবার সোমবারে জয়েন্ করি।

বঙ্কু। এখন আছ কোথায়?

জ্যোতি। টিটাগড়ে।

বঙ্কু। বাঃ! বাড়ির কাছে ভালোই হয়েছে।

লিলির প্রবেশ

লিলি। মেজদা, মা ডাকছে।

জ্যোতি। লিলি, বাবা কি করছে রে? বঙ্কুবাবু বসে রয়েছেন—

লিলি। বাবা আপনাকে একটু বসতে বললেন। আপনার চা জলখাবার নিয়ে আসছি এখুনি। আজ কিন্তু আপনাকে কিছু খেয়ে যেতেই হবে। চল মেজদা একবার ভেতরে—

জ্যোতি। আচ্ছা আপনি বসুন। আমি ভেতরে যাচ্ছি। কিছু মনে করবেন না—আপনাকে একলা বসিয়ে রেখে গেলাম বলে।

বঙ্কু। ঠিক আছে। আমি তো আর বাইরের লোক নই।

জ্যোতি ও লিলির প্রস্থান

পরেশবাবুর প্রবেশ। চটি জুতার শব্দ

এই যে পরেশ, কোন খবর না দিয়েই চলে এলাম!

পরেশ। কেন, তুমি কি আগে বরাবর খবর দিয়েই আসতে নাকি?

বঙ্কু। শোন পরেশ, তোমার চিঠি আজ সকালের ডাকে পেয়েছি। তুমি নিজের মুখে Final কথা দিয়ে এসে এমন কি দিনক্ষণ ঠিক করে এসে আবার opinion change করবে এ আমি ভাবতেই পাচ্ছি না।

পরেশ। I am really sorry বঙ্কু। আমি মহা অন্যায় করে ফেলেছি। তোমার মেয়েটিকে দেখে আমার খুব ভালো লাগলো। তুমি আমার বাল্যবন্ধু। একসঙ্গে কত তাস খেলেছি, মাছ ধরেছি। Out of joy তোমাকে কথা দিয়ে ফেললাম। Excuse me বঙ্কু। তোমাকে এই অনর্থক কষ্ট দেওয়ার ইচ্ছে আমার এতটুকু ছিল না।

বঙ্কু। তা নয় বুঝলাম। কিন্তু ব্যাপারটা কি? সুজন কি বিয়েতে মত দিচ্ছে না?

পরেশ। ঠিক তাই।

বঙ্কু। কারণটা কি?

পরেশ। সবই তো তোমাকে বলেছি ভাই।

বঙ্কু। Dreaming of disease! রোগের বাতিক।

পরেশ। তুমি কি সুজনের সঙ্গে কথা বলবে? তাকে ডাকবো?

বঙ্কু। তা বলতে পারি।

পরেশ। ও লিলি—লিলি—

লিলি। (দূর হইতে)—যাই বাবা—

পরেশ। ওরে সুজনকে একবার বাইরের ঘরে আসতে বল—

অন্ধকার

আলো জ্বলিল। লিলি ও জ্যোতির প্রবেশ

লিলি। মেজদা, কি হোল শেষ পর্য্যন্ত ? বড়দা কি বললে বঙ্কুবাবুকে ?

জ্যোতি। কি আবার বলবে। বঙ্কুবাবুর সঙ্গে কথন কথায় পেরে ওঠে। বঙ্কুবাবুই যথন শেষে বললেন, আমরা নিজেরা যথন কোন conclusion-এ আসতে পাচ্ছি না তথন মধ্যস্থ মানা যাক কোলকাতার শ্রেষ্ঠ চিকিৎসক Dr Chowdhuryকে। তিনি যা বলবেন তাই হবে। অর্থাৎ তিনি যদি বলেন, you are quite fit for marriage তাহলে ফাগুনেই, আর যদি বলেন not fit তাহলে ··

লিলি। ও—তাই বুঝি আজ ভোরবেলা বঙ্কুবাবু বড়দাকে ডেকে নিয়ে গেলেন ?

জ্যোতি। হ্যাঁ। Dr. Chowdhuryর কাছে নিয়ে গেলেন বঙ্কুবাবু।

লিলি। দেখিস, আমি বলে রাখলাম, Dr. Chowdhury বলবেন···

জ্যোতি। সে আমিও জানি। You are quite fit for marriage.

দুজনের হাসি

প্রস্থান—অন্ধকার

Dr. Chowdhuryর Chamber. ঘণ্টা বাজার শব্দ। রোগীদের অপেক্ষা করিবার স্থান। রোগীদের অনুচ্চকণ্ঠে আলোচনা

Asstt. (জোরে) বিহারীমল ঝনঝনিয়া—

বিহারীমল। হা-জি-র। কোন দিকে সে যাবে থোড়া বাতলিয়ে দিবেন হুজুর। হামি নয়া আদমী আছে।

Asstt. সোজা চলে যান। পয়লা, দোসরা, তিসরা কামরামে—

বিহারী। বহুৎ বহুৎ সুক্রিয়া—

বঙ্কু। ও মশাই, একটু kindly শুনুন না এদিকে—

Asstt. কি করতে পারি বলুন ?

বঙ্কু। না, মানে, অনেকক্ষণ থেকে বসে আছি। দূর থেকে এসেছি। যদি দয়া করে waiting listটা দেখে বলে দেন—সুজন রায় নামটা আর ক'জনের পরে আছে।

Asstt. সু-জন-রায়—ও—এইতো। Next call.

বঙ্কু। অশেষ ধন্যবাদ।

Asstt. সুজন রায়—

বঙ্কু। এসো বাবা, আমাদের ডাক এসেছে।

অন্ধকার

আলো জ্বলিল। Dr. Chowdhuryর খাস কামরা। সুজন ও বঙ্কুবিহারীর প্রবেশ

ডাঃ চৌধুরী। হুঁ—বছর দু'এক আগে একবার অসুথ হয়েছিল ?

সুজন। আজ্ঞে হ্যাঁ। তারপর থেকেই···

ডাঃ চৌধুরী। কিচ্ছু বলতে হবে না। আমি দেখছি।

ঘণ্টা বাজার শব্দ

Asstt. এর প্রবেশ

Asstt. কিছু বলছেন Sir ?

ডাঃ চৌধুরী। নার্সকে বলুন operation room ready করতে। Major operation.

Asstt. আমি এখুনি ready করতে বলছি Sir.

ডাঃ চৌধুরী। বেশী সময় দেওয়া যাবে না। Quick —Quick—Major operation.

ঝাঁঝের শব্দ। Asstt. এর দ্রুত প্রস্থান

সুজন। Major operation !

ডাঃ চৌধুরী। হ্যাঁ, Skull সেরিব্রাল Tissue—

সুজন। Operation ! Skull ! মানে আমার···

ডাঃ চৌধুরী। Wait, wait my young friend. তার জন্যে তো আমি আছি। এত বড় Medical Science আছে। বড় বড় ল্যাবরেটরীতে রাতদিন Research চলছে—

সুজন। কিন্তু আমার Skull এতো কিছু···

ডাঃ চৌধুরী। No—no—not your's বিহারীমল ঝনঝনিয়া—

সুজন। উঃ! তাই বলুন। আমার নয়। কিন্তু আমার Skull ঠিক আছে তো ?

ডাঃ চৌধুরী। Absolute normal পালস্ প্রেসার, হার্টস্ লাংগস্—কোথাও আর রোগের চিহ্নমাত্র নেই।

সুজন। কিন্তু Palpitation of the heart ? Upward motion of the wind ! মাথাঘোরা ? weakness ?

ডাঃ চৌধুরী। আছে—আছে—রোগ এথনো আছে। কিন্তু বড় মারাত্মক জায়গা।

সুজন। এর কি কোন treatment নেই ডাক্তারবাবু ?

ডাঃ চৌধুরী। Don't be nervous. আছে বৈকি ! নিশ্চয়ই আছে। আমি লিখে দিচ্ছি Prescription কিন্তু mind that, prescription বাড়ী গিয়ে পড়বে। এথেনে নয় কিম্বা পথে যেতেও নয়। Promise কর—

সুজন। আজ্ঞে হ্যাঁ promise করছি—বাড়ী পৌছে তবে আপনার Prescription পড়ব।

ডাঃ চৌধুরী। Well.

Letter Pad হইতে কাগজ ছিঁড়িলেন

সুজন। আচ্ছা নমস্কার।

ডাঃ চৌধুরী। নমস্কার। wish you good luck ! Next—

ঘণ্টার শব্দ

Next···

পরেশবাবুর বৈঠকখানা। পরেশবাবু সুনীতিকে গান শেখাচ্ছেন

পরেশ। তাহলে বুঝতে পারলে সুরীতি, শ্রুতি কাকে বলে? আর সেই বাইশটা শ্রুতির কি কি নাম?

সুরীতি। হ্যাঁ মাষ্টার মশাই। আচ্ছা, আপনি যে সেদিন স্বাভাবিক ঠাটের কথা বলেছিলেন, সেটা ঠিক কি জন্যে বলেছিলেন ভুলে গেছি—

পরেশ। হ্যাঁ, স্বাভাবিক ঠাট হোল, যার মধ্যে শুদ্ধ স্বরের ব্যবহার আছে—

বঙ্কু। পরেশ—পরেশ—

বঙ্কুবিহারী ও সুজনের প্রবেশ

পরেশ। এই যে তোমরা এসে গেছ। এত তাড়াতাড়ি ফিরবে আমি আশাই করিনি। কি খবর বল। Dr Chowdhury কি বললেন?

বঙ্কু। এই নাও Prescription. আমরা দুজনে এখনো কিছুই জানি না। ডাঃ চৌধুরী promise করিয়ে নিয়েছেন—আমরা যেন বাড়ী পৌঁছে prescription পড়ি।

পরেশ। খুব রহস্যজনক ব্যাপার বলে মনে হচ্ছে! আমার চশমাটা আবার ভেতরে রয়েছে। আচ্ছা সুজন, তোমার prescription তুমিই পড়ে শোনাও।

সুজন। বেশ, আমাকেই দাও, আমি পড়ে শোনাচ্ছি।

পরেশ। কি পড়? চুপ করে রইলে কেন? সুজন—সুজন—

বঙ্কু। কি হোল সুজন? পড়? লেখা বুঝতে পারছ না?

সুজন। আমি পড়তে পারব না। আপনারা পড়ে নিন। এই রইল prescription.

বঙ্কু। তা তুমি চলে যাচ্ছো কেন? তুমিও শোন। সুজন—সুজন—

পরেশ। ওকে যেতে দাও বঙ্কু। এখন তুমি পড় দেখি। আমি ক্রমশঃ impatient হয়ে পড়ছি।

বঙ্কু। শোন পরেশ—Dr. Chowdhury লিখছেন—"The only treatment is to marry immediately—otherwise the case will be complicated and out of treatment."

পরেশ। কি? কি লিখেছে বঙ্কু? পড়—পড়—আবার পড়—

বঙ্কু। (আবার পড়িলেন) মানে, যদি ছেলেকে বাঁচাতে চাও, এখুনি বিয়ে দাও।

পরেশ। (আনন্দে চীৎকার করিয়া) ওরে ও জ্যোতি, লিলি—কোথায় গেলি সব?

জ্যোতি ও লিলির প্রবেশ

জ্যোতি, লিলি। কি হয়েছে বাবা, কি হয়েছে?

পরেশ। ওরে তোর বড়দার বিয়ের কথা এখুনি যে পাকা হয়ে গেল। এ একেবারে ডাঃ চৌধুরীর prescrition—Dr. Chowdhury—ডাক ডাক সবাইকে ডেকে আন—আর বঙ্কুর জন্যে নিয়ে আয় এক থালা রাজভোগ—

সকলের কোলাহল, হাসি, শাঁখবাজার শব্দ। সানাই

শেষ

ইস্পাত

রত্নেশ্বর হাজরা

কঠিন মৃত্যুর তরে উদ্ধত ধারালো এ-সঙ্গীণ:
কে তুমি এখানে? সরিয়ে নাও।
এ সীমান্তে তুমি কি প্রহরী?
কিসের প্রহরী তুমি—শান্তি না যুদ্ধের?

আমার মায়ের কান্না শুনেছ কি!
অন্ধকারে এখনও গ্রামের সীমানা ছেড়ে আসে
বুলেটে রক্তাক্ত বুক লাল হ'য়ে ভিজে গেছে মাটি।
আমাকে যেতেই হবে আজ।

তোমার সঙ্গীণ নিয়ে দাঁড়াও
চূর্ণ যদি হয় হোক বুক
রক্ত যদি ঝ'রে যায় থাক তবে সীমান্তের এই অন্ধকারে
বিবর্ণ হিমেল রাতে জমে থাক বনের প্রহরে;
একা তবু যাবো আমি
আমি আজ মায়ের সান্ত্বনা।
আমার শিরায় আজ আশ্বিনের ঝড়
প্রহরী তোমার শক্তি থাকে থামাও
বিদ্রূপে চীৎকারে কিংবা সঙ্গীণে বুলেটে।

(৩৩)
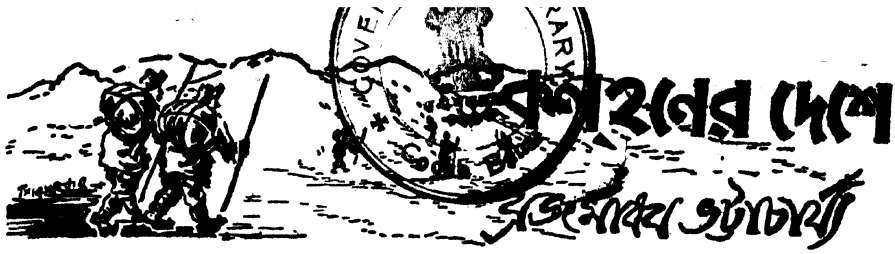
শেষ নাগ

কুঠুরিটার বাহিরে একটি গুজরাতি তরুণ দাঁড়িয়ে। বললে,—"জায়গা নেই এঘরে। আমরা আছি পাঁচজন। এক সাধুবাবাও আছে। ঘর তো ঐ একটি। রান্নাঘর বলে একটা চোরকুঠুরি আছে। আপনারা যে সাত জন। কুলুবে কেন?"

বেণু শুনে বলে—"শোনো দাদা, কি করবে করো।"

শেষনাগের শীত মনে থাকবে। বরফ হয়ে যাচ্ছে জল। হাত পায়ের ডগা, নাকের ডগা বারবার ক্রীম দিয়ে ঢাকছি। শীতের বোধ নেই মাংসে বা ত্বকে। সে বোধ বাসা নিয়েছে হাড়ে, চোখের গর্ত্তের ভিতরে, কানের পর্দার মধ্যে। সে বোধ পেটটাকে মোচড় দিচ্ছে, পায়ের তলায় জ্বালা ধরিয়েছে, মাড়ীর গোড়ায় রক্ত ঠেলে এনেছে। নিঃশ্বাস প্রশ্বাসে কষ্ট নেই ; কিন্তু রক্তের চাপ বেড়ে গেছে। নাক দিয়ে রক্ত পড়ছে। এখন কোথাও আগুন জ্বালতে পারলে হয়।

আমি বলি—"এক কম্বলে শত সন্ন্যাসী। ভাবনা কি। আমরা সাতজন নই, আরও পাঁচজন আসছেন।" রামকিশোর বংশল আসছে তার স্ত্রী, দাদা আর ভ্রাতৃবধূকে নিয়ে ; সঙ্গে কোটেশ্বর।

তারপরেই বেণু আর জগজীবনকে বলি—বস্তানা খুলে একটা কোণে জড়ো হয়ে শুতে। অসিতকে বলি—প্যাকিং বাক্স খুলে খাদ্যগুলি বার করতে ; মুনীশ্বর আর গুপ্তাকে বলি উনুন ধরাতে, আর ভর্মাকে বলি গুন্ গুন্ করে গান ধরতে।

কোণের দিকে প্রায় নগ্ন এক সন্ন্যাসী চুপ করে বসে আছেন। গায়ে একটা নগণ্য কম্বল। গরম বা হচ্ছেন তা লম্বা ছিলিমের জোরে।

এখনই লাগলো গোল। গুজরাতী ওরা বণিক এবং বেশ মাজাঘষা বণিক, যাদের চামড়া হাড়ের মতো শক্ত, আর হাড় চামড়ার মতো তুলতুলে। আশীবছর বয়স বৃদ্ধের। চক্ষে দৃষ্টি আদৌ নেই। ঝম্পানে করে চারজন বয়ে এনেছে সেই জরাজীর্ণ দেহ। ঝম্পানের প্রণামী একশত রৌপ্যমুদ্রা। সঙ্গে সহধর্মিণীটি ড াঁটো এবং ড াঁটোতর পুত্রবধূ আছেন জবরদস্ত স্বামীর আওতায়। বাইরের কিশোরটি দেবর হবেন বুঝি বা। রান্নাঘরে প্যাকিং বাক্স খুলে জিনিষপত্র নামাচ্ছি। যতক্ষণ চায়ের সরঞ্জাম নামাচ্ছি ততক্ষণ ওরা দুটী ললনা আমায় একেবারে শতদৃষ্টিতে দহন করছে। বেণু তার প্রকৃতিসুলভ অসহিষ্ণুতায় প্রায় বাগ্মী হয়ে পড়ছিল। আমি বল্লাম, "তুই যে মেয়ে, সে কথা চেপে যা। কাজ করে যাও ঘরে। এ ঘরে কিন্তু আসিস না। এলেই ঝগড়া বাধবে।" কিন্তু ওরা কাজ এগুতে দেয়না। যত বোঝাই আমরা খাওয়া সেরে ওঘরে চলে যাবো—তখন তোমরা শুতে পাবে, তত

এই বরফের চড়াই উঠতে কষ্ট হয়েছিল

ওরা বলে এ ঘরে রান্না করাটাই জুলুম। ওরা লাড্ডু পুরী প্রভৃতি দ্রব্য এনেছিল। খোলো, খাও। আমার তখন খিচুড়ী পর্ব চলবে।

ওরা যখন দেখলো দাল, চাল, কপি, নারকোল, মূলো, পেঁয়াজ, আদা, ঘী সবই বেরুচ্ছে আমার সেই প্যাকিং বক্স থেকে তখন প্রমাদ' গুনলো। ভরবার সময় যদি ওদের লাড্ডু বা পুরীর ডাব্বাটা প্যাকিং বক্সের গহ্বরে চলে যায়—অবশ্য আমাদের অজ্ঞাতেই—কারণ আমরা তো দেখতে শুনতে ভদ্রই—তবে কি অবস্থাটা হবে। ওদের সমাকুলতার প্রতি সহৃদয়তা একটু না দেখিয়ে শয়তান অসিত বল্লে—"তাতে আর কি এমন হবে, লাড্ডু বামুনের পেটেই যাবে।" এরপর ওরা যেন সাপের ছোবলের মতো অসিতকে এড়াতে লাগলো।

অসিত কখন ওদের লাড্ডুর ডিব্বা থেকে দুটো বার করে এনে

পিরামিড পিক পেরুলা

খেতে আরম্ভ করেছে আর বলছে—"বাঃ বেশ লাড্ডু তো!" তখন সেই পাপিপথ আগলাবার জন্য সদাশিবরাও ভাওয়ের বিক্রমে ঝাঁপিয়ে পড়লো যুবক গুজরাতীটি। অসিত তখন মহাভারতের ভীম। খাচ্ছে, বকরাক্ষস তার করে কি।

আমি আর সইতে না পেরে সঙ্গে-আনা ব্রাণ্ডির বোতলটা খুলে বললাম—"একটু মদ খাবেন নাকি মশায়। শীতের দেশে গরম করবে শরীর।"

ব্যস মদের বোতল, পেঁয়াজ আর কাচ্চি রসুই তিন শত্রুর ধাক্কায় সদাশিব রাও ভাও একেবারে ফেরার। শয়তান অসিত আবার এর মধ্যে দিয়ে বল্লে—"মাছ ভাজা কখানা বার করো ভর্মা।" ভর্মা বললে—"এই যে দিচ্ছি।" যদি ঘর ছেড়ে বাইরে থাকার জো থাকতো ওরা পালিয়ে যেতো। তখনকার মতো রান্নাঘর ছেড়ে বাইরের ঘরে বসে ওরা গজর গজর করতে থাকে।

সেই গজরাণি শুনে জগজীবন যেন ক্ষেপে গেল। আমায় হাঁক দিয়ে বললে—"লোকেরা যদি গজরাণি না থামায় মাছের টুকরো ছড়িয়ে দেবো সবার ওপর, আর যে গজরাবে মুখে পুরে দেবো।"

ব্যস্ এবার একেবারে ফতে। রাতের খিচুড়িটা যা জমেছিল তার আর তুলনা নেই। একটি হাঁড়ি যখন নামালাম ওরা আঁৎকে উঠলো—"এত খাবে কে?" কিন্তু রাত্রি বারোটায় সেই হাঁড়ি একেবারে নিঃশেষ করে দিলাম আমরা। চা হোলো বার দুই। তাতেই দশ ফোঁটা ব্রাণ্ডি দিয়ে সকলে একখানা বিছানার মধ্যে জড়োসড়ো হয়ে শুয়ে পড়লাম—যে যেমন কাপড় জামা পরেছিলাম সেইভাবেই।

হারিকেন একটা মৃদু জ্বলছে। গুজরাতিরা ওঘরে গিয়ে শুয়েছে। এঘরে বংশধররা লাড্ডু, পুরি, ঝুড়িভাজা, দালমুট খেয়ে শুয়ে পড়েছে। আমি ওদের বলছি সুশ্রুবস নাগের মাঝে এই শেষ নাগ। শেষনাগের নামের কথা নিয়ে অনেকের অনেক মত পড়েছি আধুনিক ভ্রমণ কাহিনীতে। রাজতরঙ্গিনীতে কিন্তু এ বিষয়ে পরিষ্কার উল্লেখ আছে। রাজতরঙ্গিনীর পংক্তিটা তুলে দিই এইখানে।—

ঘোরং জনক্ষয়ং কৃত্বা প্রাতঃ
সানুশয়োৎপ্যহি।
লোকাপবাদ নির্বিন্নঃ স্থানমুৎসৃজ্য
তদ্ যযৌ॥
দুগ্ধাব্ধি ধবলং তেন সরোদূর
গিরৌ কৃতম্।
অমরেশ্বর যাত্রায়াং জনৈরদ্যাপি
দৃশ্যতে॥
শ্বশুরানুগ্রহান্নাগীভূতস্যাপি
দ্বিজন্মনঃ।
জামাতৃসর ইত্যস্থৎ তত্র চ প্রথিতং সরঃ॥

কাশ্মীরে এই 'নাগ' কথাটা আর 'বল্' কথাটার প্রাচুর্য্যে মনে হয় ওরা 'মার্গ' কথাটা যেমন অধিত্যকাকে বোঝাতে ব্যবহার করে, তেমনি 'বল' কথাটার প্রয়োগ হ্রদ বোঝাতে আর 'নাগ' প্রস্রবণ বোঝাতে। কিন্তু নাগ বংশের রাজত্ব ছিল কাশ্মীরে। 'কর্কোটকস্য নাগস্য দময়ন্ত্যা নলস্য চ' ইত্যাদি শ্লোক যা মহাভারতে আছে—নলোপাখ্যানে তার মধ্যেও আমরা দেখতে পাই রাজা নলকে এক নাগ ইচ্ছাক্রমে বিকৃতাঙ্গ করে দিয়েছিলেন আত্মগুপ্তিতে সাহায্য করার জন্য। এই কর্কট এবং নাগেরা নানা প্রকার রূপ সজ্জায় নিজেদের আকৃতিকে অপরূপ করে তুলতে পারতো। রূপরচনার সেই অপরূপ কৌশল আর্য্য রাজা নল অনার্য্য কর্কট এবং নাগেদের কাছে শিখে তারপর ঋতুপর্ণ রাজার চাকরি নিতে পেরেছিলেন।

এই কর্কট নাগ বংশ কেবলই প্রাচীন পুরাণ-কাহিনী নয়। নাগ বংশকে ক্যানিংহাম বলেছেন সর্পপূজক। কাশ্মীরে সর্পপূজার প্রচলন বহুকাল থেকে চলে আসছে। শকজাতির কোনও এক শাখা কাশ্মীরে এই পূজার (প্রবর্ত্তন নয়) প্রচলনে উৎসাহ জোগান। তারাই নাগ-বংশ নামে খ্যাত। ক্যানিংহামের এই উক্তি অগ্রাহ্য করেছে একটা অধুনা সম্মানিত মতবাদকে।

নাগবংশ সম্বন্ধে উত্তরাপথে বহু গ্রন্থে, পুরাণে, কিম্বদন্তীতে, প্রচলিত পূজায়, আচারে, ব্যবহারে, সংস্কারের উল্লেখ পাওয়া যায়। রাজপুতরা যে এককালে উত্তরাপথে সিন্ধু ও বিতস্তার অববাহিকায় বসবাস ছেড়ে বর্ত্তমান বালুকাময় রাজস্থানে বাস করছে তার তো ইতিহাস-সম্মত ব্যাখ্যাই আছে। এই রাজপুতদের মধ্যে নাগবংশী রাজপুতরাও আছে। তক্ষ নামক একটা শকীয় শাখা মধ্য এশিয়া থেকে যে আর্য্যা-বর্তের উত্তর পশ্চিম কোণে আপন আধিপত্য বিস্তার করে এরও নজীর আছে। সবচেয়ে বড় নজীর বর্ত্তমান তক্ষশীলা নগরীর নাম। এরা অবশ্য নাগপূজা করতো।

পরীক্ষিতের সঙ্গে নাগদের একটা সজ্বর্ষ হয়। মৃত এক নাগকে ঋষির তপোবনে রেখে পরীক্ষিৎ অনার্য্য রাজ তক্ষককে রুষ্ট করেন। ফলে তক্ষকের ছদ্মবেশে রাজাকে আক্রমণ ও বিনাশের কাহিনী মহাভারতে আজও পড়া যায়। এর ফলে আগুন জ্বলে ওঠে। মধ্য এশিয়ার কৃষ্টি ও আর্য্যকৃষ্টির মধ্যে বিরাট সংঘর্ষ হয় জন্মেজয়ের সময়ে। জরৎকারু, জরৎকারী, প্রভৃতি নাগ ঋষিদের ও ঋষি কন্যাদের মান রাখতে নাগবংশীয় আস্তিকমুনি নিজের মনোবলে, তপোবলে এই সংঘর্ষের অবসান ঘটান। নাগ কন্যাদের অপরূপ রূপের প্রশংসা পুরাণে বার বার পাওয়া যায়। নাগ কন্যা উলুপীর সঙ্গে অর্জ্জুনের বিবাহের কথা মহাভারতে আছে। আর্য্যেতর ছিলেন বলেই তাঁর এত সৌখ্য ছিল মণিপুরের চিত্রাঙ্গদার সঙ্গে। শুধু নাগেদের কেন মধ্য এশিয়ারই বড় বড় পূজার আহ্নিক হিসাবে নাগ বা সর্প একটা বড় সম্মানের দাবী রাখতো। শৈব পূজায় নাগের প্রাধান্য ছিল। শশিশেখর মহাদেব অহিভূষণ ছিলেন। তাইতো এই আর্য্যেতর দেবতার এতো অবজ্ঞা দক্ষের কাছে। তিনি হবিভুক্ হতে পারেন না, যজ্ঞেশ্বর হতে পারেন না। সে কালে শিব পূজার প্রচলন নিয়ে দক্ষযজ্ঞ লণ্ডভণ্ড হোলো একদিকে আর্য্যদের অন্যদিকে আর্য্যেতর প্রতিপক্ষের সংঘর্ষে। কশ্যপের পত্নী রুদ্র ছিলেন এই নাগেদের জননী। তাতেই তো বিনতার সঙ্গে তার সংঘর্ষ। ছেলে গরুড়ের নাম হোলো নাগান্তক। বিষ্ণু আর্য্য দেবতা, তাই এই নাগান্তক গরুড়ের পৃষ্ঠপোষক হলেন। গরুড়ের সঙ্গে দেবতাদের সংঘর্ষ লাগলো কারণ—কশ্যপের ছেলে হিসেবে গরুড়ের দাবী দেবত্বে, আবার বিনতা খাঁটী দেবী ছিলেন না। তাই দেবতারা আসন দিতে চান না। বিষ্ণু তখন ডিভাইড্ এণ্ড রুল করলেন। নাগদের দমন করালেন গরুড়কে দিয়ে। গরুড়কে দিলেন আশ্রয় এবং নিজের সঙ্গে পাইয়ে দিলেন পূজা। ওদিকে গরুড়কে দিয়ে নাগ দমন করলেন তো—করলেন এমনভাবে যে পেড়ে ফেলে শুয়ে রইলেন যেন। পুরাণের একটা বৃহৎ অংশ জুড়ে আছে এই নাগেদের সঙ্গে সুরেদের বড় বড় যুগব্যাপী সংঘাতে। ব্রাহ্মণকে অবহেলা করার দরুণ নহুষের সাজাই হোলো নাগেদের মধ্যে নির্বাসনে। নহুষ নাগ হয়ে রইলেন বহুকাল।

পঞ্চতরণীর শেড.—সামনে কাণ্ডি

অমন যে বিরাট সমুদ্রমন্থন তারও মাধ্যম ছিল নাগ। সুর আর্য্য, এবং অ-সুর আর্য্যেতর জাতির মধ্যে যে বৃহৎ সংগ্রাম চললো স্বর্গের দাবী নিয়ে তার মধ্যেও মাধ্যম রইলো এই নাগেরা। যতদিন যায় ততো নাগেদের প্রতিপত্তি বাড়তে থাকে, নাগেরা ভারতের ধর্মে, সংস্কৃতিতে, আচারে, ব্যবহারে, চিন্তায় আশ্রয় ও সম্মান পেতে থাকলো। ভীমকে বলবান করে তুললো নাগেরা, দুর্যোধনকে সাহায্য পাঠালে নাগেরা, অর্জুন বিবাহ করলেন নাগেদের, কৃষ্ণ বৃন্দাবনকে বাঁচালেন নাগদের অত্যাচার থেকে। নাগেদের আনুপূর্বিক ইতিহাস অনুধাবন করলে সর্প-বৃক্ষ পূজক বর্বরদের অনুকরণ বলে অবজ্ঞা বা উপেক্ষা করতে পারা যায় না। যেখানে যেখানে নাগদের রূপের বা সংস্কৃতির বর্ণনা পাওয়া

যায় সেখানে সেখানেই সাক্ষ্য পাই একটা বলিষ্ঠ, রুচিকর, রূপ-বিত্তশালী সভ্য সমাজের। এ সমাজ এতো ঐশ্বর্য্যবান ছিল বলেই আর্য্যদের সঙ্গে পদে পদে এদের সংঘর্ষ। মহাপণ্ডিত যোগেশচন্দ্র রায় বিষ্ণুর শেষ শয্যা, কালীয় দমন এবং সমুদ্রমন্থনে নাগের ব্যবহারের জ্যোতিষিক ব্যাখ্যা করেছেন। চরম ব্যাখ্যা। যেমন যুক্তি, তেমনি প্রাঞ্জল। জ্যোতিষের নানা তথ্য কাহিনীরূপে ব্যক্ত ও লোক সমাজে প্রচারিত এই তাঁর সারগর্ভ উপপত্তি। উপস্থিত বক্তব্যের সঙ্গে উক্ত উপপত্তির কোনও অসঙ্গতি দেখি না। জ্যোতিষিক তত্ত্বকে কাহিনীর রূপই দেওয়া যখন সিদ্ধ হোলো তখন বিশেষ প্রচলিত কোনও কাহিনীর আঙ্গিক ব্যবহার করাটাই সমীচীন। নাগ-কাহিনী সেকালে একটা বিশেষ প্রতিপত্তিশালী কাহিনী হওয়াই স্বাভাবিক। নাগ ও আর্য্য সংঘর্ষের ইতিকথা কাল-প্রবাহে মসৃণতর হতে হতে তার প্রাথমিক রূপ হারিয়ে লোক কথার অঙ্গ হয়ে উঠেছে। পরবর্ত্তীকালে জ্যোতিষীরা এই প্রচলিত লৌকিক কথামালার ছন্দেই নিজেদের উপপাদ্য গেঁথে রেখেছেন। সুতরাং বর্তমান নাগ কথার ব্যাখ্যা শ্রদ্ধেয় যোগেশচন্দ্রের ব্যাখ্যার প্রতিপক্ষ নয়।

গুহার মধ্যে অমরনাথ মূর্তির ভাস্বরতা

শ্রীমতী করুণাকণা গুপ্তা ভারতীয় ঐতিহাসিক সম্মেলনে পঠিত এক প্রবন্ধে প্রমাণ করেছেন নাগেদের ঐতিহ্য ও ঐতিহাসিক অধিকার। কাশ্মীরে বহুকাল ধরে নাগেদের অব্যাহত প্রতাপ ছিল। কুশানদের সময়ে বৌদ্ধ এবং নাগেদের মধ্যে একটা তুমুল সংগ্রাম বাধে। নাগেরা সন্ন্যাসী হয়ে এক দর্শনের মাধ্যমে এক বিরাট সম্প্রদায় প্রতিষ্ঠা করে। এরাই ভারতবিশ্রুত নাগা সম্প্রদায় যাদের উগ্র, ভীষণ, ভয়ানক স্বরূপ সকলেরই জানা। 'নাঙ্গা' বা 'উলঙ্গ' সম্প্রদায় থেকে এদের 'নাগা' নাম যে নয় তার প্রধান প্রমাণ এই যে নাগা সম্প্রদায়েও সকলে উলঙ্গ নয়। শঙ্করাচার্য্য বহুকার্য্যের মধ্যে একটা বড় কাজ করে গিয়েছিলেন এই নাগাদের দশনামী সম্প্রদায় ভুক্ত করে। তবে এরা নাম মাত্র সম্প্রদায়-ভুক্ত। আসলে শঙ্করাচার্য্যের দণ্ডী সম্প্রদায়, স্বামী, সরস্বতী, পুরী উপাধি মণ্ডিত সাধুরা এবং এই নাগারা কি ব্যবহারে, কি সাধন-পদ্ধতিতে, কি আচারে, কি স্বভাবে একেবারে তির্য্যক্ গোষ্ঠীভুক্ত। আজও নাগা সন্ন্যাসীদের প্রধান আশ্রয় হরিদ্বার, হৃষিকেশ, বা গঙ্গা-বিধৌত ব্রহ্মাবর্ত্ত নয়; এদের প্রধান আশ্রয় সিন্ধু, বিতস্তা, বিপাশা, কৃষ্ণগঙ্গা, নীলগঙ্গা বিধৌত পঞ্জাব ও কাশ্মীর। কাশ্মীরে এদের প্রতাপ ছিল অখণ্ড। নীলপুরাণে পাওয়া যায় তৃতীয় গোনর্দ কাশ্মীরে নাগ সভ্যতাকে আবার প্রতিষ্ঠিত করেন। নীল পুরাণের নীল এক প্রসিদ্ধ নাগ ছিলেন। স্বয়ং কশ্যপ ছিলেন এর বাপ। কিন্তু এর মা ছিলেন আর্য্যেতরা। তাই এই বিবাহ ও এই সন্তানের সংবাদ শ্রীমান কশ্যপ বাদ দিয়ে রেখে যান, যার ফলে দেবগণ গণনারম্ভে নাগেদের নামে কঠিনীপাত সম্ভব হোলো না।

কাশ্মীরে নাগেরা রাজত্ব করে গেছে। এক আধ দিন নয়। প্রায় সওয়া দুশো বছর কাশ্মীরে নাগেদের রাজত্ব ছিল। ৬২৫ খৃষ্টাব্দে দুর্লভ নামে নাগবংশীয় রাজা কাশ্মীরে রাজত্ব আরম্ভ করেন। এই বংশে কর্কট নামে এক রাজা ছিলেন তারই বংশে রাজা নরের সময়ে এই সুশ্রবস তীর্থের প্রতিষ্ঠা। রাজ-তরঙ্গিনীতে উল্লেখিত নীল-পুরাণের সেই কাহিনীটি বলা দরকার।

তখন কাশ্মীরের সিংহাসনে রাজা নর। নাগ বংশের রাজা। নাগেদের তখন প্রবল প্রতিপত্তি। ব্রাহ্মণরা কোনও দিনই নাগদের পংক্তি দিতে চাইলো না, করে রাখলো অপাংক্তেয়। নাগেদের সঙ্গে আর্য্য ব্রাহ্মণদের লড়াই তো ইতিহাস-বিশ্রুত। ভারি ক্লানিশ ছিলেন আর্য্যেরা। অক্সাস্, ক্যাসপিয়ান সী, তাইগ্রীস আর ইরাণ এই ভূখণ্ডের অধিবাসীদের ওঁরা পাত্তা দিতে রাজী। কিন্তু মধ্য এশিয়া, মঙ্গোলিয়া, দর্দিস্তান, উজবেকীস্থান, তিব্বত এসব জায়গার বাসিন্দাদের ওঁরা কিছুতেই জাতে তুলবেন না। সংগ্রাম চলেছে সমুদ্র মন্থনে, দক্ষযজ্ঞে, কদ্রুবিনতার যুদ্ধে—তাই ব্রাহ্মণরা যদিও নাগদের প্রজা হয়ে রইলেন, মনে মনে তাদের ওপর বিতৃষ্ণা আর অশ্রদ্ধা ঠিক বজায় রাখলেন।

নাগেরা কিন্তু রাজত্ব পেয়ে ব্রাহ্মণদের কেবল সম্মানই দেখালেন না,

বড় বড় রাজপদে ব্রাহ্মণদেরই রাখলেন; ব্রাহ্মণকে মন্ত্রী করলেন, ব্রাহ্মণদের সামাজিক শ্রেষ্ঠত্ব, ব্রাহ্মণিক বিধান, আর্য্য ধর্মের অনুশাসন সব মেনে নিতে চাইলেন। এক কথায় আর্য্যদের সঙ্গে এক হয়ে যাবার সমস্ত ব্যবস্থা করলেন।

নতুন শস্য হলে ক্ষেত্রাধিপতি দেবতা আর পিতৃপুরুষকে উৎসর্গ করে নবান্ন করার পর তবে সেই শস্য গোলায় তুলে খাওয়া হোতো। যাবৎ নবান্ন উৎসব সমাপ্ত না হোতো তাবৎ নতুন শস্য খাওয়া চলতো না। এই ব্রাহ্মণিক বিধান নাগেরা মেনে নিয়েছিলো। নবান্ন উৎসব সেকালে যে যার করতো না। পিতৃপুরুষকে নবান্ন পার্বণে সন্তুষ্ট করে ইতর ভদ্র সমগ্র সমাজকে ডেকে একত্রে উৎসব করার পর নতুন শস্য পাওয়া চলতো।

এক গ্রামে এক নাগ পরিবার বাস করতো। তারা দরিদ্র। সঞ্চিত শস্য নেই। নতুন শস্য হয়েছে। শস্য কেটে গোলাজাত করা হয়েছে। তবু ওরা খেতে পায় না। তার কারণ ব্রাহ্মণদের গ্রাম। ব্রাহ্মণরা পার্বণ করেছে বটে, কিন্তু নবান্ন করছে না। উদ্দেশ্য, নাগ পরিবারটা না খেতে পেয়ে গ্রাম ছেড়ে চলে যাক্, গ্রামখানা কেবল আর্য্যদেরই হোক। ব্রাহ্মণদের ঘরে উদ্বৃত্ত শস্য প্রচুর। তারা তাই খেয়ে চালাচ্ছে। সেই দরিদ্র নাগের নাম সুশ্রব। তার দুই কন্যা। একটীর নাম চন্দ্রলেখা, অন্যটীর নাম তিলোত্তমা। সুশ্রব ক্ষুধায় মৃতপ্রায়। চন্দ্রলেখা আর তিলোত্তমা পিতার ক্লেশ আর সহ্য করতে পারে না। ক্ষেত্রাধিপতি ব্রাহ্মণের বাড়ী গিয়ে বারংবার তাকে অনুরোধ করে—নতুন শস্য তিনি গ্রহণ করে তার পিতাকে নতুন শস্য খাবার অনুমতি দিন। চন্দ্রলেখা আঁচলে করে নিত্য নতুন শস্য নিয়ে যায় ব্রাহ্মণকে দান করার জন্য। ব্রাহ্মণ তা নেবেও না, আর ওদেরও খাওয়া হয় না। জমীদার ব্রাহ্মণ যতক্ষণ না শস্য গ্রহণ করেন ততক্ষণ ওরা ব্রাহ্মণিক নিয়ম অস্বীকার করার ফলে রাজার অসন্তোষ অর্জন করতে চায় না।

অবশেষে চন্দ্রলেখা আর তিলোত্তমা মাঠে গিয়ে ঘাসের বীজ সংগ্রহ করতে থাকে, আর মাঝে মাঝে কচি কচি ঘাসের মুঠা মুখে পুরে দেয় নিজেদের ক্ষুধা মেটাবার জন্য। নতুন ফল বা নতুন শস্য কিছুই তো ব্রাহ্মণ গ্রহণ না করলে ব্যবহার করার উপায় নেই।

বিশাখ নামে বিদেশী এক ব্রাহ্মণ পথশ্রান্ত হয়ে এক সরল বৃক্ষের ছায়ায় বিশ্রাম করছিলো। সামনে দেখতে পেলে দুটি শান্তশ্রী লাবণ্যমতী নাগ-কন্যা ঘাস ছিঁড়ে ছিঁড়ে মুখে দিচ্ছে। ঘাস খায়। কতো দারিদ্র্য, অথচ ক্ষেত ভরা শস্য, গ্রাম ভরা সমৃদ্ধি। বিশাখ আশ্চর্য্য বোধ করে। কন্যাদের কাছে গিয়ে প্রথমেই অভিবাদন ও নম্রতা জ্ঞাপন করে কুশল প্রশ্ন করলেন। জিজ্ঞাসা করলেন তাদের এই অদ্ভুত আচরণের কথা। "কাদের কন্যা মা তোমরা? এতো রূপ তোমাদের, এতো লাবণ্য; সাধারণ মানবী বলে তো বোধ হয় না। তোমাদের এমন অদ্ভুত আচরণের কারণ কি।"

চন্দ্রলেখা উত্তর দেয়, "আমরা সুশ্রব নাগের কন্যা। আমাদের ভূম্যধিকারী ব্রাহ্মণ। অজ্ঞাত অপরাধে তিনি আমাদের উপর কুপিত ও আমাদের বিনষ্ট করতে কৃতসঙ্কল্প। অদ্যাবধি তিনি আমাদের শস্য গ্রহণ করে নবান্ন করেন নি। ফলে শস্য গ্রহণে আমরা অসমর্থ। আমার পিতা অনাহারে মৃতপ্রায়। এ সংবাদ দেবার পরেও ভূম্যধিকারী শস্য গ্রহণ করছেন না। মনে হয় আমরা নাগ বংশীয় বলে তাঁর ঘৃণার পাত্র। আমাদের উচ্ছেদই তাঁর কাম্য। তাই পিতার জন্য ঘাসের বীজ সংগ্রহ করছি। নিজেদের ক্ষুধা নিবৃত্তির জন্য কচি কচি ঘাস খাচ্ছি।"

ব্রাহ্মণ জমীদারের এই নির্মম কাহিনী বিশাখকে বিচলিত করলো। সে নিজে ব্রাহ্মণ। নাগেদের প্রতি ব্রাহ্মণের ঘৃণা ও অবজ্ঞার কথা তার অবিদিত থাকার কথা নয়। কিন্তু সে যুবক, সে এসব মানে না। চন্দ্রলেখার রূপও তাকে মুগ্ধ করেছে তখন।

সে গিয়ে ব্রাহ্মণ জমীদারের বাড়ী আতিথ্য গ্রহণ করলো। ব্রাহ্মণ অতিথিকে সম্বর্দ্ধনা জানালেন ও তাঁর পানাহারের ব্যবস্থা করে দিলেন। বিশাখ বললেন—"পৃথক অন্নপাকে আমার তৃপ্তি হবে না। আপনার ও আমার একই পাকে রন্ধন হবে। তাই দুই জনা ভাগ করে খাবো।"

জমীদার আপত্তি তুললো, "ব্রাহ্মণ হলেও অজ্ঞাত কুলশীলের হাতে আমি খাবো না।"

বিশাখ আশ্বাস দিয়ে বলে—"আমি সে অন্যায় অনুরোধ আপনাকে করিনি। আপনি রন্ধন করবেন। বাহিরে বৃক্ষতলে রন্ধন হবে। দেবতাকে উৎসর্গ দিয়ে সেই অন্ন ভাগ করে ভোগ প্রসাদ গ্রহণ করবো। এতে তো আপনার আপত্তি নেই?"

জমীদার বলে—"এতে আমার কোনও আপত্তি থাকার কথা নয়। আমার সৌভাগ্য যে আমি ব্রাহ্মণের ভোজ্য আজ স্বহস্তে রন্ধন করবো।"

বৃক্ষতলে রন্ধনের আয়োজন চলতে লাগলো। স্নান করার জন্য বিশাখ বিদায় নিলেন।

এই অবসরে সে চন্দ্রলেখার বাড়ী এসে বললে—"তোমার ভাণ্ডারের কিছু তণ্ডুল আমায় দাও। জমীদারকে আজ তোমার শস্য খাওয়াবো। তোমরা নির্দোষ হয়ে শস্য গ্রহণ করবে।"

একমুষ্টি তণ্ডুল নিয়ে বিশাখ ফিরে এলো যেখানে জমীদার বিশাখের জন্য পাক করছে। চাল ধোবার অছিলায় সে সেই একমুঠা চাল জমীদারের চালের সঙ্গে মিশিয়ে দিলো। অন্নপাক হয়ে গেলে উভয়ে তাই খেল। সুশ্রব ও তার কন্যারা অন্নগ্রহণ করলো।

তাদের অন্ন গ্রহণের ইতিবৃত্ত জমীদার শুনতে পেয়ে বিশাখকে যথেষ্ট নিন্দাবাদ করলো ও বিশাখের নামে রাজা নরকে গিয়ে অভিযোগ জ্ঞাপন করলো।

সুশ্রব বিশাখের উদারতায় পরম পরিতোষ লাভ করে বলে—"কি দিতে পারি আপনাকে আমায় আদেশ করুন। আমি নাগ হয়েও দরিদ্র; তবু নাগেদের মতোই সত্যাশ্রয়ী।"

বিশাখ প্রার্থনা করলেন চন্দ্রলেখার পাণি। "এমন কন্যারত্ন যাঁর তিনি দরিদ্র কিসে?"

বিশাখ নাগকন্যাকে বিবাহ করবে এই সংবাদে পরম সন্তুষ্ট হয়ে সুশ্রব চন্দ্রলেখাকে তো বিশাখের হস্তে দান করলেনই, সঙ্গে সঙ্গে তিলোত্তমাকেও দান করলেন।"

ব্রাহ্মণ হয়ে নাগকন্যাকে বিবাহ করেছে এই অভিযোগই জমীদারের প্রধান অভিযোগ হোলো রাজা নরের কাছে। "মহারাজ সে রকম রূপ-লাবণ্যবতী কিশোরী আপনার রাজ্যে সুদুর্লভ। আমি আমার প্রজা বলেই তাদের সযত্নে রক্ষা করছিলাম, কালে মহারাজের ভোগ্যা বলে নিবেদন করবো বলে। দুর্বৃত্ত সুশ্রব ব্রাহ্মণের প্রতি ঘৃণা পরবশ হয়ে এমন গর্হিত আচরণ করেছে। এর প্রতিকার অবিলম্বে চাই।"

রাজা বিশাখকে ডেকে পাঠান। ব্রাহ্মণ হয়ে তিনি নাগকন্যার পাণিগ্রহণে সম্মতি দিয়েছেন এই উদারতার জন্য বিশাখকে তিনি গ্রাম দান করে রাজধানীতেই বসবাস করার ব্যবস্থা করে দেন। এটা ছিল তাঁর অছিলা। আসলে তিনি চন্দ্রলেখার রূপে আকৃষ্ট। সময় মতো দরিদ্র ব্রাহ্মণের ঘর থেকে চন্দ্রলেখার মন বিচলিত করার আশা তাঁর মনে চেয়ে রইল।

চন্দ্রলেখাকে নিত্য দেখা, তাকে বহু উৎকোচে নিজের বাড়ীতে নিয়ে আসার বহুতর চেষ্টা রাজা করতে লাগলেন। কৃতকার্য্য হলেন না। অবশেষে রাজা বলপ্রয়োগ করে চন্দ্রলেখাকে হরণ করতে যেতে ব্রাহ্মণ বিশাখ সুশ্রবকে গিয়ে সব নিবেদন করে। সুশ্রব সমগ্র নাগকুলে এই অত্যাচারের ঘটনা বিবৃত করে বেড়ায়।

তখন হয় ভীষণ এক অবস্থার সৃষ্টি। নাগেরা করে বিদ্রোহ। নাগেদের অত্যাচারে, প্রতিহিংসায় কাশ্মীর শ্মশান হয়ে গেল। হঠাৎ উল্কার উত্তেজনায় সর্বনাশ হোলো কাশ্মীরের।

ইসলামাবাদ থেকে কিছুদূরে লীদার অববাহিকার প্রারম্ভেই বাওয়ন গ্রামে ভৌমজ্ গিরিকন্দর প্রখ্যাত। নদীবক্ষ থেকে প্রায় বাটফুটের উচ্চতায় সর্ববৃহৎ গুহায় কলাদেবের মন্দির। প্রায় ৫০ ফুট অন্ধকার সুড়ঙ্গ দিয়ে মন্দিরের দরজায় পৌঁছানো যায়। নিরাবরণ এই গহ্বর এখন প্রসিদ্ধ কলাদেবের মন্দির বলে নয়, রুকুদ্দীন ঋষির শিষ্য বাবা রামদীন ঋষির সমাধিস্থান বলেই আজ এই গিরিকন্দর প্রখ্যাত। সুশ্রব নাগ যখন নাগেদের সাহায্যে কাশ্মীর ধ্বংস করেন তখন নাগেরা এই পর্বত থেকেই শিলা সংগ্রহ করে ভীমবেগে ছুঁড়ে ফেলেন এবং সেই শিলাপাতেই কাশ্মীর ধ্বংস হয়। সেই খনন করায় গর্তগুলিই বর্তমান গুহার আকারে কাশ্মীরী জনগণের ভীতির আকর হয়ে আছে। পাপাভিলাষের ফলে দেবতার রুদ্ররোষের সাক্ষ্য হিসাবে আজও পুণ্যলোভাতুর জনতা বৎসরে একবার এই সব গুহায় গিয়ে প্রণতি জানিয়ে আসে।

পরে সুশ্রব কাশ্মীরের দশা দেখে অনুতাপে দগ্ধ হতে থাকে। বিবাগী হয়ে সে হিমালয়ের কন্দরে চলে যায়। এই হ্রদের ধারে এসে সে তপস্যা কোরে এটীকে তীর্থ করে রেখে যায়। তাই এর নাম সুশ্রব তীর্থ। সুশ্রব নাগতীর্থ—বা শেষ নাগ। এরই নিকটে সে অপর এক হ্রদ আবিষ্কার করে। জামাতা বিশাখের নামে সেই হ্রদের নামকরণ করে জামাতৃ সরোবর বা জামাতৃনাগ। সেও এই শেষ নাগের কাছাকাছিই, অমরনাথ যাত্রার অন্যতম তীর্থ বলে পরিগণিত। ক্রমশঃ

দুই প্রতিমা

শ্রীপ্রতীপ দাশগুপ্ত

অন্যের মনে কি আছে জানি না,
কিন্তু আমার মনে বসন্ত,
তাদের সুখ বা অসুখ বা এ দু'য়ের
মাঝে হাইফেন, কিন্তু আমার মনে বসন্ত।

শোন হঠাৎ লিখছি কেন কাব্য ?
কাঁকনপরা হাতে তোমার
দেখছি আমি শঙ্ক—
পুষ্পহারে শোভন তোমার
কণ্ঠ হ'তে অঙ্ক,
তাইত আমি ভাবব,
শুধুই তোমায় ভাবব।

প্রদীপ-শিখা চোখ দুটীতে
স্নিগ্ধ-কোমল দৃষ্টি,
কণ্ঠে তোমার যাদুর পরশ
আর সুরেলা ছন্দ,
ধূলার ধরায় ফুটল
এ তো পবিত্রতার গন্ধ,
মূর্তিমতী শ্রী যে তুমি
স্বর্গীয় এক সৃষ্টি।

শঙ্খধ্বনি সাজ ক'রে নৃত্য-সুরে-গানে
বন্দ তুমি পাথর-প্রতিমাকে,
দুই প্রতিমা, একটী নীরব—সরব যেটী
অনেক কাছের লাগছে আমার তাকে।
অচল দেবী কন না কথা,
নয়কো তিনি এই ধরণীর ;
সচল দেবী ! তোমার লাগি
রইল পূজা এই পূজারীর।
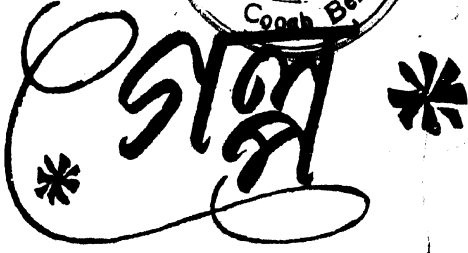
উৎসবের পর

অমরেন্দ্র দাস

বেরিয়ে এল মনীষা, বাসর ঘর থেকে, সবার অগোচরে। কেউ না বুঝতে পারে, কেউ না জানতে পারে, কারও সহানুভূতির শীতল স্পর্শ—মনের মধ্যে জ্বালা না ধরায়। দু-ফোঁটা জল চোখের দু'কোণায়, মুক্তাবিন্দুর মত। মনীষা আঁচলের খুট দিয়ে মুছতে গেল, কিন্তু মুছল না। কি ভেবে ছুটে নিজের ঘরে গিয়ে ঢুকল, গলায় মালা—হরিণীর মত সে গতি। কিন্তু রেখে গেল ব্যথাময় সুর। সে সুর বিয়ে বাড়ীর সমস্ত আনন্দ কোলাহলের অনেক উপরে সান্ত্বনাহীন।

শোনা যাচ্ছে বাসর ঘরের গান। গাইছে একটী মেয়ে। হারমোনিয়াম আর কণ্ঠের সুরে মেজাজে লাগছে দোল। মেয়েটী রসিয়ে রসিয়ে জমিয়ে জমিয়ে দুলিয়ে দুলিয়ে গেয়ে চলেছে। মধুবাসর হচ্ছে আরও মধুময়। গানের ভাষায় আছে প্রাণ-জাগানোর মৌতাত। যারা বাসর ঘরে ঢুকেছে তারা হাসছে। এ ওর গা টিপে মুখ মুচকে ইসারা করছে। রজনীগন্ধার গন্ধভরা বাসর। ঘরের গলায় নানা ফুলগুচ্ছের জোড়-বাঁধা মালা। তা থেকে গন্ধ ভাসছে। আমোদিত হচ্ছে ঘর। নেশায় ভরা চোখে ঘোর লাগছে। ঝিম্ আসছে। রসিয়ে উঠছে আইবুড়ো মেয়ের দল। গোপন এক রহস্যের ঢাক্না যেন উন্মোচন হয়ে যায় যায় এমন ধারা। এমনি সব ইসারা বাসর ঘরের মেয়েদের চোখে-মুখে। কিন্তু আশ্চর্য্য শুধু দীপক আর সুরভি—যাদের কেন্দ্র করে এত আয়োজন—তারা যেন কোথায় হারিয়ে গেছে। দীপক গম্ভীর। সুরভি কি এক বেদনায় লজ্জাবনত। মুখে তার ঘোম্টার ছাউনি। দেখা যাচ্ছে না মুখ। কিন্তু বোঝা যাচ্ছে সে মুখে রক্তের লেশ নেই। একটা কাঠ-পুতুলের মুখে কে যেন চন্দনের ফোঁটা দিয়ে ঘোমটায় ঢেকে বসিয়া দিয়ে গেছে। জানে, বিয়ে বাড়ীর সবাই-ই এর কারণ। কেন কি জন্যে চিরা-চরিত বিয়ের আনন্দে হঠাৎ ভাঁটা পড়ে গেছে। সানাইও বেজেছিল। এই কিছুক্ষণ হল সেটা থেমেছে। কিন্তু সুর গেছে হারিয়ে।

সুর গেছে হারিয়ে অনেক আগে। যখন দীপক বিয়ে বাড়ীতে ঢুকেছিল। সেও আর পাঁচজনের মত ফুল ময়ূরের গাড়ী সাজিয়ে এ বাড়ীতে বিয়ে করতে এসেছিল। এসে-ছিল মনীষাকে বিয়ে করতে। অনেক আশা নিয়ে, অনেক আকাঙ্ক্ষা নিয়ে, পুলক, আনন্দ, আবেগ, মূর্ছনা সব, সব ছিল। কিন্তু—

আনন্দে ঝলমল, আলো উৎসব ঘেরা বিয়ে বাড়ী। মানুষ-কণ্ঠই চারিদিকে। কানে যেন কেমন এক সুর-অসুরের রিনিঝিনি। আলোয় আলোয় চারিদিক আলো-উৎসব। কালো মুখে সুন্দরের রোশনাই। আর সুন্দরের ত কথাই নেই। মেয়েদের গায়ে চড়েছে দামী দামী সব জর্জেট, বেনারসী শাড়ী। আসমানী, ফিরোজা, আকাশী কত রঙের। মুখে পান, দাঁতে হাসি, প্রাণে ঝরণার কলকাকলি। বিয়ে বাড়ীতে কে যেন এক সাথে কয়েক ঝাঁক পাখী ছেড়ে দিয়েছে। তাদের কলকাকলিতে ভরে উঠেছে একটা উৎসব-বাড়ীর জম্জমাট। তার ওপর বর-যাত্রীদের জন্য অত্যধিক আপ্যায়নের বহর। কন্যার বাবা রাজীববাবু গলায় বস্ত্র দিয়ে হাতজোড় করে ঘোরাফেরা করছেন। তার হাতজোড়ে কারও ভ্রূক্ষেপ নেই। যার যা খুসী তাই করে চলেছে। অঢেল, অফুরন্ত, অপর্যাপ্ত স্বাধীনতা। কেউ জল খেতে গিয়ে মাটীর গেলাস ফেলে শব্দ করছে। কেউ চায়ের কাপ ফেলছে অসাবধানে।

কেউ বা একগাল পান চিবিয়ে তার পিচ ফেলতে গিয়ে অসাবধানে কারও আদ্দির পাঞ্জাবী রঙিণ করছে।

যাই হক, বিয়ের উৎসবে কোন ফাঁক নেই। সব বিয়ের মতই এও একটা বিয়ে। সুতরাং সব বিয়ের মত এখানেও মেলে সব। কার্পণ্য নেই কোথাও। অনাবিল আনন্দ, নোংরা রসিকতা, উলঙ্গ কথাবার্ত্তা—কেমন যেন লাগাম হারিয়ে উন্মুক্ত। বৃদ্ধও হাসছে তার মাড়ি বার করে। বৃদ্ধা ভাবছে জীবনের ফেলে আসা দিন। তারও জীবনে একদিন এনেছিল এ সময়। এই মধুমুহূর্ত্ত। এই সুখস্বপ্ন।

তারপর লগ্ন সমাগম হতে এল শুভদৃষ্টির ক্ষণ। গায়ে আসমানী রঙের বেনারসী। কপালে চন্দনের অঙ্কন লিপি। অঙ্গের বিভিন্নাংশে গয়নার চেক্‌নাই। একটি কনের পরিচ্ছদে যা প্রয়োজন সবই ছিল মনীষার অঙ্গে। লজ্জারুণ দু'টী আঁখি বুজে, বুকের স্পন্দন থামিয়ে, মনে বলের প্রয়াস জাগিয়ে তাকে হাজির করা হল একটি ব্যগ্র চাউনি-ভরা পুরুষের দুটি সতৃষ্ণ চোখের সামনে। চারিদিকে জেগে উঠল মেয়েলী চাপা হাসির অনুরণন। খুসীর এক ঝলক্ ফাল্গুন-বসন্ত বাতাস। প্রজাপতি যেন ডানা মেলে বার বার উড়ে এসে বসতে লাগল। কে যেন ভীড়ের ভেতর থেকে বলে উঠল—"বর বড় না কনে বড়।" সেই পুরনো রীতি। সেই পুরনো নিয়ম। তবু যেন চিরাচরিত ভাল-বাসা। ভালবাসা। মনীষার গোলাপী নরম ঠোঁটের ফাঁকে হাসি।

দীপক চোখ তুলে তাকাল। স্বপ্নের দৃষ্টি নিয়ে, আবেশের চোখ নিয়ে, প্রেমের মূর্ত্তি নিয়ে। মনীষাও তাকাবে তাকাবে ভাবছে, কিন্তু তাকাতে পাচ্ছে না। কোথায় যেন সঙ্কোচ। কে যেন ঘাড় ধরে নামিয়ে দিচ্ছে বার বার দৃষ্টি। কেমন যেন লজ্জা। পা থেকে মাথা পর্য্যন্ত বিদ্যুতের হিল্লোল। কিন্তু তবু মিষ্টি, তবু মধুর। তবু ভাল লাগে। কুমারী মেয়ের জীবনে ঈপ্সিত কামনা। মনীষার চোখে এল স্বপ্নের ছায়া ছবি। আবেগের মূর্চ্ছনা। আস্তে আস্তে চোখের পাতা দুটী কাঁপতে কাঁপতে সবে মেলবার চেষ্টা করছে।

হঠাৎ মানুষ পড়ার প্রচণ্ড শব্দ। মনীষার চোখের ঘোর কেটে গেল। ছিঁড়ে গেল আবেশের মূর্চ্ছনা। মুছে গেল স্বপ্নের ছায়াছবি। একটু কেন, বেশ অস্বচ্ছ গোলমাল। লোকজনেরা মনীষাকে ছেড়ে দিয়ে ঘটনাস্থলে ছুটে গেল। জল, পাখার শুধু চীৎকার। হৈ-হৈ। মনীষার যখন সম্বিৎ ফিরে এল, তখন সে দ্রুতপদে ঘটনাস্থলে ফিরে গেছে। যেখানে তার বড় বোন সুরভি অজ্ঞান অচৈতন্য অবস্থায় মাটীর ওপর পড়েছিল। ভীড় ঠেলে মনীষা এগুল। স্বপ্নোত্থিতের মত বড় বোনের মাথাটা নিজের কোলে টেনে নিল। পাখাটা হাতে নিয়ে মাথায় আস্তে আস্তে বাতাস করতে লাগল। সুরভির মুখের দিকে তাকিয়ে দু-ফোঁটা জল চোখ দিয়ে টপ টপ করে পড়ল সুরভির চেতনাহীন মুখের ওপর। সুরভি যেন ঘুমচ্ছে। অনেক যন্ত্রণার শেষে ঘুম। তাই মুখে কাতরতার ছায়া। বেদনার কাল-প্রলেপ। মনীষা কাতর হয়ে উঠল। ভুল গেল এই কিছুক্ষণ আগে সে ভাবছিল কোন অপার্থিব জগতের কথা। কোন স্বপ্নের কথা। সে নিজেকে ভীষণ অপরাধী মনে করতে লাগল। নিজের স্বার্থের জন্য এত বড় একটা সঙ্কল্প মন থেকে মুছে ফেলেছিল বলে নিজেকে ধিক্কার দিতে লাগল। অথচ সেই মনে মনে প্রতীজ্ঞা করেছিল—দিদিকে যেমন করে হোক্ এ যন্ত্রণা থেকে মুক্তি দিতে হবে। দরকার হলে সে স্বার্থত্যাগ করবে। কিন্তু কই? সে ত সময়ে তা করে নি। তার নিজের সুখে সে ছিল মশগুল। ছিঃ ছিঃ। শেষ পর্য্যন্ত সে এমন ব্যবহার করল? মনে পড়ল মনীষার এক এক করে সব কটি কথা। বড়দির নীরবে অশ্রুপাত। ঠাকুরের কাছে অনুরোধ। বেদনা চাপতে গিয়ে বার বার মুখের পরিবর্ত্তন।

সব। সব এক এক করে মনে পড়তে লাগল। সুরভি একদিন ঠাকুরের কাছে গিয়ে প্রার্থনা করেছিল। অনুনয়ের ভঙ্গিতে ঠাকুরকে বলেছিল—ঠাকুর তুমি তো সবই জানো। আমার শক্তি দাও ঠাকুর। মণির বিয়ে হয়ে যাচ্ছে—ওর ওপর যেন আমার কোন হিংসে না হয়। ও তো আমারই বোন।

মনীষার চোখে জল এসে পড়েছিল সেদিন—দিদির প্রার্থনা শুনে। ছুটে গিয়ে মার কাছে বলেছিল—মা এ বিয়ে বন্ধ কর। আমি বিয়ে করব না।

শান্তি দেবী মেয়ের কথা শুনে গোপন ব্যাপারটা বুঝতে পারেন নি। তারপর বুঝতে পেরে তাঁরও মুখের ওপর ফুটে

উঠেছে বেদনার কাতরতা। মুখে দেখা গিয়েছে শুকনো একটুকরো হাসি। কোথা থেকে যেন চাপা দীর্ঘশ্বাসের গুরুভার বোঝা নেমে গেছে দেহ খালি করে। আস্তে আস্তে বলেছেন—অমত করিস্ না মণি। সুরো তো অরাজি নয়।

না মা, এ অসম্ভব! দিদি থাকতে আমার বিয়ে—লোকে কি বলবে?

লোকের কথায় কান দিলে ত মানুষের সমাজে বাস করা যায় না মণি। দেখলি ত সুরোর পাত্র জুটলো না। আমরা কি তার জন্য কম চেষ্টা করেছি। দেখ্ এ নিয়ে আর কোন গোলমাল করিস্ নে—উনি রাগ করবেন। জানিস্ তো এই পাত্রটী যোগাড় করতে ওনাকে কত কষ্ট করতে হয়েছে।

মনীষা ফিরে এল নিজের অন্তর গভীরে। চিন্তা করল কত। কিন্তু কোন সমাধানে আসতে পারল না। সেও জানে কত পাত্রপক্ষ দিদিকে দেখে গেছে। কিন্তু কেউ একবারটি বলেনি—পাত্রী পছন্দ। অথচ দিদির রূপ আর তার রূপে এমন কোন পার্থক্য নেই। বরং দিদি তার চেয়ে ভাল বৈ মন্দ নয়। অথচ কেন যে দিদিকে কেউ পছন্দ করল না—এও এক রহস্য। পাত্রপক্ষ অপছন্দ করে চলে গেছে—আর সুরভির মুখের ওপর ফুটে উঠেছে বেদনার ম্লান ছায়া। অপরাধী যেন সে নিজে। মনীষা কত দিন শুনেছে—গভীর রাত্রে ফুঁফিয়ে ফুঁফিয়ে কান্নার শব্দ। নিস্তব্ধ রাত্রিতে দীর্ঘশ্বাসের চাপা কান্না। এক একবার মনীষার মনে জেগেছে—একবার গিয়ে দিদিকে সান্ত্বনা দেয়। কিন্তু পরক্ষণে মত পাল্টেছে। যার ব্যথা সেই বোঝে বেশী। সে কি করে বুঝবে দিদির ব্যথা কতখানি। এও দেখেছে মনীষা লক্ষ্য করে—পাত্র পক্ষ অপছন্দ করে চলে গেলে দিদি কদিন তাকায় নি কারুর দিকে। কথা বলে নি। লুকিয়ে লুকিয়ে বেড়িয়েছে।

তাই মনে মনে মনীষা সঙ্কল্প করেছিল যদি সম্ভব হয়—এ বিয়ে সে দিদির সঙ্গে দেবে। একবার ভেবেছিল পাত্রকে চিঠি লিখে সব জানাবে। কিন্তু যদি সম্বন্ধ নষ্ট হয়ে যায় তাহলে বাবা আর সহ্য করতে পারবেন না ভেবে এ ব্যবস্থা থেকে সে ক্ষান্ত হয়েছিল। কিন্তু বিয়ের দিন সব কিছু ভুলে গিয়েছিল। ভুলে গিয়েছিল হয়ত নিজের স্বার্থের খাতিরে—কিংবা সুখ হারানোর আশঙ্কায়। দেখেছিল সুরভির শুক্‌নো মুখের ছবি। কলের পুতুলের মত কাজ করে চলেছে। অচল গতি, নিষ্প্রাণ কর্মোদ্যম। দু-একজনের কথাও কানে গেছে—"আহা, ভাগ্য! বড় বোনের বিয়ে হল না ছোট বোনের হয়ে যাচ্ছে।" সুরভির কানে গেছে। পালিয়ে গেছে স্থান ছেড়ে। মনীষার মুখে কে যেন কালি ঢেলে দিয়েছে। কিন্তু তবু পারেনি মনীষা সঙ্কল্প দৃঢ় করতে। কেমন যেন আপনা থেকে শিথিল হয়ে গেছে। ভাবতে চায় নি। ভাবতে পারে নি। সুখ দান করা যে বড় শক্ত। হোক্ না নিজের বোন।

মনীষা অতীত থেকে আবার বর্ত্তমানে ফিরে এল। চেয়ে দেখল, কোলে শুয়ে দিদি—চোখে জল। আস্তে আস্তে মুছিয়ে দিল বেনারসীর আঁচল দিয়ে। নিজের চোখের জল অনেকক্ষণ শুকিয়ে গিয়েছিল। এবার কণ্ঠে এল দৃঢ়তা। সঙ্কল্পে অটল। চেয়ে দেখল ভীড়ের মধ্যে। খুঁজল দীপককে। দেখল ব্যগ্র চাউনি নিয়ে দীপক দাঁড়িয়ে আছে। চোখের কালো মণি দুটো তারই দিকে! চোখের ভাষায় কাতরতা। শুভদৃষ্টি হল মনীষার সঙ্গে। মনীষা মুগ্ধ হল। কাঁপল কণ্ঠ। কিন্তু সঙ্কল্প শিথিল হল না। চোখের ইসারায় ডাকল দীপককে। দীপক কাছে যেতে মনীষা কাতরস্বরে বলল—একটা অনুরোধ আমার রাখবেন।

বলুন, এসব ব্যাপার দীপক কিছুই বুঝতে পাচ্ছিল না। তবে খানিকটা আঁচ যে করতে পাচ্ছিল না তা নয়। তবু মুখে বিহ্বলতা।

মনীষা কোন দিকে না তাকিয়ে কাতর কণ্ঠে বলল—আমার দিদিকে আপনি বিয়ে করবেন?

সরাসরি আর্জি। কোন জড়তা নেই, কোন সঙ্কোচ নেই। বরযাত্রীরা শুনে ক্ষেপে গেলেন। মনীষার বাবা রাজীববাবু ছুটে এলেন। শান্তি দেবী নিষেধ করতে গেলেন। কিন্তু মনীষার মুখের দিকে তাকিয়ে সবাই হঠাৎ স্তব্ধ হয়ে গেলেন। মনীষা সঙ্কল্পে অটল, কর্মে দৃঢ়। সাম্রাজ্ঞীর মত নাট্যমঞ্চে দৃঢ় পদক্ষেপে এগিয়ে চলল। মুখে অভিনয় নয়। অন্তর নিংড়ানো কথায় দর্শকের প্রশংসা কুড়োতে লাগল।

মনীষা আবার বলল দীপকের দিকে তাকিয়ে—আমি কি তাহলে এই কথাই বুঝবো, আমাদের দেশের যুবকদের কোন সৎসাহস নেই? আপনি অবশ্য আমার দিদিকে বিয়ে করলে লাভবানই হবেন। দেখে নিশ্চয় বুঝতে পাচ্ছেন—আমার দিদি আমার চেয়ে কোন অংশে অসুন্দর নয়। বিয়ে তারও হত। কিন্তু কেন জানি না, কেউ তাকে পছন্দ করলেন না। অথচ দিদিকে রেখে আমার বিয়ে অতি অনায়াসেই ঠিক হয়ে গেল।

চোখে জল। মুখে করুণাক্ত ভাষা। মনের বেদনা যেন মনীষার এতগুলো লোকের সামনে ঝরে ঝরে পড়তে লাগল। বলা যাই হোক। অন্তরস্পর্শী বেদনা যেন সবার হৃদয়ে গিয়ে ধাক্কা মারল। গুঞ্জন উঠল বরযাত্রীদের মধ্যে। ফিস্‌ফাস্ কথা শোনা গেল নিমন্ত্রিতদের মধ্যে থেকে। কেমন যেন চাঞ্চল্য। কেমন যেন বিহ্বলতা। সবার মনে যেন রেখাপাত করল। দাগ ফেলল। সামনে অচৈতন্য সুরভি। সবার লক্ষ্য পড়ল সুরভির দিকে। সবাই দেখল মিলিয়ে মনীষার সঙ্গে সুরভিকে। মনীষার কথাগুলো মিলিয়ে সবাই বুঝল—সত্যিই সুরভি মনীষার চেয়ে অনেক সুন্দরী। ফিস্‌ফাস্ কথা। অযাচিত মন্তব্য। উচিত অনুচিত বিবেচনা।

কিন্তু দীপক ভাবছে। ভাবছে অতলান্ত গভীরে ডুবুরী নামিয়ে দিয়ে। চোখের সামনে জোরালো লাইটের আলো। সে বিচারক। নিজের বিচার সেই করছে। সমস্যা তুলেছে একটী সুন্দরী মেয়ে। বিরুদ্ধপক্ষ সেও সুন্দরী। কি করবে? কি বলবে? এতগুলো লোক তার একটী কথা বলার অপেক্ষায় দাঁড়িয়ে। বর-কর্তা তার কাকা। সেও ভাইপোর উত্তরের আশায় অপেক্ষমান। সময় যাচ্ছে। মোমবাতির মোম গলছে। মনীষা উত্তরের অপেক্ষায় তার মুখের দিকে তাকিয়ে আছে। আর শুভ-দৃষ্টির রোমান্স নেই। সুরভিকে গ্রহণ করলে মনীষা হয়ত বাহবা দেবে কিন্তু মনীষা। দীপক মনে মনে একটু বিরক্ত হয়ে উঠল—ঘটনাটা আর একটু পরে ঘটলেই কি পারত না? হৃদপিণ্ডটা লাফাতে লাগল। মনে হল—কে যেন গলা টিপে কণ্ঠরোধ করতে চায়। অনিশ্চয়তার ধোঁয়াটে বাষ্প। সমস্যার তীব্র কষাঘাত। কিন্তু তবু কি করা যায়?

অনেক ভেবে দীপক কথা বলল—বেশ, আমি আপনার দিদিকে বিয়ে করব।

হঠাৎ কারা যেন শঙ্খনিনাদ করে উঠল। মেয়ে কণ্ঠের উলুধ্বনিতে সারা বাড়ী মুখর হয়ে উঠল। সানাইতে বসন্ত রাগ বেজে উঠল। মেয়েদের কলহাসিতে চারিদিক জম্‌-জমাট হয়ে উঠল। শিশুদের কান্নায় আর একটা বিচিত্র সুরের সৃষ্টি হল। মনীষা এগিয়ে এল বেনারসী ছেড়ে। অন্য কাপড় কোমরে জড়িয়ে। নিজে সাজিয়ে দিল সুরভিকে। চন্দনের ফোঁটা পরাল কপালে। চুল ফেরালো সুন্দর করে। খুব সুন্দর করে সাজালো। এত সুন্দর বোধ হয় তাকেও কেউ সাজায় নি। এক এক করে প্রতিটি নিয়ম সুষ্ঠু ভাবে করে গেল। চোখে জল নেই। মুখে গ্লানি নেই। কেবল হাসি। সকলে অবাক হল। আড়ালে মনীষার প্রশংসা করল। কেউ কেউ থাকতে পারল না, সামনেই প্রশংসা করল। কিন্তু যে সুর আগে ছিল সে সুর আর ফিরল না। লোকে যতই তাকে বাহবা দিক্। মনে মনে কিন্তু সকলে বলতে লাগল। মেয়েটা ভুল করল বোধ হয়। নিজের বোনের জন্যে বর পাল্টান—এমন আর দেখা যায় না।

যাই হক তবু বিয়ে হল। বর কনেকে বাসর ঘরে পৌঁছে দিয়ে আর নিজেকে ধরে রাখতে পারল না মনীষা। বেরিয়ে আসছে—দীপক আঁচল টানল। মনীষার তখন চোখে জল আসে আসে। করমজা চোখ। মুখ ফেরাতে দীপক একটু থতমত খেল। যা বলবার জন্যে তাকে ডেকে-ছিল—আটকে গেল। বলা হল না। দীপক মনীষাকে একটা ধন্যবাদ দিতে চেয়েছিল। দীপক কিছু না বলতে ভারাক্রান্ত গলায় মনীষা বলল—আমায় কিছু বলবেন?

দীপক মাথা নাড়ল। হতবুদ্ধি তার চাউনি। মনীষা যে কাঁদতে পারে সে বুঝতে পারে নি এবং এই কান্নার যে আর এক অর্থ, এ কথাও সে ভালভাবে বুঝতে পারল না। একটা কিছু বলার জন্যে মুখ ফেরাতেই দেখে ঘর ছেড়ে মনীষা কখন বেরিয়ে গেছে।

মহাযুদ্ধের পশ্চাৎপট

অধ্যাপক শ্যামলকুমার চট্টোপাধ্যায়

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ অনেক দিন আগে শেষ হলেও আজও ঐ যুদ্ধ বাধার আসল কারণ আর তার জন্যে দায়ী কে বা কারা, তা আমাদের দেশের সাধারণ লোকেরা জানেন বলে মনে হয় না। একটা ভুল ধারণা প্রচলিত দেখা যায়: নাৎসি জর্মনি, ফাশিস্ত্ ইতালি আর জিঙ্গো জাপানিই যত অনর্থের মূল; বিশেষত, জর্মনি পোল্যাণ্ড আক্রমণ করলে বলেই তো পোল্যাণ্ডের সঙ্গে চুক্তিবদ্ধ ব্রিটেন ও ফ্রান্স নিরুপায় হয়ে জর্মনি আক্রমণ করল? একথা তো মনে রাখতে হবে যে, হিটলার দানবরূপ গ্রহণ করে অষ্ট্রিয়া, চেকোশ্লোভাকিয়া, মেমেল গ্রাস করে দান্তসিক্ (Danzig)-এর দিকে থাবা বাড়িয়ে দিয়েছিল বলেই না গণতন্ত্রের পূজারী ফ্রান্সই প্রথমে জর্মনির বিরুদ্ধে সৈন্য চালনা করে জর্মনিতে প্রবেশ করে? কে না জানে যে, হিটলার ও নাৎসিবাদ ইউরোপ তথা জগৎ গ্রাস করতে উদ্যত হয়েছিল?

১৯৩৯ সালের ৩রা সেপ্টেম্বর ব্রিটেন ও ফ্রান্স জর্মনির বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে। জর্মনি প্রথমে তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে নি, সবাই ঐ যুদ্ধের দায় জর্মনির ঘাড়েই চাপায়। মাত্র কিছুদিন আগে খ্রুশ্চেফ্ ঘোষণা করেন যে, দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের দায়িত্ব ব্রিটেন ও ফ্রান্সের, জর্মনির নয়; মনে পড়ে, ১৯৪৩ সালে বার্লিন বেতারের এক বাংলা বক্তৃতা: "মিথ্যা কথা বলা ইংরেজদের চরিত্রগত দোষ। যখন নিরপেক্ষভাবে ইতিহাস লেখা হবে তখন বিশ্ববাসী জানতে পারবে, প্রথম গুলি কোন্ পক্ষের বন্দুক থেকে ছোড়া হয়েছিল।" মহাযুদ্ধের পশ্চাদ্বর্তী সমস্ত ঘটনাবলী আলোচনা করলে স্পষ্টই দেখা যায় যে, ইঙ্গ-মার্কিন-ফরাসি প্রচার যন্ত্রের শক্তিশালী মিথ্যা প্রচারে স্বাধীনতা লাভের পরও ভারতবাসিগণ বিভ্রান্ত হয়ে আছে। বিশেষতঃ ভারতীয় শিক্ষিতমণ্ডলী ব্রিটেনের দৃষ্টিতে জগৎ দেখতে অভ্যস্ত হওয়ায় তাঁরা মুক্ত দৃষ্টিতে পূর্বসংস্কারমুক্ত মনে বহির্জগতের ঘটনাবলীর বিচার প্রায়ই করতে পারেন না। দীর্ঘ বিশ বছর পরে সমস্ত ঘটনার অন্তর্নিহিত তাৎপর্য বিশ্লেষণ করলে এখন হয়ত তাঁরা দেখতে পাবেন যে, জর্মনির বিশেষ কিছু দোষ ছিল না এবং খ্রুশ্চেফের উক্তি মোটেই মিথ্যা নয়।

জর্মনির স্বপক্ষে প্রধান বিবেচ্য বিষয় এই যে, সে সমস্ত জর্মনভাষী জর্মনসংখ্যাগরিষ্ঠ এলাকা একত্র করে ইউরোপে একটি অখণ্ড জর্মন রাষ্ট্র গঠন মাত্র করতে চেয়েছিল। ভারতীয় ইউনিয়নের অন্তর্ভুক্ত সমস্ত বাংলাভাষী এলাকা একত্র করে অখণ্ড পশ্চিমবঙ্গ গঠন করতে চাওয়া যদি দোষের না হয়, তাহলে ইউরোপে, যে আত্মনিয়ন্ত্রণের দাবি বোলশেভিকরা প্রথম ব্যাপকভাবে প্রচার করে তদনুসারে, অখণ্ড সম্পূর্ণ জর্মনি গড়তে চাওয়াও দোষের হতে পারে না। সমস্ত জর্মনগরিষ্ঠ এলাকাই নিদেশ বার্লিনের কেন্দ্রীয় সরকারের অধীনতা বরণ করতে চেয়েছিল। হিটলারও অষ্ট্রিয়া, সুদেতেনল্যান্ট্ বা দক্ষিণ জর্মনভূমি, মেমেল এবং দান্তসিক্ শান্তিপূর্ণ উপায়ে দখল করার চেষ্টাই করেছিলেন। ভার্সাই চুক্তির চেয়ে অঞ্চলবিশেষের সংখ্যাগরিষ্ঠ জনসাধারণের ঐকান্তিক ইচ্ছাই নিশ্চয় বেশি মূল্যবান্। প্রথম মহাযুদ্ধের বিজয়ী পক্ষ অন্যায়ভাবে পঞ্চাশ লক্ষ জর্মনকে জর্মনি-সন্নিহিত ডেনমার্ক, হল্যাণ্ড, বেলজিয়াম, ফ্রান্স, পোল্যাণ্ড, চেকোশ্লোভাকিয়া, লিথুয়ানিয়া, ইতালি দেশগুলিতে বিক্ষিপ্ত করে দিয়েছিল এবং ক্ষুদ্রকায় অষ্ট্রিয়া রাজ্য এমনভাবে গঠন করেছিল যে, তার পক্ষে স্বাবলম্বী হয়ে থাকা ছিল নিতান্ত অসম্ভব। ১৯২৬ সালেই অন্নদাশংকরও স্বীকার করেছিলেন যে, অষ্ট্রিয়ার জর্মনির সঙ্গে মিলিত না হয়ে উপায় নেই। জাতীয় নেতারূপে হিটলার যদি ন্যায়সঙ্গতভাবে সমস্ত জর্মনগরিষ্ঠ এলাকাকে একে একে একত্র করতে চান, তবে তাতে সাম্রাজ্যিক ও বাণিজ্যিক স্বার্থ ক্ষুণ্ণ হওয়ার ভয়ে ব্রিটেন ও ফ্রান্স আপত্তি করতে পারে বটে, ভারতীয়দের জর্মনি বা হিটলারের বিরুদ্ধে রাগের কোন কারণ নেই।

যুদ্ধ বেধে যাবার পর আত্মরক্ষাব্যপদেশে রণনীতির তাগিদে জর্মনি কখন্ কোন্ রাজ্য আক্রমণ করেছে এবং সে-আক্রমণ ন্যায়সঙ্গত কিনা, আপাততঃ সে-আলোচনা অনাবশ্যক। হিটলারকে সমস্ত জর্মন এলাকা দিয়ে দেবার পর দেখা উচিত ছিল যে, তিনি অন্যায়ভাবে অ-জর্মন এক ইঞ্চি এলাকাও দখল করার চেষ্টা করেন কি না। তিনি সে চেষ্টা করলে ব্রিটেন, ফ্রান্স, রাশিয়া, আমেরিকা—সকলের একযোগে জর্মনিকে আক্রমণ করার ন্যায়সম্মত অধিকার জন্মাত। অখণ্ড জর্মনি যত শক্তিশালীই হোক্, বিশ্ববাসীকে সে পরাজিত করতে পারত না। খ্রুশ্চেফ্ বলেছিলেন যে, সকলে মিলিতভাবে প্রতিরোধ করতে উদ্যত হলে জর্মনির লড়ার সাহসই হত না।

প্রকৃতপক্ষে, জর্মনির শিল্প-বাণিজ্য বিস্তারে ভয় পেয়ে মিত্রশক্তি অন্যায় ভাবে গায়ে পড়ে জর্মনিকে আক্রমণ করে। ইউরোপে ভাষা ও জাতীয়তার ভিত্তিতে নতুন করে রাষ্ট্র গঠনের দ্বারা ক্রমশ জর্মনি সারা ইউরোপের কৃতজ্ঞতাভাজন হবে এবং ক্ষুদ্র ইউরোপীয় জাতিগুলির নেতৃত্বপদ লাভ করবে, নব জাতীয়তার উন্মাদনায় প্রবুদ্ধ জাতিগুলি তাদের সদ্য গড়ে তোলা ভাষাভিত্তিক রাষ্ট্রগুলিতে ফ্রাঙ্কো-ব্রিটিশ বাণিজ্য-বিস্তার বন্ধ করে দেবে, যে অর্থনৈতিক সুবিধা ও অধিকার এতদিন ব্রিটেন ও ফ্রান্স ভোগ করছিল, হয়ত সে-সবই জর্মনির শিল্পবিস্তারের করায়ত্ত হবে, এই সব ভয়ে অধীর হিংসুটে ও ঈর্ষ্যাকাতর ঐ দুই সর্ববৃহৎ সাম্রাজ্যবাদী রাষ্ট্র নবীন শক্তিচেতনায় প্রবুদ্ধ জর্মন জাতিকে আক্রমণ করে। এর মধ্যে মানবতা ও গণতন্ত্র বনাম দানবতা ও পীড়নতন্ত্রের লড়াইএর কোন প্রশ্ন যদি থেকে থাকে তবে তা জর্মনির পক্ষে; শ্রীঅরবিন্দ-বর্ণিত দেবাসুরের

যুদ্ধ ; এ-যুদ্ধ ছিল দুই দল শক্তিপ্রিয় মানবের লড়াই, এক দল চেয়েছিল স্বাধিকার প্রতিষ্ঠা করতে, অন্যদল চেয়েছিল অন্যায় কায়েমি স্বার্থ রক্ষার জন্যে বিপক্ষের স্বাধিকারপ্রতিষ্ঠাপ্রয়াসকে ক্ষুণ্ণ ও ব্যর্থ করতে। এ বিষয়ে তথ্য, প্রমাণ ও যুক্তি কোন্ দিকে যায়, তা সতর্কভাবে পরীক্ষা করা যেতে পারে।

জর্মনির বিরুদ্ধে একটা মস্ত অভিযোগ এই যে, ইহুদি-নির্যাতনে জর্মনরা কলঙ্কিত হয়েছে। এর উত্তরে বলা যায় যে, ইউরোপের প্রায় সব জাতিই ইহুদিদের আন্তরিকভাবে ঘৃণা করে ইহুদিদের নিজ গুণেই ; ইহুদি-নির্যাতন পূর্ব-ইউরোপের বহু রাজ্যে ন্যায়সঙ্গত ভাবেই হয়েছে, এখনও হচ্ছে। সে-সম্বন্ধে কিছু বলার আগে আচার্য সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের একটি লেখা পাঠকের বিবেচনার জন্যে উদ্ধৃত হচ্ছে।

"দেখে শুনে মনে হল, অষ্ট্রিয়ায় ইহুদিদের দুর্দশা ক্রমে জর্মানিরই মতন হবে। অন্য দেশেও এরূপ অবস্থার দিকে যে ঘটনাচক্র গতি নিচ্ছে—পরে হঙ্গেরিতে গিয়ে আর পারিসে গিয়ে তা দেখলুম। ইহুদিদের কেমন কতকগুলো জাতীয় বৈশিষ্ট্য আছে যাতে করে তারা এতদিনে বিভিন্ন জাতির লোক—যাদের সঙ্গে বসবাস করছে তাদের প্রীতি শ্রদ্ধা আকর্ষণ করতে পারলে না—মনে হয়, খাঁটি জর্মানদের রাগের কারণও আছে যথেষ্ট—ইহুদিদের অবস্থা এখন মধ্য-ইউরোপে কোনও দেশে সুবিধার নয়।…জর্মানদের বিশ্বাস, ইহুদিরা জর্মানভাষী হলেও তাদের মনোভাব জর্মান নয়, তারা জর্মান জাতীয়তাবোধের পরিপন্থী, তারা জর্মানিকতা-র বিরোধী, তারা হচ্ছে আন্তর্জাতিকতাবাদী। এইজন্য এবং অর্থনৈতিক নানা কারণের জন্য জর্মানরা ইহুদিদের সন্দেহের চোখে দেখতে আরম্ভ করে।…হঙ্গেরিতেও ইহুদি-বিদ্বেষ প্রকট হয়ে উঠ্‌ছে… আমায় জর্মানিতে একজন অধ্যাপক বলেছিলেন—জর্মানিতে রবীন্দ্রনাথ যে কয়বার এসেছিলেন, জনকতক ইহুদি তাঁকে এমনি করে ঘিরে আর চালিয়ে নিয়ে বেড়াত যে, অন্য ভদ্র জর্মানরা সেখানে পাত্তা পেত না।… কার্যত ব্যাপারটা বোধ হয় কতকটা সত্য।…হিব্রু লিপি বিভিন্ন দেশের ইহুদি জনসাধারণ প্রাণপণে আঁকড়ে রইল।…হিব্রু লিপিতে লেখা জর্মান এখন এমন একটা বিশিষ্ট ভাষা হয়ে দাঁড়িয়েছে যে, এর একটা নাম দিতে হয়েছে Yiddish। এই য়িদ্দিশ্ ভাষা হচ্ছে জর্মানি, পোলাণ্ড, রুমানিয়া, লিথুয়ানিয়া, লাট্‌ভিয়া, আর রুশদেশের ইহুদিদের মাতৃভাষা।"

এই ইহুদিরা শুধু স্বতন্ত্র ধর্মমত গ্রহণ করে নি, এরা একটি স্বতন্ত্র জাতিও বটে। পৃথিবীর সব দেশেই এরা নিজেদের স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করে চলে। এদের নিজস্ব স্বদেশ বা Homeland থাকা বিশ্বজনের স্বার্থেই প্রয়োজন। কিন্তু সেই ইহুদি রাষ্ট্রের বাইরে এদের রাখা এই জন্যেই বিপজ্জনক যে, এরা পঞ্চম বাহিনী হিসেবে যে কোন দেশের পক্ষে ক্ষতিকর হয়ে উঠতে পারে। Mein campf গ্রন্থে এ সম্বন্ধে হিটলার যা বলেছেন, তাতে আন্তর্জাতিকতাবাদীরা রাগ করলেও যুক্তির দিক থেকে কোন ভুল নেই। ইস্রেল-রাষ্ট্রের বাইরে ইহুদিদের নাগরিক অধিকার দেওয়া, আর পঞ্চম বাহিনী পোষা একই কথা। সুয়েজ আক্রমণের সময় ১৯৫৬ সালে বুলগানিন এমন কথাও বলেছিলেন যে, ইস্রেল রাষ্ট্রের অস্তিত্ব থাকার প্রয়োজন আছে কি না, সন্দেহ! হতভাগ্য ইহুদিদের সম্বন্ধে এতটা নিষ্ঠুর হওয়া সমীচীন নয়। কিন্তু তাদের একটি উপযুক্ত বাসভূমি স্থির করার পর সেখানে তাদের একত্র রাখাই সুবুদ্ধির পরিচায়ক। বিশ্ববাসী যদি এক জাতিবর্ণহীন মিশ্রণের একাকারত্বে লুপ্তির মহানির্বাণ সুখ পেতে না চায়, তাহলে কট্টর আন্তর্জাতিকতাবাদী ইহুদিদের এক রাষ্ট্রে সমবেত করে অন্যান্য রাজ্য থেকে তাদের নাগরিক অধিকার অপসারিত করাই মঙ্গলজনক। পূর্ব ইউরোপের প্রায় সব দেশেই এখন সেমিটিক-বিদ্বেষ প্রবল এবং ব্যাপক ইহুদি-দলন সেখানে চলেছে। সোভিয়েট ইউনিয়নও ইহুদিদের বিশ্বাসঘাতকতায় বিরক্ত হয়ে উঠেছে। সোভিয়েট সংবিধানের সঙ্গে যাঁরা ঘনিষ্ঠভাবে পরিচিত, তাঁরা সবাই Jewish Region-এর কথা জানেন। ঐ নির্দিষ্ট "ইহুদি এলাকা" থেকে দলে দলে ইহুদি ইস্রেলের দিকে যাত্রা সুরু করায় রাশিয়া ক্রোধে অস্থির হয়ে সাম্প্রতিক কালে আবার ইহুদি-তোষণনীতি পরিত্যাগ করেছে। প্রাক্-সোভিয়েট আমলে রাশিয়া ইহুদিদের বিরুদ্ধে ঢের বেশি অত্যাচার করেছে যার সাক্ষ্য দিয়েছেন স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ এই বলে যে, "মাঝে মাঝে ইহুদি প্রতিবেশিদের পরে খুন চেপে যায়, তখন পাশবিক নিষ্ঠুরতার আর অন্ত থাকে না।"

ইহুদি-নির্যাতন যদি অন্যায়ই হয় তাহলে সে-অন্যায় সারা ইউরোপের অন্যায়। এককভাবে জর্মনিকে মসীবর্ণ চিত্রিত করা দুরভিসন্ধির পরিচায়ক। বিশেষ রাজনৈতিক প্রয়োজনে ব্রিটেন, ফ্রান্স ও আমেরিকা একদা জর্মনির বিরুদ্ধে ঐ প্রচারকার্য চালিয়েছিল। ভারতবাসীরা যদি তাতে এখনও বিশ্বাস স্থাপন করে তাহলে গুরুতর ভুল হবে। ইস্রেল রাষ্ট্রকে যতখানি সহানুভূতি অর্পণ করা উচিত ছিল, ভারত তা কোনদিনই করে নি ; অথচ, জর্মনদের ইহুদি-পীড়নের নিন্দায় এদেশের শিক্ষিত লোকেরা অজ্ঞতাবশত পঞ্চমুখ! এই অসঙ্গতি দূর হওয়া উচিত।

ইহুদি-প্রসঙ্গ বাদ দিলে জর্মনির বিরুদ্ধে দ্বিতীয় অভিযোগ হচ্ছে, আর্যামির অভিমান ; নর্ডিক জাতির শ্রেষ্ঠত্বের গর্ব বা Cult of Herrenvolk ; কিন্তু তথাকথিত "আর্য" জাতির শ্রেষ্ঠত্বের তত্ত্ব প্রথম প্রচার করেন ইংরেজ ও ফরাসি পণ্ডিতেরা ; কাইজার তাঁদের মতের দ্বারা বিশেষভাবে প্রভাবান্বিত হন। হিটলারও প্রথমে ঐ মতবাদের দ্বারা খানিকটা অভিভূত হয়ে পড়েন ; সমসাময়িক বৈজ্ঞানিক ও মনীষীদের রচনার দ্বারা তেমন প্রভাবিত হওয়া খুবই স্বাভাবিক। বাংলাদেশেও ভূদেব মুখোপাধ্যায় প্রভৃতির ঐ ধরণের আর্য-সংস্কার দেখা গিয়েছিল। হিটলারের স্বপক্ষে আর একটি কথা বলতেই হবে। চেম্বারলেন সাহেবের যে বইএ জর্মনদের শ্রেষ্ঠত্বের কথা বলা হয়, তার প্রতিপাদ্য বিষয় যুক্তি দ্বারা খণ্ডন করা একরকম অসম্ভব। যাঁরা Mein Kampf পড়েছেন, তাঁরাই জানেন যে, হিটলারের বক্তব্য অপ্রমাণ করা মোটেই তত সোজা নয়, তাঁকে কটূক্তি করা যত সহজ। চেম্বারলেনের গ্রন্থের অনুবাদক বলেছিলেন, চতুরতম মনবীও তাঁর যুক্তির ভুল দেখাতে পারবেন না।

আজ পর্যন্ত কোন মনীষীই সে-চেষ্টায় সফল হন নি। শ্রীঅরবিন্দও তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থসমূহে জর্মন জাতির শ্রেষ্ঠত্ব স্বীকার করে নিয়েছেন। অথচ, তাঁর মতো নাৎসি-বিরোধী, হিটলার-বিদ্বেষী এবং জর্মন-অন্তর্মুখী-সাধনার ভ্রান্তির সমালোচক খুব কমই দেখা গেছে। তিনি বলেছেন: Germany is the most remarkable subjective nation. সুতরাং যে জাতিপ্রেম ও শ্রেষ্ঠত্বাভিমান প্রায় সব জাতিরই আছে তার অস্তিত্বমাত্র জর্মনদের মধ্যেও থাকাটা দোষের নয়। দোষের হচ্ছে শ্রেষ্ঠত্বের অভিমানে অন্যের বিলোপ সাধনের ব্যবস্থা করা। সে-দোষ হিটলারের খুব বেশি ছিল, এই ধারণা অনেকেরই আছে। কিন্তু তার কোন প্রমাণ পাওয়া যায় নি। ইতালীয় মুসোলিনির প্রতি সর্বাধিক শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করা হয়েছে Mein Kampf-এ; নর্ডিক জাতির গর্ব নিয়েও নিট্শে ইতালীয়দের যে গুণগান করেছেন, তা যদি কেউ পড়েন, তাহলে বুঝতে অসুবিধা হবে না যে, জর্মনরা ভয়ানক পরজাতিবিদ্বেষী নয়। বিশ্বের অনার্য জাতিগুলিরও সভ্যতা ও সংস্কৃতির যে চর্চা ও অনুশীলন এবং সংরক্ষণের ব্যবস্থা নর্ডিকরা করেছে তার অনুরূপ কিছু অন্যত্র দেখা যায় না। বরং চলার পথের প্রতিবন্ধক হিসেবে সেমিটিকরা কি ভাবে অন্যের সংস্কৃতিসম্পদ্ ধ্বংস করেছে, ইহুদি ও ইসলামের ইতিহাস তার প্রমাণ।

এর পরে জর্মনির বিরুদ্ধে তৃতীয় ও গুরুতর অভিযোগটির বিষয় আলোচনা করা যাক। জর্মনি অন্যায়ভাবে পররাজ্য গ্রাস করেছিল কিনা বিচার্য। অষ্ট্রিয়ার জর্মনরা জর্মনিতে যোগ দেবার জন্যে একান্ত ইচ্ছুক ছিল, সেকথা ভোলা অনুচিত। এ সম্বন্ধে গোপাল হালদার লিখেছেন, "অষ্ট্রিয়াবাসীরা জাতিতে ও ভাষায় জর্মান। ইহাতে সন্দেহ নাই যে, নাৎসি আগমনে অষ্ট্রিয়ায় উদ্বেল আনন্দের ঢেউ বহিয়া গিয়াছে।" চেকোশ্লোভাকিয়ার সম্বন্ধেও একথা ঠিক। চেকদের মার্কিন ভোট পাবার উদ্দেশ্যে অসাধু মার্কিন প্রেসিডেণ্ট উড্রো উইলসন জোর করে চেকোশ্লোভাকিয়া রাষ্ট্রে চেকদের হাতে শ্লোভাক, লুথেনিয়, হাঙ্গেরিয়, পোল ও জর্মনদের একটা মস্ত বড় অংশকে তুলে দেন। হিটলার চেকোশ্লোভাকিয়ার যে সীমারেখা প্রধানত মার্কিনরা স্থির করে তার পুনর্বিন্যাস করে জর্মনদের ন্যায্য প্রাপ্য এলাকা নিয়ে শ্লোভাকদের স্বাধীনতা আন্দোলনে সাহায্য করেন। ফলে চেকোশ্লোভাকিয়া ভেঙে চেকিয়া ও শোভাকিয়া নামে দুটি স্বাধীন রাজ্য গড়ে ওঠে। পোলরা পোল্যাণ্ডে যোগ দেয়। হাঙ্গেরি হাঙ্গেরিয় এলাকার সঙ্গে সঙ্গে লুথেনিয় অঞ্চলও আত্মসাৎ করে। কিন্তু তার জন্য হাঙ্গেরিকে কেউ নিন্দা করে না। কৌতুকের বিষয় এই যে, হিটলারের সহায়তায় পোল্যাণ্ড নিজের পোলগরিষ্ঠ এলাকা অধিকার করলে দোষ হয় না, কিন্তু পালদের কাছে জর্মনরা ন্যায্য প্রাপ্য দাবি করলে মানবতা ও গণতন্ত্র লঙ্ঘন করা হয়।

চেকোশ্লোভাকিয়ার লুথেনিয় এলাকা পরবর্তীকালে ইউক্রেন বা উক্রাইনে রাষ্ট্রকে ফিরিয়ে দেবার ইচ্ছা হিটলারের বরাবরই ছিল; তিনি ঐ এলাকাটির নামকরণ করেন, "কার্পাথো-ইউক্রেন" বা কার্পেথিয় পর্বতমালাসংলগ্ন ইউক্রেন; হাঙ্গেরিই এলাকাটি তৎক্ষণাৎ আত্মসাৎ করে, জর্মনরা নয়। সেই ক্ষোভে পরবর্তীকালে রুশরা হাঙ্গেরির সঙ্গে সর্বদা সদ্ব্যবহার করেনি। ইম্রে-নজের শোকে হাঙ্গেরির দুষ্কার্য ভুলে যাওয়া সঙ্গত হবে না।

নাৎসিবিরোধী পাঠকেরা বিখ্যাত সাহিত্যিক গোপাল হালদারের এই লেখাটুকু পড়লে "অন্তর হতে বিদ্বেষ-বিষ" দূর করতে পারবেন:—

"যুদ্ধশেষের ভাগ-বাঁটোয়ারায় মাসারিক, বেনেস—এই দুই মহামনীষী নিজেদের অংশটিকে ফাঁপাইয়া তুলিতে গিয়া জর্মানির একটি অংশ গ্রাস করিয়া বসেন। ৩৫ লক্ষ জর্মান এই সুদেতেন জর্মান অঞ্চলে এতদিন বহু দুঃখও ভোগ করিয়াছে। ম্যাগিয়াররা (হাঙ্গেরিয়ান) শতকরা ৫জনের কম, পোলরা এদেশে শতকরা আধ জন, তবু তাহারাও বাড়াবাড়ি করিতে ছাড়ে না।" চেকোশ্লোভাকিয়া-সরকারের তত্ত্বাবধানে দক্ষিণ জর্মনভূমিতে যে নির্বাচন হয় তার সম্বন্ধে গোপালবাবু লিখেছেন, "সুদেতেন অঞ্চলের নির্বাচনে শতকরা ৮০টি ভোটই গিয়াছে হেনলাইনের পক্ষে। হেনলাইন হিটলারপন্থী নেতা ছিলেন। শান্তিপূর্ণ উপায়ে নির্বাচনের দ্বারা ক্ষমতা হস্তান্তরিত করতে রাজি না হওয়ায় চেকোশ্লোভাক-সরকারকে হিটলার বলপ্রয়োগের হুমকি দেন। তাতে দোষ কোথায়? হেনলাইনের ৮ দফা দাবির প্রত্যেকটিই যে সুসঙ্গত ছিল, তা পাঠকেরা নিজেরা বিচার করে দেখতে পারেন। রয়টার সে-সময়ে খবর দেন:—

"লণ্ডনের টাইম্স্ পত্রিকা সুদেতেন জার্মানদিগকে সুদেতেন-অধ্যুষিত জেলাগুলি ছাড়িয়া দেওয়াই চেক্ সমস্যা সমাধানের সম্ভাব্য উপায় বলিয়া সম্পাদকীয় নিবন্ধে মন্তব্য করিয়াছেন।"

ব্রিটেন ফ্রান্সের চেকোশ্লোভাকিয়ার ব্যাপারে নীতিগতভাবে বাধা দেওয়ার শক্তি যে ছিল না, টাইম্সের মন্তব্য তারই প্রমাণ। গোপাল হালদারের মতো বিখ্যাত কমিউনিস্ট লিখছেন: "লিথুয়ানিয়ার মেমেলে জার্মান পুনরধিকার প্রতিষ্ঠিত হইতেছে। মেমেলের নির্বাচন নাৎসিদের এই সুযোগ দান করিয়াছে। মেমেল অবিলম্বেই জার্মানির হস্তগত হইবে। পোল্যাণ্ডের সঙ্গে জার্মানির একটু ছাড়াছাড়ি ঘটিয়াছে। পোল্যাণ্ড ও হাঙ্গেরি একত্রিত হইয়া লুথেনিয়া দখল করিয়া দুই দেশে ভৌগোলিক যোগাযোগ স্থাপন করিতে চাহিতেছিল। পোল্যাণ্ডও এখন নূতন করিয়া সোভিয়েট বন্ধুত্ব আবার স্বীকার করিল। হয়ত জার্মানিকে চাপ দিবার জন্যই। কারণ, সোভিয়েটের সঙ্গে তাহার সৌহার্দ্য সহজ নয়, আর পোল্যাণ্ডের বন্ধুত্ব চিরদিনই ক্ষণস্থায়ী।" পোল্যাণ্ডের কাছে জর্মনি কেবল জর্মনভাষী এলাকার প্রত্যর্পণ দাবি করেছিল। দান্ত্সিকের শতকরা ৯৬জন ছিল জর্মন। তা ফিরিয়ে দিলে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ বাধ্ত না। এ সম্বন্ধে সমস্ত দায়িত্ব প্রত্যক্ষভাবে পোল সরকারের, পরোক্ষভাবে তার তিন পোষ্টা ব্রিটেন, ফ্রান্স ও রাশিয়ার। গোপাল হালদার তার কারণ এইভাবে বিশ্লেষণ করেছেন:—

"পোল্যাণ্ড ও রুমানিয়া আপনার অঙ্গচ্ছেদের সম্ভাবনায় ত্রস্ত; হিটলার নূতন উক্রেইন রাষ্ট্র পত্তন করিয়া যখন সোভিয়েট রুশিয়াকে পর্যুদস্ত করিবেন, তখন পোল্যাণ্ড ও রুমানিয়ার অধিকৃত উক্রেইন খণ্ডদ্বয়ও সেই দুই রাজ্যের বিসর্জন দিতে হইবে। পোল্যাণ্ড সেই

ভবিষ্যতের ভয়ে বাধ্য হইয়াই সমাবস্থ সোভিয়েটের সঙ্গে নিজের পুরাতন বন্ধুত্ব পুনঃস্বীকার করিয়াছে।"

সুতরাং দেখা যাচ্ছে, হিটলার পররাজ্য-গ্রাস তো দূরের কথা, বিখ্যাত জর্মন দার্শনিক হার্ডারের আদর্শ অনুসারে ইউরোপে ভাষার ভিত্তিতে রাজ্য পুনর্গঠন করছিলেন, পাছে উক্রাইনে বা রেড রাশিয়া বা লিট্‌ল রাশিয়া বা রুথেনিয়া বা ইউক্রেনকে ন্যায্য প্রাপ্য ছেড়ে দিতে হয়, সেই ভয়ে পোল্যাণ্ড বৃহৎ রাশিয়ার শরণাপন্ন হয়। এ থেকে হিটলারকে দুর্বৃত্ত বলে মনে করা যায় কি? আজ জাতিসংঘে যে রাশিয়ার সঙ্গে উক্রাইনেরও ভোটাধিকার আছে তার মূলে হিটলারের উক্রাইনেকে দেওয়া উৎসাহ ও প্রেরণা কার্যকরী হয়েছে। আর, পোল্যাণ্ডের সঙ্গে রাশিয়ার সাম্প্রতিককালে মন-কষাকষি সুরু হওয়ার কথা পাঠকদের নিশ্চয় স্মরণ হয়। গোমুল্‌কার কর্তৃত্ব মেনে না নিলে পোল্যাণ্ডও মিত্র হাঙ্গেরির অনুগমন করতো।

দান্তসিক্‌ সম্বন্ধে কয়েকজন শ্রেষ্ঠ ঐতিহাসিকের মতের সারসংকলন তুলে দেওয়া হচ্ছে সাধারণ পাঠকের সুবিধার জন্যে। বিজ্ঞ পাঠক "Inside Europe" প্রভৃতি বই পড়ে দেখতে পারেন, সত্য কোন্‌ পক্ষে।

"জার্মেনির ডানজিগ বন্দরকে একটি স্বাধীন সহরে পরিণত করে পোল্যাণ্ডকে সেই বন্দর মারফৎ বৈদেশিক বাণিজ্য চালাবার অনুমতি দেওয়া হয়। ডানজিগে পৌঁছাবার জন্য তাকে জার্মেনির খানিকটা অংশও ছেড়ে দেওয়া হয়। এটাই "পোলিশ করিডর" নামে বিখ্যাত এবং দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ আরম্ভ হওয়ার প্রত্যক্ষ কারণ। ডানজিগ নগরী চিরদিনই স্বায়ত্ত শাসনের অধিকার ভোগ করে এসেছে। এর লোকসংখ্যার অধিকাংশই জার্মান। স্বায়ত্ত শাসনের ব্যাপারেও এই জার্মানদের প্রভুত্ব ছিল চিরদিনই অটুট। ভার্সাই সন্ধিতে এর পররাষ্ট্রীয় নীতি নিয়ন্ত্রণের ভার পড়ে পোল্যাণ্ডের উপরে। এ ব্যবস্থা ডানজিগের জার্মান জনগণ কোনদিনই প্রসন্ন অন্তঃকরণে গ্রহণ করতে পারেনি। ডানজিগের পার্শ্ববর্তী পোমেরানিয়া প্রদেশ চিরদিনই জার্মান ভাষাভাষী লোকের বাসভূমি। ভার্সাই সন্ধিতে এই প্রদেশটিকে পোল্যাণ্ডের হাতে সমর্পণ করা হয়। উদ্দেশ্য ছিল, সমুদ্রতীরে পৌঁছোবার পথ প্রদান। এই করিডরেরও অধিকাংশ অধিবাসী ছিল জার্মান এবং হিটলারের অভ্যুদয়ে তাদেরও আনন্দ কম হয়নি। জার্মান সেনা করিডরে প্রবেশ করা মাত্র সেখানকার জার্মান অধিবাসীরা তাদের সাদরে অভ্যর্থনা করে নিল।"

অন্যত্র গোপাল হালদার মহাশয় লিখ্‌ছেন :—

"চেকোশ্লোভাকিয়া-যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট শ্লোভাকিয়ার প্রধানমন্ত্রী টিসোর স্বাতন্ত্র্য-প্রয়াস রোধ করিবার জন্য টিসোকে পদচ্যুত করিলেন। অমনি শ্লোভাক স্বাতন্ত্র্যবাদীরা একটা বিদ্রোহের চেষ্টা করিল। সে-চেষ্টা ব্যর্থ হইলে হিটলারের সকাশে চেকদের বিরুদ্ধে আবেদন গেল। বের্লিনের আদেশ—যুক্তরাষ্ট্র হইতে বিচ্ছিন্ন, স্বাধীন শ্লোভাকিয়া গঠিত হইবে। অমনি নূতন শ্লোভাকিয়া জন্ম লইল। অবশ্য হিটলার বলিয়াছেন—"চেকিয়া"-রও নিজ জীবনযাত্রা নিজেরই থাকিবে। শ্লোভাকিয়ার সঙ্গেই রুথেনিয়া বা কার্পেথো-উক্রেইনও স্বাধীন হইল। সেখানে আবির্ভূত হইল হাঙ্গেরীয় বাহিনী। চেক সৈনিকদের সঙ্গে ও শ্লোভাক সীমান্তে শ্লোভাকদের সঙ্গে হাঙ্গেরীয় বাহিনীর যুদ্ধও বাধিল। কিন্তু অনতিবিলম্বেই হাঙ্গেরি পোলাণ্ডের সীমান্তে গিয়া পৌঁছিল। দুই দেশের বহুদিনের আকাঙ্ক্ষা এই সংযোগ।"

সম্প্রতি রুশ-হাঙ্গেরি, রুশ পোল্যাণ্ড মন-কষাকষির মূলে আছে অন্যান্য কারণের সঙ্গে এই ব্যাপারটাও যে, দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর রাশিয়া ঐ সংযোগ ছিন্ন করে দিয়েছে। হাঙ্গেরি-পোল্যাণ্ড সংযোগের পর চেকিয়া ও শ্লোভাকিয়া স্বেচ্ছায় জর্মনির "আশ্রিত" রাজ্যে পরিণত হয়। কারণ, তা না হলে পোল্যাণ্ড ও হাঙ্গেরি তাদের গ্রাস করত। এখনও পূর্ব ইউরোপের এত গোলমালের মধ্যেও চেকোশ্লোভাকিয়ায় রুশের বিরুদ্ধে কোন আন্দোলন নেই; ইউগোশ্লাভিয়ায় তিতো, পোল্যাণ্ডে গোমুল্‌কা, হাঙ্গেরিতে ইম্‌রে নজের সঙ্গে রুশের খিটিমিটি বাধলেও পোল্যাণ্ড ও হাঙ্গেরির বন্ধুত্বের বিরুদ্ধে জর্মন অনুপস্থিতিতে এখন রাশিয়াই চেকোশ্লোভাকিয়ার আশ্রয়। দক্ষিণ-পূর্ব ইউরোপে রাশিয়ার মিত্র হচ্ছে বুলগারিয়া। এ ছাড়া আজকের পূর্ব ইউরোপে রাশিয়ার প্রতি প্রসন্ন কেউ নয়। তার মূলও আছে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পশ্চাৎপটে আত্মগোপন করে।

পোল্যাণ্ডের ব্যাপারেও গোপালবাবুর মত হিট্‌লারের অনুকূলে যায় :—

"স্বাধীন নগরী ডানজিগ মোটের উপর জার্মানদের বাসভূমি। ইহার শতকরা ৯৬জনই জার্মান। ১৯১৮ সালে জার্মান শক্তিকে খর্ব করিয়া রাখিবার চেষ্টায় পোল্যাণ্ড পুনর্জন্ম লাভ করিল। প্রয়োজন হইল একটি সমুদ্র পথের দ্বার। পোল্যাণ্ডের নাম সুবিধাবাদের সঙ্গেই বিজড়িত। জন্মাবধিই এ বিষয়ে সে উদ্যোগী। যুদ্ধশেষে লিথুয়ানিয়ার নিকট হইতে সে ভিল্‌না শহরটি কাড়িয়া লয়। নিরুপায় লিথুয়ানিয়া আর কি করিবে? সীমান্ত বন্ধ করিয়াই নিজের বিরোধিতা জানাইতেছিল। পোল্যাণ্ড এবার (মার্চ, ১৯৩৮) লিথুয়ানিয়াকে চরম পত্র দিয়া তাহার সেই সীমান্তদ্বার আবার খুলিতে বাধ্য করিল। এইরূপে শ্লোভাকিয়ার খানিকটা অংশও পোল্যাণ্ড কবলিত করিয়া লইয়াছে। ইচ্ছা ছিল, তাহার সীমান্ত এদিকে রুমানিয়ার সীমান্ত ছুঁইবে। যুদ্ধ আরম্ভ হইল। পোল্যাণ্ডের দশ আনা গিয়া পড়িল সোভিয়েট রুশিয়ার কবলে। মলোটভ ঘোষণা করিলেন, পোল্যাণ্ডের সংখ্যাল্প হোয়াইট রুশীয়দের আজ অত্যাচারী পোল সামন্তদের হাত হইতে রক্ষা করা দরকার। পোল্যাণ্ড জয় করিয়াছিলেন হিটলার, ভাগ বসাইলেন স্টালিন। রুমেনিয়া ও হাঙ্গেরির সঙ্গে পোল্যাণ্ডের যে অংশ সংযুক্ত, তাহাও সোভিয়েট অধিকারে গেল।"

এমন অসৎ রাষ্ট্র পোল্যাণ্ডের পতনে কারো দুঃখ হবার কথা নয়। যদি সংখ্যাল্পতার অজুহাতে হোয়াইট ও লিট্‌ল রুশীয়দের রক্ষা করা চলে, তাহলে জর্মনদেরই বা দোষ কোথায়? এরপর গোপালবাবু

যা লিখছেন, তা থেকেই বোঝা যায়, রাশিয়া গায়ে পড়ে জর্মনিকে যুদ্ধে আহ্বান করে :—

"সোভিয়েট-অধিকৃত পোল্যাণ্ডের হোয়াইট রুশীয় অঞ্চল সোভিয়েট হোয়াইট রুশিয়ার এবং লিটল রুশীয় অঞ্চল সোভিয়েট উক্রেইনের সঙ্গে মিশিতেছে, বাকি অংশে একটি পোলিশ সোভিয়েট স্থাপিত হইতেছে। পোল্যাণ্ডের খনিজ অঞ্চলও পড়িল সোভিয়েট হস্তে। অথচ জার্মানির খাদ্য চাই, তেল চাই! সেই তেল ও শস্যের জন্য রুমেনিয়া ছিল ভবিষ্যৎ পথ। সে-পথও কি রুদ্ধ হইল? কিন্তু বড় বেশি তাড়াতাড়ি হইতেছে। ধীরে, কমরেড স্টালিন, আর একটু ধীরে!"

রুমানিয়ার কাছে রাশিয়া কিভাবে বুকোভিনা ও বেসারাবিয়া ১৯৪০ সালে আদায় করে এবং ১৯৪১ সালের রুশ-জর্মন যুদ্ধে রুমানিয়া জর্মন পক্ষ গ্রহণ করে, তার ইতিহাস সুবিদিত। অনেকের ধারণা, হিটলার গোটা পোল্যাণ্ড দখল করতে চেয়েছিলেন; কিন্তু হালদার মহাশয় স্বীকার করেছেন, "ডানৎসিগ্ ও করিডর মাত্র তিনি চাহিয়াছিলেন, পাইলেন অনেক বেশি।" ঐ পাওয়ার দায়িত্ব কার? হিটলারের বাহিনী দাস্তসিকে প্রবেশ করলে তাকে আক্রমণ করেছিল যে পোলিশ সরকার, তারই। রুশ যখন এস্তোনিয়া, লাটভিয়া ও লিথুয়ানিয়া দখল করে, তখন বলা হয় যে, স্থানীয় জনসাধারণ নাকি তা চেয়েছিল। তাহলে অষ্ট্রিয়া থেকে দান্‌সিক পর্যন্ত একথা তো আরো বেশি যথার্থ। আরও সময় পেলে জর্মনি ফ্রান্সের কাছে আলসাস ও লোরেন প্রদেশ দুটী দাবি করত। তার আগেই ব্রিটেন-ফ্রান্স যুদ্ধ ঘোষণা করে। সুতরাং জর্মনির নামে যে মিথ্যা অপবাদ দেওয়া হয়, তা প্রমাণিত হল। যুদ্ধ চলার সময়ে প্রথমে ফ্রান্সের বাহিনী জর্মনিতে প্রবেশ করে। জর্মনি পরের বছর ফ্রান্স দখল করে। হিটলার বারবার সন্ধির প্রস্তাব করেন। কিন্তু অযৌক্তিকভাবে মিত্রশক্তি তা উপেক্ষা করে। জর্মনিকে চূর্ণ করাই ছিল তাদের লক্ষ্য, "জল ঘোলা করা"-র অভিযোগ ছুতো মাত্র।

যে নাৎসি জর্মনিকে সর্বাধিক দায়িত্ব দেওয়া হয় তার নির্দোষিতা সবচেয়ে বেশি। বরং ফাশিস্ত্ ইতালি ও জিঙ্গো জাপানির দায়িত্ব এটুকু দেখা যায় যে, তাদের আগে থেকেই ব্রিটেন, ফ্রান্স প্রভৃতির মতো সাম্রাজ্য ছিল। কিন্তু যদি মাত্র দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পূর্ববর্তী অবস্থায় যুদ্ধ বাধার সঙ্গে সম্পর্কিত কারণগুলি আলোচনা করা যায় তাহলে দেখা যাবে যে, ইতালিকে যুদ্ধে নামানোর দায়িত্ব ব্রিটেন ও ফ্রান্সের, বিশেষত ফ্রান্সের। গোপাল হালদার যে যুক্তিতে রাশিয়ার ফিনল্যাণ্ড আক্রমণ সমর্থন করেছেন, সেই যুক্তিতে ইতালির আলবানিয়া-অধিকার সমর্থিত হয়। ইতালির আবিসিনিয়া-অভিযানের জন্যে ধূর্ত ব্রিটেন ও ফ্রান্স কি ভাবে কতখানি দায়ী, ১৯৩৬ সালে লিখিত Inside Europe গ্রন্থে John Gunther তা নিপুণভাবে ব্যাখ্যা করেছেন। ইথিওপিয়া নিজেই একটি সাম্রাজ্যবাদী রাষ্ট্র, এটা আফ্রিকা সম্বন্ধে অভিজ্ঞ পাঠক জানেন। Inside Africa পড়লে এ সম্বন্ধে কৌতূহলী পাঠক আরো জানতে পারবেন। ইতালি ফ্রান্সের কাছে কর্সিকা এবং ভূমধ্যসাগরের দক্ষিণ তীরস্থ বেশ খানিকটা এলাকা ন্যায্যত দাবি করতে পারত। কিন্তু শান্তি-পূর্ণ উপায়ে সে-দাবি পূর্ণ হয়নি। ফরাসিরা সবিদ্রূপে বলে: আমরাও আমেরিকা চাই, ভিসুভিয়াস চাই! অর্থাৎ, কর্সিকা ও নিস্ দাবি করা আমেরিকা ও ভিসুভিয়াস দাবির সমান। এর পর যুদ্ধ বাধা স্বাভাবিক ও সঙ্গত।

জাপানকে যুদ্ধে নামানোর দায়িত্ব ব্রিটেন ও আমেরিকার; চীনের সঙ্গে জাপানের যুদ্ধের ব্যাপারেও লোকের মারাত্মক ভুল ধারণা দেখা যায়। চীন-জাপান প্রসঙ্গে ভবিষ্যতে স্বতন্ত্র আলোচনার ইচ্ছা রইল। প্রাক্-বিপ্লব চীন যে জাপানের চেয়েও বেশি সাম্রাজ্যবাদী রাষ্ট্র ছিল, একথা কে না জানে? বিপ্লবোত্তর এবং কমিউনিস্ট অভ্যুত্থানের পূর্ববর্তী চীনের সম্বন্ধে সংক্ষেপে নেতাজির বিবৃতিটুকু উদ্ধৃত করা হচ্ছে। চিয়াঙের চীন সম্বন্ধে মোহভঙ্গ করার জন্যে তাই যথেষ্ট :—

"আমার দেশের অন্যান্য অনেক লোকের মতোই আমিও বুঝতে পারতাম না, ১৯৩৭ সালে জাপান হঠাৎ চীন আক্রমণ করে বসল কেন? ১৯৩৭-৩৮ সালে আমার দেশের অন্যান্য লোকের মতো আমার সহানুভূতি ছিল চুংকিং-এর প্রতি। কংগ্রেসের প্রেসিডেন্ট হিসেবে ১৯৩৮ সালের ডিসেম্বর মাসে আমিই চুংকিং-এ চিকিৎসক-বিমান পাঠিয়েছিলাম। কিন্তু জাপান পরিদর্শনের পরে আমি যা বুঝতে পেরেছি এবং আমাদের দেশের অনেকেই এখনও যা বুঝতে পারছেন না, সেটা হচ্ছে এই যে, যুদ্ধারম্ভের পর থেকে এশিয়ার জাতিপুঞ্জ সম্বন্ধে জাপানের মনোভাবে বিপ্লবাত্মক পরিবর্তন এসেছে। শুধু যে জাপানি সরকারের এ-পরিবর্তন হয়েছে, তা নয়; জাপানি জনগণেরও মনে এসেছে নবীন চেতনা। চীনে জাপানের নতুন নীতির মূলে এই ভাব। জাপানের নতুন নীতি প্রকৃত, না নিছক প্রতারণা, তা দেখার জন্যে আমি চীনেও গিয়েছিলাম। জাপান এবং চীনের জাতীয় সরকারের মধ্যে সর্বশেষ চুক্তির ফলে চীনের জনসাধারণ যা দাবি করেছিল কার্যত তার সবই তারা পেয়েছে। ঐ চুক্তিতে জাপান যুদ্ধ শেষে চীন থেকে তার সৈন্যদল সরিয়ে নেবার প্রতিশ্রুতি দিয়েছে। চুংকিং যুদ্ধ করছে কেন? জাপানের প্রতি অতীত ঘৃণা ও বিদ্বেষের দরুণ চুংকিং নিজেকে ব্রিটেন ও আমেরিকার কাছে বন্ধক দিচ্ছে। চুংকিং-এ একনায়কত্বের শাসন চলছে। চুংকিং-এ যে একনায়কত্ব বিরাজমান, তার উপর বিদেশি মার্কিন প্রভাব সুস্পষ্ট। ভারতে চুংকিং সরকার যে প্রচার কার্য চালায় এবং ভারতীয়দের হৃদয়াবেগে নাড়া দিয়ে যে ভাবে তাদের সহানুভূতি লাভের চেষ্টা করে, তার কিছু কিছু সংবাদ আমি রাখি। কিন্তু ওআল স্ট্রিট আর লম্বার্ড স্ট্রিটের কাছে যে নিজেকে বন্ধক রেখেছে, সে আর ভারতীয় জনগণের সহানুভূতি পাবার যোগ্য নয়—বিশেষ করে চীনের প্রতি জাপানের নতুন নীতি প্রবর্তনের পরে।"

১৯৪২ সাল থেকে চীনকে সাহায্য করার যে-নীতি জাপান গ্রহণ করেছিল, তার আর পরিবর্তন ঘটে নি। জাপান লাল চীনের প্রতি বরাবরই সহানুভূতিসম্পন্ন। মাত্র সেদিনও জাপান তাইওয়ান

সরকারকে সাহায্য করতে অস্বীকার করেছে। পূর্ব-এশিয়ার স্বাধীনতা-সংগ্রামে জাপান এমনভাবে অস্ত্র-শস্ত্র দিয়ে সাহায্য করেছে যে, যুদ্ধান্তে ব্রিটেন, হল্যাণ্ড, ফ্রান্স ও আমেরিকার পূর্ব-এশিয় সাম্রাজ্য চূর্ণ হয়ে গেছে। জাপানকে যতই জঙ্গী মনোভাবের জন্যে নিন্দা করা হোক না কেন, ১৯৪১ সালের ৭ই ডিসেম্বর জাপান তার অভিযান সুরু না করলে আজও ভারত, পাকিস্থান, সিংহল, নেপাল, ব্রহ্ম, কাম্বোদিয়া, লাওস, ইন্দো-নেশিয়া, ফিলিপাইন, ভিএত্‌নাম, মালদ্বীপপুঞ্জ—এই রাষ্ট্রগুলি স্বাধীন হতে পারত না। প্রায় এক ডজন স্বাধীন রাষ্ট্রের উৎপত্তির মূলে জাপানের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ সহায়তা আছে। নিজ স্বার্থে কাজ করতে গেলেও জাপানের দ্বারা বিশ্বশক্তির নিয়ন্ত্রণে এশিয়ার এই মহৎ উপকার সাধিত হয়েছে। মওলানা খাফি খানের লেখা পড়লে অনভিজ্ঞ পাঠক জানতে পারবেন, ইন্দোনেশিয়ার স্বাধীনতায় জাপানের দান কি-অপরি-সীম। ভারতের স্বাধীনতা-সংগ্রামে জাপান সাহায্য না করলে আজ ভারত যে সামান্য ক্ষমতাটুকু পেয়েছে, তাও পেত না। এশিয়া থেকে ইউরামেরিকান সাম্রাজ্যবাদ তাড়াবার জন্যে, নিজের বাণিজ্যিক অধিকার সুরক্ষিত করার জন্যে জাপানের যুদ্ধ ছাড়া অন্য উপায় ছিল না। প্রসঙ্গত রাধাবিনোদ পাল মহাশয়ের রায়দানের কথা বিবেচ্য। মিত্রপক্ষের যুদ্ধাপরাধ তাতে ব্যাখ্যাত ও প্রমাণিত।

পরিশেষে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের জন্যে দায়ী পোল একগুঁয়েমির শোচনীয় পরিণাম আলোচনা করে প্রবন্ধ শেষ করা যাক। জর্মনি প্রভৃতির যা হবার হয়েছে; কিন্তু সুবিধাবাদী পোলদের কি হল? ১৯৩১ সালে পোল্যাণ্ডের আয়তন ছিল ১৪৯২৭৪ বর্গ মাইল, লোক সংখ্যা ৩১৯৪৮০২১ জন; এ থেকে জর্মনির দাবি পূরণ করলে সামান্য কয়েক শো বর্গ মাইল এলাকা ও ৬ লক্ষ লোক কমে যেত। কিন্তু এখন রাশিয়ার দাবি পূরণের পর ১৯৫০ সালের হিসেবে পোল্যাণ্ডের আয়তন ১২১১৩১ বর্গ মাইল, লোক সংখ্যা ২৪৯৭৭০০০! বিশ বছরে লোক সংখ্যা ৭০ লক্ষ কমে গেছে। শুধু তাই নয়, দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর ইউরোপের বিভিন্ন রাষ্ট্রের যে সীমারেখা আঁকা হয়েছে তা মুছে ফেলার জন্যে আর একটা মহাযুদ্ধ আসন্ন ও অনিবার্য। তারপর পোলাণ্ডের অবস্থা আরো শোচনীয় হবে। কারণ, জর্মণভাষী যে এলাকা এখন পোলাণ্ডের মধ্যে আছে, তা জর্মনি একদিন ফিরিয়ে নেবেই। জর্মনির উন্নতি যে নিয়তি-নির্দিষ্ট, তার সব লক্ষণ সুপরিস্ফুট।

লক্ষ্মীবন্ত কে?

শ্রীকেশবচন্দ্র গুপ্ত

শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনকে যোগ-শিক্ষা দিলেন। কী ভাবে তাঁকে ধ্যান করতে হবে এবং কী প্রকারে আত্মদর্শন হয় এবং কেমন জীবন যাপন করলে সাধক যোগী হ'তে পারে সে বিষয়ে বিশদ শিক্ষা দিলেন। বোঝালেন তিনি সর্ব্বভূতে বিদ্যমান। যোগীকে তাঁর একত্ব উপলব্ধি করতে হবে। যে ব্যক্তি মাত্র নিজের উপমায় পরের সুখ দুঃখকে আপনার সুখ দুঃখ বোধ করেন এবং সকলকে সমভাবে দেখেন তিনি পরম যোগী।

আমাদের কথা তুচ্ছ। স্বয়ং অর্জ্জুন বললেন—সব তো বোঝালেন শ্রীকৃষ্ণ, কিন্তু মন যে ভীষণ চঞ্চল। বায়ুকে ধরে রাখা যেমন অসম্ভব মনকে ধ'রে এক ব্রহ্ম ধ্যান তেমনই দুরূহ ব্যাপার বোধ হচ্ছে।

শ্রীকৃষ্ণ বল্লেন—সত্য কথা। কিন্তু অভ্যাস এবং বৈরাগ্যের দ্বারা এ কর্ম্ম সম্ভবপর। অভ্যাস করতে করতে মনকে অন্যপথ থেকে টেনে নেওয়া সম্ভব।

সন্দেহ গেলনা শিষ্যের। বল্লেন—আচ্ছা প্রয়াস করলে সাধক, কিন্তু সিদ্ধি পেলেনা। তখন সে নিরাশ্রয় একুল-ওকুল-হারা কী বিনষ্ট হবে?

জগদগুরু বল্লেন—না মা। যতটুকু সাধনকরেছে তার ফলে সে বহুবর্ষ পুণ্যবানের লভ্য লোকে বাস ক'রে শেষে আবার মনুষ্য-জন্ম লাভ করবে। যোগের ফল পুরস্কারলাভ। এ পৃথিবীতে ফিরে এসেও পূর্ণ সিদ্ধি লাভ করেনি যে যোগী সে শুচি শ্রীমতের গৃহে জন্মগ্রহণ করে।

এখন প্রশ্ন ওঠে—এ শ্রীমান কে? শুচি শুদ্ধ। শ্রী লক্ষ্মী—এ কথা জানি আজ। গীতায় বহু দেবতা এবং উজ্জ্বল বিভূতির বর্ণনা আছে—দেবীদের বর্ণনা নাই। নারীদের উৎকৃষ্ট ভাবের মধ্যে বলেছেন—নারীদের কীর্ত্তি, শ্রী, বাক্, স্মৃতি মেধা ধৃতি আর ক্ষমার কথা। পরে পুরাণে এই সব গুণ ধর্ম্ম-পত্নী নামে অভিহিত হ'য়েছে।

শ্রী উৎকৃষ্ট গুণ নারীর। শ্রী লক্ষ্মী পুরাণে এবং তন্ত্রে। গীতার ধনাধিকারী দেবতা কুবের। পরে ভগবান বলেছেন—শ্রীমন্ত যত কিছু সবই তাঁর বিভূতি। শ্রী শোভা। শ্রী সম্পদ।

জগতের শোভা, জগতের ঐশ্বর্য্য, মাধুরী সবই শ্রী। কারণ তারা সুন্দরের চেতনায় মন কে নিয়ে যায়।

মলিনতা শ্রী নয়। শ্রীমন্ত লক্ষ্মীবন্ত।

বহু স্তবস্তুতিতে লক্ষ্মীবন্তের উল্লেখ আছে।

বিদ্যাবন্তঃ যশস্বন্তঃ লক্ষ্মীবন্তঞ্চ মাং কুরু।

যে প্রার্থনার আগড় বেঁধে চণ্ডীপাঠে সাধক ব্রতী হয়—এ তার অংশ-বিশেষ।

লক্ষ্মীবন্ত কে? লক্ষ্মীশ্রী লাভ করা যায় কিসে?

লক্ষ্মীবান বলি কাকে সাধারণ কথায়? অনেক সম্পদের যে অধিকারী তাকে? কৃপণ ধনপতিকে তো বলিনা লক্ষ্মীবান। মোটেই

না। বিলাস-সামগ্রীর পতি নিশ্চয় লক্ষ্মীবন্ত নয়—যদি তার সকল ঐশ্বর্য্য মাধুরীহীন হয়ে আবর্জ্জনা জঞ্জালের সাথে মিলে থাকে। নানা স্তূপে অবিলি ব্যবস্থার অন্তরালে থাকে যদি অগোছালো, বিশ্রী বা শ্রেণীহীন সম্পদ, বিচিত্র চিত্র, ঐতিহাসিক দুর্লভ সামগ্রী বা অপরূপ মণিমাণিক্যের অলঙ্কার, তারা লক্ষ্মীবন্ত করেনা অধিস্বামীকে, তাদের প্রভা হয় নিষ্প্রভ অযত্নে। ঐশ্বর্য্যশালী মাত্রেই তাই লক্ষ্মীশ্রীর দাবী করতে পারেনা।

অথচ দরিদ্র কুটীরবাসী যদি তার তুচ্ছ সম্পদ গুছিয়ে রাখে পরিশ্রমে, শিল্প দৃষ্টিতে—তাকে বলা যায় লক্ষ্মীবন্ত। ধনীর যা নাই হয়তো তা নির্ধনের আছে সুন্দরের সেবা। সামান্য বনফুল যদি যত্নে তুলে, জলে ধুয়ে, চেতনার গভীর হ'তে শ্রদ্ধা আহরণ ক'রে তার সাথে মিলিয়ে দরিদ্র ভক্ত যদি আরাধ্যের বেদীপাদমূলে অর্পণ করে, শ্রীভগবান ভক্তির সে উপহার গ্রহণ করেন সাদরে।

জগৎ-সুন্দর। বিশ্ব-পতির রূপের ঝলক সর্ব্বত্র। যে দেখে মাধুরী সে কল্যাণ-পথের পথিক। যতদিন পৃথিবীতে বাস করতে হ'বে, দেহকে রাখতে হবে সুস্থ। সুস্থতা অলভ্য অমনোযোগিতায়, সুন্দরের উপেক্ষায়। স্বাস্থ্য সম-দৃষ্টিতে অধিগম্য, সংযত সচেষ্ট মনের সহজলভ্য। নানা শব্দের রেশ ঘুরছে পবনে—নানা দৃশ্য ভাসছে বিশ্বমাঝে। তাই বৈদিক ঋষি স্বস্তিবচনে চেয়েছিলেন—

ভদ্রং কর্ণেভিঃ শৃণুয়াম দেবা ভদ্রং পশ্যেমাক্ষিভির্যজত্রাঃ।
স্থিরৈরঙ্গৈস্তুষ্টুবাংসস্তনূভির্ব্যশেম দেবহিতং যদায়ুঃ।

হে দেবতাবৃন্দ, আমরা কর্ণে যেন কল্যাণকর বিষয় শুনতে পাই, হে বরণীয় দেবগণ আমরা যেন চক্ষে মঙ্গলময় বস্তু দর্শন করতে পারি। তোমাদের স্তব করে যেন আমরা দৃঢ় অঙ্গপ্রত্যঙ্গ নিয়ে দেবতা নির্দ্দিষ্ট আয়ু লাভ করতে পারি।

এ স্তবে বৈরাগ্যের আকুতি নাই। আছে আকাঙ্ক্ষা জীবন ধারণের সুন্দরের সান্নিধ্যে—মঙ্গলময় শব্দ শুনে কল্যাণকর দৃশ্য উপভোগে সুস্থ অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের অধিস্বামী হবার প্রার্থনা।

জীবনের এই আবাসই কী লক্ষ্মীবানের গৃহ নয়? সুকৃতীর ভবনেই মহামায়া শ্রী—পাপাত্মার গৃহে তিনিই অলক্ষ্মী, সাধু-প্রকৃতি জনের প্রাণের শ্রদ্ধা সেই একই দেবী যিনি কুলজনের লজ্জা অমঙ্গল, অশোভন কর্ম্মের সঙ্কেতে।

পৃথিবীতে যত আছে সৌন্দর্য্য তত আছে মলিনতা। পৃথিবীতে আছে গাছ-পালা, কীট পতঙ্গ, পশু পক্ষী, আর মানুষ। এই মানুষ অপূর্ব্ব সৃষ্টি। বৈজ্ঞানিক তাকে বলেছে বিদ্রোহী। মনুষ্যেতর যা উপভোগ করে সে তার অধিকারী জীবন সূত্রে। কিন্তু মনুষ্যের বিশেষ সম্পদ জ্ঞান। শব্দ করে রাসভ, কিন্তু সেই একই সরগ্রামকে নানাভাবে মিলিয়ে মিশিয়ে মানুষ গায় গান—যা বিদ্ধ করে ধ্রুবকণ্ঠে অন্যের চিত্ত, যার পর্দ্দায় দাবী সকল চেতনায় মূল-চেতনার সাথে মিলতে চায় স্তব রূপে। পরমহংসদেব বলেছিলেন—"ঈশ্বর ও তাঁর ঐশ্বর্য্য। এই জগৎ তাঁর ঐশ্বর্য্য। কিন্তু ঐশ্বর্য্য দেখেই সকলে ভুলে যায়,—যাঁর ঐশ্বর্য্য তাঁকে খোঁজে না।"

বাহিরের প্রকৃতি-উপহৃত সম্পদ সৃষ্টির সাথে মানুষ লাভ করে। সে সূর্য্যের কিরণ পায়, চন্দ্রের সুষমা ভোগ করে, ফুলের সৌরভে তুষ্ট হয়, নদীর তরল চঞ্চলতা তাকে বিমোহিত করে। কিন্তু সে তাদের মাত্র বাহিরের রূপেই তুষ্ট নয়। হেথায় মানবের পার্থক্য জগতের অন্য সৃষ্ট জীব হতে।

এই পার্থক্যের প্রথম আশীর্ব্বাদ তাকে করে লক্ষ্মীবন্ত যখন সে পার্থিব সম্পদের কল্যাণ উপভোগ করতে পারে তাদের সাজিয়ে গুছিয়ে, পরিচ্ছন্ন বিন্যাসে। হেথায় আবার তার লক্ষ্মী স্থিরা নন। চঞ্চলা যেমন ছেড়ে যান—তেমনি তার পূর্ব্বে পরীক্ষা করেন মানুষকে। দেখেন সে বাহিরের সুন্দর সমাবেশের দৃষ্টান্তে অন্তরের সম্পদকে শ্রীসম্পন্ন করতে পারে কিনা। মানুষের জ্ঞান এক বিচিত্র সম্পদ। সে প্রকৃতির কাছে আব্দার করে সদাই—জানাও, জানাও, জানাও। সূর্য্যের করে বিশ্ব আলোকময়। সে অস্ত গেলেও কি মানুষ পেতে পারে রশ্মি? সেই আব্দারের পারিতোষিক দিয়েছেন হেসে তার প্রকৃতি জননী। প্রথমে তার অসন্তোষ মিটিয়েছেন—দুটা কাঠে ঘষে আলো বার করতে শিখিয়ে। চকমকি, তেলের আলো, গ্যাসের বাতি, বিজলীর রশ্মির ছটায় সাধ মেটাবার সঙ্কেত পেয়েছে মানুষ।

কিন্তু এ সম্পদ লাভের জন্য তাকে হ'তে হ'য়েছে লক্ষ্মীবন্ত। তাকে স্তরে স্তরে শ্রেণীবদ্ধ ক'রে, পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন ক'রে রাখতে হ'য়েছে বিজ্ঞান বুদ্ধি সংসারে, জ্ঞানের ভাণ্ডার ঘরে। লক্ষ্মীশ্রী কল্যাণকর সমাবেশে গোছানো, নিকানো, ধোয়া, মোছা জ্ঞান বিজ্ঞান লব্ধ ঐশ্বর্য্যকে, পুরুষানুক্রমে। এ কৃতীর লব্ধ। অলস নিষ্কর্ম্মা, নিদ্রিতের অপব্যয় নয়। তারা পাপী। তারা দুর্লভ মনুষ্য জন্ম লাভ ক'রে মনের মাঝে যে সচেতন জ্ঞান-বিজ্ঞান আছে—তাদের পরিষ্কার করে গোছাতে জানে না। তাই তারা দাবী করতে পারে না পুণ্যের। শ্রী মানুষের মনের সম্পদ ঘিরে। তাই অলক্ষ্মী তাদের অশুভের বিধান করে। মনের সম্পদ গোছাম লক্ষ্মীশ্রী। দরিদ্র জ্ঞানী লক্ষ্মীমন্ত। আর উদ্যোগী পুরুষসিংহকে লক্ষ্মী করুণা করেন। উদ্যোগ—হেলাগোছা চেষ্টা নয়। উদ্যোগ—অধ্যবসায়, দৈবের প্রসাদে লাভ করবার মানসে স্থির হয়ে জ্ঞানকে মলিন করা আলস্য নয়। সে আলস্য কাপুরুষতা। কাপুরুষ শ্রীহীন।

তাই লক্ষ্মীবান অধ্যবসায়সম্পন্ন কৃতী—সুকৃতী। মনের ভাবকে সুন্দরভাবে সে সুসজ্জিত করে শ্রেণীবদ্ধ করে এবং সেই সম্পদে লাভ করতে চায় কল্যাণ-পার্থিব এবং আধ্যাত্মিক।

লক্ষ্মী চঞ্চলা। এতো জগতের ধারা। পার্থিব জড় সম্পদ—টাকা কড়ি, সোনা দানা—বুদ্ধিকে বিপর্য্যস্ত করে। তাদের সাথে আসে দম্ভ, দর্প, অভিমান, মূঢ়তা, ক্রূরতা। আবার এই পার্থিব সম্পদকে মানুষ গুছিয়ে লক্ষ্মীবান হ'তে পারে, সোনাদানা টাকাকড়ি, যশমান—গর্ব্ব দম্ভ প্রভৃতির সংস্রব থেকে সরিয়ে রাখতে পারলে। অর্থ অনর্থ হয় এদের মিশ্রণে।

মানুষের সমৃদ্ধি, দানে। তার কল্যাণ আপনাকে বিলিয়ে দিয়ে। তার লব্ধ অর্থ যদি তাকে প্রথমে দ্রব্যদানের পরে আত্মদানের পথ দেখিয়ে দেয়—অর্থ মোটেই অনর্থের জনক হয়না। দারিদ্র্য দোষ গুণ-রাশি-নাশী। পরের দারিদ্র্য ঘোচালে জগতের সমস্ত গুণের সঞ্চয় বাড়ে। যে নিজের ধনে নির্ধনের ক্লেশ মোচন করতে পারে সে লক্ষ্মীবান। কার্পণ্য জয় হয় দানে। বুদ্ধদেব বলেছিলেন—

জিনে কদরীয়ং দানেন। কদর্য্যের জয় লক্ষ্মীশ্রী লাভ।

সুতরাং লক্ষ্মীবান মাত্র জড় সম্পত্তি গুছিয়ে রেখে হওয়া যায়না—যদি কেহ মনকে করে অশোভন ও দুষ্ট। তখন লক্ষ্মী নিজের স্বভাব প্রকাশ করেন চঞ্চলতায়। কিন্তু যদি পার্থিব ধনের অধিস্বামী মানসিক সম্পদকে সাজিয়ে গুছিয়ে তার দ্বারা বাহিরের ভোগ নিয়ন্ত্রণ করতে পারে, সে লক্ষ্মীবন্ত। একথা ধ্রুব সত্য। মনের সম্পদকে চিত্তে করতে হবে স্থির—অভ্যাসে, অধ্যবসায়ে মানসিক শক্তির উদ্বোধনে। জ্ঞানই মানুষের বিশেষত্ব। সে দেখিয়ে দিতে পারে পথ মনের ঐশ্বর্য্য ভাণ্ডারের, শিখিয়ে দিতে পারে তার মধ্যে যে দৈবী সম্পদ আছে তাদের কেমন ক'রে সুসজ্জিত করতে হয়—আসুরিক সম্পদকে কেমন ক'রে আবর্জ্জনা কুঠিতে মনের একপ্রান্তে বদ্ধ ক'রে তেজহীন করে রাখতে হয়। সে বর্জ্জন সম্ভবপর নয় কারণ আসুরী সম্পদও প্রকৃতির দান বিশ্ব-সংসারে।

মাত্র আমাদের সমাজে কেন, পৃথিবীর বহু প্রাচীন সভ্য সমাজে, লক্ষ্মীপূজার অনুরূপ শুভ শ্রী কামনা উদ্বুদ্ধ করতো মানুষকে ঐশ্বর্য্য-দাত্রী দেবীর পূজার আয়োজনে। লক্ষ্মীপূজা নিশ্চয়ই সকাম পূজা—যার মাঝে আপনার মঙ্গলের বাসনা থাকে প্রবল। পৃথিবীতে প্রতিষ্ঠা-লাভের মানস খণ্ড দেবশক্তি আরাধনার মূলে থাকে বিদ্যমান।

কিন্তু জড়বাদী বা অনিশ্বরবাদী নাস্তিক অপেক্ষা কী সকাম সাধক শ্রেষ্ঠ নয়। জড়বাদী জড়ের স্ফূরণ ও মাহাত্ম্য বিশ্বাস করে। নাস্তিক ঈশ্বর মানেনা কষ্ট করে মনকে ভুল বুঝিয়ে। কারণ সবার নিয়ন্ত্রক একটা শক্তি বিদ্যমান এই কর্ম্মশীল বিশ্বে—এ উপলব্ধি সাধারণ। কেহ নাই আমি আছি—ঋণ ক'রে ঘৃত পান কর—এ মনোভাব গড়া কষ্টসাধ্য।

প্রার্থনা এবং দেবতা নির্ব্বাচনে মানুষের প্রবৃত্তির বিভিন্নতা বোঝা যায়। লক্ষ্মী-উপাসকের প্রকৃতিগত ধারণায় প্রথম চাহিদা—ধন-সম্পত্তি, অবশ্য পার্থিব। তাই প্রার্থনার ফল বুঝতে পারা যায়। যদি তার প্রার্থনা প্রাণ থেকে ওঠে, পূজারীকে সাফল্য লাভের চেষ্টায় অনুরূপ পরিশ্রম করতে হয়। হে মা ধনবর্ষণ কর আমার শিরে—যে বলে সে জানে অর্থের মূল্য এবং আহরণ করবার জন্য তার আগ্রহাতিশয্য ব্যক্ত হয়। তখন সিদ্ধির জন্য লক্ষ্মীর কৃপা-ভিক্ষুক পরিশ্রম করবার প্রেরণা লাভ করে। বাণী-পূজায় জ্ঞান প্রসারের চেষ্টায় অনুপ্রাণিত হয় সাধক।

সুতরাং লক্ষ্মীপূজা উদ্যোগী পুরুষের প্রেরণার মূল হ'তে পারে যদি তার প্রার্থনা হয় আন্তরিক। দেব-ভক্তি ক্রমশঃ তাকে প্রকৃত লক্ষ্মীবন্ত করতে পারে। যদি সে তার বোধ শক্তি ও চিত্তের কমনীয়তা মলিন না করে, সোনাদানার সঙ্গীতে। কৃপণ ধনী কৃপার পাত্র। কিন্তু ধনী যখন পরোপকারে নিয়োজিত করে আপনার ধন-ভাণ্ডার—সে আত্মোন্নতির সোপানে ওঠে স্তরে স্তরে।

লক্ষ্মীবন্ত কে, এ প্রশ্নের উত্তর লাভ করবার অপর একটা পথ আছে। হিন্দু পুরাণে বহুস্থলে লক্ষ্মী ও মহালক্ষ্মীর স্তব আছে। সেই সব স্তবের অন্তে আছে ফলশ্রুতি। নিত্য লক্ষ্মীদেবীর স্তোত্র পাঠ করলে সাধকের কি উপকার হ'তে পারে, সে কথা আছে। উচ্চ দর্শন বা সাধনার দিক হ'তে সে সকাম সাধনা হয়তো অনুমোদিত নয়। কিন্তু সাধারণ গৃহস্থ ধর্ম্মচর্চ্চা আরম্ভ করে প্রসাদ পাবার কামনায়। তাই স্তবস্তুতি কামনা এবং কৃপা-ভিক্ষা সম্বলিত।

এ ব্যবস্থায় বিস্ময়ের কারণ নাই। সকল ধর্ম্মই বাস্তবে প্রতিষ্ঠিত। সমস্ত জগতটা যদি হয় একব্রহ্মের লীলা, তা হ'লে তাঁর স্বরূপ অনু-সন্ধান করা কী ঋষি ও মহামানবের কর্ত্তব্য নয়? এই নিত্য লীলার ভূমি—জীবের প্রাণ। এর মাঝে দুটা বিপরীত স্রোত সমভাবে বর্ত্তমান—সুখ, দুঃখ। অশান্ত জীব শান্তির সন্ধানে—সেই গোছানোর আয়োজনই ধর্ম্ম। প্রতিদিন কীভাবে নিজের জীবনের স্রোতকে নিয়ন্ত্রিত করতে হবে—প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ ভাবে, এ চিন্তা সদাই বর্ত্তমান প্রত্যেক প্রাণে। ভ্রান্তি কু-পথ দেখায়—জ্ঞান দেখায় সুপথ। কিন্তু যে পথের অনুসন্ধান করে জীব সেটি শান্তি ও সুখের পথ। ভ্রম বলে সুরাপানে সব দুঃখ-কষ্টের অবসান। জ্ঞান বলে—ও ক্ষণিক বিস্মৃতির ব্যবস্থা—সুখের নয়, বরং অশান্তি বাড়ে মাদকের আশ্রয়ে। মনুষ্য-সমাজের আদি হতে অদ্যাপি সুরাপান, দ্যূতক্রীড়া ও ব্যভিচার বর্ত্তমান। বৈরিতা, হিংসা, ঈর্ষা, লোভ, স্পর্দ্ধা, গর্ব্ব, দম্ভ এবং অভিমান—মহান এবং উদারকেও বিপর্য্যস্ত করে সুবিধা পেলে, ধার্ম্মিক কর্ত্তব্য-বুদ্ধির ক্ষণিক সুপ্তির অবকাশে।

আলোচনা হচ্ছিল-লক্ষ্মীবন্তের স্বরূপ। বাস্তবের পটভূমিতে দেখলে লক্ষ্মীশ্রীলাভের উদ্দেশ্য এমন পরিবেশের সৃষ্টি—যার মাঝে মানুষের শান্তি থাকে। এ'হল জগতের দৃষ্টিভঙ্গি। মানুষ কষ্ট পায় অপর জীব হ'তে, নিজের দেহের ব্যাধিতে এবং প্রকৃতির খেয়ালী লীলার অসহনীয় আচরণে। বাহিরের অত্যাচার ও আচরণ হতে পরিত্রাণ পেলে জীব করতে পারে চিত্ত-নিয়ন্ত্রণ, শান্তি ও চরম সুখের সন্ধানে। এই বাহির ও অন্তরের নিরাময়তার জন্য সহায়তা মাগে মানুষ দেব-শক্তির। খণ্ড-শক্তির উপাসনা এবং বোধে ক্রমে লাভ করা সম্ভব অখণ্ড অনন্তের সন্ধান।

কাজেই লক্ষ্মী শ্রী কামনা মানবপ্রকৃতি। ঋষিরা মানব চিত্তের এ প্রকৃতির সন্ধান পেয়েছেন। তাঁরা সারা সমাজকে শান্তিপূর্ণ করতে চেয়েছেন কারণ দেহের সকল অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ সুস্থ ও সবল না হ'লে সম্পূর্ণ জীবনী-শক্তি স্বচ্ছ ও সাবলীল গতিতে বহিতে পারে না। যে সংসারে মানুষকে প্রতিক্ষণে জীবন-যাপন করতে হয়, তার পরিবেশের প্রভাব মনুষ্য-চরিত্রে যথেষ্ট। তাই প্রার্থনা করতে হয় সে পরিবেশের সম্পদের

জন্য। আন্তরিক প্রার্থনা মানুষের শক্তিকে নির্দ্দিষ্ট করে। সে যখন অর্থ চায় তখন অর্থলাভের জন্য প্রার্থনা করে। তার চরিত্রও নির্দ্ধারিত হয় সেই আদর্শে। সে অপব্যয় করেনা বা এমন কর্ম্মে নিবিষ্ট হয় না যার অনিবার্য্য ফল অর্থহানি। ফলশ্রুতি কাম্য চাহিদার তালিকা। লক্ষ্মীর স্তবে শুনি তিনিই বৈকুণ্ঠে মহালক্ষ্মী, বাগদেবী গসরস্বতী, গঙ্গা, তুলসী, সাবিত্রী এবং কৃষ্ণ-প্রাণাধিকা দেবী গোলোকে রাধিকা স্বয়ং। বলা বাহুল্য স্তোত্রে শাস্ত্রকার লক্ষ্মীলাভের পুজারীকে প্রকৃতির বিভিন্ন রূপের চেতনায় উদ্বুদ্ধ করবার আয়োজন করেছেন। শেষে স্তবে কী ফল হয় সে কথা বলেছেন। এর মাঝে শান্তির সংসারের কামনা। সে সংসার আদর্শ।

প্রথমে আবশ্যক—বিনীতা সুমতি সতী ভার্য্যা—সুশীলা, সুন্দরী, রম্যা, অতিপ্রিয়বাদিনী। পুত্র কাম্য—বৈষ্ণব, বিশ্ব-জীবী সম্পদশালী বিদ্যাবন্ত এবং যশস্বী। এই রকম সব কাম্যের তালিকার শেষে বলা হয়েছে লক্ষ্মীর স্তব পাঠের অন্য ফল—

হর্ষানন্দকরং শশ্বৎ ধর্ম্ম-মোক্ষ সুহৃৎ-প্রদম। সুতরাং বোঝা যায় ঐশ্বর্য্য-কামনার মাঝে মহান আদর্শে অনুপ্রাণিত করতে চেয়েছে শাস্ত্র লক্ষ্মী-ভক্তকে।

অগস্তি-বিরচিত কমলা স্তোত্র বিষদ। সেথায় শ্রীপতি প্রিয়ে মহালক্ষ্মীকে প্রথমেই সংসারার্ণবতারিণী বলা হয়েছে। সুতরাং কৃপণ সংসারী লক্ষ্মীবন্ত নয়, যদি তার সম্পদ সংগ্রহের মূলে না থাকে ভাবনা—সংসার সমুদ্রপার হবার ভগবতী পুজার শ্রদ্ধা। অর্থ সঞ্চয়ের সাথে সাথে যে ভক্তি সঞ্চয় করে সেই লক্ষ্মীবন্ত। তাঁর কাছে চাহিতে হবে—সর্ব্ব ভুতহিতার্থায় বসুবৃষ্টিং সদা কুরু। বসুবৃষ্টি অবশ্য ধনবৃষ্টি—কিন্তু তার আবশ্যক সর্ব্ব-ভূতের হিতের জন্য। বস্তাবন্দী করবার উদ্দেশ্য নয় বা নিজের গর্ব্ব-বহ্নিতে ইন্ধন যোগাবার জন্য নয়।

ইন্দ্রকৃত মহালক্ষ্মীর স্তোত্রে শুনি—
সর্ব্বপাপ হরে দেবি মহালক্ষ্মী নমস্তুতে।
আরও শুনি—

> সর্ব্বজ্ঞে সর্ব্ববরদে সর্ব্ব দুষ্ট ভয়ঙ্করি
> সর্ব্ব দুঃখ হরে দেবি
> মহালক্ষ্মী নমোঽস্তুতে।

সুতরাং লক্ষ্মী মাত্র, ধন-প্রদায়িত্রী নন। একবার কোনো দেবদেবীকে ঐকান্তিক ভক্তিতে প্রণাম করতে অভ্যস্ত হলে ধীরে ধীরে জ্ঞান চক্ষুর উন্মোচন অনিবার্য্য। তখন বৈকুণ্ঠের লক্ষ্মী, রাধা, কালী, জগদ্ধাত্রী, সরস্বতী বা কাত্যায়নীর স্বরূপ হবে এক। সে কথা এই স্তোত্রে ইন্দ্র বলেছিলেন। আরও বলেছেন—

> সর্ব্বজ্ঞে সর্ব্ববরদে সর্ব্বদুষ্ট ভয়ঙ্করি
> সর্ব্ব দুঃখহরে দেবি মহালক্ষ্মী নমোৎস্তুতে।

দুঃখ পেলে চক্ষু ফোটে। তাই দেবতা বলেন—

> সিদ্ধি বুদ্ধি প্রদে দেবি ভক্তি মুক্তি প্রদায়িনী
> মন্ত্র মূর্ত্তে সদা দেবি মহালক্ষ্মী নমোঽস্তুতে।
> আদ্যন্ত রহিতে দেবি আদ্যশক্তে মহেশ্বরি
> যোগজে যোগ সম্ভুতে মহালক্ষ্মী নমোঽস্তুতে।

বলা বাহুল্য এ ধারণা যেমন ফুটবে স্তোত্র পাঠে তখনই সোনাদানা হীরা-মুক্তার প্রদায়িত্রী মাত্র যে মা লক্ষ্মী সে ধারণা হবে ভস্মীভূত। ফুটে উঠবে সেই মহা-শক্তি আদ্যা-শক্তি, যোগমায়া শ্রীকৃষ্ণহৃদয় বিহারিণী। তাঁরই সৃষ্টি মহালক্ষ্মীর স্বরূপ। ভক্তি মনুষ্যের প্রকৃত ঐশ্বর্য্য, আসল ধন ভাণ্ডারের কপাট খুলবে ভক্তের চিত্তে। তখন লক্ষ্মীবন্ত প্রাণের উচ্ছাসে গাহিবে ইন্দ্রের সাথে—

> স্থুল সূক্ষ্ম মহারৌদ্রে মহাশক্তে মহোদয়ে।
> মহাপাপ হরে দেবি মহালক্ষ্মী নমোঽস্তুতে।

অতঃপর যখন হৃদি পদ্ম উঠবে ফুটে, মনের মলা যাবে ছুটে—প্রাণ গাহিবে—

> পরমেশি জগন্মাতর্মহালক্ষ্মী নমোঽস্তুতে,
> শ্বেতাম্বর ধরে দেবি নানালঙ্কার ভূষিতে
> জগৎস্থিতে জগন্মাতমহালক্ষ্মী নমোৎস্তুতে।

লক্ষ্মীবন্ত সে যার প্রাণে ফোটে এই লক্ষ্মীর বিভূতি, যার সম্পদ পরব্রহ্ম স্বরূপ জ্ঞান।

দারিদ্র্য দোষগুণরাশিনাশী নিশ্চয়। ধন চাই গৃহস্থের। কিন্তু প্রয়োজন তার সদ্ব্যয়। মনের মাঝে সাজানো সম্পদ যার জ্ঞান-সম্পদ জন-কল্যাণে সদ্ব্যয়ে লাভ তার পরমার্থ।

এমন মানুষই—বিদ্যাবন্ত, যশোবন্ত, লক্ষ্মীবন্ত।
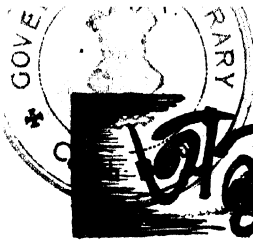
চরমোন্নতি

শ্রীতপনকুমার চট্টোপাধ্যায়

[জন গলস্‌ওয়ার্দ্দি (John Galsworthy) উনবিংশ শতাব্দীর সাহিত্যাকাশের এক দ্যুতিমান নক্ষত্র। ১৮৬৭ খ্রীষ্টাব্দে এক ধনী এবং প্রাচীন ডিভনশায়ার বংশে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। অক্সফোর্ডের হ্যারো এবং নিউ কলেজে তাঁর শিক্ষালাভ ঘটে। দীর্ঘ চার বৎসর তিনি ব্রিটিশ উপনিবেশ, প্রশান্ত উপদ্বীপ প্রভৃতি বিভিন্ন জায়গায় পরিভ্রমণ করেন। অতঃপর সাহিত্য জগতের প্রতি তাঁর অনুরাগ জন্মে। ১৮৯৭ খ্রীষ্টাব্দে তাঁর প্রথম ছোট গল্পের বই "From the four winds" এবং ১৮৯৮ খ্রীষ্টাব্দে তাঁর প্রথম উপন্যাস "Jocelyn" প্রকাশিত হয়। কি ছোট গল্প, কি উপন্যাস, কি নাটক সব বিষয়েই তাঁর অসাধারণ ক্ষমতায় শিক্ষিত সমাজ বিস্মিত ও মুগ্ধ হয়ে উঠেন। ১৯০৪ খ্রীষ্টাব্দে তাঁর উপন্যাস "The Island Pharisees" প্রকাশিত হওয়ার সঙ্গে পাঠক-সমাজে তুমুল আলোড়ন উঠে। তাঁর উল্লেখযোগ্য সাহিত্য-কৃতি, "In Chancery", "Awakening," "To Let", "Fraternity," "The Patrician," "Maid in waiting," "Strife," "Justice", "The Forest", "Loyalties" প্রভৃতি।

১৯৩২ খ্রীষ্টাব্দে তিনি বিখ্যাত নোবেল পুরস্কার লাভ করেন। ১৯৩৩ খ্রীষ্টাব্দে পঁয়ষট্টি বৎসর বয়সে তাঁর জীবন-দীপ নির্ব্বাপিত হয়।

বর্ত্তমান গল্পটী তাঁর "Acme" শীর্ষক ছোট গল্পের অনুবাদ। যে জিনিষের গুরুত্ব অধিক—তা অনেক সময় সমাদর পায় না এবং যা লঘু, যা তুচ্ছ—তা অধিকাংশ ক্ষেত্রে প্রশংসিত হয়—এই বিষয়ের উপর নির্ভর করে গড়ে উঠেছে এই গল্প এবং পাঠকদের রুচি-বিকৃতির প্রতি এক তীক্ষ্ণ ব্যঙ্গ হেনেছেন লেখক। নিপুণ বর্ণনাভঙ্গীতে, ভাবের মাধুর্য্যে গল্পটী লেখকের সাহিত্য-প্রতিভার এক উজ্জ্বল নিদর্শন।]

বর্ত্তমানকালে কোন প্রতিভা-সম্পন্ন ব্যক্তিকে অনাহারে থাকতে হয় না। আমার বন্ধু ব্রুস সম্বন্ধে নিম্নলিখিত এই গল্পটা এ কথার নিশ্চয়তা স্বরূপ ধরা যেতে পারে। ওর সঙ্গে যখন আমার প্রথম পরিচয় তখন ওর প্রায় ষাট বৎসর বয়স। ততদিনে ও প্রায় খান পনেরো বই লিখে থাকবে এবং তার ফলে যে মুষ্টিমেয় কয়েকজন তার খোঁজ রাখে তাদের মধ্যে সে "একজন অসাধারণ প্রতিভাবান ব্যক্তি" হিসাবে নাম কিনে ফেলেছিল। বাস করতো আদেলফির ইয়র্ক ষ্ট্রীটে—একটা বাড়ীর দারুণ নড়বড়ে সিঁড়ির উপর দুখানা ঘর নিয়ে। বাড়ীটা নজরে পড়বার মত ছিল এইজন্যে যে মনে হতো তার সদর দরজা সকল সময়েই বুঝি খোলা আছে। আমার মনে হতো লোকে ওর সম্বন্ধে কি চিন্তা করে সে ব্যাপারে ওর চেয়ে উদাসীন লেখক আর দেখা যায়নি। খবরের কাগজের প্রতি ওর ছিল নিদারুণ উপেক্ষা—স্বরচিত রচনা সম্পর্কে মতামত পাঠ করে লেখকদের মনে যে নানারূপ অবজ্ঞা জন্মে তার কোনটাই নয়। মনে হতো সমালোচনা কখনও ও পড়ে না—ওর মধ্যে ছিল মৌলিকত্ব, যাযাবর প্রকৃতির ঐকান্তিক অবজ্ঞা যে প্রাণে বর্ত্তমান সভ্যতার মধ্যে অতিথির মত বাস করতো—যার জন্যে ওর চিলেকুঠরী ছেড়ে মাসকয়েকের মতো দিত সুদীর্ঘ পাড়ি, তারপর আবার প্রত্যাবর্ত্তন করে ভাবাবেগে থাকত আচ্ছন্ন হয়ে এবং অবশেষে লিখে ফেলতো একখানা বই।

সে ছিল লম্বা, পাতলা মানুষ—মুখখানা অনেকটা ছিল মার্ক-টোয়েনের মতো। খোঁচা খোঁচা কালো দুই ভ্রূ রয়েছে উদ্ধত হয়ে, ঝুলে পড়া গোঁফে ধরেছে পাক, আর রোঁয়া রোঁয়া পাক-ধরা চুল—কিন্তু তার চোখদুটো ছিল পেঁচার মতো—অন্তর্ভেদী, ম্লান, কালো তামাটে। দেহের মধ্যে বন্দী হয়েও যে প্রাণ দেহাতীত, তারই আবেশ তার বলিচিহ্নিত মুখ-মণ্ডলে এনে দিয়েছিল এক অতিপ্রাকৃত ভাব। ও ছিল অবিবাহিত। মনে হতো মেয়েদের হতে দূরে সরেই থাকে—তারা এ বিষয়ে কিছু হয়তো "শিখিয়েছিল"—কারণ তাদের কাছে ওর আকর্ষণ থাকবার কথা ছিল যথেষ্ট।

যে বছরের কথা লিখতে যাচ্ছি, সে বছরটা বন্ধু রুশের পক্ষে ছিল মূর্ত্তিমান শনিগ্রহের মতো—অবশ্য আর্থিক ব্যাপারেই। যে জিনিষের প্রতি সে যুগের নেই বিন্দুমাত্র রুচি—তাই লিপিবদ্ধ করার দুর্নিবার বাসনা নিয়ে কা-ই বা ওর আশা করার থাকতে পারে? তাঁর শেষ প্রকাশিত বইটার একটাও উৎরোয় নি। এ ধারে ওর উপর একটা অপারেশন হয়েছিল, যাতে ওর খরচ হয় যথেষ্ট এবং তাকে দুর্ব্বল করে ফেলেছিল অত্যন্ত বেশী। অক্টোবর মাসে যখন আমি ওকে দেখতে যাই, তখন গিয়ে দেখি দু'খানা চেয়ার জুড়ে ও লম্বা হয়ে পড়ে আছে, টেনে চলেছে ওর অভ্যস্ত ব্রেজিলিয়ান সিগারেট—যা আমাকে সকল সময়েই অভিভূত করতো। হলদে ভুট্টাপাতার মোড়কওয়ালা সে সমস্ত সিগারেট ছিল এমনি কালো আর তীব্র। লিখবার একখানা প্যাড রয়েছে ওর কোলের উপর—আর চারধারে ছড়ানো রয়েছে কাগজের তাড়া। ঘরখানা একেবারে সৌন্দর্য-বর্জ্জিত। এক বছরের উপর ওর সঙ্গে আমার দেখা হয়নি, কিন্তু আমার দিকে এরূপভাবে দৃষ্টি নিক্ষেপ করলে যেন গতকালও ওর ওখানে আমি গিয়েছিলাম।

"হ্যালো! লোকে যাকে সিনেমা বলে সেই জায়গায় গতকাল রাত্রে গিয়েছিলাম। তুমি কি কখনও গিয়েছ?"

"কখনও? তুমি জান কতকাল ধরে চলে আসছে সিনেমা? প্রায় ১৯০০ সাল থেকে।"

"হায়! কি যে জিনিষ! এই নিয়ে আমি একটা চিত্র লিখছি।"

"কি! চিত্র?"

"প্যারডি—এমন গাঁজাখুরী গল্প কখনও পড়নি।"

একখানা কাগজ হাতে তুলে নিয়ে মুচকি মুচকি হাসতে লাগল ও।

ও বললে, "আমার নায়িকা হচ্ছে এক অক্টোরুণ (নিগ্রো শ্বেতাঙ্গের মিশ্রণজাত বর্ণসঙ্কর)। ছলছলে দুটী চোখ, সুঠাম ভুরুভুরু অন্তর। সকলেই তাকে চায় কিন্তু পায় না, সবাই তার কাছে পরাজিত হয় এমন সে সতী-সাধ্বী। যে সমস্ত অবস্থার মধ্যে পড়েও সে তার সতীত্ব ত্যাগ করেনি, তার কথায় শরীরের রক্ত শীতল হয়ে যাবে তোমার —আর অস্থি-মজ্জা হয়ে উঠবে ভাজা ভাজা। তার আছে একটী অতি দুর্বৃত্ত ভাই, তারই সঙ্গে সে প্রতিপালিত হয়ে উঠেছে। সে তাই জানে তার গভীর গুপ্ত রহস্য, আর তাকে বিক্রী করতে চায় এমন এক ধন-কুবেরের কাছে যার জীবনেও আছে গভীর অজানা রহস্য। সর্ব্ব-সাকুল্যে আমার এ গল্পটাতে আছে চার-চারটে গভীর গোপন রহস্যের ইতিবৃত্ত। স্রেফ্ একটা ইয়ার্কি।"

"বৃথা সময় নষ্ট করছ কেন?" আমি বললাম।

"আমার সময়?" উত্তেজিতভাবে উত্তর দিলে ও, "আমার সময়ের মূল্য কী? আমার বই তো কেউ কেনে না।"

"তোমার দেখাশোনা কে করছে?"

"ডাক্তাররা। তারা এসে নিয়ে যাবে টাকা, ব্যস্, চুকে গেল। আমার আর একটী পয়সাও নেই। আমার কথা আর জিজ্ঞাসা করো না।" পুনরায় পাণ্ডুলিপির একটী পাতা তুলে নিয়ে মুচকি মুচকি হাসতে লাগল।

"গতকাল রাত্রে সেই স্থানে ওদের ছিল—হা ঈশ্বর! ট্রেণ আর মোটর গাড়ীর এক প্রতিযোগিতা, আচ্ছা, আমারও একখানা ট্রেণ, মোটরগাড়ী, উড়ো-কল আর ঘোড়ার গাড়ির মধ্যে রয়েছে এইরূপ এক প্রতিযোগিতা।"

আমি উঠে বসলাম। বললাম, "তোমার রচনা যখন সম্পূর্ণ হবে তখন একবার দেখতে দেবে আমায়?"

"সম্পূর্ণ হয়ে গেছে। একটানা লিখে শেষ করেছি। তুমি কি মনে কর একবার বন্ধ করলে ঐরূপ একটা জিনিষ নিয়ে লেখা আর চালাতে পারতাম?" কাগজগুলো একত্রে জড়ো করে আমার দিকে এগিয়ে দিলে। "রচনাটা নিয়ে যাও। ওটা তৈরী করতে কম কৌতুক অনুভব করিনি। নায়িকাটীর রহস্য হচ্ছে এই যে, সে মোটেই অক্টোরুণ নয় —সে হচ্ছে দে লা কাজ—দক্ষিণাঞ্চলের খাঁটি ক্রেয়োল (শ্বেত) বংশে তার জন্ম—তার বদমাইস ভাইটাও প্রকৃত-পক্ষে তার ভাই নয়। সেই দুরাচার ধনকুবেরও আসলে ধন-কুবের নয়—ধনকুবের হচ্ছে কপর্দ্দকশূন্য—তার প্রেমিকটী। মালওলা জিনিষ এটী—তোমায় বলে দিচ্ছি।"

নীরসকণ্ঠে বললাম, "ধন্যবাদ।" এবং কাগজের তাড়াগুলো তুলে নিলাম।

চিন্তাকুল মন নিয়ে উঠে এলাম। চিন্তা তার অসুস্থতা ও দারিদ্র্য সম্বন্ধে—বিশেষভাবে দারিদ্র্য ব্যাপারেই—কেননা এর কোন কূল-কিনারা আমি খুঁজে পাচ্ছিলাম না।

সেদিন সন্ধ্যাবেলায় ডিনারের পর মন্থরগতিতে পড়তে আরম্ভ করলাম ওর সেই নক্সাটা। পঁয়ত্রিশ পৃষ্ঠা ব্যাপী সেই রচনাটার মধ্যে সম্পূর্ণ দু' পৃষ্ঠাও পড়া হয়নি—তার মধ্যে আমি লাফিয়ে উঠলাম, পুনরায় বসে পড়ে এক নিঃশ্বাসে পড়ে যেতে লাগলাম। চিত্র! মাইরি!—এ লিখে ফেলেছে একখান নিখুঁৎ দৃশ্যাবলী—অর্থাৎ যেটাকে সম্পূর্ণরূপে খাঁটী করে তুলতে প্রয়োজন শুধু ব্যবসায়ীহাতের একটু স্পর্শ। আমি উত্তেজিত হয়ে উঠলাম। ঠিক মতো কায়দা করতে পারলে হাতে আসবে ছোটখাটো একটা স্বর্ণ-খনি। আমার দৃঢ় প্রত্যয় জন্মাল—যে-কোন নাম-করা ফিলম্ কোম্পানী এটা কেড়ে নেবে। নিশ্চয়ই। কিন্তু কিভাবে কায়দা করা যায়? ক্রস হচ্ছে গোঁ-ওলা এক হুঁশিয়ার ব্যক্তি। সবেমাত্র সে সিনেমার সংস্পর্শে এসেছে। যদি আমি তাকে বোঝাতে যাই যে এই নক্সা হয়েছে যথার্থ এক ফিলম্-কাহিনী, তাহলে ও বলে উঠবে—"হা ঈশ্বর!" এবং সেটাকে পুরে দেবে উনুনের আগুনে—যদিও তা অমূল্য।

অথচ এধারে সাদা কাগজের একিয়ারনামা না পেলে জিনিষটাকে বাজারে ছাড়ি-ই বা কি করে—আর আমার এই আবিষ্কার কাহিনী প্রকাশ না করে কেমন করে পাব সেই একিয়ার নামা? যাতে সে কিছু টাকাকড়ি পায়, তার জন্য আমি একেবারে মরিয়া হয়ে উঠলাম। এই জিনিষ যদি ঠিকভাবে কাজে লাগানো যায় তাহলে আর্থিক ব্যাপারে ও স্বয়ংসম্পূর্ণ হবে। আমার বোধ হলো আমার নাগালের মধ্যে রয়েছে যাদুঘরে রাখার উপযুক্ত এমন এক অমূল্য সম্পদ—যা সামান্য একটু অসাবধানে ভেঙ্গে টুকরো টুকরো হয়ে যাবে। সিনেমার কথা বলতে গিয়ে যেরূপ তাচ্ছিল্যভরে ও বলে উঠেছিল—"কী-ই বা এমন বস্তু" তার রেশ তখনও আমার কানে এসে ভাসছিল। তার আত্মবোধ এদিকে ছিল টনটনে—আর্থিক ব্যাপারে আরও। ওকে না জানিয়ে জিনিষটা আমি লোকচক্ষু-সমক্ষে আনতে পারি কি? খবরের কাগজের দিকে কখনও সে ফিরেও তাকায় না—এ ব্যাপার ত আমার জানা আছে। কিন্তু এই সুযোগ নিয়ে ওর অগোচরে জিনিষটা চালিয়ে দেওয়া এবং প্রযোজনা করানো আমার পক্ষে যুক্তিযুক্ত হবে কি? ঘণ্টার পর ঘণ্টা এই প্রশ্ন আমার মনকে তোলপাড় করতে লাগল এবং অবশেষে পরদিন গিয়ে সাক্ষাৎ করলুম ওর সঙ্গে।

পড়ায় মগ্ন ছিল সে তখন।

"আরে! আবার কী ভেবে? আচ্ছা', এই মত-বাদ সম্বন্ধে তুমি কি ধারণা পোষণ কর? যা হচ্ছে, মিশরীদের উদ্ভব হয়েছে কোন্ এক সাহারীয় সভ্যতা হতে?"

"আমি তা মনে করি না" বলে উঠলাম আমি।

"অর্থহীন কথা বললে, এই ব্যক্তি—"

ওর কথায় আমি বিঘ্ন ঘটালাম।

"সেই নক্সাটা কি ফেরৎ চাও, না আমি ওটা রাখতে পারি?"

"নক্সা? কিসের?"

"গতকাল যেটা আমায় দিয়েছিলে।"

"ও! সেইটে। ওটা আগুনে পুড়িয়ে দিও। এই ব্যক্তি—"

"বেশ, ওটা আগুনেই পুড়িয়ে দেব" আমি বললাম। "মনে হচ্ছে তুমি অত্যন্ত ব্যস্ত রয়েছ।"

"আরে না। আমি ব্যস্ত নই" বলে উঠলো ও, "আমার এখন কাজ কিছু নেই। আর লিখে হবেই বা কী? আমার উপার্জ্জন একটু একটু করে কমে আসে এক একটা বই প্রকাশিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে। দারিদ্র্যের সঙ্গে যুদ্ধ করে মরতে বসেছি।"

"তার কারণ জন-সাধারণকে তুমি গ্রাহ্যই কর না।"

"তারা কি চায় তা-ই যখন আমার জানা নেই তখন তাদের গ্রাহ্যের মধ্যে কিরূপে আনবো?"

"তার কারণ খুঁজে বার করার কষ্টটুকু করতেও তুমি অনিচ্ছুক। যদি জনসাধারণকে তৃপ্ত করে আর্থিক সুযোগ লাভের পথ তোমায় দেখিয়ে দি, তাহলে লাথি মেরে ঘর থেকে আমায় বার করে দেবে।"

সঙ্গে সঙ্গে জিভের গোড়ায় এসে গিয়েছিল এই কথা—

"এই ধরো তোমার একটি স্বর্ণ-খনি রয়েছে আমার পকেটের মধ্যে" কিন্তু চেপে গেলাম। অতদূর অগ্রসর হওয়া যুক্তিসঙ্গত হবে না আমার মনে হলো। যা

চাওয়া হয়েছিল তা ত ও দিয়েই বসেছে। সাদা কাগজে খাঁটী এক্তিয়ারনামা।”

স্বর্ণ-খনি সঙ্গে করে নিয়েই চলে এলাম এবং ফিল্মের উপযুক্ত করে তৈরী করার জন্য তৎক্ষণাৎ তার উপর সামান্য একটু হাত বোলালাম। এটা ছিল খুবই সোজা, কেননা গল্পের কোন পরিবর্ত্তনই প্রয়োজন হবে না। তার সঙ্গে ওর নাম জুড়ে দেবার ইচ্ছা আমার মনে বলবতী হলো। প্রকৃত ব্যাপার হচ্ছে এই, যদি সেটাকে কোন ফিলম্ কোম্পানীর কাছে নিয়ে যাই অজ্ঞাত, অখ্যাত লেখকের মতো—আর যদি সেটার সঙ্গে ওর নাম জুড়ে দিই তাহলে সামান্য একটু কায়দা দেখিয়েই কমপক্ষে দ্বিগুণ মূল্য আদায় করে নিতে পারবো। যারা ফিলম্ দেখে তারা অবশ্য ওর নামের সঙ্গে পরিচিত নয়, কিন্তু সাহিত্য জগৎ সম্পর্কে যারা ওয়াকিবহাল তারা ওর নাম জানে এবং “প্রতিভা” শব্দটীকে ঠিকভাবে কাজে লাগাতে পারলে সারা বাজারটাকে সে কিরূপে অভিভূত করতে সক্ষম হবে, তা এক তাজ্জব ব্যাপারই বটে। কিন্তু কাজটায় যথেষ্ট বিপত্তির আশঙ্কাও ছিল। অবশেষে তাই একটা মাঝামাঝি পন্থা অবলম্বন করার কথা আমার মাথায় এলো। রচনাটায় কোন নাম সংযোগ না করেই তাদের কাছে এটা উপস্থাপিত করে জানাবো যে এ জিনিষটা হচ্ছে “জনৈক প্রতিভাশালী লেখকের” রচনা, আর তাদের এই পথ বাৎলে দেব যে লেখকের ছদ্মবেশ মোচন করে বেশ মোটা রকমের টাকা হস্তগত করতে তারা সক্ষম হবে। আমি বুঝতে পারলাম—ওঁদের এ ব্যাপারে দৃঢ় প্রত্যয়ই জন্মাবে যে এটা প্রতিভাশালী ব্যক্তির রচনাই বটে।

এটা নিয়ে এক উঁচুদরের কোম্পানীতে উপস্থিত হলাম। সঙ্গে জুড়ে দিলাম এই মর্ম্মে এক মুখবন্ধ, “রচনাকার হলেন সর্ব্বজনস্বীকৃত প্রতিভা-সম্পন্ন সাহিত্যিক, কয়েকটী কারণবশতঃ অজ্ঞাত থাকাই তিনি যুক্তিসঙ্গত মনে করেন।” এ ব্যাপারে তাঁদের উৎসাহিত করতে পনেরোটী দিন কেটে গেল, তবে শেষ পর্য্যন্ত তাঁরা উদ্যোগী হয়ে উঠলেন। না হয়ে কোন উপায়ই ছিল না। কারণ জিনিষটী এমনিতেই ছিল সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। এক সপ্তাহ ধরে দরদস্তর করে ওঁদের পরীক্ষা করে নিলাম। দু’দুবার তাঁদের জানিয়ে দিলাম আমার চরম কথা—আর দু’বারই তাঁরা তা মেনে নিলেন। তাঁরা বেশ ভালভাবেই বুঝতে পেরেছিলেন কি মূল্যবান জিনিষ তাঁদের হস্তগত হয়েছে। ইচ্ছে করলে আমি চুক্তি করতে পারতাম যে সঙ্গে সঙ্গে দিতে হবে ২০০০ পাউণ্ড এবং চুক্তির নির্দ্ধারিত সময় সম্পূর্ণ হবার পূর্ব্বেই দিতে হবে আরও ২০০০ পাউণ্ড, কিন্তু পরিশেষে নগদ ৩,০০০ পাউণ্ডের চুক্তিতেই সম্মত হলাম—কেননা তাতে ক্রুসের সঙ্গে গোলমালের সম্ভাবনা কিছু কম হবে। বাস্তবিকপক্ষে জিনিষটা সিনেমা হিসাবে সেরা জিনিষ ছিল—যার তুলনায় ওর মূল্য বিন্দুমাত্রও বেশী হয় নি। আমার তরফ হতে সমস্ত কিছু তথ্য যদি যথার্থ-ভাবে প্রকাশ করতে সক্ষম হতাম। যাই হোক অবশেষে চুক্তিপত্রে সই করে দিলাম। পাণ্ডুলিপিখানাও তাঁদের হাতে সমর্পণ করলাম এবং মূল্যস্বরূপ একখানা চেক পেলাম। আমি অত্যন্ত আনন্দিত হলাম এবং বুঝতে পারলাম সঙ্কটের আবর্ত্তে পড়ার আরম্ভ হলো এইখান হতে। ফিলম্ সম্পর্কে ক্রুসের যে ধারণা, তাতে কোন সাহসে আমি তার হাতে এই অর্থ তুলে দিতে পারি? যাব না কি ওর প্রকাশকদের কাছে পরামর্শ করে এই বন্দোবস্ত করে আসতে—যে তাঁরা ধীরে ধীরে যেন টাকাটা তাকে দিয়ে যান, যাতে করে ওর ধারণা হবে যে টাকাটা ওর বই হতেই পাওয়া যাচ্ছে? তার ফলে কিন্তু গোপন কথাটা তাঁদের কাছে প্রকাশ করা; তাছাড়া ওর বই হতে কিছু না উপার্জ্জন করতেই ও অভ্যস্ত হয়ে উঠেছে। এর ফলে ও অনুসন্ধান করবে এ ব্যাপারে—আর তাতে এই গোপন ব্যাপারটা প্রকাশ হবেই। উত্তরাধিকার সূত্রে ওর কিছু পাওনা আছে এই ছুতো ধরানোর জন্য একজন উকিল দেখবো নাকি? এর ফলে কিন্তু মিথ্যা অপ-প্রচারের কোন অন্ত থাকবে না, অবশ্য কোন উকিল যদি এতে সম্মত হন। আজীবন আপনার প্রতিভামুগ্ধ কোন ভক্তের কাছ হতে “এই কয়টী কথা সমেত টাকাটা ইংলণ্ডের ব্যাঙ্কের নোটে ওকে পাঠানোই কি যুক্তি সম্মত হবে? ভয় হলো পাছে ও সন্দেহ করে যে এটা একটা কৌশল, না-হয় এগুলো কোন চোরাই নোট এবং এর সমাধান করতে হয়তো পুলিশের শরণাপন্ন হবে। নয়তো কি সোজা ওর কাছে উপস্থিত হয়ে

চেক্‌খানা টেবিলের উপর রেখে বলে ফেলবো সত্য কাহিনীটা ?

প্রশ্নটা সত্যই আমাকে চিন্তাকুল করে তুললো, কেননা অন্য যাঁরা ওর সঙ্গে পরিচিত, তাঁদের সঙ্গে যুক্তি পরামর্শ করবার সাহস আমার আছে বলে মনে হলো না। এটা একটা এমন ব্যাপারই ছিল যেটা নিয়ে কথাবার্ত্তা বলতে গেলেই সমস্ত প্রকাশ হয়ে পড়বে। এতবড় একটা চেক্ ভাঙ্গাতে বিলম্ব করাও উচিত হবে না। এধারে আবার ওঁরা প্রযোজনা আরম্ভ করে দিয়েছেন। সময়টা ছিল এদিকে—অলস-প্রকৃতির ভালো ফিল্মের ছিল অত্যন্ত দুর্ভিক্ষ—সেইজন্য ওঁরা এটার প্রযোজনা দ্রুত গতিতে এগিয়ে নিয়ে চলেছিলেন। এদিকে আবার ছিল ক্রস—সমস্ত কিছু প্রয়োজন হতে যে সম্পূর্ণ বঞ্চিত, অর্থের অভাবে সাময়িকভাবে ভ্রমণ করাও ওর পক্ষে অসম্ভব—আর স্বাস্থ্য ও ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে সে স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছে নিরবচ্ছিন্ন অন্ধকার। তবুও আমার চোখ অন্যের চেয়েও ছিল সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র এবং আশ্চর্য্যজনক। আমাদের সভ্যতা ও পরিবেশের এত উর্দ্ধে ছিল ও—যে ওর কাছে গিয়ে "যে চিত্রটা তুমি ফিল্মের জন্য লিখেছিলে তার জন্য এই তোমার পাওনা"—এই সামান্য কথাটা ব্যক্ত করবার মত সাহস আমার বিন্দুমাত্র ছিল না। আমি যেন সুস্পষ্টভাবে শুনতে পেতাম ওর উত্তর, "আমি? সিনেমার জন্য লেখনী ধারণ করবো? তুমি কি বলতে চাও ?"

চিন্তা করতে করতে মনে হলো ওর সঙ্গে পরামর্শ না করে জিনিষটাকে বাজারে বিক্রী করে দেওয়া আমার পক্ষে অতিরিক্ত স্বাধীনতার পরিচয় দেওয়া হয়েছে। আমার মনে হলো এজন্য ও কিছুতেই হয়তো আমাকে ক্ষমা করবে না—অথচ ওর প্রতি আমার হৃদয়ে ছিল এমন এক স্নেহের ভাব—বস্তুতঃ শ্রদ্ধার ভাবই, যে ওর সাহচর্য্য হতে বঞ্চিত হবার চিন্তাও আমাকে অস্থির করে তুলেছিল। অবশেষে এর একটা প্রতিকার খুঁজে পেলাম যেন। মনে হলো ব্যাপারটার মধ্যে আমার সুবিধা করে নেওয়ার একটা ছুতো ধরতে পারলে হয়তো কিছুটা উদ্ধার পেতে পারি। চেক্‌টা আমি ভাঙালাম, টাকাটা আমার ব্যাঙ্কে জমা দিলাম, গোটা টাকাটারই একটা চেক নিজে কাটলাম এবং সেই চেক্ আর চুক্তি-পত্র সঙ্গে নিয়ে সাক্ষাৎ করতে গেলাম ওর সঙ্গে।

দু'খানা চেয়ার জুড়ে ও শুয়েছিল—টেনে চলেছিল ব্রেজিলিয়ান সিগারেট—আর একটা পালিয়ে-আসা বিড়াল ওর বশীভূত হয়ে পড়েছিল—তার সঙ্গে করছিল খেলা। সাধারণতঃ ও যেরূপ বদরাগী থাকে তার চেয়ে কিছু নম্র বলে মনে হলো। ওর স্বাস্থ্য কিরূপ এবং অন্যান্য বিষয় কেমন চলছে এ সব ব্যাপারে ধান ভানতে শিবের গীতের মত এলোমেলো কতকগুলো কথা বলার পর আমি আরম্ভ করলাম—

"তোমার কাছে আমার একটা অন্যায় স্বীকার করবার আছে, ক্রস।"

"অন্যায় স্বীকার!" ও বলে উঠলো, "কিসের অন্যায় স্বীকার?"

"তুমি যে ফিলম্ নিয়ে একটা নক্সা লিখেছিলে এবং প্রায় সপ্তাহ ছয় পূর্ব্বে আমায় দিয়েছিলে—সে কথা তোমার স্মরণ আছে?"

"কই না তো।"

"নিশ্চয়ই! নিশ্চয়ই তোমার স্মরণ আছে—সেই যে অক্টোরুণকে নিয়ে লেখা।"

মুচকি মুচকি হাসতে লাগলো ও, "ও হো! বুঝেছি। সেইটে।"

লম্বা একটা নিঃশ্বাস টেনে আমি বলতে আরম্ভ করলাম—

"তা আমি সেটা বিক্রী করে দিয়েছি। দামটা অবশ্যি তোমারই প্রাপ্য।"

"সে আবার কী? ওরকম জিনিষ ছাপবে কে?"

"ছাপা ওটা হয় নি। ওটা দিয়ে তৈরী হয়েছে একটা ফিলম্—সকলের মতে ফিলমের সেরা।"

বেড়ালটার পিঠের উপর থেমে দাঁড়াল ওর হাতখানা। আমার দিকে তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে তাকালে ও। আমি দ্রুতবেগে একটানা বলে চললাম—

"আমি কি করছি তা তোমায় বলা উচিতছিল—কিন্তু এমনিতেই সর্ব্বক্ষণ উগ্রভাবাপন্ন হয়ে থাকো, তাছাড়া তোমার রয়েছে অনেক অলীক উঁচু ধারণা। আমার ধারণা হলো—তোমায় বললে নিজের নাক কান কেটে

নিজেরই যাত্রা ভঙ্গ করবে তুমি। প্রকৃত ব্যাপার হচ্ছে জিনিষটা সত্যই ছিল চমৎকার এক দৃশ্য-মালা। এই তার সর্ত্তনামা, এই চেক্ আমার ব্যাঙ্কের উপর তার মূল্য বাবদ —৩,০০০ পাউণ্ড। তুমি যদি আমায় তোমার দালাল বলে ধরতে চাও—তাহলে তোমার কাছে আমার প্রাপ্য হবে ৩০০ পাউণ্ড। আমি অবশ্য তা খুঁজছি নে, তবে তোমার মত গর্ব্বিত লোক আমি নই, দিতে গেলে "থাক থাক্" করে উঠবো না।

"হ্যা, সব জানি। কিন্তু সমস্তই নিবুর্দ্ধিতার পরিচয়, ক্রুস। বাছবিচারের ব্যাপার তুমি যথেচ্ছ টেনে নিয়ে যেতে পারো কিন্তু তা যুক্তিযুক্ত নয়। পাপের অর্থ! যদি তাই বলতে চাও—তাহলে জেনে রেখো সব জিনিষেই আছে পাপের চিহ্ন। ফিলম্ বর্ত্তমান সভ্যতার এক সঙ্গত প্রকাশ—যুগের এক স্বাভাবিক উৎপত্তি। হতে পারে তা নীচ, হতে পারে তা সস্তা, তবে তা আমরা নই এরূপ ছল করার কোন অর্থই হয় না—অবশ্য তোমার কথা স্বতন্ত্র, ক্রুস আমি সাধারণ মানুষের কথাই বলছি। নীচ যুগ চায় নীচ আনন্দ-তামাসা এবং তা দিতে যদি আমরা সক্ষম হই, আমাদের তা দেওয়া উচিত। যাই বলো জীবন তো আর পরিপূর্ণ আনন্দে উপছে পড়ছে না মোটেই।"

ওর চোখের সেই দৃষ্টি আমাকে প্রায় অসাড় করে ফেলেছিল, তবুও কোনরূপে আমতা আমতা করে বলে যেতে লাগলাম—

"পৃথিবীর উর্দ্ধে তোমার বসবাস—নির্ব্বোধ লোক কি চায় না চায় সে বিষয়ে কোন ধারণাই তোমার নেই। তারা এমন কিছু চায় যা তাদের বিষণ্ণতার, তাদের ব্যর্থতার ভারসাম্য রক্ষা করতে সক্ষম হবে। তারা চায় খুন-জখম, চায় রোমাঞ্চ, চায় যত রকমের উত্তেজনা। তুমি তাদের তা দিতে ইচ্ছা কর না কিন্তু দিয়েছ, আর ইচ্ছায় হোক অনিচ্ছায় হোক—তাদের উপকার তুমি করেছ, অতএব এ টাকা তোমারই পাওনা এবং তোমাকে এটা নিতেই হবে।"

হঠাৎ বিড়ালটা নীচে লাফিয়ে পড়লো। অপেক্ষা করতে লাগলাম এই বুঝি ঝড় সবেগে আত্মপ্রকাশ করবে।

আমি ক্ষিপ্রগতিতে বলে চললাম, "জানি ফিল্মের ওপর তোমার ঘৃণা আছে এবং এটাকে হেয় জ্ঞান করে—'

হঠাৎ বেরিয়ে এলো ওর গম্ভীর কণ্ঠস্বর—

"আরে ছাই। কি সব আজেবাজে বকে চলেছে। ফিলম্! ফি-রাত পর পরই আমি ওখানে যাই।"

"হা ঈশ্বর।" বলে চীৎকার করে উঠবার পালা এবার আমার। ওর খালি হাতের মধ্যে সর্ত্তনামা আর চেক খানা জোর করে গুঁজে দিয়ে ক্ষিপ্রবেগে বাইরে বেরিয়ে এলাম, আর বিড়ালটাও আমার সঙ্গে পিছু পিছু ছুটে এলো।

USK

শ্রীমতী অরুণা চট্টোপাধ্যায়

(T. S. Eliot এর ভাবানুবাদ)

ভেঙো না গাছের শাখা কিম্বা সহসা আশা
যদি লক্ষ্য ভ্রষ্ট হয় তোমার সন্ধান
সুশুভ্র নিঝর তটে সুশুভ্র হরিণ।
হাতের বল্লমভল্লা থাক দূরে থাক্
প্রাচীন কুহকী মন্ত্র! তারাও ঘুমাক!

ত্রস্তে নেমো ধীর পায়ে মেলে দুনয়ন
যেখানে পথের শেষ; পথের উত্থান
যেখানে সবুজ আলো মেশে এসে ধূসর হাওয়ায়
যাত্রীর বন্দনা গাওয়া ঋষির দাওয়ায়
সেখানে তোমার লক্ষ্য, তোমার সন্ধান।

নরোত্তম ঠাকুর—প্রসঙ্গ

জ্যোতিঃপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়

১৫৩৩ খৃষ্টাব্দের আষাঢ় শুক্লা সপ্তমীতে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর তিরোধানের পর ঐ বৎসর মাঘী পূর্ণিমাতে রাজসাহীর অন্তর্গত খেতরী গরাণহাটি পরগণার ভূস্বামী (রাজা) কৃষ্ণানন্দ দত্ত বহু তপস্যার ফলে নরোত্তমকে প্রিয়দর্শন পুত্ররূপে লাভ করেন। বাল্যকাল হইতেই সংসারে অনাসক্তি, জীবের প্রতি ভালবাসা, জ্ঞানানুরাগ, সততা দর্শন নরোত্তমকে বৈশিষ্ট্য দান করিয়াছিল। পিতামাতার ধর্ম্মনিষ্ঠা ও পরহিত-চিকীর্ষা তাঁহার সাধু-মনোবৃত্তিকে উৎসাহিত করে। শ্রীচৈতন্যের প্রেমধর্ম্ম তাঁহাকে আকৃষ্ট করে এবং বৃন্দাবনের গল্প তাঁহার উপর এরূপ প্রভাব বিস্তার করে যে তিনি বিবাহ করিতে অস্বীকার করিয়া গোপনে গৃহ ত্যাগ করেন। বহু পথক্লেশ সহ্য করিয়া বৃন্দাবনে পৌঁছিয়া তিনি সাধুসঙ্গ অন্বেষণ করিতে করিতে বৈষ্ণব-শ্রেষ্ঠ গোস্বামী লোকনাথের কৃপাভিক্ষা করিলেন, কিন্তু শিষ্যত্ব পাইলেন না। তখন তাঁহার অনুমতি লইয়া কুঞ্জের এককোণে পর্ণকুটীর নির্ম্মাণ করিয়া তাঁহার সেবায় লাগিয়া গেলেন। কয়েকদিনের মধ্যেই লোকনাথ বুঝিতে পারিলেন নরোত্তম নিজ হস্তে গোপনে রাত্রির অন্ধকারে প্রতিদিন তাঁহার মল মূত্র ত্যাগ করিবার স্থানটি পরিষ্কার করিয়া রাখে। চমৎকৃত হইয়া রাজপুত্রের এই অপূর্ব নিষ্ঠা ও সেবার জন্য তাঁহাকে ডাকিয়া বলিলেন, তোমাকে দীক্ষা দিব। কায়স্থ নরোত্তমের আশা পূর্ণ হইল।

লোকনাথকে স্বয়ং শ্রীচৈতন্য বৃন্দাবনে পাঠাইয়াছিলেন বিলুপ্ত তীর্থগুলি ও বৈষ্ণব সাহিত্যের উদ্ধারকল্পে; লোকনাথ বয়সে তাঁহার অপেক্ষা দুই বৎসরের বড় এবং কিছুদিন দুইজনে শান্তিপুরে অদ্বৈতাচার্য্যের নিকট শ্রীমদ্ভাগবত ও বেদ অধ্যয়ন করিয়াছিলেন। লোকনাথের পিতা পদ্মনাথ চক্রবর্ত্তী আদিনিবাস মাগুরা তালখড়ি গ্রাম ছাড়িয়া সেকালের শ্রেষ্ঠ বিদ্যাপীঠ নবদ্বীপে অদ্বৈতাচার্য্যের নিকট শাস্ত্রজ্ঞানলাভ করিতে আসেন ও সেইখানেই লোকনাথের জন্ম হয়। বৃন্দাবনে আসিয়া লোকনাথ পাইলেন অশেষ শাস্ত্রজ্ঞানসম্পন্ন, আকুমার ব্রহ্মচারী শ্রীজীবগোস্বামীকে—ইনি রূপ-গোস্বামীর ভ্রাতুস্পুত্র ও মন্ত্র শিষ্য এবং প্রভু নিত্যানন্দ কর্তৃক বৃন্দাবনে প্রেরিত বলিয়া মহাখ্যাতিমান শিক্ষক ও কাশীধামের সুপ্রসিদ্ধ মধুসূদন বাচস্পতির প্রতিভাধর ছাত্ররূপে বৃন্দাবনে পরম সমাদৃত। রঘুনাথ ভট্ট, রঘুনাথ দাস, প্রবোধানন্দ, কাশীশ্বর ও কৃষ্ণদাস কবিরাজ শ্রীজীব গোস্বামীর ছাত্র হিসাবে বৃন্দাবনের অলঙ্কার। ইঁহার নিকট শিক্ষালাভ করিয়া লোকনাথ গোস্বামী কিশোর নরোত্তম দত্তকে শিষ্যরূপে গ্রহণ করিয়া শ্রীচৈতন্যদেবের প্রেমধর্ম্ম প্রচারের এক মহান কর্ম্মী সৃষ্টি করিলেন এবং নরোত্তমকে তাঁহারই গুরু শ্রীজীবগোস্বামীর পদতলে ভক্তিশাস্ত্র পাঠের জন্য প্রেরণ করিলেন। নরোত্তমের মত সৌভাগ্য কয়জনের হইয়া থাকে?

বৃন্দাবন সম্বন্ধে নরোত্তমের রচিত একটি মনোজ্ঞ সঙ্গীত এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য :—

বৃন্দাবন রম্যস্থান, দিব্য চিন্তামণি ধাম, রতনমন্দির মনোহর, আবৃত কালিন্দী-নীরে, রাজহংস কেলী করে, কুবলয় কনক উৎপল; তার মধ্যে হেম পীঠ, অষ্টদলেতে বেষ্টিত, অষ্টদলে প্রধানা নায়িকা। তার মধ্যে রত্নাসনে, বসি আছেন দুজনে, শ্যাম সঙ্গে সুন্দরী রাধিকা। ওরূপ-লাবণ্য রাশি, অমিয় পড়েছে খসি, হাস্য পরিহাস সম্ভাষণে, নরোত্তম দাস কয়, নিত্যলীলা সুখময়, সদাই স্ফুরুক মোর মনে।

নরোত্তমের "প্রার্থনা" শীর্ষক পুস্তিকার মধ্যে উল্লিখিত গানটির সহিত আরও কয়েকটি সুন্দর ভক্তিপূর্ণ আবেগময় সঙ্গীতের সমাবেশ দেখা যায়। সবগুলিই মনোহর তানলয় সমম্বিত; কয়েকটি গরাণহাটি সুরের (আবিষ্কর্ত্তা নরোত্তমের পরগণার নামে চিহ্নিত) নব নব ভঙ্গী ও গীতি-মাধুর্য্যের লীলায়িত বিন্যাসে ছন্দোবদ্ধ; আবৃত্তি ও কীর্ত্তনের উপযুক্ত বিশেষ কয়েকটি রচনা একাধারে মৌলিক ও গতানুগতিকতাবর্জ্জিত। জয়দেব, বিদ্যাপতি ও চণ্ডীদাস প্রাক্‌চৈতন্য পদকর্ত্তা, গোবিন্দদাস জ্ঞানদাস ও ঠাকুর নরহরি সরকারের পদাবলী চৈতন্যের সমসাময়িক সৃষ্টি এবং নরোত্তম, বাসুদেব, যদুনন্দন ও প্রেমদাস প্রভৃতি চৈতন্যোত্তর পদকর্ত্তা। নরহরি ও নরোত্তম বহু ভাবায় গৌরলীলায় পদরচনার প্রথম প্রবর্ত্তক, একটি বালারুণ, অপরটি দীপ্তসূর্য্য।

সহজবোধ্য সাবলীল ভাষা ও প্রাণমাতান ছন্দ নরোত্তমের বৈশিষ্ট্য; প্রার্থনা, 'হাটপত্তন', 'প্রেমভক্তি চন্দ্রিকা' তাঁহার অপূর্ব্ব সৃষ্টি; চণ্ডীদাস ও বিদ্যাপতির প্রভাব তাঁহার রচনায় অতি অল্পই দেখা যায়, যদিও তাঁহার নিজের প্রভাব পরবর্ত্তী কোন কোন গীতকারদের উপর পরিস্ফুট; দৃষ্টান্ত স্বরূপ বলা যায়—

আর কবে নিতাইচাঁদ করুণা করিবে
সংসার বাসনা মোর কবে তুচ্ছ হবে।
বিষয় ছাড়িয়া কবে শুদ্ধ হবে মন
কবে হাম হেরব শ্রীবৃন্দাবন।
হরি হরি কবে মোর হইবে সুদিন।
ফলমূল বৃন্দাবনে খাব দিবা অবসানে
ভ্রমিব হইয়া উদাসীন।
শীতল যমুনাজলে, স্নান করি কুতুহলে
প্রেমাবেশে আনন্দিত হইঞা
নরোত্তমের "প্রার্থনা"॥

সুবিখ্যাত গীতকার নীলকণ্ঠ মুখোপাধ্যায়ের প্রসিদ্ধ সঙ্গীত—

কত দিনে হবে সে প্রেম সঞ্চার।
হ'য়ে পূর্ণকাম বল্‌বো হরিনাম, নয়নে বহিবে প্রেম অশ্রুধারা।
কবে হবে আমার শুদ্ধ প্রাণ মন, কবে যাব আমি প্রেমের বৃন্দাবন
সংসার বন্ধন হইবে মোচন, জ্ঞানাঞ্জনে যাবে লোচন-আঁধার।
কবে পরশমণি করি পরশন, লৌহময় দেহ হইবে কাঞ্চন
হরিময় বিশ্ব করিব দর্শন, লুটাইব ভক্তিপথে অনিবার।
কবে প্রেমে পাগল হইয়ে হাসিব কাঁদিব
সচ্চিদানন্দ সাগরে ভাসিব
আপনি মজিয়ে সকলে মজাব
হরিপদে নিত্য করিব বিহার।

নরোত্তম মৈথিলী ভাষা ব্যবহার করেন নাই বলিলেই চলে—শালীনতার দিকে দৃষ্টি রাখিয়া, কাব্য সৃষ্টিতে অনুভূতির প্রকাশ করিয়াছেন। যদিও তাঁহার লীলা কীর্ত্তনের অংশ বিশেষে চণ্ডীদাস ও বিদ্যাপতির প্রভাব আসিয়া পড়িয়াছে—তথাপি নরোত্তমের স্বভাব সুন্দর সুরুচিবোধ তাঁহাকে পরিত্যাগ করে নাই। এই বৈশিষ্ট্য বড় কম কথা নয়। মাধুর্য্যের সহিত সৌন্দর্য্যের অভিন্ন সমাবেশ তাঁহার নিম্নলিখিত রচনাটিতে দেখা যায়—

কুসুমিত বৃন্দাবনে, নাচত শিখিগণে, পিককুল ভ্রমরা ঝঙ্কারে।
প্রিয় সহচরী সঙ্গে, গাইয়া যাইব রঙ্গে, মনোহর নিকুঞ্জ কুটীরে।
কুটিল কুন্তল সব, বিথারিয়া আঁচরব, বনাইব বিচিত্র করবী।
মৃগমদ মলয়জ, সব অঙ্গে লেপব, পরাইব মনোহর হার।
চন্দন কুঙ্কুমে তিলক বনাইব, হেরব মুখ সুধাকর।
নীল পটাম্বর যতনে পরাইব পায়ে দিব রতন মঞ্জীরে।
ভৃঙ্গারের জলে রাঙা চরণ ধোয়াইব, মুছব আপন চিকুরে।
কুসুম কমল দলে, শেজ বিছাইব শয়ন করাব দোঁহাকারে।
ধবল চামর আনি, মৃদু মৃদু বীজব, ছরমীত দুহুক শরীরে।
শ্রীগুরু করুণাসিন্ধু, লোকনাথ দীনবন্ধু, মুই দীনে কর অবধান।
রাধাকৃষ্ণ বৃন্দাবন, প্রিয় নর্ম্ম সখিগণ, নরোত্তম মাগে এই দান।

কেহ কেহ নরোত্তমকে শ্রীচৈতন্যের অবতার বলিয়া থাকেন; আবার কেহ বা শ্রীনিবাস আচার্য্যকে এই গৌরব দান করেন। উভয়েই শ্রীচৈতন্যের প্রেম ধর্ম্ম প্রচারের (নরোত্তম উত্তর বঙ্গে, শ্রীনিবাস রাঢ় ও পশ্চিমবঙ্গে) জয়যুক্ত হইয়াছিলেন। ভক্তের পূজা এইভাবেই হইয়া থাকে।

ঈশ্বরের পরম প্রিয়পাত্র সাধু এলিজার দেহাবসানে শিষ্য এলিষার উপর তাঁহার উত্তরীয় নিক্ষিপ্ত হইবার কথা প্রবাদ বাক্যের সম্মান পাইয়াছে।

শ্রীচৈতন্যের উপদেষ্টারূপে সাধকশ্রেষ্ঠ ঈশ্বর পুরী, কেশব ভারতী ও মাধবেন্দ্র পুরীর উল্লেখ করা হয়। তাঁহার সমসাময়িক সাধক ও সহকর্ম্মীদের মধ্যে ছিলেন আচার্য্য অদ্বৈত, প্রভু নিত্যানন্দ ও পণ্ডিত গদাধর। তাঁহার তিরোধানের পর নরোত্তম ঠাকুর, শ্রীনিবাস আচার্য্য ও শ্রীশ্যামানন্দ তাঁহার প্রেমধর্ম্মকে প্রসারিত করেন। নিত্যানন্দ-পুত্র শ্রীবীরচন্দ্র ইঁহাদের নেতৃস্থানীয়।

শ্রীবৃন্দাবনে রাসের আনন্দের কলরোল শেষ হইলে শ্রীজীব গোস্বামীর প্রস্তাবমত নরোত্তম, শ্রীনিবাস ও শ্যামানন্দ গৌড়, বাংলায় ও উড়িষ্যায় প্রেমধর্ম্ম প্রচারের জন্য বৃন্দাবনে রক্ষিত গ্রন্থরাজি লইয়া বাংলাদেশের উদ্দেশ্যে বাহির হইলেন। পথে ডাকাতির ফলে গ্রন্থরাশি তাঁহাদের হস্তচ্যুত হইল।

শ্রীনিবাস পুস্তক উদ্ধারের চেষ্টায় ডাকাতির গ্রামে (মল্লভূমিতে) রহিয়া গেলেন—নরোত্তম দেশে (খেতরীতে) ও শ্যামানন্দ উড়িষ্যায় গমন করিলেন। খেতরীতে পিতা রাজা কৃষ্ণানন্দের সহযোগিতায় নরোত্তম প্রেমধর্ম্মপ্রচারে ব্রতী হইলেন। এইবার পরমোৎসাহে নবদ্বীপ ও অন্যান্য তীর্থ ভ্রমণ করিয়া নীলাচলে যাত্রা করিলেন—সেখানে শ্যামানন্দের সহিত মিলিত হইয়া বৈষ্ণবধর্ম্ম পুনরুত্থানে মনোযোগী হইলেন। পরে খেতরীতে ফিরিয়া আসিয়া নামপ্রচারে মাতিয়া উঠিলেন। অব্রাহ্মণদের দীক্ষা দিতেছেন দেখিয়া কয়েকজন বর্ণাশ্রমী ব্রাহ্মণ প্রতিবাদ করিলেন—কিন্তু প্রেমের বন্যায় তাহা ভাসিয়া গেল। শ্রীচৈতন্যের মহাবাণী "ভক্তের জাতি নাই" বিরুদ্ধপক্ষের অন্তর স্পর্শ করিল এবং নরোত্তমের অনুচরগণ শুদ্ধাচার ও পরহিতসাধনের দ্বারা সকলের চিত্ত জয় করিলেন। ইতিমধ্যে সংবাদ পাওয়া গেল শ্রীনিবাস আচার্য্য মল্লভূমির রাজা বীর হাম্বিরকে ডাকাতি ব্যবসা হইতে বিমুক্ত করিয়া বৈষ্ণবধর্ম্মে দীক্ষিত করিয়াছেন, অপহৃত পুস্তকরাজী ফেরত পাইয়াছেন এবং বিবাহ করিয়া সংসারী হইয়া মল্লভূমির রাজগুরু হইয়াছেন।

নরোত্তম ও তাঁহার পিতার আগ্রহে খেতরীতে একটি মন্দির প্রতিষ্ঠিত হইল; শ্রীরাধা, গৌরাঙ্গ ও অন্য ৪টি বিগ্রহ সেই মন্দিরে স্থাপিত হইল। নরোত্তমের আহ্বানে শ্রীনিবাস আচার্য্য খেতরীতে আসিয়া এই প্রতিষ্ঠা কার্য্য সুসম্পন্ন করিলেন।

"উঠিল কীর্ত্তন ধ্বনি ব্যাপিল ভুবন
স্বর্গে রহি পুষ্প বৃষ্টি করে দেবগণ,
(নরোত্তম বিলাস)।

এই প্রতিষ্ঠা কার্য্যে রাজা কৃষ্ণানন্দ আমন্ত্রিত অগণিত বৈষ্ণবকে ভোজ্য অর্থদানে আপ্যায়িত করেন। এই কার্য্যটি লোকের মুখে মুখে ফিরি[illegible] এই মহামহোৎসবে প্রভু নিত্যানন্দের পত্নী জাহ্নবী দেবী পরিজ[illegible] উপস্থিত হইয়া রন্ধনাদি কার্য্য সুশৃঙ্খলার সহিত নির্ব্বাহ করেন। [illegible] ছিল শ্রীচৈতন্যের জন্মতিথির উৎসব (১৫৮৩ খৃঃ)। নির্জ্জনে ধ্যা[illegible] চিন্তা করার উদ্দেশ্যে নরোত্তম খেতরী হইতে এক ক্রোশ দূরে [illegible] একটি স্থানে কুটীর নির্ম্মাণ করিয়া সঙ্গীত রচনায় মনোনিবেশ ক[illegible] শ্রীনিবাস আচার্য্য উৎসবের কয়েকদিন পরে কবিরাজ রামচন্দ্রকে বৃন্দাবনে চলিয়া গেলেন। রামচন্দ্র নরোত্তমের অনুগত কর্ম্মী শ্রীচৈতন্যের ভক্তছিলেন; তাঁহাকে ছাড়িতে নরোত্তমের আদৌ ইচ্ছা

না। যাহা হউক কয়েকদিন পরে সংবাদ আসিল শ্রীনিবাস ও রামচন্দ্র উভয়েই দেহরক্ষা করিয়াছেন। নরোত্তম অসুস্থ হইয়াছিলেন—এবার শয্যাশ্রয় করিতে হইল। একটি কবিতায় তাঁহার গভীর শোকের পরিচয় রহিয়াছে।

আচার্য্য শ্রীনিবাস আছিনু যাহার পাশ
কথা শুনি জুড়াইত প্রাণ
তেঁহ মোরে ছাড়ি গেল। রামচন্দ্র না আইল
দুঃখে জীউ করে আনচান,
মোর মনের ব্যথা, কাহারে কহিব কথা
এ ছার জীবনে নাহি আশা
অন্নজলে বিষ খাই মরিয়া নাহিক যাই
ধিক্ ধিক্ নরোত্তম দাস ॥

অল্প কয়েকদিন পরেই গঙ্গাতটে শ্রীকৃষ্ণের নাম করিতে করিতে চির-কুমার বৈষ্ণব শ্রেষ্ঠ নরোত্তম তনুত্যাগ করিলেন। সেদিন রাসপূর্ণিমার পরবর্ত্তী কৃষ্ণাপঞ্চমী ১৫৮৭ খৃষ্টাব্দ।

অন্ধ

জীবনকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়

হাল্ ছাড়া তরীখানি
কে ভাসিয়ে দিল রাতের ওই পারাবারে ?
যে নাবিক থাকেনা সে দেশে, জানেনা সে

কোথায় হারিয়ে যাবে
হয় তো ফিরিয়ে পাবে
তরঙ্গ উত্তাল ওই সিন্ধুর অন্ধকার পারে।
সাগরের তীরে ব'সে
কে তুমি এ নিশীথ আঁধারে আজ
ভাসিয়েছ হাল্‌ছাড়া তরীখানি
এপারের নাবিকের তরে ?
যতটুকু জানি ; তুমি জানোনা যে

সে নাবিক থাকেনা এ দেশে
সেদিনের সাগর প্রভাতে এসে
দেখেছে, দেখিয়েছিল
মানুষেরে, তারও এক মাধবীর
ব্যথিত হৃদয় আছে ওই সরোবরে—।
তাই সে হারায় তারে

হয়তো হারাবে তরী
বিশাল সিন্ধুর ওই অন্ধকার পারে।

মুহূর্ত

শ্রীসুনীতি মুখোপাধ্যায়,

নিঃসীম সিন্ধুর বুকে একটি বিন্দুর আবেদন
অযুত তরঙ্গ মাঝে তোলে বল কতটুকু সাড়া,
নির্বাক শূন্যের কোলে সঙ্গীহীন দীপ্ত এক তারা
কালো রাতে পূর্ণিমার কতটুকু অভাব পুরণ
করে বল ? তেমনিই জীবনের ভগ্নাংশ সময় :
একটি মুহূর্ত—তার আছে আর কতটুকু দাম,
তবুও তো মানুষের লেন-দেন, নিখাদ্ প্রত্যয়
একেই ভিত্তি করে, এখানেই তার পরিণাম।

সেঁজুতি স্বপ্ন আজ এই সবে মনের কুটীরে
আশা-বর্তিকা তুলে আগামীর পথে ধরে আলো,
সে' আলো আবার জানি পৃথিবীর জমে থাকা কালো
মুছে দেবে, কিন্তু ভাবি প্রাত্যহিক সেঁজুতির ভিড়ে
কতটুকু ঠাঁই তার! তবু সেই আলো জ্বালা ক্ষণ
জীবনে আর কি আসে, বিনিময়ে জীবনের ফল
দিলেও মেলে কি আর! মুহূর্ত আছে তো অগণন,
তবুও ডুবুরি মন বলে না তো সমুদ্র অতল।

জীবনের বেলাভূমি ছুঁয়ে কত ঢেউ এসে থামে :
একক সত্তা কারও মেলে না তো কল্পনার চরে,
তবুও ফসল ভেবে যা তুলেছি আজ আমার ঘরে :
একটি মুহূর্ত তা-ও, পাই শুধু ভিন্ন এক নামে।

কেমন করে জীবন গড়্তে হয়

উপানন্দ

নৈতিক চরিত্রের সৌন্দর্য্য মানব সভ্যতার মূলাধার। জ্ঞান বিজ্ঞান, শিল্প-কলা ও ধর্ম্ম সাধনার দ্বারা তোমরা যে পরিমাণে ঐহিক ও পারত্রিক সম্পদলাভ কর্তে পারো, তার চেয়ে অনেক বেশী সম্পদ লাভ করা তোমাদের পক্ষে সহজসাধ্য হোতে পারে যদি নৈতিক চরিত্র বলে বলীয়ান্ হোতে পারো। নৈতিক সৌন্দর্য্য যাদের চরিত্রে পরিস্ফুট হয়, তারা লাভ করে অসাধারণ দৈবশক্তি—আর এই শক্তি বলে তারা অসম্ভবকে সম্ভব কর্তে পারে। মানুষের এই চারিত্রিক সৌন্দর্য্য প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যের চেয়ে বেশী চিত্তাকর্ষক ও হৃদয়গ্রাহী। এ সৌন্দর্য্য অনন্যসাধারণ—একে কখন ভোলা যায় না। নৈতিক সৌন্দর্য্যহীন মনীষী কালভুজঙ্গের চেয়ে ভয়াবহ। তাঁর দ্বারা সমাজের কোন কল্যাণ হয় না। চরিত্রই তুখোর মূলধন।

মানসিক শক্তির বিকাশ ও অর্থোপার্জ্জনই শিক্ষার প্রধান উদ্দেশ্য, এরূপ ধারণা অনেকের মধ্যে দেখা যায়। কিন্তু এটী সম্পূর্ণ ভ্রান্তিমূলক। যে সব বিষয় বা বস্তু অজ্ঞাত, তাদের জ্ঞাত করাবার জন্যই শিক্ষার এক-মাত্র লক্ষ্য নয়, কি ভাবে মানুষের সঙ্গে ব্যবহার করা উচিত তা শেখানোই শিক্ষার প্রকৃত তাৎপর্য্য। অশ্ব সুসজ্জিত না হওয়া পর্য্যন্ত যুদ্ধে স্থান লাভ কর্তে পারে না। আধারের মধ্যে বাষ্পকে আবদ্ধ না রাখ্তে পার্লে সে তার শক্তি প্রকাশ করে কিছুই টেনে নিয়ে যেতে পারে না। নায়েগ্রার মত কোন জল-প্রপাতই আলো ও শক্তি সরবরাহ কর্তে পারে না, যদি না তাকে সঞ্চালিত করা যায় নিম্নস্থ সুড়ঙ্গ পথ দিয়ে নলের মধ্যে। কোন জীবনও বড় হয়ে উঠ্তে পারে না যদি না তাকে কেন্দ্রীভূত, উৎসর্গীকৃত ও নিয়মানুবর্ত্তী করা যায়, আর যদি না সে মহৎ প্রেরণায় উদ্বুদ্ধ হয়।

নশ্বর জগতে সৎলোকের পবিত্র ছন্দোময় জীবনই সভ্যতার শ্রেষ্ঠ শিল্প নিদর্শন। এ জীবন কোন দৈব ঘটনা সম্ভূত নয়, এটী সাধনা সাপেক্ষ। প্লেটো প্রভৃতি বড় বড় দার্শনিক পণ্ডিতরা বলেছেন, মানুষের জীবন সকল রকমে সুন্দর হয়ে গড়ে ওঠা দরকার—তোমাদের জীবনের সর্কোত্তম অবদান হচ্ছে নিজেকে ক্রমাগত গড়ে তুলে আত্মোন্নতি করা—এই আত্মোন্নতির পথে তোমাদের উপলব্ধি হবে কেমন করে উত্তমরূপে প্রাণ-ধারণ করে জগতে সুশৃঙ্খলভাবে বাস কর্তে হয়। সংযতবাক্ হোলে সমাজে খ্যাতিলাভ করা যায়। ত্রিশ বছর বয়স পর্য্যন্ত বিনম্র ও লাজুক না হয়ে বাচালতা প্রকাশ করা অখ্যাতির পরিচায়ক। তোমাদের মধ্যে যে সব ছেলে মেয়ে বাইশ বছরেও উদ্ধত আর বাচাল হয়ে থাকে, তারা বিয়াল্লিশ বছরেও সমাজে হয়ে ওঠে বিরক্তকারী ব্যক্তি। নম্রতা ও লাজুকতা যার মধ্যে নেই, তার ব্যক্তিত্ব প্রকাশ পায় না। স্মৃতিশক্তি বৃদ্ধি করা দরকার। এই শক্তি বৃদ্ধি কর্তে হোলে চেঁচিয়ে পড়া দরকার, এতে চোখ ও কান দুইটী কর্ম্মলিপ্ত থাকে, আর মন ঘুরে ফিরে নানাদিকে চলে যায় না। হাসি অনেক সময়ে মানুষকে মোহিত করে—আবার বিরক্ত ও বিকৃত করে তোলে মানুষের মন। গম্ভীরপ্রকৃতিবিশিষ্ট মানুষের মুখ থেকে যখন হাসি ফুটে ওঠে সেটী প্রকৃতপক্ষে মানুষের মন ভোলায়, আর সে হাসিতে থাকে উজ্জ্বলতা। এর সৌন্দর্য্য দুর্নিবার। অনেকের ভুল ধারণা, হাস্তে পার্লেই মানুষের মন ভুলিয়ে কাজ আদায় করা যায়, খুব কম লোকের মুখেই নির্দ্দোষ হাসি ফুটে ওঠে। শয়তানের হাসি মারাত্মক। হাসির মধ্যে থাকে মনোভাবের নানা তাৎপর্য্য, অতএব হাসিতে ভুল্বে না।

অলস আর অপব্যয়ী ব্যক্তি কখন বড় হোতে পারে না। সৌভাগ্য ও যশ অনায়াসসাধ্য নয়। যারা জীবনের একটি মুহূর্ত্ত ও বৃথা নষ্ট করে নি, এরূপ লোকের অক্লান্ত পরিশ্রমের ফলে আর উচ্চ শিক্ষা, জ্ঞান-বিজ্ঞান লাভ ও আবিষ্কারের ফলে সমগ্র জগৎ চলে থাকে। পরিশ্রমই মানুষ প্রস্তুত করে—অদৃষ্ট নয়। সৌভাগ্য কোন গাছের ফল নয়, যে সুযোগ না হারায়, সে-ই সৌভাগ্যবান হয়। যে যত বড় কর্ম্মক্ষম উদ্যোগী সে-ই তত ভাগ্যবান পুরুষ। যে উদ্যোগী, সেই লক্ষ্মীর কৃপা পায়।

জ্ঞানই স্বর্গের মত জায়গায় আমাদের উড়িয়ে নিয়ে যাওয়ার পক্ষীরাজ ঘোড়া। জ্ঞান-লিপ্সা থাকলেই বহু বিষয়ে শেখা যায়। জ্যোতি যেমন চন্দ্র সূর্য্যের পুষ্টি, হৃদয়ের আনন্দ তেমনই তোমাদের পুষ্টি। নীতি সাধন জীবনের পরিণতির অঙ্গীভূত। বুদ্ধ বলেছেন, যে ব্যক্তি উত্থান সময়ে উত্থান করে না, যুবা ও বলী হয়েও আলস্যপরায়ণ, যার মনের সঙ্কল্প অবসন্ন হয়ে যায়, সেই দীর্ঘসূত্রী ও অলস ব্যক্তি প্রজ্ঞালাভের পথ পায় না। প্রজ্ঞা বা জ্ঞান লাভ করতে হোলে নিবিষ্ট চিত্তে পড়াশুনা করা দরকার।

সম্মানলাভ জোর করে হয় না, যোগ্য ব্যক্তির সম্মান নিজস্ব সম্পত্তি। তোমাদের মধ্যে অনেক গুণ থাকতে পারে কিন্তু অন্যের আরও অধিক আছে, এই ভেবে নম্রতা অবলম্বন করবে। নির্ব্বোধের হৃদয় তার মুখে, নির্ব্বোধ হাঁ করলেই বুঝতে পারা যায় তার ভাব কিন্তু জ্ঞানীর মুখই থাকে হৃদয়ে। যার ধর্ম্মের আবরণ নেই, যে যত বস্ত্রই পরিধান করুক না কেন, তার দরিদ্র বেশ। অনর্থক কর্ম্ম, আচার ব্যবহার নিয়ে আত্মীয় প্রতিবেশীগণের সঙ্গে বাক্‌বিতণ্ডা করে সময় নষ্ট করো না, তাতে যে নিজেদের সময় নষ্ট হয় তা নয়, অনেক শত্রু বৃদ্ধি ও করা হয়। ভালো কাজে স্বার্থ ত্যাগ করবে, এর দ্বারা হৃদয় উচ্চ হবে, সমাজের উপকার হবে। পবিত্র হৃদয়ে সন্তোষের নিভৃত কক্ষে সুখের আবাস দেখতে পাবে।

বিখ্যাত ঔপন্যাসিক ডাঃ এ, জে, ক্রনিন এম্‌ডি উপাধি লাভ করে একদা লব্ধপ্রতিষ্ঠ চিকিৎসক হয়েছিলেন। তিনি যখন স্কটল্যাণ্ডে চিকিৎসা শাস্ত্র অধ্যয়ন করছিলেন তখন তাঁকে একজন বিখ্যাত সার্জ্জেন বা শস্ত্রোপচারকের অধীনে হাসপাতালে কিছুকাল কাজ করতে হয়েছিল। শস্ত্রোপচারকের নিজের সম্বন্ধে এত উঁচু ধারণা ছিল যে অপরের খুঁটি-নাটি দোষ ত্রুটির ওপর তিনি তীব্র মন্তব্য প্রকাশ করে তার অন্তরে আঘাত দিতেন। এই কটুভাষী অস্ত্র চিকিৎসক ক্রনিনকে বলেছিলেন—'তুমি কোন দিনই সার্জ্জেন হোতে পারবে না—ক্রনিনের মনে সর্ব্বদাই কথাগুলির গতিবিধি লক্ষ্য করা যেতো, ফলে তাঁর আত্মবিশ্বাস হারিয়ে গিয়েছিল। পরবর্ত্তীকালে তিনি এম, ডি উপাধিলাভ করে চিকিৎসকের বৃত্তি গ্রহণ করে ওয়েষ্টার্ন হাইল্যাণ্ডে যে সময়ে অবস্থান করছিলেন সে সময়ে একদা ডিসেম্বর মাসে গ্রাম্য যুবক রবিন গ্রেয়ারের অস্ত্র চিকিৎসার জন্যে তিনি আহূত হন। ছেলেটির উত্তম স্বাস্থ্য। একদিন রবিন ও তার বাবা পঞ্চাশ ফুট উঁচু ফার গাছ কাটতে যায়। কুঠারের আঘাতে গাছটা পিছন দিক থেকে অপ্রত্যাশিতভাবে দমকা বাতাসের চাপে রবিনের ঘাড়ের ওপর হুড়মুড় করে এসে পড়ে, তুষারের গভীরতাই বালককে অবশ্য সে সময়ে আসন্ন মৃত্যু থেকে রক্ষা করে কিন্তু তার দেহের নিম্নার্দ্ধ একেবারে ভেঙ্গে পড়ায় সে পক্ষাঘাত অবস্থায় পড়ে থাকে, তার মোটেই জ্ঞান ছিল না। তার পিতামাতাও স্ত্রী ক্রন্দনরত, জীবনের আর আশা নেই। ক্রনিন প্রথমে শস্ত্রোপচারে সাহসী হননি, কেননা পূর্ব্ব থেকেই তাঁর মন দমে ছিল। গ্লাসগোর ভিক্টোরিয়া হাসপাতাল থেকে অস্ত্র চিকিৎসক আনবার সঙ্কল্প করলে ও তা ব্যর্থ হয়ে যায়। ঝড় ও তুষারপাতের জন্যে পল্লী অঞ্চলের সঙ্গে সহরের সর্ব্বপ্রকার যোগাযোগ সে সময়ে বিচ্ছিন্ন হয়েছিল, টেলিফোন নিষ্ক্রিয় অবস্থায় থাকে, ট্রেণ চলাচল ও বন্ধ। কোথাও কোন অস্ত্র চিকিৎসক পাবার সম্ভাবনা না থাকায় ডাক্তার হতাশ হয়ে পড়লেন, রবিনের পরিবারবর্গও ক্রমাগত অশ্রুবর্ষণ করতে লাগলো। ডাক্তার ক্রনিনের মধ্যে তখন এলো কর্ত্তব্য-বুদ্ধির প্রাথর্য্য। তিনি মনে জোর পেলেন, তারপর ছেলেটিকে গ্রামের হাসপাতালে এনে নিজেই তার শস্ত্রোপচার করবেন এরূপ সঙ্কল্প করে যখন তাকে অপারেশন থিয়েটারে নিয়ে এলেন—তখনও তাঁর কাণে ধ্বনিত হচ্ছে তাঁর ছাত্র জীবনের অধ্যাপক সেই কটুভাষী সার্জ্জেনের কথা—'তুমি কখন সার্জ্জেন হোতে পারবে না—তাঁর মন বিদ্রোহী হয়ে উঠলো। নিজের মনে বললেন—'নিশ্চয়ই হবে'।—তাঁর শস্ত্রোপচারের ফলে সেই শীতার্ত্ত রাত্রে পল্লীর ক্ষুদ্র হাসপাতালে রবিন গ্রেয়ার বেঁচে উঠলো, তার অশ্রুভারাতুর আর্ত্ত পরিবারবর্গের মুখে হাসি ফুটে উঠলো। তিন মাস পরে সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে রবিন হাসপাতাল থেকে বেরিয়ে এলো। ডাঃ এ, জে, ক্রনিন বলেছেন—'যখন সব আশা ভরসা চলে যায় তখনও যদি আমরা চেষ্টা করতে ত্রুটি না করি—তাহোলে পরাজয়ের মধ্য থেকে জয়কে টেনে বের করা যায়, এই বিশেষ উল্লেখযোগ্য শিক্ষাই আমি লাভ করেছি। এ থেকে আমার শিক্ষা হয়েছে—কি করে নিরুৎসাহ বক্রোক্তি, অসাফল্যের ভয় প্রভৃতি পুরুষকার প্রয়োগের দ্বারা দূর করে সাধনায় সিদ্ধিলাভ করা যায়।'

সবুজের-হাট্

বাসুদেব পাল

ঝিল্‌মিল্ খিল্‌খিল্ ঘুম্‌তির ঢেউ—
মিঠে-রোদে কি-বা হাসি দেখেছ কি কেউ?
চকাচকি লুকোচুরি করে সারাবেলা;—
পানিকৌড়ির শেষ হয়নাকো খেলা!

ঝুমাঝুম্ ঝুমঝুম্ ঝাউয়ের নূপুর—
একমনে শোনে বসে ক্লান্ত-দুপুর!
শাপ্‌লা-শালুক বনে শ্যাওলার-মেয়ে,
অ-বেলায় শুধু হায়, মরে নেয়ে-নেয়ে!

রিম্‌ঝিম্ ঝিম্‌ঝিম্ ঝুম্‌কোলতায়—
বাব্‌লার ফুল-ফুলে পরাণ মাতায়!

মট্‌মট্‌ বাঁশবন আকাশ-ছোঁয়ায় ;
সাধ্য কি বুড়ো-বট তাহারে নোয়ায় ?

কাশফুল চুল্‌বুল্ দোল্ দোল্ দোলে—
গান গায় বুল্‌বুলি ভাটিয়াল্ বোলে !
ছাড়া পেয়ে এই মন ছুটে যায় দূরে—
সবুজের-হাট্ যেথা প্রকৃতির পুরে।

সৌমিত্রের অভিযান

শ্রীপরেশকুমার দত্ত

(পূর্বপ্রকাশিতের পর)

(২)

সৌমিত্র জানত না রাজ্যের এক সুন্দরী নর্তকী তখন রাজার স্ত্রীরূপে রাজপ্রাসাদে বাস করছে। আসলে কেউ জানত না সে একজন মায়াবিনী। তার দু'ভাইয়ের সঙ্গে এই রাজ্যে প্রবেশ করে সমস্ত রাজ্যটি তারা দখল করতে চায়। ইতি-মধ্যেই তারা রাজ্যের অধিকাংশ ক্ষমতা দখল করে ফেলেছে। রাজ্যের প্রজাদের দুর্গতির সীমা নেই। অসহায় রাজাপ্রজাদের দুর্দশার কথা চিন্তা করে বৃদ্ধ না হয়েও বৃদ্ধের মতোই ভেঙ্গে পড়েছিলেন।

মায়াবিনী পাপা আর তার দুই ভাই জানত যে রাজা আর বেশীদিন বাঁচবেন না। আর শীঘ্রই তারা দখল করবে সমস্ত রাজ্য। কিন্তু তারা যখন জানলে যে রাজ্যের প্রকৃত উত্তরাধিকারী রাজার একমাত্র ছেলে রাজার কাছে আসছে, আর সে অমিত শক্তিশালী, তখন তারা গোপনে পরামর্শ করলে, কিছুতেই তারা ছেড়ে দেবে না রাজসিংহাসন ও রাজদণ্ড। আর তাদের পথের কাঁটা সরিয়ে দেবার জন্য যে কোনো কাজ করতে বিন্দুমাত্র ইতস্ততঃ করবে না তারা।

সৌমিত্র রাজপ্রাসাদে পৌছুতেই পাপার ভাইয়েরা তাকে চিনতে পারলে। আর সেই মুহূর্তেই তারা তাদের অভি-সন্ধি স্থির করে ফেললে।

পাপার দু'ভাই এমন ভাল করলে যেন তারা সৌমিত্রের একান্ত আপন জন। সৌমিত্রকে তারা জানালে যে, তার সঙ্গে পরিচিত হয়ে তারা খুব খুশি হয়েছে। সৌমিত্রের কাছে তারা প্রস্তাব করলে, রাজার সমুখে গিয়েই সে যেন নিজের প্রকৃত পরিচয় দান না করে, একজন অপরিচিতের মতো দাঁড়ায়। রাজার ছেলে সে, রাজা নিজেই যেন তাকে চিনে নিতে পারেন।

সৌমিত্রও তখনই রাজি হল এই প্রস্তাবে। সে ভাবলে, বেশ মজা হবে, তার বাবা তাকে ছেলে বলে চিনতে পারবেন না। আর দেখাই যাক না—শেষ পর্যন্ত কি ভাবে তিনি তাকে চিনতে পারেন।

আর সৌমিত্র যখন রাজপ্রাসাদের বাইরে তার পিতার দর্শন লাভের জন্যে অপেক্ষা করতে লাগল, তখন তারা দু' ভাই হন্তদন্ত হয়ে রাজার কাছে ছুটে গিয়ে বললে, সর্বনাশ হয়েছে মহারাজ, আমাদের প্রতিবেশী শত্রুরাজ্যের একজন গুপ্তচর ধরা পড়েছে। রাজ্যের অনেক গোপনীয় সংবাদ সে ইতিমধ্যেই সংগ্রহ করে ফেলেছে। মহারাজ যদি হুকুম করেন তবে এখানেই তাকে আপনার কাছে নিয়ে আসি।

এই সংবাদে ভীষণ উত্তেজিত হয়ে উঠলেন রাজা পৃথ্বী মিত্র। সেই দণ্ডেই তাকে সমুখে আনবার আদেশ দিলেন।

রাজার চোখে তখন আগুন জ্বলে উঠেছে। কঠিন কণ্ঠে আদেশ দিলেন গুপ্তচরের জন্যে নির্মম শাস্তির।

মায়াবিনী পাপা এগিয়ে এলো রাজার কাছে।

এই পাপাকে রাজ্যের প্রজারা যেমন ভয় করত, তেমন ঘৃণাও করত। নিতান্ত খেলাচ্ছলে অনেক প্রজাকে সে হত্যা করেছে, জ্বালিয়ে-পুড়িয়ে দিয়েছে অনেকের বাড়ী-ঘর। সকলেই জানে স্বার্থের জন্য সে পারে না এমন কাজ নেই। এই ক্রুরস্বভাবা দুষ্ট নারীকে সভয়ে সকলে এড়িয়ে চলত।

সেই পাপা রাজার কাছে এসে ওষ্ঠের কোনে মুচকি হেসে বললে, এই পাপিষ্ঠকে আমার হাতে ছেড়ে দিন মহারাজ। যুবকটিকে সসম্মানে সম্ভাষণ করে রাজ সভায় আপনার কাছে আসবার অনুমতি দিন। তারপর এই স্বর্ণখচিত পেটিকা তার হাতে দিয়ে এর ভিতরের মন্ত্রপূত সোনার হারটি তাকে কণ্ঠে ধারণ করতে বলুন। দেখবেন তখনই তার মন থেকে দুষ্ট মতলব চলে গিয়ে সে আপনার হিতাকাঙ্ক্ষী হয়ে উঠবে। পাপা তার আঁচলের তলা থেকে

একটি অতি সুন্দর হীরক খচিত পেটিকা রাজার হাতে তুলে দিলে। রাজা জানতেন না সেই স্বর্ণপেটিকার মধ্যে রেশমী সুতায় বাঁধা আছে একটি রক্তবর্ণ অতি ভয়ঙ্কর ক্ষুদ্রাকৃতি বিষধর সর্প। পেটিকা উন্মুক্ত করা মাত্রেই বিদ্যুৎ বেগে লাফিয়ে উঠে দংশন করবে সমুখের ব্যক্তিকে। আর মুহূর্তের মধ্যে মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়বে সেই হতভাগ্য।

হিংস্র-প্রকৃতি পাপাকে রাজা ভালো করেই চিনতেন, আর নিশ্চিত অনুমান করেছিলেন পেটিকায় কোনো সাংঘাতিক বস্তু লুকানো আছে।

গুপ্তচর যুবককে রাজা যে কোনো শাস্তিই দিতে প্রস্তুত ছিলেন। তৎনই তিনি যুবককে রাজসভায় আহ্বান করলেন। পাশে প্রস্তুত করে রাখলেন সেই বিষাক্ত সর্পের পেটিকা। পাপা ও তার ভাইয়ের চোখ নিষ্ঠুর আনন্দে জ্বলে উঠল। এই ভাবে তারা রাজার চোখের সমুখেই রাজপুত্রকে হত্যা করবার আয়োজন করলে।

আভুমি নত হয়ে রাজাকে অভিবাদন করলে সৌমিত্র। মাথা তুলে দেখলে—সিংহাসনে উজ্জ্বল মুকুট ধারণ করে বসে রয়েছেন শুভ্রকেশ সৌম্যদর্শন রাজা। হাতে হীরকখচিত স্বর্ণনির্মিত রাজদণ্ড। কিন্তু দু'চোখে তার অকাল-বার্ধক্যের ছায়া। আনন্দ ও বেদনায় আর্দ্র হয়ে উঠল সৌমিত্রের চোখে। মনে হল তার সেই মুহূর্তে ছুটে গিয়ে পিতার বাহুর মধ্যে সমর্পণ করে নিজেকে।

সৌমিত্রের মনের গতি অনুমান করে পাপা রাজাকে কানে কানে বললে, দেখুন মহারাজ অপরাধী কেমন ইতস্তত করছে। ওর মনে নিশ্চয় কোনো কুমতলব রয়েছে। এখনই ওর হাতে ওই স্বর্ণ-পেটিকা তুলে দিন।

কিন্তু রাজা তখন নির্নিমেষ নয়নে তাকিয়ে রয়েছেন তার সমুখের যুবকের দিকে। তার পৌরুষব্যঞ্জক অঙ্গ-সৌষ্ঠবের দিকে তাকিয়ে তার চোখ জুড়িয়ে গেল। পৃথ্বী মিত্রের মনে হল কোথায় যেন দেখেছেন তাকে। করুণায় স্নেহে ছলছল্ করে উঠল তাঁর চোখ।

রাজার মনের অবস্থা বুঝে পাপা তাঁকে গোপনে আবার স্মরণ করিয়ে দিলে যে যুবক তার পরম শত্রু। এখনই তাঁর প্রাণ বিপন্ন করে তুলতে পারে। মুহূর্তে কঠিন হয়ে উঠল রাজার মুখ। পাপার পরামর্শ মতো কপট হাসি-মুখে রাজা তাকে সম্ভাষণ করে বললেন, যুবক তোমার অনেক বীরত্বের কথা শুনে আমি মুগ্ধ হয়েছি। তাই তোমার মতো বীরকে আমি সম্ভাষণ জানাচ্ছি। এই সুবর্ণ-পেটিকায় তোমার উপযুক্ত সম্মানের জন্য আমি একটি স্বর্ণ-হার উপহার দিতে চাই। এটি তোমার কণ্ঠে ধারণ করে আমাকে সম্মানিত কর যুবক।

কিন্তু পেটিকাটি সৌমিত্রের হাতে তুলে দেবার সময় কেঁপে উঠল রাজার হাত। সৌমিত্রের মুখের নবীন লাবণ্যের দিকে তাকিয়ে তার মৃত্যুর আর বিলম্ব নেই জেনে তিনি অত্যন্ত বিচলিত বোধ করলেন। রাজার কানে কানে পাপা অস্ফুটস্বরে বললে, আপনি এখনো চিনতে পারেন নি এই গুপ্তচর যুবককে। দেখুন ওর কটি-বন্ধে কী ভয়ঙ্কর তরবারি। যদি প্রাণরক্ষা করতে চান তবে এখনই ওকে স্বর্ণপেটিকাটি দিন।

মনের সমস্ত দুর্বলতা সবলে সরিয়ে দিয়ে সিংহাসনে সোজা হয়ে বসলেন পৃথ্বী মিত্র। তারপর সমুখের দিকে ঈষৎ নত হয়ে সৌমিত্রের দিকে এগিয়ে দিলেন সেই সাংঘাতিক স্বর্ণপেটিকাটি যার মধ্যে অপেক্ষা করছে নির্মম মৃত্যু। রাজা কঠিনকণ্ঠে বললেন, এখনই এটি উন্মুক্ত করে কণ্ঠে ধারণ কর ভিতরের হারটি। ঠোঁটের কোণে তাঁর নির্মম হাসি ফুটে উঠল। মনে মনে বললেন, এই রকম উপহারই তোমার প্রাপ্য। পেটিকা গ্রহণ করবার জন্যে সানন্দে হাত বাড়িয়ে দিলে সৌমিত্র। কিন্তু তা উন্মুক্ত করার পূর্বেই ঘটে গেল এক অভাবনীয় ঘটনা।

অকস্মাৎ রাজার দৃষ্টি স্থির হয়ে দাঁড়াল সৌমিত্রের কটিদেশের সোনার হাতলওয়ালা বাঁকানো তরোয়ালের ওপর। পৃথ্বী মিত্র দাঁড়িয়ে উঠে চিৎকার করে উঠলেন, কোথায় পেলে তুমি ওই তরোয়াল, আর ওই মুক্তার মালা? নিদারুণ উত্তেজনায় কেঁপে উঠল তাঁর কণ্ঠ।

তরবারি স্পর্শ করে সৌমিত্র ভীত কণ্ঠে বললে, মহারাজ! এটি আমার পিতার তরবারি। আর এই মুক্তার মালাটিও তাঁর। একমাস পূর্বে সিন্দুক খুলে এগুলি আমি পেয়েছি। তারপর আমার মা চন্দ্রাবতীর নির্দেশে ইন্দ্রনগরে এসেছি আমার পিতার সন্ধানে।

ওরে বৎস আমার! পুত্রের হাত থেকে স্বর্ণপেটিকাটি দূরে নিক্ষেপ করে রাজা বলে উঠলেন, হাঁ এই তো, এই তো সেই চোখ, সেই মুখ···এই তো আমার সৌমিত্র।

সিংহাসন থেকে নেমে প্রসারিত বাহুতে পুত্রের দিকে এগিয়ে গেলেন পৃথ্বীমিত্র।

সেইদিন অপরাহ্ণে রাজপ্রাসাদের অলিন্দে পৃথ্বীমিত্রের পাশে করজোড়ে দাঁড়িয়েছিল সৌমিত্র। রাজ্যের প্রজারা ছুটে এসেছে রাজপ্রাসাদের সুমুখের বিশাল প্রাঙ্গণে। বীর রাজকুমারকে তাদের রাজ্যের মধ্যে লাভ করে তাদের আনন্দের আর সীমা রইলনা।

পৃথ্বীমিত্র রাজকুমারকে চিনতে পারার সঙ্গে সঙ্গেই পাপার দু'ভাই তখনই রাজ্য ছেড়ে পালাল। আর মায়াবিনী পাপা? তার অবস্থা আরও শোচনীয়। রাজা সৌমিত্রকে বুকে আলিঙ্গন করার সঙ্গে সঙ্গে আতঙ্কের চিহ্ন ফুটে উঠেছিল সেই দুই রমণীর চোখে। রাজসভা থেকে অন্তর্হিত হয়ে তখন সে প্রবেশ করলে তার গুপ্ত কক্ষে। তারপর সন্ধ্যার অন্ধকার ঘনাতেই প্রচণ্ড শন্ শন্ শব্দে সচকিত হয়ে সকলে হঠাৎ আশ্চর্য হয়ে দেখলে প্রকাণ্ড কালো ডানা মেলে প্রাসাদের শীর্ষে নেমে এলো কৃষ্ণবর্ণ এক পক্ষীরাজ ঘোড়া। চক্ষের পলকে সে আবার আকাশে উড়ল। আচ্ছা অন্ধকারেও রাজ্যের লোকের চিনতে ভুল হলনা পক্ষীরাজের পিঠে যে বসে রয়েছে সে আর কেউ নয়—মায়াবিনী পাপা। দুষ্ট রমণীকে রাজ্য ছেড়ে পালাতে দেখে আনন্দে হর্ষধ্বনি করে উঠল সমস্ত প্রজারা। কিন্তু কেউ জানত না—সে গোপনে নিয়ে যাচ্ছে রাজকোষের অনেক হীরা, মুক্তা, চুনী, পান্না।

রাজ্যের লোককে হর্ষধ্বনি করতে দেখে শূন্যে বসে ও হিংসায় রাগে জ্বলে উঠল পাপা। নীচের দিকে তাকিয়ে দু'হাত জড়িয়ে অভিশাপ দিতে গেল। আর সেই মুহূর্তে হাত থেকে ছড়িয়ে পড়ল সমস্ত মণিমাণিক্য।

সেই মণিমাণিক্যই নক্ষত্র হয়ে ছড়িয়ে রইল আকাশে।

গতি

নন্দা চট্টোপাধ্যায়

ট্রাম চলে, বাস চলে, চলে হাতি ঘোড়া
এক পায়ে ভর দিয়ে লাঠি হাতে খোঁড়া।
অন্ধ যে—সেও চলে ঠুকে ঠুকে লাঠি,
হয়তো বা দেখে কারো লাগে দাঁত-কপাটি।
কায়াহীন ছায়া তবু, সেও দেখি চলে
যার ছায়া তারি সাথে চলে নানা ছলে।
শন্ শন্ চলে হাওয়া, বন্ বন্ চাকা,
কল্ কল্ চলে জল, পথ আঁকাবাঁকা।
ঘর-বাড়ী, গাছপালা, বড় বড় মাঠ,
টেলিগ্রাফ পোষ্ট আর যত পথ-ঘাট ;
রেলগাড়ী চড়ে দেখি দুই পাশে চেয়ে
তারা সব ছুটে ছুটে ঘেমে উঠে নেয়ে।
গতি নেই কার তবে, বুঝিতে না পারি,
লোকে বলে জড় যাহা, গতি নেই তারি।
জড়রাজ এ জড়-জগৎ, লোকে তাই বলে,
বিজ্ঞান বলে তাও বন্ বন্ চলে।
অতো বড় দিবাকর নভে যার বসতি
পূব হতে পশ্চিমে দেখি তারও গতি।
গতি নেই, "ধ্রুব" যে-ই ধ্রুবতারা আকাশে
রোজ দেখি এক ঠাঁই, যেন চির আঁকা সে।

—

মার দিল কে ?

অমৃতলাল বন্দ্যোপাধ্যায়

পুপু আর ফুফু, দুইটি লোক—এক গাঁয়ের লোক। সুতরাং তাদের ভিতরে ঐক্য থাকাই উচিত। কিন্তু ঐক্য নেই, আছে অনৈক্য—শত্রুতা। শত্রুতা আছে বটে, তবু এযাবৎ একজনে অপর জনের কোন ক্ষতি করে নি; কিন্তু করে ভাব।

পুপুর একটা গাধা আছে। সেই গাধা তার বহন করে,

দুধও দেয় অনেকটা। তাই থেকে পুপু অনেক টাকা পায়—গাধার দুধ একটু দুর্লভ কিনা।

দিন যায়, মাস যায়। কিন্তু পুপু আর ফুফুর শত্রুতার ভাব কি যায়? হাঁ, তাও যায়, তবে কমে যায় না—বেড়ে যায়!

একদিন, তখন সন্ধ্যা হয়ে গেছে, অন্ধকার এসে-গেছে। সেই সময়ে ফুফুর মনেও ঘনিয়ে এল অন্ধকার—কুভাব—কুমতলব। ফুফু ভাবল, আজ এই অন্ধকারে পুপুর গাধার গর্দান নেব—ওটাকে মেরে ফেলব। কেউ দেখতে পাবে না, কেউ জানতে পাবে না! পুপুর অনিষ্ট হবে, আমার মন হৃষ্ট হবে! ওঃ, কী মজা!

রাত দুপুর হ'ল। গাঁয়ের ঘরে ঘরে বাতি নিভে গেল। আকাশে উল্কার উৎপাত। একটা কাটারি ফুফুর হাতে এল—খুব ধারালো কাটারি। তাই নিয়ে ফুফু চলে গেল পুপুর বাড়ী। সে বাড়ীতে তখন কেউ জেগে নেই। সবার চোখে ঘুম।

একটা ভাঙা ঘর। সেখানে রয়েছে পুপুর সেই গাধা। গলায় দড়ি বাঁধা।

ফুফুর হাতে প্রকাণ্ড কাটারি। কাটারি উপর দিকে উঠল—লাফ দিয়ে উঠল। গাধা তাই দেখল। সে বুঝতে পারল, কাটারি কি করতে চায়, কাটারির কর্তা কি করতে চায়! গাধা শব্দ ক'রে উঠল—আর্তনাদ। ঠিক সেই মুহূর্তে, ফুফুর কাটারি গাধার গলার উপর পড়ল—গাধার মাথাটাও মাটিতে পড়ল। তখন ফুফু কি করল? দৌড় মারল—সেই দৌড় দুরাত্মার দৌড়।

এদিকে গুণবান সেই গাধাটির আর্তনাদ পুপুর কানে প্রবেশ করল; নিদ্রাকে আর নয়ন দু'টি দখল ক'রে থাকতে দিল না। পুপু জেগে উঠল, বাইরে ছুটল। গাধার ঘরে ঢুকল। গাধার দুর্দশা দেখল। নির্দোষ গাধাকে বধ করেছে যে গাধা, পুপু সেই গাধার সন্ধান করল। কিন্তু সেই গাধা তখন কোথায়! পুপু কি আর তার দেখা পায়!

পুপুর চোখ সেই দুরাত্মাকে দেখতে পেল না, কিন্তু তার মন দেখতে পেল। পুপু বুঝল, ঐটি ফুফুর কর্ম।

পুপু তখনই দৌড় দিল। রাজার কোটালের কাছে গেল। তাকে ব্যাপারটা সব জানিয়ে দিল। কোটাল জিজ্ঞাসা করল, "পুপু, তুমি কাকে সন্দেহ কর?" পুপুর মনে সন্দেহ পূর্ণমাত্রায় বিদ্যমান, কিন্তু সে তার মুখে কারুর নাম প্রকাশ করল না। সে বলল, "কোটালজী, আমি তো কাউকে দেখি নি—আন্দাজে কার নাম বলব। বললেও, তা প্রমাণ করা চাইতো।"

কোটাল মাথা নাড়ল।

পরের দিন, প্রভাতকালে, কোটাল এল পুপু-ফুফুদের গাঁয়ে। একজন গ্রামবাসীকে সে জিজ্ঞাসা করল, "তুমি গত রাতে পুপুর বাড়ীতে গিয়েছিলে? আজ ভোরে পুপুর বাড়ী থেকে কেউ তোমার বাড়ীতে এসেছে?" গ্রামবাসী উত্তর করল, "আজ্ঞে না, আমি যাই নি; কেউ আসে নি। কেন? কি ব্যাপার?"

কোটাল কটমট ক'রে তাকাল। বলল, "পুপুর বাড়ীতে রাত্রে একটা খুন হয়েছে।" গ্রামবাসীটি আঁৎকে উঠল। বলল সে, "কে খুন হয়েছে, কোটালজী? পুপুর ছেলে-মেয়ে, না, বউ, না, আর কেউ?" কোটালের মুখ গম্ভীর। প্রশ্নের উত্তর সে দিল না। গাঁয়ের আর এক-জনের বাড়ীতে চলে গেল। সেখানেও সেই আগেকার মত প্রশ্ন করল, উত্তরও পেল পূর্ববৎ।

তার পরে, কোটাল পর পর গেল আরও অনেকের বাড়ী। সেই একই কথা জিজ্ঞাসা করল, উত্তরও পেল সেই একই।

এদিকে ফুফু তো জেনে ফেলেছে, গাঁয়ে কোটাল এসেছে। ফুফু ভাবছে, বুদ্ধি কত কোটালটার, দেখব এবার—দেখব এবার!

অন্ধকারে গাধা বধ করেছি। ক'রে পালিয়ে এসেছি। দেখি কোটাল কি ক'রে আসামী আস্কারা করে? এত বুদ্ধি ওর ঘটে নেই। ঠিক সেই সময়ে কোটাল ফুফুর বাড়ীতে এসে হাজির।

ফুফুকে প্রশ্ন করল, "গত রাত্রে পুপুর বাড়ীতে কি সব কাণ্ড হয়েছে, জান কিছু?" ফুফু তো জানে সবই। তবু, এমন ভাব দেখাল যেন কিছুই জানে না। বলল সে, "না, না, কোটালজী, কিছুই জানি না তো। কি হয়েছে? কি হয়েছে?" কোটাল নিজের কথার উপর খুব জোর দিয়ে বলল, "খুন হয়েছে—খুন!"

ঐ কথা শুনেই ফুফু একেবারে ক্ষেপে উঠল। সে ব'লে

ফেলল, "কে বললে খুন হয়েছে? মারা গেছে তো একটা গাধা! ওকে কি খুন হওয়া বলে! মানুষকে মেরে ফেললে তাকে বলে খুন।"

তৎক্ষণাৎ কোটাল ফুফুর ঘাড় ধ'রে ফেলল। ফুফু গাধার ঘাড়ে ঘা দিয়েছিল—এইবার তার মনে হ'ল যেন তার নিজের ঘাড়েই ঘা পড়ল। সে কোটালের হাত থেকে রেহাই পাবার চেষ্টা করল। হাঁক দিয়ে বলল, "আমার ঘাড় ধরছেন কেন? আমি কি করেছি? আমি কি করেছি?"

কোটাল অট্টহাসি হাসল। হুংকার ক'রে বলল, "তুমি কি করেছ, জান না? কিন্তু আমি জেনেছি—এই তোমার কথা থেকেই এখন তা জানলুম। পুপুর বাড়ীতে রাত্রে কি ঘটনা ঘটেছে, তা গ্রামের কেউ জানে না। কিন্তু তুমি জানলে কি ক'রে?"

ফুফুর মুখে তখন আর কথা ফুটছে না। তার সব শয়তানি ফাঁক!

ফুফু রাতের অন্ধকারে গা-ঢাকা দিয়ে অন্যায় কাজ করেছিল। কিন্তু এখন দিনের আলোকের মধ্যে থেকেও, সে যেন চারদিক অন্ধকার দেখতে লাগল।

কোটাল ফুফুকে দড়ি দিয়ে বাঁধল। ফুফুর দুর্দশা আরম্ভ হ'ল। তার চোখে দর দর ধারায় নেমে এল অশ্রু। কোটাল ফুফুকে ধরে নিয়ে গেল রাজার বিচারশালায়।

গাধা বধ করবার পরে, দুরাত্মা ফুফুর মন খুব হুঁশিয়ার ছিল বটে; কিন্তু মনই তাকে মার দিল—জবর মার!

সে যুগের শ্রেষ্ঠ বাঙালী

শ্রীমতী ফুল্লরা রায়

ইংরেজ রাজত্বের গোড়ার দিকের কথা। প্রবল প্রতাপে ইংরেজ তখন এদেশ শাসন করছে। এদেশের জনগণের সঙ্গে তাদের যে যোগসূত্র সেই ইংরেজি ভাষা, তখনও তা' বিশেষ প্রসার লাভ করেনি। যাঁরা ইংরেজি ভাষা ভালোভাবে শিখতেন, তাঁরাই রাজকর্মচারীর উচ্চ সম্মান পেয়ে খাস সাহেব বনে যেতেন। অনেকে আবার মোহে পড়ে খৃষ্টধর্ম গ্রহণ করতেন।"

রাজা রামমোহন সে যুগের একজন উচ্চ ইংরেজি-শিক্ষিত বাঙালী হলেও বিদেশীদের অযথা অনুকরণ করেননি। পরন্তু সমাজ-সংস্কার, গ্রন্থরচনা, শিক্ষা-বিস্তার প্রভৃতির দ্বারা নানাভাবে দেশের ইষ্টসাধন ক'রে জাতীয় স্বাতন্ত্র্য রক্ষা ক'রে চলতেন।

ব্রাহ্মধর্ম প্রচার ক'রে এদেশের লোকদের ক্রীশ্চান হওয়ার পথ তিনি বন্ধ ক'রে দিলেন। সে যুগের শ্রেষ্ঠ বাঙালী ছিলেন তিনিই।

রাজা রামমোহনের কি প্রকার আত্মমর্যাদা-বোধ ছিল, তার একটি গল্প বলা হচ্ছে—

একবার তিনি পশ্চিমের কোন সহরের রাস্তায় পাল্কী ক'রে যাচ্ছিলেন। অসহ্য গরম, পাল্কী-বেহারারা রৌদ্রে কষ্ট পাচ্ছিল। তিনিও পাল্কীর মধ্যে বসে বসে ঘামছিলেন। সে বেচারাদের দুঃখে রাজা রামমোহন একবার ভাবলেন—নেমে পড়ে পায়ে হেঁটে যাবেন না-কি!

এমন সময়ে পাল্কীটা হঠাৎ থেমে গেল। রাজা বুঝতে পারলেন না কি ঘটছে। তিনি ব্যগ্রকণ্ঠে প্রশ্ন করলেন—'কি হ'ল রে?'

বেহারারা ভীতকণ্ঠে বলল—একজন সাহেব আপনাকে নামতে বলছেন।

ইংরেজ রাজকর্মচারীরা তখন এদেশের সাধারণ জনগণের কাছ থেকে নানাভাবে নিজেদের রাজকীয় সম্মান আদায় করত। এটা তারা পেয়েছিল দরবারী আদাব-কায়দা থেকে। মুসলমান শাসকেরা একসময়ে হিন্দুদের কাছ থেকে জোর ক'রে রাজকীয় সম্মান দাবি করত। তাদের বিনা অনুমতিতে কেউ ঘোড়ায় চড়ে যেতে পারত না, দরবারে যেতে হ'লে বহুদূর থেকে কুর্নিশ করতে করতে এগোতে হ'ত, আবার কুর্নিশ করতে করতেই পিছু হেঁটে স্বস্থানে ফিরে আসতে হ'ত। সরকারী লোক দেখলেই পাগড়ী খুলতে হ'ত। উচ্চ রাজকর্মচারীদের সামনে ছাতা মাথায় কিংবা পাল্কী ক'রে কোন হিন্দু যেতে পারত না।

ইংরেজরা বাণিজ্য করতে এসে রাজা বনে গিয়েছিল, তারাও সেইরূপ রাজকীয় সম্মানের দাবি করত।

যে সাহেবটি রাজা রামমোহনের পাল্কী থামাতে

বললেন, তিনি ছিলেন বিহারের একজন কালেক্টর সাহেব —স্যার ফ্রেডারিক হ্যামিল্টন। রাজা রামমোহন যেন শুনতেই পাননি, এমন ভাব দেখিয়ে বেহারাদের বললেন—'ঠিক আছে, চলো।'

হ্যামিল্টন ঘোড়া ছুটিয়ে পাল্‌কীর সামনে এসে থামলেন; বললেন—"কি তুমি আমার হুকুম না শুনেই চলে যাচ্ছ যে? তোমার বড়ই স্পর্ধা দেখছি!"

পাল্কী বেহারারা ভয়ে পাল্কী ফেলে দিল, রামমোহন উন্নত মস্তকে বাইরে এসে গম্ভীর স্বরে বললেন—"ইংরেজকে আমি ভদ্র সভ্যজাতি বলেই জানতাম, কিন্তু তুমি যে ভাবে আমার পাল্কী থামিয়ে সম্মান আদায় করতে চাইছ, তাতে তোমাকে ইংরেজ ব'লে তো মনে হয় না!"

এই বলে তিনি আবার পাল্কীতে উঠে বেহারাদের পাল্কী বাইতে হুকুম দিলেন।

হ্যামিল্টন এতটা প্রত্যাশা করেননি, অপমানিত হয়ে পাল্কীটিকে এবার নির্বিঘ্নে যেতে দিয়ে ভদ্র ইংরেজের মতো ব্যবহারই করলেন।

রাজা রামমোহন এই ব্যাপারে ক্ষুব্ধ হয়ে বড়লাট লর্ড মিণ্টোকে সমস্ত জানিয়ে এই ধরণের অপমানজনক প্রথার রহিত ক'রে ইংরেজ জাতির মর্যাদা রক্ষা করতে অনুরোধ করেন।

শেয়ালের চালাকী

(রূপকথা)

পুষ্পদল ভট্টাচার্য্য

এক বনে এক শেয়াল থাকত। রোজ রোজ পাখী আর খরগোসের মাংস খেয়ে তার অরুচি হয়ে গিয়েছিল। তাই তার সাধ হল হরিণের মাংস খাবার। কিন্তু একে তো হরিণেরা সবাই এক সঙ্গে থাকে। তার উপর তাদের মাথায় আছে বড় বড় শিং। তাই শেয়ালের হরিণ মারতে সাহস হয় না।

একদিন একটা হরিণকে একলা বনের ধারে চরতে দেখে শেয়াল খানিক দূরে দাঁড়িয়ে মিষ্টি-সুরে বলতে লাগল, "আহা কী সুন্দর দেখতে হরিণটা! কী বড় বড় শিং। গায়ের চামড়ারই বা কি বাহার। এমন বড় বড় চোখ, এমন সুন্দর মুখ এ বনে আর কোন জন্তুরই দেখিনি।"

শেয়ালের কথা শুনে হরিণের যেমন গর্ব তেমনি আনন্দ হল। সে বলল, "সত্যি বলছ? সত্যি আমি খুব সুন্দর দেখতে?"

"সত্যি নয় তো কি!" শেয়াল উত্তর দিল, "বিশ্বাস না হয় আয়নাতে একবার নিজের চেহারাটা দেখলেই পার।"

হরিণ দুঃখ করে বলল, "এ বনে আয়না কোথায় পাব ভাই?"

"তাই তো।" শেয়াল যেন কতই ভাবনায় পড়ল। মাথায় হাত দিয়ে খানিকক্ষণ ভেবে সে বলল, "ওদিকের মাঠে চাষী ভায়ার কুয়া আছে। তার স্থির জলে আয়নার মতই মুখ দেখা যায়। সেই আয়নাতে মুখ দেখবে চল।"

হরিণেরও অনেক দিনের সাধ আয়নাতে নিজের মুখ দেখবে। তাই সে খুশী মনে শেয়ালের সঙ্গে কুয়ার ধারে গিয়ে ঝুঁকে পড়ে কুয়ার জলে নিজের মুখ দেখতে লাগল মুগ্ধ হয়ে। শেয়াল অমনি হরিণকে ঠেলে জলে ফেলে দিল। কুয়াটা ছিল গভীর। তাতে জলও ছিল অনেক। কাজেই হরিণ আর উপরে উঠতে পারল না।

হরিণকে কুয়াতে ফেলেই শেয়াল ছুটে গেল ক্ষেতের ধারে। সেখানে চাষী-ভায়া চাষ করছিল। শেয়াল তাকে শুনিয়ে বারবার বলতে লাগল, চাষী-ভায়া, চাষী-ভায়া, হরিণ ছটফট।

চাষী শুনে জিজ্ঞাসা করল—"কি বলছিস রে তুই?"

শেয়াল বলল, "দেখবে এস, তোমার কুঁয়াতে হরিণ পড়ে ছটফট করছে।"

চাষী-ভায়া কুঁয়ার ধারে গিয়ে দেখল সত্যি একটা শিংওয়ালা হরিণ জলে পড়ে আধমরা হয়ে গিয়েছে। সে খুসী হয়ে দড়ি দিয়ে হরিণটাকে অনেক কষ্টে উপরে তুলল।

এদিকে শেয়াল করেছে কি—চাষী কুঁয়ার ধারে চলে যেতেই চাষীর ক্ষেতের ধারে যে গাদা করা কলাই রাখা ছিল তাতে আগুন লাগিয়ে দিয়েছে। তারপর কুঁয়ার ধারে গিয়ে যখন চাষী হরিণটাকে উপরে তুলল তখন বলতে লাগল—"চাষী-ভায়া, চাষী-ভায়া, কলাই চটপট।"

চাষী-ভায়া জিজ্ঞাসা করল, "আবার কি বলছিস তুই?"

শেয়াল বলল "তোমার কলাইগাদায় আগুন লেগেছে, দেখ গিয়ে।"

চাষী দেখল সত্যি তার কলাইগাদা থেকে ধোঁয়া উঠছে। সে ছুটে গেল আগুন নেবাতে। তখন শেয়াল সুযোগ বুঝে আধমরা হরিণটাকে মেরে মনের সাধ মিটিয়ে মাংস খেল।

চাষী-ভায়া কলাইগাদার আগুন নিবিয়ে এসে দেখে হরিণের মাংস খেয়ে শেয়াল বনে পালিয়ে গিয়েছে, আর সেখানে বসে মনের আনন্দে গাইছে—

"কেয়া হুয়া, কেয়া হুয়া, বড়া মজা হুয়া।
চাষী-ভায়াকো বোকা বানায়কে
হরিণকা মাংস খায়া।
এখন বসে তামুক টানি,
হুয়া, হুয়া, হুক্কা হুয়া।"

ভারতবর্ষ প্রিন্টিং ওয়ার্কস্ নদীর পথে ফটো : আনন্দ মুখোপাধ্যায়

শরৎচন্দ্রের জন্মভূমি দেবানন্দপুর

মণীন্দ্র চক্রবর্তী

আজ থেকে তিরাশি বছর আগে ১৮৭৬ খ্রীষ্টাব্দে ১৫ই সেপ্টেম্বর (১২৮৩ সালে ৩১শে ভাদ্র—অশ্লেষা নক্ষত্রে, ত্রয়োদশী তিথিতে) শরৎচন্দ্র দেবানন্দপুরে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। শরৎচন্দ্রের পিতা মতিলাল চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের আদি দেশ ছিল হালিশহর। দেবানন্দপুরের মাতুলালয়ের সম্পত্তি তিনি উত্তরাধিকারসূত্রে পেয়েছিলেন। তখনকার নিয়মানুযায়ী তাঁর বাল্যেই বিবাহ হয়েছিল হালিশহরের বিখ্যাত গাঙ্গুলী পরিবারের কেদারনাথ গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয়ের মধ্যমা কন্যা ভুবনমোহিনী দেবীর সঙ্গে। দরিদ্রের সন্তান মতিলাল, শ্বশুরবাড়ীতে থেকেই তিনি এণ্ট্রান্স পরীক্ষায় পাশ করেন এবং শরৎচন্দ্রের জন্মগ্রহণের কয়েক বছর পরে মতিলাল নিজ অর্থ বলে দেবানন্দপুরে বসতবাটী নির্মাণ করেছিলেন।

সেখানে কয়েক বছর পূর্বে শরৎচন্দ্রের একটি স্মৃতিস্তম্ভ স্থাপিত হয়েছিল। সেদিনের সেই সূচনা থেকেই যথাযথভাবে (২৬শে জুলাই রবিবার ১৯৫৯ সালে) শরৎচন্দ্রের স্মৃতি-মন্দিরের দ্বার উদ্‌ঘাটন করা হলো এটা আজ কম গৌরবের কথা নয়। অথচ শরৎচন্দ্র জীবিতকালে কেন যে পিতৃভিটে উদ্ধার করতে পারেনি সেটা আজ জানবার বিষয়।

শরৎচন্দ্রের জন্মভূমি

শরৎচন্দ্রের পিতার চিরদিনই নানা দারিদ্র্যের মধ্য দিয়ে কেটেছিল। দেবানন্দপুরে শরৎচন্দ্র বাল্যজীবনে কাশীনাথ গল্পটি লিখেছিলেন বটে, কিন্তু তাঁকে ভাগলপুরে মাতুলালয়ে মানুষ হতে হয়েছিল। পিতা মতিলালকে কখনো স্কুল মাষ্টারি, কখনো জমিদারী সেরেস্তায় কাজ করে জীবিকা নির্বাহ করতে হতো। সে হিসাবে বৃহৎ একটা সংসার প্রতিপালন করবার মতো তাঁর ক্ষমতা ছিল না। মতিলালকে তাই শ্বশুরালয়ে পড়ে থাকতে হয়েছিল।

শরৎচন্দ্রের মাতা ভুবনমোহিনী দেবীর ১৮৯৪ খ্রীষ্টাব্দে ভাগলপুরে পিতৃগৃহে মৃত্যু হয়। তাঁর আকস্মিক মৃত্যুতে মতিলালবাবু শ্বশুরালয় ত্যাগ করে খঞ্জরপুরে দিন যাপন করলেও শরৎচন্দ্রের ওপর তাঁর তখন কোন ভরসা বা আস্থা ছিল না। কারণ শরৎচন্দ্রের সাহিত্যচর্চা আর ছন্নছাড়া

জীবন তাঁর দুঃখের কারণ হয়ে উঠেছিল। যার ফলে কোনদিকে কূল কিনারা না পেয়ে মতিলাল ১৮৯৬ সালের ৯ই নভেম্বর তাঁর কনিষ্ঠ মাতুল অঘোরনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়কে নাম মাত্র ২২৫৲ টাকায় দেবানন্দপুরের বসত বাড়ীটিকে বিক্রয় করে দিয়েছিলেন।

১৯০৩ খ্রীষ্টাব্দে শরৎচন্দ্রের পিতার মৃত্যু হয়। শরৎচন্দ্র তখন নিঃস্ব কাতর ও বিপন্ন। সেই অবস্থায় তাঁকে তিন ভাইবোনের থাকবার আশ্রয় খুঁজে বেড়াতে হয়েছিল। কোনরূপে আশ্রয়ের ব্যবস্থা করে শরৎচন্দ্র কোলকাতায় মাতুল উপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয়ের কাছে কিছুদিন অবস্থান করবার পর রেঙ্গুনে চলে গিয়েছিলেন। প্রথম যৌবনের মতো আবার যে তিনি সাহিত্য চর্চা সুরু করতে পারবেন তেমন মনোবল তখন তাঁর ছিল না।

১৯১৩ ও ১৯১৪ খ্রীষ্টাব্দে (সস্ত্রীক) শরৎচন্দ্র কোলকাতায় এসেছিলেন। তখন তাঁর সাহিত্য প্রতিভা বাংলাদেশে ছড়িয়ে পড়েছিল! সেই সময় শরৎচন্দ্র তাঁর দিদি অনিলা দেবীর সঙ্গে দেখা করতে এসেছিলেন গোবিন্দপুরে তাঁর শ্বশুরালয়ে। (১৮৮৬ সালে অনিলা দেবীর বিবাহ হয়েছিল) ভাই বোনদের সঙ্গে দেখা করে শরৎচন্দ্র রেঙ্গুনে চলে গিয়েছিলেন বটে, কিন্তু সেই সময় তাঁর পিতৃভিটে দেবানন্দপুর উদ্ধার করবার বাসনা একটু জেগেছিল। কিন্তু ভাগ্যচক্রে

তো আর সম্ভবপর হয়নি। যাই হোক ১৯১৬ খ্রীষ্টাব্দে মে মাসে শরৎচন্দ্র রেঙ্গুন ত্যাগ করে যখন ৪নং কাজে শিবপুর ফার্স্ট বাই লেনে স্থায়ীভাবে বসবাস সুরু করেছিলেন তার কিছুকাল পরে স্ত্রী হিরণ্ময়ী দেবীর একান্ত ইচ্ছায় শরৎচন্দ্র দেবানন্দপুরে এসেছিলেন এবং তাঁর পিতার কনিষ্ঠ মাতুল অঘোরনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের পুত্রদ্বয়ের কাছে পিতৃভিটে উদ্ধার করবার প্রবল ইচ্ছা জানিয়েছিলেন। কিন্তু তাঁরা আপত্তি করেছিলেন বলেই শরৎচন্দ্রকে সেদিন নিরাশ হয়েই ফিরতে হয়েছিল। সেজন্য শরৎচন্দ্র আত্মীয় স্বজনদের কাছে প্রায়ই দুঃখ করে বলতেন—"আমি পিতৃভিটে উদ্ধার করতে পারিনি বটে, কিন্তু সবাই তো কিছু না কিছু অংশ পায়। অথচ আমি এক গাছা ঝাঁটার মতো তুচ্ছ জিনিসও পাইনি। এ দুঃখটা আমার চিরকালের জন্যে জেগে রইলো। তা কি সহজে ভোলা যায়!" (দরদী শরৎচন্দ্র পৃষ্ঠা ১১৭)

শরৎচন্দ্রের এই উক্তি থেকে আমরা জানতে পারি সেদিন তাঁর কী না মনোবেদনা জেগেছিল। অবশেষে অনিলা দেবী ও তাঁর সরিক বাঁড়ুজ্যেদের জায়গা (১৯২৫ খ্রীঃ) ক্রয় করে শরৎচন্দ্র হাওড়া জেলার অন্তর্গত সামতা বেড়েতে রূপনারায়ণ নদীর তীরে স্থায়ীভাবে বসবাসের জন্য বাড়ী তৈরী করতে বাধ্য হয়েছিলেন। ১৯২৬ সালের প্রথমার্দ্ধ সময়ে শরৎচন্দ্র বাজেশিবপুর ত্যাগ করে সামতা বেড়ের পল্লীভবনে চলে গিয়েছিলেন। সেই সময় শিবপুরের সাহিত্য সংসদ তাঁকে এক সম্বর্দ্ধনাও দিয়েছিলেন।

অথচ শরৎচন্দ্র তাঁর পল্লীভবনে বসবাস করলেও জন্মভূমি দেবানন্দপুরের ওপর তাঁর কত টান ছিল সে কথাটাও জানতে পারা যায় তাঁর স্ত্রী হিরণ্ময়ী দেবীর মুখ থেকে। এই প্রবন্ধলেখককে তিনি বলেছেন—"একজনের কথা বড়ই মনে পড়ে। তিনি হলেন দিজুবাবু। (শরৎচন্দ্রের দেবানন্দপুরের বাল্যবন্ধু দ্বিজেন্দ্রলাল দত্ত মুন্সী) তিনি মাঝে মাঝে আমাদের এখানে আসতেন। দেবানন্দপুরে জন্ত জায়গা কিনে থাকবার জন্যে ওঁকে (শরৎচন্দ্রকে) অনেক অনুরোধ করতেন। তিনি আমাকে বৌদি বলেই ডাকতেন। আমি তাঁর কথামতো ওঁকে (শরৎচন্দ্রকে) জায়গা কিনবার জন্য দেবানন্দপুরে যেতে বলি। কিন্তু তিনি তা যান নি এই কারণে—পিতৃভিটে উদ্ধার হয়নি বলে।"

এ সম্বন্ধে শ্রদ্ধেয় সুসাহিত্যিক অসমঞ্জ মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের কাছে শুনেছি "শরৎচন্দ্র শেষ জীবনের দিকে একবার তাঁর কোলকাতার বাসভবনে গিয়ে (২৪ নং অশ্বিনী দত্ত রোড) দেখতে পেলুম একটা বড় কাগজের ওপর লাল নীল পেন্সিল দিয়ে কি যেন একটা ছবি আঁকছেন। কৌতূহল জাগলো। পাশে গিয়ে দাঁড়াতেই শরৎচন্দ্র হেসে বললেন, এই যে অসমঞ্জ! দেখো, আমি ভেবেছি, কোলকাতায় যেমন একটা বাড়ী করবো—তুমি তো অনেকদিন ধরে, কোলকাতায় বাসা ভাড়া করে আছ? চলনা আমরা দু'জনে মিলে দেবানন্দপুরে গিয়ে থাকি। এই দেখো, নক্সা করেছি। পাঁচ সাতখানা বড় বড় ঘর হবে। তুমি দু'তিন খানা আর আমিও দু'তিন খানা। বেশ থাকা যাবে।......নক্সাটি পছন্দ না হওয়ায় তিনি ছিঁড়ে ফেলে দেন। তারপর আর একদিন তাঁর বাসায় গেলে তিনি আমাকে আর একটা নক্সা দেখিয়ে বললেন, দেখোতো এবারকার নক্সাটা বোধহয় ঠিক হয়েছে। চলো এবার একদিন দেবানন্দপুরে যাওয়া যাক।......এ সব কথা শুনে আমার মনে হয়েছিল, শরৎচন্দ্রের জন্মস্থান দেবানন্দপুরে বাড়ী তৈরী করার কী ভীষণ ঝোঁক ছিল। তাঁর সেই নক্সাটি দেখে এইটুকুই বুঝেছিলুম তাঁর শিল্প ক্ষমতাও যথেষ্টই ছিল।

সুইফটের প্রেম

শ্রীসুনীলকুমার নাগ

"গালিভার্স ট্রাভেলস্" হলো এমন একখানি বই—যা সভ্য পৃথিবীর শিক্ষিত সমাজের অধিকাংশেই পড়েছেন ধরে নেওয়া যায়। এ বই কেউ পড়েন বক্রোক্তির আস্বাদের জন্য, কেউ পড়েন লোকের কল্পনা কতো উদ্ভট হতে পারে তা দেখবার জন্য, কেউ পড়েন গল্পের আকর্ষণে। আবার কেউ নিছক মজার জন্যেও পড়েন এ বই। সত্যি এ এক বিচিত্র বই। জোনাথান সুইফটের আগে এবং পরে গালিভার্স-ট্রাভেলস্-এর মত উদ্ভট পরিবেশের উদ্ভট কাহিনী অনেকেই পরিবেশন করে গেছেন, কিন্তু গালিভার্স ট্রাভেলস্ এর মতো সব বয়সের অগণিত পাঠককে আর কোন বইই এমন আকর্ষণ করতে পারে নি, এ বইয়ের কাহিনী ভাগের প্রধান বৈশিষ্ট্য হলো স্বচ্ছন্দ গতি, অর্থাৎ সুইফটের সরল সহজ গল্প বলার ভঙ্গি।

কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় হ'লো এই যে, যার গল্প বলার ভঙ্গিটা অমনধারা সহজ ও সরল, তাঁর নিজের জীবনটা কিন্তু কেটেছে অত্যন্ত জটিলতার মধ্যে, বর্ত্তমান আলোচনায় আমরা সুইফটের জীবনের মাত্র একটা দিক অর্থাৎ ওঁর জীবনে প্রণয়ের বিকাশের মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখবো।

সুইফটের জীবনে প্রেমের প্রথম প্রকাশ হয় মিস্ রিঙ, বা ভ্যারিনা নামে এক বড়লোকের মেয়ের সঙ্গে। ভ্যারিনা সুইফটের কলেজের এক সহপাঠীর বোন ছিল। সুইফটের তখন বয়স কম। প্রথম যৌবনের উদ্দামতায় কিছুদিন পরেই উনি প্রস্তাব করে বসলেন ওকে বিয়ে করবার জন্য, কিন্তু ভ্যারিনা এ বিয়েতে রাজী নয় জানালো নিজের শারীরিক অসুস্থতার জন্য। আর সেই সঙ্গে সুইফটের দারিদ্র্যের প্রতিও কিছুটা ইঙ্গিত করলো ভ্যারিনা। বলা বাহুল্য যে বাস্তবিক পক্ষে ওর শরীর মোটেই খারাপ ছিল না।
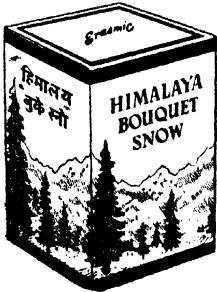
তাই পরে সুইফটের যখন অবস্থা ফিরলো তখন যদিও ভ্যারিনা বিয়ের জন্য ব্যস্ত হয়ে উঠলো—কিন্তু বেঁকে বসলেন সুইফট্ নিজে, এবার ভ্যারিনা নিজে থেকেই বিয়ের প্রস্তাব করলো কিন্তু সুইফট্ তাঁর স্বভাবসিদ্ধ তিক্ততাপূর্ণ শ্লেষের সঙ্গে জানালেন যে—তা কি হয়, তোমার যে শরীর খারাপ! পরবর্তী জীবনে অর্থাৎ পরিণত বয়সে প্রায় সারাটা জীবন ধরেই একটিমাত্র ক্ষেত্র ছাড়া আর সব ক্ষেত্রে এবং সব সময় সুইফট যে মেয়েদের সম্পর্কে ঔদ্ধত্যপূর্ণ বা এমন কি অভদ্র ব্যবহার করে গেছেন তার মূলে এই প্রথম জীবনে প্রত্যাখ্যাত হবার বেদনা। বেদনা মানুষকে অনেক সময় মহৎ করে তোলে, আবার অনেক সময় তাকে কিছুটা টেনে নীচেও নামায় স্বাভাবিকতার আসন থেকে। তবে প্রেমের বেলায় পুরুষ যদি প্রত্যাখ্যাত হয় এবং বিশেষ করে এমন একটা কারণের জন্য যাতে পুরুষের মর্যাদায় আঘাত করে তবে তার পক্ষে কিছুটা বিকৃত হয়ে পড়া মোটেই অস্বাভাবিক নয়।

সাত চল্লিশ বছরের এক ভদ্রলোক তাঁর কোন বন্ধুর বাড়ীতে গিয়ে প্রথম দিনেই যদি তাঁর স্ত্রীকে হুকুমের সুরে বলে বসেন: একটা গান করুন তো শুনি,—তা হলে সে কথাটা কেমন শোনাবে? কিন্তু সুইফট ঠিক এই রকমই বলেছিলেন লর্ড বারলিংটনের স্ত্রীকে, ভদ্রমহিলা প্রথমটা অবাক হয়ে যান! অতো বড় একজন বিদ্বান, বুদ্ধিমান, জ্ঞানী গুণী নামজাদা ভদ্রলোকের মুখে প্রথম আলাপেই অমন ধারা হুকুম শুনে। একটি কথাও বলতে পারলেন না তিনি, কাঁদতে কাঁদতে বেরিয়ে যান সে ঘর থেকে। এরপর আবার একদিন সুইফটের সঙ্গে ওঁর দেখা হয়েছিল। কিন্তু এবার আর সুইফট্ অতটা অভদ্রের মতো ব্যবহার করেন নি। কিছুটা নরমভাবে কিন্তু শ্লেষের সঙ্গেই বলেছিলেন:

মহাশয়ার মেজাজটা আশা করি কিছুটা ঠাণ্ডা হয়েছে!

ক্রমে লেডি বারলিংটন বুঝতে পারেন যে ডীন সুইফটের কথাবার্তার ধরণটাই একটু ভিন্ন রকম। সাধারণ ভব্যতা বা সৌজন্য বলতে যা বোঝায় সুইফট্ বড় একটা তার ধার ধারেন না। উনি যেন কিছুটা ওঁর অবচেতনের প্রভাবে ধরেই নেন যে সবাই ওঁর হুকুম তামিল করবার অপেক্ষায় আছে—যেন আর কারো কোন কাজ নেই, থাকতে পারে না। ধীরে ধীরে লেডি বারলিংটনের সঙ্গে সুইফটের এক ধরণের বন্ধুত্ব গড়ে উঠে।—এবং সেটা বন্ধুত্বই।

এরপর সুইফটের জীবনে এলেন মিস্ লঙ-নামে একটী অপূর্ব সুন্দরী মেয়ে, এবং সে সম্পর্ক ক্রমে খুব গভীর হয়ে ওঠে, মিস্ লঙ্ মারা যাবার পর তাঁর স্মৃতি স্তম্ভের উপর যে স্মারক নাম খোদাই করা হয়েছিল, সেটি সুইফটেরই রচনা। লেডি বারলিংটনের চাইতে মিস্ লঙের সঙ্গে সুইফটের ঘনিষ্ঠতা তুলনামূলক ভাবে দেখতে গেলে কিছুটা বেশীই হয়েছিল বলতে হবে।

এঁদের পরেও আরো কয়েকজন মহিলা এসেছেন সুইফটের জীবনে। মিসেস ডিঙ্‌লে লেডি একসন্ এবং মিসেস্ পেনড়ারভেস্তের নাম এ প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যায়। এঁদের সঙ্গে উনি ঠিক প্রেমে পড়েছিলেন এ কথা হয়ত বলা চলে না—তবে বন্ধুত্ব হয়েছিল নিশ্চয়ই এবং মেয়েদের সঙ্গে পুরুষদের বন্ধুত্বে যেটুকু রোমান্স থাকতে বাধ্য তা নিশ্চয়ই ছিল। এগুলির কোনটাই ঠিক প্রেম নয়। ঠিক ভাবে বলতে গেলে সুইফট্ প্রেমে পড়েছিলেন দুটি মেয়ের সঙ্গে। প্রথমতঃ মিস্ এসথার জনসন্ বা ষ্টেলা এবং দ্বিতীয়তঃ মিস্ ভ্যানহমরিগ বা ভ্যানেসা।

প্রথমে ভ্যানেসার কথাই বলা যাক।

ভ্যানেসার সঙ্গে সুইফটের পরিচয় হয় ষ্টেলার সঙ্গে ওঁর সম্পর্ক গড়ে ওঠার অনেক পরে। ১৭১০ খৃঃ অব্দে সুইফট লণ্ডনে এসেছিলেন কিছুদিন। এই সময়েই ভ্যানেসার সঙ্গে ওঁর প্রথম পরিচয় হয়। ভ্যানেসা ষ্টেলার চাইতে অন্ততঃ দশ বছরের ছোট ছিল। ১৭১০ সালে ভ্যানেসার বয়স বছর সতেরোর বেশী ছিল না। বছর খানেকের মধ্যে ওদের ঘনিষ্ঠতা এতই গভীর হ'য়ে উঠেছিল যা বুঝতে পারলে ষ্টেলা নিশ্চয়ই সুইফটের সততায় স্বাভাবিক ভাবেই সন্দেহ প্রকাশ করতে পারতেন। তবে এ প্রসঙ্গে একটী কথা বলা দরকার তা হলে। সেটা এই যে ভ্যানেসার সঙ্গে সুইফটের সম্পর্কের জন্য বোধহয় সুইফটকে দায়ী করা যায় না। কারণ সুইফট একেবারে গোড়া থেকেই ভ্যানেসাকে মেয়ের মত দেখে আসছেন, অথচ এদিকে ভ্যানেসা আধ-বুড়ো সুইফটকে ভালবেসে আসছে। একদিন ভ্যানেসা সরাসরিই প্রেম নিবেদন করে বসলো সুইফটকে। সুইফট তো অবাক।

সুইফট কিন্তু একেবারে প্রথম থেকেই চেষ্টা করে এসেছেন ষ্টেলার কাছ থেকে ভ্যানেসাকে দূরে দূরে রাখতে। ১৭২৩ খৃঃ অব্দে ভ্যানেসা একদিন সরাসরি ষ্টেলার কাছে চিঠি লিখে জানতে চাইলেন যে ডীন সুইফটের সঙ্গে তাঁর প্রকৃত কি সম্বন্ধ। ষ্টেলাও অল্প কথায় জানালেন যে তাঁরা স্বামী-স্ত্রী—এর মধ্যে অন্যের নাক গলাবার প্রয়োজন হবে না।

ষ্টেলা ভ্যানেসার চিঠিখানা সুইফটের হাতে দিয়েছিলেন। সুইফট্ উত্তেজিত ভাবে সঙ্গে সঙ্গে চলে এলেন ভ্যানেসার বাড়ী। মুখে একটি কথাও না বলে সোজা ভ্যানেসার ঘরে গিয়ে ঢুকলেন। রাগে কাঁপতে কাঁপতে ওর চিঠিখানা ওকে দেখিয়ে একটা টেবিলের উপর রেখে নিঃশব্দে সে ঘর থেকে বেরিয়ে আসেন। অনেকে মনে করেন যে ভ্যানেসার অকালমৃত্যুর জন্য সুইফটই দায়ী। কারণ এ ঘটনার পর ভ্যানেসা মাত্র আর কয়েক দিন বেঁচে ছিলেন।

মৃত্যুর কয়েক দিন আগে ভ্যানেসা তার উইলের পরিবর্তন ঘটালেন। উনি ওঁর সমস্ত স্থাবর অস্থাবর সম্পত্তিই সুইফটের নামে উইল করে দিয়ে যাচ্ছিলেন, কিন্তু এবার নাকচ করে দিলেন সে উইল।

তবে ওঁদের সম্পর্ক স্থাপিত হবার কিছুদিন পর সুইফট যে ভ্যানেসা সম্পর্কে বেশ কিছুটা দুর্বল হয়ে পড়েছিলেন তা কোন মতেই অস্বীকার করা যায় না। ওদের প্রেমকে চিরস্মরণীয় করে রাখবার জন্যে সুইফটের কাব্য রচনা এ প্রসঙ্গে উল্লেখনীয়- Cadenus and Vanessa.

মিস্ এসথার জনসনের নাম সুইফটের সঙ্গে অচ্ছেদ্য বন্ধনে বাঁধা পড়েছে। সুইফট এর নাম দিয়েছেন ষ্টেলা। সুইফটের Journal to Stella এক বিচিত্র বই।

ডাবলিনের এক পাত্রী টিসডালের সঙ্গে স্টেলার বিয়ের কথাও শোনা গিয়েছিল এক সময়—কিন্তু সুইফট্ বাধা দেন তাতে। স্টেলাও সুইফটের প্রেমে বিভোর হয়ে যান। ওদের মধ্যে বিয়ের কথা উঠতে সুইফট একাধিক বার সে প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেন নিজের আর্থিক দুর্দশার অজুহাতে। অজুহাত এইজন্য বলবো যে সুইফটই প্রথম জীবনে মিস রিং বা ভ্যারিনাকে বিয়ে করতে রাজী ছিলেন চরম দারিদ্র্য সত্ত্বেও। শোনা যায় শেষ বয়সে সুইফট স্টেলাকে প্রচলিত মতে বিয়ে করার কথা পেড়েছিলেন, কিন্তু এবার স্টেলাই অনেক দুঃখে সে প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করলেন। তবে অনেকে আবার এমন কথাও বলে গেছেন যে বিয়ে ওদের মধ্যে বাস্তবিকই হয়েছিল, কিন্তু গোপনে। বিবাহিতা না হয়েও সুইফটের সঙ্গে সারাটা জীবন কাটাবার জন্য যে অবাঞ্ছিত লোকনিন্দা আর মুখ টেপাটেপি সারাজীবন ধরে সহ্য করতে হয়েছে—স্টেলা জানালেন যে তাতে উনি বেশ ধাতস্থ হয়ে গেছেন—মরবার আগের মুহূর্তে আর পত্নীর মর্যাদা না পেলেও চলবে। এটা নিঃসন্দেহে চরম দুঃখের কথা। এর থেকে আরো বোঝা যায় সারাটা জীবন স্টেলা নিজের মনে একদিকে প্রেমের দহন, আর একদিকে সামাজিক নিন্দার জ্বালায় কি ভোগাটাই না ভুগেছেন।

১৭২৬ সালের কথা। সুইফট কিছুদিনের জন্য ইংলণ্ডে এসেছিলেন। ওদিকে ডাবলিনে তখন স্টেলা অসুস্থ। কেউ কেউ মনে করেন যে রোগশয্যায় স্টেলার যে কষ্ট হতো তা যাতে নিজের চোখে না দেখতে হয়—সেইজন্যেই সুইফট দূরে চলে যান। এটা অসম্ভব নয়। কারণ অনেক মতিভ্রমের পর স্টেলাকে সুইফট্ সত্যি গোটা অন্তর দিয়ে ভালবেসে ফেলেছিলেন। প্রেমিকের যে অসহায়তা ভ্যানেসার বেলায় সুইফটের মধ্যে তার কিছুটা দেখা যায়। কিন্তু স্টেলার বেলাতে সুইফট সত্যি অসহায়—একেবারেই অসহায় হয়ে পড়েন। স্টেলার মৃত্যু হবে, স্টেলা থাকবে না পৃথিবীতে—এ যেন সুইফটের চিন্তার অতীত একটা ব্যাপার।

দূরে চলে এসে সুইফট রোজ চিঠি লিখতেন স্টেলার শরীরের অবস্থা জানবার জন্য। একবার উত্তর এলো স্টেলা সত্যি মৃত্যু শয্যায়। সুইফট লিখে পাঠালেন : What have I to do in the world ? I never was in such agonies as when I received your letter, and had it in my pocket. I am able to hold up my sorry head no longer.

কিন্তু শেষ পর্যন্ত সুইফট আর দূরে থাকতে পারলেন না। কি এক অদৃশ্য শক্তির তাড়নায় ছুটে চলে এলেন প্রেয়সীর মৃত্যু শয্যার পাশে। স্টেলা মারা যান ১৭২৮ সালের ২৮শে জানুয়ারী—সেদিন সারারাত ধরে সুইফট জেগে বসে থেকে বিগত জীবনের স্মৃতির টুকরোগুলি গুছিয়ে কিছু একটা রচনা করবার চেষ্টা করলেন। কিন্তু পারলেন না। সকালের দিকে উনি শোকে মুহ্যমান হয়ে পড়লেন। স্টেলাকে কবর দেবার সময়ে সুইফটের যে দশা হয়েছিল তা ভাষায় প্রকাশ করা সম্ভব নয়।

সুইফটের রচনাবলী আয়তনে মোহাৎ-কম নয় এবং একমাত্র Journal to Stella বাদ দিলে তাঁর প্রত্যেকটি রচনাই Satire এর পর্যায়ে পড়ে। আর্কবিশপ কিন্তু সুইফটকে বলে গেছেন "the most unhappy man. সুইফট নিঃসন্দেহে ইংরেজী গদ্য সাহিত্যের ক্ষেত্রে শ্রেষ্ঠ ভাষায় সুইফটের সমগ্র রচনাবলীই হলো bitter desert এবং এর মধ্যে Journal to Stella হলো the one oasis.

জার্ণাল টু স্টেলা নানা কারণেই একখানা অসাধারণ বই। এর চিঠিগুলি যে কোনদিন সাধারণের পড়বার জন্য প্রকাশ করা হবে তা সুইফট কোনদিন ভাবেন নি। স্টেলা এবং মিসেস্ ডিঙলের কাছে লেখা কতকগুলি চিঠির সমষ্টি হলো এই বইটা। সুইফটের অন্তরতম আশা-আকাঙ্ক্ষা, সুখ-দুঃখের কথার সঙ্গে আমরা এই বইয়ের মাধ্যমে পরিচিত হই। এমন এক বিচিত্র সাঙ্কেতিক পদ্ধতিতে এর লিপিগুলি লেখা হয়েছিল যার অর্থভেদ করতে অনেক বিশেষজ্ঞের বহু সময় খরচ করতে হয়েছে।

পৃথিবীর সমস্ত কিছু ত্যাগ করেও সুইফটের সঙ্গে সারাটা জীবন কাটিয়ে বা অন্যভাবে বলতে গেলে সুইফটের জন্য নিজের মান, মর্যাদা, খ্যাতি এক কথায় সব কিছু বিলিয়ে দিয়েও স্টেলার জীবন সার্থক হয়েছিল বলতে হবে। কারণ তিনি তাঁর প্রেমিকের সমস্ত মনটা পেয়েছিলেন। তেমনভাবে আর কোন মেয়ে পায়নি, এবং হয়ত একথা বললেও বেশী বলা হবে না যে বাস্তব জীবনে খুব কম মেয়েই এতো গভীর ভাবে তাঁর মনের মতো মানুষটিকে পেয়ে থাকে। স্টেলার সঙ্গে সুইফটের যখন প্রথম পরিচয় হয় তখন ওঁর বয়স মাত্র আট বছর, সেই থেকে জীবনের শেষ দিন পর্য্যন্ত স্টেলার জীবনে সুইফট ছাড়া অন্য কোন চিন্তা ছিল না। স্টেলা মারা যান সাত চল্লিশ বছর বয়সে।

প্রসঙ্গতঃ একটা কথা বলা যেতে পারে। বাহ্যত সুইফটকে দেখে কেউ কোনদিন ভাবতো না যে এ ব্যক্তির কোন প্রেরণার প্রয়োজন থাকতে পারে—এ ব্যক্তি নিজে কোন মেয়েকে হয়ত পাগল করে দিতে পারেন, কিন্তু কোন মেয়ে এঁকে পাগল করে দিতে পারে—কিন্তু বাস্তবিক পক্ষে ঠিক তাই হয়েছিল। সুইফটের জীবনে সাহিত্য সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ সময় ছিল তাঁর দুই প্রণয়িনীর মৃত্যুর ব্যবধানের পাঁচটা বছর। ভ্যানেসা মারা যান ১৭২৩ খ্রীষ্টাব্দে আর স্টেলা ১৭২৮ খৃঃ অব্দে। এই পাঁচ বছরের মধ্যেই সুইফট্ তাঁর ড্রাপিয়ারস্ লেটার্স, প্রোপোসাল ফর দি ইউনিভারসাল ইউস অব আইরিশ ম্যানুফ্যাকচারস্ এবং তাঁর অমর কীর্তি গালিভার্স ট্রাভেলস্ রচনা করেন।

স্টেলা যে সুইফটের জীবনের কতখানি জুড়ে ছিলেন এবং বাস্তবিক পক্ষে সুইফট্ স্টেলার উপর কতটা নির্ভর করতেন নিজের কাজকর্ম এবং ভালোমন্দের জন্য, তা বোঝা যায় আর একটি জিনিষ থেকে। তা হলো এই যে স্টেলার মৃত্যুর পর সুইফট আর বিশেষ উল্লেখযোগ্য কিছুই সৃষ্টি করতে পারেন নি—স্টেলা সুইফটের কল্পনা শক্তিকে হরণ করে নিয়ে যান বলা যায়।

শুধু কি তাই—স্টেলার মৃত্যুর পর সুইফট্ একে একে তাঁর বন্ধু-বান্ধবদের ছাড়তে আরম্ভ করলেন। কেউ বাড়ী এলেও বড় একটা

কথাবার্তা বলতেন না কারো সঙ্গে। কী অভিমান! কিন্তু কে ভাঙবে এ অভিমান? কে ভাঙতে পারে এই অভিমান? যে পারতো সে তো তখন কবরের তলায় পোকা-মাকড়ের ক্ষিদের জ্বালা মেটাচ্ছে। সুইফটের কেবলই মনে হতো যেন ষ্টেলা ডাকছে—এসো, একা একা আর কতদিন থাকবে?

নিঃসঙ্গ থাকতে থাকতে এক এক সময় সুইফট্ ভয় পেতেন পাগল হয়ে যাচ্ছি নাকি ভেবে। দিনের পর দিন এইভাবে চলতে চলতে তারপর এক সময় সুইফট্ সত্যি পাগল হয়ে গেলেন—এটা ১৭৪৯ খৃঃ অব্দের কথা। দু'বছর কেটেছে সুইফটের এই অপ্রকৃতিস্থ অবস্থায়। তারপর পাগলামী তার একটু কমেছিল বটে কিন্তু পাগলামী কমে যেতে শোকের দহন আবার বেড়ে যায়। এইভাবে আরো পাঁচটা বছর কাটাবার পর ১৭৪৫ খৃঃ অব্দে সুইফট্ নিজে মারা যান।

পাগলামীটা একটু ভালো হবার পর সুইফট নিজেও বুঝতে পেরে ছিলেন ষ্টেলার কাছে যাবার সময় হয়ে এসেছে। তাই উনি আগে থাকতেই জানিয়ে রেখেছিলেন যে মৃত্যুর পর যেন ওঁকে ষ্টেলার পাশে কবর দেওয়া হয়। হলোও তাই। এতদিনে ষ্টেলা তার প্রণয়ীকে পেলেন লোক চক্ষুর আড়ালে, একেবারে একান্ত নিজস্ব ভাবে। অসহায় প্রেমিক খুঁজে পেলেন তাঁর আশ্রয়। এ অসহায়তা সব পুরুষ মানুষের জীবনেই কখনো না কখনো এসে পড়ে। এ অবস্থা থেকে কেউ দূরে থাকতে পারে না চিরদিন। কারণ সুইফটের নিজের ভাষায় বলতে গেলে :

Be you lords or be you earls,
You must write to naughty girls.

আপনারও
-চিত্রতারকাদের মত উজ্জ্বল লাবণ্য হতে পারে
বৈজয়ন্তীমালা বলেন "লাক্স টয়লেট সাবান ব্যবহার করে আমার লাবণ্য সর্ব্বদাই সুন্দর ও সতেজ থাকে। লাক্সের সরের মত ফেণা আমার ত্বকের পক্ষে ভাল—এর সুন্দর সৌরভ আমাকে সারাদিন ধরে সতেজ করে রাখে।"
আপনিও বৈজয়ন্তীমালার মত লাবণ্যময়ী হতে পারেন। লাক্স টয়লেট সাবান আপনার দৈনন্দিন সৌন্দর্য্য চর্চ্চার সঙ্গী হোক। মনে রাখবেন লাক্স স্নানের সময় সত্যিই আনন্দদায়ক।
বিশুদ্ধ, শুভ্র
লাক্স
টয়লেট সাবান
চিত্রতারকাদের সৌন্দর্য্য সাবান
LUX
TOILET SOAP
হিন্দুস্থান লিভার লিঃ, কর্তৃক প্রস্তুত।

ব্যথা

কুমারকিশোর মুখোপাধ্যায়

মেঘ থম্‌থম্‌ রাতের আকাশ! চারটে দেয়ালবন্দী সুর!

সব ছাপিয়ে উঠেছে মন। সোনালীর মন! কালো নিয়েট আকাশ দেখছে। কমল নিখাদ গলার সুর শুনছে। আর সইতে পারছে না জীবনের অপেক্ষার মুহূর্ত্তগুলো। বুক চেপে এসে পড়েছে পাশের ঘরের তক্তাপোসে। চাপতে চাইছে একবুক কান্নার ঢেউ। ফুলে ফুলে উঠছে দেহ।

গানের কথাগুলো কানের কাছে অক্ষম আর্ত্তনাদের কলকলানি তুলছে। বিতৃষ্ণায় ভরে উঠছে মন। সব যেন এই একটা জীবনকে উপহাস করছে তারস্বরে। সব বেমানান ঠেকছে জীবনের সঙ্গে।

সব চেয়ে বেশী ওই নিরলস কণ্ঠের সুর। স্বামীর গান। তপন গোঁসায়ের সাধনা।

তপন সুরে বিভোর। তালে লয়ে বিলীন।

মেঘমল্লারে আলাপ চলছে; পাশে বসে পিতা তানপুরায় ধরে রেখেছেন সুর। সামনে সঙ্গত করছে মাইতি।

এমনি রোজ চলে। তবে রোজ তো বাবা কাছে থাকে না তপন গোঁসায়ের। থাকে ওর ছাত্র আর দু'-একজন বন্ধুবান্ধব নিয়ে নিজে। এমনিই আলাপ চলে। এমনিই সুরভর হয়ে মন্থর গতিতে রাত কেটে যায়।

আজ বাবা এসেছেন। সাধক বাবা। আজ আর অন্য কেউ নয়। শুধু মাইতি, পিতা-পুত্র আর সোনালী।

কিন্তু আলাপ আরম্ভ হতেই হঠাৎ সোনালীর ব্যথা উঠলো। আর পারলে না। মনে হলো, আর একটা মুহূর্ত্তও এমন উপহাস সইতে পারবে না জীবনে। অবহেলায় কাটাতে পারবে না একটা দিনও। অনেক দিন কাটিয়ে এলো। ক'টা বছরই পেরিয়ে গেল বিয়ের পর হতে। ঠিক এমনি ভাবেই পেরিয়ে গেল। ওই রাগ রাগিণী নিয়ে বিভোর থাকলো গোঁসাই। আর ওর দিকে তাকিয়ে তাকিয়েই কাটলো সোনালীর।

সাগরের যেমন আকাশের ছায়ামাখা স্বপ্ন বুকে নিয়ে কাটে, সোনালীর ঠিক তেমনিই কাটলো ওই আকাশের মত উদার বুকখানার ছায়াময় স্বপ্ন-সাধ নিয়ে। যে এক বুক স্বপ্ন-সাধ নিয়ে এই সঙ্গীত-দরদীকে চেয়েছিল বিয়ে করতে। সে কামনা নিয়ে কায়মন সঁপেছিল ওকে। সেই কামনাটাই হঠাৎ জমাট বেঁধেচে শুক্তির বুকে জমাট বাঁধা শক্ত লালার মত। একদানা কাঁকর হঠাৎ অন্তরের অন্তস্থলে সব কামনা কেটে, ভ্রমরের মত ছেঁদা করে ঢুকেছে। ওই কাঁকরটা যখন নড়ে চড়ে তখনই বুকের ব্যথাটা বাড়ে সোনালীর। ওটাই ব্যাধি! ওরই জন্যে ডাক্তার আসে। ওষুধ দেয়। ওষুধ খায় সোনালী। আজ ক'বছর ধরেই খেয়ে চলেছে, কিন্তু কিছুই হয় নাই। বরং যন্ত্রণা বেড়েই চলেছে।

আজ বেশ বেড়েছে। ওই তানপুরার তার ক'টা যতই গুমরে উঠছে প্রবল কম্পন নিয়ে, ততই ব্যথাটা বুকের ভিতর পাক খেয়ে খেয়ে উঠছে। অসহ্য যাতনা তার।

কিন্তু সহ্যের সীমা তবু আজও হারায় নাই সোনালী। সে অনেক দিনের কথা। তখন ওরা বহরমপুরে। ওখানেই শ্বশুর বাড়ী সোনালীর। বিয়ের পর তখন বছর খানেক চলে গিয়েছে। কিন্তু সোনালীর জীবনে একটা দিনও তখন আসে নাই বহু প্রত্যাশিত মধুরের স্বাদ নিয়ে। তখন স্বামীর ধ্যানী মূর্ত্তির দিকে নির্নিমেষ চেয়ে চেয়ে দিন গুণছে।

তবুও সে অপেক্ষাক্লান্ত গোনা দিনগুলো সহ্য হয়েছে। চিন্তা করতে ভাল লেগেছে যে, সে এক সাধক-পুরুষের স্ত্রী। শিল্পীর সঙ্গিনী। আনন্দও পেয়েছে বৈকি। যে আনন্দ প্রকাশ করা যায় না, শুধু অনুভব হয় মনে মনে,

সেই আনন্দে বিভোর ছ'চোখ স্বামীর ভাবুক প্রকৃতিকে লেহন করেছে দিনের অবসরে, রাতের আবেশে।

তপন হয়ত খেয়াল হলে জিজ্ঞাসা করেছে, 'অমন করে' কি দেখো সোনা ?

ছোট্ট উত্তর দিয়েছে সোনালী, 'তোমার মনটাকে।'

হাসিমাখা মুখে তপন শুধিয়েছে, 'মন দেখাদেখি শেষ হয় নাই এখনো ?

ছ' ঠোঁটে কবুতরী কামনা কাঁপিয়ে বলেছে সোনালী, 'আরম্ভ হলো কবে তাই শেষ হবে !'

তপন একগাল হেসে তানপুরার গায়ে সাতটা সুর নিয়ে খেলা করার মত আবেশমাখা মুখখানায় পাঁচটা আঙুল বুলিয়ে বেরিয়ে গেছে গান শেখাতে।

আর সোনালী কামনা নিয়ে কাটিয়েছে অনেকক্ষণ। তানপুরার গায়ে যেমন তারের ঝঙ্কার শেষ হয় না সহসা, তেমনি ওর দেহের সহস্র ধমনী হতে ঝঙ্কার ঝরেছে অনেক সময় নিয়ে।

এমনি করেই ঝরে গেছে শুধু কতকগুলো মাস একটি একটি বছর নিয়ে। পরম সাধক শ্বশুরের স্নেহ পেয়েছে। পরিজনের সোহাগ পেয়েছে। আর স্বামীর কাছে ওই সপ্তসুরের আবেগ পেয়ে পরম প্রত্যাশায় বিভোর হয়ে ঘন ঘন শ্বাস-প্রশ্বাসে ভরে উঠেছে।

হঠাৎ একদিন সেই রক্ত-টলমল-ভরা বুকে একদানা কাঁকর ছিটকে এসে গাঁথলো। আর গড়িয়ে পড়লো সোনালী !

সেদিন সন্ধ্যায় হঠাৎ তপন গোঁসায়ের বাড়ী এলো সুরভি। দাঁড়ালো সোনালীর সামনে। প্রশ্ন করলো, 'শিল্প কি, আপনি বোঝেন ?'

সোনালী কোন উত্তর দিতে পারে না। অবাক চোখে তাকিয়ে থাকে ওর আরক্ত মুখের দিকে।

উত্তর প্রত্যাশা না করেই যেন এসেছিল সুরভি, তাই উত্তর না পেয়েও বলে গেল, 'আপনার স্বামী বোঝেন না। হীন চরিত্র পুরুষ যেমন পুরুষ নয়, তেমনি সে শিল্পীও নয়। তপনবাবুকে আমাদের বাড়ী গান শেখাতে যেতে নিষেধ করে দেবেন। নমস্কার।'

কিছুই বুঝলো না সোনালী—কেবল স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে ওর কথাগুলো বোবার মত গিলল। আর সুরভি চলে যেতেই পড়লো মাটিতে গড়িয়ে। জ্ঞান হারালো !

জ্ঞান ফিরে পেতেই অনুভব করলো ব্যথাটা। যেন একটা গুবরে পোকা তখনো সব শক্তি দিয়ে কেটে চলেছে বুকের ভেতর। সে কি যন্ত্রণা। নড়াচড়া করতে কষ্ট।

সেদিনই প্রথম ডাক্তার এলো। ভাল করে দেখে রকমারি ওষুধ দিয়ে গেল। ওষুধ খেলো সোনালী। কিন্তু ব্যথা সারলো না।

কাঁদলো সোনালী। বোবা কান্নায় ভেঙে পড়লো। সে কান্নায় পাষাণ গলে যায় কিন্তু বুকের ওই একটুকরো কাঁকরটা একটুও ঘামলো না।

তপন গোঁসাই ঘরে ঢুকে সোনালীর মুখের দিকে তাকিয়ে বিস্মিত হয়ে শুধালো, 'কি হয়েচে সোনা ?'

উত্তর মিলল না।

উত্তর দিলেন বাবা। পুত্রকে কাছে ডেকে সস্নেহে বললেন, তোমার ব্যবহার বৌমাকে আঘাত দিয়েছে।

তপন ঠিক বুঝলো না।

তিনি ভেঙেই বললেন, 'সুরভি নামে একটি মেয়ে তোমার চরিত্র সম্বন্ধে কটাক্ষ করে গেলেন বৌমার কাছে।'

তপন একটু স্থির ভাবে নত নেত্রে দাঁড়িয়ে থেকে শুধু বললে, 'ওদের বাড়ীর টিউসনিতে আমি কাল জবাব দিয়ে এসেছি।'

বাবা শুধু একটা নিশ্বাস চেপে বললেন, ভালই করেছো।

তপন কিছুক্ষণ তেমনি স্থির ভাবে দাঁড়িয়ে থেকে এক সময় বাবাকে বললে, 'আমি বহরমপুর ছেড়ে অন্য কোথাও গিয়ে থাকতে চাই বাবা।'

বাবা সস্নেহেই বললেন, 'তোমার মনের ওপর বাধা নাই আমার, তবে একটা কথা ভুলে যেও না ; যেখানেই যাও—চরিত্র তোমার সঙ্গেই থাকবে, আর থাকবে সোনালীও। তার মনে আঘাত দিওনা, সেও তোমার সাধনারই ধন—ভালবেসেই ওকে বিয়ে করেছো।'

সোনালীকেও এসে বললে, 'আমাকে বিশ্বাস করো সোনা। আমি বহরমপুর ছেড়ে তোমাকে নিয়ে অনেক দূরে অপরিচিতের মাঝে ঘর বাঁধবো।'

বাঁধলোও তাই। বহরমপুর হতে এলো সাঁইথিয়া। ছোট্ট বাসা করলো সোনালীকে নিয়ে। ছ'চার দিনেই

লোকে চিনলো। জুটলো ছাত্র-ছাত্রী। আসতে লাগলো অনেক অনুরাগী। রাত-দিন মত্ত হলো শিক্ষা আর সাধনায়। আবার যেন প্রথম পালা শুরু করতে চাইলো। সবই হলো, কিন্তু সোনালীর সেই ব্যথাটা বুকের ভিতর রইলই। তার জন্যে ডাকতে হয় ডাক্তার। ডাক্তার আসে মাঝে মাঝে। ওষুধ দেয়। সোনালী দশদিন ভালো থাকে তো একদিন অস্থির হয় ব্যথায়।

তপন চিন্তিত মুখে কাছে এসে দাঁড়ালে বলে, 'কিছু না, এ আমার কঠিন রোগ নয়; এ রোগ সারবারও নয়। এর জন্যে তুমি অমন চিন্তা করো না।'

তপন কাছে বসে হাত দেয় বুকে।

সোনালী হাতখানা চেপে ধরে বলে, 'সেরেই গেছে এক রকম।'

তপন আশ্চর্য্য হয় সোনালীর মুখের ওপর তাকিয়ে। আশ্চর্য্য হয় ব্যাধি আর ব্যাধির নিরাময় চিন্তায়।

কিন্তু সে ক্ষণিকের তরল চিন্তা মন হতে গড়িয়ে পড়ে। সুরের গাঢ় মধুরসের স্বাদে হয়ে ওঠে মত্ত। ডুবে যায় সঙ্গীতে। আজ যেমন ডুবেছে নিঃশেষে।

আজ অনেক রাতে রেওয়াজ থামে। শোনে কে যেন কাঁদছে। বাবার মুখের দিকে তাকাতে তিনি বলেন, 'দেখো, ওঘরে বৌমা বোধ হয় কাঁদছে।'

তপন উঠে এসে দেখে, সত্যিই কাঁদছে সোনালী। বালিশে বুক চেপে গুমরে গুমরে কাঁদছে। কান্নার আওয়াজে মেঘমল্লারের সুরের মতই সারা ঘরটা থই থই করছে।

তপন তাড়াতাড়ি কাছে বসে সস্নেহে জিজ্ঞাসা করে, 'কি হলো সোনা? ব্যথা কি বেশী উঠেছে?'

হঠাৎ পাশ ফেরে সোনালী। জল-চক-চক চোখে তপনের মুখের ওপর তাকিয়ে তীক্ষ্ণ কণ্ঠে বলে, 'ব্যথা আর ব্যথা, কেবল ওই ব্যথাই জেনেছো—ওই শব্দটাই জানো। আর কিছু না। আর হয়ত কিছু জানোও না।'

—কেনো জানবো না সোনা?

—জানবে তা কেনো, 'নিশ্চয় জানো। সকলেই যা' জানে তা কি তুমি জানো না! কিন্তু জেনেও তুমি না জানা থাকতে চাও। ওই শব্দের মূলে যে একটা রক্ত মাংসের দেহ আছে, সেটাকে তুমি বুঝতে চাও না। তার মাঝে যে হৃদয় আছে, তার খবর রাখতে চাও না!' কথা-গুলো যেমন ক্রুদ্ধ কণ্ঠে বলে সোনালী তেমন আর কোন দিনই বলে নাই।

কোন দিন শোনে নাই তপন, তাই অবাক চোখে ওর ক্রুদ্ধ মুখের ওপর তাকিয়ে শুধায়, 'তুমি কি বলছো সোনালী! তুমি কি আমাকে বিশ্বাস করো না!'

সোনালী তেমনি ভাবেই বলে, 'বিশ্বাস? বিশ্বাস করাতে অনেক দিতে হয়। কি দিয়েছো তুমি? কেমন করে বিশ্বাস করি।' কান্নার বিরাট ঢেউটা আর চেপে রাখতে পারে না সোনালী।

আরো বুকের কাছে ঝুঁকে তপন শুধায়, 'কি চাও তুমি?'

সোনালী হঠাৎ কেমন যেন হয়ে যায়। সব ক্রোধ ঝেড়ে ফেলে দু'হাতে তপনের গলাটা জড়িয়ে ধরে গভীর দরদ দিয়ে কম্পিত স্বরে শুধায়, 'তুমি কি চাও তোমার সাধনার কাছে?'

—'আমি চাই অপূর্ব্ব সৃষ্টির আনন্দ।'

সোনালী যেন কেঁপে ওঠে এক বুক আনন্দে। তপনের বুকখানা বুকের ওপর টেনে নিতে চেয়ে বলে, তবে? তবে কেন তুমি শুধাবে, আমি কি চাই? চাওয়া যে সব এক সুরে বাঁধা। এক স্বর, একই স্বরলিপি তার।' বলেই মিশে যেতে চাইলো তার প্রশস্ত বুকখানায়।

LIFEBUOY
SOAP
LIFEBUOY
SOAP
LIFEBUOY
SOAP
লাইফবয় সাবান দিয়ে স্নান
করলে পাবেন সেই
পরিস্কার ও ঝরঝরে আমেজ।
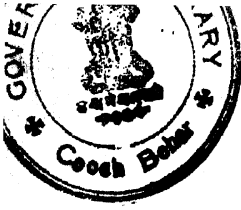
সাহিত্যে শিশুর ভূমিকা

শ্রীসতীরঞ্জন রায়

আদিম প্রকৃতির আদিরসাত্মক পাশবিকতা মানব সমাজে চলে এসেছে দীর্ঘকাল থেকে। যে যুগে সমাজ সৃষ্ট হয়নি, বাধা-বন্ধনের মূল্য অপরিহার্য হয়ে ওঠেনি, সেই যুগেই আদিরসাত্মক-প্রবৃত্তি পাশবিকতায় কৌলিন্যে অনুভূতির ভিত্তি স্থাপিত হয়। সেই আদিমতা যুগ অতিক্রম করে পরিমার্জিত হয়ে আশ্রয় নিয়েছে অনুভূতির কোমল পলিমাটিতে বন্য জীবনযাত্রার ছায়ায়, পশু প্রকৃতির উন্মাদনায় ও আর্য-অনার্যের সংমিশ্রণের মধ্য দিয়ে কখন যে এই অনুভূতি নর ও নারীর অন্তর্লোকের নিগূঢ় পথে তন্ত্রীধ্বনি তুলেছিল, তার ইঙ্গিত সেদিন তারা একেবারেই জানতে পারে নি। দিনের পর দিন চিন্তা ও স্বপ্ন সচেতনতার সমারোহের মধ্য দিয়ে যে সুর-ধারা অন্তরের মর্মমূলে জমাট বেঁধে উঠেছিল, সেই আদিরসই হলো অকৃত্রিম অনুভূতি।

বিভিন্ন যুগের বৈচিত্র্য সামাজিক ও পারিবারিক আঙ্গিকের স্পর্শে বিভিন্ন ও বিচিত্ররূপ পরিগ্রহ করেছে। ফলে যুগে যুগে অনুভূতির তারতম্যও ঘটেছে। নর-নারীর অন্তর্বিনিময়ের অনুভূতি, আর নৃশংসতায় অনুভূতি এক নয়। প্রাচীনকাল থেকে মানবসমাজের এক স্তরে এই অনুভূতির সঙ্গে জড়িয়ে ছিল একাধারে আদিরসাত্মক পাশবিক অনুভূতি, আর একদিকে নির্মমতার কঠিন যন্ত্রনা। সমাজের আর একপ্রান্তে তখন ধর্ম ও প্রেমের মুছ না ধীরে ধীরে শাখা-প্রশাখা বিস্তার করে এগিয়ে চলেছে সম্মুখের দিকে। সামাজিক ও পারিবারিক সংগঠন যুগ-মানস সৃষ্টি করে এসেছে আদিমকাল থেকে। পারিবারিক বন্ধন গড়ে উঠেছে অনুভূতি ও প্রেমের মৈত্রী বন্ধনের ভিতর দিয়ে—তারই পথ ধরে সামাজিক উন্মেষণার রূপায়ন মানব মনে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

এমনই সামাজিক ও পারিবারিক পরিবেশের মধ্যে মানব চেতনার অগ্রগমন সঞ্চারিত হয়েছে। কোন ইংরেজ সমালোচক বলেছেন—Love is the Solar passion of the race. ডাঃ শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় বলেছেন—প্রেমই মানবজাতির প্রবলতম প্রবৃত্তি। এ উক্তি প্রকৃতপক্ষেই অনস্বীকার্য। পারিবারিক ও সামাজিক মৈত্রীর পথ ধরে এসেছে এই প্রেম। প্রেমের কাহিনী মানুষ রচনা করেছে কাব্যেছন্দে—নর ও নারী তার প্রধান কেন্দ্র। অন্তরের অন্তঃস্থল থেকে মানুষ এই প্রেমকে বিভিন্নরূপে পূজা করে এসেছে। তাই সাহিত্যের বিষয়বস্তু সেদিন ছিল দেব-দেবী অথবা অতিমানুষ বা উচ্চশ্রেণীর মানুষের কীর্তিকলাপ। এ প্রসঙ্গে প্রখ্যাত সমালোচক বলেছেন—"প্রাচীন সাহিত্যের বিষয় প্রধানতঃ অতি-মানুষ বা উচ্চশ্রেণীর মানুষের কীর্তিকলাপ; ইহা সাধারণ লোকের বিশেষ ধার ধারে না। যে সমস্ত স্থলে সাধারণ মানুষ প্রাচীন সাহিত্যের নায়কের পদে উন্নীত হইয়াছে, সেখানেও সে দেবানুগ্রহীত বলে ধরে নেওয়া হয়েছে। সুতরাং দেখা যাচ্ছে সে সমাজে তখন এমনই আবহাওয়া প্রবাহিত যে সেখানে প্রেম ও দেব-দেবী ব্যতীত অন্য কোন কিছু কল্পনা করাই ভুল, বিদ্যাপতি ও চণ্ডীদাসের পদাবলীতে তারই স্বাক্ষর উজ্জ্বল আলোকে প্রতিবিম্বিত। সাহিত্যের মধ্যযুগের ইতিহাসেও সেই প্রেমের কাহিনী মঙ্গলকাব্য-স্রোতকে আশ্রয় করে এগিয়ে এসেছে বর্তমানের বেলাভূমিতে। পদাবলী যুগের পূর্বেও যে 'কান্ত-কোমলপদ' সৃষ্টি হয়েছিল, সেখানেও দেখা গিয়েছে জয়দেবের প্রেম ও তার বৈচিত্র্য। সুতরাং যুগধারা অতিক্রম করে সে ধারা আমাদের অন্তরে প্রবাহিত, সে ধারায় আছে প্রেম-গঙ্গা। সমাজ বিবর্তনের মধ্য দিয়েই এই প্রেম-গঙ্গা কঙ্কর-বন্ধুর পথ অতিক্রম করে উরশালিনী পেলবমাটিকে আশ্রয় করে মার্জিত সভ্যতাকে সম্প্রসারিত করে দিয়েছে দূর ভবিষ্যতের দিকে।

সাহিত্যে শিশুর ভূমিকা আলোচনা করতে গিয়ে এ আলোচনার প্রয়োজনীয়তা গভীরভাবে অনুভব করেছি। কারণ, যে সমাজে শুধু প্রেম ও ধর্মই মুখ্য হয়ে উঠেছিল, সেখানে নর-নারীর প্রেমই বড় করে দেখানো হয়েছে, আর কাব্য-কাহিনী ছন্দে গড়া হয়েছে দেব-দেবীর উপাখ্যানকে প্রচার করার জন্যে। শুধু প্রচার করার জন্যে কথাটা বললে ভুল হবে—কারণ, সামাজিক ও পারিবারিক বন্ধনকে দৃঢ় করবার জন্যে নীতি ও ধর্মের বোধ ও চেতনা সকলকে আচ্ছন্ন করেছিল। এই আচ্ছন্নতাই সমাজকে পরিমার্জনা করে সুষ্ঠু ও সুন্দর করে তুলতে সহায়তা করেছে। সেদিনের সেই সামাজিক পরিবেশের মাধ্যমে নর ও নারীর প্রেম ছিল, কিন্তু শিশুর কোন স্থান ছিল না। সমাজ সেদিন শিশুকে জগতের সম্মুখে তার স্বাতন্ত্র্যসহ স্বীকার করে নিতে চায় নি। সমাজে ও পরিবারে তার একটা স্বল্প-পরিসর বিশিষ্ট স্থান হয়ত আছে, কিন্তু কাব্যকারগণ তার অস্তিত্ব পর্যন্ত স্বীকার করতে রাজী ছিলেন না। আদিরসের ভিয়েন চাপিয়ে সেদিনের কবি, কবিওয়ালা ইত্যাদি কাব্য-সংগীত স্রষ্টাগণ জমাট মিছরি সৃষ্টি করেছিলেন, সমাজ ব্যবস্থা তা' স্বীকার করে নিয়ে সকলের সম্মুখে তুলে ধরেছেন তাদের বিচিত্ররূপ। তাই সেদিনকার সাহিত্য প্রেম ও ধর্মের রঙে রাঙানো—উজ্জ্বল।

এই অবস্থার মধ্য দিয়ে সমাজের বন্ধন গড়ে উঠেছে বটে, কিন্তু অপর দিক দিয়ে সমাজে দেখা দিয়েছে স্বাতন্ত্র্যের সাধনা। এই সাধনা জন্মলাভ করেছে দীর্ঘ কয়েক শ' বছর ধরে, পুরো মধ্যযুগ ব্যয় হয়েছে স্বাতন্ত্র্য তপস্যায়। অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগ থেকে সাহিত্যে নবচেতনার জাগৃতি দেখা দেয়—আসে স্বাতন্ত্র্যবোধ। মনে হয়, সেই বোধ থেকেই শিশুদের প্রতি মর্যাদা প্রদর্শন করার শক্তি জন্মলাভ করে। সামাজিক ও পারিবারিক চিন্তাধারায় অপূর্ব মিশ্রণের সমন্বয় সাধিত হওয়ায় এ স্বাতন্ত্র্য বোধের পূর্ণতা দেখা দেয়।

প্রবন্ধটির নামকরণের মধ্যেই আমার বক্তব্য পরিস্ফুট হয়েছে বলে মনে করি। 'শিশু-সাহিত্যের ভূমিকা' আর সাহিত্যে শিশুর ভূমিকা' এক নয় বলেই আমার ধারণা। সমগ্র সাহিত্যে শিশুদের স্থান অতি অল্পই বলা চলে। শিশুদের চরিত্রকে অবলম্বন করে বিচিত্র ধরণের গল্প ও উপন্যাস গড়ে উঠেছে। একদিন সাহিত্যকাররা এই শিশুচরিত্রের প্রতি বিশেষ নজর দেননি। কিন্তু আজ এমন এক সমাজ সৃষ্টি হয়েছে যেখানে শিশুদের স্বাতন্ত্র্য ও স্বীকার করে নেওয়ার প্রয়োজন হয়েছে শুধু সমাজের খাতিরে নয়, গল্প ও উপন্যাসের খাতিরেও। বর্তমান কালের লেখক সম্প্রদায় শিশু-চরিত্রকে কেন্দ্র করে তাঁদের গভীর চিন্তাধারাকে রূপায়িত করে চলেছেন। কোন্ অবস্থার ভিতর দিয়ে লেখক-সম্প্রদায় সাহিত্যের প্রাংগণে এই শিশুচরিত্র অংকনে সচেষ্ট হয়েছেন, তা' সত্যিই বিচার করে দেখবার প্রয়োজন আছে। শিশুসাহিত্যের সৃষ্টি কখন থেকে সুরু হয়েছে, সেই ইতিহাস রচনার দায়িত্ব গ্রহণ করতে চাইনি। আমি চেয়েছি, গল্পে, উপন্যাসে তাঁদের প্রকৃত ভূমিকা কতটুকু?—কতটুকু মর্যাদা লেখক তাকে দিয়েছেন এবং কেন দিয়েছেন?—এইটাই পরিমাপ করতে।

*　　*　　*　　*

সাহিত্যের আদিরসের সংগম স্থলে নর এসেছে,—নারী এসেছে, কিন্তু আসেনি শিশু। সমাজের কোন প্রয়োজনে যে শিশুদের একটা ভূমিকা থাকতে পারে, তৎকালীন সমাজ ব্যবস্থায় তার কোনরূপ ইংগিতই পাওয়া যায় না। নিজের কথা সেই যুগের কবিগণ বলতে শিখলে সাহিত্যের মধ্যে ঘরের কথার প্রতিরূপ স্পষ্ট হ'য়ে প্রতিবিম্বিত হতো, অবশ্য কোনো কোনো কবি পৌরাণিক কাব্যগাথার এখানে সেখানে ঘরের সহজ প্রতিকৃতি—বেদনা—আনন্দ-মাধুরিমার রঙে রাঙিয়েছেন।

এবার আমরা আমাদের সাহিত্যের গোড়ার দিকে ফিরে আসি। সাহিত্য-সৃষ্টির প্রথম পর্য্যায়ে কোন সাহিত্যিক শিশুদের মূল্য অবশ্য দিতে চাননি। তথাপি, সৃষ্টির আড়ম্বরের মধ্যে লেখকদের অজ্ঞাতসারেই শিশু চরিত্রের প্রভাব লক্ষ্য করা যায়।

'আলালের ঘরের দুলাল'-এ দুলালের চিত্র অংকন করা হয়েছে বটে, কিন্তু সত্যিকারের শিশু-চরিত্র তাতে নেই। প্রকৃতপক্ষে, তারক গংগোপাধ্যায়ের 'স্বর্ণলতা'র দুটি ছোট বালকের চিত্র পাওয়া যায়। সেখানে লেখক মাঝে মাঝে নিপুণভাবে ঘটনার অগ্রগতির দিকে লক্ষ্য রেখে তাদের কাজে লাগাবার চেষ্টা করেছেন। কখনও কখনও দু' একটি সংলাপের মধ্য দিয়ে করুণ রসের অনুভূতি আমাদের অন্তরে ছড়িয়ে দিয়েছেন। সামাজিক ও পারিবারিক বন্ধনের ফলেই যে শিশু-চরিত্রের সাহিত্যে আগমন, তাতে সন্দেহ প্রকাশ করবার আর কোন কারণই থাকতে পারে না। সবচেয়ে বিস্ময়ের বিষয় হচ্ছে এই যে, এই চিন্তাধারা পরবর্তী সাহিত্যকারের মধ্যে আর দেখা যায় না। বঙ্কিমচন্দ্রের [illegible]লাই তার প্রমাণ। যুগের মানসরূপ তাঁর মধ্যে থেকে তাঁকে সংস্কারকের ভূমিকায় রূপান্তরিত করেছে, তাই হয়ত, তাঁর সৃষ্টির সাধনায় শিশু-চরিত্র মূল্যহীন হয়ে গিয়েছিল। তাঁর চিন্তায় যে রাজকীয় ভাব ছিল, সেই ভাবই শিশুকে মূল্য দিতে চায়নি।

ধীরে ধীরে মানুষের মনে জটিলতার জটাজাল বিস্তার লাভ করলো। মানব মনের সংশ্লেষণ ও বিশ্লেষণের মধ্য দিয়ে নতুন রূপ ধরা পড়লো। সেই প্রেমই নরনারীর পর্যায় অতিক্রম করে শিশু মনেও সঞ্চারিত হলো। যে প্রেম স্থির, তার অগ্রগমন নেই, তাই নরনারীর সেই বিশ্লেষিত প্রেম প্রবাহিত হলো দিকে দিকে বিভিন্ন মুখ নিয়ে, রবীন্দ্রনাথের সাহিত্যে শিশু-চরিত্রের মেলা বসেছে। তাদের অন্তরের মণি-কোঠায় বসে রবীন্দ্রনাথ শিশুদেরকে নিয়ে মাতামাতি করেছেন। সমাজে যেমন তাদের একটা প্রয়োজন আছে, সাহিত্যেও তেমনি যে প্রয়োজন আছে, একথা তিনি প্রকৃতই অন্তর দিয়ে অনুভব করেছিলেন। তাই পোষ্টমাষ্টারের 'রতন', ব্যবধান গল্পে দুই ভায়ের ভ্রাতৃত্ব, কাবুলিওয়ালার 'মিনি' ইত্যাদি বহু বিচিত্র শিশু-চরিত্র তাঁর সাহিত্যে ভীড় করে এসেছে। এই শিশুদের ভূমিকা কোথাও বিচিত্র সুন্দর, কোথাও প্রাঞ্জল মর্মস্পর্শী। লেখক এদের সাহায্যে সমাজের অভ্যন্তরে একটা মধুর চিন্তার প্রলেপ বুলিয়ে দিয়েছেন।

এদিক দিয়ে শরৎচন্দ্রের সাহিত্য সাধনা আরও গভীর, তিনি সমাজে যশোদার সেই বাৎসল্যরস 'বিন্দুর ছেলে', 'রামের সুমতি', 'মেজদিদি'র কেষ্ট' 'মামলার ফলের' গয়ারামের মধ্য দিয়ে প্রস্ফুটিত করেছেন। অন্তরের অনন্ত ঐশ্বর্য এই শিশু-চরিত্র রূপায়নের মধ্য দিয়ে ব্যয়িত হয়েছে। তাই চরিত্রগুলি বড় মধুর, শরৎচন্দ্রের 'পণ্ডিতমশায়'-এর 'চরণ' এক অবিস্মরণীয় চরিত্র। লেখকের, রচনাগুণ ও ঘটনা সমাবেশ এত মাধুর্যমণ্ডিত ও চিন্তাসমন্বিত যে অপূর্ব সংযোজনার গুণে এই 'চরণ' সকলের দৃষ্টিই আকর্ষণ করবে। কুসুম আর বৃন্দাবনের মধ্যে যে অন্তর্দ্বন্দ্ব চলছিল, তারই সমাধান লাভ করে চরণের মৃত্যুতে। চরণের মধ্যস্থতায় অন্তর্দ্বন্দ্ব প্রবল থেকে প্রবলতর হয়, আর তারই মৃত্যু এনে দেয় স্বামী স্ত্রীর মিলন-মাধুর্য। অথচ সমগ্র উপন্যাসটিতে চরণের মুখে লেখক অনেক কথা গুঁজে দেননি, কিন্তু যা দিয়েছেন, তারই সংযোজনা এত উজ্জ্বল যে চরণ এই স্বল্প-পরিসরে আপন আসন আপনিই প্রতিষ্ঠিত করে রেখেছে। চরণকে বলা যায় সংযোগ-সেতু। ঠিক এই কারণেই 'মামলার ফল'-এর গয়ারামও তাই। এইখানেই শিশুর প্রকৃত ভূমিকা সাফল্য লাভ করেছে। লেখক সুন্দর পরিবেশটিকে—নর-নারীর সেই প্রেমকেই জটিল করে আবার মধুর করে তুলেছেন একটিমাত্র শিশু-চরিত্রকে এই গ্রন্থে মর্য্যাদা দিয়ে। সুতরাং শিশুদের একটি আপন বৈশিষ্ট্য আছে, আছে আপন মর্যাদা।

উনবিংশ শতকে সাহিত্যের প্রকৃত হাট বসেছে। সাহিত্যের বাজারে আড়ম্বর—অনাড়ম্বর অলংকারে সজ্জিতা সাহিত্য রূপসীর দল ঝরঝরার মত বরণডালা নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। সেখানে রয়েছে জীবন-বোধ, নরনারীর আবরণ ছিন্ন করে শিশুদের মিছিল ভীড় করে এসেছে সাহিত্যের বাজারে। সাহিত্যে শিশুর ভূমিকা প্রসঙ্গে সংস্কৃত সাহিত্য যুগের কথা স্মরণ করা যেতে পারে। সংস্কৃত সাহিত্যের ভাণ্ডার থেকে

এমন দুটি নাটকের নাম করা যায়, যাদের মধ্যে বিশেষ ভূমিকা একেবারে মূল্যহীন নয়। শূদ্রকের 'মৃচ্ছকটিক' নাটকে চারুদত্তের পুত্র রোহসেন অল্পবিস্তর মূল্যবান এক ভূমিকায় দাঁড়িয়ে আছে। মহাকবি কালিদাসের 'অভিজ্ঞান শকুন্তলার' নাটকের শকুন্তলার পুত্র ভরতের ভূমিকাও কম আকর্ষণীয় নয়। মাটির শকটকে কেন্দ্র করেই 'মৃচ্ছকটিক' নাটকের সূত্রপাত। রোহসেন মাটির গাড়ীর বদলে সোনার গাড়ীর জন্যে বায়না ধরেছে। দাতা চারুদত্ত দরিদ্র, কিন্তু অপরের কৃপার দান তিনি কখনও গ্রহণ করেন না। বসন্তসেনা পুত্রের ক্রন্দন শুনে নিজদেহের সমস্ত অলংকার রোহসেনের মাটির গাড়িতে দিয়ে, বলে যায় সোনার গরুর গাড়ি তৈরি করে নিতে। পরমুহূর্ত থেকেই ঘটনার বৈচিত্র্য ও জটিলতা দেখা দেয়। চারুদত্তকে বধ্যভূমিতে নিয়ে যাওয়ার সময়েও আর একবার রোহসেনকে ঘটনা ক্ষেত্রে টেনে আনা হয়েছে করুণরসের সৃষ্টি করতে। শূদ্রক অতি সুন্দর ও নিপুণভাবে রোহসেনের ভূমিকাটি সৃষ্টি করে ঘটনার প্রয়োজন অতি কৌশলে মিটিয়েছেন। মহাকবি কালিদাসের 'অভিজ্ঞান-শকুন্তলম্' নাটকে ভরত এক অপূর্ব চরিত্র। শরৎচন্দ্রের পণ্ডিতমশাই-এর চরণ যে ভূমিকায় অবতীর্ণ, ঠিক একইরূপ ভূমিকায় দেখা যায় ভরতকে। চরণ ছিল পিতামাতার মধ্যে মিলনের সেতুস্বরূপ, আর 'অভিজ্ঞান-শকুন্তলম্'-এ ভরত যেন দুষ্মন্ত ও শকুন্তলার মধ্যে মিলনেরই সূত্র। কালিদাস অসম্ভবকে সম্ভব করেছেন, ভরত চরিত্র রূপায়নের অপূর্ব কৌশলের সাহায্যে।

যাঁরা সাধক, তাঁরা শুধু নিজেদের মধ্যে সমাধিমগ্ন হয়ে থাকতে ভালবাসেন। তাঁদের কথা, তাঁদের চিন্তা—শুধু তাঁদেরই। তাঁদের ভাষা এবং সাহিত্য সবসময় সর্বজনের জন্য নয়। তবে মানুষ তাঁদের শ্রেষ্ঠত্ব স্বীকার করেছে; তাঁদেরই ভাষা ও সাহিত্যকে আপনার করে নিয়ে। তাই হয়েছে সেই যুগে। বর্তমান যুগ সেই এককের যুগ থেকে সরে এসে দশের কথা বলতে শিখেছে। আজ ভাবলে বিস্মিত হতে হয়, সেই যুগেও দশের কথা বলবার নাট্যকারের অভাব ছিলনা। তাঁরা নরনারীর কথা বলেছেন এবং সেই নরনারীর মধ্যে শিশুদের স্থানও রেখেছেন।

অন্ধ চকোরী

শ্রীকৃষ্ণধন দে

অন্ধ চকোরী কাঁদে চাঁদের লাগি',
তার সে বেদনা হায়, চাঁদ না জানে,
কত দূরে আছে চাঁদ কোন্ আকাশে,
কেন সে লুকাল আজ নিঠুর-প্রাণে!
চাঁদকে মনের চোখে যায় সে এঁকে,
ধেয়ানে জুড়ায় বুক চাঁদেরে ডেকে,
আপন ডানার তলে মুখটি ঢেকে
প্রেমের স্বপনে তার করুণা মাগি'।

অন্ধ চকোরী কাঁদে চাঁদের লাগি',
সারা নিশি জেগে রয়, সাধ যে বাড়ে,
মাটির কত-না ফুল ফুটে ঝরে যায়,
আকাশে তারার ফুল ফোটে আঁধারে!
কিছুই ত তার কাছে পড়ে না ধরা,
একটি পরম তৃষা হোল মুখরা—
"কোথা চাঁদ? এনে দেবে কে তারে ত্বরা?
আশায় আশায় কত রজনী জাগি!"

অন্ধ চকোরী কাঁদে চাঁদের লাগি',
দিশাহারা তৃষা নিয়ে আকাশে ওড়ে,
হায় রে, চাঁদের আলো কোথা মিলালো,
হতাশা আগুনে শুধু মন যে পোড়ে!
বিহগী-সখীরে বলে "চাঁদ কই মোর?
কোথায় লুকায়ে আছে সেই মনোচোর?
সহিতে পারি না সই এ আঁধার ঘোর,
চাঁদের বিরহে মন হোল বিবাগী!"

অন্ধ চকোরী কাঁদে চাঁদের লাগি',
ধরণী সেজেছে বধূ উতলা রাতে,
তাহার আকাশে ঝরে চাঁদের আলো,
শত চাঁদ গড়ে নদী ঢেউ-মালাতে।
অন্ধ চকোরী মরে না দেখে চাঁদে,
একটি চাঁদের লাগি' নীরবে কাঁদে,
না-দেখা জ্যোছনা শুধু ডানায় বাঁধে,
উড়ে উড়ে চাঁদে চায় সে হতভাগী।

মেয়েদের কথা

দুরপনেয় কলঙ্ক

শ্রীমতী মমতাময়ী দেবী

মহাকবি গিরিশচন্দ্র আমাদের সমাজ-জীবনের প্রয়োজনানুসারে তাঁহার 'বলিদান' নাটক যখন মঞ্চস্থ করিলেন, তখন কে চিন্তা করিয়াছিলেন যে বর্ত্তমান 'স্ফুটনিকে'র কালেও মধ্যবিত্ত পরিবারের ঘরে ঘরে "করুণাময়ে"র মত পিতার দলকে আজও অনুশোচনা বা আক্ষেপ করিতে হইবে?

সত্যই ইহা লজ্জাকর ব্যাপার যে আমাদের পিতা-মাতার কাছে কন্যাদায় আজ একটি দুরারোগ্য ব্যাধির মত দেখা দিয়াছে। কন্যাকে সৎপাত্রস্থ করিতে হইলে যেরূপ পীড়ন এবং অত্যাচারের সম্মুখীন কন্যার পিতা-মাতাকে হইতে হয় তাহা আশা করি প্রত্যেক ভুক্তভোগী মাত্রেই স্বীকার করিয়া থাকিবেন।

কি শিক্ষিত বা কি অশিক্ষিত, সর্ব্বক্ষেত্রেই দেখা গিয়া থাকে কন্যাদায়গ্রস্ত পিতার দলকে পীড়ন করিতে পাত্র-পক্ষীয়গণ কিছুমাত্র দ্বিধা করেন না। বিবাহকালে এক অভিনববেশে পাত্র-পক্ষীয়গণ কন্যাপক্ষীয় পিতার দলের নিকট যে "demand of charter"রূপে দাবী দিয়া থাকেন তাহা সত্যই লজ্জার বিষয়! কন্যার পিতা হইলেই সে যেন কত অপরাধী? সুতরাং কন্যার বিবাহের সময় পাত্র পক্ষকে যে royalty বা dividend দিতে হইবে তাহাতে আমাদের অনুশোচনা করিলে চলিবে কেন?

বিভিন্ন কবি বা নাট্যকার মানুষের জড়বুদ্ধিকে বা তামসিক মনোভাবাপন্ন এবং জড় পদার্থবৎ ব্যক্তিবর্গের শুভ চেতনাকে জাগ্রত করিবার জন্য যুগ যুগ ধরিয়া তাঁহারা অমোঘ লেখনীর দ্বারা আমাদের সাহিত্য ভাণ্ডারকে সমৃদ্ধশালী করিয়া গিয়াছেন। ইহার প্রকাশও ঘটিয়াছে বিভিন্নরূপে। কিন্তু আজও দেখিতেছি সহানুভূতিহীন, স্বার্থপরায়ণ এবং প্রতিক্রিয়াশীল ব্যক্তিদের এই বিষয়ে shylock-এর ভূমিকায় নির্ব্বিকারে অভিনয় করিয়া যাইতে। বলিতে লজ্জাবোধ হয় এবং কুণ্ঠা জাগে যে, দেশের যাঁহারা সাম্যবাদের জোয়ারে জাতিকে ও দেশকে প্লাবিত করিবার জন্য সর্ব্বদাই উদ্‌গ্রীব হইয়া আছেন, জাতিকে নবমন্ত্রে দীক্ষিত করিবার জন্য যাঁহারা কি রাজপথে বা কি সমাজ-জীবনে সর্ব্বত্রই আগাইয়া চলিয়াছেন তাঁহারাও বিবাহকালে নির্ব্বিকারে পিতামাতার এই পীড়নকে সমর্থন করিয়া থাকেন। পিতামাতার এইরূপ অন্যায়ের বিরুদ্ধে সেই সমস্ত শিক্ষিত তরুণ সমাজের প্রতিবাদ করিবার সৎসাহসের অভাব দেখিয়া আজও মনে বিস্ময় জাগে এবং মনে এই প্রশ্নই উদয় হইয়া থাকে যে, জাতির কল্যাণের জন্য এখনও কি মহাকবি গিরিশচন্দ্রের 'বলিদান' নাটকের পুনরভিনয়ের প্রয়োজনীয়তা আছে?

আমরা যদি এইরূপ পীড়নের বিরুদ্ধে একতাবদ্ধভাবে সংগ্রাম করিয়া যাইতে পারি এবং ইহার অবসান ঘটাই, তবেই আমরা জাতি হিসাবে নিশ্চয়ই পরিচয় দিব যে বাঙ্গালী শুধু রাজনীতি ক্ষেত্রেই নেতৃত্ব লয় নাই, সে সামাজিক ক্ষেত্রেও যথাযথ অগ্রসর হইয়াছে। বলা বাহুল্য এই পণপ্রথা আমাদের জাতীয় জীবনের দুরপনেয় কলঙ্কস্বরূপ। ইহার অবশ্যম্ভাবী কুফল আমাদের সমাজে বিভিন্নরূপে প্রকাশিত হইয়াছে। ইহার গতি আজ রোধ করিতে হইবে। মনে রাখিতে হইবে, মহামান্য গোখেল বাঙ্গলা সম্বন্ধে কি মন্তব্য করিয়া গিয়াছিলেন, মনে রাখিতে হইবে যে, বাঙ্গলা দেশেরই সন্তান ছিলেন রামমোহন, বিদ্যাসাগর এবং বিবেকানন্দ। সুতরাং আমরা যেন তাঁহাদের যোগ্য উত্তরাধিকারীরূপে ইহার অবসানকল্পে আত্মোৎসর্গ করিতে পারি।

আল্পনা—

—ইন্দিরা বিশ্বাস

এক এবং অনেকের

রমেন্দ্রনাথ মল্লিক

একটি ফুলের ঘ্রাণে হাজারো ফুলের ঘ্রাণ শুঁকি
তবু আমাদের মন কত মনে দেয় উঁকি ঝুঁকি,
এ মনের সন্ধানীর দৃষ্টিটুকু ঢাকা বড় দায়
হাজারো আশার ভিড়ে উন্মুখীই কামনা জাগায়।

চোখের চিন্তার ভারে নিশাচর পেঁচার দৃষ্টি কি
মিশে থাকে? হৃদয়ের দংশনে রাত্রির বৃশ্চিকই
অস্থির বেদনা এক,—অপূর্ব শরীরে মায়া হয়
নতুন দর্শনে যদি অকৃত্রিম পায় পরিচয়।

ফুলে ফুলে গুণ গুণ ভ্রমরের মত ঘ্রাণ চেয়ে
হাজারো কথার ঠোঁটে মেতে উঠি কোন স্বাদ পেয়ে,
চেখে চেখে খাওয়া যেন, ভাল কত আরো ভাল আছে
কোন খানে কোন ডালে, পাশে কিম্বা পারস্তের কাছে।

একটি ফুলের ঘ্রাণে হাজারো ফুলের ঘ্রাণ শুঁকি
তবু যেন এক এবং অনেকের কাছে কাছে ঝুঁকি।

একদিন যা ঘটেছিল……ওদের মায়ে ছেলের ছোট্ট সংসার। মাধুরী এসেছে নতুন বৌ হয়ে। খাস্ কোলকাতার মেয়ে মাধুরী। মাধবপুরের মতো গ্রামে ঠিক সে পুরোপুরি খাপ খাইয়ে নিতে পারেনা। রাত্রি হলে এখনও তার ভূতের ভয় করে। শেয়ালের ডাকে ঘরে দোর দেয়। হুতুম প্যাঁচার ডাকে তার নিশিথ রাতেও ঘুম ভাঙে। ঝিঁ ঝিঁ পোকার শব্দেও নাকি মাধুরীর ভীষন ভয়। গাঁয়ের

তারাপদ মাষ্টার

বৌ-রা সহুরে মাধুরীকে নিয়ে হাসাহাসি করে। মাধবপুরের মতো অ-জ গ্রামদেশে এসে কোলকাতার লোকও সত্যিই তবে বোকা বনে যায়!……তবু মাধুরীর গ্রামকে কিন্তু ভাললাগে। ভালবেসে ফেলে মাধুরী ও গাঁয়ের মাটি আর মানুষগুলোকে—আপ্রান চেষ্টা করে ওদের আপন করে নিতে।……

বৃদ্ধা শ্বাশুড়ী সরলাবালার যত্ন নিতে মাধুরী কখনও ভুল করে না। তাইতো তিনি মাধুরীকে এত ভালবাসেন। ফায়ফরমাস মতো তাঁকে মাধুরী ভালটা মন্দটা রেঁধে খাওয়ায়। আর কত দিনইবা বাঁচবেন—এই ভেবে মাধুরী বৃদ্ধার সব অনুরোধই মেনে চলতে চেষ্টা করে। ওদের ছোট্ট সংসারে মাধুরীকে পেয়ে বোধহয় সব চাইতে বেশী খুশী হয়েছেন তার শ্বাশুড়ী।……কত অনুনয়ের পর তারাপদ বিয়ে করতে রাজী হয়েছে। বেচারী তারাপদ এই বিয়ের কথা নিয়ে মা'র কাছে কতই না কথা শুনেছে। মাধুরী এসে অবধি তাকে আর সকাল সাঝেঁ মা'র মোকাবেলায় যেতে হয়না।

এম. এ. পাশ করে গাঁয়ের স্কুলের মাষ্টারীর কাজ নিয়েছে তারাপদ। ভাল চাকুরীর আশায় সে গ্রাম ছেড়ে সহরে চলে যায় নি। গ্রামকে সে ভালবাসে। এ গাঁয়ের ছেলে বুড়ো সবার সে আপনারজন—তারাপদ মাষ্টার। এদের নিয়েই তারাপদর দিন কেটেছে।……মাধুরী আজ তার স্বামীর পাশে এসে দাঁড়িয়েছে তার স্বপ্নকে বাস্তবে রূপ দিতে—মাধবপুরকে আদর্শ গ্রাম করে গড়ে তুলতে।……

ইতিমধ্যে মাধুরী সবার প্রিয় হয়ে উঠেছে। সেলাইয়ে রান্নায় মাধুরী পাড়া জোড়া নাম। আনাড়ী ভাবলেও আজকাল কাজের ফাঁকে গাঁয়ের বৌ-রাই এসে মাধুরীর কাছে ভীড় জমায়। বুড়ীদের আসরে সরলাদেবী বৌ-মার যা প্রশংসা করে বেড়ান, তাতে সব শ্বাশুড়ীই চায় বৌ-রা তাদের মাধুরী-বৌ-র মতো কাজকম্ম শিখুক।……

DL/P. 4A-X52 BG

গাঁয়ের বৌ-দের যত্ন নিয়ে রান্না শেখায়—মাধুরী। অবাক হয়ে তারা দেখে মাধুরীর রান্নার নতুন ঢং। মাধুরী তার সব রান্নাতেই 'ডাল্‌ডা' ব্যবহার করে। ওদের কাছে, আজব লাগে। কালু মুদীর দোকান সাজানো খেজুর গাছ মার্কা 'ডালডার' টিন তারা অনেকেই দেখেছে। বৌ-রা জানে 'ডাল্‌ডা' দিয়ে মেঠাই-মণ্ডা ভাজাভুজি হয়—সব রকম রান্নার কাজও যে 'ডালডা'য় হয় এ কথা তারা ভাবতেও পারে না। তাই মাধুরীকে 'ডাল্‌ডা' দিয়ে সব রান্না রাঁধতে দেখে ওদের অত আশ্চর্য্য লাগে। কৌতূহল বাড়ে—তবু মাধুরীকে জিজ্ঞেস করতে তারা লজ্জা পায় লজ্জার মাথা খেয়ে 'বেন্থ-বৌ' জিজ্ঞেস করে বসে। মাধুরী কিন্তু ওর কথায় হাসে না, বুঝিয়ে বলে ওকে 'ডালডার' কাহিনী। 'বেন্থ-বৌ, পায় তার প্রশ্নের জবাব, কেন মাধুরী সব রান্নাতেই 'ডাল্‌ডা' ব্যবহার করে।……

"খাঁটি ভেষজ তেল থেকে 'ডাল্‌ডা' তৈরী। আর প্রতি "আউন্স" 'ডাল্‌ডা'তেই আছে ভিটামিন 'এ'র ৭০০ 'ইণ্টার ন্যাশানালইউনিট' এবং 'ডি'র ৫৬ 'ইণ্টার ন্যাশনাল ইউ-নিট'—আমাদের শরীর রক্ষার প্রয়োজনীয় দুটি উপাদান। কেবলমাত্র বিশেষ বিশেষ রান্নার কাজেই 'ডাল্‌ডা' ব্যবহার হয় না, 'ডাল্‌ডা' দিয়ে আমরা সব রকম রান্নাই রাঁধতে পারি। আর 'ডাল্‌ডা' সবসময় সীল করা টিনে পাওয়া যায় বলে ধূলোময়লা পড়বার বা ভেজালের কোন ভয় থাকে না। 'ডাল্‌ডা' চেনবার সহজ উপায় হোল—সীল করা টিনের গায়ের 'খেজুরগাছ' মার্কা ছাপ"—মাধুরী তার 'ডাল্‌ডা'র বিশ্লেষন পর্ব্ব শেষ করে। গাঁয়ের বৌ-রা ঘরে ফেরে।……

দিন কতক পরের কথা। বাইরে গনেশ ব্যাপারীর গলা শুনে মাধুরী দাওয়ায় এসে দাঁড়ায়। দেখে গনেশ ব্যাপারীর হাতে 'ডাল্‌ডা'র একটা ছোট্ট টিন। আজই হয়ত গনেশ কিনেছে। সত্যতা জেনে নিতে মাষ্টারের কাছে ছুটে আসা। কিন্তু কেন? নিশ্চয়ই এ সব বেন্থ-বৌ-র পরামর্শে। নইলে গনেশ আবার 'ডাল্‌ডা' কিনতে যাবে কেন।…… স্বামীর চোখে চোখ পড়ায় মাধুরী ভেতরে চলে আসে। ভেতর থেকে কান পেতে শোনে স্বামীর কথা "হ্যাঁ গনেশ, একেবারে খাঁটি জিনিষ 'ডাল্‌ডা' ওতে আর বলার কি আছে। ব্যবহার করলেই বুঝতে পারবে……হেঁসে মাধুরী কাজে চলে যায়।

DL/P, 4B-X52 BG

হিন্দুস্থান লিভার লিমিটেড বোম্বাই।

মানবতার সাগর-সঙ্গমে, সুইডেনে আর সোবিয়েতে

শচীন সেনগুপ্ত

কালচুরাল সাব-কমিশনগুলির সিদ্ধান্তআলোচনা করবার জন্য কমিশনের পূর্ণাঙ্গ অধিবেশন যে-দিন হয়, সে-দিন সভা বেশ গরম হয়ে ওঠে। শিক্ষার ব্যবস্থা নিয়ে বাদ-প্রতিবাদে হলটি মুখরিত হয়ে ওঠে। প্রধানতঃ স্কুল-পাঠ্য বই আলোচনার বিষয় হয়। দেশের পর দেশের প্রতিনিধি উঠে বলেন যে, ভবিষ্যতে পৃথিবীর ভাগ্য-নিয়ন্ত্রণ যারা করবে, সেই ছেলে-মেয়েদের মন, নানা দেশে, স্কুল-পাঠ্য বইগুলিতে নানা বক্তব্য ঢুকিয়ে বিষিয়ে দেওয়া হচ্ছে। তার প্রতিকার কিসে হবে, কংগ্রেস সে-বিষয়ে কোন নির্দ্দেশ কেন দেবে না? এই দাবীতে বেশি করে জোর দেন বৃটেনের আর পশ্চিম জার্ম্মেনীর প্রতিনিধিরা, তাও আবার বিশেষ করে শিক্ষিকারা। এডুকেশন সাব-কমিশনের কয়েকজন প্রতিনিধি বলেন, তাঁরা ও-সম্বন্ধে যে প্রস্তাব করেছিলেন, তাহা গ্রহণ করা হয়নি কেন?

গোপাল হালদার আর রাণী রায়চৌধুরাণী এডুকেশন সাব-কমিশনে ছিলেন। তাঁদের কাছ থেকে শুনে নিলাম, তাঁরা কি প্রস্তাব করেছেন। গোপালের চিন্তাশীলতার পরিচয় পাঠকরা পেয়েছেন। রাণী রায়চৌধুরাণীও চিন্তাশীলতার কম পরিচয় দেননি। আমি তাঁকে নেহাৎ ছেলে-মানুষ মনে করতাম। ছেলে-মানুষীও আছে, গভীরতাও আছে।

ভারতীয় ডেলিগেশন থেকে ডক্টর মুলকরাজ আগে বল্লেন। তাঁর বক্তব্য, সমসাময়িক সমস্যা শিশুদের মনে ঢুকিয়ে দেওয়া ক্ষতিকর হবে। ও-বিষয়ে প্রতি দেশ নিজ-নিজ ব্যবস্থা যেমন করছে, তেমনই করুক। কংগ্রেসের হস্তক্ষেপের কোন আবশ্যকতা নেই। তারপরেও অনেকে জোর দিয়ে বল্লে—নআবশ্যকতা অবশ্যই আছে।

আমি তখন বলবার অনুমতি চাইলাম। আমি বল্লাম—বিভিন্ন সাবকমিশনের আলোচনার ভিত্তিতে কংগ্রেসের এই কালচুরাল কমিশন সমগ্রভাবে যে প্রস্তাবগুলি করেছেন, আমি তা সমর্থন করতে দাঁড়িয়েছি। কিন্তু শিক্ষা সাব-কমিশন যে সুপরিশগুলি করেছিলেন, তা বিবেচনা করা হয়নি। না করা ন্যায়-সঙ্গত হয়নি। আমার শ্রদ্ধেয় বন্ধু ডক্টর আনন্দ বলেছেন—ছেলে-মেয়েদের মনে পৃথিবীর বর্ত্তমান সমস্যাগুলি ঢুকিয়ে দেওয়া উচিত নয়। সত্যই তা অনুচিত। কিন্তু সেই অনুচিত কাজ করা হচ্ছে, বহু প্রতিনিধি তাই মনে করেন। আমরা শান্তি-কর্মীরা মনে করি দেশজয়ের আর পারস্বাপহরণের বীরত্বকে আজও গৌরব দেওয়া হয় স্কুলপাঠ্য ইতিহাসে, কবিতায়, নাটকে। আজও বিশেষ-বিশেষ রাজনীতিক মতবাদকে দেশ-বিদেশে প্রাধান্য দেওয়া হয়। এ-সবের পরিবর্ত্তন আবশ্যক। সে পরিবর্ত্তন কংগ্রেস করতে পারে না, আমি জানি। কিন্তু কংগ্রেস সকল দেশের চিন্তাশীলদের মন সেই বিষয়ে আকর্ষণ করতে পারে। আমার বিশ্বাস কংগ্রেসের তাও একটা কাজ। তাতে করে কোন দেশের শিক্ষা ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করা হয় না। আমি তাই প্রস্তাব করি, ইউনেস্কো যেমন কতগুলো আদর্শ পাঠ্য-পুস্তক প্রকাশ করেছে, এই কংগ্রেসও তাই করুক। এই কংগ্রেসে বহু বিশ্ববিশ্রুত লেখক আছেন। যদি তাঁরা সত্যিকারের শ্রেষ্ঠতর কিছু দিতে পারেন, কোন দেশ তা অগ্রাহ্য করবে না। ওতে বিরোধ সৃষ্টির ভয় থাকবে না। যদি শিক্ষা বিষয়ক একটা বাস্তব পরিকল্পনা না-ই করা হবে, তাহলে কমিশন শিক্ষা-সাবকমিশন গঠন করেছিলেন কেন?

আমার ভাষণের পর আরো কয়েকজন তাঁদের বক্তব্য বলেন। একটি বেলজিয়ান মেয়ে একটি প্রস্তাব লিখে আমাকে দেখিয়ে জানতে চান, ওই প্রস্তাবটি উপস্থিত করলে কি অন্যায় হবে? মেয়েটি মেডিকাল কলেজের ছাত্রী। ভারতীয় ডেলিগেশনের মহিলাদের সঙ্গে বেশ ভিড়ে গিয়েছিলেন। আমাদের মেয়েরা তাঁকে শাড়ী-সিন্দুরও পরিয়ে দিয়েছিলেন। তাঁর প্রস্তাবের মর্ম্ম হচ্ছে, ছেলে-মেয়েদের পাঠ্য থেকে নৈতিক আর আধ্যাত্মিক বিষয় বাদ দেওয়ার অর্থ ই হচ্ছে বিরোধের ও বলাৎকারের সম্ভাবনাকে জিইয়ে রাখা। প্রস্তাবটি দেখে আমি বল্লাম—তুমি এই প্রস্তাব উপস্থিত করতে চাও!

—কেন, দোষ কি?

—দোষের কথা বলছি না। একটু বিস্মিত হয়েছি।

—সে কি! আমি যে আর কাউকে প্রস্তাবটা না দেখিয়ে তোমাকেই দেখালাম, তোমার সমর্থন পাব জেনে।

—আমার সমর্থন রয়েছে। কিন্তু যাদের নেই, তারা বলবে ইতিহাসে তারা দেখেছে ও-বিষয় যখন খুব বেশি করে পড়ানো হোতো, তখনো বিরোধ আর বলাৎকার বড় কম হয়নি।

ইতিহাসে ত দেখা যায় যুদ্ধের পর যুদ্ধ হয়েছে, তবে বিশ্বশান্তি আন্দোলন কেন? মেয়েটি জিজ্ঞাসা করলেন।

—ঠিক কথা। তুমি প্রস্তাব উথাপন কর। কেউ প্রতিবাদ করলে আমি তোমাকে সমর্থন করব।

প্রতিবাদ কেউ করল না। প্রেসিডিয়াম স্থির করলেন—শিক্ষা বিষয়ক সুপারিশ তখনকার আলোচনার ভিত্তিতে আবার নতুন করে ড্রাফট করা হবে। হোলও তাই। কমিশন তা গ্রহণ করলেন।

একটি ব্রিটিশ শিক্ষিকা বল্লেন—ঘরেও পুরুষদের লজিক দুর্ব্বোধ্য, বাইরেও তাই।

—কেন, বাইরের এই পুরুষরা ত তোমাদের দাবী মেনেই নিল। বল্লাম আমি।

—কোথায় আর নিলে! আমরা চাই শিক্ষাবিষয়ক সুপারিশ সর্ব্বাগ্রেই থাকবে। কিন্তু তোমরা রাখলে সবার পেছনে।

—এই কথা!

—কথাটা তুচ্ছ নয়।

— পুরুষরা তোমাদের কোন কথাই তুচ্ছ করে না। কিন্তু মনে রেখো আমরা সুপারিশ করছি কংগ্রেসের কাছে, কংগ্রেস এই সুপারিশ থেকে তার প্রস্তাবের খসড়া করবে। কোথায় থাকবে মুড়ো আর কোথায় ল্যাজা, তা ড্রাফটিং কমিটি ঠিক করবেন। আমরা শুধু দেখব আমাদের সুপারিশ উপেক্ষিত না হয়। তা হলেই আমরা প্রতিবাদ করব।

আমি সব কমিশনে উপস্থিত থাকতাম না। একই সময় এক ব্যক্তির একাধিক যায়গায় উপস্থিত থাকা সম্ভব নয়। তাই সব কমিশন যে-সব সুপারিশ করেন, তার সংক্ষিপ্ত বিবরণ শুনিয়ে রাখি।

সামরিক অস্ত্রবর্জ্জন কমিশন
(Dis-armament Commission)

১। আধুনিক অস্ত্র-সমূহের, বিশেষ করে আণবিক শক্তি পরিচালিত অস্ত্রসমূহের, ধ্বংস-ক্ষমতা ও প্রয়োগ-পরিধি দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে। বিভিন্ন দেশে প্রচুর পরিমাণে ওই অস্ত্র মজুত রাখা হচ্ছে।

২। ক্ষেপণাস্ত্র প্রয়োগের ঘাঁটির সংখ্যা দ্রুত বৃদ্ধি করা হচ্ছে। যাঁরা তা করছেন, তাঁরা অপর রাষ্ট্রে নানা অজুহাতে বলপূর্ব্বক ঢুকে পড়ে যায়গা দখল করে নিচ্ছেন নতুন নতুন ঘাঁটি স্থাপন করতে।

৩। ব্রিটেনের এবং আর্টিক সাগরের উপর দিয়ে আণবিক বোমা বহন করে বোমারু-বিমান নিয়মিত টহল দিচ্ছে। পশ্চিম জার্মেনীতে, জাপানে, এবং দক্ষিণ কোরিয়ায় বহু ঘাঁটি স্থাপন করে আণবিক বোমা ও রকেট মজুত করা হচ্ছে।

৪। ফরাসী গবর্ণমেণ্ট সাহারা মরুভূমিতে পরীক্ষামূলক বিস্ফোরণ করবার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছেন। পশ্চিম জার্ম্মেনী আণবিক অস্ত্র সম্বলিত সৈন্যবাহিনী গড়বার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন।

৫। এই ধরণের ব্যাপক আয়োজন তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধের প্রস্তুতি। সেই যুদ্ধ যদি অনুষ্ঠিত হয়, তাহলে পৃথিবীর বৃহত্তম অংশই কেবল ধ্বংস হবে না, ধ্বংস থেকে যা রক্ষা পাবে, তাও অ-কেজো হয়ে যাবে। এ বিষয়ে পৃথিবীর শ্রেষ্ঠতম বিজ্ঞানীরা একমত।

৬। এই কংগ্রেস বিশ্বাস করে বিজ্ঞান পক্ষপাতিত্ব করে না, মৃত্যুও তা করে না। প্রতিপক্ষ যখন রয়েছে, তখন আণবিক অস্ত্রবৃদ্ধি আর হত্যা একতরফা হবে না। তাই এই কমিশন দাবী করে :

(ক) বোমারু বিমানের টহল বন্ধ করা হোক্।

(খ) রকেট ছোঁড়বার ঘাঁটি নষ্ট করে ফেলা হোক্।

(গ) পরীক্ষামূলক-বিস্ফোরণ বন্ধ করা হোক্।

(ঘ) আণবিক শক্তিকে ধ্বংসের কাজে নিয়োগ না করে জনকল্যাণে নিয়োগ করা হোক্।

(ঙ) উক্ত বিষয়গুলি কার্য্যকর করবার জন্য ১৯৫৯ খৃষ্টাব্দের মাঝেই রাষ্ট্রনায়কদের একটি বৈঠক আহ্বান করা হোক্।

এখানে বলে রাখা ভালো যে, এই বিষয় যখন লিখছি, অর্থাৎ ১৯৫৯ এর মাঝামাঝি, তখন জেনিভায় চারশক্তির পররাষ্ট্র সচিবরা মিলিত হয়ে আলোচনা করছেন রাষ্ট্রনায়কদের বৈঠক কি সর্ত্তে আহ্বান করা সম্ভব হবে। ১৯৫৫ খৃষ্টাব্দে দ্বিতীয় যুদ্ধের রাষ্ট্রনায়করা প্রথম মিলিত হন আপোস-আলোচনা দ্বারা তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধের সম্ভাবনা দূর করতে। তাঁদের আলোচনার ভিত্তিতে কার্য্যকর ব্যবস্থা কি হতে পারে, তাই ঠিক করবার জন্য পররাষ্ট্র সচিবরা পরে মিলিত হন। কিন্তু তাঁরা একমত হতে পারেননা বলে আয়োজন ব্যর্থ হয়। এবার তাই প্রথমে পররাষ্ট্র সচিবরা বৈঠকে বসেছেন। তাঁরা একমত হলে রাষ্ট্রনায়করা মিলিত হবেন আশা করা যায়।

রাজনীতিক সহযোগ কমিশন
(The Commission on Political Co-operation)

এই কমিশন বিশ্বাস করে যে, সহযোগের আর সহ-অবস্থানের দ্বারা সকল সমস্যা সমাধানের সম্মতির ফলেই এই পৃথিবীকে সকলে মানুষের স্থিতির, উন্নতির, এবং পরম পরিণতির আনন্দধাম করে গড়া যেতে পারে। তার জন্য :

(১) ঠাণ্ডা-লড়াইয়ের অবসান ঘটাতে হবে।

(২) সামরিক জোট ভেঙে দিতে হবে।

(৩) রাষ্ট্রনায়কদের খোলা মন নিয়ে আলোচনায় প্রবৃত্ত হতে হবে।

এই কমিশন বিশ্বাস করে অস্বস্তির ও অশান্তির মূল কারণ :—

(ক) অর্থনীতিক, সামরিক, এবং প্রশাসনিক সুযোগ নেবার সংযম-বিহীন প্রবৃত্তি।

(খ) রাষ্ট্রের এবং মানুষের স্বাধীনতা-সঙ্কোচ।

(গ) জাতি সমূহের আত্ম-নিয়ন্ত্রণের অধিকার অস্বীকৃতি।

(ঘ) রাষ্ট্রসঙ্ঘে কোন-কোন জাতির চার্টার-বিরোধী শক্তি-জোট গঠন, এবং অবাধ কর্ত্তৃত্ব।

(ঙ) রাষ্ট্রসঙ্ঘে চীনের ন্যায্য-প্রাপ্য আসন থেকে পিপল্‌স্ অব চায়নাকে বঞ্চিত রাখবার দীর্ঘকালীন ষড়যন্ত্র।

(চ) সামরিক অস্ত্রবৃদ্ধি, আণবিক অস্ত্রবৃদ্ধি, সামরিক ঘাঁটি, সৈন্য-বৃদ্ধি, সামরিক ব্যয়বৃদ্ধি।

এই কমিশন বিশ্বাস করে রাষ্ট্রনায়করা খোলাখুলি আলোচনায় প্রবৃত্ত হলে সহজেই বুঝতে পারবেন যে, আজকার পৃথিবীতে অস্বস্তির ও অশান্তির উক্ত কারণগুলি দূর করা আদৌ দুঃসাধ্য নয়। যে রাষ্ট্র-নায়করা সহযোগিতায় সম্মত হবেন না, তাঁরা পৃথিবীর মানুষের বিচারে অপরাধী বিবেচিত হবেন এবং নিজেদের রাষ্ট্রেরও অমঙ্গল ডেকে আনবেন।

এই কমিশন বিশ্বাস করে ইউনাইটেড নেশনস অর্গানাইজেশন যদি বিশেষ বিশেষ রাষ্ট্র-গোষ্ঠীর প্রভাবে বিপথে না গিয়ে সঙ্ঘের চার্টার অনুযায়ী কাজ ন্যায়সঙ্গতভাবে পালন করেন, তাহলে স্বল্পকালের মধ্যেই পৃথিবীর বহু সমস্যার শান্তিপূর্ণ সমাধান হয়।

এই কমিশন যেমন রাষ্ট্রসঙ্ঘকে, তেমন গবর্ণমেণ্ট সমূহের স-

দের বিশ্বমানবের এই দাবীকে শ্রদ্ধার সঙ্গে বিচার করতে অনুরোধ জানাচ্ছে। সঙ্গে সঙ্গে বিশ্বের মানব-গোষ্ঠীকে স্মরণ করিয়ে দিচ্ছে যে, তাঁদের জন্মগত সকল অধিকার অর্জ্জন করবার জন্য তাদের হিংসা, বিদ্বেষ, দ্বিধা, সংশয় দূরে সরিয়ে স্বাধিকার অর্জ্জন করবার জন্য সঙ্ঘবদ্ধ হতে হবে, এবং এমন বিরাট এক জনমত গড়ে তুলতে হবে, যার ফলে মানুষের সমাজ থেকে সকল অশান্তির সকল কারণ বিদূরিত হয়।

রাজনীতিক সহযোগিতা কমিশন
ও
জাতীয় স্বাধীনতা সমস্যা

(Political Commission on the Problems of National Independencc.)

এই কমিশন মনে করে যে, প্রত্যেক জাতিই স্বাধীনভাবে নিজ-নিজ রাষ্ট্রকে তার ইচ্ছামত রূপ দেবার অধিকারী। সে-বিষয়ে কোন রাষ্ট্র অপর কোন রাষ্ট্রের আভ্যন্তরিক বিষয়ে হস্তক্ষেপ ত করতে পারবেই না, পরন্তু প্রতি জাতিই প্রতি জাতির আত্মনিয়ন্ত্রণের প্রয়াসকে সফল ও সার্থক করে তোলবার সহায়তা করবে। এই কমিশন বিশ্ব-মানবকে অবহিত করতে চায়:—

(ক) আলজেরিয়ার আত্ম-নিয়ন্ত্রণের অধিকার অস্বীকার করে বছরের পর বছর যে যুদ্ধ জিইয়ে রাখা হয়েছে, তার ফলে বর্ব্বরতা বৃদ্ধি পাচ্ছে, ক্রমশই অধিকতর বে-সামরিক নর-নারী-শিশু নিহত হচ্ছে। মানুষের এই অমানুষিক হত্যার উৎসব সমগ্র উত্তর আফ্রিকার অধিবাসীদের উত্যক্ত ও উত্তেজিত করে প্রবলতর সংঘর্ষের সম্ভাবনা বৃদ্ধি করছে।

(খ) এই কমিশন তাই সকল শান্তিকামী অধিবাসীদের অনুরোধ করছে নিজ-নিজ রাষ্ট্রের গবর্ণমেণ্টকে অবহিত করতে যে, রাষ্ট্রসঙ্ঘের জেনারেল এসেম্ব্লি এই বিরোধকে শান্তিপূর্ণ উপায়ে, গণতান্ত্রিক রীতিতে, এবং ন্যায়সঙ্গতভাবে, মীমাংসা করবার যে নির্দ্দেশ দিয়েছেন, আজও তা অজ্ঞাত কারণে কার্য্যকর করা হয়নি। তা করা হয়নি বলে রাষ্ট্র-সঙ্ঘের সদস্য গবর্ণমেণ্টসমূহকে সক্রিয় হতে হবে, কেবল আত্মমর্য্যাদা রক্ষার জন্য নয়, বিশ্বশান্তির জন্যও।

(গ) এই কমিশন লক্ষ্য করছে সিপ্রিয়ট গ্রাকরা ধারাবাহিক অনাচারে অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছে। তাদের আত্ম-নিয়ন্ত্রণের অধিকার যাতে করে অক্ষুণ্ণ থাকে, তারই জন্য সাইপ্রাস থেকে বৈদেশিক সামরিক সমাবেশ অপসারিত করতে হবে।

(ঘ) কোরিয়া আর ভিয়েৎনাম শুধু দ্বিধা বিভক্তই করা হয়নি, পরন্তু একই দেশের দুই অংশের পরস্পর-বিরোধী মনোভাবকে উস্কানি দেওয়া হচ্ছে, যাতে করে বৃহৎ শক্তিবর্গ নিজেদের প্রয়োজন মত ওই বিরোধকে নিজেদের কাজে লাগাতে পারেন। এই পরিস্থিতির অবসান ঘটাতে হবে।

(ঙ) বান্দুংয়ে, কায়রোতে, আংকারায় সমবেত হয়ে আফ্রো-এশিয়ান রাষ্ট্রসমূহের প্রতিনিধিরা পারস্পরিক সহযোগিতার যে অঙ্গীকার করেছেন, সিয়াটো চুক্তি তার প্রতিবন্ধক হয়ে রয়েছে। এশিয়ার সকল গবর্ণমেণ্টকে সক্রিয় ব্যবস্থা অবলম্বন করবার জন্য অগ্রগামী হতে হবে, যাতে না এশিয়ার সীমানার মাঝে ওই চুক্তি কায়েম থাকে।

(চ) গোয়া ভারতকে এবং ওকিনাওয়া জাপানকে ফিরিয়ে দিতে হবে।

(ছ) দক্ষিণ আফ্রিকার আত্ম-নিয়ন্ত্রণের অধিকার যাতে করে সত্বর স্বীকৃতি পায়, তার জন্য সকল জাতিকে সক্রিয় হতে হবে। নইলে, উত্তর আফ্রিকার মতো দক্ষিণ আফ্রিকাতেও আগুন জ্বলে উঠবে।

জার্ম্মান সমস্যা
ও
রাজনীতিক কমিশন

(The Commission for Political Co-Operation on the German Problem.)

এই কমিশন অবগত আছে যে, পশ্চিম এবং পূর্ব্ব জার্ম্মেনীর জনগণ ফেডারেল্ সৈন্যবাহিনীকে আণবিক অস্ত্রে সজ্জিত করা যেমন নিজেদের পক্ষে বিপজ্জনক মনে করে, তেমন সমগ্র ইউরোপের পক্ষেই বিপজ্জনক মনে করে। নাৎসী-বাহিনী যেমন দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধকে অনিবার্য্য করেছিল, তেমন ফেডারেল্ গবর্ণমেণ্ট গঠিত আণবিক অস্ত্রে সুসজ্জিত সৈন্য-বাহিনী তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধকে অনিবার্য্য করে তুলতে পারে।

এই কমিশনের দৃঢ় বিশ্বাস যে, দুই জার্ম্মেনীর জনগণ পুনরায় এক অখণ্ড জার্ম্মান রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠা কামনা করে। সুতরাং এই কমিশন আশা করে:—

(ক) সুযোগ করে দেওয়া হোক্—যাতে দুই-জার্ম্মেনী পুনর্ম্মিলনের জন্য আলাপ-আলোচনা করতে পারে।

(খ) রাষ্ট্রনায়করাই দুই জার্ম্মেনীর সৃষ্টি করে বিরোধের কারণ ঘটিয়েছেন। পুনর্ম্মিলনের পথ তাঁদেরই তৈরি করে দিতে হবে।

অর্থনীতিক সহযোগিতা কমিশন

(The Economic Co-operation Commission)

এই কমিশন অবগত আছে যে, বর্ত্তমানের রাষ্ট্রসমূহ বছরে একশত বিলিয়ন ডলার (আমাদের হিসেবে পঞ্চাশ হাজার কোটি টাকা) সামরিক ব্যাপারে ব্যয় করে। প্রতি বছরেই যেমন এই ব্যয় বাড়ছে, তেমনি ট্যাক্সের হারও বৃদ্ধি পাচ্ছে। এই ব্যয় ইনফ্লেশন বৃদ্ধি করছে,

মানুষের শক্তির অপচয় ঘটাচ্ছে, প্রকৃতির সম্পদ নিরর্থক নষ্ট করছে।

এই কমিশন অবগত আছে যে, যুদ্ধবাজরা প্রচার করেন এই ব্যয়-বৃদ্ধিই শিল্পোন্নতির সহায়তা করে, রাষ্ট্রের অর্থনীতিক প্রবাহকে খরতর করে। ও প্রচারণা সত্য নয়। আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্র যুদ্ধের ব্যয় উত্তরোত্তর বাড়িয়েই চলেছেন। তাতে করে উৎপাদন বৃদ্ধি পায়নি,—বৃদ্ধি পেয়েছে বেকারের সংখ্যা, আর ছোট-ছোট শিল্পের ক্ষতি।

এই কমিশন নিশ্চয় করে বুঝছে যে, সামরিক ব্যয় না বাড়িয়ে রাষ্ট্রের অর্থনীতিক প্রবাহকে খরতর করা যায় আন্তর্জ্জাতিক সহযোগিতার পথ সুগম করে দিয়ে। পৃথিবীর অগণ্য মানুষ আজও পেট ভরে খেতে পায় না, পৃথিবীর অসংখ্য দেশ আজও শিল্প-প্রতিষ্ঠায় সক্ষম হয় নি, পৃথিবীর অপরিসীম প্রাকৃতিক সম্পদ আজও মানব-কল্যাণে নিয়োজিত হবার অপেক্ষায় রয়েছে। কমিশন তাই দাবী করে :

(ক) সামরিক অপব্যয় ও অপচয় বন্ধ করে সেই অর্থে শিল্প-প্রতিষ্ঠার সহায়তা করা হোক্।

(খ) বিজ্ঞান আণবিক শক্তিকে সৃষ্টির কাজে সহায়তা করবার শক্তির যখন সন্ধান দিয়েছে, তখন সেই শক্তিকে ধ্বংসের কাজে নিয়োগ না করে শিল্পোন্নয়নের সহায়তায় নিযুক্ত করা হোক্।

(গ) তেল ও কয়লা যাতে না ভূগর্ভ থেকে একেবারে লুপ্ত হয়ে যায়, তার জন্য আণবিক শক্তিকে এখন থেকেই পাওয়ার হিসেবে ব্যবহার করা হোক্।

(ঘ) মানুষের আজকার মানসিক রূপান্তরকে, এবং তার আজকার প্রয়োজনকে স্বীকার করে নিয়ে, শিল্প-বাণিজ্যের প্রসারে শোষণের, লুণ্ঠনের, মুনাফা-শীকারের সুযোগ না রেখে, সমবায়ের মাধ্যমে কাজ করা হোক্।

(ঙ) পৃথিবীর বিভিন্ন জাতির অর্থনীতিক প্রতিষ্ঠানগুলির সহযোগিতার সুযোগ দেওয়া হোক্।

(চ) দেশ-বিদেশের বৈজ্ঞানিক, টেক্‌নিশিয়ান, কৃষক, শ্রমিক, ওই সব বিষয়ের ছাত্র-ছাত্রী যাতে শিল্পে ও কৃষিতে উন্নত দেশের অভিজ্ঞতা প্রত্যক্ষভাবে অর্জ্জন করতে পারে, তার ব্যবস্থা করা হোক্।

(ছ) শিল্প-বাণিজ্যকে জনকল্যাণকর করা যায় কি করে, তারই হদিস পাবার জন্য আন্তর্জ্জাতিক কনফারেন্সের আয়োজন করা হোক্।

(জ) যে-সব দেশ এখন প্রধানতঃ কাঁচামাল রপ্তানি করে তাদের অর্থনীতিক-কাঠামো খাড়া রেখেছে, আন্তর্জ্জাতিক অর্থনীতির নানা পরিবর্ত্তন যাতে না তাদের ক্ষতিগ্রস্ত করে, সেই বিষয়ে সতর্ক দৃষ্টি রাখা হোক্।

(ঝ) রাজনীতিক মতবাদকে উপলক্ষ করে বিশেষ বিশেষ বাণিজ্য প্রসার ক্ষুণ্ণ করবার জন্য যে-সব অর্থনীতিক প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলা হয়েছে, সেগুলি লিকুইডেট্ করা হোক, যে-সব আইন চালু রয়েছে সে-গুলি বাতিল করা হোক্।

(ঞ) ষাট কোটি লোকের সংগঠন নয়া-চীনের দ্রুত শিল্পায়ন ব্যাহত করবার জন্য নয়া-চীনকে রাষ্ট্রসঙ্ঘের বহির্ভূত রেখে অর্থ নৈতিক বৈষম্যের যে নীতি রাষ্ট্রসঙ্ঘ আঁকড়ে রয়েছেন, তা শিল্প-বাণিজ্যক্ষেত্রে সঙ্কটের সৃষ্টি করবে। রাষ্ট্রসঙ্ঘকে এবং জনমতকে তা বোঝাবার চেষ্টা করা হোক্।

(ট) সকল দেশের সকল রকমের শিল্প-বাণিজ্যের প্রতিনিধি নিয়ে একটি স্বাধীন অর্গানাইজেশন সংগঠিত হোক্।

সাংস্কৃতিক কমিশন
(The Cultural Commission)

এই কমিশন বিশ্বাস করে যে, বিভিন্ন জাতির সাংস্কৃতিক অবদানের আদান-প্রদানের ফলে পৃথিবীতে এমন এক নব-সংস্কৃতি রূপ পরিগ্রহ করবে, যা এক দেশের মানুষের সঙ্গে অপর দেশের পরিচয় নিবিড় করে তুলবে, মানুষ সম্বন্ধে মানুষের যে অজ্ঞতা, অবজ্ঞা, ঔদাসীন্য ও অবিশ্বাস রয়েছে, তার অবসান ঘটিয়ে মৈত্রীর এবং সহমর্ম্মিতার সহযোগিতার সহায়তায় সকল মানুষের পরিণতির পথ প্রশস্ত করে দেবে।

এই কমিশন তাই সকল দেশের, সর্ব্বপ্রকারের সৃজন-ধর্মী শিল্পী, বিজ্ঞানী, শিক্ষাব্রতী সমীপে আবেদন উপস্থিত করে :

(ক) বিশ্বশান্তির সহায়ক শিল্প সৃষ্টির দিকে মনোনিবেশ করতে। অতীতের ও বর্ত্তমানের সেই শিল্প-সৃষ্টি দেশে-দেশে চালু করতে, যা মানুষকে বিশ্বশান্তির তাৎপর্য্য বুঝতে সহায়তা করে। নব শিল্প সৃষ্টিতে সত্যিকারের শিল্পী-মনের লক্ষণ প্রকাশ থাকা চাই। কেন না প্রচারণা চিত্ত স্পর্শ করে না, বিপরীত প্রচারণার প্রবৃত্তিকে উস্কে দেয়। তাই থেকে বিরোধের সৃষ্টি হয়।

(খ) ওই সব সার্থক সৃষ্টি দেশ-বিদেশের প্রকাশকদের নিজ-নিজ ভাষায় প্রকাশ করতে হবে, সংবাদপত্রে তাদের সমালোচনা প্রকাশের ব্যবস্থা করতে হবে, তাদের বহুল প্রচারের ব্যবস্থা করতে হবে।

(গ) সাধারণত প্রাচ্যের ও পাশ্চাত্যের সাংস্কৃতিক প্রয়াসের পরিচয় দেবার জন্য মাঝে-মাঝে এক-একখানি রিভিউ বার করতে হবে, যাতে সকল দেশের শিল্পীরা তাঁদের অভিমত ও অভিজ্ঞতা প্রকাশ করবেন।

(ঘ) মাঝে-মাঝে সাংস্কৃতিক বুলেটিন প্রকাশ করতে হবে, যাতে সাংস্কৃতিক আদান-প্রদানের সংবাদ থাকবে, শান্তির সহায়ক শিল্প ও বিজ্ঞান এবং সাহিত্যসংক্রান্ত গ্রন্থমালার, সঙ্গীতের, নৃত্যের ও নাটকের প্রদর্শনীর, বৈজ্ঞানিক গবেষণার. বিবরণ থাকবে।

(ঙ) দেশে-দেশে শিল্পী-বিজ্ঞানীদের ক্লাব গড়তে হবে, ক্লাবে-ক্লাবে সংযোগ রক্ষা করতে হবে, নতুন নতুন অভিজ্ঞতা অর্জ্জনের জন্য শিল্পীদের দেশ-দেশান্তরে ঘোরবার সুবিধে করে দিতে হবে, ওর বাধা-বিঘ্ন অপসরণ করতে হবে।

(চ) সভা, সমিতি, কন্‌ফারেন্স, ফেষ্টিভ্যাল প্রভৃতির মাধ্যমে শিল্প যেমন সমৃদ্ধ হবে, তেমন আন্তর্জ্জাতিক পরিচিতি ও প্রীতি জাতির সহ-অবস্থান সংশয় বিহীন করে তুলবে।

(ছ) কপিরাইট এবং শিল্পীদের পারিশ্রমিকের সম্বন্ধে যে কনভেনশন চালু রয়েছে, তার অসামঞ্জস্য দূর করতে হবে।

(জ) দুইটি বিশ্বযুদ্ধে যে-সব মূল্যবান চিত্রের বা স্থাপত্যের ক্ষতি হয়েছে, তাদের ফোটোগ্রাফিক প্রতিলিপির একটি ভ্রাম্যমান প্রদর্শনী দেশে-দেশে ঘুরিয়ে বোঝাতে হবে—বিশ্বযুদ্ধে বার বার মানব-সংস্কৃতির কি ক্ষতিই না হয়েছে।

(ঝ) শান্তি-সংক্রান্ত ফিল্ম তৈরীর ক্ষেত্র ও উপাদান সংগ্রহের জন্য দেশে-দেশে ফিল্ম ক্লাব স্থাপন করতে হবে।

(ঞ) যে-সব ফিল্ম-পরিচালক এবং আর্টিষ্ট ফিল্ম তৈরী করতে চান, কিন্তু নিজ-নিজ দেশে তা তৈরীর সুযোগ করে নিতে পারেন না, তাঁদের সাহায্যের ব্যবস্থা করতে হবে, অথ বা একাধিক দেশের সমবেত প্রয়াসে যৌথ প্রথায় তা তৈরি করতে হবে।

(ট) বিজ্ঞান, সংস্কৃতির মতোই, বিশ্বপ্রকৃতির মতোই, সকল মানুষেরই সম্পদ। তাই সকল মানুষই যাতে বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারের সুফল ভোগ করতে পারে, তার ব্যবস্থা করতে হবে।

(ঠ) আজকার শিশুরাই আগামী কালের নায়ক ও কর্ম্মি, জনক ও জননী। কাজেই আজকার শিশুদের পাঠ্যপুস্তকে দিগ্বিজয়কে গৌরবজনক বলে বর্ণনা করা হবে না, জনহত্যাকে বীরত্বের পরিচয় বলে প্রতিষ্ঠা দেওয়া হবেনা। পাঠ্যপুস্তকে এমন সব বিষয় সন্নিবেশ করতে হবে, যাতে করে শিশুরা বুঝতে পারে মানুষ মানুষের শত্রু নয়, জাতি হিসেবে শ্রেষ্ঠ বা নিকৃষ্ট বিবেচিত হবার মতো কোন দুস্তর ব্যবধান নেই।

(ড) শিশুদের জনক-জননীদের, শিক্ষক-শিক্ষিকাদের, মনে রাখতে হবে যে, নতুন পৃথিবী যে নতুন মানুষ কামনা করে, তা গড়ে তোলবার দায়িত্ব তাঁদেরই।

এ ছাড়া সাংস্কৃতিক কমিশন দুইটি আবেদন প্রচার করেন, যাতে করে সাংবাদিক আর সাহিত্যিকদের আহ্বান করা হয় কমিশনের সুপারিশগুলিকে সহযোগিতা দ্বারা সফল করে তুলতে। পৃথিবীর সত্তরটি জাতির বারো শত নরনারী সাতদিন এবং একটি পুরো-রাত আলাপ-আলোচনা করে কংগ্রেসের কাছে যে সুপারিশ করেন, কংগ্রেস সর্ব্বসম্মতি ক্রমে তা গ্রহণ করেছেন এবং বিশ্বের জনগণের কাছে তা উপস্থিত করেছেন। বিশ্বের জনগণ এ-বিষয়ে যতটা সচেতন ও সক্রিয় হয়ে তাঁদের নিজ-নিজ রাষ্ট্রকে মানব-কল্যাণকর কাজে নিয়োগ করতে পারবেন, ততই তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধের সম্ভাবনা হ্রাস পাবে। বলা বাহুল্য, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর যে গণ-চেতনা জাগ্রত হয়েছে, তাহা-ই তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধকে এতদিন ঠেকিয়ে রেখেছে। আগেকার মতো জনগণ যদি নির্ব্বিকার ও নিষ্ক্রিয় থাকত, তাহলে ক্ষমতালোভীরা, যুদ্ধবাজরা, তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধ বাধিয়ে দিত। জনগণের তীক্ষ্ণ দৃষ্টি ও দ্বিধাহীন প্রতিবাদ তার প্রতিবন্ধকতা করেছে। তাই কায়েমী স্বার্থের অধিকারীরা চেষ্টা করছে—পৃথিবীর জনগণকে ভয় দেখিয়ে, উৎকোচ দিয়ে, আদর্শের আলেয়ায় ভুলিয়ে বিচ্ছিন্ন করতে। তা যাতে না তারা করতে পারে, তারই জন্য বিশ্বশান্তি সংসদ অনুষ্ঠিত এই আন্তর্জ্জাতিক কংগ্রেসের আবশ্যকতা আছে এবং আবশ্যকতা আছে তাকে দল-মতের উর্দ্ধে রাখবার, মানব-প্রীতিকে প্রগাঢ় করবার, মানবতাকে বিকশিত করবার।

আট দিনে কংগ্রেসের কাজ শেষ হয়ে যায়। এই আট-দিনের মাঝে ডেলিগেটদের যিনি যখনই সময় পেয়েছেন, তিনি তখনই যতটা পারা যায় ষ্টকহোলমের দ্রষ্টব্য বিষয়গুলি দেখবার অবকাশ করে নিয়েছেন।

রাণী রায়চৌধুরাণী একদিন বল্লেন—কোথায় থাকেন গোপালদা! মিড্‌সামার নাইটস্‌ ড্রিম দেখলেন না? আমি দেখে এলাম। চমৎকার!

—একদিন দেখব ভাবছি ত।

—আর কবে দেখবেন!

সত্যি। ও-অভিনয় আমাদের আর দেখা হোলনা। কিন্তু আমার ওতে তেমন আফশোষ হয়নি, যেমন হয়েছে ষ্ট্রিণ্ডবার্গের দেশে গিয়ে তাঁর নাটক দেখতে পেলাম না বলে। আমাদের কংগ্রেস সাধারণত গরমের সময়েই হয়, সব দেশের ডেলিগেটরা প্রচণ্ড শীত সইতে পারবেন না বলে। গরমের সময় ও-সব দেশে নাটকের অভিনয় হয় না। খাঁটি থিয়েটারগুলি তখন বন্ধ থাকে।

আমাদের দেশে বারো-মাসই থিয়েটারে অভিনয় হয়। অভিনেতৃদের বিশ্রামের অবসর দেওয়া হয় না, জীবনের বৈচিত্র্য থেকে বঞ্চিত রেখে তাদের লাউড স্পীকারের মতো যন্ত্র করে ফেলা হয়, তাদের অন্তর-লোকের শিল্প-সত্তাকে জীবনের সর্ব্বরস থেকে বঞ্চিত রেখে শুকিয়ে শীর্ণ করে ফেলা হয়। আপিস-আদালতের কর্ম্মিদের অবশ্য মাঝে-মাঝে ছুটি দেওয়া হয়। কিন্তু তাদের যখন ছুটি হয়, তখন অভিনেতৃদের দ্বিগুণ শ্রম করতে হয়, মালিকের ক্ষয়-ক্ষতি নিবারণ করবার জন্য অথবা লাভের অংশ বাড়াবার জন্য। আমাদের অভিনেতৃদের কথা কেউ ভাবেন না—না থিয়েটারের মালিকরা, না দর্শকরা, না সরকার, না অভিনেতৃরা নিজেরা। কিছুটা আর্থিক স্বচ্ছলতা এবং নিরাপত্তা, কিছুটা স্বাস্থ্য এবং বৈচিত্র্য, নতুন অভিজ্ঞতা অর্জ্জনের কিছুটা সুযোগ, না পেলে অভিনেতৃরা জীবনে রসের যোগান কি করে পাবেন, তা কেউ ভাবে না। অথচ তাঁদের কাছে কত দাবী। দাবী পরিপূর্ণ আধুনিকতার, আর ব্যবস্থা ষোড়শ শতাব্দীর!

বাংলার ডেলিগেটরা 'ডাকহরকরা' ফিলম এর একটি কপি নিয়ে গিয়েছিলেন কংগ্রেসের ডেলিগেটদের দেখাবার জন্য। যে সন্ধ্যাতে সেটি দেখাবার ব্যবস্থা করা হয়, সেই সন্ধ্যাতেই ওখানকার একজন অধ্যাপক দশজন ভারতীয় ডেলিগেটকে সাপারে নিমন্ত্রণ করেন। আবার সেই সন্ধ্যাতেই বিশ্ব শান্তি সংসর্গের সাংগঠনিক-সভা আহূত হয়। আমি না পারলাম অধ্যাপকের আমন্ত্রণ রক্ষা করতে, না পারলাম ডাক-হরকরা প্রদর্শনীতে যেতে। গোপাল আর রাণী গেলেন নিমন্ত্রণ রক্ষা করতে, ডক্টর ভবানী ভট্টাচার্য্য আর তাঁর স্ত্রী সলিলা ভট্টাচার্য্যও তাই গেলেন। উমা, শোভা প্রভৃতি ফিল্ম প্রদর্শনী নিয়ে ব্যস্ত রইলেন।

শুনে বিস্মিত হলাম আর আনন্দও পেলাম যে, শোভা চক্রবর্ত্তী, যাঁকে কোনদিন লোকের সামনে দাঁড় করিয়ে একখানা গান শোনাতে

পারিনি, সেই শোভা, প্রেক্ষাগৃহে দর্শকদের সামনে দাঁড়িয়ে, সমগ্র 'ডাক-হরকরা' চিত্রটির ইংরেজীতে রানিং কমেন্টারী করে দর্শকদের বুঝিয়ে দিয়েছেন। অথচ ওর জন্য তিনি প্রস্তুত হয়ে যাননি। শুনে সত্যি-সত্যিই আনন্দ পেলাম। কর্ত্তব্য অপ্রত্যাশিতভাবে কাঁধে এসে পড়লে তা সুসম্পন্ন করবার শক্তি ও সামর্থ্য কালচারের পরিচয়। রইলই বা একগুঁয়েমি! শুনলাম তিনি কমেন্টারী করবার সময় কাঁপছিলেন। যদি চিত্ত বিশ্বাস আর উমা সহনবীশ তাঁর দুই-হাত চেপে ধরে দাঁড়িয়ে না থাকতেন, তাহলে, শোভা বল্লেন, তিনি পালিয়েই যেতেন। তা করলে বাঙালী মেয়েদের মুখে চুণ-কালি মাখিয়ে আসতে পারতেন! কিন্তু তিনি বিপরীত কাজই করেছেন, কেবল নিজেরই নয়, সকলেরই মুখোজ্জ্বল করেছেন। ওঁদেরই মুখে শুনলাম দর্শকদের ছবিটি ভালোই লেগেছে। তবে অনেকে নাকি মনে করেছেন ছবিটি অনাবশ্যক দীর্ঘ হয়েছে।

নিমন্ত্রণ থেকে গোপাল ফিরে আসতে জিজ্ঞাসা করলাম অধ্যাপকের বাড়ীতে ভোজের টেবিলে কি কথাবার্ত্তা হোলো?

গোপাল বল্লেন—ওঁরা ওঁদের দেশের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে অনেকটা নিশ্চিন্ত দেখলাম। ওঁরা মনে করেন সোশ্যালিজম প্রতিষ্ঠা কমিউনিজম-এর মাধ্যমে যে হতেই হবে, এ-কথা মনে করবার কোন কারণ নেই।

—আপনি কি বল্লেন? আমি জিজ্ঞাসা করলাম।

—ও নিয়ে আমি তর্ক তুলিনি। তবে ওঁদের আত্ম-সন্তুষ্টি লক্ষ্য করে আমি বলেছিলাম—দুটো যুদ্ধে তোমরা নির্লিপ্ত থাকতে পেরেছিলে, তাই ঘর গুছিয়ে নেবার অবসর পেয়েছ। কিন্তু আণবিক যুদ্ধ হয় যদি?

—তিনি কি বল্লেন?

—তিনি বল্লেন তাই ত সুইডেন যুদ্ধের বিপক্ষে, এবং শক্তি-জোট নিরপেক্ষ, ভারতবর্ষেরই মতো।

—আপনাদের আলোচনা লাফিয়ে-লাফিয়ে চলছিল, বলুন। এক কথার জবাবে আর এক কথা।

—উপায় কি, বলুন! নুন খেতে-খেতেই কিছু গুনাহ করা যায় না। ওঁরা বল্লেন—জাতীয়-জীবনের সকল সমস্যাই প্রায় ওঁরা সমাধান করে ফেলেছেন। বেকার দেশে নেই বল্লেই হয়। জীবন-যাত্রার মান স্থিরগতিতে উর্দ্ধগামী হচ্ছে, হাঙ্গামা-হুজ্জত ক্রমশই কমে যাচ্ছে। কো-অপারেটিভ প্রয়াস যে সকলেরই কল্যাণকর, সে-কথাও বেশি লোক বুঝতে পারছে এবং মেনেও চলছে। শিক্ষা ক্রমশই লিবারেল হচ্ছে, জাতীয় সংস্কৃতিও দানা বাঁধছে। কিন্তু একটি বিষয়ে ওঁরা বেশ শঙ্কিত হয়ে পড়েছেন।

—সে বিষয়টি কি?

—টেলিভিশনের হরার-কমিকস্। ওঁদের ভয়—ওর প্রভাব ভবিষ্য-বংশধরদের ক্ষতি করবে। ও-ধরণের লিটারেচারের আমদানি তাঁরা বন্ধ করে দিয়েছেন। কিন্তু ওই টেলিভিশন প্রোগ্রাম তাঁরা কেমন করে বন্ধ করবেন?

ক্রিষ্টেনবুর্গ হোটেলের লবীতে দু'তিন দিন টেলিভিশনের ওই প্রোগ্রাম আমি দেখেছি, সইতে পারিনি। ভালো প্রোগ্রাম যে আদৌ হয় না, তা নয়। কিন্তু ছেলে-মেয়েদের তা দেখবার আগ্রহ কোথায়? সমস্যাটা আমাদের দেশে আসেনি। কিন্তু ও-সব দেশে এসেছে। ওঁদের চিন্তাশীলরা অস্বস্তি বোধ করছেন, আমরা যেমন অস্বস্তি বোধ করছি এক ধরণের ফিল্ম-এর প্রভাব দেখে। ওই ফিল্ম আমাদের সাহিত্যের, নাটকের, এমন কি সাংসারিক জীবনের উপরও প্রভাব বিস্তার করছে। শাসকদের উপরও যে করছে না, তাও বলা যায় না। কেউ ও-বিষয়ে চিন্তা করেন, কেউ মুনাফার কথা ভেবে নিশ্চিন্ত থাকেন। যখন নিশ্চিন্ত থাকা যাবেনা, তখন দেখা যাবে সমগ্র সমাজ অনেকটা নেমে গিয়েছে। সুইডেনের চিন্তাশীলরা ধোঁয়া দেখে আগুনের অস্তিত্ব বুঝে চিন্তিত হয়েছেন।

ষ্টকহোলমে থাকবার দিন ফুরিয়ে এলো। তাই একদিন সকালে সিটি হল দেখতে গেলাম। সিটি হলটি দেখে মনে হয় মধ্য-যুগের একটি দুর্গ। কিন্তু আসলে ওটিকে মিউনিসিপালিটির সভা এবং নাগরিক প্রশাসনের আপিস হিসেবে ব্যবহার করা হয় ১৯২৩ খৃষ্টাব্দ থেকে। বাড়িটি সিটি রিসেপশান হল হিসেবেও ব্যবহার করা হয়। ওর টাওয়ারে উঠে সমগ্র শহরটি দেখা যায়, পাদমূলে হ্রদের ছোট-ছোট ঢেউগুলি আছড়ে পড়ছে।

গাইড আমাদের উপরে নিয়ে গেল। মিউনিসিপালিটির সভাগৃহে ঢুকে আসবাব-পত্রের জাঁকজমক দেখে জিজ্ঞাসা করলাম—এগুলি কি তোমরা সাজিয়েই রেখেছ, না সত্যি সত্যিই এখানে মিউনিসিপালিটির সভার অধিবেশন হয়? নিয়মিত বৈঠক হয়, বলে গাইড দেখালেন কোথায় কোন দলের লোকেরা বসেন। এক-সারিতে মাত্র তিনখানা আসন দেখিয়ে গাইড বল্লেন—এই হচ্ছে কমিউনিষ্টদের আসন।

তাঁর ধারণা আমরা যখন শান্তি কংগ্রেসে এসেছি, তখন আমরা নিশ্চিতই কমিউনিষ্ট। ওদেশের কাগজে লিখত—কমিউনিষ্টদের কংগ্রেস। আমরা আশ্চর্য্য হচ্ছিলাম এই ভেবে যে, আসনগুলি এমন তক্‌-তকে ঝক-ঝকে রয়েছে কেমন করে! ওদের মিউনিসিপাল কাউন্সিলাররা ত খুব শিষ্ট-শান্ত প্রকৃতির লোক।

অপর একটা ঘরে নিয়ে গিয়ে গাইড বল্লে, এটা ব্লু রুম। তাতে খুব সুন্দর ফ্রেস্কো আঁকা। ওগুলি নাকি ওঁদের রাজকুমারের আঁকা। তারই পাশে ভোজের হল। নাগরিক ভোজ ওইখানেই দেওয়া হয়, নাচও হয়।

নিচে নেমে এসে হ্রদের কিনারা দিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছি। দুটি বাঙালী ছেলে এগিয়ে এলেন। তাঁরা আমাদের চেনেন। তাঁদের একজনের বাড়ী হাতী বাগানে। আর একজন গোপালের ভাইয়ের বন্ধুর ছেলে। ম্যাঞ্চেষ্টারে কি বার্মিংহামে বল্লেন, এখন মনে নেই, এঞ্জিনিয়ারিং পড়েন। এখানে বেড়াতে এসেছেন। তাঁরা আমাদের একটা ফোয়ারার পাশে বসিয়ে ফোটো নিলেন।

মিলেস গার্ডেন আর একটা দেখবার জিনিস। কালর্স মিলেস সুইডেনের বিখ্যাত স্থপতি। তাঁর তৈরী মূর্ত্তিগুলি শিল্প হিসেবে প্রচুর খ্যাতি অর্জ্জন করেছিল। যায়গাটা তাঁর আবাস স্থল ছিল এবং যায়গাটিকে তিনি অলকাপুরী করে তুলেছিলেন। থাকে-থাকে পাহাড়ের উপর যেমন বাগান করেছিলেন, তেমন নিজের তৈরী নানা মূর্তিও প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। এখন সেখানে অপরের তৈরি ভাস্কর্যও স্থান পেয়েছে। বর্ত্তমানে মিলেস গার্ডেন সাধারণের সম্পত্তি হয়েছে।

শিল্পানুরাগীরা, বিলাসীরা, টুরিষ্টরা, লিডিংগো দ্বীপের এই বাগানটিকে তীর্থক্ষেত্র করে তুলেছেন। খুব ব্যয়বহুল রেস্তোরাঁ এখানে আছে। ওখানকার লোকেরাই বলে—আমেরিকানরা ছাড়া সেখানে খাবার সঙ্গতি আর কারু নেই। ওখান থেকে শহরের অনেকটা দেখা যায়,যেমন দেখা যায় স্লাশেন ষ্টেশনের কাছেকার এলিভেটরে দাঁড়িয়ে। দেখবার মত শহর ষ্টকহোলম। তাই দেখাবার নানারকম ব্যবস্থাও রয়েছে। শুধু টুরিষ্ট আকর্ষণ করবার জন্যই ওরা তা করেনি, নিজেদের শহরের রূপের গরবেও তা করেছে। নীচের দিকে চাইলে হ্রদের নীলিমা, ওপরের দিকে চাইলে আকাশের নীলিমা, ডাইনে-বাঁয়ে শ্যাম বনানী, ধূসর পাহাড়, আর ফুলের বর্ণসমারোহ। সেই বর্ণসমারোহ আবার মেয়েদের পোষাকে। কোন্ রঙয়ের সঙ্গে কোন রঙ মিলবে, সে সম্বন্ধে তাদের বিস্ময়কর শিল্পের চেতনা। সব কিছুই স্নিগ্ধ, পরিপাটি।

যতই ভালো লাগুক, পরের দেশ ছেড়ে আসতেই হোলো। মানবতার সাগর-সঙ্গমে যে মেলা জমেছিল, দশ-দিন বাদে তা ভেঙ্গে গেল। আমরা তিনটি দলে বিভক্ত হয়ে পরপর আবার বল্টিক-সাগর আকাশ-পথে পাড়ি দিয়ে রীগায় ফিরে এলাম এবং রাতেই ট্রেণে চেপে মস্কোর দিকে ধেয়ে চল্লাম।

কাহিনী এবার পিছিয়ে নিয়ে নিচ্ছি ১৯৫৫ খ্রীষ্টাব্দে। সেবার হেলসিঙ্কি থেকে ট্রেণে গিয়েছিলাম সোবিয়েতে, অনেকগুলি ডেলিগেশান একসঙ্গে। ভারতীয়, চাইনিজ, ব্রিটিশ, আরবী, ভিয়েৎনামী, আর জাপানী একই কন্টিনেন্টেল ট্রেণে চাপলাম আমরা লেলিনগ্রাদের উদ্দেশ্যে। বিবেকানন্দ মুখোপাধ্যায় আর আমি একটি কুপেতে স্থান পেলাম। দিনের যতটুকু কাল অবশিষ্ট ছিল, জানালার রেশমী পর্দ্দা সরিয়ে ফিনল্যাণ্ডের পল্লী অঞ্চল চোখ ভরে দেখে নিলাম। ততক্ষণ ষ্টুয়ার্ডে এসে বিছানা করে দিয়েছে। বাইরে অন্ধকার নেমে আসতেই বিছানায় গা ঢেলে দিলাম। সকালে যখন ঘুম ভাঙল, তখন জিজ্ঞাসা করে জানলাম সোবিয়েৎ দেশে প্রবেশ করেছি। না জিজ্ঞাসা করলেও বুঝতাম, পারিপার্শ্বিক পরিবর্তন দেখে। ফিনল্যাণ্ড সর্ব্বত্র সৌন্দর্য্য ছড়িয়ে দিয়েছে। আর এখানকার প্রকৃতি যেন ধ্যান-গম্ভীর। ষ্টেশনের পর ষ্টেশন অতিক্রম করে চলেছি। কিন্তু কোনটারই নাম পড়তে পারছি না, জিজ্ঞাসাবাদ করে জেনে নিচ্ছি। যুদ্ধের সময় পড়া দু'একটা নাম যেন জানা-জানা বলে মনে হলো। রাত্রে খাওয়া হয়নি। কেননা আমাদের যাঁরা নিয়ে যাচ্ছেন, তাঁরা ভেবেছিলেন হেলসিঙ্কিতেই আমরা সাপার খেয়ে এসেছি। একখানা ডাইনিং-কারে এত লোকের খাবার ব্যবস্থা করাও সম্ভব হচ্ছে না। সকালে গাড়ীতে বসেই চা আর বিস্কুট পাওয়া গেল। একটা বড় ষ্টেশনে গাড়ী থামতেই বলা হোলো ষ্টেশনের ডাইনিং রুমেই খাওয়া-দাওয়া সেরে নিতে হবে। শ'দেড়েক বুভুক্ষু প্লাটফর্মে লাফিয়ে পড়লাম। কিন্তু অত লোকের এক সঙ্গে খাবার যায়গা ষ্টেশনের খাবার ঘরেও নেই। হাত মুখ ধুয়ে এদিক-ওদিক ঘুরে বেড়াতে লাগলাম। রুশ দেশে গিয়ে রুশ নর-নারী সে-ই প্রথম দেখলাম। যত রুশী উপন্যাস মনে ছিল, তাদের চরিত্রগুলির আকৃতি-প্রকৃতি স্মরণ করে ষ্টেশনে সমবেত জনতার মাঝে সেই টাইপ খুঁজে বার করবার চেষ্টা করলাম। কিছু কিছু সাদৃশ্য যে পেলাম না, তা নয়।

আমাদের উপন্যাসগুলির কথা মনে পড়ল। তাদের চরিত্রগুলির সঙ্গে আকৃতি-প্রকৃতিকে মেলে এমন লোক শহরের বাইরের জনতার মাঝে খুব কমই দেখতে পাওয়া যায়। আমাদের উপন্যাস পড়ে মনে হয়না যে আমাদের জাতি তাতে প্রতিফলিত হয়েছে, প্রতিফলিত হয়েছে শুধু বড় লোকরা আর বুদ্ধিজীবীরা : সমগ্র জাতিটি পোষাকে-পরিচ্ছদে, চেহারায় ব্যবহারে তাতে রূপায়িত হয় না। কিন্তু রুশী উপন্যাসে, তা তলস্তয়ের হোক আর গোর্কিরই হোক, তুর্গেনেভেরই হোক আর দস্তয়েভস্কিরই হোক, শোলকোভেরই হোক আর আলেক্‌সি তলস্তয়ের বা পান্তার নেকেরই হোক, রুশী বিশেষ একটি রূপ মনে দেগে দেয়। তাদের আজও পথে-প্রান্তরে দেখা যায়। চিনে নিতে মোটেও কষ্ট হয় না যে এঁরা একান্তই রুশী। রুশ সাহিত্যে নায়করা চিরকালই তাঁদের জনগণকে জানতে চেয়েছেন, বুঝতে চেয়েছেন, তাঁদের সৃষ্টিতে প্রতিফলিত করেছেন। তাই রুশ সাহিত্য বিশ্ব-সাহিত্যে বিশিষ্ট সাহিত্যের হয়ে রয়েছে। বাংলায় একটি বিশেষ সম্প্রদায় কিছুটা প্রতিফলিত হয়েছে, কিন্তু সমগ্র জাতি বেশ-ভূষায়, আচারে-ব্যবহারে, দোষে-গুণে. সমগ্রভাবে, খুব কমই প্রতিফলিত হয়েছে। সমগ্র বাঙালীর রূপ সম্বন্ধে একটি রূপের ধারণা বাংলার সাহিত্য থেকে করে নেওয়া শক্ত। রুশী সাহিত্য পড়ে রুশের জনগণের যে রূপ মোটামুটি মনে ছিল, ১৯৫৭-৫৮ খ্রীষ্টাব্দেও তার কিছু কিছু পথে প্রান্তরে দেখতে পেয়েছি ; দেখে মনে হয়েছে, কোনদিন যেন ওদের সঙ্গে আগে কোথাও দেখা হয়েছিল।

খবর পেলাম, খাবার ঘরে বসবার যায়গা পাওয়া যাবে। খেতে বোসলাম। বেশ গুরু ভোজ। দই, মাখন, মাংস, ডিম, বান্, শশা, টমেটো, কালো রুটি, শাদা রুটী, বিয়ার, মিনারেল ওয়াটার।

প্রায় ঘণ্টা তিনেক ওই ষ্টেশনে অপেক্ষা করে গাড়ী আবার আমাদের বয়ে নিয়ে চল্ল। এক সময় রমেশচন্দ্র আমাদের কামরায় এসে ঢুকলেন। তিনি বল্লেন ঘণ্টাখানেকের মাঝেই আমরা লেনিনগ্রাদে পৌঁছে যাব। ষ্টেশনে ডেলিগেশনকে অভ্যর্থনা জানাবে লেনিনগ্রাদ শান্তি কমিটি। তার প্রত্যুত্তরে প্রত্যেক ডেলিগেশনকেই কিছু কিছু বলতে হবে। ভারতীয় ডেলিগেশনের পক্ষ থেকে বিবেকানন্দ যদি কিছু বলেন, ভালো হয়।

বিবেকানন্দ বল্লেন—আমি বাংলায় বলব।

বাংলা-ইন্টারপ্রিটার তখনো পাওয়া যায়নি। তাই ঠিক হোলো তিনি

বক্তৃতাটা বাংলাতেই লিখবেন, পশ্চিম বাংলা শান্তি কমিটির সম্পাদক কল্যাণদত্ত তার ইংরেজী অনুবাদ পড়বেন, আর তাই রুশীতে শোনানো হবে কোন ইংরেজী জানা রুশী-ইন্টারপ্রিটারের সাহায্যে। বিবেকানন্দ বক্তৃতা, ছোট, লিখে ফেল্লেম।

লেনিনগ্রাদ ষ্টেশনে যখন ট্রেণ ঢুকল, মনে হোলো গোটা ট্রেণখানা যেন একটা ফুলের বাগানে ঢুকে পড়ল। অভ্যর্থনা করতে সমবেত হয়েছেন যে শত শত নর-নারী, তাঁদের প্রত্যেকেরই হাতে একটি করে ফুলের বাঞ্চ। আমরা ট্রেণ থেকে নামতেই তাঁরা ওই ফুলের তোড়া আমাদের প্রত্যেকের হাতে তুলে দিলেন। উভয় পক্ষের হাসি আর করমর্দ্দনের ভিতর দিয়েই অভ্যর্থনা আর কৃতজ্ঞতা বিনিময় হলো। এক পক্ষের ভাষা অপর পক্ষের কণ্ঠে নেই। কাঁধে হ্যাণ্ডব্যাগ ঝুলিয়ে আর হাতে ফুলের তোড়া আর ওভারকোট নিয়ে ষ্টেশনের বাইরে যাবার জন্য এগিয়ে চলেছি। হঠাৎ একটি দীর্ঘকায়া মহিলা পাশে এসে জিজ্ঞাসা করলেন—আপনি কি বাংলা ভাষায় কথা বলিতে পারেন?

—তিরিশ বছর বাংলা ভাষায় যখন নাটক লিখিয়াছি, তখন মনে হইতেছে বাংলা ভাষায় কথা বলিতে পারিব।

মহিলাটি একটু যেন ভড়কে গেলেন। আমি হেসে বল্লাম—আপনি ধরলেন কি করে আমি বাঙালী? আমার নাম শচীন সেনগুপ্ত।

—নাটক সম্বন্ধে আপনার লেখা একটি প্রবন্ধ 'পরিচয়' পত্রে প্রকাশিত হইয়াছিল। উহা আমি পড়িয়াছি। আমার নাম ভেরা নোভি-কোভা। আমি লেনিনগ্রাদ বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা ভাষার অধ্যাপিকা।

—আপনার নাম আমি শুনিয়াছি। অকস্মাৎ দেখা হইয়া গেল। ধন্য হইলাম।

মাদাম নোভিকোভার সঙ্গে তারপর প্রগাঢ় বন্ধুত্ব স্থাপিত হয়েছে। সে বন্ধুত্ব প্রায় আত্মীয়তার পরিণত হয়েছে আমার পরিবারে তাঁর, এবং তাঁর পরিবারে আমার যাওয়া-আসার ফলে। তাঁর নিজের, তাঁর স্বামীর, তাঁর ছেলের, মধুর ব্যবহার চিরদিন মনে থাকবে। সেবারকার প্রথম পরিচয়ের পর তিনি কোলকাতায় এসেছিলেন কোলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে বাংলা-ভাষার ক্লাশের লেকচার য্যাটেণ্ড করতে। তখন তাঁর সঙ্গে দেখা-সাক্ষাৎ হতো। তখন তিনি আমার বাড়ীতে এসে আমার বৌমাদের সঙ্গে, ছেলেদের সঙ্গে, আলাপ পরিচয় করে গেছেন। এবারও তিনি লেনিনগ্রাদ স্টেশনে আমাদের অভ্যর্থনা করতে উপস্থিত ছিলেন। কিন্তু এবার আর জিজ্ঞাসা করেননি, বাংলা-ভাষায় কথা বলতে পারি কিনা? এবার গোপালের আর আমার সব ভার তিনিই নিয়েছিলেন তাঁর দুটি ছাত্রীকে সহচরী করে। সেবারকার কথাতেই ফিরে যাওয়া যাক্।

স্টেশন থেকে বেরুতেই আমাদের একটা বড় পার্কে নিয়ে যাওয়া হোলো। সেইখানেই অভ্যর্থনা হবে। লেনিনের একটি প্রতিমূর্ত্তির সামনে ভীড়ের বাইরে আমি দাঁড়িয়ে রইলাম। অনতিদূরে বক্তৃতা শুরু হয়ে গেছে। মিসেস নোভিকোভা তিনটি তরুণীকে এনে বল্লেন—আমার ছাত্রী। ওই ইনট্রোডাকশনটি দিয়েই তিনি অন্যত্র চলে গেলেন। তরুণী তিনটী একে একে বল্লে:

—আমার নাম ইরা।

—আমার নাম ইনা।

—আমার নাম লেনা।

—বাংলাদেশ হইতে তোমরা কবে আসিয়াছ? আমি জিজ্ঞাসা করলাম। একজন বল্লে:

—আমরা লেনিনগ্রাদের মেয়ে, বাংলা শিখিয়া বাঙালী হইয়াছি।

আমি জিজ্ঞাসা করলাম—কি শিখিতেছ?

একজন বল্লে—শিক্ষা আমাদের সমাপ্ত হইয়াছে।

—এখন কি করিতেছ? জানতে চাইলাম।

—আমি রবীন্দ্রনাথের গল্পগুচ্ছ প্রথমভাগ অনুবাদ করিয়াছি। এই দেখুন। আমার হাতে একখানা বই দিল, রুশীতে লেখা।

অপর একটি তরুণীকে জিজ্ঞাসা কোরলাম—তুমি কি করিতেছ?

—আমি রবীন্দ্রনাথের শেষের কবিতা অনুবাদ করিতেছি। চমকে গেলাম। জিজ্ঞাসা কোরলাম—শেষের কবিতা তুমি বুঝিয়াছ?

সে বল্লে—মানুষের কথা মহামানুষ লিখিয়াছেন, মানুষ হইয়া কেন বুঝিব না?

এবার চমকালাম না, স্তব্ধ হয়ে গেলাম। মেয়েটি বোধ করি ভাবলে কথাটা ও-ভাবে বলা ঠিক হয়নি, তাই কৈফিয়ৎ কেটে বল্লে:—আপনি ত লেনিনগ্রাদে থাকিবেন, আপনার সহায়তা পাইব।

তাঁর শেষের কবিতা প্রকাশিত হয়েছে। এবার আর তাঁর সঙ্গে দেখা হয়নি। দ্বিতীয়াটির সঙ্গে দেখা হয়েছে। তৃতীয়াটির সঙ্গেও মস্কোতে দেখা হয়েছিল। ওঁদের প্রথমটি লেনিনগ্রাদ আর দ্বিতীয়টি মস্কো ওরিয়েন্টাল ইনস্টিটিউটে কাজ করেন। এবার আর ওঁদের সঙ্গে সাধু-ভাষায় কথা বলতে হয়নি, কথ্য বাংলা ওরা আয়ত্ত করে ফেলেছেন। এবার মাদাম নোভিকোভা একটি মেয়েকে দেখিয়ে বল্লেন—এই মেয়েটি বাংলার ছাত্রী। কিন্তু বন্ধুদের সঙ্গে বাংলায় কথা বলে না। আপনার সঙ্গেই ও বাংলায় কথা বলছে। আপনি ওকে পাশে-পাশে রাখবেন, আর বাংলায় কথা বলবেন। এবার যে দুদিন ছিলাম, মেয়েটি আমার সঙ্গে-সঙ্গেই থাকত। আমরা বাংলাতেই কথা বলতাম। মেয়েটি ইংরেজীও জানে। মেয়েটির নাম ছানা। মাদামও কোলকাতায় থেকে কথ্য বাংলা রপ্ত করে গেছেন। ওদের নিষ্ঠা দেখে বিস্মিত হতে হবে।

আবার গতবারের কথায় ফিরে যাই। বক্তৃতার পালা শেষ হতেই আমাদের বাসে করে হোটেলে নিয়ে যাওয়া হোলো। হোটেলে সিঙ্গল-রুমই পেলাম, বাথ সমেত। হোটেলটির নাম য্যাস্টোরিয়া। নামজাদা হোটেল। একটি মজার ইতিহাস আছে এই হোটেলটির।

নাৎসীরা তখন লেনিনগ্রাদ শহর ঘিরে ফেলে নিত্যই গোলাবর্ষণ করছে। লেনিনগ্রাদ মৃত্যু পণ করে আত্মরক্ষা করছে। শহরে অন্নাভাব। অনশনে লোক মারা যাচ্ছে। লেনিনগ্রাদ তবুও আত্ম-সমর্পণ করছে না। কিন্তু হিটলারের বদ্ধমূল বিশ্বাস, লেনিনগ্রাদ আত্মসমর্পণ করতে বাধ্য হবে; আর তখন তিনি ধুমধাম করে শহরে প্রবেশ করবেন, আর এই য্যাস্টোরিয়া হোটেলে ব্যাঙ্কোয়েট দিয়ে তিনি রুশ জয়ের উৎসব করবেন! সেই শুভ সময় কখন উপস্থিত হবে, তা তিনি জানেন না বলে হোটেল-কর্ত্তৃপক্ষের ওপর হুকুম জারি করলেন প্রতি রাতেই ব্যাঙ্কোয়েটের সব কিছু তৈরি রাখতে হবে। ব্যাঙ্কোয়েটে উপস্থিত থাকবার জন্য কোন কোন্ সম্মানীয় রুশীকে আমন্ত্রণ করতে হবে, তারও তালিকা তিনি পাঠিয়ে দিলেন।

হোটেলের কর্ত্তৃপক্ষ নিশ্চিত করে জানেন না, অদৃষ্টে কি আছে। সরে পড়বারও উপায় নেই। বাধ্য হয়ে প্রতি রাত্রেই ব্যাঙ্কোয়েটের সব আয়োজন করে শঙ্কিত হয়ে তাঁরা বসে থাকেন। কে জানে শহরে শয়তানের আবির্ভাব কখন অনিবার্য্য হয়ে পড়ে!

রাতের পর রাত যায়, হিটলার আর শহরে ঢোকবার পথ করে নিতে পারেন না। এ সেই লেনিনগ্রাদ, বিশ্বের সর্ব্বাপেক্ষা বিস্ময়কর বিপ্লব যেখানে রূপ-পরিগ্রহ করেছিল,—এ সেই লেনিনগ্রাদ, যা লেনিনকে মশলা যুগিয়েছিল রুশ জাতির নব-জীবন গড়ে তোলবার জন্য। সেই লেনিনগ্রাদ কি সহজে আত্ম-সমর্পণ করতে পারে?

একদিন দেখা গেল হিটলার পশ্চাদপসরণ করছেন রুশ বিজয় অসম্ভব বুঝে। তিনি দ্রুত বার্লিন অভিমুখে ধাবিত হলেন, রুশবাহিনী বার্লিনে প্রবেশ করল, হিটলারের আকাশ-স্পর্শী দম্ভ ধোঁয়া হয়ে উপে গেল! য্যাস্টোরিয়ায় প্রতি রাতে এখনো ব্যাঙ্কোয়েটের ব্যবস্থা থাকে বিদেশী সুহৃৎদের জন্য, মানবতা-বিরোধী দানবদের জন্য নয়। ক্রমশঃ

রূপকথার রাজকুমারী

মুন্নি যখন আমার নতুন তৈরী করা ফ্রক্‌টা পরলো তখন আনন্দে উচ্ছসিত হয়ে উঠলো। ফ্রক্‌টাও আমি অনেক যত্ন করে তৈরী করেছিলাম—সাদা ধব্‌ধবে জামার ওপর ছোট্ট নীল ফুলের পাড় দিয়ে। আনন্দে লাফাতে লাফাতে মুন্নি আয়নার সামনে গেলো। ঘুরে ফিরে চারিদিক থেকে মুন্নি তার ফ্রক্‌টা দেখলো তারপর ছুটলো তার বন্ধুদের দেখাতে তার নতুন জামা, তক্ষুনি বিকাল পর্য্যন্ত অপেক্ষা না করতে পেরে। আমি চেঁচিয়ে ডাকলাম ওকে, "মুন্নি, মুন্নি নতুন ফ্রক্‌টা খুলে যা—ওটা ময়লা হয়ে যাবে যে ওটা পরে বিয়ের নেমন্তন্নে যাবিনা?" মুন্নি ততক্ষণে বাড়ীর থেকে বহুদূরে। নতুন ফ্রক্‌টা পরে মুন্নিকে দেখে মনে হলো আমার যেন কোন এক পরীর দেশের রাজকন্যা, ওকে সত্যিই মানিয়েছিলো, আর সত্যিই এত সুন্দর লাগছিল। একবার ভাবলাম ডাকি ওকে কারণ ফ্রক্‌টা ওকে পরতে দিয়েছিলাম শুধু ঠিক হয় কিনা দেখার জন্য। ইতিমধ্যে রান্না ঘরের থেকে কি যেন একটা পোড়ার গন্ধ পেয়ে আমি উঠে গেলাম, তারপর আর আমার খেয়ালই ছিলনা। আমার হুঁস হল যখন রাধার গলা শুনলাম দরজার সামনে। রাধাকে দেখে খুব খুশী হলাম এবং ওকে নিয়ে যখন বসার ঘরে এলাম, দেখি মুন্নি দরজায় দাঁড়িয়ে।

ওকে দেখেই আমি রেগে আগুন—ফ্রক্‌টা একদম নোংরা করে ফেলেছে—বিয়েতে যাওয়ার সময় পরবেই বা কি? "ফ্রক্‌টার কি ছিরিই করেছো এখন পরবে কি বিকালে" বলে আমি ওকে মারতে যাচ্ছিলাম এখন সময় রাধা মুন্নিকে সরিয়ে নিয়ে আমায় ধম্‌কালো—" তোর মাথা খারাপ

হল নাকি' এতটুকু বাচ্চাকে মারছিস। "মুন্নি বাঁচলো আর ফ্রক্‌টা খুলে রাখলো তাড়াতাড়ি।"

ফ্রক্‌টা নিয়ে আমি কলতলায় পরিষ্কার করতে এলাম এবং যখন ফ্রকটাকে আছড়াতে যাচ্ছি, রাধা বললো" মেয়ের ওপর রাগটা কি ফ্রকের ওপর ফলাবি!"

"এটা না কাচলে ও পরবেটা কি? অন্য ভাল জামা যে আর নেই" আমি বললাম। রাধা বললো, "কিন্তু ওটা আছড়ালে ছিঁড়ে যাবে যে।"

আমি বললাম "না আছড়ালেই বা কাচবো কি করে?" "আছড়াবার কি দরকার—ভাল সাবান ব্যবহার করলেই হয়। আমি তো সানলাইট ব্যবহার করি।" "কিন্তু সানলাইট কি সত্যিই এত ভাল সাবান?" "সত্যিই সানলাইটে জামা-কাপড় সাদা ও উজ্জ্বল হয়। এবং এটা এত বিশুদ্ধ যে এতে কাপড়ের কিছু ক্ষতি হয় না।"

"কিন্তু সানলাইটে খরচা বেশী পড়েনা?" রাধা তো হেসেই আকুল—" সে কিরে, ভেবে দ্যাখ্‌, একটু ঘষলেই সানলাইটে এত ফেনা হয় যে এক গাদা জামাকাপড় কাচা চলে অল্প সময়েই সাদা ধব্‌ধবে করে। এছাড়া পিটে আছড়ে কাপড়ের সর্বনাশও হয়না, নিজেরও ঝামেলা বাঁচে কতো—এর পরেও তুই বলবি খরচা বেশী।"

তক্ষুনি আমি একটা সানলাইট সাবান আনালাম এবং কাচা শুরু করতেই ফ্রকটা ফেনার স্তুপে ভরে গেলো আর দেখতে দেখতে সাদা ধব্‌ধবে হলো। সন্ধ্যেবেলা নতুন কাচা ফ্রকটা পরে মুন্নিকে সত্যিই পরীদের গল্পের রাজকুমারীর মত লাগছিলো। আমি মুন্নিকে কপালে কাজলের টীপ্‌ পরিয়ে দিলাম।

হিন্দুস্থান লিভার লিঃ, বোম্বাই

S/P. 3 B-X52 BG
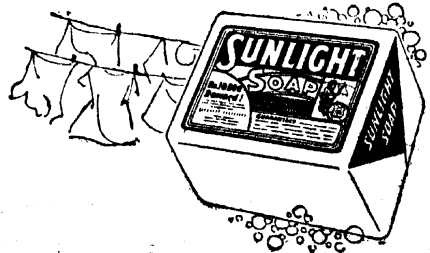
খাদ্যদ্রব্যের মূল্য বৃদ্ধি—

গত জুলাই মাসের প্রথম হইতে পশ্চিমবঙ্গে চাউলের মূল্য বৃদ্ধির ফলে সকল খাদ্য দ্রব্যেরই মূল্য বাড়িয়া গিয়াছে। মাছের মূল্য বৃদ্ধির কথা আমরা অন্যত্র উল্লেখ করিয়াছি। পাকিস্তানী ডিম আমদানী বন্ধ হওয়ায় ১ জোড়া ডিমের দাম ৪ আনা স্থলে ৮ আনা হইয়াছে। নানা স্থানে বিশেষতঃ কলিকাতার নিকটস্থ বসিরহাট অঞ্চল ও সুন্দরবন এলাকার একাংশ বন্যায় ডুবিয়া যাওয়ায় তরিতরকারীর দামও অসম্ভবরূপে বাড়িয়া গিয়াছে। পাকিস্তান হইতেও প্রচুর তরিতরকারী আমদানী হইত, তাহাও প্রায় বন্ধ হইয়াছে। চোরাকারবারীদের জন্য তেল, চিনি, মসলা প্রভৃতির দাম বাড়িয়াছে। সরকারী খাদ্য বিভাগের অব্যবস্থার ফলে সর্বত্র চালের মণ ৩০ টাকা হইয়াছে। কাজেই নিম্নবিত্ত সাধারণ লোকের দুঃখ-দুর্দ্দশার অন্ত নাই। সহর ও সহরতলী অঞ্চলে রেশনের দোকানে—ভাল হউক, মন্দ হউক, চাল সকল সময়ে পাওয়া যায়; কিন্তু মফঃস্বলে বেশী সময় দোকানে চাল যায় না—সাধারণ মানুষ ৩০ টাকা মণের চাল কিনিতে বাধ্য হয়। চাল কিনিতে সব টাকা ব্যয় হইলে তরিতরকারী, মাছ, তেল, লবণ প্রভৃতি কিনিবার পয়সা থাকে না। কতদিন মানুষ এই দুঃখ-দুর্দ্দশা নীরবে সহ্য করিবে। খাদ্যমন্ত্রী কি ইহার কোন প্রতীকার করিতে পারেন না?

পশ্চিমবঙ্গে মৎস্যাভাবের কারণ—

গত কয়েক সপ্তাহ ধরিয়া পাকিস্তান সীমান্তে রপ্তানী আইন কঠোর হওয়ার ফলে পূর্ব পাকিস্তান হইতে পশ্চিমবঙ্গে আর মৎস্য আমদানী হইতেছে না। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের মৎস্য বিভাগের এক মুখপাত্র গত ২৯শে জুলাই পশ্চিমবঙ্গের মাছের অভাবের ঐ কারণ প্রকাশ করিয়াছেন। কলিকাতা সহরে প্রতিদিন ৬ হাজার মণ মাছ প্রয়োজন—সেখানে বর্তমানে কলিকাতায় মাত্র ৩ হাজার মণ মাছ আসে। হুগলী নদীতে ইলিশ মাছও এবার (১৭ই আগষ্ট পর্য্যন্ত) আদৌ আসে নাই। গত বৎসর এই সময়ে প্রত্যহ পূর্ব পাকিস্তান হইতে ৬ শত মণ মাছ আসিত—এবার তাহা কমিয়া মাত্র ২ শত মণ মাছ আসিতেছে। হাসনাবাদের নিকটস্থ সাঁকরা খাল দিয়া নৌকাযোগে পূর্ব পাকিস্তান হইতে যে জীবন্ত মৎস্য আসিত, পুলিশ নৌকা আটক করায় সে মাছও আর আসে না। মাছ সম্বন্ধে পশ্চিমবঙ্গ কি স্বয়ংসম্পূর্ণ হইতে পারে না? মাছও খাদ্যের অঙ্গ—কাজেই নূতন খাদ্য উৎপাদন-মন্ত্রী শ্রীতরুণকান্তি ঘোষের দৃষ্টি এ বিষয়ে আকৃষ্ট হওয়া প্রয়োজন।

চিনির মূল্য নিয়ন্ত্রণ—

চিনির মূল্যের উর্দ্ধগতি রোধ করার উদ্দেশ্যে ভারত সরকার পশ্চিমবঙ্গ হইতে অন্য রাজ্যে চিনি রপ্তানী বন্ধ করার নির্দ্দেশ দিয়াছেন। গত ২৯শে জুলাই দিল্লী হইতে ঐ নির্দ্দেশ আসা মাত্র সংশ্লিষ্ট ব্যবসায়ীদের বিষয়টি জানাইয়া দেওয়া হয়। ইতিমধ্যে ঐ নির্দ্দেশের কথা জানিতে পারিয়া ব্যবসায়ীরা নানা উপায়ে হাজার হাজার মণ চিনি অন্য রাজ্যে প্রেরণের ব্যবস্থা করিয়া ফেলে। কলিকাতার এনফোর্সমেণ্ট বিভাগের পুলিস সে খবর পাইয়া বহু সহস্র মণ চিনি নানা স্থানে আটক করিয়াছে। ঐ আটক চিনির মূল্য কয়েক কোটি টাকা। শুধু চিনি ধরিলেই হইবে না, যে সকল দুষ্ট ধনী ব্যবসায়ী ঐ ভাবে কোটি কোটি দরিদ্রের সর্বনাশ করিয়া অন্যায়ভাবে অর্থ উপার্জনে প্রবৃত্ত হইয়াছিল, তাহাদের যদি কঠোর শাস্তির ব্যবস্থা করা না হয়, তবে দেশে এইরূপ অরাজকতা চলিতে থাকিবে এবং দেশের দরিদ্র জনসাধারণকে ১২ আনা সেরের চিনি পাঁচসিকা সেরে কিনিতে হইবে। আজ শাসক-গোষ্ঠির সম্মুখে বিষম সমস্যা উপস্থিত—ধনিক-তোষণ বন্ধ না হইলে দেশে বিপ্লব অবশ্যম্ভাবী।

সর্বত্র ভেজাল—

খাদ্যে ভেজালের জন্য দেশের ধনী দরিদ্র সকলে চিন্তান্বিত হইয়াছেন। চালে খুদ, কাঁকর, কুঁড়া প্রভৃতি

ভেজাল দেওয়া হয়—আটার মধ্যে পাথর গুঁড়া, তেল-ঘির ত কথাই নাই—তাহাতে দেওয়া হয় না—এমন জিনিষ নাই। দুধে ভেজাল—শুধু জল নহে—অন্যান্য জিনিষও আছে। কাঠের গুঁড়া, চামড়ার গুঁড়া প্রভৃতি চা'য়ের সঙ্গে মিশাইয়া দেওয়া হয়। হলুদ, জিরা, মরিচ প্রভৃতি মসলাতেও ভেজাল—হলুদে ছোট সরু গাছের ডাল কাটিয়া হলুদে রং দিয়া মিশানো হয়—মাটীর জিনিষেও রং করিয়া হলুদের সঙ্গে মেশানো হয়। চোরকাঁটা, সিমেণ্ট, চিটেগুড় ও সাদা গুঁড়া মিশাইয়া জিরে প্রস্তুত হয়—গোলমরিচে পেঁপে বীচি, লবঙ্গে বুনো ফুলের বোঁটা, মাটীতে রং করিয়া খয়ের, লবণ ও সাদা আটা মিশাইয়া সোড়া প্রস্তুত হয়। গত ৭ মাসে ২৪ পরগণা, হাওড়া ও কলিকাতার নানা স্থানে হানা দিয়া ঐ সকল ভেজাল তৈয়ারীর শতাধিক কারখানা ধরা পড়িয়াছে। কিন্তু ঘটনা ঐ পর্য্যন্ত—জুয়াচোরদের শাস্তির কোন খবর পাওয়া যায় না। পুলিসও কি ভেজালে পরিণত হইয়াছে—তাহারাও কি আর ঠিক মত কাজ করে না?

পশ্চিমবঙ্গের জন্য ঋণ—

পশ্চিমবঙ্গের পথ ঘাটের উন্নতি, দুর্গাপুরে কোকচুল্লী, গ্যাসগ্রীড, শক্তি উৎপাদন পরিকল্পনা এবং দ্বিতীয় পাঁচশালা পরিকল্পনার অন্যান্য কার্য্যের জন্য পশ্চিমবঙ্গ সরকার শতকরা ৪ টাকা সুদে ৭ কোটি টাকার (১৯৭১) ঋণ সংগ্রহ করিয়াছেন। এই ভাবে জনগণের নিকট ঋণ সংগ্রহ করার প্রয়োজন ও যৌক্তিকতা আছে। আমাদের দেশের লোক এখনও ঘরে যে টাকা জমাইয়া রাখে, তাহা দ্বারা কোন কিছু উৎপন্ন হয় না—ঐরূপ অনুৎপাদক টাকা সরকারী ঋণে পরিণত করিলে দেশ উপকৃত হয়। ভারতের ১২টি রাজ্যে ঐ ভাবে ৫৭ কোটি ৫০ লক্ষ টাকা ঋণ গ্রহণের ব্যবস্থা হইয়াছে। ইহা আনন্দের বিষয়।

ভারতকে ঋণ দান—

৩০শে জুলাই নয়া-দিল্লী হইতে ঘোষণা করা হইয়াছে যে সোভিয়েট সরকার তৃতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার জন্য ভারতকে ১৮০ কোটি টাকা ঋণ দিতে সম্মত হইয়াছেন। ঐ দিন বোম্বায়ে মাদ্রাজ বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস-চ্যান্সেলার ডাঃ এস-মুদালিয়ার জানাইয়াছেন যে উচ্চ কারিগরী শিক্ষার জন্য কানাডা সরকার ভারতকে ১ কোটি ডলার দান করিয়াছেন। এই সকল অর্থে ভারতকে সমৃদ্ধ করা হইবে; এরূপ ঋণ যত অধিকই গৃহীত হউক না কেন, ভারতে কৃষি-শিল্পের উৎপাদন বর্দ্ধিত হইলে সে ঋণ শোধ করিতে অধিক সময় লাগিবে না।

পরলোকে প্রভাময়ী মিত্র—

গত ১০ই শ্রাবণ ১৩৬৬ সোমবার (ইং ২৭শে জুলাই) "লোকান্তর" ও "পারায়ণ" রচয়িতা ৺সুরেন্দ্রনাথ মিত্রের পত্নী সুলেখিকা প্রভাময়ী মিত্র পরলোকগমন করিয়াছেন। তিনি জীবনে একাধারে কবি, সাহিত্যিকা, বাগ্মী ও শিল্পী ছিলেন। এক সময় তিনি ভারতবর্ষের নিয়মিত

প্রভাময়ী মিত্র

লেখিকা ছিলেন। তাঁহার রচিত "দেউল" নাটক ও "মায়াহ্নিকা" কাব্যগ্রন্থ উল্লেখযোগ্য। প্রভাময়ীর বাগ্মিতা ও দেশপ্রেম অনন্যসাধারণ। তিনি শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ শিষ্য শ্রীমৎ শিবানন্দ স্বামীর কৃপাধন্যা এবং শ্রীশ্রীসারদেশ্বরী আশ্রমের সহিত সংযুক্ত থাকিয়া সমাজে নারীকল্যাণের বিশেষ অংশ গ্রহণ করিয়াছিলেন। পরলোকতত্ত্বের বিষয়ে তাঁহার গভীর অভিজ্ঞতা ছিল।

জেলা বিভাগ—

২৪ পরগণা জেলাকে ২ ভাগে ভাগ করা হইবে—সে জন্য উদ্যোগ আয়োজন চলিতেছে—সম্ভবতঃ আগামী ১লা

এপ্রিল ঐ জেলায় ২টি সদর স্থাপিত হইবে। বর্দ্ধমান জেলাকেও ২ ভাগে ভাগ করা হইবে—এখন ও এলাকা স্থির হয় নাই। তবে আসানসোল—দুর্গাপুর অঞ্চলকে পৃথক না করিলে শাসন ব্যবস্থা পরিচালনার যে অসুবিধা হইবে তাহা সকলে স্বীকার করেন। নদীয়া জেলার ছোট একটি অংশকে ২৪ পরগণার মধ্যে আনিয়া ২৪ পরগণার একটি বৃহত্তর অংশ নদীয়ার মধ্যে লইয়া যাওয়ার প্রস্তাব হইয়াছে—এ প্রস্তাবের একদল বিরোধিতা করিলেও বিষয়টি চিন্তা করিয়া দেখা প্রয়োজন। শাসন ব্যবস্থার উন্নতির জন্য এইরূপ বিভাগের প্রয়োজন হইয়াছে।

উপেন্দ্রনাথ বিদ্যাভূষণ—

সিটি কলেজের খ্যাতনামা অধ্যাপক উপেন্দ্রনাথ রায় চৌধুরী বিদ্যাভূষণ শাস্ত্রী গত ২১শে জুলাই ৮২ বৎসর বয়সে কলিকাতায় পরলোক গমন করিয়াছেন। তিনি বরিশাল রায়ের কাটির রাজা শশিভূষণের পুত্র। কলিকাতা

উপেন্দ্রনাথ বিদ্যাভূষণ

সংস্কৃত কলেজ হইতে এফ, এ ও বি, এ পাশ করিয়া ১৮৯৮ সাল হইতে ১৯৩৮ সাল পর্য্যন্ত ৪০ বৎসর কাল তিনি সিটি কলেজের অধ্যাপকের কাজ করিয়াছিলেন। তিনি বহু গ্রন্থ রচনা করিয়া ও খ্যাতি লাভ করিয়াছিলেন।

রমাপ্রসাদ গুপ্ত—

খ্যাতনামা পেন্সিল ব্যবসায়ী মেসার্স এক, এন, গুপ্ত কোম্পানীর ফণীন্দ্রলাল গুপ্তের জ্যেষ্ঠ পুত্র রমাপ্রসাদ গুপ্ত গত ১৫ই জুলাই ৫৯ বৎসর বয়সে কলিকাতায় পরলোক

রমাপ্রসাদ গুপ্ত

গমন করিয়াছেন। পেন্সিল ও কলমের ব্যবসা শিক্ষার জন্য তিনি ভারতের বাহিরে নানা দেশে যাইয়া ঐ শিল্প সম্বন্ধে অভিজ্ঞতা অর্জন করিয়াছিলেন। পেন্সিল ব্যবসায়ী সমিতির সভাপতিরূপে তিনি ঐ শিল্পের উন্নতি বিধানে সর্বদা অবহিত থাকিতেন।

রুশিয়ার ভারত-প্রীতি বৃদ্ধি—

কেন্দ্রীয় সরকারের বৈজ্ঞানিক গবেষণা ও সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রী অধ্যাপক হুমাউন কবীর তিন সপ্তাহ সোভিয়েট রুষিয়ায় ভ্রমণের পর দিল্লীতে ফিরিয়া ২৯শে জুলাই প্রকাশ করেন—রুশিয়ায় সকল শ্রেণীর সকল লোকের মধ্যে ভারতের প্রতি প্রীতি ও শ্রদ্ধা বর্দ্ধিত হইতেছে দেখিয়া তিনি খুব আনন্দিত হইয়াছেন। ১৯৫৬ সালে অধ্যাপক কবীর প্রথম রুশিয়ায় গিয়াছিলেন—এবার দ্বিতীয়বার তিনি রুশিয়া দেশে গিয়াছিলেন। ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা পর্য্যন্ত রুশিয়ায় সকলে ভারতের সব খবর রাখে ও ভারত যে শান্তি প্রতিষ্ঠায় উদ্যোগী—সে জন্য তাহারা ভারতকে শ্রদ্ধা করে। সেখানে কিণ্ডারগার্টেন স্কুলে ছাত্র-ছাত্রীরা সকাল সাড়ে ৭টা হইতে সন্ধ্যা ৭টা পর্য্যন্ত থাকে। খুব মেধাবী ছাত্র ছাড়া কেহ বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়িতে যায় না। অধ্যাপক কবিরের অভিজ্ঞতার কথা এ দেশে বহুল প্রচারের ব্যবস্থা হইলে দেশবাসী উপকৃত হইবে।

মাধ্যমিক শিক্ষার ক্রমোন্নতি—

গত ২৭শে জুলাই নয়াদিল্লীতে সারা ভারতের মধ্যশিক্ষা পর্ষদের প্রথম অধিবেশনে স্থির হইয়াছে, ১৯৬০-৬১ সালে দেশে যে সকল হাইস্কুল থাকিবে, তৃতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা কালে তাহার শতকরা ৫০টিকে উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে পরিণত করা হইবে। স্কুল ফাইনাল পরীক্ষায় পাশের হার কমিয়া যাওয়ার কারণরূপে (১) ত্রুটিপূর্ণ পাঠক্রম (২) পরীক্ষাগ্রহণের অতি পুরাতন পদ্ধতি (৩) ইংরাজীতে ছাত্রদের খারাপ পরীক্ষা দান (৪) প্রাইভেট পরীক্ষার্থীদের সংখ্যাধিক্য (৫) সংকীর্ণ মানের দ্বারা সকল পরীক্ষার্থীর বিচার—প্রভৃতি আলোচিত হয়। সম্মিলনে ৫টি বিষয়ের আলোচনার জন্য ৫টি সাব কমিটী গঠিত হইয়াছে—(১) উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয় ও সর্বার্থসাধক বিদ্যালয় (২) পাঠক্রম ও পরীক্ষা সংস্কার (৩) শিক্ষকগণ চাকরীতে থাকাকালে তাহাদের শিক্ষণ ব্যবস্থা (৪) পরীক্ষা-কার্য্য ও গবেষণা এবং (৫) বিজ্ঞান সম্পর্কে শিক্ষণ। মোটের উপর সকলেই বর্তমান শিক্ষা ব্যবস্থার সংস্কার চাহেন—কিন্তু তাহা কি ভাবে করা হইবে, সে সম্বন্ধে সর্বজনগ্রাহ্য পরিকল্পনার অভাবে এ কার্য্য অগ্রসর হইতেছে না। সত্বর এ সমস্যার সমাধান হওয়া দরকার।

সমাজ উন্নয়ন পরিকল্পনা—

পশ্চিমবঙ্গে সরকারী সমাজ উন্নয়ন পরিকল্পনার কাজ দ্রুত আগাইয়া চলিয়াছে। ১১৬টি ব্লকে প্রথম পর্য্যায়ের কাজ চলিতেছে ও ১৭টি ব্লকে দ্বিতীয় পর্য্যায়ের কাজ আরম্ভ হইয়াছে। ইহার ফলে একদিকে দেখা গিয়াছে—গ্রামের কৃষকদের মধ্যে ব্যাপক ভাবে রাসায়নিক সারের চাহিদা বাড়িয়া গিয়াছে। কোন কোন অঞ্চলে চাষের জন্য যে সেচ পরিকল্পনার অভাব রহিয়াছে—কৃষকগণ সর্বদা সে বিষয়টি সরকারকে জানাইতেছে। বিভিন্ন ধরণের ঋণ দানের ব্যবস্থায় সরকার কৃষকদিগকে স্বাবলম্বী করিবার চেষ্টা করিতেছে। খাদ্যোৎপাদন বৃদ্ধির দিকে সকলের মনোযোগ দেখা যায়। অন্য দিকে দেখা যায়—অনেক কৃষক জমীকে দো-ফসলী করার দিকে নজর দেয় নাই। কান্দী, বর্দ্ধমান, বনগাঁ প্রভৃতি অঞ্চলে সকলেই জলাভাবের জন্য চিন্তিত। সেচের উন্নতির জন্য বহু প্রকার চেষ্টা আরম্ভ হইলেও তাহার ফল কোথাও দেখা যায় না। গ্রামগুলি যে ক্রমে উন্নতির পথে চলিয়াছে—তাহা কেহই অস্বীকার করেন না। কিন্তু কি করিয়া এই উন্নয়ন পরিকল্পনা আন্তরিকতাপূর্ণ ও সক্রিয় করা যায়, তাহাই সকলের চিন্তার বিষয়।

তিব্বত তদন্ত কমিটি—

জেনিভাস্থ আন্তর্জাতিক জুরী কমিশন তিব্বত সম্পর্কে তদন্ত ও তিব্বতে ব্যাপক নরহত্যা সম্বন্ধে তথ্যানুসন্ধান করিবার জন্য পৃথিবীর নানা স্থানের বিশিষ্ট আইনজীবীদের লইয়া এক তদন্ত কমিশন গঠন করিয়াছেন। ভারত হইতে শ্রীরমাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় ও শ্রীনির্মলচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়কে ঐ কমিশনের সদস্য নিযুক্ত করা হইয়াছে। তিব্বত সম্বন্ধে একটি নিরপেক্ষ তদন্তের প্রয়োজন এবং কমিশনের অনুসন্ধানের ফল প্রচারিত হইলে সভ্য জগত সকল ঘটনা জানিতে পারিবে। দালাই লামার ভবিষ্যতও এই তদন্তের ফলে স্থির হইতে পারিবে।

সরকারী ক্ষতিপূরণ লইব না—

গত ১৩ই জুন পুলিসের গুলীতে কেরল রাজ্যের আঙ্কামালী সহরে যে ৭ জন নিহত হইয়াছে, কেরলের কম্যুনিষ্ট সরকার তাহাদের প্রত্যেকের পরিবারকে তিন হাজার টাকা করিয়া ক্ষতিপূরণ দিতে চাহিয়াছিলেন। মৃত ৭ ব্যক্তির পরিবারের ১৭ জন লোক ২৭শে জুলাই এক বিবৃতি প্রকাশ করিয়া জানাইয়াছেন—ক্ষতিপূরণ গ্রহণে মৃতের স্মৃতির প্রতি, মৃতের পরিবারবর্গের প্রতি ও গণতন্ত্রের প্রতিরক্ষায় সংগ্রামকারী রাজ্যের জনগণের প্রতি অপমান করা হইবে। কেরল সরকার মৃত ব্যক্তিদের অপরাধের কথা উল্লেখ করিয়াই ক্ষতিপূরণ দিবার প্রস্তাব করিয়াছিলেন। এই অর্থ গ্রহণের অসম্মতি জনগণের স্বাতন্ত্র্য ও স্বাজাত্যবোধের পরিচায়ক।

শিয়ালদহ ষ্টেশনের উদ্বাস্তু—

কলিকাতায় ২৯শে জুলাই স্থির হইয়াছে, যে সকল উদ্বাস্তু পরিবার গত ৭।৮ বৎসর ধরিয়া শিয়ালদহ ষ্টেশনে ও নিকটস্থ জমীতে বাস করিতেছে, তাহাদের পুনর্বাসনের এক পরিকল্পনা করা হইয়াছে—উহা ক্রমিক পর্য্যায়ে বিভক্ত। প্রথমে ১২টি কৃষক পরিবারকে কৃষি জমী দিয়া সরানো হইবে। পরে দলিলপত্র-সম্বলিত ১৭৭টি অকৃষক পরিবারকে লইয়া যাওয়া হইবে। শেষে ২ পর্য্যায়ে অন্যান্য ৪১০টি পরিবার ও ৩১৪টি শিবির-ত্যাগী পরিবারকে পুনর্বাসন

দেওয়া হইবে। বর্তমানে তথায় ৯১১টি উদ্বাস্তু পরিবার আছে—তন্মধ্যে ১৮৭টির দলিলপত্র আছে। ৪১৪টির কোন দলিলপত্র নাই। ইহার পূর্বে ২বার শিয়ালদহ ষ্টেশন হইতে সকল উদ্বাস্তু সরাইয়া ষ্টেশন এলাকা ফাঁকা করা হইয়াছিল—আবার নূতন উদ্বাস্তু আসিয়া ঐ স্থান পূর্ণ করিয়াছে। একদল দালাল নেতা সাজিয়া ঐ কাজ করে, অনেক সময় দরিদ্র উদ্বাস্তুদের নিকট তাহারা সে জন্য টাকা লয়। ঐ দালালের দলকে ধ্বংস করিতে না পারিলে পুনর্বাসনের কোন পরিকল্পনা সাফল্যমণ্ডিত করা সম্ভব হইবে না।

কলিকাতায় খেলার ষ্টেডিয়াম—

এতদিন কলিকাতার মত বিরাট সহরে কোন খেলার ষ্টেডিয়াম বা মঞ্চ নির্মিত হয় নাই—ইহা সহরবাসীর পক্ষে লজ্জার কথা। সম্প্রতি পশ্চিমবঙ্গ সরকার কলিকাতা গড়ের মাঠে এলেনবরা কোর্সের উত্তরপূর্ব কোণে ১৫ একর জমী ভারতসরকারের নিকট গ্রহণ করিয়া তথায় একটি ষ্টেডিয়াম নির্মাণের ব্যবস্থা করিয়াছেন এবং সেজন্য দুই কোটি টাকা ব্যয়ের পরিকল্পনা প্রস্তুত হইয়াছে। সেজন্য সরকার এক ষ্টেডিয়াম বোর্ড গঠন করিয়াছেন। প্রবীণ খেলোয়াড় ও মন্ত্রী শ্রীভূপতি মজুমদার ঐ বোর্ডের সভাপতি এবং রাজ্যপালের ডেপুটী সেক্রেটারী শ্রীসৌরেন সেন বোর্ডের সম্পাদক নিযুক্ত হইয়াছেন। বিধানসভার আগামী অধিবেশনে ষ্টেডিয়াম নির্মাণ ও তাহার অর্থ ব্যবস্থা সম্বন্ধে একটি আইন প্রণীত হইবে। সত্বর কলিকাতার এই অভাব দূর হইলে কলিকাতাবাসী আশ্বস্ত হইবে।

নূতন লিমিটেড কোম্পানী—

১৯৫৬ সালের ১লা এপ্রিল হইতে ভারতে নূতন কোম্পানী গঠনের আইন প্রচলিত হইবার পর তিন বৎসরে অর্থাৎ ১৯৫৯ সালের ৩১শে মার্চ পর্য্যন্ত ভারতে মোট ১৯০৪টি লিমিটেড কোম্পানী গঠিত হয়—তাহাদের মূলধন ৫৯৮ কোটি টাকা। তন্মধ্যে ১৬৬ কোটি টাকা মূলধনের ২০৭ কোম্পানী পাবলিক ও ৪৩২ কোটি টাকা মূলধনের ১৬৯৭টি প্রাইভেট। মোট সংখ্যার এক তৃতীয়াংশ কোম্পানী পশ্চিমবাংলায় ও একপঞ্চমাংশ কোম্পানী বোম্বায়ে গঠিত হইয়াছিল। মোট সংখ্যার শতকরা ৬১ কোম্পানী ছোট ছিল—অর্থাৎ তাহাদের মূলধন ৫ লক্ষ টাকার কম ছিল। গভর্ণমেণ্ট মোট ২২৫ কোটি টাকা মূলধনের ১৫টি বড় কোম্পানী গঠন করেন এবং বেসরকারী চেষ্টায় ২৫১ কোটি টাকা মূলধনের মোট ৬৩ বড় কোম্পানী গঠিত হয়। গত ৩১শে মার্চ তারিখের হিসাবে দেখা যায়, ভারতে মোট ২৭৪৭৯টি লিমিটেড কোম্পানী কাজ করিতেছে। ৩ বৎসর পূর্বে অর্থাৎ ১৯৫৬ সালের ৩১শে মার্চ ভারতে লিমিটেড কোম্পানীর সংখ্যা ছিল ২৯৮৭৪টি। ভারতে যৌথ কারবারের সংখ্যা এখনও অধিক হয় নাই—ইহাই বিস্ময়ের বিষয়।

কলিকাতা কর্পোরেশন নির্বাচন—

কলিকাতা কর্পোরেশনের কংগ্রেসী কাউন্সিলার পঞ্চানন সরকারের মৃত্যুতে বেলিয়াঘাটায় যে উপনির্বাচন হয়, তাহাতে পঞ্চাননবাবুর ভ্রাতা স্বতন্ত্রপ্রার্থী শ্রীসমরনাথ সরকার সর্বাপেক্ষা অধিক ভোট পাইয়া নির্বাচনে জয়ী হইয়াছেন। কংগ্রেসপ্রার্থী শ্রীশান্তিনাথ সরকার (সমরবাবুর জ্ঞাতি ভ্রাতা), কম্যুনিষ্ট শ্রীপ্রবোধ ভট্টাচার্য্য, পি-এস-পি শ্রীশৈলেন্দ্রনাথ দে ও স্বতন্ত্র শ্রীবিমলেন্দু গুহ পরাজিত হইয়াছেন। বামপন্থীরা একত্র না হওয়ায় একটি আসনের জন্য ৫জন প্রার্থী ছিলেন।

পদ্মা-ভাগীরথী সংযোগ—

পদ্মা নদীর সহিত ভাগীরথীর সংযোগ সাধনের জন্য মুর্শিদাবাদ সীমান্তে নুরপুরে ভাগীরথীর বর্তমান মুখ হইতে ৪ মাইল নিম্নে ফিরোজপুর মৌজার চরবিশ্বনাথপুরে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের সেচবিভাগ যে ৪০০ফিট দীর্ঘ খাল খনন করাইয়াছেন গত ৩রা জুলাই তাহার দুই মুখ কাটিয়া দিয়া নদী দুইটির মিলন সাধন করা হইয়াছে। পদ্মার জল কম থাকায় খালে পর্য্যাপ্ত জল আসে নাই। খালটি ৩০ ফিট গভীর করা হইয়াছে—পূর্ণ বর্ষার পর খালের অবস্থা কিরূপ থাকে, এঞ্জিনিয়ারগণ তাহা পর্য্যবেক্ষণ করিতেছেন।

অপূর্বকুমার দাশগুপ্ত—

খাদি প্রতিষ্ঠানের নিষ্ঠাবান কর্মী অপূর্বকুমার দাশগুপ্ত গত ১১ই জুলাই রাত্রিতে ৫৯ বৎসর বয়সে কলিকাতা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে পরলোকগমন করিয়াছেন। এক সময়ে তিনি উত্তর কলিকাতা জেলা কংগ্রেস কমিটীর সম্পাদক ছিলেন। তাহার বাড়ী ছিল শ্রীহট্ট জেলায়—

খাদি প্রচার উপলক্ষে তিনি সারা বাংলায় পরিভ্রমণ করিয়াছিলেন।

রতনমোহন চট্টোপাধ্যায়—

খ্যাতনাম সলিসিটার রতনমোহন চট্টোপাধ্যায় গত ১১ই জুলাই ৬৩ বৎসর বয়সে তাঁহার বালীগঞ্জ ১নং কুইন্স পার্কের বাসগৃহে পরলোকগমন করিয়াছেন। তিনি শিল্পী অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ভগিনী সুনয়নী দেবীর পুত্র। কলিকাতার বহু জনহিতকর প্রতিষ্ঠানের সহিত রতনবাবু নিজেকে সংযুক্ত রাখিয়াছিলেন।

বিদেশে ভারতের ঋণ—

১৯৫৬ সালে ভারত সরকার বিদেশী রাজ্যগুলির নিকট ২১৫ কোটি টাকা পাইত—কিন্তু ১৯৫৭ সালে সে পাওনা টাকা পাইয়া তাহাকে বিদেশে ২৬৭ কোটি টাকা ঋণ করিতে হয়। ১৯৫৮ সালে তাহার ঋণ বাড়িয়া ৬৪৮ কোটি হইয়াছে! ১৯৫৫ সালে বিদেশ হইতে ভারতের পাওনা ছিল আরও বেশী—৯৭০ কোটি টাকা। ইহার পুরা টাকা সরকারী ঋণ নহে—বেসরকারী ব্যবসায়ীদের ঋণও ইহার সহিত ধরা হইয়াছে। এখন ভারতের কৃষি ও শিল্প উৎপাদন বাড়াইতে না পারিলে এ ঋণ শোধের অন্য উপায় নাই। দেশের নানারূপ উন্নতি সাধন করা হইতেছে —নূতন রেল, নূতন পথ, নূতন খাল, নূতন নগরপত্তন, নূতন ছোট ও বড় কারখানা স্থাপন, স্কুল, কলেজ (বিশেষত এঞ্জিনিয়ারিং ও টেকনিকাল কলেজ), কৃষিক্ষেত্র, বাঁধ, সেচ-ব্যবস্থা, পুল, বাসগৃহ প্রভৃতি নির্মাণ—এ সমস্ত কাজেই ঋণের টাকা ব্যয় করা হইয়াছে। কাজেই আশা করা যায় আগামী ১০ বৎসরে ভারতের সকল প্রকার উৎপাদন বর্দ্ধিত হইয়া এই ঋণ পরিশোধে সমর্থ হইবে। আমদানীর পরিমাণ কমাইয়া রপ্তানীর পরিমাণ বাড়াইতে পারাই ঋণ-শোধের একমাত্র উপায়।

পাকিস্তানের ৩০০ কোটি টাকা ঋণ—

গত ৫ই জুলাই করাচীতে এক সাংবাদিক বৈঠকে পাকিস্তানের অর্থমন্ত্রী মিঃ এম-সোয়েব জানাইয়াছেন—"বর্তমান বাজেটে দেশ বিভাগ বাবদ ভারতের প্রাপ্য ঋণের টাকা পরিশোধের কোন ব্যবস্থা রাখা হয় নাই। কারণ পাকিস্তানের যখন ভারতের নিকট বহু টাকা পাওনা, তখন ঋণ পরিশোধের ব্যবস্থা রাখার কোন প্রয়োজন নাই।" এই ত গেল ঋণ শোধ সম্বন্ধে ব্যবস্থা। আসাম সীমান্তে বহু স্থানে পাকিস্তানীরা সৈন্যের ঘাঁটি বসাইয়াছে ও যত্রতত্র ভারতীয় এলাকায় গুলীবর্ষণ করিতেছে। ফলে বহু এলাকা হইতে ভারতীয় অধিবাসীদিগকে সরাইয়া আনিতে হইয়াছে। বহুবার এ বিষয়ে আপোষ-আলোচনা হইয়াছে এবং প্রতিবার পাকিস্তান সরকার—পূর্বকৃত অপরাধের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করিয়াছে ও ভবিষ্যতে আর এরূপ ঘটনা ঘটিবে না বলিয়া প্রতিশ্রুতি দিয়াছে। কিন্তু তাহারা কোন প্রতিশ্রুতি রক্ষা করে নাই। এ অবস্থায় ভারত সরকারের কর্তব্য কি? ঋণের টাকা শোধের জন্য কি কোন ব্যবস্থা হইবে না? বর্তমানে যে একমাত্র উপায় অবলম্বন অবশিষ্ট, তাহা কত দিনে করা হইবে। প্রতিরক্ষা বিভাগ কি কোনরূপ আক্রমণাত্মক ব্যবস্থা করিতে অসমর্থ। সাধারণ মানুষ সর্বদা এই সকল প্রশ্ন চিন্তা করিতেছে।

অধ্যাপক নির্মলকুমার সিদ্ধান্ত—

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস চ্যান্সেলার অধ্যাপক শ্রীনির্মলকুমার সিদ্ধান্তের কার্য্যকাল ৩১শে জুলাই শেষ হইয়াছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের চ্যান্সেলার শ্রীমতী পদ্মজা নাইডু তাঁহাকে আগামী ৪ বৎসরের জন্য দ্বিতীয়বার ভাইস চ্যান্সেলার নিযুক্ত করিয়াছেন। অধ্যাপক সিদ্ধান্ত ইউ-রোপে গিয়াছিলেন,—তিনি ৩১শে জুলাই ফিরিয়া আসিয়া ১লা আগষ্ট পুনরায় নূতনভাবে কর্মভার গ্রহণ করিয়াছেন।

পূর্ণিয়া-মালদহ রেল—

গত ১২ই জুলাই রবিবার রেলমন্ত্রী শ্রীজগজীবন রাম উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলের কুমেদপুর ও মুকুরিয়া সংযোগ-কারী নূতন ১৫ মাইল রেলপথের উদ্বোধন করিয়াছেন। এক কোটি টাকা ব্যয়ে এই রেল হওয়ায় বিহারের পূর্ণিয়া জেলার সহিত পশ্চিমবঙ্গের মালদহ জেলার সংযোগ স্থাপিত হইল। যত নূতন পথ নির্মিত হয়, দেশের সম্পদ-বৃদ্ধির উপায় তত বাড়িয়া যাইবে।

শিল্প উপনগরী নির্মাণ—

ভারতের বিভিন্ন রাজ্যের শিল্প উপনগরী সমূহে বর্তমানে ২১৫টি কারখানার মোট ৩ হাজার ৫শত লোক বাস করে। দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় মোট ১১ কোটি টাকা ব্যয়ে দেশে ৯৭টি শিল্প উপনগরী নির্মিত হইবে—তন্মধ্যে ইতিমধ্যে ৮৯৯ কারখানাবিশিষ্ট ৩৬টি শিল্প উপনগরী নির্মিত হইয়াছে। ৯৭টির মধ্যে ১৯টি গ্রাম্য-শিল্প উপনগরী—তথায় কৃষিমূলক শিল্প ও অন্যান্য ক্ষুদ্র শিল্প স্থাপন করা হইবে! ৯৭টি শিল্প উপনগরীতে প্রায় ৫০ হাজার লোকের কর্মসংস্থান হইবে। বিরাট বিরাট কারখানায় যে শিল্পাঞ্চল নির্মিত হয়, তাহা দেশের পক্ষে নানা কারণে অমঙ্গল সৃষ্টি করে। ছোট ছোট শিল্প প্রতিষ্ঠা দ্বারা সেই অমঙ্গলের হাত হইতে জাতিকে রক্ষা করার ব্যবস্থায় এই সকল উপনগরী নির্মাণ প্রয়োজন হইয়াছে।

কেরলে কম্যুনিষ্ট শাসন শেষ—

কেরল রাজ্যের কম্যুনিষ্ট দল মন্ত্রিসভা গঠন করিয়া গত দুই বৎসরের অধিক কাল সাধারণ দেশবাসীর উপর এত অধিক অনাচার করিয়াছে যে কেরলের অকম্যুনিষ্ট অধিবাসীরা ঐ শাসনের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ আন্দোলন করিতে বাধ্য হয়; অবশ্য ঐ আন্দোলনের ফলে পুলিসের গুলিতে ১৫ জন ও ছুরি দ্বারা আহত হইয়া ১২ জন মারা যায় ও পুলিসের লাঠিতে ৩০০ জন অত্যধিক আহত হয়।

নানা দিক দিয়া আন্দোলনের ফলে কেরলে মোট ক্ষতির পরিমাণ প্রায় ১ কোটি টাকা। স্থানীয় কংগ্রেস ও অন্যান্য রাজনীতিক দল কম্যুনিষ্ট মন্ত্রিসভার বিরুদ্ধে রাজ্যপাল ও রাষ্ট্রপতির নিকট এক অভিযোগ পত্র পেশ করে—সে সম্বন্ধে কম্যুনিষ্ট মন্ত্রিসভার কৈফিয়ৎ সন্তোষজনক না হওয়ায় কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভার পরামর্শে রাষ্ট্রপতি মন্ত্রিসভা ভাঙ্গিয়া দিয়া কেরলের রাজ্যপালের উপর রাজ্যের শাসন ভার অর্পণ করিয়াছেন। আগামী জানুয়ারী মাসে কেরলে পুনরায় বিধান সভার সদস্য নির্বাচনের পর নূতন মন্ত্রিসভা গঠিত হইবে। সম্প্রতি পশ্চিমবঙ্গ হইতে কংগ্রেসের যে প্রতিনিধি দল কেরল রাজ্য ঘুরিয়া আসিয়াছেন তাঁহাদের বিশ্বাস, কেরলের আগামী নির্বাচনে কম্যুনিষ্ট দল শতকরা ২০টির অধিক আসন দখল করিতে পারিবেন না। দেখা যাউক, নির্বাচনের কি ফল হয়।

সাময়িক পত্র সংঘে শ্রম-মন্ত্রী—

গত ৪ঠা আগষ্ট কলিকাতা কলেজ ষ্ট্রীট মিউনিসিপ্যাল মিউজিয়াম হলে বঙ্গীয় সাময়িকপত্রসংঘের উদ্যোগে অনুষ্ঠিত এক সম্মিলনে পশ্চিম বঙ্গীয় শ্রম-মন্ত্রী জনাব আবদাস সত্তর ও শ্রম-সচিব শ্রীএস, কে বন্দ্যোপাধ্যায় আই, এ, এস পশ্চিম বঙ্গের শ্রমিক-সমস্যা ও শ্রমিক কল্যাণ আইন সম্বন্ধে আলোচনা করিয়াছিলেন। সংঘের সভাপতি শ্রীফণীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় সভাপতিত্ব করেন এবং মাসিক বসুমতী সম্পাদক শ্রীপ্রাণতোষ ঘটক, প্রবর্তক সম্পাদক শ্রীরাধারমণ চৌধুরী, কলিকাতা মিউনিসিপ্যাল গেজেটের শ্রীরবীন্দ্রনাথ ভটাচার্য্য, শ্রীকুমারেশ ঘোষ, শ্রীবিজয় চট্টোপাধ্যয়ে, শ্রীকালীপদ ভট্টাচার্য্য প্রভৃতি আলোচনায় যোগদান করেন। এইরূপ আলোচনার ফলে সাময়িক পত্র সম্পাদকগণ শ্রমিক আইন সম্বন্ধে বহু সমস্যার বিষয় অবগত হইতে সমর্থ হইয়াছেন। সংঘের সম্পাদক শ্রীসুরেন্দ্রনাথ নিয়োগী এরূপ সম্মিলনের ব্যবস্থা করিয়া সকলের ধন্যবাদভাজন হইয়াছেন।

পশ্চিমবঙ্গে গ্রাম-পঞ্চায়েৎ—

এ পর্য্যন্ত পশ্চিম বঙ্গে দুই হাজার গ্রাম পঞ্চায়েতের নির্বাচন হইয়া গিয়াছে—তন্মধ্যে শতকরা প্রায় ৭৫টি ক্ষেত্রে কংগ্রেসপ্রার্থীরা জয়যুক্ত হইয়াছে। ১৯৬৩ সালের মধ্যে পশ্চিমবঙ্গে সর্বত্র ৪ হাজার অঞ্চল পঞ্চায়েৎ ও ১৬৷১৭ হাজার গ্রাম পঞ্চায়েৎ স্থাপন করা হইবে। গ্রাম-পঞ্চায়েৎ গুলি উন্নয়নের কাজ করিবে এবং অঞ্চল পঞ্চায়েৎ গুলি প্রধানতঃ কর ও রাজস্ব আদায়ের কাজ করিবে। প্রতি অঞ্চল পঞ্চায়েতে একজন করিয়া বেতনভুক সেক্রেটারী থাকিবে, রাজ্য সরকার তাহাদের বেতন দিবেন। ইউনিয়ন বোর্ডগুলির স্থলে অঞ্চল পঞ্চায়েৎ গুলি ও শাসনের প্রাথমিক কেন্দ্র হইবে। উপরের পর্য্যায়ে কি ভাবে জেলা-সংস্থা গঠিত হইবে, তাহা এখনও স্থির হয় নাই। ব্লক এলাকা গুলিতে ব্লক কমিটী-গুলি অঞ্চল পঞ্চায়েৎ গুলিকে পরিচালন করিবেন। এইভাবে শাসনকে বিকেন্দ্রীকৃত করা না হইলে শাসন ব্যবস্থার উন্নতি হইবে না।

পানিহাটিতে বৈষ্ণব স্মৃতি সংরক্ষণ—

শ্রীপাট পানিহাটীতে (২৪ পরগণা) শ্রীগৌরাঙ্গ গ্রন্থ মন্দিরের গৃহ-নির্ম্মাণ, প্রাচীন বটবৃক্ষ রক্ষা ও বটতলাস্থ শ্রীবিগ্রহের গৃহ সংস্কার প্রভৃতি কার্য্যের জন্য কয়েক বৎসর পূর্বে শ্রীফণীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়কে সভাপতি ও শ্রীসাতকড়ি মিত্রকে সম্পাদক করিয়া একটি সমিতি গঠিত ও রেজেষ্টারী-কৃত হইয়াছে। সম্প্রতি ঐ সমিতির উদ্যোগে ও কলিকাতা কলুটোলার শ্রীবনমালী শীল ও গৌড়ীয় বৈষ্ণব সম্মিলনীর শ্রীচিত্তরঞ্জন মল্লিকের সহায়তায় গত ১২ই জুলাই পানিহাটী বটতলায় একটি বিশেষ মহোৎসবে ঐ বিষয়টি আলোচিত হয় এবং তথায় পুরাতন সমিতির কার্য্যে সহায়তা করিবার জন্য প্রভুপাদ শ্রীচৈতন্যচন্দ্র গোস্বামীকে সভাপতি, শ্রীফণীন্দ্র-নাথ মুখোপাধ্যায়কে সম্পাদক ও শ্রীসাতকড়ি মিত্রকে সহ-সম্পাদক করিয়া অর্থ সংগ্রহের ও অন্যান্য ব্যবস্থার জন্য একটি সমিতি গঠিত হয়। সভায় স্থির হয়, দেশবাসী বদান্য বৈষ্ণবগণের এ বিষয়ে দৃষ্টি আকর্ষণ করার জন্য সত্বর এ জন্য একটি আবেদন প্রকাশ করা হইবে। পানিহাটী মিউনিসিপ্যালিটির কর্তৃপক্ষও এ বিষয়ে সাহায্য করিতে উদ্যোগী হইয়াছেন।

হাওড়া-বার্তার বার্ষিক উৎসব—

গত ৮ই আগষ্ট হাওড়া সালকিয়া ২১ শশিভূষণ সরকার লেনে হাওড়া-বার্তা সাময়িকপত্রের ৭ম প্রতিষ্ঠা দিবস উৎসব অনুষ্ঠিত হইয়াছে। হাওড়া জেলা বোর্ডের সভাপতি ডাঃ মণিলাল বসু এম, এল, এ সভাপতি, কলিকাতার মেয়র শ্রীবিজয়কুমার বন্দ্যোপাধ্যায় উদ্বোধক ও শ্রীফণীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় প্রধান অতিথিরূপে উৎসবে উপস্থিত ছিলেন। ঐ উপলক্ষে অনুষ্ঠিত এক সাময়িক পত্র প্রদর্শনীর উদ্বোধন করেন যষ্ঠি-মধু সম্পাদক শ্রীকুমারেশ ঘোষ। উৎসবে বহু লোক সমাগম হইয়াছিল এবং হাওড়া-বার্তা সম্পাদক ডাঃ শম্ভুচরণ পাল সকলের অভ্যর্থনার বিশেষ আয়োজন করিয়াছিলেন। সহরতলীর একখানি সাময়িক পত্রের উৎসবে এরূপ সুধী সমাগম দেশের নব জাগরণেরই লক্ষণ বলিয়া মনে হয়।

উজ্জয়িনী—

গত ৫ই জুলাই অধ্যাপক শ্রীমণিভূষণ ভট্টাচার্যের সভা-পতিত্বে ৬৮, যতীন্দ্রমোহন এভিনিউ-তে উজ্জয়িনী সাহিত্য সভার সাপ্তাহিক অধিবেশন অতি মনোজ্ঞ পরিবেশের মধ্যে অনুষ্ঠিত হয়। সভায় পঞ্চাশ জন শিল্পী ও সাহিত্যিক উপস্থিত ছিলেন। শ্রীমতী উমা দেবী (ডাঃ উমা রায়) প্রধান অতিথির আসন গ্রহণ করেন।

(পূর্বপ্রকাশিতের পর)

সারা বাড়িটা নিঝুম। অন্ধকার উঠোন, ঘরে ঘরে দরজা বন্ধ। কোথাও কোনো শব্দ নেই। কেবল দোতলায় ওঠবার সিঁড়ির পাশে শুয়ে রয়েছে একটি কুকুর। এ কুকুর ঘরের নয়। অচেনা মানুষ দেখলে ডেকে জানাবার দাসত্ব নেই তার। অপরিচিত মানুষ দেখতেই সে অভ্যস্ত।

অভয় দোতালায় উঠে এল। না, একেবারে নিঃসাড় নয়। কোন্ ঘরে যেন এখনো গোঙা জড়ানো-স্বরে কথা শোনা যাচ্ছে। আর মাঝে মাঝে মেয়ে-গলায় চাপা স্বরের ধমক।

মদ খায় নি অভয়, তবু মাতাল মনে হচ্ছে তার নিজেকে। যেন হাত পা' তার নিজের আয়ত্তে নেই। চোখের দৃষ্টি নেই স্থির। সে পশ্চিমদিকের বারান্দায় এগিয়ে গেল। কিন্তু দরজা চিনতে পারছে না। কোন্ ঘরটা সুবালার। আবিষ্ট হলেও, ছবি একটি মনে আছে ঘরের সামনেটার।

আরো এগিয়ে গেল সে। চিনতে পারল ঘরটা। দরজা বন্ধ, কোনো সাড়া শব্দ নেই। হাত তুলে দরজা ধাক্কা দিতে গিয়ে থামল অভয়। কী চায়, কেন এসেছে সে এখানে ?

তার বুকের ভিতর থেকে যেন কেউ হাঁপিয়ে হাঁপিয়ে, চেপে চেপে ব'লে উঠল, বড় একলা লাগছে আমার। বিশ্রী, ভয়ংকর একা একা। আর কিছুতেই থাকতে পারি নে। এত লোক আমার চারপাশে। এত লোক থিক্ থিক্ করছে। কিন্তু সারা পৃথিবীর লোক এলেও; আমার এই একলা থাকা বুঝি ঘুচবে না। এখন শুধু একজনকে হলেই হয়। এমন একজনকে, যার কোনো দাবী নেই। যার কোন ভয় নেই। মাটি আমাকে ফেলে দেয় না, বুক পেতে চলতে দেয়। জল ফিরিয়ে দেয়না। ঝাঁপ দিলে সে শুকিয়ে যায় না। মুখ তুলে তাকালে, আকাশ ডানা মেলে উড়ে যায় না কোথাও। তেমনি ক'রে আমায় কেউ নি'ক তার বুক ভরে। তার সারা অঙ্গ জুড়ে, স্বাভাবিক আকর্ষণে। তার চুক্তিহীন স্নেহের দরিয়ায়। যুক্তি দিয়ে তৈরী মাপাজোকা ভালোবাসার কাটা-খালের ঢেউহীন ছোট যার বুক নয়। সে আমাকে একটু নি'ক।

এমন বুঝি হয় না সংসারে ? না হ'লে, এমন চিন্তা মনে এল কেন অভয়ের। মনে হল কেন সুবালার কথা। এমন একটু স্নেহ, এমন একটু ভালোবাসার জন্য। কে তবে তাকে ছুটিয়ে নিয়ে এল এখানে।

সংসারের সবটাই কি কল্পনা ? শুধু মন দিয়ে গড়া ! যে-বস্তু পৃথিবীতে নেই, সে বস্তুর জন্য তবে বুক উথালি-পাথালি করবে কেন ? আছে। আছে ব'লেই করে। মন তৈরী করেছে এই পৃথিবী। প্রত্যক্ষের সীমায় আছে বলেই তো মনে কল্পনা আসে।

অভয় দরজায় ধাক্কা দিল আস্তে আস্তে। কোনো সাড়া নেই। আবার শব্দ করল। আগের চেয়ে জোরে শব্দ ক'রে ধাক্কা দিল।

ভিতর থেকে ঘুম ভাঙার শব্দ পাওয়া গেল একটা। ঘুম ভেঙে যাবার বিরক্তিকর শব্দ। তার চেয়েও বেশী বিরক্ত-গলায় প্রশ্ন এল, কে ?

সুবালারই ঘুম ভাঙা বিরক্ত গলা। অভয় বলল, আমি।

—এই রাত ভোরে আমি' কে ?

সুবালার গলায় বিরক্তির ওপর রাগের মাত্রা চড়ছে। অভয়ের মনটা যেন দমে এল। সে আবার বলল, আমি, আমি।

এবার তীক্ষ্ণ গলায় ঝংকার দিয়ে উঠল সুবালা, আ' ম'লো, খালি আমি আমি ক'রে মরছে? নাম নেই নাকি? মাসীকে ডাকব?

অভয় বোধহয় ফিরতেই যাচ্ছিল। তবু বলল, আমি অভয়।

তারপর নিঃশব্দ এক মুহূর্ত। সুইচ্ টেপার শব্দ হ'ল। দরজায় জানালায় বিন্দু বিন্দু আলোর রেশ ফুটল। দরজা খুলে দাঁড়াল সুবালা। বলল, তুমি? কি মনে ক'রে?

ঘরের উদ্ভাসিত আলোর সঙ্গে সুবালাও যেন একটি দ্যুতির মত জ্বলে উঠল অভয়ের চোখের সামনে। শুধু সায়া আর বুকের সংক্ষিপ্ত অন্তর্বাস তার সারা গা'য়ে। সদ্য ঘুম ভাঙার চকিত আড়ষ্টতা তার ভঙ্গিতে। বোধহয় পোষাকের সংক্ষিপ্ততাতেই তার দেহ অকূল, উপছানো, খর মনে হচ্ছে। খোঁপা খুলে জোড়া বেণী গেছে লুটিয়ে। সোজা সিঁথীতে এসে পড়েছে এলো চুলের গুচ্ছ। কপালের টিপ্ গেছে বেঁকে। কাজল গেছে চোখের কোলে লেপটে। একটা দুঃস্বপ্নের স্মৃতি থেকে যেন তার দৃষ্টি এই মাত্র ফিরে এসেছে। বিজলী আলোর ঝলকটা চাপবার জন্য, হাত তুলে চোখে ছায়া ফেলেছে।

আবার বলল, তুমি এসময়ে?

সুবালা ভয় পেল কি না কে জানে। সে দরজার কাছ থেকে দু' পা' সরে গেল।

অভয় বলল, তোমার কাছে এলুম।

বলতে বলতে অভয় ঘরের মধ্যে, সুবালার গায়ের কাছে ঘেঁষে এল।

সুবালা যেন চিনতে পারছে না অভয়কে। দেহোপ-জীবিনী মেয়ে, পুরুষের সান্নিধ্যে তার ভয় নেই। কিন্তু অভয়ের দিকে তীব্র দৃষ্টি রেখে, খাটের ধারে পিছিয়ে গেল সুবালা। নাকের পাটা ফুলিয়ে সে গন্ধ নেবার চেষ্টা করল। অভয় মদ খেয়েছে কিনা বুঝতে চায়। কোঁচকানো ভ্রূ তার সোজা হল না। চোখ থেকে নামাল না হাত। বলল, আমার কাছে? কেন?

অভয় যেন চোখ ফেরাতে পারছে না সুবালার দিক থেকে। তার গাল কপাল গলা সব ঘামছে দরদর করে। সে সুবালার কাছে ঘেঁসে গেল আরো। কথা ঠিক যোগাচ্ছে না অভয়ের মুখে। সে প্রায় স্খলিত স্বরে বলল, এলুম! চলে এলুম তোমার কাছে। আসতে নেই?

বলতে বলতে সে সুবালার গায়ের ওপর এসে পড়ল। প্রকাণ্ড একটি লোহার চাংড়া যেন বেঁকে দুমড়ে এলিয়ে পড়তে উদ্যত হল সুবালার বুকের ওপরে। আবার বলল প্রায় চুপি চুপি গলায়—আমি তোমার কাছে চলে এলুম।

সুবালার স্মৃতিভ্রংশ হল কি না, কে জানে। তার মনে হল, এ লোকটিকে সে চেনে না। ঠিক এই মানুষটির সঙ্গে তার কোন পরিচয় নেই যেন। সে দু'হাত দিয়ে অভয়ের দু' হাত সরিয়ে দিয়ে তীক্ষ্ণ গলায় চেঁচিয়ে উঠল, এ রাত দুপুরে এ আবার কেমন ঢং। যাও এখন, আমার এসব ভালো লাগছে না।

অভয় এক মুহূর্ত স্তব্ধ হয়ে রইল। আড়ষ্ট হয়ে রইল টলে পড়ার ভঙ্গিতে। বিড় বিড় করে বলল, রাগ করলে? রাগ করলে?

পরমুহূর্তেই তার দু'চোখ যেন ঘৃণায় ও রাগে দপদপিয়ে উঠল। প্রায় টলতে টলতে বেরিয়ে গেল সে।

সুবালা যেন তখনো কেমন একটা দুঃস্বপ্নের ঘোরে। সে তখনো বিচলিত বিস্মিত চোখে বাইরের দিকে তাকিয়ে সিঁড়িতে অভয়ের ভারী পায়ের শব্দ শুনতে লাগল। তার-পরেই শুনল কুকুরের ডাক। কুকুরটা এবার ডেকে উঠেছে অভয়কে মাতাল ভেবে। কারণ, ওই রকম অবস্থাতেই লোকগুলি অনেকবার এ বাড়িতে তার গায়ে হুমড়ি খেয়ে পড়েছে।

আর কোনো শব্দ নেই। শুধু ঝিঁঝির ডাক শোনা যাচ্ছে বাইরে। সুবালার ভ্রূ দুটি সোজা হ'য়ে এল। আর চকিতে যেন তার সারা মুখ থেকে একটি ছায়া সরে গেল। দু'চোখ ভরে ব্যাকুলতা নিয়ে ফিরে তাকাল সে। আপন মনেই বলল, সে নয়? সে-তো, হ্যাঁ—

দ্রুত বেগে সে সিঁড়ি ভেঙে উঠোন পার হ'য়ে, দরজার ধারে ছুটে গেল। দূরে আলো, আর সামনে অন্ধকার। সুবালা ডাকল, কই, কোথায় গেলে? কোথায় গো! শুনছ?

বলতে বলতে রাস্তায় এসে পড়ল সে। বড় রাস্তার দিকে যাবে না গলির ভিতর দিকে যাবে, কিছু স্থির করতে পারল না। একটি বিচিত্রবেশিনী পাগলীর মত মনে হল সুবালাকে।

আবার ডাকল। নাম ধরে ডাকতে গিয়ে, থম্‌কে, আবার ডাকল, কই গো গাইয়ে, কোথায় গেলে।

কেউ জবাব দিল না। মালীপাড়ার গলিতে শেষ রাতের হাল্‌কা বাতাসে ফুলের গন্ধ বাসি হয়ে ভাসছে। সুবালা চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল দরজায়। ছোট মেয়েটি যেন খেলতে খেলতে সাধের জিনিষ হারিয়ে, সহসা হতাশায় ও ব্যথায় থতিয়ে গেছে।

অভয় ভিতর গলির দিকেই গেছে। কিন্তু বাড়ির দিকে নয়। মালীপাড়া গলির যে-কালিটা গেছে গৃহস্থপাড়ার দিকে, সেটা ডাইনে। বাঁয়ের রাস্তাটা গেছে গঙ্গার ধারে। খানিকটা বেঁকে। যেখানে ধাঙড় বস্তি শুরু হয়েছে। ডাইনে না গিয়ে, বাঁয়ের দিকেই ছুটে গেল অভয়। যেন সে পালিয়ে যাচ্ছে। তার দু' চোখের সামনে ভাসছে শুধু সুবালার গিলটি-করা-চুড়ি-পরা হাতের ঝটকা দেওয়ার অপমানকর ভঙ্গিটা। ঝটকাটা যেন তার মুখেই মারছে সুবালা। জোরে জোরে মারছে, কষ বেয়ে বুঝি রক্তও পড়ছে। আর নিমি হাসছে খিল খিল করে। হাততালি দিতে দিতে হাসছে।

একটা গুরুগম্ভীর গোঙানির শব্দে থামল অভয়। সে দেখল, কাছেই শুয়োরের খোঁয়াড়। গায়ে মুখে হাওয়া লাগল। সামনে অবারিত গঙ্গা। আজই কি এ গঙ্গার ধারে, অন্যখানে গিয়েছিল অভয়? সেটা যেন আজ নয়—অনেক, অনেকদিন আগের ঘটনা সেটা। তারপরে যেন একটি যুগ কেটে গেছে।

আবার শুয়োরের গোঙানি শোনা গেল। খোঁয়াড়ের ভিতরে বাইরে শুয়োরের পাল। অচেনা মানুষকে অসময়ে দেখে, সন্দেহ জানাচ্ছে কেউ কেউ। ওদিকটায় বাতি নেই। শুয়োরের আস্তানায় ওপাশ থেকেই এবড়োখেবড়ো বস্তি ঘরগুলি দেখা যাচ্ছে। অভয় চেনে রাস্তা। গঙ্গাধারের সরু পথটা দিয়ে সে হাঁটতে লাগল। সে থামতে চায় না, বসতে চায় না। পারবেও না। তার ছুটতে ইচ্ছে করছে। দাঁতে দাঁত চেপে, প্রাণপণে দৌড়তে ইচ্ছে করছে। দৌড়তে দৌড়তে তাদের সেই গ্রাম, সেই বাড়ি চলে যেতে ইচ্ছে করছে।

হঠাৎ পায়ে যেন কি ঠেকল। আর আর্তনাদের মত শোনা গেল, আঃ আঃ……

অভয় থেমে ফিরে তাকাল, কে?

লক্ষ্য পড়ল, মানুষ। আরো কাছে ফিরে এল অভয়। লোকটা কেমন যেন গড়াগড়ি খাচ্ছে মাটিতে। আর ফোঁস ফোঁস করে শব্দ করছে। কাঁদছে নাকি? বোধ হয় কোনোরকম শোক পেয়েছে।

অভয় চলে যাবার আগে আর একবার জিজ্ঞেস করল, কে হে? এখানে এ ভাবে পড়ে কেন?

পড়ে-থাকা মানুষটির একটি হাত যেন উঠে এল অভয়ের দিকে। আবার পড়ে গেল। ফিস্‌ফিস্ স্বরে ডাকল, জরা ই-ধার……

অভয়ের নাকে মদের গন্ধ গেল। মাতাল! ঘরের বাইরে এসে পড়ে আছে। অভয়ের মত অবস্থা লোকটার। কোথাও কেউ নেই? বউ ভালোবাসে না? ঘর থেকে তাই চলে এসেছে? লোকটা আবার হাত তুলল। ডাকল, হে হো—!

অল্পবয়সী ছেলের গলা বলে মনে হল এবার। অভয় নীচু হয়ে তার হাতটা ধরল। ধরতেই লোকটা তাকে আকর্ষণ করল। অভয় হাঁটু পেতে বসল। লোকটির আর একটি হাত এসে তার কোমর জড়িয়ে ধরল। আর ঠিক এই মুহূর্তে অভয় অনুভব করল, পুরুষ নয়। মানুষটি মেয়েমানুষ। এই শেষ রাত্রির অন্ধকার গঙ্গার ধারে তার হাতের কাচের চুড়ি বেজে উঠল একটি দুর্বোধ্য হাসির মত। সে অভয়ের হাঁটুতে বুক চেপে, সাপের মত সাপ্‌টে ধরল।

অভয় এক মুহূর্ত একেবারে পাথর হয়ে গেল। তার নিজের দুর্গতির কথা ভুলে, সজাগ হয়ে উঠল সে—পরমুহূর্তেই মেয়েমানুষটির হাত ছাড়বার চেষ্টা করতে করতে বলল সে, কে তুমি! ছাড়, ছাড় ছেড়ে দাও আমাকে।

মেয়েলোকটি তাকে আরো জোরে আঁকড়ে ধরল। এবার সে তার মদের গন্ধ ভরতি মুখটা তুলে নিয়ে এল অভয়ের বুকের কাছে। পরিষ্কার বুঝতে পারল অভয়, মেয়েটির গায়ে জামা নেই। অনুমান হল, বয়সও খুব বেশী

নয়। বোঝা গেল সে বাংলা বুলি বোঝে, বলতে পারে না। প্রায় চাপা আর্তনাদ করে বলল, নহি, ছোড়ব নহি তুহঁকো। পাকৃড়ো, হেই বাবু মেরী, ঘরে থোড়ি লেহি চল।

কোমর ছাড়িয়ে, কাঁধের ওপর উঠে এল মেয়েটির হাত। যেন একটা নাগিনী বেয়ে বেয়ে উঠছে। শক্তি আর কতটুকু তার। ইচ্ছে করলে অভয় তাকে ঠেলে ফেলে দিতে পারে। কিন্তু ফেলতে পারল না সে। মেয়েটা যেন বড় অসহায় হয়ে, এই অবলম্বনকে জড়িয়ে ধরেছে। পরম নির্ভরে ও নির্ভয়ে যেন লুটিয়ে পড়ছে। গুটিয়ে আসছে বুকের মাঝখানে।

অভয় জিজ্ঞেস করল, কোথায় তোমার ঘর?

মেয়েটি মুখ তুলে দেখাল বস্তির দিকে। বলল, উহে।

তারপর থিতিয়ে আসা অন্ধকারে অভয় দেখল, মেয়েটি তার মুখ দেখার চেষ্টা করছে। যদিও চোখ তার পুরো-পুরি মেলছে না। এখনো ঢুলুঢুলু করছে। তার গরম নিশ্বাস লাগছে অভয়ের বুকে গলায়। কিন্তু মেয়েটার মুখে জায়গায় জায়গায় কালো দাগ। ডান দিকের ভ্রু'র কোন্‌টা যেন ফোলা ফোলা লাগছে।

মেয়েটি চাপা চাপা গলায় বলল, তুঁ কম্‌লার বাবু?

কম্‌লার বাবুটি কি এবং কে, বুঝতে পারল না অভয়। সে বলল, না।

অভয়ের বোঝবার কথা নয়। কম্‌লার অর্থে কম্পাউণ্ডারবাবু। মিউনিসিপালিটির যে-বাবুটি তার চার পাশে অনেক পেখম বিস্তার করেছে, এমনি ক'রে একদিন বুকে নেবার জন্যে। বাংলা বুলি শুনে, এখন এই ঘোরের মধ্যে মনে হ'চ্ছে, সেই বাবু বুঝি।

আপন দুর্গতির কথাটা চাপা পড়েছে অভয়ের। তার কোনো দুর্মতি উছ্‌লে ওঠেনি মেয়েটিকে বুকে করে। কিন্তু তার বিশাল দেহের রক্তস্রোতে একটি দূরাগত ধ্বনি যেন ক্রমেই নিকটবর্তী হচ্ছে। কিংবা তার পাকে-পড়া রুদ্ধ যন্ত্রণাটা একটি মুক্তির দরজা পেয়ে সোর তুলেছে।

মেয়েটি আবার বলল, নহি তো? তুঁ কে বা? ছোটা সোনাটরি সাহ্‌ব বা কি?

ছোটা সোনাটরি সাহ্‌ব যে ছোট স্যানিটারি সাহেবের রূপান্তর মাত্র, অভয় এবারো তা' বুঝল না। শুধু এইটুকু বুঝল, তার বুকের ওপর এই মেয়েমানুষটি হয় তো ঝাড়ুদারণী।

অভয় বলল, না না, আমি তোমার চেনা লোক নই বাপু?

—নহি? তবু তুঁহকো রামজী ভেজে দেহ্‌লাইন হো বাবু।

ব'লে মেয়েটি ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠল অভয়ের কাঁধে মুখ দিয়ে। তার উত্তপ্ত ঠোঁট অভয়ের গলায় চেপে বসল।

অভয় যেন অসহায় বোধ করতে লাগল। অন্ধকার গঙ্গার বুকে ফিরে তাকাল সে। আকাশের দিকে দেখল। নক্ষত্রেরা তাকিয়ে আছে। যেন কি এক রহস্যের খেলা দেখছে তারা। আর গঙ্গা ছল ছল শব্দে চির রহস্যের দুর্বোধ বাণী গেয়ে চলেছে। শেষ রাত্রি দুলছে বাতাসে।

এই বিষম বিপাকে নিজেকে কঠোর করতে চাইল অভয়। কিন্তু মেয়েটির কান্নায় তার নিজের জমে থাকা পাথরের কান্নাটাও যেন গলতে লাগল! তার ইচ্ছে হ'ল, সব কিছু দিয়ে সে এই অবহেলিতা ফেলে-দেওয়া জীবটিকে স্নেহ করে।

মেয়েটি বলেই চলল, হামি কো নাম ছে মাহুনি। মরদ সহদেও, মাসিপালি কী ধাঙড়। হেই বাবু, মরদ হামিকো জবর পিট পিটাহ্‌লে, ফেক্কো দেহ্‌লে দরিয়া কিনারে। হেই বাবু মেরী, হামি কো তন্‌খা সব লেই লেইছে ও, পীয়ে ন দেহ্‌লে হামিকো, খা'য়ে না দেহ্‌লে, কপড়া ন দেহ্‌লে হামি কো। খালি পিটাহ্‌লে, মাতোয়ালে মরদ, মহব্বত ন দেহ্‌লে—

অভয়ের মনে হ'ল সে যেন, মাহুনির মরদ সহদেবের সঙ্গে কথা বলছে, কেন, সহদেব এমন ক'রে ফেলে দিয়েছে মাহুনিকে। কেন মেরেছে?

সে বলল, চল্‌, কোথায় তোমার ঘর, দিয়ে আসি। চিনতে পারবে?

—হঁ বাবু।

অভয় মাহুনিকে ধরে তুলে দাঁড় করালো। না ধরলেও চলত। মাহুনি তাকে সাপ্‌টে আছে। সাপ্‌টে ধরে মাথাটি এলিয়ে দিয়েছে বুকের ওপর। আর, মাহুনি মোটেই হাল্‌কা নয়, ভারি আছে।

রক্ত স্রোতের দুরাগত ধ্বনিটা অভয়ের সারা অঙ্গে ঝাঁপ দিয়েছে বটে। কিন্তু তার মধ্যে কোনো অন্ধ-রঙ্গ নেই। বরং একটি ব্যথিত প্রসন্নতা, স্নেহ এবং ভালবাসার একটি আবেগ অনুভব করছে সে। একে তার পাপ ব'লে বোধ হ'ল না। যেন দু'জনের কান্না এক হয়ে, সন্ধি-যুক্ত হ'য়ে এক অপরূপ বন্ধুত্বের মর্যাদা পেয়েছে। সে বলল, চল মাহুনি, তোমাকে দিয়ে আসি।

মাহুনি তার তাড়ির টোকো গন্ধ ভরা মুখ তুলে বলল, চহ্‌লো মেরী রামজী। থোড়ি কহ্‌দে ভগবান, হামি কো ন পিটে।

অর্থাৎ সহদেবকে যেন অভয় বলে দেয়, সে মাহুনিকে আর না মারে। অভয়ের বুকটা টাটিয়ে উঠল, বলল, বলব। ঘরটা আমাকে দেখাও।

মাহুনি ঢুলুঢুলু চোখে তাকাল সামনের দিকে।

অনেকগুলি ঘর, এলোমেলো। সারবন্দী লাইন নয়। সেটা আছে আর একটু উত্তরে, মিউনিসিপালিটির নিজস্ব তৈরী লাইন। অবশ্য বস্তির পুরো এলাকাটাই পৌর-সভার জমি।

মাহুনি টলটলায়মান ঘাড় তুলে বিড়বিড় করতে লাগল, বটুয়া, ঝগড়ু, বিদেশী, পাহ্‌লোয়ান, লাল্লু, এ, এহি···।

ঘরগুলি পার হচ্ছিল সে একজনের নাম ক'রে। একটি ঘরের সামনে এসে দাঁড়াল সে। বলল, এ হি···।

সেই ঘরে টিম্‌টিম্‌ ক'রে একটি আলো জ্বলছে। মাহুনির গলার শব্দেই, সেই টিমটিমে আলোয় একটি ছায়া উঠে এল। বলল, হেই, হেই মাহুনি?

মাহুনি বলল, হঁ। খবরদার, ফের পিটাহ্‌লে—

—নাহি নাহি, হেই ভগবান।

মাহুনি আবার বলল, এ বাবু হামিকো লে আইলান। বাবু রামজী ছে।

বলতে বলতে মাহুনি অভয়ের পায়ের কাছে বসে পড়ল। দেখাদেখি সহদেবও অভয়ের পায়ের ওপর পড়ল হুমড়ি খেয়ে। সেও পুনরাবৃত্তি করল, হঁ রামজী ছে'।

অভয় দু'জনকেই টেনে তোলার চেষ্টা করল।

মাহুনি বলল, তু হামিকো খুন কইলে। ভগবান হামি কো বাঁচাইলান।

সহদেব অভয়ের দু'পা আঁকড়ে ধরে ডুকরে কেঁদে উঠল, হে ভগবান, হে বাবা!

অভয় বুঝলে, সহদেব এখনো মাতাল আছে। তবে সে তার মাহুনির জন্য মাতাল অবস্থাতেও ঘুমোতে পারে নি। মাহুনিকে পেয়ে তার আবেগ কান্নায় ভ'রে উঠেছে। আর অভয়ের বুকটা টনটন করতে লাগল। সে একটু হেসে বলল, মাহুনিকে ঘরে তুলে নাও সহদেব। ওকে আর মের না।

সহদেব ছুটে ঘরে গেল। বেরিয়ে এল একটি জংধরা জীর্ণ লোহার অস্ত্র নিয়ে। অভয়ের হাতে দিয়ে বলল, পিটো, হামকো পিটো হে রামজী। হাম পাপ কইলা, হাম্‌ পাপী হো ভগবান।

অভয় দুজনকেই হাত ধরে ঘরে ঢুকিয়ে দিল। সে বিব্রত, কিন্তু খুশি। তার বুকে একটা ব্যথা, তবু হাসি পাচ্ছে তার। তার ইচ্ছে করছে, সেও ওদের সঙ্গে অমনি মাতলামি করে। সে বলল, শুয়ে পড় তোমরা।

কিন্তু দুজনেই তাকে জাপটে ধরল। মাহুনি বলল, নহি বাবুজী, থোড়ি বইঠে যাহ্‌।

তার চেয়েও বেশী আঁকড়ে ধরল সহদেব। বলল, হে ভগবান, থান লো। পাপী কো উদ্ধার ক'রো। মাহুনি, খানা দে, রামজী কো ভোজন করব্‌।

মাহুনি ছুটে গেল হাঁড়ি ডেয়ো ঢাকনা খুলতে। অভয় দেখল, দুটিকে শান্ত করাই মুশকিল। সে মাহুনিকে বলল, মাহুনি, আমি খাব না। তুমি সহদেবকে শান্ত কর।

সহদেব সেই ধ'রে আছে অভয়কে। মাহুনি তার কাছে এল। অভয় দেখল, সে যা ভেবেছিল, তাই। মাহুনির বয়স বেশী নয়। টিমটিমে আলোয় বোঝা যাচ্ছে, মাহুনি তাদের জাতের রং পার হয়ে কটা স্পর্শ পেয়েছে। মনে হল, কাজে অকাজে পথে সে তাকে অনেকবার দেখেছে।

পরমুহূর্তেই সহদেব যে কথা বলল, অভয়ের সর্বাঙ্গ পাথর হ'য়ে গেল যেন।

—হে ভগবান, তুঁহোকো গোড় লাগি, ভোজন কর লো। মাহুনি কো সাথ্‌ শুত্‌ যাহ্‌। হেই, হেই মাহুনি—

—হাঁ।

—ইধারে আ।

অভয় কিছু বলবার আগেই, মাহুনিকে সহদেব অভয়ের গায়ের ওপর ফেলে দিল। বলল, ভগবান কো সাথ্ সেবা কর্। ভোগ্ লেহ্ বাবা, ভোগ লেহ্।

মুহূর্তে রক্তে একটা তোলপাড় লেগে গেল অভয়ের। অবিশ্বাস্য মনে হ'ল তার। শরীর শক্ত হয়ে উঠল। মাহুনি হেসে উঠল খিল্‌খিল্ ক'রে এবার। অভয় দেখল। মাহুনির মুখে রক্তের দাগ। কাঁধে, হাতে মারের কালশিরা। তবু যেন বিচিত্ররূপিণী উদ্ধত দেহিনী এক মেয়ে তাকে আমন্ত্রণ করছে হেসে হেসে। মাহুনির হাত অভয়ের গায়ে কিলবিল করছে। তার হাত অভয়ের ঠোঁটে মুখে হাতড়াচ্ছে।

অভয় একবার মাহুনির কাঁধে হাত দিল। তারপর তার চোখ ফেটে সহসা জল আসতে লাগল যেন। সে মাহুনিকে জড়িয়ে ধরে, সহদেবের বুকের ওপর দিয়ে বলল, ওকে নাও সহদেব, ওকে নাও, ও তোমার।

ব'লে সে মাহুনির হাত থেকে ছাড়িয়ে বাইরে চলে গেল। মাহুনি হাত তুলে ডাকল, মত্ যাইহো বাবু, মত্—

সহদেব চীৎকার ক'রে ডাকল, হে ভগবান—

অভয়কে তারা আর দেখতে পেল না।

মাহুনি বলল, চহ্‌ল গেইলান্।

সহদেব বলল, চহ্‌ল গেইলান্।

অভয় গঙ্গার ধারে এসে দাঁড়াল। ভোর হ'য়ে আসছে। ছল্‌ছলানি বাড়ছে জলের। ভাঁটার অন্তিম-কাল চলেছে। তাই শব্দ বাজছে বেশী ক'রে। জোয়ার আসবে এখুনি।

অভয়ের মনে হল, তার গ্লানি শেষ হয়েছে। তার দুঃখ যন্ত্রণা যেন কেমন এক দুর্বোধ প্রসন্ন স্রোতে ভাসতে ভাসতে চলে যাচ্ছে। রাত্রের যত কষ্ট অপমান অবহেলা, সব যেন এক অশেষ মহাসমুদ্রের দিকে ধাবিত।

সূর্য ওঠেনি। লাল হ'য়ে উঠেছে পুবদিকের আকাশ। ওপারের কারখানা, বাড়ি, শহর একটি একটি ক'রে ফুটছে আকাশের গায়ে। তাড়াতাড়ি ফিরে চলল।

উঠোনে ঢুকেই সে দেখল, শৈলবালা ব'সে আছে নিমিকে ধ'রে। নিমি ওয়াক্ তুলছে। বমিও করেছে কিছু—চোখ লাল।

কিন্তু শৈলবালার মুখে এখন অদ্ভুত খুশি খুশি ভাব কেন। শৈলবালা জিজ্ঞেস করল, কোথায় ছিলে বাবা?

—ঘাটে।

—কোন্ ঘাটে?

—ধাঙড় বস্তির ঘাটে। ওর কি হয়েছে মা?

অভয় কাছে এল। হাসতে হাসতে শৈলবালার চোখে জল দেখা গেল। বলল, ভয়ের কিছু নয় বাবা, এরকম হয়। মুখপুড়ি কি আমাকে কিছু বলে নাকি?

তবু অভয় অবুঝের মত তাকিয়ে রইল।

শৈলবালা বলল, তোমার ছেলে হবে বাবা। আমার মেয়ের পেটে সন্তান এসেছে।

অভয়ের বুকে সহসা প্রচণ্ড ঢেউ আছড়ে পড়ল। একটা চকিত, একেবারে নতুন খুশির ঢেল ভেঙে প'ড়ে, তার বুকের বালুচর প্লাবিত ক'রে দিল যেন। সে তাকাল নিমির দিকে।

নিমি কাপড় টানতে লাগল ঘোমটা টানবার জন্যে।

ক্রমশঃ

চতুর্থস্থান বা সুখভাব

(ভৃগুসংহিতা অবলম্বনে)

উপাধ্যায়

(পূর্বপ্রকাশিতের পর)

বৃশ্চিকলগ্নের চতুর্থ স্থান বা সুখভাব কুম্ভরাশি—

এখানে রবি থাকলে সুখ স্বচ্ছন্দতার সঙ্গে বৃত্তিভোগ, মোটামুটিভাবে ভূমিলাভ, অনেকের ওপর কর্তৃত্ব প্রকাশ, সম্ভ্রমবৃদ্ধি, মানসিক অশান্তি দেখা যায়। চন্দ্রের অবস্থান অত্যন্ত সৌভাগ্যপ্রদ। মাতৃসুখ, ধর্ম্ম-পালন, গৃহভূমি সম্পত্তি, উত্তম ব্যবসায় ও ভাগ্যবৃদ্ধি দেখা যায়। এখানে মঙ্গল থাকলে গৃহ ও মাতা সম্পর্কে অশুভ,পারিবারিক অশান্তি, জন্মস্থানে বাস, প্রচুর লাভ, রাজ্যসরকার ও সমাজের নিকট সম্মানার্হ ব্যক্তিত্ব, পিতার আনুকূল্যে অর্থ সম্পত্তির প্রাচুর্য্য, স্ত্রীপক্ষ থেকে কিঞ্চিৎ বিরোধিতা। বুধের অবস্থিতিহেতু উত্তম আয়, কর্ম্মে কিঞ্চিৎ বাধা, দীর্ঘজীবন, মাতৃস্থানের দুর্ব্বলতা, সুখস্বাচ্ছন্দ্য। বৃহস্পতি এখানে থাকলে জাতক ধনী, বুদ্ধিমান এবং সম্ভ্রান্ত হয়। জাতকের সন্তান লাভ, দীর্ঘ-জীবন, আভিজাতিক মর্য্যাদাসম্পন্ন হয়ে দৈনন্দিন জীবনযাত্রা, ধনৈশ্বর্য্য-ভোগ ও প্রচুর অর্থ সঞ্চয় হোলেও শেষ পর্য্যন্ত অনেকখানি যে কোন ভাবেই হোক্ অপব্যয়িত হবে। শুক্র থাকলে দৈনন্দিন জীবনযাত্রা সুন্দর-ভাবে পরিচালিত হয়, মাতৃক্ষতি, স্ত্রীপক্ষ থেকে সুখলাভ, পিতার সঙ্গে অসদ্ভাব, সম্মান লাভে বাধা, যৌন সম্ভোগে তৃপ্তি। শনি থাকলে বহু সম্পত্তি হয়, একাধিক গৃহ ও ভূমি লাভ, মাতার কাছ থেকে অবিরত সুখ ও সাহায্য লাভ, মাতুলপক্ষের ক্ষতি ও স্বার্থকেন্দ্রিকতা দেখা যায়। রাহু থাকলে মাতৃক্ষতি, সুখৈশ্বর্য্য লাভ ঘটে না, কলহ প্রিয় পরিবার, সুখ শান্তি লাভের চেষ্টা সত্বেও সাফল্য ঘটে না। কেতুও রাহুর অনুরূপ ফল দেয়, উপরন্তু প্রবাস গমন ও বিদেশে কষ্টভোগ।

ধনুলগ্নের চতুর্থ স্থান বা সুখভাব মীনরাশি—

এখানে রবির অবস্থিতি অত্যন্ত শুভব্যঞ্জক। জাতক ভূম্যধিকারী হয়। মাতৃপক্ষ থেকে সুখভোগ ও পিতার কাছ থেকে নানা সুখ সুবিধা পাওয়া যায়, সহজেই যশ, সম্মানলাভ, সৌভাগ্য বৃদ্ধি ও ব্যবসায়ে উন্নতি। এখানে চন্দ্র মাতৃভাবের অশুভকারক। দীর্ঘজীবন হয়, পারিবারিক আবহাওয়া সুখ সমৃদ্ধিরপক্ষে অনুকূল হয় না, জীবনের উন্নতি, সম্মান ও ব্যবসায় সম্পর্কে বাধাসৃষ্টি করে, পিতৃক্ষেত্রের দুর্ব্বলতা আসে, দৈনন্দিন জীবনযাত্রা মোটের উপর মন্দ হয় না। মঙ্গল এখানে মাতৃহানিকারক, মাতৃকষ্ট ভোগ, সম্পত্তিহানি, উপার্জ্জনের জন্য নানাপ্রকার কৌশল অবলম্বন, সন্তান স্থানে দুঃখ, বিদ্যায় বাধা প্রভৃতি জন্মায়। বুধ এখানে সম্মান ও প্রতিপত্তিহানিকারক, পারিবারিক দুশ্চিন্তা ও চাঞ্চল্যভোগ, পিতৃক্ষেত্রের অবনতি, বাহিরের চাকচিক্য বজায় রাখার চেষ্টা, কর্ম্মলাভে কষ্ট, দৈনন্দিন জীবিকানির্ব্বাহে নানা অন্তরায়, স্ত্রীপক্ষের দুর্ব্বলতা প্রভৃতি ঘটে। নিজের আলস্যও দুর্ব্বুদ্ধির জন্য লাঞ্ছনাভোগ। এখানে বৃহস্পতির অবস্থান সুখকর, মাতার সুখ স্বচ্ছন্দতা, গৃহ ভূসম্পত্তি ও অগ্রজগণের সুখ, নানাপ্রকারে সুখ সৌভাগ্য ও সমৃদ্ধি, দীর্ঘজীবন, উৎসাহবৃদ্ধি এবং উত্তম জীবনযাপন। এখানে শুক্র বিশেষ শুভপ্রদ, আয়ের প্রাচুর্য্য, গৃহ ও সম্পত্তি সুখ, মাতার প্রভাব, উত্তম আহার্য্য ও বিলাস ব্যসন, পিতৃপক্ষের পক্ষে নানা অসুখকর অভিজ্ঞতা লাভ হয়। এখানে শনির অবস্থান চিত্তপীড়াদায়ক, বিমাতৃযোগ, নানাপ্রকার বাধা-বিপত্তির মধ্য দিয়ে দৈনন্দিন জীবনযাত্রা, আশাভঙ্গ ও মনস্তাপ প্রভৃতি সম্ভব। মাতৃপক্ষের বহুকষ্টভোগ হয় এখানে রাহু থাকলে। সুখহানি ভূমিনাশ, ভগ্ন গৃহ, মানসিক দুঃখ, কর্ম্মে বাধা বিপত্তি যোগ দেখা যায়। কেতুর অবস্থান ও অশুভপ্রদ—মাতৃবিচ্ছেদ, বিয়োগ বা কষ্ট, প্রবাসে গমন, নানাপ্রকার মানসিক কষ্ট, অর্থাগমে বাধা বিপত্তি।

মকরলগ্নের চতুর্থ স্থান বা সুখভাব হচ্ছে মেষরাশি—

এখানে রবি থাকলে লুকানোধন পাওয়া যেতে পারে, দীর্ঘজীবন, সাধারণভাবে জীবনযাত্রা,ব্যস্তবাগীশ হওয়া প্রভৃতি সম্ভব। চন্দ্র পারিবারিক

সুখদাতা হয়, সুন্দরী স্ত্রীলাভ, মাতৃ সাহায্য, যৌনতৃপ্তি, সুন্দর পেশা এবং অর্থ সমৃদ্ধি ঘটে, মঙ্গল এখানে বিশেষ শুভ, প্রচুর ধনদৌলত—সুন্দর ষুক্তিভোগ দৈনন্দিন কার্য্যে আলস্য, রাষ্ট্রে ও সমাজে প্রতিষ্ঠা। বুধ এখানে থাকলে পরিশ্রম ও অধ্যবসায়ের দ্বারা সৌভাগ্য অর্জ্জন, গৃহভূমি ও সুখ সমৃদ্ধি, স্বদেশে জীবিকা উপার্জ্জন, সাধারণ বাধা বিপত্তির মধ্যে উন্নতি। শেষ পর্য্যন্ত বিশেষ অর্থে সৌভাগ্যশালী।

বৃহস্পতি মেষে চতুর্থ স্থানে থাকলে কিছু ভূমিসম্পত্তির ক্ষতি, মাতৃ ও ভ্রাতৃহানি, শত্রুবৃদ্ধি, মানসিক শান্তির অভাব, বিনা চেষ্টায় বহু সুযোগ আসে। অতিরিক্ত ব্যয়বৃদ্ধি, কর্ম্মক্ষেত্র সুবিধাজনক নয়। শুক্র এখানে থাকলে অসংখ্য বন্ধু, বিরাট ব্যবসায়, শিক্ষালাভ, সন্তান সুখ, মান ও প্রতিপত্তি, পদমর্য্যাদা, সমাজেও রাষ্ট্রে সুখ প্রতিষ্ঠা হয়। গৃহভূমি বাহন সম্পত্তি যোগ ঘটে। স্ত্রী ও মাতার উত্তম সাহায্য পারিবারিক-শান্তি। এখানে শনি অত্যন্ত দুঃখদাতা—স্বজনবিয়োগ মাতৃহানি, বিরাট ব্যবসায় পিতৃমর্য্যাদা ও সমৃদ্ধিলাভ কিন্তু পারিবারিক ও সামাজিক জীবনে নানা অপ্রীতিকর ঘটনার জন্যে বহু বিড়ম্বনা ও লাঞ্ছনা ভোগ। রাহুর অবস্থিতি ও শুভকর নয়, গৃহের অভাব, নৈরাশ্য ও নির্য্যাতন ভোগ, সুকৌশলে জাতক কর্ম্মসিদ্ধিলাভ করে। কেতুও মাতৃপক্ষের হানিকারক, নানাপ্রকার বিপত্তি, নির্ব্বাসন প্রবাস গৃহসুখ সম্পত্তি হানি, ও নানা আপত্তির কারণ দেখা যায়, কোন প্রতীকার হওয়া সম্ভব নয়।

কুম্ভলগ্নের চতুর্থস্থান বা সুখভাব বৃষ।

এখানে রবি থাকলে স্ত্রী সুখ হয়, পেশা অবলম্বনে উন্নতি, মাতৃ-বৈরিতা, স্ত্রীর প্রভাব প্রতিপত্তি থেকে পারিবারিক অশান্তি, কর্ম্মোন্নতি, দৈনন্দিন জীবন যাত্রার পথ প্রশস্ত হওয়ায় আর্থিক সঙ্গতি হবে। চন্দ্র এখানে বিক্ষোভ, কর্ম্মে বাধা ও শত্রু সৃষ্টি করে, গভর্ণমেন্টের সহিত কারবারে অদ্ভুতভাবে মনোমালিন্য ও তজ্জনিত অর্থ অপব্যয় ঘটবে। পারিবারিক শান্তির অভাব। এখানে মঙ্গল থাকলে পিতার আনুকূল্য লাভ হয়। মাতা, ভ্রাতাভগ্নীর সাহায্যে আনন্দ লাভ, মহৎ কার্য্যের জন্য জনপ্রিয়তা অর্জ্জন, সুখৈশ্বর্য্যলাভ। স্ত্রীর প্রভাব ও প্রতিপত্তি ঘটে। আয়ের মাত্রা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি হয়ে থাকে। বুধ এখানে অবস্থান করলে দীর্ঘজীবন হয়, মাতৃস্থানে দুর্ব্বলতা, সন্তান ক্ষেত্রেও দুর্ব্বলতা তজ্জনিত হানিযোগ, গৃহ ও ভূমির হানি, বাধা বিপত্তির মধ্য দিয়ে ব্যবসায় উন্নত অবস্থা, শেষে ক্ষতি, বিদ্যালাভ, আরামপ্রিয়তার দিকে লক্ষ্য। বৃহস্পতি এখানে থাকলে যথেষ্ট অর্থসঞ্চয়, ধন খ্যাতির জন্য সমাজে বিশিষ্ট ব্যক্তি-রূপে সমাদর লাভ, ব্যয় সঙ্কোচের প্রচেষ্টা, উত্তম গৃহ, সম্পত্তি ও বাহনযোগ। রাষ্ট্রসরকারের নিকট পসার প্রতিপত্তি লাভ ঘটে। নানাভাবে অর্থলাভ ও সুখভোগ। এখানে শুক্র থাকলে জাতকধর্ম্ম-নিষ্ঠ হয়, গৃহ সুখসম্পত্তি প্রভৃতি লাভ হয়, সামাজিক মর্য্যাদালাভ, চাতুর্য্যের দ্বারা কৌশলে ধনসম্পত্তি বৃদ্ধি ইত্যাদি হয়। এখানে শনি থাকলে অন্য নারীর সাহায্যে মায়ের চিত্তপ্রসাদ, মাতৃহানি ও পর স্ত্রীলোকের সাহায্য লাভ ও সুখ হানি ঘটে, মানপ্রতিষ্ঠা ও অর্থলাভ হয়, শত্রু দমনে তৎপরতা ও দেখা যায়। এখানে রাহু ও কেতুর অবস্থিতি অত্যন্ত অশুভজনক।

মীনলগ্নের চতুর্থ স্থান বা সুখভাব মিথুন।

এখানে রবি থাকলে পিতৃসম্পর্কীয় ব্যাপারে নানাপ্রকার ঝঞ্ঝাট ও অশান্তি, মাতৃভাব শুভপ্রদ নয়। জমিজমা, সম্পত্তি, গৃহ আবাস সম্পর্কে নানা বিশৃঙ্খলতা, অধ্যবসায় ও পরিশ্রমের দ্বারা উন্নতি ও সম্মান বৃদ্ধি, রাজকীয় মর্য্যাদালাভ, সাংঘাতিক কার্য্যেও পটুতা প্রভৃতি লক্ষ্য করা যায়। চন্দ্র এখানে বিদ্যার উন্নতিকারক, সন্তানভাব শুভ হয়, বুদ্ধির প্রাখর্য্য হয়। রঙ্গরস পরিহাসপ্রিয়তা জন্মায়, মাতৃসুখ, সমাজে ও রাষ্ট্রে সম্মান বৃদ্ধি প্রভৃতি যোগ আছে, ব্যবসায় উন্নতি হয়। মঙ্গল এখানে থাকলে উত্তম গৃহ ও সম্পত্তি, ধন সঞ্চয়, সৌভাগ্যোদয়, বিনা বাধায় কর্ম্মোন্নতি, সৌভাগ্যবতী জননীর সাহায্য লাভ, উত্তম স্ত্রী, ব্যবসায়ে শ্রীবৃদ্ধি ও সাফল্য, সুখস্বচ্ছন্দতার সহিত সংসার যাত্রা নির্ব্বাহ, উত্তম যানবাহন প্রভৃতি সম্ভব। বুধও এখানে উত্তম ফলদাতা। পারিবারিক সুখ সমৃদ্ধি, গৃহ ভূমি ও বিদ্যালাভ। পিতৃধনে ধনী, সামান্য মূলধনে ব্যবসায় সুরু করে বিরাট ব্যবসায়ী হবার সুযোগ, রাজকীয় মর্য্যাদা ও সম্মান লাভ হয়।

এখানে বৃহস্পতি ও শুভব্যঞ্জক, গৃহভূমি সুখসম্পত্তি ও মাতা পিতার সাহায্য প্রভৃতি দেখা যায়। অদম্য ইচ্ছাশক্তিবলে উত্তরোত্তর কর্ম্মোন্নতি, দীর্ঘজীবন, কর্ম্মে মর্য্যাদা ও সম্মানলাভ, পারিবারিক শান্তি ও সমাজে কর্তৃত্ব প্রভৃতি যোগ আছে। এখানে শুক্র থাকলে মাতার সম্বন্ধে শুভ বলা যায় না। ভ্রাতা, ভগ্নীর সুখ, দীর্ঘজীবন, দৈনন্দিন জীবনযাত্রা সুখে নির্ব্বাহ, বিদেশে সম্মান ও সুখলাভ, চাতুর্য্য সম্পন্ন কর্ম্ম পদ্ধতি পরিলক্ষিত হয়। এখানে শনি মিশ্রফল দাতা—লাভ ও ক্ষতি, সুখ ও দুঃখ উভয়ই প্রদান করে—পরিমিত ব্যয়ের জন্য আনন্দ, পরিমিত লাভ ত ঘটে—কিন্তু সময়ে সময়ে আকস্মিক অর্থক্ষতির সম্ভাবনা, শারীরিক অসুস্থতা, পিতৃক্ষেত্রে নানাপ্রকার বাধা বিপত্তি প্রভৃতি সূচক হয়। রাহু এখানে থাকলে অসদুপায়ে বিত্তশালী, সুখৈশ্বর্য্য ও গৃহলাভ কিন্তু চিত্তের অশান্তি ও উদ্বেগ থাকে। এখানে কেতু মাতৃবিয়োগ-কারক বা মাতৃবিচ্ছেদ কারক, পারিবারিক অশান্তি, প্রতিবেশী ও সহকর্ম্মীদের সঙ্গে কলহ, নিম্নশ্রেণীদের সংস্পর্শে এসে প্রভূত উন্নতি যোগ।

* * *

ভাদ্র মাসের ব্যক্তিগত রাশির ফলাফল

মেষ

ভরণী নক্ষত্রাশ্রিতগণের পক্ষে সর্ব্বোৎকৃষ্ট ফল, এর পরেই কৃত্তিকা জাতগণের শুভযোগ, আর অশ্বিনী জাতগণের মন্দ ফল দেখা যায়। দুঃখ, মানসিক অশান্তি, কার্য্যে বাধা, স্বজন বিরোধ, বন্ধুবিচ্ছেদ, শত্রুপীড়ন, শারীরিক কষ্ট, ক্লান্তিকর ভ্রমণ, মানহানি প্রভৃতি অশুভ ঘটনা পরিলক্ষিত হয়। নূতন বিলাসব্যসন সামগ্রী ক্রয়, শত্রু দমন, লাভ, সাফল্য ইত্যাদি শুভ সম্ভাবনা আছে। কোন প্রকার বিশেষ পীড়া নেই, তবে শারীরিক দুর্ব্বলতা সূচিত হয়। সন্তানাদির পীড়া ও তজ্জনিত উদ্বেগ। পারিবারিক অশান্তি, দাম্পত্য সুখ স্বচ্ছন্দতার ব্যাঘাত ঘটবে, কোন কোন ক্ষেত্রে স্বামী স্ত্রীর মধ্যে মানসিক বিচ্ছেদের সম্ভাবনা ও আছে। আত্মীয় স্বজন ও সন্তানাদির সহিত কলহহেতু মানসিক অশান্তি। আর্থিক অস্বচ্ছলতার আশঙ্কা নেই। আয় বৃদ্ধি, লাভ প্রভৃতি সূচিত হয়। বাড়ীওয়ালা, ভূম্যধিকারী ও কৃষিজীবীদের পক্ষে মাসটী মধ্যম। সম্পত্তি ক্রয়-বিক্রয়ে আশাপ্রদ সুযোগ ও লাভ হবে না। চাকুরিজীবীদের পক্ষে মাসটী মধ্যম। উপরওয়ালার বিরাগভাজন হবার সম্ভাবনা। ব্যবসায়ী ও বৃত্তিজীবীগণের পক্ষে এ মাসটী উল্লেখযোগ্য বলা যায় না, কোন রকমে দৈনন্দিন কর্ম্মনির্ব্বাহ হবে। স্ত্রীলোকগণ নানা প্রকারে সুযোগ সুবিধা পাবেন, কাজে এঁদের সাফল্য হবে। পুরুষের সহিত মেলামেশায় আনন্দ উপভোগ করবেন ও নানাপ্রকার আমোদ-প্রমোদে মানসিক স্ফূর্ত্তি লাভ করবেন। বিদ্যার্থী ও পরীক্ষার্থীদের পক্ষে মাসটী শুভ যাবে।

বৃষ

কৃত্তিকা রোহিণীনক্ষত্রে জাতকগণের পক্ষে মাসটী মন্দ যাবে না কিন্তু সব চেয়ে খারাপ অবস্থা হবে মৃগশিরাজাত ব্যক্তিগণের, বহু অশুভ ঘটনার সম্মুখীন হবেন। পারিবারিক অশান্তি, কর্ম্মে বাধা বিঘ্ন, অকারণ কলহ, বন্ধুদের দ্বারা প্রতারণা, উদ্বেগ, বিক্ষোভ প্রভৃতি লক্ষ্য করা যায়। মাসের শেষার্দ্ধে মোটামুটি সর্ব্ব বিষয়ে সাফল্যলাভ, সৌভাগ্য বৃদ্ধি, খ্যাতি, প্রভাব প্রতিপত্তি, ভ্রমণ, অর্থলাভ ইত্যাদির সম্ভাবনা রয়েছে। স্বাস্থ্যহানির আশঙ্কা নেই, তবে হজমশক্তির ব্যাঘাত, উদরঘটিত পীড়া, ইনফ্লুয়েঞ্জা ইত্যাদি লক্ষ্য করা যায়, তাও গুরুতর আকার ধারণ করবে না। পারিবারিক অশান্তি ও ঘরে বাইরে শত্রু বৃদ্ধির জন্য মানসিক স্বাস্থ্যহানি ঘটবে। আর্থিকক্ষেত্রে লাভ ক্ষতি, হারজিত, আয়বৃদ্ধিও হ্রাস দুইই দেখা যায়। মাসের প্রথমার্দ্ধ শুভ, সাহিত্যিকতা বা গ্রন্থ প্রকাশ, প্রভৃতি বিষয়ে লাভ। ভূম্যধিকারী, বাড়ীওয়ালা ও কৃষিজীবীদের পক্ষে মাসটির ফল শুভাশুভ। একদিকে যেমন ভাড়া বৃদ্ধি ও কৃষিজাত দ্রব্যজনিত লাভ, অপর দিকে তেমনি বাড়ীর ভগ্নাবস্থা ও কৃষির অনিষ্টহেতু ক্ষতি। সম্পত্তি ক্রয় বা ভূমি সম্পর্কে টাকা লেনদেন বর্জ্জনীয়। চাকুরির ক্ষেত্রে প্রথমার্দ্ধ অতীব উত্তম, শেষার্দ্ধ নৈরাশ্যজনক। ব্যবসায়ীদের পক্ষে মাসের বেশীর ভাগ ভালো হবে না, বৃত্তিজীবীগণের পক্ষে উত্তম নয়। বিদ্যার্থী ও পরীক্ষার্থীদের পক্ষে মধ্যম। স্ত্রীলোকদের পক্ষে মাসটী সম্পূর্ণ শুভ হোলেও আংশিকভাবে স্বার্থের ব্যাঘাত ঘটবে। প্রথমার্দ্ধ নানাপ্রকার প্রণয়ঘটিত ব্যাপারে আনন্দ ও সাফল্যলাভ, শেষার্দ্ধে পারিবারিক অশান্তি ও সামাজিক মর্য্যাদাহানি।

মিথুন

আর্দ্রানক্ষত্রজাতগণের পক্ষে অনেকটা শুভ কিন্তু মৃগশিরা ও পুনর্ব্বসুজাতগণের পক্ষে বিশেষ ভালো বলা যায় না। মাসটী শুভাশুভ ফল দাতা। ভয়, উদ্বিগ্নতা, স্বজন ও বন্ধু বিরোধ, চেষ্টায় অসাফল্য, শারীরিক ও মানসিক অসুস্থতা, ক্লান্তিকর ভ্রমণ প্রভৃতি পরিলক্ষিত হয়। লাভ, বিলাস ব্যসন,সম্মান উত্তম অবস্থা,উত্তম বন্ধুলাভ প্রভৃতি শুভফলেরও আশা আছে। মাসের বেশীর ভাগ সময়ে স্বাস্থ্য ভালো যাবে। গুহ্য প্রদেশে প্রদাহ, জ্বর, হজমের গোলমাল প্রভৃতি ঘটতে পারে। অকারণ অপবাদের জন্যে অশান্তিভোগ। পরিবারবর্গের সহিত মধ্যে মধ্যে মনোমালিন্য ঘটবে। আর্থিক অবস্থার উন্নতিযোগ আছে। যে সব কাজে গণসংযোগ আছে সে সব কাজে অর্থাগম হবে। স্পেকুলেশন বর্জ্জনীয়। বাড়ীওয়ালা, ভূম্যধিকারী ও কৃষিজীবীদের পক্ষে মাসটী ভালো যাবে না, আবহাওয়া প্রতিকূল হেতু ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার আশঙ্কা। চাকুরিয়ক্ষেত্রে পদোন্নতি, মর্য্যাদালাভ ও উপরওয়ালার প্রীতিভাজন হওয়ার যোগ আছে। বেকার ব্যক্তির কর্ম্মলাভ। ব্যবসায়ী ও বৃত্তিজীবীগণের পক্ষে মাসটী বিশেষ শুভপ্রদ। স্ত্রীলোকের পক্ষে মাসটী সর্ব্বতোভাবে শুভ হবে—দাম্পত্য প্রীতি, অবৈধ প্রণয়ে সাফল্য, সামাজিক মর্য্যাদালাভ ও পারিবারিকক্ষেত্রে কর্তৃত্বলাভ, অর্থ ও উপঢৌকন প্রাপ্তি সূচিত হয়। বিদ্যার্থী ও পরীক্ষার্থীদের পক্ষে মাসটী শুভ বলা যায় না—নানাপ্রকার বাধা ও বিশৃঙ্খলতার সম্ভাবনা।

কর্কট

অশ্লেষা নক্ষত্রজাতগণের পক্ষে বিশেষ শুভ, পুনর্ব্বসু পুষ্যানক্ষত্রজাতগণের মধ্যবিধ ফল। উত্তম লাভ, সম্মান, স্বাস্থ্য ও সুখসমৃদ্ধি, গৃহে মাঙ্গলিক অনুষ্ঠান, সৌভাগ্য বৃদ্ধি ও শত্রুদমন যোগ দেখা যায়। কিছু কিছু বাধা কার্য্যকলাপে আসতে পারে আর অকারণ উদ্বেগ ঘটতে পারে। স্বাস্থ্য ভালোই যাবে। অতিরিক্ত পানভোজনের দরুণ মধ্যে পীড়া হোতে পারে। গার্হস্থ্য সুখ লক্ষ্য করা যায়। আর্থিক স্বচ্ছন্দতা, অর্থাগম, আয়বৃদ্ধি ও নব প্রচেষ্টায় সাফল্য যোগ আছে। স্পেকুলেশনেও লাভ। বাড়ীওয়ালা, কৃষিজীবী ও ভূম্যধিকারীর পক্ষে মাসটি মন্দ যাবে না। চাকুরিয়ক্ষেত্রে উত্তম অবস্থা, বেকার ব্যক্তির কর্ম্মলাভ। ব্যবসায়ী ও বৃত্তিজীবীদের পক্ষে ও মাসটী উত্তম। স্ত্রীলোকের পক্ষে মাসটী মোটামুটি যাবে, কোনপ্রকার ঘটনাবহুল দিন দেখা যাবে না—সর্ব্বক্ষেত্রে মাসটির নিষ্ক্রিয়তা পরিলক্ষিত হয়। বিদ্যার্থী ও পরীক্ষার্থীদের পক্ষে মাসটি ভালো বলা যায়।

সিংহ

মঘানক্ষত্রাশ্রিতগণের পক্ষে অশুভ মাস, উত্তরফল্গুনী নক্ষত্রজাতগণের পক্ষে মধ্যম এবং পূর্ব্বফল্গুনী নক্ষত্রজাত ব্যক্তিদের পক্ষে উত্তম। মধ্যে মধ্যে শারীরিক কষ্ট, শ্লেষাঘটিত পীড়া, রক্তের চাপবৃদ্ধি ও ছোটখাটো আঘাত ইত্যাদি সূচিত হয়। পারিবারিকক্ষেত্রে ভালোমন্দ অবস্থা, সময়ে সময়ে অশান্তি ও কলহ, আত্মীয়বর্গের সঙ্গে বিরোধ হেতু যথেষ্ট অশান্তির কারণ ঘটবে, স্বজনবিয়োগজনিত শোক। আর্থিক বিষয়ে ভালো বলা যায় না, চুরির ভয় আছে, ব্যয় বৃদ্ধি ঘটবে, এজন্যে হয়তো ঋণ ও করতে হবে, স্পেকুলেশন বর্জ্জনীয়, সন্তানাদির শরীর ভালো যাবে না। বাড়ীওয়ালা ভূম্যধিকারী ও কৃষিজীবীদের পক্ষে মাসটী মোটামুটি যাবে—কোনপ্রকার পরিকল্পনা করলে তা ব্যর্থ হবে। চাকুরিরক্ষেত্রে একভাবেই যাবে। ব্যবসায়ী ও বৃত্তিজীবীদের অবস্থার কোনরূপ ভালোমন্দ পরিবর্ত্তন হবে না। স্ত্রীলোকদের পক্ষে সর্ব্ববিষয়ে নৈরাশ্যজনক পরিস্থিতি—কোন সামাজিক অনুষ্ঠানে যোগদান না করাই ভালো। বিদ্যার্থী ও পরীক্ষার্থীদের ফল মধ্যম—শেষার্দ্ধে কিছু বাধা বিঘ্ন।

কন্যা

উত্তর ফল্গুনী ও হস্তা নক্ষত্রাশ্রিতগণের পক্ষে অপেক্ষাকৃত শুভ। চিত্রাজাতগণের পক্ষে নিকৃষ্ট ফল। মানসিক অশান্তি, উদ্বেগ, কলহ, স্ত্রীলোকের নিকট নিগ্রহভোগ, ক্ষতি, বন্ধুবিরোধ, স্বজন বিয়োগ, ক্লান্তিপ্রদ ভ্রমণ প্রভৃতি দেখা যায়। মাসের প্রথমার্দ্ধটী শুভ—সম্মান ও সৌভাগ্যবৃদ্ধি। শারীরিক কষ্ট অল্পই হবে। শ্লেষ্মাপ্রকোপ, চক্ষু পীড়া, রক্তের চাপবৃদ্ধি প্রভৃতির সম্ভাবনা আছে। পরিবারবর্গের সহিত সময়ে সময়ে মনোমালিন্য ঘটবে। আয় ও ধনাগম প্রথমার্দ্ধে হবে, শেষার্দ্ধে ব্যয়বৃদ্ধি। নানা দিকে কিছু কিছু আর্থিক ক্ষতি সম্ভব। স্পেকুলেশন বর্জ্জনীয়। বাড়ীওয়ালা, ভূম্যধিকারী ও কৃষিজীবীদের পক্ষে মাসটী মোটামুটিভাবেই যাবে। চাকুরিজীবীদের পক্ষে উপর ওয়ালার প্রীতি অর্জ্জন, নূতন পদমর্য্যাদা, সাফল্য ও সুখ্যাতিলাভ ঘটবে। ব্যবসায়ী ও বৃত্তিজীবীদের পক্ষে মাসটী শুভাশুভপ্রদ। স্ত্রীলোকের পক্ষে মাসের প্রথমার্দ্ধে শুভ, শেষার্দ্ধে ভালো বলা যায় না। বিদ্যার্থী ও পরীক্ষার্থীদের পক্ষে মাসটি শুভ নয়।

তুলা

স্বাতী নক্ষত্রাশ্রিতগণের পক্ষে বিশেষ শুভ, চিত্রা ও বিশাখানক্ষত্রাশ্রিত গণের ফল মধ্যবিধ। সুখৈশ্বর্য্য লাভ, অর্থাগম, শত্রু দমন, মাঙ্গলিক অনুষ্ঠান, নব পদমর্য্যাদা, সৌভাগ্য বৃদ্ধি, বিলাসব্যসন ও আনন্দ সম্ভোগ ঘটবে। স্বাস্থ্য ভালোই যাবে। পারিবারিক শান্তিও শৃঙ্খলা অক্ষুন্ন থাকবে। জনপ্রিয়তা অর্জ্জন, অর্থাগম ও সর্ব্বপ্রকার শুভযোগও রয়েছে। বাড়ীওয়ালা, কৃষি জীবী ও ভূম্যধিকারীরা লাভবান হবেন। চাকুরিজীবীরাও এখানে উন্নতিশীল হবেন, খ্যাতি প্রতিপত্তি ও মর্য্যাদালাভ। স্ত্রীলোকদের পক্ষে মাসটী উত্তম, সামাজিক, পারিবারিক ও প্রণয়ক্ষেত্রে বিশেষ সাফল্য সুখ। পরীক্ষার্থী ও বিদ্যার্থীদের পক্ষে মাসটী ভালো যাবে।

বৃশ্চিক

বিশাখা নক্ষত্রাশ্রিতগণের পক্ষে উত্তম, অনুরাধা ও জ্যেষ্ঠা জাতগণের পক্ষে অপেক্ষাকৃত অশুভ। আশাভঙ্গ, মনস্তাপ, শত্রুবৃদ্ধি, ধনক্ষয়, কর্ম্মে বাধা বিপত্তি ও অসম্মান সূচিত হয়। মাসের মধ্যভাগে কিছু লাভ, সাফল্য, উত্তমসঙ্গ ও বন্ধুত্ব লাভ। গুরুতর পীড়াদির আশঙ্কা নেই, তবে শারীরিক দুর্ব্বলতা সূচিত হয়। পারিবারিক কলহ ও স্বজন বিয়োগ ঘটবে। আর্থিক উন্নতির সম্ভাবনা নেই, আয়ের পথে বাধা আসতে পারে, ব্যয়াধিক্যহেতু জটিল পরিস্থিতির উদ্ভব হবে, টাকা লেনদেন ব্যাপারে শঠতার সম্ভাবনা। প্রতারণা, ক্ষতি ও চৌর্য্য ভয়। স্পেকুলেশন বর্জ্জনীয়। বাড়ীওয়ালা, ভূম্যধিকারী ও কৃষিজীবিগণ নানাপ্রকার দুর্ভোগের সম্মুখীন হবেন। এঁদের পক্ষে মাসটী শুভ নয়। চাকুরীজীবীদের পক্ষে মাসটী অশুভ। ব্যবসায়ী ও বৃত্তিজীবীরা এ মাসে শুভ ফললাভ করবেন। এ মাসটী স্ত্রীলোকদের পক্ষে শুভাশুভ মিশ্রিত, মাসের শেষের দিকে উন্নতিযোগ আছে। অবৈধ প্রণয়ে বিপত্তি। পুরুষের দ্বারা প্রতারণা, পারিবারিক কলহ ও ব্যয়বৃদ্ধি। পরীক্ষার্থী ও বিদ্যার্থীগণের পক্ষে মাসটি নৈরাশ্যজনক।

ধনু

মুলানক্ষত্রাশ্রিতগণ অপেক্ষা পূর্ব্বষাঢ়া ও উত্তরাষাঢ়া জাতগণের শুভ ফল। মোটামুটিভাবে বিচার করলে কারো পক্ষেই বিশেষ ভালো যাবে না। সুযোগবাদী বন্ধু, কলহ, সর্ব্বত্র শত্রুপ্রকোপ বৃদ্ধি, নৈরাশ্য, মর্য্যাদাহানি, স্বজন বিয়োগ, সর্ব্বকার্য্যে বিলম্ব ও ব্যাঘাত, প্রভৃতি অশুভ ফলের আশঙ্কা করা যায়। মাসের মধ্যভাগে কিছু কিছু সাফল্য, সুখ, নূতন বিষয়ে জ্ঞান লাভের স্পৃহাহেতু অধ্যয়ন ও সৌভাগ্য বৃদ্ধির সম্ভাবনাও আছে। শারীরিক অবস্থা ভালো যাবেনা, জীবনীশক্তির হ্রাস, আঘাত প্রাপ্তি বা পতনের আশঙ্কা। স্ত্রীর পীড়া হবে। শেষ দিকে স্বাস্থ্যোন্নতি। পারিবারিক ক্ষেত্রে শান্তি ও শৃঙ্খলা দেখা যাবে। সমগ্র মাসটীতে মানসিক উত্তেজনা ও ব্যয়াধিক্য হেতু অশান্তি। স্পেকুলেশন একেবারেই বর্জ্জনীয়। বাড়ীওয়ালা, ভূম্যধিকারী ও কৃষিজীবীদের পক্ষে মাসটী অত্যন্ত অশুভ, মামলা মোকর্দ্দমা, দাঙ্গা হাঙ্গামার ভয় আছে। চাকুরি জীবীদের পক্ষে মাসটী মন্দ যাবে না। ব্যবসায়ী ও বৃত্তিজীবীরা আশাপ্রদ উন্নতি করতে পারবেন না। স্ত্রীলোকেরা প্রণয়ে সাফল্যলাভ করবেন, সামাজিক, পারিবারিকক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠা হবে। বিদ্যার্থী ও পরীক্ষার্থীগণের পক্ষে মাসটী মধ্যম।

মকর

ধনিষ্ঠাজাতগণের পক্ষে অশুভ ফলের আধিক্য, উত্তরাষাঢ়া ও শ্রবণাজাতগণের পক্ষে অনেকটা ভালো। ক্লান্তিকর ভ্রমণ, মানসিক অশান্তি, উদ্বেগ, শারীরিক অসুস্থতা, ব্যয়বৃদ্ধি মামলা মোকর্দ্দমা প্রভৃতির সম্ভাবনা। স্বাস্থ্যহানি, অজীর্ণ, উদর পীড়া, জ্বর, রক্তশূন্যতা সম্ভব। স্ত্রী-পুত্রাদির সহিত মনোমালিন্য, মানসিক উত্তেজনা ও দুঃখ—আত্মীয়-স্বজনের মৃত্যু। লাভ ও ক্ষতি দুই-ই যোগ আছে। বাড়ীওয়ালা, ভূম্যধিকারী ও কৃষি-

জীবীদের সৌভাগ্যবৃদ্ধি। চাকুরিজীবীদের পক্ষে মাসটী শুভ নয়। ব্যবসায়ী ও বৃত্তিজীবীগণের পক্ষে মাসটি শুভ। স্ত্রীলোকদের পক্ষে শুভ। বিদ্যার্থী ও পরীক্ষার্থীগণের পক্ষে মধ্য ফল।

কুম্ভ

ধনিষ্ঠা, শতভিষা ও পূর্ব্বভাদ্রপদজাত ব্যক্তিগণের এমাসে একই প্রকার শুভাশুভ ফল লাভ হবে। মাসের প্রথমার্দ্ধ অপেক্ষাকৃত ভালো, শেষের দিকে কিছু মন্দ ফলের সম্ভাবনা। উত্তম স্বাস্থ্য, প্রতিযোগীর উপর জয় লাভ, শত্রুদমন, সাধারণ সাফল্য, জনপ্রিয়তা, সৌভাগ্যলাভ, খ্যাতি প্রতিপত্তি, গৃহে মাঙ্গলিক অনুষ্ঠান প্রভৃতি প্রথমার্দ্ধে সম্ভব, শেষের দিকে অপবাদ, নিগ্রহভোগ, অপব্যয়, বন্ধুবিরোধ, অপ্রীতিকর পরিবর্ত্তন দেখা যায়। যাঁরা স্থায়ী ব্যাধিতে ভুগছেন, তাঁদের অবস্থা শেষার্দ্ধে অশুভ হবে। প্রস্রাব ও গুহ্যপ্রদেশে পীড়া, ঈষৎ ক্ষত। পারিবারিক শান্তি। মাসটীতে আর্থিক যোগাযোগ দেখা যায়। নানাদিকে কর্ম্ম প্রসারতা কিন্তু ঝোঁকের মাথায় নানা ভাবে ব্যয় হবে। স্পেকুলেশন বর্জ্জনীয়। বাড়ীওয়ালা, ভূম্যধিকারী ও কৃষিজীবিগণের পক্ষে মাসটী উল্লেখযোগ্য হবে না। চাকুরিজীবীদের পক্ষে অতীব শুভ সময়, কর্ম্মক্ষেত্রে জয়লাভ, পদোন্নতি, উপরওয়ালার অনুগ্রহ লাভ, অস্থায়ী পদে যাঁরা আছেন তাঁদের চাকুরি পাকা হবে। বেকার ব্যক্তিগণ কর্ম্মলাভ করবেন। স্ত্রীলোকেরা সাফল্যলাভ করবেন সকল বিষয়ে—পারিবারিক শান্তি, অলঙ্কার ও আসবাবপত্র প্রাপ্তি প্রভৃতি সূচিত হয়, প্রণয়ানুরাগ বৃদ্ধি পাবে। বিদ্যার্থী ও পরীক্ষার্থীদের পক্ষেও মাসটি খুব শুভ।

মীন

পূর্ব্বভাদ্রপদ নক্ষত্রাশ্রিতগণের পক্ষে নিকৃষ্ট ফল, উত্তরভাদ্রপদ ও রেবতী নক্ষত্রজাতগণের পক্ষে অপেক্ষাকৃত শুভ। সাফল্য লাভ, সুখস্বচ্ছন্দতা প্রভৃতি সম্ভব, মামলা মোকর্দ্দমায় জয়লাভ, শত্রুদমন, অসুস্থতা ইত্যাদি সূচিত হয়। স্বাস্থ্যোন্নতি যোগ আছে। শ্লেষ্মা প্রকোপ দেখা যায়। পারিবারিক স্বচ্ছন্দতা ও শুভ পরিবর্ত্তন সম্ভব। আয় বৃদ্ধি, লাভ ইত্যাদি সত্ত্বেও বিশেষ ব্যয় বৃদ্ধির যোগ আছে। বাড়ীওয়ালা, ভূম্যধিকারী ও কৃষিজীবিগণের সময়টী মধ্যম। চাকুরির ক্ষেত্রে বেতন বৃদ্ধি, নূতন পদমর্য্যাদা, মানসিক সুখ ইত্যাদি সূচিত হয়। ব্যবসায়ী ও বৃত্তিজীবিগণের পক্ষে বিশেষ শুভ সময়। স্ত্রীলোকেরা সর্ব্ববিষয়ে সুখ সুবিধা ও শান্তি লাভ করবে। পরীক্ষার্থী ও বিদ্যার্থীগণের পক্ষে শুভ।

ব্যক্তিগত লগ্ন ফলাফল

মেষলগ্ন—

কোন নূতন কার্য্যে হস্তক্ষেপ। উচ্চ পদ মর্য্যাদাসম্পন্ন ব্যক্তির সান্নিধ্যলাভ ও তদ্দ্বারা উপকৃত হওয়ার সম্ভাবনা। শারীরিক অসুস্থতা। বাস পরিবর্ত্তন। গৃহে অশান্তি। সন্তানের পীড়া। আনন্দলাভ। দুর্ঘটনার ভয়। ব্যয় বৃদ্ধি। বিদ্যাভাব শুভ।

বৃষলগ্ন—

ভ্রমণ। বিত্তলাভ। গৃহ সম্পত্তি সুখ। শত্রু পীড়া, সম্মানলাভ, অর্থলাভ, ব্যয় বৃদ্ধিও উদ্বেগ. সৌভাগ্যবৃদ্ধি, প্রণয়ে সাফল্য, দাম্পত্য প্রীতি মামলা মোকর্দ্দমায় পরাজয়।

মিথুনলগ্ন—

উদ্বেগ, ধনাগম, সাহিত্য সাধনায় সুনাম অর্জ্জন, পত্রাদি লেখা থেকে বিপত্তি, কর্ম্মে সাফল্য, শারীরিক অসুস্থতা, স্বজনহানি সম্ভাবনা, স্ত্রীর পীড়া, বন্ধু বিচ্ছেদ, বিদ্যার আংশিক ক্ষতি, হৃৎপিণ্ডের দুর্ব্বলতা, প্রস্রাবের দোষ।

কর্কটলগ্ন—

ব্যয় বাহুল্য, স্ত্রীর স্বাস্থ্যহানি, ভাগ্যোন্নতি, মানসিক কষ্ট, ধনাগম, বিদ্যার্জ্জন, সন্তানের স্থান শুভজনক, কর্ম্মে বাধা বিপত্তি কিছু পরিমাণে ঘটবে।

সিংহলগ্ন—

দেহ পীড়া, বাত ও পিত্ত প্রকোপ, অর্থোন্নতির যোগ থাকা সত্ত্বেও ব্যয় বাহুল্যহেতু মানসিক চাঞ্চল্য, বিদ্যাস্থানে বিঘ্ন, সন্তানের দেহপীড়া, চাকুরীতে পদোন্নতি, ভূম্যাদি ক্রয়, গৃহ নির্ম্মাণযোগ।

কন্যালগ্ন—

ধনভাবের ফল শুভ, শারীরিক ও মানসিক অসুস্থতা, উদ্বেগ ও ভয়। ক্ষতি, কর্ম্মে বাধাবিঘ্ন, কপট বন্ধুর সমাগম, পত্নীর স্বাস্থ্যভঙ্গযোগ, উচ্চস্থান থেকে পতনের সম্ভাবনা, বিদ্যাভাব শুভ, কর্ম্মলাভ ও পদোন্নতি।

তুলালগ্ন—

দেহভাব শুভ, ধনাগম, স্বজন বিরোধ, ভ্রাতৃ বিচ্ছেদ, নূতন কর্ম্মে যোগদান বা পদোন্নতি, বেতন বৃদ্ধির সুযোগ, মাতার স্বাস্থ্য অপেক্ষাকৃত ভালো, পিতার স্বাস্থ্যহানি, বিদ্যাভাব মধ্যম।

বৃশ্চিকলগ্ন—

শারীরিক ও পারিবারিক সুখস্বচ্ছন্দতা। ধনাগমে অন্তরায় ঘটবে, ব্যয় বাহুল্য যোগ। সদ্বন্ধু লাভ, সন্তানের দেহপীড়া, পড়াশুনায় বাধাবিঘ্ন, কর্ম্মভাব মধ্যম। পত্নীর স্বাস্থ্যহানি। প্রণয়ভঙ্গ যোগ। সম্মান বৃদ্ধি।

ধনু লগ্ন—

শারীরিক ও মানসিক অবস্থা ভালো নয়, উদর পীড়া, যকৃতের দোষ। কপট বন্ধুর দ্বারা প্রতারণা লাভ। সন্তানের লেখাপড়ায় উন্নতি। বিদ্যাভাব মধ্যম। পত্নীর অসুস্থতার জন্য অর্থক্ষয়, কর্ম্মস্থলে বাধাবিঘ্নজনিত নানা আশঙ্কা। চিকিৎসকগণের সুনাম। ২৬শে ভাদ্রের পর ধনাগম বৃদ্ধি। মাতৃকষ্ট।

মকরলগ্ন—

আয়বৃদ্ধি, ব্যয়াধিক্য হেতু চাঞ্চল্য, সহোদরের সঙ্গে মতানৈক্য, স্ত্রীর শরীর ভালো বলা যায় না। বিদ্যাভাব শুভ। কর্ম্মোন্নতি দেখা যায় না। কৃষিজাত দ্রব্যের ব্যবসায়ে কিছু কিছু লাভের আশা আছে। সংস্কৃতের পরীক্ষায় শুভ।

কুম্ভলগ্ন—

মনস্তাপ, পাকাশয়ের দোষ, অর্থাগমের সুযোগ দেখা যায়, পত্নীর পীড়া উচ্চশিক্ষিত ব্যক্তির সহিত মিত্রতা, বিদ্যাভাব কিঞ্চিৎ দুর্ব্বল, চিকিৎসা ও অধ্যাপনায় সুনাম। কর্ম্মোন্নতি।

মীন লগ্ন—

বায়ুঘটিত পীড়া, স্নায়বিক দুর্ব্বলতা, অর্থাগম, নানারকম ব্যয়াধিক্য, বন্ধুগণের সহিত মতানৈক্য, পত্নীর স্বাস্থ্য ভালো বলা যায় না। কোন অভিনব কার্য্যে প্রতিষ্ঠা, কর্ম্মস্থলে কিছু ক্ষতির আশঙ্কা, সাহিত্যচর্চ্চা, বিদ্যায় উন্নতি লাভ। গৃহনির্ম্মাণের পরিকল্পনা।

মহা সরস্বতী

(বাহার)

তব মুখ চন্দ্রমা জাগে প্রাণে।
ধন্যা সুহাসিনী সিদ্ধি প্রদায়িনী
বিরূপা নহ মা কভু সন্তানে।
আছ বিশ্ব-কর্ম্মে যুক্ত নিরন্তর,
যাহা কিছু করো মাগো হয় সর্ব্ব-সুন্দর,
আমারে তেমনি গড় কৃপা দানে।

কথা : শ্রীঅনিলবরণ রায় স্থর ঃ শ্রীযুক্ত গোপেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায়

স্বরলিপি ঃ শ্রীমতী ইরা দেবী

II ণা ণা পা মা | পা -া মজ্ঞা মা | মা -ণধা ধা না | র্সা -া -না -র্সা I
তবমুথ চন্দ্রং মা জা ০০ গে প্রা ণে ০ ০ ০

I ণা -া পা পা | মজ্ঞা -মা ণা পা | মা -জ্ঞা জ্ঞা জ্ঞা | জ্ঞা -মা রা সা I
ধ ন্ না সু হাং ০ সি নী সি ০ দ্ধি প্র দা ০ য়ি নী

I সা সা মা মা | পা পা মজ্ঞা মা | -মা -ণধা না -র্সা | র্সর্রা -র্মর্জ্ঞা -র্রর্সা -নর্সা II
বি রূ পা ন হ মা কং ভু সন্ ০০ তা ০ নেং ০০ ০০ ০০

II মা মা ণা -ধা | না র্সা -া র্সা | র্সা -া র্সা র্রা | র্সা -না র্সা র্সা I
আ ছ বি ০ শ্ব ক র্ মে যু ০ ক্ত নি র ন্ ত র

I র্সা র্রা র্সা র্রা | র্জ্ঞা র্জ্ঞা র্রা র্সা | না -র্সা -ণর্রা র্সা | না -র্সা ণা ধা I
যা হা কি ছু ক রো মা গো হ য় সর্ ব সু ন্ দ র্

I ধা ণা র্সা র্রা | র্মা র্জ্ঞা র্রা র্সা | নর্সা -র্রা না র্সা | ণা -ধণা -পধা -নর্সা II
আ মা রে তে ম নি গ ড় কৃং ০ পা দা নে ০০ ০০ ০০

বেদান্ত-দর্শন

শ্রীতারকচন্দ্র রায়

ভ্রান্তি-জ্ঞান

শঙ্কর জগতের জ্ঞানকে ভ্রান্তি বলিয়াছেন। এই ভ্রান্তি-জ্ঞানের উৎপত্তি সম্বন্ধে তাঁহার সহিত নৈয়ায়িক ও মীমাংসকদিগের মতভেদ আছে। মীমাংসকদিগের মতে সমস্ত প্রত্যক্ষ জ্ঞানই সত্য—প্রত্যক্ষ জ্ঞানে তাঁহারা ভ্রান্তির সম্ভাব্যতা স্বীকার করেন না। এই মত সত্য হইলে শঙ্করের মায়াবাদের কোনও ভিত্তিই থাকে না। মীমাংসকদিগের মতে শুক্তিতে যখন রজত জ্ঞান হয়, তখন স্মৃতির সহিত প্রত্যক্ষ জ্ঞান মিশ্রিত হয়, তাহা কেবল প্রত্যক্ষ জ্ঞান নহে। স্মৃতিজ্ঞানের সঙ্গে প্রত্যক্ষ জ্ঞানের ভেদের বোধের অভাববশতঃই শুক্তিতে রজতের জ্ঞান হয়। অদ্বৈতবাদিগণ বলেন, শুক্তিতে রজত জ্ঞান—"ইহা রজত", এই জ্ঞান—একটি মাত্র জ্ঞান। ইন্দ্রিয়ের সম্মুখে উপস্থিত বস্তু (ইদম্) দ্বারা অতীতে প্রত্যক্ষীকৃত রজতের সমৃতি যে উদ্বুদ্ধ হয়, তাহা সত্য। কিন্তু এই স্মৃতিজ্ঞান প্রত্যক্ষ শুক্তিজ্ঞানের সহিত মিলিত হইয়া একমাত্র জ্ঞানের উৎপাদন করে। তাহা যদি না হইত যদি স্মৃতিজ্ঞান ও প্রত্যক্ষ জ্ঞান পাশাপাশি পৃথকভাবে থাকিত, তাহা হইলে দুইটি জ্ঞানের উৎপত্তি হইত—(১) আমি ইহা (শুক্তি) দেখিতেছি এবং (২) আমার রজতের স্মৃতি হইতেছে অথবা (১) এই শুক্তি আছে, (২) ঐ রজত ছিল। কিন্তু "ইহা রজত" এই বাক্যে "ইহা"তে রজতত্ব আরোপিত হয়। সুতরাং একালে "ইদম্" এর সহিত রজতের অভিন্নত্বই উক্ত হয়। জ্ঞানে এই অভিন্নতা যদি না থাকিত, তাহা হইলে রজ্জুতে যখন সর্পের জ্ঞান হয়, তখন দ্রষ্টা ভীত হইয়া পলায়ন করিত না। সুতরাং প্রত্যক্ষে যে ভ্রান্তি হয় ইহা অস্বীকার করা যায় না।

নৈয়ায়িকদিগের মতে রজ্জুতে সর্পজ্ঞানের সময় পূর্ব্বদৃষ্ট সর্পের স্মৃতি (রজ্জুর সহিত সর্পের সাদৃশ্য বশতঃ) এত বলবতী হয়, যে তাহা প্রত্যক্ষের মত স্পষ্ট হইয়া উঠে। পূর্ব্বদৃষ্ট সর্পের আকৃতি তখন তাহার প্রত্যয় দ্বারা মনের সম্মুখে উপস্থাপিত হয়। যাহা পূর্ব্বে বর্ত্তমান ছিল, তাহাই মনের সম্মুখে উপস্থিত হয়। সম্পূর্ণ অসৎ কোনও বস্তু মনের নিকট উপস্থিত হয় না। যাহা সম্পূর্ণ অসৎ তাহার জ্ঞান হওয়া অসম্ভব। সুতরাং বর্ত্তমানে যে জগৎ প্রত্যক্ষ হইতেছে, তাহা সম্পূর্ণ ভ্রান্তি বলিয়া উড়াইয়া দেওয়া যায় না, অন্ততঃ অতীতে তাহা প্রত্যক্ষ হইয়াছে, ইহা স্বীকার করিতে হয়। জগতের অস্তিত্ব কখনই ছিল না, ইহা প্রমাণ করা অসম্ভব।

ইহার উত্তরে অদ্বৈতবাদী বলেন—যে বস্তু অন্য স্থানে অন্য সময়ে বর্ত্তমান ছিল, বর্ত্তমান স্থলে ও বর্ত্তমান কালে তাহার প্রত্যক্ষ জ্ঞান হওয়া অসম্ভব। স্মৃতিতে রক্ষিত রূপ যতই স্পষ্ট হউক না কেন—তাহা অতীতে প্রত্যক্ষীকৃত বস্তুর রূপ, বর্ত্তমান প্রত্যক্ষের বিষয়ের রূপ নহে। সুতরাং অতীতে প্রত্যক্ষীকৃত বস্তু যে বর্ত্তমানে মনের সম্মুখে উপস্থিত হয়, ইহা অসম্ভব। স্মৃতিতে রক্ষিত "প্রত্যয়" একটি সত্য বস্তুকে তাহার স্থান ও কাল হইতে বিচ্যুত করিয়া ভিন্নকাল ও স্থানে স্থাপন করিতে পারে, ইহা মনে করা অসম্ভব। নৈয়ায়িকদিগের মতে ইহা স্বীকৃত যে যাহা বর্ত্তমান কালে ও স্থানে বর্ত্তমান নাই, তাহা বর্ত্তমান কালে ও স্থানে প্রতিভাত হইতে পারে। বর্ত্তমান কালে ও স্থানে অবস্থিত বস্তুর (রজ্জুর) জ্ঞানের অভাব ইহার এক কারণ। এই দুই তথ্যের সমাবেশ করিয়া অদ্বৈতবাদী বলেন—ভ্রান্তি জ্ঞানে অবিদ্যা কর্ত্তৃক বস্তুর (রজ্জুর) রূপ আবৃত হয় এবং তাহাতে অন্য বস্তুর ভাণ হয়। বস্তুর যে প্রতীতি হয় না, তাহার কারণ চক্ষুর দোষ, আলোকের অভাব প্রভৃতি হইতে পারে। পূর্ব্বদৃষ্ট বস্তুর সহিত সাদৃশ্য এবং তাহার ফলে স্মৃতির উদ্বোধন অন্য বস্তুর (সর্পের) ভান উৎপাদনে অবিদ্যার সহায়ক হয়। ভ্রান্তিতে যে ভান হয় তাহা ভান বা প্রতিভাস রূপে বর্ত্তমান কালে ও স্থানে বর্ত্তমান থাকে। ইহা অবিদ্যার অস্থায়ী সৃষ্টি। এই সৃষ্টিকে সৎ বলা যায় না, কেননা পরে রজ্জুর প্রত্যক্ষ দ্বারা ইহা বাধিত হয়। ইহাকে অসৎও বলা যায় না, কেননা ইহা ক্ষণ-কালের জন্য হইলেও প্রতিভাত হয়। ইহার জ্ঞান হয়। যাহা একেবারেই অসৎ তাহার ভান ও হইতে পারে না। যেমন বন্ধ্যার পুত্র ইহা অনির্ব্বচনীয় সৃষ্টি। অদ্বৈতবাদীর এই মতকে বলে অনির্ব্বচনীয় খ্যাতিবাদ।' *

অনির্ব্বচনীয় খ্যাতিবাদে দুইটি বিষয় লক্ষণীয়। প্রথমতঃ যে বস্তু ইন্দ্রিয়ের সম্মুখে অবস্থিত, তাহা আবৃত হয় অর্থাৎ তাহার প্রতীতি হয় না। দ্বিতীয়তঃ যাহা ইন্দ্রিয়ের সম্মুখে অনুপস্থিত, তাহার প্রতীতি হয়। প্রথম ব্যাপারকে বলে আবরণ ও দ্বিতীয় ব্যাপারকে বলে বিক্ষেপ। এই আবরণ ও বিক্ষেপ অজ্ঞানের সৃষ্টি। এই অজ্ঞান একটি স্বতন্ত্র পদার্থ বলিয়া স্বীকৃত। ইহার সৃষ্টি যেমন সৎও নহে, অসৎও নহে, ইহা নিজেও তেমনি সৎ নহে,

---

* Vide Introduction to Indian Philosophy, Chatterjee & Datta.

অসৎও নহে। অবিদ্যাও তাহার সৃষ্টি একটি দুর্ব্বোধ্য প্রহেলিকা, গূঢ় রহস্য। নৈয়ায়িকগণও ভ্রান্তি জ্ঞানের মধ্যে এই রহস্য স্বীকার করেন। তাঁহারা ভ্রান্ত প্রত্যক্ষকে "অলৌকিক প্রত্যক্ষ" বলেন।

মায়া

জগতের পারমার্থিক অস্তিত্ব না থাকিলেও তাহার ভান হয়। এই ভানের কারণ অবিদ্যা। ব্রহ্মই একমাত্র বস্তু যাহার অস্তিত্ব আছে। ব্রহ্ম এক ও অদ্বিতীয়, তিনি ভিন্ন দ্বিতীয় বস্তু নাই। অথচ বহুবস্তুসমন্বিত জগতের ভান হয়। ইহার কারণ অবিদ্যার আবরণ ধর্ম্ম কর্তৃক সৎ-চিৎ-রূপ ব্রহ্ম আবৃত হন এবং বিক্ষেপ ধর্ম্মবশতঃ অলীক জগতের প্রতীতি হয়। সাধারণ ভ্রান্তি-জ্ঞানে সত্য বস্তুর আবরণের সঙ্গে পূর্ব্ব-দৃষ্ট-কোনও বস্তুর ভান হয়। কিন্তু যখন জগৎ ভ্রান্তি হয়, তখন পূর্ব্বদৃষ্ট বস্তু কোথায়? ইহার উত্তরে অদ্বৈতবাদী বলেন—সৃষ্টি-প্রবাহ অনাদি। বর্ত্তমান জগতের পূর্ব্বেও বহু জগতের উৎপত্তি ও বিলয় হইয়াছে এবং আমাদের বর্ত্তমান জন্মের পূর্ব্বেও অনাদি কাল হইতে আমরা জন্ম ও মৃত্যু ভোগ করিয়া আসিতেছি। সুতরাং বর্ত্তমান যে জগতের প্রতীতি হয়, তাহার মূলে পূর্ব্বজন্মে অনুভূত জগতের স্মৃতি বর্ত্তমান। "শঙ্কর স্মৃতিরূপঃ পরত্রপূর্ব্বদৃষ্টাবভাসঃ"কে অধ্যাসঃ বলিয়াছেন। এই অধ্যাসই ভ্রান্তি-জ্ঞান। কিন্তু পূর্ব্ব দৃষ্ট বস্তুর স্মৃতি যদি নাও থাকে, তথাপি এক বস্তুর স্থানে অন্য বস্তুর প্রতীতি প্রত্যেক ভ্রান্তি-জ্ঞানেই দেখিতে পাওয়া যায়। ইহা দ্বারা প্রমাণিত হয়, যে যাহার বর্ত্তমান কালে সত্য অস্তিত্ব নাই, তাহার ভান হইতে পারে। সৎরূপে অসতের ভান প্রত্যেক ভ্রান্তি-জ্ঞানেই হয়।

কিন্তু অদ্বৈতবাদীর মতে অসতের এই ভান অবলম্বন-শূন্য নহে বা বিজ্ঞানমাত্র নহে। বৈনাশিক বৌদ্ধমতে জগতের ভানের মূলে কোনও সৎবস্তু নাই। বিজ্ঞানবাদী বৌদ্ধও বিজ্ঞান ভিন্ন অন্য কিছুর অস্তিত্ব স্বীকার করেন না। কিন্তু শঙ্কর এই প্রতীয়মান জগতের নিম্নে ব্রহ্মের অস্তিত্ব স্বীকার করেন।

অদ্বৈতবাদী দ্বিবিধ অবিদ্যার কথা বলেন—মূলাবিদ্যা ও তুলাবিদ্যা। যে অবিদ্যার দ্বারা জগৎ ভ্রম উৎপন্ন হয় তাহা মূলাবিদ্যা, যাহা দ্বারা ক্ষণিক ভ্রান্তিজ্ঞান হয় (রজ্জুতে সর্প) তাহা তুলাবিদ্যা।

ভ্রান্তির কারণ যে অবিদ্যা, তাহাই মায়া। বিষয়ীর দিক হইতে তাহা অবিদ্যা, বিষয়ের দিক হইতে মায়া। মায়া শব্দ বেদে বহুস্থানে দৃষ্ট হয়। "ইন্দ্রঃ মায়াভিঃ পুরুরূপ ঈয়তে" এখানে "অপ্রাকৃতশক্তি" অর্থে মায়াশব্দ প্রযুক্ত হইয়াছে। অসুরগণ মায়াবী অর্থাৎ ধূর্ত্ত ও প্রতারক। বহুরূপ ধারণ করিবার শক্তি মায়া। প্রশ্নোপনিষদে (১।১৬) "তেষাম অসৌ বিরজঃ ব্রহ্মলোক ন যেষু জিহ্মং অনৃতং মায়া চ ইতি"—যাহাদের জিহ্ম (কুটিলতা) মিথ্যা ও মায়া নাই, তাহাদেরই সেই ব্রহ্মলোক। এখানে মায়া শব্দ প্রবঞ্চনা অর্থে ব্যবহৃত। শ্বেতাশ্বতর উপনিষদে (৪।১০) প্রকৃতিকে মায়া এবং মহেশ্বরকে মায়ী বলা হইয়াছে।

শঙ্কর ২।১।২৮ সূত্রের ভাষ্যে লিখিয়াছেন—মায়াবী যেমন বিচিত্র হস্তী অশ্বাদির সৃষ্ট করে সেইরূপ এক ব্রহ্মে অনেকাকার সৃষ্টি হয়। মায়াবীর সৃষ্টি মিথ্যা, প্রবঞ্চনা। এই অনেকাকার সৃষ্টিও শঙ্করের এই উপমা অনুসারে ভেল্‌কী মাত্র, মিথ্যা, তাহার সত্য অস্তিত্ব নাই।

মারীচ যে মৃগরূপে রামসীতার নিকট উপস্থিত হইয়াছিল, তাহা মায়ামৃগ, সত্য মৃগ নহে, মৃগরূপে ভান। এই জগৎ মায়া, কেননা যুক্তিতে ইহার সত্যতা থাকে না। জগতের প্রতীতি হয়; সুতরাং বন্ধ্যাপুত্রের মতো ইহা একেবারের মিথ্যা নহে। কিন্তু ইহা ভানমাত্র, অনুভব মাত্র, তাহার অতিরিক্ত সত্যতা ইহার নাই। তাই জগৎ মায়া।

জগতের সঙ্গে ব্রহ্মের সম্পর্ক কি, তাহা বুঝাইতেই মায়াবাদের উৎপত্তি। কিন্তু সম্বন্ধ দুইটি বিভিন্ন বস্তুর মধ্যেই সম্ভব। অদ্বৈত মতে ব্রহ্ম ও জগৎ অভিন্ন। সুতরাং উভয়ের মধ্যে সম্বন্ধের প্রশ্ন উঠিতে পারে না। জগতের মূল ব্রহ্মে নিহিত (ঊর্দ্ধমূলংঅধঃশাখং অশ্বত্থং)। কিন্তু ব্রহ্ম জগতের সহিত যেমন অভিন্ন, তেমনি অভিন্ন নহেন। জগৎ ব্রহ্ম হইতে স্বতন্ত্র নহে, তাহার বাহিরে নহে, এইজন্য তাহা ব্রহ্মের সহিত অভিন্ন। জগৎ, দেশ ও কালে সীমাবদ্ধ। ব্রহ্ম তাহা নহেন বলিয়া তিনি জগতের সহিত অভিন্ন নহেন। জাগতিক যাবতীয় বস্তুর সমষ্টিও ব্রহ্ম নহে। জগৎ হইতে ব্রহ্মকে স্বতন্ত্র করা যায় না। ব্রহ্ম সৎ, জগৎ তাহার ভান, একটি হইতে অন্যকে বিচ্ছিন্ন করা যায় না, সসীমের মধ্যেই অসীম বর্ত্তমান, কিন্তু আমাদের দৃষ্টিতে ধরা পড়েন না, দৃষ্টির বাধাবশতঃ। আমাদের সসীম মন তাহার অভিজ্ঞতার জগৎকে অনপেক্ষ সৎ বলিয়া গণ্য করে, স্বয়ং সম্পূর্ণ বলিয়া গ্রহণ করে। তাই ব্রহ্মের সহিত জগতের সম্বন্ধের কথা ওঠে। অসঙ্গ পরমাত্মাকে যখন আমরা জানিতে পারি, তখন যাবতীয় সসীম রূপ বিলুপ্ত হইয়া যায়। তাই জগৎ মায়া। কিন্তু মায়া ব্রহ্মের স্বরূপগর্ভ নহে।

সতের সহিত অসতের কোনও সম্বন্ধ হইতে পারে না। ন্যায় দর্শনে যে সকল পদার্থ স্বীকৃত তাহাদের দ্বারা ব্রহ্মের সহিত জগতের সম্বন্ধের ব্যাখ্যা করা যায় না। জগতের যখন অনুভব হয়, তখন তাহার এক প্রকার অস্তিত্ব আছে ইহা স্বীকার করিতে হয়। কিন্তু চরম সত্তার সহিত তাহার সম্বন্ধের বর্ণনা করা অসম্ভব। তাহা অনির্বচনীয়। শঙ্কর দেখাইয়াছেন এই সম্বন্ধের যত ব্যাখ্যা হইয়াছে, তাহাদের

কোনটিই সুসংগত হয় না। যদি ব্রহ্মকে জগতের স্রষ্টা ও কারণ বলা যায়, তাহা হইলে ব্রহ্মকে কালে অবস্থিত বলিয়া স্বীকার করা হয়। কিন্তু ব্রহ্ম কালাতীত। সামুৎপাদিক জগতের বাহিরে কারণত্বের আরোপ করা যায় না, কেন না অসীম বস্তুদিগের মধ্যেই কার্য্য-কারণ-সম্বন্ধের অস্তিত্ব সম্ভবপর। সেখানেই পূর্ব্ববর্ত্তিতা ও পরবর্ত্তিতার অবকাশ আছে। ব্রহ্মকে জগতের কারণ বলিলে, তাঁহার অসীমত্বের অপহ্নব হয়। সসীম ও কার্য্য-কারণ শৃঙ্খলে বদ্ধ জগৎ কিরূপে অসীম ও অসঙ্গ ব্রহ্মের কার্য্য হইতে পারে তাহা বুঝিতে পারা যায় না। অসীম কিরূপে আপনার অসীমত্ব বর্জন করিয়া সসীমে অবস্থিত হইতে পারে, তাহা দুর্বোধ্য। বাস্তবিক জগতের উৎপত্তি অথবা অভিব্যক্তি নাই, কিন্তু আমাদের সীমিত দৃষ্টিতে তাহা উৎপন্ন বা অভিব্যক্ত বলিয়া প্রতীত হয়। জগৎ ব্রহ্ম হইতে "অনন্য" ও "অ-ব্যতিরিক্ত"—ভিন্ন নহে। ব্রহ্ম হইতে জগৎ কালে অভিব্যক্ত নহে। ব্রহ্ম জগতের আত্মা। জগৎ যদি ব্রহ্ম হইতে স্বতন্ত্র প্রতীত হয়, তাহা হইলে বলিতে হইবে জগৎ যাহা বলিয়া প্রতীত হয়, তাহা নহে। অসীমে কোনও ক্রিয়ার আরোপ করা যায় না, কেননা সকল ক্রিয়ারই উদ্দেশ্য থাকে; কিছু পাইবার জন্যই সকল ক্রিয়া অনুষ্ঠিত হয়। অসীমের অপ্রাপ্ত কিছুই নাই। সসীমের মাধ্যমে অসীম আপনাকে প্রকাশিত করেন, ইহাও বলা চলে না। কেননা অসীম তো সর্ব্বদাই সূর্য্যের মতো আপনাকে প্রকাশিত করিতেছেন। কখনো যদি আমরা সূর্য্যকে দেখিতে না পাই, তাহা সূর্য্যের দোষ নহে। অসঙ্গ আত্মা ও তাহার প্রকাশের মধ্যে কোনও ভেদ নাই। যদি বলা হয় ঈশ্বরের প্রকাশ সৃষ্টি ভিন্ন হয় না, তাহা হইলে সৃষ্টির বাহিরে তিনি নাই, ইহা বলিতে হয়। তিনি সমগ্র স্বরূপে বিশ্বে অনুস্যূত বলিতে হয়। ঈশ্বরের পরিণাম নাই। জগৎ যদি ব্রহ্মের পরিণাম হয়, তাহা হইলে সমগ্র ব্রহ্ম অথবা তাহার এক অংশ জগদ্রূপে পরিণত হইয়াছে, এই প্রশ্ন আসিয়া পড়ে। যদি সমগ্র ব্রহ্ম জগদ্রূপে পরিণত হইয়া থাকেন তাহা হইলে জগতের বাহিরে ব্রহ্ম নাই বলিতে হয়, যদি ব্রহ্মের অংশ জগতে পরিণত হইয়াছে, বলা হয়, তাহা হইলে নিষ্কল নিরবয়ব ব্রহ্মের কলা (অংশ) স্বীকার করিতে হয়। যাহার অবয়ব আছে তাহা নিত্য হইতে পারে না। অসঙ্গ যদি জগদ্রূপে পরিণত হইয়া জগতের ক্রমবিকাশের দ্বারা বিকাশ প্রাপ্ত হন যদি জগতের অংশীভূত আমাদের কার্য্যদ্বারা অসঙ্গের বিকাশ-প্রাপ্তি সংঘটিত হয়, তাহা হইলে তাঁহার অসঙ্গত্ব থাকে না। বীজের সহিত বৃক্ষের যে সম্বন্ধ, ব্রহ্মের সহিত জগতের সম্বন্ধ তাহা নহে। সমুদ্রের সহিত তরঙ্গের যে সম্বন্ধ অথবা মৃত্তিকার সহিত ঘটাদির যে সম্বন্ধ তাহাও নহে। কেননা এই সম্বন্ধের মধ্যে অবয়ব-অবয়বী এবং দ্রব্য ও গুণের সম্বন্ধ আছে। ব্রহ্মের সহিত জীবের সম্বন্ধ সংযোগ নহে, সমবায় ও নহে। উভয়ই অংশহীন। জীব কি ব্রহ্মের মধ্যে অবস্থিত অথবা ব্রহ্মই জীবে অবস্থিত? যে ভাবেই ব্রহ্মের সঙ্গে জগতের সম্বন্ধের কল্পনা করা হউক না কেন, শেষ মীমাংসা পাওয়া যায় না। অসীমের বক্ষে সসীম জগতের উদ্ভব কিরূপে হইল তাহা আমাদের বুদ্ধির অতীত। "মায়া" শব্দ দ্বারা আমাদের জ্ঞানের এই অক্ষমতাই সূচিত হয়।

ব্রহ্মের উপর যদিও জগৎ নির্ভরশীল, তথাপি জগতের উদ্ভাব দ্বারা ব্রহ্মে কোনও বিকার উৎপন্ন হয় না। জগৎ ব্রহ্মের বিবর্ত্ত। অসঙ্গ ব্রহ্ম স্বরূপে অপ্রচ্যুতে থাকিয়া দেশ কালাধীন জগৎ রূপ প্রতিভাত হন।

ব্রাড়লে তাহার Appearance and Really গ্রন্থে লিখিয়াছেন "ভানের (appearance) অস্তিত্ব কিরূপে সম্ভব হয়, আমরা জানিনা"। বিশ্ব কিরূপে এবং কেন আছে, এবং কেনই বা অসীম বস্তু তাহার মধ্যে আছে তাহা ব্যাখ্যা করা সম্পূর্ণ অসম্ভব। সমগ্রের অংশ মানব-বুদ্ধির পক্ষে সমগ্রের জ্ঞান অসম্ভব।" ব্রাড্লের মতে এই বিশ্ব অসঙ্গের মধ্যে বর্ত্তমান—সমগ্র অভিজ্ঞতার সমষ্টিই অসঙ্গ। এই সমগ্র অভিজ্ঞতার মধ্যে কেন ভিন্ন ভিন্ন কেন্দ্রে অভিজ্ঞতার (Experience) উদ্ভব হয় এবং তাহা সসীম "ইদম্" রূপ ধারণ করে, তাহা ব্যাখ্যা করা যায় না। গ্রীণ (Green) এক শাশ্বত সংবিদের (Consciousness) অস্তিত্ব স্বীকার করেন। এই সংবিদ কালাতীত এবং পূর্ণ। এই কালাতীত সংবিদের সহিত অপূর্ণ সসীম ও কালে অবস্থিত বহু সংবিদ বর্ত্তমান। কিন্তু এই উভয়বিধ সংবিদের মধ্যে সম্বন্ধ ব্যাখ্যা করা অসম্ভব। এক অসীম পূর্ণ সংবিদ কেন আপনার অসংখ্য অপূর্ণ প্রতিরূপ সৃষ্টি করিয়া যাইতেছেন, তাহা জিজ্ঞাসা করা এবং সৎ কেন সতের স্বভাবাপন্ন, তাহা জিজ্ঞাসা করা একই কথা। এ প্রশ্নের উত্তর দেওয়া যায় না। *

মায়ার একাধিক ব্যাখ্যা আছে। ব্রহ্ম একমেবাদ্বিতীয়ম্। সুতরাং মায়া ব্রহ্ম হইতে স্বতন্ত্র কিছু হইতে পারে না। কিন্তু যে বিশ্বরূপে মায়া প্রকাশিত, তাহা চঞ্চল নিত্য ও পরিণামী। ব্রহ্ম স্থির অচঞ্চল, পরিণামবিহীন। সুতরাং ব্রহ্ম হইতে মায়াকে অভিন্নও বলা যায় না। ব্রহ্মের সত্তার মতো পূর্ণসত্তা জগতের নাই। তাহাতে সত্তার অভাব আছে, তাহা সত্তার সহিত অসত্তার সংযোগ—যাহা সৎ, তাহারই অসৎ রূপে প্রকাশ। যে শক্তি অখণ্ড ব্রহ্মকে খণ্ড খণ্ড রূপে প্রকাশিত করে, যে তত্ত্ব অনন্ত ব্রহ্মকে সান্ত রূপে প্রকাশিত করে, অপরিমেয়কে পরিমেয় (মা=মাপা),

* Dr. Radhakrishan Indian Philosophy vol. p. 560-569.

করে, রূপহীনে রূপ সৃষ্টি করে তাহাই মায়া। যাহা দ্বারা মৃত্তিকা ঘটাদি বিশিষ্ট রূপ ও নাম ধারণ করে, স্বর্ণ নানাবিধ অলংকারের নামও রূপ ধারণ করে, তাহাই মায়া; ঘট, কঙ্কন প্রভৃতি বাচারম্ভন (বাক্য মাত্র) বিকার, তাহারা সত্য নহে। এক নির্বিশেষ অবিভক্ত নিষ্কল ব্রহ্ম যে শক্তিদ্বারা বিবিধ খণ্ডিত বিশিষ্ট রূপ ও বিশিষ্ট নামে প্রকাশিত হন তাহাই মায়া। মায়াকে ব্রহ্মের লক্ষণ (feature) বলা যায়। কিন্তু ইহা ব্রহ্মের সহিত অভিন্ন ও নহে, তাহা হইতে ভিন্নও নহে। জগতে যে বিভেদ বা নানাত্ব দৃষ্ট হয় তাহার কারণ মায়া। যখন ব্রহ্মে মায়া যুক্ত হ'য়, তখন মায়া-যুক্ত ব্রহ্ম ঈশ্বররূপে প্রকাশিত হন। তখন মায়াকে ঈশ্বরের "শক্তি" বলা হয়। কিন্তু ঈশ্বর মায়াযুক্ত হইলেও মায়ার অধীন নহেন, তিনি সর্ব্বদাই মায়াধীশ (মায়ী)। মায়ার অস্তিত্ব স্বীকার না করিলে অসীম ব্রহ্মের পার্শ্বে সসীম জগতের অস্তিত্বের ব্যাখ্যা করা যায় না। আবার স্বীকার করিলেও তাহা দ্বারা ব্রহ্মকে সীমাবদ্ধ করা হয়। এইজন্যই মায়াকে সৎ ও অসৎ উভয়ই বলা হইয়াছে।

কেহ কেহ মায়াযুক্ত ব্রহ্মকে জগতের উপাদান কারণ বলিয়াছেন। মায়াই জগৎ পরিচালন শক্তি। ইহা ব্রহ্মের কার্য্য (product), ব্রহ্মের ক্রিয়ার এক বিধা (mode)। মায়া জগতে অনুগত এবং কার্য্যরূপে জগতের অস্তিত্বের নিয়ামক (কার্য্য-সত্ত্ব নিয়ামক)। মায়া নিজে জগতের উপাদান নহে, ইহা দ্রব্য নহে, ব্যাপার মাত্র —উপাদান ব্রহ্মের ক্রিয়ার রূপ মাত্র। ইহা হইতেই জগতের উদ্‌ভব হয়। মায়ার দুই ধর্ম্ম—আবরণ ও বিক্ষেপ সত্যকে আবৃত করা এবং তাহাকে মিথ্যারূপে প্রকাশ করা। আবরণ অভাবাত্মক, বিক্ষেপ ভাবাত্মক, (মিথ্যা জ্ঞানের উৎপাদক)। অসঙ্গকে আমরা কেবল যে দেখিতে পাই না, তাহা নহে, তাহার স্থলে অন্যবস্তু প্রত্যক্ষ করি। মায়া হইতে বিবিধ নাম ও রূপের উদ্‌ভব হয়। সেই নাম রূপই জগৎ। মায়ার প্রসঙ্গে ডাঃ রাধাকৃষ্ণন্ ব্রাউনিংএর দুই ছত্র কবিতা উদ্ধৃত করিয়াছেন :

> Some think creation is meant
> to show him forth,
> I say it is meant to hide him
> all at one.

কেহ কেহ বলেন তাঁহাকে (ঈশ্বরকে) প্রকাশিত করাই সৃষ্টির উদ্দেশ্য। আমি বলি, যথাসাধ্য তাঁহাকে লুকাইয়া রাখাই তাহার উদ্দেশ্য।

কেহ কেহ মায়াকে ঈশ্বরের শক্তি বলিয়াছেন, এই শক্তি বলেই ঈশ্বর শক্য জগৎ বাস্তব জগতে পরিণত করেন। মায়ার স্বরূপ অচিন্তনীয়। মায়া কাম ও সংকল্প রূপে পরিণত হয়। ঈশ্বরের সৃষ্টিশক্তিই মায়া, মায়া ঈশ্বরের মতই সনাতন। উত্তাপ যেমন অগ্নিতে বর্ত্তমান, মায়াও তেমনি ঈশ্বরেই বর্ত্তমান, তাহার অন্য স্থান নাই। "নিত্যত্ত্বা কার্য্য-গম্যা অস্য শক্তিঃ মায়া অগ্নিশক্তিবৎ (পঞ্চদশী)"। ইহার কার্য্য হইতে ইহার অনুমান হয়। মায়াই নামরূপ। অব্যক্ত অবস্থায় নামরূপ ঈশ্বরে বর্ত্তমান থাকে, ব্যক্ত অবস্থায় জগতের সৃষ্টি করে। মায়াই প্রকৃতি। (ঈশ্বরস্য মায়া-শক্তি প্রকৃতিঃ—শঙ্কর ভাষ্য ২।১।২১) এই প্রকৃতি সাংখ্যের প্রধানের মত ঈশ্বর-নিরপেক্ষ নহে। ইহার মধ্যে বীজের মধ্যে বৃক্ষের শক্যতার মতো জগতের শক্যতা নিহিত। নিগুর্ণাত্মকা প্রকৃতিকে ঈশ্বর হইতে ভিন্নও বলা খারাপ, অভিন্নও বলা যায় না। প্রলয়েও ইহার অস্তিত্বের লোপ বলা হয় না, যদিও তাহা ঈশ্বরের উপর নির্ভর শীল। এই প্রকৃতিই পুরাণে ঈশ্বরের স্ত্রীরূপে কল্পিত।

অদ্বৈত দর্শনে মায়াশব্দ যে সকল বিভিন্ন অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে ডাঃ রাধাকৃষ্ণ তাঁহার গ্রন্থে তাহাদের উল্লেখ করিয়াছেন। তাহারা এই :

(১) জগতের ব্যাখ্যার জন্য যে জগতের বাহিরে যাইতে হয় (world is not self explanatory) ইহা হইতে ধারণা করা হয় জগৎ সমুৎপাদ বা প্রতিভাস (phenomenal)। মায়া শব্দ ইহা বুঝাইতে প্রযুক্ত হয়।

(২) যাহা চরম সত্য তাহার সহিত জগতের কি সম্বন্ধ তাহা আমরা বুঝিতে অক্ষম। মায়া শব্দ দ্বারা এই দুর্ব্বোধ্যতা সূচিত হয়।

(৩) ব্রহ্মকে যখন জগতের কারণ বলিয়া গণ্য করা যায়, তখন তাহার অর্থ এই যে জগতের অস্তিত্ব ব্রহ্মের উপর নির্ভরশীল। কিন্তু ব্রহ্মের সহিত জগতের সংস্পর্শ নাই। এই অর্থে জগৎকে মায়া বলা হয়।

(৪) ব্রহ্মের জগৎরূপে প্রতিভাত হওয়ার মূলে যে তত্ত্ব তাহা বুঝাইতে মায়া শব্দের ব্যবহার হয়।

(৫) ঈশ্বরের শক্তি অর্থে মায়া শব্দ ব্যবহৃত হয়।

(৬) ঈশ্বরের এই শক্তি উপাধিতে বা অবচ্ছেদে (অব্যাকৃত প্রকৃতিতে) পরিণত হয়। তাহা হইতে ঈশ্বর কর্ত্তৃক জগতের সৃষ্টি হয়। (ঈশ্বরস্য আত্মভূতে ইব অবিদ্যা কল্পিত নামরূপে তত্ত্বান্যত্বাভ্যাম অনির্ব্বচনীয়ে সংসার-প্রপঞ্চ-বীজভূতে···ঈশ্বরস্য মায়াশক্তিঃ প্রকৃতিঃ ইতি চ শ্রুতি স্মৃত্যোঃ অভিলপ্যতে (শঙ্কর ভাষ্য ২।১।১৪)*

অবিদ্যা

চক্ষুর দোষবশতঃ রজ্জু সর্পরূপে প্রতীত হয়। তেমনি বুদ্ধির দোষবশতঃ ব্রহ্ম জগৎরূপে প্রতীত হন। দৃষ্টিকালে যাহা চক্ষুতে পতিত হইয়া স্নায়ুযন্ত্রের সাহায্যে

* Indian Philosophy—Vol II. P. 574

মস্তিষ্কে সঞ্চারিত হয়, তাহা হইতেছে স্নায়ুর স্পন্দন, অথচ তাহা দৃষ্ট হয় বিশিষ্ট বস্তু রূপে। শ্রবণ-ইন্দ্রিয়ে পতিত হইয়া যাহা মস্তিষ্কে সঞ্চারিত হয় তাহাও স্নায়ুর স্পন্দন অথচ তাহা অনুভূত হয় শব্দরূপে। বস্তুর যাহা স্বরূপ তাহা হইতে ভিন্ন ভাবে প্রতীতিই অবিদ্যা। ইহা জ্ঞানেন্দ্রিয়ের দোষের ফল। আমাদের বুদ্ধি এমন ভাবে গঠিত যে তাহা দেশ ও কালে সীমাবদ্ধ ভাবে সকল বস্তু দেখে। অনন্ত ব্রহ্ম সমগ্র ভাবে প্রত্যেক বস্তুতে অবস্থিত হইলেও বুদ্ধি প্রত্যেক বস্তু দেশ ও কালে সীমিত দেখে। জগতে এক ব্রহ্ম ভিন্ন দ্বিতীয় বস্তু না থাকিলেও সেই বস্তুকে নানাভাগে খণ্ডিত নানা বস্তুরূপে প্রত্যক্ষ করে। আমাদের বুদ্ধি যুক্তির (ন্যায়ের) নিয়মে চালিত। যতদিন বুদ্ধির বেষ্টনী অতিক্রম করিয়া আমরা বোধিতে (Intrution) পৌঁছিতে না পারি, ততদিন সত্য দৃষ্টি লাভ হয় না। এই বুদ্ধির বেষ্টনীই অবিদ্যা। ডয়সন বলেন, আমাদের জ্ঞানের স্বাভাবিক আবরণই অবিদ্যা—দেশ ও কালের চস্‌মা ব্যতীত বস্তু দর্শনের অক্ষমতা। বোধি লাভের ফলে যখন আমরা ব্রহ্মের স্বরূপ দেখিতে পাই, তখন অবিদ্যার আবরণ বিদূরিত হয়। তখন অবিদ্যার আবরণে আচ্ছাদিত বস্তু সকলের রূপের পরিবর্ত্তন হয় ও জগৎ ব্রহ্ম-রূপে দৃষ্ট হয়। শুক্তিতে রজত দৃষ্টির পরে শুক্তি যখন শুক্তি রূপে প্রতীত হয়, তখন দৃষ্ট রজতের সহিত শুক্তির সম্বন্ধ কি, তাহাই বুঝিতে পারি না। রজত তো সেখানে কখনই ছিল না। যাহা সেখানে ছিল, তাহার সহিত যাহা ছিল না, তাহার কি সম্বন্ধ থাকিতে পারে? তাই রজতকে মিথ্যা বলি। অবিদ্যা কেবল অভাবরূপ নহে। তাহার ভাবরূপও আছে। তাহা কেবল জ্ঞানের অভাব নহে। ভ্রান্ত জ্ঞান।

উপনিষদে বহুস্থলে অবিদ্যা শব্দ পাওয়া যায়। তাহার অর্থ জ্ঞানের অভাব। পরে উক্ত শব্দে নূতন অর্থ সংযোজিত হইয়াছে। মানব মনের সসীম হইতে উদ্‌ভূত যে চিন্তাপ্রণালী, যাহা ন্যায়ের বন্ধনে বদ্ধ (logical way of thinking) তাহাই শঙ্করের অবিদ্যা।* অবিদ্যা বন্ধ্যাপুত্রের মতো অসৎ নহে। অসৎ হইলে ইহা হইতে কিছুই উদ্‌ভূত হইতে পারিত না। ইহা যদি সৎ হইত, তাহা হইলে ইহা হইতে যাহা উদ্‌ভূত হয়, তাহাও সৎ হইত।

কিন্তু এই অবিদ্যার কারণ, ইহার উৎস কি? পার্থ-সারথি মিশ্র বলে "এই অবিদ্যা কি ভ্রান্ত জ্ঞান অথবা অন্য কিছু, যাহা দ্বারা ভ্রান্ত জ্ঞান উৎপন্ন হয়? যদি অবিদ্যা ভ্রান্ত-জ্ঞান মাত্র হয়, তাহা হইলে কাহার এই-ভ্রান্ত জ্ঞান? ভ্রান্তজ্ঞান ব্রহ্মের হইতে পারে না। কেননা বিশুদ্ধ জ্ঞানই ব্রহ্মের স্বরূপ। সূর্যের মধ্যে অন্ধকারের স্থান নাই। অবিদ্যা জীবাত্মার ঈশ্বর ভ্রান্তজ্ঞান হইতে পারে না, কেননা জীবাত্মাগণ ব্রহ্মের সহিত অভিন্ন। এই হেতু অবিদ্যার অস্তিত্ব যখন অসম্ভব, তখন তাহার কারণস্বরূপ দ্বিতীয় বস্তুর অস্তিত্বও অসম্ভব। অজ্ঞান অথবা তাহার কারণকে যদি ব্রহ্মের অতিরিক্ত কিছু গণ্য করা যায়, তাহা হইলে অদ্বৈত থাকে না। ব্রহ্মের অবিদ্যা আসিল কোথা হইতে? ব্রহ্ম ভিন্ন অন্য কোনও বস্তুর অস্তিত্বই যে নাই। অবিদ্যা ব্রহ্মের স্বভাব বলা যায় না। কেননা জ্ঞানই ব্রহ্মের স্বরূপ"। এই সকল প্রশ্নের উত্তর দেওয়া সহজ নয়। তাই অবিদ্যা অনির্বচনীয়।

ব্রহ্মের পার্শ্বে অবিদ্যা কিরূপে থাকিতে পারে। তাহা দুর্বোধ্য। ডয়সন বলিয়াছেন "এক ব্রহ্ম ব্যতীত প্রকৃত পক্ষে অন্য কিছুরই অস্তিত্ব নাই। যদি জগতে আমরা তাহার বিকার দেখিতে পাই এবং তাহাকে বিভিন্ন বস্তুতে বিভক্ত দেখি বলিয়া আমরা কল্পনা করি, তাহা হইলে তাহার কারণ অবিদ্যা। কিন্তু ইহা ঘটে কিরূপে? যেখানে ব্রহ্ম অবিকৃত ও অবিভক্ত, যেখানে আমরা যে বিকার ও বহুত্ব দেখি বলিয়া আমাদিগকে প্রতারিত করে, ইহার সম্ভব হয় কিরূপে? এ সম্বন্ধে কোনও ব্যাখ্যা গ্রন্থকারগণ দেন নাই।" অবিদ্যার উদ্‌ভবের কোনও ব্যাখ্যা দেওয়া অসম্ভব।

বুদ্ধ ভবচক্রের বর্ণনায় যে দ্বাদশ নিদানের বর্ণনা করিয়াছেন, তাহাদের মধ্যে মূল নিদান অবিদ্যা, এই অবিদ্যাও ভ্রান্তজ্ঞান। ইহা অনাদি হইলেও "আসব"-দিগের উৎপত্তি হইতেই ইহার উৎপত্তি হইয়াছিল বলিয়া বর্ণনা আছে। আসব পঞ্চবিধ—কমাসব (ইন্দ্রিয় সুখের কামনা), ভাবাসব (অস্তিত্বের প্রতি আসক্তি), দৃষ্ট্যাসব (ভ্রান্তমত) ও অবিদ্যাসব (দুঃখের কারণ ও নাশ সম্বন্ধে জ্ঞানের অভাব)। বেদান্তের অবিদ্যাও বুদ্ধের অবিদ্যা এক নহে।

* Dr. Radhakrishna vol II—B 576
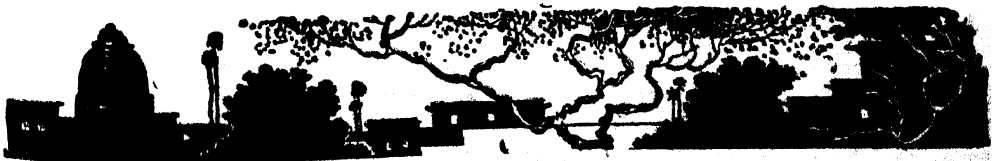
শ্রী'শ'—

॥ শিশু-চিত্র ॥

আধুনিক যুগে জনমনে প্রভাব সৃষ্টিকারী শিল্প রূপে চলচ্চিত্রের স্থান সর্ব্বাগ্রে বললে অত্যুক্তি করা হবে না নিশ্চয়ই। মানুষ গড়তে বিদ্যালয় ও বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা যেমন দরকার, সমাজ জীবনে সাহিত্যের যেমন বিশেষ স্থান আছে, জনমত গঠনে সংবাদপত্রের যেমন বিশিষ্ট ভূমিকা রয়েছে,—তেমনি জনগণের মনে প্রভাব সৃষ্টি করতে চলচ্চিত্রের যে জুড়ি খুঁজে পাওয়া যাবে না একথাও সত্য। তাই, এই অতুলনীয় প্রভাবশালী শিল্পটিকে প্রমোদশিল্প রূপেই না রেখে গঠনমূলক কাজে লাগানও যে অতি আবশ্যক তা কেউই অস্বীকার করবেন না।

কিন্তু শিক্ষা মূলক বা গঠন মূলক চিত্র নির্ম্মাণে ক'জন চিত্র-নির্ম্মাতা উদ্যোগী হয়েছেন? ক'জন প্রযোজক ও পরিচালক এ বিষয়ে উৎসাহ বোধ করেন? বেশির ভাগ চিত্র-নির্ম্মাতাদেরই লক্ষ্য বক্স-অফিসের দিকে। নির্ম্মিত চিত্র লাভ্যাংশকে স্ফিত করতে পারলেই তাঁরা সন্তুষ্ট। সে চিত্র শালীনতা ও সংস্কৃতির দিক দিয়ে দেশের ও দশের উপযোগী হল কি না, শিক্ষা কিছু দিতে পারল কি না, গঠন কিছু করল কিনা—সে দিকে তাঁরা লক্ষ্য রাখেন না। তাই, অতি হাল্কা ও কুরুচিপূর্ণ সঙ্গীত-নৃত্য মুখরিত চিত্রের চাহিদা আমাদের দেশেই শুধু নয় সর্ব্ব-দেশেই বেশি দেখা যায়। তার কারণ, একশ্রেণীর অতি সাধারণ অল্প শিক্ষিত কিন্তু সংখ্যাগরিষ্ঠ লোকেরা এই জাতীয় চিত্রের বিশেষ পক্ষপাতি এবং এরা বক্স অফিসকেও ফাঁপিয়ে তোলে তাদের পৃষ্ঠপোষকতায়। কিন্তু এ জাতীয় চিত্রের দ্বারা সমাজের কোনও উন্নতি হয় না বরং দর্শকদের বিশেষ করে অপ্রাপ্ত বয়স্ক বালক বালিকাদের যথেষ্ট মান-সিক ক্ষতি হয়। এ কথা অবশ্য চিত্র-নির্ম্মাতারাও জানেন কিন্তু আর্থিক ক্ষতি সহ্য করে জাতি গঠনের কাজে অগ্রসর হতে অনেকেই চান না। বড়দের হয়ত এই সব চিত্র বিশেষ ক্ষতি করতে পারে না, কারণ তাঁরা অভিজ্ঞতালব্ধ বুদ্ধি দ্বারা নিজেদের সংযত করতে পারেন। কিন্তু অপ্রাপ্ত বয়স্ক ও অপরিণত বুদ্ধি বালক বালিকাদের মনে এই ধরণের চিত্র গভীর রেখাপাত করে এবং তার ফলও বিশেষ ক্ষতিকর হয়ে দাঁড়ায়। কিন্তু অপ্রাপ্ত বয়স্কদের চল-চ্চিত্রের এই ক্ষতিকর প্রভাব থেকে দূরে রাখবার উপায় কি? বড়দের চেয়ে চলচ্চিত্রের আকর্ষণ তাদের কাছেই বেশি। আজকাল অবশ্য প্রাপ্ত বয়স্কদের উপযোগী ছবি অপ্রাপ্ত বয়স্কদের দেখতে দেওয়া হয় না। কিন্তু সর্ব্ব-সাধারণের উপযোগী "ইউ" মার্কা ছবিগুলির অনেকগুলিই বালক বালিকাদের দর্শনেরও উপযোগী নয়, আর সব চিত্রই যদি প্রাপ্ত বয়স্কদের জন্য হয় তাহলে শিশু ও কিশোররা কোন ছবি দেখবে? তাদের সিনেমা প্রীতিকে কি সম্পূর্ণরূপে নিবৃত্ত করা সম্ভব? তাও নয়। তাহলে দেখা যাচ্ছে এ সমস্যার সমাধানের একমাত্র উপায় অপ্রাপ্ত বয়স্ক বালক বালিকা ও শিশুদেরই একান্ত উপযোগী চলচ্চিত্র নির্ম্মাণ করা। তাতে বালক বালিকা ও শিশুরা তাদের উপযোগী ও মনের মতন চিত্র পেলে আর বড়দের ছবি-গুলি দেখতে আগ্রহ বোধ করবে না। তার ওপর ছোট-দের চিত্রগুলি শিক্ষামূলক ও চরিত্র গঠন মূলক রূপেই তৈরী করা হলে সমাজের পক্ষেও যথেষ্ট উপকার হবে, আর চলচ্চিত্রের যে অতুলনীয় প্রভাব ও সৃজনীশক্তি রয়েছে তাও সার্থক হয়ে উঠবে।

সুখের বিষয় পশ্চিমবঙ্গ তথা জাতীয় সরকারও এ বিষয়ে অবহিত হয়ে শিশুদের উপযোগী চিত্র নির্ম্মাণে উদ্যোগী হয়েছেন। শিশুরাই জাতির ভবিষ্যৎ, তারাই দেশের আগামী দিনের নাগরিক, তাদের মধ্য থেকেই তৈরী হবে রাষ্ট্রের কর্ণধার, তারাই উত্তরাধিকার সূত্রে পাবে রাষ্ট্র পরিচালনার, সমাজ পরিচালনার, শিক্ষা পরি-চালনার দায়িত্ব। তারাই হবে আমাদের সভ্যতা, সংস্কৃতির বাহক, তারাই হবে ভারতীয় ঐতিহ্যের ধারক। তাই, এই শিশুদের, এই কিশোরদের মানসিক গঠনের

দিকে লক্ষ্য রেখে এমন সব শিক্ষামূলক চিত্র প্রস্তুত করতে হবে যা তারা আগ্রহের সঙ্গেই দেখবে এবং ছবি দেখার নির্মল আনন্দের মধ্যে দিয়েই জ্ঞান ও শিক্ষা লাভ করবে। তবে, সব সময়েই লক্ষ্য রাখতে হবে ছোটদের চিত্র হলেও তার মান বা ষ্ট্যাণ্ডার্ড যেন সব ক্ষেত্রেই উঁচু থাকে। ছেলে-ভোলান কিছু বিষয় বস্তর অবতারণা করেই তা ছোটদের ছবি বলে চালালে চলবে না। এর জন্য নিপুণ শিল্পী, ও অযোগ্য লোকের হাতে পড়ে শিব গড়তে বানর গড়াই হবে।

এই সঙ্গে উল্লেখযোগ্য যে ছোটদের ছবি প্রস্তুতের সঙ্গে বালক-বালিকা ও শিশুদের উপযোগী চিত্র-গৃহ নির্মাণও দরকার। এই সব চিত্র-গৃহে শুধু ছোটদের ও শিশুদের উপযোগী চিত্রই দেখান হবে। এই সব চিত্রগৃহের বন্দোবস্তও এমন ভাবে করতে হবে যাতে অভিভাবকদের সঙ্গ
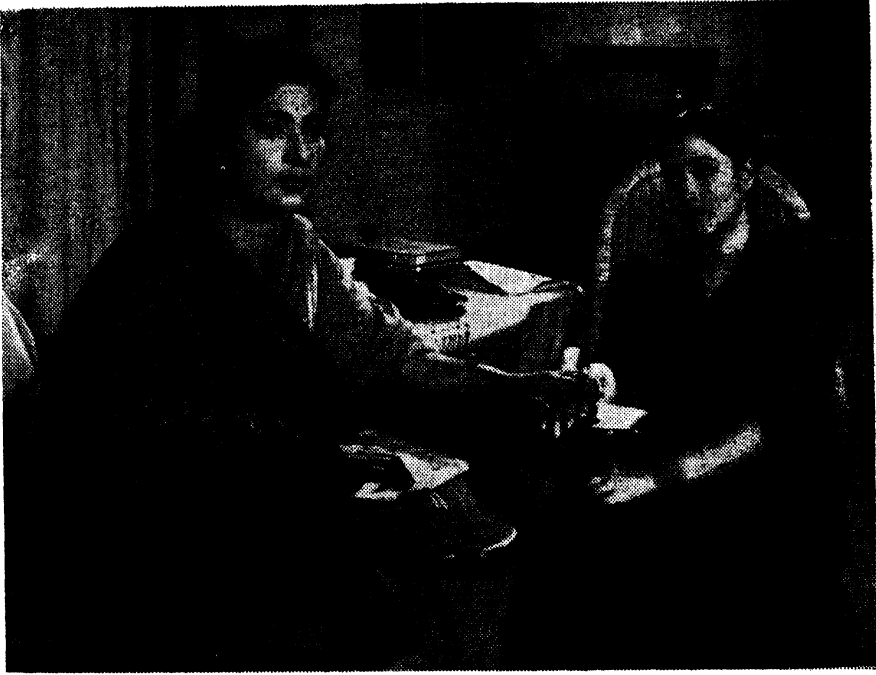
প্রেমচাঁদ আঢ্য প্রযোজিত ডাঃ নীহাররঞ্জন গুপ্তর 'হাসপাতাল' কথাচিত্রের একটি দৃশ্যে সুচিত্রা সেন এবং আরতী মজুমদার

সুদক্ষ পরিচালক, সুযোগ্য স্ক্রীপ্ট লেখক প্রভৃতির দরকার হবে এবং লাভের দিকে লক্ষ্য না রেখে অর্থব্যয় করতে হবে। মনে রাখতে হবে ছোটদের ছবি দেখিয়ে মুনাফা বৃদ্ধি করা অন্যায়ই শুধু নয় দেশের পক্ষেও ক্ষতিকর। সরকারেরও এদিকে বিশেষ লক্ষ্য রাখা উচিত এবং সত্যকার শিল্পীমনা ও শিশুদরদীদের ওপরই ছোটদের ছবি প্রস্তুতের দায়িত্ব ন্যস্ত করা উচিত। তা না হলে অবাঞ্ছিত ছাড়াই ছোটরা নিশ্চিন্তে ছবি দেখতে পারে। তাদের নিরাপত্তা ও সুখ সুবিধার ব্যবস্থাও চিত্রগৃহের কর্তৃপক্ষদের করতে হবে।

ছোটদের ছবির দৈর্ঘ্যও খুব বেশি করা উচিত হবে না। ৩০০০ থেকে ৫০০০ ফিটের মধ্যে রাখলেই ভাল। আর ছোটদের চলচ্চিত্র দেখবার বয়স যদি ৫ থেকে ১৬ বছর ধরা হয়, তাহলে দুই শ্রেণীর চিত্র ছোটদের জন্য

প্রস্তুত করা উচিত। এক শ্রেণীর চিত্র ৫ থেকে ১০ বছর বয়সের শিশুদের জন্য ও অন্য শ্রেণীর চিত্র ১০ থেকে ১৬ বছর বয়সের বালক বালিকাদের উপযোগী করে নির্ম্মাণ করাই ভাল। তাতে সব বয়সেরই ছেলে মেয়েদের ছোটদের ছবি দেখবার আগ্রহ থাকবে। তা নাহলে কিশোর কিশোরীদের শিশুদের চিত্র দেখতে হয়ত ভাল লাগবে না, আর শিশুদেরও কিশোরদের উপযোগী ছবি দেখে বুঝতে অসুবিধা হতে পারে। চিত্র প্রদর্শনের সময়েরও পরিবর্ত্তন করে ছোটদের উপযোগী করতে হবে। সকাল ১১টা থেকে বিকাল ৫টার মধ্যেই দুইবার প্রদর্শনের সময় ধার্য্য করতে হবে। সাধারণ চিত্রগৃহেও যখন ছোটদের ছবি প্রদর্শিত হবে তখনও প্রদর্শনের সময়ের পরিবর্ত্তন করে ছোটদের দেখবার সুবিধা করতে হবে। টিকিটের মূল্যও কম করতে হবে যাতে সর্বশ্রেণীর অভিভাবকরাই তাঁদের সামর্থ অনুযায়ী ছোটদের ছবি দেখার ব্যয়বহনে সমর্থ হন।

সর্ব্বশেষে উল্লেখ করি যে সরকারী সাহায্য ছাড়া আমাদের দেশে ছোটদের উপযোগী চিত্রের সর্বাঙ্গীন উন্নতি বোধ হয় সম্ভব নয়। তাই জাতীয় সরকারকে অনুরোধ তাঁরা যেন অকুণ্ঠ হস্তে সাহায্য করে ছোটদের ছবিকে সর্বদিক দিয়ে উন্নত ও ছোটদের উপযোগী করে তাদের শিক্ষা ও মানসিক গঠনের সাহায্য করেন।

***

খবরাখবর ঃ

আসামের 'কথাকলি সাইন্ প্রডিউসার্স'-এর প্রযোচনায় এভারেষ্ট বিজয়ী বিখ্যাত অভিযাত্রী তেনজিং নরগে 'তুষার মরুর প্রান্তর' চিত্রে অবতীর্ণ হবেন বলে স্বীকৃতি দিয়েছেন। চিত্রটি যুগ্মভাবে প্রযোজনা করবেন পঞ্জী ডস্ ও খগেন রায়। পরিচালনার ভার নিয়েছেন প্রভাত মুখোপাধ্যায় এবং সংগীত পরিচালনা করবেন তারিকুদ্দিন আমেদ।

* * * *

প্রযোজক পরিচালক বিকাশ রায় পরলোকগত স্বনামধন্য অভিনেতা ধীরাজ ভট্টাচার্যের 'যখন আমি পুলিশ ছিলাম' আত্মজীবনী মূলক উপন্যাস অবলম্বনে 'রাজাসাজা' চিত্রটি নির্মাণ করছেন। সর্বজন প্রিয় অভিনেতা ধীরাজ ভট্টাচার্যের স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধাঞ্জলির উদ্দেশ্যে তাঁর এই আত্মজীবনী চিত্রে রূপায়িত করে শ্রীরায় সবার ধন্যবাদ ভাজন হবেন নিশ্চয়ই।

* * *

শ্রীপ্রেমেন্দ্র মিত্র পুনরায় ছায়াচিত্র কার্যে নিয়োজিত হয়েছেন। তাঁর লেখনী প্রসূত এবং পরিচালনা পুষ্ট 'চুপি চুপি' চিত্রটি অরোরা ষ্টুডিয়োতে অরোরা ফিল্মসের প্রযোজনায় পরিসমাপ্তির পথে দ্রুত এগিয়ে চলেছে। বিভিন্ন চরিত্রে রূপদান করছেন ছবি বিশ্বাস, জহর গাঙ্গুলী, রবীন মজুমদার প্রভৃতি।

* * * *

শ্রীসন্তোষকুমার ঘোষ রচিত সুপরিচিত বাংলা উপন্যাস 'কিনু গোয়ালার গলি' নব নিয়োজিত স্ক্রীন্ প্লে প্রোডাক্সনের উদ্যোগে অদূর ভবিষ্যতে চিত্ররূপ ধারণ করবে। পরিচালনার ভার নিয়েছেন ও, সি, গাঙ্গুলী। শ্রীমতী অরুন্ধতী মুখার্জীকে একটি বিশেষ স্ত্রী চরিত্রে রূপদান করতে দেখা যাবে।

* * * *

কলকাতার 'আর্ট ও কালচার পিকচার্সে'র বাংলা ছবি 'অগ্নিসম্ভবা' ভিয়েনায় আসন্ন সপ্তম বিশ্ব যুব সম্মেলনে প্রদর্শিত হবে। ভারতীয় যুব-প্রতিনিধিদলের নেতা শ্রীঅরবিন্দ ঘোষাল এম, পি, চিত্রটির মুদ্রিত প্রিণ্ট সংগে করে ভিয়েনা অভিমুখে যাত্রা করেছেন।

* * *

'চিত্র সারথীর' পরিচালনায় সেবক চিত্র প্রতিষ্ঠান তাঁদের 'ত্রৈলঙ্গস্বামী' চিত্রটির কাজ প্রায় শেষ করে এনেছেন। ছবিটির নাম ভূমিকায় আছেন প্রখ্যাত অভিনেতা গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়। সংগীত পরিচালনায় রয়েছেন অনিল বাগ্‌চী।

* * * *

সম্প্রতি বম্বের কোন এক ষ্টুডিওতে একটি ছবির ডাকাতির দৃশ্য গ্রহণ কালে একটি মর্মান্তিক দুর্ঘটনা ঘটেছে। খবরে প্রকাশ, সহকারী পরিচালক ডাকাতের ভূমিকায় অবতীর্ণ অভিনেতাকে যখন নির্দেশ দিচ্ছিলেন কেমন করে বন্দুক ধরতে হয়, তখন ব্লাঙ্ক কার্টুজে ভর্ত্তি বন্দুকটা হঠাৎ ছুটে যায়। ফলে সহকারী পরিচালক বিশেষ আহত হন এবং হাসপাতালে নিয়ে যাবার পথে মৃত্যুমুখে পতিত হন। এরূপ দুর্ঘটনা যাতে ভবিষ্যতে আর না ঘটে তার জন্য চলচ্চিত্র কর্তৃপক্ষগণ সচেষ্ট হবেন আশা করি।

শ্রীক্ষেত্রনাথ রায়

সুধাংশুশেখর চট্টোপাধ্যায়
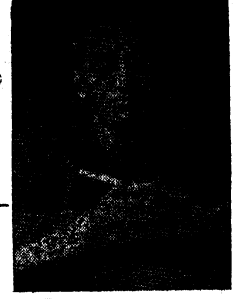
ভারতবর্ষ বনাম ইংলণ্ড ঃ

ইংলণ্ড : ৪৯০ (জি পুলার ১৩১, এম জে কে স্মিথ ১০০। সুরেন্দ্রনাথ ১১৫ রানে ৫ উইকেট) ও ২৬৫ (৮ উইকেটে ডিক্লে: গুপ্তে ৭৫ রানে ৪ উইকেট)।

ভারতবর্ষ : ২০৮ (বোরদে ৭৫। রোডস ৭২ রানে ৩, ব্যারিংটন ৩৬ রানে ৩) ও ৩৭৬ (আব্বাস আলী বেগ ১১২ রান আউট, পি উমরীগড় ১১৮)।

ওল্ডট্রাফোর্ডে অনুষ্ঠিত ভারতবর্ষ বনাম ইংলণ্ডের ৪র্থ টেষ্ট খেলায় ইংলণ্ড ১৭১ রানে ভারতবর্ষকে পরাজিত করেছে। পাঁচটি টেষ্ট খেলার মধ্যে ইংলণ্ড চারটি খেলায় জয়লাভ করেছে। ৫ম টেষ্ট খেলা বাকি আছে। পরপর তিনটি টেষ্ট খেলায় জয়ী হয়ে আলোচ্য টেষ্ট সিরিজে ইংলণ্ড 'রাবার' সম্মান লাভ করেছে।

পিটার মে আহত থাকায় তাঁর স্থলে কলিন কাউড্রে ইংলণ্ড দল পরিচালনা করেন। ইংলণ্ড টসে জয়ী হয়। প্রথম দিনের খেলায় ৩০৪ রান ওঠে, ৩টে উইকেট পড়ে। ল্যাঙ্কাসায়ারের নাটা খেলোয়াড় পুলার তাঁর টেষ্ট খেলোয়াড় জীবনের প্রথম টেষ্ট সেঞ্চুরী (১৩১) করেন। এটা তাঁর দ্বিতীয় টেষ্ট খেলা।

২য় দিনে ইংলণ্ডের ১ম ইনিংস ৪৯০ রানে শেষ হয়। ইংলণ্ডের পক্ষে আর একজন সেঞ্চুরী করলেন—এম জে কে স্মিথ। স্মিথের এটা প্রথম টেষ্ট সেঞ্চুরী। ভারতবর্ষের ফিল্ডিংয়ে অনেক গলদ দেখা যায়। ঐদিনেই ভারতবর্ষের ১ম ইনিংসের খেলায় ১২৭ রান ওঠে, উইকেট পড়ে ৬টা। হাতে মাত্র ৪টে উইকেট; 'ফলো-অন্' থেকে ছাড়ান পেতে তখনও ২১৩ রান তুলতে বাকি।

৩য় দিনের খেলায় ভারতবর্ষের ১ম ইনিংস ২০৮ রানে শেষ হ'ল—ফলে তারা ইংলণ্ডের থেকে ২৮২ রানে পিছিয়ে রইলো। ইংলণ্ডের অধিনায়ক ভারতবর্ষকে 'ফলো-অন্' থেকে ছাড়ান দিলেন। ৩য় দিনের গোড়াতেই ইংলণ্ডের অধিনায়ক তাঁর সিদ্ধান্ত ঘোষণা করায় টেষ্ট ক্রিকেট খেলার মর্য্যাদা যথেষ্ট ক্ষুণ্ণ হয়। ভারতবর্ষের প্রতি একটা অবজ্ঞার ভাবতো বটেই। এই নিয়ে ইংলণ্ডের কাগজে যথেষ্ট আলোচনা হয়ে গেছে। কাউড্রের একটা কৈফিয়ৎ ছিল, দর্শকদের মুখ চেয়ে তিনি এই রকম খাপছাড়া সিদ্ধান্ত নাকি নিয়েছিলেন। দর্শকরা যে তাঁর যুক্তিকে কোন আমলই দেননি তা ৫ম দিনের খেলায় দর্শক সমাগম থেকেই মালুম হয়েছে; মাত্র ৫০০ জন মাঠে এসেছিলেন। তবে, তাঁরা হতাশ হননি। আব্বাস বেগ শেষ পর্য্যন্ত কাউড্রের মুখ রক্ষা করেছেন। টেষ্ট ক্রিকেট খেলায় কোন যোগ্যতাই যে ভারতবর্ষের নেই—এই সিদ্ধান্ত দ্বারা ঢাকঢোল পিটিয়ে সারা পৃথিবীতে ছড়ান হয়েছে। কোন কোন ভারতীয় সমালোচক এর পাল্টা জবাব দিয়েছেন, অষ্ট্রেলিয়ার কাছে ইংলণ্ডের 'গো-হার' দৃষ্টান্ত দিয়ে। এ প্রতিবাদের কোন ফল নেই। কারণ ইংলণ্ডের হার স্বজাতীয় দেশের কাছে; অষ্ট্রেলিয়ার সঙ্গে ইংলণ্ডের রক্তের সম্বন্ধ আছে। তাদের কাছে হার হলে দুঃখ হয় কিন্তু কালাআদমীকে হারিয়ে যতখানি মনের আনন্দ ততখানি কি আর স্বজাতীয় দলকে হারিয়ে হয়?

ভারতবর্ষের প্রতি ইংলণ্ডের এতখানি অবজ্ঞার হেতু ঐ কারণে। এই অবজ্ঞার ভাব তাদের মন থেকে প্রতিবাদ করে মুছে ফেলা যায় না। আমাদের খেলায় সত্যিই গলদ

রয়েছে—আমরা অনেক দুর্ব্বল। আমরা সেভাবে তৈরী না হয়ে কি আক্কেলে ইংলণ্ডের সঙ্গে পাল্লা দিতে যাই ? আমাদেরও তো আক্কেলের বালাই নেই। আর ইংলণ্ডের 'স্পোর্টিং স্পিরিটে'র কথা যদি বলেন তা হলে বলি এটা তো আর আমাদের কাছে নতুন নয়। পুরনো কাসন্দি ঘেঁটে লাভ নেই। এইটুকু কেবল বলি—চোখে আঙুল দিয়ে কত আর দেখাতে হবে ?

থাক, ইংলণ্ডের এই অবজ্ঞা গায়ে মেখে ভারতবর্ষ ইংলণ্ডের ২য় ইনিংসে খাটান দেয়।

৩য় দিনের খেলার শেষে স্কোর বোর্ডে দেখা গেল ২য় ইনিংসে ইংলণ্ডের ৮ উইকেট পড়ে ২৬৫ রান উঠেছে।

৪র্থ দিনের গোড়াতেই কাউড্রে ৮ উইকেটে ২৬৫ রানের ওপর ইনিংস ডিক্লেয়ার্ড করলেন। ভারতবর্ষের হাতে তখন পুরো দু'দিন খেলার সময়; জয়লাভ করতে ৫৪৮ রান প্রয়োজন। ৪র্থ দিনে ভারতবর্ষ ২য় ইনিংসের খেলায় ২৩৬ রান করে ৪ উইকেট হারিয়ে। আব্বাস বেগ ৮৫ রান ক'রে আহত হওয়ার দরুণ অবসর নেন্। এই দিন আব্বাস বেগই জমাটি খেলা দেখিয়েছিলেন। তাঁর ৮৫ রান তুলতে ১৬৫ মিনিট সময় নেয়।

৫ম দিনের খেলায় লাঞ্চের কিছুপরই ভারতবর্ষের ২য় ইনিংস ৩৭৬ রানে শেষ হয়। ইংলণ্ড ১৭১ রানে জয়ী হয়।

৪র্থ টেষ্টে ইংলণ্ডের জয়লাভ যতখানি না প্রাধান্ত পেয়েছে তার থেকে বেশী পেয়েছে বেগের খেলা। জীবনের প্রথম টেষ্ট খেলতে নেমে ভারতবর্ষের পক্ষে এ পর্য্যন্ত ৪জন টেষ্ট সেঞ্চুরী করেছেন। আব্বাস বেগ তাঁদের মধ্যে ৪র্থ খেলোয়াড়। তাঁর আগে যাঁরা সেঞ্চুরী করেছেন তাঁরা হলেন—অমরনাথ (ইংলণ্ডের বিপক্ষে ১৯৩৩ সালে বোম্বাইয়ে), দীপক শোধন (১৯৫২-৫৩ সালে পাকিস্তানের বিপক্ষে কলকাতায়) এবং কৃপাল সিং (১৯৫৫ সালে নিউজিল্যাণ্ডের বিপক্ষে হায়দ্রাবাদে)। এ প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য, ভারতবর্ষের পক্ষে না হলেও দু'জন ভারতীয় খেলোয়াড়—রঞ্জিৎ সিংজী এবং পতৌদির নবাব ইংলণ্ডের পক্ষে প্রথম টেষ্ট খেলতে নেমে সেঞ্চুরী করেছিলেন।

আব্বাস বেগ ভারতবর্ষের কাল মুখে হাসি ফুটিয়েছেন। তাঁর খেলায় ইংলণ্ডের জাঁদরেল ক্রিকেট-সমঝদার দল পঞ্চমুখ হয়েছেন। ক্রিকেট খেলার ধুরন্ধর—ব্র্যাডম্যান, রঞ্জি, নীল হার্ভে প্রভৃতি প্রখ্যাত খেলোয়াড়দের খেলার সঙ্গে তাঁর খেলা তুলনা ক'রে প্রশংসা করা হয়েছে।

প্রথম বিভাগের ফুটবল লীগ ঃ

১৯৫৯ সালের প্রথম বিভাগের ফুটবল লীগ খেলায় মোহনবাগান চ্যাম্পিয়ানসীপ লাভ করেছে। এই নিয়ে মোহনবাগান আটবার প্রথম বিভাগের লীগ চ্যাম্পিয়ান হ'ল। প্রথম লীগ চ্যাম্পিয়ান হয় ১৯৩৯ সালে। মোহন-বাগান এবং এরিয়ান্স ক্লাব প্রথম ভারতীয় ক্লাব হিসাবে ১৯১৪ সালে প্রথম বিভাগের লীগ প্রতিযোগিতায় যোগ-দান করে। মোহনবাগান লীগ চ্যাম্পিয়ান হয়েছে ১৯৩৯, ১৯৪৩—৪৪, ১৯৫১, ১৯৫৪—৫৬ এবং ১৯৫৯ সালে।

আলোচ্য বছরে মোট ২৮টি খেলায় মোহনবাগান ৪৮ পয়েণ্ট পায়। তারা মাত্র একটা খেলায় হার স্বীকার করে—ইষ্টবেঙ্গল দলের কাছে ফিরতি খেলায় ০—১ গোলে। প্রথম খেলায় অবিশ্যি মোহনবাগান ২—০ গোলে ইষ্টবেঙ্গলদলকে পরাজিত করে। ফিরতি খেলায় মোহনবাগান পেনাল্টির সুযোগ নষ্ট করে এবং তাদের একটা গোল 'অফ-সাইড' আইনের আওতায় লাইন্স-ম্যানের হস্তক্ষেপে বাতিল হয়। রেফারী প্রথমে গোলের নির্দ্দেশ দেন। এই বাতিল গোল নিয়ে মাঠে এবং সংবাদ-পত্রে যথেষ্ট মতবিরোধ দেখা দিয়েছিল। ২৮টা খেলার মধ্যে মোহনবাগান ২১টা খেলায় জয়লাভ করে এবং মাত্র একটায় হারে। বাকি ৬টা খেলা ড্র যায়। মোহনবাগান ৪৯টা গোল দিয়ে মাত্র ৪টে গোল খায়।

দরদী শরৎচন্দ্র : শ্রীমণীন্দ্র চক্রবর্তী

শরৎচন্দ্রের জীবনী বিষয়ক কয়েকখানি গ্রন্থ বাজারে আত্মপ্রকাশ করেছে, কিন্তু সেগুলি পড়বার সুযোগ আমার হয়নি। মাত্র একখানা বই কিছুদিন আগে পড়েছিলাম ; বইখানির নাম ও তার লেখকের নাম আমার মনে নেই। সেই বইখানি শরৎচন্দ্রের অপরূপ ও অদ্ভুত জীবনী। বইখানি পড়বার কালে, বিস্মিত হ'য়েছিলাম যেমন, তেমনি মনোবেদনার সঙ্গে নাসিকা কুঞ্চনও করেছিলাম। কিন্তু এই মণীন্দ্র চক্রবর্তী লিখিত 'দরদী শরৎচন্দ্র' সত্যকারের একখানি জীবনী গ্রন্থ হিসাবে, শরৎ অনুরাগীদের কাছে যোগ্য আদর পাবে বলেই মনে করি। বইখানি পড়ে আনন্দ পেয়েছি, সুতরাং খুসী হয়েছি। জগতে ফাঁকির ওপর কোনও সত্যকার কাজ হয় না। সাহিত্যের বেসাতীতে, পচা ও ভেজাল মাল চালিয়ে, হয়তো দু'পয়সা উপায়ও করা যেতে পারে, কিন্তু তা স্থায়ী হয় না ; অক্ষমতা ও দুর্নামের ধাক্কায় সেই কারবার তার কারবারী সমেত চিরতরে লালবাতি জ্বালতে বাধ্য হয়। 'দরদী শরৎচন্দ্র' সত্যকার ইচ্ছা, চেষ্টাও পরিশ্রমের সুফল। নবীন ও তরুণ জীবনীকার বহু অনুসন্ধান ও পরিশ্রমের ফলে, সত্যকার মাল মশলা সংগ্রহ করে বইখানি লিখেছেন। তিনি ফাঁকি দিয়ে কেল্লা-ফতে করবার ঘৃণিত বাসনা ও চেষ্টা করেননি। বইখানিতে প্রথমেই নজর পড়ে, শরৎচন্দ্রের সমগ্র জীবনকে ক্রমিক স্তর বিভাগে সাজিয়ে, প্রত্যেক বিভাগের যথাসাধ্য খোঁজ খবর ও বর্ণনা দিয়েছেন। এই সমস্ত বর্ণনার ওপর যাতে আলোকপাত হয়ে সুবোধ্য ও সহজ বোধ্য হয় তার জন্যে অনেকগুলি আলোক চিত্র এবং শরৎচন্দ্রের হাতে আঁকা একটি রেখাচিত্র বইখানিতে সংযোজিত করে, তিনি বইখানির মর্য্যাদা বৃদ্ধি করেছেন।

শরৎচন্দ্রের 'শুভদা' সাধারণের কাছে একটি অজ্ঞাত এবং রহস্য-জালে আবৃত্ত ব্যাপার। আমরা তাঁর অন্তরঙ্গ বন্ধু হয়েও কখনো সেই গভীর রহস্যজাল ছিন্ন করতে চেষ্টা করিনি বা সমর্থ হয়নি। কিন্তু শ্রীযুত মণীন্দ্র চক্রবর্তী সে বিষয়ে ভবিষ্যতে যথাসাধ্য আলোকপাত করতে চেষ্টা করবেন বলে আশা করি। বইখানির বাহ্যিক শোভাও সুন্দর তার জন্যে প্রকাশকও প্রশংসা ধন্যবাদ পাবার অধিকারী।

[প্রকাশক—বসুধারা প্রকাশনী, ৪২, কর্ণওয়ালিস স্ট্রীট, কলিকাতা—৬। মূল্য—৪.৫০ নঃ পঃ]

অসমঞ্জ মুখোপাধ্যায়

অনামিকা (কাব্যগ্রন্থ) : শ্রীগোবিন্দপদ মুখোপাধ্যায়

ভূমিকায় কবি লিখেছেন,—যে আমার হাত থেকে প্রবন্ধ লেখার লেখনী কেড়ে নিয়ে কবিতার লেখনী দিয়ে দিলে, তাকে জানি না, চিনি না বলেই তাকে অনামিকা নাম দিয়েছি।'

এ গ্রন্থের কবিতাগুলি সেই অপরিচিতা অনামিকার নূপুরের ছন্দে বাঁধা। হেমন্তিকার কনকাঞ্চলে, বর্ষার সজল মেঘছায়, শরতের তপন কিরণে কবি পেয়েছেন সেই অনামিকার ইসারা। কলমীলতায়, দোপাটি ফুলে, বেদনা করুণ গানের সুরে, জোনাকির আলোর কাঁপনে, সব কিছুতেই কবি খুঁজে পেয়েছেন সেই সঙ্কেতময়ীকেই। কবি বলেছেন, —'সঙ্কেতে তব জীবন ভরিয়া চলিয়াছি দিনরাত্রি।' আর, দিনরাত্রির সেই চলার পথে—'ধরার বুকে, বন্ধু, আমি তোমায় কভু ভুলব না।'—বার বার এই কথাটুকু জানিয়ে কবি শেষ করেছেন তাঁর কাব্যগ্রন্থ।

ছন্দের পরিচ্ছন্নতায় ও বৈচিত্র্যে, ভাষার পারিপাট্যে, ভাবের আন্তরিকতায় কবিতাগুলি সমুজ্জ্বল। কবিতাগুলির ভিতর দিয়ে শুধু একটি দক্ষ হাতের পরিচয়ই পাওয়া যায়নি, সেই সঙ্গে ফুটে উঠেছে একটি ভাবুক মন।

[প্রকাশক—রীডার্স কর্ণার। ৫, শঙ্কর ঘোষ লেন, কলিকাতা—৬। দাম ২'২৫]

প্রশান্ত চৌধুরী

শেষ বহ্নি : শ্রীরাইমোহন সাহা

পূর্ববঙ্গের গ্রাম জীবনের পটভূমিকায় লিখিত 'শ্বেতবহ্নি' নামক উপন্যাসখানি পড়ে আমি আনন্দ পেয়েছি। বস্তুত এটি একটি এপিক উপন্যাসের প্রথম খণ্ড হলেও লেখক এর মধ্যে যে শক্তিমত্তা ও জীবন-বোধের পরিচয় দিয়েছেন তাতে মনে হয় যে তাঁর প্রস্তাবিত খণ্ডগুলি সমাপ্ত হলে এটি বাংলা উপন্যাস সাহিত্যে একটি উল্লেখযোগ্য সংযোজন বিবেচিত হবে। লেখক শ্রীরাইমোহন সাহা সাহিত্যক্ষেত্রে একেবারে নবাগত না হলেও খ্যাতিমান নন। তবে তাঁর 'শ্বেতবহ্নি' তাঁকে সাহিত্য ক্ষেত্রে পরিচিত করে তুলবে বলেই আমার বিশ্বাস।

বাংলা সাহিত্যক্ষেত্রে আমরা বর্তমানে—সহরে নেশায় মশগুল। এর মধ্যে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'পদ্মানদীর মাঝি' বা বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'পথের পাঁচালী' ব্যতিক্রম। শ্রীসাহার 'শ্বেতবহ্নি' এই সব গ্রন্থের সমপর্য্যায়ের না হলেও সমগোত্রীয় যে সে বিষয়ে সংশয়ের অবকাশ নেই। পূর্ববঙ্গের গ্রাম জীবনের যে সব চরিত্র তিনি এঁকেছেন তারা তাঁর পরিচিত এবং তাদের কথাবার্তায় পূর্ববঙ্গের ভাষা দক্ষতার সঙ্গে ব্যবহার

করে লেখক চরিত্রগুলিকে সজীব করে তুলতে পেরেছেন। পূর্ববঙ্গের একটি অন্ত্যজপরিবারের একটি প্রতিভাধর শিশুর জীবন কাহিনীর প্রসঙ্গে এ গ্রন্থে উচ্চ ও নীচ সম্প্রদায়ের বহু চরিত্র এসে ভীড় করেছে। সুখের বিষয় সেই সব চরিত্রের ভীড়ে লেখকের মূল প্রতিপাদ্য কোথাও হারিয়ে যায় নি। তাঁর এই জীবনোপন্যাসের অন্যান্য খণ্ডগুলির জন্যে আমার মত অনেকেই সাগ্রহে প্রতীক্ষা করবেন বলে আমার বিশ্বাস।

[প্রকাশক—শ্রীগুরু লাইব্রেরী, ২০৪, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট কলিকাতা—৬, মূল্য ৪৲ টাকা]

শ্রীগোপাল ভৌমিক

প্রাণতত্ত্ব ও সমাজতত্ত্ব : অধ্যাপক সন্তোষকুমার সামন্ত

মার্ক গ্রাউবার্ডের "বাইওলজী এণ্ড সোস্যাল অর্ডার" গ্রন্থের চিন্তাধারায় অনুপ্রাণিত অধ্যাপকের এ-গ্রন্থ সমাজ বিস্তায় তাঁর বিশেষ দান হিসাবে গণ্য হবে। সমাজ তত্ত্ব ও ভারতবর্ষ সম্বন্ধে যা লেখক বলেছেন তা আমাদের কৌলীন্য গর্বিত মানুষদের অন্ধ কুসংস্কার মুক্ত করবে বলে আশা করা যায়।

কবিতা আর গল্পে প্লাবিত বাঙলাদেশে এরূপ গ্রন্থের বিশেষ উপযোগিতা রয়েছে।

[প্রকাশক—দাশগুপ্ত এণ্ড কোং। ৫৪।৩ কলেজ ষ্ট্রীট, কলিকাতা—১২। মূল্য ৩৲ টাকা]

শ্রীশৈলেনকুমার চট্টোপাধ্যায়

সাবিত্রী : শ্রীঅরবিন্দ

শ্রীঅরবিন্দ রচিত সুবিখ্যাত কাব্যগ্রন্থ সাবিত্রীর পঞ্চম পর্ব তৃতীয় সর্গের অনুবাদ করেছেন শ্রীনলিনীকান্ত গুপ্ত। সাবিত্রী-সত্যবানের প্রথম দর্শন ও আলাপের বর্ণনায় এ-সর্গ মধুর হয়ে উঠেছে। ঋষি কবি বলেছেন, আকাশে নক্ষত্র যেমন আকৃষ্ট করে নক্ষত্রকে তেমনি পরস্পরকে দেখে তারা ক্ষণেক অভিভূত হয়ে রইল। পরে তাদের এই প্রথম অন্তরঙ্গ বাক্ বিনিময়। নলিনীবাবুর পদ্যানুবাদ সর্থকতার দাবী রাখে।

[প্রকাশক—শ্রীঅরবিন্দ আশ্রম, পণ্ডিচেরী। মূল্য ১৲ টাকা]

স্বর্ণকমল ভট্টাচার্য্য

সাময়িকী : শ্রীঅনিলবরণ গঙ্গোপাধ্যায়

একখানি প্রবন্ধ পুস্তক—১১টি প্রবন্ধ আছে—তন্মধ্যে দিল্লীতে অনুষ্ঠিত সর্বভাষা কবি সম্মিলন সম্বন্ধে ১৯৫৬, ১৯৫৭ ও ১৯৫৮ সালের বিবরণ, সাহিত্য সমাজের ১৯৫৭ ও ১৯৫৮, মুদ্রণ প্রদর্শনী ৫৫, ৫৬ ও ৫৭ এবং রেডিও সংগীত সম্মিলন ১৯৫৭ এর বিবরণ ইহাতে প্রদত্ত হইয়াছে। তাহা ছাড়া তান সেন, আলবেনার কামু ও আঁদ্রে জিড় এবং লোকমান্য তিলক সম্বন্ধে তিনটি স্বতন্ত্র প্রবন্ধ এই পুস্তকে আছে। লেখক সাংবাদিক—বিভিন্ন অনুষ্ঠানের বিবরণগুলি গ্রন্থাকারে একত্র করিয়াছেন। ফলে এগুলি স্থায়ী সাহিত্যে স্থান লাভ করিল।

[প্রকাশক—দে পাবলিশিং কনসার্ণ, ২৭সি ক্রীক রো, কলিকাতা—১৪। মূল্য—৩৲ টাকা]

শ্রীফণীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়

নবপ্রকাশিত পুস্তকাবলী

শ্রীধীরেন্দ্রনারায়ণ রায় প্রণীত উপন্যাস "অচল প্রেম" (২য় সং)—৪৲

শ্রীশচীন সেনগুপ্ত প্রণীত নাটক "সিরাজদ্দৌলা" (১৮শ সং)—২৲

শ্রীবসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায় প্রণীত নাটক "জেবউন্নিসা"—১·২৫

সম্পাদক—শ্রীফণীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় ও শ্রীশৈলেনকুমার চট্টোপাধ্যায়

২০৩।১।১, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা, ভারতবর্ষ প্রিন্টিং ওয়ার্কস হইতে শ্রীকুমারেশ ভট্টাচার্য কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

=সৌখীন সমাজে অভিনয়যোগ্য উচ্চপ্রশংসিত নাটকসমূহ=

শরৎচন্দ্রের কাহিনী অবলম্বনে

বিপ্রদাস ১-৫০ রাজলক্ষ্মী ২, গৃহদাহ ২,

রামের সুমতি ১-৫০, নিষ্কৃতি ১-৫০, দেবদাস ২৲, রমা ২৲, পথের দাবী ২৲, কাশীনাথ ২৲, বিন্দুর ছেলে ১-৫০, বিরাজ-বৌ ২৲

গিরিশচন্দ্র ঘোষ প্রণীত

জনা ২-৫০, সিরাজদ্দৌলা ৩৲, প্রফুল্ল ২-৫০, বিল্বমঙ্গল ঠাকুর ২৲, নল-দময়ন্তী ১-৫০, বুদ্ধদেব-চরিত ২৲

রমেশ গোস্বামী প্রণীত

কেদার রায় ২-৫০

বিধুভূষণ বসু প্রণীত

দুই বিঘা জমি ১৲

অনুরূপা দেবীর কাহিনী অবলম্বনে

মন্ত্রশক্তি ২৲

মহানিশা ২-৫০

অমৃতলাল বসু প্রণীত

ব্যাপিকা বিদায় ০-৭৫

অপরেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় প্রণীত

ইরাণের রাণী ১-৫০

কর্ণার্জ্জুন ২-৫০, ফুল্লরা ২৲, পুষ্পাদিত্য ১৲, শকুন্তলা ১৲, শুভদৃষ্টি ১৲, সুদামা ১-২৫, অপ্সরা ০-৩৭

নির্ম্মলশিব বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত

রাতকাণা ০-৬২

তারক মুখোপাধ্যায় প্রণীত

রামপ্রসাদ ১-৫০

যামিনীমোহন কর প্রণীত

মিটমাট ০-৭৫ প্রহেলিকা ০-৭৫

নিশিকান্ত বসুরায় প্রণীত

...জেবর্গী ২-৫০, পথের শেষে ২-৫০, দেবলাদেবী ২-৫০, ললিতাদিত্য ২৲

মনোমোহন রায় প্রণীত

রিজিয়া ১-৫০

রবীন্দ্রনাথ মৈত্র প্রণীত

মানময়ী গার্লস্ স্কুল ১-৫০,

ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ প্রণীত

আলিবাবা ১৲, নর-নারায়ণ ২-৫০

প্রতাপ-আদিত্য ২-৫০

আলমগীর ২-৫০, রত্নেশ্বরের মন্দিরে ০-৭৫, ভীষ্ম ২-৭৫, বাসন্তী ০-২৫

দ্বিজেন্দ্রলাল রায় প্রণীত

রাণাপ্রতাপ ২-৫০, মেবারপতন ২৲, সাজাহান ২-৫০, দুর্গাদাস ২-৫০, পরপারে ২-৫০, বঙ্গনারী ২৲, সোরাব-রুস্তম ১-২৫, পুনর্জন্ম ০-৬২, চন্দ্রগুপ্ত ২-৫০, বিরহ ০-৫০, সীতা ২৲, সিংহল-বিজয় ২-৫০, ভীষ্ম ২-৫০, নুরজাহান ২-৫০

বটকৃষ্ণ রায় প্রণীত

পাকচক্র ০-৫০, পাল্টা-পাল্টি ০-৩৭

নিরুপমা দেবীর কাহিনী অবলম্বনে দেবনারাণ গুপ্ত প্রদত্ত নাট্যরূপ

শ্যামলী ১-৫০

শচীন সেনগুপ্ত প্রণীত

এই স্বাধীনতা ২৲, হর-পার্ব্বতী ১-২৫, সিরাজদ্দৌলা ২৲, সুপ্রিয়ার কীর্ত্তি ১-২৫, ভারতবর্ষ ১-২৫

কানাই বসু

গৃহপ্রবেশ ২৲

মণিলাল বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত

অহল্যাবাঈ ১৲, ঝান্সীর রাণী ২৲

অয়স্কান্ত বক্সী প্রণীত

ভোলা মাষ্টার ২-৫০

ডাঃ মিস্ কুমুদ ১৲, খুনী ১-৫০

মন্মথ রায় প্রণীত

মরা হাতী লাখ টাকা ১৲, অশোক ২৲, সাবিত্রী ২৲, চাঁদসদাগর ২৲, রাজনটী ০-৭৫, খনা ২৲, জীবনটাই নাটক ২.৫০, কারাগার, মুক্তির ডাক ও মহুয়া (একত্রে) ৩৲

মীরকাশিম, মমতাময়ী হাসপাতাল ও রঘুডাকাত (একত্রে) ৩৲

ধর্মঘট, পথে বিপথে, চাষীর প্রেম, আজব দেশ (একত্রে) ৪৲

ছোটদের একাঙ্কিকা ২৲

একাঙ্কিকা ৫৲ নবএকাঙ্ক ৩৲

কোটিপতি নিরুদ্দেশ—বিদ্যুৎপর্ণা—রাজনটী—রূপকথা (একত্রে) ৩৲

অতুলকৃষ্ণ মিত্র প্রণীত

আয়েসা ০-৫০, পাষাণে প্রেম ০-৫০, রংরাজ ০-২৫, আসল ও নকল ০-৩৭, হিন্দা হাফেজ ০-৫০

শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত

বন্ধু ১-৭৫

রেণুকারাণী ঘোষ প্রণীত

রেবার জন্মতিথি ১-২৫

তুলসীদাস লাহিড়ী প্রণীত

ছেঁড়া তার ২৲, পথিক ২-২৫

জিতেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় প্রণীত

পরিচয় ২৲

মহারাজ শ্রীশচন্দ্র নন্দী প্রণীত

অন্ন-প্যাশ্রি ২৲

নিত্যনারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত

ভুল ১৲

গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স,—২০৩।১।১, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা-৬

— ✱ বিবিধ গ্রন্থ ✱ —

ভারতবর্ষের সূচী

সপ্তচত্বারিংশ বর্ষ—প্রথম খণ্ড—চতুর্থ সংখ্যা

আশ্বিন—১৩৬৬

লেখ-সূচী

চিত্র-সূচী

লেখ-সূচী

চিত্র-সূচী

লেখ-সূচী

লেখ-সূচী

লেখ-সূচী

তাড়াতাড়ি আরাম
আর
নিরাময়ের জন্যে

বেঙ্গল ইমিউনিটি

বি. আই. কফ সিরাপ

দেব সাহিত্য কুটীরের

• নূতন বই •

পূজাবার্ষিকী

দেব-দেউল

প্রায় ৫০০শত পৃষ্ঠা · দাম—৫৲

বরণ ডালা - ২৲

রাক্ষস-খোক্কস

প্রায় ৩০০শত পৃষ্ঠা · দাম—৩৲

গল্প ভালো আবার বলো - ২৲

ভূত-পেত্নী-দত্যি-দানা … ৩৲

ঠাকুর মার ঝুলি … … ৩৲

ঠানদিদির থলে - ৩৲

শ্রেষ্ঠ উপহার

হাসির এ্যাটম বোম্

প্রায় ৫০খানা কার্টুন ছবিসহ দাম—২৲

* সুষমা সেন *

রন্ধন শিক্ষা

হাজার রকম খাবার তৈরী শখতে পারবেন। উপহারের উপযুক্ত কভার আধুনিক গেটআপ—৩৲

বিশ্ব পরিচয়

উপন্যাসের আকারে সমগ্র পৃথিবীর ইতিহাস—৮৲

* এ. টি. দেব *

নব বিধান…৬৲

(নূতন নিয়মে অভিধান)

---

* নৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায় *

চিত্রে জয়দেব

জয়দেব পদ্মাবতীর অপরূপ প্রেম কাহিনী… উপন্যাসের আকারে লেখা, তার সঙ্গে সমগ্র গীত গোবিন্দ মূল ও অনুবাদ সমেত ২ রংয়ে ছাপা অসংখ্য চিত্রসহ…৬৲

চিত্রে বিদ্যাপতি চণ্ডীদাস

বৃন্দাবন লীলার অসংখ্য রঙ্গিন চিত্রসহ—৫৲

হিন্দু নারী

যে কোন মেয়েদের পড়া উচিত। ৮খানা পৌরাণিক রঙ্গিন চিত্র…২॥•

দেব সাহিত্য কুটীর
২১, ঝামাপুকুর লেন
কলিকাতা-৯

এখানে চিঠি লিখলেই দশ হাজার রকম বইয়ের ক্যাটালগ পাঠানো হয়

শুকতারা

সরস্বতী পূজার দিন ত্রয়োদশ বর্ষে প'ড়বে

বার্ষিক মূল্য—৫৲

আশ্বিন—১৩৬৬

প্রথম খণ্ড	সপ্তচত্বারিংশ বর্ষ	চতুর্থ সংখ্যা

চণ্ডী দেবীর স্বরূপ

অধ্যাপক শ্রীশশিভূষণ দাশগুপ্ত

চণ্ডী বা চণ্ডিকা দেবীর প্রতিষ্ঠা মার্কণ্ডেয় পুরাণ অবলম্বন করিয়া। মার্কণ্ডেয় পুরাণের অন্তর্গত দেবী-মাহাত্ম্য নামক ত্রয়োদশটি অধ্যায়ই হইল প্রসিদ্ধ 'চণ্ডী' গ্রন্থ। বর্তমান-কালে এই গ্রন্থখানিকেই শাক্ত সম্প্রদায়ের শ্রেষ্ঠ—অন্ততঃ শাক্ত সম্প্রদায়ের মধ্যে সর্বাধিকপ্রচলিত শাস্ত্র বলা যাইতে পারে। এই 'চণ্ডী' শাস্ত্র অধ্যয়ন করিলে দেখিতে পাই, এখানে এক পরমা দেবীর মহিমা বর্ণিত হইয়াছে। এই দেবী অধিকাংশ স্থলে শুধু 'দেবী' রূপেই খ্যাতা; কোথাও তিনি ভগবতী, পরমেশ্বরী। তাঁহার মুখ্য পরিচয় চণ্ডিকা; তাঁহার প্রসিদ্ধ অন্যান্য নামগুলির মধ্যে অম্বিকা নামটি খুব বেশি ব্যবহৃত হইতে দেখি; দুর্গা নামও কয়েক স্থলে ব্যবহৃত হইয়াছে। গৌরবর্ণা বলিয়া এক স্থলে তিনি 'গৌরদেহা' বলিয়া আখ্যাতা; 'গৌরী' সম্বোধনও কয়েক স্থলে পাওয়া যায়। তাহা ব্যতীত তিনি কাত্যায়নী, শিব-দূতী, শাকম্ভরী, ভীমা, ভ্রামরী ইত্যাদি। এই জাতীয় নাম-গুলি তিনি কখন কেন গ্রহণ করিয়াছেন গ্রন্থ মধ্যেই তাহার ব্যাখ্যা দেওয়া আছে। তাঁহা হইতেই কৌশিকী, কালী বা চামুণ্ডা প্রসূতা হইয়াছিলেন। কিন্তু সর্বাপেক্ষা কৌতূহল-জনক হইল যে তথ্যটি তাহা এই যে, এই দেবী কোথাওই হিমাচল-দুহিতা উমা নহেন। সমস্ত 'চণ্ডীর' মধ্যে দেবীর উমা নামটির উল্লেখ একবারের জন্যও নাই। পঞ্চম অধ্যায়ে দেবীকে তিনবার মাত্র পার্বতী বলিয়া উল্লিখিত দেখিতে পাই, তাহাও পর্বত-কন্যা পার্বতীরূপে নহে—পর্বতবাসিনী পার্বতীরূপে। ঐতিহাসিক দৃষ্টিতে যে কথাটি তাই অত্যন্ত

বড় করিয়া মনে হয় তাহা হইল এই যে, দেবীরূপে চণ্ডীর ধারা ভারতবর্ষের প্রাচীন দেবী পার্বতী উমার ধারা হইতে একটি স্বতন্ত্র ধারা।

'চণ্ডী'-গ্রন্থ মধ্যে তিনকালে তিনটি প্রধান ঘটনা অবলম্বন করিয়া দেবীর মহিমা প্রচারিত হইয়াছে; প্রথমে দেবীর সহায়তায় বিষ্ণু কর্তৃক মধুকৈটভ অসুরদ্বয় বিনাশে; দ্বিতীয়ে স্বয়ং দেবী কর্তৃক মহিষাসুর নিধনে; তৃতীয়ে দেবী কর্তৃক শুম্ভ-নিশুম্ভ অসুরদ্বয় বধে। এই শুম্ভ-নিশুম্ভ বধ উপলক্ষে অবশ্য দেবীকে চণ্ড-মুণ্ড এবং রক্তবীজ প্রভৃতি আরও অনেক অসুর বধ করিতে হইয়াছে। উল্লিখিত প্রথম দুই ঘটনার ক্ষেত্রে দেবীর হিমালয় পর্বতের সহিত কোনও যোগ নাই; শুধু দ্বিতীয় ঘটনায় দেখিতে পাই, দেবগণের তেজের ঘনীভূতরূপে দেবীর আবির্ভাবের পর সমস্ত দেবতাগণ দেবীকে নিজের নিজের অস্ত্র দান করিলেন, সেই প্রসঙ্গে দেখি—

হিমবান্ বাহনং সিংহং রত্নানি বিবিধানি চ।
দদাবাশূন্যং সুরয়া পানপাত্রং ধনাধিপঃ॥

হিমবান্ দিলেন বাহন সিংহ এবং বিবিধ রত্ন সকল, আর ধনাধিপ কুবের দেবীকে দিলেন সর্বদা সুরা দ্বারা পরিপূর্ণ একটি পানপাত্র। তৃতীয় ঘটনা শুম্ভ-নিশুম্ভ বধের প্রসঙ্গেই শুধু দেখিতে পাইলাম, শুম্ভ-নিশুম্ভ অসুরদ্বয় কর্তৃক নির্যাতিত হইয়া ইন্দ্রাদি দেবগণ অসুর নিধনের জন্য দেবীর শরণ গ্রহণ করাই একমাত্র উপায় মনে করিয়া নগেশ্বর হিমবানে গমন করিলেন এবং দেবীকে স্তবের দ্বারা তুষ্ট করিলেন। দেবী তখন জাহ্নবীর জলে স্নান করিতে যাইতেছিলেন; সেই অবস্থায়ই তিনি দেবগণের সম্মুখে উপস্থিত হইলেন। শুম্ভের অনুচর চণ্ড-মুণ্ডও গিয়া শুম্ভের নিকট বলিয়াছিল, 'কাপ্যাস্তে স্ত্রী মহারাজ ভাসয়ন্তী হিমাচলম্।' শুম্ভ-নিশুম্ভের সেনানায়ক ধূম্রলোচনও দেবীকে দেখিয়াছিল—'তুহিনাচলসংস্থিতাম্।' দেবীকে এখানে হিমালয়বাসিনী বলিয়া বর্ণিত হইতে দেখিলাম, সমস্ত চণ্ডীর মধ্যে হিমালয়ের সহিত দেবীর এইটুকুই সম্বন্ধ। সুতরাং দেখিতে পাইতেছি সমগ্র চণ্ডীর মধ্যে দেবীর যে উমা পরিচয়েরই অভাব তাহা নহে, তাঁহার পার্বতী বা গিরিজা রূপটিও একান্ত গৌণ।

কিন্তু ইহা অপেক্ষাও অধিক লক্ষণীয় তথ্য হইল এই, দেবী সমগ্র 'চণ্ডী'-গ্রন্থের মধ্যে কোথাও শিব-শক্তি নন; শিবের সহিত তাঁহার সম্পর্ক অত্যন্ত গৌণ—প্রায় নাই বলিলেই চলে। কালিদাস পার্বতী পরমেশ্বরের ভিতরকার সম্পর্ককে বাক্য ও অর্থের নিত্য-সম্পর্কের ন্যায় অবিনাবদ্ধ সম্পর্ক বলিয়াছেন; কিন্তু চণ্ডীতে বর্ণিত দেবীর সহিত শিবের কোনও উল্লেখযোগ্য সম্পর্ক খুঁজিয়া পাইতেছি না। প্রথমে মধুকৈটভ-বধের সময় স্পষ্টই দেখিতে পাইলাম, দেবী হইলেন জগৎপতির যোগনিদ্রা—তিনি হইলেন হরির মহামায়া—

তন্নাত্র বিস্ময়ঃ কার্যো যোগনিদ্রা জগৎপতেঃ।
মহামায়া হরেশ্চৈতত্তয়া সংমোহ্যতে জগৎ॥

(চণ্ডী ১।৫৫)

দেবী জগৎপতি বিষ্ণুর যোগনিদ্রা শব্দের অর্থ নৈমিত্য-রূপা নিত্যা সমবায়িনী শক্তি। এই শক্তি যে পর্যন্ত নৈমিত্য-রূপা হইয়া 'হরিনেত্রকৃতালয়া' (চ, ১।৭০) হইয়া থাকেন সে পর্যন্ত ত বিষ্ণুর কোনও সঙ্কল্প-বিকল্প এবং সঙ্কল্প-বিকল্পাত্মক ক্রিয়াদির সম্ভাবনা নাই; তাই প্রথমে আদি-দেব ব্রহ্মা স্তবের দ্বারা এই নিস্তরঙ্গা দেবীকে জাগ্রত করিলেন; সমবায়িনী শক্তির জাগরণের ফলেই বিষ্ণুর অসুর-হননাদি ক্রিয়া সম্ভব হইল। এই স্তবের মধ্যেও স্পষ্ট দেখিলাম, এই বিশ্বেশ্বরী জগদ্ধাত্রী, স্থিতি-সংহারকারিণী ভগবতী হইলেন বিষ্ণুর নিদ্রা-শক্তি—অর্থাৎ নৈমিত্য-রূপিণী নিষ্ক্রিয়া সমবায়িনী শক্তি (চ, ১।৭১)। শক্তি একদিক হইতে শক্তিমান্ অপেক্ষাও প্রধান, কারণ শক্তি ব্যতীত শক্তিমানের শক্তিমত্তাই ত সিদ্ধ হয় না। তাই পরমেশ্বর বিষ্ণুর উপরেও পরমেশ্বরী বিষ্ণুশক্তিরই অখণ্ড অধিকার। সেইজন্যই বলা হইয়াছে—

যয়া ত্বয়া জগৎস্রষ্টা জগৎপাতাত্তি যো জগৎ।
সোঽপি নিদ্রাবশং নীতঃ কস্ত্বাং স্তোতুমিহেশ্বরঃ॥

(চ, ১।৮-৮৪)

'যিনি জগৎস্রষ্টা, জগৎপাতা—এবং যিনি জগৎ-গ্রাসকারী—তিনিও তোমাদ্বারা নিদ্রাবশোনীত হন, সেই তোমাকে স্তব করিতে কে সমর্থ?' সুতরাং শক্তির বোধনের দ্বারা শক্তিকে তরঙ্গময়ী করিয়া তুলিতে পারিলেই জগৎ-স্বামী বিষ্ণুর

প্রবোধ হইবে—শক্তির জাগরণই বিষ্ণুকে ক্রিয়া-প্রবৃত্তি দান করিবে। ব্রহ্মার তাই বিষ্ণুশক্তি যোগমায়ার নিকট প্রার্থনা—

প্রবোধঞ্চ জগৎস্বামী নীয়তামচ্যুতো লঘু।
বোধশ্চ ক্রিয়তামস্য হন্তমেতৌ মহাসুরৌ॥

ব্রহ্মার স্তবে দেবী বিষ্ণুদেহ হইতেই জাগ্রতা—সক্রিয় হইয়া উঠিলেন, বিষ্ণুকে যুদ্ধ-প্রবৃত্তি দান করিলেন, অসুরগণকে মহামায়া দ্বারা বিমোহিত করিলেন, ফলে অসুরবধ হইল। দেখিলাম, এই অসুরনাশিনী দেবীর সহিত শিবের কোনই সম্পর্ক নাই। দেবী বিষ্ণুশক্তিরূপেই যজ্ঞের সহিত সম্পৃক্তা—তিনি স্বাহা, স্বধা, বষট্‌কাররূপিণী, তিনি প্রণবরূপা, সাবিত্রী, দেবজননী, সৃষ্টি-স্থিতি-সংহারকারিণী, মহাবিদ্যা, মহামায়া, মহাবেধা, মহামোহা, মহাদেবী, মহাসুরী; তিনিই ত্রিগুণাত্মিকা প্রকৃতি, সর্বসংহরণকারিণী দারুণা কালরাত্রি (ব্রহ্মার লয়কারিণী) মহারাত্রি (জগৎ লয়কারিণী) এবং মোহরাত্রি (যাহাতে জীবের লয়); তিনি শ্রী, হ্রী, বুদ্ধিরূপিণী, লজ্জা, পুষ্টি. তুষ্টি, শান্তি, ক্ষান্তি; কিন্তু তিনিই আবার—

শঙ্খিনী শূলিনী ঘোরা গদিনী চক্রিণী তথা।
শঙ্খিনী চাপিনী বাণভুসণ্ডীপরিঘায়ুধা॥

বেশ বোঝা যাইতেছে, এই বর্ণনা দ্বারাই বিষ্ণুশক্তিকে অস্ত্রশস্ত্রধারিণী অসুরনাশিনী দেবীর সহিত যুক্ত করা হইতেছে।

দেবীর দ্বিতীয়বার আবির্ভাবকালে দেখিতে পাইলাম, স্বর্গ হইতে মহিষাসুর কর্তৃক বিতাড়িত হইয়া দেবগণ ব্রহ্মাকে অগ্রে করিয়া গরুড়ধ্বজ বিষ্ণুর নিকটে গেলেন এবং বিষ্ণুর নিকটে তাঁহারা অসুরের সর্বপ্রকার অত্যাচারের বর্ণনা করিয়া নিবেদন করিলেন,—'শরণঞ্চ প্রপন্নাঃ স্মো বধস্তস্য বিচিন্ত্যতাম্'—'আমরা সকলে আপনারই শরণ গ্রহণ করিলাম,—আপনি সেই অসুরের বধের কথা ভাবুন'। দেবতাগণের এই কথা শুনিয়া মধুসূদন এবং শম্ভু ভ্রুকুটি-কুটিলানন হইয়া কোপ করিলেন এবং প্রথমে অতিকোপ পরিপূর্ণ চক্রধারী বিষ্ণুর এবং তাহার পরে শঙ্করের বদন হইতে মহা তেজ নির্গত হইল। ইন্দ্রাদি দেবগণের দেহ হইতেও এইরূপে সুবিপুল তেজরাশি নির্গত হইল—পরে এই সমস্ত তেজ ঐক্য লাভ করিল। তখন সেখানে দেবগণ 'জ্বালাব্যাপ্তদিগন্তর' অতিশয় জ্বলন্ত পর্বতের ন্যায় একীভূত এক তেজঃপুঞ্জ দেখিতে পাইলেন। দেবগণের দেহ হইতে বিনির্গত সেই তেজ একীভূত এবং ঘনীভূত হইয়া এক অপূর্ব নারীমূর্তি পরিগ্রহ করিল—সে মূর্তির দীপ্তিচ্ছটায় ত্রিভুবন উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল। বিভিন্ন তেজের দ্বারা এই জ্যোতির্ময়ী নারীর বিভিন্ন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ গড়িয়া উঠিল, শাম্ভব তেজে তাঁহার মুখসৃষ্টি হইয়াছিল। প্রত্যেক দেবতা তখন এই তেজোময়ী নারীকে তাঁহার বিশেষ বিশেষ অস্ত্রশস্ত্র দান করিলেন, 'পিনাকধৃক্' তাঁহাকে দান করিয়াছিলেন তাঁহার শূল। এই জ্যোতির্ময়ী নারীই হইলেন মহিষাসুরমর্দিনী মহাদেবী। দেবীর অসুরনাশিনী রূপের মধ্যে এই মহিষাসুরমর্দিনী রূপই অতি প্রাচীন এবং প্রধান। পরবর্তী কালের শারদীয়া দুর্গাপূজায় দেবীর মৃণ্ময়ী মূর্তিতে দেবীর এই মহিষমর্দিনী রূপই গৃহীত হইয়াছে। বহু প্রাচীনকাল হইতেই আমরা দেবীর প্রস্তর নির্মিত মহিষমর্দিনী রূপের সন্ধান পাই। ভাস্কর্যে ও চিত্রেও দেবীর মহিষাসুরমর্দিনী রূপেরই প্রাধান্য। মনে হয়, দেবীর অসুরনাশিনী রূপের মধ্যে এই মহিষাসুরমর্দিনী রূপকে অবলম্বন করিয়াই অন্যান্য অসুরবিনাশের কাহিনী কালক্রমে গড়িয়া উঠিয়াছে।

এই মহিষমর্দিনী রূপের প্রাচীনতম নিদর্শন পাই মধ্যভারতের উদয়গিরিতে দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তের কালে নির্মিত প্রস্তরমূর্তিতে। এই মূর্তি খ্রীষ্টীয় চতুর্থ শতকের। মূর্তিখানি দ্বাদশভুজা, দ্বাদশভুজে বিবিধ প্রহরণ। গুপ্তযুগের আরও অনেক ছোট ছোট প্রস্তরমূর্তির কথা মার্শাল উল্লেখ করিয়াছেন; মূর্তিগুলি দ্বিভুজা এবং অসুরের সঙ্গে সংগ্রামনিরতা।

মহিষাসুরমর্দিনী মূর্তি সম্বন্ধেও একটা কথা মনে হয়। 'মহিষ' কথাটি বেদে মহিষ পশু এই অর্থে যেমন ব্যবহৃত দেখা যায় তেমনই সায়নাচার্য কোন কোন স্থলে (ঋগ্‌বেদ ৮।১২।৮) 'মহিষ' শব্দটি মহান্ অর্থে গ্রহণ করিয়াছেন; সেক্ষেত্রে মহিষাসুর কথার অর্থ মহান্ অসুর। দেবী হয়ত মূলে মহান্ অসুর মর্দন করিয়াই মহিষাসুরমর্দিনী; মহান্ অসুরই পরবর্তী কালে পশু মহিষের মূর্তি ধারণ করিয়াছে। আমরা 'চণ্ডী'কে অবলম্বন করিয়া ভারতীয় ভাষা-সাহিত্যগুলিতে যত কাব্য দেখিতে পাই

সেখানে সাধারণতঃ মহিষাসুরকেই প্রধান করিয়া দেখিতে পাই। আর পূর্বেই উল্লেখ করিয়াছি, দেবীর যত অসুর-নাশিনী প্রাচীন প্রস্তরমূর্তি পাওয়া যায় তাহা সর্বত্রই মহিষাসুরনাশিনী বা মহিষমর্দিনী রূপ।

এই যে 'নিঃশেষদেবগণসমূহমূর্তি' দেবীর আবির্ভাব ইহা এক অভিনব আবির্ভাব; ইহা যেমন ভাবভূয়িষ্ঠ, তেমনই তত্ত্বগূঢ়; কিন্তু লক্ষ্য করিতে পারিতেছি যে, এই দেবীর সহিতও আমাদের পার্বতী দেবীর কোনও সম্পর্ক নাই; ইঁহার আবির্ভাবের সহিত পিনাকধৃক্ শঙ্করের যে সম্পর্ক তাহাও অত্যন্তভাবেই গৌণ। শম্ভু এখানে অসুর-লাঞ্ছিত অন্যান্য দেবগণের মধ্যেই একজন মাত্র—ইহার অধিক আর কিছুই নন।

তৃতীয়বারে শুম্ভ-নিশুম্ভ অসুরদ্বয় বধের কালে দেবীর কোনও নূতন পরিচয় পাইলাম না; এখানে তিনি পুরাতনী; তিনি দেবগণকে বর দিয়াছিলেন, যখনই তাঁহারা কোনও আপদে পড়িবেন তখনই যদি দেবীর স্মরণ করেন তবে দেবী তৎক্ষণাৎ তাঁহাদের আপদ নাশ করিবেন। এই কথা স্মরণ করিয়াই দেবগণ হিমালয়ে গিয়া দেবীর শরণ লইলেন; দেবীও অসুর নিধন করিয়া দেবগণের আপদ নাশ করিলেন। এখানেও কিন্তু লক্ষ্য করিতে পারিতেছি, দেবগণ 'দেবীং বিষ্ণুমায়াং প্রতুষ্টুবুঃ'; যে-দেবীকে হিমালয়ে গিয়া দেবগণ স্তব দ্বারা তুষ্ট করিলেন, সে-দেবী বিষ্ণুমায়া, তিনি শিবমায়া নন।

যখন দেবী শুম্ভাসুরের সঙ্গে যুদ্ধে ব্যাপৃতা তখন ঈশানরূপে মহাদেব শিবকে আমরা একবার দেখিতে পাইলাম। দেবীর সাহায্যের জন্য ব্রহ্মা, শিব, কার্তিক, বিষ্ণু, ইন্দ্র প্রভৃতি দেবগণের শরীর হইতে তাঁহাদের শক্তিসমূহ নির্গত হইয়া যুদ্ধক্ষেত্রে আবির্ভূতা হইলেন। এই দেবীগণের মধ্যে ছিলেন ব্রহ্মার শক্তি ব্রহ্মাণী—অক্ষ-মালা ও কমণ্ডলু হস্তে হংসযুক্ত বিমানে; মহেশ্বরের শক্তি আসিলেন মাহেশ্বরী—তিনি ত্রিশূলবরধারিণী, মহাসর্পবলয়-ধারিণী, চন্দ্ররেখা-বিভূষণা বৃষারূঢ়া;(১) কুমার কার্তিকের শক্তি আসিলেন কৌমারী—তিনি শক্তিহস্তা ও ময়ূরবাহনা; বিষ্ণুশক্তি আসিলেন বৈষ্ণবী—শঙ্খ-চক্র-গদা-ধনু-খড়্গ-ধারিণী—গরুড়বাহনা; বিষ্ণু-অবতার বরাহের শক্তি আসিলেন বারাহী, নরসিংহের শক্তি নারসিংহী, ইন্দ্রশক্তি গজারূঢ়া ঐন্দ্রী। এই সকল দেবশক্তি দ্বারা পরিবৃত হইয়া ঈশান (শিব) চণ্ডিকাকে বলিলেন, 'আমার প্রতি প্রীতি-বশতঃ (মম প্রীত্যা) এই সকল দেবীগণকে লইয়া সত্বর অসুর বিনাশ করুন।' দেবী ঈশানকে দূতত্ব স্বীকার করিয়া শুম্ভ-নিশুম্ভের নিকট যাইতে বলিলেন, শিবও দেবীর দূতত্ব স্বীকার করিয়া শুম্ভ-নিশুম্ভের নিকট গমন করিয়াছিলেন। যে-হেতু দেবী কর্তৃক স্বয়ং শিব দৌত্যে নিযুক্ত হইয়াছিলেন এই কারণে দেবী জগতে 'শিবদূতী' নামে খ্যাতি লাভ করিয়াছিলেন।'(১)

এখানেও যে শিব বা ঈশানকে পাইলাম, তিনিও দেব-গণের মধ্যে একজন হইয়া গৌণভাবে দেখা দিলেন, তিনি আমাদের চিরপরিচিত 'মহেশ্বর' নন। অসুরগণের নিকটে দেবীর দূতরূপে তাঁহার গৌণত্ব আরও প্রকটিত হয় বলিয়া মনে হয়। দেবীকে অবশ্য একাধিক স্থানে 'শিবা'-রূপে আখ্যাত হইতে দেখি; কিন্তু প্রসঙ্গ লক্ষ্য করিলেই বুঝিতে পারি, এই শিবা শিব-গৃহিণী বা শিব-শক্তি নহেন, 'শিবা' শব্দ এসব স্থানে সাধারণভাবে মঙ্গলময়ী এই অর্থে ব্যবহৃত। 'গৌরী' কথাটিও কয়েক স্থানে সাধারণভাবে গৌরবর্ণা এই অর্থেই ব্যবহৃত হইয়াছে। একটি স্থলে অবশ্য বলা হইয়াছে, 'গৌরী ত্বমেব শশিমৌলিকৃতপ্রতিষ্ঠা'—'তুমিই গৌরী—শশিমৌলী অর্থাৎ চন্দ্রশেখর শিবে তোমার প্রতিষ্ঠা'; কিন্তু ঠিক এই শ্লোকেরই পূর্বচরণে দেখি—'শ্রীঃ কৈটভারি-হৃদয়ৈককৃতাধিবাসা'—'তুমিই শ্রী—কৈটভের অরি বিষ্ণুর হৃদয়েই যাঁহার বাস।' সুতরাং দেখিতেছি, একই শ্লোকে দেবী 'বিদিতাখিলশাস্ত্রসারা' মেধা, 'দুর্গভবসাগরনৌ' অসঙ্গা দুর্গা, আবার বিষ্ণুবক্ষোবিলাসিনী শ্রী—শশিশেখরাশ্রিতা গৌরী। সুতরাং এ-ক্ষেত্রেও 'শশিমৌলিকৃতপ্রতিষ্ঠা' রূপটি দেবীর একমাত্র বা প্রধান রূপ নয়।

পূর্বেই বলিয়াছি, দেবীর অম্বিকা নামটি বহুবার চণ্ডীতে ব্যবহৃত হইয়াছে। তৈত্তিরীয় আরণ্যকে অম্বিকাকে রুদ্র

১ তুলনীয়—

ত্রিশূলচন্দ্রাহিধরে মহাবৃষভবাহিনী।

মাহেশ্বরী-স্বরূপেণ নারায়ণি নমোঽস্তুতে॥ (চ, ১১।১৪)

১ যতো নিযুক্তো দৌত্যেন তয়া দেব্যা শিবঃ স্বয়ম্।

শিবদূতীতি লোকেঽস্মিংস্ততঃ সা খ্যাতিমাগতা॥ (৮।২৮)

ভগিনীরূপেও দেখি, রুদ্র-পত্নী-রূপেও দেখি। কিন্তু এই ক্ষীণ সূত্রকে অবলম্বন করিয়া চণ্ডীতে দেবীর অম্বিকা নামের ব্যবহারের দ্বারা শিবের সহিত দেবীর অচ্ছেদ্যযোগের কথা স্থাপিত করা যায় বলিয়া মনে হয় না। 'অম্বিকা' এখানে সাধারণভাবেই দেবীর একটি নাম রূপে গৃহীত হইয়াছে।

সংস্কারবিহীনভাবে চণ্ডী পাঠ করিলে দেবীর দুইটি রূপ প্রধান ভাবে মনে ভাসিয়া ওঠে; একটি হইল দেবীর বিষ্ণু-শক্তি রূপ—অপরটি হইল দেবীর পরম 'স্বতন্ত্রা' রূপ। প্রথমে দেবীর এই 'স্বতন্ত্রা'রূপের কথাই আলোচনা করিতেছি; দেবীর বিষ্ণুশক্তি বা বিষ্ণুমায়া রূপের কথা পরে আলোচনা করিব।

ভারতবর্ষের শাক্তধর্ম ও শাক্ত দর্শনকে বিশ্লেষণ করিলে আমরা দেবীর মুখ্য তিনটি রূপ লক্ষ্য করিতে পারি। প্রথমতঃ দেখিতে পাই, দেবী শিবাশ্রয়া; পরমেশ্বর শিবই হইলেন পরমতত্ত্ব—দেবী সেই পরমতত্ত্ব মহেশ্বরের পত্নী বা শক্তিরূপে গৃহীতা। শক্তি ও শক্তিমানের অভেদত্ব স্বীকৃত হওয়া সত্ত্বেও এখানে ধর্মে ও সাহিত্যে শিবেরই পরমশক্তি-মান্‌রূপে প্রাধান্য লক্ষ্য করিতে পারি। দ্বিতীয় মতে দেখিতে পাই শিব এবং দেবী বা শক্তির সমপ্রাধান্য; তন্ত্রের মধ্যে আমরা এই তত্ত্বকেই প্রধান ভাবে লাভ করি। শিব ও শক্তি অন্যোন্যাশ্রয়ে উভয়ই উভয়ের সম্পর্কে পরতন্ত্র; কেহই একক সত্য বা পূর্ণ সত্য নহেন; উভয়ের 'যামল'ই হইল পরমতত্ত্ব। তৃতীয় আর একটি মতবাদে দেখিতে পাই, দেবী 'স্বতন্ত্রা'—তিনিই পরমতত্ত্ব। দেবী হইলেন ত্রিভুবনব্যাপিনী এক অদ্বিতীয়া মহাশক্তি—সেই মহাশক্তি হইতেই সব কিছু প্রসূত—সেই দেবীর উপরে আর কিছুই নাই। অন্যান্য দেবগণের বিভিন্ন এবং বিচিত্রভাবে এই অদ্বিতীয়া মহাশক্তির আধার-স্বরূপত্বেই যাহা কিছু মহিমা।

উপনিষদাদিতে দেখিতে পাই, ব্রহ্মই এক এবং অদ্বিতীয়—তিনিই পরাৎপর—তাঁহার ভাস বা দীপ্তি লইয়াই দেবগণ পশ্চাৎ প্রকাশ পান (অনুভাতি)। শাক্ত-ধর্মের একটি ধারায় দেখিতে পাই, দেবীই হইলেন ব্রহ্ম-স্বরূপিণী—তিনিই পরাৎপরা; তিনি শুধু জগতের অধীশ্বরী নন—জীবগণেরই অধীশ্বরী নন—তিনি সমস্ত দেব-দেবী-গণেরও অধীশ্বরী; তিনিই দ্বয়রহিতা পরমেশ্বরী। অবশ্য গভীর দার্শনিক দৃষ্টিতে শক্তিকে সর্বত্রই দ্বয়-রহিতা বলিয়া কীর্তন করা যাইতে পারে, কারণ পরমা শক্তিরূপে তাঁহার নিত্যই দ্বয়াভাব, শক্তিমানের সঙ্গেও যে তাঁহার নিত্য-অদ্বয়ত্ব। এই জন্য পুরাণ-তন্ত্রাদিতে বহুশঃই শিবাশ্রিতা শক্তি বা বিষ্ণু-আশ্রিতা শক্তিও এইরূপ নিত্যা অদ্বয়া এবং পরমেশ্বরীরূপে কীর্তিতা। কিন্তু স্থানে স্থানে আবার বর্ণনার রকম দেখিলে মনে হয়, দেবী বা শক্তির প্রসঙ্গে শক্তিমানের কোনও প্রশ্নই নাই, শক্তি স্বাশ্রয়া স্বতন্ত্রা। চণ্ডীর ভিতরেও আমরা দেবীর এই স্বাশ্রয়া স্বাতন্ত্র্য রূপের কথাই বহু স্থানে বেশ বড় করিয়া দেখিতে পাই। চণ্ডীতে বলা হইয়াছে, 'সৈব সর্বেশ্বরেশ্বরী' (১।৫৮); দেবী 'পরা পরাণাং পরমা ত্বমেব পরমেশ্বরী' (১।৮২); 'সা ভগবতী পরমা হি' (৪।৯)। নিশুম্ভের মৃত্যুর পরে শুম্ভ যখন দেবীকে বলিয়াছিল—'অন্যাসাং বলমাশ্রিত্য যুধ্যসে যা হতিমানিনী'—'যে অতিমানিনী তুমি অন্যান্য দেবীগণের বল আশ্রয় করিয়াই যুদ্ধ করিতেছ।' উত্তরে দেবী বলিয়াছিলেন—

> একৈবাহং জগত্যত্র দ্বিতীয়া কা মমাপরা।
> পশ্যৈতা দুষ্ট ময্যেব বিশন্ত্যো মদ্‌বিভূতয়ঃ॥

'জগতে আমি একাই; আমার পরে অপর কে আর দ্বিতীয়া আছে? এই সব (দেবীগণ) আমারই বিভূতিমাত্র—হে দুষ্ট, দেখ, সেই আমার বিভূতিসকল আমার মধ্যেই প্রবেশ করিতেছে।' এই বলিয়া দেবী সমস্ত দেবীরূপ তদ্‌বিভূতি-সমূহ নিজের মধ্যেই আবার নিঃশেষে সংহরণ করিয়া রণক্ষেত্রে একাকিনী বিরাজ করিতে রহিলেন। এই পৃথক্ পৃথক্ শক্তিগণ কিন্তু পৃথক্ পৃথক দেব-শক্তি; সুতরাং দেখিতেছি, ব্রহ্মা-বিষ্ণুমহেশ্বরাদি সমস্ত দেবতাগণের যে শক্তি মূলে তাহা সব এক মহাদেবী হইতেই প্রসূত—তাঁহা কর্তৃকই বিধৃত—আবার তাঁহাতেই সংহৃত। এই দেবীর স্তবে দেবগণ বলিয়াছেন—

> বিশ্বেশ্বরী ত্বং পরিপাসি বিশ্বং
> বিশ্বাত্মিকা ধারয়সীতি বিশ্বম্।
> বিশ্বেশবন্দ্যা ভবতী ভবন্তি
> বিশ্বাশ্রয়া যে ত্বয়ি ভক্তিনম্রাঃ॥

এখানে লক্ষ্য করিতে হইবে, দেবী শুধু বিশ্বেশ্বরী নন, তিনি বিশ্বেশবন্দ্যা। অবশ্য শৈব-দর্শনের মধ্যে দেখিতে পাই, শিব-তত্ত্বের অনেক স্তরভেদ রহিয়াছে—পরতত্ত্বরূপে মহেশ্বরের যে বৈষ্ণব-স্থিতি তাহার মধ্যে সমস্ত শক্তিতত্ত্বও

আবার সংহত হইয়া আছে। কিন্তু তন্ত্রের বা শৈবদর্শনের সেই বৈষ্ণব পরমেশ্বর-তত্ত্বের আভাস মার্কণ্ডেয় চণ্ডীর মধ্যে আমরা পাই না; এখানে প্রসঙ্গ ক্রমে স্থানে স্থানে আমরা যে শিব বা ঈশানের বা পিনাকধ্বকের সাক্ষাৎ পাই তিনি দেবতাগণের মধ্যে একজন দেবতামাত্র। অবশ্য এ-কথা স্বীকার করতে হইবে যে চণ্ডীর মধ্যে দেবীর যে পরমেশ্বরী-রূপের বর্ণনা পাইতেছি তাহাকে যে শিবাশ্রিতা বা বিষ্ণু-আশ্রিতা দেবী বলিয়া ব্যাখ্যা করা যায় না—তাহা নহে, বস্তুতঃ বহু স্থানে বিষ্ণু-আশ্রিতা দেবী সম্বন্ধেই এই সব বিশেষণ প্রযুক্ত হইয়াছে। আমাদের প্রধান বক্তব্য এই, গ্রন্থ মধ্যে সমগ্র দেবগণ কর্তৃক দেবী বারবার পরমেশ্বরীরূপে যে-ভাবে বন্দিতা হইয়াছেন তাহাতে তাঁহার একটা স্বতন্ত্র-রূপই মনের মধ্যে প্রধান হইয়া জাগিয়া ওঠে।

'চণ্ডী'র মধ্যে দেবীর যে স্বতন্ত্র রূপ দেখিতে পাই তাহারই বিস্তার দেখিতে পাই পরবর্তী কালে রচিত 'দেবী-ভাগবতে'র মধ্যে। 'দেবী-ভাগবতে' দেবী সম্বন্ধে বলা হইয়াছে।

স্মৃষ্ট্বাখিলং জগদিদং সদসংস্বরূপং
শক্ত্যা স্বয়া ত্রিগুণয়া পরিপাতি বিশ্বম্।
সংহৃত্য কল্পসময়ে রমতে তথৈকা
তাং সর্ববিশ্বজননীং মনসা স্মরামি॥ (১।২।৫)

এখানকার এই 'রমতে তথৈকা' কথাটি বিশেষ করিয়া লক্ষ্য করিতে হইবে। অন্যত্রও দেখি, 'কৃত্বাখিলং জগদিদং রমসে স্বতন্ত্রা' (১।৭।৪৫)। এই এক এবং অদ্বিতীয়া দেবীরই সাত্ত্বিকী, রাজসী ও তামসী শক্তিকে অবলম্বন করিয়া মহালক্ষ্মী, মহাসরস্বতী ও মহাকালী এই ত্রিদেবীর উদ্ভব। ত্রিদেবী আসলে একই দেবীর ত্রিতত্ত্ব। এই মহা-দেবী 'সর্বকারণকারণম্' এবং তাঁহার সম্বন্ধেই বলা হইয়াছে 'জননীং সর্বদেবানাং ব্রহ্মাদীনাং তথেশ্বরীম্' (১।১৫।৩৪)। বেদের 'নারদীয়' সূক্তের অতি ক্ষীণ প্রতিধ্বনিরূপে 'দেবী-ভাগবতে' দেখিতে পাই—

যদা ন বেধা ন চ বিষ্ণুরীশ্বরো
ন বাসবো নৈব জলাধিপস্তথা।
ন বিত্তপো নৈব যমশ্চ পাবক-
স্তদাসি দেবি ত্বমহং নমামি তাম্॥

জলং ন বায়ুর্ন ধরা ন চাম্বরং
গুণা ন তেষাঞ্চ ন চেন্দ্রিয়াণ্যহম্।
মনো ন বুদ্ধির্ন চ তিগ্মগুঃ শশী
তদাসি দেবি ত্বমহং নমামি তাম্॥

(২।৭।৬১-৬২)

বেদে যেরূপ পুরুষ-সূক্তে পুরুষের বর্ণনা পাই, 'সহস্রশীর্ষা পুরুষঃ সহস্রাক্ষঃ সহস্রপাৎ'—সেইরূপ এখানেও দেবীর বর্ণনায় দেখি—

সহস্রনয়না রামা সহস্রকরসংযুতা।
সহস্রবদনা রম্যা ভাতি দূরাদসংশয়ম্॥ (৩।৩।৪৮)

এক স্থলে দেখিতে পাই, ব্রহ্মই পরতত্ত্ব কি দেবীই পর-তত্ত্ব এই সংশয় তোলা হইয়াছে; সেখানে ব্রহ্মা দেবীকে প্রশ্ন করিয়াছেন—

একমেবাদ্বিতীয়ং যদ্ ব্রহ্ম বেদা বদন্তি বৈ।
সা কিং ত্বং বাপ্যসৌ বা কিং সন্দেহং বিনির্বতয়॥

(৩।৫।৪৩)

'বেদ সকল যে' এক এবং অদ্বিতীয় ব্রহ্মের কথা বলেন; তুমিই বা কি এবং সেই ব্রহ্মই বা কি—এই সন্দেহ দূর কর।'

উত্তরে দেবী বলিলেন—

সদৈকত্বং ন ভেদোঽস্তি সর্বদৈব মমাস্য চ।
যোঽসৌ সাহমহং যাসৌ ভেদোঽস্তি মতিবিভ্রমাৎ॥

(৩।৬।২)

'আমার এবং উহার (ব্রহ্মের) সর্বদাই একত্ব, কোনও ভেদ নাই; যে ঐ (ব্রহ্ম) সেই-ই আমি; যে আমি সে-ই ঐ (ব্রহ্ম); ইহার মধ্যে ভেদ হইল মতি-বিভ্রমহেতু।'

অবশ্য অতিসূক্ষ্ম ভেদের কথা দেবী উল্লেখ করিয়াছেন—সে ভেদ হইল শক্তি-শক্তিমানের ভেদ; সে ভেদ হইল কালাশ্রয়ে সৃষ্টির ক্ষেত্রে—নতুবা শক্তি-শক্তিমানের মধ্যে আসলে কোনও ভেদ নাই। পরমতত্ত্বকে শক্তিরূপে বা শক্তিমান্ রূপে—যে কোনও রূপেই গ্রহণ করা যাইতে পারে। এই গ্রন্থে দেবীর 'পরতন্ত্রা' রূপের বর্ণনাও আছে—সে ক্ষেত্রে অনেক স্থলেই দেবী বিষ্ণুশক্তি।

'চণ্ডী'র মধ্যেও দেবীর পরতন্ত্রা রূপ যেখানে যেখানে লক্ষ্য করি সেখানে দেবী বিষ্ণুমায়া বা বিষ্ণুশক্তি—শিবমায়া বা শিবশক্তি নহেন। আমরা পূর্বে দেবীর যে পরিচয় বিবৃত করিয়াছি তাহার মধ্যে এই বিষ্ণুমায়া পরিচয় বহু-

ভাবে লক্ষ্য করিয়াছি। একাদশ অধ্যায়ে দেবী-স্তুতিতেও বলা হইয়াছে, 'ত্বং বৈষ্ণবীশক্তিরনন্তবীর্যা'; ত্রয়োদশ অধ্যায়ে এই দেবী সম্বন্ধেই বলা হইয়াছে, 'বিদ্যা তথৈব ক্রিয়তে ভগবদ্‌বিষ্ণুমায়য়া'। পঞ্চম অধ্যায়ে দেখিতে পাই, পঁয়ষট্টি শ্লোকে 'নমস্তস্যৈ নমো নমঃ' বলিয়া দেবীকে নমস্কার করা হইয়াছে। দেবীর এই নমস্কার শ্লোকগুলি অতিশয় প্রসিদ্ধ; এই শ্লোকগুলির মধ্যে দেবীর সর্বপ্রথম পরিচয়েই দেখিতে পাই—

যা দেবী সর্বভূতেষু বিষ্ণুমায়েতি শব্দিতা।
নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমঃ নমঃ॥

আবার দেখিতে পাই একাদশ অধ্যায়ের আট হইতে তেইশ পর্যন্ত শ্লোকে দেবীর যে প্রসিদ্ধ নমস্কার শ্লোকগুলি রহিয়াছে তাহার সর্বত্র দেবীকে নমস্কার করা হইয়াছে 'নারায়ণি নমোঽস্তুতে' বলিয়া। দেবীকে 'ত্র্যম্বকে গৌরি', সম্বোধন করা হইয়াছে, অথচ নমস্কারের বেলায় 'নারায়ণি নমোঽস্তুতে।' তেমনই দেখি, 'মাহেশ্বরী স্বরূপেণ নারায়ণি নমোঽস্তুতে', 'কৌমারীরূপসংস্থানে নারায়ণি নমোঽস্তু তে', 'বরাহরূপিণী শিবে নারায়ণি নমোঽস্তুতে', 'ঘোররূপে মহারাবে নারায়ণি নমোঽস্তুতে', 'চামুণ্ডে মুণ্ডমথনে নারায়ণি নমোঽস্তু তে'।

এ-প্রসঙ্গে অতি স্বাভাবিকভাবেই প্রশ্ন জাগে, দেবী চণ্ডিকা এমন করিয়া বিষ্ণুমায়া কেন এবং এমন করিয়া নারায়ণী রূপে তিনি নমস্যা কেন। জিনিসটি আমাদের নিকট অত্যন্ত গূঢ়ার্থব্যঞ্জক বলিয়া মনে হয়। ভারতবর্ষের দার্শনিক শক্তিবাদ মূলতঃ শিবকে অবলম্বন করিয়াই গড়িয়া উঠিয়াছে বলিয়া আমাদের মনে একটা দৃঢ়-সংস্কার রহিয়াছে; কিন্তু এই দার্শনিক শক্তিবাদের ইতিহাস লক্ষ্য করিলে দেখিতে পাইব আমাদের এই সংস্কারটি সর্বাংশে সত্য নহে। ইতিহাস-লব্ধ তথ্যের উপরে নির্ভর করিয়া সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিলে বলিতে হয়, দার্শনিক শক্তিবাদ বেশি করিয়া গড়িয়া উঠিয়াছে বিষ্ণুশক্তিকে অবলম্বন করিয়া। দার্শনিক শক্তিবাদের বীজ উপনিষদাদিতেই নানাভাবে ছড়াইয়া আছে; কিন্তু শক্তিবাদ সম্বন্ধে খুব স্পষ্ট এবং সুষ্ঠু আলোচনা প্রথম দেখিতে পাই পঞ্চরাত্র-সংহিতাগুলির মধ্যে। বিষ্ণুশক্তিকে অবলম্বন করিয়া যে শক্তিতত্ত্বের আলোচনা দেখিতে পাই তৎপূর্বে এরূপ আলোচনা কোনও শৈব বা শাক্ত গ্রন্থে আছে বলিয়া আমাদের জানা নাই। আমার 'শ্রীরাধার ক্রমবিকাশ' গ্রন্থখানিতে এই পঞ্চরাত্র-বর্ণিত শক্তিতত্ত্বের মোটামুটি একটি পরিচয় দিয়াছি বলিয়া বর্তমান প্রসঙ্গে তাহার আর পুনরুল্লেখ করিলাম না। এই সংহিতাগুলিকে অতি প্রাচীন বলিয়া গণ্য করা হয়; সম্প্রদায়ের লোকগণ এগু'লকে যত প্রাচীন বলিয়া মনে করিয়াছেন পণ্ডিতগণ এগুলিকে তত প্রাচীন বলিয়া স্বীকার না করিলেও এগুলিকে খ্রীষ্টীয় চতুর্থ শতকের কাছাকাছি সময়ে রচিত বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন। ইহার পরে শক্তিবাদ সম্বন্ধে উল্লেখযোগ্য দার্শনিক আলোচনা দেখিতে পাই কাশ্মীরের শৈবদর্শনে। এই শৈবদর্শনগুলি মোটামুটিভাবে খ্রীষ্টীয় অষ্টম শতাব্দী হইতে খৃষ্টীয় দশম শতাব্দীর মধ্যে লিখিত বলিয়া গ্রহণ করা যাইতে পারে। কাশ্মীরে শৈবদর্শনের প্রাচীন আচার্যগণ যে পঞ্চরাত্র-শাস্ত্রের সহিত পরিচিত ছিলেন তাহার প্রমাণ আছে। বাঙলাদেশে এবং দাক্ষিণাত্যের কেরলাদি অঞ্চলে যে-সকল শাক্ততন্ত্র প্রচলিত আছে তাহাতে দার্শনিক শক্তিবাদ নানাভাবে ছড়ান আছে, কিন্তু কোনও একগ্রন্থে ব্যাপক এবং স্পষ্টভাবে নাই। তাহা ছাড়া বাঙলাদেশে ও দাক্ষিণাত্য অঞ্চলে রচিত বা প্রচলিত এই তন্ত্রাদিগ্রন্থের কোনও গ্রন্থই দশম শতকের পূর্ববর্তী কালে রচিত বলিয়া মনে করি না।

দার্শনিক শক্তিবাদের পরিচয় তন্ত্রাদি হইতে প্রাচীন পুরাণগুলির মধ্যে বেশি পাওয়া যায় বলিয়া আমাদের বিশ্বাস। এই প্রাচীন পুরাণগুলির মধ্যে যে শক্তিবাদের আলোচনা পাই তাহা অধিকাংশ স্থলেই মূলতঃ বিষ্ণুশক্তি বা বিষ্ণুমায়াকে লইয়া। এই বিষ্ণুশক্তি বা বিষ্ণুমায়ার সহিত অবশ্য একটা অত্যন্ত জনপ্রিয়-পদ্ধতিতে সাংখ্যের প্রকৃতি-পুরুষ, বেদান্তের ব্রহ্ম-মায়া, তন্ত্রের শিব-শক্তি প্রভৃতি মিলিয়া মিশিয়া একাকার হইয়া গিয়াছে। মার্কণ্ডেয়-পুরাণোক্ত দেবী-মাহাত্ম্যে ব্যাখ্যাত শক্তিতত্ত্ব বিষ্ণুপুরাণাদিতে বর্ণিত এবং পঞ্চরাত্র-সংহিতাগুলিতে বর্ণিত শক্তিতত্ত্ব হইতে প্রাচীন বলিয়া মনে হয় না। কেহ কেহ অবশ্য 'চণ্ডী-সপ্তশতী' মার্কণ্ডেয় পুরাণের কোনও আসল অংশ কিনা এ-বিষয়েও সংশয় প্রকাশ করিয়াছেন এবং সূর্যের ঔরসজাত এবং সূর্যস্ত্রী সবর্ণার গর্ভজাত সাবর্ণি

অষ্টম মন্বকে অবলম্বন করিয়া এই দেবীমাহাত্ম্যের সাতশত শ্লোক মার্কণ্ডেয় পুরাণে পরবর্তী কোনও কালে প্রক্ষিপ্ত হইয়াছে বলিয়া মনে করিয়াছেন। এ মত অশ্রদ্ধেয় বলিয়া ছাড়িয়া দিয়া 'চণ্ডী-সপ্তশতী'কে মার্কণ্ডেয় পুরাণেরই একটি মূল অংশ বলিয়া গ্রহণ করিলেও ইহার রচনা-কাল খ্রীষ্টীয় চতুর্থ শতকের পূর্ববর্তী হইবে বলিয়া মনে হয় না। তৎকালে বিষ্ণুমায়া বা বিষ্ণুশক্তিকে অবলম্বন করিয়াই শক্তিবাদের প্রসার দেখিতে পাই; মনে হয়, এই কারণেই 'চণ্ডী'র মধ্যেও দেবীর বিষ্ণুমায়া রূপই এমন প্রধানভাবে আত্ম-প্রকাশ করিয়াছে। 'চণ্ডী'র মধ্যে মুখ্যতঃ দুইটি অংশ দেখিতে পাই; একটি হইল দেবীর সহায়তায় বা দেবী কর্তৃক বহুবিধ অসুর-নিধনের কাহিনী; এই কাহিনীর মধ্যে যুদ্ধ-বিগ্রহই অধিকাংশ স্থান জুড়িয়া আছে। অপর অংশ হইল দেবীর তত্ত্ব; এই তত্ত্ব-রূপ মুখ্যতঃ ফুটিয়া উঠিয়াছে দেবগণ কর্তৃক দেবীর কয়েকটি স্তুতিতে। এই স্তুতিগুলির মধ্যেই দেবীর বিষ্ণু-মায়া রূপ ফুটিয়া উঠিয়াছে। অন্যান্য পুরাণ ও পঞ্চরাত্রে বর্ণিত বিষ্ণুমায়ার সহিত অসুরবিনাশের কোনও তত্ত্ব বা কাহিনী যুক্ত নাই; এই স্তুতিগুলির ভিতর দিয়াই অসুর বিনাশের কাহিনীর সহিত বিষ্ণুমায়া যুক্ত হইয়া পড়িয়াছেন।

মাতৃপূজার ধর্ম এবং শক্তিবাদের দার্শনিক তত্ত্বের সহিত যুক্ত হইয়া শক্তির এই অসুরবধের কাহিনী কোন্ সময়ে কি-ভাবে গড়িয়া উঠিয়াছিল তাহা এখন বলা শক্ত। 'চণ্ডী-সপ্তশতী'তে অসুরনিধনের কাহিনী বেশ বিস্তৃত-ভাবেই পাইলাম; ইহার প্রাক্‌রূপ কোথায়? অবশ্য সাধক-গণ সমস্ত অসুরনিধন-কাহিনীকেই একটি অধ্যাত্মতত্ত্ব রূপে গ্রহণ করিয়াছেন। শ্রীশ্রীসত্যদেব এই অসুরনিধন-কাহিনীকে 'সাধন-সমর'রূপে যে বিস্তৃত এবং গভীর ব্যাখ্যা দিয়াছেন তাহাকে গভীরভাবে শ্রদ্ধা করি; কিন্তু সে ব্যাখ্যায় ঐতিহাসিক জিজ্ঞাসার নিবৃত্তি নাই।

মহাভারতে মহিষাসুর ও তারকাসুর বধের কথা জানিতে পারি; ইন্দ্র কার্তিকেয় স্কন্দের সহায়তায় এই অসুরদ্বয়কে পরাস্ত করিতে সমর্থ হন। মহিষাসুর এবং তারকাসুর স্কন্দ কর্তৃকই নিহত হয়। মহাভারতে স্কন্দের জন্মবৃত্তান্ত নানা-স্থানে নানাভাবে বর্ণিত হইয়াছে। শিবের ঔরসে উমা পার্বতীর গর্ভে স্কন্দের জন্ম একস্থলে এইরূপ আভাসমাত্র আছে। এই আভাস গ্রহণ করিয়াই সম্ভবতঃ কালিদাস তাঁহার প্রসিদ্ধ 'কুমার-সম্ভব' কাব্য রচনা করিয়াছিলেন। 'কুমার-সম্ভবে' দেখিতে পাইতেছি, তারকাসুর কর্তৃক নির্যাতিত এবং বিতাড়িত হইয়া দেবগণ ইন্দ্রকে অধিনায়ক করিয়া ব্রহ্মলোকে গমন করেন এবং সেখানে সকলে পরামর্শ করিয়া শিববীর্যে কিরূপে কুমারের জন্ম সম্ভব করা যায় তাহারই ব্যবস্থা করিলেন। স্পষ্ট বোঝা যাইতেছে, কালিদাসের সময়ে অসুরনাশিনী দেবীর কোনও প্রসিদ্ধি ছিল না, থাকিলে তারকাসুরের বধের জন্য কুমারের কি প্রয়োজন ছিল, দেবগণ ত দেবীর শরণ গ্রহণ করিলেই পারিতেন। সমগ্র 'কুমার-সম্ভব' কাব্যে পার্বতীর এতভাবে এত বর্ণনা পাইলাম, কিন্তু দেবীর অসুরনাশিনী রূপের বিন্দুমাত্র আভাস কোথাও নাই। হর-পার্বতীর কথা তাঁহার অন্যান্য কাব্যের মধ্যেও স্থানে স্থানে দেখিতে পাই, তাহার মধ্যে কোথাও দেবীর অসুরনাশিনী রূপের কোনও রূপ উল্লেখ নাই। কালিদাস মধুর রসের কবি বলিয়াই কি অসুরনাশিনী উগ্র মূর্তিকে একেবারে পরিহার করিয়া-ছিলেন, না কালিদাসের সময়ে এই অসুরনাশিনী দেবীর কোনও প্রসিদ্ধিই ছিল না? সতী-কাহিনী কালিদাসের জানা ছিল, দক্ষ-যজ্ঞের কাহিনী-প্রবাদের সহিত কালি-দাসের ভাল পরিচয় ছিল, 'অভিজ্ঞান শকুন্তল'-এর একটি শ্লোকে তাহার স্পষ্ট প্রমাণ মেলে।' (১)

'চণ্ডী'-কাহিনীর পশ্চাতে কোনও লৌকিক কাহিনী ছিল কি না, থাকিলে তাহা কি ছিল তাহা এখন আমরা জানি না; কিন্তু পরবর্তী কালে যে এই চণ্ডী-কাহিনী বিভিন্ন অঞ্চলে বিভিন্ন আঞ্চলিক লৌকিক কাহিনীর সহিত জড়িত হইয়া নানা প্রকার বিস্তার লাভ করিয়াছিল তাহার নমুনা পরবর্তী ভারতীয় সাহিত্যসমূহে দেখিতে পাই। আধুনিক ভারতীয় সাহিত্যগুলির মধ্যে প্রত্যেক সাহিত্যেই মার্কণ্ডের 'চণ্ডী'র অবলম্বনে কাব্য রচিত হইয়াছে। ইহার মধ্যে গুরুগোবিন্দ সিং কর্তৃক রচিত 'চণ্ডী-চরিত্র' বিশেষ উল্লেখ-যোগ্য মনে করি।

পাঞ্জাবীতে এবং হিন্দীতে লিখিত গুরুগোবিন্দ সিংহের

১। কৃষ্ণসারে দদচ্চক্ষুস্ত্বয়ি চাধিজ্যকার্মুকে।
মৃগানুসারিণং সাক্ষাৎপশ্যামীব পিনাকিনম্॥ ১ম অঙ্ক

ণ্ডী-চরিত্র' দেখিতে পাই। গুরু গোবিন্দসিংহ শিখ হলেও চণ্ডী-ভক্ত ছিলেন, কারণ অন্তরে তিনি ছিলেন শৌর্য-বীর্যের উপাসক অর্থাৎ শক্তির উপাসক। খড়্গকে তিনি 'ভগৌতী' (ভগবতী) আখ্যা দিয়াছিলেন। প্রচলিত তে আমরা দেখি, চণ্ডী-কাহিনীর উৎপত্তি স্থলের সম্ভাবনা দুটি অঞ্চলে ধরা হয়, এক উজ্জয়িনী অঞ্চলে, অপর বাঙলা দেশে।'২ গুরু গোবিন্দসিংহের 'চণ্ডী-চরিত্রে' দেখিতে পাওয়া যায়, চণ্ডী উজ্জয়িনীর রাজকন্যা ছিলেন; তাঁহার পিতার মৃত্যুর পরে এই রাজকন্যাই রাজ্য পরিচালনার ভার স্বন্ধে গ্রহণ করেন, কারণ চণ্ডীই রাজার একমাত্র সন্তান ছিলেন। চণ্ডী কন্যা হইলেও তাঁহার শৌর্য-বীর্যের খুব খ্যাতি ছিল। একদিন রাজকুমারী চণ্ডী নদীতীরে তর্পণাদির জন্য যাইতেছিলেন, এমন সময় দেবরাজ ইন্দ্র আসিয়া তাঁহার সম্মুখে উপস্থিত হইলেন। দেবরাজ ইন্দ্র অসুর কর্তৃক স্বর্গ হইতে বিতাড়িত হইয়াছেন, তিনি চণ্ডীর সাহায্য প্রার্থনা করিলেন; চণ্ডী ইন্দ্রের প্রতি সদয় হইয়া ব্যাঘ্র-পৃষ্ঠে[১] আরোহণ করিয়া তাঁহার সমস্ত সৈন্যদল লইয়া যুদ্ধ-ক্ষেত্রে অবতীর্ণা হইলেন এবং অসুরগণকে নিধন করিলেন।

গুরু গোবিন্দসিংহ উজ্জয়িনীর রাজকন্যা এই চণ্ডীর কাহিনী কোথায় পাইলেন? 'চণ্ডী-সপ্তশতী'কে অবলম্বন করিয়া নিজের কবি-কল্পনায় কি তিনি এই লৌকিক কাহিনী গড়িয়া তুলিয়াছিলেন? 'চণ্ডী'র কাহিনীর পশ্চাতেও কি বহু প্রাচীন কালের এইরূপ কোনও লৌকিক কাহিনী প্রচলিত ছিল?

২। স্বামী জগদীশ্বরানন্দ সম্পাদিত 'শ্রীশ্রীচণ্ডী'র ভূমিকা দ্রষ্টব্য।

১। এই প্রসঙ্গে স্মরণ করা যাইতে পারে, মহারাষ্ট্রের তুলজাপুরের দেবী হইলেন ব্যাঘ্রবাহনা। গুজরাটের জুনাগড়ের দেবীও হইলেন 'বাঘেশ্বরী'।

সাবিত্রী

নিগূঢ়ানন্দ সরকার

আমি এক সাবিত্রীকে চিনি—
জীবনে প্রচুর স্বপ্ন পাথেয় তাহার
যাত্রা করেছিল সুরু পৃথিবীর রোমাঞ্চ জগতে!
তারপর ধরণীর বিসর্পিল পথে,
রক্তাক্ত চরণ দুটি বার বার হারায়েছে দিশা—
হতাশার সীমাহীন অন্ধকারে—
স্বপ্নের সবুজ দ্বীপ গ্রাস করে অন্ধকার নিশা।

যতবার স্ফীত স্বপ্ন নবীন আশায়
বাড়ায়েছে দুটি হাত অধীর আগ্রহে—
ঘৃণিত শীতল দেহ কালনাগ জড়ায়ে ধরেছে;
ছুঁয়েছে বুকের মধ্যখানি উদ্ধত ফণায়—
ভেঙ্গে গেছে অনস্ফীত পীন পয়োধর—
ব্যথা নীল হয়ে গেছে বুকের আকাশ।
স্বপ্নের সবুজ দ্বীপ পায় পায় সরে গেছে
দূরে পর পর।

যখন হতাশা তার আর্তস্বরে দীঘল নিশ্বাসে
বাহিরে ঝড়ের রাতে কেঁপেছিল প্রদীপের মত—
'থেকে নেই?' সম্মুখে তাহার—
অগ্নিদগ্ধ সত্যবান বহু ব্যর্থ কামনার শেষে—
শুদ্ধ-প্রেম চেয়েছিল চোখে চোখে মুখোমুখী তার।
প্রাণ চিনেছিল—প্রাণ, প্রেম প্রিয়তমা—
সত্যবান দয়িতারে কয়েছিল, সাবিত্রী আমার।

সন্ধ্যারাগ

হরেন ঘোষ

মাঝে মাঝে রাত্রির নিস্তব্ধতা ভেঙ্গে দিয়ে কর্কশ শব্দ করে দু একখানা ট্রাম ছুটে যায়। আবার ঝিমিয়ে পড়ে চারিদিক। শুধু একটানা ঝিঁ ঝিঁ ডাকে ঝাঁকড়া নিমগাছটায়, দু'চারটে রাত-পাখি ডানা ঝাপটায়। আর কোণের দিকের ছোট্ট ঘরটায় মৃদু টেবিল-ল্যাম্পের আলো জ্বলে। খাটে আধশোয়া অবস্থায় সাইমন। একদৃষ্টে তাকিয়ে থাকে দেয়ালের দিকে। পলক পড়ে না দু'চোখে, ও পাশের দেয়ালঘড়ির একঘেয়ে টিকটিক শব্দ ক্রমশঃ যেন কাছে আসতে থাকে। ভুরু কোঁচকায় সাইমন। মনে হয় দুহাতে তুলে ধরে আছাড় মেরে ভেঙ্গে টুকরো টুকরো করে দেয় ঘড়িটা। একেবারে চিরকালের জন্যে ওর ওই যন্ত্রণাদায়ক টিকটিক শব্দ বন্ধ করে দেয়। দুহাতে কান ঢাকে। তবু, তবু সে শব্দ যেন বেজে চলে রক্তে। কত রাত হবে? আন্দাজ করতে চেষ্টা করে। হয়ত দুটো, তিনটে। বাইরে তাকায়। অন্ধকারে দৈত্যের মত ঐ ঝাঁকড়া গাছগুলো; আর মাতাল প্রহরীর চোখের মত লাইটপোষ্ট। দু'চারটে বাড়ি ঠিক যেন ঝোপঝাড়। লোহার সমান্তরাল লাইনের বুক দুমড়ে প্রচণ্ড গতিতে চলে গেল আর একটি ট্রাম। আবার দেয়ালের দিকে চোখ ফেরায় সাইমন। চেয়ে থাকে একদৃষ্টে। আর ভেবে চলে আপন মনে।

এখানে আসবার দিনটি এখনো উজ্জ্বল হয়ে আছে মনে। কতোদিন হয়ে গেল তবু সে স্মৃতি অস্পষ্ট হয়নি, কোনদিন কি ভেবেছিল, এমন হবে! তবু যে পথের ধুলোয় মরতে হয়নি, সেই পরম সৌভাগ্য। কিন্তু বেঁচে থাকতে তো চায়নি সে। আর বাঁচার সাধ নেই। জীবনভোর পরিশ্রম করেছে, এই শেষ বয়সে একটু সুখ একটু শান্তি চেয়েছিল। এমন কি বেশি চেয়েছে সে!

কী প্রচণ্ড বেগে ছুটে চলে রাতের ট্রেণ। ষ্টেশনে থামছে, আবার মৃদু গতি উদ্দাম হয়ে উঠছে। অরণ্য-প্রান্তর জনপদ অতিক্রম করে ছুটছে। রক্তে ওর গতির নেশা। অতদিন একই পথে ছুটেছে, তবু একঘেয়ে লাগেনি। ষ্টেশনে ষ্টেশনে অজস্র যাত্রী, উঠছে নামছে—সেই তাদের পারাপার করছে, কত অ্যাকসিডেণ্ট, মৃত্যুর সঙ্গে মুখোমুখি—আবার মুক্তি। কত হতাশ-হৃদয়ের জ্বালা জুড়িয়েছে, অসাবধান পথিকের প্রাণ নাশ করেছে। হাজার জনকে বাঁচাতে একজনকে মেরেছে। চাকার তলায় পিষ্ট হয়েছে কত প্রাণ। তবু মনে ছাপ পড়েনি। দুদিন, তিনদিন পর ফিরে এসেছে। মনে হোত প্রাণ নেই দেহে। নিস্তেজ। গভীর অবসাদে লুটিয়ে পড়ত শয্যায়। একটানা বারো থেকে চোদ্দ ঘণ্টা ঘুমিয়ে আবার জেগে উঠতো। এবার নতুন প্রাণ। নতুন কর্মশক্তি ফিরে এসেছে শরীরে। আনন্দে উত্তেজনায় হাসিতে উদ্দাম হয়ে উঠতো বারবারা। দুজনে বসে, হাসি গল্প কলরব—ধমক দিত বারবারা—মাত্রা ছাড়িয়ে যাচ্ছ তুমি। শরীর ভেঙ্গে যাবে।

হো! হো! করে হেসে উঠতো ও। তাকাতো নিজের পেশীবহুল সুঠাম দেহের দিকে, আত্মগর্বে চোখমুখ জ্বলজ্বল করতো—এই স্বাস্থ্য দিয়েছেন ঈশ্বর। কিছুই পরোয়া করিনা। তারপর দৈহিকশক্তি পরীক্ষা করতো বারবারার মোমের মত নরম দেহের ওপর। দুমড়ে মুচড়ে চূর্ণ-বিচূর্ণ করে দেবে যেন।—আঃ ছাড়ো দস্যু কোথাকার। শালিকের ছানার মত চিঁ চিঁ কণ্ঠস্বর ওর। ও তবু ছাড়তো না।—এই তো আজ যাব, আবার তিনদিন পর ফিরবো। দুচোখ বেয়ে জল পড়তো বারবারার। তবু মুখে পরম পরিতৃপ্তির হাসি।

আর সেই দিনটি! যে দিন জানলো যে তাদের সন্তান আসছে, সে মাতাল হয়ে পড়েছিল। চিৎকার, উত্তেজনা, হৈ চৈ, কি করবে ভেবে পায় না। বলের মত লুফতে ইচ্ছে

করছে বারবারাকে। বন্ধুদের নিয়ে অনেক রাত পর্যন্ত হৈ চৈ করলো, মদ খেল মাত্রা ছাড়িয়ে। আর বারবারাকে আদরে আদরে অস্থির করে তুললো। তারপর তাদের পরিকল্পনা, কত হিসেব-নিকেস। ব্যাঙ্কের পাশ বইতে এবার থেকে মোটা অঙ্ক রাখতে হবে। আর আমাদের ছেলে-মানুষি করা চলবে না। ওকে ভালো ইস্কুলে পড়াতে হবে। প্রথমবার নিশ্চয় ছেলে হবে। যাতে আমার মত কাজ না করতে হয় কোনদিন। ওর সামনে বেশি মদ খাওয়া চলবে না, যাতে ভক্তিশ্রদ্ধা করতে পারে। ওকে ঠিক ভদ্রলোকের মত মানুষ করতে হবে। পরিকল্পনার শেষ নেই।

সে কি আজকের কথা! তবু মনে হয় যেন এই সেদিন। কত সুখ, কত শান্তি, কিন্তু অদৃষ্টে সইল না। বছর কয়েক কাটলো ভালোই। ছেলে জন ফুলের মত সুন্দর। ওকে নিয়ে কত আনন্দ ওদের। কখন বাড়ি ফিরবে এ জন্যে চঞ্চল হয়ে উঠতো ইঞ্জিনে বসে। বারবার ওর মুখ মনে পড়ে যায়।

একটা মরা-মেয়ে হ'ল বারবারার। এরপর থেকেই ক্রমশঃ শরীর ভেঙ্গে পড়লো বারবারার। রক্তহীন ফ্যাকাশে হয়ে উঠছে। কত চেষ্টা, চিকিৎসা চলছে। স্বভাবও বদলে যাচ্ছে ওর। কোন কথা সহ্য করতে পারে না। মেজাজ রুক্ষ, খিটখিট করে সর্বক্ষণ। এই সময় আবার পেটে সন্তান এলো ওর। ওরা চায়নি, চিকিৎসকের নিষেধ ছিল, তবু। এবার যেন মাথা খারাপ হয়ে গেল ওর। তীক্ষ্ণ-দৃষ্টিতে ঘৃণা মাখিয়ে তাকাতো ওর দিকে। যেন ও তার শত্রু। মাথা নীচু করে ও। চোখদুটি যেন সর্বক্ষণ ধিকি-ধিকি জ্বলে ওর। সত্যিই অন্যায় করেছে ও, চিকিৎসকের নিষেধ অমান্য করে।

এবারও মৃত সন্তান। ধরাছোঁয়ার বাইরে চলে গেল প্রায় বারবারা। জন বড় হচ্ছে, ভালো স্কুলে পড়ছে। সেও বুঝতে পারে তাদের শান্তির সংসারে ভাঙন ধরেছে। মা-বাবার মধ্যে আগেকার ভাব নেই আর। ওর সামনেই মা-বাবা অকথ্য ভাষায় ঝগড়া করে—গালিমন্দ করে পরস্পরকে। মাঝে মাঝে ক্ষুধার্ত বন্য পশু হয়ে উঠতো সাইমন। মদ ওকে অমানুষ করে তুলতো। পরে সুস্থ মনে চিন্তা করে নিজের ওপর রাগ হয়েছে। অনুতাপ করেছে। প্রথমে বোঝাত, নিষেধ করতো তারপর শাসাত বারবারা। কিন্তু শক্তিতে ওর সঙ্গে পারবে কেন বারবারা। একদিন ভারি ফুলদানি ছুঁড়ে মারলো বারবারাকে। কপালের পাশে লেগে দরদর করে রক্ত ঝরছে, তবু বাধা দিতে পারেনি সাইমনকে। এখনো সে দাগ রয়েছে। কপালের কুঞ্চিত চামড়ায় ঢাকা পড়েনি।

এতটা ভাবেনি ও। বিস্ময়ে হতবাক হয়ে গিয়েছে। বাড়ি ঘর অগোছাল। দুদিন পর কাজ থেকে ফিরলো। দেহ অবসন্ন। বারবারা নেই। ভাবলো, হয়ত মার্কেটে গিয়েছে, নয় কারো বাড়িতে। জন জানে না কিছু। স্কুল থেকে ফিরে ও দেখেছে। তারপর খেলতে গিয়েছিল। অনেক রাত পর্যন্ত অপেক্ষা করে বুঝতে পারলো সাইমন, আর আসবে না বারবারা। বসে বসে এক বোতল নির্জলা মদ সাবাড় করলো। ভয়ে কাছে এলো না জন।

মনে মনে বিচলিত হলেও বাইরে কাউকে বুঝতে দিল না সাইমন। কদিন ছুটি নিল। সারাদিন এখানে ওখানে ঘুরে বেড়াল। জনকে পাঠিয়ে দিল হোষ্টেলে। তারপর একদিন বাড়ি এনে তুললো মারজরিকে। বয়সে তার চেয়ে বড়ই হবে, স্থূলাঙ্গী। অনেক ঝড়জল বয়ে গেছে তার শরীরের ওপর দিয়ে। এখন বিশ্রাম চায়, ঘর চায়। আগে ওদের আস্তানায় যেত সাইমন। তখন থেকেই চেনাশুনো। ওকে মনেও ধরেছিল। কিন্তু বারবারার জন্যে ভুলে গিয়েছিল সব। আবার এতদিন পুরোনো মারজরিকে মনে পড়েছে। ওকে ভোলেনি মারজরি, ওকে ফিরিয়ে দেয়নি।

প্রথমে হেসেছিল বাঁকাচোখে—তোমার বন্ধুবান্ধবরা কি বলবে? অনেকেই তো চেনে আমায়! তাছাড়া কদিন পরই তোমার নেশা কেটে যেতে পারে।

—উঁহু, কোন বন্ধুর সঙ্গে সম্পর্ক নেই আমার। সব বেইমান। হিংস্রভাবটা কাটিয়ে একটু মোলায়েম স্বরে বললো এবার—সব নেশা কি কাটে?

মাঝে মাঝে আসে জন। সেও যেন বুঝতে পারে। বয়স হচ্ছে, বুদ্ধি পাকছে। ওর দিকে মুখ তুলে তাকায় না সাইমন। ছেলে লেখাপড়া শিখছে, কি ভাববে আমায়? ওর বাড়ী আসা প্রায় বন্ধ করে দিল। টাকার অঙ্ক বাড়িয়ে দিল। ছুটিতে যেন বেড়াতে যায় এখানে-ওখানে।

সেও অনেকদিনের কথা। তবু মনে হয় এই সেদিন! চাকরী থেকে অবসর নেবার সময় হোল তার। শরীরও আগের চেয়ে ভেঙেছে। এবার বিশ্রাম নিতে হবে। সঞ্চিত অর্থ যা আছে তাতে দিন চলে যাবে। তাছাড়া জন তো বড় হয়েছে। ওই আশা ভরসা।

আর কিছুদিন মাত্র। মনের আনন্দে থাকে মারজরি। কোন সন্ধান হয়নি ওর। ভাবে সাইমন, এই ভালো। একজনকে তো হারালাম। সে থাকলে আমার দুঃখ কিসের! প্রথম কিছুদিন খোঁজখবর না করলেও পরে জেনেছিল বারবারা তার কাকীমার কাছেই আছে। কিন্তু মুখ দেখাতে পারেনি সাইমন। ওর মুখোমুখি হবার সাহস নেই আর।

কর্মক্লান্ত দেহে ফিরলো অনেক রাতে। সেদিন ওর ফেরার কথা নয়। হঠাৎ পিঠে একটা যন্ত্রণা হওয়ায় সিক্ দিয়ে চলে এসেছে। দরজার কড়া নাড়লো। এতরাতেও আলো জ্বলছে! হয়ত গল্পের বই পড়ছে মারজরি। খুব অবাক হবে। খুশিও। পিঠটা মালিশ করাতে হবে। আবার কড়া নাড়লো। ভিতরের আলো নিভে গেল। ফিসফিস শব্দ। তবে কি জন এসেছে? অসহ্য ক্লান্তি। ঘুমে বুঁজে আসছে চোখ। দরজা খুললো। রাতের পোষাক ঠিকমত গায়ে জড়িয়ে এসেছে মারজরি। ওকে দেখে ভূত দেখার মত চমকে উঠলো—

—তুমি? তুমি এসেছ! আজ তো—

কিছুই বুঝতে বাকি রইল না আর। রক্তচক্ষু মেলে তাকালো। বাঁশ পাতার মত কাঁপছে মারজরি। ভিতরে ঢুকলো। অন্ধকার। ওর গা ঘেঁসে দ্রুত বাইরে বেরিয়ে গেল একটি মূর্তি। অট্টহাসি হেসে উঠলো সাইমন। আক্রোশে লাথি ছুঁড়লো মারজরিকে লক্ষ্য করে। আর্তনাদ করে মুখ ঢেকে বসে পড়ল মারজরি। এবার কুৎসিৎ ভাষায় গালাগাল। কোন জবাব দিল না মারজরি। কোন রকমে বাকি রাতটুকু কাটিয়ে ভোরবেলা উঠেই বেরিয়ে গেল সাইমন।

তিনদিন পর ফিরে এলো সাইমন। খাঁচায় পাখি নেই। এ যেন ও জানতো। ঘরের বৌই থাকে না, আর ও তো নীল আকাশের পাখি। বিয়ে করা বৌও নয়। কুড়িয়ে আনা। ওর ওপর কিসের অধিকার? তবু অনেকক্ষণ ভাবলো বসে বসে। আমি তো খারাপ ব্যবহার করি না, আদরযত্ন কম করিনা—তবু, আমায় সহ্য করতে পারে না ওরা। ভালোবাসা নেই, দরদ নেই, মনুষ্যত্ব নেই। গেলাসে মদ ঢাললো সাইমন।

আর নয়। বিশ্বাস নেই ওদের। একা একাই থাকা ভালো। আঘাত সহ্য করে নিল। রিটায়ার্ড জীবনটা সুখে শান্তিতে কাটিয়ে দেয়া ভালো। দেখতে দেখতে দিনও কেটে যাচ্ছে। টাকা কমে আসছে। তার ওপর মোটা খরচ মদের। এ অভ্যেসটা ছাড়তে পারছে না। ক্রমশঃ বাড়ছে যেন। যাক, যতদিন চলে। তারপর তো জন আছেই।

ভালো চাকরি পেয়েছে জন। আপন মনে থাকে, খেলে, ক্লাবে যায়। কথাবার্তা চলে না বিশেষ। ওর কাছ থেকে নিজেকে লুকোতে চায় সাইমন। নিজের ওপর রাগ হয়। ক্রমশঃ যেন বাড়ছে মদের নেশা। গম্ভীর গলায় বলে জন—শরীর খারাপ হবে অত বেশি খেলে। হাসে সাইমন। তাকায় নিজের পেশী বহুল শরীরের দিকে। ভুরু কুঁচকে ওঠে। সত্যিই তো তেমন আঁটসাট নেই আর, কেমন শিথিল হয়ে এসেছে চামড়া।

বিয়ে করলো জন। দেখতে শুনতে মন্দ নয় মেয়েটি। প্রায়ই আসতো ওর সঙ্গে। তখনি বুঝেছে সাইমন। তারও যৌবন ছিল তো। তবে জন বড় গম্ভীর আর সংযত। হয়ত লেখাপড়া শিখেছে বলে। তবে কি ও আমায় ঘৃণা করে? ভাবে সাইমন, এবার থেকে কম মদ খাব, হৈ চৈ করবো না। কিন্তু ভুলে যায়, সব ভুলে যায়।

এবার উঠে বসলো সাইমন। চোখদুটো জ্বলছে ওর। থরথর করে কাঁপছে সর্বাঙ্গ। সেই ছেলে, আমার টাকায় যে লেখাপড়া শিখে মানুষ হল, বড় কাজ পেল, সুন্দরী বউ পেল, সেই কি না আমায় তাড়িয়ে দিল। আমি নাকি মাতাল, আমি জানোয়ার! আমি তার মাকে শান্তি দিইনি কোনদিন। আমারি জন্যে সে নাকি ঘরদোর ছেড়ে চলে গিয়েছে। জন তার খোঁজ নিত, দেখা করতো, টাকা দিত চুপিচুপি। আমিই তার সর্বনাশ করেছি। কোটরগত দুচোখ ছাপিয়ে জল এলো সাইমনের। ক্ষমা করতে পারলো না আমায়। ফুটপাথে ফেলে দিল আবর্জনার মত। লেখাপড়া শেখার মূল্য এই! বুড়ো

বাবাকে দেখবে না, খাওয়াবে না, ঘেয়ো কুকুর-বেড়ালের মত পথে ফেলে দেবে। শীর্ণ হাত তুলে চোখের জল মুছে নিল। তাকালো বাইরের দিকে। নাঃ আর অন্ধকার নেই। পাখি ডাকছে, পাতলা কুয়াশার আবরণ সরে যাচ্ছে। একটু পরেই রাস্তায় জল দিয়ে যাবে। ট্রাম চলবে, বাস চলবে, জেগে উঠবে মহানগরী।

বারান্দায় পায়ের শব্দ এগিয়ে আসছে। বিছানা ছেড়ে নামলো সাইমন। গ্রেগরি আসছে। এবার বেড়াতে যেতে হবে। ময়লা কালো ওভারকোট টেনে নিল। নইলে ঠাণ্ডা লাগবে। এখন বাতাস বড় ঠাণ্ডা। আর কেউ জাগেনি এখনো। ওরা তুজন। ও-তো জেগেই ছিল, শুধু গ্রেগরি জেগেছে। লাঠিটা নিয়ে এলো।—এই যে রেডি। হাসলো গ্রেগরি।—আশ্চর্য! তুমি কি করে না ঘুমিয়ে পার। ভাঙ্গা চুরুটের টুকরো ওর ঠোঁটে গুঁজে দিয়ে ম্যাচ জ্বাললো গ্রেগরি। নিজে আগেই ধরিয়েছে। তাকালো সাইমন, টুপিটা নেমে এসেছে কপালের ওপর। ইস ও বেচারি একেবারে কুঁজো হয়ে গিয়েছে। মনে মনে বললো। তারপর দুজন লাঠি ঠুকে ঠুকে সিঁড়ি বেয়ে নামলো ধীরে-সুস্থে। গেট খুলে বাইরে এসে আবার বন্ধ করলো। ট্রাম লাইন পেরিয়ে এপাশে; তারপর রাস্তা পেরিয়ে ফুট-পাথে। এবার নিশ্চিন্তে হাঁটা যাবে।

সবারই ঘুম ভাঙ্গলো, সবাই উঠে পড়েছে। ওপর-নীচ, দোতলাতেই ধীর স্থির পায়ের শব্দ, মৃদু মৃদু কণ্ঠস্বর। আর একটি রাত কাটলো। সবাই যেন এই একটি কথাই ভাবে এখানে, প্রতিদিন ভোরে সূর্যের আলো দেখে। টেবিল ঘিরে বসেছে ওরা। দুটি চেয়ার এখনো খালি। মারিয়া হাসে—বুড়োদের সময়ের খেয়াল নেই। কতদূর গেছে কি জানি। দিনের বেলার শেষে ট্রাম-বাস চাপা না পড়ে। একটি কুঁজো, আর একটি ইনসমনিয়ার রুগী।

সবাই থ্যাক থ্যাক করে হাসে ওর কথায়। কুতকুতে চোখে, ফোকলা দাঁতে হাসে সবাই। ঝুলে পড়া মুখের চামড়ায় কোন স্পন্দন অনুভূত হয় না। যাই বল, এবার আমরা আরম্ভ করে দি। কতক্ষণ আর এ ভাবে বসে থাকা যায়! জর্জ ওদের দিকে তাকায় সম্মতির আশায়।

ঠিক তখনই দুটি লাঠির শব্দ শোনা যায় বারান্দায়। সবার চোখ মুখ উজ্জ্বল হয়ে ওঠে। ফিরেছে তাহলে, অ্যাকসিডেন্ট হয়নি। ওরা এসে খালি চেয়ার দুটোয় বসে। দু-মিনিট নীরবে প্রার্থনা করে রুটি হাতে তুলে নেয়। কাঁচা রুটিতে জ্যাম বা মাখন মাখায়। মারিয়া চা পরিবেশন করে। কার ক-চামচ চিনি লাগবে, কে একে-বারেই খায় না, তার সব মুখস্থ। যার যার সামনে কাপ এগিয়ে দেয়। এতগুলি বৃদ্ধ-বৃদ্ধা মিলে নানা গল্প, রসিকতা করে পুরো এক ঘণ্টা ধরে প্রাতরাশ সমাধা করে। তারপর একে একে উঠে পড়ে। আর যেন কিছুই করার নেই।

চারিদিক থেকে এসে আজ এক সঙ্গে একই পরিবারের পরমাত্মীয়ের মত দিবারাত্রির সঙ্গী ওরা। কেউ কারো আপন নয়, আত্মীয় নয়। ছড়িয়ে ছিল এখানে ওখানে, সব কুড়িয়ে একত্র করা হয়েছে। সবারই জীবনে এক একটি ইতিহাস আছে। কৈশোরে-যৌবনে এরাই নায়ক-নায়িকা ছিল জীবনের। কালের কুটিল চক্রান্তে, অজস্র তিক্ত অভিজ্ঞতা বহন করে, ঘা-খাওয়া, গোড়-খাওয়া এত-গুলি নরনারী এখন এখানে। মধুর স্মৃতি কজনের আছে এদের! এই ওদের বার্দ্ধক্যের আশ্রম। তবু এটুকু ছিল, খাওয়া-ঘুমোনোর চিন্তাটুকু নেই। তবু কি ঘুমুতে পারে সবাই! চিন্তার বৃশ্চিক দংশনের জ্বালা মুহূর্তের জন্যেও শান্তি দেয় না কাউকে, কারো বা ইনসমনিয়া।

সংসারের কোন চিন্তা নেই, আত্মীয়-স্বজনের ভাবনা নেই। এখন ওরা অপ্রয়োজনীয় বাড়তি। এ পৃথিবীতে বেঁচে থাকবার যেন কোন অধিকার নেই ওদের। কারণ ওরা কিছু করে না, করতে পারে না, সামর্থ্যও নেই। শুধু জায়গা জুড়ে আছে—আরেকজনের ব্যাঘাত সৃষ্টি করছে। বুড়ো বলদ, ন্যাড়া গাছ তবু কাজে লাগে—কিন্তু ওরা অকর্মণ্য। কী আশ্চর্য পরিণতি! সাইমন প্রায়ই ভাবে, বলে ও গ্রেগরিকে। সমস্যার সমাধান করতে পারে না। এ পৃথিবীতে আমাদের প্রয়োজন এত কম। কতকাল ধরে রয়েছে পৃথিবী, আরো থাকবে, সে তুলনায় একটা মানুষের পরমায়ু কত কম, তার মধ্যেই সে অপ্রয়োজনীয়, ভার হয়ে পড়ে। আর আমরা না এলে আগামী যুগের লোক আসবে কি করে। গ্রেগরি ওর কথা শুনে নিঃশব্দে হাসে।

এদের অনেকের ছেলে-মেয়ে নাতি-নাতনি আছে, সমাজে অনেকে উচ্চাসন পেয়েছে; খ্যাতি অর্থ প্রতিপত্তি

আছে, কিন্তু এদের সঙ্গে আর কোন সম্পর্ক নেই তাদের। কেউ কারো সঙ্গে আসে না দেখা করতে কুশল জানতে, কোন চিঠি বা পার্শ্বেল আসে না কারো নামে; শুভ-নববর্ষ বা ক্রিশমাসের কার্ডও পায় না কেউ। একদিন যে জীবন-রঙ্গমঞ্চে এদেরও কোন ভূমিকা ছিল, সে কথা এরাও প্রায় ভুলতে বসেছে। কারো জন্মদিনের বা বিবাহের নিমন্ত্রণ-লিপি আসে না এদের কাছে। এদের সম্বল শুধু অতীত স্মৃতিরোমন্থন আর দিনগোনা। এক এক করে কবরের দিকে এগিয়ে যাওয়া। এখান থেকেই ওরা সোজা চলে যায় গ্রেভইয়ার্ডে। দু-চারদিন আসন শূন্য থাকে, আবার নতুন অতিথি এসে যায়। একই তার কাহিনী, সেই অনাদর অত্যাচার—অপ্রয়োজনীয় জীবনভার বহনে অক্ষম আত্মীয় ছেলেমেয়ে বা নাতিনাতনি, অতি আপন জন। কাহিনীতে আর বৈচিত্র্য নেই। এরা নিজেদের জন্যে নিজেরাই প্রার্থনা করে। ওরা জানে, ওদের দিন ফুরিয়ে আসছে, নতুন করে আর কিছু পাবে না ওরা। শুধু সব হারানোর ব্যথা মাঝে মাঝে উন্মনা করে তোলে। তখন নিজের ওপরই রাগ হয় সব চেয়ে বেশি। চুল ছিঁড়তে ইচ্ছে করে, মাথা গুঁড়ো করে ফেলতে চায় ওরা। কেন বেঁচে আছি, আজো কেন বেঁচে আছি? মরতে চায়, পারে না। মৃত্যুকে এখনো ভয় পায়।

পথের দিকে তাকালেই চোখে পড়ে প্রাণোচ্ছল যুবক-যুবতী, শিশুর দল। কানে আসে তাদের উচ্চহাস্য, কলতান, বেপরোয়া হাঁকডাক। বুক জ্বলে যায়। মনে মনে বলে, আমরাও একদিন অমনি ছিলাম। কিছুক্ষণ চুপচাপ দেখে। নিজেদের মনকে সান্ত্বনা দেয়—ওরাও একদিন আমাদের মত হবে। পরক্ষণে মনে পড়ে, ওরা তো এখানে আসবে না, এত পাপ ওরা করেনি। একদৃষ্টে চেয়ে থাকতে থাকতে নিজের অজ্ঞাতে কোটরাগত ক্ষীণদৃষ্টি চোথ থেকে লোলচর্ম গণ্ডে অশ্রু নামে দু-ফোঁটা। সচকিত হয়ে মুছে ফেলে। নাঃ তারা কাঁদতে পারবে না, কাঁদা তাদের উচিৎ নয়। সব কিছু ফেলে তারা চলে এসেছে। অনেক নদী-নালা খাল-বিল মিলে এক লোনা সমুদ্র। তাদের শুধু একটি মাত্র পরিচয় আছে। সমাজের অবজ্ঞাত অপ্রয়োজনীয় সামগ্রী, তারা অথর্ব।

প্রায় রাতেই চিৎকার করে কেঁদে ওঠে সুমান। বিড়-বিড় করে আপন মনে বকে চলে। ওরা সান্ত্বনা দেয়। ও তখন বলে চলে অতীতের কাহিনী। ওর ঘর, ছেলেমেয়ে নাতি-নাতনির কথা। কত ভালোবাসতো তাকে। তবু একদিন তাড়িয়ে দিল। কত সম্পত্তি ছিল তার। আত্মীয়-স্বজনরা ঠকিয়ে নিয়ে আজ তাকে এই আস্তাকুঁড়ে ঠেলে দিয়েছে। সমাজে কত উঁচুতে ছিল তার আসন, আর আজ কোথায় কাদের মাঝে! ওরা বোঝায়। মারিয়া ওর কপালে হাত বুলিয়ে দেয়। চুপ কর, চুপ কর। ওসব ভেবে দুঃখ পেয়ে লাভ নেই কিছু। সকলেরই অতীত কাহিনী আছে। এখানে আমরা সব এক, জাত-ধর্ম নেই, ধনী-দরিদ্র নেই। শুধু ভেবে মনে ব্যথা পাও। ঘুমোও। এবার চুপ করে সুমান। যেন বুঝতে পারে।

লুইসা মাঝে মাঝে ডেকে নেয় এক কোণে। ফিস-ফিস করে বলে—দেখতো আমার গায়ে লাল গুটি গুটি হয়েছে কিনা।

ক্ষীণদৃষ্টি চোখে তন্ন তন্ন করে খোঁজে মারিয়া—কৈ, না ওসব বাজে চিন্তা কোরো না।

কুঞ্চিত চামড়ায় হাসি ফোটে—ঠিক বলেছ তুমি। তবু নিজের দিকে তাকায়, প্রায় নিশ্চিহ্ন স্তন সরিয়ে দেখে। অতীত স্মৃতি রোমন্থনে চমকে ওঠে। তাকেও তাড়িয়ে দিয়েছে সেখান থেকে। সে অপ্রয়োজনীয়। আর এক-দিন কত টাকা উপার্জন করেছে। সব কেড়ে নিয়েছে ঐ মায়াবিনী রুবিটা। ও আসতেই তো আমার কদর কমলো। চোখে জল আসে ওর। না ওকে আর হিংসে করবো না। হয়ত ওরও একদিন এই অবস্থা হবে। আমি তবু খেতে পরতে পারছি, বৃদ্ধ বয়সে ও তাও পাবে না।

গ্যারী ঘরে ঢোকে। চেয়ারে বসে। চোখের ওপর মেলে ধরে খবরের কাগজ। প্রায় বানান করে পড়তে হয়।

কিছুক্ষণ শুনে দীর্ঘশ্বাস ফেলে হেন্‌রি—কি হবে আর শুনে। আমরা এখন সব খবরের বাইরে।

তবু আপন মনে পড়ে চলে গ্যারী। দীর্ঘদিন খবরের কাগজের অফিসে কাজ করেছে ও। এখন দেখতে পায় না চোখে, তবু মায়া ছাড়তে পারে না।

দিন যায় রাত আসে। আবার ভোর হয়। রুটিন মত চলে সব। প্রতি মুহূর্তে পরস্পরের আহ্বানের প্রতীক্ষা করে।

পা ফসকে পড়ে গেল সাইমন। চিৎকারে আকৃষ্ট হয়ে ছুটে আসতে চায় ওরা। পারে না দেহের জন্যে। মন ছোটে। হাঁপাতে হাঁপাতে এসে পৌছয় সবাই। কোন রকমে ওকে ধরে তুলে শুইয়ে দেয় নীচের তলার ঘরে। ওপরে ওঠাতে পারবে না ওরা। চাকরেরাও সবাই আসেনি এখনো। অজ্ঞান হয়ে পড়ে আছে সাইমন। চারপাশে ওরা, চুপচাপ। চোখে-মুখে আতঙ্ক। ফোনে ডাক্তার ডাকে মারিয়া।

অনেক রাতে জ্ঞান ফেরে সাইমনের। ওরা সবাই চলে গেছে ঘুমুতে। মারিয়া বসে আছে। লুইসা বলেছে ঘণ্টা দু'য়েক বাদে ডেকে দিতে। গ্রেগরীও বলেছে, ভোর হবার আগেই ডাকতে ওকে। একা মারিয়া পারবে কি করে?

—আঃ! যন্ত্রণায় কঁকিয়ে ওঠে সাইমন। চোখ মেলে তাকায়।

ফ্লাস্ক থেকে গরম দুধ ঢালে মারিয়া—এটুকু খেয়ে নাও।

শীর্ণ হাত দিয়ে সরিয়ে দিতে চায় সাইমন। মৃদুকণ্ঠে ডাকে—মারজরি।

কেঁপে ওঠে ওর হাত, সামলে নেয়। ঝুঁকে পড়ে ওর মুখের কাছে।

—কি বলছো?

—আর বাঁচবো না মারজরি। বাঁচতে চাইও না। তুমি আমায় ক্ষমা কোরো মারজরি। আমি তোমায় দেখেই চিনেছিলাম, কিন্তু তুমি পারোনি। থেমে থেমে বললো সাইমন।

—ওসব কথা থাক। দুধটুকু খেয়ে নাও। তা ছাড়া দোষ তো আমারি। আমিই তো ক্ষমা চাইব। চোখ ছল ছল করে ওঠে ওর। ওর মুখের দিকে তাকায় এবার।

—আমিও ঠিক চিনেছিলাম, কিন্তু আমরা তো আরম্ভ করতে পারবো না, আমরা ফুরিয়ে গেছি। শেষ হয়ে গেছি, তাই চিনতে চাইনি। তাছাড়া শেষ জীবনে এত লোকের সেবা করতে পারলাম, এতে আমার প্রায়শ্চিত্ত হবে নিশ্চয়। আবার থামলো। সাইমন একদৃষ্টে চেয়ে আছে ওর দিকে। যন্ত্রণার কথা আর মনে নেই ওর।

—তোমায় তো চোখের সামনে পেয়েছি। আমরা ফুরিয়ে গেছি, আমাদের সময় হয়েছে, আমরা অথর্ব। ভিজে বারুদে কি আগুন লাগানো যায়? জ্বলে না। ওর কপালে হাত বুলিয়ে দিতে দিতে আপন মনে বলে চলে মারিয়া। ওর খেয়ালই নেই কখন লুইসা এসে পাশে দাঁড়িয়েছে, অবাক হয়ে ওর কথা শুনছে।

একত্বের দর্শন

স্বামী মহাদেবানন্দ গিরি

একটি সর্ষপ গাছে কম পক্ষে ৫০।৬০টী ফুল দৃষ্ট হয়। উহার প্রত্যেক ফুলে মধু আছে। ঐ ৬০টী ফুলে যে মধু তাহা একই মধু। সর্ষপক্ষেত্রে যতগুলি গাছ—সব গাছের যত ফুল সব ফুলেই এক মধু। তেমনি একটী ঝিলে বহু পদ্ম ফুলে পূর্ণ। সেই ঝিলের পদ্ম ফুল গুলিতে যে মধু আছে তাহা একই মধু। তেমনি এক কমলা লেবুর বাগানে যত কমলাগাছ আছে এবং তাহাতে যত ফুল ফুটে তাহাদের মধু একই মধু। সর্ষপের মধু, কমলালেবুর মধু ইহাদিগকে পৃথক মনে করিয়া ৩টি নাম দেওয়া হয়। কিন্তু যখন মধুকরেরা এই সব বিভিন্ন ফুলের বিভিন্ন মধু সংগ্রহ করিয়া তাহাদের ভাণ্ডারে একত্র জমা করে তখন সেই ভাণ্ডস্থ মধু একই মধু হয়। তখন কোনটা কোন মধু, বলিতে পারা যায় না। ইহা সর্ষপের মধু ইহা পদ্মের মধু ইহা কমলার মধু এমন পৃথকত্ব তখন আর থাকে না। অর্থাৎ একীভুত হইয়া যায়। তেমনি ইনি বৃক্ষলতাস্থ জীব চৈতন্য, ইনি বনস্থ কুরাল ঈগলাদি পক্ষীর দেহে জীব চৈতন্য, ইনি সিংহব্যাঘ্রাদি দেহের জীব চৈতন্য, ইনি সর্প ও ভেকের দেহস্থ জীব চৈতন্য, ইনি ঘোটক, গর্দ্দভের দেহস্থ জীব চৈতন্য, ইনি হস্তী, গণ্ডারের দেহের জীব-চৈতন্য, ইনি মশা মক্ষিকার দেহস্থ জীব চৈতন্য, ইনি যক্ষ-রক্ষের দেহের জীব চৈতন্য, ইনি নরদেহস্থ জীব-চৈতন্য—পৃথক নহে। একই চৈতন্য সর্ব্বত্র বিরাজমান। যখন দেহ ত্যাগ হয় তখন জীব-চৈতন্য একীভুত হয়। বিভিন্ন পুষ্পের মধুর একত্ববৎ একীভুত হইয়া যায়। তখন জীবের স্বাতন্ত্র্য থাকে না। যেমন মধুর স্বাতন্ত্র্য থাকে না।

বিচার করিলে বৃক্ষ লতাদিরও প্রাণ আছে। প্রাণী মাত্রেই জীব সংজ্ঞা হয়। এই সব জীব দেহ রক্ষার্ত্ত সৃষ্টিকর্ত্তা দেহে দেহে ক্ষুধা বা

জঠরাগ্নিরূপে বাস করিয়া থাকেন। প্রাণীগণ যে যাহা ভক্ষণ করে জঠরাগ্নি তাহা পচাইয়া নয় ভাগ করেন। যাহাকে ভাল সংস্কৃতে বৈশ্বানর দেব বলে। তিনিই উদরস্থ খাদ্য সামগ্রী মথিত করিয়া তাহা নয় ভাগে বিভক্ত করেন। উহাদের ২ ভাগ মল ও মূত্ররূপে শরীর হইতে বাহির হইয়া যায়। অন্য ৭ভাগ সপ্ত ধাতু অর্থাৎ চর্ম্ম, মাংস, রুধির, অস্থি, মজ্জাদি সাত ভাগে বিভক্ত করিয়া দেহস্থ অস্থি মাংস রুধিরাদি রক্ষার্থ অভাব পূরণ করেন এবং ৩।০ হাত দেহের পূর্ণতা প্রাপ্ত করান।

ঈশ্বর দেহে দেহে বাস করেন। দেহী জীব আবদ্ধরূপে বাস করে—এই জন্য সর্ব্বদেহস্থ বৈশ্বানর দেব তিনি ঈশ্বরাংশ। গীতা ১৫।১৪ ভগবান বলিয়াছেন—

অহং বৈশ্বানরো ভূত্বা প্রাণিনাং দেহমাশ্রিত।
প্রাণাপান সমাযুক্তঃ পচাম্যন্নং চতুর্ব্বিধম্॥

জরায়ুজ, অণ্ডজ, স্বেদজ, উদ্ভিজ্জ সর্ব্বদেহই জঠরাগ্নির দ্বারা রক্ষিত হন। একই জঠরাগ্নি সর্ব্বত্র এই সবের। পৃথকত্বের মধ্যে একত্ব দর্শন বিচারাধীন।

পৃথিবীর রস টানিয়া নিয়া বৃক্ষলতাদি জীবিত থাকে—তাদের ফুল-ফল খাইয়া সর্ব্বপ্রাণী জীবিত থাকে। একই পৃথিবীর রস সর্ব্বত্র নানা-ভাগে দৃষ্ট হয়। যেমন ইক্ষুরস, গুড় চিনি মিশ্রিরূপে। তৃণ ভক্ষণকারী গবাদি তৃণের রস হইতে দুগ্ধাদি প্রদান করে। এই পৃথিবী ঐ রস গ্রহরূপে সূর্য্য হইতে প্রাপ্ত হয়। সূর্য্য সকল গ্রহেই করে নেবুলা পাত। সুতরাং নেবুলা বা কারণ সলিল যাহাকে অব্যক্ত প্রকৃতি বলে তাহা একই রসযুত। কার্য্য কারণে লয় হয়। প্রলয়ে সূর্য্যগ্রহ নক্ষত্রাদি সমুদ্রার্ণবে কারণ সলিলরূপে একীভূত হয়। তাই শ্রুতি বাক্যে "রসো বৈ সঃ।" তিনি সর্ব্ব রসের আকর আধার।

যেমন একটি থানার অধীন দশখানি গ্রাম। তথায় এক কুমার আছে। সেই কুমার ঘট সরা হাঁড়িপাতিল নির্ম্মাণ করে। হাড়ী পাতিলাদি গ্রামবাসীরা ব্যবহার করে। তেমন একই ঈশ্বর বিশ্ব-জগৎ রচনা করিয়া প্রাণীকে একই রসে রসিত করেন।

টিউব ওয়েলের জল, ইন্দারার জল, পুকুরের জল, বিলের জল, নদীর জল, সমুদ্রের জল, মেঘের জল, সব জলই—এক জল।

আবার দার্জ্জিলিংএর হাওয়া, কলিকাতার হাওয়া সুন্দরবনের হাওয়া, সমুদ্রের হাওয়া,পর্ব্বতের হাওয়া—একই হাওয়া একই বায়ুমণ্ডলের সামগ্রী। তেমনি মেঘের বিজলীর অগ্নি, সূর্য্যাগ্নি, কাষ্ঠস্থ অগ্নি, বাড়বাগ্নি অগ্নি—একই অগ্নি।

যেমন সিংহের দুধ, ব্যাঘ্রের দুধ, হস্তীর দুধ, ঘোটকের দুধ, গর্দ্দভের দুধ, ছাগলের দুধ, মেষের দুধ, হরিণের দুধ, মহিষের দুধ, গোদুগ্ধ, নারীর দুগ্ধ সকলি তৎ তৎ পানকারী শিশুদের জীবন রক্ষা করে। এই সব দুধই শ্বেতবর্ণ, তরল ও মাখন বিশিষ্ট ইহাতে একতা আছে।

যতদেহ সকলি পাঞ্চভৌতিক অর্থাৎ আকাশ, বায়ু, অগ্নি, জল ক্ষিতি এই পঞ্চ ভূত বর্ণিত। কি বৃক্ষলতা, সিংহ, ব্যাঘ্র, মৎস্য, কুম্ভীর, কুড়াল, গরুড়, কি কনক ভূজী প্রাণী সকল দেহই পাঞ্চভৌতিক। আকারে পার্থক্য বটে বস্তুতঃ সব একই পাঞ্চভৌতিক।

সূর্য্যগণ মধ্যে সাইরাস আমাদের সূর্য্য হইতে আয়তনে দুইশত গুণ বড়। সাইরাস জ্যোতিষ্মগণের মধ্যে প্রথম। আমাদের সূর্য্য ৬ষ্ঠ শ্রেণীর মধ্যে গণ্য। সূর্য্য শ্রেণীর মধ্যে ছোট বড় আরও অনেক সূর্য্য আছে। সব সূর্য্যই সুরতে। গ্রহাদি প্রসূয়তে, সকলই জ্যোতির্ম্ময়। এই একতা দেখিতে পাই। এই সব জ্যোতিষ্কের জ্যোতি সম্বন্ধে শ্রুতি বলেন "অসূর্য্যা নাম তে লোকা অন্ধো তমসাবৃতা।" "ন তত্র সূর্য্যো ভাতি, এই সম্বন্ধে গীতা বলেন ১১।১২ দিবি সূর্য্যসহস্রস্য ভবেদ্ যুগপদুত্থিতা।

যদি ভাঃ সদৃশী সা স্যাদ্ ভাসস্তস্য মহাত্মনঃ
মুণ্ডকেবলে ন তত্র সূর্য্যো ভাতি ন চন্দ্র তারকম্
নেমা বিদ্যুতো ভাতি কুতোঽয়মগ্নি।
তমেব ভান্তমনুভাতি সর্ব্বং
তস্য ভাষা সর্ব্বমিদ্ বিভাতি॥

একই জ্যোতি সর্ব্বজ্যোতির আধার।

যেমন আমাদের এই সৌর জগতের গ্রহগণ একই সূর্য্যের আলোকে আলোকিত হয়।

যেমন কেনেডার হউক, আমেরিকার হউক, আফ্রিকার হউক বা রাশিয়ায় হউক—সব জায়গারই মেটে তৈল একই তৈল। মোটর, প্লেনে একই পেট্রোল সব দেশে ব্যবহৃত হয়। অর্থাৎ মোটর প্লেনাদি চালিত হয়।

জলে স্থলে অন্তরীক্ষে একই বিজলী। Hydrolic, thermo, Voltaic frictional ইত্যাদি স্বতন্ত্র বলিয়া মনে হয়।

যেমন একই আকাশ সর্ব্বত্র বিরাজিত। অথচ ঘট আকাশ ঘটা-কাশ, গৃহাকাশ ইত্যাদি স্বতন্ত্র মনে হয়। সেইরূপ সর্ব্বদেহস্থ আত্মা পৃথক বলিয়া মনে হয়। বস্তু তত্ত্ব একই আত্মা সর্ব্বত্র বিরাজিত।

মাতা চ পার্ব্বতী দেবী পিতা দেবো মহেশ্বর
বান্ধবাঃ শিবভক্তাশ্চ স্বদেশো ভুবনত্রয়ম্॥

এই যে লোকে স্বদেহ, স্বগৃহ, স্বদেশ, স্বজন ইত্যাদি শব্দ ব্যবহার করে। স্ব সৌর জগৎ, স্বজন, সবই স্বস্থান কেহই পর নহে। এই স্বকে দেহী স্ব শব্দ বাচ্য। সব দেহই স্ব বা স্বকীয় এইরূপ উদারতা হওয়া চাই। তখন স্ব ব্যতীত আর অপর কিছু দেখেনা। সর্ব্বরা একই স্ব স্থিত। স্ব—সু+অ—সুষ্ঠু প্রকাশে যাহার অস্তিত্ব সদাকাল অবাধিত। ইহাই একত্বের পরম স্থান। এজন্য ঋগ্বেদে বলে ইন্দ্রিয়াণি শতক্রতো যা তে জনেষু পঞ্চষু। ইন্দ্র তানি ত আবৃণে (ঋ ৩।৩৭।৯) হে শতক্রতু পঞ্চজনের যত ইন্দ্রিয় তাহার সকলি তোমার দ্বারা আবৃত ও পরিচালিত হইয়া থাকে। এবং তুমি একাই তাহার ব্যবহার কর্ত্তা। অর্থাৎ ইন্দ্র সর্ব্ব সর্ব্ব দেহে দ্রষ্টা, শ্রোতা, মন্তা, বোদ্ধা। পঞ্চজন—অর্থ

দেব, যক্ষ, রক্ষ, নর ও তির্য্যগ্ যোনি। দেহে দেহে স্বতন্ত্র দ্রষ্টা শ্রোতা মন্তা ও বোদ্ধা কল্পিত হয়। এক দেহীই সব দেহের ইন্দ্রিয়গণের পরিচালয়িতা। মন বুদ্ধি অন্তঃকরণ ইন্দ্রিয়গণ বহিষ্করণ। যিনি শ্রোতা তিনিই দ্রষ্টা তিনিই মন্তা তিনিই বোদ্ধা। দর্শন জনিত শ্রবণ জনিত মনন জনিত বা বিচার বুদ্ধি জন্য যে জ্ঞান তাহা একই জ্ঞান। একই বুদ্ধির জ্ঞান ইহা উপনিষদেও দেখিতে পাই—

> যস্ত সর্ব্বাণি ভূতান্যাত্মন্যেবানু পশ্যতি।
> সর্ব্বভূতেষু চাত্মানাং ততো ন বিজুগুপ্সতে
> যস্মিন্ সর্ব্বাণি ভূতান্যাত্মে বা ভূদ্বিজানতঃ।
> তত্র কো মোহ কঃ শোক একত্বমনুপশ্যতঃ॥

যেখানে পৃথকত্ব সেখানে সমে অসম, বিষমতায় পূর্ণ রজঃ গুণের প্রভাবেই পৃথকত্ব দর্শন ঘটে। এইরূপ রজঃ গুণী ব্যক্তি আপনাকে অল্পজ্ঞ ও অল্প শক্তিমান মনে করে। একজন বড় উকিল কিন্তু—তিনি যেমন মেডিসিন, ইঞ্জিনিয়ারিং জানেন না সুতরাং নিজেকে অল্প শক্তিমান অক্ষম দুর্ব্বল মনে করেন। তেমন একজন সার্জ্জেন মেডিকেল ম্যান তিনি ইঞ্জিনিয়ারিং বা ল' জানেন না সেইজন্য নিজেকে অক্ষম দুর্ব্বল মনে করেন। আবার একজন ইঞ্জিনিয়ার ডাক্তারি বা ওকালতি জানেন না, তিনি নিজেকে অক্ষম দুর্ব্বল মনে করেন!

যখন গুরুকৃপায় জানিতে পারেন একই ঈশা সর্ব্বদেহে বিরাজমান তখন আপনাকে আর অসমর্থ মনে করেন না। আমি ঈশা সাক্ষাৎ জানিয়া শোক রহিত হন।

গীতাও বলে—

> "বিদ্যা বিনয় সম্পন্নে ব্রাহ্মণে গবি হস্তিনি।
> শুনি চৈ শ্বপাকে চ পণ্ডিতাঃ সমদর্শিনঃ॥

যেমন একটি গাধা আছে। উহাতে ও তোমাতে কি পৃথক ভাব আছে? গর্দ্দভের দেহ ও রোম, চর্ম্ম, মাংস, রক্ত, অস্থি শিরাদি যুক্ত। দশ ইন্দ্রিয় মন বুদ্ধি ও হৃদে চেতন পুরুষ বিদ্যমান। তুমি মানব—তোমার দেহেও রোম, চর্ম্ম, মাংস, রক্ত, অস্থি শিরাদিযুক্ত। দশ ইন্দ্রিয় মন বুদ্ধি ও হৃদে চেতন পুরুষ বিদ্যমান। সে উদ্ভিদ ভোজী তুমিও উদ্ভিদ ভোজী। কেবল আকারে পৃথক মাত্র। গাধ অর্থ অল্প, অগাধ অর্থ বহু। যেমন বলে অগাধ জল সঞ্চারী বিকারী নাপি চ রোহিত। গর্দ্দভকে গাধা বলে অল্পবুদ্ধির জন্য। অল্পবুদ্ধি ব্যক্তিকেও বলে তুমি একটা আস্ত গাধা। বুদ্ধির বৈষম্য জন্য পৃথক কল্পিত হয় মাত্র। সম বুদ্ধিং বিশিষ্যতে। সম পদার্থ একরূপ। এজন্য একত্বের দর্শন বুদ্ধিমত্তার পরিচায়ক।

যখন মধু মাসে আমের মুকুল আসে, ফুল ফুটে, অর্থাৎ ফুলের মুখ খোলা থাকে তখন ভ্রমর, মৌমাছি সঙ্গীত সহ আমের সেই মধু পান করে। কতিপয় দিবস সেই মধু ভাণ্ডের খোলা মুখ চোচরারূপ আচরণ দ্বারা আবৃত হইলে মধুমক্ষিকা আর সেখানে মধুপান করিতে পায়না। বুদ্ধিমান লোক মনে করে সেই মধু দ্বার রুদ্ধ হইয়াছে মাত্র। পরে সেই আম্র সুপরিপক্ক হইলে চোচরারূপ আবরণ উন্মোচন করিয়া মধুময় অমৃত ফল আস্বাদন করে।

যতক্ষণ ব্রহ্মানন্দ মায়া মোহরূপ আবরণে আবৃত থাকে ততক্ষণ দেহ সেই সেই ব্রহ্মানন্দ ভোগ করিতে পারে না। যে বিচক্ষণ ব্যক্তি সাধনা দ্বারা ঐ আবরণ উন্মোচন করিতে সমর্থ হয় সে সেই ব্রহ্মানন্দ ভোগ করে। সেই ব্রহ্মানন্দ আত্যন্তিক সুখময়। ইহা ঈশোপনিষদে বর্ণিত আছে।

> হিরণ্ময়েন পাত্রেণ সত্যস্যাপিহিতং মুখং।
> তত্ত্বং পুষন্নপাবৃণু সত্য ধর্ম্মায় দৃষ্টায়ে॥

যেমন দেবতার চক্ষু, যক্ষের চক্ষু, অপসরার চক্ষু, রক্ষের চক্ষু, নরের চক্ষু সিংহের চক্ষু, ব্যাঘ্রের চক্ষু, কুকুরের চক্ষু, বিড়ালের চক্ষু, পেচার চক্ষু, শকুনির চক্ষু, পিপীলিকার চক্ষু—সব চক্ষুই দর্শন করে। দর্শনশক্তি একই।

তেমনি ঘ্রাণ সমষ্টি একই, আবার রসনায় রসাস্বাদন একই। তেমনি দর্শন, শ্রবণ, রসাস্বাদন, আঘ্রানাদি একই ব্যক্তির শক্তি। (ঋ ৩,৩,৩৯) ইহাই ঋক্বার দিয়া বলিয়াছেন ইন্দ্রিয়াণি শতক্রতো যা তে জনেষু পঞ্চসু। ইন্দ্র তানি ত আবৃণে। দর্শনাদি কার্য্য একই ব্যক্তি সম্পন্ন করেন। তাঁহাকে ইন্দ্র বা শতক্রতু বলে।

সাংখ্যকার কপিল যেমন একই প্রধানা হইতে নানাত্বের সৃষ্টি বলেন তেমনি বর্ত্তমানে বিজ্ঞানবিদ্গণ একই নিউট্রণ হইতে বিশ্বের নানাত্বের উৎপত্তি ঘটে বলেন। প্রধান ও নিউট্রণস্থলে কেহ কেহ অব্যক্ত প্রকৃতিকে গ্রহণ করেন। পৃথিবীতে অচেতন কর্ত্তার দৃষ্টান্ত নাই চেতন কর্ত্তা ভোক্তারূপে পরিদৃষ্ট হন। সেই চেতনকে কর্ত্তা করিয়া কার্য্য ব্রহ্ম বা সূত্রাত্মারূপে গ্রহণ করিলে কথাটি নির্দ্দোষ হয়। পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ, সর্ব্বব্যাপী একের (Absolute) ভাবটি নিতে রাজী নহেন। কার্য্য ব্রহ্ম (Absolute) নহেন। যাহা (Absolute) তাহা নিষ্ক্রিয় নির্ব্বিকার অকর্ত্তা অভোক্তা হন।

সুরেন্দ্রনাথ শিক্ষায়তন ব্যায়ামাগার

ব্যায়ামাচার্য্য শ্রীতারাচরণ মুখোপাধ্যায়

স্বাস্থ্য এবং সামর্থ্যের আদর্শ এবং প্রতীক ছিলেন রাষ্ট্রগুরু সুরেন্দ্রনাথ। তাঁহার প্রতিষ্ঠিত শিক্ষায়তনের ছাত্রবৃন্দের দৈহিক উন্নতির প্রতি বিশেষ প্রেরণা এবং প্রচেষ্টা প্রয়োজন। মৃত্যুর পূর্ব্ব পর্য্যন্ত সুরেন্দ্রনাথ প্রতিদিন প্রাতে এবং অপরাহ্নে নিয়মিত ব্যায়াম অনুশীলন করিতেন। প্রাতে স্যাণ্ডোর স্প্রীং ডাম্বেল এবং অপরাহ্নে মণিরামপুরে তাঁর বাসভবনের পশ্চিমে ভাগীরথীর তীরে বর্ত্তমানে তাঁর দাহস্থলে প্রতিদিন তাঁর দ্রুত এবং ক্ষিপ্রভ্রমণ (প্রায় দৌড়ান) স্থানীয় জনগণ ছাড়াও তদানীন্তন মহানগরীর

শ্রীতারাচরণ মুখোপাধ্যায়

বহু বিশিষ্ট ব্যক্তিদেরও বিশেষভাবে জানা ছিল। কারণ কলিকাতার বহু-লোক ঐ সময়ে তাঁহার সহিত সাক্ষাত আলোচনা করিতে আসিতেন। কিন্তু এত দ্রুত তার গতি ছিল যে বহু বিশিষ্ট লোক তাঁহার সহিত চলিতে না পারিয়া মাঝে মাঝে দাঁড়াইয়া কিছুক্ষণ বিশ্রাম করিয়া লইতেন। কিন্তু তাঁর কোনদিকে ভ্রূক্ষেপ বা লক্ষ্য ছিল না। তিনি ঘড়ি ধরে ঠিক নির্দ্দিষ্ট সময় এই ব্যায়াম অভ্যাস করিতেন। প্রকৃতির কোন দুর্য্যোগ কিংবা অন্য কোনপ্রকার বাধা বা কর্ম্মব্যস্ততা একদিনও তাঁকে এই অভ্যাস থেকে বিরত করিতে পারে নাই। এমনি ছিল তাঁর স্বভাব এবং কর্ম্মসূচী। ভীষণ দুর্য্যোগ কিংবা বৃষ্টির দিনও দেখেছি ছাতা মাথায় দিয়া তিনি তাঁর নিত্যকর্ম্ম এই ব্যায়াম করিতেছেন।

তাঁর একমাত্র পুত্র ৺ভবশঙ্করের (এই শিক্ষায়তনের প্রাক্তন সম্পাদক) স্বাস্থ্যোন্নতির প্রতি তাঁর বিশেষ লক্ষ্য ছিল। সেজন্য শৈশবে একজন পলোয়ান কুস্তি শিখাইবার জন্য ছিল এবং পরে ব্যায়াম শিক্ষক ছিল। বাড়ীর পাশে তাঁর জমিতে একটী ব্যায়ামাগার স্থাপন করিয়াছিলেন। পল্লীবাসীরাও সেখানে ব্যায়াম চর্চ্চা করিত। তাঁর পুত্র উন্নত সবল স্বাস্থ্য এবং শক্তি অর্জ্জন করিয়া বহু সাহসের পরিচয় দিয়াছেন। তিনি দুর্ব্বলের প্রতি সবলের অত্যাচারের বিরুদ্ধে তাঁর শক্তি প্রয়োগ করিয়া বহুলোকের উপকার করিয়াছেন। বারাকপুর সৈন্য এলাকায় তখন অধিকাংশ বিশিষ্ট ইউরোপীয়ানদের বসতি ছিল। তদানীন্তন গোরা সৈন্যেরা ভারতীয়দের ভীষণ মারপিট এবং অত্যাচার করিত। বর্ণ-বৈষম্য এবং স্বাধীনতার গর্ব্বে গর্ব্বিত ইংরাজ জাতি ভারতবাসীদের হেয় জ্ঞান করিত। ৺ভবশঙ্কর ইহার তীব্র প্রতিবাদ এবং প্রয়োজন বোধে ভীষণ প্রহারও দিতেন। এরূপ অসংখ্য ঘটনার ২।১টী আমি উদ্ধৃত করিব—বর্ত্তমান ছাত্রদের অবগতি এবং উদ্দীপনার জন্য। একবার তিনি কলিকাতায় আসিতেছিলেন কিছু মালপত্র লইয়া। বারাকপুর ষ্টেশনে আসিতেই একটি কুলী সেই মালপত্র লইয়া একটু অগ্রসর হইতেই ইউরোপীয়ন সৈন্যবিভাগের একজন উর্দ্ধতন অফিসার আসিয়া অন্য কোন কুলী না দেখিতে পাইয়া সেই কুলিটিকেই জোর করিয়া আদেশ দিল তাহার মালপত্র লইতে এবং কুলিটিও তার লম্বা চওড়া লালমুখ দেখিয়া কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া দেশবাসীর মালপত্র রাখিয়া তার মালপত্র তুলিয়া লইল। ইহাতে ৺ভবশঙ্কর এই নিদারুণ অপমান সহ্য করতে না পারিয়া সেই ইংরাজ অফিসারের উপর ঝাপাইয়া পড়িয়া নিদারুণ প্রহার করিতেই কুলীটী ভীত হইয়া উভয়ের মাল রাখিয়া পলায়ন করিল! সঙ্গে সঙ্গে হৈচৈ পড়িয়া গেল। বহু পরাধীন ভারতবাসীর ভীত সঙ্কুচিত নেত্র তাঁর ক্রোধমত্ত বিরাট স্বাস্থ্যের উপর কেন্দ্রীভূত হইয়া ইহার ফলের জন্য উদ্‌গ্রীব হইয়াছিল। রেল পুলিস সার্জ্জেণ্ট প্রভৃতি তাঁকে ঘিরিয়া ফেলিল। তারপর যখন ইন্সপেক্টর তার বক্তব্য (Statement) লইতেছিলেন, পিতার নাম লিখিবার জন্য যখন দেখিলেন শুধু সুরেন্দ্রনাথ লিখিতেছেন তখন তিনি বজ্রগম্ভীর কণ্ঠে চিৎকার করিয়া গালাগালি করিয়া বলিয়া উঠিলেন "Write, Sir Surendra Nath" ইত্যাদি। যাই হোক্ সঙ্গে সঙ্গে জামীন মঞ্জুর হইয়া পরে আপোষে মামলা নিষ্পত্তি হইয়া গেল। আর একবার আমাদের পল্লীতে একজন খুব বড় সরকারী চাকুরে এবং বিশিষ্ট

ব্যক্তি তাঁর ভাড়াটিয়াকে উচ্ছেদ করিতে মারপিট করিয়া বাড়ী হইতে বাহির করিবার সময় এক মহিলার মাথা কাটিয়া যায়। সেই মহিলা ৺ভবশঙ্করের নিকট আবেদন জানাইতেই সঙ্গে সঙ্গে সেই মহিলাটিকে লইয়া আমাদের বাড়ী আসিয়া আমার বাবাকে (বারাকপুর বারলাইব্রেরীর প্রেসিডেণ্ট ছিলেন) আদালতে মামলা রুজু করিতে অনুরোধ করিলেন এবং সেই ভদ্রলোককে তার বাড়ী গিয়া প্রহার করিয়া জানাইয়া দিলেন প্রহারের কত যন্ত্রণা। তাছাড়া গোরা সৈন্য পল্লীর সীমার মধ্যে আসিলেই ইলেকট্রিক পোষ্টে বাঁধিয়া ভীষণ প্রহার করিতেন। এভাবে তার অর্জিত শক্তি দুর্ব্বলের উপর সবলের অত্যাচারের বিরুদ্ধে এবং স্বদেশবাসীকে অপমানের জন্য বিদেশীদের বিরুদ্ধে প্রয়োগ করিতেন।

ব্যায়ামাগারের ছাত্র শ্রীসুনীল দাস অরবিন্দশ্রী (২য়)

সুরেন্দ্রনাথের অনুজ স্বর্গীয় ক্যাপ্টেন জিতেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় একসময়ে ভারতবর্ষে সবচেয়ে শক্তিমান পুরুষ বলিয়া পরিচিত ছিলেন। তাঁহার মত স্বাস্থ্য, শক্তি, সাহস, তখনকার দিনে কাহারও ছিল না বলিলেই হয়। আমার উন্নত স্বাস্থ্য বিশেষতঃ আমার পেরেলালবারের কৌশল দেখিয়া অত্যন্ত খুশী হইয়াছিলেন এবং আমি তাঁর খুব স্নেহভাজন ছিলাম। তিনি বারাকপুরে গেলেই আমার মণিরামপুরের ব্যায়ামাগারে যাইতেন এবং আমাদের উৎসাহিত করিতেন। আমিও তাঁর ৮নং ওল্ড পোষ্ট অফিস ষ্ট্রীটের বাসায় প্রায়ই যেতাম এবং আলাপ-আলোচনা করিতাম। তাঁর কাছে শোনা অতীত কাহিনীর সংক্ষিপ্ত বিবৃতি দিতেছি। তৎকালীন কলিকাতা সহরে চৌরঙ্গী প্রভৃতি এলাকায় ইংরাজদের জনসংখ্যা এবং চলাফেরা বেশী ছিল। স্বাধীনতার গর্ব্বে গর্ব্বিত স্ফীতবক্ষ উন্নত মস্তকে সোজা হইয়া চলিত তাহারা এবং পরাধীনতার নিষ্পেষিত দুর্ব্বল দেহমন লইয়া পথচারীরা পাশ কাটাইয়া চলিত। তাদের চলার পথে বাধা প্রাপ্ত হইলেই তাহারা চাবুক মারিত কিংবা ধাক্কা মারিয়া ফেলিয়া দিত। বীর জিতেন্দ্রনাথ এই বর্ণভেদের দুঃখ সহ্য করিতে পারিতেন না। ব্যাঘ্র যেমন মেষদলের মধ্যে তীব্র গতিতে ঢুকিয়া ছত্রভঙ্গ এবং প্রাণহানি ঘটাইয়া আতঙ্কের সৃষ্টি করে তেমনি তিনি একাই ঐসব বিজাতীয়দের দলের ভিতর সজোরে প্রবেশ করিয়া ভীষণ প্রহার করিতেন। তাঁর অনন্যসাধারণ দেহসৌষ্ঠব, অপরিসীম শক্তি, দুর্জয় সাহস এবং অত্যাশ্চর্য্য ক্ষিপ্রতা বিদেশীদের বিপন্ন, ভীত ও ত্রস্ত করিয়া তুলিয়াছিল এবং তিনি তাদের নিকট বিভীষিকার হেতু হইয়া উঠিয়াছিলেন। সেজন্য তদানীন্তন পুলিশ কমিশনার তাঁর অগ্রজ সুরেন্দ্রনাথের নিকট দুইটী প্রস্তাব পেশ করিয়া একটী গ্রহণ করিতে অনুরোধ জানান। হয় তাঁর ভ্রাতাকে

ব্যায়ামাগারের ছাত্র শ্রীসাতকড়ি প্রামাণিক
(প্যারালাল বার ও রিংয়ে বেঙ্গল চ্যাম্পিয়ান)

এরূপ মারামারি বন্ধ করিতে নচেৎ তাঁকে এইস্থান ত্যাগ করিতে বলুন। জিতেন্দ্রনাথের কাছে এই সংবাদ আসিলে তিনি দ্বিতীয় প্রস্তাব গ্রহণ করিয়া বিলাতে যান। সেখানে তিনি জার্ম্মান ব্যায়ামবীর ডক্টর ইউজিয়ন স্যাণ্ডোর সার্কাস দলে যোগদান করিয়া শারীরিক শক্তির ক্রীড়া এবং কৌশল দেখাইয়া জীবিকার্জ্জন করিতে লাগিলেন। প্রবাদ আছে সেখানেও তিনি একবার এই বর্ণবৈষম্যের ব্যাপারে এক সংগ্রামে একাই শুধু একটি বেঞ্চির দ্বারা ৫০ জন ইংরাজ ছাত্রকে আহত এবং পরাভূত করেন। তারপর যখন আগ্নেয়াস্ত্রের সাহায্যে এবং প্রয়োগে তাহাকে জখম করিবার আভাস পান তখন তিনি সেই স্থান হইতে দৌড়াইয়া বাকিংহাম রাজপ্রাসাদে উপর্যুপরি সুরক্ষিত ছয়জন দ্বাররক্ষীদের পরাজিত করিয়া সম্রাজ্ঞী ৺ভিক্টোরিয়ার

শরণাপন্ন হন। তিনি তাঁহার এই অসামান্য শক্তিশালী ভারতীয় প্রজার অদ্ভুত আশ্চর্যজনক কাজে বিস্মিত এবং অভিভূত হইয়া তাঁকে অভয় দেন এবং উদ্ধার করেন।

তাঁর শক্তি পরীক্ষার জন্য সাম্রাজ্ঞীর প্রধান দেহরক্ষী এবং ইংলণ্ডের সব চেয়ে শক্তিশালী ব্যক্তির সহিত তাঁহার শক্তি প্রতিযোগীতার আয়োজন হয়। তিনি জয়ী হইয়া প্রচুর পুরস্কার এবং সম্মান পান। এরূপ তাহার সম্বন্ধে অনেক কিংবদন্তি এবং অলৌকিক ঘটনা ও গল্প আছে। অতঃপর তিনি ব্যারিষ্টারী পাশ করিয়া স্বদেশে আসিয়া আইন-ব্যবসায়ে আজীবন অর্জ্জিত অর্থ এবং পৈত্রিক সম্পত্তি বাংলার যুবকদের স্বাস্থ্যচর্চ্চা এবং উন্নতিকল্পে All Bengal Physical Association নামক প্রেসিডেন্সী কলেজের পশ্চিমে বঙ্গদেশের একটী সুন্দর এবং সুবৃহৎ ব্যায়ামাগার প্রতিষ্ঠিত করিয়া দেশবাসীর অন্তরে অমর হইয়া রহিয়াছেন। ব্যায়াম চর্চ্চার জন্য এককালীন এত বড় দান এবং দরদ বাংলাদেশে আজ পর্য্যন্ত কাহারও কাছে পাওয়া যায় নাই।

তাই আজ আমি আমার ছাত্রবন্ধুদের সজাগ এবং স্মরণ করিয়ে দিতে চাই পশ্চিম বাংলায় তথা ভারতে স্বাস্থ্য চর্চ্চার এরূপ ঐতিহ্য আদর্শ এবং প্রকৃষ্ট উদাহরণ কোন শিক্ষায়তনে নাই। প্রত্যেক ছাত্রের সর্ব্বপ্রধান কর্ত্তব্য এই শিক্ষায়তনের প্রতিষ্ঠাতা এবং পরিচালকদের মহান আদর্শে ও শিক্ষায় অনুপ্রাণিত হওয়া। তাঁদের পদাঙ্কানুসরণ করিয়া সুস্থ ও সবল দেহ ও মনের অধিকারী হওয়া এবং প্রগতিশীল ও কল্যাণব্রতী রাষ্ট্রের ভবিষ্যৎ কর্ণধার ও স্রষ্টা হইয়া স্বাধীন ভারতবাসীর সুখ, স্বাচ্ছন্দ, শান্তি এবং সমৃদ্ধি বর্দ্ধন করিবার জন্য সচেষ্ট হওয়া।

এতদুদ্দেশ্যে এই শিক্ষায় ছাত্রদের স্বাস্থ্যোন্নতি কল্পে রিপন হোষ্টেলে একটী ব্যায়ামাগার আছে। প্রত্যেক ছাত্রদের কর্ত্তব্য বিদ্যা-শিক্ষার সাথে সাথে এই ব্যায়ামাগারে ভর্ত্তি হইয়া বিজ্ঞানসম্মত এক সুপরিকল্পিত উপায়ে, স্বাস্থ্য চর্চ্চা করিয়া সুস্থ সবল এবং শক্তিমান স্বাস্থ্যের অধিকারী হইয়া নিজের এবং দেশের উন্নতি বিধান করা।

ময়ূরাক্ষী পরিক্রমা

স্বপ্না মুখোপাধ্যায়

কলকাতা থেকে ১৫০ মাইল দূরে সুন্দরী ময়ূরাক্ষীর সঙ্গে যখন প্রথম পরিচয় হোল, তখন গোধূলির রক্তিম আলো তার মুখে এসে পড়েছে। ক্রমশঃ সন্ধ্যার ধূসর ঘোমটা তার লজ্জাবনত রক্তিম মুখখানি ঢেকে নিল। সে দিনটি ছিল শরতের ভরা পুর্ণিমার মধুর রাত্রি। ষোড়শী শশী সঙ্গিনী তারাদের নিয়ে শান্ত পরিবেশটি আরো মায়াময় করে তুলেছিল।

একটা ডেকচেয়ার টেনে ব্যালকনির ওপর বসে পড়লাম। মন-প্রাণ দিয়ে সেই অপূর্ব্ব দিনটির মাধুর্য্য আকণ্ঠ পান করতে লাগলাম। মুক্ত প্রকৃতির কোলে চাঁদনি রাতকে যে কত সুন্দর দেখায় তা সেখানেই প্রথম উপলব্ধি করলাম। ময়ূরাক্ষী ভবনের চারপাশে 'রিজার্ভারের জলের উপর চাঁদের আলো পড়ে আলোছায়ার সুন্দর আল্পনা এঁকে দিয়েছে। শান্ত নিস্তরঙ্গ বিশাল জলরাশি ছাড়িয়ে দূরে দেখা যাচ্ছে বাঁধের আলোগুলি। ওই আলোর সারিগুলি মনে হচ্ছে যেন একছড়া আলোর মালা জলের চারপাশ ঘিরে রয়েছে। আরো দূরে আধো অন্ধকারে নিঝুম, নিথর, নিঃশব্দ গম্ভীর পাহাড়গুলি দাঁড়িয়ে আছে—জলাশয়রক্ষী প্রহরীর মত। নিরালা নিঃশব্দপুর সাঁওতাল পল্লী থেকে ভেসে আসছে মাদলের মেঠো সুর। সেই ঘুমপাড়ানী সুর শুনতে শুনতে কখন যে সুপ্তির কোলে ঢুলে পড়েছি জানি না।

যখন ঘুম ভাঙলো তখন দেখি প্রভাতী আলোয় চারিদিক হাসছে। সূর্য্যের সেই সোনালী রশ্মিতে পড়লাম সকল কবির আদি কবির প্রভাতী বিষয়ক ছোট্ট একটি নীরব কবিতা। দেখলাম বিশ্বশিল্পীর তুলির ছোঁয়ায় ফুটে উঠেছে অপূর্ব্ব নৈসর্গিক দৃশ্য। অর্দ্ধচন্দ্রাকারে চারিদিকে বেষ্টন করে আছে ছোট, বড় পাহাড়ের সারি। তাদের ঢেকে আছে ঘন সবুজ উত্তরীয় আর তাদের পায়ের কাছে লুটিয়ে পড়ছে ময়ূরাক্ষীর হিল্লোলিত জলরাশী। দূরে তীরের মাঠঘাট-গুলি সবুজ কিংখাবে মোড়া। কাল রাতে যাকে রহস্যময়ী ব'লে মনে হয়েছিল আজ প্রভাতে তার অবগুণ্ঠন মুক্ত হাস্যোজ্জ্বল রূপ দেখে মনে হলো এবার সুন্দরী তার নব পরিচয়ের লজ্জায় বাধা কাটিয়ে এসেছে সকল সৌন্দর্য্য ও মাদকতা নিয়ে আমার কাছে ধরা দিতে।

এরপর বেরোনর পালা সুতরাং স্নানাদি সেরে সোহনলালের আয়োজিত উপাদেয় প্রাতঃরাশ সেরে নিলাম। প্রথমেই বেরিয়ে এলাম ময়ূরাক্ষী ভবনটিকে দেখতে। সত্যিই এই বিশ্রাম আবাসটি যে সব স্থপতিরা নির্ম্মাণ করেছেন তাঁহাদের শিল্প কৌশল তারিফ করার মত। ছোট্ট একটি পাহাড়ের চূড়ায় এই বাড়ীটি। বাড়ীর পর থেকে ধাপে ধাপে গোল ক'রে নেমে এসেছে নানা রংয়ের ফুলের বাগান। আর চারিদিকে ঘিরে আছে বাঁধের জল। দূর থেকে দেখে মনে হচ্ছে, ছোট্ট একটি পাহাড়ী দ্বীপের উপর আধুনিক শিল্প তার রূপকে রূপ দিয়েছে এই বাড়ীটির মাঝে।

তারপর চল্লাম ময়ূরাক্ষী বাঁধটিকে দেখতে: মানুষ বিজ্ঞানের সাহায্যে যে কি বিস্ময়কর ভাবে প্রকৃতিকে করায়ত্ত করতে উদ্যত

হয়েছে তা বাঁধগুলি দেখলে কিছুটা উপলব্ধি করা যায়। যখন আমরা বাঁধ দেখতে যাই তখন সবেমাত্র বাঁধ নির্ম্মাণ কাজ শেষ হয়েছে। তাই তখন সব কিছুই একেবারে নূতন। ওখানকার একজন ইঞ্জিনিয়ার খুব সুন্দর করে আমাদের এই বাঁধগুলির ক্রিয়াকলাপ ও উপযোগিতার কথা বুঝিয়ে দিতে লাগলেন। প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনাতে এই বাঁধের প্ল্যানটি গ্রহণ করা হয়। গ্রীষ্মে যখন দারুণ অগ্নিবানে ধরিত্রী তৃষ্ণার্ত্ত হয়ে উঠবে তখন বাঁধ দেবে তাকে শান্তিবারি। এই বাঁধ বঙ্গ বিহারের কিছুটা অংশের শস্যক্ষেত্রকে গ্রীষ্মে জলদান করে আর বর্ষায় বন্যার হাত থেকে রক্ষা করে, আরও শস্যশ্যামল করে তুলবে। আর এর জলবিদ্যুৎ সাহায্য করবে চারপাশে জনপদ গড়ে তুলতে। ক্যানাডা সরকারের সাহায্যের কথা স্মরণ করে এই বাঁধটির নাম দেওয়া হয়েছে 'Canada Dam'.

সেখানকার দেখা সাঙ্গ করে, চল্লাম স্থানটিকে ঘুরে দেখতে। জায়গাটা ছোট্ট, বাঁধ আর প্রকৃতির দৃশ্য ছাড়া দেখবার মধ্যে আছে, বিহার সরকারের Rest house, আর ময়ূরাক্ষীর Youth Hostel ও স্থানীয় বাসিন্দাদের পর্ণকুটির। দেখতে পেলাম ক্ষেত আর মাঠের মাঝে মাঝে গুটিকয়ক করে সাঁওতালীদের কুটির। তবে সাঁওতালী বলতে বাঁশী আর মাদলধারী যে স্বাস্থ্য-সমুজ্জ্বল মানুষগুলির চিত্র আমাদের মনে ভেসে ওঠে, তেমন সাঁওতালীর সংখ্যা খুবই কম। এইসব কুটির দেখতে দেখতে ক্ষেতের মধ্যে দিয়ে চল্লাম Youth Hostelএর উদ্দেশ্যে। যেতে যেতে আরেকটি বিস্ময়কর জিনিষ চোখে পড়লো। দূর থেকে যেটিকে পাহাড়ের গায়ে সবুজ আবরণ মাত্র মনে হয়েছিল। এখন তার প্রকৃত পরিচয় পেলাম। দেখলাম সেটা আসলে বিরাট বিরাট গাছের গভীর ঘন বন, যার স্থলে স্থলে দিনের বেলাতেও অন্ধকারে সমাচ্ছন্ন। স্থানীয় বাসিন্দাদের কাছে শুনলাম ওখান থেকে কখনও কখনও চিতাবাঘ বাঁধের জলে তৃষ্ণা নিবারণের জন্য আসে। এই সব শাল, পিয়াল, মহুয়া প্রভৃতি গাছ দেখতে দেখতে, মাঠের সবুজ ঘাসের উপর দিয়ে চলতে চলতে Youth Hostel-এর সামনে এসে দাঁড়ালাম। একটি ছোট্ট এবড়ো খেবড়ো পাহাড়ের উপর দুর্গের মত বাড়ীটি ছাত্রছাত্রীদের ছুটি কাটাবার ভারী উপযুক্ত স্থান।

ক্রমে সন্ধ্যা হয়ে এলো, আমাদের বিদায়ের সময়ও সমাগত প্রায়। আসন্ন বিচ্ছেদের বেদনায় মনটা ভারী হয়ে উঠেছে। ময়ূরাক্ষীর দিকে ফিরে দেখি সেও তার শান্ত মূর্ত্তি নিয়ে নীরবে দুয়ারে দাঁড়িয়ে আছে, সন্ধ্যার অন্ধকারের মাঝে তার কাল অবগুণ্ঠন আবার নেমে আসছে! সেই সুন্দরীকে মনে মনে wordsworthএর মত করে বল্লাম—'হে সুন্দরী ময়ূরাক্ষী তোমার মধুর স্মৃতি আমার মনের মণিকুটিরে সযত্নে রাখবো আর চিরদিন বলবো—

"For oft, when on my Couch I lie
In vacant or in pensive mood,
That flash upon that inward eye
Which in the bliss of solitude."

কবি চণ্ডীদাসে প্রকৃতির প্রভাব

শ্রীকেশবচন্দ্র গুপ্ত

কাব্য রসাত্মক বাক্য। কিন্তু সে রসের স্রোত বহে কোথায়? নিশ্চয় মনের অতল গভীরে। বাক্য ফোটে মুখে কিন্তু ওঠে, প্রাণের নির্ঝর হতে—যদি তার উদ্দেশ্য হয় সত্যের প্রকাশ। তাই কবির ভাষার উৎসমুখ সেথায় যেথা বহে রসের স্রোতস্বতী। যে কবি যত বড় তার প্রকাশ ভঙ্গী তত রসাত্মক।

আবার এই রসের নদীর উৎস অনুসন্ধান করলে নিশ্চয় পৌছান যায় সেই মনোহর গিরিতে যার শীলাগুলা গড়া কবির অভিজ্ঞতায়। একই দৃশ্য দেখে সবাই। কিন্তু তা হতে কবি সঞ্চয় করে রস। আবার সেই রস যখন শ্রোতার মনে জোগায় মাধুরী, তখন রসাস্বাদী। হয়তো বোঝেনা যে রস তার লুকানো, অজানা বা বিস্মৃত রস-ভাণ্ডে ছিল সঞ্চিত। কবির রসকে আপনার জানলে শ্রোতার ঘুম ভাঙ্গে। কবির গড়া ছন্দে ও তালে তার প্রাণের ছন্দ বন্ধনমুক্ত হয়, কেঁপে ওঠে কবির গানে তালে তালে।

কবি যে মধু সঞ্চয় করে, পায় তাকে সে পরিবেশে ও সংস্কারে। প্রত্যেক দেশের কবি আসলে বিশ্ব কবি। কিন্তু ভঙ্গিমায় বিশেষত্বের পরিচয় দেয়। সত্য এক। তার মাধুরী বিলায় কবি বিভিন্ন প্রকারে। এই প্রকার বিশ্লেষণ করলে, কবির পরিবেশের সন্ধান পাওয়া যায়।

বাঙ্গালার কবি যে প্রকৃতির মাঝে জন্মে, লালিত হয়, সুখ পায় সে পরিবেশ গাছপালা, ফল, ফুল, পশু, পক্ষী কীট-পতঙ্গ ভরা। নদী ও সরোবর লালিত্য দেয়-বাংলার ভূমিকে। তাদের অনেক গুলিই মধুর সৃষ্টি। কবি সে মাধুরীর সন্ধান পায় এবং সে সুষমা বিতরণ করে শ্রোতার প্রাণে। তাই সে কবি।

এ প্রসঙ্গ রবীন্দ্রনাথ প্রভৃতি গবেষণার বিষয় আমি বিস্তারিতভাবে বহু আলোচনা করেছি। আজ বলব চণ্ডীদাসের কথা। তাঁর মাধুরী দেশ মাতিয়েছে বহু শতক।

চণ্ডীদাস বৈষ্ণব কবি। তাঁর প্রাণ-মন পূর্ণ ছিল রাধাকৃষ্ণের প্রেমের লীলায়। মহাপ্রভুর বিতরিত করুণার পূর্বে জয়দেব চণ্ডীদাস প্রভৃতি কবি

প্রকৃত প্রেমের সুষমা বিলিয়েছেন বাংলাদেশে। প্রতিপাদ্য বিষয়— নিকষ হেমের মত প্রেমের সৌন্দর্য্য। কিন্তু তাঁর বর্ণনার মাধ্যম দেশের ভাষা ও স্বদেশের বাহ্য-প্রকৃতি নেংড়ানো রস। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর আবির্ভাবের পূর্ব্বে জয়দেব, বিদ্যাপতি ও চণ্ডীদাস প্রেমের যে বিজয় শঙ্খ বাজিয়ে গেছেন গীতি কবিতার কুঞ্জে, সে সুরছন্দ আজও বিমোহিত করে আমাদের চিত্ত।

চণ্ডীদাস এঁকেছেন বন-মালা শোভিত বনমালির ছবি। সুতরাং বনের মাধুরী তাঁর বর্ণনা জুড়ে। প্রকৃতির বিভিন্ন বিকাশের তরঙ্গে উচ্ছ্বাসকে প্রকাশ করেছেন কবি নায়ক-নায়িকার আবেগের উত্তাল স্পন্দনে। নায়িকার বেশ-ভূষায় প্রকৃতির বিকাশ। চিন্ময়ভাবেও দেখি সাধারণ গৃহস্থালীর অতি-সাধারণ নিত্য-কর্ত্তব্যের মাঝে চিত্ত-চাঞ্চল্যের আভাসের পরিচয়। নায়িকার বসন—

কিবা সে তুকুলি শঙ্খ ঝলমলি
সর সর শশি-কলা।
সাঁজেতে উদয় শুধু সুধাময়
দেখিয়া হইনু ভোলা।

প্রকৃতির বিকাশ দেহসজ্জায়। তাই নায়কের চিত্তে ভাব উঠলো— সরোবর হ'তে ওঠা নায়িকাকে দেখে—

চলে নীল সাড়ি নিঙাড়ি নিঙাড়ি
পরাণ সহিত মোর।

জলে ভিজলে জ্বর আসে। আবার হৃদ্-পিণ্ডকে মুচড়ে দিলে দেহ হয় জ্বর গ্রস্ত। তাই নীল সাড়ি নিঙড়ানির ফল—

সেই হতে মোর হিয়া নয় থির
মনমথ জ্বরে ভোর।

চণ্ডীদাসের মুখে শুনি নায়ক জলদ-বরণ। তার দেহের অপর অঙ্গ সম্বন্ধে শুনি—বদন-কমল, খঞ্জন-নয়ন, দাড়িম্ব-বীজ দন্ত, বিম্বক-শোভা ওষ্ঠ। এ তুলনাগুলো প্রমাণ করে চণ্ডীদাসের প্রকৃতি-প্রেম। তিনি বাহিরের ফুল্ল-সরোবরের মনোলোভা শোভা দিয়ে সাজাতেন কানুর শ্রী। আবার—

চরণ কমল ভোমরা বুলায়ে
চৌদিকে বেরিয়ে ঝাঁক।

বলেছেন—

যেমত অঞ্জন দলিত রঞ্জন
কিবা অতসীর ফুল।

অবশ্য শ্রীকৃষ্ণ গভীর প্রেরণা—

অতি অনুপম যেন নব ঘন
জলদ সমান দেখা।

তাঁর দশনখ—চাঁদ। পীত সাজ ছিল—কলহংস জিনি। অবশ্য বাঙালীর এ সাজই প্রকৃতির অনুকরণ।

কবি চণ্ডীদাসের নায়িকা শ্রীরাধিকার-রূপ বর্ণনায় ফুটে ওঠে সেই প্রকৃতির প্রভাব।

শ্রীমতীর রূপলীলার আরও উপমা—

থির বিজুরী বদন গৌরী
কানেড়া ছাঁদে কবরী বাঁধে
তাঁর আঁখি তারা দুটিকে
নীল-পদ্ম ভাবি লুব্ধ ভ্রমরা
ছুটিতেছে নিরবধি।
কিবা দন্তভাতি মুকুতার পাঁতি
জিনিয়া কুন্দক কুঁড়ি।

দেহে—শ্রীফল-যুগল জিনি কুচ-দল। কেশরী জিনি কৃশ মাঝাখানি গজ কুম্ভ জিনি নিতম্ব আর উরু করি-কর পারা।

প্রেমের আবেগ নিরাশার গোপনশীলার আঘাতে যখন ক্ষুব্ধ করে প্রাণকে তখন মানুষ দোষ গুণের হয় বিচারক নিজের ও প্রিয়ার। বাঙ্গালী কবি চণ্ডীদাস বঙ্গের শীতল সরসী হরষ গ্রামে লালিত ও পালিত। জন্মভূমির প্রাকৃতিক রূপ অপরূপ। তাই লীলাছন্দ কবির রসছন্দে ও ওতপ্রোত ভাবে মিলিত ছিল। পল্লীর মোহিনী শক্তি উচ্ছ্বসিত-প্রাণ ছিল বৈষ্ণব কবির। উপমা উপমেয়র মাত্র অভিজ্ঞাতার ভিত্তিতে সৃষ্টি হয় না। তাদের সাবলীল বিকাশ প্রকাশ করে চিত্তে সদা-প্রবাহিত ভাব ধারার স্রোত। যখন কবির নায়িকা প্রেমকে সুখের সাগর ভেবে নাহিতে নেমে বাধা পেলেন তখন তিনি সে সাগরের জল পরীক্ষা করে দেখলেন—

কেবা নিরমিল প্রেম সরোবর
নিরমিল তার জল
দুঃখের মকর ফিরে নিরন্তর
প্রাণ করে টলমল।
গুরুজন জ্বালা জলের শিহালা
পরসী জিয়ল মাছে
কুল-পানিফল কাঁটা যে সকল
সলিল বেড়িয়া আছে।
কলঙ্ক পানায় সদা লাগে গায়
ছাঁকিয়া খাইনু যদি
অন্তর বাহিরে কুটু কুটু করে
সুখে দুঃখ দিল বিধি।

খাঁটি বাংলা-পল্লীর পুকুরের ছবি। কেবল আজই আমরা পানা পুকুর দেখিনা—পাঁচ শত বছর পূর্ব্বে আমাদের পূর্ব্ব-পুরুষেরা জলে পেতেন মকর, জিয়ল মাছ, পানিফলের কাঁটা আর পানা।

শ্রীমতীর এ উক্তিকে লক্ষ ক'রে কবি যে বিজ্ঞের বাণী উচ্চারণ করলেন তার মাঝে বাংলার যৌথ সংসারের ভ্রাতৃ প্রেম না ভ্রাতৃ-বৈরিতার নির্দ্দেশ আছে তা আমি আজও বুঝতে পারিনি। কারণ কবি বল্লেন—

চণ্ডীদাস কহে শুন বিনোদিনী
সুখ দুঃখ দুটি ভাই।
সুখের লাগিয়ে যে করে পিরীতি
দুঃখ যায় তার ঠাঁই।

অবশ্য ভাই দুটি একেবারে উল্টোপথের পথিক।

সত্যই তো জলের বিশুদ্ধতা সম্পাদন করা বিশেষ কষ্টসাধ্য—একবার কাঁটা গাছ আর শিহালা জন্মিলে। ভূমিরও অবস্থা তেমনি, আগাছার বীজ যে কোথায় লুকিয়ে থাকে, তার সন্ধান পায় না কৃষক। সর্ব্বজনবিদিত এ কথায় উপমা দিলে বড় প্রাণস্পর্শী হয়। যত্নের অসাধ্য হয় এক একবার কৃষি। তাই কবি শ্রীমতীর মুখে শোনালেন নিরাশার উচ্ছ্বাস—

ভুবন ছানিয়া যতন করিয় আনিনু-প্রেমের বীজ
রোপণ করিতে গাছ সে যে হইল মরণ বীজ।
সখি প্রেম তরু কেন হৈল,
হান অভাগিনী দিবস রজনী সিঁচিতে দিবস গেল।
এত কষ্টে রোপিত বৃক্ষে কি ফল ফলিল?
অমিয়া হইতে স্বাদু লাগিত হইল গরল ফলে
কানুর পিরীতি শেষে হেন রীতি জানিনু পুণ্যের বলে।

বিরহ-কাতরতা মিলনের পূর্ব্বরাগ। মিলন-তুষ্টের চক্ষে তরুলতা ধারণ করে অন্য রূপ। মিলনের রাতে—

শারদ পূর্ণিমা নিরমল রাতি উজর সকল বন
মল্লিকা মালতী বিকসিত তথি মাতল ভ্রমরগণ।
তরু-কুলগণ ফুল ভরি ভালো সৌরভে পুরিল তায়

কিন্তু মিলন তো বিলাস। সেথা মাত্র সাধারণ বনানীর উপাদান সমৃদ্ধ করতে পারে না কুঞ্জ। ধনী-গৃহের অবদান প্রয়োজন তার আয়োজনে। কিন্তু সে সরঞ্জামেও প্রকৃতির বিশেষ দানের উপকরণ পড়ে দৃষ্টিতে। প্রাসাদে নয় বনে এ সাজ।

নিধুবনে আছে রতন-বেদিকা মণি-মাণিক্যেতে বাঁধা
ফটিকের তরু শোভিয়াছে চারু তাহাতে হীরার ছাঁদা।
চারিপাশে শোভে প্রবাল মুকুতা গাঁথবি আঁটনি কত
তাহাতে বেরিয়া কুঞ্জ কুটীর নীলমণি শত শত।
নেতের পতাকা উড়িছে উপরে কি তার কহিব শোভা
অতি রম্যস্থল দেব অগোচর কি কহিব তার আভা।

কিন্তু মাত্র মানুষ আহরিত উপাদান কী কুঞ্জ-কুটীরের প্রকৃত শোভা সম্পাদন করতে পারে শেষ স্পর্শ যদি প্রকৃতি-রাণীর না থাকে? তাই কবির প্রাণ আবার উজ্জ্বলের ছটায় উছলে উঠলো শারদ পূর্ণিমার সুষমায়।

মাণিকের ছটা কিরণের ছটা এমতি মণ্ডপ ঘর। অন্যত্র কবি বলেছেন মিলন-মন্দির—

যমুনার তট অতি রম্যস্থল রতন বেদিকা তায়।

কিন্তু এ রতন বেদিকাকে প্রকৃত সুন্দর করলেন তিনি প্রকৃতির অবদানের সহায়তায়।

নানা তরুবর পুষ্প বিকশিত নানা পক্ষী গুণ গায়।

আরও—

তরুগণ যত ফুল-ভরে তারা লম্বিত ধরণী-তলে
মধু ঝরে কত দেখহ সে কত মধুকর ভ্রমে ডালে।
ময়ুর ময়ুরী নাচে ফিরি ফিরি পেখম ধরিয়া তারা
চাতক-চাতকী ডাহুক ডাহুকী হংস জোড়ে ডাকে তারা।
যমুনার নীরে জলচর চরে সফরী ফিরিছে তায়
নানা পুষ্প ফুটে শব্দ দুসারি মধুকর মৃদু গায়।

তাই আনন্দে কবি মন্তব্য কবলেন—

চণ্ডীদাস কহে কিবা সুখময় নিভৃত সুচারু বনে
এখানে একাকী বৈঠল নাগর এ কথা কেহ না জানে।

যে কেহ বাংলাদেশকে চেনে তাকে স্বীকার করতেই হবে যে চণ্ডীদাসের প্রকৃতি-বর্ণনায় অপ্রাকৃত কিছু নাই। সাদা ফুল রাত্রে ফোটে কারণ মধুলোভী ভ্রমর মধুপের দৃষ্টি আকর্ষণ করে শ্বেত বর্ণ রাতের আঁধারে। মল্লিকা মালতী সাদা ফুল। তরুলতার বীজ ছড়াবার এক উপকরণ কীটের দেহ। মধুর লোভে সে অঙ্গে মেখে নিয়ে যায় রেণু এক ফুল হতে যা অন্য ফুলের উপকরণের সাথে মিলে বীজ হয়। বনানী বাড়ে তাতে, মধুপ পায় তার পারিশ্রমিক।সেদিন বাংলাদেশে ময়ুর ছিল বহু। আজও অল্প বিস্তর দেখতে পাওয়া যায়। চাতক-চাতকী ডাহুক ডাহুকী আজও বিদ্যমান—আগ্নেয়াস্ত্র নিয়ে শিকারী তাদের উচ্ছেদে রত।

প্রভাতের পাখী কুক্কুট, কাক, কোকিল প্রভৃতি। তাই কুঞ্জভঙ্গের বর্ণনায় শুনি—

পদায়ুধ কাক কোকিলের ডাক
জানাইল রজনীর শেষ।

এমন বর্ণনা সর্ব্বত্র। এ যুগের কবি মাইকেল মধুসূদনের কুঞ্জ বর্ণনাতে—মধুময় যত নিখিল জগতে সকলি সেখানে ফলে। সেথা পরিচয় পাওয়া যায় তবু মনোহর ইন্দ্রধনুর, শরতের শশীর সরসী-নীরের। মাইকেল বলেছেন—

সখীগণ চলে কবি কুঞ্জবনে কনকন ঝরে সুরে
কুসুমবাসিত সুমন্দ মলয় সুগন্ধ বিতরে দুরে।
ঘন কুহুধ্বনি ভ্রমর ঝঙ্কার শ্যামার সুন্দর তান
বেণু বীণা শ্রুত অস্ফুট কাকলী পুলকিত করে প্রাণ।

বলা বাহুল্য মাত্র চণ্ডীদাস কেন সকল প্রাচীন লেখক প্রকৃতির কতকগুলি সুকোমল বিকাশের সাথে নরদেহের অঙ্গ প্রত্যঙ্গের উপমা করেছেন। এমন কি উপমা ও উপমেয়কে নিবদ্ধ করেছেন ভাষার বাঁধন-ফাঁসে। আমাদের চলতি ভাষারও ধরণ তাই। চাঁদ-মুখ, হরিণ-প্রেক্ষণ, মরাল-গমন ইত্যাদি।

চণ্ডীদাসের অপূর্ব্ব অজস্র কবিতা হ'তে মাত্র দু-চারটা উদাহরণ দিলাম তাঁর প্রকৃতি-প্রেমের। সকল কবির মানসিক উপকরণের বিশ্লেষণে তাদের পরিচয় পাওয়া যায়। চণ্ডীদাসে এই প্রথার বাহুল্য কী বঙ্কিমচন্দ্রের মন্তব্যের একটা উপকরণ নয়?

বৈষ্ণব কবিদের বঙ্কিমচন্দ্র দুই শ্রেণীতে ভাগ করেছেন। তিনি বলেছেন—"একদল প্রাকৃতিক শোভার মধ্যে মনুষ্যকে স্থাপিত করিয়া তৎপ্রতি দৃষ্টি করেন। আর একদল বাহ্য প্রকৃতিকে দূরে রাখিয়া কেবল মনুষ্য হৃদয়েই দৃষ্টি করেন।"

তিনি প্রথম শ্রেণীর প্রধান বলেছেন জয়দেবকে এবং দ্বিতীয় শ্রেণীর মুখপাত্র বলেছেন বিদ্যাপতিকে। চণ্ডীদাসকে জয়দেবের শ্রেণীভুক্ত করেছেন। তিনি বলেছেন—

"যাহা জয়দেব সম্বন্ধে বলিয়াছি, তাহা গোবিন্দদাস, চণ্ডীদাস প্রভৃতি বৈষ্ণব কবিদিগের সম্বন্ধে বেশী খাটে।"

জয়দেবের শ্রেণীর এই প্রসিদ্ধ কবিদের সম্বন্ধে তিনি বলেছেন—জয়দেবের কবিতায় সতত মাধবী-যামিনী, মলয়সমীর, ললিতলতা, কুবলয় শ্রেণীদল স্ফুটিত কুসুম, শরচ্চন্দ্র, মধুকরবৃন্দ, কোকিল, কুজিতকুঞ্জ, নবজলধর তৎসঙ্গে কামিনীর মুখমণ্ডল, ভ্রূবল্লী, বাহুলতা, বিম্বোষ্ঠ, সরসীরুহলোচন, অলস মুখমণ্ডল, নিমেষ এই সকলের চিত্র, বাতোত্থিত তটিনীতরঙ্গবৎ সতত চাকচিক্য সম্পাদন করিতেছে। বাস্তবিক এই শ্রেণীর কবিদের কবিতায় বাহ্য-প্রকৃতির প্রাধান্য।

রবীন্দ্রনাথ বলেছেন চণ্ডীদাসকে গভীর এবং ব্যাকুল। তাঁর অভি-মতের ভিত্তিতে নিশ্চয়ই আছে চণ্ডীদাসের সেই অপরূপ ব্যাকুলতার সঙ্কেত—

দুহুঁ কোলো দুহুঁ কাঁদে বিচ্ছেদ ভাবিয়া।

যমুনা তটের একটি বর্ণনা দিয়া প্রবন্ধ শেষ করব। আবার বলি কবি চণ্ডীদাসের রসের উৎস-মুখ ছিল বাঙ্‌লার নদী-সরোবর, পশু পক্ষী, গাছ-পালা, ফল, ফুল। তাই দুটি আরাধ্যের সকল লীলায়, অঙ্গের সকল সৌন্দর্য্যে তিনি প্রকৃতির মাধুরী দেখতেন। যমুনা-পুলিন—

যমুনা নিকট যথা বংশীবট
অতি সে সুন্দর স্থল
নানা পক্ষিগণ তরুগণ তাতে
ধরে নানা ফুল ফল।
নানা পুষ্প ফুটে পরিমল উঠে
কেতকী চামেলী কুন্দ
নাগেশ্বর আদি নানা সে কুসুম
চাঁপা পারলির গন্ধ
গুলাল দুলাল ঝাঁটি গজ কুন্দ
কিংশুক আমলা কত
কদম্ব দোসরি শোভা অতি বড়ি
লাথে লাথে ফুল যত।

পক্ষীদের উল্লেখ তার পর

হংস হংসিনী চক্রবাক অতি
চকোর চকোরী ডাকে।

তারপর অবশ্য ভ্রমরা ভ্রমরী। আর সেই পরিবেশে শ্রীকৃষ্ণ—

গলে বনমালা কিবা করে আলা
দোলই হিয়ার মাঝে
অলিকুল মত লাথে লাথে কত
সতত তাহারি রাজে।

স্বাধীনতা দিবসে

শৌরীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য

স্বাধীনতা—স্বাধীনতা—কোন্ পথে এলি কবে
সর্বহারার দলে ছলিতে,
মায়াবিনীরূপধরি আগুনের স্তূপ বহি
নিজেরি আগুনে নিজে জ্বলিতে।
যেই দিন এলি তুই সে যে কী কুপ্রভাত
চারিদিকে হত্যা ও লুণ্ঠন,
তাই বুঝি মুখখানি লজ্জায় ঢেকে রেখে
খুলিস্‌নি আজো তুই গুণ্ঠন।
ভেবেছিনু না জানি কি হবে তোর মূর্ত্তি গো
সৌন্দর্য্যের মহাজ্যোতিমা,
হবি বুঝি তুই গত যুগযুগ তৃষ্ণার
ভারতের আত্মার প্রতিমা।
তারপর? তারপর যাহা তোরে অর্জিল
তাহাদেরি শৌর্য্যের দীনতায়,
হঠাৎ দেখিনু তোর চারিদিকে লজ্জায়
ভরে গেল দুর্নীতি হীনতায়।
যাহা তোরে অর্জিল তাঁহাদেরি ধ্বংসেতে
বহিল মা রক্তের লালবান,
হঠাৎ বর্বরতা ডঙ্কা উঠিল বেজে
গৌরব হল তোর খানখান।
চারিদিকে মহাপাপ আকাশ ছাপিয়া উঠে
বুক ফাটে নারীদের রোদনে,
আগমনী কিগো তোর এ মহা শ্মশান বুকে
এ জাতির মৃত্যুর বোধনে?
তবু তোরে ভালবাসি হাহাকারে গাহি গান
গুণ্ঠন কবে দিবি খুলি মা?
স্বাধীনতা—স্বাধীনতা—তবু তোরে ভালবাসি
তবু তোরে বুকে নিই তুলি মা!

বালিগঞ্জের সঙ্গে টালিগঞ্জের রেষারেষি !

এরা যেন দুই সতীন !

টালিগঞ্জের বাসিন্দাদের অভিযোগ—কৃষ্টিকেন্দ্র কেন বালিগঞ্জ হবে ? লেকের ওধারটা ভাগ্যিক্রমে পেয়ে গেছে বলেই কি বালিগঞ্জ সব তাতেই বাজিমাৎ করবে ? কৃষ্টির চূড়ান্ত উদাহরণ দেখাবার অধিকার ওরাই কি একচেটে করে রাখবে ?

কেন, টালিগঞ্জ কি ভেসে এসেছে ?

ওরাও ত' একেবারে ফেলনা নয়। লেক ত' ওদেরও গা ঘেঁষে রয়েছে। লেকের হাওয়া ত' ওদের পাড়ার ওপর দিয়েও ঝির ঝির করে বয়ে যায়।

তবে টালিগঞ্জ সকল দিক দিয়ে এতটা পেছিয়ে থাকবে কেন ?

টালিগঞ্জের চাইতে বালিগঞ্জ কিসে এত বড় হল—তারই হিসেব কষতে বস্‌ল মিলনেশ্বর মাইতি। ভুষি মাল চালান দিয়ে অবস্থা ফিরিয়েছে। এখন কৃষ্টির দিকে প্রখর দৃষ্টিপাত করেছে। অনেকখানি জমি নিয়ে টালিগঞ্জ অঞ্চলে হাল ফ্যাসানের বাড়ী তৈরী করেছে।

তারই আক্রোশ সব চাইতে বেশী।

কাজেই মিলনেশ্বর মাইতি খাতা-পেন্সিল নিয়ে হিসেব কষতে বসে গেল। চুলে আর গোঁফে মিলনেশ্বর নিজেকে অনন্য সাধারণ করে রেখেছে—যাতে সকলের দৃষ্টি পড়ে !

বালিগঞ্জের প্রত্যেক বাড়ী থেকে প্রত্যহ সন্ধ্যায় নাকি-সুরে আধুনিক গান ভেসে আসে। টালিগঞ্জে ওটার আশু চালু করা প্রয়োজন। দোলের সময় বালিগঞ্জের ছেলে-মেয়েরা এক সঙ্গে আবির ছোঁড়াছুঁড়ি করে। এ অঞ্চলে

মিলনেশ্বর মাইতি

সেটার ব্যবস্থা করা দরকার। অনেক বাড়ীতে ওরা সঙ্গীতের জলসা করে। এটার আয়োজন করা খুব বেশী শক্ত নয়। মাঝে মাঝে ওরা নাকি পরিচিত অঞ্চলে উদ্যান-সম্মেলনের আয়োজন করে। তাতে স্ত্রী-পুরুষের অবাধ মেলামেশার ব্যবস্থা থাকে। টালিগঞ্জে এই প্রথার প্রবর্ত্তন করতে হয়ত

কিছুটা সময় লাগ্‌বে। কিন্তু তবু হাল ছেড়ে বসে থাক্‌লে ত' চল্‌বে না।

এই ভাবে নানা রকমে হিসেব করতে থাকে—অতি উদ্যমী মিলনেশ্বর মাইতি।

মিলনেশ্বরের বন্ধুর নাম রত্নাকর রায়। নামেও রত্নাকর

রত্নাকর রায়

—কাজেও রত্নাকর। সে মিলনেশ্বরের সব প্ল্যান শুনে বল্‌লে, ওভাবে চল্‌লে সারা জীবন কেটে যাবে। তার চাইতে একটি "কৃষ্টিকেন্দ্র" খোলা যাক্। সেইখানেই সকল রকম "কাল্‌চার" শেখানো যেতে পারবে।

মিলনেশ্বরের ভ্রূটা জিজ্ঞাসা চিহ্নের মতো বেঁকে উঠল। জিজ্ঞেস করলে, "কৃষ্টিকেন্দ্র" ? সেটা আবার কি ব্যাপার ?

রত্নাকর উত্তর দিলে, ও! বাঙলা করে না বল্লে বুঝি তুমি বুঝতে পারবে না ? সোজা কথায় "কাল্‌চার সেণ্টার।"

এইবার বোধ করি বিষয়টা মিলনেশ্বরের মগজে প্রবেশ করল। সে চেয়ারে ব'সে ঘন ঘন মাথা দোলাতে লাগল।

তখন "কৃষ্টিকেন্দ্রের" সব পরিকল্পনা দুই বন্ধুতে ছকে ফেল্‌লে।

মিলনেশ্বর জিজ্ঞেস করলে, আইডিয়াটা ত' মন্দ করা গেল না! এখন প্রতিষ্ঠানটি খোলা হবে কোথায় ? লেকের ধারে ?

রত্নাকর উত্তর দিলে, নারে—লেকের ধারে কেন ? তা হলে ত' বালিগঞ্জের নকল করা হবে। তোর বাড়ীর একতলার ঘরগুলি ত' খালিই পড়ে আছে। ওখানে দিব্যি "কৃষ্টিকেন্দ্র" খোলা যেতে পারে। যা কিছু নতুন আইডিয়া সব এখান থেকেই রূপ লাভ করবে। তোর বাড়ীটি হবে টালিগঞ্জের তীর্থকেন্দ্র।

বন্ধুর কথা শুনে মিলনেশ্বর মনে মনে রোমাঞ্চ অনুভব করলে। তারপর মিস্ত্রীকে খবর দিলে। ঘরগুলি নতুন ডিজাইনে রঙ্ করতে হবে। একটি নটরাজের মূর্ত্তি বস্‌বে—দেয়ালের ধার ঘেঁষে। কোনে-কোনে পদ্মের আলপনা। ঘরে যে ফ্যানগুলি চল্‌বে—তার ব্লেডগুলিও হবে পদ্মের আকারে। সব কিছুই যাতে "কৃষ্টিকেন্দ্র" নামের সঙ্গতি রক্ষা করে চলে—সেদিকে প্রখর দৃষ্টি দিতে হবে।

ভেতরের সব কাজ যখন সমাধা হয়ে গেল—তখন বাইরে ফটকের কাছে শ্বেত-পাথরের ফলক পড়ল "কৃষ্টিকেন্দ্র"।

কৃষ্টিকেন্দ্রের লনের বাগানটা সাজানোর কথা ভুল্‌লেও চল্‌বে না। নানা রকম সিজন ফ্লাওয়ার এমন ভাবে বসাতে হবে—যাতে নামকরা সিনেমা তারকাদের মুখের আদল আসে। আগেকার দিনে ঘুম থেকে উঠে অহল্যা, দ্রৌপদী প্রভৃতি পঞ্চকন্যার নাম স্মরণ করতে হত। আজকের যুগে সিনেমা তারকাদের নাম জপ করলে দিন ভালো যায়।

তাছাড়া "কৃষ্টিকেন্দ্রের" অধিষ্ঠাত্রী দেবতাই হচ্ছেন—চোখ ঝল্‌সানো তারকার দল। তাদের ভুলে থাকা ত' কোনো ক্রমেই সমীচীন হবে না!

কাজেই রচিত হল সুন্দর উদ্যান।

এই উদ্যান দেখে কে না বল্‌বে—"আমি তব মালঞ্চের হব মালাকর।"

এরপর রত্নাকর রায়ের পরামর্শে রচিত হল একটি আবেদন পত্র—

টালিগঞ্জবাসীদের প্রতি করুণ আবেদন,

হে অঞ্চলবাসী ও বাসিনীগণ,

টালিগঞ্জের নামে আজকাল অনেকেই নাসিকা কুঞ্চন করে। কিন্তু কৃষ্টির ক্ষেত্রে টালিগঞ্জ কেন বালিগঞ্জ থেকে পিছিয়ে থাক্‌বে ? বালিগঞ্জের অন্ধ অনুকরণ করে আমরা এ অঞ্চলের সুনাম নষ্ট করতে চাইনে। আমরা এই অঞ্চলে কৃষ্টি বিতরণের তপস্যা সুরু করে দিয়েছি। সেই মহান উদ্দেশ্যেই "কৃষ্টিকেন্দ্র" গঠিত হয়েছে।

কে আছেন তরুণ-তরুণী, বালক-বালিকা, প্রৌঢ়-প্রৌঢ়া, বৃদ্ধ-বৃদ্ধা—সবাইকে আমরা সমভাবে কৃষ্টি-ধর্ম্মী করে তুলবো। কোনো বয়সই কৃষ্টি লাভের পক্ষে অধিক নয়। আসুন, জীবনকে কৃষ্টিমণ্ডিত করে শতদলের মতো বিকশিত করে তুলুন।

মিলনেশ্বর মাইতি
সর্ব্বাধিনায়ক
"কৃষ্টিকেন্দ্র"

এই করুন-আবেদন সর্ব্বত্র ছড়িয়ে দেয়া হল। গৃহিণীরা অন্দরমহলে রান্না করছেন—সেখানে গিয়ে উড়ে পড়ল—এই আবেদন। ছেলে-মেয়েরা বিদ্যালয় থেকে ফিরে আসছে—তাদের হাতে গুঁজে দেওয়া হল—এই আবেদন। তরুণেরা ফুটবলের মাঠ থেকে হৈ-হুল্লোড় করে ফিরে আসছে—তাদের সবাইকার হাতে গুঁজে দেওয়া হল—করুণ আবেদন। পাড়ায় নতুন বৌ আসছে—তার হাতে দেওয়া হল—এই করুণ আবেদন! শুধু কি তাই? মাসি-পিসি-খুড়ি-জেঠির দল কালিঘাট যাচ্ছেন—কিম্বা গঙ্গাস্নানে চলেছেন—তাদের গঙ্গাজলের ঘটির ভেতর কিম্বা গামছার পুঁটলীতে কৌশলে করুণ আবেদন গচ্ছিত রাখা হল! পেন্‌সন্‌প্রাপ্ত আর অবসরপ্রাপ্ত বৃদ্ধেরা মাঠে ও পার্কে ছাতা মাথায় বসে সংসারের অনিত্যতা সম্পর্কে বক্তৃতা করছেন, তাঁদেরও কোলে এসে পড়ল এই করুণ আবেদন!

এই ভাবে কৃষ্টিকেন্দ্রের করুণ আবেদনে টালিগঞ্জের আকাশ-বাতাস অশ্রু-ভারাক্রান্ত হয়ে উঠল। তার ফল ফল্‌তে বিশেষ বিলম্ব হল না।

দলে দলে শিক্ষার্থী শিক্ষার্থিনীরা এই নবগঠিত "কৃষ্টি-কেন্দ্রে" এসে ভর্ত্তি হতে লাগলো।

সেদিন সকালবেলা মিলনেশ্বর মাইতি আর রত্নাকর রায় বসে "কৃষ্টিকেন্দ্রের" নব নব পরিকল্পনার কথা আলোচনা করছে—এমন সময় মধ্য-বয়েসী এক ভদ্রলোক গাড়ী থামিয়ে একেবারে ওদের দু'জনের সাম্‌নে হুম্‌ড়ি খেয়ে বসে পড়ল।

ব্যাপারটা এত তাড়াতাড়ি ঘটে গেল যে, ওরা দুজনে কোনো কার্য্য-কারণ ঠাহর করতে পারলে না!

মিলনেশ্বর ভয়ে ভয়ে জিজ্ঞেস্ করলে, আচ্ছা ভাই রত্নাকর, লোকটার মৃগীর ব্যামো নেই ত?

রত্নাকর নীচের ঠোঁটটা বেঁকিয়ে অবজ্ঞার সুরে বল্লে, কি জানি! কিন্তু আমাদের এখানে আসা কেন? আমরা ত' আর চিকিৎসক নই!

মিলনেশ্বর মাথা নেড়ে উত্তর দিলে, ঠিক কথা!

কিন্তু লোকটা ইতিমধ্যে নিজেকে সাম্‌লে নিয়েছে। হঠাৎ চোখ দুটো কপালের দিকে মেলে ধরে বল্‌লে, একটু জল!

জল এলো, লোকটি সেই ঠাণ্ডা জল পান করে শান্ত হয়ে উঠে বসল। তারপর ক্ষীণ কণ্ঠে শুধোলে, আচ্ছা, আমি কৃষ্টিকেন্দ্রে এসে পৌছেচি ত?

এইবার মিলনেশ্বর বোধকরি কথা সুরু করবার একটা সুতো খুঁজে পেলে। আগ্রহের সঙ্গে বল্‌লে, নিশ্চয়, নিশ্চয়! আপনি বুঝি আপনার মেয়েকে কৃষ্টিকেন্দ্রে ভর্ত্তি করে দিতে চান?

রত্নাকর বাকি বক্তব্যটা লুফে নিয়ে মন্তব্য করলে, আপনি কিছুমাত্র চিন্তা করবেন না। আমরা আপনার মেয়েকে সকল রকমে আধুনিকা করে তৈরী করে দেবো।

লোকটি একটা উদ্গার তুলে উত্তর দিলে, আজ্ঞে আমার ত মেয়ে নেই। ভর্ত্তি হতে চাই আমি। আমার নাম মোহমুদ্গার কুঠারী।

মোহমুদ্গার কুঠারী

এইবার দুই বন্ধুর হেঁচকি তোলার পালা। দুই জনেই অনেকক্ষণ এ-ওর মুখের দিকে তাকিয়ে নির্ব্বাক ভাবে বসে রইল।

তারপর রত্নাকর জিজ্ঞেস্ করলে, আচ্ছা মোহমুদ্গরবাবু, আপনি এই বয়সে কৃষ্টিকেন্দ্রে ভর্ত্তি হবেন—ব্যাপারটা ঠিক বোঝা যাচ্ছে না ত!

মোহমুদ্গার কুঠারী একটা গগনভেদী দীর্ঘ নিঃশ্বাস ছেড়ে উত্তর দিলেন, গোলমরিচই আমার কাল হল!

উত্তর শুনে দুই বন্ধু একেবারে অগাধ জলে পড়ে গেল! কৃষ্টিকেন্দ্রের সঙ্গে গোলমরিচের কি সম্পর্ক?

দুজনের মুখ দিয়ে এক সঙ্গে বেরিয়ে গেল, গোলমরিচ?—অ্যাঁ! গোলমরিচ দিয়ে কি হবে? আপনি খুব গোলমরিচ খেতে ভালবাসেন বুঝি?

মোহমুদ্গার কুঠারী একটু নড়ে চড়ে বস্‌লেন। দুই বন্ধুর মুখের দিকে একবার তাকিয়ে দেখলেন। তারপর বল্লেন, আমার দুঃখের কাহিনী আপনাদের তাহলে খুলেই বলি: সারা জীবন শুধু গোলমরিচ চালান দিয়েছি। তাই ছিল আমার ধ্যান, জ্ঞান, আরাধনা। সংসার বাঁধবার বা বিয়ে করবার সময় ছিল না। যখন ব্যবসাতে অনেক টাকা জমে গেল—তখন হঠাৎ মনে পড়ল—বয়েস অনেক হয়ে-গিয়েছে, এখন বিয়ে না করলে জীবনে হয়ত আর সুযোগই পাওয়া যাবে না।

বাঙলা দেশে সব কিছুতেই ভেজাল আছে। কিন্তু ভালো করে খুঁজলে আপনি ভেজালশূন্যভাবেই পাবেন। আমিও একটু চেষ্টাতেই পেয়ে গেলাম। মেয়েটি পূর্ব্ববঙ্গ থেকে এসেছে। এইখানে নিজের চেষ্টায় বি-এ পাশ করেছে। সেতার, এস্রাজ বাজাতে পারে, ভালো নাচ-গান জানে। অনেক গুণ তার। তাকে পেয়ে আমার জীবন ধন্য হয়েছে। কিন্তু দুঃখের কথা বল্‌ব কি মশাই, সে গোলমরিচের গন্ধ সইতে পারে না। অথচ মজা দেখুন, গোলমরিচই আমার প্রাণ। সমস্ত দিন গোলমরিচের মধ্যেই কাটে। সারা দেহে আমার গোলমরিচের গন্ধ।

সুনীতা বলে, তুমি সরে বোসো আমার কাছ থেকে। গোলমরিচের গন্ধ আমি আদৌ সইতে পারি না! তারপর একদিন সে হঠাৎ বলে বস্‌ল, এতটুকু 'কাল্‌চুর' নেই তোমার বাড়ীতে।

আমি ভাবলাম, 'কাল্‌চুর' বুঝি আমচুরের মতো মেয়েদের কোনো মুখরোচক খাদ্য। তাই সারাটী দিন হন্যে হয়ে ঘুরে ঘুরে বড়বাজার ঝেঁটিয়ে নানা জাতের আমচুর জোগাড় করে নিলাম। যেটা ওর পছন্দ হয় নিজে হাতে তুলে নেবে।

—তারপর?

তারপর আর কি! পা দিয়ে সব ছড়িয়ে ফেলে দিলে। বল্‌লে, এই তোমার বাড়ীর 'কাল্‌চুর'। টাকা থাকলেই সেটা পাওয়া যায় না জেনো!

আমি ত' মাথায় হাত দিয়ে বসে পড়লাম! অনেক খোঁজা-পাতি, জিজ্ঞেসবাদ আর ছুটোছুটির পর—আমার এক বন্ধু বলে দিলে, এই কৃষ্টিকেন্দ্রে এলে কাল্‌চুরের হদিশ মিলবে। তাইত ব্যবসা-বাণিজ্য বন্ধ করে দিয়ে এলাম সেই কাল্‌চুরের সন্ধানে।

মোহমুদ্গার কুঠারী কোঁচার খুঁট দিয়ে নিজের কপালের ঘাম মুছে ফেল্‌লে।

নতুন করে মিলনেশ্বর মাইতি আর রত্নাকর রায় উৎসাহিত হয়ে উঠল।

বল্‌লে, ঠিক আছে। আপনি কিছুমাত্র চিন্তিত হবেন না। আমরা আপনাকে ছ'মাসের মধ্যে এমন 'কাল্‌চুরে' অভিষিক্ত করে তুল্‌বো যে, আপনার নব-পরিণীতা সুনীতা আপনার কাছ থেকে কাল্‌চুরের নব পাঠ নিতে এগিয়ে আস্‌বেন।

এই ঘটনার মাসখানেক বাদে একটি পুরোনো বাড়ীর গাড়ী এসে থাম্‌লো—"কৃষ্টিকেন্দ্রের" দরজার সাম্‌নে।

এক বৃদ্ধ একটি সুন্দরী তরুণীকে নিয়ে কৃষ্টিকেন্দ্রের অফিস ঘরে এসে ঢুক্‌লেন। মেয়েটি স্বাস্থ্যে-সৌন্দর্য্যে একেবারে অতুলনীয়া। দেখলে চোখ ফেরানো মুস্কিল। সদ্য-বিবাহিতা বলেই মনে হয় মেয়েটিকে। মাথার ওপর ঘোম্‌টা টানা।

মিলনেশ্বর বৃদ্ধকে জিজ্ঞেস্ করলেন, আপনার মেয়েকে ভর্ত্তি করবেন বুঝি?

বৃদ্ধ চাদর দুলিয়ে হাওয়া খাচ্ছিলেন। রত্নাকর বল্‌লে, এই যে, এই ফ্যানের তলায় এসে বসুন। গায়ের ঘাম এক্ষুণি মরে যাবে।

বৃদ্ধ আরাম করে চেয়ারে বসে বল্‌লেন, আর কপালের ফেরোর কথা বল কেন ? ও আমার মেয়ে নয়—ভাগনী। আমরা পল্লী অঞ্চলের মানুষ। ভগবানের আশীর্ব্বাদে
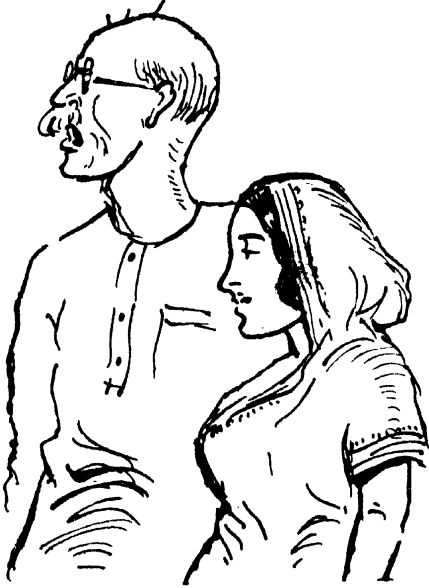
বৃদ্ধ ও তাঁর ভাগনী

অবস্থা আমার ভালই। এই ভাগনীকে আমিই মানুষ করেছি বাবা। গিন্নির সখ হল—কল্‌কাতা শহরের জামাই করবেন। জামায়ের বাড়ী-গাড়ী থাকবে। মাঝে মাঝে কল্‌কাতায় এসে কালিঘাট দর্শন আর গঙ্গা স্নান—এই বোধকরি মনোবাসনা ছিল।

মিলনেশ্বর জিজ্ঞেস্ করলে, তা মনোমত জামাই বুঝি মেলে নি ?

বৃদ্ধ আবার মাথা নাড়তে লাগলেন।

বললেন, না বাবা, সে কথা বল্‌ব না। ভগবানের দয়ায় যেমনটি চেয়েছিলাম—ঠিক তেমনটি পেয়েছি। সুদর্শন জামাই, ইঞ্জিনিয়ার—বাড়ী, গাড়ী, ব্যাঙ্কে প্রচুর টাকা। আমার ভাগ্নীকে নিজে দেখে পছন্দ করেই বিয়ে করেছিল।

—তারপর ?

—তারপর গোলমাল লাগলো বিয়ের পর থেকেই।

—কেন ? গোলমাল আবার কিসের ? এমন লক্ষ্মী প্রতিমা বৌ। ছেলের অবস্থা ভালো। নিজে ইঞ্জিনিয়ার। অশান্তি ত' হবার কথা নয় ! ও দজ্জাল শাশুড়ী রয়েছে বুঝি সংসারে ?

—না বাবা ! সে সব কিছু ঝামেলা নেই। আসলে আমাদের জামাই বাবাজীর পছন্দ হচ্ছে না আমার ভাগ্নীকে।

—কেন ? কেন ? এমন স্বাস্থ্য, এমন মুখশ্রী। শহরেই বা ক'টি মেয়ে মিল্‌বে !

—বলত বাবা ! বল ত সে কথা। আমরাও ত' সেই কথাই বলি।

—তবে ?

—তবে আমাদের জামাই বলে অন্য কথা।

—কি রকম ?

—বিয়ের পরেই সিঁথের সিঁদুর মুছে দিয়েছে। বলে, আমার সঙ্গে পার্টিতে যেতে হবে। ওসব সেকেলে-পনা চল্‌বে না। মেয়ে প্রতিদিন সন্ধ্যায় লক্ষ্মীর কাছে প্রদীপ দেয়। জামাই সে সব ভেঙে ফেলেছে। বল্‌ছে কুসংস্কার। ওকে আবার ইস্কুলে ভর্ত্তি করে দেবে। কিন্তু বাবা, সাড়ী কি করে পরতে হয়, নখ কি করে রাঙাতে হয়, মুখে কি করে চুনকাম করতে হয়—এ সব ত' আমরা পাড়াগাঁয়ে শেখাই নি। তাই জামাই রাগে গর্‌গর্ করে। বলে, মাকাল ফলের মতো শুধু রূপ থাকলে কি হবে ? কাল্‌চার দিয়ে তার দীপ্তি ফুটিয়ে তুল্‌তে হবে। আমরা কর্ত্তা-গিন্নি ভেবে ভেবে মরি। মেয়েটার এম্‌নি যা দীপ্তি আছে তাই সবাই অবাক হয়ে তাকিয়ে দেখে ! আবার ওর আলাদা দীপ্তি কি করে ফোটাবো ?

আমাদের পাড়ার এক বখা ছোঁড়া চুল উল্টে ঘুরে বেড়ায়। সে সব কিছু শুনে বল্‌লে, আপনাদের মেয়েকে "কৃষ্টিকেন্দ্রে" ভর্ত্তি করে দিন, সব ঠিক হয়ে যাবে। আমরা ত' আকাশ-পাতাল ভেবে মরি—কোথায় কৃষ্টিকেন্দ্র। তখন ছেলেটি ঠিকানা দিতে ভাগনীকে নিয়ে সোজা এইখানে চলে এসেছি। তোমরা আমার ছেলের মতো। ভাগনীটিকে সব শিখিয়ে পড়িয়ে দাও, যাতে আমাদের জামায়ের মনে ধরে।

সব শুনে মিলনেশ্বর হাস্‌বে কি কাঁদ্‌বে—ঠিক বুঝতে পারে না। ওদের যে এত গুণ—সে কথাও এর আগে জানা ছিল না ! সত্যিই কি কৃষ্টিকেন্দ্র খুলে ওদের কোনো 'বিভূতি' লাভ হয়েছে ?

যাই হোক, বাইরে কোনো চাঞ্চল্য প্রকাশ করা হবে না। সিদ্ধিলাভ করা সন্ন্যাসীর মতো ধীর-গম্ভীর কণ্ঠে মিলনেশ্বর সান্ত্বনা দিয়ে বল্‌লে, আপনি কোনো কিছু ভাববেন না। আপনার ভাগ্‌নীকে আমরা একেবারে জামায়ের মনোমত করে গড়ে দেবো। তখন সে কেবলি বৌয়ের পায়ে পায়ে ঘুরবে—আর মন জুগিয়ে চল্‌বে।

বৃদ্ধের মন থেকে যেন একটা বিরাট বোঝা নেমে গেল। ডান হাতটা তুলে বল্‌লেন, তাই করো বাবা, তাই করো। ওর দীপ্তি ফুটে বেরুলেই জামায়ের হাতে ওকে তুলে দিয়ে আমরা বুড়ো-বুড়ী একেবারে কাশীবাসী হবো—ঠিক করে ফেলেছি। সংসারের ভেজালে আর নয়।

পল্লী অঞ্চলের সুন্দরী মেয়ে কৃষ্টিকেন্দ্রে ভর্তি হল—দীপ্তি ফুটিয়ে তোলবার জন্যে।

আরো কয়েকদিন পরের কথা।

একটি কলেজের ছেলে, একটি কলেজের মেয়েকে সঙ্গে নিয়ে ধীর পদক্ষেপে কৃষ্টিকেন্দ্রে এসে হাজির হল। প্রথমে ছেলেটি একটু ইতস্তত করছিল।

কিন্তু মেয়েটি এগিয়ে গেল একেবারে সপ্রতিভের মতো।

মিলনেশ্বর জিজ্ঞেস্ করলে, তোমরা ভর্তি হবে বুঝি ?

মেয়েটি উত্তর দিলে, হ্যাঁ, ভর্তি হবো। কিন্তু আমাদের একটু আলাদা ব্যবস্থা করতে হবে।

—কি রকম ?

—মানে—আমরা কলেজ থেকে সোজা এখানে চলে আস্‌বো কিনা। আমাদের কৃষ্টি সম্পর্কে অনেক কিছু আলোচনার আছে। তাই দুপুরবেলাটা নিরিবিলি আলোচনার জন্যে একান্তে একটি ছোট্ট কামরা চাই। অবশ্য টিউশন ফী ছাড়াও আমরা এক্সট্রা পে' করবো।

মিলনেশ্বরের মুখে মৃদু হাসি ফুটে উঠল। ধীর কণ্ঠে উত্তর দিলে, কৃষ্টি বিতরণের জন্যে আমরা সব রকম আয়োজনই করে দেবো। তোমাদের ভাবনার কোনো কারণ নেই।

এই কলেজের ছেলেটি আর মেয়েটি 'কৃষ্টিকেন্দ্রের' প্রায় প্রচার সচিবের কাজ করলে। ওদের কাছ থেকে নিরাপদ আশ্রয়ের হদিশ পেয়ে—বিভিন্ন কলেজের ছেলে-মেয়েরা দলে দলে এসে ভর্তি হতে লাগলো।

কৃষ্টিকেন্দ্রের একেবারে বাড়-বাড়ন্ত হতে থাক্‌ল। রত্নাকর বুদ্ধি করে একটি কফি হাউস এবং টিফিনের জন্য একটি ক্যান্টিন খুলে দিলে। তাতেও লাভ হতে লাগ্‌লো প্রচুর।

সারা শহরে এই ভাবে কৃষ্টিকেন্দ্র সাড়া জাগিয়ে তুল্‌লো।

কিন্তু আরো বিস্ময় জমা হয়েছিল—টালিগঞ্জের অধিবাসীদের জন্যে।

কিছুদিন বাদে পাড়ার লোকেরা অবাক হয়ে তাকিয়ে দেখল—"কৃষ্টিকেন্দ্রের" নেম প্লেট সরে গেছে—তার সেই জায়গায় জ্বল্ জ্বল্ অক্ষরে নিয়ন লাইট জ্বল্‌ছে। জ্বল্‌ছে আর নিভছে—

"বৈজ্ঞানিক প্রজাপতি অফিস্"
আধুনিক তরুণ-তরুণীদের রাজজোটক বিচার
করা হয়।

শোনা গেল, অতি শীঘ্রই এই প্রতিষ্ঠানের বিশাল অট্টালিকা লেকের ধারে তৈরী হবে। তাতে যদি বালিগঞ্জ আর টালিগঞ্জের চিরকেলে ঝগড়া মিটে যায়।
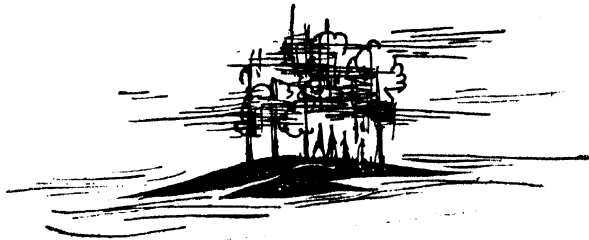
মানসিক ব্যাধি সম্বন্ধে ভ্রান্ত ধারণা

অধ্যাপক শ্রীঅজিতকুমার দেব এম-এস-সি, এম-বি, ডি-পি-এম (লণ্ডন)

শারীরিক ব্যাধির মত মানসিক ব্যাধিও যে একটি রোগ এবং রোগের প্রারম্ভে চিকিৎসায় রোগী সম্পূর্ণ নিরাময় হ'য়ে স্বাভাবিক মানুষ হ'তে পারে আমাদের দেশের লোক এই সত্যটিকে এখনো উপলব্ধি করিতে পারেন না। প্রথমে যখন রোগের লক্ষণ প্রকাশ পায় তখন রোগীর আপন জনেরা মনকে আঁখি ঠারিয়া বোঝাতে চেষ্টা করেন যে মনের এই বৈলক্ষণ্য কিছুই নয় এবং এসব সামান্য উপসর্গ মাত্র—যা আপনিই দূর হবে। তারপর উন্মাদ রোগী যখন প্রবল উত্তেজনার বশে বাড়ীতে ভীষণ গোলোযোগ করে তখনই ডাক পড়ে মনো-চিকিৎসকের উত্তেজনা প্রশমনের জন্য। উত্তেজনা প্রশমিত হওয়ার পর রোগীর চিকিৎসার জন্য আর কেউই চিন্তা করার প্রয়োজন বোধ করেন না, রোগের কারণ নির্ণয়ের জন্য কেউই ব্যস্ত নয় এবং অধিকাংশ ক্ষেত্রেই প্রাথমিক চিকিৎসার পর আর চিকিৎসা করানো হয় না। রোগীর আপন জনেরা রোগের কারণ সম্বন্ধে বিচিত্র অভিমত প্রকাশ করে থাকেন—যথা, পরীক্ষায় অকৃতকার্য্য হওয়া, বিবাহের পর শ্বশুরালয়ের দুর্ব্যবহার, কলকারখানা বা অফিসের সহকর্মীদের বিদ্রূপ, খাদ্য বা পানীয়তে বিষ প্রয়োগ বা তুক-তাক করা, বাণমারা প্রভৃতি ভৌতিক ব্যাপার। 'পাগল' কথাটাই যেন একটা বিশেষ আপত্তিকর কথা এবং কোনো এই জাতীয় অঘটন ঘটিলেই মানুষে দৈহিক ব্যাধির মধ্যে মনোরোগের কারণ অনুসন্ধানে ব্যস্ত হয়। কবে ছেলেবেলায় পড়ে গিয়ে মাথায় সামান্য আঘাত লেগেছিল, টাইফয়েড হয়েছিল বা কুকুরে কামড়েছিল তা' নিয়ে গবেষণার অন্ত নাই। কেহ বা হস্তমৈথুনের মন্দ অভ্যাসকে ব্যাধির কারণ প্রতিপন্ন করেন। সাধারণতঃ দেখা যায় যাঁর যে রকম চিন্তাধারা তিনি সেইভাবে রোগের কারণ নির্দেশ করেন। মনোচিকিৎসকের সাহায্যগ্রহণেও লোকে ইতস্ততঃ করেন। পাগল কথাটার ভিতর যে শ্লেষ আছে, তার থেকেই উৎপত্তি পাগলের চিকিৎসককে এড়িয়ে চলার মনোবৃত্তি। সেজন্য পাগলের চিকিৎসককে আনার সময়ে রোগীর আপন জনেরা চারিদিক দেখে নেন কেউ লক্ষ্য করলে নাকি এই লজ্জাকর ব্যাপারটি। কিন্তু লুকোচুরীর খেলা কতক্ষণই বা চলিতে পারে। কারণ উত্তেজিত রোগী পরক্ষণেই তারস্বরে চিৎকার করিতে থাকে বা উগ্রমূর্ত্তি ধারণ করে ছুটোছুটি, দাপাদাপি আরম্ভ করে। এই লজ্জা সরমের মূলে আছে পর্বত-প্রমাণ অজ্ঞতা, কুসংস্কার এবং ভ্রান্ত ধারণা।

প্রাথমিক পরীক্ষার পর রোগীর আপন জনেরা প্রশ্ন করেন, ডাক্তার-বাবু, রোগীকে পরীক্ষা করে কি বুঝলেন? রোগের কারণ কি? এবং ডাক্তারকে জানাবার জন্য ব্যস্ত হন যে তাঁদের বংশে কেহ কখনো এরোগাক্রান্ত হয় নি।

কিন্তু বংশগত দোষের কথা না বলাই ভালো, কারণ পূর্ব্বপুরুষদের কথা আমরা অনেক সময়েই সঠিক জানি না। তারপর মানসিক ব্যাধি কিভাবে পুরুষানুক্রমে পরিব্যাপ্ত হয় সে বিষয়েও আমাদের জ্ঞান সম্পূর্ণ নির্ভুল এবং নির্ভরযোগ্য নয়; তবে একথা জোরের সঙ্গে বলা যায় যে, যে-পরিবারে একটি জড়বুদ্ধি শিশু আছে ঐ পরিবারে পরবর্ত্তীকালে ঐরূপ শিশু জন্মগ্রহণ করার সম্ভাবনা আছে।

রোগীর অভিভাবকেরা প্রায়ই প্রচার করে থাকেন—'আমাদের রোগী তেমন পাগল নয়—ওর সঙ্গে কথা কয়ে' বুঝতে পারবেন যে ও পাগল? ও আপনার যে কোনো প্রশ্নের নির্ভুল উত্তর দেবে। তা ছাড়া ওর মত ভালো এবং বাধ্য ছেলে দেখা যায় না; কখনো কোনো খারাপ ছেলের সঙ্গে মেশে না।'

এ সকল কথাবার্ত্তা বিশ্লেষণ করিলে দেখা যায় যে রোগ প্রকট হওয়ার পূর্ব্বে তার ব্যবহারে যে সূক্ষ্ম পরিবর্ত্তন হচ্ছিল ধীরে ধীরে রোগীর অভিভাবকেরা তা লক্ষ্য করেন নাই। রোগীকে প্রশ্ন করে ও তার উত্তর শুনে রোগ নির্ণয় করার চেষ্টা করা হয়। কিন্তু রোগীর ভাবভঙ্গী, ব্যবহার, চাঞ্চল্য, ঔদাসিন্য প্রভৃতির প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে তার মনের খবর ভালোরূপে জানা যায়। রোগীর বক্তব্যর চেয়ে তা'র বলার ভঙ্গী বিশেষভাবে লক্ষণীয়। অভিভাবকের কঠিন শাসনাধীনে ছেলে-মেয়েরা তাদের মনোবাসনা বা ভয়ের কথা প্রকাশ করিতে দ্বিধাবোধ করে—এই রকমের অবদমিত কিশোরকে অতিবাধ্য এবং সচ্চরিত্র আখ্যা দেওয়া হয়। মনোভাব প্রকাশের সুযোগ না পাওয়ায় ভাবপ্রবণতা, লাজুকতা ও ভীরুতা এদের প্রকৃতির বৈশিষ্ট্য হ'য়ে দাঁড়ায়। এই সমস্ত কিশোর-কিশোরী আত্মচিন্তায় বিভোর হ'য়ে নিঃসঙ্গ জীবনযাপনই শ্রেয়ঃ মনে করে। লোকের সঙ্গে মেলামেশা ত্যাগ করিয়া এই নিয়া দিন কাটায়। অভিভাবকেরা ছেলেমেয়ের এই আচরণ আদর্শ আচরণ মনে করেন এবং এই ভ্রান্ত দৃষ্টি-ভঙ্গীর মধ্যে অন্তর্নিহিত থাকে ভবিষ্যৎ মানসিক ব্যাধির মূল!

অভিভাবকেরা আরেকটি প্রশ্ন করেন মনোচিকিৎসককে যে—এই রকমের রোগী তিনি পূর্ব্বে আর দেখেছেন কি-না? অর্থাৎ তাঁদের বক্তব্য হচ্ছে যে বিভিন্ন লোকের প্রকৃতি যেমন বিভিন্ন, তেমনি তাদের রোগেরও বৈশিষ্ট্য থাকাই সম্ভব এবং এই লক্ষণগুলি অন্য রোগীর দেখা যায় না। তখন অভিভাবকদের বোঝানো দরকার যে রোগটি—মোটের উপর অসাধারণ নয় এবং ঠিক মত ব্যবস্থা না করার জন্য রোগের প্রকোপ উত্তরোত্তর বেড়েই চলেছে। অনেকে আবার প্রশ্ন করেন—রোগের নামটি কি? উদ্দেশ্য যে নামটি জানিলে অন্য চিকিৎসকের কাছে গিয়া আলোচনা এবং যাচাই করা—যে চিকিৎসক ঠিক রোগটি ধরতে পেরেছেন কিনা। আবার অনেকে চিকিৎসকের কাছে রোগের নাম জেনে মনো-

বিদ্যার সংক্ষিপ্ত পুস্তক পাঠ করে চিকিৎসকের বিদ্যা পরখ করিতে থাকেন। কিন্তু চিকিৎসা ও চিকিৎসকের সম্বন্ধে প্রচলিত চিরন্তন কথাটি রোগীর অভিভাবকদের স্মরণ রাখা একান্ত প্রয়োজন—সেটি হ'ল উপযুক্ত বিশিষ্ট চিকিৎসক ঠিক করিয়া তাঁর উপর সম্পূর্ণ বিশ্বাস রাখা ও নির্ভর করা প্রয়োজন। এরকম সন্দিগ্ধ এবং দ্বিধাগ্রস্ত মনোভাব পোষণ করিলে রোগীকে সাহায্য করা যায় না—রোগীকে ছেড়ে তত্ত্বকলার বাদ-প্রতিবাদের সৃষ্টি হয়, চিকিৎসা সঙ্কটের সম্ভাবনা দেখা দেয়, ফলে সময় নষ্ট হয়। এই প্রকার দ্বিধাগ্রস্ত মনোভাব নিয়া অভিভাবকেরা বহু চিকিৎসকের সঙ্গে আলাপ-আলোচনা করেন—কিন্তু কাহারো পরামর্শ গ্রহণ করেন না, ফলে রোগীর কোনো উপকারই হয় না এবং সেই রকমের অভিভাবক এই সিদ্ধান্তে উপনীত হ'ন যে রোগটি যে কি তা' কোনো চিকিৎসকই ঠিক ধরিতে পারিলেন না। তাঁরা নূতন মনোচিকিসকের সন্ধান পাইলে তাঁর কাছে বলেন যে অনেক বৈদ্যই ত দেখালাম—ফল হ'ল না কিছু। আসলে কিন্তু তাঁরা রোগীর মতই—পাগল বা পাগল কথাটি পছন্দ না করার জন্যে রোগী যে পাগল নয় সেই তত্ত্বটি প্রমাণ করার জন্য শশব্যস্ত! কিছুতেই তুষ্ট না হ'য়ে এই সকল অভিভাবক বারবার রোগীর মলমূত্র, রক্ত ও যাবতীয় দৈহিক রস পরীক্ষায়, এক্সরে এবং এনকেফেলোগ্রাফি প্রভৃতিতে অযথা প্রচুর অর্থব্যয় করেন। বলা বাহুল্য এই সকল আড়ম্বরের ব্যবস্থাও হয় এমন চিকিৎসকের পরামর্শে যাঁরা মনোরোগ বিশেষজ্ঞ নন; কিন্তু অভিভাবককের মনের কন্দরে আছে বদ্ধমূল ধারণা তাঁদের রোগী পাগল নয় এবং সেজন্য এই সকল পরামর্শ শিরোধার্য্য করিয়া সেইরূপ ব্যবস্থা হয়। বিশেষজ্ঞকে রোগী দেখাবার পূর্ব্বেই অনেকে এই সমস্ত পরীক্ষার কাগজপত্র হাজির করেন যেন এই সকল পরীক্ষার ফলাফলের প্রয়োজনীয়তা রোগীকে পরীক্ষা করার চেয়ে অনেক বেশী। এই মনোবৃত্তির জন্যই অধিকাংশ ক্ষেত্রে চিকিৎসাপ্রসঙ্গে যাঁরা মনোরোগের বিশেষজ্ঞ নন তাঁদের মতকে প্রাধান্য দেওয়া হয়। রোগের উগ্রাবস্থায় যখন রোগীকে বাড়ীতে সামলানো সম্ভবপর নয় এবং তা'কে হাঁসপাতালে ভর্ত্তি করা একান্ত প্রয়োজন—তখনো নানা ওজর আপত্তি উঠে। যে রোগীর বাড়ী থেকে পালানোর সম্ভাবনা আছে অথবা রোগী যদি আহার-নিদ্রা ত্যাগ করে, ওষুধ না খায় বা সর্ব্বদাই উত্তেজিত হ'য়ে আপনজনকে গালিমন্দ করে এবং মারমুখী হয় বা বারম্বার আত্মহত্যার কথা বলে, সে সকল রোগীকে বাড়ীতে রেখে চিকিৎসা করার চেষ্টা না করাই যুক্তিযুক্ত। এরকম ক্ষেত্রেও রোগীর অভিভাবক ও আত্মীয়-স্বজনেরা মন্তব্য করেন যে হাঁসপাতালে অন্য রোগীকে দেখিলে তাঁদের রোগীর অবস্থার আরো অবনতি হওয়ার সম্ভাবনা আছে। কিন্তু এসকল ক্ষেত্রে দেখা যায় রোগীকে হাঁসপাতালে ভর্ত্তি করিয়া সামান্য ওষুধেই তার বেশ উন্নতি হয়। এর কারণ বাড়ীতে যে পরিবেশের মধ্যে রোগ সৃষ্টি হয় সেখান থেকে অন্যত্র নিয়ে গেলে সে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে এবং দ্রুত আরোগ্যলাভ করে। কিন্তু দেখা যায় রোগীর কিছুটা উন্নতি হ'লেই অভিভাবকেরা রোগীকে গৃহে ফেরানোর জন্য ব্যস্ত হ'য়ে পড়েন। কিন্তু পুরাতন পরিবেশের মধ্যে ফিরিয়া গেলে রোগের পুনরাবির্ভাবের বিশেষ সম্ভাবনা। অবশ্য হাঁসপাতাল হ'তে তাড়াতাড়ি রোগীকে ঘরে ফিরিয়ে আনার জন্য যে ব্যস্ততা ইহার প্রধান আরেকটি কারণ অর্থাভাব। মনোচিকিৎসা ব্যয়সাপেক্ষ, হাঁসপাতালে রাখার ব্যয়ও অত্যধিক। এখনো পর্য্যন্ত আমাদের দেশে স্বল্প ব্যয়ে মনোরোগের চিকিৎসার ব্যবস্থা হয় নাই। রোগীর অভিভাবক বা আত্মীয়-স্বজনেরা ঠিকভাবে রোগীকে চিকিৎসা করিতে হ'বে তাহারও নির্দ্দেশ দেন। আজকাল অনেকপ্রকার চিকিৎসার কথা সাধারণে জানিতে পারায় এঁরা নিজেদের পছন্দমত চিকিৎসা-ব্যবস্থার জন্য পীড়াপীড়ি করিতে থাকেন। কেউ বা চান—ইলেকট্রিক শক-চিকিৎসা, কারো বা অনুরোধ মনঃসমীক্ষণের ব্যবস্থা। এই সকল অভিভাবক চিকিৎসকের উপর ভার দিয়া নিশ্চিন্ত হ'তে পারেন না। অনেকে আবার জানান যে রোগী না সারিলে তাঁদের সম্মানে আঘাত লাগিবে। যেন রোগ না সারাটা একটা লজ্জার বিষয় এবং আরোগ্য হওয়াই একটা স্বাভাবিক ব্যাপার এবং না হওয়াই আশ্চর্য্য। পূর্ব্বে ইলেকট্রিক চিকিৎসার প্রতি লোকের মনে আতঙ্ক ছিল কিন্তু এখন ডাক্তার ইলেকট্রিক চিকিৎসার ব্যবস্থা না করিলে রোগীর আপন-জনেরা অনেক সময়ে ক্ষুণ্ণ হন যে চিকিৎসা ব্যবস্থা সম্পূর্ণ হল না। সম্পূর্ণ বধির রোগীর জন্যও মনঃসমীক্ষণ ব্যবস্থায় অনেক সময়ে অভিভাবকেরা আগ্রহান্বিত হন। অনেক সময়েই যাঁরা বিশেষজ্ঞ নন এই সকল ব্যক্তি বা চিকিৎসক রোগীর আত্মীয়-স্বজনের মনে এই সব উদ্ভট ধারণা ঢুকাইয়া দিয়া চিকিৎসার অহেতুক বিঘ্ন ঘটান।

এই সমস্ত অভিভাবক রোগীর যখন উগ্র অবস্থা সে সময়ে হাঁসপাতালে ভর্ত্তি করে দিতে রাজী হন কিন্তু প্রশমিত হওয়ার সঙ্গে-সঙ্গেই রোগীকে ঘরে ফিরিয়ে নিয়ে যান। এর ফল হয় অত্যন্ত খারাপ। কারণ কিছুদিন পরেই আবার রোগ দেখা দেয় এবং রোগের উগ্রতা বৃদ্ধি পেলেই অনুযোগ করা হয় চিকিৎসা অসমাপ্ত রয়ে গেছে। কথাটি সত্য, কিন্তু অসমাপ্ত থাকার জন্য অভিভাবকেরাই দায়ী। সর্ব্বদা মনে রাখা প্রয়োজন যে চিকিৎসার মূল উদ্দেশ্য রোগের উগ্রতা কমানো নয়, উদ্দেশ্য হচ্ছে রোগীকে সম্পূর্ণ নিরাময় করা। রোগীকে সম্পূর্ণ নিরাময় করিতে হ'লে রোগী শান্ত হ'বার পর তাঁর মনের খবর নেওয়া দরকার এবং তা'কে শেখাতে হ'বে কি ভাবে জীবনের বন্ধুর পথে সুস্থ মস্তিষ্কে চলিতে হয়। ত্রুটিপূর্ণ শিক্ষা যে মনোরোগের একটি প্রধান কারণ, তা ইদানীং অনেকেই উপলব্ধি করিতে পেরেছেন। শিক্ষার ত্রুটির জন্য আমরা পরস্পরকে বুঝিতে বা চিনিতে পারি না এবং এর ফলে হয় যতপ্রকার বিরোধ, শত্রুতা এবং যুদ্ধবিগ্রহের সৃষ্টি। এই ভুল বোঝা এবং ভুল দৃষ্টিভঙ্গীর জন্যই অধুনা মানসিক ব্যাধির বিস্তৃতি ঘটেছে সারা পৃথিবীতে। রোগী যাতে সম্পূর্ণরূপে নীরোগ হয় তা'র জন্য প্রয়োজন মনচিকিৎসার সাহায্যে তা'র চরিত্র পুনর্গঠন করা এবং সঙ্গে-সঙ্গে আত্মীয়-স্বজনকেও শিক্ষা দেওয়া—হাঁসপাতাল থেকে প্রত্যাবর্ত্তনের পর তার সঙ্গে কিরূপ ব্যবহার করা দরকার। যে পরিবেশে রোগের সৃষ্টি হয়েছে সে পরিবেশের পরিবর্ত্তন না হলে রোগের পুনরাবির্ভাব অনিবার্য্য। সহৃদয় দৃষ্টিভঙ্গি, সহানুভূতি ও উপযুক্ত বোঝাপড়ার অভাবে রোগী সম্পূর্ণ নিরাময় হ'তে
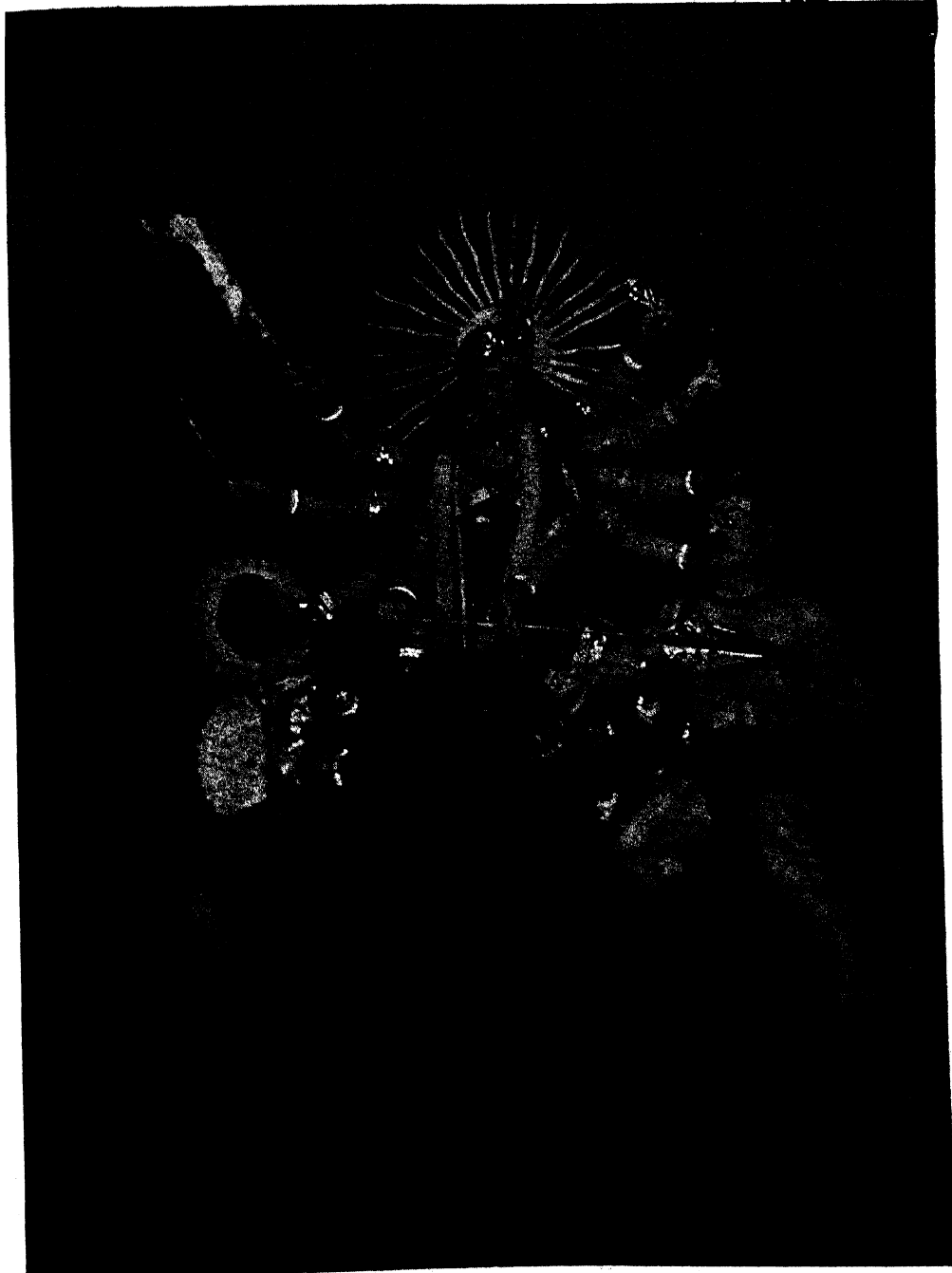
ভারতবর্ষ প্রিন্টিং ওয়ার্কস্

দেবী দুর্গা

ফটো : সমর মিত্র
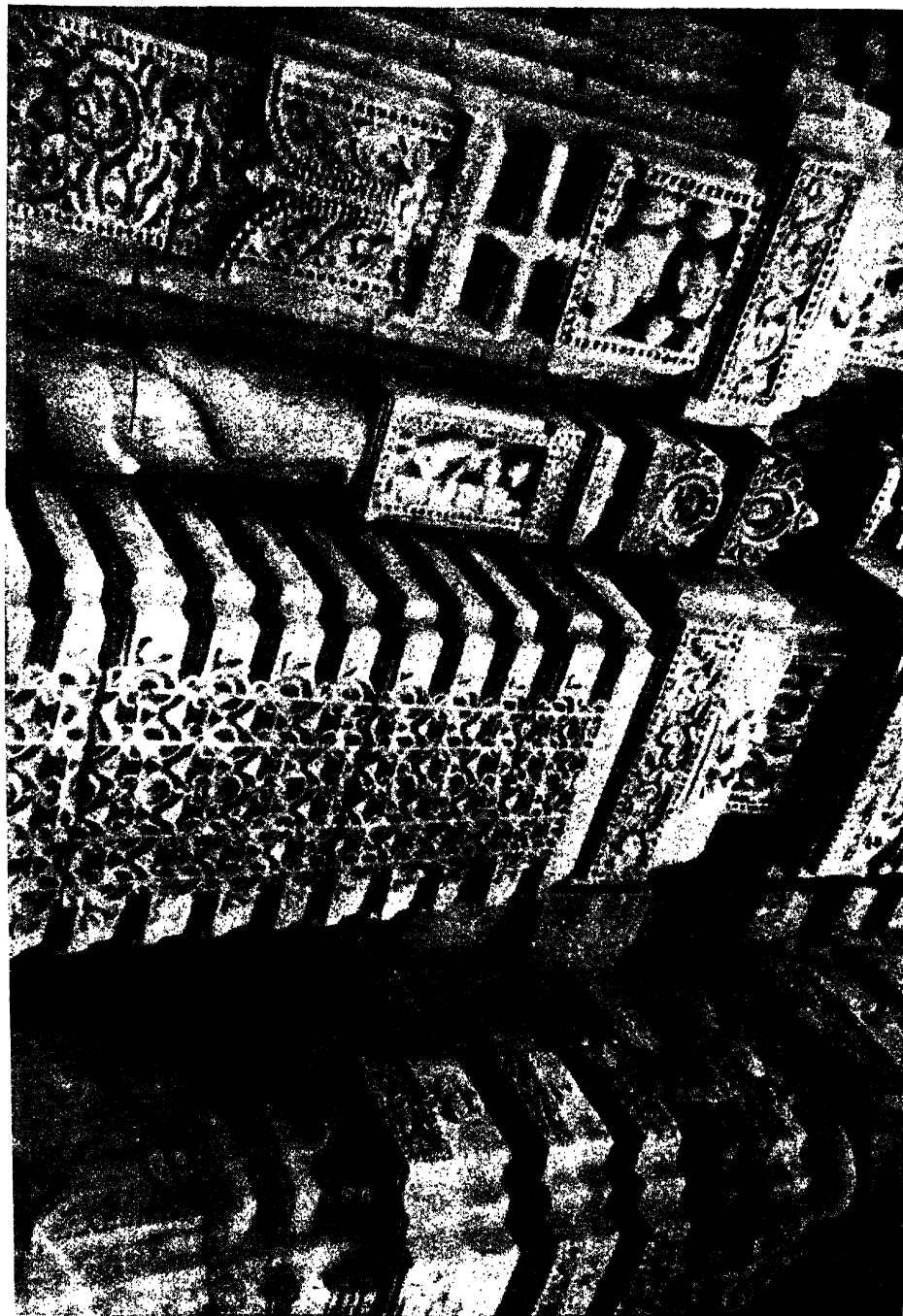
পারে না। নাচ গান বাজনা, ছবি আঁকা, হস্তশিল্প, বই পড়া এ সকলেরই প্রয়োজন আছে রোগীর চরিত্র গঠন এবং যথোপযুক্ত পুনর্বাসনের জন্য। এই ভাবে রোগী কর্ম্মে নিযুক্ত থাকিলে তা'র মনোবল বৃদ্ধি পায় এবং সে উপলব্ধি করে যে তারও পৃথিবীতে অনেক কিছু করার বা দেওয়ার মত আছে। অপরের সঙ্গে মেলামেশার সুযোগ পেলে সে আর একাকী নিঃসঙ্গ জীবনযাপন করে' রোগের চিন্তায় মুহ্যমান্ হ'য়ে দিন কাটাবে না। এই রকমের ব্যবস্থার দ্বারাই মানসিক ব্যাধির প্রতিরোধ সম্ভবপর।

প্রবন্ধ শেষ করার পূর্ব্বে আরেকটি বিষয়ের উল্লেখ করা প্রয়োজন। সেটি হ'ল সিনেমার কথা। চিত্রজগৎ আমাদের আবাল-বৃদ্ধ-বনিতার মনের উপর একাধিপত্য বিস্তার করেছে বললে অত্যুক্তি করা হয় না। সিনেমার যে সকল চমকপ্রদ দৃশ্য ও ঘটনা দেখানো হয় সেগুলি অ-বাস্তব এবং অধিকাংশ ক্ষেত্রে ছেলেমেয়েদের অপরিণত মনকে বিভ্রান্ত, অস্থির ও চঞ্চল করে তুলে। সিনেমার কোনো বিশিষ্ট চরিত্রের মধ্যে নিজের সত্তা হারিয়ে ফেলে ছেলে-মেয়েরা তার লঘু অনুকরণে প্রবৃত্ত হয়। সংযমের বাঁধ টুটে গেলেই আনন্দ পাওয়া যায় না—আনন্দের জন্যও প্রস্তুতি প্রয়োজন। আজকাল আবার ব্যাধিগ্রস্ত মনের এমন কতকগুলি ছবি তোলা হচ্ছে তা'র সঙ্গে বাস্তবের কোনো সম্পর্ক নাই। এগুলিকে মানসিক ব্যাধির বিকৃত চিত্র বলা চলে। এই সকল ছবির মাধ্যমে মানসিক ব্যাধির ও তা'র চিকিৎসা প্রণালী সম্বন্ধে সাধারণের মনে ভ্রান্ত-ধারণার সৃষ্টি করা হয় মাত্র। এ ধরণের ছবি আনন্দদায়ক ত নয়ই, বরং পাগলের সংখ্যা-বৃদ্ধিরই সহায়তা করে। আমার মতে পাগলের ছবি যত কম দেখানো যায় ততই ভালো, কারণ এ সকল ছবি সমাজের পক্ষে আদৌ কল্যাণকর নয়। যাঁরা সমাজের প্রকৃত হিতাকাঙ্ক্ষী তাঁদের কাছে আমার নিবেদন যেন অর্থের মোহে তাঁরা মানুষের দুঃখ-দুর্দ্দশা এবং রোগের বিকৃতরূপ সিনেমার মাধ্যমে মানুষকে দেখিয়ে তা'র সুস্থ মনকে ব্যস্ত না করেন। আনন্দের খোরাক যোগানর সঙ্গে মানুষের মনকে শান্ত, সংযত ও সুষমাময় করে তোলাই হ'ল সিনেমার প্রযোজক এবং পরিচালকদের কর্ত্তব্য, তাঁদের স্মরণ রাখা উচিত দেশ এবং সমাজগঠনে তাঁদেরও দায়িত্ব আছে।

বিস্মরণ-ব্যথা

শ্রীদিলীপকুমার রায়

তুমি যে পতিতপাবন, কৃপাল—জানে জানে প্রাণ
আমার :
শুধু এই মন কালো আমার—ভুলে তাই যায় সে
বারে বার।

জানি হে : তুমি দীনবন্ধু—দয়াময় যে তোমার নাম,
বিরাজে ভক্তেরি অন্তরে তোমার নিত্যানন্দধাম,
শুধু সে ভক্তি কোথায়—গায় যে :
"আমি তোমারি শুধু?"
বাসি তবু : মলিন আমার মনে তোমায় ডাকতে যে বঁধু!
তুমি যে ভক্তবছল, কৃপাল—জানে জানে প্রাণ আমার :
শুধু এই মন কালো আমার—ভুলে তাই যায় সে
বারে বার।

তুমি নাথ, প্রেমেরি অধীন—সাধে যেই প্রেমে
তোমায়—পায়,
পারো না থাকতে দূরে—যেম্‌নি কেঁদে কেউ
ডাকে তোমায়।
শুনে নাম তোমার কবে বইবে ধারা নয়নে সদাই?
সে-আগুন জ্বলবে কবে—'আমি আমার'
দেয় ক'রে যে ছাই?
ডাকলেই দাও যে দেখা, কৃপাল—জানে জানে
প্রাণ আমার :
শুধু এই মন কালো আমার—ভুলে তাই যায়
সে বারে বার।

অভিমান না যদি হয় লয়—পাব না বন্ধু কি তোমায়?
যত না হই অবলা, ম্লান—পাব না শরণ রাঙা পায়?
মীরা গায় : হ'য়ে দাসী দাঁড়িয়ে রবো দুয়ারে তোমার,
শ্রীচরণ ধরব—ছেড়ে প্রিয় পরিজন গৃহ সংসার।
আমাকে করতে আপন, কৃপাল—জানে জানে
প্রাণ আমার
শুধু এই মন কালো আমার—ভুলে তাই যায়
সে বারে বার।

ইন্দিরাদেবীর সমাধিশ্রুত মীরা-ভজনের অনুবাদ।

হরিকৃষ্ণ মন্দির

নরেন্দ্র দেব

শ্রাবণ মাস। চলেছে অবিরল ধারাবর্ষণ : আকাশের কান্না যেন আর থামে না। দিবা-রাত্রিই ঝরছে—ঝর ঝর বারিধারা। বাড়ী থেকে সংকল্প করে বেরিয়েছিলুম পুনায় এবার যেতেই হবে। ছত্রপতি শিবাজীর কীর্তি-স্মৃতি বিজড়িত পুনা। একদা স্বাধীন মহারাষ্ট্রের গৌর-বোজ্জ্বল রাজধানী ছিল এদেশ। চারিদিক দুর্ভেদ্য পর্বতমালায় ঘেরা এই পুনা। ঘন অরণ্য পরিবেষ্টিত এক মনোরম ভূমি। দুটি বিশাল গিরি-নদীর সঙ্গমতীরে এই সুন্দরী নগরী। পুনার মাটিতে মিশে রয়েছে সাধু রামদাস স্বামীর পুণ্য পদধূলি। মিশে রয়েছে কত মারাঠাবীরের মহান বীরত্বের ইতিহাস। বড় ভাল লাগে আমার এই শিখর সমারোহে সমৃদ্ধ স্নিগ্ধ নির্জন পুরী। প্রকৃতির বিচিত্র সৌন্দর্য একে নানা ঐশ্বর্যে ঘিরে রেখেছে। মেঘের পরে মেঘ জমে ওঠা ধূসর আকাশের মতো পাহাড়ের পর পাহাড় জমে আছে পুনার বুকে। এ পর্বতমালা তরুতৃণহীন শুষ্ক নীরস পাষাণ স্তূপ নয়। শ্যামলে শ্যামলে ঘেরা এই পাথরের বুকে বিরাজ করছে তরুঘন বনরাজিনীলা।

পুনায় এর আগেও দু'একবার বেড়িয়ে গেছি, সে শুধু অকারণ পুলকে, দেশভ্রমণের নেশার ঝোঁকে, এবার পুনায় এসেছি অন্য এক আকর্ষণে। কিন্নর-কণ্ঠ শ্রীমান দিলীপ রায় এখানে থাকেন। স্বর্গীয় দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের সুযোগ্য পুত্র তিনি। একাধারে কবি, কথাশিল্পী, নাট্যকার, জীবনী-রচয়িতা, প্রবন্ধকার, বিশ্ব-পরিব্রাজক, সঙ্গীতাচার্য। উপরন্তু প্রেমভক্তির একনিষ্ঠ সাধক তিনি। সর্বত্যাগী পরম বৈষ্ণব। পুনায় ইন্দিরা-নিলয়ে হরিকৃষ্ণমন্দির স্থাপনা করে সেখানেই বাস করছেন। মন্দিরে গিরিধারী গোপালের বিগ্রহ মূর্তি আছে। ব্রজবিহারী বংশীধারী শ্রীকৃষ্ণের রূপ। সেটি না কি অপরূপ! সেই বিগ্রহ দর্শনের লোভ, দিলীপের কণ্ঠে গান আর ইন্দিরা দেবীর দিব্য মধুর আলাপন—এই ত্রিবিধ সৌভাগ্য লাভের সম্ভাবনায় পুনায় ছুটেছিলুম এবার। একটা সুযোগও পাওয়া গিয়েছিল। কন্যা নবনীতাকে আমেরিকাযাত্রার পথে জাহাজে তুলে দিয়ে আসবার জন্যে বোম্বাই বন্দরে যেতে হয়েছিল। পুনা থেকে বোম্বাই মাত্র ১২০ মাইল পথ। সুতরাং এই সুযোগে পুনায় এবার তীর্থযাত্রা।

তীর্থযাত্রায় আমার সঙ্গী হয়েছিলেন পত্নী রাধারাণী দেবীর অগ্রজ শ্রীবিভূতিভূষণ ঘোষ। মানুষটি হৃদয়বান। সরল সদানন্দময় পুরুষ। তিনি আকাশপথে উড়ে এসেছিলেন তাঁর ভাগিনেয়ীকে বিদায় সম্ভাষণ জানাতে। যাওয়া-আসার টিকিট করেই এসেছিলেন। আমি পুনা হয়ে কলকাতায় ফিরবো শুনে তিনি আমায় একলা ছাড়লেন না। ভাবলেন, একমাত্র মেয়েকে সাতসাগরের পারে পাঠিয়ে আমার মনটা বোধহয় খুব বিচলিত হয়ে পড়েছে। তাই বিমানে না ফিরে তিনি রেলপথেই আমার সঙ্গ নিলেন। জিজ্ঞাসা করলেন—পুনা যাবেন কেন?

বললুম, মণ্টুর ঠাকুরকে দেখবার টানে চলেছি। দিলীপকে আমরা মণ্টু বলেই ডাকি। আমায় সে তার ঠাকুরের একখানি ছবি পাঠিয়েছিল। অতি সুন্দর মূর্তি। তার সেই ভুবনমোহন বিগ্রহটিকে এবার চাক্ষুষ দেখতে যাচ্ছি।

আমার কথা শুনে তিনি একটু বিস্মিত হলেন; কারণ, তিনি জানতেন, মূর্তি পূজাকে আমি ঠাকুর নিয়ে ভক্তিপ্রেমের খেলা করাই বলি। সংসারী মানুষেরা যেমন তাদের ছেলে-মেয়ে নিয়ে নাতি-নাতনি নিয়ে স্নেহমায়ার বশে খেলায় মেতে থাকে, ঠিক তেমনি সংসারবিরাগী সাধু ভক্তরাও ঠাকুর ঠাকুরুণের মূর্তি এনে প্রেমভক্তিবশে তন্ময় হয়ে সংসার পেতে খেলায় মেতে থাকেন।

কিন্তু, এটাও আমি বিশ্বাস করি—যিনি এ খেলা সমস্ত মনপ্রাণ দিয়ে আত্মভোলা হয়ে একান্তভাবে খেলতে পারেন মাটির প্রতিমা বা পাষাণ বিগ্রহ তাঁর কাছে একদিন সত্য হয়েই ওঠে। একাগ্র সাধনা কখনো ব্যর্থ হয় না। কিন্তু ক'জন মানুষ পারে ভগবানকে আত্মীয় বন্ধু বা প্রিয়তম ভেবে তেমন করে ভালবেসে তন্ময় হয়ে ডাকতে? সংসারে কিন্তু দেখেছি এমন তন্ময় মানুষ, যাঁরা পিতা-মাতা বা পুত্রকন্যাকে নিয়ে প্রতিদিনের তুচ্ছ গৃহ কর্মকে জীবনের শ্রেষ্ঠ ধর্ম কর্ম বলে মনে করেন। আমি তাঁদের সংসারের কীট বলবো না। তাঁরাও নমস্য। তাঁরাও ভগবানকে পাবেন। যেহেতু ইহসংসারও তাঁর এবং সর্বভূতে তিনি বিরাজ করেন এটা যদি আমরা মনে প্রাণে যথার্থ মানি।

স্টেশন থেকে আমরা একখানি ট্যাক্সি নিয়ে ৺হরিকৃষ্ণ মন্দিরে রওনা হলুম। বেলা তখন প্রায় দুটো হবে। কোন্ রাস্তায় কোন্ মহল্লায় এ মন্দির আমি চালককে তা বলতে পারিনি। কারণ ঠিকানাটা ভুলে ফেলে এসেছিলুম। বৃদ্ধ বয়সে স্মরণশক্তি ম্লান হয়ে এসেছে। কিছুতেই মনে পড়লো না। তবে মন্দিরের একটা মোটামুটি বর্ণনা দিলুম, কারণ মন্দিরেরও ছবি পাঠিয়েছিল মণ্টু। চতুর সারথি বুঝে নিয়ে ঠিক মন্দিরে এনে হাজির করে দিল।

বাইরে থেকে মন্দিরটি দেখতে অনেকটা আধুনিক পাশ্চাত্য স্থাপত্য কলানুসারী সৌখীন বাস-গৃহ। মন্দির শীর্ষের সুবৃহৎ 'ওঁ' এই প্রণব অক্ষরটি মন্দিরের অস্তিত্ব ঘোষণা করছে। তোরণ দ্বারের একধারে একটি ফলকে লেখা 'ইন্দিরা নিলয়' অপরদিকে লেখা 'হরিকৃষ্ণ মন্দির।' তোরণের ভিতরে সুদৃশ্য রেলিং দিয়ে ঘেরা প্রশস্ত প্রাঙ্গণ। বিচিত্র তরুলতা ও নানা ফুল ফলের বৃক্ষে সুশোভিত। প্রাঙ্গণ পার হয়ে মন্দিরের মর্মর সোপান বেয়ে উপরে উঠতে না উঠতেই সর্বাগ্রে মন্দির-লক্ষ্মী ইন্দিরা দেবী

এগিয়ে এসে আমাদের স্বাগত সম্ভাষণ জানালেন। শিশুসুলভ নির্মল হাস্যোজ্জ্বল মুখে দিলীপকুমার এসে বুকে জড়িয়ে ধরলেন। বললেন, একলা খুঁজে খুঁজে আসতে কষ্ট হলো তো? একটা তার করলে না কেন নরেনদা? আমি গাড়ী পাঠিয়ে দিয়ে স্টেশন থেকে নিয়ে আসতুম। আমাদের একাধিক ভক্তের গাড়ী সর্বদাই এখানে হাজির রয়েছে। মুখ হাত ধুয়ে খেয়ে নেবে চলো। বেলা দুটো বাজে।

বললুম, বেলা হবে জেনেই আমরা স্টেশনের রিটায়ারিং রুমে স্নানাহার সেরে এসেছি।

দিলীপ শুনে বেশ একটু ক্ষুণ্ণ হ'ল। তাকে বোঝালুম, খাওয়া কি পালাচ্ছে? আজ বিকেলে খাবো, রাত্রে খাবো। আবার কাল সকালে খাবো, দুপুরে খাবো। কত খাওয়াবে খাইয়ো না ভাই।

শুনলুম ৺গুরু পূর্ণিমা উপলক্ষে কাল এখানে বহু ভক্তের সমাগম হয়েছিল। সকালের ও দুপুরের ট্রেণে তাঁরা অনেকেই চলে গেছেন। আর মাত্র জন-দশ বারো আছেন। তাঁরাও কেউ বিকেলের ট্রেণে কেউ কাল সকালের ট্রেণে চলে যাবেন। ভক্তজন-বন্দন-মুখরিত এ হরি-কৃষ্ণ মন্দির চত্বর কাল থেকে আবার নিস্তব্ধ হয়ে পড়বে। মণ্টু বার বার বলতে লাগলো, কাল এলে আরও ভাল লাগতো।

আশ্রমের জন্য সামান্য কিছু ফলমূল মিষ্টান্ন সঙ্গে নিয়ে গিয়েছিলুম। ইন্দিরার হাতে সে ডালিটি তুলে দিয়ে মণ্টুকে বললুম—তুমি থাকতে মন্দির নিস্তব্ধ হয়ে পড়বে কি? তুমি একাই তো একশো ভাই! গানে গল্পে হাস্য-পরিহাসে কাব্যে সাহিত্যে যথেষ্ট মাৎ করে রাখতে পারবে আমাদের।

অল্পক্ষণ আলাপের পরই মণ্টু অতিথিদের জন্য নির্দিষ্ট একখানি সুসজ্জিত কক্ষে আমাদের নিয়ে গিয়ে বললেন, অনেকটা পথ ট্রেণে এসেছো, একটু বিশ্রাম করো। ঠিক চারটে বাজলেই বিকেলে আসবো। চায়ের আসরে ডেকে নিয়ে যাবো। আমিও একটু গড়িয়ে নিইগে।

চেয়ে দেখলুম ঘরখানি চমৎকার! অতিথিদের আরামের যা কিছু প্রয়োজন সমস্তই সাজানো রয়েছে। আমাদের আর 'হোল্ড্‌অল্‌' খুলে বিছানা বার করতে হলনা। পাশাপাশি দুখানি একক খাটে পরিপাটি শয্যা বিছানো। টেবিল, চেয়ার, ড্রেসিং মিরার, আলমারি, কোনও কিছুরই অভাব নেই। কক্ষ সংলগ্ন সুন্দর একটি বাথ্‌রুম, সুসজ্জিত। জানালা দরজায় সুন্দর ভারতীয় কারুকার্য বিচিত্রিত পর্দা। মনটি বেশ প্রফুল্ল হয়ে উঠলো। বৈদ্যুতিক আলো পাখাও রয়েছে। একেবারে যেন হাইক্লাস হোটেলের কামরার মতো। ধর্মশালায় মর্মভেদী যন্ত্রণা থেকে রক্ষা পেয়ে মনটা খুসি হয়ে উঠলো।

ট্রেণের কাপড় বদলে মুখহাত ধুয়ে বিশ্রামের জন্য শুভ্র কোমল শয্যায় আরামে শুয়ে পড়লুম। সঙ্গী বিভূতিবাবু একটু ধূমপানাসক্ত। তিনি হরদম বর্মা চুরুট টানেন। জিজ্ঞাসা করলেন, আশ্রমের মধ্যে ধূমপান করা চলবে কি? অভয় দিয়ে বললুম, নিশ্চয় চলবে। ও তো আমাদের ধর্মের মতই শুধুই ধোঁয়া। তুমি অবশ্যই টানতে পারো। কোনও দোষ নেই। বিভূতিবাবু আশ্বস্ত হয়ে একটি লম্বা চুরুট বার করে ধরাতে গিয়ে দেখেন তাঁর দেশলাইয়ের বাক্স একেবারে শূন্য হয়ে গেছে। ভদ্রলোক মুষড়ে পড়লেন। এমন সময় হঠাৎ চখে পড়লো খাটের পাশে সাইড টেবিলে একেবারে নতুন আনকোরা একটি দেশলাই রয়েছে। সম্ভবতঃ অতিথিদেরই ব্যবহারের জন্য। বললুম, দেখলে তো দাদা, ধূমপান নিষেধ হলে ঘরে দেশলাই থাকতোনা।

তিনি চুরুট ধরিয়ে হাঁফ ছেড়ে বাঁচলেন। তারপর নানা গল্প করতে করতে দ্বিপ্রাহরিক বিশ্রামের অবসরে কখন যে নাক ডাকিয়ে ঘুমিয়ে পড়েছিলুম জানি না। দরজায় টুক্‌টুক্ আওয়াজ হচ্ছে শুনে আমরা ধড়মড়িয়ে উঠে পড়লুম। ঘড়িতে দেখি চারটে বেজে গেছে।

সাধক শ্রীদিলীপকুমার রায়

বাইরে থেকে মণ্টুর গলা পেলুম; চা যে জুড়িয়ে গেল নরেনদা'! বেরিয়ে এস। তোমাদের জন্য সকলে অপেক্ষা করছেন।

আমরা সত্বর প্রস্তুত হয়ে বেরিয়ে আসতেই মণ্টু আমাদের ডাইনিং হলে নিয়ে গিয়ে নিজের আসনের দু'পাশে দুজনকে বসালেন। চায়ের সঙ্গে ইন্দিরা দেবী বিবিধ সুস্বাদু জলযোগেরও ব্যবস্থা করে টেবিলে সাজিয়ে দিয়েছেন। উষ্ট্র পৃষ্ঠবৎ টেবিলের পৃষ্ঠদেশ দস্তুর মতো লোভনীয় হয়ে উঠেছে! সধূম গরম চা ও বিচিত্র টা'র আস্বাদ নিতে নিতে অনেক রকম সরস ও চিত্তাকর্ষক আলোচনা চলছিল বিষয় থেকে বিষয়ান্তরে। চা সেবার পর মণ্টু আমাদের আশ্রমটি ঘুরিয়ে নিয়ে দেখালেন। দোতালায় তিনখানি প্রশস্ত ঘর ও একটি আধ-

ঢাকা দালান। এখানে মণ্টুর লেখাপড়াও চলে আবার বৈঠকও বসে। সামনে খোলা ছাদ। ছাদে বেরিয়ে এলে পুনার চারিদিকের নিসর্গ দৃশ্য চখে পড়ে। ভারী ভালো লাগলো পর্দার বাইরে অনবগুণ্ঠিতা প্রকৃতির সেই অপরাহ্ণ বেলার রূপ। মেঘমেদুর আকাশের দিকে মাথা তুলে দাঁড়িয়ে রয়েছে স্নিগ্ধ সবুজের উষ্ণীষপরা ধূমল পাহাড়। অদূরে পাহাড়ের কোলে পুনার প্রসিদ্ধ পার্বতী দেবীর মন্দির-চূড়া দেখা যাচ্ছে। এবার এলুম তিনতলার ছাদে। নির্জন ছাদের নিভৃত এক কোণে দিলীপের ধ্যানের জন্য একটি শিলাবেদী স্থাপিত রয়েছে। দেখে মনে হল এমন সুন্দর পরিবেশে যদি কেউ ধ্যানে বসে, তবে মহাসুন্দরের সঙ্গে তার যোগে বিহার বিচিত্র নয়!

ছাদ থেকে আমরা সবাই নেমে এসে দিলীপের সেই বৈঠকে সমবেত হলুম। আমরা দুই অতিথি, দিলীপ ও তাদের কয়েকজন ভক্ত-শিষ্য। ঠাকুরের সন্ধ্যারতির পূর্বক্ষণ পর্যন্ত আমাদের আসর চললো। আলোচনা যে শুধু দৈবী রহস্যের গূঢ় তত্ত্ব নিয়েই হচ্ছিল তা নয়। কাব্য, সাহিত্য, সমালোচনা, শ্রীঅরবিন্দ, রবীন্দ্রনাথ, শ্রীরামকৃষ্ণ, রমণ ঋষি, এঁদের নিয়েও আলাপ চলছিল। 'অঘটন আজও ঘটে' এ নিয়েও গল্প হল অনেক। হরিপ্রেমের পরমসাধিকা ইন্দিরা দেবী কৃষ্ণ-প্রেমিকা রাজরাণী মীরার যে ভজনগুলি সমাধি অবস্থায় শোনেন 'শ্রুতাঞ্জলি' 'সুধাঞ্জলি' প্রভৃতি গ্রন্থে দিলীপকুমার সেগুলি মূল হিন্দী ও তার অনুবাদ সহ প্রকাশ করেছেন। এই ভজনগুলির কথা উঠতে, বললুম, ভাবের ঐশ্বর্য ও কাব্য সম্পদে এগুলি অতুলনীয়। পড়ে আনন্দের সঙ্গে বিস্মিতও না হ'য়ে পারা যায় না। ইন্দিরা দেবী নিশ্চয় খুব ভাল হিন্দী কবিতা রচনা করতে পারেন? কিন্তু শুনে আশ্চর্য হলুম যে ইন্দিরা একেবারেই হিন্দী জানেন না। তাঁর মাতৃভাষা উর্দু। অবশ্য উর্দুতে ইন্দিরা দেবী ভালই কবিতা লিখতে পারেন। কিন্তু, মীরার ভজনগুলি তিনি ভাব-সমাধি অবস্থায় কানে শুনে বলে যান এবং সেগুলি ভক্তেরা লিপিবদ্ধ করে রাখেন।

দিলীপ উঠে গিয়ে দুখানি মোটা খাতা তাঁর দেরাজ থেকে বার করে নিয়ে এলেন। খাতার পাতা উল্টে পাল্টে ইন্দিরার সমাধিশ্রুত কয়েকটি মীরার ভজন পড়ে আমাদের শোনালেন এবং তার ব্যাখ্যা করে বুঝিয়ে দিলেন। বললেন, সেগুলি এত উচ্চ স্তরের প্রেমভক্তিমূলক রচনা যে সে একমাত্র গিরিধারী গোপালের অন্তরঙ্গ সেবিকা মীরার পক্ষেই রচনা করা সম্ভব।

এঁদের ভক্ত শিষ্য বিষ্ণুদাসজী বললেন, যে-সব হিন্দী রচনা ভারত সরকারের আকাদামী পুরস্কার পায় সেগুলি এর পাশে দাঁড়াতে পারে না। তাঁরা বোধহয় ইন্দিরা দেবীর বইগুলির সন্ধানই জানেন না। আমাদের উচিত এগুলির প্রতি তাঁদের দৃষ্টি আকর্ষণ করা, তাহলে ইন্দিরা দেবীকে তাঁরা পুরস্কৃত না করে পারবেন না। ইন্দিরা দেবী এই সময় আমাদের চা দিতে সেই ঘরে এসেছিলেন। দিলীপের ইনি মন্ত্র-শিষ্যা। গুরুকে 'দাদাজী' বলে সম্বোধন করেন। ভক্তি ও সেবা করেন পিতার মতো। আবার স্নেহ যত্ন করেন আপন সন্তানের তুল্য। মনে হল ইন্দিরা দেবী তাঁর ইষ্টদেব হরিকৃষ্ণের পর আমাদের দিলীপকেই সবচেয়ে বেশি ভালবাসেন। এমন অকপট শ্রদ্ধা ও ভক্তি আর কোনও গুরুর ভাগ্যে কখনো মিলেছে কিনা জানি না। এই ভক্তিমতী মহিলাকে আমাদের এক পরম বিস্ময় বলে মনে হল। এঁর স্বাস্থ্য ভাল নয়! দুঃসহ হাঁপানি রোগে প্রায়ই নিদারুণ কষ্ট পান। কিছুদিন থেকে তাঁর শরীরের গ্রন্থিগুলিতে কঠিন যন্ত্রণাদায়ক বাতরোগ আশ্রয় করেছে। কিন্তু, না-দেখলে বিশ্বাস করা কঠিন যে দেহের সমস্ত ক্লেশ ও রোগযন্ত্রণা তিনি অসামান্য মনের জোরে জয় করে ভোর রাত্রি চারটে থেকে প্রায় মধ্যরাত্রি পর্যন্ত আশ্রমের যাবতীয় কাজ একা স্বহস্তে সুসম্পন্ন করেন। ঠাকুর সেবা থেকে গুরু সেবা, অতিথি সৎকার থেকে ভক্তগণের পরিচর্যা। মন্দিরের পূজারিণী হয়ে শ্যাম সোহাগিনী দেবদাসীর কর্তব্যও সমস্ত নিজে করেন। আবার রন্ধনশালায় এসে সকলের জন্য বিবিধ অন্ন ব্যঞ্জন প্রস্তুত করে নিজেই স্বহস্ত-পরিবেশনে সকলকে তৃপ্তির সঙ্গে ভোজন করান। কখনও পীড়িত অতিথির শুশ্রূষা ও ভক্তবৃন্দের সেবা করছেন, আবার কখনো বা অনুসন্ধিৎসু ভক্তগণের কঠিন প্রশ্নের সরল সদুত্তর দিচ্ছেন। এই রুগ্ন দেহ নিয়ে তাঁকে এত কাজ করতে দেখে আমরা বিস্মিত হচ্ছিলুম। আকাদামী পুরস্কারের আলোচনাটা ইন্দিরা দেবীর কাণে যেতে তিনি ক্ষুব্ধ হয়ে বললেন, দোহাই আপনাদের, এমন কাজ কখনো করবেন না। আমি সরকারী পুরস্কারের প্রার্থী নই। ওর ওপর আমার কোনও লোভও নেই। আমার গিরিধারী গোপালকে ভজন শুনিয়েই আমি কৃতার্থ। দিল্লীর স্বীকৃতির মূল্য তার কাছে তুচ্ছ। এই বলে কিছুটা বিরক্ত হয়েই তিনি সেখান থেকে চলে গেলেন।

মণ্টুর মুখে শুনেছি—এঁর জপতপ পূজা ধ্যানের ইষ্টদেব শ্রীগিরিধারী গোপাল এঁর কাছে নাকি প্রত্যক্ষ রূপ ধরে দেখা দেন। এঁর সেবায়, পূজায়, প্রেমে, ভক্তিতে প্রীত ও পরিতুষ্ট হয়ে তিনি নাকি সানন্দেই ধরা দিয়েছেন এই পরম প্রেমিকার কাছে। ইন্দিরা দেবীর নিবেদিত ভোগ ঠাকুর স্বয়ং গ্রহণ করেন। আরও শুনলুম, ইন্দিরা দেবী যখন ভাবাবেগে ব্যাকুল হয়ে তাঁর ঠাকুরের চরণতলে মাথাটি লুটিয়ে দেন, পাদুখানি দুহাতে জড়িয়ে ধরেন, ঠাকুর তাঁর এই ভক্ত-প্রেমিকার শ্রীঅঙ্গে আপন পদ্মহস্ত বুলিয়ে দিয়ে আশীর্বাদ করেন। শুনলে হয়ত অনেকেই এটা বিশ্বাস করতে পারবেন না যে এই শ্রীহরি চরণ স্পর্শের পর সৌভাগ্যবতী ইন্দিরা দেবীরও করপুটে পদ্মনাভের পদ্মগন্ধ সংক্রামিত হয়। এই অবস্থায় ইন্দিরা দেবীর চরণ স্পর্শ করে যদি কোনও ভক্ত শিষ্য তাঁকে প্রণাম করে, তাঁরও করপুটে কমল গন্ধ সঞ্চারিত হয়ে যায়। একাধিক ভাগ্যবান ভক্তের কাছে এটা নাকি পরীক্ষিত সত্য। অবশ্য, ভক্তের সাক্ষ্য কোনদিনই প্রমাণ স্বরূপ গ্রাহ্য হয় না। আমার সে পদ্মগন্ধ আঘ্রাণের সৌভাগ্য ঘটেনি এবং কোনওদিন ঘটবে কি না জানি না, তবে আমাদের মতো অল্পবুদ্ধি অজ্ঞান জীবেরা বিশ্বাস করে সংসারে সকলই সম্ভব। কারণ, অবিশ্বাস মনে বড় অশান্তি আনে। বিশ্বাসের মধ্যে একটা শান্তির আরাম আছে।

...বললেন, শ্রীমতী ইন্দিরা দেবী তাঁর ঐকান্তিক হরিপ্রেম সাধনায় বেশ একটু দৈবশক্তির অধিকারিণী হয়েছেন। তিনি যে-কোনও মানুষের দিকে এক নজরে চেয়েই তার মনের ছবিটি দেখতে পান। দূর প্রবাসী তাঁদের কোনও ভক্ত কবে কখন লোকান্তরে চলে গেলেন তিনি তৎক্ষণাৎ তা জানতে পারেন। বলেন—সে আর নেই। সন্ধান নিয়ে দেখা যায় সত্যই তাকে গুরু-ভাই-বোনেরা হারিয়েছেন। তাঁর পরিচিত কেউ মরণাপন্ন রোগে আক্রান্ত হলে ইনি বুঝতে পারেন সে এ যাত্রা রক্ষা পাবে কিনা। অনেক সময় তাঁর অকৃত্রিম ভক্তজনকে নাকি মৃত্যুর দ্বার থেকেও ফিরিয়ে এনে দিয়েছেন। শুনলুম কোনও এক বিশ্বাসী ভক্তের লুপ্তপ্রায় দৃষ্টি শক্তিকে প্রভুর দয়ায় তিনি অক্ষুণ্ণ রেখেছেন। সবচেয়ে আশ্চর্য হলুম একথা শুনে, ইন্দিরাদেবীর প্রেমের আরাধনায় পরিতুষ্ট পাষাণ বিগ্রহ মূর্ত হয়ে উঠে তাঁর সঙ্গে কথা বলেন।

সন্ধ্যা হয়ে এল। ইন্দিরা দেবী এসে জানিয়ে গেলেন সন্ধ্যারতি ও উপাসনার সময় সমাগত। আমরা আসর ছেড়ে উঠে পড়ে মন্দিরে যাবার জন্য প্রস্তুত হলুম। এই প্রথম আমাদের ঠাকুর দর্শন হ'ল। চিত্রে যে মূর্তি দেখে মুগ্ধ হয়েছিলুম প্রত্যক্ষ দর্শনে মনে হল তিনি আরও সুন্দর।

ধূপ ধুনার সুরভি ভরপুর দীপোজ্জ্বল মন্দিরে একটি পবিত্র গাম্ভীর্য বিরাজ করছে। কক্ষতলে বিস্তৃত গালিচার উপর ভক্ত সাধকবৃন্দ সমাসীন। নিমীলিত নেত্রে সংযত চিত্তে ধ্যান নিমগ্ন তাঁরা। সেই প্রশস্ত নাটমন্দিরের এক প্রান্তে সুদৃশ্য দেবমঞ্চ। সেটি ভারতীয় গর্ভমন্দিরের ঐতিহ্য অনুসারে ঈষৎ অপ্রশস্ত হলেও অপূর্ব কারুকার্য খচিত। দেবমঞ্চটিতে ঠাকুর দালানের মত তিনটি তোরণাকৃতি সুন্দর খিলান। মধ্যের খিলানের মধ্যে বংশীধারী শ্রীকৃষ্ণের মর্মর মূর্তি। কিন্তু শ্যামবর্ণ নয়, শুভ্রকান্তি। হাতে বাঁশী, মুখে হাসি, গলে বনমালা, শিরে ময়ুর-মুকুট, চরণে নূপুর। মধুর সে মূর্তি। দেবতার দু'পাশের দুটি খিলানে ভারতের যোগীশ্বর শ্রীঅরবিন্দ ও কবীশ্বর রবীন্দ্রনাথের প্রতিকৃতি। মন্দিরের মাঝামাঝি একদিকের দেয়াল ঘেঁষে একটি সুসজ্জিত সঙ্গীত ও উপাসনা বেদী স্থাপিত।

সমবেত সকলেই উৎসুক আগ্রহে প্রতীক্ষা করছিলেন দিলীপকুমার, ও ইন্দিরা দেবীর মন্দির প্রবেশের। যথাসময়ে তাঁরা এলেন। দাঁড়িয়ে উঠে সকলে তাঁদের সশ্রদ্ধ অভিবাদন জানালেন। গুরুজী ও ইন্দিরামাতা আসন গ্রহণ করলে সকলে বসলেন। গুরু ও ইষ্ট বন্দনার পর উপাসনা শুরু হল। উপাসনা অবশ্য ইংরাজীতেই হল, কারণ সমবেত শিষ্য ও ভক্তবৃন্দের অধিকাংশই অবাঙালী। মারাঠী, পাঞ্জাবী, গুজরাটী, রাজস্থানী, পার্শী ও তামিলনাদের অধিবাসী ও অধিবাসিনী। আমরা দুজন ছাড়া আর কোনও বাঙালী ছিল কিনা জানিনা। বিচিত্র ভারতের ঐক্য যেন মূর্ত হয়ে উঠেছে এখানে।

দেবতা ও গুরুর চরণ বন্দনান্তে প্রার্থনা শুরু হল। প্রথমে বৈদিক মন্ত্রোচ্চারণের দ্বারা মুখবন্ধ, পরে ভাগবতের শ্রীকৃষ্ণস্তুতি। তদনন্তর দিলীপকুমার আজকের সান্ধ্য উপাসনার বিষয় সম্বন্ধে প্রাঞ্জল ইংরাজী ভাষায় একটি নাতিদীর্ঘ ভাষণ দিলেন এবং ইন্দিরার ভাবসমাধি অবস্থায় শ্রুত একটি মীরার ভজন গাইতে শুরু করলেন। গানখানির বিষয় বস্তু আগেই তিনি ইংরাজীতে অনুবাদ করে সকলকে বুঝিয়ে দিলেন। তারপর গান আরম্ভ হল। গানখানি সময়োপযোগী হয়েছিল। বাদল সাঁঝে প্রিয় বিরহে উতলা শ্রীরাধা যেন বলছেন—সজল বরষার ঘনঘটায় আকাশ ছেয়ে ফেলেছে। বাদল মেঘে গুরু গুরু মাদল বাজছে। কলাপীর কেকারবে বনভূমি মুখরিত। কুঞ্জে কুঞ্জে সদ্যফোটা কুন্দ কদম্ব করবী চম্পক সুরভি বিকীর্ণ করছে, কিন্তু তাতে কী এসে যায়! এতে আনন্দই বা কোথায়, যদি কৃষ্ণকেই না আমার কাছে পেলুম? ইত্যাদি। সকরুণ মর্মছোঁয়া কৃষ্ণ বিরহ সঙ্গীত দিলীপের দেবকণ্ঠে সুরের ঐশ্বর্যে মধুময় হয়ে উঠে সকলের হৃদয়ে রাধার বিরহ বেদনাকে সঞ্চারিত করে তুলল। গানের সঙ্গে ইন্দিরার হাতে মন্দিরার নিক্কণ সুন্দর সঙ্গত সৃষ্ট করছিল।

মীরার ভাবাবেশে শ্রীমতী ইন্দিরা দেবীর নৃত্য

প্রায় এক ঘণ্টা আমরা মন্ত্রমুগ্ধ হয়ে এই পবিত্র অনুষ্ঠান উপভোগ করলুম। চমক ভাঙলো যখন নারায়ণং নমস্কৃত্য এর পর শান্তিবাক্য

উচ্চারণ শেষে ঠাকুরের আরতি শুরু হল। অবাক হয়ে চেয়ে দেখলুম, দিলীপ-শিষ্য ব্রিগেডিয়ার জেনারেল থাডানীর রূপান্তর। দুপুরে তাঁকে দেখেছিলুম আপাদমস্তক সামরিক পোষাকে ঢাকা সাম ব্রাউন বেল্ট আঁটা এক মিলিটারীম্যান। এখন তাঁর সে রণবেশ আর নেই। হরিভক্ত বৈষ্ণবের রেশমী পীতবাসে সজ্জিত তাঁর সে পূজারীর শান্ত সুন্দর মূর্তি বড় ভাল লাগলো। পীতবসন প্রান্ত ভূচুম্বিত, পীত উত্তরীয় স্কন্ধের উভয় অংশে শোভিত। কণ্ঠে স্ফটিক-সংহিত তুলসী মালা বিলম্বিত; প্রশস্ত ললাট চন্দন তিলক চর্চিত, দু'হাতে প্রজ্জ্বলিত পঞ্চ-প্রদীপ প্রসারিত করে ধরে ভক্তিভরে তদ্‌গতচিত্তে তিনি মদনমোহনের আরতি করছেন।

মন্দিরে আরতির সময় উচ্চ রবে ঢাক-ঢোল কাঁসর ঘণ্টা বাজে নি। স্তব্ধ নিঃশ্বাসে নিঃশব্দ আরতি সে। শেষ হল আরতি। আরতি প্রদীপের স্তিমিত প্রায় শিখার মৃদু তাপ প্রসারিত যুক্ত করে ভক্তি ভরে গ্রহণ করে ললাটে ছুঁইয়ে নিলেন মেয়ে পুরুষ নির্বিশেষে সকল ভক্তবৃন্দ। তারপর তাঁদের পরম প্রেমময় গুরু ও আচার্য দিলীপকুমার ও ইন্দিরা দেবীর চরণে মাথা ছুঁইয়ে একে একে তাঁরা মন্দির থেকে বার হয়ে গেলেন। একে একে দীপও নিভতে শুরু হল। আমরা যেন এক স্বপ্নের বৈকুণ্ঠ থেকে আবার মর্ত্যের মাটিতে ফিরে এলুম। ভক্তি কিছু থাক বা-না থাক, অনুষ্ঠানটি আমার লাগলো বেশ। জন্ম জন্মান্তরের সংস্কারের প্রভাব হয়তো।

অল্প কয়েকটি ভক্তসেবক ও অতিথি আমরা মন্দির দ্বার সংলগ্ন দালানটিতে বসে কিছুক্ষণ আলাপ আলোচনা করলুম। তখনও সকলের চিত্ত একটি বিশুদ্ধ পবিত্র ভাবে ভরে রয়েছে। আলোচনা ঠাকুরের মহিমাকে কেন্দ্র করেই চললো। ভক্তি ও ভক্তের প্রভাবের কথাও হল। তৃণাদপি সুনীচেন ও তরোরপি সহিষ্ণু পরম ভাগবতগণের বৈষ্ণবী ঐশ্বর্যের অন্ত নেই। এই নিয়ে যখন জগতের নানা 'অঘটন ঘটনার' মধ্যে এসে পড়েছে আমাদের আলোচনা, এমন সময় ইন্দিরা দেবী এসে জানালেন আপনাদের প্রসাদ প্রস্তুত, সেবা করবেন আসুন।

ডাইনিংহলে গিয়ে দেখি অতিথি সৎকারের জন্য আশ্রমলক্ষ্মীর সে কি বিপুল আয়োজন। বিবিধ ভোজ্যসম্ভারে ভারাক্রান্ত টেবিলখানি। দেখি জুঁই ফুলের মতো ধবধবে ভাত। রুটিও গোছা করা রয়েছে। পাঞ্জাবী পরোটা এবং ফুলকো লুচিও সাজানো। ছোলার দাল, আলুর ডালনা, ভেজিটেবিল চপ, চাটনি, পাঁপড়, আচার রকমারী; আম, আপেল, কলা, কমলালেবু, পেঁপে প্রভৃতি বিবিধ ফল। পায়েস, রাবড়ি, সন্দেশ, রসগোল্লা, রসোমালাই, মায় গরম দুধ ও কফিটুকু পর্যন্ত। ইন্দিরা দেবী সকলের কাছে ঘুরে ঘুরে এসে অন্নপূর্ণার মতো উদার হাতে পরিবেশন করে খাওয়াচ্ছিলেন। শুনলুম এ সমস্ত কিছু আহার্যই স্বয়ং ইন্দিরা দেবী স্বহস্তে পাক করেছেন। আশ্রমের পাকশালাতেও তিনিই পাটেশ্বরী! আমরা প্রায় দশ বারো জনে নৈশ ভোজনে একত্রে বসেছিলুম। তাঁদের মধ্যে অধিকাংশই এখনও যৌবনরাজ্যের অধিবাসী। আমি ছিলুম সে দলের বাইরে। বয়সে ও অজ্ঞানতায় সকলের চেয়ে প্রবীণ। আমি জানি আমার ভক্তিও নেই, মুক্তিও পাব না। যে কদিন বাঁচার মেয়াদ আছে নির্দিষ্ট, সেই ভাবে সদ্ভাবে জীবন যাপন করে চলে যাবো। চিত্রগুপ্তের সামনে গিয়ে কোনও কৈফিয়ৎ না দিতে হয়। কিন্তু, ইন্দিরা দেবীর দিব্য দৃ তো ফাঁকি দেবার উপায় নেই কারুর। তিনি এক লহমায় ধরে ফে লেন, এই লোভাতুর বৃদ্ধটি ঠাকুরের প্রেমরসাস্বাদনের চেয়ে তাঁর উদ্দে নিবেদিত প্রসাদের রসাস্বাদনেই অধিকতর আসক্ত। কাজেই তাঁর যে পরিবেশনও পক্ষপাতদুষ্ট হয়ে পড়লো। সব কিছু চর্ব্য চোষ্য লেহ্য আমার পাত্রেই বেশি বেশি পড়তে লাগলো। ভদ্রতার আইন কিছুটা লজ্জা ও কুণ্ঠার সঙ্গে আপত্তি করা সত্ত্বেও তিনি রেহাই দি না।

একে মনসা তাতে ধুনোর গন্ধ। দিলীপ ফোড়ন কাটলেন, হ্যাঁ তুমি নরেনদাকে বেশি করে দাও ইন্দিরা। ওঁর খাইয়ে বলে সুনাম আ আমার সেই বৃকোদরতুল্য আহার দেখে আশে পাশের ভক্ত শিষ্য বিস্মিত হচ্ছিলেন নিশ্চয়। ঈর্ষান্বিত হচ্ছিলেন কিনা জানিনা। ভ বৃন্দের মধ্যে ঈর্ষা যে একটু থাকেই এ আমার নানা সম্প্রদায়ে গিয়ে দেখা গুরুদেব কার প্রতি অধিক প্রসন্ন, কাকে বেশি স্নেহ করেন, কে তাঁ সেবা ও পরিচর্যার অধিক সুযোগ পায়, শিষ্যবর্গের মধ্যে এ নিয়ে কারু মনে অহংকার ও কারুর যে মনঃক্ষোভ হয়না এ কথা কি হলফ্ করে বলা যায়? প্রেম ভক্তিও ঈর্ষাপীড়িত হয়। শ্রীরাধার ঈর্ষা কম ছিল

খেতে খেতে আমাদের আলাপ আলোচনা দৈবীস্তর থেকে ক্রমে মানবিক স্তরে নেমে এল। অনেক দিন পরে মণ্টুর সঙ্গে এমন ঘনিষ্ঠ ভাবে আলাপ আলোচনার সুযোগ পাওয়াতে বহু পুরাতন স্মৃতি ও হারিয়ে যাওয়া বন্ধুদের কথা আপনিই এসে পড়েছিল। কত যে ভাল লাগছিল বলা যায়না। জীবনের ফেলে আসা দিন গুলির প্রতি মানুষের একটা মমতা থাকেই। যে জন্যে সাধক দিলীপকুমার আজও পূর্বাশ্রমের স্মৃতি-চারণ করে চলেছেন।

নৈশ ভোজন শেষে টেবিল ছেড়ে আমরা উঠে এলুম আবার মন্দির দ্বারের সামনের সেই দালানটিতে। অনেকগুলি চেয়ার সাজানো আছে সেখানে। দু'ধারে দুটি বইয়ের আলমারী রয়েছে। সামনেই খোলা আকাশের নিচের একটি চতুষ্কোণ প্রাঙ্গণ। এটি সিমেন্টে বাঁধানো। এক-খানি পাষাণ ফলকের মতো নির্মল ঝকঝকে। এরই দু'ধারে দুটি আলপনা-অলংকৃত-সুদৃশ্য ঘটের মত আধারে দু'টি পরিপুষ্ট তুলসীতরু মুঞ্জরিত হয়ে ওঠবার অপেক্ষা করছে। অদূরে খিড়কীর খোলা দরজায় দেখা যাচ্ছিল বাইরের সবুজ ঘাসে ছাওয়া বর্ষাধোয়া মাঠ। শুক্ল রাত্রির নিবিড়তায় প্রকৃতি যেন তন্দ্রাতুর। পার্বতী পুনা মনে হচ্ছিল ঘুমন্ত পাহাড়ের কোলে ঝাউতলায় তার নিদ্রালস অঙ্গ এলিয়ে দিয়েছে। শুধু ক'জন ভক্ত শিষ্য ও বাইরের আমরা দুই অতিথি দিলীপকে ঘিরে বসে নানা গল্প গুজবে মশ্‌গুল হয়েছিলুম। ঘড়ির কাঁটা ঘুরে চলেছে। লক্ষ্য নেই কারুর সেদিকে।

ইন্দিরা দেবী আশ্রমের সমস্ত পাট চুকিয়ে এসে কিছুক্ষণ বসলেন আমাদের কাছে। সময় সম্বন্ধে তিনি সর্বদা সজাগ। শান্ত বিনম্র কণ্ঠে

কে বললেন, দাদাজী! রাত এগারোটা বেজে গেছে। আপনার শোবার সময় উত্তীর্ণ হয়ে গেল যে! শুনে আমরা অপ্রতিভ হয়ে পড়লুম। আমি ও বিভূতিভূষণবাবু চলে এলুম আমাদের ঘরে। ঝাড়িয়া পুনায় মধ্যরাত্রি বৃষ্টিতে ভিজে বাদল বাতাসে বেশ ঠাণ্ডা হয়ে উঠেছিল। ঈষৎ শীতবোধ হচ্ছিল আমাদের দু'জনেরই। ভূষণবাবু জিজ্ঞাসা করলেন, আপনি রাত্রে কী গায়ে দেবেন মশাই? আমি তো একখানা মোটা এণ্ডির চাদর এনেছি সঙ্গে। আপনার তো ফিন্‌ফিনে একটা উড়ুনী দেখছি শুধু। আমি তখন মাথার বালিশটি একটু কৃশ দেখে তার তলায় কিছু শয্যা-বিরোধী বস্তু স্থাপন করে সেটিকে উচ্চতর করিয়ে নিয়ে যাবার চেষ্টা করছি। কারণ আমার নীরেট মাথাটা চিরদিন উঁচু বালিশ আশ্রয় করে চোখ বুজতে অভ্যস্ত। তাই বাড়ীতেও বলে রেখেছি, আমি মারা গেলে তোমরা যেন বালিশ বাঁচাবার চেষ্টায় আমার মাথায় একটিমাত্র বালিশ দিয়ে ঘাটে পাঠিও না। তাহলে আমার সেই মহানিদ্রার ব্যাঘাত হতে পারে। ভূষণবাবুকে বললুম—দুশ্চিন্তার কারণ নেই তোমার। এই যে পুরু বেডকভারখানি রয়েছে, যদি শীত বোধহয় ওইখানাই টেনে নিয়ে মুড়ি দেবো। এমন সময় দেখি ঘরে ইন্দিরা দেবীর আবির্ভাব। হাতে তাঁর দুখানি নরম-গরম হালকা কম্বল। আশ্চর্য হয়ে জিজ্ঞাসা করলুম আপনি কি করে জানতে পারলেন যে এই জিনিসটাই আমাদের সঙ্গে নেই। আপনি কি বাঁধা-ছাঁদা হোল্ড-অলের ভিতরেও দেখতে পান কি আছে না আছে? আপনার দৃষ্টি দেখ্‌ছি এক্স-রের মতো! আপনিতো বড় ভয়ানক লোক! তিনি স্নিগ্ধ হাস্যে জবাব দিলেন—আপনারা গরম দেশ থেকে আসছেন, সঙ্গে যে কম্বল আনেননি এটা সহজেই অনুমেয়। এ সময় এখানে রাত্রে এ জিনিসটা অনেকেরই দরকার হয়। উত্তর দেবার আগেই পিছু পিছু দিলীপকুমারও ঘরে এসে হাজির। আমাকে বালিশ উঁচু করতে ব্যস্ত দেখে বললেন, আরে থামো থামো। ওকি করছো? আমার ঘরে অনেক বালিশ আছে এনে দিচ্ছি। বলতে বলতে মন্টু দোতলায় ছুটলো বালিশ আনতে। ইন্দিরা তাকে ডেকে বললেন—আমি এঁদের এখনি বালিশ বার করে দিচ্ছি দাদাজী, আপনি উপরে যাবেন না! কিন্তু কে শোনে? দিলীপ ততক্ষণে উধাও!

ইন্দিরা দেবী বেরিয়ে গিয়ে সিঁড়ির ধারে রাখা মালগাড়ীর ওয়াগনের মতো এক ঢাউস ষ্টীল ট্রাঙ্ক খুলে দুটি মোটা পুরু মাথার বালিশ বার করে এনে আমাদের বিছানায় যখন সাজিয়ে দিচ্ছেন—দিলীপ নেমে এলেন উপর থেকে দুই বগলে দু'টো দু'টো চারটে রঙীণ বালিশ নিয়ে! আমরা তো দেখে হেসেই খুন! বললুম, এযে একেবারে গন্ধমাদন পর্বত এনে হাজির করলে হে! দিলীপ বোধ করি শুনতেই পেলে না। সে আজকাল কানে একটু কম শোনে। বললে, রাখো এগুলো, আমি দুটো পাশ বালিশ নিয়ে আসছি। পাশ বালিশ আমরা ব্যবহার করি না বলে বহু কষ্টে তাকে নিরস্ত করা হলো।

শুভরাত্রি জানিয়ে রাত্রের মতো বিদায় নিলেন তাঁরা।

ভোর রাত্রি। চারটে সাড়ে চারটে হবে। সুমধুর প্রভাতী সুর যেন বহু দূর থেকে কানে ভেসে আসছিল। মনে হচ্ছিল 'কোন্ মহা-সিন্ধুর ওপার থেকে কী সঙ্গীত ওই ভেসে আসে!' কোনও কোনও ভক্ত
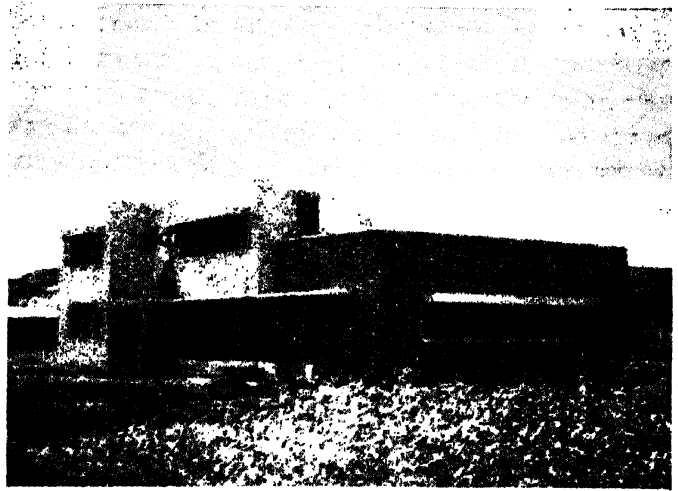
হরিকৃষ্ণ মন্দির—ইন্দিরা নিলয়

অতিথিদের কক্ষ হতে যেন অস্পষ্ট মৃদু কাকলি কানে আসছিল। সেদিকে কান না দিয়ে ভোরাই সুরের মিষ্টি দোলায় আবার ঘুমিয়ে পড়লুম। যখন ঘুম ভাঙলো ঘড়িতে দেখি ছ'টা বেজে গেছে। মুখ হাত ধুয়ে রাত্রির সাজ বদলে নিঃশব্দে ঘরের বাইরে বেরিয়ে এলুম। বিভূতিভূষণ ভায়া তখনও অগাধ-ঘুমের-ঘোরে। মন্দির দ্বারের সম্মুখে সেই দালান-টিতে এসে দেখি গুরু পূর্ণিমা উপলক্ষে সমবেত ভক্তশিষ্যগণের শেষ দলটি বিদায় নিয়ে চলে যাচ্ছেন আজ সকালের ট্রেণে। তাঁদের জিনিসপত্র বাক্স বিছানা বাঁধা ছাঁদা সেখানে তৈরি রয়েছে। কিন্তু, কোনও মানুষজন দেখতে পেলুম না। একলাই দালানে পায়চারি শুরু করলুম। ইন্দিরা নিলয়ের প্রাঙ্গণে নেমেও একটু বেড়ালুম। এমন সময় হুস্ হুস্ করে খান দুই তিন ট্যাক্সী এসে ঢুকলো। রথের ঘর্ঘর শব্দ শুনে গৃহ-যাত্রী রথীরাও এবার বেরিয়ে এলেন। ইন্দিরা দেবী ও দিলীপ

কুমারও তাঁদের সঙ্গে এলেন। বিদায় দৃশ্য শুরু হল। আশ্রম-অধিষ্ঠাত্রী ইন্দিরা দেবী সেই ভোরেই চা জলখাবার করে তাদের খাইয়ে দিয়েছিলেন।

বিদায় দৃশ্য সব সময় সর্বত্রই সকরুণ। যথারীতি প্রণাম আলিঙ্গন ও আশীর্বাদের পর তাঁরা গুরুদেব ও ইন্দিরাদেবীর পাদ বন্দনা করে বিদায় নিলেন। সবার চোখেই জল। ইতিমধ্যে বিভূতিভূষণবাবুও শয্যাত্যাগ করে প্রস্তুত হয়ে বেরিয়ে এলেন। তাঁর গায়ে ছিল গিলে করা আদ্দির পাঞ্জাবী। সকালেও পুনায় বেশ ঠাণ্ডা দেখে আমি একটি মোটা কাপড়ের লম্বাকোট গায়ে চড়িয়ে বেরিয়েছিলুম। বিভূতিবাবুর গায়ে সেই পাতলা জামা দেখে পাছে ঠাণ্ডা লেগে যায় বলে মণ্টু অস্থির হয়ে উঠলো। ইন্দিরা দেবী ছুটে গিয়ে একটি সুন্দর উলেন সোয়েটার নিয়ে এসে বিভূতিভূষণ বাবুকে পরতে দিলেন। বিভূতিবাবু প্রথমটা না-না থাক, লাগবেনা, দরকার হবে না ইত্যাদি বলতে শুরু করেছিলেন, কিন্তু আমার ও দিলীপের মৃদু ভর্ৎসনা ও ইন্দিরা দেবীর অনুরোধ উপেক্ষা করতে না পেরে শেষ পর্যন্ত সোয়েটারটি পরে ফেললেন। সেটি যেন তাঁর গায়ের মাপেই তৈরি এমন চমৎকার ফিট করলো। তারপর মন্দির সংলগ্ন সেই দালানে বসে শান্ত শীতল আবহাওয়ায় আবার নানা গল্প শুরু হল।

দিলীপ বলছিল, কেমন করে শ্রীঅরবিন্দ আশ্রম ছেড়ে সে শূন্য হাতে পথে বেরিয়ে পড়েছিল। শ্রীঅরবিন্দের দেহরক্ষার পর পণ্ডিচেরী আশ্রমে সে যেন হাঁপিয়ে উঠছিল। বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ড তার কাছে শূন্য মনে হচ্ছিল। দিলীপ পারলে না সে আবহাওয়ায় থেকে সহজভাবে নিঃশ্বাস নিতে। বেরিয়ে এল সে একদিন তার দীর্ঘপরিচিত প্রিয়তম আশ্রম-নীড় ছেড়ে। দিলীপের মন্ত্র-শিষ্যা ইন্দিরা তাঁর গুরুজীকে এমন ভাবে ছেড়ে দিতে ভয় পেলেন। শ্রীঅরবিন্দআশ্রম যে দিলীপের জীবনের অনেকখানিই অধিকার করে বসেছিল। তখন ইন্দিরাও তাঁর গুরুদেবের অনুগামিনী হলেন। তারপর কেমন করে তাঁরা হরিদ্বারে গেলেন, কিজন্য সেখান থেকে হতাশ হয়ে ফিরলেন এবং কেনযে ভারতের প্রত্যন্ত প্রদেশ এই পুনায় এসে আশ্রম প্রতিষ্ঠা করলেন সমস্ত ইতিহাস সরলভাবে আমাদের শোনালেন। বার বার বললেন, সেই দুর্দিনে স্যার চুণীলাল মেটা যদি পুনায় তাঁর নিজের একখানি বাড়ী আমাদের আশ্রম প্রতিষ্ঠার জন্য ছেড়ে না দিতেন তাহলে এই 'হরিকৃষ্ণ' মন্দিরের প্রতিষ্ঠা হয়ত কোনও দিনই সম্ভব হত না। দীর্ঘ চার বৎসর তাঁরা স্যার চুণীলালের বদান্যতায় তাঁর 'ডলফিন্ কটেজে' বসে এই আশ্রমের স্বপ্ন দেখেছিলেন। বোধকরি ইচ্ছাময়ের কাছে তাদের সে ঐকান্তিক ইচ্ছা গিয়ে পৌঁচেছিল। দেখতে দেখতে ভক্তবৃন্দের দানে ও সহযোগিতায় গণেশ খন্দ রোডে জমি কিনে এই সুদৃশ্য আশ্রমটি গড়ে উঠলো। ঠাকুরের কৃপার কথা বলতে বলতে দিলীপের কণ্ঠস্বর ভক্তিপ্লুত হয়ে উঠছিল। উপন্যাসের চেয়েও চিত্তাকর্ষক সে কাহিনী।

ইন্দিরা দেবী এসে জানালেন প্রাতরাশ প্রস্তুত। ঘড়ির দিকে চেয়ে দেখি আটটা বেজে গেছে। চায়ের টেবিলে গিয়ে দেখি প্রাতরাশের যে আয়োজন করেছেন তিনি, একমাত্র আমি ছাড়া আর কেউ তার সদ্ব্যবহার করতে পারবেন কিনা সন্দেহ। চায়ের সঙ্গে প্রচুর ফল, ফুলুরী, মিষ্টান্ন, রুটি মাখন জ্যাম জেলীর সমাবেশ হয়েছে। ভেজিটেবল চপ, ডালপুরি, পরোটাও ছিল। আমি চা পান করিনি শুনে ইন্দিরা দেবী আমায় কফি কোকো, ওভ্যালটিন হর্লিক্‌স অনেক কিছু দিতে চাইলেন। সবেতেই আমার নেতিবাচক শিরঃসঞ্চালন দেখে শেষে যখন বললেন, তাহলে এক পেয়ালা গরম দুধ দিতে পারি কি? হেসে উঠে বললুম এইবার অন্তর্যামিনী আমার মনের খবরটা ঠিক ধরে ফেলেছেন দেখছি। বলতে না বলতে ইন্দিরা দেবী একবাটি গরম দুধ এনে হাজির করলেন। সকালে চায়ের আসরে বসে দুগ্ধপান করতে দেখে কেউ কেউ তাঁদের আস্তিনের আড়ালে গোপনে হাসছেন বুঝে আমি ইন্দিরা দেবীকে বললুম, আপনাদের এই ভক্তেরা বোধহয় জানেন না যে It is only the innocent milk-babies who have the right to enter into the kingdom of Heaven! চায়ের টেবিল ঘিরে এইবার সশব্দ হাস্যরোল উঠলো। তার মধ্যে দিলীপের কণ্ঠের প্রাণখোলা হাসি আমাকে বার-বার তার স্বর্গগত পিতা দ্বিজেন্দ্রলালের উচ্চহাস্য স্মরণ করিয়ে দিচ্ছিল।

চায়ের আসর ভাঙলো প্রায় বেলা দশটায়। ইন্দিরা দেবী নোটিশ দিলেন স্নানাদি সেরে আপনারা প্রস্তুত হয়ে থাকবেন। ঠিক সাড়ে বারোটায় আমি আপনাদের মধ্যাহ্ন ভোজ প্রস্তুত রাখবো। বললেন, আমি একটু বাইরে বেরিয়ে যাচ্ছি। একটি সুন্দরী মেয়েকে দেখিয়ে আমাদের জানালেন—এর মায়ের খুব অসুখ। তিনি আমায় একবার দেখতে চাইছেন। মেয়েটি গাড়ী নিয়ে এসেছে আমায় নিয়ে যাবার জন্যে। আমি আধ ঘণ্টার মধ্যেই ফিরে আসবো। মেয়েটি কাঁদছে দেখে আমি জিজ্ঞাসা করলুম, আপনার মায়ের অসুখ কি খুব বাড়াবাড়ি? মেয়েটি ফুঁপিয়ে উঠে বললেন, হ্যাঁ, মা বোধহয় আমাদের ছেড়ে চলে যাবেন। ইন্দিরা দেবী তাকে নিয়ে চলে গেলেন।

আমরাও একটু আশ্রমের আশে পাশে বেড়িয়ে পার্বতী মন্দিরটি দেখে আসবার জন্য বাইরে বেরিয়ে পড়লুম। সেই বন বিভাগের কর্তাটি (কনজার্ভেটর অফ্ ফরেষ্ট) আশ্রমের একজন নৈষ্ঠিক ভক্ত। অতিথিদের দেখা শোনার ভার ছিল তাঁর উপর। তিনি ঘন ঘন আমাদের খোঁজ খবর নিচ্ছিলেন, কি চাই না চাই, কোনও অসুবিধা হচ্ছে কিনা। কাল থেকে তাঁকে অনবরত পান চিবুতে দেখে আমি আশ্বস্ত হয়েছিলুম, প্রয়োজন হলে আশ্রমে পান পাওয়া যাবে বুঝে। পুনা ষ্টেশান থেকে আমি যে পানের রসদ সংগ্রহ করে এনে ছিলুম আজ প্রাতরাশ পর্যন্ত তা চলেছিল। প্রাতরাশের পর একটী টাকা দিয়ে তাঁকে বলেছিলুম গোটাকয়েক সাজা পান সংগ্রহ করে আনবার জন্য। তিনি হেসে টাকাটি ফেরত দিয়ে বলেছিলেন, পানের এখানে অভাব নেই। এখনি আনিয়ে দিচ্ছি।

আশ্রম থেকে বেরিয়ে বেড়াতে বেড়াতে পথে ভক্তপ্রবর বিষ্ণুদাসজীর সঙ্গে দেখা। তিনি আমাদের ধরে নিয়ে গেলেন তাঁর বাড়ীতে। অনেকক্ষণ তাঁর কাছে বসে অনেক গল্প শুনলুম। তিনি ছিলেন ঘোরতর

নাস্তিক। প্রথমে ছিলেন কংগ্রেসাইট, তারপরে যোগ দেন সোস্যালিষ্ট-দের দলে। পরে কমিউনিষ্ট হয়ে যান। তাঁর স্ত্রী ছিলেন বোম্বাইয়ের সোসাইটি গার্লদের মধ্যে একজন বিশিষ্ট মহিলা। সন্ধ্যা থেকে মধ্য-রাত্রি পর্যন্ত তিনি রোজ ক্লাবেই কাটাতেন। তাসের জুয়া খেলায় তাঁর প্রচণ্ড নেশা ছিল। তিনি বলতে লাগলেন আশ্চর্য এই দিলীপবাবু ও ইন্দিরা দেবীর প্রেমভক্তির দিব্যশক্তি। এঁরা আমাকে একেবারে নিরীহ বৈষ্ণব বানিয়ে ছেড়ে দিয়েছেন। শুনে হয়ত বিশ্বাস করতে পারবেন না আমার স্ত্রীর পরিবর্ত্তন আরও অদ্ভুত! সেই ফ্যাশানেবল্ লেডী প্রেম-ভক্তির প্রভাবে প্রায় সর্বত্যাগিনী। এ আশ্রম তাঁর কাছে শান্তির স্বর্গ। ভুলে গেছে সে তার টয়লেট প্রসাধন, তার লিপষ্টিক্, নেইল-পলিশ, রুজ, ক্রীম, পাউডার, এসেন্স। আমারই মতো সে আজ একেবারে যেন নতুন মানুষ হয়ে জন্মেছে! আরও অনেক কথা অনেক কাহিনী তাঁর মুখে শুনে এলুম।

বাড়ী ফিরে স্নান সেরে নিলুম। ইন্দিরা দেবী স্নানের জন্য গরম জলের ব্যবস্থা করে গেছলেন। স্নানান্তে বস্ত্র পরিবর্তন করে মধ্যাহ্ন ভোজনের জন্য প্রস্তুত হয়ে বাড়ীতে চিঠি লিখে দিলুম আমরা ২৩শে এখান থেকে বেরিয়ে ২৫শে সকালে কলকাতায় ফিরবো। তারপর সংবাদপত্রে মনোনিবেশ করলুম। ঠিক সাড়ে বারোটায় মন্টু এসে ডাক দিলে—নরেনদা খাবে এস।

মধ্যাহ্ন ভোজনের টেবিলে আজ আমরা মাত্র অল্প কয়েকজন ছিলুম। ভক্তশিষ্যরা অধিকাংশই যে যার গৃহে ও কর্মস্থলে ফিরে গিয়ে-ছেন। দ্বিপ্রাহরিক আহারের যে ব্যবস্থা দেখলুম সেটাকে ভুরিভোজের আয়োজনই বলা চলে। ভাত ও লুচির সঙ্গে ভাজাভুজি, দাল, বিবিধ তরিতরকারী, চাটনি, পাঁপর, আচার, দধি, পায়স, মিষ্টান্ন, আম, কমলা, কলা সে এক বিরাট তালিকা। খাওয়ার অবকাশে নানা সরস আলাপ আলোচনা চলছিল। আমাদের সকলকে হাসিমুখে মুক্ত হস্তে পরিবেশন করছিলেন ইন্দিরা দেবী। গল্প করে খেতে খেতে অনেক বেলা হয়ে যাচ্ছে দেখে আমরা সকলে ইন্দিরা দেবীকে আমাদের সঙ্গে বসে খাবার জন্য অনুরোধ জানালুম। ভয়ও দেখালুম, আমাদের সঙ্গে বসে না খেলে আমরা আর খাবনা, উঠে পড়বো কিন্তু। সকলের সনির্বন্ধ উপরোধ উপেক্ষা করতে না পেরে বাধ্য হয়ে বসলেন তিনি আমাদের সঙ্গে। আশ্চর্য হয়ে দেখলুম, তিনি গুরুর প্রসাদী অন্ন দু এক গ্রাস মাত্র মুখে দিয়েই উঠে পড়লেন। কাল রাত্রেও দেখেছি তিনি গুরুর পাতের উচ্ছিষ্ট একটু তরকারী দিয়ে মাত্র একখানি হালকা ফুলকো লুচিতেই তাঁর নৈশভোজ শেষ করে-ছিলেন। ভাবনা ঢুকলো এত স্বল্পাহারে এ মেয়েটি বেঁচে আছে কেমন করে, আর উদয়াস্ত এত পরিশ্রমই বা করে কি করে? গুরু ভোজনে চিরাভ্যস্ত আমার কাছে এ যেন এক প্রহেলিকা। তবে কি গুরুর প্রসাদ-কণিকা মাত্র উদরস্থ হলে বিশ্বের ক্ষুধার শান্তি হয়? ভাবলুম একবার পরীক্ষা করে দেখলে হয় না? কিন্তু, তেমন গুরু পাই কোথায় যাঁর উচ্ছিষ্ট খেতে মনে কোনো দ্বিধা বা কুণ্ঠা হবেনা। দিলীপের মতো গৌরকান্তি সুপুরুষ প্রিয়দর্শন গুরু খুঁজে পাওয়া বড় কঠিন। অতএব ও চেষ্টা না করাই ভাল।

মধ্যাহ্ন-ভোজন সমাপ্ত করে উঠতে না উঠতে সেই অরণ্যপাল ভক্ত এসে আমার হাতে একডজন সাজা পানের খিলি দিয়ে গেলেন। ধন্যবাদ দেবার আগেই তিনি নিরুদ্দেশ। কথায় কথায় দিলীপকে জিজ্ঞাসা করলুম—রাত্রি চারটে নাগাদ বেশ একটি প্রভাতী সুর কানে আসছিল। তুমি কি শুনেছিলে?

দিলীপ হেসে উঠে বললেন, তোমরা তখন কোথায় ছিলে? বললুম—কোথায় আবার থাকবো? আশ্রমের সুসজ্জিত কক্ষে আরাম শয্যায় কম্বলাবৃত হয়ে সুখ শয়নে সুপ্ত ছিলুম।

দিলীপ বললেন, আমাদের ঠাকুরের উষারতি ও উপাসনা থেকে তাহলে তোমরা আজ বঞ্চিত হয়েছো। রোজই তো ভোর চারটে থেকে মন্দিরে পূজারতি, উপাসনা ও স্তবগান হয়। নৃত্যগীতও বাদ যায়না। ইন্দিরা ভক্তদের কাছে ভাষণ দেয়, নিজ হাতে ঠাকুরের আরতি করে। আবার রাধাভাবে ভাবিত হয়ে মাঝে মাঝে নৃত্যও করে। তুমি বোধহয় ইন্দিরার নাচ কখনো দেখনি? অদ্ভুত নৃত্যপটিয়সী ও। ঠাকুর ওর নৃত্য দেখে মুগ্ধ হয়ে নিজে এসে ওর নিবেদিত ভোগ খেয়ে যান। কখনও কখনও কথাও বলেন ওর সঙ্গে। কিন্তু, আমার সে সৌভাগ্য এ পর্যন্ত হয়নি। আজও ঠাকুরের প্রত্যক্ষ দর্শন আমার ঘটেনি। আরও কতদিন আমার কাছ থেকে লুকিয়ে থাকবেন ঠাকুর কে জানে? হয়ত আমার প্রাণে ইন্দিরার মতো এমন গভীর প্রেমের আকুতি নেই, তাই ঠাকুর আমায় দেখা দেন না।

অনুযোগ করে দিলীপকে বললুম, কেন তুমি আমাদের ঘুম থেকে ডেকে তুলে আনলে না। আমরা নতুন মানুষ, এই প্রথম এসেছি এখানে। মন্দিরের উষারতির সংবাদ আমাদের জানা ছিল না। দেখ দেখি কতবড় আনন্দ থেকে আমাদের বাদ দিলে।

দিলীপ বললেন, তোমরা কলকাতার মানুষ। বেলা পর্যন্ত ঘুমোনো তোমাদের বরাবরের অভ্যাস। রাত চারটেয় বিছানা থেকে ডেকে তুললে কি ভবিষ্যতে আর কখনো এ আশ্রমের পথটি মাড়াবে?

জনৈক ভক্ত বলে উঠলেন, আপনারা দিদিজীকে বলে রাখেননি কেন? উনি নিশ্চয় আপনাদের ঘুম থেকে ডেকে তুলে দিতেন। আমরা কেউ কেউ কোনদিন গাঢ় ঘুমে আচ্ছন্ন হয়ে পড়ি এই ভোর রাত্রির দিকে। ঠাকুরের উষারতি আর উপাসনার কথা একেবারেই ভুলে যাই। কিন্তু দিদিজীকে আমাদের বলা আছে, তাই ঠিক সময়ে তিনি আমাদের শিয়রে এসে মাথায় হাত বুলিয়ে মধুর কণ্ঠে বলেন, পুজোর সময় হয়েছে যে! আর কত ঘুমুবে ভাই? এইবার ওঠো তোমরা। ঠাকুর যে অপেক্ষা করে রয়েছেন তোমাদের জন্য।

আমরা ধড়মড়িয়ে উঠে পড়ে আলো জ্বেলে দেখি চারটে বেজে গেছে বটে, কিন্তু, দিদিজী কোথায় গেলেন! এইমাত্র তো আমাদের ডেকে তুলে দিলেন। ঘরের দরজার দিকে চেয়ে দেখি কাল রাত্রে শোবার সময় যেমন খিল এঁটে শুয়ে ছিলুম, দরজা ঠিক তেমনি খিল

আঁটা বন্ধ রয়েছে। কিন্তু, আমরা যে সুস্পষ্ট দেখলুম তাঁকে। তাঁর কণ্ঠস্বর শুনলুম। বিস্ময়ে অভিভূত হয়ে পড়ি আমরা! ভাবি এই দিদিজী কে? দাদাজীকে জিজ্ঞাসা করলে বলেন, ও কৃষ্ণপ্রেমে পাগলিনী মীরা!

দিলীপের মুখে শুনেছি ইন্দিরা লক্ষপতির কন্যা। ওর স্বামীও একজন খুব ধনী ব্যবসায়ী। ইন্দিরার দু'টি ছেলে আছে। বড় ছেলে বয়োপ্রাপ্ত। সে সামরিক নৌবিভাগে আছে। ছোট ছেলে শ্রীমান প্রেমলের বয়স বছর দশেক হবে। সে মার কাছে এই আশ্রমেই থাকে। ইন্দিরার স্বামী মাঝে মাঝে আশ্রমে এসে স্ত্রী পুত্রের সঙ্গে দেখা করে যান। এই আশ্রম ও মন্দির নির্মাণে তিনিও মোটা টাকা সাহায্য করেছেন। শ্রীঅরবিন্দের আদেশেই দিলীপ শিষ্যারূপে ইন্দিরাকে গ্রহণ করেছিলেন। ইন্দিরার মধ্যে ঐশী শক্তির সমাবেশ দেখে শ্রীঅরবিন্দ তাকে একটি ভাল আধার বুঝে স্বয়ং দীক্ষা দিতে চেয়েছিলেন। কিন্তু ইন্দিরা নাকি তাঁকে বলে সে স্বপ্ন পেয়েছে—দিলীপই তার জন্মজন্মান্তরের গুরু! তখন শ্রীঅরবিন্দ দিলীপকেই বলেন, ইন্দিরার সাধন মার্গের পথ প্রদর্শক হ'তে। ইন্দিরা একবার কঠিন রোগে মরণাপন্ন হয়েছিল। দিলীপ সেই সময় মরণোন্মুখী ইন্দিরার শিয়রে বসে ঠাকুরের কাছে একান্ত মনে প্রার্থনা করেছিল ওকে ফিরিয়ে দেবার জন্য। দিলীপের সে প্রার্থনা ঠাকুর শুনেছিলেন। ইন্দিরা মৃত্যুর মুখ থেকে বেঁচে ফিরে এসেছে। তারপর আরও অনেক অদ্ভুত কথা শুনেছি এই মেয়েটির সম্বন্ধে।

বেলা বেড়ে চলেছে। তিনটের ট্রেনে আমরা সেইদিনই ফিরবো এবং বোম্বাই থেকে কলকাতার ট্রেণ ধরবো। বললুম, আর না। এইবার যাই দিলীপ। 'চলো মুশাফের, বাঁধো গাঠ্‌রিয়া' আমাদের জিনিসপত্রগুলো একটু গুছিয়ে নিই। মণ্টু বলে, আরে না না, তা কি হয়! তেরাত্রি না কাটালে তীর্থযাত্রা সফল হয়না। আরও দুটো দিন অন্ততঃ তোমরা থেকে যাও এখানে।

বললুম—তোমার এখান থেকে যেতে ইচ্ছে হচ্ছে না একটুও, কিন্তু ভাই, না গেলেই যে নয়। মেয়েকে জাহাজে তুলে সাগর জলে ভাসিয়ে দিয়ে এলুম। নবনীতার মা অসুস্থ দেহে শূন্য ঘরে অপেক্ষা করছেন আমার জন্য একান্তই একা।

প্রেমকোমল হৃদয় দিলীপকুমার অবস্থা বুঝে আর বাধা দিলেন না। 'পুনরাগমনায়চ' বলে গাঢ় আলিঙ্গন দিয়ে বিদায় দিলেন। ইন্দিরাদেবীর পদস্পর্শ করে প্রণতি জানিয়ে হরিকৃষ্ণ মন্দিরের আনন্দময় পুণ্য স্মৃতি নিয়ে 'ইন্দিরা-নিলয়' থেকে বেরিয়ে স্টেশানের দিকে রওনা হলুম।

শ্রাবণ দিনের একটি সাঁঝে

অধ্যাপক শ্রীগোবিন্দপদ মুখোপাধ্যায়

বৃষ্টি ঝরে, বৃষ্টি ঝরে
মাটির বুকে মনের 'পরে
ঝিমঝিমানি ঘুমের সুরে ওই,
শাওন দিন, মেঘের-ছায়া,
ধরার বুকে কাজল মায়া,
সজল দিনের স্বপ্নে ভ'রে রই।
নীরব, নিথর সকল দিক,
গ্রামের পথে নেই পথিক,
মৌন বিহগ, মৌন হৃদয় আজ;
আব্‌ছা যে ওই দূর—সুদূর,
পূবের বাতাস আবার সুর,
উদাস-করা—ভোলায় সবি কাজ।
তরুর-বীথি, বনের লতা—
আজ্‌কে যেন তাদের ব্যথা
ছাপিয়ে ওঠে শাওন-বারি-ধারে,
আকাশ-ছোঁওয়া ধানের ক্ষেতে
এই বরষার দিবস-রেতে
কোন বিরহী কান্না জানায় কারে।
কাঁদন-ভরা শ্রাবণ দিন,
কাঁদন-ভরা হৃদয়-বীণ্,
কাহার তরে, কাহার তরে গো;
সে কি আমার মনের পটে,
উদাসী এই হৃদয়-তটে
রেখে গেছে চিহ্ন পায়ের গো!
শ্রাবণ-দিনের একটি সাঁঝে
মৌন বিধুর মনের মাঝে
কাটল যে দিন মেঘের ছায়ার হায়,
সেই সে দিনের মধুর গীতি,
কান্না ঝরার মধুর প্রীতি
করুণ সুরে সারা জীবন ছায়।

ঋণ

আকাশটা গলা রূপোর মত সাদা, তাপে সর্বাঙ্গ জ্বলে যায়। এত তাপ এখানে? গাছের পাতা নড়ে না। বাতাসও নেই একটুও। বিহার বাংলার মাঝামাঝি সহরটা যেন ঝলসে যাচ্ছে। গামছা দিয়ে গায়ের ঘাম মুছে এক গেলাস জল খেলেন মণিবাবু।

এসেছেন এখানে ভাইয়ের বাসায়—বোনের বিয়েতে।

দু'দিন থেকে হাঁপিয়ে উঠেছেন। যত তাড়াতাড়ি পারেন চলে যেতে পারলে বাঁচেন।

কিন্তু চেঁচায় কে?

দরজা বন্ধ। কান পেতে শোনেন মণিবাবু।

সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায়

একটা মেয়ে চেঁচাচ্ছে যেন। এই সাংঘাতিক রোদে বেরিয়েছে সে ?

মণিবাবু ওঠেন।

উঠে বাইরে বেরিয়ে দেখেন সদরের সামনে একটা মেয়ে।

বয়েস দেখলে তেরো মনে হয়। কালো রঙ। বড় বড় চোখ। নাকের নীচে খানিকটা জমাট রক্ত।

—কি চাই ?

মেয়েটা এগিয়ে আসে !

ফ্যাল ফ্যাল করে তাকিয়ে বলে—চারানা পয়সা দিন ?

চার আনা! ভিখিরী এক-আধটা পয়সা চায়। এ একেবারে চার আনা ?

—ভাগ। পয়সা নেই।

মেয়েটা এসে সামনে দাঁড়ায়। বড় বড় চোখ দুটো বেয়ে টস টস করে জল পড়ে গালে। নাকের নীচে জমাট রক্ত চোখের জলে গলে ঠোঁটের মাঝখানে আসে।

মণিবাবু একটু অবাক হন, একটু বিরক্তও হন।

—আমাকে মেরে ফেলবে। চারানা দিতেই হবে।

মেরে ফেলাব ? মণিবাবু একটু ভেবে বলেন—কে মারবে ?

—ওই লোকগুলো।

—কে লোক ?

মেয়েটার কথায় বেশ হিন্দী টান আছে। বলে—ওই ওরা। এই ত একটু আগে মারলে। মুখে একটি লাথি মারলে জগুয়া। বললে, নিদেন চারানা না আনলে কেটে ফেলবে।

—তোর নাকে রক্ত কেন ?

মেয়েটা নাকের নীচে হাত দেয়, আঙুলে করে একটু রক্ত নিয়ে দেখে, তারপর ফ্যাল ফ্যাল করে তাকিয়ে বলে, ওই ত মেরেচে।

মণিবাবুর একটু কৌতূহল হয়, কষ্টও হয়।

—তোর বাপ মা কোথায় ?

—জানি না।

—লোকগুলো তোর কে ?

—তাও জানি না। ওরা রোজ আমায় ভিক্ষেয় পাঠায়। পয়সা চাল বেশী না পেলে মারে।

অমানুষিক কাহিনী। বিশ্বাস করবার মত নয়।

তবু মণিবাবু বিশ্বাস না করে পারেন না ওর চেহারার দিকে তাকিয়ে। শরীরটা শক্ত সমর্থ। ওটা বোধ হয় জন্ম থেকেই। গায়ের কালো রঙ ভুসো ভুসো হয়ে গেছে, বোধ হয় বহুদিন স্নান না করে। চোখ দুটো বড় বড় ঘোলাটে—লালচে ভাব।

মণিবাবু কিছুক্ষণ ভাবেন। আজ চার আনা পয়সা দিলেই যে মেয়েটার ওপর অত্যাচারের শেষ হবে, এমন কথা মোটেই সত্যি নয়। কাল আবার আট আনা আনবার জন্যে ঠিক একই ভাবে মারবে লোকগুলো। বেশ বুঝতে পারেন, ওকে দিয়ে ভিক্ষে করিয়ে রোজগার করে কয়েকটি লোক।

—লোকগুলো কি করে ?

মেয়েটা এতক্ষণ ঠোঁট থেকে চেটে রক্তটার লোনা স্বাদ নিচ্ছিল, বলে—সাধু। ধুনি জ্বালিয়ে বসে থাকে !

সাধু! মেয়েটার জন্যে কষ্ট হয়, তবু হেসে ফেলেন।

আশ্চর্য! মেয়েটাও হাসে। গালে ওর চোখের জল তখনও শুকোয় নি।

হাসিটা খুব ভাল লাগে মণিবাবুর। আশ্চর্য সহজ হাসি।

—আয় ভেতরে আয় ?

মেয়েটা একটু পিছিয়ে যায়। ভয়ে ভয়ে তাকায়।

—ভয় নেই। ভেতরে আয়।

এগিয়ে মেয়েটার হাত ধরেন মণিবাবু। ভেতরে নিয়ে আসেন টেনে।

এমনি করেই বছর আষ্টেক আগে কুড়িয়ে পেয়েছিলেন মণিবাবু মেয়েটাকে। নাম রেখেছিলেন রাধা। কত লোক কত কথা বললে। কেউ বললে, মেয়েটি নিশ্চয় বিলাসপুরী। কেমন বাড়-বাড়ন্ত শরীর।

কেউ বা বললে, এখানে অনেক তেলেঙ্গী থাকে, তাদের কারো মেয়ে বোধ হয়।

আবার কেউ হাসলে, সাঁওতাল-টাওতাল হতে পারে।

—বেশ্যার মেয়ে কিনা তাই বা কে জানে!

মণিবাবু হাসলেন মনে মনে। কারো কথার জবাব

দিলেন না। ভাবলেন, ওর কোন জাত না থাকলেও একটা জাত আছে। ও মানুষ। কুকুর বেড়াল নয়।

রয়ে গেল রাধা। মণিবাবুর স্ত্রী সুনন্দা বড়ই বিপদে পড়লেন মেয়েটাকে নিয়ে।

কলকাতার বাসায় ঘরে শুয়ে ছটফট করে মেয়েটা।

—কি হোলরে?

—দম বন্ধ হয়ে আসছে।

—সে কিরে? গরম লাগছে?

ফ্যান খুললেন।

কেঁদে উঠল রাধা। ওরে বাবা। অত বিচ্ছিরি বাতাসে হাঁসফাঁস করে।

—বিরক্ত হয়ে সুনন্দা বলেন—তবে কি করবি?

কিছুক্ষণ কি ভেবে রাধা অন্ধকারে দৌড়ে ছাদে উঠে যায়।

পেছনে পেছনে যেতে হয় সুনন্দাকে। মণিবাবুর ওপর রাগ হয় সুনন্দার। কোত্থেকে একটা জানোয়ার ধরে এনেছে। নিজে নাক ডেকে ঘুমোচ্ছেন। যত ঝক্কি সুনন্দার।

ছাদে এসে দেখেন, শুয়ে পড়েছে ছাদের ওপর রাধা।

একটু সময় দাঁড়িয়ে থাকেন। একটু সময়ের ভেতরেই রাধা ঘুমিয়ে পড়ে।

থাক ছাদে একা একা। মরুকগে। নীচে নেমে আসেন সুনন্দা। শুয়ে পড়েন।

নানা জ্বালা ওকে নিয়ে।

বয়েস বাড়ছে। ব্লাউজ কিনে দিয়েছেন সুনন্দা। একদিনও পরবে না। বলে, কেমন যেন দড়ির বাঁধন মনে হয়।

দাঁত বার করে হাসে। সুনন্দা রাগে জ্বলে ওঠেন—ওসব অসভ্যতা আমার এখানে চলবে না।

ভয়ে ভয়ে যদি বা রাধা ব্লাউজ পরল তা বোতাম লাগাবে না কিছুতেই।

শেষকালে প্রায় কেঁদেই ফেলে—আমায় বেঁধে মারবে!

মণিবাবু শুনে হাসতে থাকেন। বলেন—অভ্যেস হয়ে যাবে—আস্তে আস্তে।

—এ জন্মে আর হবে না—রেগে চলে যান সুনন্দা।

সবচেয়ে বিপদ হয়েছে যখন-তখন যা তা বলে ফেলে। যেখানে সেখানে হাসতে সুরু করলে আর থামবার নাম নেই।

পাড়ার দু-চারটে ছেলে যে ওর কাছাকাছি আসত না তা নয়। সদরে দাঁড়িয়ে তাদের সঙ্গে স্বচ্ছন্দে কথা বলত, হাসির শব্দ রান্নাঘরে বসে শুনতে পেতেন সুনন্দা।

ডাকতেন, রাধা!

ছুটে চলে আসত। সুনন্দা বলত, তোকে দৌড়ে আসতে বলেছি। ডাকলেই তুই দৌড়ে আসিস কেন? হাঁটতে জানিস না?

রাধা হাসত।

—ও ছেলেগুলোর সঙ্গে দাঁড়িয়ে হাসছিলি কেন?

ভীষণ অবাক হোল রাধা, তাতে কি হয়েছে?

—হয়েছে আমার মাথা আর মুণ্ডু! তোর বয়েস ত কম হোল না?

—কি বলছ, বুঝতে পারছি না। রাধা ফ্যাল ফ্যাল করে তাকাল।

সুনন্দা কপালে হাত দিয়ে বসে থাকে। রাধাকে কি বলে বোঝাবে যে ওর উদ্ধত যৌবন অনেক ছেলের কাছে লোভনীয়।

—তোর সর্বনাশ হবে। হোক্! আমার কি? যা ওপরের ঘর থেকে বিছানার চাদরগুলো এনে সাবান দে। পরিষ্কার হওয়া চাই।

কাজে রাধার আলস্য নেই। প্রায় নাচতে নাচতে গিয়ে বিছানার চাদর তিনখানায় সাবান ঘষতে বসে।

সে দিনের একটা কাণ্ড হবার পর রাধা একটু যেন গম্ভীর হয়ে যায়। হকচকিয়ে যায়। বস্তি বাড়ীর সোনাই সেদিন ওর সঙ্গে দুপুর বেলা গল্প করছিল। আরও দুটো ছেলে বসে বসে দেখছিল ওপাশের রোয়াক থেকে।

সোনাই আস্তে আস্তে সদরের ভেতরটায় ঢুকে ওর পিঠে হাত দিলে।

রাধা হেসে উঠল, এমনিই। হঠাৎ।

হঠাৎ সোনাই ওকে জড়িয়ে ধরেছিল। ধরা মাত্র রাধার সর্বাঙ্গে কি যে একটা অনুভূতি এলো ও ঠিক বুঝতে পারল না। শুধু কনুই দিয়ে সোনাইয়ের দাঁতে একটু গুঁতো মেরেছিল বেশ জোরে। সোনাইয়ের দাঁতটা বেঁকে গেল আলগা হয়ে। রক্তে মুখ ভরে গেল।

রাধা ধীরে ধীরে ওপরে উঠে এল। দৌড়োল না।

কনুইটা একবার দেখলো ছড়ে গেছে। তারপর ধীরে ধীরে এ ঘরে ঢুকে সুনন্দার পাশে শুয়ে পড়ল।

দুপুরবেলা শুয়ে পড়া রাধার জীবনে এই প্রথম।

এর দু-চার দিন পরেই রাধা একদিন রুটি বেলতে বেলতে বলে সুনন্দাকে।

—মা ?

—কিরে ?

—আমার বিয়ে দেবে না ?

সুনন্দা হাসবে কি কাঁদবে ভেবে পায় না। উনিশ বছরে মেয়ের লাজ-লজ্জার বালাই নেই গা !

—দূর মুখপুড়ী ! ও কথা আমাকে বলতে আছে ? জ্ঞান-গম্যি কিছুই হোল না তোর !

তারপর হাসতে হাসতে বলেন, দোব। তোর বিয়ে দোব। তেমন-তেমন একটা ছেলে দেখতে হবে ত ?

রাধা আর কিছু বলে না।

দিন পাঁচেক পরে দুপুর বেলায় রাধা সদরে দাঁড়িয়ে আছে। বড় বড় চোখ দুটোয় ওর চাঞ্চল্য নেই তেমন। একটু যেন ঝিমিয়ে পড়েছে। দুটো কাক অনবরত ডাকছে ওর মাথার ওপর গ্যাস লাইটের ওপরে বসে। ভ্রূক্ষেপ নেই রাধার। ও কি যেন ভাবছে।

হঠাৎ চোখ পড়ে ওর সোনাই বস্তিবাড়ী থেকে বেরোল। নির্জন গলিটায় আর কেউ নেই।

রাধা ডাকে—এই শোন।

সোনাই ফিরে তাকিয়ে রাধাকে দেখেই দু-পা পিছিয়ে যায়। একটা দাঁত ওর গেছে। ওটা বাঁধাতে হবে। আর যে কটা আছে, সে কটার মায়া ত্যাগ করতে ও রাজী নয়। তাছাড়া কনুই যে মেয়েমানুষের অমন পাথরের তৈরী হয়, সোনাই ভাবতেও পারে নি।

রাধা ডাকে, শোন না।

—আমায় ডাকছিস ? সোনাই ভয়ে ভয়ে বলে।

রাধা আবার ডাকে, শোন না ?

সোনাই ওর কনুইয়ের নাগালের বাইরে নিজের মুখখানাকে রেখে এগোয়।

—কি বলছিস ?

—কথা আছে তোর সঙ্গে।

—কি বল না ?

রাধা তৎক্ষণাৎ বলে, আমায় বিয়ে করবি ?

সোনাইয়ের ছোট ছোট চোখ দুটো টান-টান হয়ে ওঠে।

একটা ঢোঁক গিলে বলে—তোকে ?

রাধার আর সইছে না। বলে, হ্যাঁ। আমাকে ?

সোনাই বলে—কিন্তু মণিবাবু যদি কিছু বলে ?

রাধা বলে—সে আমি বুঝব।

—ভেবে দেখি।

—ভাববি আবার কি ?

—বাড়ীতে বলি।

—বাড়ীতে আবার বলবি কি ? তোর তিনকুলে ত কেউ নেই।

সোনাই বলে, বাঃ ! দিদিকে বলতে হবে না ?

সোনাইয়ের দিদি আছে বটে।

—বিয়ে ত তুই করবি, তোর দিদি ত করবে না ?

—তা ছাড়া—

—তা ছাড়া কি ?

সোনাই বলে—দাস বংশের ছেলে আমি ! হাজার হোক—মানে একটু বলে কয়ে—

রাধার মুখটা শুকিয়ে যায়, অ ! দাস বংশ ! তবে এই-ছিলি কেন আমার কাছে ? এবার এলে আর কটা দাঁত নোড়া দিয়ে ভেঙে দোব।

রাধা ভেতরে চলে আসে হন্ হন্ করে।

সোনাই দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কি একটু ভাবে। একটা বিঁড়ি ধরায়। গেঞ্জীর কলে কাজ করে ও। দেরী হয়ে গেল ! চলে যায় সোনাই।

সেদিনই রাত্রে সুনন্দা মণিবাবুকে ঠেলা মারেন। ঘুমুচ্ছিলেন মণিবাবু।

—শুনছ ?

রাধা আজ বারান্দায় শুয়েছে। কিছুতেই ঘরে শুল না। ভালই হয়েছে। সুনন্দা আবার ডাকেন মণিবাবুকে।

—বলি শুনছ ?

—বলো। ঘুম ভেঙেছে মণিবাবুর।

—রাধা কি বলছিল জান ?

—কি ?

—ও বিয়ে করতে চায়। বলে হাসতে গিয়ে মুখে আঁচল চাপা দেন সুনন্দা, পাছে রাধা হাসির শব্দ শুনতে পায়।

মণিবাবু চোখ মেলেন—বিয়ে ?

—হ্যাঁ গো! ও বলছিল, আমার বিয়ে দেবে না ?

মণিবাবু গম্ভীর হয়ে থাকেন কিছুক্ষণ। তারপর একটা নিশ্বাস ফেলেন।

—তা একটা ছেলের খোঁজ করো।

—কিন্তু ও জন্তুকে কে বিয়ে করবে ?

—তা করবে। এখন ও অনেক ভদ্র হয়েছে।

—ছাই হয়েছে। তবু দেখি সবাইকে বলে।

মণিবাবু আর ঘুমোতে পারেন না। তাকিয়ে থাকেন।

অনেকক্ষণ পরে বলেন, আমাদের যেমন বিয়ে হয়, তেমন বিয়ে কি ওর সইবে ?

—তা আর সইবে না কেন ? এ্যাদ্দিন মানুষ করলুম! এতকাল আমাদের দেখল।

মণিবাবু চুপ করে থাকেন।

পরদিন ভোরবেলা বাসন মেজে ছাই ফেলতে গেছে রাধা। বাইরে বেরিয়ে—ছাই ফেলতে হয়। গলিটায় লোকজন খুব কম। দু-একটি লোক গঙ্গায় যাচ্ছে গামছা কাঁধে।

রাধা বেরোতেই দেখে সোনাই ওর সামনে।

—শোন। সোনাই ডাকে।

—যা ভাগ। রাধা চলে যেতে চায়।

রাধার ছাইমাখা হাত পাছে সোনাইয়ের গালে পড়ে সজোরে তাই সোনাই একটু সরে দাঁড়ায়।

—কাল রাত্তিরে ভেবে দেখলুম।

—যা যা আর ভাবতে হবে না।

—তোকেই বিয়ে করব।

—রাধা বলে, তোকে বিয়ে করছে কে ? ভাগ এখান থেকে।

সোনাই দাঁড়িয়ে থাকে। রাধা চলে যেতে গিয়ে আবার ফিরে আসে।

—ঠিক বলছিস ?

—হ্যাঁ। মাইরি।

রাধা ছাইমাখা হাতে দাঁড়িয়ে থাকে। তারপর বলে, তবে চ।

—সোনাই অবাক। যাব কোথায় ? বিয়ে হবে না ? তুই মণিবাবুকে বল।

—খেপেচিস। বাবুকে বলি, তারপর মা পান চিবোবে। ঘুমিয়ে উঠবে, তারপর উঠবে বসবে, জিরোবে। দূর! ওসব আমার পোষাবে না।

সোনাই ভয়ে ভয়ে বলে, তবে ?

—আমার সঙ্গে চ। দু-জন কোথাও চলে যাই।

—কিন্তু বিয়ে ?

—এই ত বিয়ে।

রাধা হাসে। সোনাই চুপ করে থাকে কিছুক্ষণ।

তারপর দুর্বল কণ্ঠে বলে—যাব কোথায় ?

—চুলোয়। বলে হেসে ওঠে রাধা। বলে, আজ রাত্তিরে যাবি ?

সোনাই ক্ষীণকণ্ঠে বলে—দেখি।

রাধা ছাই ফেলে বাড়ীর ভেতরে চলে আসে।

পরদিন সকালে মণিবাবু ঘুমোচ্ছেন। ধাক্কা মেরে ডাকে সুনন্দা। বেলা তখন সাড়ে সাতটা। মণিবাবু একটু দেরী করেই ঘুম থেকে ওঠেন।

—বলি শুনছ। সর্বনাশ হয়েছে।

মণিবাবু উঠে পড়েন—কি হোল ?

—রাধা পালিয়েছে।

পালিয়েছে! মণিবাবু চোখ কচলে ভাল করে তাকান।

সুনন্দা কাঁদছেন, দুধ-কলা দিয়ে কাল-সাপ পুষেছিলুম এতদিন।

—ব্যাপারটা কি ?

—কি আবার। বস্তিবাড়ীর সোনাই বলে ছোঁড়াটাও ঘরে নেই। রাধাকেও ভোরবেলা থেকে দেখছি না। প্রথমে ভেবেছিলুম। কোথাও গেছে-টেছে, আসবে। তারপর পাড়াশুদ্ধু হই-চই। মুখে চুণ-কালি। তখনই বলেছিলুম ওসব অজাত-বেজাতকে ঘরে জায়গা দিও না!

মণিবাবু একটু ভাবেন।

তারপর ধীর স্বরে বলেন—ভালই হয়েছে।

আবার শুয়ে পড়েন মণিবাবু।

সুনন্দা কাঁদেন—ভাল কি হোল শুনি ?

মণিবাবু বলেন—তোমার মায়া পড়েছিল ওর ওপর বেশ বোঝা যাচ্ছে। কিন্তু মায়া না পড়লেই ভাল হোত। ও যা করেছে, এর চেয়ে ভাল আর কিছু ও করতে পারত না।

একটু ভেবে বলেন—এর চেয়ে ভাল আমরাও বোধহয় কিছু করতে পারতাম না।

জাতিগঠনে খাদি

শ্রীবিজয়লাল চট্টোপাধ্যায়

আমাদের দেশের শতকরা পঁচিশজন মানুষ পল্লী অঞ্চলের বাসিন্দা। সুতরাং গ্রামের উন্নতিতেই ভারতের উন্নতি—এতে কি কোন সংশয় আছে? সুদীর্ঘকালের উপেক্ষায় এবং শোষণে গ্রামাঞ্চলগুলি এতকাল শ্মশানেরই সামিল হ'য়ে ছিল। বৃটিশ বণিকদের দুর্দ্দান্ত অর্থলালসা কুটীর-শিল্পগুলির মূলে করলো কুঠারাঘাত। সেই নিদারুণ আঘাতে গ্রাম্যশিল্পগুলির মৃত্যু ঘট্‌লো। ফলে পল্লীতে পল্লীতে জীবনের নির্ঝর গেল শুকিয়ে। চাষ এবং কুটীরশিল্পকে আশ্রয় ক'রে আনন্দময় গ্রাম্যজীবন যারা যাপন করতো তারা পর্য্যবসিত হ'ল চলন্ত নরকঙ্কালে। গ্রামের পঞ্চবটচ্ছায়াশীতল কুটীরে যারা সহজ সরল জীবন যাপন করতো তারা অন্নের সন্ধানে শহরের অভিমুখে করলো ধাওয়া। গাঁয়ে যারা মানুষ ছিল শহরের বস্তীতে এসে তারা পরিণত হোলো কেবল সংখ্যায়। রবীন্দ্রনাথের 'রক্তকরবী'তে বিশু বড়ো দুঃখেই বলেছে: "আমি ৬৯এ গাঁয়ে ছিলুম মানুষ, এখানে হ'য়েছি দশপঁচিশের ছক। বুকের উপর দিয়ে জুয়োখেলা চলেছে।"

গাঁয়ের সমস্ত আলো গেল নিবে। রবীন্দ্রনাথের ভাষায় "নগরী হ'ল সুজলা সুফলা, টানাপাখা-শীতলা; সেইখানে মাথা তুললে আরোগ্য-নিকেতন, শিক্ষার প্রাসাদ।" গাঁয়ের যারা ধনী মানী শিক্ষিত তাঁরা জীবনের সন্ধানে নগরীতে এসে বাঁধলেন বাসা। শহরের চাকচিক্যে মুগ্ধ হ'য়ে এঁরা গেলেন গ্রামকে ভুলে। 'শিক্ষার বিকীরণ' প্রবন্ধে এঁদের সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ মর্ম্মস্পর্শী ভাষায় লিখেছেন: ইস্কুলের বেঞ্চিতে বসে যারা ইংরাজী পড়া মুখস্থ করলেন শিক্ষা-দীপ্ত দৃষ্টির অন্ধতায় তাঁরা দেশ বলতে বুঝলেন শিক্ষিত সমাজ, ময়ূর বলতে বুঝলেন তার পেখমটা, হাতী বলতে তার গজদন্ত। সেদিন থেকে জলকষ্ট বলো, পথকষ্ট বলো, অজ্ঞান বলো, রোগ বলো, জমে উঠল কাংস্যবাদ্যমন্দ্রিত নাট্যমঞ্চের নেপথ্যে নিরানন্দ, নিরালোক গ্রামে গ্রামে।"

আমরা ইংরেজি-পড়া শিক্ষিত সম্প্রদায় আধুনিক সভ্যতার চাকচিক্যে মুগ্ধ হ'য়ে যখন ইংরেজের জয়ধ্বনি দিচ্ছিলাম, তখন বঙ্কিমচন্দ্র এসে আমাদের চিন্তার মোড় ঘুরিয়ে দিলেন। উপেক্ষিতা গ্রামলক্ষ্মীর মাথায় তিনি পরালেন গৌরবের মুকুট। আমাদের চোখে আঙুল দিয়ে বুঝিয়ে দিলেন, দেশ বলতে বোঝায় দেশের কৃষিজীবী সম্প্রদায়কে—কারণ দেশের অধিকাংশ লোকই কৃষিজীবী। আর যেহেতু এই কৃষিজীবী সম্প্রদায় ইংরেজ শাসনে অনুমাত্রও উপকৃত হয়নি সেই হেতু বঙ্কিমচন্দ্র ইংরেজ শাসনকে গৌরব দান করতে অত্যন্ত দৃঢ়তার সঙ্গে অস্বীকার করলেন।

বিবেকানন্দ আরও জোরালো ভাষায় শিক্ষিত সমাজের দৃষ্টি আকর্ষণ করলেন পদদলিত ধূল্যবলুণ্ঠিত জনসাধারণের দিকে। তাঁর কণ্ঠে উচ্চারিত 'দরিদ্রনারায়ণ' শব্দটী যাদুর কাজ করলো। নতুন ভারতের চিন্তারাজ্যে তিনি ওলোট-পালোট ঘটিয়ে দিলেন। এলেন রবীন্দ্রনাথ, এলেন গান্ধী। যে-গ্রাম উপেক্ষায় মৃতপ্রায় ছিল সে পেলো নূতন মূল্য, নূতন মান। গান্ধী ও রবীন্দ্রনাথ বঙ্কিমচন্দ্রের ও বিবেকানন্দের ভাবধারার পতাকাবাহী। সবাই চেষ্টা করে গেছেন আমাদের শহরমুখী চিত্তকে গ্রামমুখী করবার জন্য।

স্বাধীন ভারতের কল্যাণ-রাষ্ট্রগুলি দেশকে নূতন করে গড়ে তোলার ব্যাপারে বঙ্কিমচন্দ্র-বিবেকানন্দ-গান্ধী-রবীন্দ্র-নাথের গ্রামোন্নয়নের আদর্শকে অনুসরণ ক'রে চলেছে। এই গ্রামোন্নয়নের সঙ্গে খাদির সম্পর্ক অবিচ্ছেদ্য। খাদির স্থান হচ্ছে সমস্ত গ্রাম্যশিল্পের একেবারে কেন্দ্রস্থলে। খাদিকে গান্ধীজী তুলনা করেছেন সূর্য্যের সঙ্গে—যাকে ঘিরে আবর্ত্তিত হবে অন্য সমস্ত গ্রাম্যশিল্পের গ্রহরাজী। মনে রাখতে হবে, ভারতের শতকরা আশীজন লোক কৃষিজীবী। কিন্তু চাষের কাজ ক'রেও চাষীর হাতে উদ্বৃত্ত সময় এত প্রচুর থাকে যে অবসর সময়কে সে অন্যকাজে অনায়াসে লাগাতে পারে। সুতাকাটার ও কাপড় বোনার কাজে এই উদ্বৃত্ত সময় ব্যয়িত হ'লে চাষীর বস্ত্রের সংস্থান হ'তে পারে। তাহ'লে কাপড় কিনতে যে কয়েকমাসের ধান বিক্রী করতে সে বাধ্য হয় সেই ধানটা তার ঘরেই থেকে যায়। এমন কথা কখনও বলা হয়ন

যে বেশী আয়ের কাজ বাদ দিয়ে চাষীরা ঘরে বসে সুতাই কাটুক। পরিপূরক শিল্প হিসাবেই খাদির প্রধান সার্থকতা। পল্লীগ্রামে যাদের অন্যকাজ করবার সুযোগ অথবা সামর্থ্য নেই, তাদের কাছে চরখা নিশ্চয়ই বিধাতার আশীর্ব্বাদ। অন্যান্য গ্রাম্যশিল্পের মধ্যমণি হিসাবে খাদিকে কেন্দ্র ক'রে আমাদের গ্রামগুলি স্বাবলম্বী হ'য়ে উঠবে, আমরা যতদূর সম্ভব পল্লীবাসীদের পরিশ্রমে উৎপন্ন নিত্য-প্রয়োজনীয় দ্রব্য সামগ্রীর ব্যবহার করবো—স্বরাজের এই লোভনীয় স্বপ্নই গান্ধী দেখেছিলেন।

খাদির অর্থনৈতিক দিকটাকে একটুও ছোট ক'রে দেখা উচিৎ নয়। 'খালি পেটে ধর্ম্ম হয়না', কিছুই হয় না। কিন্তু আমরা তো এমন দেশ গড়তে চাইনে যেখানে শুধু অট্টালিকার বাহুল্য এবং অর্থের প্রাচুর্য। আমরা গড়ে তুলতে চাই এমন একটা বিচিত্রসুন্দর দেশ—যেখানে মানুষের জীবনের মূল্য আর সমস্ত কিছুর মূল্যকে ছাড়িয়ে আছে। গান্ধী যন্ত্রশিল্পকে তেমন আমল দেননি—কারণ যন্ত্রশিল্পের আওতায় মানুষ হারিয়ে ফেলে তার আত্মার গরিমা। সারাজীবন একই কাজ প্রতিদিন একইভাবে হাজারবার ক'রতে ক'রতে শ্রমিক শেষে যন্ত্রেরই সামিল হ'য়ে যায়। একটা বস্তুর সবটুকু তৈরী করবার সে সুযোগ পায় কোথায়। তার বুদ্ধিকে খাটানোরই বা অবকাশ কোথায়? যন্ত্রের উদ্ভাবন প্রচুর পরিমাণে দ্রব্য উৎপাদনের জন্য। জিনিষপত্রের দাম যাতে সস্তা হয় তারজন্য দরকার অতিকায় দানবের যন্ত্রের হাতে নিমেষে পর্ব্বত পরিমাণ বস্তু উৎপাদন করা। বিনা আয়াসে যন্ত্র নিরবচ্ছিন্ন-ধারায় তৈরী করে চলেছে অজস্র দ্রব্যসামগ্রী। কিন্তু এইসব দ্রব্য সামগ্রী তৈরীর ব্যাপারে শ্রমিকের হাত কতটুকু? নিজের হাতে আগাগোড়া একটা জিনিষ তৈরীর মধ্যে সৃষ্টির যে সুগভীর আনন্দ আছে—সে আনন্দ থেকে যন্ত্রাসুর (রবীন্দ্রনাথের ভাষায়) আজ শিল্পীকে বঞ্চিত করেছে। শ্রমিকের মনের উপরে এর প্রতিক্রিয়া হ'য়েছে বিষময়। কাজের মধ্যে তার আনন্দ নেই, স্বাধীনতা নেই। সুতরাং কাজকে এড়িয়ে যাবার দিকেই তার ঝোঁক বেশী।

ভারতবর্ষকে সকল দিক দিয়ে আমরা যদি মহান করতে চাই তবে দরকার মহৎ মানুষ তৈরী করা—আধখানা যন্ত্রবৎ মানুষ নয়, পূর্ণ, শুদ্ধ, মুক্ত মানুষ এবং বস্তির পঙ্কিল আবহাওয়ায় আর যাই হোক্, মনুষ্যত্বের বিকাশ আশা করা দুরাশা মাত্র। তাই আধুনিক রাষ্ট্রনায়কদের মধ্যে, বোধ হয়, একমাত্র গান্ধীই বিংশ শতাব্দীর এই মানব-সভ্যতাকে দাঁড় করাতে চেয়েছিলেন মুক্তপ্রকৃতির সুষমাময় পরিবেশের মধ্যে—যেখানে তারার আলো আর উজ্জ্বল রোদ্দুর, বাতাসে মধু আর আকাশে ভেসে-যাওয়া মেঘ, যেখানে সৌন্দর্য্য, আনন্দ আর স্বাস্থ্য। এদিক দিয়ে বিচার করলেও গ্রাম্যশিল্পের প্রয়োজনীয়তা অপরিমেয়। গ্রামে শিল্প না থাকলে সেখানে জীবনের প্লাবন আস্‌বে কোথা থেকে? আর মানুষ স্বতঃই প্রাণেরই পিয়াসী। জীবনের প্রতি তার মজ্জাগত অনুরাগ। তাই গ্রামীণ সভ্যতাকে সৃষ্টি করা এ যুগের যদি বৃহত্তম কাজ ব'লে বিবেচিত হয় তবে গ্রাম্য শিল্পগুলির ভিত্তিতে নয়া ভারতের সভ্যতাকে গড়ে তোলার উপরে জোর দেওয়া সকল দিক দিয়েই বাঞ্ছনীয়।

খাদি ভারতীয় সংস্কৃতির শুচি, শুভ্র প্রতীক। এই সংস্কৃতি দ্রব্যরাশির এবং আড়ম্বরের উপরে কখনো জোর দেয়নি। জোর দিয়েছে সরল শান্ত জীবন-যাত্রার উপরে। রবীন্দ্রনাথের ভাষায়:—

কোরোনা কোরোনা লজ্জা হে ভারতবাসী,
শক্তি-মদ-মত্ত ওই বণিক বিলাসী
ধনদৃপ্ত পশ্চিমের কটাক্ষ সম্মুখে
শুভ্র উত্তরীয় পরি' শান্ত সৌম্যমুখে
সরস জীবনখানি করিতে বহন!
....

দেখিতে যা বড়,
চক্ষে যাহা স্তূপাকার হইয়াছে জড়,
তারি কাছে অভিভূত হ'য়ে বারে বারে
লুটায়োনা আপনায়!

এই সরলতাই গান্ধীর জীবন-দর্শনের প্রথম মূলগত নীতি, আর এই নীতির উপরেই তিনি গড়ে তুলতে চেয়েছিলেন নয়া ভারতের অর্থনৈতিক কাঠামোকে। বৃহদায়তন শিল্পের উপরে তিনি জোর দেননি, কারণ বৃহদায়তন শিল্প মানে বস্তুর প্রাচুর্য্য—সিগার, শ্যাম্পেন আর মোটরের উদগ্র

বাসনায় অন্ধ হ'য়ে বাজারের সন্ধানে জগৎময় ঢুঁড়ে বেড়ানো, উপকরণের পরিমাণ অনবরত বাড়িয়ে যাওয়া। কিন্তু টাকায় মানুষের সুখ নেই। ভারতবর্ষের সংস্কৃতিতে পয়সাপূজো চিরদিন ধিক্‌কৃতই হয়ে এসেছে। এককালে ব্রাহ্মণেরা এত সম্মান পেতেন—সে কেবল পাণ্ডিত্যের এবং নির্ম্মল-জীবন যাপনের জন্ম নয়, কাঞ্চনের প্রতি ঔদাসীন্যের জন্মেও।

রবীন্দ্রনাথ ঠিকই বলেছেন :

হে ভারত তব শিক্ষা দিয়েছে যে ধন
বাহিরে তাহার অতি স্বল্প আয়োজন,
দেখিতে দীনের মতো ; অন্তরে বিস্তার
তাহার ঐশ্বর্য্য যত !

জাতির সত্যিকারের সম্পদ গগনচুম্বী সৌধমালায় নয়, প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড কলকারখানাতেও নয়। একটা জাতির যথার্থ সম্পদ হচ্ছে তার এমন সব মানুষ, যারা নির্ভীক, নিঃস্বার্থ, প্রেমিক এবং সত্যাশ্রয়ী। গান্ধীজীর অর্থনৈতিক পরিকল্পনায় অর্থের প্রাচুর্য্য নয়, চরিত্রের গৌরব পেয়েছে স্বীকৃতি। গ্রামের 'পঞ্চবটছায়াশীতল' কুটীরে চাষীরা অবসর সময়ে সূতা কাটছে, কাপড় বুনছে, সমস্ত গ্রাম মধুচক্রের মতো কর্ম্মচঞ্চল, বেকার হয়ে কেউ বসে নেই—এই তো ছিল গান্ধীর স্বরাজের স্বপ্ন। নয়া ভারত বৃহদায়তন শিল্প প্রতিষ্ঠার পথে রাশি রাশি দ্রব্য উৎপাদন করছে এবং সেই উৎপন্ন দ্রব্যরাশি কাটাবার জন্মে পৃথিবীর অন্যান্য জাতির সঙ্গে ঈর্ষামূলক প্রতিযোগিতায় অবতীর্ণ হয়েছে—এ চিন্তা গান্ধীর চিত্তকে পীড়িত করতো।

খাদি শিল্প মানবপ্রেমের প্রতীক। খদ্দর পরলে গ্রামের কাটুনী আর তাঁতিদের অন্নের সংস্থান হয়। মিলের কাপড় পরা মানে কলের মালিকের তেলামাথায় আরও তেল ঢালা। চারপাশের অসংখ্য নিরন্ন মানুষের সঙ্গে অন্তরের জীবন্ত সহানুভূতির নিষ্কলঙ্ক প্রকাশ খদ্দরের অনাবিল শুভ্রতায়। মিলের কাপড় খদ্দরের তুলনায় সস্তা হতে পারে—কিন্তু সস্তার লোভে পড়শীর সুখ-দুঃখের প্রতি নির্ম্মম ঔদাসীন্য নিশ্চয়ই মনুষ্যত্বের লক্ষণ নয়।

সর্ব্বশেষে খদ্দরের মধ্যে কর্ম্মের জয়গান। স্বামীজী বলেছিলেন "কর্ম্মতৎপরতার দ্বারা ঐহিক অভাব দূর না হলে ধর্ম্মকথায় কেউ কান দেবেন না।" চরকার উপরে গান্ধী এত জোর দিয়েছিলেন একটা অলস কর্ম্মবিমুখ জাতিকে কর্ম্মতৎপর করবার জন্মে। বিবেকানন্দের ভাষায়, "হাজার হাজার লম্বা কথার চেয়ে এতটুকু কাজের দাম ঢের বেশী।" বিবেকানন্দের বক্তৃতার পর বক্তৃতায় যে কর্ম্মবাদের জয়ধ্বনি—গান্ধী চরকার প্রবর্ত্তন করে সেই কর্ম্মবাদকেই মূল্য দিয়েছেন। ঘোর তামসিকতায় যে-জাতি ছিল মৃতবৎ, তাকে জড়তা থেকে মুক্ত করবার জন্মেই চরকাকে এতখানি গৌরবদান। খাদির মাধ্যমে আমাদের মৃতপ্রায় গ্রামগুলি আবার প্রাণচাঞ্চল্যে সজীব হয়ে উঠুক ; দেশবাসীর মধ্যে আসুক সেই উৎসাহের প্রবল বন্যা—যাতে যুগ যুগসঞ্চিত আলস্য নিমেষে দূর হয়ে যায় ; আসুক সেই মানব-প্রীতি যাতে পড়শীর দুঃখকে আমরা নিজেরই দুঃখ বলে অনুভব করি ; সস্তার লোভকে সংবরণ করে প্রতিবেশীর তৈরী জিনিষ ব্যবহার করতে উৎসাহিত হই।*

* অল্ ইণ্ডিয়া রেডিওর সৌজন্যে।

দীপ জ্বালো

প্রভা দত্ত

আশ্বিন শেষে সোনার সূর্য্য গিয়েছে মিশে :
ফেন সমুদ্র আজকে বুঝি না নিরুদ্বেগ—
সীমান্তে দেখি নতুন সূর্য নতুন দিন,
নীল দিগন্ত আজ নিঃসীম হ'ল কিসে ?

উত্তর পাখী পাখা মেলে দেয়, লাল আলো :
নীড়ের স্বপ্নে জীবনের ডানা মেলা—
এখন তাই তো তাদের প্রাসাদে নিদ্ ভাঙ্গে
স্বস্তি কোথায়, আগামী দিনের দীপ জ্বালো।

নবদ্বীপের পথে পথে

শ্রীফণীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়

বাংলার অতি প্রাচীন গৌরবময় সাধনক্ষেত্র, কলির পতিতপাবন শ্রীমন মহাপ্রভু শ্রীগৌরাঙ্গের জন্মভূমি নবদ্বীপ আজও সগৌরবে তাহার পুরাতন কীর্তি ও বর্তমান সংস্কৃতি লইয়া বিরাজ করিতেছে—আমাদের দুর্ভাগ্য, বাংলার তরুণের দল নবদ্বীপ দেখে না, নবদ্বীপের কথা চিন্তা করে না—নবদ্বীপকে চিনিবার চেষ্টা করে না। সে যাহা হউক, বর্তমান স্বাধীনতা-পরবর্তী যুগেও নবদ্বীপের সমৃদ্ধি দিন দিন বর্দ্ধিত হইতেছে, ইহা বাঙ্গালীর পক্ষে আশা ও আনন্দের কথা।

১৯১৯ সালে প্রথম নবদ্বীপ দর্শনের সৌভাগ্যলাভ করি। তখন স্বর্গত পণ্ডিত কুলদাপ্রসাদ মল্লিক ভাগবতরত্ন মহাশয় নবদ্বীপে বড়াল-ঘাটে শ্রীশ্রীরাধারমণ সেবাশ্রম ও শ্রীনিত্যানন্দ মাতৃমন্দির পরিচালনা করিতেন। আমি তখন কুলদাবাবু গৃহে বাস করি, তাঁহারই আদেশে সেবাশ্রম ও মাতৃমন্দির পরিচালনা সংক্রান্ত কাজে নবদ্বীপ গিয়াছিলাম। ষ্টেশনের নিকটস্থ স্বর্গত উপেন্দ্রনাথ ভাদুড়ী মহাশয়ের গৃহে প্রথম যাই—উপেন্দ্রবাবুর অগ্রজের কন্যাকে কুলদাবাবু বিবাহ করিয়াছিলেন—কাজেই ভাদুড়ী পরিবারের অনেকের নিকট পূর্বেই সুপরিচিত ছিলাম। সেখান হইতে সেবাশ্রমে স্বর্গত কর্মী অন্নদাচরণ রায়ের কাছে যাই। তারাদাস ভট্টাচার্য্য ও সে সময়ে সেবাশ্রমের কর্মীছিলেন। নবদ্বীপে ভ্রূণহত্যা নিবারণের জন্য স্বর্গত পুলিনবিহারী মল্লিকের চেষ্টায় মাতৃমন্দির প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল এবং তাঁহার বিয়োগের পর তাঁহারই বৈষ্ণব নাম নিত্যানন্দের নামে মাতৃমন্দিরের নামকরণ করা হইয়াছিল। সেবাশ্রম নামপ্রেমী শ্রীল রাধারমণ চরণ দাস বাবাজীর নামেই করা হইয়াছিল এবং তাঁহার শিষ্যদ্বয় শ্রীমৎ রামদাস বাবাজী ও শ্রীমতী ললিতা সখি—উহার দেখাশুনা করিতেন—কুলদাবাবু উভয় প্রতিষ্ঠানের পরিচালক সমিতির সম্পাদক ছিলেন এবং সকলে মিলিয়া অর্থ সংগ্রহ করিয়া প্রতিষ্ঠান দুইটির ব্যয় নির্বাহ করিতেন।

তাহার পর গত ৪০ বৎসর কাল বহুবার নবদ্বীপ গিয়াছি। এক-বারের যাওয়া বিশেষ উল্লেখযোগ্য। শ্রদ্ধেয় শ্রীহেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ ও লেখক একবার নবদ্বীপের পাঠাগারের বার্ষিক উৎসবে সভাপতি ও প্রধান অতিথি হইয়া নিমন্ত্রিত হইলেন। আমার পূজনীয় সুহৃদ্ পণ্ডিত শ্রীগোপেন্দুভূষণ সাংখ্যতীর্থ ও শ্রদ্ধেয় বন্ধু স্বর্গত জনরঞ্জন রায় নিমন্ত্রণ করিলেন। হেমেন্দ্রবাবুর সহিত এক সঙ্গে যাওয়া ও সভা করার সৌভাগ্য হইবে—পুলকিত হইলাম। একটি যুবক কলিকাতায় আসিয়া সঙ্গে লইয়া গেল। বেলা ৩টায় নবদ্বীপ ষ্টেশনে নামিয়া তিনজনে এক ঘোড়ার গাড়ীতে উঠিলাম। কিছুক্ষণ পরে দেখিলাম, সাধারণতঃ যে পথ দিয়া পাঠাগারে যাইতে হয়, গাড়ী সে পথ না ধরিয়া অন্য পথ ধরিয়াছে। ভাবিলাম, অপর কোন নেতৃস্থানীয় ব্যক্তির বাড়ী লইয়া যাইতেছে। গাড়ী নবদ্বীপ সংস্কৃত কলেজে আমাদের লইয়া গেল। বুনো রামনাথের টোল-বাড়ী তখন সরকারী সংস্কৃত কলেজে পরিণত হইয়াছে। তথায় দেখিলাম, বিরাট সভামণ্ডপে নবদ্বীপবাসী বহু পণ্ডিত সমবেত হইয়াছেন। কয়েকজন মহামহোপাধ্যায় ও উপস্থিত। শুনিলাম, পাঠাগারে লইয়া যাওয়ার পূর্বে পণ্ডিতমণ্ডলী আমাদের অভিনন্দিত করিবেন। বুঝিলাম, জনরঞ্জনবাবু ও গোপেন্দুদা প্রভৃতি উহার উদ্যোক্তা। অতিবৃদ্ধ মহামোহ-পাধ্যায় চণ্ডীদাস ন্যায়রত্ন সভাপতিত্ব করিলেন। হেমেন্দ্রবাবুকে বিদ্যা-রঞ্জন ও লেখককে ভারতীরঞ্জন উপাধি দানে সম্মানিত করা হইল। শ্রীমন্ মহাপ্রভুর কৃপা লাভ করিয়া ধন্য হইলাম। পাঠাগারের বার্ষিক উৎসব সন্ধ্যার পর অনুষ্ঠিত হইল—উভয়ে রাত্রি ২টার ট্রেণে কলিকাতা রওনা হইলাম। এই দিনের স্মৃতি কখন ও ভুলিবার নহে।

একবার মহাপ্রভু শ্রীশ্রীদুর্গা পূজার পর টানিলেন। সোমবার বিজয়ার পর দিন একাদশীর রাত্রি ১১টায় আগড়পাড়া হইতে ৫জন বন্ধুসহ নৌকা-যোগে নবদ্বীপ যাত্রা করিলাম। সারা দিনরাত্রি নৌকা চালাইয়া (অবশ্য দাঁড়ি মাঝিরা সুবিধামত বিশ্রাম করিত—তাহারা ছিল ৫ জন) শনিবার বেলা ১১টায় নবদ্বীপে যাইয়া গঙ্গাতীরে উপস্থিত হই। মহাপ্রভু দর্শনের পর স্বর্গত জনরঞ্জনবাবুর গৃহে মধ্যাহ্ন ভোজন ও সন্ধ্যায় সঙ্গীত-বিশারদ বন্ধুবর শ্রীযুত সুধাময় গোস্বামীর গৃহে নৈশভোজন সমাপ্ত করিয়া আমরা ঐ দিনই শনিবার রাত্রি ১২টায় নৌকা ছাড়িয়া পরদিন রবিবার রাত্রি ১২টায় আগড়পাড়ায় ফিরিয়া আসিয়াছিলাম। স্রোত ও বাতাসের বিরুদ্ধে দাঁড় ও গুণ টানিয়া যাইতে ১০৮ ঘণ্টা এবং স্রোত ও বাতাস অনুকূল পাইয়া ফিরিতে মাত্র ১২ ঘণ্টা সময় লাগিয়াছিল। সে আজ হইতে ১৬ বৎসর পূর্বের কথা। জনরঞ্জনবাবুর পুত্র শ্রীমান রাম-গোপালের বিবাহের পর পার্কস্পর্শ উপলক্ষে সস্ত্রীক নবদ্বীপ যাইয়া কয়েকদিন বাস করিয়া আসিয়াছিলাম। কবিবন্ধু সুপণ্ডিত ও ভক্তপ্রবর শ্রীযুত বিষ্ণু সরস্বতী মহাশয় নবদ্বীপ ন্যাশানাল স্কুলের প্রধান শিক্ষক হইয়া কিছুকাল নবদ্বীপে বাস করিয়াছিলেন, সে সময়ে ও নবদ্বীপ যাইয়া স্কুলের নিকটস্থ এক গৃহে বাস করিয়া আসিয়াছি। কালনার অধিবাসী খ্যাতনামা কবিরাজ-বংশীয় বন্ধুবর শ্রীযুত রাসবিহারী সেন মহাশয়ের সহিত প্রায় ২৫ বৎসর পূর্বে নবদ্বীপ যাইয়া ৩ দিন তথায় এক ব্রজ-গোস্বামীর গৃহে বাস করিয়াছিলাম ও তাঁহার সহিত নদীর পরপারে নূতন মায়াপুর দেখিতে গিয়াছিলাম। শ্রীল হরিদাস বাবাজীর কথা মনে পড়ে। তাঁহার হরিবোল কুটীরে যাইয়া তাঁহাকে কয়েকবার দর্শনের সৌভাগ্য হইয়াছিল।

শ্রদ্ধেয় ব্রজমোহন দাস বাবাজীর কথা সর্ব্বজনবিদিত। নবদ্বীপে যে স্থানে শ্রীমন মহাপ্রভু আবির্ভূত হইয়াছিলেন, সে স্থানে খ্যাত-

নামা জমীদার দেওয়ান গঙ্গাগোবিন্দ সিংহ এক মন্দির নির্মাণ করিয়া দিয়াছিলেন। তথায় শ্রীশ্রীমাতা বিষ্ণুপ্রিয়া-সেবিত মহাপ্রভু-মূর্তি রক্ষিত ও পূজিত হইতেন। সকলেই জানেন, মহাপ্রভু অপ্রকট হইবার পূর্বেই মাতা বিষ্ণুপ্রিয়া মহাপ্রভুর ঐ মূর্তি নির্মাণ করাইয়া তাহা পূজা করিতেন। বিষ্ণুপ্রিয়া দেবী ১৪০ বৎসর বয়সে দেহ ত্যাগ করেন এবং সম্ভবতঃ প্রায় ১২০ বৎসর কাল তিনি ঐ মূর্তির পূজা করিয়া গিয়াছেন। ঐ মূর্তিই এখনও নবদ্বীপে কৃষ্ণনগরের মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্রের নির্মিত মন্দিরে সেবিত হইতেছেন। যাহা হউক, নবদ্বীপে গঙ্গার প্রবাহ পরিবর্তিত হয় এবং গঙ্গাগোবিন্দের মন্দির গঙ্গাগর্ভে চলিয়া যায়। তাহার বহু বর্ষ পরে ব্রজমোহন দাস বাবাজী মহাপ্রভুর জন্মস্থান নির্ণয়ে প্রবৃত্ত হন। তিনি পূর্ব-জীবনে সরকারী সেচ বিভাগের এঞ্জিনিয়ার ছিলেন। বহু পরিশ্রম করিয়া বাবাজী মহাশয় বর্তমান নবদ্বীপের উত্তরে জলার মধ্যে একটি স্থান নির্ণয় করেন এবং তথায় মাটীর মধ্যে গর্ত করিয়া জানিতে পারেন, মন্দিরটি ঐ স্থানে ভূগর্ভে প্রোথিত আছে। আমরা শুনিয়াছি, নবদ্বীপ-বাসী মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত স্বর্গত অজিতনাথ ন্যায়রত্ন বলিতেন, তিনি ১০।১২ বৎসর বয়সে গ্রীষ্মকালে গঙ্গায় সাঁতার কাটিবার সময় মন্দিরের চূড়ায় যাইয়া বিশ্রাম করিতেন, তখন মন্দিরটি জলের মধ্যে ছিল—গ্রীষ্ম-কালে গঙ্গার জল কমিয়া গেলে মন্দিরের চূড়াটি দেখিতে পাওয়া যাইত। ন্যায়রত্ন মহাশয় যে সময়ের কথা বলিতেন, তাহার প্রায় এক শত বৎসর পরে বাবাজী মহাশয় মন্দিরের স্থান নির্ণয় করেন ও তথায় একটি স্মারক স্তম্ভ নির্মাণ করেন। অর্থাভাবে এবং একদল লোকের বাধা প্রদানের ফলে দরিদ্র ব্রজমোহনের পক্ষে মৃত্তিকা গর্ভ হইতে মন্দির উত্তোলন করা সম্ভব হয় নাই। বর্তমানে নবদ্বীপ উত্তর দিকে বহুদূর পর্য্যন্ত বিস্তৃত হইয়াছে। ৩০ বৎসর পূর্বে যে স্থানে জলা-জঙ্গল দেখিয়া আসিয়াছিলাম, সে স্থান বর্তমানে লোকালয়ে পূর্ণ, ঐ দিকেই বর্তমানে ন্যাশানাল স্কুল, রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রম প্রভৃতি অবস্থিত এবং বোধ হয় সর্বাপেক্ষা উত্তরপ্রান্তে নিদয়ার ঘাটের নিকট শ্রীমান গোবিন্দলাল গোস্বামী বর্তমানে বঙ্গবাণী নামক বিরাট প্রতিষ্ঠান ও শ্রীঅরবিন্দ মন্দির প্রভৃতি নির্মাণ করিয়া সে স্থানকে বিজলী আলোকে সুশোভিত, বহু অট্টালিকা সমন্বিত সহরে পরিণত করিয়াছেন। যে স্থানে নৌকায় চড়িয়া শ্রীমন্ মহাপ্রভু সর্বশেষ নবদ্বীপ ত্যাগ করেন, সে স্থানই নিদয়ার ঘাট নামে পরিচিত।

অগ্রজপ্রতিম পূজনীয় পণ্ডিত গোপেন্দুভূষণের কন্যার বিবাহ সম্পর্কে, স্বর্গত শ্রদ্ধেয় বন্ধু জনরঞ্জনের বিদ্যালয়ের উৎসবে, মহাপ্রভুর সেবাইত পণ্ডিতপ্রবর শ্রীপ্রাণ গোপাল গোস্বামী ও স্বর্গত শিক্ষাব্রতী মনোমোহন গোস্বামীর আমন্ত্রণে—এইরূপ কতবার কত কারণে নবদ্বীপে গমন করিয়াছি, তাহার সংখ্যা নাই। কবি-বন্ধু শ্রদ্ধেয় বিষ্ণু সরস্বতীর নবদ্বীপ ত্যাগের পর ও তাঁহার ন্যাশানাল স্কুলের উৎসবে নবদ্বীপ গিয়াছিলাম। কয় বৎসর পূর্বে বঙ্গবাণীর দীপ-বাণী উৎসবে তথায় যাইতে হইয়াছিল। কাজেই সারা জীবন মহাপ্রভুর কৃপায় নবদ্বীপের পথে পথে ঘুরিবার যে সৌভাগ্য লাভ করিয়াছি, তাহা ভুলিবার নহে।

শ্রীবাস অঙ্গন ও শ্রীশ্রীসোনার গৌরাঙ্গের সেবক পণ্ডিতপ্রবর পরম-ভাগবত শ্রীযুত চৈতন্যচন্দ্র গোস্বামী মহাশয়ের আমন্ত্রণে গত ১৪ই আগষ্ট অপরাহ্নে আবার শ্রীধাম নবদ্বীপ দর্শনের সুযোগ হইয়াছিল। চৈতন্যচন্দ্র খড়দহের গোস্বামী বংশ সম্ভূত—কলিকাতায় ও নবদ্বীপে বাস করেন। তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র শ্রীমান নিমাইচন্দ্র ইংরাজ আমলে উপাধি লাভ করিয়া ও নবদ্বীপ মিউনিসিপালিটির কমিশনার ও চেয়ারম্যানরূপে বহু বৎসর জনসেবা করিয়া সর্বজনপ্রিয় হইয়াছেন। গত ১৪ই আগষ্ট শুক্রবারে বিকালে তাঁহাদের নবদ্বীপের গৃহে যাইয়া উপস্থিত হই। সন্ধ্যায় নিমাই-চন্দ্রের সহিত তোতারাম দাস বাবাজীর সমাধিক্ষেত্র বড় আখড়া, জগন্নাথ-দাস বাবাজীর সমাধি পুরাতন ভজন কুটীর, গিরিধারী হরিবোলের শিষ্য ও স্বর্গত সুহৃদ্ হরিদাস দাস বাবাজীর গুরু ভাই বিশ্বম্ভর দাস বাবাজীর সাধন কুটীর ও সুপ্রসিদ্ধ সমাজবাড়ী দর্শন করি। সমাজবাড়ীর রক্ষক শ্রীল রামদাস বাবাজী ও ললিতা সখীর কৃপা ও সান্নিধ্য লাভ করিয়া জীবনে বহু সময় ধন্য হইয়াছি ও তাঁহাদের সহিত বহু সময় সমাজবাড়ীতে অতিবাহিত করিয়াছি—কাজেই ঐ স্থানে গমন করিয়া পুরাতন দিনের বহু কথা মনে পড়িয়াছিল। বর্তমানে কানাইদাস বাবাজী সমাজবাড়ীর রক্ষক এবং তরুণ কর্মী শ্রীমান দুর্গাপদ বন্দ্যোপাধ্যায় তথায় থাকিয়া বাবাজী মহাশয়কে সকল বিষয়ে সাহায্য করিতেছেন দেখিয়া আনন্দিত হইলাম।

পূর্বেই-বলিয়াছি শ্রদ্ধাভাজন চৈতন্যচন্দ্র বর্তমানে শ্রীবাস অঙ্গনের সেবাইত। শ্রীবাস অঙ্গনের শেষ মোহান্ত রামদাস প্রায় ৯০ বৎসর পূর্বে চৈতন্যচন্দ্রের পিতামহ ভক্তবর নবদ্বীপচন্দ্র গোস্বামীর নিকট দীক্ষা গ্রহণ করিয়া শ্রীবাস অঙ্গন রক্ষার ভার গুরুর উপর অর্পণ করেন। তাহার পর প্রায় ৬০ বৎসর পূর্বে নবদ্বীপচন্দ্রের পুত্র ভক্তপ্রবর প্রতাপচন্দ্র শ্রীবাস অঙ্গনের নিকট সোনার গৌরাঙ্গ মন্দির নির্মাণ করিয়া নূতন মূর্তি প্রতিষ্ঠা করেন। দুই শতাধিক বৎসর পূর্বে হইতে এই গোস্বামী বংশীয়গণ কলিকাতা আহিরীটোলায় সোনার গৌরাঙ্গ মন্দির প্রতিষ্ঠা করিয়া তাহার সেবা পূজা করিয়া আসিতেছেন। প্রতাপচন্দ্রের জ্যেষ্ঠ পুত্র গৌরচন্দ্রের পুত্র নাই—তিনি কলিকাতায় থাকিয়া সোনার গৌরাঙ্গ সেবা ও বিষয় সম্পত্তি রক্ষা করেন। কনিষ্ঠ পুত্র চৈতন্যচন্দ্র শ্রীধাম নবদ্বীপে থাকিয়া সর্বদা সাধন-ভজনে রত আছেন। চৈতন্যচন্দ্রের জ্যেষ্ঠ পুত্র নিমাইচন্দ্র নবদ্বীপে পিতার নিকট ও অপর দুই পুত্র শ্যামসুন্দর ও বীরচন্দ্র কলিকাতায় জ্যেষ্ঠতাতের নিকট বাস করেন। ধনী চৈতন্যচন্দ্রের গৃহে দেব-সেবার ব্যবস্থাও ধনীজনোচিত। বিরাট গৃহ ও তৎসংলগ্ন শ্রীবাস অঙ্গন নবদ্বীপের অন্য-তম শ্রেষ্ঠ দ্রষ্টব্য স্থান। আমার সৌভাগ্য, সেই দিনই ১৪ই আগষ্ট শ্রীবাস অঙ্গনের গৃহ নূতনভাবে নির্মাণের পর তথায় বিগ্রহাদি সজ্জিত করা হইয়াছে। রাত্রিতে বহুক্ষণ ধরিয়া শ্রীবাস অঙ্গনের শ্রীমূর্তিগুলি দর্শন করিয়া কৃতার্থ হইলাম। রাত্রিতে ভাটপাড়ানিবাসী তরুণ বন্ধু সুলেখক শ্রীমান গোপীমোহন ভট্টাচার্য্য যাইয়া আমার সহিত মিলিত হইলেন। তিনি কাজে আটক পড়ায় বেলা ৫টায় কলিকাতা ত্যাগ করিয়া রাত্রি ৯টায় নবদ্বীপে উপস্থিত হইয়াছিলেন। রাত্রে একত্র প্রসাদ গ্রহণের পর বহু সময় প্রভুপাদ গোস্বামীজী ও তাঁহার পুত্রের সহিত

নবদ্বীপ ব্রজবাটীতে (নিমায়ের ঘাট) শ্রীঅরবিন্দ মন্দির
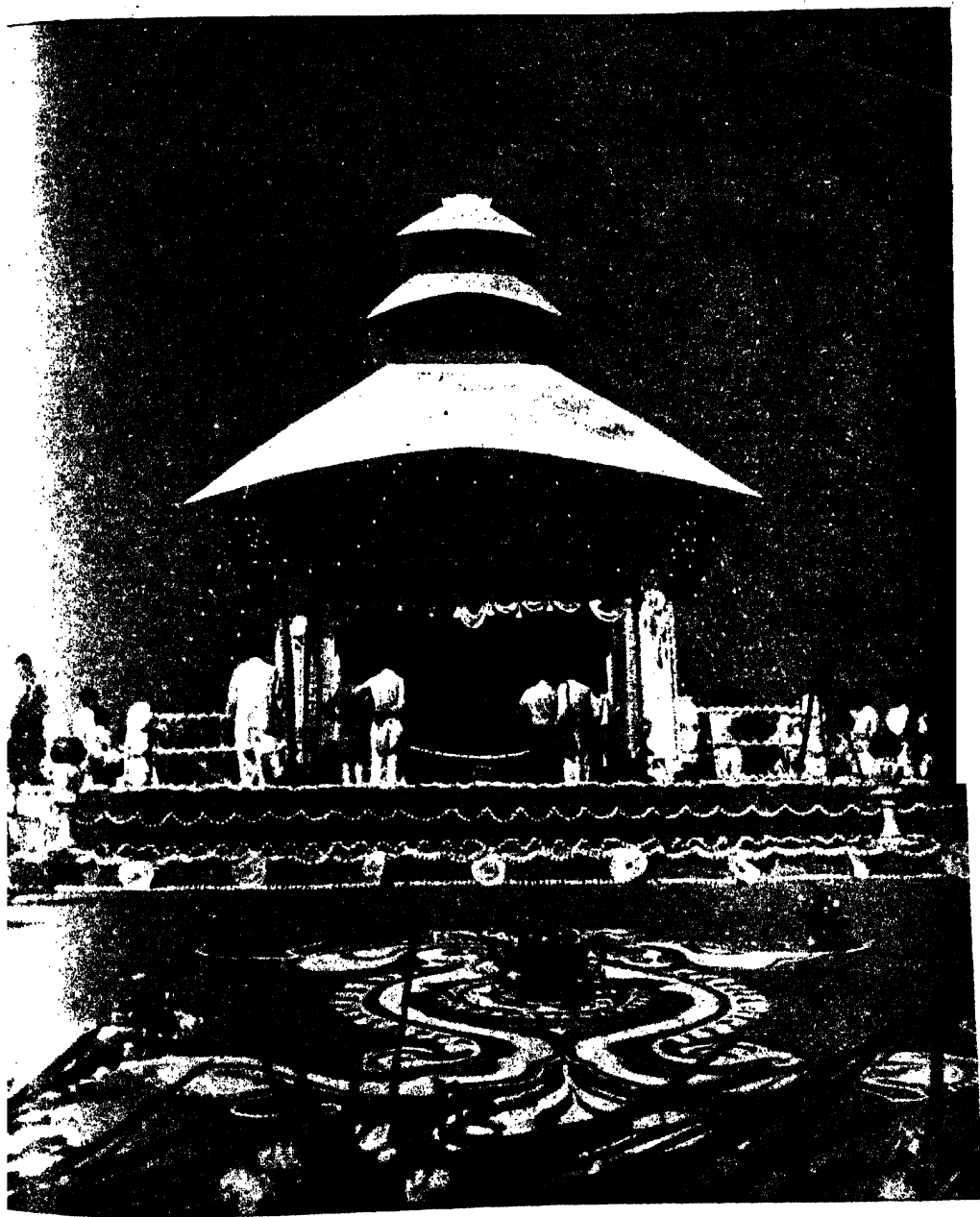
নানা বিষয়ে আলোচনা চলিল। গোস্বামীজী কৃষ্ণকথা ছাড়া অন্য কথায় যোগদান করেন না—ইহাই তাঁহার বৈশিষ্ট্য। তাঁহার বাচনভঙ্গী এবং শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীচৈতন্যের লীলা সম্বন্ধে জ্ঞান অসাধারণ বলা যায়। সর্বদা ভগবৎ চিন্তায় নিযুক্ত ও শ্রীল রামদাস বাবাজীর মত অতিথিঅভ্যাগতদের সকল সুখ সুবিধা বিধানে তিনি সর্বদা অবহিত।

পরদিন সকালে গঙ্গাস্নান ও পূজার্চনার পর আমাদের নবদ্বীপ মৈত্রী সংঘে পতাকা উত্তোলন করিতে লইয়া যাওয়া হইল। সেদিন ১৫ই আগষ্ট—কাজেই স্বাধীনতা উৎসবের অনুষ্ঠানে সানন্দে যোগদান করিলাম। সেথান হইতে নবদ্বীপের বহু দ্রষ্টব্য স্থান দর্শন করিয়া বেড়াইলাম—মণিপুর রাজবংশের তিনটি পৃথক দেবালয়, এগুলি নবদ্বীপ সহরের উত্তর প্রান্তে অবস্থিত—মহানির্বাণ মঠ, ভারত সেবাশ্রম সংঘের নবনির্মিত মন্দির ও ধর্মশালাদি গৃহ, বুনো রামনাথের বাটীতে সরকারী সংস্কৃত কলেজ, নবদ্বীপের প্রায় মধ্যস্থলে নির্মিত গৌড়ীয় মঠের মন্দির, শ্রীমন মহাপ্রভুর বাটী (এ স্থানের কথা পূর্বেই বলিয়াছি—নবদ্বীপের শ্রেষ্ঠ স্থান—শ্রীশ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া-সেবিত শ্রীচৈতন্য মূর্তির দিকে চাহিলে আর অন্যদিকে চাওয়া যায় না—বহুক্ষণ সেখানে বসিয়া থাকিতে হয়—সেখানে স্বর্গত মনোমোহন গোস্বামীর পুত্রের সহিত সাক্ষাৎ হইল এবং সেদিন তাঁহার বিগ্রহ সেবা থাকায় আমাদের জন্য প্রসাদ প্রেরণ করিলেন), বিদগ্ধজননী বা পোড়ামা-তলা প্রভৃতি বহু স্থান দর্শন করিয়া সমাজবাড়ীতে যখন ফিরিলাম, তখন মন্দিরের দ্বার রুদ্ধ হইয়াছে—অর্থাৎ বেলা ১২টা বাজিয়া গিয়াছে। পূর্বদিন সন্ধ্যায় পথে গোপেন্দুদাদার সহিত দেখা হইয়াছিল এবং শ্রীমান নিমাইচন্দ্র তাঁহাকে পরদিন প্রসাদ গ্রহণের নিমন্ত্রণ করিয়াছিলেন। ফিরিয়া গোস্বামী গৃহে তাঁহার সাক্ষাৎ পাইলাম ও সকলে একত্র শ্রীবাস অঙ্গনে প্রসাদ গ্রহণের পর কয়েক ঘণ্টা মহাপ্রভুর কথা আলোচনায় অতিবাহিত হইল।

বেলা ৩টায় বঙ্গবাণী হইতে সেখানকার অধ্যক্ষ কল্যাণভাজন শ্রীমান গোবিন্দলাল গোস্বামীর লোক আসিয়া উপস্থিত হইল এবং তাঁহার সহিত গোপীমোহনকে সঙ্গে লইয়া বঙ্গবাণী যাত্রা করিলাম। সেখানে পৌঁছিয়াই সভায় সভাপতিত্ব করিতে হইল। গাড়ী হইতে নামিয়াই দুই পুরাতন বন্ধুর সাক্ষাৎ পাইলাম—(১) খ্যাতনামা নাট্যকার ও দেশসেবক শ্রীনিতাই ভট্টাচার্য্য—প্রায় আমার সমবয়স্ক—১৯১৯ সাল হইতে উভয়ে উভয়ের ঘনিষ্ঠ পরিচিত (২) খ্যাতনামা শিল্পী রাণাঘাটনিবাসী শ্রীতরুণ ঘোষাল—ইনিও বহু বৎসরের পরিচিত। সভায় তিনটি নূতন গৃহের উদ্বোধন উৎসব সম্পাদিত হইল। সেদিন একে স্বাধীনতা দিবস, তাহার উপর শ্রীঅরবিন্দের জন্মদিন। বঙ্গবাণীর কর্মীরা সকলেই শ্রীঅরবিন্দের ভাব ও আদর্শে অনুপ্রাণিত, পণ্ডিচেরীর শ্রীঅরবিন্দ আশ্রমের শ্রীমা'য়ের কৃপাপ্রাপ্ত। কয় বৎসরে বঙ্গবাণী আশ্রমে বহু নূতন গৃহ নির্মিত হইয়াছে। মন্ত্রী শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র সেন বঙ্গবাণীর পরিচালক সমিতির সভাপতি, নিতাই সম্পাদক ও গোবিন্দলাল কর্মকর্তা। শ্রীমতী উত্তরা চৌধুরী প্রতিষ্ঠানের নিয়ন্ত্রণ করেন। শুনিলাম, বর্তমানে ছাত্রাবাসে প্রায় তিন শত ছাত্রী থাকেন। ১১টি বিভাগে কাজ চলিতেছে—(১) শিশুবাণী—প্রাক্ বুনিয়াদী নার্সারী বিভাগ (২) আস্তবাণী—(ক) অবৈতনিক প্রাথমিক বিভাগ ও (খ) সহরের বুনিয়াদী বিভাগ (৩) মধ্যবাণী—মধ্য শিক্ষাবিভাগ—বর্তমান সরকারী সর্বার্থসাধক উচ্চ বিদ্যালয়। (৪) তীর্থবাণী—সাহিত্য, দর্শন, সমাজ-বিজ্ঞানের ইতিহাস প্রভৃতির শিক্ষা ব্যবস্থা সম্বলিত আই-এ ও বি-এ পরীক্ষার্থী বিভাগ। (৫) গণবাণী—সমাজ শিক্ষা ও সেবা বিভাগ (ক) গ্রামে ৪টি সমাজ-শিক্ষা কেন্দ্র (খ) প্রাপ্তবয়স্কাদের ৩ বৎসরের উচ্চ-শিক্ষা ব্যবস্থা (গ) সমাজ-শিক্ষা শিক্ষণ কেন্দ্র—সরকারী ব্যবস্থায় পরিচালিত—তথায় ৪ মাসে ভারতীয় সংস্কৃতি, লোক-সঙ্গীত, লোক-শিল্প, অর্থনীতি প্রভৃতির শিক্ষা ব্যবস্থা ও আছে। (ঘ) মালদহে আদিবাসীদের মধ্যে স্কুল তথা সমাজ সেবা কেন্দ্র (ঙ) দেখা-শুনার মাধ্যমে শিক্ষা। ৬। শিল্পবাণী—কুটীর শিল্প বিভাগ (ক) সেলাই, বুনন ও পাড়ের কাজে লেডী ব্রাবোর্ণ ডিপ্লোমা বিভাগ (খ) কাপড় কাটা, বেত ও বেঁকারীর কাজ, মাদুর বোনা, চামড়ার কাজ (জুতা, সুটকেশ, হোলডল, ফোলিও, ব্যাগ প্রভৃতি), সূত্রধরের কাজ, খেলনা তৈয়ারী—২ বৎসরে সার্টিফিকেট দেওয়া হয় (গ) রুটী, বিস্কুট ও মিষ্টি খাদ্য, কেক প্রভৃতি প্রস্তুত—গ্রাম্য শিল্প—অম্বর চরকা, চাকী প্রভৃতিতে এক বৎসরে সার্টিফিকেট দেওয়ার ব্যবস্থা।

৭। রূপবাণী—ড্রইং, পেন্টিং, মৃৎশিল্প ও কমার্সিয়াল আর্ট, ৫ বৎসরের ডিপ্লোমা কোর্স।

৮। (ক) মার্গ, কীর্তন, রবীন্দ্র সঙ্গীত ও লোক সঙ্গীত, নৃত্য, তারের বাজনা, নাটক প্রভৃতিতে ৪ বৎসরের সার্টিফিকেট ও ৬ বৎসরের ডিপ্লোমা দান ব্যবস্থা—(খ) মহিলাদের সঙ্গীত-শিক্ষক-শিক্ষণের সরকারী ব্যবস্থা (সাধারণত ২ বৎসর—বিশেষজ্ঞ হইবার জন্য ৩ বৎসরের ব্যবস্থা)।

(৯)—শক্তিবাণী—শরীর চর্চা বিভাগ।

(১০) দীপবাণী—আত্মপ্রকাশ, সৃষ্টি ও সেবার জন্য ছাত্র-সংগঠন।

(১১) বাণী-তীর্থ—সকল বিভাগের পাঠাগার খোলা হইয়াছে—(ক) শিক্ষক-শিক্ষণ বিভাগের শিক্ষাবাণী (খ) সংস্কৃতি ও গবেষণা বিভাগের দিব্যবাণী (গ) কৃষি, পশুশালা প্রভৃতির জন্য ভূবাণী।

৫টার পর নবনির্মিত শ্রীঅরবিন্দ মন্দিরের মাঠে শরীর চর্চা প্রদর্শনী হইল ও সন্ধ্যায় মন্দিরের চত্বরে প্রার্থনা সভা হইল। বহুক্ষণ ধরিয়া ধর্ম সঙ্গীত ও উপনিষদের প্রার্থনামন্ত্র পাঠ করার পর শ্রীঅরবিন্দের ইংরাজি ও বাংলা গ্রন্থ হইতে কিছু পাঠ করা হইল। গোবিন্দলাল প্রার্থনা পরিচালন করিলেন। মাঠে বিরাট মন্দির নির্মিত হইতেছে—সম্মুখে নাটমন্দির হইবে। গঙ্গাতীরে মাঠের উপর কয়েক শত বিঘা জমী সংগৃহীত হইয়াছে ও কয়েক লক্ষ টাকার বাড়ী নির্মিত হইয়াছে। বিজলী আলো এখনও সেখানে যায় নাই, শীঘ্র যাইবে। বর্তমানে নিজেদের ব্যবস্থায় কতকগুলি বিজলী বাতি জ্বলে। বহুসংখ্যক নলকূপের সাহায্যে জল সরবরাহ হয়। রাত্রিতে বিরাট খাবার ঘরে সকলের সহিত একত্র নৈশ ভোজন করা হইল। সকালে উঠিয়া

স্নানাদির পর চারিদিকে ঘুরিয়া বেড়াইলাম। স্বাধীনতা লাভের পর দেশের নানাস্থানে যে নির্মাণ যজ্ঞ আরম্ভ হইয়াছে, বঙ্গবাণী তাহার অন্যতম কবিগুরু। রবীন্দ্রনাথের শান্তি নিকেতনের আদর্শে ও পণ্ডিচেরীর শ্রীঅরবিন্দ আশ্রমের প্রেরণায় ইহার উৎপত্তি। একজন ত্যাগী কর্মী এই সৃষ্টি কার্য্যে নিযুক্ত। গোবিন্দলালকে প্রায় ৩০ বৎসর পূর্বে আমার পল্লীর আরিয়াদহে শিক্ষাব্রতীরূপে প্রথম দেখিয়াছিলাম। সে সময়ে আমার পূজনীয় শিক্ষাগুরু শ্রীযুত নির্মলচন্দ্র চক্রবর্তী মহাশয় কালাচাঁদ উচ্চ বিদ্যালয়ের সম্পাদক—তিনি উভয়ের মধ্যে পরিচয় করাইয়া দেন। তারপর গোবিন্দলাল ৩০ বৎসর ধরিয়া বঙ্গবাণীর সেবা করিয়া তাহাকে এক বিরাট নারীকল্যাণ প্রতিষ্ঠানে পরিণত করিয়াছেন। তাঁহার একমাত্র পুত্র শ্রীমান দিব্যেন্দু ও বঙ্গবাণীর সেবায় নিযুক্ত। বঙ্গবাণীর শ্রেষ্ঠ বৈশিষ্ট্য—তথায় শ্রীঅরবিন্দের পূতাস্থিরক্ষিত হইয়া শ্রীঅরবিন্দ মন্দির নির্মিত হইল—ইহা বাঙ্গালীর পক্ষে কম গৌরবের বিষয় নহে। শ্রীমান গোবিন্দলাল এ বিষয়ে উদ্যোগী হইয়া বাঙ্গালী মাত্রেরই কৃতজ্ঞতার পাত্র হইয়াছেন। কারণ শ্রীঅরবিন্দ বাঙ্গালীর প্রাণের দেবতা। বঙ্গবাণীর ছাত্রীর দল মাতৃস্নেহ দ্বারা ২ দিন আমাদের দেখাশুনা করিল - তাহাদের আন্তরিকতা ও সেবাপরায়ণতা বহুদিন মনে রাখার বিষয়। বঙ্গবাণীতে বহু নূতন বন্ধু জুটিয়া গেল। বেলঘরিয়ার এক শিক্ষয়িত্রী যাইয়া বঙ্গবাণীর সর্বার্থসাধক বিদ্যালয়ের কর্মভার গ্রহণ করিয়াছেন দেখিয়া আনন্দিত হইলাম। বেলা ১০টায় বঙ্গবাণী হইতে বিদায় গ্রহণ করিয়া আবার শ্রীবাস অঙ্গনে প্রত্যাবৃত্ত হইলাম ও তথায় প্রসাদ গ্রহণের পর বেলা সাড়ে ৩টায় নবদ্বীপ ত্যাগ করিলাম। পূজনীয় চৈতন্যচন্দ্রের প্রীতি ও কৃপার কথা ও সহজে ভুলিবার নহে। নবদ্বীপধামের অধিপতি শ্রীচৈতন্যের কৃপায় এইরূপ বন্ধুলাভ ঘটিয়াছিল। নবদ্বীপকে বার বার প্রণাম করিবার সময় প্রার্থনা জানাইলাম—বর্তমান জগতকে ত্রিতাপ জ্বালা হইতে উদ্ধার করিবার জন্য আবার কবে নবদ্বীপচন্দ্রের পুনরাবির্ভাব হইবে। আমরা ত ভাগ্যবান নই—তাই উপলব্ধি করিবার শক্তিও নাই—

অদ্যাপিও সেই লীলা করে গৌর রায়।
কোন কোন ভাগ্যবানে দেখিবারে পায়॥

যোগীন্দ্রচন্দ্র চক্রবর্তী

শ্রীঅমিয়কুমার সেন

অখণ্ড বাংলার সর্বজনমান্য জননায়ক, উত্তর বঙ্গের সর্বযজ্ঞেশ্বর, দিনাজপুর জেলার প্রাণ-দেবতা যোগীন্দ্রচন্দ্র চক্রবর্তীর মহাপ্রয়াণ ঘটিয়াছে ১৩৪৮ সালের ২৫ এ আশ্বিন, রবিবার (ইং ১২ই অক্টোবর ১৯৪১)।

তাঁহার মৃত্যুর পর দেশ অনেক অগ্রসর হইয়াছে—বহু যুগযুগান্তর সাধনার পর আমরা স্বাধীনতা লাভ করিয়াছি, কিন্তু দেশের দুর্ভাগ্য পরাধীন দেশের লাঞ্ছিত, অপমানিত জনগণের মর্ম বেদনা অনুভব করিয়া তাহাদের মুক্তির জন্য যিনি আজীবন কঠোর সংগ্রাম করিয়া গিয়াছেন এবং এই সংগ্রাম ক্ষেত্রে বীরের ন্যায় ধীর ও দৃঢ় পদক্ষেপে অগ্রসর হইয়া দেশের জাতীয় স্বাধীনতা-আন্দোলনের চিন্তা, আদর্শ ও ভাবধারাকে প্রচার করিতে যিনি এতটুকুও ভীত হন নাই—সেই স্বাধীনতাকামী যোগীন্দ্রচন্দ্র দেশের নবলব্ধ স্বাধীনতা দেখিয়া যাইতে পারিলেন না।

যোগীন্দ্রচন্দ্র উত্তরবঙ্গের অপ্রতিদ্বন্দ্বী ব্যবহারাজীবী ছিলেন, ছাত্রজীবনে তিনি তীক্ষ্ণধী মেধাবী ছাত্ররূপে কৃতিত্ব অর্জন করিয়াছিলেন, কর্মজীবনে তিনি অজস্র অর্থ উপার্জন করিয়াছিলেন, দিনাজপুরে সুদীর্ঘকাল নানাপ্রতিষ্ঠানের তিনি নেতৃত্ব করেন—যোগীন্দ্রচন্দ্রের জীবনের ইহা এই পরিচয় নয়। তাঁহার পরিচয়—তাঁহার দেশ-সেবায়; দুর্ভিক্ষ, মহামারী, প্লাবন, পীড়িতের সাহায্যদানে—হিংসা, দ্বেষ, ক্রোধ, লোভ, উত্তেজনারহিত ত্যাগী পুরুষের এক পরমাশ্চর্য চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যে; সমাজে ও রাষ্ট্রে হিন্দু ও মুসলমানের সমন্বয় সাধনে তাঁহার বহুমুখী বুদ্ধি বিশ্লেষণ শক্তি প্রকাশে এবং সর্বোপরি ধর্মের অনুশাসন অতি নিষ্ঠা ও ভক্তির সহিত তাঁহার আমৃত্যু উদ্‌যাপনে!

জীবনের ক্ষেত্রে যে তেজোদীপ্ত যশোকিরীটমণ্ডিত উন্নত শির লইয়া লক্ষ লক্ষ লোকের পুরোভাগে থাকিয়া তিনি গৌরবময় মহোজ্জ্বল আসন অলঙ্কৃত করিয়া গিয়াছেন তাহাতে মনে হয় মানুষের জগতে তিনি এক স্বনামধন্য ব্যক্তিত্বসম্পন্ন মহামানব। এই মহামানবকে নানাভাবে বুঝিতে গিয়া বিস্ময়ে বিমুগ্ধ হইয়া যাই। আজিকার জগতে—এই মিথ্যা-স্বার্থ-কলুষিত, চটুল পৃথিবীতে যে লোক সত্যের সন্ধানে ও পরোপকারে ঋষিকল্প জীবনযাপন করিয়া গিয়াছেন, উনবিংশ শতাব্দীর আভিজাত্যের ও ঐশ্বর্যের কোলে মানুষ হইয়াও যিনি আজীবন অনাড়ম্বর সাদাসিধা জীবন যাপন করিয়া ভোগ বিলাসকে স্বেচ্ছায় দুইহাতে সরাইয়া দিয়াছেন, এই পরাধীন দেশের স্বাধীনতা চিন্তায় যাঁহার আশাবাদ চিরদিনই ছিল অম্লান, সকলপ্রকার নীচতার উপরে সাম্য মৈত্রীর মহাকাশে যাঁহার ছিল অবাধ বিচরণ সেই মহাপুরুষ যোগীন্দ্রচন্দ্রের মৃত্যুতে যে ক্ষতি দেশের হইয়াছে তাহার অপরিসীম ব্যাপকতা স্মরণ করিয়া মন এখনও স্বতঃই আড়ষ্ট হইয়া যায়।

যোগীন্দ্রচন্দ্রের সমগ্র জীবন বলিতে গেলে দেশ সেবায় উৎসর্গীকৃত। তাহার মধ্যে কৃত্রিমতা ছিল না—স্বার্থ বিজড়িত ছিল না। কংগ্রেসের প্রারম্ভ হইতে সুদীর্ঘ ৫০ বৎসরকাল তিনি অনলস চিত্তে দেশ সেবা

করিয়া গিয়াছেন। দিনাজপুরে যাঁহারা ১৯০৫ সালে বঙ্গভঙ্গ রদ আন্দোলন করেন, তিনি তাঁহাদের অন্যতম নেতা ছিলেন এবং ঐ সময় তিনি সরকারী উকিলের পদ পরিত্যাগ করেন। কংগ্রেসের প্রতি তাঁহার ঐকান্তিক নিষ্ঠা ছিল। কংগ্রেসের সংহতি শক্তিতে যাহাতে ফাটল না ধরে, ইহার শৃঙ্খলা যাহাতে ভঙ্গ না হয় সেদিকে তাঁহার সজাগ দৃষ্টি ছিল। তিনি বলিতেন, "With Congress we live, with Congress we die".

মহাত্মা গান্ধীর প্রতি যোগীন্দ্রচন্দ্রের অপরিসীম শ্রদ্ধা ছিল। ১৯২৫ সালে মহাত্মাজী যখন দিনাজপুর আসেন তখন যোগীন্দ্রচন্দ্রের নেতৃত্বের অকুণ্ঠ প্রশংসা করেন এবং দিনাজপুর হইতে ফিরিয়া যাইবার পর মহাত্মার Young Indiaতে (June 4, 1925) বাহির হইয়াছিল —When I wrote my last letter from Mymensingh, I hardly imagined that still better things were awaiting us in North Bengal. From Dinajpur to Bogra and thence to Talora rnd Pabna was a chapter of surprises. At all these places the number of spinning members was larger than the non-spinning ones. Babu Jogindra Chandra Chekravertty of Dinajpur is an M. L. C., who is respected by pro-changers and no-changers alike, if such a difference still exists. The spinning demonstration that he had arranged as part of the public meeting was rightly described by Gandhiji as a sight for the Gods to see—"

দেশ-গৌরব সুভাষচন্দ্র যোগীন্দ্রচন্দ্রের নেতৃত্বের উপর যথেষ্ট শ্রদ্ধা পোষণ করিতেন। একবার দিনাজপুর সহরে Boycott আন্দোলনে সুভাষচন্দ্রের হস্তক্ষেপের জন্য তাহাকে কলিকাতা হইতে দিনাজপুর আসিতে অনুরোধ করা হইয়াছিল। কিন্তু তিনি বলিয়াছিলেন—যোগীনবাবু থাক্‌তে আমার যাওয়ার কোন প্রয়োজন মনে করি না। ১৯৩০ সালে রাজদ্রোহ অপরাধে কারাগারে যাইবার সময় B. P C. C. র সভাপতির পদের জন্য তিনি যোগীন্দ্রচন্দ্রের নাম প্রস্তাব করিয়া যান। কিন্তু দিনাজপুরে থাকিয়া কংগ্রেসের এই দায়িত্ব-পূর্ণ ও বহু-সম্মানিত পদের কর্তব্য তিনি যথাযথ পালন করিতে পারিবেন না বলিয়া স্বেচ্ছায় তিনি ইহাতে সাড়া দেন নাই। কিন্তু এই পদ গ্রহণ করার জন্য তাঁহাকে নানাভাবে অনুরোধ করা হইয়াছিল। তিনি দৃঢ়তা সহকারে বলিয়াছিলেন—'এ কার্য্যের দায়িত্ব আমি যথাযথ পালন করিতে না পারিলে—আমি কংগ্রেসের কাছে অপরাধী হইব।'

১৯২৭ সালে মাজুতে প্রাদেশিক রাষ্ট্রীয় সম্মেলনের সভাপতিত্বকালে তাঁহার রুদ্রবাণী বীণায় যে নির্ভীক সুরের ঝঙ্কার তুলিয়াছিলেন, তাহা দেশবাসীকে নূতন প্রেরণায় অনুপ্রাণিত করিয়াছিল—স্বাধীনতাকামী জনগণকে সত্যপথের সন্ধান দিয়াছিল। ১৯২৮ সালে দুর্ভিক্ষ মহামারী-কবলিত বালুরঘাট মহকুমায় ছুটিয়া গিয়া যে ভাবে তিনি অর্থ দিয়া, শারীরিক শক্তি ও মানসিক ভক্তি দিয়া অগণিত বুভুক্ষিত, পীড়িত জনগণের সেবা করিয়াছিলেন জাতির ইতিহাসের মণি কোঠায় তাহা চিরদিন স্বর্ণাক্ষরে লিপিবদ্ধ থাকিবে। ইহা তাঁহার এক বিরাট কীর্ত্তি।

১৯৩২ সালে Emergency powers ordinance অনুসারে তিনি কারারুদ্ধ হন। কারণ উইলিংডন অর্ডন্যান্স দ্বারা কংগ্রেস ধ্বংস হইয়া যাইবে ইহা সহ্য করিতে না পারিয়া প্রতিবাদে তাঁহাকে কারাবরণ করিতে হয়। ১৯৩৪ সালে Communal Award ব্যাপারে কংগ্রেসের মধ্যে যখন একটি ভেদের সৃষ্টি হয়, তিনি মালব্যজীপ্রমুখ নেতৃবৃন্দকে কংগ্রেসকে দ্বিধা বিভক্ত না করিতে অনুরোধ করেন। ইহার কারণ কংগ্রেসকে তিনি বড় করিয়া দেখিতেন এবং একমাত্র কংগ্রেসই দেশের স্বাধীনতা আনিতে পারে এই দৃঢ় বিশ্বাসই তাঁহার ছিল।

১৯৩৫ সালের ডিসেম্বর মাসে কংগ্রেসের যে সুবর্ণ জয়ন্তী উৎসব পালিত হয় তাহাতে যোগীন্দ্রচন্দ্র শ্রেষ্ঠ অংশ গ্রহণ করেন এবং এই জয়ন্তী উৎসব সর্বাংশে সাফল্যমণ্ডিত হইয়াছিল যোগীন্দ্রচন্দ্রের ঐকান্তিক চেষ্টা ও যত্নে। তৎকালীন কংগ্রেস সভাপতি ডাক্তার রাজেন্দ্রপ্রসাদ যোগীন্দ্রচন্দ্রের এই প্রচেষ্টাকে অভিনন্দন জানান এবং ১৯৩৬ সালের ১লা জানুয়ারী কংগ্রেস প্রাঙ্গণে দরিদ্র নারায়ণের সেবার যে অভূতপূর্ব ব্যবস্থা হইয়াছিল তাহাও পরিচালিত হইয়াছিল যোগীন্দ্রচন্দ্রের নেতৃত্বে। শুনিয়াছি এই ব্যাপারে তিনি নিজ হতে ৬০০৲ টাকার উপর খরচ করিয়াছিলেন।

১৯৩৮ সাল হইতে বাংলা কংগ্রেসে দলাদলি, ক্ষমতার দলাদলি, ক্ষমতার লড়াই চলিয়া আসিতেছে। কিন্তু তিনি বলিতেন—মহাত্মার নেতৃত্বে পরিচালিত জাতীয় কংগ্রেসই একমাত্র রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান। এ প্রতিষ্ঠান ভাঙ্গিলে দেশের সর্বনাশ হইবে—স্বাধীনতার পথে দেশ অনেক পিছাইয়া যাইবে। তাই তিনি কংগ্রেসের কর্মপন্থা ও নির্দেশ কঠোরভাবে মানিয়া চলিতেন—ইহার বিরোধিতা তিনি কোনদিনই করেন নাই। শুনিয়াছি যে সব রাজনৈতিক বন্দী কারাগার হইতে মুক্তি লাভ করিতেন, তিনি তাঁহাদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিয়া তাঁহাদের কংগ্রেসের সেবা করিবার জন্য সনির্বন্ধ অনুরোধ করিতেন। তাঁহাদের আবেগরুদ্ধকণ্ঠে বলিতেন—আপনারা কংগ্রেসে আসুন—আপনারা না আসিলে কংগ্রেস শক্তিশালী হইবে কেন—কংগ্রেস বাঁচিবে কেন? শুনিয়াছি তাঁহার এই আবেদনে মুক্তিপ্রাপ্ত অনেক রাজনৈতিক বন্দী কংগ্রেসের সেবায় আত্মনিয়োগ করিয়াছিলেন।

কংগ্রেসের নির্দেশ তিনি কি ভাবে অক্ষরে অক্ষরে পালন করিতেন তাহার একটি মাত্র দৃষ্টান্ত দিই। ১৯৩৬ সালের ৩রা ফেব্রুয়ারী তারিখে বাংলার লাট সাহেব Sir John Andersonএর দিনাজপুর আগমন উপলক্ষে দিনাজপুর মিউনিসিপ্যালিটি হইতে অভিনন্দন দেওয়া

স্থির হয়। যোগীন্দ্রচন্দ্র তখন মিউনিসিপালিটির চেয়ারম্যান এবং তিনি কংগ্রেসের একনিষ্ঠ সেবক। এই অভিনন্দন ব্যাপারে তিনি মহাসঙ্কটে পড়িলেন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত তিনি ইহাতে সম্মতি দিতে পারিলেন না। সরকারী নির্দেশ, বিশিষ্ট 'নাগরিকবৃন্দের অনুরোধ উপেক্ষা করিয়া তিনি দেশবাসীদের বলিলেন—আপনারা আমাকে বাদ দিন, আপনারা করুন, আমার মন এতে সাড়া দেয় না। তারপর মিউনিসিপালিটির যে বিশেষ অধিবেশনে ঐ অভিনন্দন দেওয়া স্থির হইবে, তিনি ঐ অধিবেশনে উপস্থিত হইয়া, চেয়ারম্যানের Minute Book টানিয়া লইয়া লিখিলেন—"As I am wedded to the policy and creed of the Indian National Congress, I am not in a position to accord my approval to the welcome address to be presented to H. E. the Governor, on behalf of the Dinajpur Municipality.

দেশের যুবসমাজের প্রতি যোগীন্দ্রচন্দ্রের মমত্ববোধ ছিল অপরিসীম। Defence of India Rules এর অত্যাচারে দুর্দশাগ্রস্ত যুবশক্তির কথা চিন্তা করিয়া তিনি বড় বিচলিত হইতেন এবং দেশের স্বাধীনতা আন্দোলনে ব্যাপৃত থাকিয়া নানা কারণে যে সব যুবক রাজদ্বারে অভিযুক্ত হইতেন তিনি প্রায়ই আদালতে বিনা ফিতে তাহাদের পক্ষ সমর্থন করিতেন।

যোগীন্দ্রচন্দ্রের ব্যক্তিগত জীবনের কয়েকটি বিশেষত্বের কথা বলি। স্ত্রী পাগল, একমাত্র ছেলে পাগল, একটি শিক্ষিত ভাইপো পাগল,—কিন্তু পারিবারিক জীবনের এই অসহনীয় মর্মবেদনা তিনি বাহিরের কাহাকেও ধরিতে দেন নাই—তাঁহাকে দেখিয়া সব সময় মনে হইত—পারিবারিক জীবনে দুঃখকষ্টবিমুক্ত এক প্রশান্ত দিব্য পুরুষ। পারিপার্শ্বিক খুঁটিনাটি প্রত্যেকটি বিষয়ে ছিল তাঁহার অপরিসীম সজাগতা। চারিদিকে তাঁহার চক্ষু দুইটি যেন সহস্র চক্ষু লইয়া কার্য করিত। প্রাত্যহিক কাজকর্মের হুড়োহুড়ির ভিতর একান্তভাবে নিমগ্ন থাকিয়াও সমস্ত ব্যাপারের ঊর্ধ্বে দাঁড়াইয়া তিনি যেন একটা পরিচ্ছন্ন দৃষ্টিতে সব কিছুর উপর তাকাইতেন। বাড়ীতে বসিয়া আছেন, আশে পাশে বসিয়া অভ্যাগত লোকজন রকমারি প্রশ্ন করিতেছেন, তাঁহাদের সে প্রশ্নের উত্তরে তাঁহার কথাগুলি কত মধুবর্ষী ও প্রাণবন্ত হইয়া ফুটিয়া উঠিতেছে। আরও একটা বিশেষত্ব তাঁহার দেখিয়াছি—নিজের কথা অন্যকে সহজে বুঝাইতে পারার একটা অসাধারণ ক্ষমতা। তাঁহার দানের প্রবৃত্তি ছিল আন্তরিক ও বেগোচ্ছল। শুনিয়াছি তিনি যখন দিনাজপুরের বাহিরে কোথাও যাইতেন সঙ্গে অনেক 'রেজগী, লইয়া যাইতেন এবং যাতায়াতের পথে ভিক্ষা-প্রার্থীকে তিনি বিমুখ করিতেন না। কোন বুভুক্ষিত তাহার বাড়ীর ধার হইতে ফিরিত না। আমরা স্বচক্ষে দেখিয়াছি বহু দরিদ্র-নারায়ণ প্রত্যহ তাঁহার বাড়ী হইতে ক্ষুন্নিবৃত্তি করিয়া তাঁহার নাম কীর্তন করিতে করিতে চলিয়া যাইতেছে।

যোগীন্দ্রচন্দ্র যখন তাঁহার মতামত প্রকাশ করিতেন তখন তাঁহাকে দেখা গিয়াছে তেজস্বী কিন্তু বিনয়ী, স্পষ্টবাদী কিন্তু মিষ্টভাষী, দৃঢ়চিত্ত কিন্তু অক্রোধী। তাঁহার কর্মজীবন, তাঁহার সামাজিকতা, তাঁহার স্বাদেশিকতা—মোটের উপর তাঁহার সমগ্র জীবনই ছিল সত্য, সদাচার ও নির্ভীকতার উপর প্রতিষ্ঠিত।

যোগীন্দ্রচন্দ্রের বহুমুখী প্রতিভার প্রভাবের কথা বাদ দিলেও তাঁহার সুন্দর হাস্য, সুন্দর বাক্য, সুন্দর চেহারাও মানুষের জীবনে কম প্রভাব বিস্তার করে নাই। প্রশান্ত, সৌম্য-সুন্দর অথচ দীপ্তিময় তপ্তকাঞ্চন-নিভ মুখমণ্ডল, প্রতিভা-স্ফুরিত দীপ্ত চক্ষুতারকা, ঋষিকল্প ভাবাভিব্যঞ্জক মূর্তির প্রভাব ও আকর্ষণী শক্তি যেমন ছিল, তেমনি শক্তি ছিল তাঁহার বীণাবিনিন্দিত কণ্ঠের, তাঁহার মিষ্ট মধুর হাসির।

তাঁহার মৃত্যু সময়ে আমার পিতৃদেব সুপ্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক স্বর্গত অশ্বিনীকুমার সেন দিনাজপুরে আমার ওখানে ছিলেন। তাঁহাকে যোগীন্দ্রচন্দ্রের মৃত্যু সংবাদ দিলে তিনি আবেগরুদ্ধ কণ্ঠে বলিয়া ওঠেন—'বাংলার একটা জলন্ত কংগ্রেস নিভে গেল।' যোগীন্দ্রচন্দ্রের মৃত্যু সংবাদে তাঁহার মন্ত্রশিষ্য দেশসেবী স্বর্গত লোকেন্দ্রমোহন সেন বলিলেন—'মহাত্মা গান্ধীর গুণমুগ্ধ শিষ্য আর এক মহাত্মা চলিয়া গেলেন।' দিনাজপুরের অন্যতম জননেতা স্বর্গীয় মাধবচন্দ্র শিকদারের কণ্ঠে শুনিতে পাইলাম—' আমাদের সামনে ছিলেন এক চলন্ত গীতা তাঁকে হারালাম।' স্বনামধন্য মৌলানা আজাদ লিখিলেন—He was a veteran Congressman of Bengal. He served the ideals of the Congress unflinchingly to the last. মাননীয় নলিনীরঞ্জন সরকার জানাইলেন—'His service to the Country and the national movement have been great,' পার্লামেন্টের সদস্য অখিল দত্ত মহাশয় লিখিয়া পাঠাইলেন—' 'Let us follow his foot prints. That would be the last way, of doing honour to his sacred memory.' চাঁদপুরের নেতা হরদয়াল নাগ জানাইলেন—' তাঁহার গুণাবলী আদর্শ-স্থানীয়, তিনি উত্তর বঙ্গের আদর্শ নেতা ছিলেন', যোগীন্দ্রচন্দ্রের স্মৃতিসভায় বিখ্যাত ব্যবহারজীবী অতুলগুপ্ত এই বলিয়া তাঁহার উদ্দেশে শ্রদ্ধা নিবেদন করেন—' তিনি চরিত্রবল এবং নেতৃত্বগুণে অশ্বিনীকুমার দত্তের মতই ছিলেন। ঐ সভায় বেদান্তরত্ন হীরেন্দ্রনাথ দত্ত সভাপতির ভাষণের মাঝে বলেন—' বাংলার সৌভাগ্য এরূপ মহৎপ্রাণ এ মাটিতে উৎপন্ন হয়। এটা chance নয়।' ঐ সভায় মহিলা কবি হাসিরাশি দেবী-যোগীন্দ্রচন্দ্র সম্বন্ধে যে মনোজ্ঞ কবিতা পাঠ করেন, তাহাতে এক যায়গায় পাই—

অনন্ত কালের যোগী,......
......তারপরে,
নিঃশব্দ অক্ষরে
অজানা কালের ইতিহাস,
তোমার কীর্তির কথা করিবে প্রকাশ।

যোগীন্দ্রচন্দ্রের জন্ম হয় ১২৭৮ সালের ১০ই আশ্বিন, ১৩৪৮ সালের আর এক আশ্বিনে তিনি চলিয়া যান। মৃত্যুর কোন ইঙ্গিত নাই—

রোগ যন্ত্রণা তাঁহাকে স্পর্শ করিবার পূর্বেই সহসা হৃদযন্ত্রের ক্রিয়া বন্ধ হইয়া সুস্থ দেহেই তিনি চলিয়া যান। মৃত্যুঞ্জয়ী আত্মার নিকট ব্যাধি ও মৃত্যুর এইখানেই পরাজয় বরণ।

তাঁহার মৃত্যু হইয়াছে প্রায় ১৮ বৎসর। এই দীর্ঘকালের মধ্যে তাঁহার মৃত্যুর পর ২।১ বার সভা করিয়া তাঁহার স্মৃতি তর্পণ করা হয় এবং দিনাজপুরে তাঁহার স্মৃতি রক্ষার ব্যবস্থা হয়। কিন্তু তারপর আমরা তাঁহাকে ভুলিয়া গিয়াছি। এত বড় লোকোত্তর প্রতিভার অধিকারী—এত বড় দেশভক্ত পুরুষের স্মৃতি-পূজার অনুষ্ঠান দেশে আর হয় নাই—তাঁহার স্থায়ী স্মৃতি রক্ষার কোন ব্যবস্থার কথাও আর শুনি না—তাঁহার জন্ম বা মৃত্যু দিবস স্মরণ করিয়া কোন সাময়িক পত্র পত্রিকায় জীবনী আলোচনা হয় না।

এই বিস্মরণ—এই নিশ্চেষ্টতা আমাদের কেন? তিনি নাম যশ-প্রার্থী ছিলেন না—ইহা কি তাহারই একটা সুস্পষ্ট প্রতিধ্বনি?—না ইহা জাতির কলঙ্ক—পরাধীনতার শৃঙ্খল কবলিত বিগত কালের ভারতবর্ষ আজ স্বাধীন দেশের তোরণ দ্বারে হানা দিয়া বার বার তাঁহাকে বলিতেছে—তোমাকে ধিক!

মালতী লতা

বীরেন্দ্রকুমার গুপ্ত

মনে করো, ভালবাসি তাকে,
যে-মেয়ে বাঁধেনা চুল অকারণ এলো খোঁপা রাখে।
দিগন্ত-সবুজ মাঠে চেয়ে-চেয়ে হয় দিশাহারা,
আঁচলে কুড়ায়ে ফেরে গুঁড়ো-গুঁড়ো রৌদ্রের ধারা,
গোপন মনের রঙে ঠোঁট, মুখ, গাল
প্রদোষ ঊষার মত লাল।
তনুর রহস্য—যারে একটি সবুজ-নীল আবরণে ঢেকে
খেয়ালে মাটিতে কী-যে হিজিবিজি লেখে
যায় নাকো বোঝা,
হলুদে দুপুরবেলা ভালবাসা-কুয়াশায় পথ শুধু খোঁজা
প্রদক্ষিণ রত
পৃথিবীর মত।
ঘাটে, বাটে, মাঠে
অলস মধ্যাহ্নবেলা কাটে
ভালবেসে তাকে।
আমার মনের মিতা মালতী লতাকে।
মালতী লতার
সংগে কী যোজনা চলে বসন্ত-হাওয়ার?:
যে-হাওয়া শুধুই কাঁপে মৌমাছির
পাখায় পাখায়,
একটু রঙের ঢেউ তুলে শুধু হায়
কোথায় মিলায়।
মালতী লতারে
তাই বারে বারে
কাগজে পেন্সিল দিয়ে ছবি এঁকে রাখি,
সে কথা একটু জানে মালতীলতা কী?
মনে আছে, ঘুম ভেঙে মালতী লতারে দেখি
আরবার কাল
তখন আঁধার স'রে শিউলি-সকাল;
একটি গোধূলি-রাঙা সময়ের দ্বিধার চূড়ায়
হৃদয়ের কথাগুলি—ঢেউ ভেঙে যায়,
দু'বাহু বাড়ায়।
মালতী লতারে কত ভালবাসি, ভালবেসে
মেটেনা দুরাশা,
সে যেন রাতের চাঁদ, চারদিকে কঠিন কুয়াশা;
মেঘের পাহাড় ভেঙে আমি এক দৈত্য সুবিশাল
তার যেন কাছে আমি—দু'হাতে খসিয়ে ফেলে
কুয়াশার জাল:
নক্ষত্রের ভিড় ঠেলে যাই
মালতী লতার খোঁজে পথ হাতড়াই,
ভালবাসি তাকে
যে-হেসে মনের হ্রদে আলোকের আল্পনা আঁকে।

জানলার খড়খড়িটা একটু ফাঁক করে সুরমা দেখল। ক দৃশ্য। সারাটা দিন গলিটা যেন চাদর মুড়ি দিয়ে ঝুম হ'য়ে পড়ে থাকে। কোন সাড়া থাকে না। ন্তু সন্ধ্যার ঝোঁকে গ্যাসগুলো জ্বলে ওঠার সঙ্গে সঙ্গেই র চেহারা বদলে যায়। দরজায় দরজায় জটলা। ঙয়ে শাড়ী, রংচংয়ে মুখ। বাতাসে হাসি ঠাট্টার টুকরো নে গেলেই সুরমা লজ্জায় লাল হ'য়ে ওঠে। আঁচলে জের মুখ ঢাকে।

নিখিলেশকে অনেক বলেছে, এখনও সময় পেলেই বলে। তুমি সারা সহরে আর বাসা খুঁজে পেলে না? এই অঞ্চলে ডেরা বাঁধলে।

খেতে খেতে নিখিলেশ মুখ তুলে হেসেছে, এও জুটেছে সাড়ে তিন বছর ধর্ণা দিয়ে। সাড়ে তিনটি বছর তোমার বিরহ যন্ত্রণা সহ্য করে। আজ তুমি ছেড়ে দাও না, হাজার লোক লুফে নেবে এমন বাড়ী।

তা বলে এমন পাড়ায়? সুরমা বিড় বিড় করেছে।

আরে এটা কি তোমাদের চণ্ডীপুর যে কায়েতপাড়া, ডোমপাড়া, বামুনপাড়া আলাদা আলাদা থাকবে? এটা শহর। সর্বধর্ম সর্বকর্ম সমন্বয়। এরাই যখন গরদের শাড়ী পরে কালীঘাটে মায়ের মন্দিরে তোমার পাশাপাশি দাঁড়িয়ে প্রণাম ঠুকবে, তখন চেনা দুষ্কর। একেবারে সতীলক্ষ্মী সিরিজ, বুঝলে? তোমাকেই লোকে বরং ভুল করবে।

থাক, থাক, খুব হয়েছে। নিজের আর কি, সারাটা রাত তো বাইরে কাটাও। আমারই হয়েছে যত জ্বালা।

সারাটা রাত বটে, কিন্তু সারাটা মাস তো আর নয়। পনেরো দিন বাড়ী থাকি, পনেরো দিন বাইরে। একেবারে চাঁদের সগোত্র। শুক্লপক্ষ আর কৃষ্ণপক্ষ। তোমার জ্বালা আর কি। দরজায় তো সাইনবোর্ড লটকানোই রয়েছে। ভয় কিসের।

নিখিলেশের কথায় সুরমার আপাদমস্তক জ্বলে যায়। তবে আর কি, সাইনবোর্ড টাঙানো রয়েছে তো সব বিপদ কেটে গেল। মাত্র একটা ঠিকে ঝি সম্বল করে এমন পাড়ায় রাত কাটানো কম ঝামেলা। সাইনবোর্ডে নিখিলেশই লাল কালিতে বড় বড় অক্ষরে লিখে দিয়েছে, ইহা ভদ্রলোকের বাড়ী। কিন্তু অন্ধকার রাতে মাতালের চোখে ওই লেখার কিই বা দাম। রাতদিন দরজায় ধাক্কা পড়েছে। জড়ানো গলার চিৎকার—তারপর ঠিকে ঝির গালাগালের চোটে লোক সরে গেছে দরজার সামনে থেকে।

আজকাল অবশ্য এ অত্যাচার একটু কমেছে। পরিচিত পথিকরা এ ভুল করে না। তাঁদের দরজা ঠিক জানা আছে। নতুন যারা তাদেরও ঝোঁক দরজার কাছে জটলা করে দাঁড়ানো মেয়েদের ওপর। বন্ধ দরজা ঠেলে বাড়ীতে ঢোকবার উৎসাহ আর ধৈর্য দুইই তাদের কম।

নিখিলেশের চাকরি খবরের কাগজের অফিসে। রাত্রে ডিউটি থাকলে দশটায় বেরিয়ে যায়, ফেরে ছটা নাগাদ। এর আগেও অবশ্য ফিরতে পারে কিন্তু বাস না চালু হ'লে ফেরা সম্ভব নয়।

প্রথম প্রথম খুবই কষ্ট হ'ত সুরমাকে ছেড়ে থাকতে।

তুমিও না হয় চলো আমার সঙ্গে। নাইট ডিউটি মানে রাত দুটো আড়াইটে পর্যন্ত তারপর দুজনে শুয়ে পড়া যাবে।

ওমা, সেকি গো, অফিসে শোবো কোথায়?

কেন যে ভাবে আমি শুই। এখন একটা টেবিলে শুই, তখন আর একটা টেবিল জুড়ে নেওয়া যাবে।

সুরমা কপট রাগে মুখ বেঁকিয়েছে, অফিসে কি তুমি একলা থাক নাকি? আর কেউ থাকে না?

থাকবে না কেন, অনেকেই থাকেন। তারা সবাই ভদ্রসন্তান, আর এক ভদ্রসন্তানের অবস্থা ক্ষমার চোখেই দেখবেন। এ পাশ ফিরবেন না কেউ। তাছাড়া, মশার অত্যাচারের জন্য মশারি টাঙাতে তো হয়ই। তুমি থাকলে মশারিতে আত্মরক্ষা মানরক্ষা দুইই হবে।

যাও, অসভ্য কোথাকার।

সুরমা সরে গিয়েছে সামনে থেকে। না গিয়ে উপায়ও নেই। মুখের আগঢাক নেই লোকটার, কথার কোন ছিরিছাঁদ নেই।

এখন সয়ে গিয়েছে। মাসের পনেরো দিন নিখিলেশের সঙ্গেই সুষমা খেয়ে নেয়। নিখিলেশ বেরিয়ে গেলে বই হাতে কিছুক্ষণ বিছানায় এপাশ ওপাশ করে, তারপর বাতি নিভিয়ে শুয়ে পড়ে।

আজকাল অবশ্য এই এক কাজ হয়েছে। বাতি নিভিয়ে চুপচাপ জানলার কাছে দাঁড়িয়ে থাকে। খড়খড়িতে চোখ রেখে।

আগে আগে ঘেন্না করত, বিতৃষ্ণা জাগত, কিন্তু আজকাল মন্দ লাগে না।

দরজার কাছে জটলা করে দাঁড়িয়ে থাকা মেয়েগুলোর কথা বেশ উপভোগ করে সুরমা। তাদের ব্যক্তিগত সুখদুঃখের কথা, ব্যবসার মন্দার খবর, মাঝে মাঝে যৌবনবতী সমব্যবসায়িনীর উন্নতির কাহিনী। কোন এক চিত্র-পরিচালকের সুনজরে পড়ে জোনাকি তারকায় রূপান্তরিত হ'তে চলেছে সে সম্বন্ধে ঈর্ষার ভেজাল দেওয়া আক্ষেপ।

দু-এক রাতে বেশ গোলমালও হয়। জানলার শিক ধরে সুরমা কাঠ হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে। পুলিশ আসে। দু-একজনকে ধরেও নিয়ে যায়। আবার মাঝরাতে হারমোনিয়মের সুরের পাশাপাশি চাপাকান্নার সুরও শোনা যায়। সে যেন ইনিয়ে বিনিয়ে কাঁদছে।

সুরমারা একলা নয়, এদিকটা পাশাপাশি অরো

কয়েকজন ভদ্রলোক থাকে। ছাদ থেকে কথা হয়। দু একদিন ছুপুরবেলা তাদের কারো কারো বাড়ী সুরমা যায়। তারাও আসে। তাদের মুখেই সুরমা শুনেছে। এখন তো অনেক কম। আগে বেলেল্লাপনার জন্য অতিষ্ঠ হয়ে উঠত সবাই। দলও কমে গেছে। ছড়িয়ে ছিটিয়ে নানা জায়গায় গিয়েছে। এবার থাকবে না। আইন হচ্ছে। সবাইকে যেতে হবে।

সেদিন সবে সন্ধ্যা উতরেছে। নিখিলেশ বিকালেই বেরিয়ে গেছে। বোন থাকে শ্যামবাজারে। তার বাড়ী হয়ে তারপর অফিসে যাবে। খাওয়া দাওয়া সেখানেই সারবে!

শুধু একটা মানুষের রান্না। কতক্ষণেরই বা ব্যাপার। রান্না শেষ করে সুরমা আলনার শাড়ী জামাগুলো গোছাচ্ছিল, হঠাৎ দরজার কড়া নাড়ার শব্দ।

সুরমা চমকে উঠল। এই সময়ে এ বাড়ীর কড়া নাড়ার অর্থ কি তা সুরমার অজানা নয়। দরজা খোলা চলবে না। পাশের ছোট জানালাটা খুলে গালাগাল দিয়ে তাড়াতে হবে লোকটাকে। বলতে হবে, এটা ভদ্রলোকের বাড়ী। ভালোয়, ভালোয় না যায় তো পুলিশের ভয় দেখাতে হবে। এতে কাজ হয়। চোখ যতই লাল হোক, লালপাগড়ির নাম করলেই নেশা ফিকে হয়ে যায়। পালাবার পথ পায় না।

সুখী, সুখী। সুরমা ঝিকে ডাকল।

সুখী বিকেলের চায়ের বাসন ধুচ্ছিল। কল খোলা। জলের শব্দে প্রথমটা সুরমার ডাক কানে যায়নি। সুরমা গলা চড়াতে এঘরে এসে দাঁড়াল।

ডাকলে বৌদি?

হ্যাঁ, দেখ, দরজায় এক আপদ এসে দাঁড়িয়েছে। বিদেয় কর। এসব বিষয়ে সুখীর উৎসাহ অসীম। আঁচলটা কোমরে জড়িয়ে বীরদর্পে নিচে গিয়ে দাঁড়াল। সুরমা কান পেতে রইল। সুখীর গালাগালগুলো শুনতে বেশ ভাল লাগে। প্রথম দিকটা খুব মার্জিত ভাষায় সুখী শুরু করে, কিন্তু দরজা না ছাড়লে ক্রমেই সুখীর ভাষা বস্তিঘেঁষা হয়ে দাঁড়ায়। আরম্ভের সম্বোধন, ও ভালমানুষের ছেলে শেষদিকে আবাগের পুত, উন্নুনমুখো মিন্সেতে গিয়ে দাঁড়ায়।

জানলা খুলে কিছু বলবার আগেই সুখী থেমে গেল। ভদ্রলোক খোলা জানলার দিকে চেয়ে বলল, নিখিলেশ আছে? নিখিলেশ সেন?

সুখী সঙ্গে সঙ্গে কোমরের আঁচল খুলে মাথায় দিল। মিষ্টি, মোলায়েম সুরে বলল, দাদাবাবু তো নেই। আপনি কোথা থেকে আসছ?

আস্‌ছি অনেক দূর থেকে। নিখিলেশ নেই? দু-এক মিনিট ভদ্রলোক কি ভাবল, তারপর বলল, তোমার বৌদি আছেন?

ঘাড় নেড়ে হ্যাঁ বলার আগে চোখ কুঁচকে সুখী ভদ্রলোককে দেখল। এ আবার কেমন ধারা লোক। বাবু নেই তো তার বৌকে ধরে টানাটানি কেন?

সুখীর ইতস্তত ভাবটা বোধ হয় ভদ্রলোকের চোখ এড়ায় নি। একটু জোর গলায় বলল, তোমার বৌদিকে বল আমি অমর। নিখিলেশবাবুর বন্ধু।

একটু দাঁড়িয়ে থেকে সুখী ওপরে উঠে গেল। বেশী উঠতে হ'ল না, সিঁড়ির চাতালেই সুরমার সঙ্গে দেখা হ'য়ে গেল।

নিচের সব কথাই সুরমার কানে গেছে। ইতিমধ্যেই শাড়ীটা পালটেছে, মুখে হালকা পাউডারের প্রলেপ, বিকেলের খুলে পড়া খোঁপার ওপরও সযত্ন স্পর্শ।

দাদাবাবুর কে এক বন্ধু এসেছে। তোমার সঙ্গে দেখা করতে চায়।

সুখীর কথা শেষ হবার আগেই সুরমা তরতর করে সিঁড়ির বাকি কটা ধাপ নেমে গেল।

অমর ঠাকুরপো এসেছেন। দরজাটা খুলে দে সুখী।

সুখী নেমে দরজাটা খুলে দিতেই অমর এগিয়ে এল। সামনে সুরমাকে দেখে হাতযোড় করে বলল, নমস্কার বৌদি, আমাকে মনে আছে নিশ্চয়।

উত্তরে সুরমা হাসল।

মনে আবার নেই। খুব আছে। ভাঙাঘরে চাঁদের আলোর সামিল। মধ্যবিত্ত নিখিলেশের বন্ধুদের মধ্যে এই একটি বন্ধু ভিন্ন গোত্রের। কাঞ্চন-কৌলিন্যে আর সবার অনেক ওপরে। বাপ মস্ত-বড় কাঠের কারবারী। আসামে জঙ্গল লিজ নেওয়া আছে। গুদামও আছে গোটা কয়েক। ক'লকাতাতেও বড় আড়ত। বাপ কলকাতায় থাকেন, অমরকে আসামের জঙ্গল ঘুরে বেড়াতে

হয়। এক সঙ্গে নিখিলেশের সঙ্গে কলেজে পড়েছিল। অর্থে আর সামাজিকতায় দুজনের মধ্যে মিল ছিল না। মিল ছিল অন্য ব্যাপারে।

লুকিয়ে লুকিয়ে দুজনেই কবিতা লিখত। অন্য সব বন্ধুদের না জানিয়ে দুজনেই পত্রিকা-অফিসে কবিতা পাঠাত। মাঝে মাঝে দুজনের কবিতা এক খামে। প্রায় একই ডাকে দুজনের কবিতাই ফিরে আসত অমনোনীত হ'য়ে। সেই জন্যই বোধ হয় অন্তরঙ্গতাটা এত বেশী হ'য়েছিল।

নিখিলেশ বি-এ পাশ করেছিল, অমর করে নি, কিন্তু তাতে বন্ধুত্বের ফাটল ধরে নি। অমর বাপের ব্যবসায় ঢোকবার আগে পর্যন্ত দুজনের প্রায় রোজই দেখাশোনা হ'ত। কবিতা পাঠিয়ে পাঠিয়ে আর ক্রমাগত: ফেরত পেয়ে দুজনেরই উৎসাহে ভাঁটা পড়ে গিয়েছিল।

হঠাৎ বোধ হয় বাপের নজর পড়েছিল অমরের দিকে। পরীক্ষায় ফেল করে ছেলে চুপচাপ বসে রয়েছে। অন্নধ্বংস আর আড্ডা। কারবারীর ছেলের এমন ভাবে দিন কাটানো ঠিক নয়। বাপ টুঁটি ধরে অমরকে কাঠের গোলার গদিতে বসিয়ে দিল। অবশ্য তাকিয়া ঠেস দিয়ে।

সেই ভাঙন ধরল। ভাঙন ঠিক নয়। দুজনের পথ দুদিকে ছিটকে পড়ল। দেখা-শোনা বন্ধ।

নিখিলেশ তখন চাকরির জন্য পাগলের মতন ঘুরছে। দরখাস্তের বিল্বপত্র নিয়ে অফিসের পীঠস্থানে স্থানে হত্যা দিয়ে বেড়াচ্ছে। কিন্তু সুবিধা হ'চ্ছে না। নো-ভেকেন্সির পাঁচিল পেরিয়ে ভেতরে ঢোকাই দায়।

ইচ্ছা করলে নিখিলেশ অমরকে ধরতে পারত। ওই কাঠগোলার একপাশে নিজের ঠাঁই করে নিতে পারত, কিন্তু সম্মানে বাঁধল। যেখানে বন্ধু মালিক, সেখানে কাজ করলে ইজ্জত থাকে না।

অবশেষে নিখিলেশের ভাগ্যে শিকে ছিঁড়ল। খবরের কাগজের অফিসে চাকরি জুটে গেল। সামান্য চাকরি, তা হোক, পায়ের তলার মাটি তো। একটু একটু করেই উন্নতি হবে।

চাকরি পাওয়ার খবর প্রথমে অমরকে দিতে গিয়ে নিখিলেশ শুনল, অমর আসামে। দু-তিন মাস অন্তর একবার বাড়ীতে আসে।

চাকরি হ'তেই বুড়ী মা চেপে ধরলেন নিখিলেশকে। অন্নের যখন বন্দোবস্ত হ'ল, তখন অন্নপূর্ণা আনার ব্যবস্থা করুক এবার। আর ঘর খালি রাখা ভাল দেখায় না। মায়েরও বয়স হচ্ছে। ছেলে, ছেলের বৌ নিয়ে সাধ-আহ্লাদ করতে কার না ইচ্ছা হয় শেষ বয়সে।

চাকরি পাকা হ'তে নিখিলেশ মায়ের সাধ পূর্ণ করল। সেই সময় একবার অমরের খোঁজ পড়েছিল।

অমর তখনো আসামে। নিখিলেশ ঠিকানা নিয়ে অমরকে চিঠি লিখল। নিখিলেশের বিয়ে। কোন ওজর আপত্তি শুনবে না। যেমন করেই হোক অমরকে আসতেই হবে। অমর না এলে নিখিলেশ বিয়ে ভেঙে দেবে।

বিয়ের ঠিক দিন তিনেক আগে অমর এসে হাজির। নিখিলেশের সঙ্গে দেখা করে বলল, শোন, তোমার বিয়েতে আমি কবিতা লিখব। সারাজীবন তো অমনোনীত কবিতার বোঝা ঘাড়ে করে বেড়ালাম, তোমার বিয়েতে অন্ততঃ আমার একটা কবিতা মনোনীত হ'ক। একটা কবিতা ছাপা হ'ক এই উপলক্ষে।

তাই হ'ল। শুধু কবিতা ছাপানো নয়, হাসি-ঠাট্টায় অন্য বরযাত্রাদের মাতিয়ে রাখল অমর। দু-একবার বাসর ঘরে উঁকি দিয়েও দু-একটা হালকা রসিকতা করে এল। ফুলশয্যার দিন রাজ্যের ফুল ঘাড়ে করে নিখিলেশের অপরিসর ছোট গাঁয়ের বাড়ী সাজিয়ে ফেলল। দামী নেকলেশ পরিয়ে দিল সুরমার গলায়। অন্য সাধারণ বন্ধুদের মধ্যে অমর যেমন তার চেহারার বৈশিষ্ট্য নিয়ে ফুটে উঠল, তেমনি অন্য মধ্যবিত্ত উপহারের মধ্যে অমরের উপহারটা জ্বল জ্বল করতে লাগল সুরমার মনে। বলবার মতন উপহার এই একটি। সুরমার ধারণারও অতীত।

ফুলশয্যার দিন অমরকে টানতে টানতে নিখিলেশ সুরমার সামনে নিয়ে এল—এই আমার বন্ধু অমর। প্রাণের বন্ধু।

অমর হাতযোড় করে সুরমার নমস্কার ফেরত দিয়ে বলল, আমরা এক প্রাণ, দেহটা আলাদা।

নিখিলেশ হাসল, ভাগ্যিস দেহটা আলাদা, তা না হলে আজকের দিনে কেলেঙ্কারি হ'ত।

সুরমা লজ্জায় অনেকক্ষণ মুখ তুলতে পারে নি।

তারপর বার দুয়েক দেখা হয়েছে অমরের সঙ্গে নিখি-

লেশের গাঁয়ের বাড়ীতে। শহরে উঠে আসার পর আর দেখা সাক্ষাৎ হয়নি। অনেকবার সুরমা নিখিলেশকে বলেছে চিঠি লিখে অমরের খোঁজ নিতে। কিন্তু অলস নিখিলেশ লিখব লিখব করেও আর লেখে নি, বরং সুরমাকে বলেছে, তুমিই একটা লিখে দাও। ওর আসামের ঠিকানা আমার ডায়েরির মধ্যে পাবে।

সুরমা লিখতে রাজী হননি। লজ্জা করেছে। কি ভাববে অমর!

আজ খুঁজে খুঁজে অমর এ বাড়ীর দরজায় এসে দাঁড়িয়েছে।

আসুন, আসুন, কি ভাগ্যি আমার। সুরমা সিঁড়ি দিয়ে উঠতে উঠতে বলল।

এমন চোরাগলিতে এসে বাসা বেঁধেছেন, খুঁজে বের করা রীতিমত শক্ত। চেয়ারটা অমরের দিকে টেলে দিতে দিতে সুরমা বলল, সত্যি এ গলির খবর জানলেন কি করে?

নিখিলেশের অফিসে ফোন করেছিলাম, তারাই বলে দিলে। নিখিলেশ বাড়ী নেবার আর জায়গা পেলে না?

বুঝিয়ে বলুন না আপনার বন্ধুকে। আমি তো বলে বলে হয়রান হ'য়ে গেছি। এমন পাড়ায় ভদ্র পরিবার থাকে কখন। বললেই বলে, সারা কলকাতায় বাড়ীর দুর্ভিক্ষ চলেছে।

ওটার কথা ছেড়ে দিন। চিরকাল কুঁড়ের বাদশা। আচ্ছা আমি তো এখন এখানেই থাকব, আমি একটা ব্যবস্থা করার চেষ্টা করব।

এখন এখানেই থাকবেন বুঝি?

হ্যাঁ, বাবার শরীর খারাপ। রোজ বেরোতে পারেন না। এখানকার আড়তে আমিই বসব। আমার ছোট ভাইকে আসামে পাঠিয়েছি।

কথার ফাঁকে সুরমা ভেতরে গিয়ে সুখীকে পয়সা দিয়ে এল। মোড়ের দোকান থেকে খাবার এনে দেবে। মাসের প্রায় শেষ। এই কটা দিন বেশ টানাটানি চলে, নিখিলেশ মাইনে না পাওয়া পর্যন্ত। কিন্তু সে হিসেব অমরের বেলায় চলতে পারে না। নিখিলেশের অকৃত্রিম বন্ধু, তার ওপর নিখিলেশ বাড়ীতে নেই। অমরের অনাদর হ'লে সে রীতিমত দুঃখই পাবে।

ফিরে এসে সুরমা বলল, আপনাকে একটু একলা বসতে হবে ঠাকুরপো?

একলা তো আমি চিরকালই। কিন্তু কি ব্যাপার? কোথায় যাবেন?

সুরমা হাসল, দূরে কোথাও নয়। গরীবের বাড়ী এক কাপ চা অন্ততঃ খেয়ে তো যাবেন।

তা না হয় খাব। কিন্তু একলা এতক্ষণ মুখ বুজে বসে থাকব?

অমরের কথার ধরণে সুরমা হেসে ফেলল। মুখ থেকে আঁচল সরিয়ে বলল, তা হ'লে চলুন। রান্নাঘরের চৌকাঠে বসবেন। আমি চা করতে করতে গল্প করব।

তাই হল। রান্নাঘরের চৌকাঠে নয়, অমর বসল রান্নাঘরের মেঝেয় সুরমার পেতে দেওয়া আসনে।

চায়ের সঙ্গে খান কয়েক লুচিও ভাজল সুরমা। লুচি আর আলুর তরকারি।

একি বৌদি, এসব কার জন্য?

আমি খাব। জানেন না, আপনার বন্ধু অফিসে বেরিয়ে গেলেই রোজ আমি নিজের জন্য লুচি তরকারি ভাজতে বসি।

আবার অমর হেসে উঠল। একটু বেশী হাসাই তার স্বভাব। কারণে অকারণে। জীবনে দুঃখের ভাগ বেশী পেতে হয়নি। প্রায় রূপোর চামচ মুখে দিয়েই জন্ম। হাহাকার আর দৈন্যের সঙ্গে কোন পরিচয় নেই।

সুখী ফিরে আসতে সুরমা থালা সাজিয়ে অমরের সামনে রাখল।

সর্বনাশ, একি, কে এত খাবে? অমর প্রায় আঁতকে উঠল।

কেন আর লজ্জা দিচ্ছেন ঠাকুরপো। আপনার বন্ধুর রোজগারের মাত্রা তো আপনার অজানা নয়। কিছুই যে আপনাকে দিতে পারিনি, সেটা আর আমার চেয়ে বেশী করে কে জানে। নিন, খেয়ে নিন।

অমর আর কথা বাড়াল না। আস্তিন গুটিয়ে পাতে হাত দিল।

খেতে খেতেই বলল, সত্যি আয়োজনটা একটু বেশীই করেছেন বৌদি। বাড়ী গিয়ে খাওয়ার দফা শেষ।

পরিহাস করার লোভ সম্বরণ করতে পারল না সুরমা।

মুচকি হেসে বলল, বাড়ীতে আর কে থালা আগলে বসে থাকবে। আপনার বন্ধুর কাছেই শুনেছি, সারা সংসারের ভার ঝি চাকরের ওপর।

তা সত্যি। এক পিসি ছিলেন, কিন্তু তিনি আমার হালচাল দেখে অতিষ্ঠ হয়ে কাশীবাসী হয়েছেন।

কি হালচাল ?

অমর হাসল, বিয়ের ব্যাপার। বলে বলে পিসি হয়রাণ। সকাল বিকেল ঘটকের আমদানী। আসাম পালিয়েও রক্ষা নেই। সপ্তাহে দুখানা করে চিঠি। একখানা বাবার, একখানা পিসির।

তা আপনিই বা এমন এড়িয়ে এড়িয়ে বেড়াচ্ছেন কেন ? নাকি বন্ধুর অবস্থা দেখে সাহসে কুলোচ্ছে না ?

উহু, বরং লোভ হচ্ছে, চায়ের কাপে চুমুক দিতে দিতে অমর উত্তর দিল। তাহ'লে ঘটকালি শুরু করব নাকি ঠাকুরপো ?

দাঁড়ান, আর কিছুদিন আপনার আদর যত্ন খেয়ে নিই।

খুব সাধারণভাবেই অমর কথাটা বলল, কিন্তু সুরমার দুটি গাল আরক্ত হয়ে উঠল, অনেকক্ষণ সুরমা কোন কথা বলতে পারল না। খাওয়া শেষ করে অমর বাইরের ঘরে এসে বসল। সুরমা পানের ডিবে এনে পাশের টেবিলে রাখল।

তা হ'লে ছুটির দিন ছাড়া নিখিলেশের সঙ্গে দেখা হবার আর উপায় নেই ? পানের খিলি মুখে দিতে দিতে অমর জিজ্ঞাসা করল।

নিশাচর বৃত্তি মাসের দিন পনেরো। তারপর এলে দেখা পাবেন। সন্ধ্যের পর তখন আর বাড়ী থেকে বিশেষ বেরোয় না।

আজ উঠি বৌদি। বিরক্ত করে গেলাম কিছু মনে করবেন না। আমার কথা নিখিলেশকে বলবেন।

অমর উঠে দাঁড়াল। সুরমার ইচ্ছা হল তাকে আর একটু বসতে বলে, কিন্তু কি ভেবে কিছু বলল না।

অমর চলে গেল।

পরের দিন নিখিলেশ ফিরতেই সুরমা বলল, কাল অমরঠাকুরপো এসেছিলেন।

অমর ? জামা ছাড়তে ছাড়তে নিখিলেশ ফিরে দাঁড়াল, শুনেছি আসাম থেকে ফিরেছে। আবার আসতে বলেছ তো ?

আমায় বলতে হয়নি। তিনি নিজেই বলেছেন আবার আসবেন।

খাওয়া দাওয়া ?

অবস্থা তো জানো ? তাও লুচি ভেজে, আলুর তরকারি করে দিয়েছি। সঙ্গে চা আর মিষ্টি।

একটা কাজ করলে হয়।

কি ?

আমার ছুটির দিনে অমরকে খেতে বললে হয়। অবশ্য মাইনে পাওয়ার পরে।

বেশ তো। বলে এস।

নিখিলেশ মাসের প্রথম দিকে অমরের খোঁজ করল। অমর নেই। জরুরী তার পেয়ে আসাম চলে গেছে। কবে ফিরবে ঠিক নেই।

ফিরে এসে নিখিলেশ সুরমাকে সে কথা বলতে সুরমা হাসল, ঈশ্বর সহায়। টাকাকটা বেঁচে গেল। অদৃষ্টে আমার শাড়ী পাওয়া আছে দেখছি। শাড়ীগুলোর যা অবস্থা হয়েছে, বাড়ীতেও পরবার উপায় নেই।

সেকি আমার সামনেও নয় ? নিখিলেশ হাসল।

সুরমা কপট ক্রোধে ভ্রূ বাঁকাল, তোমার কি লজ্জার বালাই নেই ?

বিয়ের আগে ছিল। নিখিলেশ হাতের খবরের কাগজে মন দিল।

দিন দশেক পর। আবার দরজার কড়া নড়ে উঠল। রাত তখন সাড়ে আটটা।

সুখী বাড়ীতে নেই। দেশের লোক এসেছে, তার সঙ্গে দেখা করার অছিলায় আধ ঘণ্টার জন্য বেরিয়েছে, কিন্তু এক ঘণ্টার ওপর হ'য়ে গেল। সুখীর ফেরার নাম নেই।

সুরমা চিন্তিত হয়ে উঠল ; সুখীর জন্য নয়, সে ঠিক আসবে। কিন্তু নিচের ওই অতিথিটিকে কে তাড়াবে ?

নিরুপায় সুরমা নিজেই নেমে গেল। উঁকি দিয়ে দেখেই চিনতে পারল। অমরঠাকুরপো।

নিজের দিকে সুরমা চকিতে একবার নজর বুলিয়ে

দিল। শাড়ীটা যে শুধু বেশ ময়লা তাই নয়, জায়গায় জায়গায় ছেঁড়া। এমন সময় লোক আসবে কে জানত। কিন্তু এখন অতিথিকে দরজায় দাঁড় করিয়ে কাপড় বদলানো যায় না। বিশেষ করে এমন অতিথিকে।

একটু দ্বিধা করে সুরমা দরজা খুলে দিল।

অমর চৌকাঠ পার হ'য়েই জিজ্ঞাসা করল, আজও নিখিলেশ নেই? না, দেবদর্শন আমার অদৃষ্টে নেই দেখছি।

ওপরে উঠে সুরমা উত্তর দিল, আবার বুঝি আসাম পালিয়েছিলেন? হ্যাঁ, কিন্তু আপনি জানলেন কি করে?

আমি সব জানতে পারি। ভূত, ভবিষ্যত, বর্তমান সব একেবারে নখদর্পণে। সত্যি, সঙ্গে সঙ্গে অমর হাতটা প্রসারিত করে দিল সুরমার বাহুমূলের ওপর। দেখুন তো, আমার ভাগ্যে কি আছে।

কোন কাণ্ডজ্ঞান নেই ভদ্রলোকের। সুরমার সমস্ত শরীর শিউরে উঠল। হাতটা আস্তে ঠেলে দিয়ে বলল, হাত আমি দেখি না ঠাকুরপো। মুখ দেখেই সব বুঝতে পারি। আপনার অদৃষ্টে অনন্ত দুঃখ।

এঁ্যা! অমর বিস্ময়ের ভাণ করল। হ্যাঁ, যতদিন না বিয়ে করবেন।

কবচ-টবচের একটা ব্যবস্থা করে দিন না, কিংবা শান্তি স্বস্ত্যয়ন।

উঁহু বিয়ে করা ছাড়া আর কোন উপায় নেই। হাসতে গিয়েই সুরমা সামলে নিল। এ ধরণের কথা বলে লাভ নেই। রসিকতা হালকাভাবে শুরু হলেও শেষের দিকে ঠিক হালকা থাকে না। কোথাকার জল কোথায় গিয়ে দাঁড়াবে কিছু বলা যায়?

সুরমা আসল কথাটা পাড়ল, আপনার বন্ধু আপনার খোঁজে গিয়েছিল। গিয়ে শুনল আপনি আসামে।

হ্যাঁ, হঠাৎ জরুরী তার পেয়ে চলে যেতে হয়েছিল। বন্ধুর সঙ্গে কি করে দেখা করা যায় বলুন তো। দুদিন এসে তো নিরাশ হলাম। অবশ্য বন্ধুপত্নী আপ্যায়নের কোন ত্রুটি রাখছেন না, সে কথাও একশোবার স্বীকার করব।

এক কাপ চা ছাড়া অমর কিছু খেল না। হিসাব করে বলল, সামনের মঙ্গলবার আসব। দুপুরের দিকে এলে নিখিলেশকে নিশ্চয় পাব, নাকি এসে দিবানিদ্রার ব্যাঘাত ঘটাব?

সে ভয় নেই। খবরের কাগজের অফিসে আপনার বন্ধু কাজ করলে হবে কি, খবরের কাগজের ওপর বিন্দুমাত্র বিতৃষ্ণা নেই। যেটুকু ঘরে থাকে কাগজ মুখে দিয়ে।

অমর হাসল, নিখিলেশটা চিরকালের অপদার্থ। রূপসী ভার্যা ছেড়ে শুকনো খবরে মুখ দিয়ে পড়ে থাকে? এই গ্রাউণ্ডেই ওকে ডাইভোর্স করুন বৌদি।

সুরমা হাসল না, আর একবার রক্তিম হল।

পরের মঙ্গলবার দুপুরবেলা নয়, বিকেলের দিকে অমর এল। নিখিলেশ বাড়ীতেই ছিল কিন্তু অসহায় অবস্থায়।

ভোরবেলা ঘুমচোখে বাস থেকে নামতে গিয়ে পা মচকে গেছে। বেশ মোক্ষম রকমের। চুণহলুদে সুরমা গরম করে লাগিয়ে দিতেছে।

যন্ত্রণায় নিখিলেশ একটু একটু কাতরাচ্ছিল, অমরকে দেখে চুপ করল।

নিচের দরজা ভেজানো ছিল, তাই অমর ডাকাডাকি না করে সোজা ওপরে উঠে এসেছে। চৌকাঠের ওপারে এসে অবশ্য জানানী হিসেবে একটু কেশেছিল।

সুরমা নিখিলেশের পাটা কোলের ওপর নিয়ে হলুদ টিপে টিপে দিচ্ছিল, অমর ঢুকতেই তাড়াতাড়ি পাটা নামিয়ে রাখল।

নিখিলেশ উঠে বসল। দুটো পা প্রসারিত করে।

এস, এস, তোমার তো দেখাই নেই। দুদিন এসেছিলে, তা শুনেছি।

দুদিন নয় ভাই, দু রাত। অমর কথা শেষ করে সুরমার দিকে ফিরে বলল, কি ব্যাপার বৌদি, এ যে একেবারে পদপল্লবমুদারমের বিপরীত সংস্করণ। পাটা কি আপনিই ভেঙে দিয়েছেন? রাত্রে যাতে আর বেরোতে না পারে?

না অমর, নিখিলেশ হাসল, এর জন্য আমি নিজে সম্পূর্ণ দায়ী। কায়দা করে চলতি বাস থেকে নামতে গিয়ে এই অবস্থা। যাকগে, তোমার কথা বল।

আমার কথা আর কি। আগে কবিতা লিখতাম, এখন কারবারের হিসেব লিখছি। আগে ভাবতাম মন্দাক্রান্তা, পঞ্চটিকা, লঘু ত্রিপদী, এখন ভাবি শাল, সেগুন আর মেহগনি। কিন্তু আমাকে তো মুসকিলে ফেললে তুমি।

সুরমা আর দাঁড়াল না। পাশের ঘরে গিয়ে ঢুকল।

শাড়ী পালটে সুরমা যখন এ ঘরে ঢুকল, তখন দু বন্ধু গল্পে মত্ত। পুরোনো দিনের সব কথা। কলেজ-জীবনের।

সুরমাকে দেখে নিখিলেশ বলল, ওগো অমর খেয়ে যাবে এখানে।

অমর প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই বলল, খেতে পারি বৌদি, কিন্তু এক সর্তে। আমার জন্য কোন বাড়তি আয়োজন করতে পারবেন না। নিখিলেশ যা খাবে, আমিও তাই খাবো।

সুরমা কিছু বলল না। এ যেন মানুষকে আরো বিপদে ফেলা। রাত্রে নিখিলেশ খায় ভাত, ডাল আর একটা ভাজা। জোর করে সুরমা দুধের বন্দোবস্ত করেছে। এ আহার্য বাইরের কারো সামনে ধরে দেওয়া যায় না। অমর ঠাকুরপোকে তো নয়ই।

নিখিলেশ আর অমর দুজনকেই সুরমা লুচি ভেজে দিল। কপি দিয়ে একটা বাড়তি তরকারি। কেবল দুধটা ঘন করে অমরকে দিল। সে দুধের অর্ধেকটা অমর নিখিলেশের পাতে ঢেলে দিল—নিখিলেশের আপত্তি সত্ত্বেও।

এর পর অমর প্রায় সপ্তাহে একদিন আসতে লাগল। একদিন তিনজনে মিলে একটা ইংরেজী ছবি দেখে এল। দামী সিটে বসে। আর একদিন বেড়িয়ে এল গঙ্গার ধারে। হাঁটতে হাঁটতে নিখিলেশ বার বার পিছিয়ে পড়ল।

অমর চেঁচিয়ে বলল, কি হ'ল কি তোমার? এস।

নিখিলেশ দাঁড়িয়ে পড়ল, আরে তোমরা তো ছুটছ, চলছ কোথায়। আমার পায়ের চোট এখনও সারে নি।

অমর এগিয়ে এল, কোলে করতে হবে তো বল?

নিখিলেশ মাথা নাড়ল, কোলেই যদি চড়তে হয় তো, তোমার কেন, তোমার বৌদির কোলে চড়ব।

অমর আর সুরমা দুজনেই হেসে উঠল। সশব্দে।

নিখিলেশ না থাকলেও অমরের অসুবিধা নেই। তার জন্য অবারিত দ্বার। সুরমার জন্য লাইব্রেরী থেকে বই এনে দেয়, মাঝে মাঝে কিনেও আনে।

সুরমা আপত্তি করছে, আমার জন্য মিছামিছি কেন এত পয়সা খরচ করেন বলুন তো?

অমর অপ্রস্তুত গলায় বলেছে, কেন লজ্জা দেন বৌদি। ভারি তো খরচ করি আপনার জন্য। এখানে, আপনার কাছে এসে কত শান্তি পাই, তা জানেন?

অমরের মুখের দিকে চেয়ে সুরমা মাথা নিচু করেছে। অমরের দৃষ্টি নেশাতুর। নিষ্পলক চোখে যেন লেহন করছে সুরমাকে।

প্রথমটা শিউরে উঠলেও মুগ্ধ চোখের এ দৃষ্টি ভাল লাগল সুরমার। এ শুধু দেখা নয়, এ যেন দৃষ্টির প্রদীপ জ্বালিয়ে আরতি করা।

ইতিমধ্যে বই ছাড়াও দামী এসেন্স আর বিলিতি পাউডার উপহার দিয়েছে অমর। এ জিনিস কোনদিনই নিখিলেশ কিনে দিতে পারত না। এ তার সাধ্যের বাইরে।

এ নিয়ে নিখিলেশ ঠাট্টাও কম করেনি। বলেছে, ব্যাপারটা তো বড় ভাল ঠেকছে না। অমর আমার বন্ধু না তোমার, বোঝা দায়। আমায় তো কোনদিন একটি কানাকড়ির জিনিসও দেয় নি।

নেমকহারাম কোথাকার, সুরমা মুখ ঝামটা দিয়েছে, এই তো সেদিন একটা কলম প্রেজেন্ট করলেন তোমাকে। বাসে খুইয়ে এলে মনে নেই।

একদিন দুপুরে অমর এসে হাজির। নিখিলেশ আর সুরমা বসে বসে তাস খেলছিল, অমর এসেই চেঁচামেচি শুরু করল, কাল সন্ধ্যের সময় দুজনেই তৈরী থেক, এক্জিবিশনে যাব। ব্রিটিশ এম্পোরিয়মের প্রদর্শনী। আমাদের দোকানে কার্ড দিয়ে গেছে।

কদিনই খবরের কাগজের পাতাজোড়া বিজ্ঞাপন। নানা ধরণের অলঙ্কার, শাড়ী, খেলনা। ভিড়ের চোটে টিকেট পাওয়া দায়। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের বাছাই করা সব জিনিস।

সুরমা নেচে উঠল কিন্তু নিখিলেশ ঘাড় নাড়ল, আমার বরাতে আর দেখা হ'ল না ভাই। অফিসে এখন ভীষণ কাজ। তিব্বতের ঝামেলায় প্রাণ ওষ্ঠাগত। কামাই করলেই চাকরির গিঁট খুলে যাবে। তোমরা দুজনে যেও। তোমাদের চোখ দিয়েই দেখব।

নিরুপায়। তাই ঠিক হ'ল। ঠিক সন্ধ্যেয় অমর আসবে, সুরমা যেন তৈরী থাকে।

বিকেল থেকে সুরমা সাজতে শুরু করল। এক্জিবিশন সুরমা জীবনে দেখে নি। দেখার অবকাশও হয় নি।

অমরঠাকুরপো না থাকলে হ'তও না। শুনেছে অনেক ভাল ভাল জিনিস সেখানে বিক্রির জন্ম থাকে। সেরা সব জিনিস। কিছু বলা যায় না, অমরঠাকুরপো যা লোক, ঠিক কিছু একটা কিনে বসবে। বারণ করলেও শুনবে না। অমরঠাকুরপোর পাশাপাশি হাঁটতে ভারি ভাল লাগে সুরমার। পরিপাটি পোষাকে, সুরভিতে, হাস্য-পরিহাসে নিখুঁত পুরুষ। সারাক্ষণ হাসতে হাসতে পেট ব্যথা হয়ে যায়। সামান্য কথাও বলার গুণে অসামান্য হয়ে ওঠে।

অন্ধকার নামতেই সুরমার খেয়াল হ'ল, এখনি অমর-ঠাকুরপো এসে পড়বে। তৈরী থাকতে বলে গেছে। অবশ্য একবার বেরিয়ে পড়তে পারলে আর কষ্ট নেই। একপা হাঁটতে দেবে না। মোড় থেকে ঠিক ট্যাক্সি নেবে।

শাড়ীটা পরে নিয়ে আয়নায় ঘুরিয়ে ফিরিয়ে সুরমা নিজেকে দেখল। প্রসাধনের খুঁত মেরামত করে নিল। পুঁথি বসানো চটিটা পায়ে দিয়ে আবার খুলে ফেলল। এ সাজে চটি মানাবে না, লাল জুতোটা পরতে হবে। লাল ব্যাঙ্গালোর শাড়ীর সঙ্গে মিল থাবে তাহ'লে।

জানলা দিয়ে সুরমা ডুবার উঁকি দিল। রাস্তার গ্যাসের বাতি কখন জলেছে, এখনও আসছে না কেন অমর-ঠাকুরপো? এক কথার মানুষ। কথা দিয়ে কথনো কথার খেলাপ করে না। সময়ের একটু এদিক ওদিক নয়।

সিঁড়ি দিয়ে সুরমা নেমে গেল। দরজার একটা পাট খুলে ঝুঁকে রাস্তার দিকে দেখল, তারপর মুখ ফিরিয়েই চমকে উঠল।

একেবারে নিজের প্রতিবিম্বের মুখোমুখি। পরণে রঙীন শাড়ী, রঙীন ব্লাউজ, মুখে প্রসাধন, কপালে কুঙ্কুমের টিপ, সযত্নে বাঁধা খোঁপা। দুচোখে খদ্দেরের জন্ম একই উৎসুক দৃষ্টি।

কি তফাৎ সুরমার সঙ্গে? কোথায় তফাৎ? ওরা হয়তো আগন্তুকের কাছ থেকে দাম নেবে নিজের যৌবনের, মনের কোণে সুরমারও কি তেমনি কোন অভিলাষ নেই। হাত পেতে না নিক, মন পেতে!

সশব্দে দরজা বন্ধ করে সুরমা দ্রুতপায়ে ওপরে উঠে এল।

মানবতার সাগর-সঙ্গমে, সুইডেনে আর সোবিয়েতে

শচীন সেনগুপ্ত

লেনিনগ্রাদ শহরটি নেভা নদ দ্বারা দ্বিধা-বিভক্ত। নেভার একটা বিশিষ্ট রূপ আছে। সে রূপ রয়েছে তার জলের নীলিমায়। শীতের সময় সেই জল জমে বরফ হয়ে যায়। নদের দুই তীরেই প্রশস্ত রাজপথ। একদিকে উইন্টার প্যালেস, জারদের রাজপ্রাসাদ, আর তার অপর দিকে পিটার-পল দুর্গ, রাজনীতিক বন্দীদের যেখানে আটক করে রাখা হোতো, পীড়ন করা হোতো, অনেক সময় মেরে জলে ভাসিয়েও দেওয়া হোতো। সেই তীরেই লেনিনগ্রাদ বিশ্ববিদ্যালয়। অনেকগুলো সেতু দিয়ে দুই তীর সংযোগ করা হয়েছে, আর প্রত্যেক সেতুর উভয় দিকের বুরুজের শুরুতে আর শেষে একটি করে ব্রোঞ্জের তৈরি কালো রংয়ের ঘোড়া রয়েছে। ঘোড়াটি তিন পা বাতাসে তুলে তীর বেগে ছুটে যেতে চাইছে, আর একটি পেশীবহুল মানুষ তার বল্গা ধরে তাকে সুস্থির রাখতে চাইছে। মনে হোলো শক্তির আর সংযমের প্রতীক। প্রত্যেক সেতুতেই ওই রকম চারটি করে মূর্ত্তি।

নেভা নদ সোজা বয়ে গেছে। শহরের মাঝে তার বাঁক নেই, তীরে চরা পড়েনি, দুই কূলই পাথর দিয়ে বাঁধানো; শহরের সীমানার মাঝে ডক্ নেই, জেটি নেই, ঢেউগুলো ভেঙে পড়বার মৃদু মর্ম্মর ধ্বনি আছে। তীরে দাঁড়িয়ে চেয়ে থাকতে ইচ্ছে করে। কিন্তু চেয়ে দেখে নিশ্চিন্ত থাকবার উপায় নেই। উইন্টার প্যালেস আর পিটার-পল ফর্ট্রেস মন নিয়ে টানা-টানি করে। একদিকে স্বৈরাচারী শাসকদের, বিলাসী শোষকদের বংশানুক্রমিক প্রাসাদ; আর একদিকে বিপ্লবের আদর্শে অনুপ্রাণিত যুগ-যুগান্তরের নির্য্যাতিত তরুণ-তরুণীর সব আশা চূর্ণ করে দেওয়া পাষাণ দুর্গ। বহুদিনের রুশ-রাজনীতির ইতিহাস, স্বৈরাচারের আর স্বাধিকার অর্জ্জনের ধারাবাহিক সংগ্রামের স্মৃতি, চিত্ত তোলপাড় করে দেয়। তারই মাঝে ফাঁকে-ফাঁকে কুতূহলী মন জেনে নিতে চায় নেভার বুকের কোনখানটায় জমে-ওঠা বরফের নীচে—বিষ-খাওয়ানো, গুলী বেঁধানো, তলোয়ার দিয়ে চিরে-ফেড়ে-ফেলা রাসপুটিনের দেহটা ঢুকিয়ে দেওয়া হয়েছিল!

আজ যে শহর লেনিনগ্রাদ নামে পরিচিত, তা গড়ে ওঠে ১৭০৩ খ্রীষ্টাব্দে। পিটার দি গ্রেট রাজত্ব পেয়ে ওই সময়ে ওর নাম দেন সেইন্ট পিটারস্বার্গ। পিটার দি গ্রেট ছিলেন রোমানভ বংশের চতুর্থ নরপতি।

ওই বংশের প্রতিষ্ঠা হয় ১৬১৩ খৃষ্টাব্দে, আর ওই বংশ আর রুশের জারতন্ত্র লোপ পায় ১৯১৮ খৃষ্টাব্দের ১৬ই জুলাই তারিখে।

এই শেষ জার দ্বিতীয় নিকোলাস্ দম্ভ করে বলতেন, তাঁর পিতৃভূমি রুশ সত্যের-সৌরকরে চিরকাল সোনার মতো ঝল্‌মল্ করবে। এক-নায়কত্ব অতীতে যেমন অজেয় ছিল, ভবিষ্যতেও তেমনই অপরাজেয় থাকবে। দুর্ব্বলতা, দাম্ভিকতা, আর মিথ্যা ভাষণ ছিল তাঁর সহজাত সঞ্চয়। আজ যে প্রতিশ্রুতি দিলেন, কাল তা ভঙ্গ করলেন। আজ যাকে মর্য্যাদা দিলেন, কাল তাকে পায়ের তলায় পিষে ফেল্লেন। এই ছিল তাঁর স্বভাব। পৃথিবীর অনেক স্বৈরাচারীই ওই স্বভাবের পরিচয় রেখে গেছেন। তাইত পৃথিবীতে স্বৈরাচারী শাসন-ধারা দ্রুত শুকিয়ে যাচ্ছে।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় তিনি নিজেই কমাণ্ডার-ইন্-চীফ্ হয়ে যুদ্ধক্ষেত্রে চলে গেলেন। তাঁর অবর্ত্তমানে তাঁর রাণী আলেকজান্দ্রা-ফিয়োদর-ভনা রাসপুটিন এবং আরো কয়েকটি কুচক্রীর পৃষ্ঠপোষকতায় 'ডুমার' সকল কাজে বাধা দিতে লাগলেন।

এই রাসপুটিনের কিছু অলৌকিক শক্তি ছিল বলে প্রচারিত হয়েছিল। দ্বিতীয় নিকোলাসের একামাত্র পুত্র ছিল। তার শরীরের রোমকূপ দিয়ে যখন তখন রক্ত নির্গত হতো। তুক-তাক ঝাড়-ফুঁক করেও তার রোগ-মুক্তি হয় না। সেই সময়ে রাসপুটিন এসে রাণীকে বলেন যে, অলৌকিক শক্তির বলে রাজকুমারকে তিনি রোগমুক্ত করতে পারেন। তিনি ছিলেন অতিকায় পুরুষ, সন্ন্যাসের সর্ব্বলক্ষণযুক্ত। কুসংস্কারাচ্ছন্ন রাণী রাজ-কুমারকে তাঁর হাতে তুলে দিলেন। রাসপুটিনের হস্ত স্পর্শ ই রাজকুমারকে রোগমুক্ত করল বলে প্রচারিত হোলো। রাসপুটিন রোমানভ্ বংশের দুর্দ্দিন আগত বলে রাণীকে সাবধান করে দিলেন। রাণী তাঁর কৃপা ভিক্ষা করলেন এবং তাঁকে প্রাসাদে থেকে রাজবংশের মঙ্গলের ব্যবস্থা করতে বল্লেন। রাসপুটিন তাই চেয়েছিলেন। তিনি যেমন রাজকুমারের অভিভাবক হলেন, তেমন হলেন রাণীর প্রধান পরামর্শদাতা।

তারপর শুরু হোলো রাসপুটিনের ষড়যন্ত্র, আর ব্যভিচার। সময়টা প্রথম বিশ্বযুদ্ধের দ্বিতীয় বর্ষ। তখন রুশ সৈন্যবাহিনীতে ভাঙন ধরেছে নানা অব্যবস্থার ফলে। জার দ্বিতীয় নিকোলাস্ ফ্রন্টিয়ারে থেকেও তাঁর গবর্ণমেন্টের প্রতি সৈনিকদের শ্রদ্ধা আর আস্থা ফিরিয়ে আনতে পারছেন না। দলে দলে সৈনিক যুদ্ধক্ষেত্র ত্যাগ করে চলে আসছে।

রাজধানীতে এবং দেশাঞ্চলে যাঁরা শাসন-সংস্কারের জন্য আন্দোলন চালিয়ে আসছিলেন এবং নিজেদের মাঝে ঝগড়া করছিলেন, মাতৃভূমির সঙ্কট কালে তাঁরা কিছুটা ঐক্যবদ্ধ হয়ে দেশরক্ষার প্রয়াস করলেন। তাঁরা বিপ্লবও চাইতেন না, রাজতন্ত্রের উচ্ছেদও চাইতেন না, রোমানভ্ বংশেরও উচ্ছেদ চাইতেন না। কিন্তু রাসপুটিন রাণীকে তাঁদেরও বিরুদ্ধে উত্তেজিত করে তুল্লেন। রাণী একাধিক মন্ত্রীকে বরখাস্ত করলেন, অপমান করলেন অনেককে। দারুণ অসন্তোষের সৃষ্টি হোলো। রাসপুটিনের ব্যভিচারও সীমা ছাড়িয়ে গেল। রাজবংশের কোন পরিবারই সেই কলুষ থেকে মুক্ত রইল না।

অবশেষে জারের ভ্রাতুষ্পুত্রীর স্বামী প্রিন্স ইউসিপভ্ আর ডুমার সদস্য পুরিশকেভিচ্ স্থির করলেন রাসপুটিনকে আর বেঁচে থাকতে দেওয়া হবে না। তাঁরা তাঁকে একদিন নৈশ-ভোজনে আমন্ত্রণ করলেন। রাসপুটিন কিছুমাত্র সন্দেহ না করে নিমন্ত্রণ রক্ষা করতে গেলেন। দিনটা ছিল ১৯১৬ খৃষ্টাব্দের ১৭ই ডিসেম্বর।

রাসপুটিন খাবার মুখে তুলেই বল্লেন—মনে হচ্ছে বিষ-মেশানো খাবার। প্রিন্স ইউসিপভ্ পিস্তল শক্ত করে মুঠোয় ধরলেন, পুরিশকে-ভিচ্ তাঁর তলোয়ারখানা।

রাসপুটিন মদের গ্লাস মুখে তুলে বল্লেন—একি! এতেও যে বিষ!

প্রিন্স আর পুরিশকেভিচ্ স্তব্ধ হয়ে রইলেন।

রাসপুটিন তাঁদের মুখের দিকে চেয়ে দেখে বল্লেন—আপনারা উদ্বিগ্ন হবেন না। বিষে আমার কোন ক্ষতি হবে না। তাঁদের সঙ্গে গল্প করতে করতে রাসপুটিন পানাহার করতে লাগলেন।

খাওয়া শেষ করে ধন্যবাদ জানিয়ে যখন রাসপুটিন উঠে দাঁড়ালেন, তখন শীকার হাত-ছাড়া হয় দেখে প্রিন্স ইউসিপভ্ রিভলবার বার করে পর পর রাসপুটিনকে দুই বার গুলি করলেন। রাসপুটিন অচল পর্ব্বতের মতো দাঁড়িয়ে রইলেন। পুরিশকেভিচ তলোয়ার দিয়ে তাঁর দেহটা ফালি-ফালি করে ফেড়ে ফেল্লেন। রাসপুটিন আর দাঁড়িয়ে থাকতে পারলেন না। তিনি মেজেয় লুটিয়ে পড়লেন। তাঁর হত্যাকারীরা অনেকক্ষণ অপেক্ষা করলেন তাঁর মৃত্যুর লক্ষণ দেখবার জন্য; কিন্তু রাত প্রায় উত্তীর্ণ হয়ে যায়, তবুও সে লক্ষণ যখন প্রকাশ পেলনা, তখন তাঁরা লোকজন ডেকে সেই ক্ষত-বিক্ষত অথচ জীবন্ত মানুষের দেহটাকে নিয়ে নেভা নদের বুকে বরফের নিচে ঢুকিয়ে দিলেন। শোনা যায় তার পরের দিন যখন দেহটাকে পরীক্ষা করা হয়, তখনো জীবনের লক্ষণ কিছু তাতে অবশিষ্ট ছিল! রাণী ফিয়োদরভনা আরো ক্ষেপে গেলেন। ডুমার সদস্যরা তখন আলোচনায় প্রবৃত্ত হলেন, রাণীকে গ্রেফতার করা হবে কিনা। কিন্তু ছাব্বিশে ফেব্রুয়ারী তারিখে ডুমার অধিবেশন বাতিল করে দেওয়া হোলো।

৮ই মার্চ্চ তারিখে এক লক্ষ তিরিশ হাজার শ্রমিক ধর্ম্মঘট করে পেট্রোগ্রাদের পথে-পথে বেরিয়ে পড়ল। সেই দিনটি ছিল নারী শ্রমিকের দাবী উপস্থিত করবার দিবস। তাই বহুসংখ্যক নারীও ওদের সঙ্গে মিলিত হয়েছিল। গবর্ণমেন্ট অসহায়ের মতো নিষ্ক্রিয় থেকে তাই দেখল। দুই দিন পরে হোলো জেনারেল ষ্ট্রাইক, সঙ্গে সঙ্গে সামান্য কিছু লুট-পাট। পুলিশ শ-দেড়েক লোককে গুলি করে মারল। মজুরী-বৃদ্ধির দাবী নিয়ে যারা ষ্ট্রাইক করেছিল, পুলিশের অবিমৃষ্যকারিতায় তারাই বিপ্লবী হয়ে গবর্ণমেন্টের উচ্ছেদে প্রবৃত্ত হোলো। তারপর ঘটল আরো বিস্ময়কর ঘটনা। এই বিপ্লব ব্যর্থ করে দেবার জন্য রাজধানীতে যত সৈন্যবাহিনী আমদানি করা হতে লাগল, যত পুলিশ নিয়োগ করা হলো, সবই বিপ্লবীদলে ভিড়ে যেতে লাগল। মন্ত্রীরা তারের পর তার করতে লাগলেন জারের কাছে সৈন্য পাঠিয়ে রাজধানী রক্ষা করতে। কিন্তু সৈন্য আর আসে না। তারাও আসবার পথে বিদ্রোহ করে, অথবা যান-বাহনের সাহায্য পায় না।

রাণী ফিয়োদোরভনা ওই গোলমালের মাঝে কোন এক সময়ে দুই-কন্যা আর রাজকুমারকে নিয়ে পালিয়ে গিয়ে তাঁর স্বামীর সঙ্গে মিলিত হলেন। তাঁদের গবর্ণমেণ্টের মন্ত্রীরা কিছুদিন উইণ্টার-প্যালেসে থেকে, কিছুদিন নৌ-দপ্তরে আশ্রয় নিয়ে, আত্মরক্ষা করেন। কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত জনতাকে তাঁরা এড়াতে পারেন না। তাঁদের গ্রেফতারও করা হয়, হত্যাও করা হয়। পেট্রোগ্রাদে জার-জারিনা-জারোভিচ (সাম্রাজ্যের উত্তরাধিকারী) রইল না, জারের গবর্ণমেণ্টও রইল না। বিপ্লবের প্রথম পর্ব্ব শেষ হোলো।

কিন্তু গবর্ণমেণ্ট গড়বে কারা? ডুমার সদস্যরা কিছুই ঠিক করতে পারেন না। বোলশেভিক দল নিজেদের শক্তির পরিচয় না পেয়ে এগিয়ে এলেন না। তাঁরা সোভিয়েৎ কমিটিতে নিজেদের শক্তি বৃদ্ধির অপেক্ষায় রইলেন। লেনিন তখনো রাশিয়ায় ফিরে আসেন নি। শ্রমিকরা, মুক্তিপ্রাপ্ত রাজনৈতিক বন্দীরা, বিপ্লবের নেতৃত্ব নেবার আয়োজন করলেন। ডুমার সদস্যরা তখন ডুমা-কমিটি গড়লেন এবং গবর্ণমেণ্ট গঠন করবার পরিকল্পনায় নিযুক্ত হলেন। কিন্তু তাঁরা বিপ্লবের অনিবার্য্য শক্তির পরিচয় পেয়েও বিপ্লবকে জয়যুক্ত করতে চাইলেন না, তলে-তলে যোগ রক্ষা করে চল্লেন জারের প্রাক্তন গবর্ণমেণ্টের অবশিষ্ট নায়কদের সঙ্গে, এমন কি রোমানভ্ বংশকে পুনরায় প্রতিষ্ঠার সুযোগ করে দেওয়াও তাঁদের কল্পনার বাইরে ছিল না। সোবিয়েৎ-কমিটি গবর্ণমেণ্টে যোগ দিতে চাইলেন না। পরন্তু ডুমা-কমিটিকে চাপ দিতে লাগলেন গবর্ণমেণ্ট গঠন করতে। বোলশেভিকরা তখনো সোবিয়েৎ-কমিটিতে প্রাধান্যলাভ করেন নি। তখনকার সোবিয়েৎ-কমিটি তাই সোশ্যালিষ্ট গবর্ণমেণ্ট অথবা ডিক্‌টেটরশিপ অব দি প্রলেটারিয়েট প্রতিষ্ঠার আদর্শ নিয়ে কাজ করবার জন্য তৈরী হননি। তাঁরা ডুমা-কমিটিকে সমর্থন করেন, কিন্তু নিজেরা দায়িত্ব গ্রহণ করতে রাজী হন না। সোভিয়েৎ-কমিটির জনৈক সদস্য কেরেনেস্কি, ব্যক্তিগতভাবে গবর্ণমেণ্ট গঠনের উদ্দেশ্য নিয়ে ডুমা-কমিটিতে স্থান নিলেন।

ওরই কিছুদিন পরে লেনিন দেশে ফিরে আসেন। তিনি এসে দেখেন যে, বোলশেভিকদের দুর্বলতা বিপ্লবকে ব্যর্থতার পথে এগিয়ে নিচ্ছে। তিনি তাই তাঁর দলকে বিপ্লবের গভীরতর সম্ভাবনার দিকে সচেতন করে তোলবার কাজে আত্ম-নিয়োগ করলেন, অস্থায়ী গবর্ণমেণ্টের সাময়িক ভূমিকা ও অন্তিম পতন সম্বন্ধে সুনিশ্চিত হয়ে। তাঁর এই প্রজ্ঞা এবং বিপ্লবের বিকাশের স্বাভাবিক ধারা সম্বন্ধে সচেতনতা যেমন তাঁকে নায়কত্ব দিল, তেমন রাশিয়ার রূপান্তরও সার্থক করে তুল্ল। তাঁর তখনকার এবং পরবর্ত্তী বৎসরগুলির নেতৃত্ব যদি রুশের স্বতস্ফূর্ত্ত বিপ্লব না পেত, তাহলে অক্টোবর বিপ্লব ঘটত না এবং পরবর্ত্তীকালের সোশ্যালিষ্ট রেভলিউশনও বাস্তব হয়ে উঠত না।

ডুমা-কমিটি কিন্তু সোভিয়েৎ-কমিটিকে বাইরে রেখে গবর্ণমেণ্ট গড়তে ইতস্তত করতে লাগলেন। ওদিকে জার দ্বিতীয় নিকোলাস তখনো জীবিত এবং মুক্ত। তিনি স্বেচ্ছায় তাঁর ক্ষমতা ত্যাগ না করলে, অথবা তাঁকে ক্ষমতাহীন না করলে, গবর্ণমেণ্টই বা গড়া যায় কি করে?

ডুমার দুজন, সদস্যকে পাঠানো হোলো জারের হেড্-কোয়ার্টার্স, প্‌শকভে এই প্রস্তাব নিয়ে যে, তিনি রাজকুমারকে সিংহাসনের অধিকারী করে নিজে ক্ষমতা ত্যাগ করুন। কুমার যতদিন নাবালক থাকবেন, ততদিন জারের ভাই গ্রাণ্ড-ডিউক মাইকেল রিজেণ্ট হয়ে থাকবেন। নিকোলাস পুত্রকে বিপদের মাঝে ঠেলে দিতে চাইলেন না। তিনি পাল্টা প্রস্তাব করলেন যে, তাঁকে যদি সপরিবারে ইংলণ্ডে চলে যাবার সুযোগ দেওয়া হয়, তাহলে তাঁর ভাইকে সিংহাসন দিয়ে তিনি ক্ষমতা ত্যাগ করতে প্রস্তুত আছেন।

ডুমা-কমিটি প্রভিশনাল গবর্ণমেণ্ট গঠন করতে বাধ্য হলেন পরিস্থিতির চাপে। এই গবর্ণমেণ্ট গঠিত হবার পর নিকোলাস নিজেকে আর কিছুতেই নিরাপদ মনে করতে পারলেন না। তিনি গোপনে দেশ ত্যাগ করবার উদ্দেশ্যে সপরিবারে তাঁর নিজস্ব ট্রেণে করে প্‌শকভ ত্যাগ করলেন। কিন্তু সোভিয়েৎ-কমিটি আকস্মিকভাবে যেমন ডুমা-কমিটির কাছে নিকোলাসের প্রস্তাব জেনেছিলেন, তেমন জানলেন তাঁর প্‌শকভ ত্যাগের সংবাদ। তাঁরা তখনই রেলওয়ে কর্ম্মিদের জারের ট্রেণ আটক করবার নির্দ্দেশ দিলেন, এবং নিজেদের একজন সদস্যকে সশস্ত্র একদল সৈনিকের নায়ক করে জার-পরিবারকে গ্রেফতার করতে পাঠালেন। কিন্তু ওই খবর পেয়ে ডুমা-কমিটিও দুইজন মন্ত্রীকে ওই কাজ করবার জন্য নিয়োগ করলেন। হয়ত কমিটির তখনো অভিপ্রায় ছিল জারকে বাঁচানো।

জারের ট্রেণ জারস্‌কোয়ে-সেলোতে পৌঁছে আর এগুলোনা। দীর্ঘকাল অপেক্ষার পরও যখন ট্রেণ আর অগ্রসর হয় না, তখন জার নিকোলাস আর জারিণা ফিয়োদরভনা অত্যন্ত উদ্বিগ্ন হয়ে উঠলেন। তাঁদের দেহরক্ষীরা জানালেন রেল-শ্রমিকরা ট্রেণকে আর এগুতে দেবে না। ট্রেণ যারা আটক করেছিল, তারা শুধু ট্রেণই আটক করেছিল, জারের এবং তাঁর পরিবারের এবং অনুচরদের প্রতি কোনরূপ অসৌজন্য প্রকাশ করেনি। ডুমা-কমিটির প্রেরিত মন্ত্রীরা এসে জার পরিবারকে গ্রেফতার করে একাটেরিনবার্গে আটক রাখল। তাতেও সোভিয়েৎ-কমিটির হাতে জারকে পড়তে না দেবার অভিসন্ধি হয়ত ছিল।

ওই সপ্তাহেই সোভিয়েৎ কমিটি ঘোষণা করলেন যে, রাশিয়া আর যুদ্ধ করতে চায়না, সন্ধি করতে চায়। তবে তার জন্য ক্ষতিপূরণও করবে না, লাভের ফল প্রত্যাশাও রাখবে না। প্রভিশনাল গবর্ণমেণ্ট বাধ্য হলেন অনুরূপ ঘোষণা করতে। কিন্তু সোবিয়েৎ-কমিটি অবিরাম চাপ দিতে লাগলেন ঘোষণা কার্য্যকর করতে। গবর্ণমেণ্ট মিত্রশক্তির কাছে রাষ্ট্রদূতদের মারফৎ এই ঘোষণা পাঠিয়ে দিলেন। কিন্তু গবর্ণমেণ্টের পক্ষ থেকে মিলিউকভ রাষ্ট্রদূতদের গোপন-পত্রে জানিয়েও দিলেন যে, মিত্রশক্তিকে যেন বলা হয় যে, বর্ত্তমান গবর্ণমেণ্ট মিত্র শক্তির সঙ্গে মৈত্রী অটুট রেখেই চলবেন। আসলে অন্তর্বিরোধ চাপা দেবার জন্যই যুদ্ধ থেকে অপসৃতির প্রস্তাব করা হয়েছে; গবর্ণমেণ্ট কিছুটা সুপ্রতিষ্ঠিত হলেই ওই ঘোষণা বাতিল করা হবে।

প্রভিশনাল গবর্ণমেণ্ট সোভিয়েৎ-কমিটির নির্দ্দেশ মতো যে-দিনটি

স্মরা-রুশ শ্রমিক ও সৈনিক দিবস পালন করছিলেন, সেই দিনেই মিলিউকভের গোপন চিঠির মর্ম্ম প্রচারিত হওয়ায় দারুণ বিক্ষোভের সৃষ্টি হোলো। সৈনিকরা আর যুদ্ধ করতে নারাজ। তাদের সঙ্গে প্রভিশনাল গবর্ণমেণ্টের সংঘর্ষ ঘটবার উপক্রম হোলো। সোভিয়েৎ দৃঢ় হাতে ঘটনা আয়ত্তে না আনলে গৃহযুদ্ধ তখনই শুরু হয়ে যেত। সোবিয়েতের নির্দ্দেশে শ্রমিক ও সৈনিকরা শান্ত হোলো। সোবিয়েতের বিপুল প্রভাবের পরিচয় প্রকট হতেই প্রথম প্রভিশনাল গবর্ণমেণ্টের পতন হোলো।

দ্বিতীয় প্রভিশনাল গবর্ণমেণ্টে সোবিয়েৎ যোগদান করলেন। তাঁদের পক্ষ থেকে পাঁচজন মন্ত্রী নিযুক্ত হলেন। কিন্তু কেরেনেস্কি হলেন সমর-সচিব। এই দ্বিতীয় প্রভিশনাল গবর্ণমেণ্টের আমলেই বোলশেভিকরা পেত্রোগ্রাদে প্রাধান্য লাভ করতে সক্ষম হলেন। তখনই লেনিন ঘোষণা করলেন—সকল ক্ষমতা সোবিয়েৎকেই দিতে হবে। ডুমা-কমিটি ভীত হয়ে গেলেন। সমর-সচিব কেরেনেস্কি যুদ্ধ ক্ষেত্রের অবস্থা জানবার ছল করে ফ্রণ্টিয়ারে চলে গেলেন এবং প্রকাশ্যে যুদ্ধ জয় করবার জন্য, আর গোপনে বোলশেভিদের ধ্বংস করবার জন্য, সৈনিকদের উত্তেজিত করবার চেষ্টা করলেন।

ফ্রণ্টিয়ার থেকে ফিরে এসে কেরেনেস্কি ঘোষণা করলেন যে, লেনিন জার্ম্মেণীর চর, জার্ম্মাণ অর্থেই বোলশেভিক পার্টির শক্তি বৃদ্ধি হচ্ছে। তখনকার দিনে এইরূপ একটি ঘোষণা দারুণ উত্তেজনা সৃষ্টি করবার কথা। লেনিন আর জিনোভিভ আত্মগোপন কোরলেন। ট্রট্স্কি, কামানেভ, লুনাচারস্কি কারারুদ্ধ হলেন। প্রাভ্দার প্রকাশনা বন্ধ করে দেওয়া হোলো। উত্তেজিত জনতা প্রাভ্দা-প্রেস ভেঙে তচ্-নচ্ করে দিল। কেরেনেস্কি প্রাইম মিনিষ্টার হলেন, এবং ভাবলেন তিনিই জয়ী হলেন।

কেরেনেস্কির কোন পরিকল্পনাও ছিল না, যোগ্যতাও ছিল না; ছিল কিছু দুষ্টবুদ্ধি আর জনতা-মাতানো বক্তৃতা করবার ক্ষমতা। তাঁর মৌলিক কামনা ছিল নিছক আত্ম-প্রতিষ্ঠা। লেনিনের নামে মিথ্যা প্রচারণা করে তিনি ভাবলেন, তিনি জিতে গেলেন। কিন্তু খুব শিগ্গীরই বুঝতে পারলেন লেনিন আত্মগোপন করে কূর্ম্ম হয়ে বসে নেই, বোলশেভিক অগ্নি-স্ফুলিঙ্গ দেশময় ছড়িয়ে দিয়েছেন; রাজধানীর ত বটেই, গ্রামাঞ্চলের সোবিয়েৎ গুলিতে বোলশেভিকরা সংখ্যা গরিষ্ঠ হয়ে উঠেছেন।

কেরেনেস্কি তখন কর্ণিলভের সঙ্গে ষড়যন্ত্র করে মিলিটারী ডিক্টেটরশিপ প্রতিষ্ঠার আয়োজন করছিলেন। কিন্তু যখন তিনি বুঝতে পারলেন যে, কর্ণিলভ নিজেই ডিক্টেটর হতে চান, তখন তিনি পিছিয়ে পড়লেন। কর্ণিলভ ততক্ষণ পেত্রোগ্রাদের দিকে অগ্রসর হয়েছেন। প্রভিশন্যাল গবর্ণমেণ্ট ট্রটস্কি প্রভৃতিকে মুক্ত করে দিলেন। কর্ণিলভ রাজধানীতে পৌঁছুতে পারলেন না। সোবিয়েৎ শ্রমিক আর সৈনিক প্রতিনিধিরা এগিয়ে গিয়ে তাঁর কশাক সৈন্যদের চিত্ত জয় করে ফেল্লেন। ২৬শে অক্টোবর তারিখে সোবিয়েতের নায়করা মিলিটারী রেভোলিউশনারী কমিটি গঠন করলেন এবং সামরিক সর্ব্বাধিনায়কত্ব দাবী করলেন। সেই হোলো আসলে বোলশেভিক শক্তির প্রতিষ্ঠা। লেনিন আবার আত্মপ্রকাশ করলেন। দ্বিতীয় সোভিয়েৎ কংগ্রেস সমস্ত ক্ষমতা বোলশেভিক পার্টিকে দান করল।

কেরেনেস্কি আবার ছুটে গেলেন যুদ্ধক্ষেত্রে সৈন্যবাহিনী নিয়ে—ফিরে এসে বোলশেভিক শক্তিকে চূর্ণ করবার জন্য। কিন্তু তার কথায় কেউ কর্ণপাত করলেন না। একমাত্র ক্রাসেনভ তাঁর কসাক সৈন্যবাহিনী নিয়ে এগিয়ে এলেন। কিন্তু ট্রটস্কির কাছে তিনি শোচনীয় ভাবে পরাজয় মেনে নিলেন। কেরেনেস্কি আর রাজধানীতে ফিরে এলেন না। তিনি দেশত্যাগ করলেন। তাঁর সহযোগীরা মনে করেছিলেন ট্রটস্কিই পরাজিত হবেন। তাই তাঁরা রেভলিউশনারী মিলিটারী কমিটিকে গ্রেফতার করবার জন্য এবং সোবিয়েতের আড্ডাগুলি ভেঙে দেবার জন্য গবর্ণমেণ্টের অনুগত সৈন্যবাহিনী নিয়োগ করে উইণ্টার প্যালেসে আশ্রয় নিলেন। ফল হোলো বিপরীত। সমগ্র পেত্রোগ্রাদ বোলশেভিকদের করতলগত হোলো।

বোলশেভিকদের প্রতিষ্ঠার পর ডুমা-কমিটির অস্তিত্ব রইল না। কিন্তু সোশ্যাল রেভলিউশনারীরা গৃহযুদ্ধের আয়োজন করে তুল্ল। তারা যদি বিপ্লবের আদর্শকে গ্রহণ করত, তাহলে বিপ্লবোত্তর রাশিয়ায় রক্তের প্লাবন বইত না। কিন্তু তারা তা গ্রহণ করতে পারল না। না পারবারই কথা। কেন না মার্ক্সবাদী বিপ্লব পৃথিবীতে সেই প্রথম অনুষ্ঠিত হোলো। তা হচ্ছে আগেকার সমস্ত রাজনীতিক বিপ্লবের চেয়ে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। সকল বিপ্লবের মূল কারণ উৎপাটন করাই সে-বিপ্লবের উদ্দেশ্য। তাই কাউণ্টার রেভলিউশন যেমন অস্বাভাবিক নয়, তেমন বিপ্লবের আদর্শ অম্লান রাখবার জন্য বিপ্লবীদের কোন প্রকার আপোষে সম্মত না হওয়াও স্বাভাবিক।

সোশ্যাল রেভলিউশনারীরা স্তাভিনকভের নেতৃত্বে ইয়ারোস্লাভ শহরে বিদ্রোহ করল। বোলশেভিকিরা সে বিদ্রোহ দমন করল। সোশ্যাল রেভলিউশনারী দল সেইখানেই সমাধি লাভ করল।

হোয়াইট জেনারেল কোল্চাক ওমস্কে বিপ্লব-বিরোধী গবর্ণমেণ্ট প্রতিষ্ঠা করলেন। আঞ্চলিক সোবিয়েতের সন্দেহ হলো যে, একাটারিণবার্গে অবরুদ্ধ দ্বিতীয় নিকোলাস সপরিবার কোল্চাকের সঙ্গে মিলিত হবার কল্পনা রাখেন। আঞ্চলিক সোবিয়েৎ পাঁচ মাস নিষ্ক্রিয় ছিলেন রাজপরিবার সম্বন্ধে কোন চরম ব্যবস্থা অবলম্বন করতে। কিন্তু কাউণ্টার রেভলিউশনারী কোল্চাক আর হৃত-ক্ষমতা দ্বিতীয় নিকোলাসের মিলন সম্ভাবনা আঞ্চলিক সোবিয়েতকে উত্তেজিত করে তুল্ল। ঐ সোভিয়েৎ সমগ্র রাজপরিবারটিকে মৃত্যু দণ্ডে দণ্ডিত করল, এবং ১৯১৮ খৃষ্টাব্দের ষোলই-সতেরোই নিশীথ রাতে তাদের সকলকে হত্যা করল।

কয়েক সপ্তাহ পরে কোল্চাকের বাহিনী একাটেরিণবার্গ দখল করল, কিন্তু মৃতদেহগুলির কোন সন্ধান পেল না,—শুধু দেখতে পেল বনের মাঝে অনেকটা যায়গা অগ্নিদগ্ধ রয়েছে। সেই ভস্মস্তূপের মাঝে নাকি মণি-মাণিক্য, হীরে প্রভৃতি পাওয়া যায়।

দ্বিতীয় নিকোলাস দম্ভ করে বলতেন, তাঁর প্রতিষ্ঠা সত্য এবং সৌরকরের মতোই সেই সত্য সমগ্র রাশিয়াকে আলোর ঝর্ণা-ধারায় প্লাবিত রাখবে, একনায়কত্বের স্বৈরাচারী শাসন অতীতের মতোই ভবিষ্যতেও সুপ্রতিষ্ঠিত থাকবে। রুশ-জাতির ভাগ্য-বিধাতা তাঁর সে দম্ভ রাখলেন না। কোন স্বৈরচারীর অনুরূপ দম্ভ কোন জাতিরই ভাগ্য-বিধাতা সহ্য করেন না। জাতির ভাগ্যবিধাতা কোন অলৌকিক শক্তি নয়, জাতির ভাগ্য-বিধাতা জাতির জনগণ। ক্রমশঃ

নবাবিষ্কৃত দ্বীপের কথা

উপানন্দ

আমেরিকার উপকূল থেকে দু হাজার মাইল, আর নিউজিল্যাণ্ড চার হাজার মাইল দূরে প্রশান্ত মহাসাগরের দক্ষিণ সীমায় রয়েছে দ্বীপ। দ্বীপটী বেশী বড় নয়। এর আয়তন পঁয়তাল্লিশ বর্গ মাইল এটী পৃথিবীর মধ্যে অন্যতম অত্যাশ্চর্য্য দেশ, এর জন্ম হয়েছে গিরি থেকে। এই দ্বীপে প্রস্তরের অনেক খোদিত মূর্ত্তি আছে। লি বিশাল আর অতি বৃহৎ পাদভূমির ওপর স্থাপিত। এই ক্ষুদ্র প্রস্তর নির্ম্মিত বৃহৎ ও ক্ষুদ্র এত অধিক সংখ্যক মূর্ত্তি আছে যে, বিস্মিত হোতে হয়। এর ইতিহাসের খোঁজ করেও আজ পর্য্যন্ত কিছু পাওয়া গেছে বলে আমাদের জানা নেই।

কোন মহাদেশের সন্নিকটবর্ত্তী হোলে এই দ্বীপটির রহস্য উদ্‌ঘাটন অবশ্য বহু বিলম্ব হোতো না, কিন্তু এটী মহাদেশ থেকে রয়েছে বহু সমুদ্রের মধ্যে, আর এখানে যে সব প্রস্তরের কার্য্য রয়েছে, তা দেখে ই প্রমাণিত হয় যে এগুলি মানুষের হাতে গড়া জিনিষ। এখানে শতেরও অধিক প্রস্তর মূর্ত্তি আছে। এগুলি দু হাত থেকে সাত হাত পর্য্যন্ত উঁচু—আর এরা ছড়িয়ে আছে দ্বীপের নানাস্থানে। র পিরামিড তৈয়ারী কর্‌বার জন্যে যত লোক লেগেছিল, ততলোক র্ত্তিগুলি নির্ম্মাণ কর্‌তে লেগেছিল বহুদিন ধরে, এরূপ অনুমান হয়। নির্ম্মিত মূর্ত্তিগুলির পরস্পরের মুখাবয়বের সাদৃশ্য আছে। মূর্ত্তিগুলির সক। এদের মুখের এরূপভাব, যেন মনে হয় সেগুলি অবজ্ঞা করছে। মিসরের প্রাচীন মূর্ত্তিগুলির মুখে মনের ভাব স্পষ্টরূপে শিত হয়েছে, এই মূর্ত্তিগুলি কিন্তু তার চেয়েও বেশী ভাবব্যঞ্জক। সাক্ষ্য দিচ্ছে অতীতের অজানা মানুষদের অত্যাশ্চর্য্য শিল্প নিদর্শন। প্রস্তর খণ্ড থেকে এক একটি মূর্ত্তি খোদিত করে বাহির করা । এর মধ্যে কোথাও জোড় নেই, এটী আরও আশ্চর্য্যের কথা। তীর থেকে আট মাইল দূরে এক নিভে-যাওয়া আগ্নেয়গিরি থেকে পাথর বের করা হয়েছে।

এ সব মূর্ত্তি কারা নির্ম্মাণ করেছে, কি যন্ত্র তারা ব্যবহার করেছে, আর কোন যুগে এগুলি নির্ম্মিত হয়েছে, এ সম্বন্ধে আজও পর্য্যন্ত কোন ঐতিহাসিক তথ্য পাওয়া যায় নি। যে দেওয়ালের ওপর এই মূর্ত্তিগুলি স্থাপিত হয়েছে, তাও খুব আশ্চর্য্যজনক। দেওয়ালগুলি নিরবচ্ছিন্ন নয়, কিন্তু ভাগে ভাগে নির্ম্মিত। তার মধ্যে কতকগুলি চারশো ফিট লম্বা আর তেরো হাত থেকে বিশ হাত পর্য্যন্ত উঁচু ও দেওয়ালের উপরিভাগ ছাব্বিশ হাত চওড়া।

এই দেওয়াল পাথর কেটে তৈয়ার করা হয়েছে। প্রত্যেক প্রস্তর খণ্ড এগারো মণ থেকে একশো চল্লিশ মণ পর্য্যন্ত ভারী। এতদূর এই সব প্রস্তর খণ্ড কিভাবে এনে এক খণ্ডের উপর অপর খণ্ড কারা সাজিয়ে ছিল, এ সব প্রশ্নের কোন সন্তোষজনক উত্তর আজ ও পর্য্যন্ত পাওয়া যায় নি. তবে এখানকার মানুষেরা যে খুব সভ্য ও শক্তিশালী ছিল তদ্বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। বিগত শতাব্দীতে টোপাজ নামক রণতরী একবার এই দ্বীপে গিয়েছিল। তার কর্ম্মচারীরা জেড় নামক হরিৎবর্ণের প্রস্তর-বিশেষের বাটালি পেয়েছিল, কিন্তু এ ধরণের যন্ত্র সাহায্যে এতবড় মূর্ত্তি আর দেওয়াল প্রস্তুত করা অসম্ভব। বিশেষতঃ মূর্ত্তি নির্ম্মাণ কর্‌তে যে প্রস্তর ব্যবহৃত হয়েছে, তা এত শক্ত যে উৎকৃষ্ট ইস্পাতের বাটালিও খারাপ হয়ে যায়।

যে দেওয়ালের ওপর মূর্ত্তিগুলি রয়েছে. তার সমান্তরালে আরও এক শ্রেণী দেওয়াল আছে, মাঝে মাঝে আড়া-আড়ি দেওয়াল দিয়ে ঐ দুই দেওয়াল সংযোগ করা আছে। কোন কোন জায়গায় ছাদ দেওয় হয়েছে, আর তার নীচে হয় মানুষ বলি দেওয়া হয়েছে অথবা যারা এইগুলি প্রস্তুত কর্‌তে মারা গিয়েছে, তাদের মৃতদেহ সেখানে রক্ষিত হয়েছে—কোন্‌টা ঠিক নিশ্চয় করে বলা যায় না।

কোন্ দেশীয় লোক, কোন্ জাতি বা কারা এই আশ্চর্য্য মূর্ত্তিগুলি নির্ম্মাণ করেছে, তাও বলা যায় না। তবে একথা সত্য যে, এখানে একদা

উচ্চ সভ্যতা বিস্তৃত হয়েছিল, তার প্রমাণ পাওয়া গেলেও ইতিহাস এর উচ্চসভ্য অধিবাসীদের সম্বন্ধে নীরব। তবে কতকগুলি নিদর্শন থেকে এদের সম্বন্ধে কিছু জান্‌বার চেষ্টা করা যেতে পারে।

প্রত্যেক মূর্ত্তির মস্তকের পশ্চাদ্ভাগ সমতল করা আছে, আর তাতে রয়েছে নানা রকমের রেখাপাত ও চিত্রাক্ষর, তা পড়া যায় না। কারণ এই রেখাক্ষর ও চিত্রাক্ষর পড়্‌বার প্রণালী কারো জানা নেই, জান্‌বারও উপায় নেই। বৃহৎ পাষাণনির্ম্মিত গৃহগুলির ভিতরেও ঐ রকম খোদিত চিত্রাক্ষরাদি আছে, এছাড়া কাঠের তক্তার ওপর নানাপ্রকার খোদিত চিত্রাক্ষর দেখ্‌তে পাওয়া যায় এই সব চিত্রাক্ষর ও রেখাক্ষর পাঠ করতে পার্‌লে যে আশ্চর্য্যজনক ইতিহাস বের হবে, তা বোধ হয় নিনেভের ইতিহাসের মতই হবে অদ্ভুত।

এই দ্বীপের কাছে যে সকল পলিনেসিয়ার দ্বীপ আছে, তার অধিবাসীরা এই দ্বীপ সম্বন্ধে কিছুই বল্‌তে পারে না, এমন কি তারা এ সম্বন্ধে কোন গল্প বা কোন প্রকার অনুমান করতে পারে না। এরকম বিশাল ও আশ্চর্য্যজনক মূর্ত্তি প্রভৃতি যখন তৈরী হয়েছিল, তখন নিশ্চয়ই অনেক সুনিপুণ শিল্পীর প্রয়োজন হয়েছিল, তা ছাড়া বর্ত্তমান দ্বীপটী যত ক্ষুদ্র, তার মধ্যে এত লোক নিশ্চয়ই ধরে না, এ দ্বীপে খাদ্য জল নেই বল্‌লেই চলে, খাদ্য দ্রব্য জন্মাবার স্থান ও অধিক নেই। এই সব দেখে অনুমান হয় যে, এই ইষ্টার দ্বীপ এক সময়ে খুব বৃহৎ ছিল ও এক দ্বীপপুঞ্জের মধ্যে অবস্থিতি ছিল, অথবা এটী অষ্ট্রেলিয়া প্রভৃতির মত এক মহাদেশের বৃহৎ দ্বীপ ছিল কিম্বা এশিয়া বা আমেরিকার সঙ্গে সংলগ্ন ছিল। এ দ্বীপটী নির্ব্বাণপ্রাপ্ত আগ্নেয়গিরিতে পূর্ণ। ভাবীকালে হয়তো একদিন এর সমস্ত রহস্য উদ্‌ঘাটিত হবে কোন প্রত্নতাত্ত্বিকের আনুকুল্যে।

হে মহামানব !

শ্রীরঞ্জিতবিকাশ বন্দ্যোপাধ্যায়

এই দিনটিতে হে মহামানব ! জন্ম লভিলা আসি,
মানুষে মানুষে ভেদাভেদ তুমি-চেয়েছিলে যাবে নাশি ;
মানুষের মাঝে শান্তির তরে,—
বারে বারে তুমি এস ধরা 'পরে,
শেখাও সবারে ন্যায়ের মন্ত্র মানুষেরে ভালবাসি।

ত্যাগেতে মহান, করমেতে দৃঢ়, সত্যদ্রষ্টা বীর,
বিশ্বের সেরা ভারতবাসীর ওগো দূত মুক্তির !
অহিংসা নীতি করি সম্বল,
ভেঙেছো : কঠিন কারার আগল,
উন্নত তাই বিশ্বের কাছে ভারতের আজি শির।

নগ্ন, শীর্ণ, হে ভিখারীবেশী, সীমাহীন তব দান,
সকল কালের সকলের সেরা দেখালে মানব প্রাণ
জন্মবাসর আসিয়াছে দ্বারে,
তাইতো তোমারে স্মরি বারে বারে—
শ্রদ্ধায় আজি নতকরি শির, আমাদের পরণাম।

[২রা অক্টোবর মহাত্মাজীর জন্মদিন স্মরণে।]

ভালুকের সঙ্গে একরাত *

মন্মথ রায়

দুষ্টু ছেলেমেয়ের গল্প তোমরা অনেক শুনেছ। কিন্তু শঙ্কর সীতার দুষ্টামির কথা যদি জানতে ! ইস্ কী ভয়ংকর কাণ্ডই না করল ওরা !

শোন বলি। তোমরা ভয় পেও না কিন্তু।

আত্রাই নদীর ধারে যদুবাবুর মাঠে জুপিটার সার্কাসের তাঁবু পড়ল। সহরের রাস্তায় রাস্তায় ব্যাগপাইপ আর ড্রাম বাজিয়ে সার্কাসের রঙচঙে জামাপরা দু'তিন জন লোক চেঁচিয়ে বলে গেল—রয়েলবেঙ্গল টাইগার—আসুন—আসুন—বাঘের মুখের ভেতরে হাত দিয়ে খেলা দেখানো হবে—সন্ধ্যা ছয়টায় আরম্ভ হবে। আসুন—

সন্ধ্যা হয়ে এল। যদুবাবুর মাঠে বিশাল তাঁবুটা আলোয় ঝলমল করে উঠল। ড্রাম আর ব্যাগপাইপে বাজনা সুরু হল। দলে দলে ভেঙ্গে এল সহরের লোক প্রত্যেকেই ছোট ছোট বাচ্চাদের নিয়ে এসেছে। তাদের কী স্ফুর্ত্তি। শঙ্কর আর সীতার তো কথাই নেই। একেবারে সার্কাসের তাঁবুর পাশে তাদের বাড়ীটা। তাদের আর নাওয়া-খাওয়ার সময় নেই। সারাদিন বাঘ ভালুক সার্কাসের সব জন্তুদের খাঁচার কাছে ঘুর ঘুর করেছে কিন্তু ওরাই সবচয়ে আগে এল সার্কাস দেখতে। সুরু হল তারের ওপর দিয়ে খেলা, আগুনের ভেতরে দিয়ে ঝাঁপিয়ে পার হয়ে যাওয়া, আরও কত কি ! কিন্তু শঙ্কর

আর সীতা অস্থির হয়ে উঠেছে। কখন আরম্ভ হবে বাঘের খেলা! একটার পর একটা খেলা হয়ে গেল।

—এইবার বাঘের খেলা হবে রে সীতু! ঐ দেখ দেখ খাঁচার ভেতর থেকে বাঘটাকে বের করছে!—দাদা কি রকম ডোরাকাটা রঙ দেখেছিস বাঘটার গায়ের। ঠিক ঠাকুমার পূজোর আসনের মত—

—ঠাকুমা তো বাঘের ছালের ওপরই পূজো করে রে! বাঘের খেলা হয়ে গেল। শঙ্কর আর সীতার মত সব ছোট ছোট ছেলেমেয়ের দল আনন্দে হাততালি দিয়ে উঠল। সার্কাস শেষ হলো। শঙ্কর আর সীতা বাড়ীতে ফিরে এল। ওদের বাবা রঘুনাথবাবু বললেন—যা রাত হয়েছে। শীগগীর ঠাকুমার কাছে গিয়ে শুয়ে পড়—

—কি রে খোকা সীতু; তোরা সব সার্কাস কেমন দেখলি?

—ঠাকুমা তুমি তো গেলে না—বলল সীতু—কী অদ্ভুত ডাকাতের মত চেহারার একটা লোক কেমন বাঘের মুখের ভেতরে হাত দিয়ে—

—ওরে ওসব সার্কাসের বাঘ সিংহকে নেশা খাইয়ে কাবু করে রাখে—

—তুমি খুব জানো—মাথা ঝাঁকিয়ে বলল শঙ্কর, বাঘটার লাফাঝাঁপি যদি দেখতে, তাহলে আর একথা বলতে না—

—ঠাকুমা, কি রকম নথ দিয়ে মাটি আঁচড়াচ্ছিল জানো? আর কি বড় বড় গোঁফ! বলল সীতু। আঃ তোরা এখন ঘুমো তো! জড়িয়ে জড়িয়ে বললেন ঠাকুমা।

বাইরে একটানা ঝিঁঝি ডেকে চলেছে। থেকে থেকে ভেসে আসছে বাঘের গর্জন। ঘুম আসে না সীতা আর শঙ্করের। বারান্দার ঘড়িতে ঢং ঢং করে দশটা বাজল। বাইরে ফুট ফুট করছে জ্যোৎস্না। ঠাকুমা নাক ডাকিয়ে ঘুমোচ্ছেন। ফিস্ ফিস্ করে শঙ্কর বলল—সীতু, আমরা মানুষরা রাতের বেলা ঘুমোই। কিন্তু বাঘ, ভালুক, বানররাও কি আমাদের মত ঘুমোয়?—নিশ্চয় ঘুমোয়—বলে সীতা—না ঘুমুলে শরীর খারাপ করবে যে!

চল না দেখে আসি, রাত্রে ওরা কি করে?

—এত রাত্রে যাবি দাদা? ঐটা পাগলটা যদি রাস্তায় দাঁড়িয়ে থাকে—

আর দূর! তুই কিচ্ছু না। এত ভীতু তুই! রাস্তাটার ওপারে গেলেই যদুবাবুর মাঠ। তাঁবুর পাশেই তো সারি সারি খাঁচাগুলো রয়েছে!

—চল্ যাবো আর আসবো কিন্তু! বলল সীতু। বিছানা থেকে নেমে, হাফপ্যান্টের বেল্টটা কষে নিয়ে বুক ফুলিয়ে দাঁড়াল শঙ্কর। সীতার কানে কানে বলল, এক কাজ করা যাক্। দুটো পাশ বালিশের ওপরে লেপ মুড়ি দিয়ে এমন করে সাজিয়ে রাখ, যাতে ঠাকুমা মনে করে যে শুয়েই আছি আমরা!

—কিন্তু ঠাকুমার যদি ঘুম ভেঙ্গে যায়!

—না রে না—যাবো আর আসবো।

পাশ বালিশকে লেপ মুড়ি দিয়ে মশারী থেকে বেরিয়ে এল সীতা। চাপা গলায় বলল—দাদা, ঠাকুমার ঐ পাথর-বাটী ভরা দুধ বাঘটার জন্য নিয়ে যাবি?

—দূর, দুধ কেমন করে নিয়ে যাবি?

—তাহলে বানরগুলোর জন্য কলা আর ছোলাভাজা নেই দাদা?—

—ভাঁড়ার ঘর থেকে কলা ছোলাভাজা নিয়ে শঙ্কর আর সীতা বাড়ী থেকে বেরিয়ে পড়ল।

সার্কাসের তাঁবুর সব আলো নিভে গেছে। শুধু গেটের কাছে একটা হ্যাজাক জ্বলছে। গেটের পাশে পাহারাদার শুয়ে আছে। প্রতিটি খাঁচার ভেতর থেকে বন্দী জন্তুদের সাড়া পাওয়া যাচ্ছে। চল, আগে বাঘের খাঁচার দিকে যাই—বলল সীতা। হাত ধরাধরি করে চারিদিকে ভীতু চোখে তাকিয়ে তারা বাঘের খাঁচার কাছে এল।

—না রে চল, বাঘটা ঝিমোচ্ছে—

—বোধ হয় ঘুম পেয়েছে রে।

—এই দাদা,এদিকে আয়—দেখ দেখ বানরটার কাণ্ড! সীতা খাঁচার ওপরে দাঁড়িয়ে সুর করে চাপাগলায় বলল—এই বানর কলা খাবি, জয় জগন্নাথ দেখতে যাবি—একটা কলা ছুঁড়ে দিল বানরকে।

চল তো সীতু, ভালুকটার খাঁচার দিকে—তারা গুটি গুটি ভালুকের কাছে এল। কালো কুচকুচে গায়ের রঙ। পশমের মত ঘন বড় বড় লোম। পাতলা অন্ধকারে ভালুকের চোখ দুটো দপ দপ করছে। খাঁচার ভেতরে গুটি সুটি মেরে বসে আছে।

—এই ভালুক বুটভাজা খাবি—সীতা বলল—এই নে—নে—বলেই একরাশ ছোলাভাজা ছড়িয়ে দিল খাঁচার ভেতরে। ভালুকটা মাথা নীচু করে গোঁ গোঁ করতে লাগল। মাটিতে ছড়ানো ছোলাগুলোর গন্ধ শুঁকেই হঠাৎ সামনের দুপা তুলে লাফিয়ে উঠল। জেগে উঠল পাহারাদার। সীতা আর শঙ্কর চাকা লাগানো খাঁচার নীচে গুঁড়ি মেরে লুকিয়ে পড়ল। কাঁচা ঘুম জড়ানো চোখ দুটো রগড়ে নিয়ে বিরক্ত হয়ে বললো রাত্রেও উৎপাত করবে—চারিদিকে একবার ঘুরে দেখে নিয়ে সে আবার শুয়ে পড়ল। শঙ্কর আর সীতা আবার ভালুকের খাঁচার সামনে এসে দাঁড়াল।

—দাদা, খাঁচার খিলটা কেমন নড়বড়ে হয়ে গেছে দেখেছিস! এই দেখ,—সীতা খিলটা একটু টানতেই খুলে গেল। আনন্দে চকচক করে উঠল শঙ্করের চোখ দুটো। তার মনে ভয়ের লেশ নেই। সে খাঁচার দরজার একটা পাল্লা একটু আলগা করে ধরতেই একলাফে ভালুকটা হঠাৎ বেরিয়ে পড়ল। সঙ্গে সঙ্গে ভয়ে ছুটে পালিয়ে গিয়ে তারা খাঁচার নীচে লুকিয়ে পড়ল।

জোছনার ঝাপসা আলো-ভরা মাঠের চারিদিকে ভালুকটি তার দুই বন্ধুকে খুঁজে বেড়াতে লাগল। শঙ্কর কাঁপতে কাঁপতে বলল—সীতু, ভালুকটা আমাদের পেলে খেয়ে ফেলবে রে—

—চল, ওর খাঁচার ভেতরে ঢুকে খিল এঁটে দেই—তাহলে ও আর আসতে পারবে না—

—ঠিক বলেছিস! ভালুকটা আরও একটু দূরে যেতেই শঙ্কর ও সীতা খাঁচার ভেতরে ঢুকে পড়ল।

ভালুকটা গেটের পাশ দিয়ে সদর রাস্তার দিকে যেতেই গেটের আলোর নীচে অন্ধকারে চাদর মুড়ি দিয়ে শুয়ে থাকা পাহারাদারের পায়ে ধাক্কা লাগল ভালুকের। সঙ্গে সঙ্গে জেগে উঠে দেখল, ভালুক খাঁচা থেকে বেরিয়ে মাঠ ছাড়িয়ে সদর রাস্তার দিকে যাচ্ছে—চারিদিক কাঁপিয়ে সে চীৎকার করে উঠল—ভালুক খাঁচা থেকে বেরিয়ে গেছে—সব্বনাশ হয়েছে—সব্বনাশ হয়েছে! তাঁবুর ভেতরে সার্কাসের সমস্ত লোক জেগে উঠলও লাঠি সোঁটা নিয়ে সার্কাসের ম্যানেজার রঙ্গনাথমের চারপাশে জড়ো হলো। ভালুকের যে খেলা দেখায় সে, রহমত বলল—কোনদিকে গেছে?

—সদর রাস্তার দিকে—বলল পাহারাদার। তাদের হাঁকডাকে চীৎকারে পাড়ার লোকও জেগে উঠল। ভালুকটা ভয় পেয়ে রঘুনাথের বাড়ীর খোলা দরজা দিয়ে উঠোনে চলে এল। উঠোনে দাঁড়িয়ে চারিদিকে তাকিয়ে শঙ্করের ঠাকুমার ঘরের দরজা খোলা পেয়ে ভেতরে ঢুকে পড়ল ভালুকটা। তার গোঁ গোঁ চীৎকার শুনে ঠাকুমা ঘুম ভেঙ্গে আঁতকে উঠলেন। দুহাতে বুক চেপে ধরে চাপা গলায় বললেন—রাম! রাম! হে ভগবান বাঁচাও—বাঁচাও—কিন্তু ভালুকের নজরে পড়ল খাটের নীচে পাথরবাটী ভরা দুধের দিকে। সে দুধ খেতে লাগল। সঙ্গে সঙ্গে ঠাকুমা এক লাফে খাট থেকে নেমে ছিটকে ঘরের বাইরে চলে গেলেন। বাইরে এসে ঘরের শিকল লাগিয়ে দিলেন। রঘুনাথবাবুর দরজায় ধাক্কা দিয়ে চেঁচিয়ে উঠলেন—রঘুনাথ—শিগগীর—ওঠ—আমার ঘরে ভালুক ঢুকেছে। খোকা আর সীতুকে দেখছি না—

এঁ্যা! বলো কি—দরজা খুলেই ভয়ে চেঁচিয়ে উঠলেন রঘুনাথবাবু।

—আমার খোকা—আমার সীতু কোথায়? বলে কেঁদে উঠলেন শঙ্করের মা। রঘুনাথবাবু, তাঁর স্ত্রী এবং মা, সবই ছুটে বাইরে চলে গেলেন—শঙ্কর আর সীতাকে খুঁজতে। রাত্রির নিস্তব্ধতাকে কাঁপিয়ে তারা চীৎকার করে ডাকতে লাগলেন—খোকা!—খোকা—সীতু! তোরা কোথায় গেলি রে।

ওদিকে শঙ্কর আর সীতা ভালুকের খাঁচা থেকে বেরিয়ে এল।

—দাদা, ঐ শোন, আমাদের নাম ধরে ডাকছে—বলল সীতা।

—চুপি চুপি চল—বলল শঙ্কর—গোয়ালঘরের পাশে ছোট দরজা দিয়ে বাড়ীতে ঢুকে পড়বো—

—বাবা মেরে পিঠের ছাল তুলে দেবে আমাদের—

—তুই তো খাঁচার খিলটা খুলেছিস, তোর জন্যই তো সব—

—কী, বেশ তো শুয়েছিলাম, তুই তো টেনে বের করে নিয়ে এলি! কথা বলতে বলতে তারা বাড়ীর পেছনে গোয়ালঘরের পাশে ছোট দরজা দিয়ে উঠোনে এসে দাঁড়াল।

সদর রাস্তার ওপরে সার্কাস পার্টির লোকজনের সঙ্গে রঘুনাথবাবুদের দেখা হল। সার্কাসের ম্যানেজার রঙ্গনাথম্ বললেন—আমাদের ভালুকটাকে কি আপনারা দেখেছেন?

—হ্যাঁ, হ্যাঁ, ভালুকটা আমার মা-র ঘরে ঢুকে পড়েছেল। মা তাকে আটকে রেখেছেন—বললেন রঘুনাথবাবু—

—কিন্তু আমার খোকা কোথায়, সীতু কোথায়—পাগলের মত চীৎকার করে উঠলেন শঙ্করের মা—

—ভালুকটার আফিং-এর ডোজ কম হয়েছিল। ও ক্ষেপে আছে বলল রহমত—হয়তো ওদের খেয়ে ফেলেছে—

—এ্যাঁ! ভয়ে রঘুনাথবাবুর মাথার চুল খাড়া হয়ে উঠল।

—তাহলে কী হবে! বলে কাঁপতে কাঁপতে রাস্তার ধুলোর ওপর বসে পড়ল শঙ্করের মা।

—আপনারা আগে বাসায় ফিরে চলুন—বলল ম্যানেজার রঙ্গনাথম্—এমন হতে পারে আপনার ছেলে-মেয়েরা অন্য কোথাও লুকিয়ে আছে। ভালুক হয়ত ওদের খায়নি—রঘুনাথবাবুর সঙ্গে সকলেই তাঁর বাড়ীর দিকে হাঁটতে সুরু করল।

এ কী রে দাদা—ঠাকুমা কোথায়? ঘরে শেকল দেখছি। হয়তো স্নানঘরের দিকে গেছে—বলল শঙ্কর।

না রে দাদা, ঠাকুমা নিশ্চয়ই আমাদের খুঁজতে গেছেন—বলল সীতা—

সীতু, আমরা চুপচাপ ঘরে ঢুকে খিল লাগিয়ে দিয়ে শুয়ে পড়ি—বুড়ী পেলে আমাদের আর আস্ত রাখবে না—

ঠাকুমা তাহলে সারারাত বাইরে থাকবে?

বাইরে থাকবে কেন? বলে সীতু—ঘরে ঢুকবার জন্য কান্নাকাটি করবে না? তখন খিল খুলে দিয়ে আমরাই শাসিয়ে বলবো, খবরদার! বুড়ী মানুষ, রাতবিরেতে আর কখনো বাইরে যেও না—

—যা বলেছিস! সীতু, তুই ছোট হলে কি হয় সত্যি তোর বুদ্ধি আছে—

শঙ্কর আর সীতা ঘরে ঢুকে খিল লাগিয়ে দিল।

রঘুনাথ বাবু ও সার্কাসের লোকজন সকলে এসে উঠানে জমা হলো। ঠাকুমা তাঁর ঘরে খিল দেখে আঁতকে উঠলেন—এ কী! আমি যে নিজে শেকল লাগিয়ে গিয়েছিলাম।

—তাহলে কি খোকা আর সীতু ঘরে আছে? বললেন রঘুনাথবাবু—

—সর্ব্বনাশ! ঘরের ভেতরে যে ভালুক আছে!

—তাহলে নিশ্চয়ই ওদের খেয়ে ফেলেছে—বলল রহমত।—শীগগীর দরজা ভেঙ্গে ফেলুন—বলল রঙ্গনাথম—কোন একটা দুর্ঘটনা ঘটে গেল, আমাকে পুলিশ হাঙ্গামায় পড়তে হবে—দেখেছো, কী সর্ব্বনাশ!—জানলা দিয়ে ঘরের ভেতরে তাকিয়ে শিউরে উঠে বললেন রঘুনাথবাবু—ভালুকটাকে মায়ের বিছানার ওপরে উঠিয়ে নিয়ে ওরা তার কান মোচড়াচ্ছে—খেয়ে ফেলবে—এক্ষুণি খেয়ে ফেলবে—তিন লাথি মেরে রঙ্গনাথম দরজা ভেঙ্গে ফেললেন।

—ভালুক ভাইকে আমরা এত আদর করছি—বলল সীতু—তবু রেগে গোঁ গোঁ করছে—শঙ্কর আর সীতার চোখেমুখে ভয়ের কোন চিহ্ন নেই—বরং ভয় হয়েছে ওর!—চেঁচিয়ে উঠল রহমত—জ্বর না হলে আপনার খোকা-খুঁকুকে খেয়ে ফেলতো! বলেই ভালুকটির গলায় শিকল পরিয়ে দিল। সবাই স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে বাঁচলো। ঠাকুমা তারায় ভরা আকাশের দিকে তাকিয়ে বললেন—ঠাকুর আমার দুধের বাচ্চাদের রক্ষা করেছেন!

যার শেষ ভাল, তার সব ভাল।

* "উইথ এ বিয়ার ইন দি বেড"—মন্মথ রায় রচিত ফিল্মকাহিনী থেকে সুভাষ সমাজদার কর্তৃক অনুদিত।

মিনি-পুষি গান গায়

শ্রীশান্তশীল দাশ

মিনি-পুষি দুই বোন থাকে ওরা বনগা'য়,
পড়াশুনো করে নাক' শুধু বসে গান গায়।
ভোরবেলা উঠে পুষি আদা দিয়ে খায় চা,
তারপর চীৎকার করে সা রে গা মা পা।
গান শুনে একে একে ঘুম ভাঙে সকলের,
রাত শেষ হয়ে গেছে সকলেই পায় টের।
দুপুরেতে খেয়ে নিয়ে এক পেট ভরপুর,
জানালায় বসে মিনি এক মনে সাধে সুর।

ঘণ্টা চারেক পরে থেমে যায় গলা তার,
সবাই বুঝতে পারে বেলা বেশি নেই আর।
যেই না সন্ধ্যে হ'ল, পুষি এসে বলে, ভাই,
গলা সাধা ঢের হয়েছে, এইবার গান গাই।'
এই না বলেই পুষি-সুরু করে 'আধুনিক',
কাঁদছে কি গাইছে, বোঝা যায়নাকো ঠিক।
মিনি বলে, 'চুপ কর, আমি গাই এইবার,
ভাল করে মন দিয়ে শোন তুই সুর তার।
গাইতে গাইতে গান-রাত ঢের হয়ে যায়,
মা ডাকেন রেগে গিয়ে—ওরে তোরা খাবি আয়।
রাত ভোর হয়ে গেল, একটু কি হুঁস নেই,
চীৎকার করে যান শুধু এক নাগাড়েই।
এমনি করেই তারা গেয়ে চলে দু'জনায়,
সবাই বারণ করে, কথা কার কানে যায়।
বকা-ঝকা কিছুতেই দেয় নাক' তারা মন,
গাইয়ে হতেই হবে—এ তাদের দৃঢ় পণ।

তোমরা কি জানো ?

সিদ্ধার্থ গংগোপাধ্যায়

আকাশ কি কোনদিন ভেঙে পড়তে পারে।

আকাশের পক্ষে পৃথিবীর উপর ভেঙে পড়ে যাওয়া একেবারেই অসম্ভব, কারণ তোমরা যে বিরাট আকাশ দেখতে পাচ্ছ, তার মধ্যে পড়ে যাওয়ার মতো কিছুই নেই। আকাশ বলে সত্যিই কিছু নেই। তোমরা যাকে আকাশ বলে জানো, সেটা বাতাসের যে পুরু স্তরটা পৃথিবীকে ঘিরে রয়েছে, তার উপরে সূর্যের প্রতিফলন ছাড়া আর কিছুই নয়। অর্থাৎ ঐ স্তরটা আয়নার মতো কাজ করছে, সূর্যের রশ্মিকে টুকরো টুকরো করে ছড়িয়ে দিয়ে অমন সুন্দর নীল আকাশটার সৃষ্টি করছে।

তোমরা হয়তো বলতে পার—আচ্ছা, আকাশে ঐ যে শাদা শাদা মেঘ ভেসে বেড়াচ্ছে, তারা তো ভেঙে পড়তে পারে। কিন্তু ঐ মেঘগুলো আশ্চর্য-রকমের হাল্কা জলীয় বাষ্পে তৈরী। সূর্য, পৃথিবীর সমস্ত নদী-নালা-পুকুর আর সমুদ্র থেকে কিছুটা করে জল শুষে নিয়ে ঐ মেঘদের তৈরী করছে, ঐ মেঘগুলো বৃষ্টি হয়ে আবার পৃথিবীতে ঝরে পড়ছে। মেঘদের ওজন একেবারে নেই বললেই চলে, তাই তাদের পড়বার সম্ভাবনাও কম।

চাঁদের মধ্যে কি সত্যি চাঁদের বুড়ি থাকে।

তোমরা যখন আরো ছোট ছিলে, কান্নাকাটি করতে, ঘুমোতে চাইতে না, তখন তোমাদের ঘুম পাড়াবার জন্যে মা চাঁদের গল্প করতেন। তিনি বলতেন—'জানিস্ খোকা, চাঁদের মধ্যে এক থুথ্থুড়ে বুড়ি থাকে। তার মাথার সমস্ত চুল শণের মতো ধবধবে, তার পায়ের রংও দুধের মতো সাদা। তার হাতের কাছে রয়েছে মস্তোবড়ো একটা চরকা, সে রাতদিন বসে বসে সেই চরকায় সুতো কাটছে।' তোমাদের ভারী মজা লাগত সেই শুনে। তোমরা হয়তো জিজ্ঞেস করতে—'মা, তাকে এখান থেকে দেখা যায়?' মা বলতেন, 'হ্যাঁরে, ঐ দেখ,' বলে আঙুল দিয়ে দেখাতেন জানলার ফাঁকে। তোমরাও সত্যি সত্যি দেখতে পেতে রূপোর থালার মত চাঁদটার মাঝখানে কে যেন বসে রয়েছে। ঐ তাহ'লে চাঁদের দেশের সেই থুথ্থুড়ে বুড়ি!

আকাশ আর নক্ষত্রের রহস্য নিয়ে যে-সব বিজ্ঞানীদের কারবার, তাঁরা বড় বড় টেলিস্কোপ দিয়ে দেখে উদ্ধার করেছেন সেই চাঁদের বুড়ির রহস্য। তাঁরা চাঁদের মধ্যে দেখতে পেয়েছেন অসংখ্য ছোট বড় বরফে-ছাওয়া পাহাড়। সবুজের চিহ্ন মাত্রও সেখানে নেই। সেই পাহাড়গুলোর কোন-কোনটা হয়তো আমাদের এভারেষ্টের চেয়েও উঁচু। আর পাহাড়গুলোর মাঝে মাঝে চাঁদের গায়ের উপর বিরাট বড় বড় গভীর গর্ত। খালি চোখে অস্পষ্ট ছায়ার মতো সেই পাহাড়গুলোর কোন কোনটাকে (যেগুলো খুব উঁচু) দেখা যায়। এখন তাহ'লে বুঝতে পারছ, ছোটবেলায় যাকে চাঁদের বুড়ি ভেবে তোমাদের কৌতূহলের আর অন্ত থাকত না, তা ঐ চাঁদের দেশের উঁচু উঁচু তুষারে ঢাকা পাহাড়!

পৃথিবীতে কিসের বয়স সবচেয়ে বেশী।

পৃথিবীর সব চেয়ে পুরণো জিনিস হচ্ছে রেডউড (Redwood) নামের এক রকম দৈত্যাকৃতি গাছ—যাদের এখনো কালিফোর্ণিয়ার জংগলে দেখতে পাওয়া যায়। পাঁচ হাজার বছর ধরে তারা সেখানে রয়েছে।

এই গাছেরা অনেকটা আমাদের হিমালয়ের কোলের পাইন, ফার্ ইত্যাদি গাছের মতো দেখতে। কিন্তু তারা আরো অনেক লম্বা আর খাড়া হ'য়ে ওঠে। তাদের মধ্যে কোন কোনটা তিনশো চল্লিশ ফুট উঁচু। এদের পাতাগুলো ছোট ছোট আঁশের মতো দেখতে, ডালপালার গায়ে লেপটে থাকে। এই রকম একটা গাছের থেকে দশ ফুট করে লম্বা দশ হাজার খুব ভাল জাতীয় কাঠের টুকরো পাওয়া গিয়েছিল বলে শোনা যায়।

আমেরিকার এক জায়গায় এই রেডউড গাছের বনের মধ্যে, একটা গাছ মাটিতে ফেলে তার গুঁড়ির মধ্যে দিয়ে লম্বা সুড়ংগ করে দেওয়া হয়েছে। এই সুড়ংগের ভিতরে মোটর গাড়ী যাওয়া-আসা করে। একথা ভাবলেও আশ্চর্য লাগে যে ছোট্ট একটা বীজের থেকে কেমন করে জন্মালো ঐ দৈত্যের মতন বিশাল গাছ।

চকোলেট কোত্থেকে আসে।

তোমরা চকোলেট খেতে নিশ্চয়ই খুব ভালবাস। সেই চকোলেট কোত্থেকে আসে তা কি জান?

চকোলেট তৈরী হয় কোকো নামের এক জাতীয় গাছের ফল থেকে।

এই কোকো গাছ খুব গরম দেশে হয়। কোকো গাছ উঁচুতে খুব বাড়ে না। যখন তার বয়স হয় পাঁচ কি সাত বছর, তখন তাতে ফল ধরে। হাজার হাজার ফুলে গাছ একেবারে ভরে থাকে, কিন্তু তাদের মধ্যে মাত্র কয়েকটা থেকেই পাকা কোকোর ফল পাওয়া যায়। প্রত্যেকটি ফলের মধ্যে দুই থেকে তিন ডজন করে কোকোবীন থাকে। ফলগুলোকে কেটে খুলে, ঐ কোকোবীনগুলোকে বের করে ভালো করে শুকিয়ে নেওয়া হয়। প্রতি ছয় বা সাত একর কোকোর বাগান থেকে এক টন শুকনো বীন পাওয়া যায়।

এবার এই কোকো বীনগুলোকে চকোলেটের কারখানায় পাঠিয়ে দেওয়া হয়, পরিষ্কার করবার এবং একটু ভেজে নেবার জন্যে। তারপর এগুলোকে ফাটিয়ে ফেলে, গুঁড়িয়ে নিলে পাওয়া যায় চকোলেট পাউডার। এর সংগে চিনি মেশানো হয় মিষ্টি করবার জন্যে, কোনো সেন্ট মিশিয়ে দেওয়া হয় সুগন্ধি হবার জন্যে। এবার এগুলোকে লেইয়ের মতো করে নিয়ে ছাঁচ থেকে নানা রকম ধরণের লম্বা লম্বা ধরণের পাতের মতো চকোলেট বেরিয়ে আসে।

কোন্ জন্তু সব চেয়ে বেশী লাফাতে পারে।

জীব-জন্তুদের মধ্যে ক্যাঙারুই সব চেয়ে বেশী লাফাতে পারে। তার অনায়াসেই এক লাফে পার হয় সত্তর ফুট, আর পনেরো ফুট উঁচু বেড়া লাফিয়ে অতিক্রম করে যেতে পারে।

এ্যান্টিলোপের দলের এক জাতীয় পশু, যাদের 'স্প্রীং বোক' (Springbok) বলা হয়, তারাও বেশ ভাল লাফাতে পারে। বেশ সহজেই তারা বাতাসের মধ্যে বারো ফুট ঝাঁপ দিতে পারে।

সিংহ, বাঘ, আর চিতা বাঘেরাও লাফাতে পারে বলে সুখ্যাতি আছে। মরোক্কো ছাগল বার ফুট উঁচু বেড়া লাফিয়ে পার হয়।

ঘোড়ারও লাফানোর ব্যাপারে যথেষ্ট সুনাম আছে, তবে তারা ক্যাঙারুর রেকর্ড এখনও ভাঙতে পারে নি। তারা লাফিয়ে সাঁইত্রিশ ফুট পর্যন্ত পার হতে পারে।

দুটো চোখ থাকার দরকার কি।

তোমরা যদি এক চোখ বুঁজে, আর একটিমাত্র চোখ মেলে ঘরের দিকে তাকাও, তাহ'লে দেখবে, দুচোখ খুলে তোমরা যেরকম দেখতে পাও, তার চেয়ে অনেক চ্যাপ্টা দেখতে পাচ্ছ। দুচোখ মেলে তাকালে স্পষ্ট দেখতে পাবে, চেয়ারটা টেবিলের সামনে রাখা রয়েছে, ঐ জানলার কাছে-রাখা মোড়াটা কেমন গোল ইত্যাদি ইত্যাদি। দুটোরই কেন্দ্রবিন্দু থেকে মাপলে আমাদের দু-চোখের মধ্যে ব্যবধান হোলো দুই থেকে আড়াই ইঞ্চি। দুটো চোখ আলাদা আলাদা মেলে তাকালে, আমরা একটা জিনিস একরকম দেখতে পাই না। একটা চোখ দিয়ে কোন জিনিসের চেহারা আমরা যেরকম দেখি, আর একটা দিয়ে দেখি তার চেয়ে কিছুটা আলাদা। এই জন্যে আমরা কোন জিনিস দেখবার সময় তার চারদিকে আমাদের দু-চোখ ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে দেখে নি, আর তাতে ক'রে আমরা বুঝতে পারি সে জিনিসটা সরু না মোটা, গভীর না অগভীর, সেটা কোন কিছুর সামনে আছে না পিছনে আছে।

কর্ক কোথেকে আসে।

বোতলের মুখ আঁটার জন্যে যে-ছিপি ব্যবহার করা হয়, সেগুলো যে কর্কের তৈরী, তা তোমরা শুনেছ বোধ হয়। এই কর্ক কোথেকে আসে তা কি জান ?

পর্তুগাল, স্পেন, আর ভূমধ্যসাগরের তীরের আরো অনেক দেশে কর্কওক নামে একরকম চিরসবুজ গাছ দেখতে পাওয়া যায়, যার ছালের বাইরের অংশটুকু দিয়ে এই কর্ক তৈরী করা হয়। এই জাতীয় গাছ আমেরিকাতেও কিছু পোঁতা হয়েছে, এবং কালিফোর্ণিয়ায় এরা বিশেষভাবে ছড়িয়ে পড়েছে।

যখন এই গাছের বয়স হয় কুড়ি বছর বা তার কাছাকাছি, তখন তার বাইরের ছালটা খুলে নেওয়া হয়। ছালের প্রথম স্তরটা খসখসে আর ফুটো ফুটো, তাই আঙুর বাক্সবন্দী করার সময় ছাড়া এরা আর কোন কাজে লাগে না। এই ছালটা তুলে নেবার পর দ্বিতীয় স্তরটা (যে স্তর থেকে কর্ক পাওয়া যায়) প্রতি দশ বছরে একবার তোলা হয়। খসখসে বাইরের অংশটা চেঁচে ফেলে বাকী অংশটুকু ফাঁপিয়ে নেওয়া হয়, তারপর শুকোতে দেওয়া হয়।

পোকামাকড়দের কি মস্তিষ্ক আছে।

বেশীর ভাগ পোকামাকড়েরই সুগঠিত স্নায়ুপ্রণালী আর মস্তিষ্ক আছে। এটা মাথার মধ্যে থাকে, আর এর আবার দুটো ভাগ। মস্তিষ্ক প্রধান স্নায়ুগ্রন্থির সংগে সংযুক্ত, এই স্নায়ুগ্রন্থি দুটো সরলরেখায় সেই পোকার সারা দৈর্ঘ জুড়ে রয়েছে। এই গ্রন্থির মাঝে মাঝে গ্যাংগলিয়া নামে স্নায়ুকেন্দ্র রয়েছে।

এমন কোন জন্তু আছে, যে বছরের পর বছর না খেয়ে বাঁচতে পারে।

এক জাতের ছোট্ট জন্তু আছে যারা না খেয়ে বছরের পর বছর বাঁচতে পারে। এদের সঙ্গে মাকড়সার সুদূর আত্মীয়তা আছে। এদের বলা হয় 'জলের ভাল্লুক' (water bear), এদের নাম হোলো টার্‌ডিগ্রাডা (tardigrada)।

এরা সাধারণত স্যাঁতস্যাঁতে জায়গায় থাকে, কিন্তু যদি আব-হাওয়া শুকনো হয়ে যায়, তাহ'লে তারাও শুকিয়ে আসে। সমস্ত নড়াচড়া আস্তে আস্তে বন্ধ হয়ে যায়, শরীরটা কুঁকড়ে গিয়ে ফলের একটা শুকনো ছোট্ট বিচির মতো দেখায়। তারা এই রকমভাবেই মৃতের মত বছরের পর বছর কাটিয়ে দেয়। যদি এসময় কেউ এদের জলে ডুবিয়ে দেয়, তাহ'লে আবার তারা ফুলে-ফেঁপে ওঠে, শুকনো কোঁকড়ানো ভাবটা কেটে যায়, পা-গুলো ছড়িয়ে পড়ে, আর তারা আস্তে আস্তে চলাফেরা করতে সুরু করে। একঘণ্টার মধ্যে আগেকার মতো সজীব আর ছটফটে হয়ে ওঠে, সাঁতার কেটে বেড়ায়।

কোন কোন জাতের শামুকেরাও বছরের পর বছর খাবার না খেয়ে মড়ার মতো পড়ে থাকতে পারে। তারপর খাবার-দাবার পেলে আগেকার সেই সতেজ আর চনমনে ভাব ফিরে আসে, যেন কোথাও কিছু হয়নি।
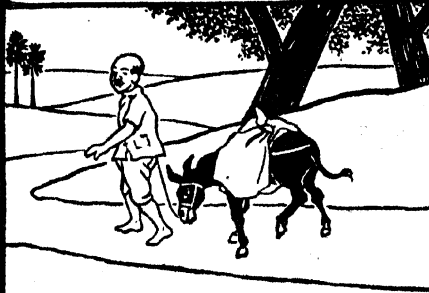
অতি-বুদ্ধির সাজা : দেবশর্মা চিত্রিত
গাধার পিঠে নুনের বস্তা চাপিয়ে ব্যাপারী চলেছে হাটে ... ভার বইতে গাধা নারাজ ... কিন্তু নিরুপায়!..
পথে নদীর সাঁকো পার হতে পা পিছ্‌লে গাধা পড়লো জলে ...
বস্তার নুন জলে গলে সাফ্ ... বোঝা হাল্‌কা ... গাধা মহা খুশী ....
আর একদিন ... গাধার পিঠে তুলোর বস্তা চাপিয়ে ব্যাপারী ফিরছে হাট থেকে ...
সেই সাঁকো! ... গাধার মাথায় জাগে ফন্দী! সাঁকো থেকে সে ঝাঁপ দিল জলে ....
কিন্তু উল্টা ফল ... অতিবুদ্ধির যা হয়! ভিজে তুলোর ভার বইতে গাধার প্রাণ যায়! ...
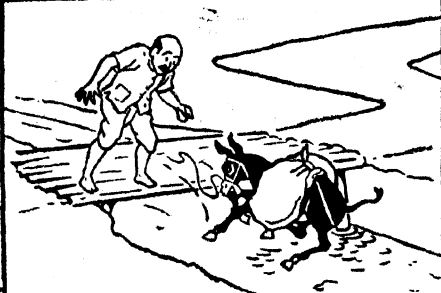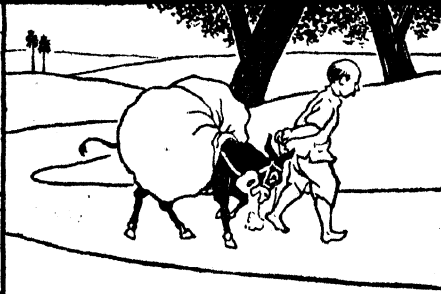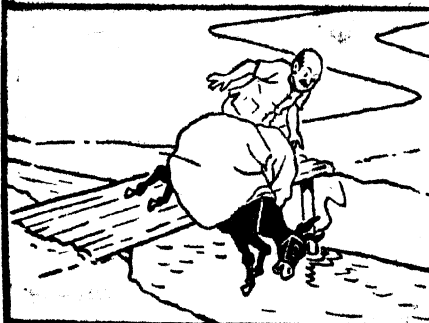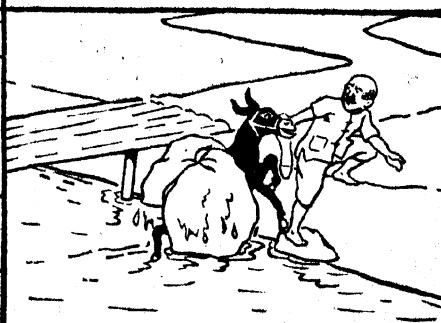
গ্রামের দুলাল
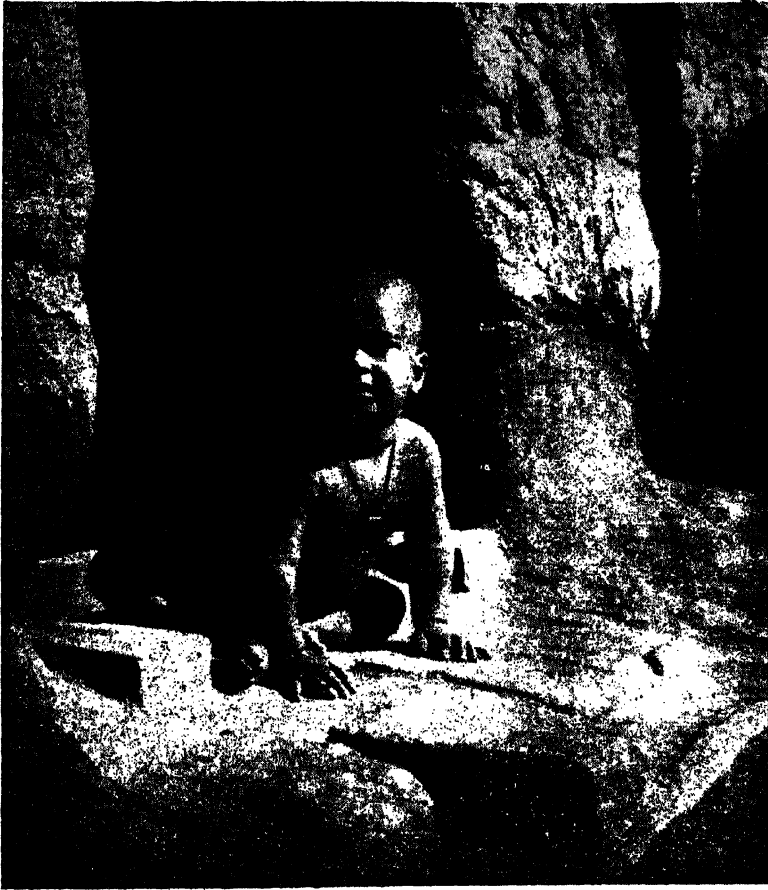
মাটির ঘরের পুতুল তুমি
মাটির কিন্তু নও,
সুস্থ, সবল, সজীব দেহে
মিষ্টি কথা কও।

গ্রাম বাংলার দুলাল তুমি
গ্রামের মাঝেই রও,
শহরে এসে শহুরে বাবু
না যেন কভু হও।

মাটির ঘরের মানুষ তুমি
অঙ্গে মাটি বও॥

—শা-ক-চ

ফটো : আনন্দ মুখোপাধ্যায়

প্রবাসের সাথী

অধ্যাপক ডাঃ প্রবাসজীবন চৌধুরী

এম-এ, এম-এস্‌সি পি-আর-এস, পিএইচ-ডি

সমরের তখন বয়স পনেরো কি ষোলো হবে—সেইবারই স্কুল-ফাইনাল দেবে। পূজার ছুটিতে সে এলো তার কাকার বাড়ীতে—বিহারের এক গ্রামে। ফতুয়া হতে ইসলামপুর অবধি মার্টিন কোম্পানীর যে ছোট লাইন গেছে, তারই শেষ ষ্টেশনে ওর কাকা ষ্টেশন-মাষ্টার ছিলেন। কোলকাতার হেড অফিস হ'তে ঐ লাইনের কর্মীদের মাইনে দেবার জন্য খাজাঞ্চি-বাবু ফি-মাসে যেতেন। তাঁরই সঙ্গে সমর চলে গেলো তার কাকার বাড়ী। চারিদিকে ফাঁকা মাঠ। জায়গায় জায়গায় লম্বা লম্বা জনারীর ক্ষেত বাতাসে শোঁ শোঁ করছে—মাঝে মাঝে এক একটা বড়ো অশ্বথ বা তেঁতুল গাছ। দূরে একটু ফাঁকা—সেখানে গরু মোষ চরছে। রাখাল ছেলেদের কলরব মাঝে-মাঝে আসছে। প্রথম কয়েক-দিন সমর খুব বেড়ালো ক্ষেতের আল ধরে। তারপর একঘেয়ে লাগতে লাগলো। এমন সময় পার্সেলে ওর মা পাঠালেন কোলকাতা হ'তে অনেকগুলি গল্পের বই, আর নানা শারদীয়া বই। মহা আনন্দে তারই এক একখানি নিয়ে ও বেরিয়ে পড়তো, আর মুক্ত শ্যামল প্রকৃতির মধ্যে গাছের ছায়ায়, সবুজ ঘাসে বসে-বসে পড়তো আপনা ভুলে। বাড়ীতে কাকা কাকিমা আর তাঁদের ছোট্ট আট মাসের ছেলে—কার সঙ্গেই বা সমর গল্প করবে? বইটির মধ্যে নিজেকে ডুবিয়ে দিয়ে উদার প্রকৃতির স্নেহচ্ছায়ে বেশ থাকতো ও।

সেদিন খুব সকাল হতে সমর বসে বসে পড়ছে একটি নতুন বার্ষিকী। মাথার ওপর তেঁতুল গাছের মৃদু গুঞ্জন চলছে, আর পাশে জনারীর ক্ষেতে থেকে থেকে সরসর মর্মর-ধ্বনি উঠচে। একমনে পড়ছে, সমর—এমন সময়ে মাথার ওপর একটা কি পড়লো। চমকে উঠে দেখে একটা কাঁচা তেঁতুল। এ রকম কাঁচা তেঁতুল তো আপনি ভেঙ্গে পড়ে না। সমর ওপরে চেয়ে দেখে একটি নয় দশ বছরের ছোট মেয়ে তেঁতুল-গাছের ওপর ডালে বসে আছে—ঘন সবুজ পাতার রাশির মাঝে—আর ডাল সরিয়ে পাতার আস্তরণ সরিয়ে মাঝে মাঝে ওর দিকে ঝুঁকে চেয়ে মিটিমিটি হাসছে। ছলোছলো শ্যামল দেহের বর্ণ—ঢলঢলে মুখখানি—চোখ দু'টি টানাটানা, পরণে একখানি হলুদে রঙ্গানো ফুলপাড় শাড়ী আর আঁট লাল জামা। মাথার ঘোমটা সরে গিয়ে সিঁথিতে টানা চওড়া সিঁদুর দেখা যাচ্ছে। নিটোল হাতে রং বেরঙ্গের কাঁচের চুড়ী আর পায়ে রূপার দুটি কড়া। সমর ঈশারায় বললে নেমে আসতে। ও ঘাড় নেড়ে অসম্মতি জানালো। গল্পের দিকে মন পড়েছিলো—সমর আবার বই খুলে গল্পে ডুবে গেলো। একটু পরেই ওর মাথায় আবার তেঁতুল পড়লো। ঈষৎ চমকে উঠলেও সমর ওপর দিকে চাইলো না। তেঁতুলটা খেতে-খেতে বই পড়তে লাগলো। একটু পরে বুঝলো সে যেন নামছে। সে বুঝে না বুঝতে পলকের মধ্যে একখানি উড়ে-এসে-পড়া হাল্কা পালকের মতো সে এসে ওর পাশে বসলো—আর ঝুঁকে পড়ে লম্বা ঝুমঝুমে চু দুলিয়ে বই এর ছবি দেখতে লাগলো। দেখতে দেখতে ওর প্রশ্নের প প্রশ্নে সমর ব্যস্ত হয়ে পড়লো। মেয়েটি কেবল জিজ্ঞাসা করে। এটা-ওটা আর সমর ভুল ভুল বাংলা-মেশানো ভাঙ্গা হিন্দীতে উত্তর দেয়। মেয়ে কি বোঝে কে জানে—কিন্তু প্রশ্নের তার আর বিরাম থাকে না—' ছবি কিসের?' 'এ লোকটা ওকে ধরে নিয়ে যাচ্ছে কেন?' ' মেয়েটি কাঁদচে কেন?' এইরকম সব প্রশ্ন। সমর বইপড়া ভুলে প্রাণ পণে বোঝাতে চেষ্টা করেও পেরে ওঠে না। মেয়েটি হতাশ ভঙ্গী হঠাৎ খপ্ কোরে বইখানি নিজের কোলে টেনে নেয়। নতুন ঝক ঝকে সেলোফেণে মোড়া বইখানি নষ্ট হবার ভয়েতে সন্ত্রস্ত সমরকে কিছু আর জিজ্ঞাসা না করে—নিজেই অনেক ভেবে ভেবে হাত আর মুখ নে অর্থ ঠিক করে। মাঝে-মাঝে সমরের অবোধগম্য দেহাতী 'হিন্দী মন্তব্য করতে করতে একমনে ও অনেকগুলো ছবি দেখে নিবিষ্ট ম পরের পর। শেষে যেখানে রাজপুত্র রাজকুমারীকে নিয়ে পক্ষীরা ঘোড়ায় চেপে ছুটেছেন আর চারদিক হ'তে ভয়ঙ্কর দাঁতাল দৈত্য, মাতা 'দৈত্য রণদৈত্য-এরা সব হুম হুম করে হাত বাড়িয়ে ভাঁটার মতো চো নিয়ে ছুটে আসছে—সে ভয় বিস্ময়-বিস্ফারিত মুখে সেই গভীর বিচিত্র ভাবভরা 'কঠিন' ছবিটিও অনেকক্ষণ ধরে দেখলো। তারপ এক সময় তার ঝকঝকে মুক্তার মতো সাদা দাঁত ঝিলিক্ দিয়ে উঠলে মুখ চোখ ভরা উচ্ছ্বসিত হাসিতে। সে বললে—'আমার হলে তো ভয়ে জ্ঞান হারিয়ে পড়ে যেতুম!' সমর ওর কথা বুঝতে পেরে বললে—'না রাজকুমারী জ্ঞান হারিয়ে নীচে পড়ে যাবার আগেই রাজপুত্র বুঝে পেরে—তার উড়্‌নী দিয়ে রাজকুমারীকে নিজের পিঠের সঙ্গে কষে বেঁ দিতো!' হাত পা নেড়ে নানা ভঙ্গী করে সমর একথা তাকে বুঝি দিল। মেয়েটি এবার খিল্‌খিল্ করে হেসে উঠলো। তারপর দুজনে কেমন চুপ হয়ে রইলো অনেকক্ষণ। ওদের চারপাশে হাওয়ার আসা যাওয়া চলতে লাগলো—আর জনেরী গাছের মাথার ওপর দিয়ে নান ছাঁদের ঢেউ খেলতে লাগলো সরসর মরমর শব্দ করে। মেয়েটি এক মনে এক একটি ছবি দেখে আর পাতা ওল্টায়। ওর লীলায়িত কচি আঙুল গুলিকে সমর চেয়ে চেয়ে দেখে। ওর সমস্তই যেন এখানকার খোল আকাশ-বাতাস আর দিগন্ত প্রসারিত সবুজ মাঠের ছন্দে বাঁধা—ও যে এই মুক্ত প্রকৃতির আত্মা-স্বরূপিণী। চোখে-মুখে ওর কি উদার উন্মু ভাব—কি উজ্জ্বলতা। এখানকার এই আকাশে মাটিতে—সবুজে ও জন্ম, আর এরই মধ্যে প্রতিপালিত হয়েছে ওর দেহমন। এই কয়দিনে সমর বুঝতে পারছে—কলকাতা হতে এসব জায়গায় এলে দেহমনে কতোটা পরিবর্তন হয়। দেহ যেন ফিরে পায় তার সহজ সাবলীল ছন্দ আর মনের অনেক জট আর পাক খুলে সটান হয়ে যায়। কতো হাল্ক ঝরঝরে মনে হয় নিজেকে। কলকাতার হাজারো জিনিষের মেল মানুষের মনকে নানান্ খান করে দেয়, আর তাকে বাঁকিয়ে দুমড়ে

কু'কড়ে দেয়। হয়তো মানুষ এমনি করেই বিচিত্র হ'তে বিচিত্রতর হবে—তার চেতনার প্রসার হবে। তবু একথাও ঠিক যে এর মধ্যে অনেক কিছু কেবল বিক্ষেপ—মানুষকে ক্লান্ত করে মাত্র—কিছুই দেয় না,—বরং কেড়ে নেয় তার দৃষ্টি—যে দৃষ্টি দিয়ে সে দেখতে পায় প্রকৃতি আর জীবনের অনেক গভীর সত্য। সমর বিভূতি বন্দ্যোপাধ্যায়ের ভক্ত, সে রবীন্দ্রনাথ ও ওয়ার্ডস্‌-ওয়ার্থ পড়ে। সমরের মনে হয় মানুষকে মাঝে মাঝে ফিরে আসতে হবে তার সহজ প্রকৃতিতে। জীবনের নানা জটিলতা—জ্ঞান-বিজ্ঞানের অজস্র খুঁটিনাটি তার চেতনাকে সমৃদ্ধ করে বটে—কিন্তু তাকে হয়রাণও করে আর তার মধ্যেকার সহজাত একটি জ্ঞান ও আনন্দ-বোধকে নষ্ট করে। সেই জ্ঞান প্রকৃতি ও মানুষের অপরোক্ষ একটি অনুভূতি, যার দ্বারা সে যেন এদের সঙ্গে এক হয়ে যায় আর পায় আত্মীয়তার এক সুগভীর আনন্দ।

সমর জিজ্ঞাসা করে—'তোমার নাম কি? কোথায় থাক?' মেয়েটি বলে—'আমার নাম ধনেশ্বরী—আমার বাবার নাম হীরামন!—আমাদের গ্রাম ওই যে দেখা যাচ্ছে। আমাদের মোষ আছে নয়টা—গরু ষোলোটা আর পনেরো বিঘে জমি। আমি বাবার এক মেয়ে—ভাই-বোন আর কেউ নেই—তাই বাবা বলেচে আমাকে শ্বশুর বাড়ী পাঠাবে না'—একটু চুপ করে থেকেই আবার বলে ওঠে—'তুমি আমার ভাই হবে?' সমর একটু থতমত হয়ে যায়। তারপর স্মিত হাস্যে বলে—'হব, আমারও বোন নেই।'

তারপর কৌতুকভরা মুখে ওর সিঁথের টানা সিঁদুরের দিকে আঙুল দেখিয়ে বলে—'বিয়ে হলো কবে?' ও হেসে বলে—'এই দু'বছর হোলো! বর দুই গ্রাম ছাড়িয়ে রাণীপুর গ্রামে থাকে। তারাও খুব বড়লোক—অনেক জমি, মোষ আর গরু আছে। তবে বাবা আমাকে পাঠাবেই না—আর আমিও যাবো না।' সমর বলে—'তাহলে তোর বর এখানে এসে থাকবে? 'যদি থাকতে চায়—থাকবে—নাহলে আর কি?' —ও বলে। আবার দুজনে চুপচাপ। খানিক পরে মেয়েটি আবার কথায় হাসিতে উচ্ছল হয়ে ওঠে—প্রশ্ন করে সমরকে কলকাতা সম্বন্ধে একটার পর একটা—কলকাতায় নাকি একটা ঘরে বাঘ, সিংহ, গণ্ডার সব রাখা আছে?—আবার সেখানে নাকি বাড়ী এতো উঁচু যে মেঘে ঠেকে যায়? —সেখানে নাকি 'টিরাম' গাড়ী চলে—'টিরেন' গাড়ীর মতো? সমর ওর সব প্রশ্নের উত্তর দেয় আর ও চোখ বড়োবড়ো করে শোনে।

ক্রমে বেলা বাড়লে ওরা উঠে পড়ে। ধনেশ্বরী খানিক দূর সমরের সঙ্গে এসে এক সময়ে, দ্রুত মাঠের মধ্যে নেমে দৌড়ে নিজের গ্রামের দিকে চলে যায়—তার হলুদ-ছোপানো শাড়ীপরা ছোট্ট দেহটি দেখতে-দেখতে সবুজের মধ্যে মিলিয়ে যায়।

সমরের কাকিমা ধনেশ্বরীর গল্প শুনে বলেন—'ওঃ, ভারী চমৎকার মেয়ে। অনেক টাকা আছে ওর বাবার—মাটীতে পুঁতে রাখে ওরা—জানিস? আর থাকে অমনিভাবে। ধনেশ্বরীর বিয়েতে শুনেচি আশে-পাশের সমস্ত গাঁয়ের লোক খাইয়েছিল।'

এরপর সমরের সঙ্গে ধনেশ্বরীর সকালে মাঠে প্রায়ই দেখা হয়। সমর কলকাতা হ'তে আরও ছবির বই আনালো। ওরা দু'জনে বসে বইগুলি দেখতো। কোনদিন ধনেশ্বরী না এলে সমর আর বই না পড়ে চুপ কোরে বসে থাকতো। সামনে দিয়ে হয়তো পিঁপড়ের সার যাচ্ছে কি কাঠবেড়ালী খেলা করছে—তাই দেখতো। কোনদিন আবার ধনেশ্বরী চুপিচুপি এসে পেছন হ'তে ওর চোখ দুটো টিপে ধরতো। সমর লজ্জা পেয়ে যেতো। একদিন চোখ ছাড়াতে গিয়ে ও ধনেশ্বরীর হাতের এক-গাছি জলরঙা নীল চুড়ী ভেঙে ফেললো। ধনেশ্বরী খুব রাগ করে উঠলো—'আমার চুড়ী ভাঙলে তো? কিনে দিতে হবে—না কিনলে দেখবে—' 'আচ্ছা ধনেশ্বরী, মাপ করো—এনে দেবো চুড়ী—কোলকাতা থেকে—খুব ভালো সোনালী চুড়ী—!' অপ্রস্তুত সমর বাধা দিয়ে বলে ওঠে—তারপর মাপের জন্য চুড়ীর ভাঙা আধখানি টুকরোটি তুলে পকেটে রেখে দেয়। ধনেশ্বরী হাসতে হাসতে বলে—'তুমি ভারী বোকা! সত্যি আমি রাগ করিনি!'

ধনেশ্বরী এক একদিন ভুট্টার খই নিয়ে আসতো গরম গরম ভাজা—আর আনতো কাঁচা লঙ্কা আর নুন। ওরা খেতো। একদিন বললে—'তোমরা মাছ কেন খাও? এতো দুধ, দই থাকতে মাছ খাবার কি দরকার? ঘেন্না করে না?' সমর ভেবে দেখে সত্যিই তো ঘেন্নার কথা বটে! ও চুপ করে থাকে। ধনেশ্বরী ভার ভার গলায় আবার বলে—'আর মাংস খাও কি কোরে বলো তো? দুঃখ হয় না?...বেচারী কচি বাচ্চাকে কেটে ফেলে তারই গায়ের মাংস তোমরা চিবিয়ে-চিবিয়ে খাও!' সমর কোনও উত্তর দিতে পারে না। ধনেশ্বরী জোরের সঙ্গে বলতে থাকে—'কই তোমাদের গায়ের জোর তো আমাদের মতো নয়—জানো,—দুধ-ঘী খেলেই শরীর ভালো হয়—তুমি তাই খেয়ে ভাখো—লক্ষ্মীটি। দেখবে শরীর কতো ভালো আর জোরালো হবে—আর মাছ মাংস খেয়ো না—ছিঃ।'

সমর ভালো করে ভেবে দেখে সত্য কথাই বলছে এই লেখাপড়া না-জানা গ্রাম্য মেয়েটি—তার একটি স্বাধীন স্পষ্ট ব্যক্তিত্বের পরিচয় পায় সমর।

আর একদিন ধনেশ্বরী বলে—'তুমি খুব পড়াশোনা শিখবে—বলো তো—সব চেয়ে বড়ো কে হয়?—তুমি তাই হবে।' 'কে হয় সবচেয়ে বড়ো ধনেশ্বরী?' কৌতুহলী হয়ে সমর ওকে প্রশ্ন করে হেসে।

'কেন—সিভিল সার্জন! জানো সমর—সেদিন আমার বাবুজীর (বাবার) সঙ্গে আমার এই নিয়ে তর্ক হয়ে গেলো। বাবুজী বলে—সবচেয়ে বড়ো হলো ম্যাজিস্টার (ম্যাজিস্ট্রেট), কারণ সে ইচ্ছে কোরলেই যাকে-তাকে ফাঁসীতে লটকে দিতে পারে।—আর আমি বললুম—মোটেই না। ম্যাজিস্টার তা পারে না। কিন্তু সিভিল সার্জন ইচ্ছে কোরলে তোমার ভালো কোরতে পারে—নাও পারে। ম্যাজিস্টারের অসুখ কোরলে কি হবে বলো তখন?'

ওর উজ্জ্বল আত্মপ্রত্যয়পূর্ণ মুখের পানে চেয়ে সমর ঘন-ঘন ঘাড় নেড়ে জানায় যে ধনেশ্বরীই ঠিক বলেছে। ধনেশ্বরী গম্ভীর হয়ে বলে—'আর ভাখো—লোকের কতো উপকার কোরতে পারে সিভিল-সার্জন। তুমি

তাই হয়ো। আর তা যদি না হ'তে পারো তো মাস্টার (মাষ্টার) হওয়াও ভালো—কতো ছেলেদের শিখিয়ে পড়িয়ে মানুষ করবে। হয়তো তোমারই কোনও ছাত্র সিভিল সার্জন হবে—কেমন না?' সমর সানন্দে আবার তার সম্মতি জানায়। ধনেশ্বরীকে ওর খুব ভালো লাগে।

পরদিন সমর ভোরেই ওর কাকার সঙ্গে পাটনা বেড়াতে চলে গেলো, হঠাৎ ঠিক কোরে। ফিরলো রাত্রিবেলা। পরেরদিন সকালে তেঁতুল গাছ-তলে গিয়ে দেখলো ধনেশ্বরীর দুটি জলরঙা নীল চুড়ী ভাঙা পড়ে আছে। সমরের মনটা খুব খারাপ হয়ে গেলো—চুপ করে বসে রইল গাছের তলে—বুঝতে পারলো ধনেশ্বরীকে বলে যায়নি বলে সে রাগ করেছে।

একটুপরেই ধনেশ্বরী এলো—এখন কিন্তু তার মুখে রাগের অন্ধকার একেবারে মুছে গেছে। হেসে বললে—'বাঃ তুমি কাল এলে না! না বলে পাটনা বেড়াতে চলে গেলে আর আমি এখানে কতোক্ষণ বসে বসে চলে গেলুম—ছাখো না—রাগ কোরে কেমন চুড়ী ভেঙেছি।' ধপ করে ওর পাশে বসে পড়ে ধনেশ্বরী ভাঙা চুড়ীর টুকরোগুলি গাছের তলে নরম মাটি আঙুল দিয়ে খুঁড়ে পুঁতে রাখলো—বললে—'থাক ওগুলো ঐখানে।' সমর ওর জন্য পাটনা হ'তে চুড়ী এনেছিলো সোনালী জলরঙের—সেগুলি ওর হাতে দিতেই ও খুশীতে নেচে উঠলো। তারপর সমর ওকে চুড়ীগুলি পরিয়ে দিল যত্ন করে।

তারপর ছুটিতে কতো যে গল্প-সল্প হলো। ধনেশ্বরীই অনর্গল বক্তা, আর সমর ওর কথা-বলা আর হাতনাড়া দেখে হাসে আর মাঝে মাঝে মন্তব্য করে।...কার গ্রামে ডাকাত পড়েছিলো—কবে বন্যার জলে সব ভেসে গেছিলো—কবে খুব কলেরা হয়েছিলো—এই সবের বর্ণনা দেয় ধনেশ্বরী। বছরের কোন কোন সময়ে কোন কোন ফসল হয়—তাও শোনে সমর। শীতকালে সে এলে দেখবে চারিদিকে কেবল ছোলা, মটর আর সর্ষের ক্ষেত।' কাঁচা ছোলা পুড়িয়ে খেতে যে কি ভালো! সমর যেন অবশ্যই আসে শীতকালে—তাহলে ওরা আগুন জ্বালিয়ে ছোলাপোড়া খাবে এইখানে বসেই—ভারী মজা হবে!

দেখতে দেখতে সমরের ফেরার দিন এসে পড়লো। ও ধনেশ্বরীকে চলে যাবার কথা বলতে সে খুব মুষড়ে পড়ে। চুপ করে বসে থাকে সে—উচ্ছল হাসি তার নিভে যায় মুখের। সমর ওকে বার্ষিক শিশুসাথীটি দিয়ে বলে—'ধনেশ্বরী—তুমি এ বইটার ছবি দেখো—আমি দিলাম!' ধনেশ্বরী বইটি কোলের কাছে টেনে নিয়ে পাতা ওলটায় অন্যমনস্ক হয়ে—তারপর বলে—'আমি আর এদিকে আসবোই না—মায়ের কাছে বসে বসে দইয়ের সর থেকে ঘী তৈরী করবো, কিংবা বাবুজীর সঙ্গে ক্ষেতে কাজ করবো...!' তার চোখ দুটি ছলছল করে। সমর বিদায় নিয়ে আস্তে আস্তে চলে আসে।

পরেরদিন সকালেই সমরের কলকাতার ট্রেণ। ভোরেই একজন গোয়ালা একটি কালো মাটির হাঁড়ীতে করে জমা ক্ষীর, দই ও ঘী নিয়ে এলো—বললে—'হীরামন গোয়ালা খোকাবাবুর মা-বাবার জন্য পাঠিয়েছে!' কাকিমা খুশী হয়ে সমরকে ডেকে বললেন—'সমু দেখ ধনেশ্বরীর কাণ্ড—নজর বটে ওদের—একেবারে পাঁচসের ঘী আর রাশি-খোয়া-দই! ওদের ঘী-এর গন্ধ কি চমৎকার দেখচিস—আমি যেটা দিলুম দিদির জন্য সেটা অতো ভালো হবে না...হবে কি কোরে এ যে তোর বোনের দেওয়া...!' বলে হাসলেন। 'এতো দিলো কেন কাকিমা—নিয়ে যাবো কি কোরে?' সমরের মন-ভার মুখের দিকে চেয়ে কাকিমা বললেন—'ওরা ঐ রকমই দেয় রে—এবার গরমের ছুটিতে যখন আসবি, ধনেশ্বরীর জন্য ভালো ভালো জিনিষ কিছু আনবি—মেয়েটা বড়ো ভালো!'

* * * * *

কিন্তু তারপর আর সমরের ওদিকে যাওয়া হয়নি। অল্পদিন পারেই কাকিমার শক্ত অসুখ হওয়ায়, কাকা ওখান হ'তে নিজেকে বদলী করিয়ে কলকাতার হাওড়া-আমতা লাইনে চলে এলেন। সমরও পরীক্ষার চাপে পশ্চিমের সেই দিনগুলির কথা একরকম ভুলে গেলো। কলেজের ধাপে পৌঁছে বহুমুখী বিচিত্র পড়াশুনো আর জীবনের নানা সমস্যার সম্মুখীন হ'তে হলো—বন্ধুবান্ধবও হলো কতো—দর্শন-বিজ্ঞান, রাজনীতি-মানবতা আর সৌন্দর্যানুভূতির কতো কথাবার্তা, আলোচনায় চেতনা পরিপূর্ণ হ'তে লাগলো তার। ওর পরীক্ষার ফলাফল খুব ভালই হতো, তাই অনেক সুযোগ-সুবিধা ও ভালো ভালো বন্ধুও পেলো।

জীবনের বিরাট অজানা কুঠুরীর নানান্ দিকের জানালা যেন খুলে গেলো সহসা। কতো বিদ্বান গুণী অধ্যাপকের স্নেহভরা সংস্পর্শে সে এলো। দিনে দিনে বিশ্ব পৃথিবীর কতো বিচিত্র ও গভীর অর্থ তার সমুখে প্রকাশমান হলো। মানুষ যে কতো বড়ো—আর তার সম্ভাবনা কতো বেশী—উপলব্ধি করে সমর। খুব উৎসাহ আর বিশ্বাস নিয়ে সে দ্রুত এগিয়ে গেলো তার ছাত্র জীবনের সার্থকতার সোনামোড়া পথে।... তখন ইস্‌লামপুরের সেই দিনগুলি তার মনের এককোণে পড়ে রইল—পড়ে রইল একটি ছোট, পুরোনো, প্রিয় গল্পের বইর মতো। তার স্মৃতিও ফিকে হয়ে এলো। শুধু কখনো-সখনো নিরালায় বসলে বা মাঝরাতে ঘুম ভেঙে গেলে সেই পুরানো হাসি আনন্দ ভরা কথাগুলি তার মনের আকাশে তারা হয়ে ফুটে উঠতো। একটি মধুর আবেশে আর অব্যক্ত বেদনায় ও কিছুক্ষণ ডুবে যেতো।...মনে পড়তো ওকে ডাক্তার হ'তে বলেছিলো ধনেশ্বরী।—আহা! বেচারী এখন কেমন আছে কে জানে... ভগবান ওর ভালো করুন! সেই ক্ষুদ্র বিদেশিনী বান্ধবীর অন্তরের প্রীতির ডোর তার সেই বিদায়-দিনের, ছলছল কালো চোখের স্মৃতি এনে সমরের হৃদয়কে ব্যাকুল করে।

* * * * *

পনেরো বছর পরে। সমর বড়ো ডাক্তারই হয়েছে—বি-এস-সির পর এম-বি, এম-ডি, হয়ে বিলেত হতে এফ, আর, সি, এস হয়ে এসেছে। কোলকাতায় বেশ পসার জমিয়ে বসেছে।

একদিন পাটনায় এক বন্ধুর নিমন্ত্রণ এলো সমরের কাছে। তার নাম হরিনারায়ণ সিংহ—দুজনে এক সঙ্গে বিলেতে ছিলো।

হরিনারায়ণ আছে পাটনা হাসপাতালে। ওর বিয়ে—সমরের যেতেই হবে।

…এ নিমন্ত্রণ সমর ঠেলতে পারে না—রওনা হলো পাটনায়। সকালে ওর ট্রেণ যখন ফতুয়া-ষ্টেশনে থামলো—ওর মনে হলো ইস্‌লামপুরের কথা—ধনেশ্বরীর কথা—মনে হলো একদিন ঘুরে এলে বেশ হতো—

ধনেশ্বরীকে বলবো—'এই ভাখো আমি ডাক্তার হয়েছি—খুসী হয়েছো?' কিন্তু সময় কোথায়? কলকাতার কতো রুগী অপেক্ষা করছে ওর জন্ম—তাদের বলে এসেছে দুই তিনদিনের মধ্যেই সে ফিরবে। ডাক্তারের জীবনে কি সময় আছে এসব ভাবালুতার?—তবুও ওর মন খচখচ করে। ইচ্ছে করে সেই খোলা মাঠে তেঁতুল গাছটির তলে গিয়ে বসে কিছুক্ষণের জন্ম আবার ধনেশ্বরীর খবর নেয়—আর নিজের খবর দেয়। ধনেশ্বরীর ছেলেমেয়েদের একটু আদর করবে—নিশ্চয়ই খুব ফুটফুটে দু চারটি ছেলেমেয়ে হয়েছে ওর এতোদিনে। ধনেশ্বরীও অভিমান করবে সমর তার স্ত্রীকে—ছেলেকে আনেনি বলে।

…পাটনায় ষ্টেশনে গাড়ী নিয়ে হরিনারায়ণ নিজেই উপস্থিত—ভারী খুশী। বাড়ী পৌঁছে আদর-অভ্যর্থনা খাওয়া-দাওয়ার পালা শেষ হলে, দুই বন্ধুতে সবে হাসি-গল্প জমিয়েছে এমন সময় বেয়ারা এসে খবর দিলে যে গ্রাম থেকে একজন লোক এসেছে—ডাক্তার-সাহেবকে ডাকতে। ভারী বিরক্ত হয়ে হরিনারায়ণ বলে উঠলে—'বোলো উস্‌কো—মেরা টাইম্ নেহী!' তারপর সমরের দিকে ফিরে বললে—'ভাখো তো ভাই—আজ বাদে কাল বিয়ে—এখন আর কারুর গায়ে ছুরি চালাতে ইচ্ছে করে? আর এইসব পাড়াগাঁয়ের দেহাতী লোকগুলো একেবারে শেষ মুহূর্তে খবর দেবে—কবিরাজী-হাকিমী-হোমিওপ্যাথী করবার পর। যদি বাঁচে তাহলে অবশ্য তোমার কেনা হয়ে থাকবে সারাজীবন, কিন্তু যদি মরে যায় তো তোমার বিপদ—চিরদিনের বদনাম। বেহারের গ্রামের লোক বড়োই অবুঝ ভাই।' 'তা ওদের দোষ কি বলো ভাই? অজ্ঞতা, মূর্খতা আর কুসংস্কার ওদের বিচার-শক্তিকে ঢেকে রেখেছে।' সমর বলে, 'কিন্তু ভাই হরিনারায়ণ। ওদের মধ্যে বুদ্ধির উজ্জ্বল দীপ্তিও আমি দেখেছি। লেখাপড়া না জানতে পারে এবং কিছু কুসংস্কারও থাকা আশ্চর্য নয় মানি—কিন্তু সাধারণ বুদ্ধি-বিবেচনা, রীতিনীতি এ সবের অভাব বড়ো একটা নেই। আসলে ওরা খুব ভালো লোক—যাই বলো!'

'তুমি এদের জানলে কি করে?'—হরিনারায়ণ হেসে বলে। সমর মৃদু হেসে চুপ করে যায়। এমন সময় চাকর এসে বললে—'লোকটি বড়োই কান্নাকাটি করছে—ওর একমাত্র মেয়ে মরোমরো—আপনি যা চান—তাই দেবে বলছে…' 'আমি একলাখ টাকা দিলেও যাবো না এখন—বল।' বাধা দিয়ে হরিনারায়ণ চেঁচিয়ে ওঠে। তারপর সমরের দিকে চেয়ে বিরক্তি হেসে অপ্রস্তুত ভাবে বললে, 'এ দেশের লোকেরা এই রকম সমর—টাকার লোভ দেখায় আমায়!'

"আহা! ভুল বুঝব কেন হরিনারায়ণ? তোমার মেয়ে হয়নি তাই জানো না—ওর বিপদটা ভাখো!"

'বেশ তো ভাই—তুমিই যাও না—ঘুরে এসো! সত্যিই এখানে আর কোনো ভালো সার্জেনও নেই এখন। যাঁরা অভিজ্ঞ আছেন তাঁরা সকলেই বুড়ো—বাইরে কেউ যেতে চান না দূরে—তাছাড়া তারা ভয়ানক ব্যস্তও থাকেন।…সত্যি বিপদ তো বুঝছি লোকটার—কিন্তু আমারও যে এখন বাইরে যেতে নেই সময়—পরশু বিয়ে…কাল গায়ে—'

'কিন্তু একবার শুনতে দোষ কি লোকটির মেয়ের কি হয়েছে?' বাধা দিয়ে সমর বলে। তারপর দুই ডাক্তার ডিসপেনসারী ঘরে যেতেই একটি লম্বা-চওড়া পাথরে কোঁদা দেহ প্রৌঢ় গ্রাম্য লোক প্রায় কেঁদে ওদের পায়ে লুটিয়ে পড়লো—'হুজুর! আমার একমাত্র মেয়ে—অন্য কোনও বড়ো ডাক্তার পেলাম না তাঁরাই সিংহসাহেবের নাম কোরলেন। পেটের যন্ত্রণায় ছটফট করছে মেয়ে হুজুর…জানি না এতোক্ষণ বেঁচে আছে কিনা! ওখানকার ডাক্তার বলেছে অপারেশন কোরতে হবে।'

'কোথায় যেতে হবে?' হরিনারায়ণের ইঙ্গিতে সমর প্রশ্ন করে।

'ইস্‌লামপুর-হুজুর!'

'ও বাবা! সেখানে মোটর যাবে কি কোরে? কাঁচা রাস্তা—যেতেই তো তিন ঘণ্টা লাগবে—তুমি হাসপাতালে নিয়ে এলে না কেন?' অসহিষ্ণুভাবে হরিনারায়ণ বলে ওঠে। 'কি কোরে আনবো—হুজুর? টেনে আনলে সে কি বাঁচতো…তাছাড়া বাচ্চী (মেয়ে) বললে সে হাঁসপাতালে যাবেই না।' লোকটির চোখ দিয়ে জল গড়িয়ে পড়লো। সমর এবার কি ভেবে জিজ্ঞেস করলে—'তোমার নাম কি?'

'হীরামন—হুজুর।'

সমরের মুখ শুকিয়ে গেলো—পাথরের মূর্তির মতো ও স্তব্ধ হয়ে গেলো হঠাৎ—যে আশঙ্কা চকিতে ওর মনে দেখা দিয়েছিলো—তাই সত্য হলো।

ওর মুখ দেখে হরিনারায়ণ বললে—'কি হলো সমর?' সমর ততোক্ষণে উঠে দাঁড়িয়েছে—'শিগ্‌গির তোমার মোটর বার করো হরিনারায়ণ—আমি এক্ষুণি যাবো। তোমার দু'একজন সহকারীকে শীঘ্র ডেকে পাঠাও—যন্ত্রপাতিগুলি গুছিয়ে দাও……বোধহয় এ্যাপেণ্ডিসাইটিসই হবে……বোধহয় ইমিজিয়েট অপারেশন দরকার।'

হরিনারায়ণ ওর ভাব দেখে ঘাবড়ে গেলো—তাড়াতাড়ি বেয়ারাকে সব কিছুর ব্যবস্থা করতে বলে—ফোন করলো হাসপাতাল 'হ'তে দুজন নার্স পাঠাতে তার সহকারীদের সঙ্গে। সমর ততোক্ষণে তৈরী হয়ে নিয়েছে, হরিনারায়ণ বললে—'ব্যাপার কি ভাই? তোমার জানাশোনা না কি?,

'হ্যাঁ ভাই! কিন্তু সে কথা ফিরে এসে হবে—এক্ষুণি শীঘ্র না গেলে বোধহয় তাকে বাঁচাতে পারবো না। 'তাহলে আমি ও চলি সমর তোমার সঙ্গে।

……ওরা ইসলামপুরে পৌঁছলো বিকেল প্রায় তিনটেয়। দিগন্ত ছেয়ে শীতের রৌদ্র ম্লান হয়ে এসেছে। মেদিনী চোখ বুজে আচ্ছন্ন হয়ে

পড়ে আছে—ওরা দুই ডাক্তারে পরীক্ষা করে দেখলো অ্যাপেণ্ডিসাইটিসের মারাত্মক মুহূর্ত এসে পড়েছে—এক্ষুণি অপারেশন ছাড়া বাঁচানো যাবে না।

—অপারেশনের আয়োজন চলতে লাগলো। সমর এবার হীরামনকে বললো বেদনার্ত স্বরে—'ধনেশ্বরীকে বলো যে তোমার সেই বন্ধু সমর এসেছে—চোখ মেলো, ভয় নেই।'

বিপদ বিমূঢ় হীরামন তাকে চিনতে পারলো না—মনে করতেও পারলো না। কিন্তু মুমূর্ষু ধনেশ্বরী সমরের নাম শুনেই সব যন্ত্রণা ভুলে আনন্দে বিহ্বল হয়ে—'সমর সমর।' বলে ডেকে উঠলো। সমরের হাতটি ধরে তার মুখের দিকে রোগ-করুণ হাসি মুখটি তুলে 'বললে—'তুমি তাহলে সিভিল সার্জন হয়েছ—আমিও তাই-ই ভাবতুম যে সমর নিশ্চয়ই এতোদিনে সিভিল সার্জন হয়েছে আর কতোজনের প্রাণ বাঁচাচ্ছে।...তুমি তো আর এলে না? তোমার বইটি ওই ছাখো কতো যত্ন কোরে তুলে রেখেছি কুলুঙ্গীতে। আমার ছেলে ছবি দেখে—ওই একমাত্র ছেলে।......আয় রে বউয়া (বাছা) রামচন্দ্র আমার কাছে!...ওই ছাখো—সুন্দর ছেলে না? ভারী বুদ্ধিমান ও—ওকে লেখাপড়া শেখালে হয়...তোমার মতো সিভিল সার্জন করা যায় না ওকে?'

'কেন হবে না ধনেশ্বরী...যদিও আমি ঠিক সিভিল সার্জন হইনি—তবে ডাক্তারি সব শিখেছি—তুমি খুশী হয়েছ ধনেশ্বরী?'...কোনোমতে সমর বলে।

'বড্ড খুশী হয়েছি—কোনো কষ্টই যেন আর নেই আমার।' আস্তে আস্তে কষ্টে বলে ধনেশ্বরী—'সমর, তোমার বউ আনোনি? খুব সুন্দর বউ হয়েছে তো—খুব লেখাপড়া গান-বাজনা জানা? বাঃ! আর ছেলে মেয়ে? তোমারো মোটে একটি ছেলে?...আহা—তাকে দেখতে পেলুম না—সে নিশ্চয়ই তোমার মতো সুন্দর হয়েছে! কেন আনলে না তাদের? ধনেশ্বরীর পাণ্ডুর মুখে অভিমান খেলে যায়, আর সমরের সেই হারানো দিনের কথা মনে পড়ে যায়—সে ওর শীর্ণ হাতটি নিজের হাতে নিয়ে নাড়ীর স্পন্দন অনুভব করে। ওর ভেতরকার ডাক্তার রোগিণীর অসুখের কঠিন অবস্থা নিমেষের জন্যেও ভুলতে দেয় না। কোনো কথাই বলতে পারে না সমর।

এক সময়ে ধনেশ্বরী ধীরে ধীরে বলে জড়িয়ে-জড়িয়ে—'সমর একটা কথা শোনো!...আমি আর বাঁচবো না—জানো! জীবন-মরণ অবশ্য ভগবানেরই হাতে।...তুমি আমার রামচন্দ্রকে কোলকাতায় পড়িয়ে ডাক্তার কোরে দেবে? ওর বাপ নেই। তিন বছর আগে গ্রামে দারুণ কলেরা হলো—আমার মা তাতে গেলো...তাকেও নিয়ে গেলো।...তারও বড়ো ইচ্ছে ছিলো রামচন্দ্র ডাক্তার হয়। আমার মুখে তোমার কথা শুনে বলতো—ধনেশ্বরী বেটাকে আমার পারি তো ডাক্তার করাবো—মাটিতে টাকা পুঁতে রেখে কি হবে? ছেলে যদি বংশে মানুষ হয় তো সে ধন দৌলতকে হার মানায়।...ওর বাপকে তুমি দেখনি—সে বড়ো ভালো ছিলো—মনটা তোমার মতোই শাদা আর নরম ছিলো।—ভগবান তাকে নিয়ে নিলেন আর আমাকেই বা কেন নেবেন না? ওই ছেলের জন্য কেবল বুকটা কাটে...সমর! তুমি কি ওকে দেখবে?'...

ধনেশ্বরীর কণ্ঠস্বর স্তিমিত হয়ে আসে—বড়োবড়ো তার কালো গভীর চোখে সে চেয়ে থাকে।

'অমন কথা বোলো না ধনেশ্বরী। তুমি ভালো হয়ে উঠবে—আমি বলছি! তোমার ছেলেকে আমি ডাক্তার ঠিকই কোরে দেবো—কিছু ভেবো না।' কোনোমতে সমর বলে। ধনেশ্বরী এবার যেন পরম শান্তিতে চোখ বন্ধ করে—আবার আস্তে বলে—'জানো সমর, তুমি চলে গেলে সেই তেঁতুল গাছের তলে আমি বছর খানেক যেতে পারিনি। তারপর থেকে কিন্তু প্রায়ই যেতুম-ওখানে বসে তোমার কথা ভাবতুম। ভাবতুম তুমি কতো লেখাপড়া করছ—বড়ো হচ্ছ।

ভগবানকে বলতুম—সমরকে সিভিল সার্জন কোরে দাও ভগবান...ওর মন মাখনের মতো নরম—একটুতে ওর চোখে জল এসে যায়—ওই বুঝবে রোগীর দুঃখ...।' সমরের দু'চোখ জলে ভাসতে থাকে। ও ধনেশ্বরীর কাছ হ'তে উঠে চলে আসে। হরিনারায়ণকে বলে—'তুমিই অপারেশন করো ভাই—আমি পারবো না।'

......অপারেশন ভালোই হয়েছিলো—কিন্তু ধনেশ্বরীর জীবনী-শক্তি ফুরিয়ে গিয়েছিলো। অপারেশনের পর আর তার জ্ঞান ফেরেনি—রাত্রি ভোর হবার আগেই তার সব শেষ হয়ে গেলো।

......সেখান হ'তে চলে আসবার সময়ে সমর সেই তেঁতুল গাছটির তলে এসে বসলো। তখন সন্ধ্যা ঘনিয়ে এসেছে। সকালের সময় ওখানে ওরা বসতো এখন সন্ধ্যার আলো নিভে আসছে—পশ্চিমের আকাশে তখন নিভন্ত আগুন।...সমর গাছের তলে বসে রইলো অনেকক্ষণ। হঠাৎ তার কি মনে হলো—গাছের তলাকার মাটি খুঁড়তে লাগলো—বার হয়ে এলো কয়েকটুরো ভাঙা কাঁচের চুড়ী। ওগুলি সে আবার সেখানেই পুঁতে রাখলো—মনে মনে বললো—'ধনেশ্বরী তুমি এই বনভূমির প্রকৃতি দেবী—এখানকার আকাশে-বাতাসে মাটিতে বনস্পতিতে তুমি চিরদিন থাকবে। তোমার দেখা পেয়ে—তোমার ভালোবাসা পেয়ে আমি ধন্য হয়েছি।—ভেবেছিলুম বুঝি তোমায় ভুলে গেছি—তা নয়। আমার স্মৃতির মনিকোঠায় তুমি ছিলে—সেখানেই তুমি থাকবে চিরকাল।'

* * * * *

আরো দশ বছর পরের কথা। দুটি ছেলে কলকাতা হতে পুজার ছুটিতে বেড়াতে এসেছে ইসলামপুরে হীরামনের বাড়ীতে। একটী হীরামনের নাতি—ধনেশ্বরীর ছেলে রামচন্দ্র, অন্যটি সমরের ছেলে সন্দীপ। দু'জনে কলেজে পড়ে। তারা বেড়াতে বেড়াতে সেই তেঁতুল গাছটির তলে এসে বসে। নানা গল্প হয় দুজনে—এক সময় সন্দীপ বলে—'রামচন্দ্র তোকে বাবা বলেন ডাক্তারী পড়াবেন, অথচ আমাকে বলেন ইঞ্জিনীয়ার করাবেন—কেন বল্‌তো?'

'আমার ডাক্তারী ভালো লাগে না রে দীপু—কি কোরবো—মামাবাবু মামীমা বলেন আমার মা নাকি তাই চেয়েছিলেন।' রামচন্দ্র বলে।—ওর মার কথা উঠতেই দুজনেই চুপ করে যায়। জনেরী ক্ষেতের ওপর দিয়ে শন্ শন্ করে হাওয়া এসে ওদের মুখে-চোখে লাগে। ওদের মুখরতাকে

শুরু করে দিয়ে কি যেন একটা নিগূঢ় রহস্য ওদের দুটি মনকে আবেষ্টন করে ধরে। আকাশে বাতাসে মাটিতে বনস্পতিতে যেন কোন এক অপ্সরা-বালিকার দ্রুত আনাগোনা চলতে থাকে। কে যেন ওদের মুখে-চোখে কৌতুকপূর্ণ স্নেহ পরশ বুলিয়ে দেয়। ওরা ধীরে ধীরে উঠে গ্রামের দিকে চলে—সন্ধ্যা হয়ে এসেছে। এক সময় সন্দীপ রামচন্দ্রের হাত ধরে বলে—'বাবার কথাই ভালো রে। বাবা একদিন মাকে বলছিলেন তোকে ডাক্তার কোরে এখানেই তোর জন্য ডিস্পেন্সারী আর ধনেশ্বরী-মার নামে একটি হাসপাতাল কোরে দেবেন। হীরামন দাদুও নাকি তাই চান।' 'ভালোই হবে রে—নিজের দেশের লোকের উপকার কোরতে পারবি!'

'তাই যেন কোরতে পারি রে!' গাঢ় স্বরে রামচন্দ্র বলে।

সেবাব্রতী শশিপদ বন্দ্যোপাধ্যায়

শ্রীপ্রভাতকিরণ বসু (কাকাবাবু)

সুরজন বার্ডফিয়ারের নাম শুনেছ তোমরা কেহ?
গুরুজনদেরও অজানা এ নাম, নেই তাতে সন্দেহ।
শশিপদবাবু ব্রাহ্মণ তিনি, ব্রাহ্ম হলেন যবে,
বরানগরের প্রতিবেশীগণ তাঁহাকে সগৌরবে
লাঞ্ছনা আর অপমানে প্রায় ক'রে দিলো কোণঠাসা!
নারীশিক্ষার প্রচারে তবুও সীমাহীন তাঁর আশা!
সেই আঠারোশো পঁয়ষট্টিতে মেয়েদের স্কুল খুলে
গ্রাম-বালিকার জ্ঞানবিস্তার-ব্রত যে নিলেন তুলে,
সেদিনের যত শিক্ষাবিহীন মূর্খ পল্লীবাসী
সব মেয়েদের টেনে নিয়ে গেল ভয় দেখাইতে আসি'।
বাগানের গাছ কেটে দিয়ে গেল, ভেঙে দিয়ে গেল বাড়ী;
বিদ্যায়তন শূন্য তখন, সব মেয়ে গেছে ছাড়ি'।
একটি মাত্র ভাইঝি কেবল ছাত্রী রহিল কাছে,
সেই শশিপদ বাঁড়ুয্যে আছে, বিদ্যায়তনও আছে!—
অসহ্য এটা ষড়যন্ত্রের জটিলতা হল সুরু,—
মিথ্যা মামলা প্রমাণ করিল সকল নাটের গুরু
শশিপদবাবু, চরিত্রহীন ভণ্ড ও জুয়াচোর।
রায় হ'য়ে গেল—জেল জরিমানা শশিপদ বন্দ্যোর।
হাইকোর্টে হল আপীল, বিচার সুরু হল রীতিমত।
সাক্ষ্যসাবুদ কেহ নাই, শুধু কাগজে প্রমাণ যত।
রদ হল জেল, ফাইন রহিল শুধু পঞ্চাশটাকা।
গুণী মানী ধনী এগিয়ে এলেন—নহে সান্ত্বনা ফাঁকা,
লালায়িত সবে টাকা ফেলে দিতে; গেল যে খবর পাওয়া
সকল মুদ্রা জমা ক'রে দিয়ে দাতা হয়ে গেছে হাওয়া!
কে দিলে এটাকা? কে দিলে এটাকা? চারিধারে বিস্ময়!
জজসাহেবের সেলাম জানাতে পিয়ন হাজির হয়।
সুরজন বার্ডফিয়ার বলেন, 'আপনাকে আমি জানি
বহুদিন হ'তে, মহৎ ব্রতের সার্থকতাও মানি।
অন্যায় জেল বুঝেছি, কিন্তু নোংরা ফাইল দেখে
কিছু জরিমানা করিতেই হবে, পার পাব কোত্থেকে?
ফাইন করাও পাপ সে আমার, দণ্ড স্বরূপ তাই
এ জরিমানার টাকা দিয়ে দিনু, অন্য পন্থা নাই।
অনুমতি দিলে, মাসে মাসে আমি স্ত্রীশিক্ষা বিস্তারে
পঁচিশটি টাকা দিয়ে দিয়ে যাব গেলেও সাগর পারে।'
গুণীর মর্ম্ম গুণীই তো বোঝে, জজসাহেবের দানে
গ্রামবাসীদের চোখ খুলে গেল, অনুতাপ এলো প্রাণে।
সে রাজকুমারী বিদ্যায়তন আজ দেখে এসো গিয়ে—
চারতলা এক প্রাসাদ উঠেছে অসংখ্য মেয়ে নিয়ে।
নির্য্যাতনেও দমেননি যিনি, আজ জয়গানে তাঁর
বরানগরের এ যুগের লোক করিছে নমস্কার।

ম্যাজিকের কৌশল

যাদুকর এইচ, ভট্টাচার্য্য

পেপার টীয়ারিং খেলাটি যাদুকর ও দর্শক মহলে খুবই সুপরিচিত। ইহা একটি অতি উঁচুদরের বিলেতি খেলা। আজ এই খেলারই গুপ্ত কৌশল পাঠকবর্গের কাছে প্রকাশ করছি।

যাদুকর এক ইঞ্চি চওড়া এবং একফুট লম্বা লাল রং-এর পাতলা কাগজ নিয়ে মঞ্চে এলেন। এই ক্ষুদ্র লাল রংএর পাতলা কাগজ সম্বন্ধে প্রথমে ছোট্ট একটি বক্তৃতা দিয়ে কাগজ খণ্ডটি ঠিক মাঝখানে ভাঁজ করলেন। তার-পর এই ভাঁজের উপর কাঁচি দিয়ে কাটলেন। কিন্তু কাগজের একদিকের মাথা ধরে ওপর দিক যখন ছেড়ে

দিলেন তখন দেখা গেলো কাগজ কাটে নি। এই ভাবে কয়েকবারই যাদুকর দর্শকদিগকে দিয়ে কাগজ কাটালেন এবং প্রত্যেকবারই কাগজ কাটে সত্যি, তবে কাগজের এক অপূর্ব্ব ক্ষমতাগুণে প্রতিবারই নিখুঁত ভাবে জোড়া লেগে যায় এবং দূর থেকে মনে হয় কাগজ কাটেনি। উপযুক্ত ভঙ্গিমার সাহায্যে দেখাতে পারলে খুবই সুন্দর লাগে ও যে কোন বড় খেলার চেয়ে এই খেলার চিত্তাকর্ষকতা কোন অংশেই কম হয় না।

এবার কৌশল :—এই নির্দ্দিষ্ট কাগজটুকরোর এক-দিকে খেলা দেখাবার পাঁচ মিনিট আগে খুব ভাল করে ডুরোফিক্স (Durofix) নামে একপ্রকার আঠা জাতীয় জিনিষ লাগিয়ে রাখতে হয়। তারপর খেলা দেখাবার তিন মিনিট আগে এই কাগজের যে দিকে ডুরোফিক্স লাগানো থাকে সেদিকে অল্প একটু মুখে দেবার পাউডার ঘষে লাগিয়ে দিতে হয়। পাউডার যেন বেশী না হয় সেদিকে লক্ষ্য রাখা দরকার। তারপর কাগজটুকরোকে ঝেড়ে নিলে যেটুকু অতিরিক্ত পাউডার থাকবে তা পড়ে যাবে। কাগজের যেদিকে ডুরোফিক্স লাগানো আছে সে-দিকে কাগজ ভাঁজ করতে হবে,তারপর ভাঁজের উপর কাঁচি দিয়ে কাটতে হবে। কাগজ কাটার পর একটা দিক ধরে অপর দিক ছেড়ে দিলে দেখা যাবে কাগজ কাটে নি। (ডুরোফিক্স লাগানো থাকে বলে কাগজ কাটার সাথে সাথেই জোড়া লেগে যায় এবং দূর থেকে মনে হবে কাগজ কাটেনি) এই একটুকরো কাগজকে তিন চারবার অনায়াসে দেখানো যায়। কাগজ নিজে না কেটে দর্শকদের দ্বারা কাটালে খুবই চিত্তাকর্ষক হয়। আশাকরি খেলাটি বুঝতে কারু কোন অসুবিধে হয়নি।

টুটুন

শ্রীসুধীরকুমার রায়

টুটুন—টুটুন—টুটুন,
শান্ত সে তো নয়কো মোটে
দস্যি কেমন বুঝুন।
ভাঙতে জানে চায়ের বাটি
বলছি যাহা সত্যি খাঁটি
ভালই ভাঙে কাচের গেলাস
যতই কিনে লুকুন।
টুটুন—টুটুন—টুটুন,
ফেলতে পারে দাদার কালী
না রেখে একটুকুন।
ছিঁড়তে পারে খাতার পাতা
নয়কো মেয়ে মোটেই যা'তা'
খিল্‌খিলিয়ে হাসতে জানে
বোকলে পরে বুঝুন।
টুটুন—টুটুন—টুটুন,
ভয় দেখিয়ে তাহার পেছু
যতই কেন ছুটুন—
ভয় পাবে না হলেও কচি
এই বয়সেই অনেক অছি
জানা আছে আদর খাবার
এমন মেয়ে টুটুন।
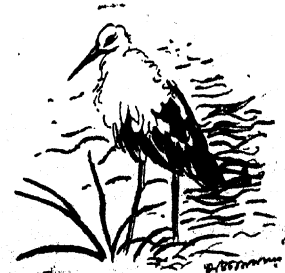
কৃষি-অর্থনীতি ও পল্লী-সংস্কার

অধ্যাপক শ্রীঅক্ষয়জীবন বসু এম-এ

বর্ত্তমান শতাব্দীর তৃতীয় দশকের অবতারণা করিতেছি। তখনও ভারতের বুকের উপর দিয়া অসহযোগ—আন্দোলনের ঢেউ বহিয়া চলিয়াছে। ঐ রাষ্ট্রিক আন্দোলনের মূলধারার সঙ্গে দুইটী গৌণধারা যুক্ত হইয়াছিল—(১) খাদি-প্রচার এবং (২) পল্লী সংস্কার। ক্ষুদ্র ও কুটীরশিল্পের পুনরুজ্জীবন কল্পে যে কর্ম্ম-সূচি রচিত হইত তাহারই একটা অংশ ছিল খাদি-প্রবর্ত্তন। ইহাও পরোক্ষভাবে পল্লী-সংস্কারের সঙ্গেই জড়িত বলা যাইতে পারে। আজ 'দ্বিতীয়-পঞ্চ বার্ষিক' পরিকল্পনার মধ্য পর্য্যায়ে দ্রুত শিল্পায়নের উদ্যোগ-আয়োজন সত্ত্বেও এ দেশ যে এখনও পর্য্যন্ত কৃষিপ্রধান এ কথা অস্বীকার করার উপায় নাই। এই তথা-কথিত 'অতিপ্রজ' 'অপরিণত অনগ্রসর অর্থনীতির' দেশে প্রায় দুই-তৃতীয়াংশ লোক এখনও একান্তভাবে কৃষির উপর নির্ভরশীল। যেহেতু কৃষি ভারতীয় আর্থিক ব্যবস্থার এবং পল্লীজীবনের অবিচ্ছেদ্য অংশ, অতএব পল্লী-সংস্কারের সঙ্গে কৃষি-অর্থনীতির ঘনিষ্ঠ যোগ রহিয়াছে। প্রসঙ্গক্রমে এতদুভয়ের সম্পর্ক আলোচিত হইবে। কৃষি-অর্থনীতির কথাই প্রথমে বলিব।

ভারতে কৃষি যে নিছক জীবিকা বা বৃত্তিমাত্র নয়, পরন্তু একটা জীবন-বেদ বা জীবন-দর্শন—ইহা অতিশয়োক্তি নয়। কৃষি-সম্পর্কিত ভারতীয় রয়াল কমিশন বহুপূর্ব্বে যাহা স্বীকার করিয়াছেন, প্রখ্যাত কৃষি-অর্থনীতিবিদ্ ক্লেন সাহেবও তাহার The Foundation of Agricultural Economics' নামক বিরাট গ্রন্থে সংপ্রতি তাহার উল্লেখ করিয়াছেন। চাষীর মনস্তত্ত্ব অর্থাৎ স্মৃতি চিন্তা ও কল্পনা সবুজরঙে রঙীণ, তাহার দৃষ্টিভঙ্গী ও মনোবৃত্তি কৃষির দ্বারা অনুরঞ্জিত। পল্লীর প্রতি পক্ষপাত এবং গ্রামীণ ঝোঁক তাহার মজ্জাগত। পার্লবাকের 'good earth' এবং হিন্দী হইতে অনূদিত 'গোদানে'র মধ্যে যে মর্ম্মান্তিক আকুতি ব্যক্ত হইয়াছে তাহাই কৃষকের, বিশেষ করিয়া ভারতীয় কৃষকের, প্রাণের ও মনের কথা। মাটীই তাহার খাঁটি মা—ধাত্রী-দেবতা। সাতপুরুষের ভিটার ও চাষের জমিখণ্ডের সঙ্গে আছে কৃষকের নাড়ীর টান। বটের শীতল ছায়া, দীঘির কালোজল এবং দিগন্তবিস্তৃত মাঠের যে মায়া—তাহা তাহাকে পল্লীর কোলে ধরিয়া রাখে। অভাবে কখনও কখনও সে মায়ের স্নেহাঞ্চল ছাড়িয়া শিল্পাঞ্চলে, চা-বাগানে, খনি-গর্ভে, জনাকীর্ণ সহরে যাইতে বাধ্য হয় বটে, কিন্তু পল্লী-জননীর নীরব হাতছানির আকর্ষণ সে এড়াইতে পারে না, যে কোনও অজুহাতে সে আবার তাহার পরিচিত নীড়ে ফিরিয়া আসে। ভারতে কৃষক ও কৃষি অভেদাত্মা। এ দেশে কৃষিকে জীবিকামাত্র বলিয়া ধরিলে বা সেইভাবে ব্যাখ্যা করিতে গেলে বিষম ভুল করা হইবে। কৃষি-অর্থনীতিকে এক হিসাবে ভারতীয় অর্থনীতির গুরুত্ব মানিয়া লইতে হয়।

কৃষি-অর্থনীতির আলোচনায় আমার অধিকার আছে কিনা এবং কেন ইহাতে আমি হাত দিলাম তাহার কৈফিয়ৎ দিতে গিয়া আমার নিজের কথা অনিবার্য্যভাবে আসিয়া পড়ে। অবশ্য খুব সঙ্কোচের সঙ্গেই নিজের কথা বলিতে হয়। আমার আলোচ্য বস্তুর সঙ্গে আমার বৃত্তিগত কর্ম্ম-প্রচেষ্টার কথা এবং ব্যক্তিগত জীবনের-অভিজ্ঞতা এমনভাবে জড়িত আছে যে এ প্রসঙ্গে কিছুতেই নিজের কথা বাদ দেওয়া চলে না। আমি যে বিষয় সম্পর্কে মূল উৎস হইতে তথ্য সংগ্রহ করিয়াছি, যাহা লইয়া ভাবনা-চিন্তা করিয়াছি এবং পরীক্ষা-নিরীক্ষার পরে তত্ত্ব-সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছি তাহার বিজ্ঞান-সম্মত পারিভাষিক নাম ত্রিশবৎসর পূর্ব্বে হয়ত এত ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত ও প্রচারিত হয় নাই। আমার আলোচিত বিষয়বস্তু সমাজ-বিদ্যার যে শাখার অন্তর্ভুক্ত তাহাকে এখন কৃষি-অর্থনীতি (Agricultural Economics) নামে অভিহিত করা হয়। ক্রমশঃ এই বিদ্যার ক্ষেত্র প্রসারিত ও সুনির্দ্দিষ্ট হইতেছে এবং বিশেষজ্ঞদের গবেষণার দ্বারা সমৃদ্ধ হইতেছে। এ বিষয়ে বহু গ্রন্থ লিখিত হইয়াছে এবং হইতেছে, সাময়িক পত্রিকা বাহির হইতেছে, অনুসন্ধান ও গবেষণা চালাইবার জন্য বিশেষজ্ঞ ও কর্ম্মীদের লইয়া সমিতি ও পরিষদ গঠিত হইতেছে। এই বিদ্যার আকার আয়তন ও উৎকর্ষ দিন দিন বাড়ি-তেছে। বিশ্ব-বিদ্যালয়ের স্নাতক ও স্নাতকোত্তর শ্রেণীতে এই বিষয়ের পঠন-পাঠন চলিতেছে এবং আর্থিক পরিকল্পনায় ইহার গুরুত্ব স্বীকৃত হইয়াছে। ধন-বিজ্ঞানের বিভিন্ন বিভাগের মধ্যে ইহার যথাযোগ্য স্থান-নির্দ্ধারণ এবং সমাজ-বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখার সঙ্গে ইহার সম্বন্ধ নির্ণয় অবশ্যই করিতে হইবে। কিন্তু তাহা মুলতঃ তাত্ত্বিকের কাজ। আপাততঃ আমরা তাত্ত্বিকতার আকর্ষণ এড়াইয়া ঐ বিদ্যার স্থূল উপাদান স্বরূপ যে মালমশলা তাহা লইয়াই নাড়াচাড়া করিব।

ইংরাজী ১৯২৯ সাল হইতে আমি 'বিহার-উড়িষ্যার' সমবায়-শিক্ষা বিভাগের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ছিলাম। সেই সূত্রে আমাকে পল্লী-সংস্কারের কাজেও প্রত্যক্ষভাবে আত্ম-নিয়োগ করিতে হইয়াছিল। এই প্রসঙ্গে ইহা উল্লেখ করা অবান্তর হইবে না যে বিহার-উড়িষ্যা কো-অপারেটিভ্ ফেডারেশনের পরিকল্পনা অনুসারে দাক্ষিণাত্যের কতকগুলি নির্ব্বাচিত অঞ্চলে সমবায়-সমিতির ও পল্লী-সংস্কার কেন্দ্রের ক্রিয়া-কলাপ পর্য্যবেক্ষণ করার জন্য আমি দক্ষিণ ভারতে প্রেরিত হইয়াছিলাম। দক্ষিণ-ভারতের সমবায়-আন্দোলনের সাক্ষাৎ পরিচয় লাভের যে সুযোগ পাইয়াছিলাম তজ্জন্য আমি ওয়াই এম্ সি এ (Y. M. C. A.) প্রতিষ্ঠানের নিকট কৃতজ্ঞ। রামনাড়ের প্রবীণ সমবায় কর্ম্মীর (পুরা নাম মনে নাই) আনুকূল্যে বহু সমবায়-সমিতির আভ্যন্তরীণ ক্রিয়া-কলাপ দেখার সুযোগ আমার ঘটিয়াছিল। কোয়েম্বাটুর সহরের উপকণ্ঠে অবস্থিত রমানাথ-

পুরমের পল্লী-সংস্কার-কেন্দ্রের সঙ্গে যুক্ত থাকিয়া ঐ অঞ্চলে প্রবর্ত্তিত কুটির-শিল্পাদির সম্পর্কে প্রত্যক্ষ জ্ঞান লাভ করিতে পারিয়াছিলাম। তারপরে ত্রিবাঙ্কুরের কতিপয় অঞ্চলের সমবায়-সমিতি ও পল্লী-সংস্কার কেন্দ্র দেখিয়া মাদ্রাজ সহরের প্রসিদ্ধ Triplicane Stores এর বিভিন্ন শাখার কর্ম্ম-প্রণালী খুব নিকট হইতে ঘরোয়াভাবে পর্য্যবেক্ষণ করার সুযোগ পাইয়াছিলাম! Servants of India Society এর তদানীন্তন ও তত্রত্য সুযোগ্য সভ্য মহোদয়ের তত্ত্বাবধানে মাদ্রাজ শহরে Triplicane Stores পরিচালিত হইতেছিল। ষ্টোর্সের পরিচালনা কার্য্যে তাঁহাকে যেরূপ শ্রম ও ক্লেশ স্বীকার করিতে দেখিয়াছি তাহার তুলনা হয় না। প্রত্যেকটী খুঁটিনাটী যেন তাঁহার নখদর্পণে ছিল। পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে তখন সারা ভারতে অসহযোগ আন্দোলনের ঢেউ বহিয়া চলিয়াছে। দক্ষিণ ভারতের কোন কোন অঞ্চলে সরকারী ও আধা-সরকারী প্রতিষ্ঠানের পরিচালনায় সমবায়-সমিতি ও গঠনমূলক কাজের ক্ষীণধারা যেন কোন প্রকারে আত্মরক্ষা করিয়া চলিয়াছিল।

কটকে কো-অপারেটিভ ইনষ্টিটুটের অধ্যাপক রূপে আমাকে ক্লাশে ছাত্রদিগকে যে সব বিষয় শিক্ষা দিতে হইয়াছে 'গ্রামীণ অর্থনীতি ও পল্লী-সংস্কার' ছিল তাহার অন্যতম। বস্তুতঃ গ্রামীণ অর্থনীতির তাত্ত্বিক (Theoretical) ও ফলিত (applied) দিক—এই দুইটাতেই সব্যসাচীর মত আমাকে সমভাবে হাত দিতে হইয়াছে। তথ্য সংগ্রহ এবং সংগৃহীত তথ্যের মধ্যে সাধারণ-সূত্র আবিষ্কার, আবিষ্কৃত নীতির প্রচার ও প্রয়োগ —ইহাই ছিল আমার কাজ। পল্লীতে পল্লীতে ঘুরিয়াছি, এক দুই তিন সপ্তাহ পর্য্যন্ত একাদিক্রমে গ্রামে বাস করিয়াছি। গ্রামবাসিগণের সঙ্গে তাহাদেরই মত জীবন-যাপন করিয়াছি, সুখ দুঃখের অংশ গ্রহণ করিয়াছি, তাহাদের ঘরের দাওয়ায় বসিয়া তাহাদের ভাষায় ঘরোয়াভাবে তাহাদের সঙ্গে কথাবার্ত্তা বলিয়া তাহাদের ঘরের খবর জানিয়াছি। আমার চিরার্জ্জিত ইংরাজী শিক্ষা-সংস্কার দূরে রাখিয়া নিরক্ষর গ্রাম্য চাষীর স্তরে নামিয়া আসিয়াছি, তাহাদের সঙ্গে একাত্ম হওয়ার প্রাণপণ চেষ্টা করিয়াছি (কতদূর সফল হইয়াছি বলিতে পারি না)।

পল্লীর উৎসব পার্ব্বণে যোগ দিয়াছি, ঝগড়া বিবাদ মিটাইয়াছি, গ্রাম্য জীবনের সমস্যাগুলি হৃদয়ঙ্গম করিয়াছি, ক্রমে ক্রমে পল্লীকে ও পল্লী-বাসীকে ভালবাসিয়াছি। পল্লীবাসিগণকে সঙ্ঘবদ্ধ করিয়া পল্লী-সংস্কার কার্য্যে আত্মনিয়োগ করিতে যথাসাধ্য অনুপ্রাণিত ও উৎসাহিত করিয়াছি। আমার ছাত্রদিগকে লইয়া আমিও হাতে নাতে কিছু কাজ করিয়াছি। এখানে উল্লেখ করা যাইতে পারে যে আমার ছাত্রদের শিক্ষার অঙ্গরূপে তাহাদের দ্বারা আমার তত্ত্বাবধানে গ্রামের সামাজিক ও অর্থনৈতিক জরিপ (Socio-economic survey) করাইয়াছি।

এই জরিপ কার্য্যের জন্য প্রথমে দুইটি গ্রাম বাছিয়া লইয়াছিলাম— একটী খুব ক্ষুদ্র গণ্ডগ্রাম, আর একটি বহু পাড়া লইয়া গঠিত বৃহৎ গ্রাম। বড়টীর নাম চাষিখণ্ড। কটকজেলার কমলপুর ও চাষি-খণ্ড অঞ্চলের পল্লী-সার্ভে-রিপোর্ট বিহার-উড়িষ্যা প্রদেশের সমবায় বিভাগের তদানীন্তন ডেপুটী রেজিষ্ট্রার মিঃ এন কে রায়ের (N. K. Ray) অকুণ্ঠ প্রশংসা লাভ করিয়াছিল। কো অপারেটিভ ইনষ্টিটুটের সেক্রেটারী (যিনি পরে নব-গঠিত উড়িষ্যা প্রদেশের ডাইরেক্টর অব ডেভেলপমেণ্ট হইয়াছিলেন—রায় বাহাদুর সতীশচন্দ্র রায়) উক্ত রিপোর্টখানা পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে আলোচনা করিয়া অনুকূল মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছিলেন। দুঃখের বিষয় ঐ রিপোর্টের কোন কপি আমার কাছে নাই। ত্রিশ বৎসর পূর্ব্বেকার উড়িষ্যার গ্রামের সামাজিক ও আর্থিক চিত্র উহাতে যথাযথভাবে অঙ্কিত হইয়াছে। পল্লীবাসীর দারিদ্র্য, ঋণগ্রস্ততা, সাময়িক বেকারত্ব, জীবন-যাত্রার হীনমান, নিরক্ষরতা, প্রভৃতি বাস্তব সত্য নিখুঁতভাবে রিপোর্টে চিত্রিত হইয়াছে। আর আছে জন্ম, মৃত্যু, গড়পড়তা আয়ুষ্কাল, মহামারী, কর্ম্ম-সংস্থানের জন্য বিদেশগামীর সংখ্যা, মামলা মোকদ্দমায় অর্থ ব্যয়, পূজা-পার্ব্বণ উৎসব, গবাদি গৃহপালিত পশুর আদমসুমারি, জলাশয়, শ্মশান, গোচারণ ভূমি, বিভিন্ন ফসল এবং কুটিরশিল্প ইত্যাদি বিবিধ বিষয়ে নির্ভুল তথ্যরাশি, তথ্যরাশির যথাযথ বিন্যাস ও বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণ। সিদ্ধান্তগুলিকে গ্রহণ করিয়া গ্রাম-সংগঠন কার্য্যে প্রয়োগ করার আগে সতর্কতার সঙ্গে উহা যাচাই, বাছাই ও পরখ করিয়া লইতে হইয়াছে। শিল্পী সতর্কতা ও নিপুণতার সঙ্গে সযত্নে নৌকা গঠন করিয়া জলে ভাসাইয়া দেখে—কোথাও ছিদ্র বা খুঁৎ আছে কিনা। ছিদ্র বা খুঁৎ থাকিলে আবার নৌকাকে ডাঙ্গায় টানিয়া মেরামতের কাজ সারিয়া পুনরায় জলে ভাসায়। আবার কোন ত্রুটী ধরা পড়িলে আবার সংশোধনের চেষ্টা হয়। 'গ্রামীণ অর্থনীতির' ক্ষেত্রেও বরাবর এরূপ পরীক্ষা-নিরীক্ষা চলিয়াছে। গ্রামের সরজমিন জরিপ সারিয়া কটকে কো-অপারেটিভ ইনষ্টিটুটের বক্তৃতা-কক্ষে আমার প্রত্যক্ষ-অভিজ্ঞতালব্ধ এবং পুস্তকাবলী হইতে আহরিত তথ্য ও তত্ত্ব "গ্রামীণ অর্থনীতি ও পল্লী-সংস্কারের" ক্লাশে পরিবেশন করিয়াছি। আবার ইনষ্টিটুটের সেসন শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে কটক সহরের বক্তৃতা-মঞ্চ হইতে নামিয়া গিয়া উড়িষ্যার কোন সুদূর নিভৃত পল্লীতে সমবায়-সংগঠন, গ্রামোন্নয়ন, এবং লোকশিক্ষার কাজে আত্ম-নিয়োগ করিয়াছি। আমার কর্ম্মক্ষেত্রের একপ্রান্তে ছিল উড়িষ্যার শিক্ষা-সংস্কৃতির প্রাণকেন্দ্র ও প্রধান সহর কটক, অপর প্রান্তে ছিল 'পাখী-ডাকা ছায়ায় ঢাকা' নিভৃত নিরালা পল্লী। গ্রামে তথ্যসংগ্রহ করিয়াছি, তত্ত্বের প্রচার, প্রয়োগ ও পরীক্ষা করিয়াছি। আর কটকে ফিরিয়া গ্রাম হইতে সংগৃহীত তথ্যের বিন্যাস, বিশ্লেষণ ও বিচার করিয়া সাধারণ সূত্রের আবিষ্কার করিতে প্রয়াস পাইয়াছি এবং পূর্ব্বসূরিদের গ্রন্থ-নিবদ্ধ তত্ত্বের সঙ্গে আমার আবিষ্কৃত সূত্র মিলে কিনা তাহা পরখ করিয়াছি। উৎকলে কৃষি-অর্থনীতির গবেষণায় আমি যথাক্রমে লাইব্রেরী ও ল্যাবরেটারী এই দ্বিবিধ ব্যবস্থার সুযোগ-সুবিধা সমভাবে পাইয়াছিলাম এবং দুয়েরই সদ্ব্যবহার করিতে সমর্থ হইয়াছিলাম। সহরের পুস্তকাবলীই যে ছিল আমার লাইব্রেরী ইহা বলাই বাহুল্য। আর সুবিস্তৃত গ্রাম-অঞ্চল ছিল আমার 'গ্রামীণ অর্থনীতি ও পল্লী-সংস্কার' বিদ্যার ল্যাবরেটারী স্বরূপ—সেখানে আমি সমাজ-বিজ্ঞানের এই বিশিষ্ট শাখার পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালাইয়াছি, আমার প্রত্যক্ষ-দৃষ্ট জীবিত পল্লীবাসী-

ব্যবহার করুন
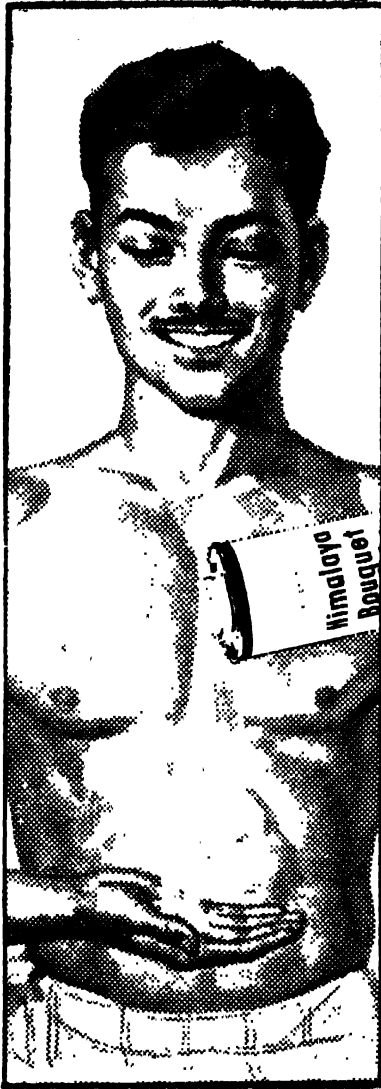
হিমালয় বোকে ট্যালকাম পাউডার

সারাদিন
সতেজ
থাকার জন্যে
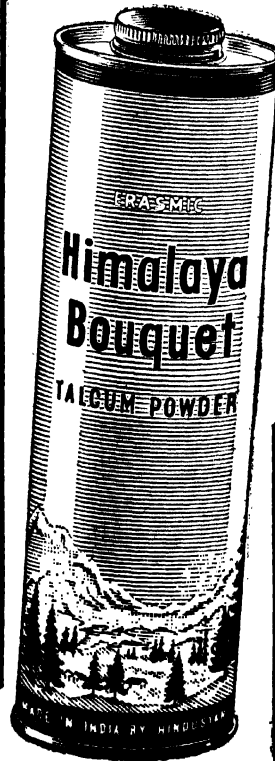
• সারা পরিবারের
পক্ষেই আদর্শ

এরাসমিক লণ্ডনের পক্ষে হিন্দুস্থান লিভার লিঃ কর্তৃক ভারতে প্রস্তুত

HBT 19-X52 BG

দের বাস্তবজীবনের দৈনন্দিন সমস্যা লইয়া। এইভাবে আমার ছয় বৎসরের কার্য্যক্রম শেষ হয়।

ইংরাজী ১৯৩৬ সালে আমি ময়ূরভঞ্জ ষ্টেটের Senior Marketing Officer (সিনিয়র মার্কেটিং অফিসার) পদে নিযুক্ত হইলাম। তখন সেখানকার দেওয়ান ছিলেন স্বনামধন্য শ্রীযুক্ত ক্ষিতিশচন্দ্র নিয়োগী মহাশয় (পরে ভারত সরকারের বাণিজ্য সচিব এবং শিল্প-মন্ত্রী হইয়াছিলেন)। ইংল্যাণ্ডের Ministry of Agriculture হইতে মিঃ লিভিংষ্টোনকে ভারতসরকার তাহার বিপনন উপদেষ্টা (Marketing Advisor) রূপে নিযুক্ত করিয়া আনেন। লিভিংষ্টোন সাহেবের উপদেশ অনুসারে ব্রিটিশ ভারতের প্রত্যেক প্রদেশে এবং বড় বড় দেশীয় রাজ্যে বিপনন-জরিপ (marketing survey) আরম্ভ হয়। কৃষিজাত দ্রব্যের মার্কেটিং সার্ভে করার উদ্দেশ্যে যে প্রশ্নমালায় (Questionare) রচিত হইয়াছিল তদনুসারে বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে তথ্যসংগ্রহ, তথ্য-বিন্যাস, তথ্য-বিশ্লেষণ এবং সংগৃহীত ও নির্ব্বাচিত তথ্যরাশি হইতে নীতি নির্দ্ধারণ ও কার্য্যক্রম স্থির করার কথা। লিভিংষ্টোন-প্রবর্ত্তিত মার্কেটিং সার্ভের পরিকল্পনা অনুসারে কৃষিজাত দ্রব্য বলিতে শুধু ধান, গম, তৈল-বীজ ও ইক্ষু প্রভৃতি কৃষিক্ষেত্রে উৎপন্ন ফসলই বুঝাইত না—গৃহ-সংলগ্ন উঠানে বা বাগানে উৎপন্ন শাকসব্জী, দুগ্ধ ও দুগ্ধজাত দ্রব্য, ডিম, ফল, এমন কি মৃত জন্তুর চামড়া পর্য্যন্ত কৃষিজাত দ্রব্যের শ্রেণীভুক্ত হইয়াছিল। বলাই বাহুল্য যে ময়ূরভঞ্জের মত প্রগতিশীল দেশীয় রাজ্যে মার্কেটিং সার্ভে পরিচালনার ব্যবস্থা করা হয়। সেই সম্পর্কে এবং সেই কাজের জন্যই ময়ূরভঞ্জ ষ্টেটে আমার নিয়োগ। শ্রীসদাশিব মিশ্র এম্ এ (পরে তিনি পি, এইচ ডি হইয়া র‍্যাভেনসা কলেজের ধন-বিজ্ঞানের প্রধান অধ্যাপক ও অধ্যক্ষ হন) জুনিয়র মার্কেটিং অফিসার (Junior marketing officer) পদে নিযুক্ত হন।

এই মার্কেটিং সার্ভের ভার গ্রহণ করিয়া আমাকে সারা ময়ূরভঞ্জ ঘুরিতে হইয়াছে। কখনও পায়ে হাঁটিয়া, কখনও বা গরুর গাড়ীতে চড়িয়া গ্রামের পর গ্রাম অতিক্রম করিয়াছি। গ্রামে গ্রামে তথ্য সংগ্রহ করিতে হইয়াছে, প্রধান তহশীলদার এবং অন্যান্য সরকারী ও বে-সরকারী কর্ম্মচারীদের সঙ্গে আলাপ-আলোচনা করিয়াছি, হাট, বাজার, গোলা, গঞ্জ এবং মেলায় ক্রয়-বিক্রয় পর্য্যবেক্ষণ করিয়াছি। ব্যাপারী, দালাল, ফড়িয়া, আড়তদার, মহাজন, ইজারাদার,ষ্টেশনমাষ্টার, গাড়োয়ান, গোলাদার, ঠিকাদার, আড়কাঠি প্রভৃতি কত ধরণের লোকের সঙ্গে মোলাকাৎ করিয়া কথোপকথনচ্ছলে যে কত বিষয় জানিতে হইয়াছে তাহার ইয়ত্তা নাই। ধানের কল থেকে আরম্ভ করিয়া কুটুনীর ঢেঁকির এবং রেলষ্টেশন থেকে নদীর খেয়াঘাট কোন কিছু আমার "সার্ভে" হইতে বাদ পড়ে নাই। কত বিচিত্র যানবাহন দেখিয়াছি—ডুলি, পাল্‌কি, "খাটিয়া", গরুর গাড়ী, ঠেলা, নৌকা, "হাড়ি-ভেলা", মটর-লরি। পাইকারী ও খুচরা বিক্রয়ে বিনিময় এবং নোটও মুদ্রার আপেক্ষিক গুরুত্ব লক্ষ্য করিয়াছি। পাল-পার্ব্বণ উপলক্ষে, বিশেষতঃ রথযাত্রায়, মকর-সংক্রান্তিতে, শিবরাত্রিতে ও দোল-পুর্ণিমায় মন্দির এবং স্থান-বিশেষে বিরাট জন-সমাবেশ এবং তদনুরূপ ক্রয়-বিক্রয়ের যে ধুম ছিল তাহা বাস্তবিকই লক্ষ্যণীয়। বৎসরকাল অবিশ্রান্তভাবে মফঃস্বলে ঘুরিয়াছি এবং কার্য্য-ব্যপদেশে কখনও ডাকবাংলোয়, কখনও Police outpostএ, কখনও বনান্তরালে Beat officeএ, কখন গ্রামের প্রধানের বৈঠকখানায়, প্রাথমিক বিদ্যালয়ে বা ভাগবত-ঘরে আশ্রয় লইতে হইয়াছে। আমি সরকারী মোটরে ভ্রমণ করি নাই—যাহা অফিসারদের প্রথা ও রেওয়াজ ছিল। ময়ূরভঞ্জ রাজ্যের প্রতি ইঞ্চি মাটী ছুঁইয়া এবং প্রত্যেক "গ্রাম-দেবতার স্থানে" মাথা ঠেকাইয়া, "বড়গাছের" ছায়ায় বিশ্রাম করিয়া আমার পরিক্রমা পরিসমাপ্তি করিয়াছি। দর্শনযোগ্য ও উল্লেখযোগ্য স্থান, মানুষ ও বস্তু এমন কিছু ছিল না যাহা দেখি নাই বা যাহার পরিচয় লাভ করি নাই। এইভাবে বর্ষা হইতে আরম্ভ করিয়া বসন্ত পর্য্যন্ত ছয় ঋতুতে অনাবৃত অবিকৃত পল্লী-প্রকৃতির রূপ দেখিবার এবং পল্লী-জীবনের "বারমাস্যা" পর্য্যবেক্ষণ করিবার সৌভাগ্যলাভ করিয়াছিলাম। বিভিন্ন অঞ্চলের বৈশিষ্ট্য এবং বিভিন্ন এলাকার 'স্থান-মাহাত্ম্য' যেমন ইন্দ্রিয়ের দ্বারা গ্রহণ করিয়াছি, তেমন হৃদয়-মনে ও উপলব্ধি করিয়াছি। ময়ূরভঞ্জের পাহাড়-প্রান্তর-বন-নদী-সমন্বিত নিসর্গ-চিত্র এবং সরল নিরক্ষর আদিবাসীদের 'পল্লী সমাজ' আমার মর্ম্মে চিরদিনের জন্য অঙ্কিত হইয়া আছে। মুখের কথায় বা কলমের ডগায় তাহা ফুটাইতে পারি না। কবির ভাষা যদি আমার থাকিত তবে ময়ূরভঞ্জের প্রকৃতি-রাণী ও আদিম মানব-সমাজ বাংলা ভাষায় ও বাংলা-সাহিত্যে অমর হইয়া থাকিত। পাহাড় চূড়ায় সূর্য্যাস্তের বর্ণ-সমারোহ, ক্ষীণকায়া স্রোতস্বিনীর উপল-ব্যথিত গতি, নিস্তব্ধ নিদাঘ-মধ্যাহ্নের ছায়াঘন শালবীথিকা নয়ন ও মন হরণ করিয়া লইত। উষায়, সন্ধ্যায়, পূর্ণিমা—নিশীথে দৃশ্যপটের কত না পরিবর্ত্তন!

মার্কেটিং সার্ভের সূত্র ধরিয়া আবার পূর্ব্ব প্রসঙ্গে ফিরিয়া যাই। বর্ণ-হিন্দু, তথা-কথিত অস্পৃশ্য অন্ত্যজ জাতি এবং সাঁওতাল প্রভৃতি আদিম অধিবাসীদের সঙ্গে সমভাবে মিশিয়া যেমন 'হাটুয়াদের' তেমন 'কলা-পটুয়াদের হাঁড়ির খবর জানিয়াছি। সরকারী কর্ম্মচারীদের সম্বন্ধে জন-সাধারণের মধ্যে যে অবিশ্বাস ও সন্দেহ ছিল এবং যাহা থাকা স্বাভাবিক তাহা দূর করিতে আমাকে কম বেগ পাইতে হয় নাই। বিবিধ তথ্য সংগ্রহ ও যাচাই করিবার উদ্দেশ্যে গ্রামবাসীদের নিকট যে প্রশ্নমালা স্থাপিত করিয়াছি তাহার সদুত্তর সহজে মিলে নাই। পূর্ব্বের তিক্ত অভিজ্ঞতা হইতে প্রজাদের মনে স্বভাবতই এই সন্দেহ জাগিত—বুঝি নূতন কোন কর স্থাপন বা খাজনা বৃদ্ধি অভিসন্ধি লইয়া আমি তাহাদের মধ্যে ঘোরাফেরা করিতেছি। অফিসার হওয়া সত্ত্বেও কেন আমি কোট্‌প্যাণ্ট পরি না এবং মোটরে না চড়িয়া পায়ে হাঁটিয়া কেন পরিভ্রমণ করিতেছি এ প্রশ্ন তাহাদের মনে উদিত হইয়াছে। শুধু তাই নয়। চোখ-রাঙানো বা ধমকানোর (যাহা তাহারা অফিসারদের কাছে প্রত্যাশা করে) বদলে আমি তাহাদিগকে মিষ্টভাষায় কাছে ডাকিয়া তাহাদের ঘরের বারান্দায় তাহাদের সঙ্গে একই মাদুরে বসিয়া ঘরোয়াভাবে তাহাদের সুখ দুঃখের কথা আলোচনা করিয়াছি বলিয়া প্রথম প্রথম তাহাদের সন্দেহ আরও

ফটো : রতন দাশগুপ্ত

আলোর আস্তরণ

ভারতবর্ষ প্রিন্টিং ওয়ার্কস্

ভারতবর্ষ প্রিন্টিং ওয়ার্কস্ — আলোর পথে — ফটো : সত্যপ্রকাশ বালা
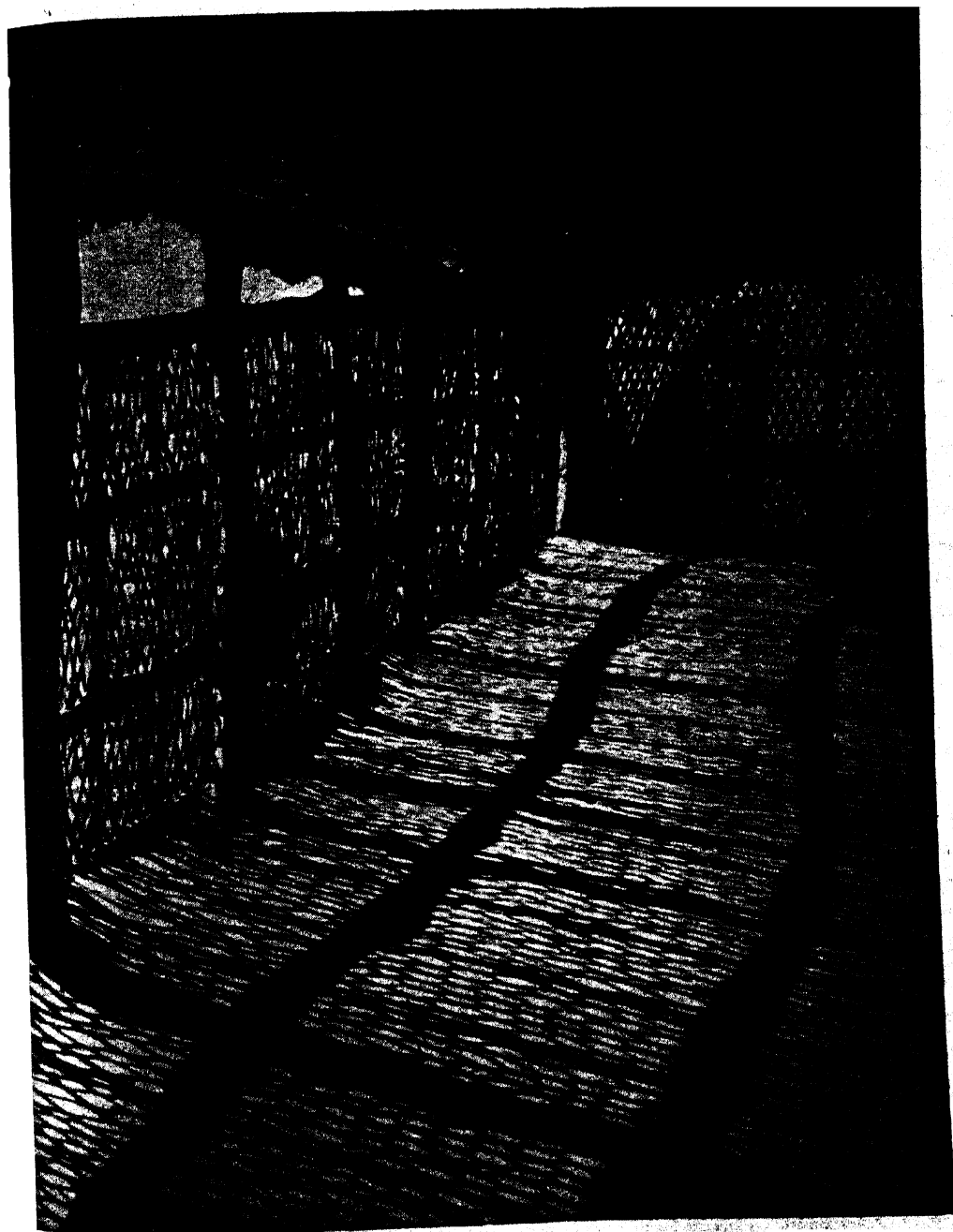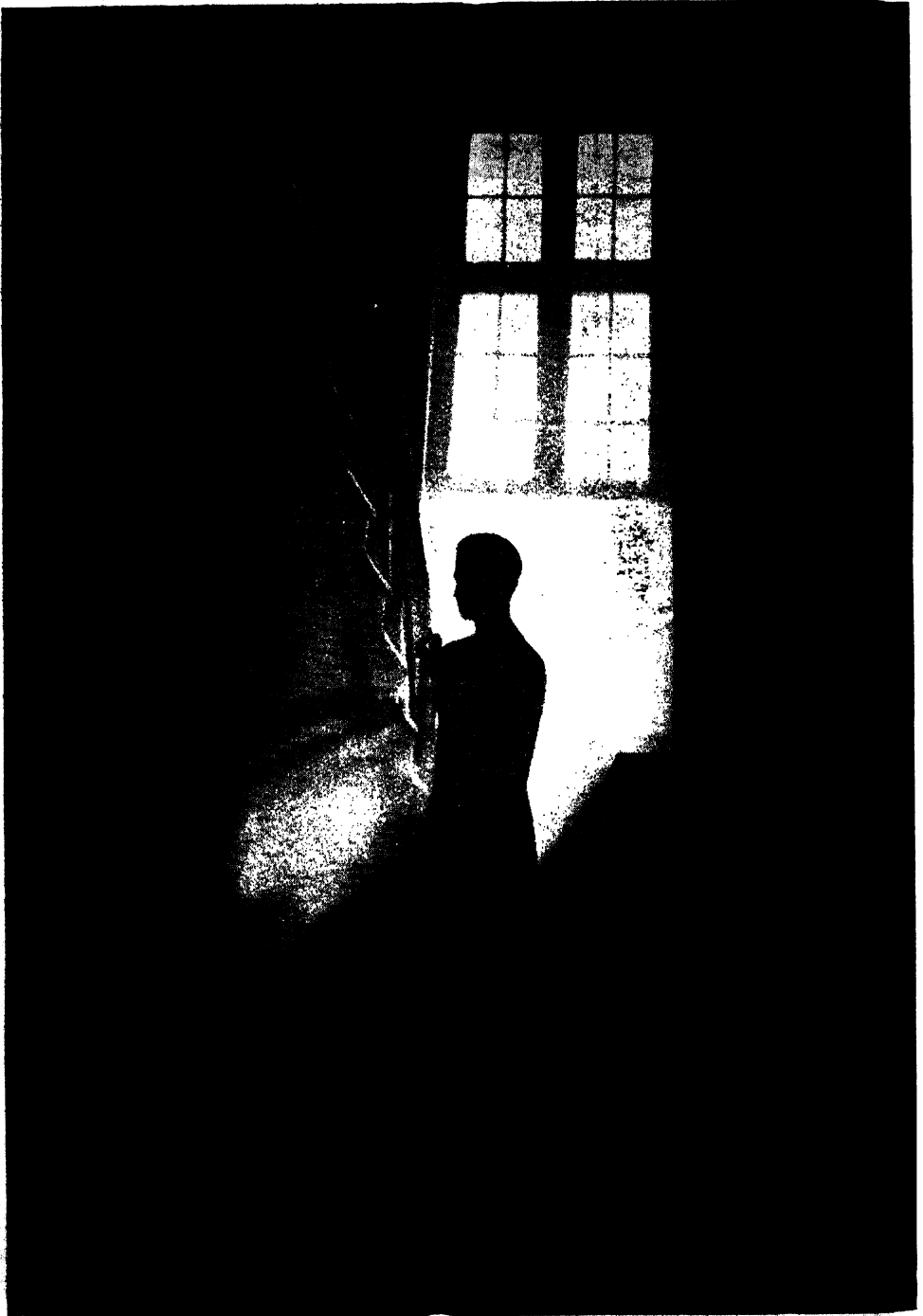
বাড়িয়াছিল। কিন্তু কিছুদিন পরে তাহারা আমাকে তাহাদেরই একজন বলিয়া গ্রহণ করিয়াছিল এবং অকপটে সহজ সরলভাবে আমার প্রশ্নের জবাব দিত। কয়েক অঞ্চলের লোক যখন আমার সম্বন্ধে "ভাল রিপোর্ট" দিতে লাগিল তখন চারিদিকেই যেন একটা 'নদিচ্ছার আবহাওয়া' তৈরি হইল। তাহাতে আমার প্রশ্নোত্তরের সাহায্যে তথ্য সংগ্রহের কাজ সহজ হইয়াছিল। মার্কেটিং সার্ভে সম্পর্কে আমি ময়ূরভঞ্জের প্রায় সব হাটই দেখিয়াছি। তিন, চারি, পাঁচ, ছয় মাইল দূরে দূরে হাট। কোনটা সপ্তাহে দুইবার, কোনটা বা সপ্তাহে একবার মাত্র বসিত। পঞ্চেন্দ্রিয়ের মধ্যে চারিটী ইন্দ্রিয়ের দ্বারাই হাটকে অনুভব করিয়াছি বলা চলে। ক্রেতা, বিক্রেতার দর-দস্তুর এবং কথাবার্ত্তা কানে শোনা যায়, বিক্রেয় ফল মিষ্ট জিহ্বা দ্বারা আস্বাদন করা চলে, কিন্তু হাটে ঘ্রাণেন্দ্রিয়ের কাজের তেমন অবকাশ কোথায় এ প্রশ্ন স্বাভাবিক। ময়ূরভঞ্জ রাজ্যের প্রজাদের বেশীর ভাগই ছিল আদিবাসী। মকর-সংক্রান্তি (পৌষ-পার্ব্বণ) তাহাদের প্রধান পরব, বা "জাতীয় উৎসব।" সাওতালদের মধ্যে প্রবাদ প্রচলিত আছে যে বাপ-মাকে বরং না হইলে চলে, কিন্তু মকর বাদ দেওয়া যায় না। মকর-সংক্রান্তির পূর্ব্বে প্রতি হাটে "শুখুয়া" (শুঁটকি মাছ) এবং "হাণ্ডিয়ার" (মদ) গন্ধে বাতাস হয় ভারাক্রান্ত। সুতরাং হাটের খবর জানিবার জন্য যে দর্শক তখন হাটে আসিবেন তাঁহার নাসিকার নিস্তার নাই। আর একটী অদৃষ্টপূর্ব্ব দৃশ্য ও তাঁহার চোখে পড়ে। হাটের আর এক প্রান্তে খোলা জায়গায় চলে 'কুকড়ার' লড়াই (মোরগের যুদ্ধ)। গড়ের মাঠে মোহনবাগান ইষ্ট-বেঙ্গলের ফুটবল ম্যাচ্ যেমন উৎসাহ-উত্তেজনার সৃষ্টি করে, প্রতি হাটবারে ময়ূরভঞ্জের পল্লী অঞ্চলে "কুকড়ার লড়াই" জন সাধারণের মধ্যে তেমন চাঞ্চল্য ও উদ্দীপনার সৃষ্টি করিয়াছে।

বৎসরকাল তথ্য সংগ্রহ করিয়া আমি Report on the Marketing Survey of Agricultural produce of Mayurbhanj State দাখিল করিলাম। মূল রিপোর্টের সঙ্গে বিবিধ বিষয়ের পরিসংখ্যান সম্বলিত কতিপয় পরিশিষ্ট সংযোজিত হইয়াছিল। ইহাতে বাইশ বৎসর পূর্ব্বেকার ময়ূরভঞ্জের তথ্য-নিষ্ঠ খাঁটী আর্থিক পরিচয় দেওয়া হইয়াছে। এই রিপোর্টের বিষয় বস্তু Rural Economics বা Agricultural Economics এর অন্তর্ভুক্ত বলা যাইতে পারে। এই রিপোর্টখানা কর্ত্তৃপক্ষের প্রশংসালাভ করিতে সমর্থ হইয়াছিল। সরকারী রিপোর্ট বলিয়া ইহার কোন কপি আমার কাছে রাখি নাই। তবে মার্কেটিং সার্ভে সম্পর্কে আমি কৃষি অর্থনীতি ক্ষেত্রে যে গবেষণা করিয়াছি তাহার সংক্ষিপ্ত বিবরণ পাঠকদের নিকট দাখিল করিবার ইচ্ছা রহিল।

এখানে প্রসঙ্গ-ক্রমে ইহা উল্লেখ করা বোধ হয় অবান্তর নয় যে আমি এখন কৃষি-অর্থনীতি-সংক্রান্ত তথ্য-সংগ্রহে বিরত আছি। বিগত পাঁচ বৎসরের উপর আমি কৃষি অর্থনীতি-সংক্রান্ত তত্ত্বের বিচার ও ব্যাখ্যানে রত আছি। কলেজের বি, কম, শ্রেণীর পঠিতব্য বিদ্যার মধ্যে কৃষি-অর্থনীতি একটি বিশিষ্ট বিষয়—আমাকে ঐ বিশিষ্ট বিষয়ের অধ্যাপনা করিতে হইতেছে। আমার কৃষি-অর্থনীতি-আলোচনার কারণ ও প্রয়োজন হিসাবে ইহা উল্লেখ করিতে হইল।

কামনা

শ্রীকৃষ্ণদাস চক্রবর্তী

সারাটী জীবন জুড়িয়া কেবল জ্বেলেছি বহ্নিশিখা
তুমি পতঙ্গ—চিরালোক-লোভাতুরা,
আলোক আভায় অনুমানি শুভ দীপিকা
দেয়ালীর রূপে কণ্ঠ ভরিয়া পিয়েছ শুধুই সুরা।

তুমি পতঙ্গ, পরাণ তোমার আলোকের লোভে ছুটে
শারদ নিশির প্রথম প্রদোষে পদ্মের রূপলোভে,
বিগলিত প্রাণ ভ্রমর সমান আন্‌মনে মধু লুটে
এলাইয়া পড়ি' পদ্মের বুকে অপরূপ রূপে শোভে।

এ নহে শান্ত সন্ধ্যার চির স্নিগ্ধ প্রদীপখানি
পল্লীবধূর অঞ্চল-ঘেরা বদ্ধ দেউল দ্বারে
বহিয়া আনে না দেবতার পূত-আশীর্বাণী,
সান্ত্বনা দিতে ক্ষত-পরাণের অতৃপ্ত বাসনারে।

পূর্ণিমা রাতে আকাশের বুকে এ নহে জোছনা-ডালি,
নহে হোমানল শুভ যজ্ঞের রূপ-লিখা।
চির অন্ধ এ কালানল বাজাইয়া করতালি—
পুড়াইয়া কত ছাই করে দিল নির্দোষ পাদপিকা।
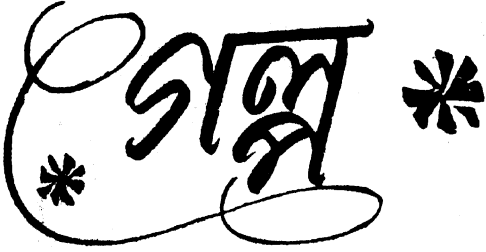
রাণীর কলংক

স্বর্ণকমল ভট্টাচার্য

রাণীর মত সুন্দরী মেয়ে দেখিনি। যদি বাঙ্‌লা দেশের সবচেয়ে সুন্দরী মেয়েকে দেখে থাকেন, তবে নিশ্চয় রাণী-কেই আপনি দেখেছেন। এত সরল সহজ মেয়েটির স্বভাব, সাধারণ বেশ-ভূষা, এসব কিছু মিলে তাকে অসাধারণ করে তুলেছিল। এই অসাধারণত্বটাকে বাড়িয়ে দিয়েছিল তার স্কুলে পরীক্ষার ফল। সব পরীক্ষায় সে প্রথম হ'ত। তার সহপাঠিনীরা—আর যে পাড়ায় থাকত সে পাড়ার প্রায় সম-বয়সী মেয়েরা—সকলে তাকে হিংসে করত। বলত, ওর যা রূপ, পরীক্ষায় প্রথম না হয়ে যায়!

রাণীর জন্ম থেকেই কলংক। এক বছর বয়স না যেতেই সে মা-বাপকে হারায়। মামা যখন তার মা ও বাপের কলেরায় এক সংগে মৃত্যুর পর তাকে নিজের বাড়ী নিয়ে গেলেন, তার মামীমা তাকে দেখেই বলেছিলেন, 'বড় কুলক্ষণে মেয়ে। কাঁচা হলুদের মত রঙ্‌ হ'লে কি হবে? সে সব কথা রাণী বলতে পারে না, তবে তার মামার এখনও মনে আছে। মামা-মামীর সংসারে রাণীর জীবনের দ্বিতীয় আর তৃতীয় বৎসর দুটো মন্দ কাটে নি। কারণ তখনও মামা-মামীর কোন সন্তান হয়নিকো। তার যখন চার বছর বয়স, তখন মামীমার প্রথম মেয়ের জন্ম হ'ল। তখন থেকে তার আদর কমতে লাগল। ক্রমে ক্রমে মামীর তিনটি মেয়ে হ'ল। রাণীর ও দুঃখ দুর্দশা ক্রমে ক্রমে বাড়তে লাগল। তার সংগে কলংকও।

মামীর কুসংস্কার—অলুক্ষুণে মেয়ে রাণীর জন্যেই তার ছেলে হচ্ছে না। শুধু তাই নয়, যে-মেয়েগুলি জন্মাছে তারা কুৎসিৎ হয়েছে, রোগা হয়েছে। সাধারণ বাঙালী ঘরের মেয়ের এত সুন্দরী হওয়াটা কখনও মঙ্গলজনক নয়। মঙ্গলজনক যে নয় একথাটা রাণী হাড়ে-হাড়ে বুঝতে আরম্ভ করল, যতই তার বয়স বাড়তে লাগল। মামীর উৎপাত যে বাড়ল তা নয়, পাড়ার পাঁচজনের নজর পড়তে লাগল। কত রকমের লোক যে সংসারে আছে এত রূপসী না হ'লে রাণী জানতেও পারত না, যেমন জানে না, তার মামাত বোনেরা। তারা সকলে তাকে হিংসে করত, শুধু তার রূপ ছিল বলে নয়, পরীক্ষায় প্রথম হ'ত বলে নয়, ভাল গাইতে পারত বলে নয়, স্বাস্থ্য ভাল ছিল বলেও নয়, তাকে সে-পাড়ার বে-পাড়ার দুষ্ট ছোঁড়ারা লুব্ধ নেত্রে চেয়ে দেখত তার জন্যও। মোট কথা সুন্দরী হয়ে রাণী কি অপরাধ করেছে—সে স্পষ্টই বুঝতে পারল।

মামার ইচ্ছে ছিল রাণীকে কলেজে পড়ান। কিন্তু মামী কিছুতেই দিলেন না। প্রথম কারণ, মামাকে নিজের তিনটি মেয়ের বিয়ে দিতে হবে; দ্বিতীয় কারণ, কলেজে গেলে রাণী কি গোলমাল বাঁধাবে কেউ বলতে পারে না। একমাত্র তার মামীমাই কল্পনা করতে পারেন শুধু।

সবচেয়ে রাণীর খারাপ সময় আরম্ভ হ'ল যখন তার মামাত বোনদের জন্য বিয়ের সম্বন্ধ আসতে লাগল। যিনিই পাত্রী দেখতে আসেন তিনিই রাণীকে পছন্দ করে যান, মামাত বোনদের আর কারো পছন্দ হয় না। মামা বলেন—ওকে যখন পছন্দ করেছেন সবাই, ওর বিয়েটা আগেই দেওয়া যাক্‌, পরে এদের কথা দেখা যাবে। মামী কিছুতেই হতে দেবেন না। কিন্তু তবু তাকে দিতে হ'ল।

টাটানগরের এক পাত্র মামার বড় মেয়েকে দেখতে এসে রাণীকে দেখে পাগল হয়ে গেল। পাগল, মানে রাঁচীতে পাঠাবার মত যদিও নয়। পাত্রটি এম-এ পাশ। এই মাত্র তার গুণাগুণ। সামান্য চাকুরী করে—স্কুল-মাষ্টারী। মাইনে কতই বা পায়। এক পয়সার ভূসম্পত্তি নেই। এমন ঘরে মামীমার মেয়েদের বিয়ে হতে পারে না। কিন্তু রাণীর বিয়ের বিন্দুমাত্র সম্ভাবনা ছিল না যদি পাত্রটি রাণীকে দেখে পাগল না হয়ে যেত। শুধু শংখ

সিঁদুরের বেশী কিছু দিয়ে কন্যাদান করতে হলেই তার মামীমা আপত্তি করতেন।

স্বামীর ঘরেও রাণীর কলংক ছিল। তার ভাসুর বীরেন সরকারের স্ত্রী—অর্থাৎ জা সুন্দরী ছিলেন না। কিন্তু অনেক টাকা আর অলংকার নিয়ে তিনি শ্বশুরের ঘরে এসেছিলেন। আর বীরেনের ছোট ভাই বরেন কিনা তাকে শুধু রূপ দেখে কুড়িয়ে নিয়ে এসেছে। তবু রাণীকে এখন সুখী বলতে পারা যায়। বরেন তার কথা শুনে, এম-এ পাশ হলেও মেট্রীক পাস স্ত্রীর বিদ্যা-বুদ্ধির কাছে সে মাথা নত করে।

আগেই বলেছি রাণীকে দেখে তার বরের অর্থাৎ বরেনের মাথা খারাপ হয়েছিল। বিয়ের পরও সে মাথা খারাপ ভাবটা কেটে যায় নি। দাড়ি রাখল সে, চুল রাখল, স্কুলের শিক্ষক বন্ধুরা বললেন, বরেনবাবু কি সাধু হবেন নাকি? সাধু হন নি, বরেনবাবু রাণীকে বিধবা করে শেষ পর্য্যন্ত মারা গেলেন! পুকুরের জলে তিনদিন পরে তার পচা মৃতদেহ ভেসে উঠল। সকলেই বলল, আত্মহত্যা করেছে। রাণী তার পায়ের তলায় মাথা কুটে—অচৈতন্য হয়ে পড়ল।

রাণীকে পথে বসিয়ে বরেন আত্মহত্যা করলে কেন, পাড়ার লোকেরা ভেবে পেল না। শেষে অবশ্য পেল, যখন রাণী ইন্‌সিওর কোম্পানী থেকে ত্রিশ হাজার টাকা আদায় করে নিয়ে এল। সকলেই বুঝতে পারল, ষাট টাকা মাইনে থেকে পঞ্চাশ টাকা খরচ করে বরেন কেন ত্রিশ হাজার টাকার জীবন বীমা করেছিল।

টাকা পেয়েও রাণীর শান্তি নেই। এত সুন্দরা যুবতী মেয়ের হাতে এত টাকা! তাকে নিয়ে তার ভাসুর আর মামার মধ্যে বেশ একটা টাগ-অব-ওয়ার হয়ে গেল। রাণী কিন্তু ভাসুরের ঘর ছেড়ে গেল না। এঘরে তার স্বামীর স্মৃতি জড়িয়ে আছে।

রাণীর আর এক কলংক—যেটা এতদিন জানা ছিল না —সেটা হ'ল সে বড় কঞ্জুষ। তার জা একটি পয়সা তার কাছ থেকে আদায় করতে পারে না। সব টাকা সে ব্যাঙ্কে রেখে দিয়েছে। মাসে মাসে শুধু নিজের খরচের টাকাটা তুলে এনে ভাসুরের হাতে দেয়। কিন্তু তারও একটা ব্যতিক্রম মাঝে মাঝে হ'ত। তাদের পাড়ায় একটি গরীব মেয়ে ছিল—সদাপাগলার বৌ। তার স্বামী সদাপাগলাও ছিল চুলে দাড়িতে অনেকটা বরেনের মত। পাগলামি করলেও স্ত্রীকে সে ভিক্ষে করে দুটি চারটি পয়সা এনে দিত। বরেন-এর আত্মহত্যার কিছুদিন আগে থেকে সে নিরুদ্দেশ হয়েছে। সমব্যথার ব্যথী সে গরীব মেয়েটিকে রাণী লুকিয়ে অর্থ সাহায্য করত। জায়ের হাতে একদিন ধরা পড়াতে কলংক তার আরও বাড়ল। সে প্রচার করল নানা রকম কথা—যা আপনারা ভাবতেও পারবেন না।

সুন্দরী তরুণী বিধবার হাতে ত্রিশ হাজার টাকা! অনেক সহৃদয় তরুণ যুবক তার পাণিগ্রহণের ইচ্ছা গোপনে জানাতে লাগল। গোপনে হলেও জায়ের চোখে গোপন রইল না। ধরা পড়ল। তার অবস্থা আপনারা বুঝতেই পারছেন। এত সব সত্ত্বেও কিন্তু রাণী অচল-অটল।

বরেনের সাংবাৎসরিক শ্রাদ্ধের দিন তিনেক বাকী। সহরে এক জটাজুটধারী মৌনীবাবার আবির্ভাব হ'ল। কেউ বলল—তিনি হিমালয় থেকে এসেছেন, কেউ বললেন—হরিদ্বারছত্র থেকে। যেখান থেকেই আসুন তাঁর অলৌকিক ক্ষমতার কথা শুনে সকলে এসে দেখতে লাগলো। তিনি দৃশ্যকে অদৃশ্য করতে পারেন। রাণীও তার জায়ের সঙ্গে সাধুকে দেখতে গেল, শুধু গেল না, সাধুর পায়ে মাথা কুটে তাকে নিজের বাড়ী নিয়ে এল। ব্যাপারটা তার জায়ের পছন্দ হচ্ছিল না; তবু সাধুজীর ক্ষমতার কথা স্মরণ করে ভয়ে সে আপত্তি তুলতে পারল না। তাই সারাটা দিন তাদের বাড়ীতে সাধুজীর সেবা হ'ল। সন্ধ্যা হ'ল, রাত্রি গভীর হ'ল। দর্শনার্থীরা ধীরে ধীরে যে-যার ঘরে চলে গেল। সারাদিনের ক্লান্তিতে ঘুমিয়ে পড়ল, রাণী ও বাড়ীর সকলে।

পরের দিন সকালবেলা সাধুজীকে খুঁজে পাওয়া গেল না। তিনি নিজে অদৃশ্য হয়েছেন সঙ্গে সঙ্গে রাণীকেও অদৃশ্য করেছেন! সারাটা সহরে হৈ-চৈ পড়ে গেল। রাণীর জা এবার খুব বড় গলায় বলল—'দেখলে ত, এত রূপসী মেয়ে সতী হতে পারে না।' বীরেন দাঁত কড়মড় করে নীচু গলায় বললে "রাণী অসতী নয়, সে সতী সাধ্বী আর বুদ্ধিমতী। ঘটে একটু বুদ্ধি থাকলে বুঝতে সদা-পাগলা কোথায় গেল। কেন বৌমা ওর বৌকে টাকা দেয়!" কিন্তু কে কার কথা শোনে? রাণীর কলংক আর কিছুতেই ঘুচল না, কখনও ঘুচল না।

হাতের পুতুল

আশা গংগোপাধ্যায়

আপনি কি জানেন আপনার ছেলে যখন তখন কারণে অকারণে মিথ্যাকথা বলে? আপনার সামনে ভালছেলে সেজে আপনার আড়ালে বাজে কথা বলে—বড় বড় কথা বলে—আর নিজেকে সকলের কাছে দর বাড়ায়? যদি জেনে থাকেন—

তাহলে আজই লেগে যান আপনার ছেলে মেয়ের এই বদভ্যাসটাকে সংশোধন করতে।

আর যদি না জানেন—

তাহলে কানে আসবামাত্রই খোঁজ করুন ভাল কোরে—তারপর সমস্ত কাজ ফেলে সন্তানের দিকে নজর দিন।

ছোট ছোট শিশুরা—এরাই ত হচ্ছে ভবিষ্যৎ জাতি। দেশের কাজে নামবার আগে—সমাজের বা জাতীয় কল্যাণের কাজে হাত দেবার আগে আপনার নিজের সংসার—নিজের চার দেয়ালের মধ্যে সীমাবদ্ধ ক্ষুদ্র-কায় সমাজটুকুর সংস্কার করুন। এর চেয়ে বড় কাজ আর নেই।

প্রত্যেক মা যদি তার শিশুদের শরীর মন গঠনের প্রতি নজর দেন—শিক্ষা-দীক্ষার প্রতি অবহিত হন—তাহলে ভবিষ্যতে আপনার দ্বারা সমাজ বা দেশই উপকৃত হবে।

আপনার হাতের সংস্কৃত, শিক্ষিত শিশুরাই এক একটি মহামানব হয়ে জনকল্যাণের কাজে নিজেদের নিযুক্ত করবে। আর সকলে যদি জাতির মূলটিকে সংস্কার করি, সমাজ বৃক্ষের গোড়ায় জলসিঞ্চন কোরে তাকে আলো বাতাস যুগিয়ে বাঁচিয়ে রাখি—ভবিষ্যতে দৃঢ় মূল হয়ে সেই বৃক্ষই ত শাখা-প্রশাখা বিস্তার কোরে দশজনের উপকারে লাগবে।

তাই সব আগে আমাদের চেয়ে দেখতে হবে শিশুদের মনের দিকে। মনের দিকে চেয়ে দেখতে হবে'—একথা বলার উদ্দেশ্য—শরীরটা ত সহজেই আমাদের চোখে পড়ে।

শিশুর জ্বর হল, পেটের অসুখ হল, হাত পা ভাঙল বা খাওয়া-দাওয়ায় অরুচি হল—এগুলি জানা মোটেই কঠিন নয় এবং এর জন্য উচিত মত ব্যবস্থা করাটাও সহজ।

কিন্তু শিশুর মন? সেটি এমনই একটি নরম জিনিষ যাতে অতি-সামান্য একটু আঁচড় দিলেই চিরদিনের জন্য গভীর ভাবে দাগ কেটে যেতে পারে। এই দাগের গভীরতা যে ভবিষ্যৎ জীবনের পক্ষে কতখানি ক্ষতিকর—সেগুলি আমাদের বিবেচনা কোরে দেখতে হবে—সমস্তটুকু জানতে হবে।

শিশুদের মন স্বভাবতঃই কল্পনাপ্রবণ—

তাছাড়া শিশুরা অনুকরণপ্রিয়। এই কারণে মা যখন শিশুকে গল্প বলেন—শিশু খুব সহজেই সেটা অনুকরণ কোরে ফেলে। শিখে ত নেয়ই—উপরন্তু আরও কল্পনার রং চড়ায়। বড় বড় কথা বলতে সাধারণতঃ সব শিশুই পছন্দ করে।

তিন-চার বছরের শিশু বলে—

'আমি জাহাজে কোরে বিলেতে গিয়েছিলাম—সুন্দর-বনে গিয়ে মস্ত বড় একটা পাগলা হাতী মেরেছি—বাঘের সাথে যুদ্ধ করলাম—কাল রাতে আমার ঘরে ছোট্ট নীলপরী এসেছিল—কি সুন্দর দেখতে ইত্যাদি।'

আবোল তাবোল বলে—কিন্তু তার মধ্যে অর্থ থাকে; আশ্চর্য কিছু করবার বা লোককে জানাবার।

এই ধরণের কথা শুনলে অবশ্য ভয় পাবার কোনও কারণ নেই। কেন না কল্পনার সুতোয় নানা ধরণের গল্পের মালা গাঁথা এবং যখন তখন যাকে-তাকে মিথ্যে কথা বলা মোটেই এক নয়।

আমরা একটা জিনিষ দেখতে পাই—সাধারণতঃ মায়েরা কল্পনাপ্রবণ হলে সে মায়ের সন্তানও কল্পনাবিলাসী হয়ে ওঠে। বিভিন্ন ধরণের সুন্দর সুন্দর গল্প বলে যে মা শিশুদের ভুলিয়ে রাখতে চান—তাঁর ছেলে মেয়েরা ভবিষ্যতে কল্পনাপ্রবণ হয়ে ওঠে। গান গেয়ে গেয়ে ঘুম পাড়াতে গেলে শিশুও অনুকরণ কোরে সুন্দর গান গাইতে শিখে ফেলে।

কল্পনা-বিলাস কিছুটা পর্যন্ত ভাল। কিন্তু বাড়াবাড়ি হয়ে উঠলে অদূর ভবিষ্যতে পরবর্তী জীবনে বহু আঘাত পাবার সম্ভাবনা আছে। তাই কাল্পনিক কথাবার্তা সম্বন্ধে বেশী প্রশ্রয় না দেওয়াই উচিত।

মিথ্যাভাষণ সম্পূর্ণ অন্য জিনিষ। আমরা সময়ে সময়ে একটু আধটু মিথ্যা বলেই থাকি। যে সমস্ত ক্ষেত্রে একটু সামান্য মিথ্যা কথা বললে অনেক ঝঞ্ঝাট মিটিয়ে ফেলা যায়—সেখানে মিথ্যে কথা বলেই থাকি এবং তার জন্য

আমাদের অনেক বড় রকমের ক্ষতিকে এড়িয়ে যেতে পারি। সে সব জায়গায় আমরা আমাদের বিচার বুদ্ধিকে কাজে লাগাই।

কিন্তু শিশুর বিবেচনা শক্তি ত বড়দের মত সুপরিণত নয়। সুতরাং একটি মিথ্যা ঢাকতে গিয়ে আরও অনেক কথা বানিয়ে বলতে বলতে মিথ্যা বলার বদভ্যাস দাঁড়িয়ে যায়।

সাধারণতঃ সাত-আট বছর বয়স থেকেই এই মিথ্যা-ভাষণ করবার দুষ্প্রবৃত্তি শিশু মনে উঁকি ঝুঁকি মারে। এর কারণ কি?

আপনি যদি আপনার সন্তানকে বেশী শাসন করেন—অর্থাৎ লঘু পাপে গুরুদণ্ড দেন—তাহলে সে ভয়ে ভয়ে সত্যি ঘটনা চেপে গিয়ে মিথ্যা কথা বলবেই। অন্যায় কোরে স্বীকার করবার মত সৎসাহস তার কোনও দিনই হবে না।

শিক্ষকদের শাসনের ভয়ে বালকবালিকা মিথ্যার আশ্রয় নেয়। বিদ্যালয়ের পাঠ্যবস্তু ক্ষমতার অতিরিক্ত হলে শিশুরা নানা রকমের ছলনা-ওজর আপত্তি জানিয়ে বকুনির হাত থেকে রেহাই পেতে চায়।

এ ছাড়া যে সমস্ত বাবা মা শিশুদের সামনে বড় বড় কথা বলেন, নিজেদের গুরুত্ব সম্বন্ধে আলাপ-আলোচনা করেন—দশজনকে হীন প্রতিপন্ন কোরে বিভিন্ন উপায়ে নিজেরা সমাজে লব্ধ প্রতিষ্ঠ হতে চান—সেই সব জনকের সন্তানরা—সেই সেই পরিবার-প্রতিপালিত শিশুরা মিথ্যা-বাদী—চালিয়াৎ হবেই।

নিজেকে সকলের চেয়ে বড় মনে করা—সকলের চেয়ে বুদ্ধিমান মনে ভাবা—সকলের চেয়ে ধনী প্রতিপন্ন করার মধ্যে যে হীন মনের পরিচয় লুকিয়ে থাকে এটুকু কাণ্ডজ্ঞান যে সমস্ত লোকের একেবারেই থাকে না—তাদের সন্তান-রাই শৈশব থেকে এক একটি সমাজকলঙ্ক তৈরী হয়।

যদি বাবা ও মা ভিন্ন প্রকৃতির হন—তাহলে দেখা যায়—শিশুরা দুজনের মনোবৃত্তিগুলিরই কিছু কিছু ধারা পেয়েছে। যে যে বৃত্তিগুলি প্রবল, সেই সেই গুলিই শিশু মনে ধরা দেয়।

পিতার উদারতা শিশুকে মনের দিকে থেকে যদি বা প্রসার কোরে তোলে, বয়স বাড়বার সংগে সংগে মায়ের নীচতা কোনও কোনও ক্ষেত্রে প্রবলতর হয়ে আত্ম-প্রকাশ করে।

মায়ের কোলে শিশু বড় হয় বলে মায়ের স্বভাব-শৈশবে পাবেই। বয়সের সংগে তার নিজস্ব কতগুলি চারিত্রিক বিশেষত্ব এবং পিতার কতকগুলি চারিত্রিক বিশেষত্ব ক্রমশই প্রকট হয়ে ওঠে শিশুর আচার ব্যবহারে—দৈনন্দিন জীবনে।

সেই জন্য শিশুর মনকে সুষ্ঠুরূপে সংগঠিত করতে গেলে—শিশু চরিত্রকে নিখাদ সোনায় পরিণত করতে হলে মা-বাবার আচরণকে উন্নত ও মার্জিত করার বিশেষ প্রয়োজন। এ ছাড়াও আছে পরিবেশ। শিশু যে পরিবারে লালিতপালিত হচ্ছে—সেই পরিবারের সকলের আদর্শকে উন্নত করতে হবে। বিদ্যালয়ের শিক্ষা-দীক্ষার ব্যবস্থার আমূল সংস্কার সাধন ও সবিশেষ প্রয়োজন এই সংগঠনমূলক কাজে। পারিপার্শ্বিক আবহাওয়ার উপর শিশুমনের বিকাশ অনেকটাই নির্ভর করে।

এক তাল মাটীকে যেমন আমি ইচ্ছামত ভাঙতে বা গড়তে পারি—ইচ্ছামত রংচং দিয়ে সুন্দর কোরে তুলতে পারি—আর সেটির ভাল মন্দ হওয়াটা আমার নিজের বুদ্ধি বিবেচনার উপর নির্ভর করে সম্পূর্ণভাবে—সেই রকম শিশুর নমনীয় সরল মনকে তার মা-বাবা সম্পূর্ণ নিজের ইচ্ছানুযায়ী ভালমন্দ কোরে তৈরী কোরতে পারেন। এই শিশুসংগঠন দ্বারা জাতির ভবিষ্যতকে সহজে সুন্দরতর, মহত্তর কোরে তুলতে পারেন।

হাতের কাজ

রুচিরা দেবী

ঘর-বাড়ী সাজিয়ে রাখতে কোন সুগৃহিণী না চান। ঘরের সজ্জা-ভূষণের জন্য পছন্দমত জিনিষপত্র অনেক সময় বাজারে পাওয়া যায় না—পাওয়া গেলেও, একালে সে-সব জিনিষের দাম এত বেশী যে সাধারণ গৃহস্থের পক্ষে তা কেনবার সামর্থ্য নেই। ত্রিশ-চল্লিশ বছর আগেও বাঙালী গৃহস্থ-ঘরের অনেক মহিলা নানা ধরণের শিল্প-কাজ করতেন—যেমন, কাঁথা-সেলাই, কার্পেটের আসন বোনা, পশমের ছবি, রেশমের নক্সাদার ছবি, মাছের আঁশের বিচিত্র কাজ, ডিমের খোলার উপরে রঙীণ চিত্র-রচনা, ঝিনুকের কাজ, জামা-কাপড় তৈরী প্রভৃতি—এমনি বহু রকমের হাতের কাজ করতেন সুনিপুণভাবে। সেগু'লতে শুধু যে তাঁদের শিল্প-নৈপুণ্য প্রকাশ পেতো তাই নয়, সারাদিন ঘরকন্নার হাজার রকম কাজের মাঝে অবসর সময়টুকু কাটতো পরম সুন্দর-ভাবে। তাছাড়া সেগুলিতে তাঁদের ঘরের সজ্জা-শ্রী সম্পাদিত হতো তো বটেই, উপরন্তু গৃহস্থের নানা কাজের প্রয়োজনও মিটতো সুষ্ঠুভাবে। এখনও যে সব হাতের কাজের রেওয়াজ নেই, সে কথা বলছি না—তবে, এখন ছোটাছুটির যুগ…ব্যস্ততার যুগ—সেকালের মতো দিনের কাজকর্ম্মের ফাঁকে মেয়েদের অবসর মেলে কম। সেই সল্পাবসরে ঘরের সজ্জা এবং প্রয়োজন মেটানোর জন্য বা সখের খাতিরে টুকিটাকি যে সব সুন্দর সুন্দর শিল্প-কাজ হাতে করতে পারেন—এবার থেকে এই বিভাগে সে-সম্বন্ধে আমরা যথোচিত নক্সা নির্দ্দেশসহ নানান্ আলাপ-আলোচনা করবো। আশা রাখি, এ বিষয়ে আপনাদের সুচিন্তিত মতামত, সক্রিয়-সহযোগিতা এবং আন্তরিক সহানুভূতিলাভে আমরা বঞ্চিত হবো না।
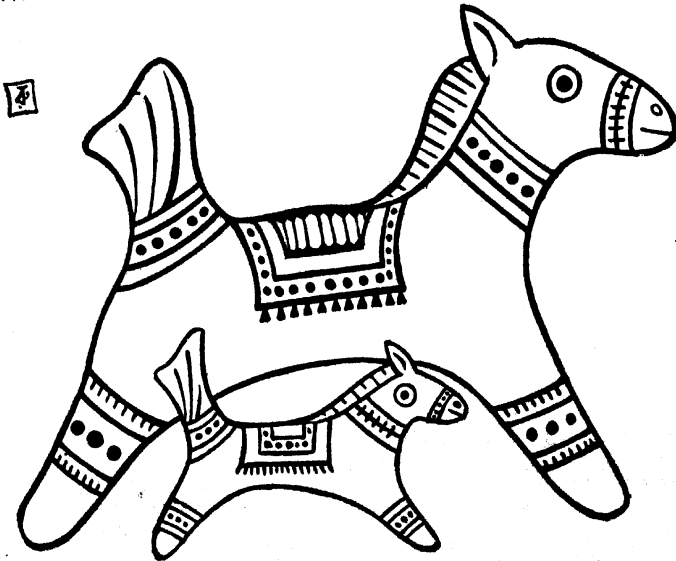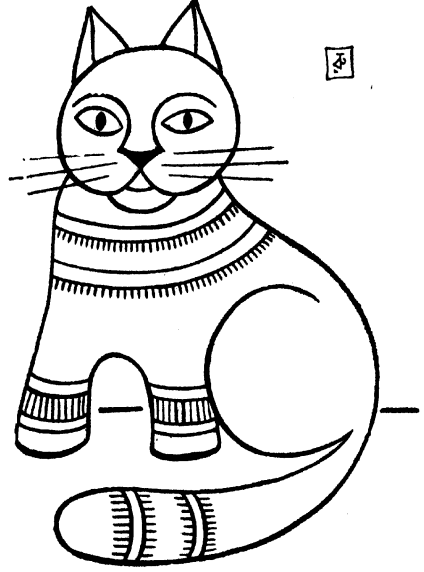
এ মাসের আলোচনায় প্রকাশিত হলো বাঙলার লোক শিল্পের ধারানুসরণে রচিত দুটি নক্সা। এই নক্সা দুটি সূচী-শিল্পে এবং চামড়ার ব্যাগ প্রভৃতির আলঙ্কারিক-কাজে ব্যবহার করা যেতে পারে। এছাড়াও 'ল্যাম্প-শেড্ (Lamp shade), মাটির পাত্র বা ঘরের শার্সির কাঁচের উপর বিচিত্র বর্ণে চিত্রণের কাজেও এ দুটি নক্সাকে

ব্যবহার করা চলবে। কাজের সময় পাতলা 'ট্রেসিং' কাগজে নিখুঁতভাবে পছন্দমত নক্সাটির প্রতিলিপি এঁকে নিয়ে, 'কার্ব্বণ' কাগজের সাহায্যে সেটির ছাঁচ তুলে নিতে হবে হাতের কাজের আসল জিনিষটির উপর।

সূচী-শিল্পের কাজে এই সব নক্সাগুলি 'ষ্টেম্ ষ্টিচ' (stem stich), বা 'ব্যাক্ ষ্টিচ্' (Back stich) দিয়ে

সাটিন-ষ্টিচ্ ব্যাক্-ষ্টিচ্
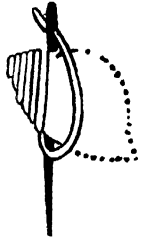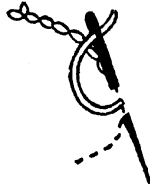
ষ্টেম্ ষ্টিচ্

করা যেতে পারে। ইচ্ছানুযায়ী কোন কোন ক্ষেত্রে 'সাটিন ষ্টিচ্' (Satin stich) দিয়ে ভরাট করা চলতে পারে। প্রয়োজন হলে নক্সা ছুটি বহু বর্ণের সূতা বা রেশম দিয়ে সেলাই করাও যাবে। তার রঙীণ সেলাইয়ের সময় নক্সার outline বা বহিঃরেখাঙ্কনগুলি কোন একটি বা ছুটি গাঢ় রঙের হওয়াই বাঞ্ছনীয়। বাঙলার লোক-শিল্পের আদর্শে রচিত এই নক্সাগুলি শিশুদের গলায় বাঁধবার 'বিব' (Bib), 'স্থাপ্‌কিন্', 'রোম্পার-স্যুট্', 'নিকারবোকার', ছোট ছেলেমেয়েদের ফ্রক, জ্যাকেট, বসবার ঘরের কুশন, পর্দ্দা, কোচ-ঢাকা, টেবিল-ক্লথ, বালিশের ওয়াড় প্রভৃতি বিচিত্রিত করার কাজে ব্যবহার করা যেতে পারে। এই প্রবন্ধের সঙ্গে 'ষ্টেম্ ষ্টিচ্', 'ব্যাক ষ্টিচ্', ও 'সাটিন্ ষ্টিচ্', সেলাইয়ের বিভিন্ন পদ্ধতি ছবির সাহায্যে দেখিয়ে দেওয়া হলো। এ ধরণের সেলাই পদ্ধতি সূচী-শিল্পের খুবই সহজ সাধারণ পদ্ধতি। আজকাল প্রায় অধিকাংশ ঘরেই মেয়েদের মহলে এ-ধরণের সেলাই-পদ্ধতির প্রচলন আছে বলেই, আপাততঃ এ-বিষয়ে বিশদ বর্ণনা দেওয়া হলো না।

বাঙলার লৌকিক-শিল্পের বিশিষ্ট নমুনা হিসাবে, চামড়ার ব্যাগ, বুক-কভার, ফোলিও-কেশ, 'টাই' রাখার কেশ্ প্রভৃতি অলঙ্করণের কাজেও এ ছুটি নক্সা ব্যবহার করা চলতে পারে। শুধু 'মডেলারের' (Modeller) সাহায্যে নক্সা তোলাই নয়, ইচ্ছানুযায়ী বিচিত্র বর্ণেও নক্সা ছুটিকে রঞ্জিত করা যাবে। প্রয়োজন হলে, 'মডেলার' ব্যবহার না করেও পছন্দমত নক্সাটিকে 'বাটিক-শিল্পের' (Batik Style) ধরণে চামড়ার উপর মুদ্রিত করা চলবে। সেক্ষেত্রে, গোড়ায় নক্সাটিকে চামড়ার উপর ছকে নিয়ে সেই প্রতিলিপির উপর নক্সার 'outline' বা 'বহিঃ-রেখা-চিত্রণ'টিকে পাকা করে সরু তুলির সাহায্যে চামড়ার কাজের রীতি-অনুযায়ী স্পিরিটের সঙ্গে পছন্দমত রঙের গুঁড়ো গুলে মিশিয়ে, সেই রঙে এঁকে নেবেন। outline-এর মাঝের অংশগুলিতে যেন রঙ না লাগে। 'বহিঃ-রেখা-চিত্রণ' শেষ হলে, অন্য একটি পরিষ্কার তুলির সাহায্যে জলে-গোলা গঁদের আঠার (Arabic Gum) প্রলেপ দিয়ে দেবেন outline-এর মধ্যকার ভরাট করবার শাদা (original) চামড়ার অংশগুলিতে। তারপর, গঁদের প্রলেপটি ভালভাবে শুকিয়ে গেলে, আবার স্পিরিটে পছন্দমত অন্য রঙ গুলে মিশিয়ে পুরো জিনিষটির উপর দ্বিতীয়বার রঙের প্রলেপ দেবেন। এবারে রঙের প্রলেপ দেবার সময় গঁদের প্রলেপের উপরেও প্রলেপ পড়লে ক্ষতি নেই, কারণ গঁদের আস্তরণে ঢেকে থাকার ফলে নক্সার outline এর মধ্যকার ভরাট অংশগুলিতে রঙের ছোপ ধরবে না, সেটি থাকবে অবিকৃত-অবস্থায়। পুরো জিনিষ-টিতে এইভাবে রঙ লাগানোর পর, সেটি ভালভাবে শুকনো হলে, খাঁটি স্পিরিটে তুলোর প্যাড্ ভিজিয়ে নিয়ে গঁদের প্রলেপ দেওয়া অংশগুলি সাফ্ করে নেবেন। তারপর, যথারীতি পরিষ্কার মিহি-নরম কাপড় বা তুলার প্যাডের সাহায্যে রঙীণ নক্সাদার চামড়াটি ঘষে পালিশ্ করে দিলেই, গাঢ় রঙের পশ্চাদপট জমির (Back ground) উপর রঙ-না-লাগা গঁদের আস্তরণ আবৃত-থাকা শাদা (original) অবিকৃত-রঙের চামড়াটি অপরূপ সুস্পষ্ট হয়ে উঠবে। খাঁটি স্পিরিটে ভিজিয়ে নেবার ফলে অবিকৃত-শাদা চামড়ার গাত্র থেকে গঁদের প্রলেপ বেমালুম নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে। এ ধরণের নক্সাদারী কাজ সুষ্ঠুভাবে করতে পারলে সার্থক-সুন্দর সৃষ্টির জন্য চামড়ার কাজের শিল্পী সুখ্যাতিলাভ করবেন প্রচুর এবং আনন্দও পাবেন রীতিমত।

যাই হোক, এবারে এই পর্য্যন্তই আলোচনা করলুম। এরপর উড়িষ্যা ও রাজস্থানের লোক-শিল্পের ধারানুসারে নতুন কয়েকটি নক্সা পরিবেশন করার ইচ্ছা রইলো। আপাততঃ, ঘর-সংসারের আরো অন্য দু'একটা বিষয় আলোচনা করা যাক!

শুধু শিল্প-কাজেই নয়, সুগৃহিণীর গুণের আরো পরিচয় পাওয়া যায় তাঁর নিজের এবং স্বামী-পুত্র-কন্যার সুরুচি ও শালীনতা-সম্পন্ন পোষাক-পরিচ্ছদ ব্যবহার করা দেখে। বিলাতী নানান পত্রিকায় নিত্য প্রকাশিত হয় ওদেশী নর-নারী এবং ছেলেমেয়েদের সুন্দর সুন্দর

ফ্যাসানের সুরুচিকর পোষাক-পরিচ্ছদ ও বেশভূষা-প্রসাধনের বহু রকম নক্সা আর নির্দ্দেশ আলোচনা। আমাদের দেশেও আজকাল অনেকেই এ বিষয়ে বিশেষ উৎসাহ-অনুরাগ দেখা যাচ্ছে। তাই এই বিভাগে নিয়মিতভাবে নতুন ফ্যাশানের বেশ-ভূষার নক্সা আর আলাপ-আলোচনার আয়োজন করবার ইচ্ছা আছে।

এ মাসে দুটি নক্সা দেওয়া হলো—একটি মহিলাদের

ব্লাউজের প্যাটার্ণ এবং আরেকটি ছোট মেয়েদের উপযোগী ফ্রকের ডিজাইন্। এ দুটি প্যাটার্ণ সুতি, রেশম এবং পশম—সব রকম কাপড়েরই উপযোগী।

এই নক্সাগুলি আমাদের পাঠিকা-মহলে সমাদর লাভ করলে আমরা বিশেষ উৎসাহিত হবো এবং এ সম্বন্ধে আপনাদের মতামত জানতে পারলে আমরা উত্তরোত্তর আরো নানা বিষয়ের আলাপ-আলোচনা চালানোর আয়োজন করবো।

"মিষ্টি-চপ্"

উপকরণ—কাঁচা মুগের ডাল, আলু, তেল, লবণ, জিরে, লঙ্কা, গরম মশলা, বাদাম, কিস্‌মিস্, আদা, চিনি ও অল্প আটা।

প্রথমে ডালগুলি ঝেড়ে বেছে নিতে হবে। তারপর ডালগুলি কড়াতে ভাল করে ভেজে নিয়ে এমন অল্প পরিমাণে জল দিতে হবে, যাতে করে ডালগুলি ভালভাবে সিদ্ধ হয়, অথচ জল থাকবে না একটুও। এইবার ডালগুলি নামিয়ে ঠাণ্ডা হতে দিন। তারপর শুকনো কড়ায় জিরে ও লঙ্কা ভেজে নিয়ে গুঁড়িয়ে রাখুন। এবার আলুগুলি সিদ্ধ করতে দিন। সিদ্ধ হয়ে গেলে, নামিয়ে খোসা ছাড়িয়ে বেশ ভাল করে চট্‌কিয়ে মেখে ফেলুন। তারপর এতে মশলা-গুঁড়ো, বাদাম, কিস্‌মিস্, অল্প চিনি, আদাবাটা, গরম মশলা ও পরিমাণ মত লবণ দিয়ে মেখে রেখে দিন। এই হ'ল চপের 'পুর।'

তারপর ডালগুলির সঙ্গে অল্প দুটি আটা দিয়ে, অল্প পরিমাণে ঐ মশলা, লবণ ও মিষ্টি দিয়ে ভাল করে মেখে নিন। এবার এই ডালমাখা অল্প করে হাতে নিয়ে ছোট ঠোঙার মত তৈরি করে তার ভেতরে ঐ আলুর পুর দিয়ে আপনার পছন্দ মত আকার তৈরি করে করে রাখুন। তারপর সবগুলি তৈরি হয়ে গেলে, কড়াতে করে ঘিয়ে (তেলে) ভেজে নিন। তাহলেই "মিষ্টি চপ্" তৈরি হয়ে গেল। এখানে একটি কথা বলে রাখা ভাল, মশলা বা লঙ্কা আপনাদের

রুচি মত কম-বেশী ব্যবহার করতে পারেন। আর ইচ্ছা হলে আলু-মাখার সঙ্গে পিয়াজের রসও দিতে পারেন। ইহা একটি সত্যিই চমৎকার "চপ"। খেয়ে এবং প্রিয়-জনকে পরিবেশন করে খুবই আনন্দ পাবেন।

তাল-বসা

উপকরণ—তাল (মাঝারি সাইজের) ১টী, নারকেল ১ মালা, চিনি (চায়ের চমচের ৩ চামচ), চূণ আধ চামচ, ঘি অল্প পরিমাণে এবং কড়াপাকের সন্দেশ ২টী।

এখানে আমি একটা মাঝারি সাইজের তালের মত পরিমাণ দিলাম। অর্থাৎ তাল-মাড়ি আধসের থেকে তিন পোয়ার মত। কিন্তু তাল-মাড়ির পরিমাণ মত উপরি উক্ত জিনিসগুলিও কম-বেশী করে নিতে হবে।

প্রথমে তালটী ভেঙে চেঁচে বা মেড়ে নিতে হবে। তারপর সেই তাল-মাড়ি থেকে তালের আঁশ বা শুঁয়াগুলি বেশ ভালভাবে বেছে নিতে হবে একটা চামচ মাড়ির ভেতর ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে (কিম্বা একটি নতুন গামছায় করে ছেঁকে)। তারপর এই ভাবে সব আঁশ বাছা হয়ে গেলে, তার সঙ্গে নারকেল মালাটী কুরুণীতে কুরে নিয়ে দিয়ে দিন এবং চূণ ও চিনি দিয়ে এক সঙ্গে সব ৫ মিনিট ধরে ভাল ভাবে মেখে নিন। তারপর একটা পাথরের থালা ধুয়ে নিয়ে ঘি মাখিয়ে নিন। এখন তাতে ঐ মাখা তাল-মাড়িটা বেশ সমানভাবে ঢেলে দিন এবং ওপরটা আর একবার হাত বুলিয়ে বা একটা চামচ দিয়ে সমান করে দিন। লক্ষ্য রাখবেন পাথরের উপর তাল-মাড়ি কোনখানে একটা রুল পেনসিলের চেয়ে যেন বেশী মোটা না হয়। তাহলে নাও বসতে পারে। তারপর একটা ধামা বা গামলা তার উপর উপুড় করে চাপা দিয়ে রেখে দিন। যেন কোন দিকে ফাঁক না রয়। অর্থাৎ পাথরের থালার চেয়ে ঢাকনাটা যেন বড় হয়। ৩।৪ ঘণ্টা ঢাকা থাকার পর, ঢাকা খুলে ছুরি দিয়ে আপনার পছন্দ মত বরফি বা অন্য কোনরূপ সাইজ করে কেটে সন্দেশ গুঁড়ো তার উপর ছড়িয়ে দিয়ে চায়ের প্লেটে করে খেতে দেবেন। মনে রাখবেন, পাত্রান্তরে "তাল-বসা" বেশীক্ষণ ভাল থাকবে না।

—শ্রীমতী রাণী চক্রবর্ত্তী
(চন্দননগর)

অপরূপের হাট

প্রফুল্ল রায় ॥

রূপের হাট ঘরে ঘরে। রসের হাট মনে মনে।

কিন্তু অপরূপের হাট? সে কোথায়? সে কেমন?

রূপ তো ঠাট করে দেখাবার জিনিস। কিন্তু অপরূপ?

চোখ মেললেই রূপ। তা সে রূপের কত বাহার, কত জলুস! কেউ সুরূপ, কেউ কুরূপ, কেউ বিরূপ। কিন্তু অপরূপ কে?

রূপ দেখে তো সবাই পাগল। রূপে কে না মজে! রূপ কে না ভজে! রূপের স্তুতি, রূপের বাখান সবখানে।

রূপ দেখে চোখ ভরে। কিন্তু মন ভরে কিসে?

চোখ মেললে তো রূপ। কিন্তু চোখ বুঁজলে?

রূপের মধ্যেই তো মানুষ পরমকে খুঁজে খুঁজে বেড়ায়। এই পরমই তো অপরূপ। অপরূপকে পাওয়াই তো পরম পাওয়া।

রূপসাগরের ঘাট বড় পিছল। সে ঘাটে অনেক ভয়। সেখানে মন বিকল হ'ল তো পা-ও টলল।

রূপের হাটে কেউ পায়, কেউ পায় না। কিন্তু অপরূপের হাটে?

সেখানে ভয় নেই, সংশয় নেই। চোখ বুঁজে শুধু হাত পাতো। সেখানে হাত পাতলেই মুঠি ভরে যায়।

রূপের বড় ধন্দ, বড় জ্বালা। রূপের হাটে কেউ বিকোয়, কেউ বিকোয় না। কারো দাম চড়া, কারো দাম কানা-কড়িও না।

কিন্তু অপরূপের হাটে?

সেখানে সব সমান। সব এক দাম। সেখানে জ্বালা নেই, দুঃখ নেই, ধন্দ নেই, মাতামাতি নেই, দরাদরি নেই। না পাওয়ার আক্ষেপ নেই। সেখানে শুধু পাওয়ার আনন্দ।

আনন্দই তো বড় কথা।

অপরূপের হাট নিয়ত আনন্দে বিভোর হয়ে আছে।

অপরূপের হাট।

কেউ যদি বলে, 'এ আবার কী নামের ছিরি! এ নামের হাট আছে নাকি কোথাও?'

তা হলে বলতে হয়, 'অপরূপের হাট যেমন অপরূপ, তার নামও তেমনি।'

কেউ যদি বলে, 'অপরূপের হাট বসেছে কোথায়?'

তা হলে বলতে হয়, 'এ হাট বসে নি কোথায় ?'

অপরূপের হাট তো বিশেষ কোন হাট নয়। সে নির্বিশেষ। সে একটা প্রতীক মাত্র।

মানুষ যে এত কাঁদে, এত আক্ষেপ করে, তা কিসের জন্যে? রূপ থেকে অপরূপে পৌছবার জন্যেই তো। অপরূপকে পাবার জন্যেই তো।

রূপের মধ্যেই রয়েছে অপরূপ। আর এই অপরূপের হাট রয়েছে সবখানে। স্থল-জল-মানুষ, পৃথিবীর সব কিছু জুড়ে।

পৃথিবী খুব বড় কথা। ছোট কিছু দিয়েই ধরা যাক।

ধরা যাক, এই চিত্তিরগঞ্জেই অপরূপের হাট বসেছে।

দুই

বছরের তৃতীয় ঋতুটি এখন যায় যায়।

ওপরে ঝাঁকে ঝাঁকে সরালি পাখি ওড়ে। আরো ওপরে বকের পাখার মত সাদা সাদা, ছেঁড়া ছেঁড়া ছন্নছাড়া মেঘ ভেসে বেড়ায়।

আকাশের রং ঝকঝকে নীল। এ দেশে বলে মাজা নীল।

নীচে ঘোলা ঘোলা, গেরুয়া জলের নদী। নদী এখন স্থির, শান্ত।

ক'দিন আগেও নদীতে মাতামাতি ছিল, ঢলানি ছিল। এখন ঢল মরেছে। গেরুয়া জলে টান ধরেছে।

বছরের দ্বিতীয় ঋতুতে নদীতে যৌবন আসে। তৃতীয় ঋতুর শেষে সেই যৌবন মরতে শুরু করে।

নদীর নাম ঢলানি। ঢলানি নদীর ঠিক পার ঘেঁষে চিত্তিরগঞ্জ। চিত্তিরগঞ্জ বাজার-বন্দর জায়গা।

একটানা লম্বা লম্বা টিনের ঘর। এগুলো পাইকের মহাজনদের আড়ত। টিনের চাল আর কাঠের পাটাতনে পাকা ব্যবস্থা। এখানে রাখি মালের কারবার।

আড়তগুলোর লাগোয়া কাতারে কাতারে গোলপাতার দোচালা। এগুলো অস্থায়ী আস্তানা। এখানে রোজ কাঁচা মালের দোকান বসে।

রোজ হাট বসে চিত্তিরগঞ্জে।

এটা দক্ষিণের আবাদ অঞ্চল। এখানে চিত্তিরগঞ্জের হাটটাই একমাত্র হাট। ক্ষ্যাপা বাতাস যেন চারপাশের অর্থাৎ বাজিতপুর-নামথানা-দ্বারিকনগর—সব জায়গার সব মানুষকে তাড়িয়ে তাড়িয়ে এখানে এনে ফেলে। আবাদের বাসিন্দাদের এখানে না এসে গতি নেই।

কিছু কিনতে হলেও চিত্তিরগঞ্জে আসতে হবে। বেচতে হলেও আসতে হবে। এই হাটের সঙ্গে আবাদের মানুষের বাঁচা-মরার সমস্যা বাঁধা।

রোজকার মত আজও হাট বসেছে।

ফড়ে-পাইকের-দালাল-দোকানী-খদ্দের—নানান জাতের মানুষে চিত্তিরগঞ্জের হাট গিজ গিজ করছে।

হাটের ঠিক নীচেই মাঝিঘাটা।

এখান থেকে কাকদ্বীপ, কুলপী, কুঁকড়োহাটি, গেও-খালির বোট ছাড়ে।

পারে অর্থাৎ এক হাঁটু থকথকে কাদায় দাঁড়িয়ে চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে সওয়ারী ডাকছে বিলাস, 'যাবে গো কুঁকড়োহাটি—যাগে গো—হেই—'

বিলাসের কাজটা বিচিত্র। কুঁকড়োহাটির বোটের সে মালিক না, মাঝি না। তার কাজ হল চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে সওয়ারী ডাকা। কোন রকমে চল্লিশটা সওয়ারী জুটিয়ে বোটের খোলে পুরতে পারলেই সে দায় থেকে খালাস। শুধু খালাসই না, খুশীও।

চল্লিশটা সওয়ারী জোটাতে পারলে নগদ একটি টাকা পাবে বিলাস। চল্লিশজন না জুটলে টাকাটা থেকে হিসেব মত মজুরি কাটা যাবে।

আজকাল দক্ষিণের এই আবাদে লোক বাড়ছে। চল্লিশটা সওয়ারী জুটে যায়ই। মজুরি কোনদিনই বড় একটা কাটা যায় না বিলাসের।

সকাল-বিকেল—কুঁকড়োহাটির বোট দিনে দু-বার পাড়ি মারে। দুই পাড়িতে দুটি টাকা কামায় বিলাস। এই তার সারাদিনের রোজগার।

বিলাস চিল্লাচ্ছে, 'যাবে গো, কুঁকড়োহাটির মানুষ—থরথর এসো। এক্ষুনি বোট ছাড়বে—থরথর—হেই কুঁকড়োহাটি-ই-ই-ই—'

এখন বিকেল।

এর ভেতরেই জন কুড়ি সওয়ারী জুটিয়ে ফেলেছে

বিলাস। আর কুড়িজন জোটাতে পারলেই আজকের মত কাজ শেষ।

একটু পরেই হাট ভাঙবে।

গলা ফাটিয়ে বিলাস চেঁচাচ্ছে, 'এই ছাড়ল—এক্ষুণি ছেড়ে দেবে। পা চালিয়ে থরথর এসে পড়—'

সন্ধ্যের ঠিক মুখে মুখে চিত্তিরগঞ্জের হাট ভেঙে গেল।

এখন সামনের নদী আবছা, অস্পষ্ট হয়ে গিয়েছে। ধোঁয়ারঙের একটা পর্দা আকাশ-নদী—সব কিছুকে ছেয়ে ফেলেছে।

আরো কুড়িজন অর্থাৎ মোট চল্লিশজন সওয়ারী জুটিয়ে কুকড়োহাটির বোটে পুরে দিল বিলাস।

একটু পর বোট ছেড়ে দিল।

নদীর পার থেকে দৌড়তে দৌড়তে হাটে উঠে এল বিলাস।

মদন ঢালী মস্ত বড় কারবারী। তার ধান চালের কারবার। তামাকের কারবার। গরু-ছাগলের কারবার। এ ছাড়া কুঁকড়োহাটি কুলপীতে তার সাতখানা বোট ভাড়া খাটে। সেই সব বোটেরই একটাতে হেঁকে হেঁকে সওয়ারী জোটায় বিলাস।

সরাসরি মদন ঢালীর ধানের আড়তে এসে উঠল বিলাস।

সামনে হ্যারিকেন জ্বালিয়ে খেরো খাতায় হিসেব কষছে মদন ঢালী।

ভয়ে ভয়ে বিলাস ডাকল, 'মহাজোন—'

তেরছা চোখে একবার তাকাল মদন। তার তাকানোটা অদ্ভুত। পুরোপুরি চোখ মেলে না সে। অর্ধেক বুঁজে অর্ধেক মেলে ভুরু দুটো কুঁচকে রাখে।

মদন ঢালীর চেহারাটা থলথলে, মাংসল। বিরাট ভুঁড়িটা লোমে ভরা। নাকটা যেন মাংসের একটা ঢিবি। নাকের ভেতর থেকে পাঁশুটে রঙের কয়েকগাছা রোঁয়া, বাইরে বেরিয়ে পড়েছে।

লোকটার চামড়া খুব উর্বর। কানের লতি, ঘাড়, গলা, পিঠ—সব জায়গায় লোম গজিয়েছে। কিন্তু আশ্চর্য! মাথায় মস্ত এক টাক। মনে হয়, একদম চাঁচা। একটা চুলও নেই।

পরণে হাঁটু পর্যন্ত ঠেঁটি কাপড় আর ফতুয়া। ফতুয়াটা ভুঁড়ির কাছে বেড় পায় না। সেখানকার বোতামটা সব সময় খোলাই থাকে।

মদনের আকারটা যেমন বিরাট, গলার আওয়াজটা সেই অনুপাতে বেজায় সরু, মিহি। সরু কিন্তু তীক্ষ্ণ, ধারাল।

মদন বলল, 'বোট ছেড়ে গেচে?'

মুখে কিছু বলল না বিলাস। ঘাড় কাত করে সায় দিল। আসলে মদন ঢালীর সামনে এলেই হাত-পা পেটের ভেতর সেঁদিয়ে যায় তার। ভয়ে জিভ জড়িয়ে যায়। গলা দিয়ে আওয়াজ বেরোয় না।

মদন আবার বলল, 'ক'জন সওয়ারী হয়েছে?'

'দু কুড়ি।'

'ঠিক তো?'

বিলাস মাথা নাড়ল। বলল, 'হ্যাঁ।'

'এই নে তোর মজুরী।'

টাকা-সিকি-আধুলি—সামনের দিকে সব থাকে থাকে সাজানো রয়েছে। একটা কাঁচা টাকা তুলে ছুঁড়ে দিল মদন।

টাকাটা কুড়িয়ে বাইরে বেরুতে যাবে, মদন ডাকল, 'আই বিলেস—'

বিলাস থমকে দাঁড়াল।

মদন বলল' 'শুনলম, যমুনার ওখেনে রোজ যাস।'

'হ্যাঁ।'

'কী করিস সেখেনে?'

'যমুনা মাসি য্যাখন গান গায় ত্যাখন কত্তালে ঠেকো দি।'

'অ'—অস্ফুট একটা শব্দ করল মদন। তারপর এদিক-সেদিক ভাল করে তাকিয়ে পাটকিলে রঙের খস-খসে জিভটা বার করে পুরু পুরু ঠোঁট দুটো চাটল। ফিস ফিস করে বলল, 'কাছে আয়।'

মদনের রকম সকম দেখে আরো ভয় পেয়ে গেল বিলাস। কাঁপা-কাঁপা পায়ে সে এগিয়ে এল। গলা শুকিয়ে কাঠ হয়ে গিয়েছে। শুকনো, ভরানো গলায় সে বলল, 'কী কইচেন?'

এমনিতেই গলাটা সরু। সরু গলা খাদে চোকাল

মদন, 'যমুনার ওখেনে রোজ বেশ গাওনা-বাজনা হয়, না রে?'

'হ্যাঁ।'

'কে কে যায়?'

'অনেকে যায়। সুচাঁদ যায়, ধনঞ্জয় যায়, লোটন যায়, আমি যাই। সন্‌ঝে (সন্ধ্যে) বেলায় যমুনা মাসির ওখেনে গে আমরা জুটি।'

'হুঁ—'

হুস করে একটা শব্দ করে মদন ঢালী।

অন্য সময় চোখ দুটো অর্ধেক বুঁজে অর্ধেক মেলে, ভুরু কুঁচকে বিলাসের দিকে তাকায় মদন। আশ্চর্য! এখন পুরোপুরি চোখ মেলে তাকিয়েছে। হ্যারিকেনের তেজী আলোতে চোখ দুটো চক চক করছে।

বেশ খানিকটা চুপ। তারপর মদনই প্রথম কথা বলল, 'হ্যাঁ রে বিলেস—'

'কী কইচেন মহাজন?'

'যমুনার মেয়েটা নাকি ঘাটাল থেকে ফিরেচে?'

'কে কইল?'

বিলাস চমকে উঠল।

অন্য সময় হ'লে মদন খেঁকিয়ে উঠত। কিন্তু এখন নরম গলায় বলল, 'যেই বলুক, এসেছে কিনা বল্—'

'হ্যাঁ—'

বিলাসের গলা দিয়ে আওয়াজ বেরুল কি বেরুল না।

'নাম কীরে ছুঁড়িটার? আঁই বিলেস—'

খসখসে জিভ বার করে পুরু ঠোঁট দুটো সমানে চাটছে মদন।

এদিক-সেদিক তাকালো বিলাস। মদনের আড়তে কেউ নেই। শুধু সে আর মদন। এমনিতেই মদনের কাছে এলে ভয়ে হাত-পা তার পেটে ঢুকে যায়। এখন ভয়টা এত বেড়েছে যে, শ্বাস টানতে কষ্ট হচ্ছে। হাত-পা —সারা গা কাঁপছে। নাকের ডগায় কণা কণা ঘাম ফুটে বেরিয়েছে। মনে মনে বিলাস বলে, 'হেই মা গোসানী, কী গেরোতে পড়লম?'

মদন খেঁকিয়ে উঠল, 'আঁই বিলেস; অমন চুপ মেরে আচিস যে? যমুনার মেয়েটার নাম কী?'

'পদ্ম।'

'নামের তো বেশ ছিরি আছে। দেখতে কেমন? ছিরি ছাঁদ আছে?'

একটু থামে মদন। কি যেন ভাবে। তারপর বলে, 'বছর দুই আগে দেখেছিলুম ছুঁড়িটাকে। ত্যাখন তো বেশ ডেঁসিয়ে উঠেছিল। পুরো দু বচ্ছর আর দেখিনি। ছুঁড়িটাকে ঘাটালে সরিয়ে দিয়েছিল যমুনা। যাক ও কথা।'

চোখ নাচিয়ে নাচিয়ে, খিসখিসিয়ে খুব একচোট হাসল মদন। আবার নতুন উৎসাহে শুরু করল, 'দু বচ্ছরে ছুঁড়িটা বেশ বড়সড় হয়ে উঠেছে, কী বলিস বিলেস?'

হাঁ-না—কিছুই বলল না বিলাস। কান দুটো তার ঝাঁ ঝাঁ করছে।

মদন বলল, 'পদ্ম কী যমুনার সঙ্গেই আছে?'

'হ্যাঁ।' বিলাসের গলাটা ফিসফিস করল।

কি ভেবে মদন বলল, 'আচ্ছা, তুই এখন যা।'

মদনের আড়তে যেন হাওয়া নেই। এতক্ষণ শ্বাসটা চেপে চেপে আসছিল। বাইরে বেরিয়ে বুক ভরে হাওয়া টেনে বাঁচল বিলাস।

তিন

চিত্তিরগঞ্জ শুধু বাজার-বন্দরই না। এর অন্য মহিমা আছে।

ধান-চালের আড়তগুলোর পেছনে একটা বসতি গড়ে উঠেছে। সারি সারি ঘর। কোনটা গোলপাতার, কোনটা টিনের।

এই বসতিটা অনেক কালের। চিত্তিরগঞ্জ বাজারের জন্মের সঙ্গে সঙ্গে এরও জন্ম। এখানকার যারা বাসিন্দে, তাদের কেউ বাপের কুল, কেউ শ্বশুরের কুল মজিয়ে এসে উঠেছিল।

এখানকার যারা বাসিন্দে, তারা রূপ এবং দেহকে পণ্য করেছে। এখানে ঘরে ঘরে রূপের হাট, রসের হাট।

এখানে একবার যে এসেছে, সে-ই ডুবেছে, সে-ই মজেছে।

এককালে এখানকার বাসিন্দেদের সবাই ছিল রূপা-জীবা। হাল আমলে কিছু কিছু ব্যতিক্রম ঘটেছে। শুধু

জীবনের স্বাদ পেয়ে কেউ কেউ পুরুষ সঙ্গী জুটিয়ে সংসারী হয়েছে।

রসিক সুজনরা বলে, লোকে বলে কামিনী পাড়া।

কামিনী পাড়াটার চরিত্র অদ্ভুত। এখানকার আধা-আধি বাসিন্দে রূপাজীবা। বাকী অর্ধেক গৃহস্থ সংসারী মানুষ। তারা জীবনকে পুরো না পারলেও অনেকখানি সৎ এবং সুস্থ করে ফেলেছে।

এই কামিনী পাড়ারই একজন হল যমুনা। আর তার মেয়ে পদ্ম।

এককালে সারা আবাদের লোক যমুনা বলতে উন্মাদ ছিল।

কেউ যদি বলত, 'যমুনাকে চেন?'

যাকে বলা হত, সে জবাব দিত, 'চিনবুনি, বল কী গো খুড়ো? মাগী সারা আবাদের মাথা খাচ্ছে!'

রূপ! হ্যাঁ, তা রূপ বটে একখানা।

চোখ মেললেই তো রূপ। কিন্তু অমন রূপ কপালের জোর থাকলে, আগের জন্মের সুকৃতি থাকলে চোখে পড়ে।

অমন রূপ রাজা-বাদশার ঘরে নেই। বামুন-কায়েত-বড় মানুষের ঘরে নেই। অমন রূপ শহরে-বন্দরে মেলে না।

নকুড় গায়েনের গোলদারি দোকান। মাল কিনতে সে একবার কলকাতা গিয়েছিল। ফিরে এসে প্রথম যে কথাটি সে বলেছিল, তা হল, 'না বাপু, এই চোখে তো কম দেখলম নি। স্বগ্‌গ-মর্ত্ত-পাতাল—যেথেনেই খোঁজ, এ রূপ পাবে নি।'

যমুনা আবাদ অঞ্চলের গর্ব; আবাদের মানুষের গৌরব।

সেই যমুনার হঠাৎ কী যে মতি হ'ল! কামিনী পাড়ার জীবনে তার অরুচি ধরে গেল।

কামিনী পাড়া ছেড়ে সে গেল না। এক টেরেতে একটা বড় টিনের ঘর তুলে সংসার পাতল।

সংসার! হাঁ সংসারই তো! মজার সংসার।

যমুনা রূপাজীবা। রূপ বেচে তার দিন চলত। রূপের টানে যারা তার কাছে আসত, তাদের সম্বন্ধে কোন মোহ, কোন আসক্তিই তার ছিল না। দেহ বিকিকিনির সম্পর্ক ছাপিয়ে অন্য কোন গূঢ়, গোপন সম্পর্ক তাদের সঙ্গে গড়ে উঠত না।

কিন্তু আশ্চর্য! একদিন ফাঁদে পড়ল যমুনা। যে নারী দেহের মাংস বেচে, সুন্দর সুঠাম মাংস ছাড়া যার কিছুই নেই, মনটা যার মৃত, আশ্চর্য, একদিন তার মনের সাড়া পাওয়া গেল।

সুন্দর শরীরের কঠিন, সুঠাম মাংসের মধ্যে এতদিন কোথায় যে একটি মন লুকিয়ে ছিল, যমুনা টের পায়নি। যখন টের পেল, অসহ্য আবেগে, খুশিতে কেঁপে উঠল।

কুঁকড়োহাটি থেকে মথুর সাঁইদার রোজ আসত চিত্তিরগঞ্জে। মথুর মস্ত লোক। তার মাছের কারবার।

সারাদিন হাটে মাছ কেনাবেচা সেরে সন্ধ্যের ঠিক মুখে মুখে পেট ভরে তাড়ি গিলে যমুনার কাছে আসত মথুর সাঁইদার।

রোজ তাকে ফিরিয়ে দিত যমুনা, 'ঘরে ফের মিনসে। বেশি রস থাকলে অন্য কারো কাছে যাও। আমি উ-সব ছেড়ে দিইচি।'

'কী যে বলিস তোর মাথার ঠিক নি যমুনা! তোরা যদি সতী হয়ে যাস্ আমরা কোন চুলোয় মুখ গুঁজব।'

'কোন চুলোয় মুখ গুঁজবে, তা কি আমায় বলে দিতে হবে!'

'হ্যাঁ মাইরি!'

'ড্যামনা কুথাকার, চোখের অরুচি। বেরো বেরো।' যমুনা ক্ষেপে উঠত।

'গাল দে মাইরি, মেরে মেরে পাট করে ফ্যাল, তবু কুকুর বেড়ালের মতন তাড়িয়ে দিস নি।'

বিড় বিড় করে যমুনা বলত, 'কেম্নো কুথাকার, ড্যাঙার কামট কুথাকার!'

এত যে গালাগালি খেত, তবু শিক্ষা নেই মথুরের। রোজ সন্ধ্যেয় একবার সে হানা দিতই।

বেশিদিন আর মথুরকে ঠেকিয়ে রাখতে পারল না যমুনা। যার রক্তে কামিনী পাড়ার বিষ মিশে আছে, কদ্দিন আর সে মথুরকে ঠেকিয়ে রাখতে পারে।

একটি মাত্র পুরুষই ঘরে আসে যমুনার। মাত্র একজন পুরুষ। তাকে নিয়েই সে মেতে উঠল।

তিনকুলে কেউ নেই মথুরের। বউ না, ছেলে না, মা-বাপ-ভাই—কেউ না। মাছের কারবার আর যমুনা ছাড়া কেউ নেই তার।

মথুরের ওপর কেমন যেন মায়া পড়ে গিয়েছিল যমুনার। রোজ রোজ যে মানুষটা তার কাছে আসে, তার ওপর মায়া পড়াই তো স্বাভাবিক।

বর্ষার মরসুমটা আর কুঁকড়াহাটি যেত না মথুর। এই চিত্তিরগঞ্জেই কোন পাইকেরের আড়তে পড়ে থাকত।

এ-সময়টা নদীর ওপারে মাছ মেলে না। এপার থেকে মাছ কিনে শহরে চালান দিত মথুর।

পুরো দিনটা মাছের ধান্দাতেই কাটত।

সেবার খুব সুবিধে হয়ে গিয়েছিল মথুরের। পাই-কেরের আড়তে কাটাতে হত না। যমুনার ঘরেই সে আস্তানা গেড়েছিল।

যমুনা বলত, 'হ্যাঁ গো মিনসে, তুমার তো তিনকুলে কেউ নি।'

'না।'

'কেউ য্যাখন নি, ত্যাখন আমার কাছেই থাক।'

'তোর কাচেই তো রইচি।'

'ত্যামন থাকা লয়। চের কালের জন্যে থাক।'

পেট ভরে এন্তার তাড়ি গিলেছিল মথুর সাঁইদার। নেশার মুখে সে বলেছিল, 'রইব, রইব। তোর কাচে না থাকলে থাকব কুথায়? য্যাত কাল পেরান রয়েছে, তোর কাচেই কাটাব যমুনো।'

সুখে, আনন্দে, সোহাগে উপচে পড়েছিল যমুনা। ফিস ফিস করে সে বলেছিল, আমার খুব সাধ, বিয়ে করি। সোয়ামী ছেলে-পুলে নিয়ে ঘরসংসার করি।

নেশার মুখে মথুর বলেছিল, বিয়েই হ'ল আমাদের।'

'সত্যি?'

'সত্যি ভগমানের দিব্যি।'

যমুনার সব হ'ল। ঘর হ'ল, সংসার হ'ল। এমন কি যা সে চেয়েছিল, অর্থাৎ জীবনে একটি মাত্র মরদ, তা-ও জুটল। এমন কি পেটে তার বাচ্চা এল।

সুখে বুকের ভেতরটা তির তির করে কাঁপত যমুনার।

তখন তার বয়েস আর কত। একেবারে কাঁচা বয়েস, ভরা বয়েস। জীবনের হাল-চাল-চরিত্র কতটুকুই বা বুঝে-ছিল যমুনা!

কথায় বলে, সুখের দিনের পরমায়ু বেশি দিন না।

একদিন যমুনা বুঝল, মথুর সাঁইদারের পিরীত মস্ত এক ধাপ্পা, বিরাট এক ফক্কিকার। বর্ষার মরসুম যেই কাটল, নদীর ঘোলা ঘোলা গেরুয়া জলে যেই টান ধরল, চিত্তির-গঞ্জ ছেড়ে মথুর সাঁইদার রওনা হ'ল।

খুব কেঁদেছিল যমুনা। পুরো তিনদিন সে খায় নি। মথুরের পা ধরে কেঁদে কেঁদে সে বলেছিল, 'আমাকে ছেড়ে যেও নি।'

ভেঙিয়ে ভেঙিয়ে মথুর বলেছিল, 'খুব যে সতী হইচিস! বাজারে মাগীর আবার সতীগিরি! পা ছাড়।'

একটা মরসুম একসঙ্গে কাটিয়েই নেশা চটে গেছে মথুর সাঁইদারের।

ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কেঁদেছিল যমুনা, 'আমাকে ছেড়ে যেও নি সাঁইদের। তুমার ছেলে রয়েছে আমার পেটে। তুমার এট্টুস মায়াও হয় না।'

'অমন কত শ্যাল-কুকুর জন্মাচ্ছে রোজ! শ্যাল-কুকুরের জন্যে আবার মায়া।'

মথুর সাঁইদারকে ঠেকিয়ে রাখা গেল না। চিত্তির-গঞ্জ ছেড়ে কুঁকড়োহাটি চলে গেল সে। যাবার সময় এক মরসুম এক সঙ্গে কাটাবার ফসল হিসেবে যমুনার পেটে একটা বাচ্চা রেখে গেল। সেই বাচ্চাই পদ্ম।

আসল কথাটা বুঝতে ভুল করেছিল যমুনা, কামিনী পাড়ার বাসিন্দের সঙ্গে এক রাত দু রাত, বড় জোর একটা মরসুম কাটানো যায়। এমন কি তার পেটে একটা বাচ্চার জন্মও দেওয়া যায়। কিন্তু তাকে নিয়ে কেউ সারাজীবন কাটায় না।

মথুর চলে যাবার পর একদিন পদ্ম জন্মাল।

পৃথিবীর নোংরামির সঙ্গে, কামিনী পাড়ার জীবনের

যাঁরা স্বাস্থ্য সম্বন্ধে সচেতন তাঁরা সবসময় লাইফবয় সাবান দিয়ে স্নান করেন।
খেলাধূলোই বলুন বা কাজকর্ম্মই বলুন আমরা কখনই ধূলোময়লার
নিরাপদ নয়। আর ময়লা বহন করে রোগের বীজানু যা সবসময় আপনার স্বাস্থ্যের পক্ষে ক্ষতি-কর। লাইফবয় সাবান এই বীজানুগুলি ধুয়ে সাফ করে দেয় এবং আপনার স্বাস্থ্য সুরক্ষিত রাখে।
প্রত্যেকদিন লাইফবয় সাবান দিয়ে স্নান করে আপনার স্বাস্থ্য সুরক্ষিত রাখুন—
এটি আপনাকে এত ঝরঝরে করে
LIFEBUOY
SOAP
হিন্দুস্থান লিভার লিমিটেড, কর্তৃক প্রস্তুত।
L/P. 2-X52 BG
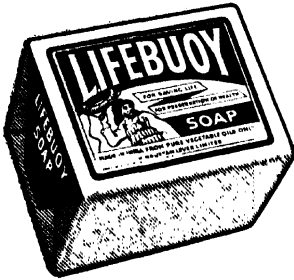
সঙ্গে অনেক যুঝেছে যমুনা। কামিনী পাড়ার জীবনকে সে এড়াতে চেয়েছিল। কিন্তু পারল না।

পেট কোন কথা মানে না। পেট বড় অবুঝ। যত দিন পারত, কামিনী পাড়ার জীবনকে দূরে ঠেকিয়ে রাখত যমুনা। কিন্তু পেটের জ্বালা যখন অসহ্য হয়ে উঠত, তখন মাঝে মাঝে রাত্রির অন্ধকারে নেশাখোর কামটগুলোকে ঘরে এনে ঢোকাতে হত যমুনার। না ঢুকিয়ে উপায় থাকত না।

এমন করেই দিন-মাস-বছর এবং জীবন কাটছিল।

যমুনার অতীতটা মোটামুটি এই রকম।

চার

বিলাস যখন এসে পৌছল, আসর বেশ জমে উঠেছে।

যমুনার ঘরের উঠোনে একটা গোলপাতার দোচালা। দোচালাটার বেড়া নেই। দো-চালাটার তলায় তিনটে হ্যারিকেন জলছে। হ্যারিকেনের কাচগুলো অনেক কাল সাফ করা হয় নি। লালচে ধোঁয়া ধোঁয়া, মেটে মেটে আলোতে জায়গাটা আচ্ছন্ন হয়ে আছে। কেমন যেন আবছা আবছা, অস্পষ্ট।

দো-চালার তলায় ঘেঁষাঘেঁষি করে বসেছে তিনজন। ফড়ে সুচাঁদ, কাপড়ের দোকানী ধনঞ্জয়, আর মাঝি লোটন—

মানুষের আকার বোঝা যায় কিন্তু লালচে, আবছা আলোতে তাদের চোখের ভাষা, মুখের রং বোঝা যায় না।

মানুষগুলো দলা পাকিয়ে বসে রয়েছে। সবার মাঝখানে যমুনা।

রোজই গানের আসর বসায় যমুনা। কোনদিন কীর্তন গায়, কোনদিন সখিসোনার গান।

রোজকার আসরে যমুনা হ'ল মূল গায়েন। গলাটা তার ভারি মিঠে।

যমুনা সখিসোনার গান ধরেছে:

হেই পেরাণী,
সখির অঙ্গে রূপ এয়েচে,
সখির পেরাণ খুব রসেচে,
হেই পেরাণী,
হেই গোসানী।

কোত্থেকে যেন একটা খোল জুটিয়ে এনেছে ধনঞ্জয়। খোলে চাঁটি মারতে মারতে মুখে সে আওয়াজ করে, 'টাটুম—টুটুম—টাটুম-টুটুম—'

সুচাঁদের কাঁধ পর্যন্ত লম্বা বাবরি চুল। চুল নেড়ে নেড়ে সে ঠেকো দেয়:

হেই পেরাণী,
হেই গোসানী।

বয়েস হয়েছে যমুনার। হ্যারিকেনের আলোতে ঠিক চোখে পড়ে না। কিন্তু দিনের আলোতে বোঝা যায়, মুখের চামড়ায় সরু সরু অনেক দাগ পড়েছে। সিঁথির দু-পাশ হাতড়ালে কালো চুলের ফাঁকে ফাঁকে রুপোর তার পাওয়া যাবে।

যৌবন এখনও পুরোপুরি মরে নি। কথায় বলে মেয়েমানুষের শরীর হ'ল নদীর মত। ক্ষ্যাপা ঢলের পর মধ্যম ঋতুতে নদীতে টান ধরে। নদীতে তখন ধার নেই, মাতামাতি নেই। নদী তখন স্থির।

যমুনার জীবনে এখন মধ্যম ঋতু। আবাদের মানুষ দেখেছে, কাঁচা বয়সে তার কোমর ছিল চিকন, হাত-পা-গলা-বুক—সব কিছুর ছাঁচ ছিল সুঠাম। এখন শরীরটা ভারী হয়েছে। কোমরে অযথা চর্বি জমেছে। বয়েসের ভারে দেহ এখন থলথলে। জীবনে যৌবনে ভাটির টান ধরেছে।

সব কিছুতেই বয়েসের টান ধরলেও গলাটা কিন্তু প্রথম বয়েসের মতই মিঠে, সুরেলা আর তাজা আছে যমুনার। যমুনা গাইছে:

হেই পেরাণী,
সখির অঙ্গ জরজর,
সখির পেরাণ থরথর—

গোলপাতার দো-চালাটার এক কোণে দাঁড়িয়ে যমুনাকে দেখল বিলাস, সুচাঁদকে দেখল, খোলঞ্চী ধনঞ্জয়কে দেখল; লোটনকে দেখল। কিন্তু কেউ তার দিকে তাকাল না, তাকে ডাকল না।

পা টিপে টিপে, নিঃশব্দে, নিজের অস্তিত্ব কারুকে না জানিয়ে আসরে এসে বসল বিলাস। একপাশে এক জোড়া পেতলের করতাল পড়ে ছিল। তুলে নিয়ে বাজাতে শুরু করল, 'ঝমর-ঝমর-ঝম—'

গান-বাজনার খুব সখ যমুনার। রোজ সন্ধ্যেয় গোল-পাতার ছাউনির তলায় সে আসর বসায়।

যৌবনে টান ধরার সঙ্গে সঙ্গে কেউ আর তার কাছে আসে না। তা ছাড়া কামিনী পাড়ার জীবনে তার আদৌ মোহ নেই।

রোজ সন্ধ্যেয় গোলপাতার ছাউনির তলায় যারা এসে জোটে, তারা হ'ল সুচাঁদ, ধনঞ্জয়, লোটন আর যাকে কেউ গ্রাহ্য করে না, যার দিকে কেউ তাকায় না পর্যন্ত, সেই বিলাস। চুপচাপ গুটিগুটি পায়ে আসরে ঢুকে করতাল বাজিয়ে যমুনার গানে ঠেকো দেয় বিলাস। তারপর গান যেই শেষ হয়, আসর যেই ভাঙে, সবার অলক্ষ্যে সে উঠে যায়।

সুচাঁদ-লোটন-ধনঞ্জয় আর বিলাস—এই চারজনকে নিয়ে যমুনার গানের আসর বসে। এর চেয়ে একজন বাড়তি নয়। বরঞ্চ মাঝে মাঝে কমে যায়। হয়ত লোটন এল না, কিংবা ধনঞ্জয় এল না, কিংবা সুচাঁদ এল না। কেউ না আসুক, গোলপাতার ছাউনির আসরে একজন ঠিকই হাজিরা দেবে। ঝড়-জল, বান-তুফান, ছয় ঋতু বারো মাস বিলাস আসবেই। এমন ভাবে সে আসবে আর এমন ভাবে যাবে, কেউ টের পাবে না।

আজ কিন্তু ব্যতিক্রম ঘটল।

অন্য অন্য দিন বিলাসরা চারজন ছাড়া কেউ এ মুখো হয় না। আজ মাছের কারবারী যোগেন জানা এল, কাঠের পাইকের অবিনাশ ধাড়া এল।

যমুনা বলল, 'তুমরা ?'

'হ্যাঁ আমরা—এলম। এসতে কী দোষ আচে নাকি ?'

'না-না, দোষ কী। এখেনে কারো আসতে মানা নি।'

যোগেন জানা আর অবিনাশ ধাড়া আসার পর আসর যেন জমল না। তারা দুজন হ'ল বড় কারবারী—চিত্তির-গঞ্জের মস্ত মানুষ। তাদের দেখে সুচাঁদ, ধনঞ্জয়, লোটন আর বিলাসের হাত-পা পেটের ভেতর সেঁদুতে লাগল।

খোলে চাঁটি মারতে ভুল করতে লাগল ধনঞ্জয়। গানে ঠেকো দিতে গিয়ে গলায় কাঁপুনি ধরল সুচাঁদের। বিলাসের হাত আর চলে না; করতাল-জোড়া যেন মণ দুই ভারী। এমন করে আসর চালানো যায় না।

একটু পরেই আসর ভাঙল। সুচাঁদ-ধনঞ্জয় আর লোটন চলে গেল। গোলপাতার ছাউনিটার তলায় মুখো-মুখি বসল তিনজন। যোগেন জানা, অবিনাশ ধাড়া আর যমুনা। এক কোণে পড়ে রইল বিলাস। তাকে কেউ গ্রাহ্যেই আনল না; কোন দিন তাকে কেউ গ্রাহ্যেও আনে না। বিলাস যে হাত-পা-শরীরওলা একটা আস্ত মানুষ, এই মোটা দাগের সোজা কথাটা সবাই যেন ভুলে যায়।

যোগেন জানা আর অবিনাশ ধাড়া বলল, 'এদিক দিয়ে যাচ্ছিলম, তুমার গানের আওয়াজ পেয়ে ঢুকে পড়লম।'

যমুনা জবাব দিল না।

'বেড়ে গলা, মিঠেন গলা। কদ্দিন ধরে তুমার গলা শুনচি। চেরটাকাল তুমার গলা এক রকমই রইল।'

'রইল নাকি ?'

'দু-জনে হাঁ-হাঁ করে উঠল, 'রইল বলে রইল! তুমায় না দেখে কেউ যদি দূর ঠেঙে (থেকে) গান শোনে ভেরোম (ভ্রম) হয়।'

'কিসের ভেরোম (ভ্রম) ?'

'মনে হয়, ডাকাবুকো যুবুতী মেয়ে গাইচে।'

'কী যে বলেন পাইকের!'

মুখ নামিয়ে অল্প একটু হাসে যমুনা। খুব আস্তে আস্তে বলে, 'সে বয়েস কী আছে! সে গলাই বা পাব কুথায় ?'

যোগেন জানা আর অবিনাশ ধাড়া মাথা নাড়ে। বলে, 'সে তুমি যাই বলো, গলা তুমার এক রকমই আচে।'

একটু চুপ।

রাত বেশ গাঢ় হয়েছে। আকাশময় পেঁজা পেঁজা মেঘ হানা দিয়ে বেড়াচ্ছে।

গোলপাতার চালাটার ওপাশে একটা উঁচু ছাই-গাদা। সেখানে দুটো বেঁটে আকারের পেঁপে গাছ খাড়া দাঁড়িয়ে আছে। পেঁপের লম্বা, সরস, সবুজ পাতাগুলো বাতাসে সরসর করছে।

ছাই-গাদাটার ওপর অন্ধকারকে আলোর সুঁচের মত বিঁধে বিঁধে জোনাকি জলছে। জলছে আর নিবছে।

যোগেন আর অবিনাশ উঠি-উঠি করেও ওঠে না। বলি-বলি করেও বলে না।

যমুনা বলল, 'রাত হয়েচে পাইকের, এবেরে ঘরে ফিরবেন তো।'

'হ্যাঁ-হ্যাঁ, ঘরে তো ফিরতেই হবে। এখুনি উঠব। তুমি তো আর ঘরে রাখবে নি। হে-হে—'

খেঁকিয়ে খেঁকিয়ে দু-জনে হাসল।

ফিস ফিস করে যমুনা বলল, 'বয়েসের সে গোন মরে গেচে গো পাইকের। ঐ সবে অরুচি ধরে গেচে।'

'হে-হে, কী যে কও!'

খুব একচোট হেসে যোগেন জানা আর অবিনাশ ধাড়া বলল, 'উ সব কথা ছেড়ে দাও যমুনা। আসল কথায় এসো।'

'আসল কথা! সি আবার কী?'

যোগেনের চোখ দুটো পিট পিট করে। অবিনাশ খরখরে, কর্কশ জিভ বার করে পুরু কালো ঠোঁট দুটো চেটে নেয়। বলে, 'পদ্ম নাকি কাল এয়েচে?'

'কে বললে?' যমুনা চমকে উঠল।

'এ খপর কী কইতে হয়। ও আপনি রটে যায়।'

ঘাড় গোঁজ ক'রে কিছুক্ষণ বসে রইল যমুনা। তারপর শুকনো, রুক্ষ গলায় বলল, 'ঘর যান পাইকের।'

'যাব যাব। ঘর তো যাবই। তার আগে কথাটা সেরে নি।'

যোগেন টেরিয়ে টেরিয়ে চায়। অবিনাশ মোটা গোঁফে তা মারতে মারতে বলে, 'পদ্ম ফুটলে তাকে কী চেপে রাখা যায়। কারো না কারো চোখে পড়বেই। কারো না কারো নাকে তার বাস যাবেই।'

হঠাৎ লাফ মেরে উঠে দাঁড়াল যমুনা। চেঁচাতে লাগল, 'যা যা, এক্ষুণি আমার ঘর থেকে বেরো। চ্যামনা ঘা-চাটা কুত্তারা। এখেনে কী? মড়াখেগোর দল, শুকুনির দল, কামটের পাল—ভাগাড়ে যা।'

অবিনাশ আর যোগেন উঠে পড়ল। শাসাতে শাসাতে বলল, 'বাজারে নাম লিখিয়েচিস। অত সতীগিরি কীরে মাগী—আচ্ছা, তোর তেল মজাবো।'

'যা চ্যামনারা, এক্ষুণি বেরো—দেরি করলে ঝ্যাঁটা মেরে বের করব।'

শাসাতে শাসাতে গজরাতে গজরাতে দু-জনে চলে গেল।

অনেকটা সময় কাটল।

হঠাৎ ক্ষেপে উঠেছিল যমুনা। উত্তেজনায় কপালের দু-পাশে সরু সরু রগগুলো দপ দপ করছে। দু হাতে টিপেও তাদের বাগ মানানো যাচ্ছে না।

দু হাঁটুর ফাঁকে মুখ গুঁজে বসে আছে যমুনা।

কানের কাছে কে যেন ফিসফিসিয়ে উঠল, 'মাসি, হেই গো—'

যমুনা চমকে উঠল। বলল, 'কে রে?'

'আমি বিলেস।'

বিলাসকে দেখে চমকানি ভাবটা কাটল। যমুনা বলল, 'তুই কখন এসেচিস?'

'অনেক্ষণ। পাইকেরদের গান শোনালে। আমি কত্তালে ঠেকো দিলম।'

'অ'—সংক্ষেপে জবাব সেরে চুপ করে গেল যমুনা।

খানিকটা চুপচাপ। যমুনাই আবার শুরু করল, 'পদ্মর খপরটা কেমন করে রটল রে? তাকে তো লুকিয়ে এখেনে এনেছিলম। তুই কারুকে বলেচিস?'

'না মাসি। আমি কেন কইতে যাব। তুমি তো বারণ করলে। বিলাস বলতে লাগল, আমিও খপরটা বাজারে শুনলম।'

'কী শুনলি?'

'মদন ঢালী আমাকে শুদোচ্ছিল, 'শুনলম পদ্ম নাকি এয়েচে?' ত্যাখন আমি বললম, 'হ্যাঁ'।

চাপা গলায় চেঁচিয়ে উঠল যমুনা, 'মদন ঢালীর কানেও খপরটা উঠেচে?'

'তাই তো শুনলম।'

'হেই মা গোসানী!' যমুনা ককিয়ে উঠল।

চার

পদ্মর দিকে চাইলে যমুনার বুকের ভেতর কাঁপুনি ধরে যায়। মেয়ে বড় হয়ে উঠেছে। বড়ই না শুধু, রূপসী যুবতী হয়ে উঠেছে।

রূপকে বড্ড ভয় যমুনার।

ডাঙার কামটগুলো রূপের খোঁজ পেলে উপায় রাখে না। ছিঁড়ে ছিঁড়ে খায়। এ হ'ল বাজার। বিকি-কিনির বাজার। বড় বিষম ঠাঁই।

যে বাজারের যে নিয়ম। কোন বাজারে মশলা বেচা-কেনা হয়, কোন বাজারে ধান-চাল, কোন বাজারে মাছ কি পান।

এই বাজারের রীতি আলাদা। এখানে মাংস বিকি-কিনি হয়—মেয়েমানুষের শরীরের কাঁচা মাংস।

অন্য বাজারে বিকিকিনির রীতি অন্য। মাল একবার বেচা হ'ল তো হ'ল। এক মাল দুবার বেচা যায় না। কিন্তু দেহ বেচাকেনার রীতি আলাদা। এখানে এক দেহ বার বার বিকোয়।

রীতি যাই হোক, বাজারে-বন্দরে যে একবার এসে পড়েছে, তাকে বিকোতেই হবে।

মেয়ের দিকে চেয়ে চেয়ে তাই যমুনার বুক থরথর করে।

কামিনী পাড়ার জীবনে যে কি সুখ, তা তো সারাজীবন ধরে বুঝেছে যমুনা। না না, মেয়েকে কামিনীপাড়ার নরকে ডুবতে দেবে না সে।

যখন পদ্ম ছোট ছিল, এত ভয় ছিল না। কিন্তু তার বড় হবার সঙ্গে সঙ্গে যমুনার ভয় শুরু হ'ল, ভাবনা শুরু হ'ল।

বছর দুই আগে পদ্মকে ঘাটালে পাঠিয়ে দিয়েছিল যমুনা। সেখানে টগরের কাছে থাকত পদ্ম। মাস মাস খরচ পাঠিয়ে দিত সে।

টগর যমুনার সই। এককালে চিত্তিরগঞ্জের এই বাজারে রূপাজীবা ছিল টগর। রূপ, দেহ, যৌবন বেচত।

সেই টগর হঠাৎ একদিন বদলে গিয়েছিল।

মানুষ ওপরটা ছাখে। চামড়া ছাখে, রূপ ছাখে, শরীর ছাখে। কিন্তু রূপের তলায়, চামড়ার তলায়, শরীরের ভেতর যে প্রাণ, তা দেখার চোখ ক'জনের?

ধান-চালের বাজারে ফড়ের কাজ করত নকুড় রাণা। সে টগরের প্রাণের খোঁজ পেয়েছিল। পেয়েই তাকে নিয়ে ঘাটাল চলে গিয়েছিল। সেখানে গুরু-পুরুত সাক্ষী রেখে তাকে বিয়ে করেছিল।

সুস্থ, স্বাভাবিক, সংসারী জীবন পেয়ে বেঁচে গিয়েছিল টগর।

টগরের কাছে মেয়েকে রেখে নিশ্চিন্ত ছিল যমুনা। কামিনীপাড়ার দুঃসহ জীবন যাতে পদ্মকে ছুঁতে না পারে, তার সব ব্যবস্থা করেছিল টগর।

মেয়ের সম্বন্ধে কোন ভাবনাই ছিল না যমুনার। ঠিক হয়েছিল, একটা ভাল, সৎ, রোজগেরে ছেলে দেখে পদ্মর বিয়ে দেবে। কিন্তু সাধ মিটল না। আশা পূরল না যমুনার।

দিন তিনেক আগে পালা জ্বরে টগর মরেছে। টগর ছাড়া সংসারে দ্বিতীয় মানুষ নেই।

অগত্যা নকুড় কাল রাত্রে পদ্মকে তার মায়ের কাছে রেখে গিয়েছে।

পদ্ম আসার পর থেকেই যমুনার খাওয়া নেই, ঘুম নেই। তার ওপর ডাঙার কামটগুলো এসে পদ্মর খোঁজ নিচ্ছে। ভাবনায়, চিন্তায় মাথাটা খারাপ হয়ে যাবার জো হয়েছে যমুনার।

পাঁচ

চল্লিশটা সওয়ারী জুটিয়ে কুঁকড়োহাটির বোটটা কোন রকমে ছেড়ে দিতে পারলেই বিলাস কাজ থেকে খালাস। এর পর তার অফুরন্ত ফুরসত।

ফুরসত থাকলে কোনদিন সে নদীর পারে বসে বিড়ি ফোঁকে। কোনদিন এর-ওর-তার কাজ করে দেয়। কারো মাল টেনে দেয়, কারো মাছ বেচে দেয়, কারো তামাক সেজে দেয়। বদলে একটা পয়সাও পায় না বিলাস। একটু মিঠে কথা বললেই সে খুশী।

যারা কাজ করায়, তারা বলে—'তুই বড্ড ভাল বিলেস। তোর মত পেরান চিত্তিরগঞ্জে এট্টাও নি। দে ভাই, এই ধানের বস্তাটা এট্টু গুদোমে তুলে দে।'

তারা আড়ালে বলে, 'ব্যাটা পাঁটার বাচ্চা পাঁটা, আস্ত গরু—বোকা—'

আড়ালে যা খুশি বলুক, সামনের মিঠে কথাটুকুতে গলে যায়।

একটু আগে কুঁকড়োহাটির বোটটা ছেড়ে চলে গেছে।

মদন ঢালীর কাছ থেকে একটা টাকা মজুরী নিয়ে ট্যাকে গুঁজেছে বিলাস। তারপর লম্বা লম্বা পা ফেলে বাজারের ভেতর দিয়ে চলেছে।

বাজারের চালাগুলো গা ঘেঁষাঘেঁষি করে দাঁড়িয়ে রয়েছে। পুরোদমে বিকিকিনি, দরাদরি, কষাকষি চলছে। ফড়ে-দালাল-পাইকের-দোকানী আর খদ্দেরে চিত্তিরগঞ্জের হাট সরগরম হয়ে আছে।

মাছের পাইকের অমর্ত ডাকল, 'হেই বিলেস, ইদিকে শুনে যা দাদা—'

'আজ না গো পাইকের।'

মসলার দোকানী হেমন্ত হাঁকল, 'বিলেস—হেই বিলেস—'

'আজ সময় নি।'

চায়ের দোকানের কুঞ্জ ডাকল, 'বিলেস—শোন মাইরি—'

'আজ হবে নি।'

কোন দিকে তাকাচ্ছে না বিলাস। ঘাড় গোঁজ করে লম্বা লম্বা পায়ে বাজারটা পেরিয়ে যাচ্ছে।

অবাক হয়ে অমর্ত দেখল, হেমন্ত দেখল, কুঞ্জ দেখল, চিত্তিরগঞ্জ বাজারের সবাই দেখল, বিলাস আজ বড় ব্যস্ত। আজ তার কোন দিকে তাকাবার সময় নেই।

যে মানুষটার সারাদিন অফুরন্ত ফুরসত, একটু মিঠে কথা বললে যে আগ বাড়িয়ে সবার ফুট-ফরমাস খেটে দেয়, হঠাৎ তাকে ব্যস্ত হতে দেখলে, তার সময়ের অভাব হতে দেখলে অবাক হবারই কথা।

অমর্ত, কুঞ্জ আর হেমন্ত মুখ চাওয়াচাওয়ি করতে লাগল।

হেমন্ত বলল, 'ব্যাপার কী?'

'কী জানি।' কুঞ্জ বলল।

'বিলেস অমন দৌড়তে দৌড়তে চললে কুথায়?'

'কী জানি।'

'বড্ড কাজের লোক হয়ে গেল দেখচি।'

দু-হাত ঘুরিয়ে কুঞ্জ বলল, 'তাই তো দেখচি।'

ছয়

দৌড়তে দৌড়তে যমুনার বাড়ি চলে এল বিলাস। উঠোনের মাঝখানে গোলপাতার চালা। তার তলায় দাঁড়িয়ে রইল।

বড় ঘরের দাওয়ায় একটা খুঁটিতে ঠেসান দিয়ে বসে রয়েছে পদ্ম। সুতো দিয়ে চটের আসন বুনছে।

গোলপাতার চালার তলা থেকে পদ্মকে ঠিকমত দেখা যায় না। গালের একটা দিক, সরু নাকটা, পিঠময় কালো কোঁকড়া কোঁকড়া চুল, পায়ের ক'টি আঙুল, বড় বড় পালকে ঘেরা একটা চোখ, দুটো সাদা, নিটোল হাত—এর বেশি কিছুই চোখে পড়ে না।

দু বছর ঘাটালে ছিল পদ্ম।

ঘাটাল হ'ল শহর-বন্দর জায়গা। সেখানকার ধরণ-ধারণই ভিন্ন।

সেই ছোটবেলা থেকে পদ্মকে দেখছে বিলাস। মাঝখানে দু বছর খালি বাদ। এই দু বছরে ঘাটাল থেকে একেবারে আলাদা মানুষ হয়ে ফিরে এসেছে পদ্ম।

কত বড় হয়েছে পদ্ম! কত সুন্দর হয়েছে!

এখন তার কাছে যেতে গা কাঁপে। জিভে কথা জড়িয়ে যায়। হাতের তেলো দুটো ঘামে ভিজে ওঠে বিলাসের।

শহর-বন্দর থেকে একেবারে বদলে এসেছে পদ্ম। তার কথাবার্তায়, চালচলনে, ধরণ-ধারণে এখন কত জেল্লা, কত জলুষ!

গোলপাতার চালার তলায় দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে অনেকক্ষণ পদ্মকে দেখল বিলাস। নাঃ, পদ্ম একবারও এদিকে ঘাড় ফেরাচ্ছে না। যমুনা মাসিকেও দেখা যাচ্ছে না।

কি করবে, বিলাস ভেবে উঠতে পারল না। একবার ভাবল, নদীর পারেই ফিরে যাবে। আবার ভাবল, দেখি আর একটু।

বেশ খানিকটা পর ফর্সা, গোল ঘাড়টা কাত করে এদিকে তাকাল পদ্ম। দেখল, গোলপাতার চালার তলায় বিলাস দাঁড়িয়ে রয়েছে।

পদ্ম ডাকল, 'হ্যাঁ গো বিলেসদাদা—ইদিকে এসো।'

বিলাস সামনে এসে দাঁড়াল।

'কতক্ষণ এয়েচ ?'

'অনেক্ষণ।'

'ওখেনেই দাঁড়িয়ে ছিলে ?'

মুখে কিছু বলল না বিলাস। ঘাড় কাত করে সায় দিল।

পদ্ম আবার বলল, 'আমায় ডাকলেও তো পারতে।'

'তুমি কাজ করছেলে ; তাই ডাকি নি।'

'বেশ লোক—নাও বোসো দিকি।'

দাওয়ার এক পাশে পদ্মর ছোঁয়া বাঁচিয়ে কুঁকড়ি মেরে বসল বিলাস।

চটের আসনে নীল সুতো দিয়ে ফুল তুলতে তুলতে পদ্ম বলল, 'এই দুপুরবেলায় এয়েচ—কিছু কথা আছে ?'

'হ্যাঁ। যমুনা মাসি ডেকে পাঠিয়েছিল। তাই এয়েচি।'

'তবে তো তুমায় এট্টু সবুর করতে হবে।'

'কেন ?'

'মা নদীতে চান করতে গেচে।'

কথা ক'টা বলে চটের আসনে পর পর ক'টা ফোঁড় বসাল পদ্ম। তারপর দাঁতে সুতো কাটল।

মুখোমুখি বসে আছে পদ্ম। সরাসরি তার মুখের দিকে তাকাতে পারছে না বিলাস। মুখ নীচু করে লুকিয়ে চুরিয়ে এক একবার পদ্মর মুখটা দেখছে।

আসন বুনতে বুনতে পদ্ম মুখ তুলল। বলল, 'কি গো বিলেসদাদা, চুপ করে বসে রইলে যে ? কথা কইচ না কেন ?'

'কী কইব !'

'হেই মা গোসানী ! কি কইবে, আমায় শুধোচ্ছ !'

পদ্ম গালে একটা হাত রাখে। বলে, 'দুবচ্ছর পর চিত্তিরগঞ্জে এলম। এর ভেতর কুনো কথা জমে নি তুমার।'

'কী কথা জমবে !' বিলাসের গলাটা হতাশ শোনাল।

অল্প একটু হাসল পদ্ম। তারপর ছোট একটা হাই তুলল। তারও পর বলল, 'তুমি সেই একরকমই আছ বিলেসদাদা।'

বিলাস জবাব দিল না।

একদৃষ্টে বিলাসের দিকে তাকিয়ে রইল পদ্ম। বিলাস দু বছর আগেও যা ছিল, এখনও তাই আছে। লোকটার কোন হেরফের নেই, অদলবদল নেই। সেই শুওরের কুচির মত খাড়া খাড়া চুল, সেই খালি গা, মুখময় দাড়ি-গোঁফ, ভাঙা ভাঙা, ক্ষয়া ক্ষয়া নখ। আঁচড় কাটলে চামড়া থেকে খই ওড়ে। গায়ে বোঁটকা, বিটকেল গন্ধ।

বিলাস বুঝতে পারছে, একদৃষ্টে পদ্ম তার দিকে তাকিয়ে রয়েছে। বুঝতে পেরে কুঁকড়ে গেল সে।

পদ্ম বলল, 'আজকাল কী করচ ?'

'সেই কাজটাই করচি।'

'কী কাজ ?'

'হেই যে কুঁকড়োহাটির বোটে সওয়ারী জোটাতুম। তাই জোটাচ্চি।'

'অ—'

একটু চুপ।

পদ্মই আবার বলল, 'কত মাইনে পাও ?

'তা অনেক।' উৎসাহে বিলাসের চোখ দুটো চকচক করতে লাগল। সে বলল, 'দু কুড়ি সওয়ারী জোটাতে পারলে পুরো একটাকা মজুরি পাই।'

'অ—' অস্ফুট একটা আওয়াজ করল পদ্ম।

বিলাসের উৎসাহ মরে নি। সে সমানে বকে যায়, 'মহাজোন বলেচে, একটা দুটো মাস গেলে আমায় বোটের মাঝি করবে। মাঝি হলে দিনে তিনটাকা মজুরি পাব।'

পদ্ম কিছু বলল না। তার হাতদুটো ফোঁড়ের পর ফোঁড় বসিয়ে চটের ওপর সুতোর নক্সা আঁকতে লাগল।

পদ্ম আর বিলাসের কথা কওয়া-কওয়ির ভেতরেই যমুনা ফিরে এল। নদী থেকে চান করে এসেছে। ভিজে কাপড় থেকে ফোঁটায় ফোঁটায় জল ঝরছে।

যমুনা বলল, 'কখন এলি বিলেস ?'

'অনেক্ষণ। তুমার জন্যে বসে রইচি। কেন, ডেকে পাঠিয়েচিলে কেন ?'

'কইব, সব কইব।' এট্টু সবুর কর। আমি একটা শুখো কাপড় পড়ে আসি।'

যমুনা ঘরের ভেতর ঢুকল।

খানিকটা পর আবার বেরিয়ে এল যমুনা। মেয়ের দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে বলল, 'হেই পদ্ম, তুই এখেন ঠেঙে (থেকে) যা দিকিনি। বিলেসের সঙ্গে কথা কয়ে নি।'

চটের আসন, সুঁচ আর সুতো নিয়ে ঘরের ভেতর চলে গেল পদ্ম।

যমুনা বিলাসের গা ঘেঁষে বসল। বলল, 'আমার একটা কথা রাখবি বিলেস?'

'কী কথা?'

'আগে বল্ রাখবি। ভগমানের দিব্যি!'

'ভগমানের দিব্যি, তুমার কথা রাখব।' একটু থেমে কি যেন ভাবল বিলাস। বলল, 'অমন কোরচ কেন মাসি? তুমার কুন কথাটা আমি রাখি না?'

'আমার মনে বড্ড লেগেচে। উই সুচাঁদকে বললম, উই ধনঞ্জয়কে বললম, লোটনাকে বললম। কেউ আমার কথাটা রাখল নি। কারুকে না পেয়ে তুকে ডেকে পাঠিয়েচি।'

যমুনার গলাটা ভারী শোনাল।

'কও, কী কথা রাখতে হবে?'

'একবার ডায়মনহারবার যাবি। শ্যাম গায়েনকে চিনিস?'

'চিনি।'

'তাকে খপর দিবি। আমার কথা কইবি। কইবি, যমুনা মাসি তুমায় যেতে বলেচে। বুঝলি?'

ঘাড় কাত সায় দিল বিলাস। তারপরেই উঠে দাঁড়াল।

যমুনা বলল, 'সব কথা না শুনে দৌড়ুচ্চিস যে? আগে সব বলে নি। পা পেতে বসে থির হয়ে শোন।'

অগত্যা বিলাস বসেই পড়ল।

যমুনা বলল, 'শ্যাম গায়েনকে সঙ্গে করে ধরে নে এসবি। বুঝলি?'

'বুঝলম।' বিলাস মাথা নাড়ল।

'এবেরে যা।'

বিলাস উঠে পড়ল। উঠোনের মাঝখানের চালাটার কাছে গিয়ে থমকে দাঁড়াল। তারপর ঘুরে এসে বলল, 'যমুনা মাসি একটা কথা শুদোব (জিগ্যেস করব)?'

'শুদো না।'

'শ্যাম গায়েনকে কী দরকার?'

'পদ্মর বে দুবো শ্যামের সঙ্গে।'

বলতে বলতে গলাটা কেঁপে উঠল যমুনার, 'যত তাড়াতাড়ি পারি মেয়ের বে দুবো! নইলে কামটগুলোর কাছ ঠেঙে (থেকে) উকে বাঁচাতে পারব নি।'

একটু দাঁড়াল বিলাস। তারপর দৌড়তে দৌড়তে বেরিয়ে গেল।

ছয়

দাওয়ার খুঁটিতে ঠেসান দিয়ে বসে বসে ভাবছে যমুনা। আশায়-নিরাশায় তার বুকের ভেতরটা কাঁপছে।

এখন বিকেল।

দ্বিতীয় ঋতুর আকাশটা টুকরো টুকরো, হানাদার মেঘে আবছা হয়ে আছে। আকাশের রং এখন সীসের মত। মেঘের সঙ্গে যুঝে যুঝে যেটুকু আলো এসে পড়েছে, তাতে উঠোনের ওপাশের ছাইগাদাটা স্পষ্ট না।

জোর হাওয়া দিয়েছে। থেকে থেকে হাওয়াটা হিসিয়ে হিসিয়ে উঠছে। ছাইগাদার ওপাশে পেঁপের লম্বা লম্বা পাতাগুলো কাঁপছে।

পেঁপে পাতার কাঁপুনি যেন যমুনার বুকের ভেতর ছড়িয়ে পড়েছে। একবার আশা, একবার নিরাশা। একবার আলো, একবার ছায়া।

আশায় আর নিরাশায়, আলোয় আর ছায়ায় বুকটা থরথর করছে যমুনার।

মন একবার বলছে, শ্যাম আসবে। আবার বলছে, না।

বসে বসে শ্যাম গায়েনের কথা ভাবছে যমুনা।

কেন আসবে না শ্যাম? নিশ্চয়ই আসবে। গায়ে যদি মানুষের চামড়া থাকে, কলজেতে যদি মানুষের রক্ত থাকে, তবে তাকে আসতেই হবে। না এসে কিছুতেই পারবে না শ্যাম।

দু তিন বছর আগের কথা মনে পড়ল যমুনার।

সেটা ছিল বছরের পঞ্চম ঋতু। পোষ মাস।

শীত হোক, গরম হোক, খুব ভোরে রাত থাকতে ওঠা যমুনার অভ্যেস।

শীতের ভোরটা কুয়াসা আর অন্ধকারে আচ্ছন্ন হয়ে ছিল। নদীর দিক থেকে হিম-হিম, কনকনে বাতাস ছুটেছিল। শীতের বাতাসের যেন দাঁত বেরোয়। আর সেই দাঁতগুলো শরীরের খোলা অংশে কেটে কেটে বসে।

খুব ভোরে ওঠার মতই ভোরে নদীতে চান করাও যমুনার অভ্যেস।

ঘর থেকে উঠোনে নেমেই চমকে উঠেছিল যমুনা।

আবছা অন্ধকার গাঢ় কুয়াশা ফুঁড়ে নজর চলে না। ঠিক বুঝতে পারছিল না যমুনা। আন্দাজ করেছিল, উঠোনের চালাটার তলায় কে যেন কুঁকড়ি মেরে পড়ে রয়েছে।

লাফ মেরে দাওয়ায় উঠে পড়েছিল যমুনা। সেখান থেকে ঘরের ভেতর। ঘরে ঢুকে খিল এঁটে দিয়েছিল।

সেই ভোরে যমুনার নদীতে যাওয়া হল না।

সকালে অন্ধকার আর কুয়াসা কাটলে দরজা খুলে বাইরে এসেছিল যমুনা। যা সে আন্দাজ করেছিল, ঠিক তাই।

গোলপাতার চালাটার তলায় নোংরা কাপড় সারা গায়ে জড়িয়ে হাত-পা-মাথা একাকার করে, কুণ্ডলী পাকিয়ে কে যেন শুয়ে আছে।

কাছে গিয়ে যমুনা দেখেছিল, বছর বিশ বাইশের একটা ছেলে। মুখটা দেখা যাচ্ছিল। খোঁচা খোঁচা দাড়ি গোঁফ, চোখ দুটো বোঁজা। মুখখানা ঢলঢলে, ভারি মিষ্টি। হঠাৎ দেখলে বিশ বাইশ বছরের জোয়ান মনে হয় না। মনে হয় দশ বারো বছরের ছেলের মুখ।

শীতে কুঁকড়ে আছে ছেলেটা। দেখে ভারি মায়া হয়েছিল যমুনার। আস্তে আস্তে ডেকেছিল, 'হেই গো বাছা—হেই গো—'

বার কতক ডাকাডাকির পর ধড়মড় করে উঠে বসেছিল ছেলেটা। যমুনাকে দেখে সে চমকে উঠেছিল। থতমত গলায় বলেছিল, 'আমি—আমি—'

যমুনা বলেছিল, 'তুমি কাদের ছেলে গো? কুনোদিন তুমাকে তো বাপু চিত্তিরগঞ্জে দেখিনি।'

যমুনার গলাটা ভারি নরম। নরম গলায় ছেলেটার ভয় কাটল। তখনও পুরোপুরি ঘুমটা ছোটে নি। দু হাতে চোখ রগড়াতে রগড়াতে সে বলেছিল, 'আমি এখেনকার লোক না। গেঁওখালি ঠেঙে (থেকে) এসেচি। রাত্তিরে কুথাও জায়গা না পেয়ে এখেনে এসে শুয়েছিলম। এখুনি চলে যাচ্চি।'

'যাবে যাবে, যাবেই তো বাবা। সারারাত ঠাণ্ডায় কষ্ট পেলে। আমায় ডাকলেই তো পারতে। যাক সে কথা—'

যমুনা বলেছিল, 'এখেনে কুথায় এয়েচ?'

'কাজের খোঁজে এয়েচি। এখেনকার কারুকে চিনি না।'

'নাম কী তুমার?'

'শ্যাম—শ্যাম গায়েন।'

'বা, বড্ড ভাল নাম।'

শ্যাম বলেছিল, 'এবেরে যাই।'

'এখন যাবে কুথায়?'

'দেখি, যদি কিছু কাজ জোগাড় করতে পারি।'

শ্যাম উঠে পড়েছিল। গোলপাতার চালা ছেড়ে বাজারের দিকে পা বাড়াতে যাবে, সেই মুখে যমুনা ডেকেছিল, 'হেই বাছা', শোন—'

ঘুরে দাঁড়িয়েছিল শ্যাম। বলেছিল, 'কী কইচেন?

'যাবেই তো। পরের ছেলে তো আর ধরে রাখতে পারব নি। তা বাপু সারারাত চালার তলায় ঠাণ্ডায় কষ্ট পেলে—তা এবেলা চাট্টি খেয়েই যেও।'

শ্যাম থেকে গেল।

সেই বেলাটাই শুধু না, আরো অনেক বেলা, অনেক দিন, অনেক মাস সে যমুনার কাছে কাটাল।

ঢলঢলে মিষ্টি মুখ, লাজুক লাজুক স্বভাব—সবই কেমন যেন ভাল লেগে গিয়েছিল যমুনার। প্রথম দিন ঠাণ্ডায় কুঁকড়ি মেরে পড়ে থাকতে দেখে মায়া পড়েছিল। সেই মায়াটা আস্তে আস্তে একটা উষ্ণ স্নেহের রূপ নিয়েছিল।

খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে শ্যামের সব খবর জেনে নিয়েছিল যমুনা। বাপ-মা-ভাই-বোন, সংসারে কেউ নেই শ্যামের। গেঁওখালিতে বিঘে পাঁচেক ধানের জমি ছিল। বানের তোড়ে নোনা জল ঢুকে মাটিকে নিষ্ফলা করে দিয়েছে।

পেট তো আর নোনা জলের বাহানা শুনবে না। পেটের তাগিদে কাজের খোঁজে বেরিয়ে পড়েছে শ্যাম। গেঁওখালি থেকে চিত্তিরগঞ্জে এসেছে। এখানে যদি সুবিধে না হয়, সে কুঁকড়োহাটি যাবে। সেখানে কাজ না পেলে সিধে ডায়মণ্ডহারবার।

আসল কথা, একটা কাজ তার চাই-ই।

যমুনা বলেছিল, 'কী কাজ করবে শ্যাম?'

'যা পাই।'

'যদি তুমায় একটা গোলদারি দোকান করে দি।'

চোখ দুটো চকচক করে উঠেছিল শ্যাম গায়েনের। বলেছিল, 'তা হলে আমি বেঁচে যাই মা।'

প্রথম দিন থেকেই যমুনাকে মা বলে ডাকতে শুরু করেছিল শ্যাম।

'ভাল কথা রে ছেলে, তাই দুবো।'

চিত্তিরগঞ্জের বাজারে গোলদারি দোকান খুলে দিয়েছিল যমুনা।

শ্যামের ব্যবসার মাথা খুব পরিষ্কার। ছ-সাত মাসে দোকান বেশ জমে উঠল। বেশ লাভ হতে লাগল।

হাজার লাভ হোক, চিত্তিরগঞ্জে দোকানদারি করে শ্যামের মনে সুখ নেই। তার নজর আরো উঁচুতে, আরো বড় কিছুতে।

একদিন সে মুখ ফুটে বলল, 'হেই গো মা, একটা কথা কইচিলম।'

'কী কথা?'

'এই চিত্তিরগঞ্জে দোকানদারি করতে ভাল লাগচে না।'

'তবে কী করবি বাপ?'

'তুমি যদি শ পাঁচেক টাকা দাও, ডায়মনহারবারে একটা হোটেল খুলে বসি। হোটেলের ব্যবসাতে অনেক লাভ।'

'বেশ, দোব টাকা। কিন্তুক—' বলেই থেমে গিয়েছিল যমুনা। অদ্ভুত করুণ একটু হেসেছিল।

'কিন্তুক কি মা?'

'ডায়মনহারবার গেলে তুই আমায় ভুলে যাবি।'

যমুনার পা দুটো ধরে ছোট ছেলের মত মাথা ঝাঁকিয়ে ঝাঁকিয়ে শ্যাম বলেছিল, 'কক্ষণো না মা, কক্ষণো না। তুমি আমার পেরাণ বাঁচিয়েচ। রাস্তায় ঘাটে না খেয়ে শুকিয়ে মরতম। তুমি আমার মা, তুমায় ভুলতে পারি?'

যমুনার টাকায় ডায়মণ্ডহারবারে হোটেল খুলে বসল শ্যাম। আগে আগে ফাঁক-ফুরসত পেলে চিত্তিরগঞ্জ চলে আসত। আজকাল হোটেল জমে গেছে। হোটেল থেকে নড়ার উপায় নেই তার।

ছ-সাত মাস হ'ল, চিত্তিরগঞ্জে আসে নি শ্যাম।

একটু আগে দ্বিতীয় ঋতুর দিনটা মরেছে। সীসে রঙের আকাশটা আরো আবছা, আরো দুর্বোধ্য হয়ে গেছে। একটা ঝাপসা পর্দা নেমে এসে চোখের সামনের সব কিছুকে আচ্ছন্ন করে দিয়েছে।

উঠোনের ওপাশে ছাইগাদাটা আর দেখা যায় না। পেঁপে গাছ দুটো লম্বা হাত বাড়িয়ে থরথর কাঁপছে। পেঁপে গাছের থরথরানি যমুনার বুকের ভেতরও চলছে। আশায় নিরাশায় প্রাণটা কাঁপছে।

মন বলছে, শ্যাম নিশ্চয় আসবে। যদি সে না আসে? হেই ভগবান, হেই মা গোসানী! আসবে না কী? তাকে আসতেই হবে। যমুনা তার প্রাণ বাঁচিয়েছে। এই বিপদের মুখে সে তাকে বাঁচাবে না? নিশ্চয় বাঁচাবে।

মেঘ আরো ঘন, আরো গাঢ় হয়েছে। মাঝে মাঝে আকাশটাকে আড়াআড়ি ফেঁড়ে বিদ্যুৎ চমকায়। আকাশ-জোড়া বিরাট একটা মৃদঙ্গে গুরু গুরু ঘা পড়ে। কড়-কড়-কড়াৎ—কানে তালা ধরিয়ে বাজ পড়ে।

বাজ আর বিজুরীর সঙ্গে পাল্লা দিয়ে একসময় বৃষ্টি শুরু হ'ল। ক্ষ্যাপা উত্তুরে বাতাসে বৃষ্টিটা বেঁকে যাচ্ছে। ঝড়ো বাতাস ছুটেছে সাঁই সাঁই।

ঘর থেকে পদ্ম ডাকল, 'ভেতরে এস মা।'

আশা-নিরাশার ঘোর লেগেছিল যমুনার মনে। হঠাৎ ঘোরটা কেটে গেল। আস্তে আস্তে ঘরে ঢুকে খিল এঁটে দিল যমুনা।

খানিকটা চুপচাপ।

ঘরের ঠিক মাঝখানে একটা হ্যারিকেন জ্বলছে। তেজী আলোতে ঘরটা ঝকমক করছে।

হঠাৎ যমুনা বলল, 'হ্যাঁ রে পদ্ম, সেই যে বিলেস কাল ডায়মনহারবার গেল, এখনো তো ফিরল নি।'

পদ্ম চুপ করে রইল।

'আমার মন বড্ড খারাপ গাইচে পদ্ম। শ্যাম বুঝি আসবে নি।'

এবারও কিছু বলল না পদ্ম।

অস্থির, অবুঝ গলায় যমুনা বলল, 'হেই পদ্ম, মুখ বুঁজে রইলি কেন?'

অস্ফুট গলায় পদ্ম বলল, 'কী কইব!'

সাত

সারারাত ঝড়বৃষ্টি গিয়েছে।

নদীটাকে উথল পাথল করে বিরাট বিরাট তুফান উঠেছিল। চিত্তিরগঞ্জের ওপর দিয়ে ক্ষ্যাপা বাতাস যেন ঘোড়া ছুটিয়ে যাচ্ছিল। আকাশটাকে ফালা ফালা করে বিদ্যুৎ চমকাচ্ছিল।

নদীটা ফুলে ফুলে গজরাচ্ছিল।

ভোরে উঠে অভ্যেস মত নদীতে চান করতে এসেছিল যমুনা।

আজ নদীর ক্ষ্যাপামি অনেকটা মরেছে। কিন্তু তার আক্রোশ একেবারে পড়ে নি। কাল বিকেল থেকে আকাশটা সেই যে সীসের রং ধরেছিল, সেই রংটা এখনো ঘুচল না। এখনো আকাশের নীল দেখা গেল না।

এখনো পুব দিকটা খুব পরিষ্কার হয় নি। আকাশে একটা পাখি নেই, নদীতে একটা নৌকো নেই। ওপারটা ধুধু, আবছা, ঝাপসা।

দুই পারের মাঝখানে নদীটা কানায় কানায় ভরা। কখন যে নদী কানা ছাপিয়ে উপচে পড়ে চিত্তিরগঞ্জের বাজারটাকে ভাসিয়ে নিয়ে যাবে, কে বলবে।

তাড়াতাড়ি দুটো ডুব দিয়ে, গায়ে ভিজে কাপড় আর গামছা জড়িয়ে নদী থেকে পারে উঠে এল যমুনা।

বাজারের ভেতর দিয়ে পথ।

বাজারের মানুষ এখনো ওঠে নি। সারা রাত বৃষ্টি হয়েছে। ঠাণ্ডায় কাঁথা মুড়ি দিয়ে একটা নিটোল ঘুমে সবাই তলিয়ে আছে।

এখন বাজারে ফড়ে নেই, দালাল-দোকানী নেই, খদ্দের নেই। কোন শব্দ নেই। বাজারের চালাগুলো গা ঘেঁষা-ঘেঁষি করে নিঃশব্দে দাঁড়িয়ে রয়েছে।

বৃষ্টিতে ভিজে পথ পিছল হয়ে রয়েছে। কাদা থকথক করছে। সাবধানে কাদা বাঁচিয়ে বাঁচিয়ে পা ফেলছে যমুনা।

টিনের আড়তগুলোর কাছে এসে শিউরে উঠল যমুনা।

পেছন থেকে কে যেন সরু, তীক্ষ্ণ গলায় ডাকছে, 'হেই যমুনো—হেই গো—'

গলার আওয়াজেই যমুনা বুঝতে পারল, মদন ঢালী।

এক মুহূর্ত থমকে দাঁড়াল যমুনা। তারপরেই হন্ হন্ করে পা চালিয়ে এগুতে লাগল।

পেছন থেকে সাপের মত হিসিয়ে উঠল মদন, 'হেই যমুনো, যাচ্চিস কেন? কথা আছে—খাম নে!'

যমুনা দাঁড়াল না। ঊর্ধ্বশ্বাসে দৌড়তে দৌড়তে বাজারের শেষ মাথায় এসে পড়ল। কিন্তু কত দৌড়বে যমুনা! এক সময় খপ করে তার হাতটা চেপে ধরল মদন। দাঁত বার করে খুব একচোট হাসল সে। বলল, 'সক্কাল বেলায় খুব ছোটালি যমুনো—ন্যাখ, ক্যামন হাঁপ ধরে গেচে।'

পাটকিলে রঙের পুরু, থসথসে জিভটা বার করে হাঁপাতে লাগল মদন।

'হাত ছাড় মহাজোন—'

এক ঝটকায় হাতটা ছাড়িয়ে নিল যমুনা।

'কী হ'ল কী?'

'আমি এ্যাখন ঘর যাব।'

'যাবি তো, আমি তোকে আটকে রাখব নাকি?'

এখনও হাঁপাচ্ছে মদন ঢালী। হাঁপানির তালে তালে তার বিরাট মাংসল ভুঁড়িটা অল্প অল্প দোল খাচ্ছে। নাকের ভেতর থেকে যে পাঁশুটে রঙের রোঁয়াগুলো বেরিয়ে পড়েছে, সেগুলো নড়ছে।

'আমি যাই।'

রুক্ষ, শুকনো গলায় বলল যমুনা। দাঁতে দাঁত চাপল। চোয়াল দুটো ভয়ানক দেখাল।

'যাবি—যাবি। তা অমন করচিস কেন?'

'কী করচি?'

'আমায় যেন চিনতেই পারচিস না।'

'না, পারচি না। তুমার সঙ্গে চেনাশোনা রাখা ঠিক না।'

মদন খ্যা খ্যা করে খেঁকিয়ে খেঁকিয়ে খুব একচোট হাসল। তারপর বলল, 'ঘর যাবি তো?'

'হ্যাঁ!'

'চ, তোকে এগিয়ে দি।'

'না।' গলাটা কেঁপে উঠল যমুনার। গলার কাঁপুনি মুহূর্তের মধ্যে তার হাত-পা-বুক—সারা দেহে ছড়িয়ে পড়ল।

'কী হ'ল ?'

চোখ দুটো অর্ধেক বুঁজে অর্ধেক খোলা রেখে অদ্ভুত দৃষ্টিতে যমুনার দিকে তাকিয়ে রইল মদন ঢালী।

'আগের মতই কাঁপা, ডরানো গলায় যমুনা বলল, 'তুমার মতলব কী মহাজোন ?

'মতলব আবার কী ?

দু হাতের দশটা আঙুল ঘুরিয়ে নিপাট ভালমানুষের গলায় মদন বলল, 'কিচ্ছু না, কিচ্ছু না', কুনো মতলব নি। শুধু তোকে তোর ঘর পর্যন্ত এগিয়ে দেওয়া। হে-হে—'

টেনে টেনে হাসতে লাগল মদন ঢালী।

'না না, তুমি যাও মহাজোন—তুমার পায়ে পড়ি।'

'বেশ যাচ্চি—'

মুখটা যমুনার কানে গুঁজে দিল মদন ঢালী। গুজ গুজ করে বলল, 'এ্যাখন তোকে ছেড়ে দিলম। তবে যাবো—দু-দশ দিনের ভেতরেই তোর বাড়ি যাব—'

বিরাট, মাংসল দেহটা দোলাতে দোলাতে মদন ঢালী চলে গেল।

কান ঝাঁ ঝাঁ করছে। বুকের ভেতর কিসের যেন ঘা পড়ছে।

চোখের সামনে এখন সব অন্ধকার, সব ঝাপসা। কিছুই যেন শুনছে না যমুনা, কিছুই দেখছে না, কিছুই বুঝছে না।

কোন রকমে টলতে টলতে বাকি পথটুকু পার হয়ে বাড়ি ফিরল যমুনা।

আট

দুপুর পর্যন্ত ছটফট করে কাটাল যমুনা। খেল না, শুল না, কোন কাজে মন বসল না। দাওয়ার খুঁটিতে ঠেসান দিয়ে উদাস চোখে আকাশের দিকে তাকিয়ে রইল।

এখন মেঘ কেটে গেছে। সীসে রঙের আকাশটা আবার নীল হয়ে গেছে। তীব্র, ধারাল রোদ দেখা দিয়েছে। সেই রোদ এসে পড়েছে মুখের ওপর। চামড়া যেন পুড়ে যাচ্ছে। তবু হুঁশ নেই যমুনার।

যতবার মদন ঢালীর কথা মনে পড়ল, যতবার তার চেহারাটা চোখের সামনে ভাসল, বিচিত্র এক ভয়ে কুঁকড়ে গেল যমুনা।

মদন ঢালীর মত ধূর্ত, শয়তান সারা চিত্তিরগঞ্জে আর একটাও নেই। তার হাড়ে হাড়ে রগে রগে শয়তানি। পৃথিবীতে এমন কু-কাজ নেই, যা সে করতে পারে না।

মদনকে কী আজ থেকে দেখছে যমুনা ? সেই যেদিন চিত্তিরগঞ্জে এসেছে, সেদিন থেকেই দেখছে।

শয়তানির কাজে বুকটা এতটুকু কাঁপে না মদনের, হাতটা এতটুকু টলে না।

দিনটা আস্তে আস্তে বিকেলের দিকে গড়াতে লাগল।

এখনও বিলাস ফেরে নি।

যমুনার ভয় আর ভাবনা পরস্পরের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে বাড়তে লাগল।

'মা-মা—' খুব আস্তে নরম গলায় পদ্ম ডাকল।

আকাশের দিকে তাকিয়ে বসে ছিল যমুনা। চমকে উঠল। তার গলা ফুঁড়ে কর্কশ, রুক্ষ আওয়াজ বেরুল, 'কে—কে—'

'আমি—আমি পদ্ম। কী হয়েচে তুমার ? অমন কোরচ কেন ?'

অবাক হয়ে মায়ের দিকে তাকিয়ে রইল পদ্ম।

খানিকটা ধাতস্থ হয়ে যমুনা বলল, 'ও তুই। আমি ভেবেছিলম—'

'কী ভেবেছিলে ?'

নিজেকে সামলে নিল যমুনা। ফিস ফিস করে বলল, 'কিছু না, কিছু না। সে কথা তোর শুনতে হবে নি।'

পদ্ম পীড়াপীড়ি করল না।

যমুনা বলল, 'ডাকচিলি কেন ? বল্—'

খাবে না—ইদিকে বেলা যে গড়াতে চলল।'

পদ্মর কথা কানে গেল কি গেল না। একদৃষ্টে মেয়ের মুখের দিকে তাকিয়ে রইল যমুনা।

এতদিন মেয়ের দিকে ভাল করে তাকায় নি যমুনা। আজ তাকাল। আর তাকিয়েই গায়ে কাঁটা দিল।

রূপ ! তা রূপ বটে একখানা। যেন খা-খা করছে। যে দেখবে সে-ই এই রূপে পুড়তে চাইবে।

মেয়ের দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে শ্বাস আটকে আসতে লাগল যমুনার। বুকের ভেতর অসহ্য এক কান্না উঠে এসে গলার কাছে ডেলা পাকিয়ে গেল। হাজার ঢোঁক গিলেও

কান্নাটাকে নামাতে পারল না যমুনা। কান্নাটা নামেও না, বারও হয় না। অনড় হয়ে আটকে থাকে।

পদ্মর দিকে চেয়েই আছে যমুনা। তার চোখের পাতা পড়ছে না।

পদ্ম উসখুস করে উঠল। বলল, 'অমন করে কী দেখছ মা ?'

চোখ নামিয়ে যমুনা বলল, 'কিছু না, ও কিছু না।'

'খাবে চল—'

'না, আজ আর খাব না। শরীলটা ক্যামন যেন ম্যাজ-ম্যাজ করছে। তুই খেয়ে নে গে—'

'তুমি চল।'

'যা পদ্ম, বিরক্ত করিস নি। আমার খেতে ইচ্ছে কোরচে না।'

মায়ের থমথমে মুখ দেখে একটু যেন ভয়ই পেয়ে গেল পদ্ম। বেশি জেদ করল না। খালি মুখভার করে বলল, 'বেশ, তুমি না খেলে আমিও খাব নি।'

'না খাবি না খাবি,যা চোখের আড়ালে যা সব্বোনাশী। তোকে দেখলে আমার হাত-পা ভয়ে পেটের ভেতর সেঁদিয়ে যায়। যা—যা—'

একটুক্ষণ অবাক হয়ে তাকিয়ে রইল পদ্ম। কী দোষ করল, বুঝে উঠতে পারছে না। অথচ বিনা দোষে মা তাকে বকল। মায়ের ওপর ভীষণ রাগ হ'ল পদ্মর। দুম দুম করে পা ফেলে ঘরে গিয়ে ঢুকল সে।

দাওয়ায় বসে বসে যমুনা ভাবতে লাগল, চারপাশের বেড়া আগুন থেকে কেমন করে সে পদ্মকে বাঁচাবে? ভেবে ভেবে দিশেহারা হয়ে পড়ল। মাথাটা বুঝি তার খারাপই হয়ে যাবে।

সন্ধ্যের মুখে মুখে ডায়মণ্ডহারবার থেকে ফিরে এল বিলাস।

উঠোনের দোচালাটার তলায় জড়াজড়ি করে বসে রয়েছে তিনজন। সুচাঁদ, ধনঞ্জয় আর লোটন।

দাওয়ার খুঁটিতে ঠেসান দিয়ে চুপচাপ বসে আছে যমুনা। তিনটে হ্যারিকেন টিমিয়ে টিমিয়ে জ্বলছে। হ্যারিকেনের অনুজ্জ্বল আলোতে কিছুই স্পষ্ট না।

আজ আর আসর বসে নি।

বিলাসকে দেখে ধড়মড় করে উঠে দাঁড়াল যমুনা। এদিক-সেদিক তাকাতে লাগল। কিন্তু না, যাকে সে খুঁজছে, তাকে পাওয়া গেল না। একাই এসেছে বিলাস।

রুদ্ধশ্বাস গলায় যমুনা বলল, 'হ্যাঁ রে বিলেস, তুই একাই এসেচিস ?'

মাথাটা নীচের দিকে নামিয়ে বিলাস ফিস ফিস করল, 'হ্যাঁ—'

বিলাসের সামনে এসে তার দু কাঁধ ধরে ঝাঁকানি দিল যমুনা। বলল, 'শ্যাম এল নি।'

'না।'

আর কিছু বলল না যমুনা। টলতে টলতে দাওয়ায় গিয়ে উঠল। খুঁটিতে ঠেসান দিয়ে আগের মতই বসল।

তার মুখে জীবনের কোন লক্ষণ নেই। মনে হয়, মরা মানুষের মুখ। চোখে জেল্লা নেই। হাত দুটো এলিয়ে পড়েছে। অকৃতজ্ঞ পৃথিবীর কাছে নিদারুণ একটা ঘা খেয়ে একেবারে বোবা হয়ে গেছে যমুনা।

গুটি গুটি পায়ে যমুনার পাশে এসে দাঁড়াল বিলাস। খুব আস্তে ডাকল, 'হেই গো যমুনো মাসি—'

যমুনা সাড়া দিল না।

আবছা আবছা, ছেঁড়া ছেঁড়া অন্ধকারে যমুনার মুখটা ঠিকমত দেখা যায় না। একবার যমুনার দিকে তাকিয়ে নিজের খেয়ালে বকতে লাগল বিলাস, 'আমি অনেক করে বললম, অনেক করে বোঝালম, কিন্তুক শ্যামদাদা কিচুতেই এল নি। বললম, যমুনো মাসির খুব বিপদ। পদ্মকে তুমার সন্‌গে (সঙ্গে) বে দেবে। পদ্মর বে না হলে মাসির বিপদ কাটবে নি। শুনে খুব খারাপ কথা বললে—'

'কী বললে ?' যমুনা চিৎকার করে উঠল।

বিলাস চুপ করে রইল। ধনঞ্জয়-লোটন আর সুচাঁদ, —তারা কী বুঝল, তারাই জানে। উঠে চলে গেল।

'চুপ করে রইলি কেন ? কী বললে শ্যাম ?' আবার চেঁচিয়ে উঠল যমুনা।

'সে বড্ড খারাপ কথা। তুমার শুনে কাজ নি মাসি।'

'বল্, তোকে বলতেই হবে। কী বলেচে শ্যাম ?'

'শুনবেই তবে।'

যমুনা জেদ ধরল, 'শুনবই।'

'শ্যামদাদা বললে, অমুকের মেয়েকে বে করতে আমার বয়ে গেচে। যা-যা, ভাগ্। দুর দুর করে আমায় তাড়িয়ে দিলে।'

'ও'—অস্ফুট একটা শব্দ করল যমুনা।

কপালের দু-পাশে দুটো অবাধ্য রগ সমানে লাফাচ্ছে। জোরে টিপে ধরেও তাদের বাগ মানানো যাচ্ছে না। বুকের ভেতর অসহ্য যন্ত্রণা। শ্বাস টানতে শ্বাস ফেলতে ভয়ানক কষ্ট হচ্ছে।

এখন রাত কত, কে বলবে।

দ্বিতীয় ঋতুর আকাশে উজ্জ্বল, গোল একটা চাঁদ দেখা দিয়েছে। ঠাণ্ডা ঝিরঝিরে বাতাস বইছে। হ্যারিকেন তিনটে জ্বলে জ্বলে কখন যে নিমে গেছে, কে তার হদিস দেবে।

এক নাগাড়ে খুঁটিতে ঠেসান দিয়ে বসে ছিল যমুনা। পিঠটা ব্যথা হয়ে গিয়েছে। একটু পাশ ফিরে বসতে গিয়েই তার চোখে পড়ল, গোলপাতার চালাটার তলায় দুই হাঁটুতে মাথা গুঁজে বসে রয়েছে বিলাস।

যমুনা ডাকল, 'হেই বিলেস, এখনো যাস নি?'

হাঁটুর ফাঁক থেকে মাথা তুলে খাড়া হয়ে বসল বিলাস। চোখ রগড়াতে রগড়াতে বলল, 'না মাসি, যাই নি।'

কি যেন একটু ভাবল যমুনা। তারপর বলল, 'যাস নি, ভালই করেচিস। ইদিকে আয়।'

গোলপাতার চালার তলা থেকে দাওয়ায় উঠে এল বিলাস। বলল, 'কী কইচ?'

একেবারে ভেঙে পড়ল যমুনা, 'কী করি বল দিকিনি বিলেস। ভেবে ভেবে তো কূল পাচ্ছি না। ইদিকে কী হয়েচে জানিস?'

'কী?'

'মদন ঢালীর সন্গে (সঙ্গে) দেখা হয়েচিল। সে বলেচে, দু-দশ দিনের ভেতরেই আমার এখেনে আসবে।'

'সব্বোনাশ'—বিলাস আঁতকে উঠল।

'সব্বোনাশ বলে সব্বোনাশ! ভয়ে আমার হাত-পা পেটের ভেতর সেঁদিয়ে গেচে।'

বিলাসের দু-হাত ধরে কাঁদতে লাগল যমুনা, 'কী করব, আমায় একটা পরামশ্য দে দিকিনি বিলেস। মেয়েটাকে কেমন করে বাঁচাই?'

বিলাস বলল, 'একটা কথা ভাবছিলম মাসি। কইব?'

'বল—'

'রাগ করবে নি।'

'না-না, তুই বল্—'

'একবার কুঁকড়োহাটি যাব?'

'কেন?'

'পদ্মর বাপ মথুর সাঁইদারকে কইব, তুমার মেয়ে বড় হয়েচে। এবেরে তার বে'র জোগাড় কর। নইলে চার ধারে অনেক শ্যাল-কুকুর আচে।'

অনেক, অনেকদিন পর মথুর সাঁইদারের কথা মনে পড়ল। এখনও মথুরের জন্য যমুনার প্রাণের ভেতর খানিকটা তাপ আছে। নইলে তার কথা ভাববার সঙ্গে সঙ্গে স্নায়ুগুলো অমন ঝঙ্কার দিয়ে উঠবে কেন?

চোখ দুটো চকচক করল যমুনার। সে ভাবল, মেয়ে বড় হয়েছে। একবার যদি মথুর পদ্মকে দ্যাখে, নিশ্চয় তার মায়া পড়ে যাবে।

খুব আস্তে অথচ ব্যগ্র গলায় যমুনা বলল, 'যা বিলেস, যা। তুই কুঁকড়োহাটিই যা। যার মেয়ে তাকে ধরে আন। তার হাতে তার মেয়ে দিয়ে আমি নিচ্চিন্ত হই। যা বিলেস, কাল ভোরেই চলে যা!'

নয়

আজও মদন ঢালীর সঙ্গে দেখা হয়ে গেল।

চাল-ডাল তেল-মশলা কিনতে বাজারে গিয়েছিল যমুনা।

মানুষের চোখ না তো শকুনের চোখ; শয়তানের চোখ। আড়াল থেকে ঠিক ঠিক যমুনাকে দেখে ফেলেছে মদন ঢালী। আর দেখার সঙ্গে সঙ্গে হিসেবের খাতাটা বেঁধে, নোট আর রেজগিগুলোকে টিনের বাক্সে পুরে তালা এঁটে দৌড়তে দৌড়তে যমুনার পাশে এসে দাঁড়াল।

গোলাদারি দোকানে জিনিস কিনছিল যমুনা।

মদন ঢালী ডাকল, 'হেই যমুনো—'

ঘুরে মদনকে দেখে আঁতকে উঠল যমুনা, 'তুমি!'

'হ্যাঁ, আমি।'

মদন ঢালী বলতে লাগল, 'আড়তে বসে দেখলম, তুই জিনিস কিনচিস।'

'অমনি চলে এলে?'

'তা এলম।'

মদন ঢালী খ্যা-খ্যা করে হাসতে লাগল। হাসির তালে তালে তার ভুঁড়িটা দোল খাচ্ছে। টিবির মত নাকটা ফুলে ফুলে উঠছে।

নীরস গলায় যমুনা বলল, য্যামন এসেচ ত্যামন ফেরত যাও।'

'ফেরত যাবার জন্মে তো আসি নি।'

হঠাৎ গলাটা নামিয়ে মদন ঢালী বলল, 'চ, ওধারে যাই। নিরিবিলিতে তোর সন্‌গে (সঙ্গে) একটা কথা আচে।'

জিনিস-পত্তর বু'ঝে নিয়ে দাম দিতে যাবে যমুনা, খপ করে তার হাতটা চেপে ধরল মদন ঢালী। বলল, 'ও দামটা দিতে হবে নি।'

'কেন?'

'আমি দে দোব।'

এক ঝটকায় মদনের হাত থেকে নিজের হাতটা ছুটিয়ে নিয়ে কর্কশ, রুক্ষ গলায় যমুনা বলল, 'চালাকি ক'রো নি মহাজোন। দাম দিতে দাও।'

মুখটা কপট কাঁচুমাচু করে মদন ঢালী বলল, 'দাম তা হলে দিতে দিবি না?'

'না।'

'দিতে দিলেই ভাল করতি।'

একটা কথাও বলল না যমুনা। হিসেব করে দোকানীকে দাম চুকিয়ে হন্ হন্ করে হাঁটতে শুরু করল।

সঙ্গে সঙ্গে মদনও চলল।

বাজার পেরিয়ে একটা নিরিবিলি ঘাসের মাঠ। তারপর যমুনার ঘর।

মাঠে এসে মদন ঢালী বলল, 'অত জোর জোর হাঁটচিস কেন যমুনো?'

ঘুরে দাঁড়িয়ে যমুনা মুখিয়ে উঠল, 'তুমি আমার পেছু লেগেচ কেন মহাজোন? কী করেচি তুমার?'

মদন ঢালী কিছু বলল না।

একটু চুপচাপ। তারপর মদন বলল, 'ক'দিন ধরে খুব কাজের চাপ পড়েচে। তাই তোর ওখেনে যেতে পারতি না। তবে যাবো, শিগগিরই একদিন তোর বাড়ি হাজির হব।'

'না-না মহাজোন, তুমি এসো নি—তুমার পায়ে ধরচি।'

'অমন কচ্চিস কেন যমুনো? অমন পর-পর ভাবচিস কেন? আগে তো তুই এমন ছিলি নি।'

'আগের দিনের কথা ভুলে যাও মহাজোন। আমায় এট্টু শান্তিতে বাঁচতে দাও।'

'বেশি ঘ্যানর ঘ্যানর করিস নি যমুনো। শুনলম—' বলতে বলতে হঠাৎ থেমে গেল মদন ঢালী।

'কী শুনলে?'

'যা শুনলম তা দেখতেই তো তোর বাড়ি যাব। হে-হে—'খেঁকিয়ে খেঁকিয়ে হাসতেই লাগল মদন ঢালী। বলল, 'এ্যাখন যাই রে যমুনো। অনেক্ষণ আড়ত ঠেঙে বেরিয়িচি। ঠিক যাব একদিন—সু'বদে পেলেই যাব।'

দুলতে দুলতে চলে গেল মদন ঢালী।

নয়

ভয়ে ভাবনায় মাথাটা বুঝি খারাপই হয়ে যাবে যমুনার।

এখন দুপুর। দ্বিতীয় ঋতুর আকাশে পেঁজা-পেঁজা ছেঁড়া-ছেঁড়া মেঘ জমেছে। মেঘের সঙ্গে যুঝে যুঝে খানিকটা নিরুত্তেজ, অনুজ্জ্বল রোদ এসে পড়েছে।

উঠোনের ওপাশে ছাইগাদা। ছাইগাদার ওপর এক জোড়া যমজ পেঁপে গাছ। পেঁপে গাছের মাথায় বসে একটা ঘুঘু থেকে থেকে করুণ, বিষণ্ণ আওয়াজ করে এক-টানা ডেকে চলেছে।

উনুনে ভাত চাপিয়ে গালে হাত দিয়ে চুপচাপ বসে আছে যমুনা।

মেঘে মেঘে পুবের আকাশটা ঝাপসা হয়ে আছে। সেদিকে চেয়ে আছে যমুনা। ঘুঘুর বিষণ্ণ, করুণ ডাক কানে আসছে।

মেটে হাঁড়িতে ভাত ফুটছে। হাঁড়িটার মতই যমুনার প্রাণের ভেতরটা টগবগ করছে।

একধারে বসে আনাজ কুটছে পদ্ম। হঠাৎ তার দিকে তাকাল যমুনা। ভাবল, পৃথিবীর নোংরামি আর শয়তানির হাত থেকে কেমন করে সে মেয়েকে বাঁচাবে।

ভাবতে ভাবতে মেয়ের দিকে তাকিয়ে ছিল যমুনা।

আনাজ কুটতে কুটতে মুখ তুলল পদ্ম। মায়ের দিকে তাকিয়ে তার হাত থেমে গেল। ভাবল, 'মা—'

'কী কইচিস ?'

'তুমি য্যাখন ত্যাখন অমন করে আমার দিকে চেয়ে থাক কেন বলো দিকি ?'

'কেন যে চেয়ে থাকি, তুই বুঝবি নি পদ্ম।'

'বুঝব, তুমি বলো।'

বঁটি আর আনাজ রেখে যমুনার পাশে এসে বসল পদ্ম।

যমুনা হঠাৎ এক কাণ্ড করল। দুই হাঁটুর ফাঁকে মুখটা গুঁজে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে, ফুলে ফুলে কাঁদতে লাগল।

'হেই মা, হেই গো—'

আঙুল দিয়ে যমুনার হাতে আস্তে আস্তে ঠেলা দিতে লাগল পদ্ম।

যমুনা মুখ তুলল না। কান্নাভরা, ভাঙা ভাঙা গলায় বলল, 'কী কইচিস ?'

'অমন কাঁদচ কেন মা ? কী হয়েচে ?'

'এমনি এমনি কী কাঁদচি ! আমার কপাল কাঁদাচ্চে।'

যমুনার ফোঁপানি একটু একটু করে বাড়তেই লাগল।

খানিকক্ষণ যমুনার ফোঁপানির আওয়াজ শুনল পদ্ম। তারপর খুব নরম গলায় বলল, 'কী হয়েচে মা, বলবে তো ?'

'সে কথা বলা যাবে নি পদ্ম। বড্ড নোংরা কথা। তুই শুনতে চাস নি মা।' একটু থামল যমুনা। মুখ তুলল। চোখের জলে ভুরু, গাল, চোখ মাখামাখি হয়ে আছে। একটা হাত বাড়িয়ে পদ্মকে নিজের দিকে টেনে নিল। আস্তে আস্তে বলল, 'উপায় নি, উপায় নি—'

'কিসের উপায় মা ?'

'এই তোর কি আমার ভালভাবে বাঁচার।'

'কেন ?' অবুঝ গলায় শুধলো পদ্ম।

'পিরথিমীটা ভত্তি খালি কামট, কেম্নো আর মড়াখেগো শকুনির পাল। একটু থামল যমুনা। আবার বলল, আমাদের বাঁচার উপায় নি।'

'আমরা কী দোষ করেচি মা—'

'জানি না পদ্ম, জানি না।'

অনেকক্ষণ কেউ কথা বলল না। না পদ্ম, না যমুনা।

কখন যে দু-জনের অজ্ঞাস্তে ভাতে পোড়া লেগেছিল। পোড়া ভাতের বোটকা গন্ধে হুঁশ ফিরল।

তাড়াতাড়ি হাঁড়িতে খানিকটা জল ঢেলে দিল যমুনা।

বলল, 'অনেক বেলা হয়ে গেচে পদ্ম। আর দেরী ক'রিস নি। হাত চালিয়ে আনাজ ক'টা কেটে কুটে দে। খেতে খেতে বেলা হেলে যাবে।'

'দিচ্চি মা।'

পদ্ম বঁটি আর আনাজ নিয়ে বসল।

এগার

ঘাটাল থেকে পদ্ম যেদিন চিত্তিরগঞ্জে এসেছে, সেদিন থেকেই বুকের থরথরানি শুরু হয়েছে যমুনার। সেই থরথরানিটা তার বেড়েই চলেছে।

পদ্মর দিকে যতবার সে তাকাচ্ছে, যতবার মদন ঢালীর কথা মনে পড়ছে, ততবারই গায়ে কাঁটা দিচ্ছে যমুনার।

একটু পরেই সন্ধ্যে নামবে। তারই আয়োজন চলছে।

দ্বিতীয় ঋতুর দিনটা চোখের সামনে ক্ষয়ে ক্ষয়ে একসময় নিবে গেল।

গোলপাতার চালাটার তলায় বসে ছিল যমুনা। তার মনের ওপর অনেকগুলো মানুষ, অনেকগুলো ভাবনা ছায়া ফেলছিল।

প্রথমেই শ্যাম গায়েনের কথা ভাবল যমুনা। মানুষ যে এত অকৃতজ্ঞ, এত নিমকহারাম হয়, সমস্ত জীবনে এই প্রথম বুঝল সে। আর বোঝার সঙ্গে সঙ্গে এক যন্ত্রণা তাকে বিকল করে ফেলল।

যন্ত্রণা বুঝি নেশার মতই মানুষকে বুঁদ করে রাখে।

অশেষ, অফুরন্ত যন্ত্রণায় বুঁদ হয়ে আছে যমুনা।

মথুর সাঁইদারের কথা মনে পড়ছে। মথুর কি আসবে না ? মথুর কি বিলাসকে ফিরিয়ে দেবে ?

যদি ফিরিয়ে দেয়, কী করবে যমুনা ? পদ্মকে কেমন করে বাঁচাবে ?

অবিনাশ আর যোগেন তাকে শাসিয়ে গিয়েছে।

বলে গিয়েছে, তাকে দেখে নেবে। মদন ঢালী বলেছে, দু-চার দিনের মধ্যেই সে তার বাড়ি আসবে।

কথাগুলো যতই ভাবল, অদ্ভুত এক ভয় চারপাশ থেকে যমুনাকে ঘিরে ধরতে লাগল।

রোদ অনেক আগেই মরেছে। ধোঁয়ারঙের আবছা আবছা একটা পর্দা নেমে এসেছে।

দ্বিতীয় ঋতুর আকাশে টুকরো টুকরো, পাটকিলে রঙের মেঘ ভেসে বেড়াচ্ছে। ঝাঁকে ঝাঁকে সরালি পাখি উড়ছে।

হঠাৎ যমুনার খেয়াল হল, কাল বিলাস কুঁকড়োহাটি গেছে। এখনও ফেরে নি। সে ভাবল, মথুর সাঁইদার যদি ফিরিয়ে দিত, তা হলে এতক্ষণে ফিরে আসত বিলাস। নিশ্চয়ই মথুর আসবে। কাজের মানুষ। হাতের কাজ গুছিয়ে তবে তো আসবে।

মথুর না এসে কি পারে? তার জন্যে না থাক, নিজের মেয়ের জন্যে তার টান থাকবেই।

আশায় আশায় বুক বাঁধল যমুনা।

ধোঁয়ারঙের যে পর্দাটা নেমে এসেছিল, সেটা আরো ঘন আরো গাঢ় হয়ে সব কিছুকে অস্পষ্ট করে দিচ্ছে।

এখন আকাশটা দেখা যায় না, মেঘ বোঝা যায় না। সরালি পাখিগুলো অন্ধকারে হারিয়ে গেছে।

কোন দিকে নজর নেই যমুনার। সে ভাবছে, মথুর সাঁইদার এলে পদ্মর বিয়ের ব্যবস্থা করবে।

অদ্ভুত একটু সুখে, অদ্ভুত একটু আনন্দে বুকের ভেতরটা তির তির করে কাঁপতে লাগল যমুনার।

হঠাৎ খচখচ করে শব্দ হ'ল। চমকে ঘুরে বসল যমুনা। চেঁচিয়ে উঠল, 'কে, বিলেস এলি?'

'না মাসি, আমি ধনঞ্জয়—'

'আয়।'

ধনঞ্জয় পাশে এসে বসে পড়ল। বলল, 'হারকেন (হ্যারিকেন) জ্বালো নি?'

'না।'

'আজ আসর বসবে নি?'

'না।'

ধনঞ্জয় চুপ করে বসে রইল।

আরো খানিকটা পর আবার পায়ের আওয়াজ হ'ল।

যমুনা চমকে উঠল, 'কে—কে এলি—বিলেস?'

'না মাসি, আমি লোটন।' এগিয়ে আসতে আসতে লোটন বলল, 'এই আঁধারে বসে রয়েচো যে?'

যমুনা জবাব দিল না।

ধনঞ্জয়ের গা ঘেঁষে বসল লোটন।

আরো খানিকটা পর সুচাঁদ এল।

ধনঞ্জয়, লোটন আর সুচাঁদ—অন্ধকারে তিনজনে গা ঘেঁষাঘেঁষি করে বসল।

ফিস ফিস করে তিনজনে কথা কওয়া-কওয়ি শুরু করল।

'মাসির হ'ল কী?'

'কথা কইচে না কেন?'

'আজ আসর বসবে নি?'

সবাই প্রশ্ন করল। কিন্তু জবাব দেবার কথা যার, সে-ই মুখ বুঁজে রইল।

বেশ খানিকটা রাত করে কুঁকড়োহাটি থেকে ফিরে এল বিলাস।

ধনঞ্জয়রা এখনও যায় নি।

গুটি গুটি পায়ে গোলপাতার চালাটার তলায় এসে মাথা নীচু করে দাঁড়িয়ে রইল বিলাস।

'কে, বিলেস?'

যমুনা উঠে দাঁড়াল।

'হ্যাঁ'—বিলাসের গলাটা শোনা গেল কি গেল না।

ফিস ফিস করে যমুনা বলল, 'তাকে এনেচিস?'

'না।' বিলাসের গলায় অস্ফুট একটা আওয়াজ ফুটল।

হঠাৎ ক্ষেপে উঠল যমুনা. 'কেন, কেন তাকে আনলি নি? কী জন্যে তোকে পাঠিয়ে ছিলম?'

মথুর সাঁইদার আসে নি, সে দোষ যেন বিলাসের। ঘাড় নামিয়ে চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল সে।

'হেই ভগমান, এখন আমি কী করি? আমি বাঁচব ক্যামন করে?

যমুনা অস্থির হয়ে উঠল। টেনে টেনে নিজের চুল ছিঁড়ল। দুম দুম করে বুকে কীল মারতে লাগল। তারপর বিলাসের দু-কাঁধ ধরে ঝাঁকাতে ঝাঁকাতে বলল, 'কেন, কেন তাকে আনলি নি কুকুর?'

ভয়ে ভয়ে বিলাস বলল, 'সাঁইদের যে এল নি।' আমায় নাথি মারতে মারতে তাড়িয়ে দিলে। আমি বললম, তুমার মেয়েকে নিয়ে যমুনা মাসি বড্ড বিপদে পড়েচে। সাঁইদের দাঁত খিঁচিয়ে উঠলে বললে, রাস্তার শ্যাল-কুকুর আমার মেয়ে! যা ভাগ্—একবার মেয়ের নাম করেচিস তো, পিঠের ছাল তুলে নোব।

'মিছে কথা, সব মিছে কথা। তুই বানিয়ে বানিয়ে বলচিস।'

নিজেকে আঁচড়াল, কামড়াল যমুনা। চুল ছিঁড়ল। অস্থির, অবুঝের মত নিজেকে ক্ষত-বিক্ষত করে ফেলল। ফুলে ফুলে, ফুঁপিয়ে ফুপিয়ে, ডাক ছেড়ে কাঁদল। কেঁদে কেঁদে হয়রান হয়ে একসময় ভেঙে পড়ল, 'আমি এখন কী করব? ক্যামন করে মেয়েকে বাঁচাব?'

ধনঞ্জয়-লোটন-সুচাঁদ জড়াজড়ি করে বসে রইল। মাথা নীচু করে চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল বিলাস।

অনেক রাত্রে অনেক কাঁদার পর মনের অস্থির ভাবটা অনেকটা কাটল। মাথা ঠাণ্ডা করে ভাবল যমুনা।

কয়েকদিনের মধ্যেই মদন ঢালী তার বাড়ি আসবে। তার আসার আগেই মেয়েকে বিয়ে দেবে যমুনা।

হঠাৎ তার চোখ পড়ল, ধনঞ্জয়রা জড়াজড়ি করে বসে রয়েছে।

যমুনা ডাকল, 'হেই ধনা—'

'কী কইচ মাসি?'

'আমার একটা কথা রাখবি বাপ?'

'কী কথা?'

'পদ্মকে তুই বে কর—'

'কী যে বল মাসি! তা কখনো হয়! অমার বাপ-মা-র-সোমসার আচে। বাজারের মেয়েকে ঘরে নে তুলব ক্যামন করে? লোকে গায়ে যে থুথু ছিটোবে।'

'যা-যা, কুকুর, বেরো এখেন ঠেঙে—'

মাথা নামিয়ে ধনঞ্জয় চলে গেল।

একটু কি ভাবল যমুনা। তারপর ডাকল, 'হেই বাপ লোটনা—'

'কী কইচ?'

লোটনের দু-হাত ধরে যমুনা করুণ গলায় বলল, 'আমায় আর পদ্মকে বাঁচা বাপ। পদ্মকে তুই বে কর।'

'না মাসি, তা হয় না।'

লোটন চলে গেল।

কিছু বলার আগেই সুচাঁদ পালাল।

তার পাশে কেউ নেই। তাকে বাঁচাবার মত এতবড় পৃথিবীতে একটা মানুষও নেই। কোথাও যেন একটু আলো নেই, একটু হাওয়া নেই। শ্বাসটা আটকে আটকে আসছে যমুনার। নিরন্ধ্র অন্ধকারে চোখদুটো যেন অন্ধ হয়ে যাবে।

গোলপাতার চালার তলায় সারাটা রাত কাটিয়ে দিল যমুনা।

এখন ভোর। অন্ধকার কেটে কেটে পুব দিকটা ফরসা হতে শুরু করেছে।

হঠাৎ যমুনার চোখে পড়ল, মাথা নীচু করে চুপচাপ দাঁড়িয়ে রয়েছে বিলাস।

যমুনা বলল, 'তুই দেঁড়িয়ে আচিস যে? যাস নি এখনো?'

'না।'

'যা, ভাগ এখেন থেঙে।'

'না।' ফিস ফিস করে বিলাস বলল, 'সবাই তো চলে গেল। আমি গেলে তুমায় আর তুমার মেয়েকে বাঁচাবে কে?'

'তুই—তুই আমাদের বাঁচাবি বিলেস?'

বিলাস জবাব দিল না।

বিলাসের দুহাত ধরে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে লাগল যমুনা। অদ্ভুত এক আবেগে তার শরীরটা থরথর করতে লাগল।

সমাপ্ত

রূপকথার রাজকুমারী

মুন্নি যখন আমার নতুন তৈরী করা ফ্রক্‌টা পরলো তখন আনন্দে উচ্ছসিত হয়ে উঠলো। ফ্রক্‌টাও আমি অনেক যত্ন করে তৈরী করেছিলাম—সাদা ধব্‌ধবে জামার ওপর ছোট্ট নীল ফুলের পাড় দিয়ে। আনন্দে লাফাতে লাফাতে মুন্নি আয়নার সামনে গেলো। ঘুরে ফিরে চারিদিক থেকে মুন্নি তার ফ্রক্‌টা দেখলো তার-পর ছুটলো তার বন্ধুদের দেখাতে তার নতুন জামা, তক্ষুনি বিকাল পর্য্যান্ত অপেক্ষা না করতে পেরে। আমি চেঁচিয়ে ডাকলাম ওকে, "মুন্নি, মুন্নি নতুন ফ্রক্‌টা খুলে যা — ওটা ময়লা হয়ে যাবে যে ওটা পরে বিয়ের নেমন্তন্নে যাবিনা ?" মুন্নি ততক্ষণে বাড়ীর থেকে বহুদূরে। নতুন ফ্রক্‌টা পরে মুন্নিকে দেখে মনে হলো আমার যেন কোন এক পরীর দেশের রাজকন্যা, ওকে সত্যিই মানিয়েছিলো, আর সত্যিই এত সুন্দর লাগছিল। একবার ভাবলাম ডাকি ওকে কারণ ফ্রক্‌টা ওকে পরতে দিয়েছিলাম শুধু ঠিক হয় কিনা দেখার জন্য। ইতিমধ্যে রান্না ঘরের থেকে কি যেন একটা পোড়ার গন্ধ পেয়ে আমি উঠে গেলাম, তারপর আর আমার খেয়ালই ছিলনা। আমার হুঁস হল যখন রাধার গলা শুনলাম দরজার সামনে। রাধাকে দেখে খুব খুশী হলাম এবং ওকে নিয়ে যখন বসার ঘরে এলাম, দেখি মুন্নি দরজায় দাঁড়িয়ে।

ওকে দেখেই আমি রেগে আগুণ—ফ্রক্‌টা একদম নোংরা করে ফেলেছে—বিয়েতে যাওয়ার সময় পরবেই বা কি? "ফ্রক্‌টার কি ছিরিই করেছো এখন পরবে কি বিকালে" বলে আমি ওকে মারতে যাচ্ছিলাম এমন সময় রাধা মুন্নিকে সরিয়ে নিয়ে আমায় ধম্‌কালো—" তোর মাথা খারাপ

S/P. 3 A-X52 BG

ইস্পাহানের ডায়েরী

অধ্যাপক শ্রীমাখনলাল রায়চৌধুরী

১১ই এপ্রিল ১৯৫৯। ইস্পাহান বিশ্ববিদ্যালয়ের অতিথিরূপে বেলা তিনটার সময় ইস্পাহানের তোরণ অতিক্রম করলাম—তোরণ দ্বারে লেখা ছিল "খুশ-আম-দেদ" (সু-স্বাগতম)। আমার জন্য বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ ডাঃ ফারোগী ও অন্যান্য অধ্যাপকবর্গ অপেক্ষা করছিলেন।

ইস্পাহান সম্বন্ধে আমি মোগল ইতিহাসে অনেক বিবরণ পড়েছিলাম, ইস্পাহানের বিখ্যাত চল্লিশ 'স্তম্ভসমন্বিত রাজপ্রাসাদের প্রাচীর গাত্রে হুমায়ুন বাদশাহের অভ্যর্থনার চিত্র-অঙ্কিত রয়েছে। এই ইস্পাহানেরই অদূরে পর্ব্বতশীর্ষে ভারতের আর্য্য ঋষিগণ বেদমন্ত্র পাঠ করে অগ্নিতে আহুতি প্রদান করতেন। হিজাজ-বিন-ইউসুফ সিন্ধু অভিযানের প্রাক্কালে তাঁহার জামাতা মহম্মদ বিন কাসিমকে উৎসাহ দানের জন্য ইস্পাহান

শাহ্ দাহমস্প কর্ত্তৃক হুমায়ুনের অভ্যর্থনা

পর্য্যন্ত এসেছিলেন। ইস্পাহানের সৌন্দর্য্যে মুগ্ধ হয়ে তিনি বলেছিলেন—"ইস্পাহানের প্রস্তরগুলি উজ্জ্বল অঞ্জনবর্ণন মুকুর. মক্ষিকা মধুবাহী, বৃক্ষরাজি কুসুমগন্ধি"। মরোক্কোর বিখ্যাত পর্য্যটক ইবনবাতুতা ইস্পাহান অতিক্রম করে ভারতবর্ষে এসেছিলেন। তিনি বলেছিলেন, "ইস্পাহান নগরের অধিবাসী সুন্দর সুশ্রী, তাদের গণ্ডদেশে গোলাপের রক্তিম আভা, তাদের খাদ্য অতি সুস্বাদু, বিদেশীর প্রতি আতিথ্যে তারা পরস্পর প্রতিযোগিতা করে। আমি পড়েছিলাম যে, ভারতবর্ষ থেকে বহু দেবতা বিগ্রহ ইস্পাহানে আনীত হয়েছিল। দেবতার বেদীগুলিকে মসজিদের সম্মুখে পাত্রাকারে খোদিত করে নমাজের জন্য জলাধারে পরিণত করা হয়েছিল। আমি শুনেছিলাম যে, ইস্পাহানের পূর্বপ্রান্ত জুলফা অঞ্চলে পৃথিবীর প্রাচীনতম গীর্জা অক্ষত অবস্থায় এখনও বিদ্যমান। আর্মেনিয়ান খ্রিশ্চানগণ এই গীর্জা নির্মাণ করেছিলেন এবং ভারতবর্ষের একজন চিত্রকর যীশুখৃষ্টের তৈল-চিত্র অঙ্কিত করে উপহার দিয়েছিলেন। সে চিত্র এখনও গীর্জার প্রাচীর গাত্রে বিলম্বিত রয়েছে। অদ্ভুত কাহিনী শুনেছিলাম যে মাদ্রাজের একজন আর্মেনিয় বণিক থিত্রোস তাহার বিরাট সম্পত্তি ইস্পাহানের জুলফার গীর্জাটি দান করেছিলেন। ধর্মপ্রাণ প্রিন্স নির্দেশ দিয়েছিলেন যেন মৃত্যুর পরে তার হৃদপিণ্ড দেহ বিচ্যুত করে জুলফার গীর্জার সংলগ্ন সমাধি-ক্ষেত্রে সমাধিস্থ করা হয়। জুলফার গীর্জার সংলগ্ন যাদুশালায় ঐ ধর্মপ্রাণ প্রিন্সের তৈলচিত্র বিলম্বিত রয়েছে। তৈলচিত্রের নিম্নভাগে পিত্রোস হৃদপিণ্ড অঙ্কিত রয়েছে। আমার মনে হয় ইস্পাহান শব্দটি এসেছে অশ্বপহন্ বা অশ্বপদ শব্দ থেকে। কারণ ইস্পাহানের অশ্ব ছিল বিখ্যাত এবং ইস্পাহান নগরের পরিকল্পনাও অশ্বপদাকৃতি। ভারতীয় মুঘল যুগে ইস্পাহান ছিল ইরাণের আব্বাসীয় রাজবংশের রাজধানী এবং ভারত ইতিহাসের বহু ঘটনার সংগে বিশেষভাবে জড়িত। ফার্সী ভাষায় ইস্পাহানকে বলা হয়েছে নিস্ফ-জাহান (অর্দ্ধেক পৃথিবী. নিস্ফ অর্থ অর্দ্ধ, জাহান অর্থে পৃথিবী)। অথবা নাকসঙ্গে-ই-জাহান। (নকস—চিত্র, জাহান—পৃথিবী)। বিখ্যাত জিন্দ-আ-রুদ-নদীজল ধারা ইস্পাহান নগরকে কেন্দ্র করে নিরন্তর বয়ে চলেছে। এই অনন্ত সলিলা নদীর বিবরণ পড়েছিলাম জরথুষ্ট্রের গ্রন্থ আবেস্তায়; তখন এই জলধারার নাম ছিল অনহিত যেমন ছিল ভারতীয় আর্য্যদের স্বর্গ গঙ্গা অথবা মন্দাকিনী। ইস্পাহান ছিল আমার কল্পনার দেশ। নগরে প্রবেশ করে এক অপূর্ব পুলকে আমার দেহ মন ভরে গেল।

সন্ধ্যাবেলা ডাঃ ফারোগীও তাঁর বন্ধু বৈজ্ঞানিক বণিক অধ্যাপক মালকুতিকে নিয়ে এলেন আমার সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেবার জন্য—মালকুতি ইংরেজি জানেন না। তার শিক্ষা প্যারিসে। তিনি ইংরেজীকে এত ঘৃণা করেন যে ইংরেজ ভাষা শিখতেও তিনি অস্বীকার করলেন। আমার সঙ্গে ফরাসী এবং ফার্সী ভাষায় আলাপ করলেন।

এমন সময় এলেন ডাঃ মেহেরিয়া; অতি চমৎকার ইংরেজী বলেন, লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয় থেকে তিনি ডিগ্রী নিয়ে এসেছেন। তিনি আমায় অভিনন্দন করে বললেন, "ভারতবর্ষ আমার স্বপ্নের দেশ, ভারতবাসী আমার শ্রদ্ধার পাত্র, আমার পিতার কাছে সুফী অম্বাপ্রসাদের কাহিনী শুনেছিলাম। ঐ বৃটিশ ভারতসন্তান বিদ্রোহী পলাতক-বিংশ শতকের প্রথম পাদে ইরাণে এক নূতন স্পন্দন সৃষ্টি করেছিলেন। এখনও ইস্পাহান সিরাজের বহু মনীষী সুফী অম্বাপ্রসাদের কাহিনী বলতে বলতে ও শুনতে শুনতে অশ্রু বিসর্জন করে। সুফী অম্বা-প্রসাদের জীবনের ঘটনা নিয়ে ফার্সী ভাষায় বহু ছড়া ও কবিতা রচিত হয়েছে।" আমি সুফী অম্বাপ্রসাদের দেশের লোক বলে তিনি যেন শ্রদ্ধায় বিগলিত হয়ে গেলেন। আমি ডাঃ মেহেরিয়ার মুখের দিকে চেয়ে বিস্ময়মুগ্ধ হলাম! সহমর্মিতায় ও শ্রদ্ধায় যেন সমস্ত ঘরখানি ভরে গেল।

আমরা প্রায় দু-তিন ঘণ্টা কথা বলেছিলাম। বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাঙ্গণে মুক্ত আকাশের নীচে আমার ইস্পাহান বিশ্ববিদ্যালয়ে বক্তৃতার বিষয় নিয়ে আলোচনা হলো; বক্তৃতা দিতে হবে কাল রবিবার। আমার বক্তৃতার বিষয় প্রাচীন ইরাণ ও প্রাচীন ভারতবর্ষ। বিশ্ববিদ্যালয়টি নতুন, পাঁচমাসের শিশু। আমিই প্রথম এই বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রথম বৈদেশিক অতিথি। অবশ্য এর পূর্বে একজন আমেরিকান এসেছিলেন। তিনি এসেছিলেন দেখতে, আমি এসেছি জানতে, চিনতে। আমার দৃষ্টির পশ্চাতে রয়েছে শ্রদ্ধা, দর্শনের পশ্চাতে আছে অনুসন্ধিৎসা। মিঃ মালকুতি আমার কাছে ইস্পাহানের সৌন্দর্য্য, কীর্তিকাহিনী, সংস্কৃতি, পথঘাট, সৌধ প্রাসাদ, মসজিদ, বৃক্ষ নদী সব কিছুর পরিচয় দিলেন। প্রথমে ভাবছিলাম তিনি বোধহয় পথপ্রদর্শক (travel guide তারপর বুঝলাম মিঃ মালকুতি ইস্পাহানকে অত্যন্ত ভালোবাসেন। ইস্পাহানের গর্বে তিনি উচ্ছসিত, উল্লসিত, ইস্পাহান দর্শনের জন্য আগত সকল উল্লেখযোগ্য বিদেশীর তিনি বন্ধু, ইস্পাহানের কথা বলে, ইস্পাহানের দর্শনীয় বস্তু দেখিয়ে তিনি অপরিমেয় আনন্দ লাভ করেন। আমার মত বিদেশী অতিথি পর্য্যটক বৎসরে অন্ততঃ পাঁচ ছয় জন তাঁর আতিথ্য গ্রহণ করেন। তাঁর গাড়ী রয়েছে, গৃহ রয়েছে, গৃহে সুন্দরী অতিথি বৎসলা গৃহিণী রয়েছেন। সুতরাং তাঁর কথা শুনে, তাঁর পরিচয় জেনে আমার ধারণা পরিবর্তিত হলো। ডঃ ফারোগী বললেন 'আমার পিতা শৈশবে এই ইস্পাহানের ডেপুটি গভর্ণর ছিলেন। আমরা ইস্পা-হানের বিদ্যালয়ে শৈশবের দিনগুলি কাটিয়েছি। মিঃ মালকুতির সবই ভালো, কিন্তু একবার কথা বলতে আরম্ভ করলে, বিশেষতঃ ইস্পাহানের কথা তার বাক্য হয়ে পড়ে অন্তহীন। কিন্তু মিঃ মালকুতির কণ্ঠে এমন মধু আছে যার জন্য আমরা তার নাম দিয়েছিলাম মধুকণ্ঠ (শিরিণ গলুক) মিঃ মালকুতি প্রশংসায় বেশ স্ফীত হয়ে উঠলেন।

ইতিমধ্যে আমরা তিনবার চা খেয়েছি। 'গ্যাজ' নামে এক অপূর্ব দেশীয় মিষ্টি বার বার পরিবেশন করা হলো। আমার ডায়েবেটিস: আমি মিষ্টি খাইনা। বিনা চিনিতে চা খাচ্ছিলাম, দুধহীন, চিনি বিহীন। দু-এক জন আশ্চর্য্য হয়ে গেলেন চিনিবিহীন চা ইরাণে অকল্পনীয় ব্যাপার। ডাঃ ফারোগী সিগারেটের গন্ধ সইতে পারেন না। ডাঃ মেহেরিয়া রঙীণ সুধা পান করছিলেন। আমি সেই গন্ধ সইতে পারছিলাম না। মিঃ মালকুতি নেবু ছাড়া চা খেতে পারেন না। তিন মাইল দূরে তাঁর গৃহে পাঠান হলো নেবু আনতে। ডাঃ ফারোগীর বৃহত্তম কৃতিত্ব হলো ইস্পাহানের বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন। এ যেন তাঁর স্বপ্নশিশু। তিনি প্যারিস বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র, ব্রাসলটের ইতিহাসের ডক্টর, লণ্ডনের ব্যারিস্টর, আমেরিকার শিক্ষণ-শিক্ষক। দীর্ঘ তেরো বৎসরকাল ইরাণের বাইরে কাটিয়েছেন। অনেক দেখেছেন, অনেক শুনেছেন, অনেক বলেছেন।

জুলফা—আর্মেনিয়ান চার্চ

জাপানে প্রাচ্য দেশীয় শিক্ষা দেখবার জন্য আমন্ত্রিত হয়েছিলেন; প্রত্যা-বর্তনের পথে তিনি দিল্লী এসেছিলেন, কিন্তু ভিসা পান নি বলে ভারতবর্ষ দেখবার সুযোগ হয়নি। তিনি অভিযোগ করে বললেন যে ভারত সরকারের বৈদেশিক বিভাগ অত্যন্ত শ্লথগতি কিংবা কৃপণ, কাগজ এবং ডাক খরচ করে না। যদিও কথাটা পরিহাস করেই বলেছিলেন, তবু আমি দুঃখিতই হলাম যে আমাদের দেশের বৈদেশিক বিভাগ সম্বন্ধে বিদেশীর এমন একটি ধারণা রয়েছে। আমাদের কথা তখন শেষ হয়নি, এমন সময় হোটেল থেকে একজন কর্মচারী এসে খবর দিয়ে গেল আমার জন্য বিখ্যাত 'ইরাণ তুর' হোটেলে স্থান হয়েছে। রাত

আটটার সময় আমাকে আমার বাইশ নম্বর ঘরে যেতে হবে। তারপর স্থির হলো কাল ভোর আটটায় মিঃ মালকুতি আমাকে নিয়ে যাবেন শহর দেখাতে। বেলা এগারোটার সময় আমার দ্বিতীয় অভিভাষণ "ভারতীয় পরিবেশে সুফী ধর্ম (Sufism in Indian back ground)—প্রবন্ধে ফরাসী ভাষায় অনুবাদ করবেন ডাঃ মেহেরিয়া—বেলা ১১টা থেকে ১টায়। তারপর ১টার সময় আমরা বিশ্ববিদ্যালয়ের অতিথিরূপে জিন্দারুদ নদীর অপর তীরে প্লাজা হোটেলে লাঞ্চে সমবেত হবো।

রাত আটটার সময় ডাঃ ফারোগীর গাড়ীতে আমরা ইরাণ-তুর হোটেলে এলাম। তখন ডিনারে সঙ্গীত অধিবেশন চলেছে! ইরাণের জাতীয় সঙ্গীত আরম্ভ হয়েছে। যে যেখানে ছিল দাঁড়িয়ে গেল। তারপর আমরা এলাম বাইশ নম্বর ঘরে। ঘর তো নয় ইন্দ্রপুরী, হোটেলের ঐক্যতান। ওপর থেকে হলুদ নিওনের আলো জ্বলে উঠলো। সমস্ত প্রাঙ্গণ ফিকে হলুদের আলোছায়ায় ছেয়ে গেল যেন চলচ্চিত্রের পট-পরিবর্তন।

রাত্রি সাড়ে নটায় নৈশ ভোজনে উপস্থিত হয়েছিলাম। আমেরিকানের সংখ্যাই বেশী। এককোণে একদল ফরাসী বসেছিলো—বিকট উচ্ছ্বসিত হাসি। আমার পাশেই বসেছিলো একদল ইরাণী সৈনিক, পদস্থ কর্মচারী—তাদের বেশভূষা এবং স্কন্ধে বিলম্বিত স্বর্ণজাল, শাহানশাহের প্রতিকৃতি। সকলেই এক বর্ণ, এক বয়েস, এক পরিচ্ছেদ অতি স্বল্পভাষী। অবশ্য তারা পানে ব্যস্ত ছিল—কথা বলবার অবসর ছিল না। আমেরিকান হুইস্কি বেশী খায়, ফ্রেঞ্চ টেবিলে দেখলাম রাশিয়ান ভোদকা, আর ইরাণের লাল সিরাজী তাদের জাতি বিচার নেই। ইরাণী টেবিলে রয়েছে বিভিন্ন বর্ণের বোতলের সমাবেশ। আমাকে পেপ্সি কোলা, অরেঞ্জ কোয়াস দিয়ে গেল। বেয়ারা ভারী খুশী, আমার টেবিল থেকে অ-পীত দুটি পেগ তুলে নিয়ে গেল। আমার মত শুষ্ক পর্য্যটক তারা সব সময়ে পায় না। আমি কৌতুহলী দৃষ্টি নিয়ে এক ঘণ্টা সঙ্গীত, সুরা-পান, ভোজন ও বিভিন্ন ভাষায় আলাপ শুনছিলাম।

রাত্রি সাড়ে দশটার সময় আমার ঘরে ফিরে এলাম। আমার ঘর থেকে পূর্বের আকাশ দেখছিলাম, আকাশে জ্বলছে তারার মালা, নীলের প্রচ্ছদপটে। ভাবছিলাম অতীত মিশরের কাহিনী। ডিনারের পরিচ্ছদ ত্যাগ করে দিনলিপি সমাপ্ত করলাম। ঘুম আমার চিরসাথী;
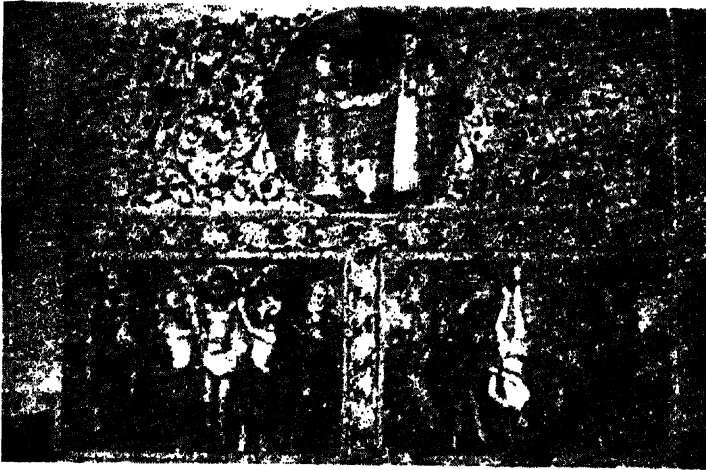
জুলফার গীর্জ্জার গাত্রে অঙ্কিত নরকের দৃশ্য

দ্বার থেকে আমার প্রকোষ্ঠ পর্য্যন্ত লাল পুরু গালিচা প্রথমে আমার বসবার ঘর, তারপর আমার শোবার ঘর, সর্ব্বশেষে আমার স্নানের ঘর।

শোবার ঘরের দেওয়াল ফিকে হলুদ; পর্দাগুলি ফিকে হলুদ; কাপড়ের জালগুলিও ফিকে হলুদ ছাদের তলায় বিচিত্র রঙের ফুল পাতা আঁকা রয়েছে। ফুল-পাতার রঙের সঙ্গে দেয়াল ও পর্দার রঙ সুসঙ্গত। গালিচা কুশনের আচ্ছাদন সব কিছুর মধ্যেই ফিকে হলুদ রঙের এক সুসঙ্গত সমন্বয়।

একটু পরেই ফিকে হলুদ রঙের আচ্ছাদনে ঢাকা একটি ট্রেতে করে ফিকে হলুদ রঙের চায়ের সরঞ্জাম নিয়ে এলো। আমরা চা পান করে আমার শোবার ঘরে এলাম। প্রত্যেক ঘরে টেলিফোন রয়েছে—পায়ের নীচে কলিংবেল, বিরাট ওয়ার্ড রোব, ড্রেসিং টেবিল, সবই হালকা হলুদ রঙের পর্দা দিয়ে ঢাকা। হঠাৎ বেজে উঠলো বাইরে সবুজ লনে

আমি ইচ্ছা-নিদ্র। যখন ইচ্ছা তখন ঘড়ি ধরে পনেরো মিনিট, আধঘণ্টা, একঘণ্টা, চারঘণ্টা, যতটুকু প্রয়োজন ঘুমোতে পারি—যে সময় ইচ্ছে করি তখনই উঠতে পারি। শেষরাত্রে বাড়ীর যদি কারো কোথাও যেতে হয়, তবে আমিই বাড়ীর ঘড়ির কাঁটা।

আমি পৌনে এগারোটায় সময় ঘুমিয়ে পড়লাম—রাত সাড়ে চারটেয় ঘুম থেকে উঠলাম। হাত মুখ ধুয়ে একটু ব্যায়াম করলাম। তারপর লিখতে আরম্ভ করলাম আজকের ভাষণ। কারণ মিঃ মালকুতি আসবেন আটটার সময়; তিনি আমাকে নিয়ে যাবেন নগর পরিদর্শনে। এগারোটার সময়ে আসবেন ডঃ মেহেরিয়া। তারপর একটায় সময় যাব প্লাজা হোটেলে। সেখানে আছে অফিসিয়াল লাঞ্চের ব্যবস্থা। এরপর আমার আজকের ভাষণ প্রাচীন ইরাণ ও প্রাচীন ভারতবর্ষ। প্রায় একটি সম্পূর্ণ প্রবন্ধ লিখেছিলুম।

আটটার সময় আমি স্নানের ঘর থেকে শুনলাম টেলিফোনের শব্দ। গায়ে জল মুখে সাবান—টেলিফোনের সামনে দাঁড়ালাম। বিরাট আয়নায় নিজের মুখ দেখে নিজেই হাসছিলাম—ইরাণীর রূপের সঙ্গে আমাদের ভারতীয় রূপের মুখের ও বর্ণের পার্থক্য। মিঃ মালকুতি গাড়ী নিয়ে এসেছেন। আমরা যাব নগর পরিদর্শনে। দশ মিনিটের মধ্যে আমি তৈরী হয়ে নিলাম। এর আগেই সাতটার সময় আমি প্রাতরাশ সেরে নিয়েছিলাম।

আমরা প্রথমেই এলাম জুম্মা মসজিদে। এই মসজিদ ছিল ইস্পাহানের প্রাচীনতম। মালেকশাহ সেলজুক সুলতানের উজির নিজাম উল্ মুলক্ এই মসজিদ নির্মাণ করেছিলেন। মসজিদটি ইস্পাহানের একটি প্রাচীন অগ্নি মন্দিরের ধ্বংসাবশেষের উপর নির্মিত হয়েছিলো। এই মসজিদটির অভ্যন্তরে মিম্বার অর্থাৎ ইমামের আসন অগ্নি মন্দিরের অগ্নিকুণ্ডের উপরে নির্মিত হয়েছিলো। এই মসজিদের মধ্যে আরব, সেলজুক, তুর্ক, মঙ্গল, ইরানীয়ান, আফগান, প্রত্যেক জাতির হস্তচিহ্ন রয়েছে। যে জাতি যখন ইস্পাহান জয় করেছে, সেই তখন এই মসজিদের বিভিন্ন অংশ নির্মাণ করেছে। কোথাও যোগ করেছে, কোথাও বা বিয়োগ করেছে, প্রত্যেক জাতি নিজের শিল্পাদর্শকে অক্ষুন্ন রেখে মসজিদের বিভিন্ন অংশ নির্মাণ করেছে। মুসলমানের রচনা—তা লিখিতই হোক অলিখিতই হোক, আলোচনা করবার যথেষ্ট সুযোগ রয়েছে। কারণ প্রত্যেক লেখক চিত্রকর শিল্পী প্রস্তর গাত্রে কিংবা গ্রন্থের পৃষ্ঠায় নিজের নাম লিখে রাখে। এই জুম্মা মসজিদের বৈশিষ্ট্য এই যে খালিফা আল মুস্তাসিম থেকে আরম্ভ করে রিজাশাহ পহেলবী পর্যন্ত সকলেই মসজিদের বিভিন্ন অংশে প্রস্তর ফলকে নিজের নাম ও সময় উল্লেখ করে গেছেন। মসজিদের প্রত্যেকটি অংশ স্তরে স্তরে সাজানো প্রত্যেকটি বিভিন্ন অথচ সংযুক্ত।

এই জুম্মা মসজিদের চারটি অংশ দূর থেকেই দর্শকের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। প্রবেশ তোরণে, স্নানাগারে, ঝরণায়, মোজেক পাথরে, মীনার কাজে বিভিন্ন প্রকারের লেখা কোরাণের আয়াত উৎকীর্ণ রয়েছে। দূর থেকে তোরণের অক্ষরগুলি মনে হয় যেন প্রস্ফুটিত পুষ্প, পল্লব,—পাথর দিয়ে পাথরের উপর আঁকা। এই প্রস্তর কিংবা মোজেকগুলি সর্বত্রই নীল। নীলের উপরে সাদা অক্ষর এবং বিন্দুগুলি মনে হয় যেন নীল আকাশে তারার বিন্দু। ভারতবর্ষের আগ্রা দিল্লী লাহোরে এই রঙের খেলা দেখেছি। কিন্তু মুঘল শিলালিপি, মসজিদ এবং প্রাসাদের প্রাচীরগুলির প্রচ্ছদপট নীলবর্ণ নয়। তাজমহলের ভিত্তিগাত্রে শ্বেত মর্মরের উপরে কোরাণের আয়াতগুলি শ্বেত-মর্মর খোদিত। দূর থেকে মনে হয় যেন পাষাণগাত্রে ফুটে উঠেছে পাষাণের পুষ্প, ও কোরক পল্লব।

ইস্পাহানের এই জুম্মা মসজিদের দুই পার্শ্বে রয়েছে মাদ্রাসা, গ্রীষ্মকালে নমাজের জন্য আগত মুসলিমদের জন্য বিশ্রামাগার। পূর্ব ও পশ্চিম পার্শ্বে অনেকগুলি স্নানাগার। এই মসজিদের আরম্ভ সপ্তম শতাব্দীর শেষপাদে। ১০৫০ খৃষ্টাব্দে সেলজুক সুলতান এই মসজিদ সংস্কার করেন। তারপর তুর্ক, মোঙ্গল, আরব, পার্শী, আফগান, এই মসজিদটি যুগে যুগে সংস্কার করেন। পারস্য দেশে অবস্থিত হলেও মসজিদ গাত্রে উৎকীর্ণ অক্ষরগুলি আরবী ভাষায় তুর্কী রীতিতে খোদিত। এই মসজিদের মিনার সমগ্র এশিয়ার মধ্যে বৃহত্তম। এই মিনারটির ব্যাসার্ধ ১১৬ ফুট। অথচ একমাত্র খিলানের উপরেই সন্নিবেসিত। কোন স্তম্ভ নাই—অপূর্ব এই স্থাপত্য কলা-কৌশল।

দশটার সময় আমরা ফিরে এলাম কারণ ডঃ মেহেরিয়া আসবেন—বিশ্ববিদ্যালয়ে আমার প্রস্তাবিত ভাষণ অনুবাদ করবেন। সে অনুবাদের ভাব ও ভাষা আমরা আলোচনা করে সর্বশেষে রূপ দেব। ১টা বাজবার পাঁচ মিনিট আগে মালকুতি ডাঃ মেহেরিয়া, ডাঃ ফারে। সবাই আমরা লাঞ্চের জন্য প্লাজা হোটেলের দিকে যাত্রা করলাম। পথে আমরা জিন্দারুদ নদী অতিক্রম করলাম। প্লাজা হোটেল জিন্দারুদ নদীর দক্ষিণ তীরে। আমেরিকান রীতিতে নির্মিত। এর ভিতরে কোন শিল্পকলা রূপ বা কোন সৌন্দর্যের ছায়া নেই। ইটের উপর ইট কোথাও দন্ত-বিকশিত করে রয়েছে। প্রাচীরগুলিও সু-সন্নিবেসিত নয়। কিন্তু ভিতরে প্রবেশ করে দেখলাম প্রয়োজনীয় সমস্ত দ্রব্য অতি সুন্দর সযত্নে সুরক্ষিত। অভ্যর্থনা কক্ষের বাম পার্শ্বে অতি সুবেশধারী সুশ্রী শ্বেত পরিচ্ছদভূষিত সুবর্ণখচিত শিরস্ত্রাণ পরিহিত পরিচারক অভ্যর্থনার জন্য দাঁড়িয়ে রয়েছে। মুখে সুস্মিত হাসি, সম্মুখে বৃত্তাকার টেবিলে অসংখ্য সুরাপাত্র। পশ্চাতে স্তরে স্তরে সুসজ্জিত কাচের পাত্রে সুরাধার। বিভিন্ন কক্ষে বিভিন্ন বর্ণের বিভিন্ন-আকারের আসন, কুশন, প্রায় প্রত্যেকটি আকার বিচ্ছিন্ন। সংগতি বিহীনতাই ছিল যেন সৌন্দর্য্যের আদর্শ। এমন কি টেবিলগুলিও যেন বিভিন্ন ধরণে সুসজ্জিত। সংস্কৃত ভাষায় যাকে বলে সুখস্ত বিস্রস্ত, ইংরাজীতে যাকে বলা যেতে পারে carefully careless. তখন একটা বেজে গেছে। বহু সম্ভ্রান্ত পরিবার পুত্র কন্যা স্বামী স্ত্রী অতিথিসহ বা অতিথি বিহীন প্রতিদিন এখানে লাঞ্চের জন্য পাশে আসেন।

আমাদের পাশেই বিরাট একটি টেবিলের পাশে সংরক্ষিত ছিল বিংশতি আসন। সামরিক কর্মচারী,তাদের স্ত্রী কিংবা আত্মীয়সহ লাঞ্চেও এসেছেন। তাদের পরিচ্ছদ সুবর্ণখচিত—শাহানশাহের প্রতিকৃতি উৎকীর্ণ ; সুতরাং তাদের নূতন পরিচয়ের প্রয়োজন হয় না। অপূর্ব সুন্দর—এ যেন যক্ষ যক্ষিণীর মেলা। ডাঃ ফারোগী বললেন, এরা সব রাজ পরিবারের,সকলেই উচ্চপদস্থ সৈনিক কর্মচারী। আমি জিজ্ঞাসা করলাম, "রাজ পরিবার কথাটার উপর জোর দিলেন কেন?" ডাঃ ফারোগী বললেন, ১৯৫৫ সালে মসদ্দকের বিদ্রোহের পর মহম্মদ রিজা শাহ পহেলবী নূতন করে সৈন্যদলে নিজের পরিবার ও আত্মীয়বর্গকে প্রতিষ্ঠিত করেছেন। তারপর ইরাকে রাজতন্ত্র কি গুপ্ত হয়েছে। রাজমন্ত্রী নুরি-আল-সাইদকে প্রকাশ্য রাজপথে খণ্ড বিখণ্ড করা হয়েছিলো। সুতরাং ইরাণে বাদশাহ স্বয়ং দেহরক্ষী-বাহিনী গঠন করেছেন। সে বাহিনীতে বিশ্বস্ত রাজ পরিবারও রাজভক্তের স্থান। তার উপর আবার রয়েছে গুপ্ত দেহরক্ষী। গুপ্ত চিহ্নবিহীন পরিচ্ছদ ভূষিত এই দেহরক্ষী বাহিনী পথে অ-পথে, বিপথে, নাচের হোটেলে, ট্রেণে বাসে, ষ্টীমারে, এরোপ্লেনে ঘুরে বেড়াচ্ছে। কেহ কাহাকে বিশ্বাস করে না। কারও সঙ্গে কারো পরিচয় নেই। অথচ সকলেই কর্মে একই সন্ধানে নিযুক্ত, ডাঃ মেহেরিয়া বললেন যে আমার

পাশের টেবিলে বসেছেন যিনি হয়তো তিনিই একজন গোপন দেহরক্ষী পারস্যের আকাশ বাতাস সন্দেহের আবিলতায় বিষাক্ত এমন সময় মিঃ মালকুতি ওষ্ঠে আঙুল দিয়ে নীরবতর ইঙ্গিত করলেন। দেখলাম সামান্য শুনলাম, সামান্যতর বুঝলাম অনেক।

এখানে প্রধান খাদ্য চেলো-কাবাব। অতি নরম কাবাব, ছড়ান যুঁই ফুলের মত ভাত দুধের মত সাদা ; দুধের চেয়েও সাদা মাখন, তারপর নানা রকম পারস্য দেশীয় শাক, চাটনী, স্যালাড্। একসঙ্গে তিনরকম স্যালাড আর কোথাও কোনদিন খাইনি। দেশী রুট,তারপর পেপ্সী কোলা,বিভিন্ন রকমের সুরা। চলেছে অবিরাম রেডিও-র গান, কি বিশ্রী, পাশে জিন্দা-রুদ নদী থেকে বয়ে চলেছে তরঙ্গ সঙ্গীত, সুদূরে জিন্দারুদের অপর তীর থেকে ভেসে আসছে চীনার বৃক্ষের মৃদু মৃদু পত্র মর্মর। মনে হচ্ছিল ওমর খৈয়ামের সেই সুরভিত উদ্যান, সেই সুরাপাত্র, সেই আহার্য্য সম্ভার। কিন্তু ছিল না উদ্যান, ছিল না সাকি, ভদ্রসমাজে রেডিও সঙ্গীত অচল। লাঞ্চের শেষে আমরা হোটেলের উত্তর পার্শ্বের বারান্দায় দোতলায় উঠলাম। সেটি ঝুলন্ত বারান্দা, জিন্দারুদ নদীর উপর পর্য্যন্ত বিস্তৃত কুড়ি ফুট প্রশস্ত। ইচ্ছানুযায়ী একে প্রসারিত ও সংকুচিত করা যায়। প্রয়োজন হলে এই বারান্দায় প্রকোষ্ঠ নির্মাণ করা যায়। আমরা বসে মুক্ত হাওয়ায় আইসক্রীম, কফি আর চা খেলাম তারপর অরেঞ্জ কোয়াস, ছয় রকমের পানীয়। তার পরিবর্তে ডাঃ মেহোরিয়া ঐ রকম ছয় রকমের সুরা পান করলেন।

বেলা আড়াইটার সময় আমরা জিন্দারুদ অতিক্রম করে এলাম ক্রিশ্চান মিশন হাউসে ডাঃ টমসনের সঙ্গে দেখা করতে। কারণ কলকাতা থেকে বিশপ ফিলিপ প্রামার একখানি পরিচয় পত্র দিয়েছিলেন। আমার ইচ্ছে ছিলো যে ইরাণে খ্রীষ্ট ধর্মের প্রসার এবং কার্য্যকলাপ সম্বন্ধে সংবাদ নেবো। ডাঃ ফারোগী বললেন, বিশপ টমসনের কন্যা একজন ইরাণী যুবককে বিয়ে করেছে। সুতরাং ইরাণী যুবকটি সমাজে অপাংক্তেয়। আমি বললাম, "কেন আপনারা তো খুব গর্ব করেন, ইরাণে ধর্মে স্বাধীনতা রয়েছে। প্রায়ই আমাকে বলে থাকেন, ভারতীয় হিন্দু, শিখ, সেমিটিক ইহুদি এবং প্রাচীন অগ্নি উপাসক জরথুষ্ট্রের ধর্মাবলম্বী—সমানভাবে রাজানুগ্রহ লাভ করে। তিনি হেসে বললেন—এটা বিজ্ঞাপন, আত্ম-প্রশংসা। মোটের উপর আমরা খৃষ্টানদের স্বচ্ছন্দে গ্রহণ করিনা। কারণ তারা রাজনীতিক্ষেত্রে সব সময়ে জটিলতা সৃষ্টি করে. অন্ততঃ ইতিহাস তাই বলে।

আমরা খ্রীষ্টান মিশনে গিয়ে শুনলাম বিশপ টমসন অনুপস্থিত। তিনি পার্সিয়ান পারস্যোপ তীরে কোয়াইত বন্দরে গিয়েছেন এবং ২৭শে এপ্রিল ইস্পাহানে ফিরবেন। আমরা নিরাশ হয়ে ফিরে এলাম। ডাঃ ফারোগী খুশী হলেন।

আমরা জিন্দারুদের নূতন সেতু অতিক্রম করে শহর থেকে পাঁচ মাইল দূরে জুলফা অঞ্চলে উপস্থিত হলাম। জুলফা ইস্পাহানের প্রাচীনতম অংশ। জুলফার কাহিনী শুনেছিলাম, পড়েছিলাম। এখানে আর্মেনীয়ানদের একটা গীর্জা রয়েছে, পৃথিবীর প্রাচীনতম গির্জা। বেথলেহাম, জেরুজালেম এর গির্জাগুলি বহুবার ধ্বংস হয়েছে। আবার নূতন করে নির্মাণ করা হয়েছে। স্থানটি একই আছে, গির্জাটি নূতন। আমরা দূর থেকে শুনলাম গির্জার ঘণ্টাধ্বনি। দূরাগত গম্ভীর এই ঘণ্টাটির বয়স চৌদ্দশত বৎসর। সেই প্রাচীন তোরণ, দ্বার, সমস্ত আবেষ্টনী অত্যন্ত গুরুগম্ভীর, শান্ত। বিলাস নাই অথচ আড়ম্বর রয়েছে। মিঃ মালকুতিকে দেখে গির্জার অধ্যক্ষ এগিয়ে এলেন ; তারা পূর্ব পরিচিত। তিনি আমাকে পরিচয় করিয়ে দিলেন—ইনি ভারতবর্ষের পর্য্যটক, এসেছেন তীর্থ দর্শনে। আমি পূর্বে জেরুজালেমে যীশুখৃষ্টের জন্মস্থান, সমাধি, গির্জা, Hall of Cnfession দেখেছিলাম। আমার আলোচনার সময় মিঃ মালকুতি বল্লেন, হয়তো আপনি পূর্বজন্মে খ্রীষ্টান ছিলেন। তিনি জানেন যে হিন্দুরা পূর্বজন্মে বিশ্বাসী। জুলফা গির্জার অধ্যক্ষ তীর্থ দর্শনে এসেছি মনে করেছিলেন আমি হয়তো খৃষ্টান। আমি গির্জার অভ্যন্তরে প্রবেশ করলাম।

গির্জায় সমস্ত প্রাচীর গাত্রে সম্পূর্ণ চিত্রাঙ্কিত, ওল্ড টেষ্টামেন্ট এবং নিউ টেষ্টামেন্টে বর্ণিত যীশুখ্রীষ্টের সম্পূর্ণ জীবনের ঘটনাগুলি চিত্রের মাধ্যমে অঙ্কিত। নরকের শাস্তির চিত্রগুলি অত্যন্ত জীবন্ত। বর্ণ বৈচিত্র্য, বর্ণ সমন্বয়, আলোর ছটায়:উদ্ভাসিত কতকগুলি চিত্রে অত্যন্ত বিভীষিকাময় নরকের বিভিন্ন দৃশ্য। কোথাও বা রহস্যময়, কোথাও ইঙ্গিতপূর্ণ, কোথাও বা প্রতীক, কোথাও অত্যন্ত স্থূল, কোথাও বা অস্পষ্ট ছায়াময়। গির্জার অধ্যক্ষ আমাকে ইটালিয়ান, চাইনিজ, আর্মেনীয়ান, ইরানীয় চিত্রকরদের অঙ্কিত বিভিন্ন চিত্র দেখিয়ে দিলেন, বুঝিয়ে দিলেন। ভারতবর্ষের একজন আর্মেনিয় চিত্রকরের অঙ্কিত একখানি চিত্র প্রাচীরগাত্রে সুশোভিত।

তারপর আমরা এলাম জুলফার মিউজিয়মে বা যাদুশালায়। এই যাদুশালায় সংরক্ষিত বহু প্রাচীন দ্রব্যসামগ্রী দেখলাম। এখানে রয়েছে পৃথিবীর প্রথম কাষ্ঠফলকে মুদ্রিত বাইবেল ; আরও দুখানি রয়েছে হিব্রু ও আর্মেনীয় ভাষায়। ১০৪৮ খৃষ্টাব্দ থেকে আরম্ভ করে ১৯৩৯ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত প্রায় নয়শত বৎসরের সমস্ত ধর্মাধ্যক্ষদের চিত্র অঙ্কিত রয়েছে। পার্শ্বে এক একখানি প্রস্তর ফলক। ফলকে জন্ম নাম মৃত্যুর দিবস উৎকীর্ণ রয়েছে। বিভিন্ন যুগের পরিচ্ছদ সম্বন্ধে অতি তথ্যপূর্ণ সংবাদ সংগ্রহ করা যায়। এই জুলফা অঞ্চলে তেরোটি বিভিন্ন গির্জা রয়েছে। প্রত্যেক গির্জায় দাতা ও নির্মাতার নাম লিখিত রয়েছে। শাহ আব্বাস ইরাণের শিল্প এবং ঐতিহ্য অক্ষুণ্ন রাখবার জন্য আর্মেনীয়ান খৃষ্টানদের এই জুলফা অঞ্চলে স্থায়ী বসবাসের অনুমতি দিয়েছিলেন এবং আর্মেনীয় খৃষ্টানদের ধর্ম, সংস্কৃতি ও স্বার্থতে আঘাত করেননি। কিন্তু বর্তমান ধর্মযাজক দুঃখ করে বললেন তিনি শেষ পর্য্যন্ত ইহুদিরাও ইজরাইলে তাদের মাতৃভূমি স্থাপন করেছে। আর্মেনীয়গণ আজ পৃথিবীর সর্বত্র উদ্বাস্তু,তারা যাযাবর ; তাদের নাম আছে, কিন্তু ঠিকানা নেই। জুলফা না দেখলে আমার ইস্পাহান ভ্রমণ ব্যর্থ হতো।

ফলিত জ্যোতিষশাস্ত্রে অভিজ্ঞতার কথা

উপাধ্যায়

তুলা এবং মকর লগ্নে জাত নারী পুরুষের সপ্তমে মঙ্গল অবস্থান বা দৃষ্টি করলে স্বামী বা স্ত্রীর মৃত্যুর কারণ হয় না, দাম্পত্যজীবনের নানাপ্রকার ক্ষতি করে এবং স্বামী স্ত্রীর মিলন সুখের হয় না। এক্ষেত্রে কিছু না কিছু বাধা বিপত্তি, কলহ, বিচ্ছেদ প্রভৃতি ঘটবেই। অনেকে বলেন কর্কট বা মকরে সপ্তম স্থানে মঙ্গল থাক্‌লে ক্ষতিকর হয় না—কিন্তু ভৌম দোষজনিত কিছু ক্ষতি কর্‌বেই বৈধব্য বা স্ত্রীবিয়োগ না ঘটালেও। মকর লগ্নে শনি অবস্থান করেও অনেক সময়ে ভালো ফল দেয় না। শনির ক্ষেত্রে সপ্তম স্থানে মঙ্গলের অবস্থিতি দোষজনক নয়। লগ্ন রাশি বা শুক্রের গৃহ থেকে সপ্তম স্থানে মঙ্গল উচ্চস্থ থাক্‌লে ভৌমদোষ হয় না।

লগ্ন থেকে শুক্র চতুর্থ স্থানে, সপ্তম স্থানে চন্দ্র, একাদশে বুধ, দ্বিতীয়ে বৃহস্পতি আর শুভগ্রহের সহিত রবির সহাবস্থানে কামিনী যোগ হয়। এই যোগে জন্ম হোলে ৪২ বৎসর বয়স থেকে পূর্ণ সৌভাগ্যোদয়। লগ্নে বৃহস্পতি, সপ্তমে চন্দ্র আর দ্বিতীয়ে রবি থাক্‌লে কুসুমযোগ হয়। এই যোগে বিশ বছর বয়সের পর জাতক রাজা বা রাজতুল্য অথবা প্রধান নাগরিক হয়। আত্মকারকাধিকৃত নবাংশ থেকে দ্বিতীয়, তৃতীয় বা পঞ্চমে কেতু ও বৃহস্পতি থাক্‌লে জাতক অঙ্কশাস্ত্রে দক্ষ হয়। চন্দ্র এবং মঙ্গল একত্র থেকে বুধের দ্বারা দৃষ্ট আর বুধ বা মঙ্গল কেন্দ্রস্থিত হোলে জাতক গণিতজ্ঞ হয়। অষ্টমাধিপতি হয়ে বুধ বলী হোলে আর লগ্নে বৃহস্পতি ও অষ্টমে শনি থাক্‌লে ও জাতক গণিতজ্ঞ হয়। কেন্দ্র বা কোণে বৃহস্পতি, শুক্র বলশালী আর বুধ দ্বিতীয়াধিপতি হোলেও গণিতশাস্ত্রে বুৎপত্তিলাভ করা যায়। অঙ্কে বিচক্ষণতা সম্বন্ধে জানতে হোলে দ্বিতীয় স্থানের এবং বুধের বলাবল বিচার করা দরকার। যে সব স্ত্রীলোকের পায়ের গোড়ালি খুব পুরু, তাদের নৈতিক চরিত্র দূষিত হয়। সপ্তমে শনি থাক্‌লে বিবাহে বিলম্ব ঘটে! বৃহস্পতি থেকে চন্দ্র ষষ্ঠে, অষ্টমে অথবা দ্বাদশে থাক্‌লে শকটযোগ হয়। এই যোগে জাতকের ভাগ্যহানি হয়ে পুনরায় ভাগ্যলাভ হয়। জাতক সাধারণ ও তুচ্ছ ব্যক্তি হয়। শকটযোগে জাত ব্যক্তির দুষ্টা স্ত্রী হয়। তুলা লগ্নের পক্ষে অষ্টমস্থ বৃহস্পতি অত্যন্ত অশুভপ্রদ। বক্র হোলে গ্রহটি শক্তি সম্পন্ন হয়। বাগ্মিতা ও বিদ্যার ক্ষেত্র দ্বিতীয় স্থান। এখানে শুভগ্রহের দৃষ্টি থাক্‌লে উত্তম বক্তা ও বিদ্বান হওয়া যায়। চতুর্থে বুধ বিদ্যাদায়ক। কর্কট লগ্নের পক্ষে কুম্ভে মঙ্গল ও মেষে শনি থাক্‌লে দৈন্য যোগ হয়, এযোগে জাত ব্যক্তি জীবনে বহু কষ্ট পায়, তার আর্থিক স্বচ্ছলতা হয় না। বহু দূরদেশে ভ্রমণ নবমস্থান ও নিকটবর্ত্তী দেশে ভ্রমণ তৃতীয় স্থান থেকে বিচার হয়। তুলা লগ্নের ব্যক্তির পক্ষে অষ্টমে বৃহস্পতি থাক্‌লে আর চতুর্থে বুধ চর রাশিতে থাক্‌লে যদি সে ব্যক্তি বৃহস্পতি দশা জীবনে পায় তা হোলে তার দশায় বুধের অন্তর্দ্দশায় সে দূর বিদেশে ভ্রমণ কর্‌বে। গোচরে তুলা লগ্নের জাত ব্যক্তির পক্ষে শনি, কর্কট জাত ব্যক্তির পক্ষে যেরূপ অশুভ, সেরূপ হবে না। চতুর্থ স্থান থেকে পৈতৃক ধন সম্পত্তি বিষয়ে জানা যায়। শনি ও চন্দ্র এখানে থাক্‌লে ভূ-সম্পত্তিলাভ হয়, বৃহস্পতি থাক্‌লে অর্থ আর বুধ থাক্‌লে অস্থাবর সম্পত্তিলাভ হয়। বৃত্তি বা কর্ম্ম সম্পর্কে গণনায় লগ্নের দশাংশ-বের কর্‌লে আর তদনুসারে বিচার কর্‌লে সুন্দর ফল মিল্‌তে দেখা যায়। রবি লগ্নাধিপতি হোলে জাতক স্বাস্থ্যবান ও বলিষ্ঠ হয়।

রবি দ্বিতীয়াধিপতি হোলে মধ্যবিত্ত শ্রেণীতে জন্ম হয়। চাকুরি দ্বারা জীবিকা-নির্ব্বাহ কর্‌তে হয়। তার পক্ষে স্বাধীন ব্যবসা চল্‌বে না। আমরা দেখেছি দ্বিতীয় স্থানে রবি শুভ ফলদাতা হয় না। এখানে অবস্থিতির জন্য জাতক ধনী হোতে পারে না, বরং অপরিমিত ব্যয়শীল হয়। তৃতীয় স্থানে রবি থাক্‌লে জাতক ভ্রাতাদের মধ্যে জ্যেষ্ঠ ও বুদ্ধিমান হয়। রবি চতুর্থে থাক্‌লে হৃদ্রোগ হয়। এই রবি এখানে দুর্ব্বল হোলে জাতক মায়ের ভালবাসা পায় না, শেষ জীবনটা দুঃখে অতিবাহিত হয়। অষ্টম স্থানে রবি ও চন্দ্র একত্র থাক্‌লে বালারিষ্ট যোগ হয় এবং জাতকের বাল্যকালে মৃত্যু ঘটে। পঞ্চমে রবি থাক্‌লে সাধারণতঃ প্রথমে পুত্র হয়, কিন্তু এখানে দুর্ব্বল হোলে জাতকের অস্থির চিত্ত দেখা যায়,

তার সন্তানাদি হয় না, হোলেও সন্তানদের আয়ু অল্প হয়। পঞ্চম স্থান মেষ, সিংহ ও ধনু হোলে—আর এই সব স্থানে রবি থাক্‌লে খুব কম সন্তান হয় কিন্তু কর্কট, বৃশ্চিক ও মীন হোলে আর এই সব স্থানে রবি থাক্‌লে বহু সন্তান হয়। সপ্তমাধিপতি রবি হোলে জাতক স্ত্রীকে উত্তম সঙ্গিনী-রূপে লাভ করে থাকে। বিবাহ কিছু বিলম্বে ঘটলেও দাম্পত্য জীবন সুখের হয়। সপ্তমে রবি থাক্‌লে স্ত্রী উচ্চবংশসম্ভূতা হয়, কিন্তু জাতকের মধ্যে নারী বিদ্বেষ থাকে, আর সে দুষ্ট স্বভাব সম্পন্ন হয়। ব্যবসায়ে সে উত্তম অংশীদার লাভ করে আর তার দ্বারা উপকৃত হয়।

রবি দশমাধিপতি হোলে জাতক সমাজে সুপ্রতিষ্ঠিত হয় এবং ব্যবসায়ে বা চাকুরীতে উন্নতি করে। দশমে রবি অত্যন্ত শক্তি সম্পন্ন। এখানে যার রবি আছে সে ব্যক্তি জন্মগত নেতা, উদার ও গভর্ণমেণ্টের বিশেষ উচ্চপদস্থ হয়। এর মধ্যজীবন অত্যন্ত সুখের। কর্কট, বৃশ্চিক ও মীন ভিন্ন অন্য কোন রাশি একাদশ হোলে আর সেখানে রবি থাকলে জাতকের প্রচুর ধনোপার্জ্জনও উত্তম স্ত্রীপুত্র লাভ হয়। সমাজে তার সম্মান ও প্রতিষ্ঠা লাভ দেখা যায়। রবি দ্বাদশাধিপতি হোলে জাতক অধ্যাত্মপথে উন্নতি করে এবং ধর্ম্মশাস্ত্রে সুপণ্ডিত হয়। শেষ জীবনে বিখ্যাত হয়।

হার্সেল বা নেপচুন পঞ্চমস্থানে থাক্‌লে আকস্মিক ও অপ্রত্যাশিত-ভাবে শিশু সন্তানের মৃত্যু হয়।

অষ্টম স্থানে চন্দ্র রাহু সংযুক্ত হয়ে থাকলে জাতকের অস্ত্রাঘাতে মৃত্যু ঘটে। চররাশিতে রবি আর লগ্নে চন্দ্র থাক্‌লে গঙ্গাতীরে মৃত্যু হয়। সিংহ লগ্ন হোলে, শনি বৃহস্পতির সহিত ষষ্ঠে মিথুনরাশিতে থাক্‌লে, আর লগ্নাধিপতি নিধন স্থানে দৃষ্টি করলে জাতকের মৃত্যু কাশীতে হয়।

ষষ্ঠস্থানে মঙ্গল, সপ্তমে রাহু আর অষ্টমে শনি অবস্থান করলে স্ত্রী কিছুতেই জীবিত থাকে না। এইরকম যোগ সত্ত্বেও যদি জাতকের কোষ্ঠীতে শুক্র, চন্দ্র ও সপ্তমপতির অবস্থান ভালো হয় অর্থাৎ তারা যদি বলবান হয়, তাহোলে বহু বিবাহ হবে, আর পুনঃ পুনঃ স্ত্রীর মৃত্যু হবে। উক্ত মঙ্গল রাহু বা শনির দশান্তর্দ্দশা পড়লেই প্রায় মৃত্যু যোগ উপস্থিত হবে। ষষ্ঠ ও অষ্টমভাবে পাপগ্রহ থাকলেও পত্নীনাশ ও পত্নী সম্বন্ধীয় অশুভ ফল বুঝায়।

একাদশ স্থানে পাপগ্রহ অথবা লাভাধিপতি কেন্দ্রে বা ত্রিকোণে অবস্থান করলে ধনলাভ হয়ে থাকে। পাপগ্রহ সকল চতুর্থে অবস্থান অথবা লগ্ন, পঞ্চম, অষ্টম ও দ্বাদশে পাপগ্রহ থাক্‌লে বংশ নাশ হয়। লগ্নে বৃহস্পতি, ধনস্থানে শনি আর তৃতীয়ে রাহু থাক্‌লে মাতার বিনাশ হয়।

***

গ্রহ সংস্থানানুসারে ফলাফল

নানা জ্যোতিষ গ্রন্থে গ্রহসংস্থানুসারে নানাপ্রকার ফলের কথা বলা হয়েছে। সমস্ত ফল সামঞ্জস্য করে বিচার করা অতীব কঠিন ব্যাপার। এজন্যে অভিজ্ঞতা ব্যতীত সঠিকভাবে বিচার করে সুন্দরভাবে ফল বলা সহজ নয়। কোষ্ঠীর প্রধান জিনিষ তিনটী—লগ্ন, রবি ও চন্দ্র। কোষ্ঠী বিচার কালে এদের ওপর লক্ষ্য রেখে বিচার করতে হয়।

অগ্নি, পৃথ্বী, বায়ু ও জলরাশির মধ্যে কোন্ রাশিতে লগ্ন, রবি ও চন্দ্র অবস্থিত, তা দেখে জাতকের আকৃতি প্রকৃতি, ভাগ্যোৎপত্তি, ও চরিত্র সম্পর্কে বিচার করা হয়। এরপর অপরাপর গ্রহগণের ঐ রকম রাশি চতুষ্টয়ের ভেতর কোন্ রাশিতে কোন্ গ্রহ কোন নক্ষত্রের সঙ্গে রয়েছে তা দেখে ফল নির্দ্দেশ করা বিধেয়।

উদয়শীল গ্রহদের দ্বারা জাতকের স্বীয় উদ্যম, সহিষ্ণুতা, সাহসাদির দ্বারা উন্নতি ঘটে, বিশেষতঃ উদয়োন্মুখ কেন্দ্র কোণপতিগ্রহরা জাতকের বিশেষ সৌভাগ্য এনে দেয়। এরা অস্তমিত বা পরাজিত হোলে জাতক উদ্যম বিহীন, পরাধীন ও পরভাগ্যোপজীবী হয়ে থাকে। দশম ভাব-গামী গ্রহরা শুভ ফলদাতা, তারা সম্মান, উন্নতি, কর্ম্মদক্ষতা, উদ্যম আর বংশোন্নতিদায়ক। পৃথিবীর নিম্নস্থ অর্থাৎ দ্বিতীয় ভাব থেকে সপ্তম ভাব পর্য্যন্ত স্থানে যে সব গ্রহ থেকে, তারা জীবনের শেষার্দ্ধে ভাগ্যোদয়, উন্নতি ও সুখস্বচ্ছন্দতা দেয়।

মেষ, সিংহ ও ধনু এই তিনটী অগ্নিরাশির অন্যতম রাশিতে যদি অধিকাংশ গ্রহের অবস্থান হয়, তবে সেই জাতক অত্যন্ত তেজস্বী, গর্ব্বিত, ক্রোধপরায়ণ, উচ্চাশয়যুক্ত, উদ্যমশীল ও বীরের মতন হয়ে থাকে। বৃষ কন্যা ও মকর পৃথ্বীরাশি। এই রাশিত্রয়ের মধ্যে গ্রহাধিক্য হোলে জাতক সমধাতু, কার্য্যদক্ষ, সারগ্রাহী, বৈজ্ঞানিক জ্ঞান ও দক্ষতা সম্পন্ন, পার্থিব পদার্থে লাভবান, ন্যায়পরায়ণ, কষ্টসহিষ্ণু ও তীক্ষ্ণ বুদ্ধিসম্পন্ন হয়। মিথুন, তুলা ও কুম্ভ বায়ুরাশি। এই বায়ুরাশিত্রয়ের কোন এক রাশিতে অধিকাংশগ্রহ থাক্‌লে জাতক স্বীয় বুদ্ধি ও উদ্যমের সঙ্গে কার্য্য করতে অক্ষম। মনে মনে সে অনেক কাজ কল্পনা করতে পারলেও, কার্য্যক্ষেত্রে দক্ষতার অভাব হয়। কর্কট, বৃশ্চিক ও মীন জলরাশি। জলরাশিতে গ্রহাধিক্য হোলে জাতকের আধ্যাত্মিক বিষয় অনুশীলনে মতি ও উত্তেজনা থাকে, আর সেই সব বিষয় হৃদয়ঙ্গম করতে সক্ষম হয়। জলরাশিতে জাত ব্যক্তির প্রকৃতি গঠন সংসর্গানুসারে হয়ে থাকে।

মেষ, কর্কট, তুলা ও মকর চররাশি। এই রাশি চতুষ্টয়ে অধিকাংশ গ্রহেরা অবস্থান করলে জাত ব্যক্তি উদ্যমশীল, সৎসাহসযুক্ত, উচ্চাভিলাষী, কোন না কোন বিষয়ের নেতা, অত্যন্ত কার্য্যদক্ষ, স্বাধীনচেতা, যশস্বী ও পরিবর্ত্তনশীল হয়। বৃষ, সিংহ, বৃশ্চিক ও কুম্ভ স্থির রাশি। স্থির রাশিতে গ্রহাধিক্য হোলে জাতক সারগ্রাহী, বিশ্বাসী, ধীরপ্রকৃতি, দৃঢ়-প্রতিজ্ঞ আর স্বাধীনতা প্রিয় হয়। মিথুন, কন্যা, ধনু ও মীন দ্ব্যাত্মক-রাশি। এই দ্বিস্বভাব রাশিতে গ্রহ থাক্‌লে জাতক অস্থিরমতি, সহৃদয়, সময়ে সময়ে অস্থিরতা ও অনিশ্চয়তার বশবর্ত্তী হয় কিন্তু সর্ব্বদা জ্ঞানলাভে ও মহত্ত্ববিশিষ্ট কার্য্যে তৎপর হয়।

***

আশ্বিন মাসের ব্যক্তিগত রাশির ফলাফল

মেষ

কৃত্তিকানক্ষত্র জাতগণের পক্ষে সর্ব্বোৎকৃষ্ট ফল। ভরণীনক্ষত্রজাতগণ নিকৃষ্টতম ফলভোগ করবে। অশ্বিনীজাতগণের পক্ষে এমাসটী মধ্যবিত্ত শারীরিক কষ্ট, ছোটো-খাটো আঘাত বা দুর্ঘটনা ভ্রমণ সময়ে ঘটবে। কলহ ও ভাবের আদান-প্রদানে ভুল ক্রটিহেতু মনোমালিন্য, স্বজনগণের কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়া, মনস্তাপ প্রভৃতি সম্ভব। স্বজন বিয়োগ সংবাদে বা বন্ধু-বান্ধবের মৃত্যুতে শোক। মাসের শেষের দিকে স্বাস্থ্যোন্নতি। আর্থিক বিষয়ে লাভ ও ক্ষতি দুই-ই ঘটবে। প্রথম দিকে ক্ষতি, শেষ দিকে লাভ। মাসের মধ্য সময়ে কোন কর্ম্মপ্রচেষ্টা আশাপ্রদ। সম্পত্তি সংক্রান্ত ব্যাপারে অনেকটা শুভ। মাসের শেষ দিকে মামলা মোকর্দ্দমা, কলহ, পাড়া প্রতিবেশীর সঙ্গে মনোমালিন্য ও দ্বন্দ্ব সংঘর্ষ প্রভৃতি হোতে পারে। চাকুরিরক্ষেত্রে শুভ। প্রতিষ্ঠা, যশ, শত্রুজয়, উপরওয়ালার অনুগ্রহ। ব্যবসায়ী ও বৃত্তিজীবীদের পক্ষে মাসের প্রথম দিক শুভ, শেষ দিকে বহুল পরিমাণে উন্নতি। স্ত্রীলোকের পক্ষে পুরুষের সহিত মেলা-মেশায় সতর্কতা অবলম্বন বাঞ্ছনীয়—কোনপ্রকার ভাবপ্রবণতা বা উদ্দীপনা সংযত না রাখ্‌লে নৈতিক চরিত্রের ওপর কলঙ্করেখা পড়্‌তে পারে। পারিবারিক ও সামাজিকক্ষেত্রে সাফল্য। এ মাসে মিলন ও প্রণয়ানুরাগজনিত পরিণতি সুদৃঢ় হবে আর তার স্থিতিস্থাপকতা কোনরূপে রদ হবে না। এজন্য স্ত্রীলোকদের পক্ষে পুরুষের সঙ্গে চলাফেরায় হুঁসিয়ার হওয়া দরকার। বিদ্যার্থীগণের পক্ষে মাসটী আদৌ আশাপ্রদ নয়।

বৃষ

কৃত্তিকা ও মৃগশিরাজাতগণ উত্তম ফললাভ করবে। রোহিনী জাতগণ অশুভ ফলগুলি ভোগ করবে, শুভ ফল এদের ভাগ্যে এমাসে নেই বল্লেই চলে। নিজের বা সন্তানদের স্বাস্থ্য আদৌ ভালো যাবে না। নিজের দৈহিক দুর্ব্বলতাই প্রকাশ পাবে, বিশেষ কোন উল্লেখযোগ্য অসুখের সম্ভাবনা নেই। যাঁরা কোন স্থায়ী অসুখে ভুগছেন, সতর্ক হবেন, বিশেষভাবে জ্বর হোতে পারে। সন্তানদের এমন অসুখ হবে যার জন্যে বিশেষজ্ঞ চিকিৎসককে এনে চিকিৎসা করাতে হবে। ছোটো-খাটো অসুবিধা, অসন্তোষ আর গৃহে কলহ দেখা দেবে। ঘরে বাইরে আত্মীয় স্বজন বা অন্তরঙ্গজনের পক্ষে মাসটী ভালো যাবে। অর্থোন্নতির দিক দিয়ে মাসটী কোন রকমে সন্তোষজনক। লাভ বা ক্ষতি কোনটাই বিশেষ হবে না। ব্যবসায়ে অংশীদার পাওয়া বা আর্থিক সাহায্য পাওয়ার পক্ষে অসুবিধা হবে না। বাড়ীওয়ালা, ভূম্যধিকারী, কৃষক প্রভৃতির পক্ষে এমাসটী শুভ। এমাসে স্থাবর বা অস্থাবর সম্পত্তি ক্রয় বা বিক্রয় করা অশুভজনক। বহু হিসেব করে কাজ করা প্রয়োজন। এমাসে শেষের দিকে চাকুরিজীবীদের পক্ষে নানপ্রকার অসুবিধা ও কর্ম্মভোগ দেখা যায়, উপরওয়ালা বা উচ্চপদস্থ ব্যক্তির সঙ্গে মতদ্বৈধজনিত অশান্তি ও অসন্তোষ। ব্যবসায়ী ও বৃত্তিজীবীগণের পক্ষে মাসটী বিশেষ শুভ, উত্তরোত্তর অর্থাগম ও আয়বৃদ্ধি। স্ত্রীলোকের পক্ষে এমাসে প্রণয়ঘটিত ব্যাপারে উত্তম সাফল্য,—অন্তরের সহিত যাকে ভালবাসে তাকে করায়ত্ত করতে পারবে। মাসের প্রথম দিকে প্রেমের আদান-প্রদান বা অবৈধ প্রণয়ে, সহৃদয় পুরুষ বান্ধব বা সঙ্গী লাভে, ক্লাবে সিনেমায় বা থিয়েটারে পুরুষের সান্নিধ্য সুখে বিশেষ তৃপ্তি প্রীতির সম্ভাবনা আর লাভজনক ব্যাপার ও ঘটবে, গুপ্ত প্রণয়েও কোনপ্রকার অসাফল্য বা বিপত্তির সম্ভাবনা নেই। নারী শিল্পীরা সমাদৃত হবে, সামাজিক ও পারিবারিক ক্ষেত্রে মর্য্যাদা লাভ, জনকল্যাণকর কর্ম্মে সুনাম অর্জ্জন। বিদ্যার্থীগণের পক্ষে শুভ নয়।

মিথুন

মৃগশিরাজাতগণের পক্ষে উত্তম ফললাভ, পুনর্ব্বসুজাতগণের পক্ষে মধ্যম আর আর্দ্রাজাতগণের পক্ষে নিকৃষ্টতম ফলভোগ। স্ত্রী, সন্তানবর্গ ও নিজের শরীর ভালো যাবে না, হজমশক্তির হ্রাসজনিত নানাপ্রকার উপসর্গ, শূলবেদনা, উদরাময়, আমাশয় প্রভৃতির আশঙ্কা করা যায়। ভ্রমণ বর্জ্জনীয়। মাসের শেষ দিকে পারিবারিক সুখের ব্যাঘাত ঘটবে। দৈনন্দিন কাজে পারিবারিক অশান্তির জন্যে অসুবিধা ভোগ হবে। আত্মীয়স্বজনের কাছ থেকে নানারকম কষ্টভোগ। এমাসে আর্থিক উন্নতির আশা নেই। মাসের শেষ দিকে আর্থিক অভাব অনাটন দেখা যাবে। অর্থোন্নতির পক্ষে কোন প্রকার প্রচেষ্টা সফল হবে না। ভূম্যধিকারীদের পক্ষে মাসটী অত্যন্ত অশুভ। মামলা মোকর্দ্দমা, বিবাদ, অনাদায় প্রভৃতি ঘটবে আর আসবে ভবিষ্যতের দুশ্চিন্তা। চাকুরিজীবীদের পক্ষে মাসটী শুভ। উপরওয়ালার প্রীতিভাজন হওয়ার ফলে অদূর ভবিষ্যতে নানাপ্রকার সুযোগ সুবিধার পথপ্রশস্ত হবে। ব্যবসায়ী ও বৃত্তিজীবীদের পক্ষে মাসটী আশাপ্রদ নয়। স্ত্রীলোকের পক্ষে মাসটী ঘটনাবহুল আর অসম্প্রীতিদায়ক। কথাবার্ত্তায় ও চিঠিপত্র লেখায় বিশেষ সতর্কতা আবশ্যক। গুপ্ত প্রণয়লিপির আদান প্রদান সম্পর্কে অত্যন্ত হুঁসিয়ার হওয়া দরকার। অপরিচিত বা অতিথি অভ্যাগত বা ক্লাবের নবাগত পুরুষের সান্নিধ্যে বা সংস্পর্শে না আসাই ভালো, অপবাদ বা অপকলঙ্কের আশঙ্কা আছে। পর পুরুষের সঙ্গে একা থাকা এমাসে বর্জ্জনীয়, গুপ্তপ্রণয় ও পরিত্যাজ্য। পারিবারিক ও সামাজিকক্ষেত্রে মোটামুটিভাবে ভালো যাবে। গভীর অধ্যয়নের দিকে মনোযোগী হোলে, মানসিক শক্তির উৎকর্ষ সাধন হবে। বিদ্যার্থীর পক্ষে মাসটী মোটেই ভালো নয়।

কর্কট

পুনর্ব্বসু ও অশ্লেষানক্ষত্রজাতগণের পক্ষে সর্ব্বোত্তম ফল লাভ, পুষ্যাশ্রিতগণের পক্ষে মাসটী বিশেষ আশাপ্রদ নয়। পারিবারিক সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য, বিলাসব্যসন ও সন্তান সুখ প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য, মাসের শেষ

দিকটা বিশেষ ভালো। গৃহে মাঙ্গলিক অনুষ্ঠান প্রভৃতি সম্ভাবনা আছে। নবজাত সন্তান লাভ, মধ্যে মধ্যে অল্প বিস্তর অসুস্থতা সত্ত্বেও স্বাস্থ্য ভালো যাবে। আর্থিক উন্নতি বিশেষতঃ মাসের শেষার্দ্ধে পরিলক্ষিত হয়। ধনীর সান্নিধ্যে বিশেষ অর্থাগম। এ মাসে কম দরে মাল কিনে চড়া দরে বেচে ও ধনোপার্জ্জন হবে। ভূম্যধিকারী, বাড়ীওয়ালাও কৃষিজীবীদের পক্ষে মাসটী অশুভ হবে না। চাকুরির ক্ষেত্রেও মাসটি শুভপ্রদ। উপরওয়ালার আনুকুল্যে পদোন্নতিযোগ আছে। ব্যবসায়ী ও বৃত্তিজীবীদের সৌভাগ্য-বৃদ্ধি হবে। স্ত্রীলোকদিগের পক্ষে এমাসটী অতীব উত্তম। যে নারী যেরূপ প্রকৃতি সম্পন্ন, তার প্রকৃতি অনুসারে তার অনুকুল আবহাওয়া ও পরিবেশ সৃষ্টি হবে যাতে করে সে তার অন্তরের আশা আকাঙ্ক্ষা সম্পূর্ণ ভাবে সার্থক করে তুলতে পারে। সামাজিকক্ষেত্রে, পারিবারিকক্ষেত্রে এমন কি রাজনৈতিক ক্ষেত্রে বিশেষ সাফল্যলাভ। শিল্প কার্য্যে খ্যাতি। সর্ব্বদিকেই সমাদরলাভ এবং পূর্ণ সৌভাগ্যোদয়, অযাচিতভাবে পুরুষেরা বন্ধুত্ব করবার জন্যে ব্যগ্র হবে এবং উল্লেখযোগ্য পুরুষ বন্ধুর সান্নিধ্যে নানাপ্রকার লাভ ঘটবে। পার্টিতে যোগদান বা পার্টি দেওয়া এমাসে বাঞ্ছনীয় তাতে যশ, প্রতিষ্ঠা ও অনুরাগ লাভ ঘটবে। যারা অবৈধ বা গুপ্ত প্রণয়াভিলাষে ব্যগ্র, তাদের আশাতীত সাফল্য হবে। গৃহিণীরা পারিবারিক কর্তৃত্বলাভ করবে। অধ্যাত্মসাধিকারা বিশেষভাবে ধর্ম্মোন্নতি করবে, ধ্যান-ধারণা, মনন ও নিদিধ্যাসনের মাধ্যমে ঈশ্বরানুভূতি ও প্রকট হোতে পারে। বিদ্যার্থীগণের মাসটী অত্যন্ত শুভ।

সিংহ

পূর্ব্বফল্গুনীনক্ষত্রাশ্রিতগণের পক্ষে মাসটী অশুভপ্রদ, মঘানক্ষত্রজাতগণ মধ্যফল লাভ করবে, আর উত্তরফল্গুনীনক্ষত্রাশ্রিতগণের পক্ষে মাসটী শুভ। গুরুতর পীড়ার আশঙ্কা না থাকলেও অল্পবিস্তার মানসিক ও শারীরিক অস্বচ্ছন্দতা দেখা দেবে। রক্ত চাপ বৃদ্ধি হবে। ফুস্ ফুস্ ও শ্বাস-প্রশ্বাসের ক্রিয়ায় ব্যাঘাত, হৃদ্ কষ্ট, চক্ষু পীড়া প্রভৃতি ঘটতে পারে। পারিবারিক অশান্তি, মতভেদ, কলহ, উদ্বেগ ও হিংসাপ্রবণতা যোগ আছে। আত্মীয়-স্বজনের হানিজনিত মনোকষ্ট। কোষ্ঠীতে দশান্তর্দ্দশা অশুভ হোলে সাময়িকভাবে পরিবার থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়ার সম্ভাবনা। আর্থিক শ্রীবৃদ্ধির কোন লক্ষণই প্রকাশ পাবে না বরং ব্যয়ের মাত্রাধিক্য-হেতু দুশ্চিন্তা দেখা দেবে। নানাভাবে প্রতারিত হওয়ার সম্ভাবনা। অসৎ সংসর্গে পড়ে ক্ষতি হবে। প্রতারিত হওয়া সম্পর্কে সাবধান হওয়া দরকার দৈনন্দিন জীবনযাত্রা পথে, কোন প্রকার নব প্রচেষ্টা বিপজ্জনক ও ক্ষতিকর। স্পেকুলেশন বর্জ্জনীয়। বাড়ীওয়ালা, ভূম্যধিকারী ও কৃষিজীবীদের পক্ষে কোন প্রকার অঘটন মারাত্মক পরিস্থিতির আশঙ্কা নেই, কোন গুরুতর সমস্যার সম্মুখীন ও হোতে হবে না। চাকুরির ক্ষেত্রে ঘটনাবর্জ্জিত মোটামুটিভাবে দিনগুলি চলে যাবে। ব্যবসায়ী ও বৃত্তিজীবীদের পক্ষে কিছু ক্ষতি হবে। এদের পক্ষে নব-প্রচেষ্টা বর্জ্জনীয়—স্ত্রীলোকের পক্ষে প্রথমার্দ্ধ মোটেই ভালো নয়, শেষার্দ্ধ কিছু পরিমাণে শুভ। প্রৌঢ় পুরুষদের সঙ্গে সর্ব্বপ্রকার যোগাযোগ সম্পর্কে সতর্ক হওয়া দরকার। পারিবারিক ও সামাজিক ক্ষেত্রে খুব হিসেব করে চলা আবশ্যক, পার্টিতে যোগদান বর্জ্জনীয়। প্রেম বা ভালোবাসার দিকে এমাসে আগ্রহ প্রকাশ করার পরিণতি শোচনীয় বা ভয়াবহ হোতে পারে। এ মাসে স্ত্রীলোকের পক্ষে আশাভঙ্গ, মনস্তাপ, শত্রুবৃদ্ধি, ধনক্ষয়, শারীরিক ও মানসিক কষ্ট ঘটবে। বিদ্যার্থীর পক্ষে মাসটি শুভপ্রদ কিন্তু ইংরাজী পরীক্ষার ফল আশানুরূপ না হওয়ায় সম্ভাবনা। এজন্যে বিদ্যার্থীগণের পক্ষে বিশেষভাবে ইংরেজী অধ্যয়নের দিকে জোর দেওয়া আবশ্যক।

কন্যা

হস্তানক্ষত্রাশ্রিতগণের পক্ষে মাসটি অশুভ। উত্তরফল্গুনী ও চিত্রানক্ষত্রাশ্রিতগণের পক্ষে মাসটীতে বিশেষ অশুভ ঘটনা ঘটবে না। রক্ত, পিত্ত ও উত্তাপের বিশৃঙ্খলতাহেতু শারীরিক কষ্টভোগ। খাদ্য দোষে বিপত্তি, দুর্ঘটনা ইত্যাদি ও সূচিত হয়। ভ্রমণের সময়ে খাবারের দিকে সতর্ক হওয়া বাঞ্ছনীয়। ভিড়াক্রান্ত রাস্তা বা স্থান আর কলহ বিবাদের মধ্যে যাওয়া বর্জ্জনীয়। ঘরে বাইরে কলহ ও মনোমালিন্যের সম্ভাবনা। আর্থিক শ্রীবৃদ্ধি আশা করা যায় না, বরং ব্যয় বৃদ্ধি ও ক্ষতির আশঙ্কা আছে। অবৈধভাবে অর্থসংগ্রহের প্রচেষ্টা সংযত করা দরকার—রেস, জুয়া, বা কোনপ্রকার স্পেকুলেশন মারাত্মক অবস্থা এনে দিতে পারে। বাড়ীওয়ালা, ভূম্যধিকারী ও কৃষিজীবীদের পক্ষে মাসটী অত্যন্ত খারাপ। সম্পত্তি নিয়ে মামলা মোকর্দ্দমা, ঝগড়া প্রভৃতি ঘটতে পারে। এ মাসে সম্পত্তি ক্রয় বিক্রয় ক্ষতিকর হবে, দালালের প্ররোচনায় শেয়ার বিক্রয়ও ক্ষতিজনক হবে। মাসের শেষার্দ্ধ অশুভপ্রদ। চাকুরিজীবীদের পক্ষে অশুভ হবে না। ব্যবসায়ী ও বৃত্তিজীবীরা বহু অসুবিধায় পড়বে, এরা ক্ষতিগ্রস্ত হোতে পারে। স্ত্রীলোকদের পক্ষে, মাসটি আদৌ শুভ নয়. যৌন-সংসর্গ বিপত্তিপ্রদ, ও মানসিক কষ্টভোগ দাতা। পারিবারিক ও সামাজিক ক্ষেত্রে কোন গুরুতর কার্য্য গ্রহণ বা হস্তক্ষেপ শুভ ফলপ্রদ হবে না। ক্লাবে পার্টিতে বা কোন প্রকার আমোদ প্রমোদ যোগদানের সময় সতর্কতা বাঞ্ছনীয়। বিদ্যার্থীগণের পক্ষে মাসটি শুভ নয়।

তুলা

চিত্রানক্ষত্রাশ্রিতগণের পক্ষে মাসটি উত্তম, বিশাখা নক্ষত্রজাতগণের পক্ষে এবং স্বাতী নক্ষত্রাশ্রিতগণের পক্ষে নিকৃষ্ট। স্বাস্থ্য ভালো যাবে। জনপ্রিয়তা অর্জ্জন ও পারিবারিক সুখ, সন্তান জন্ম, ধর্ম্মোৎসব প্রভৃতি সম্ভব। বিলাস দ্রব্যাদি লাভ। আর্থিক অবস্থা মোটের উপর ভালো বলা যায়। একাধিক ব্যাপার থেকে অর্থলাভের পথ প্রশস্ত হবে। মাসের প্রথমার্দ্ধে অর্থলাভের আধিক্য। ভ্রমণ লাভজনক হবে, পরিকল্পনাকে রূপ দেবার জন্যে যেখানে যাওয়া যাবে সেখানেই সাহায্য পাওয়ার সম্ভাবনা। মাসের শেষার্দ্ধে কোন বিষয়ে আশানুরূপ সাফল্যলাভ হবে না। বাড়ীওয়ালা, ভূম্যধিকারী ও কৃষিজীবীদের পক্ষে মাসটি ভালো যাবে না। মাসের প্রথমার্দ্ধে চাকুরিজীবীদের পক্ষে বিশেষ শুভ সময়, এই সময়ে তাদের দাবীদাওয়া, অভাব অভিযোগ, পদোন্নতি বা পদমর্য্যাদা সংক্রান্ত বিষয়ে উপর ওয়ালার দৃষ্টিতে আনতে পার[illegible]। বেকার ব্যক্তির কর্ম্ম সুযোগ। ব্যবসায়ী ও বৃত্তিজীবীদের

পক্ষে মাসটি উন্নতিব্যঞ্জক। স্ত্রীলোকের পক্ষে মাসটি শুভ হোলেও মাসের শেষার্দ্ধে পুরুষের সংস্রবে এসে প্রলুব্ধ হওয়া, উত্তেজনাজনিত অসোয়াস্তি-বোধ, প্রলোভনে প্রমত্ত হয়ে বিবেক বুদ্ধিকে নিষ্ক্রিয় করার প্রচেষ্টা, শেষে সংযম হানিবশতঃ নিজেকে কলঙ্কিত করা প্রভৃতির সম্ভাবনা আছে। গার্হস্থ্য ও সামাজিক ক্ষেত্রে কৃতিত্ব প্রকাশ হেতু প্রশংসা অর্জ্জনের যোগ দেখা যায়। বিদ্যার্থীগণের পক্ষে ফল মধ্যম।

বৃশ্চিক

বিশাখা ও জ্যেষ্ঠানক্ষত্রাশ্রিতগণের পক্ষে মাসটি অনুরাধাজাত ব্যক্তিগণ অপেক্ষা অধিকতর শুভ। শারীরিক দুর্ব্বলতা অনুভব। পারিবারিক শান্তিও শৃঙ্খলা। প্রভাব প্রতিপত্তিশালী ও ধনীলোকের সংস্রবে এসে নানাপ্রকার সুখ-সুবিধা লাভ ও সামাজিক প্রতিষ্ঠা। পারিবারিক ক্ষেত্রে সংখ্যা বৃদ্ধি, সন্তান লাভ। স্বজন বিয়োগ। আর্থিক স্বচ্ছন্দতা ঘটলেও ব্যয় বৃদ্ধির জন্যে অসোয়াস্তি বোধ, সময়ে সময়ে অর্থকৃচ্ছ্রতার জন্যে মানসিক চাঞ্চল্য প্রতারিত হওয়ার জন্য বিশেষ ক্ষতি। স্পেকু-লেশন বর্জ্জনীয়। বাড়ীওয়ালা, ভূম্যধিকারী ও কৃষিজীবীদের পক্ষে মাসটি মোটামুটি গতানুগতিকভাবে যাবে। চাকুরির ক্ষেত্রে অত্যন্ত শুভ—প্রতিদ্বন্দ্বীর পরাজয়, পদোন্নতি বা নূতন পদলাভ, সম্মান, উপরওয়ালার অনুগ্রহ লাভ প্রভৃতি যোগ আছে। ব্যবসায়ী ও বৃত্তিজীবিগণের পক্ষে বিশেষ শুভ।

স্ত্রীলোকের ভালোমন্দ আচার ও আচরণের ওপর মাসটী নির্ভরশীল। কোনপ্রকার ভুল ত্রুটি হোলে সেটি মারাত্মক হয়ে উঠতে পারে। কোন কাজে তাড়াতাড়ি উপসংহারে আসা বা সিদ্ধান্ত করার দিকে ঝোঁক দিলে পরিণতি নৈরাশ্যজনক হবে বিশেষতঃ প্রণয় সংক্রান্ত ব্যাপারে শোচনীয় ঘটনা ঘটতে পারে, এ বিষয়ে সতর্ক হওয়া দরকার—বরং প্রণয়ীকে নানাভাবে প্রলুব্ধ করে রাখা যুক্তিসঙ্গত হবে। যদি চপলতা অসংযম হাবভাবে কথাবার্ত্তায় বা চিঠিপত্র লেখায় না প্রকাশ পায়, তা হোলে সকল দিক থেকেই আশাতীত সাফল্য ঘটবে। পারিপারিক ও সামাজিক ক্ষেত্রে প্রাধান্য বিস্তারের চেষ্টা না করে বরং গাম্ভার্য ও ঔদাস্য প্রদর্শন শুভফলপ্রসূ হবে। সন্তানগণকে অতিরিক্ত শাসন বা স্নেহপ্রদর্শনও ক্ষতিকর হবে। বিদ্যার্থীগণের পক্ষে শুভ—পরীক্ষায় সাফল্য লাভ।

ধনু

উত্তরাষাঢ়াজাতগণের পক্ষে মাসটী শুভ, পূর্ব্বাষাঢ়াগণে পক্ষে মধ্যম এবং মুলাজাতগণের পক্ষে নিকৃষ্ট। শরীর মোটামুটি ভালো যাবে তবে দুর্ব্বলতা অনুভব, অপ্রাকৃত মানসিক অহেতুক অস্বচ্ছন্দতা যা ব্যাখ্যা করে ওঠা যায়না, নৈরাশ্যভাব অন্তরে পোষণ প্রভৃতি পরিলক্ষিত হয়। পারিবারিক ক্ষেত্রে স্ত্রী ও সন্তানগণের পীড়া, এমন কি এদের অনেকে কিছুদিন শয্যাগত হয়ে থাকতে পারে। এই সব ঘটনা থেকে দুঃখ ও উদ্বিগ্নতার দরুণ গার্হস্থ্য বিষয়ক শান্তির অভাব ঘটবে। ঘনিষ্ঠ [illegible] মৃত্যুও মনে আঘাত দেবে। মাসের প্রথমার্দ্ধে আর্থিক ব্যাপারে কোনপ্রকার সুযোগ সুবিধা দেখা যাবে না, শেষার্দ্ধে উত্তরোত্তর আর্থিক শ্রীবৃদ্ধি ও আয়াধিক্য ঘটবে। প্রথমার্দ্ধে সামান্য ক্ষতি, অর্থ-হেতু শত্রুবৃদ্ধি, মজুত মালের মূল্য হ্রাস প্রভৃতি দেখা যায়। স্পেকু-লেশন ও নবপরিকল্পনা বর্জ্জনীয়। বাড়ীওয়ালা, ভূম্যধিকারী ও কৃষি-জীবীগণের কিছু ক্ষতি হবে। দীর্ঘচুক্তিতে চাষবাসের ব্যবস্থা গ্রহণ করা অনুচিত। এমাসটী বিশেষতঃ শেষার্দ্ধ চাকুরিজীবিদের পক্ষে উত্তম, উপরওয়ালার অনুগ্রহ লাভ, কর্ম্মদক্ষতার দরুণ উন্নতির সূচনা ইত্যাদি সম্ভব। ভবিষ্যতের উন্নতির পথ রচনা এমাসেই হবে। বৃত্তিজীবীও ব্যবসায়ীগণের সৌভাগ্য বৃদ্ধি সুরু হবে মাসের শেষার্দ্ধে।

সাধারণতঃ মাসের প্রথমার্দ্ধ স্ত্রীলোকের পক্ষে ভালো নয়, শেষার্দ্ধ শুভ। না ভেবে তাড়াতাড়ি চিঠিপত্র লেখা মাসের প্রথমার্দ্ধে অশুভ-ব্যঞ্জক, ওতে সুনামের ক্ষতি হবে। কোষ্ঠীতে দশান্তর্দ্দশা খারাপ হোলে চরিত্রের ওপর কলঙ্কের দাগ পড়তে পারে। এমাসে প্রথমার্দ্ধে কোন গুরুদায়িত্ব নিয়ে কাজ করা সমীচীন হবে না, কেন না হিসাবের ভুলে শোচনীয় পরিণতির সম্ভাবনা। শেষার্দ্ধে সর্ব্বপ্রকার কার্য্যে সাফল্যলাভ।

মকর

উত্তরাষাঢ়া ও ধনিষ্ঠানক্ষত্রজাতগণের পক্ষে মাসটি শুভ শ্রবণাজাতগণ অশুভ ফলভোগ করবে। দেহভাব শুভাশুভ। উল্লেখযোগ্য পীড়া না হোলেও, শারীরিক দৌর্ব্বল্য ঘটবে। তীক্ষ্ণদ্রব্যের আঘাতে দুর্ঘটনার আশঙ্কা ও তজ্জনিত রক্তক্ষয়। সদিচ্ছা, ঐক্য ও সুখ পরিবারবর্গের মধ্যে থাকবে, সামাজিকক্ষেত্রেও পসার প্রতিপত্তি ও জনপ্রিয়তা লাভ। আর্থিক অবস্থা ভালোমন্দভাবে যাবে। মাসের শেষার্দ্ধে ব্যয়ের পরিমাণ বেশী, অর্থের জন্যে শত্রু বৃদ্ধি, চিত্তের উদ্বেগ প্রভৃতি সম্ভব। বাড়ী-ওয়ালা, ভূম্যধিকারী ও কৃষিজীবিগণের পক্ষে মাসটী শুভ। ক্রয়ের ব্যাপারে খুব হুঁশিয়ার না হোলে দালালের দুষ্টামির জন্য অথবা অন্য কোন স্বার্থান্বেষী লোকের প্ররোচনায় প্রতারিত হওয়ার জন্য বিশেষ ক্ষতিগ্রস্ত হোতে হবে। চাকুরিজীবিদের পক্ষে মাসটী মোটামুটি ভালোই যাবে। পদোন্নতি, নূতন পদপ্রাপ্তি, সম্মান ও প্রতিষ্ঠার সূচনা দেখা যায়। ব্যবসায়ী ও বৃত্তিজীবিগণের পক্ষে মাসটী বিশেষ শুভপ্রদ।

শিল্পকার্য্যে, গান বাজনায়, সামাজিক সর্ব্বপ্রকার কার্য্যে স্ত্রীলোকের অসাধারণ সাফল্য, প্রতিযোগিতায় পুরস্কার লাভ, পারিবারিকক্ষেত্রে প্রভূত উন্নতি প্রভৃতি সূচিত হয়। সবন্ধু লাভ, প্রীতিপ্রদ ভ্রমণ, পিকনিক, আমোদ প্রমোদের জন্য পর্য্যটন, অবৈধ প্রণয়ে আশাতীত সাফল্য, সুন্দর প্রণয়ীর সাহচর্য্য লাভ, উপঢৌকন লাভ, পাটিতে মর্য্যাদা প্রাপ্তি প্রভৃতি দেখা যায়। গার্হস্থ্য ক্ষেত্রে সন্তানদের স্নেহ যত্ন ও সমাদর লাভ, স্বামীর সমাদর প্রভৃতি যোগ আছে। যারা আধ্যাত্মিক সাধনা করে, তাদের অভাবনীয়ভাবে উন্নতি হবে এমন কি অলৌকিক শ্রবণ বা দৃষ্টি লাভ ঘটবে। অপার্থিব আনন্দ তারা উপভোগ করবে। বিদ্যার্থীগণের পক্ষে মাসটী শুভ।

কুম্ভ

ধনিষ্ঠানক্ষত্রাশ্রিতগণের পক্ষে মাসটী উত্তম, পূর্ব্বভাদ্রপাদজাতগণের পক্ষে মধ্যম এবং শতভিষাজাতগণের পক্ষে নিকৃষ্ট। শারীরিক কষ্ট

অনুভূত হোলেও উল্লেখযোগ্য ব্যাধির সম্ভাবনা নেই। রক্তের চাপ বৃদ্ধি, মাসের শেষার্দ্ধে বিশেষ ভাবে দেখা যাবে। গুহ্যপ্রদেশে ও মূত্রাশয়ে কষ্টভোগ। জ্বর, ক্ষত, রক্তশূন্যতা, এমন কি রক্ত বিকৃতির সম্ভাবনা। স্ত্রী ও সন্তানগণের সঙ্গে কলহবিবাদ ও ভুল বোঝার জন্যে মনোমালিন্য বা অসদ্ভাব, এছাড়া অন্যান্য পারিবারিক অসুবিধাজনিত দুঃখকষ্টভোগ। আর্থিক বিষয়ে কষ্টভোগ বা বিপত্তি। কোন নব পরিকল্পনায় সাফল্য লাভ কিন্তু স্পেকুলেশন বর্জ্জনীয়। বাড়ীওয়ালা, ভূম্যধিকারী ও কৃষিজীবিগণের পক্ষে নানাপ্রকার দুশ্চিন্তা, উদ্বেগ ও অশান্তি যোগ আছে। চাকুরির ক্ষেত্রে মোটামুটি একভাবেই যাবে, তবে মাসের শেষার্দ্ধে অনেকখানি শুভ দেখা যায়। এই রাশিতে জাত-ব্যক্তির সুখ সুবিধা ও সুযোগের সম্ভাবনা নিয়ে কোন অপ্রত্যাশিত ঘটনা ঘটবে। এতদ্‌সত্ত্বেও উপরওয়ালার বিরাগভাজন হবে। বৃত্তিজীবি ও ব্যবসায়ীর পক্ষে মাসটী কোন রকমে অতিবাহিত হবে। নানা প্রকার অসুবিধা, বাধাবিপত্তি ও কষ্টভোগ সত্ত্বেও মাসটী শুভপ্রদ হবে, মাসের শেষার্দ্ধে সর্ব্বপ্রকার বাধা বিপত্তি দূরীভূত হবে এবং আশা-আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ হবে। বিদ্যার্থীগণের পক্ষে মাসটী শুভ।

মীন

পূর্ব্বভাদ্রপদ ও রেবতীনক্ষত্রজাতগণের পক্ষে মাসটী উত্তম, উত্তরভাদ্র-পদজাতগণের পক্ষে নিকৃষ্ট। প্রথমার্দ্ধে স্বাস্থ্য ভালোই যাবে, শেষার্দ্ধে প্রস্রাবের কষ্ট, গুহ্যদেশের পীড়া প্রভৃতি আশঙ্কা করা যায়। পারিবারিক ক্ষেত্রে স্ত্রী ও সন্তানগণের সঙ্গে মনোমালিন্য ঘটবে। পরিবারবর্গের বৃদ্ধি সূচিত হয়। আর্থিক শ্রীবৃদ্ধি এমাসে দেখা যায় না। লাভ ও ক্ষতি সমানভাবেই চলবে। প্রথমার্দ্ধে যেরূপভাবে আয়বৃদ্ধি হবে, শেষার্দ্ধে তদনুপাতে ব্যয় হয়ে যাবে। বাড়ীওয়ালা, ভূম্যধিকারী ও কৃষিজীবিগণের পক্ষে মাসটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য নয়। মাসের প্রথমার্দ্ধ চাকুরিজীবির পক্ষে শুভ,—কর্ম্মপ্রসারতা লাভ। স্ত্রীলোকের পক্ষে আশাভঙ্গ, মনস্তাপ, শত্রুবৃদ্ধি, প্রণয়ভঙ্গ যোগ। বিদ্যার্থীগণের পক্ষে মাসটী শুভ নয়।

***

ব্যক্তিগত লগ্ন ফলাফল

মেষলগ্ন—

আশ্বিন মাসের প্রথমার্দ্ধে শারীরিক অসুস্থতার সম্ভাবনা, পিত্তাধিক্য, শূলবেদনা, ব্রণ বা আঘাতজনিত কোন ব্যাধি। পুত্র সম্ভাবনা। সম্মান-লাভ। শত্রুহানি। সাফল্যলাভ, বিপদের সম্ভাবনা মাসের প্রথমার্দ্ধে। আংশিক ব্যয়বৃদ্ধি। ২৫শে আশ্বিন মঙ্গল তুলায় এলে স্ত্রীর পক্ষে অশুভ ও তজ্জনিত মানসিক কষ্ট, বিদ্যাভাব শুভ।

বৃষলগ্ন—

দেহভাব শুভ, দুঃখ কষ্টভোগ, এবং নানাপ্রকারে হয়রাণ হবার সম্ভাবনা। আর্থিকলাভ, ভয় ও অপবাদ, সন্তানাদির বিশেষপীড়া। আয়বৃদ্ধি। বিদ্যায় আংশিক বাধা।

মিথুনলগ্ন—

সম্মানলাভ। শারীরিক ভাব মধ্যম, মানসিক স্বচ্ছন্দতা, উদ্বেগ, শত্রুবৃদ্ধি, স্ত্রীর অসুস্থতা, মানহানি। বিদ্যার্জ্জনে কিছু ক্ষতি।

কর্কটলগ্ন—

শারীরিক ভাব শুভ, সৌভাগ্যবৃদ্ধি, অর্থলাভ, কর্ম্মে সাফল্য, সন্তান সম্ভাবনা। মানসিক স্থৈর্য্যের অভাব, সাংসারিক ক্ষতি, বিদ্যাভাব শুভ, বিলাস বিভ্রম, প্রণয়েচ্ছা।

সিংহলগ্ন—

স্বাস্থ্যোন্নতি ও সুখভোগ, অর্থলাভ, ভূসম্পত্তির ক্ষতি, ব্যয়বৃদ্ধি, সন্তানের পীড়া, কর্ম্মে ঝঞ্ঝাট, স্ত্রীর পক্ষে অশুভ, বিদ্যাভাব মধ্যম, মধ্যে মধ্যে অমনোযোগহেতু বিদ্যার্জ্জনে ক্ষতি, উদর পীড়া।

কন্যালগ্ন—

স্থান পরিবর্ত্তন, ভ্রমণ, মধ্যে মধ্যে শারীরিক ও মানসিক অস্বচ্ছন্দতা, দুর্ঘটনার ভয়, আয়বৃদ্ধি, স্নায়ু দৌর্ব্বল্য, বিক্ষিপ্ত চিত্ত, মাতৃকষ্ট, সম্মানলাভ, ভূসম্পত্তির ক্ষতি।

তুলালগ্ন—

পুরস্কার প্রাপ্তি, লাভ বা অর্থাগম। সৌভাগ্যোদয়, আনন্দলাভ ও সন্তোষবৃদ্ধি, বিদ্যায় পারদর্শিতা, ব্যয়বৃদ্ধি, বায়ুপিত্তকোপজনিত মধ্যে মধ্যে শারীরিক কষ্ট।

বৃশ্চিকলগ্ন—

ধনভাব উত্তম, ভ্রমণ, মানসিক কষ্ট ও দুর্ঘটনার ভয়। ব্যয়াধিক্য। বিদ্যায় ক্ষতি, আংশিক অপবাদ, আয় বৃদ্ধি, রক্তাধিক্য, হৃৎপিণ্ডের পীড়া।

ধনু লগ্ন—

মানসিক অশান্তি ও অকারণে কার্য্যে হয়রাণ হওয়ার সম্ভাবনা। অবস্থার উন্নতি, বড় ও মহৎলোকের সহিত আলাপ। মাতার স্বাস্থ্য ভালো যাবে না। উদ্বেগ। শত্রুবৃদ্ধি, সৌভাগ্যসূচনা, বৈষয়িক ব্যাপারে সাফল্যলাভ, বিদ্যায় বাধা।

মকরলগ্ন—

উত্তম আয়, মধ্যে মধ্যে আর্থিক অস্বচ্ছন্দতা, এজন্তে উদ্বেগ, ভ্রাতাদের উন্নতি, সন্তোষলাভ, আশানুরূপ উন্নতি, লাভ ও কর্ম্মে সাফল্য, বিদ্যায় বাধা। স্ত্রীর পীড়াদি।

কুম্ভলগ্ন—

স্ত্রীর সহিত কলহ, কামপ্রবণতা, পিতৃরিষ্টি। ভয়, গুরুজনবিয়োগ, ব্যয়বৃদ্ধি, অবস্থার উন্নতি, কর্ম্মোন্নতি ও লাভপ্রদ প্রাপ্তির সম্ভাবনা। বিদ্যাভাব মধ্যম।

মীন লগ্ন—

মানসিক স্বচ্ছন্দতা, কিছু পরিমাণে চিত্তের উদ্বেগ। শত্রুবৃদ্ধি, আকস্মিক ব্যয়বৃদ্ধি, ভ্রমণ, স্ত্রীর দুর্ঘটনার ভয়, সৌভাগবৃদ্ধি, কর্ম্মস্থান সংক্রান্ত ক্ষতি, রাজ্য সরকারের ঔদাস্যহেতু কোন আশাপ্রদ বিষয়ে ক্ষতি ও তজ্জনিত অধৈর্য্য, বিদ্যাভাব মধ্যম।

॥ বঙ্গদর্শন ॥

মা দুর্গা বলেন,—বঙ্গ দেখি জলে জল।
খাদ্যহারা—তবু এত রঙ্গে টলমল॥

শিল্পী—পৃথ্বী দেবশর্মা

চীন কর্তৃক ভারত আক্রমণ—

কম্যুনিষ্ট চীন বিশ্বের শান্তিরক্ষা ব্যবস্থা বানচাল করিবার জন্য উঠিয়া পড়িয়া লাগিয়া গিয়াছে। কয়েক মাস পূর্বে চীনা সৈন্যরা তিব্বতে প্রবেশ করিয়া এমন অত্যাচার আরম্ভ করে যে তিব্বতের সর্বপ্রধান ধর্মনেতা ও রাষ্ট্র পরিচালক দালাই লামা গোপনে তিব্বতের রাজধানী ত্যাগ করিয়া বন-জঙ্গলের মধ্য দিয়া ভারতে আসিয়া আশ্রয় গ্রহণ করিতে বাধ্য হন—তাঁহার অপরাধ দালাই লামা কম্যুনিষ্ট চীনের কর্তৃত্ব স্বীকার করিয়া তাহাদের রাজনীতিক মত স্বীকার করিয়া লন নাই। দালাই লামা শুধু তিব্বতের ধর্মগুরু ছিলেন না, তিনি সারা বিশ্বের বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের ধর্মগুরু। দালাই লামার সহকারী পাঞ্চেন লামা কিন্তু চীনের সহিত একমত হইয়া যে কোন কারণেই হউক, দালাই লামার বিরুদ্ধাচরণ করিয়াছে ও বর্তমানে চীন-নেতা মাং-সে তুং ও চো-এন-লাইএর নেতৃত্ব স্বীকার করিয়া লইয়া তিব্বতে বাস করিতেছে। চীনা সৈন্যরা শুধু তিব্বত আক্রমণ ও দখল করিয়া ক্ষান্ত হয় নাই। যে সকল তিব্বতীয় তাহাদের পুরাতন নীতি ত্যাগ করে নাই, তাহাদের হত্যা করিয়াছে ও তাহাদের উপর অমানুষিক অত্যাচার করিয়াছে। ফলে কয়েক সহস্র তিব্বতীয় ভয়ে ভারতে পলায়ন করিয়া আসিয়া উদ্বাস্তুরূপে ভারতের নানা স্থানে আশ্রয় গ্রহণ করিয়া বাস করিতেছে। সমগ্র তিব্বত অধিকার করার পর চীনা কম্যুনিষ্ট সৈন্যরা ভারত ও ভুটান আক্রমণ করিয়াছে। ভুটান, নেপাল ও সিকিম দেশ স্বাধীন—তাহারা ভারতের সীমান্তে অবস্থিত, তাহাদের সহিত ভারতের মৈত্রীর সম্পর্ক বর্তমান ও ঐ ৩টি দেশের অধিকাংশ লোক ভারতের সহিত ব্যবসা বাণিজ্য করিয়াই অর্থ-উপার্জন করে। চীনা সৈন্য ভারতের অন্তর্গত ২টি স্থানে প্রবেশ করিয়া সকল স্থান হইতে ভারতীয় সৈন্য তাড়াইয়া দিয়াছে ও সে সকল স্থানে নিজেদের অধিকার প্রতিষ্ঠিত করিয়াছে। ঐ ২টি স্থান অনেক দিন হইতে চীনারা তাহাদের প্রস্তুত মানচিত্রে তাহাদের অধিকারভুক্ত বলিয়া দেখাইতেছিল। ওদিকে চীন কর্তৃক ভারত আক্রান্ত হইতে দেখিয়া বৃটীশ প্রধান মন্ত্রী ও আমেরিকার সভাপতি উভয়ে মিলিত হইয়া ভারতকে জানাইয়াছেন যে প্রয়োজন হইলে চীনের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিবার জন্য তাঁহারা ভারতকে সমরোপকরণ দিয়া সাহায্য করিবেন। চীন কর্তৃক ভারতের উত্তর পূর্ব সীমান্ত আক্রান্ত হইতে দেখিয়া ঐ সীমান্তবাসী বিদ্রোহী নাগার দল আবার নূতন করিয়া ভারত রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে আক্রমণ আরম্ভ করিয়াছে ও সে জন্য উত্তর পূর্ব সীমান্ত এজেন্সির শাসককে বিব্রত হইতে হইয়াছে। ভারত এক সময়ে চীনকে বন্ধু মনে করিয়া রাষ্ট্র সংঘে তাহাকে গ্রহণ করিবার জন্য চেষ্টা করিয়াছিল এবং চীন-ভারত-মৈত্রী প্রতিষ্ঠার ব্যবস্থা করিয়াছিল। বর্তমানে ভারত চীনের আক্রমণ সম্বন্ধে চীন সরকারকে পত্র দেওয়ায় প্রথমে চীন সরকার কোন উত্তর দেয় নাই, তাহার পর জানাইয়াছে যে তাহারা ভারতকে আক্রমণ করে নাই—যে সকল অঞ্চলে চীনা সৈন্য গিয়াছে, সে অঞ্চলগুলি পূর্ব হইতেই চীন সরকারের অধীন ছিল—ভারত ঐ সকল অঞ্চল জোর করিয়া দখল করিবার চেষ্টা করায় তাহারা বাধা প্রদান করিয়াছে। বর্তমানে এই অবস্থায় ভারতকে ঐ সকল স্থানে সৈন্য প্রেরণ করিয়া স্থানগুলি পুনরায় দখল করিয়া লইবার ব্যবস্থা করিতে হইতেছে, ইহার ফল কি হইবে, এখন তাহা বলিতে পারে না। এই বিষয় লইয়া তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধ আরম্ভ হওয়াও বিচিত্র নহে। যদিও মার্কিণ প্রেসিডেণ্ট আইসেন-হাওয়ার সম্প্রতি ফ্রান্স, জার্মানি ও ইংলণ্ড বেড়াইয়া গিয়াছেন এবং যদিও রুশিয়ার কর্তা ক্রুশ্চেভ সম্প্রতি আমেরিকায় গিয়াছে, তথাপি এ কথা বলা যায় যে ইঙ্গ-আমেরিকা দল একদিকে ও রুসিয়া চীন প্রভৃতি কম্যুনিষ্ট দেশগুলি অপর দিকে যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হইয়া আছে। ভারতের প্রধান মন্ত্রী শ্রীনেহরু এই উভয় দলের মধ্যস্থতা করিয়া এতদিন যুদ্ধ ঠেকাইয়া রাখিতে-

ছিলেন। আজ ভারত বিপন্ন হইলে বা চীন কর্তৃক আক্রান্ত হইলে যদি রুশিয়া ভারতের পক্ষ অবলম্বন না করে, তবে ভারতকে বাধ্য হইয়া ইঙ্গ-মার্কিণ দলের সাহায্যপ্রার্থী হইতে হইবে। পাকিস্তান ইঙ্গ-মার্কিণ দলভুক্ত হইয়া আছে। সে জন্য পাকিস্তানের কর্তা আইউব খাঁ সাহেবও সম্প্রতি দিল্লীতে আসিয়া শ্রীনেহরুর সহিত কথা বলিয়া গিয়াছেন। এই সকল ঘটনায় সমগ্র জগৎ সন্ত্রস্ত—ভারতের ত কথাই নাই। ভারতে যুদ্ধক্ষেত্র হইলে ভারতের সকল উন্নয়ন পরিকল্পনা ব্যর্থ হইয়া যাইবে ও ভারতবাসী ধনে-প্রাণে ধ্বংস হইয়া যাইবে। কিন্তু ইহার প্রতীকারেরই বা উপায় কোথায়?

সাম্প্রতিক হাঙ্গামা—

গত ৩১শে আগষ্ট সোমবার হইতে ৪ঠা সেপ্টেম্বর শুক্রবার পর্য্যন্ত ৫ দিন ধরিয়া কলিকাতা, হাওড়া ও ২৪-পরগণায় যে দাঙ্গাহাঙ্গামা হইয়া গেল, তাহা পূর্ব পূর্ব সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার সহিত তুলনার যোগ্য। কয়েকটি কংগ্রেস-বিরোধী তথা গভর্ণমেণ্ট বিরোধী দল কম্যুনিষ্ট দলকে নেতা করিয়া খাদ্যমূল্য বৃদ্ধির জন্য আন্দোলনে প্রবৃত্ত হয়—১লা সেপ্টেম্বর তাঁহারা ছাত্রদের দ্বারা সে আন্দোলন জোরালো করিতে যাইলে শহরের অবস্থা গুরুতর হইয়া পড়ে। মঙ্গলবার দুপুর হইতেই কলিকাতার সকল কাজ বন্ধ হইয়া যায়—বুধবার সারাদিন এক শ্রেণীর লোকেরা কলিকাতার বহু স্থানে বহু প্রকারে জনগণের সম্পত্তি নষ্ট করে ও জনগণের সকল কাজে বাধা দেয়। বৃহস্পতিবার আন্দোলনকারীরা হরতাল ঘোষণা করিয়াছিলেন এবং হরতালের সুযোগ লইয়া কোথাও কোথাও অশান্ত জনতা জনগণের উপর অত্যাচার করিয়াছে ও ফলে সর্বত্র মানুষ শঙ্কিত অবস্থায় দিন যাপন করিয়াছে। শুক্রবারেও অধিকাংশ ট্রাম ও বাস পথে বাহির না হওয়ায় শহরের কাজকর্ম্ম ব্যাহত হয়। ৫ই সেপ্টেম্বর শনিবার হইতে কলিকাতা, হাওড়া ও সহরতলীতে শান্ত অবস্থা ফিরিয়া আসিয়াছে। হাওড়ায় অশান্তি খুব বেশী হইয়াছিল এবং ঐ হাঙ্গামায় ও পুলিশের গুলি চালনায় মোট ৮৯ জন লোক মারা গিয়াছে বলিয়া সরকারী সূত্রে সংবাদ পাওয়া গিয়াছে। সরকারী সংবাদে জানা যায় কলিকাতার ১৯জন, হাওড়ার ১৭জন ও ২৪-পরগণার ৩জন ছিল। কলিকাতায় নিহত ১৯জনের মধ্যে ১৬জনের মৃতদেহ তাহাদের আত্মীয়দের প্রদান করা হয় ও ৩জনকে সনাক্ত করা যায় নাই। হাওড়ায় নিহত ১৭জনের মধ্যে ১৪জনের শব হিন্দুসৎকার সমিতি দাহ করে, ২টি শব তাহাদের আত্মীয়কে ও ১টি মুসলেম ধর্মসংস্থা সফিজুল ইসলামকে দেওয়া হয়। ২৪পরগণার ২টি শব আত্মীয়দের ও ১টি হিন্দুসৎকার সমিতিকে দেওয়া হইয়াছে। কলিকাতার ৭টি পুলিস ফাঁড়ি, হাওড়ায় পুলিস কণ্ট্রোল ঘর এবং ২৪পরগণার সোদপুর ফাঁড়ি উচ্ছৃঙ্খল জনতা কর্তৃক আক্রান্ত হইয়াছিল।

৩১শে আগষ্টের পূর্বে ৫।৭দিন ধরিয়া পুলিস কলিকাতায় ও বিভিন্ন জেলায় আন্দোলনকারীদের নেতাদের গ্রেপ্তার আরম্ভ করিয়াছিল। খাদ্য আন্দোলন সম্বন্ধে সারা পশ্চিম বাংলা রাজ্যে ৮ই সেপ্টেম্বর পর্য্যন্ত মোট ১২ হাজার ৪শত ৮৫জনকে গ্রেপ্তার করা হইয়াছিল। এই সংখ্যার মধ্যে শুধু কলিকাতা সহরে ১৭৮৫জনকে গ্রেপ্তার করা হইয়াছিল। ৮ই সেপ্টেম্বর পর্য্যন্ত মোট ৩৮৪৩জন জেলে আটক ছিল—তন্মধ্যে ১৯১জনকে পি-ডি আইনে আটক রাখা হইয়াছিল। ৩৪৭০জন বিচারাধীন ছিল—তন্মধ্যে বহুসংখ্যক জেলে ছিল ও বাকী সংখ্যা জামিনে মুক্ত ছিল। এই হাঙ্গামায় মোট ক্ষতির পরিমাণ এখনও বলা কঠিন। শুধু একটি অঞ্চলে (সহরতলীতে) সোদপুর ফাঁড়ি, পানিহাটীর মীনা সিনেমা, আগড়পাড়া রেলষ্টেশন ও কামারহাটীর মুক্তি সিনেমা আক্রান্ত ও ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে। সহরেও অনেক নিরীহ ভদ্রলোক অকারণে লাঞ্ছিত ও ক্ষতিগ্রস্থ হইয়াছেন। আহতের সংখ্যা কয়েক হাজার হইবে—ঐ সংখ্যা সঠিক বলা কঠিন।

মহাপূজার অব্যবহিত পূর্বে কয়েকদিন কলিকাতার সকল ব্যবসা বাণিজ্য বন্ধ থাকায় জনসাধারণ যেভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছেন,তাহার ক্ষতিপূরণ কে করিবে? সাধারণ ব্যবসায়ীরা ও যারা দিন রোজকারে সংসার চালায় তারাও তো জনতারই অংশ—তাদের কথাও তো ভাবা উচিত। সাধারণ লোকে তাই কোনও রকম ক্ষতিকর আন্দোলন ও হাঙ্গামাকে প্রীতির চক্ষে দেখে না। বর্ত্তমানের এই গণ্ডগোলের পর সরকার পক্ষ, বিরোধী পক্ষ ও বিশেষ করিয়া সাধারণ মানুষ ভবিষ্যতের জন্য সতর্কতা অবলম্বন করিবেন বলিয়া আশা করা যায়।

নূতন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী—

ইন্দোনেসিয়ার প্রাক্তন ভারতীয় রাষ্ট্রদূত, লোকসভার সদস্য ডাঃ পি-সুবারায়ন গত ৩১শে আগষ্ট কেন্দ্রীয় মন্ত্রি-সভার অন্যতম সদস্য নিযুক্ত হইয়াছেন। তিনি শ্রীএস-কে-পাতিলের নিকট পরিবহন ও যোগাযোগ রক্ষার ভার গ্রহণ করিয়াছেন। তিনি গত ১১ই সেপ্টেম্বর ৭০ বৎসর বয়সে পদার্পণ করিয়াছেন।

অধ্যাপকের সম্মান—

কলিকাতা প্রেসিডেন্সী কলেজের দর্শন বিজ্ঞানের প্রধান অধ্যাপক ডক্টর শ্রীপ্রবাসজীবন চৌধুরী এম-এ, এম-এস-সি, পি-আর-এস, ডি-ফিল, মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের কর্ণেল ইউনিভার্সিটি ও দক্ষিণ ক্যালিফোর্ণিয়া ইউনিভার্সিটির কর্তৃপক্ষের বিশেষ আমন্ত্রণে, উক্ত দুইটি বিশ্ববিদ্যালয়ের পদার্থ বিজ্ঞানের বিশ্লেষণাত্মক গবেষণা ও অধ্যাপনার জন্য ১লা আশ্বিন বিমানযোগে আমেরিকা যাত্রা করিয়াছেন।

ডক্টর শ্রীপ্রবাসজীবন চৌধুরী

ডাঃ চৌধুরী ভারতীয় চিন্তাধারার নূতন পথের সন্ধান বর্হি-ভারতে প্রদান করিয়া স্বদেশের মুখোজ্জ্বল করিয়াছেন। তাঁর বিজ্ঞান-দর্শন ও সৌন্দর্য্য-দর্শন বিষয়ক গ্রন্থগুলি ও গবেষণামূলক প্রবন্ধাবলী ইউরোপ ও আমেরিকায় সমাদৃত হইয়াছে। ডাঃ চৌধুরী "ভারতবর্ষ"র নিয়মিত লেখকরূপে "ভারতবর্ষ"র পাঠক পাঠিকাগণের নিকট পরিচিত। আমরা তাঁর উত্তরোত্তর উন্নতি ও সাফল্য কামনা করি।

শান্তি সেনা দল গঠন—

সর্বোদয় নেতা পশ্চিমবঙ্গের প্রাক্তন মন্ত্রী শ্রীচারুচন্দ্র ভাণ্ডারী ও উড়িষ্যার প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী শ্রীনবকৃষ্ণ চৌধুরী কলিকাতা ও হাওড়ায় দাঙ্গা-হাঙ্গামার পুনরাবির্ভাব প্রতিরোধের জন্য একটি শান্তি সেনা দল গঠনে উদ্যোগী হইয়াছেন। কলিকাতা সি—৫২ কলেজ ষ্ট্রীট মার্কেটের দ্বিতলে শান্তিসেনার কার্য্যালয় খোলা হইয়াছে। শান্তিসেনার কার্য্য রাজনীতিক দলাদলি বা মতামতের উর্দ্ধে থাকিবে। আচার্য্য বিনোবাভাবে কিছুকাল পূর্বে এই শান্তিসেনাদল গঠনের প্রয়োজনের কথা বলিয়াছিলেন। ভাণ্ডারী ও চৌধুরী মহাশয়দ্বয়ের চেষ্টায় কলিকাতা তথা পশ্চিমবঙ্গে এইরূপ সেনাদল গঠিত হইলে দেশ উপকৃত হইবে।

পাট ও পীঠ

শ্রী 'শ'—

॥ সিনেমার সংস্কার ॥

চলচ্চিত্রের জনপ্রিয়তা যে রকম বৃদ্ধি পাচ্ছে সে তুলনায় চিত্রের উন্নতি অর্থাৎ মান বা ষ্ট্যাণ্ডার্ড কি বাড়ছে? এ প্রশ্ন আজ চলচ্চিত্র সমালোচকদের মনেই শুধু নয় সাধারণ রুচিবান দর্শকদের মনেও জাগছে। আর, এ প্রশ্ন জাগার যথেষ্ট কারণও যে রয়েছে তাতে সন্দেহ নেই মোটেই। যে কোনও শিল্প যখন অর্থকরী হয়ে ওঠে—বিশেষ করে চলচ্চিত্রের মতন শিল্প, যা প্রভূত অর্থের উপার্জনে সাহায্য করে—তাকে সংযত করে শুধু মুনাফা বৃদ্ধির দিকে লক্ষ্য না রেখে চলচ্চিত্রের সর্ব্বাঙ্গীন উন্নতির, বিশেষ করে তার পরিচ্ছন্নতা ও পারিপাট্য, শালীনতা ও সংস্কৃতিকে বজায় রেখেই শুধু নয় উৎকর্ষ বিধানও করে, চলচ্চিত্রকে শ্রেষ্ঠ ও নির্দ্দোষ প্রমোদ শিল্পরূপে সর্ব্বদেশের ও সর্ব্বকালের উপযোগী করে তোলাই সমীচীন। অবশ্য সব মানুষের রুচিও এক নয়, সবদেশের সংস্কৃতিও সমান নয়, আর সবকালের শালীনতা বোধেরও তফাৎ আছে। তবুও সর্ব্বদেশের, সর্ব্বকালের, সর্ব্বরকম সভ্য মানুষের মনেই সভ্যতা, সংস্কৃতি, শালীনতা ও রুচির একটা নির্দ্দিষ্ট মান বা বোধ আছে। সেই মানের নীচে কোনও দেশের চলচ্চিত্রেরই নেমে যাওয়া উচিত নয়,—যত উর্দ্ধে ওঠা যায় ততই মঙ্গল, চলচ্চিত্রের দিক থেকেই শুধু নয়, জাতির দিক থেকে, দেশের দিক থেকে, শিল্পের দিক থেকে। কিন্তু লজ্জার কথা, দুঃখের কথা অধুনা সারা পৃথিবীর মানুষের মনই যেন এক অধঃপতনের দিকে এগিয়ে চলেছে,—আর তারই সুস্পষ্ট লক্ষণ ফুটে উঠ্‌ছে সাহিত্যে, শিল্পে, জীবনে, দর্শনে, আচারে, ব্যবহারে। চলচ্চিত্রও এই নিম্নাভিমুখী ধারায় স্বাভাবিকভাবেই ধরা পড়েছে।

আজকালকার বেশির ভাগ চলচ্চিত্রের মধ্যে তাই দেখা যায়—হয় তথাকথিত সাম্যবাদের নামে এক উৎকট রাজনৈতিক প্রচার পুষ্ট বা অশ্লীল যৌন আবেদনে দুষ্ট, কিংবা হাল্কা ধরণের ছ্যাবলামী মার্কা সঙ্গতি বিহীন প্রলাপোক্তি রসসিক্ত ভাবেরই ছড়াছড়ি। কিন্তু এই সব ধরণের চিত্র সাময়িকভাবে হয়ত কিছু দর্শক আকর্ষণ করতে

বোম্বাইয়ের জনপ্রিয়া চিত্রাভিনেত্রী শ্যামা।

পারলেও সর্ব্বকালের, সর্ব্বলোকের উপযোগী উৎকৃষ্ট চিত্র রূপে জনচিত্তে এদের স্থান কখনও হবে না—এরূপ চিত্রের স্থায়ী প্রভাবও কিছু মাত্র নেই ; খালি সস্তা বাহবা বা 'ষ্টাণ্ট' দিয়ে, লোকের মনে ধোঁকা লাগিয়ে বক্স-অফিসের লাভ্যাংশকে বর্দ্ধিত করাই এই সব চিত্রের একমাত্র উদ্দেশ্য। অবশ্য মাঝে মাঝে সত্যকার ভাল চিত্রের সাক্ষাৎ মেলে, কিন্তু তার সংখ্যা নগণ্য বললে অত্যুক্তি করা হবে না। সত্যকার সংবেদনশীল,সমাজ জীবনে ও জনজীবনে উপকারী, দেশের সভ্যতা ও সংস্কৃতির উপযোগী, জনচিত্তে স্থায়ী আসন গ্রহণকারী, বুদ্ধি ও চিন্তা প্রসারকারী, মনীষাধর্ম্মী, শাশ্বত সত্য ও চিরন্তন সত্তার প্রভাব পুষ্ট ও আবেদন আপ্লুত কালজয়ী চিত্রের দর্শন সাধারণতঃ হয় না। কিন্তু এরূপ চিত্রের নির্ম্মাণ ও প্রচার না হলে চলচ্চিত্রের অগ্রগতি একদিন প্রতিহত হবে, মানুষের মন নিকৃষ্ট চিত্র দেখতে দেখতে চলচ্চিত্রের প্রতি প্রতিকূল হয়ে উঠবে। সেজন্য উৎকৃষ্ট ও উন্নততর চিত্র প্রস্তুতের দিকে চিত্র-নির্ম্মাতাদের ঝোঁক দেওয়া উচিত। শুধু ভাবধারার ও দৃষ্টিকোণের নতুনত্ব দেখালেই চলবে না—সে ভাবধারা উন্নত চিন্তার পরিপোষক হল কিনা তাও লক্ষ্য করতে হবে। জাতীয় সরকারেরও উচিত জাতীয় জীবনের উন্নতির জন্য নিকৃষ্ট চিত্রের প্রচার বন্ধ করে উৎকৃষ্ট চিত্রের নির্ম্মাণে সাহায্য ও উৎসাহ দান করতে এগিয়ে আসা। চিত্র-সমালোচকদেরও এ বিষয়ে বিশেষ দায়িত্ব রয়েছে। নিকৃষ্ট চিত্রের সমালোচনায় যেন তাঁরা পরাঙ্মুখ না হন, আর উৎকৃষ্ট চিত্রের জন্য গঠনমূলক সমালোচনাও যেন তাঁরা অক্লান্তভাবেই করে যান। তবেই হয়তো সিনেমার সংস্কার সম্ভব হবে। আর, জাতীয় সরকার, চিত্র-নির্ম্মাতারা ও চিত্র-সমালোচকরা একযোগে চলচ্চিত্রের উন্নতির জন্য চেষ্টা করলে এবং দর্শকদের অকুণ্ঠ সহানুভূতি পেলে উন্নততর চলচ্চিত্রের বহুল নির্ম্মাণ ও প্রচারও যে সম্ভব হবে তাতে কোনও সন্দেহ নেই,—আমরাও সেই আশাই পোষণ করি।

***

খবরাখবর ঃ

আগামী নভেম্বর মাসে পশ্চিম বাংলায় একটি আন্তর্জাতিক শিশু চিত্রের প্রদর্শনী অনুষ্ঠিত হবে বলে জানা গেছে। এই প্রদর্শনীর উদ্দেশ্য ভারতে যাতে প্রচুর পরিমাণে উন্নত ধরণের শিশুদের উপযোগী চিত্র প্রস্তুত হয় তার জন্য উৎসাহ দান। আশা হয় এইরূপ চিত্র প্রদর্শনীর থেকে ভারতীয় ও বাংলার চিত্র নির্ম্মাতারা উৎসাহ লাভ করে শিশু-চিত্র নির্ম্মাণে আরও উদ্যোগী হবেন।

* * * *

পূর্ব্ব-জার্ম্মান চলচ্চিত্রের একটি সপ্তাহব্যাপি প্রদর্শনী শীঘ্রই বোম্বাইএ অনুষ্ঠিত হবে। এই প্রদর্শনীতে তিনটি পূর্ণাঙ্গ চিত্র ও কয়েকটি আন্তর্জাতিক প্রশংসাপ্রাপ্ত ছোট চিত্র প্রদর্শিত হবে। পূর্ণাঙ্গ চিত্রগুলির মধ্যে "Stars", "Don't Forget My Trandel" ও "The Devil Muchlenberg" এবং ছোট চিত্রগুলির মধ্যে "Dance in the Art Gallery" প্রভৃতি কয়েকটি চিত্র প্রদর্শিত হবে।

* * * *

এ-ভি-এম্ কর্তা দক্ষিণ ভারতীয় চিত্র নির্ম্মাতা শ্রীমৈয়াপ্পাণ তাঁর বিশ্ব-ভ্রমণের পর মাদ্রাজে এসে জানিয়েছেন যে হলিউডের বিশাল ও বহু-ব্যয়সাপেক্ষ চিত্রগুলি বিশ্ব-বাজারের পক্ষে উপযোগী সন্দেহ নেই ; কিন্তু আমাদের চলচ্চিত্রের সীমাবদ্ধ বাজারের পক্ষে ঐরূপ বিরাট ব্যয়বহুল চিত্র নির্ম্মাণ করা যুক্তিযুক্ত নয়। তাঁর মতে জাপানী চলচ্চিত্র নির্ম্মাণের নীতিই আমাদের পক্ষে উপযুক্ত। এতে খরচ কম হয় কিন্তু চিত্রের উৎকর্ষ কমে না। কম খরচে ভাল চিত্র নির্ম্মাণ করতে হলে জাপানী প্রথাই অবলম্বন করা উচিত।

* * * *

বিলাতের "The Oxford Playhouse Company" শীঘ্রই ভারত ভ্রমণে আসছেন। এই দলটি সেক্সপীয়র, বার্ণাড শ ও টি, এস্, এলিয়ট্-এর কয়েকটি নাটক প্রদর্শন করবেন। এই নাটকগুলির মধ্যে সেক্সপীয়রের "Twelfth Night", বার্ণাড শ-র "Man of Destiny", Don Juan in Hell" ও "Man and Superman"-এর কিছু অংশ এবং টি, এস্, এলিয়ট্-এর "Cocktail Party" উল্লেখযোগ্য।

* * * *

খবরে প্রকাশ University Grants Commission কলেজ ও বিশ্ব-বিদ্যালয়ে 'ফিল্ম ক্লাব' প্রতিষ্ঠার একটি

পরিকল্পনা অনুমোদন করেছেন। এরকম ফিল্ম ক্লাব্‌গুলির কাজ হবে সভ্যদের জন্য নির্ব্বাচিত চিত্রগুলির প্রদর্শন ও চিত্র সমালোচনায় সভ্যদের উৎসাহ দান। প্রথম প্রথম বৎসরে ছয়টি করে বিশেষ গুণসম্পন্ন ছবি নির্ব্বাচিত করা হবে।

* * *

শ্রীরমাপদ চৌধুরীর গল্প "দ্বীপের নাম টিয়া রং" অবলম্বনে বাংলা ও হিন্দীতে চলচ্চিত্র নির্ম্মিত হবে। চিত্রটিতে অভিনয় করবেন—মালা সিন্‌হা, মানসী সোম, জাবিন্ জলিল, বিনোদ শর্ম্মা, রাজকুমার, অভি ভট্টাচার্য্য, জহর রায় প্রভৃতি।

* * *

শ্রীশক্তিপদ রাজগুরুর "চেনা-মুখ" গল্প অবলম্বনে পরিচালক ঋত্বিক ঘটক "মেঘে ঢাকা তারা" নামে একটি চিত্র নির্ম্মাণের মনস্থ করেছেন।

বিদেশী খবর ঃ

তৃতীয় বার্ষিক Sanfrancisco Iniernational Film Festival আগামী ১১ই নভেম্বর থেকে ২৭শে নভেম্বর পর্য্যন্ত অনুষ্ঠিত হবে। এই উৎসবের "Golden Gate Awards" প্রতিযোগীতায় যোগদানের জন্য যাটটিরও বেশী দেশকে আমন্ত্রণ জানান হয়েছে।

* * *

প্রখ্যাত হলিউড্ চিত্র-তারকা Yul Brynner Geneva-য় U. N. High Commission for Refugees-এর কাজে সক্রিয়ভাবে নিযুক্ত হয়েছেন। পরবর্তী তিন বৎসরের বেশির ভাগ সময় তিনি হাই কমিশনারের বিশেষ অবৈতনিক পরামর্শদাতারূপে আন্তর্জাতিক উদ্বাস্তু সমস্যার অনুসন্ধানে কাটাবেন। এই সময়েও তিনি চলচ্চিত্রে অভিনয়ের কাজ চালিয়ে যাবেন যদিও তাতে অনেকবার তাঁকে যাতায়াত করতে হবে। Yul Brynner মনে করেন এই উদ্বাস্তু সমস্যার সমাধান করতে সকলেরই সাহায্য করা উচিত কারণ এর দায়িত্ব সমগ্র মানুষ জাতির।

সরোজ সেনগুপ্ত প্রযোজিত 'খেলাঘর' চিত্রে মালা সিন্‌হা।

* * * *

পরলোকগত বিশ্ব-বিখ্যাত চলচ্চিত্র নির্মাতা Cecil B. De Mille-এর কন্যা Mrs. Cecilia De Mille Harper তাঁর পিতার পরিকল্পনা অনুযায়ী বয় স্কাউট্

আন্দোলন ও তার প্রতিষ্ঠাতা Lord Baden Powell-এর জীবনী, "On My Honor" নামে একটি চিত্রে রূপায়িত করবেন। Henry Wilcoxon এই চিত্রটির প্রযোজনা করবেন।

* * *

কিছুদিন আগে Walt Disney-র "Sleeping Beauty" নামের একটি পূর্ণাঙ্গ কার্টুন্ চিত্র আমেরিকায় মুক্তি পেয়েছে ও দর্শকদের কাছ থেকে প্রভূত প্রশংসাও অর্জ্জন করেছে। চিত্রটির কাহিনী রচিত হয়েছে Charles Perrault (১৬২৮—১৭০৩)-এর একটি রূপকথা অবলম্বনে যাতে এক রাজকুমার দীর্ঘ ঘুম থেকে রাজকুমারী অরোরাকে একটি চুম্বনে জাগিয়ে তুলেছিল। চিত্রটির সঙ্গীতাংশ George Bruns গ্রহণ করেছেন Tchaikovsky-র "Sleeping Beauty" ব্যালে থেকে। এই ক্লাসিক্ রূপকথাটি টেক্‌নিকলার রংএ ও টেক্‌নিরামা পদ্ধতিতে চিত্রায়িত হয়ে এরূপ সুন্দর ও হৃদয়গ্রাহী হয়েছে যে চিত্র সমালোচকরা এটিকে অনবদ্য বলে প্রশংসা করেছেন।

* * * *

Columbia Pictures ও "Magoo's Arabian Nights" নামে একটি পূর্ণ দৈর্ঘ্যের চিত্র প্রস্তুত করছেন। চিত্রটি এই বৎসরের বড়দিনের সময়ে মুক্তি লাভ করবে। ছোট দৈর্ঘের জনপ্রিয় "Magoo Cartoons"-এর স্রষ্টিকর্তা Steven Bosustow এই চিত্রটির প্রযোজনা করবেন।

শিল্পীর কথা

সুরশিল্পী রাইচাঁদ

কুমারেশ ভট্টাচার্য

এ সংসারে প্রতিনিয়ত কত লোকই জন্মগ্রহণ করছে আবার কত লোক এখান থেকে বিদায় নিচ্ছে চিরতরে। কিন্তু তাঁদের জীবনই সার্থক যাঁরা তাঁদের কৃতকর্মের জন্যে লাভ করেন বিপুল যশ ও সম্মান। এই সুনাম লাভের পেছনে রয়েছে কিন্তু তাঁদের বিরাট প্রতিভা। আর এই প্রতিভা অনেকটা দৈবানুগৃহীত বস্তু হলেও তার সম্যক্ বিকাশের জন্যে চাই অনুকূল পরিবেশ, চাই অনুশীলন। তবেই তা লাভ করে পরিপূর্ণতা।

আজ থেকে প্রায় পঞ্চাশ বছর আগের কথা। কলকাতার প্রেমচাঁদবড়াল ষ্ট্রীটের বিখ্যাত ও বনেদী বংশ বড়ালবাড়ী। বাড়ীতে সংগীত-চর্চা চলে নিয়মিত। ভারতের বিভিন্ন স্থানের বিখ্যাত ওস্তাদ গায়ক-বাদক কলকাতায় এলে বড়ালবাড়ীতে গান-বাজনা করেন। সে সংগীত-আসরে কলকাতার তদানীন্তন প্রায় সমস্ত বিখ্যাত ওস্তাদই যোগ দেন। তাঁদের সমাগমে বাড়ীটা যেন হয়ে উঠেছিল সংগীতের একটা পীঠস্থান।

ঐ সময়ে এরূপ পরিবেশে উক্ত বাড়ীর ছয়-সাত বছরের একটি বালক গানবাজনার প্রতি এমনিই আকৃষ্ট হয় যে লেখাপড়ার চেয়ে সংগীতচর্চাই তার কাছে অধিকতর প্রিয় হয়ে ওঠে। অভিভাবকেরা কিন্তু তার এই সংগীত-চর্চাকে সমর্থন করতেন না মোটেই, বরং বালকটিকে তিরস্কারই করতেন। কিন্তু যে বিষয়ে যার প্রতিভা তার দীপ্তিকে কি চাপা দেওয়া যায়? কেমন করে সবার অজ্ঞাতে, সবার অবহেলার মধ্যে দিয়ে একদিন প্রতিভাবানের প্রকাশ হয়, তার মেলে না কোন হদিস, কিন্তু যখন হয় তখন তাকে সসম্ভ্রমে স্বীকার না করে কি উপায় থাকে? সংগীতজ্ঞ, কবি, সাহিত্যিক, চিত্রকর প্রভৃতি যাঁরাই স্ব স্ব ক্ষেত্রে স্মরণীয় ও বরণীয় হয়ে ওঠেন তাঁদের প্রত্যেকেরই জীবনেতিহাসে এটাই হচ্ছে পরম সত্য।

উক্ত প্রতিভাবান বালকের জীবনেও একদিন এমনিই ঘটনা হল সংঘটিত। সংগীতের যে অদম্য উৎসাহ ও প্রেরণা তাকে সব কিছু থেকে দূরে সরিয়ে রেখেছিল, ঘরের রুদ্ধ দুয়ারের বাধা না মেনে যেদিন তা বাইরে ধরা পড়ে গেল সেদিন তার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতাই সর্বপ্রথম বালকটির প্রতিভালোকে হয়েছিলেন মুগ্ধ, বিস্মিত। সুসজ্জিত ও মূল্যবান বাদ্যযন্ত্রে পরিপূর্ণ যে কক্ষটিতে বসত সংগীতের আসর সেখান থেকে ভেসে আসা তবলার অতি সুমিষ্ট বোল শুনে বারান্দায় থমকে দাঁড়ান তিনি আর মনে মনে ভাবতে থাকেন, অসময়ে কে বাজাচ্ছে তবলার এত সুমিষ্ট বোল! কোন্ ওস্তাদযন্ত্রী তবলার এমনি মধুর ধ্বনিতে ভরে তুলছে সারা ঘর?

কৌতূহলী শ্রোতা দরজায় ধাক্কা দিলেন, মুহূর্তে খুলে গেল রুদ্ধ দুয়ার। কিন্তু এ কী! তাঁরই ছোট্টভাইটি চোখ বুজে আপন মনে বাজিয়ে চলেছে তবলা, সুরের সাধনায় সে মগ্ন! দাদা বাধা দিলেন না, নিশ্চলভাবে দাঁড়িয়ে শুনতে লাগলেন। সহসা বালকের দৃষ্টি পড়ল দাদার দিকে। বাজনা হঠাৎ গেল থেমে, আতংকে বালকটি হল পাথরের মত নিশ্চল।

—কে শেখালে বাজাতে? জলদগম্ভীর স্বরে হল প্রশ্ন।

—কেউ না, নিজে নিজেই শিখেছি। ভয়ার্ত কণ্ঠে উত্তর দেয় বালক।

—চালাকি হচ্ছে? এ কি কেউ নিজে শিখতে পারে? কর্কশ কণ্ঠে দাদা বলেন।

—আমি নিজেই শিখেছি, ভীতকণ্ঠে উত্তর দেয় বালক।

—কিন্তু এ যে বড় কঠিন বোল। ওস্তাদজী মাত্র দিনকয়েক আগে বাজিয়েছেন। কিন্তু তুই শিখেছিস কী করে?

বিস্ময়ের সুর ধ্বনিত হয় দাদার কণ্ঠে।

এবার একটু সাহস হয় বালকের মনে। ধীরে ধীরে সে বলে, শুনে শুনে। যখন আসর বসে তখন আমি ঐ ঘরের একটি কোণে চুপ করে বসে থাকি। তারপর সবাই যখন যায় চলে তখন আমি চুপি চুপি সাধতে থাকি তবলা নিয়ে।

দাদা ভাবতে থাকেন, একি সম্ভব? আবার অবিশ্বাসও তো করা যায় না। তিনি নিজেও তো একজন বাদ্য ও সংগীত-বিশারদ। সেদিন তিনি সসম্ভ্রমে স্বীকার করে নিতে বাধ্য হয়েছিলেন বালকের অপূর্ব প্রতিভাকে, আত্মমর্যাদায় লাগেনি তাঁর এতটুকু আঘাত।

সেদিনকার সেই প্রতিভাশালী বালক আর কেউই নয়, ইনি হচ্ছেন সর্বজন পরিচিত, বাঙলা তথা ভারতের গৌরব, সর্বজন শ্রদ্ধেয় বিখ্যাত সুরশিল্পী শ্রীরাইচাঁদ বড়াল। রাইবাবুর পিতা স্বর্গীয় লালচাঁদ বড়াল ছিলেন একজন ভারত-বিখ্যাত সংগীত-সাধক। তাঁর পুত্রগণ যেন উত্তরাধিকার সূত্রেই লাভ করেছিলেন অসাধারণ সংগীত প্রতিভা। তিন ভাইয়ের মধ্যে রাইবাবু কনিষ্ঠ। অভিভাবকদের দৃষ্টি এড়িয়ে সংগীতচর্চা হয়ে উঠল যেন রাইচাঁদের দৈনন্দিন কর্তব্য। মাঝে মাঝে ধরা পড়ে কঠিন তিরস্কার সহ্য করাও যেন ক্রমে ক্রমে তার স্বভাবসিদ্ধ হয়ে উঠল।

কিন্তু যার যেদিকে প্রতিভা তাকে শেষ পর্যন্ত অনিবার্যভাবেই মেনে নিতে হয়। বালক রাইচাঁদ সম্পর্কেও তাঁর অভিভাবকদের এই গুণই প্রকাশ পেয়েছিল শেষ পর্যন্ত। ক্রমে ক্রমে প্রকাশ্যভাবে রাইচাঁদ সঙ্গীত চর্চা শুরু করলেন, সংগীতে তাঁর উপযুক্ত শিক্ষার ব্যবস্থা করলেন অভিভাবকেরা। এত অল্প বয়সে যেমনি তাঁর সুরজ্ঞান তেমনি

রাইচাঁদ বড়াল

তাল-লয়বোধ প্রখ্যাত ওস্তাদদের পর্যন্ত অবাক করে দিত। দেখতে দেখতে তিনি যেমন সংগীতে ওস্তাদ হয়ে উঠলেন তেমনি তবলা পিয়ানো প্রভৃতি যন্ত্রশিল্পেও লাভ করলেন অসাধারণ অধিকার। বহু বিখ্যাত ওস্তাদের কাছ থেকেই তিনি সংগীত শিক্ষা লাভ করেছেন। তাঁদের মধ্যে রামপুরের ভারত-বিখ্যাত ওস্তাদ মুস্তাক হোসেন এবং প্রফেসার হাফেজালি খাঁ সাহেবের নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। বিখ্যাত যন্ত্রশিল্পী ওস্তাদ মসীদ খাঁ সাহেবের নিকট রাইচাঁদ তবলা বাদ্য শিক্ষা করেন। মিস্ বব্ লুইচ্ নাম্নী

একজন জার্মান মহিলার কাছে তিনি শিক্ষা করেন পিয়ানো বাজনা।

তখন কলকাতায় সর্বপ্রথম বেতার কেন্দ্র স্থাপিত হয়। রেডিয়োর প্রচলন যেন এক নূতন চমক। সেদিন রেডিয়োর সাথে যাঁদের নিবিড় সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল, সেই সব উদ্যোক্তাদের মধ্যে রাইচাঁদ ছিলেন একজন। নূতনের আনন্দে তিনিও উঠেছিলেন মেতে। বিরাট ধনীপরিবারের সন্তান তিনি। অর্থ-চিন্তা নেই তাঁর মনে। কি করলে রেডিও-সংগীতের উন্নতি করা যায়, কি ক'রে রেডিয়োর গানগুলি জনপ্রিয় হয়ে উঠবে এই চিন্তাই সেদিন তাঁর মনে প্রবল হয়ে উঠেছিল। হয়তো উত্তরকালে রাইচাঁদকে জনসাধারণ রেডিয়োর একজন শ্রেষ্ঠ শিল্পী বলেই জানতেন কিন্তু বিধাতার মনে বুঝি ছিল না সে ইচ্ছা। তিনি তাঁকে বাঙলার চিত্রজগতে একজন শ্রেষ্ঠ সংগীত পরিচালক করে গড়ে তোলবার ব্যবস্থা করে রেখেছেন একথা সেদিন কেউ কি ভাবতে পেরেছিল!

বিখ্যাত এ্যাটর্নী স্বর্গীয় নিমাই বড়াল ছিলেন রাই-বাবুর পিতামহ। নিউ থিয়েটার্সের তদানীন্তন স্টুডিয়ো ম্যানেজার অমর মল্লিকের পিতৃদেবের সঙ্গে তাঁর ছিল ঘনিষ্ঠ বন্ধুত্ব। এদিকে রাইচাঁদ ও অমরবাবুর মধ্যেও গড়ে ওঠে নিবিড় পরিচয়। সে পরিচয় ক্রমে ক্রমে বন্ধুত্বে হয় পরিণত। অমর মল্লিক এসে একদিন রাইচাঁদের কাছে প্রস্তাব করেন নিউ থিয়েটার্সের সংগীত-পরিচালকের দায়িত্ব গ্রহণ করতে। কিন্তু রাইচাঁদ রাজী হলেন না। যেন গর্জে উঠলেন তিনি সে প্রস্তাব শুনে। অমরবাবুকে তিনি বলেন, তোমার নিউ থিয়েটার্স রেডিয়োর চেয়েও কী বড় ব্যাপার? এ হ'ল গভর্ণমেণ্টের আর নিউ থিয়েটার্স হ'ল বি, এন, সরকারের। এ কি কখনো তুলনা হতে পারে?

সেদিন অমরবাবু চলে গেলেন বটে কিন্তু নিরুৎসাহ হলেন না। শেষে একদিন রাইচাঁদ যখন নিউ থিয়েটার্স স্টুডিয়োতে সংগীত-পরিচালকের দায়িত্ব নিয়ে উপস্থিত হলেন সেদিন সবার চাইতে বেশী আনন্দিত হয়েছিলেন যিনি, তিনি অমর মল্লিক।

একাগ্রচিত্তে রাইচাঁদ কাজ করে যেতে লাগলেন। কারও সাধ্য নেই তাকে এতটুকু বিরক্ত করে কাজের মধ্যে। তিনি বুঝলেন এতো সামান্য ব্যাপার নয়। ছবির কাহিনীর সংগে সুরের মিলন সাধনে যে এত মাধুর্য আছে, আছে এমন আনন্দ এ কথা কি তিনি কখনও ভেবেছিলেন! রাইবাবু সত্যিসত্যিই সাধনায় মগ্ন হলেন—যে সাধনায় থাকে না কোন বাহ্যজ্ঞান।

নিউ থিয়েটার্সের 'ভাগ্যচক্র', 'দেবদাস', 'চণ্ডীদাস', 'দিদি', 'মীরাবাঈ', 'সাথী', 'সাপুড়ে' প্রভৃতি বহু চিত্রে গানের অপূর্ব সুর সংযোজনা করেছেন রাইচাঁদ। তিনি যে কত বড় সুরশিল্পী তা ভাবতেও বিস্ময় জাগে মনে।

শরৎচন্দ্রের 'দেবদাস' ছবিতে গানের সুর দিতে গিয়ে একটা মজার ব্যাপার হয়েছিল। একদিন কাজের মধ্যে ভয়ানক গণ্ডগোল। রাইবাবু বেঁকে বসলেন, তিনি কিছুতেই সুর দেবেন না। অমরবাবু হন্তদন্ত হয়ে এসে জিজ্ঞেস করেন, কেন, সুর দেবে না কেন?

রাইবাবুর চোখ-মুখ তখন লাল হয়ে উঠেছে। তিনি বল্লেন, বেশ্যা বাড়ীর গানের সুর দেব আমি? লোকে বলবে কি? বাড়ীর লোকেরাই বা কি ভাববেন?

অবশ্য পরে তাঁকে বিশেষভাবে বোঝানো হলে তিনি সুর দিতে রাজী হলেন। সে গান সায়গলের কণ্ঠে—

'গোলাপ হয়ে উঠুক ফুটে'।

এখানে একটা কথা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। সায়গলের মত একজন পাঞ্জাবী যুবক বাঙলা চিত্রজগতে যে যুগান্তর এনেছিলেন, তার মূলে রয়েছে রাইচাঁদের বিশেষ আন্তরিক চেষ্টা। সায়গল সর্বপ্রথমে 'দেবদাস' কথাচিত্রে উক্ত গানখানা গেয়েই পরিচিত হন। রাইবাবু শুধু যে ঐ গানখানায় সুর দিয়েছিলেন তা নয়, তাঁরই একান্ত চেষ্টায় ও জিদে সায়গল সুযোগও পেয়েছিলেন গান গাইবার। সায়গলের মধ্যে রাইচাঁদ দেখেছিলেন বিরাট সম্ভাবনার ইংগিত। তাই তাঁকে নিজের বাড়ীতে রেখে নানাভাবে সাহায্য ক'রে গুণগ্রাহী রাইবাবু সায়গলের প্রতিভার বিকাশে করেছিলেন সাহায্য।

স্টুডিয়োর কাজ সেরে বাড়ীতে ফিরতে অনেক সময় বেশ রাত হয়ে যেতো। এদিকে মায়ের মুখ কিন্তু গম্ভীর। প্রথমত রাইবাবু বুঝে উঠতে পারতেন না এর কারণ কি।

শান্তভাবে মিষ্ট কণ্ঠে একদিন মা বললেন, রাই, তোর এই স্টুডিয়োতে যাওয়াটা আমি মোটেই পছন্দ করি না

বাবা! রাইবাবু অবাক হলেন মার কথা শুনে। মা যে কষ্ট পাচ্ছেন একথা তিনি ভাবতেও পারেননি কখনো। কাতরকণ্ঠে তিনি জিজ্ঞেস করেন, তুমি একথা বলছ কেন মা? ধীরকণ্ঠে মা বললেন, ও সব জায়গা ভাল নয়। ওখানে গেলে লোকে মদ খেতে শেখে, ক্রমে ক্রমে উৎসন্নে যায়। রাইবাবু তখন বুঝতে পারলেন, মায়ের কোথায় দুঃখ। তিনি মায়ের পা-দুখানা ধরে শপথ করে বললেন, তোমার পা ছুঁয়ে বলছি, আমি জীবনে কখনো মদ স্পর্শও করবো না।

পর্দার বুকে গানের নামে প্রকাশ্যে গায়ক বা গায়িকা ঠোঁট নেড়ে যখন গানের ভান করে তখন আর একজনের কণ্ঠনিঃসৃত সংগীত প্রেক্ষাগৃহকে করে তোলে মুখর; এরই নাম 'প্লে ব্যাক'। চিত্রজগতে এই প্লে ব্যাকের প্রথম প্রবর্তন করেন রাইচাঁদ বড়াল—'ভাগ্যচক্র' ছবিতে ১৯৩৪ সালে। যে নায়ক বা নায়িকা গানের 'গ' ও জানেন না তাঁর কণ্ঠেও গান শোনার আনন্দ নিয়ে আমরা ঘরে ফিরি—প্লে ব্যাকের এমনিই মহিমা।

'চণ্ডীদাস' বাণীচিত্রেই রাইবাবু সর্বপ্রথম আবহ সংগীতের প্রবর্তন করেন। 'চণ্ডীদাসে'র জনপ্রিয়তা নিউ থিয়েটার্সে'র জীবনে একটি স্মরণীয় ঘটনা। তারপর 'ভাগ্যচক্র' 'দেবদাস' প্রভৃতি বহু বাণীচিত্রের অসাধারণ সাফল্য ও জনপ্রিয়তার মূলে রাইবাবুর কৃতিত্ব অনস্বীকার্য। বম্বে গিয়ে 'মহাপ্রভু চৈতন্', 'দরদে দিল' এ দুখানা হিন্দীচিত্রেরও তিনি সংগীত পরিচালনা করেছেন।

রাইচাঁদের ছাত্রদের মধ্যে ৺অনুপম ঘটক, রামচন্দ্র গাংগুলি, পংকজকুমার মল্লিক সংগীত পরিচালক হিসেবে যথেষ্ট সুনাম অর্জন করেছেন।

সুরই ব্রহ্ম একথা রাইবাবু বিশ্বাস করেন সমস্ত অন্তর দিয়ে। ভারতীয় সংগীতের যে রয়েছে একটা বৈশিষ্ট্য, একটা স্বাতন্ত্র্য—এ যে সপ্তসুরের বহিঃপ্রকাশ নয়, ধ্যানের বস্তু তা রাইচাঁদ উপলব্ধি করেছেন বিশেষভাবে। এর আদর্শকে এতটুকু ক্ষুণ্ণ হতে দেন নি তিনি।

বর্তমানে রাইবাবু নিউ থিয়েটার্সে'র আগামী চিত্র 'নতুন ফসলে'র সংগীত পরিচালনায় নিযুক্ত আছেন।

অত্যন্ত অমায়িক ও আত্মভোলা লোক রাইচাঁদ। তাঁর মধ্যে নেই এতটুকু গর্বের লেশ। তাঁর ব্যবহারে সত্যিই মুগ্ধ হতে হয়।

বর্তমানে রাইবাবুর বয়স ছাপান্ন বৎসর। আমরা আন্তরিকভাবে ভগবানের কাছে প্রার্থনা করি তাঁর সুদীর্ঘ ও শান্তিময় জীবন।

শুভদৃষ্টি

শ্রীহরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়

যুগল বাহুর বন্ধন যার কণ্ঠে দুলায় মুক্তামালা
স্নিগ্ধ পরশ হরিচন্দন বহিরন্তরে জুড়ায় জ্বালা
কটাক্ষ যার কুসুম শায়ক গোপন মনের শান্তি হরে
কৌমুদী স্নাত হাসিতে যাহার সুধার শীকার ঝরিয়া পড়ে
কলগুঞ্জন মঞ্জুভাষণ পুরানো গানের নূতন রীতি
পুষ্পিত করে প্রণয় কুঞ্জ সুরভি তৈল উছলে প্রীতি
প্রতি ধমনীতে তুলি হিল্লোল জীবন যাহার বক্ষোপরে
কুণ্ঠা বিহীন লুণ্ঠন মাগি চাহে লুটাইতে লজ্জাভরে
অধীর যাহার লুব্ধ অধর মূক করি রাখে মুখর মুখে
আপনা বিলাতে উথলে হৃদয় অনাস্বাদিত সোহাগ সুখে
যে ছিল অচেনা ক্ষণ পরিচয়ে বারেক চাহিতে
যাহার পানে
নব জীবনের নূতন চেতনা অসহ বেদনা বহিয়া আনে
সেই চির প্রিয় সুমুখে তোমার দেখ সখি দেখ
মেলিয়া আঁখি
এ শুভ মিলন সার্থক কর নয়নে তাহার নয়ন রাখি

গৃহিণী সচীব সখী ও শিষ্যা হৃদি অধিদেবী সেবিকা রূপে
হৃদয়েশ্বরে কর গো বরণ প্রথম প্রেমের আরতি ধূপে

সুধাংশুশেখর চট্টোপাধ্যায়

টেনিস খেলার দু'চার কথা

এস, জে, ম্যাথুজ্

[শীতের হাওয়া এখনও গায়ে না লাগলেও শীতের মরশুম সুরু হতে যে দেরী নেই তা বোঝা যায় শীতকালীন খেলাধুলার প্রস্তুতি পর্ব্ব থেকেই। শীতকালীন খেলাধুলার মধ্যে টেনিসের একটি বিশিষ্ট স্থান রয়েছে। টেনিস অবশ্য সব মরশুমেই খেলা চলে, তবে ঠাণ্ডা আবহাওয়াই এই পরিশ্রম-সাধ্য খেলাটির পক্ষে বিশেষ উপযোগী। তাই শীতের গোড়া থেকেই টেনিস খেলোয়াড়রা প্রস্তুত হচ্ছেন উৎসাহের সঙ্গে। এই সময় টেনিস খেলোয়াড়দের বিশেষ করে সাধারণ স্তরের খেলোয়াড়দের জন্য এই প্রবন্ধটি লিখেছেন মিঃ এস্, জে, ম্যাথুজ্। মিঃ ম্যাথুজ কলিকাতার টেনিস মহলে সুপরিচিত। তাঁর এই প্রবন্ধটি সাধারণ মানের খেলোয়াড়গণের খেলার উন্নতি বিধানে সহায়তা করবে বলে আশা করা যায়।—খেঃ ধুঃ সঃ]

অর্থের দ্বারা টেনিস খেলার দক্ষতা ক্রয় করা যায় না—তা সে টেনিস শিক্ষার জন্য যত অর্থই ব্যয় করা যাক না কেন। 'Seek and ye shall find' বাইবেলের এই উপদেশ এখানে পর্য্যাপ্ত নয়। যদি কেহ খেলার উন্নতি করতে চান তবে এর সঙ্গে যোগ করতে হবে 'Strive and ye shall get' অর্থের দ্বারা অনুশীলনের জন্য শুধু 'কোর্ট' ভাড়া করা যেতে পারে মাত্র।

এই প্রবন্ধে যে সকল অভিমত দেওয়া হল সেগুলি এই খেলা শিক্ষায় সহায়তা করবে। তবে এগুলিকে কাজে লাগাতে হবে। টেনিস খেলা সংক্রান্ত সমস্ত শিক্ষা পূর্ণতা পাবে ভাল ভাল খেলোয়াড়দের খেলা লক্ষ্য করলে। এই বিষয়ে অধ্যয়ন—যাহা পড়া গেল সেগুলির কার্য্যক্ষেত্রে প্রয়োগ এবং ভাল খেলোয়াড়দের খেলার 'এ্যাকশন' ছবি দেখা প্রভৃতি আবশ্যক। 'কেমন করে, কখন, কেন এবং কোথায়,'—এই ধরণের প্রশ্নগুলি সর্ব্বদা করে যেতে হবে। এইভাবে দ্রুত শিক্ষালাভ করা সম্ভব। কারণ বোঝবার জন্য এখানে চেষ্টা আছে। আর কোন জিনিষই না বুঝে মেনে নেওয়া উচিত নয়। ছোট ছেলেদের লক্ষ্য করলে দেখা যায় তারা তাদের পিতা-মাতা ও বয়োজ্যেষ্ঠদের নানা রকম প্রশ্ন করে উত্যক্ত করে। কিন্তু এরা শুধু শেখবার জন্য চেষ্টা করছে এবং এদের এই চেষ্টাকে যদি ধমক দিয়ে থামিয়ে দেওয়া যায় তাহলে এদের প্রতি ঘোরতর অবিচার করা হবে। ফলে এদের শিক্ষাও হবে বাধাপ্রাপ্ত।

এখন টেনিস খেলার পেশাদার বা তথাকথিত মার্কারদের কথা ধরা যাক,—যারা কলিকাতার সেরা টেনিস ক্লাবগুলিতে খেলে। এরা সকলেই বাল্যে 'বল বয়' ছিল এবং টেনিস খেলা সম্বন্ধে কোন শিক্ষাই পায় নি। কিন্তু এরা সকলেই ভাল টেনিস খেলে। এটা সম্ভব হয়েছে, কারণ এরা খেলা শিক্ষা করেছে কেবল পর্য্যবেক্ষণের দ্বারা।

আবার শিক্ষিত বলতে আমরা যা বুঝি সেই অর্থে এরা কেহই শিক্ষিত নয়—কারণ এরা কেহই কখনও স্কুলে

যায় নি। তবুও এদের বুদ্ধিমানের শ্রেণীতে ফেলতে হবে। আমেরিকার ডাঃ ফ্লেস বলেছেন, "Intelligence is the ability to learn."

লিউ হোড্ তাঁহার একটি সাম্প্রতিক প্রবন্ধে লিখে-ছেন,—"আমি আমার জীবনে কেমন করে বল্ মারতে হয় এই শিক্ষা কোনদিনই পাইনি। আমার মতে প্রত্যেক খেলোয়াড়ের তাহাদের খেলার নিজ নিজ ভঙ্গিমার (style) উন্নতি করতে সচেষ্ট হওয়া উচিৎ। যে সকল ক্রীড়াশিক্ষক বলেন যে, এই এইরূপ 'গ্রাপ্' ফোরহ্যাণ্ড মারের জন্য

ভারতের ভূতপুর্ব্ব এক নম্বর খেলোয়াড় দিলীপ বোস ব্যাকহ্যাণ্ড মারছেন।

ধরতেই হবে বা এই এই রকম 'ফুটওয়ার্ক' ব্যাকহ্যাণ্ড মারের জন্য করতেই হবে—আমি তাঁহাদের সহিত একমত নয়। যে, যেভাবেই র‍্যাকেট ধরুক না কেন, যদি সে, সেইভাবে র‍্যাকেট ধরে স্বাচ্ছন্দ্যের সঙ্গে খেলতে পারে আর যেদিকে চায় সেদিকে বল্ মারতে পারে, তবে সেইটাই তার সঠিক 'গ্রীপ্'।"

হোড্ আরও বলেন, হ্যারি হপ্ম্যান তাঁকে কেমন করে ষ্ট্রোক নিতে হয়, র‍্যাকেট ধরতে হয়, ফুটওয়ার্ক বা র‍্যাকেট সঞ্চালন, এই সকল সম্পর্কে কোনরূপ শিক্ষাই দেন নাই। হ্যারি, হোডের মারের লক্ষ্যবস্তুর উপরই সবিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেছিলেন এবং ইহার চরম সদ্ব্যবহারই ছিল তাঁহার প্রধান লক্ষ্য। হোডের সঙ্গে আমি কিছুটা একমত। কিন্তু হোড্ ব্যতিক্রমের পর্য্যায়ে পড়তে পারেন। বাস্তবিক, হোডের সম্বন্ধে আমরা যা পড়েছি এবং জেনেছি তাতে তাঁর মধ্যে সহজাত প্রতিভার পরিচয় পাওয়া যায়। কিন্তু সাধারণ মানের খেলোয়াড়দের এই খেলার 'টেক্‌নিক' সম্বন্ধে কিছুটা জ্ঞানের প্রয়োজন আছে। এই সম্বন্ধে কিছুটা ধারণা হলে তারপর যে যার নিজের ধারায় খেলার উন্নতিতে সচেষ্ট হবেন।

শুধুমাত্র বল্‌টিকে জালের অপর পারে ফেলতে পারলেই টেনিস খেলোয়াড় হওয়া যায় না। হপ্ম্যান বলেন, তাঁহার ছাত্রের মারের লক্ষ্যবস্তুর উপরই তিনি আসল গুরুত্ব দেন। সোজা লক্ষ্যবস্তু হচ্ছে, 'কোর্টে'র দুটি কোন্ (Corner) আর পার্শ্ববর্তী লাইনগুলি, এইগুলি লক্ষ্য করে খেলতে হবে (মারবার সময় অবস্থা যদি পার্শ্বলাইনগুলিতে কোণাকুণি খেলার উপযোগী হয়)। বিশেষ করে, উচ্চ পর্য্যায়ের মহিলাদের খেলার কথা যদি ধরা যায় তাহলে দেখা যায় যে, মেয়েদের ক্রীড়া জগতের তিনজন বিশ্ববিখ্যাত খেলোয়াড়—লেংলেন্, উইলস-মুডী ও কন্নোলী —এঁরা প্রত্যেকেই 'কোন্' (Corner) লক্ষ্য করে মারেন এবং শুধুমাত্র তাঁহাদের মারের নিভুর্লতার জন্যই সমস্ত বাধা অতিক্রম করেন। আমাদের সাধারণ মানের খেলার উন্নতিও এই ধাঁচে চারটি মারের উপর করতে হবে—দু'টি ফোরহ্যাণ্ড এবং দু'টি ব্যাকহ্যাণ্ড—উভয় মারই কোণাকুণিভাবে প্রতিপক্ষের কোণের লাইনের উপর মারতে হবে। প্রত্যেকটি বল্ মারবার পরই আপনা হতে কোর্টে'র মাঝখানে, 'বেস্‌লাইনে'র ঠিক পিছনে ফিরে আসতে হবে। তা না হলে 'পোজিসন' নষ্ট হয়ে যাবে। আর 'পোজিসন' নষ্ট হওয়া মানে পরিণামে পয়েণ্ট নষ্ট হওয়া।

ধরা যাক, খেলার প্রথম কয়েক গেমের পর আপনি বুঝতে পারলেন যে, প্রতিপক্ষের ব্যাক্‌হ্যাণ্ড মার,—যেটি আপনার ফোরহ্যাণ্ডে আসছে—কিছুটা দুর্ব্বল এবং সাধারণ মানের খেলোয়াড়দের পক্ষে এই ধরণের দুর্ব্বল-

তাই স্বাভাবিক। এই সময় আপনাকে প্রতিপক্ষের এই বিভাগের দুর্ব্বলতা প্রকাশ করে দিতে হবে। ফলে সে এত ভুল করতে আরম্ভ করবে যে নিজেই আপনাকে পয়েন্টের পর পয়েন্ট দিয়ে যাবে। মনে রাখবেন, সাধারণ মানের টেনিস খেলায় যত না পয়েন্ট পাওয়া যায় নির্ভুল মারের সাহায্যে তার অনেক বেশী পাওয়া যায় প্রতিপক্ষের মারের ভুলের জন্য। সেজন্য অযথা উত্তেজিত না হয়ে স্থির মস্তিষ্কে খেলতে হবে। বিশেষ প্রয়োজন ছাড়া জালের কাছে যাবেন

ভারতীয় ডেভিস কাপ দলের অধিনায়ক নরেশ কুমার,—ইনি পিতার অসুস্থতার জন্য অষ্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে ভারতের পক্ষে অংশ গ্রহণ করতে পারেন নাই।

না। এ বিষয়ে বড় বড় খেলোয়াড়দের অনুকরণ বাঞ্ছনীয় নয়। কারণ তাঁহারা 'কোর্টের' যে কোন জায়গা থেকে 'ভলি' মারতে পারেন এবং চুড়ান্তভাবে মারেন। উপরন্তু তাহাদের দৈহিক পটুতাও অনেক বেশী। আর এঁদের খেলার উৎকর্ষতার কথা বাদ দিলেও, এঁরা প্রত্যহ তিন থেকে চারঘণ্টা করে অনুশীলন করেন। সে জায়গায় আপনি হয়তো সপ্তাহে তিনদিন অনুশীলন করেন এবং তা'ও হয়তো এক বা দুই ঘণ্টার অধিক নয়।

প্রতিযোগিতামূলক খেলার মাধ্যমেই নিজের খেলার দুর্ব্বলতা জানতে পারা যায়। আমার নিজের ক্ষেত্রে, আমার ব্যাকহ্যাণ্ড দুর্ব্বলতার বিষয়ে আমি কিন্তু কিছুটা ভাগ্যবান। একটি স্থানীয় দৈনিক আমার সম্বন্ধে লেখেন যে, যদিও আমার ফোরহ্যাণ্ড মার খুবই প্রশংসনীয়, কিন্তু আমার ব্যাকহ্যাণ্ড মার এতই খারাপ যে এই বিভাগে
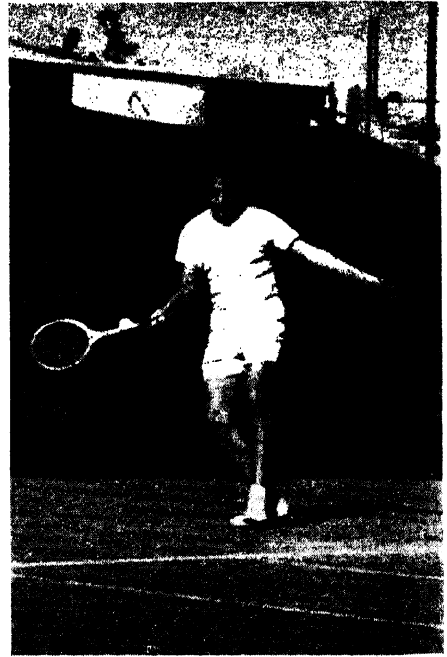
সুমন্ত মিশ্র ফোরহ্যাণ্ড মারছেন। এঁর সার্ভিস, 'ক্যানন্ বল সার্ভিস' নামে খ্যাত।

উন্নতির আর কোনই অবকাশ নেই। এই প্রবন্ধটি কলিকাতার একজন খ্যাতনামা খেলোয়াড় ছদ্মনামে লিখেছিলেন। অবশেষে আমি জানতে পারি যে কে এই প্রবন্ধটি লেখেন। আমি তাঁহার নিকট যাই ও এই বিষয়ে আলোকসম্পাতের জন্য ধন্যবাদ জানাই। ইহার একসপ্তাহ পর আমি ফ্রি স্কুল ষ্ট্রীটে একটি উঁচু দেওয়াল খুঁজে বার করি এবং দশ মিনিট বা তাহার অধিক সময় আমার ব্যাকহ্যাণ্ড অনুশীলনে ব্যয়িত করতে থাকি। যখন বুঝলাম কিছু

উন্নতি হয়েছে তখন এইরূপ অনুশীলন পরিত্যাগ করি। কয়েকমাস পরে কাশীপুর ক্লাব হার্ড কোর্ট টেনিস টুর্ণামেণ্ট আরম্ভ হয়। কার্য্যনির্ব্বাহক সমিতির সহিত ব্যবস্থাক্রমে আমি প্রথম রাউণ্ডে শ্রীছদ্মনামীর সহিত প্রতিদ্বন্দ্বিতায় অবতীর্ণ হই। একমাত্র লোক যার সঙ্গে খেলবার জন্য এবং যাকে পরাজিত করবার জন্য আমি মনে-প্রাণে চেয়েছিলাম তিনি হচ্ছেন এই শ্রীছদ্মনামী এবং আমি কৃতকার্য্যও হয়েছিলাম। আমি তাঁকে দুই সেটে পরাজিত করি। খেলা শেষে করমর্দ্দনকালে তাঁহাকে আমার এই নূতন আরব্ধ ব্যাকহ্যাণ্ড সম্বন্ধে তাঁহার মত জিজ্ঞাসা করি। আমার তৃপ্তির মূলে ছিল খেলার ফলাফল—তাঁহার উত্তর নয়। এখন হয়তো আপনারা বুঝতে পারবেন—মন স্থির করলে আর একটুখানি আন্তরিক প্রচেষ্টার দ্বারা কতখানি সফলতা লাভ করা যায়।

ফোরহ্যাণ্ড ও ব্যাকহ্যাণ্ড, এই দুই প্রকার 'ড্রাইভের জন্য সহজ 'ফরওয়ার্ড সুইং' অথবা 'ফলো থ্রু'—এই দু'টিরই উন্নতি সাধন করতে হবে। সাবলীল ভাবে 'ড্রাইভ' মারতে হলে, সময় থাকতে র‍্যাকেটটি পিছনে টেনে নিয়ে তারপর ঝাঁকানি যাতে না লাগে সেজন্য তাড়াতাড়ি সামনের দিকে সময়মত চালাতে হবে। খোলা মনে খেলতে হবে আর দৈহিক আড়ষ্টতা যেন না থাকে। সহজ লম্বা 'ফলো থ্রু' গ্রাউণ্ড ষ্ট্রোকে নির্ভুলতা, জোর আর গভীরতা আনে।

চূড়ান্ত বিশ্লেষণ হচ্ছে, টেনিস শুধু 'ষ্ট্রোকের' খেলা নয়। ইহা বুদ্ধির যুদ্ধ, এখানে আছে চাতুর্য্য ও কৌশলতার প্রাচুর্য্য এবং মনস্তত্বের প্রয়োগ। প্রত্যেক খেলোয়াড়ের খেলা তাহার দৈহিক ও মানসিক প্রতিক্রিয়ার দ্বারা প্রভাবিত এবং প্রত্যেক খেলোয়াড়ের কর্ত্তব্য হচ্ছে প্রতিপক্ষের দুর্ব্বলতার সন্ধান করা ও তাহা পরীক্ষা করা। ইহার জন্য দরকার অভিজ্ঞতা। আর এই অভিজ্ঞতা শুধু প্রতিযোগিতামূলক খেলার মাধ্যমেই অর্জন করা যায়। শুধু অনুশীলনের ভিতর দিয়ে একজন প্রকৃত সৈনিকের নৈপুণ্যের পরিচয় পাওয়া যায় না। তার নৈপুণ্যের পরিচয় পাওয়া যাবে আসল যুদ্ধক্ষেত্রে—বুলেট, বম্, সেলের মাঝখানে।

—

খেলা-ধূলার কথা

শ্রীক্ষেত্রনাথ রায়

ভারতবর্ষ বনাম ইংলণ্ড টেষ্ট ক্রিকেট ঃ

ভারতবর্ষ : ১৪০ (ট্রুম্যান ২৪রানে ৪ উইকেট) ও ১৭৪ (ট্রুম্যান ৩০ রানে ৩, ষ্টেথাম ৫০ রানে ৩)

ইংলণ্ড : ৩৬১ (আর সুব্বারাও ৯৪, জে কে স্মিথ ৯৮, ইলিংওয়ার্থ ৫০, সুইটম্যান ৬৫। সুরেন্দ্রনাথ ৭৫ রানে ৫ উইকেট)

ওভালে অনুষ্ঠিত ভারতবর্ষ বনাম ইংলণ্ডের ৫ম টেষ্ট অর্থাৎ শেষ টেষ্ট খেলায় ইংলণ্ড ১ ইনিংস এবং ২৭রানে ভারতবর্ষকে পরাজিত ক'রে আলোচ্য টেষ্ট সিরিজে ৫—০ খেলায় জয়ী হয়েছে। পাঁচদিনের টেষ্ট খেলা শেষ পর্য্যন্ত সোয়া তিন দিনেই শেষ হয়ে যায়। টেষ্ট খেলার ইতিহাসে ইংলণ্ডের কাছে ভারতবর্ষের এই শোচনীয় পরাজয় কলঙ্কমলিন অধ্যায় হিসাবে চিহ্নিত হয়ে রইলো। সাম্প্রতিক কালে কোন দেশই টেষ্ট সিরিজের ৫টি খেলাতেই ভারতবর্ষের মত পরাজয় বরণ করেনি। ১৯২০-২১ সালের টেষ্ট সিরিজের ৫টি খেলাতেই অষ্ট্রেলিয়া ইংলণ্ডকে পরাজিত করে। তার দীর্ঘকাল পর অষ্ট্রেলিয়াই ১৯৩১-৩২ সালের টেষ্ট সিরিজে দক্ষিণ আফ্রিকাদলকে ৫টি খেলায় হারায়।

সুতরাং ইংলণ্ডের কাছে ভারতবর্ষের ৫টি টেষ্ট খেলায় পরাজয়ের ঘটনা উল্লেখযোগ্য হয়ে রইলো। ইংলণ্ডের মাটিতে কোন দেশের পক্ষে পাঁচটি টেষ্ট খেলায় জয়লাভের দৃষ্টান্ত এই প্রথম হ'ল। ক্রিকেট খেলায় ভারতীয় খেলার মান ইংলণ্ডের তুলনায় কত নীচু তা প্রমাণিত হয়েছে। দল গঠনেও আমরা নিরপেক্ষ নীতি গ্রহণ করতে পারিনি। খেলার মধ্যেও রাজনীতি এবং প্রাদেশিকতাকে প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে। আমাদের কোন গঠনমূলক পরিকল্পনা নেই—অন্ততঃ কাজের মধ্যে দিয়ে তার পরিচয় কোন পাওয়া যায়নি। খেলায় হার-জিত আছে। ইংলণ্ড টেষ্ট ক্রিকেটে অষ্ট্রেলিয়ার কাছে হালফিল হার স্বীকার করেছে। কিন্তু ইংলণ্ড এবং ভারতবর্ষের ক্রিকেট দলের সঙ্গে তুলনা করলে স্পষ্টই দেখতে পাবেন ইংলণ্ডের

দৃষ্টিভঙ্গী কত গঠনমূলক এবং সুদূর প্রসারী ; তাদের খেলায় প্রতি পদে পদে নিষ্ঠা এবং জাতীয়তাবোধের চেতনা কত পরিস্ফুট হয়ে ওঠে। আর আমাদের ভারতীয় দল—যেন ধরে বেঁধে হরিনাম করানো হচ্ছে। খেলার প্রাথমিক চরিত্রই গঠন হয়নি। দলের চেহারাটা জবড়জং—ক্রিকেট দলের চেহারা যা হওয়া উচিত তা নয়।

২০শে আগষ্ট ওভাল মাঠে ৫ম টেষ্ট খেলা সুরু হয়। ভারতবর্ষ প্রথম ব্যাট করার সুযোগ পায়। ১মদিনেই ভারতবর্ষের ১ম ইনিংস শেষ হয় মাত্র ১৪০ রানে। ইংলণ্ড কোন উইকেট না হারিয়ে ৩৫ রান করে। ২য় দিনে ইংলণ্ডের ৬ উইকেট পড়ে রান দাঁড়ায় ২৮৯।

৩য়দিনে ইংলণ্ডের ১ম ইনিংস ৩৬১ রানে শেষ হ'লে ইংলণ্ড ২২১ রানে এগিয়ে যায়। ৩য়দিনের বাকি সময়ে ভারতবর্ষ ২য় ইনিংসের খেলায় ১৪৬ রান করে ৫টা উইকেট হারিয়ে। তখনও ইনিংস পরাজয় থেকে ভারতবর্ষের ৭৫ রান প্রয়োজন—হাতে ৫টা উইকেট জমা। কিন্তু এই ৭৫ রান বাকি ৫ উইকেটে ভারতবর্ষ তুলতে পারলো না। ৪র্থ দিনের ২ ঘণ্টার কিছু কম সময়ের খেলায় ভারতবর্ষের ২য় ইনিংস ১৯৪ রানে শেষ হ'ল। ফলে ইংলণ্ড এক ইনিংস এবং ২৭ রানে জয়ী হ'ল।

ক'লকাতার ১৯৫৯ সালের ফুটবল খেলোয়াড় ঃ

ক'লকাতার ভেটারান্স ফুটবল ক্লাবের বিচারকগণ এই বৎসরে ইষ্টবেঙ্গল ক্লাবের হাফ-ব্যাক রাম বাহাদুরকে ক'লকাতার মাঠে ১৯৫৯ সালের শ্রেষ্ঠ ফুটবল খেলোয়াড়ের সম্মান দান করেছেন।

ইংলিস-চ্যানেল সন্তরণ ঃ

বিলি বাটলিন-এর উদ্যোগে অনুষ্ঠিত ইংলিস-চ্যানেল অতিক্রম সন্তরণ প্রতিযোগিতায় এ বছর ২৩জন সাঁতারু যোগদান করেন। খারাপ আবহাওয়ার দরুণ যে ১৫জন শেষ পর্য্যন্ত জলে নামেননি ভারতবর্ষের সাঁতারু ডাঃ বিমলচন্দ্র তাঁদের মধ্যে একজন। ৩৮জনের যোগদানের কথা ছিল। প্রতিযোগিতায় যোগদানকারী ২৩জন সাঁতারুর মধ্যে যাঁরা অবসর নিয়েছিলেন তাঁদের মধ্যে ভারতবর্ষের আরতি সাহা ছিলেন। আরতি সাহার দুর্ভাগ্য যে, ডোভারের উপকূলে পৌছাতে যখন মাত্র ৩ মাইল বাকি তখন প্রবল স্রোত এবং তীব্র বাতাসের মুখে পড়ে প্রতিযোগিতা থেকে অবসর নিতে বাধ্য হন। তিনি ১৪ ঘণ্টা ১০ মিনিট সাঁতার দিয়েছিলেন।

প্রতিযোগিতায় ১ম স্থান পান আর্জেন্টিনার আলফ্রেডো ক্যামারিরো। সাঁতারে ইংলিস-চ্যানেল অতিক্রম করতে তাঁর সময় নেয়—১১ ঘণ্টা ৪৮ মিঃ ২৬ সেঃ।

গতবছরের ২য় স্থান অধিকারী পাকিস্তানের ব্রজেন দাস এবার ৫ম স্থান পান।

১০ই সেপ্টেম্বর ভারতীয় সাঁতারু ডাঃ বিমলচন্দ্র ইংলিস চ্যানেল অতিক্রম করতে সক্ষম হন। তাঁর সময় লেগেছিল ১৩ ঘণ্টা ৫০ মিনিট। এ প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য, এ পর্য্যন্ত দু'জন ভারতীয় সাঁতারু ইংলিস-চ্যানেল অতিক্রম করতে সক্ষম হয়েছেন। ভারতীয় সাঁতারু হিসাবে প্রথম ইংলিস চ্যানেল অতিক্রম করেন মিহির সেন।

ভারতবর্ষ বনাম কাবুল ঃ

আগামী অলিম্পিক ফুটবল প্রতিযোগিতার প্রাথমিক পর্য্যায়ের খেলায় ভারতবর্ষ ৫—২ গোলে কাবুলকে পরাজিত করে।

আন্তঃ রেলওয়ে ফুটবল :

খড়্গাপুরে অনুষ্ঠিত আন্তঃ রেলওয়ে ফুটবল প্রতিযোগিতার ফাইনালে গত বছরের বিজয়ী ইষ্টার্ণ রেলওয়ে 'বি' দল ১—০ গোলে নদার্ণ রেলদলকে পরাজিত করে। এই নিয়ে ইষ্টার্ণ রেলদল পাঁচবার চ্যাম্পিয়ান হ'ল ; তারা ইতিপূর্ব্বে জয়ী হয়েছে ১৯৫২, ১৯৫৩, ১৯৫৪ এবং ১৯৫৮ সালে।

ডেভিস কাপ :

১৯৫৯ সালের আন্তর্জাতিক ডেভিস কাপ লন্ টেনিস প্রতিযোগিতার চ্যালেঞ্জ রাউণ্ডে অষ্ট্রেলিয়া ৩—২ খেলায় গত বছরের চ্যাম্পিয়ান আমেরিকাকে পরাজিত ক'রে পুনরায় ডেভিস কাপ জয়ী হয়েছে। প্রথমদিন উভয়দেশই একটি ক'রে সিঙ্গলস খেলায় জয়ী হয়। ফল সমান

১—১ দাঁড়ায়। ২য় দিনে অষ্ট্রেলিয়া ডাবলসে জয়ী হয়ে ২—১ খেলায় অগ্রগামী হয়। ৩য় দিন আমেরিকা একটা সিঙ্গলস খেলায় জয়ী হ'লে ফলাফল সমান ২—২ দাঁড়ায়।

৪র্থ দিনের শেষ সিঙ্গলস খেলায় অষ্ট্রেলিয়া জয়ী হ'লে অষ্ট্রেলিয়ার পক্ষে জয় হয় ৩ এবং আমেরিকার পক্ষে ২।

ডেভিস কাপ প্রতিযোগিতা আরম্ভ হয় ১৯০০ সালে। যুদ্ধের দরুণ মোট ১০ বছর (১৯১৫—১৮ এবং ১৯৪০—৪৫) খেলা হয়নি।

এ পর্য্যন্ত মাত্র চারটি দেশ ডেভিস কাপ জয়ী হয়েছে—আমেরিকা ১৯বার, অষ্ট্রেলিয়া ১৬ বার, বৃটেন ৯ বার এবং ফ্রান্স ৬বার।

১৯৩৮ সাল থেকে ডেভিস কাপের চ্যালেঞ্জ রাউণ্ডে অষ্ট্রেলিয়া এবং আমেরিকা এই দুটি দেশই প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছে। ১৯৩৮ সাল থেকে এ পর্য্যন্ত ১৬ বার ডেভিস কাপের খেলা হয়েছে—অষ্ট্রেলিয়া জয়ী হয়েছে ৯বার এবং আমেরিকা ৭বার।

ইণ্ডিয়ান লাইফ্ সেভিং সোসাইটি ঃ

লেডী রাণু মুখার্জির সভানেত্রীত্বে ইণ্ডিয়ান লাইফ্ সেভিং সোসাইটির ৩৭তম প্রতিষ্ঠা দিবস অনুষ্ঠান ঢাকুরিয়া লেক অঞ্চলে সোসাইটির নিজস্ব ভবনে মহাসমারোহের সঙ্গে উদ্‌যাপিত হয়। কলিকাতা পৌরপ্রতিষ্ঠানের মেয়র শ্রীযুক্ত বিজয়কুমার বন্দ্যোপাধ্যায় প্রধান অতিথি হিসাবে অনুষ্ঠানে যোগদান করেন। এই উপলক্ষে সোসাইটির বৃহৎ প্রাঙ্গণটি বিচিত্রবর্ণের আলোকমালায় এবং রঙীণ মনোরম সাজসজ্জায় সুসজ্জিত করা হয়। সোসাইটির সভ্য এবং সভ্যাগণ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর রচিত 'চিত্রাঙ্গদা' থেকে গৃহীত 'পার্থ বিজয়' নামে একটি জলক্রীড়ানুষ্ঠানে যোগদান করেন। অনুষ্ঠানটি দর্শক সাধারণের খুবই মনোজ্ঞ হয়েছিল। লেডী মুখার্জি পুরস্কার বিতরণ করেন।

নতুন রেকর্ড

হিজ্‌ মাস্টার্স ভয়েস্‌ ও কলম্বিয়া রেকর্ডের সংক্ষিপ্ত পরিচয়

"হিজ্‌ মাষ্টার্স ভয়েস"

N828[illegible] —[illegible] মান্নাদের কণ্ঠে দু'খানা মনোরম আধুনিক গান 'মেঘলা মেয়ে মেঘেরি সাজে' ও 'একই অংগে এত রূপ।'
N82830—শ্রীমতী উৎপলা সেনের মিষ্টি কণ্ঠের দুখানা মিষ্টি গান—'তোমার কথাই ভাবছিলাম' ও 'ছলছল চঞ্চল নদী বইছে'—
N82831—সতীনাথ মুখোপাধ্যায়ের দরদী কণ্ঠের আধুনিক গান—'দুটি ঐ কাঁকনের ছন্দ' ও 'তুমি মেঘলা দিনের।'
N82832—তরুণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের বলিষ্ঠ ও মিষ্ট কণ্ঠের দুখানি আধুনিক গান—'জনপদের ছাড়িয়ে সীমা' ও 'স্বপ্ন ভাঙতে কেন এলে।'
N82833—সনৎ সিংহের দরদী কণ্ঠে দুখানা হাসির গান—'এই দুনিয়ায় সকল ভালো' ও 'বাবুরাম সাপুড়ে।'
N82834—প্রখ্যাত শিল্পী শ্যামল মিত্রের গাওয়া দুখানা আধুনিক গান—'হয়তো সেদিন আমার মত' ও 'ভালবাসো তুমি।'
N82835—[illegible] সুপ্রীতি ঘোষের মধুক্ষরা কণ্ঠে দুখানা কীর্তন—'কহিও নিঠুর আগে' ও 'কেন গেলাম যমুনার জলে।'
N82836—জনপ্রিয় শিল্পী মানবেন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের মধুর কণ্ঠে দুখানা আধুনিক গান—ঐ দূর নীলাকাশ' ও 'চম্পকবনে অলি তোলে সুর।'

কলম্বিয়া

GE24957—শিল্পী শৈলেন মুখোপাধ্যায়ের কণ্ঠে দুখানা আধুনিক গান—'ওগো লজ্জাবতী' ও 'সাগরের দুটী ঢেউ।'
GE24958—মধু-কণ্ঠী কুমারী গায়িত্রী বসুর কণ্ঠে দুখানা মধুর গান—'নীল প্রজাপতি নীল অপরাজিতা' ও 'এই রাত এত গান।'
GE24959—শ্রীমতী বেলা মুখোপাধ্যায়ের কণ্ঠে দুটী অতি মধুর আধুনিক গান—'ফুলের কানে কানে' ও 'কেন চলে যাবে।'
GE24960—পান্নালাল ভট্টাচার্যের আকুতি ভরা কণ্ঠের দুখানা শ্যামা সংগীত 'কালো বলা হয় কি বলো' ও 'মা বলে মা ডাকতে তোর।'
GE24961—শিল্পী বনানী ঘোষের সুরেলা কণ্ঠে দুখানা গান—'আম আটির ভেঁপু বাজে' ও 'মা জানি ঐ কাজল কালো।'
GE24962—শ্রীমতী প্রতিমা বন্দ্যোপাধ্যায়ের মিষ্টি কণ্ঠের দুখানা মিষ্টি গান—'মেঘ রাঙানো অস্ত আকাশ' ও 'ছলকে পড়ে কল্‌কে ফুলে।'
GE24963—শিল্পী অমল মুখোপাধ্যায়ের কণ্ঠে দুখানা আধুনিক গান—'চাঁদের থেকে অনেক দূরে' ও 'দেখো শুকতারা।'

সম্পাদক—শ্রীফণীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় ও শ্রীশৈলেনকুমার চট্টোপাধ্যায়

২০৩।১।১, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা, ভারতবর্ষ প্রিন্টিং ওয়ার্কস্ হইতে শ্রীকুমারেশ ভট্টাচার্য কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

ভারতবর্ষের সূচী

সপ্তচত্বারিংশ বর্ষ—প্রথম খণ্ড—পঞ্চম সংখ্যা

কার্ত্তিক—১৩৬৬

লেখ-সূচী

চিত্র-সূচী

লেখ-সূচী

চিত্র-সূচী

লেখ-সূচী

লেখ-সূচী

লেখ-সূচী

পূর্ণ প্রেক্ষাগৃহে প্রদর্শিত হচ্ছে
হিন্দ · বসুশ্রী · বীণা
প্রত্যহ তিনটি প্রদর্শনী
তৎসহ
বঙ্গবাসী * মৃণালিনী * জয়শ্রী
পি, সন্ * স্বপ্না * রজনী
সন্তোষ * মানসী * আরতি
চম্পা * মোহন * শ্রীলক্ষ্মা
বম্বে সিনেমা * সূর্য্যঘর
জেমিনীর
মহান
সামাজিক চিত্র
পয়গম
নির্মাতা — পরিচালনা — এস. এস. ভাসন
সঙ্গীত — সী. রামচন্দ্র · গীত — প্রদীপ · সংলাপ — রামানন্দ সাগর
অভিনেতা — দিলীপ কুমার · বৈজয়ন্তীমালা · রাজকুমার
বী সরোজা দেবী · পন্ডরী বাই · মতীলাল · মীনু মমতাজ · জনী ওয়াকার

শিল্পী : শ্রীবিশ্বপতি চৌধুরী

গঙ্গাবতরণ

ভারতবর্ষ প্রিন্টিং ওয়ার্কস্

কার্ত্তিক—১৩৬৬

প্রথম খণ্ড | সপ্তচত্বারিংশ বর্ষ | পঞ্চম সংখ্যা

মহামায়া

ডক্টর রমা চৌধুরী

আজ অতি শুভ-লগ্ন, যেহেতু আজ পবিত্র দেহমন প্রাণে, মুগ্ধ বিস্ময়ে চতুর্দিকে ঝঙ্কার ছড়িয়ে আমরা বারংবার উচ্চারণ করছি—সেই মহা মাতৃমন্ত্র :—

"মহাবিদ্যা মহামেধা মহামায়া মহাস্মৃতিঃ।
মহামোহা চ ভবতী মহাদেবী মহাসুরী।"

(শ্রীশ্রীচণ্ডী)

এই যে জগন্মাতা, যাঁরই আলোকে আজ উদ্ভাসিত হয়ে উঠেছে শরতের নির্মল আকাশ, যাঁরই আনন্দে উচ্ছল হয়ে উঠেছে কলহাসিনী তটিনী, যাঁরই সুগন্ধে সুরভিত হয়ে উঠেছে সুশোভিত বন উপবন, তাঁর অমৃত-স্বরূপ কি? শাস্ত্রকারগণ বলেছেন যে, তাঁর ভাগবতী সত্তার মূল কথা হল এই যে, তিনি "মহামায়া"—পরম মায়াবিনী দেবী। এই একটী মাত্র ক্ষুদ্র শব্দ "মহামায়া"র মধ্যেই কিন্তু নিহিত রয়েছে যুগযুগান্তব্যাপী ভারতীয়-দর্শনের সারতত্ব, প্রাণ-স্পন্দন, সুরভিনির্যাস।

প্রথমতঃ, "মায়া" বলতে আমরা সাধারণতঃ কি বুঝি? আমরা সকলেই জানি যে, অদ্বৈত-বৈদান্ত-দর্শনে "মায়া" একটী মূলীভূত তত্ব এবং সেই দিক্ থেকে, "মায়ার" নানাবিধসংজ্ঞা ও ব্যাখ্যা দেওয়া হয়েছে। কিন্তু এই সকল দার্শনিক মতবাদ বাদ দিয়ে সাধারণ দিক্ থেকেও আমরা "মায়া" বলতে যা বুঝি তা' হল এই যে, মায়া এরূপ একটী গুণ বা শক্তি যা' সকলকে মোহগ্রস্ত করে। তাদের মনে একটী মিথ্যা বস্তু বিষয়ে সত্য প্রতীতি জন্মায়। যেমন,

মায়াবী তাঁর মায়া-শক্তির প্রভাবে, বাঁশ-দড়ি প্রভৃতির সাহায্যে একটী আকাশ-বিহারী পুরুষের সৃষ্টি করেন। আপাতদৃষ্টিতে মনে হয় যেন, পুরুষটী একটী সত্য ব্যক্তি, এবং সত্য সত্যই যেন আকাশে বিচরণ করছেন। কিন্তু মায়াবী জানেন, যাঁরা মোহগ্রস্ত হননি তাঁরাও জানেন যে, এ স্থলে কোনো পুরুষই প্রকৃতপক্ষে নেই এবং কেহই প্রকৃত পক্ষে শূন্যে বিচরণ করে বেড়াচ্ছেন না।

"মায়ার" এই অর্থ গ্রহণ করলে স্পষ্ট হবে যে, সত্য-স্বরূপা জগজ্জননীই স্বয়ং এই ভাবে মিথ্যা মায়ার সাহায্যে বিশ্বজনকে বিমূঢ় করছেন কেন? কিন্তু এরই মধ্যে ত নিহিত হয়ে রয়েছে নিগূঢ় সৃষ্টিতত্ত্বের মূল কথাটী। এক-দিক্ থেকে দেখতে গেলে, সত্যই সৃষ্টির কোনোরূপ প্রয়োজনই নেই, কারণ জগজ্জনক বা জগজ্জননী স্বয়ংসম্পূর্ণ, অন্য কোনো ব্যক্তি বা বস্তুকে তাঁর প্রয়োজনই নেই, তাঁর নিজের আনন্দ বা পরিপূর্ণতার জন্য। এরূপে তিনি নিত্য-তৃপ্ত, নিত্যবদ্ধ, নিত্যশুদ্ধ, কিন্তু তা' সত্ত্বেও, এই স্বয়ং-সম্পূর্ণতা, এই পরিপূর্ণতার মধ্যেই অতি সুন্দরভাবে ওত-প্রোত ভাবে সংমিশ্রিত হয়ে আছে তাঁর স্বরূপের আরেকটী দিক, অর্থাৎ লীলাময়তা, আনন্দরসঘনতা। তিনি লীলা-ময়ী, যেহেতু তিনি আনন্দরসঘনা। আনন্দের স্বভাবই এই যে, আনন্দ লীলা বা খেলায় উচ্ছলিত হয়ে উঠে, আনন্দের সুন্দরতম প্রকাশ লীলায় এবং লীলার জন্য প্রয়োজন দু'জন—একলা খেলা হয়না, খেলা করা যায় দুজনেই কেবল। লীলা বা খেলার মাধ্যমে লীলাকারী নিজের আনন্দকে, আলোককে, সৌন্দর্যকে, মাধুর্যকে, ঐশ্বর্যকে প্রতিফলিত দেখতে পান লীলা-সঙ্গীর মধ্যে এবং এই পঞ্চগুণই পঞ্চাশ গুণ হয়ে পুনরায় ফিরে আসে তাঁরই স্বরূপে। এই ভাবে, আদান-প্রদানের মাধ্যমেই যেন তাঁর পরিপূর্ণ আনন্দ পরিপূর্ণতর হয়, নিগূঢ়তর হয়, সুন্দর-তর হয়। সে জন্যই, সৃষ্টিপ্রসঙ্গে সুপ্রাচীন ও সুপ্রসিদ্ধ বৃহদারণ্যকোপনিষদ্ বলছেন :—

স বৈ নৈব রেমে। স দ্বিতীয়মৈচ্ছৎ। তস্মাদেকাকী ন রমতে।

"কিন্তু তিনি আনন্দলাভ করলেন না। তিনি দ্বিতীয় এক জনের জন্য ব্যাকুল হলেন। সে জন্যই কেহ একাকী আনন্দলাভ করতে পারেন না। তিনি সে জন্য নিজেকে দুই ভাগে বিভক্ত করলেন। এই ভাবে, পতি ও পত্নীর উদ্ভব হল।"

এইভাবে, পরম লীলাময়ী জগজ্জননী নিজেকে দুই ভাগে বিভক্ত করে, জীব-জগতের সঙ্গে লীলা করছেন অহরহ। সেজন্যই ব্রহ্মসূত্রে বলা হয়েছে—

"লোকবত্তু লীলা কৈবল্যম্।"

সৃষ্টি পরব্রহ্মের লীলা মাত্র।

এরূপ লীলার স্বরূপ কি? লীলার দুটি দিক—বিরহ ও মিলন, অন্তর্ধান ও আবির্ভাব। নতুবা আর লীলা কি? প্রথম থেকেই, দুজনে দুজনের সঙ্গে এক হয়ে থাকলে, সুমধুর লীলা আর কি করে হবে? লীলার মাধুর্য ত এইখানেই—প্রথমে নিজেকে কৌতুকচ্ছলে গোপন করে, পরে রসভরে প্রকাশিত করে—একদিক্ থেকে। লীলার মাধুর্য ত এইখানেই—প্রথমে প্রিয়জনকে খুঁজে খুঁজে বেড়িয়ে, পরে তাঁকে লাভ করে ধন্য হওয়া—অন্যদিক থেকে। এই ত হল রসমধুর, আবেগোচ্ছল, পরম রমণীয় লীলার প্রকৃত রূপ।

এরূপে "লীলার" নিত্যসহচরী হল "মায়া"। এই মায়ার সাহায্যেই যেন লীলাকারী তাঁর লীলা-সঙ্গীর নিকট থেকে নিজেকে লুকিয়ে ফেলেন, নিজেকে অন্যরূপে প্রকাশ করেন। এটি "মায়াই" মাত্র—সত্য ঘটনা কিছু নয়। কারণ সত্যই ত তিনি তাঁর লীলা-সঙ্গীকে পরিত্যাগ করে' চলে যাচ্ছেন না, অন্য কিছু হয়ে পড়ছেন না। তাঁর লীলা-সঙ্গীও প্রথমে যেন এই মায়া জালে পড়ে' তাঁকে হারিয়ে বিরহ-ব্যথায় অস্থির হয়ে উঠছেন; পরে মায়া ভেদ করে' তাঁকে যেন পুনরায় লাভ করে' তৃপ্ত হচ্ছেন।

এই ত চিরন্তন লীলা—লুকিয়ে' প্রকাশ, হারিয়ে' লাভ। বিশ্ব প্রকৃতিই ত এই মহালীলায় লীলায়িত নিত্যই। ক্ষণে ক্ষণে রবি লুকিয়ে পড়ছে মেঘের আড়ালে; আবার পরক্ষণে রাঙিয়ে তুলছে ধরণীর বুক হিরণ-কিরণে। ক্ষণে ক্ষণে সরে যাচ্ছে সাগরোর্মি বেলাভূমি ত্যাগ করে; আবার পরক্ষণে ঝাঁপিয়ে পড়ছে তারি বুকে উচ্ছল পুলকে। ক্ষণে ক্ষণে, দূরে উড়ে যাচ্ছে মধুলোভী ভ্রমর; আবার পরক্ষণেই সোল্লাসে স্পর্শ করছে বিকশিত কমলকে মধু

গুঞ্জন সহকারে। এইভাবে চোখ মেলে দেখলেই দেখতে পাওয়া যাবে সর্বত্র সেই একই লীলার ললিত-লোভন বিকাশ।

একইভাবে, মহামায়ারও লীলাভূমি এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ড, এই মানব-হৃদয়। আপন আনন্দে আপনি মত্তা, তিনি লীলাভরে নিজেকে লুকিয়ে ফেলেন বিশ্বের অনু-পরমাণুতে—হৃদয়-গত দলের রেণুতে রেণুতে। এই ত তাঁর মহতী মায়া এবং সেজন্যই তিনি "মহামায়া"। তাঁর এরূপ মায়ার মোহিনী শক্তিতে, জগৎ যা নয় তা'ই বলে বোধ হয়—জড়, অশুদ্ধ বলে বোধ হয়; জীবও যা' নয় তা'ই বলে' বোধ হয়—ক্ষুদ্র, পাপ-ক্লেশ-ক্লিষ্ট বলে' বোধ হয়। এরূপ বোধই ত "মায়া"—মিথ্যায় সত্য ও সত্যে মিথ্যা দর্শন। কিন্তু এই ত মহামায়ার মহালীলা—তিনি যদি দূরেই সরে না থাকবেন, তবে তাঁকে পাবার সাধনারই বা অবসর থাকবে কোথায়? এই মায়াবরণ ভেদ করে, তথাকথিত জড়-অশুদ্ধ জগতে তাঁকে খুঁজে বের করতে হবে; তথাকথিত ক্ষুদ্র, পাপ-ক্লেশক্লিষ্ট জীবে তাঁকে খুঁজে বের করতে হবে। দেখতে হবে, জগৎ জগৎ নয়—ব্রহ্ম; জীব জীব নয়—ব্রহ্ম; "সর্বং খল্বিদং ব্রহ্ম" (ছান্দোগ্যোপনিষদ) "ব্রহ্মেদং সর্বম্" (বৃহদারণ্যকোপনিষদ)। এই খোঁজাই সাধনা, এই দেখাই সিদ্ধি। মহামায়ার মায়ার জন্যই ত এইভাবে সাধনা ও সিদ্ধি—এক কথায়, আধ্যাত্মিক জীবন সম্ভবপর হচ্ছে। যা চিরকাল আছে, তার জন্য সাধনা নিষ্প্রয়োজন; যা চিরকাল নেই, তারজন্যও সাধনা নিস্ফল; কিন্তু যা চিরকাল আছে অথচ সাময়িকভাবে নেই, তারজন্যই ত প্রয়োজন নিরন্তর সাধনা। মহামায়া মায়া বলে, এই সাধনাই আমরা করবার সুযোগ লাভ করে' ধন্য হচ্ছি।

এরূপে, পরমা জননীর আনন্দের অনিবার্য প্রকাশ লীলায়; লীলার অনিবার্য প্রকাশ মায়ায়। সেজন্য, আনন্দ, লীলা ও মায়া তাঁর অনুপম স্বরূপের তিনটি রূপ। যখন জীব জগৎ তাঁর সঙ্গে অভিন্ন, যখন কেবল তিনিই আছেন, তখন সেটি তাঁর "আনন্দ" রূপ। যখন জীবজগৎকে তিনি স্বীয় সত্তা থেকে বিচ্ছিন্ন করেন খেলার জন্য, যখন তিনিও জীবজগৎ দুই আছেন, তখন সেটী তাঁর "লীলা" রূপ। যখন জীবজগতের মধ্যে তিনি নিজেকে গোপন করে' ফেলেন যখন কেবল জীবজগৎই আছে, তখন সেটী তাঁর "মায়া" রূপ। এইভাবে আনন্দময়ী, লীলাময়ী, মায়াময়ী জননী নিত্যই, নিজের সঙ্গে নিজেই মধুরতম লীলা করছেন। কে বলে "সর্বং দুঃখং দুঃখম্", "সর্বং ক্ষণিকং ক্ষণিকম্"? জননীর আনন্দের প্রকাশ এই সংসার, তাঁর লীলার ক্ষেত্র এই সংসার, তাঁর মায়ার লুকোচুরি এই সংসার। এই পরম-রসময়ী, পরমকৌতুকময়ী, পরমমায়াময়ীর সমস্ত মধু ও সুধা, সমস্ত সঙ্গীত ও সুরভি, সমস্ত শান্তি ও কান্তি নিত্যই ঝরে ঝরে পড়ছে অঝোর ঝোরে এই সংসারেরই মর্মস্থলে। সেই সংসার কি সংসার? না' তা নয়—তা' পরমানন্দময়ীরই, অমৃত, মধুর হাস্য।

প্রস্তুতি

শ্রীসুরেশ বিশ্বাস এম-এ, বার-এট-ল

চলো যাই দণ্ডকারণ্যে যাই—তৈরী হয়ে নেও—
জনারণ্যে আর কত কাল বাস্তুহারা গৃহ পাবো
সবল বাহুর বলে কঠিন মাটিরে তুলো তুলো
ধুনে নেব লাঙলে শাবলে। যাব—তাই যাব
যা আছে তা নিয়ে চলো, যা নাই তা ফিরে
করে নেব তোমাতে আমাতে। যদি দুটো খেতে পাই
দুই মুঠো দিতে পারি ছেলে মেয়েদের ঢের ঢের।

উর্দ্ধে আছে নীলাকাশ শক্ত মাটি পায়ের নীচেতে।
ওগো লক্ষ্মী—বিলেও রয়েছি ধান, জঙ্গলও
করেছি আবাদ, মিথ্যাশঙ্কা মনে এনো নাকো।
তোমার লাউয়ের মাচা বাতাসকে শিহরিয়া দেবে।
শাকান্নে পরম তৃপ্তি বাস্তুভিটা যদি খুঁজে পাই,
যাবো যাবো দণ্ডকারণ্যেই যাবো—চলো
সোনাডাঙ্গা বহু দূরে—এবার নূতন ডাঙ্গা পাবো।
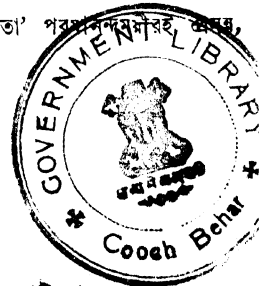
স্বীকারোক্তি

শ্রীপুলক বন্দ্যোপাধ্যায়

আর একটা সিগারেট জ্বালিয়ে বললাম, "তরুদি ওইটেই কি তোমার জীবনের প্রথম প্রেম ?"

তরুদি পরিপূর্ণ দৃষ্টিতে আমার দিকে চাইলো, তারপর মৃদু হেসে বললো, "সে প্রশ্ন এখন থাক, কেন তোমায় অফিস থেকে এখানে টেনে আনলাম তাই শোনো।"

'ফ্লুরি'র একটা সিলিঙের আবছা-আলোয় তরুদির সুন্দর চোখ দুটোর চাউনি যেন নরম হয়ে এলো "তুমি তো সবে ফার্স্ট ইয়ারে ঢুকেছ। মুখের কচি-কচি ভাব দেখে আমার কেমন মায়া হতো। অনার্স ক্লাসে যেতে গেলে তোমাদের 'ল্যাঙ্গয়েজ' ক্লাশটা চোখে পড়ত। প্রোফেসার আসার অনেক আগেই তোমার 'সিট'টায় তুমি লক্ষ্মী হয়ে বসে থাকতে। আমার সঙ্গে চোখাচোখী হয়ে যেত, আর লজ্জায় চোখ-মুখ লাল করে মুখটা নামিয়ে নিতে। একেবারে ছেলেমানুষ ছিলে তুমি।"

"তোমাকে তো বলেছি তরুদি, মেয়েদের দেখলেই আমার কেমন নার্ভাসনেস আসতো আগে।"

বয় বিলটা নিয়ে এলো। তরুদি বিলটা আলগা ভাবে তুলে নিয়ে বললো, "আউর দো কোল্ড কাফি।" বয়টা চলে গেলে তরুদি আবার সুরু করলে, "সে সব কথাগুলো বলতে এখন কত ভাল লাগে, তোমারও নিশ্চয়ই শুনতে খারাপ লাগে—না সমীর ? ফোর্থ ইয়ারের ছেলেরা আমার নাম দিয়েছিল 'ডেসডিমোনা' আর কলেজে আমি ছিলাম 'মিস বিউটি', কো-এডুকেশান কলেজে এমনিতেই মেয়ে মাত্রই ছেলেদের চোখে সুন্দর। তার ওপর তখন গানের গলা ছিল আমার আরও মাইল্ড, ফিগার ছিল আরও স্লিম্।

সত্যি, তরুদি যে সুন্দরী একথা তার অতিবড় শত্রুও স্বীকার করবে।

জানো সমীর, ওই যে সলিল সেন, ক্লাশে ঢুকতো খুব কমই, যার নামের সঙ্গে 'স্ক্যাণ্ডাল' করে সুখ পেত অনেক ছেলেই। তাকে আমি মোটেই ভালবাসতাম না। অমন ছেলেকে কোনো মেয়েই ভালবাসে না, তার না ছিল রূপ, না ছিল 'ইন্‌টেলেক্ট', না ছিল এ্যারিষ্টোক্র্যাসি। যুদ্ধের বাজারে হঠাৎ বড়লোক হয়েছিল ওর বাবা, তাই মেশবার পক্ষে সারা কলেজে ওকেই আমি সর্ব্বশ্রেষ্ঠ মনে করেছিলাম, হঠাৎ একদিন···

বয়টা দু'গ্লাশ কোল্ড কাফি দিয়ে গেল। তরুদি একটা আমার দিকে এগিয়ে দিয়ে আর একটার স্ট্রতে দুবার সিপ করলো অলস প্রশান্তিতে।

"ভাল লাগছে ?"

"মন্দ করেনি, তবে সেদিনেরটা আরও ভাল ছিল।"

"তা হবে। হুঁ যা বলছিলাম। একদিন ছুটির পর দেখলাম বৃষ্টির জন্য অনেক ছেলেমেয়েই সিঁড়ির মুখে দাঁড়িয়ে আছে। দেখি তোমার কাঁধে একটা ওয়াটার-প্রুফ রয়েছে। আমার সলিলের সঙ্গে একটা বিশেষ জরুরী 'এন্‌গেজমেণ্ট' ছিল 'বুফে'তে। তাই ওয়াটার-প্রুফটা তোমার কাছে চাইব মনে করে এগিয়ে গেলাম। কিন্তু আমার চাওয়ার আগেই তোমাদের ইয়ারের বন্দনা তোমাকে বললো, কিছু যদি মনে না করেন, ওয়াটার-প্রুফটা একবার দেবেন ? তুমি বিনা প্রতিবাদে কৃতার্থের হাসি হেসে বললে, "নিন্ না। আমার তেমন তাড়া নেই।"

ও বললো, "হোষ্টেলের চাকরটাকে দিয়ে এখুনি এখানে পাঠিয়ে দেবো, আপনি মিনিট দশেক এখানে অপেক্ষা করতে পারবেন না ?"

"অত তাড়ার কী আছে ? বৃষ্টি থামলে সমীর না হয় নিজেই নিয়ে আসবে।" তোমাদের কথার মাঝখানে আমি অভদ্রের মত কথাটা বলে ফেল্লাম। তোমার সঙ্গে

তখনও আমার আলাপ ছিল না। একটা স্যোসালে তুমি আবৃত্তি করেছিলে তাই নামটা চেনা ছিল। তোমরা দুজনেই অত্যন্ত অবাক হয়ে গেলে। আচ্ছা তাই আসবেন, বলে বন্দনা তাড়াতাড়ি চলে গেল। তখন তোমার সঙ্গে নানা কথা সুরু করে পরিচয়টা নিবিড় করে নিলাম। সেদিনের ঘটনায় বন্দনার প্রতি একটা নারী-সুলভ ঈর্ষাই ছিল একমাত্র কারণ। ইতিমধ্যে বৃষ্টিটা কিছু কমে এলো মাত্র, থামলো না। এদিকে আমার এন্‌গেজ-মেন্টের দেরী হয়ে যাচ্ছিল। সলিল এমনিতেই অস্থির, তার ওপর এ অবস্থায় সে যে কী করছে এই ভেবে করুণা হতে লাগলো। হাত-ঘড়ির দিকে তাকিয়ে বললাম, একটা ট্যাক্সীও যদি এ সময় পাওয়া যেত। কতক্ষণ আর এমনি ভাবে অপেক্ষা করা যায়? শুনেই তুমি বৃষ্টির মধ্যে ছুটে গেলে ট্যাক্সী ডাকতে। খানিক বাদে ভিজে সপসপে হয়ে এলে। সমীর আজ তোমার বয়স অনেক বেড়েছে। সংসারের অনেক কিছু চিনেছ, অনেক জেনেছ, অনেক অভিজ্ঞতা লাভ করেছ। তাই আজ আর বলতে বাধা নেই যে, সেদিন থেকেই তোমাকে 'এক্সপ্লয়েট' করার সঙ্কল্প করে ফেললাম। সব মেয়েরাই এ অবস্থায় তাই করতো। সুতরাং তারপর থেকে আমার একটু সঙ্গ লাভের জন্য তুমি চারটে থেকে পায়চারী করতে মেট্রোর সামনে, 'পিপিং'-এ নিয়মিত আনাগোনা সুরু করলে, আর ডায়মণ্ডহারবারের রাস্তায় ছুটে যাবার জন্য তোমার গাড়ীটা আমার সামান্যতম ইঙ্গিতের অপেক্ষায় অস্থির হয়ে উঠতো।

"এসব কথা আজ আবার বলছো কেন তরুদি?"

"না, না, যা সত্যি যা বাস্তব তাই বলছি সমীর। আজ আমি তোমাকে অনেক কিছুই বলবো। যা এতদিন শোনোনি তার অনেক কিছুই শোনাবো। জেনে রেখো তার এককণাও মিথ্যে নয়।" তরুদি পাতলা নরম ঠোঁট দুটোয় গ্লাসের 'স্ট্র'টা চেপে ধরলো।

"বন্দনার সঙ্গে তারপর থেকে নিশ্চয়ই তোমার কোনোদিন একটা কথাও কইতে ইচ্ছে করেনি। কারণ তার চেয়ে অনেক গুণে আমি সুন্দর। তুমি তো নিজেই বলেছো যে হষ্টেলে লোক পাঠিয়ে দুদিন বাদে ওয়াটার-প্রুফটা ফেরৎ নিয়েছিলে। কিন্তু তোমার ওপর আমার কেমন যেন মমতা পড়ে গেল। ঠিক করলাম—তোমাকে আমার ঘনিষ্ঠ বন্ধু করে নেবো। তাছাড়া বাংলাদেশের কো-এডুকেশন কলেজে সুন্দরী মেয়ের সংখ্যা অত্যন্ত অল্প! তাই সুন্দর মেয়েদের অকৃত্রিম মেয়ে-বন্ধু বড় একটা থাকে না। মুখে বন্ধুত্বের অভিনয় করে মাত্র কয়েকজন মেয়ে, কিন্তু অন্তরে তারাই থাকে অত্যন্ত ঈর্ষাকাতর। আর বাকি অংশের মেয়েরা সোজাসুজি স্ক্যান্‌ডাল্‌ রটিয়ে এক ধরণের তৃপ্তি লাভ করে। সুতরাং মেয়েদের মধ্যে বন্ধু আমি পাইনি একজনও। ছেলেদের কাছে সব সময়েই আমাকে 'ক্লিওপেট্রা'র অভিনয় করে থাকতে হোতো। এ অবস্থায় তোমাকে পেয়ে আমি বেঁচে গেলাম।"

"সে তো অনেকদিনই শুনেছি তরুদি। আজকে আবার নতুন করে বলছো কেন?"

"আঃ সমীর। বলেছি তো তোমাকে আজকে সব কিছুই বলবো। চুপ করে শুনে যাও। পরক্ষণেই বিরক্তি সামলে নিয়ে তরুদি বললো, অত ব্যস্ত হচ্ছ কেন? কোনো কাজ আছে কী?"

"না, না, তুমি বলো আমি শুনছি।"

"আচ্ছা যেদিন মেমোরিয়ালের মাঠে লজ্জা-ভয়ে মুখটা বিবর্ণ করে আমাকে বললে, তরুদি, তোমায় ছাড়া আমি বাঁচবো না তরুদি, তোমায় আমি ভালবাসি, বিয়ে করতে চাই?' মনে আছে তার কী উত্তর আমি দিয়েছিলাম?"

"বলেছিলে কত টাকা ষ্টেট থেকে হাত খরচা পাও যে এ কল্পনা করতে সাহস করো?"

"সত্যি, তখন এছাড়া অন্য কোনো উত্তর দেওয়া আমার পক্ষে সম্ভব ছিলনা। তারপর তোমাকে কত বোঝালাম। তুমি বুঝলে, তারপর বললে, তবু জেনো তরুদি, তুমি আমাকে ফিরিয়ে দিলেও আমার ভালবাসা চিরদিন অমর থাকবে।" যাকগে সে সব কথা। ইতি-মধ্যে ফাইন্যাল পরীক্ষা শেষ হয়ে গেল। কতকগুলো বছর কেটে গেল। য়্যানিভার্সিটিতেও সলিল ছিল আমার মনোমত সঙ্গী। তারপরও তার সঙ্গে যেতাম ক্যালকাটা ক্লাবে, রেসকোর্সে, ফুটবলে, ক্রিকেটে, এখানে সেখানে। তোমার সঙ্গে সলিলের তফাৎও ছিল অনেকখানি। তুমি মেয়েদের মত মিইয়ে মিইয়ে কবিত্ব করে প্রেম জানিয়ে ছিলে, আর সলিল ছিল পুরুষ। তার পৌরুষের কাছে

আমি আত্মসমর্পণ করলাম ঠিক চিত্রাঙ্গদার মত। কিছুদিন পরে আমার মোহের ফল পেলাম। বুঝতে পারলাম আমি মা হতে চলেছি।"

সলিলকে সে কথা বলতে ও অত্যন্ত সহজভাবে বললো, "তাতে ভয়ের কি আছে? চল ডাঃ ঘোষের কাছে, সব ম্যানেজ হয়ে যাবে।"

এইখানে আমি প্রথম হার মানলাম। আমার ভারতীয় নারীত্ব মাথা তুলে বললো, "না এ হত্যা মহাপাপ।" তুমি শুনেই বললে, তরুদি তুমি আমায় বিয়ে করো, তোমার কৌমার্য্যের সম্ভ্রম, সামাজিক সম্মান সমস্তই বজায় থাকবে তা হলে।"

কিন্তু তাতেও মন সায় দিল না। তোমার ওপর একটা স্নেহজড়িত মমত্ববোধ তখন আমার সমস্ত অনুভূতিকে আচ্ছন্ন করে রেখেছে। এ হয়না। সলিলকে বিয়ে করতে বললাম। তারপরদিন থেকেই ও আমায় এড়িয়ে চলতে সুরু করলো। ওর দোষ ছিল না। আমি যাকে ভালবাসতাম না, তার কাছ থেকে কেবল প্রয়োজনের তাগিদে ভালবাসার বন্ধন দাবী করাটা নেহাতই গর্হিত ছিল নাকি? তাছাড়া ও ধরণের ছেলেদের আমি চিনতাম খুবই, তাদের পক্ষে এসময়ে এড়িয়ে চলাটাই স্বাভাবিক। কিন্তু তাই বলে তার পেছনে কাঙালের মত বিয়ের মালা নিয়ে ঘোরা বা কেস করার নামে ব্ল্যাক মেলিং করারও পক্ষপাতী ছিল না আমার নারীত্ব। তাই হঠাৎ বিয়ে করলাম অমিয় সেনকে—যে অমিয় সেন অক্সফোর্ড থেকে ফার্ষ্ট ক্লাশ পেয়েছিল। তোমরা অবাক হলে, পরিচিত প্রেম-কাঙাল বন্ধুরা ঈর্ষান্বিত হল। আমি কিন্তু আশ্চর্য্য হলাম তার সংযম দেখে। বিয়ের পর দুমাস কেটে গেল। কোনোদিনই সে তার স্বামীত্বের দাবী জানালো না। রাত্রে মাঝে মাঝে তার বুকে মাথা রেখে ঘুমিয়ে পড়তাম। ঘুম ভেঙে দেখতাম বালিশে মাথা রেখে শুয়ে আছি। আর অমিয় ও-পাশ ফিরে নির্ব্বিকারভাবে ঘুমোচ্ছে। মুনি-শ্রেষ্ঠের তপস্যা ভেঙেছিল মেনকা! আর আমি মেনকা-সুলভ সমস্ত গুণের অধিকারী হয়েও একজন সাধারণ মানুষ অমিয় সেনের সংযমকে টলাতে পারলাম না। দিন যেতে লাগলো। যখন আমার ছেলের জন্মের চারমাস মাত্র বাকি তখন একদিন স্পষ্টভাবেই কারণ জিজ্ঞাসা করলাম। অমিয় কী বললো জানো? বললো, "তুমি যে মা হতে চলেছ সে কথা পরিবার শুদ্ধু সবাই জানেন। আর আমি তোমার স্বামী হয়ে সেকথা জানি না? তবে তুমি নিশ্চিন্ত থেকো—ওঁরা সবাই জানবেন আমিই তোমার সন্তানের জনক।" জানি না লেডি চ্যাটার্জি একথা শুনে কি বলতেন, তবে আমি অত্যন্ত অবাক হয়ে জিজ্ঞাসা করলাম, "তার মানে।"

অমিয় উত্তর করলো, "সলিল আমার পুরোনো বন্ধু। তোমায় যখন বিয়ে করি তার কিছুদিন আগে ওর সঙ্গে হঠাৎ দেখা হয়ে যায়। ও কথায়-কথায় ওর নতুনতম রোমান্সের নায়িকার নাম বললো, সাহানা রায়। আর এইমাত্র যে পেয়ালা শূন্য করে পরিত্যাগ করে এসেছে, তার নাম বললো তোমার। ঠিকানাও বলে ফেলেছিল। তোমার সঙ্গে যে আমার আলাপ আছে তা বোধহয় সলিল জানতো না। তোমার সঙ্গে যে আমার কোনো-দিন বিয়ে হতে পারে এ কল্পনাও নিশ্চয়ই কোনোদিন সে করেনি।"

তুমি জেনে শুনে আমায় বিয়ে করলে? এন্‌গেজমেণ্ট ভেঙে দিলে না! আমার এ প্রশ্নের জবাবে অমিয় বললো, তাতে কী। দত্তক ছেলেও তো লোকে নেয়। তাকে স্নেহ করে, ভালবাসে। এতো তার চাইতে অনেক ভাল। তবু এ ছেলের শিরায় থাকবে তোমার রক্ত। তোমায় যদি ভালবাসতে পারি, আর তোমার ছেলেকে পারবো না? তাছাড়া সারা পৃথিবী তো জানবে এ ছেলে আমার।

তরুদির দুচোখে জল চিক্ চিক্ করে উঠলো। কফির গ্লাসটা শেষ করে বললো, "সমীর, অমিয় সেনের মত লোক আজকের পৃথিবীতে কটা সম্ভব বলতে পারো? তার বুকে ঝাঁপিয়ে পড়ে কত কাঁদলাম, সে আমার মাথার চুলে হাত বুলোতো লাগলো। বহুক্ষণ বাদে ধীরে ধীরে বললো, তুমি মা হয়েছ জেনেই আমি বিয়ে করলাম তোমাকে, তা না হলে করতাম না। অক্সফোর্ডে থাকতেই আমার একবার ভীষণ অসুখ করে। প্রায় মাস দশেক আমার বিছানায় কেটেছে। শেষে ভাল হলাম। কিন্তু—কিন্তু সন্তানের পিতা হবার যোগ্যতা আমার বিলুপ্ত হ'ল। সারা ইংলণ্ডে চিকিৎসা করালাম, রোগ সারলো।

অর্থাৎ আমার স্বামী অমিয় সেন একটা ক্লীব। আচ্ছা বলতে পারো সমীর, ও যদি এ ইতিহাস আমায় না শোনাতো তা হলে কী এসে যেতো। আমি কি এতটা গূঢ় কারণ জানতে চেয়েছিলাম?" তরুদির চোখ-মুখ প্রবল রক্তোচ্ছ্বাসে কেমন অদ্ভুত হয়ে উঠলো। নিঃশ্বাস হয়ে উঠলো দ্রুত। তরুদি আবার বলতে সুরু করলো—"জানো সমীর, ও আমায় একটা যৌন ক্ষুধার্ত্ত পশু মনে করেছে। এতটা অপমান ও আমায় কোন সাহসে করলো? ও কেমন করে ভাবতে পারলো যে, এতটা উদারতার পরও আমি আর কোনোদিন আমার কলঙ্কিত দেহ-কুসুম দিয়ে ওই দেবতার আরাধনা করতে চাইবো কেবল মাত্র দৈহিক আকাঙ্ক্ষার প্রশান্তির আশায়? একী তার ক্ষমার প্রতিশোধ, না উদারতার প্রতিহিংসা? মনে হল এক্ষুণি পাগল হয়ে যাবো। সারা পৃথিবী দুলে উঠলো, যেন প্রবল ভূমিকম্প হচ্ছে। কোলকাতা শহরটা ঘুরছে, ঘুরছে···ঘুরছে।" বলতে বলতে উত্তেজিত তরুদি সামনের টেবিলটা শক্ত করে চেপে ধরলো। তারপর গলার স্বর নামিয়ে বললো—"মাথা ঘুরে পড়ে গেলাম ঘরের চেয়ারটার ওপর, সেখান থেকে ছিটকে মেঝেতে, তারপর আর মনে নেই। জ্ঞান হয়ে দেখি নার্সিং হোমে রয়েছি। সেখান থেকে ছাড়া পেয়ে দু-মাস বাড়ীর মধ্যে বন্দী ছিলাম। আজকে একটু ছাড়া পেয়ে তোমাকে অফিস থেকে এখানে টেনে আনি।"

তরুদি উঠে দাঁড়ালো, "আচ্ছা চলি আজ সমীর।"

বিলটা চুকিয়ে দিয়ে আমি বাড়ী মুখো রওনা হলাম।

*　　*　　*　　*

বেশ কিছুদিন তরুদির আর দেখা পাইনি। ওর বাড়ী যেতেও মন চাইতো না মোটেই। সেদিন সন্ধ্যায় চৌরঙ্গীতে দেখা হয়ে গেল কলেজের সহপাঠী অমরের সঙ্গে। ও এখন বিখ্যাত মানসিক চিকিৎসক ডাঃ ব্যানার্জীর এ্যাসিস্ট্যান্ট। এ কথা সে কথার পর ও বললো, জানিস সমীর—তরুদি এখন স্যারের আণ্ডারে রয়েছেন। উদ্‌ভ্রান্তের মত প্রশ্ন করলাম, "আমাদের তরুদি? কেন? কী হয়েছে?"

"আর বলিস নি, দেখে দুঃখ হয়। কী চেহারা কী হয়ে গেছে। প্রেগন্যাণ্ট অবস্থায় নাকি একবার পড়ে যান। তারপর নার্সিং হোমে একটা মৃত সন্তান প্রসব করার পর থেকে ইনস্যানিটির লক্ষণ দেখা যায়। বাড়ীর লোকেরা ঘরে বন্ধ করে রাখতেন, কারণ উনি নাকি মাঝে মাঝে পালিয়ে যেতেন। ইদানীং অসুখটা বেড়ে যাওয়াতে ওঁরা স্যারের কাছে নিয়ে এসেছেন যাতে রোগটা সেরে যায়।"

"কেমন বুঝছেন ডাঃ ব্যানার্জী?"

এখনও কিছু বোঝা যাচ্ছে না ভাই। পেসেণ্ট এক-দিকে অনেকটা 'নরমাল'। কিন্তু একটা ব্যাপারে যতই ক্রস এগজামিন করা হয়, যতই প্রশ্ন করা হয় ওই তাঁর একমাত্র উত্তর "এ কী তার ক্ষমার প্রতিশোধ না উদারতার প্রতিহিংসা। আমি কি এতটা নীচ?" কোন উদারতা বা কোন্ নীচতা সেগুলো এখোনো আউট করা যায়নি। এ সময়ে তাঁর স্বামীকে পাওয়া গেলে সুবিধে হত অনেক। তিনি আবার এখন রয়েছেন বোম্বেতে কী বিশেষ জরুরী কাজে। তবে স্যারের হাতে যখন কেসটা পড়েছে সুরাহা একটা হবেই। এটা নিশ্চিত জানিস। এই ধরণের হিষ্টিরিয়া ঘটিত ইন্‌স্যানিটির একটা হিষ্ট্রির 'ক্লু' পেলেই ব্যাস। সিওর সাকসেস। কারণ সাইকো এ্যানালিসিসটাই এখানে বড় কিনা। ওই যে ডাবল-ডেকার এসে গেছে। আচ্ছা আজ গুড-নাইট। চলি। অমর ডবল-ডেকারে উঠে পড়লো।

ভাবলাম অমরকে বলে দিই তরুদির সমস্ত ইতিহাস। তরুদি তাহলে তাড়াতাড়ি সেরে উঠবে। কিন্তু সেরেই বা লাভ কী। নাঃ, তরুদি পাগল হয়ে যাক, উন্মাদ হয়ে যাক, সর্ব্বপ্রকার আধুনিক চিকিৎসাও যেন তাকে ভাল করতে না পারে। বদ্ধ উন্মাদ হয়ে তরুদি হয়তো কিছুটা শান্তি পাবে।

মানবতার সাগর-সঙ্গমে, সুইডেনে আর সোবিয়েতে

শচীন সেনগুপ্ত

লেনিনগ্রাদে গেলে সর্ব্বাগ্রে জারদের প্রাসাদ উইণ্টার-প্যালেস দেখবার আগ্রহ প্রবল হয়ে ওঠে রাশিয়ার ইতিহাসের সঙ্গে ওর যোগ রয়েছে বলে। আমরাও উইণ্টার প্যালেস দেখতে গেলাম। প্রাসাদের বৃহত্তম অংশটি মিউজিয়ামে রূপান্তরিত হয়েছে। সেই অংশটি 'হার্মিটেজ' অর্থাৎ 'সাধনাশ্রম' নামে পরিচিত। ও-নাম কেন দেওয়া হয়েছে? জাররা কি ওখানে সাধনা করতেন? না, তা নয়। সে জন্যে ও-নাম দেওয়া হয়নি। জাতির শিল্পের এবং সংস্কৃতির সাধনার নিদর্শন ওখানে রাখা হয়েছে ওই জারদেরই সংগৃহীত চিত্রে, ভাস্কর্য্যে, তাদেরই ব্যবহৃত অলঙ্কার-পত্তরে। জারদের স্মৃতি রাখবার জন্যই কি তা করা হয়েছে? মোটেই নয়। ওই সব শিল্প-সৃষ্টি যারা করেছিল, তাদেরই দর্শকদের মনে বড় করে রাখবার জন্য তাদের সৃষ্টিকে সাধারণের দৃষ্টির সামনে সাজিয়ে রাখা হয়েছে। তারা কারা? ইতিহাসে তাদের যারা অখ্যাত অজ্ঞাত রয়ে গেছে, তারা জনগণ থেকেই উদ্ভূত। তাদের নাম নেই, কিন্তু তাদের সৃষ্টি চির-বিস্ময় জাগিয়ে রেখেছে। তাদেরই সাধনার ধন চোখ ভরে দেখে তাদের প্রতি মন-ভরা শ্রদ্ধা জাগিয়ে তোলাই হচ্ছে আজকার জাতীয় সাধনা। আর সেই সাধনাই হচ্ছে নব-বিশ্বের নতুন সংস্কৃতি। কিন্তু ভূ-বিখ্যাত শিল্পিদের কালজয়ী সৃষ্টিকেও এখানে সযত্নে রাখা হয়েছে।

উইণ্টার প্যালেসের ঘরের সংখ্যা এক হাজারেরও বেশি; হয়ত কুড়ি-পঁচিশটি বেশি। সমগ্র প্রাসাদটিকেই হার্মিটেজ বলা হয় না। প্রাসাদটি বাহির থেকে দেখতে খুব বিস্ময়কর নয়। রুশ-স্থাপত্যের কোন নিদর্শন ওতে নেই। কোলকাতার চৌরঙ্গী অঞ্চলের যে-কোন বাড়ী যদি সাদায় আর সবুজে রঙ করা যায়, তাহলে তাও বাহির থেকে দেখতে ওই উইণ্টার প্যালেসের মতোই দেখাবে। প্রধান প্রবেশ পথ প্যালেস-স্কোয়ার দিয়ে। স্কোয়ারট পাথরের ইট দিয়ে মোড়া। স্কোয়ারের দিকে বড় বড় বাড়ী, আর একদিকে প্রাসাদ। ওই বড় বড় বাড়ীগুলোয় জারদের আমলে নানা দফ্‌তর ছিল, এখন নব-রাষ্ট্রের নানা দফ্‌তর।

স্কোয়ারের মাঝখানে প্রায় কোলকাতার অক্টারলোনী মনুমেণ্টের মতো উঁচু পাথরের একটি স্তম্ভ আছে। শুনলাম সেটি মাটিতে প্রোথিত নয়, নিজের ভারেই নিজে দাঁড়িয়ে আছে। অত বড় উঁচু স্তম্ভটি অখণ্ড, জোড়া নয়, খোদাই, ঈষৎ গোলাপী, মার্ব্বেলের মতো মসৃণ। ইণ্টার-প্রিটার শোনালে—ওটি তৈরী করেছিল একটি অজ্ঞাত পল্লী-ভাস্কর। কোথায় তৈরী হয়েছিল, কেমন করে আনা হয়েছিল, খাড়া করা হয়েছিল, তা কিছু জানতে পারলাম না। আমাদের দেশের উড়িষ্যার এবং দক্ষিণ-ভারতের অনেক কীর্ত্তি দেখেও মনে ওই-সব প্রশ্ন জাগে। তারও সদুত্তর পাওয়া যায় না। লেনিনগ্রাদের ওই স্তম্ভ সম্বন্ধে সকল তথ্য যাঁরা দিতে পারতেন, তাঁদের সঙ্গে সংযোগ আমাদের হয়নি।

হার্মিটেজে আমরা ঢুকলাম প্রাসাদের পেছনকার প্রবেশ দ্বার দিয়ে। তারই পেছনে নেভা। একটিমাত্র রাস্তা দুয়ের ব্যবধান রক্ষা করে চলেছে। প্রাসাদে ঢুকতেই আমাদের দো-তলায় নিয়ে যাওয়া হোলো। সে-ঘরটিতে নানা কিউরিয়ো সংগৃহীত রয়েছে। সবই মূল্যবান পাথর এবং মণি-মুক্তা খচিত। সবগুলি বর্ণনার স্থান নেই। সবগুলিই বিস্ময়কর সৃষ্টি, ঘড়ি-খেলনা-বাসনকোসনই বেশি।

সবই যে রুশদেশে তৈরি, তা নয়। নানাদেশ থেকে জাররা বহু অর্থব্যয় করে যা সংগ্রহ করেছিলেন, তারই প্রদর্শনী। সবগুলির ওপর দিয়ে শুধু দৃষ্টি বুলিয়ে যেতেই প্রায় ঘণ্টাখানেক সময় লাগল।

তারপর চিত্রশালা দেখবার পালা। ঘরের পর ঘর শুধুই ছবি আর ছবি। পৃথিবীর সমস্ত শ্রেষ্ঠ চিত্র-শিল্পিদের আঁকা বিশ্ববিশ্রুত ছবির সংগ্রহ। শুনলাম ও-গুলো ওরিজিন্যাল, অর্থাৎ শিল্পির নিজের হাতের আঁকা। আমার এমন শক্তি নেই যে, ছবি দেখে বলব কোনটা আসল, কোনটা নকল। নরেন্দ্র দেব চুপি চুপি বল্লেন, সবগুলি আসল নয়। হবেও বা। কতগুলো হল-ঘর যে ছবি দেখে-দেখে আর তাদের পরিচয় শুনে শুনে অতিক্রম করলাম, তা হিসেব করে আজ বলতে পারি না। বকে-বকে ইণ্টারপ্রিটারদের গলা শুকিয়ে গেল। ছবির ঘর তবুও শেষ হয় না।

সহসা একটি ছবি বিহীন হল-ঘরে প্রবেশ করেই শুনলাম—জারদের থ্রোন রুম। একদিকে একটা উঁচু প্লাটফর্ম্ম। কিন্তু তাতে সিংহাসন নেই, আছে দেয়াল-জোড়া ইউনিয়ন অব দি সোশ্যালিষ্ট সোভিয়েৎ রিপাবলিকের একটি মানচিত্র। সরু-সরু ফ্লোরোসেণ্ট টিউব থেকে আলো বেরিয়ে পনেরোটি রিপাবলিকের সীমানা, নদ-নদী, কল-কারখানা, শহর-বন্দর প্রভৃতির পরিচয় প্রকাশ করছে। ঘরটিতে বিশেষ কিছু দেখবার নেই। বিশেষ দেখবার বিষয় ছাদের আর মেজের কারুকাজ একেবারে এক। সকলের পিছনে একটি কোণে চুপ করে অনেকক্ষণ একা দাঁড়িয়ে রইলাম আমি। জার-আমলের খণ্ড-খণ্ড কল্পিত চিত্র আমার মনের পর্দ্দায় যেন রূপ-পরিগ্রহ করে ভেসে যাচ্ছিল। সেই বিশেষ ধরণের দাড়ী-গোঁফবিশিষ্ট সামরিক পোষাক পরিহিত, ডেকরেশন শোভিত, দীর্ঘাবয়ব, বীরোচিত মূর্ত্তি; সেই মুণ্ডিত-গুম্ফ-শশ্রু নবীন-রুশীদের চলন-চাতুর্য্য, সেই পীন-পয়োধরা রত্নালঙ্কার শোভিতা সূক্ষ্মবাস পরিহিতা রূপ-লাবণ্যের অধিকারিণী নয়নাভিরামা বিভিন্ন বয়সের বামাবৃন্দ, সেই মৃদু গুঞ্জরণ, তারঙ্গায়িত কলহাস্যের মদালস

হিন্দোল, তলোয়ারে খাপের সঙ্গে জুতোর স্পারের সংঘর্ষের ঘন-ঘন ঝনাৎকার, সবই যেন দেখতে পেলাম, শুনতে পেলাম।

দোভাষিণী তামারা স্বপ্ন ভাঙ্গিয়ে দিলে—এখানে একলাটি দাঁড়িয়ে যাদের কথা ভাবছ, অনন্তকাল অপেক্ষা করেও তাদের দেখা পাবে না। তারা আর কোন দিনই ফিরে আসবে না। চল।

একটা কোরিডোরে গিয়ে পড়লাম। নেপোলিয়ানিক যুদ্ধের নানা ছবি। কোন ছবিতে নেপোলিয়ানের প্রতি কোন প্রকার অশ্রদ্ধা করা হয়নি। রুশীদের সেই অনুপম প্রতিরোধকে জীবন্ত করে রাখা হয়েছে। ১৯৫৫ খ্রীষ্টাব্দে জারদের প্রাসাদে দাঁড়িয়ে ১৮০২ খৃষ্টাব্দের পূর্ব্ব-ইউরোপ পলকে দেখে নিলাম।

তারপর গেলাম পিটার দি গ্রেটের কারখানা দেখতে। রকমারি যন্ত্র রয়েছে সেখানে। সবই তাঁর নিজের হাতের তৈরি। পিটার তার ছেলে বয়েসে তাঁর পিসী সোফিয়ার চক্রান্তে অত্যন্ত উপেক্ষিত ছিলেন। প্রাসাদে অথবা রাজধানীতে তিনি বেশি থাকতেন না, গ্রামাঞ্চলে চাষীদের ছেলে-দের নিয়ে যুদ্ধের খেলা-খেলতেন। একজন সুইস্ শিক্ষক তাঁকে যুদ্ধের খেলা ছেড়ে সত্যিকারের যুদ্ধের কৌশল অর্জন করবার প্রেরণা দিলেন। পিটার সুযোগের অপেক্ষায় রইলেন। সে সুযোগ এলো ১৬৮৭-৮৯এর ক্রাইমিয়া যুদ্ধে তাঁর পিসীর পরিকল্পনার ব্যর্থতায়। পিটার ওই সুযোগ নিয়ে রিজেন্ট-পিসীকে কন্‌ভেন্টে পাঠিয়ে দিয়ে রাজ্যভার গ্রহণ করলেন। আজভ আক্রমণের সময় তিনি বুঝলেন যে, সামরিক জ্ঞানের তাঁর একান্তই অভাব। তিনি স্থির করলেন, তিনি পশ্চিম ইউরোপ থেকে বিদ্যা অর্জ্জন করে আসবেন। কিন্তু রাশিয়ার জার হয়ে তিনি তা কেমন করে করবেন? সাধারণ একজন কর্মী হিসেবে তিনি তাঁরই এমব্যাসিতে কাজ নিলেন এবং জার্ম্মেনী, হল্যাণ্ড, ইংলণ্ড থেকে একবছর কাল তিনি শিক্ষানবিসী করলেন।

কিন্তু তাঁর পিসীর সমর্থকরা রাজ্যে গোলযোগ সৃষ্টি করায় তিনি দেশে ফিরে আসতে বাধ্য হলেন এবং ফিরে এসেই ঘোষণা করলেন কেউ আর বড়-বড় দাড়ী দিয়ে মুখ ঢেকে রাজ-দরবারে উপস্থিত হতে পারবে না, আর সকলকেই পাশ্চাত্য পোষাক পরতে হবে। রাজ্যভার গ্রহণ করবার পর দীর্ঘকাল (১৬৯৯-১৭২১) তাঁকে যদিচ ইউরোপের এবং নানা শক্তির সঙ্গে, বিশেষ করে পোলাণ্ড আর সুইডেন—যুদ্ধ করতে হয়, তবুও তিনি রাশিয়াকে ইউরোপীয়ান শক্তি হিসেবে প্রতিষ্ঠা দান করতে সক্ষম হন। তাঁর সময়েই সর্ব্বপ্রথম জমিদারদের এক পর্য্যায়ভুক্ত করা হয় এবং জমির শ্রমিকদের একই রকমের দাসত্ব শৃঙ্খলে বেঁধে ফেলা হয়। তবুও, বিপ্লবের পূর্ব্বেও যেমন, বিপ্লবের পরেও তেমন, পিটার দি গ্রেটকে সকল রাশিয়ান শাসকরা শ্রদ্ধা দিয়ে এসেছেন। বিপ্লবের পর আলেক্সি তলস্তয় 'পিটার দি গ্রেট' নাটক রচনা করেন। তাতে করে খুব হৈ-চৈ হয়। স্তালিন তা এই বলে শান্ত করেন যে, পিটারের কাজ-গুলি তখনকার সমাজের পরিপ্রেক্ষিতে বিচার করে দেখলে বোঝা যাবে, আসলে তাঁর মন ছিল প্রগতিশীল। ওই প্রগতিশীল মনের অধিকারীকে শ্রদ্ধা জানানো অন্যায় নয়, সঙ্গত।

পিটারের কারখানা দেখবার পর গেলাম—জার-পরিবারের পরিত্যক্ত অলঙ্কার আর শখের জিনিষ পত্তর দেখতে। হঠাৎ আরব্য রজনীর গল্প বাস্তব হয়ে উঠল। বেশিক্ষণ সেই ঔজ্জ্বল্যের দিকে চেয়ে থাকা যায় না। কত আকারের, কত প্রকারের, সেই রাশি রাশি অলঙ্কার। কত রকমের হীরে, চুণী, পান্না, প্রবাল, মুক্তা, নাম-না-জানা আরো কত কি! নাই বা জানলাম ওদের নাম। অলঙ্কারে যে সূক্ষ্ম কারুকার্য্য দেখলাম, তাতেই মুগ্ধ হয়ে গেলাম। ও-সব অলঙ্কার যাঁরা পরত, তাদের কথা ত কতই না কেতাবে পড়িছি। কিন্তু যারা ওই অলঙ্কারের রূপ দিয়েছে, তাঁরা কারা? তারা হয়ত পেট ভরে খেতেও পেত না। হয়ত তারা এই প্রাসাদেরই কোন স্বল্পালোকিত স্যাঁৎসেতে কক্ষে কড়া-পাহারায় থেকে অলঙ্কারের ওই রূপ দেবার জন্য দিবারাত্র কাজ করত। হয়ত উৎসবের আগে তাড়াতাড়ি কাজ শেষ করে দেবার জন্য প্রহরে প্রহরে প্রহরীদের চাবুক খেতো, কেউ কেউ হয়ত কাজ করতে করতে মুখ থুবড়ে পড়েই যেত, আর মাথা তুলত না! তাদেরই তৈরি অলঙ্কার পরে জারেরা, জারিনারা, জারেভিচরা, গ্রাণ্ড ডিউকরা, গ্রাণ্ড-ডাচেসরা, মার্শালরা, জেনারেলরা, য়্যাড্‌মিরালরা সকলের বাহবা পেতেন; স্রষ্টারা জানতেও পেত না তাদের শ্রমের ফল কত নর-নারীর জীবন-যৌবন সফল, সার্থক করে দিল!

ওই স্রষ্টারা কারা? কোথা থেকে এসেছিল তারা? রুশেরই লোক-শিল্পী তারা। তারা এসেছিল রুশের অশিক্ষিত, নিরন্ন, জনতার ভিতর থেকে, হয়ত ব্যক্তি-স্বাধীন তাহারা দাস-যূথেরই মাঝ থেকে। কোথায় শিখেছিল তারা এই অনুপম শিল্পী-শৈলী? কোন বৈজ্ঞানিক ল্যাবরে-টারীতে নয়, কোন টেক্‌নোলজির স্কুলে নয়। শিখেছিল গুরুর কাছে; আর নিজেদের মনের মাধুরী মিলিয়ে সেই সর্ব্বহারারাই দিয়েছিল বিত্ত-বানদের, ভাগ্যবতীদের, অলঙ্কারের এই সব বিচিত্র আর বিশিষ্ট রূপ। সকল দেশেই এই হয়েছে। আমাদের দেশেও হয়েছে। আমরা, এত-দিন, অলঙ্কার পরে যারা যুগে-যুগে গরবে ফুলে-দুলে বেড়িয়েছে, তাদেরই ধন্য ধন্য করিছি। আজ সময় এসেছে যখন ওই পরিচয়হারাদের শিল্প-সৃষ্টির মাঝে তাদের মনের সম্পদের পরিচয় পেয়ে তাদেরই উদ্দেশে ধন্য ধন্য ধ্বনি তুলতে হবে। সোবিয়েৎ সরকার এই সব মিউজিয়াম প্রতিষ্ঠা করে দেশ-বিদেশের লোকদের সেই শিক্ষাই দিচ্ছেন।

একটি ঘরে নর-নারীর ব্যবহারোপযোগী অজস্র ঘড়ি (ওয়াচ) দেখতে পেলাম। কত রকমের ওয়াচ যে চালু ছিল, তাই বা আমরা জানব কেমন করে? কত দেশের তৈরি, কত প্যাটার্ণের। তারপর গেলাম চীনা-ঘরগুলিতে। চীনা মৃৎ-শিল্প এককালে বিলাসীদের কাছে মণি-মুক্তার চেয়েও মূল্যবান ছিল। এখনো যে নেই, তা নয়। চীনে গিয়ে আধুনিক সময়ে নির্ম্মিত অনুপম অনেক জিনিষ দেখে এসেছি। এই প্রাসাদে সংগৃহীত জিনিষগুলিও বিস্ময়কর সৃষ্টি।

ভারতের শিল্প-সংগ্রহের ঘরটিও আগ্রহ নিয়েই দেখলাম। নানা জানা ও অজানা জিনিষও দেখতে পেলাম সেখানে। গৌরবের বস্তু' সেগুলি। কিন্তু সংখ্যায় বেশি নয়, বৈচিত্র্যেও প্রচুর নয়।

তারপর নেমে গেলাম একেবারে নীচের তলায়, স্থাপত্যের কিছু পরিচয় নিতে। কিন্তু পা আর চলে না, চোখ যেন দেখবার শক্তি হারিয়ে ফেলেছে, ক্ষিধেতেও পেট চোঁ-চোঁ করছে। মূর্ত্তিগুলির উপর দৃষ্টি বুলিয়ে হার্মিটেজ থেকে বেরিয়ে পড়লাম। এবারও গিয়েছিলাম। এবারও আর একবার দেখে এলাম একটু গভীর দৃষ্টি দিয়ে, সেবার যে-গুলি মনে ধরেছিল। এবার মনে একটা নতুন প্রশ্নের উদয় হয়েছে। তা হচ্ছে, গুরু-পরম্পরায় যে শিক্ষার ব্যবস্থা অতীতে ছিল, তাই শ্রেষ্ঠতর শিল্পী-সৃষ্টির সহায়তা করত, না সিলেবাস-কারিকুলাম কণ্টকিত ক্লাশ-রুমের শিক্ষা তার বেশি সহায়তা করছে? শিল্পে শিল্পীর ব্যক্তিত্বের মূল্য বেশি, না ঢালাই ফর্ম্মের মূল্য বেশি?

লাঞ্চের পর একটু বিশ্রাম করে সাইট-সিয়িংয়ে বেরুলাম। এ-ব্যাপারটি হচ্ছে ওমনিবাসে করে শহর পরিক্রমা। শহরের নানা পথ দিয়ে বাস চলে যায়, আর মাইক্রোফোনের সাহায্যে দর্শনীয় বিষয়গুলি বিবরণ শোনানো হয়। এর প্রয়োজন আছে। গভীরভাবে কোন বস্তু দেখায় মনের ওপর যে চাপ পড়ে, তা লঘু হয়ে যায়; নতুন জিনিষ গ্রহণ করিবার উৎসাহ পুনরায় উদ্দীপ্ত হয়। সাপারের সময় পর্য্যন্ত এইভাবেই তিনখানা বাসে করে আমরা ঘুরে বেড়ালাম।

সাপারের পর গেলাম আলেকজান্দ্রিনিস্কি থিয়েটারে অপেরা-অভিনয় দেখতে। অভিনয় করলেন উক্রেনিয়া থেকে আগত একটি দল। উক্রেনিয়া অপেরারও খ্যাতি আছে। ওঁরা বেশ ভালো অভিনয়ই দেখালেন। অপেরার মাধ্যম হচ্ছে নাচ আর গান। দুয়েরই টেক-নিক আমাদের অজানা। তবুও ওতে যে নাট্যরস থাকে, তা কিন্তু ভাষা আর টেকনিকের উর্দ্ধে উঠে খানিকটা রস বিস্তার করে। সেইটেই আমরা উপভোগ করতে পারি। কিন্তু পূর্ণ রসোপলব্ধি হয় না। কি আর করা যায়? থিয়েটারটি জারদের আমলের থিয়েটার। এখন ষ্টেটথিয়েটার। সব থিয়েটার তাই। বোলশয়ের মতো এটিও অপেরা অভিনয় করে। অপেরার অবদান সম্বন্ধে আগেও লিখিছি, পরেও হয়ত লিখতে হবে। ও-বস্তু আমাদের দেশে নেই। অথচ থাকা দরকার।

পরেরদিন সকালে প্রাপ্ত-অবসর অভিনেতৃদের আশ্রম দেখতে গেলাম। সোবিয়েৎ দেশে ষাট বছরের উর্দ্ধবয়স্ক নর-নারীর পেনসনের ব্যবস্থা আছে, এবং ওই বয়েসের শিল্পিদের বস-বাসের জন্য আশ্রমও করা হয়েছে। একদা যাঁরা রাতের পর রাত দর্শকদের আনন্দ যুগিয়েছেন, তাঁদের জীবনের শেষদিনগুলিতে যদি তাঁদের দৈন্যে, অমর্য্যাদায়, দিন কাটাতে হয়, তাহলে তা সমগ্র জাতির অকৃতজ্ঞতার, অমানুষিকতার, পরিচয় হয়ে ওঠে। সোবিয়েৎ সরকার তাই তাঁদের দৈন্য থেকে, অমর্য্যাদা থেকে, মুক্ত রাখবার জন্য এই সুব্যবস্থা করেছেন। এ যে মানবতার কত বড় পরিচয়, তা ফলিয়ে বলবার অপেক্ষা রাখে না। আমাদের দেশে তারাসুন্দরী, কুসুমকুমারীর মতো নিরুপমা অভিনেত্রী-দের, তুল্যশক্তির অধিকারী অভিনেতাদেরও, শেষ দিনগুলি যে কী অসম্মানের ভিতর দিয়ে অতিবাহিত করতে হয়েছে, আমার তা জানা আছে। আজকারদিনের অনেকের দুরবস্থাও আমার অজানা নেই। মানি, আজ কোন-কোন দুস্থ শিল্পীকে কিছু কিছু বৃত্তি দেওয়া হচ্ছে। কিন্তু তার জন্য বৃত্তি-প্রার্থীকে যে-পথ ধরে এগুতে হয়, তা আদৌ সম্মানজনক নয়। আমাদের মন্ত্রিরা মনে করেন, তাঁদের কাছে প্রার্থী হয়ে দাঁড়াবার সুযোগ দেওয়াই বৃত্তিপ্রার্থিদের সম্মান দেওয়া! শুধু যদি তাই হোতো, তবুও বাঁচোয়া ছিল। কিন্তু ওর আগে মন্ত্রীর আস্থাভাজন শিল্পীদের সার্টি-ফিকেট সংগ্রহ করতে হবে, পুলিশ-তদন্তে উত্তীর্ণ হতে হবে, তারপর মন্ত্রী যদি বোঝেন বৃত্তিপ্রাপ্ত ব্যক্তিকে তাঁর ব্যক্তিগত কাজে লাগানো যাবে, তাহলে এমন কিছু বৃত্তি দেওয়া হবে, যাতে করে মন্ত্রীর করুণার প্রচারণা হবে, কিন্তু বৃত্তিপ্রাপ্ত ব্যক্তির পরাশ্রিত হয়ে থাকবার অসম্মান থেকেই যাবে। এতে যে কী ক্ষতি করা হচ্ছে, তা বোঝবার সময় এসেছে। করুণার দানে নয়, পাবার অধিকারের স্বীকৃতিতেই রয়েছে শিল্পীর মর্য্যাদা। সোবিয়েৎ সরকার তাই করেছেন। ব্যক্তিগত বদান্যতার সঙ্গে তার পার্থক্য আকাশ-পাতাল।

যে আশ্রমটি দেখতে গিয়েছিলাম, তার পরিবেশটি চমৎকার। প্রাসাদোপম সেই বাড়িটি হয়ত এক সময়ে কোন ভাগ্যবানের বাড়ী ছিল। আমরা যে যাব, শিল্পীদের তা আগেই জানিয়ে দেওয়া হয়েছিল। তাঁরা প্রস্তুত হয়েই ছিলেন, কিছু জলযোগেরও ব্যবস্থা করে রেখেছিলেন। তাঁরা সবাই কিছু অথর্ব্ব নন।

দু-একজন তাঁদের অতীত অভিজ্ঞতা শোনালেন। তাঁরা জীবনে দুঃখও পেয়েছেন, আনন্দও পেয়েছেন। কিন্তু অতীতের দুঃখের দিনগুলি তাঁরা ভুলে গেছেন, আনন্দের দিনগুলির স্মৃতি দিয়েই মন ভরিয়ে রেখেছেন। তাঁরাই বল্লেন, এটি হোত না, যদি না সোবিয়েৎ সরকার এই নতুন ব্যবস্থা চালু করতেন। তাঁরা বল্লেন,সরকার এই ব্যবস্থা করেছেন বলেই ত নতুন নতুন প্রতিভা নিশ্চিন্ত মনে শিল্পের সাধনায় আত্মনিয়োগ করছেন। তাঁদের দিনে কত শঙ্কা নিয়েই না দিন কাটাতে হোতো। যদি নাটক না জমে, তাহলে চাকরি খতম হয়ে যাবে। ব্যর্থতার ছাপ তাঁদেরও কপালে দাগা হয়ে থাকবে, অপর কোন থিয়েটার সহজে কাজ দেবে না। আজকার আর্টিষ্টদের সে ভয় নেই। নতুন ব্যবস্থা নবাগতদের পক্ষেও যেমন ভালো হয়েছে, তাঁদের পক্ষেও তেমন ভালো হয়েছে।

—নতুন আর্টিষ্টরা আপনাদের শ্রদ্ধা করে?

—করে বৈকি! দলে দলে এসে আমাদের সঙ্গে দেখা করে, মন দিয়ে আমাদের আমলের কথা শোনে, আমাদের সময়কার অভিনয়-রীতি জেনে নেয়, ওদের রীতি বুঝিয়ে দেয়। ছেলে-মেয়েরা বড় বিনয়ী হয়েছে আজকাল।

—আপনাদের ছেলে-মেয়ে, নাতী-নাতনীরা?

—তারাও মাঝে-মাঝে আসে কত উপহার নিয়ে। আমরাও পাল-পার্ব্বণে তাদের আশীর্ব্বাদ করতে যাই।

আমরা বেশিক্ষণ বোসতে পারলাম না। ওর পরেই অরোরা জাহাজ দেখতে যেতে হবে। পেন্সন-প্রাপ্ত আর্টিষ্টদের সঙ্গে ওই স্বল্পকালের আলাপেই বুঝে এলাম জীবনের শেষ-কটা দিন তাঁরা সুখে, তার চেয়েও

বড় কথা, স-সম্মানে থাকতে পারবেন। কারু করুণার দানে বেঁচে রয়েছেন ভেবে তাঁদের মরমে মরে যেতে হবে না। মানুষকে এই মানসিক স্বস্তি দেওয়াই ত মানবতা।

ওখানে একটু দেরি হয়ে গিয়েছিল। তাই তাড়াতাড়ি ছুটলাম নেভার তীরে নৌ-বিদ্যালয়ের দিকে। তারই সামে ভূ-বিখ্যাত অরোরা জাহাজ আমাদের অপেক্ষায় রয়েছে। সিঁড়ি বয়ে যখন জাহাজে উঠ্‌-ছিলাম, উত্তেজনায় তখন বুক কাঁপছিল। অরোরা আজকার জাহাজ নয়। ১৯০৫ খৃষ্টাব্দে রুশ-জাপান যুদ্ধের সময় জারিষ্ট রুশিয়া জাপানকে প্রশান্ত সাগরের জলে তলিয়ে দেবার দুরাশা নিয়ে যে বল্টিক ফ্লিট পাঠিয়েছিল, অরোরা ছিল সেই ফ্লিটের ফ্ল্যাগ-শিপ। বল্টিক সাগর থেকে বেরিয়ে ব্রিটেনকে বাঁয়ে রেখে আফ্রিকার উত্তমাশা ঘুরে প্রশান্ত সাগরে পৌঁছুতেই তুশিমা প্রণালীতে জাপানী অ্যাডমিরাল টোগোর কৌশলে প্রায় সমগ্র বাহিনীটি ধ্বংস হয়ে যায়। সামান্য খান-কয়েক যা পালিয়ে আসতে পারে, অরোরা তাদেরই অন্যতম। আমার বয়েস তখন এগারো, বারো। তখন স্বদেশী আন্দোলন শুরু হয়ে গেছে। তাই তখন আমাদের কামনা ছিল জাপান জয়ী হোক। সেইজন্য খবরের কাগজে নিত্য বলটিক ফ্লিটের অগ্রগতির যে সংবাদ প্রকাশিত হোতো, তা আমরা বিশেষ ঔৎসুক্য নিয়ে পড়তাম। সেই বল্টিকফ্লিটের পলাতক একখানা জাহাজ প্রথম গোলাবর্ষণ করে অক্টোবর বিপ্লবের সাফল্যের সূচনা করে দিয়েছিল জানবার পর থেকেই যে-অরোরাকে কৈশোরে ঘৃণা করতাম, সেই অরোরার প্রতিই শ্রদ্ধান্বিত হলাম। কোথায় ছিল তখন রাশিয়া, আর কোথাই বা জাপান। কোন সংযোগই ছিল না আমাদের সঙ্গে। বল্টিক ফ্লিট আমরা চোখেও দেখিনি, আমাদের দেশ আক্রমণ করতেও তা আসেনি। তবুও তখনকার রাশিয়ার আর তার বল্টিক ফ্লিটের প্রতি আমাদের আন্তরিক ঘৃণা, আর জাপানের প্রতি আন্তরিক প্রীতি কেন আমাদের উত্তেজিত করে তুলেছিল? আর কেনই বা রুশের অক্টোবর বিপ্লব আর তাতে পরাজিত-পলায়িত অরোরার অংশ গ্রহণ আমাদের মনকে আনন্দে ভরিয়ে দিল? সোবিয়েৎ ত দেখলাম ১৯৫৫ খৃষ্টাব্দে, কিন্তু তারও কত আগে আমেরিকান সাংবাদিক জন রীড লিখিত 'টেন ডেজ্ দ্যাট শুক্ দি ওয়ার্ল্ড' যখন পড়েছিলাম, যখন পড়েছিলাম' ট্রট্স্কির 'দি হিষ্টরী অব দি রাশিয়ান রেভোলিউশন', থিয়োডোর ড্রেই-জারের 'ড্রেইজার লুকস্ য়্যাট রাশিয়া' যখন পড়েছিলাম, তখন থেকেই ওই রেভোলিউশনের প্রতি, ওই অরোরা জাহাজের প্রতি, লেনিন, ট্রট্স্কি, স্তালিনের প্রতি উদ্দেশে শ্রদ্ধা নিবেদন করেছিলাম—পরবশ ভারতের মুক্তি-সাধনার প্রাচীনতম ও পুরোধাতম কেন্দ্র ইংরেজের গড়ে তোলা এই শহর কোলকাতা থেকে।

অরোরা জাহাজের কাপ্তেন আর অফিসাররা আমাদের সাদর অভ্যর্থনা জানিয়ে জাহাজখানা ভালো করে দেখলেন, দেখালেন কোন কামানটা কোথা থেকে জারদের প্রাসাদের উদ্দেশে প্রথম গোলা ছুঁড়েছিল, শোনালেন সৈনিকরা কখন বিদ্রোহ করেছিল।

সব দেখে-শুনে নেমে আসছি, এমন সময় পশ্চিমবঙ্গ শান্তি সংসদের সম্পাদক, অধ্যাপক কল্যাণ দত্ত ডেক্ থেকে ডেকে ফিরিয়ে বল্লেন—ওঁদের ধন্যবাদ জানাতে হবে যে।

চেয়ে দেখলাম কাপ্তেন তাঁর অফিসারদের এবং সৈনিকদের নিয়ে এক জায়গায় জড়ো হচ্ছেন। সময় নষ্ট না করে আমরা তাঁদের কাছে এগিয়ে গেলাম এবং ধন্যবাদ জানিয়ে আমি বল্লাম—পৃথিবীর অনেক জাহাজের নাম নানা কারণে ইতিহাসে অমর হয়ে রয়েছে, যেমন ড্রেকের 'পেলিকান', নেলসনের 'ভিক্টরী', 'নেপোলিয়ানের' আশ্রয়দাতা ইংরেজের 'বেলারফোন', উত্তরমেরুর অন্যতম আবিষ্কারক কাপ্তেন স্কটের 'টেরানোভা', জার্ম্মান মাইনে নিমজ্জিত 'টাইটানিক', বিশ্বত্রাস 'এমডেন' প্রভৃতি। তাদের কেউ সাম্রাজ্যবাদের, কেউ দেশ আবিষ্কারের, কেউ বিশ্বাসঘাতকতার, কেউ অসহায়তার, কেউ দুরন্ত দস্যুপনার জন্য স্মরণীয় হয়ে রয়েছে। কিন্তু সমগ্র একটা জাতির মুক্তধারার প্রস্তর-বাঁধ ভেঙে দেবার কৃতিত্বের পরিচয় দিয়ে বিশ্বের প্রপীড়িত মানুষের অন্তরের শ্রদ্ধা অর্জন করেছে তোমাদের এই 'অরোরা।' অরোরাকে এই গৌরব তোমরাই দিয়েছ। তাই প্রকৃত গৌরবের অধিকারী তোমরা। আজ অরোরার ডেকে তোমাদের পাশে দাঁড়িয়ে সদ্য শৃঙ্খল-মুক্ত জাতির এই সমবেত নর-নারী আমরা, নিজেদের ধন্য মনে করছি। তোমাদের জয় হোক্, আমাদেরও জয় হোক্, পৃথিবীর পরবশ জাতি-সমূহের জয় হোক্।

অরোরার কাপ্তেনকে আর অফিসার ও সৈনিকদের স্মারক হিসেবে একটি করে ভারতীয় শান্তি সংসদের ব্যাজ দিয়ে আমরা বিদায় নিলাম।

বিকেলে বেরুলাম জারদের 'সামার প্যালেস্', অর্থাৎ গ্রীষ্মকালীন প্রমোদ-প্রাসাদ দেখবার উদ্দেশ্যে। ও-দেশে গ্রীষ্ম আর বসন্ত হাত ধরাধরি করে আবির্ভূত হয়। গ্রীষ্ম দাহ আনেনা, শীতক্লিষ্ট দেহ-মনে উষ্ণ পরশ দেয়। আর তখনই বসন্ত জাগিয়ে দেয় জীবনকে নতুন করে ফলিয়ে তোলবার উল্লাস। তখনই ওরা বেরিয়ে পড়ে নানা-ধরণের প্রমোদ-উৎসবের প্রমত্ত-আহ্বানে। বসন-ভূষণ, যতটা পারে, তখন ওরা ছুঁড়ে ফেলে দেয়। তখন ওদের সবচেয়ে কামনার বিষয় হয় জল-কেলি,—অবগাহন, আর সন্তরণ। আমরা, যারা ভারতবর্ষ থেকে যাই তারা, কিন্তু শীতের শিহরণ অনুভব করি।

লেলিনগ্রাদ থেকে মাইল কয়েক দূরে ফিনল্যাণ্ড উপসাগরের কূলে জারদের এই গ্রীষ্মাবাস, সামার প্যালেস। প্রাসাদটি দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে জার্ম্মানরা কিছুটা ভেঙে দিয়েছিল। এখন মেরামত হচ্ছে। প্রাসাদটি অনেক উঁচুতে, মনে হয় কোন পাহাড়ী টিলার মাথা সমতল করে ওটি তৈরী হয়েছে। প্রাসাদের বাড়িটি দেখে তেমন অভিভূত হইনি। কিন্তু ওর সাম্নেকার প্রাসাদ-চত্বরে দাঁড়িয়ে যে দৃশ্য দেখা যায়, তা মনোমোহন। ফিনল্যাণ্ড উপসাগর আর প্রাসাদ-ভবনের ব্যবধান সৃষ্টি করে রয়েছে একটি সুবিস্তৃত প্রমোদ-কানন। সে-কানন ফুলের বাগিচা নয়, পল্লব-ঘন শাখাবহুল শ্যাম বৃক্ষরাজীর সমারোহ। তাদেরই মাঝে-মাঝে প্রশস্ত পথ, আর উৎক্ষিপ্ত কৃত্রিম ফোয়ারা। প্রাসাদের উচ্চ পদমূলে দাঁড়িয়ে

দেখা যায় নানা জাতীয় জল-জীবের মুখ থেকে শত ঝর্ণাধারায় উৎক্ষিপ্ত জল-কণা বাতাসে বিচ্ছুরিত হয়ে নীচে ঝরে পড়ে একটি স্রোতস্বিনী সৃষ্টি করছে, যা দুইকূলের প্রস্তর-বাঁধের ভিতরে নিজেকে সংযত রাখতে বাধ্য হয়ে সোজা চলে গিয়েছে উপসাগরের নীলাম্বু-সঙ্গমের ব্যাকুলতায়। তারই দুই পাশে রয়েছে দুইটি প্রশস্ত ঈষৎ-রক্তাভ প্রোমেনাদ' বা অলস-বিহার-বীথি। প্রাসাদ থেকে সাগর পর্য্যন্ত ওদের বিস্তৃতি!

এই পার্কে আর প্রোমেনাদের, নানাধরণের ফোয়ারা, আর উপসাগরের নিবিড় নীলিমার যাদুই হচ্ছে সামার প্যালেসের আকর্ষণ। সত্যই দৈনন্দিন জীবনের নানা বঞ্চনা-বেদনা-গ্লানি মন থেকে মুছে দেয় ওখানে কিছুকাল থাকবার সুযোগ পেলে। অতীতে জনসাধারণের ওর ত্রিসীমানায় পা দেবার, ওর নিকটবর্ত্তী জন-পথে ভিড় করে দাঁড়াবার, ওর অতিথিদের দূর থেকেও চোখে দেখবার অধিকার ছিল না। শুধু দাস-মজুররা মাথা নীচু করে কাজ করতে করতে শস্ত্রপাণি প্রহরীদের দৃষ্টি এড়িয়ে চকিতে চেয়ে চেয়ে দেখত জার-পরিবারের, জার-অনুগ্রহপ্রাপ্ত নর-নারীর ন্যায়-নীতি বিহীন পানোন্মত্ত উচ্ছৃঙ্খলতা, কখনো কখনো বৈধ-অবৈধ মিলন-বিচ্ছেদের মর্ম্মন্তুদ নাট্যাভিনয়।

আজ সমাজের জীবন-রস শুষে নিয়ে পুরষ্টু হওয়া সেই পরগাছাদের অস্তিত্ব অপসৃত। তাই আজ এই প্রাসাদের আর পার্কের দ্বার সকলের জন্যই খোলা রাখা হয়েছে। শুধু খোলা রেখেই কর্ত্তব্য খতম করা হয়নি, মিল-ফ্যাক্টরীর, ক্ষেত-খামারের, আপিসের-বাজারের কর্মীরা যাতে মাঝে-মাঝে এখানে এসে এক-ঘেয়ে জীবনের অবসাদ দূর করতে পারে, ওদের ইউনিয়নগুলিকে তারও নির্দ্দেশ দেওয়া রয়েছে। এও মানবতা।

পার্কের মাঝে প্রস্তরখণ্ড সমাচ্ছন্ন একটা স্থান আছে। অতর্কিতে তা অতিক্রম করবার সময় পায়ের চাপে কতগুলো গুপ্ত ফোয়ারার মুখ খুলে গিয়ে জলধারা উৎক্ষিপ্ত হয়। আর একটি যায়গায় ছত্রাকৃতি একটি বেদী ঘিরে রয়েছে অনেকগুলি গুপ্ত ফোয়ারা। তাদের মুখ আপনা থেকে খুলে যায়, বন্ধ হয়। ফোয়ারার উৎক্ষিপ্ত সেই জল এড়িয়ে বেদীতে যাওয়া এবং বেদী থেকে নেমে আসা আর একটি কৌতুকপ্রদ জল-ক্রীড়া। এই দুইটি যায়গাতেই ছেলে-মেয়ের, যুবক-যুবতীর, বৃদ্ধ-বৃদ্ধার ভিড় লেগেই থাকে। তাদের কল-হাস্য, মিথ্যা শঙ্কার শিহরণ, অঙ্গের নৃত্য-রঙ্গ তারা নিজেরাও উপভোগ করে, দর্শকদেরও উপভোগ করবার সুযোগ দেয়।

তিন ঘণ্টা কাল সামার প্যালেসের পার্কে প্রোমেনাদে ঘুরে ঘুরে ক্লান্ত হয়ে আমরা হোটেলে ফিরে এলাম। সাপারের পর আবার অপেরা।

ক্রমশঃ

জাপানে সমবায় সমিতি

অণিমা রায়

ভারতের জাতীয় সরকার ও নিখিল ভারত কংগ্রেস বহু গবেষণার পর এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন যে ভারতবাসীর সমবেত ও সমবায়িক চেষ্টা ছাড়া দেশের ও দেশবাসীর অর্থনৈতিক উন্নতি হতে পারে না। ভারতবাসীর শতকরা প্রায় সত্তরজন গ্রামবাসী কৃষক। কৃষি বা তৎ-সংশ্লিষ্ট কাজ তাঁদের জীবিকা উপার্জনের উপায়। কাজেই কৃষি বা কৃষকের অবস্থা উন্নীত করবার জন্য জাতীয় সরকার সারা ভারতে গ্রামে গ্রামে কৃষি সমবায় সমিতি গঠন করবার সঙ্কল্প গ্রহণ করেছেন। কাজ আরম্ভ হয়ে গেছে এবং দেশবাসীকে সমবায়-ভাবাপন্ন করবার জন্য গ্রামে গ্রামে "সারভিস কো-অপারেটিভ" বা সেবা সমবায় সমিতি স্থাপন করা হচ্ছে। আমাদের গণতান্ত্রিক দেশ; এখানে বলপূর্ব্বক কাহাকেও কোন কাজ করতে বাধ্য করা হয় না। দেশবাসীকে বুঝিয়ে তাঁদের দ্বারা "সারভিস-কো-অপারেটিভ" গঠন করা হচ্ছে। এই সম্পর্কে আর একটি গণতান্ত্রিক দেশ জাপানে কিভাবে সমবায় সমিতিগুলি কাজ করছে এবং কতটা সফল হয়েছে তা আলোচনা করা এই প্রবন্ধের উদ্দেশ্য।

ক্রেতা সমবায় সমিতি, কৃষি সমবায় সমিতি, সমাজ-কল্যাণ-সমবায় সমিতি প্রভৃতি বিভিন্ন রকমের সমবায় সমিতি নিয়ে জাপানে মোট ৭৩,০০০ প্রাথমিক সমবায় সমিতি আছে। এইসব সমিতি জাপানের সামাজিক ও অর্থনৈতিক জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে সেবার কাজ ক'রে থাকে এবং জাপানের জাতীয় জীবনে একটি বিশিষ্ট ও গৌরবের স্থান অধিকার ক'রে আছে।

সমস্ত দেশটিকে ছোট ছোট সমবায়িক অঞ্চলে ভাগ ক'রে নিয়ে প্রতি অঞ্চলে একটি করে নানার্থক সমবায় সমিতি স্থাপন করা হয়েছে। যতদূর সম্ভব জাপানের প্রতি কৃষক পরিবার নিজের আঞ্চলিক সমবায় সমিতির সদস্য হয়েছেন। জাপানের ৪৬টি প্রদেশ বা জেলার (Prefecture) প্রায় প্রত্যেকটিতে স্থানীয় বিভিন্ন রকমের প্রাথমিক সমবায় সমিতিগুলি নিজ নিজ প্রাদেশিক সমবায় সংঘ গঠন করেছে। বিভিন্ন বিষয়ের প্রাদেশিক সমবায় সংঘগুলি মিলিত হয়ে কতকগুলি জাতীয় সমবায় সংঘ তৈরি করেছে। উপস্থিত জাপানে এইরকম ২৩টি বিভিন্ন বিষয়ের জাতীয় সমবায় সংঘ আছে। এদের মধ্যে কেন্দ্রীয় কৃষি সমবায় সংঘ এবং জাতীয় বিক্রেতা সমবায় সংঘগুলি নিজ নিজ ক্ষেত্রে বিশেষ

কল্যাণপ্রদ ও গুরুত্বপূর্ণ কাজ করছে। জাতীয় সমবায় ব্যাঙ্কটিও এইসব সমবায় সমিতিগুলিকে বিশেষভাবে সাহায্য করে। সমবায় আন্দোলন সম্পর্কে কতকগুলি প্রয়োজনীয় পুস্তিকা প্রকাশ ক'রে রাগানোহিকার সংঘ নামক একটি সমবায়িক প্রতিষ্ঠান সমবায় সমিতিগুলিকে পথপ্রদর্শন ক'রছে।

বিভিন্ন রকমের সমবায় সমিতিগুলির কার্যাবলীর বিস্তারিত বিবরণ দেওয়া এ প্রবন্ধে সম্ভব নয়। জাপানে সমবায় আন্দোলনের অগ্রগতি সম্বন্ধে কিছু প্রয়োজনীয় তথ্য এ প্রবন্ধে দেওয়া হবে।

জাপানে কৃষিফসল উৎপাদন বৃদ্ধি দ্বারা জনসাধারণের জীবনযাত্রার মান উন্নীত করবার জন্য ১৯৪৮ সালে জাতীয় বিক্রেতা সমবায় সংঘগুলি প্রতিষ্ঠিত হয়। উপস্থিত এই সংঘগুলির মোট মূলধন ৬ কোটি টাকা। সংঘগুলি কিন্তু নিজ সদস্যদের হিতার্থে কোটি কোটি টাকা মূল্যের জিনিষপত্র কেনাবেচা করে। সংঘগুলি সদস্যদের জন্য সার, পশুখাদ্য, কৃষি সম্পর্কিত নানাবিধ হাতিয়ার প্রভৃতি ক্রয় করে এবং ধান, গম, যব, ডিম এবং ফল প্রভৃতি নানাবিধ কৃষিজাতদ্রব্য উচিত মূল্যে বিক্রয় করে। সবচেয়ে বড় কথা যে এইসব সংঘের যাবতীয় কাজকর্ম সদস্যেরা বিনা পারিশ্রমিকে সম্পন্ন করেন। সদস্যরা সংঘগুলির কাযে এতদূর সন্তুষ্ট হয়েছেন যে তাঁদের সঞ্চিত অর্থ সংঘগুলিতেই জমা দেন। এর দ্বারা সংঘগুলিকে কখনও অর্থকষ্ট ভোগ ক'রতে হয় না এবং তাদের মূলধন বেড়ে যায়। সদস্যরা অবশ্য বছরের শেষে নিজ নিজ মূলধন অনুযায়ী অধিবৃত্তি (Bonus) পেয়ে থাকেন।

জাপানে প্রাথমিক সমবায় সমিতিগুলি জাতীয় জীবন গঠনে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অংশ গ্রহণ করেছে। সেগুলি নিজ নিজ অঞ্চলে অর্থনৈতিক অবস্থার বিশেষ উন্নতি সাধন করেছে। এই সমবায় সমিতিগুলির কাছ থেকে কৃষকরা অল্পদিনের জন্য ঋণ গ্রহণ করেন। অবশ্য এই ঋণ বাবদ সমিতি কৃষকদের নগদ টাকা প্রায় দেয় না—কৃষির জন্য নানাবিধ প্রয়োজনীয় উপাদান ঋণ হিসাবে কৃষকেরা সমিতির নিকট পান। যাঁদের সমিতির কাছে সুখ্যাতি আছে সেই সব কৃষক ঋণের আবেদন-পত্র আঞ্চলিক সমবায়-অধ্যক্ষ দ্বারা সুপারিশ করিয়ে নিলে সঙ্গে সঙ্গে ঋণ পান। সুপারিশও সঙ্গে সঙ্গেই পাওয়া যায়। সচরাচর আবেদন পত্র পেশ করবার দু'মাস পরে কৃষকেরা ঋণ পান।

ঋণ বণ্টন ছাড়া প্রাথমিক সমিতিগুলি কৃষির উপকরণসমূহ পাই-কারী বাজারে কম মূল্যে কিনে সদস্যদের বাজারের চেয়ে নিচুদরে বিক্রয় করে। আবার বছরের শেষে সদস্যদের কেনাদামের উপর কিছু বাটা (Rebate) দেওয়া হয় এবং কখনও কখনও এই বাটা কেনা-দামের শতকরা ৩০ টাকা পর্যন্ত হয়। প্রতি সমবায় সমিতির চাল রাখ-বার জন্য গুদাম থাকে। জাপানে চাল অত্যন্ত দুষ্প্রাপ্য ব'লে জাপান সরকার কৃষকদের কাছ থেকে সমবায় সমিতিগুলির মাধ্যমে চাল কেনেন। প্রতি সমবায় সমিতির কতকগুলি লরী থাকে। এই লরী যোগে সমিতি সদস্যদের কাছে তাদের কেনা মাল পাঠায় এবং সদস্যরা যেসব কৃষিফসল সমিতিকে বিক্রয় করে সেগুলি সদস্যদের আবাদ থেকে নিয়ে আসে। একটি ভাল সমবায় সমিতির ১০৯টি লরী থাকে। প্রাথমিক সমবায় সমিতিগুলি সদস্যদের বীমার কাজও ক'রে থাকে।

এইবার একটি সমাজ কল্যাণ সমবায় সমিতির বিষয় বলা হবে। এই সমিতিটি কামোতে অবস্থিত। সমিতিটি একটি সমবায়িক হাস-পাতাল এবং এই হাসপাতালটি আরও ৯টি হাসপাতাল পরিচালনা করে। এই চিকিৎসা সম্বন্ধীয় সমিতি বা হাসপাতালটি ১৯৪৭ সালে সামান্যভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়। এখন হাসপাতালটিতে ২১৯টি রোগি-শয্যা আছে এবং ২জন চিকিৎসক, ৭জন সহকারী চিকিৎসক ও ৫জন সেবিকা এখানে কাজ করেন। এই হাসপাতালটিতে ৬২,৬২৯ জন বিভিন্ন রোগাক্রান্ত রোগী রোগমুক্ত হয়েছেন এবং প্রায় দু'লক্ষ রোগীকে ঔষধ দিয়ে চিকিৎসা করা হয়েছে। হাসপাতালটি খরচখরচা বাদ গত বছরে ১৭ লক্ষ ইয়েন লাভ করেছিল এবং এই বছরে ৪০ লক্ষ ইয়েন লাভ করেছে।

জাপানের এই সমবায় সমিতিগুলি দেশটির অর্থনৈতিক অবস্থা বিশেষভাবে প্রভাবান্বিত করেছে। সমিতিগুলির উদ্যমে দেশে উৎপাদন বৃদ্ধি হয়েছে এবং জাপানীদের সুখ স্বাচ্ছন্দ্য যথেষ্ট রকমে বেড়ে গিয়েছে। বিগত মহাযুদ্ধের পর থেকে আজ পর্যন্ত সময়ের মধ্যে জাপানের জাতীয় আয় যে শতকরা ৬০ভাগ বেড়ে গিয়েছে তার মূলে আছে এই সমিতি-গুলির অদম্য প্রচেষ্টা এবং প্রগাঢ় কর্তব্যানুরাগ। জাপানের এই সম-বায়িক প্রচেষ্টা দরিদ্র ভারতবাসীর অনুকরণ করা উচিত।

হীরেন্দ্র নারায়ণ মুখোপাধ্যায়

(পূর্বপ্রকাশিতের পর)

এক কথায় রাজী হয়েছে অতসী। কোন আপত্তি করেনি।

পদ্ম বিস্মিত হয়েছে। ও ভাবতে পারেনি। ভাবতে পারেনি যে, কোন প্রতিবাদ না ক'রে অতসী এক কথায় ছেড়ে দেবে ঘরখানা।

কী-ই বা জিনিস ছিল! শানকি মাদুর ছেঁড়া-কাঁথা তেলচিট-ধরা একটা বালিশ আর মাটির দুটো কলসী-হাঁড়ি। বিকেলেই অতসী বগলে করে তার জিনিসগুলো নিয়ে গিয়ে ফেলেছে পদ্মার দরজার সামনে।

নিবারণ তখনো বাড়ী ফেরেনি। অফিস-ফেরতা খদ্দেরদের রোক বুঝে কোন রাস্তার মোড়ে বসে হয়তো বেসাতিগুলো নাড়াচাড়া করে উল্টে-পাল্টে সাজাচ্ছিল।

পদ্ম যেন উথলে উঠেছিল। উল্লাসে ঝকমকিয়ে উঠেছিল ওর চোখদুটো।...কাঙাল হলে কি হয়! আমি জানি, মন তোর রাজরাণীর মতন: প্রসন্ন দৃষ্টিতে পদ্ম বার-বার চেয়েছিল অতসীর মুখপানে।

অতসী কোন উত্তর দেয়নি।

পুঁটি গয়লানি মুখটিপে হেসেছিল। ঘর থেকে বেরিয়ে এসে দাঁড়িয়েছিল ফালি উঠানটার একপাশে:

কি লো পদ্ম! মালাচন্দন করবি নাকি?...কণ্ঠিবদল?

হাঁ। আগে পলতে পোড়াই, তারপরে করবো: বলতে বলতে পদ্ম জিনিসগুলো টেনে টেনে এঘর থেকে ওঘরে পার করেছিল।

সরষে-পড়া পড়েছিল পুঁটির মাথায়। সরষে-পড়া ছাড়া আর কি! পলতে পুড়িয়ে পারার ধোঁয়া দিয়েই তো ওর ব্যামো সারিয়েছিল বাবাজী।...মাগি নিজে যেন সাতধোয়া আতপ চাল! ছেলে খেয়ে জনম গেল, পরকে বলে ডাইনি।

অতসী মুখ তুলে একবার চেয়েও দেখেনি। ওর চোখ দুটো আটকে ছিল ছেড়ে-যাওয়া ঘরখানার গায়ে। খাপরা-খোলায়-ছাওয়া এঁদো বস্তির ওই সাঁৎসেঁতে ঘরখানায় যেন ওর জীবনটা আঠার মত জড়িয়ে আছে! ওর বাবা, খোকা, দীনু—ওরা আজ আর নাই কেউ। বাবা মুক্তি পেয়েছে। দীনু আবার ছিটকে পালিয়েছে, কোন্ পথে কে জানে।...আর খোকা!...ওই ঘরের মেঝেয় বুক পেতে রাতদিন কলবল করে হাতপা ছুঁড়তো খোকা।

কাঁদবে না ভেবেও অতসী পারে না চোখের জল আটকে রাখতে। বুকের ভিতরটা মোচড় দিয়ে ওঠে।...খোকা মরেছে। ওর বুকের দুধ যখন শুকিয়ে কাঠ হয়েছিল, দেহে একফোঁটাও রক্ত ছিল না, খোকার চোয়াল দুটো হয়তো জমে গিয়েছিল ভোক-ছাঁদিতে। নিবারণ মরা ছেলেটাকে বুকের ওপর থেকে টেনে নিয়ে গিয়ে পুড়িয়ে এসেছে নিমতলার ঘাটে। ওর তখন সোর-সংজ্ঞাও ছিল না। নইলে যাবার বেলায় একবার দেখে নিত খোকার মুখখানা।

নিবারণকে অনেকবার সে জিজ্ঞেস করেছে খোকার কথা। নিবারণ খোলসা বলেনি কোন দিন। হয় এড়িয়ে গিয়েছে, না-হয় বলেছে—হাসপাতালে দিয়ে এসেছে খোকাকে! কিন্তু মায়ের মনকে ক'দিন ফাঁকি দিয়ে রাখবে?

কি লো অতসী, অমন ক'রে বসে রইলি যে! জিনিস-গুলো ঘরে তোল।

তুলি: ভিজে মনটা নিংড়ে নিয়ে অতসী উঠে দাঁড়িয়েছিল।

পদ্ম এসেছিল ওকে সাহায্য করতে। কিন্তু অতসী বাধা দিয়েছিল: কী-ই বা আছে যে গোছাতে লোক লাগবে পদ্মদিদি!...ও আমি নিজেই পারবো। তার চেয়ে

বরং তোমার ঘরখানাই গুছিয়ে দিইগে চলো। জিনিস-পত্তর তো কম করো নি তুমি!

পদ্মর মুখখানা খুসীতে ভরে উঠেছিল। সত্যি, জিনিস ও কম করেনি। ফেরিওয়ালার ঘাড় ভেঙে সাধ মিটিয়ে নিয়েছে অনেক কিছুর। সেইটাই বড় কথা নয়। তার চেয়ে বড় হয়েছিল অতসীর মুখ থেকে এই কথা শোনা।...পদ্ম জানতো যে, ফেরিওয়ালাকে নিয়ে ঘর-করা অতসী ভালো চোখে দেখেনি কোনদিন। পদ্ম ঘনিয়ে ঘনিয়ে দশবার ওর ঘরে গেলেও, অতসী একটী-বারের জন্যেও পা দেয়নি তার ঘরে। মনে মনে অতসীকে ও হিংসে করেছে। কিন্তু অতসী কখনো ওর মুখের দিকে চোখ তুলে তাকায় নি।

এখন আর পদ্মকে ভয় করে না অতসী। ভয় করতো, যতদিন দীনু ছিল ওর কাছে, খোকা ছিল ওর বুকে।... গায়ের জ্বালায় কম করেনি পদ্ম।...কিন্তু আজ! আজ আর কি আছে ওর, যা পদ্ম ছিনিয়ে নেবে?...সবই গিয়েছে। তবুও আক্রোশ যায়নি ওই গল্পকাটির। অতসী একখানা ফর্সা কাপড় পরলেও যেন জ্বালা ধরেছে সংসারিরি গায়ে। সইতে পারেনি। ভাদুরে কুকুরের মতন দাঁতে চিবিয়ে টুক্‌রো-টুকরো করেছে ওর শাড়ির আঁচলা।...তবু যদি কেনা হতো, না জানি কি করতো হতচ্ছাড়ি!

এবার রেহাই পেয়েছে অতসী। নতুন ঘরকন্না নিয়ে পদ্ম ব্যস্ত হয়ে উঠেছে। রাতদিন গুনগুন সুরে গান করে আর ঘর সাজায়। পাশাপাশি দুখানা ঘর: ওর আর নিবারণের। বিকেল হলে রান্নার ধুম পড়ে।

নিশ্চিন্ত হয়েছে অতসী। নিবারণের কাছে ও ছিল ঋণী। অনেক করেছে নিবারণবাবু। কিন্তু অতসী পারে নি সে ঋণের এককণাও শুধতে।...নিবারণবাবু দু'পয়সা আনে আজকাল। পদ্ম নিজের হাতে রান্না করে। তরিবত করে খাওয়ায় সামনে ব'সে।...অতসীর মনটা হালকা হয়। তৃপ্তিতে ভরে উঠে।

ক'দিন ধরে নিবারণবাবু যেন চোরের মতন যায়-আসে। কখন বাসায় ফেরে, অতসী টেরও পায় না। ভোরবেলায় অতসী যখন বেরিয়ে যায়, ওদের তখনো ঘুম ভাঙে না। অতসী ইচ্ছা করেই তাকায় না ওর পুরানো ঘরখানার দিকে। হয়তো দেখবে, পদ্মর দরজাটায় তালা দেওয়া আছে। না হয়, নিবারণের ঘরে ঝুলছে তালা।... নিবারণ যে এত ছোট হয়ে যাবে, অতসী তা ভাবতে পারেনি।...ভদ্দরলোকের ছেলে। একবার হয়তো ভুল করেছিল। পারতো আবার সামলে নিতে। কিন্তু হলো না। চোরা টানে তলিয়ে গেল এই বস্তিতে পা বাড়িয়ে। কতটুকুই বা সাধ্য তার! তবুও অতসী প্রাণপণ চেষ্টা করেছিল নিবারণকে শুধরে দেবার। কিন্তু তা হবার নয়।...যা করেছে, তার বেশী আর কিই বা উপায় ছিল তার!

নিবারণবাবু যেন আপনা থেকেই পিছিয়ে গেল। তবুও ভাল যে ভিকিরি হয়ে গেল না।

পদ্ম রোজই জিজ্ঞেস করে: কি লো, কাক-কোকিল না ডাকতে যাস কোথা? না, মাঝ-রাতেই উঠে পালাস দরজায় কুলুপ দিয়ে!

যেদিন যেমন হয়: অতসী হাসিমুখে উত্তর দেয়।

ইচ্ছা থাকলেও পদ্ম পারে না তার বেশী কিছু জিজ্ঞেস করতে। ওর মনের সেই কাল কেউটে যেন আপনা থেকেই ফণাটা নীচু করে আজকাল।...ঘরখানা ছেড়ে দিয়েছে অতসী। একবারের বেশী দু'বার বলতে হয়নি। শুধু হারমানা নয়, মাথাটা ওর বিকিয়ে গিয়েছে অতসীর কাছে।

অতসী ভালোবাসেনি নিবারণকে। কেমন ক'রে তা সম্ভব হলো, পদ্ম ভাবতে পারে না। কিন্তু নিবারণের চোখেমুখে সে দেখেছে অতসীর গা-চাটা চনমনানি। পদ্মর সারা-গা নিস্‌পিস্ করে উঠেছে। অতসী গায়ে মাখেনি। কিন্তু পদ্ম দিনের পর দিন অধীর হয়ে উঠেছে।

পুঁটি গয়লানি পদ্মকে খোঁচা দিতে ছাড়ে না। ফাঁক পেলেই চুটকি কেটে বলে: দেখিস লো! গুড়ের হাঁড়িতে পিঁপড়ে না ঢোকে।

পদ্ম উত্তর দেয় না। মুখ ফিরিয়ে কাজে মন দেয়। আগে একবেলা রাঁধতো, এখন দু'বেলা রাঁধে।

আর অতসী! রোজ ভোরে বেরিয়ে যায়। সন্ধ্যা

ছ'টায় ফিরে আসে। কোনদিন রাঁধে। কোনদিন বা পান্তা খেয়ে, মাদুর খানা বিছিয়ে গা ঢেলে দেয়।

পদ্ম সন্ধ্যাবেলায় মাঝে মাঝে উঁকি দিয়ে যায় ওর ঘরে : একবাটি চা দেবো অতসী ?

না।

চা অতসী খায় না। পদ্ম জানে। তবুও রোজ জিজ্ঞেস করে একবার।

নিবারণ যখন দিনান্তের ফেরি সেরে বাসায় ফেরে, তখন সন্ধ্যা উৎরে যায়। বেসাতি নামিয়ে, হাতমুখ ধুয়ে চোরা-পায়ে একবার চালাঝিতে এসে দাঁড়ায়। হয়তো কান পেতে শুনবার চেষ্টা করে অতসীর শ্বাস-প্রশ্বাসের শব্দ। পদ্মর ভয়ে পারে না ওর ঘরে পা বাড়াতে।... অতসী যেন দিনদিন দূরে সরে যায়।

সকাল সাতটায় বাজে কারখানার বাঁশী। যক্ষপুরীর সিংদরজার মত বিরাট ফটকটা খুলে যায়। অসংখ্য মানুষ কিলবিল ক'রে ঢোকে আপন আপন টিকিট হাতে নিয়ে। ওপাশে পুরুষদের কারখানা, এ পাশে মেয়েদের। পুরুষেরা ভারি ভারি মাল তোলা-নামানো কাজ করে। মেসিন চালায়। বড় বড় লরিতে বোঝাই দেয় রকমারি মালের পেটি। আর মেয়েরা কাজ করে খেলনা তৈরির কারখানায়। কেউ ঢালাই করা পুতুলের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গগুলো জোড়া দেয়। কেউবা লেবেল আঁটে; টিকিট লাগায়। চুম্‌কি-জরি বসিয়ে রঙীণ কাপড়ের টুক্‌রো দিয়ে ডল-পুতুলের পোষাক তৈরি করে।

দেখতে দেখতে সারা যক্ষপুরী গমগম ক'রে ওঠে কর্ম-চঞ্চল মানুষের ক্ষিপ্রতায়। বড় বড় হল ঘরগুলো থেকে মেসিনের শব্দ ছড়িয়ে পড়ে কারখানার অপর প্রান্তে। বেলা যত বাড়ে, মানুষের শব্দ তত কমে আসে। কাজের স্রোত বইতে সুরু করে ওদের শিরায় শিরায়।

অতসীর কাছে এ যেন এক নতুন পৃথিবী। কান্না নাই। বিরাম নাই। হতাশা নাই। কেউ কারো মুখ-পানে চেয়ে হাত পেতে হা-পিত্যেশ ক'রে বসে থাকে না। ওরা হাতে হাতে কাজগুলো বিলি ক'রে দিয়ে যায়। আবার সময় হলে তৈরি মাল বুঝে নেয় গুণ্‌তি ক'রে।

অতসী যেদিন হাঁটতে হাঁটতে সহরের সীমানা ছাড়িয়ে এসে পৌঁচেছিল এই কারখানার ফটকে, সেদিন সে ভাবতেও পারেনি যে এমনি ক'রে এসে বসবে এই সব জ্যান্ত মানুষের সঙ্গে—পাশাপাশি একই জায়গায়।

তখন সবে সূর্য উঠেছে। পূবের আকাশ লাল হয়ে উঠেছে সোনালি আলোয়। অতসী চলতে চলতে থমকে দাঁড়িয়েছিল ফটকটার এক পাশে। রাজবাড়ীর সদর দেউড়ির মত প্রকাণ্ড ফটকটার সামনে সারবন্দী মেয়ে-পুরুষদের দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে, অতসী ভেবেছিল—হয়তো ভিক্ষের বার, না-হয় কাঙালী বিদায় হবে।

কাঙালীই তো! ওরই মত গরীব সব। কিছু পাওয়ার আশায় ভিড় জমিয়েছে এসে ধনীর সিংদরজায়।

হঠাৎ যেন বিদ্যুৎ খেলে গেল অতসীর মনের আকাশে : দীনু!...দীনু নাই তো ওই পুরুষগুলোর মাঝখানে ?

না।...নাই। নাই দীনু।...অতগুলো পুরুষ এসে দাঁড়িয়েছে ফটকটার ওপাশে। কিন্তু কারো মুখের সঙ্গে দীনুর মুখ মেলে না। অমন চোখ, অমন ধারালো নাক-মুখ ওরা পাবে কোনখানে! দীনু তো ওদেরই মত হা-ভাতের ঘরে জন্মায় নি।

হয়তো দীনু বেঁচে নাই। একমুঠো ভাতের নাকাল সইতে না পেরে অপঘাতী হয়ে মরেছে।...নিজে মরেছে। ছেলেটাকেও কোলটান দিয়ে ছিনিয়ে নিয়েছে ওর বুক থেকে।...বেঁচে থাকতে একটী বারের জন্যেও ছোঁয়নি খোকাকে। একদিনও নেয়নি কোলে তুলে। কিন্তু মরবার পর আর সবুর সইল না। শেষ চিহ্নৎ-টুকুনও ধুয়ে মুছে দিয়ে গেল।

অতসী যে কতক্ষণ স্থাণুর মত দাঁড়িয়েছিল লোকগুলোর পিছনে, সে খেয়ালও ছিল না তার। ওর সংবিৎ ফিরে এলো, যখন লম্বা ভদ্রলোকটি এগিয়ে এসে জিজ্ঞেস করলেন :

কাজ করবে তুমি ?

কাজ!

হাঁ।

বিহ্বল দৃষ্টিতে কিছুক্ষণ তাঁর মুখপানে চেয়ে থেকে

অতসী বলেছিল: কি কাজ করবো বাবু? আমরা গরীব ভিকিরি। কাজ তো জানি না কিছু।

জানো না, শিখে নেবে। কারখানায় কাজ করলে, বারো আনা রোজ পাবে। ভালো কাজ শিখলে, আরও মাইনে বাড়বে।

হবে?…শিখে নিলে হবে? আমি পারবো।…দেবেন বাবু আমাকে কারখানার কাজ?

দেবো।

মুহূর্তে অতসীর চোখ-মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠেছিল আশার আলো দেখে। ভিক্ষে নয়।…কারখানার কাজ। আরো পাঁচজনের মত হাত-পা নেড়ে বাঁচবে ও। ভিক্ মেগে বেড়াবে না লোকের দরজায় দরজায়। ইজ্জৎ খোয়াতে হবে না পেটের দায়ে।…দীনু থাকতে থাকতে ও কেন পায়নি এমনি একটা কাজ! তাহলে দীনুকে একটি দিনের জন্যেও সে দিত না ভিক্ষে করতে। কাজ শিখে, দীনুকে সে বস্তি থেকে সরিয়ে নিয়ে যেত কোন ভদ্দরলোকের পাড়ায়। ছোট একখানা ঘর ভাড়া নিয়ে থাকতো ওরা দুজনে। খোকা আস্তে আস্তে বড় হতো।

বলো, কি নাম তোমার?

অতসী। অতসী বালা—

পদবী নাই?

জানি না।

বাপের নাম জানো?

জানি।…উপেন দত্ত। ব্যামোতে ভুগে বাবা আমার অন্ধ হয়েছিল। তাই তার হাত ধরে ভিক্ষে করতাম সহরে। আমরা গেরস্ত ছিলাম। বাড়ী-ঘর সবই ছিল আমাদের। দেনার দায়ে বিকিয়ে গেল। মা আর ছোট ভাইটা না খেয়ে শুকিয়ে শুকিয়ে মরেছে। আমি তো তখন বড় হইনি। নইলে—

দেরী ক'রো না। বলো—তোমার বাবা বেঁচে নেই?

না।

কোথায় থাকো তুমি?

আতাবাগানের বস্তিতে।

বস্তিতে?…ভদ্রলোকের চোখের দৃষ্টিটা যেন পলকে কেমন ছুঁচলো হয়ে উঠেছিল। একটু থেমে, কি ভেবে বললেন: আচ্ছা, কাজ করো। একমাস পর জানতে পারবে, তোমায় রাখা হবে কিনা।…রোজ সকাল সাতটায় কারখানা খোলে। চারটেয় ছুটি। মাঝখানে এক ঘণ্টা অবসর পাবে—টিফিন।

বেশ: অতসী স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলেছিল।

ভদ্রলোক নির্নিমেষ দৃষ্টিতে চেয়েছিলেন অতসীর মুখপানে।

অতসী হাত জোড় করে নমস্কার করেছিল। শুধু ওই ভদ্রলোককে নয়, ওর নির্মম ভাগ্যদেবতাকেও—এতকাল পরে যিনি মুখ তুলে চেয়েছেন একবার ওর পোড়া কপালের দিকে।…সেই ছাতার বাঁটের কারখানাওয়ালা! মোষের মত কালো মোটা লোকটার মুখখানা মুহূর্তে ভেসে উঠেছিল চোখের সামনে। ওর অন্ধ রুগ্ন বাপকে একবাটি সাবু খাওয়াবার জন্যে অতসী নিজেকে তুলে দিয়েছিল সেই জানোয়ারটার হাতে।…উঃ! কি অন্ধকার ছিল গলিটা। ধাড়ী ইঁদুরগুলো ছুটোছুটি করছিল মনের উল্লাসে।

এই নাও তোমার টিকিট।

টিকিটখানা অতসীর হাতে দিয়ে ভদ্রলোক ভিতরে চলে গেলেন।

অতসী কারখানায় ঢুকলো।…কেমন একটা ভয়! অজ্ঞাত ভয়ে টিপটিপ করছিল ওর বুকের ভিতরটা। আশ্বাস ও আশঙ্কায় দ্বিধাগ্রস্ত পা' দুটো জড়িয়ে আসছিল। তবুও সে থামলো না। এগিয়ে গেল মরণপণ ক'রে। আরও দশজন মানুষের পাশে দাঁড়িয়ে, না হয় মরবে—তবু বাঁচবে সে। অপঘাতে মরবে দীনুর মতন।

সেইদিন থেকেই অতসী কাজে লেগেছে। ওর এতদিনের ঝিমিয়ে-পড়া জীবনী শক্তি আবার উজ্জীবিত হয়ে উঠেছে নতুন আগ্রহে। ভোর পাঁচটায় বেরিয়ে যায়, সন্ধ্যা ছ'টায় ফিরে আসে। কোনদিন উনুন জ্বালে, কোনদিন জ্বালে না।

সকলের দৃষ্টি এড়িয়ে গেলেও পদ্মর দৃষ্টি এড়িয়ে যায় না। মাঝে মাঝে লাবস্তা করে বলে: সারাটা দিন ঘুরে এসে শরীর যেদিন বয় না, একমুঠো চাল আমার হাঁড়িতে দিলেই পারিস। জাত তো যাবে না।

ভিকিরীর আবার জাত কি পদ্মদিদি! এঁটো পাতা

কুড়িয়ে যারা খায়।···ফিকে হাসির সঙ্গে অতসী কথাটা এড়িয়ে বলে: খিদে থাকলে ফুটিয়েই নিতাম একমুঠো।

বাইরে খেয়ে আসিস বুঝি?

হাঁ: ঘাড় কাৎ করে অতসী সংক্ষেপে উত্তর দেয়। প্রসঙ্গটা চাপা দেবার জন্যে তাড়াতাড়ি মাটির পিদিমটা নিবিয়ে শুয়ে পড়ে।

পদ্ম নিরস্ত হয় না। বাইরে দাঁড়িয়ে ওকে শুনিয়ে শুনিয়ে বলে: সে আর কে না বোঝে! নইলে দিন দিন অমন চেকনাই হয়ে ওঠে চেহারাটা। এতকাল পরে মরা গাঙে আবার বান ডেকেছে। হাতে-পায়ে যৈবন যেন ধরছে না।

হয়তো তাই। অতসীর দেহে সত্যি এসেছে আবার বল। হাত-পাগুলো সজীব হয়ে উঠেছে। ওর অসহায় মন এতকাল পরে পেয়েছে বাঁচবার একটা অবলম্বন। কিন্তু কি হবে এই অবলম্বন নিয়ে! কার জন্যে বাঁচবে সে!

মন বোঝে না। মাঝে মাঝে হাহাকার করে ওঠে ওর অন্তর। এক-একবার মনে হয়, এই বস্তি ছেড়ে চলে যায় দূরে—কোন নির্জন জায়গায়—যেখানে পদ্ম নাই, পুঁটি গয়লানি নাই, নিবারণ নাই। কিন্তু পারে না।···যদি দীনু বেঁচে থাকে! যদি সে আবার ফিরে আসে কোন-দিন!···পাবে না সে অতসীকে খুঁজে। কোন সন্ধান পাবে না তার। ওই লাখ-লাখ লোকের মাঝখানে কোথায় হারিয়ে যাবে অতসী। কেউ জানবে না। কারো কাছে দীনু পাবে না তার ঠিকানা।

এত ভাগ্য হবে তার!···দীনু ফিরে আসবে! আপনা থেকে মনে হবে তার অতসীর কথা! খুঁজে বেড়াবে অতসীকে!···জল ভরে আসে অতসীর চোখে।

অতসী আর আজকাল ছেঁড়া কাপড় প'রে বাইরে বেরোয় না। মাইনের টাকা দিয়ে কিনেছে দু'খানা মোটা শাড়ি। দু'দিন অন্তর সোডার জল ক'রে কাপড় দু'খানা কেচে দেয় রাতের বেলায়।

পদ্ম গিসগিস করে।

পুঁটি গয়লানি হেসে বলে: কিলো, কাজকম্ম জুটিয়ে-ছিস নাকি? দেখিস, হোটেলওয়ালার পাল্লায় প'ড়ে শেষে গলাতে পোড়াতে না হয়।

কাঁসরের মত খনখনে আওয়াজ তুলে পদ্ম ওঘর থেকে বলে: কাজকম্ম না, হাতী! কোন পয়সাওয়ালা দোকানী না হয় বিড়িওয়ালার নজরে পড়েছে। নইলে দু'মাস যেতে না-যেতে হাতে-পায়ে জল এসেছে কি অমনি!···দুদিন পরে হয়তো খোকাও আসবে একটা কোলে!

অতসীর পা থেকে মাথা পর্যন্ত যেন আগুনের হল্কা বয়ে যায়। মুখে এলেও দেয় না কোন জবাব। মাথাটা নীচু করে চোখের জল মোছে।

নিবারণ বাধা দেয়। চাপা গলায় পদ্মকে নিরস্ত কর-বার চেষ্টা করে: ছি! ওসব কি বলছো পদ্ম?

পদ্ম থামবার পাত্রী নয়। থামেও না। ঝাঁজিয়ে ওঠে নিবারণের মুখের ওপর: মিনসের দরদ যে দেখছি উথলে উঠেছে!···তা হবে না! ছুঁড়ি যে দলমলে হয়ে উঠছে আবার।

অতসী ঘরের দরজাটা বন্ধ করে। খিল লাগিয়ে দেয়।

পদ্ম খিলখিল করে হাসে। ও জানে, কেমন করে ওঘরের খিলটা বাইরে থেকে খুলতে হয়। এতকাল বাস করে এসেছে ওই ঘরখানায়।

দুঃস্বপ্নের ঝড় বয়ে যায়। ঘুম আসে না অতসীর চোখে। মাঝে মাঝে চোখদুটো জুড়ে আসে। পর-ক্ষণেই চমকে ওঠে আশঙ্কায়। কেমন একটা ভয় থমথম করে ওর মনে।

নিশুতি রাত। সারা বস্তি ঝিমিয়ে পড়েছে দিনের অবসাদে। কোথাও কোন সাড়াশব্দ নাই। অন্ধকার জমাট বেঁধে নেমেছে বস্তির আনাচে-কানাচে।

মাঝে মাঝে শুধু বাবাজীর কাশির শব্দ শোনা যায় পুঁটি গয়লানির ঘর থেকে। গাঁজার নেশা ছুটে গেলে অমনি দম-আটকানো কাশি কাশে লোকটা।

হঠাৎ চীৎকার করে উঠলো অতসী। গোঙানির সঙ্গে একটা আর্তনাদ উঠলো সারা বস্তির নিস্তব্ধতা আলোড়িত ক'রে।

নিবারণ ছুটে বেরিয়ে এলো ঘর থেকে। পুঁটি গয়লানি, বাবাজী, সেই সঙ্গে আশপাশের লোক-

গুলো এসে জমলো অতসীর দরজার সামনে।…দরজাটা খোলা।

পুঁটি তাড়াতাড়ি টিনের লণ্ঠনটা জ্বেলে এনে ঘরে ঢুকলো : অতসী—অতসী !…কি হলো তোর ?…চোর ?…চোর ঢুকেছিল ঘরে ?

না।

তবে ?

জানি না।

অতসী তখন উঠে বসেছে বিছানায়। সর্বাঙ্গ থরথর কাঁপে। কপালটা ভিজে উঠেছে ঘামে। কথা বলবার শক্তিটুকুও যেন লোপ হয়ে আসে।

ওঘর থেকে ঝন্‌ঝন্ ক'রে ওঠে পদ্মর গলার আওয়াজ। নিবারণকে উদ্দেশ করে বলে : ওখানে কি তামাসা দেখছো শুনি ?…স্বপন দেখেছে।…খোয়াব।

পুঁটি গয়লানি কাছে বসলো অতসীকে দু'হাতে জড়িয়ে।

অতসীর শরীরটা নুয়ে পড়ে যন্ত্রণায়। ওর পরণের কাপড়খানা তখন ভিজে উঠেছে রক্তে। ক্রমশঃ

দ্বিপদী

কবিশেখর শ্রীকালিদাস রায়

(১)

মোটাবাবু চড়ে যায় ভারী লাগে পাল্কী
মোটা বক্‌শিস পেলে তাও হয় হাল্কী।

(২)

ছাগ বলিদানে শক্তি তুষ্ট হবে ?
মহাশক্তিরে তুষিতে হইলে বাঘ বলি দিতে হবে।

(৩)

সকল দেশেই পাইবে একটি পৃথক্ নাড়ীর সাড়া
যে হোক দেশের শাসকভিষক চলিবে একই ধারা।

(৪)

কাব্যকলা বেচতে এলাম পেলামনাক খরিদ্দার
রথ দেখাতো হ'য়ে গেল তাও বড় লাভ দরিদ্রার।

(৫)

স্পষ্টভাষী যারা ছিল পেল তারা অক্কা
এখন গাজনে নাচো শোন শোনাও ঢক্কা।

(৬)

বাড়াও কচুর চাষ জমি যদি পাও
ভাতের অভাব হ'লে কচুপোড়া খাও।

(৭)

কৃটিকে বলিল কবি, "তুমি ত কর্কট।"
কবিরে কৃটিক বলে, "তুমি যে মর্কট।"

(৮)

আলতা পাদুকা দুইই চান মহিলারা
আলতার রঙ বাঁচে কিসে জুতা ছাড়া ?

(৯)

কবিতা ভাবের বাস লুতার নকল
ঢাকে না অথচ ঢাকে, ঢাকা শুধু ছল।

(১০)

আজি প্রিয়ে বড় ভালো রাঁধন তোমার
কচু সিদ্ধ, আলুপোড়া, আমের আচার।

(১১)

রসনারে তৃপ্ত কর যত পার খাইয়া হজমি
গলায় আঙুল দিয়ে না হয় করিও শেষে বমি।

(১২)

হে রবি তোমার কাব্যে ওরা আর পায়নাক রস,
অপাঠ্য বলিয়া তবু রায় দিতে করেনা সাহস।

(১৩)

বঙ্গ হতে রঙ্গ-ব্যঙ্গ ভেসে গেছে পদ্মার প্লাবনে
মাঘের দপম-কুন্দ ফুটিবে কি এ ভরা শ্রাবণে ?

(১৪)

অস্থি শৃঙ্গে চর্মে ধ্বনি সুপ্ত হয়ে থাকে
জাগিয়া কাঁপায় ধরা শিঙা শাঁখে ঢাকে।

(১৫)

পদ্ম থেকে বহুদূর নেমে গেলে বাহিয়া মৃণাল
পাবে না নামিলে আরো পাঁক ছাড়া আর কিছু মাল।

(১৬)

পতি-পত্নী বড় সুখী, আছে ধন, নাইক বিরহ
রাত্রিতে বিচ্ছেদ শুধু, সারাদিন তুমুল কলহ।

দীপাবলী

(রসরচনা)

শঙ্কর গুপ্ত

বাজালে বাঁশী আর ঘোরালে কোঁৎকা। শিশুগণ যখন নিজ নিজ পাঠে মন দেয় তখন রাখাল গরুর পাল মাঠে নিয়ে যয়ে। হয়ত পড়তে চায় নি বলে গরু চরাতে পাঠান হয়ে থাকবে। গরু চরাতে গিয়ে তাদের দুটি বস্তুর প্রয়োজন হয়—একটি পাঁচন, অপরটি বাঁশী। উভয় বস্তুই বংশজ। তাই অনেক রাখাল বুদ্ধি করে একটির দৈর্ঘ্যে দুটি কাজ সারে। হাত দুয়েকের এক বংশ খণ্ড—তার একধারে কয়েকটি ফুটো করে বাঁশী তৈরী করা হয় এবং বাকী অংশটা থাকে লাঠির মত। তখন ঐ এক লাঠিই আড় করে ধরে বানান চলে অথবা শূন্যে আন্দোলিত করে গোচারণ ক্রিয়া সম্পাদিত হয়। তাই বাজালে বাঁশী আর ঘোরালে কোঁৎকা। বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক মশাই লাঠি ব্যবহার করেন এখন যদিও বাতের প্রকোপে, আগে করতেন দুষ্টের দমনে। এক বস্তুর একাধিক ব্যবহার সংসারে বিরল নয়।

'ওই ঘরে তোরা লাগাবি অনল, তপ্ত করিব কর পদতল'—কাশীর মহিষী করুণা (?) আগুন পোয়াবার জন্যে বাড়ীতে আগুন লাগাতে বলে যতটা না ধনমদ যৌবনমদ মত্ততার পরিচয় দিয়েছেন তার চেয়ে বেশী দিয়েছেন নির্বুদ্ধিতার পরিচয়। আগুন পোয়াবার সুখ নেই, পুড়ে মরার ষোল আনা সম্ভাবনা—অপচিকীর্ষার কথা বাদ দিলেও এ থেকে করুণার হৃদয়হীনতার চেয়ে বুদ্ধিহীনতা প্রকট। মানুষ স্বভাবত নির্বোধ নয়, তাই আলোর প্রয়োজনে সে বাড়ীঘর পোড়ান সুরু না করে প্রদীপ আবিষ্কার করলে।

ফ্লোরসেণ্টকে সর্বাধুনিক বললে প্রদীপকে প্রাচীনতম বলা যায়। এসপ্লানেড অঞ্চলে অর্ধলুপ্ত কার্জনপার্কে সন্ধ্যা সমাগমে দেখা যায় নিয়ন লাইনের বিজ্ঞাপনে বিজ্ঞাপনে জড়োয়া গয়না-পরা সলমা চুমকীর ওড়না সালোয়ার শোভিত বারনারীর চমকপ্রদ চাকচিক্যময় জৌলুষের আভাস; আর তুলসীতলার মাটির প্রদীপে—ঈষৎ অবগুণ্ঠিতা শ্যামলা পুরনারীর স্নিগ্ধ সংহতির প্রতিভাস।

আলো যখন চোখে আঙ্গুল দিয়ে নিজেকে দেখাতে চায় তখন চোখ বন্ধ না করে নিস্তার কই।

এই কলকাতায় ঈশ্বরচন্দ্র যখন রাস্তার গ্যাস বাতিতে পড়তেন (ভবিষ্যতে বিদ্যাসাগর হলেন) তখন যারা বাড়ীতে আলো জ্বালাতে সক্ষম তারা জ্বালতো রেড়ির তেলের প্রদীপ। আজ যাদের সত্তর আশি বছর বয়স—তাঁদের কাছে শোনা যাবে তাঁরা যখন কলকাতার কলেজের ছাত্র তখন তাঁদের মেসের ঘরেও রেড়ির তেলের প্রদীপ জ্বলত। তাঁদের পড়াশুনার কাজ চলেছে তাতে। পি আর এস দেওয়া ছাত্রকেও ঐ আলো ব্যবহার করতে হোত। নেহাত দু একজন বড়লোকের বাড়ীর ছেলেদের পড়ার টেবিলে কাঁচের চিমনী লাগান টেবল ল্যাম্প প্রথমে রেড়ির তেলে পরে কেরোসিনে জ্বালান হত। কোন সন্ধ্যায় কোন ছাত্র টেবল ল্যাম্প-ওলা বন্ধুর বাড়ী থেকে পড়ে ফিরলে সেদিন তার মন গরম হয়ে উঠত।

খনিজ তেল ব্যবহারের সঙ্গে সঙ্গে প্রদীপের দিন গেল! হ্যারিকেন জাতীয় আলোর প্রচলন হল। ক্রমে বিজলীর ব্যবহারের সঙ্গে সঙ্গে কেরোসিনের আলো মফঃস্বল এবং পল্লী অঞ্চলকে আলোকিত করতে গেল। কলকাতার রাত্রি বিজলী বাতির কল্যাণে 'থির বিজুরী বরণ গৌরী পেখনু ঘাটেরি কূলে' রূপে শোভা পেতে আরম্ভ করল।

প্রাক্ দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ কালে কলকাতা সহরে বছরে একবার হলেও দেওয়ালীর সন্ধ্যায় মাটির প্রদীপে ছাদের আলসে সাজাতে দেখা যেত। এক মাপের ছোট ছোট শতাধিক প্রদীপ।

প্রত্যেকটায় একটু করে তেল, একটি করে সলতে একটা দেশলাই কাঠি জ্বেলে দুতিনটে ধরিয়ে সেগুলে

থেকে বাকী প্রদীপগুলো জ্বালিয়ে নেওয়া হত। তারপর সারি সারি সাজিয়ে দিয়ে দীপাবলী অনুষ্ঠান পালন করা হত। যুদ্ধকালীন দুষ্প্রাপ্যতা, পাশ্চাত্যে ব্যবহৃত হয় অথবা আর পাঁচ জায়গায় তৈল নিষেক করে অনটন পড়ে—যে কোন কারণেই হোক এখন দেওয়ালীতে মোমবাতি দিয়ে আলসে সাজানর রেওয়াজ। বর্তমানে অনাবশ্যক ঝামেলায় মানুষ বীতস্পৃহ। প্রদীপের হাঙ্গামার চেয়ে মোমবাতির দেওয়ালী সুসাধ্য। অন্তত এখনও সেভাবে নিয়মরক্ষা হচ্ছে। মনে হয় অদূর ভবিষ্যতে দেওয়ালীর নিষ্প্রয়োজনীয়তা হৃদয়ঙ্গম করে ঢাকী শুদ্ধ বিসর্জন হয়ে যাবে। প্রদীপ বা মোমবাতি কিছুই জ্বলবে না।

আমাদের প্রদীপ ব্যবহার নেহাত গন্ধময়। প্রযোজনের দিক থেকে একে কেবল দেখেছি বলে খনিজ তেল বিদ্যুত সকলেই এর প্রতিদ্বন্দ্বী হয়ে দাঁড়িয়েছে। আটপৌরে কথাবার্তায় এক-আত্মারামবাবু মারা যাবার আগের দিন একটু অবস্থা ভাল হলে বলি, প্রদীপ নেবার আগে একবার জ্বলে উঠেছিল ; আর এক—বিশ্বভ্রাতৃত্ব সংস্থার সভাপতি প্রিয়তোষবাবুর যখন আদালত ছাড়া (একমাত্র আদালতেই হয়) বাইরে ভাইদের সঙ্গে মুখ দেখাদেখি হয় না তখন বলি প্রদীপের নিচেই অন্ধকার। এই রকম দু একটা ক্ষেত্র ছাড়া প্রদীপকে আমরা তেমন ব্যবহার করতে পারি নি। কিন্তু ভরসার কথা জগতে আমরা ছাড়া আরও মানুষ আছে এবং তাদের কেউ কেউ বাঁশি বাজিয়েছে।

পাশ্চাত্যে মোমবাতি শাস্ত্রীয়। ওদেশের লোক গীর্জে গোরস্থানে মোমবাতি জ্বালে। জন্মদিন বা বিয়ের দিন কেকের উপর মোমবাতি জ্বালান ওদের মাঙ্গলিক অনুষ্ঠান। এখানে যেমন বাড়ীর গিন্নি গ্রহণের দিন গঙ্গা নাইতে গিয়ে বাড়ীশুদ্ধ প্রত্যেকের নামে একটা করে ডুব দেন, ওখানে ছেলে পিলের কল্যাণকামনায় মিসেস অমুক গীর্জেয় গিয়ে বিলের নামে একটা মোমবাতি জ্বেলে দেন নিজেরটা ছাড়া।

ভিক্টর হ্যুগো অনেককাল বহুজনকে মুগ্ধ করে আসছেন হৃদয়ের বিরাটত্বে। তাঁর লা মিজারেবলস গ্রন্থের জাঁ ভলজাঁ চরিত্রে তিনি যেভাবে আলোকপাত করেছেন তা অবিস্মরণীয়। যাকে রাত্রে আশ্রয় দিয়েছিলেন বিশপ, সেই জাঁ ভলজাঁকে ধরে নিয়ে এল পুলিশ মোমবাতি-দান সমেত। বিশপের বাতিদান চুরি করে পালাচ্ছিল সে। বিশপের সামনে বামাল হাজির করে পুলিশ প্রশ্ন করল তাঁকে। একটা সঙ্গীণ মুহূর্ত। সত্যের অবতার বিশপ একটু চিন্তাগ্রস্ত হলেন—ক্ষণমাত্র দ্বিধার পর অবিচলিত কণ্ঠে বললেন 'চুরি নয়, ওকে আমি দিয়েছি'। একটি মিথ্যা শতশত সত্যের উপর উঠে গেল। পুলিশ ঘাবড়ে গিয়ে ফিরে গেল। চোরের মনে কি হাজার বাতির আলো পড়েনি!

আলো জ্বললে অন্ধকার থাকে না। যেখানে অন্ধকার সেখানে পাপ। যেখানে আলো সেখানে পাপীর ভয়, লজ্জা, সেখানে বিবেককে যেন দেখা যায়। লেডী ম্যাকবেথের মৃত্যুসংবাদ শুনে তাই ম্যাকবেথ আলো সহ্য করতে পারছে না ; বলছে, আউট আউট ব্রিফ ক্যাণ্ডল। ক্ষুদ্র বাতির শিখাটা নিবে গিয়ে আলো দূর করুক—বিবেক অদংশিত থাকে।

সক্রেতিস নাকি দিনের বেলা এথেন্সের পথে পথে লণ্ঠন নিয়ে বেড়াচ্ছিলেন। লোকে প্রশ্ন করলে বল্লেন, 'মানুষ খুজছি'। কিন্তু মানুষকে অনেক সময় খুঁজে পেলে যে বিনা আলোতেও চেনা যায়, দেখালেন বঙ্কিমচন্দ্র। মতিবিবি চিনল।

—নবকুমার পর্যবেক্ষণ করিয়া দেখিলেন পরিচ্ছদ পশ্চিম প্রদেশীয়া মুসলমানীর ন্যায় বটে ; কিন্তু বাঙ্গলা ত বাঙ্গালীর মতই বলিতেছে। ক্ষণপরে তরুণী বলিতে লাগিলেন, মহাশয় বাকবৈদগ্ধে আমার পরিচয় লইলেন, আপন পরিচয় দিয়া চরিতার্থ করুন। যে গৃহে সেই অদ্বিতীয়া রূপসী সে গৃহ কোথায়? নবকুমার কহিলেন, "আমার নিবাস সপ্তগ্রাম।" বিদেশিনী কোন উত্তর করিলেন না। সহসা মুখাবনত করিয়া প্রদীপ উজ্জ্বলতর করিতে লাগিলেন। ক্ষণেক পরে মুখ না তুলিয়া বলিলেন, "দাসীর নাম মতি। মহাশয়ের নাম কি শুনিতে পাই না?" নবকুমার কহিলেন, "নবকুমার শর্মা।"

প্রদীপ নিবিয়া গেল।—

উপমা কালিদাসস্ত। সরস্বতী পূজায় ফর্দ লিখে একটা প্রদীপ আনাই প্রতিমার সামনে জ্বালাবার জন্যে। কালিদাসের বাণী বন্দনায় প্রদীপ ছিল, তবে ব্যবহার বিধি

আমাদের চেয়ে ভিন্ন। রঘুর পুত্র অজ। অনুপম রূপ, বলিষ্ঠ কলেবর, অমিত শক্তি ; দৈহিক এবং মানসিক উভয় বিধ উন্নতিতে অজ সর্বাংশে পিতার অনুরূপ হয়েছিলেন। কালিদাস বললেন—'ন কারণাৎ স্বাদ্ বিভিদে কুমার: প্রবর্ত্তিতো দীপ ইব প্রদীপাৎ'। একটি প্রদীপ থেকে আর একটি প্রদীপ জ্বাললে যেমন উভয়ের কোন পার্থক্য থাকে না তেমনি কুমার অজের সঙ্গে তার পিতার কোন প্রভেদ রইল না।

ইন্দুমতীর স্বয়ংবর সভা। বিভিন্ন দেশ থেকে রাজারা ইন্দুমতীকে লাভ করার আশায় সভায় উপস্থিত। সখী সুনন্দার সঙ্গে তিনি এক একজন রাজার কাছে গিয়ে দাঁড়াচ্ছেন। ভাট সেই সেই রাজার গুণাবলী বর্ণনা করছেন। শোনা শেষ হলে সে রাজাকে প্রণাম করে পরের রাজার কাছে গিয়ে দাঁড়াচ্ছেন। এই চিত্রটির বর্ণনা দিচ্ছেন কালিদাস :

> 'সঞ্চারিণী দীপশিখেব রাত্রৌ
> যং যং ব্যতীয়ায় পতিংবরা সা।
> নরেন্দ্র মার্গাট্ট ইব প্রপেদে বিবর্ণ
> ভাবং স স ভূমিপাল: ॥'

রাত্রে সঞ্চারিণী দীপশিখা সামনে থেকে সরে গেলে রাজপথবর্তী অট্টালিকা যেমন তিমিরাবৃত হয় তেমনি ইন্দুমতী যে যে রাজাকে অতিক্রম করে যেতে লাগলেন সেই সেই নিরাশ নৃপতি যেন বিষাদে কালো হয়ে গেলেন।

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত প্রণেতা 'শ্রীম' ১৮৮২ খ্রীষ্টাব্দে শ্রীরামকৃষ্ণের সংস্পর্শে আসেন।' 'শ্রীম'র সান্নিধ্যলাভের অর্থ অদ্যাবধি প্রত্যেকের সান্নিধ্যলাভ। কারণ যিনি শ্রীরামকৃষ্ণের প্রতিটি কথা নির্ভুল শ্রুতলিপিকের (রোমা রোলাঁ যাকে স্টেনোগ্রাফিক একস্যাকটিটুড বলেছেন) নিষ্ঠায় প্রকাশিত করেছেন পস্টারিটির জন্যে—তার জন্যে আমরা জেনেছি উপমা রামকৃষ্ণস্য। অনাসক্তি বোঝাতে যেয়ে শ্রীরামকৃষ্ণ বললেন,—মন্তর আর কিছু নয় মন তোর। মন স্ববশে এলে ভাল বা মন্দ দ্বারা প্রভাবিত হয় না। প্রদীপের সামনে বসে কেউ ভাগবত পড়ে, কেউ বা নোট জাল করে—তাতে প্রদীপের কোন ক্ষতিবৃদ্ধি হয় না।—অনেকে তাঁকে বলত, পাপে ডুবে আছি কি করে উদ্ধার পাব। তিনি বলতেন,—পাপী পাপী করলে মানুষ পাপী হয়ে যায়। জোর করে বল আমার যা আছে, সব পাপ চলে যাবে। তাঁর নামের মহিমা এমন যে মনের মালিন্য কেটে যায়। হাজার হাজার বছর কোন ঘর যদি গভীর অন্ধকারময় থাকে সেখানে একটি প্রদীপ জ্বাললে একটু একটু করে নয় সব অন্ধকার তৎক্ষণাৎ দূর হয়।—

> 'আয়ুহীন দীপমুখে শিখা নিব নিব
> আঁধারের গ্রাস হতে কে টানিছে তারে
> বলিতেছে বারবার যেতে দিব না রে।'

রবীন্দ্রনাথের ভারতী বন্দনায় প্রদীপের সব রকম সুরই ব্যবহৃত। তা যখন উজ্জ্বল তখন—'তরাসভয়ে চকিত করে প্রদীপখানি জ্বেলে চাহিলে মুখে' ; আবার কখন-'রূঢ় দীপের আলোক লাগিল ক্ষমাসুন্দর চক্ষে' কি করে—না বাসবদত্তা যখন 'প্রদীপ ধরিয়া হেরিল তাহার নবীন গৌরকান্তি' ; একবার দেখে ভুল হতে পারে তাই 'মিনতি মম শুন হে সুন্দরী,আরেকবার সমুখে এস প্রদীপখানি ধরি' এ বারে 'এনেছি শুধু বীণা, দেখতো চেয়ে আমারে তুমি চিনিতে পার কি না'। শুধু জলন্ত নয়, নিব নিব নয়—আরো আছে, নিবন্তের পর।—'এদিকে রাত্রিও অনেক হওয়াতে বইটা ধাঁ করে মুড়ে ধপ করে টেবিলের উপর ফেলে দিয়ে শুতে যাবার উদ্দেশে এক ফুঁয়ে বাতি নিবিয়ে দিলুম। দেবামাত্রই হঠাৎ চারিদিকের সমস্ত খোলা জানলা থেকে বোটের মধ্যে জ্যোৎস্না একেবারে ভেঙ্গে পড়ল। হঠাৎ যেন আমার চমক ভেঙে গেল। আমার ক্ষুদ্র একরত্তি বাতির শিখা * * * * এই বিশ্বব্যাপী গভীর প্রেমের অসীম আনন্দচ্ছটাকে একেবারে আড়াল করে রেখেছিল। * * * * * সে কতক্ষণ থেকে সমস্ত আকাশ পরিপূর্ণ করে নিঃশব্দে বাইরে দাঁড়িয়ে ছিল। যদি দৈবাৎ না দেখে অন্ধকারের মধ্যে শুতে যেতুম তা হলেও সে * * * প্রতিবাদ না করে নীরবেই বিলীন হয়ে যেত। * * * * বিশ্বকে ব্যাপ্ত করে সেই রকম নীরবে, সেই রকম মধুর মুখেই হাস্য করত—আপনাকে গোপন করত না, আপনাকে প্রকাশও করত না।' শরৎচন্দ্র আঁধারের রূপ সুধা পান করেছিলেন, রবীন্দ্রনাথও আঁধারের উপর বিরূপ ছিলেন না। 'দীপ নিবে গেছে মম দখিনা সমীরে'—আলো নিবে গেলে যারা বিভীষিকা দেখে—তেমন কেউ হলে বলত প্রচণ্ড ঝড়ে ; দখিনা সমীরে বলায়—গেল রে গেল রে ভাব প্রকাশ পায় নি।

সহর কলকাতার কালকের খবর

শ্রীসুধাংশুমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়

ভাবছি, আজকের কলকাতায় বসে কালকের কলকাতার কথা মনে করতে কেমন লাগে, যে কাল গেছে চ'লে। কাকে ডেকে বলবো—কথা কও, কথা কও। সে রামও নেই, সে অযোধ্যাও নেই, হারিয়ে গেছে জবচার্নকের কলকাতা আর জন কোম্পানীর দিন। বটযক্ষিণীর আওতায় বসে বৈঠকখানা বাজারে গুড়গুড়ী টানতে টানতে বেচাকেনার ভ্রষ্ট লগ্ন আর আসে না, যেমন আসে না সুন্দরী বিধবার 'সতী' হতে হতে সাহেবের অঙ্কশায়িনী হওয়া। তবু এককালের মৃগলাঞ্ছিত পার্ক ষ্ট্রীটের শেষ কোণায় আজও বিদ্রোহীদের আস্তানা আছে, হয় তো গভীর রাতে আসর বসে কবর খানায়। সে সব দুরন্তদিনের ইতিহাস আজ স্তিমিত, ফিকে হয়ে গেছে বোম্বেটেদের হার্মাদদের হল্লার কথা, আর্মেনিয়ান রূপসীদের জেল্লার কাহিনী, হাবসী ক্রীতদাসীদের হাহুতাশ, নিমকীর চৌকীর গল্প, ভোর রাতে বাগানবাড়ী ফেরতা নতুন বাবুদের জুড়িগাড়ীর ঘোড়ার খুরের কদম্ কদম্ শব্দ। বজ্রবাহী বাদাবনের শার্দ্দুল চিহ্নিত পথে বিপথে দক্ষিণ রায়ের রাজত্বে, বেতের জঙ্গল চিরে যেদিন ক্ষীণ পটল রেখা উঠেছিল, সেদিন গোবিন্দপুর সুতোনুটী ডুবুডুবু—কালীঘাট যায় ভেসে। দেখতে দেখতে কলকাতা হয়ে উঠেছিল কলকল্লিতা, রঙ্গে ভরা বঙ্গদেশে নতুন মালিকেরা জেঁকে বসলো। সাতসমুদ্দুর তেরো নদী পেরিয়ে তাদের আগমন, ভোগবতীর ভৃঙ্গার তারা ভরে নিতে জানে ভাগীরথীর জলে। যৌবনবতী কলকাতা বরণ ডালা হাতে তাকে বরণ করে নিলে। ইতিহাসের পাতায় পাতায় তার শিহরণ জাগলো, দিল্লীশ্বরের সিংহাসনেও গিয়ে তাঁর কাঁপন লাগলো, ভিত নড়লো, ফাটল ধরলো। অষ্টাদশ শতাব্দীতে কলকাতার কৈশোর, ঊনবিংশ শতাব্দীতে তার খর যৌবন, বিংশ শতাব্দীতে সে প্রৌঢ়া। আজ তার প্রথম যৌবনস্ফীত দিনের কথাই বলি একটু আধটু—বেশীদূর পেছিয়ে না গেলেও চলে। একশো ত্রিশ-চল্লিশ-পঞ্চাশ বছর আগেকার কলকাতা গেজেটের পাতাগুলো উল্টে যান—দেখবেন কতো কথাই না ভেসে উঠছে আজকের এই মরাগাঙে জলজ্যান্তো হয়ে, কতো রং বেরংএর মজাদার গল্প আর কাহিনী। ১৭৮৪ খ্রীঃ অব্দের ৪ঠা মার্চ থেকে এই গেজেটের পত্তন। শুধু কি মহামান্য কোম্পানীর দপ্তরের খোসখবরই থাকতো, তাতো নয়, বেসরকারী কতো জব্বর খবরও, অর্থাৎ সেকালে গেজেট কাজ করতো একেলে "নিউসপেপারের" বা খবরের কাগজের। স্বাস্থ্য, শিক্ষা, শাসন, বিচার বাণিজ্য সামাজিক রীতিনীতি এমন কি সাহিত্যিক প্রচেষ্টারও টুকরো টাকরা খবরও পাওয়া যেতো এই গেজেটে। সরকারের খবর থাকতো, সম্পাদকীয় মন্তব্য থাকতো, বিজ্ঞাপন থাকতো, অন্য কাগজ থেকে উদ্ধৃতি থাকতো, নানা মজাদার খবর থাকতো, মোটের উপর ফুটে উঠতো একটা নিটোল চিত্র। ১৮২৩ থেকে ১৮৩২ সাল পর্য্যন্ত খবরের এইরকম একটা সংকলন সম্প্রতি রাজ্যসরকারের আনুকুল্যে বেরিয়েছে। পূর্বেও ব্রিটিশ যুগে সেটন্কার, স্যাণ্ডিমান্ প্রভৃতির সম্পাদনায় কয়েক খণ্ড বেরিয়েছিল। ১৮৩২ সালের পর সরকারী খবর ছাড়া গেজেট আর কোন সংবাদ পরিবেশ করতো না। কোম্পানীর রাজত্বের এই যুগটা একটা বিরাট আলোড়নের যুগ। কলকাতা কাঁপছে দুলছে ফুলছে, শুধু বাইরেই নয়, মনেও। শ্রীঅরবিন্দের কথা মনে পড়ছে—a, society electric with thought and loaded to the brim with passion, এই যুগেই দেখছি আমরা রামমোহনকে, দ্বারকানাথ ঠাকুরকে, লর্ড উইলিয়াম বেন্টিঙ্ককে, মেকলেকে, উঠে যাচ্ছে সতীদাহ প্রথা, বিদায় নিচ্ছে ঠগীরা পিণ্ডারীরা। খোলা হচ্ছে স্কুল কলেজ হাঁসপাতাল; শোনা যাচ্ছে বেদান্তের বাণী একেশ্বর বাদের কথা। সুপ্রীম কোর্ট গ্র্যাণ্ড জুরীকে ডেকে আইনের নূতন ব্যাখ্যা ক'রছেন। একটা নির্ভীক প্রেস গড়ে উঠছে; হোরেস উইলসন্ অনুবাদ করছেন মালতীমাধব, উত্তররাম চরিত, মুদ্রারাক্ষস। বেঙ্গল এনুয়ালে বেরুচ্ছে সর্বস্ব পুরাণের অনুবাদ। এসিয়াটিক সোসাইটিতে গবেষণা হচ্ছে। চৌরঙ্গী থিয়েটারে অভিনয়—The wheel of Fortune, the Blind Boy, Liar প্রভৃতি নাটক। বৈঠকখানা থিয়েটারে A lesson for lovers, My lady's gown—দেখানো হচ্ছে ওয়াটর্লু যুদ্ধের চিত্র প্রদর্শনী। তখনি কলকাতার নাম হয়ে গেছে City of Palaces, ১৮২১ সালের এক গেজেটে "জনবুল" থেকে কলকাতার নানা উন্নতির কথা উদ্ধৃত হয়েছে। কলিকাতা উন্নয়ন কমিটি (Committee for improving the Town of Calcutta) বলে একটি প্রতিষ্ঠানও ছিল। আমরা পড়ি যে ১৮২১ সালে তাঁরা ধর্মতলায় একটি নতুন বাগান রচনা করছেন "with the street passing along to western side to the Bow Bazar."—অনুমান করছি আজকের ওয়েলিংটন ষ্ট্রীট ও তৎসংলগ্ন স্কোয়ারের কথাই বলা হচ্ছে। আমরা পড়ি বৌবাজার থেকে চিৎপুর পর্য্যন্ত আর একটা রাস্তার কল্পনাও। ডালহৌসী স্কোয়ারের নাম তখন Tank Square।" ঐ সময়েই রাইটার্স' বিল্ডিংএর নূতন রূপায়ন হয়। একটা নূতন কাষ্টম হাউসও তৈয়ারী হয়। ১৮২২ সালে "জনবুল" কলকাতার জনসংখ্যা স্থির করেন—খ্রীষ্টান ১৩১৩৮, মুসলমান ৪৮১৬২, হিন্দু ১১৮২০৩ আর চীনা ৪১৪, মোট ১৭৯৯১৭। অথচ ১৮১৪ সালের অন্য এক হিসাবে কলিকাতার ম্যাজিষ্ট্রেটরা ৭ লক্ষ লোকের গণনা দিয়াছেন। কলিকাতার নাকি সেইযুগে ৬৭,৫১৯টি বাড়ী ছিল, তার মধ্যে দোতালা ছিল ৫৪৩০, একতালা ও টালি ছিল ৮৮০০ আর ১৫৭৯২ গোলপাতার আর খড়ের কুঁড়ে ছিল ৩৭৪৯৭। আজ থেকে একশো সাইত্রিশ বছর আগেও অর্থাৎ ১৮২২ খৃঃ অব্দেও দেখছি যে বাজারে ভালো মাছ পাওয়া যাচ্ছে

না। গভর্ণমেণ্ট কমিটি সংগঠন করছেন "To Examine into the state of the Calcutta Fish market and report upon the possibility to improvement." ১৮২৮ সালে দেখছি সমুদ্রের মাছ ধরে সাগর দ্বীপে ঘাঁটি করে কলকাতার বাজারে ছাড়া যায় কিনা সে বিষয়ে আলোচনা হচ্ছে। এই রিপোর্টে মাছের ব্যবসায় কাদের হাতে, কোথা থেকে সরবরাহ আসে, জেলে, নিকারী, হালদার, পাইকাররা—কে কত লাভ করে তার পুঙ্খানুপুঙ্খ বর্ণনা আছে। কলকাতায় তখন দেখি চৌদ্দটি মাছের বাজার—মেছুয়া বাজার, লালাবাবুর বাজার, শিমলের, কাশীনাথ বাবুর, রাজা সুখময়ের পোস্তার, কাশীনাথ মল্লিকের, তালতলার, শ্যামল দাসের বাজার আর বৈঠকখানা বাজার, শোভাবাজার, চাঁদনীচক, বউবাজার আর টেরিটি বাজার। ১৮১৭ সালে মাছের দর ছিল দেখছি—রুই ২৮ পণে সের, কাতলা ২২, ভেটকী ২০। আটা ত্রিশ সের টাকায়, ভালো ময়দা ১২ সের, উত্তম পাটনাই চাল টাকায় ১১ সের, সবচেয়ে নিরেশ টাকায় ৫৪ সের। ঘি ৩২ ছটাক টাকায়। অবশ্য আজকের দিনের টাকা আর সেদিনের টাকার অনুপাত এক নয়, উৎসাহের আতিশয্যে এই কথাটা আমরা ভুলে যাই।

১৮১৬ সালের ৪ঠা জুলাইয়ের গেজেট খুলে সম্পাদকীয় মন্তব্য পড়ুন—দেখতে পাবেন 'হিন্দু কলেজের' প্ল্যান—তার সম্বন্ধে হিন্দু সমাজ-প্রধানদের মতামত—কি রকম ভাবে পড়ানো হবে তার ব্যবস্থা। প্রিপারেটরী ক্লাস ছাড়াও থাকবে একটি সুপিরিয়র বা কলেজ বিভাগ. যেখানে পড়ানো হবে ইতিহাস, ভূগোল, ক্রনোলজি, গণিত এবং তুলনা-মূলক দর্শনশাস্ত্র। শুধু বিল্ডিংফাণ্ডই তোলা হবে না, একটা "Free Education Fund" ও গড়া হবে। একশো ছাত্র নিয়ে হবে এর পত্তন এবং যে কেউ পাঁচ হাজার টাকা দিলেই এর গভর্ণরদের একজন হতে পারবেন। এই হিন্দু কলেজই আমাদের আজকের প্রেসীডেন্সী কলেজের জনক্। এ ছাড়াও ছিল আরো অনেক কলেজ, স্কুল, যেমন ধর্মতলা একাডেমী, এ্যাংলো ইণ্ডিয়ান কলেজ, সংস্কৃত কলেজ প্রভৃতি। এ্যাংলো ইণ্ডিয়ান কলেজের এক পারিতোষক বিতরণী সভায় দেখি—আবৃত্তি করছেন রামগোপাল ঘোষ, দিগম্বর মিত্র, রাধানাথ শিকদার, রেভঃ কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, রামতনু লাহিড়ী। কেউ সেজেছেন, ব্রুটাস, কেউ সেজেছেন হোরেশিয়ো, কেউ ক্যাসিয়াস্, কেউ ম্যালকম্। আবার ১৮২৫ খৃঃ অব্দে দেখি "নেটিভ ফিমেল এডুকেশন" সোসাইটি স্থাপন হচ্ছে এবং কলকাতার টাউনহলের এক জনসভায় প্রস্তাব গৃহীত হচ্ছে "That the education of Native females is an object highly desirable and worthy of the best exertions of all who wish well to the happiness and prosperity of India." লাটগিন্নী লেডী এমহার্ষ্ট তার পৃষ্ঠপোষিকা। কলকাতার বাইরেও দেখি এর প্রভাব। কাশীতে কলেজ স্থাপন করেছেন একজন স্কচ্ ভদ্রলোক—নাম মিঃ ডান্কান্। কাশী তখন সবে চৈৎ সিংহের দুঃস্বপ্ন থেকে জেগেছে। কাশীর পণ্ডিতরা এক সময়ে ওয়ারেণ হেষ্টিংসকে শুধু মানপত্রই দেন নি, "শ্রীমতস্থ রাজরাজেষু ইংলেণ্ড ভূমিস্থেষু শ্রীমত কোম্পানো চ"। হেষ্টিংসের কাছে নিবেদন জানিয়েছিলেন যে তিনি 'নানাশাস্ত্র কোবিদ' 'নির্লোভ' ও সুশাসন করেছিলেন। আমরা আরো জানতে পারি যে হেষ্টিংস বিশ্বনাথ মন্দিরের গলিতে একটি নবতখানা বানিয়ে দেন 'শ্রীশ্রীতোরণ সমীপে........বাদিএং নরেন্দ্র কারয়মাস।

আবার দেখি রাধাকান্ত দেব ক্যালকাটা স্কুল সোসাইটির রিপোর্ট পেশ করছেন। রাজা কালীশঙ্কর ঘোষাল কাশীতে ভরতপুর বিজয়ের সম্মানার্থে ইংরাজদের পার্টি দিচ্ছেন। বাবু স্বরূপচন্দ্র মল্লিক জাঁকজমকের সঙ্গে সিংহবাহিনীর পুজো করছেন। এই পুজায় খুচরো দেনদারদের জেল থেকে ছেড়ে দেওয়া হচ্ছে, আপামরজন সাধারণের সঙ্গে তারা পেটপুরে ভোজনই করছে না, নগদ এক টাকা দক্ষিণাও পাচ্ছে, নতুন কাপড় পরছে। ঢাক-ঢোল কাড়া-নাকাড়া চৌকীদার চোরদার ব্যাগ পাইপ ব্যাণ্ড সঙ্গে দেবী শোভাযাত্রায় চললেন, সঙ্গে বিগ্রহরূপী শ্রীকৃষ্ণ। ফিরে এসে দেবী বসলেন সোনার সিংহাসনে, শ্রীকৃষ্ণ রূপোর আসনে। ব্রাহ্মণ বৈষ্ণব গোঁসাইরা ভোজন করলেন, টাকা পেলেন আর শাল-দোশালা। বিকালে কাঙালী ভোজন হলো—দীয়তাং-ভুজ্যতাং। সন্ধ্যায় আলোর মালা, নাচের আসর—ভোর পর্য্যন্ত চললো উৎসবের মহড়া। সমাচার চন্দ্রিকা থেকে উদ্ধৃত বাবুস্বরূপচন্দ্র মল্লিকের বাড়ীতে দোলযাত্রার উৎসবেরও এক রঙীণ কাহিনী পাওয়া যায়। আবার দেখি বাবু গুরুপ্রসাদ বসুর বাটীতে মস্তো বড় শামিয়ানা টাঙিয়ে রাত দশটায় আখড়াগানের মহড়া সুরু হলো। একদিকে গরাণহাটার গোবিন্দ বন্দ্যোপাধ্যায়ের দল, আর একদিকে বাগবাজারের মনোহর বসু। গরাণহাটী ও মনোহরশাহীর গানের পাল্লার ও কীর্ত্তনের নামডাক অনেক দিনের। প্রথমে আরম্ভ হলো দেবী ভবানীকে নিয়ে পালা, তারপরে এলো চুটকী, তৃতীয় পালায় হলো প্রভাতী। ভোর ৭টা পর্য্যন্ত চললো এই হুল্লোড়, কথার কিরতি আর লড়াই, সুরের জগঝম্প।

দুর্গাপুজার সময় এ সব চলতো আরো জোরে। বাবুদের বাড়ীর নাচের আসরে মায়ের পুজোটা ছিল উপলক্ষ—আসলে চলতো সাহেব বিবি গোলামের মিলিত হৈ চৈ নৃত্য-গীত, নারী-সুরা, ঠাণ্ডা মাংস পোলাও। ইংরাজ মুসলমান হিন্দু সবাই আসতো।

ঐ সময়কার গেজেটে এক ইউরোপীয় ভদ্রলোকের তীব্র মন্তব্য পড়ি—As far as we can judge, the Durga Pujah continues to be celebrated with undiminished pageantry and expenditure, not with standing the diffusion of liberal ideas amongst those especially of the more apulent classes by whom it is observed, It is however a very heterogeneous sort of business, and the performances of Mahomedan singers and dancers, with the append ages of cold beef and beer for the grosser entertainment of European guests are little campatible with the adoration of the Deir. We confess we do not think the sort of

association that takes place at the Season creditable to any of the parties. এইসব আসরে শ্যাম্পেন ক্লারেটের বিজ্ঞাপনটা খুব জোরালো হতো। আবার দেখি তালও কাটছে। নাচ দিলেন ১৮৩১ সালে পাথুরিয়াঘাটার মোহিনীমোহন ঠাকুরের ছেলে কানাইলাল ঠাকুর। বাড়ী সাজানো হলো এলাহী কায়দায়। ভজহলের প্রাসাদের অনুকরণে চব্বিশটি থামের উপর সুদৃশ্য প্যাভেলিয়ন তৈয়ারী হলো, কিন্তু অভ্যাগতদেরই একজনের বগী গাড়ী চুরি করে চারজন গোরা পালালো। সকালে পাওয়া গেলো বগীটাকে ভাঙাচোরা অবস্থায় আর ঘোড়াটাকে একটা গাছের সঙ্গে বাঁধা। ১৮২৬ সালের শারদীয়া পূজায় বর্মা দেশ থেকে পোয়ে নাচের আসর এসেছিল গোপীমোহন দেবের বাড়ীতে। ১৮২৮ সালের গেজেটে পড়ি (৪ঠা সেপ্টেম্বর) যে এক বৈষ্ণবের এমন এক ছেলে হয়েছে যে পাঁচদিনেই মায়ের কোল ছেড়ে হামাগুড়ি নয়, সোজা হেঁটে বেড়াচ্ছে। আবার দেখি একজন খিষ্ট্রিয়ান চড়কে যোগ দিয়েছে, কান ফুঁড়েছে, কালীঘাটে ঘুরে এসেছে—ঝাঁপ দিয়েছে, সে খবরও ফলাও করে বেরিয়েছে।

এই সময়ে কলকাতায় একদিকে সদরদেওয়ানী আদালত, অন্যদিকে ইংরেজী কায়দায় সুপ্রীমকোর্ট। সেখানে গ্র্যাণ্ডজুরীরা বিচার করতে বসেন, জজ তাদের প্রতি ভাষণ দেন, আইনের বিশ্লেষণ হয়। গ্র্যাণ্ডজুরী জেল পরিদর্শন পর্য্যন্ত করতেন। তখনও অভিযোগ হচ্ছে মামলা-মকর্দ্দমায় বড্ড খরচা—ezpensiveness of law proceedings. এই সময়ের কয়েকটি বিখ্যাত মামলার মধ্যে দুটি জাল দলিল করার অভিযোগ—মহারাজা নন্দকুমারের বিরুদ্ধে যে চার্জ ছিল ও যার জন্য তাঁর প্রাণদণ্ড হয়। ১৮২৯ সালে দেখি মকর্দ্দমা হচ্ছে The king v... Prasanno Coonar Haldar. এ ধরণের অপর একটি মামলা ...চ্ছে The king versus Rajah Baide nath Roy, যাকে ...রা বেকসুর খালাস দেন। ১৮২৯ সালে রামমোহন রায়, দ্বারকানাথ ঠাকুরও হেরাল্টের স্বত্বাধিকারী হিসাবে একটি Lible case এ জড়িত।

এ ছাড়া দেখি Salt monopoly নিয়ে লেখালেখি হচ্ছে, তিতুমিয়া বিদ্রোহ করছেন, হাঙ্গর শিকারের গল্প বেরুচ্চে Strand Mills এর বিবরণ, proposed prospectus of a college, ইলোরার গুহা-মন্দিরগুলির বর্ণনা, ব্রহ্মপুত্রের উৎস সন্ধানে গবেষণা, আরাকানের কথা, ক্যালকাটা এপ্রেন্টিস্ সোসাইটির কাহিনী, হর্টিকালচারাল ও এগ্রিকাল-চারাল সোসাইটির পৃষ্ঠপোষকতায় দশসেরী ওজনের বাঁধা কপি, ৩।৪ সেরী ফুল কপির ইতিহাস। চল্লিশ টাকা পুরস্কার ও মেডেল দেওয়া হচ্ছে ইউসুফ মালিকে সব চেয়ে ভালো আলুর জন্য। আবার দেখি ফোর্ট উইলিয়াম কলেজ থেকে বই বেরুচ্চে মুগ্ধবোধ, লঘু কৌমুদী, ভট্টিকাব্য, সাহিত্যদর্পণ, রঘুবংশ, লীলাবতীর অঙ্কশাস্ত্র, সংস্কৃতে অস্থিবিদ্যা বা এনাটমি এবং ইউরোপীয় সাহিত্য ও বিজ্ঞানের চয়নিকা হিসাবে দিগ-দর্শন। ১৮২৭ সালে দেখি মেয়েদের উপদেশ হিসাবে 'Matrimonial maxims' ও গভর্ণমেণ্ট গেজেটে স্থান পেয়েছে এবং হাসি পায় পড়ে যখন বলা হচ্ছে—"Implicit submission in a man to his wife is ever disgraceful to both, but implicit ubmisgsion in a wife to the will of her husband is what she promises at the acter ; whar the laws of God aud men enjoin ; what the good will revere her for, and what is in fact the greatest honour she can receive. হায়রে যত্র নার্য্যস্তু পূজ্যন্তে রমন্তে তত্র দেবতা নয়, এ হচ্ছে নম্রী স্বাতন্ত্র্যমর্হতি। আবার পড়ি যে বেঙ্গল ব্যাঙ্কের নোট ছাড়া মাড়োয়ারী প্রকরা অন্য নোট বা হুণ্ডী ব্যবহার করতে চায় না। বড়বাজারের পগেয়াপটির বাবু মনোহরদাস (যার নামে আজও চক্ রয়েছে) ও গোপালদাস এ বিষয় জল্পনা কল্পনা করছেন। মাড়োয়ারী ব্যবসাদারদের কথা দেড়শো বছর আগেও শুনি। ১৮৩০ সালেই কলকাতা থেকে ব্যারাকপুর পর্য্যন্ত প্রথম ঘোড়ায়টানা বাস চলে। বাস্ চলতো তিন ঘোড়ায়। তরুণকান্তি ও 'ইয়ংবেঙ্গল'দের আদর্শগুরু ডিরোজিওর বহু কবিতা এই গেজেটে মুদ্রিত হয়েছে। হিন্দু কলেজের ছাত্র কাশীপ্রসাদ ঘোষও কবিতা লিখতেন। কলিকাতার উন্নতির জন্য লটারী করে টাকা তোলা একটা ফ্যাশন্ হয়ে দাঁড়িয়েছিল। চিৎপুর রোডে জল দেবার জন্য দশহাজার টাকা দিলেন এক মুসলমান ভদ্রলোক—আগা কুরবুলী মহম্মদ। ষ্ট্রাণ্ডরোডকে আগিয়ে নিয়ে গার্ডেন রিচ পর্য্যন্ত নিয়ে যা...র পরিকল্পনাতেও এই ভদ্রলোকের সাহায্য আছে। তখন শেয়ার করে টাকা তুলে 'টোল' বসিয়ে রাস্তা তৈয়ারী হতো। আবার পড়ি কালীনাথ রায় চৌধুরীকে নাকি একঘরে করে দেওয়া হয়েছিল। কারণ তিনি সব প্রগতিশীল কাজেই অ...নী ছিলেন এবং তিনি বেণ্টিঙ্ককে ধন্যবাদ জানিয়েছিলেন।

১৮২৯সালে ১৭নং রেগুলেশনে সতীদাহ বন্ধ হলো। তার একটা বিশদ-...রণ শুধু নয় বাদানুবাদ, ও সেই বিতণ্ডাকে ঘিরে সমাজ মনের এক বিচিত্র প্রকাশকেও দেখি। ১৮২৮ সালে ১০ই এপ্রিল তারিখের বেঙ্গল হরকরা ও ক্রনিকেল প্রেরিত ও গেজেটে উদ্ধৃত শালিখা হাওড়ায় একটি সতীদাহ ঘটে। এটি ঘটে প্রকাণ্ড সম্মোহের মধ্যে। মেদিনীপুর থেকে একটি তরুণী সদ্যবিধবা এলেন 'সতী' হবার জন্য মৃত স্বামীর দেহ নিয়ে। তার সম্পত্তির মূল্য আনুমানিক তিন লক্ষ টাকা। পূর্ব্বের দিন তাঁর সমস্ত অলংকার ও নগদ অর্থ সবই দান করেছিলেন আত্মীয় স্বজন, দাস-দাসী গরীব প্রজাদের মধ্যে। ভোর হতেই তিনি সহমৃতা হবার জন্য তৈয়ারী! কতলোক এলো তাঁকে বোঝালো, ধর্ম, সমাজ সংসার সবই ডাকলে তাঁকে। তিনি অচল অটল। তিনি পারবেন না তাঁর শপথ ভঙ্গ করতে, তামাতুলসী মাথায় নিয়ে যে প্রতিজ্ঞা করেছিলেন। ম্যাজিষ্ট্রেটের প্রতিনিধি এসে তাকে কতো বোঝাল। মহিলাটি যেন ভাবোন্মাদনায় মত্ত—অদ্ভুত ভাবে সংযত। অগ্নি সংযোগ হলো—ভদ্র মহিলা শান্ত স্তব্ধ হয়ে শবকে আলিঙ্গন করলেন সবাইকে হাত ... কিছু করতে নিরস্ত করলেন।

১৮৩০ সালের ১৫ই নভেম্বর গেজেটে খবর বেরুলো এলবিন জাহাজে রামমোহন চলেছেন বিলাতে। সম্পাদকীয় মন্তব্য দেখেই বোঝা যাবে

যে তার সম্বন্ধে সমকালীন কালে ইংরেজদের মধ্যেও কি উচ্চ ধারণা ছিল—The Baboo who is in some degree, a reformer, may be considered as one of those remarkable men who attract attention in their day and generation by outstripping the prejudices and shoukles of a peculiar position, and taking nothing for granted examine every-thing for themselves. রীতিনীতি, আইনকানুন, শাস্ত্রের বিধান-নিদান মেনে না নিয়ে তাকে বিচার করে দেখার এই যে আত্মজ্ঞান সচেতনতা এই ছিল রামমোহন চরিত্রের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ। রবীন্দ্রনাথের ভাষায় তাঁর মন ছিল বহতা নদী—সে এনেছিল বহমান্ মনন ধারার সঙ্গে সামঞ্জস্যের স্রোত। সেকালের সম্পাদকবলছেন—Conscious of high intellectual powers, he determined by a course of self education to bring them to bear with as much advantage as possible upon society and circumsstances around him. রামমোহন শুধু সতীদাহ প্রথা বন্ধের জন্য অমানুষিক পরিশ্রম করেন নি। একেশ্বরবাদ প্রতিষ্ঠার জন্যও কঠোর সংগ্রাম করলেন, তুফাৎ-উল-মুহাদ্দীন শুধু বক্তৃতা বা তর্ক নয়—তাঁর আত্মপ্রীতির কথাও। রামমোহন রায়কে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী ১৮৩১ সালের ৯ই জুলাই যে ডিনার দেন টাইমসে তার খবর ও বর্ণনা বেরোয়—গভর্ণমেণ্ট গেজেটে ওর পুনর্মুদ্রণ দেখি ১৮৩১ সালের ১০ই নভেম্বর, এবং সেই মন্তব্যে দেখি—It was rather curious to see the Brahmin surrounded by hearty feeders upon the turble and vension and champagne touching nothing but rice cold water.

রামমোহন চরিত্রের এই যে বৈশিষ্ট্য—অর্জ্জন করবো, কিন্তু বর্জ্জন করবো না—এই যে গ্রহিষ্ণুতা, সহিষ্ণুতা—এটাই তাকে ভারতপথ পথিক করেছিল—আয়ত্ত সর্বত স্বাহা।

একশোত্রিশ বছর আগের কলকাতার কথা মনে হতে মনে পড়ছে এই মহাপুরুষকে, আর মনে পড়ছে ডিরোজিওর একছত্র কবিতা

The moon stood silent in the sky
And look'd upon our earth ;
The clouds divided, passing by,
In homage to her worth.

আজকের মেঘের আড়ালে সেদিনের কলিকাতাকে যেন শুভ্র জ্যোৎস্না-স্নাতই দেখি, আর মহাকবির ভাষা একটু বদলে বলি—

শত বরষের আগে যে মানুষ যাত্রা করছে সুরু
সেই যে প্রপিতামহ
জীবনে মরণে পথের শরণে
দুনিয়ার যত পদাতিকদের একটি প্রণাম লহ।

ঋতু বদলের দিনে

শ্রীঅপূর্ব্বকৃষ্ণ ভট্টাচার্য্য

দূর হোতে ধ্বনিতেছে সমুদ্রের স্বর,
নভে তার প্রতিধ্বনি।
গীতধারা সমুচ্ছল, মোরা পরস্পর
নিবিড় আশ্লেষে গণি
রজনী সুন্দর। তনু মনে জাগিতেছে তরুণতা,
চেয়ে দেখ ঝিলিমিলি খুলে, কাননের তরুলতা
কবোষ্ণ হৃদয়ে বুঝি
নৈশ অভিসারে মত্ত প্রণয়ের অবসর খুঁজি!

আকুল কম্পিত লাজে চঞ্চল নিশীথে
তুমি শ্রান্ত অবসাদে
বুকের দোলায় দুলে দিতে আর নিতে
শুনালে অস্পষ্ট বাণী। অন্ধকার ঘুমায়েছে শেষে,
ক্লান্তির মর্ম্মরে তব রূপ-বীথি মধুর আবেশে
ছিল বসন্ত-বিহ্বলা,
নীল বাতায়ন তলে যৌবনে উতলা!

সময় হয়েছে মোর ফসল বুননে
মেঘমদিরতা লয়ে,
রাতের কণিকা ঝরে দেহে আর মনে।
আকাশ কুসুম হয়ে—
ঘনিষ্ঠ নিভৃতে ছিলে রোমাঞ্চিত স্বপনের সম,
সে কুসুম ফুটে গেছে কামনার আয়োজনে মম ;
দাও তব অঙ্গীকার,
এ রাত্রি প্রয়াণে তবু রেখো নর্ম্মাচার।

মোর জীবনের ঋতু বদলের দিনে
নামে বাদলের ধারা,
তবু ও সবুজ স্মৃতি, পথ চিনে চিনে
থামে আর দেয় সাড়া।
শিশির বিন্দুর মত পড়ে ঝরে সুদূরের আশা,
তুমি যেন মেরুজ্যোতি,মরু হোতে পেলে ভালোবাসা।
তোমারে পেয়েছি কবে
জ্যোৎস্না-জড়ানো রাতে বকুল সৌরভে!

প্রথম কুমারগুপ্ত

অধ্যাপক শ্রীনলিনীনাথ দাশগুপ্ত

গুপ্ত-বংশীয় চতুর্থ সম্রাট প্রথম কুমারগুপ্তের রাজত্বকাল সম্বন্ধে দুই-চারিটি কথা আলোচনা করা প্রয়োজন মনে করিতেছি।

সম্ভবতঃ যৌবন শেষে তিনি ৪১৪ খৃষ্টাব্দে রাজ্যারোহণ করিয়া প্রায় ৪০ বৎসর রাজত্ব করিয়াছিলেন। গুপ্তবংশের অন্য যে কোনও রাজার তুলনায় তাঁহার রাজত্বকালেরই সর্বাধিকসংখ্যক, অন্ততঃ তেরখানি, খোদিতলিপি অদ্যাবধি আবিষ্কৃত হইয়াছে, অথচ আশ্চর্য, এতগুলি লিপিতে তাঁহার রাজত্বের বিশেষ কোনও ঘটনার উল্লেখ নাই। এই জন্য তাঁহার ইতিহাসের জন্য তাঁহার বিভিন্ন প্রকারের মুদ্রা ও তাঁহার উত্তরাধিকারীদের খোদিতলিপির উপর নির্ভর করিতে হয়।

তাঁহার মুদ্রা হইতেই এতকাল জানা যাইত তাঁহার বিরুদ (উপাধি) ছিল মহেন্দ্রাদিত্য, কোনও খোদিতলিপিতে ইহা আগে দেখা যায় নাই। কিন্তু কিছুদিন হইল রেওয়া রাজ্যের অন্তর্গত সুপিয় নামক স্থানে তাঁহার পুত্র স্কন্দগুপ্তের রাজত্বকালে ৪৬১ খৃষ্টাব্দে উৎকীর্ণ একটি লিপিতে তাঁহাকে 'বিক্রমাদিত্যে'র পুত্র 'মহেন্দ্রাদিত্য' বলিয়াই উল্লেখ করা হইয়াছে। অর্থাৎ পিতা ও পুত্রের বিরুদই তাঁহাদের উভয়ের ব্যক্তিগত নাম হিসাবে ব্যবহৃত হইয়াছে।১

সুপিয় লিপির আর এক বৈশিষ্ট্য, মহেন্দ্রাদিত্য ও স্কন্দগুপ্তকে মহারাজাধিরাজের পরিবর্তে শুধু মহারাজ বলা হইয়াছে; বিক্রমাদিত্যকে আবার তাহাও নয়, কেবলমাত্র শ্রীবিক্রমাদিত্য। কুমারগুপ্তের রাজত্বকালে এলাহাবাদ জেলার মনকুয়ার গ্রামে আবিষ্কৃত একটি বুদ্ধ প্রতিমার পাদপীঠে ৪৪৯খৃষ্টাব্দে উৎকীর্ণ লিপিতে 'মহারাজ শ্রীকুমার গুপ্তস্য রাজ্যে' দেখিয়া বহুকাল পূর্বে ডক্টর ফ্লিট সন্দেহ করিয়াছিলেন, ইহার নিগূঢ়ার্থ অনেকখানি। অর্থাৎ কুমারগুপ্তের সাম্রাজ্য এই সময়ে বহিঃশত্রুর আক্রমণে এতই ছিন্নবিচ্ছিন্ন হইয়া গিয়াছিল যে তিনি ঐ সময়ে আর মহারাজাধিরাজ নন, শুধু সামন্তশ্রেণীর একজন মহারাজ।২ এই বিষম ভুল নিরসনের জন্য অন্যান্য প্রমাণের মধ্যে এই সুপিয় লিপির সাক্ষ্য একটি নূতন ও প্রকৃষ্ট প্রমাণ। অতবড় 'মহারাজাধিরাজ'কে মাঝে মাঝে গুপ্তলেখমালায় ও মুদ্রায় সংক্ষেপে 'মহারাজ' লিখিয়া লিপিকারগণ এইরূপ আরও বিভ্রাট সৃষ্টি করিয়াছেন।

কুমারগুপ্তকে কতগুলি গুপ্তলিপিতে (যথা, তাঁহার গড়ওয়া শিলালিপি, স্কন্দগুপ্তের বিহার শিলাস্তম্ভলিপি, ইত্যাদি) সাধারণভাবে পরম-ভাগবত বলিয়া অভিহিত করা হইলেও তিনি প্রকৃতপক্ষে ছিলেন 'শিব-'গোষ্ঠীভুক্ত দেবতা কার্তিকেয়ের ভক্ত। এই ভক্তির নিদর্শন স্বরূপ তিনি ময়ূরবাহন-কার্তিকেয় জাতীয় মুদ্রাও প্রচলন করিয়াছিলেন। মনে হয়, তাঁহার পিতৃদত্ত এই নামটিকে সার্থক করিবার জন্যই তিনি নামের সঙ্গে সঙ্গতি রাখিয়া দেবতাদের মধ্যে কার্তিককে নিজের উপাস্য বলিয়া বাছিয়া লইয়াছিলেন। পূর্বে যাঁহারা ভাবিতেন পরম-ভাগবত কুমারগুপ্তের রাজত্বের শেষাশেষি শত্রু দ্বারা তাঁহার সাম্রাজ্য নিদারুণ-ভাবে আক্রান্ত হইলে তিনি দেব-সেনাপতি কার্তিকের পূজা আরম্ভ করিয়া দিয়াছিলেন, তাঁহারাও কম ভুল করেন নাই। তাঁহার রাজত্বের প্রারম্ভ হইতেই গুপ্ত সাম্রাজ্যে কার্তিক জনপ্রিয় হইয়া উঠিয়াছিলেন। ৪১৫ খৃষ্টাব্দেই উত্তরপ্রদেশের এটা জেলার বিলসদ গ্রামে একটি শিলাস্তম্ভে লেখা আছে, (৩) ধ্রুবশর্মা নামে এক ব্রাহ্মণ স্বামীমহাসেনের (কার্তিকেয়ের) এক মন্দিরে একটি প্রতোলী (সোপানবলী সংযুক্ত তোরণ, a gateway with a flight of steps) নির্মাণ করিয়াছিলেন। ৪২৪ খৃষ্টাব্দেও মালবে কুমারগুপ্তের সামন্তরাজা বিশ্ববর্মার মন্ত্রী ময়ূরাক্ষ কার্তিকেয়ের ধাত্রী মাতৃকাগণের একটি মন্দির নির্মাণ করিয়াছিলেন।৪ লক্ষ্যণীয়, বিলসদ শিলাস্তম্ভলিপিতে দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তকে পরম ভাগবত বলিয়া উল্লেখ করিলেও কুমারগুপ্ত সম্বন্ধে এই বিশেষণটি সযত্নে পরিহার করা হইয়াছে। ইহাতে বুঝা যায় অন্যান্য লিপিতে কুমারগুপ্তের পরমভাগবত আখ্যাটি নিতান্তই গতানুগতিক ও অযাচিত, ইহা তাঁহার প্রকৃত ধর্মমতকে প্রতিফলিত করে না। কুমারগুপ্তের মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গেই লোকে কার্তিকের মাহাত্ম্য একেবারে বিস্মৃত হইয়া গিয়াছিল তাহাও নয়, কারণ সুপিয় লিপির সাক্ষ্যে দেখা যায়, ৪৬১ খৃষ্টাব্দে ছন্দক নামে এক ব্যক্তি কার্তিকের পত্নী ষষ্ঠীদেবীর একটি মূর্তি প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। স্কন্দগুপ্তের বিহার শিলাস্তম্ভলিপির সাক্ষ্যেও স্কন্দ-কার্তিকেয় ও মাতৃগণের পূজার প্রচলন দেখা যায়।৫

১। Proceedings of the All India Oriental Conference, Twelfth Session, Benares, vol. 111, 1943.44, pp. 587-589.। অনেক শতাব্দী পরে লেখা মঞ্জুশ্রীমূলকল্পেও তাঁহাদের নাম বিক্রম ও মহেন্দ্র,—

সমুদ্রাখ্যো নৃপশ্চৈব কীর্তিতঃ।

মহেন্দ্র নৃপবরো মুখ্য সকারাদ্যো মতঃপরম্। ৬৪৬। Imperial History of India, K. P. Jayaswal, Text, P. 47,

(২) Fleet, Gupta Inscriptions (C. I. I. Vol. 111), P. 46.

(৩) Ibid, pp. 43-44.

(৪) Ibid, P. 76.

(৫) Ibid, P. 49.

প্রথম কুমারগুপ্তের মুদ্রা হইতে আরও জানা যায় তিনি (পিতামহ সমুদ্রগুপ্তের ন্যায়) অশ্বমেধ যজ্ঞ করিয়াছিলেন এবং সমুদ্রগুপ্তের মতই সেই উপলক্ষে, মুখ্যতঃ পুরোহিতদের দক্ষিণা প্রদানের জন্য, অশ্বমেধ জাতীয় মুদ্রা প্রচলন করিয়াছিলেন। কুমারগুপ্ত কার্তিকের উপাসক ছিলেন বলিয়া ধর্মমতের দিক দিয়া অশ্বমেধযজ্ঞ অনুষ্ঠান করিতে তাঁহার কোনও বাধা ছিলনা। সমুদ্রগুপ্তেরও তাই, কারণ একমাত্র তাঁহার নালন্দা তাম্রশাসন ব্যতীত অন্য কোনও গুপ্তলেখমালায় তাঁহাকে পরম ভাগবত আখ্যা দেওয়া হয় নাই। তবে সমুদ্রগুপ্ত গরুড় লাঞ্ছনটিকে সর্বপ্রথম গুপ্তমুদ্রায় প্রবর্তন করিয়াছিলেন, তাহা অবশ্যই তাঁহার বৈষ্ণব-ধর্মের প্রতি কিছুটা অনুরাগের লক্ষণ। কিন্তু তাঁহার বিষ্ণুভক্তি যতই প্রবল হোক, তাঁহার ধর্মপ্রবণতা তাঁহার রাজনীতিকে অতিক্রম করিতে পারে নাই, সেইজন্য দিগ্বিজয় শেষে তিনি যে সার্বভৌমত্ব অর্জন করিয়াছিলেন তাহারই আনুষ্ঠানিক প্রতিষ্ঠার জন্য অশ্বমেধ করিয়াছিলেন। কিন্তু দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত দিগ্বিজয় করিয়াও এই যজ্ঞ করেন নাই কেন? তিনি এই যজ্ঞ করিতে গ্রাহ্য করেন নাই ("did not care to perform that Sacrifice"), ৬ ইহা এই প্রশ্নের উত্তর নয়! তিনি মনে-প্রাণে পরমভাগবত হইয়াছিলেন, সে ধর্মে পশু নিধন নিষিদ্ধ,—এইজন্য করেন নাই।

প্রথম কুমারগুপ্তের অশ্বমেধযজ্ঞ অনুষ্ঠানের আর একটা দিক আছে যাহা আলোচনা সাপেক্ষ। প্রাচীনকালে দুই প্রকারের অশ্বমেধ হইত। প্রথম প্রকার, দিগ্বিজয় সম্পন্ন করিয়া অশ্বমেধ, যেরূপ মহাভারতের যুধিষ্ঠির করিয়াছিলেন এবং যাহাকে সাধারণতঃ বলি মহাকাব্যের মত অশ্বমেধ (of epic style) ; দ্বিতীয় প্রকার, দিগ্বিজয়-বিহীন সাধারণ অশ্বমেধ। কুমারগুপ্তের অশ্বমেধ কোন্ প্রকারের তাহা বলা কঠিন, কিন্তু স্মরণীয়, সমুদ্রগুপ্তের অশ্বমেধ জাতীয় মুদ্রার তুলনায় কুমারগুপ্তের অশ্বমেধ মুদ্রা সংখ্যায় অনেক কম। মুদ্রার এই স্বল্পতা কোনও গুরুত্বপূর্ণ বিজয়ের অবশ্যই কতকটা পরিপন্থী। তাছাড়া, সমুদ্রগুপ্তের অশ্বমেধের কথা পরবর্তী গুপ্তরাজারা যেমন গৌরব করিয়া স্মরণ করিতেন, কুমারগুপ্ত এমন এক অশ্বমেধ করিয়াছিলেন যাঁহা তাঁহার বংশধরেরা ইঙ্গিতেও উল্লেখ করেন নাই। তবু সমুদ্রগুপ্তের পৌত্র হিসাবে কুমারগুপ্তের অশ্বমেধ প্রসঙ্গে বিজয়ের একটা কল্পনা বিজড়িত থাকিয়াই যায়, সে কল্পনার মোহ বিসর্জন দেওয়া দুরূহ। সেই কথাই বলিতেছি। কুমারগুপ্তের অন্যান্য মুদ্রার মধ্যে আর তিন জাতীয় মুদ্রা আছে, (১) ব্যাঘ্র-হন্তা, (২) সিংহ-হন্তা ও (৩) গণ্ডার-হন্তা। প্রথম দুই জাতীয় মুদ্রা স্পষ্টতঃ তাঁহার পিতামহের ব্যাঘ্র-হন্তা ও পিতার সিংহহন্তা মুদ্রাগুলির অনুকরণ, কেবল গণ্ডারহন্তা জাতীয় মুদ্রা তাঁহার নিজের রাজত্বকালের মৌলিক উদ্ভাবন। ইহার মধ্যে প্রথম ও তৃতীয় জাতীয় মুদ্রার উপর ভিত্তি করিয়া দুইটি মতবাদ প্রচারিত হইয়াছে, (১) তাঁহার দাক্ষিণাত্যের কিয়দংশ আক্রমণ এবং (২) তাঁহার কামরূপ বিজয়। প্রথম মতবাদ বলা হইয়াছে, "ব্যাঘ্রহন্তা জাতীয় মুদ্রার উপর কুমারগুপ্ত কর্তৃক ব্যাঘ্র-বল-পরাক্রম উপাধি ধারণে সম্ভবতঃ ইহাই বুঝায় যে তিনি তাঁহার পিতামহের দক্ষিণ দিকের দুঃসাহসিক অভিযানের (ventnre) পুনরাবৃত্তি করিয়া নর্মদার অপরদিকে ব্যাঘ্র-অধ্যুষিত অরণ্যে অনুপ্রবেশ করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন। সাতারা জেলায় ১৩১৫টি মুদ্রার আবিষ্কার দক্ষিণদিকে সাম্রাজ্য বিস্তারের সূচনা করিতেছে। কিন্তু সম্রাটের সেনাবাহিনী অবশ্যই বিপর্যয়ের সম্মুখীন হইয়াছিল। গুপ্তবংশের নিপতিতা ভাগ্যলক্ষ্মীকে যুবরাজ স্কন্দগুপ্ত পুনরুদ্ধার করিয়াছিলেন।" ইতিপূর্বেই ডক্টর মজুমদার মহাশয় এই মতবাদের প্রতিবাদ করিয়া বলিয়াছেন, ঐ উপাধি ধারণ অথবা সাতারা জেলায় মুদ্রা আবিষ্কার কোনটিই এই অনুমান সমর্থন করে না।৭ বড়ই দুঃখের সহিত প্রশ্ন করিতে হয়, এইরূপ মতবাদের সার্থকতা কি? ব্যাঘ্রও ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলের জন্তু, এবং কুমারগুপ্তের মুদ্রাও ভারতের বিভিন্ন স্থানে, এমন কি ব্যাঘ্রচর স্থানেও পাওয়া গিয়াছে, তখন কেন তাঁহার ব্যাঘ্রবল-পরাক্রম এই উপাধিটি নর্মদার ওপারে দাক্ষিণাত্যের পশ্চিমাঞ্চল আক্রমণ বুঝাইতে যাইবে? তাছাড়া, যে আক্রমণ শোচনীয় ব্যর্থতায় পর্যবসিত হইয়াছিল, তবে কি সেই দুর্ঘটনার স্মারক হিসাবে একজাতীয় স্বর্ণমুদ্রার প্রচলন করা হইয়াছিল? আরও প্রশ্ন করি, কুমারগুপ্তের সময়েই কি প্রথম সাতারা জেলা (দক্ষিণ মহারাষ্ট্র) পর্যন্ত গুপ্ত রাজনৈতিক প্রভাব বিস্তৃত হইয়াছিল? কুমারগুপ্তের ব্যাঘ্রহন্তা মুদ্রাগুলি যদি অত কথা বলিতে পারে, তাঁহার সিংহহন্তা মুদ্রাগুলি আর এক দফা মালব ও সুরাষ্ট্র বিজয় বুঝাইবে না কেন?

দ্বিতীয় মতবাদটি অপেক্ষাকৃত সুচিন্তিত, কিন্তু গ্রহণীয় নয়। কুমারগুপ্তের গণ্ডারহন্তা মুদ্রাগুলি হইতে (অশ্বমেধ যজ্ঞানুষ্ঠানের পূর্বে) তাঁহার কামরূপ জয় অনুমান করা হইয়াছে, কারণ গণ্ডার কামরূপেরই বিশেষ জন্তু (an animal which is peculiar to Assam (Kamarupa)" ।৮ কিন্তু এই প্রসঙ্গে ভারতের গণ্ডার সম্বন্ধে একটি প্রবন্ধ হইতে কয়েক লাইন উদ্ধৃত করিতেছি, "প্রাচীনকালে 'গ্রেট ইণ্ডিয়ান' গণ্ডারের নিশ্চয়ই বিশেষ একটা মর্যাদা ছিল ; কারণ সিন্ধু উপত্যকায় মোহেনজো-দড়োর প্রাগৈতিহাসিক মৃত্তিকা স্তূপ খনন করে যেসব সীল আবিষ্কৃত হয়েছে সেগুলিতে প্রায়শ 'গ্রেট ইণ্ডিয়ান' গণ্ডারের প্রতিকৃতি রয়েছে। সিন্ধু উপত্যকায় নিশ্চয়ই বহু গণ্ডার জন্মাত। এমন কি ষোড়শ শতাব্দীর শুরুতেও যে এ অঞ্চল গণ্ডারের

(৬) Catalogue of the Gupta Gola Coins in the Bayana Hoard, A. S. Altekar, Intro, p. xxix.

(৭) Vakataka-Gupta Age, Alteker and Majumder, P. 161, footnote 2,

(৮) Ind Hist Quart, Vol. xxxi, 1955, P-177, Sri Bratindra Nath Mukherjee.

বাসভূমি ছিল, তার প্রমাণ পাওয়া যায় বাবরের আত্মজীবনীতে। বাবর তার আত্মস্মৃতিতে লিখেছেন—"পেশোয়ার ও হর্ষনগরের জঙ্গলে এবং সিন্ধুনদ ও ভেরাদেশের জঙ্গলের মধ্যবর্তী অঞ্চলে প্রচুর গণ্ডার আছে। হিন্দুস্থানের সরু নদীর তীরও গণ্ডারে ভর্তি"।৯ ইহার সঙ্গে আর একটু নূতন সংযোগ করিয়া দিতেছি, গুপ্তবংশের অবসানের কিছুকাল পরে হুয়েন-সাং এর সময় পাটলিপুত্রেরই অনতিদূরে চম্পার (ভাগলপুরের) দক্ষিণে অরণ্যে প্রচুর (abundant) গণ্ডার ছিল।১০ দক্ষিণবঙ্গেও গণ্ডারের অস্তিত্বের প্রমাণ আছে। কাজেই গণ্ডার কুমারগুপ্তের সময়ে একমাত্র কামরূপের জন্তু ছিল, একথা বলা যায় না। পক্ষান্তরে, তখন কামরূপেই গণ্ডার ছিল কিনা তাহা বলা কঠিন, কারণ হুয়েন-সাং কামরূপের বর্ণনায় বিষধর সর্প ও বন্য হস্তীযূথের কথা বলিয়াছেন, গণ্ডারের কোনও উল্লেখই করেন নাই।১১ দ্বিতীয়তঃ, কামরূপ রাজ্যটি সমুদ্রগুপ্তের সময়ে তাঁহার সাম্রাজ্যের যে কেবল একটি প্রত্যন্ত রাজ্য ছিল তাহা নয়, কামরূপের সমসাময়িক রাজা, সম্ভবতঃ পুষ্যবর্মণ, সমুদ্রগুপ্তের এতই অনুগত হইয়া পড়িয়াছিলেন যে, তিনি নিজের পুত্রের নাম পর্যন্ত সমুদ্রবর্মণ ও পুত্রবধূর নামও সমুদ্রগুপ্তের মহিষীর নামানুসারে দত্তদেবী রাখিয়াছিলেন। হয়ত বা এই আনুগত্যের ফলে গুপ্ত সভ্যতার দুই একটা ঢেউ গিয়াও কামরূপে লাগিয়াছিল। এত আনুগত্য সেখানে, প্রয়োজনের দিক দিয়া সে রাজ্যটিকে জয়ের প্রশ্নই ওঠেনা—যদি না কুমারগুপ্তের সময় তাঁহাকে দুর্বল বা কাপুরুষ মনে করিয়া সমুদ্রবর্মণের পুত্র বলবর্মণ বা পৌত্র কল্যাণবর্মণ তাঁহার বিরুদ্ধাচরণ করিয়া থাকেন। কিন্তু সেক্ষেত্রে কুমারগুপ্ত কামরূপ বিজয়ের পর অবশ্যই এই রাজবংশকে উচ্ছেদ করিতেন ও অন্য রাজাকে বা কোনও ভুক্তিপতিকে কামরূপ শাসনে নিযুক্ত করিতেন। উপরন্তু, কামরূপে তখন গুপ্তাব্দেরও প্রচলন হইত। কিন্তু পুষ্যবর্মণের বংশে অন্ততঃ ভাস্করবর্মণ পর্যন্ত পুরুষানুক্রমে অব্যাহতভাবে রাজত্ব করিয়া গিয়াছে, আর কামরূপেই বা গুপ্ত সংবতের প্রচলনের প্রমাণ কই?

অশ্বমেধের পূর্বে কুমারগুপ্ত বিস্তর যুদ্ধবিগ্রহ এবং সত্যই কোনও জয় করিয়া থাকিতে পারেন সেকথা অস্বীকার করিনা, কিন্তু তাঁহার গণ্ডারহন্তা মুদ্রা দিয়া তাঁহার কামরূপ বিজয় প্রমাণিত হয় না। প্রবন্ধান্তরে দেখাইবার ইচ্ছা রহিল, দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তের সিংহহন্তা মুদ্রাগুলিও তেমনই তাঁহার মালব ও সুরাষ্ট্র জয় মোটেই প্রমাণ করেনা, কারণ প্রাচীনকালে সিংহ ভারতের অন্যান্য কোনও কোনও অঞ্চলেও বাস করিত।

বস্তুতঃপক্ষে গুপ্তরাজাদের এই পশুহন্তা জাতীয় মুদ্রাগুলি তাঁহাদের দৈহিক অমিত শক্তির পরিচয়ই বহন করিতেছে। এইগুলি তাঁহাদের এক একটি দেশ বিজয়ের স্মারক, এই কল্পনা কাহার মনে প্রথম উদয় হইয়াছিল জানি না, কিন্তু ইহার নাম আর যাহাই হোক গবেষণা নয়। এই মুদ্রাগুলির উদ্দেশ্য অতি স্পষ্ট, সহজ ও সরল। সমুদ্রগুপ্তের ব্যাঘ্রহন্তা মুদ্রাগুলিতে দেখা যায়, তিনি বিপুল পরাক্রমে একটি ভূপতিত ব্যাঘ্রকে পদদলিত করিয়া ধনুর্বাণ হস্তে তাহাকে শরবিদ্ধ করিতে উদ্যত, আর ব্যাঘ্রটি ভয়ে ও অসহ বেদনায় মুখব্যাদান করিয়া আছে। এই মুদ্রাগুলিতে তিনি 'ব্যাঘ্রপরাক্রমঃ' আখ্যা লইয়া আত্মপ্রসাদ লাভ করিয়াছেন। ইহারই দেখাদেখি তাঁহার পুত্র সিংহহন্তা মুদ্রার প্রচলন করিয়াছিলেন, ইহাতে ব্যাঘ্র অপেক্ষাও বলবান জন্তু সিংহকে অনুরূপভাবে পরাভূত করিয়া যোদ্ধাবেশে দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত নিজের বিক্রম প্রদর্শন করিতেছেন। এই জাতীয় মুদ্রায় তাঁহাকে সেজন্য 'সিংহবিক্রমঃ' বলা হইয়াছে। তেজ ও বলের দিক দিয়া জন্তুর মধ্যে সিংহ ও ব্যাঘ্রের পরই গণ্ডারের স্থান হইলেও গণ্ডার ইহাদের অপেক্ষা অনেক নিকৃষ্ট। দেবসেনাপতি কার্তিকের পূজারী কুমারগুপ্ত সম্ভবতঃ নিজেকে তাঁহার পিতা-পিতামহ অপেক্ষা অধিকতর শক্তিশালী ভাবিতেন, কুমারগুপ্তের রৌপ্যমুদ্রায় তাঁহার প্রকাণ্ড মুখমণ্ডল দেখিলে সকলেরই তাহা মনে হইতে পারে। কাজেই তাঁহার শারীরিক শক্তিমত্তার পরিচায়ক হিসাবে শুধু গণ্ডারকে মুদ্রায় ব্যবহার করিয়া তিনি যথেষ্ট তৃপ্ত হইতে পারেন নাই, গণ্ডার, ব্যাঘ্র ও সিংহ পরপর এই তিন জন্তুকে দিয়া তিনি নিজের আত্মাভিমান চরিতার্থ করিয়াছেন। সুতরাং একই রাজার ব্যাঘ্রহন্তা সিংহহন্তা ও গণ্ডারহন্তা এই তিন জাতীয় মুদ্রা প্রচলনের কারণ বুঝিতে দেরী হয় না। এই তিনজন মহাপরাক্রান্ত রাজার এই সকল মুদ্রার একদিকে তাঁহাদের দেহের স্ফীত পেশীগুলি, মুখের কঠিন ভাব ও চোখের একাগ্র ও স্থিরসঙ্কল্প দৃষ্টি, এবং অপরদিকে মরণের পূর্বে ভয়ঙ্কর জন্তুগুলির যন্ত্রণাকাতর মুখভঙ্গীর যে নিপুণ প্রকাশ রহিয়াছে, তাহাতে ইহাদের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে ভুল করিলে চলিবে কেন?' এগুলির মধ্যে তাঁহাদের দেশজয়ের ঘুণাক্ষরেও কোনও ইঙ্গিত নাই, কেবলমাত্র রাজাদের দৃপ্ত পৌরুষ ও অমানুষিক বীর্যের পরিচয় দিয়া নূতন রাজবংশের পরমদৈবত রাজাদের প্রতি প্রজার মনে ভয়, বিস্ময় ও সম্ভ্রমের অনুভূতি উদ্রেক করাই উদ্দেশ্য।

পরলোকগত ভিনসেণ্ট স্মিথ সাহেব কোনও ব্যক্তিগত সংগ্রহে কুমারগুপ্তের একটি রৌপ্যমুদ্রা দেখিয়াছিলেন, যাহার তারিখ তিনি পড়িয়াছিলেন ১৩৬ গুপ্তসংবত (৪৫৬ খ্রীষ্টাব্দ)। ইহার উপর নির্ভর করিয়া এতকাল সকলের ধারণা ছিল কুমারগুপ্ত অন্ততঃ ৪৫৬ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত রাজত্ব করিয়াছিলেন। কিন্তু কিছুদিন আগে অধ্যাপক এ, এল, ব্যাসাম দেখাইয়াছেন স্কন্দগুপ্তের রাজত্বকালে উৎকীর্ণ গির্ণার শিলালিপিতে ১৩৭ গুপ্ত সংবতেই তাঁহার রাজত্বের প্রথমভাগের এমন কতগুলি ঘটনার (যেমন, স্কন্দগুপ্তের ম্লেচ্ছদিগকে পরাজয়, সকল দেশে উপযুক্ত

(৯) দেশ, ২১বর্ষ, ২২ সংখ্যা, ১৩৬০, পৃঃ ৫৬১ ৬২।

(১০) The Life of Hiuen Tsiang, S, Beal P 124.

(১১) Watter, On Yuan Chwang, II, p. 186; Beal, Records, II, p 199.

শাসনকর্তা (গোপ্তৃ) নিয়োগ, সুরাষ্ট্রদেশে শাসনকর্তা হিসাবে পর্ণদত্তকে নিযুক্ত করা, পর্ণদত্ত কর্তৃক আবার তাঁহার পুত্র চক্রপালিতকে গির্ণার নগরীর স্থানীয় শাসনকার্যে নিয়োগ, নিজের বিবিধ গুণ ও নানা সৎকার্যের দ্বারা চক্রপালিতের লোকপ্রিয়তা অর্জন, অত্যধিক বর্ষার ফলে উর্জয়ৎ (গির্ণার) পর্বতের পাদদেশের উপত্যকায় সুদর্শন হ্রদের বাঁধ ভাঙ্গিয়া যাওয়া, এবং ১৩৬ গুপ্তাব্দে দুই মাসের চেষ্টায় সেই বাঁধ সংস্কার ইত্যাদি) উল্লেখ আছে যেগুলি ঘটিতে অন্ততঃ বছর দুই সময় লাগিয়াছিল। সুতরাং কুমারগুপ্তের মৃত্যু ১৩৪ গুপ্তসংবতের (৪৫৪ খৃষ্টাব্দের) পরে ঘটিতে পারে না।১২ কুমারগুপ্ত ৪৫৪ খৃষ্টাব্দে (অথবা তাহারও পূর্বে) লোকান্তরিত হইয়া থাকিলে ভিনসেন্ট স্মিথ তাঁহার ৪৫৬ খৃষ্টাব্দের মুদ্রা দেখিলেন কি করিয়া? মুদ্রাটির এখন আর সন্ধান পাওয়া যায় না, কিন্তু তারিখটি পড়িতে স্মিথ সাহেব ভুল করিয়াছেন, অথবা মুদ্রাটি তিনি স্বচক্ষে দেখেন নাই—উহার কথা লোকমুখে শুনিয়াছিলেন, কিংবা মুদ্রাটিই জাল, এই তিন বিকল্পের কোনটিই বলিতে যাওয়া শোভন বা সঙ্গত নয় বলিয়া ব্যাসামকে বিনয় করিয়া বলিতে হইয়াছে যে, কুমারগুপ্তের মৃত্যুর দুই বৎসর পর পর্যন্তও এই মুদ্রাশালার অধ্যক্ষ জানিতেন না যে সম্রাটের মৃত্যু হইয়াছে, তাই ৪৫৬ খৃষ্টাব্দেও তিনি কুমারগুপ্তের নামে মুদ্রা প্রচলন করিয়াছিলেন। এই নিরীহ অধ্যক্ষটিকে অভিযুক্ত করিলেই যদি ইহার সদুত্তর মিলে তবে ব্যাসামের বিনয়কে সানুনয়ে মানিয়া লইতে দোষ নাই, কিন্তু একথা স্থির যে কুমারগুপ্ত ৪৫৪ খৃষ্টাব্দের এদিকে আর জীবিত ছিলেন না।

কথা উঠিয়াছে, কুমারগুপ্ত নাকি শেষজীবনে তাঁহার পুত্র স্কন্দগুপ্তকে সিংহাসনে বসাইয়া তিনি ধর্মজীবন যাপন করিয়াছিলেন বা বৌদ্ধ সন্ন্যাসী হইয়াছিলেন। এই ধারণার মূলে রহিয়াছে চন্দ্রগর্ভপরিপৃচ্ছা নামে একখানি বৌদ্ধগ্রন্থের একটি উপাখ্যান। গ্রন্থখানি কে এবং কখন লিখিয়াছিলেন জানা যায় না, তবে তিব্বতীয় ঐতিহাসিক লামা বুস্তো বা বুদোন খৃষ্টীয় চতুর্দশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে তাঁহার ভারতবর্ষ ও তিব্বতের বৌদ্ধধর্মের ইতিহাসে ঐ ধর্ম কিভাবে বিলুপ্ত হইবে এই প্রসঙ্গে গ্রন্থখানি হইতে উপাখ্যানটি উদ্ধৃত করিয়াছেন। এই উপাখ্যানে দেখা যায়, এক প্রশ্নের উত্তরে বুদ্ধ ভবিষ্যদ্বাণী করিয়া বলিতেছেন যে, তাঁহার মহাপরিনির্বাণের পর হইতে ১,৫০০ বৎসরের মধ্যে তাঁহার ধর্ম কি প্রকারে ক্রমশঃ লোপ পাইবে। তিনি বলিলেন, এই সময়ে জম্বুদ্বীপে নরপতিগণ পরস্পর পরস্পরকে যুদ্ধে আক্রমণ করিবে, ফলে নানাবিধ বিশৃঙ্খলা, দুর্ভিক্ষ ও মড়ক দেখা দিবে। ভিক্ষুগণ সদ্ধর্ম হইতে বিরত হইয়া পার্থিব লাভ ও যশের অন্বেষণ করিবে। ইত্যাদি, ইত্যাদি। তারপর এক সময়ে যবন, বহ্লিক ও শকুন (অথবা যবন, বলবু ও শিকুন) নামে তিনজন রাজার আবির্ভাব হইবে, ইহাদের কেহই ভারতীয় বা চীনা বংশ হইতে উদ্ভূত হইবেন না। তাঁহারা যুদ্ধবিগ্রহ করিবেন, কলহ করিবেন, এবং পশ্চিমে ও উত্তরে অনেক জনপদ বিনষ্ট করিবেন। এই সকল স্থানের মন্দির ও বিহারগুলি তাঁহারা ধ্বংস করিবেন এবং আগুনে পোড়াইয়া দিবেন। এই তিনজন রাজা পরস্পর বিরোধ করিবেন এবং ইহাদের কাহারও রাজত্বকালই সুখের হইবে না। কিন্তু পরে কোন এক সময়ে তাঁহারা মিত্রতাপাশে বদ্ধ হইয়া একটি রাজ্যে মিলিত হইবেন, এক বিশাল সেনাবাহিনী গঠন করিবেন এবং গান্ধার, মহাদেশ, ও গঙ্গার এইদিকে (পশ্চিমে) অবস্থিত অন্যান্য দেশগুলি অধিকার করিবেন। সেই সময়ে গঙ্গার অন্য পার্শ্বে, দক্ষিণদিকে, কৌশাম্বী নামে দেশে মহেন্দ্রসেন নামে এক রাজা হইবেন। এই রাজার দুঃপ্রসহহস্ত (বা দুপ্রসহ কিংবা দুষ্প্রহহস্ত) নামে এক পুত্র হইবে। তাহার কপালে একটি লোহার দাগ থাকিবে এবং হাতের কনুই পর্যন্ত তাহার শরীরের নিম্নভাগ রক্তে রঞ্জিত থাকিবে। এই সময়ে ৫০০ জন মন্ত্রীর ৫০০ পুত্র জন্মগ্রহণ করিবে। তাহাদের কটিদেশ পর্যন্ত রক্তে রঞ্জিত থাকিবে। সেই সময় রাজাও—কথা বলিতে পারে এমন—এক টাট্টু ঘোড়া লাভ করিবেন। যে সন্ধ্যায় ঐ টাট্টু ঘোড়া জন্মগ্রহণ করিবে তখন আকাশ হইতে রক্তবৃষ্টি নামিবে। অলৌকিক শক্তিসম্পন্ন একজন সন্ন্যাসীর নিকট রাজা এইসকল অশুভ ঘটনার অর্থ প্রশ্ন করিবেন। সন্ন্যাসী এইরূপ দৈববাণী করিবেন, "হে মহারাজ, রক্ত দিয়া আপনার পুত্র জম্বুদ্বীপের মাটি সিঞ্চিত করিবে, এবং তাহার পর সে নিজেকে জম্বুদ্বীপের অধীশ্বর করিবে।" এই পুত্রের জন্মের পর ১২ বৎসর অতীত হইলে যবন প্রভৃতি তিনজন রাজার সম্মিলিত বাহিনী রাজা মহেন্দ্রসেনের রাজ্য আক্রমণ করিবে। এই বাহিনীতে ৩,০০,০০ সৈন্য থাকিবে এবং ঐ রাজারা ইহার পুরোভাগে থাকিবেন। এইরূপে যুদ্ধ বাধিয়া উঠিবে এবং রাজা বিপন্ন হইয়া খেদ করিতে থাকিবেন। তিনি এইভাবে পরিতাপ করিতে থাকিলে তাঁহার পুত্র দুঃপ্রসহহস্ত জিজ্ঞাসা করিবে, পিতা, আপনি এত বিমর্ষ হইয়াছেন কেন? পিতা তখন উত্তর দিবেন, আমি বিমর্ষ হইয়াছি, কারণ তিনজন রাজার সৈন্যদল আমাদের রাজ্যে উপস্থিত হইয়াছে। ইহা শুনিয়া পুত্র উত্তর দিবে—পিতা, আপনি শঙ্কিত হইবেন না, আমি এই সৈন্যদিগকে পরাস্ত করিব। পিতা বলিবেন, উত্তম। তখন রাজকুমার মন্ত্রীদের পাবণ্ডক পুত্রদের ও অন্যান্যদের লইয়া ৫০০ জনকে ২,০০,০০০ সৈন্যের অগ্রভাগে স্থাপন করিবে। যুদ্ধের সময় তাহার কপালের লৌহচিহ্ন আরও স্পষ্টভাবে পরিস্ফুট হইবে, তাহার সমস্ত শরীর লৌহময় হইয়া উঠিবে এবং ভয়ঙ্কর বেগে শত্রুপক্ষকে আক্রমণ করিয়া সে জয়লাভ করিবে। জয়লাভের পর দুঃপ্রসহহস্তের বাহিনী প্রত্যাবর্তন করিবে, এবং পিতা তাহাকে বলিবেন,—হে পুত্র, তুমি তিনজন রাজার এত বিরাট সেনাবলের সহিত যুদ্ধ করিয়াছ ও জয়লাভ করিয়াছ। তুমি উত্তম করিয়াছ। এখন হইতে তোমাকেই এই রাজ্য শাসন করিতে হইবে, আর আমি ধর্মজীবন যাপন করিব এবং তাঁহার আদেশ পালন করিয়া পুত্র রাজত্ব করিতে থাকিবেন। ইহার পরবর্তী আরও ১২ বৎসর ধরিয়া তিনি ঐ তিনজন রাজার সেনাবাহিনীর সহিত যুদ্ধে ব্যাপৃত থাকিবেন

---

(১২) Bulletin of the School of Oriental and African Studies, University of London, Vol. XVII, Part II, 1955, pp. 366-367, A. L. Basham.

এবং ক্রমশঃ ঐ বাহিনীর এক বৃহৎ অংশকে পরাভূত করিবেন। ঐ তিনজন রাজাকেও তিনি বন্দী করিয়া হত্যা করিবেন। তখন তিনি জম্বুদ্বীপের রাজচক্রবর্তী হইবেন। অনন্তর তিনি মন্ত্রীদের বলিবেন, আমি যে জম্বুদ্বীপের অধীশ্বর হইয়াছি ইহাতে আমার উৎফুল্ল হওয়ার কথা। কিন্তু আমি এতগুলি প্রাণীহত্যা করিয়া মহাপাপ করিয়াছি। এইজন্য আমি ক্ষুব্ধ হইয়াছি। এখন আমি আমার পাপ স্খালন করিতে কি করিতে পারি? মন্ত্রীরা উত্তর দিবেন, পাটলিপুত্র দেশে ত্রিশাস্ত্রে ব্যুৎপন্ন একজন (বৌদ্ধ) ধর্মাচার্য্য আছেন, তিনি ব্রাহ্মণ অগ্নিদত্তের পুত্র ও তাঁহার নাম শিষ্যক। তিনি এক বিহারে বাস করেন, তাঁহাকে আমন্ত্রণ করিয়া আনিলে তিনি আপনাকে পাপমুক্ত করিতে সমর্থ হইবেন। রাজা সন্তুষ্ট হইয়া শিষ্যককে (পাটলিপুত্র দেশ হইতে) আমন্ত্রণ করিয়া আনাইলেন ও প্রশ্ন করিলেন, আমি কি প্রকারে আমার পাপ হইতে বিশুদ্ধ হইতে পারি? শিষ্যক উত্তর করিলেন, আপনাকে বার বৎসর ধরিয়া ত্রিরত্নের পূজা করিতে হইবে এবং তাঁহাদের শরণ লইতে হইবে। যদি আপনি এইরূপ করেন তবে আপনি পাপমুক্ত হইতে পারিবেন। তখন রাজা জম্বুদ্বীপে যত শ্রমণ থাকিবেন তাঁহাদের সকলকে কৌশাম্বিতে আসিয়া উপনীত হইবার জন্য সর্বত্র দূত প্রেরণ করিবেন। ইত্যাদি, ইত্যাদি। ১৩

এই দীর্ঘ কাহিনীটাকে পণ্ডিতপ্রবর জয়সোয়াল সংক্ষেপ করিয়া তাঁহার একখানি গ্রন্থে উদ্ধৃত করিয়াছেন, এবং বলিয়াছেন যে "বিবরণটি যথার্থ ঘটনার উপর প্রতিষ্ঠিত বলিয়াই মনে হয়"।১৪ অর্থাৎ কাহিনীর মহেন্দ্রসেন ও তস্য পুত্র দুঃপ্রসহহস্তই ইতিহাসের মহেন্দ্রাদিত্য-কুমারগুপ্ত ও স্কন্দগুপ্ত, আর যবন মানে হুন। কিন্তু তিনি অত আয়াস স্বীকার করিয়া সংক্ষেপ না করিয়া সোজাসুজি সমগ্র কাহিনীটি উদ্ধৃত করিলেই সকলে বুঝিতে পারিতেন—চন্দ্রগর্ভ পরিপৃচ্ছার ঐ দুই রাজা কতখানি ঐতিহাসিক আর কতখানি কল্পনারাজ্যের সৃষ্টি। মহেন্দ্রসেনের ত কথাই নাই, তাঁহার জম্বুদ্বীপাধিপতি পুত্রও এমন এক রাজা, পাটলিপুত্রই যাঁহার রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল না। তা ছাড়া, ভারতে হুন আক্রমণ কুমারগুপ্তের সময় ঘটে নাই। তাঁহার রাজত্বের সায়াহ্নে যে জাতির আক্রমণে গুপ্ত সাম্রাজ্য কাঁপিয়া উঠিয়াছিল তাহার নাম পুষ্যমিত্র ১৫। তাহারা এই যবন-পহ্লিক-শকুনের দলে পড়ে না। পুষ্যমিত্রদের সম্ভবতঃ নর্মদার উপত্যকা ভূমিতে পরাস্ত করিয়া যুবরাজ স্কন্দগুপ্ত রাজধানীতে ফিরিয়া আসিয়া দেখেন, পিতা পরলোকগমন করিয়াছেন (পিতরি দিবং উপেতে)। কুমারগুপ্ত তাহা হইলে পুত্রকে, "হে পুত্র, এখন হইতে তুমিই রাজত্ব কর, আমি সন্ন্যাসী হইয়া চলিলাম", একথা বলিবার অবসর পাইলেন কখন? রাজা হইয়া স্কন্দগুপ্ত হুনদের আক্রমণ প্রতিহত করিয়াছিলেন এবং তাহাদের এমন নিদারুণভাবে পরাস্ত করিয়াছিলেন যে, ভারতের মধ্যে হুনরা আর পঞ্চাশ বৎসরের মধ্যে আসিয়া রাজ্যস্থাপন করিতে সাহস পায় নাই। ইতিহাস হইতে এই সকল অসঙ্গতিগুলি কাটিয়া-ছাঁটিয়া ধুইয়া-মুছিয়া ফেলিতে পারিলে তবে বিবরণটি যথার্থ বলিয়া মনে করা সহজ হইতে পারে।

এসব সত্ত্বেও চন্দ্রগর্ভ পরিপৃচ্ছার রূপকথার নায়ক মহেন্দ্রসেন 'ধর্মের জন্য সিংহাসন ত্যাগী কুমারগুপ্ত' সাজিয়া এমন উৎপাত করিতেছেন যে, কুমারগুপ্তের 'অপ্রতিঘ' জাতীয় সুবর্ণমুদ্রাগুলি পর্য্যন্ত নিজের বলিয়া দাবী করিতেছেন। এই জাতীয় মুদ্রা অদ্যাবধি ১০।১২ টিই আবিষ্কৃত হইয়াছে। এগুলির সোজাপৃষ্ঠে তিনটি দণ্ডায়মান মূর্তি খোদিত। মধ্যেরটি পুরুষমূর্তি ও মুদ্রার লেখ অনুসারে নিঃসন্দেহ মহারাজাধিরাজ কুমারগুপ্ত; কিন্তু তাঁহার গাত্রে অলঙ্কার নাই, হাতে রাজকীয় কোনও প্রতীকও নাই, চুলগুলি মাথার উপরে ঝুঁটি করিয়া বাঁধা, আর তিনি করজোড়ে দাঁড়াইয়া। রাজার বামদিকে তাঁহার দিকে তাকাইয়া এক নারীমূর্তি, সম্ভবতঃ রাণী, কিন্তু তাঁহারও বেশভূষা সাধারণ এবং তিনি বামহস্ত কোমরে রাখিয়া দক্ষিণহস্ত রাজার মুখের দিকে প্রসারিত করিয়া আছেন। রাজার ডানদিকে আর এক সাধারণ-বেশী পুরুষমূর্তি, তিনিও রাজার দিকে তাকাইয়া, তাঁহারও দক্ষিণ হস্ত রাজার মুখের দিকে প্রসারিত, তবে তাঁহার বাম হস্তে একটি ঢাল। এই পুরুষমূর্তির ও রাজার মধ্যস্থলে একটি গরুড় ধ্বজা (কোনও কোনও মুদ্রায় মনে হয় যেন দক্ষিণের পুরুষমূর্তি ধ্বজাটি হস্তে লইয়া দাঁড়াইয়া আছেন)। এই রাজা নিরলঙ্কার ও অঞ্জলিবদ্ধহস্ত বলিয়াই তাঁহার চেহারা নাকি দেখিতে বৌদ্ধ উপাসক বা যতির মতন। ইহা মনে হওয়ায় চন্দ্রগর্ভ পরিপৃচ্ছার মহেন্দ্রসেনকে স্মরণ করিয়া স্বচ্ছন্দে মুদ্রাগুলিতে (বৌদ্ধ) ধর্মের কারণে কুমারগুপ্তের সিংহাসন ত্যাগের দৃশ্য খোদিত আছে বলিয়া অনুমিত হইয়াছে। দুই পাশের পুরুষ ও নারীমূর্তির ব্যাখ্যায় বলা হইয়াছে ইহারা রাজাকে তাঁহার সঙ্কল্প হইতে নিবৃত্ত করিবার চেষ্টা করিতেছেন, কিন্তু রাজা অটল, এবং এইজন্যই মুদ্রায় 'অপ্রতিঘ' (অজেয়) শব্দটি ব্যবহৃত।১৬

এই মতবাদের সমালোচনা ইতিপূর্বেই অন্যত্র করিয়াছি১৭, এখানে শুধু দুই একটা কথা বলি। রাজা বৌদ্ধ যতি হইলে মুণ্ডিত কেশ হইতেন, তাঁহার মাথায় চুলের বোঝা থাকিতনা। রাজা বৌদ্ধ (গৃহী) উপাসক হইলে তাঁহার সিংহাসন ত্যাগের প্রয়োজন হইত না। মুদ্রাগুলির পটভূমিতে বৌদ্ধধর্মই যদি থাকিয়া থাকে তবে ওগুলিতে বড় বড় করিয়া

(১৩) History of Buddhism in India and Tibet, by Bu-ston, ed. F. Obermiller, Heidelbery 1932, Part II, pp. 171—178.

(১৪) Imperial History of India, p. 57.

(১৫) 'পুষ্যমিত্র' পাঠান্তরটি একেবারেই অচল।

১৬। Catalogue of the Gupta Gold Coins in the Bayana Hoard, Intro, pp cx-cxii, and Plate XXXI (Nos. 6—13).

১৭। Journal of re U. P. Historical Society, Vol, III (New Series), Part II. pp, 156-158.

গরুড়ধ্বজা চিত্রাঙ্কিত করা নিতান্তই বিসদৃশ। তাছাড়া কাহারও সিংহাসন ত্যাগ এমন এক উৎসব নয় যাহার উপলক্ষে ঘটা বা আড়ম্বর করিয়া মুদ্রা প্রচলন করিতে হয়। এই সকল এবং আরও নানা কারণ কুমারগুপ্তের 'অপ্রতিঘ' মুদ্রাগুলি চন্দ্রগর্ভ পরিপৃচ্ছার মহেন্দ্রসেনের হাতে স'পিয়া দেওয়া হঠকারিতারই সমতুল্য। মুদ্রাগুলির যথার্থ তাৎপর্য হয়ত ভবিষ্যৎ একদিন বলিয়া দিবে, এখন উহা অজানাই রহিয়া গেল।

স্কন্দগুপ্তের ভিটারি শিলাস্তম্ভলেখে আছে, স্কন্দগুপ্ত নিজভুজবলে অরিকে বিজিত করিয়া ও গুপ্তদের বংশলক্ষ্মীকে পুনরায় প্রতিষ্ঠিত করিয়া ফিরিয়া আসিয়া দেখিলেন (তাঁহার) পিতা স্বর্গে গিয়াছেন, তখন তিনি (বিধবা) মাতার নিকট গিয়া 'জয়লাভ করিয়াছি' এই সংবাদ ঘোষণা করিলে মাতা আনন্দাশ্রু বর্ষণ করিতে লাগিলেন, যেমন কৃষ্ণ তাঁহার অরিকে (কংসকে) বধ করিবার পর তাঁহার মাতার নিকট গমন করিয়াছিলেন। কিন্তু স্কন্দগুপ্তের বা তাঁহার পরবর্তী গুপ্তরাজাদের লেখমালায় কোথাও স্কন্দগুপ্তের মাতার নাম ব্যক্ত করা হয় নাই। এই গোপনতার জন্যই প্রায় সকলের সন্দেহ, তিনি কুমারগুপ্তের মহাদেবী অনন্তদেবীর গর্ভজাত সন্তান নন। অর্থাৎ, স্কন্দগুপ্তের মাতা কুমারগুপ্তের একজন সামান্যা রাণী বলিয়াই মাতার নাম প্রকাশে স্কন্দগুপ্তের এত সঙ্কোচ। রবার্ট সিলয়েল প্রভৃতি কেহ কেহ মনে করেন, ভিথারি শিলাস্তম্ভলেখের উদ্ধৃতাংশে 'দেবকী' শব্দটি দ্ব্যর্থ ব্যঞ্জক, উহা কৃষ্ণ ও স্কন্দগুপ্তের উভয়েরই মাতার নাম, কেননা উভয়ের মাতার প্রসঙ্গে কবি শুধু একজনেরই মাতার নাম উল্লেখ করিবেন কেন? কিন্তু এই ভিটারি লিপিরই তিন হইতে আট পংক্তিতে গুপ্তদের বংশতালিকায় যেখানে স্কন্দগুপ্তের মাতার নাম থাকা উচিত সেখানে নামটি অতি সতর্কতার সহিত পরিহার করা হইয়াছে, কবির স্পর্ধা কি—যে ঐ লিপিরই অন্যত্র সেই নাম লইয়া খেলা করেন? নামটি প্রকাশ করা যদি নিষিদ্ধ না হইত তবে বংশতালিকার যথাস্থানে তাহা গোপন করার সার্থকতা কোথায়?

স্কন্দগুপ্তের মাতার প্রসঙ্গে সম্প্রতি অধ্যাপক ব্যাসাম বলিয়াছেন যে, ভিটারি লিপির এক জায়গায় আছে, চারণদের স্তুতিগান দ্বারা স্কন্দগুপ্ত আর্যত্বে, অর্থাৎ আর্য মর্যাদায়, উন্নীত হইয়াছিলেন, এবং ইহাতে মনে হয় তিনি একজন নীচ শূদ্রা উপপত্নীর পুত্র (son of humble Sudra Concubine)[১৮] ছিলেন। কিন্তু ব্যাসামের এই ব্যাখ্যা বিপজ্জনক। ইহার অর্থ বিশ্লেষণ করিলে দাঁড়ায়, স্কন্দগুপ্ত তাঁহার জন্মের কলঙ্ক মোচনের ভার কতগুলি ভাড়াটে চারণদের উপর অর্পণ করিয়াছিলেন, তাহারা গানে গানে প্রচার করিয়া বেড়াইত স্কন্দগুপ্ত শূদ্রার সন্তান নয়, তাহাতেই লোকে ভুলিয়া গিয়া তাঁহাকে আর্য বলিয়া স্বীকার করিয়া লইয়াছিল! মূল পাঠটি হইতেছে, "গীতৈশ্চ স্তুতিভিশ্চ বন্দকজনো যং প্রাপয়ত্যার্যতাম্," ইহার সহজ অর্থ, বন্দকজনের (চরণদের) গীত ও স্তুতি দ্বারা যিনি (স্কন্দগুপ্ত) আর্যতা (যশ, গৌরব, distinction) লাভ করিয়াছিলেন। স্কন্দগুপ্তের বিহার শিলাস্তম্ভলিপির সম্পাদনাকালে ফ্লিট অনুমান করিয়াছিলেন, ইহার তৃতীয় পংক্তিতে কুমারগুপ্তের এক নাম হয়ত উল্লেখ ছিল,[১৯] তবে স্তম্ভের গাত্র হইতে নানাস্থানে পাথর এমন খসিয়া পড়িয়াছে যে অন্যান্য স্থানের মধ্যে এস্থানের কোনও লেখাই দেখা যায় না। কিন্তু জনৈক রাণীর উল্লেখ থাকিলেও তাঁহার নামটিও লেখা ছিল এ বিষয়ে নিঃসন্দেহ হওয়া কঠিন। ফ্লিটের আরও অনুমান, কুমারগুপ্তের এ রাণী তাঁহার কোনও মন্ত্রীর ভগিনী। ইহা হওয়া বিচিত্র নয়।

স্কন্দগুপ্তের মাতার নাম আপাততঃ না-ই বা জানিলাম, কিন্তু মহাদেবীর গর্ভজাত নহেন বলিয়া তিনি পিতার জ্যেষ্ঠপুত্র হইতে পারেন না, এমন কোনও কথা নাই। নিজের অসামান্য বীরত্বের ঐতিহ্যের ভার ছাড়াও স্কন্দগুপ্ত হয়ত অনেকটা এই অধিকারে পিতার উত্তরাধিকারিত্ব দাবী ও লাভ করিয়াছিলেন। কেহ কেহ মনে করেন, মহাদেবী অনন্তদেবীর পুত্র হিসাবে জ্যেষ্ঠ পুরুগুপ্তই কুমারগুপ্তের অব্যবহিত পরে সিংহাসনে উপবেশন করিয়াছিলেন এবং কিছুদিন পরে তাঁহার সহিত স্কন্দগুপ্তের যে উত্তরাধিকার সংগ্রাম হয় তাহাতে জয়লাভ করিয়া ও পুরুগুপ্তকে হত্যা করিয়া স্কন্দগুপ্ত সিংহাসন অধিকার করিয়াছিলেন। কিন্তু অধ্যাপক ব্যাসাম অত্যন্ত দক্ষতার সহিত দেখাইয়াছেন যে, পুরুগুপ্ত আগে রাজা হইয়া থাকিলে স্কন্দগুপ্ত সিংহাসন লাভ করিয়া পুরুগুপ্তের সন্তান-সন্ততিদের অবশ্যই জীবিত রাখিতেন না, কিন্তু যেহেতু পরে পুরুগুপ্তের বংশই ধারাবাহিক ভাবে রাজত্ব করিয়াছিল, ইহাই প্রতিপন্ন করে স্কন্দগুপ্তের পরে পুরুগুপ্ত রাজা হইয়াছিলেন। দ্বিতীয়তঃ, স্কন্দগুপ্তের মুদ্রাগুলিকে দুই শ্রেণীতে ভাগ করা যায়, প্রথম শ্রেণীর মুদ্রাগুলি পূর্ববর্তী রাজাদের মুদ্রার অনুসরণে অপেক্ষাকৃত লঘু ওজনের, আর দ্বিতীয় শ্রেণীর মুদ্রাগুলি তিনি তাঁহার সময়ে নূতন প্রবর্তন করিয়াছিলেন, অপেক্ষাকৃত অধিক ওজনের। পুরুগুপ্তের একটিও লঘু ওজনের মুদ্রা পাওয়া যায় নাই, যাহা পাওয়া গিয়াছে তাহা স্কন্দগুপ্তের প্রবর্তিত বেশী ওজনের মুদ্রার অনুসরণে; ইহাও প্রমাণ করে যে স্কন্দগুপ্তের পরে পুরুগুপ্ত রাজা হইয়াছিলেন, কারণ আগে তিনি রাজা হইয়া থাকিলে তাঁহার লঘু ওজনের মুদ্রাই পাওয়া যাইত, যেহেতু সেই সময়ে অধিক ওজনের মুদ্রার প্রচলন হয় নাই। ব্যাসামের এই দুই যুক্তিই এত অকাট্য যে ইহার পরে স্কন্দগুপ্তের পূর্বে পুরুগুপ্তের রাজ্যারোহণের, তথা দুই বৈমাত্রেয় ভ্রাতার মধ্যে উত্তরাধিকার সংগ্রামের প্রশ্ন আর উঠিতেই পারেনা। অতএব সিদ্ধান্ত করা যায়, ৪৫৫ খৃষ্টাব্দে বা তাহারও পূর্বে কুমারগুপ্তের মৃত্যুর পর রণক্ষেত্র হইতে প্রত্যাবর্তন করিয়া স্কন্দগুপ্তই গুপ্তসাম্রাজ্যের অধীশ্বর হইয়াছিলেন, এবং ৪৬৭ খৃষ্টাব্দে হয় অপুত্রক অবস্থায় তাঁহার মৃত্যুর পর, না হয় তাঁহার পিতৃহীন পুত্রদের যেরূপেই হোক বঞ্চিত করিয়া, পুরুগুপ্ত সিংহাসন অধিকার করিয়াছিলেন, এবং বংশপরম্পরায় রাজত্ব করিয়াছিলেন।

১৮। Basham. op. cit., pp. 368-69.

১৯। Fleet, Gupta Inscriptions, P. 48.

—সাতাশ—

দাড়িটা কামিয়ে ফেলে, একটা ভদ্রলোকের মতো ধুতি চাদর পরলে রীতেনকে যে বেশ ভালো দেখায়—এই সত্যটা আবিষ্কার করে খুশি হল সত্যজিৎ। আরো অদ্ভুত লাগল, গ্লোব-ট্রটার রীতেন যখন নিচু হয়ে তার পায়ে প্রণাম করলে। একটা কিছু আশীর্ব্বাদ করা উচিত—সত্যজিৎ ভাবল। কিন্তু কী বলা যায় কিছুতেই মনে পড়ল না।

প্রাতির কপালে সিঁদুরের ফোঁটা জ্বল জ্বল করছে। সিঁথিতে রক্ত চিহ্নের মতো সিঁদুরের রেখা। সত্যজিতের মনে হল, এ ছাড়া প্রাতিকে মানায় না। এতদিন ধরে ওর কুমারী ললাট যেন ওকে জীবনের সহজ স্বাভাবিক অধিকার থেকে বঞ্চিত করে রেখেছিল। যে মেয়েরা শান্ত স্নিগ্ধ গৃহবধূ হওয়ার জন্যেই জন্ম নেয়, প্রাতি তাদেরই দলের।

রীতেন আস্তে আস্তে মাথা তুলল। ডাকল, দাদা।

—বলো।

—আমি সেই মোটর কোম্পানির চাকরিটা পেয়েছি। আজকে আটাশে, আমাকে পয়লা থেকে জএন করতে হবে কানপুরে।

—সত্যি নাকি।—পুলকিত বিস্ময়ে সত্যজিৎ বললে, ইট্‌স এ নিউজ।

—তাই প্রীতিকে নিয়ে কালই আমি কানপুরে চলে যেতে চাই।

যে আশার্বাদটা কিছুতেই মনে পড়ছিল না, এতক্ষণে সেটা উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠল গলায়।

—সুখী হও—সুখা হও।

—কিন্তু মাইনে মাত্র তিনশো টাকা—হয়তো প্রাতির কষ্ট হবে—

—কিছু না, কিছু না।—সত্যজিৎ এবার রীতেনের কাঁধে হাত রাখল: তুমি যদি প্রাতিকে ঠিক চিনতে পেরে থাকো, তা হলে ওর কোনো কষ্ট হবে না।

চায়ের টেবিলটায় মুখ গুঁজে প্রাতি সমানে কাঁদছিল। মুখার্জি ভিলায় সে আর কোনোদিন ফিরে আসবে না। এখানকার বাঁধন চিরদিনের মতো ছিঁড়ে গেল তার। ভালোই হল—ওই বাড়ীর ইতিহাসের, শিবশঙ্করের, ইন্দ্রজিতের আর অভ্যাসের নাগপাশ থেকে মুক্তি পেলো প্রাতি। এইবার বুঝতে পারবে, বাঁচবার একটা অর্থ আছে—মাথার ওপরে আকাশ আছে—পৃথিবীতে রক্ত মাংসের মানুষ আছে। তবুও প্রাতি কাঁদছে। একটা বিষাক্ত নেশা থেকে বঞ্চিত হয়ে নেশাখোরও ছটফট করে, কাঁদে। কিন্তু এ কিছু না। দুদিন পরেই সব সহজ হয়ে যাবে। প্রাতি বাঁচল।

হোটেলের জানলা দিয়ে দেখা যাচ্ছিল পশ্চিমের আকাশ। মেঘে মেঘে কালো হয়ে আসছে। বৃষ্টি নামবে।

—উইস ইউ বেস্ট্‌ অফ্‌ লাক। কানপুরে পৌঁছে একটা চিঠি দিয়ো।

প্রীতির দিকে আর একবারও না তাকিয়ে সত্যজিৎ পথে নামল। এক ঝলক ঠাণ্ডা হাওয়া এসে আছড়ে পড়ল মুখের ওপর।

প্রীতি সুখী হবে। হয়তো বনশ্রীও। অবশ্য কোনো-

দিন যদি বনশ্রীর মনে হয় এইবার তার বিয়ে করবার সময় হয়েছে। নীরব ভক্ত হীরেন প্রতীক্ষা করে আছে—হয়তো জীবনের শেষ দিনটি পর্য্যন্ত নিঃশব্দে অপেক্ষা করবে। অত ধৈর্য্য সত্যজিতের নেই।

কিন্তু : একটা স্নিগ্ধ কৌতুকে মনটা ভরে উঠল। বনশ্রী হীরেনের ছেঁড়া গেঞ্জি পরবার অভ্যাসটা ছাড়াতে পারবে তো? আর চায়ের কাপ নিয়ে দাড়ি কামানো? দেওয়ালে ছারপোকার দাগ লাগা ওই ঘরে সংসার গুছিয়ে বসতে পারবে বনশ্রী? না—বিয়ের পরে নিশ্চয় কোথাও এক ছোট খাটো ভদ্র রকমের বাসা জোগাড় করে নেবে সে।

তারপর? বনশ্রী আরো বেশি করে নোট লিখবে। আরো মোটা করে বই বের করবে হীরেন। 'বাই এ গোল্ড্ মেডালিস্ট্'। ক্লান্ত বনশ্রী নিজের মনের সব ভার হীরেনের ওপর চাপিয়ে দিয়ে নিশ্চিন্ত হবে। 'শেষের কবিতা' মনে পড়ল সত্যজিতের—'যে আমারে দেখিবারে পায়, অসীম ক্ষমায়, ভালো মন্দ সুখ দুঃখ মিলায়ে সকলি।' সত্যজিৎ পারে না। নিঃশব্দে সব দেবার মত মন তার নয়—তার নিজেরও দাবি আছে। বনশ্রীই ঠিক বুঝেছে। এই ভালো হল।

আবার ঠাণ্ডা হাওয়ার ঝলক আসছে। 'ঐ যে ঝড়ের মেঘের কোলে, বৃষ্টি আসে রুদ্র বেশে' - প্রীতি গেয়েছে কতদিন। গেয়েছে মুখার্জি ভিলায় নিজের কারাগারের মতো ঘরের জানলায় বসে—যেখান থেকে আকাশের একটা ফালি ছাড়া আর কিছুই চোখে পড়ে না। মুখার্জি ভিলায় আর কেউ গান গাইবে না এর পর থেকে। কেবল অদ্ভুত বিকৃত কণ্ঠে বোদ্‌লেইরের কোনো বীভৎস কবিতা আবৃত্তি করবে ইন্দ্রজিৎ—মুখার্জি ভিলার যত গ্লানি, যত যন্ত্রণা, যত বিকার তারই মধ্যে আত্মপ্রকাশের পথ খুঁজে পাবে।

টপ টপ করে কয়েকটা বড় বড় ফোঁটা পড়ল। বৃষ্টি নামছে। সেদিনকার মতোই ধর্মতলা স্ট্রীটের আড্ডাটার দিকে দ্রুত পা চালালো সত্যজিৎ। সামনের তেতলা বাড়ীটার মাথার ওপর মস্ত একটা ব্যানার—কেশ তৈলের বিজ্ঞাপন। নিবিড় কালো চুল এলো করে দিয়েছে একটি মেয়ে—বনশ্রীর মুখের সঙ্গে তার আদল আসে।

আবার বনশ্রী। বুকের ভেতরে কোথায় ছোট একটা কাঁটা খচ্ খচ্ করে উঠল। এতদিন বনশ্রী যখন ছিল না, তখন কোথাও ছিল না। বনশ্রী স্মৃতি হয়ে গিয়েছিল, মিশে গিয়েছিল বার্ণসের কবিতা আরও একটু ভাল লাগার ভেতরে, মিশে গিয়েছিল প্রীতির গানে : 'আমার পরাণ যাহা চায় তুমি তাই গো।' তারপর কবিতার লাইন থেকে, গানের সুরের ভেতর থেকে আবার বাস্তব হয়ে দেখা দিল বনশ্রী। আবার মনে হল—

নিজেকে বড় বেশি শ্রদ্ধা করেছিল সত্যজিৎ। অর্থহীন অহমিকায় ভেবেছিল, সবাই তারই জন্যে অপেক্ষা করে আছে। তার জন্যে ডালি সাজিয়ে প্রত্যেকে পথের ধারে বসে আছে—যে যখন খুশি, যাকে খুসি ধন্য করতে পারে। সে ভুল তার চুরমার হয়ে গেছে। সাধারণ, অতি সাধারণ হীরেন, যে ইংরেজিতে কিছুতেই এম-এটা পাস করতে পারল না, 'বাই এ গোল্ড্ মেডালিস্ট্' লেখা নোট বই ছাপিয়ে আর প্রুফ্ দেখে যার দিন যাত্রা, যে ছেঁড়া গেঞ্জী পরে, চায়ের কাপে দাড়ি কামায়, গরম জিলিপি আর ঠাণ্ডা চা দিয়ে যে বনশ্রীকে অভ্যর্থনা করে—উজ্জ্বল, বুদ্ধিদীপ্ত সত্যজিৎকে কখন সে হারিয়ে এগিয়ে চলে গেল। 'যে আমারে দেখিবার পায়, অসীম ক্ষমায়—'

না—না। অত ছোট করে কেন সে দেখছে হীরেনকে? হীরেন জীবনকে অন্তত একটা সহজ সত্য দিয়ে বুঝে নিয়েছে—মনের মধ্যে কোথাও শক্ত হয়ে দাঁড়াবার মতো একটা জায়গা আছে তার। আর সত্যজিৎ? ত্রিশঙ্কুর মতো ঝুলে আছে অনিশ্চিতের মহাশূন্যে—নিজের বুদ্ধির জটিলতায় ঘুরে মরছে চোখ বাঁধা কানা মাছির মতো। হীরেনের গতিটা যত ছোটই হোক—তার মধ্যেই তার আশ্রয় আছে একটা। আর সে? সে নিজে?

তাই কি পূরবীও তাকে সইতে পারল না? ছুটে পালালো তার কাছ থেকে?

সত্যজিৎ দাঁতে দাঁত চাপল। মুখার্জি ভিলা। তার বর। তার নাগ পাশ। তার পাকের পর পাক।

জোরালো বৃষ্টি নেবেছে এতক্ষণে। সত্যজিৎ ছুটল। সামনেই সেই পুরোনো আড্ডাটা।

ভেতরে পা দিয়ে দেখল, লম্বা হল ঘ

ফরাসের ওপর বসে তিন চারটি ছেলে একমনে পোস্টার লিখছে।

আর এদিকে লেনিনের বড় ছবিটার নিচে টেবিলের ওপর ঝুঁকে একমনে কী পড়ে চলেছে সুমিত্র।

—সুমিত্র।

—হ্যালো অধ্যাপক —কী মনে করে?

—কী আর মনে করব?—এই ঘরে পা দিয়ে, সেই পুরোনো অভ্যাসেই যেন খানিকটা সহজ হল সত্যজিৎ। সুমিত্রের সামনে চেয়ারটা টেনে নিয়ে বললে, আবার সেই বৃষ্টি।

—হুঁ, সিম্বলিক।—সুমিত্র গম্ভীর ভাবে একটা বিড়ি ধরালো: বৃষ্টি নামলেই তখন মাথা বাঁচাতে আমাদের এখানে আসতে হয়—নইলে মনেও পড়ে না। এর মধ্যে ইতিহাসের কোনো তাৎপর্য বুঝতে পারছ অধ্যাপক?

—পারছি।

—কিন্তু যারা আমাদের ছেড়ে চলে যায়, দুঃসময়ে তাদের আমরা আশ্রয় দেব এমন আশা রাখো কী করে?

—রাখিনা। তাই ভুল শোধরাতে চাই।—সত্যজিৎ একটুখানি ঝুঁকে পড়ল সামনের দিকে: কাজ দাও আমাকে।

—রিয়্যালি?—সুমিত্রের চোখ হঠাৎ দপদপ করে উঠল: সত্যি বলছ?

—সত্যি বলছি।

চেয়ার ছেড়ে হঠাৎ লাফিয়ে উঠল সুমিত্র। এসে দু হাতে জড়িয়ে ধরল সত্যজিৎকে। যে চারজন পোস্টার লিখছিল, তারা অবাক হয়ে তাকিয়ে দেখল একবার। এতক্ষণে সত্যজিৎ লক্ষ্য করল তাদের মধ্যে একটি মেয়ে আছে এবং মেয়েটিকে সে তাদের বাড়ীতেই বীথির কাছে আসা যাওয়া করতে দেখেছে।

—ওয়েলকাম অধ্যাপক, ওয়েলকাম।—সুমিত্র ফেটে পড়ল উচ্ছ্বাসে: কী যে খুসি হয়েছি। বলো—কী কাজ চাও।

—যা দেবে।

—ভেরি গুড্। আধুনিক ইকনমিকসের খোঁজ খবর রাখো কিছু?

সত্যজিৎ হাসল: রাখি সামান্ত সামান্ত।

—ভেরি ওয়েল।—সশব্দে একটা ড্রয়ার টানল সুমিত্র, বার করলে কয়েকটা কাগজপত্র। বললে, এই ডেটাগুলো তোমায় দিচ্ছি। একটা জোরালো ইংরেজি প্রবন্ধ চাই তিনদিনের মধ্যে।—তারপর ডাকল: অশোক?

পোস্টার লেখা একটি ছেলে উঠে দাঁড়ালো।

—চট করে নিচের চায়ের দোকানে পাঁচটা চা আর টোষ্ট্ বলে এসো তো ভাই। ইট্স্ এ গ্রেট্ ডে। ভালো করে সেলিব্রেট করতে হবে আমাদের।

পকেট থেকে একটা দু টাকার নোট বের করতে যাচ্ছিল সত্যজিৎ—সুমিত্র বাধা দিলে।

—নো-নো। আজ আমাদের খরচ। তোমাকে আমরা আজ অভ্যর্থনা করব।

মুখার্জি ভিলার গেট পার হয়ে সিঁড়ির দিকে উঠতে উঠতে সত্যজিৎ ভাবছিল, এবার সেও বাঁচল। এই বুদ্ধির কুয়াশা থেকে বেরিয়ে এসে আবার শক্ত হাতে আঁকড়ে ধরল বিশ্বাসের হাল। এই বারো বছর ধরে কেবল নিজেকে নিয়ে ভেবেছে, ক্রমাগত পাক খেয়েছে নিজের ভিতর। আর যত বেশি নিজের কথা ভেবেছে ততই জটিলতার জাল জড়িয়েছে তাকে। আবার পুরোনো জীবনের মধ্যেই সে ফিরে যাবে—আবার অনেকের সঙ্গে পা ফেলতে চেষ্টা করবে—আবার আশা করতে থাকবে: মানুষ বড় হবে, মানুষ মহৎ হবে—দুনিয়া বদলাবে। ইতিহাসের হাল আমাদের হাতে—আমরাই তাকে ভিড়িয়ে দিতে পারব নতুন কালের, নতুন দিগন্তের বন্দরে।

বীথি খুশি হবে। সব চাইতে বেশি খুশি হবে।

পায়ের ভারটা লঘু হয়ে গেছে—মন যেন এতদিন পরে রোগশয্যা ছেড়ে বাইরে এসে দাঁড়িয়েছে। হালকা পায়ে সিঁড়ি দিয়ে উঠছিল সত্যজিৎ। কিন্তু হঠাৎ সিঁড়ির মাথায় দেখা গেল রঘুকে। তারপরেই—সোজা ছুটে এল রঘু—আর্ত কান্নায় আছড়ে পড়ল সত্যজিতের পায়ের কাছে।

—কী হল—কী হল রঘু? বাবা কি—

না, শিবশঙ্কর নয়। মুখার্জি ভিলার মন্দির অব

সহজেই বিলুপ্তি হবার নয়। সাউথ্ ইণ্ডিয়ার কন্‌ফারেন্সে গিয়ে দু দিনের জ্বরে হার্টফেল করে মারা গেছে বীথি।

মুখার্জি ভিলা একটা বালির বুরুজ হয়ে ভেঙে পড়ছে মাথার ওপর। একটা প্রলয়ের অন্ধকার যেন নেমে আসছে চারদিক থেকে। চোখ বুজে অন্ধের মতো সিঁড়ির ওপর বসে পড়তে সত্যজিতের মনে পড়ল: এই আশ্চর্য পৃথিবীতে—এই অপরূপ উজ্জ্বল জীবনের মধ্যে বীথি অনেক দিন—অনেকদিন বাঁচতে চেয়েছিল।

[আগামীবারে সমাপ্য

মন্দিরময় ভারত

শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক

১

মোচন করিতে মহাঅশৌচ, যুগান্ত ব্যাপী শোক,
স্বাধীন বিশাল এ ভারত পুনঃ মন্দিরময় হোক।
ধ্বংস হয়েছে কোটী মন্দির—সন্দেহ তাতে নাই,
একটীও কমে হবে না তাহার—কোটী মন্দির চাই।
ভগ্ন, চূর্ণ, লুপ্ত সুপ্ত মন্দির কণিকার—
জোয়ার ডেকেছে বুকে—শাশ্বত জাগরণ পিপাসার।
উঠ মন্দির ধ্যানী তপস্বী—ওই শোনো আহ্বান—
জাগ্রত দেশ, জাগ্রত জাতি—জাগ্রত ভগবান।

২

মন্দির-ভাঙা বীরত্ব ছিল, বীভৎসতার যুগ—
বর্ব্বরতাও ধরেনি কখনো তেমন ঘৃণ্য রূপ।
খাড়া থাকিবেনা কোনো মন্দির—রাখিতে পাবেনা কেহ—
এই রীতি-নীতি—বিবেক ছিল যে অবিবেক চেয়ে হেয়।
ছিল আতঙ্ক হিংসা ও দ্বেষ সৃষ্টি করাই কাজ—
ধর্ম্মের নামে কোনো অন্যায়ে ছিলনাক ভয় লাজ।
অপমান যাতে প্রতিহিংসায় পরিণত নাহি হয়—
মন্দিরময় এ মহাভারত হোক মন্দিরময়।

৩

জাগ্রত জাতি ভুলিতে পাবেনা—সে সব অত্যাচার,
এখনো সে সব দুর্দ্দিন ফেরে করিয়া হাহাকার।
প্রতি ধূলিকণা তাদের চক্ষে চূর্ণ শ্রীমন্দির—
দিব্যোন্মাদ আনে—করে তাহাদিকে চঞ্চল অস্থির।
চক্ষে তাদের অতীতের দ্যুতি—অতীতের গৌরব
নাসিকায় আসে শতাশ্বমেধ যজ্ঞের সৌরভ।
সমুজ্জল সে দিনের সঙ্গে তাদের প্রাণের যোগ,
মন্দিরময় এ ভারত পুনঃ মন্দিরময় হোক।

৪

একা মথুরায় ভগ্ন করেছে সহস্র মন্দির—
প্রতি অনু তার মন্দির হবে—উন্নততর শির।
ভীতি বিহ্বল জনগণ ভয়ে করিতনা আলোচনা—
ধ্বংসের সে কি আস্ফালন—আর দারুণ বিড়ম্বনা।
ধন গৌরবে মহামহিমায় ভক্তের উল্লাসে—
বিদ্যুৎময় দিব্যজ্যোতি মন্দির শ্রেণী আসে।
কোটী দধীচির অস্থি চূর্ণ বিফল যাবে না ভবে—
তারাই অজেয় ভক্তিকেন্দ্র শক্তিকেন্দ্র হবে।

৫

দিল্লার তলে প্রোথিত হয়েছে লক্ষ দেব-দেউল,
টুটিবার নয় চিরপ্রস্ফুট দেবগ্রাহ্য সে ফুল।
সত্যে তাদের প্রতিষ্ঠা আর ধর্ম্মে অবস্থিতি—
জাতির বুকে উষ্ণ সলিলে—অভিষেক নিতিনিতি।
জাগে ঋষিদের জাগৃহি রব—বাণী যে পুণ্যশ্লোক—
মন্দিরময় ভারত আবার মন্দিরময় হোক।
অশনি—গর্ত্ত মেঘ খেলা করে—হাসিছেন মহাকাল,
দূরীভূত হোক বর্ব্বরতার জঘন্য-জঞ্জাল।

৬

স্বাধীন ভারতে মুক্তি স্নানে নিষ্পাপ দেহমন।
কোটী মন্দিরে প্রণমিয়া হোক অপরাধ ভঞ্জন।
যত মন্দির ভগ্ন হয়েছে দ্বিগুণ হইয়া আসে,
অনির্ব্বাপিত হোমাগ্নি ওই চক্ষে আমার ভাসে।
অনাগত ধূপ ধূনার গন্ধ মহামন্ত্রের সাড়া—
আমি যে পেতেছি নিত্য আমাকে করিছে আত্মহারা।
দেবতা মানব ছায়া-কায়া লয়ে মোরা করি সংসার।
দেবতার ঘর আগে চাই মোরা—দেরী করিয়োনা আর।

শিশিরকুমার ও কলিকাতা ইউনিভার্সিটি ইনষ্টিটিউট

অধ্যাপক শ্রীখগেন্দ্রনাথ মিত্র

অধ্যাপক বিনয়েন্দ্রনাথ সেন ইনষ্টিটিউটের সেক্রেটারী ছিলেন। আমি ছিলাম তাঁহার সহকারী। ১৯১২ সালে এপ্রিল মাসে তিনি মারাত্মক অসুখে শয্যাশায়ী হইলে আমি ইনষ্টিটিউটের ভার গ্রহণ করিলাম। তখন ইনষ্টিটিউট হিন্দুস্কুলের কয়েকটি কক্ষে অবস্থান করিত। বিনয়েন্দ্রবাবুর আমলে Mr. Gourlay যখন প্রেসিডেন্ট ছিলেন তখন তাঁহারই উদ্যোগে বৃটিশ গভর্ণমেণ্ট ইনষ্টিটিউটের একটি বাড়ী তৈয়ারী করিবার জন্য তিন লক্ষ টাকা দিবার প্রতিশ্রুতি দিয়াছিলেন। ১৯১৪ সালে পৃথিবী-ব্যাপী মহাসমর বাধিলে ঐ টাকা দেওয়া বন্ধ হইয়া যায়।

আমি ইনষ্টিটিউটে আসিয়া দেখি যে সেখানে ছাত্র সভ্যের মধ্যে প্রধান ছিলেন শিশির কুমার ভাদুড়ী, নরেশ মিত্র, সুনীতি কুমার চট্টোপাধ্যায়, রাঘবেন্দ্র ব্যানার্জী, অঘোর নাথ ঘোষ, প্রফুল্ল ঘটক প্রভৃতি। ইঁহারাই ছিলেন under-secretary এবং ইঁহারাই ইনষ্টিটিউটের সর্ববিধ কার্য্যের জন্য দায়ী থাকিতেন। বিনয়েন্দ্রবাবুর কার্য্যকালে শেষের দিকে তিনি আর বড় একটা দেখিতে পারিতেন না; সেইজন্য এই ছাত্র সভ্যেরা (junior members) সমস্ত বিধি ব্যবস্থা করিতেন।

শিশিরকুমার তখন এম. এ. পাশ করিয়াছিলেন এবং অন্য সদস্যগণের মধ্যে প্রাধান্যলাভ করিয়াছিলেন। শিশির-কুমার ও নরেশ মিত্রের উদ্যোগে ডি. এল. রায়ের বিখ্যাত নাটক "চন্দ্রগুপ্তের" অভিনয় হয়। সেই অভিনয়ে চাণক্যের ভূমিকায় শিশির কুমার, কাত্যায়নের ভূমিকায় নরেশচন্দ্র অপূর্ব দক্ষতা প্রদর্শন করিলেন।

"চন্দ্রগুপ্ত" ব্যতীত অন্যান্য নাটক অভিনীত হইত। ইনষ্টিটিউটের তৎকালীন প্রেসিডেন্ট ছিলেন Mr. Cumming (পরে Sir John Cumming), স্যর গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, Mr. R. D. Mehta. রায় বাহাদুর চুনীলাল বসু প্রভৃতি। আশুতোষ মুখোপাধ্যায় কোনও একটি পদে ছিলেন কিন্তু তিনি বিশেষ প্রয়োজন না হইলে উপস্থিত হইতেন না। মনে আছে তিনি আমাকে একবার বিশেষ সাহায্য করিয়াছিলেন। ইনষ্টিটিউটে স্যর রাসবিহারী ঘোষ মহাশয়কে সম্বর্দ্ধনা করিবার প্রস্তাব হয়। তিনি সম্মত হইবেন কিনা তাহা জানা প্রয়োজন হইলে আমি স্যর গুরুদাসকে বলিলাম, "আপনি স্যর রাসবিহারীর সম্মতি জেনে আমায় বলুন।" তিনি তৎক্ষণাৎ বলিলেন, "না না, আমি পারব না। আপনি আশুবাবুকে বলুন।" আমি আশুবাবুর বাড়ী গিয়া তাঁহার সহিত সাক্ষাত করিলে তিনি বলিলেন, "রাসবিহারীবাবুর অভিমত নিতে আমি পারব না। তুমি স্যর গুরুদাসকে বল।" তখন আমি তাঁহাকে স্যর গুরুদাসের অভিমত জানাইলাম এবং বলিলাম, "যদি আপনারা কেউ তাঁর সম্মতি নিতে না পারেন তবে আমিই যাব।" আশুবাবু আমাকে বলিলেন, "না না, তুমি যেও না; গেলেও তোমার সঙ্গে দেখা করবার সময় হয়ত তাঁর হবে না। না, না, তোমার গিয়ে কাজ নেই। আমিই তাঁকে জিজ্ঞেস করব।" অতঃপর তিনি স্যর রাসবিহারী ঘোষের সম্মতি আনিয়া দিয়াছিলেন। আমি বুঝিলাম না কেন এই দুইজন জজ স্যর রাসবিহারীর ভয়ে তটস্থ হইয়া থাকেন। অবশ্য সম্বর্দ্ধনা খুব আড়ম্বরের সহিত সম্পন্ন হইয়াছিল। শিশিরকুমার ও তাঁহার অন্যান্য বন্ধুগণ এই ব্যাপারে আমাকে যথেষ্ট সাহায্য করিয়াছিলেন। ইনষ্টিটিউটে কোনও অভিনয় হইলে তাহার একমাস পূর্ব হইতে রিহার্সাল চলে। এই অভিনেতাদের শিক্ষা দিবার ভার আমার সহকারী মন্মথ মোহন বসুর উপরেই অর্পিত ছিল। অধ্যাপক বসু বিশেষ যোগ্যতার সহিত এই কার্য্য পরিচালনা করিতেন। কোনও কোনও দিন আমিও ইঁহাদিগকে অভিনয় শিক্ষা দিয়াছি। ইনষ্টিটিউটের হল যেদিন অন্য ব্যাপারে আবদ্ধ থাকিত সেদিন বিকালে আমি প্রেসিডেন্সী কলেজের ঘরে সমস্ত অভিনেতাদের লইয়া গিয়া শিক্ষা দিতাম। শিশিরকুমার ও নরেশ মিত্র যে পরে এত কৃতিত্ব অর্জন করিয়াছেন তাহাতে

আমি যে একসময় তাঁহাদের শিক্ষাদাতা ছিলাম একথা বলিলে আজকাল হয়ত কেহ বিশ্বাস করিতে চাহিবেন না।

আমি যখন ইনষ্টিটিউটের সেক্রেটারি ছিলাম তখন উহার স্থায়ী একটি বসতবাটি নির্মাণের জন্য নানা চেষ্টা করিতে লাগিলাম। যেখানে এখন ইনষ্টিটিউটের প্রাসাদোপম সৌধ নির্মিত হইয়াছে সেখানে অনেক মুসলমান দপ্তরী ও অন্যান্য লোক বাস করিত। আমি ইহাদিগকে উৎখাত করিয়া ইনষ্টিটিউটের জন্য ভূমি প্রস্তুত করিলাম। কিন্তু টাকা কোথায়? স্যর জন্ কামিং এবং পরে Mr. P. C. Lion এ বিষয়ে আমাকে যথেষ্ট সহায়তা করিয়াছিলেন। কিন্তু ইহাদের তো টাকা নাই। টাকা গভর্ণমেণ্ট অফ্ ইণ্ডিয়ার হাতে। কিন্তু যে সময়ে ঐ গভর্ণমেণ্টের সমস্ত টাকাই যুদ্ধের ব্যয়-সংকুলান করিতে সীমিত, তখন টাকা পাইবার আর উপায় কি? এমন সময়ে ইণ্ডিয়া গভর্ণমেণ্টের শিক্ষামন্ত্রী Sir Harcourt Butler কলিকাতায় আসিলেন। কামিং সাহেব বলিলেন, "স্যর হারকোর্টকে ইনষ্টিটিউটে আনলে কেমন হয়?". আমি বলিলাম, খুব ভাল হয়; কিন্তু কবে? মিষ্টার কামিং বলিলেন, "পরশুদিন"। আমি বলিলাম, 'শিক্ষামন্ত্রী ইনষ্টিটিউটে এলে তাঁকে একটা address of welcome দিতে হয়। সাহেব বলিলেন কিন্তু সেটা কি সম্ভব হবে?

আমি বলিলাম, দেখি কি করতে পারি। মিষ্টার কামিং ইহাতে সন্তুষ্ট হইলেন এবং বলিলেন addressটি লিখে যদি প্রয়োজন হয় তবে আমাকে দেখিতে নিতে পারেন। আমি এজন্যে রাত্তির এগারোটা পর্য্যন্ত জেগে থাকব।

আমি তখন হইতে কাজে লাগিয়া গেলাম। address লেখা, ছাপান এবং আড়াই হাজার সভ্যকে নিমন্ত্রণ করা এক দুরূহ কার্য্য। সেদিন ২০শে জানুয়ারী ছিল। এইসময়ে শিশিরকুমারের যে সহযোগিতা পাইয়াছিলাম তাহা ভুলিবার নহে। যে দুই সহস্র ছাত্র-সভ্য ছিল তাহাদের নিমন্ত্রণও সংবাদ-পত্রের সাহায্যে করিতে হইল এবং তখনই সে নিমন্ত্রণ-পত্র সংবাদপত্র সমূহে পাঠাইয়া দিলাম। আমার মনে আছে রাত্রি বারোটা পর্য্যন্ত অসম্ভব পরিশ্রম করিয়া শিশির-কুমার ও তাহার বন্ধুগণ addressটি লিখিয়া ফেলিলেন। ২২শে জানুয়ারী সন্ধ্যায় Sir Harcourt সাহেবের সম্বর্দ্ধনা হইল এবং তিনি যে অত্যন্ত প্রীত হইয়াছেন তাহা আমাকে ব্যক্তিগত এক পত্রে জানাইয়াছিলেন।

এই সম্বর্দ্ধনার ফলে গভর্ণমেণ্টের টাকা যে পাওয়া গিয়াছিল তাহা ভাবিয়া আমরা অত্যন্ত আনন্দ লাভ করিয়াছিলাম। সে সম্বর্দ্ধনায় কেবল স্যর আশুতোষ মুখোপাধ্যায় মহাশয় আসিতে পারেন নাই। এই প্রসঙ্গে আর একটি কাজের কথার উল্লেখ না করিলে আমার কর্ত্তব্য অসমাপ্ত রহিয়া যাইবে।

বর্দ্ধমানের মহারাজা শ্রীবিজয় চাঁদ মহতাব আসবাব-পত্রের জন্য সাঁইত্রিশ হাজার টাকা দিয়াছিলেন।

ইনষ্টিটিউটের ইতিহাস শিশিরকুমারের জীবনীর সহিত সংশ্লিষ্ট। সুতরাং আমি সেইদিকেই কিছু আলোকপাত করিতে চেষ্টা করিয়াছি। রঙ্গমঞ্চে শিশিরকুমারের এবং নরেশচন্দ্রের অবদান সর্বজনস্বীকৃত। আমি সেকথা আর বিশেষভাবে ব্যক্ত করিতে বিরত হইলাম।

মধু

শ্রীমুক্তিপদ বন্দ্যোপাধ্যায়

সমীরণ মধু করিছে বহন,
নদীমালা মধু করিছে ক্ষরণ,
মধুময়ী হোক ধরণী
পৃথিবীর ধূলি হোক মধুময়,
বনস্পতি ও ওষধি নিচয়,
দিনমণি, উষা-রজনী ॥
গাভীগুলি সব মধুময়ী হোক,
আমা সবাকার পালক দ্যুলোক
অনুখন মধু বরষি'—
নিখিলেরে দিক সরসি' ॥

(ঋগ্বেদ—১।৯০।৬—৮)

তাড়াতাড়ি করো! তাড়াতাড়ি করো!
সানলাইট রঙ দেওয়ার প্রতিযোগিতা
২৫,০০০ টাকার
চমৎকার পুরস্কার!
২টী
প্রথম পুরস্কার
৪,০০০ টাকার
ভেতর সারা ভারত
ভ্রমন বা নগদ
৪,০০০ টাকা
চারটী
২য় পুরস্কার
এইচ.এম. ভি.
রেডিওগ্রাম
৬ টী
৩য় পুরস্কার
মার্ফী অল
ওয়েভ রেডিও
এবং একটী
করে হিন্দ প্র্যাম্পসজর
সাইকেল
২,০০০
অন্য পুরস্কার ছবি আঁকার
রঙের বাক্স
বা
ডল পুতুল
SUNLIGHT
SOAP
অভিভাবকরা: আপনাদের ছেলেমেয়েরা এখনও যোগদান করেছে কি? মনে রাখবেন সান-লাইটের প্রত্যেকটী মোড়ক পাঠিয়ে তারা সান-লাইট রঙ দেওয়ার প্রতিযোগিতায় যোগ দিতে পারবে।
এই প্রতিযোগিতা দুটী বিভাগে ভাগ করা হয়েছে (১) ১০ বছর বয়সের কম (২) ১০ থেকে ১৫ বছর পর্য্যন্ত। এই দুটী বিভাগের ছবিগুলি আলাদা ভাবে বিচার করা হবে এবং প্রত্যেক বিভাগে ১ম, ২য় ও ৩য় ও অন্য পুরস্কার যারা পাবে তাদের একই রকম পুরস্কার দেওয়া হবে।
তাড়াতাড়ি করো
শেষ তারিখ: ১৬ই নভেম্বর ১৯৫৯।
বিনামূল্যে আপনার সানলাইট বিক্রেতার কাছ থেকে প্রবেশপত্র নিয়ে আসুন। প্রতিটী প্রবেশপত্রে একটী সুন্দর ছবি আছে তাতে আপনার ছেলেমেয়েদের রঙ লাগাতে হবে! যে রকম রঙ তাদের ইচ্ছা ব্যবহার করতে পারবে।
অল্প একটু সানলাইটেই অনেক কাপড় কাচা যায়।
হিন্দুস্থান লিভার লিঃ, কর্ত্তৃক প্রস্তুত।
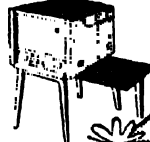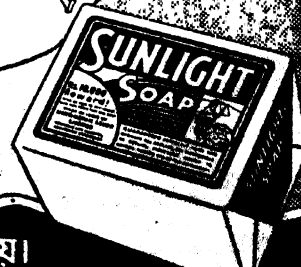
উপনিষদে মানবতা

শ্রীরঘুনাথ কাব্যব্যাকরণতীর্থ

বর্ত্তমান যুগকে অনেকে মানবতা-বাদের যুগ বলিয়া অভিহিত করিয়া থাকেন। পাশ্চাত্য মতাবলম্বাদের ব্যক্তি-স্বতন্ত্রতা বিশ্বভ্রাতৃত্ব স্থাপনাদির দ্বারা মানবতার স্থাপনের চেষ্টা চলিতেছে। বিচারবুদ্ধিই মানবকে অন্য প্রাণী হইতে স্বতন্ত্র করিয়াছে—ইহাই তাঁহাদের মত কিন্তু উপনিষদ অন্য পথের পথিক। উপনিষদ ব্রহ্মবিদ্যা শিক্ষা দেয় এবং তাহাকেই মানবতা বলে। প্রথম মত বহির্মুখী—উপনিষদ অন্তর্মুখী।

উপনিষদ—এই শব্দ হইতেই ইহার উপযোগিতা জানা যায়। উপনিষদ—নিকটস্থ হওয়া। কাহার নিকটস্থ হওয়া? ব্রহ্মের। উপনিষদ্ বিচার প্রধান ও ব্রহ্মবিদ্যার পরিপোষক। এই মতে ত্রিগুণাতীত পূর্ণব্রহ্মে প্রতিষ্ঠিত না হইলে পূর্ণ মানবত্ব বা মানবতা লাভ হইতেই পারে না। সেই লক্ষ্যে যাইবার প্রশস্ত রাজপথ শাস্ত্র-পথ। ব্রহ্ম নিগুণ ও সগুণ দুই-ই। আত্মশুদ্ধির জন্য প্রথমে সগুণ ব্রহ্মের উপাসনা প্রশস্ত। সগুণ সাধনার শেষ হইলে নির্গুণ সাধনার অধিকার জন্মে। উপাসনার মূলকথা হইতেছে দেহাত্মবোধের বিলোপ সাধন! এই বিলোপ সাধনের জন্য কতকগুলি বিশেষ গুণের চর্চা বা বৃদ্ধি করিতে হয়। প্রথমেই দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়—অগৃধ্নুতা'য়।

> ঈশাবাস্য মিদং সর্ব্বং যৎ কিঞ্চ জগত্যাং জগৎ।
> তেন ত্যক্তেন ভুঞ্জীথা মা গৃধঃ কস্যস্বিদ্ ধনম্॥ ১॥
> ঈশোপনিষৎ

জগতের সকল পদার্থে ঈশ্বর পরিব্যাপ্ত অর্থাৎ ঈশ্বর বা ব্রহ্মই একমাত্র সত্য। সেই হেতু মিথ্যা ধনাদিতে আকাঙ্ক্ষা না করিয়া ত্যাগের দ্বারা ভোগ করিবে। প্রথম কথাই হইল নির্লোভ হইতে হইবে। অন্যের অর্থ দেখিয়া লোভ হয়। লোভের ফলেই তাহা লাভের জন্য নানা অসদুপায় অবলম্বন করার চেষ্টা বা মানসিক ঈর্ষাদি বিকারের দ্বারা শ্রেয়ের পথ হইতে বিচ্যুত হইতে হয়—'লোভে পাপ পাপে মৃত্যু'। সেই জন্য প্রথমেই নির্লোভ হইতে হইবে।

জীবন যাত্রা প্রণালী কিরূপ হইবে তাহার আলোচনায় প্রয়োজন। একমাত্র ব্রহ্ম সত্য অন্য সব মিথ্যা। সর্ব্বব্যাপী ব্রহ্মের কোন পদার্থে অভাব হইতে পারে না। কিন্তু ছন্দের বা স্পন্দনের বিশেষতা বিশেষ পদার্থে দৃষ্ট হয়। এই সব জাগতিক পদার্থ কাম্য নয়। দেহ ধারণের জন্য যদৃচ্ছা লাভে সন্তুষ্ট হইয়া জীবন যাপন করিতে হইবে। সত্ত্বগুণ বৃদ্ধি যাহাতে হয় সেইরূপ জীবন যাত্রার রীতি হওয়া উচিত। সত্ত্বের দ্বারা রজ তম গুণকে অতিক্রম করিয়া সত্বে প্রতিষ্ঠিত হইবে। তদনন্তর সত্ত্বগুণাতীত হইতে হইবে। তাহার জন্য প্রয়োজন—

> "অহিংসা সত্যমস্তেয় ব্রহ্মচর্য্যাপরিগ্রহাঃ।
> অক্রোধোগুরু শুশ্রূষা শৌচং সন্তোষ আর্জবম্॥" ৪॥
> শরীরকোপনিষৎ

'অহিংসা, সত্য, অচৌর্য্য, ব্রহ্মচর্য্য, অপরিগ্রহ, অক্রোধ, গুরু শুশ্রূষা, শৌচ, সন্তোষ ও সরলতা'—এই গুণগুলির বৃদ্ধি করিতে হইবে। এই সকল গুণের বর্দ্ধন মাত্র শক্তিমানের পক্ষে সম্ভব। দুর্বলের দুঢ়তার অভাবে সব নষ্ট হইয়া যায়। সেইজন্য উপনিষদ্ বলিয়াছেন—"নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ।" এই সকল গুণ একাধারে অবস্থিতি অসম্ভব বলিলে বোধ হয় অসঙ্গত হয় না। এই গুণগুলির যে কোনও একটি যথাযথভাবে আশ্রয় করিলে মানবতা লাভ হইয়া থাকে। উপনিষদে মাত্র সরলতা অবলম্বনে মানুষ কৃতার্থ হইয়াছে তাহার নিদর্শন স্বরূপ জাবালা সত্যকাম ও গৌতমের উপাখ্যানের উল্লেখ করা যায়।

সত্যকাম মাতা জাবালাকে নিজগোত্র সম্বন্ধে প্রশ্ন করিল। মাতা জানাইলেন যে অতিথিবর্গের সেবা ও লজ্জার জন্য সত্যকামের পিতার নিকট হইতে গোত্র জানিবার সুযোগ হয় নাই। বয়স অল্প থাকায় ঐরূপ ইচ্ছার উদয় হয় নাই। যৌবনে সত্যকামকে লাভ করার কালেই তিনি গত হওয়ায় এবং দুঃখের উৎপীড়নে গোত্র জানা সম্ভব হয় নাই। বয়সকালে বৃদ্ধেরা গত হওয়ায় গোত্র জানিতে পারি নাই। এখন কোনরূপে গোত্র জানা সম্ভবও নয়। আমি জাবালা তুমি সত্যকাম। অতএব তোমার পরিচয় তুমি জাবলা-সত্যকাম।

> সা হৈনমুবাচ নাহমেতদ্বেদ তাত যদ্ গোত্রস্তমসি
> বহ্বহং চরন্তী পরিচারিণী যৌবনে ত্বামুপলভে, সাহমেতন্ন বেদ
> যদ্ গোত্রস্তমসি জাবাল তু নামাহমস্মি সত্যকামো নাম ত্বমসি
> স সত্যকাম এব জাবালোব্রুবীথা ইতি॥ ৪।৪।২ ছান্দোগ্য উপনিষদ্

গৌতমের নিকট ব্রহ্মবিদ্যা শিক্ষা প্রার্থনা করিলে তিনি গোত্র জিজ্ঞাসা করিলেন। সত্যকাম সকলকথা বলিল এবং সত্যকাম জাবালা বলিয়া পরিচয় প্রদান করিল। সরলতায় মুগ্ধ গৌতম বলিলেন—তুমি ব্রাহ্মণ অর্থাৎ পূর্ণ মানবতা লাভের অধিকারী। সত্যকামকে উপনীত করিলেন। ব্রহ্মচারী সত্যকামকে গাভী পালনে নিযুক্ত করিয়া বলিলেন—এই গাভী সকল দশ সহস্র হইলে ফিরিয়া আসিবে।

> "তং হোবাচ নৈতদব্রাহ্মণো বিবক্তুমর্হতি।" ৬।৪ ছান্দোগ্য
> 'ব্রাহ্মণ ভিন্ন অন্যে এইরূপ সরলভাবে পরিচয় দিতে পারে না।'

সত্যকাম গুরুর আদেশ শিরধার্য্য করিয়া বন হইতে বনান্তরে গোচারণ করিতে লাগিল। সাগ্নিক সত্যকাম সন্ধ্যার কালাদি রক্ষা করিয়া চলিল। ব্রহ্ম স্ব স্বরূপ প্রকাশের জন্য সত্যকামের নিকট বৃষাদিরূপে উপদেশ করিলেও সত্যকাম দৃঢ়-প্রতিজ্ঞ শ্রীগুরুদেবের উপদেশই গ্রাহ্য। ব্রহ্মবিদ্যা স্বতঃস্ফূর্ত্ত কাহারও অপেক্ষা রাখে না। গাভীর সংখ্যা পূর্ণ হইয়াছে। ব্রহ্মানন্দে বিহ্বল সত্যকাম গুরুদেব পদপ্রান্তে উপস্থিত। গৌতম সব বুঝিয়া শিষ্যকে আশীর্ব্বাদ করিলেন। সত্যকামের পরম-কাম্য ব্রহ্মবিদ্যালাভে মানবজন্ম সফল হইল। সরলতা ও নিষ্ঠার ফল হইল মানবতা লাভ।

উপনিষদে মানবতা বলিতে ব্রহ্মজ্ঞানই আলোচিত হইয়াছে। মানবের বিনাশ আছে কিন্তু মানবতার বিনাশ নাই। কেবলমাত্র ব্রহ্মজ্ঞানের বিনাশ নাই জ্ঞানের ধ্বংস হয়। অতএব ব্রহ্মজ্ঞানই প্রকৃত মানবতা। মানব জীবনের উদ্দেশ্য মানবতা অর্থাৎ ব্রহ্মজ্ঞান লাভ, নতুবা মানবতা-বিহীন মানব, মানবপদবাচ্যই নয়।

—বায়ুযান-পঞ্চতরণী—

(৩৪)

সুশ্রবস নাগের কাহিনী ও শেষনাগের গল্প শেষ হতে গুপ্তাজী প্রশ্ন করলে "নাগ মানে প্রস্রবণ অথচ শেষনাগ হ্রদ কেন ?"

"জামাতৃসরকে জামাতৃনাগ বলে না, অথচ শেষনাগকে শেষনাগ বলে —এ থেকেই এ প্রশ্নের উত্তর পাবেন। জামাতৃসর থেকে কোনও প্রস্রবণ বেরুচ্ছে না, তাই ওটা নাগ নয়। কিন্তু শেষনাগ থেকে বেরুচ্ছে নীলগঙ্গা, লীদার। বেরুবার মুখটায় দেখেছেন কুরুরনাগ, অনন্তনাগের মতো উচ্ছ্বাস আর কল্লোল।"

গুপ্তাজী বললেন "লীদার নামটার একটা ধ্বনি আমার কানে ভাসছে, জানি না এর মর্ম কি।"

"কি ধ্বনি ?" আমি জিজ্ঞাসা করি।

"নীলগঙ্গার ধারা এই লীদার ; নীলধার থেকে লীহ্ধার নাম অবশ্যই হতে পারে।"

কথাটা সে রাতে মনে লেগেছিল। গল্পের শেষে ওরা সব ঘুমিয়ে পড়েছে। আমি শীতে ঘুমুতে পারছি না ; তাছাড়া একটা অদ্ভুত উত্তেজনা। সন্ন্যাসী পূর্ববৎ বসে আছেন নিদিধ্যাসনে।

গোল বেধেছে জবরদস্ত্। বংশলের বড় ভাই শেষনাগের শীত বরদাস্ত করতে পারেনি, তাছাড়া পথের ভয়াবহতা তার স্নায়ুকে বিচলিত করেছে।

সে যাবেনা।

লজ্জায় তার স্ত্রী অধোবদন।

জায়ে জায়ে রেষারেষি ! ছোট জা বিশেষ উৎসাহ করছে না ; ছোটোভাই বড়ভাজকে উৎসাহ দিচ্ছে এবং বড় ভাই যাতে যায় সে সম্বন্ধে খোঁচাটা আসটা দিচ্ছে।

তখন ঘুম নেমেছে তন্দ্রার ফাঁক দিয়ে শীতের বেড়া অগ্রাহ্য করে। আমার মাথায় হাত রেখেছে বংশলের বড় ভাজ। "বাবুজী তুমি নৈলে মান থাকে না। বুড়ো যদি শেষনাগে একা থেকে যায়, সবাই চলে যাবে, আমি কোন্ প্রাণে ওকে ফেলে যাবো। অথচ এতদূর এসে একদিনের পথ থেকে ফিরে যাবো এটাই কি একটা যোগ্য কথা হোলো ?"

অগত্যা বুড়োকে বোঝাই। বুড়ো তো খাপ্পা। "কে হে বাপু তুমি? তোমার জন্যই আমার এতো বিপদ। প্রথম থেকেই তাতিয়ে তাতিয়ে মাগীদের মাথা খেয়েছো ; নৈলে এই ঝকমারীর দেশে কেউ আসে ভগবানকে ডাকতে ?"

আমি পরামর্শ করে সব ঠিক করে ফেল্লাম।

আমরা রওনা হব অন্ধকার থাকতে। সকালে অভ্যাস মতো পরিষ্কার হতে গেলাম। তখনও বেশ অন্ধকার। উনুন জ্বালানোই ছিল সারা-রাত। কোটেশ্বর আর মুনীশ্বর খুব জোরালো চা করলো। আধখানা করে পাঁউরুটী, এক চাকতি মাখন আর জেলি সংযোগে প্রাতরাশ চললো। পকেট ভরে নিলাম আখরোট, বাদাম, খোবানী, কাজু আর কিসমিস। সারাদিন ঘোড়ার পিঠে। পরবর্ত্তী চটী পঞ্চতরণী ; তুঙ্গ-তম, বাত্যাসঙ্কুল, ভয়ার্ত্ত শৃঙ্গ বায়ুজান অতিক্রম করতে হবে। এখানে সমগ্র পথ বরফে ঢাকা, এমন কি পাহাড়ের গাগুলোও বরফে ঢাকা।

ঘোড়ায় চড়ার আগে আবার একটু করে ব্রাণ্ডী খেয়ে নিলাম। ঐটাই করলাম ভুল। পরে জেনেছিলাম হিমালয়শৃঙ্গে অভিযানকারীরা সঙ্গে মাদক দ্রব্য রাখেই না, কারণ এতো উঁচুতে মাদকদ্রব্যপান সম্পূর্ণ নিষেধ। এমনিতেই রক্তের চাপ এখানে ভীষণ বেড়ে যায়, হৃদযন্ত্র ও শ্বাসযন্ত্রের ওপর প্রচণ্ড জুলুম চলে এইসব পথে। তার ওপর মাদক পানীয় দ্বা[illegible] বপ-জ্জনক। রাতে ব্রাণ্ডী [illegible] দিয়ে শুয়েছিলাম। সেটা তবু মন্দের ভালো, বিপদের কিছু নয় ; কিন্তু সকালে এই ব্রাণ্ডি খেয়ে যেন বিষপান করে যাত্রা করলাম। যার ফল পরে ভুগতে হয়েছিল।

সকালের ধোয়ামোছার ব্যাপারে একটা ঝরণার জলে এমনি হাত ধুতে গেছি। যেই না জলের তলায় হাত দেওয়া, সঙ্গে সঙ্গে মনে হোলো দেহ থেকে হাত কেউ কেটে নিয়েছে। দূর থেকে কোটেশ্বর দেখে তাড়াতাড়ি কেটলির গরম জল আমার হাতে ঢেলে দিয়ে মুছে দস্তানা পরিয়ে দিয়েছে। বলেছে, সর্ব্বনাশ করেছিলেন এখুনি। এ যে বরফগলা, সদ্য বরফগলা জল। হাত জমে না গেলেও অসাড় হয়ে থাকতো চিরদিনের জন্য।"

চিরদিনের জন্য অসাড় হয়ে নেই হাত, তবে মাসখানেক হাত নিয়ে ভুগতে হয়েছে এবং আজও হাত আমার পূর্বাবস্থা যে পায়নি অনেকক্ষণ কলম ধরলে বা দড়িতে গাঁট দিতে গিয়ে বা জোরে টিপে আঙুলের চাপে কিছু করতে গেলে বুঝতে পারি।

যখন শেষনাগ থেকে বেরুলাম তখনও সূর্য্যোদয় হয়নি।

"অন্ধকারে বেরুতে হবে। সারারাত বরফ জমে শক্ত হয়ে আছে। এই বরফ গলে নরম হবার আগে যতটা চলা যায় ততটাই আরামের এবং ততটাই কম বিপদের। বরফ নরম হলে তা হবে চোরা বালির মতো।" বল্লে সর্দার ঘোড়াওয়ালা সলীম।

আমাদের আগেই সন্ন্যাসী বেরিয়ে গেছে। গুজরাতী দল তখনও প্রস্তুত হচ্ছে। বংশলদের দল সব বেঁধে বুঁদে ঘোড়ায় চেপেছে। বংশলের ভাইকে জোর করে চাপিয়ে হাঁকিয়ে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। ভোর সাড়ে চারটে তখন। কৃষ্ণা অষ্টমার রাত্রিশেষ, নবমীর সকাল। শেষ রাতের চাঁদের আলো পড়েছে তুষারের গায়ে। এসে গেলাম একেবারে তুষারের দেশে—যার সঙ্গে মেরুদেশের সঙ্গে প্রকৃতিগত চেহারায় কোনও আর অমিল নেই।

খানিকক্ষণ সমতল। তারপরে একটা চড়াই, চওড়া দুটো পাহাড়ের মাঝখান দিয়ে পাহাড়-ঢল বেয়ে ওঠা, যেন বুক বেয়ে ওঠা। পায়ের জুতোর ওপরে ঘাসের জুতো ল্যাপটানো। রেকাবে সেই পা ঢুকেছে আঁট হয়ে। খুব ধীর পদক্ষেপে ঘোড়া চলেছে। কেবল বরফ ভাঙ্গার মশ্ মশ্ শব্দ কানে আসছে। মাঝে মাঝে মুনীশ্বর চেঁচাচ্ছে "জয় বাবা অমরনাথ কী!"

চড়াইটা প্রায় দেড়মাইল। এর পরেই এলো একটা বাঁক। তারপরেই প্রায় আধমাইলের একটা পাহাড়ী বাঁক। একটা মস্ত পাহাড়ের পেটের গা কুরে কুরে পথ। ষাট ডিগ্রীর খাড়াই পাহাড়। নীচ দিয়ে বয়ে যায় একটা নদী। এখন তার জল জমে আছে বরফে। সুতরাং সেই নীহার স্রোতের দুধার দিয়ে উঠেছে দুটো আদিঅন্তহীন ক্ষমাহীন পাহাড়। চতুর্দিকে কেবল শাদা। অন্য কোনও রং নেই।

পথ নেই সামনে। মুনীশ্বরের হাতে কুঠার। সেই কুঠার দিয়ে কুরে কুরে পাহাড়ে গা থেকে খসিয়ে ফেলছে বরফ, ইঞ্চি দুয়েক চওড়া। সেই চওড়া পথটুকুর ওপর ঘোড়া ফেলছে তার ক্ষুর। সেই নির্ভরটুকুনীর ওপর ভরসা রেখে আমরা এই দুর্গমকে বরণ করছি। পড়লে কোনও গাছপাথর বা একটু তৃণের ভরসাও নেই যে তার সংঘাতে আত্মরক্ষা করা যেতে পারবে। একেবারে সেই 'একচিতে নরকে পতন'—থামতে হবে সেই শিলীভূত বারিধারায়। পড়লেই সে বরফ কেটে যাবে, তার তলার দুরন্ত তুহিনে সমাহিত হতে হবে।

অমরনাথের পথ সত্যিই এতো দুর্গম নয়। রাকী পূর্ণিমার দিন থেকে যাত্রা শুরু হয়ে যখন আনুষ্ঠানিকভাবে মেলা সুরু হয় তখন এ সব বরফ গলে যায়, নদীর জল বয়ে যায় নির্ঝরের শব্দ তুলে। পথ করে আত্মপ্রকাশ, সরকার বেঁধে দেয় সেতু; ভীষণ হলেও তা মৃত্যুযাত্রা নয়, এখন এর যা অবস্থা। এ অবস্থায় যাত্রা করা আত্মহত্যার সমগোত্রীয়।

কিন্তু এখন তো আর ফেরা যায় না।

প্রকৃতি ভালবাসি। প্রকৃতিকে ভালবাসার দায়েই এতদূরে আমায় সুন্দরী নিয়ে এসেছে তার সোনারতরীতে বসিয়ে। কিন্তু এই ভালবাসার শেকড় প্রাণের পিপাসার সকল অবধি বিস্তৃত হয়ে গ্রাস করতে পারেনি। তাই প্রাণ যখন বাঁচার আগ্রহে শঙ্কিত মুহূর্ত্ত পার হয়ে যেতে চায়, তখন চোখ আড়ষ্ট থাকে চলার পথের নির্ভরের পানে। বাঁচবো, বাঁচতে চাই—এই আগ্রহটাই জীবজগতের মূলতত্ত্ব। এই তত্ত্বের আসনেই বসেছে তাবৎ জিজ্ঞাসা। আমাদের তাত্ত্বিক জীবনটা যে কতো বড় একটা ভণ্ডামী তা বোঝা যায় প্রাণের সঙ্গে যোঝাযুঝির চরম মুহূর্ত্তে। যুদ্ধে প্রাণ দেওয়া, দেশাত্মবোধে অন্যায়ের প্রতিকারে আত্মোৎসর্গ করা, এমন কি তত্ত্বের তুরীয় অবস্থায় শেলীর মতো জিজ্ঞাসার চোখে চোখ রেখে প্রাণকে অস্বীকার করে পেছনে আছে একটা উত্তেজনা, প্রতিকারের স্পর্দ্ধা, ব্যাহতের উদগ্র উদ্দীপনা। কিন্তু এই যে একটা সৌখীন প্রকৃতি বিলাসে নির্ভর করে পদে পদে প্রাণটুকু হাতে নিয়ে চলা—এরমধ্যে নেই সেই রমণীয়তার আবিষ্কার যার সঙ্গপিপাসাকে এতকাল বড় করে নিজেকেই বড় করতে চেয়েছি। মানুষ কতো ছোটো, অহংবোধ কেমন দুষ্ট ব্যাধির মতো, গিয়েও যায় না, আঠার মতো লেগে থাকে গায়ে, তা এখানে এসে বুঝতে পারি। মন এখন প্রতিপদে লক্ষ্য রেখেছে, পূর্ণিমা গেছে হারিয়ে।

পার হয়ে গেল অসিত, ভর্মা, জগজীবনও। এবার পার হচ্ছে বেণু। তারপরেই আমি। ঘোড়াওলাগুলো ঘোড়ার পাশে পাশে বরফে পা জমিয়ে জমিয়ে চলেছে। আশ্চর্য্য শিক্ষা ঘোড়াদের। পদস্খলন হচ্ছে না এমন 'ক্ষুরস্য ধারা নিহিতং দুরত্যয়া' পথেও।

সঙ্গে সঙ্গে চোখের ওপর বেণুর ঘোড়ার পা হড়কালো। মুহূর্ত্ত! তারমধ্যে ঘোড়াটা গেছে রেকাবে। বেণু নীচে তো ঘোড়া ওপরে, ঘোড়া নীচে তো বেণু ওপরে গড়াতে লাগলো ওরা দুটো প্রাণী—যে যার প্রাণভয়ে কাতর। ঘোড়াওলা ছটকে গিয়ে ঘোড়ার রাশ ধরে আটকাতে গেল। রাশ ছিঁড়ে ঘোড়া বেণুকে নিয়ে তীব্র বেগে গড়াতে লাগলো।

মুনীশ্বর ঝাঁপিয়ে পড়ে রাক্ষসের মতো সেই তুষার সমুদ্রে। অনেক বেশী বেগে নীচে নেমেও দুহাতে জাপটে নিলো বেণুকে, হাঁটু অবধি ওর বরফে ঢুকে গেছে। ঘোড়াটাও ঐ সামান্য আঘাসেই দুপা ঢুকিয়ে দিয়েছে বরফে। থেমে রইল সেই পতন। আমি ঘোড়ার ওপর স্থির বসে দেখছি এই সঙ্গীণ পরিণতি। উপায় নেই ঘোড়ার ওপর থেকে নামি, ঝাঁপালেও কিছু কাজে আসবোনা।

কিন্তু প্রকৃত কথা এসব ন্যায়ের তর্ক মাথায় আসেনি। যে ধাক্কা খেলে সমগ্র বুদ্ধিশক্তি একেবারে বন্ধ বোবা মেরে যায়, স্থবির হয়ে পড়ে সকল কিছু জঙ্গম, এ যেন সেই ধাক্কা। বেণুর নতির পরিমাপে আমার স্থিতি অনড় হতে অনড়তর হয়ে গিয়েছিল।

বেণু শোয়া অবস্থাতেই প্রথম আশ্রয় পাবা মাত্র একটা হাত তুলে আমার অভয় দিয়ে হাসতে লাগলো। তারপরেই রেকাব থেকে পা মুক্ত করে ওর সেই প্রাণ খোলা হাসি—এ জীবনে আমি ভুলবো না। ভয়ের আতঙ্ক মুহূর্ত্তে ভাসিয়ে নিল ওর সেই অভয় কিরণে উদ্ভাসিত হাস্য প্রবাহ।

ঘোড়াওলা আর মুনীশ্বরের হাত ধরে উঠে এলো। আমার ঘোড়া এগিয়ে গেল। গুপ্তাজীর ঘোড়াও নির্বিঘ্নে পারহোলো। বংশলরা

ঘোড়ায় বসতে চাইলো না। ঘোড়াওলা আর কোটেশ্বর ধরে ধরে ওদের পার করলো।

এই ধরণের পথ মাঝে মাঝেই পড়তে লাগলো। কিন্তু এখন যেন আর তেমন আতঙ্ক নেই। বেণু কেবল নেমে নেমে চলতে লাগলো।

একটা জায়গায় এসে সলীম বল্লে—এবার ভাল পথ।

ওদের ভাল পথে আমার কি যায় আসে? যেদিকে চাই দেখি বরফ, কোথাও শক্ত, কোথাও গলিত স্রাব। জলও দেখিনা, পাথর ও দেখিনা। গাছ, পাখী তো দেখিই না। ভরসার মধ্যে এই যে বরফ বেশ শক্ত। ঘোড়া চলেছে শক্ত পদক্ষেপে।

এবার একটা বরফের সমতলের মতো। বহু দূরে একটা গিরিশৃঙ্গ মন্দিরের মতো কোণকাটা। সমচিত্রকোণ এবং পিরামিডের আকার। পরপর তিনটে এই রকম শৃঙ্গ। সূর্য্যালোক পড়ে তার মায়া যেন আবাহন করছে। সমতলটা ঢালু হয়ে উপরের দিকে চলে গেছে মাইল-খানেক। এ চড়াইটা উঠতে খুব কষ্ট হচ্ছে। ঘোড়ায় বসে এমন আর কষ্ট কি! কিন্তু ঘোড়াও থেমে থেমে যাচ্ছে। মাঝে মাঝে কামড়ে ধরছে বরফ। দাঁত দিয়ে টুকরো কেটে কড়মড় করে চিবিয়ে খাচ্ছে। আমার বুকটার মধ্যে কি যেন দাপাদাপি সুরু করেছে। নিশ্বাস-প্রশ্বাস নিতে কষ্ট হচ্ছে।

বাতাস যেন প্রবল, প্রবলতর হচ্ছে। শীত আর সহ্য হয় না। মনে হয় চিৎকার করে ডাক ছেড়ে বলে উঠি "কে কোথায় আছো এক কাপ চা দাও।" কিন্তু চিৎকার করলাম—"বোলো অমরনাথ বাবা কী জয়।" সকলে যেন আশ্রয় পেলো—চিৎকার করে উঠলো—" জয় বাবা অমরনাথ কি জয়।" নগরপুষ্ট সন্দেহ জর্জরিত প্রতিটী প্রাণী তখন চিৎকার করে উঠতে লাগলো ঘন ঘন "জয় বাবা অমরনাথ কি জয়।"

বাতাসের বেগে নিঃশ্বাস তো নিতে পারছিই না, ঘোড়ায় চেপে থাকা দায় হয়ে উঠছি। শতচ্ছিন্ন কাপড়ের ওপর একটা করে কাশ্মিরী কম্বল জড়িয়ে, মাথায় একটা থুলি-ঢাকা টুপী পরে, পায়ে শুধু দড়ির জুতো পরে চলেছে সলীম তার দল নিয়ে। মাঝে মাঝে চাইছে সিগারেট। ওদের জন্যই একগাদা চার-মিনার সিগারেট সঙ্গে নিয়েছিলাম। আর ওদের গরম হবার বিশেষ কিছু নেই। অবাক হচ্ছি ওরা চলেছে কি করে। কিন্তু আমাদের গৃহস্থী দয়া তো! ঐ এক চলক্ ভ্যাদভেদে হৃদয়পনা অবধিই শেষ। বড় জোর দুটো পয়সা দেবো, বা একটা সিগারেট বা একটা ছেঁড়া জামা। এগুলো দিয়ে, বা আরো কিছু বেশী দিয়ে, আসল কথা কিছু "দিয়ে", ওদের জন্য কিছু "করে", নয়,—আমরা আমাদের ethical সুনিদ্রার ব্যবস্থা করবো। "দিয়ে" ওদের থামিয়ে রাখবো সমাজে ভালভাবে থাকার আটালান্টা রেসে। সুযোগ করে দেব এ্যাটালান্টির বনেদী স্বার্থ আর পুঁজীকে ফাষ্ট প্রাইজ পাইয়ে দিতে। যতদিন এই প্রাচীন দেবতা অনুমোদিত ব্যবস্থার অনুসরণ করতে থাকবো, ততদিনই সমাজপতি, দেশাগ্রগণ্য, বরেণ্য, ধর্মধ্বজী, হিসেবে খ্যাতি পাবো কিন্তু 'করবো না' কিছু। যদি 'করি' তখন হবো বিদ্রোহী, সমাজধ্বংসী কালাপাহাড়, লালচে-শয়তান। গৃহস্থী সহানুভূতি সিগারেটে আর পয়সাতেই নিঃশেষিত।

সলীম চিৎকার করে উঠলো—"লা ইলাহা ইল্লাল্লা, মুহম্মদ রসুলুল্লা! জিজ্ঞাসা করি "চেঁচালে কেন সলীম?"

এটা পেরিয়ে এলাম ১৯০০০ ফুট দিয়ে। নীচের ঐ জায়গাটা সতের হাজার ফুট। অমরনাথ যাত্রীরা ঐ পথ দিয়েই যায়। আমরা একটু বেশী ওপর দিয়ে এসেছি। যদি বরফ গলে থাকে ওধারে, নরম হয়ে থাকে, বিপদের ভয় বেশী। একবার উঠে এলে তখন আর ভয় কি? এখান থেকে বরফে গড়িয়েই পঁচতলী পৌঁছে যাবে।

"ভীষণ বাতাস সলীম। তোমার কথা শোনা যাচ্ছে না। ওটা বরফে ঢাকা কালো মতো কি? মনে হচ্ছে টীনের শেড্?"

এবার বেণু আমার পাশে পাশে চলেছে। আর দূরে যাচ্ছে না। নতুন জীবন ওর! সে জীবনে ও ওর দাদাকে যেন বেশী চিনেছে। ওর দাদাও যেন ফিরে পেল বোনকে।

অসিত আপন মনে ঘোড়া নিয়ে আগে আগে চলেছে। রোদ লাগিয়েছে দারুণ চমক বরফের ওপর। চোখ টাটিয়ে ওঠে। সকলেই গগ্‌ল্‌স্ পরেছি। এই গগ্‌ল্‌স্ না পরার জন্য ঘোড়াওলাদের প্রত্যেকেই রেটীনায় গোলমাল, বহু ঘোড়াওলা নিশান্ধতায় ভুগছে। বর্ণান্ধতার সংখ্যা নিশান্ধতার চেয়ে বেশী। চোখের কোণে প্রত্যেকের ঘা; কারুর চোখের পল্লব নেই; পুড়ে-হেজে শেষ হয়ে গেছে।

রোদের খেলা বরফে দেখতে যেমন এমন জলেও নয়। রোদে-জলে নিবিড় খেলা চলে জলপ্রপাতের কাছে। সেখানে জলকণা ওড়ে বাতাসে। সূর্য্যালোকে দেখতে পাওয়া যায় সূর্য্যের সাতরঙা রথের বাহার। কিন্তু দিগন্ত বিস্তৃত সম্মুখে, পশ্চাতে, আশে-পাশে এই যে জমাট হিমসাগর এর ওপরে সূর্য্যালোক ক্ষণে ক্ষণে আপন চেহারাটা বদলাচ্ছে। সূর্য্য তো সরছে; তাই সরছে ছায়া। ছায়ার বাহারই তো আলোর প্রকাশকে প্রকাশযোগ্য এবং যোগ্যতর করে তোলে। শাদা কেবল একটা আভাস। শাদা রংটার যে কতো রকম ভোল আছে, দেখতে হলে এই সব মহিমময় স্থানে আসতে হয়। এ্যালুমুনিয়মের সাথে গলানো দস্তা; শিঁউলির পাঁপড়ীর কোমলতার সাথে হাল্কা মেহেদীফুলের বেগুনচে আভা; হিমটাপার ক্রীম রংয়ের সঙ্গে গরদের ক্রীম, বকের পালকের সঙ্গে বিভূতির শাদা, চুণের স্তুপের সঙ্গে পাঁক শ্যাওলায় জড়ানো একটা রং; শাদার বর্ণনা তো করা যায় না। সব রং একাকার করে দেওয়া সেই মহৎ সমাধির অপরূপ মনোহারিত্বের সামনে পড়ে আমরা যেন বিহ্বল হয়ে উঠি।"

ভর্মা বলে—"মন ভরে গেল দাদা, জীবন সার্থক হোলো। এ যেন গুরুদেবকে দেখছি একেবারে কোলের কাছে বসে। এ আনন্দ সেই আনন্দ, এ মহিমা সেই মহিমা।

শান্তিনিকেতনের ছেলে ভর্মা। ওর সব আনন্দ, সব প্রত্যক্ষ সেই পরম প্রত্যক্ষকে সামনে রেখে। জগজীবন বলে. "কি ভুলই করতাম যদি না আসতাম।" হঠাৎ একটা দিক সোনায়-কমলায় যেন মাখামাখি

হয়ে গেল. গেরুয়া রংয়ের একটা বালতি কে যেন ঢলকে দিলো পশ্চিম-ধারের ঐ শাদা পাহাড়ের গায়ে। পূবের সূর্য্যকে দেখে অস্তসাগরে সাজ সজ্জার সাড়া পড়েছে। আমাদের দেখা যেন ফুরোয় না।

এ যেন বর্ণরাজ্য। ভাসিয়ে নিয়ে যায় বাতাস। সলীম কি বলে শোনা যায় না।

"হবে না বাবুজী ?" বলে সলীম—"এরই নাম ভাব্ জান্, বায়ুজান বলেন আপনারা। হাওয়াই এখানকার জান্। আর ঐ যে চটী দেখছেন, ওর নাম পীরকা মকবরা।"

আমি বলি "আমরা জানি পিরামিড্ পীক্ বলে।"

"হ্যাঁ, বাবুরা ঐ নাম দিয়েছে। আর কালো কালো বরফে ঢাকা যা দেখছেন ওগুলো টীনের শেড্। মেলার সময় যাত্রীরা থাকে তাঁবুতে; এখানে ঘোড়া রাখা হয়। ক্রমাগত বরফে আর হাওয়ায় এখন ওর ঐ দশা। মেলার সময়ে যখন বরফ গলে যাবে তখন আবার এ সব ঠিক-ঠাক করা হবে।"

এখন সব ঘোড়া থেকে নামার পালা। অমরনাথের পথে সর্ব্বোচ্চ শিখর এই বায়ুযান। কে এই নাম দিয়েছেন জানিনা; কিন্তু অপূর্ব নাম। বায়ুযানের ভয়াবহতা আরোহণে, শৈত্যে আর বায়ুর প্রকোপে।

সম্মুখে বিস্তৃত সুবিশাল বরফ-সমাচ্ছন্ন দেশ, ক্রমশঃ ঢালু হয়ে চলে গেছে তরঙ্গে তরঙ্গে ভূমিভাগের নতোন্নতার সীমার ইঙ্গিত জানিয়ে গভীর হতে গভীরে। সুইজারল্যাণ্ড হলে স্কী খেলার আদর্শক্ষেত্র হোতো। তিন মাইল এই ঢালু প্রশস্ত পথে নেমে গেছে একেবারে পঞ্চতরণী পর্য্যন্ত। এখান থেকে পঞ্চতরণীর চটিটা দেখা যায়। এর মধ্যে পড়ে দুটো নদী। দুটোরই সেতু ভেঙ্গে গেছে। নদীর জল ক্রমে ক্রমেও ভীষণ তরঙ্গে শেষ অবধি প্রা[illegible] ক্ষুদ্র জমেনি !

সলীম আমাদের বর্ষাতিগুলো খুলে ফেলার আদেশ দিলো। বেলা তখন এগারোটা হবে। তখনও অবধি বৃষ্টি হয়নি। আকাশ মেঘলা হচ্ছে মাঝে মাঝে। বর্ষাতিগুলো বরফে বিছিয়ে তার ওপরে এক এক-জন বসলাম। চারধার দিয়ে গুটিয়ে বর্ষাতিটা কোলের কাছে একহাতে ধরে রইলাম। ঘোড়াগুলো ছেড়ে ঘোড়াওলারা আমাদের হাতের লাঠির একটা অংশ নিজেরা ধরলো, অন্য প্রান্তটা এক হাতে আমরা ধরে রইলাম। বাঁ হাতে ধরা বর্ষাতির প্রান্ত। ঘোড়াওলারা লাঠি ধরে জোরে টান মারলো। তারপর আমাদের বরফের ওপর দিয়ে গড়ানোর পর্ব চলতে লাগলো। বরফের বর্ষাতি খুব মসৃণ বলে সর্ সর্ করে নেমে যেতে লাগলাম; কিন্তু সামনে বরফের স্তূপ জমে ওঠে, গতিবেগ ও গতির দিক হারাই; বরফ সরিয়ে আবার হড়কাতে থাকি। যেন খেলায় পেয়ে গেল। মিনিট দশেকের মধ্যে প্রায় দু মাইল পথ নেমে থামলাম এক নদীর ধারে।

ঘোড়ায় চড়ে নদীটা পার হলাম। একটা বড় গুজর দলও তখন নদী পার হচ্ছে। তাদের দেখে যেন সাহস হোলো।

পঞ্চতরণীর কাছাকাছি বরফ কমে এসেছে। পঞ্চতরণীতে পাঁচটা নদীর ধারা এক হয়ে মিশেছে। আস্তিক হিন্দু মাত্র এখানে শ্রাদ্ধ ক্রিয়া করে থাকে। পঞ্চতরণীর উচ্চতা ন-হাজার ফুট হবে। খুব উঁচু নীচু পাহাড়ের ঘাঁটিতে ভরা। ঘোড়া নিয়ে নামলাম। নদীর ঠিক পাড় থেকে বরফ এতো উঁচু হয়ে আছে যে ঘোড়া নামতে ভয় পেতে লাগলো। প্রায় লাফিয়ে পার হতে হোলো সেই দেয়াল।

অসিত জল পেরুতে বার বার ভয় পেয়েছে। পঞ্চতরণীর নদীশয্যা উপল বিস্তৃত। প্রায় আধ মাইল চওড়া নদী। এখন জল আছে কুড়ি ফুটও হবে না; কিন্তু বেগ প্রচণ্ড। ঘোড়ার পেট অবধি ডুবছে। ঘোড়া অতিকষ্টে উপল কণ্টকিত নদীবক্ষে পা রাখছে; রাখতে পারছে না। নদীর বেগ ঘোড়াকে টেনে নিয়ে যাচ্ছে। ঘোড়াওলারা যে যার অন্য পথে উধাও। ঘোড়ারা আমাদের পিঠে নিয়েই টপাটপ নদীতে নেমে পড়লো ও ভাসতে ভাসতে ওপারে গিয়ে উঠলো। কিন্তু অসিত ভীষণ ভয় পেতে লাগলো। তার ভয়েতে ঘোড়া আরও ভয় পেয়ে গেল এবং পাড়ে ওঠার পূর্ব-মুহূর্তে, জল যেখানে খুব গভীর সেখানেই ঘোড়াশুদ্ধ জলে কাৎ হয়ে পড়ে গেল।

"গেল", "গেল", রব উঠলো। ঘোড়া আর অসিত অনেকটা ভেসে গেল। ঘোড়াওয়ালা লাফিয়ে পড়ে দুজনাকেই টেনে তুললো বটে, কিন্তু ভিজে অসিত তখন টইটম্বুর।

ঐ দুরন্ত শীতে সমস্ত শীতবস্ত্র ভিজে অসিতের অবস্থা কাহিল। আমার প্রথম ও প্রধান চিন্তা অসিতকে বস্ত্র পরিবর্ত্তন করানোর। উপরি কাপড় জামা তো আমাদের কারুর নেই। উপরের অংশ তবু হয়তো ভাগা-ভাগি করতে পারা যায়, কিন্তু নীচের অংশ আদৌ নয়।

ততক্ষণে কোটেশ্বরও এসে গেছে। কোটেশ্বর তার চুস্ত পাজামা খুলে দিল। আমরা কেউ গেঞ্জী, কেউ পুলোভার, কেউ কিছু দিলাম। ও জড়ালো কম্বল। চটির ভেতর কয়েকটা ঘোড়াওলা এবং দুচার জন যাত্রী ছিল। তারা একটা বড় চুল্লী জ্বালিয়েছিল। সেই আগুনের আঁচে ওকে বসিয়ে দেওয়া গেল।

আমাদের তাবু লাগানো হোলো। সেই তাঁবুর তলায় ত্রিপল বিছিয়ে তার ওপর বিছানা পুরু করে বেছানো হোলো। উনুনে আগুন দিয়ে চা হোলো।

ঘোড়াওলাদের সম্বল কাশ্মীরীর মহামূল্য সম্পদ 'কাঙ্গড়'। বেতে বাঁধানো মাটির সরা; ওপরে গোল হাতল, তলায় খুরো, সবই বেতের। পেটটা মোটা। তলা আর গলা সরু। এর মধ্যে কয়লার আগুন থাকে। গলায় ঝুলিয়ে রাখে। বুকের কাছে সেটা দোলে। তার ওপর হয় আলখাল্লা চাপানো, নয়তো কম্বল মুড়ি দেওয়া। বুকে জড়িয়ে রাখে; শরীর গরম হয়; দারুণ শীতে বাঁচে। ঠাট্টা করে ওরা বলে "মজনুর কাছে লয়লা যা, কাশ্মীরীর কাছে কাঙ্গড় তাই!" বুকের কাছে দোলে বলে এই রসিকতা। কিন্তু এর খেসারৎ দিতে হয় কাশ্মীরীকে। অগ্নিকাণ্ড তো আছেই, তার চেয়েও ভয়ানক, কর্কটরোগের আধিক্য এই কাশ্মীরীদের বুকে। কারণ অগ্নিস্পর্শের নিরবচ্ছিন্নতা। কাঙ্গড় নাকি ইটালি থেকে আমদানী হয়েছিলো কাশ্মীরে; অনেক য়ুরোপীয়

না, না !
এ 'ডালডা' নয় !
'ডালডা' কখনও খোলা অবস্থায় বিক্রী হয় না !

আজ্ঞে হ্যাঁ, ডালডা বনস্পতি আপনি কেবল শীলকরা টিনেই কিনতে পাবেন। এই জন্যেই এতে কোনও ধুলো ময়লা লাগতে পারে না আর না পারা যায় একে নোংরা হাত দিয়ে ছুঁতে। তাছাড়া খোলা অবস্থায় 'ডালডা' কেনার দরকারই বা কী যখন আপনার সুবিধের জন্য ভারতের যে কোন জায়গায় আপনি ১০, ৫, ২, ১ ও ½ পাঃ টিনে 'ডালডা' কিনতে পাবেন।
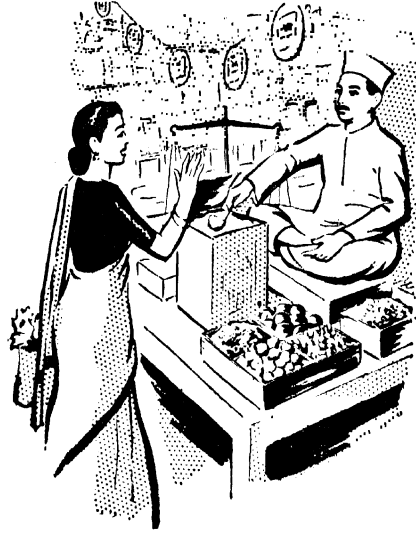
হ্যাঁ, এই তো 'ডালডা' !
এর হলদে টিনের ওপোর খেজুর গাছের ছবি দেখলে সবাই চিনতে পারে।

মনে রাখবেন 'ডালডা' কেবল একটি বনস্পতির নাম। আপনার এবং পরিবারের সকলের স্বাস্থ্য সুরক্ষিত রাখতে সব সময়েই ডালডা বনস্পতি কিনবেন শীলকরা বন্ধ টিনে। কেন না কোন রকম ভেজাল বা দোষযুক্ত হবার বিপদ এতে থাকে না আর যা কিছু এই দিয়ে রাঁধবেন সেই সব খাবারের প্রকৃত স্বাদ বজায় থাকবে।

ডালডা বনস্পতি দিয়ে রাঁধুন—আর স্বাস্থ্য ও শক্তি সঞ্চয় করুন।

DL. 469-X52 BG

হিন্দুস্থান লিভার লিমিটেড, বোম্বাই।

পণ্ডিতের (?) দাবী। হবে কি করে তা? রাজতরঙ্গিণীতে এই দাবীর স্বাক্ষর। এতে আর অন্য দেশীয় ভেজাল নেই। বরং ওদের আলখাল্লাটা আকবরের দেওয়া এ কথাটায় খানিকটা আস্থা রাখা যায়। জয়নাল বিরক্ত হয়ে ওঠেন একবার হিন্দুদের নাক উঁচুনিতে। ফলে ওদের শাসন করার জন্য বাধ্য করেন বুকে কাঙড় লটকাতে আর বাসি রুটি খেতে। এই অছিলা দেখিয়ে অনেকে বলেন কাঙড় জয়নালের আবিষ্কার হিন্দু দমনের অস্ত্র হিসেবে। রাজতরঙ্গিণীর বন্যায় এ কথাও ভেসে যায়। কাঙড় প্রধানতঃ ও সর্বৈব কাশ্মীরী বৈশিষ্ট্য, এবং দুরন্ত শীতে গরীবের একমাত্র সহায়।

কিন্তু আজই অমরনাথ সেরে ফিরে এখানে রাত্রিবাসের কথা। এটা সম্ভবও হোতো। এখান থেকে অমরনাথ মাত্র সাড়ে তিন মাইল, বিশ্রী চড়াই, ভারি দুর্গম পথ।

এখানে অমরনাথের পথের খানিকটা ইতিহাস বলা দরকার।

(ক্রমশ)

তুলুর্দ্ধ লত্রেক

মলয় রায়চৌধুরী

সংক্ষিপ্ত হলেও হেনরী দ্য তুলুর্দ্ধ লত্রেকএর জীবন অনাকর্ষক নয়। দক্ষিণ ফ্রান্সের এ্যালিবিতে তাঁর জন্ম ১৮৬৪ সালের ২৪শে নভেম্বর। হেনরীর বাবা কাউন্ট এ্যালফঁসে দ্য তুলুর্দ্ধ লত্রেক ছিলেন তখনকার ফ্রান্সের এক ধনী অভিজাত বংশের কর্তা। অভিজাত বংশের সন্তান হওয়া সত্বেও হেনরীর জীবনের অনেকাংশ ব্যয়িত হয়েছে মঁৎমারতিয়ার-এ আনন্দ সঞ্চয়ে। সময় কাটানোর জন্যেই তিনিই প্রথম জীবনে একটু আধটু ছবি আঁকতেন। বরং বলা যায় এ তাঁর অভিজাত-শখ ছিল। হেনরীর বাবা ভেবেছিলেন যে তাঁর পুত্রের কাছেই সঁপে যাবেন পরিবার দেখাশোনার ভার; তাই ঘোড়ায় চড়ে শিকারে গিয়ে বেশ কাটছিল হেনরীর জীবন। কিন্তু ১৮৭৮-৭৯ সালে পরপর দুবার দুটি দুর্ঘটনা ঘটায় তাঁর দুটি পাই বিকৃত হয়ে যায়।

লত্রেকের পায়ের হাড় কখনও ভালভাবে জোড়া লাগেনি, আর তাঁর এই শারিরীক বিকৃতি তাঁকে এমন ছোট-খাটো আর অদ্ভুতাকৃতির করে দিয়েছিল যে তা সহজেই সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করতো। তিনি আশ্রয় নিলেন মঁৎমারতিয়ার এর মিউজিক হল গুলোতে, প্যারী আসার পর। লত্রেক প্যারী আসেন ১৮৮৪ সালে এবং তাঁর মৃত্যু হয় ১৯০১ সালে। এই সময়টুকুর মধ্যে তিনি বহু কাফে, ক্যাবারে আর ডানসিংহল গুলোতে বেশ কিছু ছবি রচনা করেছেন। এই ধরণের মিউজিক হল গুলোতে তাঁর নিজস্ব স্থান থাকতো একটি করে, আর সেখানে থেকেই খুব তৎপরতায় গায়ক-গায়িকা, ক্লাউন এবং নৃত্য শিল্পীদের ছবি আঁকতেন। লত্রেকের জীবনের দশটি বছর খুব মূল্যবান, কারণ এই সময়েই তাঁর সুখ্যাত ছবিগুলোর জন্ম দেন তিনি। ১৮৮৮ থেকে ১৮৯৯ পর্যন্ত যে ছবিগুলি তিনি এঁকেছেন পরবর্তী কালে সেগুলো পথপ্রদর্শক হয়ে ওঠে। আর এই সময়ই মানসিক এবং শারিরীক অবনতির জন্য ১৯০১ সালে সাইত্রিশ বছর বয়েসে মারা যান লত্রেক।

লত্রেকের জীবনের অনেকাংশের প্রভাব আছে তাঁর আঁকার স্টাইলে। তিনি যখন প্রথম প্যারী আসেন তখন প্রিন্সেতোর কাছে ছবি আঁকা শেখেন। প্রিন্সেতো জন্তুজানোয়ারের ছবি আঁকতো। এরপর তিনি বনাৎ আর করম্ এর স্টুডিওতে আসেন। করম্ এর সঙ্গে থাকার সময়েই তিনি ভিনসেনৎ ভ্যানগ এবং এমিল বার্ণার্ড এর সংস্পর্শে আসেন এবং ইমপ্রেশনিজম্ দ্বারা প্রভাবিত হন। কিন্তু তাঁর নিজস্ব স্টাইলে ক্রমবিকাশ ঘটতে থাকে মিউজিক হলগুলোর প্রভাবে।

যে সমস্ত কাফেগুলোতে তুলুর্দ্ধ লত্রেক যেতেন তার মধ্যে প্রধান ছিল লৈ মিরলিতন। নীচু স্তরের জীবন-যাত্রার পথিকদের তিনি খুব ভালো করে চিনতে পেরেছিলেন এই কাফেটিতে। এরিসতাইদ ব্রুয়াস্ত ছিল এই কাফের মালিক। ব্রুয়াস্তের বহু ভঙ্গিমা আজও বেঁচে আছে লত্রেকের আঁকা পোষ্টারে। পতিতা আর নাচিয়ে

সম্বন্ধে একরকম গান গাইতে পারতো ব্রুয়াস্ত, তাইতে তার বেশ রোজগারও হতো আবার নামও হতো। গ্রাহকদের আকর্ষণ করার এক ফন্দি ছিল ব্রুয়ান্তের। খরিদ্দাররা আসলেই একদল মেয়ে নাচতে নাচতে তাকে অভ্যর্থনা করতে আসতো, আর এতে তাদের মুগ্ধ হওয়া অস্বাভাবিক নয়। এই নাচিয়েদের রঙীণ পোষাকে অদ্ভূত দেখাতো সেই সময়ে। অনেকে মনে করেন লত্রেকের ব্যঙ্গাত্মক আঁচড় গুলোতে এর প্রভাব পরিলক্ষিত। মানুষের মধ্যে অপরকে নিজেকে-দেখানোর' যে একটা অদ্ভুত প্রবৃত্তি আছে সেটা সহজেই ফোটাতে পারতেন তিনি। তাঁর বহু ছবিতেই একটা করুণ-গম্ভীর-ব্যঙ্গ প্রধান স্থান পেয়েছে।

লত্রেকের ওপর সবচেয়ে বেশী প্রভাব পড়েছে দেগাস-এর। ১৮৮৪ সালের কোনও এক সময়ে দেগাসএর সঙ্গে তার দেখা হলেও খুব বেশী ঘনিষ্ঠতা তাঁদের হয়নি। এই বৃদ্ধ শিল্পীকে লত্রেক ভক্তি ও শ্রদ্ধার চোখে দেখতেন। সমালোচকেরা বলে থাকেন যে দেগাস এর সাথে লত্রেকের সম্বন্ধ ফ্লবেয়ারের সাথে মপাসাঁর মতো। দেগাস-এর ছিল বাস্তব জীবনের প্রতিফলন সম্বন্ধে আগ্রহ, তাঁর মধ্যে তাই রোমান্টিসিজম এর আধিক্য দেখা যায় না—দেখা যায় দৈনিক জীবনের সুচারু ভঙ্গিমা। দেগাস এর কাছ থেকে লত্রেক পান তাঁর জাপানী ছবির মতো ছায়াপ্রাধান্য, নাটকীয় বর্ণালী এবং মননশীল ভঙ্গিমা।

কিন্তু দেগাসএর মতো লত্রেক ক্ল্যাসিকাল নন। ক্ল্যাসিকাল নিয়ম ভঙ্গ করে ভাবপ্রকাশার্থে তিনি ইচ্ছানুগ রঙ ব্যবহার করেছেন। এমনকি দেগাস এর কাছ থেকে যা নিয়েছেন তাও তিনি প্রয়োজন মতো পরিবর্তন করতে কুণ্ঠাবোধ করেননি। সেই জন্যেই হয়তো তাঁর অঙ্কনের ছন্দপ্রাধান্য গীতিময় হয়ে উঠতে পেরেছে। লত্রেকের সঙ্গে তাঁর সাবজেক্ট এর সম্পর্ককে ফিজিকাল বললে হয়তো ভুল হবেনা, তার চরিত্রাঙ্কনও বিদ্রোহব্যঞ্জক।

লত্রেকের প্রধান অবদান হচ্ছে পোষ্টার আর কালার লিথোগ্রাফ। প্রায় ত্রিশের অধিক পোষ্টার এঁকেছেন তিনি এবং লিথোগ্রাফের সংখ্যাও তিনশতাধিক। এগুলোর মধ্যে সহজেই বিদ্রোহী লত্রেককে খুঁজে পাওয়া যায়। রঙএর ব্যবহার সত্যিই অতুলনীয়। কিন্তু খুব বেশী রঙ প্রয়োজন হয়নি তাঁর। অল্প রঙ ব্যবহার করতে যে তিনি কোনও বাধানিষেধ মানেননি সেটা বিদ্রোহেরই লক্ষণ। একটি বিখ্যাত লিথোগ্রাফ—ইভেত্তি গিলবার্ত এর গান গাওয়ার ভঙ্গিমা। ওর কালোদুটো দস্তানা এবং মুখভঙ্গি ওর কথা বলার পক্ষে যথেষ্ট।

লত্রেকের মধ্যে একদিকে যেমন পাওয়া যায় ইমপ্রেশনিজম, অপরদিকে তেমনি আধুনিক শিল্পীর বহু গুণ খুজে পাওয়া যায়। আধুনিক এক্সপ্রেশনিজম-এর সূক্ষ্ম জন্মসূচনার চিহ্ন পাওয়া যায় তাঁর রচনায়। তাঁর দৃষ্টি মুখ্যত তাঁর নিজের এবং তাঁর সৃষ্ট কৃত্রিমতার সৌন্দর্যে অননুকরণীয়—সূর্যের প্রখরতার প্রাধান্য এতে নেই, আছে তার রঙের অপূর্ব সংযোজন এবং এই রঙ যা ফুটিয়ে তুলেছে তা মানুষের অমানুষ-বৃত্তি।

লত্রেককে তাঁর সমসাময়িক—দেগাস, সেজানে এবং রেনয়েরএর মতো না বলে বরং বলা যায় আমাদের কালের। পোষ্ট-ইমপ্রেশনিষ্টদের মধ্যে ভ্যানগ, সরাৎ এবং গগাঁর সাথে মিল খুজে পাওয়া যায় তাঁর। ১৮৯৩ সালে তাঁর চিত্রের প্রথম প্রদর্শনী প্যারী নগরীতে হয় এবং এই সময় তিনি ব্রুসেলস্, লণ্ডন, হল্যাণ্ড, স্পেন পর্তুগাল ভ্রমণ করেন। লণ্ডনে তার সঙ্গে অস্কার ওয়াইল্ড এবং বার্ডস্লের দেখা হয়। ১৮৯৯ সালে তাঁর দুর্বল স্বাস্থ্য ভীষণভাবে ভেঙে পড়ে এবং প্যারীর নিকটেই এক স্যানাটোরিয়ামে নিয়ে যাওয়া হয়। কিন্তু অধিক এ্যালকোহলজনিত পাকস্থলীর সহন শক্তি শেষ সীমায় পৌছানোয় ১৯০১ সালে লত্রেকের মৃত্যু হয়। তাঁর পায়ের আঘাতের মত তাঁর মৃত্যুও আঘাতজনিত।

লত্রেকের অঙ্কিত The Daundress, Cirque Fernando, A corner in the Monlin de la Galetta, La Goulue entering the Moulin Rouge, At the Moulin de la Galette, M. Boilean at the cafe, A La Mie, At the Monlin Rouge, The Toilette, The Grand loge, Salon in the Rue des Moulins, Chilperie, Private Room at "Le Rat Mort," The Modiste ইত্যাদি অপূর্ব কালজয়ী সৃষ্টি।

বঞ্চনা

শক্তিপদ রাজগুরু

সন্ধ্যা হয়ে গেছে। সহরতলীর গাছগাছালির মাথায় পাখীর ডাক থেমে গেছে; আঁশফল গাছের ঘন কালো পাতায় আঁধার নামা রাত্রি, আকাশের আঙ্গিনায় ফুটে রয়েছে দু একটা তারাফুল; উষার মনে গুণ গুণ একটা গানের কলি। বাস থেকে নেমে বাড়ীর দিকে ফিরছে; খোয়াঢাকা পথের দুপাশে এখনও সবুজের ঘন পুঞ্জ; দত্তদের বাগানে কোথায় ফুটেছে হাস্নুহানা ফুল। রাতের বাতাসে ব্যাকুল সৌরভ ওর মিশে আছে নীরব কান্নার রেশে। সুপুরী গাছের মাথায় দমকা বাতাস ঝড় তোলে।

উষার মনে একটা চাপা খুসির আমেজ; সমস্ত মন ছেয়ে সেই সুরটা অদেখা অনুভূতির সঙ্গে মিশে রয়েছে। মিটমিটে আলো জ্বলছে রাস্তায়—একটা থেকে অন্যটা অনেক দূরে; জীবনের পথ যেন অমনি, খুশির হাওয়া—পাওয়ার আনন্দ, অমনি আলোর মত দূরে দূরেই ছড়ান, একটা-থেকে অন্যটায় যাবার পথ অন্ধকার হতাশায় ঢাকা; আলো-আঁধারিতে মেশামেশি। কোথায় একটা পাখী ডেকে উঠল—রাতজাগা কোকিল। কি মাস! বাতাসে ছড়ানো তারই ইসারা, আমের বোলে মধুসঞ্চয়, গুণগুণ উড়ছে মৌমাছি, বাতাবিফুলের গন্ধ লাগে। বসন্তকাল।

মোটা থ্যাবড়া-নাক হেডদিদিমণির বুলডগের মত মুখ-খানা মনে পড়ে; অকারণেই আজ খুশী হয়ে ওঠে বেলাদি। চোখদুটো গালের জমাট মাংসস্তরের আড়ালে হারিয়ে যায়, হাসলে মানুষকে এত কুৎসিত দেখায় এর আগে জানে নি উষা; কুশ্রী মোটা বেঢপ বেলাদি নাকি এককালে একটি ছেলেকে ভালবেসেছিল; কথাটা ভাবলেই হাসি পায় উষার; দুঃখ হয় ছেলেটার জন্য। ওই নীরস কর্কশ মদ্দা মেয়েকে ভালবাসার বিড়ম্বনা সহ্য করবে কোন পুরুষ—একথাটা ভাবতেই কেমন লাগে। শেষ পর্যন্ত বেঁচে গেছে বেচারা—মরে বেঁচে গেছে। ওর ভয়েই বোধ হয় আঁৎকে উঠে হার্ট-ফেল করেছিল। বাপরে কি গলা! যেন বাঁশ ফাটছে। ইস্কুলের মাষ্টারদের হাজরিখাতা আগলে বসে থাকে দশটা থেকে—কে কখন আসছে, তার দিকে কড়া নজর, সেদিন সুলতার ছেলের অসুখ, দেরীতে এসেছে। ছাত্রীদের সামনে কি নাকালই না করলে তাকে। বেচারীতো চোখের জলে নাকের জলে।

বেলাদি গজগজ করে—ঘর-সংসার আর চাকরী দুটো একসঙ্গে হয় না, দুধও খাবো তামাকও খাবো—এটা কি ভালো কথা সুলতা?

কেমন যেন জ্বলছে সারাটাদিন, হিংসায় ফেটে পড়ে ওদের দেখলে, আড়ালে রমা বলে—বুঝলি, ও ভয়ানক হিংসুক। বিশেষকরে বিয়ে থা যারা করেছে।

উষা কথা বলে না, মনে হয় কথাটা খানিকটা সত্যি; একদিনের ব্যর্থতা ও ভুলতে পারে নি। সেই বেলাদি আজ নিজে এসে তাকে সংবাদটা জানায়, উষা এ্যাসিস্টাণ্ট হেডমিস্ট্রেস হচ্ছে, মাইনে খাতির দুই বাড়লো।… কোকিলটা তখনও ডাকছে। আবছা চাঁদের আলোয় বাতাবি ফুলের গন্ধমাখা বাতাস কাঁপে থরথর মুকুলঝরা আম বাগানে—পথ হারিয়ে। আর চারটে লাইট পোষ্ট—বাঁশ বনটা দেখা যায়, ওর পাশেই তার বাড়ী। সাধুখাঁয়ের বৌদের চাকরীটা ছেড়ে দেবে এইবার।

হালি বড়লোক, বাড়ীর কর্তা এখনও ঠেঁটি গামছা পরে। চাকামত মুখাখানা হাড়ীর তলার মত, কালো কুচকুচে গলায় একটা সরুহার। বৌগুলোও তেমনি মাংসের ডেলা; ছিরি ছাঁদ নেই, গড়ন পেটনের বালাই নেই, যেমনি চেহারা কিম্ভুতকিমাকার, তেমনি রুচি। গায়ে একতাল করে সোনার বেঢপ গহনা চাপানো। আধুনিক হবার জন্য বাড়ীতে মাষ্টার রেখেছে; পড়াশোনা এক আধটু আর সেলাই ফোড়াইও শেখাবে, সেই সঙ্গে চালচলনও।

উষা যেন ওই জগদ্দল বাড়ীর মাঝে একটা বাইরের আলো হাওয়ার স্পর্শ। নোতুন মেসিন কিনে বৌরা সেলাই শিখছে। শিখছে তো হাতী। নামেই শেখা।

বাড়ীর আলো দেখা যায়, গেটের মাথায় মাধবী-লতার সবুজ পুঞ্জে ফুলের শুভ্রতা, আবছা অন্ধকারে দু একটা রজনীগন্ধার স্তবক মাথা তুলে রয়েছে। দেখার সুর

শোনা যায়। রেওয়াজ করছে লেখা। জানলার পর্দার ফাঁক দিয়ে দেখা যায় ওর মুখের একপাশ, সুন্দর টকটকে রং, নীল শাড়িতে মানিয়েছে চমৎকার।

বারান্দা দিয়ে বাইরের ঘরে এগিয়ে গেল উষা, অশোক ঢুকছে বাড়ীর গেটে, তার পিছু পিছুই। বাল্যবন্ধু ললিতার ভাই।

—তুমি!

—হ্যাঁ, একটু দরকার ছিল তোমার কাছে।

উষা আবছা অন্ধকার থেকে আলোর দিকে এগিয়ে আসে। সুন্দর বলিষ্ট চেহারা, আলোকের দিকে চেয়ে কি ভাবছে; তাকে বাইরের ঘরে বসিয়ে রেখে ভিতরে আসে সে।

—বসো, আসছি।

—এই ফিরলে বুঝি? অশোক একটা চেয়ার টেনে নিয়ে পুরানো মাসিকের পাতা ওলটাতে থাকে।

এ বাড়ীতে এসেছে সে বহুবার, উষার বাবা মারা যাবার সময় সেই সমস্ত কাজকর্মের ব্যবস্থা করে, নানা ভাবে দুটি পরিবার একসঙ্গে যেন জড়িয়ে আছে। ললিতার বিয়ের সময় উষাই কথাটা জানায়—বোনটি চলে গেল পরের ঘরে, তাই বলে আমি তো যাই নি। যোগাযোগটা রেখো বুঝলে?

অশোকও ভোলেনি উষার কথা, নিজের বোনের মতই নানাভাবে সাহায্য করেছে তাকে। অভাবের সংসার, কলেজের মাইনে পরীক্ষার ফি—এমন কি কলম-বই পর্য্যন্ত দিয়ে সাহায্য করেছে উষা।

—ললিতার ভাই তুমি, আমার কি কোন দাবী নেই?

ওর কথায় আর অমত করতে পারে নি অশোক, বহুদিন বহুভাবে উষা তাকে ঋণী করে রেখেছে।

জানলার পর্দাটা দুলছে—ওপাশের ঘর থেকে ভেসে আসে সুরের রেশ; সন্ধ্যার শুব্ধ অন্ধকারে সৌরভমদির বাতাসে নিঃশেষে হারিয়ে গেছে সেই সুর। যেন অসংখ্য ভ্রমর উড়ছে গুণগুণিয়ে।

একটা মৃদু শব্দ—শাড়ীর খসখসানি; টিপয়ের উপর প্লেটটা নামাল উষা; কয়েকটা সন্দেশ—আর দু কাপ চা।

—নাও, মিষ্টিমুখ করো।

অশোক ওর দিকে চেয়ে থাকে, এরই মধ্যে স্নান সেরে এসেছে। চুলে মিশে রয়েছে হালকা সুবাশ, চোখের তারায় একটা শ্যাম সজীবতা। হাসছে উষা…মিষ্টি একটু হাসি।

—হ্যাঁ, প্রমোশন হল যে, এ্যাসিট্যাণ্ট হেডমিস্ট্রেস।

—ওরে বাবাঃ, এইবার ওই দেহে মেদ মাংস লাগবে। ফুলে ফেঁপে বুলডগের মত হয়ে উঠবে।

হাসছে উষা; তবু ওর কথায় মনে মনে যেন শিউরে ওঠে। বেলাদির মুখখানা অকারণেই চোখের সামনে ভাসে। ওর জীবনের একদিনের ব্যর্থ কাহিনী, যে প্রেম কোন সার্থকতা পায় নি, তারই বেদনা ওর দেহ মন ঘিরে আজও লেগে রয়েছে অভিশাপের মত। ব্যর্থ করুণ একটি কান্নার সুর। কৃত্রিম কোপে চটে ওঠে উষা।

—যাঃ, যা তা বলছে। কই মোটা হচ্ছি আমি?

কেমন যেন অভিনয় করছে উষা, ইস্কুলের কড়া দিদি-মণি রাতের সৌরভমদির বাতাসের দোলায় যেন দুলছে—মাধবীলতার ঝোপে হারানো চন্দনফুলের মত। অশোক সন্দেশ চিবুতে চিবুতে বলে, হওনি—হতে কতক্ষণ?

—না, হবো না আমি। বুঝলে মশাই। উষা অকারণেই হাসে।

অশোকের হাতে তুলে দেয় টাকাগুলো; এ দেওয়ায় যেন অপরিসীম আনন্দ আছে, কি একটা কাযে বাইরে যেতে হচ্ছে তাকে কদিন, হঠাৎ কিছু টাকার দরকার। অশোককে দেবার জন্যই যেন উষা পথ চেয়ে ছিল। সেবার এম-এ পরীক্ষার ফিস যোগাড় হয়নি; জমা দেবার দিনও পার হয়ে যাচ্ছে; কথাটা ললিতার কাছে শুনে নিজেই গিয়ে হাজির হয়; চুপকরে বসে আছে অশোক, দু একটা টুইশানি মাত্র সম্বল, তারাও সময়মত দিতে পারেনি, ছাপোষা গৃহস্থ।

উষা ওর মাথার চুলগুলো ধরেই নাড়া দেয়—বলোনি কেন? লজ্জা করে, না?

একশো টাকা তুলে দেয় ওর হাতে; অশোক কি যেন বলতে যায়, বাধা দেয় উষা—দুমকরে খাটের উপর বসে—ওর পাশেই।

—ধরো দিকি, ললিতার কাছ থেকে আনছি। বাপরে

কি পথ; হাঁপিয়ে গেলাম। যা লাগে জমা দিও, বাকী রেখে দাও, পরীক্ষা দিতে যাবে ওই ভোঁতা পাইলট কাঁধে করে? একটা কলম কিনে নিও, বুঝলে।

ঝড়ের মত আবার বের হয়ে এসেছিল উষা। কোথায় যেন একটা দাবী তার জন্মে গেছে।

লেখার রেওয়াজ থেমে গেছে। বাতাসে হাজারো মৌমাছির গুণগুণানিও স্তব্ধ হয়ে গেছে। অশোক উঠে পড়ে।

—রাত হয়েছে চলি।

উষা এগিয়ে দেয় তাকে গেট পর্য্যন্ত। লেখার দরজার কাছে এসে দেখে বইখাতা বের করে পড়ছে লেখা। দুপাঁচবছরের তফাৎ; নামেই যেন পিসীমা। ...তবু লেখা কোথায় একটা সম্মানের গণ্ডী টেনে রেখেছে। উষাকে দেখে মুখ তুলে চাইল, এতক্ষণ নিবিড়ভাবে পড়ার মধ্যে ডুবে রয়েছে সে। ...হাসছে উষা।

—কি রে, গান আর পড়া, এছাড়া দুদণ্ড কি করবার কিছুই নেই। বাইরে একটু বেরুলেইতো পারিস। সিনেমার টিনেমায়—

—ধ্যাৎ, ও সব ভালো লাগেনা আমার; সেই প্যানপ্যানে প্রেম, আর নাকিসুরে গান; কি যে গান। কানে গেলে বেসুরো ঠেকে।

উষার মনে হালকা স্বরের রেশ, চাঁদ ওঠা রাত্রি, নারকেল গাছের বিরলপাতার পিছনে পড়ে তার আভা; কেমন যেন অদ্ভুদ্ ভাল লাগে তার। দুঃখ হয় লেখার জন্য—চাপা একটা সহানুভূতি; জীবনের একটা স্পর্শ থেকে আজও বঞ্চিত রয়েছে সে।

বৌদি দাদা মারা যাবার পর লেখাকে তার কাছে আনে উষা। মনের মত করে মানুষ করে তুলবে। দাদাকে শান্তি দেয়নি বৌদি। দজ্জাল ঝগড়াটে মেয়ে তুচ্ছ ব্যাপার নিয়েই আকাশ ফাটিয়ে ফেলতো, সামান্য ব্যাপার থেকেই সংসারে অশান্তির একটা স্থায়ী কালো ছাপ জেঁকে বসেছিল। অভাব অভিযোগ সহ্য করেও মানুষ বাঁচবার জন্য সংগ্রাম করে; কিন্তু অহরহ; অশান্তি আর দুর্ভোগ মানুষের বুক পুড়িয়ে ছাই করে দেয়—দাদাও তাই বোধ হয় অকালে মারা যান। বৌদি যায় তার কিছু দিন পরই।

—আর রুটি দোব? লেখার কথায় মুখ তুলে চাইল উষা। রাতে সে ভাত খায় না, মোটা হয়ে যাবে বোধ হয়, এই ভয়ে। হাসে লেখা—মোটা হবার এত ভয় তোমার; আমিতো ভাবছি কি করে মোটা হওয়া যায়। উষা ওর দিকে চেয়ে থাকে, হালকা সুঠাম শরীর। সারা দেহে যৌবনের একটা নিবিড় ছাপ। মায়ের রূপই পেয়েছে লেখা; সুন্দরী ছিপ্ ছিপে পাতলা চেহারা।

হাসে উষা—একবার মোটা হতে সুরু করলে আর থামবিনা।

—এ হাড়ে মাংস লাগবেনা, বুঝলে। লেখার মনে কোথায় যেন একটা আক্ষেপ।

"কায আর কায। শুকনো নীরস কাযের চাপে বেলাদি শুকিয়ে কাঠ হয়ে গেছে, কর্কশ স্বরে দাবড়ে বেড়ায় যাকে তাকে। নিজের চারিপাশে উষর-তর একটা পরিবেশ, দুনিয়ার সব কিছুর উপরই বিতৃষ্ণা, একজনের অন্তহীন নিঃশেষ ঘৃণা আর অবহেলাই তাকে অভিশাপ-গ্রস্ত করে গেছে।

উষা গুণগুণকরে সুর ভাঁজে; কোথায় এই অনুভূতি, প্রাণটুকু হারাতে চায় না সে। ক্লাসের মধ্যেই মেয়েরা হাসি তামাসা করে। কে যেন বিশেষ দরকারে এখনিই বাড়ী চলে গেল। মেয়েদের স্কুলে এমনি দরকার প্রায়ই পড়ে অনেকের। গম্ভীর হবার চেষ্টা করে উষা—এই মেয়েরা; লতা, বার করো ইংরাজী পোয়ট্রি।

ক্লাসে গম্ভীর হবার চেষ্টা করে উষা, সাজা রাজা; তবু ভাল লাগে ক্ষণিক এই রুক্ষ কর্কশ হবার প্রচেষ্টা।

সাধুখাঁদের মেজবৌ সেলেট পেন্সিল নামিয়ে রেখে হাফ ছেড়ে বাঁচে।

—দাগ বুলিয়ে কি হবে উষাদি? মেয়েদের লেখা পড়াতো বিয়ের জন্য, তাতো হয়ে গেছে কি বল! তা তুমি এত লেখাপড়া শিখলে বিয়ে করোনি কেন?

হাসে উষা—লোক পাচ্ছি কই?

হাসে মেজবৌ—ধ্যাৎ, লোকের অভাব।

সেজবৌএর সংসারে হিংসা আছে, বছর বছর বিইয়ে চলেছে, এরি মধ্যে তিনছেলের মা। চেহারা হয়ে উঠেছে পোড়াকাঠ; ঘরে ঢুকে কয়েকটা ফ্রকের কাপড় ফেলে ধরে মেজবৌএর বই খাতার উপর। বেশ পাকাগিন্নীর

মত ফরমাইস করে—হেমটিচ না কি বলে, তাই করে দিতে হবে দিদিমণি, ভাল প্যাটার্ণের।

উষা কথা বললো না; তবু কেমন যেন মন সায় দেয় না এই দর্জিগিরি করতে। এমাস থেকে এতবড় ইস্কুলের এ্যাসিস্ট্যাণ্ট হেডমিসট্রেস হয়েছে সে। এই কাজ আর ভাল লাগেনা; তবু কেমন যেন চুপকরে যায়। মাসে ক'দিন এসে গল্পগুজোব করেই পঞ্চাশ টাকা নিয়ে যায়; লেখার গানের মাষ্টারের মাইনে, অশোকের বইকেনার খরচ। বই পাগল ছেলে—এমনিতে কিছু নিতে সহজে চায় না; বইএর দোকানে গিয়ে বললে যায়; দাও না ওই বইখানা কিনে'—কামুর বিখ্যাত বই 'প্লেগ'। আরে এযে কল্ডওয়েলের 'ইলিশন এণ্ড রিয়ালটি'। সাতশিলিং দাম? আছে সাত বারোং চুরাশি আনা—ধর পাঁচটাকা।

উষার ভাল লাগে এই সখ মেটানো। তারজন্য মেসিনে বসে একঘণ্টা প্যাডেল করতেও সহ্য হয়। সেজবৌ-এর কথায় বলে ওঠে—আচ্ছা, রেখে যাও, করে দোব।

মেজবৌ ও চলে যাবার পর গজগজ করে—কেন, করতে যাবে এসব। দর্জিতো বাড়ীতেই আসে। তাকে দিলেইতো পারে। তা নয় ওর দখল জানানোর ফন্দী। এক নম্বর হিংসুটে।

মেজবৌ চা খাবার এনে দেয়, সারা মনে ওর একটা চাপা বিক্ষোভ, পুঞ্জীভূত হতাশা। এখনও সে সন্তানের মা হয়নি। কেন হয়নি তার কারণও মেজবৌ না জানতে পারে—উষা অনুমান করে। ওর স্বামীকে দেখেছে—বড়লোকের বকাটে ছেলে। সব দোষগুলি পেয়েছে, খেসারত দিচ্ছে হতভাগা মেয়েটা।

—ছেলেপুলে হবার জন্ম মানসিক করেছি দিদিমণি; ডাক্তারও বলে হবে। কিন্তু কোন লক্ষণইতো নাই।

উষা কথা বলে না, কি জবাব এর দেবে! আপনমনে কল চালাতে থাকে, বেগে সুচটা ওঠা নামা করছে; সাদা সুতোগুলো জালবুনে চলেছে কাপড়ের উপর। একটু দম নিয়ে বলে উঠে—হবে বৈকি, সময়তো যায় নি।

—আর হবে! হতাশায় কালো হয়ে ওঠে মুখখানা।

উষার মনে একটা অদম্য কৌতুহল চাপা নিরাশার সুর ফুঠে ওঠে, ওই ব্যর্থ নারীর জীবনের সুর কোথায় যেন তার মনের এক নীরব কান্নায় মিশে যায়—একাকার হয়ে; ম্লান জোনাকি-জলা রাত। তারার আকাশশিমীম ধরাণো পথে ফিরছে সে সারাদিনের কর্মক্লান্তির পর। মাঝে মাঝে এমনি একটা উৎকণ্ঠাহীন হতাশার কালো ছায়া তার মনের সজীবতা ঘিরে ফেলে।

মাথার মাঝখানের চুলগুলো উঠে যাচ্ছে; সযত্নে চুলগুলোকে টেনে এনে ঢেকে রাখে সেই টাকটুকু, জামার ছাঁটকাটের দিকে অজানাতেই সে নজর দিয়েছে। বসন্তের হালকা বাতাসে ঝরা পাতা উড়ছে দেবদারু গাছ থেকে। একদিন তারাও সজীব সবুজ ছিল। আজ খসে যাবার পালা এসেছে তাদের।

বকুলের ম্লান সৌরভ আজ সেই দীর্ঘশ্বাসের রব আনে।

বাড়ীটা শুদ্ধ, লেখার ঘরেও আলো জ্বলেনি, বারান্দাটা অন্ধকার। একটু অবাক হয়ে যায় উষা। গেটটা খুলে এগিয়ে গেল। পায়ের সাড়া পেয়ে ঝি এগিয়ে আসে।

—লেখা কোথায়?

—বৈকালে বের হয়েছে,বলে গেছে ফিরতে দেরী হবে।

কথা কইলনা উষা। চুপ করে নিজের ঘরে গিয়ে ঢুকলো। কেমন যেন সব অগোছাল। বই খাতাগুলোও সাজিয়ে তোলেনি লেখা, ঝি তো পেয়ে বসেছে। সারাদিন খেটে খুটে এসে এসব করতে মেজাজ থাকেনা।

—মনোর মা! সারাদিন কি করিস তুই? ফাঁকি দিয়েই চলবে সব কিছু? ঝি দিদিমণির দিকে চেয়ে থাকে। আজ যেন হঠাৎ উষা কেমন বদলে গেছে। চোখে মুখে একটা কঠিন কঠোর ভাব। মনোর মা বইখাতা-গুলো তুলতে থাকে। লেখাই এসব করে, আজ আর হয়ে ওঠেনি।

গজগজ করছে উষা, ঘরের সবকিছু দোষ ত্রুটি গুলো ফুঠে ওঠে চোখের সামনে। মরা ফুলগুলো নিয়ে যা; দুটো ফুলই যদি না আনতে পারিস বাইরে থেকে, এই সং দাঁড় করিয়ে রেখে লাভ কি?

রাত হয়ে গেছে'—লেখা আজ খুশীতে উপচে পড়ছে। রেডিও ষ্টেশনে অডিশন দিতে এসেছে। জোর করেই ঠেলে পাঠিয়েছে একজন। দুঃসহ লজ্জা তার পায়ে পায়ে জড়ায়—না পাঁরবো না আমি।

—ঠিক পার্বে।

পেরেছেও। প্রোগ্রাম ডিরেক্টর নিজে ওর গান শুনে খুশী হয়েছেন। ছএকদিনের ভেতরই সংবাদ যাবে, সেই সঙ্গে কনট্রাক্ট ফর্ম। সই করে পাঠালেই ওরা ব্যবস্থা করে দেবে। বাতাসে বাতাসে কিসের কানাকানি। বকুল-ঝরা পথে এগিয়ে আসে লেখা।

গুণগুণ সুরের রেশ তার মনে। বাহারের একটা টুকরো অকারণেই মনে আসে। বাতাসে বাতাসে ভ্রমরের গুঞ্জন—আমবাগানের একটা মিষ্টি সুবাস। জোনাকি জ্বলা রাত্রি—তারা জ্বলা আকাশ।

হঠাৎ ঘরে পা দিয়ে একটু চমকে ওঠে-উষার দিকে চেয়ে। গম্ভীর থমথমে মুখ—কেমন যেন অন্য মানুষ।

—কোথা গিয়েছিলি উষা?

যে মানুষটি তাকে বলেছিল কোথাও বেড়িয়ে আসতে, এ সেই সন্ধ্যার মানুষ নয়। উষার দিকে লেখা রেডিও ষ্টেশনের চিঠিখানা এগিয়ে দেয়, যেন ওর কৈফিয়তের উত্তর দিচ্ছে।

—আজ অডিশন দিয়ে এলাম।

উষা বেশ ভরাটি গলায় বলে ওঠে—কদিন পরই তোর পরীক্ষা! এসময় অডিশন?

—হয়ে গেল। মাসে একদিন প্রোগ্রাম, তা যেমন করে হোক ম্যানেজ করে নোব।

কথা বললনা উষা; স্থিরদৃষ্টিতে ওর খুশীতে উপচে-পড়া মুখের দিকে চেয়ে থাকে।

দেবদারু গাছের পাতা ঝরছে। একদিন যারা সাজিয়েছিল ওই বনস্পতিকে সবুজ কিশলয়ে, বসন্তের বাতাসে যাদের খুশী উপচে উঠেছিল—অন্য বসন্তের সর্বনাশা হাওয়া তাদের সরিয়ে দিচ্ছে—ছিটিয়ে দিচ্ছে অবাধে।

কেমন যেন গালে একটা কর্কশ অনুভূতি আসে, আয়নার সামনে বসে উষা দুআঙুলের ডগায়, ক্রিম নিয়ে ঘসছে মসৃণ-গতিতে; চোখের কোলে জমেছে চশমার কালি, আস্তে আস্তে ঘসছে আঙুল দুটো সেখানে।··· মাথার চুলগুলো টেনে টেনে মধ্যিখানের টাকমত ফাঁকটুকু ঢেকে রেখেছে। হ্যাঁ—বেমালুম ঢাকা পড়ে। চোখের তারায় হাসির আভা আজও ঝলসে ওঠে! মরেনি। উষা আজও বেঁচে আছে—ফুলদানীর বুকে রাখা রজনী-গন্ধার মত সজীব-সৌরভমদির একটি অনুভূতি।

···হঠাৎ দরজা ঠেলে কে যেন ঢুকছে। চমকে ওঠে উষা, কি যেন গোপন সঞ্চয় তার ধরা পড়ে যাবে ওর কাছে।···একমুহূর্তে ই সামলে নেয় নিজেকে।

লেখা দাঁড়িয়ে আছে, আটপৌরে শাড়ীখানা গায়ে জড়ানো; গরমে ব্লাউজ পরেনি বোধ হয়।

শাড়ীর ফাঁক দিয়ে দেখা যায় অফুরান যৌবনের নিটোল পূর্ণতার আভাস—মাতাল যৌবনের ছড়ানো অপব্যয়।···বুভুক্ষু কাঙ্গালের দৃষ্টিতে ওর দিকে চেয়ে থাকে উষা। পরক্ষণেই চোখ নামাল। শাসনের সুরে বলে—খালি গায়ে থাকিস কেন?

—যা গরম, এই নেয়ে উঠলাম। চল খাবার জায়গা হয়েছে।

সুলতা, রমা, বাসন্তী হাসাহাসি করে। হঠাৎ কি যেন হাল্‌কা আলাপ করছে তারা টিচার্স কমনরুমে, রমার স্বামী কি বলেছে—তাই নিয়ে হাসছে ওরা। মা হতে চলেছে রমা, হঠাৎ দরজা ঠেলে উষাকে ঢুকতে দেখে থামল তারা। এককালে কিছুদিন আগে পর্য্যন্ত ওরা সমানে ইয়ার্কি মেরেছে। কার জীবনের কি গোপনকথা আছে তার আভাসও দিয়েছিল ওরা। হঠাৎ আজ উষাকে দেখে ওরা চুপ করে যায়; তাদের মধুময় স্বপ্ন-জগতের বাসিন্দা উষা নয়; এই পার্থক্যটাই উষার চোখে বড় হয়ে ওঠে। উষাও গম্ভীর সুরে বলে ওঠে—অন্য কিছু বলবার মত না পেয়ে—তোমার ক্লাসের ইংরাজীর রেজাল্‌ট অত্যন্ত খারাপ রমা, সেদিন খাতাগুলো দেখলাম। একটু কেয়ার নাও।

সেকেণ্ড পিরিয়ডের ঘণ্টা বাজছে, টেবিল থেকে চক ডাষ্টার নিয়ে উষা বের হয়ে গেল। হঠাৎ দরজার কাছে গিয়ে কানে আসে সুলতার কথা।

—বেলাদি, দি সেকেণ্ড।

—যা বলেছিস!

একটা চাপা হাসির শব্দ গরম শিসের মত কানে আসে উষার। সর্বাঙ্গে জ্বালা ধরায়, দরজা ঠেলে বারান্দায় বের হয়ে গেল।···ক্লাসে মেয়েদের কলরব শোনা যায়।

দিনের আলো কাঁপছে পামগাছের পাতায়; ন্যাড়া অশত্থগাছটার ডালে ঠোকর মারে একটা কাক, বিশ্রী টাকপড়া মাথা—কর্কশ স্বরে ডাকছে বারবার।···

ক্লাসের দরজায় এসে থমকে দাঁড়াল, ক্লাস টেনের মমতা গান গাইছে এই কয়েকমিনিটের অবসরেই—মোর জীবনপাত্র উছলিয়া; গা জ্বালা করে উষার; ক্লাসে ঢুকেই হুকুম করে—তোমার অঙ্ক এনেছো মমতা?

মাথা নীচু করে সে। সারাদিন গান গেয়েই কাটায়—সে অঙ্ক কষবে কখন। ছোট ভাইকে লজেঞ্জ দিয়ে সিনেমা দেখিয়ে ম্যানেজ করে। আজ তাও হয়ে ওঠেনি। উষা যেন বোমার মত ফেটে পড়ে,—এতবড় ধিঙী মেয়ে, লজ্জা করে না?

এ কণ্ঠস্বর যেন উষার নিজেরই অচেনা; ক্লাসের মেয়েরাও চমকে ওঠে।

কালবৈশাখীর প্রথম মেঘজমা সন্ধ্যা; সাধু খাঁয়ের বিরাট বাড়ীর কাছাকাছি যেতেই ঝড় উঠেছে। আকাশ মাটি কাঁপানো ঝড়। ধুলো আর ঝরাপাতা পাক খেয়ে চলেছে; কালো আকাশ ফুঁড়ে ঝলসে ওঠে বিদ্যুতের আভা—গাছ-গাছালির মাথায় উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে। কোন রকমে উষা গিয়ে ওদের বাড়ীতে ঢোকে।

নিস্তব্ধ অন্দর মহল। দোতালার বারান্দা দিয়ে চলছে সে। আলোগুলোও সব জ্বালা হয়নি। ঝড়ের দাপটে আছড়ে পড়ছে জানালা দরজাগুলো।···বৃষ্টির ধারা নেমেছে, আকাশ ছাওয়া প্রথম বর্ষণ। তৃষিত মাটির বুক থেকে উঠছে ভিজে সোঁদা গন্ধ, শুকনো বিবর্ণ রোদপোড়া পাতাগুলো বৃষ্টির সামনে নিজেদের আত্মসমর্পণ করে নিশ্চুপ আবেশে ওই প্রথম বর্ষণের স্পর্শমুখে বিভোর।

আবছা আঁধারে ওদিককার দরজাটা ঠেলে উষা—মেজবৌ-এর ঘরেই গিয়ে বসে সে। আজও অভ্যাসমত এসে দরজায় ধাক্কা মারে; একটা অস্ফুট কণ্ঠস্বর শোনা যায়, দরজাটা খুলে গেল—কালো ছায়ামূর্তিটা বেগে অন্ধকার বারান্দার কোণে অদৃশ্য হয়। চমকে উঠে উষা। সেজবাবুর চাকর বনমালীর মতই মনে হল ওকে।

মেজবৌএর দিকে চেয়ে চোখ নামাল উষা; বিছানার একটা ঝড় বয়ে গেছে; মেজবৌ কাপড়চোপড় গুছিয়ে নিয়ে অভ্যর্থনা জানায়।

—এসো উষাদি। কাঁপছে ওর কণ্ঠস্বর। মুখে একটা অপরিসীম দৈন্যের কালো ছায়া তখনও মুছে যায়নি। বলবার চেষ্টা করে—এই ঝড়ে?

—এসে পড়লাম। উষা মাথা নীচু করে। মেজবৌ-এর উদ্দাম দেহ এখনও যেন কাঁপছে ঝড়ে-কাঁপা পাতার মত। কেমন যেন শিউরে ওঠে উষা।

বাইরে বৃষ্টির ধারা কমে এসেছে।···থেকে থেকে ঝলসে উঠছে বিদ্যুতের আভা; উঠে পড়ে সে—কাল আসবো, আজ চলি। আবার বৃষ্টি নামতে পারে।

মেজবৌ কথা কইল না, খাটের বাজু ধরে দাঁড়িয়ে থাকে। তার মনের ঝড় তখনও নিঃশেষে থামেনি।

লেখা স্বপ্ন দেখছে। এমনি ঝড়ো হাওয়ায় বাদল সন্ধ্যায় সারামন তার কেঁপে ওঠে একটি মধুর স্বপ্নময় সুরের অনুভূতিতে। সে রাতের কথা ভোলেনি। একজনের হাসি তার একটু স্পর্শ তাকে সব ভুলিয়ে দিয়েছে। গোপন মনের সরম জড়ানো একটু চাওয়া; বার বার পেতে ইচ্ছে করে সেই স্পর্শ। বসন্তরাগিণীর এই সুরাবেশ থামতে দিতে চায় না সে। একটি মনের নিভৃত অন্ত-কামনা—তার স্বাদ সে পেয়েছে। সার্থক হয়ে উঠেছে তার স্বপ্ন।

ছোট্ট একটি নীড়; সন্ধ্যার আকাশে জেগে উঠবে তারার আলো, পাখী-ডাকা সন্ধ্যা—বকুলগন্ধ-মাখা বাতাসে তারা দুজনে দুজনের মাঝে মিশে যাবে। সহরের কোলাহলের বহু দূরে—তারা বাসা বাঁধবে।

ঝড় থেমে গেছে। বাতাসের সব সৌরভ মুছে গেছে। শুষ্ক পথটা দিয়ে ফিরছে উষা; সারা মনে শুষ্ক কামনার জ্বালা; পথ দিয়ে জল গড়িয়ে চলেছে, বৃষ্টির জলস্রোত।···আলোয় ধিকধিক করছে পথটা। একটা দৃশ্য বার বার মনে পড়ে···ভুলতে পারে না সে। কামনা-ব্যাকুল মেজবৌএর সেই রূপ। চুলগুলো খুলে পড়েছে, কাপড়-চোপড়ও এলোমেলো, চোখে ওর বৈশাখের নিদারুণ শুষ্ক তৃষ্ণা; বুক জুড়ে সেই তৃষ্ণার সংক্রমণ।

লেখা পড়ছে; চুপ করে নিজের ঘরের দিকে এগিয়ে চলে উষা, ক্লান্ত পরিশ্রান্ত সে। পাউডারের দাগ ধুয়ে

গেছে, ঝড়ো বাতাসে চুলগুলো উস্কোখুস্কো, চোখের নীচে স্পষ্ট কাল দাগটা প্রকট হয়ে উঠেছে, চোখে ফুটে উঠেছে সেই দৃশ্যটার···একটা ব্যর্থ শোচনীয়তা।···মনের উষর রুক্ষতার প্রকাশ তার গালের কর্কশ চামড়ার ভাঁজে ভাঁজে, চোখের চাহনিতে।

হঠাৎ ঘরে ঢুকেই থমকে দাঁড়াল। টিপি টিপি বৃষ্টি নেমেছে আবার। তারই বিছানায় শুয়ে আছে অশোক, সিগারেটের গন্ধে বদ্ধ ঘরখানা ভরে উঠেছে। বৃষ্টির ঝাপ্টার জন্য জানালাগুলো বন্ধ।···

—তুমি? কেমন ইণ্টারভিউ দিলে?

অশোক উঠে বসে বিছানায়; সিগারেটের টান দিতে দিতে বলে—চাকরীটা নেহাৎ জুটে গেল, শো চারেক মাইনে আপাততঃ, পরে বাড়বে। বসো।

—সত্যি! উষা যেন খুশীতে উপচে পড়ে।

মুখে চোখে তার হালকা হাসির স্পর্শ; বৃষ্টির ছাট আসছে। দরজার পর্দা টেনে দিয়ে এসে বসল খাটের উপর। মিষ্টি ক্ষীণ আলোয় ঘরখানা ভরে উঠেছে। অশোকের প্রশস্ত ললাটে—চোখে আজ খুশির আবেশ। উষা বলে ওঠে—দেখি তোমার হাতখানা; চাকরীর যোগটা কেমন?

উষার অজ্ঞাতেই তার বয়স কমে গেছে কয়েক বছর; হাতখানা হাতে নিয়ে যেন কাঁপছে সে। সারা শরীরে একটা বিস্ময় অনুভূতি; স্থির দৃষ্টিতে চেয়ে আছে অশোকের দিকে। অশোক বলে ওঠে—আর একটা রেখা ফুটে উঠেছে দেখেছো ওতে?

হঠাৎ যেন ঔৎসুক্য বেড়ে যায় ছোট্ট মেয়েটির—কি, দেখি?

হাতটা দেখতে থাকে, অশোক বলে ওঠে—বিয়ের রেখা।

চমকে ওঠে উষা; কাঁপছে তার সারা দেহ অসহ্য নীরব একটা রেশে; কোথায় বৃষ্টির ঝরা রাতে ডাকছে সেই রাতজাগা কোকিল—শেষ বসন্তের একক সঙ্গী।···বাতাসে ভেসে ওঠে হাসনুহানার সুবাস। জাগররাত্রির বাসক-সজ্জিকা।

অশোক বলে ওঠে—তুমি যদি রাজী থাকো তাহলেই সব হয়ে যায়। কোনদিক থেকেই কোন আপত্তি নেই।

ডাগর অসহায় দুটো চোখ তুলে চেয়ে আছে অশোক তার দিকে, করুণ মিনতিভরা সে চাহনি। উষার মনে অসহ্য আনন্দের পূর্ণতার সুর। নিজেকে যেন এতদিন সে চিনতে পারেনি; এই পুঞ্জীভূত কামনার বোঝা সে বয়ে ফিরেছে এতদিন—এত অধীর প্রতীক্ষায়। ওর হাতটা তার হাতে; চোখের পাতা কাঁপছে—জলভরা বাদল মেঘের মত টলটলো।

একটা বিদ্যুতের তীক্ষ্ণ ঝলক শান্ত আঁধার আকাশ ফাটিয়ে গেল—দূর ক্রন্দসীর কান্নাভেজা বুক টুকরো টুকরো করে, বাতাসে বাতাসে রুদ্র গর্জন। কাঁপছে পৃথিবী—কোন সর্বনাশা ধ্বংসের মাতনে। চমকে উঠেছে উষা; এতদিনের স্বপ্ন এক নিমেষেই চূর্ণ হয়ে যায়; অশোক বলে ওঠে—লেখারও কোন অমত নেই, পাত্র হিসেবে আমিও অযোগ্য নই। এখন তুমি যদি মত দাও।

স্বপ্নের ঘোরে উষা যেন বিড় বিড় করছে, পাংশু বিবর্ণ রক্তশূন্য হয়ে উঠেছে সারা মুখ; চোখের কোলে জমাট কালির দাগ।···অশোকের হাতটা কখন ছেড়ে দিয়ে উঠে দাঁড়িয়েছে। অশোক চেয়ে থাকে তার দিকে বিস্ময়-বিস্ফারিত দৃষ্টিতে।

লেখা!···এতদিন তার অন্তরালে এতবড় একটা নাটকের মহলা চলেছে সে দেখেনি; আজ, শেষ দৃশ্যে তাকে প্রয়োজন হয়েছে। অশোকের দিকে চেয়ে থাকে উষা—কাছ থেকে ঠিক দেখতে পায় না, চশমাটা লাগাতে হয়। স্থির তির্য্যক দৃষ্টি; লেখা—অশোক কেউ যেন ওই গম্ভীর ভরাটি স্থূল মেয়েটিকে চেনে না।

একটা দীর্ঘশ্বাস বের হয়ে আসে, উষা যেন সচেতন হয়ে উঠেছে। উদ্গত নিঃশ্বাস চেপে সহজ কণ্ঠেই সায় দেয়। জলস্রোতকে বাধা দেবার ক্ষমতা তার আজ আর নেই।

দেওদারু গাছের ঝরা পাতাগুলো ছিটিয়ে পড়েছে বাগান ময়, কাদা আর জলে মাখামাখি—আবার ডালে ডালে নোতুন পাতা গজিয়েছে। গাঢ় হলুদ চিকন পাতা—বাতাসে তারা শেষ বসন্তকে প্রণতি জানায় মাথা নেড়ে।

আর বেশী কাজ করবার প্রয়োজন তার নেই; কেউ

অপূর্ব সৌন্দর্য্যের জন্যে...

হিমালয় বোকে
শ্রেষ্ঠ
প্রসাধন
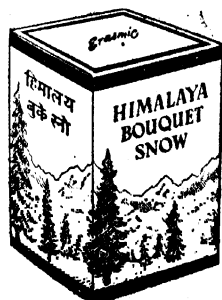
স্নিগ্ধ এবং সুগন্ধ হিমালয় বোকে স্নো আপনার ত্বককে মসৃণ এবং মোলায়েম রাখে। [illegible] হিমালয় বোকে টয়লেট পাউডার আপনার লাবণ্যর স্বাভাবিক সৌন্দর্য্যকে বাড়িয়ে তোলে।

হিমালয় বোকে স্নো এবং টয়লেট পাউডার

এরাসমিক কোং লণ্ডনের পক্ষে হিন্দুস্থান লিভার লিঃ কর্তৃক প্রস্তুত

গোপন সন্ধ্যার গন্ধমদির বাতাসে এসে তার পাশে দাঁড়াবে না—বই এর দোকানে গিয়ে রাজ্যি শুদ্ধ বই হাঁটকে বগলে তুলতেও যাবে না। সাধুখাঁয়ের বাড়ীর চাকরী ছেড়ে দিয়ে স্কুল নিয়েই পড়ে আছে উষা। বেলা দি রিটায়ার করার পর সেই-ই হয়েছে হেড মিস্‌ট্রেস। অজানতেই মোটা হয়ে গেছে—চোখের কোলে পড়েছে কালি, মাথার টাকটা আর ঢাকা যায় না, ঢাকবার দরকারও বোধ করে না উষা সেন। আয়নার দিকে চায় এ যেন অন্য মানুষ।

হঠাৎ সেদিন সাধু খাঁ বাড়ীর মেজবাবুকে মস্ত গাড়ী হাঁকিয়ে স্কুলে আসতে দেখে চমকে ওঠে; একটি বর্ষামুখর সন্ধ্যা—বিচিত্র নেশা-লাগানো একটা অনুভূতি! উষা সেন ওর দিকে চেয়ে আছে। দামী কাঁচি ধুতি, গিলেকরা মিহি পাঞ্জাবী গায়ে; পাঁচ আঙুলে ঝকমক করছে ক'টা হীরা-বসানো আংটি, আলো ঠিকরে পড়ে তার থেকে, চোখ ধাঁধানো আলো।

নমস্কার করে এগিয়ে আসে বিনোদিনী স্কুলের হেড মিসট্রেসের টেবিলের দিকে।...

—বসুন। গম্ভীর সুরে উষা চেয়ারখানা দেখিয়ে দেয়।

ব্যস্ত সমস্ত হয়ে বলে ওঠে মেজবাবু। উষা ওর কথাগুলো শুনে চলেছে মামুলি রিটার্ণের কাগজ থেকে মুখ তুলে।

—আমার ছেলের অন্নপ্রাশন, উনি আপনার ছাত্রী ছিলেন, তাই বারবার করে বলে দিলেন যদি কাল সন্ধ্যায় একটিবার যান—

একটি বর্ষামুখর সন্ধ্যা; সামনে ওই কদর্য লোকটা!... মেজবৌএর মুখখানা মনে পড়ে।...ঝড় ওঠা মন ..কাঁপছে সারা দেহ! একটা ঘৃণা জন্মে ওঠে সারা মনে। পুঞ্জীভূত বিক্ষোভ রাজ্যি-জোড়া ভণ্ডামি আর বঞ্চনার বিরুদ্ধে। বলে ওঠে

—আমার যাওয়া সম্ভব নয়, বলবেন ওঁকে।

—একটিবার?

—এইখান থেকেই আশীর্ব্বাদ করছি—আপনার সন্তানের কল্যাণ হোক।

মেজবাবু বের হয়ে গেল।...একা ঘরে বসে কি ভাবছে উষা, আশীর্ব্বাদ!...শুকনো একটা বঞ্চনায় বিক্ষুব্ধ—মনের নীরব স্তোক প্রকাশ ছাড়া আর কিছুই নয়। তার জীবন ঘিরে অসীম শূন্যতা, উষর মরুভূমির রুক্ষ বঞ্চনা, নিষ্ফল হাহাকার। তবু সে অশোক-লেখাকেও আশীর্ব্বাদ করেছে।

ক্ষণিকের জন্য মনটা কেমন করে ওঠে—অসহ্য একটা জ্বালা।

আবার কাজে মন দেয় উষা সেন।

শারদ সঙ্গীত

শ্রীশৈলেন্দ্রকৃষ্ণ লাহা

সারাদিন, সারা রজনী কোথায় বাজিছে একটি সুর,
কে জানে কোথায়? হয়ত নিকটে, হয়ত অনেক দূর।
সেই সুর শুধু সুর নয়, সে যে অপরূপ এক গান,
যেন বুঝি, যেন বুঝি না, কে তার অর্থ করিবে দান?

ঊর্দ্ধে অসীম নীল বিস্তার, আকাশ বাজায় বাঁশী,
পৃথিবীর শ্যাম-কাননে ফুটেছে শুভ্র পুষ্পরাশি,
সেথা ছায়ালোকে ঘোরে-ফেরে সুর, পাতা কাঁপে শুধু গানে,
ভরা নদী সুর বয়ে নিয়ে যায় দূর সাগরের পানে।

নীলের নিম্নে সাদা মেঘ—কোথা যাত্রা করেছে তারা,
কোন্ সে গীতের বৈরাগী সুরে হয়েছে আত্মহারা!
সলিলের ফোঁটা পদ্মের বুকে ভ্রমর ঘুরিয়া মরে,
দূর আকাশের ছায়া সারাদিন জলের গভীরে পড়ে।

স্থলে জলে আর আকাশে বাতাসে এমনি অনুক্ষণ
বাজে সঙ্গীত, ব্যাকুল জগৎ করে কার আবাহন?
বিশ্বপ্রাণের সঙ্গীত বুঝি অন্তরে ওঠে রণি'
সেই সুর দিয়ে শারদ প্রভাতে রচি তাঁরি আগমনী।

ফটো : হারাণচন্দ্র ঘোষ

শোক মগ্না

ভারতবর্ষ প্রিন্টিং ওয়ার্কস্

ভারতবর্ষ প্রিন্টিং ওয়ার্কস্

বিসর্জ্জন

ফটো : সমরেন্দ্র মিত্র
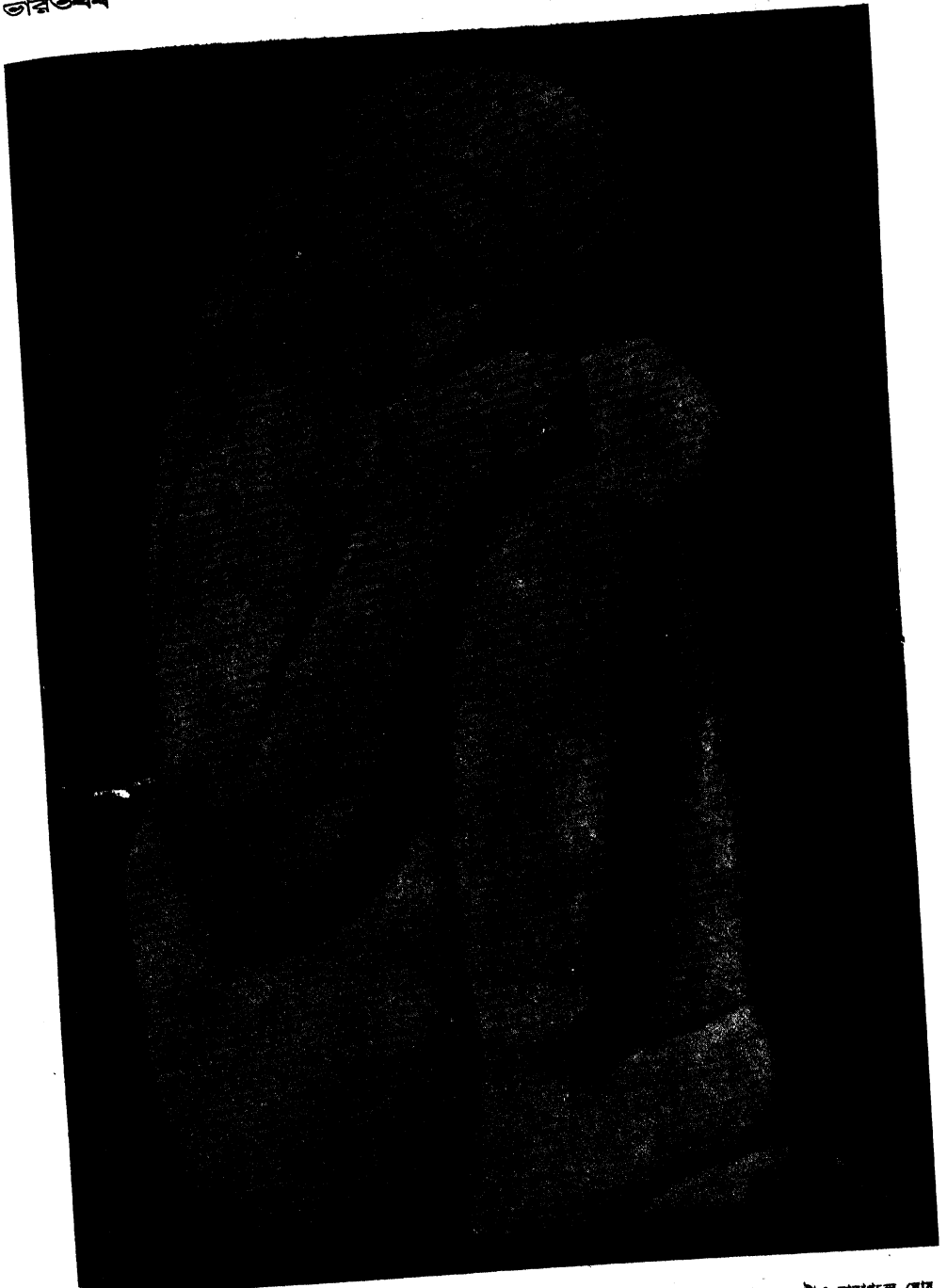
ছাত্রজীবনে অধ্যয়নের প্রণালী

উপানন্দ

তোমাদের প্রথম ও প্রধান কর্ত্তব্য হচ্ছে—ক্লাসে গিয়ে ঠিকমত বসে তোমাদের শিক্ষক মহাশয়েরা যে যে বিষয়ে ক্লাসের ভেতর শিক্ষা দেন, সে সম্বন্ধে মনোযোগী হয়ে শোনা আর বুঝবার চেষ্টা করা। ক্লাসে প্রস্তর মূর্ত্তি বা সাক্ষী গোপালের মত বসে থাকবে না এবং সব বিষয়বস্তু যা বোর্ডে শিক্ষক মহাশয়েরা লিখেছেন তাই টুকে নেবে—জীবন্ত কার্ব্বন কাগজের মত। আগ্রহশীল দর্শকের মত বসে বুঝবার চেষ্টা করবে শিক্ষক কি বলছেন। ধীর, স্থির ও মনোযোগী হয়ে শুন্‌বে প্রত্যেকটি কথা। নিজেদের মধ্যে যেন ধারণা থাকে যে—শিক্ষক যা বলছেন তা বুঝবার পক্ষে অসুবিধা হবে না। শিক্ষকের কোন কথা অন্যমনস্কতার মাধ্যমে হারিয়ে ফেলবে না। শিক্ষক যা বল্‌ছেন শুন্‌বে, বোর্ডে কি লিখছেন দেখবে আর প্রথমে বুঝবার চেষ্টা করবে তাঁর সব কথা, তারপর উল্লেখযোগ্য আবশ্যকীয় অংশগুলি যা বোর্ডে তিনি লিখে দেবেন···নকল করে নেবে নিজেদের খাতায়।

বিদ্যালয় থেকে বাড়ী ফিরে এসে জলযোগ সেরে খেলাধূলার ভেতর দিয়ে সারা দিনের ক্লান্তি দূর কর্‌বে। তারপর সন্ধ্যাবেলায় বসে ক্লাসে যে সব দেখানো হয়েছে সেগুলি পুনরায় পরীক্ষা ও আবৃত্তি করবে। নিজেদের মনে স্মরণ করবার চেষ্টা করবে সারা দিন ধরে যে সব বিষয়ে শিক্ষকরা বিদ্যালয়ে তোমাদের ক্লাসে বক্তৃতা করেছেন। পরিষ্কারভাবে চিন্তা কর্‌বে কোন্ কোন্ বিষয়ে দেখানো হয়েছে, আর কোন্ কোন্ প্রসঙ্গ আলোচিত হয়েছে। তারপর খাতা খুলে দেখ্‌বে ক্লাসে যে সব নোট করে নিয়েছ।

তোমাদের লিখে-নেওয়া নোটগুলি যেন শিক্ষকদের বক্তৃতাগুলির সারমর্ম্ম হয়ে ওঠে। তারপর যেগুলি উল্লেখযোগ্য নয় ভেবে বাতিল দিয়ে নোট বইতে টুকে নাওনি, সেগুলি মনে করবার চেষ্টা করবে। সারাংশগুলি মন থেকে বের করে নিজের ভাষায় লিখে রূপ দেবে। নিত্য যদি দৃঢ়সঙ্কল্প করে এইভাবে ক্লাসে শেখানো বিষয়বস্তুগুলি নিয়ে আলোচনা করো, তাহ'লে পড়াশুনায় বেশ এগিয়ে যাবে, ফলও ভালো হবে।

তারপর প্রত্যেক অধীতবস্তু সুষ্ঠুভাবে ভালো করে আলাদা ভাবে ধারাবাহিক ক্রমে লিখ্‌বে, তারপর নোট বই বা পড়ার বইয়ের সঙ্গে মিলিয়ে দেখবে ঠিক মত লেখা হয়েছে কিনা স্মৃতিশক্তির সাহায্যে। আবোল তাবোল লিখবে না, নিজেই নিজের ভুল সংশোধন করতে পার্‌বে এইভাবে। ক্রমে তোমাদের অন্তরের মধ্যে বিদ্যার অমূল্য ভাণ্ডার গড়ে উঠবে জ্ঞান বিজ্ঞানের রত্নরাজিতে। অনেক ছেলেমেয়ে আছে যারা পড়েই যায়, কিন্তু যা পড়ে যায়, তা লেখে, বইয়ের সঙ্গে বা ক্লাসের নোট-বুকের সঙ্গে শেষ মিলিয়ে দেখতে হয়, ঠিক হয়েছে কিনা। উত্তম-ভাবে দেখার নিদর্শন হচ্ছে যথাযথভাবে বর্ণনা। প্রতিদিনের পাঠ মনের মধ্যে পুনরাবৃত্তি কর্‌বে, তা'তে জ্ঞানার্জ্জন সুদৃঢ় হবে, সহজে ভুলবে না।

এরূপভাবে দৈনন্দিন অভ্যাস ক'র্‌লে গৃহশিক্ষক রাখার দরকার হবে না, পরীক্ষায়ও উত্তম রূপে কৃতকার্য্য হোতে পার্‌বে। এরপর হচ্ছে আলোচনা। আজ যেগুলি ক্লাসে শিখলে, সেগুলি আগামী কাল বন্ধু-বান্ধব বা সহপাঠিদের সঙ্গে আলোচনা কর্‌বার চেষ্টা কর্‌বে।

অন্তরঙ্গ বন্ধুদের নিয়ে এক একটি ছোট দল গড়বে। এই দলের ভেতর যেন ক্লাসের দৈনন্দিন পড়াশুনার বিষয় বস্তুগুলি নিয়ে আলোচিত হয়। যার যে বিষয়ে বুঝতে অসুবিধা হচ্ছে বা আট্‌কে যাচ্ছে, তাকে সাহায্য কর্‌বে দলের অন্যান্য ছেলেরা। ভাবের আদান প্রদানের মধ্য দিয়ে এইভাবে জ্ঞানার্জ্জনের পথ সুগম হবে।

অধ্যয়ন দ্বারা জ্ঞান লাভ আর অনুশীলন দ্বারা চরিত্র গঠন ভিন্ন জগতে বড় হওয়া যায় না। বর্ত্তমান সময়ে পড়ার ওপর জোর দেওয়া হয়েছে। ন্যাশানাল বুক লীগের সভাপতি স্যার উইলিয়ম হ্যালি বলেছেন যে ঘণ্টায় একশত পৃষ্ঠা পড়ে তিনি বুঝে মনে রাখতে সক্ষম হয়েছেন। এরূপ দ্রুত পঠনের দ্বারা ঐরূপ শক্তি অর্জ্জন করা সকলের পক্ষে সম্ভব নয়।

অধ্যাপক এইচ, জে আইসেঙ্ক লক্ষ্য করেছেন যে বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদের বেশীর ভাগই তাদের অধ্যয়নে মন্থরভাবে অগ্রসর হয়, ফলে তাদের বিদ্যার্জনের পথ সম্যকভাবে প্রশস্ত হয় না। বেকন বলেছেন—Reading maketh a full man. মানুষের পূর্ণতা সৃষ্ট হয় পঠনে। ডোরিক লেসিং তাঁর উপন্যাস মার্থা কোয়েষ্টের মধ্যে বলেছেন—There are two ways of reading. One deepens and intensifies that one already knows, From the other one takes new facts new views to weave into ones life. অধ্যয়নের দুরকম পথ। পূর্ব্বে জানা বিষয়কে তীব্র গভীরভাবে উপলব্ধি করা এক রকম উপায়, আর অপরের কাছ থেকে নতুন তথ্য নতুন মতবাদ নিয়ে নিজের জীবনে বুনে যাওয়া আর একটি উপায়। কোন কোন অধ্যাপক বলেন—দ্রুত পঠনের দোষও আছে, পঠিত বস্তু সম্পর্কে বোধগম্য হবার অবকাশ থাকে না। ট্রাথার্স বার্ট বলেন—মানুষের অসাফল্যের কারণ তাদের নির্ব্বুদ্ধিতার জন্তে নয়, তার কারণ যথেষ্ট পরিমাণে তারা মনঃসংযোগ করে অভিভূত হয় না তাদের কর্ত্তব্য কর্ম্মে।

জীবনে সুখদুঃখ, আলো অন্ধকার, জয় পরাজয়, সাফল্য অসাফল্যের ঘাত প্রতিঘাত আছে। সংসারের পথগুলি কুসুমাস্তীর্ণ নয়, কোন কোন পথ বিশেষভাবে কণ্টকাকীর্ণ। থিয়োডোর রুজভেল্ট বলেছেন—The Law of worthy life is fundamentally the law of strife. It is only through labour and painful effort by grim energy and resolute courage, that we move on to better things. মূলত: জীবনের বিধিই হচ্ছে দ্বন্দ্বের বিধি। কেবলমাত্র পরিশ্রম আর কষ্টদায়ক প্রচেষ্টা, দারুণ উৎসাহ আর দৃঢ়প্রতিজ্ঞ সাহসের মাধ্যমে আমরা উন্নততর বস্তুলাভের দিকে এগিয়ে যাই।

জীবনের অন্ধকারাচ্ছন্ন দিকটা অনায়াসে অতিক্রম করতে হোলে ছাত্রজীবনে সুদৃঢ় অধ্যবসায় ও প্রগাঢ় অধ্যয়ন একান্ত প্রয়োজন। ছোট্ট ছেলে ম্যাকডোনাল্ড উত্তরকালে অনন্যসাধারণ ব্যক্তি হয়ে বিশ্বসমাজে প্রতিষ্ঠা অর্জ্জন করেছিল। কোন সময়ে সে যখন জুতো কাঁধে নিয়ে পাহাড়িয়া পথ পার হচ্ছিল, তখন বলে উঠলো—

To have what we desire that is riches, but to be able to do without it that is power. অর্থাৎ যা পাবার ইচ্ছা করা যায় তা পাইয়ে দেওয়া ধনের কাজ, কিন্তু ধনের অভাবে যা ইচ্ছা তাই পাবো এরকম করতে পারার নামই ক্ষমতা।' প্রচুর অর্থ থাকলে তো সমস্তই পাওয়া যায়, কিন্তু অর্থের অভাবে কোন কাজ করে বাসনা পূর্ণ করাই তো বাহাদুরী। এই বাহাদুরী উত্তরকালে ঐ বালক দেখিয়েছিল। প্রকৃত দৈন্যের মধ্যে সে মানুষ হয়ে তার এই কথাটি কাজে দেখিয়েছে। রাজারামমোহন, বিদ্যাসাগর প্রভৃতি প্রাতঃস্মরণীয় মহাপুরুষদের জীবনী পর্য্যালোচনা করলে দেখতে পাবে তাঁরা কঠোর অধ্যবসায় ও অধ্যয়নের দ্বারা বাল্য জীবনকে সুন্দর ভাবে গঠন করে উত্তরকালে শ্রেষ্ঠ পুরুষ হয়েছিলেন। তোমরা তাঁদের পদাঙ্ক অনুসরণ করে এগিয়ে চলো। কবি লংফেলো বললেন—"Go forth to meet the shadowy future without fear, and with a manly heart.

অবাক কাণ্ড

শ্রীনগেন্দ্রকুমার মিত্র মজুমদার

পূজোর দিনে—

ব্যাপার একি! মিথ্যা মহোৎসব!
টাট্‌কা ফুলো লুচিগুলো উড়ে গেল সব!
গাওয়া ঘিয়ের লুচি ছিল কড়া কড়া ভাজা,
হাওয়ায় কোথা মিলিয়ে গেল পেলাম বড় সাজা!
বাক্স করে ঠেসে ঠেসে রেখে ছিলাম লুচি,
সকাল বেলায় বাক্স খুলে দেখ্‌ছি না এক কুচি।
লুচিগুলো ফুলে ফুলে হল কোলা ব্যাঙ,
হঠাৎ কি সব রাতারাতি গজিয়ে গেল ঠ্যাং!
ঠ্যাং গজিয়ে রাতারাতি—দিল কি সব পাড়ি?
গজিয়ে পাখা গেল উড়ে—গেল দিয়ে আড়ি!
বাক্স-ভরা লুচি গেল—কাণ্ডখানা এ কি!
লুচি হয়ে কাঠের ঘোড়া—পাশেই পড়ে দেখি!

রোগের মাঝে

শ্রীআশাবরী দেবী বি-এ

রেবা কিছুদিন হতে অসুখে পড়ে আছে। ওর ঘরটা ঠিক রাস্তার ওপর। জানালা দিয়ে রাস্তার সবখান দেখা যায়। ও শুয়ে শুয়ে তাই দেখে। ভোরে একটা ট্রেণ আসে তাই অন্ধকার থাকতেই সাইকেল-রিক্সা গুলো যায়। তারপরেই পাঁউরুটি বিস্কুটওলা মাছওলা তরকারীওলা সব যায়। একটু বেলা হলে আসে পিয়ন। সারাদিনটায় রাস্তা দিয়ে কে কে যায়—কার কি আওয়াজ—সব রেবার মুখস্থ হয়ে গেছে।

রাত্রে রেবার ভাল ঘুম হয় না। প্রায়ই দেওয়াল-ঘড়ির সব আওয়াজ-গুলোই শোনে। সকাল হয়—মারা ব্যস্তভাবে ওঠেন। মা রান্নাঘরের কাজে লাগেন, বাবা যতো সাংসারিক হিসেব-নিকেশ, বাজার আর নটায় অফিস-বেরোনো নিয়ে বিব্রত হয়ে পড়েন। দাদা কলেজের পড়া নিয়ে মনে হয় যেন চব্বিশ ঘণ্টাই মগ্ন। সকালবেলাটা তার কাছে এসে দাঁড়াবার, দুটো কথা বলা বা মাথায় হাত বুলিয়ে দেবার সময় বড় একটা ওঁদের হয় না। এই চার মাস বিছানায় পড়ে থাকার আগে তাকেও ঢের কাজকর্ম ফাই-ফরমাস খাটতে হতো, কিন্তু এই দীর্ঘদিন জ্বরের ঘোরে দুর্বলতা-ভরা শরীরে বিছানায় পড়ে থেকে থেকে সে-কথা আর তার খেয়াল নেই। কেন সবাই তার কাছে রাতদিন বসে থাকেনা, কথা বলেনা, আদর করে না—এই ভেবে ওর খুব অভিমান হয়, বালিশে মুখ গুঁজে এক এক সময় তাই ও কাঁদে। ক্রমে সাতটা বাজে। কোনোদিন হারুয়া চাকর, কোনোদিন ছোট সাত বছরের ভাই মন্টু, কোনোদিন হয়ত মা নিজেই আসেন। রেবার জ্বরের তাপটা এখন কমে গেছে, কিন্তু ভারী দুর্বল—এর ওপর আবার লুকিয়ে কেঁদে গা গরম হয় মাঝে মাঝে। ভারী শরীর খারাপ ওর—তাই ওকে তুলে ধরে জানালার কাছে নিয়ে গিয়ে দাঁত মাজিয়ে মুখ হাত ধুইয়ে, জামাকাপড় বদলে দিয়ে কোনদিন চুলও আঁচড়ে দেন না। তারপর দুধ-বার্লি, একফালি সেঁকা পাউরুটি আর কমলা-লেবুর কোয়া খানিকটা এনে একটু আদর করে খেতে বলেন। কোনো-দিন ওর খাওয়া শেষ হওয়া পর্য্যন্ত দাঁড়ান—কোনোদিন বা কাজের তাড়ায় আগেই চলে যেতে হয়।

এইভাবে দিন কাটে। সেদিন মার একটু দেরী হয়ে গেছে ওর খাবার নিয়ে আসতে সকাল-বেলা। রেবার মাকে ঘরে খাবার হাতে ঢুকতে দেখেই অভিমানে চোখভরে জল এলো। মা যতো আদর করেন কিছুতে খাবে না ও। মা তখন ব্যস্ত হয়ে বললেন "ছি রেবু-মা! খেয়ে নাও লক্ষ্মী মেয়ে, অমন করে না—আমার যে আজ মেলাই কাজ। জানো না রেবু, আজ যে যমু আসবে!"

"কখন মাগো? দিদি আসবে?" ক্ষীণগলায় উত্তেজনা এসে গেলো রেবার। ও চমকে উঠে বসবার চেষ্টা করলো।

"এই তো এক্ষুণি সাড়ে দশটায় আসবে সোনা—" মা আদর করে মেয়েকে শুইয়ে দিতে দিতে বলেন—"রোগা শরীরে অত খুশী হ'তে নেই মাণিক—দিদি তো তোর কাছেই থাকবে—এখন খেয়ে নে!" রেবার কিন্তু চোখে আবার জল ভরে আসছিলো। আজ দিদি আসবে? অন্য অন্যবার রেবাই সব চেয়ে আগে জানতে পারে কারও আসার কথা থাকলে। আর আজ দিদি আসবে কিন্তু সে বিন্দুবিসর্গ জানেনা—সেই রোজকার মতো একঘেয়ে বিছানায় পড়ে রয়েছে! দিদিকে আনতে কেমন মন্টু যাবে, দাদা যাবে, বাবা যাবেন ইষ্টিশানে, কেবল রেবাই পড়ে থাকবে। দিদির ছোট্ট খোকাটা এতদিন নিশ্চয়ই হাঁটতে শিখে গেছে। খোকনকে তো ও কোলেও করতে পারবে না, দিদির ঐ সুন্দর মোটামোটা খোকনকে কোলে নিতে গেলে ও তো নিজেই উল্টে পড়ে যাবে! জামাই-বাবুর বোধহয় মাত্র দুদিনের ছুটি—একটু বেড়াতে যেতে পারবে না—দিদি জামাইবাবু আর দাদা মন্টু কি আনন্দ কোরে ওর সামনে দিয়ে বেড়াতে যাবে বিকেলে!—হু হু করে রেবার চোখে আবার জল এসে পড়লো, কিন্তু প্রাণপণে কান্না চেপে রেবা মাকে বললো—"মামণি তুমি যাও, আমি নিজেই খাচ্চি!" মা খুশী হয়ে চলে গেলেন। রেবা ধীরে ধীরে বিস্কুটখানি তুলে মুখের কাছে আনতে গেলো, কিন্তু হাত কেঁপে বিস্কুট আলগা হয়ে পড়ে গেল মাটিতে। রেবা একবার মাটিতে পড়া বিস্কুটটির দিকে চেয়ে দেখলো, আর একবার নিজের হাড়-বেরোনো রোগা হাতটির দিকে চেয়ে দেখলো—তারপর কেঁদে ফেললো দুঃখে!

রেবা জানালা দিয়ে বাইরের দিকে চেয়ে বসে আছে—দশটা কুড়ি হয়ে গেছে—এক্ষুণি দিদি আসবে। তার চোখ দুটি চঞ্চলভাবে রাস্তার শেষ সীমানায় নেচে বেড়াচ্ছে—ঐ বুঝি গাড়ী দেখা যায়। একে একে অনেক-গুলি গাড়ী চলে গেলো। এইবার দেখা গেলো—ঐযে বাবা সামনেই বসে আছেন খোকনকে কোলে কোরে। বাঃ খোকনটা কি সুন্দর হয়েচে—সাদা সাদা মোটা হাত দিয়ে বাবার চশমা টানছে—ঐ যে দিদি ঘোমটা দিয়ে জামাইবাবুর পাশে পেছনে বসে আছে—অতো হাসি-হাসি মুখ কেন? নিশ্চয় মন্টুর সঙ্গে কোনও মজার গল্প হচ্ছে!—এবার ব্যস্ত হ'য়ে রেবা ক্ষীণগলায় চীৎকার করে হারুয়াকে ডাকতে লাগলো তাকে বাইরে নিয়ে যাবার জন্য। মা রান্নাঘর হ'তে মুখ বাড়িয়ে বললেন—"ওরে রেবা! যমুরা এসে গেছে নাকি রে? হারুয়াকে কেন ডাকছিস? সে তো গেছে চিনি আনতে বাজারে!" রেবার চোখ ফেটে আবার জল এলো; আচ্ছা সকলেই তো জানে যে ও আজকাল নিজে নিজে উঠে বসতে পারে না। দিদি চলে এলো অথচ দেখো কেউ একজন নেই যে ওকে ধরে বাইরে নিয়ে যায়। গড়িয়ে আসা চোখের জল মুছতে মুছতেই যমুনা গাড়ী হ'তে ছুটে নেমে এলো—বুকে জড়িয়ে ধরলো রেবাকে। রেবার শুকিয়ে যাওয়া রোগা মুখখানি আনন্দে উজ্জ্বল হয়ে উঠলো—দুহাত বাড়িয়ে দিদিকে ও জড়িয়ে ধরলো। যমুনা ওর কপালে চুমু দিয়ে বললো, "রেবুমণি এতো রোগা হয়ে গেছিস্—এবার আমি এসেছি, ভালো হয়ে উঠবি দেখতে দেখতে!" মা হাসিমুখে ঘরে ঢুকলেন নাতিকে কোলে নিয়ে—"ও কিরে যমু, ট্রেণের কাপড়ে বিছানায় বসলি? আয় খাবি আয়!" যমুনা ছুটে গিয়ে মাকে প্রণাম করলো।

কি আনন্দ! কি আনন্দ! সারাক্ষণই দিদি, জামাইবাবু আর ছোট খোকন রেবার ঘরে। জামাইবাবু ওর জন্য কি চমৎকার একটি ডল-পুতুল এনেছেন, আর একটি ছবিভরা রূপকথার বই। দিদি এনেছে লাল টুকটুকে একখানি ডুরে শাড়ী, আর ছোট খোকন এনেছে কচি মুখভরা হাসি আর আধ-ফোটা ভাষা!

দুপুরবেলা তেতো ওষুধ খাবার সময় আজ আর রেবার কান্নাকাটি কিছুই শোনা গেলো না। দিদি হাসিমুখে ওষুধের গ্লাস তুলে ধরলো, রেবাও হাসিমুখেই খেয়ে ফেললো। দুপুর বেলায় রেবার ঘরে মস্ত আনন্দ সভা বসলো—কতো গল্প হাসি—রেবা যেন আর অসুখের বিছানায় শুয়ে নেই—ভেসে বেড়াচ্ছে হালকা শরৎ মেঘের শয্যায় খুশী ঝলমল নীল আকাশে।

"যাই, রান্নাঘরে ঢের কাজ পড়ে আছে—" বলে মা জামাইর জন্য মালপোয়া ভাজতে গেলেন। বাবা জামাইবাবু গেলেন বিশ্রাম করতে। দাদা আর মণ্টু গেলো পড়তে। দিদি কিন্তু রেবাকে ছেড়ে যায়নি। খোকনকে নিয়ে রেবারই বিছানার এক পাশে শুয়ে দেখতে দেখতে লম্বা চুল ছড়িয়ে ঘুমিয়ে পড়লো। রেবার কিন্তু খুশীর উত্তেজনায় মোটে ঘুমই এলো না। খোকন শুয়ে শুয়ে খেলা করছিলো—রেবা একটু চেষ্টা করলো তাকে কাছে টানতে, কিন্তু তার স্বাস্থ্য এতো বেশী ভালো যে পারলো না। রেবা ধপাস করে মাথাটা বালিশে ফেলে বল্লো—"না রে খোকনমণি, আমার এই বিচ্ছিরী হাতটায় জোরই নেই একদম, ডাক্তাররা কিচ্ছু জানে না—একটা ভালো ওষুধ দেয় না যে গায়ে জোর হবে!"

রাত প্রায় দশটা বাজে। রেবার রাতের খাওয়া হয়ে গেছে। বাড়ীর আর সবারও খাওয়া হয়ে গেছে। উঠোনে চেয়ারে বসে চাঁদের আলোয় বাবা জামাইবাবু গল্প করছেন। রেবা নতুন ডল পুতুলটা বুকে নিয়ে ঘরে একা শুয়ে রান্নাঘরের দিকে চেয়ে মা ও দিদির খাওয়া দেখছে, আর নানা কথা ভাবছে। একটু পরে বাবা ও জামাইবাবু ভেতরে চলে গেলেন—ওর কানে তখন মা ও দিদির কথাবার্তার টুকরো ভেসে আসতে লাগলো; যমুনা বললো—"রেবুর শরীরটা কিছুতে সুস্থ হচ্ছে না কেন মা? অদ্ভুত দুর্বল শরীর মাঝে মাঝে জ্বর হচ্ছে—কি হয়ে গেলো মেয়ে!" মা বললেন, "জানি না কপালে কি আছে! চারজন বড়ো ডাক্তার দেখেছেন—এতো রকম ওষুধ এই চার পাঁচ মাসে খেলো, আর ওষুধ খাওয়ানো যায় না—এতো কাঁদে।" যমুনা বললো "আচ্ছা মা! ওকে একা বিছানায় রাখো কেন? ভয় টয় পায় না তো?" মা বললেন —"কি করবো—ডাক্তারবাবু বলেছেন মেয়ের ঘরে কেউ থাকবে না—ঘর ফাঁকা থাকবে। তাই আমি মেঝের দূরে শুই—ও নিঃশ্বাস ফেললেই জেগে যাই—কবে যে মা কালী এ দুর্ভোগ কাটাবেন। "আচ্ছা মা রেবু অতো মন গুমরে থাকে, কেন চোখে যেন একটুতেই জল ভরে আসতে চায়—" "ঠিক বলেছিস যমু—ডাক্তারবাবুও এই কথাই বলছিলেন যে ও মেয়ে একদিন হাসিখুশীতে থাকলেই সব অসুখ সেরে যায়—কিন্তু এই লম্বা অসুখে এত অভিমানী হয়েছে যে একটু হাসে না পর্যন্ত—" এসব কথা শুনতে শুনতে রেবার আজ রাগ হলো না। ডল-পুতুলটার গায়ে হাত বুলোতে বুলোতে ও মনে মনে বললে, "এখন কিন্তু খুব ভালো লাগছে দিদি আমার—" গুনগুন করে বলতে বলতে কখন রেবা অকাতরে ঘুমিয়ে পড়েছে……হঠাৎ শুনলো কে যেন তাকে গায়ে মৃদু ছোঁয়া দিয়ে ডাকছে। আপনিই রেবা উঠে বসলো বিছানায়, কিন্তু কিছুতেই চোখ চাইতে পারলো না। একি হলো? অন্যদিন রেবার রাতে একটুও ঘুম হয় না। চেয়ে থেকে থেকে চোখ জ্বালা করে, আর আজ যেন সাত রাজ্যের ঘুম ওর চোখের পাতায় এঁটে বসেছে। ঘুমের ঘোরের মধ্যেই রেবা শুনলো—কে যেন মিষ্টি মধুর গলায় "রেবু দোর খোলো ভাই!" বলে বারবার ডাকছে! যেমন কোরে হোক এই চারমাস পর রেবা আপনিই উঠে দাঁড়ালো, তারপর আস্তে আস্তে দোর খুলে ফেললো। দোর খোলার সঙ্গে সঙ্গেই এক ঝলক জ্যোৎস্না-ধোওয়া ঠাণ্ডা হাওয়া আর অনেক গুলি ছোট ছোট নরম হাতের ছোঁয়া একসঙ্গে তার হাতে মুখে এসে লাগলো। রেবাকে যেন কারা হাওয়ায় ভাসিয়ে নিয়ে চললো—

রেবাকে পরীরা নিয়ে চলেছে…।

পায়ের তলে মাটি ঠেকছে না। রেবা অস্পষ্ট মৃদুস্বরে বলতে চেষ্টা করলো —"ওগো তোমরা কে—আমায় কোথায় নিয়ে চলেছ?" কিন্তু আওয়াজ ফুটলো না গলায়। কেন জানি না রেবার মোটে ভয় করলো না—একটা চোখ অতি কষ্টে মেলে দেখলো অনেকগুলি ছোট ছোট খোকাখুকু অনেকগুলি কচি হাতে তার হাত ধরে প্রজাপতির মতো চাঁদের অফুরন্ত আলোয় ভেসে চলেছে। রেবার ঐ আধ-চাওয়া চোখেই স্বপ্ন দেখার মতো সব দেখতে পাচ্ছে—এইবার ওরা উড়ে চলা বন্ধ করেছে। বাঃ কি চমৎকার দেশ—আলো আলো—ফুলের গন্ধ বাতাসে ছড়াচ্ছে। পরীদের অনেক খোকাখুকুরা খেলা করছে—চারদিকে ফুলের ছড়াছড়ি।

কি বড়ো ঝকঝকে সোনার চাঁদ। তার উজ্জ্বল অম্লান আলো সমস্ত দেশটা যেন ধুয়ে দিচ্ছে। পরীদের নিতান্ত ছোট খোকাখুকুরা নানান রঙের মেঘের টুকরোর ওপর কতো রকম রঙের গন্ধের কোমল সব ফুলের পাপড়ির তৈরী লেপ গায়ে দিয়ে শুয়ে আছে। রেবার হাত ধরে একদল পরীদের খোকাখুকুরা নিয়ে চলেছে। কি সুন্দর তাদের হাতের কোমল স্পর্শ! তাদের চাঁদের রঙের তুলতুলে ঘাড়ের সাথে প্রজাপতির মতো দুটি বিচিত্র কোমল পাখা—তাতে রামধনুর ছটা। রেবাকে নিয়ে ওরা খুব আনন্দ করে সারা দেশটায় ঘুরে ঘুরে নেচে বেড়াতে লাগলো। সারা দেশটাই যেন ফুলের গন্ধে আর পাখীর গানে ভরপুর। এক এক জায়গায় পরীর মেলা বসেছে। তারা ব্যস্ত হয়ে আসছে যাচ্ছে—পিঠের পাখা দুটি দুলিয়ে। গোলাপ-বনের ওপাশে দুটি পরী ব্যস্তভাবে ফুলের মধু আর চাঁদ-গলানো শিশির দিয়ে কি জানি কি করছিলো। পরীরা এবার তাদের কাছে রেবাকে নিয়ে গেলো। তাদের একজন এসে রেবাকে একটি ছোট চুমু দিয়ে বললো—

"তোমরা যারা পড়ে আছো রোগের অত্যাচারে
তাইতো তাদের আমি হেথায় সুস্থ করার তরে
ওগো মর্ত্যের খুকু—খাও এ সুধাটুকু
সকল রোগ যাবে দূরে।"

গোলাপপাপড়ির গ্লাসে পরীর দেওয়া ওষুধ টুকু খেতেই রেবার মনে হলো সেও যেন ঐ পরীদের খোকাখুকুর মতোই সুস্থ ও সুন্দর হয়ে গেছে—আহা! কি হালকা চমৎকার লাগছে শরীরটা! রেবা সমানতালে ওদের সাথে গান গেয়ে গেয়ে নাচতে লাগলো। নাচের উৎসব শেষ হলে ওদের সাথে লুকাচুরী খেলা আরম্ভ হলো। পরীদের খোকা খুকুরা সব লুকিয়েছে—রেবা চোর। রেবা আর খুঁজে খুঁজে তাদের কিছুতেই পায় না। ঐ যে মেঘ আর বরফের তৈরী বাড়ীটা—বাড়ী থেকে মাঝেমাঝে রামধনুর ছটা বেরোচ্চে—ওরই আড়ালে দুটি ছোট ছোট পাখা দেখা গেলো না? রেবা ছুটে সেই বাড়ীর গা ঘেঁষে যেতেই বরফের দেওয়ালের সাথে ভীষণ ধাক্কা খেয়ে রেবা ছিটকে পড়লো—অন্ধকার নীচের দিকে রেবা পড়তে লাগলো। ও প্রাণপণে চেঁচিয়ে পরীর খোকাখুকুদের কত ডাকলো কিন্তু কেউ বোধহয় শুনতে পেলোনা। চারদিকে কি কালো অন্ধকার। গাছগুলো ঝাঁকড়া মাথা নিয়ে ঠিক যেন ভূতের মতো দাঁড়িয়ে আছে, রেবা মাথা ঘুরে শুকনো মাটিতে এসে পড়লো।

ভোরে হারুয়া কাজ করতে এসে দেখে বেশী রাত্তির পর্য্যন্ত গল্প করে কেউই তখনো জাগেন নি। ঘুরে রেবার জানালা দিয়ে ডাকতে গিয়ে সামনে দেখলো তাতে ভয়ে অবাক হয়ে গেলো। সেইখানে বাগানের মধ্যে একটি ফুলগাছের কাছে রেবা পড়ে আছে অজ্ঞান হয়ে। হারুয়া ওকে কোলে তুলে নিয়ে তাড়াতাড়ি সবাইকে ডাকলো।

দু ঘণ্টা সকলের প্রাণপণ চেষ্টা ও চোখের জল ফেলার পরে ডাক্তারবাবু আনন্দে চেঁচিয়ে উঠলেন "রেবা চোখ মেলেছে।" এর এক সপ্তাহের মধ্যেই সকলকে আশ্চর্য করে দিয়ে রেবা একেবারে ভালো হয়ে উঠলো। একদিন খোকনকে কোলে নিয়ে ও দিদিকে পরীর দেশে বেড়ানোর কথাটা বললো। মা শুনে চমকে বললেন—"সত্যনারায়ণ করতে হবে, নিশির ডাক।"

—

শ্রীহরিপদ গুহ

অনেকদিনের কথা।

নদীর ধারে খড়ের ঘরে এক দরিদ্র বিধবা একটি ছেলে ও একটি মেয়ে নিয়ে বাস করত। সংসারে তার আপন বলতে আর কেউ ছিল না। 'নিত্য ভিক্ষা, তনু রক্ষা' করেই তাদের দিনাতিপাত হতো। মেয়েটী বড়, নাম চিত্রা; ছেলেটী ছোট, নাম হিরণ।

চিত্রা ফুল তুলে মালা গেঁথে বিক্রী করে যা পায়, এনে মায়ের হাতে দেয়। হিরণ নদীর ধারে সুন্দর সুন্দর প্রজাপতির পেছনে সমস্ত দিন ঘুরে বেড়ায়।

তখন বসন্তকাল।

গাছে গাছে রঙ্-বেরঙের ফুল ফুটে ধরণীর শোভা বাড়িয়ে তুলেছে। চিত্রা মালা গাঁথবার জন্য নদীর তীরে একটা গাছ থেকে কুসুম তুলে তার সাজি ভরছিল। হঠাৎ কোথা হোতে দু'খানা লম্বা হাত এসে তাকে জলের মধ্যে টেনে নিয়ে গেল। সেখানে তার আর কোন চিহ্নই রইল না।

যখন নির্দ্দিষ্ট সময় উত্তীর্ণ হয়ে গেলেও চিত্রা বাড়ী ফিরে এলো না, তখন তার মা বড়ই অস্থির হয়ে পড়ল। সে ওই নদীর তীরে ঘুরে ঘুরে মেয়ের অনেক খোঁজ করলে. কিন্তু তার কোনো সন্ধানই পেলে না। তখন তার মনে হলো—নিশ্চয়ই সে জলে ডুবে গেছে। কন্যার শোকে বিধবা রাতদিন চোখের জল ফেলে; কেউ তাকে একটা মিষ্ট কথা বলেও সান্ত্বনা দিতে আসে না। হিরণ তার আদরের দিদিকে দেখতে না পেয়ে কাঁদে, আর বিষণ্ণ অন্তরে মাকে শুধায়—হাঁ মা, দিদি কোথা গেল? মাতা কোনো উত্তর দেয় না। ছেলের মুখের দিকে শুধু উন্মাদিনীর মত ফ্যাল ফ্যাল করে চেয়ে থাকে!

(২)

হিরণ বড় হয়েছে।

একদিন সে প্রতিজ্ঞা করে বসল—যেমন করেই হোক্ তার দিদিকে সে খুঁজে বের করবে। তারপর একদিন মার কাছে বিদায় নিয়ে হিরণ তার দিদির সন্ধানে বেরিয়ে পড়ল।

পথ চলতে চলতে হিরণ একটা নতুন দেশে এসে উপস্থিত হোলো। রাস্তা দিয়ে সে চলেছে—হঠাৎ সে দেখে একপাশে দাঁড়িয়ে তিনটী বালক খুব বিবাদ করছে। সে তাদের কাছে গিয়ে বলল—হ্যাঁ ভাই, তোমরা এত ঝগড়া করছ কেন?

তাদের মধ্যে একজন তাকে বললে—কয়েকদিন হোলো তাদের বাবা মারা গেছেন। তিনি একজোড়া মাগ্‌না জুতো, একটা চাবি ও একটা টুপি রেখে গেছেন। এতো

আর যে সে জিনিষ নয়, এই জুতো যে পরবে সে যেখানে খুশী যেতে পারবে; এই চাবি দিয়ে পৃথিবীর যে কোনো তালা খোলা যাবে; আর এ টুপি যে মাথায় দেবে তাকে কেউ দেখ্‌তে পাবে না; সে কিন্তু সবাইকে দেখতে পাবে। এ সব জিনিষ ত আর সহজে ছাড়া যায় না, তাই নিয়ে চলেছে এ ঝগড়া!

হিরণ ছিল খুব চালাক। 'ঝাঁ' করে তার মাথায় একটা বুদ্ধি খেলে গেল। সে তাদের বল্‌লে—এর জন্য আর বিবাদ কেন? আমি তোমাদের ঠিক্ ঠিক্ ভাগ করে দিচ্ছি।

তারা সবাই এতে রাজী হয়ে তাকে ঘিরে দাঁড়িয়ে জিনিষগুলি তার হাতে দিয়ে বল্‌লে—দাও তো ভাই ভাগ করে!

হিরণ খুব দূরে একটা ঢিল ছুঁড়ে বল্‌লে—এটা যে আগে আন্‌তে পার্‌বে, সে পাবে টুপি।

তারা সকলেই ঢিলটাকে আগে আন্‌বার জন্য প্রাণপণ শক্তিতে দৌড়তে লাগ্‌ল।

এই ফাঁকে হিরণ তাড়াতাড়ি জুতোটাকে পরে চাবি ও টুপিটা হাতে নিয়ে বল্‌লে—ওহে জুতো, আমার বোন যেখানে আছে, আমাকে সেখানে নিয়ে চলো!

(৩)

চোখের পলক ফেলতে না ফেল্‌তে সমুদ্র-তীরে একটা পর্ব্বত-গুহার কাছে এসে সে উপস্থিত হলো। বেলাভূমে বালির ওপর পড়ে একটা মাছ ছট্‌ফট্ কর্‌ছে দেখে তার ভারি কষ্ট হলো। সে তাকে তুলে নিয়ে জলে ফেলে দিলে।

মাছটা তাকে বললে—আমি মাছেদের রাজা, যদি তোমার কখনো কোনো দরকার হয় আমায় ডেকো, আমি তোমার কাজ করে দেবো। এই বলে সে ডুব মেরে অগাধ জলে চলে গেল।

ফেরবার সময় হিরণ দেখলে—একটা প্রকাণ্ড পাখী জালে আটকে গিয়ে উড়ে পালাবার জন্য কত চেষ্টা কর্‌ছে; কিন্তু কিছুতেই সে জাল থেকে বেরুতে পার্‌ছে না। তার ডানার ঝাপটা মারা এবং ছট্‌ফটানি দেখে তার ভারি দয়া হলো। সে এগিয়ে গিয়ে জালটা একটু তুলে ধর্‌লে; ফাঁক পেয়েই পাখীটা 'ফুস্' করে বেরিয়ে পড়ে একটা গাছের ডালের উপর বসে তাকে বল্‌লে—আমি পাখীদের রাজা, যদি তোমার কখনো কোনো বিপদ হয়, আমায় স্মরণ করো, আমি তোমাকে উদ্ধার কর্‌ব। তারপর সে নীল আকাশে কোন্ অসীমের দিকে উড়ে চলে গেল।

গহ্বরের কাছে এসে, সেই অদৃশ্য টুপিটা মাথায় দিয়ে হিরণ জুতাকে তার বোনের কাছে নিয়ে যেতে বল্‌লে। তখনই সে একটা ঘুটঘুটে অন্ধকার সুড়ঙ্গ পথ দিয়ে নেমে প্রকাণ্ড এক অট্টালিকায় এসে উপস্থিত হলো। দিদির কাছে গিয়ে সে দেখে যে, তার আদরের বোনটী মাটিতে লুটিয়ে পড়ে ফুলে ফুলে কাঁদ্‌ছে।

হিরণ মাথা থেকে অদৃশ্য টুপিটা খুলে ফেল্‌লে। চিত্রা তখন তার ছোট ভাইটীকে দেখতে পেয়ে নিজের কষ্টের কথা ভুলে আনন্দে একেবারে আত্মহারা হয়ে তাকে কোলে তুলে চুমো দিতে দিতে বল্‌লে—লক্ষ্মী ভাইটী, শীগ্‌গির আমাকে এ বাড়ী থেকে নিয়ে চলো, এখানে থাক্‌লে আর আমি বাঁচব না। তারপর তার ভাইটীকে সে সেখানকার বিবরণ সব খুলে বল্‌তে লাগল;—একটা দৈত্য তাকে ধরে নিয়ে এসেছে। সে তাকে বিয়ে কর্‌বার জন্য প্রত্যহ কী ভয়ানক জ্বালাতনই না করে! বার বার কাকুতি-মিনতি করে, হাতে পায়ে ধরেও তার কবল থেকে সে মুক্তি পায় নি! বেশী কিছু বল্‌তে গেলে শয়তানটা তার বিশ্রী কদাকার মুখ বিকৃত করে ভয় দেখায়—ভালয়-ভালয় কথা না রাখলে তাকে সে জোর করে বিয়ে কর্‌বে। দুনিয়ার কাউকে সে ভয় করে না; সে নাকি অমর!

সব কথা শুনে হিরণ তার দিদিকে বল্‌লে—এবার যখন সে পাজিটা আস্‌বে, তুমি তাকে জিজ্ঞাসা কোরো সকলকেই যখন একদিন মর্‌তে হবে, তখন সেই বা মর্‌বে না কেন? এ কথা ভেঙে বল্‌লে তবেই তুমি তাকে বিয়ে কর্‌তে পার।

সহসা সেই বিশাল পুরী ভূমিকম্পের মত থর্ থর্ করে কেঁপে উঠল। ঝড়ের মত শোঁ শোঁ করে একটা ভীষণ শব্দ হতে লাগল। চিত্রা হিরণকে বল্‌লে—শয়তানটা এইবার আস্‌ছে।

হিরণ তাড়াতাড়ি তার টুপিটা মাথায় দিয়ে একপাশে সরে দাঁড়াল।

দৈত্যটা এসেই চিত্রাকে বল্‌লে—তুমি আমাকে বিয়ে কর্‌বে, না চির-জীবন এম্‌নি করে কেঁদেই কাটাবে?

চিত্রা তাকে বল্‌লে—আমি তোমায় বিয়ে কর্‌ব, কিন্তু তুমি আগে বল, কেন তোমার মৃত্যু হবে না।

শয়তানটা বিকট হাসি হেসে বল্‌লে—ও তুমি আমাকে মারবে! সে আশা দুরাশা, তা কখনো পারবে না। যাতে আমার মরণ, কেউ জানে না। সমুদ্রের নীচে লোহার সিন্ধুকের মধ্যে একটা শাদা ঘুঘু পাখীর পেটের তলায় একটা ডিম আছে, যদি কেউ সেই ডিমটা এনে আমার মাথার উপর ভাঙতে পারে, তবেই হবে আমার মরণ। কেমন পার্‌বে? বলেই সে আবার দাঁত বের করে হাস্‌তে লাগল। তারপর সে চিত্রার কাছে সরে এসে বল্‌লে—যা জানতে চেয়েছ, তা তো বল্‌লুম, তুমি এখন আমাকে বিয়ে করে তোমার কথা পালন করো।

চিত্রা মিনতি-ভরা কণ্ঠে বল্‌ল—তিন দিন সময় দাও আমাকে, তারপর বিয়ে হবে।

দৈত্যটা ভারী খুশী হয়ে হাস্‌তে হাস্‌তে পুরী থেকে বেরিয়ে চলে গেল।

সে চলে যেতেই হিরণ তার টুপিটা খুলে ফেলে দিদির কাছে এসে আনন্দে চীৎকার করে বলে উঠল—দিদি, তোমার কষ্ট ফুরিয়ে এসেছে; আর তোমায় এখানে থাক্‌তে হবে না। আমি চল্‌লুম ডিম আন্‌তে। তিন দিনের মধ্যেই ডিম নিয়ে ফিরব। তারপর সে জুতোকে ডেকে তাকে সমুদ্রের তীরে নিয়ে যেতে আদেশ কর্‌লে।

চিত্রা তার আদরের ভায়ের সাহস ও বুদ্ধি দেখে একেবারে অবাক্ হয়ে গেল। তার মুখে ফুঠে উঠল হাসির রেখা।

(৪)

সমুদ্র তীরে এসে হিরণ মাছের রাজাকে ডাক্‌তে লাগল। একটু পরেই পূর্ব্বের সেই মাছটা উপস্থিত হয়ে তাকে বল্‌লে—আমি তোমার কি কাজে লাগতে পারি বল?

তখন সে তাকে সমুদ্রের তলায় যে লোহার সিন্ধুকটা আছে, সেটাকে আন্‌তে বল্‌লে।

মাছের রাজা অন্যান্য মাছদের ডেকে বলে দিলে—শিগ্‌গির সিন্ধুক আন্‌বার বন্দোবস্ত কর। একটু পরেই ভৃত্য এসে মৎস্যরাজকে খবর দিলে যে, অনেক মাছের প্রাণ নষ্ট হলো, কিন্তু কেউ সিন্ধুক নাড়াতেও পার্‌ছে না। রাজা তখন তিমি মাছকে ডেকে হুকুম কর্‌লে তার আদেশ পালন কর্‌তে।

অল্পক্ষণের মধ্যেই সে সেই ভারী সিন্ধুকটাকে টান্‌তে টান্‌তে ডাঙায় নিয়ে এল।

হিরণের কাছে যে অদ্ভুত চাবিটা ছিল, তা দিয়ে তালাটা খুলে তাড়াতাড়ি সে ডালাটা তুলে ধর্‌তেই ঘুঘু পাখীটা তার ডিম মুখে করে উড়ে চলে গেল। হিরণ ডিম উদ্ধারের আশায় নিরাশ হয়ে ধপ করে মাটিতে বসে পড়ল।

তাকে কিন্তু বেশীক্ষণ এ ভাবে ভাবতে হলো না; একটু পরেই পাখীদের রাজার কথা তার মনে পড়ে গেল। তখন সে তাকে একমনে স্মরণ করতে লাগল। দেখতে দেখতে পক্ষীরাজ সেখানে উপস্থিত হয়ে তার কি প্রয়োজন জান্‌তে চাইলে।

হিরণ তাকে তখন সেই ঘুঘু পাখীর ডিম এনে দিতে বল্‌লে। এই কথা শুনে সে সব পাখীদের তলব কর্‌লে। একে একে সকলেই রাজার কাছে হাজির হলো; কিন্তু সেই পাজি শাদা ঘুঘুটাকে দেখতে পাওয়া গেল না। রাজা তখন কাঠঠোক্‌রা আর হাড়গিলে এই দুজন পেয়াদাকে তার সন্ধানে পাঠালে। তারা অনেক খুঁজে ডিম সমেত সেই শাদা ঘুঘুটাকে ঠোক্‌রাতে-ঠোক্‌রাতে রাজার কাছে এনে হাজির কর্‌লে।

হিরণ ডিমটা তুলে নিয়ে সমস্ত মাছ ও পাখাদের ধন্যবাদ জানিয়ে বিদায় গ্রহণ কর্‌লে। তারাও যে যার কাজে চলে গেল।

তখন সে টুপিটা মাথায় দিয়ে জুতো জোড়াকে বল্‌লে—শীগ্‌গির আমাকে সেই দৈত্যের বাড়ীতে নিয়ে চল। দেখতে দেখতে সেখানে উপস্থিত হয়ে দেখে—শয়তানটা তার দিদিকে বিয়ে করবার জন্য খুব তম্বিতম্বা কর্‌ছে; সে এক কোণে বসে আপন মনে ঝর্‌ঝর্ করে চোখের জল ফেল্‌ছে।

দৈত্যটা তাকে শাসাচ্ছে শিগ্‌গির বিয়ের যোগাড় করো; আমি এখনই ফিরে আস্‌ছি। মনে থাকে যেন, আজ তিন দিন শেষ হয়ে যাবে।

সে চলে যেতেই হিরণ মাথার টুপিটা খুলে ফেলে দিদির সামনে এসে হাস্‌তে হাস্‌তে বল্‌লে—নাও দিদি, ডিম এনেছি। এর পর যখন সেই পাজিটা আস্‌বে আদর করে তার মাথায় হাত বুলিয়ে দিতে দিতে এক সময় ফট্ করে ডিমটা ভেঙে ফেলো।

একটু পরেই দৈত্য ফিরে এল। তারপর সে চিত্রার হাতটা নিজের হাতের মধ্যে তুলে নিয়ে বল্‌লে—কই বিয়ে কর আমায় এবার। আজ খুব ভাল দিন।

চিত্রা মুচকে হেসে ভুরু কুঁচকে তাকে বল্‌লে—বিয়ে কর্‌ব বই কি! আজই তোমার বিয়ে হবে। তারপর সে আদর করে তার মাথায় হাত বুলিয়ে দিতে লাগল।

দৈত্যের স্ফুর্ত্তি আজ দেখে কে! আনন্দের নেশায় বিভোর হয়ে তার মন তখন কোন্ কল্পলোকের দিকে উধাও হয়ে চলে গিয়েছিল। অকস্মাৎ চিত্রা তার মাথায় ফট করে ডিমটা ভেঙে ফেল্‌তেই দানবটা একটা বিকট চীৎকার করে মাটিতে লুটিয়ে পড়ল। সঙ্গে সঙ্গে দেহ-পিঞ্জর থেকে তার প্রাণ-পাখাও উড়ে বেরিয়ে গেল।

হিরণ টুপিটা খুলে ফেলে ছুটে এসে তার দিদিকে জড়িয়ে ধরলে। চিত্রা আনন্দে আত্মহারা হয়ে ভাইটীকে কোলে টেনে নিয়ে চুম্বনে চুম্বনে তাকে আচ্ছন্ন করে দিলে।

দৈত্য চিত্রার বিয়ের জন্য অনেক ধনরত্ন, মণি-মাণিক্য এনেছিলো। তারা ভাইবোনে সেইগুলো একটা খুব বড় থলেতে ভরে নিয়ে দু-জনে হাত ধরাধরি করে বাড়ীর দিকে রওনা হয়ে পড়ল।

বাড়ী এসে দেখে মা তাদের জন্য কেঁদে কেঁদে কী এক রকম হয়ে গেছে! হারানো ছেলে-মেয়েকে দেখতে পেয়েই বুড়ী তাদের বুকে জড়িয়ে ধরলে। হারানিধি ফিরে পেয়ে তাঁর আনন্দ আর ধরে না। গৃহে তখন আনন্দ-উৎসবের স্রোত বয়ে চল্‌ল। কিছুদিন পরে প্রতিবেশী ও দীন-দরিদ্রগণকে তারা ভুরিভোজে আপ্যায়িত কর্‌তে লাগল।

বেশী লোভ করতে নেই : দেবশর্মা চিত্রিত
আকাশে পাখী উড়ছে দেখে, জলার পাড়ে শুয়ে শুয়ে ব্যাঙ ভাবে—আমি যদি উড়তে পারতুম!…
বককে মিনতি জানায়—আমিও আকাশে উড়বো!… বক বোঝায়—পাখা নেই…যদি পড়ে যাও!….
ব্যাঙ বলে—ভাবছো কেন…পায়ে-জড়ানো ঐ লতা ধরে ঝুলবো! বক বোঝায়—যদি ফশ্‌কে পড়ো তো বেঘোরে প্রাণ যাবে!
ব্যাঙ নাছোড়বন্দা! বক ব্যাঙকে নিয়ে উড়লো! ব্যাঙের সাধ— আরো, আরো উঁচুতে উড়বে সে…
অনেক উঁচুতে উঠে ব্যাঙ ভাবলো—কেন মিছে লতা ধরে ঝুলি…নিজেই উড়বো!…লতা দিলে ছেড়ে…
সোজা সোজা আকাশের বুক থেকে ছিটকে নীচে পাহাড়ের মাথায় পড়ে মরলো ব্যাঙ!…
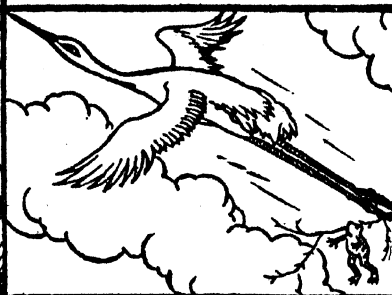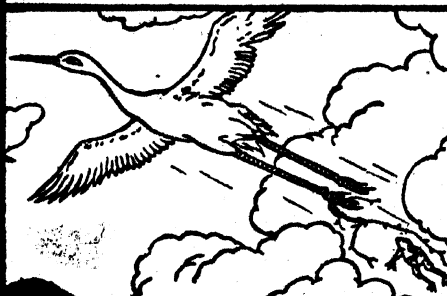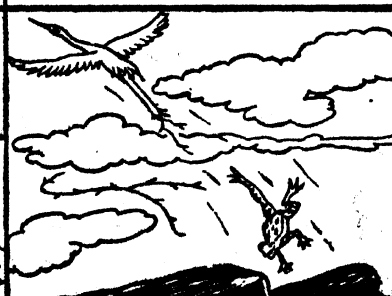
দেবপ্রয়াগে কয়েকঘণ্টা

শ্রীহরেন্দ্রনাথ মজুমদার

অখিল ভারত প্রাথমিক শিক্ষক সঙ্ঘের ওয়ার্কিং কমিটির সভা ২৮শে জুলাই তারিখে হরিদ্বারে স্থির করে অনুমতি চেয়ে চিঠি দিলেন সঙ্ঘের সম্পাদক শ্রীজগদীশ মিশ্র। হরিদ্বার কেদারবদ্রীনারায়ণের প্রবেশ দ্বার—ভারতের তীর্থসমূহের মধ্যে প্রধানতম বলা যেতে পারে—সাধু সন্তদের আরাধ্য স্থান। প্রস্তাবটা ভালই লাগল এবং সানন্দে অনুমতি দিলাম। ২৬শে রাত ৮.৫০ মিঃ দেরাদুন এক্সপ্রেস ট্রেণে রওনা হলাম ; সঙ্গে রইলেন বন্ধুবর শ্রী রবীন্দ্রনাথ বারিক, প্রদেশ শিক্ষক সমিতির সম্পাদক এবং অনুজপ্রতিম শ্রীসুশীলকুমার সাবুই। হরিদ্বার ষ্টেশনে গাড়ী সকাল ৬॥০টায় পৌঁছিবা মাত্র প্ল্যাটফরমে দণ্ডায়মান উত্তর প্রদেশের হরিদ্বার জেলার শিক্ষকবৃন্দ অভ্যর্থনা জানালেন। ভারী ভাল লাগে প্রাণভরা আন্তরিক এই ভালবাসা—যেন কতদিনের নিবিড় পরিচয় তাঁদের সভাপতির সঙ্গে। অবস্থানের জন্য রিটায়ারিং রুম ঠিক ক'রে রেখেছিলেন তাঁরা, সেখানে পৌঁছিবার সঙ্গে সঙ্গেই দাবী জানালেন তাঁদের সঙ্গে বসে চা খাবার। ২০ মিনিটে তৈরী হব আশ্বাস দিয়ে মুখ হাত ধুয়ে নিলাম। রবীনবাবু এবং সুশীলবাবু চলে গেলেন হরিদ্বারে গঙ্গায় অবগাহন স্নানের জন্য। ইচ্ছা থাকলেও শিক্ষকদের ক্ষুণ্ণ করতে বাধল…তাঁদের সঙ্গে চায়ে যোগ দিতে গেলাম নগরপালিকা পরিচালিত বিদ্যালয়ে। চা শেষ করে অখিল ভারত প্রাথমিক শিক্ষক সঙ্ঘের সম্পাদক শ্রী জগদীশ মিশ্রের সঙ্গে গঙ্গার দৃশ্য দেখবার জন্য বেরিয়ে পড়লাম, পথে রবীনবাবু ও সুশীলবাবুর সঙ্গে দেখা—তাঁরা ফিরছেন স্নানান্তে। তাঁদেরও সঙ্গে নিলাম। প্রশস্ত সোপান শ্রেণী অতিক্রম করেই সামনে গঙ্গা—বেগবতী স্রোতস্বিনী—উদ্দাম বেগে জলরাশি ছুটে চলেছে—দক্ষিণে পারাপারের সেতু আছাড় খেয়ে পড়ছে তার স্তম্ভগুলির উপর। সামনেই ব্রহ্মকুণ্ড—স্নানরত বিভিন্ন প্রদেশের অজস্র নরনারী হৃদয়ে অপরিসীম ভক্তি—হরিদ্বারে পবিত্র গঙ্গাবক্ষে অবগাহনে পুণ্য সঞ্চয় করছেন। ঘুরে ঘুরে ব্রহ্মকুণ্ডের উপরের মন্দিরগুলি, দেবালয়—রামসীতার মূর্তিই প্রধান—গঙ্গাজীর পূজার্চনা হয় তাঁর মন্দিরে। ব্রহ্মকুণ্ডের কিছুদূরেই নেতাজীর জঙ্গী পোষাক পরিহিত সাড়ম্বর মর্ম্মর মূর্তি। দেখে আনন্দ হ'ল। গঙ্গার উদ্দাম জলস্রোত নেতাজীর উদ্দাম জীবন-স্রোতেরই প্রতিরূপ। সেইজন্য এই স্থানে মূর্তি স্থাপন উপযুক্ত হইয়াছে। দক্ষিণের পারাপারের সেতু পার হয়ে অপর পারে দেবালয় অপেক্ষাকৃত শান্ত পরিচ্ছন্ন পরিবেশ। এখানে ঘাটে প্রশস্ত সোপানশ্রেণী গঙ্গাবক্ষ পর্য্যন্ত প্রসারিত। সোপানের সঙ্গে লোহার শিকল গাঁথা, স্নানার্থীরা শিকল ধরে দুর্ব্বার স্রোতের মধ্যে যাতে নির্ভয়ে অবগাহন করতে পারে। গঙ্গা স্পর্শ করলাম—জল হিম-শীতল—ভারী ভাল লাগল, চোখ মুখ মাথা শীতল বারি স্পর্শে স্নিগ্ধ হ'ল। ওপার থেকে চেয়ে সামনের পাহাড়ের শীর্ষে দেখা গেল মনসা দেবীর মন্দির।

তাগাদা এল মধ্যাহ্নের আহার প্রস্তুত। খাওয়ার পরই অধিবেশন আরম্ভ, হলে ফিরতে হ'ল। অধিবেশন বেলা ৪টা পর্য্যন্ত চলল। অধিবেশনের পর ওয়ার্কিং কমিটির সদস্য অসমীয়া বন্ধু শ্রীগৌরালাল পাটোয়ারী এম, এল, এর সনির্ব্বন্ধ অনুরোধে মস্কো ও চীনের জন্য যে ডেলিগেশান পাঠান অধিবেশন স্থির করেছেন তাঁদের ফটো নেওয়ার জন্য বসতে হ'ল।

অধিবেশনের পর বেরিয়ে পড়লাম ট্যাক্সি নিয়ে হৃষীকেশ ও লছমন-ঝোলা দেখার জন্য। হৃষীকেশে দ্রষ্টব্য মন্দিরগুলি দেখার পর [illegible] ত্রিবেণী ঘাট। এখানে গঙ্গাবক্ষ বিস্তৃত—অগণিত নরনারী গঙ্গাবক্ষে সুন্দর ছোট ছোট দীপ ভাসিয়ে পুণ্যার্জ্জন করছেন—ছোট ছোট অসংখ্য প্রজ্বলিত ক্ষুদ্র দীপাবলী সুন্দর শোভা সৃষ্টি করেছে। কৌতুহলী ২।৪ পয়সার মুড়ি মুড়কি ছড়িয়ে যে বিরাট বিরাট আহারান্বেষী মৎস্য [illegible]
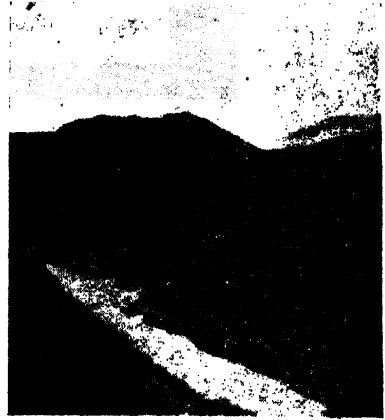
দেবপ্রয়াগ—গঙ্গা ও অলকানন্দার সঙ্গম স্থল

ফটো—লেখক

দিকে আকর্ষণ করে নিয়ে আসছেন তাহা দেখার জন্য বহু লোক ভীড় করে রয়েছে। গঙ্গার সন্নিকটেই বাঙ্গালী সন্ন্যাসীর দাতব্য চিকিৎসালয়। ভারপ্রাপ্ত চিকিৎসকের সঙ্গে আলাপ হ'ল। অতি অমায়িক সদালাপী ভদ্রলোক—প্রথম জীবনে সংসার বন্ধন ছেড়ে সন্ন্যাস নিয়েছেন এবং জনসেবার মধ্যে নিজেকে বিলিয়ে দিয়েছেন। চিকিৎসালয়ের কথা বললেন—অর্থ সঙ্কটের মধ্য দিয়ে চলেছে। বাংলা দেশের কোন দানবীর লক্ষ টাকা দেবেন প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন, কিন্তু ২০ হাজার টাকা দেবার পর তাঁর জীবনান্ত হওয়ায় ঐ টাকা আর পাওয়া যায় নাই। বিশ

হাজারেই বাড়ী ও চিকিৎসালয় যেটুকু হয়েছে তার বেশী আর করা যায় নি। এর প্রতিষ্ঠাতা স্বামী কৃষ্ণানন্দ বৃদ্ধ হ'য়ে পড়েছেন, সেজন্য বাংলা দেশে গিয়ে দান সংগ্রহ করাও সম্ভব নয়। এই সব প্রতিষ্ঠান বাঙ্গালীর সেবাধর্ম্মের পরিচয় দেয়—এদের বাঁচিয়ে রাখা আমাদের কর্ত্তব্য।

হৃষীকেষ থেকে ৩ মাইল দূরে লছমন ঝোলায় যাবার জন্য বেরিয়ে পড়লাম। গন্তব্য স্থানে পৌছিবার কিছু আগে গঙ্গার অপর পারে মন্দির-শ্রেণী ও টাওয়ার প্রত্যেকের দৃষ্টি আকর্ষণ করবেই। এপার থেকে ছবি নেওয়া হল। গাইড হিসাবে সঙ্গে ছিলেন এখানকার শিক্ষক শ্রীহরিহর শর্ম্মা এবং পাঞ্জাবের শিক্ষক প্রতিনিধি শ্রীযোগীন্দ্র সিংজী। লছমন-ঝোলার কিছু আগেই গাড়ী রেখে হেঁটে বেশ কিছুদূর নীচে নামতে হ'ল। রোপওয়ে—দুদিকে তারের দড়ি থেকে ঝোলাটী ঝুলিয়ে দেওয়া হয়েছে গঙ্গা পারাপারের জন্য—পূর্ব্বে এইটি পার হয়ে যাত্রীর দল কেদারনাথ বদ্রীনাথের পথে পদযাত্রা সুরু করতেন। বর্ত্তমানে কেদারনাথের ২৯

হরিদ্বার—হর—কি—পেয়ারী ঘাট

ফটো—লেখক

মাইল পূর্ব্ব পর্যন্ত রাস্তা তৈয়ারী হ'য়েছে গঙ্গার এপারের পর্ব্বতশ্রেণীর উপরে—ওপারের পায়ে চলার পথের অপরিসীম কষ্ট লাঘবের জন্য। কিন্তু পায়ে চলার পথে গঙ্গা অলকানন্দা ভাগীরথীর কূলে কূলে ও হিমালয়ের ঝোপ জঙ্গলে পাথরের ভিতর দিয়ে হাঁটার পথে যে অনুভূতি লাভ হ'ত—দৃষ্টির যে অপূর্ব্ব আনন্দ উপভোগ করত, তা রাজপথের মোটর ভ্রমণের মধ্যে পাওয়া যাবে না। লছমনঝোলা পার হ'য়ে গাড়োয়ালী রাজ্য—ভারত ভুক্তির পর এখন উত্তর প্রদেশের শাসনাধীন। মন্দির ও দেবমূর্ত্তি গতানুগতিক। আমাদের গাইড শর্ম্মাজী বললেন, গঙ্গার পরপারে দেখা গীতা-ভবন, শান্তি স্তম্ভ দেখবার মত—প্রায় এক মাইল দূরে। পায়ে হেঁটে এক মাইল পথ অতিক্রম করে এসে পৌছিলাম কালীকমলীওয়ালার গদি ও যাত্রীনিবাসে। সারা হিমালয়ের পথে পথে এই কালী-কম্বলী-ওয়ালার যাত্রী নিবাস ও ধর্ম্মশালা তীর্থযাত্রী সাধারণের পথকষ্ট লাঘবের জন্য সাময়িক আশ্রয় দান করে আসছে যুগ যুগ ধরেই।

যাত্রীনিবাসের পাশ দিয়ে নেমে যেতে হয় গীতা ভবন, স্বর্গ আশ্রম ও পরমার্থ নিকেতনের দিকে গঙ্গার কিনারায়। গীতা ভবনের দেওয়ালসমূহে গীতার সকল অধ্যায় ছবি ও লেখার সাহায্যে ফুটিয়ে তোলা হয়েছে। পরিবেশ মনোমুগ্ধকর। গঙ্গার নীচে পর্য্যন্ত সিঁড়ি নেমে গেছে একপ্রান্ত হইতে, আর একপ্রান্তে চত্তর এবং প্রশস্ত বাঁধান স্থানসমূহ। এইখানে গঙ্গার উপর বসে ঈশ্বরের নাম চিন্তা ও বিশ্রামালাপ করছে বহু নরনারী। জলের স্পর্শ হিমশীতল। দেড় মাইল রাস্তা হাঁটার পর এইখানে গঙ্গাতীরে শীতাতপ-নিয়ন্ত্রিত ঘরের ঠাণ্ডা আবহাওয়ার মত আবহাওয়া অনুভব করলাম, উপরন্তু খোলা আকাশের নীচে হিমস্পর্শ অনুভব করে পরিশ্রমের পর শরীর জুড়িয়ে গেল। এখানে বহু যাত্রীদল ২২ দিন থাকেন। থাকার বন্দোবস্তও আছে—৩দিন থাকলে শরীর ও মনের ওপর শান্তির প্রলেপ এনে দেবে। এক চটীতে চা ও পুরি মিলল, তাই খেয়ে বেরিয়ে পড়লাম ফেরার পথে। পূর্ণিমার চাঁদ উঠেছে—গাছের ফাঁকে ফাঁকে চাঁদের আলো ছড়িয়ে পড়েছে, সেই আলোয় পথের দিশা মিলছে। গাইড শর্ম্মাজী সঙ্গে, ভাবনার কারণও নেই সেজন্য। লছমনঝোলা পার হয়ে খাড়াই উঠ্‌তে বেশ কষ্ট অনুভব হচ্ছে।

আস্তে আস্তে এগিয়ে চললাম। সাথীরা সবাই দৃষ্টির বাইরে—দেরী দেখে সুশীলবাবু নামছেন সন্ধানে। যা হক তাঁকে আশ্বস্ত করে, কষ্ট চেপে জোরেই খাড়াই পার হয়ে গাড়ীর কাছে পৌছিলাম। আমাদের সবাইকে নিয়ে গাড়ী হরিদ্বারের দিকে ছুটল। ফেরার পথে কথা হ'ল—কেদার-বদরীর পথে যতদূর যাওয়া যায় কাল বেরিয়ে পড়তে হবে মোটরে। যেমন কথা অমনি দরদস্তুর ঠিক হয়ে গেল। গাড়ী সেভ্রলে বড় সুন্দর মজবুত গাড়ী—তার চেঁয়েও মজবুত তার ড্রাইভার—শক্ত হাতে ষ্টিয়ারিং ধরে ঝড়ের বেগে চালায়—গাড়ীর ওপর কণ্ট্রোলও অদ্ভুত। রাত্রে ফিরতে সাড়ে দশটা বেজে গেল, রেলের রিফ্রেসমেণ্ট রুম বন্ধ হ'য়ে গেছে, কাজেই রাত্রের খাওয়া আর হল না। সকাল ৬।টায় প্রস্তুত হ'য়ে থাক্‌তে হবে, গাড়ী তার আগেই আস্‌বে। কেদার বদরীর পথে এক মুখো রাস্তা, অর্থাৎ one way traffic. সেইজন্য ফাষ্ট' গেটের সঙ্গে যেতে হবে। তার মানে প্রথম যাত্রীবাহী গাড়ীর সঙ্গে বেরিয়ে পড়তে হবে, না হলে ফিরতি গাড়ী যতক্ষণ না হৃষীকেশ পৌছিবে ততক্ষণ এদিক থেকে গাড়ী ছাড়া হবে না অর্থাৎ ৩য় গেটের গাড়ী ছাড়বে না—অন্যথায় পথের সরু রাস্তায় বিপরীত-মুখী গাড়ী পরস্পরকে অতিক্রম করতে পারবে না। হৃষিকেশের মুখ থেকে গাড়ী ছেড়ে প্রথম হল্ট ১৯ মাইল দূরে বিয়াণী বলে জায়গা; সেখান পর্য্যন্ত গাড়ী পৌছিলে তবে উল্টা দিকের যাত্রীবাহী গাড়ী সেখানে থেকে ছাড়বে। সেইখানে উভয় দিকের গাড়ী পরস্পরকে অতিক্রম করবে।

সোমবার ২৮শে জুলাই সারাদিন আবহাওয়া বেশ ভালই ছিল, দুপুরে প্রচণ্ড রোদে হর-কি-পেইড়ি ঘুরতে বেশ কষ্টই হয়েছে। মনে বেশ আনন্দ—রৌদ্রকরোজ্জল দিনে ভালয় ভালয় কেদার বদরীর পথে বেরিয়ে পড়ব। ইচ্ছা টেরী-গাড়ওয়াল রাজ্যের নরেন্দ্র নগরও ফেরার পথে দেখে ফিরব।

মাঝ রাত্রে অবিশ্রান্ত বৃষ্টির শব্দে ঘুম ভেঙ্গে গেল। বৃষ্টির বিরাম নাই—ভোরের দিকে বৃষ্টির জোর—কমলে সবাইকে ডেকে তুললাম—হিমালয়ের সরু পথে বৃষ্টির পর যাওয়া সঙ্গত হবে কি না—ধ্বস নামলে গাড়ী ফেরান যাবে না—এইসব বিবেচনা করে যাত্রা স্থগিত রাখারই সিদ্ধান্ত হ'ল। তার ওপর চালকের গাড়ী নিয়ে ৫৷৷• টার মধ্যে আসার কথা; গাড়ীও যখন আসেনি তখন বোধহয় ড্রাইভারও যাওয়া সঙ্গত মনে করেনি। চা টোষ্ট দিয়ে গেল, খাওয়া সাঙ্গ হওয়ার পূর্ব্বেই গাইড শর্ম্মাজী ও পাঞ্জাবের যোগীন্দ্র সিংজী গাড়ী নিয়ে এসে হাজির—বললেন যাওয়া হবে, গাড়ী আট্‌কাবে না। স্নান সেরে বেরুনার কথা। সময় নেই। ভাগীরথী ও অলকনন্দার সংযোগ স্থলে স্নান সারা হবে। কাপড়-চোপড় তেল গামছা সেজন্য নেওয়া হ'ল। ছবি তোলার জন্য ক্যামেরাও সঙ্গে রইল। সাড়ে ছয়টায় যাত্রা সুরু—হৃষিকেশ পৌঁছে প্রথম গেটেই প্রথম বাসের পেছনে আমরা হিমালয়ের পথে এগিয়ে চললাম। আস্তে আস্তে সর্পিল পথে ঘুরে ঘুরে হিমালয়কে বেষ্টন করে গাড়ী চলেছে। পেছনেও শ্রেণীবদ্ধ বাসগুলি এগিয়ে আসছে। বাঁদিকে সুউচ্চ পর্ব্বতরাজী, দক্ষিণে খাদের নিম্নতা ক্রমেই বাড়ছে। দক্ষিণে বিপরীত দিকের পর্ব্বতের গা দিয়ে সরু পায়ে-হাঁটা পথ, কত যুগ ধরে পুণ্যাত্মা, দর্শনলোভী হিমালয়ের রূপ অন্বেষণকারী যাত্রীদল চলেছে অজানার উদ্দেশ্যে। সরুপথ, সর্পিল আকারে—ওপারের পর্ব্বতগাত্রে কখনও চড়াই, কখনও উৎরাই। মধ্যে গঙ্গাজী গত রাত্রের পাহাড় গাত্রের বৃষ্টির জল ধারায় পুরিপুষ্ট হয়ে উদ্দাম নৃত্যে সমতল ভূমির দিকে ছুটছে।

এ এক অপূর্ব্ব দৃশ্য—আমরা ছুটে চলেছি—সঙ্গে সঙ্গে বিপরীত দিকে পর্ব্বত গাত্রে যুগ যুগান্তর মানবের পায়ে হাঁটা পথ—কখনও উৎরাই গঙ্গার কিনারা ঘেঁসে, কখনও বা চড়াই উঠে পর্ব্বত গাত্রে লুকিয়ে যাচ্ছে। আবার হয়ত দুই পাহাড়ের মধ্যে ছোট ঝরণা বা নালা পার হওয়ার জন্য ছোট্ট সাঁকো দেখা যাচ্ছে। উপরের দিকে চেয়ে চেয়ে মনে হ'ল ঐ শাশ্বত পথই তো ভাল ছিল। ঐ পথ দিয়ে কতশত মুনিঋষি হিমালয়ের কন্দরে কন্দরে ভ্রমণ করেছেন তপস্যার জন্য, ঐ পথ দিয়েই তো তাঁরা তাঁদের সাধন স্থান বেছে নিয়েছেন, তাঁদের চরণ-রেণু-ধন্য ঐ পথ যুগ-যুগান্তর মানবের মুক্তিপথ বলেই তো মানুষ সমস্ত কামনা বাসনা পরিত্যাগ করে একাগ্র হয়ে ছুটে যায় তার ইষ্টের দর্শনে। হিমালয়ের যে রূপ সেতো উপলব্ধি করবে তার বুকের পাথর মাটী স্পর্শ করে, নয়নভরে চারিদিকে চেয়ে তার রূপের জ্যোৎস্নায়—চটীতে চটীতে যাত্রীদলের সাক্ষাৎ, পরস্পর কুশলবার্ত্তা, পরস্পরের প্রতি সহানুভূতি—সবাই যেন এক মন—আবার পরস্পর ছাড়াছাড়ি।

হিমালয়ের বুকের সরল মানুষের সঙ্গে ঐ পথেই তো সাক্ষাৎ মিলে, তাদের ঘরকন্না, তাদের হাসিমুখ সে ওতো এক অনুভূতি সৃষ্টি করে সবার মনে। মনে হয় রাজপথে দ্রুতগামী যানে গন্তব্য স্থানে পৌঁছান যাবে, কিন্তু হিমালয়ের আত্মার পরিচয় মিলবে না।

প্রায় দশ মাইল যাওয়ার পরে সামনের বাস হঠাৎ দাঁড়িয়ে যায়, গত রাত্রের বর্ষায় ধ্বস নেমেছে—ছোট ছোট পাথরে রাস্তা বোঝাই। বাসেই কুলির দল শাবল গাঁইতি নিয়ে হাজির ছিল, পাথরের স্তুপ সরিয়ে যাত্রা-পথ পরিষ্কার করল। শ্রেণীবদ্ধ গাড়ী আবার এগিয়ে চলল। প্রায় দু মাইল যাওয়ার পর হঠাৎ ওপর থেকে এক পাথর পড়ল ঠিক আমাদের গাড়ীর মাডগার্ড ঘেঁষে। পর মুহূর্ত্তে ভীষণ শব্দ করে সামনে বিরাট আকারের পাথর পড়ে রাস্তা দিয়ে গড়িয়ে খাদের ভিতর গড়িয়ে গেল। এক মুহূর্ত্ত পরে না হ'লে আমাদের গাড়ী ও সেই সঙ্গে আমরা ভগবানের করুণায় সবাই রক্ষা পেতাম না। পাহাড়ের গা কেটে রাস্তা—কোথাও বা ডিনামাইট দিয়ে বিরাট পাথরের স্তুপ উড়িয়ে দেওয়া হ'য়েছে, কিন্তু রাস্তার ওপরে উচুতে ছত্রাকারে পাহাড় ঝুলে রয়েছে—যে কোন মুহূর্ত্তে হয়ত বর্ষায় ধ্বসে পড়তে পারে। আরও মাইল তিনেক এগিয়ে সামনের গাড়ী দাঁড়িয়ে পড়ল—সঙ্গে সঙ্গে পেছনের সব গাড়ীই থেমে গেল। দুতিনটা বাঁক নিয়ে তাড়াতাড়ি নেমে যা দেখলাম তাতে অন্তরাত্মা শুকিয়ে যায়। সমস্ত রাস্তা জুড়ে ভারী ভারী বিরাট আকারের বহু পাথর রাস্তার বিস্তীর্ণ

কেদার বদরীর পায়ে চলার পথের পারাপারের সেতু
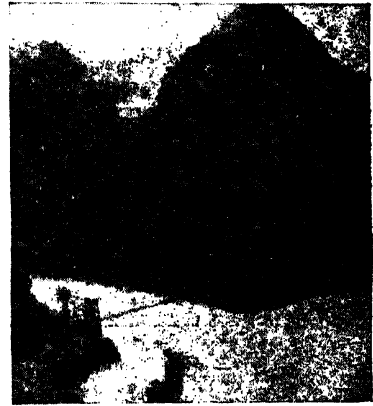
ফটো—লেখক

অংশ জুড়ে পড়ে আছে—পি, ডব্লু, ডি কুলিরা সরানর কাজ আরম্ভ করেছে। ভারী পাথর, ১৪।১৫ জন ধ'রে সরাবার সাধ্য নেই—মোটা মোটা ভারী হাতুড়ি গাঁইতি সাহায্যে ভাঙ্গার চেষ্টা চলছে তবে যদি নাড়াতে পারে। বাসের কুলির দল ও ওখানকার কুলির দলের সমবেত চেষ্টায় প্রায় এক ঘণ্টায় রাস্তা পরিষ্কার হ'ল। আমাদের গাড়ী এবারে পেছনে ছিল, আমাদের ড্রাইভার সর্দ্দারজী গাড়ী কিছুটা পিছে হটিয়ে বললেন, ডানদিকে নীচে বশিষ্ঠ আশ্রম—ইচ্ছা করলে এই ফাঁকে দেখতে যেতে পারি। হিমালয়ের পথে সত্যকারের সাধু সন্ত দেখার প্রবল আগ্রহ মনের কন্দরে ছিল। এই কথা শুনে তখনই পায়ে চলার উৎরাই পথে নামতে সুরু করলাম। পথ ঘুরে ঘুরে নামছে, শর্ম্মাজী দেখালেন—জাতি ফুলের গাছের পাতার মত পাতা এক রকম গাছ জিবের বা মুখের ভেতরের ক্ষত আরাম করবার অব্যর্থ ঔষধ। কিছুদূর নামতেই চোখে পড়ল যাত্রীদের প্রশস্ত বিশ্রামস্থান।

আরও অনেক দূর নেমে গেলাম—তারপর পথ খুব সরু এবং খাড়া নিম্নদিক—যাবখানে কিছুদূর নামার পর পাথর কেটে উঁচু উঁচু ধাপ নামিয়ে দেওয়া হয়েছে বহু নীচে। একটু পরেই গঙ্গার কলধ্বনি শোনা গেল। সমতল ভূমিতে পদস্পর্শ হ'ল। ডানদিকে ফিরে এগিয়ে চলেছি—বেড়া এবং ছোট ফটক ঠেলে ভেতরে প্রবেশ করতেই ফটক বন্ধ হ'য়ে গেল। আশ্রমের কুকুর মানুষের সাড়া পেয়ে চেঁচাতে চেঁচাতে ছুটে এল। আশ্রমবাসী কেউ বোধ হয় কিছু বললেন কুকুরকে। এ্যালসেসিয়ান জাতীয় কুকুর এগিয়ে এল কিন্তু কিছু বলল না—গা ঘেঁষে ঘেঁষে ফিরে চলল আমাদের সঙ্গে। দুদিকে ছোট তরীতরকারীর ক্ষেত পার হ'য়ে আশ্রম সান্নিধ্যে এসে পড়লাম। গুহাভ্যন্তরে আশ্রম—উপরের পাহাড়ের এক অংশ ছত্রাকারে গুহার সামনে কিছুদূর পর্য্যন্ত বিস্তৃত, সেখানে চত্বরের উপর কম্বলাসনে সৌম্য মূর্ত্তি সন্ন্যাসী উপবিষ্ট। পায়ের নীচে শিষ্যবৃন্দ ও শিষ্যা একজন উপবিষ্টা ধর্ম্মগ্রন্থ পাঠ ও আলোচনায় ব্যাপৃত।

দেবপ্রয়াগ—মন্দির ধর্ম্মশালা প্রভৃতি

ফটো—লেখক

আমরা উপস্থিত হওয়া মাত্রই একজন শিষ্য আমাদের হাত ধোয়ার জল দিলেন। হাত মুখ ধুয়ে সন্ন্যাসীর সম্মুখে উপস্থিত হয়ে বসিবার জন্য ইঙ্গিত করিলেন। পরিচয়াদির পর জিজ্ঞাসা করলাম—মুক্তির সাধনায় সদ্‌গুরুর আবশ্যক কি না এবং গুরু কি নিজ হতে আসবেন, না তাঁর অনুসন্ধান করতে হবে? উত্তরে বললেন—নিশ্চয়, মনের ইচ্ছা প্রবল হলেই গুরু পাবেই। প্রয়াস প্রয়োজন। সৌম্যদর্শন সন্ন্যাসীর নাম স্বামী পুরুষোত্তমানন্দ। গৃহজীবনে তিনি মালয়ালাম। তাঁর একজন সন্ন্যাসী শিষ্য বাংলায় আমাদের সঙ্গে কথাবার্ত্তা বললেন। তিনি ১৬ বৎসর পূর্ব্বে এঁর শিষ্যত্ব গ্রহণ করে—ঐ গুহা কন্দরে স্বামীজির সেবা ও ধর্ম্মসাধনা করছেন তাঁর কাছে শুনলাম। স্বামীজি হিন্দি ও ইংরাজি উপদেশ পুস্তক দিলেন ও শিষ্যকে গুহাভ্যন্তর দেখাবার নির্দ্দেশ দিলেন। গুহাভ্যন্তর ১ রশি পরিমিত লম্বা এবং ১০ ফুট চওড়া। গুহার মুখ গাঁথিয়ে ঘরের মত করা হইয়াছে, ভিতরে শেষ প্রান্তে বেদীতে শিবলিঙ্গ আসীন এবং সম্মুখে চক্রাকার বেদীতে স্বামীজির বসিয়া পূজার্চ্চনা ও উপাসনা স্থান। বাঙ্গালী সন্ন্যাসী বললেন এবং ৩৫ বৎসর পূর্ব্বে যখন স্বামীজি প্রথম আসেন তখন দূর গ্রামের বৃদ্ধ অধিবাসীদের নিকট শুনেছেন যে ঐ গুহা প্রায় ১০ মাইল লম্বা ছিল এবং এক পর্ব্বত হইতে অন্য পর্ব্বতে যাওয়া যাইত। স্বামীজিও যখন প্রথম আসেন তখন উহা ১ মাইল লম্বা ছিল—আস্তে আস্তে তাহাও সঙ্কুচিত হয়ে বর্ত্তমান আকারে এসে দাঁড়িয়েছে। সামনের প্রথম হল্টে না পৌঁছান পর্য্যন্ত বিপরীত দিকের গাড়ী আসবে না চিন্তা করে অনিচ্ছায় আশ্রমের স্নিগ্ধ এবং পবিত্র পরিবেশ ছেড়ে আসতে হ'ল। গাড়ীতে উপদেশ পুস্তক থেকে জানলাম, তিনি অল্প বয়সেই রামকৃষ্ণ মিশনে আকৃষ্ট হন এবং রামকৃষ্ণ মিশনের প্রথম সভাপতি স্বামী-ব্রহ্মানন্দের নিকট দীক্ষা লাভ করেন। আশ্চর্য্য মনে হ'ল রামকৃষ্ণদেবের মানসপুত্র নরজগতের পরমারাধ্য রাখালচন্দ্র ঘোষ লেখকের মাতুল সম্পর্কীয় ছিলেন—তাঁর নিকট দীক্ষাপ্রাপ্ত সন্ন্যাসী হিমালয়ের নিভৃত কন্দরে গঙ্গার কূলে বসে এখনও সাধন করছেন—বয়সে নিশ্চয়ই অতি বৃদ্ধ—অদ্ভুত এ যোগাযোগ। মনে মনে তাঁকে আমার অন্তরের সশ্রদ্ধ প্রণাম জানালাম।

বাসগুলি রাস্তা পরিষ্কার হতেই এগিয়ে চলে গেছে; আমরাও গাড়ী ছেড়ে দিলাম। সর্দ্দারজীর মাইল মিটারে ২০ মাইল স্পিডে কাঁটা উঠে গেল। এত ছোট ছোট বাঁক, সরু রাস্তা—ডানদিকে ৭০০ হইতে ১০০০ ফুট নীচু খাদ—রবীনবাবু সাবধান বাণী উচ্চারণ করলেন। সর্দ্দারজী স্পিড্ কমিয়ে দিলেন, সবাই আশ্বস্ত হলাম। ১৯ মাইল বিয়াসী পৌঁছিলাম বেলা ১০॥টায়, সাথী বাসগুলি ও সব সেখানেই দাঁড়িয়ে আছে। এখানে বিপরীতগামী যানগুলি পাশ করবে। যাত্রীর দল নেমে পড়েছে, তিন চার খানি দোকান, যাত্রীদের ফুলুরি-ভাজা চা ইত্যাদি পরিবেশন করছে, বিভিন্ন প্রদেশের যাত্রীদল মেয়ে পুরুষ কেদার বদরীর পথে চলেছে। এখন উপরে ঠাণ্ডা—কম বৃষ্টি হ'লেও, বিপদের সম্ভাবনা থাকলেও পুণ্য সঞ্চয়ের জন্য সব কিছু বিপদ উপেক্ষা করে চলেছেন। শর্ম্মাজী আমাদের জন্য শালপাতার ঠোঙায় ফুলুরি নিয়ে এলেন—দেখতে পলতার বড়ার মত, কিন্তু আলু ও কি একরকম পাতার ফুলুরি। খিদের মুখে ভালই লাগল তার সঙ্গে ১ গ্লাস চা পরিতৃপ্তির সঙ্গে পান করে যাত্রার জন্য সর্দ্দারজীকে বলতে ঘাড় নেড়ে জানালেন—সে হবার উপায় নেই, যতক্ষণ না বিপরীতগামী বাসের সেখানে দেখা গেল। ঝরণার জল পাইপের মধ্যে ধরে পি, ডব্লু, ডি সরবরাহ করছিল; এক ঋষিমূর্ত্তির যুক্তকরের মধ্য দিয়ে জল পড়ছে অবিরাম, ধর্ম্মান্ধ নরনারী ভক্তিভরে পান করছে। সাড়ে এগার, তারপর দেড়টা বাজল, কোন গাড়ীর দেখা নাই। সর্দ্দারজী বললেন—দেবপ্রয়োগ পর্য্যন্ত রাস্তার মধ্যে খারাপ নাও হতে পারে, তারও ওদিকে খারাপের জন্য বাস থাকতে পারে—আমরা এগিয়ে যাই, পথে গাড়ী এলে এক আধ জায়গা চওড়া পাব, গাড়ী পাশ করে নেব। ঐরূপ যাত্রার বিপদের সম্ভাবনা থাকলেও অনির্দ্দিষ্ট কাল বসে থাকার চেয়ে ভাল মনে করে সবাই সম্মতি দিলাম। গাড়ী গন্তব্য স্থানের উদ্দেশ্যে চলল হর্ন দিতে দিতে, কি জানি যদি হঠাৎ বাঁকের মুখে বিপরীতগামী গাড়ী এসে পড়ে। সামনে পালি-

গ্রাম, অপূর্ব্ব দৃশ্য—ডানদিকে পর্ব্বত অর্দ্ধ গোলাকারে আসীন, নীচে বিস্তীর্ণ সমতল ক্ষেত্র গঙ্গানদী চক্রাকারে এই পর্ব্বত থেকে ওধারের পর্ব্বতের পাদদেশ ধৌত করে চলেছে—মধ্যে গোলাকৃতি দ্বীপ সৃষ্টি হ'য়েছে। উপরে পাহাড়—মধ্যে মধ্যে সাদা মেঘে ঢাকা, পর্ব্বতশৃঙ্গ গাত্র কালচে নীল মেঘে আচ্ছাদিত, পর্ব্বতগাত্রে গুল্ম বৃক্ষরাজির ঘন সবুজ আস্তরণ। সব দৃশ্য মিলিয়ে নয়ন জুড়িয়ে গেল। ভগবানের অপূর্ব্ব লীলা মনে মনে উপলব্ধি করলাম। কিছুদূর এগিয়েই গ্রাম, পাহাড়ের গায়ের কতকগুলি কুটীর সিঁড়ির মত ধাপ কেটে কৃষিক্ষেত্র বানিয়েছে। ওপরে ছেলের দল গরু নিয়ে চরাচ্ছে, সামনে নীচে পাকাবাড়ী। শুনলাম ইণ্টারমিডিয়েট কলেজ। সামনে কিছুদূর এগিয়ে চলেছি এমন সময় ওপর থেকে একটী লোক চীৎকার করে নেমে এল—সামনে যাবেন না, রাস্তা বন্ধ—ধ্বস নেমেছে। বারণ না শুনে সর্দ্দারজী এগিয়ে চল্‌ল—কিছুটা যেতেই দেখা গেল ধ্বস [illegible] রাস্তা জুড়ে—আবার ডানদিকে খাদের দিকে গাছের ডাল বেঁধে রেখেছে—রাস্তার নীচ থেকে কিছুটা অংশ ধ্বস পড়ে গিয়ে রাস্তাকে বিপজ্জনক করে রেখেছে। পাথর সরাবার কোদাল গাঁইতি পড়ে আছে—কিন্তু লোক নেই; বোঝা গেল সেই লোক দুটী ঐ ভাবে তাদের কর্ত্তব্য সম্পাদন করছে। সবাই মিলে পাথর সরাবার জন্য হাত লাগান গেল—অবশ্য সর্দ্দারজী আর যোগীন্দ্র সিংজী বেশীর ভাগ পাথরই সরালেন। আমরা সবাই হেঁটে পার হলাম। সর্দ্দারজী খুব সাবধানে ডানদিকের ভাঙ্গা রাস্তা বাঁচিয়ে ধ্বসের ওপর দিয়ে গাড়ী পার করলেন। কিছুদূর যাওয়ার পর মোড় ঘুরতেই বিপরীত-গামী বাস।
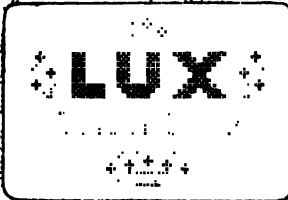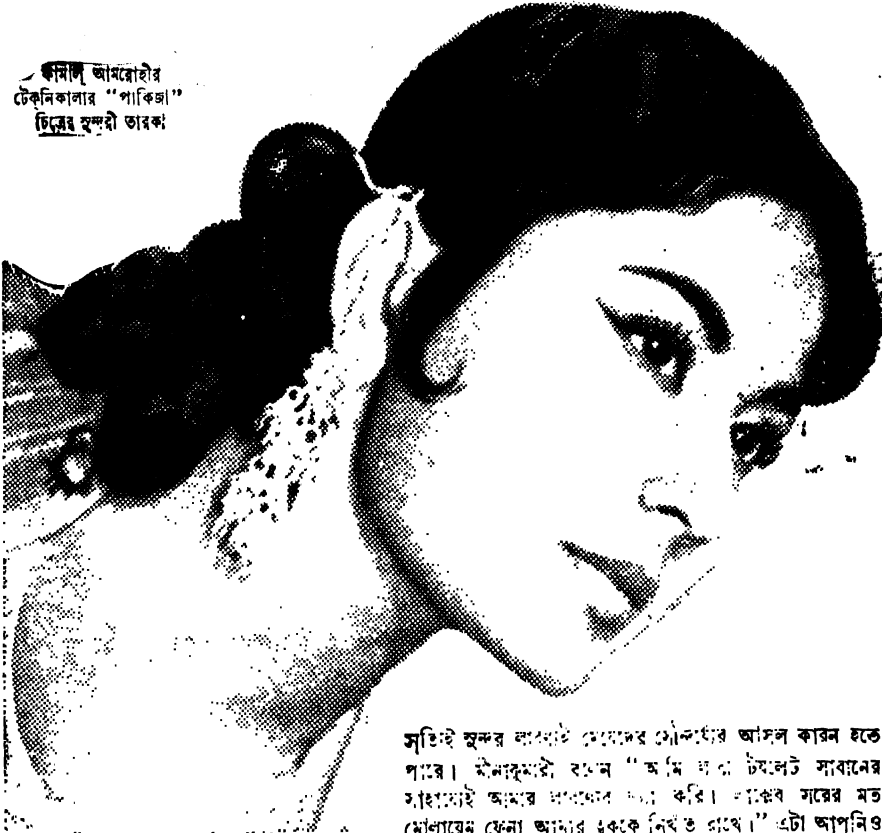
সাবধানে গাড়ী বেঁধে ফেললেন সর্দ্দারজী—পাশ হবার রাস্তা নেই, অতি সাবধানে পিছু হটে বাঁক ঘুরে পরিসর জায়গার জন্য গাড়ী চালাতেই হর্ণ বাজাতে বাজাতে পিছনের একখানি বাস বিয়াশী থেকে এসে পৌছে গেল। তারা আমাদের যাত্রার পর অপেক্ষা করে বিপরীতগামী গাড়ী আসবে না স্থির করেই বেরিয়ে পড়েছে। আমাদের তখন ত্রিশঙ্কুর স্বর্গ-লাভের অবস্থা—না আগান—না পেছনে যাওয়া—যাবে। তখনই সামনের বাস থেকে লোক ছুট্‌ল যাতে পিছনের অন্য বাসগুলি এ পর্য্যন্ত এগিয়ে না আসে। আমাদের গাড়ী ও পিছনের বাসের যাত্রী খালি করা হল, আস্তে আস্তে পিছু হটে চলতে লাগল, পরের বাঁক কিছুটা প্রশস্ত—সামনের বাসদের পার হতে বলা হ'ল, তারাও যাত্রী নামিয়ে সাবধানে পার হ'য়ে গেল। আমরা আবার চললাম, ভাগীরথী ও অলকানন্দার সঙ্গম স্থানের উদ্দেশ্যে। বেলা ৪টায় পৌছিলাম দেবপ্রয়াগে—দূর থেকে মনোরম দৃশ্য। গাড়ী দাঁড় করিয়ে ছবি নেওয়া হ'ল। ভাগীরথী ও অলকানন্দার সংযোগস্থানের ওপরে সুউচ্চ পাহাড়ের ওপর মন্দির, নীচে চত্বর এবং সোপান শ্রেণী নেমে গেছে ভাগীরথী-অলকানন্দা সঙ্গম ঘাটে। ঘাটের ওপর বহুদূরবিস্তৃত অসংখ্য ইমারত, পর্ব্বত গাত্রে পাণ্ডাদের বাসস্থান ও যাত্রীনিবাস। হাঁটা পথে অলকানন্দার অপর পারে পৌছে যাত্রীদল অলকানন্দা পার হ'য়ে আসে ছোট তারের ঝোলার পোলের ওপর দিয়ে। এ পারে সঙ্গম ঘাটে স্নান ক'রে পিতৃপুরুষের পিণ্ডদান ক'রে অগ্রসর হয় কেদার বদরীর পথে। এইখান থেকেই পাণ্ডারা সঙ্গ নেয়—কার খাতায় নাম আছে তা নিয়ে অনুসন্ধান চলে। কোলকাতার যাত্রী শুনলে বাঙ্গালী না মাড়োয়ারী এ কথা অনেক পাণ্ডাই জিজ্ঞাসা করে। গাড়ী ষ্ট্যাণ্ডে এসে পৌছল, নামতেই পাণ্ডার দল ঘিরে দাঁড়াল। তীর্থযাত্রী নয়, টুরিষ্ট শুনেও রেহাই পেলাম না। কাপড়, তেল, তোয়ালে নিয়ে নেমে পড়লাম সবাই। সামান্যদূর এগিয়ে ডান দিকে নামার পথ। বেশ কিছুদূর উৎরাই ঘুরে নেমে ভাগীরথীর ওপর তারের দড়ির ঝোলান পোল—পাটাতন কাঠের—পার হ'য়ে পারে পর্ব্বত গাত্রে রামসীতার মন্দির। গুণে ১০০ ধাপ সিঁড়ি উঠতে হবে মন্দিরের প্রবেশ দ্বারে পৌছতে। নীচে সিঁড়ি নেমে গেছে ভাগীরথী ও অলকানন্দার সঙ্গম স্থানে। আরও নীচে নেমে গেলাম স্নানের জন্য। জলের স্রোত দুর্ব্বার, দুই ধাপের বেশী নামা গেল না। জল হিমশীতল। সেইখানে স্নান সেরে উঠে পড়লাম সবাই। শরীর জুড়িয়ে গেল; সারাদিনের পরিশ্রম ও ক্লান্তি এক নিমেষে চলে গেল। উপরে উঠে মন্দির দর্শন করে নামলাম। পাণ্ডাজী যুবক, লেখাপড়া জানেন বললেন—৬ মাস বদরীনারায়ণে থাকেন ও ৬ মাস দেবপ্রয়াগে থাকেন। তাঁর কাছে শুনলাম পিতৃ-পুরুষের পিণ্ডদান গয়ার পর এখানেও করা যায় এবং দেবপ্রয়াগে পিণ্ডদান করলে আর কোথাও পিণ্ডদান করতে হয় না। এইখানেই ও কার্য্যের শেষ। ভগীরথ গঙ্গা অবতরণ করিয়েছিলেন হিমালয় থেকে। দেবপ্রয়াগ পর্য্যন্ত গঙ্গার নাম ভাগীরথী। এখান থেকে অলকানন্দার সঙ্গে মিশে যে ধারা বয়ে চলেছে তারই নাম গঙ্গা—ভারতের সভ্যতা ও সংস্কৃতির বাহন। গঙ্গাজীকে প্রণাম সেরে ফিরতি পথে বেরিয়ে পড়লাম, পথে লছমনঝোলা, হৃষিকেশ ফেলে চললাম পর পর। অন্ধকার ঘনিয়ে এসেছে, টেরী-গাড়োয়ালের রাজধানী নরেন্দ্র নগর পরিদর্শন করার বাসনা পরিত্যাগ করতে হ'ল। ফিরে চললাম হরিদ্বারে। পরদিন মুসৌরী পাড়ি দেওয়ার পালা। ভগবানের ইচ্ছা অন্যরূপ; রাত্রে অবিশ্রান্ত বৃষ্টি—ঝম্ ঝম্—সকালেও বৃষ্টি সমান ভাবে চলেছে। রেল ষ্টেশনে খবর এল রায়লাসীমায় রেল লাইন ডুবে গেছে, দেরাদুনের গাড়ী বোধ হয় যাবে না। কোলকাতা থেকে দেরাদুনের গাড়ী ৪ ঘণ্টা লেট—এই অবস্থায় দেরাদুন থেকে মুসৌরীর রাস্তায় মোটর যাবে কিনা সন্দেহ। মুসৌরীর পথে দেরাদুন যাত্রা করলে হয়ত পথেই আটকে থাকতে হবে। এই সব চিন্তা করে এবারের মত মুসৌরী যাত্রা স্থগিত হ'ল। সবাই মিলে কোলকাতা পাড়ি জমালাম।

অভিমান

কার ভাবনায় কোন বেদনায় ভুলেছ বিশ্ব ধরা
ধরা পড়ে গেছ বুঝি তার কাছে দেয়নি যে জন ধরা ?
কার অবহেলা জেগেছে হৃদয়ে দুর্জয় অভিমান
পাষাণ কঠিন করেছে কোমল প্রাণ
সেই পাষাণের তলেই গোপন নির্ঝর ঝরঝরা !

অবেলায় ওই দীঘল বেণীর বন্ধন-জাল খোলো
পিঠের উপরে ঘন কেশভার ভেঙে দাও এলোমেলো ।
করপল্লবে নত মুখ ঢেকে কাঁদো বসে তার তরে,
সে তো দেখে সব অলখ-আড়ালে সরে
বুঝি জেনে গেছে কান্না-শেষের হাসিতেই মধু ক্ষরা ॥

কথা ঃ গোপালকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়

সুর ও স্বরলিপি ঃ পঙ্কজকুমার মল্লিক

II পদ প ণ ণদ - প I ম - - - - - I ম -প মপম জ্ঞ ম দ I প - - - স স I

কা৹ ৹ র ভা ৹ ব না ৹ ৹ ৹ ৹ য় কো ৹৹ ৹৹৹ ন্ বে দ না ৹ ৹ য় তু মি

স গ গ - - - I স গ গ মদ প দ I মপ ম জ্ঞ প - - I পদ প ণ ণদ - প I

ভু লে৹ ছ ৹ ৹ ৹ ভু লে ছ বি৹ ৹ শ্ব ধ রা ৹ ৹ ৹ ৹ কা৹ ৹ র ভা ৹ ব

ম - - - ম ম I ম ধ ধণ পধ প ধ I ণ - - - - - I মধ পণ ধর্স র্সণ - দ I

না ৹ ৹ য় বু ঝি ধ রা প৹ ড়ে ৹ গে ছ ৹ ৹ ৹ ৹ ৹ তা৹ ৹৹ ৹৹ ৹ র্ কা

প - - - - - I প - দ পদ মপ দ I প দ - - - - I স গ গ মদ প দ I

ছে ৹ ৹ ৹ ৹ ৹ দে য় নি যে৹ জ৹ ন ধ রা ৹ ৹ ৹ ৹ ভু লে ছ বি৹ ৹ শ্ব

মপ ম জ্ঞ প - - II

ধ রা ৹ ৹ ৹ ৹

র্স -ণ দ ণ দ I প - - - - - I প দ প ম প ম I জ্ঞ ম জ্ঞ ঋ জ্ঞম জ্ঞ ঋ I
কা র অ ব ০ হে লা ০ ০ ০ ০ ০ জ্বে লে ছে হৃ দ য়ে তু ন্ জ য় অ০০ ভি

স - - সজ্ঞ রম জ্ঞ I জ্ঞ ম জ্ঞ ঋ জ্ঞমজ্ঞ ঋ I স - - - - - I স গ - গ ম - I
মা ০ ০ ০০ ০০ ন তু ন্ জ য় অ০০ ভি মা ০ ০ ০ ০ ন্ পা ষা ণ্ ক ঠি ন্

মপ দ পমপদ I প - - - - - I {প - প ধ ণ র্স I ণ র্সণ দণর্স ণ র্স(- I
ক রে ছে কো০ম ল প্রা ০ ০ ০ ০ ণ সে ই পা ষা ণে র ত লে০ ০০ই গো প ০

- - - ণর্স দণ প)} I - ন I ণর্স ণ ধ পম প দ I প দ - - - - I স গ গ মদ প দ I
০ ০ ০ ০০ ০০ ন্ ন্ নি০ র্ ঝ র০ ঝ র ঝ রা ০ ০ ০ ভু লে ছ বি০ ০শ্

মপ ম জ্ঞ প - - II
ধ রা ০ ০ ০

ধ ণ ধপ ধ ম পদ I প মগ ম০জ্ঞ র জ্ঞ I ম - - - - - I ধ - ণ র্স ধণ ধ I
অ বে লা০ য় ও ০ই দী ঘ০ ০ ল ০ বে পী ০ ০ ০ ০ র ব ন্ ধ ন জা০ ল

ণ র্স ধণ ম ধণ ধ I ণ র্স - ণর্স ণ দ - I দ দ প দ - প I দ - প দ পদ ম I
খো ল ০০ ০ জা০ ল খো ল ০ ০০০ ০ ০ পি ঠে র উ ০ প রে ০ ০ ০ ০০ ০ ০

{প ণ ধ - - (- I পণ ধণ পধ ম র ম)} I - I ণ র্স ণ র্স - - I ণর্র র্সণ দণদ প - - I
কে শ ভা০ ০ ০ ০০ ০০ ০০ ন্ ঘ ন ভে ঙে দা ০ ০ ০ ০০ ০০ ০০০ ০ ০ ও

প ধ ণধ ণধ প দ I প ম - - - - I র্স জ্ঞ র্র র্স র্র র্স ণ I ধ ণ ধপ ধ প ম I
ভে ঙে দা০ ০ও এ লো মে লো ০ ০ ০ ০ ক র প০ ল্ ল বে ন ত মু০ খ ঢে কে

জ্ঞ র - - রজ্ঞ স I র ম গ ম - গ I মপ দ ম প - দণ I দণ দ প ম ম ম I
কাঁ দো ০ ০ ০০ ০ কাঁ দো ব সে ০ ০ ০০ ০ ০ ০ ০ ০০ তা০ র ত রে সে তো

প ণ - - র্সর্র ণর্স I দণ প - - - - I প ধ ণ ধ প দ I প ম - - প ধ I
দে খে ০ ০ ০০ ০০ স০ ০ ০ ০ ০ ০ অ ল খ আ ড়া লে স রে ০ ০ বু ঝি

{ণ র্স ণ র্স - - I (- ণর্স ধণ প প ধ)} I ণ - - ণর্র র্সজ্ঞ র্র I র্স - - - - - I
জে নে গে ছে ০ ০ ০ ০০ ০০ ০ বু ঝি কা ০ ন্ না০ ০০ শে ষে ০ ০ ০ ০ র

ণর্র র্সণধ পধ প ম I প দ - - - - I স গ গ মদ প দ I মপ ম জ্ঞ প - - II II
হো০ সি ত০ ০ই ম ধু ক রা ০ ০ ০ ০ ভু লে ছ বি০ ০শ্ ধ রা ০০ ০ ০

মহাযুদ্ধের পশ্চাদ্‌পট

(প্রতিবাদ)

ভারতবর্ষ সম্পাদক মহাশয় সমীপেষু

সবিনয় নিবেদন,

বর্তমান সংখ্যা 'ভারতবর্ষের' একটি প্রবন্ধের প্রতি আমার মনোযোগ আকৃষ্ট হল। প্রবন্ধটি বৈদেশিক রাজনীতি সম্বন্ধে—বিশেষ করে পশ্চিম জার্মানি বিষয়ে; লেখক "অধ্যাপক শ্যামল ভট্টাচার্য্য।" তাতে আমার নাম ও আমার লেখার উদ্ধৃতি দেখে বিশেষ কৌতুক বোধ করলাম। যতদূর বুঝছি—উদ্ধৃতিগুলো আমার লেখা বই থেকে নয়, বোধ হয় 'প্রবাসী' পত্রে ১৯৩৮-৩৯ই সালে লেখা 'বহির্জগৎ' নামীয় আমার সাময়িক লেখা থেকেই গৃহীত। খোদ অধ্যাপক-বর্গীয় একজন পণ্ডিত আমার ও রকম অসংখ্য সাময়িক লেখা দিয়ে গবেষণা করছেন, এতবড় সম্মান আমার মত কলম-জীবীর ভাগ্যে জুটবে তা কল্পনাও করি নি। কিন্তু জুটেছে সম্ভবত গবেষণার গরজে নয়, অধ্যাপক মহাশয়ের লভ্য বৈদেশিক দাক্ষিণ্যেরই দায়ে। না হলে, আপনি সম্পাদক মহাশয়। আপনিও মানবেন: (১) আমার মতামত আমার প্রকাশিত গ্রন্থাদি থেকেই গ্রহণ করা প্রশস্ত—আমার সাময়িক 'নোটস'-জাতীয় সাংবাদিক মন্তব্য থেকে নয়। (২) ১৯৩৮-৩৯ইং ও তৎপরে ('মডার্ণ রিভিয়্যু' বা 'প্রবাসী') কোনো সাংবাদিকের পক্ষে স্বাধীনভাবে বৈদেশিক নীতি নিয়ে লেখা সম্ভব ছিল না। সম্পাদকও স্বাধীনতা দিতে অক্ষম ছিলেন। বিশেষতঃ, আমার জন্য ইং ১৯৩২-৩৭এর মধ্যে (আমি তখন বিনা বিচারে কারারুদ্ধ) উক্ত সম্পাদক মহাশয়েরও পুলিশের নিকট জবাবদিহি করতে হয়েছিল। তবু তিনি আমার সঙ্গে সম্পর্কচ্ছেদ করেননি। ১৯৩৮ইং বৈদেশিক প্রসঙ্গে আমার সেসব লেখা বাঙলা সাংবাদিক জগতে নূতনও ছিল। (৩) উক্ত সাংবাদিক (ইংরেজি ও বাঙলা) মন্তব্য-মালা আমার দ্বারা রক্ষিত হয়নি। কিন্তু সমুদয়ভাবে লেখাগুলি যা ছিল অধ্যাপক মহাশয়ের উদ্ধৃতি-সমূহ তার বিকৃতি সাধনের জন্যই পরিবেশিত হয়েছে। (এ জন্যই তিনি আমার প্রকাশিত গ্রন্থও বর্জন করেছেন)। (৪) যদি আমার মতামত সম্বন্ধে তাঁর বক্তব্য একেবারে ষোলা আনা ছেড়ে আঠারো আনা সত্য হোত, তা হলেও বোধ হয় মানবেন—১৯৩৮-৩৯ইং কালের (দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের ছায়ায়) মতামত (ভ্রান্ত হোক, অভ্রান্ত হোক) বদলানো ১৯৫৯ইং সালে কারো পক্ষে অসম্ভব বা অন্যায় নয়। (৫) সমগ্রভাবে 'অধ্যাপক'-এর কি আমার লেখা (ও জীবন—কারণ আমার লেখা আমার জীবন থেকে তত বিচ্ছিন্ন নয়) নিয়ে গবেষণা করে দেখবেন? নিশ্চয়ই জীবনের সঙ্গে আমার রাজনৈতিক সামাজিক দৃষ্টি বিকশিত হয়েছে। কিন্তু তাঁর পক্ষেও সাধ্য হবে না দেখানো আমি কোথাও (ক) ভারতবর্ষ ও ভারতীয় স্বাধীনতার প্রতি জন্মগত শ্রদ্ধা থেকে বিচ্যুত হয়েছি; (খ) কোথাও ফ্যাশিজম্ (হিটলার মুসোলিনি স্বধর্মী ইউরোপে তখন আরও মানুষ ছিল যেমন এখন পশ্চিম জার্মানিতেও অনেকে আছে)-এর প্রতি বিরাগ ছাড়া অন্য কিছু ভাব পোষণ করেছি; (৩) সাধারণভাবে কোনো জাতির আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকারের দাবিকে সমর্থন করি নি।

অলমতি বিস্তারেণ। কিন্তু আশা করি, আমার প্রতি ন্যায় বিচার করে পত্রখানা প্রকাশ করবেন। ইতি ৯।৯।৫৯

বিনীত

গোপাল হালদার

(প্রতিবাদের উত্তর)

অধ্যাপক শ্যামলকুমার চট্টোপাধ্যায়

শ্রীযুক্ত গোপাল হালদার মহাশয় আমার প্রবন্ধের প্রতিপাদ্য বিষয়ের কোন প্রতিবাদ করেননি দেখে ন্যায়সঙ্গতভাবে অনুমান করছি যে, কোন যুক্তি বা তথ্যের প্রতিবাদ করা তাঁর পক্ষে সম্ভবপর নয়। সুতরাং আত্মপক্ষ সমর্থনে অর্থাৎ তিনি যে একজন বিশুদ্ধ কমিউনিষ্ট, একথা প্রমাণের গরজে তিনি যা লিখেছেন, তার উত্তরে কিছু বলা অবান্তর। তবে আমার পদবীর বিকৃতি সাধন দেখে বোঝা যায়, লেখাটি তিনি ভালো করে পড়েননি। "বৈদেশিক দাক্ষিণ্যের দায়ে" মন্তব্যটি দেখে প্রাণের মায়া ছেড়ে হাসার সুযোগ পেলাম। "আত্মবৎ মন্যতে জগৎ", তাই নয় কি?

গোপালবাবু ভারতীয় স্বাধীনতার প্রতি শ্রদ্ধার বিষয়ে যা লিখেছেন তা হচ্ছে প্রলাপোক্তি; আর তিনি যদি সকলের সঙ্গে জর্মনিরও আত্মনিয়ন্ত্রণের দাবি মেনে নেন, তাহলে অলমতি।

শরীর শ্রম

শ্রীরবীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়

বৈজ্ঞানিক উন্নতির যুগে যেখানে নিত্যনূতন শ্রম-লাঘব-কারী যন্ত্রের সৃষ্টি হইতেছে, যেখানে মানুষের জীবনে শ্রমের মাত্রা কমাইবার রব উঠিয়াছে, সেক্ষেত্রে গান্ধীজী শরীর-শ্রমের এই সুপ্রাচীন তত্ত্বের উপর কেন এত জোর দিলেন? কারণ, শরীর-শ্রম তাঁহার দৃষ্টিতে এক মৌলিক বিচার। মানুষ তাহার মাথার ঘাম পায়ে ফেলিয়া নিজ অন্নের সংস্থান করিবে—ইহা তাঁহার নিকট কেবল একটি ধর্মীয় নীতি-বাক্যই ছিল না। পরন্তু তিনি বিশ্বাস করিতেন, সমাজ-জীবনে স্বাধীনভাবে বাঁচার জন্য শরীর শ্রম—প্রকৃতির এক অমোঘ বিধান। ব্যক্তি মানুষ বুদ্ধির জোরে যেন শ্রমকে ঘৃণা না করে, শ্রমের শোষক না হইয়া বসে।

ইহার আরও ব্যাপক আলোচনা করিলে দেখা যায় যে, বর্তমানে সমাজ দুইভাগে বিভক্ত হইয়া গিয়াছে। একদল শ্রম না করিয়াই বিত্তের মালিক, অপর দল ঘর্মাক্ত শ্রম করিয়াও দিনের আহার জোটাইতে সমর্থ নয় অর্থাৎ মজুর ও মজুর শ্রেণী। পাশ্চাত্যের যন্ত্রবহুল উৎপাদন প্রথার ফলে আজ কম পরিমাণ হস্তচালনাকেই অবস্থার উন্নতি বলিয়া ভাবা হইতেছে। মানুষ ক্রমেই সৃষ্টিমূলক জীবনচর্য্যা (Creative Living) হইতে সরিয়া আসিয়া কলের পুতুলে পরিণত হইতেছে। মানুষের বাঁচার জন্য শ্রেষ্ঠ প্রয়োজনীয় হইতেছে শ্রম। চিন্তা ও কর্মের মিলিত প্রয়াসের ফলেই জীবন বিবর্তনের ধারায় বিজ্ঞান, কলা, ধর্ম ও দর্শন প্রভৃতির ক্রিয়াত্মক অভিব্যক্তির ভিতর দিয়া সভ্যতার গতি ক্রমবর্ধমান। এ সকলই কর্মের প্রকাশ।

একটি টুল, থালা, একটি কবিতা কিংবা কোন বৈজ্ঞানিক তত্ত্বকেও পূর্ব্বাপেক্ষা সুন্দর করিতে হইলে যে সাধনা ও একাগ্রতার প্রয়োজন হয়, তাহার ফলে সেই মানুষটিও অধিকতর দক্ষ, সুন্দর ও নিখুঁত হয়। মানুষের কাজের রূপই তাহার নিজের রূপ, তাহার ব্যক্তিত্ব। এই কথাই বলিয়াছেন একজন বিখ্যাত ইংরাজ অর্থনীতিবিদ ও শান্তিবাদী Wilfred Wellock তাঁহার New Horizons পুস্তকে। অনুভূতি, বোধশক্তি, দক্ষতা প্রভৃতি গুণগুলি বৃত্তিশ্রমের মাধ্যমে যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠভাবে বিকশিত হয় তাহার কারণ, এইরূপ শ্রমের ফলে তাহার সমগ্র সত্তার অন্তর্নিহিত শক্তির চরম উৎকর্ষ সাধিত হয়। কোন প্রয়োজনীয় অথচ সুন্দর জিনিষ তৈয়ারীর প্রচেষ্টার ন্যায় অন্য আর কিছুতেই মন বা হৃদয়ের তেমন কর্ষণ হয় না। ...অতএব দেখা যায় যে, কর্ম মানবজীবনের এক মৌলিক অভ্যাসক্রম। জীবনে যাঁহারা সৃষ্টির আনন্দ অনুভব করিয়াছেন তাঁহারাও এই মতের সমর্থক। আচার্য্য বিনোবা তাই মানুষের জীবন বিকাশে কৃষিকর্মকে এক গুরুত্বপূর্ণ উপায় বলিয়া মানেন। তিনি বলেন, "আমরা এমন সমাজ গঠন করতে চাই যেখানে আদর্শ হবে প্রত্যেক মানুষের ভূমির সঙ্গে সম্বন্ধ রাখা।......আমি মনে করি চাষের সঙ্গে মানুষের বিকাশের সম্বন্ধ রয়েছে। জীবন বিকাশের জন্য চাষের প্রয়োজন।......লেখাপড়া-জানা লোকের গণনা করে আমরা বলি—দেশে ১০০ জনশিক্ষিত হ'লে ভাল হবে। আমি বলি, এই বৃত্তি চাষের জন্য হোক। দেশে যত বেশী লোক চাষ জানবে তত তাড়াতাড়ি দেশের বিকাশ হবে। আমার এই বিচার অভিজ্ঞতার উপর দাঁড়িয়ে আছে। অন্য শিল্পে ও যে বিকাশ হয়, তা আমি মানি।...এ এক স্বতন্ত্র দর্শন, স্বতন্ত্র তত্ত্বজ্ঞান।" (সাধনা)

শরীর শ্রমের প্রকৃত তাৎপর্য্য ও গভীরতর দর্শন ইহা। গান্ধীজী তাই বলিয়াছেন, "সর্ব্বাপেক্ষা শোচনীয় দুরবস্থা আজ ইহাই যে, লক্ষ লক্ষ ব্যক্তি তাহাদের হাত দুটীর ব্যবহার বন্ধ করিয়া দিয়াছে।......আমরা দেহরূপী তুলনাতীত এই জীবন্ত যন্ত্রটীকে ধীরে ধীরে ধ্বংসের মুখে ঠেলিয়া দিয়া তাহার বদলে কতকগুলি প্রাণহীন অনড় যন্ত্র আনিয়া বসাইতেছি।"

[It is a tragedy of the first magintude that millions have ceased to use their hands as hands......We are destroying the matchless living machines, i.e., our own bodies by leaving them to rust and trying to substitute lifeless machinery for them.]

বাইবেলে, আছে, 'He that will not work, neither shall he eat—যে কাজ করিবে না, অন্ন গ্রহণ করাও তাহার উচিত নয় (St. Paul)। প্রিন্স ক্রোপোট্‌কিন তাঁহার Anarchist Communism গ্রন্থে বলিতেছেন, "কাজ আমাদের কাছে নেশার ন্যায়, আর আলস্য এক অস্বাভাবিক সৃষ্টি।" (With us work is a hobby and idleness an artificial growth)। বর্তমান যুগে যন্ত্রশিল্পের নির্জীব, একটানা, বিরক্তিকর কর্মপদ্ধতির জন্য অধিকতর বিশ্রামের যে দাবী উঠিয়াছে, গান্ধীজীর দৃষ্টিতে তাহা শুভচিহ্ন নয়। তাই এক বন্ধুর প্রশ্নের উত্তরে তিনি বলিলেন, "ধরুন, আমেরিকা হইতে কতিপয় ধনীব্যক্তি এখানে আসিয়া আমাদের প্রয়োজনীয় সমস্ত খাদ্যদ্রব্য বিনামূল্যে পাঠাইবার প্রস্তাব করিলেন এবং আমাদের কাজ করিতে না দিয়া তাহাদের এই দাক্ষিণ্যটুকু দেখাইবার অধিকার দিবার কথা যদি বলেন, তবে আমি সরাসরি তাহাদের এই দান প্রত্যাখ্যান করিতে দ্বিধা করিব না; প্রধানতঃ এইজন্য যে, ইহা আমাদের জীবন সত্তার অর্থাৎ—মানুষ তাহার জীবিকার জন্য শ্রম করিবে—এই মহান নীতির মূলে কুঠারাঘাত করিবে।" (হরিজন, ৭।১২।৩৫) বার্ণার্ড শ' তাই তাঁহার কুশলী লেখনীতে বলিয়াছেন, "নরকের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সংজ্ঞা হইতেছে অনন্ত বিরাম।" (The best definition of Hell is perpetual holiday) Reference রাষ্ট্রীয় মতবাদের ভূমিকা সি. ই. এম. জোয়াড, পৃঃ ১২৭।

মানুষের জন্য বিরামের প্রয়োজন আছে; কারণ মানুষ তো আর গাধা নয়। কিন্তু এই সকল দ্রষ্টা পুরুষ শরীরশ্রমের যে তাৎপর্য্য সমাজে প্রতিষ্ঠা করিতে চান, তাহা আজিকার পরিস্থিতিতে অতীব মূল্যবান।

মেয়েদের কথা

সন্তান পালন সম্পর্কে আলোচনা

শ্রীমতী অম্বুজবালা দেবী

অভিভাবক ও অভিভাবিকাদের ঔদাস্য আর অবহেলা বহু কিশোরকিশোরীর অগ্রগমনের পথরোধ করে, যার ফলে ভাবী জীবনের নৈরাশ্যের অন্ধকারে নিমজ্জিত হয়ে তারা অনুতপ্ত হয়। কিন্তু তখন তাদের চরিত্র সংশোধন ও জীবনের সৌভাগ্যোন্নতির কোন ব্যবস্থাই কার্য্যকরী হয় না। মনোবিজ্ঞানীরা বলেন—'ন বছরের একটি ছেলে নিজের কাজের সম্পর্কে সমালোচনা করতে পারে। তা থেকে ভালো হবে, কি খারাপ হবে, তাও বুঝতে পারে। এই ন' বছরই শিক্ষার প্রকৃষ্ট সময়।' আমাদের দেশে একটি চল্‌তি কথা আছে—'যার না হয় নয় বছরে, তার হয় না নব্বুই বছরে।' দশ বছরের পর থেকে শৈশবের স্তর আর থাকে না। শিশুর মধ্যে দেখা দেয় বিভিন্ন দিকে পরিবর্ত্তন।

এগারো বছর বয়স থেকে সুরু হয় কৈশোরে পদচারণা। ইংরেজীতে কৈশোরকে বলা হয়েছে 'টিন্‌এজ'—পাশ্চাত্য দেশে উনিশবর্ষ পর্য্যন্ত কৈশোরের বিস্তৃতি, তারপর আসে যৌবন—কিন্তু আমাদের গ্রামপ্রধান দেশে ষোল বছরেই যৌবনের সমাগম হয়। ইতিপূর্ব্বে শিশুপালন সম্পর্কে আলোচনা করা গেছে, এদের সম্বন্ধে বর্ত্তমান সময়ে আলোচনার বহু অবকাশ আছে। কিশোরকিশোরীকে ঠিক শিশু বলা যায় না, আবার পূর্ণ মানুষ বলাও ভুল। এদের গড়ে তোলাই আমাদের প্রধান কর্ত্তব্য। কেননা এরা আমাদের ভাবীকালের অগ্রদূত, মানব সভ্যতার সংরক্ষক, আদর্শের বার্ত্তাবহ, আর দেশ ও জাতির সুমহান্ ঐতিহ্যের ধারক ও বাহক। সন্তানের জননী হবার পরও যাঁরা পরকীয় প্রেমের মদিরা পানে উন্মত্তা হয়ে থাকেন বা স্বামীর সঙ্গে বিবাহ বিচ্ছেদ ঘটিয়ে পারিবারিক শান্তি ও শৃঙ্খলতা নষ্ট করেন, তাঁদের সন্তান সন্ততিরা অধঃপতনের চরম সীমায় উপস্থিত হয়ে নিজেদের জীবন ধ্বংস করে থাকে, এরূপ দৃষ্টান্ত বিরল নয়। অতএব সন্তানের কল্যাণের জন্যে এসব উন্মাদনা পরিত্যাগ করা এবং দাম্পত্য জীবন দৃঢ় করা প্রত্যেক নারীরই কর্ত্তব্য।

এগারো বছর বয়স থেকে ছেলেদের দৈহিক পরিবর্ত্তন চল্‌তে থাকে—এ পরিবর্ত্তন ষোলো পর্য্যন্ত লক্ষ্য করা যায়। নয় বছর থেকে পনরো বছর পর্য্যন্ত মেয়েদের পরিবর্ত্তন ঘটে। শুধু যে দেহে, তা নয়—মনেও। এক-ভাবে পরিবর্ত্তন সবারই হয় না—কারো আগে, আবার কারো বা পরে। দৈহিক বিকাশ সংক্রান্ত কয়েকটী সমস্যা এদের অন্তরকে বিব্রত করে তোলে, অথচ এই পরিবর্ত্তন বড়দের কাছে নতুন কিছু না হোলেও এদের কাছে অদ্ভুত বলে মনে হয়।

ছেলেদের গোঁফের রেখা ফুটে উঠ্‌তে থাকে, চোয়ালের হাড় ও চওড়া হয়। গলার আওয়াজও বদ্‌লে যায়, মুখে দেখা দেয় ব্রণ। মেয়েদের দেহ ও ভেঙে চুরে গড়ে উঠ্‌তে থাকে, এদেরও মুখে ব্রণ বেরোয়, আর মুখের সৌন্দর্য্য নষ্ট হোতে থাকে।

ফলে কিশোরকিশোরীরা এ সময়ে একটু বিব্রত বোধ করে, লাজুক হয়ে ওঠে। বড়দের কর্ত্তব্য হচ্ছে এদের লজ্জা ভেঙে দেওয়া আর বুঝিয়ে দেওয়া দেহের গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্ত্তন গুলির কথা। প্রকৃতির সন্তান, প্রাকৃতিক নিয়মেই চল্‌বে—তাতে লজ্জা পাবার অবকাশ হওয়াই উচিত নয়।

কৈশোরের পদার্পণের সঙ্গে সঙ্গে শুধু রূপকথায় মন বসেনা, রোমাঞ্চকর গল্প, ডিটেক্‌টিভ কাহিনী প্রভৃতি প্রিয় হয়ে ওঠে। শৈশব অবস্থা থেকেই ছেলেমেয়েদের সন্ধানী চোখ চতুর্দ্দিকে ঘুরে বেড়ায় সব দেখবার জন্তে, আর এরা উৎকর্ণ হয়ে থাকে কিছু শুন্‌বার জন্ত। যা কিছু রহস্যে আবৃত, গুপ্ত আর কৌতূহলোদ্দীপক তা সবই ছেলেমেয়েদের মনের ভেতর আন্দোলনের সৃষ্টি করে। এইসব রহস্য উদ্‌ঘাটনের

জন্যে এরা উৎসুক হয়ে থাকে—বহুক্ষেত্রে উদ্‌ঘাটিত হয়ে পড়ে—আর এরা জানতে পেরে পরম আনন্দ অনুভব করে।

মেয়েরা মাকে সাংসারিক কাজে সহায়তা করে, সেলাই করে, অন্যের কাছে নিজেদের ভালো ভালো জিনিষের গল্প করতে ভালোবাসে, ফুল তুলে খোঁপায় গুঁজে দেয়, মালাও গাঁথে। প্রতিযোগিতামূলক খেলাধূলায় অনেকে উৎসাহী হয়ে ওঠে। ধাঁধাঁর সমাধান, দুরূহ কথার সমাধান, আর ম্যাজিকের কায়দা কানুনগুলো নিয়ে বেশ আনন্দ পায়। মেয়েদের মধ্যে কেউ কেউ গানবাজনার দিকে ঝুঁকে পড়ে।

অভিভাবক ও অভিভাবিকারা যদি ছেলেমেয়ের ওপর নজর রাখেন, বন্ধুত্বপূর্ণ ব্যবহার করেন, অতিরিক্ত আদর বা শাসন না করেন, আর নিজেরাও সত্য আচরণে অভ্যস্ত হয়ে ওঠার অভ্যাস করেন, তাহোলে ছেলেমেয়েরা সহজেই উচ্চ আদর্শে সুপ্রতিষ্ঠিত হয়ে নিজেদের সমাজ ও জীবনের বহু কল্যাণ করতে পারে। পিতামাতা বা অভিভাবক ও অভিভাবিকার উচিত—ছেলেমেয়েদের ব্যক্তিত্বকে উৎসাহ দিয়ে সুপথে পরিচালিত করা, তাতে অনেক সুফল হয়। এদের সামনে কোন প্রকার অশ্লীল ভাষণ বা কুৎসিত আচার ও আচরণ একেবারে বর্জ্জনীয়—কেননা এ বয়সেই ধীরে ধীরে এদের ভেতর যৌন বোধশক্তি বৃদ্ধি পেতে থাকে।

এইসব কিশোরকিশোরীর মধ্যে এমন এক শ্রেণীর আবির্ভাব হোতে দেখা যায় যারা অনেক সময়ে বাবার পকেট বা মায়ের আঁচল থেকে পয়সা নিয়ে স্কুল পালিয়ে সিনেমা দেখে আসে, এদের প্রতি তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখা দরকার। কেননা এরা বিপথে চলে গেলে, একদিন শুধু নিজেদের উন্নতির পথই বন্ধ করবে না, সমাজেরও বহুক্ষতি সাধন করবে। আর ভবিষ্যতে এদের দেখা যাবে আদালতে আসামীর কাঠগড়ায় আর জেলের ভেতর।

কল্‌কাতার রাজপথে ছেলেমেয়েদের ধরে নিয়ে বহু আড়কাঠি তাদের ক্রীতদাস ও ক্রীত দাসীর মত করেরাখে—কেউ কুলির কাজ করে, কেউ ভিক্ষা করে, কেউ বা রেস্তোরাঁয় আবদ্ধ থাকে। প্রত্যহই সংবাদপত্রে দেখা যায় বহু ছেলে মেয়ে নিখোঁজ,এর কোন প্রতীকার হয়না—কেননা এইসব ছেলেমেয়ে ধরার আড়কাঠিদের পৃষ্ঠপোষক হচ্ছেন আমাদের দেশের বড় বড় ধনী ও হোমরা-চোমরাব্যক্তি, আর সব আড়কাঠির সঙ্গে বন্ধুত্ব সূত্রে আবদ্ধ এদেশের পুলিস। সুতরাং ছেলেমেয়েদের স্কুল কলেজে পাঠিয়ে নিশ্চিন্ত হওয়া যায় না অন্য দেশের সভ্য সমাজের মত। পয়সার জন্যে এদেশের মানুষ জানোয়ারের অধম হয়ে সব কিছু করতে পারে—রক্ষক ভক্ষক হয়, কলার চাষ করতে গিয়ে কচু ফলে।

কৈশোরের সমাগমে বালকবালিকার বুদ্ধিবৃত্তি দ্রুতভাবে বৃদ্ধি পেতে থাকে, কিন্তু বারো বছরের পর থেকে আবার তা সাধারণতঃ কিছু কিছু হ্রাস পায়। এই সময়ে এদের মধ্যে রাজনৈতিক প্রভাব পড়ে, রাজনৈতিক জুয়াড়ীদের দ্বারা এরা প্রলুব্ধ হয়, সার্ব্বজনীন উৎসবেমেতে ওঠে,আর বাড়ী বাড়ী ভোট ক্যানভাস করে চাঁদা তোলে,আর জলসার আয়োজন করে। তাছাড়া পাড়ার প্রণয়ী ও প্রণয়িনীদের মধ্যে পত্রের আদান প্রদান এবং কোথায় প্রণয়ীযুগল গোপনে অভিসারে মিলবেন তা এদের মারফৎই হয়ে থাকে। এদের প্রধান বিষয় হয়ে ওঠে জ্ঞান বিজ্ঞানের খোঁজ খবর রাখা, রীতিমত কাগজপড়া, বিভিন্ন দেশের খেলাধুলা ও সিনেমা তারকাদের সম্বন্ধে ঔৎসুক্য প্রকাশ করা,প্রাইভেট-টিউটরের সঙ্গে ফষ্টিনাষ্টিও গল্প গুজব করে সময় কাটানো, আর রাজনৈতিক আলোচনা করা। খুব কম ছেলেমেয়েরই এবয়সে পড়াশুনায় মন দিয়ে মানুষ হবার চেষ্টা করে। পথভ্রান্ত কিশোরদের জীবনের প্রধান শত্রু হয়ে দাঁড়িয়েছে অসৎসঙ্গ, সিনেমা আর খেলার মাঠ।

মনোবিজ্ঞানীরা বলেন যে, ছেলে মেয়েদের প্রকৃত বয়স সাধারণতঃ অনেক সময় মানসিক বয়সের সমান হয় না। তাই দেখা গেছে—এগারো বছরের বালককে হয় তো নয় বছরের শিশুর মানসিক বয়সের সমান। এজন্যে এর সমবয়স্ক ছেলে বা মেয়ের সঙ্গে এর খেলাধুলা বা মেলামেশা অনুচিত, তাতে কল্যাণের চাইতে অকল্যাণই বেশী হয়। কিশোর মনের অভাব অভিযোগ, সুখ দুঃখ, চিন্তাধারার সঙ্গে যে সব পিতামাতা বা অভিভাবক ও অভিভাবিকারা পরিচিত হবার চেষ্টা না করে গাম্ভীর্য্য অক্ষুণ্ণ রাখেন—আর কিশোর মনে ভীতি উৎপাদনের দিকে অগ্রসর হয়ে থাকেন, তাঁদের পক্ষে ছেলে মেয়েকে ঠিক মত গড়ে তোলা বা মানুষ করা সহজসাধ্য নয়।

অন্যান্য পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে কৈশোরে একদিকে যেমন থাকে অনেক কিছু জান্‌বার বা রহস্য ভেদ কর্‌বার কৌতূহল ও আগ্রহ, অপর দিকে থাকে তেমনই পাঠ্যপুস্তকে অমনোযোগ যা আগেকার দিনে ছেলেমেয়েদের মধ্যে ছিল না। কৈশোরকদের মধ্যে অপরাধ-প্রবণতা ধীরে ধীরে বিস্তার লাভ করে। একে ছয় ভাগে বিভক্ত করা হয়েছে—(১) সহজ ধরণের অপরাধ-প্রবণতা (২) স্বভাবগত অপরাধ-প্রবণতা (৩) সরল অপরাধ প্রবণতা (৪) প্রতিক্রিয়া মূলক প্রবণতা (৫) মৃগীরোগজনিত অপরাধ-প্রবণতা (৬) স্বল্পবুদ্ধিজনিত অপরাধপ্রবণতা।

অনুকরণ প্রিয়তাই অপরাধ প্রবণতার দিকে টেনে নিয়ে যায়। যাতে অপরাধ প্রবণতা কিশোর মনে স্থান না পায়, তার জন্যে সচেষ্ট না হোলে এরা ভবিষ্যতে সমাজের কলঙ্ক হয়ে দাঁড়াবে। পিতামাতা বা অভিভাবক অভিভাবিকার চরিত্র সর্ব্বপ্রকারে উন্নত ও বিশুদ্ধ না হোলে, ছেলেমেয়েরা যে জাহান্নমের পথে গিয়ে এঁদেরই মৃত্যুর কারণ হয়ে উঠ্‌বে, তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই। দূষিত পরিবারের ভেতর যদি দু'একটি উজ্জ্বল রত্ন হয়ে ওঠে, তা হোলে বুঝ্‌তে হবে সেটাও প্রকৃতির ঐন্দ্রজালিক লীলা।

চৌদ্দ বছর বয়সে ছেলেমেয়েদের স্বাতন্ত্র্যপ্রিয়তা লক্ষ্য করা যায়। এসময়ে এদের আমিত্ব বোধ বেশী পরিমাণে ফুটে ওঠে, আর এরা অত্যন্ত আত্মকেন্দ্রিক হয়ে থাকে। সব কিছুতেই এদের একটা গোপনীয়তা অবলম্বন করার অভ্যাস দেখা যায়, ব্যক্তিত্ব সুস্পষ্ট হয়, আর গোপনে উত্তেজনামূলক রোমান্টিক গল্প উপন্যাস পড়ার প্রবৃত্তি পরিস্ফুট হয়। এসময়ে কড়া শাসন সুরু হোলে, এদের মনে প্রতিক্রিয়াও খুব তাড়াতাড়ি প্রকাশ পাবে, ফলে এরা দ্রুত এগিয়ে যাবে অধঃপতনের দিকে।

এক্ষেত্রে পিতামাতা অভিভাবক ও অভিভাবকদের উচিত, নিজেদের ব্যক্তিত্বটী বজায় রেখে ছেলেমেয়ের সঙ্গে সব কিছুই খোলাখুলিভাবে আলোচনা করে এদের মনের মত করে বল্‌তে অভ্যস্ত হওয়া, তাতে খুব ভালো ফল হয়, অধঃপতনের পথ থেকে এদের উদ্ধার করে আনা যায়। কতকগুলি ছেলেমেয়ের জন্মগত অপরাধপ্রবণতা চরিত্রের ভেতর ওতোপ্রোত ভাবে জড়িয়ে থাকে, সেগুলিকে মানুষ কর্‌তে হোলে আদর্শ ও দৃষ্টান্ত তাদের সম্মুখে উপস্থিত কর্‌তে হবে, যাতে তারা বুঝ্‌তে পারে অপরাধ কর্‌লে কী ভয়াবহ শোচনীয় পরিণতি হয়।

ষোল বছর বয়সটী কৈশোর ও যৌবনের সন্ধিক্ষণ। এই স্তরে এসে ছেলেমেয়েদের পক্ষে খুব আত্মসচেতন ও সতর্ক হয়ে জীবনের পথে অগ্রসর হওয়া দরকার। ষোল বছর বয়সে ছেলে মেয়েদের মধ্যে সুরুচি জ্ঞান না জন্মালে তাদের পরিণাম ভয়াবহ হয়ে উঠবে। কুরুচিপূর্ণ আচার-ব্যবহার, হাবভাব ও পোষাক পরিচ্ছদ যাতে তাদের ভেতর না দেখা যায় বা তাদের অন্তরের আবহাওয়া দূষিত না হয় এজন্যে পিতামাতা বা অভিভাবক অভিভাবিকাদের তীক্ষ্ণ-দৃষ্টি দেওয়া উচিত।

এ বয়সে সাধারণতঃ ছেলে মেয়েরা একগুঁয়ে, অবাধ্য, বাচাল, স্বাধীনচেতা ও বন্ধুদের পরামর্শ অনুসরণকারী ও ধুমপায়ী হয়, কোন কথা বল্‌লে সঙ্গে সঙ্গে গুরুজনদের মুখের ওপর প্রতিবাদ কর্‌তে অভ্যস্ত হয় তা'তে ফল ভালো হয় না। শত বক্তৃতায় ও শাসন অনুশাসনে যা সম্ভব নয়, তা সম্ভব হয়, এদের মনের কথা টেনে বের করে নিয়ে সেই মত শিক্ষা দেওয়ার ব্যবস্থা করা—এ জন্যে এদের সামনে তুলে ধরতে হবে মহান্ আদর্শ, অমর কাহিনী ও উজ্জ্বল মহা-জীবনের দৃষ্টান্ত।

অধ্যবসায়, স্বাবলম্বন, উচ্চাকাঙ্ক্ষা, শ্রমশীলতা, জ্ঞানার্জ্জনর আগ্রহ প্রভৃতি এদের মধ্যে যাতে পরিস্ফুট হয়, সেদিকে এদের মন নিয়োজিত করা দরকার, আর এদের জীবনের লক্ষ্য সম্পর্কেও সুস্পষ্ট সিদ্ধান্তে এনে সেই পথে এদের নিয়ে যাওয়া আবশ্যক। জীবনের প্রতিক্ষেত্রে সাহিত্যে দর্শনে রাজনীতিতে শ্রমশিল্পে, শিল্প কলায় এই সব ছেলে মেয়ে যাতে জাতির গৌরব বৃদ্ধি করতে পারে, আজকের দিনেপ্রত্যেকেরই তাহা লক্ষ্য হওয়া উচিত।

রবীন্দ্রনাথ বলেছেন—

"মরে না মরে না কভু সত্য যাহা শত শতাব্দীর
বিস্মৃতির তলে,
নাহি মরে উপেক্ষায় অপমানে না হয় অস্থির
আঘাতে না টলে।"

---

(২)

—রুচিরা দেবী—

বেশ-ভূষার সখ বা রুচি নিন্দার জিনিষ নয়, বরং সুসভ্য মানবসমাজের বিশেষ এক ধরণের সংস্কৃতি—যা উন্নত মনোবৃত্তিরই পরিচয় দেয়। কারণ, বসন-ভূষণের প্রয়োজন শরীরের আব্রু-রক্ষা আর সৌন্দর্য্য-সাধনের জন্য। কাজেই যে ধরণের বেশ-ভূষায় শ্রী-শালীনতা বা সম্ভ্রম-হানির আশঙ্কা নেই, অথচ শারীরিক সৌন্দর্য্য-সাধন, মানসিক রুচির বিকাশ, দৈহিক স্বাচ্ছন্দ্যলাভ আর নিজের এবং পরিজনবর্গের তৃপ্তিদায়ক হয়, সেগুলি সব দিক দিয়েই গ্রহণযোগ্য। তবে দেশ-কাল-পাত্রভেদে যুগে-যুগে বেশে-ভূষায় মানুষের রুচির পরিবর্ত্তন ঘটে বলে পুরোনো-আমলের বসন-ভূষণ বা প্রসাধনের রীতি যে আজকের দিনে একেবারে অচল করতে হবে, তার মানে হয় না। বরং অনেক ক্ষেত্রেই দেখা যায় যে মানুষ প্রাচীনকালের বেশ-ভূষা-প্রসাধনের রীতিগুলিকে আধুনিক যুগের সাজ-পোষাক অঙ্গভূষণের পদ্ধতির সঙ্গে মিলিয়ে বিচিত্র-সুন্দর সমন্বয় ঘটিয়ে তুলেছেন। এমন কি, এই অপরূপ সমন্বয়-সাধনের ব্যাপারে সৌখীন মানুষ শুধু যে নিজের দেশের শিল্প-রুচির আদর্শ অনুসরণ করে চলেন তা নয়, বিদেশী বহু জাতির বহু সুন্দর সুরুচিকর কলা-চাতুর্য্যের অনুকরণ করে নিজেদের বসন-ভূষণ-প্রসাধন পদ্ধতির প্রভূত উন্নতিসাধন করেন। দৃষ্টান্ত হিসাবে, আমাদের সমাজে ইউরোপীয় আদর্শানুসরণে কোট-প্যান্ট, ফ্রক, সায়া, সেমিজ, ব্লাউশ, মোজার প্রচলন এবং প্রতীচ্য-সমাজে প্রাচ্য দেশীয় শাড়ী, চোলী, কুর্ত্তা, পায়জামা, টোগা, লুঙী, হাওয়াই জ্যাকেট, কাবুলী চপ্পল, নাগরা ও চটি জুতা প্রভৃতির চাহিদার কথা এক্ষেত্রে বিশেষভাবে উল্লেখ করা যেতে পারে। সুতরাং আমাদের এই আসরে শুধু যে ভারতের নানা অঞ্চলের বেশ-ভূষা-প্রসাধনের বিষয়ই আলোচিত হবে তা নয়, প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের নানা দেশের নানা ধরণের সাজ-পোষাকের রীতি পদ্ধতির সম্বন্ধেও আলাপ-আলোচনা চলবে। এ আলাপ-আলোচনা অনেকেরই কাজে লাগবে বলে আমাদের বিশ্বাস।

এ মাসে ভারতের লৌকিক-শিল্পের আদর্শে আরো দুটি নতুন নক্সা দেওয়া হলো—প্রথমটি, রাজস্থানের লোক-কলা অনুসরণে রচিত উটের প্রতিলিপি, দ্বিতীয়টি, উড়িষ্যার মন্দির-গাত্রে খোদিত গজ-মূর্ত্তির চিত্র। বিচিত্র কলা-নৈপুণ্যে ভারতের এ দুটি রাজ্য সমধিক প্রসিদ্ধ। বারান্তরে আরো অনেক শিল্প-কাজের নক্সা-নমুনা দেওয়া যাবে। আপাততঃ যে নক্সা দুটি প্রকাশিত হলো, সে-বিষয়ে আলোচনা করি।
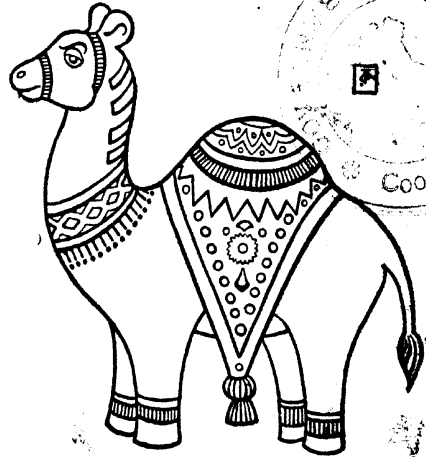
গতমাসে মুদ্রিত বাঙলার লোক-শিল্পের ধারানুসারে রচিত চিত্রগুলির মত এবারের নক্সা দুটিও সূচী-শিল্পে এবং চামড়ার কাজে ব্যবহার করা চলবে। এ দুটি নক্সা গতবারে উল্লিখিত বিভিন্ন জিনিষের শোভাবর্দ্ধনের কাজে ব্যবহৃত হতে পারে।

সূচী-শিল্পের কাজে, গতমাসের নির্দ্দেশানুসারে এ দুটি

নক্সাই 'ষ্টেম্-ষ্টিচ্' (Stem Stich) বা 'ব্যাক্-ষ্টিচের' (Back Stich) সাহায্যে সেলাই করতে হবে। প্রয়োজন হলে, উটের পিঠের আসন, ঘাড়ের কেশ, পায়ের অলঙ্কার এবং হাতীর পিঠের আসন, মাথার ঢাকা, পায়ের গহনা ও গাছের ডাল-পাতার ভিতরের অংশগুলি ইচ্ছানুযায়ী রঙীণ সুতো বা রেশম দিয়ে 'সাটিন্-ষ্টিচের' (Satin Stich) সাহায্যে ভরাট করতে পারেন। ছোটখাট নক্সা বা 'ডিজাইন' (Design) ভরাট করার কাজে 'সাটিন্ ষ্টিচ্' (Satin Stich) খুবই উপযোগী। তবে বড় বড় জায়গা ভরাটের সময় 'লং এ্যাণ্ড শর্ট ষ্টিচ্' (Long and Short Stich) সেলাইয়ের পদ্ধতিটি বিশেষ কাজে লাগে। এছাড়া মূল নক্সার চারিদিকে সাধারণ 'বর্ডার' (Border) বা 'ধারি-দেওয়ার কাজে' 'হেরিং বোন্ ষ্টিচ্' (Herring Bone Stich), 'ফেদার ষ্টিচ্' (Feather Stich), 'ফ্লাই ষ্টিচ্' (Fly Stich) সেলাই পদ্ধতিগুলিও নানাভাবে ইচ্ছামত ব্যবহার করা চলে। চওড়া 'বর্ডার' ভরাট করার কাজে 'ওরিয়েণ্টাল্ ষ্টিচ্' (Oriental Stich) ব্যবহার করা যেতে পারে।
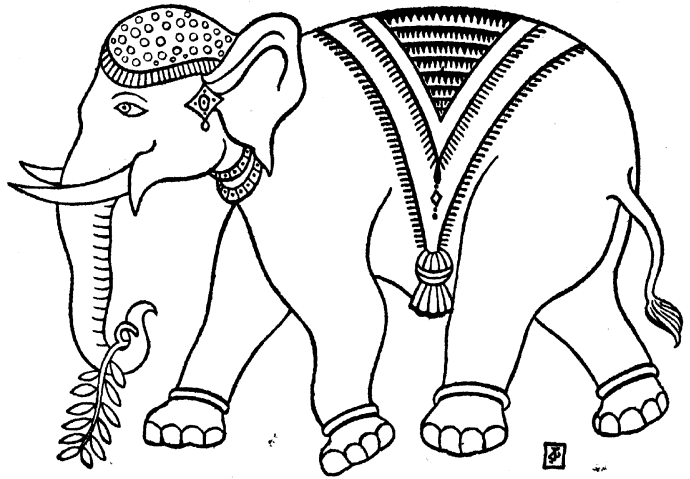
সূচী-শিল্প প্রসঙ্গে আরো কয়েকটি দরকারী কথা জানিয়ে রাখি। সেলাইয়ের কাজের সময় বসবার আসনটি যেন আরামপ্রদ হয়। কষ্টকর ভঙ্গীতে সেলাই নিয়ে বসলে, বেশীক্ষণ কাজ করা সম্ভব হয় না···খানিকক্ষণ আড়ষ্টভাবে বা ঘাড় নীচু করে বসে সেলাইয়ের কাজ করবার পর শরীর-মন ক্লান্ত হয়। তাছাড়া সেলাইয়ের সময়, ছাদে-বারান্দায়, খোলা জানলার ধারে কিম্বা উজ্জ্বল-ল্যাম্পের কাছে বসে কাজ করাই উচিত। কারণ, স্বল্প-আলোয় সূক্ষ্ম সূচী-শিল্পের কাজ করলে চোখের পরিশ্রম ছাড়াও মাথার যাতনায় কষ্ট পাবার আশঙ্কা আছে। উপরন্তু, এমন অস্বস্তিকরভাবে পরিশ্রম করলে কিছুক্ষণ বাদেই শুধু যে মনের স্ফূর্তি নষ্ট হবে তাই নয়, হাতের কাজেরও বিশেষ ক্ষতি হবে। কাজেই প্রত্যেক সূচী-শিল্পীরই এ সম্বন্ধে রীতিমত হুঁশিয়ার থাকা প্রয়োজন।

সেলাইয়ের কাজের সময় ছুঁচ-সুতো যা ব্যবহার করবেন, সে সব যেন ভালো মজবুত ধরণের হয়। মরচে-ধরা ছুঁচ দিয়ে কখনও সেলাই করবেন না—তাতে সেলাইয়ের কাজ অপরিচ্ছন্ন হয়, কাপড়ে মরচের দাগ ধরে এবং মরচের দাগ-ধরা কাপড় অল্পদিনেই পচে জীর্ণ হয়ে যায়। কাজেই সব সময় ভালো মজবুত ছুঁচ, পাকা সুতো, রেশম বা পশম ব্যবহার করবেন। শস্তাদরের বাজে সুতো, রেশম বা পশম আদৌ ব্যবহার করবেন না—কারণ, এ সব জিনিষ ধোপে টেঁকে না···এ সব জিনিষ ব্যবহারের ফলে, সখ করে যে হাতের-কাজটি করবেন, সেটি দু দিনেই নষ্ট হয়ে যাবে এবং যা কিছু পয়সা-কড়ি বা মেহনৎ খরচ করবেন, সবই হবে অপব্যয়! সেলাইয়ের সময় বিশেষ লক্ষ্য রাখবেন যে, কাজ করবার ছুঁচ যেন সুতোর চেয়ে কিছু মোটা (thick) হয়—না হলে ছুঁচের গর্ত্তে সুতো পরাবার ভারী অসুবিধা ঘটবে। সরু ছুঁচে মোটা সুতো পরানো যদি বা সম্ভব হয়, তবু সে-সুতো পরানোর সময় ঘবড়ানো লেগে সুতোর 'তন্তু' (chord-fabric) কমজোর হয়ে পড়ে—সেলাই তেমন মজবুত থাকে না··· উপরন্তু, সুতোর আঁশ ওঠে আর ঘন ঘন ফাঁশ জড়ায়। কাজেই সেলাইয়ের বাক্সে সর্ব্বদা ছোট-বড়-মাঝারী সব ধরণের ভাল মজবুত এবং পরিষ্কার ছুঁচ মজুত রাখবেন—

বিভিন্ন রকমের সূচী-শিল্পের জন্য ! সেলাইয়ের পর ছুঁচ বাক্সে তুলে রাখার সময় সেগুলি খড়ির গুঁড়ো বা পাউডার দিয়ে ঘষে নেবেন—তাহলে কাজের সময় হাতের ঘাম লাগার দরুণ ছুঁচে মরচে ধরবার আশঙ্কা থাকবে না এবং ছুঁচগুলিও বেশ পরিস্কার-শুকনো থাকবে। সেলাইয়ের সময় হাতের ঘাম সম্বন্ধেও হুঁশিয়ার থাকবেন—না হলে হাতের ঘাম লেগে সেলাই অপরিচ্ছন্ন হবার ও ছুঁচে মরচে ধরবার সম্ভাবনা! সেলাইয়ের সময় যাঁদের হাত ঘামে, তাঁরা সঙ্গে কৌটায় করে একটু পাউডার বা খড়ির গুঁড়ো রাখবেন—কাজের সময় মাঝে মাঝে সেই গুঁড়ো হাতে ঘষে নিয়ে হাতের ঘাম শুক্‌নো করে নেবেন। ছুঁচে যদি মরচে ধরে, তাহলে গোল আলুতে সেই ছুঁচটি বার কয়েক বিঁধিয়ে নিলেই আলুর রস লেগে সে-মরচে অদৃশ্য হবে।

সেলাইয়ের বাক্সে সব সময় দুখানি কাঁচি মজুত রাখবেন—একটি বড় এবং মোটা, আরেকটি—ছোট এবং সরু! বড় কাঁচিটি কাপড়-কাটার কাজে এবং ছোটটি সুতো-কাটার কাজে ব্যবহার করবেন। সেলাইয়ের কাপড় সব সময় কাঁচি দিয়ে প্রয়োজনমত আকারে কাটবেন—হাতে টেনে ছিঁড়বেন না কখনো। কারণ, কাপড় টেনে ছিঁড়লে সে কাপড়ের সুতোর বুনানীর জোর কমে যায়…মজবুত থাকে না। তাছাড়া হাতে টেনে ছেঁড়ার ফলে, বে-কায়দায় কাপড়টির কিনারা বেমানান ও বাঁকাট্যারা হয়ে নষ্ট হবার সম্ভাবনাও প্রচুর। সুতরাং বড় কাঁচি দিয়ে কাপড়টিকে আগাগোড়া ঠিকমত কেটে নেওয়াই উচিত। সেলাই সূক্ষ্ম-সৌখিন শিল্প-কাজ…একাজে তাড়াহুড়োর স্থান নেই…সুশৃঙ্খল-পদ্ধতিতে পরিপাটিভাবে হাত, চোখ আর মন স্থির রেখে কাজে এগুতে হবে—তবেই সার্থক সৃষ্টি হতে পারবে…চঞ্চল হলেই শেষ পর্য্যন্ত 'শিব গড়তে বাঁদর' হয়ে দাঁড়াবে !

সূচী-শিল্পের এই আলোচনার সঙ্গে এ-মাসে আরো দুটি নতুন জামার প্যাটার্নের নক্সা দেওয়া হলো। প্রথমটি, মেয়েদের ব্লাউজের এবং দ্বিতীয়টি, ছোট-মেয়েদের ফ্রকের ডিজাইন। ব্লাউশের প্যাটার্নটি শাদা বা রঙীণ সিল্ক, মিহি সুতির কিম্বা পাতলা ফ্লানেলের কাপড়ে বসানো চলতে পারে। গলার চেন্‌টি ব্লাউশের কাপড়ের সঙ্গে মানান-সইভাবে রঙ মিলিয়ে নিকেল বা সোনালী-গিল্টি করা ধাতুনির্ম্মিত রিংওয়ালা সরু চেন, কিম্বা রেশম বা পশমের তৈরী দুটি 'ঝুম্‌কো' বা 'ট্যাসেল্‌' (Tassel) ঝুলানো দড়ির মত পাকানো 'কর্ডের' (chord) সাহায্যে রচনা করা যেতে পারে। ফ্রকের প্যাটার্নটি ইচ্ছানুযায়ী কোন হাল্‌কা এক-রঙা বা 'চেক্‌-কাটা' ছিটের কাপড়ে রচিত হবার উপযোগী।

আপাততঃ এই পর্য্যন্ত—আগামী মাসে আরো কয়েকটি নতুন বিষয়ের হদিশ ও নক্সা প্রকাশ করার বাসনা রইলো।

শ্রীশ্রীশ্যামা মায়ের রূপ

শ্রীকেশবচন্দ্র গুপ্ত

মহামায়া মা দুর্গার পূজার পর কোজাগরী লক্ষ্মীপূজা। তারপর অমা-নিশায় শ্রীশ্রীশ্যামা পূজা। সে রাত্রে দীপালি।

শ্যামা মায়ের পদতলে জবা দেখে কবির হ'য়েছিল ক্ষোভ। কোন সাধনায় পেলে সে শ্যামা মায়ের চরণতল? সে সাধনার তল্লাসের কারণ বলেছিল কাজী কবি।

তোর মত মা'র পায়ে রাতুল
হবো কবে প্রসাদীফুল
কবে উঠ্‌বে রেঙে
ওরে মায়ের পায়ের ছোঁয়া লেগে
কবে তোরই মত রাঙ্‌বে রে মোর মলিন চিত্তদল।

ভক্ত রামলাল দত্ত গেয়েছিলেন—

শ্মশান ভালবাসিস বলে শ্মশান করেছি হৃদি
শ্মশান-বাসিনী শ্যামা নাচবি বলে নিরবধি।

সাধক রামপ্রসাদ তো শ্যামা মায়ের গণ্ডী দিয়ে শমনকে তীব্র উপেক্ষায় ভ্রূকুটি করেছেন।

এসব সাধক ও ভক্তদের কথা। আমরা সংসারীর চোখ নিয়ে কী দেখি, কী ভাবি শ্যামামায়ের রূপ দেখে?

শ্যামা মায়ের রূপে আছে ভীতির পূর্ণ নিশানা। করাল-বদনা কালী। গলে মুণ্ডমালা। লোল জিহ্বা—রক্তের সন্ধান তথায়—অন্তরের রক্ত নয় বাহিরের রক্ত—শত্রুর শোণিতবিন্দু ক্ষরণের রেখা। মায়ের বর্ণ কালো—আলুলায়িত কেশদাম। ঘোর কৃষ্ণবর্ণ গ্রস্ত করে দৃষ্টি। মায়ের কেশরাশি ফুটিয়ে তোলে জানতে না দেওয়া বাহিরের পিছনের কোনো তথ্য বা তত্ত্ব। ঘোর কৃষ্ণ যবনিকা। কৃষ্ণা ভীমা ভয়ঙ্করী। কটিদেশে কোনো মূর্ত্তিতে দেখি বাঘছাল, কোথাও কাটা হাত।

ভীতি নিয়ে যায় মার শ্রীচরণে। আবার প্রাণে আশ্বাস আসে—মায়ের পদতলে শায়িত শান্ত শিব সুন্দর। রামপ্রসাদ যখন হৃদি রত্না-করের অগাধ জলে ডুব দিতে বলেছিলেন মনকে, তখন বুঝিয়েছিলেন—

রত্নাকর না শূন্য কখন, দু'চার ডুবে ধন না পেলে
তুমি দম-সামর্থে এক ডুবে যাও কুল-কুণ্ডলিনীর কূলে।
জ্ঞান সমুদ্রের মাঝেরে মন, শক্তিরূপা মুক্তা ফলে
তুমি ভক্তি ক'রে কুড়ায়ে পাবে শিব-যুক্তি মত চাহিলে।

কাজী কবি বলেছেন—কালো মেয়ের পায়ের তলায় দেখে যা আলোর নাচন।

সত্যই কী বিশ্বমাতা মাত্র ভয়ঙ্করী—ঘোরা দিগম্বরা অসিপাশাদি শস্ত্রবিভূষণা? শুনি আনন্দই সর্ব্বস্ব পরব্রহ্মের। মা কি সর্ব্বমঙ্গলা নন?

কী তাৎপর্য্য এ রূপের।

শাস্ত্র বলেছে—

ন দেবো বিদ্যতে কাষ্ঠে ন পাষাণে ন মৃন্ময়ে
দেবো হি বিদ্যতে ভাবে তস্মাৎ ভাবো হি কারণম্।

সত্য ভাবই উদ্বুদ্ধ করে দেব মূর্ত্তি—যদি বোঝা যায় রূপের সার্থকতা। দেবতা কাষ্ঠে, পাষাণে বা মৃত্তিকায় মাত্র বিরাজ করেন না। মা যে আমার সর্ব্বস্বরূপা। তিনি দিগ্বসনা—কাজেই সারা বিশ্ব তাঁর রূপ। অনন্ত সে ব্যাপ্তি।

মনকে এক কেন্দ্র করবার জন্য, সাধকের হিতের জন্য, ব্রহ্মের রূপ কল্পনা। বিষ্ণুপুরাণ স্পষ্ট বলেছে—

চিন্ময়স্যাপ্রেময়স্য নিগুর্ণস্যা শরীরিণঃ
সাধকানাম্ হিতার্থায় ব্রহ্মণো রূপ কল্পনা।

যিনি চিন্ময় অপ্রাময়, নিগুর্ণ অশরীরি। তাঁর রূপ কী? অরূপের রূপ কল্পনা করেছেন ঋষিরা—সাধকদের হিতার্থে।

এখন প্রশ্ন ওঠে—অখণ্ড মণ্ডলাকার চরাচরব্যাপ্ত অনন্তরূপ মায়ের কালী-রূপ কল্পনায় সাধকের কী ভাবে হিতসাধন হয়। সর্ব্ব-মঙ্গলা শিবা সর্ব্বার্থ সাধিকা।

আমাদেরই এ-যুগে রামপ্রসাদ এবং পরমহংসদেব নিরন্তর মূর্ত্তিময় শ্যামা মায়ের পদসেবায় মোক্ষ লাভ করেছেন। দিগ্বিজয়ী হয়েছেন দিগম্বরার ধ্যানে। প্রমাণ করেছেন এঁরা মূর্ত্তি পূজার সার্থকতা।

সংসার কীটের জ্বালায় অবিরত নির্য্যাতিত আমরাও তো মায়ের আদরের সন্তান। সবাই জানি এ স্নেহ ভাণ্ডারের উৎস-মুখ প্রাণের গভীরে। কিন্তু তার সন্ধান পাই না বলেই আমরা নই স্নেহ-ধন্য। ভয় পাই রূপ দেখে।

বহু উপদেশ পেয়েছি পুস্তকে মায়ের রূপের। আমার মনে প্রতীতি হয়েছে যে অর্থের, আজ সে কথা বলব। অন্ততঃ রূপের মাঝে অরূপের কী বর্ণনা দিয়েছেন ঋষিরা সে বিষয়ে পাঠকের চিত্ত হবে জ্ঞান-পিপাসু। ভুল ভ্রান্তি আমার—ব্যাখ্যাতাদের সম্যক্ ব্যাখ্যা বোঝবার ভ্রমে।

কালীর উৎপত্তির সমাচার পাই মার্কণ্ডেয় চণ্ডীতে। দেবীর সাথে যুদ্ধে ধূম্রলোচন বধ হয়েছে। অর্থাৎ মনের মধ্যে—ধোঁয়াটে চোখের যে বিকৃত দর্শন তার হয়েছে অবশেষ সমর-সাধকের। কিন্তু অসুরভাব তো মাত্র মনের মাঝে নির্ম্মল দৃষ্টিতেও যায় না। অস্মিতা—আমিত্ব—এ ভাব ভীষণ, সৃষ্টি-লীলাময়ীর সৃষ্টি লীলায়। এই অস্মিতায় আছে দুটি

দিক—প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তি। নিষ্কাম কর্ম্ম জ্ঞানের আলোকে ভক্তির প্রেরণায় সাধন করলেও—সাধকের আমিত্ব বোধ, এক ব্রহ্ম হতে ভিন্নতার ভাব, মুছে যায় না, অথচ অস্মিতার বিলোপ না হ'লে মুক্তি অসম্ভব। স্যন্দমান নদী সাগরে না মিশলে তো নদীর স্রোতস্বিনী নাম ঘোচে না—সে সমুদ্রের প্রসারতাও পায় না।

প্রবৃত্তি নিবৃত্তি দুই অসুরের নাম—চণ্ড ও মুণ্ড। ধূম্রলোচন বধের পর শুম্ভ আদেশ দিলেন এই দুটি সেনাপতিকে। কেশ আকর্ষণ ক'রে বা বেঁধে আনতে অম্বিকাকে আজ্ঞা দিল অসুররাজ শুম্ভ চণ্ড-মুণ্ডকে। সগর্ব্বে সবলে মাকে আনতে চেয়েছিলেন এ যুগের সাধকেরা বাঙলা গীতি-কাব্যে। পরমহংসদেবের কথামৃতে তার পরিচয় পাই। কিন্তু সে জোর অভিমানী ছেলের আব্দার স্নেহময়া মার কাছে—যখন তাদের মন-প্রাণ উচ্ছ্বসিত উচ্ছলিত মার প্রতি ভালবাসায়। জননীর স্নেহ-ভাগীরথীর জলে তাঁরা সাঁতার দিতেন, ডুবতেন রত্ন তুলতে, ভাসতেন। হৃদয়কে করতেন শ্মশান—কারণ মা ভালবাসেন শ্মশান। সেই অনুরাগের দর্পে আব্দার করেছিলেন রামলাল মাকে নাচতে বলে। এ হুকুম স্নেহের আব্দার—জ্ঞান ধোয়া মনের উচ্ছাস—

মৃত্যুঞ্জয় মহাকালে রাখিয়ে চরণ তলে
নাচ দেখি মা তালে তালে, হেরি আমি নয়ন মুদে।

কিন্তু শুম্ভের আজ্ঞা ছিল আসুরিক আত্মম্ভরিতার নির্ব্বোধ দর্প। শত্রুর নির্দ্দেশ সেনাপতিদ্বয়ের প্রতি—চুল ধরে বেঁধে আনো।

অম্বিকা এ অস্মিতার গর্ব্ব চূর্ণ করবার উপায় উদ্ভাবন করলেন। এ উপায় চিরন্তনের পৃথিবীর চিরকালের সংসারীর উপায়। বাঙ্গালী সাধক মাটির আর পাথরের মূর্ত্তি গড়ে সে সত্যকে ছকে এঁকে, গঠন ক'রে ধরলেন দেশবাসীর সামনে। দুর্গাপূজা, লক্ষ্মীপূজার আনন্দকে আরও ফুটিয়ে তোলবার জন্য বোঝালেন প্রকৃত আনন্দ শাশ্বত, অখণ্ড, শান্ত। সেথা পৌঁছতে হবে মায়ের ধ্যানে। এ সত্য শ্রীকৃষ্ণ বুঝিয়ে ছিলেন বিশ্বরূপ দেখিয়ে, বৌদ্ধদর্শন বুঝিয়েছিল—ক্ষণিক বিজ্ঞানবাদের মাধ্যমে। শ্রীশ্রীচণ্ডীতে বোঝালেন ঋষি। বাঙ্গালী কবি সাধকেরা গানে এবং মূর্ত্তি সৃষ্টি করলেন শ্রীশ্রীকালীর।

বলছিলাম চণ্ড মুণ্ড ধ্বংসের কথা—প্রবৃত্তি, নিবৃত্তি নিধনের মঙ্গল অনুষ্ঠানের। শুম্ভের দুই সেনাপতি চণ্ড এবং মুণ্ডকে বিনাশ করবার জন্য অম্বিকার বরণ হ'ল মসীর। তখন—

ভ্রুকুটি-কুটিল তাঁর ললাট-ফলক হ'তে অতি দ্রুত বেগে করাল-বদনা কালী বিনিষ্ক্রান্ত হলেন। তাঁর হাতে অসি এবং পাশ বিচিত্র খট্টাঙ্গধারী তিনি। দেবী নরমালাবিভূষণা। পরণে তাঁর শার্দুলচর্ম্ম। শুষ্ক মাংস অতি ভয়ঙ্করা। অতি বিস্তারবদনা ভীষণ লোল জিহ্বা। নয়ন রক্তবরণ কোটর প্রবিষ্ট। ভীষণ গর্জ্জনে তিনি দিগ্মণ্ডল পরিপূরিত করলেন।*

এই মূর্ত্তিপূজা হয় বাঙ্গলাদেশে। তবে বহুস্থলে কালীমূর্ত্তিতে দেখি—তিনি ব্যাঘ্রচর্ম্ম পরিহিতা নন। তাঁর কটিদেশ মানুষের কাটা হাতের বসনে আবৃত।

কী ভাব জাগাবার জন্য এরূপ পরিকল্পনা? বাংলাদেশের গর্ব্ব যাঁরা—তাঁরা মোক্ষ লাভ করেছেন এই মূর্ত্তির ধ্যানে জ্ঞানে। কেহ করেছেন শ্যামসুন্দরের ত্রিভঙ্গ কালো রূপের মহিমায়।

চণ্ডমুণ্ড-বিনাশ কালীমাতার আবির্ভাবের উদ্দেশ্য। চণ্ডমুণ্ড ঘোর অন্তর্নিহিত আমিত্বের প্রতীক অসুর। সকল অসুরভাব নিবন্ধায়, বন্ধনের হেতু, বলেছেন শ্রীকৃষ্ণ। সেই অসুরভাবে বন্ধন করে আনতে চেয়েছিল অসুররাজ কালকে—মোক্ষ জ্ঞানকে, কিন্তু তা হয় না। নিবৃত্তির আমিত্বে চিত্তবৃত্তি নিরোধেও আমিত্বের লেশ থাকে—আমার বৃত্তি নিরোধ। প্রবৃত্তি-মার্গে তো আমিত্ব থাকেই—যত জোরেই কেন সাধিত হ'ক না কর্ম্মের কাজ নিষ্কামভাবে। কালী ভজনে যায় সে অস্মিতা—সর্ব্ব নিবেদন করলে।

কালই রূপ দেয় অরূপকে—অথচ কাল চলেছে কলাকাষ্ঠাদি রূপে।

যা' কিছু জানি, যত কিছু দেখি, যে ভাব করি উপলব্ধি—সকলই সর্বদাই প্রতিমুহূর্ত্তে পরিবর্ত্তিত হচ্চে। পৃথিবী ঘুরছে, সূর্য্য চলেছে, দেহের মাঝে স্থির নয়—রক্ত, মাংস, অস্থি, চর্ম্ম। ভাবের তো কথাই নাই। কিন্তু এই সবার মাঝে আছে বোধ—কালকের আমিই আজকের আমি। বুদ্ধিমান জ্ঞান অর্জ্জন করে ভাবে—বিগত দিনের মূর্খ আমি—আজ আমি জ্ঞানী। বৌদ্ধশাস্ত্র এ ভাবকে বলেছে—ক্ষণিক বিজ্ঞান। কালের ধারার সঙ্গে প্রতিক্ষণে পরিবর্ত্তিত হচ্ছে জগত। অথচ এর একটা আলয় আছে ঘর আছে। পূর্ব্বাপর বোধের আলয়। নির্বাণ লাভ করেই বুদ্ধদেব বলেছিলেন—গেহকারককে দেখেছি। সেই গৃহ নির্ম্মাতাই চণ্ডী পুরাণের চণ্ড মুণ্ড, দর্শনের অস্মিতা। আমিত্ব-গেহ বা আলয়ের নির্ম্মাতা।

কাল ভাঙ্গছে আর সঙ্গে সঙ্গে গড়ছে? কারণ আলয় বিজ্ঞান বর্ত্তমান। কবি নটরাজকে বলেছিলেন—

নটরাজ তোমার নাচের দোলায়, বাঁধন খোলায় বাঁধন পরায়।

নটরাজ মহাকাল। তাই কালের পার্থক্যের বোধ ঘটায় ভেদাভেদ।

রূপ দেখে চোখ সাতটা রঙের বিভিন্ন মিশ্রণের ফলে। সাত ঘোড়ার রথ সূর্য্য। রবিকরই দেখায় এক অখণ্ড জগতের বিভিন্ন মূর্ত্তি। কেহ হাঁসায় কেহ জাগায় বিভীষিকা মনে। চিত্ত সমাহিত হয় খণ্ডে। তাকেও টুকরো টুকরো করে কাল।

শাস্ত্র—বলে মুছে ফেল কালের অনুভূতি চিত্ত হ'তে। থাকবে শূন্য। সূর্যও যাবে ডুবে। তার ধার করা রশ্মিতে রূপবান চন্দ্রও

---

* ভ্রুকুটি কুটিলাত্তস্যা ললাটফলকাদ্ দ্রুতম।
কালী করাল-বদনা বিনিষ্ক্রান্তাসিপাশিনী।
বিচিত্র খট্টাঙ্গধরা নরমালা বিভূষণা,
দ্বীপি চর্ম্ম পরিধানা শুষ্ক মাংসাতিভৈরবা।
অতি বিস্তার বদনা জিহ্বা ললন ভীষণা।
নিমগ্না রক্তনয়না নাদাপূরিতদিঙ্মুখা।

হবে হতশ্রদ্ধ। সব যাবে শূন্যের গহ্বরে। নিবিষ্ট চিত্ত হও তাতে—কালো কেশ ঢেকে আছে সব—মায়ের কালো বর্ণেই সকল ভেদাভেদের অপহরণ।

তাই তো পরিকল্পনা—মায়ের বিস্তৃত কালো কেশ রাশি—ঘোর তিমির বরণা তাই শ্যামা।

কিন্তু এই তো শেষ নয়। এ পরিকল্পনা শূন্য বাদ। একো ব্রহ্মজ্ঞান নয়। তবে কেন মায়ের বিশ্ব রূপের মাধুর্য্য জেনেছেন ঋষি, কবি, মুক্ত সাধক?

সে পরের কথা। আপাততঃ বোঝা গেল—কালী পেতে গেলে—কালের দৌড়ানো খণ্ড খণ্ড রূপ হ'তে মনকে তুলতে হবে। কালরূপে প্রতি পূর্ব্ব মুহূর্ত্তকে বিনাশ করেছেন তিনিই। তাই শ্রীকৃষ্ণ বল্লেন—কালম্ কলয়তামস্মি। ঋষি মা দুর্গাকে ডেকে বল্লেন—কলাকাষ্ঠাদি-রূপেণ পরিণামপ্রদায়িনী। কালী—মহাকালী বেগবান খণ্ড কাল নয়। তাই কালীর রূপ কালো, কৃষ্ণ কালো, তাঁর আশ্রিত কোকিল কালো, তমাল কালো, তাই কবি বল্লেন—তাই কালে রূপ ভালোবাসি।

এবার নরমুণ্ডমালা। সত্যই বীভৎস সে কণ্ঠভূষণ। পঞ্চাশটি নরমুণ্ডের গাঁথা মালা দুলছে মায়ের গলায়। বিদেশী বিধর্ম্মী বলে—হরীড্, তোবা তোবা। সত্যই না বুঝলে বলার মধ্যে কোনো অপরাধ নাই।

এ নরমুণ্ডমালা বর্ণমালা। এ মানুষের কাটা মাথার হার নয়। তার কথা বলার প্রতীক। বিভিন্নতা মনের ভাষায় উপলব্ধি করার প্রতীক। একটা বড় গৌরব মানুষ জাতির যে—সে মনের ভাবকে গোচর করতে পারে অন্যের জ্ঞানে—কথা কহে। সত্যই এ গর্ব্বের দান লভেছে মানব-জাতি। এই শব্দের বলে সে দন্তীনখদংশন-লালায়িত সকল পশুর উপর স্থাপন করেছে নিজের প্রাধান্য।

কিন্তু আর্য্যঋষি যখন দেখলেন এ পুণ্য-ভূমিতে যে—সর্ব্বংখল্বিদং ব্রহ্ম,—তখন তাঁর চেষ্টা হ'লো সেই অনন্ত জ্ঞানকে নিজস্ব ক'রে, নিজের ক্ষুদ্রত্বকে বিস্তার ক'রে, অতিবিস্তার করে, নিস্তার পেতে এই দুঃখালয়ম শাশ্বত সংসার কারাগৃহ হ'তে। কালকে একযোগে দেখবার উপদেশ দিলেন। কলাকাষ্ঠা হ'তে যুগ-মহাযুগ খণ্ড করে কালকে। ডোবাও ডোবাও কালের বিচার, কালের বিভাগ। সমগ্রটা এক—মা কালী। রহিতকর কাল জ্ঞান—যাঁর লীলা তাঁকে উৎসর্গ কর। অহমিকা লোপ পাবে, আমিত্ব ঘুচে যাবে, অস্মিতা খণ্ড খণ্ড হবে, সাতরঙা বর্ণ হবে এক। পঞ্চাশ বর্ণের মিশ্রণে ভাষার পার্থক্য হবে লোপ।

কেটে দাও সেই মুখ-রূপ বর্ণ মালা। গেঁথে দোলাও তাঁর গলায় যিনি লীলা তরঙ্গে বিশ্ব বিমোহন করেছেন জগৎ বর্ণমালায়। এ সত্য উপলব্ধি করা তো সহজ। হ, আ এবং ত উচ্চারণ করলে হয় হাত, আবার ঐ তিন বর্ণে একটা ঈ যোগ ক'রে দিলে হয় হাতী—বৃহত্তর পশু। মাতার অপেক্ষা প্রিয়তো কেহ নাই জগতে। সেই শব্দে দ যোগ করলে হয় বিস্মনীর মাতাল—সুরাপানে নষ্টজ্ঞান।

তাই প্রতীক বর্ণ-মালা—পঞ্চাশ অক্ষরের হার—তারা মুখ দিয়ে নির্গত হয় তাই ছিন্ন শির। বিভিন্নতা বন্ধ হয় ভাষার প্রাচীর ভেঙ্গে দিলে। তাই মাকে উৎসর্গ কর কথার মার প্যাঁচ বর্ণনা, হিংসার ভাষা, দ্বেষের উদ্গার। মার কটি দেশে কোনো মূর্ত্তিতে দেখি কাটা হাত—কোথায় দেখি বাঘছাল। হাত কর্ম্মের প্রতীক। কাটা হাত কর্ম্ম নিবৃত্তির প্রতীক। নিষ্কাম কর্ম্ম উৎপাদন করে কর্ম্ম সন্ন্যাস—কাজ টেনে নেওয়া। কর্ম্ম বিরতি আলস্যের প্রতীক নয়। কারণ অলসের হাত বন্ধ থাকলেও মনের মাঝে রাজা উজীর মারবার চিন্তাস্রোত হয় প্রবহমান। মনের কাজও করতে হবে বন্ধ। সকল স্রোত উৎসর্গ করতে হবে মাতৃ-পূজায়।

বর্ণমালায় ভাষা গেল—মাত্র বাহিরের না, অন্তরের যাতে ভেদাভেদ আসে। হাত কেটে বসন পরিধান করানো হ'ল মাতাকে। কর্ম্ম প্রচেষ্টা কেন কর্ম্মের ভাবনা গেল। মন হল শূন্য। চিত্ত তো অস্মিতার প্রধান কর্ম্মী। সে গেল কালোরূপ শূন্য করলে মন-প্রাণ।

শ্রীশ্রীচণ্ডীপুরাণে তাঁকে দ্বীপিচর্ম্মপরিহিতা বলা হয়েছে। শার্দ্দূলচর্ম্ম মানে মনের হিংসাবৃত্তিকে বধ ক'রে তার চামড়া অর্পণ মাতৃ-সজ্জায়। অস্মিতার হিংসুক ভাব বর্জ্জনের এ অপর এক অর্ঘ্য।

লোলজিহ্বা স্বামী সত্যদেব সাধন-সমরে বলেছেন রক্তবীজবধের। রক্তবীজের প্রতি রক্ত বিন্দু বহু অসুর উৎপাদন করত। এ বাসনাময় সংস্কার বন্ধ না করলে প্রতি কামনা হ'তে উদ্ভুত হবে অপর কামনা। মায়ার খেলা চলবে মহাবেগে। বাসনা রক্তবীজ নিহত না হ'লে মুক্তি কোথা। শ্রীশ্রীকালীমাতার উদ্দেশ্যে যখন সমস্ত অর্পিত হয় নিজ প্রসাদে মা যখন অস্মিতার সকল উপাধি হরণ করেন হাতের আয়ুধে তখন তার মাথা যায় কাটা। মায়ের হাতে ঝোলা কাটা শির অস্মিতা অসুরের।

আমার মনে হয় এই ভাবে উপলব্ধি করলে করালবদনা ঘোরকৃষ্ণা শ্যামা মায়ের মূর্ত্তি হতে ভয়ের সন্ধান লোপ পায়। প্রাণ শুদ্ধ হয় যখন সকল রঙীণ বাসনা উচ্চারিত ও অনুচ্চারিত ভাষা জলাঞ্জলি দিয়ে বিভেদ লোপ করা যায়। কিন্তু সন্দেহ হয় তবে কি ঋষিরা এ রূপের মাধ্যমে শিখাতে চেয়েছেন শূন্যবাদ। কোথা গেল উপনিষদের বাণী—আনন্দং ব্রহ্মণো বিদ্বান ন বিভেতি কদাচনঃ। কোথা সে আনন্দের নির্দ্দেশ আনন্দময়ীর প্রতিমায়। মা যে আনন্দময়ী। সাধক কি মিথ্যা গেয়েছিলেন—ভবে সেই সে পরমানন্দ সে আনন্দময়ী মায়েরে জানে।

না না তা' কেন? যখন সব যায়, অস্মিতা যায়, তখন আত্মা তো বিদ্যমান থাকে। অনাত্মবাদ তো বেদে নাই, তন্ত্রে নাই। শ্রীকৃষ্ণ ধর্ম্মক্ষেত্রে কুরুক্ষেত্রে সম্পাত করেছেন মঙ্গলাশোক। আত্মা অবিনশ্বর তিনিই সূত্র জীবাত্মারূপ এক একটি অবিনশ্বর আত্মায় সকলগুলি যে এক হারে গাঁথা।

মুক্ত হ'ল আত্মা। লুটি গেল কৃষ্ণ-বরণীর চরণ তলে শিবের দশায়। মুক্ত আত্মা শিব। জীবই শিব, অহং জ্ঞান ভরা বাসনার স্রোতে ভাসা জীব নয়। যার কাটা মাথা দোদুল্যমান কালীর হাতে সেই জীবও অন্তে শিব। শূন্যতা এলেই জ্বলে ওঠে বিশ্বজ্ঞান অনন্ত আনন্দ—মায়ের রাঙা পায়ের প্রসাদ স্পর্শে।

যাঁরা স্বাস্থ্য সম্বন্ধে সচেতন তাঁরা সবসময় লাইফবয় সাবান দিয়ে স্নান করেন।
খেলাধূলোই বলুন বা কাজকর্ম্মই বলুন আমরা কখনই ধূলোময়লার থেকে নিরাপদ নয়। আর ময়লা বহন করে রোগের বীজাণু যা সবসময় আপনার স্বাস্থ্যের পক্ষে ক্ষতি-কর। লাইফবয় সাবান এই বীজাণুগুলি ধুয়ে সাফ করে দেয় এবং আপনার স্বাস্থ্য সুরক্ষিত রাখে।
প্রত্যেকদিন লাইফবয় সাবান দিয়ে স্নান করে আপনার স্বাস্থ্য সুরক্ষিত রাখুন—এটি আপনাকে এত ঝরঝরে করে তোলে।
LIFEBUOY
SOAP
হিন্দুস্থান লিভার লিমিটেড, কর্তৃক প্রস্তুত।
L/P. 2-X52 BG
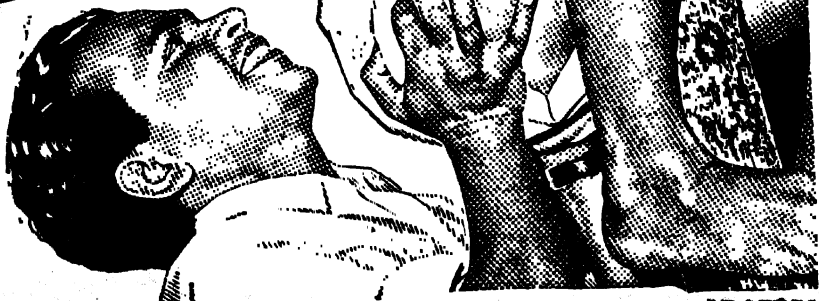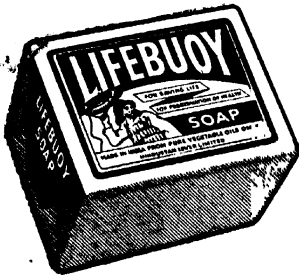
মায়ের পদতলে শান্ত শিব সুন্দর। সেথা যে আনন্দধাম। শিব সচ্চিদানন্দ। সে সমুদ্রে বিলুপ্ত হয় সকল আমিত্ব। উঠে যায় যবনিকা। আঁধার ঘর জলে ওঠে অনন্ত আলোকে। আনন্দলোকে মঙ্গলালোকে যে বিরাজেন সত্য সুন্দর।

অবশ্য আমরা কেবল কালী মূর্ত্তির একটা উপাধি আলোচনা করছি। কালী মা। তিনি সৃষ্টি, স্থিতি, সংহারের দেবী। সংহার পরিবর্ত্তন আত্মার নয় মায়িক অনুভূতির এবং অশাশ্বতের। চণ্ডীপুরাণে মাতৃ-কৃপার প্রচুর বর্ণনা আছে যার ফলে প্রাণ হয় প্রফুল্ল, চিত্ত হয় উচ্ছ্বসিত। গীতাতে সে পরিচয় পাই। ভগবান সংহারমূর্ত্তির পরিচয় দিয়েছেন। দংষ্ট্রাকরাল কালানলসন্নিভ। নদীর অম্বুরাশি যেমন সমুদ্রে প্রবেশ করে সবেগে তেমনি নরলোকবীরেরা সমস্ত তাঁর মুখে হচ্ছে প্রবিষ্ট। আবার তিনি স্রষ্টা, সখা, বন্ধু, পিতা পিতামহ

মহানির্ব্বাণতন্ত্র শ্রীশ্রীকালী স্তোত্র আরম্ভ করেছেন—

> ত্বং পরা প্রকৃতি সাক্ষাৎ ব্রহ্মণঃ পরমাত্মনঃ
> ত্বত্তো জাতং জগৎ সর্ব্বং ত্বং জগজ্জননী শিবে।

হে শান্তিময়ি তুমি পরমাত্মা ব্রহ্মের সাক্ষাৎ প্রকৃতি। তুমিই তো জগজ্জননী। কারণ সমস্ত জগৎ জন্মেছে তোমা হ'তে। বলা হয়েছে—তুমিই সাকার, তুমি নিরাকার, তুমি বিশ্বরক্ষার্থ নানা অঙ্গধারণ কর—কভু দ্বিভুজা, কভু চতুর্ভুজা, ষড়ভুজা, অষ্টভুজা। স্তোত্রে আরও শুনি—

> ত্বমন্নপূর্ণা বাগদেবী ত্বং দেবী কমলালয়া।
> সর্ব্বশক্তি স্বরূপা ত্বং সর্ব্বদেবময়ী তনুঃ।

এই সর্ব্বস্বরূপা, সর্ব্বেশা, সর্ব্বশক্তিসমন্বিতার ভাব লোপ তো পেতে পারে না ভক্তের মনে। মূর্ত্তির সম্মুখে এ ভাবও জাগবে, আর জাগবে সেই ভাব যা মহানির্ব্বাণ তন্ত্র এই স্তোত্রের শেষে বলেছে—

> তব রূপং মহাকাল জগৎ সংহার কারকঃ
> মহাসংহার সময়ে কালঃ সর্ব্বং গ্রসিস্যতি।

তিনি মহাপ্রলয়ে সমস্ত কাল গ্রাস করবেন। একথা ব্যক্তি চৈতন্যে প্রযুজ্য। তাই—

> কলনাৎ সর্ব্বভূতানাং মহাকালঃ প্রকীর্ত্তিতঃ।
> মহাকালস্য কলনাৎ ত্বমাদ্যা কালিকা পরা।

ব্যক্তি চৈতন্যে এ বাণী কি এই অর্থ প্রকাশ করেনা যে আত্মা যখন মায়া মুক্ত হবে তখন বিনষ্ট হবে সব ভেদাভেদ ভূতে ভূতে।

শ্রীরামকৃষ্ণের জীবনী আলোচনা করলে এই কথা স্পষ্ট প্রতীত হয় যে তিনি ভবতারিণী কালী মূর্ত্তির সম্মুখে বসে চিনি খাওয়ার আনন্দ পেতেন—আবার চিনি হতেন ব্রহ্মচৈতন্যে লয় হ'য়ে। সাধক রাম-প্রসাদের নানা গানে এই কথার প্রকাশ পেতো। পরিব্রাজক শ্রীকৃষ্ণানন্দ স্বামী গেয়েছিলেন—

> তুমি অন্নপূর্ণা মা, শ্মশানে শ্যামা, কৈলাসেতে উমা, তুমি বৈকুণ্ঠে রমা
> ধর বিরিঞ্চি শিব-বিষ্ণুরূপ সৃজন লয় পালনে।

শ্যামা মায়ের পূর্ণ উপাধি হৃদয়ঙ্গম করে তাঁর ঘোর কৃষ্ণ দিগম্বর মূর্ত্তি জপ করলে, কোথায় অবকাশ থাকে ভাতির? ধীরে ধীরে কালের পরি-ণাম ঘুচে যাবে সব শূন্য হবে—তখন ফুটে উঠবে শাশ্বত চৈতন্য—সচ্চিদা-নন্দ শান্ত শিব সুন্দরের। একাক্ষরতন্ত্রের নাদধ্বনির সার্থকতা।

আর একটা বিষয়ের উল্লেখ এ সম্পর্কে আবশ্যক। হিন্দু ধর্ম্মের মূলমন্ত্র—বিভিন্নতার মাঝে একের উপলব্ধি। মানুষের কালক্রমে মতি তেত্রিশ লক্ষ। তাই বহু দেবতার বর্ণনা। অর্থাৎ মানুষের চিত্তবৃত্তি ক্ষণিক। সেই ক্ষণে ক্ষণে যে ভাব ওঠে তা নিবৃত্ত বা প্রবৃত্ত করবার জন্য একেশ্বরকে খণ্ডভাবে ভাববার বিধান—এই বহু দেবতার উপাসনা। তা হ'লে সকল কর্ম্মে নিবেদিত হবে চিত্ত ভগবানে—তাঁকে যে ভাবেই ভাবা যাক। কেবল মনের মাঝে দৃঢ় প্রত্যয় রাখতে হবে যে—সকলি তাঁহাতে তিনি সকলেতে।

অনেক সময় আমাদের ভ্রম এবং গোঁড়ামী বিভেদ সৃষ্টি করে তথা-কথিত উপাসকদের মধ্যে। ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ বলেছেন—নানা মত নানা পথ—কিন্তু গন্তব্য একই স্থান। আর এক সাধক গেয়েছিলেন—

> হৃদয়-রাস মন্দিরে দাঁড়া মা ত্রিভঙ্গ হ'য়ে
> হয়ে বাঁকা দে মা দেখা শ্রীরাধারে বামে লয়ে।

এমন উচ্ছ্বাস ওঠে সাধকের প্রাণে বিভিন্ন ভাবের উচ্ছ্বাসে—কিন্তু সে জানে—শ্যাম শ্যামা শিব রাম—সবই এক।

এ বিষয় কমলাকান্তের একটি সঙ্গীতের কিয়দংশ উদ্ধৃত করব—

> জান না রে মন পরম কারণ শ্যামা ত শুধু মেয়ে নয়,
> মেঘের বরণ করিয়ে ধারণ কখন কখন পুরুষ হয়,
> কভু বাঁধে ধড়া কভু বাঁধে চূড়া ময়ূর পুচ্ছ শোভিত তায়,
> কখন পার্ব্বতী কখন শ্রীমতী কখন রামের জানকী হয়।
> হয়ে এলোকেশী করে লয়ে অসি দনুজ দলে করে অভয়,
> ব্রজপুরে আসি বাজাইয়ে বাঁশী ব্রজবাসীর মন হরিয়ে লয়।

শেষে বলেছেন—

> যে রূপে যে জন করয়ে সাধন সে রূপে তাঁহারি মানসে রয়
> কমলাকান্তের হৃদি সরোবরে কমল-কামিনী হবে উদয়।

জননী

(সমারসেট মম্)

শ্রীসুভাষ সিংহ

দু'তিনজন লোক তাদের ঘর থেকে বেরিয়ে এল। বারান্দায় যে ঝগড়াটা হচ্ছে তা তারা শুনতে পেল।

"আরে ও হচ্ছে সেই নূতন ভাড়াটে," একটি স্ত্রীলোক বললে," মনে হচ্ছে স্ত্রীলোকটি কুলীর সাথে দু'এক পেনী কমাবার জন্য কথা কাটাকাটি করছে।"

এই বাড়ীটা হ'ল দোতালা। চারিদিকে বারান্দা। পিছনের দিকে রয়েছে সেভিলির সবচেয়ে খারাপ জায়গা, অর্থাৎ লা ম্যাকারেনা। ভাড়াটের মধ্যে পুলিশ, পোষ্ট-ম্যান, ট্রামকণ্ডাক্টর এবং শ্রমজীবীরা আছে। মোট কুড়িটি পরিবার এই দোতালা বাড়ীটায় ভাড়া থাকে। তারা সামান্য বিষয় নিয়ে নিজেদের মধ্যে ঘেয়ো কুকুরের মত কামড়াকামড়ি করে, কিন্তু এ কলহ তাদের বেশীক্ষণ থাকে না—আবার সবাই বন্ধু হয়ে যায়। যখন সাহায্যের প্রয়োজন হয়—পরস্পর পরস্পরকে সাহায্য করে।

একটি ঘর কিছুদিন যাবৎ খালি ছিল। একদিন সকালে সেই স্ত্রীলোকটি এল। সঙ্গে ছিল অনেক মাল-পত্র—যতটা সে নিজে পেরেছে এনেছে। বাকীটা এনেছে একটা কুলী।

কিন্তু ঝগড়াটা ক্রমশঃ যেন বেড়েই চলল। উপর তলার দুটি স্ত্রীলোক ব্যালকনি ঘেঁষে নীচের দিকে কান খাড়া করে রেখেছে—যেন একটি কথাও তাদের কান থেকে ফসকে না যায়। তারা শুনতে পেল নূতন-আসা স্ত্রীলোকটির কর্কশগলার স্বর এবং সেই সঙ্গে অকথ্য গালা-গালি—আর কুলিটির তীব্র প্রতিবাদ। স্ত্রীলোক দু'টি একে অন্যের দিকে চেয়ে রইল।

কুলীটি বলতে থাকে, "আমার পাওনা মিটিয়ে না দিলে আমি যাবো না।"

"তোমাকে যা দেবার আমি আগেই দিয়েছি। তুমি তিন রীল (স্পেনদেশীয় মুদ্রাবিশেষ) চেয়েছ, তাই তো দিয়েছি।"

"আলবৎ না। আপনি চার রীল্ দেবেন বলে প্রতি-শ্রুতি দিয়েছেন।" দু'জনের মধ্যে আড়াই পেনী নিয়ে দর কষাকষি চলতে থাকে।

"এই সামান্য ক'টা জিনিষ আনার জন্য চার রীল দাবী করছ? তুমি একটা উজবুক।" নূতন-আসা স্ত্রী-লোকটি চেষ্টা করল তাকে হটিয়ে দিতে। কুলীটি কিন্তু তার গোঁ ছাড়ল না, "আমার পাওনা মিটিয়ে দিন আমি চলে যাচ্ছি।"

"ওহে বাছা, তোমাকে আর এক পেনী বেশী দিতে পারি।"

"আমি তা নেব না।" এর ফলে কলহ আরও বেড়ে চলল। স্ত্রীলোকটি ক্ষেপে গেল। রাগের মাথায় কুলীটির মুখে একটা ঘুষি মেরেই বসল। অবশেষে কুলীটি ধৈর্য্য হারাল।

"বেশ, তাই হক। আমাকে এক পেনী দিয়ে দাও—আমি চলে যাই। তোমার মত একটা বাজারে মেয়ে-মানুষের সাথে কথা কাটাকাটি করে সময় নষ্ট করতে চাই নে।" এক পেনী পেয়ে স্ত্রীলোকটির মালপত্র আছাড় মেরে ফেলে কুলীটি চলে গেল। স্ত্রীলোকটি অস্ফুটগালাগাল করল; তারপর বাক্স-প্যাটরাগুলি নিজের ঘরে নিয়ে এল। উপরতলার দুটি মেয়েমানুষ তার হিংস্র মুখ দেখতে পেল।

"কেরী, দেখছ কী ভয়ানক চেহারা! ওকে যেন ঠিক খুনীর মত দেখাচ্ছে।" এই সময় একটি মেয়ে তাদের কাছে এসে দাঁড়াল। তার মা তাকে বলল, "তুমি তাকে দেখেছ রোসালিয়া?"

রোসালিয়া জবাব দিল, "আমি কুলীটাকে ওই স্ত্রীলোকটির কথা জিজ্ঞেস করেছিলুম। সে বলল যে, ওই সমস্ত মালপত্র স্ত্রীলোকটি ট্রিনা থেকে এনেছে।"

"তার নাম কী কুলীটা বলেছে?"

"সে জানে না। কিন্তু ট্রিনাতে লোকে ওই স্ত্রীলোকটিকে লা-কাচিরা বলে ডাকে।"

এমনি সময় সেই ঝগড়াটে মেয়েমানুষটি তার ঘর থেকে বেরিয়ে এল তার বাকী অল্পকিছু মালপত্র নিয়ে যাবার জন্য। সে দেখতে পেল ব্যালকনি থেকে দুটি স্ত্রীলোক তাকে দেখছে। মুখটা তার একটু কঠিন হল এবং সে কোনদিকে না চেয়ে নিজের ঘরে ফিরে এল।

রোসালিয়া বিড় বিড় করে বলল, মেয়ে লোকটি আমাকে রীতিমত ভয় পাইয়ে দিয়েছে। লা-কাচিরা চল্লিশ পেরিয়েছে। তাকে দেখতে অনেকটা দুর্ব্বল লাগে—কিন্তু মুখাবয়বে যেন একটা বন্যভাব রয়েছে। হাতের আঙুলগুলি যেন শকুনির থাবার মত। তার শুকনো গাল দুটি বসে গেছে এবং তার গায়ের চামড়া হলদে—আর কেমন যেন ফ্যাকাশে, বিবর্ণ। যখন সে হাঁ করে তখন তাকে মনে হয় যেন একটা রক্তপিপাসু হিংস্র জানোয়ার। তার চুলগুলি কাল কিন্তু অবিন্যস্ত এবং সে চুলগুলিকে মোরগের ঝুঁটির মত করে বেঁধে রাখে। তার দুটি চোখ বড় ও কাল এবং সবসময় যেন হিংস্রপশুর চোখের মত জ্বলেই আছে। তার মুখে সর্ব্বদা এমন একটা রুক্ষতা ফুটে আছে যে, কেউ এসে দু'দণ্ড তার সাথে আলাপ করতে সাহস পায় না।

লা-কাচিরা নিজেকে নিয়েই ব্যস্ত থাকে। তার সম্বন্ধে প্রতিবেশীদের কৌতূহল বেড়েই চলেছে। সে যে গরীব এটা সবাই জানত। কেন না পোষাক পরিচ্ছদ দেখেই তার আর্থিক অবস্থা বোঝা যেত। সে রোজ সকালে বেরিয়ে যেত এবং রাত না-হলে ফিরে আসত না। কিন্তু কী করে যে সে নিজের খোরাক পোষাকের ব্যবস্থা করত তাই কেউ জানত না। একদিন তারা একটা পুলিশকে ডাকল। পুলিশ এই বাড়ীরই একজন বাসীন্দা।

পুলিশটি বলল, "দেখ বাপু, যতক্ষণ পর্য্যন্ত না লা-কাচিরা জনসাধারণের শান্তি ভঙ্গ করছে—সে পর্য্যন্ত আমার বলবার কিছু নেই।"

কিন্তু সেভিলিতে কুৎসা তাড়াতাড়ি ছড়ায়। কয়েক দিনের মধ্যে একজন রাজমিস্ত্রী (সে উপরের তলার একজন বাসীন্দা) এসে জানাল যে তার একজন বন্ধু লা-কাচিরার সমস্ত খবর জানে: লা-কাচিরা মাত্র একমাস হল জেল থেকে ছাড়া পেয়েছে এবং হত্যার অপরাধে সাত বৎসর তাকে জেলে থাকতে হয়েছিল। সে ট্রিনাতে ঘর ভাড়া করে থাকে। এই সমস্ত কুৎসা যখন পাড়ার বকাটে ছোড়ার দল জানতে পারল—তখন তারা লা-কাচিরাকে দূর থেকে ঢিল মারতে থাকে। তাকে অশ্রাব্য গালাগালি দেয়। লা-কাচিরাও ছোঁড়াগুলিকে বাগে পেয়ে একদিন বেদম পিটুনী দিল। ফলে ব্যাপারটা এমন হয়ে দাঁড়াল যে, স্বয়ং বাড়ীওয়ালা লা-কাচিরাকে তাড়িয়ে দিল।

রোসালিয়া জানতে চাইল, "কাকে সে খুন করেছে?" রাজমিস্ত্রী উত্তর দেয়—"লোকে বলে সে লোকটা তার প্রণয়ী ছিল।" রোসালিয়া হেসে গড়িয়ে পড়ল এবং বলল, "ওর কখনও কোন প্রণয়ী থাকতেই পারে না।"

তার মা চিৎকার করে বলল, "আমার মনে হয় যে, ও আমাদের কাউকে খুন করতে পারে। আমি বলছি ওকে ঠিক হত্যাকারীর মত দেখায়।"

রোসালিয়া যেন ভয় পেয়ে আঁৎকে ওঠে। তাড়াতাড়ি মা-মেরীর নামে শপথ উচ্চারণ করে। এমনি সময় লা-কাচিরা দিনের কাজ সেরে ফিরছে এবং আলোচনাকারীরাও সঙ্গে সঙ্গে যেন ভয় পেয়েই চুপ করে যায়। লা-কাচিরা যেন এমনি নিস্তব্ধতার মধ্যে অশুভতার লক্ষণ পেল। মনে হল ওরা যেন ওর সম্বন্ধেই কিছু আলোচনা করছিল। সে ওদের দিকে কঠোর চোখে তাকায়। পুলিশটি যেন আলাপের ছলেই সুসন্ধ্যা জানাল। লা-কাচিরাও প্রত্যুত্তর করল এবং তাড়াতাড়ি নিজের ঘরে এসে খিল এটে দিল।

রোসালিয়া বলল, "ওর মধ্যে যেন একটা মূর্ত্তিমান

শয়তান বাস করছে।" পিলার অর্থাৎ মেয়েটির মা বলল, "ম্যানুয়েল (পুলিশটির নাম), তুমি আছ তাই আমরা ভরসা পাচ্ছি!"

লা-কাচিরা কিন্তু কারো ব্যক্তিগত ব্যাপারে নাক গলাতে এল না। সে তার নিজের মনেই চলতে থাকে। কারু সাথে কোন কথা বলল না এবং সবার বন্ধুত্ব প্রত্যাখ্যান করল। তার মনে হল যেন প্রতিবেশীরা তার গোপন খবর জানতে পেরেছে। ফলে লা কাচিরার মেজাজ আরও খারাপ হয়ে উঠল এবং চোখের দৃষ্টি ক্রমশঃ অমানবীয় হল!

ধীরে ধীরে তার সম্বন্ধে মুখর আলোচনা কমে আসতে লাগল। এমন কী বাচাল পিলার পর্য্যন্ত চুপ করে গেল। লা কাচিরা প্রায়ই তার কাছ দিয়ে যাতায়াত করে—কিন্তু পিলার কোন মনোযোগই যেন দেয় না।

"আমার ধারণা জেল থেকে বেড়িয়ে ওর মাথা খারাপ হয়ে গেছে। লোকে বলে এমনটি হওয়া অসম্ভব কিছু নয়।"

কিন্তু একদিন এমন একটা ঘটনা ঘটল যে আবার পূর্ব্বের মত জোর আলোচনা চলতে সুরু হল। একটি যুবক এল এবং এ্যান্টোনিয়া স্যাঞ্জের খোঁজ করল। পিলার সিঁড়ির উপর দাঁড়িয়ে একটা স্কার্ট বুনছিল। সে জবাব দিল, "ওই নামে এখানে কেউ থাকে না।"

"হ্যাঁ, সে থাকে।" যুবকটি চুপ করে বলল, "লোকে তাকে লা কাচিরা বলে ডাকে।"

"ও! রোসালিয়া সদর দরজা খুলে অন্য একটা ঘরের প্রতি যুবকটির দৃষ্টি আকর্ষণ করে বলল, "ওই ঘরে সে থাকে।"

"ধন্যবাদ!" যুবকটি তার দিকে চেয়ে একটু হাসল। রোসালিয়া সুন্দরী মেয়ে। তার গায়ের বর্ণ সুন্দর এবং কাল চোখ দুটি এককথায় বলা যায় অপূর্ব্ব।

রোসালিয়াকে উদ্দেশ করে যুবকটি বলল, "তোমার মত সুন্দরীকে যিনি গর্ভে ধরেছেন তাঁকে আমার অসংখ্য ধন্যবাদ!"

পিলার উত্তর দিল, "ভগবান তোমায় সুখী করুন।" যুবকটি আর দাঁড়ায় না। লা কাচিরার ঘরের দিকে অগ্রসর হয়। তারপর কপাটের উপর মৃদু আঘাত করে। স্ত্রীলোক দুটির চেহারা দেখে বোঝা যায় যে, তারা বেশ বিস্মিত হয়েছে।

"ছেলেটা কে বল তো?" পিলার প্রশ্ন করল। যেন না লা কাচিরার কোন পরিচিতজন আছে বলে ওরা শোনেনি।

"মা।" যুবকটি আস্তে আস্তে ডাকল। মচ্‌মচ করে একটা শব্দ হল—দরজাটা খুলে গেল।

"কুরিটো!" লা কাচিরা হঠাৎ আনন্দে যেন মত্ত হয়ে উঠল। ছেলেটিকে দু'হাত দিয়ে জড়িয়ে ধরল। স্নেহ চুম্বন করল ছেলেটির কপালে।

মেয়েটি ও তার মা ভাবতেই পারেনি যে, এই বন্য স্বভাবের স্ত্রীলোকটার অন্তরে এত স্নেহ লুকিয়ে থাকতে পারে। অবশেষে আদর আপ্যায়ন যখন একটু প্রশমিত হল—লা কাচিরা ছেলেসহ নিজের ঘরে চলে গেল।

"যুবকটি ওর ছেলে।" রোসালিয়ার যেন বিস্ময় কাটে না। কেউ এমন কথা কখনও ভাবতে পারে বল? ওই কুৎসিত মেয়েলোকটির এত সুন্দর ছেলে!

কুরিটোর মুখখানা বেশ সুন্দর। সাদা দু'পাটি দাঁত, মাথায় চুলগুলি সুবিন্যস্ত। তার তামাটে চামড়ার নীচে অকালপক্ক কয়েকগাছি দাড়ি নীলাভ দেখায়। কুরিটো বেশ ফুলবাবু। সুদৃশ্য পোষাক পরিচ্ছদ, তার অঙ্গে যেন সব সময়ই এঁটে আছে। তার খাটো জ্যাকেট এবং চুনট করা শার্ট। তার মাথায় সর্ব্বদা একটা বড় টুপি থাকে।

একসময় লা কাচিরার ঘরের দরজা খুলে গেল। ছেলের বাহুতে ভর দিয়ে সে বাইরে এল।

"তুমি আসছে রবিবার আসবে আবার?" লা কাচিরা জানতে চায়।

"খুব দরকার না থাকলে আসব।" কুরিটো রোসালিয়ার দিকে তাকায়।

মাকে বিদায় জানায় এবং রোসালিয়াকেও। রোসালিয়া তার দিকে চেয়ে বিদ্যুৎ কটাক্ষ হানল এবং সুন্দর করে হাসল। লা কাচিরা সব লক্ষ্য করল। কিছুক্ষণ আগে, মনে যে আনন্দ ছিল, তা যেন এক মুহূর্ত্তে নষ্ট হয়ে গেল। মুখটা কাল এবং থমথমে হয়ে উঠল। সে সুন্দরী মেয়েটির দিকে হিংস্র দৃষ্টিতে চেয়ে রইল।

"ছেলেটি বুঝি আপনার?" যেন কিছুই জানে না এমনিভাবে প্রশ্ন করল পিলার।

"হ্যাঁ, ওটী আমারই ছেলে।" একটু রেগেই যেন উত্তর দিল লা কাচিরা—তারপর নিজের ঘরে চলে গেল।

কোন কিছুতেই সে নরম হতে পারে না। এমন কী যখন তার অন্তর আনন্দে ভরপুর থাকে তখনও সে প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করতে ইতস্ততঃ করে না। 'ছেলেটি বেশ সুন্দর'! রোসালিয়া যেন নিজেকেই বলল এবং সে শুধু কুরিটোর কথাই চিন্তা করতে লাগল।

পুত্রের প্রতি লা কাচিরার ভালবাসা ছিল নিখাদ। পৃথিবীতে তার একমাত্র ছেলে ছাড়া আর কী-ই বা ছিল—এবং সে তাকে এত ভালবাসত যে, তার পরিবর্তে কুরিটোর ভালবাসা কিছুই পেত না। ভালবাসা যেখানে আছে সেখানে হিংসাও থাকবে এবং লা কাচিরার মধ্যে তা পূর্ণ মাত্রায় ছিল। সে চাইত তাকে পরিপূর্ণ ভাবে পেতে। কুরিটোর কাজের জন্য তারা একসাথে থাকতে পারত না এবং একথা ভেবে তার কষ্ট হত যে, তার অনুপস্থিতিতে কুরিটো কী করে। সে মোটেই পছন্দ করত না যে, তার ছেলে কোন সুন্দরী মেয়ের প্রেমে পড়ে এবং এমন ধারণাও তার সুস্পষ্ট ছিল—কুরিটো নিশ্চয়ই কিছুসংখ্যক মেয়েকে সঙ্গদান করে। সেভিলিতে প্রেমের খেলা বেশ চলত এবং মধ্যরাত পর্য্যন্ত প্রেমিক প্রেমিকার কানে ফিস্‌ফিস্‌ করে প্রেমগুঞ্জন করত। লা কাচিরা ছেলের কাছে জানতে চাইত যে, ওর কোন সুইটহার্ট আছে কী না। এমন সুন্দর একজন যুবক, নিশ্চয়ই মেয়েদের সুমধুর হাসি উপভোগ করে। যদিও কুরিটো মিথ্যে করে বলে যে, সে সন্ধ্যাকালটা কাজ করেই কাটিয়ে দেয়। তার এই অস্বীকৃতি লা কাচিরাকে প্রগাঢ় আনন্দ দেয়।

যখন লা কাচিরা দেখল—রোসালিয়ার মদিরাপূর্ণ চাহনী আর কুরিটোর সুস্মিত হাসি—রাগে তার সর্ব্বশরীর জ্বলে উঠল। সে তার প্রতিবেশীদের ঘৃণা করে—কারণ তারা হল সুখী, আর সে হচ্ছে পরিত্যক্তা। ওরা তার গোপন খবর জানত—এজন্য তার রাগ ছিল আর বেশী। আজকাল সে আরও বেশী ঘৃণা করে তার প্রতিবেশীদের—কারণ তার মনে হয় ওরা যেন সর্ব্বদাই ফন্দী আঁটছে—কী করে কুরিটোকে তার কোল থেকে ছিনিয়ে নেবে!

রবিবার এল। বিকেলের দিকে লা কাচিরা গেটের কাছে এসে দাঁড়াল। তাকে এভাবে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে প্রতিবেশীরা একটু ভ্রূ বাঁকা করল।

"তোমরা জাননা বুঝি ও কেন এখানে দাঁড়িয়ে আছে। রোসালিয়া বলল, "ওর সবেধন নীলমণি যে আসছে। এবং ও চায় না যে, আমরা ওর ছেলেকে দেখি।"

"কেন? আমরা ওর ছেলেকে গিলে খাব না কী?" এমন সময় কুরিটো এল এবং লা কাচিরা তাকে তাড়াতাড়ি নিজের ঘরে নিয়ে গেল।

পিলার বলল, "ওর ভাবভঙ্গী দেখলে মনে হয় বুঝি বা কুরিটো ওর ছেলে নয়—প্রেমিক।" রোসালিয়া বন্ধ দরজাটার দিকে চেয়ে হাসল—তার উজ্জ্বল চোখ দুটি যেন কেমন নিষ্প্রভ দেখাল। মনে হল কুরিটোর সাথে দুটো কথা বলতে পারলে ব্যাপারটা বেশ উপভোগ্য হত। লা কাচিরার রাগের কথা মনে পড়তেই ওর সাদা দাঁতগুলির দীপ্তি কমে এল। ও গেটের কাছে গিয়ে দাঁড়াল। নিশ্চয়ই ওদের দু'জনকে এখনি ফিরতে হবে। কিন্তু লা কাচিরা ওকে দেখে ছেলেকে নিয়ে অন্যদিকে চলে গেল। এমন কি রোসালিয়া এক মুহূর্ত্তের জন্যেও কুরিটোকে দেখতে পেল না। রোসালিয়া অল্প একটু মাথা নাড়াল। মনে মনে বলল, 'অত সহজে তুমি আমায় পরাস্ত করতে পারবে না।'

পরের রবিবার। লা কাচিরা গেটের সামনে দাঁড়িয়ে। একটু পরেই কুরিটো আসবে। রোসালিয়া রাস্তায় বেরোলে এবং কুরিটো যে পথে আসবে তার কাছাকাছি পায়চারী করতে লাগল। কিছুক্ষণের মধ্যেই কুরিটো এল। রোসালিয়া যেন তাকে দেখতে পায়নি এমনি ভান করে পাশ কাটাতে চাইল।

"হ্যালো!" কুরিটো থামল।

"ও তুমি! আমি ভেবেছি তুমি বুঝি আমার সাথে কথা বলতে ভয় পাও।"

"আমি কাউকে ভয় করি না।" ও যেন একটু গর্ব্বের সাথেই বলল।

"কেবল মাত্র মাকে ছাড়া।" সুতীব্র ব্যঙ্গমান নিক্ষেপ

করে রোসালিয়া হাটতে সুরু করে যেন কুরিটোর সাহচর্যে ও বিব্রত। কিন্তু এটা জানত যে কুরিটো তার সঙ্গ ছাড়বে না।

"কোথায় যাচ্ছ?" কুরিটো কাছে এসে দাঁড়ায়।

"তোমার তাতে কী এসে যায় কুরিটো? ওহে বৎস, তোমার মার কাছে লক্ষ্মী সুবোধ ছেলের মত ফিরে যাও। যখন সে তোমার সাথে থাকে তুমি আমার দিকে তাকাতে পর্য্যন্ত ভয় কর। কী লজ্জার কথা!"

"বাজে বকো না।" এসব মেয়েলী কথার কোন দাম দেয় না কুরিটো।

"বিদায় বন্ধু। আমারই অন্যায় হয়েছে তোমাকে এসব কথা বলা।"

কুরিটো যেন লজ্জা পেয়ে চলে গেল। রোসালিয়া নিজের মনেই হাসল। ও যখন পরে গেটের কাছে এসে দাঁড়াল তখন কুরিটো আর লা কাচিরাকে দেখতে পেল। হঠাৎ যেন এক দুঃসাহসের পরিচয় দিয়ে কুরিটো তাকে ধন্যবাদ জানাল। লা কাচিরা রেগে লাল হয়ে যায়।

'এসে পড় কুরিটো।" সে চিৎকার করে বলল, "তুমি কার জন্য অপেক্ষা করছ?" কুরিটো চলে যায়। লা কাচিরা রোসালিয়ার সামনে এসে দাঁড়ায়। কিছু বলতে চায়—কিন্তু কী ভেবে নিজেকে সংযত করল। তারপর ঘরে চলে গেল।

কয়েকদিন পরের কথা। সেভিলির মহান সাধু স্যানইসিডোরোর জন্মোৎসব। সেই দিনটিতে রাজমিস্ত্রী এবং আরো কয়েকজনে মিলে নীচের বড় হলঘরে চীনে লণ্ঠন জ্বালাল। পরিষ্কার গ্রীষ্মের রাত্রে তারা সব উত্তেজিত হয়ে উঠল। উজ্জল নক্ষত্রভরা আকাশ ছিল শান্ত। বাড়ীর সবাই হলঘরের মাঝখানে এসে জমায়েত হয়েছে। স্ত্রীলোকেরা বুকের উপর ছেলেদের নিয়ে কাগজের পাখায় হাওয়া খেতে লাগল। তারা নিজেদের মধ্যে বকবক্ করতে লাগল এবং মাঝে মাঝে একটু বড় ছেলেদের দুষ্টুমীর জন্য ধমকাতে লাগল। সমস্ত দিনের তাপদাহের পর রাত্রির বাতাস বেশ মনোরম ছিল। কেউ কেউ সবিস্তারে বুলফাইটের ব্যাখ্যা করতে থাকে। তারা সুন্দর করে বলতে থাকে—বেলমেটের কথা—সে হচ্ছে বিখ্যাত বৃষঘাতক। তাদের বর্ণনা এত মধুর হল যে, সকলে যেন ব্যাপারটা বেশ উপভোগ করে আনন্দ পেল। সেভিলিতে এর আগে যেন এত আনন্দের জোয়ার প্রবাহিত হয়নি! এই উৎসবে সকলেই উপস্থিত ছিল—কেবলমাত্র লা কাচিরা তার প্রায়ান্ধকার ঘরে একটা মোমবাতি জ্বেলে চুপচাপ বসেছিল।

"ওর ছেলেটা কোথায়?"

"ওর ঘরেই আছে।" পিলার জবাব দেয়, "ঘণ্টাখানেক আগে ওকে তো ওদিকেই যেতে দেখেছি।"

রোসালিয়া হেসে বলল, "ও নিজেকে নিয়েই আনন্দ পায়।"

"হাঁ, হাঁ!" সকলে চিৎকার করে উঠল, "যাও রোসালিয়া—নাচ, নাচ!"

স্পেনে নাচতে এবং নাচ দেখতে সবাই ভালবাসে। অনেক বছর আগে এমন প্রবাদ শোনা যেত যে, এমন কোন স্পেনদেশীয় স্ত্রীলোক ছিল না যে নাচ না জানত।

চেয়ারগুলি বৃত্তাকারে সাজান হল। রাজমিস্ত্রী এবং ট্রাম-কণ্ডাক্টর তাদের গীটার বার করল। রোসালিয়া অন্য একটি মেয়ের সাথে সামনের দিকে এগিয়ে গেল, হাতীর দাঁতের করতাল বাজিয়ে নাচ সুরু করল। কুরিটো নোংরা ছোট্ট ঘরে বসে নাচগান শুনে যেন লাফিয়ে উঠল। 'ওরা নাচ সুরু করেছে!' কুরিটোর মনে হল ওর সারা অঙ্গপ্রত্যঙ্গ যেন নাচবার জন্য ছটফট্ করছে। জানালার মধ্যে দিয়ে ও চীনে লণ্ঠনের আলোতে সবাইকে দেখতে পেল। দেখল দু'জন মেয়ে নেচে যাচ্ছে। রোসালিয়া রবিবারের পোষাক পরেছে এবং ওদের নিয়মমত খুব পাউডার মেখেছে। একটা সুন্দর লাল সুগন্ধিযুক্ত ফুল ওর নরম চুলে শোভা পাচ্ছে। কুরিটোর মন যেন কেমন হয়ে উঠল। স্পেনে প্রেম খুব তাড়াতাড়ি হয়। কুরিটো ওই সুন্দরী মেয়েটার সাথে কথা বলবার পর থেকে শুধু ওর কথাই ভাবে। ও দরজার দিকে এগিয়ে গেল।

"কোথায় যাচ্ছ?" লা কাচিরা প্রশ্ন করল।

"আমি ওদের নাচ দেখতে যাচ্ছি। তুমি বুঝি চাও না আমি একটু ফুর্ত্তি করি।"

"বুঝেছি, রোসালিয়া আছে তাই তুমি যেতে চাও।" লা কাচিরা তাকে বাধা দিতে এল। কুরিটো মাকে একটু

মৃদু ধাক্কা দিয়ে সরিয়ে দেয়। তারপর তাড়াতাড়ি হলঘরে চলে যায়। সকলের সাথে মিলে নাচ দেখতে থাকে। লা কাচিরা একটু অগ্রসর হয়। তারপর অন্ধকারের মধ্যে নিজের শরীর ডুবিয়ে দাঁড়ায়—মনের মধ্যে জলতে থাকে প্রচণ্ড অসন্তোষ ?

রোসালিয়া কুরিটোকে দেখতে পেল। ওর কাছ দিয়ে যাবার সময় ফিস্‌ফিস্ করে বলল, "আমার দিকে তাকাতে তুমি ভয় পাও না ?" নাচ যেন রোসালিয়াকে বেপরোয়া করে তুলেছে—এমন কী লা কাচিরাকেও এখন সে ভয় করে না। নাচের একটা পালা যখন শেষ হল—তার সঙ্গিনী চেয়ারে বসল। রোসালিয়া কুরিটোর সামনে এসে দাঁড়াল। বুকটা ওর যেন থরথর করে কাঁপছিল।

রোসালিয়া বলল, "তুমি নিশ্চয়ই নাচতে জান না।"

"হ্যাঁ—জানি।"

"বা! চলে এসো তবে।" ও চোখের ভুরু নাচিয়ে হাসল। কুরিটো ইতস্ততঃ করে—যেন অন্ধকারের মধ্যে দূরে কাকে দেখতে পায়। রোসালিয়া ওর দৃষ্টি অনুসরণ করে কুরিটোর মনমরা ভাব বুঝতে পারে।

"তুমি কী ভয় পাচ্ছ ?"

"ভয় পাওয়ার কী আছে ?" কুরিটো কাঁধ নাচিয়ে জবাব দেয়। তারপর একটু এগিয়ে যায়। গীটার বেজে ওঠে এবং দর্শকবৃন্দ সুর মিলিয়ে হাতের তেলোতে চাঁটি মারে। একটি মেয়ে কুরিটোকে একজোড়া করতাল দেয়। রোসালিয়া আর কুরিটো নাচতে সুরু করে। ওরা যেন একটু দূরে আধো অন্ধকারে হিস্‌হিস্ শব্দ শুনতে পায়—বিষধর সাপের মত। সাহসিকা রোসালিয়া ফিক্ করে একটু হেসে অদূরবর্তী অন্ধকারে সাদা একটা মূর্তির দিকে তাকায়। লাকোচিরা চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকে। দেখতে থাকে নাচের গতি, দেখে দুটি দেহের অপূর্ব্ব দোলা। দেখে রোসালিয়ার সুন্দর শরীরটা পিছনের দিকে ঝুঁকে পড়ল—তারপর সে মুখটা কুরিটোর মুখের কাছে এনে হাসল। লাকাচিরার চোখ দুটো অন্ধকারে জলে উঠল—যেমন কয়লার আঁচে উনুনের আগুন গন্‌গন্ করে জলে ? কিন্তু কেউ তাকে লক্ষ্য করল না। সে শুধু নিজেই জলতে থাকে ?

নাচ শেষ হয়ে এল। রোসালিয়া দর্শকবৃন্দের ধন্যবাদ জানাল। তারপর কুরিটোকে বলল, তুমি এত ভাল নাচতে পার তা আমি আশা করিনি।

লাকাচিরা নিজের ঘরে ছুটে আসে—দরজায় খিল এঁটে দেয়। একটু পরে কুরিটো এসে ডাকাডাকি সুরু করল—কিন্তু কোন উত্তর পেল না।

"বেশ আমি চলে যাচ্ছি—আমাকে যখন তোমার কোন প্রয়োজন নেই।" একথা শুনে লাকাচিরা মনে অত্যন্ত ব্যথা পেল, কিন্তু কোন উত্তর দিল না। ওই ছেলেই তো তার সব—পৃথিবীতে ওকেই তো একমাত্র ভালবাসে। কিন্তু এখন থেকে ওকে ঘৃণা করবে; হ্যাঁ, ছেলের প্রতি বিদ্বেষে মনটা বিষিয়ে উঠল লাকাচিরার। সেই রাত্রে সে কিছুতেই ঘুমোতে পারল না। শুধু আধ-পাগলা অবস্থায় ভাবতে লাগল যে, ওরা (প্রতিবেশীরা) কুরিটোকে তার কাছ থেকে ছিনিয়ে নিচ্ছে! পরের দিন সকালে সে কাজে গেল না—রোসালিয়ার জন্য অপেক্ষা করতে লাগল। অবশেষে মেয়েটা এল। গত-রাতের ধকল তার উপর কম হয়নি। সেই চিহ্নই ওর সর্ব্বশরীরে যেন পরিস্ফুট। যেন এইমাত্র বিছানা থেকে উঠে এসেছে। ও চলে যাচ্ছিলো, হঠাৎ লাকাচিরা ওর পথ আটকে দাঁড়াল।

"আমার ছেলেকে নিয়ে তুমি কী করতে চাও শুনি ?"

"তার মানে ?" রোসালিয়া যেন আকাশ থেকে পড়ল ?

লাকাচিরা উত্তেজিত হয়ে উঠল। নিজেই নিজের হাতে আঘাত করল—যেন এতে তার উত্তেজনা প্রশমিত হতে পারে।

"ও! তুমি ভেবেছো তোমার ছেলেকে আমি চাই ? আমার কাছ থেকে তাকে সরিয়ে রাখলেই পার। আমি কী করতে পারি, যদি তোমার ছেলে সব সময়ই আমার পিছনে আঠার মত লেগে থাকে ?"

"মিথ্যুক কোথাকার!" লাকাচিরা ক্রমশঃ রেগে যাচ্ছে।

"তোমার ছেলেকে জিজ্ঞেস কর।" রোসালিয়ার গলার স্বর যেন কঠিন হয়ে উঠল। লাকাচিরা নিজেকে আর সামলাতে পারছে না। রাগে তার সর্ব্বশরীর জলে পুড়ে খাক্ হয়ে যাচ্ছে ? শুনল রোসালিয়া বলছে "তোমার ছেলে আমার জন্য ঘণ্টার পর ঘণ্টা রাস্তায়

দাঁড়িয়ে থাকে। কেন তুমি তাকে আটকে রাখতে পার না?"

"তুমি মিথ্যুক, মিথ্যুক! তুমিই কুরিটোর সর্ব্বনাশের মূল কারণ!"

"দেখ, প্রেমিকের জন্য আমাকে কারু পায়ে তেল মাখাতে হয় না—ওরা সব আপনিই এসে জোটে? আমি একটা খুনীর ছেলেকে আমার প্রেমিক হিসেবে চাই নে?"

লাকাচিরার মাথায় ছলাৎ করে রক্ত উঠে গেল! মুখচোখের ভাব বন্য হয়ে উঠল। ও হঠাৎ রোসালিয়ার উপর ঝাঁপিয়ে পড়ল—ওর চুল ছিঁড়ল, কীল, চড়, আর লাথি এলোপাথাড়ি মারল! মেয়েটা একটা আর্তনাদ করে উঠল। নিজেকে একটা দানবীর হাত থেকে রক্ষা পাবার জন্য ছটফট করতে লাগল।

হঠাৎ গোলমাল শুনে পাড়ার লোকে এসে দু'জনকে দু'দিকে হটিয়ে দিল। লাকাচিরা চিৎকার করে বলল, "তুই যদি কুরিটোকে না ছাড়িস—তোকে খুন করব!"

"আমি তোমাকে ভয় পাইনে। যদি পার তো তোমার ছেলেকে আমার কাছ থেকে ছিনিয়ে নিয়ো। ওরে নির্ব্বোধ, এটুকু বুদ্ধি নেই, তোমার ছেলে আমাকে প্রাণাপেক্ষাও ভালবাসে!"

"এই গোল কর না।" পাড়ার লোকে ধমকে উঠল, "রোসালিয়া চলে যাও। ওর কথার কোন জবাব দিয়ো না।"

লাকাচিরা রাগী বিড়ালের মত ফুলতে থাকে। তারপর একটা দমকা হাওয়ার মত ছুটে চলে যায়।

সেদিনের নাচ কুরিটোকে রোসালিয়ার প্রতি আরও আকর্ষিত করল। সমস্ত দিন শুধু সে রোসালিয়ার রক্তিম ঠোঁট, তার চোখের অপূর্ব্ব রহস্যের মধ্যে ডুবে রইল। কুরিটোর প্রেম দুর্দ্দমনীয় হয়ে উঠল। রাত্রে ও ম্যাকরেনার দিকে হেঁটে চলল এবং কখন যেন রোসালিয়াদের বাড়ীর কাছে এসে উপস্থিত হল। বারান্দার অন্ধকারে অনেকক্ষণ অপেক্ষা করার পর অবশেষে রোসালিয়াকে সিঁড়ির মুখে দেখা গেল। করিডোরের একদম শেষ প্রান্তে একটা ঘরে মিটমিট করে আলো জ্বলছিল—ঘরটা লাকাচিরার।

"রোসালিয়া!" কুরিটো চাপা গলায় ডাকল। রোসালিয়া কাছে এসে দাঁড়াল। মৃদু গুঞ্জনে বলল, "তুমি আজ এসেছ কেন?"

"তোমায় ছেড়ে থাকতে পারলাম না। তাই চলে এলাম।" কুরিটো হাসল।

"কেন?" রোসালিয়াও হাসল।

"তোমায় ভালবাসি তাই।"

"বেশ কথা! কিন্তু তুমি বোধ হয় জাননা—আজ সকালে তোমার মা আমাকে প্রায় খুন করতে বসেছিল।" এবং অ্যাণ্ডালুসিয়ানদের প্রকৃতি অনুযায়ী রোসালিয়া তার বক্তব্যকে জোরালো করবার জন্য সকালের সব ঘটনা বলল, যদিও তার সেসব ক্ষুরধার ব্যঙ্গে লাকাচিরা ক্ষেপেছিল, তা সযত্নে চেপে গেল।

"শয়তানের মত ওর আজকাল স্বভাবটা হয়েছে।" কুরিটো বলল, "আমি তাকে স্পষ্ট বলব যে, তুমি আমার প্রেমিকা।"

"সন্দেহ নেই, তোমার মা কথাটা শুনে ভারী খুশী হবেন!" হুল ফোটাল রোসালিয়া।

"কাল গেটের কাছে আসছ তো?"

"সম্ভবত।" রোসালিয়ার সংক্ষিপ্ত জবাব। কুরিটো চাপা হাসল। কারণ রোসালিয়ার গলার স্বর শুনেই বুঝেছে যে, ও নিশ্চয়ই আসবে, আর এবিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। কুরিটো নবাবী চালে রাস্তায় হাঁটতে থাকে। মনটা যেন খুশীতে ডগমগ করে ওঠে।

পরের দিন কুরিটো এল। রোসালিয়া অপেক্ষা করছিল। সেভিলিতে এমনি মুহূর্ত্তে প্রেমিক প্রেমিকারা যা করে ওরাও তাই করতে থাকে। ঘণ্টার পর ঘণ্টা ফিস্ ফিস্ করে কথা বলে কাটাল। দু'জনের মাঝখানে যে একটা লোহার গেটের অস্তিত্ব আছে—একথা যেন ওরা ভুলেই গেছে। তা'ছাড়া সেসময় বাইরের পৃথিবীর কথা ওরা ভুলে যায়। কুরিটো গাঢ়স্বরে জানতে চায় রোসালিয়ার ভালবাসার পরিমাণ কতটা—আর রোসালিয়া উত্তরে শুধু প্রণয়মুগ্ধ দৃষ্টিতে ওর দিকে তাকিয়ে থাকে। পরস্পরের চোখের তারার মধ্যে ভাবাবেগ কতটা ফুটে উঠেছে—একে অন্যের দিকে তাকিয়ে তাই বুঝতে চেষ্টা করে। এরপর থেকে কুরিটো রোজ রাত্রে আসতে থাকে।

শুধু রবিবার আসল না। ভয় ছিল এই দিনে হয়ত লাকাচিরার সাথে দেখা হয়ে যেতে পারে। দুর্ভাগিনী জননী—কুরিটোর জন্য ব্যাকুল হৃদয়ে অপেক্ষা করত। সে কুরিটোর পায়ের উপর মাথা খুঁড়তে রাজী আছে—যদি ছেলে তাকে ক্ষমা করে এবং ওর কাছে ফিরে আসে। কিন্তু যখন দেখল, কুরিটো আর এল না, সে তাকে ঘৃণা করতে সুরু করল। সে তার মৃত্যু কামনা করল। লাকাচিরার হৃদয় পুড়ে যেতে লাগল এই ভেবে যে আরও একটা সপ্তাহ চলে যাবে এবং এর মধ্যে সে আর কুরিটোকে দেখতে পর্য্যন্ত পাবে না। শুধু একটিবার চোখের দেখা—তাও কী সে আশা করতে পারে না?

সপ্তাহ শেষ হল। কুরিটো কিন্তু এল না। লাকাচিরা যেন আর সহ্য করতে পারে না। দুঃসহ যন্ত্রনায় যেন ছট্‌ফট্‌ করতে থাকে। যে কোন প্রেমিকার ভালবাসার চেয়ে তার ভালবাসা একতিল কম নয় কুরিটোর প্রতি। মনে মনে বলল—'এসব হচ্ছে রোসালিয়ার শয়তানি এবং এই রূপসী মেয়েটির কথা মনে পড়তেই একটা বিশ্রী রাগে ওর সর্ব্বশরীর জ্বলে উঠল'।

অবশেষে একদিন সাহস করে কুরিটো ওর মার কাছে এল। কিন্তু লাকাচিরা অনেক অপেক্ষা করেছে। লাকাচিরার ভাবভঙ্গী দেখে মনে হয় যেন ওর প্রেমিক মারা গেছে। কুরিটো তাকে চুমো খেতে এলে সে দু'হাত দিয়ে তাকে দূরে ঠেলে দিল।

"এতদিন আসনি কেন?"

"তুমিই তো চাওনি। আমার মুখের উপর দরজা বন্ধ করে দিয়েছিলে। ভাবলাম আমাকে আর তোমার কোন প্রয়োজন নেই।"

"শুধু কী এই কারণেই? আমাকে বোকা ভেবেছো বুঝি?"

"আমি ব্যস্ত ছিলাম।" কুরিটো কাঁধ নেড়ে জবাব দেয়।

"তোমার মত একটা অলস ভবঘুরে আবার ব্যস্ত থাকে কোন্ হিসেবে? কোন কাজটা করে বেড়াও শুনি। অথচ রোসালিয়াকে রোজ দেখতে আস—তখন বুঝি ব্যস্ততা থাকে না।"

"তুমি তাকে মেরেছো কেন?" যেন কুরিটো কৈফিয়ৎ চাইল।

"তুমি জানলে কীভাবে?" লাকাচিরা ছেলের কাছে এগিয়ে এসে বলল।

"সে কী-না আমাকে খুনী বলে।"

"তাতে এমন কী হয়েছে।"

"তার মানে!" লাকাচিরা যেন গর্জে উঠল। উপরের তলার বাসিন্দারা শুনতে পেল। "আমি যদি খুনী হই, তা শুধু তোমার জন্যেই হয়েছি। হ্যাঁ, আমি পেপী স্যান্‌টীকে খুন করেছিলাম—কারণ সে তোমায় মেরেছিল—হ্যাঁ, আমি সাতবছর জেল খেটেছি—পুরো সাত সাতটা বছর—তাও তোমার জন্যে! মূর্খ কোথাকার! তুমি বুঝি ভাবতে লোকটা তোমার জন্য কিছু ভাবত এবং প্রত্যেকদিন রাত্রে বাইরে অপেক্ষা করত কার জন্যে? এটা ভাল করে জানবে তোমার কাছে ও আসত না।"

"সে আমি ভাল করেই জানি।" দাঁতবার করে হাসল কুরিটো।

লাকাচিরা ভয়ানকভাবে চমকে উঠল। বিমূঢ় দৃষ্টিতে কুরিটোর দিকে তাকিয়ে যেন সব বুঝতে পারল। বুকটা যেন ওর বেদনায় ফেটে পড়ছে—যেন আর এই অপমান্ এই দুর্বিষহ জ্বালা সহ্য করা যায় না।"

"রোজ রাত্রে এখানে তুমি আসছ—আর আমার সাথে একবার দেখা পর্য্যন্ত করতে পার না। উঃ! কী নিষ্ঠুরতা। পৃথিবীতে একজন—মানে তার সন্তানের জন্য যা করা দরকার তা সবই আমি করেছি। তুমি ভেবো না আমি পেপী স্যান্‌টীকে আদৌ ভালবাসতাম। তোমাকে বাঁচিয়ে রাখতে পারব এই ভেবে লোকটার সব অত্যাচার আমি সহ্য করেছি। এবং তাকে শেষ পর্য্যন্ত খুন করলাম্—যখন দেখলাম্ ও তোমাকে একদিন মারল। ভগবান জানেন—আমি শুধু তোমার কথা ভেবেই বাঁচতে চেয়েছি। কারাবাসের সুদীর্ঘ সাতটা বছরের দুঃখকষ্ট, গ্লানি সব অপমান শুধু তোমার মুখ চেয়ে সহ্য করেছি। আর তার পরিবর্ত্তে কী-না তোমার কাছ থেকে.........।"

চোখের জলে ঝাপসা হয়ে যায় সব কিছু—লাকাচিরার কথা অসমাপ্ত থেকে যায়।

"শোন মা, অবুঝ হয়ে লাভ কী? আমার কথাটা ভেবে দেখ—আমি বিশ বছরের সুস্থ সমর্থ যুবক। তুমি কী আশা করতে পার? আমার জীবনে এখন মেয়ে

ছেলের প্রয়োজন? রোসালিয়া না হলেও অন্য কেউ আসত। তাই বলছি অযথা মেজাজ খারাপ কর না।"

"পশু কোথাকার? আমি তোমাকে ঘৃণা করি—আমার সামনে থেকে দূর হয়ে যাও।" লাকাচিরা তাকে এক ধাক্কায় দরজার বাইরে ঠেলে দিল। কুরিটো কাঁধ নাচিয়ে জবাব দিল—"বেশ, তুমি মনে ভেব না আমি এখানে থাকতে চাই।"

ও আরাম করে হাঁটতে লাগল এবং লোহার গেট অতিক্রম করে রাস্তায় এসে দাঁড়াল। ঘণ্টার পর ঘণ্টা অতিবাহিত হল। বেশ কিছুক্ষণ লাকাচিরা জানালার কাছে দাঁড়িয়ে রইল। মনের মধ্যে যেন এক দৃঢ় সঙ্কল্প দানা বাঁধতে থাকে। মনের অস্থির চাঞ্চল্যকে, তার অসহনীয় গতিবেগকে যেন রোধ করতে চেষ্টা করল। গেটের কাছে কাকে যেন দেখা গেল—লাকাচিরার বন্য চোখ দুটো এক মুহূর্তে ভয়ঙ্কর হয়ে উঠল, এগিয়ে গিয়ে দেখল রাজমিস্ত্রীকে। সে অপেক্ষা করতে থাকে। এমন সময় বাইরে থেকে পিলার এল, বারেকের জন্য লাকাচিরাকে দেখল, তারপর সিঁড়ি বেয়ে উপরে উঠে গেল। লাকাচিরা দাঁত দিয়ে নীচের ঠোঁটটাকে চেপে বুকের অসহ্য যন্ত্রণাকে ভুলতে চেষ্টা করে। তবু সে অপেক্ষা করে. আরো অপেক্ষা সে করবে। মাঝে মাঝে যেন এক অস্বাভাবিক শিহরণ ওর সমস্ত অঙ্গপ্রত্যঙ্গ বেয়ে বেড়াতে থাকে!

অবশেষে যেন দীর্ঘ প্রতীক্ষার অবসান হল। লোহার গেটের উপর শ্বেতশুভ্র চাঁপাকলির মত কার আঙুল যেন স্পর্শ করল। চাপাকণ্ঠের একটা চিৎকার ভেসে এল, "কে তুমি?"

"বন্ধু!" রোসালিয়ার গলার স্বর চিনতে পারল লাকাচিরা। আনন্দে ওর ঘোলাটে চোখ দুটো চক্‌চক্ করে উঠল। গেট পার হয়ে যেন হাল্কা প্রজাপতির মত লঘু ছন্দে রোসালিয়া অগ্রসর হতে থাকে। জীবনে বেঁচে থাকার একটা বিশেষ আনন্দ ও যেন নূতন করে খুঁজে পেয়েছে, আর সেই অনুভবে ওর সমস্ত অন্তরাত্মা বিভোর। যেন নাচের ভঙ্গীতে রোসালিয়া সিঁড়িতে উঠতে গেল। হঠাৎ কোথা থেকে ছুটে এসে লাকাচিরা ওর পথ আটকে দাঁড়ায়। শক্ত মুঠিতে মেয়েটির কাঁধ চেপে ধরে—রোসালিয়া যেন এক-ইঞ্চিও নড়তে পারে না।

"কী চাও তুমি?" রোসালিয়া বলল—"আমাকে যেতে দাও।"

"আমার ছেলের পিছন তুমি ছাড়বে কী-না বল।"

"ছেড়ে দাও বলছি, নইলে চিৎকার করে লোকজন ডাকব।"

"এটা কী সত্যি যে, রোজ রাত্রে তুমি কুরিটোর সাথে মিলিত হও?"

"মা! সাহায্য কর! এ্যাণ্টোনিয়া!" রোসালিয়া চিৎকার করে ওঠে।

"উত্তর দাও।" যেন উপযুক্ত কৈফিয়ৎ চায় লাকাচিরা।

"বেশ! সত্যি কথা তাহলে শোন। কুরিটো আমাকে বিয়ে করবে। ও আমাকে ভালবাসে, আর বুঝেছ, আমিও তাকে ভালবাসি।" রোসালিয়া চেষ্টা করল লাকাচিরাকে দূরে হটিয়ে দিতে। পারল না। আবার সে বলতে থাকে, "তুমি আমাদের বাধা দিতে পারবে না। তুমি ভেব না যে কুরিটো তোমাকে ভয় করে। ও তোমাকে ঘৃণা করে। ও চেয়েছিল যেন আর কোনদিন তুমি জেলের বাইরে না আসতে পার।"

"কুরিটো তোমাকে এসব কথা বলেছে?" লাকাচিরা যেন একটু অন্যমনস্ক হল। রোসালিয়া পালাবার পথ পেল। বলল, 'হাঁ, কুরিটো শুধু এটুকু বলেই ক্ষান্ত হয় নি। আরও অনেক কিছু বলেছে। ওর মুখেই শুনলাম—তুমি পেপী স্যানটীকে খুন করেছ—আর তার ফলস্বরূপ সাতবছর জেল খেটেছ। কুরিটো তোমার মৃত্যুকামনা করেছিল।"

রোসালিয়া ধিক্কার দিয়ে কথাগুলি বলল এবং শেষে খিলখিল করে হেসে উঠল। দেখল হঠাৎ আঘাতে হতভাগিনী লাকাচিরা যেন কুকড়ে গেছে। এতেও রোসালিয়া ক্ষান্ত হল না। কঠিনতম আঘাত দিয়ে বলল, "এবং তোমার গর্ব্ব করা উচিত যে, আমি একটা খুনীর ছেলেকে বিয়ে করতে অস্বীকার করিনি!!"

লাকাচিরার থমথমে মুখের দিকে তাকিয়ে আবার হাসল রোসালিয়া। তারপর অতর্কিতে লাকাচিরাকে একটা ধাক্কা দিয়ে হটিয়ে সিঁড়ি বেয়ে উপরে উঠতে গেল।

ইতিমধ্যে লাকাচিরার প্রতিহিংসাপরায়ণ মনটা

জেগে উঠলো এবং কিছুক্ষণ আগের রোসালিয়ার তীব্র ব্যঙ্গ স্মরণ করে সে রাগে হিংস্র পশুর মত গরগর করে উঠল। শিকারী বেড়ালের মত সে একলাফ দিয়ে রোসালিয়ার উপর পড়ল এবং এক আঘাতে মেয়েটিকে মাটিতে শুইয়ে দিল। রোসালিয়া একটু উপরে ঝুঁকে লাকাচিরার মুখে এলোপাথাড়ি ঘুষি মারতে থাকে। লাকাচিরা হঠাৎ বুকের মধ্য থেকে একটা ঝকঝকে ছোরা টেনে বার করল। তারপর একটা শপথ উচ্চারণ করে ছোরাটা রোসালিয়ার গলায় আমূল বিদ্ধ করল। রোসালিয়া শেষবারের মত তীব্র আর্তনাদ করে বলল, "মা, খুন করে ফেলল!" তারপর সদ্য-কাটা মোরগের মত রোসালিয়ার সুন্দর দেহ সিঁড়ির উপর ছটফট করতে করতে নীচে গড়িয়ে পড়ল।

রোসালিয়ার আর্তনাদ শুনে বাড়ীর অধিকাংশ ভাড়াটেরা ছুটে এল এবং লাকাচিরাকে ধরতে গেল। কিন্তু ওর মুখেচোখের কুটিলভাব লক্ষ্য করে কেউ আর এক পা এগোতে সাহস করল না। কিন্তু তা এক মুহূর্ত-মাত্র। এমনি সময় পিলার বুকফাটানো চিৎকার করে নীচে ছুটে এল—সবার লক্ষ্য তখন ওর দিকে। সুযোগ বুঝে লাকাচিরা ছুটলো এবং নিজের ঘরে এসে খিল আটকে দিল। হঠাৎ যেন ঘটনাস্থলে লোকজনের ভীড় হতে থাকে। পিলার এক মর্মান্তিক চিৎকার করে মেয়ের ঠাণ্ডা শবদেহের উপর লুটিয়ে পড়ল এবং তাকে দু'হাতে দিয়ে আঁকড়ে ধরল। ভাড়াটেদের মধ্যে কেউ পুলিশকে খবর দিল, কেউ বা ডাক্তার ডাকতে গেল। ভীড় ক্রমশঃ বেড়ে চলল এবং রাস্তা থেকে বাজে লোক এসেও তাতে যোগ দিল। অবিলম্বে পাড়ার জনৈক ডাক্তার ডান হাতে কালো ব্যাগ নিয়ে উপস্থিত হল। এরপর পুলিশ এল এবং উত্তেজিত জনতা হাত পা নেড়ে ঘটনার ব্যাখ্যা করতে লাগলো। তারা পুলিশ দলকে নিয়ে এল লাকাচিরার বন্ধ দরজার কাছে। পুলিশবাহিনী দরজা ভেঙে ভিতরে ঢুকল এবং কিছুক্ষণ হাতাহাতির পর লাকাচিরাকে গ্রেপ্তার করতে সমর্থ হল। হাতকড়ি লাগানো লাকাচিরা বাইরে এলে উত্তেজিত জনতা ক্ষেপে গিয়ে তাকে আক্রমণ করতে এল। পুলিশের দল তরবারির খাপের আঘাতে জনতাকে ছত্রভঙ্গ করে দিল। লাকাচিরা ওদের দিকে ঘৃণার দৃষ্টিতে তাকায়। ওদের গালাগালির কোন জবাব দিল না। ওর দুটো চোখ যেন আশাতিরিক্ত জয়লাভে জ্বলছে। পুলিশবাহিনী ওকে বাড়ীর বাইরে নিয়ে চলল। তারপর ওরা রোসালিয়ার মৃতদেহের পাশ দিয়ে যাবার সময়, এক মুহূর্ত থেমে লাকাচিরা প্রশ্ন করল—"মেয়েটি কী মারা গেছে?"

"হু," ডাক্তার গম্ভীর স্বরে জবাব দেয়।

"ভগবানকে অসংখ্য ধন্যবাদ!" লাকাচিরা হাসল, অনেকদিন পরে, বেশ প্রাণ খুলেই হাসল!!

আছি

অনিলকুমার ভট্টাচার্য

তবু যদি প্রশ্ন করো : বলি আমি আছি।
তোমাদের কাছে নেই
দেহে নেই
মনে হয়, নেই, নেই,
অতি কাছাকাছি।
দুই চোখে দেখা দিন
নিরন্ধ্র মলিন :
দিগন্তের জন্ম-যন্ত্রণায় গরুড়ের ক্ষুধা!
বুভুক্ষার জ্বালা নিয়ে কে পেয়েছে সুধা?

সেখানেতে নেই আমি দৈহিক প্রত্যয় :
যদিও নিশ্চয়
নেই কাছাকাছি
তবু আমি আছি।
জিজ্ঞাসারে ঠেলে দাও—
কোথায় কোথায়?
এবারে শুধাও :
ক্ষুধা-ক্ষুব্ধ মৃত্তিকারে ছেড়ে এসো
নিলাম্ভে উধাও!!

অতিবৃষ্টি ও প্লাবন—

১৩৬৬ সাল আরম্ভ হওয়ার পর হইতে, ২রা বৈশাখ প্রথম বর্ষণ আরম্ভ হয়। তাহার পর এবার সমান বৃষ্টি হইতেছে। প্রথম কয় মাসের বৃষ্টি কল্যাণজনক বলিয়া মনে হইয়াছিল—তাহার পর গত সেপ্টেম্বর মাসের প্রথম হইতে ২ মাস কাল অতিবৃষ্টির ফলে পশ্চিম বঙ্গের ৯টি জেলার যে ক্ষতি হইয়াছে, তাহার পরিমাণ কত কোটি টাকা তাহা এখনও স্থির করা সম্ভব হয় নাই। ২৪ পরগণা, নদীয়া, মুর্শিদাবাদ, হাওড়া, হুগলী, বর্দ্ধমান, বাঁকুড়া, বীরভূম, মেদিনীপুর সকল জেলাই এই অতিবৃষ্টি ও তজ্জনিত প্লাবনে দারুণ দুর্দ্দশাগ্রস্ত হইয়াছে। নিম্নবঙ্গের যে সকল নদী, নালা ও খাল এই সকল জেলার মধ্য দিয়া প্রবাহিত, সে সকল জলপথ পলি পড়িয়া প্রায় বুজিয়া যাইতেছিল—কাজেই ঐ সকল জলপথে অধিক জল আসায় সে জল নদীর মধ্যে ধরে নাই—নদীর ২ পাড়ে উপছাইয়া পড়িয়া বহু বাসগৃহ ধ্বংস করিয়াছে, শস্যক্ষেত্র গুলি ১০।১৫ দিন জলমগ্ন থাকায় ক্ষেত্রের সকল আমন ও আউস ধান পচিয়া গিয়াছে—রাস্তাঘাট প্রভৃতি নষ্ট করিয়াছে—সব গাছ পালা হয় পড়িয়া গিয়াছে, না হয় পচিয়া গিয়াছে, তরিতরকারীর চাষ একেবারে ধ্বংস করিয়াছে। হাওড়া জেলার উলুবেড়িয়া ও আমতা অঞ্চলে, হুগলী জেলার আরামবাগ মহকুমা, মেদিনীপুর জেলার সমুদ্রতীরবর্তী নিম্ন অঞ্চলগুলি, বর্দ্ধমান জেলার কাটোয়া, কালনা মহকুমাদ্বয়, মুর্শিদাবাদ জেলার কান্দি মহকুমা, নদীয়া জেলার প্রায় সকল অংশ, ২৪ পরগণা জেলার ডায়মণ্ডহারবার, সদর ও বসিরহাট মহকুমা প্রভৃতি প্রায় সকল স্থানই ভীষণভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হইয়াছে। রাণাঘাট, নবদ্বীপ, শান্তিপুর, কৃষ্ণনগর, কালনা, কাটোয়া প্রভৃতি সহরগুলি ৫।৭ দিন জলের নীচে থাকায় বহু গৃহস্থের সর্ব্বস্ব নষ্ট হইয়াছে। ভাগীরথী নদীর জলবৃদ্ধির ফলে নদীর উভয় তীর—ফরক্কা ভগবানগোলা হইতে বারাকপুর পর্য্যন্ত—সর্ব্বত্র চাষ ও বাস নষ্ট হইয়াছে। নবদ্বীপ সহর ও তাহার সন্নিহিত কয়েক মাইল বিস্তৃত চরে গত ১০।১২ বৎসরে বহু নূতন গৃহ নির্ম্মিত হইয়াছিল। সে গুলি অধিকাংশ বন্যার জলে ভাসিয়া গিয়াছে। কলিকাতা ও সহরতলীর ক্ষতিও কম হয় নাই। বাস্তুহারার দল যে যেখানে সুবিধা পাইয়াছিল, সে সেখানে গৃহ নির্ম্মাণ করিয়া বাস করিতেছিল—তন্মধ্যে নিচুস্থানগুলি সব জলমগ্ন হওয়ায় কয়েক লক্ষ গৃহস্থ গৃহহীন হইয়া নিকটস্থ স্কুল, পাঠশালা প্রভৃতিতে আশ্রয় লইয়া অতি কষ্টে প্রাণ বাঁচাইয়াছে। এবার প্লাবনে সরকারী হিসাবে শতাধিক লোক মারা গিয়াছে বলিয়া জানা যায়—কত লোক কত স্থানে যে ভাসিয়া গিয়া প্রাণ হারাইয়াছে তাহার সংখ্যা নাই। গবাদি পশুও বহু মারা গিয়াছে। নবদ্বীপ সহরে কেহ একতলার ঘরে বাস করিতে পারে নাই, সব জলমগ্ন হইয়া গিয়াছিল। কলিকাতা সহরের বহু অংশ, কসবা, গোবরা, টালীগঞ্জ, নাকতলা, যাদবপুর, ঢাকুরিয়া প্রভৃতি অঞ্চলের কতকাংশ ১০।১৫ দিন জলমগ্ন থাকায় সহরবাসীগণও বিপন্ন হইয়াছিলেন। এই জল বাহির করিয়া দিবার পথ ছিল না। গঙ্গার জলবৃদ্ধির ফলে বিদ্যাধরী, বাগজলা, পিয়ালী প্রভৃতি নদীনালাগুলি জল পূর্ণ থাকায় দক্ষিণ দিকে জল যায় নাই। তাহার ফলে বসিরহাট মহকুমার একটা বিরাট অংশ জলমগ্ন ছিল—বসিরহাট যাতায়াতের পথে কয়েক ফিট জল থাকায় যাতায়াত অসম্ভব হইয়াছিল। বারাকপুর মহকুমার পূর্ব্বাঞ্চল জলমগ্ন হওয়ায় বিরাট সহরতলীর তরকারী সমস্যা উপস্থিত হইয়াছে—সকল তরকারীর ক্ষেতের চাষ নষ্ট হইয়া গিয়াছে। বারাসতেরও বহুস্থানে বাস্তুহারা পল্লীগুলির ঘরবাড়ী নষ্ট হইয়াছে। ডায়মণ্ডহারবার মহকুমার সাগর, কাকদ্বীপ, ক্যানিংগঞ্জ প্রভৃতি অঞ্চলের বহু স্থানে বাঁধ ভাঙ্গিয়া যাওয়ায় ধান্যক্ষেত্র প্লাবিত হইয়াছে। জমীদারী প্রথা উচ্ছেদের পর সরকার জমীদারী গ্রহণ করিয়াছে বটে, কিন্তু বাঁধ সংস্কারের কোন ব্যবস্থা করে নাই—ফলে

অধিকাংশ স্থলে বাঁধ মেরামত না হওয়ায় প্লাবন অধিক হইয়াছিল। বৃষ্টির জল ত আছেই—কারণ এবারের মত অতিবৃষ্টি নাকি গত ৬০।৭০ বৎসরের মধ্যে কখন ও দেখা যায় নাই। সরকার দামোদর ও ময়ূরাক্ষী পরিকল্পনায় যে সকল বাঁধ নির্মাণ করিয়াছেন, সে সকল বাঁধে সমস্ত জল ধরিয়া রাখিতে পারে নাই—বাঁধ রক্ষা করিবার জন্য তাহারা মধ্যে মধ্যে বাঁধের জল ছাড়িয়া দিয়াছে—তাহ তেও দেশের ক্ষতি কম হয় নাই। বীরভূম, বাঁকুড়া, বর্দ্ধমান, হাওড়া ও হুগলী জেলায় বাঁধের জল অসময়ে ছাড়ার ফলে বহু-অঞ্চল ধ্বংস হইয়াছে। গঙ্গায় পলি জমিয়া স্থানে স্থানে গঙ্গার খাত মধ্যে ১৫।২০ ফিট পর্য্যন্ত উচ্চ হইয়াছে—অনেক স্থানে যে সকল উচ্চ স্থানে গৃহ নির্মিত হইয়াছে—সর্বত্র চাষ আরম্ভ হইয়াছে—ফলে শুধু জলস্রোত রুদ্ধ হয় নাই—জল উভয় তীরে নিম্নস্থান দিয়া প্রবেশ করিয়া মানুষের বাসস্থান ও চাষের জমী নষ্ট করিয়াছে। কাটোয়ার অপর পারে নদীয়া জেলার বল্লভপাড়া প্রভৃতি অঞ্চল সে জন্য বিধ্বস্ত হইয়াছে। সরকার ও সহৃদয় জনসাধারণ দুঃস্থ ব্যক্তিদিগকে সাহায্য করিবার ব্যবস্থা করিয়াছেন বটে, কিন্তু ক্ষতির পরিমাণ এত অধিক যে সাহায্য দানের দ্বারা মানুষের কিছু করা যাইতেছে না। পশ্চিমবঙ্গের মুখ্য-মন্ত্রী ডক্টর বিধানচন্দ্র রায় নিজে দিল্লী যাইয়া কেন্দ্রীয় সরকারের দৃষ্টি এ দিকে আকর্ষণ করায় প্রধান মন্ত্রী শ্রীনেহরু গত অক্টোবর মাসে একদিন কলিকাতায় আসিয়া মেদিনীপুর, হুগলী, নদীয়া প্রভৃতি জেলায় স্থানে স্থানে যাইয়া বন্যাবিধ্বস্ত অঞ্চল নিজে দেখিয়া গিয়াছেন। তিনি এ অঞ্চলের নদীনালা গুলীতে সঞ্চিত মাটী পরিষ্কার করার প্রয়োজনীয়তার কথাও বলিয়া গিয়াছেন। নদী উন্নয়ন পরিকল্পনা ব্যবস্থা কেন সাফল্যমণ্ডিত হয় নাই সে জন্যও কেন্দ্রীয় সরকার তদন্তের ব্যবস্থা করিয়াছেন। যাহাতে ফরক্কা বাঁধ সত্বর নির্মিত হইয়া ভাগীরথী নদীর সকল স্থানে পলি পরিষ্কারের ব্যবস্থা হয়, তিনি সে জন্য সত্বর কার্য্যারম্ভের কথাও বলিয়া গিয়াছেন। বাংলার কৃষি-মন্ত্রী শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র সেন, সেচ-মন্ত্রী শ্রীঅজয়কুমার মুখোপাধ্যায়, পথ-মন্ত্রী শ্রীখগেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত, কৃষি ও খাদ্য উৎপাদন মন্ত্রী শ্রীতরুণকান্তি ঘোষ প্রভৃতি সকল বন্যা-বিধ্বস্ত স্থানে যাইয়া এক দিকে যেমন অস্থায়ীভাবে সাহায্য দানের ব্যবস্থা করিতেছেন, অন্য দিকে তেমনই এইরূপ দুর্ঘটনা ভবিষ্যতে বন্ধ করার জন্য স্থায়ী প্রতীকার ব্যবস্থার কথা ও চিন্তা করিতেছেন। যে সকল নূতন ও পুরাতন পথ অতিবৃষ্টিতে নষ্ট হইয়াছে, সেগুলি মেরামত করিতেই কয়েক কোটি টাকার প্রয়োজন হইবে। পথ-সংস্কার করা না হইলে বহু স্থানে গাড়ী যাতায়াত বন্ধ হইয়া থাকিবে। কলিকাতা সহরের মধ্যেই পথের অবস্থা এই ২ মাসের অতিবৃষ্টিতে এরূপ কদর্য্য হইয়াছে যে প্রত্যেক মোটর-চড়া লোককেও তাহা সর্বত্র সর্বদা উপলব্ধি করিতে হইতেছে। এক সঙ্গে এত অধিক সমস্যা পশ্চিমবঙ্গে আর কখনও দেখা যায় নাই। একেবারে ধ্বংসপ্রাপ্ত গৃহগুলির পুনর্নির্মাণ, ক্ষতিগ্রস্ত গৃহসমূহের সংস্কার-সাধন, কৃষককে কৃষি ঋণ, বীজ ও সার সরবরাহ, চারিদিকে নানারূপ সংক্রামক ব্যাধির সম্ভাবনা দূরীকরণ ও ব্যাধিগ্রস্তগণের চিকিৎসার ব্যবস্থা, খাদ্যহীন জনগণকে আহার্য্য, বস্ত্র, শীতবস্ত্র প্রভৃতি দান—প্রভৃতি কার্য্য এখনই করা না হইলে ভবিষ্যতে পশ্চিমবঙ্গ জনশূন্য হইয়া যাইবে। বহুস্থানে শস্যক্ষেত্রে বালি জমিয়া তথায় কৃষিকার্য্য অসম্ভব হইয়াছে, সে সকল ক্ষেত্র হইতে বালি সরাইয়া তথায় চাষের প্রবর্ত্তনের জন্যও সরকারী সাহায্য প্রয়োজন। এই দুর্দ্দশার মধ্যেও জনগণের মধ্যে দুর্নীতিপরায়ণতা দূর হয় নাই। নবদ্বীপ হইতে আমাদের এক শ্রদ্ধেয় বন্ধু পত্রে জানাইয়াছেন—সরকারী সাহায্যদাতার দল (তন্মধ্যে স্থানীয় শিক্ষকগণও আছেন) বিতরণের চাউল চুরি করিয়া তাহা অধিক মূল্যে বাজারে বিক্রয় করিতেছেন। এরূপ ঘটনা এদেশে আর দুর্লভ নাই। দুর্দ্দশাগ্রস্তদের সেবার কার্য্যে যদি এইরূপ অনাচার প্রবেশ করে, তবে আমরা কিরূপে দেশকে বাঁচাইব তাহা ভাবিয়া পাই না। যাহা হউক, আজ এই দারুণ দুর্দ্দিনে মানুষের মধ্যে মনোবল ফিরাইয়া আনিতে হইবে। মানুষকে যত্ন, চেষ্টা ও পরিশ্রমের দ্বারা এই অবস্থার প্রতিকার করিতে হইবে। অবশ্য সরকারকেও সাধ্যমত সহযোগিতা ও সাহায্য দান করিতে হইবে। দেশে এখনও সহৃদয় মানুষের অভাব ঘটে নাই—আজ এই দুর্দ্দিনে আবাল বৃদ্ধ বনিতা দুর্গত মানুষের সেবার জন্য উদ্‌গ্রীব হইয়াছেন দেখিয়া আমরা নিরাশার মধ্যেও আশার আলোক দেখিয়া সান্ত্বনা পাই।

দীর্ঘ, কৃষ্ণ ও
উজ্জ্বল
কেশরাশির জন্য...
এরাসমিক
পারফিউমড
কোকোনাট হেয়ার অয়েল
এখন এই নতুন আকর্ষনীয় বোতলে।
দুই রকম সুন্দর সুগন্ধে
গোলাপ ও যুঁই
ERASMIC
PERFUMED
COCONUT
HAIR OIL

নীহারকণা মুখোপাধ্যায়—

উচ্চাঙ্গ সঙ্গীত গবেষণায় এই বৎসর শ্রীযুক্তা নীহারকণা মুখোপাধ্যায় কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে ডি-ফিল উপাধি লাভ করিয়াছেন। নীহারকণার গবেষণার বিষয়বস্তু—"ভারতীয় সঙ্গীতের মূলসূত্র এবং বাংলা-সাহিত্যে উহার প্রভাব ও প্রয়োগ।" ডাঃ শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের অধীনে তিনি গবেষণা করেন এবং তাঁহার প্রবন্ধ পরীক্ষা করেন ডাঃ শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, স্বামী প্রজ্ঞানন্দ মহারাজ ও অধ্যাপক ধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়। এই প্রকার জটিল তথ্যপূর্ণ সঙ্গীতালোচনায় ইনি অগ্রণী। ১৯৪০
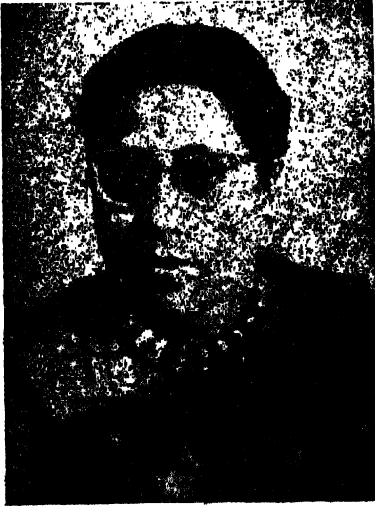
নীহারকণা মুখোপাধ্যায়

খৃষ্টাব্দে নীহারকণা কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে বাংলায় সম্মানের সহিত এম্‌-এ ডিগ্রি লাভ করেন। শ্রীযুক্তা মুখোপাধ্যায় ভারতের বহু বিখ্যাত সঙ্গীতজ্ঞদের নিকট নিয়মিতভাবে সঙ্গীত শিক্ষা করেন। ইনি নিখিল ভারত সঙ্গীত সম্মেলন প্রভৃতি ও বহু সঙ্গীতাসরে এবং কলিকাতা বেতার কেন্দ্রের শিল্পী হিসাবেও খ্যাতি অর্জন করেন। নীহারকণা পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভার সেক্রেটারী বীরভূম নিবাসী শ্রীঅজিতারঞ্জন মুখোপাধ্যায়ের সহধর্মিণী।

ভারত পাকিস্তানের মৈত্রী—

পাকিস্তানের সভাপতি জেনারেল আইউব খাঁ দিল্লীতে যাইয়া ভারতের প্রধান মন্ত্রী শ্রীনেহরুর সহিত আলোচনা করিয়া গিয়াছেন। তাঁহারা বলেন—উভয় রাষ্ট্রের মধ্যে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক স্থাপিত হইলে প্রতিরক্ষা বাবদ ব্যয় হ্রাস পাইবে, ও সেই অর্থ দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে ব্যয় করা হইবে। উভয় দেশের মধ্যে বিভিন্ন সমস্যার কথাও আলোচিত হইয়াছিল। উভয় দেশের মধ্যে এমন কোন সমস্যা নাই, বন্ধুত্বপূর্ণ উপায়ে যাহার মীমাংসা সম্ভব নহে। উভয়ে উভয় দেশের মধ্যে ভীতি ও আতঙ্ক প্রশমিত করিতে সম্মত হইয়াছেন।

পরলোকে চারুবালা দেবী—

গত সোমবার ১২ই অক্টোবর ৭১ বৎসর বয়সে সজ্ঞানে চারুবালা দেবী পরলোকগমন করিয়াছেন। ইনি নপাড়া-দত্তপুকুর নিবাসী ৺গোপালচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের একমাত্র কন্যা ছিলেন এবং মাদরাল নিবাসী রায় কমলাপতি ঘোষাল বাহাদুরের দ্বিতীয় পুত্র আশুতোষ ঘোষালের পত্নী ছিলেন। ইনি মৃত্যুকালে তিন পুত্র ও দুই কন্যা রাখিয়া গিয়াছেন। ইঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র ডক্টর পঞ্চানন ঘোষাল কলিকাতা পুলিশের এনফোর্সমেণ্ট বিভাগের ডেপুটি কমিশনার এবং হাওড়া, ২৪ পরগণার অস্থায়ী এডিশনাল সুপারিন্‌টেন্‌ডেণ্ট্‌। অন্য দুই পুত্রও কৃতী ও স্ব-স্ব কর্মে সুপ্রতিষ্ঠিত। ইহা ব্যতীত ইনি বহু আত্মীয় পরিজন রাখিয়া গিয়াছেন। আমরা ইঁহার শোক সন্তপ্ত পরিবারবর্গের প্রতি আমাদের আন্তরিক সমবেদনা জ্ঞাপন করি এবং ইঁহার স্বর্গত আত্মার মঙ্গল কামনা করি।

দণ্ডকারণ্য সংবাদ—

নয়া দিল্লীতে কেন্দ্রীয় পুনর্ব্বাসন মন্ত্রী শ্রীমেহেরচাঁদ খান্না ঘোষণা করিয়াছেন যে পূর্ব পাকিস্থানের উদ্বাস্তু ছাড়া অন্য কোন উদ্বাস্তুকে দণ্ডকারণ্যে পাঠান হইবে না। পূর্বাঞ্চলের উদ্বাস্তুদের পূর্বাঞ্চল রাজ্যগুলিতে ও দণ্ডকারণ্যে পুনর্ব্বাসন দান করা হইবে। পশ্চিমবঙ্গ, আসাম ও ত্রিপুরার বাহিরে ৫৯০২৫ একর জমীতে ১১৫৬০ উদ্বাস্তুর পুনর্ব্বাসনের জন্য ৮৬টি পরিকল্পনা মঞ্জুর করা হইয়াছে—তাহাতে ৫ কোটি ১৩ লক্ষ ৮৭ হাজার টাকা ব্যয় হইবে।

পশ্চিমবঙ্গে কয়লার সন্ধান—

পশ্চিমবঙ্গের বাঁকুড়া, পুরুলিয়া ও বর্দ্ধমান জেলায় নূতন কয়লার খনির সন্ধান পাওয়া গিয়াছে। এদেশে বৎসরে সাড়ে ৪ কোটি টন কয়লা উৎপন্ন হয়—মোট ৬ কোটি টন উৎপন্ন না হইলে এদেশে শিল্পের দ্রুত সম্প্রসারণ, তাপ বিদ্যুৎ উৎপাদন ও অন্যান্য উন্নয়ন পরিকল্পনার প্রয়োজন মিটান যাইবে না। পশ্চিমবঙ্গের বেকার সমস্যা সমাধানের জন্য নূতন শিল্প প্রতিষ্ঠা করিতে হইলে সর্বাগ্রে অধিক কয়লার সংস্থান করা দরকার। নূতন খনিগুলি হইতে সত্বর কয়লা তোলার কাজ আরম্ভ করা হইলে দেশের বেকার সমস্যা ও কমিয়া যাইবে।

তনুভাব

উপাধ্যায়

লগ্নই তনুভাব, সাধারণ ভাবে দেহ, বিশেষভাবে জাতকের মস্তক। এই ভাব থেকে জাতকের শরীর, বর্ণ, আকৃতি প্রকৃতি, যশ, সম্মান, রূপ, শৈশব, পারিপার্শ্বিক অবস্থা, ব্যক্তিত্ব, শারীরিক গঠন ও চরিত্র সম্বন্ধে বিচার করা হয়। রবি তনুভাবের কারক, এজন্যে এই ভাবে বিচারের সময় রবির অবস্থান, তনুভাবাধিপতির সহিত সম্বন্ধ, সংযোগ বা দৃষ্টি সম্বন্ধ এবং বলাবল লক্ষ্য করতে হয়। রবি তনুভাব, শত্রুভাব, কর্ম্ম ও জাগতিক উন্নতি ও পিতৃকারক। চন্দ্র মন, মাতা, সুখ, বিদ্যা (চতুর্থভাব) ও দেহপুষ্টিকারক। পাশ্চাত্য জ্যোতিষীরা জানেন তনুভাব বিচারের সময় রবি ও চন্দ্রের অবস্থান লক্ষ্য করা দরকার। জাতকের দৈহিক গঠনের সবলতা বা দুর্ব্বলতা রবির বলাবলের উপর নির্ভরশীল,আর দৈহিক যন্ত্রগুলির সক্রিয় অবস্থা চন্দ্রের দ্বারা প্রদর্শিত হয়। পাপগ্রহ, মঙ্গল, ও শনি রোগের স্রষ্টা। এল্যান লিও বলেছেন—In all astrological consideration "character is destiny," so that it is essential to know the charact er first as thoroughly as possible, and we may then judge how the fate will be affected by it." অর্থাৎ ফলিত জ্যোতিষ সংক্রান্ত সর্বপ্রকার বিচারে চরিত্রই ভাগ্য, এজন্য সর্বপ্রথমে যতদূর সম্ভব পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে জাতকের চরিত্র সম্বন্ধে জানা বিশেষ দরকার. আর এর দ্বারা ভাগ্য কি ভাবে গড়ে উঠবে, আমরা তখন বিচার করতে পারবো। জাতচক্রে রবি শুভ ও বলবান হোলে জাতকের স্বাস্থ্য ভাল হবে, পিতার শুভ হবে, জাতক নিজে শত্রু দ্বারা পীড়িত হবে না, জীবনে বহু উন্নতি করতে পারবে, আর অশুভ হোলে এই সব শুভ ফলের বিপরীত হবে।

শিশুর রিষ্টি (বা ফাঁড়া) বিচারেও রবি চন্দ্রের অবস্থিতি সর্ব্বাগ্রে বিবেচনা করতে হয়। কেননা রবি জীবনীশক্তির ও চন্দ্র দেহপুষ্টির কারক। এরা পাপ পীড়িত বা অশুভ স্থানস্থ হোলে শিশুর জীবন সংশয় পীড়া হয়। রবি ও চন্দ্র নীচ রাশিতে থেকে নীচাংশ যদি অতিক্রম না করে, তা হোলে সর্ব্বপ্রকার শুভ যোগের ভঙ্গ হয়, ফলে সৌভাগ্য সুখ শান্তির অভাব ঘটে। তনুভাবাধিপতি পাপযুক্ত হয়ে ষষ্ঠে, অষ্টমে বা দ্বাদশে থাকলে শারীরিক সুখ নষ্ট হয়। সকলভাবেই এই ভাবে ফল বিচার করতে হয় অর্থাৎ যে কোন ভাবের অধিপতি পাপযুক্ত হয়ে ষষ্ঠে, অষ্টমে বা দ্বাদশে থাকবে সেই ভাবেরই অশুভ ফল হয়। তৃতীয় ও সপ্তম স্থানে এইরূপ অশুভফল চিন্তা করতে হয়। লগ্নপতি পাপযুক্ত হয়ে ষষ্ঠে অষ্টমে,বা দ্বাদশে মিত্র গৃহে থাকলেও অশুভ ফলদাতা হয়। পাপগ্রহ লগ্নপতি হয়ে লগ্নে বা অন্য কোন কেন্দ্র স্থানে থাকলে কিম্বা চন্দ্রযুক্ত বা চন্দ্রের নবাংশে থাকলে রোগদায়ক হয়ে জাতককে কষ্ট দেয়—কিন্তু রোগনাশ করে পঞ্চমে নবমে বা একাদশে থাকলে। লগ্নপতি যদি দুর্ব্বল পাপগ্রহ হয়ে নীচ স্থানে শত্রুগৃহে অথবা সূর্য্যের অবস্থিত গৃহে থাকে কিম্বা অস্তের ক্ষেত্রে ষষ্ঠে অষ্টমে বা দ্বাদশে অবস্থান করে তা হোলে সে রোগ দায়ক হয়। লগ্নাধিপতি বা চন্দ্র যে গৃহে থাকে, সেই গৃহের অধিপতি দুর্ব্বল হয়ে তৃতীয়ে ষষ্ঠে বা দ্বাদশে থাকলে অথবা নীচস্থ, অস্তগামী বা শত্রুগৃহে থাকলে শরীর কৃশ ও জাতক রোগী হয়। কর্কট লগ্নে জাত ব্যক্তির বাল্যকালে কৃশ দেহ হয়। মিথুন সিংহ ধনু ও কুম্ভ লগ্নে জাত ব্যক্তিদের লম্বা আকৃতি হয়। বৃষ, কর্কট, মকর ও মীন লগ্নে জাত ব্যক্তিদের চেহারা বেঁটে হয়, এ ছাড়া অন্যান্য লগ্নে জাতগণের চেহারা সাধারণ ভাবে উঁচু হয়। রাশির প্রথমাংশে লগ্ন হোলে আর এর অধিপতি উচ্চস্থ হোলে জাতক লম্বা হয়। লগ্নে শুক্র থাকলে জাতক সকলের আকর্ষণীয় হয়। তার চেহারা চিত্তাকর্ষক। বরাহ মিহির বলেন, লগ্নের নবাংশাধিপতির অবস্থান ভেদে জাতকের দৈহিক সৌন্দর্য্যের আর চন্দ্রের নবাংশাধিপতি থেকে গাত্রের বর্ণের তারতম্য পরিলক্ষিত হয়। রাহু মেষ থেকে তুলা রাশি পর্য্যন্ত কোন এক রাশিতে অথবা কুম্ভে থাকলে শুভ হয়, এর মধ্যে বৃষ, কর্কট ও কন্যারাশিতে বিশেষ শুভ ফলপ্রদ, আর মিথুন ও সিংহরাশিতেও শুভ। এই সব স্থানের যে কোন একটি স্থান লগ্ন হয়ে সেখানে রাহু

থাকলে খনার মতে শুভদায়ক। খনা বলেন—লগ্নে থাকে গলা কাটা, সঙ্গে চলে শতেক বেটা। কিন্তু মঙ্গল যুক্ত বা দৃষ্ট রাহু আদৌ শুভদায়ক নয়।

লগ্নে সমস্ত গ্রহের দৃষ্টি থাকলে অতীব শুভ হয়। ফলে জাতক আমোদ প্রমোদে কাল অতিবাহিত করে,আর বলবান, কুল দীপক, ভাগ্যবান, দীর্ঘায়ু ও শত্রু বর্গের ধ্বংসকারী হয়। লগ্নে শনির যোগ বা দৃষ্টি থাকলে জাতকের চৌর ভয় ও রাজ ভয় হয়। চন্দ্র শনি ও কেতু একত্রে লগ্নে থাকলে জাতকের পাগল হওয়ার সম্ভাবনা। রবি চন্দ্র বৃহস্পতি ও শনি একত্রে থাকলে জাতক উন্মাদ হয়। রবি চন্দ্র কর্কটে থাকলে অস্থি ক্ষয় হয়। দ্বাদশাধিপতি লগ্নে থাকলে জাতকের শৌর্য্য হয় না বা জাতক অবিবাহিত থাকতে পারে। সে রূপবান, দুর্ব্বল, কফরোগী, আর ধন ও বিদ্যাবিহীন হয়। বৃষ, কর্কট ও বৃষ রাশিস্থ শনি বিশেষ শুভ নয়, মেষ ও সিংহরাশিতে শনি বিশেষ অশুভ। এই সব রাশিতে লগ্ন হোলে আর একটি গ্রহ থাকলে অগ্নি শস্ত্র বা কাষ্ঠ হেতুক মস্তকে আঘাত হয়। পাপগ্রহযুক্ত ও পাপদৃষ্ট হয়ে চন্দ্র লগ্নে থাকলে জাতকের জলে ভয় থাকে অর্থাৎ জল নিমজ্জনের সম্ভাবনা, ষষ্ঠপতি রাহু বা কেতুযুক্ত হয়ে লগ্নে থাকলে জাতক ব্রণ-রোগাক্রান্ত হয়। তুলা লগ্নে রবি থাকলে জাতক অন্ধ ও নির্ধন হয়। লগ্নে কোন গ্রহের দৃষ্টি না থাকলে জাতক গুণহীন হয়। যদি বৃদ্ধগ্রহ অর্থাৎ রবি, বৃহস্পতি ও শনি বলবান হয়ে লগ্নে থাকে তাহোলে জাতক বৃদ্ধ প্রকৃতিভাবাপন্ন আর সর্ব্বত্র গাম্ভার্য্যাদির জন্যে সুবিদিত হয়ে থাকে। লগ্নাধিপতি লগ্নে স্বক্ষেত্রগত হোলে জাতক বিখ্যাত হয়। পঞ্চমপতি অথবা বুধ পূর্ণ বলশালী হয়ে লগ্নপতির সঙ্গে লগ্নে বা চতুর্থস্থানে থাকলে আর পাপগ্রহ দৃষ্ট না হোলে জাতক বিদ্বান ও যশস্বী হয়। লগ্নাধিপতি পাপগ্রহের সঙ্গে অষ্টম স্থানে একত্র থাকলে স্বাস্থ্যহানি ঘটে আর পৌনঃপুনিক পীড়ার সম্ভাবনা পরিলক্ষিত হয়। লগ্নাধিপতি ষষ্ঠ, সপ্তম, অষ্টম ও দ্বাদশভাবের অধিপতির সঙ্গে একত্র থাকলে শরীরে অনবরত ব্যাধির সঞ্চার হয়। ষষ্ঠ, অষ্টম বা দ্বাদশে লগ্নাধিপতি থাকলে শারীরিক গঠন দুর্ব্বল হয়। লগ্নাধিপতি পাপগ্রহের সঙ্গে সংযুক্ত হোলে আর রাহু শনি লগ্নে থাকলে জাতকের দুঃখ ও ঝঞ্ঝাটের অবধি থাকে না। বৃষ লগ্নে শনি জাতককে শেষ বয়সে সে ভাগ্যবান করে। জাত চক্র বিচার কালে লগ্ন ও লগ্ন শক্তির শুভাশুভ অবস্থা প্রথমেই লক্ষ্য করা দরকার। লগ্নে তিনটি শুভগ্রহ থাকলে জাতক রাজা বা রাজতুল্য ঐশ্বর্য্যশালীও বিনীত হয়, আর তিনটি পাপগ্রহ থাকলে দুঃখ দারিদ্র্য যুক্ত লোক ও বহু ভোজী হয়। ভাবস্থ গ্রহ ইষ্টই হোক আর অনিষ্টই হোক সর্ব্বাপেক্ষা অধিক ফল দাতা হয়ে থাকে, সুতরাং তনুভাবে যে গ্রহ থাকবে সেই গ্রহ অধিক ফলদাতা হবে। লগ্নে পাপগ্রহ থাকলে শিরো রোগ হয়। পাপগ্রহের ক্ষেত্রে লগ্ন হোলে আর তাতে বৃহস্পতি চন্দ্র থাকলেও জাতকের শিরো রোগ হবে। লগ্নে রাহু, মঙ্গল, শনি ও রবি এ কয়টীগ্রহের যে কোন, আর রাহু বা শনি লগ্নে থাকলে জাতক চোর প্রতারক, পকেটমার প্রভৃতি বদমায়েসের দ্বারা, প্রবঞ্চিত ও লাঞ্ছিত হয়। রাহু মঙ্গল আর শনি লগ্নে থাকলে মূত্রাশয়ের পীড়া ও অণ্ডকোষ-স্ফীতি হয়। লগ্নে রবি, মঙ্গল, শনি প্রভৃতি গ্রহ থাকলে জাতকের দেহ শীর্ণ হয়। জলরাশিতে লগ্ন হোলে জাতকের দেহ স্থূল হয়। রবি লগ্নে অবস্থান করলে আর মঙ্গল তাকে পূর্ণ দৃষ্টি দিলে হাঁপানি যক্ষ্মা প্রভৃতি ক্ষয়কর ব্যাধি হয়। লগ্নে বহু পাপগ্রহ অবস্থান করলে জাতক জীবনে বহু কষ্ট ভোগ করে।

লগ্নের প্রথমার্দ্ধে শুক্র অবস্থান করলে জাতকের প্রথম জীবন সুখে অতিবাহিত হয়, আর এর দ্বিতীয়ার্দ্ধে ঐ গ্রহ থাকলে আর চতুর্থ ও পঞ্চমে পাপগ্রহ থাকলে জাতকের শেষ জীবন খুব দুঃখের হয়। কোন জাতক কর্কট, বৃশ্চিক, অথবা মীন লগ্নের শেষ বারো মিনিট অথবা সিংহ, ধনু বা মেষ লগ্নের প্রথম বারো মিনিটের মধ্যে জন্মালে তার শীঘ্রই মৃত্যু হয়। সিংহ, বৃশ্চিক বা কুম্ভ লগ্ন হোলে আর ঐ লগ্নে রাহু পাপগ্রহের দ্বারা দৃষ্ট হয়ে থাকলে ও বলী বৃহস্পতির দ্বারা লগ্নস্থান দৃষ্ট না হোলে জাতকের মৃত্যু ১৭ বর্ষের আগেই ঘটে। লগ্নাধিপতি অষ্টম স্থানে আর অষ্টমাধিপতি লগ্নে থাকলে, ষষ্ঠে বা দ্বাদশে দ্বিতীয়াধিপতি থাকলে ১৮ বর্ষের আগেই জাতকের মৃত্যু ঘটে। কোন জাতিকার লগ্ন মীনে হোলে আর লগ্নের অষ্টমে শনি থাকলে, তার দৈন্য যোগ হওয়ায় সমগ্রজীবনটাই দুঃখে কষ্টে অতিবাহিত হ'বে, তার বিবাহ বিলম্বে ঘটবে—অকাল বৈধব্য-প্রণয়, ভঙ্গ ও বিচ্ছেদ জনিত কষ্ট পেতে হবে। ক্ষীণ চন্দ্র রাহুর সঙ্গে লগ্নে থাকলে আর লগ্নে শুভ গ্রহের দৃষ্টি না থাকলে জাতকের বাল্যে মৃত্যু ঘটে ; কিন্তু মেষ কিম্বা বৃষে রাহু এরূপ অবস্থায় থাকলে মৃত্যু হয় না।

এলানলিও বলেন যে লগ্নাধিপতিই (Ruling Planet) অর্থাৎ অদৃষ্ট ও ভাগ নিয়ন্তা। এর মতে লগ্নাধিপতি লগ্নে থাকলে মানুষ নিজের চেষ্টায় বহুউর্দ্ধে উঠতে পারবে, আর জীবনে নানাদিকে উন্নতি করে পার্থিব সুখভোগ করবে, তার চরিত্র ও হবে বলিষ্ঠ। গ্রহরা নানাভাবে ফল দিয়ে থাকে। রাশির কারকতা অনুসারে গ্রহের নিজের স্বভাবানুযায়ী যে নক্ষত্রে অবস্থান করছে, সেই নক্ষত্রের স্বভাব অনুসারে সেইগ্রহ শুভ বা অশুভ ফল দাতা হয়। নৈসর্গিক শুভগ্রহ লগ্নাধিপতি হোলে শুভকারক হয় না, নৈসর্গিক অশুভগ্রহ লগ্নাধিপতি হোলে অশুভ ফল প্রদান করে, তবে উচ্চস্থ স্বক্ষেত্রগত বা মিত্র গৃহগত হোলে অশুভভাবের কিছুটা দোষ কেটে যায়। মনে রাখতে হবে লগ্ন ও লগ্নপতিই জাতকের রাশিচক্রের মূল ভিত্তি। তনুভাব ও তনুভাবাধিপতি বলাবল অনুসারে জাতকের স্বাস্থ্য সম্বন্ধে বিচার করতে হয়।

***

কার্ত্তিক মাসের ব্যক্তিগত রাশির ফলাফল

মেষ

অশ্বিনীনক্ষত্রজাতগণের পক্ষে ভরণী ও কৃত্তিকার অপেক্ষা নিকৃষ্ট ফল। ভরণী ও কৃত্তিকাজাতগণের পক্ষে অপেক্ষাকৃত ভালো। মাসের প্রথমার্দ্ধে শত্রু ও প্রতিযোগিগণের পরাজয়। মানসিক স্বচ্ছন্দতা লাভ, বিলাস ব্যসন দ্রব্য লাভ ও উপভোগ, স্বাস্থ্যোন্নতি, জনপ্রিয়তা, খ্যাতি,

স্বজনগণের আদর আপ্যায়ন, পারিবারিক শুভ অনুষ্ঠানের সম্ভাবনা। শেষার্দ্ধে শত্রুদ্বারা উৎপীড়ন, ক্লান্তিকর ভ্রমণ, দ্বন্দ্ব কলহ, দুর্ঘটনা ও কোন কার্য্যে হস্তক্ষেপে বাধা বিপত্তি প্রভৃতি দেখা যায়। মাসের মধ্যভাগে সামান্য পীড়াদি কষ্ট—বিশেষতঃ গুহ্য প্রদেশ ও উদরের উপর পীড়ার প্রকোপ। যাদের স্থায়ী চক্ষুপীড়া আছে, তাদের এই পীড়ায় কষ্ট ভোগ। স্ত্রীর স্বাস্থ্য ভঙ্গ ও পীড়াদি সম্ভাবনা। স্বজন বা বন্ধু বিয়োগ-জনিত দুঃখ। স্ত্রী পুত্রাদির সহিত মনোমালিন্য ও কলহ, এমন কি পারিবারিক কলহের আধিক্য হেতু সাময়িক বিচ্ছেদ। প্রথমার্দ্ধে আর্থিক স্বচ্ছন্দতা, দ্বিতীয়ার্দ্ধে আর্থিক ক্ষতি। স্পেকুলেশন বর্জ্জনীয়। বাড়ীওয়ালা ও ভূম্যধিকারীর পক্ষে মোটামুটি যাবে। কৃষিজীবীর পক্ষে মাসটী শুভ নয়। চাকুরিজীবীদের পক্ষে প্রথম দিকে কিঞ্চিৎ শুভ হোলেও শেষের দিকে উপরওয়ালার বিরাগভাজন হওয়া হেতু নানাপ্রকার অশান্তিভোগ ঘটবে। ব্যবসায়ী ও বৃত্তিজীবীরা মাসের প্রথম দিকে লাভবান হবে, শেষের দিকে নানাপ্রকার বাধা, ঝঞ্ঝাট ক্ষতির আশঙ্কা আছে। এ মাসটী স্ত্রী লোকের পক্ষে শুভ নয়। পারিবারিক অশান্তি, কলহ, দুশ্চিন্তা প্রভৃতি সম্ভব। প্রণয়ঘটিত ব্যাপারে দুঃসাহসিকতা বর্জ্জনীয়। মানসিক স্থৈর্য্য ও যৌন সংযম বাঞ্ছনীয়, অন্যথায় নানাপ্রকার অপ্রীতিকর ঘটনার সম্ভাবনা। বিদ্যার্থীগণের পক্ষে মাসটী শুভ বলা যায় না।

বৃষ

কৃত্তিকাজাতগণের পক্ষে মাসটী উত্তম, মৃগশিরাজাতগণের পক্ষে মধ্যম—কিন্তু রোহিণী জাতগণের পক্ষে কোন প্রকার ভালো দেখা যায় না। স্বাস্থ্যের অবনতি হবে না, প্রথম দিকে মানসিক কষ্ট ভোগও নেই। সন্তানদের স্বাস্থ্য হানি, সামান্য দুর্ঘটনা ও পারিবারিক শুভ অনুষ্ঠান দেখা যায়, পারিবারিক প্রীতি ও ঐক্য আশা করা যায়। আয়বৃদ্ধি, নূতন বিষয়ে অধ্যয়ন ও গবেষণা, আনন্দপ্রদ ভ্রমণ, জনপ্রিয়তা ও খ্যাতি মাসের প্রথম দিকে সম্ভব। শেষার্দ্ধে কর্ম্মে বাধা, শত্রুপীড়া, চৌর্য্যভয়, মানসিক চাঞ্চল্য প্রভৃতি সম্ভব। অর্থ সংক্রান্ত ব্যাপারে বন্ধুদের সাহায্য বা সহযোগ দেখা যায় কিন্তু কোন বিষয়েই আশাপ্রদ লাভ সূচিত হয় না। বিদ্যার্থীগণের পক্ষে মাসটি উত্তম, অধ্যয়নে মনঃসংযোগ করলে বিশেষ সাফল্য আছে। বাড়ীওয়ালা ভূম্যধিকারী কৃষিজীবীর পক্ষে মাসটি অশুভ নয়। চাকুরিজীবীদের কর্ম্মোন্নতি, পদোন্নতি বা পদমর্য্যাদা-বৃদ্ধি এবং খ্যাতি যোগ আছে। ব্যবসায়ী ও বৃত্তিজীবিগণের পক্ষেও মাসটি শুভ—সাফল্য লাভ ঘটবে। স্ত্রীলোকের পক্ষে মাসের শেষার্দ্ধ শুভ। যাঁরা ঘরের বাইরে কাজ করেন আর সামাজিক ক্ষেত্রে নানাকাজে ব্যাপৃত, তাঁদের বহু প্রকারের সহায় ও সুযোগ আস্‌বে। অবৈধ প্রণয়ঘটিত ব্যাপারে সাফল্য, বন্ধুবান্ধবলাভ ও রোমান্টিক আবেষ্টনে আনন্দানুভব ও পুরুষের স্নেহভালোবাসা অর্জ্জন। পারিবারিক ক্ষেত্রে কর্তৃত্বলাভ।

মিথুন

এ রাশিতে জাতগণের পক্ষে মাসটি আদৌ ভালো নয়, এর প্রতীকারে জপ্যে শান্তি স্বস্ত্যয়ন আবশ্যক। পাতক্রমেতে গ্রহবৈগুণ্য মারাত্মক হ'য়ে উঠ্‌তে পারে। পুনর্ব্বসুজাতগণের পক্ষে দুঃখভোগের অল্পতা মৃগশিরাজাতগণের তদপেক্ষা অশুভ, আদ্রাজাতগণের অবস্থা নৈরাশ্য-জনক। মাসের শেষভাগে কিছু সাফল্য লাভ ও সুখ স্বাচ্ছন্দ্য ঘট্‌তে পারে। এ মাসে আশাভঙ্গ, মনস্তাপ, শত্রুবৃদ্ধি, ধনক্ষয়, অপবাদ, ভ্রমণে বিপত্তি, স্বজন বিয়োগ, শারীরিক ও মানসিক কষ্ট, দৈহিক পীড়া প্রভৃতি আশঙ্কা করা যায়। সময়ে সময়ে অর্থশূন্যতা ও পাওনাদারের তাগিদ, চৌর্য্যও প্রতারণাজনিত ক্ষতি। বন্ধুদের সহিত মেলামেশায় সতর্কতা আবশ্যক। বাড়ীওয়ালা, ভূম্যধিকারী ও কৃষিজীবীদের পক্ষে নানা প্রকার অসুবিধা, দুর্গতি, মামলা মোকর্দ্দমা ও দুশ্চিন্তার সম্ভাবনা। চাকুরিজীবীদের পক্ষে সামান্য পরিমাণে ক্ষতি ও দুর্ভোগ। চাকুরি ক্ষেত্রে শত্রুদের অপ-প্রচেষ্টা গুরুত্বব্যঞ্জক। ব্যবসায়ী ও বৃত্তিজীবীদের পক্ষে হ্রাস বৃদ্ধি সম্পন্ন আয় ও অর্থাগম ঘট্‌বে। স্ত্রীলোকদের পক্ষে প্রথম দিকে মোটামুটি ঘটনাবর্জ্জিত সময়, মধ্যভাগে আর্থিক, সামাজিক ও আধ্যাত্মিক উন্নতির সম্ভাবনা। বৈধ ও অবৈধ প্রণয় ঘটিত ব্যাপারে উত্তম ফল ও পুরুষের সহিত বান্ধবতায় সুদৃঢ় ভিত্তিলাভ, শেষ দিকে অশুভ সময়, নানা প্রকার গোল যোগও বিশৃঙ্খলার সম্ভাবনা। বিদ্যার্থী-গণের পক্ষে মাসটি শুভ নয়।

কর্কট

পুষ্যানক্ষত্রজাতগণের পক্ষে মাসটি নিকৃষ্ট ফলদাতা, পুনর্ব্বসুও অশ্লেষা জাতগণের পক্ষে শুভব্যঞ্জক। যদি ও এ মাসে বিশেষ কোন উল্লেখ-যোগ্য শুভ ঘটনার সম্ভাবনা নাই, তথাপি আশঙ্কাজনক কোন ঘটনাও ঘট্‌তে দেখা যায় না। উত্তম মর্য্যাদা লাভ, স্বাস্থ্যোন্নতি, সুখ স্বাচ্ছন্দ্য, কর্ম্মে সাফল্য, গৃহে মাঙ্গলিক অনুষ্ঠান, সৌভাগ্যোদয়, উপঢৌকন লাভ, শত্রুজয় প্রভৃতি শুভফলগুলি মাসের প্রথমার্দ্ধে আশা করা যায়, শেষার্দ্ধে বন্ধুও স্বজনবর্গের দ্বারা কষ্ট ভোগ, কলহ ও মনোমালিন্য সূচিত হয়। শেষার্দ্ধে শারীরিক অস্বচ্ছন্দতা যোগ আছে। উদর ও গুহ্য প্রদেশে পীড়া। গৃহে ও সামাজিক ক্ষেত্রে প্রীতি সামঞ্জস্য থাকবে কিন্তু শেষার্দ্ধে নিজে অসংযত হোলে মনোমালিন্য ও অশান্তির উদ্রেক হ'বে। বিলাস ব্যসন দ্রব্য ক্রয়ের সম্ভাবনা। আর্থিক স্বচ্ছন্দতা ও অর্থাগমের নানা-প্রকার সুযোগ ঘট্‌বে, শেষার্দ্ধে বন্ধুদের প্ররোচনায় অর্থ ক্ষতি হোতে পারে। প্রথমার্দ্ধে স্পেকুলেশনে লাভ হবে, শেষদিকে অশুভ। বাড়ী-ওয়ালা; ভূম্যধিকারীও কৃষিজীবীদের পক্ষে মাসটি উত্তম। চাকুরিজীবী (বিশেষতঃ যাদের টেক্‌নিকাল বিষয়ে অভিজ্ঞতা আছে) উত্তম সময়, বেকার ব্যক্তিরা কিছু কর্ম্মে সুযোগ পাবে। মোটের উপর এ মাসটি সুন্দর ভাবে যাবে। ব্যবসায়ী ও বৃত্তিজীবীদের পক্ষে মাসটি সর্ব্বোত্তম। ভাবপ্রবণ স্ত্রীলোকেরা বিশেষ আনন্দ লাভ করবে। নানাপ্রকার ব্যক্তির সান্নিধ্যে এসে অন্তরের আশা আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ করবার সুযোগ পাবে, আধ্যাত্ম সাধিকারা বিস্ময়কর অনুভূতি ও দর্শনলাভ করবে। শিল্প কলা কাব্য ও সাহিত্য সাধনায় সাফল্য। অবৈধ প্রণয়াকাঙ্ক্ষা পূর্ণ হবে, পারিবারিক জীবনের সুখ শান্তি ঘট্‌বে। রোমান্টিকতার ক্ষেত্রে আনন্দ উপভোগ। বিদ্যার্থীগণের পক্ষে মাসটি অতীব উত্তম।

সিংহ

উত্তরফল্গুনী নক্ষত্রাশ্রিতগণই গোচরজনিত শুভফলগুলি বিশেষভাবে লাভ করবে। পূর্ব্বফল্গুনী নক্ষত্রাশ্রিতগণের পক্ষে কিঞ্চিৎ বাধা বিপত্তি আছে। মাসের প্রথমার্দ্ধ অপেক্ষা শেষার্দ্ধে শুভ ফলগুলি প্রকাশ পাবে। সাধারণ ভাবে সাফল্যও সুখলাভ, শত্রুজয়, মর্য্যাদালাভ, বিদ্যায় কৃতিত্ব অর্জ্জন, সর্ব্বপ্রকার আনন্দ উপভোগ খ্যাতি প্রতিপত্তি প্রভৃতি মাসের শেষার্দ্ধে আশা করা যায়। স্বাস্থ্যের অবনতি ঘট্‌বে না। প্রথমার্দ্ধে পারিবারিক অশান্তি, কলহ, ঘরে বাইরে মনোমালিন্য, এমন কি বন্ধু বিচ্ছেদ। স্বজন বিয়োগের সম্ভাবনা। আর্থিক ক্ষেত্র সন্তোষজনক নয়, ব্যয়বৃদ্ধি, প্রতারণায় ক্ষতি, অপরপক্ষে মাসের শেষার্দ্ধে লাভ, প্রচেষ্টায় সাফল্য ইত্যাদি সম্ভব। কোন প্রকার কার্য্যই সহজে সিদ্ধিলাভ করবে না নানা কারণে। স্পেকুলেশন বর্জ্জনীয়। বাড়ীওয়ালা, ভূম্যধিকারী ও কৃষিজীবীর পক্ষে মাসটি মোটামুটি ভাবে যাবে। চাকরিজীবীদের পক্ষে মাসটি উত্তম। উত্তম মর্য্যাদা লাভ, শত্রুজয়, পদোন্নতি প্রভৃতি সূচিত হয়, ব্যবসায়ী ও বৃত্তিজীবীদের পক্ষে মাসটি অতীব শুভ। স্ত্রীলোকদের পক্ষে মাসটী সর্ব্বোতোভাবে সুখকর। পারিবারিক সামাজিক ও প্রণয়ের ক্ষেত্রে সাফল্য লাভ, অর্থ, অলঙ্কার ও উপঢৌকন প্রভৃতি প্রাপ্তি, নূতন বন্ধুলাভ, স্নেহ ভালোবাসা অর্জ্জন আর আশা আকাঙ্ক্ষার সিদ্ধি সূচিত হয়। বিদ্যার্থীগণের পক্ষে মাসটি উত্তম, বিশেষতঃ ম্লেচ্ছবিদ্যায় পারদর্শিতা লাভ।

কন্যা

হস্তানক্ষত্রাশ্রিত জাতের পক্ষেই মাসটি নিকৃষ্ট ফলদাতা, উত্তরফল্গুনীও চিত্রাজাতগণের পক্ষে কম কষ্ট ভোগ। বিশেষ ভালোমন্দ কোন ঘটনা দেখা যায় না। কিছু কিছু মন্দ সাময়িক ভাবে ঘটলেও অসহনীয় হবে না। ক্লান্তিকর ভ্রমণ, সকল কাজেই কিছু না কিছু বাধা, উদ্বেগ, ভয়, অপমান, বন্ধুবান্ধব বা স্বজনবর্গের সহিত কলহ প্রভৃতি দুঃখকর অভিজ্ঞতা লাভ। রক্তের চাপবৃদ্ধি, শারীরিক দুর্ব্বলতা, পিত্তশ্লেষ্মা প্রকোপ, স্বজন বিচ্ছেদ ইত্যাদির সম্ভাবনা। স্বজনবর্গ ও ভ্রমণের জন্য অর্থক্ষতি, আর্থিক অবস্থার অবনতি ইত্যাদি যোগ আছে। বাড়ীওয়ালা, ভূম্যধিকারী ও কৃষিজীবীর পক্ষে মাসটি শুভ নয়। চাকরিজীবীদের পক্ষে মাসটি অশুভ, চাকুরির ক্ষেত্রে অকারণে ঈর্ষাপ্রণোদিত শত্রুগণের দ্বারা বিড়ম্বনা ভোগ, এমন কি কেউ কেউ পদমর্য্যাদা ও চাকুরি পর্য্যন্ত হারাতে পারেন। ব্যবসায়ী ও বৃত্তিজীবীগণের পক্ষে সর্ব্বপ্রকার অসাফল্য হেতু দুশ্চিন্তা ও অসন্তোষ জনিত দুঃখ ভোগ। স্ত্রীলোকের পক্ষে কোন প্রকার অবৈধপ্রণয় বা পুরুষের সহিত বান্ধবতা বিপত্তির কারণ হবে। আকস্মিক ও অপ্রত্যাশিত পরিবর্ত্তন হেতু চিত্তের বিক্ষিপ্ত অবস্থা। স্নায়ু উত্তেজিত থাকায় নানাপ্রকার দৈহিক ও মানসিক বিশৃঙ্খলতা আশঙ্কা করা যায়। কোনপ্রকার পার্টিতে যোগদান, পরপুরুষের সহিত মেলামেশা বা ভ্রমণ বিপত্তিপ্রদ হবে। পারিবারিক ক্ষেত্রে সীমাবদ্ধ হয়ে দৈনন্দিন কাজগুলি করে যাওয়াই ভালো, পরিবারের মধ্যেও অশান্তির যোগ আছে। বিদ্যার্থীগণের পক্ষে মাসটা অশুভ।

তুলা

চিত্রানক্ষত্রাশ্রিতগণের পক্ষে উত্তম সময়, স্বাতী ও বিশাখা নক্ষত্রজাতগণ তদপেক্ষা ন্যূনফল লাভ করবে। এই রাশিতে জাত ব্যক্তিদের পক্ষে এমাসে কোন উল্লেখযোগ্য ভালোমন্দ ঘটনা ঘটবে না, মোটামুটিভাবে যাবে। তবে নানাপ্রকার দুশ্চিন্তা, বন্ধুর সহিত কলহ, কর্ম্মে কিছু কিছু বাধা, উদ্বেগ, স্বাস্থ্যহানি, আঘাত বা দুর্ঘটনা প্রভৃতি সম্ভব, অপর পক্ষে অর্থাগম, পসার প্রতিপত্তির বৃদ্ধি, বন্ধুলাভ, সৌভাগ্যও স্বাচ্ছন্দ্য প্রভৃতি শুভ ফলও আশা করা যায়। চক্ষুপীড়া, পিত্তপ্রকোপ, রক্তদোষ ও হৃদ্‌যন্ত্রের ক্রিয়ার বৈষম্য থেকে পীড়া হোতে পারে। কলহ,বাধাবিপত্তি ও উদ্বেগ সাময়িক ভাবে এলেও ক্ষণস্থায়ী হবে। অর্থাগমও লাভ বিশেষভাবে হবে। বাড়ীওয়ালা, ভূম্যধিকারী ও কৃষিজীবীগণের পক্ষে মাসটী মিত্রফল দাতা। চাকুরিজীবীদের পক্ষে মোটামুটি ভাবে যাবে। ব্যবসায়ী ও বৃত্তিজীবীদের পক্ষে মাসটী ভালোই যাবে। স্ত্রীলোকের পক্ষে অবৈধ প্রণয়, পূর্ব্বরাগ ও গুপ্তপ্রেমের প্রচুর সুযোগ ঘটবে, আর তা সাফল্যমণ্ডিত হবে। পারিবারিক ও সামাজিক ক্ষেত্রে মোটামুটিভাবে সময় অতিবাহিত হোতে পারবে। স্ত্রীলোকের পক্ষে এখানে কোনপ্রকার হঠকারিতা, অবিবেচনা, তার্কিকতা ও অতিরিক্ত মানসিক উত্তেজনা ও ভাবাবেগ বর্জ্জনীয়। বিদ্যার্থীগণের পক্ষে মাসটী শুভ বলা যায় না।

বৃশ্চিক

অনুরাধা নক্ষত্রাশ্রিতগণের পক্ষে মাসটী অশুভ, জ্যেষ্ঠানক্ষত্রজাতগণের পক্ষে শুভ, বিশাখাজাত ব্যক্তির পক্ষে মধ্যম। মাসের শেষার্দ্ধ বিপত্তিজনক, প্রথমার্দ্ধে বিশেষ দুঃখকষ্ট ভোগ দেখা যায় না। শারীরিক দুর্ব্বলতা, উত্তরোত্তর স্বাস্থ্যের অবনতি এবং দীর্ঘস্থায়ী পীড়ার সূচনা দেখা যায়। পারিবারিক অশান্তি, দাম্পত্য কলহ, স্বজন বিরোধ, আত্মীয় বিয়োগ, উদ্বেগ ও আশাভঙ্গ পরিলক্ষিত হয়। ব্যয় বৃদ্ধি, আয়ের হ্রাস, সঙ্কল্পের ব্যাঘাত ও ক্ষতি চিন্তার কারণ হয়ে উঠ্‌বে। বাড়ীওয়ালা, ভূম্যধিকারী ও কৃষিজীবীর পক্ষে মাসটী শুভ নয়। চাকুরির ক্ষেত্র শুভ, পদোন্নতি, মর্য্যাদালাভ, খ্যাতি ও সাফল্য যোগ আছে। ব্যবসায়ী ও বৃত্তিজীবীদের পক্ষে মাসটী উত্তম। স্ত্রীলোকের পক্ষে মাসের প্রথমার্দ্ধ খুব ভালো, শেষার্দ্ধ সুবিধাজনক নয়। সামাজিক, সাংস্কৃতিক, পারিবারিক ও প্রণয়ের ক্ষেত্রে প্রথমার্দ্ধে সাফল্য ও সিদ্ধিলাভ। পূর্ব্বরাগ, প্রেম, অবৈধ ও গুপ্তপ্রণয়ে বিশেষ ভাবে কৃতকার্য্যতালাভ, স্থায়ীভাবেমিলনের পথ প্রশস্ত হবে। শেষার্দ্ধে বিশেষ সতর্কতা আবশ্যক, কোন প্রকার সামাজিক সংযোগ বা প্রণয়ের উত্তেজনায় অভাপ্সিত পুরুষের সান্নিধ্য বর্জ্জনীয়—মাসের শেষার্দ্ধে প্রণয়ঘটিত বিপত্তি কলঙ্ক ও নির্য্যাতনের আশঙ্কা করা যায়। পারিবারিক ক্ষেত্রে লাঞ্ছনার সম্ভাবনা আছে। ধর্ম্ম সাধনায় ব্যাঘাত ঘটবে। বিদ্যার্থীগণের পক্ষে মাসটী মধ্যম।

ধনু

উত্তরাষাঢ়া জাতগণের পক্ষে উত্তম, পূর্ব্বাষাঢ়া জাতগণের মধ্যবিধফল লাভ, মূলাজাতগণের পক্ষে নিকৃষ্ট ফল। প্রথমার্দ্ধ অপেক্ষা শেষার্দ্ধই

শুভ। উত্তরোত্তর সাফল্য লাভ, উত্তম সঙ্গ, বিলাসব্যসন, সকল প্রচেষ্টায় সিদ্ধি, পারিবারিক সুযোগ সুবিধা, খ্যাতি প্রতিপত্তি, নূতন বিষয়ে অধ্যয়ন, জ্ঞান বৃদ্ধি, মাঙ্গলিক অনুষ্ঠান প্রভৃতি দেখা যায়, স্বল্প পীড়াদি ভিন্ন কোনপ্রকার গুরুতর স্বাস্থ্যহানি ঘটবে না। পারিবারিক ক্ষেত্রে কলহ, স্ত্রী ও স্বজনের সঙ্গে মনোমালিন্য প্রভৃতির সম্ভাবনা। আর্থিক ক্ষেত্রে অতীব উত্তম সময়। অত্যন্ত অর্থাগম হবে, তদনুপাতে ব্যয় বৃদ্ধি সম্ভব। স্পেকুলেশন বা নব পরিকল্পনা বর্জ্জনীয়। বাড়ীওয়ালা, ভূম্যধিকারী ও কৃষিজীবীর পক্ষে উত্তম সময়। চাকুরীজীবীদের পক্ষে শেষার্দ্ধটী অতীব উত্তম। নূতন পদ মর্য্যাদা, সম্মান, কর্ত্তৃত্বলাভ, প্রভৃতি যোগ আছে, কেউ কেউ ছুটি নিয়ে ভ্রমণেও বহির্গত হোতে পারেন। ব্যবসায়ীও বৃত্তিজীবীর পক্ষে সর্ব্বোৎকৃষ্ট সময়। স্ত্রীলোকের পক্ষে মাসের মধ্য ভাগ উত্তম, শেষ ভাগ শুভ বলা যায় না, এ সময়ে প্রণয়ে বিপত্তি, অপবাদ ও অপ্রীতিকর ঘটনার সম্মুখীন হওয়ার সম্ভাবনা। বিদ্যার্থীগণের পক্ষে মাসটী আশাপ্রদ নয়।

মকর

পূর্ব্বভাদ্রপদ ও উত্তরভাদ্রপদ নক্ষত্রাশ্রিতগণের পক্ষে মাসটী জ্যেষ্ঠ জাতগণ অপেক্ষা উত্তম। মাসটী সকলের পক্ষেই মোটামুটি ভালো। উত্তরোত্তর শ্রীবৃদ্ধি ও সাফল্য লাভ, আকাঙ্ক্ষার পরিপূর্ণতা, নানাবিধ লাভ, প্রতিপত্তিসম্পন্ন সম্বন্ধ, সৌভাগ্যোদয়, শত্রু জয়, মাঙ্গলিক অনুষ্ঠান উত্তম স্বাস্থ্য, বিলাসব্যসন সামগ্রী লাভ প্রভৃতি আশা করা যায়। মধ্যে মামলামোকর্দ্দমা, কিছু কিছু বাধা, ক্লান্তিকর ভ্রমণ, দুষ্টলোকের উপদ্রব প্রভৃতির সম্মুখীন হওয়ার যোগ আছে। প্রথম দিকে স্বাস্থ্যের কিঞ্চিৎ অবনতি হোতে পারে, তীক্ষ্ণ অস্ত্রের সংযোগে শরীরের কোন অংশ দূষিত হোতে পারে এজন্য সতর্কতা আবশ্যক। পারিবারিক ক্ষেত্রে প্রথম গোলযোগের সৃষ্টি হোলেও শেষের দিক শুভ। আর্থিকউন্নতি যোগ আছে, নানাভাবে আয় হবে। স্পেকুলেশন বর্জ্জনীয়। বাড়ীওয়ালা, ভূমাধিকারী ও কৃষিজীবীর পক্ষে মাসটি শুভ। চাকুরিজীবীরা নানাপ্রকার সুযোগ সুবিধা লাভ করবে। কর্ম্মোন্নতিও আশা করা যায়। উপরওয়ালার প্রীতিভাজন হবার যোগ আছে। ব্যবসায়ী ও বৃত্তিজীবীদের পক্ষে উল্লেখযোগ্য উন্নতি দেখা যায়। সর্ব্বশ্রেণীর স্ত্রীলোকেরাই এ মাসে তাদের আশানুরূপ সিদ্ধিলাভ করবে। পারিবারিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও প্রণয় ক্ষেত্রে আনন্দ লাভ। অধ্যাত্মসাধিকারা ধর্ম্মসাধনায় দ্রুত উন্নতি লাভ করবে। বিদ্যার্থীগণের পক্ষে মধ্যবিধফল লাভ।

কুম্ভ

পূর্ব্ব ভাদ্রপদ নক্ষত্র জাতগণের পক্ষে উত্তম, ধনিষ্ঠা নক্ষত্রাশ্রিতগণের পক্ষে নিকৃষ্ট এবং শতভিষাজাতগণের পক্ষে মধ্যম সময়। কলহ, অসৎ সংসর্গ, মর্য্যাদাহানি, বয়োজ্যেষ্ঠগণের শত্রুতা, অবমাননা, পীড়া, ক্ষতি, কর্ম্মে বাধা, অভাবনীয় পরিবর্ত্তন প্রভৃতি কিছু কিছু ভোগ করতে হবে, ফলে মানসিক সুস্থতার অভাব ঘটবে। একাদশে শনি থাকার জন্যে এ মাসে বিশেষ কিছু ভালোফল আশাকরা বৃথা। রক্তের চাপ বৃদ্ধি, জ্বর, দুর্ঘটনাজনিত রক্ত পাত আঘাত, কষ্টপ্রদ ভ্রমণ প্রভৃতি ঘটতে পারে। পারিবারিক ক্ষেত্রও সুখপ্রদ নয়। স্ত্রী ও সন্তানাদির অসুখের সম্ভাবনা। কলহ বিবাদ লেগেই থাকবে। বন্ধু বা স্বজন বিয়োগ জনিত দুঃখ। এমন কি আত্মীয়বর্গের সহিত সাময়িক বিচ্ছেদ পর্য্যন্ত হোতে পারে। মাসের শেষের দিকে অবস্থার উন্নতি হবে এবং সর্ব্বপ্রকার দুঃখ কষ্ট ও বাধা বিমুক্ত হবার সম্ভাবনা আছে। আর্থিক বিষয়ে এমাসে বিশেষ খারাপ হবে না। বরং এমাসে যতদিন এগিয়ে যাবে ততই অবস্থা ভালোর দিকে এগিয়ে যাবে। অর্থসংক্রান্ত ব্যাপারে সন্তোষজনক পরিস্থিতি আশা করা যায়। তবুও মাঝে মাঝে অনাটন ও ক্ষতির সম্ভাবনা আছে। এজন্যে সর্ব্বপ্রকার আচরণে সতর্কতা আবশ্যক। স্পেকুলেশন বর্জ্জনীয়। অবস্থার অনুকূল আবহাওয়ার মধ্যেও সময়ে সময়ে নৈরাশ্যজনক পরিস্থিতির উদ্ভব হবে। অনল্প দুঃখ কষ্ট আর ক্ষয়ক্ষতি হোতে পারে মাঝে অপ্রত্যাশিত ঘটনার মাধ্যমে। বাড়ীওয়ালা ভূম্যধিকারী ও কৃষিজীবীর পক্ষে মাসটী উত্তম নয়। চাকুরির ক্ষেত্র ও সন্তোষজনক নয়, উপরওয়ালার বিরাগ ভাজন হবার যোগ আছে, মিথ্যা অভিযোগের দায়ে অভিযুক্ত হবার সম্ভাবনা। অপ্রীতিকর পরিবর্তন কর্ম্মক্ষেত্রে আশঙ্কা করা যায়। ব্যবসায়ীও বৃত্তিজীবীদের পক্ষে মাসটি আশাপ্রদ নয়। স্ত্রীলোকের পক্ষে গার্হস্থ্যজীবন অশান্তিকর হয়ে উঠতে পারে। সামাজিক ক্ষেত্রে অসংলগ্ন অপ্রীতিকর অবস্থা ঘটবে, পদে পদে বাধা বিপত্তি, ফলে মর্ম্মপীড়াদায়ক ঘটনা ঘটতে পারে। বয়োবৃদ্ধব্যক্তির আনুকূল্য লাভ হবে। অসমসাহসিক কর্ম্মে নিযুক্ত হবার যোগ আছে। হাল্কা কাজের ফাঁকে ফাঁকে অবৈধ প্রণয়লাভের প্রচেষ্টাও চলতে পারে। কুমারীগণের পক্ষে প্রণয়ীর সংস্পর্শ লাভ এবং পরে বিবাহের যোগাযোগ হোতে পারে। অবিবাহিতা মেয়েদের বিবাহের উদ্দেশ্যে দেখাশুনা বা কথাবার্ত্তা চলবে যাতে এবৎসরে বিবাহের মাসে পরিণয় ঘটে। বিদ্যার্থীগণের পক্ষে মাসটী আশাপ্রদ নয়।

মীনরাশি

পূর্ব্বভাদ্রপদ ও রেবতী নক্ষত্রাশ্রিত ব্যক্তির পক্ষে উত্তম সময়। উত্তরভাদ্রপদ নক্ষত্রাদিজাতের পক্ষে কিঞ্চিৎ দুঃখকর অভিজ্ঞতা লাভ। স্বাস্থ্যের অবনতি, ক্লান্তিকর ভ্রমণ স্বজন ও বন্ধু বিরোধ, কর্ম্মে বাধা, অন্যায় দোষারোপ, ক্ষতি, এবং মামলা মোকর্দ্দমা প্রভৃতি অশুভ পর্য্যায়ে সম্ভব। শুভ পর্য্যায়ভুক্ত ফল নিম্নোক্ত ভাবে পাওয়া যাবে যথা—সৌভাগ্যোদয়, সাফল্যলাভ, লাভ ও আয়বৃদ্ধি।

এ মাসে কলহ বিবাদ বিষয়ে বিশেষ সতর্ক হওয়া আবশ্যক অন্যথা এর মাধ্যমে অপবাদ ও অসম্মানের সম্ভাবনা আছে। পরিপাক যন্ত্রের গোলযোগ, মূত্রাশয় দোষ প্রভৃতি ঘটতে পারে, তা থেকে দূষিত জ্বর হওয়া সম্ভব। দারুণ রক্তচাপের বৃদ্ধি ও মধ্যে মধ্যে চক্ষু পীড়া সূচিত হয়। নানাপ্রকার অশান্তিকর পরিস্থিতি, পারিবারিক কলহ, বন্ধুর সহিত মনান্তর ইত্যাদি আশঙ্কা করা যায়। দুর্ঘটনার ভয় আছে। এ মাসে আর্থিক অবস্থার উন্নতি হবে না। আয় বৃদ্ধি হোলেও ব্যয়াধিক্য বশতঃ সঞ্চয় হবে না। স্পেকুলেশন বর্জ্জনীয়। বাড়ীওয়ালা, ভূমাধিকারী ও কৃষিজীবীদের পক্ষে সময়টি শুভ নয়। টাকা লেনদেন অমঙ্গলকর হবে।

চাকুরি জীবীদের পক্ষেও মাসটি আশাপ্রদ নয় যদিও মাসের শেষার্দ্ধে সুনামের সম্ভাবনা আছে। কঠোর পরিশ্রমের দ্বারা বৃত্তিজীবী ও ব্যবসায়ীর অবস্থার উন্নতি হোতে পারে।

স্ত্রীলোকের আভ্যন্তরীণ শারীরিক যন্ত্রগুলির অবস্থা দুর্ব্বল হ'য়ে উঠতে পারে, এজন্যে উত্তম চিকিৎসকের পরামর্শ গ্রহণ বাঞ্ছনীয়, অন্যথা জীবন বিপত্তিপূর্ণ হোতে পারে। কোন প্রকার পার্টি দেওয়া বা পার্টিতে যাওয়া বর্জ্জনীয়। শান্তিপূর্ণ আবহাওয়ার মধ্যে গার্হস্থ্য জীবনের দৈনন্দিন কর্ত্তব্যগুলি পালন ছাড়া অন্য কোনরূপ গুরুতর ব্যাপারে নিজেকে জড়িত করা অবাঞ্ছনীয়, কেননা শোচনীয় পরিণতির আশঙ্কা করা যায়। কোন প্রকার প্রণয় ঘটিত ব্যাপারে অগ্রসর হওয়া একেবারেই চল্‌বে না। বিদ্যার্থীদের পক্ষে মাসটি মধ্যম।

***

ব্যক্তিগত লগ্ন ফলাফল

মেষলগ্ন—

স্ত্রীর পীড়া বা দুর্ঘটনা, দাম্পত্যকলহ, ক্লান্তি, ভ্রমণ, শারীরিক অসুস্থতা, সন্তানাদি সম্ভাবনা, অসন্তোষ, উদ্বেগ ও বিপদের আশঙ্কা। বিদ্যার্থীর পক্ষে শুভ।

বৃষলগ্ন—

শত্রুবৃদ্ধি হোলেও শত্রুহানি ঘটবে। মামলা মোকর্দ্দমার সম্ভাবনা। আর্থিক স্বচ্ছন্দতা ও লাভ। সৌভাগ্যবৃদ্ধি, অপবাদ ও দুশ্চিন্তা। বিদ্যার্থীর পক্ষে শুভাশুভ।

মিথুনলগ্ন—

শারীরিক অস্বচ্ছন্দতা কর্ম্মেবিশৃঙ্খলতা, প্রণয়ভঙ্গ, সম্ভ্রমলাভ, সন্তানাদির পীড়া, উদ্বেগ ও অশান্তি, ব্যয়বৃদ্ধি। বিদ্যার্থীর পক্ষে অশুভ।

কর্কটলগ্ন—

সৌভাগ্যবৃদ্ধি, আয়াধিক্য, সুখস্বচ্ছন্দতা, সন্তানসম্ভাবনা, স্বজনবিরোধ। বিদ্যার্থীর পক্ষে মধ্যবিধ ফল।

সিংহলগ্ন—

স্বাস্থ্যোন্নতি, আমোদ প্রমোদ, সঞ্চিত অর্থের হ্রাস, ব্যয়বৃদ্ধি, সন্তানাদির পীড়া উদ্বেগ ও অশান্তি। বিদ্যার্থীর পক্ষে শুভ।

কন্যালগ্ন—

স্বাস্থ্যভঙ্গ, মধ্যে মধ্যে পীড়া বা শারীরিক অসুস্থতা, ব্যয়বৃদ্ধি, ধনাগমে বাধা বিপত্তি, শেষার্দ্ধে কিঞ্চিৎশুভ, কর্ম্মেবাধা, অকারণ মনোকষ্ট উদ্বেগ ও দুশ্চিন্তা, বিদ্যার্থীর পক্ষে শুভ।

তুলালগ্ন—

১২ই কার্ত্তিক থেকে স্থান পরিবর্ত্তন। দুর্ঘটনার ভয়, আর্থিক উন্নতি, সম্মান লাভ, খ্যাতি অর্জ্জন, সৌভাগ্যলাভ, আমোদে প্রমোদে কালাতিপাত। বিদ্যার্থীর পক্ষে মধ্যবিধ ফল।

বৃশ্চিকলগ্ন—

ভ্রমণ, ভয় ও উদ্বেগ, পুত্র বা কন্যার বিবাহের কথাবার্ত্তা, কোন বিশিষ্ট ব্যক্তির সহিত বন্ধুত্ব, পারিবারিক অশান্তি, সাংসারিক ব্যাপার নিয়ে ভ্রাতৃবিচ্ছেদ, পিতার স্বাস্থ্যভঙ্গ। বিদ্যার্থীর পড়াশুনায় কিছু বাধা।

ধনু লগ্ন—

অর্থহানি, শারীরিক অস্বচ্ছন্দতা বা পীড়া, শত্রুবৃদ্ধি আয়বৃদ্ধি, ভ্রমণ, মাতার স্বাস্থ্য হানি বা পীড়া, দাম্পত্যকলহ, এমন কি স্ত্রীর সহিত সাময়িক বিচ্ছেদ, উপঢৌকন প্রাপ্তি ও সম্ভ্রমলাভ, বিদ্যার্থীর পক্ষে বিদ্যায় আংশিক ক্ষতি।

মকরলগ্ন—

দৈহিক ও মানসিক পীড়া, আয়বৃদ্ধিঃ ব্যয়াধিক্য, উত্তম আয়, স্বজন বিরোধ, বিদ্যায় উন্নতি। আশাভঙ্গ, মনস্তাপ, স্ত্রীর সহিত কলহ প্রভৃতি সূচিত হয়। বিদ্যার্থীপক্ষে শুভ।

কুম্ভলগ্ন—

মনস্তাপ, পাকাশয়ের দোষ, রক্তের চাপবৃদ্ধি, স্ত্রীর উদর পীড়া, হৃদ্‌পিণ্ডের দুর্ব্বলতা, সন্তানাদির সম্বন্ধে ভালো বলা যায় না। দাম্পত্যকলহ ও স্বজন বিয়োগ, বিদ্যার্থীর পক্ষে মাসটী অশুভ নয়।

মীন লগ্ন—

পিশাচভয়, ব্যয়বৃদ্ধি, বাধাবিপত্তি, ক্ষতি, স্ত্রীর পীড়াদিযোগ, অপ্রত্যাশিত ভাবে শত্রুবৃদ্ধি ও তজ্জনিত অশান্তি, উদ্বেগ, গুরুজন বিয়োগ ও নানাপ্রকার অশুভ পরিস্থিতি। বিদ্যার্থীর পক্ষে মধ্যবিধফল।

সম্পাদনা ঃ শ্রীপ্রদীপ চট্টোপাধ্যায়

সুধাংশুশেখর চট্টোপাধ্যায়

ফুটবল খেলার ক্রমাবনতি

শ্রীউমাপতি কুমার

ফুটবল, বাংলা দেশের জাতীয় খেলার আসন অধিকার করেছে। কিন্তু এত জনপ্রিয়তা সত্ত্বেও এই খেলার মান আগেকার চাইতে উন্নত হয়েছে কিনা সে বিষয়ে সন্দেহের যথেষ্ট অবকাশ আছে। আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতায় বাংলার নিজস্ব খেলোয়াড়দের দাবী আজ টলায়মান। মোহনবাগানক্লাব ও বাংলার প্রাক্তন স্বনামধন্য খেলোয়াড় শ্রীউমাপতি কুমার তাঁহার গভীর অভিজ্ঞতা থেকে বাংলাদেশের বর্ত্তমান কালের ফুট্‌বল খেলা সম্বন্ধে এই প্রবন্ধটি লিখেছেন। এই খেলায় বাংলার মর্য্যাদা যাতে ম্লান না হয় সে দিকে আমাদের এখন দৃষ্টি দেওয়ার সময় এসেছে।

কিছুদিন আগে "ভারতবর্ষ" পত্রিকার ক্রীড়া-সম্পাদক আমায় বললেন, এবারকার সংখ্যায় "ভারতবর্ষে" ফুটবল সম্বন্ধে কিছু লিখতে হবে। কি বিষয়ে লিখতে হবে জিজ্ঞাসা করায় তিনি বললেন যে কোচিং সম্বন্ধে। আমি একটু বিব্রত হ'য়ে বললাম যে কোচিং সম্বন্ধে অনেকেই লিখছেন—আর কোচিংটা আমি বিশেষ বুঝি না এবং এর উপকারিতা সম্বন্ধেও আমি অজ্ঞ। যখন লিখতে বলছেন তখন ফুটবল খেলা সম্বন্ধে সামান্য যা জানি তার কিছুটা লিখে দেবার চেষ্টা করব।

আজকাল যে সব খেলোয়াড় ফুটবল খেলছেন তারা অধিকাংশই আমাদের সময়কার খেলা দেখেন নি। তখনকার European military team বা Civil European team এর খেলার কোন ধারণাই এঁরা করতে পারবেন না। তখনকার উপরোক্ত দুই শ্রেণীর দল ছাড়া, প্রায় সকল খেলাই খালি পায়ে হ'ত। তাতে বৃষ্টির সময় বা কাদা মাঠে আমাদের খেলতে খুবই অসুবিধা হ'ত—ভাল খেলেও বেশীর ভাগ খেলাতে আমাদের হার স্বীকার করতে হ'য়েছে। এদেশে বাধ্যতামূলক বুট্ পরে খেলা ৩।৪ বছর সুরু হয়েছে, যদিও পৃথিবীর অন্যান্য সব জায়গাতেই বুট্ পরে ফুটবল খেলার রীতি। অবশ্য বুট্ পায়ে খেলে ফুটবল খেলার নৈপুণ্যটা খালি পায়ে খেলার মত প্রকাশ করা যায় না।

আজকাল প্রায়ই অন্য দেশ থেকে ফুটবল টীম এদেশে এসে আমাদের দেশীয় দলের সঙ্গে প্রীতিখেলায় অংশ গ্রহণ করে—সেই রকম আমাদের দেশের খেলোয়াড়রাও বিদেশে গিয়ে খেলে আসবার সুযোগ পাচ্ছেন। এ যুগে যে সমস্ত বাহিরের ফুটবল দল এদেশে এসে খেলে গিয়েছে বা খেলতে আসে, তাদের প্রায় সব দলই আমাদের আগের civil বা military team এর সমতুল্য বলে গণ্য করা যায় না। এটা আমার অভিজ্ঞতা থেকে বলছি, কারণ আমি আগেকার প্রায় সব খেলাই দেখেছি বা খেলেছি এবং আজকালকার খেলাও দেখছি।

আমার নিজের বহু খেলায় অংশ গ্রহণ করার অভিজ্ঞতা থেকে ও আগেকার এবং এখনকার সব খেলা দেখার অভিজ্ঞতা থেকে এই বলতে পারি যে ফুটবল খেলার মান খুবই নেমে গেছে। এখন সামান্য একটা বাহিরের Team এসে ভারতীয় Combined Team কে বেশীর ভাগ সময়েই হারিয়ে দিচ্ছে, কদাচিৎ তারা হেরেও যায়, বা হয়ত বড় জোর ড্র হয়। আজকালকার খেলোয়াড়রা দেশে ও বিদেশে খেলার যেরূপ সুযোগ ও সুবিধা পায় বা ৭০ মিনিট খেলা এবং সপ্তাহে ৭ দিনই খেলা যে কত কষ্টকর—সেটা ফুটবল এসোসিয়েশনের কর্তৃপক্ষদের ভেবে দেখা উচিত। আবার Olympic Games এ ৯০ মিনিট খেলতে হয়। অত সময় খেলা আমাদের দেশের খেলোয়াড়দের পক্ষে খুবই কষ্টকর। খেলার খাতিরে খেলতে হয় বটে, কিন্তু তাতে খেলোয়াড়দের বা দেশের খেলার মানের কোন উন্নতি হয় না। কেবল খেলার দৌলতে দেশভ্রমণটাই হয়। আর একটা বিষয়ে লক্ষ্য

ম্যাঞ্চেষ্টার ইউনাইটেডের সেণ্টার ফরওয়ার্ড এ্যালেক্ ডসন, ফুলহামের বিরুদ্ধে গোল করছেন।
ইনি এই খেলায় একাই তিনটি গোল করেন।

তাতে এরূপ কখনও হওয়া উচিৎ নয়। ফুটবল খেলাটা এখন বৎসরের সব সময়েই লেগে আছে। খেলাটা যেমন দরকার সেই অনুপাতে বিশ্রামও দরকার। খেলার মান বাড়াতে হ'লে বিশ্রাম দরকার, অনুশীলন দরকার। মানুষের জীবনে যে কোন বিদ্যায় পারদর্শী হ'তে গেলে, যে কোন সাধনায় সিদ্ধিলাভ ক'রতে গেলে চাই একাগ্রতা, তন্ময়তা। অফিসে সমস্ত দিন চাকরি ক'রে মাঠে এসে ৫০ মিনিট করলে দেখা যায় যে এখনকার খেলোয়াড়দের ৮।১০ বছরের বেশী একাদিক্রমে খেলতে দেখা যায় না। যাদের দেখা যায় তারা সংখ্যায় খুবই অল্প। কচিৎ দু একজন বেশী সময়ও খেলেছেন। কিন্তু আমাদের সময়ে আমরা প্রায় বেশীর ভাগ খেলোয়াড়ই ২২।২৩ বৎসর একাদিক্রমে খেলে গিয়েছি। এর কারণও যথেষ্ট—তখন, তাঁরা স্বাস্থ্য সম্বন্ধে খুবই সচেতন থাকতেন, ক্লাবকে ভালবেসে ক্লাবের জন্য

সমস্ত শক্তি নিয়োজিত করতেন। এ ক্লাব ও ক্লাব করে ঘুরে বেড়াতেন না। একই ক্লাবে বহু বৎসর খেলেছেন। তাঁরা নিজের খেলার উন্নতির জন্য যত্নবান থাকতেন ও ক্লাব কর্তৃপক্ষদের যথেষ্ট সম্মান দিতেন। অবশ্য বেশীদিন না খেলার আর একটা কারণ থাকতে পারে, সেটা হ'ল খুব বেশী খেলা। বৎসর ভোর যদি খেলতে হয় তো খেলার মর্য্যাদা বা নিপুণতাটাও থাকে না।

এখনকার ফুটবল এসোসিয়েশন-এর কর্তৃপক্ষগণ খেলার মানের উন্নতির কোন চেষ্টাই করেন না। যদিও সভাপতি এবং সম্পাদক মহাশয় উভয়েই ভাল ক্রীড়াবিদ। তাঁরা এখন ২১৪টা Clubকে খাড়া ক'রে রেখেছেন যাদের সাহায্যে অর্থাগম হয়। প্রত্যেক ডিভিসনের Teamএর সংখ্যাধিক্য দেখা যায়। সেইসব Team-এর খেলার দিকে নজর দেওয়া কর্তৃপক্ষগণের অবশ্য কর্ত্তব্য, কিন্তু তাঁরা সেই দিকে কোন নজরই দেন না। তাদের খেলার উন্নতির চেষ্টা করতে হ'লে প্রত্যেক Division এর Team এর সংখ্যা কমাতে হবে; ফলে সেই অনুপাতে খেলার সংখ্যাও কমে যাবে। তখনকার দিনে League খেলার তালিকা খেলা আরম্ভ হবার ২৪ সপ্তাহ আগেই সমস্ত Club এর কর্তৃপক্ষগণের নিকট পাঠিয়ে দেওয়া হ'ত। তাতে একটি বা দুটি Charity খেলা থাকত, তাও আবার Combined Team এর খেলা হ'ত। এতে ক্লাবগুলির উপর কোন আর্থিক চাপ পড়ত না। এখন সে সব বালাই নেই। খেলার তালিকা ফুটবল কর্তৃপক্ষদের সুবিধামত সপ্তাহের বা মাসের জন্য প্রস্তুত হয়, যদিও League খেলা আজকাল ৪ মাস ধরে হয়। যখন যেটা সুবিধা বোঝেন সেই রকম ভাবে Charity match ঠিক করেন, ফলে কোন কোন Club কে League খেলায় তিন চারিটি করে Charity match খেলতে হয়। তারপর I. F. A. Sheild এও ২।৩ টি করে খেলতে হয়। এতে ক্লাবের সভ্যদের উপর অযথা আর্থিক চাপ দেওয়া হয়।

ষ্টিভেন্স, (মাঝখানে, সাদা জামা পরিহিত) এফ, এ, কাপের খেলায় ফুলহামের পক্ষে গোল দিচ্ছেন।

যখন লীগ খেলা প্রবর্ত্তন হয় তখন আই, এফ, এ, শীল্ড

প্রতিযোগিতার জন্য ভাল টিম গঠন করাই ইহার উদ্দেশ্য ছিল। কারণ আই, এফ, এ, শীল্ডই ভারতবর্ষের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ প্রতিযোগিতা বলে গণ্য হত। কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয় আই, এফ, এ শীল্ডকে আজ একটা তৃতীয় শ্রেণীর প্রতিযোগিতায় পরিণত করা হ'য়েছে। আর লীগ খেলাটাকেই এখন সর্ব্বশ্রেষ্ঠ খেলা করা হ'য়েছে। 'মে' মাস থেকে আরম্ভ ক'রে আগষ্ট মাস পর্য্যন্ত লীগ খেলার কোন অর্থ হয় না। আগে লীগ খেলা দু মাসের মধ্যেই শেষ হ'ত, এখন বেশী টিমের জন্য তিন মাসে শেষ করা উচিত, আর আই, এফ, এ শীল্ড আগষ্ট মাসের মধ্যেই শেষ করা উচিত। সেপ্টেম্বর মাস কলিকাতায় কখনই ভাল ফুটবল খেলার উপযুক্ত ছিল না—এখনও নাই। তবুও সেপ্টেম্বর মাস শীল্ড খেলার জন্য ধার্য্য করার উদ্দেশ্য কি? ইহা বোধগম্য নয়।

খেলার মান বাড়াবার চেষ্টা করা দূরে থাকুক, কর্ত্তৃপক্ষগণ নিজেদের খুসীমত একটা আইন ক'রে ওঠা ও নামা বন্ধ ক'রে দিয়ে খেলার মধ্যে রেষারেষিটা বন্ধ ক'রে দিলেন। খেলোয়াড়রা বুঝলে তারা খেলুক বা না খেলুক, ক্লাবএর কোনই ক্ষতি হবে না। কেবল ২।৩টি বিশিষ্ট বড় ক্লাব তাঁদের সুনাম রাখবার জন্য এবং লীগ কাপ্ লাভ করবার জন্য যেন-তেন প্রকারে অন্য প্রদেশের খেলোয়াড় যোগাড় ক'রে তাঁদের ঠাট বজায় রাখেন এবং তাদেরই মধ্যে প্রতিযোগিতা লেগে থাকে। আই, এফ, এ কর্ত্তৃপক্ষগণ সেই দলগুলির দিকে তাকিয়ে থাকেন তাঁদের আর্থিক উপায়ের জন্য। এই যে অন্য প্রদেশ থেকে খেলোয়াড় আমদানি করা এবং ৪।৫ মাসের জন্য এ প্রদেশে রেখে খেলান এটা কি আই, এফ, এ কর্ত্তৃপক্ষগণ বন্ধ করতে পারেন না? এটা না করলে এ প্রদেশের খেলোয়াড়দের উন্নতির পথ কোথায়? এ প্রদেশেও যথেষ্ট খেলোয়াড় আছে যাদের নিয়মিত সুযোগ দিলে তারাও বড় খেলোয়াড় ব'লে গণ্য হ'তে পারে—তার যথেষ্ট প্রমাণ এবার জুনিয়ার টীমগুলির খেলা থেকে পাওয়া গিয়েছে। কিন্তু সে সুযোগ আমরা দিতে পারিনা। দেখা গেছে, উনিশ-বিশ খেলোয়াড় হ'লেও অন্যপ্রদেশের খেলোয়াড়দের বেশী সুযোগই আমরা দিয়ে থাকি। বাহিরের খেলোয়াড় যাঁরা এখানে খেলেন তাঁদের খেলার নমুনা এমন কিছু উচ্চস্তরের নয় যার জন্যে তাঁদের পেছনে আমাদের ছুটাছুটি করার দরকার। তথাপি আমাদের বড় ক্লাবগুলির তাঁদের জন্য মোহ কাটে না। ইহা অতি আশ্চর্যের বিষয়। জানি না কোন অদূর ভবিষ্যতে আমাদের ফুটবলের ভাগ্য বিধাতার কৃপাদৃষ্টি এইদিকে পড়বে ও বাহিরের খেলোয়াড়ের অবাধ আমদানী বন্ধ হবে।

আমার মতে খেলার উন্নতির আর একটি প্রধান অন্তরায়, প্রত্যেক বৎসর বা দুই এক বৎসর অন্তর ক্লাব বদল করা। এতে খেলোয়াড়রা ক্লাবের প্রতি যথেষ্ট ভালবাসা বা আনুগত্য দেখাতে পারে না। তারা তখন সুবিধাবাদী ব'লে গণ্য হয়। ক্লাবএর প্রতি বা ক্লাব কর্ত্তৃপক্ষদের প্রতি যথেষ্ট সম্মানও দেখাতে পারে না। আজকালকার খেলোয়াড়রা মনে করে যেন তারা খেলবে বলেই ক্লাবগুলির অস্তিত্ব বা ক্লাবগুলি তাদের কাছে ঋণী। কিন্তু তারা ভাবে না যে ক্লাবে খেলার জন্যই তাদের সুনাম বা মানমর্য্যাদা। তাদের ভাবা উচিত যে যদি ক্লাবগুলিতে তাদের স্থান না থাকে তবে তাদের কি অস্তিত্ব থাকবে?

আজকাল 'কোচ্', 'কোচ্' ক'রে একটা রব উঠেছে। অবশ্য 'কোচ' দিয়ে খেলা সেখান যায়। আমাদের সময় কিন্তু এ সবের বালাই ছিল না। তখন 'কোচ' ছিল না ব'লে কি খেলার মান ছিল না? তখন আমরা নিজেরাই কোচ, নিজেরাই খেলোয়াড় ছিলাম। এগারজনে খেলতাম ক্লাবের জন্য, ক্লাবের গৌরবেই আমাদের গৌরব ছিল। Senior বা Junior Tournament খেলায় আমাদের মনে অপমান ছিল না। সকল খেলোয়াড়দের মধ্যে বেশ মেলামেশা ছিল। মেলামেশা ছিল বলেই senior ও junior খেলোয়াড়দের মধ্যে প্রীতির ভাব ছিল। বড়রা ছোটদের সঙ্গে মিশে খেলতেন, তখন Trophy hunting এর জন্য অন্য প্রদেশ থেকে খেলোয়াড় আমদানি করা হ'ত না। নিজেদের প্রদেশের মধ্যে বাছাই করা খেলোয়াড় নিয়ে টিম গঠন হ'ত। তাতেই বাঙ্গলাদেশের ফুটবলের এত নাম-ডাক ছিল। কোন একটা Junior Competition-এর খেলাতে খেলোয়াড়ের অভাব হ'লে Senior খেলোয়াড়রা Junior খেলোয়াড়দের সঙ্গে খেলতে দ্বিধাবোধ করত না। তাতে Junior খেলোয়াড়দের মনে খেলা শেখবার চেষ্টা হ'ত, আর তাতে তাদের অনেক শিক্ষা হ'ত। আজকাল দেখা যায় অনেক সময়

Junior Competitionএ খেলোয়াড়ের অভাব হ'লে Senior খেলোয়াড়দের উপস্থিতি সত্ত্বেও টীম গঠন হয় না। Senior খেলোয়াড়রা কোন না কোন অজুহাতে খেলতে চায় না। সেইজন্য আজকাল Senior-Junior খেলোয়াড়দের মধ্যে প্রীতির ভাব দেখা যায় না। আর ক্লাব কর্তৃপক্ষগণও Junior খেলোয়াড়দের সমানভাবে দেখেন না। ক্লাবের দলগঠনের জন্য যতগুলি খেলোয়াড় থাকেন তাঁদের প্রত্যেকের উচিত ক্লাবের দরকারের সময় ক্লাবের হয়ে খেলে ক্লাবকে সাহায্য করা। যে সমস্ত খেলোয়াড় সেটা না করবে, প্রথমে তাহাদের একবার সাবধান ক'রে দিতে হবে এবং এর পুনরাবৃত্তি হ'লে ক্লাব কর্তৃপক্ষগণের তাদের ক্লাব থেকে চলে যেতে বলা উচিত। কারণ তারা ক্লাবের নিয়মানুবর্ত্তিতা মানেনি। এইসব স্থানে মান-অপমানের স্থান দেওয়া উচিত নয়। ক্লাব এ discipline রাখা এখন প্রথম ও প্রধান কাজ হ'য়ে পড়েছে। আর খেলার মান বাড়াতে হ'লে চাই ব্যায়াম-চর্চা, দৈহিক শক্তি, চরিত্রবল এবং বুদ্ধি।

এই বৎসরের আই, এফ, এ শীল্ড প্রতিযোগিতা, এসোসিয়েশন কর্তৃপক্ষদের কোমল মনোভাবের জন্য স্থগিত হ'য়ে গেল। দুটী ক্লাবের দোষ গুণ বিচার করছি না, কেবল ভাবি ফুটবল কর্তৃপক্ষ কোন্ রাস্তায় চলছেন। দৃঢ়তার সহিত সুষ্ঠুভাবে খেলা পরিচালনার উপায় না স্থির ক'রলে আবার এর পুনরাবৃত্তি হবে। গত বৎসর হয়েছে, এবার হ'ল। ৪০।৪২টা টীমের খেলা ১০।১৫ দিনের মধ্যেই শেষ করা যায়। সেটা তাদের খামখেয়ালী মত শেষ ক'রতে একমাস লাগিয়ে দেন। কর্তৃপক্ষগণ আগের লীগ শীল্ড খেলার সূচনা ও পরিসমাপ্তি দেখেছেন, তখন তো এত গোলমাল হ'ত না—একটা নির্দ্দিষ্ট সময়ের মধ্যে সব প্রতিযোগিতাই শেষ হ'ত। এখন এমন হয় কেন? এটা কি পরিচালকদের দৃঢ় মনোভাবের অভাবের জন্য? যে ভাবে এখন খেলার ধারা চলেছে তাতে ভবিষ্যৎ খুব অন্ধকার বলেই মনে হয়। ফুটবল কর্তৃপক্ষদের এখন সচেতন হওয়া দরকার হ'য়েছে। সুবুদ্ধির উদয় হবে কি? জানিনা।

আমি বহুদিন ফুটবল খেলেছি ও এখনও ফুটবলের সম্পর্ক ছাড়তে পারিনি। আমাদের সময়ের সকলেই এবং এখানকার অনেকেই বাঙলার ফুটবলের ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল থেকে উজ্জ্বলতর দেখতে চান। কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয় যেরকমভাবে সব চলেছে তাতে উষার আলোক দেখতে পাচ্ছি না। দেখতে পাচ্ছি ভবিষ্যতের ঘন অন্ধকার। সমস্ত জিনিষ সুষ্ঠুভাবে চালনা দেখতে গেলে চাই কঠোর সমালোচনা। কঠোর সমালোচনাই কর্তৃপক্ষকে বুদ্ধি যুগিয়ে দেবে। পথ ঘোরানর এখনও সময় আছে। নিরাশ হওয়ার কারণ নেই।

খেলা-ধূলার কথা

শ্রীক্ষেত্রনাথ রায়

ইউরোপ সফরে ভারতীয় হকি দল ঃ

ভারতীয় হকি ফেডারেসন দল ছ'সপ্তাহের জন্য ইউরোপ সফরে গেছে। এই দলটি মোট ১৪টি খেলায় যোগদান করবে। গত ১৭ই সেপ্টেম্বর দলটি ভারতবর্ষ ত্যাগ করেছে। দলের ক্যাপটেন এস ক্লডিয়াস এবং কোচ মেজর ধ্যানচাঁদ। ভারতীয় হকি দল স্পেন, জার্মানী (পশ্চিম এবং পূর্ব্ব), ইটালী, হল্যাণ্ড, ফ্রান্স, বেলজিয়াম বৃটেন প্রভৃতি দেশের সঙ্গে খেলবে।

জার্মান হকি ফেডারেশনের ৫০ বৎসর পূর্ত্তি উপলক্ষ্যে এক আন্তর্জ্জাতিক হকি প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়। এই প্রতিযোগিতায় ভারতীয় হকি ফেডারেশন দল যোগদান করে। প্রতিযোগিতায় পশ্চিম জার্ম্মানী প্রথম স্থান লাভ করে। পাঁচটি খেলার মধ্যে পশ্চিম জার্ম্মানী ৪টি খেলায় জয়লাভ করে এবং একটি খেলা ড্র করে। অপর দিকে অলিম্পিক বিজয়ী ভারতবর্ষ দুটি খেলায় জয়ী হয় এবং তিনটি খেলা ড্র করে। ফলাফলের বিচারে ভারতবর্ষ ২য় স্থান পায়। প্রতিযোগিতায় এই দেশগুলি যোগদান করে—

পশ্চিম জার্ম্মানি, ভারতবর্ষ, সুইজারল্যাণ্ড, ডেনমার্ক, বেলজিয়াম, ফ্রান্স, হল্যাণ্ড, বৃটেন এবং স্পেন।

স্পেনের বার্সিলোনায় অনুষ্ঠিত ইণ্টার ন্যাশনাল হকি টুর্ণামেণ্টের ফাইনালে ভারতবর্ষ স্পেনের 'এ' দলকে ১-০ গোলে পরাজিত করে হকি খেতাব লাভ করেছে। ইটালীর বিপক্ষে ভারতবর্ষ ১০—০ গোলে জয়লাভ করে।

ফাইনাল ফলাফল : ১ম ভারতবর্ষ (৪ পয়েণ্ট) ; ২য় স্পেন 'এ' (২ পয়েণ্ট), ৩য় স্পেন 'বি' (২ পয়েণ্ট) এবং ৪র্থ ইটালী (কোন পয়েণ্ট পায়নি)।

৩০শে অক্টোবর তারিখ পর্য্যন্ত খেলার ফলাফল এই দাঁড়িয়েছেঃ ভারতীয় হকিদল স্পেন, পশ্চিম জার্মানী এবং ইটালী সফরে মোট ১৮টি খেলায় যোগদান করে জয়ী হয়েছে ১৪টি, হেরেছে মাত্র ১টি এবং খেলা ড্র গেছে ৩টি।

রাশিয়ার ভলিবল খেতাব ঃ

প্যারিসে অনুষ্ঠিত এক আন্তর্জাতিক ভলিবল প্রতিযোগিতায় রাশিয়া ১ম স্থান লাভ ক'রে ভলিবল খেতাব পেয়েছে। প্রতিযোগিতায় ৯টি দেশ যোগদান করে।

সংক্ষিপ্ত ফলাফল

১ম রাশিয়া (জয় ৮, হার ০, পয়েণ্ট ১৬) ; ২য় চেকোশ্লোভাকিয়া (জয় ৬, হার ২, পয়েণ্ট ১৪) ; ৩য় বুলগেরিয়া (জয় ৫, হার ৩, পয়েণ্ট ১৩)।

সন্তোষ ট্রফি ফুটবল প্রতিযোগিতা ঃ

১৯৫৯ সালের জাতীয় ফুটবল সন্তোষ ট্রফি প্রতিযোগিতার ফাইনালে বাংলা ৩—১ গোলে বোম্বাই দলকে পরাজিত করে।

এ প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য, বাংলা এ পর্য্যন্ত চারবার বোম্বাইয়ের সঙ্গে ফাইনালে খেলেছে এবং প্রতিবারই জয় লাভ করেছে। এ পর্য্যন্ত ১৭বার সন্তোষ ট্রফির খেলা হয়েছে ; বাংলা মাত্র ৩বার ফাইনালে উঠতে পারেনি। সন্তোষ ট্রফি পেয়েছে ১১বার—ফাইনালে হেরেছে ৩বার।

জাতীয় ফুটবল প্রতিযোগিতার প্রাথমিক পর্য্যায়ের খেলায় যোগদানকারী দলগুলিকে চারিটি অঞ্চলে ভাগ করে প্রথমে লীগ প্রথায় খেলানো হয়। এই চারিটি অঞ্চল যথ ক্রমে—পূর্ব্ব, পশ্চিম, উত্তর এবং দক্ষিণ। প্রতি অঞ্চল থেকে প্রথম ও দ্বিতীয় স্থান অধিকারী দল মূল প্রতিযোগিতার খেলার অধিকার পায়।

পূর্ব্ব অঞ্চল থেকে বাংলা এবং আসাম, পশ্চিম অঞ্চল থেকে বোম্বাই এবং বিহার (উভয় দলই সমান ৪ পয়েণ্ট পায়), দক্ষিণ অঞ্চল থেকে অন্ধ্র এবং কেরালা এবং উত্তর অঞ্চল থেকে দিল্লী এবং উত্তর প্রদেশ মূল প্রতিযোগিতায় খেলার যোগ্যতা লাভ করে। মূল প্রতিযোগিতায় এই আটটি দলকে সমান ২ ভাগে ভাগ ক'রে লীগ প্রথায় খেলান হয়।

প্রথম বিভাগে খেলে বাংলা, অন্ধ্রপ্রদেশ, বিহার এবং উত্তর প্রদেশ। দ্বিতীয় বিভাগে যোগদান করে বোম্বাই, সার্ভিসেস, আসাম এবং কেরালা। প্রথম বিভাগ থেকে বাংলা, অন্ধ্রপ্রদেশ এবং দ্বিতীয় বিভাগ থেকে বোম্বাই, সার্ভিসেস দল মূল প্রতিযোগিতার সেমি-ফাইনালে ওঠে।

সেমি-ফাইনালে বাংলা ২-১ গোলে সার্ভিসেস দলকে পরাজিত ক'রে ফাইনালে যায়। অপরদিকের সেমি-ফাইনালে বোম্বাই ২-০ গোলে অন্ধ্রপ্রদেশকে পরাজিত করে। এই নিয়ে বোম্বাই ৭ বার জাতীয় ফুটবল প্রতিযোগিতার ফাইনালে উঠে।

বাংলা প্রতিযোগিতার প্রাথমিক পর্য্যায়ের খেলায় আসামের কাছে ০-১ গোলে হেরেছিল কিন্তু মূল পর্য্যায়ের লীগ খেলায় অপরাজেয় থেকে সেমি-ফাইনালে খেলবার যোগ্যতা লাভ করে। বাংলা ১৩টি গোল দেয়, কোন গোল খায় নি।

মূল প্রতিযোগিতার খেলার ফলাফল

১ম বিভাগ

	খেলা	জয়	ড্র	হার	পক্ষে	বিপক্ষে	পয়েণ্ট
বাংলা	৩	৩	০	০	১৩	০	৬
অন্ধ্র প্রদেশ	৩	২	০	১	১০	৪	৪
বিহার	৩	১	০	২	৫	১০	২
উত্তর প্রদেশ	০	০	০	৩	২	১৬	০

২য় বিভাগ

	খেলা	জয়	ড্র	হার	পক্ষে	বিপক্ষে	পয়েণ্ট
বোম্বাই	৩	২	১	০	৫	০	৫
সার্ভিসেস	৩	১	২	০	৫	১	৪
আসাম	৩	০	২	১	২	৩	২
কেরালা	৩	০	১	২	১	৯	১

সেমি-ফাইনাল : বাংলা—২ : সার্ভিসেস—১ : বোম্বাই ২ : অন্ধ্রপ্রদেশ—০

ফাইনাল : বাংলা ৩ : বোম্বাই—১

আন্তঃবিশ্ববিদ্যালয় সন্তরণ প্রতিযোগিতা ঃ

ক'লকাতার আজাদ-হিন্দবাগে অনুষ্ঠিত আন্তঃ বিশ্ববিদ্যালয় সন্তরণ প্রতিযোগিতায় ভারতবর্ষের মোট ১৭টি বিশ্ববিদ্যালয় যোগদান করে। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ৭২ পয়েন্ট পেয়ে ১ম স্থান লাভ করে। মাত্র ১০০ মিটার ফ্রি ষ্টাইল সাঁতার ছাড়া কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় প্রত্যেকটি অনুষ্ঠানে ১ম স্থান লাভ করে। এই ১০০ মিটার ফ্রি ষ্টাইলে বেণী তালুকদার কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পক্ষে ২য় স্থান লাভ করেন। ব্যক্তিগত নৈপুণ্যের দিক থেকে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বেণু তালুকদারের নাম উল্লেখযোগ্য।

তিনি ৪০০ এবং ১,৫০০ মিটার ফ্রি ষ্টাইল, ১০০ এবং ২০০ মিটার ব্রেষ্টষ্ট্রোক অনুষ্ঠানে ১ম স্থান এবং ১০০ মিটার ফ্রি ষ্টাইলে ২য় স্থান লাভ করেন। এছাড়া বিজয়ী কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের রীলে এবং ওয়াটার পোলো দলেও ছিলেন।

ওয়াটার পোলো খেলার ফাইনালে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ১৯—৭ গোলে বোম্বাই বিশ্ববিদ্যালয়কে পরাজিত করে।

ফাইনাল ফলাফল : ১ম কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ৭২ পয়েণ্ট ; ২য় বোম্বাই ২১, ৩য় যাদবপুর ১১, ৪র্থ দিল্লী ৯, ৫ম পুণা ৩, ৬ষ্ঠ বিক্রম ১।

আন্তঃবিশ্ববিদ্যালয় ফুটবল প্রতিযোগিতা ঃ

শ্রীনগরে অনুষ্ঠিত আন্তঃ বিশ্ববিদ্যালয় ফুটবল প্রতিযোগিতার ফাইনালে ওসমানিয়া বিশ্ববিদ্যালয় ১—০ গোলে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় দলকে পরাজিত করে।

আই এফ এ শীল্ড ঃ

১৯৫৯ সালের আই এফ এ শীল্ড ফাইনাল খেলা স্থগিত আছে। দুই পুরাতন প্রতিদ্বন্দ্বী মোহনবাগান এবং ইষ্টবেঙ্গল ক্লাব ফাইনালে উঠেছে। ২৮শে সেপ্টেম্বর ফাইনাল খেলার কথা ছিল। ২৬শে সেপ্টেম্বর তারিখের সেমি-ফাইনালে ইষ্টবেঙ্গল ক্লাব ৪—০ গোলে মহমেডান স্পোর্টিং দলকে হারিয়ে ফাইনালে ওঠে। ইষ্টবেঙ্গল ক্লাব আই এফ এ-কে জানায় ফাইনাল খেলার টিকিট বিক্রীর জন্যে তাদের ৪৮ ঘণ্টা সময় দরকার ; সুতরাং ফাইনাল খেলাটী একদিন পিছিয়ে দেবার জন্যে ক্লাব কর্তৃপক্ষ প্রস্তাব করেন। সংবাদপত্রে প্রকাশিত আই এফ এ কর্তৃপক্ষের জবাবে ছিল, শীল্ডের খেলায় টিকিট বিক্রীর জন্যে ৪৮ ঘণ্টা সময় দেওয়া নাকি সম্ভব নয় ; মোহনবাগান এবং মহমেডান স্পোর্টিং ক্লাবের পক্ষে যদি একদিনের সময়ের মধ্যে খেলার টিকিট বিক্রী করা সম্ভব হয় তা'লে ইষ্টবেঙ্গল ক্লাবের ৪৮ ঘণ্টা সময় চাওয়ার মধ্যে কোন যুক্তি নেই। শেষ পর্য্যন্ত নির্দ্দিষ্ট দিনের পরের দিনও খেলাটি হ'ল না।

এরপর পুলিশের আইন অনুযায়ী প্রতি বছরের মত ৩০শে সেপ্টেম্বরের পর থেকে ময়দানে কিছুকাল খেলা-ধূলা বন্ধ থাকে। শেষ পর্য্যন্ত ১৯৫৯ সালের আই এফ এ শীল্ড ফাইনাল খেলা হবে কিনা তা নিয়ে সাধারণ লোকের এখন আর বিশেষ কোন মাথা ব্যথা নেই।

স্বপন বুড়োর কৌতুক কাহিনী : স্বপন বুড়ো

আলোচ্য গ্রন্থে খ্যাতনামা শিশু সাহিত্যিক স্বপন বুড়োর রচিত ছেলেমেয়েদের উপযোগী নয়টী ছোট গল্প গ্রথিত হয়েছে। কৌতুক কাহিনী অবতারণা করে প্রাঞ্জল ভাষায় রস সৃষ্টি করতে স্বপন বুড়ো বিশেষ দক্ষ। শুধু ছেলেমেয়েরা নয়, প্রাপ্ত বয়স্কেরা পর্য্যন্ত এঁর রচনায় প্রচুর হাসির খোরাক পায়। গ্রন্থকারের প্রতিভা বহুধা-বিস্তৃত, কল্পনা প্রবণ ছেলেমেয়েদের অন্তর্জগতের নব নব উপনিবেশ স্থাপনে তিনি কি ভাবে কৃতিত্ব অর্জ্জন করেছেন তার অন্যতম প্রামাণ্য নিদর্শন হচ্ছে এই আলোচ্য গ্রন্থখানি। সব কয়টী গল্পই এক নিঃশেষে পড়ে হেসে নেওয়া গেল। গল্পের চিত্রগুলি মনোরম, ছেলেমেয়েরা দেখেই খুসী হবে। 'মিতবরের নাকাল,' 'ও আমি আগেই জানতুম' 'নেমন্তন্ন নাও বাগিয়ে' 'বেড়ালের বোনপো' প্রভৃতি অতীব উপভোগ্য। কোন গল্পই, অনাবশ্যক ব্যাপ্তিতে ভারাক্রান্ত নয়। শুধু একা নয়, পাঁচজনে একত্র বসে গল্পগুলি পড়ে রসাস্বাদনে তৃপ্তি পাওয়া যায়। চিত্রগুলি ও প্রচ্ছদপট চিত্তাকর্ষক, উপহার দেবার মতই হয়েছে। রসিক সমাজে এই গল্পের বই সমাদৃত হবে, এ কথা নিঃসঙ্কোচে বলা যায়।

[প্রকাশক—বিদ্যোদয় লাইব্রেরী প্রাইভেট লিমিটেড। ৭২, মহাত্মা গান্ধী রোড, কলিকাতা—৯। মূল্য ৩৲ টাকা।]

সমকালীন শ্রেষ্ঠ ব্যঙ্গ কবিতা (কাব্য সঙ্কলন) :

কুমারেশ ঘোষ সম্পাদিত, চন্দন ঘোষ কর্তৃক প্রকাশিত

আলোচ্য গ্রন্থে যষ্টি-মধু সম্পাদক শ্রীযুক্ত কুমারেশ ঘোষ রবীন্দ্র পরবর্ত্তী কালের একশত চারজন নবীন ও প্রবীণ কবির রঙ্গ ব্যঙ্গ রসাত্মক কবিতা সঙ্কলিত করেছেন,—এই সঙ্কলনে অত্যাধুনিক উদীয়মান কবিও স্থান পেয়েছেন। সঙ্কলনটী সুনির্ব্বাচিত,—এর ঐতিহাসিক মূল্যও কম নয়। ব্যঙ্গ কবিতার এ ধরণের সঙ্কলন এদেশে এই প্রথম। বাংলা-সাহিত্যে বর্ত্তমান যুগে অধিকাংশ কবিতা ও গল্প সঙ্কলন দল কেন্দ্রিকতায় সীমিত ; এক্ষেত্রে তার ব্যতিক্রম লক্ষ্য করা গেল। এজন্য সঙ্কলয়িতার উদার মনোবৃত্তির পরিচয় প্রত্যক্ষ হওয়াতে, তিনি সাহিত্যরসিক ব্যক্তিমাত্রেরই প্রশংসা ভাজন হয়েছেন। সঙ্কীর্ণতার আত্মঘাতী নীতি অনুসৃত না হওয়াতে আগামীকালের মন তাঁর প্রতি একদা সশ্রদ্ধ দৃষ্টিপাত করবে। দৈনন্দিন সমাজ জীবনের গতি ও প্রকৃতি যাঁরা বাঁকা চোখে দেখে রসালো রচনায় রঙ্গ ব্যঙ্গাত্মক আলেখ্যের অলঙ্করণ করেছেন, তাঁরা সমাজ সংস্কারক। তাঁদের সকলকে একত্র পাওয়া সম্ভব নয়, সঙ্কলয়িতা সেই অভাব পূরণ করেছেন এই গ্রন্থের মাধ্যমে। পরিশিষ্ট ভাগে প্রত্যেক লেখক ও লেখিকার পরিচিত ও ঠিকানা থাকায় সাহিত্য সমাজের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ ভাবে উপকার সাধন করা হয়েছে। ব্যঙ্গ ও রঙ্গধারা বাংলা সাহিত্য ক্ষেত্রে শীর্ণতোয়া প্রবাহিনীর মত,—সেই ধারাকে বিশেষভাবে গতিশীল, প্রখর ও বিস্তৃত করবার দিকে যাঁদের প্রচেষ্টা লক্ষ্য করা যায়, শ্রীঘোষ তাঁদের অন্যতম। হাস্যরসধারায় অবগাহন ব্যতীত মানসিক স্বাস্থ্যলাভ সম্ভব নয়, প্রত্যেক চিন্তাশীল ব্যক্তিই এই কথা বলে থাকেন। এই দিকে লক্ষ্য রেখে সঙ্কলয়িতা যে উপাদেয় খাদ্য প্রাণ সংমিশ্রিত অম্ল মধুর ভোজ্য পরিবেশন করেছেন, তার রসাস্বাদন করে রসিক সমাজ আমাদের মত প্রচুর আনন্দলাভ করবেন, একথা নিঃসঙ্কোচে বলা যায়। শ্রীঘোষের এই শুভ প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয়নি, অভিনন্দন যোগ্য হয়েছে। গ্রন্থখানির বহুল প্রচার কামনা করি। প্রচ্ছদপট চিত্তাকর্ষক, ছাপা, কাগজ বাঁধাই উত্তম।

[প্রকাশক—গ্রন্থ গৃহ, ৪৫।এ গড়পাড় রোড কলিকাতা—৯, দাম ৪৲ টাকা।]

কেটির কাণ্ড : সুসান কুলিজ অনুবাদক—বীরু চট্টোপাধ্যায়

সারা চন্সেরি উলসে 'সুসান কুলিজ' ছদ্মনামে "হোয়াট কেটি ডিড' প্রকাশ করেন। তাঁর অনবদ্য 'কেটি সিরিজ' শিশু সাহিত্যক্ষেত্রে তাঁর প্রতিভার বিশেষ স্বাক্ষর রেখেছে। বনে প্রান্তরে, নদীতটে, ঝর্ণার ধারে, সবুজ প্রকৃতির অঙ্কে কল্পনার রাজ্যে,ড্রাগন ডাইনি ও ঐন্দ্রজালিক রহস্যের ভেতর পরিক্রমা করে অতিবাহিত হয়েছে তাঁর শৈশবের দিনগুলি—পরবর্তী জীবনে তাঁর অবচেতন মনের স্তর থেকে এরা বেরিয়ে এসে শিশু সাহিত্যের শিল্পকে সমৃদ্ধ করেছে—কেটি গল্পের সঙ্গে তাঁর জীবনের প্রভেদ অতি সামান্য—এখেন তাঁর আত্ম-জীবনীরই গোত্রভুক্ত। তিনি কিছুকাল নার্সের কাজও করেছিলেন। যাহোক আখ্যান ভাগটী অত্যন্ত চিত্তাকর্ষক ও কৌতুহলোদ্দীপক। অনুবাদক মূলগ্রন্থের মর্য্যাদা অক্ষুণ্ণ রেখেই সুন্দরভাবে গ্রন্থখানি ভাষান্তরিত করেছেন। যাদের জন্যে এই গ্রন্থের ভাষান্তরিত হয়েছে, তারা পড়ে খুব খুসী হবে। আমরা পড়ে আনন্দলাভ করেছি। ছোট বোধ ছেলে মেয়েরাও পড়ে খুব আনন্দ পাবে তদ্বিষয়ে সন্দেহ নেই। প্রচ্ছদপট, ছাপা, কাগজ ও বাঁধাই উত্তম।

[প্রকাশক—অভ্যুদয় প্রকাশ মন্দির, ৬, বঙ্কিম চাটুজ্জে ষ্ট্রীট, কলিকাতা—১২]

মীরাবাঈ : শ্রীব্যোমকেশ ভট্টাচার্য্য,

গবেষণা-ব্রতী গ্রন্থকার মীরা-সম্পর্কিত স্থানগুলিতে পরিক্রমা করে বহু পরিশ্রম ও অধ্যবসায়ের সঙ্গে যে সব জ্ঞাতব্য তথ্য আহরণ করেছেন, সেগুলি অবলম্বন করে আলোচ্য গ্রন্থখানির ভেতর মীরাবাঈয়ের জীবনী, সাহিত্য, অধ্যাত্মজীবন ও ভজন সম্পর্কে বিদগ্ধতাপূর্ণ আলোচনা করেছেন। কর্ণেল টডের রাজস্থানের ইতিহাসের ওপর নির্ভরশীল হয়ে অনেকেই প্রচার করেছেন মীরা মহারাণা কুম্ভের স্ত্রী। গ্রন্থকার প্রমাণ প্রয়োগের দ্বারা তা খণ্ডন করে মীরার প্রকৃত ইতিহাস আমাদের সম্মুখে তুলে ধরেছেন। মীরাবাঈয়ের জন্মস্থান মরুভূমিস্থিত কুড়কী ও বাল্য লীলাভূমি মেড়্তা সম্পর্কেও গ্রন্থে নূতন আলোক সম্পাত করা হয়েছে। প্রচলিত জনশ্রুতিকে খণ্ডন করে প্রকৃত ঐতিহাসিক সত্যকে বের করা খুব সহজ সাধ্য নয়. গ্রন্থকার সেই দুরূহ কার্য্যে আত্মনিয়োগ করে সাফল্য-মণ্ডিত হয়েছেন, এজন্যে তিনি ধন্যবাদার্হ। এই গ্রন্থের চতুর্থখণ্ডে মীরার ভজনাবলী সন্নিবেশিত আছে। গ্রন্থখানি পড়ে আনন্দ লাভ করা গেছে। এ গ্রন্থের বহুল প্রচার কামনা করি।

[প্রকাশক—প্রবর্ত্তক পাবলিশার্স : ৬১. বহুবাজার ষ্ট্রীট. কলিকাতা—১২। মূল্য সাড়ে চারি টাকা।]

শ্রীঅপূর্ব্বকৃষ্ণ ভট্টাচার্য্য

রাষ্ট্র বিলুপ্তির পথে : শ্রীনীরেন্দ্রনারায়ণ চৌধুরী

লেখক নীরেন্দ্র নারায়ণ আচার্য্য বিনোবা ভাবে প্রচারিত ভূদান যজ্ঞের সমর্থক। উড়িষ্যার খ্যাতনামা নেতা পদ্মশ্রী ডাঃ লক্ষ্মীনারায়ণ সাহু এই ছোট বই-এর ভূমিকায় লিখিয়াছেন "বৈরাজ্যের লক্ষ্য হইতেছে—সমূহের মঙ্গল করা—সমূহের মারফত প্রত্যেকব্যক্তিকে স্বাতন্ত্র্য দিয়া। রাষ্ট্রকে সুস্থ ও সবল করিতে হইলে তাহাকে সহযোগকারী ভিত্তিতে স্থাপনা করিতে হইবে।" আজও দেশবাসী বিনোবাজীর নীতি সম্যকভাবে হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিতেছেন না। দীর্ঘকালের সঞ্চিত অভ্যাস ত্যাগ করা কঠিন। কাজেই রাষ্ট্রের বিয়োগ সাধনে অধিক লোক আগ্রহান্বিত হন নাই। এইরূপ গ্রন্থ প্রকাশের দ্বারা সেই নব-পরিকল্পিত ভাবধারা প্রচারের সহায়তা হইবে।

[মূল্য ১৲ টাকা। 'সর্বত্র পাওয়া যায়]

শ্রীচৈতন্য বিজয় বা নাম মাহাত্ম্য : শ্রীভবানী ভট্টাচার্য্য

এখানি নাটক। শ্রীশ্রীচৈতন্য দেবের জীবন সম্বন্ধে প্রামানিক গ্রন্থ হইতে তথ্য সংগ্রহ করিয়া লেখক নাম-মাহাত্ম্য প্রচারের জন্য এই নাটক রচনা করিয়াছেন। চরিত্রগুলি সব সে যুগের—শ্রীচৈতন্য, শ্রীনিত্যানন্দ, শ্রীবাস, মুকুন্দ দত্ত, শিবানন্দ সেন, বাসুদেব সার্বভৌম, রাজা প্রতাপরুদ্র, রঘুনাথ, সনাতন প্রভৃতি। নাম-প্রচার কলিযুগের ধর্ম—সে দিক দিয়া ভক্ত-সমাজে নাটকখানির মূল্য আছে। ভাষা সহজ ও সরল। ভক্ত হরিদাসের জীবন লইয়া বহু নাটক আছে—এখানিতেও হরিদাসের কথাই প্রধান।

[প্রাপ্তিস্থান—সারস্বত মন্দির, ১নং রমেশ মিত্র রোড, ভবানীপুর, কলিকাতা। মূল্য ২৲ টাকা]

শ্রীফণীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়

নবপ্রকাশিত পুস্তকাবলী

শ্রীপ্রফুল্ল রায় প্রণীত উপন্যাস "নোনা জল মিঠে মাটি"—৮.৫০

শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় প্রণীত "কাশীনাথ" (১৪শ সং)—২.৫০

ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ প্রণীত নাটক "নর-নারায়ণ"—২.৭৫

দ্বিজেন্দ্রলাল রায় প্রণীত নাটক "রাণা প্রতাপসিংহ" (১১শ সং)—২.৫০

গিরিশচন্দ্র ঘোষ প্রণীত নাটক "জনা" (৮ম সং)—২.৫০, প্রফুল্ল (১২শ সং)—২.৫০

শ্রীহেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ প্রণীত শিশুপাঠ্য "আষাঢ়ে গল্প"—১.৭৫, "হারকিউলিস্"—১.৬২, "স্নো হোয়াইট"—১.৬২

শ্রীসুধীন্দ্রনাথ রাহা প্রণীত শিশুপাঠ্য "ম্যাকবেথ" ১.৫০, "জুলিয়াস সীজার"—১.৫০

প্রভাবতী দেবী সরস্বতী প্রণীত শিশুপাঠ্য "শান্তিপুরে অশান্তি"—১.৫০

যোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত প্রণীত পরলোক-তত্ত্ব "মরণের পরে"—২.২৫, "ওপারের আলো"—২.২৫

শ্রীসৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায় প্রণীত পরলোকতত্ত্ব "মৃত্যুহীন প্রাণ"—২.২৫, "ওপার থেকে আসেন"—২.২৫

"দৃষ্টিহীন" প্রণীত কিশোরপাঠ্য "মা! আমি অশোক"—১৲

দেবসাহিত্য কুটীর প্রকাশিত কিশোরপাঠ্য "হাসির এ্যাটম বোম"—২৲, "রাক্ষস খোক্কস"—৩৲

বঙ্কিমচন্দ্র ঘোষ প্রণীত "জ্যান্ত ভগবান"—০.৬২

শ্রীসুরেশচন্দ্র রায় বীরবর প্রণীত নাটক "লক্ষারণ"—২৲

সম্পাদক—শ্রীফণীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় ও শ্রীশৈলেনকুমার চট্টোপাধ্যায়

২০৩।১।১, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা, ভারতবর্ষ প্রিন্টিং ওয়ার্কস্ হইতে শ্রীকুমারেশ ভট্টাচার্য কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

নতুন রেকর্ড

হিজ্ মাষ্টার্স ভয়েস ও কলম্বিয়া রেকর্ডের সংক্ষিপ্ত পরিচয়

"হিজ্ মাষ্টার্স ভয়েস"

N76086—"শশীবাবুর সংসার" বাণীচিত্রের মনোরম দু'খানা গান 'একদিন জানবেই নয় কি' ও 'সজনী বিনায়ে রজনী না যায়'—গেয়েছেন যথাক্রমে মানবেন্দ্র মুখোপাধ্যায় ও আলপনা বন্দ্যোপাধ্যায়

N76087—'শশীবাবুর সংসার' চিত্রের আর দু'খানা গান "যে ছিল মনে মনে গোপনে' ও 'চানাচুর গরম' যথাক্রমে গেয়েছেন প্রখ্যাত শিল্পী মানবেন্দ্র মুখোপাধ্যায় ও শ্যামল মিত্র।

N82837—শ্রীমতী প্রতিমা মুখোপাধ্যায়ের সুমিষ্ট কণ্ঠে দু'খানা আধুনিক গান—'একটি গানের একটি কলি' ও 'রিক্ত আঁখির দুটি পাতায়'।

N76089—'হস্তীর কন্যা' ও 'যাও নিয়ে যাও'—গান দু'খানা গেয়েছেন যথাক্রমে প্রতিমা বড়ুয়া ও মানবেন্দ্র মুখোপাধ্যায়।

N76090—'মাহুত বন্ধুরে' কথাচিত্রের দুখানা গান "ছাড়িয়া না যাসরে" ও 'আজি আউলাইলেন' গেয়েছেন যথাক্রমে শিল্পী ভূপেন হাজারিকা ও প্রতিমা বড়ুয়া।

N76091—'হয় হয় উড়ানিকইতর' ও 'মাহুতর কলি জাত'—মাহুত বন্ধুরে বাণীচিত্রের এ দু'খানা অসমীয়া গান গেয়েছেন যথাক্রমে প্রতিমা বড়ুয়া ও ভূপেন হাজারিকা।

কলম্বিয়া

GE30422—জনপ্রিয় শিল্পী ধনঞ্জয় ভট্টাচার্যের কণ্ঠে—'কি আগুন লাগলো ঘরে' ও হেমন্ত মুখোপাধ্যায়ের কণ্ঠে "তেরো মাস গর্ভবাস করি সমাপন' গান দু'খানা ভাল হয়েছে।

GE30423—কিন্নরকণ্ঠী সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায়ের গাওয়া 'নয়নে নয়ন দিয়া' ও 'কোন্ মুসাফির ভ্রমর এলো' গান দু'খানা চিত্তজয়ী হয়েছে।

GE40425—'দীপ জ্বেলে যাই' বাণী চিত্রের দু'খানা গান—'আজ যেন নেই কোন ভাবনা' ও 'এমন বন্ধু আর কে আছে.—গেয়েছেন যথাক্রমে লতা মুঙ্গেশকর ও মান্না দে।

GE30426—'তেরে লিয়ে আয়া' ও 'চুরি করে কেন ওরে' গান দু'খানা গেয়েছেন যথাক্রমে গীতা দত্ত ও ধনঞ্জয় ভট্টাচার্য।

GE30427—'লাগ্ লাগ্ ভেল্কীর খেলা' ও 'কেগো তুমি ডাকিলে আমারে' গান দু'খানা সুন্দরভাবে পরিবেশণ করেছেন মান্না দে ও আশা ভোঁসলে।

GE30429—মুক্তি প্রতীক্ষিত "রাতের অন্ধকার" কথাচিত্রের দু'খানা গান 'আলোতে তুমি মধুর' ও 'এই হাওয়ায় কী সুর ঝরে' গেয়েছেন যথাক্রমে জনপ্রিয় শিল্পী—হেমন্ত মুখোপাধ্যায় ও আশা ভোঁসলে।

GE30430—শিল্পী আশা ভোঁসলের মধুরকণ্ঠে 'রাতের অন্ধকার' বাণীচিত্রের 'চীনে ভাষা জানো কি'—১ম ভাগ ও ২য় ভাগ বেশ উপভোগ্য হয়েছে।

GG30431—'রাতের অন্ধকার' বাণীচিত্রের আর দু'খানা গান 'এই পরিচয় এই যে প্রণয়' ও ' বিশ্বাস করো যা বলি'—গেয়েছেন শিল্পী ইলা বোস।

ভাল ভাল উপন্যাস ও গল্প-গ্রন্থ

বাঙলার বিস্মৃত ইতিহাসের পটভূমিকায়

একটি সার্থক সাহিত্য-সৃষ্টি

শক্তিপদ রাজগুরুর

মণি বেগম

বাঙলার মসনদের কর্তৃত্ব পেল সামান্য এক তওফাওয়ালী

রক্তে তার উন্মাদনা—

তার রূপের আগুনে ইংরেজ শাসককে সে লুব্ধ ক'রেছিল—পতঙ্গের মত।

ব্যর্থ প্রেমের কামনার জ্বালায় শুধু নিজেকে নয়—বাঙলার মসনদের আশে-পাশে সমস্ত ধর্ম—ন্যায় ও বিবেককে সে পুড়িয়ে ছাই ক'রে দেয়।

ছিয়াত্তরের মন্বন্তর—নন্দকুমারের আত্মত্যাগ—হেষ্টিংসের চণ্ডনীতি—

সেদিনের ইতিহাসের এক করুণ স্বাক্ষর।

—তারই নায়িকা—

মণি বেগম

দাম—৫'৭৫

দিলীপকুমারের বই ঃ

উপন্যাস ঃ ছায়ার আলো ১ম খণ্ড—৩-৫০, ২য় খণ্ড—৩-৫০
রঙের পরশ—৩৲, বহুবল্লভ ও দুধারা—৩৲
তরঙ্গ রোধিবে কে? ১ম খণ্ড—৩৲, ২য় খণ্ড—৩৲
দোলা (২য় সংস্করণ)—৮৲

নাটক ঃ ভিখারিণী রাজকন্যা—(মীরাবাঈয়ের জীবনী) ২-৫০
শাদাকালো—২৲ আপদ ও জলাতঙ্ক—২৲
শ্রীচৈতন্য—৩৲

কবিতা ঃ ভাগবতী-কথা (ভাগবতের কাব্যানুবাদ)—৫৲
শ্রীগোপীনাথ কবিরাজ : "বঙ্গভাষায় অমূল্য গ্রন্থ।"
মহাভারতী-কথা (মহাভারতের কাব্যানুবাদ)—৩৲
ভাগবতী-গীতি (গান)—৪৲

স্বরলিপি ঃ সুরবিহার ১ম খণ্ড—৪৲, ২য় খণ্ড—৪৲

ভ্রমণ ঃ দেশে দেশে চলি উড়ে—৬৲

শ্রীরথীন্দ্রনাথ ঠাকুর, শ্রীশ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীকালিদাস নাগ, শ্রীসুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক, শ্রীখগেন্দ্রনাথ মিত্র প্রভৃতি কর্তৃক বহু প্রশংসিত।

তীর্থংকর—৮৲ **অনামী**—৬'৫০

ইন্দিরা দেবীর সহযোগিতায়

প্রেমাঞ্জলি (মীরাভজন—বাংলা অনুবাদ সমেত) ৪৲

মণীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত

কপালকুণ্ডলা

মূলগ্রন্থ, ১১৭ পৃষ্ঠাব্যাপী কপালকুণ্ডলা পরিচিতি, ৫২ পৃষ্ঠাব্যাপী শব্দটীকা ও টিপ্পনী এবং

বঙ্কিমচন্দ্রের সংক্ষিপ্ত জীবনীসহ

সুদৃশ্য প্রামাণ্য সংস্করণ।

দাম—২-৫০

রাধারাণী

বঙ্কিমচন্দ্রের চিত্র, সংক্ষিপ্ত জীবনী এবং গ্রন্থখানি সম্বন্ধে সুবিস্তৃত আলোচনাসহ নূতন সংস্করণ।

উৎকৃষ্ট কাগজে মুদ্রিত। দাম—এক টাকা

শ্রীকান্ত-পরিচিতি (১ম পর্ব) ২৲

গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স—২০৩।১।১, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা-৬

ভারতবর্ষের সূচী

সপ্তচত্বারিংশ বর্ষ—প্রথম খণ্ড—ষষ্ঠ সংখ্যা

অগ্রহায়ণ—১৩৬৬

লেখ-সূচী

চিত্র-সূচী

লেখ-সূচী

চিত্র-সূচী

লেখ-সূচী

লেখ-সূচী

লেখ-সূচী

শিল্পী : শ্রীসমর ঘোষ　　কামারশালা　　ভারতবর্ষ প্রিন্টিং ওয়ার্কস

অগ্রহায়ণ—১৩৬৬

প্রথম খণ্ড	সপ্তচত্বারিংশ বর্ষ	ষষ্ঠ সংখ্যা

অর্থ নৈতিক কাঠামো ও ক্ষুদ্রশিল্পের ভূমিকা

শ্রীআদিত্যপ্রসাদ সেনগুপ্ত

যাঁরা নিয়মিতভাবে খবরের কাগজ অধ্যয়ন করেন তাঁরা হয়ত লক্ষ্য করেছেন, আমাদের দেশে জাতীয় ক্ষুদ্র শিল্প কর্পোরেশন বৃহৎ বৃহৎ শিল্পের আওতায় কয়েকটা ক্ষুদ্র-শিল্প স্থাপন করার উদ্দেশ্যে আলাপ-আলোচনা চালিয়ে-ছিলেন। কর্পোরেশন বলেছেন, যে চুক্তির ভিত্তিতে ছোট-শিল্প স্থাপিত হবে সেটা স্থায়ী হওয়া চাই এবং পৃথক পৃথক কারবারের সাথে আলাদাভাবে চুক্তি সম্পাদন করা হবে। কিছুদিন ধরে খবরের কাগজের মারফৎ যে সব সংবাদ প্রচারিত হচ্ছে সে সব সংবাদ থেকে জানা যায়, জাতীয় ক্ষুদ্রশিল্প কর্পোরেশন কর্তৃক আরব্ধ আলোচনা একেবারে ব্যর্থ হয়নি। আমরা যা বলতে চাইছি সেটা দু একটা উদাহরণ দিলেই সুস্পষ্ট হয়ে উঠবে। বাঙ্গালোরে স্থাপিত হিন্দুস্থান মেসিন টুল কারখানার নাম আমরা সকলে নিশ্চয় শুনেছি। এই কারাখানার বিরাটত্ব সম্পর্কে সন্দেহের কোন অবকাশ নেই। জানা গেছে, কারখানা-টিতে অংশ এবং অন্যান্য প্রয়োজনীয় দ্রব্য সরবরাহ করার উদ্দেশ্যে তিনটি ক্ষুদ্র কারখানা স্থাপন করা হচ্ছে। এছাড়া আরো জানা গেছে, টেলিফোন যন্ত্রের কারখানায় কলকব্জা সরবরাহ করার জন্যও একটা ক্ষুদ্র কারখানা স্থাপিত হচ্ছে। নারী-কর্ম্মীরা এই ক্ষুদ্র কারখানাটি স্থাপন করেছেন। এর মূলে রয়েছে সমবায়ের ভিত্তি। আশা করা যাচ্ছে, অদূর ভবিষ্যতে সরকারপরিচালিত কারখানায় যন্ত্রপাতি, কলকব্জা ইত্যাদি সরবরাহের জন্য আরো দু-একটা ছোট কারখানা স্থাপিত হবে। এই সঙ্গে একটা প্রস্তাব পেশ করা হয়েছে বলে সম্প্রতি প্রচারিত খবর থেকে জানা গেছে যে, জমসেদপুরে একটা বৃহৎ কারখানার

যন্ত্রপাতি, কলকব্জা ইত্যাদি সরবরাহের জন্য গোটা পঁয়ত্রিশেক ক্ষুদ্র-শিল্প স্থাপিত হবে। বম্বেতেও নাকি একটা মোটর গাড়ীর কারখানা ক্ষুদ্রশিল্পের কাছ থেকে যন্ত্রপাতি ক্রয় করতে এবং ক্ষুদ্রশিল্প যাতে প্রসারিত হতে পারে সেজন্য সহযোগিতা করতে রাজী হয়েছে। এইভাবে অনেকগুলো বৃহৎ কারখানার পক্ষ থেকে আশ্বাস দেওয়া হয়েছে, ছোট শিল্পের কাছ থেকে প্রয়োজনীয় জিনিষ সংগ্রহ করতে চেষ্টার ত্রুটি হবেনা। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ করা যেতে পারে এই মর্মে খবর প্রচারিত হয়েছে যে, পশ্চিম বাংলায় একটা সাইকেলের কারখানায় প্রয়োজনীয় উপকরণ, অংশ ইত্যাদি সরবরাহ করার উদ্দেশ্যে সাতটি ক্ষুদ্র-শিল্প স্থাপন করার জন্য আয়োজন চল্‌ছে।

পৃথিবীর যে সব দেশ শিল্পোন্নত বলে পরিচিত সে সব দেশে দেখা যায়, বহু ক্ষুদ্র-শিল্প প্রত্যেকটী বৃহৎ কারখানার সাথে যুক্ত হয়ে রয়েছে। লক্ষ্য করার বিষয় হচ্ছে, বৃহৎ কারখানার সাথে ক্ষুদ্র শিল্পের এই সংযুক্তি নেহাৎ সাময়িক নয়। স্থায়ীভাবেই ক্ষুদ্র-শিল্প বৃহৎ কারখানার সাথে যুক্ত হয়ে আছে। যখনই প্রয়োজন অনুভূত হয় তখনই বৃহৎ কারখানা ক্ষুদ্র কারখানাকে সাহায্য করে থাকে। বিশেষ করে যা'তে প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি, কাঁচামাল এবং অন্যান্য উপকরণ সংগ্রহ করতে গিয়ে ছোট-কারখানাকে অসুবিধার সম্মুখীন হতে না হয় সেজন্য বৃহৎ কারখানাকে ব্যবস্থা অবলম্বন করতে দেখা যায়। এছাড়া ছোট কারখানায় যে মাল তৈরী হয় সে মালও বৃহৎ কারখানা ক্রয় করে থাকে এবং এজন্য ছোট এবং বৃহৎ কারখানার মধ্যে কণ্ট্রাক্টের ব্যবস্থা আছে। কাজেই সুস্পষ্টভাবে দেখা যাচ্ছে, শিল্পোন্নত দেশগুলোতে ক্ষুদ্র শিল্পের প্রসারের পথ আমাদের দেশের মত সমস্যাসঙ্কুল নয়। যা'তে চাহিদা অনুযায়ী পণ্য উৎপাদন সম্ভবপর হয় সেজন্য উপকরণ সংগ্রহ এবং তৈরী মাল বিক্রী করার ব্যাপারে ক্ষুদ্র শিল্পের অসুবিধা হয়না।

বহুদিন ধরে ভারতের ক্ষুদ্র-শিল্প গুরুতর অসুবিধা ভোগ করে এসেছে। এর পিছনে বহুপ্রকার কারণ আছে। তবে এক্ষেত্রে আমরা কেবলমাত্র একটা কারণের কথাই বিশেষভাবে উল্লেখ করছি। সে কারণটি হল পড়তা খরচ এবং সম্ভাবিত বিক্রী মূল্যের মধ্যে ব্যবধান। অর্থাৎ আমরা বল্‌তে চাইছি, ক্ষুদ্র শিল্পের প্রতিদ্বন্দ্বী হওয়া এক-রকম অসম্ভব। আধুনিক যন্ত্রপাতির সাহায্যে বিরাট বিরাট কারখানায় যে সব পণ্য তৈরী করা হচ্ছে সে সব পণ্যের সাথে ক্ষুদ্রশিল্পজাত পণ্য প্রতিযোগিতা করতে সমর্থ হবে আপাততঃ একথা বিশ্বাস করা সত্যি কষ্টকর। কেন কষ্টকর সেটা বোধ হয় বিশদভাবে আলোচনা করার প্রয়োজন নেই। একটা উদাহরণ দিলেই আশা করি আমাদের বক্তব্য সুস্পষ্ট হয়ে উঠ্‌বে। শিল্পে মজুরী বাবদ খরচের কথাই বলা যাক। বৃহৎ শিল্পে যা খরচ পড়ে সেটার তুলনায় ক্ষুদ্র-শিল্পে খরচ অনেক বেশী। ফলে শেষ পর্য্যন্ত ক্ষুদ্রশিল্পে পড়তা খরচ বল্লে যা বুঝায় সেটা চড়ে যেতে থাকে। তাই বলে ক্ষুদ্রশিল্পজাত জিনিষের চাহিদা কম একথা বলা ঠিক নয়। বিভিন্ন এলাকায় এর যথেষ্ট চাহিদা আছে। বিশেষ করে যে সব সূক্ষ্ম কারুকার্য্যপূর্ণ জিনিষ তৈরী করা হয় সে সব জিনিষের চাহিদা উল্লেখ করার মত। নিঃসন্দেহে বলা যেতে পারে, এইসব জিনিষ কর্ম্মীর শিল্প-নৈপুণ্যের পরিচয় বহন করে আনে। যে সব ক্রেতা শিল্প কৌশলের গুরুত্ব উপলব্ধি করতে পারেন তাঁরা এইধরণের জিনিষ সংগ্রহ করার জন্য খুবই লালায়িত। এখানে আমরা বৃহৎ শিল্পে উৎপাদন পদ্ধতির সাথে ক্ষুদ্র শিল্পে উৎপাদন পদ্ধতির পার্থক্যের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করা প্রয়োজনীয় মনে করছি। বৃহৎ শিল্পে ঢালোয়া লাভের জিনিষ উৎপাদন করা হয়। ফলে সূক্ষ্ম কারুকার্য্য এবং শিল্পকৌশল প্রদর্শনের সুযোগ থাকেনা। কিন্তু ক্ষুদ্র শিল্পে এই সুযোগ আছে। ক্ষুদ্র শিল্পের কর্ম্মী তাঁর নৈপুণ্য দেখাবার সুযোগ পেয়ে থাকেন এবং ইচ্ছা করলে কর্ম্মী সে সুযোগের সদ্ব্যবহার করতে পারেন।

আমরা আগে বলেছি, সূক্ষ্ম কারুকার্য্যপূর্ণ জিনিষ ক্রয় করার মত লোকের অভাব নেই। তাই বলে কেবলমাত্র এইপ্রকার ক্রেতার উপর নির্ভর করলে চল্‌বেনা। ক্ষুদ্র শিল্পের প্রসার যদি কাম্য হয়ে থাকে তাহলে অন্যদিকেও মনোযোগ দিতে হবে। অর্থাৎ ক্ষুদ্রশিল্পের তরফ থেকে বৃহৎ শিল্পে যে সব উপকরণ, যন্ত্রপাতি, অংশ এবং কলকব্জা সরবরাহের প্রস্তাব করা হয়েছে সে সব উপকরণ, যন্ত্রপাতি, অংশ এবং কলকব্জার ভিতর দিয়ে যা'তে ক্ষুদ্রশিল্পের কর্ম্মীর ব্যক্তিগত শিল্প-কৌশল প্রদর্শিত হতে পারে সেজন্য

আন্তরিকভাবে চেষ্টা করা দরকার। একথা কাউকে বুঝিয়ে বলার দরকার নেই যে, ক্ষুদ্রশিল্পজাত জিনিষগুলোর উপর যদি বৃহৎ শিল্প সন্তুষ্ট হয় তাহলে ক্ষুদ্র শিল্পের প্রসারে বৃহৎ শিল্প সহযোগিতা করতে দ্বিধা করবেনা।

ক্ষুদ্র শিল্প সম্পর্কে কেন্দ্রীয় সরকারের ক্রয়দপ্তর বর্তমানে যে নীতি অনুসরণ করে চলেছেন সে নীতিকে মোটামুটি-ভাবে উদার আখ্যা দেওয়া যেতে পারে। নিঃসন্দেহে বলা যেতে পারে, ক্রয় দপ্তর ক্ষুদ্র শিল্পকে উৎসাহ দিয়ে চলেছেন। এর আগে এই মর্ম্মে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছিল যে ক্ষুদ্রশিল্পের মারফৎ কেবলমাত্র ষোলপ্রকার জিনিষ ক্রয় করা হবে। বর্তমানে দেখা যাচ্ছে, তালিকায় আরো এগার প্রকার জিনিষ স্থান পেয়েছে। এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই যে, ক্ষুদ্র শিল্পের প্রসারের জন্য সরকার নানাভাবে চেষ্টা করেছেন। তবে সরকারী প্রচেষ্টার ইতিহাস বিশ্লেষণ করতে গেলে দেখা যায়, সরকার প্রধানতঃ দুটো ব্যবস্থা অবলম্বন করেছেন—যদিও ব্যবস্থাদুটোর ফলে একদিকে—যেরকম স্থায়ী ভিত্তির উপর ক্ষুদ্র শিল্প প্রতিষ্ঠিত হতে পারেনি সেরকম অন্যদিকে ক্রেতাসাধারণের উপর অতিরিক্ত চাপ এসে পড়েছে। প্রথমতঃ সরকার বৃহৎ-শিল্পজাত পণ্যের দাম চড়াতে চেয়েছেন। এজন্য উৎপাদন-কর ধার্য্য করা হয়েছে। দ্বিতীয়তঃ যা'তে ক্ষুদ্রশিল্পজাত পণ্য কম দামে বিক্রী হতে পারে সেজন্য রাজকোষ থেকে অর্থ সাহায্যের ব্যবস্থা করা হয়েছে। এখানে একটা কথা বলে রাখা দরকার। বিভিন্ন ধরণের কুটিরশিল্প সরকারের কাছ থেকে সাহায্য পাচ্ছে সন্দেহ নেই। এই সাহায্যের ফলে হয়ত কোন কোন কুটিরশিল্প বিলুপ্তির হাত থেকে রেহাই পেয়েছে এবং কোন কোন কুটিরশিল্প হয়ত উন্নতির পথে কিছুটা এগিয়ে গেছে। কিন্তু এমনি কতকগুলো কুটিরশিল্পের কথা আমরা জানি যেগুলো সরকারী সাহায্য পেয়েও সুপ্রতিষ্ঠিত হতে পারেনি। উদাহরণ স্বরূপ হাতে-তৈরী কাগজ, ঢেঁকীতে-ভানা চাল, হাতে-চালানো তাঁতের কাপড়ের কথা বলা যেতে পারে।

The Small Industries Service Institutes এর কার্য্যাবলীর সাথে আমাদের অনেকেরই নিশ্চয় পরিচয় আছে। এগুলো হচ্ছে আঞ্চলিক সংস্থা। ক্ষুদ্র শিল্পকে সাহায্য করার জন্য এই সব সংস্থা স্থাপিত হয়েছে। সংস্থা-গুলোর পক্ষ থেকে প্রধানতঃ দু ধরণের সাহায্য দেওয়া হয়। প্রথমতঃ ক্ষুদ্রশিল্পের প্রয়োজন অনুযায়ী দাদন, কাঁচামাল, এবং অন্যান্য উপকরণ সরবরাহ করা হয়ে থাকে। দ্বিতীয়তঃ যা'তে উৎপাদন পদ্ধতি সম্বন্ধে শিক্ষা দেওয়া যেতে পারে সেজন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা অবলম্বিত হয়েছে। মাত্র অল্প কয়েকদিন আগে কলকাতার দি ষ্টেটস্‌ম্যান পত্রিকায় এই মর্ম্মে একটা খবর প্রকাশিত হয়েছে যে, "A market research programme has recently been initiated by the Small Industries Service Institute in Calcutta. The programme is designed to help small industries, determine major distribution centres for their products and establish contacts with important whole-salers and dealers outside the local producing centres." বিগত ১৩ই এপ্রিল তারিখে নয়া দিল্লী থেকে পি টি আই কর্তৃক প্রচারিত খবরে প্রকাশ "Over 11,500 small enterprisers have been provided technical guidance and assistance to set up small industrial units by Small Industries Service Institutes set up in different States by the Ministry of Commerce and Industry. Fifteen such institutes have now been set up, one in each of the States including the union territory of Delhi. Functioning under the institutes are exten-sion centers, 14 of which have already started working and 48 more have been planned." এছাড়া বিভিন্ন রাজ্যের অর্থ কর্পোরেশন এবং ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়াও ক্ষুদ্রশিল্পকে সাহায্য করতে দ্বিধা করেননি। আশা করা যাচ্ছে, অদূর ভবিষ্যতে ক্ষুদ্রশিল্প দৃঢ় এবং স্থায়ী ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত হবে।

এই নিয়ম

শ্রীপরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত

রবিবারের দুপুর। একটু দিবা-নিদ্রার আশায় সবে বিছানায় গা এলিয়েছি, এমন সময় গৃহিণী এসে নোটিশ দিলেন টালিগঞ্জ যেতে হবে।

ছা-পোষা কেরাণী। সারা সপ্তাহ হাড়ভাঙ্গা খাটুনি। তার ওপর বাঁধা আয়ে ক্রমবর্দ্ধমান সংসার-খরচের হাজার রকমের ঝক্কি। পয়সা খরচ করে কোন সাধ মেটাবার সাধ্য নেই। তাই ছুটীর দিনে বিনা পয়সার এই একটি মাত্র বিলাস—দিবা-নিদ্রা। খাওয়া দাওয়ার পর একবার গড়াতে পারলে পাঁচটার আগে বড় উঠিনা। কোন কোন দিন আরও দেরী হয়। তাই গৃহিণীর এই সতর্কবাণী।

টালিগঞ্জে জ্যাঠতুতো দাদা নূতন বাড়ী করেছেন। যুদ্ধের সময় কালো বাজারে বেশ গুছিয়ে নিয়েছেন। তাই বাড়ীও সেই অনুপাতে বিরাট আর জমকালো।

অবশ্য এখনও সে বাড়ী চোখে দেখিনি। দেখবার কৌতূহল ছিল না, এমন নয়। কিন্তু তেমন আগ্রহ ছিলনা।

দমদম থেকে টালিগঞ্জ যাওয়া—কম হাঙ্গামা নয়। তার ওপর বড়লোক আত্মীয়ের বাড়ী! এসব যায়গায় মোটর বা নিদেন পক্ষে ট্যাক্সি-বিহারী না হলে তেমন আদর আপ্যায়ন মেলেনা। অথচ ট্রাম-বাসের ওপরে ওঠবার আমার রেস্ত নেই।

কিন্তু গৃহিণী বোঝেন না। ছেলেমেয়েদের ত কথাই নেই। আর এদেরই বা কি করে দোষ দেই! আপিস উপলক্ষে আমার গায়ে তবু বাইরের রোদ হাওয়া একটু আধটু লাগে। কিন্তু পঁচিশ টাকা ভাড়ায় দেড়খানা ঘরে যাদের সারা বছর কাটাতে হয়, বাইরে যাবার আমন্ত্রণ—সে টালিগঞ্জেই হোক্, আর বেহালাই হোক্—লোভনীয় বই কি!

সকালেও এই নিয়ে এক দফা আলোচনা হয়েছে। গৃহিণীই কথাটা তুলেছিলেন। একটু খোঁচা দিয়েই বলেছিলেন, "বটঠাকুররা এত করে বলে গেলেন, তুমি বেশ ভুলেই বসে আছো। ধন্যি মানুষ যাহোক্।"

ভুলিনি।

না ভোলার কারণও ছিল। সেদিনটা ছিল মাসের শেষের দিক। হাত একরকম খালি। ছোট মেয়ে মিনি জ্বরে ভুগছে। পয়সা খরচের ভয়ে চিকিৎসার নামে নিজেই হোমিওপ্যাথি করছি। কিন্তু পাঁচ ছয় দিনেও উপশমের কোন লক্ষণ না দেখে মাসের শেষ সম্বল পাঁচ টাকার নোটখানি হাতে করে পাড়ার ডাক্তারবাবুর ডিসপেন্সারী যাচ্ছিলাম, এমন সময় বাড়ীর সামনে এসে দাঁড়াল নূতন ঝকঝকে ক্যাডিলাক্ গাড়ী।

দশ ভাড়াটের বাড়ী। তাই অন্য কোন ভাড়াটের কাছে কেউ এসেছে ভেবে পাশ কাটিয়েই যাচ্ছিলাম। এমন সময় কানে এল, "অবিনাশ না! বেরুচ্ছ নাকি?"

চমকে পিছন ফিরে দেখি, দাদা বৌদি আর তাঁদের ছেলেমেয়েরা গাড়ী থেকে নামছেন। বড় ছেলে বিলেত গেল, তাই তাকে সি-অফ্ করবার জন্য দমদম এয়ারপোর্টে এসেছিলেন।

সম্মানিত অতিথি। ভদ্রতার দায় সারতে আমাকে এখনই ডাক্তারের বাড়ী ছেড়ে দোকান ছুটতে হবে এবং নোটটি সেখানেই রেখে আসতে হবে, আর মিনি বিনা ঔষধে জ্বরের জ্বালায় ধুকবে—এসব ভেবে মনটাকে কিছুতেই প্রসন্ন করতে পারছিলাম না। তবুও জোর করে মুখে শুষ্ক হাসি ফুটিয়ে আনন্দের অভিনয় করতে হল। প্রণাম সেরে যথাসম্ভব অমায়িকতার সুরে বল্লাম, "আসুন, ভেতরে আসুন।"

তিনটি ছেলেমেয়ে নিয়ে দেড়খানা ঘরে সংসার যাত্রা নির্ব্বাহ করতে হয়। কাজেই সে ঘর কোন সময়েই তেমন সাজানো গোছানো থাকে না। আজও ছিল না। তবুও

এরই মধ্যে গৃহিণী তাড়াতাড়ি একটা বেড্‌কাভার পেতে বিছানার মালিন্য ঢেকে সবার বসবার ব্যবস্থা করলেন। ছোটছেলে নন্তকে বললেন, "জ্যেঠুমণিদের হাওয়া কর্।"

বৌদিই বাধা দিলেন। "হাওয়ার আর কি দরকার। এমনিতেই বেশ আছি।"

অথচ স্পষ্ট দেখছিলাম, স্থূলকায়া বৌদি ফ্যানের অভাবে এরই মধ্যে হাঁপিয়ে উঠেছেন।

গৃহিণীর ইঙ্গিতে আমি দোকান ছুটলাম। ধারে কাছে তেমন ভালো খাবারের দোকান নেই। তাই বাসের পয়সা খরচ করে শ্যামবাজার অবধি যেতে হল।

হন্তদন্ত হ'য়ে খাবারের ঠোঙ্গা নিয়ে ফিরে দেখি, গরমের জ্বালায় সবাই উঠি উঠি করছেন। আর এমন অসময়ে জলখাবার আনতে আমাকে দোকানে পাঠাবার জন্যে বৌদি গৃহিণীকে মৃদু অনুযোগ করছেন।

চা জলখাবার দেওয়া হল। বড়লোকী চালে সবাই এটা ওটা ভেঙ্গে একটু আধটু মুখে দিলেন। বাকী সব যেমন তেমনই পড়ে রইল। দাদার বড় মেয়ে রীণা ত' কিছু ছুঁলই না। মিষ্টি নাকি সে একেবারেই পছন্দ করে না।

তাঁরা চলে গেলেন। কিন্তু এই অযথা অপচয় আর মিনির কথা ভেবে আমার বুকের ভেতরটা জলতে লাগল।

যাবার সময় অবিশ্যি দাদা বারবারই বলে গেলেন, সবাইকে নিয়ে একদিন যেন ওঁর ওখানে বেড়িয়ে আসি। বৌদিও অনুযোগের সুরে বললেন, আমরা নাকি ইদানীং তাঁদের একদম ভুলেই গেছি।

সময়মত ডাক্তার দেখাতে পারিনি বলে মিনি সেবার পনর দিন ভুগে তবে পথ্য করে।

সে কথা কি ভোলার, না ভোলা যায়?

ছুটীর দিনে দুপুরের খাওয়া দাওয়া সারতে সাধারণতঃ একটু দেরীই হয়। কিন্তু গৃহিণীর তাড়ায় সেদিন বারোটার মধ্যেই সে পর্ব্ব শেষ। দু'টা বাজতে না বাজতেই টালিগঞ্জ যাত্রার তোড়জোড় সুরু হল।

ছেলেপেলেদের ভাল জামা কাপড় নেই। গৃহিণীরও তাই। তার ওপর তাঁর গয়না-গাঁটীও নেই। অথচ ভগবান তাঁকে রূপ দিয়েছিলেন। সাজলে তাঁকে ভালই দেখায়, তা' সে সাজ যেমনই হোক্। বলতে কি, শ্যামবর্ণা বৌদির স্থূল মাংসপিণ্ডের চেয়ে গৃহিণীর তন্বী রূপ অনেক বেশী সুন্দর। কিন্তু গরীবের সংসারে রূপচর্চ্চার উপকরণ কোথায়, অবকাশই বা কোথায়?

অবশ্য গৃহিণীর মনে এজন্য কোনদিনই দুঃখই ছিলনা। এখন ত' আরও নেই। কিন্তু বড়লোক ভাসুরের বাড়ী ত' আর যেমন তেমন করে যাওয়া চলে না। তাই আগের দিনই জীর্ণ জামা-কাপড় বাড়ীতে কেচে ভাঁজ করে বিছানার নীচে রেখে দিয়েছিলেন, যাতে বিনা পয়সায় ইস্ত্রী হয়। কিছুটা হয়েছেও।

ছেলেমেয়েরা সেই ধোয়া জামা-কাপড় পেয়েই মহা খুসী। তাদের কোথাও যাবার সুযোগ হয়না। তাই জ্যাঠুর বাড়ী যাবার নামে তাদের সে কি স্ফূর্ত্তি। তাদের সরল মনে কত জল্পনা কল্পনা। শুয়ে শুয়ে মনে মনে তাদের সে আনন্দের অংশীদার হচ্ছিলাম।

মিনি নন্তকে বলছিল, "দাদা ভাই! জ্যাঠুমণিরা খুব বড়লোক, না?"

"সে আর বলতে! সেদিন দেখলি না তাঁরা কেমন নূতন গাড়ী চড়ে এলেন। জ্যাঠীমা আর বড়দির গায় কত গয়না!"

"তাঁদের বাড়ীও খুব বড়? অই শান্তাদের বাড়ীর মত?"

"দূর বোকা! শান্তাদের বাড়ী ত' মোটে দোতলা। ক'খানাই বা ঘর। জ্যাঠুদের বাড়ী চারতলা। সামনে প্রকাণ্ড বাগান, তাতে রকমারি ফুলের বাহার। শুনলি না সেদিন, জ্যাঠীমা মাকে কেমন বলছিলেন।"

"জ্যাঠীমাকে বলে আমি তাহলে কয়েকটা ভাল ভাল ফুল তুলে আনব।"

"তা আনিস্। জ্যাঠীমা কি আর না বলবেন! চাই কি, না চাইতেই হয়ত কত কিছু দিবেন!"

"তা হলে ত' একটা রেশন ব্যাগ নিতে হয়। নইলে অত জিনিষ কি করে আনব!"

"বোকারাম! ব্যাগের আবার ভাবনা। জ্যেঠু যদি তাঁদের গাড়ীতে আমাদের ফেরবার ব্যবস্থা করেন, তখন আর ব্যাগের কোন্ দরকারটা হবে?"

"সত্যি, তা হলে কি মজাই না হবে। গাড়ী কেমন

ভোঁ করে ছোটে, বাসের মত যেখানে সেখানে যখন তখন থামেনা।''

মিনিদের এ আলোচনা আর বেশীক্ষণ শোনা গেলনা। গৃহিণীর তাড়ায় উঠতে হল এবং শেষ পর্য্যন্ত দুর্গা নাম স্মরণ করে বেরিয়ে পড়া গেল। যদিও দরকার ছিলনা, তবু বেরুবার আগে গৃহিণী ছেলেমেয়েদের বারবার সাবধান করে দিলেন, সেখানে গিয়ে কথা বার্ত্তা বা খাওয়া দাওয়া কোন বিষয়েই যেন তাদের কোন অসভ্যতা বা আদিখ্যেতা প্রকাশ না পায়।

দমদম থেকে বাসে শ্যামবাজার। সেখান থেকে ট্রামে এস্প্ল্যানেড। ফের ট্রাম বদলিয়ে টালিগঞ্জ। পাঁচজনের ট্রামে বাসে প্রায় দু'টাকা খরচ করে দাদার বাড়ী পৌছান গেল।

বড়লোকের বাড়ী বটে। ছবির মত সুন্দর। আর বেশ বড়। গেটে তকমাধারী সেপাই। ঢুকবার মুখেই হিন্দীতে প্রশ্ন—"কিস্‌কো মাংতে ?"

বল্লাম, দাদার বাড়ী। আমার কথা তার বিশ্বাস হল কিনা, সেই জানে। তবে ভিতরে যেতে বাধা দিলনা।

গেট থেকে লাল কাঁকর বিছানো পথ। দুদিকে মৌসুমী ফুলের শোভা। দেখলে চোখ জুড়ায়। অনেক খানি হেঁটে তবে গাড়ী বারান্দা।

দাদা সামনের বারান্দায় ছিলেন। বিলাতী পোষাক-পরা আর এক ভদ্রলোকের সাথে কি সব আলোচনা করছিলেন। আমাদের দেখে বললেন, "তোরা সব ভেতরে যা।"

দাদার আদেশে একজন ভৃত্য আমাদের ভেতরে নিয়ে গেল। বৌদিদি আমাদের দেখে বললেন, "তবু ভাল যে, ঠাকুরপোর এতদিনে ফুরসুৎ হ'ল। তা বেছে বেছে এমন দিনেই এলে যে, দু'দণ্ড বসে গল্প করব তারও উপায় নেই। একটু বাদেই তোমার দাদার সঙ্গে একটা মিটিংএ যেতে হবে। না গেলেই নয়।"

"তাই নাকি! তবে ত' বড় অসময়ে আসা গেছে।"

"আর বলো কেন? একটা দিনও কি অবসর পাওয়ার যো আছে? আজ মিটিং, কাল পার্টি, পরশু পিকনিক—একটা না একটা লেগেই আছে।"

অভ্যর্থনার প্রথম পর্ব্বেই মনটা মুসড়ে গেল। গৃহিণীর মুখেও হতাশার ছবি। এত হাঙ্গামা করে আসার এই পরিণতি!

এ কথা সে কথার পর জলখাবার এল। দু'খানা করে বিস্কুট, আর ছোট গ্লাসে এক এক গ্লাস সরবৎ।

খানিক বাদে দাদাও ভেতরে এলেন। তিনিও বৌদির কথারই পুনরাবৃত্তি করে বললেন, "জরুরী মিটিং। না গেলেই নয়। বৌদিকেও যেতেই হবে।"

ইঙ্গিত বুঝে আমরা উঠলাম। আর একদিন সবাইকে আসবার জন্য দাদা বৌদি দুজনেই বারবার বললেন।

ট্রামে উঠে পয়সা দেবার সময় দেখি, চশমাটি দাদার বাড়ী ফেলে এসেছি। জীর্ণ খাপে নিকেলের ফ্রেমে পুরানো চশমা। বড় লোকের বাড়ীর ঝি চাকর যদি তুচ্ছ তাচ্ছিল্য করে ফেলে দেয়, তা হলেই আবার মোটা খরচের ধাক্কা। তা, ছাড়া চশমা না হ'লে আপিসই বা করব কি করে!

গৃহিণী শুনেই বললেন, "তুমি এখানেই নেমে পড়। এক্ষুণি বট্ ঠাকুরের বাড়ী গিয়ে খোঁজ কর। আমি এ তিনটেকে নিয়ে যেমন করে হোক্ বাড়ী যেতে পারব।"

আবার দাদার বাড়ী আসতে হল। দাদা বৌদি তখনও বেরোননি। দু'জনেই বাইরের ঘরে। সেখানে আরও একজন ভদ্রলোক। পরণে মূল্যবান বিলাতী পোষাক। তাঁর সামনে ধূমায়মান চা। প্লেটে রকমারি খাবার। দাদা তাঁরই সাথে কি নিয়ে আলোচনা করছেন। বৌদি টেলিফোন করছেন—হঠাৎ একটা জরুরী কাজে আটকে যাওয়ায় তাঁদের আর মিটিংএ যাওয়া হবেনা। এ জন্য তাঁরা খুব দুঃখিত—ইত্যাদি।

বুঝলাম এই ভদ্রলোকের উপস্থিতিই মিটিংএ না যাওয়ার কারণ। সুতরাং ইনি নিশ্চয়ই কেউ-কেটা নন।

দাদা বৌদি আমাকে দেখে অবাক হলেন। আমিও তাই—যখন দেখলাম ভদ্রলোক আর কেউ নন, জয়ন্ত ভাদুড়ী।

এই জয়ন্ত আর আমি একসঙ্গে স্কটিশে দু'বছর পড়েছি। হোষ্টেলে পাশাপাশি ঘরে থেকেছি। সেই

তরুণ বয়সে দু'জনে কত কল্পনার জাল বুনেছি, কত কি রঙ্গীণ স্বপ্ন দেখেছি।

এক যুগ পর আবার আমাদের এই দেখা। এদেখা দু'জনের পক্ষেই অপ্রত্যাশিত। সংসারের চাপে আমি আর সে আমি নেই। নেই সে প্রাণ-চাঞ্চল্য। জয়ন্ত অবশ্য আগের মতই আছে। বরঞ্চ ঐশ্বর্য্যের দীপ্তিতে তার বুদ্ধিদীপ্ত চেহারা আরও খুলেছে। জয়ন্ত এখন অগাধ টাকার মালিক, ব্যবসায় জগতে কীর্ত্তিমান্ পুরুষ।

তবু জয়ন্ত আমাকে চিনল। বলল—"তুমি এখানে!"

আসল পরিচয় আর দিলামনা। শুধু বললাম, "এখানেই এসেছিলাম। চশমাটা ভুলে ফেলে গেছিলাম, তাই আবার আসতে হল।"

"ভালই হয়েছে। তোমার সঙ্গে দেখা হল—উঃ কত দিন পর দেখা! তার পর আছ কোথায়?"

এই অন্তরঙ্গ আলাপে দাদা বৌদি একটু আশ্চর্য্যই হলেন। কিন্তু মুখে কিছু বললেন না। আমিও চেপেই গেলাম। জয়ন্তর প্রশ্নের উত্তরে শুধু জানালাম, দমদমে আছি।

"কোথায় বলত? আমাকে ত প্রায়ই এয়ার পোর্টে যেতে হয়। যাওয়া যাবে একদিন তোমার ওখানে।"

ঠিকানা দিয়ে চশমাটা নিয়ে আমি উঠে আসছিলাম, জয়ন্ত কিছুতেই উঠতে দিলনা। বলল, এতদিন পর দেখা এখনই উঠবে কি হে?

কাজেই বসতে হল। চা এবং জলখাবারের সদ্ব্যবহার করতে করতে দুনিয়ার গল্প জুড়ে দিল। এমনিভাবে আধঘণ্টা আটকে থাকার পর আমি ছুটী পেলাম। তখনও দাদার সাথে জয়ন্তর গল্প চলছে—দু'জনে মিলে নূতন কি একটা মিল খুলবে, তারই আলোচনা।

রাত ন'টায় বাড়ী ফিরলাম। পয়সা বাঁচাবার জন্ম সেকেণ্ড ক্লাস ট্রামেই এসেছি। তবুও হিসেব করে দেখলাম, যাতায়াতে সব শুদ্ধ তিনটাকা সাড়ে দশ আনা খরচ হয়েছে।

স্বভাবতঃই মনে হচ্ছিল, টালিগঞ্জ না গিয়ে এই টাকাটা যদি একদিনের বাজারে খরচ করতাম, তা হলে হয়ত ছেলে-মেয়েদের মুখে একটু ভালমন্দ উঠত। যেখানে এক টাকা পাঁচসিকের মধ্যে বাজার সারতে হয়, সেখানে তিন টাকা সাড়ে দশ আনা নেহাৎ কম নয়।

গৃহিণীও বোধ হয় আমার মনের কথা টের পেয়ে-ছিলেন। বললেন, "আমাদের ভাগ্যিই আলাদা। নইলে ঠিক আজই বউ-ঠাকুরদের জরুরী মিটিং থাকবে কেন? নন্তু মিনি কত আশা করেছিল, জ্যেঠুর বাড়ীতে ভালমন্দ কত কি খাবে! শেষে কিনা দু'খানা বিস্কিট, আর একটু সরবৎ। তাড়াতাড়িতে আর কিছু করতে না পারায় দিদির সে কি দুঃখ! বারবারই বলছিলেন, মিটিং না থাকলে—

সরলমনা গৃহিণীর সরল বিশ্বাসে আঘাত দিতে ইচ্ছে হ'লনা। জিভের ডগায় এলেও চেপে গেলাম যে, শেষ পর্যন্ত মিটিংএ তাঁরা যাননি। আর বড়লোক অতিথিকে চব্য চোষ্য খাওয়াতে তাঁদের সময়েরও অভাব হয়নি।

উপলব্ধি

শ্রীঅমরনাথ গুপ্ত

যাক্—যাক্—ভেংগে যাক্ সুখের স্বপন—
রাতের আঁধারে জাগে ভোরের আলো:
বেদনার স্মৃতিটুকু থাক্ না গোপন,
হারানোর ব্যথা চেয়ে না পাওয়া ভালো।
দিনে রাতে দেশে দেশে দেখেছি ঘুরে
এক সুরে হাসা-কাঁদা এক অভিনয়

নিরাশায় ঠেলে দেয় দূর হতে দূরে
নীরবেতে মেনে নেওয়া শুধু পরাজয়।
মনের দুয়ার খুলে বাহিরে দাঁড়াও
আকাশ পৃথিবী যেথা চেনা নাহি যায়
সেথা হতে পার যদি—কিছু তুলে নাও
জীবন নদীর স্রোত এক পথে ধায়।

প্লেটোর শিক্ষা-দর্শন

শ্রীনিখিলরঞ্জন রায়

মাটির পৃথিবীতে স্বর্গরাজ্য প্রতিষ্ঠিত হবে—মানুষের এ হল একটা বড় স্বপ্ন। বিজ্ঞান দিয়েছে মানুষকে প্রকৃতির উপর আধিপত্য, আর ক্রমশঃই সেই আধিপত্যের ক্ষেত্র বিস্তৃতি লাভ করছে। জলে, স্থলে অন্তরীক্ষে মানুষের কীর্তিধ্বজা প্রোথিত হয়েছে। শুধু দৃশ্যমান বহিজগতই নয়, প্রকৃতির অতি নিগূঢ় রহস্যও উদ্‌ঘাটিত হয়েছে বিজ্ঞানীর প্রখর, অনুসন্ধিৎসু দৃষ্টির সম্মুখে। বিজ্ঞান এনেছে প্রকৃতির অপরিমেয় ভাণ্ডার লুণ্ঠন করে জড় জীবনের প্রয়োজনীয় যাবতীয় সম্ভার। আরাম আয়াস, সুখ-সম্ভোগের কত অভিনব উপকরণই আজ বিজ্ঞানের প্রসাদে মানুষের করতলগত। কিন্তু সেই কল্পিত স্বর্গরাজ্য কোথায়? মানুষ কি চায়? আপাত-মোহন সুখ-সমৃদ্ধির অন্তরালে একটা না-পাওয়ার হাহাকার মানুষের থেকে গেল! সেই স্বর্গরাজ্য আজও মানুষের নাগালের বাইরে! সুখ আছে সমৃদ্ধিও প্রচুর—কিন্তু শান্তি কোথায়—মানুষ তার সন্ধান পেয়েছে কি? জড়বাদী বিজ্ঞান আর ভোগবাদী সভ্যতা কি এই প্রশ্নের যথাযথ উত্তর দিতে পারে? বিজ্ঞানের যত উৎকর্ষই সাধিত হোক না কেন, বিজ্ঞান নব নব ক্ষেত্রে যত কৃতিত্বই দেখাক না কেন? সেই প্রতিশ্রুত শান্তির স্বর্গরাজ্য এখনও বহুৎ দূর-অস্ত। কারণ কি? বিজ্ঞান মানুষের কল্যাণ এবং অকল্যাণ উভয়েরই পরিপোষক। এক হাতে খর্পর আর অপর হাতে বরাভয় এই কি বিশ্বশক্তিরূপিণী হিন্দু জগন্মাতা মূর্তির কল্পনা নয়? বিজ্ঞান একদিকে জীবের রক্ষক ও পরিবর্ধক, আর অপরদিকে সংহারক। কেন এমন হয়? বিজ্ঞানের প্রয়োগ, বিজ্ঞানের প্রতিপত্তি এবং বিজ্ঞানের অগ্রগতি সব কিছুই যে মানুষকেই অবলম্বন করে। মানুষকে বাদ দিলে বিজ্ঞান অচল। মানুষই বিজ্ঞানের চালক ও প্রতিপালক। পরিচালকের গুণভেদে যেমন প্রতিষ্ঠানের গুণভেদ ঘটে, তেমি মানুষের গুণভেদে বিজ্ঞানের উৎকর্ষ বা অপকর্ষ সাধিত হয়। মানুষই আসল—বিজ্ঞান মানুষের হাতের পুতুল। তাই মানুষের পূর্ণতা এবং মনুষ্যত্বের বিকাশের উপরেই নির্ভর করে বিজ্ঞানের সাফল্য ও সার্থকতা।

তাই মনুষ্যত্বের অনুশীলনের উপর গুরুত্ব আরোপ করেছেন অনেকেই। বহুজন বহুভাবে মানুষের চরিত্র গঠনের প্রয়োজনীয়তার কথা উল্লেখ করেছেন, শিক্ষায় চরিত্রগঠনকে দিয়েছেন অগ্রাধিকার। এখন থেকে দু'হাজার চারশত বৎসর পূর্বে, খৃষ্টপূর্ব পঞ্চম-চতুর্থ শতকে পাশ্চাত্য সভ্যতার আদিপীঠ গ্রীসদেশে এই কথা নিয়ে প্রথম আলোচনা করেছিলেন দার্শনিক প্লেটো। সেই দু'হাজার বৎসর পূর্বেকার কথায় মূল্য আজও অপরিবর্তিত রয়েছে, আজও তার গুরুত্ব এতটুকু কমেনি। পরন্তু যুগ-প্রয়োজনে সেই পুরণো কথার পুনরাবৃত্তির আজ আবার একান্ত প্রয়োজন দেখা দিয়েছে।

ইউরোপীয় জ্ঞান-বিজ্ঞানের আদি-স্রষ্টা—সোক্রাটিস-প্লেটো-এরিষ্টটল। খৃষ্টপূর্ব পঞ্চম-চতুর্থ শতকে এথেন্স নগরীতে এই মহান ত্রয়ীর আবির্ভাব। সোক্রাটিস শিষ্য প্লেটো। প্লেটোর যখন বয়স মাত্র ২৩ বৎসর সেই সময় এথেন্স নগর-রাষ্ট্রে যে বিপ্লব ঘটে তার ফলে সমস্ত রাষ্ট্র-ক্ষমতা গণতান্ত্রিক সংসদের হস্তচ্যুত হয়ে ত্রিশজন সদস্যগঠিত এক দল-বিশেষের হস্তগত হয়। ক্ষমতাপ্রাপ্ত দলের প্রভাবশালী কয়েকজন সদস্য ছিলেন প্লেটোর আত্মীয় বা বন্ধুস্থানীয়। নূতন শাসন-সংসদে যোগদান করবার জন্য প্লেটোর নিকট আহ্বান এল। রাষ্ট্রীয় ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হবার এক অপূর্ব সুযোগ। প্লেটো সে সুযোগ গ্রহণও করেছিলেন। কিন্তু অনতি-বিলম্বেই তাঁর ভুল ভাঙ্গল। তিনি যে আশা নিয়ে নবগঠিত শাসন সংসদে যোগদান করেছিলেন তার কর্মনীতি ও পদ্ধতির সঙ্গে তাঁর আদর্শগত বিরোধ প্রকট হয়ে উঠল। আর সেই বিরোধের মূল নিহিত ছিল মানুষের চারিত্রিক মূল্যায়নে। প্লেটো দেখলেন শাসনসংসদের সদস্যেরা কলুষিত চরিত্রের লোক—

ক্ষমতা লোলুপতা এবং স্বার্থ সাধন প্রবৃত্তি এদের অভিভূত করে রেখেছে—রাষ্ট্রের প্রকৃত কল্যাণ এরা কামনা করে না, ক্ষমতা ও আধিপত্য নিয়েই এরা মশগুল। যে রাষ্ট্র ব্যবস্থার পরিবর্তন প্লেটো আশা করেছিলেন তার সম্ভাবনা সম্পূর্ণ তিরোহিত হয়ে গেল। প্লেটো সিদ্ধান্ত করলেন রাজনীতি ততদিনই নিরর্থক যতদিন না শুদ্ধ-উন্নত-চরিত্রের মানুষ রাজনীতির দায়িত্ব গ্রহণে অগ্রসর হয়ে আসে। প্লেটোর সিদ্ধান্তের আরও বিশদ ব্যাখ্যায় তদগুরু সোক্রাটিসের বাণীর প্রতিধ্বনি পাওয়া যায়: Knowledge is virtue—জ্ঞানী ব্যক্তিই সদ্‌গুণী। প্লেটো বললেন, সামাজিক অশুভ ও অকল্যাণের অবসান ঘটবে সেদিন যেদিন প্রকৃত জ্ঞানী ব্যক্তির হাতে সমাজ ও রাষ্ট্র-পরিচালনার ভার অর্পিত হবে।

"Either the real philosophers gain political control or else the politicians become by some miracle real philosophers.

এই সিদ্ধান্তের পর সক্রিয় ভাবে ক্ষমতলোভী রাজনীতি-ক্ষেত্রে আর থাকা চলে না। প্লেটো রাজনীতি চর্চা ছেড়ে দিয়ে দর্শন-চর্চায় আত্ম নিয়োগ করলেন। প্লেটোর মতবাদ লিপিবদ্ধ আছে তাঁর বিখ্যাত চিরায়ত গ্রন্থ 'Republic, এর পৃষ্ঠায়।

এই Republic গ্রন্থের এক পঞ্চমাংশই শিক্ষা বিষয়ক আলোচনায় ব্যাপৃত। শাসকবৃন্দের প্রকৃত শিক্ষার কথা নিয়ে প্লেটো বিস্তারিত আলোচনা করেছেন। রাষ্ট্র পরিচালনা ন্যস্ত থাকবে শিক্ষিত প্রজ্ঞাবান ব্যক্তির উপর—প্লেটোর ইহাই মূল বক্তব্য, আর শিক্ষার মুখ্য উদ্দেশ্য হবে

চরিত্র-গঠন ও চরিত্র-বিকাশ। নৈতিক চরিত্রের উপর এতটা গুরুত্ব, প্লেটোই প্রথম আরোপ করলেন। গ্রীক্ জাতি সুকুমার শিল্প ও সৌন্দর্যের পথিকৃৎ,—তাদেরই অন্যতম শ্রেষ্ঠ মুখপাত্র প্লেটোর মতে সত্য, শিব ও সুন্দরের উৎস চারিত্রিক উৎকর্ষ। সুস্থ সুন্দর জীবনের তাগিদেই শিল্প-সৃষ্টির প্রয়োজন। নিছক আদর্শ-বিহীন শিল্পের নিমিত্ত শিল্পের সমর্থনে কোন যুক্তিই প্লেটো প্রদর্শন করেন নি। শিক্ষানীতির ব্যাখ্যায় প্লেটো বলছেন—শিক্ষা মানুষকে যা শ্রেয় তাকে শ্রদ্ধা করতে ও গ্রহণ করতে শেখাবে এবং যা হেয় তাকে ঘৃণা করতে ও বর্জন করতে উদ্বুদ্ধ করবে। ভোগমুখী মানুষ কি তাই চায়? কি সাহিত্য, কি চিত্রকলা, কি সিনেমা সর্বত্রই "art for art" অথবা art for profit—বর্তমান যুগের শিল্প-সৃষ্টির প্রধান প্রেরণা বা প্ররোচনা। শ্রেয়কে গ্রহণ আর হেয়কে বর্জন—প্লেটো নীতির সামাজিক গুরুত্ব আবহমান কাল বলবৎ থাকবে। যখনই সত্য এবং শ্রেয় অবজ্ঞাত হয় এবং স্বার্থবুদ্ধি প্রবল হয়ে ওঠে তখনই সামাজিক জীবনে অশান্তি ও বিশৃঙ্খলা দেখা যায়—সমাজ জীবন বিষ-জর্জরিত হয়।

আজ সমাজ জীবনের প্রবলতম দুষ্টব্যাধি কালোবাজারী আর অতি লাভের আশা। সমাজ দেহের স্তরে স্তরে রক্তে রক্তে এই পাপের বিষ সংক্রামিত হয়ে মানুষের নীতিবোধকে আচ্ছন্ন করে ফেলেছে। মৌখিক প্রতিবাদের অন্ত নেই। তারস্বরে সবাই কালোবাজারের বিরুদ্ধাচারী, কিন্তু সব প্রতিবাদই নিষ্ফল—কারণ এই প্রতিবাদ নিছক মৌখিক, এর পিছনে কোন আন্তরিকতা নেই। মুখে যার মুণ্ডপাত করছি প্রাত্যহিক জীবনে পরোক্ষে বা প্রত্যক্ষে তারই সমর্থন করে যাচ্ছি। একজন অপরকে দোষ দিচ্ছে। অপরজন আর একজনের দোষ দেখাচ্ছে। কেউ আর নিজের দোষের কথা ভাবছে না। আত্মবিশ্লেষণ ও আত্ম-সংশোধনই এই বিষম গ্লানি হতে সমাজের মুক্তির একমাত্র উপায়। প্লেটো তাই বারবার প্রজ্ঞাশীল, বিবেকসম্পন্ন ব্যক্তির হস্তে রাষ্ট্র নিয়ন্ত্রণ ও পরিচালনা অর্পণ করবার কথা বলেছেন। শিক্ষা সম্বন্ধে প্লেটোর বক্তব্য স্পষ্ট ভাষায় বিবৃত হয়েছে: যে তথ্য মানুষের জানা নেই সেই তথ্য মানুষকে জানানোর নামই শিক্ষা নয়। যে ভাবে মানুষের আচরণ করা উচিত, সেই সদাচরণে মানুষকে প্রবৃত্ত করার নামই প্রকৃত শিক্ষা।

"Education does not mean teaching men to know what they do not know; it means teaching them to behave as they do not behave."

বর্তমান অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে এই কথাগুলি কতই সত্য! বিজ্ঞান নিয়ত প্রকৃতির নূতন নূতন রহস্যের উদ্ঘাটন করছে, আর শিক্ষার প্রসাদে সেই নব নব বার্তা নানা মাধ্যমে সাধারণ মানুষের মধ্যে প্রচারিত হচ্ছে। শিক্ষার দৌলতে কত তথ্যই না শিক্ষার্থী জানতে পারছে? আজ শিক্ষা প্রধানতঃ তথ্য-সর্বস্ব। কত উপায়ে কত বিষয়ের কত তথ্য শিক্ষার্থীর মগজে ঢুকিয়ে দেওয়া যায়—তাই যেন শিক্ষার প্রধান ও প্রবলতম লক্ষ্য হয়ে দাঁড়িয়েছে। শিক্ষার বড় উদ্দেশ্য,—চরিত্র-গঠন এবং মনুষ্যোচিত সদ্গুণাবলির বিকাশ—আজ প্রয়োজন সিদ্ধির চাপে মামুলী কথায় কথায় পর্যবসিত—ছাপা বইয়ের পৃষ্ঠায় নিবদ্ধ মাত্র এবং কার্যতঃ উপেক্ষিত হচ্ছে। সহজে টাকা রোজগারের পন্থা হিসেবেই আজ শিক্ষার মান ও মূল্য নির্ধারিত হচ্ছে।

বিজ্ঞান ও বৃত্তি বিষয়ক শিক্ষার উপর মাত্রাতিরিক্ত গুরুত্ব আরোপিত হচ্ছে। ভারতের কথাই বিবেচনা করা যাক। দেশ আজ পুনর্গঠনের মুখে। একটা ব্যাপক ও দূরপ্রসারী পরিকল্পনানুযায়ী জীবন-ধারণের মান উচ্চতর করার জন্য বিপুল প্রয়াস করা হচ্ছে। পৃথিবীর বহু দেশের তুলনায় ভারতের আর্থিক অবস্থা নিচু। আর্থিক মানে ভারতকে অপরাপর দেশের সমকক্ষ করে তুলতে হবে—এই হচ্ছে পঞ্চ-বার্ষিক-পরিকল্পনার মুখ্য উদ্দেশ্য। আর এই উদ্দেশ্য সফল করে তুলতে হলে চাই শিল্প ও বাণিজ্যের প্রসার। তাই ভারতে আজ শিল্প সংগঠনের এত তোড়জোড়। শিল্প সম্প্রসারণে চাই অসংখ্য কারিগর। তাই কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষার আজ এত চাহিদা।

দলে দলে ছাত্র কারিগরি শিক্ষালয়গুলিতে ভীড় করছে। বৃত্তিমূলক কারিগরি শিক্ষার প্রতি এই প্রবল ঝোঁকের পিছনে রয়েছে একটা সাময়িক সুবিধাবাদী মনোভাব। ইঞ্জিনীয়ারিং পাশের ভাল মন্দ ছাপ একটা থাকলেই একটা চাকরী জুটবে—এই আশ্বাস রয়েছে কারিগরি শিক্ষার প্রতি ঝোঁকের মূলে। দেশ-কল্যাণেচ্ছা একটা গৌণ উপলক্ষ মাত্র। আর শুধু কারিগরি শিক্ষা কেন,—শিক্ষার প্রায় ক্ষেত্রেই স্থূল প্রয়োজন সিদ্ধি আজ একচেটিয়া প্রাধান্য লাভ করেছে। স্কুল-কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা-শিক্ষণ প্রায় সংবাদ-পরিবেশনের পর্যায়ে অবনমিত হয়ে এসেছে। শিক্ষার ভিতর দিয়ে চরিত্র-গঠন বা মানুষ তৈরীর কোন সাগ্রহ চেষ্টা করা হচ্ছে কি? এ-প্রশ্নের কোন জবাব নেই। শিক্ষা, শিক্ষক ও শিক্ষার্থী আজ আদর্শের দিক দিয়ে সম্পূর্ণ নিঃস্ব দেউলিয়া।

পৃথিবীতে বেঁচে থাকার অধিকার সার্বজনীন। বেঁচে থাকার তাগিদেই জীবিকার কৌশল আয়ত্ত করাও একান্ত প্রয়োজন। কিন্তু ঐ-টুকু নিয়েই সন্তুষ্ট থাকার মানে চুষিকাঠি নিয়ে শিশুর মত থাকারই সামিল। এই সঙ্কীর্ণদৃষ্টি শিক্ষার বিরুদ্ধেই প্লেটোর সাবধান বাণী।

শিক্ষানীতি নির্দেশ করতে গিয়ে প্লেটো সর্বপ্রথমে জোর দিয়েছেন চরিত্র গঠনের উপর। আর চরিত্র গঠনের অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টির কথাও উল্লেখ করেছেন বারবার। তাঁর Republic এবং Laws এই গ্রন্থদ্বয়ে শিক্ষা সম্বন্ধে যে মৌলিক তত্ত্ব অবতারণা করেছেন সংক্ষেপে তা এই:

(১) তেমন বই-ই অধ্যয়ন করা বিধেয় যার বিষয়বস্তু এবং রচনা-বিন্যাস পাঠকের দৃষ্টি-ভঙ্গীতে এনে দেবে ঋজুতা ও আন্তরিকতা। জীবনের নানা সমস্যার শুদ্ধ সমাধানেই অধীত পুস্তক সাহায্য করবে, এবং নব নব প্রশ্নের রহস্যের উপর করবে আলোক সম্পাত। মোট কথা জীবন গঠনে সৎসাহিত্য পাঠের উপকারিতা প্লেটোর অন্যতম প্রধান বক্তব্য।

(২) দ্বিতীয়তঃ প্লেটো জোর দিচ্ছেন সঙ্গীতানুশীলনের উপর।

সুষম ছন্দ ও শব্দঝঙ্কার জীবনের প্রাত্যহিক আচরণে সমতা ও শুচিতা, সৎসাহস ও আত্মনিয়ন্ত্রণ বিধান করবে—প্লেটোর ছিল দৃঢ় বিশ্বাস।

(৩) তৃতীয়ত: নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ এই উপনিষদোক্ত বাণীরই প্রতিধ্বনি মিলবে প্লেটোর কথায়। দৈহিক দুর্বলতা যেন মানসিক উৎকর্ষের পরিপন্থী না হয়ে দাঁড়ায়—সেইজন্যই শরীর চর্চার এত প্রয়োজন।

Republic গ্রন্থে প্লেটো বলেছেন: শিশুকে একটি সৎ ও সুন্দর পরিমণ্ডলের মধ্যে স্থাপন কর। পারিপার্শ্বিকের প্রভাব যেন তাকে সত্য, শিব ও সুন্দরের প্রতি আকৃষ্ট করে। কবির কাব্যে, সাহিত্যিকের রচনায় এবং শিল্পীর সৃষ্টিতে ফুটে উঠুক আদর্শ চরিত্রের অম্লান মহিমা—ইহাই মনীষীপ্রবর প্লেটোর বক্তব্য। নীচতা, হীনতা, ইন্দ্রিয়পরায়ণতা কামুকতা যেন চিত্রকলায়, ভাস্কর্যে স্থান না পায়; উদার ও মহৎ সৌন্দর্যই যেন শিল্পসৃষ্টির একমাত্র উপজীব্য হয়। প্লেটো বলেছেন: দিনের পর দিন যদি তোমার গাভী কটু আগাছা-ভরা মাঠে বিবরণ করে তবে সে গাভীর দুধও হবে বিস্বাদ এবং স্বাস্থ্যের পক্ষে হানিকর। উৎকৃষ্ট মানসিক আহার মানুষ শিক্ষার্থীর পক্ষে অনুরূপ অপরিহার্য। প্লেটোর কথা।

"Like a breeze bearing health from healthy lands influences from noble works may continualy fall upon eye and ear from childhood upwards, and imperceptibly draw them into sympathy and harmony with the beauty of reason, whose impress they take.

সৎসাহিত্য এবং সুকুমার শিল্পের প্রভাবে শিশু-চরিত্র সুষ্ঠুভাবে গঠিত হয়ে উঠবে। বৌদ্ধ অষ্টমার্গের অন্তর্নিহিত ভাবের সঙ্গে এই ভাবধারার কী অপূর্ব সামঞ্জস্য, আর বর্তমান কালের উদগ্র যৌন-আকুতিসম্পন্ন সিনেমাচিত্র, টেলিভিশন, চিত্রকলা ও সাহিত্য অর্থাৎ জনসংযোগের যাবতীয় মাধ্যমের সহিত কী বিপুল বৈষম্য! দৈহিক সৌষ্ঠব এবং মানসিক উৎকর্ষ—এ দু'য়ের উপরেই জোর দিয়েছেন প্লেটো। শিক্ষার মাধ্যম হবে কাব্য ও সঙ্গীত, ছন্দ ও শৃঙ্খলা। সুন্দর সুগঠিত, স্বাস্থ্যোজ্জ্বল, দেহ, আর উদার, অনুভূতিপ্রবণ, সজ্ঞান ও সংবেদনশীল মন—প্লেটো পরিকল্পিত শিক্ষার এই হবে ফলশ্রুতি। শরীর-শিক্ষার উপর প্লেটো যথেষ্ট গুরুত্ব আরোপ করে বলেছেন—সচ্চরিত্রগঠনে সর্বাগ্রে প্রয়োজন দৈহিক ও মানসিক বিকাশের মধ্যে সমতা বিধান।

শুধু দেহসংগঠনে কোন পরমার্থ নেই। তেমি কেবল মানসিক অনুশীলন মানুষকে পূর্ণতা দিতে পারে না। মানসিক শিক্ষাবিহীন মল্লবীর বড়জোর একটি সুদর্শন জন্তু, আর দুর্বলদেহী রুগ্ন মনীষী একজন অকেজো, অপদার্থ সংসারের আবর্জনাস্বরূপ। তাই প্লেটো প্রস্তাব করেছেন—প্রত্যেক নাগরিক স্ত্রীপুরুষনির্বিশেষে প্রতি মাসে অন্ততঃ একদিন মুক্ত প্রাঙ্গণে খেলাধুলায় অতিবাহিত করবে। এমন কি তের থেকে আঠার বৎসর বয়স্কা মেয়েরা দৌড় এবং অশ্বারোহণ জাতীয় শ্রমসাধ্যব্যায়ামে অংশ গ্রহণ করবে। খেলাধুলা, ব্যায়াম এবং বক্তৃতা প্রদান এই তিন নিয়ে দিনের কার্যসূচি রচিত হবে। সঙ্গে সঙ্গে তরুণেরা দলে দলে মুক্ত প্রান্তর শিবির-জীবন যাপনে অভ্যস্ত হবে। শিবির-জীবনে প্রত্যেককেই স্বহস্তে যাবতীয় পরিশ্রমের কাজ করতে হবে—শিবিরে পরিচারক এবং ক্রীতদাসের সেবা গ্রহণ নিষিদ্ধ।

প্লেটোর শিক্ষানীতিতে আরও দুটো জিনিষের গুরুত্ব স্বীকৃত হয়েছে। প্রথমত: গণিত-বিজ্ঞান, আর দ্বিতীয়ত: ইতিহাস। সে কালে গণিতশাস্ত্র আজকের মত ফলিত বিজ্ঞান হতে পৃথকীকৃত হয় নি। যা গণিত তাই বিজ্ঞান। গণিত বিজ্ঞান চর্চার ব্যবহারিক মূল্য সম্বন্ধে প্লেটো পুরোপুরি সচেতন ছিলেন, কিন্তু তিনি মনে করতেন যে গণিত শাস্ত্রানুশীলন দ্বার মানুষের মন বাস্তব প্রয়োজন সিদ্ধির সীমারেখা উত্তীর্ণ হয়ে বৃহত্তর সত্যের প্রতি উন্মুখ হয়ে উঠবে। বাস্তবের স্থুল প্রয়োজন হ'তে বিচ্ছিন্ন মন কেবল সমসাময়িক দৃষ্টিভঙ্গী দিয়ে নয়, পরন্তু ভবিষ্যৎ দূরদৃষ্টি দিয়ে জীবনকে বিচার করতে শেখাবে বিজ্ঞান।

ইতিহাস অধ্যয়নের ব্যাখ্যায় প্লেটোর অভিমত—অতীতের স্মৃতিই অতীতের ভুলভ্রান্তি থেকে আমাদের বাঁচায়। এ যুক্তি অখণ্ডনীয়। ইতিহাস নিজের পুনরাবৃত্তি করুক বা না করুক, ইতিহাসের শিক্ষা মানুষের ক্রমবিকাশে অপরিহার্য। অতীতের ভিত্তি—বর্তমানের সৌধ যার উপর রচিত হয়!

প্লেটোর যৌবনকাল বেদনাসিক্ত। দু'টি প্রচণ্ড ধাক্কার টাল সামলাতে হয়েছিল অপেক্ষাকৃত অপরিণত বয়সেই! মাত্র ২৩ বৎসর বয়সে তাঁর রাজনৈতিক জীবনের অবসান ঘটে। ঘটনা পরম্পরায় সমসাময়িক রাজনীতি এবং দলীয় সহকর্মিদের সহিত বিচ্ছেদ ঘটায় রাজনীতি ক্ষেত্র হতে তিনি বিদায় নিতে বাধ্য হলেন। রাজনীতির উপর তিনি বিশ্বাস হারালেন।

আটাশ বৎসর বয়সে গুরু সোক্রাটিস বিনাদোষে প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত হন। আদর্শ রাষ্ট্র ও সমাজ প্লেটো গড়তে চেয়েছিলেন—বাস্তব ঘটনার রূঢ় সংঘাতে তা স্বপ্নে বিলীন হয়ে গেল। এরূপ নিদারুণ বিপর্যয়ে যে কোন ব্যক্তির পক্ষেই নৈরাশ্যবাদের আশ্রয় গ্রহণ ভিন্ন গত্যন্তর থাকত না। কিন্তু প্লেটোর চরিত্র ছিল ভিন্ন ধাতুতে গড়া। তিনি বেছেনিলেন—সমস্যার সমাধান কল্পে নির্দেশ জ্ঞাপন করলেন অকপট ভাষায়—প্রকৃত মানুষ তৈরী কর, শিক্ষাই মানুষ তৈরী করার একমাত্র উপায়। স্বতঃই স্মরণ করি স্বামী বিবেকানন্দের কথা: "Man making is my mission"—মানুষ তৈরী করাই আমার ব্রত।

সঙ্গীতে যুগ-চেতনা

শ্রীজয়দেব রায়

সকল দেশের সঙ্গীতেই সামসাময়িক সমাজ ও যুগচেতনার প্রভাব প্রতিবিম্বিত হয়। বাংলাদেশের গানেও চিরকালই সেই ধারা রক্ষিত হইয়া আসিয়াছে। এক এক সময়ে এক এক শ্রেণীর গানের হুজুগ পড়িয়াছে। অসংখ্য জনপ্রিয়তার সঙ্গে সঙ্গীতের রূপান্তরের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ আছে। গান রচিত হইয়াছে—আবার কালস্রোতে সব ভাসিয়া গিয়াছে।

এইভাবেই কীর্তনের যুগে বৈষ্ণব কবিরা গানের পর গান লিখিয়া নাচিয়া কুঁদিয়া খোল বাজাইয়া সমস্ত দেশকে মাতাইয়া দিয়া গিয়াছেন। তারপর আবার কীর্তনের সেই মহাজনী সুরই বোষ্টমদের মাধুকরীর সুরে পরিণত হইয়া বহিয়া আসিয়াছে। এমন কি ভক্তি সঙ্গীতের সুর হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া কীর্তনের সুরে আজ হাসির গানও রচনা করিয়াছেন কবি রজনীকান্ত সেন—

যদি কুমড়োর মত চালে ধরে রত পানতোয়া শতশত,
আর সরষের মত হত মিহিদানা, বুঁদিয়া বুটের মত ॥
(প্রতি বিঘা বিশ মণ ক'রে ফলত গো)
(আমি তুলে রাখিতাম) বুঁদে, মিহিদানা গোলা বেঁধে
(আমি তুলে রাখিতাম)
(গোলা বেঁধে আমি তুলে রাখিতাম, বেচতাম না হে)
(গোলায় চাবি দিয়ে, চাবি কাছে রাখিতাম,বেচতাম না হে) ॥

এইভাবেই প্যারডি রচনার প্রথা প্রচলিত হয়। রামপ্রসাদের গান এককালে সারাদেশের ভক্তি-সংগীতরূপে গণ্য হইত 'পালটা গান' নামে সেগুলির প্যারডিও সে আমলের আসরে গাওয়া হইত। আজু গোঁসাই কর্তৃক রামপ্রসাদের বিখ্যাত গানের প্যারডি জনগণের আদর সমভাবেই অর্জন করিয়াছিল।

রামপ্রসাদের গান—এই সংসার ধোঁকার টাটি।
ও ভাই আনন্দবাজারে লুটি।
ওরে ক্ষিতি জল বহ্নি বায়ু শূন্যে পাঁচে পরিপাটি ॥
উহার প্যারডি রচনা করিলেন আজু গোঁসাই—
এই সংসার রসের কুটি,
ওরে ভাই, খাই দাই আর মজা লুটি ॥
যার যেমন মন, তার তেমনি মন করবে পরিপাটি।
ওহে সেন, অল্পজ্ঞান, বুঝ কেবল মোটামুটি ॥
ওরে শিবের ভাবে ভাব না কেন, শ্যামা মায়ের চরণ দুটি।
ওরে ভাই দারা সুত বন্ধু সুত—পিঁড়ি পেতে দেয় দুধের বাটি ॥

ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত ছিলেন সে আমলের বাঙলা সংস্কৃতির প্রতিনিধি। পশ্চিম বঙ্গের সুপ্রচলিত রঙ্গব্যঙ্গ তাঁহার কল্যাণে নবতর রূপ লাভ করে। উল্টা-পাল্টা ইঙ্গিত করিয়া হেঁয়ালীর ভঙ্গীতে তিনি গান রচনা করিলেন—

দিন দুপুরে চাঁদ উঠেছে রাত পোয়ানো ভার
হ'ল পূর্ণিমেতে অমাবস্যা তেরো প্রহর অন্ধকার ॥
এসে বেন্দাবনে বলে গেল বামী বোষ্টমী,
একাদশীর দিন হবে—জন্ম-অষ্টমী।
আর ভাদ্দর মাসের সাতুই পোষে চড়ক পুজোর দিন এবার ॥
ঐ কলুবামী, ধোপাশামী হাসতেছে কেমন।
এক বাপের পেটেতে এরা, জন্মেছে ক'জন।
কাল কামরূপেতে কাক মরেছে কাশীধামে হাহাকার ॥

তাঁহারই গান—

ও কথা আর বোলো না, আর বোলো না, বলছ বঁধু, কিসের ঝোঁকে ?
এ বড় হাসির কথা, হাসির কথা, হাসবে লোকে, হাসবে লোকে ॥

—এই গান গাইয়া দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর এককালে জোড়াসাঁকো ঠাকুর-বাড়ীর অন্দর প্রাঙ্গণ মাতাইয়া রাখিতেন। এই গানের সুর দিয়াছিলেন জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর। তিনি ব লিতেছেন—

"পুরাতন সংবাদ প্রভাকর হইতে কতকগুলি মজার মজার কবিতা জোড়াতালা দিয়া একটা অদ্ভুত নাট্য খাড়া করিয়া তাহাতে সুর বসাইয়া ও বাড়ীর বৈঠকখানায় মহোৎসাহের সহিত তাহার মহলা আরম্ভ করিয়া দিলাম।"

ঈশ্বরচন্দ্র পল্লীবঙ্গের চিরপ্রচলিত নানা ছন্দে গান রচনা করিয়া বৈচিত্র্যের সঞ্চার করেন। ধিনতা ধিনা পাকা নোনা ছন্দে তাঁহার গান—

নোড়বো না তো নোড়বো মুখে।
পোড়বো রুখে, চোড়বো বুকে।
শত্রু যদি আসে ঝুঁকে,
থাবড়া কোসে মারব বুকে ॥
যোমকে আমি বোলবো যবে,
চোমকে যাবে, দেবতা সবে।
ধোমকে দেবো উচ্চ রবে।
সূর্য্যশশী থোমকে রবে ॥

ইংরেজ আমলের মধ্যযুগ হইতে বাঙলা দেশের গানের সুরে একটা পরিবর্তনের ইঙ্গিত দেখা দিল। হাস্য তরল পরিবেশ হইতে হঠাৎ গাম্ভীর্য-ময় পরিবেশে আসিয়া পড়িল বাঙালী। ব্রাহ্মসমাজের প্রতিষ্ঠা ও ইংরেজি-শিক্ষার প্রসারই এই পরিবর্তনের জন্য মূলত দায়ী।

সঙ্গীতে সমাজচেতনা আরও প্রগাঢ়, আরও সুস্পষ্ট হইয়া দেখা দিল।

ইংরেজ বিদ্বেষ প্রচার করিয়া এক শ্রেণীর দেশ-প্রেমোদ্দীপক গান দেশবাসীর শ্রদ্ধা ও প্রীতি আকর্ষণ করিল।

নীলকরদের অত্যাচার লইয়া গান লিখিলেন দীনবন্ধু মিত্র। তাঁহার ন্যায় আরও বহু কবি ঐ শ্রেণীর গান রচনা করিলেন। যেমন

নীলদর্পণে লর্ডসাহেব যথার্থ যা তাই লিখেছে।
নীলে নীলে সব মিলে প্রজার বল ভাই ফিরে গেছে।
কারো কার, তাদের উপর অত্যাচার,
তাই নিয়ে বার বার, লিখে লিখে হরিশ মরেছে।
ইডন, গ্রাণ্ট মহামতি, ন্যায়বান উভয়ে অতি,
করিতে প্রজার গতি, কত চেষ্টা পাইতেছে॥

রাজারামমোহন ও ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের নায়কত্বে যে সমাজ বিপ্লবের সূত্রপাত হয়, তাহার পরিচয়ও সে আমলের গানে রূপায়িত হইয়াছে। রাজা রামমোহনের উদ্দেশে রচনা করিয়াছিলেন ভোলানাথ চক্রবর্তী—

ছিল ভ্রান্ত ধর্মে তমোময় ভারত ভুবন।
যেমন অস্তাচলে রবি গেলে নিশির আগমন।
হেরে দেশের দুর্গতি রামমোহন মহামতি,
মোচন করিতে তাহা করিলেন প্রাণপণ।
হ'ল ব্রাহ্ম ধর্মোদয় পবিত্র অমৃতময়,
খুলিল মহীমণ্ডলে আনন্দের প্রস্রবণ।
ধন্য মহাভাগ তুমি! ধন্য হে ভারতভূমি;
শুভক্ষণে প্রসবিলে পুরুষ রতন॥

হিন্দুমেলা উপলক্ষে শুরু হইল স্বদেশী গান রচনার সূচনা। ১৮৬৭ সালে হিন্দুমেলায় নবজাগ্রত জাতীয় মনোভাবের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন হয়। সে আমলের অভিজাত তরুণ সম্প্রদায় প্রতিবৎসর এই মেলা উপলক্ষে স্বদেশী গানের আয়োজন করিতেন। জোড়াসাঁকো ঠাকুরবাড়ীর তরুণরা এই মেলা সংগঠনের পুরোভাগে ছিলেন। তাঁহারাই প্রথম আনুষ্ঠানিক স্বদেশী গান রচনা শুরু করিলেন।

সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর সমগ্র ভারতের উপযোগী প্রথম জাতীয় সঙ্গীত রচনা করিলেন—

মিলে সবে ভারত সন্তান একতান একপ্রাণ
গাও ভারতের জয়গান।
ভারত ভুমির তুল্য আছে কোন স্থান?
কোন অদ্রি হিমাদ্রি সমান?

ঐ একটি গানই সারাদেশ জুড়িয়া শতশত স্বদেশী গান রচনার প্রেরণা দিল।

হিন্দুমেলা উপলক্ষেই রচিত হইল—

আসি ভারতভূমে, একবার দেখে যাও আর্যগণ।
কোথা ব্যাস, বশিষ্ঠ, বাল্মীকি আদি জনকসনক সনাতন।
বুক ফাটে কি বলিব আর, ভারতভূমি চেনা ভার,
নাই আচার, নাই অধিকার, আশ্চর্য পরিবর্তন॥
ধনধান্য রত্নভার, সব যায় সিন্ধুপার,
উঠিতেছে হাহাকার, কেহ না করে শ্রবণ'
রেখে গিয়াছিলে যেই, শাস্ত্ররূপে শাস্ত্র এই,
আজো রক্ষা পায় সেই দ্রোণরূপে কর্ণধন॥

আর একটি গান—

প্রাণ কাঁদে বলিতে ভারতের বিবরণ,
ভূমণ্ডলে নাহি মেলে দ্বিতীয় আর এমন।
যেন, নির্মাণ করিয়া ক্ষিতি, আপনি করিতে স্থিতি,
নির্মিলেন জগৎপতি, এই ভুবন ভূষণ॥

হিন্দুমেলার পরের যুগ 'রাখীবন্ধন'। স্বদেশী গানের আর এক যুগের সূচনা হয় 'বঙ্গভঙ্গ আন্দোলন'কে কেন্দ্র করিয়া। এই আন্দোলন হইতেই শুরু হয় ভারতের বৃহত্তর স্বাধীনতা-সংগ্রাম। এই সময়ে কত বিভিন্ন ঢঙের স্বদেশী গানই না রচনা করেন কত অখ্যাতনামা ব্যক্তি! এই আন্দোলনই প্রথম দেশে গণজাগরণ আনে, জনগণমন এই সর্বপ্রথম আত্মোপলব্ধি করে।

রবীন্দ্রনাথ ছিলেন এই আন্দোলনের পুরোভাগে। বঙ্গজননীর পদে মস্তক অবনত করিয়া কবি বলিলেন—

ও আমার দেশের মাটি, তোমার পায়ে ঠেকাই মাথা।
তোমাতে বিশ্বময়ীর তোমাতে বিশ্বমায়ের আঁচল পাতা॥

সুরের দিক দিয়াও এই সময়েও গানের একটি পরিবর্তন দেখা যায়। এই সময়ের রচিত অধিকাংশ গান জনগণের চারণ-গীতি, তাহাদের উপযোগী বাউল কীর্তনাদি লোক-সঙ্গীতের সুরই এ সকল গানের ভূষণ।

'রাখীবন্ধন' এই সময়ের স্বদেশী উৎসব, রাখী সঙ্গীত সমগ্র বঙ্গবাসীর মিলনগীতি। রবীন্দ্রনাথ গাহিলেন—

বাঙ্গালীর পণ, বাঙ্গালীর আশা, বাঙ্গালীর কাজ, বাঙ্গালীর ভাষা,
সত্য হউক, সত্য হউক, সত্য হউক, হে ভগবান।
বাঙ্গালীর প্রাণ, বাঙ্গালীর মন, বাঙ্গালীর ঘরে যত ভাইবোন
এক হউক, এক হউক, এক হউক, হে ভগবান॥

তিনিই শুধু ন'ন, সে আমলের সকল কবিই তাঁহার সঙ্গে কণ্ঠ মিলাইয়াছিলেন। কালীনাথ ঘোষ রচনা করিলেন—

ভাই ভাই এক ঠাঁই, ভেদ নাই, ভেদ নাই;
ভায়ের সোনার হাতে বাঁধিয়াছি রাখী তাই।
ভাই ধন পরম ধন, মা বিনা কে চিনবে ভাই!
ভাই যদি সহায় রয় মায়ের কৃপা নিশ্চয়,
ভাই যদি বিমুখ হয়, সংসার আঁধারময়;
ভাই ধনে ধরে প্রাণে মার জয়গান গাই॥

রক্তকরবীর পাগল ভাই

অশোকরঞ্জন সেনগুপ্ত

রবীন্দ্রনাথ মূলত কবি। কাব্যই তাঁর বিরাট প্রতিভার পরিচয়। কিন্তু শুধু কবিতার মাধ্যমে তাঁর প্রতিভার পরিচয় যেন অসমাপ্ত থেকে যায়। তাই তাঁর সৃষ্ট নাটকগুলির মধ্যেও প্রতিভার পূর্ণ বিকাশ দেখতে পাই।

'মহুয়া' কাব্যের কিছু পূর্বে লেখা তার মুক্তধারা ও রক্তকরবী নাটক। এই দুই নাটকই সাঙ্কেতিক বাস্তবধর্মী। কবি মহিমার আত্মপ্রকাশ এই নাটকে। যান্ত্রিকতা ও নিপীড়ন থেকে মানুষকে উদ্ধারের প্রচেষ্টা তাঁর রক্তকরবী নাটকে। রবীন্দ্রনাথ বলেছেন—যারা শুধু জীবনকেই দেখে—অপরূপকে দেখে না, যারা স্বীয় বিষয়-বাসনা পূরণে মানুষকে বলি দিতে দ্বিধা করে না, রাষ্ট্রীয় স্বার্থের জন্য একটা জাতিকে ধ্বংস কোরতে চায়, যারা বস্তুর আয়োজনে পৃথিবীকে ভারাক্রান্ত করেছে, যাদের দানবীয় যন্ত্রশক্তির পেষণে প্রাণরস শুকিয়ে যাচ্ছে, তারা মানুষ নয় পশু। এই পশু জীবনের উপর মানব জীবন প্রতিফলিত করার চেষ্টা তার 'রক্তকরবী' ও 'মুক্তধারা' নাটকের মূল বক্তব্য।

এখানে 'রক্তকরবীর' বিশু পাগল আলোচ্য বিষয়। রক্তকরবীর রাজা ও নন্দিনীকে উপলব্ধি করার সাথে সাথে অন্যতম চরিত্র বিশু পাগলের কথা মনে আসে। 'রবীন্দ্রনাথ তার বিভিন্ন নাটকে দেখাইয়াছেন যে আমাদের সমাজ ও রাষ্ট্রে এমন সব নীতি ও নিয়ম রহিয়াছে, যাহাদের ফলে মানুষের স্বাধীন বিকাশ পদে পদে খণ্ডিত হয়। উপানন্দ, পঞ্চক, সুভদ্র, অভিজিৎ, বিশুপাগল—এরা মানুষের প্রতিনিধি, যে মানুষের জীবন কাব্য দুঃখের অশ্রু-লেখায় রচিত হইয়াছে।'১ তাই বিশুপাগল দুঃখভোগী সাধারণ মানুষ।

'কিন্তু রবীন্দ্রনাথের কাছে দুঃখ তো দুঃখ নয়। দুঃখের কাঁটা তাঁর হৃদয়ের স্নিগ্ধ পরশে আনন্দের কমল হইয়া উঠিয়াছে......দুঃখের অশ্রু-কালিমা আনন্দের আলোক-বন্যায় ধুইয়া গিয়াছে। দুঃখ তো মানুষের পরম গৌরব। ইহার মধ্য দিয়াই তো দুর্লভ মনুষ্যত্বের কঠোর পরীক্ষা হইয়া যায়। রবীন্দ্রনাথের নাটকে দুঃখই দুঃখের পরিণাম নয়। মৃত্যুই জীবনের সবশেষ নয়। দুঃখ ও মৃত্যুর মধ্য দিয়া কবির অদম্য আনন্দ ও আশাবাদ সর্বত্র ধ্বনিত হইয়াছে।'২ বিশু পাগলের দুঃখও তাই দুঃখ নয়। আঘাতকেও সে জীবনের অভীপ্সিত সম্পদ বলে মেনে নিয়েছে।

নন্দিনী জানে, বিশু মুক্ত জীবনের জন্য পাগল। সে ঘরছাড়া 'আকাশ ভেঙে বাহিরকে যেন লুট করিতে চায়।' নিশ্চিত ছেড়ে অনিশ্চিতের পথে, তাই বিশু তার পাগল ভাই। সত্যিই বিশু আপন-ভোলা নিয়ম-ছাড়া পাগল।

যক্ষপুরীর প্রতিটির মধ্যে নন্দিনী আনন্দ হিল্লোলের একটা স্পর্শ এনে দেয়। নন্দিনী সুন্দরের প্রতীক, তার স্পর্শ লেগেছে পাগল ভাইয়ের, তাই নন্দিনীর প্রতি অধরের অবিশ্বাসের উত্তরে তাকে বলতে শোনা যায়—"নরকেও সুন্দর আছে, কিন্তু সুন্দরকে কেউ সেখানে বুঝতে পারে না, নরকবাসীর সবচেয়ে বড়ো সাজা তাই।" নন্দিনীকে বা সৌন্দর্য্যকে মনে প্রাণে উপলব্ধি কোরতে পেরেছে বিশু।

আলোহীন, আশাহান যক্ষপুরীর অগণিত মানুষের আর্ত্তনাদ ও কাতরতা শোনা যায়—তাই বিশু বলেছে—"একদিকে ক্ষুধা মারছে চাবুক, তারা জ্বালা ধরিয়েছে—বলছে কাজ করো" তবু সুন্দরকে—প্রকৃতির অনাবিল সৌন্দর্য্যকে গ্রহণ করতে আকুলতা—"আর অন্যদিকে বনের সবুজ মেলেছে মায়া, রোদের সোনা মেলেছে মায়া—ওরা নেশা ধরিয়েছে, বলছে ছুটি ছুটি"। নন্দিনী সুন্দর মানবী, রঞ্জন ভরা যৌবন। আবদ্ধতা থেকে মুক্তির আকাঙ্ক্ষা যৌবনের ধর্ম্ম, সে চায় মুক্ত প্রাণের ছুটি।

বিশু সাধারণ মানুষের প্রতিনিধি। যে মানুষ সহজ আনন্দ উপভোগে আকাঙ্ক্ষিত, কিন্তু সমাজের আবর্তে

---

১ বাংলা নাটকের ইতিহাস—অধ্যাপক অজিতকুমার ঘোষ।

২ রবীন্দ্রনাথ—অশোক সেন—২ পর্ব।

তা সম্ভব নয়। তাই মানুষ কৃত্রিম নেশায় আকৃষ্ট। প্রাণের নেশার অভাব পরিলক্ষিত হয়—বিশু—'এ রাজ্যে এলুম, পাতালে সিঁদ কাটার কাজে লাগলুম। সহজ মদের বরাদ্দ বন্ধ হয়ে গেল, অন্তরাত্মা তাই তো হাটের মদ নিয়ে মাতামাতি করছে। সহজ নিশ্বাসে যখন বাধা পড়ে তখনই মানুষ হাঁপিয়ে নিশ্বাস নেয়।"

যন্ত্রের সংগে যুদ্ধ করে মানুষ যান্ত্রিক হয়ে গেছে। খনির শ্রমিকেরা দিনরাত সোনার মোহে পরিশ্রম করে তাদের মনুষ্যত্ব হারাতে বসেছে। তাই যন্ত্রের সংগে জীবনের বিরোধ বিশু পাগলের চরিত্রে দেখতে পাই। "আমাদের না আছে আকাশ—না আছে অবকাশ। তাই বারো ঘণ্টার সমস্ত হাসি গান সূর্য্যের আলো কড়া করে চুঁইয়ে নিয়েছে একচুমুকের তরল আগুনে।...তাই কাণ্ড হতভাগা বারো ঘণ্টার পর আরো চার ঘণ্টা যোগ করে খেটে মরে।" মনুষ্যত্বের নির্মম আঘাত—এ যেন ভারি বেদনা প্রকাশ পেয়েছে।

রক্ত করবীর যে মূল সুর প্রথমেই বলেছি পশু জীবনকে অতিক্রম করে মানব জীবনলাভের আকাঙ্ক্ষায় মানবতার জয়, বিশু পাগলই এই প্রধান সুরকে স্পষ্ট করে আমাদের সামনে তুলে ধরে। বিশুই বলে "কাছের পাওনাকে নিয়ে বাসনার যে দুঃখ তাই পশুর, দূরের পাওনাকে নিয়ে বাসনার আকাঙ্ক্ষার যে দুঃখ তাই মানুষের।...আমার সেই চিরদুঃখের দূরের আলোটি নন্দিনীর মধ্যে প্রকাশ, পেয়েছে।" রূপের মাঝে অরূপকে পাওয়ার আকাঙ্ক্ষা, জীবনাশ্রয়ী অরূপকে প্রতিষ্ঠিত করার চেষ্টা মানুষের মধ্যেই আছে এবং তা পাগল ভাই আমাদের জানায়। এখানে নন্দিনীর রূপও স্পষ্ট হয়ে উঠেছে।

নন্দিনীর পরশে অনাবিল আনন্দ উপলব্ধি করবার মনোভাব বিশু পাগলের আরেক জায়গায় প্রকাশ পেয়েছে। বিশু নন্দিনীকে বলে "তুমি আমার সমুদ্রের অগম পারের দূতী। যেদিন এলে যক্ষপুরীতে আমার হৃদয়ের লোনাজলের হাওয়ায় এসে ধাক্কা দিলে।" স্ফূর্ত্ত প্রাণের আনন্দ বিশু পাগলের মধ্যেই আছে।

রঞ্জনের যৌবনের অলীক, অমূর্ত, নন্দিনীর ভাবাদর্শের রূপ। কিন্তু একা রঞ্জনও সম্পূর্ণ নহে! রঞ্জনও বিশু জীবনের দুই দিক। একদিকে আলো ও আনন্দ, অন্য-দিকে দুঃখও রহস্য। বিশু নিজেই বলিয়াছে "আমি রঞ্জনের ওপিঠ—যে পিঠে আলো পড়ে না, আমি অমাবস্যা।" রঞ্জন ও বিশুকে লইয়াই পুরুষের পূর্ণাঙ্গ রূপকে বরণ করিয়াই নন্দিনীর প্রেম সার্থক?[৩] তাই তো আমরা দেখি—রঞ্জনের মৃত্যুর পর ধূলায় লুণ্ঠিত রক্তকরবীর মঞ্জরী বিশুই তুলে নিয়েছে।

'বিশুর ভিতর দিয়া জীবনের অন্ধকারের দিক অর্থাৎ দুঃখের রহস্যের দিকটাই প্রতিভাত, যেমন রঞ্জনের ভিতর দিয়া জীবনের আনন্দের আলোর দিক রূপায়িত।'

বদ্ধ জীবন থেকে যারা মুক্তি চায় তাদের পরিণামে নিতান্ত করুণ বাস্তব রূপ দিয়েছেন রবীন্দ্রনাথ। নন্দিনী—"আহা পাগল ভাই। ওরা কি তোমাকে মেরেছে? এ কিসের চিহ্ন তোমার?"—তবু এর মধ্যে থেকে ধনতান্ত্রিক যন্ত্র-সভ্যতার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ আবার নীতিহীন মান-অপমানের বালাই যাদের নেই সেই গোঁসাই, মোড়ল, সর্দার চরিত্রের প্রতি ব্যঙ্গের বাণ নিক্ষেপ করা হইয়াছে।

বিশু—"চাবুক মেরেছে, যে চাবুক দিয়ে কুকুরকে মারে। যে রশিতে এই চাবুক তৈরি সে রশির সুতো দিয়েই ওদের গোঁসাইয়ের জপমালা তৈরি। যখন ঠাকুর নাম জপ করে তখন ভুলে যায়।"

বিশু পাগল, নন্দিনীর পাগল ভাই সম্পূর্ণ বাস্তব চরিত্র। সহজ মানুষ। আনন্দ উপভোগে ব্যগ্র, বদ্ধ জীবন থেকে সে চায় মুক্তি।

নন্দিনী—"আমি তো ওর সব কথা বুঝতে পারি নে চন্দ্রা। ও কেন আমাকে বললে—বিপদের তলায় তলিয়ে গিয়ে তবে মুক্তি। ফাগুলাল, নিরাপদের মার থেকে মুক্তি চায় যে মানুষ আমি তাকে বাঁচাবো কি করে?"

৩ বাংলা নাটকের ইতিহাস—অধ্যাপক অজিতকুমার ঘোষ।
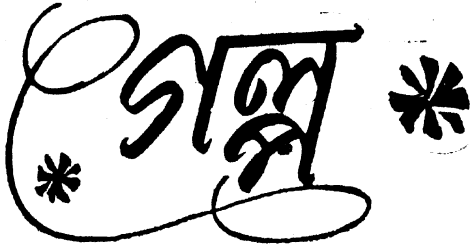
বনফুল

শ্রীযতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত

দিনান্তের সূর্য পশ্চিমের আকাশে ডুব দিয়েছে—নিস্তেজ আলো—যেন সূক্ষ্ম চুল ভেসে উঠেছে ডুব সাঁতারে জলের উপরে। পুবের আকাশে ঢিমে অন্ধকার সন্তর্পণে এগোচ্ছে নিঃশব্দ পায়ে—ভয় তো যেন ওই সূর্যের জন্য—একবার সে ডুব দিলে হয়—হুস্ করে ডানা ছড়িয়ে ধেয়ে আসবে—সমস্ত পৃথিবীটা একেবারে ঢেকে ফেলতে পারে। সূর্য কিন্তু ডুবি ডুবি করেও ডোবে না। সিঁদুরে লাল আলো তার ছড়িয়ে রেখেছে—গাছের ডগায় উঁচু পাহাড়ী টিলায়।

কাযের শেষে নিমাইকৃষ্ণ দাঁড়িয়ে দেখে—তার টং-তোলা বাংলোর বারান্দায় অস্তমিত সূর্যের রক্তিম আভায় চির-যৌবনা প্রকৃতি যৌবনোচ্ছ্বাসে যেন উপচিত রূপে আরও মনোরম আরও উচ্ছল হয়ে উঠেছে। নিমাইকৃষ্ণ অনন্ত রূপসী প্রকৃতির অসীম বিস্তারের দিকে তন্ময় হয়ে চেয়ে ছিল। পৃথিবী—তাঁর বাংলো—বাংলোতে চাকর বাকর সব কিছু লোপ পেয়ে গিয়েছিল; যেন কোন সীমাহীন অন্তহীন রূপ সাগরে পাল-তোলা বাতাসের ডিংগায় ভেসে বেড়াচ্ছে। এত রূপ! এত রূপ আছে!

ফরেস্ট অফিসার নিমাইকৃষ্ণ। সরকারী রিজার্ভ ফরেস্ট উঠে গেছে ধাপে ধাপে পাহাড়ের উপরে। ফরেস্টের পশ্চিম সীমান্তে পাহাড়ের গায়ে টিলা। টিলার উপরে বাংলো। সামনে কিছু দূরে সুরু চা বাগানের—যেন সেখান থেকে সারা পশ্চিমটাই চা-বাগানের দেশ—যেন দিক-চক্রবাল পর্যন্ত বিস্তৃত। চা গাছের সারি—কেবল চা গাছ—যেন তার শেষ নেই সীমা নেই। সীমাহীন চা বাগানের উপর দিয়ে ঢেউ তুলে এসেছে ডুবো সূর্যের সিঁদুর-রক্ত আলোর প্লাবন—এসে পড়েছে টিলার উপরে গাছে গাছে পাতায় পাতায়—বাংলোর দেয়ালে।

টিলার ঢালের উপরে কুলি লাইন—চা বাগানের কুলি লাইন। টিলার অনেক নিচে বাগানের কোন কেন্দ্রে বাগানের অফিস, কারখানা, বাবু মশাইদের বাসা বাড়ি—সে বাংলো থেকে দেখা যায় না। নিমাইকৃষ্ণের কাছে সেই চা বাগানের কোন অস্তিত্ব নেই—তার কাছে অনন্ত প্রকৃতি কেবল অন্তহীন রূপসী! নিস্তব্ধ রূপসী!

হঠাৎ যেন অতুলনীয় রূপসী অনন্ত প্রকৃতি সচল সবাক হয়ে উঠল। দিনের শেষে হাজিরা নিয়ে ফিরছে কুলির দল—যেন সাগরকূলে কিসের স্রোত প্রবাহ। নিচে থেকে টিলার ঢালে উঠে আসছে সারি সারি কুলি—কুলি রমণীর দল। তাদেরই মাথায় গায়ে এসে পড়েছে সিঁদুর রংগা অস্ত রবির রশ্মি আভা—যেন আলোর কণা ভেংগে ভেংগে পড়ছে। তন্ময় নিমাইকৃষ্ণ অপলক চেয়ে আছে।

হৈ রে উবশিয়া! ফিরে তাকায় স্রোত প্রবাহের পুরোভাগে নারী। আলোর আভা এসে পড়ে তার মুখে, নির্ঝরিণী যেন প্রতিহত হল শুভ্রশ্বেত শিলার গায়ে; প্রতিহত হয়ে শতধারায় যেন বিন্দু বিন্দু বিচ্ছুরিত হয়ে পড়ে সর্বাংগে—মুখ থেকে পায়ের নখে সর্বদিকে।

কেনে রে!—কলকণ্ঠ নীড়াভিমুখা পাখী কূজনের সুর ঝংকারে তরংগ তোলে বিস্তৃত বাতাসে। কুলি! আশ্চর্য হয়ে ভাল করে তাকায় নিমাইকৃষ্ণ। কুলি! সত্যি কুলিবালা।

কি-ই-ই হেলেক রে তুয়ার?—সুর তরংগে যেন পূরবীর মূর্চ্ছনা। কুলি রমণী! ছটকা মেরে মুখ ফিরিয়ে আনে উর্বশী—তরংগ হিল্লোলে সর্বাংগে তার ঢেউ খেলে যায়, মুখে যেন তার তখনও অস্তরবির রশ্মি রেশ রেণু ছড়িয়ে আছে। উদ্বেলিত উচ্ছসিত হয়ে ওঠে নিমাইকৃষ্ণের মন, উচকিত হয় তার সকল ইন্দ্রিয়।—কুলি! কুলি রমণী।

হায় প্রকৃতি অনন্ত রূপসী—তুমি অশেষ রসিকা—শিল্পী-শিল্পরসিকা! দিকে দিকে তোমার বিকাশ—পাহাড়ে

কন্দরে জলে-স্থলে বনে প্রান্তরে উদ্যানে ফুলে ফলে তোমার রূপ রূপপ্রস্রবণী! তন্ময় নিমাইকৃষ্ণ—সমস্ত অনুভূতি সমগ্র আবেগ সমুদয় দৃষ্টি একীভূত হল তার উর্বশী কুলি-রমণীকে ঘিরে।

সূর্য নেমে গেছে কৃষ্ণ কালো দিক-রেখার নিচে। পূবের আকাশ থেকে অন্ধকারের কালো ছায়া ছুটে চলেছে পশ্চিম দিগন্ত পানে। বাংলোর দিকে কুলি লাইনের সবশেষ কুটীর-সারির সামনে দিয়ে উর্বশী এগিয়ে চলে তার নিজ কুটীরটির দিকে। মাথার উপরে টুকরি—চা-পাতা তোলার ঝুড়ি—উর্ধে তোলা ডান হাতে ধরা—অন্ধকারের বুকে যেন শ্বেত শতদল—মলয়ের স্পর্শে যেন প্রতিটি পাপড়ি তার আন্দোলিত হিল্লোলিত হয়ে ওঠে—সূর্যের সিঁদুর রাংগা রং যেন অন্ধকারের স্পর্শে কেন্দ্রীভূত হয়ে শাদা হয়ে উঠেছে; উজ্জল দেহে শ্বেতবাস যেন অনাদিকালের শুভ্রতা শুচিতার ইংগিত!

নিমাইকৃষ্ণ তন্ময় একান্ত মনোগত। ফুল—ফুল—সুন্দর জায়গা বেছে সুন্দরের প্রকাশ হয় না—ফুল, সুন্দর ফুল কানন দেখে উপবন বেছে ফোটে না। সুন্দরের মাঝে ফুলের সৌন্দর্য নয়—ফুলের মধ্যেই সুন্দরের জন্ম! ফুলের সৌন্দর্যই উদ্যানের বুকে কাননের বুকে সুন্দরের করে সৃষ্টি! নিমাইকৃষ্ণ চেয়ে আছে—চেয়ে আছে কেন, দৃষ্টি যেন তার সেই বালার গতি ভংগীর প্রতিটি হিল্লোল গুণে গুণে অনুসরণ করে নেচে নেচে চলেছে। পাশে এসে দাঁড়ায় রমেন্দ্র—বন্ধু রমেন্দ্র।

কি রে; একেবারে কবি হয়ে গেলি নাকি? এ্যাঃ কতক্ষণ দাঁড়িয়ে আছি তার হুঁসই নেই বাবা? বলি জংগলের পূজারি—গাছ আর গাছই যাদের ধ্যান-জ্ঞান—প্রিয় বলতে জংগল, প্রিয়া বলতে বান্ধবী বিটপী—তাদের মনে কবিতা? অচলার প্রিয়তম একেবারে যে চঞ্চল কাব্য তরংগে ভেসে চলেছ হে!

চমকে উঠল নিমাইকৃষ্ণ—যেন স্বপ্নলোকে চলে গিয়েছিল সে—হাঁ স্বপ্নলোকেই। ঘুমোয় নি, নিজেকে ভোলে নি, হারায় নি নিজের সত্বা; তবু তবু—যেন মনটা তার কোন কল্পনার দেশে চলে গিয়েছিল। চমকে উঠল নিমাইকৃষ্ণ—বিমল হাসিতে মুখখানা ভরে গেল যেন—অসীম তৃপ্তি—যেন কি আরাম নিশ্চিন্ত শান্তি—যেন কত সুন্দর কত অপরূপ দেশ ভ্রমণ করে এই ফিরে আসছে। কবে, কখন এলে ডাক্তার? প্রশ্ন করে নিমাইকৃষ্ণ।

এই মিনিট পাঁচেক। ধুপ করে বসে পড়ে রমেন্দ্র পাশের চেয়ারটাতে।— তা অমন তন্ময় হয়ে এমন কি ভাবছিলে হে? কবিতা টবিতা লেখ নাকি?

অন্যমনস্ক হলেই কি লোকে কবিতা ভাবে নাকি? লজ্জার রক্তঝলক উঠে আসে নিমাইকৃষ্ণের গালে চোখের কোলে। আড় চোখে আর একবার তাকায় তবু উর্বশীর দাওয়ার উপরে।

মানে, একি অন্যমনস্ক? আমি এতক্ষণ দাঁড়িয়ে আছি হুঁস নেই তোমার, দেখতে পাওনা। এ তো কেবল কবিদের বেলায় নাকি হয়ে থাকে শুনেছি! তা তুমি একে বোটানির ছাত্র, তায় একেবারে বন-জংগলের অধিবাসী! কবি না হলে—

তা কেন! অব্যক্তের মাঝে কত কথা কত প্রাণ আছে—কত আছে তার গান! নয় তো Response in the Living and Non-living এর মূল্য কোথায় থাকত হে? জগদীশ বোসের Plant Response এর সবই তো তবে নিছক কবিতা বলে লোকে উড়িয়ে দিত—বিশ্বময় তবে আর এত হৈ-চৈ কেন?

তা যাক্ গে—বড় ক্লান্ত—একটু—

হাঁ—সিমরী।

পাহাড়ী মেয়ে সিমরী—কুড়ি বাইশ হবে বয়স; কিন্তু বড় করুণ তার মুখখানা। উঁচু স্বাস্থ্যপূর্ণ গড়ন, কটা রং—চওড়া চোয়াল; সেই চওড়া চোয়ালে মোটা নাকটা বড় নিচু ঠেকে; কিন্তু সত্যিকারের এপাক্ষী।—কি ভাইয়া! থমকে দাঁড়ায় সিমরী।

আমার দোস্ত—একটু চা আর কিছু—হাত তুলে রমেন্দ্রকে একটা ছোট্ট নমস্কার করে সংগে সংগে ফিরল সিমরী।

রমেন্দ্র নিমাইকৃষ্ণের দিকে তাকাল—চোখের কোণে কেমন যেন একটু সন্দেহ মিটিমিটি করছিল সে দৃষ্টিতে।

নিমাইকৃষ্ণ ভনিতা না করেই আরম্ভ করল—বহেন—বহেন পাতিয়েছি সিমরীর সংগে। বড় ভাল লক্ষী মেয়ে সিমরী; কিন্তু ভাগ্যহীনা অভাগিনী!

রমেন্দ্র সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে চেয়ে থাকে—চোখে অবিশ্বাসের

হাসি পাতলা পরদার মত দুলে দুলে উঠছে। নিমাইকৃষ্ণ অন্য দিকে মুখ করেই কথাগুলো বলছিল—বুকে যেন সত্যই বড় ব্যথা নূতন করে বেজে উঠছিল অভাগিনী সিমরীর কথা বলতে। রমেন্দ্রের দিকে না তাকালেও নিমাইকৃষ্ণ যেন কেমন বুঝতে পারে রমেন্দ্র সন্দেহ-চোখে চেয়ে আছে তার মুখের দিকে, তেমনি জোর দিয়ে বলে চলে—হাঁ, ভাই, বড় ভাগ্যহীনা; কিন্তু সোনার টুকরো মেয়ে!

বাঃ, অভাগী কেন বলছ মিছে; আমি তো দেখছি মহা-ভাগ্যবতী! সরকারী অফিসার নিমাইকৃষ্ণ বন্দ্যোর অনুগ্রহ লাভ করেছে!—আবার ভাগ্য তবে কাকে বলবে লোকে!—হা হা করে হাসে রমেন্দ্র।

সিমরী এল ট্রে হাতে—মালপো, পাকা পেঁপে কাটা, কলা—অন্ততঃ তিন জনার খাবার! মাঝখানকার টি-পয়ে রেখে ফিরে গেল। রমেন্দ্র কৌতুক দৃষ্টিতে মুখের দিকে ভাল করে দেখে নেয়—বিরস মলিন মুখ—অমন চোখ যেন স্থির অচঞ্চল—আবেগ আবেশের চিহ্ন মাত্র নেই।

নিমাইকৃষ্ণ জিভ কাটে—ছিঃ ওসব কথা মনে যায়গাও দিও না। বহেন—সত্যি ওযে ধর্মের বহেন আমার।

কেমন যেন একটু অবিশ্বাসের উঁকি ঝুঁকি রমেন্দ্রের মুখে চোখে দেখা দিল।—কিন্তু তুমি পেলে কোথায় বহেনটি?—মনে যা-ই থাক কথাগুলিতে সন্দেহ মিশিয়েই বললে রমেন্দ্র।

ভাই! পাহাড়ী শিকারী ছিল ঝমরু—এই বনের শেষে ছোট পাহাড়ী বস্তি, সেইখানে বাস করত ওরা—স্বামী-স্ত্রী। ওর বাপের বাড়িও ওই বস্তিতেই। ভাই ছিল একটা। ভাইটাকে নিজের কাছে রেখে পালন করেছে।...

সিমরী এল আবার—ট্রেতে চায়ের পট-কাপ চিনি দুধ। আর একটা টি-পয়ে রেখে টি-পয় শুধু আগেকার ট্রে সরিয়ে দুজনার সামনে এগিয়ে দিয়ে চলে গেল—নির্বিকার দৃষ্টি, ধীর সংযত গতি।

তারপর?—প্রশ্ন করে রমেন্দ্র।

নিমাইকৃষ্ণও স্নেহকরুণ দৃষ্টিতে সিমরীর নড়াচড়া দেখছিল। একটা দীর্ঘ-নিশ্বাস তার বুক ঠেলে বেরিয়ে এল।

হাঁ।—ভাইটাও ভগ্নীপতির সংগে থেকে ওস্তাদ শিকারী হয়ে উঠল। একদিন শালা-ভগ্নীপতি শিকারে বেরিয়েছে। আগে আগে ভগ্নীপতি পেছনে শালা—দুজনার হাতেই বন্দুক। হঠাৎ ঝপ্—সংগে গোংগানি শব্দ—ঝমরু পিছু ফিরে—অন্ধকার জংগল—আবছা আবছা দেখে বাঘ—কিন্তু ভানুয়া কই!—ভানুয়া সিমরীর ভাই। ঝমরু দিশা-হারার মত অন্ধকারেই তাক করে গুলি ছুঁড়ল দুটো। গিয়ে দেখে বাঘও পড়ে ভানুয়াও মৃত। ভানুয়াকে কাঁধে তুলে ঝমরু ছুটে আসে বস্তিতে—ভানুয়াকে মারল রে হামি, গুলি মারল, সিমরী ভাইয়া ভানুয়া—হা হা করে বুকফাটা চীৎকার করে ঝমরু।—নিমাইকৃষ্ণের চোখে জল ভরে ওঠে। রুমালে চোখ মুছে নেয় নিমাইকৃষ্ণ। গলাটা একটু পরিষ্কার করে নেয়।—সিমরী ছুটে আসে, ছুটে আসে বস্তির সবাই। ভানুয়ার ঘাড়ের উপরে দাঁতের চিহ্ন—জামাটা কাঁধের উপরে ছেঁড়া—পেশী কেটে নখের স্পষ্ট দাগ। সবাই বুঝল। ঝমরু কেবল হাউ হাউ কাঁদে—সান্ত্বনা মানে না। সবাই তাকে অনেক কষ্টে নিয়ে গেল সেই জংগলের মধ্যে টেনে। হাঁ—যা তারা বুঝেছিল। বাঘও নিয়ে আসা হল। ভানুয়ার মৃত দেহের উপরে সিমরী আকুলি বিকুলি কাঁদছে। ঝমরু ও অবোধ শিশুর মত কেবলই কাঁদে—ভাইয়া! অনেক কষ্টে প্রকৃত ঘটনা—জানা গেল। কিন্তু ঝমরুর বিশ্বাস তার দুটো গুলির একটাতে বাঘ মরেছে, কিন্তু দ্বিতীয়টা লেগেছে ভানুয়ার মাথায়। কপালে একটা গুলির দাগ ছিলও বটে।—সেই যে—ভানুয়াকে মারল—বলে কাঁদতে কাঁদতে ঝমরু বন্দুক হাতে বেরুল আর ফেরে নি। চার পাঁচ দিন পরে চিবুকের নিচে গুলির চিহ্ন, পাশে বন্দুক—ঝমরুর মৃতদেহ পাওয়া গেল জংগলের ধারে। সিমরীও তখন আধ-পাগল—ভাইয়া,ভাইয়া ভানুয়া—কেবল আকাশ-ফাটা কান্না—নায় না খায় না। স্বামীর মৃত্যু তাকে স্পর্শও করতে পারে নি। নিমাইকৃষ্ণের চোখ আবার জলে ভরে ওঠে—গলা ধরে এল; সে থেমে যায়।

তারপর?—শুধায় রমেন্দ্র।

হাঁ—নিমাইকৃষ্ণ গলা পরিষ্কার করে নেয়।—হাঁ। আমি তখন মার্কিং করতে গিয়েছি; হঠাৎ সিমরী আমার পায়ের কাছে এসে বসে পড়ে—পাগলিনীর মত—বলে

আমার ভাইয়া! জানি না কি আবেগ ছিল সেই কান্নায়। হঠাৎ আমার বুক ঠেলে বেরিয়ে এল—বহেন। ঘরে নিয়ে গেলাম বস্তিতে। কি করুণ কাহিনী! কিন্তু সিমরী আর বস্তিতে থাকবে না। আমার সংগে নিয়ে এলাম—উপায়ও নেই। সেই থেকে আছে। প্রায় বছর ঘুরে এল। আমার একটু সর্দি জ্বর হলেও ভাইয়া ভাইয়া করে পাগল হয়ে ওঠে।—একটা ভারি নিঃশ্বাস বেরিয়ে এল নিমাই-কৃষ্ণের বুক থেকে। রমেন্দ্রের মনটাও কেমন যেন ভারি হয়ে উঠেছে—ভারি নিশ্বাস তারও বুক ঠেলে বেরুল—তা আমিও তো এই এগারো মাস পরে আসছি ছুটির পরে।

হাঁ বল তোমার আমেরিকার অভিজ্ঞতা; নূতন কি কি শিখে এলে?

শীতের সন্ধ্যায় জ্যোছনা যেন ঝরণার ধারার মত স্রোত প্রবাহে ঝরে পড়ছে পৃথিবীর বুকে—শাদা কুয়াশা ঘরে ঘরে ছড়িয়ে পড়েছে। তারই উপরে সুন্দর জ্যোছনা প্রতিফলিত হয়ে আরও উজ্জ্বল হয়ে যেন ভেসে বেড়াচ্ছে, আর ঝরে পড়ছে দিকে দিকে।

শনিবারের সন্ধ্যা। জোছনা স্নাত পৃথিবীর মাটি স্পর্শ করে—ও কে?

ডাক-বাংলোর বারান্দায় বসে পশ্চিমে কুলি লাইনের দিকে চোখ পড়ে নিমাইকৃষ্ণের। এমনিতেই আজ কয়েক দিন ধরে নিমাইকৃষ্ণের মনটা বিশেষ ভাল নেই। পৃথিবীতে মানুষ কি স্ত্রী-পুরুষের কেবল একটা সম্পর্কই জেনেছে? স্ত্রী-পুরুষের কি আর কোন রূপ নেই, আর কোন ভাব কি আসে না তাদের মনে? কই। ঐ তো উর্বশী—অমন রূপ, অমন স্বাস্থ্য, অমন গতি ভংগী, অমন হাসি, অমন তার সর্বাংগের চঞ্চল ব্যঞ্জনা। কই আমার কাছে—আমার কাছে সে তো সুন্দরী—হাঁ কেবল সুন্দরী শুভ্র-শুচিতা বই তো আর কিছু নয়!—ভাবে নিমাইকৃষ্ণ—জ্যোছনা প্লাবনে পৃথিবীকে—উর্বশীকে সে সুন্দরের শুচিতার দৃষ্টি দিয়ে অনুভব করতে চেষ্টা করে। কিন্তু—ও কে?

পেছনে এসে দাঁড়ায় সুপ্রভা। তবে এ এ—যাই—নিমাইবাবু।

ফিরে তাকায় নিমাইকৃষ্ণ।

এঁ্যা—হাঁ। এস প্রভা। হাঁ দেখ মন থেকে তোমার ঐ বাজে কথাগুলো ঝেড়ে ফেলে দিও। মানুষের—

ফেলে রেখে দাও তোমার ওসব ছেঁদো কথা। ঝংকার দিয়ে ওঠে সুপ্রভা। তোমার মত লোকের নীতিই ঐ রকম। তোমরা মনকে চোখ ঠার দিতে চাও; তাই মিথ্যা আর ফাঁকি দিয়ে কেবলই মানুষ ঠকিয়ে বেড়াও—ধরা পড়লেও বাহানার অন্ত নেই—মিথ্যাকে মিথ্যা দিয়ে আরও—

প্রভা! ধমক দিয়ে ওঠে নিমাইকৃষ্ণ। রাগে ফুলতে থাকে সে।

কি—কি বলতে চাও তুমি—ছিঃ তুমি বাবাকে বৃথা আশা দিয়েছিলে। দাদাকে সেইদিনও ফাঁকি দিয়েছ। হাঁপাতে থাকে সুপ্রভা।

তোমায় কি বোঝাব প্রভা! মনে যে কথার কোন ভিত্তি নেই, তাকে প্রশ্রয় দিয়ে যদি মনে দুঃখ পাও আমার কিছু করার নেই।

ছিঃ—তোমার নজরটা এত নিচু, কোন দিন তো ধরা পড়েনি এর আগে।

নিমাইকৃষ্ণের চোখ দিয়ে যেন আগুন ঠিকরে বেরুচ্ছিল—হঠাৎ দৃষ্টি পড়ল সিমরী ঘরের মধ্যে দাঁড়িয়ে স্থির নিশ্চল। বড় লজ্জা হল—দুঃখ হল নিমাইকৃষ্ণের। কণ্ঠস্বর নিচু করে বলে—প্রভা! আবার তোমায় বলি—আমায় ভুল বুঝো না। ভেবে দেখো সুস্থির মনে—স্ত্রী-পুরুষের পরস্পরের মধ্যে দৈহিক সম্পর্ক ছাড়াও অন্য আরও সুন্দর কিছু আছে কি না! সুপ্রভা তখনও ফুলে ফুলে নিশ্বাস ফেলছিল। রমেন্দ্র তো দুদিন থেকে দেখে গিয়েছে। তোমার দাদা তো আর তোমায় মিথ্যা বোঝাবে না! আবার একটু কি ভেবে নেয় নিমাইকৃষ্ণ। তোমার বিয়ের কথা আমি আর ভাবব না; কিন্তু মিথ্যা চিন্তা নিয়ে আমাকে বিচার কর না।

হাঁ, তবু পাহাড়ীটাকে কিছুতেই ছাড়তে পারনা।

না-না না: প্রভা। নিজেকে অনেক নিচে নামিয়ে নিয়েছ; তার আর আমার কি করার আছে! ভাল আমি তোমাকে আজও বাসি, আরও বাসব—হয় তো নিজের মনে মনেই। কিন্তু, প্রভা—কিন্তু তোমার জন্য—শুধু তোমার জন্য কেন, কারুর জন্যই মা বোন ভাই ত্যাগ

করতে পারব না—একথা স্থির জেনে যেও।—নিমাইকৃষ্ণ অবজ্ঞাভরে মুখ ফিরিয়ে নিল। জ্যোছনা-প্লাবিত মাটির উপরে দৃষ্টি পড়ে তার—ওকে ?

উর্বশীর ঘরের সামনে চোখ পড়ল নিমাইকৃষ্ণের। ছি-ছি-ছি। একি বীভৎস প্রকৃতি। সুন্দরী রূপসী উর্বশী! এই কি সেই উর্বশী ? অর্ধনগ্ন বিস্রস্ত-বসনা উর্বশী—নিজে উন্মত্ত, নেশা পানে উন্মাদ পুরুষের কণ্ঠসংলগ্ন। ছি-ছি-ছি! প্রতিটি অংগ তার যেন উদ্ধত স্পর্ধায় প্রকৃতির বুকে তাণ্ডব তুলে দিয়েছে। নিরুদ্ধ নিঃশ্বাসে নিমাইকৃষ্ণ চোখ ফিরিয়ে নেয়। ছি-ছি! এই উর্বশীকে সে একদিন অন্ধকার বনানীর মাঝে শ্বেত শতদল বলে শ্রদ্ধা করেছিল! ছিঃ—সুন্দর প্রকৃতির একি নগ্ন রূপ। নারী মাত্রই কি পুরুষকে এমনি করে নিষ্পেষণে মেরে ফেলতে চায় ? তাই বুঝি প্রভার মনও এর উর্ধে—ও কে ?

সামনে বিস্তীর্ণ চা-গাছের মধ্য দিয়ে সোজা টানা রাস্তার দিকে সুতীক্ষ্ণ দৃষ্টি হানে নিমাইকৃষ্ণ। দেখ দেখ প্রভা চোখ খুলে দেখ—পাহাড়ী মেয়ে, একটা জংলী মেয়ে আমাদের সভ্য সমাজ থেকে কত উঁচুতে উঠে যেতে পারে। ঐ দেখ সিমরী ভাই চেয়েছিল, পুরুষে তার প্রয়োজন নেই। তাই সে ভাইকে সুখী দেখতে…দেখ দেখ! দেখ—মানুষ মানুষের সমাজের বাইরে কেমন বেঁচে থাকে।

সুপ্রভা রেলিং-এর ধারে এগিয়ে যায়। নিমাইকৃষ্ণ ছুটে নেমে যায় নিচে। সিমরী, বহেন! তুমার ঘর ছেড়ে কোথাকে যাবি বহেন। মোটর বাইকের স্টার্টের ফট্-ফট্ শব্দ সমস্ত বাংলোতে প্রতিহত হয়ে যেন বাগানের গাছে গাছে খান খান হয়ে পড়ল।

সিমরী তেমনি ধীর পায়ে সামনে এগিয়ে চলছে—থামল না, পিছু তাকাল না।

ভোঁ-ও-ভোঁস্ করে ছুটে বেরোল মোটর বাইক—হেড্ লাইটের আলোটা যেন হেসে হেসে নেচে নেচে এগিয়ে চলল সোজা টানা রাস্তা ধরে।

সুন্দর প্রকৃতি যেন আরও সুন্দর আরও মহিমাময়ী হয়ে দেখা দিল সুপ্রভার চোখের সামনে। জ্যোছনায় যেন মন্দাকিনী ধারা গলে গলে পড়ছে—মাটির বুকে যেন শুভ্রতার শুচিতার প্লাবন। এই তবে সত্য হোক। একটা দীর্ঘনিশ্বাস সুপ্রভার বুক ঠেলে বেরিয়ে এল। মুখে আপনি উচ্চারিত হল—সত্যম্ শিবম্ সুন্দরম্।

প্রদর্শনী

নিখিল সুর

মানব স্থাবর নয়, সে জঙ্গম। পৃথিবীর সাথে
তার বড়ই মিতালী ; দিনে যে উদ্ভাসিত, ম্লান হয় রাতে।
চোখের আড়ালে নটী সে যে, নাচে চোখের সামনে,
প্রস্তুতি নিজের, প্রদর্শনী সবার। পৃথিবী মানে
দীপ্তিরে, নাহি জানে উৎস। প্রকাশে সে খুশী,
জনমেই তৃপ্ত। প্রাণ আসে, পৃথিবীও ছুটে আসি
চুমু দেয় আবেগে, আশায়। স্বাদ পায় নতুনের,
গন্ধ পায় উচ্চতর সংস্কারের। কিন্তু অন্ধকারের
প্রাণী বুঝি ঝলসে যায় এত আলোর বন্যায়। মুছে যায়
প্রস্তুতি, প্রদর্শনী ব্যর্থ হয় বুঝি, পৃথিবী ভয় পায়।
কিন্তু তবুও মানুষ এ প্রকাশকে ধরতে চায় আঁকড়ে,
যদি সহ্যের সীমায় আসে এ আলোর তেজ। হায়!
অন্ধকার নেয় কেড়ে
পুনঃ তারে প্রস্তুতির পথে। এই জন্যই প্রদর্শনী, পরলোক
হউক প্রস্তুতি।
মৃত্তিকা বলে ; যবে তুই এসেছিলি, প্রাণে ছিল নতুনের
গীতি,
ছিল একমাত্র লক্ষ্য—সার্থক প্রদর্শনী। আমার বুকে পা
রাখার স্মৃতি
ফেলে এসেছিস বহুদূরে, আপনার কাছে
হয়েছিস প্রবীণ।
আশা মোর কত! আমি খেলা, তুই স্বয়ং প্রদর্শনী,
দেখাবি অনেক। সমকক্ষরে প্রাণ, রিক্ত এ হৃদয়। জানি
বাধা প্রচুর, তবুও স্মরণ রাখিস একটি কথা,
ব্যথা পেয়ে জয়ী হয়ে আছে সুখ, বাধাহীন
জীবন যে বৃথা।

শিল্পী-মানস ও ব্যক্তিত্ব-বাদ

অধ্যাপক প্রশান্তকুমার রায়

শিল্পের ক্রিয়াকাণ্ড খেয়ালের সামগ্রী নয়।

মানুষের সদাজাগ্রত মন বাইরের সকল কিছুর সঙ্গে মিলিয়ে নিজের মতামতকে বিশিষ্ট করে তোলে এবং বিশিষ্ট চিন্তা ও ধারণাগুলিকে কথায় ও কর্ম্মে ব্যক্ত করে অস্তিত্বকে ঘোষণা করে। যে-সব সামাজিক চিন্তা ও ধারণার সে বিরোধিতা করে সেখানেও মন সজাগ; ভালোমন্দ ন্যায়-অন্যায়, সুন্দর অসুন্দর, উচিত-অনুচিত বিচার শিল্পীর সামাজিক মন নিজের পরিবেশকে কখনই ভুলে থাকতে পারেন না। যা আছে তাকে স্বীকার করে, তাকে অবলম্বন করেই তার পাশ কাটাতে হবে, খারিজ করতে হবে। প্রয়োজন হলে তাকে অতিক্রম করতে হয়, তাকে পরিত্যাগ বা নস্যাৎ করতে হয়। সাধারণতঃ ঐ যে বলা হয়ে থাকে শিল্পী কিছু সৃষ্টি করে থাকেন, তার অর্থ, প্রমূর্তি গঠন উপাদান যার এক থেকেও বদল হতে হতে রূপান্তরিত চেহারা পরিগ্রহ করে পূর্বের স্মৃতিকে ভুলিয়ে দিতে সক্ষম হয়। তখন মনে হতে পারে, এ যেন পূর্বে ছিলনা, বর্তমানে অন্য কোথাও নেই—এ একেবারেই আবিষ্কার। গুঢ় অর্থে সমস্ত শিল্প রচনাই আবিষ্কার এবং আবিষ্কার দুই অর্থেই। যা ছিল প্রত্যক্ষ তার স্বরূপের সন্ধান দেওয়া, আর যা প্রত্যক্ষ ছিলনা তার প্রতিষ্ঠা—আবিষ্কারের উদ্দেশ্য। প্রথম পর্যায়ে শিল্পী সংগ্রাহক, দ্বিতীয় পর্যায়ে শিল্পীকে অনেকটা রাসায়নিকের কাজ করতে হয়—প্রথম পর্যায়ের পরিণাম দিয়ে একটা সত্যের প্রতীতি সৃষ্টি করাই তখন তার কাজ। শিল্পীর বিশেষ প্রবণতাই তাকে দুটোদিকের যে-কোন একটা পর্যায় বেছে নিতে বাধ্য করে। দুটো দিকে যার সমান নজর তিনি মহৎ শিল্পী, কালে ভদ্রে তার পরিচয় মেলে।

এই কথা বলা চলে শিল্পী মানস-নিরপেক্ষ নয় কিন্তু তার নিরন্তর প্রচেষ্টা নিরপেক্ষ ভূমিকা গ্রহণ করা। তার কারণ নিরপেক্ষ দৃষ্টির অধিকার না পেলে তার ব্যক্তিত্ব সম্যগ প্রকাশ পায়না অথচ শিল্পীর ব্যক্তিত্বের প্রকাশই যাবতীয় শিল্পের বিশিষ্টতা সম্পাদন করতে পারে। মাতৃমূর্তি আঁকতে পারেন অনেকেই। নাম করতে হয় র‍্যাফায়েলের মত দুর্লভ শিল্পীদের। ঐ সব ছবিতে-ভাস্কর্যে পরম-শিল্পীদের ব্যক্তিত্ব ফুটে আছে লাবণ্যের মত। তথাপি, শিল্প আস্বাদনের সময় শিল্পীর কথা আমাদের খুব একটা মনে পড়ে না। যে মানুষটির মানস-পটে ছবিটি প্রথম সঞ্চারিত হয়েছিল তার শিল্পীমানস দিয়ে যাচনদারের তেমন কিছু দরকার না থাকলেও কোন্ উপাদানকে বিশিষ্ট করে নিয়ে এই রকম একটা সুন্দরের অভিব্যক্তি ঘটল—তার ভাবনা গ্রহীতার বিস্ময়বোধকে তীব্র করে আস্বাদনের তৃষ্ণাকে বাড়িয়ে তুলবেই। তখনই আমরা প্রচলিত শিল্পরীতির আইন প্রয়োগ করে শিল্পের কলাকৌশলকে ব্যাখ্যা করে বুঝতে এবং বোঝাতে চেষ্টা করি, আর অনেক ক্ষেত্রেই আমাদের ব্যাখ্যা নিয়ে আমাদের মধ্যেই ঘোরতর বিরোধ দেখা দেয়। নিজের ব্যাখ্যা নিয়ে নিজেও খুশি থাকতে পারিনা তখন নিয়তিকৃত নিয়ম রহিত' বলে মনকে এক রকম করে বোঝাই বটে! শিল্পীর ব্যক্তিত্ব বুঝতে পারলে শিল্প-কর্ম্মের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা সম্ভব।

কিন্তু একের ব্যক্তিত্ব দিয়ে অপরের পরিচয় সম্পূর্ণরূপে সম্ভব নয়। তাই ব্যক্তিত্বের অস্তিত্ব শিল্প প্রকাশের কোথায় ধরা পড়ে তা কেউ নির্দেশ করতে পারেন না; অথচ তা লাবণ্যের মত অতি স্পষ্ট ছড়িয়ে থাকে—জমির সার যেমন ফসলের মধ্যে, জনকের অস্তিত্ব যেমন জাতকের মধ্যে বর্তমান, ঠিক তেমনি শিল্পীর ব্যক্তিত্ব তার শিল্প রচনায় আছে। তবে কি শিল্পীর ষ্টাইলের মধ্যেই তার ব্যক্তিত্ব খুঁজবো? এ প্রশ্ন অনেকের। ইংরেজীতে বলা হয়েছে Style is the man। সত্যি কথা, ঐ ষ্টাইলেই শিল্পীর মেজাজ বা মনোভাব বোঝা যায় কিন্তু চরিত্র বা ক্যারেক্টার তাতে ধরা পড়ে কমই। ষ্টাইলের বার বার পরিবর্তন হতে পারে, কবিতার এক রকম, গল্পের আরেক রকম। প্রবন্ধ, নাটকের পক্ষে যে ষ্টাইল, ভাস্কর্য বা ললিত কলায় তা খাটেনা। ষ্টাইল কোন আস্ত চরিত্র সৃষ্টি করে দেখাতে পারে না। কিন্তু ঐ আস্ত চরিত্রই চাই। ব্যক্তিত্বের মশলা দিয়ে চরিত্র গড়লে প্রতি ঘটনা সংঘাতে তা নতুন হয়ে উঠে। শিল্পীর ব্যক্তিত্ব যা সৃষ্টি করে তার চিন্তায় ষ্টাইলের প্রচেষ্টায় তার প্রকাশ ঘটে। ষ্টাইলকে চিহ্নিত করা যেতে পারে ব্যক্তিত্বের অর্গান বা মুখপাত্র হিসাবে। দুধের ক্ষীরের মত ব্যক্তিত্বকে দিয়ে ষ্টাইলের ছাঁচে ফেলে ক্ষীরের সন্দেশ তৈরীর কারিগরী বিদ্যেটার নাম শিল্পের ক্রিয়াকাণ্ড! ষ্টাইলের পেছনে ব্যক্তিত্ব বর্তমান কিন্তু ষ্টাইলই ব্যক্তিত্ব নয়। শিল্পীর ব্যক্তিত্ব কখনো ধরা পড়ে না। যে রাজা জোরজবরদস্তি করে আইন খাটাতে চায়, ষ্টেজে চিৎকার করে যে ব্যক্তিকে ঘোষণা করতে চায় সে প্রজাপুঞ্জের অথবা দর্শকের প্রিয়জন নয়। দৌরাত্ম্যে সে ধরা পড়ে গেছে বলে মূল্যহীন। শিল্পীকে ধরা পড়ে গেলে চলবেনা। নিজেকে সংগোপন রাখা সহজ কথা নয়। মহাকাব্যে কবির ব্যক্তিত্ব অতি গোপনে থাকে বলেই সৃষ্টি কার্য্য এত অসামান্য হয়ে উঠে। রঙ্গলাল বা হেমচন্দ্রের সাহিত্যে মহাকাব্যের ষ্টাইলটাই বড় হয়ে ওঠার ফলে কবিরা আত্মগোপন করবার সুযোগ পাননি, অথবা সে কলাকৌশলে আয়ত্ব করতে পারেন নি। মাইকেল মধুসূদন তার বীরাঙ্গনায় আত্মগোপন করবার অপূর্ব কলাকৌশল আয়ত্বে রেখেছিলেন বলেই তিনি অন্যান্য শিল্পীর প্রাপ্য সম্মান আজো ভোগ করছেন। তাঁর মেঘনাদবধকাব্য দুঃসাহসিক সৃষ্টি হলেও যেহেতু নিজেকে তিনি ষ্টাইলের মধ্যে অতি স্পষ্ট করবার চেষ্টা করেছেন তারি জন্যে আজো সমালোচনার পাত্র হয়ে রইলেন। বিহারীলাল গীতি কবিতা রচনা করলেও ব্যক্তিত্বকে তিনি আড়ালে রাখতে পেরেছেন।

রবীন্দ্রনাথের তো কথাই নেই। Subjective রচনা হলেই ব্যক্তিত্বের কথা উঠবে এমন কোন কথা নেই। রচনা Subjective হোক বা Objective হোক শিল্পীকে ব্যক্তিত্ব আড়ালে রাখার কলাকৌশলটি আয়ত্ত করবার বিশিষ্ট ষ্টাইলটি রপ্ত করতে হয়। শিল্পের ক্ষেত্রে যে অনুশীলনের প্রয়োজন হয়, তা এই ব্যক্তিত্বকে আড়াল করার অনুশীলনই বটে। ষ্টাইল সেই আবরণীর কাজ করে।

ব্যক্তিত্বেরও অনুশীলন দরকার। যে শিল্পী যত পরিশীলিত ব্যক্তিত্বের অধিকারী হন, তার শিল্পকীর্তি সেই পরিমাণে উজ্জ্বলতা পায়। জমিতে সার মেশাবার পরেও উপযুক্ত কর্ষণার দরকার। বিষয় বস্তু ছড়ানো আছে বাইরে। শিল্পীর মন তা গ্রহণ করে ভেতরে। গ্রহণ করার ব্যাপারে শিক্ষার অনুশীলনের দরকার আছেই। নিজেই মনকে প্রথমেই বক্তব্যের দ্বারা সংক্রামিত করতে হয়। তারপর ভাবরাজ্যের কথা উঠুক। শিল্পীর 'অহং'কে কাজে লাগাতে হবে, অমূর্তকে রূপ দেবার সাধনায়। যে সমস্ত Sentiment—intellectual, moral ও aesthetic—সংযুক্ত হয়ে মানস গঠন সূচনা করে তা পূর্ণায়ত করতে হলে অহংয়ের অস্তিত্ব ও পরিবেশের স্ব ধর্ম সম্পর্কে খুব সজাগ থাকতে হয়; তা না হলে ব্যক্তিত্ব খাঁটি হয়ে ওঠে না।

শিল্পী মানসের ব্যক্তিত্ব প্রধানতঃ সংযমের দ্বারা দৃঢ়ত্ব লাভ করে। অভিব্যক্তির সর্বক্ষেত্রে সংযম পাহারাদারীর কাজ করে। ফলে, শিল্পী নিজস্ব চিন্তার প্রতি সুস্থ আস্থা পোষণ করেন,গন্তার প্রত্যয়ে নিশ্চিন্ত হ'য়ে ওঠেন। নিজের প্রতি বিশ্বাস গভীরতর না হলে কোন শিল্পীই প্রতিষ্ঠিত হ'তে পারেন না। লিরিক উচ্ছ্বাসে রচনার শিল্পগুণ যতই চিত্ত চমৎকার উৎপাদন করুক না কেন, শিল্পী মানসের ব্যক্তিত্ব অনুপস্থিত থাকায় রচনার ষ্টাইলের দিকটাই অত্যন্ত চোখে পড়ে, হৃদয়ের গভীরে প্রবেশ করে না। সাহিত্যেও বলে যে দুটো কথা আছে অনেকের মতে ঐ দুয়ে মিলে ষ্টাইল, অন্ততঃ ইংরেজী মতে তা-ই। ভঙ্গী ও বিষয় মিলে ষ্টাইল সৃষ্টি হতে পারে কিন্তু ঐ ষ্টাইলকে নিয়ে এবং ষ্টাইলকে ছাড়িয়ে বা অতিক্রম করে শিল্পীর পার্‌সোনালিটি বা অন্যকথায় ব্যক্তিত্ব যখন অনন্য হ'য়ে ওঠে সেখানেই শিল্প সার্থক নাম, শিল্পী মহৎ আখ্যা পান। টি, এস্, এলিয়ট, এজ্‌রা পাউণ্ডের রচনায় ষ্টাইলের চমৎকৃতি উপভোগ্য, কিন্তু তাঁরা বেঁচে আছেন ষ্টাইল অতিক্রম করে ব্যক্তিত্বের মধ্যে। তাঁরা কোন কিছুর অনুকারক নয়, তাঁরা প্রথমে খাঁটি ও নিপুণ সংগ্রাহক, পরিণামে আবিষ্কারক। আমাদের জীবনানন্দ দাস, সুধীন দত্ত, এঁরাও আবিষ্কারকের মর্য্যাদা পাবেন এবং এঁদের সাথে মোহিতলাল মজুমদারের ও যতীন্দ্র সেনগুপ্তের নাম করতেই হয়। অনেক আধুনিক কবিদের মধ্যে ষ্টাইল আছে, কিন্তু ব্যক্তিত্ব প্রস্ফুটিত নয়। বিষ্ণু দে বড় কবি। বুদ্ধিকে নাড়া দেবার মত ষ্টাইল অর্জন করেছেন তিনি—তাঁর ভঙ্গী ও বিষয়বস্তু মূল্যবান—কিন্তু সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের রচনায় ব্যক্তিত্বের যে পরিচয় মেলে তাঁর কাব্যে তা জীবন্ত নয়। সুকান্তর ষ্টাইল চমকপ্রদ নয় কিন্তু ব্যক্তিত্বে দৃষ্টি আকর্ষণ করে অবারিত হৃদয়ে প্রতিষ্ঠা পেলেন তা কেবল ঐ গুণেই। ব্যক্তিত্ব যখন অপরের জিজ্ঞাসাকে গ্রাস করে অথবা স্তব্ধ করে দেয় তখন শিল্পী মানস বন্ধ্যা হয়ে আসে এবং তখনই দুর্বোধ্য শব্দসম্ভার বা রঙ রেখা দিয়ে শিল্পীরা দর্শক শ্রোতা পাঠকদের ভাবনাকে স্তম্ভিত করে দিতে চায়। এও স্বৈরাচার। নিজের লালিত্য অহংকে আরো বাড়তে দিয়ে নিজেই বিনষ্ট হয়। নিজের প্রতি বিশ্বাস এবং অপরের প্রতি শ্রদ্ধা পোষণ ব্যক্তিত্বের ধর্ম্ম। ধর্ম্মচ্যুতিই শিল্পীকে স্বৈরাচারী করে তোলে। তখন আর প্রগতির ভূমিকায় তাকে মানায় না। রাজনীতি ক্ষেত্রে হিটলারের যে ভূমিকা অনেকটা সেই অবস্থার সঙ্গে তুলনা করা যাবে ঐ সব শিল্পীদের। ঠিক এই যখন অবস্থা, তখনই শিল্পী যেন তার সৃষ্টির মহিমা প্রচারে বেরিয়ে পড়েন, সৃষ্টির পথ নির্দেশে কালক্ষয় করেন। নিজের মহিমায় নিজেই আবদ্ধ হয়ে পড়েন, দল গড়েন, আরো কবিতা পাঠ করুন বলে রাস্তার মোড়ে হানা দেন, সমাজ ধর্মীরা মিলে পরস্পরের স্তুতি ধ্বনিতে মুখর হয়ে ওঠেন। অন্যদিকে ব্যক্তিত্ব-প্রধান শিল্পীর প্রচারে অনিচ্ছা স্বাভাবিক। কারণ কোন সংজ্ঞাই তাঁকে নিশ্চিত প্রভাবিত করতে পারে না, না ঐতিহ্য, না বর্ত্তমানের প্রয়োজন, না ভবিষ্যতের সৌন্দর্য্য স্বপ্ন। তিনি যা করেন, যা ভাবেন, যা বলেন সমসাময়িক যুগের সঙ্গে যেমন তার যোগ নিবিড় থাকেই তেমনি সে নিজের ব্যক্তিত্বের দ্বারাই অপর ব্যক্তির বা সমষ্টির প্রয়োজন বা আকাঙ্ক্ষাকে শিল্প কর্ম্মে প্রয়োগ করেন।

কোন শিল্প রচনাই শিল্পীর ব্যক্তি সত্তাকে চিরকাল বাঁচিয়ে রাখতে পারেনা; কারণ নিত্য নতুন মানুষ তাদের পরিবর্তিত সমাজ ব্যবস্থা নিয়ে আসছেই। তাদের আকাঙ্ক্ষার মুখগুলি যদি ঝাপসা দেখে তবে সে শিল্পকে তারা পরিত্যাগ করবেই। উজ্জ্বল মুখ তারা দেখবে। শিল্পীর ব্যক্তিত্বের স্ফটিকে সেই উজ্জ্বল মুখ দেখা সম্ভব। তাই আজো সেদিনের প্রখ্যাত মৃত শিল্পীরা অমর হয়ে আছেন। আরেকদিকের দর্পণে দেখি, হালের ব্যক্তিত্বহীন অথচ ষ্টাইল-সর্বস্ব শিল্পীরা বর্তমানেই বিস্মৃত হতে চলেছেন, অবশ্য এমন হতে পারে, আগামী কালে এঁদের মূল্য দেওয়া হবে; তা হলে বুঝতে হবে, এক ধাপ তারা এগিয়ে গেছেন এবং প্রচারবাদীদের দৌরাত্ম্যে এ যুগে তাঁরা কোণঠাসা হয়ে পড়েছেন! অতিব্যবহারে একদিকে অনেক পদার্থের মত শিল্প সাহিত্যের দ্যুতিও ক্ষয় পায়, এ যেমন সত্য, তেমনি ব্যবহারে ঔজ্বল্য বেড়েও ওঠে, এও সত্য। যেমন হয়েছে সেক্‌সপীয়র, হোমর, বাল্মীকির ক্ষেত্রে। সত্যের অমৃত রূপ প্রত্যহ প্রদীপ্ত হয়। রবীন্দ্রনাথ বা শরৎচন্দ্রের অধিকাংশ উপন্যাসের জ্যোতি যে স্তিমিত হ'য়ে আসছে এ কথা অস্বীকার করে লাভ কি। ওদেশের টেনিসন, ডিকেন্স প্রমুখ অনেকেই যে প্রায় গুহাবাসী হতে চলেছেন তার কারণও ঐ এক। ছোট গল্পে ও কবিতা গানে ও অনেকগুলি নাটকের মধ্য দিয়ে রবীন্দ্রনাথ ক্রমশ উজ্জ্বলিত হচ্ছেন। শরৎচন্দ্রের শ্রীকান্তও তাই। কীট্‌স, সেলীর আবেদন বাড়ছে। গোর্কির অবস্থা উজ্জ্বলতর, পুস্কিনেরও তাই।

নিছক ভাবালুতায় শিল্প সাহিত্য হয় না। খেয়ালের বশে আর যাই হোক অপূর্ব বস্তু নির্মাণ সম্ভব নয়। বললাম, আলো, অমনি আলো জ্বলল—কথাটা ইলেক্‌ট্রিকের মিস্ত্রি বলতে পারেন; কারণ হাতের কাছে

তার সবই আছে, সুইচ টিপলেই হল ; কিন্তু যিনি আলোর কথা ভেবে ছিলেন সর্বপ্রথম তাঁর ব্যক্তিত্বের কথা, নিষ্ঠার কথা, তাঁর সত্য অনুশীলনের পন্থাগুলি খুব সহজ ছিল না। ব্যক্তিত্বের অভাব শিল্পের ক্ষেত্র কোন কিছু দিয়েই পূরণ করা যায় না, না অনুকরণে, না ফ্যাসনে না পাণ্ডিত্যে না কোন ষ্টাইলের চমকে। ব্যক্তিত্বের সঙ্গে চমকের কোন যোগ নেই, আছে গভীর প্রশান্তি আত্ম সম্প্রসারণের প্রবেগ। সচেতনা মহৎ শিল্পীর সহজাত ধর্ম্ম। পরিবেশের ধর্ম্ম, সামাজিক ব্যক্তি পুরুষের ধর্ম্ম বিবাগীর মত বিস্মৃত হলে কোন শিল্পীর ব্যক্তিত্বই বিশিষ্ট হয়ে ওঠে না। ষ্টাইল নয়, ব্যক্তিত্বই শিল্পীকে বিশিষ্ট করে তোলে। শিল্পের ক্রিয়াকাণ্ড খেয়ালের সামগ্রী নয়।

গায়ক কবি রামনিধি গুপ্ত

শ্রীদীপঙ্কর নন্দী

কবিকঙ্কন ভারতচন্দ্র ও কবিরঞ্জন রামপ্রসাদের পর বাঙ্‌লা সাহিত্যে কোন উল্লেখযোগ্য কাব্য রচিত না হওয়ায় কবিবর হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় দুঃখ করে লিখেছিলেন,

> আর কি আছে সে সুরভি ঘ্রাণ
> আর কি আছে সে কোকিল গান
> আর কি এখন সুগন্ধময়,
> গউড় নিকুঞ্জে মলয় বয় ?
> মুকুন্দ, ভারত, প্রসাদে শেষ
> শুকায়ে গিয়াছে সুধার লেশ।

সুধার লেশ কিন্তু একেবারে অন্তর্হিত হয় নি, এই সময় বাঙ্‌লা সাহিত্যে নিধুবাবু (রামনিধি গুপ্ত) শ্রীধর কথক, রাম বসু, হরু ঠাকুর, দাশরথী রায় প্রভৃতি কয়েকজন প্রতিভাবান কবির আবির্ভাব হয়। এঁদের রচিত অপূর্ব্ব ভাব, ভাষা ও রস মাধুর্য্যে অভিষিক্ত মধুর গান সে যুগে অসাধারণ সমাদর লাভ করে এবং বাঙ্‌লা সাহিত্যকে সমৃদ্ধির পথে অনেকখানি এগিয়ে নিয়ে যায়। বাঙ্‌লা ভাষা ও সাহিত্যের প্রথম ইতিহাসকার রামগতি ন্যায়রত্ন এই সময়কে গানের যুগ বলে অভিহিত করেন। এই সমস্ত গীত-রচয়িতাদের মধ্যে গায়ক-কবি রামনিধি গুপ্ত অন্যতম নন—প্রধান।

"উদভ্রান্ত প্রেমে"র অমর লেখক সমালোচক চন্দ্রশেখর মুখোপাধ্যায় লিখেছেন, "আমার বিবেচনায়, এই সকল গীত-রচকদিগের মধ্যে নিধুবাবু সময়ের হিসাবে যেমন সকলের অগ্রবর্ত্তী, প্রতিভা ও ক্ষমতার হিসাবেও তেমনি শ্রেষ্ঠ। প্রতিভার একটা প্রধান লক্ষণ এই যে তাহা সময়ের প্রভাব অল্লাধিক পরিমাণে অতিক্রম করিতে পারে এবং করিয়া থাকে। এই সময়কার গীত-রচকদিগের মধ্যে কেবলমাত্র নিধুবাবুর গানেই কালপ্রভাব অতিক্রমের নিদর্শন পাওয়া যায়।"

ঋষি রাজনারায়ণ বসু লিখেছেন, রামপ্রসাদের পর গীত রচনায় নিধিরাম গুপ্ত (নিধুবাবু) প্রসিদ্ধি লাভ করেন। ইহার প্রণীত গ্রন্থের নাম 'গীতরত্ন' গ্রন্থ। উহা সচরাচর "নিধুর টপ্পা" নামে প্রসিদ্ধ। নিধুবাবু ভারতচন্দ্রের জীবদ্দশাতেই জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন। *** নিধুর রচিত গীতে মধ্যে মধ্যে চমৎকার ভাব আছে।

> নির্ভয় শরীর মোর
> উল্লসিত অন্তর
> হৃদয় উদয় সদা প্রেমপূর্ণ চন্দ্র।

এই বাক্য মানবীয় প্রেম অপেক্ষা ঐশী প্রেমের প্রতি আরো অধিক খাটে।"

নিধুবাবু টপ্পা অর্থাৎ প্রণয়-সঙ্গীত রচনায় সিদ্ধহস্ত ছিলেন এবং এই প্রণয় সঙ্গীত রচনা করেই তিনি অমর হয়ে আছেন। বিদ্যাসুন্দরের পঙ্কিলতায় মানুষের মন যখন কলুষতায় ভরে উঠেছে, সেই সময় নিধুবাবু চিরাচরিত সেই কীর্ত্তন বা বাউল গান শুনিয়ে মানুষের ক্লান্ত মনকে ভারাক্রান্ত করতে চান নি। তিনি জীবনের বাস্তব প্রেম অবলম্বনে প্রণয় সঙ্গীত রচনা করেন, যা শুনে মানব-মন প্রেমরসে অভিসিক্ত হয়—প্রশান্ত শান্তিলাভ করে। বাঙ্‌লী যেন নিধুবাবুর প্রণয় সঙ্গীত শোনার জন্যই উৎকর্ণ হয়েছিল।

রামনিধি গুপ্ত ওরফে নিধুবাবুর জন্ম হয় ১৭৪১ খৃষ্টাব্দে ত্রিবেণীর নিকট চাঁপ্তা গ্রামে। কবির পৈত্রিক বাসস্থান কলিকাতায়—কুমারটুলী অঞ্চলে। কলকাতায় যখন বর্গির হাঙ্গামা হয় সেই সময় কবির পিতা কবিরাজ হরিনারায়ণ গুপ্ত কুমারটুলী পরিত্যাগ করে মাতুলালয় চাঁপ্তা গ্রামে আসেন। এই সময় কবির জন্ম হয়। চাঁপ্তা গ্রামের গ্রাম্য পাঠশালায় প্রাথমিক শিক্ষা শেষ করে কবি কলকাতায় ফিরে আসেন ইংরেজী শিক্ষা লাভের জন্য। কলকাতায় একজন ফিরিঙ্গীর নিকট কবির ইংরেজী শিক্ষা সুরু হয়। কয়েক বছরের মধ্যেই কবি ইংরেজী ভাষায় বুৎপত্তি লাভ করেন। সে যুগে কিছু ইংরেজী জানলেই চাকরী পাওয়া যেত। কবিও একটি চাকুরী পান প্রতিবেশী রামতনু পালিতের চেষ্টায়। ছাপরার কালেক্টারী অফিসের কেরাণীর চাকরী।

চাকুরী উপলক্ষে নিধুবাবু ছাপরা যাত্রা করেন। ছাপরায় অবস্থান কালে অবসর সময় তিনি সঙ্গীতপ্রিয় একজন মুসলমান ওস্তাদের নিকট সঙ্গীত-শিক্ষানবিশী গ্রহণ করেন। খেয়াল গজল প্রভৃতি

উচ্চাঙ্গ সঙ্গীত সম্বন্ধে তিনি জ্ঞানার্জ্জন করেন। তবে ওস্তাদের কাছে তিনি খুব বেশী কিছু শিক্ষা করতে পারেন নি। ওস্তাদের খুব বেশী কিছু শিক্ষা দানের ইচ্ছাও ছিল না—ওস্তাদের মনোভাব বুঝতে পেরে নিধুবাবু মিয়াসাহেবকে সেলাম জানিয়ে বিদায় গ্রহণ করেন।

ক্ষুব্ধ মনে গৃহে ফিরে এসে নিধুবাবু সঙ্গীত সাধনায় নিমগ্ন হন। দিনের পর দিন সঙ্গীত চর্চ্চার মধ্যে দিয়ে কেটে যায়। কখনও তিনি গান রচনা করেন, কখনও তালে সুর দেন, আবার কখনও সেই সুর সংযুক্ত গান করেন উদাত্ত কণ্ঠে। এইভাবে কয়েক বছর কেটে গেল। নিধুবাবু এক অভিনব বাঙ্‌লা গান সৃষ্টি করলেন। সুললিত হিন্দুস্থানী টপ্পা গানের সুর ও তাল অবলম্বনে তিনি এই গান রচনা করেন। এই গান নিধুর টপ্পা নামে খ্যাত। টপ্পা গানে নিধুবাবু কথা ও সুরের যে অপূর্ব্ব সমন্বয় ঘটিয়েছিলেন, তার তুলনা নেই। কবিবর ঈশ্বর চন্দ্র গুপ্ত লিখেছেন, বাঙ্‌লা গীতে রাজা সুরের ব্যাপারে ইনি (নিধুবাবু) যদ্রূপ ক্ষমতা প্রকাশ করেন, তাহাতে 'সারি মিয়া'র অপেক্ষা ইহাকে কোন অংশে ন্যূন বলা যাইতে পারে না। ইঁহার প্রণীত টপ্পাই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। যেমন হিন্দুস্থানে সারির টপ্পা তেমনি বঙ্গদেশে নিধুর টপ্পা। * * * নিধুবাবুর এক একখানি সুর খেয়ালের অপেক্ষা কৌশল কলাপে পরিপূরিত ও অতি মধুর।"

সঙ্গীত-সাধক নিধুবাবু যখন সঙ্গীত-সাধনায় বিভোর, সেই সময় একদিন ভাবাবেশে অফিসের ডেস্কে একটি টপ্পা গান লেখেন। এতে অফিসের অধ্যক্ষ নিধুবাবুর উপর অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হন এবং তাকে ভীষণ ভাবে তিরস্কার করেন। নিধুবাবুর প্রাণে লাগে। তিনি তৎক্ষণাৎ চাকুরীতে ইস্তফা দিয়ে সোজা কলকাতায় চলে আসেন।

কলকাতায় ফিরে এসে নিধুবাবুর সঙ্গীত চর্চ্চায় ছেদ পড়ে নি। তিনি প্রতিদিন বিখ্যাত জমিদার জয় মিত্রের পিতার বাসভবনে সঙ্গীতালাপ করতেন। সে গানের আসরে সহরের গণ্যমান্য লোক-সমাগম হত। সেকালের কলকাতার বিখ্যাত বৈঠক বটতলায় নিধুবাবু সঙ্গীতালাপ করতেন। বটতলার আসর উঠে গেলে দেওয়ান শিবচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের চেষ্টায় বাগবাজারের রসিক গোস্বামীর বাসভবনে গানের আসর বসে। এই গানের আসরে নিধুবাবু যে সমস্ত সঙ্গীত পরিবেশন করতেন তা ভাব, ভাষা, সুর ও রস মাধুর্য্যে অনন্য।

শুধু কলকাতায় নয়—সারা বাঙ্‌লা দেশে নিধুবাবুর সঙ্গীতের খ্যাতি ছড়িয়ে দেশবিদেশের সঙ্গীতাসরে নিধুবাবুর ডাক পড়তে লাগল। কিন্তু কলকাতা ছেড়ে কোথাও তিনি যেতেন না। মুর্শিদাবাদের মহারাজা মহানন্দ রায় ও বর্দ্ধমানের মহারাজা তেজচন্দ্র রায় কলকাতায় এসে নিধুবাবুর গান শুনে যেতেন।

কলকাতায় মহারাজা মহানন্দ রায়ের শ্রীমতী নামে এক অপরূপ সুন্দরী প্রণয়িনী ছিলেন। কলকাতায় এলেই মহারাজা শ্রীমতীর অঙ্গনে উঠতেন। সেখানে বসত গানের আসর এবং নিধুবাবুর ডাক পড়ত। মহারাজা নিধুবাবুর মধুর কণ্ঠের প্রণয় সঙ্গীত শুনতেন তন্ময় হয়ে। প্রতি রজনীতেই শ্রীমতীর বাড়ীতে নিধুবাবু সঙ্গীতালাপ করতেন। নিধুবাবুর প্রণয় সঙ্গীত শুনে শ্রীমতী নিধুবাবুর প্রতি প্রণয়াসক্ত হন। প্রেমিক নিধুবাবু শ্রীমতীর প্রেমের অপমান করেন, কিন্তু শ্রীমতীকে তিনি প্রাণের সহিত ভালবাসতেন। শ্রীমতীর সাহচর্য্যে নিধুবাবুর মনে নব নব ভাবের উদয় হয়, তা তিনি ভাবাও ছন্দে বেঁধে ফেলতেন এবং তাতে সুর সংযুক্ত করে গাইতেন। শ্রীমতী মুগ্ধ বিস্ময়ে সে গান শুনতেন, আর ভাবতেন এ গান তারই উদ্দেশ্যে রচিত—তারই উদ্দেশ্যে গাওয়া।

নিধুবাবুর প্রণয় সঙ্গীত আপন স্বাতন্ত্র্যে উজ্জ্বল। তিনি রাধাকৃষ্ণ বা বিদ্যাসুন্দরের প্রেম অবলম্বনে গান রচনা করেন নি। নিজের জীবনের প্রেম-বিরহ মিলন অবলম্বন করে স্বাধীনভাবে গান রচনা করেন। বাঙ্‌লা সাহিত্যে এ এক অভিনব বস্তু—নতুন জিনিষ। নিধুবাবুর প্রণয় সঙ্গীতে অশ্লীলতার স্পর্শ নেই;—আছে আত্ম সমর্পণের আকুলতা—

তোমার বিরহ সয়ে বাঁচি যদি দেখা হবে
আমি এই মাত্র চাই মরি তাহে ক্ষতি নাই
তুমি আমার মুখে থেকো, এ দেহ সফল সবে

অথবা—

খেও খেও প্রাণনাথ, প্রেম নিমন্ত্রণ,
নয়ন জলে স্নান করাব, কেশেতে মুছাব নয়ন।

মানুষের জীবনের যখন প্রেম আসে তখন সে প্রেমানন্দে আত্মহারা হয়। কিন্তু হায়! প্রেম তো চিরস্থায়ী নয়। প্রেমের পরেই আসে বিরহ। আলোর পরই অন্ধকার। প্রেমিক তখন বিরহ যন্ত্রণায় জর্জ্জরিত হয়—ঘন ঘন দীর্ঘ নিঃশ্বাস ত্যাগ করে। এইটাই জগতের নিয়ম। কিন্তু প্রেমিকের মন তো মানে না। প্রেমিক কবি নিধুবাবুরও মনে তাই প্রশ্ন জেগেছে :—

"তবে প্রেমে কি সুখ হতো
আমি যারে ভালবাসি সে যদি ভালবাসিত।
কিংশুক শোভিত ঘ্রাণে কেতকী কণ্টকহীনে
ফুল ফুটি, চন্দনে, ইক্ষুতে ফল ফলিত?
প্রেম সাগরের জল হইত শীতল
বিচ্ছেদ বাড়বানল যদি তাহে না থাকিত।

ইংরেজী ভাষার প্রথম ভারতীয় কবি কাশীপ্রসাদ ঘোষ নিধুবাবুর প্রণয় সঙ্গীত বা টপ্পা গান পাঠ করে মুগ্ধ হন এবং নিধুবাবুর ধরণের তিনশত প্রণয় সঙ্গীত রচনা করেন। কাশীপ্রসাদ তাঁর On Bengali works and writers ও "On Bengali Poetry" গ্রন্থদ্বয়ে নিধুবাবুর প্রণয় সঙ্গীতের সমালোচনা করেন। সমালোচনা উপলক্ষে তিনি নিধুবাবুর কিছু কিছু প্রণয় সঙ্গীত ইংরেজীতে অনুবাদ করেন। প্রেমিক কবি মধুসূদন নিধুবাবুর প্রণয় সঙ্গীতের অনুরাগী ছিলেন। একদা তিনি মুগ্ধ বিস্ময়ে বন্ধু গৌরদাস বসাককে লিখে-

ছিলেন, I mean to try Nidhoo's ode as soon I get my Pandit.

শুধু প্রণয়-সঙ্গীত নয়—অন্য ভাবের গানও নিধুবাবু রচনা করেছেন :

যদি সুখী হইবে হে মন রাজন,
অহঙ্কার দূর কর, ক্রোধ নিবারণ ॥

অথবা—

নানান দেশে নানান ভাষা
বিনা স্বদেশীয় ভাষা, পুরে কি আশা ॥
কত নদী সরোবর কিবা ফল চাতকীর ?
ধারা জল বিনে তার মিটে কি তিয়াসা ?

মাতৃভাষার প্রতি এমনি অকৃত্রিম অনুরাগ এক কবি ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত ছাড়া সে যুগের বাঙলা সাহিত্যে বিরল।

মৃত্যুর কিছুকাল পূর্ব্বে নিধুবাবু স্বরচিত গীতগুলি গ্রন্থাকারে প্রকাশ করেন। বলা বাহুল্য এই গ্রন্থের নাম 'গীতরত্ন'। 'গীতরত্ন' প্রকাশের কারণ প্রসঙ্গে তিনি লিখেছেন,

এই গীত সকলে বহু দিবসাবধি সুন্দর রূপ ব্যক্ত থাকাতে কোন প্রকারে মুদ্রাঙ্কিত করিয়া প্রকাশ করিতে আমার বাসনা ছিল না, এক্ষণে সময়ক্রমে এই কারণ বশতঃ সর্ব্বসাধারণ গুণগ্রাহীগণের অবগতির জন্য মুদ্রাঙ্কিত করিতে হইল। এই গীত সকলের অল্প অল্প অংশ অশুদ্ধ করিয়া আমার অজ্ঞাতে প্রচার করিতে লাগিল। কিঞ্চিৎকাল পরে তাহা হইতে অধিকাংশ ভুরি ভুরি বর্ণাশুদ্ধি এবং অশুদ্ধপদে পূর্ণিত করিয়া প্রচার করিল। এই নিমিত্ত বিবেচনা করিলাম, মৎকৃত সঙ্গীতসকল এক্ষণে ও যত্তপি বাস্তবিক এবং শুদ্ধরূপ প্রকাশিত না হয়, তবে হানি আছে। এই আশঙ্কা প্রযুক্ত প্রকাশ করিলাম।"

তথাপি নিধুবাবুর অনেক গান শ্রীধর কথকের নামে চলে। শ্রীধর কথকও সে যুগের একজন খ্যাতনামা কবি ছিলেন।

১৮৩৪ খৃষ্টাব্দে নিধুবাবু পরলোকগমন করেন। কবিবর নবকৃষ্ণ ঘোষ নিধুবাবুর প্রতি শ্রদ্ধার্ঘ্য নিবেদন করে লিখেছেন,

বাঙ্গালীর 'সারি মিঞা' তুমি গীতকার
টপ্পা গানে বাঙ্গালীর স্বকৃত গজল এ
'তোমারি তুলনা তুমি মহী মণ্ডলে'
রসে, ভাবে, সুরে, তব গীত একাকার
কি গভীর ভাব যোগ্য কথায় তোমার
ফুটিয়া তুলিয়া যেন যাদু মন্ত্র বলে
রবি করে পদ্ম পত্রে বারি কণা জ্বলে
প্রেমের স্বভাব তুমি, বুঝিলে সার।
সুরজ্ঞ সুপণ্ডিত তুমি সঙ্গীত কলায়
তাই সব প্রেম গাতে কথার বাঁধুনী
শক্তি পেয়ে সুর লয়ে মীর মূর্ছনায়
দ্বিগুণিত হয়ে আজো প্রাণে রাজে শুনি
প্রবাহিত করে গেছ তুমি বাঙলায়
মানবীয় প্রেম রস গীত সুরধ্বনি!

প্রশ্নের ফুল

সুনীল বসু

যদি কোনদিন ধূলা হয়ে মিশি পথের ধূলায়
প্রিয়তমা বলো সেদিনো হৃদয়ে থাকবে কী স্মৃতি ?
তোমার বাড়ির বাগানে ফিরবে পাখিরা কুলায়
সাঁঝের উঠোনে ছড়াবে তেমি মৃদু কলগীতি ?

আমার কক্ষ থাকবে শূন্য, টেবিলের পরে
পঠিত পুঁথির এলোমেলো গোছা থাকবে ছড়ানো,
জ্বলবে কি সেথা একটি বাতির শিখা ? ঘরে ঘরে
যাবে দক্ষিণী হাওয়া, তার সাথে তারার গানও !

উদাস চক্ষে বসবে কি ঘাটে, শ্যাওলা পিছল
দীঘির মুকুরে দেখবে কি মুখ ? ভাববে কী, চোখ—
সে-চোখের কালো বাসতাম ভালো, ভেবে ভেবে জল
আসবে কি নেমে প্রবাল কপোলে ? ধর্ম-যাযক—

হবে মহাকাল, মন্ত্র পড়াবে তারার আকাশ
প্রতিদিন এসে। মাটির শরীরে মিশে রব আমি,—
আমার স্মৃতির শবাধার ঐ মেঘ, কে বাতাস ?—
তার শববাহী, হেঁটে যাবে তারা অতি দ্রুতগামী।

সমস্ত রাত শিশিরে ঝরবে, টুক্‌রো কাঁচের
মত বাঁকা চাঁদ ঝাউবনে একা, জ্বলবে জোনাকি ;
এক ঘর গাঢ় ঘুম, তার মাঝে অন্ধকারের
আগুনে জ্বলবে রাঙা অঙ্গের হীরা ও সোনা কি ?

আঁধারে আলো

বৈভাবিক

ত্রিশ-পঁয়ত্রিশ বৎসর পূর্বের কথা। স্থানটা ঠিক মনে নেই—ঘটনা মনে আছে। দেশে জরিপের কাজ আরম্ভ হয়েছে। কানুনগো, আমিন, চেনম্যান গ্রামের এক বড়বাড়ীর নাকারি-ঘরে অফিস বসিয়েছে। মাঠের মাপ শেষ হয়েছে—এখন গ্রামের বাড়ী, বাগান, ভিটা এই সব বড় বড় শিকল ফেলে মাপ হচ্ছে—আর তাদের সাথে সাথে যখন যেখানে মাপ হ'চ্ছে তার মালিকেরা ও আশ-পাশের লোক নক্সা পরচা দলিল নিয়ে ভিড় জমাচ্ছে। পাথরঘাটা, লক্ষাচর, ঘাঘা, পাচুড়িয়া, বারপাড়া—পাঁচখানা গ্রাম ও তার মাঠের কাজ শেষ হ'ল প্রায় তিন চার মাসে। নিজ নিজ জমির সময়ই বেশির ভাগ লোক থাকত, কিন্তু বারপাড়ার দেবেন্দ্র মজুমদার, ঘাঘার আবদুল লতিফ বিশ্বাস, লক্ষাচরের লক্ষীকান্ত মণ্ডল—কেউ না কেউ দিনের মধ্যে কোনও সময় প্রায় সর্বত্রই উপস্থিত থাকতেন এই তিন-চারমাস। নাবালকের জমি, বিধবার সম্পত্তি কেউ কোন রকম ভুল রেকর্ড করাতে সাহস পায়নি। কোন কোন ক্ষেত্রে মালিক অনুপস্থিতও থাকতেন—মধ্যবিত্ত ঘরের অনেকেরই জমির আয়ে চলে না—তাই হয় ব্যবসা না হয় চাকরী স্থানে থাকেন। কিন্তু তাতে কিছু এসে যায়নি—ঐ বৃদ্ধদের সব নখদর্পণে। যা বলেছে আমিন তাই লিখে নিয়েছে। সব শ্রেণীর লোকই এই তিনজনকে খুব শ্রদ্ধা ভক্তি করত, তবুও প্রত্যেকেরই নজর ছিল স্বশ্রেণীর স্বার্থের প্রতিই নয়—স্ব-শ্রেণীর কেউ অন্য শ্রেণীর উপর অন্যায় না করে তারই প্রতি। 'মধ্যিডাঙার' একখানা জমি ওয়াদেদ লেখাল তারই নামে উঠবন্দি বলে। মালিক মাধব মণ্ডল। মাধব অনুপস্থিত। মেজে মিঞা—এই নামেই আবদুল লতিফ বিশ্বাস পরিচিত ছিলেন—কোন সম্প্রদায়ের লোকই কোন দিন অসাক্ষাতেও তার নাম উচ্চারণ করত না। আমিন বলল—মেজে মিঞা পুরাণ পরচায় তো 'প্রজার নাম' মাধব মণ্ডল—এখন কি ওয়াদেদের নাম লিখে 'সত্বের বিবরণে' উঠবন্দি লিখব? "কোন দাগড্ডা? ১৩২৬? না না না' পাঁচ বছরের 'খাই-খালাশি' চুক্তিতে মাধব ২৫৲ টাকা নিয়েছে—এডা হ'লগে তিরতীয় সন, আর দুই কসল পরেই জমি খালাশ—পরচায় যা আছে তা লেখে নেও" বাস্ আর দু'কথা নাই। কখনও কোন কথান্তর হ'লে এক অদ্ভুত উপায়ে এরা মীমাংসা করতেন। মেজেমিঞা বলতেন—ও গাজা! পশ্চিমির দিক্ মুখ কর—তারপর কও তোমার জমি—তাই লেখাব। লক্ষীকান্তর আর এক ভাগ—ও যুধিষ্ঠির! জমি পাড়ায়ে যাও তারপর কও তোমার জমি—মা ধরিত্তিরি যদি মিথ্যার ভার সন্ যার জমি তারও সবে। দেবেন্দ্র মজুমদার বাঙলা মোক্তার, ওসব ধার ধারেন না—গোটা কয়েক গালাগালি দিয়ে বলেন—রেকর্ড সংশোধনের মামলা ও না পারে আমরাই করবো, নড়ালের চিড়ে খাইয়ে আমাশা বের করে দেবো।

এঁদের উপস্থিতিতে সেবার জরিপের কাজ মোটামুটি ঠিকই হয়েছিল। বারপাড়ার গ্রামের রেকর্ডের সময় ঝোপ-জঙ্গলে এরা বড় একটা যেতে পারেন নি—পুরাণ পরচা দৃষ্টে এবং দু'একজন যারা ছিল তাদের কথা মতই রেকর্ড হয়ে গেল। কিন্তু একটু গলদ হল। এক বিধবার দুটি নাবালক ছেলে ও বৃদ্ধা শাশুড়ী—কে যায় জঙ্গলে জমির সীমানা দেখাতে! তাঁর 'যুগলের' ভিটার এক অংশে একটি পানের বরজ ছিল। আমিন জিজ্ঞাসা করল—এ বরোজ কার? উত্তর হল মধু দত্তের। মধুদত্তও অনুপস্থিত। দশ কাঠা 'যুগলে'র ভিটার তিন কাঠা রেকর্ড হল মধুদত্তের নামে। এরপর কাজ শেষ করে কানুনগো, আমিন্ সব অফিসপত্তর তুলে নিয়ে চলে গেলেন সার্কেলের হেড-কোয়াটার লক্ষীপাশায়।

দু' একদিন পরে কথাটা কানে উঠল দেবেন্দ্র মজুমদারের। তিনি এই গ্রামের এবং এর ভারও ছিল তাঁর উপর। মধুদত্ত গয়াকাশী করে সম্প্রতি বাড়ী ফিরেছেন। বারান্দায় বসে পানের গোছা তৈরি করছেন সকাল-বেলাতেই। বাজারে যাবেন, আবার কিছু পয়সাকড়ি সংগ্রহ [illegible] দরকার—তীর্থ সেরে আসলেন কয়েকটি ব্রাহ্মণের [illegible] ভাত না দিলে কি হয়! এই চিন্তাতেই

মগ্ন। হঠাৎ উঠানে দেখলেন, কাঁধে একখানা চাদর ফেলে লাঠি হাতে এসে দাঁড়ালেন দেবেন্দ্র মজুমদার—রাগে অগ্নিমূর্তি—একেবারে সাক্ষাৎ দুর্বাসা মুনি। কি মধু ধম্ম করে এলে? বসেন মজুমদারমশায়—আজ্ঞে আপনাদের আশীর্বাদে ফিরে এলাম—এখন ইচ্ছা করছি কয়েকজন ব্রাহ্মণের পাতে দু'টি ভাত দেবো।

থাম থাম—তোর আবার ব্রাহ্মণে ভক্তি—ধর্ম্মচ্যাণ্ডাৎ, বিশ্বাসঘাতক তোর আবার তীর্থ! 'যুগলে'র ভিটের যে বরজ করিস সেকি তোর জমি, যে তোর নামে রেকর্ড হ'ল?'

মধু দত্ত যেন আকাশ থেকে পড়লেন—সেকি তিনি তো বিন্দুবিসর্গও জানেন না। অল্প কথাবার্তার পরই মজুমদার-মশায় বললেন—চল তবে এখনই লক্ষ্মীপাশা, তোর নামে রেকর্ড হয়েছে—তুই গিয়ে বললেই সব গোল মিটে যাবে।

বৈশাখ মাসের মাথাফাটা রৌদ্রে চার মাইল পথ হেঁটে দুইজনে এসে উপস্থিত হলো সেটেলমেণ্ট অফিসে। কোন স্বার্থের জন্য নয়—একজনের শৈথিল্যে আর একজনের অজ্ঞাতসারে দুটি নাবালকের স্বার্থহানি হয়েছে তারই সংশোধন করতে। সুরেশ ভট্টাচার্য কানুনগো ধার্মিক লোক, সব শুনে তাদের অফিসারের কাছে নিয়ে গেলেন। মধু দত্ত লিখে দিলেন মৌজা বারপাড়া খতিয়ান—৭৭ হাল-দাগ ৪০৩ জমির পরিমাণ ১০/০—তন্মধ্যে তিনকাঠায় আমি বরজ করি—কিন্তু জমি আমার নয়—প্রকৃত নাম নাবালক ফণিভূষণ ও নিবারণচন্দ্র—পক্ষে অভিভাবিকা মাতা ভুবনেশ্বরী দেবী। হুজুরের রেকর্ড ঠিক করিতে আজ্ঞা হয়। মুখে বললেন—আমিনের কোন দোষ নাই—সে যা শুনেছে তাই লিখেছে।

ফেরবার পথে মধু বলল—আমার জন্য আজ বড় কষ্ট হল মজুমদারমশায়। ব্রাহ্মণ ভোজনের দিন আপনিও পায়ের ধুলো দেবেন।

পায়ের ধুলো দেবো কিরে হারামজাদা—তুই কি সে মধুপল্লির বড়িতে ফোঁটা ফেলার মধু—তুই হলি পদ্ম-মধু—এক ফোঁটা চোখে দিলি অনেক শালা অন্ধের দিষ্টি খুলে যাবে।

আরও অনেক কথা—মধুর গয়া কাশীর কথা সারা পথই চলল। হঠাৎ মজুমদার বলে উঠলেন—দুত্তোর তোর গয়াকাশী—এই যে নাবালকের স্বার্থে রোদে পুড়লি—এরই জন্যে তোর বিশ্বনাথ রাজমিস্ত্রী হয়ে স্বর্গের সিঁড়ি গড়ে দেবে। মধু বলল—সে আপনার জন্য।

* * * *

এখন শুনছি নানা কথা, কোথায় নাকি আমিন্, দু-পক্ষকে তুষ্ট করতে গিয়ে একপক্ষকে এমনই কষ্ট দিয়েছে যে পিঠে এসে পড়েছে লাঠি।

—লাঠি দিয়ে তো অন্ধকার তাড়ান যায়না—আলো জ্বাললে অন্ধকার যায়। তাই এই কাহিনী বলা বা তিনটি মেটে প্রদীপ জ্বালা—যদি কোনও একটি কোণেও আলো পড়ে।

নাগর স্থাপত্য

শ্রীঅপূর্বরতন ভাদুড়ী

মথুরা ও বৃন্দাবন

১৯২৬ খ্রীষ্টাব্দের জুন মাস। আমরা তখন দিল্লী প্রবাসী। তিন দিনের ছুটিতে কর্ম্মস্থল গোরক্ষপুর থেকে সস্ত্রীক জ্যেষ্ঠ পুত্র এসে হাজির। তার পরের দিন ছিল সূর্য গ্রহণ। ভোরে উঠে মটরে চড়ে ওকলায় যমুনাতে গ্রহণের স্নান করতে যাই। অব্যাহতি লাভ করি সহরের জন সমাগম থেকে। হয় কিছু ভ্রমণও।

ফিরবার পথে, বাসনা জাগে জ্যেষ্ঠ পুত্রের মনে, সকলে মিলে মোটরে করে মথুরা বৃন্দাবন ঘুরে আসবার। কন্যা তখন দিল্লীতে গ্রামের অবকাশ যাপন করছে, দেখে নাই সে মথুরা ও বৃন্দাবন, তাই এই প্রস্তাব। স্থির হয়, সেইদিনই খাওয়া দাওয়া করে, বেলা দুটোর মধ্যে রওনা হয়ে, মথুরায়, মথুরানাথের মন্দির ও দেব দর্শন করে, বিড়লার ধর্মশালায় রাত্রি যাপন করবো। পরের দিন ভোরে উঠে, বৃন্দাবনের সমস্ত মন্দির দর্শন করে, রাত্রিতে আগ্রায় উপনীত হব। তার পরের দিন, আগ্রাতে—তাজমহল, কেল্লা ও ইৎমদ্দোলা দেখে, দিল্লীতে ফিরবো।

অফিসে গিয়ে, গাড়ীটাকে "সার্ভিসের" জন্য পাঠিয়ে দিয়ে তিন

দিনের ছুটীর দরখাস্ত করি। গাড়ী "সার্ভিস" হ'য়ে এলেই বাড়ীতে ফিরে আসি। ঘড়িতে তখন দেড়টা। গাড়ীর হর্ণ শুনেই, জ্যেষ্ঠ পুত্র বেরিয়ে এসে বলে, সব প্রস্তুত, চাও তৈরী। এখন চা পান করে, জিনিস পত্র বেঁধে নিয়ে রওনা হওয়া বাকী। আধ ঘণ্টার মধ্যেই, আমি, আমার স্ত্রী, পুত্র, কন্যা, পুত্র বধূ ও চার বছরের নাতনীকে সঙ্গে নিয়ে মথুরা অভিমুখে রওনা হই। মথুরা রোড ও হার্ডিঞ্জ অ্যাভেনিউএর সংযোগস্থলের পেট্রল ষ্টেশন থেকে প্রয়োজনীয় পেট্রল ও মবিল ভর্তি করে নিয়ে, আমাদের গাড়ী বিদ্যুৎ বেগে মথুরা রোড দিয়ে চলতে থাকে।

আমরা একে একে অতিক্রম করি—নিজামুদ্দিন ও হুমায়ুনের সমাধি।

বুকে নিয়ে আছে নিজামুদ্দিন প্রবলপরাক্রান্ত বাদশাহ আলাউদ্দিন খিলজীর গুরু নিজামুদ্দিন আউলিয়ার সমাধি ও তাঁর নির্মিত মস্‌জিদ। স্থাপিত হয় এখানে একটি ধর্ম প্রতিষ্ঠান, পরিচালনা করেন সেই প্রতিষ্ঠান পরবর্তী গুরুরা। এর প্রাঙ্গণেই, বক্ষে তৃণ নিয়ে নীলাকাশের নীচে, চিরনিদ্রায় অভিভূতা, মুঘল সম্রাট সাজাহানের বিদুষী, পরম রূপবতী কন্যা, জাহানারা, অঙ্গে নিয়ে স্বরচিত কবিতা। শিষ্যা তিনি সমসাময়িক নিজামুদ্দিনের, দান করেন এই প্রতিষ্ঠানকে আঠারটি গ্রাম। শুনি, সেই গ্রামের উপসত্ব থেকেই আজও নির্বাহ হয় এই প্রতিষ্ঠানের সমস্ত ব্যয়। এই সমাধি ক্ষেত্রের অপর প্রান্তে, চির নিদ্রায় নিমগ্ন আছেন পার্শিয়ান কবি আমির খসরু।

নির্মাণ করেন মোগল বাদশাহ হুমায়ুনের সমাধি তাঁর প্রিয়তমা বেগম হামিদাবানু। চিরনিদ্রায় অভিভূত হ'য়ে আছেন তাঁরা দুই পাশাপাশি প্রকোষ্ঠে। পরে, পরিণত হয় এই সমাধি মুঘল রাজ পরিবারের সমাধি মন্দিরে, বুক নিয়ে একশ পঁচাত্তরটি সমাধি। এই সমাধি মন্দিরের একটি প্রকোষ্ঠে, লুক্কায়িত অবস্থায়, ইংরাজ কর্ত্তৃক ধৃত হন দিল্লীর শেষ বাদশাহ, দ্বিতীয় বাহাদুর শাহ।

মোটর এগিয়ে চলে, জাংপুরা অতিক্রম করে, বৃহত্তর দিল্লীর বাইরে এসে পৌছায়। দক্ষিণে, সবুজ ক্ষেত স্পর্শ করে অনুচ্চ শৈল মালার পদতল, বামে দিগন্তে গিয়ে মেশে। আমরা একে একে অতিক্রম করি কাল্‌কা দেবী আর ওকলা। দক্ষিণে, শৈল শীর্ষে, মন্দিরে বিরাজ করেন কাল্‌কা দেবী, এক বহু পুরাতন বিগ্রহ। বামে, দু'পাশের ঘনবনবীথি ভেদ করে, বঙ্কিম গতিতে অগ্রসর হয় পথ, উপনীত হয় যমুনা পুলিনে। নির্মিত হয় সেখানে যমুনার বক্ষে একটি অ্যানিকাট, তা থেকে খাল কেটে, জল নিয়ে যাওয়া হয় আগ্রা পর্যন্ত। শস্য শ্যামল হয় দু'পাশের জমি। অ্যানিকাটের ধারে, গড়ে ওঠে প্রমোদ উদ্যান, দিল্লীবাসীর ভ্রমণের স্থান, স্থান চড়ুই ভাতিরও।

মোটর নক্ষত্র গতিতে অগ্রসর হ'তে থাকে। আমরা ফরিদাবাদ অতিক্রম করি। বামে, দূরে, দেখা যায় প্রাচীন ফরিদাবাদের প্রাচীর-বেষ্টিত ভগ্ন প্রাসাদ, দক্ষিণে, নতুন ফরিদাবাদের বৃহৎ কলোনি। বাস করে এই কলোনিতে উত্তর পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশের দুর্দ্ধর্ষ উদ্বাস্তুরা।

একটি প্রাচীন অর্দ্ধ ভগ্ন প্রাচীরে বেষ্টিত প্রাসাদের সংলগ্ন পুষ্করিণীর ধারে এসে, আমাদের মোটর থামে। আমরা মোটর থেকে নেমে সতরঞ্চি বিছিয়ে কিছুক্ষণ বিশ্রাম করি। সঙ্গে আনা চা ও কিছু খাবার খাই। আবার গাড়ীতে উঠে বসি। গাড়ী ছোটে; দু'পাশের মহীরুহ ভেদ করে। রক্তিম হয় পশ্চিমের গগন। ক্রমে ধীরে ধীরে অস্তাচলে যান দেব দিবাকর, সন্ধ্যার অন্ধকার নেমে আসে দিগন্তে। ঘড়ির কাঁটার আর মাইল ফলকের প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ, হিসাব করতে থাকি কখন গিয়ে উপনীত হব মথুরায়, দর্শন হবে কি না মথুরানাথের সান্ধ্য আরতি।

হঠাৎ থেমে যায় গাড়ীর গতি, স্থির হয় একেবারে। ড্রাইভার অমর বলে, বন্ধ করে নাই সে গাড়ীর গতি, থেমেছে গাড়ী আপন ইচ্ছায়। নিশ্চয়ই বিকল হ'য়েছে কল। তবে দেরী হবে না নিরাময় হতেও। পৌছে যাব আমরা নির্দ্ধারিত সময়েই।

গাড়ী থেকে সবাই একে একে নেমে পড়ি। রাস্তার পাশে শুষ্ক, রুক্ষ জমির উপর গিয়ে বসি। অমর বনেট এর উপরে পরীক্ষা করে তার প্রতিটি অংশ। পায় না কোন দোষ। বনেট নামিয়ে ষ্টার্ট দেয়, সাড়া দেয় ইঞ্জিন, কিন্তু অগ্রসর হয় না গাড়ী। পিছন থেকে ঠেলি, তবুও অচল। মেকানিক অমর পরীক্ষা করে বারংবার। অবলম্বন করে সব রকমের সম্ভাব্য উপায়, কিন্তু সচল হয় না গাড়ী, অগ্রসর হয় না এক পাও। অতিক্রম করে সময়, মিনিটের পর মিনিট, ঘণ্টার পর ঘণ্টা। উত্তীর্ণ হয় সন্ধ্যা, রাত্রির অন্ধকারে ছেয়ে ফেলে চারিদিক। পরিত্যাগ করতে হয় গাড়ীর সচল হওয়ার সম্ভাবনা ও ছেড়ে দিতে হয় তার নিরাময় হওয়ার আশা। দুই পাশে জনহীন প্রান্তর, তার বক্ষ ভেদ করে গিয়েছে মথুরা রোড। ক্রমে থেমে আসে রাস্তার মোটর চলা, শেষে বন্ধ হ'য়ে যায় একেবারে। দর্শন মেলে না কোন পথচারীরও। নীরব, নিস্তব্ধ চারিদিক, এক ভীষণ আতঙ্কে পরিপূর্ণ হয় আমাদের অন্তঃকরণ। তবুও শেষ নাই অমরের গাড়ী সচল করবার প্রচেষ্টার, তাকে সাহায্য করতে থাকে আমার পুত্র অসিতকুমার।

এমন সময়, পিছন থেকে একখানি লরি এসে, আমাদের গাড়ীর পাশে থামে। নেমে পড়ে তার চালক। নামে তার কয়েকজন সঙ্গীও। এগিয়ে আসে তারা যন্ত্রপাতি নিয়ে আমাদের গাড়ীর কাছে। লেগে যায় অমরকে সাহায্য করতে। কিন্তু বিফল হয় তাদের সমস্ত প্রচেষ্টা। ধরতে পারা যায় না কোন খুঁত গাড়ীর, অথচ থেকে যায় সে নিশ্চল, নির্বিকার।

অতিবাহিত হয় আরও এক ঘণ্টা, মহা উৎকণ্ঠায় আর আতঙ্কে ছেয়ে ফেলে আমাদের অন্তঃকরণ। ভাবতে থাকি ভবিষ্যৎ কর্ম্ম-পদ্ধতি। এমন সময় এগিয়ে আসে লরির চালক আমাদের কাছে। বলে, যাচ্ছে তারা মথুরা হ'য়ে গোয়ালিয়রে, লরির পিছনে বেঁধে নিয়ে যাবে আমাদের মোটর, পৌছে দেবে গাড়ী সমেত মথুরাতে। আছে নাকি তাদের জানিত একটি ভাল আস্তানা মথুরাতে, পৌছে দেবে আমাদের মোটর সেই গ্যারাজে। রাজী নয় সে আমাদের এইরকম

অবস্থায় এই বিজন মাঠের মধ্যে ফেলে যেতে। ভাবি ভগবানের নির্দেশ। রাজী হয়ে যাই তার প্রস্তাবে, ফেলি স্বস্তির নিশ্বাস। আমার স্ত্রীর ধারণা, সেদিন, আমাদের বিপদ থেকে উদ্ধার করবার জন্য, সত্যিই লরি চালকের বেশে, স্বয়ং মথুরানাথ এসে, আমাদের হাত ধরে মথুরায় পৌঁছে দিয়েছিলেন।

কিন্তু কি দিয়ে, আমার মোটর, লরির পিছনে বাঁধা হবে? নাই কোন মোটা দড়ি বা লোহার শেকল তাদের কাছে, নাই আমাদের সঙ্গেও। ছিল আমাদের সঙ্গে হাত কুড়ি নারিকেলের দড়ি। শেষে তাই চারফেরতা করে পাকিয়ে সেই দড়ি দিয়েই লরির সঙ্গে আমাদের মোটর বাঁধা হয়। কাটে আরও অর্দ্ধ ঘণ্টা।

শেষে সত্যিই সুরু হয় আবার আমাদের যাত্রা। সূচীভেদ্য অন্ধকার, অজানা পথ নীরব নিস্তব্ধ চতুর্দিক, আমরা মথুরা অভিমুখে ধীরে ধীরে অগ্রসর হচ্ছি। আগে আগে চলেছে লরি; তার পিছনে আমাদের মোটর; ব্যবধান মাত্র চার হাতের। অগ্রসর হ'তে হ'চ্ছে লরির সম গতিতে, আর তার চালকের ষ্টিয়ারিং অনুসরণ করে। একটু অসাবধানতা, সামান্য মাত্র ব্যতিক্রম, ছিন্ন হবে রজ্জু, পড়ে থাকবে আমাদের গাড়ী পথের মাঝখানে অথবা সংঘাত হবে তার লরির সঙ্গে বিচুর্ণ হবে গাড়ী। চূর্ণ হবে আমাদের সর্ব্বাঙ্গ, হবে সকলের প্রাণান্ত।

একবার অমরের অন্যমনস্কতায় সত্যিই ছিন্ন হয় রজ্জু, এক ভীষণ ঝাঁকানি খেয়ে, আমাদের মোটর থেমে যায়, এগিয়ে যায় লরি। কিন্তু অতি সতর্ক লরির চালক। জানতে পেরে, অবিলম্বে, লরির গতি থামিয়ে দেয়, পেছিয়ে নিয়ে এলে আমাদের মোটরের সামনে দাঁড় করায়। তারপর, সেই ছিন্ন রজ্জু মেরামত করেই, আবার বাঁধা হয় আমাদের মোটর লরির পিছনে। অতিবাহিত হয় আবার অর্দ্ধ ঘটা। কিন্তু ছোট হয় ব্যবধান, আরও বিপদ সঙ্কুল হয় আমাদের গাড়ীর লরির পিছনে চালান। ভীত শঙ্কিত অমর, জানা নাই তার রাস্তা, সীমাহীন অন্ধকারে অদৃশ্য সামনের লরি। ভাবে পড়েছে কোন ডাকাতের পাল্লায়। কম্পিত হয় তার হস্ত, শিথিল হয় তার মুষ্টি ষ্টিয়ারিংএর অঙ্গ থেকে, এগিয়ে যায় মোটর, বেঁচে যায় সংঘাতের হাত থেকে, এক চুলের জন্য। ঘটে এই ঘটনা আরও কয়েকবার। এক সীমাহীন আতঙ্কে পরিপূর্ণ হয় আমাদের সকলের অন্তঃকরণ, প্রতীক্ষা করতে থাকি অবধারিত মৃত্যুর, গাড়ীশুদ্ধ সকলের জীবনান্তের।

অবশেষে, রাত্রি এগারটায় আমরা নিরাপদে মথুরার রাস্তাও মথুরা রোডের সংযোগ স্থলে উপনীত হই। ফেলি মুক্তির নিশ্বাস—পেয়ে সুনিশ্চিত মৃত্যুর হাত থেকে। গাড়ী থেকে নেমে লরির চালকের সঙ্গে রাস্তার সংলগ্ন গ্যারাজে উপনীত হই। সেখান থেকে একটি সুশ্রী বালককে সঙ্গে নিয়ে আবার গাড়ীতে উঠে বসি। লরি ছাড়ে; সেই সঙ্গে আমাদের গাড়ীও। মাইল খানেক এসে সেই চালকের প্রদর্শিত একটি গ্যারাজের সামনে আসে। গ্যারাজে মোটর রেখে আমরা সকলে লরিতে উঠে বসি। পাঁচ মিনিটের মধ্যেই একটি হোটেলে উপনীত হই। স্থান মেলে নীচের তলায় একটি নাতি-প্রশস্ত ঘরে। লরি চালক তার সঙ্গীদের সাহায্যে আমাদের জিনিস পত্র সেই ঘরে রেখে দিয়ে বিদায় নেয়। অনেক সাধ্যসাধনাতেও, এমন কি মিষ্টি খাওয়ার জন্যও, তাকে একটি পয়সা নিতে রাজী করাতে পারি নি। দেবদূতের মতই তার আবির্ভাব, আবার দেবদূতের মতই কার্য সমাপনান্তে তার প্রস্থান। কিন্তু রেখে যায় সে এক অক্ষয় স্মৃতি, আমাদের মণের মণিকোটায় যা আজও হয় নি ম্লান।

বিষ্ণুর অবতার, শ্রীকৃষ্ণের লীলাভূমি, মহাপুণ্যতীর্থ হিন্দুদের, এই মথুরা, দাঁড়িয়ে আছে যমুনার দক্ষিণ তীরে। জন্মগ্রহণ করেন এই মথুরায় উগ্রসেনের পুত্র, প্রবল পরাক্রান্ত নৃপতি কংসের কারাগৃহে, যাদব বসু-দেবের ঔরসে, রাজভগ্নী দেবকীর গর্ভে শ্রীকৃষ্ণ। দৈববাণী শোনেন নৃপতি কংস, মৃত্যু বরণ করতে হবে তাঁকে, ভগ্নী দেবকীর পুত্রের হস্তে। তাই যখনই সন্তান-সম্ভাবনা হয় দেবকীর, আবদ্ধ হন তিনি কারাগৃহে। হত্যা করা হয় তাঁর সন্তানকে ভূমিষ্ট হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই। নিহত হয় তাঁর সম্ভাব্য হত্যাকারী। এবারেও নিক্ষিপ্ত হন দেবকী কারাগৃহে। ঘোর তামসী নিশি, সূচীভেদ্য অন্ধকার, নিস্তব্ধ চারিদিক। শোনা যায় শুধু ঝড়ের রুদ্র গর্জন আর মুহুর্মুহুঃ অশনি সম্পাতের শব্দ। আসন্ন তাঁর সন্তান ভূমিষ্ট হওয়ার সময়। দ্বারের অপর প্রান্তে, কম্পমান দেহে, উৎকণ্ঠিত অন্তঃকরণে বসুদেব দাঁড়িয়ে। ভূমিষ্ঠ হয় সন্তান, হন ভগবান বিষ্ণু। দৈব নির্দেশ পান বসুদেব তাঁকে গোকুলে নন্দ গোপের গৃহে দিয়ে যেতে। সন্তানকে বক্ষে ধারণ করে, তিনি দ্রুত গতিতে অগ্রসর হন, নিঃশব্দ পদক্ষেপে উপনীত হন কারাগৃহের দ্বারে। দেখেন নিদ্রিত প্রহরী বৃন্দ। দ্বার অতিক্রম করে নিষ্ক্রান্ত হন কারাগৃহ থেকে, উপনীত হন রাজ পথে। আলোড়িত তখন দিগন্ত, ঝড়ের উদ্দাম বেগে, শোনা যায় তার প্রলয় নাচনের শব্দ, আকাশের বুক চিরে চমকিত হয় বিদ্যুৎ, উদ্ভাসিত হয় চতুর্দিক। ভ্রূক্ষেপ নাই বসুদেবের, অগ্রসর হন তিনি। অতি দ্রুত তাঁর গতি, উপনীত হন যমুনা-পুলিনে। দ্বিধা বিভক্ত হয় যমুনা তাঁদের আগমনে। রচিত হয় পারাপারের পথ। সেই পথ অতিক্রম করে, উপনীত হন তিনি অপর পারে। উপস্থিত হন নন্দালয়ে। বলেন নন্দ, এই মাত্র তাঁর স্ত্রী যশোদা প্রসব করেছেন একটি কন্যা। বসুদেব ভাবেন, এও ভগবানের নির্দেশ। পরিবর্তিত হয় সন্তান। স্থাপিত হয় দেবকীর নন্দন সংজ্ঞাহীনা যশোদার অঙ্কে। বুকে তুলে নেন বসুদেব তাঁর কন্যাকে। মথুরায় ফিরে এসে, স্থাপন করেন সেই কন্যাকে রক্তস্নাতা দেবকীর কোলে। তখনও নিদ্রিত রাজপুরী। প্রভাতে উঠে কংস দেখেন, প্রসব করেছেন দেবকী একটি কন্যা। যৌবনে উপনীত হ'য়ে শ্রীকৃষ্ণ কংসকে বধ করেন।

মধ্যমণি তিনি, মহাকাব্য মহাভারতের। অধিপতি মথুরার আর দ্বারকার, এক মহামানব পুরুষোত্তম। বিবাহ করেন তাঁর বৈমাত্রেয় ভগ্নী সুভদ্রাকে হস্তিনার (বর্ত্তমান মীরাট জেলায়) কুরুবংশের নৃপতি পাণ্ডুর তৃতীয় পুত্র অর্জ্জুন। স্বয়ংবর সভায় লক্ষ্য ভেদ করে বিবাহ করেন পঞ্চ-পাণ্ডব, যুধিষ্ঠির, ভীম, অর্জ্জুন, নকুল ও সহদেব, পাঞ্চাল-রাজ দুহিতা

দ্রোপদীকেও। নির্মিত হয় দ্বিতীয় রাজধানী ইন্দ্রপ্রস্থে (বর্ত্তমান দিল্লীতে)। রাজ্যের অধিকার নিয়ে মহাসমর হয় পবিত্র কুরুক্ষেত্রের বিস্তীর্ণ মাঠে, পাণ্ডবদের সঙ্গে, পাণ্ডুর জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা জন্মান্ধ ধৃতরাষ্ট্রের পুত্রদের, দুর্যোধনদের শত ভ্রাতার। সহায় হন পাণ্ডব পক্ষে শ্রীকৃষ্ণ, হন পাঞ্চালরাও। অপর পক্ষে যোগদান করেন ভীষ্ম, দ্রোণ, কর্ণ আর ভারতের সমস্ত রাজন্যবর্গ। জয়ী হন পাণ্ডবগণ। প্রতিষ্ঠিত হয় ভারতে এক ধর্ম রাজ্য, পুরুষোত্তম শ্রীকৃষ্ণের সহায়তায়। অবসান হয় বিচ্ছিন্ন বিভিন্ন ক্ষুদ্র রাষ্ট্রের। যুদ্ধক্ষেত্রে তাঁর মুখ-নিসৃত উপদেশ নিয়ে রচিত হয় ভাগবত-গীতা, শ্রেষ্ঠ ধর্মগ্রন্থ ভারতের।

ধ্বংস হয় যদুবংশের দ্বারকায়, মৃত্যুবরণ করেন শ্রীকৃষ্ণ ব্যাধের শরাঘাতে, দ্রোপদীকে সঙ্গে নিয়ে মহাপ্রস্থান করেন পঞ্চ পাণ্ডব। যাত্রার পূর্বে মথুরানগরে দূত পাঠিয়ে যদুবংশের একমাত্র বংশধর, কৃষ্ণের প্রপৌত্র, উষা ও অনিরুদ্ধের পুত্র বজ্রকে আনিয়ে ইন্দ্রপ্রস্থের সিংহাসনে অভিষিক্ত করেন।

আছে তার আগেরও এক ইতিহাস। মহাদেবকে সন্তুষ্ট করে লোনার জ্যেষ্ঠ পুত্র, মধু দৈত্য লাভ করেন একটি শূল। মহাদেবের বরে, অবধ্য হবে মধুর পুত্র, যতদিন এই শূল তার হাতে থাক্‌বে। এই বর লাভ করে, মধু নির্মাণ করেন একটি অপরূপ সুন্দর নগর, পরিচিত মধুপুরী নামে। মধুর পুত্র লবণ দৈত্য লাভ করে সেই শূল, মধুর বরুণালয়ে প্রয়াণের পর। মহা-অত্যাচারী এই লবণ দৈত্য, ত্রিভুবন কম্পিত তার অত্যাচারে। বিঘ্ন হয় তপোবনে মুনি ঋষিদের তপস্যারও। শেষে একদিন ভার্গব, তার অত্যাচারের প্রতিকারের জন্য, অযোধ্যায় শ্রীরামচন্দ্রের নিকট উপনীত হন। প্রেরিত হন সসৈন্যে ভ্রাতা শত্রুঘ্ন লবণকে দমন করতে। নিহত হন শূলহীন লবণ শত্রুঘ্নের হস্তে। নির্মাণ করেন শত্রুঘ্ন মধুপুরীতে একটি সুবর্ণ পুরী। পরিচিত হয় সেই পুরী মথুরা নামে। মহাসমৃদ্ধিশালী সেই মথুরা, বাস করেন এসে সেখানে শূরসেনরা রাজত্ব করেন সেই পুরীতে শত্রুঘ্ন দ্বাদশ বৎসর। খ্রীষ্টপূর্ব্ব ষষ্ঠ শতকে পরিণত হয় মথুরা (শূরসেন) ভারতের ষোড়শ মহাজন পদের —অঙ্গ, কাশী, কোশল, মগধ, বৃজি, মল্ল, চেদি, বৎস, কুরু, পাঞ্চাল, মৎস, সুরশেন, অশ্মক, অবন্তী, গান্ধার ও কম্বোজের অন্যতম।

মৌর্য সম্রাট চন্দ্রগুপ্ত ও অশোকের আমলে মথুরা মগধের অধীনে আসে। পরিণত হয়. মথুরা মহাসমৃদ্ধ শালী নগরে, হয় বৌদ্ধ মহাতীর্থেও, কুষাণ সম্রাট কণিষ্কের রাজত্বকালে। ইউচি নামে এক যাযাবর জাতির শাখা এই কুষাণরা, আদিম অধিবাসী চীনদেশের কানসু প্রদেশের, প্রাধান্য লাভ করেন তাঁরা ভারতবর্ষে, প্রথম কদাফিসের নেতৃত্বে, পহলব আর শকেদের শাসনের অবসানে। কনিষ্ক, সর্বশ্রেষ্ঠ রাজা এই বংশের, অধিরোহণ করেন কুষাণ। সিংহাসনে খুব ।সম্ভব ৭৮ খ্রীষ্টাব্দে। স্থাপিত হয় রাজধানী পুরুষপুরে (বর্ত্তমান পেশোয়ারে। মহাপরাক্রমশালী তিনি, বিস্তৃত হয় তাঁর রাজ্যের সীমানা গান্ধার থেকে বিহার পর্যন্ত।

ভারতের বাইরে, ।মধ্য এসিয়ার মালভূমি পর্য্যন্ত কাশ্মীরও তাঁর অধিকারে আসে। পৃষ্ঠপোষক তিনি নাগার্জ্জুন প্রবর্তিত বৌদ্ধধর্মের, শিল্প সাহিত্যেরও। নির্মাণ করেন রাজধানী পুরুষপুরে, বুদ্ধের দেহাবশেষের উপর একটি মহামহিমময় চৈত্য, বুকে নিতে অপরূপ, সুন্দরতম গান্ধার স্থাপত্যের নিদর্শন, গ্রীকের অঙ্গ সৌষ্ঠবতা আর ভারতের পেলবতা ও আধ্যাত্মিকতা। নির্মিত হয় কাশ্মীরে, কনিষ্কপুরে আর মথুরায় বহু সংঘারাম (বিহার), হয় বহু সুদৃশ্য হর্ম্যও। অলঙ্কৃত করেন তাঁর রাজসভা আয়ুর্বেদ শাস্ত্র প্রণেতা চরক, দার্শনিক নাগার্জ্জুন আর অশ্বঘোষ। বহুমুখী প্রতিভার অধিকারী এই অশ্বঘোষ, খ্যাতিলাভ করেন তিনি এক-ধারে. কবি, নাট্যকার, সঙ্গীতজ্ঞ, দার্শনিক ও ধর্মাচার্যরূপে। রচনা করেন তিনি বহু গ্রন্থ, শ্রেষ্ঠ তাদের মধ্যে বুদ্ধ চরিত আর সূত্রালঙ্কার। তেইশ বৎবস রাজত্ব করে কনিষ্ক পরলোকে গমন করেন।

রাজত্ব করেন একে একে বশিষ্ক আর হুবিষ্ক। নির্মাণ করেন হুবিষ্ক একটি সুন্দরতম সঙ্ঘারাম মথুরাতে, অঙ্গে নিয়ে প্রকৃষ্টতম শিল্প সম্ভার। বাসুদেব, শেষ উল্লেখ যোগ্য রাজা, এই বংশের। অবসান হয় কুষাণ ক্ষমতার, পরিসমাপ্তি হয় কুষাণ আধিপত্যের ভারতে খ্রীষ্টীয় তৃতীয় শতকে। গুপ্তেরা অধিকার করেন তাঁদের সাম্রাজ্য।

মহাপরাক্রান্ত এই গুপ্ত সম্রাটরা, রাজত্ব করেন মগধে প্রবল প্রতাপে ৩২০ থেকে ৪৯৫ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত। শ্রেষ্ঠ তাঁদের মধ্যে সমুদ্র গুপ্ত, চন্দ্রগুপ্ত বিক্রমাদিত্য, কুমারগুপ্ত মহেন্দ্রাদিত্য, আর স্কন্দগুপ্ত বিক্রমাদিত্য। বিস্তৃত তাঁদের রাজ্যের সীমানা, উত্তরে হিমালয়ের পাদদেশ, দক্ষিণে নর্মদা, পূর্বে ব্রহ্মপুত্র আর পশ্চিমে আরব সাগরের উপকূল পর্যন্ত। আসে তাঁদের অধিকারে পশ্চিম উপকূলের, সুপ্রসিদ্ধ বন্দর ভৃগুকচ্ছ আর সূর্পারক। মহাসমৃদ্ধিশালী হয় ভারত বৈদেশিক বাণিজ্যে, উপনীত হয় চরমে। বিদ্বান গুপ্তসম্রাটরা নিজেরা, পৃষ্ঠপোষক বিদ্যার, সংস্কৃতির আর শিল্পের, উন্নতির শ্রেষ্ঠ শিখরে উপনীত হয় ভারতের শিল্প, স্থাপত্য, ভাস্কর্য ও চিত্র-অঙ্কন, হয় ভারতের সঙ্গীত, বিজ্ঞান, ধর্ম আর দর্শন। লাভ করে পূর্ণ পরিণতি ভারতের মনীষা, ভারতের সংস্কৃতি আর কৃষ্টি। রচিত হয় শ্রেষ্ঠ স্বর্ণ যুগ ভারতে। পরিণত হয় ভারত এসিয়ার সভ্যতার আর-সংস্কৃতির শ্রেষ্ঠ কেন্দ্রস্থলে।

বপন করেন যে বীজ গান্ধারে, বৌদ্ধ আর গ্রীক মহান স্থপতি তাঁদের যুক্ত প্রচেষ্টায়, পরিণত করলে সেই বীজ মহীরুহে, মথুরাতে, পবিত্রতীর্থ বৌদ্ধদের, মহাতীর্থ হিন্দু আর জৈনদেরও,কুষাণ ও গুপ্ত সম্রাটরা। রচিত হয় কত বৌদ্ধ মহামহিম চৈত্য, হয় অসংখ্য সঙ্ঘারাম। নির্মিত হয় বহু জৈন বস্তি (মন্দির)। তাদের অঙ্গে শোভা পায় অনবদ্য, সুন্দরতম শিল্প সম্ভার আর সুষ্ঠু গঠন, জীবন্ত মূর্তি সম্ভার। রচিত হয় পরবর্তী কালে কত হিন্দুমন্দির, বুকে নিয়ে শ্রেষ্ঠ স্থাপত্যের আর ভাস্কর্যের নিদর্শন। নির্মিত হয় দেশবন্দরের মহামহিমময় মন্দির বুকে নিয়ে অলিন্দ আর শিখারা। ধ্বংসে পরিণত করেছেন সেই মন্দির—মুঘল বাদশাহ ঔরঙ্গজেব, স্থানান্তরিত করেছেন বিগ্রহনাথদ্বারে মেবারের রাণা রাজসিংহ। এখান থেকে ছড়িয়ে পরে সারা ভারতে। তাই এই বৈশিষ্ট্য মথুরার, পরিণত হয় মথুরা ভারতের মন্দিরময় নগরে। বুকে নিয়ে আছে তার নিদর্শন তোরণের অঙ্গ, প্রবেশ পথের ধ্বংসাবশেষ আর সঙ্ঘারামের রেলিং, আবিষ্কৃত হ'য়েছে মথুরাতে। বুকে নিয়ে ছিল এই মথুরাই, তেইশ ফুট আট ইঞ্চি উচ্চ ছয় টন্ ওজনের সুপ্রসিদ্ধ লৌহ স্তম্ভটি, শীর্ষে নিয়ে ছিল গরুড়ের মূর্তি। স্থাপিত এখন এই স্তম্ভটি দিল্লীতে, কুতবের প্রাঙ্গণে, নীলাকাশের নীচে। অম্লান, মসৃণতর অঙ্গ, দাঁড়িয়ে আছে অগ্রাহ্য করে প্রকৃতির সহস্র বৎসরের নির্মম. অত্যাচার—অপূর্বদান ভারতের লৌহ কারের, পরম বিস্ময় বিশ্বের লৌহকারের আর বৈজ্ঞানিকের। নির্মাণ করেন এই স্তম্ভটি গুপ্ত সম্রাট কুমার গুপ্ত ৪১৫ খ্রীষ্টাব্দে।

(আগামী সংখ্যায় সমাপ্য)

গিবনের প্রেম

সুনীলকুমার নাগ

ইংরেজী ভাষার শ্রেষ্ঠ ঐতিহাসিক এবং খুব সম্ভবতঃ সর্বকালের পৃথিবীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ ঐতিহাসিক, The Decline and fall of the Roman Empire এর লেখক এডোয়ার্ড গিবন (১৭৩৭-১৭৯৪) মৃত্যুর কিছুদিন পূর্বে তাঁর প্রথম যৌবনের প্রণয়ের কথা স্মরণ করে আত্মজীবনীতে লিখে গেছেন, I am rather proud that I was once capable of such exalted sentiment. এ কথা যখন গিবন লেখেন তখন তাঁর বয়স পঞ্চাশ পেরিয়ে গেছে। কিন্তু এই ব্যক্তিই বিশ-বাইশ বছর বয়সের সময় চরম ভীরুতায় পরিচয় দিয়েছিলেন যখন তাঁর প্রণয়িনীকে বিয়ের প্রশ্ন দেখা দিয়েছিল। তবে খুব সম্ভবতঃ অল্পদিন পরেই নিজের ভুল আর দুর্বলতা সম্পর্কে গিবন নিজেই বুঝতে পেরেছিলেন, তাই বিয়ে তিনি আর সারা জীবনেই করলেন না এবং তাঁর ইতিহাস সাধনার ফাঁকে ফাঁকে যখনই একটু ফুরসৎ পেতেন, মাঝে মাঝে এসে প্রথম জীবনের প্রণয়িনীর সঙ্গে কাটিয়ে যেতেন।

গীবনের জীবনে প্রণয়ের সূত্রপাত হয় সুইজারল্যাণ্ডের লুসান সহরে। ১৭৫৭ খ্রীষ্টাব্দের কথা—গিবনের বয়স তখন ঠিক কুড়ি বছর। মেয়েটির নাম সুনান, ওর বয়স তখন সতেরোর বেশী নয়। প্রথম পরিচয়েই মুগ্ধ হয়ে গেলেন গিবন। পরবর্তীকালে আত্মকথা লিখতে বসে গিবন এই প্রথম পরিচয় প্রসঙ্গে লিখেছেন:—I found her learned without pedantry, lively in conversation, pure in sentiment, and elegant is manners.

ও'দের পরস্পরের সঙ্গে মেলা মেশার কোনই বাধা দেখা দেয়নি। সুনান প্রায়ই গিবনকে ওদের বাড়ী যাবার জন্য নিমন্ত্রণ করতো। গিবনও প্রায়ই যেতেন। সুনানের বাবা এ মেলা-মেশায় কোনই আপত্তি জানান নি কখনো।

কিছুদিন সুইজারল্যাণ্ডে কাটাবার পর গিবন ইংল্যাণ্ড ফিরে এলেন। বাবাকে জানালেন সব কথা। গিবনের বাবা তো রেগে আগুন ও মেয়েকে বিয়ে করলে তিনি খরচপত্র সব বন্ধ করে দেবেন, এ কথা স্পষ্ট করেই জানিয়ে দিলেন। শুধু তাই নয়, সেই সঙ্গে এও জানালেন যে এখন আর—'সুইজারল্যাণ্ড যাওয়া চলবে না। টাকাকড়ির ব্যাপারে এ সময় গিবনকে সম্পূর্ণভাবে বাবার উপর নির্ভর করতে হতো। কাজেই বাবার কঠোর শাসানির পর গিবন বেশ একটু মনমরা হয়ে পড়লেন। সুনানকেও জানালেন সব কথা। সুনান এ খবর শুনে খুব অবাক, আশ্চর্য্য বা দুঃখিত হয়নি বলেই ধারণা গিবনের—সুনানের চিঠি বার বার পড়বার পর এই সিদ্ধান্তেই আসলেন গিবন। তারপর: I sighed as a Lover, I obeyed as son,

প্রথমবার লুসানে এসে গিবন, রুশো, ভলতেয়ার প্রভৃতির সঙ্গে পরিচিত হয়েছিলেন। তবে এ পরিচয়ের বিশেষ কোন দিক নেই। ও'রা তখন বলতে গেলে বিশ্ববিখ্যাত' আর গিবনের জীবন সুরুই হয়নি বলতে গেলে।

রুশো, ভলতেয়ার প্রভৃতি সুনানকেও জানতেন। কারণ লুসান সহরে সুনানই ছিল সব চাইতে সুন্দরী তরুণী।

১৭৬৩ খৃঃঅব্দে গিবন আবার লুসানে এলেন। এদিকে সুনানের তখন বিয়ে হয়ে গিয়েছিল—ম'-নেকার নামে এক বিখ্যাত ধনীর সঙ্গে। গিবন লুসানে এসে সুনানের সঙ্গে দেখা সাক্ষাৎ করছেন কিনা এ বিষয়ে জানবার জন্য অনেকেরই আগ্রহ ছিল। কারণ বাবা বারণ করেছেন বলে গিবন যেদিন সুনানকে বিয়ে করতে আপত্তি জানান, সেইদিন থেকেই সবাই দেখে আসছে সুনানের সেই রূপের যেন অনেকটাই নষ্ট হয়ে গেছে।

কোথায় সেই মৃদু হাসি, আর কোথায় বা সেই কমনীয়তা। মনের ঝড়ের একটা নিখুঁত ছায়া যেন সুনানের মুখ চোখে দেখা যেত সব সময়।

দ্বিতীয়বার লুসান এসে বেশ কিছুদিন কেটে যাবার পরও গিবন যখন সুনানের সঙ্গে দেখা সাক্ষাৎ করতে যাচ্ছেন না দেখা গেল, তখন কেউ কেউ হলো আশ্চর্য্য, আবার অনেকে রুষ্ট হলেন। এক বন্ধু রুশোকে একখানা চিঠিতে লিখে জানালেন সব কথা; এ চিঠির উত্তরে রুশো তাঁর বন্ধুকে লিখলেন—সুনানকে জানবার পরও যে তাকে ছেড়ে যেতে পারে, সে কিছুতেই সুবিধার লোক নয়। ম'সিয়ে নেকারের সঙ্গে সুনানের দাম্পত্য জীবন সুখেরই হয়েছিল।

কিন্তু এ বিয়ের পর মাদাম নেকার অর্থাৎ সুনানের সঙ্গে গিবনের সম্পর্ক ছেদ হয়ে গেল না। ও'রা পরস্পরকে ভুলতে তো পারলেনই না এবং সুযোগ হলেই মেলামেশা করতেন। ও'দের দেখা সাক্ষাৎ সাধারণতঃ নেকার পরিবারের বাড়ীতেই হতো—মাদাম নেকার নিজেই আমন্ত্রণ জানাতেন গিবনকে।

বিয়ের পর প্রণয়িনীর সঙ্গে প্রথম সাক্ষাতের কথা গিবন ও'র এক বন্ধুকে লিখে জানান: সুনানের সঙ্গে দেখা হলো প্যারিসে। আমাকে দেখে ও খুশী হয়েছে বলেই মনে হ'ল। ওর স্বামীর সঙ্গেও পরিচয় হলো। লোকটি সত্যি ভদ্রলোক। তবে কি জানো—ওদের একটা ব্যাপার আমার কাছে অত্যন্ত অপমানকর এবং নিষ্ঠুর বলে মনে হয়: ওরা প্রায় রোজই রাতে আমাকে খাবার নিমন্ত্রণ করেন এবং খাওয়া দাওয়ার পর ম'সিয়ে নেকার শুতে যান, আমাকে বলে যান—তাঁর স্ত্রী অর্থাৎ সুনানের সঙ্গে গল্প করতে···সুনান দেখতে ঠিক আগের মতই আছে।

বিয়ের পর গিবনের সঙ্গে প্রথম সাক্ষাতের ব্যাপারটা মাদাম নেকার

ও তাঁর এক বান্ধবীকে একখানা চিঠিতে জানান: গিবনের সঙ্গে দেখা হলো, কী আনন্দই যে পেলাম ওকে দেখে—তা ভাষায় প্রকাশ করা যায় না। আমি ওর অযোগ্যতা সম্বন্ধে সবই জানি, কিন্তু তবু ভালো লাগলো…গিবন দিন পনেরো ছিল প্যারিসে, রোজই আমরা নিমন্ত্রণ করতাম ওকে। আমার স্বামীর ভদ্রতা এবং রসিকতা-বোধ দেখে গিবন একেবারে অবাক হয়ে গেছে।… …

বিশ বছর পরের কথা। মাদাম নেকার তাঁর স্বামীকে নিয়ে বিলেত বেড়াতে এসেছিলেন কিছুদিনের জন্য। এ সময়ে The Decline and fall of the Roman Empire এর লেখক হিসাবে গিবনের নাম সারা ইউরোপে ছড়িয়ে পড়েছে। মাদাম নেকারের সঙ্গে গিবনের শেষ দেখা হয় ১৭৯১ খৃঃঅব্দে—অর্থাৎ গিবনের মৃত্যুর তিন বছর পূর্বে।

বিপ্লবোত্তর ফ্রান্সে তখন ঘোর অরাজকতা চলছিল। মঁসিয়ে নেকার স্ত্রীকে নিয়ে বলতে গেলে প্রায় পালিয়ে চলে যান সুইজারল্যাণ্ডে। গিবন তখন লুসানে ছিলেন। ওঁরা গিয়ে উঠলেন লুসানের কাছেই অন্য একটা সহরের বাড়ীতে। প্রায় রোজই মাদাম নেকারের সঙ্গে দেখা হতো গিবনের। তা ছাড়া ওদের মধ্যে চিঠিপত্রের আদান-প্রদান হতো। এই চিঠিগুলি বিশেষ করে গিবনকে লেখা মাদাম নেকারের চিঠিগুলি পড়লেই বোঝা যায় সেই সময় পর্যন্ত অর্থাৎ ওঁদের প্রথম পরিচয়ের প্রায় তেত্রিশ বছর পর পর্যন্ত—মাদাম নেকারের মনের কতখানি অধিকার করেছিলেন গিবন।

মাদাম নেকার লিখেছিলেন—তুমি কি জানো গিবন, এই দীর্ঘকাল ধরে তুমি আমার মনের কতখানি জুড়ে আছো…তোমাকে আমার প্রথম বন্ধু বলবো না শেষ বন্ধু বলবো? তোমার নিজের কোন্‌টা ভালো লাগে….তুমি যখন কাছে থাক তখন সময়টা যে কেমন করে কেটে যায় তা ভেবেই পাই না। ১৭৯১ খৃঃঅব্দের কথা, গিবনের শরীর তখন মোটেই ভাল যাচ্ছিল না। শরীরের জন্য তো বটেই, তাঁর অমর-কীর্ত্তি Decline and fall এর শেষ খণ্ডগুলি প্রকাশ করবার জন্যও বটে, গিবন ইংলণ্ড আসবেন ঠিক করলেন। এ খবর শুনে মাদাম নেকার লিখলেন: শরীরটা একটু ভালো হলেই ফিরে আসবে কিন্তু, যতদিন তুমি না ফেরো, ততদিন তোমার পথ চেয়ে থাকব।

কিন্তু গিবন আর সুইজারল্যাণ্ডে ফিরলেন না।

ভারতীয় চিত্রকলা

ডাঃ প্রফুল্লকুমার সরকার এম-এ, পি-এইচডি, ডিপ-এড

দৈত্য নিধনকালে নারায়ণের অঙ্গভঙ্গিমা এতই মনোমুগ্ধকর বোধ হইয়াছিল যে লক্ষ্মী তাহার পুনরভিনয় দেখতে চাহিয়াছিলেন। তাই দেবসভায় দেবতাগণের বাদ্যের সুরে সুরে লক্ষ্মী গাহিতে লাগিলেন—আর শিব তালে তালে নাচিয়া নটরাজ হইলেন। চিত্রং নৃত্যপরং মতম্—এই মত হইতে আমরা মনে করিতে পারি যে দেবসভার এই শিবনৃত্যকে স্থায়িত্ব দিতে চিত্রের উদ্ভাবন হয়।

তাহার পর যেমন ব্যাকরণের উদ্ভব তেমনই চিত্রাঙ্কন প্রথাকে নিয়মানুগ করিতে চিত্রশাস্ত্রের সৃষ্টি। সেই চিত্রশাস্ত্রেই আছে—

> 'রূপভেদ প্রমাণানি ভাবলাবণ্যযোজনং
> সাদৃশ্যং বর্ণিকাভঙ্গম্ ইতি চিত্রং ষড়ঙ্গকম্।'

চিত্রে রেখার সাহায্যে রূপ বিভিন্নত্ব দেখাইতে হইবে। কালিদাস "শকুন্তলায়" লিখিয়াছেন "তথাপি তস্যা লাবণ্যংরেখয়া কিঞ্চিদন্বিতম্।" এখানে অবশ্য রেখাঙ্কনের চাতুর্য্যে লাবণ্যের আভাবের কথা বলা হইয়াছে—যেমন ফটোতে আলোও ছায়াপাতে উচ্চাবচভাব দেখান হয়। লাবণ্য অর্থে "মুক্তাফলেষু ছায়ায়া সংদৃশ্যতে হ'বান্তরা" এই রূপ বুঝিতে হইবে। মুক্তার স্বচ্ছগাত্রে যে গোলাপীনীলাভ ছায়া পড়ে তাহাকেই লাবণ্য বলা হইতেছে। মানব দেহে মসৃণ ও পাতলা চর্ম্মাভ্যন্তরে রক্ত প্রভার আভাকেই লাবণ্য বলিয়া মনে করা যাইতে পারে। প্রমাণ বলিতে আনুপাতিক মান বুঝায়। নব ভারতীয় চিত্রকলায় ইহা অবহেলা করা একটা নুতন ধারা হইয়াছে। এখনও কাটোয়ার সন্নিকটে বিশ্বনাথ ভাস্করের নির্মিত প্রস্তরবিগ্রহাদি অনুপাতাদি বজায় রাখিয়া কেমন সুন্দর দেখায়! বিভিন্ন ভাব ও তৎসহ যোজিত বহু রস সমন্বয়ে চিত্রে অসংখ্য ভাবরসের সৃজন করা যাইতে পারে। কিন্তু আমরা চিত্র-সমালোচনা ও সৃষ্টিতে এসবের বিশেষ খেয়াল রাখি না। রাখিলে হয়তো এতরকমের ভাবরসের দিক হইতে চিত্র নানাভাবে বহুমুখী করিয়া ফুটান যায়। এই পথেই ভারতীয় চিত্রকলাকে বিকশিত করিয়া তুলিতে হইবে—হউক তাহা জড় প্রকৃতি হইতে কতকটা অন্তর্মুখী ধারায় অপূর্ব ভাবান্বিত। বর্ণিকাভঙ্গ বা বর্ণের ভঙ্গিমা শাস্ত্রানুসারী পন্থায় আরব্ধ রহিয়া শিল্পীপ্রতিভা অবস্থা ও ভাবে পূর্ণতা লাভ করিয়া স্বভাবে নিবদ্ধ রহিবে। শেষে "সাদৃশ্য"র কথাই বলি। কুমারী স্টেলা ক্র্যামরীশ এদেশে ভারতীয় কলা শিল্পের চর্চ্চা করিতে আসিয়া লিখিয়াছিলেন—"প্রাচীন ভারতে landscape painting অর্থাৎ দৃশ্যাঙ্কনপ্রথা প্রচলিত ছিল না—কিন্তু একথা একেবারেই ঠিক নহে। মদ্‌গুরু অক্ষয়কুমার

মৈত্রেয় সি, আই, ই মহোদয় আমাদের সামনেই তাঁহাকে ভারতচিত্র শাস্ত্র খুলিয়া স্পষ্ট করিয়া দেখাইয়া দেন :—

"বিবর্ণং খগমাকুলং বিশিরস্কং প্রদর্শয়েৎ"—ইত্যাদি অর্থাৎ আকাশকে উড্‌ডীয়মান পক্ষীসংকুল বিবর্ণ করিয়া ও হীনভাবে তাহার মাথা শিরস্ক অর্থাৎ Genith না দেখাইয়া অসীম দেখাইবে। এখানে বাংলা "মস্ত"র সঙ্গে ক দিয়া মস্তক করার মত শিরঃ "এর সঙ্গে ক দিয়া (যাহার শিরঃ আছে, এই অর্থে) "শিরস্ক" সাধন করা হইয়াছে। অবস্তুশিরোহীন আকাশকে সীমাহীন বলিয়া মনে করা ছাড়াও কেবল দিকচক্রবালরূপে গ্রহণ করা যায় কিনা তাহাও বিবেচ্য। অথবা বিশিষ্ট শিরঃ—এই অর্থে আকাশকে বৃক্ষ শৈলমন্দিরাদির চূড়া বা শীর্ষ দ্বারা উপলক্ষিত বুঝায় কিনা তাহাও ভাবিতে হইবে। এছাড়া হংস-কলরিত নীল সরোবর, সবুজ শস্পশোভিত বিশ্রামভূমি, মৃগগণের বিশ্রামসুখ উপভোগের জন্য ছায়াশীতল বনভূমি, পক্ষীকাকলিমুখরিত উষাকাশ, ঋষিগণবন্দিত সন্ধ্যা, অপরাধীগণের বাঞ্ছিত গভীর আঁধার রাত্রি, প্রচণ্ডমার্তণ্ডতাপদগ্ধ সন্ধ্যারও অসহনীয় মধ্যাহ্ন—শরতের চন্দ্রিকা-ধৌত রজনী, বালকবালিকাগণের হাস্যমুখর মধুপসমাকুল পুষ্পিততরুলতা দেখাইয়া বসন্তকাল প্রভৃতির দৃশ্য অঙ্কনের নির্দেশ আছে।

সুতরাং ভারতীয় চিত্রকলা শুধু convention বা প্রচলিত পদ্ধতির ছাঁচে ঢালিয়াই অনুসৃত হইবে তাহার কোনো কথা নাই। unicorn বা ঘোড়াসিংহ প্রভৃতি conventional art প্রধাচিত্রেই শিল্পচাতুর্য্যও বিকাশ থামিয়া যায় নাই তাহা "সাদৃশ্যে"র ও কমবেশী অন্যান্য চিত্রাঙ্গের সাধনার মধ্যদিয়াও শিল্পী প্রতিভার অসীম ও যুগোপযোগী বহুমুখী বিকাশের পথ খুলিয়া রাখিয়াছে।

কৈফিয়ৎ

শ্রীসাবিত্রীপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায়

কড়াক্রান্তির হিসাব করিনি ; জমাখরচের খাতা
ছিল না বলেই ডাইনে ও বাঁয়ে হিসাবের গরমিল,
জোড়াতালি দেওয়া মতিচ্ছন্ন জীবনের ছেঁড়া পাতা
দমকা হাওয়ায় উড়ে গেছে তার চিহ্ন নাহিক তিল।

জীবন-ধর্মে তবুও কখনো ঘটেনিক বিচ্যুতি,
অনৃত ভাষণে স্বার্থ-সাধন করিনি জীবনে কভু,
আঁধার ঘরের ফাটলে ফাটলে মহাজীবনের দ্যুতি
কতবার আমি দেখেছি তাইতো দাসজীনের প্রভু
নিরাশ হইয়া ফিরে ফিরে গেছে তামাদি দলিল হাতে
দেখেছে আমারে দৃষ্টি আমার প্রসারিত বহু দূরে,
ভাঙা ঘরে মোর চাঁদের আলোতে জ্যোৎস্নামদির রাতে
বীণাখানি মোর বাজায়ে চলেছি নানা বিচিত্র সুরে।

সেই সুরে এসে মিলেছিল তব মর্মবীণার সুর
ঝঙ্কারে তার হৃদয়-তন্ত্রী মধুরে উঠিল বাজি,
দেখিলাম তাহে আকাশ বাতাস হয়ে গেছে ভরপুর,
দেখিলাম দূরে বিস্ময়ে চাহি' কুসুমিত বনরাজি।
তারি সুগন্ধ সুরভিত ছিল তব অন্তর খানি
পেলাম তাহার অমৃত পরশ তপ্ত জীবন মাঝে,
তোমার কণ্ঠে শুনিতে পেলাম অশ্রুত বনবাণী
প্রভাত আলোর প্রসন্নতায় তারি সুর সদা বাজে।

রূঢ় দিবালোকে যেন ভাঙে নাক সে সুরের মূর্ছনা
যদি মোর বীণা বেসুরে বাজাই কভুও বন্ধু মোরে
নিয়তি আমার নিষ্ঠুরা অতি, মানুষের বঞ্চনা
বিহ্বল করে আমারে, তবুও যেন ভ্রান্তির ঘোরে
হারায়ে না যায় আমার বীণার সুরে বাঁধা গানগুলি,
দুঃখ দহনে জ্বলিয়া জ্বলিয়া লভুক নতুন প্রাণ
বেদনার জ্বালা সহিতে সহিতে যেন যাই তাহা ভুলি'
সঙ্কটে যেন খুঁজে নিতে পারি নিজের পরিত্রাণ।

সুদুর্লভ
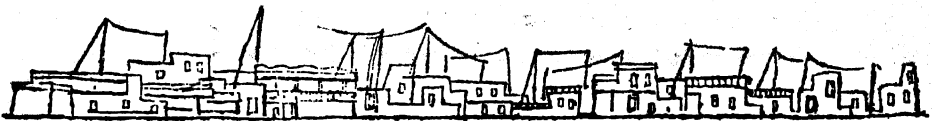
শ্রীনির্মলকান্তি মজুমদার

স্মৃতির বীথিপথ দিয়ে কত কথা চলে গিয়েছে বিস্মরণের ঘাটে। কিন্তু সেই অদ্ভুত রজনীর অপূর্ব কাহিনী আজও ভুলতে পারিনি।

এম. এ. পড়ি। গরমের ছুটি। রতন এসে বলে—ভাই, কয়েকদিন আমাদের পলাশপুকুরে বেড়িয়ে আসবে চল। ঠাকুরমা ভারি খুশী হবেন।

রতন প্রেসিডেন্সি কলেজে আমার সহপাঠী। সানন্দে গ্রহণ করি তার নিমন্ত্রণ।

পলাশপুকুর প্রাচীন গ্রাম। আগে বহুলোকের বাস ছিল এই গ্রামে। শিক্ষায় উৎসাহী ছিল গ্রামবাসী। কিন্তু সেদিনের আশীর্বাদ আজকের অভিশাপ হয়ে দাঁড়িয়েছে। শিক্ষিত সম্প্রদায় পুরাপুরি প্রবাসী। জনহীন গৃহে প্রদীপ জ্বলে না। দেউলের দেবতা উপবাসী। দেখে চোখে জল আসে।

রতনদের বিরাট বাড়ি। সেখানে বাস করে মাত্র দুটি প্রাণী—রতন আর তার ঠাকুরমা। অনেকগুলো ঘরই বন্ধ। একদিন একটা বন্ধ ঘরের তালা খোলে রতন। আমাকে নিয়ে যায় ভিতরে। পারিবারিক সংগ্রহ-শালা। নানা দেশের নানা জিনিস সযত্নে সাজানো—জয়পুরের বাসন, চুনারের চিনে মাটির ফুলদানি, আগ্রার তাজমহল, গয়ার পাথর বাটি, দার্জিলিঙের মালা। দেয়ালে ভালো ছবি—রবি বর্মা, বামাপদ বাঁড়ুজ্যে প্রভৃতি শিল্পীদের আঁকা। রতনের বাবা সত্যিই শৌখিন লোক ছিলেন।

সাগ্রহে ছবি দেখি। হঠাৎ নজরে পড়ে ঘরের কোণে টুলের ওপর বসানো একখানা জাঁতা। আশ্চর্য। এই বৈচিত্র্যাগারে সাধারণ জাঁতার স্থান হয় কেমন ক'রে। কৌতূহল জাগে। রতনকে জিজ্ঞাসা করি—আচ্ছা, এই সব দুর্লভ বস্তুর মধ্যে ঐ জাঁতাটাকে রেখেছ কেন? কোথাকার জিনিস? ওর কি কোন বিশেষত্ব আছে? আশ্চর্য প্রদীপের সগোত্র নয় তো?

দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে রতন। ছল ছল করে তার চোখ। একটু চুপ ক'রে থেকে ম্লানমুখে বলে—ওর পিছনে লুকিয়ে আছে একটি করুণ কাহিনী। পরে বলব।

যাদুঘর বন্ধ হয়ে যায়। আমার কল্পনা-বিলাসী মনে ঘনিয়ে ওঠে রহস্য।

সে দিন রাত্রে বিশ্রী গুমট। শোবার ব্যবস্থা ছাদে। শীতল পাটিতে ব'সে চারিদিকে চেয়ে দেখি। স্তব্ধ প্রকৃতি। খিড়কি বাগানে নারকোল গাছের একটি পাতাও নড়ে না। পুকুর ধারের দেবদারুগুলো ধ্যানমগ্ন। গ্রামপ্রান্তে মরা নদীটি স্বপ্ন প্লাবনে হারিয়ে গিয়েছে দূর দিগন্তে। মায়াবী আকাশ ও মায়াবিনী পৃথিবী কি কানাকানি করে কে জানে! রতনকে বলি—আজ তো ঘুমের কোন সম্ভাবনা দেখছিনে। এখন তোমার জাঁতার ব্যাপারটা খুলে বল দেখি।

মাথার বালিশটা কাছে টেনে নিয়ে রতন ধীরে ধীরে শুরু করে জাঁতার কাহিনী :—

* * * * *

আমার পাঁচ বছর বয়সে মা মারা যান। বাবা চলে যান দশ পূর্ণ হতেই। সেই থেকে ঠাকুরমার কাছে মানুষ পলাশপুকুরে। চন্দনহাটি হাই স্কুলে পড়ি। সে বছর আমার থার্ড ক্লাস। গ্রামের ছেলেরা চাকুন্দিতে চড়কের মেলা দেখতে যাবে। আমি ঠাকুরমার অনুমতি চাই। তিনি রাজী হন না। শেষে অনেক ভেবে চিন্তে বলেন—যদি একান্তই যেতে চাস তো যা। তবে বেলাবেলি ফিরতে চেষ্টা করিস। মেঘ ঝড়ের সম্ভাবনা দেখলে ফিরবার দরকার নেই। পথে বিপদ হতে কতক্ষণ! চাটুজ্যে-বাড়ির হেমাঙ্গিনী আমার 'গঙ্গাজল'। তার কাছে আমার পরিচয় দিয়ে রাত্তিরে থাকবি। খুব যত্ন আত্তি করবে।

পলাশ পুকুর থেকে চাকুন্দি তিন ক্রোশ পথ। গঙ্গা

তীরে গণ্ড গ্রাম। আমরা ভোরে যাত্রা করি। সারাদিন হই হই ক'রে মেলায় ঘুরি। মজা দেখা, পাঁপর ভাজা ও জিবে গজা খাওয়া, টুকি টাকি কেনা, চেনা লোকের সংগে গল্প করা। দেখতে দেখতে বেলা শেষ। ফিরবার উদ্‌যোগ করি। ঈষাণ কোণে কালো মেঘ দেখে ভয় হয়। মনে পড়ে ঠাকুরমার উপদেশ। বন্ধুদের বলি—গতিক সুবিধের নয়। ঝড় বৃষ্টি আসতে পারে। দুর্যোগ মাথায় ক'রে আমি ফিরছিনে। রাত্তিরে চাটুজ্যে-বাড়িতে থাকব।

পাকুড়-তলায় পান বিড়ির দোকানে চাটুজ্যেদের বাড়ির খোঁজ নিই। দোকানী বলে—গঙ্গার ধারে ধারে মিনিট দশেক হেঁটে বাঁ দিকে একটা কলা বাগান পাবে। তার পুব দিকের পাকা বাড়িটা চাটুজ্যেদের। চাটুজ্যে বলতে এ গাঁয়ে ওই এক ঘর।

জোরে জোরে হাঁটি। কলা বাগানের কাছে না যেতেই ভীষণ ঝড়। ধুলো বালিতে চারিদিক একাকার। ছুটতে ছুটতে একটা মেটে বাড়ির দাওয়ায় আশ্রয় নিই। সংগে সংগেই বৃষ্টি। বোধ হয় আমার পায়ের শব্দ শুনে একজন মহিলা ঘরের দরজা খোলেন। কোমল কণ্ঠে বলেন—কে বাছা দাঁড়িয়ে ওখানে? ভেতরে এস, ভিজে যাবে যে।

ঘরে নিবিড় অন্ধকার। কোলের মানুষ দেখা যায়না। ঘর্ঘর শব্দ হচ্ছে। তারই ফাঁকে ভারি গলায় কে একজন বলেন—রাধা, লণ্ঠনটা জ্বাল।

মহিলা হারিকেন জ্বেলে আনেন। দেখি একটি বৃদ্ধ জাঁতায় গম ভাঙছেন। আমাকে বসতে ব'লে জিজ্ঞাসা করেন—তুমি কা'দের ছেলে?

—আমার বাড়ি এ গাঁয়ে নয়। আমি পলাশপুকুরের মুখুজ্যেদের ছেলে। মেলায় এসেছিলাম।

—পলাশপুকুর তো নিকটে নয়। এই দুর্যোগে ফেরাও তো মুশকিল। দেবতা কখন শান্ত হবেন কে জানে। তোমার নাম কি?

—রতন।

—বাবার নাম?

—৺বিজন মুখুজ্যে—অধ্যাপক ছিলেন।

—শুনেছি পলাশপুকুরে অনেক শিক্ষিত লোকের বাস। তবে আমি এ অঞ্চলের কাউকে বড় একটা চিনিনে। কত কাল বিদেশে বিভুঁইয়ে কাটিয়ে এই ক-বছর দেশে ফিরেছি।

সহানুভূতির সুরে রাধা বলেন—আহা, এই বয়েসে বাপ নেই। কী দুর্ভাগ্য! মা আছেন তো?

—মা গিয়েছেন বাবারও আগে। আমি তখন খুব ছোট। মা'কে আবছা আবছা মনে পড়ে।

বাষ্পরুদ্ধ স্বর শোনা যায় রাধার—আ পোড়া কপাল!

ঝমাঝম বৃষ্টি। বিদ্যুতের ঝলকাণি। বাজপড়ার শব্দ। আমি আঁতকে উঠি। রাধা আমার পিঠে হাত রেখে বলেন—ভয় কি বাবা! তুমি আজ আমাদের এখানেই থাকবে। কাল সকালে বাড়ি যাবে।

বৃদ্ধ বলেন—কোন ভাবনা নেই। লোক সংগে দেব—তোমাকে বাড়ি পৌঁছে দিয়ে আসবে।

রাধা যে বৃদ্ধের স্ত্রী তা বুঝতে দেরি হয় না। এঁদের আত্মীয়তায় উৎকণ্ঠা কেটে যায়। দেখি বৃদ্ধের পাশের ধামাতে কিছু গম রয়েছে। আমার আকস্মিক আবির্ভাবে ব্যাঘাত না ঘটালে এতক্ষণ ওগুলো ভাঙা হয়ে যেত। অনিচ্ছাকৃত অপরাধের জন্য লজ্জা বোধ করি। এগিয়ে গিয়ে বলি—আপনি স'রে বসুন, বাকী গমগুলো আমি ভাঙব।

—ছি ছি। ছেলে মানুষ, বড় ঘরের ছেলে, তুমি জাঁতায় হাত দেবে কি! ও ক-টা আমি আধ ঘণ্টায় শেষ করব। তুমি হাত মুখ ধুয়ে এসে দেখ—বুড়ো জগমোহন মোড়লের ক্ষমতা।

বৃদ্ধের মুখে আত্ম প্রত্যয়ের হাসি। কী সুন্দর! আমি বলি—আপনি সংকোচ করবেন না। আমার অভ্যাস আছে। হাজার হোক পাড়া গাঁয়ের ছেলে তো। ঠাকুরমা বলেন—'সব রকম, শিখে রাখা ভালো। জীবনে কখন কি কাজে লাগে বলা যায় না।'

—ঠিক কথা। কিন্তু তুমি বিপদে প'ড়ে এই রাতটুকুর জন্য আমাদের অতিথি হয়েছ। তোমাকে খাটালে পাপ হবে। বয়েস তিন কুড়ি পেরিয়ে গেল, পরকাল নেই।

অগত্যা নিরুত্তরে রাধার সংগে বাড়ির ভিতর যাই। পাশাপাশি তিনখানি ঘর। তৃতীয় ঘরের দাওয়ার এক দিকে রান্না ঘর, অন্য দিকে জল চৌকির ওপর বালতি ও ঘটি। ভালো ক'রে মুখ হাত পা ধুয়ে ফেলি। ঝড়ের

বেগ কম। বৃষ্টির হাট নেই। কাঠের জ্বালের ধোঁয়া আর্দ্র আবহাওয়ায় অবরুদ্ধ। জাঁতা চলছিল। আমরা ঘরে ঢুকতেই হাতের কাজ বন্ধ হয়ে শুরু হয় মুখের কাজ। রাধাকে লক্ষ্য ক'রে বলেন বৃদ্ধ—রতনকে কি খেতে দেবে রাধা? যে সে নয়, কুলীন বামুনের ছেলে। এটা তো এতক্ষণ খেয়াল হয় নি।

বৃদ্ধের সমস্যাকুল মুখের পানে চেয়ে আমি তৎক্ষণাৎ বলি—আপনারা আদর ক'রে যা দেবেন তাই খাব।

—বাঃ বাঃ, চমৎকার কথা। হবেই তো, বিদ্বানের বংশ যে।

রাধা বলেন—ছেলে মানুষ নারায়ণ। ঠাকুর দেবতার আবার জাত আছে না কি?

একগাল হেসে রাধার যুক্তিকে সমর্থন করে বৃদ্ধ ফের জাঁতায় হাত দেন। সমস্ত দিনের ক্লান্তি, ঝড় বৃষ্টির রাত্রি, জাঁতার একটানা আওয়াজ—আমি ঘুমের দেশে। রাধার ডাকে জেগে উঠি।

খাবার তৈরি। বৃদ্ধের পাশেই আমার জায়গা। আয়োজন সামান্য—জাঁতাপেষা আটার রুটি, পটল ভাজা, আখের গুড় ও দুধ। দুর্যোগের রাতে সেই অমৃত। নীরবে আহার করি। নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করেন রাধা—রতন, তোমার ঠাকুরমার চোখে আজ ঘুম আসবে না।

—ঠাকুরমা বলেছিলেন কাল বোশেখীর সম্ভাবনা দেখলে চাটুজ্যে-বাড়িতে রাত্তিরে থাকতে। চাটুয্যে বাড়ির হেমাঙ্গিনী দেবী তাঁর সই। আমি তাঁর কাছেই যাচ্ছিলাম, ঝড়ের ঝাপটায় এগোতে সাহস হ'ল না। আবহাওয়ার অবস্থা দেখে তিনি নিশ্চয়ই বুঝে নিয়েছেন তাঁর উপদেশ অনুযায়ী আমি চাটুয্যে বাড়িতে আছি। ঠাকুরমা বেশ বিচক্ষণ—অকারণে বিচলিত হন না।

—শুনে বাঁচলাম। রুটি সেঁকতে সেঁকতে তাঁর কথাই ভাবছিলাম। দুর্যোগে ঘরের ছেলে বাইরে থাকলে মন উতলা হয় বই কি। আচ্ছা রতন, তোমার মা'র জন্ত কষ্ট হয় না?

—মা তো। ঠাকুরমাই আমার সব। তিনি মা বাবার অভাব বুঝতেই দেন না। আর মাকে বুঝবার সুযোগও তো আমার হয় নি।

বৃদ্ধ আহার শেষ ক'রে দুধের বাটিতে জল খান। বাটিটা নামিয়ে রেখে বলেন—যে যার নিজের নিজের অদৃষ্ট নিয়ে জন্মায়। কে কার কাছে মানুষ হবে সংসারে কেউ বলতে পারে না।

শোবার ঘরে দুখানা তক্তাপোশ। একখানাতে বৃদ্ধের বিছানা আর একখানাতে আমার। রাধার বিছানা মেঝেতে। সসংকোচে বলি তাঁকে—সে কি, আপনি মেঝেতে কেন! চৌকিতে আসুন। আমি বরং—

—তাই কি উচিত, না ভালো দেখায়? শীতের দিন ছাড়া আমি মাটিতে শুতেই ভালোবাসি।

—আপনাদের কত কষ্ট দিচ্ছি।

—কষ্ট। ও কথা মুখে এনো না। আমাদের এক-ঘেয়ে জীবন, শুয়ে ব'সে দিন কাটে না। আজ সোনার চাঁদ ঘরে এসেছে। কত আনন্দ!

বৃদ্ধ আরামে তামাক টানেন আর মাথা নেড়ে স্ত্রীর কথায় সায় দেন। কলকের আগুন নিবে যেতেই হুঁকাটা দেয়ালে ঠেস দিয়ে রেখে বলেন—দুলাল বেঁচে থাকলে আজ রতনের মতো এত বড়টিই হ'ত, তাই না রাধা?

আমি জিজ্ঞাসা করি—দুলাল কে?

—আমার এক মাত্র মেয়ে সাবীর একমাত্র ছেলে। সাবী আর দুলাল একই দিনে আমাদের ফাঁকি দিয়ে চলে গেল। আপনার বলতে কেউ রইল না। কলকাতায় কি মন টেঁকে! চলে গেলাম বাংলা মুলুক ছেড়ে ভাগলপুরে। সেখানে বলরাম দত্তের আটা ময়দার মস্ত কারবার। কল জাঁতো দুই চলে! দত্ত মশাই আমাকে জাঁতার কাজ দিলেন। এমন মনিব হয় না। তাঁর কাছে বহুদিন ছিলাম। বছর কতক হ'ল পৈতৃক ভিটেয় ফিরে নতুন বসবাস শুরু করেছি।

বৃদ্ধ চোখ মোছেন। রাধা আমার চিবুক স্পর্শ ক'রে স্নেহ মধুর স্বরে বলেন—আমাদের সংগে তোমার আত্মিক সম্পর্ক।

বৃষ্টি ধরেছে অনেকক্ষণ। আকাশে ফুটফুটে জ্যোৎস্না। ঠাণ্ডা হাওয়া আসে জানালা দিয়ে। নিশ্চিন্তে ঘুমিয়ে পড়ি কয়েক মিনিটের মধ্যে।

পরদিন সকালে জগমোহন ও রাধার কাছে বিদায় নিই। পলাশপুকুর পর্যন্ত আমার সংগে আসে গোবর্ধন, জগমোহনের দূর সম্পর্কের ভাইপো। বাড়ি পৌঁছে

ঠাকুরমাকে সমস্ত বৃত্তান্ত বলি। ধীরভাবে আগাগোড়া শুনে উত্তর দেন তিনি—মদন গোপাল ভালো জায়গাতেই তোর আশ্রয় মিলিয়ে দিয়েছিলেন।

মদন গোপাল আমাদের গৃহ দেবতা। আমার জন্মের বহুপূর্বে ঠাকুরমা বৃন্দাবন থেকে বিগ্রহ এনে প্রতিষ্ঠা করেছিলেন।

চার পাঁচ দিন পরে। দুপুরে আমাদের সদর দরজায় গরুর গাড়ী এসে দাঁড়ায়। নামেন জগমোহন ও রাধা। সংগে এক টুকরি কলা শসা আর পটল। উৎফুল্ল হয়ে বাড়ির ভিতর নিয়ে যাই তাঁদের। জগমোহন ও রাধা গড় হয়ে প্রণাম করেন ঠাকুরমাকে। জগমোহন বলেন—মা ঠাকরুণ, আপনার নাতি রতন আমাদেরও নাতি। যেমন ছেলে—তেমনি তার শিক্ষা। আপনাকে একবার দর্শন করতে এলাম। দুপুর বেলা বিশ্রামের ব্যাঘাত হবে। অপরাধ নেবেন না।

ঠাকুরমা বলেন—ভারি খুশী হলাম তোমাদের দেখে। রতনের মুখে সব শুনেছি। তোমরা সজ্জন। নইলে কেউ অত যত্ন করে একটা অজানা অচেনা ছেলেকে, সম্পর্ক পাতায় দুঘণ্টার পরিচয়ে।

ঠাকুরমা আদেশ দেন—দাদামশায় দিদিমাকে প্রণাম কর।

আমি মাথা নিচু ক'রে হাত বাড়াতেই ওঁরা দুজনে জড়সড় হয়ে বলেন—হয়েছে বাবা হয়েছে। পায়ে হাত দিতে নেই, আমরা যে দোষের ভাগী হব।

ঠাকুর মা জবাব দেন—দোষের ভাগী কেন হবে? যত ভেদাভেদ সব তো বাইরে। আমার ভিতরে যাঁর সিংহাসন, তোমাদের ভিতরেও তাঁরই সিংহাসন। আর সম্পর্ক যখন পাতিয়েছ তখন তার দাবি না মানলে চলবে কি ক'রে?

আবেগভরা কণ্ঠে বলেন দাদামশায়—আজ্ঞে আপনার মতো উদার মানুষ কজন আছে সংসারে!

দিদিমার সংগে ঠাকুরমার আরও কিছুক্ষণ কথাবার্তা চলে। তারপর জলযোগ ক'রে ওঁরা গাড়িতে ওঠেন। দিদিমা বলেন—রতনকে নিয়ে একদিন পায়ের ধুলটা দেবেন আমাদের বাড়ীতে। পালপার্বণে গঙ্গা স্নানে চাকুন্দিতে তো যেতেই হয়।

এরপর আস্তে আস্তে উভয় পরিবারের মধ্যে গড়ে ওঠে আত্মীয়তার বন্ধন, চলতে থাকে আসা যাওয়া। দশহরা উপলক্ষে ঠাকুরমা যান চাকুন্দিতে দাদামশায়ের বাড়িতে। দাদা মশায় দিদিমা আসেন পলাশপুকুরে ঠাকুরমার অনন্তব্রত উদ্‌যাপন অনুষ্ঠানে। আমি ম্যাট্রিকে স্কলারশিপ পাই। ঠাকুরমা ঘটা ক'রে লোক খাওয়ান। দাদামশায় দিদিমার আনন্দ দেখে কে! কলার পাতা তরিতরকারি গঙ্গার ইলিশ নিয়ে হাজির। ঘণ্টার পর ঘণ্টা অক্লান্ত হাঁক ডাক। যাবার সময়ে সজল নয়নে বলেন—রতন জলপানি পেয়েছে। ওর বাবা মা বেঁচে থাকলে আজ আরও কত আনন্দ হ'ত।

কলেজে সেকেণ্ড ইয়ার। কাকা অসুখে পড়েন। কাকা বাবার খুড়তুতো ভাই। তাঁর বাড়িতে থেকেই পড়াশুনা করি। খবর পেয়ে ঠাকুরমা আসেন কলকাতায়। কাকা সুস্থ হতে মাসখানেক লাগে। তারপর আমার প্রিটেস্ট। ঠাকুরমা থেকে যান। পূজার ছুটির প্রথম দিকে ঠাকুরমাকে নিয়ে দেশে ফিরি। অসুখ বিসুখ ও পড়াশুনা নিয়ে দুমাস এমনই ব্যস্ত যে দেশের কোন খবর নিতে পারিনি। সংবাদপত্রে সুদূর পল্লী অঞ্চলের যথাযথ সংবাদ আসে অনেক দেরিতে। লোকমুখে কিছু কিছু খবর এসেছিল বন্যার। দেশে পা দিতেই জানতে পারি বন্যার তাণ্ডবলীলার কথা। আমাদের গ্রামে সামান্য জল ঢুকেছিল, কিন্তু গঙ্গাতীরের অধিকাংশ গ্রামই গিয়েছিল ভেসে। অনেক মানুষ মারা গিয়েছে। অনেক সম্পত্তি নষ্ট হয়েছে, চাকুন্দির ক্ষতি সাংঘাতিক। মনটা ছাঁৎ ক'রে ওঠে। ব্যাকুলভাবে জিজ্ঞাসা করি দাদামশায়ের খবর; কিন্তু আমাদের গ্রামের লোক সঠিক কিছুই বলতে পারে না। ঠাকুরমা অত্যন্ত চিন্তিত হয়ে পড়েন। একদিন বাদে বলেন—তুই না হয় একবার জগমোহনের খোঁজ নিয়ে আয়।

সকাল সকাল খাইয়ে ঠাকুরমা আমাকে চাকুন্দি রওনা ক'রে দেন। খেয়া ঘাটে গাড়ি থেকে নেমে স্তম্ভিত হই। মেঘ মলিন আকাশের নিচে কী মর্মান্তিক দৃশ্য! গঙ্গার ধারের মাটির বাড়িগুলো একেবারে নিশ্চিহ্ন। ভিতরের ভিটেগুলো মাটির ঢিবি। এখানে ওখানে পচা বাঁশ, ভাঙা টিন আর টুকরো কাঠ। চাটুজ্যেদের কলা বাগানটা একদম ফাঁকা। চুনবালি খসেপড়া কোঠা বাড়িটা বিশ্রী দেখাচ্ছে। মাটি শুঁকে বেড়াচ্ছে কয়েকটা নেড়ো কুকুর। জল ঘাস

চিবোচ্ছে গুটি কতক রোগা গরু। ছাড়াগাছে শকুন। জলের ওপর গাঙচিল। দূরের ডাঙায় কতকগুলো নতুন টিনের ঘর। অশান্ত অবস্থায় সেধারে এগিয়ে যাই। এদিক ওদিক ঘোরাঘুরি করতেই সামনে পাই গোবর্ধনকে। আমাকে দেখে সে হাউ হাউ ক'রে কাঁদে আর বলে—জেঠা জেঠিকে আর দেখতে পাবেনা রতন। মা গঙ্গা তাঁদের কোলে টেনে নিয়েছেন।

অপ্রত্যাশিত আঘাতে অভিভূত হয়ে পড়ি। চোখের জলে ঝাপসা হয়ে যায় পারিপার্শ্বিক জগৎ। গোবর্ধনের হাত ধ'রে খেয়া ঘাটে গিয়ে বসি। সে বন্যার বিবরণ দেয়—আমি দেবগ্রামে ছিলাম দিদির বাড়িতে। কিছুই জানতে পারিনি। কে কাকে খবর দেবে। নদী হঠাৎ ফেঁপে উঠে গাঁ কে গাঁ ভাসিয়ে নিয়ে গেল। লোকজন গরু বাছুরকে কোথায় তলিয়ে নিয়ে গেল রাতের আঁধারে। কয়েকটা পরিবার কোন রকমে সাঁতরে এসে, কেউ বড় গাছের ডালে, কেউ চাটুজ্যেদের দোতলার ছাদে উঠে রক্ষা পেয়েছিল। আমি এসে দেখে শুনে অবাক্। এমন ঘটনা কোন দিন কল্পনাও করতে পারিনি। হপ্তা খানেক পরে হু হু করে জল নেমে গেল। ভিটেয় ফিরে দেখলাম সব গিয়েছে, শুধু জেঠার ভাগলপুরী জাঁতা মুখ থুবড়ে প'ড়ে আছে গর্তের মধ্যে আধ-পোঁতা অবস্থায়। সেখানা তুলে নিয়ে গিয়ে রেখেছি নতুন ঘরে।

গোবর্ধনের হাত চেপে ধ'রে অনুরোধ জানাই—মামা, দাদামশায়ের প্রিয় জাঁতাখানা দাও আমাকে। তাঁর ঐ স্মৃতিচিহ্ন আমি যত্ন ক'রে রেখে দেব।

গোবর্ধন রাজী। সে গাড়োয়ানকে নিয়ে চলে যায় জাঁতা আনতে। আমি একলা ব'সে ভাবি প্রকৃতির বিপুল শক্তির কথা। তার কাছে বিজ্ঞানের বাহাদুরি নিছক ছেলেমানুষি। প্রকৃতির একরাত্রের খেয়াল যেন প্রলয়ের প্রলেপ লাগিয়ে দিয়েছে শান্তশ্রী গ্রামখানির ওপর।

গোবর্ধনকে অশ্রুসিক্ত ধন্যবাদ জানিয়ে গাড়ি ছাড়ি। সংসারের কাজ ঠিক চলে আগের মতো। দানগঞ্জের খেয়া নৌকা এপার ওপার করে। যাত্রীরা জিনিস আগলে সুখ দুঃখের গল্প বলে। সন্ধ্যার কূলে জ্বলে দিনের চিতা। চাকুন্দির ঘাটে এমন করুণ অনুরাগ দিনমণি কোন দিন ছড়ায়নি।

* * * *

জাঁতার উপাখ্যান শেষ ক'রে নীরব হয় রতন। অভিসারিকা শুকতারার প্রতীক্ষায় থেকে থেকে অবসাদে ঘুমিয়ে পড়ে বিরহ-বিধুর চাঁদ।

আনন্দদীপ

সনতকুমার মিত্র

ডুবে যাই আমি—বলয়িত নীলে, নীলের অতলে ;
সে যখন তার স্নিগ্ধতা এনে উদয় অচলে
আবীরের গুঁড়ো ছড়িয়ে কপোলে সরমের লালে
অনাস্বাদিত কামনার এক সুগন্ধ ঢালে।
প্রতিটি বিকেলে সে যখন তার বন্ধন খুলে
অনিন্দনীয় রূপময় তার অপরূপ চুলে
শ্রাবণ মেঘের বিচিত্রতর চিত্রকে তুলে
বিমুগ্ধ করে ; আমার আমিকে আমি যাই ভুলে।
নিশীথে নিজের তনুতীর ঘিরে শত ইচ্ছার
তারা-দীপ জ্বেলে আকর্ষণের যে দুর্নিবার
ঢেউ তোলে, কেউ পারবে না তার আঘাতকে নিয়ে
সুস্বপ্ন ঘুমে—পথ পার হ'তে তাকে ব্যথা দিয়ে।
আমিও পারিনা,—তাই বুঝি তার আনন্দদীপে
আশা কামনার সব কিছু সঁপে তারার সমীপে
নিজেকে জ্বালাই ; সৌরভে তার ক্ষয়ে তিলে তিলে
ডুবে যাই তার মেঘের অতলে, বলয়িত নীলে।

(৩৫)

পঞ্চতরণীর রাত্রি

তখনও বায়ুযান পার হচ্ছি, ঢালটা নেমে খানিকটা চলার আনন্দে চলছি। হঠাৎ সেলীম বল্লে "ঐ দূরে দেখুন পাহাড়ের মাথায় মুণি ধ্যান করছেন। ঐ পাহাড়ের ওপারে অমরনাথ।"

ঠিক উত্তরে যে পাহাড়টা খাড়া শৃঙ্গালু ভঙ্গীতে উঠে গেছে, কমপক্ষে সেটার উচ্চতা হবে বিশ হাজার ফুট। অন্তত শুধু চোখের দৃষ্টিতে তাই মনে হয়। তার ওপরে একটা পাথরের টুকরোয় উচু হয়ে বসে, একটা হাঁটুর ওপর কনুয়ের ভর দিয়ে হাতের মুঠোয় চিবুক দিয়ে মাথা নীচু করে কে যেন ভাবছে, অন্তহীন চিন্তা—বিশাল মূর্ত্তি।

এতদূর থেকে অতবড় মুর্ত্তি দেখাচ্ছে, আসল মুর্ত্তি সুবিশাল। কিন্তু প্রকৃতি নিজে পাথরে এ মূর্ত্তি গড়েছেন। প্রাকৃতিক সংঘাতে স্বাভাবিক-ভাবে এমন একখানা মূর্ত্তি মানুষের চোখকে বিভ্রান্ত করতে পারে, না দেখলে বিশ্বাস করতাম না। আমেরিকা হলে এই মুর্ত্তির কতো ছবি হোতো, কত প্রচার হোতো।

ঐ পাহাড়টাই এককালে অমরনাথ যাবার পথ বুকে ধরেছে। স্বামী বিবেকানন্দ অমরনাথ গেছেন এই প্রাচীন পথে। এ পথ এখন যখন দেখি, বিশ্বাস হয়না কখনও কেউ এ পথে যাবার সাহস করেছে। জ্ঞানতঃ কে আর বিনা দড়ির সাহায্যে একটা শুকনো কুয়ার দেয়াল ধরে নামা ওঠা করতে পারে—যত এঁকিয়ে বেঁকিয়েই সে রাস্তা করা যাক না। ফলে সেকালে অমরনাথ যাত্রা যাঁরা করতেন উইল সেরে করতেন। কিম্বদন্তী আছে এই সব ঘোড়াওলা আর পাণ্ডাদের মধ্যে যে পুরাকালে প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত ব্যক্তি যদি কাশ্মীর রাজের কাছে নির্দোষ বলে প্রাণভিক্ষা চাইতো—কাশ্মীররাজ তাকে এই পথ অতিক্রম করে অমরনাথ দর্শন করতে যেতে বাধ্য করতেন। তখনকার দিনে ধারণা ছিল যে যারা পাপী তারা অমরনাথ দর্শন করার পথেই মারা যেতো—সর্দি-জ্বরে, নিউমোনিয়ায় বা আমাশয়ে নয়, এই পথ থেকে পড়ে পাহাড়ের তলায় চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে। একটা বিশেষ গুজর শাখাই ছিল, যারা সারা বৎসর এই পাহাড়ের আনাচে-কানাচে ঘুরে বিনষ্ট দেহ থেকে আভরণ, অলঙ্কার ইত্যাদি সংগ্রহ করতো। তবুও তো বহুলোক অমরনাথ দর্শন করে ফিরে আসতো। সেকালের রাজারা ও সাধারণ জনেরা কতো ভাগ্যবান ছিল। তারা অন্ততঃ এই অমরনাথ যাত্রার পথে বিশ্বাস করতো দেশে পাপাত্মা ও পুণ্যাত্মাদের মধ্যে পুণ্যাত্মারাই সংখ্যায় অধিক। আর এখন? কে একজন প্রশ্ন করেছিল "সেকালের আর একালের ধর্মাধিকরণের ব্যবস্থার তারতম্য কি?" কে এক মুখফোঁড় ছোকরা সেকালের কংগ্রেস আর একালের কংগ্রেসী সরকারকে লক্ষ্য করে টিপ্পনী ঝেড়েছিল—"সেকালে চুরি করার পর জেলে যেতে হোতো; একালে জেল ফেরৎ হয়ে এলে পর চুরীর অধিকার জন্মায়।" যে কালের লোকেরা জানতো পুণ্যাত্মাদের সংখ্যা পাপাত্মাদের চেয়ে বড়, সেকালে লোকে পরম আনন্দে থাকতো। বর্ত্তমান কাশ্মীররাজ বলে খ্যাত হরিসিংজীর পিতা এসব বিশ্বাস করেননি, তাই প্রতি বৎসর অমরনাথ যাত্রার সময়ে যাত্রীদের মৃত্যুর হার দেখে অনেক ঘুরিয়ে এক নতুন পথ বার করেন। খাড়াইয়ের ভয়ালরূপ তাতে খানিক কমেছে বটে, কিন্তু পথের সঙ্কীর্ণতা ও ভয়ালতা বড় বেশী কমেনি। পড়ে গেলে মানুষ মরে—তবে দেহ পাওয়া যায় এ পথে। এই নতুন পথটা পুরো চোখে দেখা যায় না বলে ধীরে ধীরে ওঠার সাহস হয় এবং ঘোড়ায় করে ওঠা যায়, ঝাম্পান, কাণ্ডি—এসব চলে। চলে বলেই নিরাপদ এ কথা ভাবা অন্যায়।

পূর্ব্বের পথটা এখন দুঃস্বপ্নের মতো পরিত্যক্ত। অন্য পথটা পঞ্চতরণী নদীর নালার সঙ্গে সঙ্গে পশ্চিম দিকে মাইলখানেক গিয়ে উত্তরে বাঁক নিয়েছে পাহাড়ের গা দিয়ে অমরগঙ্গা নদীর নালা ধরে ধরে নামা।

এ কথা সত্য যে বেলা দেড়টা নাগাদ পঞ্চতরণীতে পৌঁছে পাঁচটার মধ্যে অমরনাথ ঘুরে আসা যায় এবং অনেকেই তা করে বাহাদুরী এবং সময় সংক্ষেপ করে থাকেন।

আমাদের ঘোড়াওলা ব্যস্ত সেদিনই সব শেষ করে আসতে। গুপ্তাজীও ঐ দলে, জগজীবনও তাই। ভর্মা বলছে—"এখানে শেষ হলেই শেষ। তখনই তো উঠবে ফিরে-চলার ধ্বনি। থাকিনা আজকের রাতটা এখানে।" আমার মনে হচ্ছে সারাদিন ঘোড়ার পিঠে, ক্লান্তি; তা ছাড়া উপবাসী নই। এ অবস্থায় দেবাদিদেবকে দেখতে যাবো, মন তো এখন তমোময় হয়ে আছে। প্রকৃতির সত্ত্বগুণ ব্রাহ্মমুহূর্ত্তে যেমন জবাকুসুম সঙ্কাশ হয়ে ওঠে তেমনটা সায়াহ্নের রুদ্ররূপে পাই না। প্রভাত রসের, সন্ধ্যা কমণ্ডলুর; প্রভাত আনে আশা, সন্ধ্যায় আসে সমাপ্তি। ভালো লাগছে না। অসিত আর বেণুর মত নেই। যা বল্লেন দাদা।

সমস্ত সমস্যার সমাধান করে এলো বৃষ্টি, বাত্যা, ঝড়, শিলা। দেখতে দেখতে শিলায় শিলায় সমস্ত ভূখণ্ড শাদা হয়ে উঠলো, বৃষ্টির দাপটে সমস্ত ঘোলাটে আর ভীষণ হয়ে উঠলো। প্রতিটি জলকণা তুহিন হয়ে ঝরছে। বায়ুমণ্ডলে আর্দ্রতা মাত্রই জমাট বাঁধছে। এ বৃষ্টির অন্ধকার সমতলের বৃষ্টির রূপ নিয়ে আসেনি।

আর তেমন প্রচণ্ড বাতাস। টীনে ছাওয়া সারি সারি দুখানা লম্বা চটি। চালটা লড়ায়ের আমলের গোলাবাড়ীর মতো গোল টিনে ছাওয়া। কবে ছাওয়া হয়েছে কে জানে। বরফের চাপে, শিলাপাতের প্রকোপে ভেঙ্গে-চুরে নড়বড়ে হয়ে আছে। তার ফাঁক দিয়ে দিয়ে বাতাস বইছে, অদ্ভুত রকম শব্দ করছে সোঁ-ওঁ-ওঁ, হু-ঈ-শ-শ-শূ-উ-উ-উ; কানপাতা দায়। এক একবার দাপটের চোটে সমস্ত টিনের চালটা মড়্ মড়্ করে উঠছে। আশ্চর্য্য ছাওনদারীটার কিছু হচ্ছে না। বৃষ্টির ক্ষমা নেই, ক্লান্তি নেই, উপসংহার নেই। ঝড়টা আসছে পশ্চিমের নালাটার মধ্য দিয়ে। বায়ুকোণের উন্মত্ত সেই ঝঞ্চা সঙ্কীর্ণ নালার পথ দিয়ে সংহার মূর্ত্তি নিয়ে পাঠাচ্ছে হুন সৈন্যদলের মতো কাতারে কাতারে; আর তারা এসে আছড়ে পড়ছে পঞ্চতরণীর নদীবক্ষে। উপলগুলি পর্য্যন্ত থর্ থর্ করে উঠছে, নদীর জল থেকে ছাঁট উড়ে নদীতেই পড়ছে।

এ ঝড়ও থামলো। আবার জল্পনা চললো আজই রওনা হওয়া যাবে কিনা। যাবার কথা ঠিক হোলো কারণ বংশলরা যেতে তৈরী। নিতান্ত অনিচ্ছায় আমিও হাঁ বলি। পা বাড়ানো হবে। ঘোড়া ডাকা হোলো। অমনি আবার ঝড়, আবার ঝড়। তুমুলতর বিক্রমে বৃষ্টি। এইভাবে তিনবার। তখন আমি বলি—"অনিশ্চিত যাওয়া না যাওয়ার দোলায় আমি দুলতে নারাজ। উনুন ধরাও, খিচুড়ী চাপাও, আমি রইলাম।"

কেউ জানেনা আমার নাক দিয়ে অজস্র রক্ত পড়ছে তখন। বেলা দশটার পর থেকেই অসহ্য যন্ত্রণা হচ্ছিল মাথায়; মাথা যেন ছিঁড়ে পড়ছিল; কারুকে বলিনি; লাভ নেই। চারটে এস্‌পিরিণে কিছু হয়নি। এখন পড়তে লাগলো রক্ত। দাঁতের মাড়ী দিয়েও রক্ত পড়তে লাগল। পাহাড়ে উঠেছি, ক্লান্তি খেয়ে রওনা হয়েছি। উনিশহাজার ফুটের মাথায় পা রেখেছি। রক্তের চাপ বেড়ে গেছে খুব বেশী। নাকের ভিতরে শিরা ছিঁড়ে রক্ত ঝরছে। ঘাবড়াইনি সত্য, কিন্তু ভাল লাগেনি তখন। অমরনাথের পথে পাপীর রক্ত মোক্ষণ হোলো, তবু মাথার যন্ত্রণার উপশম হোলো না।

সকলে গুটী গুটী তাঁবুতে ঢুকলাম।

কোটেশ্বর আর বেণু কোনও মতে আমাদের ছয়দফা বিছানা দিয়ে ঘরটা ঢেকে ফেলে। তারপর আমরা যে যেখানে পারলাম গড়িয়ে পড়েছি। পড়তে না পড়তেই হিমক্লান্তি, তুহিন অবসাদ, বরফের সেই ঘুম। সমস্ত দিন ঘোড়ায় চড়ে আসতে হওয়ায় ঘুম পেয়েছে। বরফে চলতে চলতে এ ঘুম আসে। কিন্তু বেলা দেড়টার মধ্যেই আমাদের যাত্রা সেদিনের মতো শেষ হওয়ায় ঘুমের ঘোরে পড়তে হয়নি। তবে বরফের মধ্যে এই মরণ-ঘুম পায়। আমরা মরে আছি; ভয় নেই। যারা একা চলে, যদি এই ঘুমের কোলে ঢ'লে পড়ে, সেই হয় চিরনিদ্রা।

কিন্তু কোটেশ্বর আমাদের পাণ্ডা। অমরনাথের মতো দুস্তর যাত্রা-পথে কোটেশ্বরের মতো গাইড না পেলে চলতো না। বিলিতি গাইড আর আমাদের দেশের পাণ্ডাদের মধ্যে কে ভালো, কে মন্দ এ বিচার করতে গেলে নানান্ জটিল প্রশ্নের কথা এসে পড়বে। খুব সাধারণ-ভাবে গুটীকতক কথা বলা চলে। সাধারণতঃ পাণ্ডা নামটার প্রতি আমরা রুষ্ট, কারণ তীর্থে তীর্থে এদের অত্যাচার নাকি অসাধারণ। কোনও কালে হয়তো ছিল। সে কথা না তুলে মাত্র এ কালের কথাই বলা যাক্। এই পাণ্ডার দল পার্সিপোলিস, এথেন্স, অলিম্পিয়াই, রোম, লণ্ডন, কায়রোতে আছে। সে সব জায়গায় এরা পরিচিত গাইড বলে। মক্কা-মদিনার তীর্থযাত্রায় পাণ্ডাদের জুলুমের কথা জানি, ওয়েষ্ট মিনষ্টার এ্যাবেতে পাণ্ডার উৎপাত এডিসন্ জানতেন, গোল্ডস্মিথ জানতেন। যন্ত্রণা, জুলুম, ফেরেব্বাজীতে দুনিয়ার তাবৎ পাণ্ডাকুল একে-বারে কাকের সমধর্মী এ বিশ্বাস অনেকের সঙ্গে আমিও করি। কিন্তু বিশ্বাস করি না যে পাণ্ডারা গাইডদের তুলনায় বিশেষ করে অর্থগৃধ্নু এবং অসভ্য। আমি জানিনা কোনও গাইড প্রথম দিনে শ্রান্ত তীর্থ-যাত্রী বা পর্য্যটককে ফ্রা-লাঞ্চ অর্থাৎ নিখরচায় মধ্যাহ্ন ভোজের, অন্ততঃ প্রথম খানাটার ব্যবস্থা করে কিনা। আমি জানিনা কোনও গাইড ধর্মশালা বা পান্থনিবাস ছাড়া প্রয়োজন মত নিজের বাসায় নিজের খরচায় পর্য্যটককে রাখেন কি-না। আমি ভাবতে পারিনা—এথেন্সে গেছি—আমার খিচুড়ী পাকের ওরকে রুটী সেঁকার বা কোনও রান্নার কোনও ব্যবস্থা আমার গাইড করবে কি-না। আমার জন্য সে উনুন ধরিয়ে দেবে কিনা, বাসন-কোসনের ব্যবস্থা করে দেবে কি-না। এসব তো গেল সাধারণ কথা। বিদেশে, আলেকজান্দ্রিয়া, ওয়াশিংটন বা টোকিওতে নেমে যদি শুনি আপনার নাম তো অমুক, বাড়ী অমুক স্থানে। পিতার নাম এই, এই কটি ভাই, আপনার মেজদা এতো সালে এখানে এই অভাজনের বাড়ী এসেছিলেন, তখন সেই বিদেশে সেই লোকটাকে বেশ খানিকটা নির্ভরযোগ্য বোধ হবে বৈকি! আমি নিশ্চয় জানি কোনও দেশে কোনও গাইডের ত্রিসীমানায় কেউ আশা করবে না যে তার নিঃস্ব পকেটকে ক্ষণকালের জন্য সে ভরে দেবে পাঁচশ টাকা ঋণ, শুধু আপনি তাকে ফিরিয়ে দেবেন এই ভরসায়। অন্ততঃ ভারতবর্ষের তীর্থে সাধারণতঃ পাণ্ডারা পরম বান্ধবের কাজ করে। মাঝে মাঝে লোমহর্ষক ঘটনা যা শোনা যায় তা বিরাট প্রতিষ্ঠানে ঘটে, বিশেষ করে সে প্রতিষ্ঠান যখন সংঘবদ্ধ নয়। ইংরেজের সুশাসিত ব্যবস্থাতেও বহু ম্যাজিষ্ট্রেট, এস-ডি-ওর রোমহর্ষক কাহিনী শোনা যায় বলেই ইংরাজ শাসন ব্যবস্থার নিন্দা করা যুক্তিযুক্ত হবেনা।

মোট কথা বিদেশে পাণ্ডা একটা প্রকাণ্ড সাহায্য। বদলে দু'দশ টাকা দিলে তারা খুশী। আমরা অন্ততঃ কোটেশ্বরকে সেই ধরণের প্রবাসের বন্ধু হিসেবে পেয়েছিলাম।

আমি কোটেশ্বরের শব্দে জেগে দেখি—ও ডেকে সকলকে চা দিচ্ছে। বেণু আর কোটেশ্বর শুধু জেগে, বাকী সব ঘুমুচ্ছে। চা খেয়ে আবার সব চাঙ্গা। তারপর ওরা ধরলে—"খাওয়া নয় আজ, কেবল ঘুম।"

তা তো হয়না। কাল সকালেই অমরনাথ সেরে একটু চা-পান সেরে সোজা চলা একেবারে শেষনাগ হয়ে চন্দনবাড়ীতে রাত্রিবাস। দীর্ঘদিনের মধ্যে আহার জুটবে না। আজ না খেলে কাল বিপদ ঘটতে

পারে। আমি গা ঝাড়া দিয়ে উঠে যখন খিচুড়ি চাপিয়ে দিয়েছি তখন ওরা ঘুমুচ্ছে।

সন্ধ্যা হয় হয়। এমন সময়ে আমাদের তাঁবুর দোরে এসে দাঁড়ালেন মিঃ ডিগ আর মিসেস ডিগ।

"জায়গা হবে?"

সে কথা পরে—এখন চা খাও। বোসো। তোমরা একেবারে পায়ে হেঁটে?

হ্যাঁ, খুব ভোরে রওনা হয়েছি সেই তাঁবু থেকে। শেষ নাগে থামিনি, সোজা আসছি। বড্ড শ্রান্ত। মিসেস ডিগের পায়ে ফোস্কা পড়েছে। চা খাবো; বলো জায়গা হবে?

মিসেস ডিগ অদ্ভুত ভাবে চেয়ে আছে আমার পানে। ধরা গলায় বল্লে—"যদি বলতেন নেই, এখানেই অজ্ঞান হয়ে পড়তাম।"

আমি বলি, "জায়গা হবে এই তাঁবুতে গাদাগাদি করে। হনিমুনের পক্ষে ভীড় বড় অস্বাস্থ্যকর। একটু নীচে অমরনাথের ওপর একটা শেড্ আছে। সেখানে যান। যদি খারাপ দেখেন চলে আসবেন।"

চা করতে যাচ্ছে কোটেশ্বর। বল্লে,—"খাওয়া না শিরি?"

আমি বলি "শিরি?"

কোটেশ্বর বল্লে—"এতো শীতে 'খাওয়া'ই ভাল।"

আমি বলি "না বাপু 'খাওয়া' চলবে না। শিরিই দাও।"

জগজীবন বলে "ও আবার কি?"

হেসে বলি "নুন দেওয়া চাকে এরা বলে 'শিরি'। আর মিষ্টি দেওয়া চাকে বলে 'খাওয়া'।

জগজীবন হেসে বলে—"হায় ভগবান।" অর্থাৎ "হায় বাবা।"

ওরা চা খেয়ে নেমে গেল। খিচুড়ী খেতেও এলোনা। ওরা ওদের আখড়া পেয়ে গেছে। কি অসমসাহসিকতা! গাইড নেই, পাণ্ডা নেই, তাঁবু নেই। কেবল আমরা আসছি দেখে ওরাও চলে এসেছে। এতো চমৎকার হনিমুন কেউ কখনও করেছে আমার ধারণা নেই।

রাতে শুয়ে শুয়ে অন্ততঃ তিনচার বার মিসেস্ ডীগের অসহায় সেই চোখ দেখেছি। সেই প্রশ্ন "জায়গা আছে? জায়গা হবে?"

আকাশভরা নক্ষত্র। পঞ্চতরণীর জলের কলকল ধ্বনি। দুরন্ত বরফপড়া বাতাস কানাতের পাশ দিয়ে ঢুকছে। কোটেশ্বর অসিতের জামা প্যান্ট শেডের বড় চুল্লীর চারধারে ছড়িয়ে দিয়েছে। আমাদের ওপর সব কম্বল ও লেপ চাপিয়েছে। প্রায় কুকুর কুণ্ডলী হয়ে এ ওর কাছে ঘেঁসা-ঘেঁসি করে সে রাতে যে ঘুম দিয়েছিলাম, তার আসল নাম সাময়িক মৃত্যু।

ক্রমশঃ

ভারতবর্ষ প্রিন্টিং ওয়ার্কস্

শান্ত

ফটো : রমেন বাগচী

ভারতবর্ষ প্রিন্টিং ওয়ার্কস

আহার

ফটো : রামকিঙ্কর সিংহ
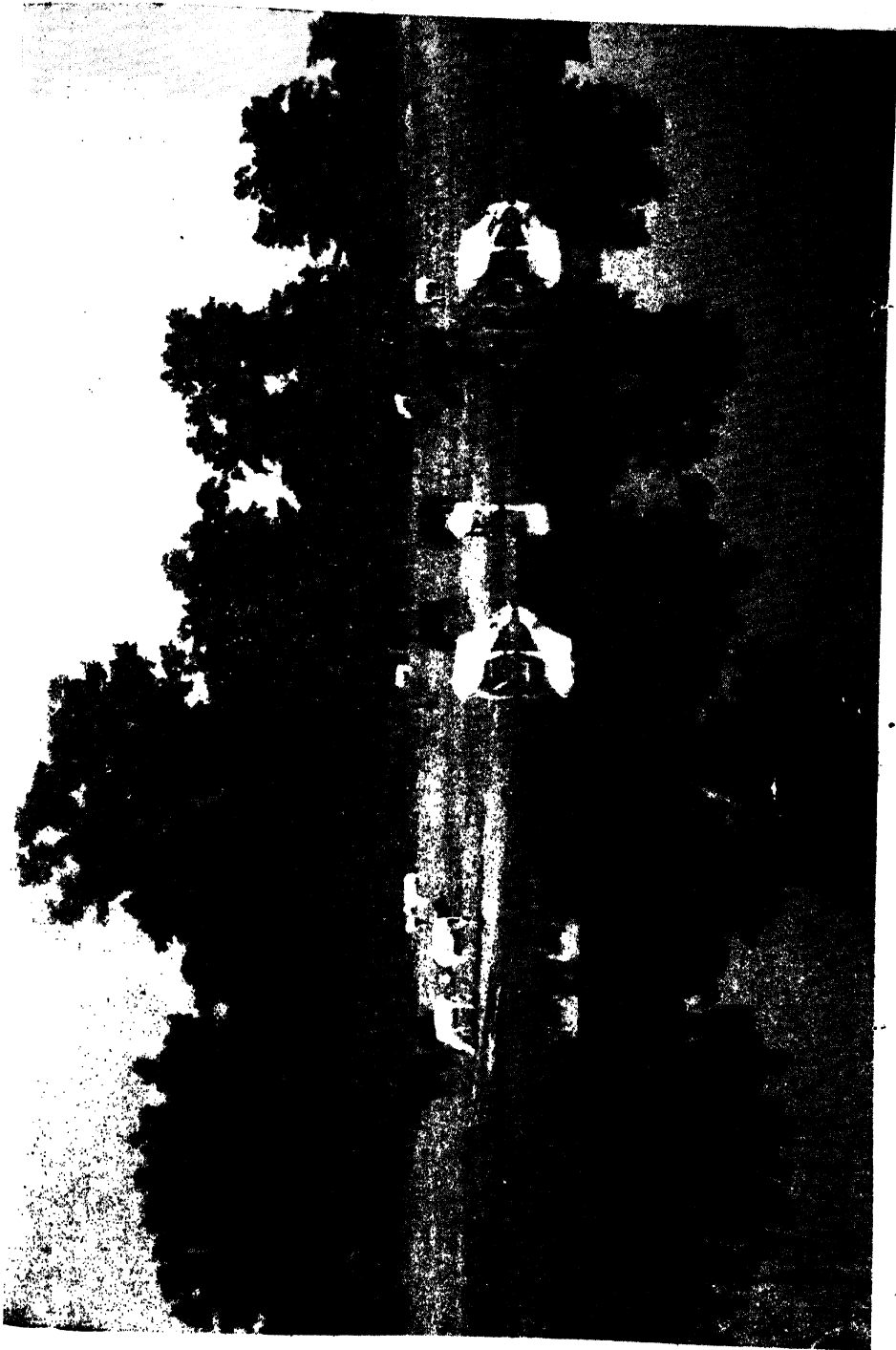
বেদান্ত দর্শন—শঙ্কর-ভাষ্য

শ্রীতারকচন্দ্র রায়

জগতের মিথ্যাত্ব

শঙ্করের মতে জগৎ মিথ্যা—মায়া-সৃষ্ট। কিন্তু তিনি বৌদ্ধ বিজ্ঞানবাদ, ক্ষণিক বিজ্ঞানবাদ ও শূন্যবাদ—সকলেরই খণ্ডন করিয়াছেন। তবে জগৎ মিথ্যা—ইহার অর্থ কি?

জগৎ মিথ্যা, কেননা ইহা চিরকাল থাকে না, সত্য জ্ঞান যতদিন না হয়, ততদিনই জগতের অস্তিত্ব। সত্য জ্ঞান হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই ইহার বিলোপ হয়। কিন্তু আকাশপুষ্প এবং শশ-শৃঙ্গ যে অর্থে মিথ্যা, সে অর্থে জগৎ মিথ্যা নহে। আকাশপুষ্প ও শশ-বিষাণ আত্যন্তিক অসৎ, তাহারা "তুচ্ছ"। কিন্তু জগৎ-প্রপঞ্চের প্রতীতি হয়, অনুভব হয় (শশবিষাণ ও আকাশপুষ্পের অনুভব কখনই হয় না)। এই অর্থে জগতের অস্তিত্ব আছে। কিছুকাল জগতের অস্তিত্ব থাকে বলিয়া জগৎ 'সৎ', চিরকাল থাকে না বলিয়া "অসৎ"। এইজন্য জগৎ সৎও নহে অসৎও নহে—অনপেক্ষভাব সৎ নহে, অনপেক্ষভাবে অসৎও নহে। আবার জগৎকে এইজন্যও মিথ্যা বলা যায় যে যদিও জগৎ সৎ অথবা সতের বিভূতি বলিয়া প্রতীত হয়, তথাপি যখন সতের সত্যজ্ঞান হয়, তখন ইহা স্পষ্টীকৃত হয়, যে জগতের বর্ত্তমান অস্তিত্ব যেমন নাই, তেমনি ইহার অস্তিত্ব পূর্ব্বেও ছিলনা কখনও থাকিবেও না। যখন রজ্জুতে সর্পভ্রম বিদূরিত হয়, তখন পূর্ব্বে যে সর্প প্রতীত হইয়া ছিল তাহার অস্তিত্ব থাকে না। ইহাও স্পষ্ট হয়, যে সর্প সেখানে কখনও ছিল না এবং ভবিষ্যতেও থাকবে না। রজ্জুতে সর্পভ্রমের সময় যেমন ইন্দ্রিয়ের সম্মুখে উপস্থিত "ইদম্" (ইহা) সর্পরূপে প্রতীত হইয়াছিল, জগৎ-ভ্রান্তিকালে তেমনি সৎ বা ব্রহ্মই জগৎরূপে প্রতীত হন। ব্রহ্মজ্ঞান হইলে জগৎ অন্তর্হিত হয় ও তখন বুঝিতে পারা যায় যে জগৎ পূর্ব্বেও ছিলনা, পরেও থাকিবে না। ব্রহ্মজ্ঞান ও জগতের তিরোধান একই সময়ে হয়। ব্রহ্মজ্ঞান ও জগৎ জ্ঞানের তিরোধান একই ব্যাপার। তখন জগৎ ও তাহার জ্ঞান উভয়েই তিরোহিত হয়। ব্রহ্মই কেবল অবশিষ্ট থাকেন। ব্রহ্মের মধ্যে জগতের অস্তিত্ব না থাকিলেও, জগৎ ব্রহ্মে অধ্যস্ত হয়। যাহার কখনও বাধা হয় না, তাহাকেই সত্য বলে। সত্যজ্ঞান হইলে যখন জগতের বাধা হয় অর্থাৎ জগৎ থাকে না, তখন জগৎকে মিথ্যা বলিতে হয়।

কিন্তু জগতের এই মিথ্যাত্ব ও রজ্জুতে সর্প জ্ঞানের মিথ্যাত্ব এক প্রকার নহে। রজ্জুতে সর্পের অস্তিত্বকে প্রাতিভাসিক বলে। রজ্জু সর্পরূপে প্রতিভাসিত হয়, তাই সর্পের অস্তিত্ব প্রাতিভাসিক, পরবর্ত্তী অনুভব দ্বারা সর্প-জ্ঞানের বাধা হয়। কিন্তু এই সংসারে জগৎ-জ্ঞানের কোনও বাধা হয় না। যতদিন ব্রহ্মজ্ঞান না হয়, ততদিন জগৎ নিয়মানুসারে চলিতে থাকে, কোনও বাধা হয় না। সুতরাং ব্রহ্মজ্ঞান না হওয়া পর্য্যন্ত জগৎকে সত্য বলিতে হইবে। কিন্তু এমন একটি অবস্থা আছে, যাহাতে জগতের কোনও প্রকাশই হয় না। এই জন্য পারমার্থিক দৃষ্টিতে জগৎকে অসৎ বলা হয়। জগতের অনুভব হয়, ব্যবহারে তাহার অস্তিত্ব অনুভূত হয় বলিয়া এই অস্তিত্বকে ব্যবহারিক অস্তিত্ব বলে (Phenomenal existence)। কিন্তু ইহা পারমার্থিক বা নিত্য অস্তিত্ব নহে। পারমার্থিক দৃষ্টিতে জগৎ অসৎ। যুক্তিতেও জগতের প্রতীয়মান অস্তিত্ব মিথ্যা বলিয়া প্রমাণিত হয়।

একত্বই পারমার্থিক সত্য, নানাত্ব মিথ্যাজ্ঞান। শঙ্করের মতে বহুত্বের জ্ঞান অবিদ্যা-সঞ্জাত। ঈশ্বরও অবিদ্যাজাত। কিন্তু আমাদের বহুত্বের জ্ঞান দ্বারা ব্রহ্মের একত্বের হানি হয় না। চক্ষুর দোষবশতঃ দুইটি চন্দ্র দৃষ্ট হয় বলিয়া চন্দ্রের একত্ব নষ্ট হয় না। আমাদের অসম্পূর্ণ জ্ঞানে ব্রহ্ম বহুরূপে প্রতীত হন বলিয়া তাঁহার একত্বের অপহ্নব হয় না। নাম-রূপে বিশিষ্ট সমগ্র ব্যবহারিক জগৎ—যাহাকে সৎও বলা যায় না, অসৎও বলা যায় না, তাহা অবিদ্যার ভূমিতে অধিষ্ঠিত। কিন্তু চরম সত্য যাহা (সত্তা), তাহাতে কোনও পরিবর্ত্তন নাই। যে পরিবর্ত্তন কেবল বাচারম্ভণ (বাক্য) মাত্র, তাহা দ্বারা সতের অবিভাজ্যতার

কোনও পরিবর্ত্তন হয় না।" জগতের বিভাগ মিথ্যাজ্ঞান হইতে উদ্ভূত এবং পূর্ণজ্ঞানের সঙ্গে তাহা বিলুপ্ত হয়। "তৎ-ত্বম্-অস" প্রভৃতি বাক্য দ্বারা যখন অভেদজ্ঞান উদ্বুদ্ধ হয়, তখন জীবের সংসারভ্রম এবং ঈশ্বরের স্রষ্টৃত্বের বিরতি ঘটে।

শঙ্কর বলেন সংসারে জীবনযাত্রায় প্রত্যক্ষ জ্ঞানই আমাদের উপজীব্য, প্রত্যক্ষ জ্ঞানের উপর আমরা নির্ভরশীল। কিন্তু তাহা দ্বারা প্রত্যক্ষ জ্ঞানের সত্যতা প্রমাণিত হয় না। সত্য-নিরূপণের উপায় পরীক্ষা। আমাদের সমকালবর্ত্তী সকলের সাক্ষ্য দ্বারা প্রতীয়মান জগতের সত্যতা প্রমাণিত হয়। এই জগতেই আমাদের চেষ্টা অভীষ্ট ফল উৎপাদন করে। এ সকলই সত্য। কিন্তু এই প্রকার পরীক্ষা দ্বারা ইহা প্রমাণিত হয় না যে এই জগৎ-প্রপঞ্চের বাধা কখনও হইবে না। পরীক্ষা দ্বারা এই মাত্র প্রমাণিত হয়, যে জগৎ-প্রপঞ্চ বর্ত্তমানকালে যেরূপ প্রতীত হয়, সেইরূপে বর্ত্তমান। ইহা বেদান্ত স্বীকার করেন। কিন্তু ইহা যে চিরকাল থাকিবে, তাহা স্বীকার করেন না। বেদান্ত মতে এক সময় আসিবে যখন ইহার অস্তিত্ব থাকিবে না।

দৃক্ (চিৎ) ও তাহার বিষয়ের (দৃশ্যের) মধ্যে, বিষয়ী ও বিষয়ের মধ্যে-যে সম্বন্ধ, তাহার স্বরূপ হৃদয়ঙ্গম করা অসম্ভব। দৃক ও দৃশ্যের মধ্যে কোনও সম্বন্ধ যদি না থাকিত, তাহা হইলে যে কোনও বিষয়ই যে কোনও সময়েই জ্ঞানে আবির্ভূত হইতে পারিত। কিন্তু এই সম্বন্ধ কি? ইহা সংযোগ নহে, সমবায়ও নহে। অন্য কোনরূপ সম্বন্ধের কথাও আমাদের জানা নাই। মীমাংসকদিগের মতে বিষয়ে "জ্ঞাততা" উৎপন্ন হয়। কিন্তু এই জ্ঞাততা বোধগম্য হয় না। প্রভাকরের মতে বিষয় দ্বারা আমাদের যে প্রয়োজন সিদ্ধ হয়, সেই প্রয়োজনই তাহার বিষয়ত্ব। কিন্তু ইহাও সত্য নহে, কেননা এমন অনেক বস্তু জ্ঞানের বিষয় হয়, যাহা দ্বারা আমাদের কোনও প্রয়োজনই সিদ্ধ হয় না। আবার জ্ঞান-কারণত্বকেও বিষয়ত্ব বলা যায়না (অর্থাৎ জ্ঞানকালে মননের বিষয়কে বিষয় বলা যায় না)—কেননা যে সকল বস্তু প্রত্যক্ষকারীর সম্মুখে বর্তমান থাকে, তাহাদের সম্বন্ধে ইহা সত্য হইতে পারে, কিন্তু অতীত কালে প্রত্যক্ষীকৃত বস্তু সম্বন্ধে সত্য হইতে পারে না। কেননা যাহা বর্ত্তমান কালে উপস্থিত নাই, তাহা জ্ঞানের বিষয় হইতে পারে না। জ্ঞানের বিষয় হওয়ার অর্থ ইহাও নহে—যে বস্তু কর্ত্তৃক তাহার রূপ জ্ঞানে অর্পিত হয়, কেননা প্রত্যক্ষ সম্বন্ধে ইহা সত্য হইলেও অনুমান সম্বন্ধে সত্য নহে। অনুমানকালে বিষয় বহুদূরে বর্ত্তমান থাকে এবং সংবিদ্ বিষয়ের রূপ ধারণ করে না। সুতরাং মন হইতে স্বতন্ত্রভাবে অবস্থানকালে বস্তুসকল কিরূপে সংবিদের বিষয় হয়, তাহা বুঝিতে পারা যায় না। সংবিদ ও তাহার বিষয়ের মধ্যে সম্বন্ধের স্বরূপও দুর্বোধ্য। ইহা হইতেও জগৎ প্রপঞ্চ যে মায়ামাত্র, তাহা স্বীকার করিতে হয়।

কিন্তু এই অবিদ্যা বা মায়া, যাহার জন্য জগৎ-প্রপঞ্চের অনুভব হয়, তাহা সর্ব্ব-সাধারণ। তাহা ব্যক্তিগত ভ্রান্তি নহে। রজ্জুতে সর্পদর্শন ব্যক্তিগত ভ্রান্তি। কিন্তু জগৎ-ভ্রান্তি সর্ব্বমানব-সাধারণ, সম্ভবতঃ সর্ব্বজীব-সাধারণ। সুতরাং রজ্জুতে সর্পভ্রান্তি ও জগৎ-ভ্রান্তির মধ্যে পার্থক্য স্পষ্ট। কিন্তু শঙ্কর যে সকল উপমার ব্যবহার করিয়াছেন তাহা হইতে মনে হইতে পারে যে শঙ্করের মতে মরীচিকার মতো জগতের কোনও অস্তিত্বই নাই। রজ্জুতে সর্পের অনুভব হইলেও সর্পের অস্তিত্ব যেমন সেখানে কখনও ছিল না, মরীচিকায় জলের অনুভব হইলেও সেখানে যেমন জলের অস্তিত্ব একেবারেই নাই, জগতেরও তেমনি কোনও প্রকার অস্তিত্ব প্রকৃতপক্ষে নাই। কিন্তু এই ধারণা সত্য নহে। অবিদ্যা অচেতন, সাংখ্যের প্রধানের মতো অচেতন। সুতরাং তাহা দ্বারা জগতের সৃষ্টি অসম্ভব। অচেতন প্রধান দ্বারা জগতের সৃষ্টি অসম্ভব, ইহা শঙ্কর বলিয়াছেন। সুতরাং অচেতন অবিদ্যা দ্বারা জগৎসৃষ্টি হইয়াছে, ইহা বলা তাঁহার অভিপ্রেত হইতে পারে না। বুদ্ধের প্রতীত্যসমুৎপাদে বর্ণিত দ্বাদশ-নিদানের প্রথম নিদান অবিদ্যা। শঙ্কর ইহা গ্রহণ করেন নাই, ইহার দোষ প্রদর্শন করিয়াছেন। তিনি শূন্যবাদ ও ক্ষণিকবিজ্ঞানবাদ অগ্রাহ্য করিয়াছেন। বিজ্ঞানবাদ খণ্ডন করিয়া তিনি জগতের মনোবাহ্য অস্তিত্ব প্রমাণ করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন, আমাদের মনের বৃত্তির উপর অস্তিত্ব নির্ভর করে না। পরবর্তী অদ্বৈতবাদিগণের মত যাহাই হউক না কেন, শঙ্কর আমাদের জাগরণ-কালের অনুভবকে স্বপ্নের অনুভবের মত অলীক বলেন নাই।

তিনি ব্যক্তিগত অবিদ্যাকেই জগতের কারণ বলেন নাই। তাঁহার মতে অবিদ্যার মনোবাহ্য অস্তিত্ব আছে, তাহা বিষয়ী-তন্ত্র (Subjective) নহে। অবিদ্যা সর্ব্বসাধারণ ও পৃথিব্যাদি প্রপঞ্চের কারণ। অবিদ্যা অনাদি শক্তি—ভাববস্তু। "অনাদি-ভাব-রূপম্ যৎ প্রজ্ঞানেন বিলীয়তে তৎ অজ্ঞানম্, ইতি প্রাজ্ঞা লক্ষণং সংপ্রচক্ষতে।" (চিৎসুখ) এই সমস্ত কারণে শঙ্কর যে জগৎকে স্বপ্ন বা মরীচিকার মতো একেবারেই মিথ্যা মনে করিতেন ইহা সম্ভবপর নহে।

ডাঃ রাধাকৃষ্ণ বলেন "শঙ্করের মতে ব্রহ্মই জগতের ভিত্তি। ব্রহ্ম যদি জগৎ হইতে সম্পূর্ণ ভিন্ন হইতেন, উভয়ের মধ্যে কোনও সাদৃশ্য যদি না থাকিত, জাগরিত, সুষুপ্ত ও স্বপ্নাবস্থার সহিত আত্মার কোনও সাদৃশ্য না থাকিত, তাহা হইলে জগৎকে ও জাগরিত, স্বপ্নও সুষুপ্ত অবস্থাকে মিথ্যা বলিলেও, তাহা দ্বারা সত্যে পৌছিবার কোনও পথের সন্ধান পাওয়া যাইত না। "যদি হি ত্রি-অবস্থাত্ম-বিলক্ষণম্ তুরীয়ম্ অন্যৎ তৎ প্রতিপত্তি-দ্বারাভাবাৎ শাস্ত্রোপদেশানর্থক্যম্ শূন্যতাপত্তিশ্চ" (মাণ্ডু-ক্যোপনিষদের শঙ্কর ভাষ্য)! তুরীয় যদি তিন অবস্থা হইতে ভিন্ন হইত, তাহা হইলে তাহার উপলব্ধির উপায়ের অভাববশতঃ শাস্ত্রোপদেশ অনর্থক হইত এবং শূন্যবাদ স্বীকার করিতে হইত। মায়িক সর্প শূন্যতা হইতে উদ্ভূত হয়না। ভ্রান্তির অপনোদনের সঙ্গে তাহা শূন্যে পরিণত হয়না। নানাভূত জগৎ ভ্রান্ত বিচারের ফল। এই ভ্রান্তির অপনোদনের অর্থ মতের পরিবর্তন। (যাহাকে সর্প বলিয়া বিশ্বাস করিয়াছিলাম তাহা সর্প নহে, এই মত অবলম্বন)। রজ্জুর সর্পরূপে জ্ঞান হয়, পরে ভ্রান্তি দূরীভূত হয় এবং সর্প রজ্জুতে পরিণত হয়। এই ভ্রান্তির মূল কারণ বস্তুর স্বরূপগত (metaphysical) নহে, তাহা হেতুগত (logical) ও মানসিক (Psychological)। সর্প যেমন ভ্রান্তি অপগমে রজ্জুরূপে প্রতীত হয়, তেমনি জগৎ প্রপঞ্চ ব্রহ্ম-জ্ঞানের মধ্যে রূপান্তরিত হয়। জগৎ তখন যে অস্বীকৃত (negated) হয় তাহা নহে, নূতন ভাবে ব্যাখ্যাত—অনুভূত হয়। জীবনমুক্তি ও ক্রমমুক্তির ধারণা, সত্য ও মিথ্যা এবং পাপও পুণ্যের ভেদ, এই জগতের মাধ্যমে মোক্ষলাভের শক্যতা—এই সকল হইতে এই সিদ্ধান্ত করা যায়, যে ভাসের (appearance) মধ্যেই সৎ বর্তমান এবং ব্রহ্ম-জগৎরূপে না হইলেও জগতের মধ্যে বর্ত্তমান। জগৎ-প্রপঞ্চ যদি একেবারে মিথ্যা হইত, ব্রহ্মের সহিত ইহার কোনও সম্বন্ধ না থাকিত, তাহা হইলে প্রেম, বিজ্ঞতা ও বৈরাগ্য দ্বারা আমরা উন্নততর জীবনের জন্য প্রস্তুত হইতে পারিতাম না। ধর্মাচরণ দ্বারা আমরা অসঙ্গ আত্মাকে পাইতে পারি, ইহা শঙ্কর স্বীকার করিয়াছেন। জগৎ সৎ নহে, ইহা সত্য, কিন্তু মরীচিকার মতো মিথ্যা নহে। জীবও অবস্তু নহে। আত্মার বিপরীত যে অহংকার (false self) তাহার লয় দ্বারা মোক্ষ হয়! বিদ্যারণ্য বলেন "সমগ্র জীবাত্মার যদি বিলাপ হইত তাহা হইলে মোক্ষ মানুষের মঙ্গলকর হইত না।"

যদি ব্রহ্মের অস্তিত্ব না থাকিত তাহা হইলে ব্যবহারিক বা প্রাতিভাসিক কোনও প্রকার অস্তিত্বেরই সম্ভাবনা থাকিত না। "প্রভবঃ সর্ব্বভাবানাং সতাংইতি বিনিশ্চয়ঃ (গৌড়পাদকারিকা—১।৬) এই সূত্রের ভাষ্যে শঙ্কর বলিয়াছেন "বন্ধ্যাপুত্রো ন তত্ত্বতঃ মায়য়া বাপি জায়তে"—তত্ত্বতঃ অথবা মায়া দ্বারা বন্ধ্যাপুত্রের জন্ম হইতে পারেনা। যদি অসতের জন্ম সম্ভবপর হয়, তাহা হইলে সতের সম্ভাবনাও অস্বীকার করিতে হয়, ব্রহ্মের অস্তিত্বও থাকেনা। সৎই জগতের আস্পদ; মৃগতৃষ্ণিকাও আস্পদ বিহীন নহে।

"আত্মাজ্ঞান-মহানিদ্রা-বিজৃম্ভিতেঽস্মিন্‌জগন্ময়ে
দীর্ঘস্বপ্নে স্ফুরন্ত্যেতে স্বর্গ-মোক্ষ্যাদি বিভ্রমাঃ

(অদ্বৈতমকরন্দ)

আত্মার অজ্ঞানরূপ মহানিদ্রায় জগৎরূপ দীর্ঘ-স্বপ্নে স্বর্গ-মোক্ষ প্রভৃতি ভ্রমের স্ফুরণ হয়! কিন্তু ঈশ্বর-সৃষ্ট স্বপ্ন, ঈশ্বর যাহার আধার, তাহা কখনও স্বপ্ন (মিথ্যা) হইতে পারে না। আমরা যে সামুৎপাদিক জগতের আবরণ ভেদ করিয়া সতে পৌছিতে সমর্থ, তাহার কারণ এই যে নশ্বর জগতের মধ্যে শাশ্বত ব্রহ্মের চিহ্ন বর্তমান। জগৎ নিত্য না হইলেও নিত্য অসঙ্গই ইহার আস্পদ। যাহা নিত্য নহে তারা নিত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত, তাহা সেই নিত্যেরই প্রকাশ। জগৎ ব্রহ্মের স্বরূপ লক্ষণ না হইলেও ইহা ব্যবহারে সত্য। সৎ ব্রহ্ম জগৎরূপেই আমাদের সসীম মনের সম্মুখে উপস্থিত হন।

শঙ্কর যে জগৎকে একান্তভাবে মিথ্যা বলেন নাই তাহা তাঁহার জীবনমুক্তের ব্যাখ্যা দ্বারাও প্রমাণিত হয়। দেহ-ত্যাগের সঙ্গে যে মুক্তি, তাহা বিদেহ মুক্তি। কিন্তু মৃত্যুর পূর্ব্বে শরীর বর্ত্তমান থাকিতে যে মুক্তি, তাহা জীবন্ মুক্তি। জীবন্ মুক্তের নিকট জগতের অস্তিত্ব বিলীন হয় না। জীবন্মুক্ত জগৎকে তাহার সত্যরূপে দেখিতে পান। তাহার অবিদ্যার নাশ হয়। অর্থাৎ তিনি সৎ ও অসতের মধ্যে পার্থক্য দেখিতে পান, জগৎকে ব্রহ্ম হইতে স্বতন্ত্র না দেখিয়া ব্রহ্মেরই ভানরূপে দেখিতে পান। শঙ্কর কার্য্যের সত্যতা স্বীকার করেন নাই, কিন্তু কারণ হইতে স্বতন্ত্রভাবে কার্য্যের অস্তিত্ব নাই, ব্রহ্ম হইতে স্বতন্ত্রভাবে জগতের অস্তিত্ব নাই, ইহাই তাঁহার মত।

অবিদ্যার আবরণ ভেদ করিয়া, অর্থাৎ জগতের নানাত্ব-সমন্বিত স্থূল রূপ অতিক্রম করিয়া তাহার কারণ-স্বরূপ ব্রহ্মে পৌঁছতে হয়। শঙ্কর পরিণামবাদী নহেন, এবং জগৎকে ব্রহ্মের পরিণাম রূপে ব্রহ্মের ন্যায় সত্য মনে করেন না। তাহার অনেক বচন হইতে মনে হয় যে সসীম মানব মনে অনন্ত ব্রহ্ম যে রূপে প্রতিভাত হন, শঙ্কর সেই রূপকেই জগৎ বলিয়াছেন। মানব-মনের বাহিরে তাহার সে রূপ নাই। এই অর্থে জগৎ মিথ্যা। আবার অনেক বচন হইতে মনে হয় যে তিনি জগতের মনো-বাহ্য অস্তিত্ব—যে রূপে জগৎ প্রতিভাত হয়, তাহার মনঃ-নিরপেক্ষ অস্তিত্ব স্বীকার করিতেন। তাঁহার মতে মায়া কেবল ব্যক্তির অবিদ্যা নহে, তাহা সর্ব্ব-ব্যক্তি সাধারণ বৈশ্বিক পদার্থ, যাহাকে সৎও বলা যায় না, অসৎও বলা যায় না। মায়ার অস্তিত্ব বশতঃ ব্যক্তির দৃষ্টিতে সৎ-সম্পূর্ণ প্রকাশিত হয় না, তাহার অখণ্ড রূপ খণ্ডিত, সুতরাং মিথ্যা রূপে প্রতিভাত হয়, ব্যক্তির বুদ্ধির বেষ্টনী রচিত হয়। কিন্তু মানব বুদ্ধির এই বেষ্টনী—সত্য-উপলব্ধির এই অক্ষমতা কেন? কেন দেশ-কাল-কারণত্বের অতীত ব্রহ্ম দেশকালকারণত্ব-নিয়ন্ত্রিত, জগৎরূপে প্রতিভাত হন? আবার যে আত্মার স্বরূপ বিশুদ্ধ জ্ঞান, তিনিই বা কেন অজ্ঞানের মধ্যে পতিত হন? এই সকল প্রশ্নের উত্তর দেওয়া অসম্ভব।

বাইবেলে আছে পূর্ব্বে একমাত্র ঈশ্বরই ছিলেন, অন্য কোনও পদার্থের অস্তিত্ব ছিল না। ঈশ্বর এই জগৎ সৃষ্টি করিতে ইচ্ছা করিলেন এবং গ্রহনক্ষত্র-সমন্বিত দ্যুলোক ও পৃথিবীর আবির্ভাব হইল। এই জগতের উপাদান ছিল না। ঈশ্বর তাহার সৃষ্টি করেন। ঈশ্বরের ইচ্ছাই এই সৃষ্টির কারণ। কিন্তু এই ইচ্ছার ফলে কিরূপে শূন্য হইতে রূপ-রস-গন্ধ-শব্দ-স্পর্শ সমন্বিত জগতের এবং চেতন জীবের উদ্ভব হইতে পারে, তাহা বুঝিতে পারা যায় না। ঈশ্বর বলিলেন "আলো হউক" আর আলোর উদ্ভব হইল। তিনি মানুষ সৃষ্টি করিতে ইচ্ছা করিলেন, অমনি মানুষের উদ্ভব হইল, ইহা বোঝা যায় না। যাহা কোথাও ছিল না, তাহার উদ্ভব কল্পনা করা যায়না। এতাদৃশ সৃষ্টি ও মায়িক সৃষ্টি একই প্রকার। ঐন্দ্রজালিক যাদু বলে হস্তী-অশ্বাদির সৃষ্টি করে, তাহারা ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য হয়। কিন্তু ঐন্দ্রজালিক সৃষ্টি বেশীক্ষণ থাকে না। জগৎ তাহা অপেক্ষা অধিককাল থাকিলেও জাগতিক সকল বস্তুই বিনাশশীল। কিছুই চিরস্থায়ী নহে। এতাদৃশ সৃষ্টি মায়া। মায়া অনাদি, কোনও কালে ইহার উদ্ভব হয় নাই। সৃষ্টিপ্রবাহ চিরকাল চলিয়া আসিতেছে; সৃষ্ট বস্তুর ধ্বংস হইতেছে। নূতন বস্তুর সৃষ্টি হইতেছে—অনাদিকাল ধরিয়া। শূন্য হইতে সৃষ্টিবাদের (Creation out of thing) সহিত মায়াবাদের বিশেষ পার্থক্য নাই। "লোকবৎ তু লীলাকৈবল্যম্ (ব্র-সূ—২।১।৩২) এই সূত্রে জগৎকে ব্রহ্মের লীলা বলিয়া ইহা যে ব্রহ্মের সৃষ্টি এবং ইহার সত্যতা আছে তাহা বাদরায়ণ স্বীকার করিয়াছেন। শঙ্কর তাঁহার ভাষ্যে এই সূত্রের অনুরূপ ব্যাখ্যা করেন নাই।

"ছিন্নপত্রে" নদী-সচেতনতা

মিহির বন্দ্যোপাধ্যায়

রবীন্দ্রনাথ বহুমুখী প্রতিভাধর কবি। তাঁর প্রতিভার স্পর্শমণি ধূলি-মুঠিকে করে তুলেছে স্বর্ণমুঠি। তাঁর কণ্ঠস্বরে গন্ধের রং ধরে পন্ধের। তাঁর অপূর্ব্ব গীতিময়তার হিরণ্য দ্যুতিতে ফোটগন্ধ হয়ে ওঠে গীতিকল্প, সুর হয় রবীন্দ্রসঙ্গীত।

বিশ্বে রবীন্দ্রনাথের পরিচয় 'কবি' হিসাবে। কবিমনের স্তরে স্তরে যে বিবিধ পরম রহস্যগুলি সুবিন্যস্ত—তারই চরম প্রকাশ ও বিকাশে বিশ্বকবির জীবনদর্শন ও ব্যক্তিগত ধ্যান-ধারণার ঘটেছে মর্ম্মোদ্ঘাটন। 'রবীন্দ্র বনস্পতির পত্রগুচ্ছ' এই রহস্যের দীপবর্ত্তিকা। কবি-মানস ও মননলোকের নানা মহলের নানা রহস্য এই পত্র-প্রদীপের উজ্জ্বল রঙীণ আলোকছটায় পাটে পাটে যে-ভাবে সহজে তরল হয়ে গতিমুক্ত হয়েছে—তা' বিস্ময়কর।

কবির পত্রসাহিত্যগুলির মধ্যে "ছিন্নপত্র" অতুলনীয়—মধ্যমণি। কবির প্রতিভাস্পর্শে পত্র হয়েও এ গ্রন্থ হয়ে ওঠে সাহিত্যপদবাচ্য। ব্যক্তিগত সংবাদ হয়েও নিখিল মানবের আনন্দ সংবাদ বাহক। তথ্যের দ্বারপ্রান্তে দাঁড়িয়ে তত্ত্বলোকের দৌবারিক। একদিকে গভীরতর কবি-জীবন, অপরদিকে ব্যক্তিজীবন—এই উভয় আকর্ষণ-বিকর্ষণে এ-গ্রন্থের পত্রগুলির বুনন হৃদয়-আবেগ—অনুভূতির রস ও রূপে এমনই চরমোৎকর্ষ লাভ করেছে—যে 'ছিন্নপত্র' ছন্দহীন কাব্য, গদ্য-কাব্য হয়ে পত্রগুচ্ছের পরিবর্ত্তে গৌরবান্বিত হয়েছে—পত্র-সাহিত্যের মর্য্যাদায়।

"ছিন্নপত্র"র রচনাকাল কবি-জীবনে বিশেষ তাৎপর্য্যপূর্ণ। ১৮৮৫—১৮৯৫ পর্য্যন্ত রবীন্দ্রকাব্যের সৃষ্টি গঙ্গায় তখন পূর্ণ-জোয়ার। প্রতিভার নিত্য নূতন তরঙ্গাঘাতে বাংলা সাহিত্য তখন উর্ম্মিমুখর। নিছক ভালো লাগা বস্তুগুলির মধ্যে রূপক-অলঙ্কার—তত্ত্ব-চিন্তাশীলতা—প্রকৃতির বিবিধ পরিবেশ, প্রকৃতির ছায়াচিত্র অঙ্কন এবং বিশেষ করে নদীর গতি ও প্রকৃতির রহস্য উদ্ঘাটন ইত্যাদিতে কবির স্বতঃস্ফূর্ত্ত চিন্তন ও অনুভবের স্মৃতিচিত্রণই "ছিন্নপত্র"র বিষয়বস্তু। এই পত্রগুচ্ছ সমকালীন কবিমনের অনুভাবনাগুলি নিপুণভাবে ধরে আছে। দৈনন্দিন চিন্তাধারার প্রবহমানতা পত্রের ভাষায় চিরন্তু লাভ করেছে।

এই "ছিন্নপত্রে"র পত্রগুচ্ছ কবির পদ্মাবাসের জীবনযাত্রাকালে রচিত। প্রথমদিকের কিছু পত্র বাদ দিলে অধিকাংশ পত্রের পশ্চাতেই পদ্মাতীরের চতুষ্পার্শ্বের প্রাকৃতিক পটভূমি বিদ্যমান। 'সীমাবদ্ধ মৃত্তিকা ভূখণ্ডের মধ্যে অবস্থান ক'রে উন্মুক্ত দিগন্তবিস্তৃত নিসর্গ সংসারের সৌন্দর্য্যদর্শন এবং তার সৃষ্টি বৈচিত্র্যে কবি যে ঐশ্বর্য্য লাভ করেছেন, তা' অতুলনীয়'। কবি নিজেও একপত্রে লিখছেন :—"আমার বুদ্ধি, কল্পনা এবং ইচ্ছাকে উন্মুখ করে' তুলেছিলো এই সময়কার প্রবর্ত্তনা—বিশ্বপ্রকৃতি এবং মানবলোকের মধ্যে নিত্যসচল অভিজ্ঞতার প্রবর্ত্তনা" (সোনারতরী, রবীন্দ্ররচনাবলী—৩য়)। বিশ্ববিধাতা যেমন প্রহরে প্রহরে এই মাটির পৃথিবীর ওপর নানা রঙের তুলি বুলিয়ে চলছিলেন—কবিও এই সময় তার দিনযাপনের ভাবনাগুলি তুলিকারিত করে রাখছিলেন তাঁর ছিন্নপত্রের পাতায় পাতায়। তাই 'ছিন্নপত্রে' আমরা পত্রসচেতনা পাইনা, পাই ব্যক্তিসচেতন, আত্মসচেতন এক মরমী শিল্পীকে।

মানবী প্রেয়সীকে মানুষ যেমন করে' ভালবাসে, 'পদ্মা'র প্রতি কবির ছিল তেমনি ভালবাসা। প্রকৃতি-সংসার ও মানব-সংসারের মধ্যকার নিবিড় আত্মীয়তা এই পদ্মার প্রভাবেই কবি-জীবনে সম্ভব হয়েছিল। পদ্মা—নদী নয়। যেন, কবির প্রেমমুগ্ধ হৃদয়খানির বিবিধ রূপ ও রসে জীবিত হয়ে কল্পনামুকুরের স্বচ্ছপটে হয়ে উঠেছে বৈচিত্র্যময়ী। সৌন্দর্য্য-পিপাসু কবির কখনো নির্মল আনন্দে, কখনো গভীর তাত্ত্বিক বিষয়ে, কখনো বৈজ্ঞানিক—ভৌগলিক ও দার্শনিক ভাবাবেগে, কত যে আবেগে রসের খেলায় মত্ত হয়ে' পদ্মাকে করে' তুলেছেন—'মায়ার চিত্রলেখা', তা' ভাবতেও বিস্ময় লাগে।

নদী ও নারী : কতকগুলি পত্রে এই পদ্মা নারীরূপা। নারী-প্রকৃতির সঙ্গে কবি কী অপূর্ব্ব তুলনাই না করেছেন এই নদী-প্রকৃতির। নারী যেমন স্নেহ-কোমল-মাধুর্য্যে পরিপূর্ণ, অন্তঃপুরচারিণী—নদীও তেমন। "যে মেয়েরা ঘাটে জল নিতে আসে এবং জলের ধারে বসে বসে অতি যত্নে গামছা দিয়ে আপনার শরীরখানি মেজে তুলতে চায়, তাদের সঙ্গে এর যেন প্রতিদিন মনের কথা এবং ঘরকন্নার গল্প চলে" (পত্র—১৯)। এরা যেন পরস্পরের সখী। "জল এবং মেয়ে উভয়েই বেশ সহজে ছল্ ছল্ ঝল্ ঝল্ করতে থাকে—একটা বেশ সহজ গতিছন্দ তরঙ্গ, দুঃখ তাপে অল্পে অল্পে শুকিয়ে যেতে পারে, কিন্তু আঘাতে একেবারে জন্মের মতন দুখানা হয়ে ভেঙে যায় না।... মেয়েতে ও জলে বেশ মিশ খায়।...উভয়ে স্বজাত।" (পত্র—৪৩)। সত্যই নারীর মত সহনশীলা এই নদী। চলার গতিই তাকে বেঁচে থাকার শক্তি দেয়। কবি, মুগ্ধ হয়ে তাইতো বলেন! 'পদ্মাকে আমি বড় ভালবাসি। ক্ষীণতোয়া হলে নদীর সে রূপ যেন আর থাকে না। "একটি পাণ্ডুবর্ণ ছিপছিপে মেয়ের মতো, নরম শাড়িটি গায়ে" নির্জীব হয়ে পড়ে। কৃশকায় এক নারীর মত কবি তখন দেখেন পদ্মাকে। প্রকৃতি-সংসারের সঙ্গে কবির নিবিড়তম আত্মীয়তাই এ-অংশে স্বতঃস্ফূর্ত্ত হয়ে ফুটে উঠেছে বলে মনে হয়।

নদী ও নাগিনী : আবার কতকগুলি পত্রে নারীরূপা এই পদ্মা কবির কল্পনেত্রে ফুটে উঠেছে বৃহৎ এক নাগিনীর মতো রূপ ধরে। তরঙ্গের আসা যাওয়ায় বালির ওপর খাঁজ পড়ে গেছে স্তরে স্তরে।

আলোর ঝলক এসে ঠিক্‌রে পড়েছে তার ওপর। কবি দেখছেন, যেন নানা রকম খোলস ছেড়েছে নাগিনী-পদ্মা। "পদ্মা তো একটা প্রকাণ্ড নাগিনীই বটে।...তার একটা বৃহৎ খোলস সন্ধ্যার আলোয় পড়ে চিক্‌ চিক্‌ করছে। বর্ষার সময় সে আপনার সহস্র ফণা তুলে ডাঙার উপর ছোবল মারতে মারতে, গর্জ্জন করতে করতে...লেজ আছড়াতে আছড়াতে, ফুলতে ফুলতে চল্‌তো।" (পত্র—১৩৪)।

নদী ও তত্ত্ব : পদ্মার তীরে ঘুরে বেড়াতে বেড়াতে তার শান্ত নির্জ্জন পরিবেশে কবি আত্মস্থ হয়ে পড়তেন, মানুষ ও প্রকৃতির মধ্যে একাত্মতা অনুভব করতেন। ভাবতেন নদীর দিকে তাকিয়ে—মানুষের আনা-গোনার স্রোতও চিরবহতা। এখানে কবি তাত্ত্বিক। মানুষকে নদীর সমধর্মী বলে কল্পনা করে' বলছেন—"মানুষও নানা শাখা-প্রশাখা নিয়ে নদীর মতই চলেছে। তার একপ্রান্ত জন্মশিখরে, আর একপ্রান্ত মরণ-সাগরে ; দুই দিকে দুই অন্ধকার রহস্য, মাঝখানে বিচিত্র লীলা এবং কর্ম্ম এবং কলধ্বনি।" (পত্র—৩৮)!

নদী ও পৃথিবীর শিশুকাল : কোন কোন পত্রে দেখি কবি এই নদীকে দেখে 'পৃথিবীর শিশুকাল'কে স্মরণ করেছেন কল্পনায়। নদী গতির চাপে এগিয়ে চলতে চলতে ছড়িয়ে পড়ে বিস্তৃত হয়ে চতুর্দ্দিকে। ক্রমে দু'পাশের সবুজ পাড় নিশ্চিহ্ন হয়ে জলে জলে সবদিক একাকার হয়ে যায়। দূরে—অনেক দূরে হয়তো একখণ্ড ভূমি মাথা তুলে চেয়ে থাকে অসহায়ের মত। কবির তা' দেখে মনে পড়ে যায় পৃথিবীর শিশুকালের কথা। "অসীম জলরাশির মধ্যে যখন স্থল সবেমাত্র মাথা তুলেছে।' চারিদিকে ভরিয়ে দিয়ে জল যখন কুল কুল করে ওঠে তখন কবি-হৃদয় যেন নূতন করে অভিভূত হয়ে যায়। কবি ভাবেন : "বৃহৎ সমুদ্র দিন রাত্রি দুলছে, এবং অবোধ মাতার মত আপনার নবজাত ক্ষুদ্র ভূমিকে মাঝে মাঝে উন্মত্ত আলিঙ্গনে একেবারে আবৃত করে ফেলছে" (পত্র—৬৭)। নদীর সৌন্দর্য্যচেতনার মাধ্যমে এ পৃথিবীর শৈশবাবস্থার কল্পনা রহস্য হলেও, মুগ্ধকর—বিস্ময়-কর তো বটেই।

নদীর সৌন্দর্য্য সম্ভোগ : সৌন্দর্য্য পিপাসু কবিমন পদ্মার বিচিত্র শোভায় চিরদিনই মগ্নচেতন। কখনো নীরবে, কখনো গানের সুরে কখনো বা লেখায় এ আনন্দভোগ করেছেন—সঞ্চয় করে তুলে রেখেছেন স্মৃতির মণিকোঠায়। পদ্মা—বৈচিত্র্যময়ী, রূপের মায়াবী। ক্ষণে ক্ষণে বেশ পালটায়। অপরূপা হয়ে কবিকে ভরিয়ে দেয় অমেয় আনন্দে। সৌন্দর্য্য সম্ভোগে আবিষ্ট কবির তাই ভয়, পাছে কোনদিন এই পদ্মা তার ঐ অনিন্দ্য রূপরাশি হারিয়ে ফেলে। বলেন : "প্রতিবার এই পদ্মার উপর আসবার আগে ভয় হয়, আমার পদ্মা বোধহয় পুরোনো হয়ে গেছে" (৬৭নং)।

তবে এ ভয়ের আশঙ্কা থাকলেও, প্রিয় পদ্মার প্রতি কবির আছে একটা সুগভীর বিশ্বাস। বোঝেন, ঐ ভয়টা একটা নিছক ভয়ই। প্রেমিকা-পদ্মা এতটা বিশ্বাসঘাতকতা করবে কি কবির সঙ্গে? কবির হৃদয় উজাড় করা ভালবাসা কখনই এত ঠুন্‌কো নয়। তাঁর স্থির বিশ্বাস, ওটা তাঁদের রাগ-অনুরাগের একটা চটুল সংশয়ই মাত্র। কারণ, আবার যখন অভিমান ভেঙে পদ্মার কাছে এসেছেন, ভাসিয়ে দিয়েছেন নিজেকে তার ওপরে, দেখেছেন, আগের মতই—"চারিদিকে জল কুল্‌-কুল্‌ করে ওঠে। চারিদিকে একটা স্পন্দন কম্পন আলোক আকাশ, মৃদু কলধ্বনি, একটা সুকোমল নীল বিস্তার, একটি সুনবীন শ্যামল রেখা, বর্ণ এবং নৃত্য এবং সঙ্গীত এবং সৌন্দর্য্যের একটি নিত্য-উৎসব উদ্ঘাটিত হয়ে যায়...(৬৮নং)।"

নদীর প্রকৃতি ভেদ : নদীর রূপ বর্ণনার সঙ্গে সঙ্গে প্রকৃতি হিসাবে তার সঙ্গে অন্য নদীরও তুলনা করতে ভোলেননি। পদ্মার সঙ্গে তুলনা করেছেন ইছামতীর। পদ্মার প্রতি কবির কেন যে এত ভালবাসা, যাচাই করেছেন যেন এই তুল্যমানের ভিত্তিতে। বলেছেন : পদ্মা নদীর কাছে মানুষের লোকালয় তুচ্ছ, কিন্তু ইছামতী মানুষ-ঘেঁষা-নদী ; তার শান্ত জলপ্রবাহের সঙ্গে মানুষের কলপ্রবাহের স্রোত মিশে যাচ্ছে। সে ছেলেদের মাছ ধরবার, মেয়েদের স্নান করবার নদী। শুধু তাই-ই নয়। কর্ম্মের চেয়ে মর্ম্মের বন্ধনও মানুষের সঙ্গে ইছামতীর কম নয়। মিতালী পাতাতে সে সততই আগ্রহী। "সম্বৎসর অদর্শন থেকে বর্ষার কয়েকমাস আনন্দগম্য করতে করতে...ঘাটে ঘাটে মেয়েদের কাছে প্রত্যেক গ্রামের সমস্ত নূতন খবর শুনে নিয়ে, তাদের সঙ্গে মাখামাখি সখিত্ব ক'রে আবার চলে যায় (১৪৫নং)"। কিন্তু পদ্মা? ইছামতীর সঙ্গে তার অনেক তফাৎ। পদ্মার কাছে ঘেঁষা, মিতালী পাতানো অত সহজ নয়। ও যে কবির রূপসী গরবিণী।

নদী ও বিল : আবার কয়েক পত্রে দেখি কবি নদীর সঙ্গে বিলের করেছেন তুলনা। বিল জলাশয়—তবে গতিহীন। কেমন যেন নিষ্প্রাণ, মরা মরা। ভালো লাগে না এর নিশ্চল গতির অমন জড় রূপ-ঐশ্বর্য্য। কবি বলেন :..."এ বিলগুলো ভারী অদ্ভুত—কোন আকার আয়তন নেই, জলে স্থলে একাকার।" নদী—দুই তীর ঘেঁষা, হাস্যময়ী। চলার বেগে মনের তরে জাগায় ছন্দময় সুরের কত না আনন্দের রাগিণী। কিন্তু বিল্‌?—"দুই দিকে দুই তীর দিয়ে সীমাবদ্ধ না থাকলে জলস্রোতের তেমন শোভা থাকে না। অনির্দ্দিষ্ট, অনিয়ন্ত্রিত বিল একঘেয়ে, শোভা-শূন্য।... তীরবদ্ধ নদীগুলির (যেমন) একটি বিশেষ ব্যক্তিত্ব আছে,... তটের দ্বারা আবদ্ধ হওয়াতেই নদীর মধ্যে একটা বেগ আছে, একটা গতি আছে ; কিন্তু প্রবাহহীন বিল কেবল বিস্তৃতভাবে দিগ্‌বিদিক্‌ গ্রাস ক'রে পড়ে থাকে। (৯৪নং)।"

নদী ও গতিবাদ : আবার কতকগুলি পত্রে নদীর স্রোত দেখে কবির মনে যে তাত্ত্বিক ভাবের উদয় হয়েছে, তার সুস্পষ্ট লক্ষণ দেখা যায়। 'গতিবাদ' সম্বন্ধে নানা চিন্তা ও সংশয় জাগ্রত হতে দেখা যায়। জলে স্রোত প্রবল হয়ে উঠলে নদীর গতি হয়ে ওঠে প্রচণ্ড। কবি পরীক্ষা করে দেখেছেন : "বোটের তক্তার ওপর পা রাখলে... তার নীচ দিয়ে কত রকমের বিচিত্র শক্তি অবিশ্রাম চলছে, (১১৪নং)।" কবি অনুভব করেছেন : "বস্তু থেকে বিচ্ছিন্ন ক'রে নিয়ে গতিটাকে যদি কেবল গতিভাবেই উপলব্ধি করতে ইচ্ছা করি, তাহলে নদীর স্রোতে সেটি পাওয়া যায়। (১১৮নং)।"

নদী ও মানবের ইচ্ছাশক্তি : আবার নদীর গতিশীলতার কথা বলতে গিয়ে এই নদীতে মানব-মনের তীব্র ইচ্ছাশক্তির প্রকাশ-প্রসঙ্গ উল্লেখ করেছেন। কবির প্রিয়সঙ্গী পদ্মাকে বুক ফুলিয়ে গরবিণী হয়ে দু'কুল ছাপিয়ে চলতে দেখে, তাঁর নিজেরও বুকখানা দুলে উঠেছে আনন্দে। তাঁর পদ্মা প্রাণবন্ত বেগবতী ছন্দময়ী। তার নৃত্যের তালে তালে কবি-বুকের আশা-আকাঙ্ক্ষার তারে তারে জেগে ওঠে কতই না রাগ-রাগিণী। কবি বলেছেন : "এই ভাদ্রমাসের পদ্মাকে একটা প্রবল মানসশক্তির মতো বোধ হয় ; সে মনের ইচ্ছার মতো ভাঙছে-চুরছে এবং চলছে।... বেগবান একাগ্রগামিনী নদী আমাদের ইচ্ছার মতো, আর বিচিত্র শস্যশালিনী স্থির-ভূমি আমাদের ইচ্ছার সামগ্রীর মতো। (১১৮নং)।"

এইভাবে বিচিত্র ভাবও সৌন্দর্য্যের ইঙ্গিত দিয়ে কতই না রসে কবি নদীর করেছেন বর্ণনা, এঁকেছে তার রূপের বর্ণালী আলিম্পন। শুধু কি সৌন্দর্য্য বর্ণন? ভাব ও তত্ত্বে—বিচার ও বিশ্লেষণে, যুক্তি তর্কে কবির নদীর প্রতি ভালবাসা বৈচিত্র্য লাভ করেছে। নদী প্রকৃতিও বৈশিষ্ট্য কবির কল্পনা ও অনুভূতিকে যে ব্যাপ্তি ও ঐশ্বর্য্য দান করেছে—পৃথিবীর কোন সাহিত্যে তার তুলনা পাওয়া যায় না। সমস্ত "ছিন্নপত্র" জুড়ে নদী তার প্রাণস্পন্দনের লক্ষণীয় স্বাতন্ত্র্য নিয়ে যেভাবে জেগে উঠেছে—তা' কবি-মনেরই বিস্ময়কর প্রকাশ ; কবি-কীর্ত্তির এক অভিনব পরিচয়।

আটাশ

সত্যজিৎ পূরবীর কাছে এল। এলো আরো দেড় বছর পরে।

সে দিনটাও মেঘে অন্ধকার! সকাল থেকেই কখনো বৃষ্টি—কখনো হাওয়া। সাইক্লোনের আবহাওয়া। সারাটা দিনের ধূসর বিষণ্ণতা বিকেলের ছায়ায় কালো হয়ে আসছে।

পূরবী নিজের ছোট কোয়ার্টারটির বারান্দায় এসে দাঁড়াল। সে ছাড়াও আর একটি শিক্ষিকা এখানে থাকে—অমলাদি। অমলাদি ব্রহ্মচারিণী। গেরুয়া পরে—জপতপ করে। অমলার আশা আছে পূরবীও একদিন তার মতো ব্রহ্মচারিণী হয়ে দীক্ষা নেবে। আভাসে ইঙ্গিতে সে কথা শুনিয়েওছে অনেকবার। কিন্তু পূরবী ঠিক মনের দিক থেকে তৈরী হতে পারেনি।

তার টাকা দরকার—বাবাকে সাহায্য করতে হয়। মা-দাদা এরা তার আসলে কেউ নয়—সবই মায়া মাত্র, এই তত্ত্ব জ্ঞানটা সে কোনোমতেই লাভ করতে পারেনি।

অমলাদি মধ্যে মধ্যে তাকে গীতার শঙ্কর ভাষ্য বোঝাতে চেষ্টা করে। বলার ভঙ্গিটি সুন্দর—সংস্কৃত উচ্চারণ আরো সুন্দর। বেশ লাগে পূরবীর। কিন্তু ব্যাখ্যার একটি বর্ণও তার কানে যায় না। অকারণে তার মনে হয়, এত মিষ্টি যার গলা, সে কেন গান শিখল না? আর মনে পড়ে, এক সময়ে নিজেও সে গান ভালোবাসত, কিন্তু প্রায় এই দেড় বছরের ভেতরে হার্মোনিয়মে হাত দেয়নি।

অমলাদি ব্রহ্মচারিণী। সংসারের সুখ দুঃখ, প্রেম মমতা সব তার কাছে মায়া। সব?

মাস কয়েক আগে সন্ধ্যাবেলা অমলাদি মন্দিরে গিয়েছিল আরতি দেখতে। পূরবী পড়তে বসেছিল। হঠাৎ জানলা দিয়ে একটি বেড়াল লাফিয়ে পড়ল অমলাদির বইয়ের টেবিলটার ওপর কয়েকটা বই হুড়মুড়িয়ে পড়ল মেঝেতে—বেড়ালটা চমকে উঠে যে পথ দিয়ে এসেছিল, সেই পথেই অদৃশ্য হল।

বইগুলো গুছিয়ে তুলতে গিয়ে ছোট একখানি ফটোগ্রাফ চোখে পড়ল তার। 'যোগ বাশিষ্ঠের মাঝখানে ছিল ছবিটা। কয়েক বছরের পুরানো ছবি—লালচে' হয়ে এসেছে। বছর পঁচিশেকের একটি মানুষ, ওল্টানো চুল, চোখে চশমা, বুদ্ধিতে উজ্জ্বল। ছবির তলায় ছোট ছোট করে লেখা: ক্যাপ্‌টেন কে কে দাশগুপ্ত।

আবার ছবির শাদা পিঠে রবীন্দ্রনাথের নামের দুটি লাইন: "তোমারি বিরহে রহিব বিলীন, তোমাতে করিব বাস, দীর্ঘ দিবস দীর্ঘ রজনী, দীর্ঘ বরষ মাস।" পূরবী জানে, ও হাতের লেখা অমলাদি ছাড়া আর কারুর নয়।

খুব কি আশ্চর্য হয়েছিল পূরবা? না। ব্রহ্মচারিণী অমলাদি সংসারের সমস্ত মায়ার বন্ধন কাটিয়ে এসেছে—কিন্তু বেদনার এই বাঁধনটুকু কিছুতেই ছিঁড়তে পারেনি। সে ও মানুষ।

কে এই ক্যাপ্‌টেন দাশগুপ্ত? সে কি কথা দিয়ে অমলাদিকে বঞ্চনা করেছে? ক্যাপ্‌টেন হয়ে যুদ্ধে যোগ দিয়েছিল, সেখানেই কি মারা গেছে সে? কিন্তু এ সব ভেবে পূরবীর দরকার নেই কোনো। এই যোগ বাশিষ্ঠের শক্ত শক্ত শ্লোকের ভেতর অমলাদির বেদনা ধীরে ধীরে বৈরাগ্যে মলিন হতে থাকুক।...

…আবার বৃষ্টি এল। জোলো হাওয়ার এক ঝলক এসে লাগল পূরবীর মুখে। খানিকটা চুল উড়ে এসে চোখ ছেয়ে ফেলল। হাত দিয়ে চুলটা সরিয়ে দিতে দিতে পূরবীর মনে হল, আজও সন্ধ্যায় অমলাদি মন্দিরে গেছে আরতি দেখতে। আরতির পর এক ঘণ্টা ধ্যান করে ফিরে আসবে। কিন্তু এমনি একটা বর্ষার সন্ধ্যায়, এই হাওয়া আর বৃষ্টির মাতলামিতে ধ্যানে তার মন বসবে? কোনো এক কে কে দাশগুপ্তের কথা—

কিন্তু পূরবী এসব অন্যায় ভাবনা ভাবছে? অমলাদির মনের খবরে তার কী দরকার?

বারান্দার আলোটা জ্বালিয়ে দিলে হয়। বিকেলের ছায়া কালো হয়ে আসছে সন্ধ্যার ছোঁয়ায়। কিন্তু কী হবে আলো দিয়ে? এই সন্ধ্যাটা ভালো লাগছে, এই ভিজে মিষ্টি হাওয়ার ছোঁয়াটুকু ভালো লাগছে, বৃষ্টির শিরশির ফিসফিস আওয়াজ ভালো লাগছে, ভিজে লাল কাঁকরের মাটি আর ঘাসের গন্ধ ভালো লাগার স্নিগ্ধ আমেজ শরীরে মনে বুলিয়ে দিচ্ছে।

পূরবী ছোট বারান্দাটুকুর শেষে—দেওয়াল ঘেঁষে, মেজেতেই বসে পড়ল। এখানে বৃষ্টি আসছে না—বৃষ্টির একটা আলগা ছোঁয়া আসছে কেবল। মুখে চোখে পড়ছে জলের গুঁড়ো—তাদের মুছে ফেলতে ইচ্ছে করে না।

সামনে ছায়া ছায়া ছুটো একটা বাড়ি—আশ্রমের এক্‌সটেন্‌শন হচ্ছে এদিকে। তা ছাড়া ঢেউ খেলানো মাঠ চলেছে, যতদুর চোখ যায় ততদুর পর্যন্ত। মধ্যে মধ্যে ছু-চারটে তাল-পলাশ-মহুয়ার গাছ। খানিক দুরে ছোট একটা পাহাড়ী নদীর খাত আছে, এই বর্ষায় আজ হয়তো জলের তোড় নেমেছে তাতে। আরো অনেক দুরে পাহাড়ের রেখা, পৃথিবীটা যেন সেইখানে গিয়ে শেষ হয়ে গেছে—পূরবীর ভাবতে ভালো লাগে ওই পাহাড়ের সীমার পরে নীল অথৈ সমুদ্র দুলছে।

দিনের বেলায় মাঠটার এক চেহারা—আজ এই বর্ষার সন্ধ্যায় আর একরকম। বৃষ্টিতে, অন্ধকারে, দুরের পাহাড় পলাশ-তাল-মহুয়া সব একাকার হয়ে গেছে—যেন কল্পনার সেই সমুদ্রটা পাহাড় পার হয়ে ধীরে ধীরে এগিয়ে আসছে এদিকে। মাঠটা কি এখন অল্প অল্প দুলছে ঢেউয়ের মতো? এক্‌সটেনশনের নতুন বাড়িগুলো ভেসে চলছে জলের টানে?

"তোমারি বিরহে রহিব বিলীন, তোমাতে করিব বাস" যোগ-বাশিষ্ঠের শুকনো পাতার ভাঁজে যে ফোটোটা দিনের পর দিন বিবর্ণ হয়ে যাচ্ছে, তারই পিঠে কবে যেন লিখে রেখেছিল অমলাদি। গানটার প্রথম লাইন মনে আসছে: 'আমার পরাণ যাহা চায়, তুমি তাই গো।" নিজের মনের কথাটাকে জোর করে নির্বাসন দিয়েছে অমলাদি। কিন্তু পূরবী কী তা পারে?

সত্যজিৎ।

সত্যজিৎ তাকে চেয়েছিল। তবু সে পালিয়ে এসেছে। তার উপায় ছিল না। বুঝেছিল সত্যজিতের তাকে চাওয়ার ভেতরে যতখানি ভালোবাসা আছে, তারও চেয়ে বেশি আছে দয়া; যতটা গভীরতা আছে, তার চাইতে অনেক বেশি আছে রঙ। পূরবী মোহের সুযোগ নিতে চায় না—দয়ার দান নেবার মতো কাঙালও নয়।

তবু দুরে সরে এসে এই কথাটাই জেগে আছে বুকের মধ্যে। "তোমারি বিরহে রহিব বিলীন"—

সেও কি ব্রহ্মচর্য নেবে নাকি অমলার মতো? সত্যজিতের স্মৃতিকেও অমনি করে লুকিয়ে রাখবে কোনো পুঁথির পাতার আড়ালে? তারপর একেবারে নির্মোহ, একেবারে নির্ভাবনা।

কিন্তু পারেনি। মা বাবা দাদা সত্যজিৎ। একজনকে জাগিয়ে রেখে আর একজনকে কি ভোলা সম্ভব?

মাঠের দিক থেকে চোখ ফিরিয়ে পূরবী আশ্রমের দিকে তাকাল। কারা যেন এদিকেই আসছে। দুজন মানুষ। একটা ইলেক্‌ট্রিক পোষ্টের তলায় আসতে দেখা গেল ছাতা মাথায় আসছেন আশ্রমের একজন স্বামীজী। ওয়াটারপ্রুফমোড়া সঙ্গের লোকটিকে চেনা গেল না। বাইরে থেকে কেউ এসেছেন খুব সম্ভব। কিন্তু এদিকে কেন? এই বাড়ীর দিকেই?

সন্দেহ ভাঙতে বেশি সময় লাগল না।

চকিত হয়ে পূরবী উঠে দাঁড়াতেই স্বামীজী বললেন, ইনি কলকাতা থেকে এসেছেন। তোমার সঙ্গে দেখা করবেন। কলকাতার লোকটি ওয়াটার-প্রুফের হুডটা খুলে ফেলবার পর আর সন্দেহ মাত্র রইল না। সা

পেরিয়ে যে সমুদ্রটা এতক্ষণ এগিয়ে আসছিল, সে এবার পূরবীর বুকের ভেতরে আছড়ে পড়ল।

বৃষ্টি ভেজা চশমাটা খুলে নিয়ে রুমাল দিয়ে মুছতে মুছতে মৃদু রেখায় হাসল সত্যজিৎ।

—ভালো আছো তো?

বাইরে বৃষ্টিটা জোরে আরম্ভ হয়েছে। ঘরের আলোটা পর্যন্ত যেন বৃষ্টিতে ভেজা—মলিন আলো ছড়িয়ে দিয়েছে। একটা চেয়ার টেনে নিয়ে বসেছে সত্যজিৎ—টেবিল থেকে পূরবীর একখানা বই টেনে নিয়েছে হাতে। এই বইগুলো নিয়েই সে ক্লাস করত, এখনো মার্জিনে মার্জিনে সত্যজিতের কথা নোট করা। এ বছর তার পরীক্ষা দেওয়া হয়নি।

কিন্তু সত্যজিৎ বইটা খোলেনি। হাতের উপর নিয়ে চুপ করে আছে। একটু দূরে দু'হাতে মুখ ঢেকে খাটের ওপর বসে আছে পূরবী—কাঁদছে।

সত্যজিৎ আস্তে আস্তে বইটাকে টেবিলে সাজিয়ে রাখল। কেস্ থেকে একটা আধপোড়া চুরুট বের করে ধরালো। অল্প হাসল তার পরে।

—তুমি মিথ্যেই দুঃখ পাচ্ছ। মুখার্জি ভিলার অনেক ঋণ জমেছিল, বীথি তার কিছু শোধ দিয়ে গেল। কিন্তু তখনো অনেক দেনা বাকী ছিল। বাবা প্যারালিসিসে চিরদিনের মতো অসাড় হয়ে পড়লেন। তখন এল দাদার পালা। মাঝরাতে একদিন বাবার ঘরে গিয়ে সে বোঝাতে লাগল; হোয়াট ডু ইউ থিঙ্ক অফ্ সুইসাইড? সারা জীবনে ক্রাইম ছাড়া আর কিছু করোনি। তোমার পাপে মা মরেছেন—প্রীতি পালিয়েছে—বীথি প্রাণ দিয়েছে, অ্যাণ্ড নাই—লুক অ্যাট মি! দো ইট্স্ টু লেট, তবু এখনো টু সেভ ইয়োর প্রেস্টিজ্—তুমি আত্মহত্যা করতে পারো। কী চাও? ছুরি, বন্দুক, বিষ—না সিম্প্‌ল দড়ি? যদিও ছেলেহিসেবে তোমার ওপর আমার এতটুকু কৃতজ্ঞতা থাকা উচিত নয়—তবু তোমার জন্যে এটুকু আমি করতে রাজী আছি।

পূরবী মুখ খুলল। জলভরা চোখ আতঙ্কে বিস্ফারিত করে তাকালো সত্যজিতের দিকে।

—চেঁচামেচি শুনে আমরা ছুটে গেলুম। আমি আর রঘু। দাদাকে কিছুতে থামানো যায় না—সে কি সময়, বাবা থর থর করে কাঁপতে লাগলেন, এই অবস্থাতেই উঠে বসতে চাইলেন বিছানায়, তারপর পড়ে গেলেন মুখ গুঁজে। অ্যাণ্ড হি ডায়েড্।

চোখের জল শুকিয়ে গেল পূরবীর। বাইরে বাতাসের সাইক্লোনের আভাস। বৃষ্টির কান্নাকে একটা হিংস্র ক্রোধ যেন চাবুক মেরে তাড়িয়ে নিয়ে চলেছে।

সীমাহীন ভয়ে পূরবী বললে, তারপর?

সত্যজিতের হাতের চুরুট নিভে গিয়েছিল। একবার টান দিয়ে বিকৃত করল মুখটা। বললে, বালির বুরুজ ধ্বসে পড়ল। বাবা বেঁচে থেকে যে সর্বনাশটাকে আড়াল করে রেখেছিলেন। সেটা মুখ বের করে দাঁড়ালো। সাড়ে তিন লাখের ওপর দেনা। মুখার্জি-ভিলা আর ভাড়াটে বাড়ীগুলোর বদলেও শোধ হল না। দাদাকে একটা সওার হোমে পাঠিয়েছি—সেখানেই জীবনের শেষ দিনগুলো সে কাটাবে। মুখার্জি-ভিলা ভাঙা হচ্ছে—কালোয়ারদের নতুন চারতলা বাড়ী উঠছে সেখানে। শুধু এখনো মধ্যে মধ্যে উল্টো দিকের ফুটপাথে এসে দাঁড়িয়ে থাকে রঘু—হয়তো একেবারে নিশ্চিহ্ন হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করবে।

আবার বাইরে হাওয়ার শব্দ। চাবুক খাওয়া বৃষ্টির কান্না। ঘরের ভেতরে নিস্তব্ধতা। কাচের শার্সীতে ক্রুদ্ধ শরাঘাতের মতো জলের আওয়াজ।

ঝি এসে উনুন ধরিয়েছিল। চা করে এনে রাখল সত্যজিতের সামনে। পেয়ালায় একটা চুমুক দিল সত্যজিৎ।

—অল্প ভাড়ায় ফ্ল্যাট নিয়েছি একটা। ভবানীপুরে। তোমাকে নিতে এলুম।

ভারী চোখ দুটো চকিত হয়ে উঠল পূরবীর।

—আমাকে?

—এই তো সময়। মুখার্জি-ভিলার যে আড়াল ছিল সে সরে গেছে। এখন তোমার কোনো সংকোচ নেই, আমার কোনো বাধা নেই। দুজনে মাটীতে এসে দাঁড়িয়েছি। আমি জানি, কাকা কাকিমা খুসিই হবেন।

—কিন্তু—

—এখনো কি আমাকে বিশ্বাস করতে পারছ না?

—সে কথা নয়। পূরবীর স্বর জড়িয়ে এল: কিন্তু আমি যে—

—তুমি কী ?—একবারের জন্যে সত্যজিতের মুখে সংশয়ের মেঘ ঘনালো। পূরবীও কি হীরেনের মতো কাউকে খুঁজে পেয়েছে ? তারও জীবনে কি বনশ্রীর মতোই এমন কেউ এসেছে যে তাকে আরো সহজে গ্রহণ করতে পারে ?

পূরবী প্রায় অস্পষ্ট গলায় বললে, আমি এখানে সেবিকা হবো ঠিক করেছি।

—সেবিকা ?

—হাঁ, ব্রহ্মচারিণী।

এক মিনিট চুপ করে রইল সত্যজিৎ। হাসিতে মুখ ভরে উঠল—তারপরে চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ালো।

—আর বসবো না। স্বামীজীরা হয়তো রাগ করবেন। তাছাড়া যে হোটেলে উঠেছি,সেটা স্টেশনের কাছে—কাজেই অনেকটা পথ যেতে হবে। তা ছাড়া যাওয়ার আগে স্বামীজীদের সঙ্গেও একটু কথা বলে যেতে চাই। সকাল ন'টায় ট্রেণ, মনে রেখো। আমি আটটার মধ্যেই আসব—গুছিয়ে নিয়ো সমস্ত।

—কিন্তু—

অসমাপ্ত ঠাণ্ডা চায়ের পেয়ালাটা নিতে ঝি ঘরে এসেছিল। তাই জবাবটা যে ভাবে দিতে চেয়েছিল সত্যজিৎ সেভাবে দিতে পারল না। পূরবীর দিকে এক পা এগিয়েই থমকে গেল।

শান্ত কোমল গলায় বললে, অনেকদিনের ফাঁকির আগুনে পুড়ে পুড়ে প্রায় ছাইয়ের পুতুল হতে চলেছি তবু বাকী আছে এখনো। নিজের দিক থেকে সেটুকু বাঁচাতে চাই—তোমাকে মিথ্যে হতে দিতে পারি না। কাল আটটার ভেতরেই আমি আসব।

সত্যজিৎ বেরিয়ে গেল বৃষ্টির ভেতরে। পূরবী প্রণাম করবারও সময় পেল না।

কাল আটটায় সত্যজিৎ আসবে। একবার কলকাতা থেকে পালিয়েছিল পূরবী। কিন্তু এখন কোথায় পালাবে ? আর কি পালাবার শক্তি আছে তার ? এখন দূরের পাহাড় পার হয়ে সমুদ্র চলে এসেছে তার কাছে—তাকে ভাসিয়ে নিয়ে যাবে।

পূরবীর চোখ বুজে এল।

বাইরে আবার কার পায়ের শব্দ। বুকের মধ্যে বিদ্যুৎ ছুটে গেল তার। সত্যজিৎ কি এখনই ফিরে এল তাকে নিয়ে যেতে—সমুদ্রের বিশাল ঢেউয়ের মতো দুটি কঠিন বাহু কি এই মুহূর্তেই তাকে কেড়ে নিয়ে যাবে ? না—সত্যজিৎ নয়। বৃষ্টির কান্না আর ঝড়ের দীর্ঘশ্বাস সর্বাঙ্গে মেখে নিয়ে ফিরে এসেছে ব্রহ্মচারিণী অমলা।

শেষ

যোগসূত্রে

রমেন্দ্রনাথ মল্লিক

চোখের পাপড়িতেই ফুটলে অনেক
যেসো রঙ, প্রাণ ভ'রে নিই আর নিই,
নিয়ে যাব পরিতৃপ্তি ; কি দিই কি দিই,
সবুজ মাঠের বুঝি পৃথিবী সাবেক।

আমি তো দেখেছি চেয়ে নীলের আকাশে
এখানের দিন নিয়ে সাদা তুলো মেঘ,—
একটি চঞ্চলগতি বায়ুর আবেগ,
মনে ভাবি সেখানের আশার উদাসে।

হাজারো কামনা নিয়ে চুপি চুপি আসা
সবুজ ঘাসের লনে—লীনা আসে তাই,
রীণা তার ছোট বোন খেলা ক'রে যাই
তার সঙ্গে প্রথমের আলাপীর হাসা।

তারপর রীণা আর আমার ঘাসের
দুএকটা প্রজাপতি উড়ে যায় ঠিক
লীনার কাছের ঘাসে, আশ্চর্য সেদিক
রীণার আদরে শেষে করেছে কাছের।

পৃথিবীর অনেকতো হাসি আর গান
প্রাণের বসন্তে পায় কোন' একদিন,
ছোট কোন যোগসূত্রে আসঙ্গ নবীন
বাড়িয়ে দেবেই জানি জীবনের মান।

এক অধ্যায়

ডাঃ নবগোপাল দাস

["ভারতবর্ষ"এর পাঠক-পাঠিকারা জানেন যে ১৯৫৮ সালের ডিসেম্বর মাসে আই-সি-এস্ থেকে পদত্যাগ করবার পূর্বে ডাঃ নবগোপাল দাস বছরখানেকের জন্য পশ্চিমবাংলা সরকারের দুর্নীতিদমন দপ্তরের সচিবের পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। দুর্নীতিদমন ব্যাপারে তাঁর সাহস এবং সততা দেশের জনসাধারণকে মুগ্ধ করেছিল। অভিজ্ঞতার বিশদ্ বিবরণী যদিও তিনি দিতে চান না, তবু যেটুকু তিনি বল্‌তে রাজী হয়েছেন সেটুকুই আমরা সকলের সাম্‌নে উপস্থাপিত কর্‌লাম। [সম্পাদক]

এক

অনেকেই আমাকে বলেছেন যে, যে এক বছর আমি পশ্চিম-বাংলা সরকারের দুর্নীতিদমন বিভাগের সচিবের পদে অধিষ্ঠিত ছিলাম সে সময়কার অভিজ্ঞতার বিশদ্ বিবরণী যদি আমি লিপিবদ্ধ করি তাহ'লে হয়ত দেশের কল্যাণ হ'তে পারে। আমার বন্ধু এবং শুভানুধ্যায়ীদের এই অনুরোধ রক্ষা কর্‌তে আমি অক্ষম, তার কারণ অভিজ্ঞতার কথা বল্‌তে গেলেই বল্‌তে হয় বিশেষ বিশেষ কেস্এর কথা, যা' বলা আমি সঙ্গত মনে করি না। এর কারণ প্রধানতঃ তিনটি। এক, আমার অনুসন্ধান (investigation) হয়েছে এক তরফা, অর্থাৎ আমি যা দেখেছি বা জেনেছি তার বিপক্ষেও হয়ত অনেক কিছু বল্‌বার আছে। কাজেই শুধু আমার বিবরণী জনসাধারণের সাম্‌নে উপস্থাপিত কর্‌লে অনেকের প্রতি অবিচার করা হবে। দ্বিতীয়, তাঁদের অনেকেই এখনও সরকারী দপ্তরে বা বেসরকারী প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত আছেন, তাঁদের বিড়ম্বিত করা অভদ্রোচিত। তৃতীয়, দেশের কল্যাণের জন্য বিশদ্ বিবরণী যদি লিখতেই হয় তাহ'লে তা' করা উচিত হবে ক্রীড়াপ্রাঙ্গণ থেকে অবসর নেবার বেশ কয়েক বছর পরে, যখন সময়ের প্রবাহে ব্যক্তিগত অনুভূতি বা উত্তেজনা অনেকখানি ধুয়ে মুছে গেছে, যখন সমস্ত পরিস্থিতি বিষয়মুখ (objective) মাপকাঠিতে পর্যালোচনা কর্‌বার মত অবস্থা এসেছে।

সবচেয়ে বড় কথা হচ্ছে এই যে, আমি পলিটিশিয়ান্ নই, আমার অভিজ্ঞতা উদ্ধৃত ক'রে পলিটিক্স্এর সৃষ্টি হয়, এ আমি চাই না।

তবে আমার ছাব্বিশ বছরের চাকুরী জীবনে (আই-সি-এস্এর প্রোবেশনারি সময়টা লণ্ডন স্কুল অব্ ইকনমিক্স্এ কাটিয়ে আমি দেশে ফিরি ১৯৩২ সালের ডিসেম্বর মাসে এবং রাজসাহী জেলায় এসিষ্ট্যাণ্ট ম্যাজিষ্ট্রেটএর পদে যোগদান করি। আই-সি-এস্ থেকে পদত্যাগ করি ১৯৫৮ সালের ডিসেম্বর মাসে—যদি চাইতাম, আরও নয় বছর আমি এই সার্ভিসে কাজ কর্‌তে পারতাম।) দুর্নীতিদমন বিভাগের এই সচিবত্ব একটা বড় অধ্যায় বই কি! এই এক বছরে আমি যা দেখেছি এবং শিখেছি তার তুলনা হয় না। আমার এই কাজ উপলক্ষে আমাকে কত বিচিত্র সংস্থার সম্মুখীন যে হতে হয়েছে তা' বল্‌তে পারি না। সরকারী এবং বেসরকারী অনেক প্রতিষ্ঠানের আভ্যন্তরীণ খবর আমার নজরে এসেছে এবং এমন অনেক লোকের সংস্পর্শে এসেছি যাদের সঙ্গে পরিচিত হবার কোনই সম্ভাবনা ছিল না। নিয়তির পরিহাসে (অথবা আমারই ইচ্ছায়) এই অধ্যায় আমার আই-সি-এস জীবনের শেষ অধ্যায়ও বটে!

আগেই বলেছি, কোন কেস্এর বিবরণী আমি লিখব না। তবে এই এক বছরে আমি যে কত হাস্যকর এবং অপ্রত্যাশিত পরিস্থিতির সম্মুখীন হয়েছিলাম তার দু'একটা কাহিনী বাংলা দেশের পাঠক-পাঠিকাকে হয়ত আনন্দ দিতে পারে। সেই জাতীয় কয়েকটি অভিজ্ঞতার কথাই বলব।

এই প্রসঙ্গে একটা সতর্কবাণী উচ্চারণ করা দরকার। কাহিনী বল্‌তে গেলে পাত্র-পাত্রীদের নাম দিতে হয়, আমাকেও দিতে হবে। কিন্তু সব নামই কাল্পনিক, অর্থাৎ কেউ যেন ভুলেও মনে না করেন যে যথার্থই একজন অমিতাভ গোস্বামী বা শ্রীমতী ঘোষাল আছেন বা ছিলেন। আমার অজান্‌তে এই সব নামে কোন লোক যদি থেকে থাকেন তাঁদের কাছে করজোড়ে ক্ষমা ভিক্ষা কর্‌ছি এবং

আবার বলছি তাঁদের বিব্রত করা আমার কল্পনারও বাইরে।

প্রথমেই বলা দরকার, আমি দুর্নীতি দমন বিভাগের ভার নেই ১৯৫৭ সালের নভেম্বর মাসে। তার ঠিক আগে প্রায় বৎসরাধিককাল আমি ছিলাম সেচ ও জল বিভাগের সচিব।

দুর্নীতিদমন বিভাগের ভার আমি খুসী মনে নেই নি। সেচ ও জল-বিভাগের সমস্যাগুলোর সঙ্গে আমি সবেমাত্র পরিচিত হতে আরম্ভ করেছি, এত শীঘ্র বিভাগীয় পরিবর্ত্তন আমার ভাল লাগেনি। কিন্তু রাষ্ট্রের বৃহত্তর দাবীর কাছে ব্যক্তিগত ইচ্ছা-অনিচ্ছাকে প্রাধান্য দেওয়া চলে না, কাজেই মন থেকে সম্পূর্ণ সম্মতি না পেলেও কর্তৃপক্ষের আদেশ মেনে নিয়েছিলাম।

নতুন বিভাগের ভার নেবার ফলে আমাকে চলে যেতে হ'ল রাইটার্স বিল্ডিংএর শীতাতপ-নিয়ন্ত্রিত কামরা থেকে হাঙ্গারফোর্ড ষ্ট্রীটএর দোতলায় সাধারণ এক কামরায়। সত্যি কথা বলতে কি, এই পরিবর্ত্তনটাও আমার ভাল লাগেনি। নতুন কামরায় air-conditionএর অভাবের কথা বলছি না, আমার ভাল লাগেনি' এই জন্য যে মন্ত্রী-পর্ষদ, মুখ্যসচিব এবং অন্যান্য সচিবদের সান্নিধ্য থেকে বঞ্চিত হ'লাম। অবশ্য কাজ উপলক্ষে আমাকে সপ্তাহে অন্ততঃ দু'তিনবার রাইটার্স বিল্ডিংস্এ যেতে হ'ত, কিন্তু সে হচ্ছে অতিথির পোষাকে। অন্যতম ভাড়াটে হিসেবে নয়।

সে যাই হোক, নতুন কামরায় এসে বসলাম এবং যথারীতি নতুন দপ্তরের প্রধান প্রধান অফিসারদের সঙ্গে পরিচয় হ'ল।

সৌজন্য বিনিময়ের পর দেখলাম কাজের তালিকা। আমার অফিসারদের জানিয়ে দিলাম আমার কর্ম্মপদ্ধতি। শুনেছিলাম, দুর্নীতি দমন বিভাগের সচিবের দিনে দু'তিন ঘণ্টার বেশী কাজ করার প্রয়োজন হয় না। আমি বললাম যে পূর্ব্বতন ইতিহাসে যাই লেখা থাকুক না কেন, আমি অফিসে থাকব দশটা থেকে সাড়ে পাঁচটা অবধি এবং নিজে গ্রহণ করব প্রত্যেকটি তদন্তের একটা মোটা অংশ।

এই প্রসঙ্গে বলা দরকার যে শৃঙ্খলাবদ্ধভাবে কাজ করা আমি চিরকাল পছন্দ করে এসেছি। আমি দেখেছি, এ ভাবে অনেক বেশী কাজ করা যায়। সুদীর্ঘ টিফিনে বা মুখরোচক গল্প-গুজবে সময় কাটানো আমার কোনদিনই ভাল লাগত না, কাজ শেষ করে গল্প, এই ছিল আমার রীতি। উর্দ্ধতন মহলে আমার দুর্নাম ছিল যে আমি নাকি ঘড়িতে সাড়ে পাঁচটার পর অফিসে এক মুহূর্ত্তও বসে থাকতাম না। অভিযোগটা একেবারে মিথ্যা নয়, অথচ আমার অতি বড় শত্রুও এই অপবাদ কখনও দিতে পারে নি যে আমার টেবিলে কোন ফাইল দিনের পর দিন, মাসের পর মাস, অবহেলিত অবস্থায় পড়ে রয়েছে।

মোট কথা, আমার ভাব-ভঙ্গী দেখে আমার নতুন দপ্তরের অফিসাররা প্রথম দিনেই বুঝতে পেরেছিলেন যে গতানুগতিক পথে আমি চলব না।

দুই

নতুন দপ্তরের ভার নিয়েই আমি সবাইকে জানিয়ে দিলাম যে দেশের রন্ধ্রে রন্ধ্রে দুর্নীতি প্রবেশ করেছে তা দূর করবার জন্যই এই দুর্নীতি দমন বিভাগ স্থাপিত হয়েছে, জনসাধারণ আশা করে খানিকটা অন্ততঃ দুর্নীতি আমরা দূর করতে পারব। অতএব, নির্ভয়ে আমরা কাজ করব এবং আমাদের প্রধান লক্ষ্য হবে সেই শ্রেণীর কর্ম্মচারী এবং ব্যবসায়ী যাদের লোভ এবং অর্থ-পিপাসার যুক্তিসঙ্গত কোন কারণ নেই, যাদের ব্যবহারে অধস্তন কর্ম্মচারীরা হয়ে উঠেছে ভীত, সন্ত্রস্ত এবং বাধ্য হয়ে দুর্নীতিপরায়ণ।

আরও জানিয়ে দিলাম যে, যে কেউ আমার সঙ্গে দেখা করতে চায় আমি দেখা করতে প্রস্তুত আছি। এক সর্ত্তে: যদি দর্শনপ্রার্থী দুর্নীতির কোন বিশদ্ খবর দিতে পারেন। অমুক দপ্তরে দুর্নীতি চলছে বা অমুক অফিসার দুর্নীতি-পরায়ণ বা দুর্নীতির পোষক, এই জাতীয় খবরের চেয়েও আমি জানতে চাই ঠিক কি ভাবে দুর্নীতি চলছে। সঙ্গে সঙ্গে এই প্রতিশ্রুতিও আমি দিলাম যে সংবাদবাহকের নাম-ধাম আর কেউ জানবেন না—একমাত্র আমি এবং আমারই খুব বিশ্বস্ত দু' একজন অফিসার ছাড়া।

আমার এক সতীর্থ আমাকে প্রশ্ন করেছিলেন, ডাঃ দাস, এটা কি সঙ্গত হ'ল? এতে ত গুপ্তচরেরা প্রশ্রয় পেয়ে যাবে, তারা নানা মিথ্যা অভিযোগ আপনার কাছে নিয়ে আসবে, যার ফলে অনেক নির্দ্দোষ ব্যক্তিকেও আপনি বা আপনার অফিসারেরা হয়রাণ করবেন।

এই সম্ভাবনা যে ছিল এবং এখনও আছে, তা আমি

অস্বীকার করছি না। কিন্তু দুর্নীতি দেশের রন্ধ্রে রন্ধ্রে এমন ভাবে প্রবেশ করেছে যে এ ছাড়া আর কোন উপায় আছে কি? যারা দুর্নীতিপরায়ণ বা দুর্নীতির পোষক তাদের অনেকেই হয় উচ্চপদে আসীন, নতুবা লক্ষ বা ক্রোড়পতি ব্যবসায়ী। মুখোমুখি তাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ করার মত দুঃসাহস ক'জন লোকের আছে বা থাকতে পারে? যদি তারা খোলাখুলিভাবে অভিযোগ করে তাহ'লে যারা অভিযুক্ত তারা কি আপ্রাণ চেষ্টা করবে না অভিযোগকারীদের নানা ভাবে বিব্রত এবং ব্যাহত করতে?

আমার সতীর্থকে আমি বলেছিলাম, পঁচিশ বছর চাকুরী করে যদি আমার এটুকু অভিজ্ঞতাও না হয়ে থাকে যে অভিযোগকারীদের অভিযোগের মধ্যে কতটুকু সত্য এবং কতটুকু নির্জ্জলা মিথ্যা, তাহ'লে বৃথাই আমি চাকুরী করেছি।

আজ আমি বলতে পারি যে আমার এই কর্ম্মপদ্ধতি ফলপ্রসূ হয়েছিল। অনেক জিনিষই আমার এবং সরকারের অজ্ঞাত থেকে যেত,যদি আমি এই ভাবে অভিযোগ আমন্ত্রণ না করতাম।

তবে এর হাস্যকর দিকও আছে। দুটো ঘটনার কথা মনে পড়ছে।

অফিসে বসে ফাইল ঘাঁটছি, চাপরাশী এসে স্লিপ দিল—অপরিচিত নাম। নামের নীচে লিখেছেন: "অত্যন্ত জরুরী, sensational খবর আছে।"

আমি জানি যাঁরা আগে থেকে বলেন, sensational খবর আছে, তারা অধিকাংশ ক্ষেত্রেই খবরটা দেন, অতি সাধারণ অথবা নির্ব্যক্তিক। তবু ভাবলাম, দেখাই যাক্ না ভদ্র-লোকটি কে এবং কি বলতে চান।

চাপরাশীকে বললাম, আসতে ব'লো।

ভেতরে ঢুকলেন জটাজুটধারী এক সন্ন্যাসী। সৌভাগ্যের বিষয় তাঁর পরিধেয়ের মধ্যে কোন অসঙ্গতি ছিলনা, গেরুয়া রংএর পোষাকে বরং মনে হচ্ছিল যেন এইমাত্র কোন বাংলা ফিল্ম্এর সেটএ অভিনয় করে আমার কাছে এসেছেন।

বসতে বললাম, তারপর স্লিপএর দিকে তাকিয়ে প্রশ্ন করলাম, আপনার নাম লিখেছেন—অমিতাভ গোস্বামী, কিন্তু আপনার চেহারার সঙ্গে নামের সঙ্গতি খুঁজে পাচ্ছিনা!

হেসে বললেন, কেন, আপনি কি আশা করেছিলেন অমিতাভানন্দ হ'লে বেশী মানাত?

খানিকটা হয়ত তাই, কিন্তু কিছু বললাম না আমি।

অমিতাভ গোস্বামী বলে চললেন, আমি এসব "আনন্দ" "টানন্দ"য় বিশ্বাস করিনা। আমি যা' তা'ই। তাছাড়া আমাদের সাধুসমাজেও নতুন কিছু আনতে হবে ত, আমরাই কেন বা চিরকাল গতানুগতিক রীতি অনুসরণ ক'রে চলব? তাই আমি আমার পিতৃদত্ত নাম বদলাইনি।

মনে মনে বললাম, শুনে সুখী হ'লাম।

মুখে বললাম, কি খবর আপনি এনেছেন, বলুন।

প্রশ্ন করলেন, বললে action নেবেন ত?

—যদি মনে করি action নেওয়া দরকার, নিশ্চয়ই নেব।

—ঐ আপনাদের বাঁধা গত!...অসহিষ্ণুভাবে গোস্বামী মশায় বললেন।...যদি মনে করি action নেওয়া দরকার নিশ্চয়ই নেব! আপনাদের এই মনোবৃত্তির ফলেই দেশটা উচ্ছন্নে যাচ্ছে।

তিরস্কারটা নীরবে হজম করলাম। বললাম, দেখুন, অনেক কাজের চাপ পড়েছে, তাড়াতাড়ি বলে ফেলুন কি বলতে চান্ আপনি।

—বলব? বলব?...এদিক ওদিক তাকালেন তিনি।

আমি বললাম, কোন ভয় নেই, আর কেউ শুনছেনা।

স্বরটা একটু নীচু খাদে নিয়ে এসে বললেন, জানেন আপনাদের সরকারের একজন বড় কর্ম্মচারী স্বামী—নন্দের শিষ্য? শুধু তিনি কেন, তাঁর দপ্তরের অনেক কর্ম্মচারীও। অথচ স্বামী—নন্দ হচ্ছেন জোচ্চোর বাটপাড় লম্পট। আপনি এর একটা বিহিত করতে পারেন না?

—আপনি যে খবরটা দিলেন তা' আমি অনেক আগে থেকেই জানি। কিন্তু কারও ব্যক্তিগত বিশ্বাস অবিশ্বাসে হস্তক্ষেপ করা আমাদের কাজ নয়।

—আপনাদের কাজ নয়? ...তীব্রভাবে মন্তব্য করলেন গোস্বামী মশায়।... তাহ'লে কাজটা বুঝি আমার?

বলতে যাচ্ছিলাম, তাই ত মনে হচ্ছে। কিন্তু কথায় কথা বাড়বে তাই থেমে গেলাম।

শুধু বল্লাম, আমি অত্যন্ত দুঃখিত গোস্বামী মশায়। এর চেয়ে জরুরী অনেক কাজ আমাদের রয়েছে, সেগুলো যদি শেষ করে উঠ্তে পারি তখন না হয় আপনার অভিযোগটা তদন্ত করব।

মনঃক্ষুণ্ণ হয়ে উঠে পড়্লেন তিনি। তারপর দরজার কাছে গিয়ে হঠাৎ ঘুরে দাঁড়ালেন। প্রশ্ন করলেন, আপনিও বুঝি—নন্দের শিষ্য ?

আমি হেসে জবাব দিলাম, না। সে সৌভাগ্য হয়নি। তাছাড়া, কোন—নন্দেই আমার বিশ্বাস নেই।

তিন

দ্বিতীয় ঘটনার নায়ক (অথবা নায়িকা) হচ্ছেন একজন মহিলা।

সেদিন অফিসে পৌছুতে আমার একটু দেরী হয়ে গিয়েছিল। ঘরে ঢুকতেই চাপরাশী বল্ল যে একজন "মেমসাহেব" প্রায় আধঘণ্টারও বেশী অপেক্ষা করছেন। প্রথমে আমার ঘরেই বস্তে চেয়েছিলেন, কিন্তু তাঁকে অফিসে একটা চেয়ার দেওয়া হয়েছে।

বল্লাম, ডাকো।

মিনিট পাঁচেক পরে পর্দাটা তুলে ঘরে ঢুকলেন মধ্য-বয়সী একজন মহিলা। গায়ের রং ময়লা, গড়ন স্থূলতার দিকে, তবু যৌবনকে আঁকড়ে ধরে রাখবার একটা ব্যর্থ প্রয়াস।

আমার নির্দ্দেশমত একটা চেয়ার টেনে তিনি বস্লেন। জিজ্ঞাসুভাবে তাকালাম তাঁর দিকে।

—শুনেছি আপনি নাকি দুর্নীতিপরায়ণ অফিসারদের সম্বন্ধে তদন্ত করেন এবং মুখ্যমন্ত্রী আপনার কথায় ওঠেন বসেন।

আমি বিনীতভাবে জানালাম যে প্রথমটা সত্যি হ'লেও দ্বিতীয়টা তাঁর সম্পূর্ণ ভ্রান্ত ধারণা। যতদূর জানি, মুখ্য-মন্ত্রী কারও কথায়ই ওঠেন বসেন না এবং আমার কথায় যে নয় তা' হলপ ক'রে বল্তে পারি।

ভদ্রমহিলা বোধ হয় বিশ্বাস করলেন না। বল্লেন, স্বীকার করতে আপনার সঙ্কোচ হচ্ছে, বুঝ্তে পারছি। সে যাই হোক্, আমার পরিচয়টা আগে দেই। আমি হচ্ছি শ্রী—ঘোষালের স্ত্রী। আমার স্বামীর নাম শুনেছেন বোধ হয়, তিনি—দপ্তরে কাজ করেন।

নাম শুনেছি বই কি! কিন্তু যতদূর জানি, আমাদের বিভাগের খাতায় ত তাঁর নাম উল্লেখ নেই। তবে ? অবশেষে স্ত্রী এসেছেন স্বামীর বিরুদ্ধে অভিযোগ করতে ? আমার এই অবাধ আমন্ত্রণ দেখ্ছি নানা জটিল সমস্যার সৃষ্টি করবে।

কিন্তু তখন ত পশ্চাদ্‌পদ হলে চল্বেনা। তাই চুপ করে রইলাম।

শ্রীমতী ঘোষাল বল্লেন, আমার স্বামীর দপ্তরে একজন মেয়ে এসিষ্ট্যান্ট আছে, কাঁচা বয়স…নাম…কুমারী—চক্রবর্তী।

ওঃ হরি, এ যে রীতিমত নারীসুলভ ঈর্ষ্যা! তবে, কি শ্রীযুত ঘোষাল এই মেয়ে এসিষ্ট্যান্টকে নিয়ে একটু বেশী বাড়াবাড়ি করছেন ? যদিও মেয়ে পুরুষের দৈহিক বা মানসিক সম্পর্কের নৈতিকতা প্রত্যক্ষভাবে আমার দপ্তরের আওতায় আসেনা, তবু পরোক্ষভাবে আসতে পারে'—যদি তার ফলে দুর্নীতির সৃষ্টি হয় অথবা দপ্তরের শালীনতা বা শৃঙ্খলা ব্যাহত হয়।

শ্রীমতী ঘোষাল বলে চল্লেন, না। আমার স্বামীর কোন দুর্ব্বলতা নেই। যদি থাক্ত তাহ'লেও নালিশ নিয়ে আপনার দপ্তরে আস্তামনা, কারণ এসব বিষয় নিজেই handle করবার মত প্রত্যয় আমার আছে।

তবে ?

—ব্যাপারটা হচ্ছে এই যে মেয়েটা ওরই সতীর্থ এসিষ্ট্যান্ট্ শ্রী— মজুমদারের সঙ্গে ঢলাঢলি করছে। শুনছি ও নাকি শীগ্গীরই মজুমদারকে বিয়ে করবে। আপনাকে এর একটা বিহিত করতেই হ'বে!

আমি সত্যি হকচকিয়ে গিয়েছিলাম। বল্লাম, আমি ? আমি কি করতে পারি ?

—কেন ? আপনি ত দুর্নীতি দমনের কর্ত্তা। আপনার নাম বাংলাদেশের কে না জানে ? আমরা, স্ত্রীমাবোনেরা, আপনার দিকে তাকিয়ে রয়েছি, সমাজের বুকে যে দুর্নীতি চল্ছে তা' আপনি দূর করবেন এই ভরসায়।

শ্রীমতী ঘোষালকে বিনীতভাবে বুঝিয়ে দিলাম যে, এই জাতীয় দুর্নীতি দূর করা, আমার কর্ত্তব্যের তালিকার মধ্যে পড়ে না। তাছাড়া সমাজের নামান্তরে যে সব অন্যায়

লুকানো রয়েছে তা' কোন সরকারী দপ্তরের পক্ষেই দূর করা সম্ভবপর নয়। সবচেয়ে বড় কথা এই যে কুমারী চক্রবর্ত্তী ও শ্রীযুত মজুমদারের যে সম্প্রীতির কথা তিনি বল্‌লেন, তা' দুর্নীতির পর্য্যায়ে আদৌ পড়ে কিনা সেবিষয়ে আমার ঘোরতর সন্দেহ রয়েছে।

ঠিক কি বলেছিলাম এখন মনে পড়ছে না, তবে যা বলেছিলাম তার সারার্থটুকু আপনাদের জানালাম।

শ্রীমতী ঘোষালের ব্যবহার কিন্তু আমার কাছে প্রহেলিকাময় বলে মনে হচ্ছিল। প্রশ্ন কর্‌লাম, কিন্তু আপনি এই অভিযোগ নিয়ে এলেন কেন?

—আমি এলাম কেন? মজুমদার ছেলেটি বড্ড ভাল, ঐ হতচ্ছাড়া মেয়েটা যদি ওকে বশ না করত তা'হলে আমার মেয়ের সঙ্গে ওর বিয়ে দিতাম।··ওঁকে কতবার বলেছি, কুমারী চক্রবর্ত্তীকে অন্য কোথাও বদ্‌লী করে দাও, কিছুতেই আমার কথা শুন্‌বেন না! বলেন কিনা, আমি নাকি ওঁর সরকারী কাজে interfere কর্‌ছি! আচ্ছা, আপনি ত বিজ্ঞ, বিচক্ষণ ব্যক্তি, আপনিই বলুন, দপ্তরের মধ্যে এ জাতীয় বেলেল্লাপনার প্রশ্রয় দেওয়া কি উচিত?

আমি বুঝ্‌তে পেরেছিলাম শ্রীমতী ঘোষালের সঙ্গে তর্ক করা নিরর্থক। তাই বল্‌লাম, আচ্ছা, এখন তাহ'লে আসুন।···নমস্কার।

চার

আমি যে একজন বিজ্ঞ, বিচক্ষণ এবং নিরপেক্ষ কর্ম্মচারী এটা দুর্নীতি দমন বিভাগে এসে যত শুনেছি—তার আগে কোথাও এতটা শুনিনি'! যে কেউ কোন অভিযোগ নিয়ে এসেছেন তিনিই মুখবন্ধ বা সমাপ্তি করেছেন এই জাতীয় স্তুতিবচনে। প্রশংসা এবং গুণগান শুন্‌লে স্বয়ং মহাদেব ও (সরকারে যাঁরা সর্ব্বোচ্চপদে আসীন তাঁরা হচ্ছেন কলিযুগের মহাদেব) গলে যান, আমি ত নগণ্য [illegible] কর্ম্মচারী মাত্র! তবু এত বেশী স্তুতিবাক্য শুনেছিলাম বলেই বোধ হয় আমার প্রথম প্রতিক্রিয়া হ'ত যিনি এসব বল্‌ছেন তাঁর বক্তব্যের সত্যতা সম্বন্ধে। ইংরেজীতে একটা কথা আছে—take it with a grain of salt; আমিও অভিযোগ শুন্‌তাম একটুখানি লবণ মিশিয়ে। অথচ দুঃখের বিষয় এই যে আমার অনেক সতীর্থ এটা বিশ্বাস কর্‌তেন না। তাঁদের ধারণা হয়েছিল (এখনও বোধহয় আছে) যে আমি উদগ্র হয়ে শুনি—যত সব আজগুবি, অবান্তর কাহিনী। বিশ্বাস করি তার শতকরা নিরানব্বুই ভাগ এবং তদন্ত কর্‌বার আগেই অভিযুক্তকে মনে মনে আসামীর কাঠগড়ায় দাঁড় করিয়ে রাখি।

এই ধারণা যে কত মিথ্যা তা' জানেন তাঁরা—যাঁরা আমার সঙ্গে দুর্নীতি দমন দপ্তরে কাজ করেছেন। দৃষ্টান্ত উল্লেখ করা উচিত হবে না, তবে এটুকু বল্‌তে পারি যে কয়েকজন কর্ম্মচারীর বিরুদ্ধে অত্যন্ত কঠিন অভিযোগ আমি পেয়েছিলাম। পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে তদন্ত করার পর যখন আমি দেখ্‌তে পেলাম যে অভিযোগগুলি প্রতিহিংসামূলক বা ঈর্ষ্যাপ্রসূত, তখন clearance সার্টিফিকেট দিতে আমি এতটুকু ইতস্তত করিনি'।

আমার দেওয়া clearance সার্টিফিকেট এর দাম যেকতখানি তা' বুঝতে পেরেছিলাম সেদিন, যেদিন একজন মধ্যপদস্থ কর্ম্মচারী এসে আমাকে বলেছিলেন, আপনি আমাকে বাঁচিয়েছেন, ডাঃ দাস। রিপোর্ট না যাওয়া পর্য্যন্ত মন্ত্রী থেকে ডেপুটি সেক্রেটারী পর্য্যন্ত আমাকে সন্দেহের চোখে দেখছিলেন। আপনার রিপোর্ট পেয়েই সেক্রেটারী আমাকে ডেকে বলেছেন, ডাঃ দাস যখন অভিযোগগুলো মিথ্যা এবং অবিশ্বাস্য বলেছেন তখন আপনি নির্ভয়ে কাজ করে যেতে পারেন। ওঁর রিপোর্টকে আমরা সবচেয়ে বেশী সম্মান দিয়ে থাকি।

পরে এই সতীর্থ সেক্রেটারীকে আমি আমার আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানিয়েছিলাম। বন্ধু হেসে বলেছিলেন, কিন্তু একটা বিপদ্ হল।

বিস্মিতভাবে প্রশ্ন কর্‌লাম, কি?

বিপদ হল এই যে তিনি এখন নিরুদ্বেগে এবং নির্ভয়ে নীতিবিরুদ্ধ কাজ করে যেতে পার্‌বেন। সার্টের উপর ডাঃ দাসের সার্টিফিকেট গাঁথা, তাঁকে পায় কে?

আমি হেসে জবাব দিয়েছিলাম, আমার কাছে তখন রিপোর্ট করবেন, আমি নতুন ক'রে তদন্ত কর্‌ব।

—আপনিও ত রক্তমাংসের মানুষ, আপনার পূর্ব্বতন তদন্তের সিদ্ধান্ত আপনাকে খানিকটা prejudice করবে না কি?

সম্ভাবনাটা হেসে উড়িয়ে দেবার মত নয়। তবে,

আমার সৌভাগ্যবশতঃ আমি যে কয়মাস ঐ বিভাগে ছিলাম তার মধ্যে এই অফিসারের বিরুদ্ধে আর কোন অভিযোগ আমার কাছে আসেনি।

পাঁচ

শ্রীমতী ঘোষালের অভিযোগের কাহিনী একটু আগেই বলেছি। ব্যাপারটা কিন্তু ঐখানেই শেষ হয়নি।

দিন দুই পরে টেলিফোন বেজে উঠল—ডিরেক্ট লাইনটা।

টেলিফোন তুলে বল্‌লাম, আমি ডাঃ দাস বল্‌ছি।

অপর প্রান্ত থেকে মেয়েলি কণ্ঠে জবাব এল, আমি কুমারী চক্রবর্ত্তী।

নামটা যেন কোথায় শুনেছি, কিন্তু ঠিক মনে আস্‌ছিল না। বল্‌লাম, বলুন।

—আপনার সঙ্গে একবার দেখা করতে পারি কি?

—কি বিষয়ে তা' একটু বল্‌বেন?

—টেলিফোনে ত সব কথা বলা যায় না। আমি আপনার বেশী সময় নেব না, মিনিট পনেরো মাত্র।

সবাই বলেন, বেশী সময় নেবেন না, কিন্তু কার্য্যক্ষেত্রে দেখেছি প্রয়োজনের অতিরিক্ত সময় নিয়ে ফেলেন। দোষটা হয়ত আমারই: অনেক সময় নিজেই অবান্তর কাহিনীর জালে জড়িয়ে পড়ি, অথবা হয়ত মনে করি যে অবান্তর কথার মাঝ থেকেই প্রাসঙ্গিক কথা বেরিয়ে আসবে।

বল্‌লাম, তবু একটুখানি আভাস দিন্...

—পরশুদিন শ্রীমতী ঘোষাল আপনার সঙ্গে যে বিষয়ে দেখা করেছিলেন সেই বিষয় সম্পর্কে।

বিদ্যুতের ঝিলিকে মনে পড়ে গেল শ্রীমতী ঘোষালের অভিযোগ। তাঁরই মেয়ের প্রতিদ্বন্দ্বী কথা বল্‌ছেন টেলিফোনের অপর প্রান্ত থেকে।

আমার উচিত ছিল বলা যে আমার সময় হবে না। কিন্তু ভাবলাম, এক পক্ষের কাহিনী যখন শুনেছি তখন অপর পক্ষেরটাও শুন্‌লে ক্ষতি কি? হয়ত আমার গল্প-পিপাসু মনও খানিকটা উদগ্র হয়ে উঠেছিল।

বিকেলের দিকে এলেন কুমারী চক্রবর্ত্তী। শান্ত দোহারা গড়ন, সুন্দরী বলা চলে না (সুন্দরী হ'লে আর কেরাণীর চাকুরী কর্‌তে আসবেন কেন?) তবে মুখে এমন একটা শ্রী আছে যা' অনেক পুরুষ মানুষকেই হয়ত আকৃষ্ট করে।

কোন প্রকার ভূমিকা না করে বল্‌লেন, শ্রীমতী ঘোষাল আমার এবং—মজুমদার সম্বন্ধে আপনার কাছে যা বলে গেছেন আমি শুনেছি। আমি বলতে এসেছি, সমস্ত মিথ্যে।

আগেই বুঝতে পেরেছিলাম শ্রীমতী ঘোষালের আমার কাছে আসার খবর ইনি কোত্থেকে পেয়েছিলেন। আমার কাছে কোন সহানুভূতি না পেয়ে শ্রীমতী ঘোষাল সোজা আক্রমণ করেছিলেন তাঁর স্বামীকে, কেন তিনি তাঁর নিজের দপ্তরে এই জাতীয় অনাচারের প্রশ্রয় দিচ্ছেন। পরের দিন শ্রীযুত ঘোষাল বাধ্য হয়েছিলেন কুমারী চক্রবর্ত্তীকে মোটামুটি সাবধান করে দিতে।

আমি প্রশ্ন কর্‌লাম, সমস্ত মিথ্যে?—মজুমদারের সঙ্গে আপনার কোনই সৌহার্দ্দ্য নেই?

একটু লজ্জিতভাবে জবাব দিলেন, দেখুন, এক অফিসে কাজ করি, কথাবার্ত্তা বিনিময় হয় বই কি। দু' এক সময় এক সঙ্গে চা'ও খেতে গিয়েছি। কিন্তু তার বেশী কিছুই নয়।

কুমারী চক্রবর্ত্তী এবং—মজুমদার কোথায় যান্ বা কি ভাবে সময় কাটান তা' জান্‌বার অধিকার আমার নেই, কাজেই এ সম্বন্ধে আর কোন প্রশ্ন আমি কর্‌লাম না। শুধু জিজ্ঞাসা করলাম, আপনার সঙ্গে—মজুমদারের বিয়ের কোন সম্ভাবনা আছে কি?

একটু যেন রাঙা হয়ে উঠলেন কুমারী চক্রবর্ত্তী। অথবা ওটা কি আমার চোখের ভুল?

বল্‌লেন, সম্ভাবনা কি করে থাক্‌বে বলুন? আমরা হচ্ছি ব্রাহ্মণ, ওঁরা কায়স্থ।...তা ছাড়া বরপণ দেবার ক্ষমতা আমার বাবার নেই।

এর উত্তরে অনেক কিছু বল্‌তে পারতাম। বলতে পারতাম, মনের মিল যদি হয়ে থাকে, তাহ'লে ব্রাহ্মণ-কায়স্থ এই বিভেদে আটকাবে না, বরপণও বাধা হয়ে দাঁড়াবে না।

কিন্তু আমি সমাজ সংস্কারক নই। হৃদয়ের ডাক্তারও নই। আমি দুর্নীতিদমন বিভাগের নিতান্ত অরসিক সচিব মাত্র!

বল্‌লাম, আপনাকে আশ্বাস দিচ্ছি, এ সব ব্যক্তিগত ব্যাপার নিয়ে আমরা মাথা ঘামাইনা। শ্রীমতী ঘোষালকে আমি এ কথা খুবই খোলাখুলিভাবে বলে দিয়েছি, আপনি ভয় পাবেন না।

বিদায় নেবার সময় কুমারী চক্রবর্ত্তী বল্‌লেন, আপনার বহুমূল্য সময় নষ্ট করলাম, কিন্তু শ্রীযুত ঘোষাল যখন ডেকে বল্‌লেন যে আপনার কানে এ সব পৌঁচেছে তখন আমি সত্যি ভয় পেয়ে গিয়েছিলাম।

কুমারী চক্রবর্ত্তী এবং—মজুমদার এতদিনে উদ্বাহবন্ধনে আবদ্ধ হয়েছেন কিনা জানিনা, যদি হয়ে থাকেন তাহ'লে তাঁরা আমার আন্তরিক অভিনন্দন গ্রহণ কর্‌বেন কি?

ক্রমশঃ

বিজ্ঞান শিক্ষা শুধু জ্ঞানের উন্নতির জন্য নয়

উপানন্দ

প্রকৃতির অন্তহীন রহস্য উদ্‌ঘাটনের দিকে মানুষের সন্ধানী মন কেবলই ঘুরে বেড়াচ্ছে, চলেছে তার শ্রান্তিহীন অভিযান জগৎ রহস্যকে আয়ত্ত করবার জন্য। আজ আমরা বিজ্ঞানের যুগে এসে দাঁড়িয়েছি, লক্ষ্য করছি বিজ্ঞানের দ্রুত অগ্রগতি। সভ্যতার সঙ্গে বিজ্ঞান ওতোপ্রোত-ভাবে জড়িত। আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র বলেছেন—'বিজ্ঞান শিক্ষা এখন শুধু আমাদের জ্ঞানের উন্নতির জন্য নহে। আমাদের জীবন মরণ ইহার উপর নির্ভর করিতেছে।' সুতরাং আজকের দিনে বিজ্ঞানী হওয়া দরকার।

বিজ্ঞানের শক্তিতে আজ মানুষ মৃত্যুঞ্জয়। তোমরা বিজ্ঞানের সাধনা করবে যাতে জাতির সুখ স্বাচ্ছন্দ্য, আনন্দ ও শক্তি উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পেতে পারে। বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে যারা পিছিয়ে থাকবে তাদের অসহায়-তার সুযোগ নিয়ে তাদের ওপর আধিপত্য করবে বিজ্ঞান-শক্তিসম্পন্ন মানুষেরা; তাদের অশুভ স্বার্থবুদ্ধি অসহায় মানুষদের মৃত্যুর পথরচনা করবে শাসন ও শোষণের মাধ্যমে, এজন্যেই এদিকে তোমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করি। তোমরা বিজ্ঞান বলে বলীয়ান হোলে, কেউই আমাদের স্বাধীনতাকে হরণ করতে পারবে না, বরং বিশ্ববাসী আমাদের ভয় ও ভক্তি করবে। তাছাড়া বিজ্ঞানের ছাত্র-ছাত্রী হোলে তোমরা বহু অজানাকে জানতে পারবে, অনেক রহস্যের সন্ধান পাবে।

আজকের দিনে বিশ্বের নূতন নূতন তথ্য ও সত্য আমাদের সম্মুখে তুলে ধরছেন বৈজ্ঞানিকেরা। সম্প্রতি জানতে পারা গেছে, সুদীর্ঘদিন ধরে গতি-মন্থর ছিল পৃথিবীর আবর্তন, এখন সুরু হয়েছে তার দ্রুত ঘূর্ণন। চেষ্টা চলেছে পার্থিব উত্তাপ থেকে বিদ্যুৎ উৎপাদন করবার জন্য, এ কাজে অগ্রণী হয়েছে সোভিয়েট রাশিয়া। আজ বাতাসে কার্ব্বণ ডায়োকসাইড গ্যাস শতকরা দু'ভাগ বৃদ্ধি পেয়েছে সেই শ্রমশিল্প বিপ্লবের দিন থেকে হিসেব করে। বাতাসে এই গ্যাস শতকরা দশ-ভাগ হোলেই মেরু তুষার দ্রুতভাবে গলে সমস্ত সমুদ্রগুলোকে ফেঁপিয়ে তুলবে, তাদের বিরাট জলোচ্ছ্বাসে পৃথিবীর প্রাণের পালা হয়তো শেষ করতে হবে, অথবা হয়তো নতুন তুষার যুগের মধ্যে এসে পড়বে পৃথিবী। আবহতত্ত্ববিদেরা বলছেন যে, উত্তর ও দক্ষিণ গোলার্দ্ধে গড়পড়তায় উত্তাপ বৃদ্ধি পাচ্ছে, তাতে মেরুসন্নিহিত হিম আবরণ ক্রমেই গলে যাচ্ছে, ফলে শীত ঋতুতে শৈত্যভাগ কমে যাচ্ছে, গরম বোধ হচ্ছে অপেক্ষাকৃত-ভাবে, আর এদিকে গ্রীষ্মঋতুতে কিছু ঠাণ্ডা অনুভূত হচ্ছে। ইংলণ্ডে ক্রিকেট ক্লাবগুলি অভিযোগ করতে সুরু করেছে যে প্রতি বছরেই তাদের ঋতুর অবস্থিতি কাল কমে আসছে। কডমাছের ঝাঁক উত্তর-মুখো যেতে আরম্ভ করেছে পলায়নী মনোবৃত্তি নিয়ে। আমরা যে গ্রহে বাস করি তার সঙ্গে নৈকট্য সূত্রে আবদ্ধ হচ্ছে মহাজাগতিক ধূলি বা পতিত উল্কাপিণ্ডদের ধূলিকণার প্রচুর নিবিড়তা। এইসব ধূলিকণার নিবিড়তার ফলে পৃথিবীর বিভিন্ন স্থানে অস্বাভাবিক বারিপাত হতে আরম্ভ করেছে। সূর্য্যের ওপর দাগ আর সৌরআবর্ত্তেও জলবায়ুর পরিবর্ত্তনের মধ্যে এমন একটা সম্বন্ধ বা যোগাযোগ রয়েছে যার ফলে বায়ুর সংবহন বৃদ্ধি পাচ্ছে উত্তরোত্তরভাবে—আর তাপমানের পরিবর্ত্তন ঘটছে অভাবনীয় অবস্থায়। চাঁদ খুব নিকটে এলে ভূমিকম্পও অবশ্যম্ভাবী।

তোমরা জানো; কারণ ব্যতীত কার্য্য হয় না। আজ যে সব নৈসর্গিক উপদ্রব হচ্ছে, বিজ্ঞান বলে তোমরা এর কারণ জানতে পারো, প্রতীকারের জন্যে গবেষণাও করতে পারো। ভূগর্ভের একটি গুহাতে যেন আমরা রয়েছি শিকলে বাঁধা বন্দীর মত। নড়তে পারিনে, শুধু সামনের দেয়ালে যে ছায়া পড়েছে, তাই আমাদের সম্বল, আর তাই নিয়ে আমরা যেটাকে সত্য বলে খাড়া করি, সে ঐ দেওয়ালের ছায়া ছাড়া আর কিছুই নয়। যেদিন মানুষ প্রথম উপলব্ধি করলো জগৎ জড় ও শক্তির খেলা, সেদিন থেকে সুরু হোলো তার বিজ্ঞানের যাত্রা,—এ যাত্রা কোথায় এসে থামবে, তা কে জানে? যতই বিজ্ঞান অগ্রসর হচ্ছে,

ততই তার সম্মুখে বিশ্বরহস্যের মহাসমুদ্র প্রতিভাত হচ্ছে। জড়বিজ্ঞান উভয় সঙ্কটের সম্মুখীন, ভাঙা ও গড়া এর হাতে।

স্বভাবত: যা অচল, তাই জড়, আর জড়কে যে সক্রিয় করে তোলে তা-ই শক্তি। আলোক হচ্ছে শক্তিরই একটা প্রকার ভেদ। আলোর গতিবেগ যে কিরূপ প্রচণ্ড, তা ধারণা করে ওঠা যায় না, একসেকেণ্ডে যায় একলক্ষ ছিয়াশি হাজার মাইল। আপেক্ষিকতা-বাদ অনুসারে কোন বস্তুর বেগ আলোর বেগকে অতিক্রম করতে পারে না। জলের ওপর ঢিল ছুঁড়লে জলকণা যেমন ওঠানামা করে—আর ঢেউ চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ে, আলো জ্বাললেও তেমি ইথার স্পন্দিত হ'য়ে ওঠে আর চারিদিকে আলোর তরঙ্গ ছুটতে থাকে। আমাদের দৃষ্টিশক্তি আলোর উপর নির্ভরশীল। আলো একরকমের তরঙ্গ ছাড়া আর কিছুই নয়। চোখ সবচেয়ে তাড়াতাড়ি আলো দেখে। অন্ধকারের ভেতর মানুষের চোখের অনুভূতি শক্তি প্রায় একলক্ষগুণ বৃদ্ধি পায়। আলোর ওপর আলো ফেলে অন্ধকার সৃষ্টি করা অসম্ভব নয়। আমাদের চোখের পিছনে যে পর্দাটা আছে, তাকে বলা হয় রেটিনা। এই রেটিনাকে যে শক্তি উত্তেজিত করে মস্তিষ্কে একটা অনুভূতি সৃষ্টি করে, আমরা তাকে বলি আলোক। যা দেখি তা আলো নয়—আলোর উৎস—আলো চির-অদৃশ্য। আমরা যা দেখি, তাও সব ঠিক দেখা হয়না, যেমন ধরো আকাশ। আমরা বলি বটে আকাশ নীল, কিন্তু আকাশ নীল নয়। এরূপ দৃষ্টি বিভ্রম আছেই। বিজ্ঞান আমাদের অনেক বিভ্রান্তি দূর করেছে।

আইনষ্টাইনের মতে আমাদের বিশ্ব এক জ্যামিতিক নিয়ম মেনে চলে, আর বিশ্বের সকল প্রাকৃতিক ঘটনা ওর স্বাভাবিক ফল মাত্র। জ্যামিতিক ধারণার দিক থেকে আধুনিক কালের মানুষ বহু উন্নত। জ্যামিতির কাঠামো সুদৃঢ় হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আমাদের সমস্ত ধারণার আমূল পরিবর্তন হয়ে গেছে। এখন আমরা বুঝেছি গ্রহরা যে সূর্য্যের চারিদিকে উপবৃত্তাকার পথে চলে, তা মহাকর্ষের (gravitation) জন্যে নয়। ঐ স্থানের জ্যামিতিক ধর্ম্ম এমনই যে, সেখানে সংঘাতহীন গ্রহগণের ঐটাই স্বাভাবিক পথ। ঐ একই কারণে কেন্দ্রীভূত পদার্থের মধ্য দিয়ে যাবার সময় আলো বক্র পথে চলে। আমরা যেসব প্রাকৃতিক ঘটনা দেখি, তার একমাত্র কারণ বিশ্বের জ্যামিতিক গঠন। জ্যামিতির সাহায্যে প্রাকৃতিক ঘটনার বিশ্লেষণ করে শুধু বিশ্বের জ্যামিতিক আকৃতি সম্বন্ধে একটা ধারণা করা যায় মাত্র কিন্তু বিশ্বের ভেতরকার বস্তুর প্রকৃতি কি, সে সম্বন্ধে কিছু বলতে পারেনা। তবে বিশ্বরহস্য উদ্ঘাটনে জ্যামিতি অনেকটা সহায়ক, একারণে তোমাদের জ্যামিতি পড়া দরকার—ইউক্লিডীয় জ্যামিতিআজ পিছিয়ে পড়ছে। নিউটনকে মাধ্যাকর্ষণ বা মহাকর্ষ (gravitation) নীতির আশ্রয় নিতে হয়েছিল ইউক্লিডীয় জ্যামিতির জন্যে। তাঁর আমলে ইউক্লিডীয় জ্যামিতিক ধারণাই প্রচলিত ছিল। আজকের দিনে মিনকোস্কি প্রাচীন প্রচলিত ধারার ওলোট পালোট করেছেন। মিনকোস্কির জ্যামিতিক ধারণা শুধু যে আইনষ্টাইনের আপেক্ষিকতাবাদের ওপর আলোকসম্পাত করেছে তা নয়, বিশেষভাবে প্রমাণও করেছে যে, বিশ্বের পক্ষে যে জ্যামিতি প্রযোজ্য তা ইউক্লিডীয় জ্যামিতি নয়। মিনকোস্কির জ্যামিতির কিছু কিছু পরিবর্তন করে আইনষ্টাইন বিশ্বের অনেক ঘটনা ব্যাখ্যা করবার চেষ্টা করেছেন। এসব পড়লে তোমরা বুঝবে মিনকোস্কি, আইনষ্টাইন, এডিংটন প্রভৃতি জ্যামিতির ওপর নব নব আলোকসম্পাত করে বিশ্বরহস্য উদ্ঘাটিত করবার দিকে অগ্রসর হয়েছেন। এঁরা পৃথিবীর নমস্য।

আজকের দিনে বৈজ্ঞানিক প্রচেষ্টা যেরূপ দ্রুতভাবে চলেছে, তা'তে আগামী একশো বছরের মধ্যে অনেক আশ্চর্য্য রকমের আবিষ্কার হবে, অধিকাংশ বিশ্বরহস্যই উন্মোচিত হয়ে উঠবে। এখন থেকেই বৈজ্ঞানিকেরা বলতে সুরু করেছেন দুহাজার খ্রীষ্টাব্দের মানুষ হবে অনেক বেশী দীর্ঘ, স্বাস্থ্যবান ও দীর্ঘায়ু—অনেকেই শতাধিক বর্ষও বেঁচে থাকবে। আমাদের জ্ঞানভাণ্ডার উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাচ্ছে, এ সময়ে তোমরা বৈজ্ঞানিক হ'য়ে ওঠবার চেষ্টা করো, গণিতশাস্ত্রে পারদর্শিতা অর্জ্জন না করলে বিজ্ঞানসাধনা ব্যর্থ হয়ে যায়। এজন্যে ছেলেবেলা থেকেই অঙ্কে পাকাপোক্ত হবার চেষ্টা করো আর চিন্তাশক্তিকে প্রখর করো।

পরমাণবিক যুগ দ্রুত এগিয়ে চলেছে। এ যুগের অগ্রগতি বিশেষ তাৎপর্য্য পূর্ণ। এই যুগ আরম্ভ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে যেসব পরমাণবিক অস্ত্র আবিষ্কৃত হয়েছে, তার তুলনায় লক্ষ লক্ষ গুণ অধিক হাইড্রোজেন বোমা। আজ বিশ্বের শক্তিশালী রাষ্ট্রগুলির ভিতরে ভিতরে পরমাণবিক গোপন তথ্য আয়ত্ত করে বসে আছেন। শান্তির স্বার্থে পরমাণু শক্তি প্রয়োগ না করে যদি সমরশক্তিকে দৃঢ় করবার জন্য নিয়োজিত করা হয় আর কোন রকমে সমরানল জ্বলে ওঠে, তা হোলে পৃথিবীর ধ্বংস অনিবার্য্য। কিন্তু বিশ্বের মানবকল্যাণে যদি পরমাণু শক্তি সংযোগে তেজস্ক্রিয় পদার্থগুলি নানা কাজে ব্যবহৃত হয়, তাহোলে বিজ্ঞানের জয়যাত্রা সার্থক হবে। এখনও বিশ্বের নানাদিকে সন্দেহ, উত্তেজনা, ঈর্ষা, হিংসা ও কপটমিত্রতা লক্ষ্য করা যাচ্ছে। সুতরাং বিজ্ঞানের সৃষ্ট পরমাণবিক যুগ কিভাবে অতিবাহিত হবে, তা বলা সহজসাধ্য নয়। তোমরা আজকের দিনের বিশ্বের উল্লেখযোগ্য ঘটনাবলীর ধারা পর্য্যালোচনা করলে জানতে পারবে, রাজনৈতিক আকাশে ক্রমেই মেঘ ঘনীভূত হয়ে উঠছে যদিও চেষ্টা চলেছে বিশ্বমৈত্রীর। এ সময়ে তোমাদের নিশ্চেষ্ট হয়ে থাকলে চলবে না—দেশের কল্যাণের জন্য তোমাদের প্রত্যেককেই বিজ্ঞানের ছাত্র-ছাত্রী হতে হবে, আর তার জন্য তোমরা এখন থেকেই প্রস্তুত হও।

উত্তরাধিকার

শ্রীপ্রবাসজীবন চৌধুরী
এম এ, এম এস সি, পি আর এস, পি এইচ ডি

সকলের খবরের কাগজে একটি ছোট বিজ্ঞাপন দেখলুম : স্বর্গীয় অধ্যাপক মনোমোহন আচার্যের সংগৃহীত পুস্তকগুলি উপযুক্ত ক্রেতা পাইলে বিক্রয় করা হইবে।—অধ্যাপক আচার্য অল্প বয়সেই মারা যান—কিন্তু তারই মধ্যে তাঁর দর্শনে খ্যাতির আসন স্থায়ী হয়ে যায়। শুনেছিলাম তাঁর নাকি বই-কেনা বাতিক ছিলো এবং রাতদিন লেখাপড়া নিয়েই থাকতেন। এও শুনেছিলুম যে তিনি নাকি বই পড়তে পড়তে রাস্তায় যাবার সময়ে ট্রাম চাপা পড়ে প্রাণ হারান।

যাই হোক—ভারী ইচ্ছা হলো একবার গিয়ে তাঁর বইগুলি দেখি। আজকাল বইয়ের যা দাম বেড়ে গেছে—তাছাড়া অনেক পুরানো বই তো পাওয়াই যায় না।

সন্ধ্যা বেলা নাগাদ ঠিকানা খুঁজে খুঁজে বেলতলার এক গলিতে ছোট একটি বাড়ীর দরজায় কড়া নাড়তে এক বৃদ্ধ ভৃত্য দরজা খুলে আমায় ভেতরে নিয়ে গেলো। বাইরের ঘরখানি মেঝে হ'তে ছাদ পর্যন্ত প্রকাণ্ড চারটি কাঁচের আলমারীতে বই ঠাশা। ঘরে ডিডিটি স্প্রের কড়া গন্ধ। ঘরের মাঝে একটি ছোট চেয়ার আর টেবিল। ভৃত্যটি চেয়ারে বসতে দিলো, আর টেবিলের ওপর পেপার-ওয়েট চাপা ছোট একখানি কাগজের দিকে আঙুল দেখিয়ে বললে :—ওটা দেখুন। দেখলুম—লেখা আছে; এই বই বিক্রী আমায় নেহাৎ দায়ে পড়ে কোরতে হচ্ছে এবং এবিষয়ে আমি কারও সঙ্গে সাক্ষাৎ কোরতে বা কথাবার্তা কইতে চাইনে। আমার পিতার বই আমার সবচেয়ে মূল্যবান ও পবিত্র বস্তু—যদিও আমি ওগুলির মর্মোদ্ধার কোরতে অক্ষম। আপনি বইগুলি দেখে যা মূল্য দিতে চান তা' জানিয়ে চিঠি দেবেন।—মনোজিৎ আচার্য।

—মনটা বিষণ্ণ হ'য়ে উঠলো। আমার পিতা অনেক টাকা রেখে গেছেন তারই সদ্ব্যবহারের জন্ত এখানে এসেছি। আর এই মনোজিতের পিতা বইগুলি রেখে গেছেন অথচ টাকা রেখে যেতে পারেননি বা ছেলেকে উপযুক্ত শিক্ষা দিয়েও যেতে পারেননি যাতে সে অর্থোপার্জন করতে পারে। তাই সে বেচারী আজ বইগুলি কতো দুঃখে বেচতে বসেছে। যাইহোক ভাবলুম—আমি যদি ভালো দাম দিই তো হয়তো তার উপকারই করবো।

আলমারী খুলে বইগুলি নাড়াচাড়া কোরতে লাগলুম। সব বইয়েরই প্রথম পাতায় মনোমোহন আচার্যের স্বাক্ষর রয়েছে আর বইগুলি যে তন্নতন্ন কোরে পড়া হয়েছে তার পরিচয়ও ছত্রেছত্রে পাতায় পাতায় রয়েছে। ছোট ছোট অক্ষরে পেন্সিল দিয়ে কতো কথা ধারে ধারে লেখা—আর লাল নীল পেন্সিলের দাগও বিস্তর। দর্শনের নানা শাখার গুরুগম্ভীর বই সব। অনেকগুলি দেখলুম প্রকাশ হ'বার সঙ্গে সঙ্গেই বিলাত হ'তে কেনা। অধ্যাপকের হাতের লেখার তারিখটি এখনও জলজল কোরছে—যেন সেদিন কিনেছেন বইটি। কতো আগ্রহভরে বইগুলি পড়তে আরম্ভ করতেন তিনি তাই ভাবছিলুম। কতো কষ্টের পয়সা দিয়ে একটি একটি কোরে বইগুলি কিনেছিলেন তিনি! আর আমি কি একদিনে আমার অনুপার্জিত ধনে সমস্ত কিনে নিয়ে ওই রকম অভিনিবেশ ভরে এই বইগুলি পড়তে পারবো? আমার বাড়ীর 'শোভা' ও আমার অহঙ্কার বৃদ্ধিরই কাজে লাগবে এ সব।—তবু যদি কিনি—তাহলে অধ্যাপকের পুত্রের অর্থকষ্ট দূর হবে আর বইগুলির যত্নও হবে। এই সব ভাবছি আর বইগুলি দেখছি এমন সময় চাকরটি এসে বললেন :—আপনার বই দেখা হয়েছে কি? আমি আশ্চর্য ও একটু বিরক্ত হ'য়ে বললুম : কেন? তোমাদের কোনো অসুবিধা আছে?—চাকরটি বিনীতভাবে বললে : বাবু বলেছেন যে কেউ যেন বেশীক্ষণ শুধু বই নাড়াচাড়া না করে!—আমি এবার রীতিমতো বিরক্ত হয়ে বললুম : তা বাপু, তোমার বাবুকে বোলো যে—বই না দেখেই কে বলবে এর দাম কতো হবে।...... আর তাহলে বইগুলি বেচতেই বা যাচ্ছেন কেন? বই নাড়াচাড়া কোরলে কি আর ক্ষয়ে যায়?...আর এসব যখন অপরের কাছে চলেই যাবে!...অত মায়া কেন? আমার কথা শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গে পুরুষ কণ্ঠে কে ডেকে বলে উঠল : শরণ! বাবুকে বলে দে যে তাঁর বই কিনতে হবে না আর দেরখার দেবারও দরকার নেই। বৃদ্ধ ভৃত্য একটু অপ্রস্তুত হয়ে আমায় চুপিচুপি বললে :

কিছু মনে কোরবেন না বাবু! আমি পুরোনো লোক সবই জানি! খোকাবাবু বই বিক্রী কোরতে চাননা, তাই খরিদ্দার এলে রেগে থাকেন।—এমনিতে উনি খুব মোলায়েম মানুষ। আপনি কাল এসে আবার দেখবেন!

সেদিন আমি চলে এলুম। অধ্যাপক ও তাঁর পুত্র সম্বন্ধে কেমন কৌতুহল হ'তে লাগলো। পরদিন বিকেলে আবার গিয়ে বইপত্র দেখতে লাগলুম। চাকরটি বললে: আপনি যতোক্ষণ ইচ্ছে দেখুন—আজ বাবু বাড়ী নেই।

বই ঘাঁটা আমার বাতিক। আমি মনের সুখে একটি একটি কোরে বই বার কোরে উলটে-পালটে দেখতে লাগলুম। যতোই দেখি—ভাবি অধ্যাপক আচার্য কতো পড়েছিলেন আর ভেবেছিলেন। আহা! আরও বেঁচে থাকলে কত ভালো হতো।

বই দেখতে দেখতে একটি আলমারীর নীচের থাকে কয়টি বাঁধানো খাতা দেখলুম অধ্যাপকের হাতের লেখায়। বেশীর ভাগ সব মূল্যবান নোট লেখা—একটিতে রয়েছে একখানি বইয়ের অসমাপ্ত পাণ্ডুলিপি। এগুলির সঙ্গেই পেলুম একখানি ছোট নীল মলাটের খাতা। সেটা বাংলায় লেখা। অধ্যাপকের ডায়েরী। দু এক পাতা দেখেই মনে ভাবলুম এটি আজ বাড়ী নিয়ে যাবোই। ভৃত্যকে ডেকে বললুম: শোনো! এই ছোট খাতাটি আমি নিয়ে যাচ্ছি আজ—কাল নিয়ে আসবো!—সে রাজী হলো। আমি ওকে আজ এসেই দুটি টাকা দিয়েই বলেছিলুম: মাঝে মাঝে ভাল পান ও লেমনেড খাইয়ো!

বাড়ী এসে ডায়েরীটি খুললুম। মনোমোহনবাবু লিখছেন নানান্ কথা—মাঝে মাঝে তাঁর জীবন ও আশ-পাশের জীবন সম্বন্ধে। কয়েকটি কথা এইরকম:—বই তো এই পৃথিবী আর জীবনকে দেখতে সাহায্য করে মাত্র। যে নিজে দেখেনা-বই পড়ে কি দেখবে? বই জানলার মতো—জানলা খুলে বাইরে দেখতে হবে।

: কী বিরাট বিশ্ব। কতোটুকুই বা জানি। জীবন কতো ছোট,অথচ আমাদের জানবার আগ্রহের শেষ নেই। : কি-ইবা পেতে পারি এতোটুকু জীবনে? এ বিস্ময় অপার। সমস্ত মন-প্রাণ ভরে রইলো।...যে কোনো মুহূর্তেই যাবার জন্য তৈরী আছি—কারণ জানি দুদিন বেশী থাকলে কি আর বেশী পেতে পারি? আমরা পৃথিবীর কোনো রহস্যেরই সন্ধান পাইনি।—তবু ভালো লাগে এই নিরন্তর খোঁজা—এই জিজ্ঞাসা।

এইরকম আরো অনেক সুন্দর সুন্দর উক্তির পর পেলুম তাঁর পুত্র-সম্বন্ধে একটি ছোট লেখা। লিখছেন: —খোকাকে আমি চিনতাম না। এমনি আদর কোরতাম, খেলনা কিনে দিতাম—কখনও বিরক্ত হয়ে বকতামও ওকে। কিন্তু সেদিন দেখি ও একটা গল্পের বই তন্ময় হয়ে পড়চে। আজকাল ওকে প্রায়ই এরকম বইয়ের পাতায় ডুবে থাকতে দেখতাম। ও কি-বই পড়ছে জানতে কৌতুহল হলো। ডেকে বললাম—'কি পড়ছিস খোকা?' ও প্রথমটা একটু লজ্জিত হয়ে পড়লো—তারপর ক্রমে সাহস পেয়ে আমার কাছে উৎসাহ-ভরে বলতে লাগলো ওর পড়া গল্প। সবই শিকারের গল্প—বনে-জঙ্গলে নানা শিকারীর অভিজ্ঞতার নানা বিচিত্র কাহিনী। এছাড়া জন্তু-জানোয়ারের বিভিন্ন প্রকৃতির কথা!—শুয়ে শুয়ে শুনতে লাগলুম ওর উজ্জল চোখ-মুখের দিকে চেয়ে। এ সব গল্প আমরা ছেলেবেলায় পড়তে পাইনি। পরে পড়বার সুযোগ বা ইচ্ছাও হয়নি। শুনতে ভালোই লাগলো। খোকার দেখলাম অনেক গল্প মুখস্ত, আর ওর এসব গল্পের সমজদার শ্রোতার একান্ত অভাব। কারণ বাড়ীতে ওর মা ও ছোট বোনটি এসব গল্প একেবারেই ভালোবাসে না ও এই বইগুলি যোগাড় করেছে ওর এক মাসতুতো ভাইর কাছ হ'তে। আমাকে এতোদিন বলতে সাহস পায়নি—আমি হয়তো বকবো মনে করে। এরপর আমি ওকে অনেকগুলি সেরা শিকারের বই কিনে দিলাম আর বললাম—'তুই ইংরাজীটা শিখে নে তাড়াতাড়ি খোকা! কারণ বড়ো বড়ো সাহেব শিকারীরা নিজের ভাষায় কি চমৎকার কোরে লিখে গেছে তাদের বিচিত্র সব শিকারের কথা, আফ্রিকার জঙ্গলে ভীষণ হিংস্র জানোয়ারদের সঙ্গে লড়াইর কথা, তাদের ভাষাতে জেনে তোর কতো ভালো লাগবে দেখিস খোকা!' খোকা চোখ বড়ো কোরে ঘাড় নেড়ে চুপ কোরে ভাবতে লাগলো সেই অনাগত দিনের কথা—যেদিন ইংরাজীতে ও সেইসব রোমহর্ষণ গল্প পড়বে।—আপাততঃ ও বাংলা গল্পই বারবার পড়ে, আর সে-বিষয়ে আমার সঙ্গে আলোচনা করে এক এক সময়—যখন দেখে যে আমি নিজের লেখাপড়ায় ঠিক

তেমন মনোযোগ দিচ্ছি না। খোকা নিয়ম কোরে আমার কাছে বসে ইংরাজীটাও একটু একটু শিখচে। দেখচি ওর বুদ্ধি খুব, আর অধ্যবসায়ও আছে।—জানি না ওর ভবিষ্যতে কি আছে !

এরপর কতকগুলি শূন্য পাতা উল্টে দেখি অন্য হাতের লেখা—পড়ে বুঝলুম মনোজিতের লেখা। মনোজিৎ লিখছে :—বাবার এই শেষ লেখা। তিনি চলে গিয়ে আমার ভবিষ্যত আর কি কোরে ভালো হবে ? আজ আমি কোনোক্রমে প্রবেশিকা পরীক্ষা পাশ কোরে একটি কেরাণীর চাকরীতে ঢুকছি। তিনি বেঁচে থাকলে নিশ্চয়ই আজ কোলকাতার শ্রেষ্ঠ কলেজে শ্রেষ্ঠ ছাত্র হিসেবেই স্থান পেতাম। কিন্তু দারিদ্র্যের সঙ্গে রাতদিন যুদ্ধ কোরতে কোরতে যেখানে দাঁড়িয়েছি তার এতোটুকুও ওপরে ওঠা যায় না। যাক্ সে দুঃখ করবার জন্য বাবার খাতায় নিজের কথা লিখতে বসিনি। তাঁর স্মৃতিটুকুই এতে অক্ষরে গেঁথে রাখবো।

—বেশ মনে পড়ে ছেলেবেলায় সেইদিনটি। তাঁকে চিনলাম যেদিন তিনি শুয়ে শুয়ে আমার গল্প শুনতে লাগলেন। আমার কি আনন্দ ! এতো দিনে মনের মতো সমজদার পেলাম বটে। ভাবতাম তিনি তাঁর যতো মোটা মোটা ছবিহীন বই পড়তেই বুঝি ভালোবাসেন। আমায় বল্লেন 'খোকা ! এসব বই ছেলেবেলায় আমরা পাইনি রে—ভাগ্যিস্ তুই এসব দেখালি। কখনো বনেও তো গেলাম না—বাঘ-ভাল্লুক শিকার তো দূরে থাক ! অথচ এসব ব্যাপার কতো জানবার বল্‌তো ? শিকারীদের সাহস আর উপস্থিত বুদ্ধির কথা ভাবলে কি আশ্চর্যই না লাগে।—তাছাড়া গভীর অরণ্যের রূপ কিরকম তা শিকারীরা বর্ণনা কোরে গেছে। তারা কত কষ্ট কোরেছে, আর আমরা শহরে বিছানায় শুয়েশুয়েই এসব পড়ে কল্পনায় বুঝতে পারছি !'

এরপর থেকে বাবার কাছে ইংরাজীটা পড়তে লাগলাম, বেশ এগিয়ে যাচ্ছিলাম এমন সময় সব ওলট পালট হয়ে গেলো। উপলক্ষ অতি তুচ্ছ, সবই নিয়তি। সেদিন সন্ধ্যায় মা-ই রান্না করছিলেন—রাঁধুনী অসুখ হয়ে ক'দিন বাড়ী গেছে। কজন অতিথি এসেছেন। মা রান্নাঘরে খুব ব্যস্ত। অতিথিরা গেছেন সিনেমায়। বাবা মন দিয়ে বই পড়ছেন—আমি বাবার পাশেই বসে বড় হাতের এ বি সি ডি লিখছিলাম, আর মাঝে মাঝে কাছেই রাখা আমার প্রিয় শিকারের বইটিতে এক মস্ত বাঘ কি কোরে এক মস্ত হরিণকে আক্রমণ করছে তার ছবি দেখছিলাম। বইটি খোলাই রেখেছিলাম। মা হঠাৎ খুব ভাবনার সঙ্গে 'শরণ শরণ' করে চাকরকে ডাকতে লাগলেন—আর তার সাড়া না পেয়ে রেগে আরও জোরে ডাকাডাকি করতে লাগলেন। বাবা একটু বিরক্ত হয়ে 'আঃ !' বলে পাতা ওলটালেন বইয়ের—আর চশমার ফাঁক দিয়ে আমার দিকে চেয়ে বললেন—'হরিণের যে রফারফা !' বলে আবার বইতে মন দিলেন। তখুনি মা এসে ঢুকলেন ঘরে, খুন্তী হাতে বল্লেন, 'চাকর না বলে বেরিয়ে গেলো বাড়ী হ'তে, একটুও তেল নেই। কি কোরে মাছ ভাজি এখন ?' বাবাকে নির্বিকার দেখে মা আরও রেগে বল্লেন —'কিছু না বলেই তো ওরকম হয়েচে —কখন কাজ শেষ করবো তার ঠিক নেই—' '—চল্ খোকা তেলটা নিয়ে আসি !' বলে বাবা এবার উঠে দাঁড়ালেন। 'তোমাদের আর যেতে হবে না !' বলে মা রান্নাঘরে গেলেন। আমার মনে বড় রাস্তা পেরিয়ে দোকানের দিকে যাবার নামে বেশ উৎসাহ হয়েছিল। অনেক দিনের ইচ্ছে একটি দম-দেয়া লাট্টুর। বাবা যদি খুশী বা অন্যমনস্কও থাকেন, কিনে দিবেনই। কিন্তু বাবার মুখে খুব বিরক্তির ভাব দেখে একটু দমে গেলাম। মা অনিচ্ছাসত্বে তেলের টিনটা আমার হাতে দিলেন। আমি জুতো পরে বাবার হাত ধরলাম। বাবা খুব গম্ভীর ও বিরক্ত মনে হোল। তাঁর মুখ দেখে ঠিক সাহস পাচ্ছিলাম না লাট্টুর কথা বলতে। তারপর বড় রাস্তা আসতে বাবা বললেন—'খোকা' তুই এখানে একটু দাঁড়া—আমি ওপারে গিয়ে একবার দেখে আসি আমার ঘড়িটা সারিয়েছে কিনা ? সময়-জানিস তো কতো মূল্যবান।…সেই সময়েরই হিসেব ভালো কোরে রাখতে পারছি না।' এই বলে তিনি আমার হাত হ'তে নিজের হাত ছাড়িয়ে নিয়ে এগিয়ে গেলেন। সেই মুহূর্তেই দেখলাম—ওঁর বাঁদিক দিয়ে ট্রাম আসছে। মনে করলাম নিশ্চয় উনি দাঁড়াবেন—কিন্তু কেমন মাথা নীচু করে অন্যমনস্ক হয়ে বাবা এগিয়েই চললেন, আর আমি চীৎকার করে উঠলাম—'বাবা ট্রাম !' ট্রাম ড্রাইভারও শেষ মুহূর্তে গতি থামালো ঘটাং শব্দে—কিন্তু ততক্ষণে তিনি একেবারে ট্রামের সম্মুখে গিয়ে পড়েছেন।

এরপর আমাদের অবস্থা তো খুবই শোচনীয় হয়ে দাঁড়ালো। কোনোমতে আমার লেখাপড়া চলতে লাগলো। পড়ার সময়ই পেতাম না—তাছাড়া কেবলই জ্বর, পেটের অসুখ—এইসব নানা কারণে স্কুল কামাই। স্কুলও তেমনি। মাষ্টাররা কিছু পড়াতো না আর কারণে অকারণে মারতো। একদিন শুধুশুধু এমন এক চড় মারলো অঙ্কের মাষ্টার যে আমি অজ্ঞান হ'য়ে পড়ে গেলাম। ঘণ্টা দুই পরে জ্ঞান হতে কোনোমতে বাড়ী ফিরে চোখের জল ফেলতে লাগলাম, লুকিয়ে বাবা বলতেন মাকে—'খোকনকে কোনো স্কুলেই এখন দোবো না। নিজে পড়াবো। পরে সব চেয়ে ভালো স্কুলে উঁচু ক্লাসে ভর্তি কোরে দেবো।'

যাক্—এতো দুঃখের মধ্যেও আমি ভেঙে পড়িনি। কারণ একদিন বাবা বলেছিলেন—'খোকন ! এইসব বন্য শিকারীর মতো দুর্জয় সাহস আর ধৈর্য রাখবি মনে,

কিছুতেই ভেঙে পড়বি নে। সংসার যেন একটা গভীর বন—আর একটা বিপদ যেন বাঘ, ভাল্লুক, গরিলা! সাহস কোরে এগিয়ে যাবি—সাহস হারালে তো সহজেই কাবু হয়ে পড়বি। কিন্তু আজ আমি সত্যি হেরে গেলাম মনে হচ্ছে। কারণ আমি তো আজও ইংরাজী এতোটা শিখলাম না যে বাবার ঐ বইগুলি পড়তে পারি। বাবা বলতেন—'বড়ো হলে দেখবি তোর ঐ সব গল্পের চেয়েও মজার আর আশ্চর্যের কথা সব আছে। ইংরাজীটা এর জন্ম ভালো কোরে শিখতে হবে তোর—এসব বই পড়লে জানবি কি অদ্ভুত এই পৃথিবী!'—আজ আমি বাবাকে বলতে চাই—'সে অদ্ভুত রহস্যভরা পৃথিবী আমার কাছে চির-অজানাই রয়ে গেলো বাবা! যে-পথ ধরে এই রহস্যের সন্ধানে আপনি চলেছিলেন—ভাবনার সেই রোমাঞ্চকর পথ এই সব বইয়ের ছত্র। তার ভাষা শিখলাম না—সে পথে যেতে পারলাম না।'

এরপর আরও কিছু লেখা দেখলুম:—আবার সাত বৎসর পরে লিখছি। ভেবেছিলাম হয়তো কেরাণী-জীবনেও সময় কোরে আস্তে আস্তে কিছু ইংরাজী শিখে এই বইগুলি পড়বো। কিন্তু তাও হলো না। এতো খাটুনী আর এতো দুশ্চিন্তা মাথায় কোরে মানুষের কোনো কিছুই হয় না—শুধু কোনোক্রমে বাঁচাই হয়। বাবার এই বইগুলি পড়তে তো পারলাম না—তবু এদের প্রত্যহ সান্নিধ্য থেকে যে আনন্দটুকু পাই-তাও বুঝি আর ভাগ্যে সইবে না। একমাত্র বোন শুভ্রার এবার বিয়ে দিতে হইবে আর তার জন্ম টাকা চাই। এসব বই এই আলো বাতাস-হীন ঘরে থাকার চেয়ে কোনো ধনীর প্রাসাদেই ভালো থাকবে, আর পাঁচজন গুণী ব্যক্তির হাতে পড়ে আদরও পাবে। আমি বাবার হতভাগ্য পুত্র—এসবের মর্ম বুঝলাম না। তবু এদের ছাড়তে বুক ভেঙে যায়। এদের প্রতিটি পাতায়-পাতায় যে বাবার হাতের স্পর্শ রয়েছে—তাঁর চিন্তার স্বাক্ষর রয়েছে। এতো দিনের শত অর্থা-ভাবের মধ্যেও একটিও বই হাতছাড়া করিনি। শুভার্থী-দের কোনো পরামর্শই মানিনি। কিন্তু আজ আপনা হ'তেই একাজ কোরতে চলেছি।—

পরদিন খাতাটি যথাস্থানে রেখে দিলুম গিয়ে, আর ভৃত্যের হাতে একটি চিঠি দিয়ে চলে এলুম। চিঠিতে এই ছিলো:—

শ্রীতিভাজনেষু

আপনার স্বর্গীয় পিতৃদেবের পুস্তকগুলি দেখেছি। ওগুলি খুব মূল্যবান গ্রন্থ। আমি পঞ্চাশ হাজার টাকা দাম দিতে চাই। তাছাড়া আপনার কাছে আমার আর একটি অনুরোধ আছে। আমার বাড়ীর গ্রন্থাগারের দেখাশোনার জন্ম একজন যোগ্য ব্যক্তি চাই। আপনি পুস্তকের যথার্থ মর্ম বোঝেন—আপনাকে পেলে আনন্দিত হবো। আপনার বর্তমান চাকরীর আয় কতো জানতে পারলে এবিষয়ে অগ্রসর হ'তে পারি। যদি সকালে একবার সাক্ষাৎ করেন তো সব কথাই হয়। ইতি—

পরদিন সকালেই মনোজিতের দেখা পেলুম। ছিপছিপে চেহারা—চোখে-মুখে বুদ্ধির দীপ্তি কিন্তু পৃথিবীর সঙ্গে যুদ্ধ কোরে যেন ক্লান্ত। তবু সোজা আছে। বললে চাকরী কোরতে কোরতেই বাড়ীতে পড়ে সে বি-এ পাশ কোরেছে। লাইব্রেরীতে কাজ পেলে সে পড়াশুনোর সুযোগ পায় আর এখানে কাজ পেলে তো তার বাবার বই-পত্রও পড়তে পারে। আপাততঃ তার আয় দেড়শো টাকা।

বললুম: আপনি আপাততঃ এই পঞ্চাশ হাজার টাকায় আপনার বোনের ভালো জায়গায় বিয়ে দিয়ে দিন ও বাকী টাকা জমা রাখুন বিলেতে গিয়ে দু চার বৎসর কিছু পড়াশুনো করবার জন্যে।—হ্যাঁ, আমার এখানে আপনি মাসিক দু'শো পাবেন। আমার ইচ্ছে, আপনি লেখাপড়া কোরে বাবার মতো পণ্ডিত হন। তখন আপনি কোনো ভালো কাজ পেয়ে অনায়াসেই আমার কাছে আপনার যা ঋণ তা শোধ কোরে আপনার বাবার বইপত্র নিজের কাছে রাখতে পারবেন।

কিছুক্ষণ চুপ কোরে থেকে মনোজিৎ অভিভূত স্বরে বললে:—তাই হবে।...তবে আপনার ঋণ শোধহবার নয়।

আমি বললুম: আমার ঋণ নয় মনোজিৎবাবু, আমার পিতার ঋণ বলতে পারেন। তিনিই আমায় টাকা দিয়ে গেছেন আর সৎকর্মে খরচ কোরতে বলে গেছেন। আপনার পিতা আপনাকে তার চেয়েও বড়ো জিনিষ দিয়ে গেছেন—জিজ্ঞাসা আর সাহস! এর জোরেই একদিন আপনি জয়ী হবেন।

প্রায়ই যা ঘটে

শ্রীঅমিয়কুমার মুখোপাধ্যায়

গড়ের মাঠে ষাঁড়ের লড়াই
উড়ল ধুলো নবদ্বীপে।
আকাশ পথে ছুটল রকেট
ভাঙল চাকা চলন্তি জীপে।
বিষম খেয়ে কাশল খোকা
ভাতের গরাস তুলতে মুখে
পাশের গাঁয়ের বিশুখুড়োর
ধরল ব্যথা আপটে বুকে।

রায় বাবুদের বড় ছেলের
পড়ল ছানি দুইটি চোখে
পাড়ার লোকে অন্ধ হ'ল
সেই ভাবনায় দুঃখ শোকে।

—

কচি-কাকার কাহিনী

বীরু চট্টোপাধ্যায়

কচি-কাকাকে চেন? না, আমাদের কাছে বিখ্যাত হলেও তামাম দুনিয়ায় স্বনামধন্য হবার মত এমন কিছু কাজ তিনি করেন নি। তবে দেখলেই তোমরা চিনতে পারবে। অঙ্গে সব সময়ই ফুল প্যাণ্ট, হাওয়াইয়ান সার্ট, পায়ে স্যাণ্ডেল। দূর থেকে মুখের দিকে চাইলে মনে হবে গোঁফটি তার হিটলারী মার্কা, কিন্তু ফিট দশেকের মধ্যে এলে দেখবে সেই চওড়া বাটার ফ্লাই গোঁফের দুই অন্ত সরু রেখায় ঠোঁটের সীমান্ত পর্যন্ত এসে অদ্ভুত ভাবে মিলিয়ে গেছে। এটা নাকি ক্লার্ক গেবলি ধরণ। তাঁর লেখা-পড়ার কথা বলব না। বলতে নিষেধ আছে। গাট্টা খেয়ে মরবে কে? তবে মুখে অনর্গল ইংরেজী বলা দেখে তাঁকে বিদ্বান বলে ভ্রম হবে। আসলে মিলিটারীতে যাওয়ার ফলেই ইংরেজী বুকনি শিক্ষা। অথচ আশ্চর্য মনে হয়, কচি-কাকার মত লোক; যে কিনা নিজের ছায়া দেখলে পর্যন্ত আঁতকে ওঠে—সে কি করে এবং কেন যে মিলিটারীতে গিয়েছিল সে রহস্যের সমাধান বহুদিন অবধি আমাদের কাছে হয়নি।

সেবার তিনি নিজের মুখেই কারণটি বিবৃত করলেন।

: কেন যুদ্ধে গিয়েছিলাম শুনবি? শোন তাহলে। না গিয়ে আমার উপায় ছিল না। যখনকার কথা বলছি সেবার আমি বি-এ পরীক্ষা (তারপর আমাদের চোখে বিস্ময় লক্ষ্য করে সামলে নিলেন) না না বোধকরি ম্যাট্রিক পরীক্ষা দিয়েছি।

আমার আর পড়াশোনা ভাল লাগছিল না। কে ঘ্যান ঘ্যান প্যান্ প্যান্ করে পড়ে। শুধু শুধু এনার্জি নষ্ট। তাই চতুর্দিকে চাকরীর জন্যে আদা-জল খেয়ে লেগে গেলাম। পড়ব না শুনে বাড়ীর লোকেরাও বেজায় খাপ্পা—বললে নিজের পথ নিজে ভাখো। এখন ম্যাট্রিক অবধি পড়ে কি চাকরীই বা পাবো। কোথাও কিছু সুবিধে হয়ে উঠছে না। এই ভাবে কয়েক মাস গেল। যথারীতি 'জনতা' বিভাগে ম্যাট্রিক পাশ করলাম।

এমন সময় বাবা বললেন, আমার বন্ধু গণপতি নারাণ-গঞ্জে কক্স এ্যাণ্ড কক্স কোম্পানীর বড়বাবু, তাকে আমি পত্র দিয়েছিলাম তোমার কথা বলে। তার কাছে চলে যাও, সে তার অফিসে হয়ত একটা ব্যবস্থা করে দিতে পারবে।

'দুর্গা' বলে রওনা হয়ে গেলাম সেখানে ষ্টিমারে চেপে।

গণপতিবাবু দুঁদে লোক। মাইনের চেয়ে উপরি বেশী। বিরাট ভুঁড়ি। সস্নেহে আমায় গ্রহণ করলেন।

—এসো এসো বাবা। তুমি হলে জয়গোবিন্দের ছেলে। দেখি কদ্দুর কি করতে পারি। আজকাল আর আমার তেমন হাত নেই। বড় সায়েব বেটা বড় ত্যাঁদোড়। চল, ব্যাটার সামনে হাজির করি তো তোমায়।

সায়েবের সামনে হাজির হওয়ার কথা শুনেই তো পিলে চমকে গেল। তার উপরে ইংরেজীতে কথা—মরেছে রে।

বাড়ীর সবার সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিলেন। চাকরকে ডেকে বাজার করতে দেওয়ার আগে জিগ্যেস করলেন, কী খাবে বলো? এখানে মাছ মাংস ডিম প্রচুর পাওয়া যায়! মাংস খাও তো? চিংড়ি মাছ!

মাংস খাইতো বলেনি? মাংসের যম আমি। আর চিংড়ি মাছ। আহা কাটলেট হলে তো কথাই নেই। মুখে বললাম, খাই।

বেশ! রামা, যা বাজার থেকে মাংস আর গলদা চিংড়ি—সব চেয়ে বড় সাইজের নিয়ে আয়। ডিমও নিয়ে আসিস কয়েকটা।

বাবার মুখে শুনেছি গণপতিবাবু খাইয়ে লোক। নিজে খেতে ভালবাসেন, পরকে খাইয়েও আনন্দ পান। মাছ, মাংস, ডিম—উঃ জমবে ভাল।

গণপতিবাবু বললেন, আজ আমার গ্রাম থেকে কয়েকটি ছেলে আসছে এখানে। সবাই মিলে তোফা খাওয়া যাবে। হ্যাঁ ভাল কথা, চল শুভস্য শীঘ্রম্। সায়েবের সঙ্গে সকালেই তোমার ইণ্টারভিউটা করিয়ে আনি। বিকেলে আবার বেটার মেজাজ খেঁচড়ানো থাকে। সায়েব দেখে ঘাবড়ে যেওনা যেন। সিম্পল ইংলিশেই কথা বলবে, বুঝতে কষ্ট হবে না। কাণ পেতে শুনে উত্তর দেবে।

মনে মনে প্রথমটা ভয় পেলেও শেষ পর্যন্ত ভাবলাম আমরা কোলকাতার ছেলে—কত সায়েব মেম দেখেছি চৌরঙ্গী এলাকায়। কুচ পরোয়া নেই। সায়েব বেটা বেশী ইয়ে করলে এ্যায়সা চাল ঝাড়বো বাছাধনের মুণ্ডু ঘুরে যাবে।

শীতলক্ষার পাড়ে বিরাট অফিস। তারই অভ্যন্তরে সায়েবের বাংলো। গণপতিবাবু আমায় নিয়ে গেলেন সেখানে। ঘরের বাইরে আমায় দাঁড় করিয়ে রেখে তিনি ভেতরে গেলেন, কিছুক্ষণ বাদে বেরিয়ে এসে বললেন, ইণ্টারভিউর সময় আমার উপস্থিত থাকা ভাল

দেখাবে না। তুমি যাও, আমি ততক্ষণ ফ্যাক্টরীর ভেতরে একটা কাজ সেরে আসি।

দুর্গা নাম জপ করে ভেতরে ঢুকলাম। সায়েব বললেন, কাম্ ইন্।

—গুড মর্ণিং স্যার।

তারপর সায়েবের সঙ্গে যে কথাবার্তা হল। তা তোদের বোঝাবার জন্যে বাংলাতেই বলি।

—কদ্দুর পড়াশোনা করেছ?

—ম্যাট্রিক পাশ করেছি স্যার।

—ম্যাট্রিক পাশ! সায়েব যেন হতাশ হলেন, গ্রাজুয়েট ছাড়া তো ক্লার্ক হিসেবে নেওয়া মুস্কিল। কলেজে পড়ছ?

ঢোঁক গিলে চালিয়ে দিলাম, হ্যাঁ স্যার পড়ি।

—কোন কলেজে?

—কোলকাতার হাটখোলা কলেজে?

—হাটখোলা কলেজ? কখনো শুনিনি তো এ নাম?

যখন একবার গুল্এর রাশ ছেড়েছি তখন আরও চালালাম, খুব নামকরা কলেজ স্যার, প্রেসিডেন্সির পরেই।

—ক্যালকাটা ইউনিভার্সিটির আণ্ডারে ও কলেজ?

—না স্যার ওটা বাগবাজার ইউনিভার্সিটি।

—বাগবাজার ইউনিভার্সিটি! সায়েব খুবই বিস্মিত হলেন, আমিও কলকাতায় কিছুকাল পড়াশোনা করেছি, সেণ্ট জেভিয়ার্সে। কিন্তু বাগবাজার ইউনিভার্সিটির নাম তো শুনিনি।

—নতুন হয়েছে স্যার।

বোধকরি সায়েবের মনে খটকা ধরলো বললে, যাই-হোক ইয়ংম্যান গ্রাজুয়েট না হলে তো তোমায় কোন চাকরী দেওয়া মুস্কিল। আর কি কোয়ালিফিকেশান তোমার আছে?

ভয় পেয়ে গেলাম। সেরেছে রে। গুল মারতে গিয়ে বুঝি চাকরী হল না। শুনেছি সায়েবরা খেলাধুলা খুব পছন্দ করে। চট করে বুদ্ধি খেলে গেল। বললাম, আমি একজন ফুটবল প্লেয়ার স্যার।

সায়েবের মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠলো, ফুটবল প্লেয়ার? ভেরি গুড কোথায় খেল?

—কলকাতায় মোহনবাগানে স্যার?

—কোন ক্লাবে?

—মোহনবাগান স্যার, আবার বেপরোয়া চালিয়ে গেলাম, আফগানিস্থান, বর্মাতে আমি খেলে এসেছি স্যার।

সায়েবের চোখ কপালে উঠলো, খুশীতে মুখ উজ্জ্বল হল, বললে, গুড, ভেরি গুড। স্পোর্টস ম্যানকে আমি খুব পছন্দ করি। আগে বলনি কেন তোমার এই মহৎগুণের কথা। ঠিক আছে একটা গুদাম ক্লার্কের পদ খালি আছে—আপাততঃ সেখানেই তোমায় নিয়ে নিচ্ছি।

গণপতিবাবু আসতে সায়েব বললেন, তোমার লোক একজন ভাল ফুটবল প্লেয়ার একথা তো তুমি বলনি আগে। আমি ওকে নেব।

যাক চাকরী হয়ে গেল। উঃ ভাগ্যিস সমানে গুল্ চালিয়ে ছিলাম। বাইরে এসে গণপতিবাবু আমার পিঠ চাপড়ে বললেন, তুমি ভাল খেলোয়াড় শুনে খুব খুশি হলাম। কোন টিমে খেল?

সায়েবকেও যা যা বলেছি—অবিকল গণপতিবাবুকেও তেমনি চালিয়ে গেলাম।

বাঁচা গেল! এবার চানটান করে, মাছ মাংস ডিম ইত্যাদি দিয়ে ভুঁড়িভাসিয়ে ভোজন করা যাবে।

বাড়ী এসে দেখা গেল কয়েকটি ছেলে এসেছে। গণপতিবাবুর গ্রামের ছেলে, যাদের আসবার কথা তিনি আমায় আগেই বলেছিলেন।

গণপতিবাবু ছেলেদের বললেন, কিহে তোমাদের এত দেরী হল। আটটার লঞ্চে আসবার কথা।

একজন ছেলে বললে, আর বলবেন না কাকাবাবু, আমাদের ফরোয়ার্ডের একজন প্লেয়ার হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়েছে। কি মুস্কিল বলুন তো। আজ ফাইনালের দিনে প্লেয়ার সট থাকলে কি করে হবে। দেখি এখান থেকে একজন প্লেয়ার ভাড়া করা যায় কিনা।

গণপতিবাবুর মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠলো, তোমাদের ভাগ্য ভাল, কিছু ভেব না।

তারপর আমায় দেখিয়ে বললেন, এই যে দেখছ এ হল আমার বন্ধুর ছেলে, বিখ্যাত ফুটবল প্লেয়ার, কলকাতায় মোহনবাগানে খেলে—একে তোমরা পাবে।

ছেলেরা বিস্ময়ে ও আনন্দে নেচে উঠলো।

—উঃ কি লাক্। এতবড় একজন প্লেয়ারকে যে পাব স্বপ্নেও ভাবিনি কাকাবাবু।

—ঠিক আছে। তোমরা সবাই স্নান সেরে খাওয়া দাওয়া করো নিশ্চিন্ত মনে। আর ভাবনা কি?

না, ভাবনার আর কি। জীবনে এতবড় বিপদে আর পড়িনি। ক্যাম্বিসের বল ছাড়া কোন বল এ যাবত পায়ে ছোঁয়াইনি। হায় হায় সবই গেল। চাকরী তো গেলই—মাছ-মাংস-ডিমের তোফা খাওয়াটার আশাও বুঝি গেল।

ছেলেরা বললে, তাহলে চলুন দাদা স্নান সেরে নেওয়া যাক। খেয়ে-দেয়েই দেড়টার ষ্টিমারে মুন্সিগঞ্জ যেতে হবে। সেখানকার কলেজ মাঠেই ফাইনাল খেলা।

সহসা যেন চৈতন্য ফিরে এলো, বললাম, ঠিক আছে, আমি একটু আসছি এই রাস্তার মোড় থেকে।

ব্যস্ সেই যে কেটে পড়লাম আর ওমুখো হইনি। চিঠিতে আমার বিষয় সব শুনে বাবা রেগে যে প্রকার অগ্নিশর্মা হলেন—শেষ পর্যন্ত বাধ্য হয়েই যুদ্ধে নাম লেখাতে হল।

দাক্ষিণাত্যে সংস্কৃত নাট্যাভিনয়

শ্রীজ্যোতির্ময় দত্ত এম-এ

সংস্কৃত সাহিত্যের পীঠস্থানরূপে দাক্ষিণাত্য সুবিদিত। সেজন্য বহুদিন থেকে দাক্ষিণাত্য ভ্রমণে আমার বিশেষ আগ্রহ ছিল। শ্রীভগবানের কৃপায় এবার পুজায় সময় সেই সুযোগ হয়। বিশেষ সুবিধা হলো এই যে, এমন সময় সংস্কৃত সেবায় দত্তপ্রাণ বিদ্বজ্জনাগ্রগণ্য পশ্চিমবঙ্গীয় সরকারের সংস্কৃত শিক্ষা পরিষদের অধ্যক্ষ ডক্টর শ্রীযতীন্দ্র বিমল চৌধুরী এবং তাঁর সুযোগ্য সহধর্মিণী লেডী ব্রেবোর্ণ কলেজের অধ্যক্ষ ডাঃ শ্রীরমা চৌধুরী তাঁদের গবেষণাগার প্রাচ্যবাণীমন্দিরের সংস্কৃত নাট্যপরিষদের সদস্য ও সদস্যাগণ সহ মাদ্রাজে ও পণ্ডিচেরীতে সংস্কৃত নাট্যাভিনয়ের জন্য যাবেন, জানতে পারলাম। প্রাচ্যবাণীমন্দিরের সদস্য ও সদস্যাগণ প্রায় সকলেই কলিকাতা ও যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় এবং বিভিন্ন কলেজের কৃতী অধ্যাপক। সেজন্য তাঁদের সঙ্গে বিদেশ-গমন লোভনীয় মনে করে বিজয়া দশমীর দিনেই আমরা মাদ্রাজ মেলে একসঙ্গে যাত্রা করলাম। সুদীর্ঘ পথ। কিন্তু বাইরে যেমন মনোরম, ভিতরেও তেমনি আনন্দোচ্ছল। ডাঃ রমা চৌধুরী মহাশয়ার সস্নেহ তত্ত্বাবধানে নাট্যাভিনয় ও গানের মহড়ায় হাস্য কৌতুকে স্বপ্নের মত প্রায় দু'দিন কেটে গেল। থার্ড ক্লাসে স্লিপিং কোচ—, কিন্তু অতি পরিষ্কার, বন্দোবস্ত ও ভাল।

১৩ই অক্টোবর প্রভাতে রবি-করোজ্জ্বল মাদ্রাজ ষ্টেশনে গাড়ী থামা মাত্রই দেখা গেল—মাদ্রাজের সর্বজনশ্রদ্ধেয় শ্রীগৌড়ীয় মঠের সৌম্য স্নিগ্ধদর্শন শ্রীনন্দদুলাল ব্রহ্মচারী, অন্যান্য ব্রহ্মাচারী ও ভক্তগণ সহাস্য মুখে ডাঃ চৌধুরী-দম্পতীকে পুষ্পমাল্যে সাদরে বরণ করে নিলেন। প্রাচ্যবাণীর নাট্যপরিষদের ২১ জনকে ৯।১০ দিন আশ্রমের ব্রহ্মাচারীরা জননীর মতই আদরে স্বহস্তে রন্ধনপূর্বক পরিবেশন করেছেন—এমন আদরযত্ন অন্য কোথাও দেখা যায় না। ভোজের মধ্যে পলান্ন, পরমান্নই থাকতো সমধিক পরিমাণ—সংস্কৃত রসিকগণের এতে পরমানন্দ স্বতঃই উদ্বেলিত হয়ে উঠতো। সত্য সত্যই শ্রীমন্ মহাপ্রভুর প্রেম ও সেবাধর্মের মূর্ত প্রতীক মাদ্রাজের শ্রীগৌড়ীয় মঠ।

পরের দিন ১৪ই অক্টোবর মাদ্রাজের বৃহত্তম প্রেক্ষাগৃহ রসিক-রঞ্জনী হলে রাজ্যপাল শ্রীবিষ্ণুরাম মেধীর সভাপতিত্বে ডাঃ যতীন্দ্রবিমল চৌধুরী বিরচিত, ভারতের বহু স্থলে অভিনীত, সর্বজনসমাদৃত সংস্কৃত নাটক "মহাপ্রভু হরিদাসম্" সহস্রাধিক বিদগ্ধ দর্শকমণ্ডলীর সমক্ষে প্রায় আড়াই ঘণ্টা ধরে অতি সুন্দরভাবে অভিনীত হয়। ভারতের ভূতপূর্ব প্রধান বিচারপতি শ্রীপতঞ্জলি শাস্ত্রী, সুপ্রসিদ্ধ বিচারপতি টি চন্দ্র-শেখরন্ এবং মাদ্রাজ হাইকোর্টের অন্য কয়জন বিচারপতি, বহু কেবিনেট-মন্ত্রী, বিভিন্ন কলেজের অধ্যক্ষ, অধ্যাপক অধ্যাপিকাগণ, পণ্ডিতমণ্ডলী প্রভৃতি মুগ্ধ বিস্ময়ে প্রত্যেক দৃশ্যের শেষে করতালি দ্বারা তাঁদের আনন্দ জ্ঞাপন পূর্বক এই সঙ্গীত-মুখর সরল সুললিত, নিগূঢ়ভক্তিরসপরিপূর্ণ নাটকটী উপভোগ করেন। অভিনয়ের শেষে শ্রদ্ধেয় রাজ্যপাল, শ্রীযুক্ত পতঞ্জলি শাস্ত্রী এবং রামকৃষ্ণ মিশনের স্বামী আদিদেবানন্দ অভিনেতা-অভিনেত্রীবৃন্দকে অভিনন্দন জ্ঞাপন করেন এবং ডাঃ চৌধুরী-দম্পতীকে সংস্কৃত নাটক মাধ্যমে সংস্কৃত ও ভারতীয় ধর্ম ও কৃষ্টি প্রচারের তৎপরতার জন্য বিশেষ ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন।

পরের দিন দুপুরেই আমরা বাসে পণ্ডিচেরী যাত্রা করি। অতি সুন্দর দুই ধারের দৃশ্য। পৌঁছাতে রাত হয়ে গেল। সমুদ্রের ধারেই আমাদের থাকবার ব্যবস্থা হলো। অপূর্ব সুন্দর স্থান এই পণ্ডিচেরী। সমুদ্রের তীরে এই অতি-পরিচ্ছন্ন আশ্রমটী যে কেবল বাইরের সৌন্দর্যে মহিমময়, তা নয়—অন্তর সৌন্দর্যই এর বৈশিষ্ট্য। এক মহা-মাতৃশক্তির অদৃশ্য নির্দেশে প্রায় দ্বিসহস্র আশ্রমবাসীসংবলিত এই আশ্রমটী যেন

অভিনেতা অভিনেত্রীগণ

কলের মতই চলেছে। কিন্তু সকলের হাসি মুখ; সকলেরই পরম উৎসাহ দেখে বারবার মনে হয়েছে যে এই শৃঙ্খলা, নিয়মানুবর্তিতা, স্নেহ সহকারে ভালবেসে কাজ করা—এ আমাদের সমগ্র দেশে কি প্রচলিত করা যায় না? কারণ এর অভাবেই তো আমাদের জাতীয় প্রগতি পদে পদে ব্যাহত হচ্ছে।

এবার নাটকের কথায় আসা যাক্। সে ও আর এক অদ্ভুত ব্যাপার। এখানে কোন দিন পূর্বে সংস্কৃত নাটকাভিনয় হয়নি। অথচ ১৬ই অক্টোবর লক্ষ্মীপূর্ণিমার দিন, ১৭ই অক্টোবর এবং ১৯শে অক্টোবর ডাঃ চৌধুরী কর্তৃক শ্রীসারদামণি দেবী, শ্রীঅরবিন্দ, ভক্তশ্রেষ্ঠ হরিদাসের পুণ্য জীবনী অবলম্বনে বিরচিত সংস্কৃত নাটক "শক্তি-সারদম্", "ভারত-হৃদয়ারবিন্দম্" এবং "মহাপ্রভু হরিদাসম্" আশ্রমের অতি সুন্দর ও বৃহৎ প্রেক্ষাগৃহে অভিনীত হলো। তিনদিনই তিলধারণের স্থান ছিলনা। প্রতিদিনই দ্বিসহস্রাধিক আশ্রমবাসী ও ভক্ত রাত্রি আটটা থেকে

সাড়ে দশটা পর্যন্ত মুগ্ধ বিস্ময়ে নিঃশব্দে এই নাটকগুলির রস উপভোগ করেছেন। বিশেষ করে শ্রীঅরবিন্দের পুণ্য জীবনী অবলম্বনে বিরচিত "ভারত-হৃদয়ারবিন্দম্" নামক সংস্কৃত নাটকটীর ভাবের গাম্ভার্য ও রসের প্রাচুর্য সকলকে বিশেষ অভিভূত করে। এটিই শ্রীঅরবিন্দ সম্বন্ধে সর্বপ্রথম নাটক। এই দিনেই অভিনয়ের প্রারম্ভে আশ্রমের সংস্কৃত বিভাগের পক্ষ থেকে ডক্টর চৌধুরীকে অভিনন্দন জ্ঞাপন ও মানপত্র প্রদান করা হয় এবং অভিনয়ের পরে শ্রদ্ধেয় নলিনীদা শ্রীশ্রীমায়ের আশীঃপূত আশ্রমের প্রস্তুত সাড়ী প্রভৃতি নানাবিধ দ্রব্য প্রত্যেক অভিনেতা ও অভিনেত্রীকে উপহার প্রদান করেন।

অভিনয়ের শেষ দিনে শ্রদ্ধেয়া ডক্টর রমা চৌধুরীর সুললিত ইংরাজীতে অপূর্ব মাতৃবন্দনা সকলকেই বিশেষ মুগ্ধ করে।

এ প্রসঙ্গে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য যে এই তিন দিনের অভিনয়ের অপূর্ব রূপ সজ্জার ভার অতি অল্প সময়ের মধ্যে গ্রহণ করে শ্রীমতী ব্রততীদি যে কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছেন, তা' সত্যই বিস্ময়কর। শ্রীমান্ নিরঞ্জন ছায়ার মত সর্বদা আমাদের সঙ্গে থেকে যে সেবা করেছেন, তার তুলনা নেই। অবশ্য কার কথা ছেড়ে কার কথা উল্লেখ করবো? প্রত্যেকেই যেন শ্রীশ্রীমায়ের নিজের হাতে গড়া—প্রেম ও সেবা ধর্মের এক একটী মূর্ত প্রতীক। শ্রদ্ধেয় দক্ষিণাপদ ও কৃষ্ণপদদা, যতীনদা, গণপতরাম, অটলদা, সিদ্ধেশ্বরদা, প্রণব প্রভৃতি কত মধুর নামই না আজ মনে পড়ছে!

আশ্রমে প্রত্যহ সকালে মায়ের দর্শন লাভ করেছি বারান্দায়। লক্ষ্মীপূর্ণিমার দিনে তাঁর চরণে গিয়ে প্রণাম করেছি। তিনি ডাঃ চৌধুরী দম্পতীকে নিজের ঘরে স্বতন্ত্রভাবে দর্শনদান করে, নিজের হাতে বহু পুস্তক উপহার দিয়েছেন। প্রত্যেক দিন অভিনয় আরম্ভের পূর্বে তিনি ডাঃ চৌধুরীর নিকট আশীর্বাদী গোলাপ পাঠিয়ে দিতেন। আমরা সকলে আশীর্বাদী পুষ্প, শ্রীঅরবিন্দ ও মায়ের ব্যাজ, তাঁদের বাণী, চিত্র, প্রভৃতি কত জিনিষই না পেয়ে ধন্য হয়েছি। এই চারদিন আমরা মাটিতে পা দিই নি। সব সময়ে যেন আমরা কত রাজা মহারাজ! আমাদের সঙ্গে একটা প্রকাণ্ড বাস থাকতো—এত স্নেহ, আদর যত্ন, কল্পনার অতীত।

মাদ্রাজে ফিরে আসার পরে পর পর দু'দিন—২০শে ও ২১শে অক্টোবর—"শক্তি-সারদম্" নাটক অভিনীত হলো। প্রথম দিন হলো রামকৃষ্ণ মিশনের সুবিশাল সারদা বিদ্যাপীঠের সুবিস্তৃত হলে—বহু স্বামীজি, অধ্যাপিকা প্রভৃতিদের সম্মুখে। মায়ের পুণ্য জীবনী কিশোরী ছাত্রীদেরও বিশেষ অভিভূত করলো দেখে আমরা মুগ্ধ হলাম।

পরের দিনের সভা ও অভিনয় বিশেষ উল্লেখযোগ্য। এই দিন মাদ্রাজ বিশ্ববিদ্যালয়ের সংস্কৃত বিভাগের প্রধান অধ্যাপক ডাঃ রাঘবন "মাদ্রাজ সংস্কৃত রঙ্গ" নামক প্রতিষ্ঠানের পক্ষ থেকে প্রাচ্যবাণী মন্দিরের সভ্য ও সদস্যাগণকে বিশেষ অভিনন্দন জ্ঞাপন করেন। এটা বাঙ্গালীদের পক্ষে বিশেষ সম্মানের বিষয়। কারণ ইতঃপূর্বে কোনও বাঙ্গালী প্রতিষ্ঠানকে সংস্কৃত নাটকের জন্য অন্য কোনও প্রদেশ এ প্রকার আনুষ্ঠানিক ভাবে সম্মান প্রদর্শন করেছেন কিনা সন্দেহ। এ দিন সভায় মাদ্রাজ রাজ্যের অনেক শ্রেষ্ঠ পণ্ডিত, অনেক স্বামীজি, অধ্যক্ষ প্রভৃতি বিশিষ্ট ব্যক্তি উপস্থিত ছিলেন এবং তাঁরা সকলেই মুক্তকণ্ঠে অভিনয়ের প্রশংসা করেন। অভিনয়ের শেষে কমিশনের চেয়ারম্যান বেঙ্কট রমণ এবং ডাঃ রাঘবন অভিনয়ের উচ্চ মানের জন্য অংশগ্রহণকারী সকলকে অভিনন্দিত করেন। প্রাচ্যবাণীর পক্ষ থেকে ডাঃ রমা চৌধুরী ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন এবং শ্রীশ্রীমায়ের আদর্শে সকলকে অনুপ্রাণিত হওয়ার জন্য আহ্বান জানান। অভিনয় প্রসঙ্গে ভারতপ্রসিদ্ধ রূপকার শ্রীযুক্ত হরিবাবুর নাম বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য। তিনি যেভাবে মন-প্রাণ ঢেলে স্বহস্তে সকলের রূপ-সজ্জার ভার গ্রহণ করেন, তাতে অভিনয়ের সৌষ্ঠব বহুলাংশে বর্ধিত হয়েছিল, সন্দেহ নাই। আর আমাদের অতুলনীয় ভোলাবাবু। যিনি "বাবু" বললে রেগে যান—কিন্তু সত্যই "পারফেক্ট জেন্টলম্যান"—তিনিও ছায়ার মত থেকে সর্বদা প্রাচ্যবাণীর সকলের যে সেবা করেছেন, তা অবিস্মরণীয়। এ প্রসঙ্গে শ্রীযুক্ত কৃষ্ণপদ মুখোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত বীরেন্দ্রনাথ দাশ মহাশয়ের নামও উল্লেখযোগ্য।

ডক্টর চৌধুরী বহু প্রতিষ্ঠানে সংস্কৃত ভাষণ দেন। প্রেসিডেন্সী কলেজ, বিবেকানন্দ কলেজ, বেঙ্গলী এসোসিয়েশন, সারদা বিদ্যাপীঠ প্রভৃতি স্থানে তাঁর স্বতঃউৎসারিত সংস্কৃত বক্তৃতায় সকলে বিশেষ অনুপ্রাণিত হন। তিনি মাতৃলীলা, সারদামণি ও বিষ্ণুপ্রিয়া এবং সংস্কৃত শিক্ষার বিশেষ প্রয়োজনীয়তা বিষয়ে ভাষণ দেন। চৌধুরী দম্পতীকে সম্মানদানের জন্য অনেক সভা আহুত হয়।

স্বপ্নের মত কেটে গেল কয়টা দিন। সাধু সঙ্গের গুণ অনেক। কলিকাতার সর্বজনশ্রদ্ধেয় ডাঃ চৌধুরী-দম্পতী এবং তাঁদের সুন্দর ও কৃতী নাট্যদলের সংস্পর্শে এসে বহু সাধুজনের সাক্ষাৎ লাভ আমার এবার হলো। এই দলে যাঁরা ছিলেন, তাঁদের কয়েক জনের নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। যেমন শ্রীরামকৃষ্ণ, শ্রীঅরবিন্দ (নেপথ্য) এবং ঠাকুর হরিদাসের ভূমিকায় অংশগ্রহণকারী অধ্যাপক অশোক চট্টোপাধ্যায়; শ্রীসারদামণি, লক্ষহীরা ও নিবেদিতার ভূমিকায় অভিনয়কারিণী শ্রীমতী স্বপ্না দাশ এবং অন্যান্য ভূমিকায় অংশগ্রহণকারী মঞ্চ-পরিচালক অধ্যাপক শ্রীসিদ্ধেশ্বর চট্টোপাধ্যায়, গোপিকামোহন ভট্টাচার্য, রবীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য, ধ্যানেশনারায়ণ চক্রবর্তী প্রভৃতি। এঁরা বহুদিন যাবৎ প্রাচ্যবাণী মন্দির থেকে মঞ্চে ও রেডিওতে সংস্কৃত অভিনয় করে ভারতব্যাপী যশ অর্জন করেছেন। নবাগতদের মধ্যে আছেন শ্রীমতী সুনন্দা মিত্র ও উমা গুহ, শ্রীশক্তিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়, দীপক চট্টোপাধ্যায়। মঞ্চ-সঙ্গীতাংশে বিশেষ কৃতিত্বের সঙ্গে অংশ গ্রহণ করেন শ্রীবিমলভূষণ, শ্রীপ্রভাতভূষণ, শ্রীবিজয়ভূষণ, স্বামী মনোহরচৈতন্য ও শ্রীসুধীর চট্টোপাধ্যায়।

মাদ্রাজপ্রমুখ ভারতের অন্যান্য সকল প্রদেশই বাংলা দেশের সংস্কৃত উচ্চারণ সম্বন্ধে বিদ্রূপ করে থাকে। শুনেছিলাম যে, বাংলা থেকে দল গিয়ে মাদ্রাজে সংস্কৃত অভিনয় করবে, এতে মাদ্রাজের কাঁরো

চিত্রতারকাদের মত নিখুঁত লাবণ্য আপনারও হতে পারে
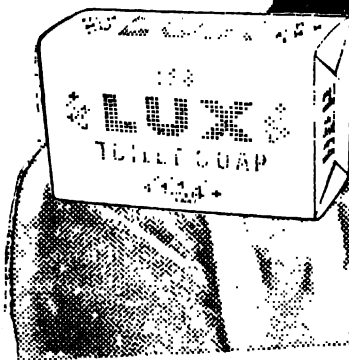
হিন্দুস্থান লিভার লিমিটেড এর তৈরী

কারো নাকি আপত্তিও ছিল। কিন্তু বাংলা দেশ থেকে এই প্রথম সংস্কৃত নাটকের দলটী সমগ্র মাদ্রাজ শহর ও পণ্ডিচেরীর চিত্ত যে জয় করে এসেছে তা আমাদের পক্ষে বিশেষ গৌরবের বিষয়। অভিনয়-গুলির ভাষার সারল্য, ভাবের উচ্চতা, সঙ্গীতের মাধুর্য, অভিনয় কৌশল ও উচ্চারণ-বিশুদ্ধতা সকলকেই বিশেষ বিমুগ্ধ করে ডাঃ চৌধুরী দম্পতীর সংস্কৃত ও ভক্তি-ধর্ম প্রচার প্রচেষ্টা জয়যুক্ত হোক্। আর জয়-যুক্ত হোক্ আমাদের পরমাদরের গীর্বাণবাণী—যে ভাষা চির-জীবন্ত, যে ভাষায় আজও এরূপ নব নব সরস নাটক-সঙ্গীত কবিতাদি রচিত হচ্ছে, যে ভাষার মধুরতানে আজও সহস্র সহস্র শ্রোতা ঘণ্টার পর ঘণ্টা বিমুগ্ধ হয়ে থাক্‌ছেন।

দেগঙ্গা হইতে হাড়োয়া

শ্রীঅশোক কুমার মুখোপাধ্যায়

মেগাস্থিনিসের ভারত বিবরণী হইতে জানা যায় যে বিশ্বজয়লিপ্সু মহাবীর আলেকজান্দার গঙ্গারিডি রাজ্যের হাতীবাহিনীর প্রতাপের কথা শুনিয়া গঙ্গাতীর হইতে প্রস্থান করেন। ঐতিহাসিক রায় বাহাদুর রমা প্রসাদ চন্দ মহাশয় 'গৌড়রাজমালা' গ্রন্থে এরূপ সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে বঙ্গদেশ উক্ত গঙ্গারিডি রাজ্যেরই এক অংশ। এই মতবাদ অন্যান্য ঐতিহাসিকগণও অস্বীকার করেন নাই। উক্ত গঙ্গারিডি রাজ্যের একটী প্রধান নগর ও তৎকালান ভারতবর্ষের অন্যতম প্রধান বন্দর ছিল গঙ্গে বা গঙ্গারেজিয়া। খৃষ্টীয় প্রথম শতাব্দীতে গ্রীক ভাষায় পেরিপ্লাসে (The Pariplus of the Erythraean Sec) এই গঙ্গে বন্দরের উল্লেখ দেখা যায়। প্রত্নতত্ত্ববিৎ সতীশচন্দ্র মিত্র মহাশয় যশোহর খুলনার ইতিহাসে এইরূপ মত প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন যে, বারাসত মহকুমার অন্তর্গত টাকী রোডের পার্শ্ববর্তী বর্তমান দেগঙ্গাই ছিল এই গঙ্গারেজিয়া বা গঙ্গে বন্দর।

৺মহেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় প্রণীত 'বাসুকী-কুল গাথা' নামক বাঙ্গালা পুঁথি হইতে এই দেগঙ্গা বা দ্বিগঙ্গা গ্রামের প্রাচীনত্বের কিছু প্রমাণ পাওয়া যায়।—

> "ভাগীরথী নদীতীরে দার্ঘগঙ্গা গ্রাম
> সর্ব্বস্থানে দ্বিগঙ্গা বলিয়া ঘুষে নাম।
> সুন্দর সে গ্রামখানি কি শোভা তাহাতে,
> সেই গ্রাম আদিশূর দিল রমানাথে।

সুতরাং দেগঙ্গার সেনবংশীয় আদিপুরুষ রমানাথ মহারাজ আদিশূরের নিকট হইতে এই গ্রামটী প্রাপ্ত হয়েন। ষোড়শ শতাব্দীর মধ্যভাগে এই বংশের অন্যতমকৃতী পুরুষ কিংকর সেন সম্ভবতঃ ভূমি অবনমনের ফলে দেগঙ্গা বাসের অযোগ্য হইয়া উঠিলে বরিশালে চলিয়া যান ও সেখানে ক্রমে প্রবল প্রতাপশালী হইয়া উঠিয়া সেলিমাবাদে ১৪টা ভুখণ্ড দখল করিয়া 'ভুঞা কিংকর' নামে খ্যাতিলাভ করেন। মহারাজ প্রতাপাদিত্য এই ১৪ ভুখণ্ডের ১৩টা হস্তগত করেন। তাঁহার পতনের পর কিংকরসুত মদনমোহন পিতৃরাজ্য স্বাধিকারভুক্ত করেন। এই কিংকর সেনের বংশ-ধরগণই 'রায়ের কাটি'র জমিদার বংশ স্থাপন করেন। বহরমপুরের সেন মহাশয়গণের কিছু কিছু জমিদারী বসিরহাট মহকুমার থাকায় অনেকে তাঁহাদেরও কিংকর সেন বংশোদ্ভুত বলিয়া মনে করেন। কমলাকান্ত সার্ব্বভৌম প্রণীত দ্বিগঙ্গারাজবংশম্' নামক সংস্কৃত পুঁথিতে এই বিষয়ে সবিশেষ জানা যাইতে পারে, কিন্তু ঐ পুঁথি এখন আর সংগ্রহ করা যায় না।

পতিতোদ্ধারিণী গঙ্গা বাঙ্গলার জন-গণ-মন-অধিনায়িকা। অনেক নদীকেই বাঙ্গালী গঙ্গা, আদিগঙ্গা, নবগঙ্গা নাম দিয়াছে। গঙ্গাশব্দেরই অপভ্রংশ 'গাং' শব্দের অর্থই তো নদী। আবার যমুনা পদ্মা গঙ্গারই শাখা বলিয়া বাংলা দেশে যমুনা পদ্মা নামে একাধিক ছোট ছোট নদী দেখা যায় নিম্নবঙ্গে। এইরূপ একটা পদ্মা নামধারী নদীর তীরবর্তী এই দেগঙ্গা গ্রাম। এই পদ্মাকেই মহেশচন্দ্র ভুল করিয়া গঙ্গা বলিয়া থাকিবেন। এই পদ্মা এখন মজিয়া গিয়াছে। এই পদ্মার একটী শাখা দক্ষিণাভিমুখে যাইয়া বিদ্যাধরীর সহিত মিশিয়াছিল। তাহার এখন চিহ্ন মাত্র নাই। পদ্মা ও এই শাখার মোহনায় ছিল চন্দ্রকেতু রাজার গড় এবং বিদ্যাধরী ও এই শাখার সংগমস্থলে হাড়গাড়া বা হাড়োয়া গ্রাম। "বাইশ কবি-মনসা" পুস্তকে উল্লেখ আছে যে চাঁদসদাগর এই দ্বিগঙ্গার নিকট চন্দ্র-কেতুর রাজ্যে বাণিজ্য করিতে আসিত।

হাড়োয়া থানার প্রধান গ্রাম হাড়োয়া আকাশপথে কলিকাতা হইতে পূর্ব্ব দক্ষিণে আন্দাজ পনের মাইল দূরে বিদ্যাধরী নদীতীরে অবস্থিত। এই হাড়োয়া গ্রাম বালণ্ডা পরগণার অন্তর্গত। এই বালাণ্ডা অতি প্রাচীন স্থান। সন্ধ্যাকর নন্দী নামক এক বাঙ্গালী কবি দ্ব্যর্থবোধক পদ্যে "রাম-চরিত" নামক এক পুস্তক লিখেন। সন্ধ্যাকর ছিলেন রাজা রামপালের সান্ধিবিগ্রহিক প্রজাপতি নন্দীর পুত্র। তাঁহার এই কাব্যের এক অর্থ ত্রেতাবতার রামচন্দ্রের সম্বন্ধে প্রযোজ্য, অপরার্থ বঙ্গাধিপ রামপালের সহিত সম্বন্ধযুক্ত। প্রখ্যাতনামা ঐতিহাসিক ডাঃ নীহাররঞ্জন রায় 'বাঙ্গালীর ইতিহাসে' এই বইটির যথেষ্ট ঐতিহাসিক মূল্য স্বীকার করিয়াছেন। মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী এই রামচরিতের একটী মুখবন্ধ লেখেন (Memoir of the Asiatic Society : Vol

III; No 1)। তাহাতে তিনি বলিয়াছেন যে বালান্দার বঙ্গের পঞ্চ বিভাগের অন্যতম বালবলভী বা বাগড়ীর প্রধান নগরী ছিল। সাহিত্য সম্মিলনের অভিভাষণে শাস্ত্রী মহাশয় বলেন—"প্রায় হাজার বৎসর পূর্ব্বে ২৪ পরগণার নানাস্থানে বৌদ্ধবিহার ছিল। * * * এমন কি এখন যে হাতিয়াগড় ও বালাণ্ডা পরগণা নগণ্য পরগণার মধ্যে গণ্য, সেখানেও বৌদ্ধবিহার ছিল।" বালাণ্ডায় ঠিক নালন্দার অনুরূপ ব্যাপক বৌদ্ধবিহার ও সংঘারাম ছিল বলিয়া অনেকে অভিমত প্রকাশ করেন। নেপালের রাজগ্রন্থাগারের কোন বৌদ্ধ পুঁথি নাকি এই অনুমানের কারণ। কিন্তু যশস্বী ঐতিহাসিক ডাঃ ষোড়শীকুমার সরস্বতী এই মতের পোষকতা করেন না। তিনি নেপাল যাইয়া এই একটীমাত্র উক্তির কোনরূপ পোষকতা বহু অনুসন্ধান করিয়াও কোথায় খুঁজিয়া পান নাই বলিয়া এইরূপ অভিমত প্রকাশ করেন যে বালাণ্ডায় নালান্দায় অনুরূপ বিশ্ববিদ্যালয় থাকা অসম্ভব ও এই উক্তি একটী প্রক্ষিপ্ত উক্তি মাত্র। প্রত্যুতঃ বিস্তীর্ণ বালাণ্ডা পরগণায় এখন আর পতিত জমি নাই ও ইহার মধ্যে কোথায় বড় রকমের বৌদ্ধবিহার ইত্যাদির ধ্বংশাবশেষের বিন্দুমাত্রও চিহ্ন দেখিতে পাওয়া যায় নাই। বালাণ্ডা নালান্দার ক্ষুদ্রতর সংস্করণ ছিল এইরূপ অভিমত সত্য বলিয়া স্বীকার না করিলেও বালাণ্ডা যে অতি প্রাচীন স্থান সে বিষয়ে আমরা নিঃসন্দেহ। কলিকাতার এত নিকটবর্ত্তী এ প্রাচীন ঐতিহ্যসমন্বিত বালাণ্ডা পরগণা আজও এত অবজ্ঞাত থাকিয়া ইহাই আর একবার প্রমাণ করিল যে প্রদীপের নীচেই থাকে অন্ধকার।

কানিংহাম সাহেবের গণনার সহিত বহুবিধ যুক্তি উপস্থিত করিয়া সতীশচন্দ্র মিত্র মহাশয় যশোহর খুলনার ইতিহাসের ১ম ভাগে ইহা প্রমাণ করিতে চেষ্টা পাইয়াছেন যে গাঙ্গেয় উপদ্বীপ বা সমতটের বৌদ্ধ যুগের রাজধানী ছিল বর্ত্তমান যশোর সহর হইতে দশ মাইল উত্তরে যশোর ঝিনাইদা লাইট রেলওয়ের বারবাজার ষ্টেশনে ও গ্রামে। প্রবাদ যে যখন মুসলমানগণ নিম্নবঙ্গে মুসলমান ধর্ম্ম প্রচার কল্পনা গ্রহণ করেন তখন যে ১২ জন আউলিয়া বা ফকীরের উপর সুন্দরবন অঞ্চলে ধর্ম্মপ্রচার ও ধর্ম্মযুদ্ধ পরিচালনা করার ভার পড়িয়াছিল তাহারা বার জন সে স্থানে আস্তানা স্থাপন করেন—তাহাই ক্রমে বারবাজার নামে প্রসিদ্ধিলাভ করে। এই বার আউলিয়ার মধ্যে খাঁ জাহান ইতিহাসপ্রসিদ্ধ লোক। এই বার আউলিয়ার অন্যতম ছিলেন গোরাই গাজী। কেহ কেহ বলেন পীর গোরাচাঁদ ও গোরাই গাজী অভিন্ন এবং গোরাই গাজী এই পীর গোরাচাঁদ নামে বালাণ্ডা পরগণায় ও পার্শ্ববর্ত্তী হাতিয়াগড় প্রভৃতি স্থানে মুসলমান ধর্ম্ম প্রচার করেন ও তজ্জন্য তৎকাল প্রচলিত নানারূপ উৎপীড়ন ব্যবস্থা অবলম্বন করেন ভিন্ন ধর্ম্মাচারীদিগের উপর। কিন্তু এইরূপ মত অত্যন্ত সীমাবদ্ধ লোকের মধ্যে প্রচলিত। অধিকাংশ স্থানীয় ব্যক্তি পীর গোরাচাঁদের সম্বন্ধে লিখিত মুসলমানী পুঁথি বা স্থানীয় জনপ্রবাদ এই মতের পোষকতা করে না।

হাড়োয়ার পীর গোরাচাঁদের শেষ খাদিমদার মহাত্মা সেখ দারা মালিকের মধ্যমপুত্র সেখলালের অধস্তন পুরুষ মুন্সী খোদাম মহিউদ্দিনের পৌত্র মহম্মদ এবাদুল্লা নামক জনৈক পিয়ারা, হাড়োয়া নিবাসী স্থানীয় উৎসাহী ভদ্রলোক বাংলা সন ১৩১৭ সালে তাঁহাদের বংশে রক্ষিত এক অতি প্রাচীন পারশী ভাষায় লিখিত পুঁথির মুসলমানী ভাষায় পাঁচালী ছন্দে কৃত এক অনুবাদ হইতে সাধারণের বোধগম্য ২৪ পরগণার প্রচলিত বাংলা ভাষায় এক সংস্করণ প্রকাশ করেন। মূল পুঁথি ও তাহার ১ম বা প্রামাণিক অনুবাদ লুপ্ত হইয়াছে। এই শেষ অনুবাদ ও স্থানীয় প্রবাদ প্রায় একই সূত্রে গাঁথা। ইহা হইতে পীর গোরাচাঁদের জীবনী যেরূপ জানা যায় তাহা সংক্ষেপে বর্ণনা করিয়াছি। বালাণ্ডা পরগণার প্রতি অংশ গোরাচাঁদের কর্ম্মভূমি, প্রতিষ্ঠা, পরগণাবাসী পীরকে এখনও শ্রদ্ধাঞ্জলি দেয় জাতিধর্ম্ম নির্ব্বিশেষে। তাহার জীবনী মাহাত্ম্য জানা দরকার।

কথিত পুঁথি অনুসারে গোরাচাঁদ মক্কানিবাসী করিমোল্লার ৩য় পুত্র। শৈশব হইতেই তিনি সংসারে অনাসক্ত ছিলেন। তাঁহাকে স্বপ্নে আদেশ দিলেন

"সত্বর চলিয়া যাও বলোণ্ডা পর্গণা।" সেখানে পীর ২টা কাজের ভার পাইলেন

"মারিবে রাক্ষস জাতি আমাকে স্মরিয়া"

এবং

"আর তুমি এছলামি করিবে প্রচার।"

গোলা বালাণ্ডার পথে গাজীপুর হইয়া 'ছিলাট' সহরে (শিলেট) সাজালাল পীরের আস্তানায় যাইয়া তাঁহার শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন এবং তাঁহারই আদেশে ৮ মাস পরে পুনরায় মক্কা প্রত্যাবর্তন করেন। সাজালাল পীর তাঁহাকে "রায়গায় জায়গীর" "ঘোড়া ঘোড়া" আর "তেগ তলোয়ার" দিলেন। এই রায়গা বর্ত্তমান রায়র্থা নামক মীনার্থার ও হাড়োয়ার নিকট একটি গণ্ডগ্রাম। মক্কা হইতে মাতাপ্রদত্ত ছোন্দল নামীয় এক দেহরক্ষী সঙ্গে লইয়া গোরাই হিন্দুস্থানে চলিলেন। "এক দল পীর সঙ্গে দেখা হ'ল পথে।" ইহার মধ্যে শাকুজী বা শাহাকুজী পাণ্ডুয়ায়, জরাক খাঁ ত্রিবেণীতে, আবাল সির্সিনিতে, একদিল আনোয়ারপুরে, ছকু দেওয়ান খামারপাড়ায় ও গোরা ছইদ সুহাইতে জায়গীর প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। পীরগণের মধ্যে অধিকাংশই ঐতিহাসিক পুরুষ ও স্থানগুলির ভৌগলিক অবস্থিতি আছে। সুহাই হইতে গোরাচাঁদ সেরপুর, গুস্তিয়া, চৌরাশী হইয়া পদ্মাতীরে উপনীত হইলেন। এওয়াজপুরে গোরা পদ্মা পার হইলেন। এখান হইতে গোরা পুনঃ পুনঃ দেউলিয়ার রাজা চন্দ্রকেতুকে নজরসহ হাজির হইতে বলিয়া পাঠাইলেন। রাজার মনে বিশ্বাস উৎপাদনের জন্য রাজার কথা মত ৩টা 'বুজরুকী' দেখাইলেন বা অতিমানবীয় ক্ষমতা দেখাইলেন। তত্রাচ চন্দ্রকেতু তাঁহাকে কুর্ণীশ জানাইতে আসিলেন না। ছলেবলে কৌশলে গোরা তাহাকে সবংশে ধ্বংস করিল। ইহার পর গোরা হামাহামা নামক বীর ভ্রাতৃদ্বয়কে দমন করেন। ইহার ফলে—

দলে দলে হিন্দুগণ হইল মোছলমান
নিত্য আসি নিকটে গোরার
বালাণ্ডা আবাদ হল ভয় ডর দূরে গেল
গোরার নাম হইল প্রচার।

অত্যাচারী বীরভদ্রকে ও কঙ্কেশ্বরকে দমন করিয়া, 'খুন মোম মধু সব যার অধিকার' সেই দক্ষিণ রায়ের সহিত এক সন্ধি স্থাপন করিলেন। তাহার পর গোরাচাঁদ যাইলেন 'ইন্দ্রপুরী জিনি হেতেগড় পরগণা' যাহা তখন মহিদানবসুত লংকেশ্বর রাবণ রাজের শ্যালক হরের সেবক অতি বলশালী ২ ভ্রাতা আকানন্দ ও বকানন্দর রাজ্য। সেখানে এক ভীষণ যুদ্ধ হইল। সেই যুদ্ধে অন্যতম ভ্রাতা বকানন্দ নিহত ও গোরা বিষমভাবে আহত হইলেন। গোরা খুনিয়া, কেশবপুর, রায় খাঁ হইয়া জুলীপুর বা বর্তমান থামবালণ্ডার পর বার্গপপুর বা বর্তমান হাড়োয়ায় আসিয়া নিঃসঙ্গ অবস্থায় ৭ দিন একা অনাহারে থাকিয়া ও আঁধারমাণিকের কিনু বা কানু গোয়ালার দ্বারা শেষ শুশ্রূষা পাইয়া ১২ ফাগুন দেহরক্ষা করিয়া বেহেস্তে চলিয়া গেলেন।

"গোরাইএর হাড়গাড়া যাইল বলিয়া
বার্গপপুরের নাম তাই হৈল হাড়োয়া।"

এই পুঁথিগত বিবরণীর সহিত ইতিহাস-অনুমোদিত বিবরণীর আলোচনা করা যাউক। হিন্দু রাজত্বকালে বালাণ্ডা বাগড়ী বিভাগের একটি শাসনকেন্দ্র ছিল। পাঠান সুলতানগণও বালাণ্ডাকে সে মর্য্যাদা দিয়া এখানে একজন শাসনকর্তা বসিতেন এবং তিনিই দক্ষিণ দেশ শাসন করিতেন। প্রাচীন দ্বিগঙ্গা ও বর্তমান দেগঙ্গা বেড়াচাঁপার সন্নিকটে দেউলিয়া পল্লী এখনও বর্তমান। এই দেউলিয়াতে চন্দ্রকেতু রাজার রাজধানী বা গড় ছিল। এই বিস্তৃত গড়ের কিছু অংশ এখনও মাথা উঁচু করিয়া দাঁড়াইয়া আছে। বেড়াচাঁপা হইতে হাড়োয়া যাবার রাস্তার বামপার্শ্বে এখনও সরকার হইতে সংরক্ষিত একটি সুদীর্ঘ স্তূপ দেখা যায়। হাড়োয়ার রাস্তার দক্ষিণ পার্শ্বে বিশেষ অনুধাবন করিয়া দেখিলে এখনও দুই চারি স্থানে এই গড়ের চিহ্ন দেখা যায়। বসিরহাট যাইবার রাস্তায় উত্তরধারে এখনও কথিত পদ্মার মজা খাল বর্তমান আছে। এই খাল ও বসিরহাট যাইবার রাস্তার মধ্যে যে সামান্য ভূখণ্ড আছে তাহার মধ্যেও যেখানে গড়ের চিহ্ন ছিল সেইখানেই আশুতোষ মিউজিয়াম ও সরকারী তত্ত্বাবধানে সামান্য কিছু অংশ খনন করা হইয়াছে। এই স্থানে যে প্রাচীর গাত্র বাহির হইয়াছে তাহার গঠনরীতি দেখিলে তাহাকে কোন দুর্গ প্রাকারের অংশ বলিয়া বোধ হয়। এই প্রাকার নীচু হইতে যেমন উর্দ্ধদিকে উঠিয়াছে তেমনি তাহা কিছুদূর অন্তর অন্তর ক্রমান্বয়ে সরু হইয়াছে। জেলখানার উত্তুঙ্গ প্রাচীর এখনও এই রীতিতেই গঠিত হয়। এই স্থান পর্য্যন্ত অর্থাৎ পদ্মার তীর পর্য্যন্ত রাজা চন্দ্রকেতুর গড় বিস্তৃত ছিল বলিয়া বোধ হয়। মনে হয় পদ্মা দিয়া জলপথে চন্দ্রকেতুর গড়ে প্রবেশের এইস্থানে কোন পথ ও ফটক ছিল। গড়ের ঠিক দক্ষিণপূর্ব্ব কোণে একস্থানে সামান্য কিছু স্থানে সুউচ্চ গড় নাই, জমি সমতল। প্রবাদ এই স্থানেই চন্দ্রকেতুর রাজবাড়ীর সিংহদ্বার ছিল। সম্মুখস্থ গ্রামের "সিংহের আট" নামও এই অনুমানের পোষকতা করে। গড়ের কিছু দক্ষিণে এখনও হামাদামা নামে গ্রাম বিদ্যমান। পুঁথিলিখিত হামাদামা ভ্রাতৃযুগলের এই ছিল লীলাভূমি। হামাদামার দক্ষিণ পশ্চিমে পীলখানা গ্রামে সম্ভবতঃ চন্দ্রকেতুর হস্তিশালা ছিল। নিকটবর্তী যোগীপোতা গ্রামে চন্দ্রকেতুর শ্রদ্ধাভাজন অনেক যোগী জীবিত অবস্থায় পাতাল প্রবেশ করেন বলিয়া জনপ্রবাদ। এই চন্দ্রকেতুর গড়ের অতি সামান্য স্থান এখন পর্য্যন্ত খনিত হইয়াছে। তাহাতেই মৌর্য ও গুপ্ত সভ্যতার নিদর্শনসমূহ যথেষ্ট পাওয়া যাইতেছে। এই সকল কারণে ইহা বিশ্বাস করা যায় যে এই অঞ্চল এক সময় সভ্যতার উচ্চ শিখরে উঠিয়াছিল এবং রাজা চন্দ্রকেতুকেই কেন্দ্র বা অবলম্বন করিয়া সেই সভ্যতা গড়িয়া উঠিয়াছিল। কিন্তু গোরাচাঁদ গাজীর আবির্ভাবের পর হইতে যেন কালাপাহাড়ী মনোবৃত্তি অবলম্বন করিয়া এমন ভাবে গোরার মাহাত্ম্য প্রচার করা হইয়াছে যে চন্দ্রকেতু আজ যেন 'নিজ বাস ভূমে পরবাসী।' বালাণ্ডা পরগণায় আজ আর চন্দ্রকেতুর নাম বড় কেহ জানে না, পীর গোরাচাঁদ গাজীর মহিমায় হিন্দুবৌদ্ধপ্রধান বালাণ্ডা আজ বৌদ্ধশূন্য, এখানে হিন্দুরা এখন সংখ্যায় নগণ্য। চন্দ্রকেতুর গড়ের সর্ব্বোচ্চস্থানে একটি গোরাচাঁদের দরগা ও আসন অনেক পরে স্থাপিত হইয়াছে।

পীর গোরাচাঁদের গাজী উপাধি অতি অর্থব্যঞ্জক। মুসলমান শাস্ত্র বলে যিনি বিধর্ম্মীর সহিত যুদ্ধে জয় লাভ করিয়া সধর্ম্ম প্রতিষ্ঠা করেন তিনিই গাজী। "Gayi signifies a conqueror—one who makes war upon (Tabaka) infidels (Nasiri) সুতরাং পীর গোরাচাঁদ ধর্ম্মপ্রচারে যে কেবল মাত্র উপদেশ ধর্ম্মালোচনা প্ররোচনা বা জীবনাদর্শ প্রচার করিয়াছিলেন তাহা মনে হয় না। গোরাই গাজী এক হস্তে কোরাণ ও অন্য হস্তে তরবারী লইয়াই কাফের-যবন-রাক্ষস ধ্বংসকরিয়া ধর্ম প্রচার করিয়াছিলেন। মুসলমান ধর্ম্মপ্রচারকগণ ধর্ম্মপ্রচারের কেন্দ্ররূপে সচরাচর বৌদ্ধমঠ ও সংঘারামগুলি অগ্রে বাছিয়া লইতেন। তাহার প্রমাণ কি? যেখানে যেখানে বৌদ্ধ সংঘারাম ইত্যাদি ছিল সেই সেই স্থানেই এখন প্রায় শতকরা ৮০.৯০ জন মুসলমান। দৃষ্টান্ত তক্ষশীলা, নালন্দা, ওদন্তপুরী, বারবাণ্ডার, বালাণ্ডা ইত্যাদি। এরূপ ঐ স্থান নির্ব্বাচনের পক্ষে কি যুক্তি বা কারণ ছিল? মুণ্ডিতমস্তক বৌদ্ধশ্রমণগণ থাকিতেন দলবদ্ধ ভাবে—'বৌদ্ধং শরণং গচ্ছামি—সংঘং শরণং গচ্ছামি'—অহিংসা তাঁহাদের পরম ধর্ম্ম। সুতরাং একটী বৌদ্ধ মঠ আক্রমণ করিলে একত্রে বহুলোক পাওয়া যাইবে ও ইহারা কেহই হিংসা করিবে না ইহা নিশ্চয়। আক্রমণের ইহা অপেক্ষা উপযুক্ত ক্ষেত্র আর কি হইতে পারে? সেই জন্যই বোধহয় গোরাচাঁদ গাজী বালাণ্ডা ও হাহিয়া গড় বা বর্তমান সোমারপুর অঞ্চল তাঁহার কার্য্যক্ষেত্র করিয়া লইয়াছিলেন। কিন্তু এই দেশে মুসলমান ধর্ম্ম প্রচার করিতে হইলে দেশের রাজা বা প্রধানপুরুষদিগকে প্রথমতঃ হাত করা প্রয়োজন। গোরাই গাজী সেই জন্য রাজা চন্দ্রকেতুর সর্ব্বনাশ সাধন

করিতে কোনরকম জবরদস্তী বা কৌশল অবলম্বন করিতে ইতস্ততঃ করেন নাই। চন্দ্রকেতুকে সহজে যখন গোরাচাঁদ বশে আনিতে পারিলেন না, তখন তাঁহার নামে বালাণ্ডার তদানীন্তন পাঠান শাসনকর্তা পীর শাহ নামক এক ব্যক্তির কাছে নালিশ করেন। এই পীর শাহ নামানুসারে হাবড়ার নিকটস্থ এক পল্লীর নাম হইয়াছে পিয়ারা। পীরশাহ ও গোরাই গাজীর অত্যাচারে দেউলিয়া ও তন্নিকটবর্তী স্থান সকল শ্মশান হইয়া যায় ও হাড়োয়া পিয়ারা আলবালাণ্ডা ইত্যাদি মুসলমানপ্রধান স্থানে পরিণত হইয়া জাঁকিয়া উঠে। যে 'হেতেগড়ে' পর্গনায় বা হাতিয়া গড়ে পীর গোরাচাঁদ রাত্রি যাপনের জন্য একটীও মুসলমানের বাড়ী খুঁজিয়া পান নাই। 'ইন্দ্রপুরী জিনি যে হেতেগড়ে পরগণায় 'ছত্রিশ হিন্দুজাতির বাস' ছিল, ধনপতি সওদাগর যে 'হাতেঘরে' গিয়াছিলেন, কবিকংকণ চণ্ডী যেখানে অম্বুলিঙ্গ ও নীলমাধবের পূজা করেন, গোঁরাচাদের আরব্ধ প্রচার ও অত্যাচার ক্রমে সেখানে এত প্রবল হইয়া উঠে যে সেই হাতিয়াগড় বা সোনারপুর অঞ্চল ক্রমেই হিন্দুশূন্য ও জনবিরল হইতে লাগিল এবং নিকটেই গড়িয়া উঠিল ঘুটিয়ারি শরীফ। কালস্য কুটিলা গতি:—তাই এত বড় হিন্দুবিদ্বেষী গাজীর অন্তিমকৃত্য সম্পন্ন হইল এক বিধর্ম্মী কাফের—রাক্ষস—কালু গোয়ালার হস্তে। গোরাচাঁদ গাজীর মৃত্যুর সংবাদ পাইয়া তৎকালীন বঙ্গেশ্বর আলাউদ্দিন (১২৩০-১২৩৭) গোরার সমাধি মন্দির ও সংলগ্ন মসজিদ নির্ম্মাণ করাইয়া ঐ সমাধি রক্ষার জন্য ১৫০০ বিঘা জমি নিষ্কর দান করেন। ইতিহাস এইরূপ বলে। এই সমাধি ও মসজিদ পরে ইলাহি বকস নামে স্থানীয় জনৈক ধর্ম্মপ্রাণ মুসলমান বহুব্যয় করিয়া সুসংস্কৃত করিয়া দিয়াছেন।

বেড়াচাঁপা-হাড়োয়া রাস্তার ধারে যে স্থানকে চন্দ্রকেতু রাজার গড় বলিয়া সাধারণে জানে ও যে স্থান সরকারীভাবে পুরাতত্ত্বতথ্যপূর্ণ ঐতিহাসিক স্থান বলিয়া স্বীকৃত হইয়া সংরক্ষিত হইতেছে সেই গড় হইতে প্রায় সিকি মাইল উত্তরে বসিরহাট যাইবার রাস্তার উত্তর ধারে পদ্মা বলিয়া কথিতা এক মহানদীর নিকটে যে সামান্য মাত্র স্থান এযাবতকাল খনন করা হইয়াছে চন্দ্রকেতু যুগের বিবরণ আবিষ্কারের পক্ষে তাহাকে সমুদ্রে পাদ্যার্ঘ্য বলিয়া মনে হয়। যেখানে অতি সামান্য স্থান খনন করিয়াই প্রাচীনত্বের এত নিদর্শন পাওয়া গিয়াছে, কেন জানি না সেখানে কাজের গতি ত্বরান্বিত না হইয়া শ্লথতর হইয়া চলিয়াছে। আমাদের মনে হয় সেখানে চন্দ্রকেতুর রাজবাড়ীর সিংহদ্বার ছিল বলিয়া জনপ্রবাদ, গড়ের সেই উচ্চতম স্থানে এখনই খননকার্য্য চালাইয়া যাওয়া একান্ত কর্ত্তব্য। গড়ের পূর্ব্ব দক্ষিণ কোনেই যে সিংহদ্বার ছিল তাহার অব্যর্থ প্রমাণ ঠিক পার্শ্ববর্ত্তী গ্রামের সিংয়ের আট' নামকরণ। এই দেশে যে কোন উঁচ্চ জমিকে এখনও আট বা আইট বলে। উচ্চ জমিতেই মানুষ বসবাস করে—জলাকীর্ণ নিম্নজমি মনুষ্যবাসের অযোগ্য। সিংহদ্বারকে এদেশে 'সিংদরজা' বলে। এই সিংদরজার সমুখে আইট এখন সংক্ষিপ্ত 'সিঙ্গের আট' নাম ধারণ করিয়াছে। ১১।১২।৫৮ তারিখের সরকারী প্রচারপত্র Weekly West Bengal-এ কলিকাতার অতি নিকটবর্ত্তী এই চন্দ্রকেতুগড়ের ঐতিহাসিক মাহাত্ম্য উচ্চকণ্ঠে কীর্ত্তিত হইয়াছে। কিন্তু এই গড় খননের কোন সরকারী প্রতিষ্ঠাই এখনও পরিদৃষ্ট হয় না। এই সিংহদ্বারের নিকট হইতে দেখিলে বোঝা যায় যে গড়ের দুইটী বাহু এখান হইতে উত্তর ও পশ্চিম মুখে ক্রমেই নিম্ন হইতে নিম্নতর হইয়া চলিয়া গিয়াছে ও কিছুদুর যাইয়া উভয়েরই অস্তিত্ব অবলুপ্ত হইতে হইতে ক্রমে সামগ্রিক অবলুপ্তি ঘটিয়াছে। এই গড় যখন পূর্ণাঙ্গ ও সমচতুষ্কোন ছিল তখন ইহা আকারে ও আয়তনে ঠিক ভুবনেশ্বরের নিকটবর্ত্তী শিশুপালগড়ের মতই ছিল। বসিরহাটের রাস্তার উত্তরধারে যেখানে সামান্য কিছু খনন করা হইয়াছে সেখানে চন্দ্রকেতুর রাজবাটী ছিল না বলিয়া অনুমানের আর একটী কারণ আছে। এই পল্লীটির নাম বেড়াচাঁপা। পীর গোরাচাঁদের পুঁথিতে এই বেড়াচাঁপা নামের কারণের একটী আজগুবি গল্প আছে। পীর স্বীয় ক্ষমতা সম্বন্ধে চন্দ্রকেতুকে অবহিত করাইবার জন্য একটী 'বুজরুকী' দেখাইয়া এখানকার বেড়ার গায়ে চাঁপা ফুল সব ফুটাইয়াছিলেন। চাঁপা ফুল ফোটানর প্রসঙ্গ ছাড়িয়া দিলেও বেড়াচাঁপার বেড়া বাক্যাংশটাই অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ অর্থব্যঞ্জক। এই স্থানে নিশ্চয় কোন বিশিষ্ট বেড়া ছিল। বেড়া কোন স্থানের সীমানা নির্দ্দেশ করে। আমরা অনুমান করি এই বেড়া চন্দ্রকেতুর রাজবাড়ীর বা গড়ের উত্তর সীমানা নির্দ্দেশ করিত। তখন রাজবাড়ীর বা গড়ের একাধিক ফটক থাকিত, বেগবতী স্রোতস্বিনী যমুনাশাখা "তিন ক্রোশ চৌড়া" পদ্মার ঘাটের নিকট একটী সিংহদ্বার থাকাই স্বাভাবিক বলিয়া বোধহয়। তাহার পর গোরাচাঁদের পুঁথিতে আছে

বাহির বাড়ী যে আছে গড়ের নিকট।
তাহার বেড়ায় যদি চাঁপাফুল ফোটে।"

ইহা হইতেও বোধ হয় যে বেড়াচাঁপায় রাজার আসল বাড়ীর অন্দর মহল বা মন্দিরাদি ছিল না। এখানে যে ধ্বংসাবশেষ আবিষ্কৃত হইতেছে তাহা মন্দিরের ধ্বংসাবশেষ বলিয়া সরকারী প্রচার পত্রে উল্লিখিত হইলেও আমরা তাহা সত্য বলিয়া বোধ করি না। প্রাচীন মন্দির এখানে একটা আছে অবজ্ঞাত অবস্থায় দিগঙ্গায়—গঙ্গেশ্বর শিবের। যশোহর খুলনায় ইতিহাস প্রণেতা এই শিব রাজা শশাঙ্কের রাজত্বকালে হাতিয়াগড়ের অম্বুলিঙ্গ শিব, কালীঘাটের নকুলেশ্বর শিব, জলেশ্বরের জলেশ্বর শিব প্রভৃতির সহিত প্রায় একই সময়ে প্রতিষ্ঠিত বলিয়াছেন।

বেড়াচাঁপার নিকটস্থ দেগঙ্গার নাম পূর্ব্বে দ্বীপগঙ্গা, দেবগঙ্গা বা দীর্ঘগঙ্গা ছিল। গোরাচাঁদের পুঁথি ইহার নাম দিয়াছেন "দহগঙ্গ." "যেথা হতে গঙ্গাদেবী পাতালে পশিল"। অর্থাৎ পুঁথির মতে এই স্থানেই ছিল নদীর গভীরতম অংশ। অথবা পূর্ব্বেই বলিয়াছি এই স্থান ছিল বরিশালের রায়ের কাটী রাজবংশের আদি বাসস্থান। এই স্থানও অতি প্রাচীন বলিয়া ঐতিহাসিক সতীশ মিত্র মহাশয় স্বীকার করিয়াছেন। আদিশূরের নিকট হইতে যে রমানাথ এই স্থান প্রাপ্ত হয়েন, তাঁহার প্রপৌত্র রামনারায়ণ মহারাজ বিজয় সেন দেবের অন্যতম মন্ত্রী ছিলেন। রামনারায়ণের সময় হইতে দে-গঙ্গার উত্থান আরম্ভ হয়। রামনারায়ণের প্রপৌত্র শ্রীমান সেনের সময় দেগঙ্গা বিখ্যাত সহর। রামনাথের ত্রয়োদশ অধস্তন পুরুষ শিবকিংকর পুরন্দর খাঁ কর্ত্তৃক মৌলিক প্রধান বলিয়া গণ্য হন। এই সময় হইতেই সেন বংশীয়গণ দেগঙ্গা ত্যাগ করিতে আরম্ভ করেন। সুন্দরবনের ভূমি অবনমনজনিত বাসের অযোগ্যতা ইহার কারণ বলিয়া অনুমিত হয়। শিবকিংকরের পৌত্রই ভুক্ত্যা কিংকর বলিয়া প্রসিদ্ধ হন বরিশাল অঞ্চলে। রামনাথের ১৯শ অধস্তনপুরুষ রাজা রুদ্রনারায়ণকে ১৪৪২ খ্রীষ্টাব্দে সগৌরবে রাজবাটীতে রাজত্ব করিতে দেখা যায়। দেগঙ্গার গৌরব রবি তখন অস্তমিত। এই দেগঙ্গার এখনও প্রত্নতাত্ত্বিক অনুসন্ধান কার্য্য করিলে কুশদহের অন্তর্গত আর একটী অবলুপ্ত সভ্যতার প্রাচীন ইতিহাস আবিষ্কৃত হইতে পারে। প্রত্যুতঃ দেগঙ্গা হইতে আরম্ভ করিয়া বেড়াচাঁপা, দেউলিয়া, হামাদামা, পিলখানা, পিয়ারা, আন্দির মাঠ, আলবালাণ্ডা হইয়া হাড়োয়া পর্য্যন্ত অঞ্চলের একটী ব্যাপক ঐতিহাসিক অনুসন্ধান আশু কর্ত্তব্য। কিন্তু ইহা কে করিবে।

সন্দেহ

(জোহনেস্ এল্ ওয়ালস)

অনুবাদক : মণিকুমার গঙ্গোপাধ্যায়

আকাশে বাতাসে সদ্য-বসন্তের আভাস মেশানো এপ্রিল মাসের সন্ধ্যা। আমি মুক্ত প্রান্তরে প্রাত্যহিক ভ্রমণ সেরে ষ্টেশনের পাশ দিয়ে ফিরছিলাম। অদূরে দেখি আমার বন্ধু ডি রিভে চলেছে, সঙ্গে রয়েছে এক অপরিচিত দম্পতি। ডি রিভের পাশে এই দম্পতিটিকে দেখলে তারা যে সহরে নবাগত তা বুঝতে ভুল হয় না। তাদের সাজ গোজের যে কিছু কমতি আছে তা নয়। বরঞ্চ ঠিক তার উলটো। সাজগোজ দু'জনে বেশ বেশীই করেছে, যেমন মফঃস্বলের লোকেরা রবিবার সহরে বেড়াতে যাবার সময় করে। আর তাতেই সহরের ফ্যাশনের পাশে তাদের কেমন বে-মানান দেখাচ্ছে।

আমার উপস্থিতি ডি রিভের চোখ এড়ায়নি। সে হাত তুলে আমার অপেক্ষা করতে বললে, মতলবটা দু'জনে গল্প করতে করতে বাড়ী ফেরা যাবে। দম্পতিটিকে বিদায় দিতে তার দেরী হবে বুঝে আমি ষ্টেশনের ষ্টলে আড্ডা নিলাম। মনে হ'ল চা পানের সঙ্গে সঙ্গে এই নবাগত দম্পতির বিদায়-দৃশ্য দেখতে মন্দ লাগবে না।

স্বামী আর স্ত্রী ট্রেণের কামরায় উঠে বসলেন। স্বামীটির গড়ন বেশ মোটাসোটা, নরম-নধর, মুখে ভালো-মানুষির হাসি লেগেই আছে। তিনি ব'সেই ডি রিভের সঙ্গে হেসে কথা সুরু করলেন। হাবে ভাবে বন্ধুর আতিথ্যের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশে ব্যস্ত ব'লেই মনে হয়। আর স্ত্রীটি......

স্ত্রীর মুখের দিকে চোখ পড়তেই আমার দৃষ্টি আটকে গেল। সেই মুখে এমন কিছু ছিল যা এক নজরে দেখা যায় না। সেই মুখের ভাষা পড়বার আগ্রহ আমায় পেয়ে বসল।

প্রথমেই যেটা চোখে পড়ে সেটা হচ্ছে স্বামীর সঙ্গে স্ত্রীর বয়সের তফাত—স্বামী মেদবহুল প্রৌঢ়, আর স্ত্রীটী তন্বী তরুণী বললেই চলে। তাতে অবশ্য আশ্চর্য হবার কিছু নেই। যেমন নেই স্বামীর তুলনায় তরুণীর সর্বাঙ্গে যৌবনের উচ্ছলতা, জীবনের জোয়ার দেখে। স্বামীর মতই স্ত্রীর মুখ প্রসন্ন, অমায়িকতায় উজ্জ্বল। তার দীপ্ত নীল চোখে আর ঈষৎ বিস্তৃত ওষ্ঠে নরম হাসির রেখা। কিন্তু তবুও মখ-মলের খাপে মোড়া শাণিত তরবারির মত এই কুসুম-কোমল আকৃতির অন্তরে কোথায় যেন লুকিয়ে আছে আলো-কিত কামরার পটভূমিকায় সেই মুখে ঘোর কঠোরতা। দেখলাম আর আমার এই ধারণা দৃঢ় থেকে দৃঢ়তর হ'ল।

একজন যাত্রী উঠল, পেছনে পেছনে এল টিকেট কলেক্টর। কামরার দরজাটা কিছুক্ষণ খোলা রইল। তরুণী স্ত্রীটিকে আরও ভালোভাবে লক্ষ্য করবার সুযোগ পেলাম। দেখলাম—তার ঋজু হ'য়ে বসার ভঙ্গী গাড়ীর পাটাতনে দৃঢ় নিবদ্ধ। তার শক্ত সোজা পা দুটো আর পায়ের ভারী ময়লা জুতো জোড়া। সব মিলিয়ে এই আত্ম-প্রত্যয়ের আড়ালে একটি কঠোর কঠিন মন আমার চোখ এড়াল না।

ট্রেণ ছাড়ার ঘণ্টা পড়ল। ডি রিভের সঙ্গে মোটাসোটা হাসিমুখ স্বামীটির আন্তরিক বিদায় সম্ভাষণ সমাপ্ত হ'ল। বন্ধু তার হাসিমুখ স্ত্রীর দিকে ফেরাল। প্রত্যুত্তরে তরুণী ছুঁড়ে দিল অবজ্ঞামেশানো তির্যক দৃষ্টি, তাচ্ছিল্যভরে গ্রীবার মৃদু সঞ্চালনেই সমাপ্ত ক'রে দিল সম্ভাষণ। ভাবটা যেন তোমার সঙ্গে এই ক্ষণিক আত্মীয়তার এইখানেই একেবারে শেষ হোক।

ডি রিভে অত লক্ষ্যই করেনি, ট্রেণ ছাড়ার সঙ্গে সঙ্গে সে ফিরে দাঁড়িয়েছে। তরুণীর এই আশ্চর্য ব্যবহার কিন্তু আমার চোখ এড়ায়নি। পরিষ্কার দেখলাম—গাড়ীর গতির সঙ্গে সঙ্গে তরুণীর মুখের মৃদু হাসি মিলিয়ে ফুটে উঠছে একটা গভীর ঘৃণার প্রলেপ, চলমান মেঘের ছায়ায় মাঠের বুকে গুটিয়ে যাওয়া রোদের রেখার মত। শুধু ঘৃণা নয়, ঘৃণার পেছনে যেন আরও কিছু আছে, আরও ভয়ঙ্কর কোনও অনুভূতি। স্বামীটি ইতিমধ্যে আরাম ক'রে শোবার ব্যবস্থায় ব্যস্ত হয়েছেন। মুখে তাঁর ভাসছে সেই তুষ্ট হাসির রেখা।

"তা হ'লে তুমি সত্যিই ব'সে আছ দেখছি!" ডি রিভে কখন পাশে এসে চেঁচিয়ে উঠেছে।

চমকে তার দিকে ফিরে প্রথমেই প্রশ্ন করলাম—"ওঁরা তোমার বিশেষ পরিচিত মনে হ'ল ?"

"হ্যাঁ, অনেক দিনের পরিচয়" সে প্রথমটা একটু থেমে যেন কি ভাবতে ভাবতে উত্তর দিলে। তারপরই তার স্বাভাবিক চঞ্চল ভঙ্গীতে বলে চলল, "হ্যাঁ, হ্যাঁ, মানে বেশ অনেক দিনের পরিচয়। বন্ধুটিকে তো দেখলে, বেশ চমৎকার লোক মনে হ'লোনা? সত্যি ভারী মিশুক লোক। পনের বছর আগে আমরা নেপেলে একই কলেজে শিক্ষকতা করেছি। সে সব দিনের কথা আজ মনে পড়লে হাসি পায়। এই রাজধানীর রাস্তায় বেড়াতে বেড়াতে সেই ছোট্ট বিশ্রি সহরের হোটেলে অন্ধকার ঘরখানায় একদিন ছিলাম, শুধু ছিলাম নয়, বেশ ক'বছর নিশ্চিন্তে ছিলাম ভাবলে আতঙ্কে গা শিউরে ওঠে।"

"তোমার বন্ধুর দেহে মেদবাহুল্য দেখে জায়গাটা যত খারাপ বললে তত খারাপ তো মনে হয়না" আমি রসিকতার সুরে বললাম।

"তা যা বলেছো" ডি রিভে একটু যেন উন্মনা হ'য়ে মন্তব্য করলে। তার গলার স্বর সামান্য সহানুভূতির ছোঁয়ায় কেমন যেন একটু করুণ শোনাল। "ও যেন বয়সের তুলনায় বেশী বুড়ো হ'য়ে পড়েছে তাই না ?" ডি রিভে ততক্ষণে সামলে নিয়ে তার বক্তব্যকে প্রাঞ্জল করার প্রচেষ্টা সুরু করেছে "মানে, আমাদের দু'জনের বয়স এক, আমরা একসঙ্গে বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠ শেষ করেছি। ওর বিষয় ছিল সাহিত্য আর আমার অর্থনীতি। ও তখন কি আমুদে আর হুজুগেই না ছিল। তারপর দু'জনেই উৎসাহের সঙ্গে একই কলেজে অধ্যাপনা সুরু করলাম। বছর দু'য়েক বেশ সুখে স্বচ্ছন্দে চ'লে গেল অর্থাৎ তোমার মত মানলে দুজ'নেই আমরা মেয়েলি জীবন নিয়ে সন্তুষ্ট ছিলাম। তারপরই আমি অধ্যাপনার শান্ত কানন ছেড়ে সাংবাদিকতার অরণ্যে প্রবেশ করলাম, তুমি যাকে বল রাজনীতির গুপ্তচরবৃত্তি। ও অধ্যাপনাতেই ম'জে রইল। অর্থাৎ হঠাৎ একটা কিছু অ্যাডভেঞ্চার করবার মত সাহস সেই মুহূর্ত্তে ওর ছিল না। তার কারণও ছিল। ইতিমধ্যে ও বিয়ে করেছে, ফলে নিশ্চিত আয়ের আকর্ষণ ত্যাগ করা ওর পক্ষে সম্ভব হয়নি। তুমিই তো বল যে—বিবাহিত প্রায় কারুর পক্ষেই হয় না।"

আমরা তখন সহরের সেরা রাজপথ ধরে হাঁটছিলাম। ছোট্ট সহর নেপেলের কাহিনী শুনতে শুনতে এই প্রশস্ত আলো-ঝলমল পথে পা ফেলতে মন্দ লাগছিল না। বন্ধু থামলে বললাম "তোমার বন্ধুর পাশে কিন্তু স্ত্রীটিকে মানায় না, মানে প্রাপ্তবয়স্ক প্রৌঢ়ের পাশে প্রাণোচ্ছল তরুণীকে দেখলে যা মনে হয় আর কি।"

বন্ধু একটু ঘাড় নেড়ে সিগারেট ধরাবার জন্যে দাঁড়িয়ে পড়ল। হাতের আলোয় তীক্ষ্ণ দৃষ্টি আমার মুখে ফেলে বললে—"তুমি বেশ মন দিয়ে দেখেছো মনে হচ্ছে।"

"তা দেখেছি," আমি উত্তর দিলাম। "ফাঁকা মাঠে বেড়াবার পর দেহ ক্লান্ত হয় কিন্তু মাথাটা বেশ পরিস্কার থাকে। মন দিয়ে শুধু দেখিনি, মস্তিষ্ক দিয়ে সবটা বিশ্লেষণও করেছি। তোমাকে অবশ্য বলতে আপত্তি নেই, আর তাই বা কেন, তোমাকে খুলে বলাই ভাল। যতই দেখলাম ততই আমার মনে হ'ল—ওই তরুণীটির মধ্যে কোথায় যেন সংযত কিন্তু সাংঘাতিক একটা সত্তা লুকিয়ে আছে। অবশ্য এটা আমার নিছক ধারণামাত্র, এমনও হ'তে পারে যে ষ্টেশনের খানিকটা অবাস্তব পরিবেশই এই ধারণার জন্য দায়ী।"

ডি রিভে কোনও উত্তর দিল না। তারপর ভাবতে ভাবতে হঠাৎ যেন কোনও একটা বিষয়ে মনস্থির ক'রে বললে "চল সামনের ওই কাফেতে একটু বসা যাক্।"

কাফেতে ঢুকে দু'জনে একটা টেবিলের দু'পাশে আসন নিলাম। সহরের বুকে সবে সন্ধ্যার প্রসাধন পড়ছে, প্রতীক্ষমান কাফেতে তখনও ভীড় জমেনি। শান্ত,

নির্জন হলে ছোট ছোট টেবিল, লাল ভেলভেটের ঢাকার ওপর শুভ্র শূন্য গ্লাস। মাথার ওপর ঘেরা বাতির নীলাভ আলো—আর তারই তলা দিয়ে কচিৎ সঞ্চরমান ওয়েটারের শুভ্র পোষাকের রেখা। জানালায় ঝোলানো ভারী পর্দা ভেদ ক'রে ভেসে আসছে নৈশ উন্মাদনার আয়োজনমুখর সহরের মৃদু গুঞ্জন, কাঁচের সার্শিতে চমকে উঠছে নিওনের উজ্জ্বল আলোর বিচ্ছুরণ, হঠাৎ দেখা যাচ্ছে অভ্রভেদী সৌধশ্রেণীর আভাস, রঙীণ বেলুনের দোলা, আর রাস্তার দ্রুতগামী যানবাহনের পিছনে ক্রমবিলীয়মান লাল আলোর হাতছানি। সমুদ্রের কল্লোলের পাশে নিবিড় নির্জন কাফের বিশ্রামকুঞ্জ।

ডি রিভে একবার চারপাশে চোখ বুলিয়ে নিলে। দূরের টেবিলে দু'একজন পানীয়ের গ্লাস নিয়ে ব'সে আছে। আমাদের দিকটা একেবারে ফাঁকা। আমার দিকে একটু ঝুঁকে নীচু গলায় সে বললে "তোমাকে আমার কিছু বলবার আছে, অর্থাৎ ওই তরুণী স্ত্রীটির সম্বন্ধে আমার মনে একটা সন্দেহ রয়েছে, নিছক সন্দেহ মাত্র, তবুও তোমায় না ব'লে স্বস্তি পাচ্ছি না।

তার প্রস্তাবনার মধ্যে আরব্য রজনীর হাজার এক রাত্রির রহস্য উঁকি মারছে দেখে আমি রহস্যচ্ছলে বললাম "আরে,এবার আলিবাবা আসবে না কি ?" উত্তরে ডিরিভে শুধু একটু হাসলে। তারপর একটি সিগারেট ধরিয়ে বেশ জুতসই ক'রে বসে নিলে, দীর্ঘ কাহিনী বলার আগে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা করার মত। কাহিনী সুরু হ'ল।

"একটু আগে তোমার সঙ্গে আমার বহুদিনের পরিচিত ওই দম্পতিটীর কথা হচ্ছিল। বন্ধুর সম্বন্ধে যা বলবার তা আগেই বলেছি। বন্ধুটি আমার সত্যিই সুন্দর লোক, তবে একটু ঢিলেঢালা এই যা। কিন্তু স্ত্রীটির কথা কিছু বলিনি, বলিনি কারণ বর্ণনাটা সহজ নয় ব'লে। স্ত্রীটি পরিপূর্ণ নারীত্বের প্রতীক এবং সেই নারী বিচিত্র চরিত্রের তাতেও সন্দেহ নেই। কিন্তু সবচেয়ে তার সম্বন্ধে প্রধান কথা হচ্ছে যে—সে আত্মপ্রত্যয়ে স্থিত এবং কতকাংশে অসাধারণও। অবশ্য একাধিক সন্তানের জননী, যৌবনের মধ্যাহ্ন যার পার হব হব, এমন একজন মহিলার সম্বন্ধে এই ধরণের সমালোচনা হয়তো ঠিক নয়। আর তুমি হয়তো মনে মনে হাসছো এই ভেবে যে, আমি হঠাৎ উচ্ছ্বসিত এবং উত্তেজিত হয়েছি এমন একজন সম্বন্ধে—যাকে অন্ততঃ বয়সের পরিমাপে আর তরুণী বলা যায় না……"

"যার পায়ে পুরাতন ময়লা জুতো" আমি টিপ্পনী কাটলাম।

"তাই না কি" ডি রিভে একটু অপ্রস্তুত হ'য়ে বলল—"আমি অবশ্য অত দেখিনি। তবে ফ্যাশনের প্রতি ভদ্রমহিলার প্রচণ্ড বিলাসের সামান্য পরিচয় আমি গতকাল পেয়েছি। আমরা তিনজন টুকিটাকি জিনিষ কেনার জন্য বেরিয়েছিলাম, প্রধান উদ্দেশ্য ছিল ভদ্রমহিলার জন্য একটা টুপি কেনা। দোকানে ঢোকবার পথে শো কেসে তিনি একটা টুপি দেখে উচ্ছ্বসিত হ'য়ে উঠলেন। টুপিটা সত্যিই অপূর্ব, দেখলেই পছন্দ হয়। ভেতরে ঢুকে কেনার সময় কিন্তু কিনলেন একটা অতি সাদামাটা সাধারণ। টুপি শো-কেশের টুপি বা সেই ধরণের কিছু একবার দেখতেও চাইলেন না। স্রেফ সাদামাটা টুপিটা হাতে নিয়ে স্বামীর পছন্দ কি না জানতে চাইলেন। স্বামী হেসে ঘাড় নাড়তেই দাম চুকিয়ে কেনা হ'য়ে গেল। আমার মতামত জানা প্রয়োজনও মনে করলেন না।"

"তোমাকে খুশী করা তাঁর উদ্দেশ্য নয়, অতএব তোমার মতামতের প্রশ্নই ওঠে না।" আমি আবার টিপ্পনী কাটলাম।

"তা ঠিকই," ডি রিভে মৃদু হেসে বললে—"কিন্তু আরও একটু আছে। তারপরও আমরা দু'একটা চিত্র প্রদর্শনী এবং বিখ্যাত ফ্যাশান বিপণীতে ঘুরলাম। নানা ছবি ও আধুনিক পোষাক এবং প্রসাধন সামগ্রিকে কেন্দ্র করে ভদ্রমহিলা আমার সঙ্গে বেশ প্রাণখুলে আলোচনা করলেন। আর এই আলোচনার মারফত আমি তাঁর মনের একটু পরিচয় পেলাম। অত্যন্ত আধুনিক এবং আশ্চর্যরকম মার্জিত তাঁর রুচি। এরই পাশে বিশেষভাবে যা লক্ষ্য করবার তা হচ্ছে তাঁর জবুথবু স্বামীটি, যিনি সারাক্ষণ নীরবে পাশে পাশে ঘুরলেন এবং যাঁকে দেখলেই মনে হচ্ছিল যে এইসব আলোচনা তাঁর মোটেই ভাল লাগছে না।"

"কিন্তু তোমার বিচিত্ররূপিণী নারীর দেখা এখনও পাওয়া যাচ্ছে না," আমি বললাম "আরও একটু প্রাঞ্জল হও বন্ধু।"

ডি রিভে প্রাঞ্জল হবার প্রস্তুতি হিসাবে একটু নড়েচড়ে

ব'সে আবার সুরু করল "আমার মনে হয় এই নারীর অন্তর জুড়ে আছে দু'টি বিপরীত অনুভূতির দ্বন্দ্ব। একদিকে রয়েছে একজন সুগৃহিণী এবং কর্তব্যপরায়ণা জননী। চারটী সন্তানকে সুষ্ঠুভাবে লালন পালন করার ব্যাপারে এই দম্পতির চেষ্টার শেষ নেই। মানে শুধু লেখাপড়া বা সাজ পোষাকের কথা বলছি না। গত আট বছর একাধিকবার আমি এঁদের অতিথি হয়েছি। প্রতিবারই সন্তানপালনে এঁদের অসীম স্নেহ আর অটুট ধৈর্য দেখে বিস্মিত না হ'য়ে পারিনি। ব্যাপারটা অবশ্য না দেখলে ঠিক বোঝা যাবে না। বাড়ীতে বাবা আর মা ছেলেমেয়েদের একজন হয়ে আছে, তাদের খেলার সঙ্গী হ'য়ে আর অসংখ্য প্রশ্নের উত্তর দিয়ে। ছেলেমেয়েদের সামনে স্বামী আর স্ত্রীর সংযত, শান্ত ব্যবহার প্রায় আদর্শ বলা চলে। মনে হয় ছেলেমেয়েদের কল্যাণে নিজেদের বিলিয়ে দেওয়ার মাঝেই এই দম্পতি খুঁজে পেয়েছে তাদের জীবনের উদ্দেশ্য এবং আনন্দ। এদের এই বিশেষ দিকটা সংসারের সেই পবিত্র, হাস্যোজ্জ্বল পরিবেশে না দেখলে ঠিক চেনা যায় না। সেখানে এদের আর অসংখ্য সমস্যা-পীড়িত সাধারণ মধ্যবিত্ত দম্পতি ব'লে মনে হয় না, সেখানে জননীত্বের মহিমায় দীপ্ত এই নারী তোমার শ্রদ্ধা সহজেই আদায় ক'রে নেবে।"

ডি রিভে একটু থামল বোধ হয় পরবর্তী বক্তব্যকে গুছিয়ে নেবার জন্য। আমি বললাম "মনে হচ্ছে এরপর বিচিত্ররূপিণী নারীর আবির্ভাব আর সম্ভব নয়।" ঠিকই, বন্ধু সঙ্গে সঙ্গে বলে উঠল "ঠিক এই কথাটাই আমারও বার বার মনে হয়েছে। অতীত দিনের এই সব চিত্র যতবার স্মৃতিপথে এসেছে, যতবার এই নারীর অন্তরে অপূর্ব ঐশ্বর্যময় দিকটা চোখে পড়েছে—ততবারই তার দ্বিতীয় সত্তা সম্বন্ধে আমি নিজেই সন্দিহান হয়েছি। মনে হয়েছে হয়তো সবটা আমারই ভুল। কিন্তু ঠিক তা নয়। এই নেপেলে, তাদের সুসমঞ্জস সাংসারিক পরিবেশই চকিতে মহিলাটির চোখের কোণে চমকে উঠেছে দ্বিতীয় সত্তার ইঙ্গিত। সে দেখা আমার ভুল নয়, কারণ আমার উপস্থিতিই সেই পরিবর্তনের হেতু, আমার প্রতি এক বিচিত্র বিরূপতার খোঁচা লেগেই হঠাৎ উৎসারিত হয়েছে সেই দ্বিতীয় সত্তার উৎস।"

"বিরূপতার কারণটা ভাবতে গিয়ে প্রথমেই মনে এসেছে তার স্বামীর তুলনায় আমার জীবন যাত্রার বৈপরীত্য। ভবঘুরে আমি, ছোট্ট একটি নীড়ের বন্ধনে বাঁধা পড়িনি। জীবনকে তার রূপ রঙ রস দিয়ে পরিপূর্ণ ভাবে আমি উপভোগ করতে চাই, উদ্দাম পাখা মেলে উড়তে চাই অদম্য বাসনা-কামনার বিস্তৃত রামধনু-রঙা আকাশে। হয়তো এ সবের সত্যিই কোনও অর্থ নেই, তবু আমার মত ব্যক্তির জীবনে এর চেয়ে বড় সত্যও বুঝি কিছু নেই।"

"আমাদের মত ব্যক্তির জীবনে বল" আমি যোগ করলাম।

"বেশ আমাদেরই বলছি। সুতরাং এই দম্পতির চোখে স্বভাবতই আমি অন্য গ্রহের লোক ব'লে চিহ্নিত হয়েছি। এদের এই ধারণাতে আশ্চর্য হইনি কারণ জানতাম সে সব শ্রেণীবিভাগেই কিছু না কিছু ফাঁকি আছে।"

"আমি তোমারই সমগোত্র, অতএব বিশদ বর্ণনা অবান্তর।" আমি তার বক্তব্যকে ঠিক খাদে বইয়ে দেবার প্রচেষ্টায় বললাম।

"ঠিক বলেছো। এইবার যা বলছিলাম। বিরূপতার কারণ খুঁজতে গিয়েই আমার চোখে ধরা পড়েছে এই মাতৃরূপের আড়ালে তার দ্বিতীয় সত্তা। আমার জীবনের প্রতি, মানে এই ধরণের আশার আকাশে নিশ্চিন্তে পাখা মেলবার আকর্ষণ শত চেষ্টাতেও সে লুকোতে পারেনি। শিরায় শিরায় রক্তের স্রোতে তার উন্মুখ হয়ে আছে মুক্ত, স্বাধীন জীবনের ডাক। ঘর তাকে বেঁধেছে ঠিকই, কিন্তু এই দ্বিতীয় সত্তার বাধায় নিরন্তর ক্ষত-বিক্ষত হচ্ছে তারই অন্তর। আর অন্তরের এই রক্তাক্ত রূপ ঢাকা দেবার জন্যই সে ভাবে-ভাবে, কথায় হাসিতে জোর গলায় সকলকে শুনিয়ে ঘোষণা করতে চায়—আমি এই সংসার নিয়ে খুব সুখে আছি, এই স্বামী আর সন্তানদের মাঝেই আমি পূর্ণ, আমি পরিতৃপ্ত।......এইবার আশাকরি বিচিত্র রূপের আভাস পাওয়া যাচ্ছে?"

"হাঁ......"

"তার চরিত্রের এই অসংলগ্ন অসম্পূর্ণ রূপ ঢাকবার জন্য তার ব্যস্ততার সীমা নেই। আদর্শকে তুলে ধরবার

অসীম আগ্রহ তার। তুমি একটু আগে তার পুরাতন ময়লা জুতোর কথা বলছিলে। ঠিকই, শুধু জুতো নয়, পোষাকে, প্রসাধনে সর্বত্রই তার নিজের গৃহিণীর রূপ জারি করবার সতর্ক সাবধান প্রচেষ্টা; কারণ সামান্য সুযোগ পেলেই যদি সেই অধীর উদ্দাম সত্তাটা প্রকাশ হ'য়ে পড়ে। আশাকরি আমার বক্তব্য বুঝতে তোমার কষ্ট হচ্ছে না?"

"এইটুকু বুঝছি যে তোমার গৃহে এই দম্পতির ক্ষণিক আতিথ্য সব দিক দিয়ে খুব সুখের হয়নি।"

"না হয়নি। মাঝে মাঝে আমি প্রায় বিরক্ত হয়ে উঠেছি। মনে হয়েছে যে এখানে আসবার আগে নেপেলের বাড়ীতে ব'সে এই নারী নিজেকে সম্পূর্ণ প্রস্তুত করেছে। তারপর আত্মপ্রত্যয়ের সুদৃঢ় বর্মে আবৃত হ'য়ে পদার্পণ করেছে আমার গৃহে। বন্ধুকে আগেও একাধিক বার আমি আমন্ত্রণ জানিয়েছি। কিন্তু সে আসেনি, সম্ভবতঃ তার স্ত্রীর মত ছিলনা ব'লেই। অর্থাৎ স্ত্রী তখনও এই পরিবেশে যুদ্ধ করবার জন্য প্রস্তুত হয়নি। সময়ের অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে সে নিজের অন্তরের দ্বন্দ্বে ধীরে ধীরে দ্বিতীয় সত্তাকে পরাজিত করেছে। তারপর আর ভয়ের কিছু নেই ভেবে এইবার সদর্পে মাথা তুলে এসেছে আমার অতিথি হ'য়ে। অবশ্য এত কথা ঠিক এইভাবে ভাববার প্রশ্নই হয়তো উঠতো না যদি না গতকাল ঘটনাটা ঘটতো।"

"ঘটনা তা'হলে একটা ঘটেছে?"

"হ্যাঁ এবং তারপরই আমার মনে সন্দেহ উঁকি দিয়েছে। গতকাল সন্ধ্যায় আমরা একটা অভিজাত নাচের আসরে গিয়েছিলাম, সেখান থেকে গেলাম সৌখীন একটা রেস্তোঁরায়। আমার উদ্দেশ্য ছিল বিদায়ের আগের দিন অতিথিদের একটু বিশেষ আপ্যায়ন করা। বেশ কাটছিল সন্ধ্যাটা, হাসি-খুশী, আলাপ-আলোচনায়। কিন্তু রাত বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে স্ত্রীটি হঠাৎ কেমন নিজেকে গুটিয়ে নিয়ে নীরব হ'য়ে বসে রইল। আমি বার বার তাকে আলাপের মধ্যে টেনে আনবার চেষ্টা করলাম, কিন্তু পারলাম না। সে যেন আপন মনে কি চিন্তা ক'রে চলেছে। দেখলাম দৃষ্টি তার সহরের আলোকোজ্জ্বল, প্রাণোচ্ছল রাজপথে নিবদ্ধ; হয় তো সহরের এই উদ্দাম জীবন তার অন্তরে আলোড়ন তুলেছে; হয় তো এই বিলাস-ব্যসনের স্রোতে সে অস্বস্তি বোধ করছে।"

"তার এই পরিবর্তন স্বামীর চোখ এড়ায়নি। বেচারি ভাল মানুষের মত ব'লে বসল, কাল রাজধানী ছেড়ে চ'লে যেতে হবে ব'লে বোধ হয় তোমার কষ্ট হচ্ছে।" সঙ্গে সঙ্গে একটা যেন চাপা আগুন ছড়িয়ে পড়ল স্ত্রীর সর্বাঙ্গে। অস্বাভাবিক জোরের সঙ্গে সে প্রতিবাদ জানালে, জোর গলায় বার বার বললে—বাড়ীর জন্যে, ছেলে-মেয়েদের জন্যে তার মন কেমন করছে। প্রথমটা মিথ্যা মনে হলেও, আমারই চোখের সামনে ধীরে ধীরে বেশ নিশ্চিতভাবে তার মাতৃসত্তা আবৃত্ত করল তার দ্বিতীয় সত্তাকে। মাতৃ-মহিমায় উজ্জ্বল হ'য়ে যখন সে থামল তখন আমার নীরব থাকা ভিন্ন গতি ছিল না। কিন্তু তার এই দ্বন্দ্ব আমার দৃষ্টিকে ফাঁকি দিতে পারে নি। এতদিন আমি নিজের জীবন নিয়ে সুখী ছিলাম, এখন তার মধ্যে প্রলুব্ধ হবার মত, অন্যকে আকর্ষণ করার মত কিছু আছে দেখে একটু গর্ব অনুভব না ক'রে পারলাম না। তার দৃষ্টিকেও আমি ফাঁকি দিতে পারিনি। আমার এই আত্মতৃপ্তির হাসি আর হয়তো সামান্য ব্যঙ্গের ভঙ্গীমা চিনতে তার ভুল হ'লো না। চিনে নিয়ে সে আবার চুপ ক'রে গেল। আমার পছন্দ-অপছন্দ ভালো লাগা, না-লাগা নিয়ে সে যে মাথা ঘামাচ্ছিল তা নয়, মোটেই নয়। সেই মুহূর্তে আমি তার সামনে হয়ে উঠেছিলাম তার দ্বিতীয় সত্তার প্রতীক, সেই সত্তা থাকে সে ভুলে থাকতে চায়, যাকে সে অবদমিত করতে চায় তার 'গৃহিণীত্বের, মাতৃত্বের আড়ালে।'

"বাড়ী ফিরে এসে আমরা একটু বিশ্রামের জন্য বসলাম। এবার সেই আলাপ সুরু করল। অনর্গল কথার স্রোত নিঃসারিত হ'ল তার কণ্ঠ থেকে। স্বামীটি শেষে হাই তুলতে তুলতে বললেন "তোমরা তা'হলে গল্প কর, আমি শুতে চললাম।"

"আমারও ঘুম পেয়েছে," আমি সঙ্গে সঙ্গে বললাম। আমার আশা ছিল যে এইবার সেও স্বামীর সঙ্গে শুতে চ'লে যাবে। সে কিন্তু বললে "বেশ তো, শুয়ে পড়গে। আমি কিন্তু আরও কিছুক্ষণ বিশ্রাম নেব। রাতের আকাশের তলায় এই নির্জন বারান্দাটা আমার বড় ভাল লাগছে, মনে হচ্ছে যেন নিজের বাড়ীতে ব'সে আছি।" কথার শেষে উছলে পড়ল তার হাসি—আমার কানে কেমন বে-সামাল শোনাল।

ডালডা

"বাঃ চমৎকার", আমি খুশী হয়েই বললাম, "কিন্তু গ্যাসটা নেভানোর ব্যবস্থা আপনার জানা আছে তো ?"

"হ্যাঁ, হ্যাঁ, আমি ঠিক নিভিয়ে দিয়ে যাব।" ভেসে এল তার শান্ত উত্তর।

এইখানে এসে ডি রিভের স্বরও কেমন যেন শান্ত হয়ে এল। মৃদু স্বরে সে বলে চলল "এখন আমার মনে হচ্ছে যে আমি গ্যাসের কথাটা বলতেই সে কেমন যেন একটু চমকে উঠেছিল। অবশ্য আমার দেখার ভুলও হ'তে পারে..."

"বারান্দার পাশেই আমার ঘর। দরজায় খিল দিয়ে শুয়ে পড়লাম। আমার দরজার মাথায় কাঁচের একটা সার্শি আছে! সেটা সব সময়েই একটু তোলা থাকে, যাতে রাতে হাওয়া আসতে পারে। কদিন সর্দি হওয়ার দরুণ বাগানের দিকের জানালাগুলো বন্ধ রেখেছি। তাই শুয়ে সার্শিটা দেখে নিলাম, ঠিকই তোলা আছে, রাস্তার আলোর একটা রেখা এসে পড়েছে দেওয়ালে।"

"এইখানে ব'লে রাখি যে আমার ঘরের এই শোবার ব্যবস্থা প্রথম দিন আমি তারই সামনে আমার পরিচারককে বুঝিয়ে ব'লেছি, তাকেও আমার ঘরে নিজে নিয়ে গিয়ে দেখিয়েছি।"

"শুয়ে কতক্ষণ জেগেছিলাম মনে নেই। বারান্দায় তার পদচারণার ক্ষীণ আওয়াজ বার দু'য়েক শুনেছি, একবার যেন ষ্টোভটায় কিসের ধাক্কা লেগে ঝনঝন্ করে উঠল। ভাবলাম আয়নার সামনে দাঁড়াতে গিয়ে ষ্টোভে তার পায়ের ধাক্কা লেগেছে।...তারপর ঘুমিয়ে পড়েছি।"

"কিসে যে হঠাৎ ঘুম ভাঙ্গল, কেন যে লাফিয়ে বিছানা ছেড়ে নেমে দাঁড়ালাম, এখন তার কিছুই মনে করতে পারছি না। হয়তো বিশ্লেষণ করতে গেলে আত্মা, ঈশ্বর, অলৌকিক শক্তি ইত্যাদির সাহায্যের সব চমকপ্রদ কাহিনী এসে পড়বে। কিন্তু আমার কথা হচ্ছে যে আমি আচমকা একটা কিসের আঘাতে ঘুম ভেঙে মোহাচ্ছন্ন অবস্থায় ঘরের মেঝেতে দাঁড়িয়েছিলাম। মাথাটা লোহার মত ভারী, নাকটা বুজে এসেছে, বুকে একটা যেন কিসের চাপ, যার ফলে নিশ্বাস নিতে কষ্ট হচ্ছে। মনে হল সর্দিটা আবার বোধহয় চেপে এসেছে। সার্শির দিকে চোখ পড়তেই দেখলাম আলোর রেখাটা নেই। তবে কি সেটা বন্ধ হয়ে গেছে? এই প্রশ্নের পিছনেই কোথা থেকে জানি না এসে দাঁড়াল আর একটা প্রশ্ন—তবে কি গ্যাসটা বন্ধ হয়নি? সেই মুহূর্তে এই প্রশ্নের আড়ালে আমি দেখতে পেলাম উঁকি মারছে সন্দেহের সর্পিল মুখ...এ শুধু একটা সরল স্থির নিবদ্ধ সন্দেহ।..."

"নিজেকে সামলে নিয়ে আমি সাবধানে খিল খুলে বাইরে এলাম, যাতে শব্দে পাশের ঘরের অতিথিদের ঘুম না ভাঙে। ষ্টোভের হিস হিস্ আওয়াজ কানে এল, কাছে গিয়ে দেখি গ্যাসের একটা সুইচ খোলা রয়েছে।"

"তারপর?" আগ্রহান্বিত আমি প্রশ্ন করলাম।

"তারপর আর কি! সুইচটা বন্ধ করে দিলাম। অবসাদে শরীর আমার টলছিল। কোনক্রমে দেহটা টেনে এনে শয্যায় আশ্রয় নিলাম।"

"তারপর আজ সকালে?" আবার আমি প্রশ্ন করলাম।

"সকালে কথাটা হাসিচ্ছলে আমিই পাড়লাম 'আপনার সম্ভবত ভুল হ'য়ে থাকবে, মজার ভুল আর কি...মানে গ্যাসটা বন্ধ করতে ভুলে গিয়েছিলেন...!"

"তাঁকে কি খুব বিচলিত মনে হ'ল?"

"মোটেই না। অবিশ্বাস্য রকম শান্ত মুখে বসে শুনলেন। আমার কথায় সেই উদাসীন্যের মুখোসে সামান্যতম রেখাও পড়ল না। আর এ ক্ষেত্রে এইটাই অস্বাভাবিক মনে হ'ল কারণ তাঁর এই ভুলের ফলে আর একটু হ'লেই শ্বাসরুদ্ধ হ'য়ে আমার মৃত্যুবরণ করতে হ'ত। ...দীর্ঘ স্তব্ধতার পর একটি মাত্র কথা তাঁর কণ্ঠ থেকে বার হ'ল "আশ্চর্য ব্যাপার তো!"

"সত্যিই বড় আশ্চর্য ব্যাপার" আমি না ব'লে পারলাম না।

"হ্যাঁ আশ্চর্য তাতে সন্দেহ নেই" বন্ধুও হেসে বলে উঠল।

একটু অন্যমনস্ক হ'য়ে পড়েছিলাম। তারপর আমি সেই আশ্চর্য কাহিনীর ছিন্নসূত্র তুলে নিয়ে বললাম" কিন্তু তোমার ভুলও তো হ'তে পারে? এই নারীর জননী-সত্তাকে তুমি তুচ্ছ করতে পার না। তুমি নিজেই তার সন্তানের প্রতি স্নেহ দেখে অভিভূত হয়েছ, বিস্মিত হয়েছ সাংসারিক পরিবেশে তার অসীম ধৈর্য দেখে।...সুতরাং

এমনও তো হ'তে পারে যে সন্তান আর সংসারকে কেন্দ্র করেই এই নারী খুঁজে পেয়েছে আন্তরিক তৃপ্তি, তার জীবনের সার্থকতা…।"

"হ্যাঁ…সন্তানের প্রতি অসীম স্নেহ"—ডি রিভে একটু উন্মনা হ'য়ে থেমে থেমে বললে—"সর্বগ্রাসী স্নেহ…তবুও এই স্নেহ, এই সংসার নিয়ে তৃপ্ত নয় এই নারী…চাওয়া আর পাওয়ার মধ্যে একটা ফাঁক আছে…জীবনের এই বিরাট ফাঁকির নগ্নরূপ হঠাৎ ধরা পড়েছে…আর তাতেই এক অসতর্ক মুহূর্তে খসে পড়েছে আত্মপ্রত্যয়ের মুখোস… প্রকাশ হয়ে পড়েছে এক বিকৃত প্রতিক্রিয়া, যাকে প্রায় প্রতিহিংসাও বলা যায়…আরে, তুমি হাসছো কেন ?"

"হাসছি মোটাসোটা ভালোমানুষ স্বামীটির কথা ভেবে" আমি বললাম।

স্বর্ণদ্যুতি

শ্রীসুধাংশুমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়

আকাশে ভোর হলো
নামলো, অসুরদলন খড়্গের জ্যোতি
বহ্নিবীণা বক্ষে লয়ে কনকপদ্মখানি
কোনদিন দেখিনি যে ভোরের স্নিগ্ধ আলো
যে ভোরাইএর গান কোনদিন শুনিনি
কনকোজ্জলার প্রথমা অগ্নিশিখা
অনগ্নিদহনে হেমচুম্বন দিলে এঁকে—
সেই স্পর্শ লাগলো আমার মগ্ন মনে
মোহাচ্ছন্ন মাথায়
পেয়ে গেলাম সকল প্রশ্নের উজ্জলতর উত্তর
সেই আলো নামলো আমার নীরব কণ্ঠে
গানে গানে জেগে উঠলো বাণী
কথায় কাহিনীতে কাব্যে
দিলে ঝঙ্কার
অহঙ্কার বলো—তাতে ক্ষতি নেই—
সেই স্পর্শ লাগলো আমার বুকে
কেঁপে উঠলো, দুলে উঠলো আমার সত্তা
পরমাশ্চর্য্য মনের মন্দিরে ঘণ্টা বাজলো ঢং ঢং
শেষের নয়, আরম্ভের—
দিনাবসানের নয়, ভোর পাঁচটার—
সেই আলো নামলো আরো নিম্নে
বিদ্যুত চঞ্চল স্পর্শে অণুতে তনুতে
কামনার কেন্দ্রে
কামময় জীবন হলো বীতকাম নয়
আপ্তকাম, সত্যকাম,
সেই দ্যুতি হিরণ্ময় পৌঁছলো আমার চরণ যুগলে
স্পর্শ করলে মাটি
অপাবৃত হলো ভূমি
স্বর্গ আর মর্ত্ত্য এক হয়ে গেলো
ইতরার ক্রোড়ে
মধুমৎ পৃথিবীর ধূলি
আর স্বর্গের দেবতা
আমার ভবন আর তোমার ভুবন
তোমার সৃষ্টি আর আমার দৃষ্টি।

শ্রীঅরবিন্দের Golden Light নামে কবিতার ছায়াবলম্বনে।

মেয়েদের কথা

হিন্দু মেয়েদের বিষয়ে উত্তরাধিকার—ভাল কি ?

শ্রীযম দত্ত

পূর্ব্বের একটি প্রবন্ধে ছেলে ও মেয়েতে তুল্যাংশে বিষয় পাইলে চাষ-বাসের কিরূপ অসুবিধা হয় তাহার আলোচনা করিয়াছি। আমাদের দেশের শতকরা ৭০ জন কৃষিজীবী বলিয়া আলোচনাটি কিছুটা বিস্তৃত হইয়াছে। অন্যান্য উপ-জীবিকারও বহু অসুবিধা হইবে। দুই একটির কথা উদাহরণ স্বরূপ দিব।

বাপের নৌকা আছে, জমি আছে, মাছ ধরিয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করে। বাপ মারা যাইলে নৌকার অর্দ্ধাংশ, জালের অর্দ্ধাংশ মেয়েরা পাইবে। ছেলেরা বাপকে সাহায্য করে ও নিজেদের পেট চালায়। বাপ মারা যাইলে নৌকার অর্দ্ধাংশ বোনেদের নিকট ভাড়া লইতে হইবে বা ভাড়া হিসাবে তাহাদের কিছু দিতে হইবে। নৌকার বছর বছর লাভ দেওয়া, রং করা ভাইয়েরাই করিবে—খরচা কে দিবে ? জাল ছিঁড়িয়া গেলে, ভাইয়েদেরই জাল মেরামত করিতে হইবে, অথচ পৈত্রিক জাল ব্যবহার করার দরুণ বোনেদের কিছুটা মুনাফা দিতে হইবে। আর তাহারা যদি নূতন জাল ফেলে,, তাহা হইলে পুরাতন জালের দরুণ কোন লাভ হইবে না।

গরুর গাড়ীর ব্যবসা সম্বন্ধেও অনুরূপ অসুবিধা। বাপের আছে একখানি গরুর গাড়ী ও একজোড়া বলদ। বাপ মারা যাইবার পর সমস্যা—কে বলদকে খাওয়াইবে ও মাল বহিবে। ভাইয়েরা বলদকে খাওয়াইবে ও পিঠে করিয়া বস্তা গাড়ীতে তুলিবে ও গাড়ীতে করিয়া মাল এখান থেকে ওখানে লইয়া যাইবে। বোনেদের পৈত্রিক গাড়ী ও বলদের জন্য একটা মুনাফা দিতে হইবে। আর বোনেরা (অর্থাৎ জামাইরা) যদি জোর করিয়া একটি বলদ লইয়া যায়, তাহা হইলে বাধ্য হইয়া ভাইয়েদের নয় আর একটি নূতন বলদ কিনিতে হইবে, নচেৎ ব্যবসা বন্ধ করিতে হইবে।

ছোট-খাট ব্যবসাতে অনুরূপ সমস্যার উদ্ভব হইবে। সীতারাম কাঁসারির বাসনের দোকান। কিছু বাসন কিনিয়া—কিছু বাসন ধারে আনিয়াছে। পুরাতন পিতল, কাঁসা কিনিয়া ও বিক্রয় করিয়া কিছু লাভ করে। সীতারাম হঠাৎ মারা যাইলে, মেয়েরা (অর্থাৎ জামাইরা) অর্দ্ধেক বাসন-কোসন ইত্যাদি ভাগ লইয়া গেল। দোকানে ছেলেরা বসে, এজন্য বাপের দেনা দিতে হইল। দোকান লাভের হইল না। দোকান তুলিয়া দিতে বাধ্য হইল। তাহারা এখন অন্য মহাজনের গদীতে চাকুরি করে।

এইরূপ বহু বিষয়ে বহু উদাহরণ দিতে পারা যায়।

কেহ কেহ বলেন যে মুসলমানদের মধ্যে মেয়েতে বিষয়ের ভাগ পায়। কৈ এইরূপ সাংঘাতিক ক্ষতি হইতে ত দেখি নাই ? এ বিষয়ে ক্ষুদ্র প্রবন্ধে সমস্ত বিষয়টি বিশদ আলেচেনা করা সম্ভব নহে—মোটামুটি কয়েকটি ইঙ্গিত দিবার চেষ্টা করিব। প্রথমেই জানা উচিত যে মুসলমানদের মধ্যে মেয়েতে ছেলের সমান সমান অংশ পায় না। ছেলে যাহা পায় মেয়ে তাহার অর্দ্ধেক পায়। আমার ২ ছেলে ও ২ মেয়ে। আমি হিন্দু হইলে আমার ত্যক্ত বিষয় ৪টি সমান ভাগে বিভক্ত হইবে। প্রত্যেক ছেলে।০ চারি আনা করিয়া পাইবে। আমি মুসলমান হইলে আমার ছেলেরা পাইবে।/০ সওয়া পাঁচ আনা করিয়া, আর মেয়েরা পাইবে ৵১০ দশ পয়সা করিয়া। পূর্ব্বে মেয়েতে আইনে যাহাই বিষয় থাকুক না কেন—বাপের ত্যক্ত বিষয়েতে বা চাষের জমীতে অংশ পাইত না। দেশাচার, লোকাচার বা বংশের আচার বলিয়া তাহাদের অংশ দেওয়া হইত না। মুসলমানদের মধ্যেও হিন্দুদের ন্যায় একান্নবর্ত্তী পরিবার প্রথা চালু আছে—এজন্য মেয়েতে বিষয় পাইবে না বলিয়া হাইকোর্টে বহু মামলা মোকর্দ্দমা হইয়াছে। এ কথা ঠিক্ যে গত ৭০।৮০ বছর যাবদ মেয়েতে তাহাদের মধ্যে সরিয়ত অনুযায়ী অংশ পাইতেছে।

এইরূপ মেয়েতে অংশ পাইবার দরুণ যে কু-ফল হয়, তাহার কতকটা উপশম হয় মুসলমানদের মধ্যে খুড়তুতো ভাই বোনে বিবাহ হওয়ার প্রথা থাকায়। মুসলমানদের মধ্যে একটি কথা চলিত আছে—"চাচা আপন চাচী পর ; চাচীর মেয়ে বিয়ে কর"। মামাতো পিসতুতো ভাই বোনের বিবাহ হয়। ফলে চাষের জমী ভাগ হইয়াও অনেকটা একই পরিবারের হাতে থাকে। জুম্মারের ২ ছেলেও ২ মেয়ে ; কালক্রমে ৮টি নাতি ও ৮টি নাত্‌নি হইল। নাতি নাত্‌নিদের মধ্যে বিবাহ হওয়ায় চাষের জমী ১৬ ভাগ না হইয়া ৮ ভাগ হইল। সব সময়ে যে এইরূপ হয় তাহা নহে। চাষের জমী টুক্‌রো টুক্‌রো হওয়ার কুফল খানিকটা কমে।

ইহা ছাড়া মুসলমানদের মধ্যে হক্‌সফার অধিকার আছে। 'দফাই-সরিক' একটি নির্দিষ্ট স্থান অধিকার করিয়া আছে তাঁহাদের ব্যবহার-শাস্ত্রে। 'তলব-ই-মওয়া্সিবাৎ' করিবার সময় খাদ টাকা দিতে হয় না—পরে দিলে চলে—তৎপরে এ বাবদ জমীদারী প্রথা ও বঙ্গীয় প্রজাসত্ব আইন বলবত ছিল। অনেক সময়ে মুসলমান ভাইয়েরা জমীদারের বা তাঁহার নায়েবের সহায়তায় বোনেদের ফাঁকি দিত। মুসলমান ভাইয়েরা ইচ্ছা করিয়া খাজনা বাকী ফেলিত ও নায়েবকে দিয়া নিজেদের নামে নালিস করাইল। বোনেরা ভিন্ন গ্রামে বিবাহ হওয়ায় দূরে থাকে। জমীদার

যাঁরা স্বাস্থ্য সম্বন্ধে সচেতন তাঁরা সবসময় লাইফবয় সাবান দিয়ে স্নান করেন।
খেলাধুলোই বলুন বা কাজকর্ম্মই বলুন আমরা কখনই ধুলোময়লার থেকে নিরাপদ নয়। আর ময়লা বহন করে রোগের বীজানু যা সবসময় আপনার স্বাস্থ্যের পক্ষে ক্ষতিকর। লাইফবয় সাবান এই বীজানুগুলি ধুয়ে সাফ করে দেয় এবং আপনার স্বাস্থ্য সুরক্ষিত রাখে।
প্রত্যেকদিন লাইফবয় সাবান দিয়ে স্নান করে আপনার স্বাস্থ্য সুরক্ষিত রাখুন—এটি আপনাকে এত ঝরঝরে করে তোলে।
LIFEBUOY
SOAP
LIFEBUOY SOAP
হিন্দুস্থান লিভার লিমিটেড, কর্তৃক প্রস্তুত।
L/P. 2-X52 BG
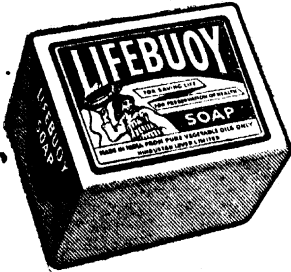
নালিসে বঙ্গীয় প্রজাস্বত্ব আইনের ১৪৬ (৩) (১) ধারা অনুসারে বোনেদের পক্ষভুক্ত করিতে বাধ্য নহেন। খাজনার ডিক্রীর দায়ে জমী-জমা নীলাম হইয়া গেলে ভাইয়েরা বেনামে ডাকিয়া লইল।

আরও অনেক রকমে বোনেদের সম্পূর্ণভাবে বা আংশিক ভাবে বঞ্চিত করা হইত। জরীপ-জমাবন্দী হইবার পর হইতে ফাঁকি দেওয়াটা পূর্ব্বের ন্যায় সহজসাধ্য না থাকিলেও ফাঁকি দেওয়া হইত।

সাধারণতঃ মুসলমানেরা পরিশ্রমী হওয়া সত্ত্বেও যে হিন্দুদের অপেক্ষা গরিব—তাহার একটি কারণ তাঁহাদের মধ্যে এইরূপে বিষয় বা চাষের জমী ভাগ। যখন ছয় আনা ইউনিয়ন রেট বা টেক্স দিলে লাট কাউন্সিলে ভোটের অধিকার হইত তখন মুসলমানেরা পূর্ব্ব-বঙ্গের উর্ব্বর জমীতে চাষ করিয়াও সমগ্র বাংলার জন সংখ্যার শতকরা ৫৫ ভাগ হইয়াও, ভোটারদের মধ্যে শতকরা ৪০ এর বেশী ছিলেন না। ইহার একমাত্র কারণ তাঁহাদের দারিদ্র্য। এ বিষয়ে বেশী বলা নিস্প্রয়োজন।

মুসলমানদের মধ্যে বাপের জীবদ্দশায় যদি কোনও ছেলে বা মেয়ে মারা যায় তাহা হইলে তাহার (অর্থাৎ মৃতের) ছেলেরা বা মেয়েরা ঠাকুরদাদার বিষয় পায় না। হিন্দুদের মধ্যে অনুরূপ অবস্থায় পৌত্রেরা তাহাদের বাপ যে অংশ পাইত সেই অংশ উত্তরাধিকার সূত্রে পাইত। এক্ষণে নব-সংহিতা অনুসারে পৌত্ররা বা পৌত্রীরা এবং দৌহিত্ররা বা দৌহিত্রীরা'ও তাহাদের বাপ বা মা বাঁচিয়া থাকিলে যে অংশ পাইত সেই অংশ পাইবে। ফলে আমাদের হিন্দুদের অবস্থা মুসলমানদের অপেক্ষাও দ্রুত পরিবর্ত্তনশীল বা শোচনীয়।

আবার কেহ কেহ বলেন যে ধরিয়া লইলাম যে চাষী বাপ মারা গেলে চাষের জমী ছেলে ও মেয়েদের মধ্যে ভাগ করা যাইবে। কিন্তু সেই সব ছেলেরা বিবাহ করিয়া আবার স্ত্রীর জমী পাইবে। ফলে 'হরে দরে হাঁটু জল।' স্ত্রীর জমী ভিন্ন গাঁয়ে বা দূরে থাকিলেও তাহা বিক্রয় করিয়া স্বামী নিজের গ্রামে স্ত্রীর নামে জমী কিনিবে। ফলে জমী একলপ্ত না হইলেও অনেকটা কাছাকাছি হইবে। জমীদারী প্রথা থাকায় জমী সহজে কিনিবার পক্ষে যে বাধা ছিল তাহাত এখন আর নাই। আবার জমী এক লাগন করা সম্বন্ধে সরকারের সাহায্য পাওয়া যাইবে। অন্যান্য উপজীবিকা সম্বন্ধেও অনুরূপ ব্যবস্থাদি করা যাইতে পারে। সব কথা স্বীকার করিয়া লইলেও ছেলে ও মেয়েতে বিষয় পাইবার ফলে কিছুটা লোকসান বা economic loss বা degredation হইবে। একটা অতি সহজ উদাহরণ দিয়া ব্যাপারটি বুঝাইবার চেষ্টা করিব।

বুঝাইবার আগে আমাদের দেশের একটি সামাজিক তথ্যের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করিব। বিবাহের সময়, কনের পিড়া তুলিবার সময়ে প্রশ্ন করা হয়—বর বড়? না ক'নে বড়? সাধারণতঃ স্বামী স্ত্রীর অপেক্ষা বড়। কত বছর বড়? এ বিষয়ে বাংলার ১৯২১ সালের সেন্সাস রিপোর্টে টমসন সাহেব গাণিতিক হিসাবে দেখাইয়াছেন যে স্বামী স্ত্রী অপেক্ষা ৮।০ বৎসরের বড়। এই হিসাব হিন্দু ও মুসলমান উভয়কে ধরিয়া। হিন্দুদের মধ্যে স্বামী ও স্ত্রীর বয়সের পার্থক্য গড়ে আরও বেশী। ক্রমে হয় ৩০ বছরে এই পার্থক্যের পরিবর্ত্তন হয় নাই।

রামবাবু ১৬০০০৲ টাকা রাখিয়া মারা গেলেন। তাঁহার ২ ছেলে ও ২ মেয়ে। প্রত্যেকে ৪,০০০৲ টাকা করিয়া পাইল। রামবাবুর বড় ছেলে শ্যাম ও ছোট যদু। দুই জনের মধ্যে বয়সের পার্থক্য ৫ বৎসর—বাঙ্গালীর গড় পার্থক্য। শ্যামের স্ত্রী শ্যাম অপেক্ষা ৮ বৎসরের ছোট। শ্যামের শ্বশুর রামবাবু অপেক্ষা ৮ বৎসরের ছোট হওয়া সম্ভব। শ্যামের শ্বশুর ৮ বৎসর বাদে মারা গেলে—তাঁহারও ২ ছেলে ও ২ মেয়ে এবং তিনিও রামবাবুর মতন ১৬,০০০৲ টাকা রাখিয়া গেলেন—শ্যামের স্ত্রী ৪০০০৲ টাকা পাইল। এইরূপে যদুর শ্বশুর ১৩ বছর বাদে মারা যাইলে যদুর স্ত্রীও ঐরূপ ৪,০০০৲ টাকা পাইল।

এইরূপে শ্যাম বাপের দরুণ ৪০০০৲ টাকা ও প্রত্যেকের দরুণ স্ত্রী মারফত ৪০০০৲ টাকা একুনে ৮০০০৲ পাইল। যদুও ঐরূপ ৮০০০৲ টাকা পাইল। বলিতে পারেন শ্যাম ও যদুর বোনেতে বিষয়ের অংশ পাওয়ায় লোক্সান কোথায়?

পূর্ব্বেকার আইন অনুসারে, রামবাবুর মৃত্যুর পর শ্যাম ও যদু প্রত্যেকেই ৮০০০৲ টাকা পাইত। এক্ষণে স্বামী ও স্ত্রীকে এক ও অভিন্ন ধরিয়া শ্যাম পাইল সেই পরিমাণ টাকা—২ দফায়—রামবাবুর মৃত্যুতে ও তাহার ৮ বৎসর পরে শ্বশুরের মৃত্যুতে। ৪০০০৲ টাকার উপর ৮ বৎসরের সুদ নষ্ট হইল। কোম্পানীর কাগজের সুদের হার শতকরা ৩॥০ টাকা ধরিলে শ্যামের লোকসান হইল শতকরা ২৮৲ টাকা। আর যদুর লোকসান হইল ১৩ বছরে শতকরা ৪৫॥০ টাকা। কাজেই বোনেরা বিষয় পাওয়াতে স্ব স্ব স্ত্রীরা বিষয় পাওয়াতে ভায়েদের লাভ হইল না। বেশ কিছুটা—গড়ে শতকরা ৩৭৲ টাকা আন্দাজ লোকসান হইল।

আরও এক কারণে লোকের মনে অসন্তোষ বৃদ্ধি পাইবে ও কিছুটা আয়ের অনুপাতে বেশী ব্যয় হইবে। রামবাবুর আয় মাসিক ৫০০৲ টাকা, তিনি ছেলেদের ও পৌত্রদের এই আয় অনুযায়ী 'মানুষ' করিতেন। এখন শ্যাম ও যদুর আয় অর্দ্ধেক হইয়া গেল; তাহাদের পক্ষে পূর্ব্বের চালে ছেলে 'মানুষ' করা সম্ভব নহে। ব্যয় সঙ্কোচ করিতে হইবে; কিন্তু হঠাৎ ব্যয় সঙ্কোচ করা চলে না। কিছুটা ও কিছুদিন আয়ের অনুপাতে ব্যয় বেশী হইবে ও রামবাবুর নাতিদের মনে ব্যয়-সঙ্কোচের ফলে অসন্তোষ বৃদ্ধি পাইবে। বার্ণার্ড শ'য়ের ভাষায়—

"If a married couple with fifty thousand a year have five children, they can leave only ten thousand a year to each after bringing them up to live at the rate of fifty thousand, and launcliug them in to the soil of society that lives at that rate, the result being that unless these children can make rich marriages they live beyond their incomes (not knowing how to live cheaply) and are presently head over ears in debt."

বসতবাটীর সমস্যা আরও জটিল। আমাদের গরিবের দেশে অনেকেরই চালা ঘর। রাম কয়েকখানি চালা ঘর রাখিয়া মারা গেল—

বাবরের আত্মকথা

শ্রীশচীন্দ্রলাল রায়

মোগল সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা বাবর আত্মচরিত লেখন তাঁর মাতৃ ভাষা তুর্কিতে। এর অনুবাদ হয় ফার্সি ভাষায় একাধিকবার। পরে অবশ্য পাশ্চাত্যের নানা ভাষায় এই অদ্ভুত আত্মচরিতের অনুবাদ হয়েছে। ইংরাজীতে এর অনুবাদ করেন জন লিডেন (John Leyden) এবং উইলিয়াম আর্সকিন্ (William Ershine) এবং সে বই ১৮২৬ সালে প্রকাশিত হয়। তারপর অনেকদিন আর এ বই পুনঃ প্রকাশিত হয় নি। এই মহামূল্য আত্মচরিতের কথা বিস্মৃতির অতল তলে ডুবে যায়। ইংরাজী অনুবাদক দুইজনের সূত্র ধরে আর একটি সংক্ষিপ্ত অনুবাদ বের করেন—লেফটেনেণ্ট কর্ণেল এফ, জি, টালবট্, (F. G Talbot)। বইখানি ১৯০৯ সালে প্রকাশিত হয়। এর পর আর কোনও ইংরাজী অনুবাদ বের হয়েছে কিনা জানা যায় নি।—

বাবরকে আমরা জানি এক দুর্দ্ধর্ষ যুদ্ধ-বিশারদ ব'লে—যিনি তাঁর বাহুবলে ভারত আক্রমণ করেন এবং বারবার পর্যুদস্ত হয়েও শেষে এ দেশ জয় করেন ও ভারতে বিশাল মোগল সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠার গৌরব লাভ করেন। ইতিহাস পাঠে অবশ্য তাঁর শৌর্য্য বীর্য্যের কথা, তাঁর অদম্য অধ্যবসায়ের কথা, ছলে বলে কৌশলে রাজ্য জয়ের কথা, ধর্ম্মে গোঁড়ামির আতিশয্যের কথা এমন কি তাঁর সন্তান বাৎসল্যের কথা জানা যায়—কিন্তু সমগ্রভাবে তাঁর জীবন দর্শন জানতে হলে তাঁর নিজের লেখা আত্মচরিতের শরণাপন্ন হতেই হবে।

ষ্টানিলি লেন্-পুল (Mr. Staniley Lanepoole) তাঁর 'বাবর' গ্রন্থের ভূমিকায় এই আত্মচরিত সম্বন্ধে লিখেছেন যে এই আত্মচরিতে জগতের তদানীন্তন কালের একজন সুশিক্ষিত কৃষ্টিসম্পন্ন ব্যক্তির নিজস্ব ভাবধারার এবং সূক্ষ্ম অনুভূতির পরিচয় পাওয়া যায়। তিনি নানা প্রাচ্য ভাষায় পণ্ডিত ছিলেন, তাঁর দৃষ্টিভঙ্গী স্বচ্ছ ছিল, পারিপার্শ্বিক ঘটনাবলীর ফলাফল তিনি সঠিক অনুধাবন করতে পারতেন। মানব চরিত্র বিশ্লেষণে তিনি পারদর্শী ছিলেন। প্রাকৃতিক দৃশ্যে মোহিত হওয়ার মত তাঁর মন ছিল। তাঁর নিজের ধ্যান ধারণার ভাবনা চিন্তা এবং নানা ঘটনাবলীর বিবরণ প্রত্যক্ষদর্শী হিসাবে তিনি সুষ্ঠু ও জোরালো ভাষায় লিপিবদ্ধ করে গিয়েছেন। তাঁর লেখার মধ্যে বীর দৃষ্টিভঙ্গী এবং মনের ভাবনাগুলি জীবন্ত হয়ে ফুটে উঠেছে। বাবরের সংসার মুক্ত বলিষ্ঠ আশাবাদী মনের পরিচয় তাঁর আত্মচরিত থেকেই আমরা পাই। নিজেকেও বিশ্লেষণ করে দেখিয়েছেন তাঁর লেখার মধ্যে। নিজের ত্রুটি বিচ্যুতি, দোষগুণ অকুণ্ঠ সততার সঙ্গে তিনি লিপিবদ্ধ করে গিয়েছেন। তাঁর আত্মচরিত সমকালীন ঘটনার প্রকৃত বিবরণ; এতে সন্দেহ করবার কিছু নাই।

লেন্-পুল আরও বলেছেন—কখন এবং কি ভাবে বাবর আত্মচরিত লেখেন তা বলা কঠিন। তবে তিনি যে নিয়মিতভাবে লেখেন নি একথা আত্মচরিত পড়লে বোঝা যায়। তিনি এক সময় লেখা সুরু করেন আবার থেমে যান। হয়তো সুযোগ সুবিধা পেয়ে আবার লিখতে সুরু করেন। এটা বোঝা যায় তাঁর লেখার ধরণ দেখে। তিনি ঘটনা লিপিবদ্ধ করতে করতে হঠাৎ স্তব্ধ হয়ে গিয়েছেন—সেটা শেষ না করেই আবার অন্যসূত্র ধরে আরম্ভ করেছেন কয়েক বছর পর—যার কৈফিয়ৎ তিনি লেখার মধ্যে দেন নি। প্রথম দিকের লেখার ভঙ্গী শেষের দিকের লেখা থেকে পৃথক। এটা বোঝা যায় যে প্রথম দিকের লেখা অনেক পরে অদল বদল করেছেন। অনুমান করা যায় এই আত্মচরিত বিভিন্ন সময়ে লেখা এবং আগেকার লেখা ভারত অভিযানের পর সংশোধন করেছেন। তখন পুর্ব্বস্মৃতি ঝাপসা হয়ে যাওয়ার জন্যই হোক কিংবা সময়ের অভাবের জন্যই হোক, ভিন্ন সূত্রগুলি আর তিনি জোড়া লাগাতে পারেন নি।

লেন্-পুল আরও বলেছেন—বাবরের আত্মচরিত একাধিকবার তুর্কি থেকে ফারসী ভাষায় অনুদিত হয়েছে। তুর্কি ও ফারসী ভাষায় অনেকগুলি হস্তলিপি বিচার করে দেখা গিয়েছে যে আসল পুঁথির সঙ্গে কোনও গরমিল নাই এবং কোনও কিছু প্রক্ষিপ্ত করার বিন্দুমাত্রও চেষ্টা হয়নি। এই বিখ্যাত আত্মচরিতের অসংখ্য বার অনুবাদ হলেও মূলের কোনও বিকৃতি হয় নি—যা সাধারণতঃ অনুবাদ করতে গেলে ঘটে থাকে। ষোড়শ শতাব্দীর প্রারম্ভে এসিয়া মহাদেশের প্রসিদ্ধ এবং আকর্ষণীয় ব্যক্তিত্বের অধিকারী একজন বীরপুরুষের লেখা আত্মজীবনী অপরিবর্ত্তিত ভাবেই আমাদের হাতে পৌঁছেচে। মোগল সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠাতার বংশ গরিমা অনেক দিন লুপ্ত হয়েছে, কিন্তু তাঁর লেখা আত্মচরিতের মর্য্যাদা কালজয়ী, তা নষ্ট হবার নয়।

মিষ্টার ট্যালবট বলেছেন—বাবরের আত্মচরিত শ্রেষ্ঠ অগাষ্টাইন ও রুসোর এবং গিবন ও নিউটনের আত্মকাহিনীর সমপর্য্যায় ভুক্ত। এসিয়ায় এর জুড়ি নেই।

ভারতে মোগল সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা বাবর এসিয়া মহাদেশ বিধ্বংসীকারী তৈমুরের অধস্তন ষষ্ঠ পুরুষ এবং মাতৃকুলের দিকে আর এক ধ্বংসলীলার অধিনায়ক চেনগিজখাঁয়ের সঙ্গে তাঁর সম্বন্ধ। বিস্ময়ের কথা—কেন তাঁকে এবং তাঁর উত্তরাধিকারীগণকে মোগল বংশ প্রসূত বলা হয়। তাঁর মাতৃকুল মোগল হলেও পিতৃকুল মোগল নয়। তিনি নিজেও মোগল জাতিকে ঘৃণা করে এসেছেন। তবে চেনগিজখানের সময় থেকে উত্তর দিক দিয়ে যারাই ভারত আক্রমণ করেছে—তারাই মোগল বলে পরিচিত হয়েছে।

বাবর তাঁর পিতার মৃত্যুর পর মাত্র বার বৎসর বয়সে ফারগানার

সিংহাসনে বসেন। পারস্যের পূর্ব সীমান্তে এই ক্ষুদ্র রাজ্য। রাজধানী ছিল আন্দেজান। রাজা হবার পর ভারত জয় পর্য্যন্ত মোটামুটি সব ঘটনাই আত্মচরিতে লিপিবদ্ধ করেছেন তিনি।

বাবর ছিলেন একাধারে বীর সৈনিক ও সুচতুর রাজনীতিবিদ্। শুধু তাই নয়—তিনি ছিলেন দার্শনিক এবং কবি। ফরাসী ভাষায় লেখা তাঁর কবিতাগুলি সুন্দর। তুর্কি ভাষাতে গদ্য ও পদ্য রচনায় প্রতিভার স্বাক্ষর রেখে গিয়েছেন তিনি। তিনি শিকারে পারদর্শী ছিলেন। উদ্যান-রচনায় তাঁর অনেক অর্থ ও সময় ব্যয় হতো। তিনি পুষ্প-বিলাসী ছিলেন। যুদ্ধক্ষেত্র থেকে ফিরে এসেই অনেক সময় ফুলের বাগানে প্রবেশ করতেন এবং একেবারে অন্য মানুষ হয়ে যেতেন। তাঁর লেখায় যুদ্ধ-ক্ষেত্রের বর্ণনার পাশেই ফুলের বিবরণ দেখা যায়।

তাঁর পরিবার পরিজনের প্রতি ব্যবহার প্রীতিপূর্ণ ছিল। বীর ছিলেন, কিন্তু নির্মম ছিলেন না তিনি। শত্রুকেও তিনি ক্ষমা করতে জানতেন। প্রবল সন্তান-বাৎসল্য তাঁর চরিত্রের একটি বিশেষত্ব। নিজের জীবনের বিনিময়ে তিনি ভগবানের কাছে পুত্র হুমায়ুনের রোগমুক্তি কামনা করেন। জনশ্রুতি তাঁর এই প্রার্থনার ফলে হুমায়ুন আরোগ্য লাভ করেন। কিন্তু বাবরকে মৃত্যু বরণ করতে হয়।

১৪৯৪ খৃষ্টাব্দে রমজান মাসে আমার বার বৎসর বয়সে ফারগাণার রাজা হই।

ফারগাণা জন-অধ্যুষিত পৃথিবীর প্রান্ত সীমায় অবস্থিত। এই রাজ্যের আয়তন ক্ষুদ্র—পশ্চিম দিক ভিন্ন অন্য তিনদিকই পাহাড় দিয়ে ঘেরা।

ফল আর শস্যে ভরা এই দেশ। এখানে আঙ্গুর আর খুবানী পর্য্যন্ত ফলে এবং স্বাদেও চমৎকার। ডালিম আর ফুটির জন্য এ দেশ বিখ্যাত। এখানকার লোকের খুবানীর বীচি বের করে অদ্ভুত কায়দায় সেই জায়গায় বাদাম ভরে দেয়—যা খেতে অত্যন্ত সুস্বাদু।

স্রোতস্বতী নদীর জলে ধৌত হয়ে এদেশের মাটি সরস। বসন্তকালে এ দেশ নয়নাভিরাম হয়ে ওঠে।

নদীর তীরে তীরে অসংখ্য উদ্যান—সেখানে ফোটে অজস্র মল্লিকা আর গোলাপ। গাছের ছায়ায় ঘেরা বাগানে পথিকেরা বিশ্রাম করতে ভালবাসে। বাগানগুলি যেন রং-বেরং-এর গালিচায় মোড়া।

পাখী আর শিকারের পশু এখানে পর্য্যাপ্ত। এ দেশের ফেজান্ট (Pheasant) পাখী এমন বড় যে এর মাংসে চার জন লোকও খেয়ে শেষ করতে পারে না। মৃগ মাংসের স্বাদ চমৎকার।

ভাল শিকারের দেশ এটি। শ্বেত হরিণ, পাহাড়ি ছাগল, লাল হরিণ আর খরগোস এখানে যথেষ্ট দেখা যায়। শিকারীদের ভাল শিকারের সুযোগ আছে এখানে।

পাহাড়ে আছে টারকুওইসিদের (terquoises) খনি। সমতল-ভূমির লোক বেগুনী কাপড় বোনে।

ফারগাণার আদায়ী রাজস্বে অনায়াসে চার হাজার সেনা রাখা চলে। আমার পিতা ওমর সেখ মির্জ্জা উচ্চাভিলাষী রাজা ছিলেন। জম-কালো জীবন যাপনের দিকে তাঁর ঝোঁক ছিল। রাজ্যজয়ের কোনও না কোনও পরিকল্পনা তাঁর মাথায় ঘুরতো। সমরকন্দ বিজয়ের জন্য তিনি বারবার আক্রমণ করেছেন এবং প্রত্যেকবারই পরাস্ত হয়েছেন।

১৪৯৪ খ্রীষ্টাব্দে সুলতান মহম্মদ সা এবং সুলতান আমেদ মির্জ্জা তাঁর আচরণে বিক্ষুব্ধ হয়ে একজোট হলেন। পিতার রাজ্যের বিরুদ্ধে একজন আক্রমণ চালালেন উত্তরদিক থেকে—আর একজন দক্ষিণ দিক থেকে।

এমনি সময়ে এক দুর্ঘটনা ঘটলো। আখ্‌সি দুর্গ খাড়া পাহাড়ের ওপর। কিনারায় কয়েকটি বাড়ীও তৈরী করেছিলেন আমার পিতা।

১৪৯৪ খ্রীষ্টাব্দে রমজানের চার তারিখে বাবা তাঁর পায়রাদের খাওয়ানোর কাজে ব্যস্ত ছিলেন। হঠাৎ তাঁর পায়ের নীচের পাটাতন সরে গেল। যার ফলে পাহাড়ের মাথা থেকে খাঁচা সমেত পায়রা নিয়ে তিনি ছিটকে পড়লেন একেবারে পাহাড়ের তলে—আর তাঁর পেয়ারের পায়রাদের নিয়েই পরপারের যাত্রী হলেন তিনি।

বাবা ছিলেন খর্বাকৃতি কিন্তু মোটা-সোটা। তাঁর দাড়ি ছিল খাটো কিন্তু ঘন। তিনি ল্যাঙ্গোট পরতেন খুব আঁটসাট করে। কোমর দস্তুরমত সঙ্কোচ করে তিনি ফিতে বাঁধতেন। তারপর কোমর ফুলে ওঠার সঙ্গে সঙ্গে অনেক সময় ফিতে ছিঁড়ে যেত। খাওয়ার জিনিষ কিংবা পোষাকের দিকে তাঁর বিশেষ কোনও নজর ছিল না। নিভাঁজ পাগড়ি পরতেন তিনি। পাগড়ির প্রান্ত ভাগ ঝুলে থাকতো। তিনি উদার চরিত্রের লোক ছিলেন। তাঁর অন্তর ছিল মহান, অথচ তিনি অত্যন্ত সাহসী ও ব্যক্তিত্বসম্পন্ন লোক ছিলেন। ধনুর্বিদ্যায় তাঁর মাঝারি ধরণের নিপুণতা ছিল। কিন্তু তাঁর হাতের কব্জির জোর ছিল অসাধারণ। তাঁর মুষ্ঠাঘাতে ভূমিশয্যা নেয়নি এমন লোক বিরল ছিল।

তিনি মানুষের মত মানুষ ছিলেন। পাশা খেলতে তিনি ভাল-বাসতেন।

তাঁর তিন ছেলে, পাঁচ মেয়ে। ছেলেদের মধ্যে আমি মহম্মদ বাবর ছিলাম বড়।

আমার মায়ের নাম কুতলক খানুম।

*　　*　　*　　*

তাঁর আমিরদের মধ্যে একজনের নাম তাইমুর তাস্। গৃহস্থালী পরিচালনার ব্যাপারে তিনিই ছিলেন প্রধান কর্ম্মকর্ত্তা। তাঁর বয়স ছিল বছর পঁচিশের মত। অল্পবয়স হলেও তাঁর কাজের রীতি, ব্যবস্থা ও নিয়ম কানুন ছিল ত্রুটিহীন। দুই বছর পরে এক যুদ্ধে তিনি মারা যান। তাঁর মৃত্যু সংবাদ জরুরী জানানো দরকার বলে সংবাদবাহক পঁচিশ মাইল পথ চারদিনে নিয়ে আসে।

তাঁর আর একজন আমিরের নাম হাফেজ বেগ। আমি যখন কাবুল অধিকার করি তার আগে মক্কা তীর্থের উদ্দেশে যাত্রা করেন তিনি। কিন্তু পথেই তিনি আল্লার ডাকে ইহলোক ছেড়ে চলে যান। তিনি সাদাসিদে, নিরহঙ্কার এবং অল্প কথার লোক ছিলেন। তাঁর জ্ঞান খুব গভীর ছিল না।

হুসেন বেগ ছিলেন আমুদে, সরল লোক। সুরাপান ও মজলিসে গান করে তিনি সকলকে মাতিয়ে তুলতেন।

মজিদ বেগ প্রথমে আমাকে দেখা শোনার ভার পান। তাঁর ব্যবস্থাপনা ও শৃঙ্খলা খুব উঁচুদরের ছিল। আমার বাবার কাছে তাঁর মত খাতির আর কেউ পান নি। কিন্তু তিনি অতি নীচুস্তরের, কামাসক্ত পুরুষ ছিলেন।

আলি মজিদ ছিলেন আর একজন আমির। তিনি ছিলেন কামুক, বিশ্বাসঘাতক, অপদার্থ, ভণ্ড।

আর একজন ছিলেন হাসান ইয়াকুব। স্পষ্টবাদী, চতুর এবং কর্ম্মঠ ছিলেন তিনি। তিনি কবিতা লিখতে পারতেন। তিনি ছিলেন ভাল তীরন্দাজ। পোলো ও খেলায় তিনি ওস্তাদ ছিলেন। বাবার মৃত্যুর পর আমার গৃহস্থালি পরিচালানার কর্ত্তা হন তিনি। কিন্তু তাঁর অন্তর ছিল সঙ্কীর্ণ, কাজে নিপুণতারও অভাব ছিল। ঝগড়া বিবাদ বাধিয়ে দিতেও ওস্তাদ ছিলেন তিনি।

হাসান বেগের পর কাসিম বেগ আমার গৃহস্থালী পরিচালনার ভার পান। যতদিন তিনি বেঁচে ছিলেন তাঁর ওপর আমার শ্রদ্ধা এবং সেই সঙ্গে তাঁর ক্ষমতাও বাধাহীন ভাবে বেড়ে গিয়েছিলো। তিনি খুব সাহসী ছিলেন। একদল উজবেক্ যখন লুটপাট করে এ দেশ থেকে ফিরে যাচ্ছিল তখন পিছু ধাওয়া করে তাদের ধরে ফেলেন এবং তাদের ভীষণভাবে পরাস্ত করেন। তরবারি চালনায় তাঁর খ্যাতি ছিল। আমি কাবুলে ফিরে যাওয়ার পর তাঁকে আমার পুত্র হুমায়ুনের গভর্ণর পদে নিযুক্ত করি। আমি যখন জেমিন্ অধিকার করি সেই সময় আল্লা তাঁকে কাছে টেনে নেন। তিনি ধাম্মিক এবং সৎ মোসলেম ছিলেন। সন্দেহজনক মাংস তিনি কখনও খেতেন না। তাঁর বিচারবুদ্ধি প্রগাঢ় ছিল। তিনি আমুদে লোক ছিলেন। তিনি নিরক্ষর হলেও তাঁর উঁচুদরের কৌতুক-প্রবণতা তাঁর অসাধারণ বুদ্ধির পরিচয় দিত।

আর একজন ছিলেন বাবা কুলি বেগ। তিনি পরে আমার গভর্ণর পদে নিযুক্ত হন। তাঁর অধীনে সৈন্য বেশ ভালভাবে রাখতেন। তাদের পোষাক এবং সাজসরঞ্জাম খুব সুন্দর ছিল। ভৃত্যদের ওপর তাঁর কড়া নজর ছিল। কিন্তু নমাজ পড়া কিংবা রোজা করার ধার ধারতেন না তিনি। তিনি ক্রূরপ্রকৃতির লোক ছিলেন। তাঁর সমস্ত আচার ব্যবহারে নাস্তিকতাই প্রকাশ পেত।

আর একজন আমিরের নাম ছিল আলিদোস্ত তাঘাই। তিনি আমার মাতামহী ইয়ান-দেলিত বেগমের আত্মীয় ছিলেন। আমাকে বলা হয় যে তিনি খুব কাজের লোক হবেন। তিনি আমার অনুগ্রহভাজন ছিলেন। কিন্তু যে কয় বছর তিনি আমার কাছে ছিলেন, আমি বলতে পারিনে তিনি আমার কি কাজ করেছেন। তিনি যাদুবিদ্যা জানেন এই রকম ভান করতেন। তিনি ভাল শিকারী ছিলেন। তাঁর ব্যবহার ছিল কর্কশ। তিনি ছিলেন—নীচ, কুচক্রী, অকৃতজ্ঞ, হামবড়া, রূঢ়-ভাষী এবং কুদর্শন।

আর একজনের নাম লাখারি। তীক্ষ্ণবুদ্ধিসম্পন্ন ছিলেন তিনি, কিন্তু মাঝে মাঝে ঝগড়া বিবাদের দিকে তাঁর ঝোঁক দেখা যেত।

মির খিয়াস্ তাঘাই খুব কৌতুক প্রিয় এবং ফূর্ত্তিবাজ হলেও বেপরোয়া কামুক প্রকৃতির লোক ছিলেন।

খোরাসানবাসী আলিফর বেশ সাহসী ছিলেন। নাস্তালিক লিপিতে এক বিশেষ ভঙ্গিতে তাঁর লেখার অভ্যাস ছিল। কিন্তু তিনি অত্যন্ত খোসামুদে, নীচ প্রকৃতি এবং কঞ্জুস ছিলেন।

কামবার আলি মোগল ছিলেন আর একজন। তাঁর বাবা কিছুদিন এদেশে চামড়ার ব্যবসা করেন। সেই জন্য তাঁকে চামড়াওয়ালার ব্যাটা বলে লোকে ডাকতো। আমার কাছে অনেক অনুগ্রহ পেয়েছিলেন তিনি। যতদিন তাঁর পদবৃদ্ধি না হয় ততদিন তাঁর স্বভাব ছিল অতি সুন্দর। কিন্তু কিছুটা পদবৃদ্ধি হওয়ার পর তিনি কর্ত্তব্যে উদাসীন এবং বেয়াড়া মেজাজী হয়েছিলেন। তিনি কথা বলতেন বেশী যার বেশীর ভাগই বাজে, অর্থহীন! প্রকৃতপক্ষে যারা বেশী কথা বলে তারা প্রায়ই নির্বোধের মত কথা বলে। তাঁর কর্ম্মপটুতার অভাব ছিল এবং তাঁর মস্তিষ্কেও বিশেষ পদার্থ ছিলনা।

যখন বাবা দুর্ঘটনার প্রাণ হারাণ, সে সময় আমি আন্দেজানের উত্থান-প্রাসাদে ছিলাম। রমজান মাসের পাঁচ তারিখে মঙ্গলবারে এই আন্দেজানে পৌঁছি। যে সব সেপাই আমার কাছাকাছি ছিল তাদের নিয়ে দুর্গরক্ষার জন্য ঘোড়ায় চড়ে বেরিয়ে পড়লাম। মির্জ্জা ফটকে পৌঁছতেই সিরাম তখনই আমার ঘোড়ার লাগাম ধরে একপাশে ফাঁকা জায়গায় নিয়ে গেলেন। তাঁর মনে এই সন্দেহ হয় যে সুলতান মির্জ্জার মত পরাক্রান্ত রাজা যখন দুর্দ্ধর্ষ সৈন্য নিয়ে এই দিকে আসছেন তখন হয়তো আন্দেজানের আমিররা আমাকে আর এই দেশকে তাঁর হাতে সমর্পন করবে। তার ইচ্ছা ছিল আমাকে উরকেন্দে নিয়ে যাবেন। কারণ, সে জায়গা পাহাড়ে ঘেরা। দেশ শত্রুর হাতে চলে গেলেও আমি তার হাতে পড়বো না আর সেখান থেকে আমার মামা ইলচে খাঁর কাছে যেতে পারবো।

যে সব কাজি এবং আমিররা দুর্গ প্রাসাদে ছিলেন তাঁরা আমাদের উদ্দেশ্য জানতে পেরে আমাদের আশঙ্কা দূর করার জন্য একজন বিশ্বস্ত লোক পাঠালেন। সে আমাদের ধরে ফেললো। ঘোড়ার মুখ ফিরিয়ে আমাদের দুর্গের মধ্যে নিয়ে গেল। আমি ঘোড়া থেকে নামলাম। খাজা কাজি এবং আমিররা আমার সামনেই আলোচনা সুরু করলেন। তাঁরা আলোচনা করে স্থির করলেন যে এই দুর্গ সুরক্ষিত করার সব ব্যবস্থা করতে হবে। শত্রুর আক্রমন যে কেনও উপায়ে প্রতিরোধ করতেই হবে। হাসান ইয়াকুব, কাসিম এবং আর কয়েকজন আমির বাইরে ছিলেন। তাঁরা ফিরে এসে আমার কাজে যোগদান করলেন। সবাই এক দিল্ হয়ে দুর্গরক্ষার কাজে লেগে গেলেন।

সুলতান আমেদ মির্জ্জা খোজেন্দ জয় করে আরও অগ্রসর হয়ে আন্দেজানের আট মাইলের মধ্যে এসে শিবির স্থাপন করলেন। এই সময় দরবেশ গ নামে আন্দেজানের একজন মাতব্বর লোককে রাজদ্রোহ-

কর উক্তির জন্য প্রাণদণ্ড দেওয়া হলো। এই ব্যাপার দেখে আর সব অধিবাসী প্রাণের ভয়ে অনুগত থাকতে বাধ্য হলো।
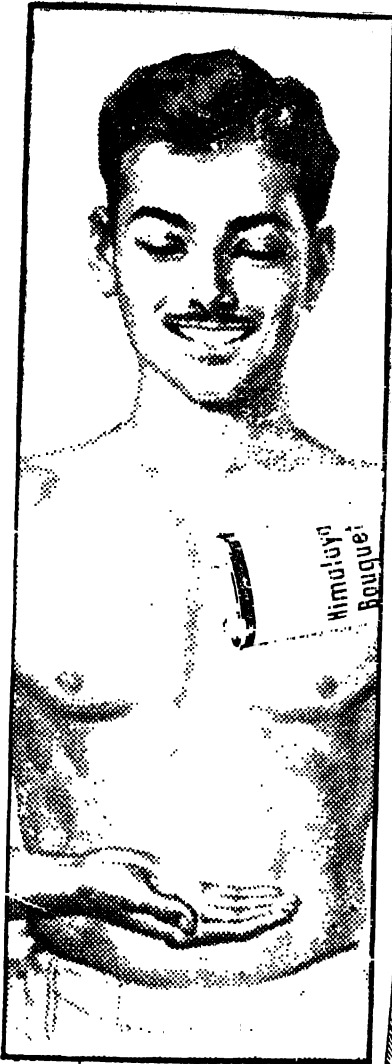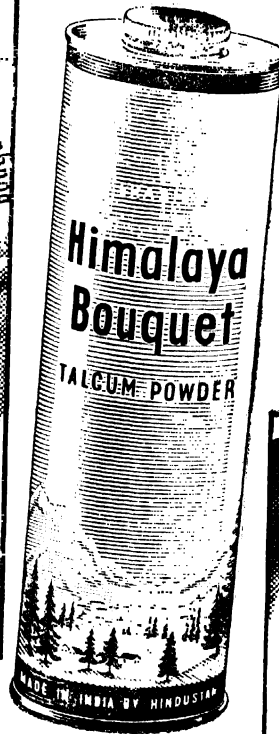
এরপর আমি সুলতান আমেদ মির্জ্জার কাছে দূতের মারফৎ এক চিঠি পাঠাই। তাতে লিখেছিলাম —জনাব, আপনি এই দেশ জয় করে আপনারই কোনও কর্ম্মচারীর ওপর এর শাসন ভার অর্পন করবেন। আমি তো আপনারই আপনজন এবং সম্বন্ধে ভ্রাতুস্পুত্র। আমাকে বিশ্বাস করে যদি এই কাজের ভার দেন তাহলে আপনার মনোবাসনা কি খুব সহজ ও সুন্দর ভাবে সিদ্ধ হবে না?

সুলতান আমেদ মির্জ্জা দুর্ব্বল দুর্জ্জন প্রকৃতির মানুষ। তিনি সব সময়েই তাঁর অনুগত আমিরদের কথায় সায় দিয়ে চলতেন। আমার প্রস্তাব তাঁদের মনঃপুত হলোনা। সুতরাং আমি পেলাম কর্কশ ভাষায় উত্তর। তিনি সসৈন্যে অগ্রসর হতে লাগলেন। কিন্তু যে সর্ব্বশক্তিমান, করুণাময় পরমেশ্বর আমার মনের অভিলাষ পার্থিব শক্তির সাহায্য ছাড়াই বরাবর পুরণ করে এসেছেন তিনিই আমার সহায় হলেন। তিনি এমন অঘটন ঘটালেন যাতে শত্রুপক্ষ বিষম বিপর্য্যয়ের মধ্যে পড়লো, তাদের অভিযান রুদ্ধ হলো। তাদের এত উদ্যম ফলপ্রসূ না হওয়ায় ভাগ্যেকে ধিক্কার দিতে দিতে ফিরতে বাধ্য হলো।

তাদের বিপর্য্যয়ের কারণের মধ্যে প্রথমটা হলো এই। কাবা নদীর কালো জল বিষাক্ত। জলে নেমে কেউ পার হতে পারেনা। নদীটি চওড়ায় খুব ছোট। সাঁকো দিয়ে পার হবার ব্যবস্থা আছে। শত্রুপক্ষের সেনা তাড়াতাড়ি পার হওয়ার জন্য সাঁকোর ওপর এমন ভিড় করলো যে তাদের সঙ্গের অনেক উট আর ঘোড়া সাঁকো থেকে জলে পড়ে গেল আর প্রাণ হারালো। তিনি চার বছর এক যুদ্ধে ভীষণ ভাবে পর্য্যুদস্ত হয়ে ছিলেন। এবারকার এই বিপদ তাদের সেই আগেকার কথা স্মরণ করিয়ে দিল এবং তারা ভাবী বিপদের আশঙ্কায় আতঙ্কিত হয়ে উঠ্‌লো। দ্বিতীয় কারণ এই সময়েই তাদের ঘোড়াগুলো এক গুরুতর রোগে আক্রান্ত হয়ে বেশীর ভাগই মরতে লাগলো। তৃতীয় কারণ তারা দেখতে পেলো আমার সেনা ও প্রজাদের ঐক্য ও স্থির প্রতিজ্ঞা। তারা বুঝতে পেরেছিল আমার সৈন্যরা দেহের শেষ রক্তবিন্দু দিয়ে জীবন উৎসর্গ করবে কিন্তু কখনও এ দেশের মাটি শত্রুর পদানত হতে দেবোনা। আন্দেজানের এক মাইলের মধ্যে এসেও তারা এইসব ব্যাপারে আতঙ্কিত হয়ে তাদের তরফ থেকে মহম্মদ তেরখানকে দূত হিসাবে পাঠায়। আমাদের তরফ থেকে দূত হিসাবে। দুর্গ থেকে খান হাসান ইয়াকুব। দুই দূতের আলোচনার পর কোনও রকমের একটা শান্তি-চুক্তি স্থির করা হলো, যার ফলে অবিলম্বে শত্রুপক্ষ এদেশ ছেড়ে চলে গেল।

(পূর্বপ্রকাশিতের পর)

নিমির ঘোমটা টানার চেষ্টা দেখে শৈলবালা সস্নেহে ধমকে উঠল—হয়েছে, আর ঘোমটা টানতে হবে না এখন। আর কী হবে ?

নিমি হাঁপাতে হাঁপাতে বলল, না।

মুখ ধুয়ে নিমি প্রায় টলতে টলতে ঘরে ঢুকল। কাৎ হ'য়ে এলিয়ে শুয়ে পড়ল বিছানায়।

অভয় না জিজ্ঞেস ক'রে পারল না, কতদিন হয়েছে মা ?

শৈলবালা বলল—হিসেব যা দিলে,তাতে তো তিন মাস উৎরে যাবার সময় হল।

অভয়ের চোখের সামনে অদ্ভুত একটি মূর্তি ভাসতে লাগল।

ছোট্ট, খুব ছোট্ট, তার ডিপার্টমেন্টের স্কেলের মাপের তিন চার ইঞ্চি একটি মানুষের বাচ্চার অবয়ব ভেসে উঠল তার চোখের সামনে। বিচিত্র কল্পনায় ও বিস্ময়ে সে অভিভূত হ'য়ে পড়তে লাগল। যেন জীবনে সে এই প্রথম বিশ্বাস করল, অবাক হ'য়ে প্রত্যক্ষ করল, মানুষ সত্যি মানুষ সৃষ্টি করে। কী আশ্চর্য জীবনের যোগফল। একে একে দুই নয়, তিন। দু'য়ে দু'য়ে চার নয়, পাঁচ। কোথায় আছে সে এখন ? কেমন ক'রে আছে ?

ঘরে ঢুকে গেল। শৈলবালা তার শারীরিক কষ্টের মধ্যে আর একবার আপন মনে না হেসে পারল না। এই লোকই আবার সারা রাত রাগ ক'রে বাইরে কাটিয়ে এল ?

সে কথা মনে নেই অভয়ের। সে এসে তখন হাঁটু গেড়ে বসেছে তক্তপোষের পাশে নিমির কাছে। এক হাত রেখেছে নিমির মাথায়। আর এক হাত নিমির কোমরে। সে যেন নিমির চেনা শরীরের নানান অন্দিসন্ধি অন্ধকার আবর্তে চোখ দিয়ে খুঁজতে লাগল। কোথায় থাকে সে ? কেমন ক'রে, কী ভাবে থাকে ? একি আশ্চর্য !

নিমি মুখ ফিরিয়ে, চোখ খুলল। চোখ তার লাল। সারা মুখে যেটা ছড়িয়ে রয়েছে, সেটা রুগ্নতা নয়।. শারীরিক একটি অপ্রতিরোধ্য কষ্টের মধ্যে কিছু লজ্জা, সোহাগ, অভিমান, একটি নিশ্চিত সাফল্যের গরব।

অভয় তাকে টেনে নিয়ে এল আরো কাছে। নিমি যেন এখনো হাঁপাচ্ছে। ক্লান্তি তাকে একটি অপরূপ রূপের তীক্ষ্ণতা দিয়েছে। নাকের পাটা ফুলে ফুলে উঠছে তার। রাগে নয়, শরীরের মধ্যে মনের একটি দুরন্ত শক্তি যেন হুড়োহুড়ি করছে।

সে বলল প্রায় ফিসফিস্ ক'রে—কোথায় থাকা হয়েছিল সারা রাত ? অভয় দেখল, নিমির ঠোঁট ফুলে উঠছে কথা বলতে বলতে। কোল-বসা চোখ দুটি ছলছলিয়ে উঠছে। আবেগে অভিমানে, তাকে যেন অন্য রকম লাগছে। অভয় তার সারা রাত্রির কাহিনী বলতে উদ্যত হ'য়ে থামল। না, প্রাণ খুলে, মন খুলে সব কথা বলা যাবে না নিমিকে। ভুল বোঝাবুঝি হ'য়ে যাবে। অভয় নিজেই কি জানে, সে কেন সুবালার কাছে গিয়েছিল। যা জানে, তা কি বোঝানো যায় ? সুবালা পর্যন্ত তাকে তাড়িয়ে দিয়েছে। ভয় পেয়ে, ভুল বুঝে কিংবা সত্যি বুঝে তাড়িয়েছে, অভয় জানে না। কিন্তু তাড়িয়ে দিয়েছে। সব মিলিয়ে যে যন্ত্রণায় সে ছটফটিয়ে মরেছে মধ্য রাত্রি থেকে ভোর রাত্রি পর্যন্ত, নিমিকে তার ভাগ দিয়ে লাভ নেই। কারণ,সে ভাগ নিমি নেবে না। নেয় নি বলেই তো জীবন ক্রমে জটিল

হ'য়ে উঠছে। সে একলা হ'য়ে যাচ্ছে। জীবনে তবে এমন কিছু কিছু জিনিষ থাকে। যার ভাগ কেউ নেয় না। কাউকে দেওয়া যায় না।

কিন্তু এখনকার এই নিমি, স্ফুরিত ঠোঁটে যার পুরুষের প্রতি সহসা যেন এক নতুন সোহাগ ও অভিমানে বড় আবেগময়ী ক'রে তুলেছে, বিবাদ ঈর্ষা সংশয় সন্দেহ পার হ'য়ে যে নিমি এখন একেবারে আলাদা হ'য়ে উঠেছে, তার সামনে আপাতত তার সব গ্লানি ভেসে যাচ্ছে। এক নতুন তরঙ্গ যেন সব ধুয়ে মুছে অভয়কে এক বিচিত্র আনন্দে স্নান করিয়ে দিচ্ছে। নিমি আজ সন্তানসম্ভবা। জীবনে বুঝি এই প্রথম নিমি এমনি চোখে তার দিকে তাকিয়েছে। এমনি ক'রে জিজ্ঞেস করেছে তাকে, জিজ্ঞেস করে এমনি ক'রে জানতে দিয়েছে, সারা রাত নিমি অপেক্ষা করেছিল অভয়ের জন্য।

সুবালার কাছে যাওয়া ও বিতাড়িত হওয়ার কথা না বললে মিথ্যাচার হবে? হোক। কিন্তু নিমি-অভয়ের জীবনে ঠিক এমন একটি সকাল আর কোনোদিন আসে নি। আসবে কি না, তাই বা কে জানে। বরং সেই ধাওড় দম্পত্তির কথা বলা যায়। কিন্তু তাই বা কেন? কোনো কথা নয়।

অভয় বলল, ধাঙর বস্তির ঘাটে বসেছিলাম।

নিমি ফিস্‌ফিস্ ক'রে বলল, রাগ ক'রে তো যাওয়া হয়েছিলো, এখন এত খুশি কেন?

অভয় আরো ঝুঁকে পড়ে বলল, আর কবে খুশি হব নিমি। আজ আর আমি মিলে যাব না।

—কামাই করবে?

—হ্যাঁ, তোমার কাছে থাকব সারাদিন।

নিমির কোল বসা দু' চোখে চিকুর হানা দ্যুতি। জিভ ভেংচে বলল, কেন, নিমি যে তোমার চক্ষুশূল?

অভয় নিমির এলিয়ে পড়া হাতের ডানায় তার থুত্‌নি রেখে বলল, শূল নয় নিমি, তুমি আমার চোখের বালি।

—তাই থালি করকরিয়ে মর দু' চোখে।

—কিন্তুন্ জল কাটে।

নিমি হাত বাড়িয়ে অভয়ের বুকে রাখল। সহসা তার দু' চোখ ছাপিয়ে জল এল। সে চাপা কান্নার স্বরে বলল, সারা রাত আমি ঘুমোইনিকো। কী যে কষ্ট হচ্ছিল। কী করব আমি? আমার মন খারাপ হ'য়ে যায়, আমি সামলাতে পারিনাকো। তোমাকে কষ্ট দি। আমারো কষ্ট হয়।

বলতে বলতে নিমি মুখ চেপে ধরল তক্তপোষে। অভয় সহসা কোনো কথা বলতে পারল না! সে দু' হাত দিয়ে সাপটে ধরে নিমিকে আরো ঘন ক'রে নিয়ে এল। কথা সে বলতে পারল না। কিন্তু বুকের মধ্যে টন্‌টন্ করতে লাগল। একটি বুকচাপা স্বর তার বুকের মধ্যে যেন চেপে চেপে বলতে লাগল, নিমির ভালবাসা বুঝি এমনি করেই কখনো কখনো টের পাওয়া যায়। তবু, এত কাল কুটীল ছায়ারা কোথা থেকে এসে ভিড় করেছিল আমাদের মাঝখানে? কে আমাদের দুজনকে এমন অসহজ ও দূর ক'রে রাখে? এ বুঝি দিনের আলো, রাতের অন্ধকারের মত অপ্রতিরোধ্য সব ব্যাপার। লোকে বলে নিয়তি।

কাঁদুক। নিমি কাঁদুক। এ কেমন স্বার্থপরতা, কে জানে। তবু এ কান্নায় যেন বড় স্বস্তি লাগছে অভয়ের। একটি উষ্ণ আনন্দময় পরিচ্ছন্নতা যেন ধুয়ে ধুয়ে ফুটে উঠছে। যেন অন্ধকার গলে গলে কোন্ এক পিছল পথের স্রোতে ভেসে যাচ্ছে। আলো ফুটছে ঘরের মধ্যে। আলো ফুটছে জীবনে, গ্লানি কাটছে অনেকদিনের।

কান্নার তরঙ্গ আস্তে আস্তে নিস্তেজ হ'য়ে এল নিমির। আস্তে আস্তে সে আবার মুখ ফেরাল অভয়ের দিকে। চোখের জলে ভেজা তার সারা মুখ। তার গাল ঠোঁট নাক। আর অবিন্যস্ত চুল ছড়িয়ে লেপটে রয়েছে সেই জলে। এখন জামা নেই নিমির গায়ে। অসঙ্কোচ-বিস্রস্ত শাড়ী মথিত, এলানো। ভুলে-যাওয়া সজ্জা ও ঘরের নিশ্চিন্ত নিরালায় অভয়ের মস্ত বড় থাবা নিমি তার ছোট হাতে টেনে নিল নিজের বুকে। যে সেতু তার গর্ভে ভিত পত্তন করেছে, বুঝি তাকে ছোঁয়াতে চায় অভয়ের হাত দিয়ে।

তারপর বলল চাপা চাপা স্বরে, সত্যি খুব খুশি হয়েছ?

সে কথার কোন জবাব না দিয়ে অভয় নিমির নোনা জলে ভেজা মুখের ওপর মুখ নামিয়ে নিয়ে এল। নিমির ঠোঁটে গালে নাকে চোখের সব লবণাক্ত স্বাদটুকু সে শুষে নিতে লাগল।

নিমির নিশ্বাস বন্ধ হ'য়ে আসতে লাগল। তবু সে স্থির থাকতে পারল না। তার নিজের মধ্যেও অভয়ের মত মত্ততা জেগে উঠতে লাগল।

একটু পরে অভয় বলল, আমি এমনি করে চিরদিন থাকতে চাই নিমি। নিমি বলল, আর আমি বুঝি চাই না? আচ্ছা বল তো, কী হবে?

—কিসের?

—ছেলে না মেয়ে।

—যা খুশি তাই হোক। যা পাব, আমার সবই এক।

—না। ছেলে হ'লে ভাল হয়।

—কেন?

—সবাই বলে। আমারও ইচ্ছে করে, ছেলে হোক।

অভয় বলল, তোর মত একটি মেয়ে হোক্, সেই আমার ইচ্ছা।

—না, একটা ছেলে। বাপের মত একটা ছেলে।

—এমন কালকুট্টে?

নিমির চোখে সেই দুর্জয় মেয়ের রঙ্গ ঈষৎ রক্তাভায় ঝক্‌ঝক্ করছে। তার মুখেও রক্তাভা। স্ফুরিত নাসারন্ধ্রে তার আবর্তিত রক্তের উষ্ণতা ও এক বিচিত্র গন্ধ। সে গন্ধ যেন দূর বাগান থেকে ভেসে-আসা অনেক নাম-না-জানা ফুলের গন্ধের মত। বলল, হ্যাঁ, এমনি কালো, এমনি হাত পা বুক। মাথায় বাপকেও ছাড়িয়ে যাবে। কিন্তু গান না-গাইতে পারলে বাড়ি থেকে বের ক'রে দেব ছেলেকে, হ্যাঁ তা বলে দিলুম।

গান? নিমি চায় তার ছেলে বাপের মতই গাইয়ে হবে? অভয়ের মত? অভয়ের সারা মুখে একটি বিস্মিত খুশির বান উত্তাল হ'য়ে উঠল। বলল, গাইয়ে ছেলে চাস্ তুই নিমি?

নিমি যেন আবার সহসা লজ্জায় মুখ ঢাকল। বলল, কাল রাতে তোমার গান আমার খুব ভাল লেগেছে। লোচনঘোষের কাছে তুমি না জিতলেও আমার কিছু মনে হত না। কেমন ক'রে সব তৈরী কর তুমি? ওই কথা গুলোন? সত্যি সত্যি ভেবে ভেবে তখুনি তখুনি গেয়ে দাও?

—তা নয় তো কি?

—ও মা। এ বড় খারাপ বাপু। বানিয়ে বানিয়ে এত কথা যে বলতে পারে, তাকে কি বিশ্বাস করা যায়? কোন্ কথা বললে তার কী জবাব দিতে হয়, সব তুমি জান।

অভয় হেসে উঠল। বলল, বা:! বানিয়ে বানিয়ে কি তা বলে মিছে কথা বলি নাকি? কবি গানে তো কখনো মিছের কারবার নেই। সাচ্চা মিছে যাচাইয়ের জন্যই তো কবিগান।

—তা হ'লেও। বাবারে বাবা, অমন ক'রে গেঁথে গেঁথে কথা সাজানো। আমাকেও যদি বল, আমি তো কিছুটি টেরও পাব না।

অভয়ের দরাজ গলার হাসি এবার ফেটে পড়ল। সেই সঙ্গেই বেজে উঠল মিলের বাঁশী।

দুজনেই একটু থম্‌কে গেল। নিমি উঠে বসল। কাপড় টেনে নিল বুকে। চুল সরিয়ে দিল মুখ থেকে।

অভয় তাড়াতাড়ি বলল, উঠলে কেন?

নিমি হেসে বলল, তবে কি শুয়ে থাকব নাকি? সোম্‌সারে কাজকম্মো নেই? মা'র শরীল খারাপ। বাসি সব প'ড়ে আছে।

—শরীল খারাপ হবে না?

—ও শরীল খারাপ কিছু নয়। তুমি ওঠ দিকিনি। যাও, হাত মুখ ধুয়ে এস। চা ক'রে দিচ্ছি, খেয়ে কাজে যাও।

এ যেন এক নতুন চরিত্র নিমির। এ নির্দেশ বুঝি অমান্য করা যাবে না। অভয় অবাক হয়ে বলল, কাজে যাব না বললুম যে?

নিমি বলল, মিছিমিছি কাজ কামাইয়ের কী দরকার? আমার কাছে সারাদিন বসে থাকতে হবে না। আমার অস্বস্তি হবে।

নির্দেশ মাত্র কাজ। যদিও আজ এক মুহূর্তও ছেড়ে থাকতে ইচ্ছে করছিল না নিমিকে, তবু কাজে যাওয়াটাও যেন আজ নিমির সঙ্গে নতুন প্রেমের সন্ধির মত। সে কাজে চলে গেল।

তিন দিন ধরে শৈলবালা আর বিছানা থেকে উঠল না। শৈলবালা চতুর্থদিনের সকালবেলা সজ্ঞানে মারা গেল।

আগের দিন সারারাত্রি সে ঘুমোয় নি। শুধু একটি কথাই সারারাত্রি বলেছে শৈলবালা, নিমির ছেলেকে না দেখিয়ে আমাকে নে' যাচ্ছ? মরতে আমার দুঃখ নেই, আর ছ'সাতটা মাস আমাকে থাকতে দাও। ওগো, তোরা আমাকে আর ক'টা মাস বাঁচিয়ে রাখ্।

অভয় মিলের বড় ডাক্তারকে এনেছিল। তিনি নিদেন দিয়ে গেছেন। বলেছেন, পুরনো রোগ, ভিতরে সব পচে গেছে। গা ফেটে যদি ঘা হ'ত আগে থেকে, তা' হ'লে আশা ছিল।

এ যেন ঘরের মধ্যে গর্তে ঢোকা বিষাক্ত সাপের মত। প্রথম থেকেই তার উপস্থিতি টের পেয়ে না তাড়ালেই সে বাড়ে। বাড়তে বাড়তে একদিন সে নতুন খোলস ছেড়ে, ভিতরে ভিতরেই নিষ্কুণ্ডল হ'য়ে বিষবায়ু ছড়িয়ে ফুঁসতে থাকে। যেদিন সে গর্ত ছেড়ে বেরুবে, সেদিনই মৃত্যু।

মৃত্যুর আগে শৈলবালা গা' থেকে সব ফেলে দিয়েছিল; তার সেই সর্বাঙ্গ খোলা রক্তাভ স্ফীত শরীরে দাপিয়ে ছটফটিয়ে সে শুধু বলেছিল, জলে দিয়ে আয় আমাকে। জলে ডুবিয়ে দিয়ে আয়। জ্বলে গেল, আমার সব জ্বলে গেল।

তারপর, মরণের একেবারে শেষ মুহূর্তে, কয়েক মিনিট আগে শৈলবালা শান্ত হ'য়ে গিয়েছিল। তখন অভয়কে কাছে ডেকেছিল। অভয় মৃত্যুলীলা দেখছিল শুদ্ধ বিস্ময়ে বেদনায় ও ভয়ে।

অভয় কাছে যেতে, শান্ত স্তিমিত স্বরে বলেছিল, নিমিকে রক্ষা ক'রো বাবা। আমার নিজের পেটের ছা, আমি জানি ও একরকমের সাপ বাবা। অনেক কিছু দিয়ে ওকে অঙ্কুরেই শেষ করতে চেয়েছিলুম, পারিনিকো।

নিমি সামনেই ছিল। অভয় বলেছিল, একথা কেন বলছ মা?

শৈলবালা বলেছিল, বলে যেতে হয় বাবা। আমার মেয়ের যে তাতে ভাল হবে। ওকে নরমে নরমে পুষবে। বিষ বেশী হ'লেই, ভাঙবে। নইলে কোন্ আস্তাঁকুড়েতে গিয়ে মরে প'ড়ে থাকবে অন্যের মার খেয়ে। আমি তো জানি, আমার মেয়ে ও। দেখ নি, কেমন ক্ষেপে যায়? সোম্সারে সব মেয়ে সমান নয়। ওকে রোজার চোখে দেখবে, নইলে কষ্ট পাবে।

তারপর নিমিকে ডেকে বলেছিল, ভয় কি লো তোর মুখপুড়ি, যে তুই ওকে কষ্ট দিতে যাস্? ওকে খ্যাপাসনে, ও তোর চেয়ে অনেক বড়। ওকে খুশি রাখবি, ও তোর গোলাম হ'য়ে থাকবে, হ্যাঁ বলে গেলুম। ও ভগবানের মতন। দে, একটু মিঠে জল দে দিনি।

জল আনতে আনতে দৃষ্টি আচ্ছন্ন হ'য়ে গিয়েছিল। জল যখন দেওয়া যাচ্ছিল, তা' আর ভিতরে যেতে পারেনি। কষ বেয়ে গড়িয়ে পড়েছিল।

নিমি বলেছিল, ও মা, জল খেলি নে?

ব'লে দাপিয়ে পড়তে যাচ্ছিল। অভয় তাকে বুকের কাছে জোর ক'রে ধরে রেখে বলেছিল, মিঠে জল আর খাবে না মা।

ক্রমশঃ
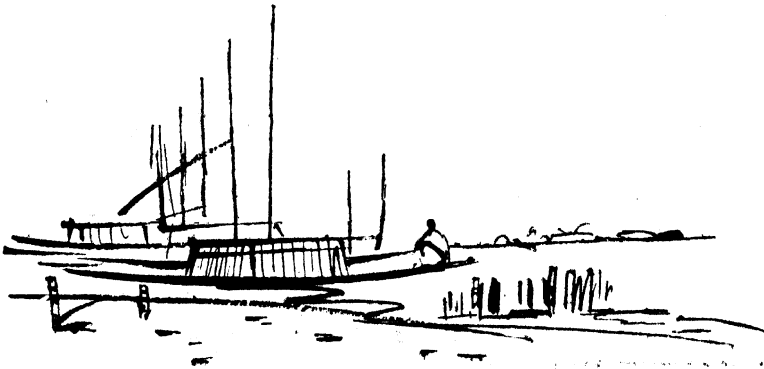
সহজভাব

উপাধ্যায়

লগ্ন থেকে তৃতীয় স্থানকে সহজ ভাব বলা হয়। এখানে ভ্রাতাভগ্নী, বুদ্ধি, পরাক্রম, নিকটবর্ত্তী ভ্রমণ, প্রতিবেশী, নিকটআত্মীয়,, চিঠিপত্র, রচনা, পরবর্ত্তী সহোদর বা সহোদরা, ষষ্ঠসন্তান, দ্বাদশসন্তান, বরাভরণ, গুরুপত্নী, দৌহিত্র ও দৌহিত্রী এবং পৌত্রবধু. চেষ্টা, দাসদাসী, আশ্রিত ব্যক্তি প্রভৃতি বিষয়ে বিচার করা হয়। এই ভাবে জাতকের বক্ষ নির্দ্দেশ করে। মঙ্গলগ্রহ' তৃতীয় বা সহজ ভাবের কারক। মঙ্গল শুভ হোলে জাতকের বিক্রম, কর্ম্মশক্তি ও অধ্যবসায়ের পরিচয় পাওয়া যাবে, ভ্রাতারও শুভ হ'বে। মঙ্গল শুষ্কগ্রহ নামে অভিহিত। তৃতীয় স্থানে পাপগ্রহ জাতকের পক্ষে শুভফল দাতা।

পাপগ্রহ তুঙ্গী হয়ে এই ভাবে থাকলে জাতকের মিত্রের সংখ্যা বৃদ্ধি হয়, কিন্তু তুঙ্গী না হোলে বলাবল অনুসারে মিত্রের সংখ্যার হ্রাস-বৃদ্ধি ঘটে। ভ্রাতৃভাবে পুরুষগ্রহ থাকলে ভ্রাতা, আর স্ত্রী গ্রহ থাকলে ভগ্নী—জাতকের অব্যবহিত পরে জন্মগ্রহণ করে। দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্থানে অর্থাৎ ধন ও সহজ ভাবে যতগুলি গ্রহ থাকে ততগুলি অনুজ, আর একাদশ ও দ্বাদশে যতগুলি গ্রহ থাকে ততগুলি জ্যেষ্ঠসহোদর জন্মগ্রহণ করে। ভ্রাতৃকারক মঙ্গল বলবান হোলে, সহোদর অল্পায়ু হয়।

এইস্থানে গ্রহ না থাকলে কতগুলি গ্রহের দৃষ্টি আছে, তা দেখে বিচার কর্‌তে হবে। গ্রহ স্বক্ষেত্রে থাকলে বা স্বক্ষেত্রে গ্রহের দৃষ্টি থাক্‌লে ফলাধিক্য হয়। তৃতীয়পতি আর লগ্নপতি দুঃস্থানগত না হয়ে যদি বলবান হয়, তাহোলে জাতক নিজের পরাক্রম দ্বারা উন্নতি লাভ করে, কোন বিশেষ অশুভ যোগ থাক্‌লে তাও ক্ষতি কর্‌তে পারে না। কেননা জাতক বাধা বিপত্তি কাটিয়ে উন্নতি কর্‌বেই, আর তার কর্ম্মদক্ষতা বা উত্তরোত্তর উন্নতি অপরের ঈর্ষ্যার কারণ হবে। তৃতীয় থেকে সপ্তম স্থানে ভ্রাতৃভার্য্যার সম্বন্ধে গণনা করা হয়।

লগ্নপতি ও তৃতীয় পতি পরস্পর পরস্পরের থেকে শুভভাবে থাক্‌লে ভ্রাতৃগণের মধ্যে মিত্রতা থাকে। এরা পরস্পর শত্রুগ্রহ বা অশুভ ভাব গত হোলে ভ্রাতৃগণের পরস্পরের মধ্যে কলহ বিবাদ হয়। রবি বা মঙ্গল তৃতীয় স্থানে থেকে পাপগ্রহের দ্বারা দৃষ্ট হোলে বিষজ ভয়, চর্ম্মরোগ, অগ্নিভয়, অস্থি ভঙ্গ প্রভৃতি ঘটে। শত্রুগৃহে' পাপ দৃষ্ট হয়ে থাক্‌লে শরীরে বিষ প্রবিষ্ট হয়। তৃতীয় স্থানে শুক্র শোক, রোগ ও ভয় প্রদান করে—তবে রবির স্ফুটের চেয়ে এই গ্রহের স্ফুট যদি ন্যূন হয়, তা হোলে শুক্রও শুভ ফলদান করে। নবমস্থানে স্বক্ষেত্রে রবি থাক্‌লে ভ্রাতৃনাশ হয়, দৈবাৎ কোন ভ্রাতা বেঁচে থাক্‌লে, সে বিশেষ বিখ্যাত হয়।

ভ্রাতৃস্থানের অধিপতি অথবা ভ্রাতৃকারক গ্রহ মঙ্গল যদি পাপযুক্ত হয়ে দুঃস্থানে থাকে, তাহোলে ভ্রাতৃক্ষয় হয়। তৃতীয়াধিপতি কোন দুঃস্থানের অধিপতি হোলেও বহু সহোদর হানি ঘটে। যার কোষ্ঠীতে সর্ব্বপ্রকার ভ্রাতৃস্থান অশুভ, তার বাল্যকালেই সহোদর হানি হয়। অল্প অশুভ হোলে ভ্রাতৃগণ দীর্ঘায়ু হয় বটে কিন্তু জাতককে ভ্রাতৃশোক পেতে হয়। রবি তৃতীয়ে থাক্‌লে অগ্রজের নাশ হয়, শনি থাক্‌লে পৃষ্ঠজাত সহোদরের নাশ হয় আর তৃতীয়ে মঙ্গল থাক্‌লে পৃষ্ঠজ ও ও অগ্রজ উভয়েরই নাশ হয়। শনি ভ্রাতৃকারক মঙ্গল ও তৃতীয় ভাবাধিপতি উভয়কে দৃষ্টি কর্‌লে ভ্রাতৃহানি ঘটে। তৃতীয় স্থানে কেতুর সঙ্গে চন্দ্র থাক্‌লে জাতক লক্ষ্মীবান হয় বটে, কিন্তু তার ভ্রাতা জীবিত থাকেনা। চন্দ্র তৃতীয়ে থাক্‌লে অথবা তৃতীয় স্থান চন্দ্রের ক্ষেত্র হোলে আর তাতে মঙ্গলের দৃষ্টি থাক্‌লে জাতকের সহোদর রুগ্ন হয়। তৃতীয়পতি চন্দ্রের সঙ্গে একত্র হয়ে দুঃস্থানগত হোলে জাতকের মৃত্যু বা মৃত্যুতুল্য পীড়া হয়।

সহোদরাধিপতি ও বন্ধুভাবাধিপতি চতুর্থ স্থানে থাক্‌লে জাতক ভ্রাতৃহীন হয়, আর এরা মঙ্গল দৃষ্ট হয়ে থাক্‌লে ভ্রাতৃলাভ হয়। তৃতীয়স্থ রাহু ভ্রাতৃবৃদ্ধিকারক। তৃতীয়াধিপতি কেন্দ্র কোণে শুভগ্রহ যুক্ত হয়ে বলবান হোলে জাতক বীর হয়। তৃতীয়াধিপতি নিধনস্থ হোলে আর মঙ্গল দুর্ব্বল হোলে জাতক বিবাদে পরাজিত হয়। মঙ্গল, তৃতীয়স্থানস্থ গ্রহ ও তৃতীয়াধিপতি তিনটাই বলিষ্ঠ হোলে যুদ্ধবিশারদ, মোকর্দ্দমাবাজ প্রভৃতি হয়ে থাকে। তৃতীয়াধিপতি বৃহস্পতিযুক্ত হোয়ে লগ্নে থাক্‌লে

চতুষ্পদাদি হোতে ভয় হয় ও লগ্ন জলরাশি হোলে জলভয়ও হয়। তৃতীয়াধিপতি রাহুযুক্ত রাশির অধিপতির সঙ্গে মিলিত হোলেও রাহু লগ্নে থাকলে সর্পভয় হোয়ে থাকে। তৃতীয়াধিপতি বুধযুক্ত হোলে গলরোগ হয়। বলবান শনি মঙ্গলযুক্ত হোয়ে তৃতীয় রাশিতে থাকলে কণ্ঠ রোগ হয়। মঙ্গল বিশেষ দুর্ব্বল হোলে ফলমূল্যাদির উত্থান হয় না। শুক্র ও চন্দ্র ভিন্ন অন্য শুভগ্রহ তৃতীয় স্থানে থাক্‌লে জাতকের সুখ ভোজন হয়। সহোদরাধিপতি জায়া বা সপ্তমস্থানে থাক্‌লে স্ত্রী রূপবতী ও সৌভাগ্যবতী হয় কিন্তু শনি বা মঙ্গল সহোদরাধিপতি হোলে জাতকের স্ত্রী দেবরের সঙ্গে অবৈধভাবে প্রণয়াসক্ত হয়, এমন কি দেবর গৃহবাসিনী হয়। তৃতীয়াধিপতি ক্রুরগ্রহ হয়ে নিধনস্থানে থাকলে অষ্টবর্ষ পর্য্যন্ত বিশেষ পীড়ায় আক্রান্ত থাকে, দৈবাৎ রক্ষাপেলেও তার বাহু বিকৃত বা ভঙ্গ হয়। তৃতীয়পতি ষষ্ঠে থাক্‌লে জাতকের সঙ্গে ভ্রাতার মনোমালিন্য আর মাতুলসুখ হয়, কিন্তু মাতুলানীর সঙ্গে অবৈধ প্রেম হয়। আর জাতক ভূসম্পত্তি-বিশিষ্ট হয়।

দ্বিতীয়, তৃতীয়, সপ্তম, নবম ও একাদশাধিপতির দশা অন্তর্দ্দশায় ভ্রাতৃলাভ ঘটে। ভ্রাতৃভাব থেকে গণনায় কেন্দ্রস্থ ও ত্রিকোণস্থ পাপগ্রহ স্বীয়দশা অন্তর্দ্দশায় ভ্রাতৃপীড়া প্রদান করে, আর উক্ত স্থানস্থ শুভগ্রহ ভ্রাতৃবিষয়ক শুভফলদান করে থাকে, এই ভাবেই অন্যান্য ভাবের ও বিচার করতে হয়। লগ্নাধিপতি ও তৃতীয়াধিপতি পরস্পর শত্রু হোলেও তৃতীয়স্থ গ্রহ দুর্ব্বল হোলে আর মঙ্গল ষষ্ঠ, অষ্টম বা দ্বাদশ গত হোলে এদের পরস্পর দশান্তর্দ্দশায় সহোদরের সঙ্গে কলহ, সহোদরহানি ও অর্থক্ষয়াদি অশুভ ফল উৎপন্ন হয়। এর বিপরীত হোলে ফল শুভ হয়ে থাকে। তৃতীয়স্থ গ্রহ, তৃতীয়াধিপতি ও মঙ্গল নীচস্থ শত্রু গৃহগত, আর দুঃস্থান গত হোলে তাদের দশা অন্তর্দ্দশায় পরাজয় ও ভ্রাতৃবিনাশ হয়। তৃতীয়াধিপতি ধন স্থানে থাক্‌লে জাতক ভিক্ষুক হয়।

এ'লান লিও বলেছেন লগ্নাধিপতি তৃতীয় স্থানে থাকলে নিম্নলিখিত ফল উৎপন্ন হয় :—

The ruling planet placed in the third house of a nativity, known astrologically as a cadent house, denotes some delays to the progress in life, and though such people have good abilities for the mind, will be the most active part of the being—they will lack those opportunities which would place them in the positions they would most desire……and brethren may either help or hinder the progress in life according to whatever sympathy or antipathy there may be between the respective horoscopes.

তৃতীয়াধিপতি অথবা মঙ্গল শুভগ্রহ দৃষ্টিবর্জ্জিত হোয়ে তৃতীয়, ষষ্ঠ ও দ্বাদশ থাক্‌লে সহোদরগণের সৌভাগ্য লাভ বিশেষ হয়না। বুধ, তৃতীয়াধিপতি ও মঙ্গল একত্রে তৃতীয়স্থানে চন্দ্র ও শনির সঙ্গে সম্বন্ধ করলে একভগ্নীযোগ হয়। তৃতীয়াধিপতি কেন্দ্রে এবং তৃতীয়াধিপতি থেকে ত্রিকোণে উচ্চস্থ মঙ্গল বৃহস্পতির সঙ্গে সহাবস্থান কর্‌লে দ্বাদশ সহোদর যোগ হয়। দ্বাদশাধিপতি মঙ্গলের সঙ্গে আর বৃহস্পতির সঙ্গে চন্দ্র শুক্রের সহাবস্থান বা দৃষ্টি বিবর্জ্জিত হয়ে তৃতীয় স্থানে থাক্‌লে সপ্তসংখ্যক সহোদর যোগ হয়। তৃতীয় স্থান শুভরাশি হোলে আর এখানে শুভগ্রহের দৃষ্টি থাকলে ও শুভ অংশে তৃতীয়াধিপতির অবস্থান হোলে সৎকথাদি শ্রবণ যোগ হয়। তৃতীয়স্থ শুক্র রাহু দৃষ্ট হোলে বিষদোষ, আর শনি দৃষ্ট হোলে সর্প ভয়ে একটি ভগ্নীর মৃত্যু হয়। শনি ও বৃহস্পতিযুক্ত তৃতীয় পতি তৃতীয়ে থাক্‌লে জাতক বিশেষ সৌভাগ্যশালী হয়। চন্দ্র থেকে তৃতীয় স্থানে মঙ্গল শুক্র বুধ অবস্থান করলে আর গুরুর কোণস্থ চন্দ্র হোলে জাতক সৎকবি, বিজ্ঞান শাস্ত্রে পারদর্শী, বহু শিষ্য যুক্ত ও সম্রান্ত হয়। লগ্ন বা চন্দ্র থেকে—সমস্ত শুভ গ্রহ উপচয়গত অর্থাৎ তৃতীয়, ষষ্ঠ, দশম ও একাদশ স্থান গত হোলে জাতক অতিশয় ধনবান, দুইটি শুভগ্রহ উপচয়গত হোলে মধ্যমরূপ ধনবান ও একটি শুভগ্রহ উপচয়গত হোলে সামান্য রূপ ধনবান হোয়ে থাকে।

অনেকে তৃতীয়স্থানকে বিদ্যাস্থান বলে থাকেন। বুদ্ধি বা মানসিক শক্তি সম্পর্কে এখান থেকে বিচার হয়। আয়ুর্গণনায় তৃতীয় স্থান ও তৃতীয়াধিপতির বলাবলও বিচার করা হয়। তৃতীয় রবি থাক্‌লে জাতকের যানবাহন, বিক্রম ও বহু অনুচর হয়। এখানে চন্দ্র থাক্‌লে সুখী, গুণী, কবি ও ধনবান হয়। মঙ্গল এখানে তুঙ্গস্থ বা স্বক্ষেত্রস্থ হোলে জাতক দীর্ঘায়ু ও ধনবান হয়। এখানে শনি থাক্‌লে ভাগ্যোদয়ে কখন বিঘ্ন হয় না। রাহু বা কেতু থাক্‌লে জাতক যশস্বী ও সৌভাগ্যবান হয়। এই স্থানে শুক্র থাক্‌লে সুন্দরী ভগ্নী হয়, বৃহস্পতি থাক্‌লে ধনবান হয়েও দরিদ্রের মত জাতক আচার ব্যবহার দেখায়। শুভ বুধ এখানে উচ্চস্থ বা স্বক্ষেত্রগত হোলে জাতক সন্তানযুক্ত ও ঐশ্বর্য্যশালী হয়, অশুভ হোলে ভ্রাতা ভগ্নী ও পত্নীর মৃত্যু সম্ভাবনা। তৃতীয় স্থান পাপসংযুক্ত বা পাপদৃষ্ট হোলে, তৃতীয়াধিপতি দুঃস্থানগত হোলে চন্দ্র, বুধ, বৃহস্পতি ও শুক্র দুঃস্থানে থাক্‌লে অথবা রবি-কিরণদগ্ধ হোলে, অথবা পাপমধ্যবর্ত্তী হোলে ফুসফুসের রোগ বা যক্ষ্মা রোগাক্রান্ত হয়। এই সব থেকে ব্রঙ্কাইটিস, নিউমোনিয়া, প্রভৃতির সম্ভাবনা থাকে। রাহু তৃতীয়ে এবং তৃতীয়াধিপতি বুধ নীচস্থ হোলে জাতক যক্ষ্মা রোগাক্রান্ত হয়ে থাকে।

***

অগ্রহায়ণ মাসের ব্যক্তিগত রাশির ফলাফল

মেষ রাশি

কৃত্তিকা নক্ষত্রাশ্রিত ব্যক্তিগণের পক্ষে ভরণী ও অশ্বিনী নক্ষত্রাশ্রিত জাতগণের অপেক্ষাকৃত শুভ, ভরণী জাতগণের পক্ষে মধ্যম এবং অশ্বিনী জাতগণের পক্ষে নিকৃষ্ট ফল। মেষ রাশি জাতগণের পক্ষে এ মাসটি আশাপ্রদ নয়, বরং কষ্টপ্রদ। এজন্য সতর্ক হওয়া উচিত। বহুক্ষেত্রেই,

নৈরাশ্যজনক পরিস্থিতি, ক্লান্তিকর ভ্রমণ, শারীরিক কষ্ট, কলহ, ক্ষতি, অপরিমিত ব্যয়, শত্রুদ্বারা পীড়িত হওয়া প্রভৃতির সম্ভাবনা আছে। এর মধ্যেই কিছু কিছু সাফল্য, গৃহে মাঙ্গলিক অনুষ্ঠান, লাভ প্রভৃতি মধ্যে মধ্যে সম্ভব। নিজের ও পরিবারবর্গের স্বাস্থ্যের অবনতি, অজীর্ণঘটিত পীড়া, রক্তের চাপ বৃদ্ধি সূচিত হয়। জ্বর, আমাশয়, গুহ্যদ্বারে পীড়া যোগ আছে। স্ত্রী পুত্রাদির নানাপ্রকার পীড়া ঘটতে পারে। ভ্রমণের সময় সতর্কতা আবশ্যক। পারিবারিক অশান্তি, দুশ্চিন্তা, উদ্বিগ্নতা, মানসিক কষ্ট হবার সম্ভাবনা। আর্থিক অবনতি বা ধনের হ্রাস হবে। আয়ের পথগুলি ক্ষতিগ্রস্ত হবে, এর ওপর অপরিসীম ব্যয়াধিক্য সম্ভব। স্পেকুলেশন বর্জনীয়। কৃষিজীবী, ভূম্যধিকারী ও বাড়ীওয়ালার পক্ষে মাসটি মোটেই শুভ নয়, নানাপ্রকার গোলযোগ ঘটবে। চাকুরিজীবীরা উপরওয়ালার বিরাগভাজন হয়ে নানা অসুবিধার মধ্যে পড়বেন। বৃত্তিজীবী ও ব্যবসায়ীরাও নৈরাশ্যজনক পরিস্থিতির মধ্যে আসবেন, এঁদের পক্ষে কোন নূতন প্রচেষ্টা বা পরিকল্পনা একেবারেই বর্জনীয়। স্ত্রীলোকগণের পক্ষে শুভ নয়। স্ত্রীলোকই স্ত্রীলোককে নির্য্যাতিত করবে, বিদ্বেষ পোষণ করবে, ফলে বিচ্ছেদ বিবাদ প্রভৃতি ঘটবে। অবৈধ ও বৈধ উভয় প্রণয়েই বিপত্তি। এ মাসে অপমান, লাঞ্ছনা, পারিবারিক ও সামাজিক ক্ষেত্রে অসম্মান ও কলহ বিবাদের আশঙ্কা করা যায়। বিদ্যার্থীগণের পক্ষে মাসটি শুভ নয়।

বৃষ রাশি

কৃত্তিকাজাতগণের পক্ষে উৎকৃষ্ট, আর রোহিণীজাতগণের পক্ষে নিকৃষ্ট ফল ভোগ। মৃগশিরাজাতগণ অনেকটা কৃত্তিকাজাতগণের ন্যায় ফল লাভ করবে। মাসের প্রথমার্দ্ধ দ্বিতীয়ার্দ্ধ অপেক্ষা বহুল পরিমাণে শুভ। মোটামুটি সাফল্য, লাভ, মানসিক শান্তি, শত্রুজয়, বিলাস দ্রব্যাদি ক্রয় ও উপভোগ, উত্তম স্বাস্থ্য, গৃহে শুভানুষ্ঠান, নূতন বিষয়ে অধ্যয়ন, বয়োজ্যেষ্ঠ ও গুরুজনদের ভালোবাসা লাভ, বন্ধু বা আত্মীয়গণের সমাদর লাভ প্রভৃতি প্রথমার্দ্ধে সূচিত হয়। শেষার্দ্ধে বন্ধু-বিচ্ছেদ, স্বজন বা বন্ধু বিরোধ জনিত কষ্ট ভোগ, ক্লান্তিকর ভ্রমণ, মনস্তাপ প্রভৃতি সম্ভব। এ মাসে স্বাস্থ্যের অবনতি হবে না, শেষার্দ্ধে কিছু পেটের গোলমাল আসতে পারে। পারিবারিক শান্তি, পরিবারের সংখ্যাবৃদ্ধি, সুখ স্বচ্ছন্দতা লাভ ঘটবে। অতীব আর্থিক উন্নতি, আশাতীতভাবে নানাদিক থেকে অর্থাগম, কিন্তু স্পেকুলেশন করলে লাভের পরিবর্ত্তে ক্ষতি হবে। কৃষিজীবী, ভূস্বামী ও বাড়ীওয়ালাদের পক্ষে এ মাসে মামলা মোকর্দ্দমায় হস্তক্ষেপ করা শুভব্যঞ্জক নয়। এঁদের সময় মোটামুটি ভাবে যাবে। প্রথমার্দ্ধ চাকুরিজীবীদের পক্ষে বিশেষ শুভ, শেষার্দ্ধ শুভ। বৃত্তিজীবী ও ব্যবসায়ীদের পক্ষে মাসটি উত্তম। বিদ্যার্থীদের পক্ষে সময়টি খারাপ নয়। সামাজিক, পারিবারিক ও প্রণয়ের ক্ষেত্রে স্ত্রীলোকদের পক্ষে মাসটি শুভ। তীর্থযাত্রার সম্ভাবনা। অবৈধ প্রেমে সাফল্য লাভ।

মিথুন রাশি

আর্দ্রা নক্ষত্রাশ্রিতগণের পক্ষে নিকৃষ্ট ফল, মৃগশিরা ও পুনর্ব্বসু-জাতগণের পক্ষে ফল অপেক্ষাকৃত ভালো। এ রাশিজাত ব্যক্তিগণ শুভাশুভ ফল লাভ করবেন। মাসের প্রথমে কিছু বাধা এলেও ক্রমে তা অপসারিত হয়ে উত্তরোত্তর অবস্থার উন্নতি আশা করা যায়। শেষ সপ্তাহটি উল্লেখযোগ্য শুভ সময়। সাধারণভাবে সাফল্য, লাভ, শত্রুজয়, সুখ ও মানসিক শান্তি, জনপ্রিয়তা এবং সুনাম অর্জ্জন ঘটবে। মাসের দ্বিতীয়ার্দ্ধে শত্রুদ্বারা উৎপীড়িত হওয়া, দুঃখ, স্বজন বিচ্ছেদ, স্বাস্থ্য হানি, কলহ বিবাদ, কর্ম্মে অসাফল্য প্রভৃতি সম্ভাবনা। প্রথমার্দ্ধে স্বাস্থ্যহানি, সন্তানদের স্বাস্থ্য সম্পর্কে বিশেষ দৃষ্টি নেওয়া আবশ্যক, দুর্ঘটনার আশঙ্কা আছে। পারিবারিক ক্ষেত্রে কলহ বিবাদের সম্ভাবনা। দ্বিতীয়ার্দ্ধে মাঙ্গলিক অনুষ্ঠান ও বন্ধু সমাগমের সম্ভাবনা। অর্থ সম্বন্ধে অপ্রত্যাশিত ঘটনার যোগ। গৃহে চৌর্য্যভয়, অর্থক্ষতি প্রভৃতি সম্ভাবনা। মাসের দ্বিতীয়ার্দ্ধে স্পেকুলেশন করা যেতে পারে। কৃষিজীবী, বাড়ীওয়ালা ও ভূম্যধিকারীর পক্ষে আয় হোলেও বন্যা, দুর্ভিক্ষ প্রভৃতি ব্যাপারে বেশ কিছু ব্যয় হয়ে যাবে। চাকুরি জীবীদের পক্ষে পদোন্নতি, উচ্চ মর্য্যাদা, অফিসে জনপ্রিয়তা প্রভৃতি মাসের শেষার্দ্ধে আশা করা যায়। কর্ম্ম সংক্রান্ত ব্যাপারে ভ্রমণ ও বিদেশ গমন যোগ আছে। বৃত্তিজীবী ও ব্যবসায়ীদের অবস্থা অপেক্ষাকৃত উন্নত হবে। যারা সৈন্য বা নৌ-বিভাগের কার্য্যের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট তারা অন্যান্য লোকের তুলনায় অপেক্ষাকৃত উন্নতি করবে। স্ত্রীলোকেরা এ মাসে নানাপ্রকারে শুভ সুযোগ পাবে। পারিবারিক ও সামাজিক ক্ষেত্রে সুনাম ও সুখ স্বাচ্ছন্দ্য লাভ। বিদ্যার্থীদের পক্ষে মাসটি উত্তম বলা যায় না।

কর্কট রাশি

পুষ্যানক্ষত্রাশ্রিত ব্যক্তিগণের পক্ষে অধম ফল। পুনর্ব্বসু ও অশ্লেষা জাতগণের অবস্থা অনেকটা ভালো বলা যায়। কর্কট রাশির পক্ষে এ মাসটি মিশ্র ফল দাতা। পারিবারিক অশান্তি, কর্ম্মে বাধা, আত্মীয় ও ও স্বজনবর্গের সহিত কলহ, অসৎ সংসর্গে নানাপ্রকার বিপত্তি, উদ্দেশ্য-বিহীন প্রচেষ্টা প্রভৃতি সূচিত হয়। অপর পক্ষে বয়োজ্যেষ্ঠদের কাছ থেকে উপকারলাভ, মাঙ্গলিক অনুষ্ঠান, ধনী বন্ধুদের সাহায্যে উপকার প্রাপ্তি, প্রভাব প্রতিপত্তি ও সৌভাগ্যোদয় প্রভৃতি শুভ ঘটনার সংযোগ। সারামাসের মধ্যে স্বাস্থ্য ভালো যাবে না। জ্বর, অজীর্ণ, গুহ্য প্রদেশে পীড়া, উদরাময় আমাশয় বা সাধারণ দৌর্ব্বল্য ইত্যাদি আশঙ্কা করা যায়। ছেলেমেয়েদেরও পীড়া হোতে পারে। দ্বিতীয়ার্দ্ধে ছোটখাটো দুর্ঘটনা ঘটতে পারে। মানসিক অশান্তি বিশেষ ভাবে হবে। আর্থিক অবস্থা ভালোমন্দ মিশ্রিত। রাজনৈতিক ঘটনা ও সরকারী নীতির জন্য বাড়ীওয়ালা, ভূম্যধিকারী ও কৃষিজীবীদের নানা অসুবিধা ভোগ। মাসের প্রথমার্দ্ধ অত্যন্ত খারাপ যাবে। চাকুরিজীবীদের পক্ষে কোন উল্লেখযোগ্য ঘটনা দেখা যায় না। বৃত্তিজীবী ও ব্যবসায়ীদের পক্ষে লাভ

ক্ষতি দুই-ই সম্ভব। যে সব স্ত্রীলোক ভীরু লাজুক ও অভিমানী তারা পদে পদে কার্য্যে বাধা পাবে, কিন্তু যারা দুঃসাহসী, তেজস্বিনী ও মুখরা তাদের পক্ষে শুভ, তারা পারিবারিক সামাজিক ও প্রণয়ের ক্ষেত্রে সাফল্য লাভ করবে। তাদের পক্ষে ভ্রমণ, চড়িভাতি, গান বাজনা, পার্টিতে যোগদান, অবাধ মেলামেশা ও হৈ হল্লা মানসিক আনন্দের হেতু হবে। বিদ্যার্থীদের পক্ষে মাসটি উত্তম।

সিংহ রাশি

সর্ব্বপ্রকার উত্তর ফল্গুনী নক্ষত্রাশ্রিত ব্যক্তির পক্ষেই বিশেষ শুভ, তৎপরে পূর্ব্ব ফল্গুনী, সর্বশেষে মঘাজাত ব্যক্তির পক্ষে তুলনামূলকভাবে শুভ। প্রথম তিন সপ্তাহ উত্তমভাবে যাবে, শেষ সপ্তাহটী আশানুরূপ শুভ হবে না। মাসের প্রথমার্দ্ধে সুখ, উত্তম বন্ধুলাভ, শত্রু জয়, বিশেষ সম্মান, জনপ্রিয়তা, উত্তম স্বাস্থ্য, সৌভাগ্য, বিদ্যার্জ্জনে সাফল্য এবং নানাপ্রকার আমোদ প্রমোদে যোগদান প্রভৃতি আশা করা যায়। মানসিক চাঞ্চল্য, অর্থ কৃচ্ছ্রতা, প্রতারণায় ক্ষতি, বন্ধু ও স্বজনবর্গের সহিত কলহ বিবাদ প্রভৃতি অশুভ ফলগুলি ও ঘট্‌তে পারে। স্বাস্থ্য ভালোই যাবে মোটামুটিভাবে। পরিবারবর্গের মধ্যে কারো অসুখ হওয়া সম্ভব। গৃহে অশান্তি ঘট্‌বে না। সারা বৎসরের মধ্যে এই মাসটিতে দুঃখ কষ্ট অল্প পরিমাণে অনুভূত হবে, নানাবিধ উপায়ে অর্থাগম। যাদের অর্থলাভের কোন সম্ভাবনা নেই, তারাও অপ্রত্যাশিত ভাবে কিছু অর্থ লাভ করবে। স্পেকুলেশন বর্জ্জনীয়। কিছু অর্থক্ষতির সম্ভাবনা আছে। বাড়ীওয়ালা ভূম্যাধিকারী ও কৃষিজীবিগণের পক্ষে মাসটি উত্তম। মাসের প্রথম দুই বা তিন হপ্তা চাকুরিজীবিদের পক্ষে শুভ—পদমর্য্যাদার বৃদ্ধি, কর্ম্মোন্নতি, বেতন বৃদ্ধি, উপরওয়ালার প্রীতি অর্জ্জন প্রভৃতি পরিলক্ষিত হয়। বৃত্তিজীবি ও ব্যবসায়ীদের পক্ষে আংশিক শুভ। স্ত্রীলোকগণের পক্ষে মাসটি ভালো বলা যায় না। চাকর চাকরাণীদের অসাধুতা হেতু অল্পবিস্তর ক্ষতি হবে, চুরির ভয় আছে, পুরুষের সহিত বিশেষভাবে মেলামেশা অনুচিত। কোন প্রকার আমোদ প্রমোদে যোগদান করা উচিত নয়। পারিবারিক ক্ষেত্রে কিঞ্চিৎ অশান্তি, প্রণয় সংক্রান্ত ব্যাপারে সতর্কতা আবশ্যক।

বিদ্যার্থীগণের পক্ষে মাসটি উত্তম।

কন্যা রাশি

হস্তা নক্ষত্রাশ্রিত ব্যক্তিদের পক্ষে মাসটি নিকৃষ্ট ফলদাতা। উত্তর ফল্গুনী ও চিত্রা নক্ষত্রাশ্রিতগণের পক্ষে মধ্যবিধ সময়। মাসের দ্বিতীয়ার্দ্ধ শুভ ব্যঞ্জক—কিছু সুখ স্বাচ্ছন্দ্য, পারিবারিক শান্তি, উচ্চপদস্থগণের সঙ্গে বন্ধুত্ব, বিলাস ব্যসনাদি, বিদ্যার্জ্জনে সাফল্য প্রভৃতি পরিলক্ষিত হয়। ক্লান্তিকর ভ্রমণ, পারিবারিক ও বন্ধু বিচ্ছেদ, স্বজন বিয়োগ, অপমান, শত্রুবৃদ্ধি প্রভৃতি অশুভফলের আশঙ্কা করা যায়। মাসের প্রথম দিকে স্বাস্থ্যহানি, বাত-পিত্ত প্রকোপ। আশাভঙ্গ, মনস্তাপ। প্রতিকূল আবহাওয়ার মধ্যে দৈনন্দিন জীবন যাত্রা। মাসের প্রথমার্দ্ধ অপেক্ষা দ্বিতীয়ার্দ্ধে আর্থিক উন্নতি। প্রথমার্দ্ধে ব্যয়বৃদ্ধি। স্পেকুলেশন বর্জ্জনীয়। ভূম্যাধিকারী, কৃষিজীবি ও বাড়ীওয়ালার পক্ষে মাসটি নৈরাশ্যজনক। চাকুরিজীবিদের পক্ষে শেষার্দ্ধই শুভ। বেকার ব্যক্তির সাময়িক ভাবে চাকুরির আশা করা যায়। বৃত্তিজীবি ও ব্যবসায়ীদের পক্ষে মাসটি শুভ নয়, শেষ সপ্তাহে কিছুটা ভালো। স্ত্রীলোকের পক্ষে প্রণয়ানুরাগ, কোর্টসিপ এবং অবৈধ প্রেমাভিলাষ সাফল্য। বিদ্যার্থীগণের পক্ষে শুভাশুভ।

তুলা রাশি

স্বাতী নক্ষত্রাশ্রিত ব্যক্তিদের পক্ষে মাসটি শুভ নয়। চিত্রা ও বিশাখা জাতগণের পক্ষে অপেক্ষাকৃত শুভ। স্বাস্থ্যের অবনতি, উদ্বেগ, অশান্তি, বিক্ষোভ, উদ্দেশ্য বিহীন ভ্রমণ, বন্ধু ও স্বজন বর্গের সহিত কলহ, প্রভৃতি অশুভ ফল দেখা যায়। সৌভাগ্যোদয়, কর্ম্মে সাফল্য, মাঙ্গলিক অনুষ্ঠান প্রভৃতি। এই মাসে রক্তচাপ বৃদ্ধি, হৃদ্‌রোগ বৃদ্ধি, উদর এবং বক্ষের যন্ত্রণা শ্বাস প্রশ্বাসে কষ্ট ও চক্ষু পীড়া হোতে পারে। আর্থিক উন্নতি যোগ আছে। মাসের শেষার্দ্ধে অর্থের হ্রাস হওয়ার দরুণ কিছু অসুবিধা ভোগ। সুনিশ্চিত না হয়ে ঝোঁকের মাথায় স্পেকুলেশন করলে প্রবল ক্ষতি হবে। বাড়ীওয়ালা, ভূম্যধিকারী ও কৃষিজীবিগণের পক্ষে মাসটি সন্তোষজনক নয়। বন্যা, দুর্ভিক্ষ ও মহামারীর প্রতিক্রিয়া এদের ওপর আসতে পারে! চাকুরিজীবিদের পক্ষে মাসটি মন্দ নয়। স্ত্রীলোকের পক্ষে বাহিরের সব কাজে সতর্কতা অবলম্বন একান্ত আবশ্যক, এমন কি অন্য-পুরুষের সান্নিধ্যে এসেও আবেগ প্রধান মন যাতে না হয় তার জন্যে সুদৃঢ় হওয়া দরকার। পারিবারিক কাজে চিত্ত নিবিষ্ট রাখা প্রয়োজন। একা ভ্রমণ বা স্থান দর্শন করা অনুচিত। বিদ্যার্থীগণের পক্ষে মধ্যম।

বৃশ্চিক রাশি

বিশাখা ও জ্যেষ্ঠা নক্ষত্রাশ্রিতগণের পক্ষে মাসটি অনুরাধা জাতগণের ফলাফল অপেক্ষা ভালো। সর্ব্বপ্রকার চেষ্টায় বিলম্ব ও বাধা, সম্মানহানি পারিবারিক বিচ্ছেদ, নীচ সংসর্গ, আত্মীয় বিয়োগ সূচিত হয়। স্বাস্থ্যহানি যোগ আছে। রক্তের চাপ বৃদ্ধি, শ্লেষ্মাপ্রকোপ, শ্বাস প্রশ্বাসের কষ্ট, উদরের বিশৃঙ্খলা প্রভৃতি।

স্ত্রীর স্বাস্থ্য ভালো যাবে না। পারিবারিক ক্ষেত্রে কোন উল্লেখযোগ্য ঘটনা নেই। আর্থিক সংক্রান্ত ব্যাপার সমস্যাজনক। প্রতারিত হওয়ার সম্ভাবনা থাকায় সতর্ক অবলম্বন আবশ্যক। ধনসঞ্চয়ে বাধা ঘটবে, ক্ষতি যোগ রয়েছে। বাড়ীওয়ালা, ভূম্যধিকারী ও কৃষিজীবির পক্ষে মাসটি সন্তোষজনক নয়। চাকুরিজীবিরা এ মাসে বিশেষ কিছু সুবিধা সুযোগ পাবে না। ব্যবসায়ী ও বৃত্তিজীবিদের পক্ষে মাসটি উদ্বেগজনক পরিস্থিতির মধ্য দিয়ে অতিবাহিত হবে। বিদ্যার্থীদের পক্ষে এমাসটি আদৌ আশাপ্রদ নয়। এই মাসটিতে যে সব স্ত্রীলোক সাহসী ও তেজস্বিনী তাদের পক্ষে শুভ। পারিবারিক, সামাজিক এবং প্রণয় ক্ষেত্রে তাদের সাফল্য লাভ হবে। ভীরু স্বভাব বিশিষ্টা নারীর পক্ষে মাসটি শুভ নয়, পুরুষের নিগ্রহ পাবার আশঙ্কা আছে।

ধনু রাশি

উত্তরাষাঢ়া নক্ষত্রজাতগণের পক্ষে সর্ব্বোত্তম ফললাভ, বিশেষ দুঃখ কষ্ট পেতে হবে না। মূলাজাতগণের পক্ষে মধ্যম আর পূর্ব্বাষাঢ়াগণের পক্ষে অধম ফল ভোগ। মাসের প্রথমার্দ্ধ বেশ ভালোই যাবে, শেষার্দ্ধে অনুরূপ হবে না। শারীরিক দুর্ব্বলতা প্রথমভাগে দেখা দেবে, এর ওপর আছে পিত্তের প্রকোপ ও তজ্জনিত জ্বর, চক্ষুপীড়া। মাসের শেষার্দ্ধে আর্থিক উন্নতির সম্ভাবনা নেই, প্রথমার্দ্ধে এবিষয়ে শুভ—লাভ ও কর্ম্মে সাফল্য। স্পেকুলেশন বর্জ্জনীয়। বাড়ীওয়ালা, ভূম্যাধিকারী ও কৃষিজীবির পক্ষে মাসটী অশুভ নয়। চাকুরিজীবিদের পক্ষে বিশেষ শুভ—খ্যাতি, প্রতিপত্তি ও পদোন্নতির সম্ভাবনা। বৃত্তিজীবি ও ব্যবসায়ীর পক্ষেও মাসটি লাভজনক। স্ত্রীলোকদের পক্ষে শুভ বলা যায় না, নানাপ্রকার বিশৃঙ্খলা, নৈরাশ্য ও কলহ বিবাদের মধ্যে অশান্তি ভোগ করতে হবে। পুরুষের সহিত মেলামেশা, বর্জ্জনীয়। পারিবারিক কর্ম্মের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকা সব চেয়ে নিরাপদ। বিদ্যার্থীগণের পক্ষে মাসটি আদৌ সন্তোষজনক নয়।

মকর রাশি

শ্রবণাজাতগণের পক্ষে নিকৃষ্ট ফলভোগ, উত্তরাষাঢ়া ও ধনিষ্ঠা জাতগণের কিছু স্বাচ্ছন্দ্য লাভ। মোটামুটিভাবে সাফল্য, অর্থপ্রাপ্তি, বিলাস ব্যসন, শত্রুজয়, প্রতিষ্ঠাসম্পন্ন ব্যক্তির সহিত বন্ধুত্ব, গৃহে মাঙ্গলিক অনুষ্ঠান, নুতন বিষয়ে অধ্যয়ন ও জ্ঞানার্জ্জন। কলহ-বিবাদ, নৈরাশ্যজনক পরিস্থিতি, লোকের উপদ্রব, এবং নানা কর্ম্ম ঝঞ্ঝাট আসতে পারে। স্বাস্থ্যোন্নতি, শিশুসন্তানদের পীড়াদি'। পারিবারিক ক্ষেত্রে কোন প্রকার অশান্তিজনক পরিস্থিতি ঘটবে না, গৃহে মাঙ্গলিক অনুষ্ঠানের সম্ভাবনা। আর্থিক ক্ষেত্রে সম্পূর্ণ শুভ বলা যায় না, ব্যয়াধিক্য হেতু সঞ্চয় আশাপ্রদ হবে না। বাড়ীওয়ালা, ভূম্যধিকারী ও কৃষিজীবির পক্ষে মাসটি শুভ, বিশেষতঃ খনি সংক্রান্ত ব্যাপারে লাভযোগ। চাকুরিজীবির পক্ষে এ মাস বিশেষ শুভ—সম্মান, পদোন্নতি আশানুরূপ সাফল্য। বৃত্তিজীবি ও ব্যবসায়ীর লাভ ও কর্ম্মবিস্তার যোগ। স্ত্রীলোকের পক্ষে মাসটি সর্ব্বোৎকৃষ্ট। সর্ব্বপ্রকার মনোভিলাষ পূর্ণ হবে। অলঙ্কার প্রাপ্তি, উত্তম পোষাক পরিচ্ছদ, বিলাস ব্যসন দ্রব্য প্রভৃতি ক্রয় —বহুপুরুষের স্তাবকতা ও প্রশংসা অর্জন, রোমান্টিক আবহাওয়া অত্যন্ত অনুকূল। পারিবারিক, সামাজিক ও প্রণয়ের ক্ষেত্রে বিশেষ সাফল্য লাভ অবৈধ প্রণয়ে কোন বিপত্তির বা বিশৃঙ্খলতার যোগ নেই—আশাপূর্ণ পরিস্থিতি ঘটবে। অবিবাহিতাদিগের বিবাহযোগ। গর্ভ বা সন্তান সম্ভাবনা, পরকীয়প্রেমে পরিপূর্ণ তৃপ্তিলাভ ঘটতে পারে। এই রাশিতে জাত সুন্দরী স্ত্রীলোকেরা প্রেম বা ভালোবাসার ক্ষেত্রে পুরুষের ওপর আধিপত্য বিস্তার করে যথেচ্ছাচারিতার ভাব দেখাতে পারেন—অবৈধ প্রণয়ের ক্ষেত্রে প্রেমাস্পদকে ক্রীড়া পুত্তলিক করে তুলবার শক্তি অর্জ্জন করবেন। তীর্থভ্রমণ, পুণ্যাদি কার্য্য, ধর্ম্মোৎসব প্রভৃতি করবার জন্যে বয়স্কা মহিলারা আগ্রহশীলা হবেন। বিদ্যার্থীদের পক্ষে শুভ, বিশেষ শুভ যারা ম্লেচ্ছদেশে সাগর পারে বিদ্যাশিক্ষা করছে।

কুম্ভরাশি

শতভিষা জাতগণের পক্ষে আশানুরূপ সুসময় নয়, পূর্ব্বভাদ্রপদ ও ধনিষ্ঠা জাতগণের পক্ষে ভালো বলা যায়। মাসের প্রথমার্দ্ধ অপেক্ষা দ্বিতীয়ার্দ্ধ উল্লেখযোগ্য ভাবে শুভ। কর্ম্মেসাফল্য, উত্তম বন্ধুত্ব এবং তজ্জনিত সুযোগ সুবিধা শত্রুজয়, সৌভাগ্যসুখবৃদ্ধি, উত্তমপদ মর্য্যাদালাভ জনপ্রিয়তার বৃদ্ধি দ্বিতীয়ার্দ্ধে পরিলক্ষিত হয়। প্রথমার্দ্ধে কিছু কিছু অসুবিধা ঘটবে কর্ম্মক্ষেত্রে কোন বন্ধু বা স্বজনের মৃত্যু সংবাদ প্রাপ্তি, অপযশ, সন্তানদের পীড়া বা স্বাস্থ্য হানি, বয়স্কদের শত্রুতা, ইত্যাদি ঘটতে পারে। কোন বিশেষ পীড়ার যোগ নেই তবে জীবনীশক্তির হ্রাস বা শারীরিক দুর্ব্বলতা, মানসিক চাঞ্চল্য ও অকারণ উদ্বেগ, দ্বিতীয়ার্দ্ধে এরূপ অবস্থা থাকবেনা। পারিবারিক ক্ষেত্রে শৃঙ্খলতা ও শান্তি সংরক্ষিত হবে, গৃহে মাঙ্গলিক অনুষ্ঠানের সম্ভাবনা। দ্বিতীয়ার্দ্ধে আর্থিক অবস্থা শুভ হবে,প্রথমার্দ্ধে অভাব অনাটন, ব্যয়াধিক্য বা অর্থ ক্ষতি হোতে পারে, অর্থসংক্রান্ত বিষয়ে কিছু শত্রুতার যোগ আছে। দ্বিতীয়ার্দ্ধে লাভ, আর্থিক সাফল্য, ব্যবসায় ও বৃত্তির ক্ষেত্রে উন্নতি সূচিত হয়। অর্থনৈতিক সমস্যার সমাধান হবে। স্পেকুলেশনে ভীষণ ক্ষতি হবে, রেস খেলায় ক্রমাগত হার হবে। বাড়ীওয়ালা, ভূম্যধিকারী ও কৃষিজীবীদের পক্ষে অতীব উত্তম সময়—চাকুরিজীবীদের পক্ষে প্রথমার্দ্ধে কিঞ্চিৎ গোলযোগ বা বাধা বিপত্তির সম্ভাবনা থাকলে ও দ্বিতীয়ার্দ্ধে বিশেষ শুভ হবে। এ রাশির বহু বেকার ব্যক্তি কর্ম্মের সুযোগ পাবে—কর্ম্মে নিযুক্ত হবে। ব্যবসায়ী ও বৃত্তিজীবীদের প্রচুর আয়বৃদ্ধি, লাভ ও সম্পত্তিসুখ ঘটবে। স্ত্রীলোকদের পক্ষে দ্বিতীয়ার্দ্ধই বিশেষভাবে শুভ। সমাজঘেঁষা নারীদের শুভ সময়। এঁরা সম্ভ্রান্ত অতিথিদের সঙ্গে মেলামেশা, আদর আপ্যায়ন প্রভৃতি দ্বারা নানাভাবে সুযোগ সুবিধা লাভ করবেন। পারিবারিক, সামাজিক ও প্রণয় ক্ষেত্রে এ মাসের জাতিকা সুখী হবেন। বিদ্যার্থীদের পক্ষে মাসটী অশুভ নয়।

মীনরাশি

উত্তর ভাদ্রপদ নক্ষত্র জাতগণের সময় নিকৃষ্ট, পূর্ব্বভাদ্রপদ ও রেবতী জাতব্যক্তিদের পক্ষে অপেক্ষা কৃত শুভ। কারো পক্ষেই মাসটি সুবিধাজনক নয়,নানাপ্রকার জটিল পরিস্থিতি,অর্থ অপব্যয়,দুশ্চিন্তা ও উদ্বেগ থাকবে,তার ওপর আছে অসৎ সংসর্গ জনিত কষ্ট ভোগ, মর্য্যাদাহানি, বয়োজ্যেষ্ঠদের শত্রুতা, স্বাস্থ্যহানি, শারীরিক দুর্ব্বলতা ও স্ত্রীলোকের উৎপীড়ন ভোগ। যাহোক্ মাসটা একেবারে খারাপ যাবে না, শেষের দিকে কিছু সাফল্য ও সৌভাগ্যের সূচনা করে দিয়ে বিদায় গ্রহণ করবে। যাদের ব্লাড প্রেসার আছে এমাসে তাদের সতর্কতা অবলম্বন আবশ্যক। রক্তাধিক্যের চাপ মারাত্মক হয়ে উঠতে পারে। দুর্ঘটনার আশঙ্কা আছে। স্ত্রী ও পরিবার বর্গের অপরাপর ব্যক্তির সঙ্গে কলহ বিবাদ আর বোঝা পড়ার ভুল হেতু অশান্তি ভোগ করতে হবে।

কাজে ও কথাবার্ত্তায় হুঁসিয়ার হয়ে চলা আবশ্যক। পরিবারে নবজাত সন্তানের সম্ভাবনা অথবা যে ভাবেই হোক পরিবারবর্গের সংখ্যা বৃদ্ধি পাবে। আর্থিক ক্ষেত্র সুবিধাজনক হবে না, লাভ ও আয় দুই-ই

হ্রাস পাবে, বৃদ্ধিপাবে ব্যয় উল্লেখযোগ্য ভাবে। দ্বিতীয়ার্দ্ধে পাওনা টাকা নিয়ে গণ্ডগোলের সৃষ্টি বা অনাদায়া হেতু বিড়ম্বনা ভোগ অথবা ন্যায্য প্রাপ্যের কিছু ক্ষতি সূচিত হয়। ধনোপার্জ্জনের কোন প্রচেষ্টাই কার্য্যকরী হবে না। সঞ্চিত টাকা থেকে ব্যয় হয়ে যাবে পাওনাদারের তাগিদের চাপে স্পেকুলেশন বর্জ্জনীয়, রেসে হার অনিবার্য্য। ভূম্যধিকারী, বাড়ীওয়ালা ও কৃষিজীবীরা নানাভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হবে। চাকুরিজীবীদের পক্ষে মাসটী প্রতিকূল, কোন প্রকার পদোন্নতি বা সুখ্যাতি লাভ ঘটবে না। অতিকষ্টে কিছু বেকার ব্যক্তি অস্থায়ী কাজ পেতে পারে। মাসের শেষ সপ্তাহটী ভালো যাবে। বৃত্তিজীবী ও ব্যবসায়ীর পক্ষেও মন্দা মাস। অবৈধ প্রণয়ের প্রচেষ্টা স্ত্রীলোকের পক্ষে বিপত্তির কারণ হবে। সমাজ তোষিনী নারীরও সতর্ক হওয়া দরকার, কেননা কোন পিক্‌নিক্, পার্টিতে, ক্লাবে বা জল্‌সায় কোন অসতর্ক মুহূর্ত্ত আলোচনার বিষয় হয়ে উঠ্‌তে পারে এবং তজ্জনিত কলঙ্ক দূর করা কঠিন হয়ে উঠ্‌বে। পারিবারিক সামাজিক ও প্রণয়ের ক্ষেত্রে এমাসে স্ত্রীলোকের সংযত আচার ও আচরণ, পুরুষের সঙ্গে অবাধ মেলামেশা বর্জ্জন ও পারিবারিক কার্য্যে দৃষ্টি নিবদ্ধ করে, বাহিরের যোগাযোগ ত্যাগ করাই উচিত। একান্ত আবশ্যক হোলে, সতর্ক হয়ে নিজের থাকা ভালো, কোথাও আবেগ, চপলতা বা রঙ্গরসে মত্ততা বর্জ্জনীয়। বিদ্যার্থীগণের পক্ষে নৈরাশ্যজনক পরিস্থিতি।

***

ব্যক্তিগত লগ্ন ফলাফল

মেষ লগ্ন—

প্রথম সপ্তাহে দাম্পত্য কলহ বা বিচ্ছেদ, প্রণয়ে বিপত্তি, স্ত্রীর পীড়া। অর্থাগমে সে বাধা—সন্তানের স্বাস্থ্য হানি, শত্রু কর্তৃক ধনহানির প্রচেষ্টা, শত্রুরও পরাজয়—সাংসারিক অশান্তি। স্বেচ্ছসাহচর্য্যে অর্থলাভ। চক্ষুপীড়া দুশ্চিন্তা, কর্ম্মস্থানে আয়বৃদ্ধি। বিদ্যাথাগণের পক্ষে বাধা।

বৃষ লগ্ন—

শারীরিক স্বাচ্ছন্দ্যের অভাব—ধনসংগ্রহ তৎপরতা—মধ্যবিধ ধনভাব—সন্তানাদির পীড়া (বিশেষতঃ কন্যা)—কর্ম্মস্থলে বাধা বিপত্তি—পিতার জীবন সংশয়—সন্তানাদির বিবাহ বা বিবাহের কথাবার্তা। বিদ্যার্থীগণের পক্ষে কিঞ্চিৎ অশুভ। ভ্রমণ।

মিথুন লগ্ন—

মাতৃপীড়াদি এমন কি মাতার জীবন সংশয়। যকৃত দোষ জনিত পাক যন্ত্রের ক্রিয়া বৈকল্য, স্ত্রীলোকের সহিত কলহ বা স্ত্রীলোক দ্বারা প্রতারিত—মাসের প্রথম দিকে সন্তান স্থান ভালো নয়, তৎপরে অনেকটা ভালো—বিশেষ শত্রুবৃদ্ধিযোগ—পত্নীর সম্বন্ধে ভালো বলা যায় না,—দাম্পত্যকলহ। স্ত্রীর হৃৎপিণ্ডের দুর্ব্বলতা। পিতৃভাব শুভ নয়। কোন ব্যক্তির মৃত্যুতে কর্ম্মক্ষেত্রে পদোন্নতি। বিদ্যার্থীগণের পক্ষে কিঞ্চিৎশুভ।

কর্কট লগ্ন—

ভাগ্যোদয়, কর্ম্মোন্নতি, শারীরিক ভাব মধ্যম—ধনভাব উত্তম—পত্নীর স্বাস্থ্যহানি তীর্থভ্রমণ, ভগ্নীর সহিত মনোমালিন্য, শত্রুহানি, মাতার শারীরিক অসুস্থতা। কর্ম্মক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠালাভ। বিদ্যার্থীগণের পক্ষে শুভ।

সিংহ লগ্ন—

মধ্যে মধ্যে দেহ পীড়া বা শারীরিক বিশৃঙ্খলতা, বাতপিত্ত প্রকোপ—হ্রাসবৃদ্ধি সম্বন্ধ ধন—মাতার পীড়া—অর্থলাভ প্রথমার্দ্ধে। সম্মানহানি। ব্যয়বৃদ্ধি। মানসিক অস্বচ্ছন্দতা। স্ত্রীভাব শুভ। আয়ভাব মধ্যম। বিদ্যার্থীগণের পক্ষে মধ্যম।

কন্যালগ্ন

মধ্যে মধ্যে শারীরিক বিশৃঙ্খলতা, পারিবারিক আনন্দ, প্রথমার্দ্ধে ব্যয় ও আংশিক ধনক্ষতি। আয়বৃদ্ধি, পদোন্নতি, স্ত্রীর মানসিক অস্বচ্ছন্দতা ও বিক্ষোভ, সৌভাগ্যবৃদ্ধি। বিদ্যার্থীগণের পক্ষে শুভ নয়।

তুলালগ্ন

প্রথমার্দ্ধে দুর্ঘটনার ভয় ও কষ্টভোগ, স্থান পরিবর্ত্তন, আয়বৃদ্ধি, কর্ম্মে বিশৃঙ্খলতা, সন্তানলাভ, ভ্রমণ, শত্রুবৃদ্ধি, সন্তানের উন্নতি, স্ত্রী ভাবশুভ, বিদ্যার্থীগণের পক্ষে মধ্যম সময়।

বৃশ্চিকলগ্ন

বেতন বৃদ্ধি. ব্যয়াধিক্য, যকৃৎ ও রক্তঘটিত পীড়া, সাহিত্যচর্চ্চায় সাফল্য, অসতর্ক মুহূর্ত্তে কোন কাগজপত্রে স্বাক্ষরের জন্যে দুর্ভোগ, সৌভাগ্যবৃদ্ধি, আয়বৃদ্ধি- ব্যবসায়ে লাভ। বিদ্যার্থীগণের পক্ষে শুভ সময়।

ধনুলগ্ন

সর্দ্দি প্রকোপ, বাত বেদনা, স্বজন বিয়োগ, অকারণ ব্যয়, বয়োজ্যেষ্ঠগণের সঙ্গে মতভেদজনিত অশান্তি, অর্থাগম, মাতার শরীর ভালো যাবে না, মাতৃ পীড়াদি কষ্ট, ধন সঞ্চয়ের চেষ্টা, পিতৃস্থান শুভ নয়। বিদ্যার্থীগণের পক্ষে কিঞ্চিৎ অশুভ।

মকরলগ্ন

দেহভাব শুভ নয়। ব্যয়বৃদ্ধিজনিত আর্থিক অস্বচ্ছন্দতা, সহোদর ভাবের অশুভ ফল, আয়বৃদ্ধি হোলেও সঞ্চয়ের আশা কম। মাতৃভাব মধ্যম, দাম্পত্য সুখের অভাব। বিদ্যার্থীগণের পক্ষে শুভ।

কুম্ভলগ্ন

দেহভাব শুভ, আয়বৃদ্ধি, ধনসঞ্চয়, রোমান্টিক পরিবেশ, স্ত্রীলোকের দ্বারা প্রলুব্ধ হবার সম্ভাবনা, যৌন উত্তেজনা, সাংসারিক অশান্তি—কর্ম্ম ভাব শুভ—কর্ম্মোন্নতির যোগ আছে। বিদ্যাথাগণের পক্ষে আশানুরূপ সাফল্য ঘটবে না।

মীনলগ্ন

পীড়া ও ভয়, ধনাগম, প্রণয়ের যোগাযোগ, অসবর্ণ বিবাহের সম্ভাবনা, ভাগ্যলাভ, আয়বৃদ্ধি, উদ্বেগ ও দুশ্চিন্তা। বিদ্যার্থীগণের পক্ষে আশানুরূপ নয়।

ভারত-চীন বিরোধ—

গত কয় মাস যাবৎ ভারতবর্ষকে নানা বিপদের মধ্য দিয়া দিনযাপন করিতে হইতেছে। তন্মধ্যে চীন কর্তৃক ভারত আক্রমণ সর্বাপেক্ষা প্রধান সমস্যার বিষয়। বহুশত বৎসর ধরিয়া চীনের সহিত ভারতের মিত্রতা ছিল। বর্তমান কম্যুনিষ্ট-চীন শক্তি ও অর্থের অহঙ্কারে তাহার দক্ষিণস্থ দেশগুলিকে গ্রাস করিতে উদ্যত। চীনারা তিব্বতে প্রবেশ করিয়া সে দেশের বহু লোককে হত্যা করিয়াছে—তথায় অশান্তির সৃষ্টি করিয়াছে ও শেষ পর্য্যন্ত তিব্বতের তথা সমগ্র বৌদ্ধ জগতের ধর্মগুরু দালাইলামাকে তিব্বত হইতে ভারতে পলাইয়া আসিতে বাধ্য করিয়াছে। তিব্বত দখল করিয়া সে নেপাল, ভুটান, সিকিম প্রভৃতি ছোট ছোট দেশগুলি দখল করিতে উদ্যত। তৎপূর্বে সে ভারত আক্রমণ করিয়াছে। ভারতের উত্তরে সাড়ে ৪ হাজার মাইল সীমান্ত হিমালয় পর্বত। সে সেই সীমান্তের ধারে আসিয়া সৈন্য সমাবেশ করিয়াছে—ঐ সীমান্ত বৃটিশ "ম্যাকমোহন লাইন" নাম দিয়াছিল—চীন সে সীমান্তে আক্রমণ চালাইয়া কয়েকটি স্থানে ভারত রাজ্যে প্রবেশ করিয়াছে। কাশ্মীরের অন্তর্গত ল্যাডাকে সে প্রবেশ করিয়া ভারতীয় রক্ষীদলের কয়েকজনকে হত্যা করে ও অপর কয়েকজনকে ধরিয়া লইয়া যায়। শেষ পর্য্যন্ত সে মৃত রক্ষীদের শবগুলি ফিরাইয়া দিয়াছে ও ধৃত ব্যক্তিগণকে ছাড়িয়া দিয়াছে। তাহা ছাড়া উত্তরপ্রদেশ, নেফা (উত্তর-পূর্ব সীমান্ত প্রদেশ) প্রভৃতিতে এবং ভুটান ও সিকিমের কয়েক স্থানে বলপূর্বক প্রবেশ করিয়া পররাজ্য দখল করিয়াছে। ভারতের প্রধানমন্ত্রী শ্রীজহরলাল নেহরু পঞ্চশীল নীতি প্রচার করিয়া জগতের সকল জাতিকে যুদ্ধ হইতে নিবৃত্ত থাকিতে অনুরোধ করিতেছেন। জগতের সকল বড় বড় শক্তি শ্রীনেহরুর প্রস্তাবে সম্মতি দিয়াছেন। আমেরিকার যুক্তরাজ্যের সহিত রুশিয়ার দীর্ঘকালব্যাপী মতের ও মতের অমিল ছিল। শ্রীনেহরুর চেষ্টায় তাহা দুর হইয়াছে এবং সোভিয়েট রুশিয়ার বর্তমান নেতা মঃ ক্রুশ্চেভ সম্প্রতি আমেরিকায় যাইয়া সেখানকার নেতা মিঃ আইসেনহাওয়ারের সহিত কয়েকদিন একত্র বাস করিয়া আসিয়াছেন—তাহার ফলে মঃ ক্রুশ্চেভ জগতের সকল জাতিকে যুদ্ধাস্ত্র নষ্ট করিয়া ফেলিতে উপদেশ দিতেছেন। চীন কর্তৃক ভারত আক্রমণের সংবাদ পৃথিবীর সর্বত্র প্রচারিত হওয়ায় একদিকে মিঃ আইসেনহাওয়ার যেমন ভারতকে তাহার এই বিপদে সর্বপ্রকার সাহায্যদানের প্রতিশ্রুতি দিয়াছেন, অন্যদিকে তেমনই মঃ ক্রুশ্চেভ তাহার বন্ধু চীনকে তাহার এই অন্যায় কার্য্যের জন্য নিন্দা করিয়াছেন ও এই কার্য্য বন্ধ করিতে বলিয়াছেন। ভারত এখনও বৃটিশ কমনওয়েলথ গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত আছে—কাজেই বৃটেনও ভারতের এই বিপদে ভারতকে সাহায্য করিতে অগ্রসর হইয়াছে। কিন্তু শ্রীনেহরু সকলকে জানাইয়া দিয়াছেন যে ভারতের সামরিক প্রস্তুতি বা শক্তি কম নহে, প্রয়োজন হইলে ভারত তাহার নিজের জনবল ও অস্ত্রশস্ত্র দ্বারা চীনকে বাধা দিতে পারিবে—সেজন্য সে অপরের সাহায্যের মুখাপেক্ষী হইবে না। আজও সে তাহা করে নাই—কারণ ভারত বিশ্বাস করে যে বর্তমান যুগে আণবিক অস্ত্রের দ্বারা যুদ্ধ আরম্ভ হইলে জগতের ধ্বংস অবশ্যম্ভাবী। যে ভারত গত ১০ বৎসর ধরিয়া যুদ্ধ-বিরোধী নীতি প্রচার করিয়াছে, সেই ভারতের পক্ষে—একেবারে অনিবার্য্য না হইলে, যুদ্ধে লিপ্ত হওয়া সঙ্গত হইবে না। সে জন্য তাহার সকল শক্তি থাকা সত্বেও সে চীনের সহিত আপোষ করিতে চাহে এবং শ্রীনেহরুর বিশ্বাস, চীন যে অন্যায় করিয়াছে, তাহা তাহাকে ঠিকভাবে বুঝাইতে পারিলে, চীনের নেতা চো-এন-লাই অবশ্যই ভারত আক্রমণে বিরত হইবেন। শ্রীনেহরুর সহিত চীন নেতার যে পত্রালাপ হইয়াছে, সেগুলি প্রকাশিত হইয়াছে এবং চীন এখন ভারতের সহিত আপোষ আলোচনা করিতে সম্মত হইয়াছে। তবে যে সকল সর্তের কথা চীন প্রকাশ

করিয়াছে, শ্রীনেহরু সে সকল সর্ত মানিয়া লন নাই এবং এ বিষয়ে উভয় নেতার মধ্যে এখনও পত্রালাপ চলিতেছে। এ সময়ে ভারতবাসী জনসাধারণের কর্তব্য সম্বন্ধে শ্রীনেহরু সকলকে সতর্ক করিয়া দিয়াছেন। প্রয়োজন হইলে শ্রীনেহরু যে চীনের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইবেন অর্থাৎ চীন ভারতের যে সকল স্থান বলপূর্বক দখল করিয়াছে, সে সকল স্থান হইতে সে যদি চলিয়া না যায়, তাহা হইলে ভারতবর্ষ বলপ্রয়োগ দ্বারা চীনাদিগকে সে সকল স্থান হইতে তাড়াইয়া দিবে—সে কথা শ্রীনেহরু সকলকে জানাদিয়াছেন। সে জন্য ভারতবাসীকে তিনি প্রস্তুত থাকিতেও উপদেশ দিয়াছেন। ভারত স্বাধীনতা লাভের পর দেশরক্ষার ব্যবস্থা করিয়াছে বটে, কিন্তু এখনও কোন আক্রমণাত্মক যুদ্ধ করে নাই—প্রয়োজন হইলে যে সে তাহা করিবে না—কেহ যেন এরূপ ভুল না বুঝেন—বার বার শ্রীনেহরু এ কথা ঘোষণা করিয়াছেন। যদিও আমরা বিশ্বাস করি ভারত-চীন বিরোধের সুমীমাংসা হইবে, তথাপি দেশবাসী সকলকে দেশরক্ষার জন্য প্রস্তুত থাকিতে অনুরোধ করি এবং প্রয়োজন হইলে দেশের স্বাধীনতা রক্ষার জন্য সকলপ্রকার ত্যাগে ও কৃচ্ছ্রসাধনে প্রবৃত্ত হইবার জন্য প্রস্তুত থাকিতে বলি। দেশের সর্বত্র আন্দোলন করিয়া ভারতের সকল অধিবাসীকে ভারতের এই বিপদে অবহিত করা আজ শিক্ষিত ও চিন্তাশীল ভারতবাসীর প্রধান ও প্রথম কর্তব্য।

পাকিস্তান সীমান্ত সমস্যা—

পাকিস্তানের নেতা জেনারেল আইউব খাঁর সহিত ভারতের নেতা শ্রীজহরলাল নেহরুর সাক্ষাতের পর হইতে ভারত-পাকিস্তান-সীমান্ত সমস্যার সমাধান আরম্ভ হইয়াছে। এতদিন ধরিয়া পাকিস্তানে কোন স্থায়ী শাসন ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত না হওয়ায় পাকিস্তানীরা প্রায়ই ভারত সীমান্ত আক্রমণ করিত। একটির পর একটি প্রধান-শাসক নিযুক্ত ও তাড়িত হইয়াছে—কাজেই কেহ কোন স্থায়ী ব্যবস্থায় মন দিতে পারেন নাই—ফলে দেশের মধ্যে অরাজকতা বাড়িয়া চলিয়াছিল। শেষ পর্য্যন্ত সমগ্র পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানে সামরিক শাসন প্রবর্তিত হয় এবং বর্তমানে সেই সামরিক শাসন ব্যবস্থা দেশের মধ্যে সর্বত্র শান্তি ও শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠা করিতে সমর্থ হইয়াছে। বর্তমান নেতা আইউব খাঁ আভ্যন্তরীণ শান্তি প্রতিষ্ঠার পরই ভারতের সহিত বিরোধ মিটাইতে অগ্রসর হইয়াছেন। সে বিষয়ে বহু স্থানে বহু আলাপ আলোচনা হইয়াছে এবং তাহার ফলে পাকিস্তান বলপূর্বক দখল করা টুকের-গ্রাম নামক স্থানটি ভারতকে ফিরাইয়া দিয়াছে। পূর্ব পাকিস্তানের চারিদিকে উভয় পক্ষের কর্তারা উপস্থিত হইয়া সীমান্ত-রেখা স্থির করিতেছেন। যে সকল স্থানে চর ও বন-জঙ্গল লইয়া প্রায়ই যুদ্ধ হইত, সে সকল স্থানই প্রথমে চিহ্নিত করিয়া ভবিষ্যত বিরোধের কারণ দূর করা হইতেছে। পাকিস্তানের রাজসাহী ও ভারতের মুর্শিদাবাদ জেলার সীমান্ত লইয়া বহু বিতর্কের পর উভয় দেশ নিজ নিজ এলাকা বুঝিয়া লইতেছেন। পাথারিয়া জঙ্গল লইয়া দীর্ঘকালের বিবাদ মিটিয়াছে—তথায় উভয় পক্ষ আপোষ করিয়া নিজ নিজ এলাকা বুঝিয়া লইয়াছেন। সাতক্ষীরা-বসিরহাট সীমান্তেও আপোষ হইয়া গিয়াছে। এখন আশা করা যায় যে সর্বাপেক্ষা বড় সমস্যা কাশ্মীর সীমান্ত লইয়াও একটা আপোষ করা সম্ভব হইবে। চীন কর্তৃক ভারত ও পাকিস্তান আক্রমণ উভয় দেশকে এই আপোষ আলোচনায় প্রবৃত্ত করিয়াছে। কাশ্মীরের একটা অংশ গত ১২ বৎসর ধরিয়া ভারত দখল করিয়া আছে—কিন্তু আর একটা অংশ —ভারত বা পাকিস্তান কাহারও দখলে নাই। তাহা স্বাধীন কাশ্মীর বলিয়া পরিচিত। সে স্থানে গত ১২ বৎসরেরও অধিককাল কোনরূপ স্থায়ী শাসন ব্যবস্থা নাই সে জন্য সে অঞ্চলের অধিবাসীদের কোন উন্নতির ব্যবস্থা হয় নাই। এ কথা সর্বজনবিদিত যে ভারত যেভাবে তাহার দেশকে উন্নতির পথে লইয়া গিয়াছে, পাকিস্তানে অন্ত-বিবাদের ফলে তথায় সে ভাবে উন্নয়ন ব্যবস্থা করা সম্ভব হয় নাই। ভারতের অন্তর্গত কাশ্মীর রাজ্যে গত ১২ বৎসরে যে ভাবে বিপুল অর্থ-ব্যয় করিয়া শুধু দেশ রক্ষার ব্যবস্থা করা হয় নাই—ঐ অংশের সকল প্রকার উন্নয়নব্যবস্থা সাফল্যমণ্ডিত হইয়াছে, কাশ্মীরের বাকী অংশটুকুতে তাহার কিছুই করা সম্ভব হয় নাই—ঐ অঞ্চল ১২ বৎসর পূর্বে যেরূপ ছিল, এখনও সেইরূপই আছে। ঐ অঞ্চলের একদল অধিবাসী যেমন সর্বদা ঐ অঞ্চলকে ভারতীয় কাশ্মীরের সহিত সংযুক্ত করিতে চেষ্টা করিয়াছে, অন্য একদল তেমনই নিজেদের স্বার্থ ও প্রাধান্য বজায় রাখার জন্য সে চেষ্টায় বাধা দান করিয়াছে। তাহারা

পাকিস্তান কর্তৃপক্ষকেও ঐ অঞ্চলে তাহাদের প্রভুত্ব প্রতিষ্ঠা করিতে দেয় নাই। এই ভাবে ঐ অঞ্চল এতদিন অনুন্নত হইয়া পড়িয়া আছে। এখন নেতা আইউব খাঁ সে সমস্যার সমাধানে অগ্রসর হইয়াছেন। তাহা ছাড়া ভারত পাকিস্তান ব্যবসা-বাণিজ্য সম্বন্ধে কোন স্থায়ী ব্যবস্থা বা চুক্তি না থাকার ফলে পাকিস্তানের বহু উৎপন্ন দ্রব্য ক্রেতার অভাবে নষ্ট হইয়া গিয়াছে—ফলে উৎপাদন ব্যবস্থায় লোকের আগ্রহ কমিয়া গিয়াছে। বর্তমানে স্থায়ী বাণিজ্য চুক্তি হওয়ায় এক দিকে যেমন পাকিস্তানের উৎপন্ন দ্রব্য অধিক পরিমাণে ভারতে প্রবেশ করিতেছে, অন্যদিকে ভারতের বহু দ্রব্য পাকিস্তানে যাওয়ায় সেখানে সে সকল জিনিষের দাম কমিয়া গিয়াছে ও লোক চা, চিনি, সরিষার তৈল, কাপড় প্রভৃতি নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিষ সুলভে ও প্রচুর পরিমাণে পাইয়া লাভবান হইতেছে। ভারতেও পাকিস্তান হইতে ডিম, মাছ, তরিতরকারী প্রভৃতি প্রচুর পরিমাণে আমদানী হওয়ায় লোক উপকৃত হইতেছে। পূর্ব-পাকিস্তানের সহিত আসাম, বিহার, পশ্চিমবঙ্গ, আগরতলা, মণিপুর প্রভৃতির ব্যবসা-বাণিজ্য প্রভৃতির যে সম্বন্ধ পূর্বে ছিল, তাহা পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হইলে সকল অঞ্চলের অধিবাসীদের শুধু খাদ্য-বস্ত্র সমস্যার সুসমাধান হইবে না—সকল দেশের আর্থিক অবস্থাও উন্নতি লাভ করিবে। পাকিস্তানে উৎপন্ন কৃষিজাত ও কুটীর-শিল্পজাত জিনিষ-পত্র ভারতে আমদানী বন্ধ থাকায় পাকিস্তানে বহু লোক আর্থিক দুর্দশায় পতিত হইয়া পাকিস্তান ছাড়িয়া চলিয়া আসিতে বাধ্য হইয়াছে। ব্যবসা যদি ভাল চলে, তবে বহু লোক আবার পাকিস্তানে ফিরিয়া যাইবে ও তাহার ফলে ভারত ও পাকিস্তান উভয়েই লাভবান হইবে। আসাম, পশ্চিম বাংলা প্রভৃতি রাজ্যের লোকসংখ্যার চাপ কমাইতে না পারিলে ঐ সকল রাজ্যের সর্বাঙ্গীণ উন্নতি বিধান কোন দিনই সম্ভব হইবে না। পাকিস্তান-নেতা আইউব খাঁ যে আজ এ সকল বিষয়ে অবহিত হইয়াছেন, তাহা শুধু পাকিস্তানবাসীদের পক্ষে নহে,ভারতবাসীদের:পক্ষেও আশা ও আনন্দের বিষয়।

অতিবৃষ্টির পর—

সমগ্র পশ্চিমবঙ্গ বিশেষ করিয়া এই রাজ্যের ৯টি জেলা গত অতিবৃষ্টি ও বন্যার ফলে যে পরিমাণ ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে, তাহা যেমন মর্মন্তুদ, তেমনই অসাধারণ। অক্টোবরের কয়েকদিনও বৃষ্টি চলিয়াছে, তাহার পর একমাস কাল বৃষ্টি বন্ধ হইলেও জলমগ্ন স্থানগুলি এখনও জলশূন্য হয় নাই। পশ্চিমবঙ্গ সরকার এবং পশ্চিমবঙ্গের জনসাধারণ দুর্গত মানুষের দুঃখ দূর করিবার জন্য যথেষ্ট চেষ্টা করা সত্বেও দুঃখের শতকরা কত ভাগ আমরা দূর করিতে সমর্থ হইয়াছি, তাহা জানি না। মানুষের ব্যক্তিগত ক্ষতির পরিমাণ স্থির করা কখনই সম্ভব হইবে না—কিন্তু ব্যক্তিগত ক্ষতি ছাড়াও জাতির যে ক্ষতি হইয়াছে, তাহার পরিমাণ কম নহে। বহু পথ নষ্ট হইয়াছে, পুল ভাঙ্গিয়া গিয়াছে, স্কুল ঘর পড়িয়া গিয়াছে, শস্যক্ষেত্রে বালি পড়িয়া তাহা কৃষির অযোগ্য হইয়াছে, জলপথ বন্ধ হইয়া গিয়াছে—এই ক্ষতির পরিমাণও কয়েক কোটি টাকা হইবে। মুখ্য-মন্ত্রী ডাঃ বিধানচন্দ্র রায় কেন্দ্রীয় সরকারের নিকট অর্থ-ভিক্ষা করিয়া আনিয়া এ সকল অভাব পূর্ণ করিবার চেষ্টার ত্রুটি করেন নাই। যে সকল পরিবার বন্যার ফলে গৃহহীন হইয়াছে, তাহাদের গৃহ নির্মাণের জন্য অর্থ সাহায্য বা ঋণ দিবার ব্যবস্থা হইতেছে। স্কুলগৃহগুলি নূতনভাবে অধিকতর কার্য্যোপযোগী করিয়া পুনর্নির্মাণের ব্যবস্থা হইতেছে। কৃষকগণ যাহাতে ধানের জমিতে অধিক পরিমাণে রবিশস্য, সব্‌জী ও আলুর চাষ করিতে পারে, সেজন্য কৃষিঋণ, বীজ, সার প্রভৃতি সরবরাহের চেষ্টা চলিতেছে। বহু বেসরকারী প্রতিষ্ঠান এ সকল কার্য্যেও অগ্রসর হইয়াছেন। বন্যাপ্লাবিত অঞ্চলের সদ্যজাত শিশু ও তাহাদের জননীগণকে রক্ষা করার জন্য ইণ্ডিয়ান রেডক্রস সোসাইটীর নেতা শ্রীসুরেশচন্দ্র রায় তাহাদের প্রত্যেকের জন্য স্বতন্ত্র-ভাবে বিছানা, কম্বল, জামা, খাদ্য প্রভৃতি দানের ব্যবস্থা করিয়াছেন। গত প্রায় ৩ মাস ধরিয়া (সেপ্টেম্বর হইতে নভেম্বর) সর্বত্র বিনামূল্যে চাল, কাপড়, বিছানা, কম্বল, দুধ প্রভৃতি অন্যান্য খাদ্য ব্যাপকভাবে বিতরণের ও কম-মূল্যে বিক্রয়ের ব্যবস্থা হইয়াছিল। তাহার পর চাষের কাজে উৎসাহ দানের সঙ্গে সঙ্গে টেষ্ট রিলিফ—অর্থাৎ রাস্তা প্রভৃতির নির্মাণের দ্বারা সরকারী অর্থে কাজ করাইয়া পারিশ্রমিক দেওয়ার কাজ আরম্ভ হইতেছে। গত কয়বৎসর ধরিয়া যে ভাবে সামান্য সরকারী সাহায্য দিয়া দরিদ্র পরিবারগুলিকে "নিজের বাড়া নিজে তৈয়ার

কর" নীতিতে গৃহনির্মাণ করিয়া দিবার ব্যবস্থা চলিয়াছে, এবারে তাহা আরও ব্যাপকভাবে করার ব্যবস্থা হইতেছে। ইট তৈয়ারীর জন্য কয়লা, গৃহের দরজাজানালা তৈয়ারীর জন্য কাঠ, ছাদের জন্য টিন, গাঁথনীর জন্য সিমেণ্ট প্রভৃতি সরকার হইতে ঋণস্বরূপ দিয়া গৃহস্থগণকে নিজ নিজ বাসগৃহ নির্মাণে উৎসাহ দানই ঐ নীতির অন্তর্গত কাজ। বহুস্থানে ঐ নীতিতে কাজ করিয়া বহু বাসগৃহ নির্মিত হইয়াছে। এতদিন টেষ্ট রিলিফে যেমন পথ তৈয়ার করা হইয়াছে, এবার তেমনই খাল-খনন ও সংস্কার এবং প্রয়োজনমত নদীনালা সংস্কার কাজ করা প্রয়োজন। বহু সরকারী অর্থ ব্যয়িত হয় বটে, কিন্তু পরিতাপের বিষয় তাহার সুব্যয় অপেক্ষা অধিক অপব্যয় দেখিয়া আমরা বিস্মিত হই। ইহার প্রতীকারে সরকার কেন সচেষ্ট হন না, তাহা আমরা বুঝিতে পারি না। সরকারী কর্ত্তৃপক্ষের সকল কাজে শিথিলতা আজ জাতীয় জীবনকে সর্বত্র কলুষিত করিতেছে। বন্যাত্রাণ ও সাহায্য ব্যাপারে এইরূপ দুর্নীতি দেখিয়া আমরা জাতির ভবিষ্যত সম্বন্ধে শঙ্কিত হইয়া থাকি। চাল বিতরণ করিতে যাইয়া কি সরকারী, কি বেসরকারী কর্মীরা বহুস্থানে চাউল বেশী দামে বিক্রয় করিয়া সে অর্থ আত্মসাৎ করিয়াছে, এ সংবাদ শুনিলে সত্যই লজ্জায় মাথা হেঁট করিতে হয়। বর্তমানে কর্তৃপক্ষ গত বন্যার কারণ অনুসন্ধানের জন্য ব্যবস্থায় প্রবৃত্ত হইয়াছেন—কিন্তু এই অনুসন্ধানের পর কি তদন্তকারীদের নির্দেশমত সরকার কাজ করিবেন? এ বিষয়ে সকলেই সন্দেহ প্রকাশ করেন। তাহা যাঁহারা বন্ধ করিতে পারেন না, তাঁহারা কি করিয়া নূতন করিয়া নূতন ব্যবস্থা দ্বারা দেশবাসীর উপকার করিতে অগ্রসর হন তাহা আমাদের বুদ্ধির অগম্য। শ্রীজহরলাল নেহরু পশ্চিমবাংলায় অতিবৃষ্টি ও বন্যায় দুর্দশাগ্রস্ত স্থান দেখিতে আসিয়া সর্বাগ্রে নদী সংস্কারে সকলকে অবহিত হইতে উপদেশ দিয়াছেন। বন্যার পর আমরা যেখানে গিয়াছি, সেখানেই শুনিয়াছি, নদীর মধ্যে ১০।১৫ ফিট পলিমাটী জমিয়া থাকায় নদীপথে অধিক জল সমুদ্রে চলিয়া যাইতে পারে না—ঐ জল নদীতীরবর্তী স্থানগুলিকে ভাসাইয়া দেয়। অতি সত্বর নদীর মধ্য হইতে ঐ পলিমাটী সরাইবার ব্যবস্থা করা না হইলে ভবিষ্যতে প্রতিবৎসর ভাগীরথী, দামোদর, অজয় প্রভৃতি বড় বড় নদীর তীরবর্ত্তী জনপদ ও শস্যক্ষেত্রগুলি জলে ডুবিয়া মনুষ্যবাসের অনুপযুক্ত হইয়া যাইবে। বর্তমান বৎসরেই (১৯৫৯—৬০) সেজন্য এ বিষয়ে কার্য্যারম্ভ করা প্রয়োজন। ভাগীরথী নদীর জল প্রবেশ করিয়া বারাকপুরের মত শিল্পাঞ্চলসহ সহরতলীও যে জলমগ্ন হইয়া যাইতেছে ও দেশ সামগ্রিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হইতেছে, কাজেই এ বিষয়ে আর কালবিলম্ব না করিয়া অবহিত হওয়া প্রয়োজন। দেশবাসীরও এজন্য প্রবল আন্দোলন করিয়া সরকারকে একাজে অগ্রসর হইতে বাধ্য করা কর্তব্য। বন্যা ও অতিবৃষ্টি আমাদের যে শিক্ষা দিয়া গেল, তাহার পরিপ্রেক্ষিতে যদি আমরা দেশের ভবিষ্যত বিপদ নিবারণে সযত্ন না হই, তাহা হইলে দেশের ধ্বংস অবশ্যম্ভাবী ও অপরিহার্য্য হইয়া যাইবে।

শ্রীসুদর্শন—

কলিকাতা হাইকোর্টের খ্যাতনামা উকীল তারাকিশোর রায় চৌধুরী মহাশয় পরবর্তী কালে বৌদ্ধ ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়া সন্তদাস বাবাজী নামে পরিচিত হন। তাঁহার জন্মের শতবার্ষিক উপলক্ষে শ্রীবৃন্দাবনস্থ নিম্বার্ক আশ্রমের মুখপত্র ত্রৈমাসিক সাময়িকপত্র 'শ্রীসুদর্শন' শ্রীশ্রীসন্তদাস জয়ন্তী সংখ্যা প্রকাশ করিয়াছেন। পত্রখানি ঐ সংখ্যায় ১৬ বৎসর পূর্ণ হইল। ব্রহ্মচারী শিশিরকুমার ইহার সম্পাদক এবং কলিকাতা বাগবাজার ৩নং অন্নদানিয়োগী লেন হইতে উহা প্রকাশিত হয়। প্রতি সংখ্যা ১৲ টাকা, বার্ষিক মূল্য ৪৲ টাকা। গত দশহরার দিন—সন্তদাসবাবাজীর জন্ম দিন—ঐ দিনই পত্রখানি প্রকাশিত হইয়াছে। মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত শ্রীকালীপদ তর্কাচার্য্য, ডক্টর মহানামব্রত ব্রহ্মচারী, স্বামী সত্যানন্দ সরস্বতী, কবি শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক, ডক্টর শ্রীকালীকিঙ্কর সেনগুপ্ত, ব্রজবিদেহী মহান্ত শ্রীপ্রেমদাস, ডক্টর রমা চৌধুরী, স্বামী প্রত্যগাত্মানন্দ সরস্বতী প্রমুখ বহু মনীষী এই সংখ্যায় সন্তদাসবাবাজীর কথা লিখিয়াছেন। এক যুগে বাবাজী মহারাজ ভারতের ধর্ম জীবনে নূতন প্রবাহ আনয়ন করিয়াছেন—আজ তাঁহার কথা স্মরণ করা প্রয়োজন। কাজেই শ্রীসুদর্শনের এই সংখ্যার বহুল প্রচার কামনা করি।

পাট ও পীঠ

শ্রী'শ'—

খবরাখবর ঃ

প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়ের ছোট গল্প অবলম্বনে সত্যজিৎ রায় তাঁর নতুন চিত্র "দেবী"র কাজ অর্দ্ধেকের ওপর শেষ করে ফেলেছেন। ছবি বিশ্বাস, শর্মিলা ঠাকুর, সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়, করুণা বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতি প্রধান ভূমিকাগুলিতে অভিনয় করছেন। আর সঙ্গীত পরিচালনায় আছেন আলী আকবর খাঁন।

* * *

সঙ্গে সন্ধ্যারাণীও অনেক কাল পরে আবার এই ছবিতে আত্মপ্রকাশ করেছেন। চিত্রটি শীঘ্রই মুক্তিলাভ করবে।

* * *

মালা প্রডাকসন্স-এর প্রথম চিত্র "দুই বেচারা"-ও শীঘ্রই মুক্তি পাবে। কালী বন্দ্যোপাধ্যায়, অনুপকুমার, বাসবী নন্দী ও সন্ধ্যা রায়কে প্রধান ভূমিকায় এবং কমল মিত্র, তুলসী চক্রবর্ত্তী, জহর রায় প্রভৃতিকে অন্যান্য ভূমিকায় দেখা যাবে।

* * *

ভারত ও রাশিয়ার মধ্যে একটি চুক্তির ফলে সোভিয়েট কাঁচা ফিল্ম শীঘ্রই এ দেশে পাওয়া যাবে। যতদিন না ভারত তার নিজের চাহিদা অনুযায়ী কাঁচা ফিল্ম এ দেশে তৈরী করতে পারছে ততদিন তার বাহিরের থেকে ফিল্ম আমদানি করা ছাড়া উপায় নেই, তাই ফিল্ম আমদানির

'শুভ বিবাহ' কথাচিত্রে তৃপ্তি মিত্র

নীহাররঞ্জন গুপ্তর সাফল্যমণ্ডিত নাটক "মায়ামৃগ"কে-এমকেজি প্রডাকসন্স চিত্রে রূপায়িত করেছেন। উত্তমকুমার, ছবি বিশ্বাস, বিকাশ রায়, সুনন্দা দেবী, প্রভৃতির

এই নতুন পথ খুলে যাওয়ায় চিত্র প্রযোজক মাত্রেই উৎসাহিত হয়েছেন।

* * *

দেশে-বিদেশে ঃ

এবারকার লণ্ডন ফিল্ম ফেস্‌টিভ্যালে ব্রিটিশ ফিল্ম ইন্‌সটিটিউটের পৃষ্ঠপোষক ডিউক্ অব্ সাদারল্যাণ্ড কর্তৃক প্রদত্ত "Sutherland Trophy"টি সত্যজিৎ রায় পরিচালিত বাংলা চিত্র "অপুর সংসার"-কে দেওয়া হয়েছে। "অপুর সংসার" দেখবার জন্ত দর্শকদের টিকিটের চাহিদা এত বেশী হয় যে অধিক রাত্রেও তিনবার প্রদর্শনের ব্যবস্থা করতে হয়। উল্লেখযোগ্য যে এর আগে "পথের পাচালী" ও "অপরাজিত"-ও এখানে ব্যবসায়িক ভিত্তিতে প্রদর্শিত হয়েছে। * * * *

আগামী গ্রাম্মকালে লণ্ডনের National Film Theatre-এ ভারতীয় চলচ্চিত্রের একটি মরসুম আরম্ভ করার উদ্যোগ হচ্ছে। British Film Institute তাঁদের National Film Theatre. Club-এ চিত্র দেখতে প্রায় প্রতিদিনই আগত সভ্যদের জন্ত ভারতীয় চিত্রগুলির একটি তালিকা প্রস্তুত করছেন যাতে করে দীর্ঘ-দিন ধরে ভারতীয় চিত্র দর্শকদের দেখান সম্ভব হয়। ভারতীয় চিত্র প্রযোজক ও পরিচালকরা যাঁরা এ বৎসর লণ্ডনে গমন করেছেন তাদের কাছ থেকেও নির্দেশ ও মতামত নেওয়া হয়েছে এবং এখনই প্রায় আটাশটি চিত্র তালিকায় স্থান লাভ করেছে। চিত্রগুলি এক বা দুই মাস ধরে প্রদর্শিত হবে।

* * * *

ছায়াচিত্র পরিষদের 'রাজা সাজা'-য় বিকাশ রায়

বিদেশী খবর ঃ

ব্রিটিশ চলচ্চিত্র প্রতিষ্ঠান Rank Organisation ও মস্কোর মধ্যে একটি চুক্তির ফলে চারটি ব্রিটিশ চিত্র রাশিয়ায় প্রদর্শিত হবে। চিত্রগুলি হচ্ছে :—চার্লস ডিকেন্স-এর "Great Expectation, Gregory Peck অভিনীত "The Million Pound Note", "Hell Drivers" এবং "Mandy", আর এগুলির বদলে Rank Organisation ও কয়েকটি রাশিয়ান চিত্র পরিবেশন করবেন।

* * * *

জার্মান রকেটের বিষয় দেখান হবে। Wehrncr Von Braun পরে এর আরও উন্নতি সাধন করেন।

পশ্চিম জার্মানীর ষ্টুডিওগুলিতে অনেক স্বল্প দৈর্ঘ্যের চিত্রও নির্মিত হচ্ছে। এইগুলি থেকে পশ্চিম জার্মানীর যন্ত্র-শিল্পের প্রভূত উন্নতি ও টেক্‌নোলজিক্যাল্ পারদর্শিতার পরিচয়ও পাওয়া যাবে।

* * * *

ব্রিটিশ ফিল্ম সেন্সর ছাড়পত্র না দিলেও পূর্ব্ব-জার্মানীর ডকুমেণ্টারী চিত্র "A Diary for Anne" লণ্ডনে প্রদর্শিত হবে লণ্ডন County Counsil-এর বিশেষ অনুমতিতে।

মুক্তিপ্রতিক্ষীত 'প্রবেশ নিষেধ' বাণীচিত্রে নমিতা সিন্হা

পশ্চিম জার্মানীর Goettingen, Hamburg, Munich, West Berlin প্রভৃতি স্থানের ষ্টুডিওগুলিতে এখন প্রচুর চিত্র নির্ম্মিত হচ্ছে। Munich-এ একটি বিশেষ চিত্রও নির্ম্মিত হয়েছে। এই চিত্রটি ভূতপূর্ব্ব জার্মান রকেট বিশেষজ্ঞ Wehrner Von Braun-এর জীবনী অবলম্বনে রচিত হয়েছে। Munich-ই Von Braun-এর জন্মস্থান। চিত্রে পঁচিশ বৎসর আগের প্রথম

Nazi Secret Police-এর কাগজ-পত্র অবলম্বনে এবং Anne Frank নামক একটি ইহুদি মেয়েকে হল্যাণ্ড থেকে চালান দেওয়ার ব্যাপার নিয়েই এই প্রামাণ্য চিত্রটি রচিত হয়েছে। Anne Frank-এর ডায়রী—যাতে সে তার জীবনের ঘটনাবলী বিবৃত করেছে তাই অবলম্বনে হলিউড থেকেও একটি চিত্র নির্ম্মিত হয়েছে। এই চিত্রটি শীঘ্রই কলিকাতাতেও প্রদর্শিত হবে। পূর্ব্ব-জার্মানীর ঐ প্রামাণ্য

চিত্রটিতে যে কন্‌সেন্‌ট্রেসন্‌ ক্যাম্পে Anne-র মৃত্যু হয়েছিল সেই ক্যাম্পের পরিচালনা ব্যাপারে জড়িত এমন তিনটি ব্যক্তিকে দেখান হয়েছে যাঁরা এখনও জীবিত আছেন। ব্রিটিশ ফিল্ম সেন্সরের নিয়ম অনুযায়ী জীবিত ব্যক্তিদের অবমাননাকর কোনও চিত্রকে ছাড়পত্র দেওয়া হয়না। তাই এই প্রামাণ্য চিত্রটিকে ছাড়পত্র দেওয়া হয় নি।

* * * *

বিশ্ব-লাইটওয়েট্‌ বক্সিং চ্যাম্পিয়ন্‌ Archie Lee Moore চিত্রাভিনেতারূপেও বিখ্যাত হবার উদ্যোগ করছেন। M-G-M নির্মিত Mark Twain-এর একটি গল্পের এক পলাতক নিগ্রো ক্রীতদাস 'Jim'-এর ভূমিকায় Archie Moore-কে নেওয়া হয়েছে। স্ক্রীন্‌ টেষ্টে Moore অভাবনীয় সাফল্যলাভ করেছে বলে প্রযোজক Sam Goldwyn Junior জানিয়েছেন।

মা চিত্রমের আবার 'ভোর হবে' চিত্রে বাণী গাঙ্গুলী, সমরকুমার ও বেবী টুলটুল

সম্পাদনা ঃ শ্রীপ্রদীপ চট্টোপাধ্যায়

সুধাংশুশেখর চট্টোপাধ্যায়

অষ্ট্রেলিয়ায় ক্রিকেট খেলা ও বর্ত্তমান অষ্ট্রেলিয়া দল

অষ্ট্রেলিয়া ক্রিকেট খেলায় নিঃসন্দেহে আজ শ্রেষ্ঠ স্থান অধিকার করেছে। সেখানে এই খেলার জনপ্রিয়তা ও প্রসার লক্ষ্য করলেই বোঝা যায় কেমন করে এই উন্নতি সম্ভব হয়েছে। ক্রিকেট্ আজ অষ্ট্রেলিয়ার জীবন যাত্রার একটি অপরিহার্য্য অংশ বিশেষ। Sydneyতে প্রথম ক্রিকেট্ খেলা লিপিবদ্ধ করা হয় ১৮০৩-০৪ সালে। সেই সময় থেকে এখন পর্য্যন্ত এই খেলার সবিশেষ উন্নতি সাধন করা হয়েছে। ১৭৮৮ সালে যাঁরা জাহাজে করে প্রথম এই নূতন দেশে আসেন তাঁরা তাঁহাদের দ্রব্যসামগ্রীর সাথে সাথে এই মনোরম খেলাটির প্রয়োজনীয় উপকরণগুলিও এখানে নিয়ে আসেন। সেজন্য ১৮০৩-০৪ সালের পূর্ব্বেও যে এখানে ক্রিকেট খেলা হয়েছিল সে বিষয়ে সন্দেহের আর বিশেষ অবকাশ নেই।

অষ্ট্রেলিয়ায় ক্রিকেট খেলার প্রসার কিরূপ তা অনুমান করা যায় সেখানকার রেজিষ্টার্ড খেলোয়াড়দের সংখ্যা থেকে। বর্ত্তমানে ১০,০০০,০০০ অষ্ট্রেলিয়াবাসীর মধ্যে ৩,৩০,০০০ জন হচ্ছেন রেজিষ্টার্ড ক্রিকেট খেলোয়াড়, এঁরা অনুমোদিত বাৎসরিক প্রতিযোগিতাগুলিতে অংশ গ্রহণ করেন। এর থেকে দেখা যায় জনসংখ্যার প্রতি ৩০ জনের মধ্যে ১ জন হচ্ছেন রেজিষ্টার্ড ক্রিকেট খেলোয়াড়। ইহা ছাড়া হাজার হাজার খেলোয়াড় আছেন যাঁরা রেজিষ্টার্ড নন, এঁরা ফ্যাক্টরী, ওয়ার্কশপ, অফিস টীম প্রভৃতির হ'য়ে নিয়মিত প্রীতি খেলায় অংশ গ্রহণ করেন।

ক্রিকেটের 'টেষ্ট' খেলার সূচনা ধরা হয় ১৮৭৬ সালের Lillywhiteএর ইংলিস টীমের অষ্ট্রেলিয়া সফর থেকে। যদিও ১৮৬৮ সালে একটি অষ্ট্রেলিয়া দল ইংলণ্ডে খেলতে যায়। সরকারীভাবে সমর্থিত টেষ্ট খেলার তারিখ যাই হ'ক না কেন, ক্রিকেট খেলোয়াড়দের বাইবেল, উইসডেন, খুললে টেষ্ট খেলায় অষ্ট্রেলিয়ার প্রাধান্যই দেখা যায়। ইংলণ্ড ও অষ্ট্রেলিয়ার মধ্যে টেষ্ট খেলায় অষ্ট্রেলিয়া জিতেছে ৭৪টি, হেরেছে ৬২টি, আর অমীমাংসিত হয়েছে ৪২টি খেলা।

সাউথ আফ্রিকার বিরুদ্ধে জিতেছে ২৭টি টেষ্ট, হেরেছে ৩টি, আর অমীমাংসিত হয়েছে ৯টি খেলা।

ওয়েষ্ট ইণ্ডিজের বিরুদ্ধে ১১ টেষ্টে জয়ী হয়েছে। পরাজিত হয়েছে মাত্র ২টি, আর অমীমাংসিত হয়েছে ২টা খেলা।

পাকিস্থানের সঙ্গে ২টি টেষ্ট খেলেছে (এব্যারকার ঢাকা 'টেষ্ট' নিয়ে) ১টিতে পরাজিত হয়েছে, আর ১টি খেলায় জয়ী হয়েছে।

ভারতবর্ষের বিরুদ্ধে ৮টি টেষ্ট খেলায় ৬টি খেলায় জিতেছে, আর ২টি খেলা অমীমাংসিতভাবে শেষ হয়েছে। একটী খেলাতেও পরাজিত হয় নি।

১৯৫৯-৬০ সালের ভারত-পাকিস্থান সফরে অষ্ট্রেলিয়ান

রিচি বেনড্

২৯ বৎসর বয়স্ক Sydney-র সাংবাদিক রিচি বেনড্ বর্ত্তমানে ভারত-পাকিস্থান সফর-রত অষ্ট্রেলিয়া দলের অধিনায়ক। নিউ সাউথ ওয়েলসের ছোট্ট Jugiong সহরের একটি গুদাম ঘরের কংক্রিটের দেওয়ালে ক্রিকেট-বল্ পিটে পিটে বেনড্ প্রথম ক্রিকেট শিক্ষা করেন। এঁর পিতা লু, বেনড্ও একজন কৃতী খেলোয়াড়—ইনি Emu Plains-এর বিরুদ্ধে খেলায় উভয় ইনিংসে ১০টি করে উইকেট লাভ করেন (প্রথম ইনিংসে ৩০ রাণে ১০, আর দ্বিতীয় ইনিংসে ৩৫ রাণে ১০ উইকেট)।

রিচি বেনড্ যদিও উচ্চস্তরের ক্রিকেট খেলায় প্রথমে বোলার হিসাবে নাম করেন কিন্তু এঁর ব্যাটিংওফিল্ডিং এত ভাল যে—এঁকে বর্ত্তমানকালের শ্রেষ্ঠ চৌকশ খেলোয়াড়দের মধ্যে একজন বলে গণ্য করা হয়। রিচি, বাম্ হাতে লেগ্ স্পিন বল্ করেন ও ডান্‌হাতে আক্রমণাত্মক ব্যাটিং করেন। ১৯৫৪-৫৫ সালের ওয়েষ্ট ইণ্ডিজ সফরে ইনি টেষ্টে ৭৮ মিনিটে ১০০ রাণ করেন (এই খেলায় ইনি ১২১ রাণ করেন)। টেষ্ট খেলার ইতিহাসে সর্ব্বাপেক্ষা দ্রুত সেঞ্চুরিগুলির মধ্যে এটি অন্যতম। ফিল্ডিং-এ বেনড্ যে কোন জায়গায় দক্ষতার সঙ্গে ফিল্ড করতে পারেন। তবে Silly mid-on-এ ফিল্ড করতেই ভালবাসেন। এই জায়গায় ইনি ব্যাটসম্যানের এত কাছে দাঁড়ান যে মনে হয় যেন ব্যাটসম্যানের গায়ে এঁর নিঃশ্বাস পড়ছে। বেনড্ ১৯৫১ সালে ওয়েষ্ট ইণ্ডিজের বিরুদ্ধে প্রথম টেষ্ট খেলেন। তখন থেকে ১৯৫৮-৫৯ সাল পর্য্যন্ত তিনি ৩৭টি টেষ্ট খেলায় তাঁর দেশের প্রতিনিধিত্ব করেছেন। তিনি ১৩০টিরও অধিক উইকেট দখল করেছেন ও ১১৩০ এরও অধিক রাণ করেছেন। ১৯৫৮-৫৯ সালে এম, সি, সির বিরুদ্ধে তিনি প্রথম অধিনায়ক মনোনীত হন। তাঁহার অধীনে অষ্ট্রেলিয়া দল 'এ্যাসেজ' পুনরুদ্ধার করে এবং শক্তিশালী ইংলণ্ড দলকে সম্পূর্ণরূপে পরাজিত করে। ৫টি টেষ্ট ম্যাচের মধ্যে অষ্ট্রেলিয়া ৪টিতে জয়ী হয় আর একটি হয় অমিমাংসিত। এই ৫টি টেষ্টে বেনড্ ৫৮৪ রাণে ৩১টি উইকেট দখল করেন এবং ৫টি ইনিংসে মোট ১৩২ রাণ করেন। বর্ত্তমান ভারত সফরে তাঁর দল যে ভাল করবে সে সম্বন্ধে তিনি সুনিশ্চিত। বেনড্ বলেছেন "১৯৫৬ সালে ভারত সফরে আমরা ২টি টেষ্টে জয়ী হই আর বাকি ১টী হয় অমীমাংসিত। কিন্তু জেতবার জন্য আমাদের যথেষ্ট শ্রম স্বীকার করতে হয়। ১৯৫৯-৬০ সালে আরও অধিক বাধার সম্মুখীন হব আশা করছি। ভারতীয়েরা নিপুণ খেলোয়াড়। ১৯৫৬ সালের পরাজয়ের প্রতিশোধ নিতে তাঁরা ব্যগ্র থাকবে।"

দলটি নিম্নলিখিত পনের জন খেলোয়াড় নিয়ে গঠিত। আর, বেনড (অধিনায়ক); এন্, হার্ভে (সহ-অধিনায়ক); এ, ডেভিডসন; এন্, ও'নীল এবং জি, রোর্কে (নিউ সাউথ ওয়েলস); আর, লিণ্ডওয়াল; কে ম্যাকে; পি, বার্জ এবং ডবলিউ গ্রাউট্ (কুইন্সল্যাণ্ড); সি, ম্যাক্‌ডোনাল্ড; এল্, ক্লাইন; আই, মেকিফ্ (ভিক্টোরিয়া); এল্, ফ্যাভেল; বি, জার্মান; এবং জি, ষ্টিভেন্স (সাউথ অষ্ট্রেলিয়া)। এই দলের ম্যানেজার হচ্ছেন এস, জে, লক্সটন্ ইনি ভিক্টোরিয়ার পার্লামেণ্টের একজন সদস্য এবং প্রাক্তন টেষ্ট খেলোয়াড়। এই দলের ২নং উইকেট-কিপার বেরী জার্মাণ ও ওপ্‌নিং ব্যাটসম্যান গেভিন ষ্টিভেন্স ব্যতীত অপর সকল খেলোয়াড়েরই টেষ্ট খেলার অভিজ্ঞতা আছে। ২২ বৎসর বয়স্ক ও'নীল এবং রোর্কে হচ্ছেন দলের সর্বকনিষ্ঠ খেলোয়াড় আর ৩৮ বৎসর বয়স্ক অভিজ্ঞ লিণ্ডওয়াল হচ্ছেন বয়োজ্যেষ্ঠ। এই দলের এ্যাভারেজ বয়স হচ্ছে ২৮ বৎসর ৩ মাস।

ইতিপূর্ব্বে আমরা দলের অধিনায়ক বেনড্, লিণ্ডওয়াল, হার্ভে, বার্জ, ম্যাকে এবং ম্যাক্‌ডোনাল্ডকে ১৯৫৬ সালে বম্বে, কলিকাতা ও মাদ্রাজ টেষ্টে দেখেছি। নূতন খেলোয়াড়দের মধ্যে দলের অন্যতম শ্রেষ্ঠ ব্যাট্‌সম্যান ২২ বৎসর বয়স্ক নরমান ও'নীলের খেলা দেখার জন্য সকলেই উদ্‌গ্রীব। এই ও'নীলকে বিল্ ও'রেলী "another Bradman" বলে অভিহিত করেছেন। ১৯৫৭-৫৮ সালে ইনি অষ্ট্রেলিয়ার সেফিল্ড শীল্ডের (আন্ত-রাজ্য প্রতিযোগিতা) খেলায় একই মরশুমে এক হাজারের উপর রান করেন। এঁর বয়স তখন ২০ বৎসর। আর মাত্র দু'জন খেলোয়াড় এই কৃতিত্বের অধিকারী—সার ডন্ ব্রাড্‌ম্যান এবং উব্‌লিউ, এইচ, পন্সফোর্ড।

নিম্নে ১৯৫৮-৫৯ সালে ইংলণ্ডের বিরুদ্ধে টেষ্ট খেলায় বর্ত্তমানে ভারত-পাকিস্থান সফর-রত অষ্ট্রেলিয়া দলের খেলোয়াড়গণের ব্যাটিং ও বোলিং এর তুলনামূলক তালিকা দেওয়া হ'ল।

ব্যাটিং

	টেষ্ট	ইনিংস	নট আউট	সর্বোচ্চ রাণ	রাণ সমষ্টি	গড়পড়তা
ম্যাক্‌ডোনাল্ড	৫	৯	১	১৭০	৫২০	৬৫
ও'নীল	৫	৭	২	৭৭	২৮২	৫৬'৪
হার্ভে	৫	৯	৩	১৬৭	২৯১	৪৮'৫
ফ্যাভেল	২	৩	১	৫৪	৭৩	৩৬'৫
ডেভিড্‌সন	৫	৫	—	৭১	১৮০	৩৬
বেনড্	৫	৫	—	৬৪	১৩২	২৬'৪
ম্যাকে	৫	৫	—	৫৭	১১৮	২৩'৬
গ্রাউট	৫	৬	—	৭৪	১১৯	১৯'৮
লিণ্ডওয়াল	২	২	—	১৯	১৯	৯'৫
মেকিফ্	৪	৪	—	৫	৯	২'২
বার্জ	১	১	—	২	২	২
[illegible]	২	২	২	৪	৫	—
রোর্কে	২	২	২	২ (নট্ আউট্)	২	—

অষ্ট্রেলিয়া দলের সর্বকনিষ্ঠ খেলোয়াড় নর্ম্যান ও'নীল। আক্রমণাত্মক খেলায় বিশেষ দক্ষ। ১৯৫৭-৫৮ সালে অষ্ট্রেলিয়ার 'ইন্টার ষ্টেট' প্রতিযোগীতায় ব্যাটিং ও বোলিং উভয় বিষয়েই শীর্ষ স্থান অধিকার করেন। Bill O'Really, ও'নীলকে "another Bradman" বলেছেন।

আয়ান মেকিফ্‌,—দীর্ঘ দেহী নেটা ফাষ্ট বোলার (২৪)। ৮টি টেষ্টে (১৯৫৯-৬০ সালের সফরের পূর্ব্বে) অষ্ট্রেলিয়ার হ'য়ে খেলেছেন। গত মরশুমে ইংলণ্ডের বিরুদ্ধে বোলিং-এ শীর্ষ স্থান অধিকার করেন।

৩১ বৎসর বয়স্ক অষ্ট্রেলিয়া দলের সহ-অধিনায়ক নেল্‌ হার্ভে। ৫৭টি টেষ্ট খেলায় অষ্ট্রেলিয়ার প্রতিনিধিত্ব করেছেন (বর্ত্তমান পাকিস্থান সফর ধরা হয় নাই।)

বোলিং

	ওভার	মেডেন	রাণ	উইকেট	গড়পড়তা
মেকিফ্	১১২'২	২৪	২৯২	১৭	১.৭১
বেনড্	২৩৩'২	৬৫	৫৮৪	৩১	১৮.৮
ডেভিড্সন	১৮৩'৫	৪৫	৪৫৬	২৪	১৯
রোর্কে	৭০'৫	১৭	১৬৫	৮	২০.৬
মাকে	৪৫	১৪	৭৯	৩	২৬.৩
লিণ্ডওয়াল	৬৬	১০	২০৯	৭	২৯.৮
ক্লাইন	২৫	৬	৭৭	০	—
ও'নীল	২	১	৮	০	—

পূর্ব্বে প্রকাশিত হইয়াছে :

টেনিস—এস, জে, ম্যাথুজ……আশ্বিন সংখ্যা

ফুটবল—উমাপতি কুমার…… কার্তিক সংখ্যা

আগামী সংখ্যায় :

ক্রিকেট সম্বন্ধে লিখবেন—

শ্রীকার্তিক বসু

খেলা-ধূলার কথা

শ্রীক্ষেত্রনাথ রায়

অষ্ট্রেলিয়া বনাম পাকিস্তান টেষ্ট ক্রিকেট ঃ

পাকিস্তান : ২০০ (হানিফ মহম্মদ ৬৬, ডানকান শার্প ৫৬। ডেভিডসন ৪২ রাণে ৪, বেনড ৬৯ রাণে ৪ উইকেট) ও ১৩৪ (ডানকান শার্প ৩৫। ম্যাক্‌কে ৪২ রাণে ৬, বেনড ৪২ রাণে ৪ উইকেট)

অষ্ট্রেলিয়া ঃ ২২৫ (নীল হার্ভে ৯৬, গ্রাউট ৬৬। ফজল মামুদ ৭১ রাণে ৫, নাসিমুল ঘানি ৫১ রাণে ৩ উইকেট) ও ১১২ (২ উইকেটে)

ঢাকায় অনুষ্ঠিত অষ্ট্রেলিয়া বনাম পাকিস্তান দলের প্রথম টেষ্ট খেলায় অষ্ট্রেলিয়া ৮ উইকেটে পাকিস্তানদলকে পরাজিত করে।

অষ্ট্রেলিয়া টসে জয়ী হয়। কিন্তু প্রথমে ব্যাট না ক'রে পাকিস্তানকে ব্যাট করতে দেয়। অষ্ট্রেলিয়ার অধিনায়ক বেনডের উদ্দেশ্য ছিল, 'Coir matting' উইকেটের স্বভাবটা স্বচক্ষে দেখে নেওয়া। প্রথম দিনের খেলায় ৪ টে উইকেট পড়ে পাকিস্তানের ১৪৬ রাণ ওঠে। দলের সর্ব্বোচ্চ রাণ করেন হানিফ—তাঁর ৬৬ রাণ তুলতে ৪ ঘণ্টার বেশী সময় লাগে।

খেলার ২য় দিনে পাকিস্তানের ১ম ইনিংস ২০০ রাণে শেষ হয়। পাকিস্তানের বাকি ৬টা উইকেটে পূর্ব্বদিনের রাণের সঙ্গে মাত্র ৫৪ রাণ যোগ হয়। অষ্ট্রেলিয়ার খেলার সূচনা মোটেই ভাল হয়নি। দলের কোন রাণ না উঠতেই একটা উইকেট পড়ে যায়। তারপর ভাঙণ দেখা দেয় ৫৩ রাণের মাথায় দুটো উইকেট পড়ে। হার্ভের ভাল খেলার দরুণই শেষ পর্য্যন্ত অষ্ট্রেলিয়া সামলে নেয়। ২য় দিনের খেলায় অষ্ট্রেলিয়ার ১২৫ রাণ ওঠে ৫টা উইকেট পড়ে। হার্ভে ৮০ রাণ ক'রে নট-আউট থাকেন।

খেলার ৩য় দিনে অষ্ট্রেলিয়ার ১ম ইনিংস ২২৫ রাণে

শেষ হ'লে অষ্ট্রেলিয়া মাত্র ২৫ রাণের ব্যবধানে এগিয়ে যায়। পাকিস্তানের ২য় ইনিংসের খেলা মোটেই সুবিধার হ'ল না—৪টে উইকেট পড়ে ৭৪ রাণ উঠল। ফলে পাকিস্তান ৪৯ রাণে এগিয়ে গেল হাতে ৬টা উইকেট নিয়ে। অষ্ট্রেলিয়ার পক্ষে জয়লাভের পথ অনেকখানি পরিস্কার হয়ে গেল।

খেলার ৪র্থ দিনে পাকিস্তানের ২য় ইনিংস ১৩৪ রাণে শেষ হয়ে যায়। এদিনের বাকী ৬টা উইকেটে পাকিস্তান মাত্র ৬০ রাণ তুলে। এইদিন অষ্ট্রেলিয়া ২য় ইনিংসের খেলায় ১টা উইকেট হারিয়ে ৬৩ রাণ করে। এ অবস্থায় জয়লাভের জন্যে অষ্ট্রেলিয়ার আর মাত্র ৪৬ রাণ দরকার—হাতে জমা ৯টা উইকেট।

খেলার ৫ম দিনে জয়লাভের প্রয়োজনীয় ৪৮ রাণ তুলতে অষ্ট্রেলিয়াকে ৬৫ মিনিট খেলতে হয়; আর একটা উইকেট হারাতে হয়। অষ্ট্রেলিয়া ৮ উইকেটে জয়লাভ করে।

ভারতীয় হকি দল ঃ

ইউরোপ সফরে ভারতীয় হকিদল ১৮টি খেলায় যোগদান করে; ফলাফল দাঁড়িয়েছে ভারতীয় দলের পক্ষে জয় ১৪, ড্র ৩ এবং হার ১। খেলার এই ফলাফল থেকেই ভারতীয় দলের প্রাধান্য প্রমাণিত হয়। কিন্তু ইউরোপ সফরে ভারতীয় হকি দলের খেলার ফলাফল কোন কোন মহলে চিন্তার কারণ হয়েছে। গত ৩০ বছরের আন্তর্জাতিক হকি খেলায় ভারতীয়দল যে অটুট প্রাধান্য বজায় রেখে এসেছিল এবারের ইউরোপ সফরে ভারতীয় দলের প্রথম পরাজয়ে তা কিছুটা ক্ষুণ্ণ হয়েছে। দলের ম্যানেজার বলেছেন, তা স্বত্তেও ভারতীয় হকি এখনও ক্রীড়াপদ্ধতি, বল নিয়ন্ত্রণ এবং ষ্টীক চালনার কলা-কৌশলে ইউরোপীয় খেলার থেকে অনেক উন্নত এবং দর্শনীয়। ইউরোপ সফরে একটা খেলায় পরাজয় এবং একাধিক খেলা ড্র হওয়ার কারণ স্বরূপ বলা হয়েছে, সেখানের মাঠের মাটি নরম এবং জলসিক্ত। মাঠ অসমতল এবং ঘন ঘন ঘাসে পরিপূর্ণ। তা ছাড়া হকি খেলার কোন কোন আইনের ব্যাখ্যা সেখানের আম্পায়ারগণ ভিন্ন ভাবে ক'রে থাকেন। ইউরোপে গায়ের উপর জোর দিয়ে খেলার যে অভ্যাস আছে তা সেখানকার আম্পায়ারদের চোখে মোটেই বে-আইনী গণ্য হয় না।

ভারতীয় হকি দলের খেলায় যে সব দুর্ব্বলতা ধরা পড়েছে সে সম্পর্কে দলের কোচ, প্রাক্তন অলিম্পিক হকি খেলোয়াড় ধ্যানচাঁদ তাঁর বিবৃতিতে আলোচনা করেছেন। আশা করি জাতীয় সম্মান রক্ষায় হকি-কর্তৃপক্ষ মহল অনুশীলনের ব্যবস্থা ক'রে দলের এই দুর্ব্বলতাগুলি সংশোধন করবেন।

শ্রীকৃষ্ণ গোল্ড কাপ ঃ

পাটনায় অনুষ্ঠিত শ্রীকৃষ্ণ গোল্ড কাপ ফুটবল প্রতি-যোগিতার ফাইনালে গত বছরের বিজয়ী কলকাতার মহমেডান স্পোর্টিং ক্লাব ২-০ গোলে পাটনা এ্যাথলেটিক এসোসিয়েশনদলকে পরাজিত করে।

জাতীয় সন্তরণ প্রতিযোগিতা ঃ

বোম্বাইয়ে অনুষ্ঠিত জাতীয় সন্তরণ প্রতিযোগিতায় সার্ভিসেস দল এবছরও পুরুষ বিভাগে প্রথম স্থান লাভ করে। মোট ৬টি বিষয়ে নতুন জাতীয় রেকর্ড স্থাপিত হয়েছে। সুইমিং ফেডারেশন অব্ ইণ্ডিয়ার অনুমোদিত ১২টি সংস্থা এ বছরের প্রতিযোগিতায় যোগদান করে।

সংক্ষিপ্ত ফলাফল :

পুরুষ বিভাগ : ১ম সার্ভিসেস (১০৪ পয়েণ্ট), ২য় বোম্বাই (৪০), ৩য় বাংলা (১১), ৪র্থ মহারাষ্ট্র (৪), ৫ম কেরালা (৩)।

মহিলা বিভাগ : ১ম বাংলা (২৯), ২য় বোম্বাই (২৪), ৩য় মহারাষ্ট্র (৮)।

জাতীয় ব্রিজ চ্যাম্পিয়ানসীপ ঃ

বোম্বাইয়ে অনুষ্ঠিত জাতীয় ব্রিজ প্রতিযোগিতায় হায়দ্রাবাদ অপরাজেয় অবস্থায় চ্যাম্পিয়ানসীপ লাভ করেছে। হায়দ্রাবাদ মোট ৬টা খেলার মধ্যে ৪টাতে জয়ী হয়, ২টো খেলা ড্র করে। বাংলা দল রানার্স-আপ হয়েছে ৮ পয়েণ্ট করে। বাংলা ৩টাতে জয়ী হয়, হারে ১টা, ড্র করে ২টো খেলা।

জাতীয় সন্তরণ প্রতিযোগিতায় প্রতিষ্ঠিত নতুন রেকর্ড ঃ

বিষয়	রেকর্ড সময়	
১,৫০০ মিটার ফ্রি ষ্টাইল	২০মিঃ ২২.৫ সেঃ	রামসিং (সার্ভিসেস)
৪০০ মিটার ফ্রি ষ্টাইল	৫মিঃ ০৯.১ সেঃ	রামসিং (সার্ভিসেস)
১০০ মিটার ব্রেষ্ট ষ্ট্রোক	১মিঃ ১৭.৩ সেঃ	রামদেও সিং (সার্ভিসেস)
২০০ মিটার ব্রেষ্ট ষ্ট্রোক	২মিঃ ৪৭.৯ সেঃ	রামদেও সিং (সার্ভিসেস)
৪×১০০ মিটার ফ্রি ষ্টাইল রীলে	৪মিঃ ১৯.৯ সেঃ	বোম্বাই দল
৪×২০০ মিটার ফ্রি ষ্টাইল রীলে	১০মিঃ ৫.৩ সেঃ	সার্ভিসেস দল

দিল্লী ক্লথ মিলস ফুটবল ট্রফি ঃ

দিল্লীতে অনুষ্ঠিত ১৯৫৯ সালের ফাইনালে হায়দ্রাবাদ সেণ্ট্রাল পুলিশ ১-০ গোলে মাদ্রাজ ইঞ্জিনিয়ার গ্রুপকে পরাজিত করে।

গৃহ-কপোত

শ্রীআশুতোষ সান্যাল

হস্ত দন্ত অবিশ্রান্ত
বাঁচিবার তরে যুঝে,
আজ সন্ধ্যায় একা গৃহকোণে
পড়ে আছি চোখ বুঁজে।
আছে বটে দেহ—নাহি তা'য় প্রাণ,
বাঁচা আর মরা সকল সমান !—
শ্রান্ত হৃদয় কি যেন পরম
শান্তি মরিছে খুঁজে !
ভালো নাহি লাগে প্রতিদিন সেই
এক ঘেঁয়ে মুখগুলি,
আর সেই পচা রদ্দি রাবিশ—
ছক-বাঁধা ক'টি বুলি।
গরুর গাড়ীর চাকার মতন
একটানা পথে চলেরে জীবন—
সারাটি প্রহর ক্যাঁচর ক্যাঁচর
বেসুর আওয়াজ তুলি !'
বাঁচার তাগিদে ভুলে গেছি যেন
মানুষের মতো বাঁচা,
কাছাটিরে কভু কোঁচা ব'লে ভাবি,
কোঁচাটিরে কভু কাছা !

নয়নের জলে জীবনের ঋণ
এইরূপে শুধে চলি প্রতিদিন ;—
আমারে ঘেরিয়া রহে সংসার—
তপ্ত লোহার খোঁচা।
এই গৃহ—হেথা এতো যে শান্তি—
কে জানিত বলো আগে,
এ যেন আমায় জড়ায় বক্ষে
বন্ধুর অনুরাগে !
এতো দিন আমি ছিনু পরবাসী,
আজি তাই স্মরি' আঁখি জলে ভাসি ;
আহা, এতোকাল খুঁজিয়াছি আম
তিক্ত নিমের শাখে !
রক্ত-ঝরানো জীবন-যুদ্ধ—
ক্ষত বিক্ষত হিয়া,
তাই পড়ে আছি ভাঙা বুক ভরি'
শত পরাজয় নিয়া।
গৃহ-পারাবত—উড়িতে না চাই,
কুলায়ে বসিয়া শুধু গান গাই ;—
ক্লান্ত এ পাখা কেন অকারণ
মরি শুধু প্রসারিয়া !

শ্রীশ্রীভগবান্‌নাম মহিমা—শ্রীশ্রীসীতারামদাস ওঙ্কার নাথ

হুগলী কলেজের ইংরাজি সাহিত্যের অধ্যাপক ভক্তিমান শ্রীমনোজ কুমার চট্টোপাধ্যায় এই গ্রন্থের ভূমিকায় লিখিয়াছেন—"শ্রীশ্রীসীতারামদাস ওঙ্কারনাথ মহারাজ শাস্ত্রসমূহ মন্থন করিয়া শ্রীনারায়ণ নাম মাহাত্ম্য সম্বন্ধে শাস্ত্রোক্ত মন্ত্ররাজি জগৎ কল্যাণের জন্য উদ্ধার করিয়া লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। * * মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যদেবের পর বাংলায় ধর্মজগতে একাকারে মহাযোগী, মহাপ্রেমিক ও মহাদার্শনিকের সমন্বয় আমরা আর এমনটি প্রত্যক্ষ করি নাই।"

সীতারামদাস বর্তমান যুগে ধর্মহীন মানব সমাজে নাম প্রচার করিয়া মানুষকে ধর্মপথে আনয়ন করিতেছেন—ইহা কলিযুগের মানুষেরকম সৌভাগ্যের কথা নহে। গত বৎসর ৪ মাসেরও অধিক কাল মগরায় বাস করিয়া তিনি জনগণকে নামমন্ত্রে দীক্ষাদান করিয়াছেন। বর্তমান সময়ে মধ্যভারতে ওঙ্কারেশ্বর মঠে থাকিয়া ঐ অঞ্চলের জনগণের মধ্যে হরিনাম প্রচারকরিয়াছেন। তাঁহার আশ্রমে ২৪ ঘণ্টা নাম কীর্তন চলে—সেই নাম মহিমার কথা তিনি অসংখ্য শাস্ত্র হইতে বচন উদ্ধার করিয়া প্রচারের ব্যবস্থা করিয়াছেন। এই গ্রন্থ অবশ্যই সর্বত্র আদৃত হইবে।

[প্রাপ্তিস্থান—দেবযান কার্য্যালয়, মগরা পোঃ, জেলা হুগলী। মূল্য এক টাকা।]

শ্রীফণীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়

শাশ্বতিক—বসুধারা

গ্রন্থের ভূমিকায় লেখক রচনার উদ্দেশ্য ও বিষয়বস্তুর উপর যথেষ্ট আলোকপাত করেছেন। তাঁর এই উপন্যাস নিছক মনগড়া কাহিনী-গঠিত সাধারণ উপন্যাস নয়। Discovery of India" ও Geography from the History of the world প্রভৃতি বই পড়ে তিনি গভীর প্রেরণা লাভ করেছেন। সাধারণ পাঠক পাঠিকার কাছে ভারত সন্ধানের বিরাটত্ব' প্রকাশ করতে চাইলেন, পৃথিবীর ইতিহাসের সঙ্গে তাদের পরিচিত করার আগ্রহ জাগল তাঁর। তাই তিনি রচনা করলেন এ উপন্যাস তাঁর কাহিনীর সঙ্গে ইতিহাসের তথ্য মিশিয়ে। কিন্তু সেই তথ্যের গুরুভার তাঁর কাহিনীকে চাপা দিয়ে মেরে ফেলতে পারেনি। অশ্রু-আনন্দ মিলিয়ে রচিত কয়টি প্রেমের কাহিনীই বেশ জমে উঠেছে। সর্বোপরি লেখকের ভাষা বেশ চমৎকার। আর এ-প্রচেষ্টা সত্য সত্যই প্রশংসনীয়।

[প্রকাশক—শ্রীনৃসিংহ প্রসাদ চট্টোপাধ্যায় : হোমশিখা প্রকাশনী। কৃষ্ণনগর। মূল্য সাড়ে চার টাকা।]

স্বাধিকার—শ্রীমতিলাল দাশ

শ্রীযুক্ত দাশ সুপণ্ডিত ব্যক্তি। গল্প, উপন্যাস, কাব্য ও নাটক তিনি অনেক রচনা করেছেন।

সারা বাঙলায় ৪৬ সালের সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার তাণ্ডব সত্যই লোমহর্ষক। দাঙ্গার প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা লেখকেরমনে যে গভীর বেদনার সৃষ্টি করেছিল, সে অন্তরবেদনাই 'স্বাধিকার' উপন্যাস খানায় বাঙময় মূর্তিলাভ করেছে। ডাঃ জার্মান, মৌলভী মঞ্জুর রহমান প্রভৃতি কয়টি চরিত্রেই দাঙ্গাকারীদের নিখুঁত রূপ ফুটে উঠেছে। এদের মধ্যে নাইলা, বা এষার চরিত্র লেখকের কল্পনায় গড়া অবাস্তব রূপ। তারপর সুবোধের চরিত্র রচনাতেও লেখক বিশেষ দক্ষতা দেখাতে পারেন নি। যে সুবোধের মধ্যে লেখক স্বাধিকারের, আদর্শ সৈনিককে মূর্ত করতে চেয়েছিলেন তাকেই করেছেন দুর্বল চরিত্র। তাতে গল্প জমেছে বটে, কিন্তু গল্পের আদর্শগত মহিমা ক্ষুণ্ণ হয়েছে। তবু নিঃসংশয়ে বলা যায় পাঠকপাঠিকার কাছে 'স্বাধিকার' তার প্রাপ্য সমাদর লাভ করবে।

[প্রকাশক—শ্রীপ্রীতিরাণী দাশ। প্লট ৪৬৭ নিউ আলিপুর, কলিকাতা—৩৩। মূল্য ছয় টাকা।]

শ্রীঅরবিন্দ (জীবন কথিকা)—প্রমোদকুমার সেন

সংক্ষিপ্ত এই সংস্করণে শ্রীঅরবিন্দের জীবনের ঘটনাবলী বিবৃত হয়েছে। কলিকাতা সহরে ১৮৭২ সালের ১৫ই আগষ্ট জন্মলাভ করে তিনি পণ্ডিচেরী আশ্রমে ১৯৫০ সালের ৫ই ডিসেম্বর মহাসমাধি লাভ করেছেন। ১৯২৭ সাল থেকে ২৩ বৎসর তিনি আশ্রমের দ্বিতলের একটি কক্ষে নির্জনে বাস করিতেন। তিনি যে যোগ সাধন করিয়াছিলেন, সে তাঁর নিজের মুক্তির জন্য নয়, মানুষের তথা জগতের মুক্তির জন্য। দিব্য প্রেরণায় তিনি পণ্ডিচেরী আশ্রম গড়ে তুলেছিলেন ; ১৯১৪ সালে শ্রীমা প্রথম শ্রীঅরবিন্দকে দেখতে আশ্রমে আসেন ও যুদ্ধের সময় ফ্রান্সে চলে যান। ১৯২০ সাল থেকে তিনি আশ্রমে স্থায়ীভাবে বাস করছেন। শ্রীঅরবিন্দ জীবনের শেষ ৩০ বৎসর—বৎসরে ৪ দিন ছাড়া জনগণের সহিত দেখা করতেন না। এখন আশ্রমে শ্রীঅরবিন্দ বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার কাজ চলছে। ১৯০৮ সালে তিনি আলিপুর বোমার মামলায় ধৃত হন, এক বছর হাজত বাসের পর ১৯০৯ সালে মুক্তি পান। ঐ সময় তিনি ইংরাজি সাপ্তাহিক কর্মযোগী ও বাংলা সাপ্তাহিক ধর্ম প্রকাশ করেন ও পরে ১৯১০ সালের ৪ঠা এপ্রিল পণ্ডিচেরী চলে যান। সেখানে তিনি

আর্য নামক ইংরাজি মাসিক পত্র প্রকাশ করেন। ছোট বইখানির মধ্যে শ্রীঅরবিন্দ জীবনের সকল উল্লেখযোগ্য ঘটনা দেওয়া আছে। মূল্য লেখা নাই।

[প্রাপ্তিস্থান—শ্রীঅরবিন্দ আশ্রম, পণ্ডিচেরী, মাদ্রাজ।]

বেতালভট্ট

মনেমনে (উপন্যাস)—সত্যব্রত মৈত্র

গ্রন্থকার বাংলা সাহিত্যক্ষেত্রে নবাগত ন'ন, ইতিপূর্বে তাঁর কয়েক খানি উপন্যাস আত্মপ্রকাশ করেছে, আলোচ্য উপন্যাস খানিতে অত্যাধুনিক অভিজাত বিত্তাঢ্য সমাজের পাশ্চাত্য সভ্যতা বিকৃত নগ্ন আচার ও আচরণ, বীভৎসতা ও কুশ্রীতা রূপায়িত হয়েছে,—নানা নাটকীয় ভঙ্গী ও ঘাত প্রতিঘাতের মাধ্যমে উপন্যাসের কাহিনী করুণ ট্রাজেডিতে এসে পরিণতি লাভ করেছে,—চলচ্চিত্রের উপযোগী করবার দিকে বোধ হয় গ্রন্থকারের দৃষ্টি থাকায় সমাপ্তির পথে লীনার বাড়ী থেকে বেরিয়ে এসে সুষুপ্ত শহরের পথে পুলিশের হাতে ধরা পড়া, অখিলের ট্রেণ থেকে নেমে বাড়ী এসে কারও সাড়া শব্দ না পেয়ে দু তিনটে বাড়ীর পরেই সুধাংশু সেনের বাড়ীটার দিকে এগিয়ে লীনার ঘরের জানালার সামনে গিয়ে দাঁড়ানো এবং সঙ্গে সঙ্গে পুলিশের হাতে গ্রেপ্তার হওয়া এবং তার মা ঊষারও ঐ রাত্রে পুলিশের হাতে পথে গ্রেপ্তার এবং সকলের একই থানায় বিস্ময়কর সম্মিলন—আমাদের মনে সুবিহিত সুসমঞ্জস সৌন্দর্য্যের আলোক সম্পাত করেনা—বরং বিসদৃশ বলেই নৈরাশ্য জনক পরিস্থিতি আনে। আমাদের মনে হয় উপন্যাসের অঙ্গহানি হয়েছে আকস্মিক অসম্ভাব্য ঘটনার অবতারণা করে সমাপ্তি রেখা টেনে দেওয়াতে।

এই কাহিনীর নায়ক হচ্ছে টিনের দোচালা ঘরের দরিদ্র বাসিন্দার পুত্র অখিল, আর প্রাসাদের অধিবাসীর একমাত্র সুন্দরী দুহিতা লীলা হচ্ছে নায়িকা—পঠদ্দশায় উপরতলার মেয়ের সঙ্গে নীচের তলার ছেলের ভালোবাসা পদে পদে ব্যাহত হোতে থাকে—নানা প্রকার সমস্যার উদ্ভবে ও বিচিত্র ঘটনার ঘাত প্রতিঘাতে, মনো বিকলন ও হৃদয়াবেগের দ্বন্দ্ব সংঘাতে শেষ পর্য্যন্ত উভয়েই বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে। অসুস্থ অখিল হাওয়া বদলের জন্যে বাইরে চলে যায় এবং লীনার বিবাহ হয় যার সঙ্গে সেই সমর সেন একজন লম্পট মদ্যপ জমিদার। তার আনুগত্য স্বীকার করেও লীনা লাঞ্ছিতা নির্য্যাতিতা ও নিপীড়িতা হয়ে পিত্রালয়ে প্রত্যাবর্ত্তন করার পর উপন্যাসের কাহিনী বিশেষ গতিশীল হোতে পারলো না, সমাজ সচেতনায় অঙ্কুর উদ্‌গত হয়ে যে ভাবে ফলে পুষ্পে বিকশিত হোতে পারতো তা আর হোলোনা, হঠাৎ সমাপ্তির রেখা টেনে দেওয়া হোলো। যাহোক উপন্যাসটী নিছক প্রেমের কাহিনী নয়, এর ভেতর আদর্শ আছে আর আছে সত্যের ব্যঞ্জনা। গঠন কৌশল, ভাষার পারিপাট্য, বিষয় বস্তুর পরিবেশ ও শিল্পচাতুর্য্য গতানুগতিকতার গণ্ডী অতিক্রম করেছে বলে আমাদের মনে হয় না।

[প্রকাশক—সুবিমল মুখোপাধ্যায়: মুখার্জ্জী বুক হাউস ৫৭ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা—৬ দাম দুই টাকা।]

শ্রীঅপূর্ব্বকৃষ্ণ ভট্টাচার্য্য

আপটার কেয়ার কলোনী : শ্রীমনোতোষ চক্রবর্তী

যক্ষ্মা রোগীদের সমস্যা নিয়ে রচিত হয়েছে এ উপন্যাস। যক্ষ্মা দুরারোগ্য রোগ নয়। তবু সমাজের মানুষেরা যক্ষ্মা রোগীদের প্রতি এমন ব্যবহার করে থাকেন যা মনুষ্যোচিত নয়। এ উপন্যাস পাঠ করলে তার কিছু নমুনা মিলবে। লেখক সুনীতির চরিত্রটাকে অতিরিক্ত কুৎসিত করে ফেলেছেন। তাকে এতখানি কুৎসিত না করেও যক্ষ্মারোগগ্রস্ত সমরের দুঃখ প্রকাশ করতে পারতেন। যাই হোক এ গ্রন্থপাঠে পাঠক-পাঠিকাদের চোখ খুলবে, সমাজের উপকার হবে।

[প্রকাশক—বুক বিভ্যু, ১৯।১ হেমচন্দ্র ষ্ট্রীট, কলিকাতা—২৩। মূল্য তিন টাকা মাত্র।]

স্বপ্নবাসবদত্তা : (ভাস বিরচিত)—অনুবাদক শ্রীবামাপদ বসু

প্রাচীন ভারতের নাট্যস্রষ্টা ঋষি ভাস। তাঁর সুপ্রসিদ্ধ নাটিকা স্বপ্নবাসবদত্তাই তাঁর সর্বশ্রেষ্ঠ রচনা বলে অনেকে মনে করেন। শ্রীবামাপদ বসু এ নাটিকার বঙ্গানুবাদ প্রকাশ করে নাট্যামোদী সমাজের কৃতজ্ঞতা ভাজন হয়েছেন। অনুবাদের ভাষা বেশ চমৎকার। ছাপা ও বাঁধাই প্রশংসা যোগ্য।

[প্রকাশক—শ্রীবিজয়পদ বসু। ৪৪ বিদ্যাসাগর ষ্ট্রীট, কলিকাতা—৯। মূল্য দুই টাকা চারি আনা।]

ল্যাম্পপোষ্ট যা বলেছে : শ্রীযতীন্দ্রনাথ বিশ্বাস

পাড়ার কাহিনী বলিয়েছেন লেখক ল্যাম্ পোষ্টের মুখ দিয়ে। এ একটা নূতন ধরণের প্রচেষ্টা।

[প্রকাশক এম সি সরকার অ্যাণ্ড সন্স প্রাইভেট লিঃ, ১৪ বংকিম চাটুজ্যে ষ্ট্রীট, কলিকাতা—১২। মূল্য দুই টাকা বার আনা।]

স্বর্ণকমল ভট্টাচার্য

সম্পাদক—শ্রীফণীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় ও শ্রীশৈলেনকুমার চট্টোপাধ্যায়

২০৩।১।১, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা, ভারতবর্ষ প্রিন্টিং ওয়ার্কস হইতে শ্রীকুমারেশ ভট্টাচার্য কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

ভারতবর্ষ

সম্পাদক—শ্রীফণীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় ও শ্রীশৈলেনকুমার চট্টোপাধ্যায়

সূচীপত্র

সপ্তচত্বারিংশ বর্ষ—প্রথম খণ্ড ; আষাঢ়—১৩৬৬—অগ্রহায়ণ ১৩৬৬

লেখ-সূচী—বর্ণানুক্রমিক